"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনা প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

মাঘ—১৩৪৬

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

গীতা-বিচার

অপরিহার্য্য কারণে "গীতা-বিচার" সন্দর্ভের পরবর্ত্তী অংশ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইতে পারিল না। আগামী সংখ্যা হইতে এই আলোচনা পুনরায় প্রকাশিত হইবে। পরবর্ত্তী আলোচনায় তর্করত্ন মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষার বিকৃত জ্ঞানের অধিকতর সাক্ষ্য উপস্থিত করা হইবে এবং প্রসঙ্গতঃ প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আলোচিত হইবে।

মনোযোগ সহকারে এই অভিভাষণ পাঠে দেখা যায় যে, মূলতঃ ইহা নিম্নলিখিত পাঁচ ভাগে বিভক্ত :—

(১) তৃতীয় বারের জন্য মিঃ সবরকর মহাসভার সভাপতিত্ব করিতে কেন স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা-সম্বলিত ভূমিকা।

(২) মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর মহাসভার আন্দোলন

সন্ধান লাভ।

মিঃ সবুরকরের ধারণাসমূহ মনুষ্যসমাজভুক্ত কোন একজনেরও ধর্ম্ম অথবা রাষ্ট্রগত প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে কি না, তাহার সন্ধানলাভার্থ আমাদিগকে "ধর্ম্ম" এবং "রাজনীতি" বলিতে কি বুঝা যায়, তৎসম্বন্ধে সুনিশ্চিত ধারণা করিয়া লইতে হইবে। আমাদের মতে, "ধর্ম্ম"

বলিতে কি বুঝা যায়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে "বিজ্ঞান" তথা "জ্ঞান" বলিতে কি বুঝা যায়, তাহারও ধারণা করিতে হইবে। আমাদের ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই তিনটি বিষয় (ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান) পরস্পর অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধযুক্ত এবং অপর দুইটির বিষয়ে ধারণা ব্যতীত ইহাদের কোন একটির বিষয়ে ধারণা করা সম্ভব হয় না। বর্ত্তমান জগতের শিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদের এই মতবাদের সহিত একমত না হইতে পারেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে, বর্ত্তমানে কোন কথার অর্থবিষয়ক ধারণা-গঠনের প্রণালীর কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নাই, সুতরাং ইহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা চলে না।

কথার অর্থবিষয়ক ধারণা গঠনের আধুনিক প্রণালীর কোন্ যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নাই, আমাদের এই কথা বলিবার কারণ এই যে, এই প্রণালী সংস্কারের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে এবং প্রায়শঃ দেখা যায় যে, একই কথা হইতে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন অর্থের ধারণা করা হইতেছে। গাণিতিক একটি অঙ্ককে যেরূপ তন্নিহিত বিভিন্ন সংখ্যা (যথা ২৫,২৫০,২০৫০ ইত্যাদি) দ্বারা বুঝিতে হয়, এবং সংখ্যা-সম্বন্ধীয় ধারণা যেরূপ কখনও বিভিন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ একটি কথা, কিংবা পদাংশ, তন্নিহিত শব্দ-সহায়ে বুঝা যাইতে পারে এবং ফলে কোন কথা বিভিন্ন অথবা পরস্পর-বিরোধী ধারণার প্রকাশক হইতে পারে না। আধুনিক জগতের ইহা অবিদিত যে, মনুষ্য, পশু ও পক্ষী প্রভৃতির ভাষা—তাহাদের মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান বলিয়া মনে হইলেও—সর্ব্বদাই প্রত্যেক ভাষার যাহা অপরিহার্য্য উপাদানস্বরূপ, সেই অ, ই, উ প্রভৃতি কয়েকটি মূল শব্দের দ্বারা গঠিত। কোন ভাষাতেই এই সকল মূলশব্দের সংমিশ্রণ এবং সংযোজন ব্যতীত কোন কথা এবং বাক্য স্থান পাইতে পারে না। যেমন, ১,২,৩ ইত্যাদি সংখ্যার একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থ বর্ত্তমান এবং এই সকল সংখ্যার বিভিন্ন সংস্থাপন বিভিন্ন সংখ্যা ও বিভিন্ন ধারণা দান করে, তেমনই অ, ই, উ প্রভৃতি মূল শব্দেরও এক একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থ বর্ত্তমান এবং এই সকল মূল শব্দের বিভিন্ন সংস্থাপন বিভিন্ন কথা ও বিভিন্ন ধারণা গঠন করে। মূল শব্দসমূহের সংযোজনের প্রকৃতিসঙ্গত বিধি এবং মূল শব্দসমূহের সংযোজনা-উদ্ভূত কথার ধারণাগঠন-প্রণালী লইয়াই "ভাষানিহিত শব্দ-বিজ্ঞান।" এই বিজ্ঞান প্রাচীন ঋষি, তথা প্রাচীন-কালের অপরাপর মনীষিবর্গের সম্পূর্ণ অধিগত ছিল এবং এই বিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়াই বেদ, বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ রচিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, বর্ত্তমানকালের মনুষ্যজাতি এই প্রাচীন বিজ্ঞান সম্পূর্ণ-রূপে বিস্মৃত হইয়াছে এবং এই জন্যই বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ তাহাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান এবং জ্ঞান, এই তিনটি কথার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা ভাষানিহিত শব্দবিজ্ঞানের উপর গঠিত।

ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও জ্ঞানের সংজ্ঞা

এতদ্বিষয়ক বর্ত্তমান আলোচনায় অবশ্য লক্ষণীয় যে, আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে "মানবধর্ম্ম", "মানববিজ্ঞান" এবং "মানবজ্ঞানে"র ব্যাখ্যা এবং মনুষ্য ব্যতীত অপর কোন জীবের এতদ্বিষয়ক আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, মনুষ্যজাতির ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও জ্ঞানের কি অর্থ, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, "মনুষ্য" কথাটির মূলগত অর্থ কি, তৎসম্বন্ধেও আমাদিগকে ধারণা লাভ করিতে হইবে। মনুষ্যজাতির অবয়ব এবং চলা-ফেরা যথাবিহিতভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রধানতঃ দুই প্রকারে কার্য্যশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি একপক্ষে যেরূপ কতিপয় শরীর-গঠন-মূলক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শরীর-বিধান-মূলক ক্রিয়াসম্বলিত, তেমনই অপর পক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তিরই আবার বোধ এবং বিচারশক্তি এবং অনুভূতি বর্ত্তমান যে, সে মাত্র কয়েকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং কয়েকটি শারীর ক্রিয়া দ্বারা গঠিত। হইতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীর-ক্রিয়া, তথা, কি করিয়া যে তাহারা কার্য্যকরী হয়, বিকাশ লাভ করে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে এবং অভ্রান্তভাবে জানে না, কিন্তু মনুষ্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এমন একটি ব্যক্তিকেও পাওয়া যাইবে না, যাহার অপরিজ্ঞাত যে, সে কয়েকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীর-ক্রিয়া-সমন্বিত। কোন ব্যক্তিকে অধিকতর বিশ্লেষণে অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে, মনুষ্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীর ক্রিয়ার মূলে দুই প্রকার উপাদান বর্ত্তমান, একটি দৃশ্য অথবা ব্যক্ত, অপরটি অদৃশ্য অথবা অব্যক্ত।

আরও দেখা যাইবে যে, যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীর ক্রিয়ার কার্যকে দৃশ্য এবং অদৃশ্য দুই প্রকারে বিভাগ করা যায়, তেমনই মনুষ্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীর ক্রিয়াকেও আবার দুইটি প্রধান বিভাগে ফেলা যায়, যথা, দৃশ্য অথবা ব্যক্ত এবং অদৃশ্য অথবা অব্যক্ত।

মনুষ্য ও অপরাপর জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শারীর-ক্রিয়া বিষয়ে অধিকতররূপে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যের এবং জীবদেহের ব্যক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শারীর ক্রিয়া যেমন পরস্পরসম্বন্ধবিশিষ্ট, তেমনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শারীর ক্রিয়ার অদৃশ্য অথবা অব্যক্তাংশের সহিতও উহারা সম্বন্ধবিশিষ্ট। ঠিক একই ভাবে মনুষ্যের, তথা অপর জীবদেহের অব্যক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীর ক্রিয়াসমূহ পরস্পরসম্বন্ধবিশিষ্ট এবং উহারাও দৃশ্য অথবা অব্যক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীর ক্রিয়াসমূহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট।

এই সকল বিষয়ে অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হইতে পারিলে বিজ্ঞান, জ্ঞান এবং ধর্ম্মের অর্থসম্বন্ধীয় ধারণাগঠন সুসাধ্য হইবে। যে বিদ্যা মনুষ্যের স্বদেহ এবং অপরাপর প্রত্যেক জীবদেহের বিভিন্ন দৃশ্য অথবা ব্যক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীর ক্রিয়ার প্রত্যেকটির বিষয়ে, তথা তাহাদের বিকাশ ও ক্ষয়-প্রণালীর বিষয়ে উপলব্ধির সহায়ক হয়, তাহাই "বিজ্ঞান।"

প্রকৃত বিজ্ঞান দ্বারা মনুষ্য নিম্নলিখিত বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে:—

(১) প্রত্যেকটী জীবদেহের দৃশ্য অথবা ব্যক্ত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীর ক্রিয়ার সমগ্র বিধান।

(২) জীবদেহের প্রত্যেকটি ব্যক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীর ক্রিয়া কি বিভিন্নরূপে এবং প্রণালীতে পরস্পরসম্বন্ধবিশিষ্ট, তদ্বিষয়ক সমগ্র বিধান।

(৩) জীবদেহের প্রত্যেকটি ব্যক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীরক্রিয়া কিরূপ বিভিন্ন ভাবে এবং প্রণালীতে অদৃশ্য অথবা অব্যক্তাংশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, তদ্বিষয়ক সমগ্র বিধান।

এক কথায় বিজ্ঞান বলিতে বুঝিতে হয় সেই বিদ্যা এবং উপলব্ধি, যদ্দ্বারা কোন ব্যক্তি তাহার স্বকীয় তথা অপর সকল জীবদেহের ব্যক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীর ক্রিয়ার সমগ্র বিষয় সম্পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারে।

"জ্ঞান," অথবা অন্য কথায় যাহাকে "দর্শন" বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা সেই বিদ্যা, যাহা স্বকীয় তথা অপরাপর জীবদেহের বিভিন্ন অদৃশ্য অথবা অব্যক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের এবং শারীর-ক্রিয়াসমূহের প্রত্যেকটি, তথা তাহাদের দ্বারা বিভিন্ন দৃশ্য অথবা অব্যক্তাংশের অভিব্যক্তির প্রণালীবিষয়ক উপলব্ধির সহায়ক হয়। প্রকৃত জ্ঞান অথবা দর্শন সাহায্যে মনুষ্য নিম্নলিখিত বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে:—

(১) প্রত্যেকটী জীবদেহের অদৃশ্য অথবা অব্যক্ত বিভিন্ন অংশ এবং শারীর-ক্রিয়ার সমগ্র বিধান।

(২) জীবদেহের প্রত্যেকটি অব্যক্ত অংশ এবং শারীর ক্রিয়া কি বিভিন্ন উপায়ে এবং প্রণালীতে পরস্পর-সম্বন্ধবিশিষ্ট, তদ্বিষয়ক সমগ্র বিধান।

(৩) জীবদেহের প্রত্যেকটি অব্যক্ত অংশ এবং শারীর ক্রিয়া কি বিভিন্ন উপায়ে এবং প্রণালীতে যথাক্রমে ব্যক্ত অংশ এবং শারীর ক্রিয়ার গতিবিধি এবং অভিব্যক্তির বিকাশ সাধিত করে, তদ্বিষয়ক সমগ্র বিধান।

এক কথায় "জ্ঞান" অথবা "দর্শন" দ্বারা বুঝিতে হয় সেই বিদ্যা এবং উপলব্ধি, যদ্দ্বারা মনুষ্য, তথা অপরাপর সকল জীবদেহের অদৃশ্য অংশ এবং শারীর ক্রিয়াসম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

"ধর্ম্ম" অর্থে বুঝিতে হয়, সেই বিদ্যা, যাহা একদিকে বোধশক্তি, বিচারসামর্থ্য এবং অনুভূতি এবং অন্যদিকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত অংশাদি ও শারীর ক্রিয়ার পরস্পর সম্বন্ধ উপলব্ধির সহায়তা করে। বলাই বাহুল্য যে, যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীর ক্রিয়া মনুষ্যের না থাকিত, তবে তাহার কোন প্রকার বিচারবোধ, বোধশক্তি, এবং অনুভূতিও থাকিত না। এই সত্য হইতে ধারণা করা যাইতে পারে যে, একদিকে প্রত্যেক জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীর ক্রিয়া ও অপরদিকে বিচারবোধ, বোধশক্তি, এবং অনুভূতির পরস্পর কোন সম্বন্ধ থাকিতে বাধ্য। এই সম্বন্ধের উপলব্ধি অথবা তাহার বিদ্যাই "ধর্ম্ম"। এক কথায়, ধর্ম্ম বলিতে সেই বিদ্যা এবং উপলব্ধিকে বুঝিতে হইবে, যদ্দ্বারা মনুষ্য তাহার স্বকীয়, তথা অপরাপর জীবের প্রত্যেকের "বিচার সামর্থ্য", "বোধশক্তি" এবং "অনুভূতি" সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় পরিজ্ঞাত হয়।

ধর্ম্মানুষ্ঠান এই প্রকার উপলব্ধির সহায়ক না হইলে, তাহাকে বস্তুতঃ ধর্ম্মমূলক বলা চলে না। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং মুসলমান, বর্ত্তমানের এই প্রধান চারিটি তথাকথিত ধর্ম্মমতের আধুনিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ যথাবিহিতভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের প্রত্যেকটী একদিকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শারীর ক্রিয়া এবং অপরদিকে বিচার-সামর্থ্য, বোধশক্তি এবং অনুভূতি, এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ উপলব্ধির সহায়তা করিবার জন্যই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। আরও দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমানে ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের প্রত্যেকেই ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যে-উদ্দেশ্যে ইহার উদ্ভাবন তাহা ভুলিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহ অভ্যাস করিয়া চলিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের সকলেই মনুষ্যজাতির সর্ব্বনাশের কারণ হইতেছেন।

আধুনিক ধর্ম্মোপদেষ্টারা যেরূপ মনুষ্যজাতিকে বিভ্রান্ত করিতেছেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এবং দার্শনিকগণও অনুরূপ কার্য্যই করিতেছেন।

ভাষানিহিত শব্দবিজ্ঞানের বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া প্রাচীন বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বেদ, বাইবেল এবং কোরাণ প্রভৃতি প্রত্যেকটী শাস্ত্র গ্রন্থে প্রকৃত বিজ্ঞান, তথা প্রকৃত জ্ঞান এবং প্রকৃত ধর্ম্ম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

বিজ্ঞান, জ্ঞান এবং ধর্ম্মের সংজ্ঞা বিষয়ে সঠিক ধারণা করিতে পারিলে স্বতঃই বুঝা যাইবে যে, বিজ্ঞান, জ্ঞান এবং ধর্ম্মের বিষয়ভাগ কোন লৌকিক ভাষাতেই যথাযথ ভাবে এবং অভ্রান্তরূপে প্রকাশ করা চলে না, ইহা প্রকাশ করিতে হইলে ভাষা-নিহিত শব্দ-বিজ্ঞানের মধ্যস্থতা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়। আমরা জানি না, প্রাচীন হিব্রু অথবা প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত 'পাণিনি'র অনুরূপ কোন গ্রন্থ আছে কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চিত সত্য যে, শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ, অর্থাৎ বিজ্ঞান, জ্ঞান এবং ধর্ম্মের বিষয়ভাগের প্রকৃত তাৎপর্য্যাপাঠের সাহায্যার্থে রচিত বেদাঙ্গসমূহের অন্তর্গত 'পাণিনি' অধিগত করিতে পারিলে ভাষানিহিত শব্দ-বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইতে পারে।

বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থ ভাষানিহিত শব্দ-বিজ্ঞানের মূলনীতিসমূহ অনুযায়ী অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের প্রত্যেকটি অধুনা যেরূপ ভাবে বুঝা হয়, তদপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ভাগ-বিশিষ্ট। অন্য কথায়, এই সকল মহাগ্রন্থের প্রত্যেকটি ভ্রান্ত অনুবাদের সহায়ে প্রচলিত রহিয়াছে। ইহার সরল কারণ হইতেছে এই যে, মনুষ্যজাতি দুর্ভাগ্যবশতঃ ভাষানিহিত শব্দ-বিজ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান প্রকৃত ভাষা-বিজ্ঞানের চরম লাঞ্ছনার পরিচয় এবং আমরা জোর করিয়া বলিতেছি যে, মনুষ্যজাতি যখন প্রকৃত ভাষাবিজ্ঞান (অর্থাৎ ভাষানিহিত শব্দবিজ্ঞান) পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে, আধুনিক ভাষা-বৈজ্ঞানিকগণ যে, সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়, তখনই তাহা সুপরিস্ফুট হইবে। মনুষ্যজাতির যদি প্রকৃত মনুষ্যোচিত মস্তিষ্ক-সামর্থ্য বিদ্যমান থাকিত, তবে তাহারা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান এবং আধুনিক ভাষা-বৈজ্ঞানিকগণের কোনরূপ প্রশ্রয় দান করিত না, কেন না, প্রকৃত বিজ্ঞান, জ্ঞান এবং ধর্ম্মের সন্ধানলাভের পক্ষে যাহা অবশ্য-প্রয়োজনীয়, সেই প্রকৃত ভাষাবিজ্ঞানের পুনরুদ্ধারের পথে তাহারাই তাহাদের বিভ্রান্তিদ্বারা অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা বিজ্ঞান, তাহার পুনরুদ্ধার সম্ভব হইলে দেখা যাইবে যে, আধুনিককালে যাহা ঐ আখ্যায় প্রচলিত, তাহা বিজ্ঞান নহে, বস্তুতঃ কেবল কয়েকটি ঐন্দ্রজালিক এবং যাদুকরসিদ্ধ চেষ্টাস্বরূপ। কি জন্য বর্ত্তমান কালে এই ইন্দ্রজাল এবং ভোজবাজী সম্ভব হইয়াছে তাহা তাঁহারা জানেন না এবং ইহার কি পরিণাম হইতে পারে তাহাও তাঁহারা জানেন না। ইহা সত্য যে, মনুষ্যজাতি এই তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণের মোহজালে আচ্ছন্ন রহিয়াছেন, কিন্তু যখন প্রকৃত বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার হইবে, তখন দেখা যাইবে যে, বস্তুত ঐন্দ্রজালিকের ছলনাস্বরূপ এই আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহই মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশাসমূহের প্রধান কারণ। আধুনিক কালের এই বৈজ্ঞানিকগণ মনুষ্যের প্রাণসংহারক এবং তাহার সুখহন্তারক কতিপয় উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু মনুষ্যজাতির জীবনযাপন সুখকর করিবার উপযোগী একটি উপায়ও তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। যথার্থ শরীর-বিধান এবং শরীরগঠন-বিদ্যা পরিজ্ঞাত হইয়া আধুনিক এলোপ্যাথিঘটিত ঔষধাদি

মনুষ্যের পক্ষে হিতকারী হইয়াছে কি না, তাহা বিশ্লেষণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহারা নিরাময়কর অপেক্ষা অধিকাংশ সময়েই গরলসদৃশ।

উপরে যেরূপ কথিত হইয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিকগণ, তদনুরূপ বটে, কিন্তু আধুনিক দর্শন এবং দার্শনিকগণ আবার এতদপেক্ষাও নিকৃষ্ট। যাহাকে দর্শনবিষয়ে পুনর্গঠনা বলা হয়, অর্থাৎ গত ত্রয়োদশ শতাব্দীর সেই প্রথম ভাগাকালীন রোজার বেকনের সময়াবধি যে দর্শন কায়ালাভ করিয়াছে, 'দর্শন' কথাটির প্রকৃত অর্থের অভাবেই তাহার প্রায় সমগ্র বৈশিষ্ট্য পর্যাবসিত। জনসাধারণের পক্ষে উহা ভিত্তিহীন কল্পনা এবং অনুমানের আশ্রয় দানে সহায়ক মাত্র হইয়া তাহাদিগকে বাস্তব জ্ঞানবিবর্জ্জিত করিয়া প্রায়োন্মত্ততার পথে ধাবিত করিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যাদি প্রচারিত ভারতীয় দর্শনকে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন। আমাদের প্রার্থনা এই যে, ভাষানিহিত শব্দবিজ্ঞানের বিদ্যা আয়ত্তপূর্ব্বক কি করিয়া ভারতের মূল দর্শনসমূহের সূত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায়, সুধীগণ তাহা পরিজ্ঞাত হউন; তখন তাঁহারা বুঝিবেন যে, বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের টীকা কি পরিমাণ বিকৃতি সৃষ্টি করিয়াছে।

"ধর্ম্ম", "বিজ্ঞান" এবং "জ্ঞানে"র প্রকৃত সংজ্ঞার সম্যক্ ধারণা লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃত "ধর্ম্ম" সংস্থাপিত না হইলে প্রকৃত "জ্ঞান" অথবা "দর্শন" সংস্থাপিত হইতে পারে না এবং প্রকৃত "জ্ঞান" ও "দর্শন" ব্যতীত প্রকৃত "বিজ্ঞান" সংস্থাপিত হইতে পারে না। ইহাও দেখা যাইবে যে-বিজ্ঞান-প্রবেশার্থী ছাত্রকে প্রথমেই তাহার শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-গ্রহণসঙ্গত সামর্থ্যের অস্তিত্বের সহায়ক কয়েকটি প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হইতে হইবে। বিজ্ঞানবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলে দর্শনে প্রবেশের অধিকার জন্মে এবং জ্ঞান অথবা দর্শন-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিলে "ধর্ম্ম"লাভ সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে। এই জন্যই প্রাচীনকালে বিধান ছিল যে, প্রকৃত "ব্রাহ্মণ", অর্থাৎ "বিজ্ঞান" এবং "জ্ঞান" বিষয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী না হইতে পারিলে, কাহারও ধর্ম্মানুষ্ঠান-চর্য্যায় অধিকার জন্মে না।

আধুনিক কালে সাধারণতঃ বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে, কিন্তু "বিজ্ঞান", "জ্ঞান" এবং "ধর্ম্মে" যথার্থ অধিকার জন্মিলে দেখা যাইবে যে, এই ত্রয়ীর প্রধান লক্ষ্য হইতেছে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন এবং এই ত্রয়ীতে সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিলে মনুষ্যত্ব নিশ্চিতরূপে পূর্ণবিকাশ লাভ করে। এই ত্রয়ীর বিলুপ্তি বশতঃই মনুষ্যজাতির আজ ধারণা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব নহে।

"বিজ্ঞান", "জ্ঞান" এবং ধর্ম্মের সংজ্ঞা বিষয়ে যথার্থ উপলব্ধির সহায়ে অনতিবিলম্বে বুঝা যাইতে পারে যে, একটি ব্যতীত ধর্ম্ম হইতে পারে না, কেন না, একদিকে মনুষ্যের বিচারসামর্থ্য, বোধশক্তি এবং অনুভূতি এবং অপরদিকে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীরক্রিয়া, এই উভয়েরই পরস্পর সম্বন্ধ সর্ব্বদা এক হইতে বাধ্য।

চক্ষুঃদৃষ্টিশক্তিবিধায়ক, কর্ণ শ্রবণশক্তিবিধায়ক, নাসিকা গন্ধগ্রহণশক্তিবিধায়ক, জিহ্বা রসগ্রহণশক্তিবিধায়ক, চর্ম্ম স্পর্শ-গ্রহণশক্তিবিধায়ক। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল মানবের সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য।

মুখ দিয়া আহার্য্যগ্রহণ, গুহ্যদ্বার এবং জননেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পুরীষ ও মূত্রত্যাগ সর্ব্বত্রই মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বাল্যান্তে যৌবন, যৌবনান্তে বার্দ্ধক্য এবং বার্দ্ধক্যের পর মৃত্যু জ্ঞানী-অজ্ঞানী-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে হয়।

খাদ্যাভাবে ক্ষুধাবোধ, পানীয়াভাবে তৃষ্ণাবোধ, রিপুতাড়না-জনিত উত্তেজনা সর্ব্বদাই হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-বৌদ্ধনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই এক।

এই নিমিত্ত মনুষ্যের ধর্ম্ম যে এক, এই সিদ্ধান্ত অনস্বীকার্য্য এবং ইহারই জন্য ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ কেবল এক "মানবধর্ম্ম" ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্মের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই।

যদ্যপি সকল মনুষ্যের ধর্ম্ম স্বভাবতঃই এক, ধর্ম্মোপলব্ধির পন্থা এক নহে এবং এক হইতে পারে না।

এক পক্ষে, বিচারসামর্থ্য, বোধশক্তি এবং অনুভূতি এবং অপরপক্ষে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শারীরক্রিয়া, এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পর পর কয়েকটি অভ্যাসক্রমের মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

প্রথমতঃ, মনুষ্যকে একদিকে তাহার উত্তেজিত এবং রিপু-প্রভাবিত অনুভূতি এবং অন্য দিকে তাহার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শারীরক্রিয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই উভয়ের পরস্পর সম্পর্ক উপলব্ধি করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, মনুষ্যকে একদিকে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীরক্রিয়া ও সেগুলির উত্তেজিত অবস্থা এবং অন্য দিকে তাহাদের সংযত অবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে হয়। যে মুহূর্ত্তে কেহ এই পরস্পর সম্পর্ক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, সেই মুহূর্ত্তে তিনি রাগ-দ্বেষবিমুক্ত হন এবং ফলতঃ অপর সকলের প্রণয়ের পাত্র হইতে পারেন।

তৃতীয়তঃ, মনুষ্যকে একদিকে তাহার রাগ-দ্বেষমুক্ত অবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং শারীরক্রিয়া, এবং অপরদিকে মনুষ্যদেহস্থ, তথা চরাচরস্থ যে বায়ু, তেজ ও রসের সংমিশ্রণ, এতদুভয়ের পরস্পর সম্পর্ক উপলব্ধি করিতে হয়। যে-মুহূর্ত্তে কেহ এই উপলব্ধি লাভে কৃতকার্য্য হন, তিনি মনুষ্য এবং অপরাপর জীবের "বৃদ্ধি" উপলব্ধি বিষয়েও কৃতকার্য্য হন এবং প্রকৃতির বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উপলব্ধির উপযোগী যথেষ্ট বুদ্ধিমান্ হন।

চতুর্থতঃ, মনুষ্যকে একদিকে তাহার স্বীয় আভ্যন্তরীণ বায়ু, তেজ ও রসের সংমিশ্রণ এবং অপর দিকে বায়ু, তেজ ও রসের সর্ব্বব্যাপক সংমিশ্রণের আদিমতম উৎসের পরস্পর সম্পর্ক উপলব্ধি করিতে হয়। যে-মুহূর্ত্তে কেহ এই বিষয় উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি একদিকে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শারীরক্রিয়া এবং অন্যদিকে তাঁহার বিচার-সামর্থ্য, উভয়ের পরস্পর সম্পর্কও উপলব্ধি করিতে পারেন। অন্য কথায় চারিটি ক্রমের চতুর্থটি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতে পারিলে মনুষ্য ধর্ম্মোপলব্ধিতে কৃতকার্য্য হয়।

এই চারিটি ক্রম যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রথম স্তর অতিক্রান্ত না হইতে পারিলে, দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করিতে না পারিলে তৃতীয় এবং তৃতীয় স্তর অতিক্রম করিতে না পারিলে চতুর্থ স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না।

ভাষানিহিত শব্দবিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এই চারিটি ক্রমের প্রথম ক্রমটিকে প্রাচীন সংস্কৃতে যেমন "শক্তিসাধনা" বলা হইয়াছে, তেমনই প্রাচীন আরবী ভাষায় তাহাকে "মুসলিম" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আধুনিক সনাতনপন্থিগণ মুসলমানগণকে অবজ্ঞা করিবার এবং তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য বিবেচনা করিবার জন্য অনেক যুক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, যাঁহারা শক্তি-সাধনারত, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের সহিত মুসলমানগণের আচার-ব্যবহারের পার্থক্য কি, তবে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই।

মুসলমানগণ গোহত্যা করেন এবং জাতিভেদ মানেন না বলিয়া অবজ্ঞাত হন, কিন্তু যাঁহারা শক্তিসাধনা করেন, তাঁহারাও কি অনুরূপ কার্য্যকারী নহেন? তাঁহারাও কি মহিষ-বলি এবং সময়ে সময়ে নর-বলিদান করেন না? শক্তি-সাধনায় রত শাক্তগণজাতিভেদ মানেন না বলিয়াই কি ধরা হয় না? বর্ত্তমানে, নরবলি, এমন কি ছাগবলির অনুমোদনকে অমানুষিক বিবেচনা করা হয় বটে, কিন্তু শক্তিসাধনার প্রণালী সম্বন্ধে যথাবিহিত ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সময়ে সময়ে শক্তি-সাধনায় উদ্দেশ্যপূরণার্থ নরবলি পর্য্যন্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ধর্ম্মোদ্দেশ্যে হত্যাকাণ্ড সাধন অপেক্ষা "বলি" বিভিন্ন অর্থদ্যোতক হইতে পারে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মানুষ্ঠান উদ্দেশ্যে "বলি"র নামে মনুষ্য এবং পশ্বাদি হত্যা করা হইবে, ততদিন নিজেরা যে অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই অনুষ্ঠানহেতুই মুসলমানগণকে অবজ্ঞা করিবার কোন যুক্তিই নাই। সেই জন্য আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, তথাকথিত হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর এই বিবাদ কেন? কোরাণ এবং বেদ, উভয়ই প্রকৃত অর্থে যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা হিন্দু নামে নিজদিগকে অভিহিত করেন, তাঁহাদের মধ্যেও যেমন একজন প্রকৃত হিন্দু নাই, তেমনই যাঁহারা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহাদের মধ্যেও একজন প্রকৃত মুসলমান নাই।

চারিটি ক্রমের দ্বিতীয় ক্রমকে প্রাচীন সংস্কৃতে যেমন "বি-ষ্ণু সাধনা" অথবা গতি-সাধনা অভিহিত করা হইয়াছে, তেমনই প্রাচীন হিব্রু ভাষায় ইহাকে "ক্রিষ্ট্‌স্" আখ্যাত করা হইয়াছে। "ক্রিষ্ট্‌স্" কথাটি আবার "ক্রাইষ্ট" এই কথাটির ল্যাটিন মূল

চারিটি ক্রমের তৃতীয়টিকে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় "শিব-সাধনা" অথবা বুদ্ধি-সাধনা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধগণ এই তৃতীয় ক্রমের সাধনাক্রমেই আখ্যাত হইয়া থাকেন। চারিটি ক্রমের চতুর্থ ক্রমকে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় "ব্রহ্ম-সাধনা" অথবা "বিশ্ব-চরাচরের আদি কারণ সাধনা" অভিহিত করা হইয়াছে। ভাষানিহিত শব্দ-বিজ্ঞান অনুযায়ী "হিন্দু" কথাটি আরবী ভাষায় "বিশ্ব-চরাচরের আদি কারণ সাধনা"র আখ্যা। ভাষানিহিত এই শব্দ-বিজ্ঞান যথাযথ-ভাবে অনুসরণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "মুসলিম", "ক্রিষ্টুস্", "বৌদ্ধ," অথবা "হিন্দু" কোনটিই কোন ধর্ম্মমতের আখ্যা নহে, পরন্তু প্রত্যেকটি "মানব-ধর্ম্মে"র উপলব্ধির নির্দ্দিষ্ট এক একটি পন্থার আখ্যা।

সুতরাং "ধর্ম্ম" লইয়া কলহের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। উপরন্তু মনুষ্যজাতির পক্ষে আশু স্মরণযোগ্য বিষয় এই যে, তাহার স্বকীয় ধর্ম্মের সম্পূর্ণ উপলব্ধির জন্য ইচ্ছুক হইলে, তাহাকে সর্ব্বপ্রথম প্রকৃত মুসলমান ধর্ম্মের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্মের সাধনা, তৃতীয়তঃ প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনা এবং চতুর্থতঃ প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। ইহা যদি সত্য হয় এবং ইহা যে সত্য, বেদ-সহায়ে আমরা তাহা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত, তবে আমাদিগকে অতি অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান অবস্থায় যখন প্রকৃত ধর্ম্মোপলব্ধির আস্তর পর্য্যন্ত বিদ্যমান নাই, তখন প্রকৃত মুসলমান ধর্ম্মই সর্ব্বোচ্চ শ্রদ্ধার অধিকারী, কেন না, ধর্ম্ম-উপলব্ধির ইহাই প্রবেশিকা।

এইবার আমরা সন্দর্ভের মূল বক্তব্য উপস্থিত করিব। এই প্রসঙ্গে আমরা পাঠককে স্মরণ রাখিতে বলি যে, মিঃ সবরকরের মতবাদ কোন প্রকারে ধর্ম্মোদ্দেশ্য-সাধনের সহায়ক হইতে পারে কি না, তাহাই আমরা পরীক্ষা করিতে চাই এবং এই জন্যই আমরা "ধর্ম্ম" বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তাহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন মনে করিয়াছি।

ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবার উদ্দেশ্য কি?

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ধর্ম্মমার্গী হইবার প্রথম সোপান হইতেছে, একদিকে উত্তেজনা-বিশিষ্ট এবং রিপু-প্রভাবান্বিত অনুভূতি এবং এতদবস্থায় শরীরগঠনগত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং শরীরবিধানগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াসমূহের পরস্পর সম্বন্ধের উপলব্ধি। ধর্ম্মবিষয়ক এই প্রথম পন্থা-সাধনায় কেহ সচেষ্ট হইলে আংশিক পরিমাণেও তিনি স্বকীয় দেহস্থ বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শরীরগঠনগত অঙ্গ এবং শরীরবিধানগত ক্রিয়া উপলব্ধি করিবেন, ইহা নিশ্চিত। এবং যখন তিনি কাম-ক্রোধাদি রিপুতাড়িত হন, তখন কি কি কুফল ঘটিয়া থাকে, তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট বোধ তাঁহার হইবে। ইহার অর্থ এই যে, একদিকে তিনি অচিরাৎ কোনরূপ পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইতে চলিয়াছেন কি না, তাহা স্পষ্টভাবে নির্দ্ধারণ করিবার সামর্থ্য তিনি অর্জ্জন করিবেন, অন্যদিকে স্বকীয় উত্তেজনা এবং রিপুপরবশতা-দমনের শিক্ষাও লাভ করিবেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, উত্তেজনা এবং রিপু-তাড়না ধর্ম্মমার্গী হইবার প্রথম পন্থার বিরোধী এবং যে-ব্যক্তি অস্বাস্থ্যের দ্বারা আক্রান্ত হন, তিনি ধর্ম্মোপলব্ধির মার্গে অগ্রসর হইতেছেন, এমন কথা কখনও বলা চলে না।

ধর্ম্মোপলব্ধির দ্বিতীয় পন্থায় আমরা দেখিয়াছি যে, মনুষ্যকে একদিকে যেমন রিপুপরবশ অবস্থায়, তাহার শরীর-গঠনগত অংশসমূহ এবং শরীরবিধানগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসমূহ, তেমনই অন্যদিকে সংযত ভাবকালীন ইহাদিগের অবস্থা, এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে হয়। ইহার অর্থ এই যে, মনুষ্য এই পন্থায় স্বদেহে যাবতীয় রোগের উপসর্গসমূহ উপলব্ধি করিতে পারে এবং রোগমুক্তির উপায়সমূহ শিক্ষা করে। কেবল ইহাই নহে, মনুষ্যগোষ্ঠীভুক্ত কোন ব্যক্তির বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া কিংবা সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সেবাকার্য্যে স্বকীয় উপযোগিতালাভের উপায়ও তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন।

এই অবস্থায় তিনি স্বীয় আভ্যন্তরীণ শরীরগঠন এবং শরীরবিধানগত বিবিধ সত্য উপলব্ধি করেন এবং তাহার ফলে মনুষ্যসমাজ শরীরগঠনবিষয়ক এবং শরীরবিধানবিষয়ক অভ্রান্ত সত্য লাভ করিতে পারে, তথা অধুনা রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মনুষ্যকে যেরূপ অসহায় বোধ করিতে হয়, মনুষ্যসমাজের সেই অসহায়তা-বোধ হইতে নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনা ঘটে। এক কথায়, যাঁহাদের

অধিকাংশই লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঘাতক ব্যতীত আর কিছুই নহেন, সেই আধুনিক চিকিৎসকগণ প্রকৃত চিকিৎসকদিগের আগমন-পন্থা হইতে তখন নিষ্ক্রান্ত হইতে বাধ্য হন।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ধর্ম্মোপলব্ধির তৃতীয় স্তরে স্বীয় আভ্যন্তরীণ "বুদ্ধি" অভ্রান্ত ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। বলাই বাহুল্য যে, যে-ব্যক্তি স্বীয় আভ্যন্তরীণ "বুদ্ধি" তথা উহার ক্রিয়াকলাপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তিনি অচিরাৎ তাঁহার ভ্রান্তি এবং ভ্রান্তির ফলাফলও বুঝিতে পারেন। সুতরাং যে-ব্যক্তি ধর্ম্মোপলব্ধির তৃতীয় স্তরে উপনীত হইতে সমর্থ, তিনি সকল প্রকার ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে বাধ্য এবং সমাজের প্রকৃত হিতসাধনের সামর্থ্যবিশিষ্ট হইতে বাধ্য।

ধর্ম্মোপলব্ধির চতুর্থ স্তর যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এই স্তরে উপনীত ব্যক্তি যুগপৎ বিজ্ঞান, জ্ঞান এবং ধর্ম্ম-বিষয়ক সকল সত্যের অধিকারী হন এবং এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেন। এইরূপে, এই স্তরে উপনীত ব্যক্তি মনুষ্যজাতির আর্থিক, শারীরিক, ইন্দ্রিয়গত, মানসিক, এবং বুদ্ধিবৃত্তিগত সকল প্রকার দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায়-সন্ধানী শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন।

সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মোপলব্ধিকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিতে হইবে। ধর্ম্মোপলব্ধির সকল পন্থা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যে-ব্যক্তি প্রথম স্তর অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তিনি কখনও অপরাপর স্তরে উপনীত হইতে পারেন না এবং কামক্রোধাদি রিপুপরবশ হইলে তাঁহার প্রথম স্তরে উপনীত হওয়াও অসম্ভব হয়, কেন না, একদিকে তাঁহার রিপুপরবশ অনুভূতি এবং অপরদিকে রিপু-পরবশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ তাঁহাকে এতদ্দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়। যদি কেহ তাঁহার প্রবৃত্তিমূলক বাসনা এবং রিপুতাড়িত কামনা-পূরণার্থে ব্যস্ত হন, তবে তৎকর্ত্তৃক এই উপলব্ধি সাধ্য হয় না। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব ধর্ম্মোপলব্ধির সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

মিঃ সবরকরের অভিভাষণে কাহারও বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব কলহের মনোভাব উদ্রেকের সম্ভাবনা আছে কি না, অতঃপর আমরা তাহার বিচার করিব। আমরা যদি দেখি, সেরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে, তবে ধর্ম্মসঙ্গত দিক্ হইতে আমাদিগকে ইহা নিন্দনীয় বলিতে হইবে এবং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, মিঃ গান্ধী এবং কংগ্রেসের হাই-কম্যাণ্ডের পাণ্ডাগণের ন্যায় ভারতের নেতৃত্ব ক্ষেত্রে মিঃ সবরকরও অনুপযুক্ত।

ধর্ম্মদৃষ্টিতে মিঃ বিনায়ক দামোদর সবরকরের অভিভাষণ বিচার

মিঃ সবরকরের অভিভাষণের প্রথমাংশে নিম্নলিখিত রূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—"মুসলমান জনতা যে-খুনমুখী মারণমহোৎসবে এই কিছুদিন পূর্ব্বে মাতিয়াছিল..." ইত্যাদি। ইহা নিশ্চয়ই সত্য যে, কেবল মুসলমান জনতাই এই তথাকথিত "খুনমুখী মারণমহোৎসবে" মাতে নাই। এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে, যথায় হিন্দু জনতাকে এই তথাকথিত "খুনমুখী মারণমহোৎসবে" মাতিতে দেখা গিয়াছে। মিঃ সবরকরকে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এতদবস্থায় যদি কেহ বলেন যে, 'খুনে' সবরকরের অধিনায়কত্বে হিন্দু জনতা 'খুনমুখী' মারণমহোৎসবে মাতিয়াছিল, কিন্তু মুসলীম সরকার-চালিত পুলিশবাহিনীর সতর্ক ব্যবস্থায় তাহারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই" ইত্যাদি, তবে তাঁহার মনে কি ভাব উপস্থিত হয়? মিঃ সবরকরের শিক্ষা-দীক্ষা কিরূপ, তাহা আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু অশিষ্ট উক্তি, অভিজাত শিক্ষাদীক্ষার সহিত খাপ খায় না, ইহা আমরা নিশ্চয়ই বলিব।

যাহাই হউক, মিঃ সবরকরের বক্তৃতার প্রথমাংশে মুসলমান-বিরোধী মনোভাব বিদ্যমান, ইহা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে এবং মিঃ সবরকরের এই মনোভাব যদি পুষ্টিলাভের অবকাশ পায়, তবে তাহা দ্বন্দ্ব-কলহের ভাব বিস্তারক হইবে।

বক্তৃতার দ্বিতীয়াংশে, তথাকথিত "নিজাম রাষ্ট্রে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন"-সম্পর্কে হিন্দু মহাসভার কার্য্যকলাপ যেখানে বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যেও একই প্রকার মুসলমান-বিরোধী মনোভাব দেখা যায়, যেন তথাকথিত মুসলমানগণেরই সকল কুকর্ম্ম একচেটিয়া, তথাকথিত হিন্দুরা যেন কুকর্ম্মের বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে। এই মনোভাব পশুসুলভ এবং এই সুদীর্ঘ, সর্ব্ববিষয়ক অভিভাষণ-রচনার দৈর্ঘ্য হইতে মিঃ সবরকরের চরিত্রের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই মনোভাব অসমঞ্জস।

তৃতীয়াংশে মহাসভার মূলনীতি এবং বিশ্বাস আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়, "আসমুদ্র-সিন্ধুব্যাপী এই যে দেশ, সেই ভারতভূমিকে যে-ব্যক্তি তাহার জন্মভূমি, তথা ধর্ম্মভূমি বলিয়া স্বীকার করে, সে-ই হিন্দু"।

"হিন্দু" কথাটির এই সংজ্ঞায় উপনীত হইবার প্রামাণিকতা কি, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, এই শ্রেণীর ভাব যতদিন প্রচারিত হইতে পারিবে, ততদিন ভারত কখনও "স্বাধীনতা" লাভ করিতে পারিবে না এবং ততদিন ভারত দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে কখনও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না, কেন না, কোন ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার ঘৃণা এবং উচ্ছ্বসিত অনুরাগ হিংসা-দ্বেষের সৃষ্টিকর হইতে বাধ্য এবং ইহার দ্বারা ঐ ব্যক্তির জীবন দুর্ব্বিষহ হইতেও বাধ্য। "হিন্দু"র এই প্রকার সংজ্ঞাকে প্রসার লাভ করিতে দিলে, ইহা নিশ্চিত ভারতের জনসাধারণের একাংশের উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বসিত অনুরাগ এবং অপরাংশের প্রতি অবজ্ঞার জনক হইবে। ইহা কেবল দলাদলিতে পর্য্যবসিত হইয়া যে-ভাবরাশি দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় প্রসারার্থ অতি অবশ্য প্রয়োজন, তাহা বিতাড়িত করিবে। আপাত ভাবে তথাকথিত হিন্দুর পক্ষে এই সংজ্ঞা শ্রুতিসুখকর এবং সুমধুর হইতে পারে বটে, কিন্তু শেষতঃ ইহা সর্ব্বনাশকর বলিয়া প্রমাণিত হইতে বাধ্য, কেন না, দলাদলির মাতামাতি এবং দলাদলির প্রাধান্য বাস্তব "স্বাধীনতার" সহিত কখনও এক বস্তু হইতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকাবহ হইতেছে যে, মিঃ সবরকর একবার বলিয়াছেন, "যে-ব্যক্তি এই ভারতভূমি তাহার জন্মভূমি এবং ধর্ম্মভূমি বলিয়া মনে করে, সে-ই হিন্দু", আবার পরক্ষণেই বলিয়াছেন, "ক্ষেত্রগত ঐক্য, একবাসভূমিই একটিমাত্র বন্ধন, যাহা জাতিগঠন করিতে পারে, করা উচিত এবং অবশ্য করিবে, এই নির্ব্বুদ্ধিতামূলক ধারণাসম্ভূত কংগ্রেসের যে ভাবধারা, তাহা প্রথমাবধিই ভ্রান্ত। এই ক্ষেত্রগত জাতীয়তাবাদ অতঃপর ইউরোপে প্রচণ্ড বিপর্য্যয়ের কারণ হইয়াছে…।" যদি বলা যায় যে, যে-ব্যক্তি ভারতভূমিকে তাহার জন্মভূমি এবং ধর্ম্মভূমি বলিয়া মনে করে সে-ই হিন্দু, তদ্দ্বারা কি বুঝিতে হয় না যে, হিন্দুজাতি ভারতভূমি ক্ষেত্রটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ইহা কি ক্ষেত্রগত জাতীয়তাবাদ স্বীকার করিয়া লওয়ার পরিচায়ক নহে? যদি কোন দেশে ক্ষেত্রগত জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রচণ্ড বিপর্য্যয় আনয়ন করিয়াছে বলিয়া দেখা যায়, তবে মিঃ সবরকর ভারতে সেই একই ক্ষেত্রগত জাতীয়তাবাদের পক্ষ সমর্থন করিতে চাহেন কেন?

সুযৌক্তিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, মিঃ সবরকরের মস্তিষ্কাভ্যন্তরীণ কার্য্যকারিতায় কিঞ্চিৎ শৈথিল্য বর্ত্তমান, কেন না "হিন্দু" কথাটির সংজ্ঞামূলেই তাঁহার পরস্পর-বিরোধিতা রহিয়াছে, সুতরাং সহস্রাধিক ব্যক্তিকে শ্রোতার আসনে রাখিয়া বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইতে তাঁহার ইতস্ততঃ বোধ করা উচিত ছিল।

মিঃ সবরকরের "হিন্দু"র সংজ্ঞা আরও অনেক কারণেই কৌতুকাবহ। যদি তিনি জানিতেন, কি উপায়ে পশু পক্ষীর ভাষা অনুসরণ করিতে হয়, তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, ভারতীয় ছাগ এবং গোসমূহও ভারতকে তাহাদের জন্মভূমি এবং ধর্ম্মভূমি বলিয়া মনে করে। আমাদিগকে কি মনে করিতে হইবে যে, ভারতের এই ছাগ এবং গোসমূহও হিন্দু এবং মিঃ সবরকর ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ভারতীয় ছাগ এবং গোসমষ্টির সমপর্য্যায়ভুক্ত? মিঃ সবরকরের এমন ঔদার্য্য হয় তো আছে, যাহাতে তিনি ইহা স্বীকার করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি যে, নিজদিগকে হিন্দু আখ্যায় পরিচয় দান করেন, এমন অনেক ভারতীয়ই মিঃ সবরকরের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিবেন না।

"হিন্দু"র এই সংজ্ঞা মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিশ্চিত দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি করিবে। এই তৃতীয়াংশেই মিঃ সবরকর "জাতীয় ভাষা", "জাতীয় লেখ্যবর্ণ" ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই বিষয়ক আলোচনায় প্রমাণ আছে যে, তিনি এ সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং এই সকল বিষয় যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের উপেক্ষণীয়। এই সকল বিষয়ক বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবার আমাদের স্থানাভাব, সুতরাং উহা হইতে নিরস্ত থাকিব।

জাতীয় ভাষা এবং জাতীয় লেখ্যবর্ণ সম্বন্ধে মিঃ সবরকর যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, উহা দ্বারাও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা।

মিঃ সবরকরের অভিভাষণের চতুর্থ এবং পঞ্চম বিষয় তলাইয়া পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের মধ্যেও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিপক্ষতামূলক যথেষ্ট ভাব বিদ্যমান।

সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ধর্মসঙ্গত দিক্‌ হইতে বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইলে মিঃ সবরকরের অভিভাষণ খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন হইয়া নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য। তথাপি দেশমধ্যে এই প্রকার বক্তৃতা যে সমাদর লাভ করে, তাহার কারণ হইতেছে, হিন্দু-মহাসভার পতাকাতলে জন কয়েক অতিশয় অধার্মিক ব্যক্তি সমাবিষ্ট হইয়াছেন এবং স্বকীয় স্বার্থাভিসন্ধিপূরণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনসাধারণের কিয়দংশের শোষণই তাঁহাদের কাম্য। সরকার যে এই শ্রেণীর বক্তৃতা এতাবৎ নিষিদ্ধ করেন নাই, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, দেশে আইন রচনার ভার যে-সকল রাষ্ট্রপুরুষের এবং শাসকবর্গের হস্তে ন্যস্ত, মনুষ্যাচরণীয় ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা যথাযথ নহে, সুতরাং দেশের শাসনকার্যে অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার এবং যোগ্যতাও তাঁহাদের নাই। জন-সাধারণকে অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, তাই বলিয়া সাধারণ ভাবে সরকারের শাসনকার্যের বিরুদ্ধে তাঁহারা যুক্তি-সঙ্গত ভাবে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারেন না, কেন না এসেম্বলী ও কাউন্সিলসমূহে গৃহীত এবং শাসন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃস্থানীয় নির্দিষ্ট আইন-কানুন সরকার পালন করিতে বাধ্য। যদি জনসাধারণের কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে হয়, তবে তাহা প্রাদেশিক শাসন-কর্তা, বড়লাট এবং সমুদ্রপারস্থ পার্লামেণ্টের রাষ্ট্রনেতাগণের পুণ্য আসনে যে সকল ব্যক্তি আসীন রহিয়াছেন, তাঁহাদের কর্মোদ্দেশ্য এবং মস্তিষ্কসামর্থ্যের বিরুদ্ধে, কেন না জন-সাধারণের হিতার্থে আইনসংস্কার এবং রচনা করিবার মূল দায়িত্ব তাঁহাদেরই।

বাঙ্গালার লাট, বড়লাট প্রভৃতির পুণ্য আসনে যাঁহারা আসীন আছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহারা বিচার করুন মিঃ সবরকরের বক্তৃতা অপেক্ষা, ধর্ম-বিষয়ক সাধারণ কল্যাণ, সুতরাং জন-সাধারণের কল্যাণের পক্ষে অধিকতর অনিষ্টকর আর কি হইতে পারে?

অতঃপর আমরা পরীক্ষা করিব, মিঃ সবরকরের মতবাদ-সমূহ দেশস্থ অথবা বিদেশস্থ মনুষ্যসমাজের কোন একটি ব্যক্তির পক্ষেও রাষ্ট্রীয় ভাবে হিতকারক হইতে পারে কি না।

আমাদের এই সন্দর্ভ সাধারণ পাঠকের ধৈর্যের পক্ষে ইতিমধ্যেই দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্তমান সংখ্যায় এই আলোচনার এইখানে থামিব এবং এতদ্বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা পরবর্তী সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিব। *

ঐক্যদর্শন এবং নব বিশ্বশৃঙ্খলা

ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা এবং আধুনিকতম রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের মূল নীতিসমূহ বিষয়ে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণের সহায়ক হিসাবে গত ডিসেম্বর মাসের মধ্য-ভাগে ভারতে দুইটি বক্তৃতা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, একটি, ভারতের সর্বপ্রধান বিচারক, চীফ জাষ্টিস্‌, স্যর মরিস গ্যইয়ারের লেখনীনিঃসৃত বারাণসীর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, অপরটি কলিকাতার ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে, ইংলণ্ডের যশস্বী ব্যবহারজীবী এবং পার্লামেণ্টের সদস্য স্যর ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের কণ্ঠনিঃসৃত। ভারতের রাজ-নীতি বিষয়ে যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু কিংবা যাঁহারা নিজেরা রাজনীতি লইয়া ব্যাপৃত, এই উভয় বক্তৃতাই তাঁহাদিগের অনুধাবনযোগ্য।

আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, তদনুসারে স্যর মরিস গ্যইয়ারের বক্তৃতার সারাংশ নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) যাঁহাদের লইয়া কোন দেশ গঠিত, তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য অথবা সাধারণ মতসাম্য না থাকিলে সেই দেশকে স্ব-সম্পূর্ণ, অথবা স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত করা যায় না।

(২) ভারতের জনসাধারণের পরস্পর সাধারণ মতসাম্য দেখা যায় না, সুতরাং ভারত এখনও স্ব-সম্পূর্ণ এবং স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য রাষ্ট্র হইতে পারে নাই।

(৩) স্ব-সম্পূর্ণ এবং স্বায়ত্তশাসনশীল রাষ্ট্র হইবার নিমিত্ত ভারতকে অতি অবশ্য চেষ্টিত হইতে হইবে এবং

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ৩রা জানুয়ারীর সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

ইতিহাসের বৃত্তান্ত পাঠে বুঝা যায় যে, এই চেষ্টার পক্ষে বর্ত্তমান সময় অত্যন্ত উপযোগী।

(৪) যদি প্রকৃত প্রস্তাবে স্ব-সম্পূর্ণ এবং স্বায়ত্তশাসনশীল রাষ্ট্র হইবার উদ্দেশ্যে ভারত চেষ্টিত হয়, তবে জন-সাধারণের মধ্যে ঐক্য অথবা পরস্পরের মতসাম্য সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমেই তাহাকে অতি অবশ্য রূপে চেষ্টিত হইতে হইবে, কেন না, জনসাধারণের মধ্যে মতসাম্য বর্ত্তমান না থাকিলে কোন দেশকেই স্ব-সম্পূর্ণ এবং স্বায়ত্তশাসনশীল রাষ্ট্রের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

(৫) শাসনতন্ত্র রচনার দ্বারা ঐক্য-অর্জ্জনের চেষ্টা ভারতের পক্ষে ভ্রান্ত নির্দ্দেশ, কেন না, "শাসনতন্ত্র রচনার দ্বারাই স্বতঃ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।" তদুপরি শাসনতন্ত্র রচনা শ্রমসাধ্য বিষয় এবং এতদ্দ্বারা স্থায়ী ফল কামনা করিতে হইলে তজ্জন্ত সীমাহীন কষ্টসহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য্যের প্রয়োজন, কিন্তু এই শ্রেণীর শ্রমসাধ্য বিষয়ের নিমিত্ত যে সীমাহীন কষ্টসহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য্য আবশ্যক, ভারতীয় জন-সাধারণ আজিও তাহার যোগ্যতা পালনের উপযোগী হয় নাই।

(৬) "কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী"-রূপ প্রণালীর দ্বারা ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, এই বিশ্বাস অভ্রান্ত নহে। বিভিন্ন সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে সকল বিভিন্ন 'কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী আহূত হইয়াছিল তাহাদিগের পরিণাম হইতেই ইহা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হইবে। অন্য পক্ষে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনতন্ত্রের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, শাসনতন্ত্রের রূপদানের সহায়ক কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী নহে, ইহার পরিকল্পনা সার্থক করিয়াছেন নগণ্যসংখ্যক প্রতিনিধি।

(৭) দেশে মতসাম্য আনয়নের একমাত্র পন্থা হইতেছে পরস্পর মেলামিশা এবং স্ব-সম্পূর্ণ ও স্বায়ত্তশাসন-শীল রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইবার চিন্তার পূর্ব্বে ভারতকে সেই পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে।

স্যর ষ্টাফোর্ড নব বিশ্ব-শৃঙ্খলা বিষয়ক আলোচনার দ্বারাই তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন। জাতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক স্বাধীনতার স্থায়ী রূপদানার্থ আগামী কিছুকাল ধরিয়া স্থিরচিত্তে এবং ধীরে ধীরে যে নূতন সংগঠনের নিমিত্ত কার্য্য করিতে হইবে, তাহার ভিত্তি বলিতে তিনি যাহা বুঝিয়াছেন, এই বক্তৃতায় তদ্বিষয়ক ধারণাদানার্থ তিনি চেষ্টা করিয়াছেন।

স্যর ষ্টাফোর্ডের বক্তৃতার প্রধান বক্তব্যসমূহ নিম্নলিখিত রূপ :

(১) আমাদের প্রথম স্মরণযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, আমরা পৃথিবীব্যাপী জনসাধারণের নির্দ্দিষ্ট একটি অংশ মাত্র এবং আমাদের ভবিষ্যৎ পৃথিবীর অপর প্রত্যেকটী দেশের ভবিষ্যতের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কবিশিষ্ট।

(২) আমাদের দ্বিতীয় স্মরণযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি কেবল কল্পনাপ্রসূত হইলে চলিবে না, তাহা বাস্তব হওয়ার প্রয়োজন।

কাল্পনিক রামরাজ্যের স্রষ্টারা সদাশয় ব্যক্তি এবং তাঁহাদের কল্পনা প্রায়শঃ জন-সাধারণকে কার্য্য-প্রেরণা-দানেও সক্ষম, কিন্তু এই রামরাজ্যের অত্যন্ত সামান্যাংশকেও যদি বাস্তব ঘটনার বিষয়ীভূত করিতে হয়, তজ্জন্য আমাদিগের জন-সাধারণের অধিকাংশকে অতি-নিকট ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৈষয়িক মনোভাব লইয়া চিন্তা এবং কার্য্য করিতে হইবে।

(৩) অতঃপর আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের অদৃষ্টের নিয়ামক একমাত্র আমরাই নহি। বিভিন্ন জাতির সহযোগিতামূলক প্রয়াস দ্বারাই কেবল নব-বিধান গঠিত হইতে পারে। ভবিষ্যৎ বিষয়ক কোন পরিকল্পনাকে আমরা নিজেরা যতই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি না কেন, আমরা অপর সকলের বিনানুমতিতে সেই পরিকল্পনা পৃথিবীর অপর জাতিসমূহের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে পারি না। অথবা শেষ পর্য্যন্ত কোন জাতি, যতই সবল এবং শক্তিমান হউন না কেন, কিংবা তাঁহাদের স্বকীয় অভিলাষকে তাঁহারা যত জ্ঞানগত

বলিয়াই মনে করুন না কেন, অপর সকল জাতির পৃষ্ঠে সেই অভিলাষের ভার তাঁহারা ন্যস্ত করিতে কখনও পারিবেন না। সকল জাতির সহযোগিতা-মূলক সম্মতি-ব্যতিরেকে পৃথিবীর স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না।

(৪) নূতন জগৎ নির্ম্মাণার্থ আমাদিগকে প্রথম সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, কি করিয়া জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহাকে এরূপভাবে কার্য্যকরী করা যায়, যাহাতে প্রত্যেক জাতির অধিকাংশ যে নিম্নস্তরের জনসাধারণ, তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজনীয় রাষ্ট্ররূপ লাভ করিতে পারে। আমাদিগের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা যখন ঐক্য এবং সহযোগিতা,—অথচ যাঁহাদিগকে অনেক ক্ষেত্রেই অনৈক্য এবং পরস্পর-প্রতিযোগিতাদ্বারা লাভবান্ হইতে হয়, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির দ্বারা যতদিন রাষ্ট্রসমূহ পরিচালিত হইবে, স্যর ষ্ট্যাফোর্ডের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, ততদিন নূতন জগতের নির্ম্মাণ-সমস্যার সমাধান হইবে না।

(৫) জনসাধারণের হিতসাধনের দিক্ হইতে আমার (স্যর ষ্ট্যাফোর্ডের) পাশ্চাত্ত্যের ইউরোপীয় সংস্করণের গণতন্ত্র সম্পর্কে এমন উচ্চ ধারণা নাই যে, আমি বিশ্বাস করিতে পারি, ইহাই অপর সকল দেশের পক্ষে একমাত্র, অথবা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের গণতন্ত্র। প্রত্যেক জাতিকে তাহার অবস্থার উপযোগী করিয়া ইহার রূপ দিতে হইবে। কিন্তু ইহার রূপ যাহাই হউক, স্বায়ত্ত-শাসন এবং স্ব-নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে তুলিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক, কেন না, একমাত্র তাহারাই স্বকীয় স্বার্থবোধ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত, সুতরাং একমাত্র তাহারাই সভ্যতার অগ্রগতির জন্য যে সকল উদ্দেশ্যপূরণ প্রাথমিক প্রয়োজন, তদ্‌কল্পে একাগ্রচিত্তে কার্য্য করিতে পারে।

(৬) ধরিয়া লওয়া যায় যে, এই পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রকাশ্যতঃ শান্তি, জীবনযাত্রার উচ্চতর মান, সুখ এবং স্বাস্থ্যাকাঙ্খার উদ্দেশ্যবিশিষ্ট, অবশ্য ইহার দুই একটি ব্যতিক্রম থাকিতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ তাহাদের অভিলাষানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলে, তাঁহাদিগকে নগণ্য বলিয়া ধরিতে হইবে। এই সকল উদ্দেশ্য-পূরণের পন্থায় আজ বাধা উপস্থিত,—জনসাধারণের অধিকাংশ এই সকল আকাঙ্খা করে না বলিয়া নহে, তাহাদের এই সকল উদ্দেশ্য যদি পূর্ণ হয়, তবে রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক শক্তির আধারও আনুষঙ্গিক ভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়া।

(৭) এই পরিবর্ত্তন নিবারণার্থ বহু ও বিচিত্র অজুহাত উপস্থিত করা যাইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমানে শক্তির আধার এবং এই পরিবর্ত্তন-সাধন, অথবা তাহার সহায়তা করিবার পক্ষে যাঁহাদের সুযোগ বর্ত্তমান, তাঁহাদের ইহা সাধনের অনিচ্ছার মূলে রহিয়াছে—অবস্থা যেরূপ চলিতেছে, সেইরূপই চলুক, এই অভিপ্রায়, অথবা যদি একান্তই ইহা পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, তবে তাহা যেন তাঁহাদের স্বার্থের যতদূর সম্ভব সামান্য ক্ষতি সাধন করে।

(৮) উন্নতির পথে এই যে প্রতিবন্ধকতা, ইহা ভাবাবেগ কিংবা প্রতীতিমূলক প্ররোচনাদ্বারা দূর করা যাইবে না। যখন সমগ্রভাবে জনসাধারণ রাষ্ট্র অথবা অর্থ-নিয়ন্ত্রণ শক্তি লাভ করিতে পারিবে, কেবল তখনই ইহার উচ্ছেদ সাধিত হইবে।

(৯) অতীত কালে দেশমধ্যস্থ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-সামর্থ্যের পরিবর্ত্তনকে প্রায়শঃই ক্রমোন্নয়ন অপেক্ষা বিপ্লবের সাহায্যে সংসাধিত হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু তথাপি আমরা ভরসা রাখি যে, পৃথিবীর উন্নতি অর্থাৎ ক্রমোন্নয়নমূলক অগ্রগতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবার নির্ব্বুদ্ধিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক আজ আর কেহই ইহার অপরিহার্য্য পরিণামস্বরূপ বিস্ফোরণ, অথবা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনয়নে ইচ্ছুক নহেন।

(১০) বর্ত্তমানে অনেকের মুখেই শুনিয়া ভরসা জাগে যে, যাহাই ঘটুক, ১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসের অবস্থায়

আর প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব নহে। ইংলণ্ডেও অনেক রক্ষণশীল এবং অপরাপর বহু ব্যক্তিকে বর্ত্তমানে অপরের সহিত এই মত গ্রহণ করিতে দেখা যাইতেছে। তাঁহারা যদি এই মতাবলম্বী ভাবে চলিতে পারেন এবং নিজেদের ব্যক্তিগত, তথা শ্রেণীগত অবস্থার উপর যে-ভাবেই ইহা ক্রিয়াশীল হউক, অন্ততঃ ইংলণ্ডের মধ্যেও এই মতবাদ অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন, তবে আশা করা যায় যে,—এখন যে-রাষ্ট্রশক্তি বিশিষ্ট শ্রেণীর হস্তে রহিয়াছে এবং জন-সাধারণ যাহার জন্য ন্যায্য দাবী উত্থাপন করিয়াছে, ক্রমোন্নয়নের পথ ধরিয়াই তাহার যেরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়, তাহা সাধিত হইতে পারে।

(১১) ভারত সম্বন্ধে আপনাদিগের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে আপনাদের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন। ইহার সম্ভাবনা চারি মাস পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তদপেক্ষা অত্য নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অতঃপর আপনাদের শাসনতন্ত্র রচনার্থ, ইহার রূপ যাহাই সিদ্ধান্ত হউক,—আমার বিশ্বাস এবং ভরসা যে, আপনারা নূতন ভারতের সেই কার্য্যভার যথাযোগ্য হস্তে, অর্থাৎ যে কৃষক ও শ্রমিক, তাহাদের নিরক্ষরতা এবং রাষ্ট্রীয় শিক্ষাহীনতা সত্ত্বেও ভারতের জীবনযাত্রার মেরুদণ্ডস্বরূপ, সেই জন-সাধারণের হস্তে অর্পণ করিবেন।

(১২) আমি নিশ্চিত জানি যে, কেবল এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলেই আমরা আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পন্থায় চালিত হইতে পারি।

(১৩) এইরূপ গণতন্ত্র গঠিত করিবার পরে আমাদিগকে (শিক্ষিত শ্রেণীকে), জন-সাধারণের (শ্রমিক শ্রেণীর), নিজেদের আকাঙ্ক্ষানুরূপ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়সমূহে নির্দ্দেশদানের যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। আমরা (শিক্ষিত শ্রেণী) যখন পুঁথি মুখস্থ করিতে নিযুক্ত, তখন তাহারা (শ্রমিক শ্রেণী) আমাদিগের আহার্য্য ও বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য পরিশ্রম করিয়াছে। আমরা অর্থাৎ শিক্ষিত শ্রেণী, বাস্তবিকই বিশিষ্ট সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং সেই জন্যই আমরা যে-ভাবে তাহাদের দ্বারা উপকৃত হইয়াছি, তাহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঐ উপকার আমাদিগকে পূর্ণরূপে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

(১৪) ইহার প্রথম কর্ত্তব্যস্বরূপ আমাদিগকে রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে যথাসম্ভব ব্যাপক জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা যোগ্যতাবিশিষ্ট হইতে হইবে। অন্ধ যদি অন্ধকে পথ দেখাইতে চাহে, তবে উভয়েরই খানায় পড়িবার আশঙ্কা। এই শিক্ষালাভার্থে সবিশেষ উদ্যোগী হইতে হইবে, কিন্তু অন্ততঃ সামান্য ভাবেও ইহার যোগ্যতা আমরা অর্জ্জন করিতে না পারিলে, জন-সাধারণের মত-পরিচালনা এবং গঠনের দায়িত্বের সহায়তা করিবার যোগ্য অথবা উপযোগী আমরা হইতে পারিব না। আমাদের উদ্দেশ্য হইবে ক্রমোন্নয়নমূলক পন্থায় এমন রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র সংগঠন, আর্থিক সাম্যের বনিয়াদের উপর এরূপ সুদৃঢ় ভাবে যাহা গঠিত হইবে যে, রাষ্ট্রান্তর্গত কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী অথবা সম্প্রদায় নিজেদের সম্প্রদায়ের অথবা শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট স্বার্থের উন্নয়নার্থ, জন-সাধারণের স্বার্থের ক্ষতি সাধন করিয়া, তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিবে না।

(১৫) যথার্থ সাম্যবাদ বিপ্লব ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, সুতরাং সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার কার্য্যকারিতামূলক প্রয়োগ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে।

(১৬) প্রয়োজন হইতেছে, আর্থিক নিয়ামনের শক্তি এবং প্রভূত অর্থ কতিপয় ব্যক্তির হস্তগত হওয়ার যে ফল ফলিয়াছে, তাহার সঙ্কোচসাধন এবং বিস্তার নিবারণ। এই শক্তির ফলাফল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে ঘটিয়াছে দেখা যাইবে।

(১৭) আমাদের স্বকীয় দেশের বাস্তব প্রয়োজনের ঘটনাসংস্থান বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, সাম্প্রদায়িক নিয়ামন এবং সংগঠনের মূলীভূত বিষয়সমূহ কি প্রকার হইবে, যাহাতে আমাদিগের গণতন্ত্রকে আমরা স্বার্থবিশিষ্ট শ্রেণীর

উদ্দেশ্য-প্রচেষ্টায় উপরিস্থিত করিয়া গঠন করিতে পারি, জন-সাধারণের জীবনযাত্রা উৎকৃষ্টতর এবং উচ্চতর স্তরে স্থাপনার্থ আমাদের জাতীয় জীবন পরিকল্পিত করিতে পারি ;—এবং যাহাতে অপরাপর দেশের সহিত স্বদেশের ধনোৎপাদন-পদ্ধতির সংযোগ সাধিত হইয়া বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশের জন-সাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যমূলক যে প্রতিযোগিতা প্রচলিত রহিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের জীবনযাত্রা সহযোগিতামূলক উচ্চতর স্তর লাভ করে, এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে।

(১৮) ইহারই (অর্থাৎ ১৭শ দফায় কথিত বিষয়ের) জন্য পরিকল্পনামূলক আর্থিক সংগঠন প্রয়োজন,—জন-সাধারণের হিতার্থেই এই আর্থিক সংগঠন পরিকল্পিত করিতে হইবে, মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হিতার্থে নহে।

(১৯) আমার যে নূতন জগৎ দেখিবার বাসনা, তাহার সকল দেশেই এইরূপ পরিকল্পনা বিহিত হইবে এবং তবেই তাহারা যে-বিশ্ব-মৈত্রী সকল শান্তিকামীর সুদূরবর্ত্তী হইলেও শেষ লক্ষ্য, তাহা গঠন করিবার নিমিত্ত আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার উপযোগী হইতে পারিবে।

(২০) লেখনী-সাহায্যে মুহূর্ত্তমধ্যে ইহা সম্ভব হইবে না, কিন্তু এই সমস্যাকে ইহার গুরুতর এবং প্রাণঘাতী দিক্ দিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে হইবে এবং ইহারই জন্য আমার মানস-লোকে যুদ্ধ-পরবর্ত্তী যে নূতন জগতের কল্পনা বর্ত্তমান, তদন্তর্গত ভারতকে গ্রেট বৃটেন এবং অপরাপর স্বাধীন বৃটিশ উপনিবেশসমূহের সহিত পূর্ণ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ এবং স্বাধীন দেখিতে চাহি।

(২১) সর্ব্বশেষ বক্তব্য : আমরা যেন না ভুলিয়া যাই যে, জন-সাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং জীবনযাত্রার মান যতই না কেন গুরু বিষয় হউক, তদপেক্ষাও গুরুতর বিষয় হইতেছে, তাহাদের আত্মিক এবং মানসিক স্বাধীনতা। কোন আর্থিক পরিকল্পনা, যতই না কেন সুগঠিত হউক, যদি তাহা পৃথিবীর মনুষ্যজাতির পক্ষে মারকস্বরূপ হয়, তবে আমার মতে তাহা বাধাহীন তাণ্ডবের নিকৃষ্ট সংস্করণ যে-করিয়াই হউক, মনুষ্যজাতির যন্ত্রমাত্রে রূপান্তরিত হওয়ার পথ বন্ধ করিতে হইবে। মনুষ্য যাহাতে তাহার কৃষ্টিগত এবং আত্মগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২২) আমাদের রাষ্ট্র-কারুগণের দায়িত্ব হইবে আমাদের নিমিত্ত এমন পন্থা ও প্রণালী আবিষ্কার, যদ্দ্বারা আমাদের দেশের এইরূপ আর্থিক সংগঠন পরিকল্পনা সম্ভব হয়, যাহা জন-সাধারণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে হিতকারী, অথচ তাহাদের স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখিতে পারে।

উপরের দুইটি বক্তৃতা যথাযথ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, এই দুইটি বক্তৃতা মনুষ্যজ-গতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দুইটি বিশিষ্ট ভাব-প্রাধান্যের প্রকাশক—"কালচক্রে"র নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি কলায় ইহাই বিধান। বর্ত্তমানে "কালচক্র" যে-কলায় সমুপস্থিত, তদধীন অবস্থায় পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শ্রেণীর ভাব-প্রাধান্যগত বিভাগ সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কাল এবং কালচক্র

আমরা উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত আমাদিগকে প্রথমে "কাল" কি, "কালচক্র"ই বা কি এবং "কালচক্রে"র কলা কয় প্রকার এবং তাহাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য কি, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

কাল কিংবা Time, এই কথার দ্বারা আমাদিগকে কি ধারণা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক অনুসন্ধানার্থ পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থকারসমূহের শরণ লইলে দেখা যায়, তাঁহাদের প্রায় সকল বিশিষ্ট কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিকার কালের উপযোগিতা এবং তাৎপর্য্য-বিষয়ক কথা কহিয়াছেন বটে, কিন্তু কাল বলিতে আমাদিগের সুস্পষ্টরূপে ধারণা কি করিতে হইবে, তদ্প্রকাশক একটি কথাও কহেন নাই। এমন কি Time কথাটির ব্যুৎপত্তি হইতেও কেহ এই কথাটি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণাপ্রয়াসী হইয়া যদি মাথা খুঁড়িয়া মরেনও, তথাপি তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইবে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা

ও বিজ্ঞানের ইহাই কৌতুকাবহতা। যাহা কিছু উত্তেজক, যাহা কিছু হতবুদ্ধিকর, তাহার সমস্ত কিছুই ইহাতে মিলিবে এবং ফলতঃ বিশ্লেষণ-সামর্থ্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু ইহার সাহায্যে জগতের কোন কিছুর কার্য্যকারণসম্ভূত সুস্পষ্ট ধারণা-লাভ কখনও সম্ভব হইবে না।

যে-সু প্রাচীন গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশার্থ প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু এবং প্রাচীন আরবীর কোন একটির সহায়তা গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা বলা চলে না। এই তিন ভাষার যাহা মূল, সেই শব্দবিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে যে-কেহ বুঝিতে পারিবেন যে, এই শব্দবিজ্ঞান অনুযায়ী—বিশ্ব-জগতে সূর্য্য এবং চন্দ্রের বিদ্যমানতাসম্ভূত চরাচরব্যাপী যে বায়ু, তেজ ও রসের সংমিশ্রণ প্রবাহ—পৃথিবী এবং সূর্য্যমধ্যস্থ দূরত্ব এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থান অনুযায়ী হ্রাসবৃদ্ধিশীল হয়, সেই প্রবাহের উগ্রতার ক্রমিক পরিমাপকেই "কাল" বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কাল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপলব্ধির নিমিত্ত আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহসমুচ্চয়ের একটিও স্থির অথবা গতিহীন নহে, ইহাদের প্রত্যেকটিই সতত পরিভ্রমণশীল, অথবা গতিশীল কিংবা সচঞ্চল। অর্থাৎ, পৃথিবী এবং অপরাপর গ্রহাদির পরস্পর দূরত্ব সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল।

আমাদিগকে আরও মনে রাখিতে হইবে যে, জীব-জগতের প্রত্যেকের জীবন ও চাল-চলনের উপর প্রভাবশীল যে-সর্ব্বব্যাপক উপাদান, তাহা বায়ু, রস ও তেজের সংমিশ্রণ-সংঘটিত। চতুষ্পার্শ্বস্থ সমগ্র জগতে এমন একটিমাত্র জীব দৃষ্ট হইবে না, যাহার মধ্যে বায়ু, তেজ ও রসের এই সংমিশ্রণের সম্পূর্ণ অভাব বিদ্যমান। সমগ্র জীব-জগতের প্রত্যেকের জীবন ও চাল-চলনের সাধারণ উপাদান-স্বরূপ বায়ু, রস ও তেজের এই যে সংমিশ্রণ, তাহার চিরন্তন উৎস-সন্ধান-প্রয়াসী হইলে দেখা যাইবে যে, সূর্য্য এবং চন্দ্রই এই সংমিশ্রণের অনন্ত ভাণ্ডার; এবং চরাচর-সহায়তায় এই বায়ু, তেজ ও রসের যে সংমিশ্রণ জীবের জীবন এবং চাল-চলনের উপর প্রভাববিশিষ্ট, তাহার প্রবাহনিহিত উগ্রতা সর্ব্বদা পৃথিবী এবং সূর্য্য-চন্দ্রের পরস্পর অবস্থান ও দূরত্ব অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইতেছে। চরাচর-সহায়তায় জীবের জীবন এবং চালচলনের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল বায়ু, রস ও তেজের এই সংমিশ্রণ-প্রবাহে এবং সূর্য্য-চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থান ও দূরত্বের পার্থক্যনিবন্ধন, পৃথিবী উগ্রতার ক্রমিকতা অথবা বিভিন্নতাকেই "কাল" বলা হয়।

"কাল"-এর অর্থ বিষয়ে সম্যক্ উপলব্ধি হইলে কালচক্র কি এবং কালচক্র প্রভাবে মনুষ্যের অবস্থা, তথা চরিত্রের উপর ফলাফল কি, তাহা উপলব্ধি করিতে বিন্দুমাত্র বেগ পাইতে হয় না।

কালচক্রের কি অর্থ তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, সর্ব্বপরিব্যাপ্ত বায়ু, রস ও তেজের সংমিশ্রণের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় কোন গ্রহই নির্দ্দিষ্ট একটি দূরত্ব অতিক্রম করিয়া যেরূপ পৃথিবীর নিকটতর হইতে পারে না, সেইরূপ পৃথিবী হইতে একটী নির্দ্দিষ্ট দূরত্বের সীমাও অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থাৎ, পৃথিবী এবং সূর্য্য-চন্দ্রের পরস্পরের মধ্যে দূরত্বের যেরূপ সর্ব্বাধিক, তেমনই একটি সর্ব্বানধিক অনুপাত থাকিতে বাধ্য। এতদ্দ্বারা আরও বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বাধিক এবং সর্ব্বানধিক দূরত্ব বর্ত্তমান থাকিলে দূরত্বের সর্ব্বমধ্য একটি পরিমাপও নিশ্চয়ই থাকিবে। ইহা হইতে বাস্তব তথ্যে উপনীত হইতে হয় যে, যখন পৃথিবী এবং সূর্য্য-চন্দ্রের দূরত্ব সর্ব্বানধিক থাকে, তখন পৃথিবীর জীবসমূহ সর্ব্বব্যাপক বায়ু, রস ও তেজের সংমিশ্রণ-প্রবাহের সর্ব্বোচ্চ উগ্রতা-প্রভাব লাভ করে। এই ভাবে পৃথিবী এবং সূর্য্য-চন্দ্রের দূরত্ব যখন সর্ব্বাধিক থাকে, তখন পৃথিবীর জীবসমূহ এই সর্ব্বব্যাপক সংমিশ্রণ-প্রবাহের সর্ব্বনিম্ন উগ্রতা-যুক্ত হয়; পৃথিবী এবং সূর্য্য-চন্দ্রের দূরত্ব যখন সর্ব্বমধ্য থাকে, পৃথিবীর জীবসমূহ তখন সর্ব্বব্যাপক এই সংমিশ্রণ-প্রবাহের সর্ব্বমধ্য উগ্রতা-যুক্ত হয়। সংমিশ্রণ-প্রবাহের উগ্রতার এই তিন প্রকার ফলাফল ত্রিবিধ কালচক্র বলিয়া অভিহিত হয়।

অঙ্কশাস্ত্র-(আধুনিক কালের নহে, কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদপ্রোক্ত)-সাহায্যে "কালচক্র" সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যায় যে, উহা আমাদের পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর জীব-জগতের জীবন এবং চাল-চলনের ছয় প্রকার বৈশিষ্ট্য এবং সামর্থ্য আনয়ন করিতে বাধ্য। সামর্থ্য এবং বৈশিষ্ট্যের এই ছয় প্রকার লইয়াই কালচক্রের ষট্‌কলা। পৃথিবী এবং

সূর্য্য-চন্দ্রের দূরত্বের সর্ব্বানাধিক্য-নিবন্ধন সর্ব্বব্যাপক বায়ু, রস ও তেজ-প্রবাহ যখন সর্ব্বোচ্চ উগ্রতা লাভ করে, তখন মনুষ্য-জাতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক-সামর্থ্যের অধিকারী হইবার সুযোগ লাভ করে এবং জমী তখন সর্ব্বোত্তম স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি-বিশিষ্ট হয়। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, কালচক্রের এই অবস্থানে মনুষ্য-মস্তিষ্কের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামর্থ্য এবং যে-মাটির উপর তাহাদের চলাফেরা, সেই মাটির সর্ব্বোত্তম স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি-হেতু মনুষ্য-মস্তিষ্ক বিশ্ব-চরাচরের প্রত্যেকটি ঘটনাসম্বন্ধীয় প্রকৃত বিজ্ঞানের সন্ধানলাভে কৃতকার্য্য হয় এবং তদ্ধেতু তাহারা সমাজস্থ প্রত্যেকটি ব্যক্তি যাহাতে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, মনুষ্যসমাজের সেই সংগঠন-প্রতিষ্ঠায় সফল হয়। কালচক্রের এই অবস্থানে মনুষ্য-সমাজ হইতে স্বাস্থ্যপ্রদ জীবন-যাত্রার প্রয়োজনীয় উপাদানের অনটন এবং দ্বন্দ্ব-কলহ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় এবং মনুষ্যসমাজ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ব্যক্তিতে বিভক্ত হয়, এক, যাঁহারা জীবসমূহের সুখ-দুঃখের বিজ্ঞানের সন্ধান লাভ করিয়া প্রত্যেকটি জীব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীবন যাপন করিতে পারে, তদনুযায়ী সংগঠনে ব্রতী হন্ এবং অপর শ্রেণী এই সংগঠনানুযায়ী কার্য্য করেন। এই দুই শ্রেণীর প্রথমকে "বুদ্ধিজীবী" এবং দ্বিতীয়কে "শ্রমজীবী" আখ্যাত করা হয়। এই অবস্থায় সমাজ হইতে বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবীর পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ তিরোহিত হয়, কেন না, বুদ্ধিজীবিগণ প্রত্যেকটি ঘটনাবিষয়ক মূল সত্যের সন্ধান-লাভে এবং সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুখী করিবার পন্থার সন্ধান লাভে কৃতকার্য্য হন এবং তাঁহারা স্বকীয় ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়া সম্পূর্ণভাবে শ্রমজীবী-সাধারণের হিতে ব্রতী জীবন যাপন সূচনা করেন।

ইহাই কালচক্রের প্রথম কলা বলিয়া অভিহিত হয়।

কালচক্রের দ্বিতীয়াবস্থানে পৃথিবী এবং সূর্য্য-চন্দ্রের দূরত্বের সর্ব্বমধ্যতা-নিবন্ধন সর্ব্বব্যাপক বায়ু, রস ও তেজের সংমিশ্রণ-প্রবাহ সর্ব্বমধ্য উগ্রতাবিশিষ্ট হয় এবং মনুষ্য-মস্তিষ্ক, তথা যে-মাটিতে তাহার বাস, সেই মাটির উর্ব্বরাশক্তি অপেক্ষাকৃত প্রাখর্য্যহীন এবং অনধিক ফলপ্রদ হয়। ইহার ফলে প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চ্চায় যে-সামর্থ্য মনুষ্য-মস্তিষ্ককে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের দুঃখ-দুর্দ্দশা-দূরীকরণে সমর্থ সমাজ-সংগঠনের পন্থার নির্দ্দেশ লাভে সক্ষম করে, সেই সামর্থ্যের অপকর্ষ ঘটে। কিন্তু এই সময়ে প্রকৃত বিজ্ঞান-চর্চ্চায় সামর্থ্য হ্রাস পাইলেও সমাজ-মধ্যে দুঃখ-দুর্দ্দশা প্রবিষ্ট হইতে পারে না, কেন না কালচক্রের প্রথম কলায় অর্জ্জিত ত্রুটীহীন সংগঠনসমূহ বলবৎ এবং কার্য্যকরী থাকে। কালচক্রের এই দ্বিতীয়াবস্থান কালে মনুষ্যসমাজ কোন দ্বন্দ্ব-কলহনিপীড়িত হয় না, এবং তখনও কালচক্রের প্রথমাবস্থানের ন্যায়ই মনুষ্য-সমাজ মূলতঃ দুই শ্রেণীতে, অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবীতে বিভক্ত থাকে।

ইহা কালচক্রের দ্বিতীয় কলা বলিয়া অভিহিত হয়।

কালচক্রের তৃতীয়াবস্থানে, পৃথিবী এবং সূর্য্য-চন্দ্রের দূরত্বের সর্ব্বাধিক্য-নিবন্ধন সর্ব্বব্যাপক বায়ু, রস ও তেজের প্রবাহের উগ্রতা সর্ব্বনিম্ন হয় এবং মনুষ্য-মস্তিষ্ক, তথা মাটির উর্ব্বরা-শক্তি যথাক্রমে নিকৃষ্টতম এবং সর্ব্বাধম হইয়া পড়ে। ইহারই ফলে প্রকৃত বিজ্ঞান-চর্চ্চার সামর্থ্যের সম্পূর্ণ তিরোধান ঘটে এবং মনুষ্যজাতি কালচক্রের প্রথমাবস্থানে যে-বিজ্ঞান সমাজের কার্য্যকরী সংগঠনের মূল ছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বিস্মৃত হয়। এই অবস্থায়, অর্থাৎ কালচক্রের তৃতীয়াবস্থানে মনুষ্য-সমাজে দুঃখ-দুর্দ্দশা প্রবেশ লাভ করে এবং মনুষ্যজাতির বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতিদানের সহায়ক যে-বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি, তাহার বিলোপ বশতঃ মনুষ্যজাতি অসহায় হইয়া পড়ে। কিন্তু এই অবস্থায় দুঃখ-দুর্দ্দশা সমাজে প্রবেশ লাভ করিলেও তাহারা মারাত্মক হয় না, কেন না, তখনও কাল-চক্রের প্রথমাবস্থানে লব্ধ সংগঠন কার্য্যকরী থাকে। কাল-চক্রের এই তৃতীয়াবস্থানে মনুষ্য-সমাজ তেমন কোন তীব্র দ্বন্দ্ব-কলহ দ্বারা বিপর্য্যস্ত না হইলেও দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রভাবে পরস্পর মৈত্রীবন্ধনে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ঘটে। তখনও মনুষ্যসমাজে দুই শ্রেণীর কর্ম্মী দৃষ্ট হয়, 'বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবী এবং পরস্পর মতানৈক্যের তেমন কোন তীব্রতা অনুপস্থিত থাকিলেও কাল-চক্রের প্রথম এবং দ্বিতীয়, উভয় অবস্থানেই পরস্পর বন্ধুত্ব এবং শ্রদ্ধার যে বন্ধন প্রবল ছিল, সেরূপ প্রাবল্য আর পরিদৃষ্ট হয় না। মনুষ্যের বৈশিষ্ট্য এবং চালচলনের দিক্ হইতে ইহাই কালচক্রের তৃতীয় কলা।

পৃথিবী এবং সূর্য্য-চন্দ্রের দূরত্বের সর্ব্বাধিক্যান্তে গ্রহ-সমূহের পরস্পরের নিকটতর হইতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু যে-পর্য্যন্ত না তাহারা প্রত্যাগমণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় চক্রের

পরিধি-সীমায় উপনীত হয়, সে-পর্য্যন্ত তাহারা কালচক্রের তৃতীয়াবস্থারই রক্ষা করে।

এই অবস্থানেও মনুষ্য-সমাজে প্রকৃত বিজ্ঞান-চর্চার সামর্থ্য অনুপস্থিত থাকে এবং কালচক্রের প্রথমাবস্থানে যে-সংগঠন দুঃখ দূর করিয়াছিল, তাহার বিকৃতিবশতঃ মনুষ্য-সমাজ অধিকতর দুঃখ-দুর্দ্দশায় নিপীড়িত হইতে থাকে। এই কালে পরস্পর মৈত্রী ও শ্রদ্ধাবন্ধন সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়, কিন্তু দ্বন্দ্ব-কলহ ও মতবৈষম্য প্রবল হইলেও তেমন মারাত্মক কোন বিপর্য্যয় ঘটে না। তখন পর্য্যন্ত মনুষ্যসমাজ মূলতঃ দুই শ্রেণীতেই, অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবীতে বিভক্ত থাকে, যদ্যপি পরস্পর সন্দেহের সূত্রপাত হয়।

মনুষ্যস্বভাব এবং চালচলনের দিক্ হইতে কালচক্রের ইহাই চতুর্থ কলা।

গ্রহসমুচ্চয় প্রত্যাসরণপূর্ব্বক দ্বিতীয় চক্রের পরিধিতে উপনীত হইয়া পুনরায় প্রথম চক্রের পরিধি স্পর্শ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রমশঃ দ্বিতীয় চক্র অতিক্রম করিতে থাকে। এই অবস্থায় পৃথিবী এবং সূর্য্য-চন্দ্রের দূরত্বের সর্ব্বমধ্যতা নিবন্ধন সর্ব্বব্যাপক বায়ু, রস ও তেজের প্রবাহের উগ্রতা পুনরায় মধ্যমাবস্থা লাভ করে এবং ফলে মনুষ্যজাতির মস্তিষ্ক-সামর্থ্য, তথা মাটির উৎপাদন-সামর্থ্য পুনরায় মধ্যমাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই কালে, মনুষ্যজাতি পুনরায় বিজ্ঞান-চর্চা আরম্ভ করে বটে, কিন্তু কালচক্রের প্রথম অবস্থানে মস্তিষ্ক-সামর্থ্য যে অবস্থার পূর্ণতা লাভ করে, তদভাবহেতু কোন কিছু বিষয়েই প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে পারে না। প্রকৃত বিজ্ঞান অথবা প্রকৃত সত্য সন্ধানে এই ব্যর্থতা হেতু বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি বিষয় লইয়া মতবৈষম্য অত্যন্ত প্রবল হয় এবং মনুষ্যজাতি যেমন তাহাদের সমস্যা-সমূহের, তেমনই তাহাদের সমাধান বিষয়ে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অকৃতকার্য্য হয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ক এই অবস্থায়, মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকের দুর্দ্দশা, কালচক্রের প্রথম কলায় যে সামাজিক সংগঠন জনসাধারণকে সুখী করিতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ বিকৃতি বশতঃ চরমে পৌঁছে।

এই কালে মনুষ্যসমাজের শ্রম ও কার্য্যসম্বন্ধে যথাযথ শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ লোপ পায় এবং দুর্দ্দশার প্রাবল্যে শ্রমজীবিগণ বুদ্ধিজীবিগণের কার্য্যবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে। অবিশ্বাস এবং স্বার্থপরতায় সমগ্র পারিপার্শ্বিক কটুতা-পরিবৃত হইয়া পড়ে এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজ নিকৃষ্ট শ্রেণীর নৈরাশ্য এবং বিশৃংখলার আবাসস্থলে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। প্রকৃতির নিয়ম পূরণার্থ আশার বাণী বহনপূর্ব্বক মস্তিষ্ক-সামর্থ্যসম্পন্ন কতিপয় নৈষ্ঠিক ব্যক্তি এই কালে আবির্ভূত হইয়া মনুষ্যসমাজকে শান্তিময় জীবন-যাপনের দুই একটি নির্দ্দেশ দান করেন। মনুষ্যসমাজের এবং মনুষ্যের মস্তিষ্ক-সামর্থ্যের বিশৃংখল অবস্থাহেতু এই সকল নৈষ্ঠিক কর্ম্মদূত সাময়িকভাবে কৃতকার্য্য হইলেও স্থায়ী সুফল আনয়নে বিফল হন। ফলতঃ, এই সময়ে দ্বন্দ্ব-কলহ এবং মতানৈক্যের বিষয়সমূহ আরও বৃদ্ধি পায় এবং এই কালে আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক শ্রমসাধ্যতা, মানসিক শান্তি, দীর্ঘ-যৌবন এবং দীর্ঘ-আয়ুর অভাব প্রাধান্য লাভ করে। এই কালেই সশস্ত্র যুদ্ধলিপ্সা এবং ছল-চাতুর্য্যগত মনোভাব প্রবল হয় এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজ ধ্বংসের শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হয়।

এই কালের শেষভাগে বুদ্ধিজীবিগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন, কেন না, তাঁহাদের অধিকাংশই প্রকৃত বিজ্ঞান এবং সত্যের সন্ধানলিপ্সু হইলেও তাঁহাদের কেহই ইহার সন্ধানলাভে কৃতকার্য্য হন না। এই পর্য্যায়ের বুদ্ধিজীবিগণকে প্রকৃতপক্ষে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যদ্যপি প্রথম প্রথম তাঁহাদিগকে বহু বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের অধিকাংশই বিভিন্ন ব্যাপার ও ঘটনা-সমূহের ক্রমপ্রসার-দৃষ্টে তদনুযায়ী বিজ্ঞান-সন্ধানে চেষ্টিত থাকেন, কিন্তু অপর জনকয়েক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই সকল ব্যাপার ও ঘটনার কারণ উপলব্ধি করিয়া তাহার সন্ধান-প্রয়াসী হন। এই কালে এই দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের প্রথম দল বিজ্ঞান এবং সত্য বিষয়ে প্রতারক পর্য্যায়ে রূপান্তরিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা কোন ব্যাপার কিংবা ঘটনার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা প্রকৃত বিজ্ঞানে উপনীত হইতে সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য্য হন। কালচক্রের এই অবস্থানে মনুষ্যসমাজকে যাঁহারা ধ্বংসের সীমায় উপনীত করেন, ইঁহারাই সেই ব্যক্তিবৃন্দ এবং তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে মনুষ্যসমাজের ঘৃণার্হতম প্রাণীপর্য্যায়ভুক্ত বলিতে হয়। সমাজ

যখন এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তানায়কগণের সম্বন্ধে বিরক্তিবিশিষ্ট হয়, তখন উল্লিখিত দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তানায়কগণের দ্বিতীয় দল কার্য্যে অবতীর্ণ হন এবং মনুষ্যের দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণসমূহের চিন্তা আরম্ভ করেন। এই দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তানায়কগণের দ্বিতীয় দল মনুষ্যের দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণবিষয়ক চিন্তা আরম্ভ করিলেও প্রথমতঃ তাঁহাদের নির্দ্ধারণ অভ্রান্ত হয় না এবং কিছু কালের জন্য তাঁহারা ভুলের পর ভুল করিয়া চলেন।

এই দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তানায়কগণের প্রথম দল সমাজের নিন্দনীয়, কিন্তু দ্বিতীয় দল শ্রদ্ধার্হ, কেন না তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে আত্ম-বিশ্লেষণের অভ্যাস অর্জ্জন করেন এবং জনসাধারণের এবং দরিদ্র-সাধারণের হিতার্থে জীবনযাপন পছন্দ করেন। প্রথমতঃ ভুল-ভ্রান্তি করিলেও এই সকল ব্যক্তিই শেষতঃ অভ্রান্ত পন্থার নির্দ্দেশ দান করেন।

মনুষ্য-স্বভাব এবং চালচলনের দিক্ হইতে কালচক্রের ইহাই পঞ্চম কলা।

গ্রহসমূহের প্রত্যাসরণপূর্ব্বক প্রথম চক্রের পরিধি স্পর্শ করিলে, পৃথিবী এবং সূর্য্য-চন্দ্রের দূরত্বের পুনরায় সর্ব্বানাধিক্য হেতু সর্ব্বব্যাপক বায়ু, রস ও তেজের সংমিশ্রণ-প্রবাহের উগ্রতা পুনর্ব্বার সর্ব্বোচ্চতা লাভ করে। ফলে মনুষ্যজাতির মস্তিষ্ক-সামর্থ্য, তথা মাটির উৎপাদন-সামর্থ্য পুনর্ব্বার সর্ব্বাধিক হয়।

এইকালে, এই দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তানায়কগণের প্রথম দল ক্রমশঃ তিরোহিত হন। দুর্দ্দশা এবং অনটন-পীড়িত জনসাধারণের চাপ প্রবল হওয়ায় এই দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এবং কর্ম্মীর প্রথম দল বাধ্য হইয়া এই দুই শ্রেণীর দ্বিতীয় দলের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। এই ভাবে প্রকৃত বিজ্ঞান পুনরায় আবিষ্কৃত হয় এবং যে-সংগঠন সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সুখ এবং শান্তি প্রদান করিতে পারে, তাহার প্রতিষ্ঠা-সম্ভাবনা ক্রমশঃ নিকট হয়। মনুষ্যজাতি যখন প্রকৃত বিজ্ঞান এবং সমাজ-সংগঠনের প্রকৃত প্রণালীর পুনরুদ্ধার করিতে পারে, মনুষ্যসমাজ তখন পুনরায় কালচক্রের প্রথম কলায় পুনঃপ্রবিষ্ট হয়।

কালচক্রের ইহাই ষষ্ঠ কলা বলিয়া অভিহিত।

শব্দ-বিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া প্রকৃত অর্থে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য-সিদ্ধান্ত অধ্যয়নপূর্ব্বক "কাল", "কালচক্র", "কালচক্রের কলা" বলিতে যাহা বুঝিতে হয়, বিভিন্ন দিক্ হইতে তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কালচক্রের প্রত্যেকটি কলা প্রায় দুই সহস্র বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, কালচক্রের প্রত্যেকটি কলার প্রত্যেকটি নির্দ্দিষ্ট ক্ষণের পুনরাবৃত্তি ঠিক দ্বাদশ সহস্র বৎসর পর-পর সাধিত হয়। এই জন্যই অনাদি কাল ধরিয়া প্রচলিত রহিয়াছে যে, মনুষ্যের ইতিহাস পুনরাবৃত্তিমূলক।

কালচক্রের কলা দ্বারা যদি মনুষ্যস্বভাব এবং চাল-চলন এমন ভাবেই প্রভাবান্বিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে—অনেকে প্রশ্ন করিবেন যে,—জ্ঞান এবং শিক্ষাদীক্ষা-অর্জ্জনে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা সম্পূর্ণ অর্থহীন, কেন না, তদ্বিষয়ক কৃতকার্য্যতা কালচক্রের উপরই অধিকাংশরূপে নির্ভরশীল। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে, কালের প্রভাব প্রায়শঃ অনতিক্রমণীয় হইলেও, সম্পূর্ণতঃ নহে। জ্ঞান এবং শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া যদি পূর্ব্বাহ্ন হইতেই কালচক্রের বিপর্য্যয় কি ভাবে মনুষ্যকে প্রভাবিত করিবার সম্ভাবনা, তাহা জানিতে পারা যায়, তবে তদ্বিরুদ্ধে অনেকাংশে জয়ী হওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, প্রকৃত জ্ঞান এবং শিক্ষা-দীক্ষা কখনও নিরর্থক হয় না। বরং কালচক্রের দুর্ব্বিপাকের প্রভাব প্রতিরোধের ইহাই একমাত্র পন্থা।

স্যর মরিস গ্যাইয়ার এবং স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের বক্তৃতার বিশ্লেষণ

এইরূপে প্রকৃত দৃষ্টিতে, "কাল", "কালচক্র" এবং "কালচক্রের কলা" বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, গত দুই সহস্র বৎসর মনুষ্যজাতি কালচক্রের পঞ্চম কলার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানে ষষ্ঠ কলার প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। আলোচ্য বক্তৃতা দুইটি অংশতঃ ইহারই উদাহরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

স্তর মরিস্ গ্যাইয়ারের বক্তৃতার বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যে, তন্মধ্যে ভারতবাসী এবং সমগ্র মনুষ্যজাতি, উভয়ের দুর্দ্দশার কারণ কি, তাহা সন্ধানের কুত্রাপি চেষ্টা নাই। কনষ্টিটুয়েণ্ট

এসেম্ব্লীর মধ্যস্থতায় ভারতবাসীরা যদি নিজেদের মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার জন্ম চেষ্টিত হয়, তবে কি ঘটিবে, ইহাতে তাহারই আলোচনা দৃষ্ট হয়। অন্ত কথায়, ভারতবাসীরা কন্ষ্টিটুয়েন্ট এসেম্ব্লী সংগঠনের আশ্রয় লইলে, তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কিরূপ হওয়া সম্ভব, স্তর মরিস্ কেবল তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ প্রাকৃতিক কারণ চালিত হইয়া ভারতবাসীরা কন্ষ্টিটুয়েন্ট এসেম্ব্লীর কথা ভাবিতে সুরু করিয়াছে এবং যে প্রাকৃতিক কারণ ভারত-বাসীদিগকে পরিচালিত করিয়া, তাহাদিগকে কন্ষ্টিটুয়েন্ট এসেম্ব্লীর চিন্তায় চিন্তান্বিত করিয়াছে, তদনুযুক্ত তাহাদের বর্ত্তমান মনোগত অবস্থায় ভারতবাসীদিগকে কি পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে, স্তর মরিসকে এই উভয় বিষয়ের সন্ধানে বিন্দুমাত্র চেষ্টিত দেখা যায় না। আলোচনার প্রণালী এইরূপে ভ্রান্ত হওয়াতে তিনি যে-সব মন্তব্য করিয়াছেন এবং সমাধান-পন্থার ইঙ্গিত দান করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই ভ্রান্ত হইয়াছে এবং দেশের কার্য্যে তিনি যে-আসন অধিকার করিয়া আছেন, তাহার অনুপযোগী হইয়াছে।

তাঁহার প্রথম যে-মন্তব্য, "যাঁহাদের লইয়া কোন দেশ গঠিত তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য অথবা সাধারণ মতসাম্য না থাকিলে সেই দেশ স্ব-সম্পূর্ণ অথবা স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না"—তাহা বিচার এবং সিদ্ধান্ত গঠন-সামর্থ্যের দারিদ্র্যের পরিচায়ক। রোমক প্রাধান্ত অপসরণান্তে ইংলণ্ড, তদ্দেশীয় অভিজাতবৃন্দ এবং তাঁহাদের অধীন প্রজাবৃন্দ, প্রোটেষ্টাণ্ট এবং ক্যাথলিক, রাজা এবং পুরোহিত সম্প্রদায়, পুরোহিত সম্প্রদায় এবং জন-সাধারণ, ইহাদের প্রত্যেকের পরস্পরের দ্বন্দ্ব-কলহ এবং বিবাদ-বিসম্বাদ সত্ত্বেও, স্বায়ত্ত-শাসনশীল রাষ্ট্র-ধারণে যখন সমর্থ হইয়াছিল, তখন স্তর মরিস্ গাইয়ারের এই বক্তব্যের কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণই থাকিতে পারে না।

সুতরাং তাঁহার দ্বিতীয় যে-বক্তব্য, "ভারতের জন-সাধারণের পরস্পর মতসাম্য দেখা যায় না, সুতরাং ভারত এখনও স্ব-সম্পূর্ণ এবং স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্য রাষ্ট্র হইতে পারে নাই", তাহা অসিদ্ধ।

কেহ যদি ভারতবাসিগণের পরস্পরের এই মতসাম্যের অভাব ব্যতিরেকে অপর কোন কারণ-সম্বলিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, ভারত এখনও স্বায়ত্ত-শাসনশীল রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তিত হইবার যোগ্য নহে, তবে তাঁহার সহিত আমরা নিশ্চিত একমত হইব।

স্তর মরিসের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ মন্তব্য তাঁহার কল্পনা-সম্ভূত, কেন না, কোন স্থায়সঙ্গত যুক্তির উপর উহারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যদি দেখা যায় যে, কোন একটি দেশও তাহার জন-সাধারণের মধ্যে সাধারণ মতসাম্য ব্যতীত স্বায়ত্ত-শাসন রক্ষা করিতে পারিতেছে, তাহা হইলে অপর একটি দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল অবস্থা লাভ করিতে চাহিলে, তাহার ঐক্যলাভ অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়, এইরূপ যুক্তি প্রদর্শনের কোন কারণই থাকিতে পারে না।

ইহা সত্য হইতে পারে, এবং সম্ভবতঃ ইহা সত্যই যে, ভারত এখনও নীতিসঙ্গত ভাবে ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারী তেমন কোন কন্ষ্টিটুয়েন্ট এসেম্বলী গঠনের যোগ্য নহে, কেন না, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ উৎকোচাদির দ্বারা ভোট-প্রভাবান্বিত করিতে দিব্য রপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু যে-হেতু কন্ষ্টিটুয়েন্ট এসেম্ব্লী অপরাপর দেশে এবং অপরা-পর কালে ব্যর্থ হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় এবং বর্ত্তমান কালে ইহা ভারতেও ব্যর্থ হইবে, এরূপ অনুমান করিবার বিন্দুমাত্র যুক্তি নাই।

স্তর মরিসের ষষ্ঠ বক্তব্যের যাহা শেষাংশ, অর্থাৎ "শাসন-তন্ত্রের রূপদানের সহায়ক কন্ষ্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি নহে, ইহার পরিকল্পনা সার্থক করিতে পারেন নগণ্যসংখ্যক প্রতিনিধি-বৃন্দ", দেশবাসী জনসাধারণের সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যে কিরূপ সীমাবদ্ধ, তাহারই পরিচায়ক। ইহা সাধারণ জ্ঞান-বিষয়ক দার্শনিক সত্য যে, সমগ্র দেশের হইয়া কোন একজন ব্যক্তি কিংবা অল্পসংখ্যক ব্যক্তি শাসনতন্ত্র কেবল তখনই গঠন করিতে পারেন, যখন সেই ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তি-বৃন্দ দেশের সমগ্রসংখ্যক অধিবাসীর প্রয়োজন এবং মনোভাব উপলব্ধি করেন এবং তজ্জন্ত দেশের সমগ্র-সংখ্যক অধিবাসীর আনুগত্য অর্জন ঐ ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবৃন্দ দ্বারা সম্ভব হয়। স্তর মরিস্ গাইয়ার কি ভারতের কিংবা ভারতের বাহিরের এমন দুই জন ব্যক্তিরও নাম করিতে পারিবেন, যাঁহারা সমগ্র ভারতের নীতিসঙ্গত আনুগত্য লাভ করিয়াছেন? এমন জন কয়েককে হয়তো পাওয়া যাইবে,

যাঁহারা নিজেদের অনুচরবৃন্দের বিপুলসংখ্যাকতা লইয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন, কিন্তু যথাযথভাবের বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যাইবে যে, সমগ্র জগতের মধ্যে এমন একটি ব্যক্তির অদ্যাবধি দর্শন মিলে নাই, যিনি ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা এমন কি একাংশেরও নীতিসঙ্গত আনুগত্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া যুক্তিযুক্ত ভাবে দাবী করিতে পারেন। গায়ের জোরে অথবা বাধ্যতামূলক আনুগত্য হয় তো সম্ভব হইয়াছে বলিয়া বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের কোন একটি ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য পরিমাণের নীতিসঙ্গত আনুগত্য অর্জ্জিত সম্ভব হয় নাই।

স্যর মরিসের সপ্তম মন্তব্য "দেশের মতসাম্য আনয়নের একমাত্র পন্থা হইতেছে পরস্পর মেলা-মেশা" অবোধ্য। পরস্পর মেলা-মেশা দ্বারা মতসাম্য নিশ্চিতভাবে লাভ করা যদি সম্ভব হইত, তবে মিঃ গান্ধী এবং মিঃ জিন্নায়, মিঃ গান্ধী এবং মিঃ সুভাষচন্দ্রের পরস্পর কোন প্রকার বিবাদ দেখা যাইত না। আর যাহাই হউক, পরস্পর মেলা-মেশায় তাঁহাদের ঘাটতি হয় নাই। ইহা সাধারণ সত্য যে, পৃথিবীর বর্ত্তমান ব্যবস্থায়, যখন রিপু-দমন শিক্ষার কোন আয়োজন নাই, উপরন্তু রিপু-উদ্রেককর শিক্ষা প্রবল, তখন পরস্পর মেলা-মেশা, পরস্পর দ্বেষ এবং তাহা হইতে পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব হইতে বাধ্য। যেখানে যেখানে পরস্পর মেলা-মেশা বর্ত্তমান, তাহার কোন একটি ক্ষেত্রের সংস্কার বর্জ্জিত বিশ্লেষণ দ্বারা এই সত্যের সারবত্তা প্রমাণিত হইবে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে সুপরিস্ফুট হইবে যে, স্যর মরিসের উল্লেখযোগ্য বক্তব্যের একটিও বিচারসহ নহে। সুতরাং, কালচক্রের পঞ্চম কলায় যে দুই শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং বৈজ্ঞানিকবৃন্দের আবির্ভাব হয় বলিয়া বলা হইয়াছে, স্যর মরিসকে তাহাদের প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে, কেন না, তিনি নিজেকে চিন্তাশীল বলিয়া বিবেচনা করেন, যদ্যপি তাঁহার বক্তৃতা হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, চিন্তাশীল হইবার নিমিত্ত যাহা প্রাথমিক উপাদান, তাহাও তিনি অদ্যাবধি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

আমাদের মতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান সঙ্কটের মূলে যে-সকল ব্রিটিশ রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধর বর্ত্তমান, স্যর মরিস তাঁহাদের অন্তর্গত একজন। গুরু দায়িত্বমূলক পদ অধিকারের নিমিত্ত ব্যক্তি-নির্ব্বাচন বিষয়ে ব্রিটিশ জন-সাধারণ যদি সতর্ক হইতেন, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অথবা ব্রিটিশ জনসাধারণের কোন সঙ্কট উপস্থিত হইত না, ইহা জোর করিয়া বলিবার স্থায় যুক্তি রহিয়াছে। অজ্ঞতা, তথা অনিষ্টকারিতা-জনিত পাপ ব্যতিরেকে কুফল উপস্থিত হয় না, এবং বিশ্বাস করিবার স্বপক্ষে আমাদের যুক্তি বর্ত্তমান যে, ব্রিটিশ জন-সাধারণ পাপাচরণ হইতে এরূপ মুক্ত যে,—যাঁহারা বিরুদ্ধ এবং স্বপক্ষীয় সকল বিষয়ের যথাযথ বিবেচনা না করিয়াই সিদ্ধান্তে উপনীত হন,—সেই স্যর মরিসের শ্রেণীর ব্রিটিশ রাষ্ট্রনৈতিক-গণ দ্বারা তাঁহারা বিভ্রান্ত না হইলে তাঁহাদিগের মুখিকোচিত জীবন-যাপনের কারণ উপস্থিত হইত না।

আমাদের প্রার্থনা এই যে,—দায়িত্বসূচক পদাধিষ্ঠিত তাঁহাদের এই বিবেচনাহীন রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণকে ফিরাইয়া লইয়া পৃথিবী সমক্ষে তাঁহারা প্রমাণ প্রদর্শন করুন, তাঁহাদের ভ্রান্তিসমূহ উপলব্ধি করিয়া তাহার সংশোধনে তাঁহারা পশ্চাদ্‌পদ নহেন,—অবিলম্বে ব্রিটিশ জন-সাধারণ এই সুমতি লাভ করুন।

স্যর মরিসের এই বক্তৃতা যেরূপ পরিচয় দান করে যে, তিনি মূল কারণের প্রতি অবহিত না হইয়াই ঘটনাসমূহের ক্রমিক বিকাশ অনুসরণ করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্যে উপস্থিত হইতে চেষ্টা পান, সুতরাং চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দের বিবেচনার যোগ্য কোন চিন্তাশীলতায় উপস্থিত হইতে তিনি অপারগ,—স্যর ষ্টাফোর্ডের বক্তৃতা সেইরূপ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

কালচক্রের পঞ্চম কলায় এমন এক শ্রেণীর চিন্তাশীল এবং বৈজ্ঞানিকগণের আবির্ভাব হয়, যাঁহারা ভিত্তিহীন চিন্তা এবং প্রতিপাদ্য দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেন, স্যর মরিসের বক্তৃতা যেমন এই সত্যের প্রকাশক, তেমনই কালচক্রের এই একই পঞ্চম কলায়, আত্মপ্রবঞ্চক চিন্তানায়ক এবং বৈজ্ঞানিকগণের ভিত্তিহীন চিন্তা এবং প্রতিপাদ্য দূরীভূত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে, যাঁহারা ঘটনাসমূহের বিষয়-পারম্পর্য্যের কারণ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক চিন্তা এবং প্রতিপাদ্য গঠন করেন, তজ্জপ চিন্তাশীল ধারণা এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দের আবির্ভাব নিশ্চিত হয়, স্যর ষ্টাফোর্ডের বক্তৃতা সেই বাস্তব ঘটনার প্রকাশক।

স্তর ষ্ট্যাফোর্ডের বক্তৃতার যথাযথ অনুশীলন দ্বারা বুঝা যাইবে যে, তদ্দ্বারা সমগ্র মনুষ্যজগতের প্রত্যেকটি ব্যক্তির শান্তি, উৎকৃষ্টতর জীবন-যাত্রার প্রণালী, সুখ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থিত হইতে পারে, এমন একটি বিশ্ব-শৃঙ্খলার নিমিত্ত তিনি অতিমাত্রায় উদ্‌গ্রীব। এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য সমগ্র জগতের পক্ষে প্রয়োজন, বিভিন্ন জাতিসমূহের "সংযোগিতামূলক প্রচেষ্টা এবং দেশের মধ্যে যাঁহাদের কোন প্রকার কায়েমী স্বার্থ বর্ত্তমান নাই, তদ্রূপ জনসাধারণের হস্তে শাসন-পরিচালনের দায়িত্ব সমর্পণ", স্তর ষ্ট্যাফোর্ড এই ধারণা পোষণ করেন বলিয়া মনে হয়।

স্তর ষ্ট্যাফোর্ডের ধারণানুযায়ী দায়িত্বের এই প্রকার হস্তান্তরণ,—যাঁহাদের দেশের মধ্যে কায়েমী স্বার্থ বর্ত্তমান, তাঁহারা পরিবর্ত্তনের কোনরূপ বিরুদ্ধতা না করিলে—ক্রমোন্নয়নমূলক প্রণালীর দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব জন-সাধারণের হস্তে অর্পিত হইলে স্বতঃই মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকের শান্তি, উৎকৃষ্টতর জীবনযাত্রা-প্রণালী, সুখ এবং স্বাস্থ্য লাভ হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন বলিয়া প্রতীতি হয়। শিক্ষিত শ্রেণীর, অর্থাৎ সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে, জন-সাধারণ কি ভাবে তাহাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থাপন করিবেন, তদ্বিষয়ক পরামর্শ দান।

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শিক্ষার উপর স্তর ষ্টাফোর্ডের যথেষ্ট ভরসা আছে বলিয়া মনে হয় না এবং সেই নিমিত্তই তিনি তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে যথাসম্ভব এবং যতদূর সাধ্য জ্ঞানার্জ্জন করিয়া যোগ্যতা-লাভের নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি –"অন্ধ যদি অন্ধকে পরিচালনা করে, তবে উভয়েরই খানায় পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে।" এই যুক্তি বস্তুতঃ আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছে। জনসাধারণের নিকট শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে-ঋণ রহিয়াছে, তাহার দায়িত্বপালনের নিমিত্ত তিনি তাঁহাদিগকে সচেতন হইবার অনুরোধও জ্ঞাপন করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে তাঁহার যুক্তি এইরূপ, "শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন পুঁথি মুখস্থ করিয়াছেন, তখন শ্রমজীবিগণ তাঁহাদিগেরই খাদ্য এবং বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়াছে।" এই যুক্তি সত্যই প্রশংসার যোগ্য এবং স্তর. ষ্টাফোর্ড যে মহদাশয়, ইহা তাহারই পরিচায়ক। কতিপয় ব্যক্তির হস্তে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং প্রচুর অর্থসঞ্চয়হেতু বর্ত্তমানে যে কুফল ফলিয়াছে, সেই কুফল হ্রাস এবং তাহার প্রসার নিবারণ দ্বারা সমাজে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পক্ষে লাভজনক না হইয়া যাহা জনসাধারণের প্রয়োজন-পূরক হইবে, এমন একটি আর্থিক পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠার্থ তিনি নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, মাত্র লেখনী পরিচালনা করিয়াই ইহা সম্ভব নহে, ইহার জন্য প্রয়োজন হইবে সমস্যাকে তাহার প্রাণঘাতী এবং গুরুতর দিক্ হইতে আক্রমণ। তিনি মনে করেন যে, এই প্রকার একটি "আর্থিক পরিকল্পনা" ব্যবস্থিত করিতে হইলে ভারতের স্বাধীন হওয়া আবশ্যক এবং গ্রেট ব্রিটেন, তথা অপরাপর স্বাধীন ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের সহিত ভারতের মৈত্রীমূলক সম্পূর্ণ সংযোগিতা আবশ্যক

জন-সাধারণের আধ্যাত্মিক এবং চিত্তগত স্বাধীনতার প্রয়োজনের প্রতি এবং "মনুষ্যকে যন্ত্রমাত্রে পর্য্যবসিত" করার প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তার প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তিনি বক্তৃতার উপসংহার করিয়াছেন।

এই প্রকার অনুশীলন-সাহায্যে স্তর ষ্টাফোর্ডের সমগ্র বক্তৃতা যদি কেহ অনুধাবন করেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে, স্তর ষ্টাফোর্ডকথিত "উৎকৃষ্টতর জীবনযাত্রা" প্রণালীর অর্থ কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার মতে, ইহার অর্থে যদি আধুনিক সমাজের অভিজাত-সুলভ জীবনযাত্রার প্রণালী ধরিতে হয়, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে, তাহা যেরূপ আদর্শ সমাজের কাহারও পক্ষেই উৎকর্ষমূলক নহে, তেমনই সমাজের প্রত্যেকের পক্ষে তাহা অর্জ্জনও সম্ভব নহে। "উৎকৃষ্টতর জীবনযাত্রার প্রণালী" অর্থে তিনি যদি জনসাধারণের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য-রক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী কোন প্রণালী বুঝিয়া থাকেন, আমরা নিশ্চিতই তাঁহার সহিত সে-বিষয়ে একমত। যে-বিশ্ব শৃঙ্খলা সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির শান্তি, যুক্তিযুক্ত জীবনযাপন প্রণালী, সুখ এবং স্বাস্থ্য-লাভ-সহায়ক সংগঠন সম্বলিত নহে, তাহা ঐ নাম-ধারণের উপযোগী পর্য্যন্ত নহে, এমন কথা বলিতে চাহিলে তিনি সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলিয়াছেন।

এই উদ্দেশ্যপূরণার্থ স্তর ষ্টাফোর্ড মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন

জাতির পক্ষে আচরণীয় হিসাবে নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

(১) অনেকগুলি বিভিন্ন জাতির সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা।

(২) সুবিধাভোগী শ্রেণী হইতে শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব জনসাধারণের নিকট হস্তান্তরণ।

(৩) বৈপ্লবিক পন্থা প্রতিরোধ এবং ক্রমোন্নয়নমূলক পন্থা অবলম্বন।

(৪) কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ যাহাতে জনসাধারণের প্রতি এই দায়িত্ব হস্তান্তরণের বিপক্ষতা না করেন, তাহার জন্য চেষ্টা করা।

(৫) রাষ্ট্রীয়, অর্থ-নৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে ব্যাপকতর জ্ঞানার্জ্জনপূর্ব্বক শিক্ষিত সম্প্রদায় জনসাধারণ-পরিচালিত শাসনতন্ত্রের যাহাতে উপদেষ্টা হইতে পারেন, তাহার জন্য চেষ্টা করা।

(৬) শাসন-দায়িত্ব জন-সাধারণের নিকট হস্তান্তরিত হইবার পর সমাজে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা।

এই সকল নির্দ্দেশপ্রসঙ্গে স্যার ষ্ট্যাফোর্ডকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে বলি :—

(১) পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে খাদ্যবস্তুর পরিমাণে যখন ঘাট্‌তি উপস্থিত এবং এই ঘাট্‌তি-নিবন্ধন যখন জন-সাধারণের কিয়দংশ সম্পূর্ণ অথবা অংশতঃ অনাহার ভোগে বাধ্য এবং যখন জীবনযাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জনার্থেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন অপরিহার্য্য, তখন কোন প্রকার সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা সম্ভব কি না?

(২) নিরক্ষর জন-সাধারণের হস্তে দায়িত্ব ন্যস্ত হইলে কোন শাসনকার্য্য যথাবিহিত ভাবে পরিচালিত হইতে পারে কি না? হস্তের এবং পদের দ্বারা মস্তিষ্কের কর্ত্তব্য সাধিত হইতে পারে কি না?

(৩-৪) শাসন-দায়িত্ব পরিহারার্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এবং যাঁহারা কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সঞ্চিত স্বার্থ বর্জ্জনার্থ বলিলে, তাঁহাদের সকলেই কি বিঘ্ন উপস্থিত না করিয়া অনুরোধ রক্ষা করিবেন? তাঁহারা ইহা রক্ষা না করিলে, বিপ্লবের কারণ আপনা হইতেই উপস্থিত হইবে না কি?

(৫) বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় এবং অর্থ-নৈতিক জ্ঞানের ত্রুটি কি, তাহা সুস্পষ্টভাবে না দেখাইয়া দিলে রাষ্ট্রীয় এবং অর্থ-নৈতিক বিষয়ে ব্যাপকতর জ্ঞানার্জ্জন শিক্ষিত সম্প্রদায় দ্বারা সম্ভব কি না?

(৬) কোন সমাজেই সম্পূর্ণ আর্থিক সাম্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না? পরিশ্রমসাধ্য এবং বুদ্ধিসাধ্য কার্য্যের মূল্যনির্দ্ধারণের একই হার প্রকৃতিসঙ্গত কি না?

স্যর ষ্ট্যাফোর্ড যদি স্বীকার করেন যে, নিম্নলিখিত প্রকার সংগঠন সাধিত হইলেই বিশ্ব-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব, তবে তাঁহার সহিত আমরা একমত; যদি সেই সংগঠন—

(১) মনুষ্যজাতির প্রত্যেককে বেতনভোগী নকরগিরির অধীন না হইয়াও জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জনের সুযোগ দান করে।

(২) ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য, মন এবং বুদ্ধি-সামর্থ্যের উপযোগী উপার্জ্জন করিতে পারিতেছেন বুঝিয়া মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের সন্তুষ্টি বিধান করে।

(৩) মনুষ্যজাতির প্রত্যেককে মানসিক অশান্তি হইতে নিষ্কৃতিলাভের সুযোগ দান করে।

(৪) মনুষ্যজাতির প্রত্যেককে শারীরিক অযোগ্যতা হইতে নিষ্কৃতিলাভের সুযোগ দান করে।

(৫) মনুষ্যজাতির প্রত্যেককে অকালবার্দ্ধক্য হইতে নিষ্কৃতিলাভের সুযোগ দান করে।

(৬) মনুষ্যজাতির প্রত্যেককে অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভের সুযোগ দান করে।

নির্দ্দিষ্ট বিশ্ব-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার্থ এই সকল উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করিতে হইলে, স্যর ষ্ট্যাফোর্ডের পর্য্যায়ের যে-সকল ব্যক্তি স্বার্থপরিহারপূর্ব্বক জন-সাধারণের হিতার্থে জীবনযাপনে আনন্দ বোধ করেন, তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ যে-সকল সংগঠন এই উদ্দেশ্যসমূহ কার্য্যকরী করিতে পারিবে, গবেষণাপূর্ব্বক তাহার সন্ধান লাভ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে গবেষণায় ব্যাপৃত হইলে দেখা যাইবে যে, কেবল নিম্নলিখিত দুইটি অবস্থাতেই এই সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া সম্ভব :—

(১) যখন পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের সমগ্র জন-সাধারণের প্রত্যেকের মাথাপিছু দৈনিক অর্দ্ধের পরিমাণ হিসাবে বার্ষিক প্রয়োজনের পক্ষে প্রত্যেকটি দেশের ধান্ত কিংবা গম উৎপাদন যথেষ্ট হইবে ;

(২) বিশ্ব-শৃঙ্খলা লাভার্থ সকল উপযোগী বিষয় এবং রিপুদমন-বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা বিস্তার লাভ করিবে।

স্যর ষ্ট্যাফোর্ডের পর্য্যায়ের ব্যক্তিবৃন্দ এই সকল বিষয়ে যদি গবেষণায় ব্যাপৃত হন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, অধুনা অধিকাংশ দেশেই তাহার সমগ্র অধিবাসীর বার্ষিক প্রয়োজনীয় পরিমাণের পক্ষে ধান্ত এবং গমের বার্ষিক উৎপাদন যেমন যথেষ্ট নহে, তেমনই বিশ্ব-শৃঙ্খলা লাভার্থ উপযোগী বিষয় এবং রিপুদমনের শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার সহায়ক কোন প্রকার শিক্ষা-পদ্ধতিবিষয়ক অভাবও তাহাদের বর্ত্তমান। তদুপরি দেখা যাইবে যে, সমগ্র জগতে বর্ত্তমান প্রয়োজনীয় আহার্য্য এবং কাঁচামালের বার্ষিক শতকরা ৪০ ভাগ ঘাটতি চলিয়াছে এবং রিপু-উদ্রেককারী শিক্ষা বলবৎ রহিয়াছে। এই জন্যই অধুনা জন-সাধারণকে পরস্পর বিবদমান হইতে দেখা যায় এবং সমগ্রভাবে সহযোগিতামূলক চেষ্টা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

স্যর ষ্ট্যাফোর্ডের পর্য্যায়ের ব্যক্তিবৃন্দ এই সত্য বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে অতঃপর তাঁহাদিগকে উৎপাদনের ঘাটতির কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে হইবে এবং যে-শিক্ষানীতিতে যুবকবৃন্দ রিপুদমনে অভ্যস্ত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উৎপাদনের ঘাটতির কারণ বিষয়ে গবেষণায় তাঁহারা ব্যাপৃত হইলে উপলব্ধি করিবেন যে, ইহার একমাত্র কারণ জমীর স্বাভাবিক উৎপাদন-শক্তির হ্রাস এবং তাহার মূলে রহিয়াছে প্রত্যেক দেশের নদীসমূহের স্রোতে বিবিধ বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি। তাঁহারা আরও উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, নদীস্রোতের এই সকল বাধা দূর করিতে পারিলে এবং মুদ্রাপ্রচলন-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বিতরণ-সাম্যের ব্যবস্থা করিতে পারিলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থিক প্রাচুর্য্য স্বতঃই সাধিত হইয়া যাইবে। অতঃপর যুবকবৃন্দকে রিপু-দমনের শিক্ষায় অভ্যস্ত করিতে পারে, এমন শিক্ষা ব্যবস্থিত করিতে পারিলে, মানসিক অশান্তির, শারীরিক অস্বাস্থ্যের, অকালবার্দ্ধক্যের এবং অকালমৃত্যুর কারণসমূহ চিরতরে বিদূরিত হইবে। এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সমগ্র গবেষণাতে দেখা যাইবে যে, স্যর ষ্ট্যাফোর্ডের উদ্দেশ্যানুরূপ বিশ্ব-শৃঙ্খলা সংগঠন সূচনায় যতখানি কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হইতেছে, বস্তুতঃ ততখানি কষ্টসাধ্য নহে। পন্থার সন্ধান যতখানি কষ্টসাধ্য, পন্থানুযায়ী কার্য্য অন্ততঃ ততখানি কষ্টসাধ্য হয় না। জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির ক্রমিক হ্রাসের নিবারণোপায় সম্বন্ধে একবার কৃতনিশ্চয় হইতে পারিলে, তখন কেবল জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির ক্রমিক হ্রাস-নিবারণের আন্দোলন উপস্থিত করিতে হইবে মাত্র। জনসাধারণের পক্ষ হইতে ইহার জন্য আন্দোলন উপস্থিত হইলে কোন রাষ্ট্রই তাহার প্রতিরোধে সক্ষম হইবে না এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র সর্ব্বতোভাবে জনসাধারণের ইচ্ছাপূরণে বাধ্য হইবে। অতঃপর যদি এমন আইন করা যায়, যদ্দ্বারা যে-ব্যক্তি তাঁহার রিপু-দমন, তথা তাঁহার কার্য্য-সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব-পরিচালনার উপযোগী গুণার্জ্জনে কৃতকার্য্য না হইবেন, তিনি সরকারের কোনও কার্য্য-দায়িত্বলাভের যোগ্য বিবেচিত হইবেন না, তবে বর্ত্তমান রাষ্ট্রসমূহের বিপক্ষাচরণের কারণ চিরকালের জন্য অপসৃত হইবে।

আমরা উপরে যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিলাম, তদ্বিষয়ে উৎসুক ব্যক্তিমাত্রকেই আমরা ইহার বিস্তৃত বিবরণ জানাইতে প্রস্তুত। রক্তপাত এবং বিপ্লব ব্যতিরেকে পৃথিবীতে উদ্দেশ্যানুরূপ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিবার সহায়ক ইহাই একমাত্র পরিকল্পনা।

আমরা প্রার্থনা করি যে, স্যর মরিসের শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ ক্রমশঃ প্রাধান্যচ্যুত হউন এবং স্যর ষ্ট্যাফোর্ড পর্য্যায়ের ব্যক্তিবৃন্দ পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করুন।*

* দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রীর ২৮শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

অপরাধের গুরুত্ব

জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার পর হইতে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ক চিন্তায় নিম্নলিখিত ঘটনাবলী দৃষ্টি আকৃষ্ট করে :—

(১) ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের নিকট যুদ্ধের উদ্দেশ্য ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণার নিমিত্ত কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক একটি প্রস্তাবে দাবী জ্ঞাপন।

(২) সংখ্যালঘিষ্ঠ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, অথবা এক কথায় হিন্দুমুসলমানের বিরোধের অবসান দ্বারা প্রকৃত ঐক্য গঠিত হইলেই ভারতকে 'ডোমিনিয়ন-ষ্টেটাস' দান করা হইবে, ভারত সচিব, তথা বড়লাটপ্রমুখ ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ কর্ত্তৃক এই উত্তর দান।

(৩) কংগ্রেসকর্ত্তৃক অধিকৃত মন্ত্রিসভার পদত্যাগ।

(৪) বড়লাট কর্ত্তৃক বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে, বিশেষতঃ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দকে পরস্পরের বিবাদ মিটাইবার অনুরোধের উদ্দেশ্যে আহ্বান।

(৫) কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে আপোষ-আলোচনা এবং বর্ত্তমানে উভয়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠার সকল সম্ভাবনার অবসান।

(৬) মিঃ জিন্না কর্ত্তৃক "মুক্তি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিবস" উদ্‌যাপনার্থ ঘোষণা এবং কংগ্রেস-পরিচালিত সরকারসমূহের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ অনুসন্ধানার্থ রয়াল কমিশনের বিষয় উত্থাপন।

(৭) "মুক্তি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিবস" বিষয়ে এক পক্ষে মেসার্স জিন্না ও ফজলুল হক এবং অন্য পক্ষে মেসার্স গান্ধী ও জহরলাল কর্ত্তৃক বাদ-প্রতিবাদমূলক বিবৃতি দ্বারা দ্বন্দ্ব-কলহের ক্ষেত্র প্রসার।

(৮) দেশের মধ্যে এই সকল দ্বন্দ্ব-কলহ নিবারণার্থ ব্যক্তিগত ভাবে অথবা বড়লাট হিসাবে লর্ড লিনলিথগোর দিক্ হইতে কোনপ্রকার চেষ্টার অভাব। এই সম্বন্ধে লর্ড লিনলিথগোর পালিত একমাত্র কর্ত্তব্য, তৎকর্ত্তৃক স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর বিবাদ মিটাইয়া ঐক্যবদ্ধ হইবার ঔচিত্য সম্পর্কে সদুপদেশ দান।

(৯) সকল উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র কর্ত্তৃক হয় এক পক্ষ, নয় অপর পক্ষ সমর্থনের প্রবৃত্তি প্রদর্শন এবং সর্ব্বতোভাবে দ্বন্দ্ব-কলহ নিবারণ প্রবৃত্তির অবিদ্যমানতা।

রাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত এই সকল ঘটনার গভীর পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ পরস্পরের মধ্যে নির্ব্বোধোচিত কলহে ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা সমগ্র দেশের কোন হিত সাধিত না হইয়া কেবল দ্বন্দ্ব-কলহেরই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধিত হইতেছে।

হিন্দুমুসলমান নেতৃবৃন্দ একদিকে যখন এইরূপে কার্য্য-নিবিষ্ট, যে সকল বিটিশ রাষ্ট্রনেতার হস্তে আইন-গঠনের কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত, অন্যদিকে তাঁহারাও এতাবৎ জনসাধারণের নিশ্চিত সর্ব্বনাশ-সাধনমূলক এই প্রকার দ্বন্দ্ব-কলহ নিবারণার্থ কার্য্যতঃ কিছুই করেন নাই। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের এই আচরণ হইতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান সন্দেহ সঙ্গতভাবে প্রমাণিত হইতে পারে যে, হয় তাঁহারা জনসাধারণের সর্ব্বনাশ-সাধনমূলক নেতৃবৃন্দের পরস্পর এই কলহ-নিবারণের পন্থা অবগত নহেন, সুতরা তাঁহারা কোন দেশ-শাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য, নয়, তাঁহারা এই দ্বন্দ্ব-কলহের নিবারণ চাহেন না, অন্য কথায় নেতৃবৃন্দের পরস্পর এই দ্বন্দ্ব-কলহবৃদ্ধিই তাঁহারা কামনা করেন। দেশের রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য ঘটনার রূপ যখন এই প্রকার, রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত এই অবস্থায় যেরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে, দেশের অর্থনীতিগত অবস্থাও তদনুরূপ। এতদ্‌ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নানুযায়ী :—

(১) প্রায় সকল পল্লীগ্রামের চাষীদিগেরই শতকরা নিরানব্বই জনের আহার্য্য সঙ্কুলানের বিষয়ে

বর্ত্তমান বৎসরের কৃষিজাত আহার্য্য দ্রব্য চারি মাস কালের পক্ষেও যথেষ্ট না হইবার আশঙ্কা।

(২) ভারতের পল্লীগ্রামবাসী শতকরা যে নিরানব্বই জন লইয়া শ্রমজীবী-শ্রেণী গঠিত, বৎসরের ৩৬৫ দিনের উপযোগী ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংগ্রহকল্পে উপযোগী কার্য্যনিয়োগ সন্ধানে অসামর্থ্যহেতু তাহাদিগের মধ্যে ক্রমশঃ অসহায়তার বৃদ্ধি।

(৩) পল্লীবাসী শতকরা নিরানব্বই জনের মধ্যে অনশন ও অর্দ্ধাশনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ নৈরাশ্যজনক ভাবের ক্রমশঃ বৃদ্ধি। স্বকীয় আত্মাভিমান অথবা পদমর্য্যাদা নিবন্ধন অন্ধতা হেতু সমূহ বিপদ্ উপস্থিত না হইলে যাঁহাদের কিছুই বোধগম্য হয় না, তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই অবস্থা ধরা পড়িতে না পারে, কিন্তু প্রকৃত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যে-কোন ব্যক্তি এই অবস্থা লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

(৪) মফঃস্বলের চিকিৎসক ও ব্যবহারজীবিগণের শতকরা নিরানব্বই জনের শিশু-সন্তান-সহ সপরিবারে দুই বেলা দুই মুষ্টি আহার্য্য সহযোগে দিন-যাপন প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ায় তাঁহাদের প্রায়শঃ হীনাহীন ও পাপাপাপ-জ্ঞানশূন্যতা।

(৫) মফঃস্বলের জোতদার ও বণিক্ শ্রেণীর শতকরা নিরানব্বই জনের মধ্যেও মফঃস্বলের চিকিৎসক ও ব্যবহারজীবিগণের এই ভাবের ক্রমশঃ সংক্রামণের প্রাবল্য।

পল্লীবাসীদিগের আর্থিক অবস্থা যেরূপ এই প্রকার, শহরবাসীদিগের অবস্থাতেও সেইরূপ নিম্নলিখিত ভাব সুপরিস্ফুট বলিয়া দেখা যায় :—

(১) শহরবাসী জন-সাধারণের শতকরা যাঁহারা একাংশ পর্য্যন্ত নহেন, সেই মাল-বাঁধাইকারী ও ফাটকাবাজের দলকে কাগজের নোট ও ধাতু-মুদ্রারূপ অর্থসঞ্চয়ে এবং লাভের আশায় উৎফুল্ল দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও অতি সামান্যাংশকেই প্রত্যাশানুযায়ী কার্য্যতঃ এতাবৎ সফল হইতে দেখা যায়। ইতিমধ্যেই তাঁহাদের একাংশকে ঝুঁকিদারী বাণিজ্যের লোকসানে উদ্বিগ্ন হইতে দেখা যাইতেছে।

(২) যে-সকল শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর ব্যবসায়-সামগ্রী সরকারের ক্রয়-দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা নিজেদের ব্যবসায়ের বাধাহীন প্রসার সন্দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন বটে, কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর সমগ্রাংশের তাঁহারা এমন কি শতকরা আড়াই ভাগ পর্য্যন্ত নহেন, অথবা শহরবাসী সম্পূর্ণ জন-সংখ্যার শতকরা একাংশের অর্দ্ধভাগও নহেন।

(৩) যে-সকল শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর ব্যবসায়-সামগ্রী সরকারের ক্রয়দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাঁহারা তাঁহাদের উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যাপার ক্রমশঃ কষ্টসাধ্য হইতেছে দেখিয়া উদ্বেগানুভাব আরম্ভ করিয়াছেন। কাঁচামাল ও কলকব্জার যেগুলি আমদানী করিতে হয়, তাহাদের অনেক উল্লেখযোগ্য দ্রব্যসমূহেরই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে বিক্রয়-সঙ্কোচ সাধনের প্রয়োজন হেতু, উৎপাদনের ব্যাপারে কষ্টসাধ্যতা উপস্থিত হইয়াছে। ক্রয়শক্তির হ্রাস নিবন্ধন বিক্রয়-ব্যাপারে কষ্টসাধ্যতার ফলে বিক্রয় বিষয়ের হ্রাস-সূচনা।

(৪) সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা যে নিরানব্বই জন, সেই জন-সাধারণের ইতিমধ্যেই দুর্দ্দশাজনিত কষ্টভোগ সুরু হইয়াছে এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের মূল্য তাহাদের ক্ষমতাতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে জীবন তাহাদিগের দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িয়াছে।

(৫) দীর্ঘকাল বেকার থাকিবার ফলে অনশন ও অর্দ্ধাশনের জ্বালায় অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকের তারুণ্যের অভাব হেতু ম্রিয়মাণতা।

সমগ্র আর্থিক অবস্থা যথাবিহিত ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে সুপরিস্ফুট হইবে যে, দেশীয় এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের ঐকমত্য এবং সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধতা

ব্যতিরেকে আর কোন পন্থাতেই জন-সাধারণকে আসন্ন সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করা সম্ভব নহে।

আমাদের মতে, যে-সকল দেশীয় এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা —যে-কোন 'মহাত্মা', কিংবা বড়লাট, কিংবা প্রধান-মন্ত্রী তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত হউন না কেন,—তাঁহাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম এবং বর্ত্তমান অবস্থায় দ্বন্দ্ব-কলহ-নিবারণার্থ কার্য্যক্রম যাঁহারা অনুসরণ করিতেছেন না, তাঁহারা নিজদিগকে কেবল দায়িত্বহীন প্রমাণ করিতেছেন যে তাহা নহে, কার্য্যকলাপের দ্বারা শুরু-অপরাধজনিত আইনকর্ত্তৃক তাঁহারা দণ্ডনীয়ও হইয়াছেন

"অপরাধ (offence)" কথাটির অর্থের সম্যক্ অনুধাবন দ্বারা বুঝা যাইবে যে আমরা অন্যায় বলিতেছি না। বেন্থামের কথায়, "অপরাধ হইতেছে নিষিদ্ধ কার্য্য, অথবা এমন কার্য্য, আইনে যাহার বিপরীত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (an offence is an act prohibited, or an act of which the contrary is commended by law*)" 'অপরাধ'-এর এই সংজ্ঞার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে হইলে, "আইন" কথাটির প্রকৃত অর্থ পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

প্রচলিত ভাষানুযায়ী, "যে-সকল বিধি, হয় যথা-বিহিতভাবে গৃহীত হওয়ায় কিংবা রীতি নীতিহিসাবে কোন রাষ্ট্র অথবা সমাজ তদন্তর্গত প্রজা অথবা সদস্যবৃন্দের পালনীয় বলিয়া মনে করেন, তাহাই আইন (law is the body of rules, whether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or commnity recognises as binding on its members or subjects.)"

আইন কথাটির এই অর্থের সহিত প্রত্যেক রাষ্ট্রের যাহা প্রাথমিক দায়িত্ব, "জনসাধারণের হিতার্থে পরিচালনা", তাহা পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলে স্পষ্ট হইবে যে, যদি কোন বিধান ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের স্বার্থসাধনের প্রতিকূল হয়, তবে সেই বিধানকে ন্যায়সঙ্গতরূপে "আইন" অভিহিত করা চলে না। সুতরাং বুঝিতে হয় যে, রাষ্ট্র-প্রতিনিধি অথবা জনসাধারণের প্রতিনিধিবৃন্দের কোন কার্য্য যদি জন-সাধারণের হিত-সাধনে অক্ষম হয়, অথবা জনসাধারণের অহিত সাধন করে, তবে সেই কার্য্যকে "অপরাধ" বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। দ্বন্দ্ব-কলহ কখনও জনসাধারণের হিত-সাধক হয় না, বরং দ্বন্দ্ব-কলহ জনসাধারণের নিশ্চিত রূপে অহিত সাধন করে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যেদি কোন বড়লাট ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণের দ্বন্দ্ব-কলহ কার্য্যতঃ নিবারণ না করিতে পারেন, তবে যে-পুণ্য আসন তিনি অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে তাহার অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া অভিযুক্ত করিতে হইবে

যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে যে, ভারতীয় জন-সাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম-বিষয়ে অদ্ভুত ধারণার বিদ্যমানতা-বশতঃই ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণের দ্বন্দ্ব-কলহ নিবারিত হইতে পারে না। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, ভারতের বড়লাট বাহাদুর যদি ভারতবর্ষের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধিসাধনের ব্যবস্থায় তৎপর হইয়া প্রত্যেক কৃষিককে বেতনভোগী নফরগিরির অধীনতা ব্যতীত জীবন-যাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যলাভের সুযোগ দান করেন, তবে এই সকল দ্বন্দ্ব-কলহপরায়ণ নেতৃবৃন্দকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশকর দ্বন্দ্ব-কলহ নিবারণে তাঁহাকে মোটেই বেগ পাইতে হইবে না।

ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, আমাদের রাজ-প্রতিনিধি বড়লাট বাহাদুরের বিরুদ্ধভাবণ আমরা করিতে পারি না, কিন্তু বড়লাটের পদাভিষিক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা এবং কার্য্যকলাপের সমালোচনায় আমাদের অধিকার আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। সুতরাং যতদিন ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণের দ্বন্দ্ব-কলহ নিবারণ করিয়া তিনি জন-সাধারণের শতকরা নব্বই জনকে প্রত্যাসন্ন অনাহার-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দান করিতে না পারেন, ততদিন বড়লাট বাহাদুরের পুণ্য আসন অধিকারের যোগ্য বলিয়া তিনি নিজেকে বিবেচনা করিতে পারেন কি না, তদ্বিষয়ক আত্ম-বিশ্লেষণার্থ আমরা লর্ড লিনলিথগোকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

ইহা স্বতঃসিদ্ধবৎ সত্য যে, ভারতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পুনরুদ্ধারের সহায়তা করিলে ভারতের জনসাধারণকে দারিদ্র্য হইতে রক্ষা, তথা অবশিষ্ট পৃথিবীর সমগ্র জনসাধারণের আহার্য্যদান এবং জগতে ব্রিটিশ জাতির প্রাধান্যরক্ষার ব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না।

আমরা ব্রিটিশ জনসাধারণ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হিতার্থী এবং সেই নিমিত্তই ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ যাহাতে সময় থাকিতে সাবধান হন, আমরা তাহাই চাই।

তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, রাষ্ট্রীয় নেতাদের পরস্পর এই দ্বন্দ্ব-কলহ ফলতঃ স্বাধীনতা এবং ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের দাবী হইতে তাঁহাদিগের আত্মরক্ষার সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে ভারতীয় জনসাধারণের সমগ্রাংশের শতকরা ৯৫ জনের অনাহার এবং বিবিধ দুর্দ্দশায় ক্ষিপ্ত হইয়া যে-বিপর্য্যয় আনয়নের সমূহ আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহা হইতে রাষ্ট্রীয় নেতাদিগের এই কলহ ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণকে কোন উপায়েই রক্ষা করিতে পারিবে না। এই বিপদ নিবারণের একমাত্র উপায় হইতেছে জমীর উর্ব্বরাশক্তির সমস্যা সমাধানার্থ আন্তরিক ভাবে চেষ্টিত হইয়া তদ্‌কল্পে বিচক্ষণ পন্থানুসরণ, কিন্তু যতদিন দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের কোনরূপ প্রাবল্য থাকিবে, ততদিন এই সমস্যার প্রতি যথোচিত ভাবে অবহিত হওয়া সম্ভব হইবে না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণের ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের দাবী ব্রিটিশ জাতিদের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য হইতে কখনও বিচ্যুত করিতে না পারিলেও জন-সাধারণের শতকরা নব্বই জনের ক্ষুধা ও দুর্দ্দশাক্ষিপ্ত বিপর্য্যয় যে-কোন সুগঠিত ও সবল-ভিত্তি রাষ্ট্রের বিনাশ সাধন করিতে পারে।

সুতরাং ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণকে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, দেশের আভ্যান্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ বস্তুতঃ তাঁহাদের উপকার অপেক্ষা অপকার অধিক সাধন করিতেছে।

ভগবান্ তাঁহাদিগকে এই সরল সত্য কথাগুলি বুঝিবার সুমতি দান করুন।*

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ২১শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

কংগ্রেস ও আমরা

…বঙ্গশ্রীর মতে, ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধিত হইয়াছিল প্রাকৃতিক কারণে এবং প্রকৃতির হস্তক্ষেপ বিদ্যমান ছিল বলিয়াই মূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ইংরাজ ও ভারতীয়ের মিলনে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের ঐকান্তিকতায় সাধিত হইয়াছিল। ঠিক পথে পরিচালিত হইলে ঐ ভারতীয় কংগ্রেসই প্রকৃত কংগ্রেসরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারিত এবং আজ উহার বিরুদ্ধে আমাদেরও কিছু কহিবার থাকিত না।…

কাজেই, বঙ্গশ্রীর বিরোধিতা অথবা বিদ্রোহ প্রকৃত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নহে, পরন্তু বর্ত্তমান পরিচালনার বিরুদ্ধে।

কংগ্রেসের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার প্রথমভাগে দেশীয় গবর্ণমেণ্ট যাহাতে লোকহিতকর হয়, তাহা করাই কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু, কি করিলে যে গবর্ণমেণ্ট প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণভাবে লোকহিতকর হইতে পারে, তাহা তৎকালিন পরিচালকবর্গ গবেষণা করিয়া আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে যথাযথ পথেও কংগ্রেস পরিচালিত হয় নাই।…

…এখনও জনসাধারণকে তাহাদের দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে হইলে, যাহাতে কংগ্রেস রাহুর কবল হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় সুপথে পরিচালিত হয়, তাহার প্রচেষ্টায় উদ্যত হইবে হইবে।…

স্থিতি ও গতি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

(৩০)

"আসুন মিষ্টার সরকার, good evening !"

"Evening ! ভাল আছেন মিষ্টার রায় ?"

"এই যেমন দেখছেন, চলে যাচ্ছে এক রকম। বাঃ, অতীন যে ! এস।"

হাসিয়া অতীন উত্তর করিল, "এসেছিই ত, যদিও সেটা বিশেষ স্বাগত বলে তুমি মনে করে নিতে পারছ কি না, জানি না। তবে আসতে আমাকে হয়েছে, কারণ ভিক্টর সাহেব টেনে নিয়ে এলেন—"

"বটে ! এঁর সঙ্গে তোমার—"

"বহু দিনের আলাপ পরিচয়, বন্ধুত্বও বলতে পার। ঘ'টে গেছে, কারণ সর্ব্বঘটেই আমি বিরাজ করি; হুতাশনবৎ সর্ব্বভুক্‌ও বটে। মোটা বাপের ছেলে ত নই; পয়সা কুড়িয়ে খাই, যেখানে যা পাই।"

হাসিয়া ভিক্টর কহিল, "অতীন আমাদের বড় একজন বন্ধু আর খুব helpful একজন agentও বটে।"

"এজেণ্ট !"

"বা দালাল ! নতুন একটা প্লে খুলতে টাকার দরকার হয়—সেটার দালালী করি, আর artist-দের সঙ্গেও যোগাযোগ অনেক সময় ঘটিয়ে দিই। একটা mass scene আনতে হয়, বহু লোক তখন লাগে, জুটিয়ে-পাটিয়ে আনা তাতেও expert hand দুই একজন দরকার। পয়সাও আছে, স্ফূর্ত্তিও আছে; আবার exuberence of animal energy যে একটা আছে তারও outlet একটা চাই—কাজেই জুটে গেছি দলে।"

ভিক্টর কহিল, "হাঁ, যথেষ্ট সাহায্য ওঁর থেকে আমরা পাই। সব রকম acting এও—comic কি serious—খাসা aptitude আছে। Artistদের coachingও চমৎকার দিয়ে থাকে, ইচ্ছে করলে ফাষ্ট ক্লাস একজন ষ্টারই হতে পারত, তবে নামাতে কখনও পারলাম না।"

রবীন কহিল, "কেন, এতই যদি aptitude আর taste আছে, নামতেই না তবে চাও কেন অতীন ?—এত বড় একটা profession, আর তার এই rising popularity—"

"সবই স্বীকার করছি রবীন। তবে কি জান, সদরে একেবারে নাম জাহির করতে চাই নি। Professionটা popularও বেশ হয়ে উঠছে আর খাসা attractiveও বটে। তবে অসুবিধেও কিছু আছে। সকল মাঠেই ঘাস আর সকল ঘাটেই জল খেয়ে এখনও বেড়াতে হয়। সর্ব্বত্র অবাধ গতি-বিধি এখনও এদেশে film-star কি stage-starদের চলে না। ছোকরা-মহলে যতই আদরে এঁরা অভিনন্দিত হন, serious গেরস্থ যাঁরা তাঁদের বাড়ীতে এঁরা কলকে বড় পান না, যদিও মজলিসে বেশ একটা হৌ-টৌ এঁদের সঙ্গে অনেকেই এসে করে থাকেন। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব যাঁরা আছেন, তাঁদের বাড়ী-ঘরের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বর্জ্জন করে চলব এতটা দুঃসাহস এখনও হয় নি। ভবিষ্যতের অনেক স্বার্থও এঁদের অনেকের সঙ্গে বেশ কিছু জড়িত আছে।"

"হু।"

রবীন একটু ভ্রূকুটি করিল। একটু কি ভাবিয়া শেষে কহিল, "তোমার দুঃসাহস বলে যে কিছু আছে, সেটা জানতাম না। তবে স্বার্থ—কোন্ স্বার্থের আশায় এ কাপুরুষতা তোমার আসছে জানি না। সে যাই হক, এ দুঃসাহসটা—দুঃসাহসই যদি বল—আমি করতে প্রস্তুত হয়েছি।"

"তা তোমরা হলে 'রাজার নন্দিনী প্যারী, যা কর তা শোভা পায়'; আর আমরা হলাম 'অবলা কুলকামিনী, পায়ে পায়ে বিপদ গণি, কথায় কথায় নিন্দার গ্লানি'—কাজেই বেশ একটু সমঝে চলতে হয়।"

"হাঃ হাঃ হাঃ ! Bravo ! Bravo !! খাসা উক্তোরটা চাপিয়েছ দাদা, just like you !—ইনি ত রাজার নন্দিনী, আর তুমি এখনও অবলা কুলকামিনী, আর আমি—"

"একদম সত্যের কুলটা, সুতরাং অলজ্জাবিবর্জ্জিতা।"

"উহুঁ! কুল তোমরা যাকে বল তার সঙ্গে কোনও

সম্বন্ধই কোনও কালে কখনও ছিল বলে কখনও জানি না। Perfectly free from early youth—never owning any trammels of your social conventions, সুতরাং কুলটা নামটা স্বীকার করে নিতে পারছি নি দাদা, তয়লজ্জা-বিবর্জ্জিতা বড়ই হই।"

"হুঁ। তাহলে যে নামটা দেওয়া যেতে পারে, সেটা—সেটা—"

"হাঃ হাঃ হাঃ! You have hit it rightly অতীন! Well, a truth's a truth and no use shelving it. ঠিক কথা! আমরা জন্মেছি, মানুষ হয়ে উঠেছি—in a sphere of life out and out modern, perfectly free from all social conventions, all prudery and nonsense! And there's real life in it if life's worth living!—আর অতীন তাদার এই foolish cowardly code—ধরি মাছ না ছুঁই পানি—ওসব কখনও মেনে চলতে শিখি নি। ঐ কোথায় ভাল পড়েছিলাম না শুনেছিলাম—

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে।
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?'

কথার মত একটা কথা বটে। কমল তুলতে চাও, কাঁটার খোঁচা দুচারটে খেতেই হবে। আর তা না পার, থাক হাত গুটিয়ে ব'সে, কমলের কোমল স্পর্শ, তার মধু আর গন্ধ—সব থেকে আপনাকে বঞ্চিত করে—vegetating in dull colourless cold muddy earth, while bright, happy and warm heaven is within your reach."

অতীন তখন কহিল, "একটু বাক্‌সংযম এখন কর দাদা, ঢের ও সব কথা শোনা আছে! কাজের কথাই এখন এস!"

টেবিলের উপরে চুরুট ছিল। ভিক্টর চুরুট ধরাইয়া দুই একটা টান দিয়া কহিল, "হাঁ—enough of this foolery and now let's come to business. সুরু করেই দাও দাদা। But excuse me, Mr. Roy, I think—I think—the talk would be pleasanter over a cup of tea."

একটু হাসিয়া রবীন কহিল, "Excuse rather me, Mr. Sircar. Certainly it would be." বলিয়া ঘণ্টটা টিপিল। খানসামা আসিয়া আদেশ লইয়া গেল, চা ও কয়েকখানা কাটলেট সহ কিছু টোষ্ট আনিয়া রাখিয়া গেল। আহার ও পানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

ভিক্টর কহিল, "হাঁ বোম্বে থাকতেই আমাদের একজন friend and partner গসোয়ামী (গোস্বামী) আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমাদের প্রস্তাব তখনই আপনাকে জানান হয়। আপনাদের শকুন্তলার uniqu success দেখে সবারই একটা ঝোঁক পড়ে গেছে সংস্কৃত নাটকগুলিকে নাচ-গানে অমনি ধারা modernise করে ফিল্মে তুলবার দিকে। দুটো বই আমরা পর পর ধরব, আগে রত্নাবলী, তারপর মালতী-মাধব। বই দুটোর বাঙ্গালা অনুবাদও ক'দিন আগে আপনাকে দিয়ে গেছলাম। বোধ হয় দেখাও হয়েছে আপনার?"

"হাঁ, হয়েছে। খাসা বই, খাসা ওদেরকে বলেই ত মনে হয়, যদি শকুন্তলার মত নাচ গান modern style এ attractive করে তোলা যায়। আর নায়ক-নায়িকার personal contact কিছু কম আছে। আরও দুচারটে রকমারী scene তার দেওয়া দরকার বলে মনে হয়।"

"হাঁ, আমরাও সেটা ভেবেছি। Scenario-র প্ল্যান-ট্যান সব তৈরী হয়ে গেছে, অতীন ভায়া নিজেই দেখে করিয়েছেন। গান-টান গুলোরও compostion, music setting, সব হয়ে গেছে—সব আপনাকে দেখাব। এখন আমরা চাই, জানানও আপনাকে হয়েছে নায়ক উদয়নের ভূমিকায় আপনি নামবেন। বলতে কি দ্বিধা হয়, আপনার দুষ্মন্ত যে public দেখেছে, আর কারও উদয়ন তাদের চোখেও ধরবে না।

"এত বড় একটা compliment দিচ্ছেন, ধন্যবাদ!" বলিয়া রবীন একটু হাসিল; হাসিয়া শেষে কহিল, "তা হলে নায়িকার ভূমিকায় কি সেই শকুন্তলা ছাড়া আর কেউ publicকে attract করতে পারবে বলে মনে করেন?"

"নক্ক! Professional বড় বড় star আর যাঁরা আছে, কেউ ঐ শকুন্তলাকে approach করতেও পারবে না। She was a real and living শকুন্তলা, just as you were a real, living দুষ্মন্ত—not merely an actor and an actress, not a bit artificial, through and through fresh, natural and life-like!"

"কিন্তু তাঁকে কি পাবেন আপনারা?"

"টোপ ফেলেছি, দেখছি—হয় ত বা ঘটেও যেতে পারে।"

"কিসে অতটা আশা করতে পারেন ?"

"আর কিছুই নয়। তবে তিনি এখন একদম helpless হয়ে পড়েছেন। অবশ্যি এটা আমাকে বলতেই হবে—আপনি জানেন না বোধ হয়—তিনি আমার sister রেজিনার sister-in-law—সুতরাং—"

"হাঁ, শুনেছি সব। ধীরেশ আপনার ভগ্নী রেজিনাকে বিবাহ করেছে। সুতরাং একটা relationship (আত্মীয়তার সম্বন্ধ) আপনাদের ঘটেছে, যদিও-যদিও—মাফ করবেন মিষ্টার সরকার,-সেটা বিশেষ সুখের একটা সম্বন্ধ হয় নি।"

"না। বলতেই হবে আমাকে—I am very sorry—Regina has treated her very shabbily—as cruelly as a spiteful woman could be cruel—turned her out of her home—at least which ought to have been hers—virtually into the street. বলতে কি মিষ্টার রায়, যখন মনে হয়, রাগে আমার পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে ওঠে। I have cut off all connection with Regina. ভগ্নী ব'লে তাকে স্বীকার করতেও আমার ঘেন্না বোধ হয়। তবে কি না একটা কথাই আছে, out of evil cometh good; রেজিনা যা করেছে, যে অবস্থায় নিয়ে তাঁকে ফেলেছে, তা থেকেই একটা opportunity আমাদের আসতে পারে।"

"কিসে এটা ভরসা করেন ?"

"যদ্দুর জানি কোনও সম্বল তাঁর নেই। তাঁর চাকরাণী টাকে নিয়ে ছোট একটু establishment করে তিনি রয়েছেন, পুরোনো সেই নোংরা ঘিঞ্জি নেটিভ কলকেতার ভেতর। সেটাও কদ্দিন কি ভাবে চালাবেন জানি না। কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা না কি করবেন, কি করছেন। কিন্তু এমন কি কাজ-কর্ম্ম তিনি পেতে পারেন বুঝতে পারছি নে, যার আয়ে ঐ establishmentও তাঁর চলতে পারে।"

একটু হাসিয়া অতীন কহিল, "কিছুই পারে না। আণ্ডার-গ্রাজুয়েট একটা মেয়ে, কাজ ত তাদের এক টিচিং টুইশনীটা, তাতই 'বে আর রোজগার তাতে করতে পারে ? আবার ...ার ছবিতে বাজারে যে নাম তার জাহির হয়েছে, তাও কোথাও পাবে না। এক ফিল্ম প্রফেসন ছাড়া গতিই তার আর নেই। তবে সহজে এদিকে ভিড়তে চাইবে না। কিন্তু ভিড়তে হবেই, শীগগিরই হবে, কারণ কিছু সম্বল গুছিয়ে নেবার চেষ্টা, এখন যা করছে, তাতে সুবিধে কিছু হবে না।"

"চেষ্টা! কি চেষ্টা করছে ?" চমকিয়া রবীন চাহিল।

একটু হাসিয়া অতীন কহিল, "কিছু গয়না তার আছে, এলোকেশীকে দিয়ে তাই বিক্রী করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু গয়না যা আছে সব জড়োয়া। ওসব জড়োয়া গহনা বাজারে বিকোবে না। আর তা না বিকোলে দুটো একটা মাসও তার চলতে পারে না।"

"কি করে তুমি জানলে ?"

"জানাটা এমন কঠিন কিছু নয়। চের লোক আছে, কিছু পয়সা দিলে বহু খবরাখবর সংগ্রহ করে তারা দিতে পারে।"

"ও! তা হলে বল, চর লাগিয়েছ ওদের পেছনে ?"

"এ সব খবর চাইলে তাই সবাইকে করতে হয় রবীন।"

"তা হয়। কিন্তু এ সব খবরে তোমার কি এমন গরজ ?"

"আর কিছুই নয়। তবে আমি চাই ফিল্ম প্রফেসনে সে নামুক, কতক মিষ্টার জামার খাতিরে আর কতক তোমার খাতিরে।"

"আমার খাতিরে ?"

"হাঁ। কারণ এ ছাড়া তার সঙ্গে তোমার মিলমিশের, এমন কি দেখাশুনোরও সুযোগ একটা ঘটতে পারে, তার আর কোনও সম্ভাবনাই নেই। গিয়েছিলে ত এক দিন মোলাকাৎ ক'রতে। তা সুবিধে বোধ হয় কিছু হয় নি। কারণ বেশ একটু ভ্রুকুটি-কুটিল আঁধার মুখেই নেমে আসতে তোমাকে দেখা যায়। ঢুকবার সময়ও এলোকেশী যেন্নাই চেঁচামেচি করে।"

রবীনের মুখখানি ভ্রুকুটিকুটিল আঁধার হইয়াই তখন উঠিল।

কেমন যেন একটা বিস্ময়ের ভাবে ঈষৎ কুঞ্চিত-ভ্রু মিষ্টার উত্তরের দিকে চাহিয়াছিল; হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, "O I see! You have been in love,

Mr. Roy, quite Dushyanta like with your charming peerless Sakuntala! Well it's no wonder that you should be. বেজিনায় ওখানে তাকে যখন দেখলাম, and it was a very delightful surprise—মনেও তখন আমার হ'ল, she was a girl, one in a million and very well—worth loving, wooing and winning in marriage and our relationship might give me a chance too. But excuse me, Mr. Roy, I did not know that she had already been her Dushyanta's real Sakuntala. তবে কি না—মনে হচ্ছে there is already a rift within the lute, though I don't see how it could be, and that so soon after—after—"

রবীন বলিয়া উঠিল, "Excuse me, Mr. Sircar—such personalities are think, out of place! এখন আপনাদের কি terms তাই শুনতে চাই।"

"Terms—" বলিয়া ভিক্টর অতীনের মুখপানে চাহিল।

অতীন কহিল, "হ্যাঁ, ওঁরা প্রস্তাব ক'রছেন, মোট পাঁচ হাজার টাকা তোমাকে দেবেন। কনট্রাক্ট সইয়ের সঙ্গে সঙ্গে দু'হাজার, আর বাকী তিন হাজার তিন কিস্তিতে রিহার্সাল আর সুটিং যেমন হ'তে থাকবে—শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চুকিয়ে দেবেন।"

রবীন্ উত্তর করিল, "অবিশ্যি এ প্রফেশনে কখনও যাই নাই। আইডিয়া আমার কিছুই নেই। তবে কি না—এদেশে—"

"হাঁ এদেশে ওদের মত অমন সব fabulous price কেউ দিতে পারে না, প্রত্যাশাও কেউ করে না। এঁরা এই যা offer ক'রছেন, এতটাও সচরাচর কেউ করে না। তবে তোমার পেছনে দুষ্মন্তের যে reputationটা রয়েছে, তার বেশ একটা মূল্যই আছে। তাই এটা এঁরা তোমাকে offer করেছেন।"

"বেশ। আমিও টাকার এই terms accept ক'রতে প্রস্তুত আছি। তবে অন্য একটা term আমারও আছে—"

"কি বল?"

"নায়িকার পার্টে যদি মীনু—এই মিস্ মোতাজ্জিকে ওঁরা আনতে পারেন তবে এই ফিল্মে নামতে আমি রাজি আছি। নইলে দশ হাজার, পনের হাজার, বিশ হাজার দিলেও নামব না।"

অতীন একটু হাসিল।

"তা হ'লে ভিক্টর তারা কি বলতে চাও?"

ভিক্টরের মুখেও চটুল একটু হাসি ফুটিল। মনে মনে একটু ঈর্ষার জ্বালাও যে না জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এমন নয়। তবে মীনাকে সে যে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, সেটা প্রেমের আকর্ষণে তত নয়, যত না কি ফিল্ম-ষ্টাররূপে তার প্রচুর উপার্জ্জনের লোভে। সেটা—মীনা একবার এই ব্যবসায়ে নামিলে একেবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে। A film-star wife may be liberal in loves but a husband is a husband! উহাদের প্রেমেও এমন একটা কিছু ঘটিয়াছে, যাহাতে ছাড়াছাড়ির মতই কিছু একটা হইয়া পড়িয়াছে। নইলে এতদিন বিবাহ ওদের হইয়া যাইত। সেটা হয় নাই, শুধু কিছু একটা অন্তরায় বোধ হয় আসিয়া জুটিয়াছে। যাহা হউক, অতীনের কাছে সব জানা যাইবে। বিবাহটা যদি ওদের না ঘটিতে পারে, তার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে। Mina' might be won over as a wife and her income would be his and he might very well shut his eyes to her loves outside as all husbands of film-stars do, as well as all wives of film-star husbands. চিন্তার গতি অতি দ্রুত এবং অতিক্রুতই, প্রায় একসঙ্গেই, এই চিন্তাগুলি ভিক্টরের মানসক্ষেত্রে দেখা দিল এবং দেখিতে দেখিতে এইরূপ একটি সিদ্ধান্তেও তাহাকে উপনীত করিল। এক আধ মিনিটের মধ্যেই অতীনের প্রশ্নের উত্তরে সে কহিল, "দেখি, ভরসা ত করি, পারব বাগাতে। কারণ অর্থের অভাবে অতি শীগ্‌গিরই একেবারে নিরুপায় হয়ে তাঁকে পড়তে হবে।"

"যদি না ইতিমধ্যে সব বুঝতে পেরে তাঁর ফেওয়া এসে তার সহায় হয়ে দাঁড়ান, আর সহায়তা গ্রহণে তাঁকে বাধ্য না করেন।"

অতীন এই টিপ্পনী কাটিল।

"ফ্রেণ্ড! কে ফ্রেণ্ড? কার ফ্রেণ্ড?" বলিতে বলিতে টেবিলে রবীন এক মুষ্ট্যাঘাত করিল।

অতীন একটু মুচকি হাসিয়া কহিল, "চটছ—তা কি করবে বল? তবে জানই ত সব, ঐ ত জানকীনাথ বাবু রয়েছেন, ঐ মন্মথনাথ রয়েছে—আর সেই আজকাল তার একরকম protector (পরিরক্ষক) হ'য়েই দাঁড়িয়েছে!"

"But this must be prevented! তারা কিছু বুঝতে পারবার আগেই ওকে নামাতে হবে, অন্ততঃ একটা কন্ট্রাক্টে।"

ভিক্টর কহিল, "চেষ্টার ত্রুটি কিছু করব না, মিষ্টার রায়; করছিও না। তাঁকে আমাদের এই ফিল্মে নামাতে পারা আমাদেরও বড় একটা interest, তাঁর সাগরিকা, তাঁর মালতী, why, would be two veritable mints of money, rather two real gold mines for us, and excuse me, Mr. Roy, I dont want to enter into any personalities—money is far more substantial than what you call love, just as blood is thicker than water."

রবীন কহিল, "চেষ্টা আপনি কি করছেন? তাঁর সঙ্গে কি দেখা আপনার হয়েছে? আপনাকে receive করেন তিনি?"

"হাঁ—সে favourটুকু পেয়েছি। রেজিনার দুর্ব্যবহারে সমবেদনা তাঁকে জানিয়েছি। আর ইঙ্গিতও কিছু দিয়েছি, এই একটা প্রফেশনও রয়েছে, যা না কি আজকাল বেশ respectable. অবিশ্যি মুখে এসব কথা বেশী কিছু বলবার সুবিধে হয় নি, তবে সম্প্রতি একটা চিঠিতে এসম্বন্ধে ভাবেই অনেক কথা লিখেছি বোঝাবার চেষ্টা করেছি, European societyতে ফিল্ম-ষ্টারেরা আজ কাল high সব aristocratic-সার্কেলেও কত বড় মর্য্যাদা পান, লর্ডরাও কেউ কেউ এঁদের বিবাহ করে কি-স্থানে এঁদের তুলে নেন—"

"উত্তর পেয়েছেন কিছু?"

"না। সেটা প্রত্যাশাও করি নি। কেবল fieldটা তৈরী করে রাখছি মাত্র। এখন একটা সুযোগ ঘটলেই formal প্রস্তাবটা করব, আর সুযোগের খবর অতীন আমার কাছেই পাব।"

"আচ্ছা, তবে তাঁর সঙ্গে আগে বন্দোবস্ত একটা করে ফেলুন। তাঁর সই করা কন্ট্রাক্ট এনে আমাকে দেখান, আমার কন্ট্রাক্ট তখনই আমি সই করব, with this express proviso that she shall be in the role of সাগরিকা।"

"বেশ, দেখি কি করতে পারি। করতেই হবে, যদি আপনাদের চাই। আর আপনাদের ছাড়াও সেটা তেমন উতরে উঠবে বলে হয় না। আচ্ছা, তাহলে উঠি আজ, good bye"

"Yes, good bye to-night and Godspeed after!"

উঠিয়া দুই জনে করমর্দ্দন করিল।

"হাঁ, তুমি একটুখানি বস অতীন। গোটা কত কথা আছে আমার।"

(৩১)

ভিক্টর বিদায় হইল। অতীন বসিল। একটা চুরুট অতীনের হাতে দিয়া আর একটা চুরুট নিজে ধরাইয়া রবীন ঘণ্টাটা টিপিল। খানসামা আসিয়া আর দুপেয়ালা চায়ের আদেশ লইয়া গেল।

"তার পর?"

"বলছি।"

চুরুটে কয়েকটা টান দিয়া রবীন কহিল, "কি মনে কর তুমি? মীনা আসবে?"

"আসতেই হবে। কারণ এ ছাড়া তার আর গত্যন্তর নেই। গয়না তাঁর একখানিও বিক্রী হবে না। হলেও জলের দরে। টুইশনী-ফুইশনী—পড়াবার কি গান-বাজনা শেখাবার—কাজ জোটাতেও যদি কিছু পারে, কটা টাকা আর মাসে তাতে হবে? দশ, পনের, হদ্দ কুড়ি! কি করে চালাবে তা দিয়ে? কাজেই ভিক্টর যে চতুর চালে জাল ফেলেছে, সে জালে এসে তাকে পড়তেই হবে। তবে তোমার মত শর্ত্ত একটা সে দাবী করতে পারে, তোমার সর্ত্তেরই ঠিক পাল্টা।"

"পাল্টা! কি সর্ত্ত?"

"বলতে পারে, তোমার সঙ্গে অভিনয় সে করবে না। তোমাকে যদি উদয়নের ভূমিকায় ওরা আনে, সে এসে তার সাগরিকা হবে না।"

"বটে! কি করে বুঝবে উদয়নের ভূমিকায় আমাকে ওরা নিতে চাইবে?"

"শকুন্তলাকে যারা এত আগ্রহে নাগরিকায় চাইছেন, তারা যে দুষ্মন্তকেও উদয়নে চাইবে, এটা অনুমান করা কিছু আশ্চর্য্য নয়, করাই বরং স্বাভাবিক। আরও সে জানে দুষ্মন্ত হাতের কাছে এই কলকেতায়ই উপস্থিত।"

"হুঁ! তাহলে কি করবে তোমরা? একজনকে ছাড়তেই হবে। আর সে একজন হচ্ছি আমি।"

"ছাড়তে আমারা কাউকে চাই না; ছাড়বও না, যদি এই প্লেটায় নামাতে হয়।"

"এই পণ যদি সে করে?"

"পণটা থাকবে মুখের কথায়; কণ্ট্রাক্টের দলিলে কালির আখরে উঠবে না?"

"যদি রাজি না হয়?"

"সেটা আমরা দেখব। একটা মেয়ে ত? পাকা কোনও উকিলের পরামর্শও নিতে যাবে না। আর তুমি কণ্ট্রাক্টে সই করবে ত তার কণ্ট্রাক্টটা দেখে? বেশ, দেখেই তখন নিও proviso এমন কিছু আছে কি না।"

"হুঁ—"

রবীন একটু কি ভাবিল। চুরুটে ধীরে ধীরে গোটা কয়েক টান দিয়া কহিল, "হুঁ!—তাহলে এমনি করে তাকে ঠকাবে ভাবছ? অবলা একটা মেয়ে—"

"হাঃ হাঃ হাঃ।" উচ্চ হাস্য করিয়া অতীন কহিল, "রবীন! তুমি তাকে যে ঠকানটা ঠকাবার ফিকিরে ফিরেছ, আজও ফিরছ, তাতে করে এ অভিযোগটা আমাদের সম্বন্ধে করতে পার না। আমরা এই ঠকাবার ফিকিরে তোমাকে help করছি। আমরা—হদ্দ বলতে পার abettor, আসল offender নই।"

"কিন্তু এই abettorইবা কেন তোমরা হচ্ছ? হাঁ, সরকারের গরজটা বুঝতে পারছি, সে তার ফিল্মের success চায়। কিন্তু তুমি? তোমার কি গরজ? আর এই প্লানটাও এল তোমার মাথা থেকে; সরকারের সঙ্গে কোনও পরামর্শও আগে হয় নি। এমন একটা পণের কথা যে ওপক্ষ থেকে আসতে পারে, এটা সে ভাবেও নি বোধ হয় কখনও।"

"না। তোমার এই পণের কথাও এই মাত্র শুনে গেল।"

"তুমিও ত এই মাত্র শুনলে। আর শুনেই অমনি এতখানি ভেবে একটা প্লানও ঠাউরে নিলে।"

"এসব ভাববার মত, আর ভেবে কি করতে হবে সেটা তক্ষুণি অমনি ঠাউরে নেবার মত, মাথা সকলের থাকে না। আর ভিক্টরের সেটা একদম নেই।"

"কিন্তু গরজটা তোমার কি?"

"আমার গরজ—সে যাই থাক, আমার আছে। তোমার এমন গরজ কিছু নেই, সেটা জানবার কি বুঝবার। তোমার আসল এই গুরু গরজটা যে হাসিল হতে পারে আমার এই প্লানে তাই যথেষ্ট নয় কি?"

"না। তোমার গরজটা বুঝবারও গরজ বেশ একটা আমার হয়েছে। আর সেটা বুঝতেও যে না পেরেছি তা নয়।"

"পেরে থাক ভালই। তা হ'লে আর আমার মুখে কেন সেটা শুনতে চাইছ?"

"বেশ বুঝতে পারছি, অতীন, মীনার সঙ্গে আমার আবার একটা contact ঘটে, এটাতে বেশ একটা আগ্রহ তোমার আছে। আমার চাইতেও তোমার আগ্রহটা বড় কম নয়।"

"হাঁ, এটা তোমার মনে হতে পারে বটে।"

"আগেও তোমার এমনই একটা আগ্রহ ছিল। অতি আগ্রহেই তুমি চেয়েছিলে তার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আমার ঘটুক, স্বামী স্ত্রী রূপে না হক, অন্ততঃ প্রেমিক-প্রেমিকা রূপে। ভেঙ্গে যে গেল, ভাঙ্গবার পরেও তুমি চাইছ, আমার চাইতে কম আগ্রহে চাইছ না—আবার আমাদের তেমনি একটা সম্বন্ধ ঘটুক। এই সুযোগটা তাই এমনি করে আঁকড়ে ধরেছ।"

"হাঁ, এটা ভাববারও তোমার যথেষ্ট কারণ আছে, স্বীকার করছি। আর সেটা ভেবে নিতে এমন কিছু বুদ্ধিরও দরকার হয় না। মাথায় একটু ঘিলু আছে, এমন যে-কেউই তা পারে।"

"পারে, কিন্তু কেন তুমি এটা চাইছ সেটা ধরতে পারা এমন সোজা কিছু নয়। রহস্যটা এতদিন বুঝতে পারি নি অতীন, এখন পেরেছি।"

"পেরেছ! বটে! কি পেরেছ?"

চকিত দৃষ্টিতে অতীন রবীনের মুখের পানে চাহিল। চাহিয়াই মুখখানি একটু ঘুরাইয়া লইল।

"হুঁ!—তারপর?"

রবীন কহিল, "তুমি চাও বিন্দুর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ আমার না ঘটে; যে বিচ্ছেদটা আছে, সেটা থেকেই যায়।"

"যদি চাই-ই তা—তা হ'লে?"

"আর কিছুই নয়, তবে তার একটা কারণ—strong একটা motive কিছু তোমার থাকবেই, আর সেই motiveটা—"

"ধরতে তুমি পেরেছ? পেরেছ বেশ! আমার এমন লজ্জা পাবার কিছু নেই তাতে, অন্ততঃ তোমার কাছে, কারণ, নামে মাত্র তুমি বিন্দুর স্বামী, বিবাহ করে ঠকিয়েছ তাকে! আর তা ঠকিয়েছ কাপুরুষের মত, কেবল এই ভয়ে পাছে পিতার অর্থ-সাহায্যে তুমি বঞ্চিত হও।"

অগ্নিদৃষ্টিতে আরক্ত মুখ খানি তুলিয়া রবীন চাহিল

অতীন কহিল, "হাঁ, রাগ হচ্ছে তোমার খুব। এত বড় sharp একটা home thrust, যাঁতে গিয়ে ঘা লেগেছে, রাগ এতে সবারই হয়। But I don't care! হাঁ স্বীকার করছি আমি আজ—নিঃসঙ্কোচে, নির্ভীক ভাবে—with perfect frankness—with brutul frankness if your like—without mincing matters, স্বীকার আমি করছি, বিন্দুকে আমি ভালবাসি! ক'বছর ধরেই গভীর ভাবে তাকে ভাল বেসে আসছি!—যখন প্রথম তাকে দেখলাম, উদ্ভিন্নযৌবনা কেবল একটি বালিকা—সেই তার মুখের শোভা, দেহের গঠন, চোক-মুখ ভরা সেই মধুর মোহন হাসির ছটা—তার এ পৃথিবীতে কোথাও যার তুলনা মেলে না—তখনই—তখনই আমি একদম মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাকে সে আকৃষ্ট করতে পারল না? আশ্চর্য্য হয়ে যাই, কেন পারল না? অমূল্য রত্ন বলে যখন তাকে বুকে ধরতে পারতে, তুচ্ছ এক টুক্‌রো পেতল-কাঁসার মত হেলায় তাকে তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে এলে।"

তীব্র একটা ঈর্ষার জ্বালা রবীনের প্রাণ ভরিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। যাহা হউক, কোনও মতে চাপিয়া কহিল, "এসেছিলাম, তার কারণ অন্য একজনকে তখন ভাল-বেসেছিলাম।"

"বিবাহ করাই এ অবস্থায় একদম তোমার উচিত হয় নি, মানুষের মত কাজ হয় নি?"

রবীন উত্তর করিল, "তুমিই বা কেন বিবাহ আগে কর নি তাকে? পরিবারের কুটুম্ব, বন্ধু, আবার এত ভালও বেসেছিলে—"

"করি নি, করতে পারি নি, তার কারণ they considered me too small for her and preferred a big golden ass like you -"

"সাবধান হয়ে কথা বল অতীন। জান, কাকে কি বলছ?"

"জানি। যাকে যা বলতে পারি তাই বলছি।—Well I must have my say, when we have begun a frank talk! পছন্দ না হয়, বিদায় হচ্ছি।" বলিয়াই অতীন উঠিল।

"না না! বসো—বসো অতীন, I too must have my say!"

বসিয়া অতীন কহিল, "হাঁ, পৃথিবীর সব মানুষ মনুষ্যত্বের—সত্যকার পৌরুষের কদর কমই করে। ক'রতে চায় না বড় কেউ, খোঁজেও না কখনও, অন্ততঃ মেয়ের বিয়ের বেলায়, প্রকৃত সেই মনুষ্যত্ব, সেই পৌরুষ কোথায় আছে। খোঁজে কেবল টাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের যত অসার উপাধি, যা না কি লাভের চেষ্টা সকল মনুষ্যত্বকে, সকল পৌরুষকে একদম পিষে ফেলে এদেশের যুবকদের ভেতর থেকে। ওঁরাও তাই খুঁজছিলেন, আর বেছে নিয়েছিলেন কেবল একটা ধনীর দুলাল তোমাকে!"

রবীন উত্তর করিল, "সেই মনুষ্যত্বের, কি যাকে পৌরুষ বল, তার এমন কি তোমাতে আছে আর তার পরিচয়ও বা কি তুমি দেখিয়েছ, তাও ত জানি না, অতীন।"

"দেখবার মত চক্ষু, বুঝবার মত বুদ্ধি, যদি থাকত, দেখতে, বুঝতে, জানতে। কাকে তুমি মানুষ বলবে, পুরুষ বলবে? বাপের টাকা যে ঘরে বসে খায়, আর ফুর্ত্তি করে বেড়ায়, তাকে? না, নিজের অধ্যবসায়ে যে তা অর্জ্জন করে, যে কাজে হাত দেবে, যেভাবে হ'ক ক'রে তা তুলতে পারে—পিছপাও কিছুতে হয় না, নির্ভীক নিঃসঙ্কোচ ভাবে নিজের লক্ষ্যের দিকে চলে, ভয় কাউকে বা কিছুকেই করে না!"

"হাঁ, সেটাকে পৌরুষ বলা যেতে পারে, আর সে পৌরুষ তোমার কিছু আছেও বটে। But you are thoroughly unscrupulous in the means you take to gain your ends; সুতরাং তোমার এ পৌরুষকে মনুষ্যত্ব ব'লতে আমি প্রস্তুত নই।"

"পৌরুষই হ'ল পুরুষের মনুষ্যত্ব! শক্তিমান্ পুরুষ, কাজ যদি কাজের মত করতে চায়, ও-সব so-called moral scruples (সাধু অসাধু নীতি বলে কোনও দ্বিধা) মেনে চলতে পারে না, কেউ কোথাও কখনও চলে নি। যে চলেছে, চলতে চেয়েছে, পদে পদে সে ঠ'কেছে, সিদ্ধিলাভ কোনও কাজেই ক'রতে পাবে নি। ধর্ম্মপুত্র এই সব যুধিষ্ঠির কেউ পৃথিবীর লোকসমাজে বাস করবার যোগ্য নয়, এর কোনও কাজেও হাত দেবারও যোগ্য নয়। যেখানে দেবে ভেস্তেই সব ফেলবে, গুছিয়ে কোনও কিছু তারা করতে পারবে না। ভীম অর্জ্জুন ছিল, আর নারীর মত নারী তেজী ঐ দ্রৌপদী ছিল, আর ছিল পাকা চালবাজ ঐ কৃষ্ণ তাই রক্ষে। নইলে কোথায় কবে ভেসে যেত। ব্যাসঠাকুরের মহাভারতও হ'ত না। আর এই যে যুধিষ্ঠির, দায়ে পড়ে তাঁকেও একদিন অসাধু হ'তে হয়েছিল 'যথা অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' তা সে যাক, এ পৃথিবীতে, পৃথিবীর মানুষের সমাজে এঁদের কোনও স্থান নেই। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে বনে গিয়ে এঁদের বাস করা উচিত। And this earth—earth of real men and women would be well rid of them! হাঁ, আমি unscrupulous. But what are you? What have you been? Are you, have you been very of scrupulous in your means to gain your ends?"

"না। তবে আমি মনুষ্যত্বের বড়াইও কখনও কিছু করি নি।"

"সেটা আমিও কখনও করি নি। ক'রেছি পৌরুষের বড়াই। আর পৌরুষের সঙ্গে এই scruples-এর সম্বন্ধ কিছু নেই!"

"থাক ওসব কথা। ওসব তর্ক-বিতর্ক more or less academic and out of place here in our immediate interests! হাঁ, বুঝতে পারছি, বিন্দুকে তুমি ভালবাস, আর আমার সঙ্গে তার এই বিচ্ছেদটা বজায় রাখতেও প্রাণপণ করছ। কিন্তু ভরসা কর কী কখনও তাকে পাবে?"

"না, একদমই করি না। করি না, তার কারণ she is a foolish girl, quite out-of-date—altogether unconscious of her rights as a woman. কিন্তু সে তোমার হবে এটাও I am not prepared to endure! তাই এই বিচ্ছেদটা বজায় রাখতেই আমি চাই!"

"কিন্তু পারবে না অতীন। বিন্দুর সঙ্গে কোনও দিন স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে গিয়ে আমি মিলতে পারি। জানি, চাইলেই তাকে পাব।"

"জানি তা পাবে। আর ঠিক কোনও আকর্ষণ না হক, অন্ততঃ আমাকে জব্দ করবার অভিপ্রায়েও সেটা তুমি করতে পার।"

"আকর্ষণও কিছু একটা অনুভব না করছি তা নয়, I tell you frankly if that will be of any satisfaction to you."

"কিন্তু মীনাকে হারাতে হবে!"

"না, দুজনেই আমার হবে!—এক নারীর স্বামী আর অন্য এক বা একাধিক নারীর প্রেমিক—এটা অস্বাভাবিক কি অসাধারণ একটা ব্যাপার পুরুষের পক্ষে কিছু নয়। সচরাচরই এটা ঘটে থাকে, বিশেষ যদি সে পুরুষের ধনবল কিছু থাকে।"

"But there are women and women, তার বন্ধু বিন্দুর স্বামীকে আত্মদান মীনা কখনও করবে না!"

সে সম্বন্ধে বিন্দুর সঙ্গে আমি আসবার আগেই মীনা আমাকে আত্মদান করবে।—নাগরিকা হ'য়ে উদয়নের কোলে এসে একবার বসলে নামতে আর সে পারবে না। একবার যে সুযোগ আমি হারিয়েছি, দ্বিতীয়বার তা হারাব না!"

"পারবে না রবীন। Mina is a girl a too stiff and stern for that, a veritable prototype of বিন্দু।"

"Well that's my lookout and you needn't bother about it."

অতীন বলিয়া উঠিল, "Any such attempt of yours will throw her into the arms of your rival Anutosh!"

"But Anuteosh is not going to think of marrying a film-star! And he is not a man of that type merely to be a lover of such a woman. সে আশঙ্কা আর আমি করি না অতীন।"

"তবে এটি জানবে রবীন, মীনার সঙ্গে এ জাতীয় একটা সম্বন্ধে আসতেও যদি পার, বিন্দুকে পাবে না।"

"সেটা আমি বুঝব। তোমার এ interested warning falls altogether flat."

ভ্রূকুটি করিয়া অতীন কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। শেষে কহিল, "তা' হলে আমিও বলে যাচ্ছি রবীন, I am determined to have Mina at least as a mistress, if not as a wife! এই প্রফেসনে সে নামলে, অনেক সুযোগ আমি পাব। আমি যত পাব, আর দিতে পারব, তুমি তা পারবে না। দেবার মত ক্ষমতাও কিছু তোমার নেই!"

বলিয়াই অতীন উঠিল—গম গম করিয়া বাহির হইয়া গেল। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

মানবের নব অধিকার

—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

সমাজতন্ত্রে মানুষের অধিকার কতদূর, সে সম্বন্ধে সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের নূতন দশম অধ্যায়ে "দেশবাসীর অধিকার ও কর্ত্তব্য" লিপিবদ্ধ হইয়াছে।* সোভিয়েট তন্ত্রের অন্যান্য অধ্যায়ের চেয়ে এই অধ্যায় অনেক অধিক আলোচিত হইতেছে। সিডনি ওয়েব এবং বিয়াত্রিশ ওয়েবের মতে ইহা "মানুষের অধিকারের" নূতন একটা সমষ্টি; তাঁহাদের ধারণা এই অধ্যায় শাসনতন্ত্রে গুরুতম পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। "গুরুত্বে এবং গভীরত্বে ইহার সমান হইতে পারে কেবল সমাজতন্ত্রের সমাজগঠন-সম্বন্ধীয় প্রথম খণ্ড, যাহার সহিত ইহার বাস্তবিক নিবিড় সম্পর্ক আছে"—এই অধ্যায় সম্বন্ধে কনষ্টিটিউসনাল কমিশনের সভ্য, বিখ্যাত সোভিয়েট-আইনজ্ঞ ক্রাইলেঙ্কো এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কনষ্টিটিউসনাল কংগ্রেস কর্ত্তৃক গঠনতন্ত্রের শেষপাঠ এবং গ্রহণের সময়ে প্রতিনিধিগণ এই অধ্যায় সম্বন্ধে, কেবল এই অধ্যায়ের বিধিগুলি সম্বন্ধেই আনন্দধ্বনি করিয়াছিলেন। রাশিয়াবাসীর অধিকারের এই ফর্দ্দ হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যাইবে যে, রাশিয়া নূতন ভিত্তিতে কি নূতন জগৎ গড়িতে চাহে।

মধ্যযুগে (যখন ইউরোপীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে, ফিউডেলিজম্, প্রতিষ্ঠিত ছিল; ইহার মূলকথা প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ বন্দকলহ হইতে উদ্ভূত)—দেশবাসীদের সমান অধিকার ছিল না।. বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর ছিল বিভিন্ন অধিকার। দুইটি সর্ব্বোচ্চ স্তর—অভিজাত এবং ধর্ম্মযাজকগণের সর্ব্বোচ্চ অধিকার ছিল। নগর ও গ্রামের সাধারণ অধিবাসী দ্বারা গঠিত তথাকথিত তৃতীয় স্তরের অনেক কম অধিকার ছিল। এমন কি তৃতীয় স্তরের মধ্যেও অধিকারভেদ ছিল। যন্ত্রচালক এবং ব্যবসায়ীদের যে-সকল সজ্ঘ নাগরিক সমাজগুলিকে গঠন করিত, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার্থী ও কর্ম্মনিযুক্তদের অধিকার নিয়োগকর্ত্তা শিল্পীপ্রভুদের চেয়ে কম ছিল।

* অ্যানা লুইস স্ট্রংয়ের "দি নিউ সোভিয়েট কন্‌ষ্টিটিউসন" নামক পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদের মর্ম্মানুবাদ।

কৃষকগণ তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত হইলেও কার্য্যতঃ তাহাদের কোন অধিকার ছিল না। দাস হিসাবে যে জমির সহিত তাহারা সম্পৃক্ত, সেই জমির মালিক তাহাদের কেবল আর্থিক প্রভুই ছিল না, রাজনৈতিক নেতা এবং স্থানীয় বিচারপতিও ছিল।

"স্বাভাবিক অধিকারে"র নামে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান ধনবল মধ্যযুগের সমাজ ভাঙ্গিল। ঘোষণা করা হইল, প্রত্যেক মানবের কতকগুলি অপরিত্যাজ্য অধিকার আছে, যাহা শাসনতন্ত্র হইতেও প্রাচীন এবং যাহা হরণ করিবার শক্তি কোন শাসকের নাই। জন্মগত স্রষ্টাদত্ত মানবাধিকার ছাড়া দেশবাসীর নানা রাষ্ট্রিক অধিকারও ঘোষণা করা হইল।

এই সকল অধিকারের আদর্শ-বিবৃতি—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণবন্ত, অথচ অস্পষ্ট স্বাধীনতা ঘোষণা নহে—তাহাদের ঘোষণায় "বাঁচিয়া থাকা, স্বাধীনতা এবং সুখসন্ধানে"* মানুষের অপরিত্যাজ্য অধিকার—ঠিক আমেরিকার "অধিকারসমূহ" নহে, শুধু বক্তৃতাদান, মুদ্রণ এবং সভাকরার স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে যাহা কংগ্রেসকে নিষেধ করে। এই তত্ত্বগুলির আরও দার্শনিক এবং বিস্তৃত বর্ণনাবিন্যাস ফরাসীবিদ্রোহ করিয়াছিল কয়েক বৎসর পরে। ১৭৮৯ সালে "মানবমাত্রের ও দেশবাসীর অধিকার ঘোষণা" অপরিত্যাজ্য অধিকার বলিয়া ধরিয়াছিল, এই কয়টি,—মুক্তি, সম্পত্তি, নিরাপত্তা এবং অত্যাচার রোধ করিবার দাবী। বিপ্লবের পতাকাতলে ফ্রান্সের উদীয়মান ধনিকগণ তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত মজুর, কৃষক, বুদ্ধিজীবীদিগকে একত্রিত করিল মধ্যযুগীয় সমাজের বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ সুখসুবিধার সহিত সংগ্রাম করিতে। ১৭৯৫ সালের রাষ্ট্রতন্ত্র বিধিবদ্ধ হওয়ার মধ্যেই অত্যাচার-রোধের অধিকার নূতন শাসকদের

* আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মূল ভাষা এইরূপ: Life, Liberty and Property। পরে জেফারসনের প্রভাবে ইহা অধিকতর আদর্শবাদমণ্ডিত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছিল।

মতে অবাঞ্ছনীয় হইল। ইহার স্থানে "সাম্য" শব্দ ব্যবহার করা হইল আইনের চোখে সমস্ত অর্থে।

এই সকল অধিকার তখনকার আর্থিক উন্নতির ভিত্তি-স্বরূপ ব্যক্তিগত ধনোৎপাদনের শক্তিকে মুক্তি দিল। লাভ-অর্জনে ব্যষ্টিসম্পত্তি প্রায় অবাধ অধিকার পাইল। নিরাপত্তার অর্থ করা হইল "দেহ, অধিকারসমূহ এবং সম্পত্তি"রক্ষা। কিরূপে সম্পত্তি অর্জিত হইল, অথবা সমাজের দিক্ হইতে বাঞ্ছনীয় কিম্বা অবাঞ্ছনীয় উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করা হইল কি না, তাহা বিবেচিত হইল না। এমন কি ব্যষ্টিসম্পত্তির ক্ষুদ্রতর অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার সরকারেরও ছিল না—আইনের আশ্রয় ও ক্ষতিপূরণ ব্যতীত।

এই সকল ঘোষণার লক্ষ্য ছিল দেশবাসীকে সরকারের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত করা। এইরূপে মুক্ত অধিবাসী ছিল উদীয়মান ব্যবসায়ী। দেড়শতাব্দী ধরিয়া ধনবাদের বিস্তার-হেতু সাধারণভাবে গৃহীত হইল যে, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে সরকারের হস্তক্ষেপ অন্যায়, রাষ্ট্রের খবরদারী যত কম হয়, ততই ভাল এবং এইরূপ হস্তক্ষেপ কেবল তখনই সহ্য করা উচিত, যখন ব্যবসায় বিপন্ন এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা আরও লাভবান্ ও নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য সাহায্যপ্রার্থী। টমাস্ জেফার্সন্ বলিয়াছিলেন, "সেই শাসনতন্ত্রই সর্বোত্তম, যাহা শাসন করে সব চেয়ে কম"। বর্তমান ব্যবসায়-জগৎ তাঁহার এই একটি নীতিকে অন্তরের সহিত সমর্থন করে।

ধনবাদী প্রজাতন্ত্রের অধিকার-সমষ্টি সবলে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল এমন শাসকশ্রেণী হইতে, যাঁহাদের কাছে সাধারণ লোকের স্বাভাবিক অধিকারের উদ্ভট শোনায় অকথ্য এবং রাষ্ট্রদ্রোহী। এই সকল বিপ্লবাত্মক অধিকার-সমূহের নামেই পুরাতন শাসনতন্ত্র ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া হইয়াছিল। যাহা হউক, শীঘ্রই এ তথ্য স্পষ্ট হইল (এবং ইতিহাস আরও স্পষ্ট করিয়াছে) যে, এই সকল ঠাট-ঠাখা অধিকার মধ্যযুগের সমাজের বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ সুবিধাগুলি দূর করিলেও কার্যতঃ ধনী-নির্ধনের ক্রমাগত-বাড়িয়া যাওয়া বৈষম্য দূর করিল।

রয়-হাওয়ার্ড সাক্ষাৎকারে ষ্টালিন বলিলেন, "একজন ক্ষুধার্ত, কর্মান্বেষী বেকার কিরূপ 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' ভোগ করে তাহা আমার পক্ষে কল্পনা করা কঠিন।" সম্পত্তির "নিরাপত্তা" মালিকের হাত হইতে গরীবের ঘর রক্ষা করে না, মালিকের স্থানচ্যুত করার অধিকার রক্ষা করে। ধন-তন্ত্রগত মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার কল্যাণে হার্ষ্ট তাঁহার একজন গ্রাহক অপেক্ষা লক্ষগুণ বেশী মনোভাব প্রকাশের সুযোগ পান, কারণ তিনি গ্রাহকের চেয়ে লক্ষগুণ অধিক লোকের নিকট নিজের কথা বলিতে পারেন। আইনের সম্মুখে "সমস্ত" ধনী-নির্ধন উভয়কেই উকিল ডাকিবার সমান অধি-কার দেয়, কিন্তু উকিল প্রচুর অর্থ ছাড়া কথা বলে না। এই রূপে আইনের মধ্য দিয়াই আর্থিক বৈষম্য প্রবল হয়। আনা-তোল ফ্রান্স বলিয়াছেন, "রাজোচিত নিরপেক্ষতা লইয়া আইন ধনী-নির্ধন উভয়কেই নিষেধ করে সেতুর নীচে নিদ্রা যাইতে, অর্থ অপহরণ করিতে এবং রুটি ভিক্ষা করিতে।"

এই সকল সাম্যের অধিকারও আক্রান্ত হইয়াছে শক্তি ধনতন্ত্র দ্বারা। বিপ্লবীদের দলিল যে বক্তৃতাদান, মুদ্রণ ও সভা করার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল, কালি শুকাইতে না শুকাইতেই সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা হইল। সেই কণ্ঠরোধ নানারূপে বহু বৎসর ধরিয়া চলিল। ধনবাদ যতই অগ্রসর হইল, ধন ততই একত্রিত, বলশালী এবং নিজ বলরক্ষা সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদল বৃদ্ধি পাইল এবং ক্রমে ক্রমে নূতন ও বিস্তৃত স্বাধীনতা দাবী করিল। ক্রমে-বাড়িয়া-ওঠা এই দ্বন্দ্বের চাপে ধনবাদ ত্যাগ করিল সেই নীতিগুলি, যাহার নাম করিয়াই ইহা একদিন শক্তিশালী হইয়া উঠিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের জন্মদাতা অগাষ্ট কোঁত দাবী করিতে-ছিলেন "অধিকার" শব্দটির বর্জন রাজনীতির ভাষা হইতে, প্রত্যেক মানবের না কি কতকগুলি কর্তব্য আছে, কিন্তু "অধিকার" বলিয়া কোন অধিকার নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মতটি পরিণত হইল এই তত্ত্বে যে, ব্যষ্টি বা সমষ্টি কাহারও কোন "অধিকার" নাই; কিন্তু প্রত্যেক ব্যষ্টির কতকগুলি কর্ম্ম আছে, ধনীর কাজ সমাজের খাতিরে সম্পত্তি অধিকার ও চালনা করা। এই ভিত্তির উপর গঠিত হইল কর্পোরেট ষ্টেটের ভাব, যাহা ফাসিজমের দার্শনিক ভিত্তি এবং যেখানে স্বাধীনতা ও সাম্যের সকল ভাণ ত্যাগ করা হইয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন্ বিপরীত দিকে গেল। ফ্যাসিজ্‌ম্ যেমন মানবের স্বাধীনতা ও সাম্য ধ্বংস করিল আর্থিক স্বেচ্ছাচার রক্ষা করিতে, বলশেভিকগণ তেমনি চূর্ণ করিল আর্থিক স্বেচ্ছাচার, মানবের স্বাধীনতা ও সাম্য বাঁচাইতে। ষ্টালিন বলিয়াছেন, "প্রকৃত স্বাধীনতা সেখানে, পর বা পরস্ব নিজ নিজ স্বার্থে নিয়োগ করা যেখানে অচল, যেখানে নাই বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য এবং মানুষ যেখানে ত্রস্ত নয় এই ভাবিয়া যে, আগামীকাল হয়তো কর্ম্ম, গৃহ, খাদ্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। কেবল এরূপ সমাজেই (শুধু কাগজ কলমের নয়), প্রকৃত ব্যক্তিগত ও অন্যান্য স্বাধীনতা ও অধিকার সম্ভব। আমরা এই সমাজ (সমাজতন্ত্র) গঠন করি নাই ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে, করিয়াছি এই জন্য যে, মানুষ যেন নিজকে বাস্তবিক মুক্ত বোধ করিতে পারে। আমরা গঠন করিয়াছি এই সমাজ সত্যকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা 'উদ্ধৃতি-চিহ্নবিহীন স্বাধীনতা'র জন্য।

বলশেভিকগণের আশা ছিল না এই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করার, ইহার আর্থিক ভিত্তি—সম্পদে সমাজের অধিকার—লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত। স্বাধীনতা তাহাদের লক্ষ্য, উপায় নয়। তাহারা সুরু করে নাই সকলের জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া, ধনীদেরও বাদ না দিয়া। ধনবাদের বিনাশ ব্যতীত স্বাধীনতা সম্ভব, এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিত না। কতকগুলি "দেশবাসীর অধিকার" ঘোষণা করা হইল ১৯১৮ সালের গঠনতন্ত্রেই, প্রত্যেকটির জন্য উপযুক্ত বৈষয়িক আশ্বাস ছিল। কেবল সরকারের ঘোষণা নয়, রাষ্ট্র হইতে গির্জ্জার বিচ্ছেদ ও বিবেককে মুক্তি দিল। শ্রমিকদের জন্য ঘোষণা করা হইল, বক্তৃতাদান, মুদ্রণ এবং সভা করার স্বাধীনতা। ধনীদের হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইল ছাপাখানা, কাগজ সরবরাহ এবং সভাগৃহ শ্রমিকসঙ্ঘের হাতে দেওয়া হইল। শ্রমিক ও দরিদ্রতম কৃষকদের ব্যয়হীন সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা একটা সম্পন্ন ব্যাপার নয়; সম্পন্ন করিতে হইবে, বলা হইল। ধনী ও ধনবাদী কাহারও মুদ্রণ এবং সভা করার স্বাধীনতা রহিল না। অপরপক্ষে বৃহৎ বৃহৎ শ্রমিক সমাজ এবং দরিদ্র কৃষকগণ ভোগ করিতে লাগিল আত্মপ্রকাশের অনাবাধিত, বিস্তৃততম মুক্তি—কেবল রাজনৈতিক নয়, ব্যবসায়ের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের নির্ব্বাচনে, সমালোচনায় এবং পদচ্যুত করায়।

বর্ত্তমান সোভিয়েট গঠনতন্ত্রে ঘোষিত মানুষে অধিকারের নূতন সনন্দ সম্ভব হইল কেবল সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ভিত্তি স্থাপনে এবং সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায়। এই অধিকার-সমূহ "বিধাতৃদত্ত" "স্বাভাবিক অধিকার" নয়। বলশেভিকরা অতীন্দ্রিয় সম্বন্ধে নিরুৎসাহ। তাহারা বলে যে, মানব-সমাজের একটা উন্নত অবস্থাতেই মানবত্বের অধিকার জন্মে এবং রক্ষিত হয় এবং বিশেষ চেষ্টা দ্বারা প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই আশ্বাস থাকে। জীবিকার মূল উপায়গুলির সমাজতান্ত্রিক প্রভুত্বেই আছে অধিকারগুলির সমগ্রভাবে রক্ষার আশ্বাস। তাহা না হইলে, এই সকল অধিকার আশামাত্র, কল্পনামাত্র।

"সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধিবাসীদের কর্ম্মে অধিকার আছে, অধিকার আছে আশ্বস্ত কর্ম্মনিয়োগে এবং কর্ম্মের গুণপরিমাণ অনুযায়ী মজুরী পাওনায়।" এইভাবে দশম অধ্যায়ের সূচনা এবং বোধ হয় এই কথাটি বিদেশে বেশী মন্তব্য জাগাইয়াছে গঠনতন্ত্রের অন্যান্য বাক্যের চেয়ে। ক্রাইলেঙ্কো বলেন, ইহাই "মূল অধিকার", "যাহার উপর অন্যান্য অধিকারের বাস্তবিকতা নির্ভর করিতেছে।"

কর্ম্মাধিকারের দাবী প্রাচীন। এমন কি মধ্যযুগেও ইহা উত্থাপিত হইয়াছিল সঙ্ঘপ্রভু ও শ্রমিকদের দ্বন্দ্বে। প্রথমকার স্বপ্নবিলাসী সমাজ-তন্ত্রবাদী রবার্ট ওয়েন ও ফুরিয়ার, এই অধিকারকে ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রের একটি স্তম্ভ হিসাবে ধরিয়াছিলেন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে কর্ম্মাধিকারই ছিল ফরাসী শ্রমিকদের মুখ্য বিদ্রোহধ্বনি। পৃথিবীব্যাপ্ত বেকার-সমস্যার চাপে ধনতন্ত্রী দেশসমূহে আজ ইহার আলোচনা একটা সম্ভাবনা হিসাবেও হয় না। ধনবাদী অর্থনীতিকগণ ধরিয়া লইয়াছেন একটা বৃহৎ বেকার-সংখ্যা স্বাভাবিক। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বেকারদের কাছে কর্ম্মাধিকারের আশ্বাস স্বপ্নলোকের ভরসার মত। ইংরেজ রাজনীতিক মাননীয় ডি. এন্. প্রিট লিখিয়াছেন, "যদি পৃথিবীর আর কোনও দেশ গঠনতন্ত্রে এই অধিকার রাখিবার ইচ্ছা পোষণ করিত, তবে হাস্যাস্পদ হইত।"

রাশিয়ার কর্ম্মাধিকারের আশ্বাস আছে: গঠনতন্ত্রের ভাষায়, (আর্টিকল ১১৮) "জাতীয় সম্পদের সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, সোভিয়েট সমাজের উৎপাদিকা শক্তির সুস্থির বৃদ্ধি, অর্থ-সঙ্কটের সম্ভাবনা নাশ এবং বেকার-সমস্যা দূর করা"

১৯৩১ সালে রাশিয়ায় সামাজিক সমস্যা হিসাবে বেকার সমস্যার লোপ একটা অপ্রবিখ্যাত ঘটনা। দেশকে দ্রুত শিল্পপ্রধান করিয়া তোলার ফলে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ১৯২৮ সালের ১৬'৬ নিযুত ১৯৩৫ সালের ২৫'১ নিযুত পর্য্যন্ত উঠিল। ইতিমধ্যে কৃষি-সমবায় প্রতিষ্ঠা করাতে পল্লীর আর্থিক ও সামাজিক জীবন পুনর্গঠনের কাজে অতিরিক্ত গ্রাম্য শ্রমিকদল নিযুক্ত হইয়াছিল। বিদেশে ধরিয়া লওয়া হয় যে, এত শ্রমিক-চাহিদার হেতু শিল্প-বিস্তারের প্রাথমিক অবস্থা (যদিও ধনতন্ত্রী দেশসমূহে এরূপ অবস্থায় বেকার-সঙ্কট হইয়াছিল এবং ইহা দেশ-গঠনের শেষে থাকিবে না। সোভিয়েট্ শ্রমিকগণ কিন্তু কোন ভবিষ্যৎ বেকার-সমস্যা আশঙ্কা করে না। তাহারা জানে যে, সমাজ-অধিকৃত, জাতি-পরিকল্পিত শিল্প অতিরিক্ত উৎপাদনের অবস্থায় পৌঁছাইলে খাটুনির সময় হ্রাস এবং বিজ্ঞান ও কলা-সংক্রান্ত ভিন্ন কাজে সময়ের প্রয়োগ, একটা সামান্য চেষ্টার ব্যাপার। কোন স্বার্থপর মালিক নাই যে বাধা দিবে। ইহাই গঠনতন্ত্রগত কর্ম্মাধিকার রক্ষার অর্থ নৈতিক নিশ্চয়তা।

কর্ম্মাধিকারের সাথী অবসরে অধিকার, যে অবসর বেকারের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আলস্য নয়, তালিকাভুক্ত বিশ্রাম ঘণ্টা এবং বিশ্রাম-সপ্তাহও বটে।

১১৯ আর্টিকল্ বলে, "বেশীর ভাগ শ্রমিকদের দৈনিক কর্মকাল কমাইয়া সাত ঘণ্টা করা, শ্রমিক ও অন্যান্য কর্ম্ম-নিযুক্তের জন্য বেতনসহ বাৎসরিক ছুটিগুলির ব্যবস্থা দান এবং শ্রমিক স্বাস্থ্য-নিবাস, বিশ্রাম-গৃহ ও ক্রীড়ালয়ের জালে দেশ ছাইয়া ফেলায় বিশ্রামের অধিকার বাস্তব হইয়াছে।"

রাশিয়ার দৈনিক কর্ম্মকাল পৃথিবীর মধ্যে স্বল্পতম। সোভিয়েট আধিপত্যের তৃতীয় দিবসে ১৯১৭ সালের ১১ই নভেম্বরে স্থির করা হইল, আট ঘণ্টার শ্রম-দিবস ধার্য্য করা হইবে। ইহা কমাইয়া সাত ঘণ্টা করা হয় ১৯২৮ সালে, বিদ্রোহের দশম বর্ষোৎসবে (অধিক পরিশ্রমের বিপজ্জনক কাজে ছয় ঘণ্টা)। এই অবসরের উপরেও সোভিয়েট্ শ্রমিক পায় আইনদত্ত বেতনসহ বাৎসরিক ছুটি, দুই সপ্তাহ হইতে দুই মাস পর্য্যন্ত। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে অন্যান্য শ্রমিক সমাজের জন্য এত বড় উদার ব্যবস্থা আর নাই।

সোভিয়েট্ ইউনিয়নে অবসর কেবল বৈচিত্র্যহীন কর্ম্মাভাব নয়, বরঞ্চ বিশ্রাম, আমোদপ্রমোদ, খেলা ও শিক্ষার নানা-বিধ সুযোগ দ্বারা পরিপূর্ণ, যাহার ব্যয় সরকার অথবা শ্রমিকসঙ্ঘ বহন করে। বিশ্রাম ও আমোদ-প্রমোদের সুব্যবস্থা করাতে ব্যাপৃত আছে স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য বিভাগ, শ্রমিকসঙ্ঘ, শিল্পকলাক্রীড়া কমিশন্ (যাহার প্রধানগণের জাতীয় প্রতিনিধিসভায় পদমর্য্যাদা কেবিনেট্ মন্ত্রিত্বের তুল্য) এবং রাষ্ট্রের পরিকল্পনা কমিশন (যাহা আলোচনা সভার ব্যবস্থা করে, এই সব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্ম্মধারায় সংহতির জন্য, যাহাতে সকল অবসর সময়—কারখানায় ভোজনের ঘণ্টা হইতে বাৎসরিক ছুটি পর্য্যন্ত আনন্দের উপযুক্ত ব্যবস্থায় বিচিত্র হইয়া উঠে)।

রাশিয়ার অবসররঞ্জনের কয়েকটি মাত্র উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাজের ফাঁকে সঙ্গীত ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করে দোকানকমিটিগুলি এবং বহু কারখানায় কর্ম্মদিনের একঘেয়েমি ভঙ্গ করে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ব্যায়াম-চর্চ্চার বন্দোবস্ত করিয়া। স্থানীয় স্বাতন্ত্র্যবিভাগ-সকল রচনা করে বিবিধ, (আশ্চর্য্যরকম বিবিধ) কর্ম্মসূচী-বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও বিশ্রাম উদ্যান। মস্কোর কেন্দ্রীয় বিশ্রাম-কৃষ্টি-উদ্যান—ঐ নগরের সমান চারিটির একটি ও সমগ্র রাশিয়ার মধ্যে ২২৮টির একটি—এই উদ্যানে সার্কাস্ হইতে আর্কটিক্ সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, ভলি-বল্, সন্তরণ ও লঘুব্যায়াম হইতে দাবাপাশা, রাজনৈতিক সভাগৃহ ও গীতিনাট্য পর্য্যন্ত নানাবিধ মনোহর ব্যবস্থা আছে। ১৯২৬ সালের গ্রীষ্মে কেবল এই উদ্যানে জনসমাগম হইয়াছিল ১১,৫০০,০০০, (মস্কোর লোকসংখ্যার তিনগুণেরও অধিক)। বাৎসরিক ছুটির সময় বিভিন্ন রুচির জন্য অবকাশ-ভ্রমণ, বিশ্রামভবন ও স্বাস্থ্যনিকেতনের বন্দোবস্ত আছে। ১৯৩৬ সালে ত্রিশ লক্ষ লোক চিকিৎসাধীন হইয়া তাহাদের ছুটি ব্যয় করিয়াছিল স্বাস্থ্যনিবাসগুলিতে; যাদুঘর, সমুদ্রতীর এবং পর্ব্বত দেখিবার জন্য পদব্রজে, অশ্বপৃষ্ঠে, নৌকায় এবং রেলে ভ্রমণ করিয়াছিল ৭০ লক্ষ। কলাপ্রদর্শনী, নৃত্যগীতশালা, সখের উদ্ভাবকদল, সখের কলাভবন বাড়িতেছে এবং বিজ্ঞানকলার কাজে ছুটির ব্যবহারে অনুপ্রেরণা দিতেছে।

"বৃদ্ধ বয়সে, রোগে ও কর্ম্মক্ষমতার অভাবে আর্থিক নিরাপত্তার অধিকার" (আর্টিকল ১২০)—সমাজতন্ত্রে

ঘোষিত দেশবাসীর তৃতীয় অধিকার—ধনতন্ত্রী দেশগুলির লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে প্রত্যায়মান হইবে, কর্ম্মাধিকারের পরেই, সর্ব্বাপেক্ষা অবিশ্বাস্য, সর্ব্বাপেক্ষা কাল্পনিক। যে-কয়টি প্রগতিশীল ধনতন্ত্রী দেশ রোগে, বার্দ্ধক্যে আংশিক নিরাপত্তা প্রদান করে, তাহারা সমাজ-বীমার মধ্য দিয়াই তাহা দেয়—যে বীমা শ্রমিকের মজুরী দ্বারা আংশিক রচিত। প্রত্যেক সমাজতন্ত্রবাদী জাতীয় ধনের অংশীদার হওয়ায় অক্ষমতার দিনে তাহার ভরণপোষণ করুণা নয়, মালিক হিসাবে মূল-অধিকার। এই অধিকার সত্য হইয়াছে সরকারের ব্যয়ে শ্রমিকদের মধ্যে সমাজবীমার বিস্তারে, অবৈতনিক চিকিৎসার এবং শ্রমিকদের কল্যাণার্থে দেশব্যাপী স্বাস্থ্যনিবাসের ব্যবস্থায়।

সোভিয়েট্‌তন্ত্রের অস্তিত্বের প্রথম মাসেই ১৯১৭ সালের নভেম্বরে ঘোষণা করা হইল যে, ইহার "পতাকায়" স্থাপিত হইয়াছে, "নগর ও পল্লীর দরিদ্র ও শ্রমিকদের পূর্ণ সমাজ-বীমা"। কিন্তু দেশের চরম দারিদ্র্য এবং ইউরোপীয় যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের পরে বিধবা, পিতৃ-মাতৃহীন শিশু ও অক্ষম লোকের অত্যধিক সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ প্রথম প্রথম এই নীতির বিস্তৃত প্রয়োগ বাধা প্রাপ্ত হইল। প্রথম পেন্সন গৃহযুদ্ধের সৈনিকদিগকে দেওয়া হইল। রাষ্ট্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশ্রমিকদের সমাজবীমা আসিল। বৃদ্ধ ও অক্ষম কৃষকদের কথা আরও পরে উঠিল। কৃষি-সমবায় স্থাপনের পরে ইহা বিস্তৃতভাবে সম্ভব হইল, আগে নয়, এবং এই বিষয়ে এখনও কৃষকগণ সহরের শ্রমিকদের অনেক পশ্চাতে আছে। সমবেত কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাবলম্বন-ভাণ্ডার কৃষকদের যত্ন নিতেছে এবং ১৯৩৫ সালে ৬৫০০০ বৃদ্ধ কৃষকের পেন্সন্ বাবদ ৮০ লক্ষ রুবল্ ব্যয় করিয়াছে। এই ভাণ্ডারগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। উপরি-উক্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে যাহারা পড়িল না, যেমন গৃহপরিচারিকাগণ, তাহাদের ভার "সমাজকল্যাণ" প্রতিষ্ঠানের অন্নভাণ্ডার দিয়াছে।

১৯৩৬ সালে রাষ্ট্রশিল্পের ধন দ্বারা পুষ্ট এবং শ্রমিকসঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিচালিত সমাজবীমা উপক্রান্তে সমগ্র জাতীয় আয়ের দশমাংশ—৮০০০,০০০,০০০,০০০ রুবল্—ব্যয় হইয়াছিল। ইহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বীমাকরা লোকদের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যভবনের কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালে সমাজবীমার স্বাস্থ্যভবনগুলি ১,৯৫৭,০০০ লোকের শুশ্রূষা করিয়াছে। সমাজবীমার ষষ্ঠাংশ ব্যয় করা হইয়াছিল পেন্সনে, যাহা পঞ্চাশ হইতে ষাট বৎসর বয়স্কদের দেওয়া হয়। পেন্সনের পরিমাণ নানাবিধ এবং নির্ভর করে অতীত মজুরী ও অক্ষম অবস্থার উপর। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা পৃথক্ থাকার পক্ষে যথেষ্ট, অন্যান্য ক্ষেত্রে বৃদ্ধগণ যাহাতে তাহাদের পরিবারের বোঝা না হয়, সেই হিসাবে যতটুকু না দিলে নয়, ততটুকুই দেওয়া হয়। দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পেন্সনের পরিমাণ বাড়িবে। পেন্সনের পরিমাণের চেয়ে সকল অবস্থায় গুরুতর এই নীতি যে, সমাজতন্ত্র প্রত্যেক দেশবাসীর সম্পূর্ণ ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী।

অক্ষমদের ভরণ-পোষণের একটা বিশেষত্ব এই যে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার শিক্ষা দেওয়া হয়, অবশ্য তাহাদের সাধ্যাতীত নয় এমন কাজে শিক্ষা। কর্ম্মাধিকার একটা মূল্যবান অধিকার যাহা আত্মগৌরবের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এ জন্যই অক্ষমগণ যাহাতে স্বাভাবিক জীবনযাপন করিতে পারে, সে জন্য সমাজতন্ত্র যথাসাধ্য চেষ্টা করে। গত চারি বৎসরের মধ্যে এক নিযুত লোকের দুই-তৃতীয়াংশ পুনর্ব্বার শিক্ষিত হইয়া সাধারণ শিল্পকার্য্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। অধিকন্তু, অক্ষমগণের নিজেদেরই উৎপাদক সমবায় আছে, এরূপ ৫,০০০ সঙ্ঘে ৮,৩০০০০ লোক নিযুক্ত আছে। অন্ধ ও বধিরদিগকে ব্যবসা-শিক্ষা দেওয়ায় ১৫,০০০ অন্ধ এবং ১৪০০০ বধির সরকারী কারখানায় নানাবিধ কর্ম্ম পরিচালনা করে। অন্ধদিগকে কাজ দেওয়ার জন্য অনেক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। মস্কোর এক বৈদ্যুতিক মোটর কারখানায় ২৭০ জন অন্ধ এক শত ভাগের পঁচানব্বই ভাগ কাজ চালায়। সকল দেশবাসী এমন কি, অক্ষমও যাহাতে কাজ পায়, এরূপ ব্যবস্থা যে কেবল সমাজতন্ত্রেই সম্ভব, তাহা সহজেই বোঝা যায়।

শিক্ষাধিকার সমাজতন্ত্র কর্ত্তৃক স্বীকৃত চতুর্থ অধিকার (আর্টিকল ১২১)। এই অধিকার "সার্ব্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা"—যাহা সকল প্রগতিশীল দেশেই আছে—এবং "অবৈতনিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা পর্য্যন্ত"—(যাহা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে) কেবল এই দুই ব্যাপারেই শেষ হয় নাই। কিন্তু সমগ্র শিক্ষাকালব্যাপী নিম্নবিদ্যালয়সমূহে রাষ্ট্রব্যয়ে আহার, পাঠ্যগ্রন্থ এবং গবেষণাগারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা এবং "উচ্চ-বিদ্যালয় সমূহে অত্যধিক অংশের জন্য সরকারী বৃত্তির নিয়ম" এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৬ সালে ছাত্রগণের বৃত্তিতে ব্যয় হইয়াছিল ২,০০০,০০০,০০০,০০০, রুবল, সমগ্র সরকারী বাজেটের একশত ভাগের তিন ভাগ। শিল্পের যে সকল শাখার জন্য ছাত্র প্রস্তুত হইতেছে, সেখান হইতে এই সকল বৃত্তি আসে। কারণ এই যে, ছাত্রের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম হইতে যে সমাজ মুখ্যতঃ উপকৃত হইবে, ছাত্রের ভরণ-পোষণসহ শিক্ষার ব্যয় বহন করা উচিত তাহারই।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য



মরীচিকা।

বিজয়ী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

সাগরে উঠিল ঢেউ

আনন্দের ভাবী পাত্রীটি যে কে—অধিকাংশ লোকই জানে না। আনন্দ সকলের প্রিয়। সুতরাং বড়লোক বলিয়া কেহ তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখে না। তাহার বিবাহে সকলেরই আনন্দ—আনন্দের আতিশয্যেই বোধহয় ভাবী বধূটির পরিচয় জানিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনগর ও শহরের ভদ্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা প্রশ্নকারীর উত্তরে বলেন—"ও—হাঁ—যেমন ওঁরা, তেমনি ঘর থেকে মেয়ে আসছে বৈ কি, দেবনাথ বাবুর কাজে কেউ খুঁত দেখেছে কখনো?"

নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া আলবোলার নল হাতে অর্দ্ধাসীন গিরিরাজ মিত্র বলিলেন, "হঠাৎ যে বড় বিয়ের আয়োজন হচ্ছে! বউরাণীটি আসছেন কোথা থেকে বলতে পার কেউ?"

একজন তরুণ পার্ষদ বলিল, "আজ্ঞে হুকুম হলেই পারি।"

সকলের কৌতুক-চঞ্চল চোখ গিয়া পড়িল তাহার উপর—গিরিরাজ সাগ্রহ প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় হে, কোথায়?"

"ষষ্ঠীতলায়। যাদবের বাড়ী প্রায়ই যাই কি না—এক সঙ্গে পড়েছি আমরা। তার বাড়ীর কাছে বিনোদ বোসের বাড়ী—মাষ্টারী করে—তিরিশ না পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে পায়, তারই ছোট বোন।"

"অ্যাঁ"—গিরিরাজের দুই চক্ষু কপালে উঠিল। তাহার পরেই অট্টহাস্যে ঘর ভরিয়া গেল।

"সত্যি পরেশ—সত্যি? আমিও মনে মনে ঠিক এইরকম আন্দাজ করেছিলাম। আমার নাতনীকে ঘরে নিতে ঠাকরুণের সাহস হ'ল না—ছোট-লোকের মেয়ে এনে ঝিয়ের কাজ খাটাবে। শুনেছি ওদের বাড়ীর মেয়েরা রাত দিন খাটে।"

"আপনার নাতনী? সে যে সাক্ষাৎ সরস্বতী।—অমত হ'ল কিসে?"—বহু কণ্ঠে ব্যগ্র প্রশ্ন উঠিল।

তাচ্ছিল্যের সুরে গিরিরাজ বলিলেন, "কে জানে! চৌধুরাণী বলেন, মেম-সাহেব তাঁর ঘরে মানাবে না! সত্যিই ত, মানাবে কেন? বলেছে ঠিক। আমার নাতনী হাঁড়ি ধরতে জানে না। কলকাতা থাকা পছন্দ করে—পাড়াগাঁয়ে সে থাকতে চায় না। ওঁরা ত কলকাতা যান কালে ভদ্রে। ও ভালই হয়েছে। তা সে রাজকন্যে না দেবকন্যেটির বয়স কত জান?"

পরেশ বলিল, "আমি ভাল করে দেখিনি, শুনেছি খুব ছোট—আহা আপনার নাতনীকে যে অপছন্দ করে—তার এইরকম হাবাতে ঘরই দরকার—।"

"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হবে বৈ কি, ও দিক পানে নজর রেখ তোমরা—মজাটা হবে খুব।"

ছোট্ট পাড়াটি ষষ্ঠীতলা, ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ঢেউ উঠিয়াছে, এ কি কাণ্ড রে বাপু! ম্যানেজারের নিজের বাদামী রঙের গাড়ীটি যখন তখন আসিয়া বিনোদের দুয়ারে দাঁড়ায়! বলি দেশে কি আর মেয়ে জুটিল না? এমন কথা শুনিয়াছে কখনও কেউ—আনন্দ চৌধুরীর গলায় মালা দিবে বিনোদ বোসের বোন?

পুকুর-ঘাটে বড়-গিন্নী বলিলেন, "লক্ষ্মণ যে ঘাটে আসা ছেড়েই দিলে? রাম না হতে রামায়ণ! বিয়ে না হ'তে আবরু? করুণাকেও দেখতে পাই নে আর, দেমাকে মাটীতে পা পড়ছে না।"

যাদবের দিদি বলিলেন, "কি জানি! আমি কিচ্ছু-ভাল বুঝছি নে, মিত্তির-বাড়ীর মেয়েটি একেবারে মেম-সাহেবের মত দেখতে, মিত্তির মশায় শুনেছি হাজার হাজার টাকা খরচ করতে চেয়েছিলেন।"

নাপিত-গিন্নী বলিল, "মেম-সাহেব দেখেছ দিদি?"

"দেখেছি না? শহরেই কত আছে।"

বিজয়া

-শ্রীঅপরাজিতা দেবী

সাগরে উঠিল ঢেউ

আনন্দের ভাবী পাত্রীটি যে কে—অধিকাংশ লোকই জানে না। আনন্দ সকলের প্রিয়। সুতরাং বড়লোক বলিয়া কেহ তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখে না। তাহার বিবাহে সকলেরই আনন্দ—আনন্দের আতিশয্যেই বোধহয় ভাবী বধূটির পরিচয় জানিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনগর ও শহরের ভদ্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা প্রশ্নকারীর উত্তরে বলেন—"ও—হ্যাঁ—যেমন ওঁরা, তেমনি ঘর থেকে মেয়ে আসছে বৈ কি, দেবনাথ বাবুর কাজে কেউ খুঁত দেখেছে কখনো?"

নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া আলবোলার নল হাতে অর্দ্ধাসীন গিরিরাজ মিত্র বলিলেন, "হঠাৎ যে বড় বিয়ের আয়োজন হচ্ছে! বউরাণীটি আসছেন কোথা থেকে বলতে পার কেউ?"

একজন তরুণ পার্ষদ বলিল, "আজ্ঞে হুকুম হলেই পারি।"

সকলের কৌতুক-চঞ্চল চোখ গিয়া পড়িল তাহার উপর—গিরিরাজ সাগ্রহ প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় হে, কোথায়?"

"ষষ্ঠীতলায়। যাদবের বাড়ী প্রায়ই যাই কি না—এক ক্লাসে পড়েছি আমরা। তার বাড়ীর কাছে বিনোদ বোসের বাড়ী—মাষ্টারী করে—তিরিশ না পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে পায়, তারই ছোট বোন।"

"অ্যাঁ"—গিরিরাজের দুই চক্ষু কপালে উঠিল। তাহার পরেই অট্টহাস্যে ঘর ভরিয়া গেল।

"সত্যি পরেশ—সত্যি? আমিও মনে মনে ঠিক এইরকম আন্দাজ করেছিলাম। আমার নাতনীকে ঘরে নিতে ওদের গিন্নীর সাহস হ'ল না—ছোট-লোকের মেয়ে এনে বিয়ের সাধ মিটাবে। শুনেছি ওদের বাড়ীর মেয়েরা রাত দিন খাটে।"

"আপনার নাতনী? সে যে সাক্ষাৎ সরস্বতী।—অমত হ'ল কিসে?"—বহু কণ্ঠে ব্যগ্র প্রশ্ন উঠিল।

তাচ্ছিল্যের সুরে গিরিরাজ বলিলেন, "কে জানে! চৌধুরাণী বললেন, মেম-সাহেব তাঁর ঘরে মানাবে না। সত্যিই ত, মানাবে কেন? বলেছে ঠিক। আমার নাতনী হাঁড়ি ধরতে জানে না। কলকাতা থাকা পছন্দ করে—পাড়াগাঁয়ে সে থাকতে চায় না। ওঁরা ত কলকাতা যান, কালে ভদ্রে। ও ভালই হয়েছে। তা সে রাজকন্যে না দেবকন্যেটির বয়স কত জান?"

পরেশ বলিল, "আমি ভাল করে দেখিনি, শুনেছি খুব ছোট—আহা আপনার নাতনীকে যে অপছন্দ করে—তার এইরকম চাবাতে ঘরই দরকার—।"

"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হবে বৈ কি, ও দিক পানে নজর রেখ তোমরা—মজাটা হবে খুব।"

ছোট্ট পাড়াটি ষষ্ঠীতলা, ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ঢেউ উঠিয়াছে, এ কি কাণ্ড রে বাপু! ম্যানেজারের নিজের বাদামী রঙের গাড়ীটি যখন তখন আসিয়া বিনোদের দুয়ারে দাঁড়ায়। বলি দেশে কি আর মেয়ে জুটিল না? এমন কথা শুনিয়াছে কখনও কেউ—আনন্দ চৌধুরীর গলায় মালা দিবে বিনোদ বোসের বোন?

পুকুর-ঘাটে বড়-গিন্নী বলিলেন, "লক্ষ্মণ যে ঘাটে আসা ছেড়েই দিলে? রাম না হতে রামায়ণ! বিয়ে না হ'তে আবরু? করুণাকেও দেখতে পাই নে আর, দেমাকে মাটিতে পা পড়ছে না।"

যাদবের দিদি বলিলেন, "কি জানি! আমি কিছু ভাল বুঝছি নে, মিত্তির-বাড়ীর মেয়েটি একেবারে মেম-সাহেবের মত দেখতে, মিত্তির মশায় শুনেছি হাজার হাজার টাকা খরচ করতে চেয়েছিলেন।"

নাপিত-গিন্নী বলিল, "মেম-সাহেব দেখেছ দিদি?"

"দেখেছি না? শহরেই কত আছে।"

"আমিও ত দেখেছি। ছেলেরা বলে ঐ মেম সাহেব। তা' সাহেবও টুপি মাথায়—মেমও টুপি মাথায়, কে যে কোনটি আমি ঠিক করতে পারি নে—বড্ড ধাঁধা লেগে যায়।"

যাদবের দিদি বলিলেন, "ক্ষেপেছ না কি, সাহেবরা কোট প্যান্টালুন পরে, মেয়েরা ঘাঘরা পরে, দেখলেই বোঝা যায়।"

চিন্তিত মুখে নাপিত-গিন্নী বলিল, "কি জানি ভাই, আমি কিছু বুঝতে পারি নে।"

এস এস বধূ প্রীতিময়ী—এস এস কল্যাণরূপিণী

সতেরই বৈশাখ রুক্মিণী বধূ বরণ করিয়া তুলিলেন। কৈকেয়ী ক্ষীণাঙ্গী বালিকাকে কোলে বসাইয়া বলিলেন, "আমায় চিনতে পারছিস ?"

বস্ত্রালঙ্কারের ভারে এবং অচেনা জন-সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া শ্রীমতী সুদেষ্ণা নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে কৈকেয়ীই তার চেনা, সে সাগ্রহে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

"ও মা, বৌ চেয়ে রয়েছে দেখ!"—আশ-পাশের মেয়েরা হাসিতে লাগিল।

সুদেষ্ণা চোখ নামাইল। কৈকেয়ী বলিলেন, "লজ্জা করতে শেখে নি, এইটি আমার ভাল লেগেছে।"

নিজের ঘরে কেশব অধ্যয়নে রত। কৈকেয়ী বলিলেন, "কেশব! আজকার দিনে অন্ততঃ লেখাপড়াটা রাখ—যেন ইস্কুলের ছেলে হয়েছিস! তারাও এমন পড়া পড়ে না। তোর ছেলের বিয়ে তুই ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছিস নে।"

কেশব মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "আমি কি করব মা ?"

"তা বটে!—তুই আর কি করবি? একবার গিয়েই দেখ তোর কেমন বৌমা—"

কেশব ফিরিয়া চাহিলেন, শুভ্রবসনা মহিমময়ী মায়ের কাছে সালঙ্কারা আরক্ত-বসনা বালিকা বধূ। কোলে বসাইয়া মুখের দিকে চাহিয়া কেশব বলিলেন, "এ কি বউ মা? এ যে মেয়েটি—"

সুদেষ্ণার চোখের পল্লব কিছু ভয় ও কিছু সঙ্কোচ জড়ান। লজ্জার চিহ্নও নাই।

"পঙ্ক থেকে পদ্ম তুলে এনেছি না? পছন্দ হয়েছে?"

"বড্ড বেশী মা—ভয় হচ্ছে।"

"কি ভয় হচ্ছে? পাছে নিজের মায়ের চেয়ে এই নতুন মা-টিকে বেশী ভাল বেসে ফেলিস ?"

"এমন কথা বলোনা, আমার মায়ের সঙ্গে ত্রিভুবনে কারো তুলনা হয় না। আবার সে কথা আমার চেয়ে আমার মা-ই ভাল জানেন"—বলিয়া কেশব মায়ের দিকে চাহিলেন।

পাঁচ বছরের ছেলের মত কেশব মায়ের উপর নির্ভরশীল। আজন্ম এই রকম কথা শোনাই কৈকেয়ীর অভ্যাস—তবু ছেলের কথায় মন ভরিয়া উঠিল।

বৌভাতের দিন সকাল বেলা মিত্রবাড়ী ও ষষ্ঠীতলার মেয়েদের নিমন্ত্রণ—রাত্রে শ্রীনগর ও শহর।

মিত্রবাড়ী হইতে গাড়ী ফেরৎ আসিল—আর আসিল আশীর্ব্বাদী দুটি গিনি।

সকলে নাক তুলিয়া বলিতে লাগিল, "ওমা, এই না কি মিত্তির-বাড়ীর কুটুম্বিতে? ও আর দেওয়া কেন? নিজেদের ঘরে রেখে দিলেই পারত।" কেহ কেহ বলিল, "ফেরৎ দিলেই ভাল হয়।"

কৈকেয়ী শুনিয়া বলিলেন, "ও কি কথা? ভালবেসে যা দিয়েছেন সেই ভাল, দামী জিনিষ না হলে আদর করতে নেই এমন বিশ্রী কথা যেন আর না শুনি। বৌমা, গিনি দু'টো তুমি নিজে নতুন কৌটোয় তুলে রাখ। আর বৌভাত দশটার আগে যেন সারা হয়, নইলে ওরা কষ্ট পাবে।"

রুক্মিণী বলিলেন, "ওঁরা কেউই এলেন না কেন মা?"

"সে ওঁরাই জানেন।"

এদিকে ষষ্ঠীতলার মেয়েরা নিজেদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে বসিয়া আছেন, ঘরের মেঝেয় গালিচা পাতা। দুই দিকে ঢালা বিছানা, বালিশ দেওয়া, মাথার উপরে বিজলী পাখা পাঁচ খানা, দুই জন ঝি ফরমাসের জন্যে নিযুক্ত, মুখুজ্যে বাড়ীর প্রধানা ঝি—সেও এক একবার আসিয়া দেখিয়া যায়। তাহার ফরাসডাঙ্গার কালপেড়ে কাপড়, গলায় মোটা বিছে হার হাতে অনন্ত, চুড়ি, বালা, গর্ব্বিত চালচলন, ভারি ভারি টানের কথা—কৈকেয়ী ছাড়া আর কেহ তাহাকে কম্মা করিতে সাহস করে না।

রুক্মিণী একবার পরিচয় ও অভ্যর্থনা করিয়া গিয়াছেন

আবার আসিয়া বলিলেন, "যখন যা দরকার বলবেন, মনে করবেন এ নিজেদের বাড়ী, নইলে বড় কষ্ট পাব মনে।"

ঝিয়েরা পান, জল, ছেলেদের দুধ, বাটী, ঝিনুক সরবরাহ করিতেছে, মেজ-গিন্নীরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলিয়া একটি ঝিকে বলিলেন, "ঠাকুর-বাড়ী যেতে পারি একবার?"

বিন্দু ঝি বলিল, "বড্ড ভিড় এখন। সন্ধে বেলা আরতি দেখবেন।"

"পুকুরের দিকে যাওয়া যাবে না?"

"তা যাবে, আসুন দেখিয়ে আনি।"

ঘরের বাহির হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া বড়-গিন্নী বলিলেন, "রান্না-বাড়ী কোন্ দিকে?"

"রান্না-বাড়ী দেখবেন? তবে এই দিকে আসুন।" বিন্দু ফিরিয়া অন্য দিকের সিঁড়ি ধরিল।

ষষ্ঠীতলা-বাসিনীদের জমিদার-বাড়ী দর্শন এই প্রথম। মনে মনে সঙ্কোচ থাকিলেও আসিবার ইচ্ছা ছিল অদম্য। তাই সকলে আসিয়াছেন। খুব বড় বাড়ী জানা আছে, সেই বড় যে এতটাই বড় সেটা ধারণা ছিল না।

নীচে নামিয়া সামনে আঙিনা, আঙিনায় নামিতে হয় না—ঘেরা বারান্দা দিয়া পথ। বারান্দার ওপারে আবার এক আঙিনা, মাঝখানে প্রকাণ্ড ইঁদারা। বিন্দু বলিল, "এই রান্না-বাড়ী।"

চারি দিকের ঘরে সারি সারি জলন্ত উনান—মাথায় ঝুঁটি বাঁধা উড়ে ঠাকুরের দল। মুখে পান-দোক্তা, ঝাঁঝরা ও হাতা হাতে টুলে বসিয়া হুকুম জারি করিতেছে। বারান্দায় সারি সারি বঁটি পাতা—ঝিয়েরা কুটনা কুটায় ব্যস্ত। দলে দলে ভারীরা জিনিস পত্র বহিয়া আনিতেছে। কয়েক জন সরকারী লোক তদারক করিয়া ফিরিতেছে। ইঁদারার চারিদিকে জেলেনীরা মাছ কুটিতে বসিয়াছে। তাহাদেরই বাহার বেশী। চওড়া-পেড়ে কাপড় পরা, গায়ে সোনার গহনা, ভারি ভারি।

বড়-গিন্নী বলিলেন, "তা ধুম হবে বৈকি। কত লোকের নিমন্ত্রণ—যোগাড়ও তেমনি।"

বিন্দু বলিল, "এখানে তো সব রান্না হচ্ছে না, রান্না হচ্ছে নানা জায়গায়—এখানে, বাইরে, নতুন চালায়, অতিথ-শালে আর ভোগের ঘরে। বামুন পণ্ডিত আর গুরু আচারী যাঁরা তাঁরা পেসাদ পাবেন। অতিথ ভিখিরীদের অতিথ-শালে। আর সব নেমন্তন্নেদের জন্যই স্কুলের পেছনে নতুন চালা উঠেছে সেখানে। এইখানে শুধু বাড়ীর লোকের আর নেমন্তন্নে মেয়েদের জন্যে।"

সেখান হইতে গোটা দুই ঘর পার হইয়া বিন্দু একটা দরজা খুলিল। সামনে চাতাল, দুদিকে বকুল ও শেফালি গাছ, উঁচু মঞ্চের উপর নূতন পল্লবিত তুলসী গাছ—চাতালের চার দিকেই অনেক ফুলের গাছ। বেল-ফুলের গাছে অসংখ্য কুঁড়ি। চাতালের শেষে ঘাটের সিঁড়ি—নীচু নীচু চওড়া লাল রঙের ধাপ, পুকুরের দিকে খেজুর ও নারিকেল গাছ। গাছের পরে খানিকটা জমী, তারপরে বাড়ীর প্রাচীর।

বড়-গিন্নী বলিলেন, "এই জলে রান্না হয়?"

বিন্দু বলিল, "না এটা নাইবার, রান্নাঘরের পেছনে আর দু'টো পুকুর আছে। একটায় রান্না আর একটায় বাসন-ধোয়া হয়। ছেলে-পিলেরা আপনাদের সাঁতার জানে ত?"

সুষমা বলিল, "জানি গো জানি।"

"জানলেই ভাল, আমাদের বৌদি-মণি সাঁতার জানে?"

"একটু একটু, আমাদের মতন না।"

"দরকার কি, ওপরেই সে নাইবে।"

বড়-গিন্নী বলিলেন, "এখানে কি কেউ চান করে না?"

"হাঁ, ওপরে ঘরে ঘরে নাইবার ঘর, কল, তবু ওনারা পুকুরে নাইতে বেশী ভালবাসে।"

সুলেখা বলিল, "আহা, লক্ষণ কিছু দেখতে পেলে না।"

সুনীলা বলিল, "তোর কথা শুনে বাঁচিনে।"

সুনন্দা বলিল, "আচ্ছা ওকে ওঁরা বৌ করলেন কেন ভাই?"

সুনীলা জবাব দিল না। সুলেখা বলিল, "সুন্দর দেখতে বলে।"

"কি এমন সুন্দর? ওর চেয়ে সুষমা ঢের ফরসা।"

সুষমা একটু খুশী হইয়া বলিল, "মা বলে ও সব কপালের কথা।"

কথার কিছু কিছু বিন্দুর কানে গেল। সে সুষমার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমিও কোন রাজার ঘরে পড়বে গো।"

মেজ-গিন্নী বলিলেন, "বড়-বাগান কোন্ দিকে?"

"সে ঠাকুর-বাড়ীর ওপাশে। এবার আসুন যাই।"

বিন্দু যে পথে আসিয়াছিল সেদিকে গেল না। সামনের দিকে কয়েক হাত দূরে দেয়ালের গায়ে একটি দরজা, সেইটা ঠেলিয়া খুলিয়া একটা সরু বারান্দায় উঠিল। ঠিক সামনে, উপরে উঠিবার সিঁড়ি।

বড়-গিন্নী অবাক্ হইয়া বলিলেন, "এত কাছে? আমরা যে মুল্লুক ঘুরে এলাম?"

বিন্দু বলিল, "এইটে দিয়েই ত আসছিলাম। আপনারা রান্না-বাড়ী দেখতে চাইলেন, তাই ওদিক দিয়ে নামলাম। মা-রা এই পথে নাইতে নামেন।"

উপরে উঠিয়া করুণা মৃদুস্বরে বলিল, "তোমাদের বৌ কই?"

"তাঁকে সাজানো হচ্ছে, এখুনি বৌভাত হবে।"

মেজ-গিন্নী বলিলেন, "তবে চল সেখানে যাই।"

লাল রঙের মেঝেতে সাদা আলপনা "বৌ ছত্র" আঁকা, তার উপরে আলপনা দেওয়া সিঁড়িতে সুদেষ্ণা বসিয়া আছে—গোলাপী রংয়ের বেনারসী পরা, কাঁধ পর্য্যন্ত লম্বা ঘন চুলের গোছা, মাথায় মুকুট, হাতে, গলায়, কানে এত গহনা উঠিয়াছে যে, সুদেষ্ণা প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। প্রতিমা মেয়েটিই সবচেয়ে ব্যস্ত—এখনও তার নিজের সাজ হয় নাই, বৌ লইয়াই অজ্ঞান।

সঙ্গিনীদের দেখিয়া সুদেষ্ণার মুখে একটু হাসি ফুটিল—করুণার কোলের খুকীটির দিকে চাহিয়া রহিল। করুণা অনেক করিয়া তাহাকে শিখাইয়াছে যে, চুপচাপ থাকিতে হইবে। সে কথা সুদেষ্ণা ভোলে নাই, তাই খুকীকে চাহিল না।

সুখদা দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল, "মা জানতে চাইলেন কতদূর?"

"আর দেরী নেই, আমি কাপড় ছেড়ে আসি"—বলিয়া প্রতিমা দৌড় দিল।

ঘরের একদিকে মেয়েদের বসিবার জন্য গালিচা বিছানো হইল। অন্যদিকের দুয়ার দিয়া বৌভাতের থালাগুলি আসিতে আরম্ভ করিল। সুখদা সুদেষ্ণার হাত ধরিয়া তুলিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। একটি এয়ো পিঁড়িটা তুলিয়া লইয়া গেল, আর একটি এয়ো দুখানি সোনালি জরির ফুল-আঁকা লাল ভেলভেটের আসন সেই 'বৌ-ছত্রে'র উপর পাতিয়া দিল।

এক দুয়ার দিয়া আনন্দের হাত ধরিয়া সবুজ বেনারসী-পরা প্রতিমা ঘরে ঢুকিল, আনন্দকে একটা আসনের উপর দাঁড়াইতে বলিয়া নিজে বৌভাতের জিনিসগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

এতক্ষণে সকলের বর দেখিবার সুযোগ হইল। কি সুন্দর বর! সাঁচ্চার পাড় বেনারসী ধুতি-পরা, গায়ে সাঁচ্চা পাড়ের হালকা নীল চাদর, চাদরের এক কোণ আনন্দ ছুঁইয়াছে, গলায় দু'নর মুক্তার মালা—দুই হাতের আঙুলে চারটি চার রঙের পাথর-বসান আংটি। সুকুমার চেহারা, মুখে একটু রাগ রাগ বিরক্তির ভাব।

আর এক দুয়ার দিয়া ঢুকিলেন রুক্মিণী, বাম হাতে একটু তুলা, ডান হাতে প্রদীপ, মেজ-গিন্নীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া তুলা পাকাইয়া প্রদীপটির সলিতা সাজাইতে বসিলেন। কপালে একটি বড় সিঁদুরের ফোঁটা, জরদা রঙের এক হাত চওড়া আঁচলাদার বেনারসী-পরা, একরাশ ঘন কালো চুল মাথার কাপড়ের বাঁ-পাশ দিয়া পিঠে ছড়ানো।

প্রতিমা চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিল, বলিল, "বকুনি খেয়ে বুঝি কাপড় ছাড়া হ'ল?"

রুক্মিণীও হাসিয়া বলিলেন, "মার কথা ছেড়ে দে।"

সুখদা বলিল, "ছেড়ে দেবে বৈ কি, মার সামনে না পড়লে ত সাদা কাপড়েই আসতে? সাধে কি মা বকে?"

বড়-গিন্নী চুপি চুপি বলিলেন, "কি রূপ! যেমন ছেলে তেমনি মা, বয়েস হয়েছে কে বলবে?"

মেজ-গিন্নী বলিলেন, "বয়েস কই? তিরিশ বত্রিশের বেশী হবে না।"

"তাও মনে হয় না, যেন কুড়ি বছরের বৌটি, কি রঙে, কি চেহারায়—লক্ষ্মী শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াতেও পারে না", বলিতে বলিতে বড়-গিন্নী একটা নিশ্বাস চাপিয়া লইলেন, সুষমা হইত এই শাশুড়ীর যোগ্য বৌ।

প্রতিমা সুদেষ্ণাকে আনন্দের সামনের আসনে দাঁড় করাইল, রুক্মিণী প্রদীপ হাতে উঠিয়া জলন্ত শিখার শীষ দিয়া ছেলে ও বৌয়ের কপালে ফোঁটা দিলেন। ধান-দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বরণ-ডালা তাহাদের কপালে ছোঁয়াইয়া এয়োর হাতে ফিরাইয়া দিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনখানা বড় বড় রূপার থালা সাজানো, একটায় কাপড়-গহনা ও সিঁদুর-আলতা। একটায় মিষ্টান্ন, একটায় অন্ন-ব্যঞ্জন।

প্রতিমা থালাগুলির গোলাপী রেশমী ঢাকনা খুলিয়া কাপড়ের থালাটি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "নাও দাদা, বৌদিকে দাও, বল, আমি তোমায় বস্ত্রালঙ্কার দিচ্ছি।"

আনন্দ সরোষে প্রতিমার দিকে চাহিল, বেলা বেশী হয় নাই, কিন্তু পর পর কর্মদনের অত্যাচার সহিয়া আজ সে কিঞ্চিৎ ধৈর্যহীন। এরকম নিয়ম বাঁধন তাহার সহে না।

রুক্মিণী বলিলেন, "নাও বাবা, ধর।"

প্রতিমার দিকে একটা তীব্র চাহনি হানিয়া আনন্দ থালাটি লইয়া সুদেষ্ণার হাতে দিল। প্রতিমা বলিল, "বৌদি, কপালে ছুঁইয়ে নামিয়ে রাখ।"

শাঁখ বাজিতে লাগিল, হুলুধ্বনি উঠিল। দ্বিতীয় থালাটি আনন্দের হাতে দিয়া প্রতিমা বলিল, "বল, আমি তোমায় অন্ন দিচ্ছি, আজ থেকে তোমার অন্নবস্ত্রের ভার আমার।"

মা সামনে দাঁড়াইয়া, আনন্দকে বলিতেই হইল, তবে সে রকম আস্তে আস্তে বলিল, একটু দূরে যাহারা, তাহারা শুনিতেই পাইল না।

"হয়েছে, এবার ভাই বৌদি, দাদাকে প্রণাম কর, পায়ে হাত দিয়ে নয়, পায়ে মাথা ঠেকিয়ে।"

সুদেষ্ণা ভূমিষ্ঠ হইয়া আনন্দকে প্রণাম করিল।

রুক্মিণী বলিলেন, "এবার বৌমাকে নিয়ে তোরা খেতে বোস", মেজ-গিন্নীদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনারা দেখুন—করুণা, তুমি বৌমার কাছে এসে বসো মা, ছেলে আমার বড্ড রেগে গেছে, ওকে খাইয়ে আসি"—বলিয়া আনন্দের হাত ধরিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

প্রতিমা বৌভাতের লাল বেনারসীটি সুদেষ্ণাকে পরাইয়া দিল, মুকুট খুলিয়া টায়রা পরাইল। নূতন কৌটা হইতে আর একবার সিঁদুর দিয়া দিল। কৌটাটি সোনার—ডালার উপর লাল পাথরে লেখা "সুদেষ্ণা", নামের নীচে সবুজ পাথরের বাঁকা রেখা টানা। লেখাটি হাতের লেখার ধরণে।

বৌভাতের থালায় অল্প অল্প করিয়া সব রকম খাবার সাজাইয়া দেওয়া হয়। বৌ বসিবে সমস্ত সঙ্গিনীগণ সঙ্গে, সেইটিই নিয়ম। সুতরাং এয়োরা এবার থালা, বাটি, রেকাব বহিয়া আনিতে আরম্ভ করিল।

আয়োজন কি! এমন কিছু নাই যা নূতন বৌকে দেওয়া হয় নাই, নানা আকারের নানা বর্ণের নানা পাত্রে সাজান রাজভোগ। রূপার বড় বড় থালা, ছোট ছোট রূপার বাটী ও রেকাব—যেন তারাদল চাঁদকে ঘিরিয়াছে।

সুদেষ্ণাকে বাঁ-দিকে লইয়া সমস্ত বালিকাদের ডাকিয়া প্রতিমা খাইতে বসিল। বিজলী-পাখার বাতাসে চুল এলো-মেলো হয় বলিয়া ক্ষান্ত-ঝি বৌয়ের পিছনে বসিয়া ভিজা খসখসের পাখা দিয়া হাওয়া দিতেছে।

করুণাকে রুক্মিণী দেখিতে বলিয়া গেছেন, করুণা দেখিবে কি? তাহার আঁচল-ধরা লক্ষ্মণ কই? কৈকেয়ীর পৌত্র-বধূর হীরা-মুক্তার কাজ-করা ঝলমলে চেহারার মধ্যে সে দীন মেয়েটি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে!

প্রতিমা সুদেষ্ণার হাতে হাতে খাবার তুলিয়া দেয়—একবার চাহিয়া দেখে পিসীমারা হাত গুটাইয়া আছে, চৌধুরীদের এক শরিকের মেয়ে উমাও ছিল—সে বলিল, "তুই বৌদিকে দেখ—এঁরা আমার।"

সুনীলা বড় চতুর—দলের সে নেতা—বিপদ দেখিয়া চুপ করিয়া আছে, কেমন করিয়া মান বজায় রাখিবে এতগুলি চোখের সামনে তাহার রকম দেখিয়া অন্য মেয়েরা তো ভয় পাইবেই।

উমা বলিল, "সে কি ভাই, তোমরা খাচ্ছনা যে? সে হবে না, তা হলে আমরাও হাত তুলছি।"

"এই খাচ্ছি, খিদে নেই তেমন"—সুনীলা একটা বাটি টানিয়া লইল।

"ওটা যে অম্বল, এখনও মাছের দিকেই হাত পড়ে নি, আগেই অম্বল?" উমা হাসিল।

অপ্রতিভ সুনীলা আর একটা বাটী ধরিল।

"ওটাও অম্বল—চাটনী। এদিককার সবটাই অম্বলের—দেখছ না পাথরের বাটী?"

ইহার পরে সুনীলা উমা ও প্রতিমার হাতের দিকে নজর রাখিয়া ভুল শোধরাইয়া লইতে লাগিল। তাহার দেখাদেখি আর সকলে বিপদ হইতে একরূপ পরিত্রাণ পাইল।

খাওয়ার পরে সুখদা নিজে সুদেষ্ণার হাত-মুখ ধোয়াইয়া দিল, নিজের আঁচল দিয়া মুছাইল, রূপার থালায় গোলাপ-ফুলের লাল ও সাদা পাপড়ি দিয়া সাজা পান সামনে ধরিল। সুদেষ্ণা একটি পান তুলিয়া লইল দেখিয়া দুঃখিত হইয়া সুখদা বলিল, "তোমার জন্তেই আমি ছোট্ট ছোট্ট করে সেজেছি গো, লক্ষ্মী, আর দুটো নাও?"

সুদেষ্ণা মাথা নাড়িল। প্রতিমা বলিল, "বৌদি নেবে না তবু সাধছ, আমাদের দাও না।"

"ইস এত যতন করে তোমাদের জন্তেই সেজেছি! ভিজে কাপড় ঢাকা দিয়ে রাখি গে—ঐ যে শশী তোমাদের পান এনেছে নাও না।" বলিয়া থালাটি লইয়া সুখদা হেলিয়া দুলিয়া প্রস্থান করিল।

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "সুখীদি আমাদের মানুষ মনে করে না।"

উমা বলিল, "দিদিমা ছাড়া কাকেই বা মনে করে?"

"এবার বৌদি শোবে, রাত্তিরে ফুলশয্যা আছে আবার—এস।"

প্রতিমার সঙ্গে আলতা-পরা পায়ে চরণপদ্ম ও তোড়ার ঝুন্ ঝুন্ শব্দ তুলিয়া সুদেষ্ণা ঘর হইতে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই মেয়েদের খাইবার ডাক পড়িল। রুক্মিণী আসিয়া সকলকে লইয়া গেলেন।

পুষ্পে পুষ্পময়ী

মেজ-গিন্নী বলিলেন, "করুণা ঘুমালি না কি?" করুণা চুপ করিয়া শুইয়া আছে—বলিল, "না।"

থালা ভরা পান-জরদা। দুয়ারের পর্দার বাহিরে ঝিয়েরা বসিয়া। প্রতিমা ও জন দুই আত্মীয় নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিল মেয়েদের। দুপুরে বৌভাত ও রাত্রে ফুলশয্যা দেখিবার নিমন্ত্রণ।

এ দিকে ধনীদের মধ্যে চৌধুরীরাই বিখ্যাত। তাহাদের চালচলন বসবাস সমান ঘরের অনেক উঁচুতে, কৈকেয়ী ত দেশবিদিতা অদ্বিতীয়া। ঐশ্বর্য্য হিসাব করিলে চৌধুরীদের চেয়ে অনেক বড় ঘর আছে বটে, কিন্তু চৌধুরীদের সঙ্গে আর কোন দিক্ দিয়াই তুলনীয় নয়।

এ হেন চৌধুরী-বাড়ীর নিমন্ত্রণ খুব ভাগ্যেরই কথা, জন্মও সার্থক—চক্ষুও সার্থক। মেজ-গিন্নীরা নিমন্ত্রণে আসিতে দ্বিধা তো করেন নাই, বরং বিনোদের ভাষায়—'নাচতে নাচতে চললেন'!

আদরযত্নের সীমাই নাই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রুক্মিণী আসিয়া দেখিয়া যান—যেমন তাঁর মিষ্টি কথা, তেমনই মধুর ব্যবহার, কে বলিবে কোন দিন পরিচয় ছিল না।

চারিটি ঘণ্টা ধরিয়া ধনরত্নের সমাবেশ ও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখিয়া পল্লীবাসিনীদের চোখ ঝলসাইয়া গিয়াছে। দুনিয়ায় অকারণ ব্যয়ের সীমা নাই, একের কাছে যা নিতান্ত সাধারণ অপরের তাহা স্বপ্ন! এত মণিমুক্তা সোনারূপাও জগতে আছে? দিনে দশ বার দশ রকম সাড়ী বদলাইতে আলস্য নাই—যেন অতি সহজ ব্যাপার—যাহাদের অভ্যাস নাই, দেখিয়াই তাহাদের প্রথমে লাগে চমক ও বিস্ময়, পরে আসে অবশ্যম্ভাবী ক্লান্তি।

ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় করুণাকে আসিতে হইয়াছে—তিনদিন সুদেষ্ণা তার কোল ছাড়া—তাহারই বৌভাত, করুণা দেখিবে না? সে বড় ভীরু, বড় নরমস্বভাব, সেইজন্য সঙ্কোচ। এখন করুণা ফিরিতে পারিলে বাঁচে নিজের ঘরটির জন্য মন কাঁদিতেছে।

মেজ-গিন্নী মানুষ ভাল, একটু হাসিয়া বলিলেন, "আর ভাল লাগছে না, রাত অবধি থাকতে হলে তো গেছি।"

আর একজন বলিলেন, "কেন গা, ঘরে কি এমন সামিগ্রি ফেলে এসেছ? এক নেপালের বাপ—তা তারাও তো আসছে রাত্তিরে নেমন্তন্নে।"

করুণা চোখ চাহিয়া বলিল, "মেজদি, চল না আমরা যাই—সত্যিই ভাল লাগছে না আর।"

মেয়েরা বলিল, "ফুলশয্যে দেখে যাবে না? কত ধুমধাম হবে—ঘর সাজানো হচ্ছে।"

বড়-গিন্নী বলিলেন, "তোরা না হয় থাক।"

সকলের কথাই এক সুরে বাঁধা। নিজের নিজের সামান্য স্বচ্ছন্দ আরামের নিশ্বাস কতক্ষণে মিলিবে, সকলেরই মনে সেই কথাটি জাগিয়াছে।

এমন সময় বিন্দু আসিল—মেজ-গিন্নী তাহাকে বলিলেন, "ঘরদোর খালি পড়ে আছে—কাজ কর্ম্ম রয়েছে, এবার আমরা যেতে চাই।"

বিন্দু বলিয়া গেল, "আচ্ছা আমি বলছি মাকে।"

বড়-গিন্নী বলিলেন, "করুণা অত করে কাপড়খানা আনালে, তাকে পরতে দেখলাম না ?"

মেজ-গিন্নী বলিলেন "পরবে—এখুনি কি হয়েছে, সবে ত দু'বার কাপড় ছাড়া দেখলে—রাত অবধি থাকলে আরও দেখবে কত বার।"

"হ্যাঁ, যত কাপড় তত গয়না। ঐটুকু মেয়ে—অত যে গয়না গড়িয়েছেন—বছর না ঘুরতেই ছোট হয়ে যাবে না ?"

"এ কি তোমার আমার মত ? একটি বৌ—সবই তার।"

"তা খুব কম করে দশহাজার টাকার গয়না হবে—যেমন হীরে জ্বলছে, চোখ ঝলসে যায়, কাপড়ই এক একখানা কি—শুনেছি ফরমাস দিয়ে আনা, কেনা নয়।"

"হ্যাঁ, উমারা বলছিল না তখন ? আনন্দের ঠাকুমা আনন্দের মার জন্যে ঐ জরদা সাড়ীটি—যেটা পরেছিলেন, ঐটে আনিয়েছেন, লাল কি গোলাপী উনি পরতে চান না, সেইজন্যে। সীতা-হারটার পরেন না বলে একটা নতুন চেন-হারও করেছেন, তা সেটা দেখলাম না।"

"তা দেবেন বৈ কি, এক ছেলের এক বৌ—তাও বৌয়ের মত বৌ, শাশুড়ীর কাছে যেন কচি বউটি, খুব বড় ঘরের মেয়ে কি না, তেমনি চলন।"

রুক্মিণী পর্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিয়া অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠিলেন, "আপনারা চলে যেতে চাইছেন ? শুভ-রাত্রের মিষ্টিমুখ না করে যেতে দিচ্ছিনে, কেন যাবেন ? কি হয়েছে ?"

বড়-গিন্নী বলিলেন, "কিছু হয় নি মা, অনেকক্ষণ এসেছি—রইলামও অনেকক্ষণ। কাজকর্ম্ম রয়েছে, ঘরে সন্ধ্যা পড়বে না।"

এ একটা কথা বটে, গৃহস্থ-ঘরে সন্ধ্যায় আলো জ্বলিবে না—সেটা হইতেই পারে না। দুঃখিত হইয়া রুক্মিণী বলিলেন—"আমি আশা করেছিলাম থাকবেন—তবে মাকে বলি গে।"

দুয়ার পর্য্যন্ত গিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "করুণা কিন্তু বাদ।"

করুণা ভয় পাইয়া উঠিয়া বসিল—"সে কি দিদি আমায় ফেলে যাবে ? আমি চলে যাবার জন্যে কখন থেকে ভাবছি।"

মেজ-গিন্নী বলিলেন, "তোর কথা আলাদা, তোকে রাখতেই পারেন জোর করে। তুই যদি এখন যাস, লক্ষ্মণ কাঁদবে।"

"না, একা আমি কিছুতেই থাকব না—তোমরা যদি থাক, রাত অবধি না হয় থাকবো।"

দুই গিন্নী পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন—মেজ-গিন্নী থাকিবেন।

সুধীরা বলিল, "আমিও থাক্‌ব।"

বড়-গিন্নী ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তুই যদি রইলি আমিও না হয়—।"

মেজ-গিন্নী বলিলেন, "সেই ভাল, ওরা আমাদের ঘরে আলো দেবে।"

খবর আসিল গাড়ী তৈয়ারী।

করুণা, দুই গিন্নী এবং তিনটি মেয়ে ছাড়া অন্য সকলে বিদায় লইল। রুক্মিণী তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পরে বড়-গিন্নীরা মন্দির দেখিয়া বাগান ঘুরিয়া উঠিলেন ছাদে। ছাদে একটি মাত্র ঘর—ঘরটির উপর বিরাট আকারের দুইটি দংষ্ট্রা-বিকশিত পাথরের সিংহমূর্ত্তি—সোজা দাঁড়াইয়া ভীষণ ভঙ্গীতে মিত্রবাড়ীর উদ্দেশে চাহিয়া আছে। মিত্রবাড়ীর ছাদেও দুইটি বন্দুকধারী পাথরের সৈনিক এই দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া—তবে এতদূর হইতে রাত্রে দেখা যায় না। সিংহ দুইটির পায়ের কাছে বৃহৎ একটা বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলিতেছে—এটি বহুদূর হইতে দেখা যায়—ছোট তারার মত। বাড়ীর চারিদিকে আলোর আলোময়—যেন দিনের বেলা। রূপার সাজ-পরা লালা ও রঞ্জন মন্দ মন্দ গর্ব্বিত পা ফেলিয়া বেড়াইয়া ফিরিতেছে—তাহাদের গলায় ছোট ছোট ঘণ্টার তালে তালে টুং টাং শব্দ হইতেছে।

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া চারিদিকের উৎসব-মুখর দৃশ্য দেখিয়া নামিবার সময় দেখা গেল, তেতালার ঘরটিতে প্রদীপ জ্বলিতেছে, বিন্দু বলিল, "যাবেন না, পিসী জপে বসেছেন।"

বড়-গিন্নী বলিলেন, "উনি এখানে থাকেন ?"

"না, গোলমাল সইতে পারে না, তাই এখানে রয়েছে।"

জানালার পথে জানকীকে দেখা গেল, শুভ্রা তপস্বিনী মূর্ত্তি—বই খুলিয়া বসিয়াছে, রুক্ষ চুল বাতাসে দুলিতেছে।

কৈকেয়ী একবার নিজের শয়নঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন,

তাঁহার বিছানার পাশে নিজের বিছানায় আনন্দ শুইয়া আছে, বলিলেন, "সে কি রে—তুই এখানে যে?"

উদাসীন ভাবে আনন্দ জবাব দিল, "কোথা যাব তবে?"

"কেন তোর নিজের ঘরে?"

"এই ত আমার ঘর"—আনন্দ নিশ্চিন্ত ভাবে পাশ ফিরিল।

চঞ্চল বাতাসের মত প্রতিমা আসিয়া বলিল, "মা গো মা, কোথায় না খুঁজতে বাকী রেখেছি, কখন ফুলশয্যা হবে?"

"যাঃ বিরক্ত করিস নে।"

"কি মজার কথা গো! দিদি বলুন না, আমাদের যোগাড় হয়ে গেছে।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "যাও মানিক, শুভ কাজের নিয়ম কি না মানলে চলে?"

"যাচ্ছি, কিন্তু এইখানে এসে শোব।"

হাসিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "তোর ঘর ঠিক করে দিয়েছি, আর এখানে থাকতে হবে না।"

"তবে আমি যাব না।"

প্রমাদ গণিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "আজকার রাত্রিটা অন্ততঃ থাকগে, কাল থেকে এখানে থেকো।"

আনন্দ চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

"আর দুষ্টুমি করতে নেই, ওঠ দাদামণি, রাত হয়ে যাচ্ছে।" আদর করিয়া কৈকেয়ী আনন্দকে ধরিয়া তুলিলেন। প্রতিমার উপর একটা তীব্র চাহনি হানিয়া আনন্দ উঠিল। "ওঃ ভয়ে মরে গেলাম আর কি? চল আগে সাজ-পোষাক করে নেবে"—বলিয়া প্রতিমা আনন্দের হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।

আনন্দের নূতন শয়নঘরে ফুলশয্যার আয়োজন। ঘরের দেওয়ালে হাল্কা গোলাপীর সঙ্গে একটু কমলা রঙ করা। দেওয়ালের উপর দিকে সবুজ রঙের লতায় লাল ফুল। আলো জ্বলিতেছে চারি দেওয়ালে চারিটি, তার মধ্যে দুটি আলোর রঙ লাল এবং শাঁখের মত প্যাঁচ দেওয়া। মেজে জুড়িয়া লাল গোলাপী ফুল তোলা পুরু গালিচা, গালিচার মাঝখানে বিয়ের নূতন পাটীতে সুদেষ্ণা বসিয়া আছে। ঘুম-জড়ানো চোখ, মাথাটি একটু নীচু, গোলাপী রেশমের জরির ফুলপাড় সাড়ী পরা। মুকুট হইতে সমস্ত গহনার হীরাগুলিতে বিজলীর আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সুদেষ্ণার সামনে ফুলশয্যার জিনিসপত্র। গালিচার উপরে মেয়েরা বসিয়া আছে আনন্দের অপেক্ষায়। তাঁদের সামনে পানের থালা।

ঘরের এক দিকে নূতন মেহগ্নি খাট, পুরু বিছানায় গোলাপী রেশমী কভার, মশারিতে গোলাপী রেশমী ঝালর, লাল ও গোলাপী ফুলের মালা খাটের ছত্রী হইতে ঝুলিতেছে এবং রেলিংয়ে দুলিতেছে, বিছানায় ফুল ছড়ানো, মাথার বালিশের উপর কুণ্ডলাকার মালা, দরজায় গোলাপী রেশমের পর্দা, চারিদিক গোলাপে গোলাপময়; যেন ফুলের রাণী গোলেবকাওয়ালীর ঘর।

ঘরের অপর দিকের দেওয়ালে চওড়া ফ্রেম-আঁটা একখানা মানুষ-সমান আয়না। খাট, বিছানা, গালিচায় মেয়েদের বসিবার ভঙ্গী, হাত-মুখ নাড়া, হাসি, সজ্জিতা সুদেষ্ণা—সমস্ত দৃশ্য সেই আয়নায় সুন্দর ফুটিয়াছে।

প্রতিমা আনন্দকে লইয়া ঘরে ঢুকিল।

শুভ রাতের রাত্রি, লাল গোলাপের জয় জয়কার! আনন্দের মুখে রাগ, বিরক্তির ভাব, চুলগুলি একটু রুক্ষ, একটু এলোমেলো, এটা তার ফ্যাশন, কিংবা হয় তো প্রতিমার উপর রাগ করিয়া। জরিপেড়ে হাল্কা বেগুনী রঙের রেশমী ধুতি, হাল্কা গোলাপী রঙের চাদরে জরির সরু পাড় ও ছোট ছোট জরির ফুল তোলা। চাদরটি গায়ে জড়ানো। গলায় মুক্তার মালা, আবার একটি সরু সোনার হার। বাঁ-হাতে বাজুবন্ধের আকারে একটি বড় এনগ্রেভ করা কবচ বিছায় আটকানো, পায়ে জরির কাজকরা লাল ভেলভেটের জুতা।

এয়োরা উঠিয়া দাঁড়াইল। একজন আনন্দকে সুদেষ্ণার ডান দিকে বসাইল, একজন এক খানা থালা সামনে রাখিল, প্রতিমা ও উমা সেরা এয়ো, তাহারা ব্যস্ত ভাবে কাজে লাগিয়া গেল। উমা বলিল, "দাদা, থালার উপর পা রাখ।"

প্রতিমা ডাবের জলভরা রূপার বাটী সুদেষ্ণার হাতে দিয়া বলিল, "ধর বৌদি, এই জলে দাদার পা ধুইয়ে দাও।"

সুদেষ্ণা বাটীর জল আনন্দের পায়ে ঢালিল, "থাক থাক আর না—চুল দিয়ে মোছাতে হয়, তা আঁচল দিয়ে মুছে দাও।"

সুদেষ্ণা নিজের আঁচলাদার আঁচলটি দিয়া আনন্দের পা মুছাইতে সুরু করিবামাত্র আনন্দ পা টানিয়া লইল।

"এই নাও মিষ্টি, এই নাও সরবৎ, দাদাকে দাও।"

সুদেষ্ণা রেকাবী ও গ্লাসটা আনন্দের সামনে রাখিল—আনন্দ গ্লাসটা একবার মুখে তুলিল, রেকাবীটা ঠেলিয়া সরাইয়া দিল।

প্রতিমা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "মিষ্টি খেলে না? বৌদির হাতের প্রথম মিষ্টি, আচ্ছা বেশ, মজা বুঝবে নিজেই, বৌদি বড় হয়ে যখন আচ্ছা ঝাল ঝাড়বে।"

আনন্দ মুখ ভারী করিয়া বসিয়া রহিল, জবাব দিল না।

মেজ-গিন্নী বলিলেন, "থাক সরবৎ খেয়েছে, সেও তো মিষ্টি।"

"নাও ভাই বৌদি, ডিবে খুলে দাদাকে পান দাও।"

সুদেষ্ণা ডিবাটি আনন্দের সামনে ধরিল, আনন্দ একটি পান তুলিয়া গাঁথা গোলাপ-পাপড়িটা খুলিয়া ফেলিয়া মুখে পুরিল।

প্রতিমা বলিল, "বৌদি, ঐ পা-ধোয়া জল তোমার একটু খেতে হবে, হাত পাত আমি ঢেলে দি—দাদারই দেবার কথা—তা উনি কি কথা শুনবেন?"

উমা সুদেষ্ণার হাতখানি পাতিয়া ধরিল, প্রতিমা সেই অঞ্জলিতে আনন্দের পা-ধোয়া জল একটু ঢালিয়া দিল।

"এবার দাদার প্রসাদ খেতে হয়—সরবৎ একটু রাখতে বলতে ভুলে গেছি। দেখি,—না আছে অর্দ্ধেকটা, এইটে খাও। দাদা, এবার বৌদিকে পান দাও—তুমি নিজে হাতে করে।"

আনন্দ নিশ্চল নির্ব্বাক্। একটু অপেক্ষা করিয়া প্রতিমা বলিল, "উমা তুই দে বৌদিকে পান, দাদার বড্ড বাড় বেড়েছে।"

এয়োরা দু'টি রূপার বড় বড় থালা পিছন দিক্ হইতে সামনে আনিয়া রাখিল। একটিতে মোটা মোটা দু'টি গোলাপ ফুলের মালা, অপরটিতে লাল, গোলাপী ও সাদা ফুলের গহনা।

বড় মালাটি তুলিয়া লইয়া প্রতিমা বলিল, "বৌদি, এই মালা তুমি দাদার গলায় পরিয়ে দাও।"

করুণার শিক্ষা দেওয়া সার্থক, উপদেশ দেওয়া সার্থক, সে অবাক্ হইয়া বসিয়া বসিয়া দেখিতেছে—শান্ত নম্র নীরব সুদেষ্ণা কেমন কলের পুতুলের মত প্রতিমার কথা শুনিতেছে। দুই হাতে মালাটি ধরিয়া উঁচু হইয়া সে আনন্দের গলায় পরাইয়া দিল।

আয়নায় সে ছবি সুন্দর ফুটিয়া উঠিল। ঘর ভরিয়া হাসির রোল উঠিল। সুনীলা হাসিতে হাসিতে গালিচার উপর গড়াইয়া পড়িল। প্রতিমাও হাসিয়া বলিল, "বৌদি, বড্ড লক্ষ্মী মেয়ে, নামেও লক্ষ্মী কাজেও লক্ষ্মী।"

সুখদা বলিল, "লক্ষ্মী বই কি, ছোট্টটি না হলে কি বিয়েতে আমোদ হয়? ধেড়ে মেয়ে হত যদি গোঁ ধরে বসে থাকত, কিছুতে কি কথা শুনত?"

উমা বলিল, "তা সত্যি, দাদা যদি বড় হয়ে বিয়ে করতে—তবে আর দিদি এমন সব গয়না পোষাক তৈরি করাতেন না—এমন মানাতও না, কি বল দাদা?"

আনন্দ সকোপে উমার দিকে চাহিল।

"থাক থাক, উমাকে আর ভস্ম করে কাজ নেই। বেচারীর সবে বিয়ে হয়েছে। নাও, এই গয়নাগুলো বৌদিকে পরিয়ে দাও, আগে মালা পরাও।"

দ্বিতীয় মালাটা প্রতিমা আনন্দের হাতের উপর দিল, আনন্দ ধরিল না, মালাটা আনন্দের পায়ের উপর পড়িল।

"ও কি ছেলেমানুষি! বৌদি সব করলে, আর যত আপত্তি তোমার। ও রকম করতে আছে? গয়না না হয় আমরা পরাচ্ছি, মালা ত পরাতে পারি নে? ধর, নাও।"

ফুলের গহনাগুলি সুদেষ্ণার হাতে, বাহুতে, মাথায়, গলায় পরাইয়া দিয়া মালাটি তুলিয়া আবার প্রতিমা আনন্দের সামনে ধরিল।

প্রতিমার উপর একটা জলন্ত চাহনি ফেলিয়া বাঁ-হাতে মালাটি ধরিয়া আনন্দ সুদেষ্ণার দিকে এক রকম ছুড়িয়াই ফেলিল, ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিল না।

আনন্দের ঘুম-জড়ান চোখ ও রাগ-রাগ মুখ দেখিয়া করুণার মন মায়ায় ভরিয়া গিয়াছে—এই অভিমানী বালকটি যেন সুবলেরই বড় ভাই। রাজবধূ সুদেষ্ণাকে মনে হইতেছে নাগালের বাহিরে—আবার আনন্দের উপর পড়িয়াছে তীব্র স্নেহের টান।

"বৌদি, এবার ভাই দাদাকে একটা প্রণাম কর, তাহলে তোমরাও বাঁচ, আমরাও বাঁচি, দাদা ত আমার মুণ্ডপাত করছে !"

সুদেষ্ণা মাথা নীচু করিতে না করিতে আনন্দ পা সরাইতে গেল, অমনি সুদেষ্ণার কপালে আনন্দের পা লাগিয়া অর্দ্ধ পথেই প্রণামটা গেল সারা হইয়া !

মেয়েরা সমস্বরে উলু দিলেন। প্রতিমা বলিল, "বড্ড তোমার বাড়াবাড়ি, কেন বাপু, ওবেলা তুমি যা যা দিলে বৌদি সব নিলে; এবেলা তুমি নিলে বৌদির অন্নবস্ত্রের ভার, জীবনটার ভার, এ বেলা বৌদি নিলে তোমার সেবা-যত্নের ভার। বৌদির কাজ বৌদি ভাল করেই করলে, তুমিই করলে না; সেবার ভার ত তোমার, তা তুমি না দিলে পান, না মিষ্টি, মজা বোঝাবে বৌদি ভাল করে এর পরে, জেনো তখন প্রতিমার কথা।"

আনন্দ অত্যন্ত রুষ্ট ভাবে মৃদু ও কঠোর স্বরে বলিল, "আর কিছু বাকী আছে ?"

"না"—বলিয়া সুদেষ্ণার হাত ধরিয়া প্রতিমা বিছানার কাছে লইয়া গেল, "কেমন ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, এবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড় বৌদি—"

সুদেষ্ণা প্রতিমার হাত চাপিয়া ধরিল, বিছানায় উঠিল না। প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

"আমি এখানে শোব না"—বলিয়া সুদেষ্ণা সরিয়া গিয়া করুণার আঁচল ধরিল।

প্রতিমা বলিল, "কি রকম হবে তবে ?"

জিজ্ঞাসা করিল করুণাকেই, কিন্তু করুণার সাধ্য কি যে জবাব দেয়, কি বলিবে খুঁজিয়াই পাইল না। উমা বলিল, "দিদিকে জিজ্ঞাসা করে আয়।"

প্রতিমা ছুটিয়া গেল। করুণা মৃদুস্বরে বলিল, "হ্যাঁ রে শুবিনে এখানে ? দেখ দেখি কি সুন্দর বিছানা।"

সুদেষ্ণা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "হোকগে আমি কাল যেখানে ছিলাম, সেইখানে থাকব, আজ তুমি আমার কাছে থাকবে না ?"

প্রতিমা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি বললেন, তাঁর কাছেই থাকবে। এবার আমরা চলুম দাদা, জীবন আসছে মেজের শোবে। বীর পুরুষ, দোর বন্ধ করো না, আজ একা থাকতে নেই।"

ঘর নির্জ্জন হইলে আনন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ বেশ মন দিয়া নিজেকে দেখিতে দেখিতে বিরক্তিটা কাটিয়া গিয়া মুখে ফুটিল হাসি। চাদরটা গালিচার উপর ফেলিয়া একটা লাল আলো ছাড়া আর সব বাতি নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। হাত পা ছড়াইয়া একটু আরাম করিয়া লইয়া আপন মনে বলিল, "কে না কে এমন বিছানাটার অর্দ্ধেকটা জুড়ে থাকত আর আমি ভয়ে জড় সড় হয়ে এক কোণে পড়ে থাকতাম, আপদ গেছে না বেঁচেছি ! এবার দিব্যি আরামে ঘুমানো যাবে।"

রামানুজ লক্ষ্মণ

কৈকেয়ী বলিলেন, "বৌমা, করুণাও যাচ্ছে ? পরশু সুদেষ্ণার সঙ্গে ত এলই না, যদি বা এবেলা নেমন্তন্ন রাখতে এল এখুনি যেতে চাইছে ? এ'কদিন থেকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না ?"

"না মা, বিনোদের অসুবিধে হবে, ইস্কুল আছে।"

"ক দিন বেশী ছুটি নেয়নি ?"

"না।"

"তা চলবে একরকম করে।"

"কি করে চলবে মা, নিজে রেঁধে খেয়ে ইস্কুল করতে হবে যে ?"

"সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।"

"না মা, করুণা থাকবেই না, কাকা সব বলেছেন তো আপনাকে।"

কৈকেয়ী ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কিছু বলিলেন না।

রুক্মিণী সকলকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেলেন, করুণাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "মা তুমি যা দিয়েছ আমাদের, তার তুলনা নেই।"

করুণা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, "সে আপনাদেরই।"

উপরে উঠিতে সিঁড়ির মাথায় কৈকেয়ীর সঙ্গে দেখা হইল, কৈকেয়ী বলিলেন, "বৌমা এবার তুমি যাও, কেশবের মাথা

ধরেছে, আর খোঁজ নিতে পারি নি, সব ত মিটে গেছে, যেটুকু বাকী আছে সুখদা দেখবে এখন।"

কৈকেয়ীর সাদা ধব্‌ধবে বিছানায় সুদেষ্ণা ঘুমাইয়া আছে, তাহার ফুলের গহনার সৌরভে, মাথার চন্দন তেলের সৌরভে ঘরের বাতাস গন্ধমধুর। বিন্দু রহিয়াছে পাহারা।

এতক্ষণে জানকী নামিয়া আসিল, কৈকেয়ীর পিছনে দাঁড়াইয়া বলিল, "কি দেখছ মা?"

"দেখ ঠিক যেন লক্ষ্মীটি, না?"

"লক্ষ্মী?" জানকী বিছানার কাছে সরিয়া আসিল, "-আমি দেখছি সাক্ষাৎ লক্ষ্মণ, কে এমন মিলিয়ে নাম রেখেছে মা? ঠিক যে রামানুজ লক্ষ্মণ। আমাদের দেশের রামলীলার কথা মনে নেই তোমার? ঠিক এতটুকু, এমনি সাজ, এমনি কপালে চন্দন, এমনি কালো চুলের বাবরি, তা তুমি কি সারারাত বসে ওকে দেখবে না কি? নিয়ে এখন পুরাণ ঠাণ্ডা করে শোও।"

কৈকেয়ী একটি একটি করিয়া সুদেষ্ণার গা হইতে সাবধানে জড়োয়া গহনাগুলি খুলিয়া লইলেন, বিন্দু সেগুলি আলমারীতে তুলিয়া রাখিল, কাঁধের ব্রোচ খুলিয়া জামাটিও খুলিয়া দিলেন, বলিলেন, "ঘুমিয়ে অজ্ঞান! গয়না ফুটে ফুটে কচি গায়ে কত দাগ পড়েছে, তোরা খুলে নে, চরণপদ্ম থাক।"

বিন্দু সুদেষ্ণার আলতা-পরা পা দুটি হইতে তোড়া খুলিয়া লইল। একটা বড় মাটীর প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরের এক কোণে পিলসুজের উপর বসাইয়া রাখিয়া বিজলী বাতিগুলি নিভাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বিছানায় শুইয়া কৈকেয়ী সুদেষ্ণাকে ধীরে ধীরে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। বিবাহ-রাত্রিটা তাহার কাটিয়াছে বাসর-ঘরে—উমা, প্রতিমা ও এয়োদের কাছে। কাল-রাত্রিটা কৈকেয়ীর কাছে—আজও সে তাঁহারই কাছে। ম্লান আলোকে সুদেষ্ণার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কৈকেয়ীর চোখে জল আসিল—আহা, নীড়হারা পাখী কেমন নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে!

সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া সুদেষ্ণা দেখে ঘরে তাহার শাশুড়ী, ননদ, এয়োরা সবাই আছে—নাই কেবল করুণা। প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদি কই?"

"তারা রাত্রিরেই চলে গেছে।"

সুদেষ্ণার মুখ মলিন হইয়া গেল—প্রতিমা বলিল, "ও কি—ও কি বৌদি, তুমি মুখ ভার করোনা বাপু! দিদি আমাদের আস্ত রাখবেন না তা হলে—"

সুদেষ্ণা মুখ নীচু করিয়া রহিল। প্রতিমা বলিল, "তবে চললাম—যাঁর সঙ্গে তোমার শুভরাত্রি কাটল—তাঁকেই ডেকে আনি, না হইলে তোমায় বোঝাবে কে?"

রুক্মিণী জিভ কাটিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

উমা বলিল, "প্রতির মুখে আগল নেই—ও দিদিকে যেমন করে বলে।"

সুখদা মস্ত নথটি দুলাইয়া বলিল, "সাম্‌নে বল, তবে বুঝি।"

রুক্মিণী বধূকে কোলে টানিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি তোমার কেমন দুটি ননদ—এদের সঙ্গে মনের সুখে থাক,—আর ত মোটে পাঁচটা দিন—তার পরই বৌদির কাছে যাবে?"

"কিচ্ছু না—মাসীমা, তুমি কিচ্ছু ভেব না—আমরা সব ঠিক করে নিচ্ছি দু'মিনিটে। তার পর দেখবে তোমার বৌটি সারা বাড়ী কেমন মাথায় করে তোলে—ইস্তক পুকুরপাড়ের গাছ অবধি চড়ে বস্‌বে।"

প্রতিমার কথায় সুদেষ্ণার মুখে হাসি দেখা দিল, লজ্জা পাইয়া সে রুক্মিণীর কোলে মুখ লুকাইল।

রাত্রি আটটা—কৈকেয়ী বসিবার ঘরের বিছানায় শুইয়া আছেন, বৈকালে সিঁড়ি উঠিতে হঠাৎ পা মচ্‌কাইয়া গিয়াছে—ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে ব্যথাটাও হইয়া উঠিল

মেঝেয় নূতন বৌ সখীদের সঙ্গে পুতুল খেলিতেছে—নূতন-পাওয়া নানা আকারের ছোট-বড় পুতুল। সেগুলির কোনোটা যোদ্ধা সাজিয়া কাঠের ঘোড়ায় চড়িয়াছে, কোনোটা বা বৌ হইয়া ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত।

সুখদা মুখ বাড়াইয়া উঁকি দিল, কৈকেয়ী বলিলেন, "তুই আবার এলি কেন? বৌমা ত হাতে পায়ে ধরে আমায় ঘরে রেখে গেল, এই কি শুয়ে থাকবার দিন? বৌমা একা কি করবে? তুই যা তার কাছে।"

"আমায় পাঠিয়ে দিলে তুমি ঘুমিয়েছ না কি দেখতে।"

একটু পরে রুক্মিণী একটা ছোট কলাই-করা বাটি হাতে করিয়া তুলিয়া কৈকেয়ীর পায়ের কাছে বসিলেন। কৈকেয়ী বলিলেন, "ও কি?"

"একটু গরম তেল—আরো দু'একটা কিছু মিশিয়ে এনেছি—বড্ড ফুলে উঠেছে যে—বললে তো শুনবেন না।"

"কি তেল?"

"তা বললে ফল হবে না—পরে বলব।"

আস্তে আস্তে রুক্মিণী কৈকেয়ীর পীড়িত পায়ে মালিশ আরম্ভ করিলেন,—আরাম পাইয়া কৈকেয়ী চোখ বুজিলেন।

একটু পরে বলিলেন, "তুমি কেন এলে—আর কাউকে পাঠালেই হ'ত—ওদিকে কি না জানি হচ্ছে।"

"কিছু হচ্ছে না মা, আজ ত বেশী কাজ নেই।"

"ঠাকুর-পোর বাড়ীর বারকোশগুলো সাজিয়ে দিলে কে?"

"আমি দিয়ে এলাম।"

"অতিথ-শালে যারা সিধে চেয়েছিল, তারা রান্না চড়িয়েছে কি না খবর নিয়েছ?"

"হাঁ, রান্না করবে না—সিধে নেয় নি, প্রসাদ পাবে।"

"কেশব কোথায়?"

"লিখছেন।"

"আনন্দ?"

"বাগানে বেড়াচ্ছে।"

কৈকেয়ী চোখ চাহিয়া বলিলেন, "বাগানে? এই রাত্রে? গায়ে-হলুদের গন্ধ যায় নি, অষ্টমঙ্গলা গেল না,—বিন্দু শীগ্‌গির জীবনকে গিয়ে বল আনন্দকে ডেকে আসুক। বাড়ীতে জায়গা নেই—গেছেন বাগানে, আমার পা পড়ে তার পা বড্ড বেড়েছে।"

বিন্দু চলিয়া গেল। কৈকেয়ী বলিলেন, "তুমিও নিশ্চিন্ত রয়েছ, আমাকেও শুইয়ে রেখেছ।"

"ওতে কি হয় মা? ভালমন্দ ভগবানের হাতে।"

"আত্মরক্ষার বুদ্ধিও তিনিই মানুষকে দিয়েছেন"—বলিয়া একটু বিরক্তভাবে কৈকেয়ী পাশ ফিরিলেন।

ঘণ্টা দেড়েক পরে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল—বিন্দু এক কড়াই গন্‌গনে আগুনে ফ্লানেল গরম করিয়া দিতেছে, রুক্মিণী তাঁহার পায়ে সেক দিতেছেন। ব্যথা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে—জ্বর-জ্বর ভাবটাও আর নাই।

"এখনও বসে আছ বৌমা? তোমার হাত ধরে গেল যে?"

"হাত ধরবে কেন, এ-কি জোরের কাজ মা?"

"থাক, আর না, তুমি যাও এইবার ওদিকের খবর নাওগে।"

[ক্রমশঃ

'ম্লেচ্ছ' কাহারা?

…সংস্কৃত ভাষায়, যাঁহারা শব্দ-বিজ্ঞানের পদ্ধতি পালন না করিয়া যথেচ্ছভাবে শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে 'ম্লেচ্ছ' বলা হয়। এতদনুসারে আধুনিক মুসলমান ও খৃষ্টান পণ্ডিতগণকে 'ম্লেচ্ছ' বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রাচীন সময়ে মুসলমান ও খৃষ্টান পণ্ডিতগণ এমন ছিলেন যে, তাঁহাদিগকেও সংস্কৃত ভাষানুসারে ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারিত না। সংস্কৃত ভাষা মানিয়া চলিলে, শুধু যে আধুনিক মুসলমান ও খৃষ্টান পণ্ডিতগণকেই ম্লেচ্ছ বলিতে হয় তাহা নহে, আধুনিক হিন্দু-'পণ্ডিত'গণকেও 'ম্লেচ্ছ' বলিতে হয়, কারণ ইহাঁরাও শব্দ বিজ্ঞানের পদ্ধতি পরিজ্ঞাত নহেন এবং শব্দের অর্থ গ্রহণ করিতে ও উহা পালন করিতে পারেন না এবং করেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এতাদৃশ ম্লেচ্ছগণ আজ বাংলার হিন্দুসমাজের ঋষি-ধর্ম্ম পালনের এবং সংস্কৃত শিক্ষার কর্ণধার হইতে চাহেন। মানুষ আর কত কাল মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে? মনুষ্য সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত যে আজ টলটলায়মান!…

ওঁ শান্তি !



[প্রকাশ যে, ১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর মাসে দেয় নোবেল শান্তি-পুরস্কার বিতরণ আগামী বৎসরের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিল]।

সভ্যতা—প্রতীচ্য ও প্রাচ্য

—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আজকাল আমরা কথায় কথায় সভ্যতার দোহাই দেই। এই শব্দটা যেন সাহিত্যিক গীতের ধুয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধ হইতেছে কেন? 'সভ্যতা' রক্ষার জন্ম। দেশজয় করা হইতেছে কেন? সভ্যতা-বিস্তারের জন্ম। মাইন ফাটিতেছে, তরী ডুবিতেছে কেন? সভ্যতার কেরামতি দেখাইবার জন্ম। কামান গর্জ্জিতেছে এবং রণ-বিমান উড়িতেছে কেন? সভ্যতার জয়-ঘোষণার জন্ম। সমাজ-সংস্কারের এত হুল্লোড় কেন? সভ্যতার মর্ম্ম বুঝাইবার জন্ম। সভ্যতা শব্দটি এখন রাজার দরবার হইতে গরিবের পর্ণ-কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সকল কাজের কথায় ব্যবহৃত হইতেছে। সভ্যতা বেচারীকে এখন সকল কাজের দায়িত্ব বহন করিতে হইতেছে। সকল রচনায়, সকল সাহিত্যে, সকল বক্তৃতায় এবং সকল গবেষণায় সভ্যতা-শব্দটিকে 'চৌদ্দ শাকের মধ্যে গুল পরামাণিকে'র মত বিরাজ করিতে হইতেছে। অথচ সভ্যতা জিনিষটা কি, উহার স্বরূপই বা কি তাহা অনেকেই বুঝেন না। অনেকে উহা জানিতে চাহিলেও উহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না। এ-পর্য্যন্ত ঐ জিনিষটার বা ভাবটার সংজ্ঞা কেহই ঠিকমত নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন তাহা মনে হয় না। আমাদের দেশে এখন সভ্যতা শব্দটি যে-অর্থে চলিত রহিয়াছে, তাহা মুক্তি-ফৌজের মহিলাদিগের মত বাঙ্গালার শাড়ী পরা বিলাতী মেমের মত ইংরাজী civilization শব্দটির বঙ্গানুবাদ। সভ্যতা শব্দটি বাঙ্গালা বটে, কিন্তু উহার লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা—দুইটিই বিলাতী civilization শব্দেরই নিজস্ব। এখন এই শব্দটি যে অর্থে চলিয়া গিয়াছে, আমি সেই অর্থেই উহাকে গ্রহণ করিব। পাকা 'গুটি' আর 'কাঁচাইবা'র চেষ্টা করিব না।

এখন দেখা যাউক, civilization শব্দের অর্থটা কি? উহার অর্থ বর্ব্বরতা পরিহারপূর্ব্বক প্রগতির পথে প্রধাবিত মনুষ্য-সমাজের এক একটি দশা বা অবস্থানের ভাব মাত্র। প্রগতির সুদীর্ঘ যাত্রা-পথে সকল মানব-সমাজ সমান অগ্রসর নহে,—প্রত্যেক সমাজ কিছু কিছু অগ্রসর হইয়া যেন বিভিন্ন স্থানের পান্থ-নিবাসে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, অথবা চলিতে চলিতে বিভিন্ন 'মাইলষ্টোনে'র নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। সেই জন্ম সকলের সভ্যতা এক নহে। গ্রীসের সভ্যতা এবং ব্যাবিলোনিয়ার সভ্যতা এক ছিল না। কালডিয়ার সভ্যতা এবং চীনের সভ্যতা সমান নহে। উহার রূপগত ভেদ আছে,—তাহা হইলেও উহারা অল্প-বিস্তর সভ্য। কেহ অসভ্য বা বর্ব্বর নহেন। কোন সমাজই আদিম যুগের বা ইতিহাসের উষাকালের মানব-সমাজের মত নহে—সকলেই সভ্যতার অনন্তানুসারী পথের গতিশীল যাত্রী। সকলেই আদিম যুগের বর্ব্বরতাকে অল্প বিস্তর পরিহার করিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, সেই জন্ম সকলেই অল্প-বিস্তর সভ্য।

এখন জিজ্ঞাস্য, আদিম যুগের বর্ব্বরতা কি ছিল? উহার উত্তরে পাশ্চাত্যখণ্ডের পণ্ডিতেরা বলেন যে, মানুষ যখন ক্ষুদ্র প্রাণী হইতে ক্রম-বিবর্ত্তনের নিয়মের বশে স্বীয় দৈহিক আকৃতিতে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল, তখন সে পশুবৎই বনে বনে বিচরণ করিত, তখন তাহার যে মানসিক এবং ব্যবহারিক অবস্থা ছিল, তাহা পশু হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল। তখন তাহার চেষ্টার বিষয় ছিল আহার, নিদ্রা এবং মৈথুন। মন ছিল হিংস্র এবং কোপন। তখনকার মানুষের বিচার-বুদ্ধির এবং চিন্তা-শক্তির ক্ষীণ উন্মেষও হইয়াছিল কি না সন্দেহ। স্বভাবতঃ তাহাদের প্রকৃতিতে চিন্তা-শক্তি এবং বিচার-বুদ্ধির বীজ উপ্ত ছিল, তাহা না থাকিলে তাহাদের ঐ শক্তি বিকশিত হইল কিরূপে। প্রকৃতি যাহা দেন নাই, তাহার বিকাশ হইতে পারে না। সেই জন্ম তির্য্যক্ প্রাণীরা নানা অবস্থায় পড়িয়াও বিচার-বুদ্ধির এবং চিন্তা-শক্তির পরিচয় দিতে পারে নাই। সৃষ্টির আদিকাল হইতে তাহারা প্রায় একই ভাবে আছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, মানুষ যখন গৌড়ায় বন্যভাবাপন্ন ছিল, অর্থাৎ বন্য পশুর ন্যায় তাহারা জীবন যাপন করিত, তখন তাহাদের অবস্থা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা বলা বড় কঠিন—

কারণ ঠিক সে-অবস্থায় মানুষ কেহ দেখেন নাই। সকলেই সভ্যতার পথে একটু না একটু অগ্রসর মানুষ দেখিয়াছেন। সবাই অল্প-বিস্তর সমাজবদ্ধ। নিতান্ত অসভ্য মানুষ বনে বনে বানর বা গরিলার মত নারী লইয়া বিচরণ করিত। কোন স্থানে স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূলের অভাব ঘটিলে তাহাকে চিন্তিত করিয়া তুলিত। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাদের ভিতর চিন্তা-শক্তির বীজ নিহিত ছিল, বুদ্ধিরও কিছু উন্মেষ ছিল। সেই জন্য তাহার সমান অবস্থায় পতিত পশু অপেক্ষা তাহার মনে চিন্তার কিছু প্রাবল্য নিহিত ছিল। কাজেই সে সর্ব্বাগ্রে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য কোন অনুকূল স্থানে যাইত। অন্যত্র যাইলে অন্য মানুষের সহিত স্থান লইয়া তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইত। যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাহাকে চিন্তিত হইতে হইত। সে চিন্তার দৌড় খুব অধিক ছিল না। প্রায় পশুদিগের মতই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তবে তাহাদের অন্তর্নিহিত চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি ছিল বিকাশী বা প্রস্ফুরণ-শীল। আদিম মানুষ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে যে চিন্তা-শক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্চালন করিতে থাকে, তাহার ফলে সে কাল-সহকারে উন্নতি-পথের সন্ধান পায়। স্বাভাবিক অস্ত্র-সম্বলশূন্য অবস্থায় মানুষ আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে করিতে অনুশীলন-ফলে চিন্তা-শক্তির এবং বুদ্ধি-বৃত্তির উন্মেষ ঘটাইতে থাকে। সে তখন ক্রমশঃ আত্মরক্ষার জন্য লাঠি, পাথরের অস্ত্র, তীর, ধনুক প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া তাহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। অবশ্য সে পুরুষ-পরম্পরাক্রমে ধীরে ধীরে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মতে এইরূপ অবস্থার চাপে পড়িয়া আদি যুগের মানুষ শেষে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখে। ফলে অবস্থার প্রতিকূলতার পরিহারের চিন্তাই মানুষের উদ্ভাবনী-বুদ্ধির বিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে সভ্যতার পথ ধরাইয়া দেয়। অমঙ্গল হইতে যে মঙ্গলের উদ্ভব ঘটে—ইহা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। আদি হইতেই বুদ্ধির বিকাশই সভ্যতার প্রবর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। ফলে সভ্যতা সম্পূর্ণ মানস ব্যাপার—অন্য কোন প্রাণীর বুদ্ধির তাদৃশ বিকাশ হয় না বলিয়া তাহারা একই ভাবে রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু চিন্তা-শক্তির এবং বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ হইলেই কেবলমাত্র উদ্ভাবনী প্রতিভার স্ফুরণ হয় না, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মানস-বৃত্তিও স্ফুরিত হইতে থাকে। কারণ তাহারা পরস্পর অনুবন্ধী (co-related)। অতএব চিন্তা-শক্তির ও বিচার-বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে হ্লাদিনী-বৃত্তিগুলি (aesthetic faculties) স্ফূর্ত্তি পায়। তাহার হৃদয়ের পশুতুল্য যৌন লালসার প্রান্তভাগ যেন একটু প্রেমের স্পন্দনে নাচিয়া উঠে, মন ধীরে ধীরে সৌন্দর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। বন-বিহঙ্গের ঐক্যতান সঙ্গীত তাহার হৃদয়ে আচম্বিতে আনন্দের ঝঙ্কার তুলে। সে একদিন প্রভাতে গিরিকন্দর হইতে বাহির হইয়া সুদূর দিক্‌চক্রবালের কোলে উদীয়মান ভানুর জবাকুসুম-সঙ্কাশ শোভা দেখিয়াই মুগ্ধ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মনে যেন পরম সুন্দরের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি উদ্ভূত হয়। তৎপূর্ব্বে সে হয় ত বহুদিন ভাস্করের ভাস্বর সৌন্দর্য্য দেখিয়াছে, কিন্তু সে তাহা উপভোগ করিতে পারে নাই ; কারণ এতদিন তাহার সামর্থ্য জন্মে নাই। সে বৃক-ব্যাঘ্রের ন্যায় অথবা উলুক-ভল্লুকের ন্যায় উহা উপেক্ষা করিয়াই চলিয়া গিয়াছে। যে প্রতিকূল অবস্থার কঠোর কশাঘাত তাহার চিন্তা-শক্তি এবং বিচার-বুদ্ধি সন্ধুক্ষিত করিয়া দিয়াছিল, তাহা তাহার নব জন্মলাভের বেদনাস্বরূপই হইয়াছিল। তাহার দেহের বিকাশ রুদ্ধ হইয়া মনের বিকাশ ঘটিতে থাকিল। সে তখন হইতে ক্রমশঃ উদীয়মান তপনে এবং জ্বালামালী দাবাগ্নিতে একটা অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া তাহারই নিকট মাথা নোয়ায়। তখন তাহার মানস সরোবরে প্রকৃতির নব নব সন্ধুক্ষণী শক্তির প্রভাবে নব নব স্বর্ণকমল ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। সে নবজীবনের সূতিকাগারে উপস্থিত হইয়াছে এবং নিজ অক্ষমতায় বা অসম্পূর্ণতায় বেদনায় আকুল হইয়া ক্রন্দনে সেই সূতিকা-গৃহ মুখরিত করিতেছে। তাহার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনে অপরিচ্ছিন্ন মহাপ্রকৃতির সত্তাজ্ঞানের অতি ক্ষীণ ছায়া হয়ত পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় তাহা ধারণা করিতে পারে না, তাই সে বিশ্বের সমস্ত গৌরবময় বস্তুতে একটা পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যময়ী সত্তা অনুভব করে। সভ্যতার সূতিকাগারে শায়িত সেই সদ্যোজাত শিশু নিজ জননীকে না দেখিয়া ধাত্রীমাতাকে ধরিয়া যেন নিজ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছে। পুত্র-শোকাতুরা রমণীর মর্ম্মান্তিক রোদনে সে ক্রমশঃ বিষাদ-সঙ্গীতের মর্ম্মান্তিকতা অনুভব করিতে থাকে। তাহার মন

হানুভূতির স্বর্গীয় পীযূষধারায় সিক্ত হইয়া উঠে। সেই হানুভূতিই ক্রমে সহস্র-বাহু জননীর ন্যায় তাহার পশু-যূথের ায় গোষ্ঠীগত দলকে মানব সমাজ-ধর্ম্মের দিকে চালিত করে। ানব সমাজের সকল উচ্চ উপভোগ্য বস্তু ও ব্যাপার লাভ করিবার জন্য তাহার নবজীবনের জয়যাত্রা ক্রমশঃ আরম্ভ হয়। আজ সভ্যতার উচ্চ পদবীতে আরূঢ় মানবজাতি ব্যষ্টি এবং মষ্টি ভাবে যে সম্পদ্ লাভ করিয়াছে, ইহাই হইল তাহার োড়ার কথা। অর্থাৎ যখন জীবের দৈহিক ক্রমবিকাশ দ্ধ হইয়া যায় এবং মানস ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয় তখনই সেই ক্রমবিকাশের মোড় ঘুরিয়া যাইয়া যে-অবস্থা উপস্থিত য় তাহাই হইতেছে "সভ্যতা"। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা লেন সভ্যতা কৃত্রিম; ইহা মানুষের চিন্তার এবং শিক্ষার ফল। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া মানুষ স্বীয় চেষ্টার ফলে এবং বুদ্ধির বলে ইহা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহা প্রকৃতির ান নহে।* পাশ্চাত্ত্য বিবর্ত্তনবাদীদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, ানুষের মানস ভাব হইতেই সভ্যতার প্রেরণা আসে।† হার মূলকেন্দ্র হইতেছে মানুষের মন; তবে বাহিরের অবস্থা ভেদে ইহার নানা রূপ আছে। এক কথায় মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভের ফলে নিজ সম্পদের য-বিস্তার সাধন করিয়াছে এবং তাহা ভোগের যে-অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাই হইল পাশ্চাত্ত্য মতে "সভ্যতা"।

প্রতীচ্য, বিশেষতঃ ভারতীয় মত ইহা হইতে সম্পূর্ণ প্রভিন্ন। আর্য মতে এই বিশ্ব মহাপ্রকৃতি হইতে উদ্ভূতা হাপ্রকৃতি পরমাত্মার শক্তি। সুতরাং এই বিশ্বের কোন স্তুই আত্মিক শক্তি হইতে বিযুক্ত নহে। মহাপ্রকৃতি ইতে নিঃসৃত মহাজ্বালামালিনী নীহারিকাও চৈতন্যশক্তি ইতে বিচ্ছিন্ন নহে। সুতরাং জীবোৎপত্তির বীজ উহাতেও প্ত আছে। তাহার পর যখন ধরা জীবধারণের উপযুক্ত ইয়া উঠিল, তখন এই ধরণীবক্ষে প্রথমে স্থাবর তৎপরে লজ জীব, তৎপরে উভচর সরীসৃপ (কূর্ম্মাদি), পরে পক্ষী ৎপরে পশু এবং ক্রমশঃ বানর এবং মানুষ পর্য্যন্ত বিবর্দ্ধিত হইয়াছে। মানুষ আবার প্রকৃতির ক্রোড়ে থাকিয়া ক্রমশঃ জ্ঞানের, বিচারের এবং ধর্ম্ম ও সৌন্দর্যভোগের অধিকারী হইয়াছে। তবে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, জীব-সকল অবস্থার চাপে পড়িয়া পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে দৈহিক উন্নতি লাভ করে, কিন্তু হিন্দুরা বলেন যে, জীবাত্মা প্রথমে অতি নিম্ন স্তরের স্থাবর যোনিতে (উদ্ভিদ্ রূপে) জন্মে এবং কর্ম্ম দ্বারা জাড্য পরিহার পূর্ব্বক ক্রমশঃ যেমন কিছু কিছু আত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন করে, তেমনই জন্মান্তরে তাহার পর পর বিকশিত আত্মশক্তির অনুযায়ী দেহ সে গঠন করিয়া লয় বা প্রকৃতি তাহাকে গঠন করিয়া দেন। ঐতরেয় উপনিষদেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। একই জীবাত্মা জন্ম ও মরণের মধ্য দিয়াই ক্রমশঃ উচ্চস্তরের প্রাণীতে উন্নীত হইতে থাকে। তির্য্যক্ প্রাণীরা জন্ম এবং মরণের ভিতর দিয়া অদৃষ্টবশে এবং প্রকৃতির প্রেরণায় ক্রমশঃ ৮৪ লক্ষ জীবদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যদেহ পায়।* এ পর্য্যন্ত সে প্রকৃতির নির্দ্দেশেই (instinct) কার্য্য করে। তাহার পর সে নরদেহ ধরে। নরদেহ ধরিয়াও সে কিছুদিন প্রকৃতির নির্দ্দেশে চলে। শেষে যখন তাহার বিচার-বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়, তখন সে ক্রমশঃ কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা ধীরে ধীরে পাইতে থাকে এবং নিজ কর্ম্মফলের অধিকারী হয়। জীব যতদিন পূর্ণ মাত্রায় প্রকৃতি কর্ত্তৃক চালিত হয়, ততদিন সে নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় না। সেই জন্য তাহার ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি অব্যাহত থাকে। কিন্তু সে যখন মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে, তখন প্রকৃতি তাহাকে চিন্তাশক্তির ও বিচারবুদ্ধির বীজ দিয়া তাহাকে কর্ম্মদ্বারা আত্মোন্নতি করিবার স্বাধীনতা দিয়া থাকেন। সে তখন নিজ কর্ম্মের দ্বারা আত্মোন্নতি করিবার স্বাধীনতা পায়। প্রথমে করুণাময়ী প্রকৃতি সেই আদিম কালীন শৈশবাবস্থায় মানুষকে মাতৃবৎ পালন করিয়া কয়েক জন্ম তাহার সেই চিন্তা-শক্তির এবং বিচারবুদ্ধির স্ফূর্ত্তি-সাধনের জন্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি তাহার মনে হ্লাদিনী বৃত্তির

* Civilization comes of reflection and education. Civilization is artificial.—*Clive Bell*

† It is in the mind of man that we must seek the cause and origin of civilization.—*Clive Bell*

* বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ যথা :—
"স্থাবরং বিংশতির্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।"
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ।
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাং চ চতুর্লক্ষং তু বানরাঃ। ইত্যাদি

এবং শক্তির কতকটা বিকাশ করিয়া দেন। সে যদি ধর্ম্মবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া চলে, তবে তাহার ক্রমোন্নতি ঘটে। অন্যথা তাহার অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সাংখ্যকারিকায় বলা হইয়াছে—"ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ ভবত্যধর্ম্মেণ।" ধর্ম্মদ্বারা ঊর্দ্ধগতি এবং অধর্ম্মদ্বারা অধোগতি ঘটে। ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হয়। এই ধর্ম্ম বলিলে কেবল মাত্র তপ-জপ, উপাসনা বুঝায় না। যাহার দ্বারা জীবের প্রকৃত মঙ্গল এবং উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। তপ-জপ প্রভৃতি ধর্ম্মের একটা অংশ বটে, কিন্তু উহা ধর্ম্মের সবটাই নহে। ধর্ম্মের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যদ্দ্বারা সেই লক্ষণগুলি লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যথা ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ। মানুষের কার্য্যকলাপ যখন এই কয়টি বিষয় অধিগত হইয়াছে—ইহা প্রকাশ করে, তখন বুঝিতে হইবে সে ব্যক্তি ধর্ম্মপথে আরূঢ় হইয়াছে। যখন সেই মানব পদবীতে আরূঢ় বনচর আদিম মানবের মনে ধীরে ধীরে ধারণাশক্তি (ধৃতি), ক্ষমা (অপকারীকে উপেক্ষা), দম (উদ্দাম মনের অসংযত গতি-নিবৃত্তি), শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ (একাদশ ইন্দ্রিয়কে আয়ত্ত করা), ধী (বুদ্ধি-শক্তি) বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য (কায়, মন এবং বাক্যে যথার্থভাব), এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ প্রস্ফুরিত হয়। বলা বাহুল্য এই লক্ষণগুলি ধর্ম্মের পরিণতি অবস্থায় সম্পূর্ণ বিকশিত হয়। কিন্তু আদিম অবস্থায় মানুষ যখন ধর্ম্মপথে কেবল পাদক্ষেপ করে, তখন তাহার যে ধৃতি বা ধারণাশক্তি প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারা সে কেবল মাত্র তাহার অতীত অভিজ্ঞতা স্মরণ করিবার শক্তিলাভ করে। সে যে-কাজ করিয়া একবার বিপদে পড়িয়াছে সে-কাজ আর করিতে যায় না। সেইরূপ যখন সেই সভ্যতাপথে সবেমাত্র আরূঢ় মানব প্রকৃতির অনন্ত গৌরবে স্তম্ভিত হইয়া যত্র তত্র একটা দেবতার কল্পনা করিয়া বসে, ঝোপে ঝোপে ভূত দেখে, তখন বুঝিতে হইবে প্রকৃতি দেবী তাহাকে আধ্যাত্মিকতার প্রথম পাঠ দিয়াছেন। সে তখন বিশ্বাধিদেবতার বিশ্বরূপ খণ্ডিতভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। ইহা তাহার অধ্যাত্মবিজ্ঞান শিক্ষার 'হাতে খড়ি'। সে প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট জ্ঞান (instinct) দ্বারা চালিত হইয়া এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। প্রকৃতি তাহাকে ঠেকাইয়া অনেক বিষয় শিক্ষা দেন। তখন তাহার সভ্যতার পথে প্রথম পাদক্ষেপ হয়, ইহাই হিন্দুর কথা।

আমরা আজকাল যাহাকে সভ্যতা বলি প্রাচীন হিন্দুরা তাহাকে সামাজিক অভ্যুদয় বলিতেন। অভ্যুদয় অর্থে উন্নতি বা মঙ্গল। মনুষ্য-সমাজ যখন পশুভাব পরিহার করিয়া মনুষ্যভাবের দিকে গতি করিতে থাকে, তখনই হয় তাহার মানস অভ্যুদয়ের আরম্ভ। ইহা ক্রমবিকাশের একটা নূতন পর্য্যায় মাত্র। মানব-সমাজের এই ক্রমবিকাশশীল অবস্থাই সভ্যতা। আর্য্যমতে কর্ম্ম বা সাত্ত্বিকতাই সভ্যতাকে উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। পশুতে সাত্ত্বিকতা নাম মাত্র বীজাকারে থাকে। সেই জন্য জীবাত্মা যতদিন পশুদেহে নিবদ্ধ থাকে তত দিন তাহার মানসিক উন্নতি ঘটে না। সে রজস্তমঃ গুণে বদ্ধ থাকিয়া স্বীয় অবস্থায় থাকিয়া যায়। সাত্ত্বিকতার উন্মেষক্ষণেই মানুষ সভ্যতার পথ ধরে। জীবাত্মার ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হইয়া যখন তাহার মানস ক্রমবিকাশের ফলে তাহাতে সাত্ত্বিক ভাব দেখা দেয়, তখন সে সভ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে সে তখন অভ্যুদয়ের পথ ধরিয়াছে।

এখন উভয় মত আলোচনা করিয়া বুঝা গেল যে, সভ্যতার মূল কেন্দ্র মানুষের মনে। মনে সাত্ত্বিক ভাব অঙ্কুরিত হইলেই সে হয় সভ্য। এখন উভয় মতের পার্থক্য কোথায় তাহাই দেখা যাক। প্রাচ্য বা আর্য্যমতে জীবাত্মার ক্রমবিকাশ হয় ক্রমশঃ জাড্য (তমোগুণ) পরিহার দ্বারা। প্রকৃতির বা প্রাকৃত শক্তির নির্দ্দেশে জীবাত্মা ক্রমে কর্ম্ম দ্বারা নিজ নিজ তমোগুণের ক্ষয় এবং রজোগুণের উপচয় করিয়া ক্রমশঃ জন্ম-মরণের ভিতর দিয়া নিজ নিজ দেহের বিকাশ সাধন করে। সে কর্ম্ম করে প্রকৃতির কঠোর শাসনাধীনে। জ্ঞানকৃত কর্ম্মের দ্বারা সে নিজ উন্নতিসাধন করিতে পারে না। কারণ সে অজ্ঞান। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পুরুষানুক্রমে জীবদেহের ক্রমোন্নতি ঘটে। তাঁহারা পশুর আত্মা স্বীকার করেন না। জীবের দেহ ক্ষয়েই জীবাত্মার বিনাশ ঘটে বটে, কিন্তু কাল-স্রোতে ভাসমান জীব প্রতিবেশ প্রভাবে বংশধারা-ক্রমে ভিন্ন জীবে পরিণত হয়। এই পাশ্চাত্য মত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। ইহা অভিব্যক্তি বাদ (theory of evolution)

নামে অভিহিত। এখনও সকলে এ-মত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। বর্ত্তমান যুগের অভিব্যক্তিবাদের বিশিষ্ট সমর্থক অধ্যাপক হেকেলও একস্থানে বলিয়াছেন : বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ক্রমবিকাশবাদ,—বিশেষতঃ ডারউইনের মত—ভ্রান্ত ; উহার সমর্থন করা যায় না।*

উক্ত মতের কোন মতই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান এই ধরাতলে জীবের আবির্ভাব কি করিয়া হইল, তাহা বলিতে পারেন না। আর্য মত এই বিশ্বে চৈতন্যশক্তি সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃ হইয়া রহিয়াছে বলেন। তবে সেটা যোগগম্য জ্ঞান দ্বারা বুঝা যায়। ফলে ক্রমবিকাশের ধারা যখন দৈহিক বিকাশের ধারা হইতে মোড় ঘুরিয়া মানসিক বিকাশের ধারা ধরে, তখন মানুষ সভ্য হইতে থাকে। য়ুরোপীয় সভ্যতা চিন্তাশক্তির, বুদ্ধি-বৃত্তির এবং হ্লাদিনী বৃত্তিগুলির বিকাশ সাধনে রত হইয়াছেন ; মনের দিকটারই অনুশীলন এবং বিকাশ সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা সভ্যতার লক্ষ্য ভোগ। হ্লাদিনী বৃত্তিগুলির বিকাশ সাধনে তাঁহারা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে এবং সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বুদ্ধি-বিকাশের দ্বারা জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতেছেন। কিন্তু হৃদয়বৃত্তির তাদৃশ উন্নতিসাধনে সমর্থ হইতেছেন না। তাহার ফলে তাঁহারা বোমা, বিষবাষ্প, টর্পেডো প্রভৃতি উদ্ভাবিত করিয়া মানবজাতির সংহার করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে আজ নিখিল য়ুরোপে নরককুণ্ড জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে দোষ দিতেছেন, ধর্ম্মের দৃষ্টিতে, ন্যায়ের দৃষ্টিতে দোষ যে কাহার কম, তাহা বুঝা কঠিন। রুশিয়া কর্ত্তৃক ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণে ইতালী নৈতিক ক্রোধ প্রকটিত করিতেছেন, কিন্তু ইতালীই সে-দিন নিতান্ত নির্ম্মম ভাবে আবিসিনিয়া গ্রাস করিয়াছেন। ধর্ম্মজ্ঞান বা হৃদয়ের উন্নতির অভাবই এই শোচনীয় পরিণামের কারণ।

পক্ষান্তরে ভারতীয় মতে, যখন ক্রমবিকাশের ধারা মোড় ফিরিয়া দৈহিক বিকাশের দিক্ হইতে মানসিক বিকাশের দিকে গতি করিয়াছে, তখন হইতে তাঁহারা হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনে অধিক অবহিত হইয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মকেই ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গলের নিদান বলিয়াছেন।* তাঁহারা বলেন ধর্ম্মের উপরই এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মই ঐহিক মঙ্গলের পরিপন্থী সমস্ত প্রতিকূল শক্তিকে প্রতিহত করেন। ধর্ম্ম দ্বারা ধৃত হইয়াই সমস্ত স্থাবরজঙ্গম বস্তু আত্মসত্তা রক্ষা করিতেছে, সেই জন্য ধর্ম্মই সকলের উপর।† এখানে বলা বাহুল্য, ধর্ম্ম বলিতে কেবল উপাসনা (religion) বুঝায় না। যে প্রাকৃতিক শক্তি মানুষকে সুস্থ রাখে তাহাই ধর্ম্ম। উপাসনা হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন। উহা ধর্ম্মের সবটাই নহে। তাই বলিয়া উপাসনা উপেক্ষণীয় নহে। ভারতীয় সভ্যতায় কেবল উপাসনাই প্রধান ছিল না। উহাতে বুদ্ধি-বৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি এবং ইচ্ছাশক্তির যথেষ্ট স্ফুরণ করা হইয়াছিল। এখন উভয় সভ্যতার পার্থক্য কোথায় তাহা বলা হইল। অন্যান্য কথা পরে বলা হইবে।

* "Most modern investigators of science have come to the conclusion that the doctrine of evolution, and particularly Darwinism is an error and cannot be maintained."

অধিকন্তু টাউনসেণ্ডের *Collapse of Evolution* এবং ম্যাক্‌ক্যানের *God or Gorrilla* দেখুন।

* যতো অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সঃ সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ—বৈশেষিক দর্শন।

† ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মেণ পাপং নুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।—বেদো শ্রুতঃ

গীতা বলিতে কি বুঝি ?

..."পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করা।" পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে দেখা "চক্ষু"র কার্য্য, আর ঐ বস্তুসমূহকে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করা "অনুভবশক্তি"র কার্য্য। কাজেই, কেন আমরা পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে চক্ষু ও অনুভব-শক্তির মধ্যে যে কি সম্বন্ধ তাহা উপলব্ধি করিতে হয়। "গীতা" বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় সেই অনুভূতিমূলক কার্য্যকে, যে অনুভূতিমূলক কার্য্যের দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে চক্ষু ও অনুভব-শক্তির মধ্যে যে কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।...

ইন্দ্রাণীর পাখী

—শ্রীরজত সেন

অবিনাশকে দূরে যেতে হল। ইন্দ্রাণীর সংসার পাখীর কলরবে মুখরিত হয়ে উঠল। অবিনাশের ব্যবধান পেল বৃদ্ধি। মফস্বলের এক ছোট সহরের প্রান্তে অবিনাশ ইন্দ্রাণীর স্বপ্ন দেখে: ইন্দ্রাণী অলস মধ্যাহ্নে খাঁচা-বন্দী পাখীগুলার সস্নেহ পরিচর্য্যা করে; সুন্দর, কমনীয় হাতে দূর করে দেয় খাঁচার মলিনতা; তার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে একাগ্রতা, দেহের শিথিলতা হয়ে ওঠে কঠিন।

পিত্রালয়ে প্রেমের অভাবে পাখীরা হয়ে উঠেছিল তার প্রিয়, যথাসময়ে এল প্রেম, আকাশে আর শোনা গেল না পাখীদের পাখার স্পন্দন। বাড়ীর আশে পাশে গাছের শাখায় কত আশ্চর্য্য সুন্দর পাখী গান গেয়ে উঠেছে, কিন্তু ইন্দ্রাণীর মনোবীণার তারে সে সুর তখন ঝঙ্কার দেয় নি।

তারপর প্রেমের পরে এল প্রশান্তি, গাছে ফুল ফুটল অনেক, কিন্তু দেখা দিল না ফল। ইন্দ্রাণীর ঐকান্তিকতা, অবিনাশের মনোযোগ, তার মায়ের জপ-তপ এবং দান-ধ্যান কিছুতেই কোন ফল হল না, ইন্দ্রাণী সন্তানবতী হবার কোন লক্ষণই দেখালে না। শ্বশ্রূমাতা দোষারোপ করিলেন, 'অপয়া', অবিনাশের বহু-সন্তান-পীড়িতা ভগিনী বললে, 'অযোগ্যা'।

সন্তান ইন্দ্রাণী আশা করেছিল; সে আহত হল, হল ক্ষুব্ধ; হঠাৎ যেন সে পরিচিত পথ থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল। সৌন্দর্য্য তার কাছে ম্লান, বিবর্ণ হয়ে এল; আসক্তিতে শিথিল হয়ে এল আকর্ষণ। পাখীর অবস্থিতি সম্বন্ধে সে সচেতন হল। আকাশের পাখীরা খাঁচায় এসে উড়তে ভুলে গেল। অবিনাশের জামার বোতাম ভাঙ্গাই রইল, পকেটে ছেঁড়া রুমাল, ধোপায় হারাল জামা; ইন্দ্রাণী তৈরী করছে খাঁচার একটা আবরণ, শীত আসছে, পাখী-গুলার ঠাণ্ডা লাগবে।

একটা পাখীওয়ালার সঙ্গে ইন্দ্রাণীর দরদস্তুর ঠিক হয়ে গেছে। দুপুরে ঝি-চাকর যখন বাড়ী থাকবে না, অবিনাশের ছোট ভাই যখন কলেজ যাবে আর অবিনাশের মা যখন রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমে আচ্ছন্ন, ঠিক সেই সময় পাখীওয়ালা আসবে তার নানা রকম আশ্চর্য্য পাখী নিয়ে। অবিনাশের এক সপ্তাহে তৃতীয় পত্র অপঠিত অবস্থায় ড্রেসিং টেবলে পড়ে আছে।

"এরই মধ্যে তোমার খাওয়া হয়ে গেল বৌমা?"—মা জিজ্ঞেস করলেন।"

মুখ ধুতে ধুতে ইন্দ্রাণী চমকে উঠল, মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে সে বললে, "অনেকক্ষণ ত বসেছি!"

ইন্দ্রাণীর স্বাস্থ্যের প্রতি তিনি যত্নশীলা তার কারণ ইন্দ্রাণী তাঁর সন্তানের স্ত্রী, মেয়ে হিসাবে তাঁর মনে ইন্দ্রাণীর জন্যে অনুকম্পা ছিল না। পুত্রের অবর্ত্তমানে ইন্দ্রাণী তাঁর কাছে গচ্ছিত, তাই তার এতটুকু ক্ষয় যোগমায়ার সহ্য হয় না। তা ছাড়া, এর মধ্যেই তিনি হাল ছাড়তে পারেন না, ইন্দ্রাণী বয়সে তরুণী, এখনও আশা আছে। আহারের প্রতি অস্বাভাবিক অবহেলা তিনি কয়েক দিন লক্ষ্য করে আসছেন। "অনেকক্ষণ বসেছ মানে? এই ত গেলে দেখলাম, দু'মিনিটও হয় নি।"

"মেয়ে মানুষের খেতে আবার কতক্ষণ লাগে?"—ইন্দ্রাণী হাল্কা সুরে বললে।

"কতক্ষণ লাগে, সে এই বুড়ো বয়সে আর তুমি শিখিও না।"

ইন্দ্রাণী শক্ত হয়ে দাঁড়াল, যোগমায়া তাকে যে ভাল চোখে দেখেন না সেটা তার অবিদিত নয়। "শেখাবার না-শেখাবার কি হল এখানে?"—সংযত কণ্ঠেই সে উত্তর দিলে, "যতক্ষণ খেতে লাগে ততক্ষণই বসেছিলাম, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকের নিজের একটা স্বাধীন ইচ্ছা আছে।"

সকাল থেকেই তার মনের আকাশে আশ্চর্য্য পাখীরা সব উড়ে যাচ্ছে; তাদের সোনালী পালক, তারা রূপালী কণ্ঠে গান গায়। সে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে তাদের, আদর করবে, ভাবতে ভাবতে ইন্দ্রাণীর নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসছিল। সময়ের ব্যবধান যতই হ্রাস হতে লাগল ততই আনন্দে আর

উত্তেজনায় সে অস্থির হয়ে উঠল। খেতে বসে কি যে খেয়েছে, সে নিজেই জানে না, হয় ত কিছুই খায় নি।

যোগমায়া শুধু আজ নয় গত কয়েক সপ্তাহ থেকেই পুত্রবধূর ভাবগতিক লক্ষ্য করে আসছেন। আজ আর তাই কিছু না বলে তিনি থাকতে পারলেন না। তিনি ভেবেছিলেন ইন্দ্রাণী তার অপরাধ স্বীকার করে আহারসম্বন্ধে মনোযোগী হবার প্রতিশ্রুতি দেবে, কিন্তু ঠিক বিপরীত দেখে তিনি রেগে গেলেন। "শুধু খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কেন, সব ব্যাপারেই দেখছি, তুমি আজকাল স্বাধীন হয়ে উঠছ! এমন ত তুমি ছিলে না কখনও?"

"ছিলাম, সব সময়েই ছিলাম!"—ইন্দ্রাণী বেশ জোর গলাতেই বললে, "শুধু আপনারাই বদলে যাচ্ছেন দিন দিন। আমার যা ভাল লাগে তাই আমি করব! পাখী নিয়ে কতদিন আপনি আমায় খোঁটা দিয়েছেন, ঠাট্টা করেছেন, গালাগালি দিয়েছেন, কেন শোনাবেন আমায় কথা? পাখীগুলোকে আপনি উড়িয়ে দিচ্ছিলেন, এ হিংসা ছাড়া আর কি?"

যোগমায়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হয়ে গেলেন; ইন্দ্রাণীর কথায় যে এত ধার আছে, সেটা তিনি কখনও জানতেন না, তারা যে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতে পারে এ তিনি বিশ্বাস করতেন না কখনও। তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হলেন, তর্কের খেই ফেললেন হারিয়ে, প্রায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, "তোমাকে হিংসা করব আমি? তুমি আমার পায়ের যোগ্যও নও, তা তুমি জান?" যোগমায়া রোগা লোক, অসুখে ভুগে ভুগে স্বাস্থ্যহীনা, রাগে আর অপমানে তিনি শুক্‌নো পাতার মত কাঁপছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রাণীও হারবার পাত্রী নয়, সে হঠাৎ যোগমায়ার দিকে রুদ্ধ আক্রোশে এগিয়ে গেল, প্রায় মুখের ওপর একটা আঙুল তুলে বললে, "খবরদার! মুখ সামলে কথা কইবেন, আপনাদের বাড়ীতে ভিখিরী আসি নি!"

"কি! আমি মুখ সামলে কথা কইব!" যেন হঠাৎ মেঘ গর্জ্জে উঠল, "আমাকে চোখ রাঙানি, তেড়ে আসা? আমার মুখের ওপর আঙুল তুলে কথা বলা? আমি—" তিনি আর সামলাতে পারলেন না, ছোট মেয়ের মত কেঁদে উঠলেন, তার পর ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলেন।

যাক! ইন্দ্রাণী বাঁচল হাঁফ ছেড়ে। যোগমায়া না গেলে তাকেই স্থানত্যাগ করতে হত, ঝগড়া করবার সময় তার নেই। এখনও পড়ে আছে তার কত কাজ। আজ তার খাঁচা পরিষ্কার করবার দিন। পাখীগুলোকে স্নান করাতে পারে নি অনেক দিন। বারান্দায় ভারি অসুবিধে। গোলমালে যোগমায়ার আহ্নিকের না কি অসুবিধে হয়, দিন-রাত কিচির-মিচির। তার পর খোলা বারান্দায় পাখীগুলোর যে ঠাণ্ডা লাগে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ছাদের ওপর যে ঘরখানা সম্প্রতি খালি করা হয়েছে ইন্দ্রাণী পাখীদের নিয়ে যাবে সেখানে! চমৎকার জায়গা! সেখানে একাকী সে পাখীগুলোকে আদর করবে, খাওয়াবে আর পোষ মানাবে। আচ্ছা এমন হয় না? তারা পোষ মানলে খাঁচার দরজা সে একদিন খুলে দেবে; বন-জঙ্গল ঘুরে সন্ধ্যার সময় আবার তারা ফিরে আসবে ইন্দ্রাণীর কাছে; বেচারাদের আর খড়কুটো সংগ্রহ করে বাসা তৈরী করতে হবে না; ঐ ঘরের কোণে সে নিজেই যত্ন করে তাদের জন্তে বাসা বানিয়ে রাখবে। সে শুধু চায় পাখীগুলো তার কাছে থাকুক। ভাবতে ভাবতে ইন্দ্রাণী অন্যমনস্ক হয়ে যায়, পার্থিব বস্তুর প্রতি তার আকর্ষণ ক্রমেই কমে আসে।

বিশেষ করে সেদিন থেকে পাখীওয়ালার সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা স্থির হয়েছে সেদিন থেকে ইন্দ্রাণীকে সংসারের কোন কাজেই পাওয়া যায় না। যোগমায়া ভেবেছিলেন অবিনাশের জন্তে পুত্রবধূর মন বিরহ-কাতর। কিন্তু অবিনাশ যে তার মনের কাছেও কোথায় নেই, এটা আবিষ্কার করে তাঁর মাথা প্রায় খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম।

কালকেই তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন, অবিনাশের চিঠি সে পেয়েছে কি না।

"পেয়েছি, সে ত আপনি জানেনই।"

"জানি, তাতে হয়েছে কি? জানলে কি কোন কথা দু'বার জিজ্ঞেস করতে নেই?"

"অনাবশ্যক!" বলেই ইন্দ্রাণী অন্যত্র গিয়েছিল।

যোগমায়া পুত্রবধূর এই উদাস ভাব দেখে ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন; কিন্তু সে তখন নাগালের বাইরে।

বিকেলের দিকে তাঁর ক্রোধ প্রায় উপশম হয়ে এসেছিল, তিনি সাহসী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। "চিঠির উত্তর দিয়েছ?"

"সময় মত দেওয়া যাবে," সব ব্যাপারে যোগমায়ার অনাবশ্যক মাথা-ঘামান ইন্দ্রাণী মোটেই পছন্দ করে না।

"সময় তোমার কখনও হবে কি না—সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

"না হলেই বা কি এসে যায়?" ইন্দ্রাণী জবাব না দিয়ে পারে নি। "আমি স্ত্রীর আসন থেকে এক ধাপ নীচে নামব না। চিঠির জবাব না দিলেই আমার ভালবাসা কমে গেছে এটা প্রমাণ হয় না।"

ইন্দ্রাণীর মেজাজ দেখে তাঁর সুর নরম হয়ে এসেছিল, "তোমার ভালবাসা কমেছে কি বেড়েছে", যোগমায়া বলেছিলেন, "এটা প্রমাণ করবার জন্য মোটেই আমি ব্যস্ত হই নি, ছেলেটা গেছে বিদেশে, একেবারে একা আছে, নিয়মমত তোমার চিঠি-পত্র পেলে কাজ-কর্মে উৎসাহ পেত।"

যত দিন যাচ্ছে ততই ইন্দ্রাণীর এই প্রায়-বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে সহ্য করা মুস্কিল হয়ে উঠছে। তার দাম্পত্য-জীবনের প্রথম দিকে যোগমায়ার অনাবশ্যক আধিপত্য তার প্রায় ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু হতাশ হবার পাত্রী সে কখনও ছিল না, নিজে সে তাঁর প্রভাব ত কাটিয়ে উঠেই ছিল, অবিনাশকেও সে চেয়েছিল, তাদের প্রেম যেন মাতৃবন্ধন থেকে মুক্তি পায়। অবশেষে একদিন যোগমায়াকে তা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়েছিল।

কিন্তু তবু যোগমায়ার সান্ত্বনা ছিল; তিনি দূরে থাকুন, এ দুটি নর-নারীর ভালবাসা নিবিড় হয়ে উঠুক, অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাক তারা পরস্পরের নিকট। কিন্তু তাঁর বিস্মিত হবার দিন সম্পূর্ণ গত হয় নি, তিনি একদিন বুঝতে পারলেন, ইন্দ্রাণীর মনোরাজ্য থেকে শুধু তিনি নিজে নন অবিনাশও আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে, অনেক দূরে। তাদের ব্যবধানের বিস্তৃতি দেখে তিনি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তার পর অবিনাশকে দূরে যেতে হল। তিনি অনুরোধ করেছিলেন, সে যেন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যায়। নূতন জায়গায় অগোছাল সংসারের নানা বিশৃঙ্খলার মধ্যে ইন্দ্রাণীর কষ্ট হবে মনে করে অবিনাশ রাজী হয় নি। ইন্দ্রাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল

তার পর পাখী! ভেবেই পেলেন না, কেমন করে পুত্রবধূকে নিরস্ত করা যায়। তিনি রাগান্বিত হলেন, বাক্যালাপ বন্ধ করলেন, তাঁর সম্মুখে অবিনাশকে জাগিয়ে রাখবার যথেষ্ট প্রয়াস পেলেন। কিন্তু একজন বয়স্কা, বুদ্ধিমতী মেয়ে কেমন করে এই ছেলেমানুষী ব্যাপারে এমন করে মেতে উঠতে পারে, এ তিনি ভেবে পেলেন না। অবশ্য ইন্দ্রাণী যে তাঁর অগোচরে পাখীওয়ালাকে বাড়ীতে আসতে বলেছে, এ-বিষয়ে তিনি কোনই সংবাদ রাখেন না।

ছাদের ঘরখানা দেখতে দেখতে পাখীদের আস্তানা হয়ে উঠল। নানা রকমের পাখী দিন-রাত কিচির-মিচির করে, ইন্দ্রাণী দূরে দাঁড়িয়ে সে-শব্দ শোনে আর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। লোহার তার খাটিয়ে তাতে সে খাঁচাগুলো ঝুলিয়েছে, দিন-রাত তাদের তদারক করে, দানা খাওয়ায়, জল বদলে দেয়; কোন খাঁচার কাছে গিয়ে কোনটিকে বা আদর করে ডাকে, তাদের সঙ্গে কথা বলে, নানা কথা। স্নান-আহারের সময় যায় অতীত হয়ে, যোগমায়া ক্ষেপে যান, কিন্তু ইন্দ্রাণীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

ব্রত-পার্ব্বণ উপলক্ষে যোগমায়া প্রায়ই উপবাস করেন। উপবাসের পরদিন শ্রান্তির দরুণ তিনি আর রান্না করেন না, ইন্দ্রাণীই সেদিন তার রান্না প্রস্তুত করে, কিন্তু ইদানীং রান্না দূরে থাক, সে যোগমায়ার ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ায় না। অভিমানে যোগমায়া পুত্রবধূর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন, কোনরকমে কষ্ট করে তাঁকেই প্রস্তুত করে নিতে হয় আহার্য্য। অবিনাশের আগমন-প্রতীক্ষা ব্যতীত আর কিছুই তাঁর করবার রইল না। অবিনাশের টান কোথায়, সেটা যোগমায়ার অজানা নেই, ইন্দ্রাণীর বদনাম করে চিঠি লিখলে সেটা খুব সু-বিবেচনার কাজ হবে না, এটা তিনি বুঝতে পারলেন। অবিনাশের জন্যে তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে ইন্দ্রাণী একদিন করল কি রাত্রে শোবার সময় খাঁচা-শুদ্ধ পাখীগুলোকে বিছানার পাশে নিয়ে এল। যোগমায়া কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন, ভাবলেন আপত্তি করবেন, কিন্তু আপত্তি তাঁর টিকবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ। ইন্দ্রাণীর স্বভাব মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়েছে, অবিনাশকে যে-কোন রকমে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে তিনি আসতে লিখেছেন, সে এসে পড়লে যদি এর কোন কিনারা হয়। মানুষের যে সংসারে কত পরিবর্ত্তন হয়, তাই তিনি রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন।

মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে দু'একটা পাখীর কিচ্ কিচ, পাখা-ঝাপটানির শব্দ শোনা যেতে লাগল। যতবার শব্দ তাঁর কানে এসে পৌঁছায়, ততবার তাঁর তন্দ্রা ভেঙে যায়, রুদ্ধ আক্রোশে তিনি ছটফট করিতে থাকেন

ইন্দ্রাণী মাঝরাত্রে উঠে পাখীদের দেখে, পর্য্যবেক্ষণ করে, পাহারা দেয়। কোথায় বাড়ীর কোন্ প্রান্তে গভীর রাত্রে একটা বিড়াল হঠাৎ বারকয়েক চেঁচিয়ে ওঠে, ইন্দ্রাণীর চট করে ঘুম ভেঙে যায়, সে বাড়ীটা পর্যবেক্ষণ করে আসে দপদপে, গোলমালে যোগমায়ার ঘুম ভেঙে যেতে পারে সেটা তার খেয়াল থাকে না। কিন্তু পাখীর নিরাপদ অবস্থিতির কাছে যোগমায়ার ঘুম-ভাঙা এমন কিছু একটা বড় জিনিষ নয়। ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক এই নিশাচর ক্ষুদ্র জন্তুটি! একবার এই সেদিন—একটা বিড়াল খাঁচা আক্রমণ করেছিল, কিন্তু ঝটপট শব্দে ইন্দ্রাণীর ঘুম ভেঙে যায়।

যোগমায়ার পাতলা ঘুম, ইন্দ্রাণীর পায়ের শব্দে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল, তিনি আতঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন। "কে?"

"আমি!"—ইন্দ্রাণী বললে।

"এত রাত্রে ভূতের মত সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?"—সাহস করে যোগমায়া জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার ইচ্ছে!" ইন্দ্রাণীর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। যোগমায়া অপমানের জ্বালায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করলেন জেগে। সামনের ছুটিতে অবিনাশ যদি বাড়ী এসে এর একটা প্রতীকার না করে, তা হলে তিনি যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবেন।

অবিনাশের চিঠিগুলো পড়ে রইল আবর্জ্জনার স্তূপে কয়েক দিনের মধ্যেই সে আসছে—কিন্তু তাতে ইন্দ্রাণীর কোন ভাবান্তর ঘটল না। আহার-নিদ্রা ভুলে সে পাখী নিয়ে মেতে রইল। স্বাস্থ্যের দীপ্তি তার ম্লান হয়ে গেল; মুখে শ্রান্তির চিহ্ন, চোখের চার পাশে অবসাদের কালো দাগ। চুলে তার তেল দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, চুলের রাশি বিবর্ণ হয়ে জট পাকিয়ে আসছে; প্রসাধনে তার মনোযোগ নেই, পরিচ্ছদে নেই পারিপাট্য। যোগমায়া ভগবৎ-প্রেমে ডুবিয়ে রাখলেন নিজেকে। ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁর একাগ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ।

তারপর—একটা লম্বা ছুটির সঙ্গে আরও কিছুদিন বাড়িয়ে অবিনাশ কলিকাতা এল।

"এ কি! তোমার শরীর এমন হয়ে গেছে কেন?" অবিনাশ অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে প্রথম-দর্শনের সম্ভাষণ-বৈচিত্র্যের উত্তেজনায় ট্রেনে সে ভাল করে ঘুমোতে পারে নি।

"কেন? বেশ ত ভাল আছি।" ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে সে উত্তর দিল। কণ্ঠে তার প্রকাশ পেল না অনুরাগ। যখনই কিছুদিন বিচ্ছেদের পর তাদের সাক্ষাৎ হয়, ইন্দ্রাণী মাথার আঁচল তুলে দিতে কখনও ভুল করে না। কিন্তু আজ বিস্রস্ত পরিচ্ছদ কোন রকম বিন্যস্ত করে নেবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ সে দেখাল না।

"মা কোথায়?"—অবিনাশ জিজ্ঞেস করলে।

"কি জানি! বোধ হয় গঙ্গা নাইতে গেছেন।"

"বোধ হয় কেন?"—অবিনাশ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "তুমি কোথায় ছিলে?"

"কোথায় আবার থাকব?"—ইন্দ্রাণীর মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠল, "এখানেই ছিলাম, ওপরে—"

"ওপরে কি?"

"পাখী।"—ইন্দ্রাণীর মুখে এক টুকরো হাসি দেখা দিল।

"পাখী?" অবিনাশের মনে ঘনিয়ে এল একটা অস্বস্তির ছায়া। সবশুদ্ধ ক'খানা চিঠি সে ইন্দ্রাণীকে লিখেছিল? চিঠিতে প্রথম সম্বোধনের শব্দটা নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তে কতদিন তার বুকে রঙের ঢেউ তুলেছে, কিন্তু পাখী দিয়ে ইন্দ্রাণী কি করে? "কি পাখী?"

"পাখী পুষেছি", ইন্দ্রাণী আহ্লাদিত কণ্ঠে বললে, "অনেকগুলো পাখী! দেখবে এস না!" এগিয়ে গেল সে সিঁড়ির কাছে—ওপরে ওঠবার জন্যে।

"কিন্তু আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দাও দেখি!" অবিনাশ সামনের সরু বারান্দায় অনেক দিনের পুরোন ইজি-চেয়ারটায় গা ঢেলে দিলে। পাখী কেন? ইন্দ্রাণীর সময় কাটে না? সবশুদ্ধ অনেকগুলো চিঠি সে লিখেছিল! ইন্দ্রাণীর যে পাখীর সখ ছিল, এটা ত কোনদিন সে বুঝতে পারে নি!

জল এল। কাঁচের গ্লাসেই সে জল গড়িয়ে এনেছে।

কিন্তু সমস্ত রাস্তাই ত সে কলের জল খেয়ে আসছে। বরফের দোকানটা কি উঠে গেছে? অবিনাশ হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিলে তাকালে একবার ইন্দ্রাণীর দিকে। ইচ্ছে হল ওকে একবার নিকটে টেনে নেয়, বুকের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রোধ এবং বিরক্তির স্রোত দোলা দিয়ে গেল তার সমস্ত রক্তে! আশ্চর্য! এই গরমে এক গ্লাস সরবৎও সে আশা করতে পারে না? আসবে সে ত পূর্ব্বেই চিঠি দিয়েছিল? বাজারে কি ডাবের দাম চড়ে গেছে?

জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে অবিনাশ বললে, "এক পয়সার বরফ আনালেই পারতে।"

"বরফ কি হবে?"

ঝন্ ঝন্ করে উঠল অবিনাশের রক্ত, কোন উত্তরই সে দিতে পারলে না; হেমন্তের সকাল এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে এল। ইন্দ্রাণী কি অসুস্থ? কোন মানসিক বিকৃতি?

"তোমার আবার পাখীর সখ কবে থেকে হল?" অবিনাশ আবহাওয়া হাল্কা করে আনবার জন্য প্রশ্ন করলে।

"কেন?" ইন্দ্রাণী ভাল করে শুনল না তার প্রশ্ন, "পাখী খুব ভাল, আমি আদর করি জান? অনেক পাখী আছে—নানা রকম, এস না দেখবে!" ইন্দ্রাণী অবিনাশের হাত ধরে তাকে চেয়ার থেকে টেনে তুললে।

ছাদে এসে অবিনাশ অবাক্ হয়ে গেল। একটা ছোট খাট চিড়িয়াখানা, নানা রকম পাখীর ভিড়।

"এত পাখী!" অবিনাশ কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হয়ে রইল "তোমার যে নেশা ধরে গেছে দেখছি!"

ইন্দ্রাণী উত্তর দিলে না, তার মনোযোগ আকৃষ্ট হল পাখীর দিকে।

"চল, নীচে যাই", অবিনাশ বললে।

ইন্দ্রাণী উত্তর দিলে না।

সিঁড়িতে যোগমায়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। তিনি স্নান করে বাড়ী ফিরেছেন। অবিনাশের বাড়ী আসবার কথা আছে বলে তিনি ভাল করে স্নান করতে পারেন নি। ওপরে উঠে এলেন তিনি। অবিনাশ চকিতে তাকালে স্ত্রীর দিকে, যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিলে। ইন্দ্রাণীর কোন ভাবান্তর ঘটল না, খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে একটা পাখীর সঙ্গে সে আলাপ করতে লাগল। আঁচলটা পর্য্যন্ত মাথায় টেনে দেবার কথা তার মনে নেই। অবিনাশ ইন্দ্রাণীর আচরণে ক্ষুব্ধ হল।

"আসতে না আসতে তুইও পাখী নিয়ে মেতে উঠলি না কি?"—যোগমায়া হাসি মুখেই বললেন, "ভাল আছিস ত? রোগা দেখাচ্ছে যে!"

"রোগা কোথায়? তোমার কাছে এলাম ত, আবার খেয়ে দেয়ে মোটা হয়ে যাব! কিন্তু মা, তোমার শরীর সত্যিসত্যিই খারাপ হয়ে গেছে, তুমি কি—"

"নিজে আর সংসারের ঝামেলা কত সামলাব? তোমাদের সংসার তোমরা গুছিয়ে নিয়ে আমায় ছুটি দাও!"

ইন্দ্রাণীর মৃদু স্বগত আলাপ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। দু'পা এগিয়ে এসে সে তাকালে যোগমায়ার দিকে। অবিনাশ বললে, "চল মা, নীচে যাই এখানে বড় রোদ্দুর।"

যোগমায়া আগে, অবিনাশ পেছনে ওরা নীচে নেমে এল। সংসারের কাজে ইন্দ্রাণীর শৈথিল্য এবং অবহেলা দেখে সম্প্রতি একটা ঠাকুর রাখা হয়েছে, একতলায় সে রাঁধছিল, দোতলার তিনটি ঘরের মধ্যে একটা ঘরে অবিনাশের ছোট ভাই সুপ্রকাশ বি. এ. পরীক্ষার পড়া তৈরী করছিল।

অবিনাশ পেছনে তাকালে; ইন্দ্রাণী আসে নি।

রাত্রে:

অবিনাশ অপেক্ষা করছিল।

ইন্দ্রাণী এল। ঘরে বাতি জ্বলছিল; অবিনাশ আধ-শোয়া অবস্থায়, হাতে একখানা মাসিক পত্রিকা। বিস্তৃত বৃহৎ শয্যার দিকে ইন্দ্রাণী অগ্রসর হতে অবিনাশ মৃদু কণ্ঠে আহ্বান করলে, "এস!"

ইন্দ্রাণী উত্তর দিলে না।

"দরজাটা বন্ধ করবে না?"

"করব।" ইন্দ্রাণী খাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে অবিনাশ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল; ইন্দ্রাণী—তার ইন্দ্রাণী আজ দূরে সরে গেছে, অনেক দূরে! কেন এমন হল? ব্যবধান? অনুপস্থিতি? ইন্দ্রাণীকে পূর্ব্বে যেমন নিঃসন্দেহে বুকের কাছে নিতে পারত আজ তার সে ইচ্ছা দুর্ভেদ্য অপরিচিতির প্রাচীরে ব্যাহত হয়ে রইল। আজ রাত্রে তার মনে হ'ল,

ইন্দ্রাণীর পক্ষে তার চিঠির জবাব না দেওয়া বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। মায়ের চিঠিতে সে জেনেছিল, সংসারের প্রতি অনুরাগ তার শিথিল হয়ে এসেছে, রাজ্যের পাখী নিয়ে মাতামাতির আর অন্ত নেই। অবিনাশ ভেবেছিল, সম্পূর্ণ দোষ তার নয়, পাখীর প্রতি অকারণ ঔৎসুক্যের হেতু তার দীর্ঘ অনুপস্থিতি।

সমস্ত দিন নানা কাজের ভিড়ে অবিনাশের কোন কথাই তার সঙ্গে হয় নি। এখন অবিনাশ তার মনের বোঝা লাঘব করতে প্রশ্ন করল; "তোমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে কেন?" "একেবারে বুঝি শরীরের যত্ন নিতে না?"

"কৈ খারাপ হয় নি ত", ইন্দ্রাণী স্বচ্ছন্দে বললে।

"ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে।" অবিনাশ হেসে বললে, "এ দিকে এস দিকি! ভাল করে দেখি তোমায়!"

"আমার ঘুম পাচ্ছে। আচ্ছা পাখীরা কি রাত্রে চোখ বুজে ঘুমোয়? স্বপ্ন দেখে?"

"কি জানি! এস না কাছে"। অবিনাশ হাত বাড়াল।

ইন্দ্রাণী উঠে এল শয্যায়। চাদর টেনে শুতে শুতে সে বললে, "আমায় কাল কয়েকটা বাটী কিনে দেবে?"

"কি বাটী?" অবিনাশ আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

"পাখীদের জল খাবার। বাটিগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে।"

"দেব।" অবিনাশ উঠে দরজা বন্ধ করে বাতি নিবিয়ে শুতে এল।

"পাখীগুলোই দেখছি তোমার কাছে সব", অবিনাশ বললে, "আমি আর কিছুই নই। তুমি ভুলে গেছ, তোমায় আমি কত ভালবাসি!" অবিনাশ তার বাহুতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। শেষের কথা কটি তার নিজের কানেই অভিনয়ের মত শোনাল।

সকাল থেকে আর ইন্দ্রাণীর দেখা নেই। পাখীদের পরিচর্য্যায় সে ব্যস্ত। বাস্তবিক সংসারের আকর্ষণ আর তাকে বশীভূত করে না। যোগমায়ার সঙ্গে তার আলোচনা হল; আগেই তাঁর মন পুত্রবধূর উপর বিরূপ হয়ে ছিল। "পাখীগুলোকে সব খাঁচা খুলে ছেড়ে দে!" যোগমায়া অনিশ্চিত কণ্ঠে বলিলেন, "বল—সে যদি ভাল ভাবে না চলে তা হলে এ বাড়ীতে তার জায়গা হবে না, বেশ শক্ত করে বল, ভালমানুষিতে কাজ চলবে না।"

"এ বাড়ী ছাড়া আর যাবে কোথায় সে?"—অবিনাশ বললে।

"কেন ভাই-এর ওখানে!"

"বললেই ত সে চলে যাবে, আর কখনও ফিরেও আসতে চাইবে না।"

"থাক না! মেয়ের অভাব কি?"—যোগমায়া স্ফীত হয়ে উঠলেন, "পাগল নিয়ে ত ঘর করা চলে না!"

অবিনাশ একটু চমকে উঠল। বেদনায় টন টন করে উঠল বুকের মধ্যে!

স্থানান্তরে গিয়ে সে বাঁচল।

কোন সিদ্ধান্তই অবিনাশের কাছে সহজ মনে হল না। পাখীগুলো উড়িয়ে দিলে পাগলামি বেড়ে যাবে, হয় ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করবে, বা কান্নাকাটি করে এক অনর্থ বাধাবে। তাকে জাগাতে হবে ইন্দ্রাণীর ঘুমন্ত প্রেম; তাকে সে ভাল বাসবে আরও গভীর ও একান্ত ভাবে; যে নারীত্বের মহিমায় একদিন সে সুষমামণ্ডিত ছিল, তাকে সে নিয়ে আসবে সেই সহজ, রমণীয় মাধুর্য্যে।

কিন্তু সেদিন গভীর রাত্রেই ইন্দ্রাণী আর একটু হলেই গোলমাল বাধিয়ে ফেলেছিল আর কি! হঠাৎ সে বলে বসল, "তোমার সঙ্গে শোব না!" খাট থেকে সে প্রায় নেমে আসছিল।

"ও কি! যাচ্ছ কোথায়? তুমি কি পাগল হয়েছ? এত রাত্রে—"

"ছেড়ে দাও!" ইন্দ্রাণী বললে।

কিন্তু অবিনাশ তাকে ছাড়তে পারে না। তার প্রয়োজন ইন্দ্রাণীকে শুধু আজ একরাত্রির জন্যে নয়, তার সমস্ত জীবনের জন্যে! ইন্দ্রাণীকে সে ভোলে নি, তার প্রেম আজও শিথিল হয় নি। তাই শীতের রিক্ত প্রকাশ-দেখে আতঙ্কিত সে হল না; বসন্তের আগমন প্রতীক্ষায় সে অপেক্ষা করবে। ইন্দ্রাণীর পত্রহীন বুকে নূতন পত্রের উন্মীলন হতে পারে! তাকে অবিনাশ বেঁধে রাখবে, মানুষের সমস্ত সাধারণ অভিব্যক্তির শৃঙ্খলে।

আবেগের সুরে অবিনাশ বললে, "পাগলামি কর না এত রাত্রে! এস, শুয়ে পড়।"

কাটল অনেকগুলি দিন ।

সেদিন সকাল থেকে ইন্দ্রাণীর ভাবগতিক দেখে অবিনাশ বিস্মিত হল, তবে খানিকটা প্রস্তুত সে হয়েই ছিল। বার বার কাজ-কর্ম্মের নানা অজুহাতে সে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছে, অকারণ হেসেছে তার উদ্দেশে, কখনও বা হাতখানা তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। ইন্দ্রাণী গম্ভীর, আজ আর তার কথায় ফুটে উঠল না বিন্দুমাত্র উচ্ছলতা। যোগমায়া লক্ষ্য করলেন, সংসারের কাজে তার কিঞ্চিৎ অধিক মনোযোগ। তিনি সন্তুষ্ট মনে ইন্দ্রাণীর কাছে কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, কয়েকটা সাংসারিক ব্যাপারে তার পরামর্শ চাইলেন, ইন্দ্রাণী তেমনি মিতভাষিণী। পাঁচবার জিজ্ঞেস করলে একবার উত্তর দেয়। উদাসীন, নিরুৎসাহী।

তবু পাখীদের সে ভোলে নি। তেমনি তাদের পরিচর্য্যা করলে, পরিবর্ত্তন করে দিলে তাদের পানীয়, তাদের আহার্য্য। কিন্তু আজ তার কাজে প্রকাশ পেল না বিন্দুমাত্র অসংযম।

অবিনাশ একটা জিনিষ লক্ষ্য করলে। ইন্দ্রাণীকে প্রথম দিন এসে দেখেছিল হতশ্রী; পরিধানে মলিন বস্ত্র, অবিন্যস্ত চুলের রাশি। কিন্তু আজ সে পরিচ্ছদে যত্নশীলা, কবরী-বিন্যাসে মনোযোগী। স্নান করতে যেতে যেতে অবিনাশ দেখলে তার দাড়ি কামাবার ব্লেড নিয়ে সে নখ কাটছে। সে নিজেই কাল ভেবেছিল তাকে নখ কাটতে বলবে।

স্নান সেরে বারান্দা অতিক্রম করবার সময় অবিনাশ দেখলে, ইন্দ্রাণী বাঁ হাতের একটা আঙুল চেপে ধরেছে, খানিকটা লজ্জ, খানিকটা উৎকণ্ঠিত তার ভাব। অবিনাশ বুঝতে পারলে, এগিয়ে এল সে। "কি হল? ইস! আঙুল কেটে ফেলেছ, দেখি, দেখি!"

ইন্দ্রাণীর মুখে ফুটে উঠল কিঞ্চিৎ লজ্জা; হাতখানা সে বাড়িয়ে দিলে। হাত তুলে নিয়ে অবিনাশ জিজ্ঞেস করলে, "কি ভাবছিলে নখ কাটতে কাটতে? তোমার পাখীর কথা না আমার কথা?"

ইন্দ্রাণী নিজের অজ্ঞাতেই বলে ফেললে, "তোমার কথা!" বলেই [illegible] দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠল মুখ।

তার পর হঠাৎ একটু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে সে বললে, "হাত ছেড়ে দাও না!"

"কেন, কি হল?"

"হয় নি কিছু, হাত ছেড়ে দাও,"—দৃঢ়কণ্ঠে ইন্দ্রাণী বললে।

"না", পরমুহূর্ত্তেই স্বাভাবিক সহজ গলায় অবিনাশ বললে, "চল, একটু আইডিন লাগিয়ে দিই, এস।"

ইন্দ্রাণী আর দ্বিরুক্তি করল না, উঠে পড়ল।

দুপুরে এক ফাঁকে যোগমায়া হঠাৎ এসে অবিনাশকে বললেন, "তুই ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দে!"

"কেন?" অবিনাশ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

"ওর মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, শেষ কালে পাগল হয়ে মারধোর করবে।"

অবিনাশ হো হো করে হেসে উঠল প্রচণ্ড শব্দে। "কিছু হয় নি ওর", সে বললে।

"হাবভাব দেখে বুঝতে পারিস না?"

"হাবভাব দেখেই ত বলছি, কিছু হয় নি, তোমার আমার মতই ও ভাল আছে।"

যোগমায়া উত্তর শুনে ক্রুদ্ধ হলেন। স্থানত্যাগ করতে তিনি এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করলেন না।

সারাদিন অবিনাশ আর ইন্দ্রাণীর দেখা পেলে না।

রাত্রেও অনেকক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করে সে প্রায় বিরক্ত হয়ে উঠছিল। ইন্দ্রাণী এল।

অসমুজ্জল আলোকে সুবিন্যস্ত পরিচ্ছদে তাকে দেখাচ্ছিল অপূর্ব্ব! অবিনাশ মুগ্ধ হয়ে গেল। শুধু প্রেম! ওর অন্তরে জাগাতে হবে প্রেম! অবিনাশ তার ঘুম ভাঙাবে, তাকে জাগাবে। তার চারধারে তৈরী করবে স্নেহের প্রাচীর, বন্ধনের শৃঙ্খল। তাকে বেষ্টন করে বিরাজ করবে সংসারের পার্থিব সুষমা!

"এস!" ইন্দ্রাণীকে সে আহ্বান করলে।

ইন্দ্রাণীর মসৃণ চুলে আলোর কয়েকটা তির্য্যক্ রেখা চিক্ চিক্ করছে, হাতের চুড়িতে অস্ফুট টুংটাং মিঠে আওয়াজ; অস্পষ্ট সঙ্গীতের ইঙ্গিত।

"দেরী হয়ে গেছে?"—ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলে।

প্রশ্ন শুনে অবিনাশ চমৎকৃত হল। সকালবেলা মা

যা বলছিলেন, মনে পড়ল। ইন্দ্রাণী যদি পাগল হয়ে যায় তবে সংসারে তার অস্তিত্বের মূল্য কি ? যদি ইন্দ্রাণী তার জীবনে না আসত, তা হলে এসে যেত না কিছুই, কিন্তু এতদিন পরে একক জীবনের কথা ভাবলে তার ভয় হয়। তাই তাকে শৃঙ্খলিত করবার অবিনাশের এত গভীর আগ্রহ।

অবিনাশ তাকে ঈষৎ আকর্ষণ করে বললে, "আচ্ছা দিনরাত তোমার পাখী নিয়ে থাকতে ভাল লাগে ? তোমার পাখীরাই আমাকে তোমার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে।"

"না", মৃদুকণ্ঠে ইন্দ্রাণী উত্তর দিলে।

কয়েকটি মুহূর্তের ছেদ। অবিনাশ বললে, "আমায় ভুলে যাও নি ত ?"

ইন্দ্রাণীর নিশ্বাস ভারি হয়ে এল; মৃদু কণ্ঠে সে কি বললে অবিনাশ বুঝতে পারলে না।

অবিনাশের ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এল। কর্মস্থলে ফিরে যাবার আর দেরী নেই। ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাকে পীড়া দিতে লাগল; স্ত্রীর প্রতি ক্রম-বর্দ্ধমান আকর্ষণ এমন প্রকট হয়ে উঠল যে, যোগমায়া বাস্মিত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। পুত্রের প্রস্তাবটির আশঙ্কা তিনি ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ইন্দ্রাণীর পাখীরা আর তার কমনীয় হাতের সেবা পায় না; অভ্যাসবশতঃ সে শুধু একবার কিছু দানা দিয়ে যায়, তারও কোন সময় নেই।

"আপনার এবেলার রান্নাটা আমি তৈরী করলেই ত পারি,"—ইন্দ্রাণী হঠাৎ একদিন বললে, "আমি ত কোন কাজই করি না!"

কোমল কণ্ঠস্বরে যোগমায়া বিস্মিত হলেন, "পাখী-গুলো ?"

"পাখী ত আছেই!" তেমনি হাল্‌কা সুরে ইন্দ্রাণী বললে, "একবার খাবারটা দিয়ে এলেই চুকে গেল!" কয়েক মুহূর্তের ছেদ। "ভাবছি পাখীগুলোকে উড়িয়ে দেব, কি আর হবে ?"

যোগমায়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন ইন্দ্রাণীর দিকে, আর একরকমের পাগলামি বোধ হয়।

কিন্তু সত্যিই যখন ইন্দ্রাণী বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল যোগমায়া আনন্দিত না হয়ে পারলেন না।

পরদিন দুপুরবেলায়।

অবিনাশ যাবার আয়োজন-বশতঃ কয়েকটা খুচরো জিনিষ কিনতে বাইরে গিয়েছিল। ফিরে এসে ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলে ইন্দ্রাণী একেবারে তন্ময় হয়ে একখানা চিঠি পড়ছে। কার চিঠি ?

অবিনাশের জুতার শব্দে ইন্দ্রাণী ভীষণ চমকে উঠে চিঠিখানা জামার নীচে লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলে।

"কার চিঠি ?"—নিজের অজ্ঞাতেই অবিনাশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ইন্দ্রাণীর পত্র অপসরণ করা আর হল না। "আমার!"—সে বললে।

অবিনাশ চেয়ে রইল ইন্দ্রাণীর দিকে, মৃদু হেসে সে বললে, "তোমার চিঠি, তুমি লিখেছিলে!" ইন্দ্রাণীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চোখে তার অনুচ্চারিত ভাষার ইন্দ্রজাল।

"এতদিন পরে আবার নূতন ক'রে পড়বার কি পেলে ?"

ইন্দ্রাণী বলতে যাচ্ছিল এ-চিঠি আজই তার প্রথম চোখে পড়ল; আলমারির নীচে ধূলিধূসরিত হয়ে নিতান্ত অবহেলায় এতদিন পড়ে ছিল, কিন্তু সামলে নিলে সে। "আজ আবার হঠাৎ এ চিঠিটা পড়তে ইচ্ছে হল; এবারে রোজ আমায় চিঠি লিখবে ত ? রোজ!"

"তুমি ত উত্তর দাও না!"

"দেব, নিশ্চয়ই দেব, লিখবে ত ? বল লিখবে!" বলতে বলতে ইন্দ্রাণী উঠে এল তার কাছে।

অবিনাশকে প্রত্যহ পত্র-লিখনের প্রতিশ্রুতি দিতে হল।

অবিনাশের সমস্ত জামায় বোতাম উঠতে লাগল, তার বালিশের ওয়াড় সাদা, পরিষ্কার রুমালের কোণে পরম যত্নে নামের আদ্যক্ষর লেখা। যাবে, এবার সে যাবে অবিনাশের সঙ্গে, না গেলে তাকে দেখাশুনো করবে কে ? কে জানে শেষ পর্য্যন্ত তার যাওয়া হতেও পারে।

অবিনাশের আজ যাবার দিন।

ভোরবেলা নিদ্রাভঙ্গের পর অস্পষ্ট অন্ধকারে পাশে তাকিয়ে দেখে ইন্দ্রাণী কখন শয্যা ত্যাগ করেছে। ওদিক

পাখীরা যাতেই তাদের অতিবাহিত হয়েছে বিনিদ্র। তাদের বৈচিত্র্যহীন জীবনে যে এত কথা থাকতে পারে এ তথ্য তাদেরও কোনদিন অবগত ছিল না।

অবিনাশ ছাদে এল। এ-সময়টা ইন্দ্রাণীকে এখানে পাওয়া যেতে পারে।

ভোরের বাতাসে ইন্দ্রাণীর খোলা চুলগুলো উড়ছে।

স্নান করেছে, বেশী দেরী হয় নি। সমস্ত খাঁচাগুলোর দরজা খোলা। শেষ পাখীটাও ইন্দ্রাণীর হাত থেকে উড়ে গেল আকাশের দিকে। ইন্দ্রাণী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেদিকে। নীলরঙের ছোট্ট পাখীটা তার আশ্চর্য্য সুন্দর ডানা মেলে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আকাশের প্রান্ত-সীমায়।

অবিনাশ তেমনি নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল।

কয়েক মিনিট পরেই ইন্দ্রাণীকে দেখা গেল। বোধ হয় অবিনাশের এখনও ঘুম ভাঙে নি। সে তাড়াতাড়ি এল, ঘুম ভাঙিয়েই অবিনাশকে প্রথম সংবাদটা সে দেবে! তার রক্তে নেমে গেল একটা বিদ্যুতের স্রোত। সে সন্তান-সম্ভাবিতা।

স্বর্গ

—শ্রীহরিপদ দত্ত

শিশুকে লইয়া বুকে জননী যখন
করেন বদন তার সাদরে চুম্বন,
বিমল জোছনা হাসি-ভাসিত সে মুখ
স্বর্গ জননীর কাছে, তাহে স্বর্গসুখ।

হইলেও পিত্রালয় সমৃদ্ধির খনি,
ভাবে স্বর্গ পতিগৃহ সাধ্বী যে রমণী—
পর্ণের কুটীর মাত্র যদিও সে বাস,
বহে সদা সেথা দারিদ্র্যের তপ্তশ্বাস।

জীর্ণবস্ত্র পরিধান লজ্জানিবারণে,
অন্নের অভাব সদা, দারিদ্র্যতাড়নে
অসুস্থ, মলিন দেহ, বিনা অঙ্গরাগ,
নারীর তথাপি স্বর্গ পতির সোহাগ।

শুদ্ধ সত্য নগ্ন দেহে যখন বিরাজে,
কুটিলতা-আবরণ ত্যজিয়া, সমাজে,
সঙ্কুচিত ষড়রিপু প্রভাবে তাহার,
সমাজ তখন স্বর্গ পুণ্যের আধার।

বন্যা, অনাবৃষ্টি, ব্যাধি, অকালমরণ
নাহি যথা, নাহি অনটন, অনশন,
উর্ব্বর যেথায় ক্ষিতি, তৃপ্তিশান্তিময়
সেই রাজ্য, সেই দেশ স্বর্গ সুনিশ্চয়।

থাকে যদি স্বর্গ ভিন্ন হতে মহীতল,
লোকচক্ষু অগোচর তাহা। কর্ম্মফল
এ জগতে স্বর্গ বা নরক। সত্যাশ্রয়
মুখ্য ধর্ম্মাচার, সত্যে স্বর্গপরিচয়।

বাঙ্গালীর চাই কি ?

—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার

সমগ্র ভারতবাসীর চক্ষু উন্মীলন করিয়া, অজগরবৎ ভারতের সকল সুষুপ্ত জাতির চক্ষু খুলিয়া দিয়া, যুগ-যুগান্তের নিদ্রার অবসাদ ঘুচাইয়া আজ আমরা 'ভেতো' বাঙ্গালী জাতিরূপে মরিতে বসিয়াছি। সকল ভারতবাসী-দের মধ্যে আমরা হিংসা, ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র। তাহার কারণ কি, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বোধ হয় যে, আমাদের দেশে প্রকৃত নিঃস্বার্থ কর্মীর অভাব, শিক্ষার অভাব, জাতিগত বৈষম্য, দ্বেষ, কলহপ্রিয়তা, স্বার্থান্ধতা, স্বধর্মত্যাগ, শাস্ত্রগত আদর্শ-পরিহার, বিলাসিতা, ব্রহ্মচর্য্য-নাশ, সৎশিক্ষাদাতার অভাব, গার্হস্থ্য ধর্মের অপব্যবহারাদি নানা দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার মধ্যে দলাদলি, এবং প্রকৃত নেতা বা দেশকালপাত্রানুযায়ী নেতার অভাবই প্রধান। স্বজাতি বা আত্মীয়-পোষণ সকল দেশেই আছে; সকল স্থানেই শক্তিসম্পন্ন বড় বড় কর্মচারীগণ ইহা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে তাহার সীমা বহুদূর অতিক্রম করিয়াছে; জুডিশিয়ালে, রেলে, দপ্তরে, কর্পোরেশনে, ডাকে, পি. ডাব্লু. ডি.-তে, পুলিসে, শিক্ষায় স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে বন্ধু বা আত্মীয়পোষণ বা স্বজাতি-পোষণের হার খুবই বেশী দাঁড়াইয়াছে। তাহার উপর হিন্দু-মুসলমানে চাকুরীতে ভাগ-বাটোয়ারায় দেশ যে কিরূপ উৎসন্ন যাইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যে সকল কাজ করিলে দেশের কোটী কোটী অভুক্ত নিঃস্ব সন্তানদের পেট-ভরণ-পালনের উপায় হইবে, সেই দিকে কাহারও আদৌ দৃষ্টি নাই। বাঙ্গালী তাই আজ খাইতে পায় না; পরের দ্বারে দু'মুঠা অন্নের সে কাঙ্গাল! যে কৃষিবিজ্ঞানঘন শঙ্কর স্বয়ং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিয়া শিষ্য করিয়াছিলেন নারদ, মতঙ্গ, ভেড় পরাশর, শ্রীকৃষ্ণ, ভৃগ্বাদি ঋষিগণকে, এবং তাঁহারা শিক্ষা দিয়াছিলেন ধার্ম্মিক রাজা শিবি, নল, জনক আদি নরপাল-দের, তাহা আমরা জাতে ঠেলিয়া রাখিয়াছি "চাষার ব্যবসা" বলিয়া। সমুদ্রপারে গিয়া কতকগুলি বাঙ্গালী "চাষার বিদ্যা" শিখিতে গেলেন বিলাতে—যেমন ব্যোমকেশ, এ. কে. রায়, ডি. এন. মুখার্জ্জি, গিরিশ বসু ইত্যাদি, কিন্তু তাহা কেহই গ্রহণ করিলেন না পাছে লোকে চাষা বলে এবং তাঁহাদের চাষা হইতে হয়। অগত্যা কেহ কেহ হইলেন ডেপুটি, কেহ হইলেন প্রফেসর, এবং কেহ কেহ হইলেন বড় ব্যারিস্টার। এমনই বিষম আত্মবঞ্চনা ও জগৎ-বঞ্চনা। যে-দেশের বড় বড় লোক এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া আসিয়াছেন, সে দেশের কি কখন কল্যাণ হইতে পারে? সে দেশ অভিশপ্ত, অধঃপাতে যাইতে বাধ্য। যে-দেশের প্রাচীন রাজাদের জিজ্ঞাস্য ছিল, দেশের চাষ-বাস, কৃষি কেমন, দেশের পশুবল—যাহারা কৃষির প্রধান সহায়, তাহাদের অবস্থা কেমন, সেখানে এখন জিজ্ঞাস্য হইয়াছে, কোন্ উত্তম যুবতী নর্ত্তকী আছে, কোন্ নটী কোথায় কি অভিনয় করিতেছে, ফুটবলে কে লীগ কাপ অর্জ্জন করিল, কোন্ টীমের হাফ্ ব্যাক্ বা গোলকীপার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। অথচ বাপের কষ্ট-অর্জ্জিত পয়সায় বিলাসিতার স্রোতে গা ছাড়িয়া দিয়া এবং কুসংস্কার ও কুস্বভাবের ভৃত্য হইয়া অকালে দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হইয়া বাপ-মায়ের শেষজীবনে দৈন্য ও বিষাদের পথ অনেকেই উন্মুক্ত করে। যে-দেশের শিক্ষিত ছেলেরা ভাবে না যে, পরের জীবন কিসে সুখে কাটিবে, সে দেশের অধিবাসীরা চিরদুঃখগ্রস্ত হইবে না ত কে হইবে, তাহা চিন্তা করিতে পারি না।

কৃষির উন্নতি করা দূরে গেল, ঠিক ধারায় কৃষি-শিক্ষা দেশে প্রবর্ত্তন করা শিকায় তুলিয়া একটা স্কীম হইল অজয় খাল বা দামোদর খাল কাটাইয়া দেশের কৃষির উন্নতি করা হইবে; যে টাকা মঞ্জুর হইল তাহার অর্দ্ধেকের বেশীতে পেট-পূজা হইল বড় বড় ইঞ্জি-নীয়ার সাহেবদের, উচ্চ কর্ম্মচারীদের এবং নামজাদা ঠিকাদারদের; কাজ হইল "যা-তা"—করভার পড়িল বেচারা নিঃস্ব, অনাহারপীড়িত, অর্দ্ধ-উলঙ্গ চাষীর উপর। কর

না দিতে পারিলেই তার জোত-জমা, গাই-বলদ বিক্রয়, তার পর জেল, সেখানে পচিয়া মর, তার পর কঙ্কালসার হইয়া যমালয়! এই ত দেশের চাষীর একাংশের চিত্র। অপর দিকে কৃষি-বিভাগের ধুরন্ধরেরা সরকারের উপদেশ-মতে তারস্বরে দেশময় চীৎকার করিয়া বেড়ান যে, পাটের চাষ কমাও। জিজ্ঞাস্য, যে তাহারা না হয় ধানের চাষ করিল, কিন্তু তার পূরা দাম দেয় কে? রেল-রাস্তা, পথ, ও বাঁধের উপদ্রবে পুরান পুরান নদীর 'বেড' উঁচু হইয়া পলি পড়িয়া গেছে, তাহা সাফ করা দু'পাঁচ শত ড্রেজারে কুলায় না; জলের স্রোত বৃদ্ধি করিতে হইবে, যেমন মিশরের উইলকক্স সাহেব পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা করে কে? দেশের মন্ত্রীদের সস্তায় নাম কেনা চাই, গ্রে-হাউণ্ডের দৌড় জারি করিয়া রাজস্ব বাড়ান চাই; চুলায় যাউক দেশের কৃষির উন্নতি ও কৃষির শিক্ষা।

বাঙ্গলার মাটিতে আছাড় খাইলে বাঙ্গলার মাটি ধরিয়াই আমাদের উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ইউরোপ-আমেরিকায় লব্ধ বিজ্ঞান-চর্চ্চা বা শিক্ষা এদেশের কাজে আসিবে না; তবে তাহা দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য, দশের উপকারের জন্য হয় তো প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দেশের লোক লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া উপন্যাস ও অসার কবিতার বইগুলা পড়িবে, তথাকথিত অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণের সারহীন রচনাসমূহ উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিবে, পড়িবে ও হজম করিবে সেও ভাল, কিন্তু কৃষিসম্পর্কীয় পুস্তকসমূহ ভুলিয়াও পড়িবে না। সকলেই চাহে চাকুরী এবং রাতারাতি যক্ষের ধনরাশি!

বাঙ্গালীকে জাতিরূপে ধরাপৃষ্ঠে বাঁচিতে হইলে নগর ছাড়িয়া গ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে। বুরব্যাঙ্কের মত বড় বড় লাউ-কুমড়া ও কমলা-আপেল উৎপাদন ও সেই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে হইবে, যাহার গুণে একটা ধানের শীষের বদলে দশটা শীষ জন্মায়, যাহাতে আমাদের দেশের কোটী কোটী অভুক্ত ভায়েদের খাদ্যসম্ভার যোগাইতে পারি। তাহা কোন্ বিদ্যায় দিবে? কৃষিটাকে জাতে তুলিয়া লইলে সেই বিদ্যা কার্য্যকরী হইবে, দশকে ও দেশকে কল্যাণ দিবে। তাহা করিতে হইলে ছেলেদের গোছাগোছা বই না পড়াইয়া কাজের দুই এক খানা মাত্র বই পড়াইতে হইবে এবং কৃষিকে প্রাধান্য দিতে হইবে, যেমন আমেরিকার এবং বিলাতের কোন কোন স্কুল ও কলেজ দিয়া থাকেন। আমাদের দেশেও দেশের উপযোগী করিয়া তাহাই করিতে হইবে। কৃষির উন্নতি করিলে ৬০।৭৫ বৎসরের মধ্যে ধনে মানে, গৌরবে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করা যায়, অথচ আমরা ভারতবাসী তথা বঙ্গবাসী সেই কৃষিকে ভুলিয়া গিয়া, কৃষির প্রধান সহায় গোমাতাকে ভুলিয়া, সেই গৌরবময় স্থান হইতে চ্যুত হইয়া আজ এক মুঠা অন্নের জন্য পরের মুখাপেক্ষী, পরের দ্বারে কাঙ্গাল! হায় আত্মবঞ্চক ও আত্মবিস্মৃত জাতি!

আমাদের বহু যুগান্তের পরীক্ষিত আদর্শ ত্যাগ করিয়া, আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া আমাদের বর্ত্তমান সমাজতন্ত্র শোচনীয়রূপে তীব্র বেকার-সমস্যা আনিয়াছে। তাহার সংশোধন আশু কর্ত্তব্য; তাহা করিতে হইলে, পরিশ্রম প্রয়োজন, বিলাসিতা পরিহার করা আবশ্যক এবং বিলাতীর অনুকরণে বর্ত্তমানে গঠিত ভুয়া শিক্ষাপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া এরূপ শিক্ষা দেশে প্রবর্ত্তিত করা অবশ্যকর্ত্তব্য, যাহাতে দশজন লোক খাইতে পায়, যাহাতে আনুমানিক শতবর্ষের পূর্ব্বেকার অবস্থা ফিরিয়া আসিয়া আমাদের প্রচুর খাদ্যসম্ভার দেয়। তাহা নির্ভর করে কৃষির উন্নতির উপর; কিন্তু সে-দিকে সরকারী কৃষি-বিভাগ, বা বিশ্ববিদ্যালয় বা মন্ত্রিবর্গ বা দেশের চিন্তাশীল লোক বা সরকার বাহাদুর বা রাজা বা প্রজা কেহই মনোযোগ দিতেছেন না। ইহা না হইলে এবং শীঘ্র না হইলে, আমার মনে হয়, এ দেশের কদাপি কল্যাণ নাই। সেই জন্য আমাদের বাঁচিতে হইলে এবং বেকার-সমস্যার আশু সমাধান করিতে হইলে চাই সফলা কৃষিবিদ্যা অনুশীলন এবং সফলা মাছ, মৌমাছি, পাখী, গো, মেষ, মহিষ, অজা-চাষ শিক্ষা। "বাপকা বেটা", আপনিও শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাবু কি এদিকে মনোযোগ দিবেন? এদিকেই মন দিলেই দেশ পুনশ্চ জীবিত হইবে; মরণোন্মুখ, আন্তরিকতাশূন্য, প্রবঞ্চক, স্বার্থান্ধ হিন্দু-জাতির গঠনে কোনই স্থায়ী কল্যাণ দেশকে দিবে না। জাতীয় চরিত্র পুনর্গঠন করিতে হইবে।

দুই দশটা তাঁত চালাইলে বা ৫০ বা ১০০টা কলাগাছ পুঁতিলে, অথবা ২।৫ টা রুটী প্রস্তুত করা তন্দুর চালান শিক্ষা করিলে, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার দৈন্য ও অন্নকষ্ট ঘুচিবে না। যে যে জাতি বাঙ্গলায় যে যে ব্যবসা করিয়া জীবনধারণ করে, সেই সেই বিদ্যাশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিতে হইবে। এখন প্রধান প্রশ্ন—প্রয়োজনীয় অর্থ দিবে কে ? দিবে দেশের লোক। এই দেখুন পাঠক, কৃষিবিভাগের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্যর তারকনাথ পালিত সাহেব ও খয়রারাজ এবং স্যর্ রাসবিহারী ঘোষের কৃষি সম্বন্ধে বিপুল দানের টাকা আছে; আজ পর্য্যন্ত তাহাতে কি কাজ হইয়াছে বা দেশের কৃষককুলের কি লাভ হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা যায় নাই। এই টাকা যদি মার্কিনের বা দিনেমারের বা বিলাতী লোকের হাতে পড়িত, তাহাতে তাহাদের কত যে কাজের মত কাজ হইত ও দেশের উপকার হইত তাহা বলিবার নয়।

আমাদের দেশের মধ্যে কালস্রোতে এখন এমন অনেক লোক এক একটি দল বাঁধিয়া গৈরিকাদি বসনের পোষাক ধারণ করিয়া "এল্‌ডোরাডো" (কাল্পনিক স্বর্ণময় দেশ) আনিয়া দিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া লোককে ঠকাইয়া গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার পথ উন্মুক্ত করিতেছে। ভ্রান্ত বাঙ্গালীর কি কিছুতে কল্যাণ আছে ? যদি আমাদের এই ধরাপৃষ্ঠে বাঁচিতে হয়, তবে চাই আমাদের হাতে কলমে প্রকৃত কৃষিশিক্ষা, বাঙ্গলা ভাষায় কৃষক-কেন্দ্রে কৃষক-কেন্দ্রে, ভ্রমণশীল কৃষি লেক্‌চারশিপ, কুটির-শিল্প জাগরণ এবং স্কুল ও কলেজে ব্যবসায়িক ও ব্যবহারিক কৃষি-শিক্ষা। ইহা কাজে পরিণত করিবে কে ? এই কাজ একজনের দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভবপর নহে। ইহা পূর্ণ করিতে হইলে চাহি সরকার বাহাদুর, মন্ত্রিমণ্ডলী, জমিদার ও প্রজামণ্ডলী, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়গণ ও বিশেষজ্ঞগণের এক জোটে সমবেত চেষ্টা ও কাজ এবং তাহার উপর সাহচর্য্য চাহি, সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকদের। কর্ম্মপদ্ধতি ঠিক করিয়া দিবেন বিশেষজ্ঞগণ, এবং পরে হাতে-কলমে কাজ শিক্ষা দিয়া পাকা-পোক্ত করিয়া দিবেন যাঁহারা নিজেরা কর্ম্মী। আমার বিবেচনা হয়, ইহা হইলে বেকার প্রশ্নের কতকটা সমাধান হইতে পারে। নচেৎ কিছুই হইবে না !

আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানের ত্রুটি কোথায় ?

...প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তি না থাকিলে কৃত্রিম সার দ্বারা যে উর্ব্বরাশক্তির উদ্ভব হয়, তাহাতে কৃষি অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয় এবং তাহা কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয় না। ইহারই জন্য ইউরোপে এবং মার্কিন দেশে কৃষিকার্য্য কৃষকের পক্ষে লাভজনক হইতেছে না এবং প্রায় সমস্ত কৃষকই কৃষিকর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতেছেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে নূতন নূতন ভাবে পাশ্চাত্ত্য দেশে যে সমস্ত আয়োজন চলিতেছে এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইতেছে, তাহা প্রকৃত কৃষকের প্রতিষ্ঠান নহে। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ ধনিক দ্বারা পরিচালিত, তাহাতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ঐ ঐ দেশের গভর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য করিতেছেন। ঐ অর্থ-সাহায্যের ফলে ঐ ঐ দেশে সাময়িক ভাবে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানই প্রকৃতপক্ষে লাভজনক হয় নাই এবং গভর্ণমেণ্টের সাহায্য বন্ধ হইলে যে-কোন সময়ে প্রতিষ্ঠানগুলি অচল হইবার আশঙ্কা আছে।

পাশ্চাত্ত্য জাতিগণ জমীর প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তির রহস্য পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়াই বর্ত্তমান জন-শিক্ষা-পদ্ধতির এবং যন্ত্র-পরিচালিত লাঙ্গলের উদ্ভব হইয়াছে।

লোহা-লক্কড়

—শ্রীহিমাংশুশেখর গুপ্ত

এখানকার আকাশে না কি কোনও কালেও শুভ্র উত্তরীয়ের মত, ফুরফুরে স্তূপীকৃত একরাশ বেলফুলের মত মেঘদল ভাসিয়া বেড়ায় না। মেঘের বর্ণ-মধুরিমা, নীল আকাশের চন্দ্রাতপ এখানে না কি চোখে পড়ে না। শুধু চোখে পড়ে—কারখানার চিম্‌নী আকাশের দিকে উদ্ধত মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে আর থাকিয়া থাকিয়া বুঝি বা কি এক রোষে, ত্রাসেই ধূম উদ্গীরণ করিতেছে।

চিম্‌নী-নিঃসৃত এই ধূমাচ্ছন্ন আকাশ, লোহা-ইস্পাত তৈয়ারীর বৃহৎ কারখানারই নিখুঁত বাস্তব রূপ। ব্যস্ততা, কর্ম্ম-চাঞ্চল্য, বিবিধ প্রকারের বিচিত্র শব্দ, মহানগরীরই যে একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, তাহা এখানে যাঁহারা কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহাদের অবিদিত নাই।

পার্শী ধনকুবের জামসেদজী টাটার অক্লান্ত চেষ্টায় কেমন করিয়া বিহারের নগণ্য সাকচী নামক পল্লীটি এই বিরাট বিস্তৃত কল-কারখানা-সমন্বিত বর্ত্তমান নগরীতে পরিণত হইল, সে-সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু কারখানার কথা একটু না বলিলে কেমন করিয়া আমরা অশোককে বুঝিতে পারিব—কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব তাহার মনের অবস্থা?

টাটার কারখানায় অশোক আজ তিন বছর ধরিয়া কাজ করিতেছে। ছাব্বিশ হাজার বিভিন্ন দেশীয় কর্ম্মী ও ছয় হাজার বাঙ্গালী কর্ম্মীদের মধ্যে সেও একজন মাত্র। কারখানায় কাজ করিতে করিতে কারখানারই পরিধির বাষ্প-শকটের ঊর্ণনাভের জালের মত বেষ্টিত লৌহ-বর্ত্ম পার হইয়া তাহার স্বভাবসুলভ কবি-মন মাঝে মাঝে এখনও দূরের পানে ছুটিয়া চলে। বাহিরের আলো, আকাশের নীলিমা, ফাঁকা মাঠের বিস্তৃতি, দুরন্ত বাতাসে বহিয়া আনা কোন পরিচিত ফুলের মিষ্ট সুবাস তাহাকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে যেন হাতছানি দিয়া এখনও ডাকে আর বলে—"এস, এস আমার কাছে এস, কি হইবে তোমার ইস্পাতের গলিত-স্রোতের বিরক্তিকর উষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করিয়া; জীবনকে হাতের মুঠির মধ্যে ধরিয়া চলাফেরা করিয়া?"

কিন্তু লোহা গলাইবার বিরাট চুল্লীর তলাকার দরজাটা খুলিয়া যায় আর গলিত লৌহস্রোত আপনার বিবর হইতে নিক্ষেপ করিতে করিতে রক্তচক্ষু হইয়া চুল্লীটাও যেন শাসনের ভঙ্গীতে বলিতে আরম্ভ করে—"ওহে, ইঞ্জিনিয়ার, তোমার কবিত্ব-টবিত্বগুলি আপাততঃ মুলতুবীই রাখ বাপু, আর যদি কাণে কথা না তোল, তবে তোমার অনবধানতার অজুহাত লইয়া দিব তোমাকে এমনি শাসন করিয়া, যাহাতে তুমি অনায়াসেই যমের বাড়ী ঘুরিয়া আসিতে পার।"

আজ অপর্ণার চিঠিখানা পকেটে ফেলিয়াই অশোক কারখানায় কাজে আসিয়াছে। নীল রঙের পুরু খামের উপর অপর্ণার সুন্দর, স্পষ্ট হাতের অক্ষরগুলি অশোকের নামের ইঙ্গিত দিতেছিল। তাহার বধূর চিঠিখানি যে ইতি-মধ্যেই কতবার সে পড়িয়া ফেলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। চিঠির কোণের ও খামের উপরের মৃদু গন্ধটুকুও তাহার ভারি ভাল লাগিতেছিল। কতবারই তো সে চিঠিখানি নাকের একান্ত সন্নিকটে তুলিয়া ধরিয়াছে, আর প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি অক্ষর পরম অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়াছে।

অপর্ণা লিখিয়াছে যে, সে না কি তিন-চারি-দিনের মধ্যেই তার ওখানে আসিতেছে, ছোট ভাই নন্তুই লইয়া আসিবে। অশোকের না কি খাওয়া-দাওয়ার ভারী কষ্ট হইতেছে—সে এখান হইতেই তা' টের পাইতেছে, আর এমনিতেই তো সে না কি ভয়ানক অমনোযোগী, অগোছালো; কারখানায় কাজ-কর্ম্ম করিবার সময় যেন সে খুব সাবধানে চলা-ফেরা করে;—নতুবা – মা গো—সে ভাবিতেও পারে না সে সব কথা। আরও কত খুঁটিনাটি বিষয় সে লিখিয়াছে। অপর্ণা তো শীঘ্রই আসিয়া পড়িতেছে, তখন আর তাহাকে কিছু ভাবিতে হইবে না। রওনা হওয়ার সময় তার বাবা টেলিগ্রামই করিয়া দিবেন তাহাকে। অশোক যেন তার পাইয়া শিয়ালদহ যাইয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে লইয়া

আসে। ইহাতে যেন অন্যথা না হয়, তাহা না হইলে তাহার একটুও ভাল লাগিবে না, চাই কি সে রাগও করিতে পারে; হ্যাঁ, সে রাগিই করিবে এবং সে তার সঙ্গে হয় তো কথাই বলিবে না—যদি সে না আসে শিয়ালদহ ষ্টেশনে? শক্ত হইলেও নন্দ ছেলেমানুষ বইতো নয় এটাও তো তার বোঝা উচিত। আর দরকার হইলে একদিন, দু'দিন, তিনদিনের ছুটিও সে লইতে পারে না না কি? ধর অপর্ণা যদি অসুখে পড়ে, খুবই শক্ত ব্যামোতে, তখনও কি তাহার ছুটি মিলিবে না, তাহাকে দেখিতে আসিবার জন্য? কি তবে সে চাকুরী করে? ইত্যাদি ইত্যাদি বহু কথাই তাহাকে অপর্ণা লিখিয়াছে। অপর্ণার এই ধরণের কথায় অশোক রাগ করে নাই, রাগ দূরে থাকুক বরং অনেকখানি খুসীতেই চিত্ত তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে এই জানিয়া যে, তাহার জীবনের আটাশ বছর বয়সের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার জানাইয়া যে চিঠি লিখিয়াছে সে তাহার স্ত্রী; কারখানার কোন উদ্ধতন কর্ম্মচারী নহে। মনে মনে সে একটু না হাসিয়াও পারে নাই যে, অপর্ণা তাহাকে ভালবাসে তাই বলিয়াই তো এত কথা লিখিয়াছে, নতুবা নিছক কর্ত্তব্য-প্রসূত চিঠির ভাষা কখনও এরূপ হয় কি?

বেলা পড়িয়া আসিলে চারিদিকে যখন আসন্ন সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া ধরণীর বুকে ধীরে ধীরে নামিতে থাকে, নীল আকাশের এদিকে ওদিকে দুই একটি তারা সবে উঁকিঝুঁকি দিতে সুরু করে, স্নিগ্ধ সান্ধ্য বাতাস বহিতে থাকে, ঠিক তেমনি সময়ে সে কারখানার পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়িয়া নিজের কোয়ার্টার্স হইতে গুটি গুটি বাহির হইয়া যখন পথে পা দেয়, নিজেকে তখন তাহার কেন জানি ভারী খুসী মনে হয়।

কারখানার রুক্ষ মালিন্য শহরে প্রবেশ করে নাই তাই রক্ষা। বিকালে রোজ অপর্ণাকে লইয়া সে এখানে হাঁটিয়া বেড়াইবে। এই চওড়া পিচ-ঢালা রাস্তার উপর দিয়া বেড়াইতে তাহাদের বেশ ভাল লাগিবে। আচ্ছা, বিজলী বাতি, মোটরগাড়ী, এখানকার পথ্য-বীথিকা দেখিতে অপর্ণার কি মোটেই ভাল লাগিবে না? বাঃ তা কেন, নিশ্চয়ই লাগিবে। তাহার নিজের অপর্ণা সঙ্গে থাকিলে তো খুবই ভালই লাগিবে—এমন কি বহুবার দেখা—কোন জায়গা দেখিতে হইলেও।

মাঝে মাঝে তাহারা শহরের শেষ সীমানার পাহাড়ের কোলে গ্রামে বেড়াইতে যাইবে। ছোট ছোট লতাপাতায় ঘেরা সুন্দর কুটীর দেখিতে দেখিতে গাছ-ঘেরা ছায়া স্নিগ্ধ পথের উপর দিয়া তাহারা গল্প করিতে করিতে হাঁটিয়া বেড়াইবে কিংবা সময় সময় সব ভুলিয়া কোন্ গাছের শীতল ছায়ায় বসিয়া তাহারা সুদূর দিক্‌চক্রবালের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া নীরবে চাহিয়া থাকিবে। মাঝে মাঝে তাহারা সম্মুখের ঐ পাহাড়টায়ও বেড়াইতে যাইবে।

রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে থাকে, আলোগুলি সমানভাবে জ্বলিতে থাকে, মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার বাতাসকে মথিত করিয়া মোটরের হর্ণের শব্দ ভাসিয়া আসে। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে অশোককে স্বপ্নজাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়।

বেণীমাধব বাবু তাহার শ্বশুর মহাশয়, অপর্ণার বৃদ্ধ পিতা; ষ্টেশনে যাইবার জন্য তাহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন। অশোককে তাহা হইলে আজই রওনা হইতে হয়। সকালের দিকে সে হাওড়া পৌঁছিবে, সেখান হইতে সে সোজা কালী-ঘাটে তাহার আবাল্য সুহৃদ্ সুরেনের ওখানে গিয়া উঠিবে। আর সুরেনের আস্তানাটাও তার একান্ত জানা। সুরেনের ঘরটা, পাশের হিন্দুস্থানী সীতারামের পানের ছোট দোকানটা, কয়লার ডিপো, রাস্তার মোড়ে সিংহমুখী কলটা, যেখানে নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষেরা কলরব করিতে করিতে স্নান সমাধা করিতে ও পানীয় জল লইতে আসে—সব কিছুই যেন সে চোখের সামনে দেখিতে পায়।

মাত্র দু'খানা কাপড়, সেভিং কেস, কয়েকটা কামিজ, তোয়ালে, টুথব্রাশ, টুথপেষ্ট, সুটকেসটায় পুরিয়া তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়া লইয়া ঠিক সময়ে ষ্টেশনে আসিয়া অশোক কলি-কাতাগামী ট্রেন ধরিল। না, বেডিং-ফেডিং-এর হাঙ্গামা সে আর করে নাই। সুটকেসটা উপাধান করিয়া ট্রেনের বাঙ্কের উপর দিব্যি লম্বা হইয়া সে শুইয়া পড়িল। একটা সিগারেট ধরাইয়া লইয়া সে সাত পাঁচ ভাবিতে লাগিল। ট্রেন তখন একটানা ঝাঁকুনি দিয়া দু'পাশের দু'একটি পথঘাট, ঝোপ-ঝাড়, গাছপালা দ্রুত পিছনে ফেলিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অশোকের ঘুম যখন ভাঙিল, তখন ট্রেন হাওড়া ষ্টেশনে সবে 'ইন্' করিয়াছে। হাওড়া ষ্টেশনের চিরন্তন গোলযোগটুকুও অশোকের কানে মিষ্টিই লাগিল। ট্রাম, রিক্‌শ, বাস, ট্যাক্সী,

গঙ্গার উপরে হাওড়ার ব্রিজ, পথ-চলতি যান-বাহন, লোকজন, ঐ ওপাশের ফুটপাথের ছিন্ন মলিন বসনাবৃতা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তা ভিখারিণীকে তাহার অসুন্দর মনে হইল না। মণি-ব্যাগ হইতে একটা পয়সা বাহির করিয়া সে তাহার ভিক্ষা-পাত্রটির মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল।

সুরেনের বাসায় আসিতে সুরেন বলিল, "ভাই বৌদিকে কিন্তু এখানে রাখতে হবে একদিন, আমরা কলকাতাতেই মানুষ; এখানকার আকর্ষণীয় স্থানগুলি আমাদের কাছে পুরণো হলেও বৌদির কাছে ভালই লাগবে আশা করি। কিন্তু আর যাই বলো 'হিপ্পো'র বেড়ার কাছে কিন্তু তোমাদের বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেব না, কি জানি হিপ্পোটা যদি বেমালুম—না ভাই ভয়ানক জানোয়ার" বলিয়া নিজের স্থূল রসিকতায় নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অশোকের বেশ লাগে তার এই গরীব অকৃত্রিম বন্ধুটিকে। হোক সে বত্রিশ টাকা মাহিনার মার্চেন্ট অফিসের এক অকিঞ্চন কেরাণী। সুরেনের অকৃত্রিম ছেলেমানুষীতে অশোক আনন্দই পায়।

বিকালে দুই বন্ধু দোতালা বাসে চাপিয়া সিনেমা দেখিয়া আসিল। অশোকের অনভ্যস্ত চোখে কলিকাতার দোকানপসার, আলোর দীপালি, জন-স্রোত কত যে ভাল লাগিল তা বলিবার নয়।

সুরেন গরীব হইলে কি হয়, সে তাহার বন্ধুকে ভাল খাওয়াইতে ত্রুটি করে নাই। নিজে বাজার করিয়াছে, নিজেই স্ত্রীলোকের মত নিপুণ ভাবে আনাজ কুটিয়া তেমনি দক্ষভাবে বিবিধ ব্যঞ্জন তাহাকে রাঁধিয়া যত্নের সঙ্গে খাওয়াইয়াছে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম আসিল না অশোকের। শেষ রাত্রির দিকে ক্রমে ক্রমে তাহার চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিল; নিদ্রাদেবী কৃপা করিলেন।

না, তাহার বড্ড দেরী হইয়া গিয়াছে উঠিতে; পোড়া ঘুম যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সুরেনকে টানিয়া তুলিয়া লইয়া অশোক অপর্ণাকে আনিতে শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে রওনা হইল।

ষ্টেশনে পৌঁছিতে তাহাদের একটু দেরীই হইয়া গিয়াছে বটে। কাতারে কাতারে মানুষ তখন প্ল্যাটফর্মের দিকে যাতায়াত করিতেছে। বাস্তবিক মহানগরীই বটে, ষ্টেশনেও কি ভিড়।

সুরেনকে দুইটি প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটিতে বলিয়া অশোক নির্দ্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছের স্বল্পপরিসর স্থানে পায়চারী করিতে লাগিল। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের আজিকার ভিড়টা একটু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতেছে না? পূজা বা অন্য কোন পর্ব্ব উপলক্ষে ছুটির সময়ও তো এখন নয়। ব্যাপার কি! বুকটা তাহার একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। পাশের লোকগুলির মুখে কি কোন আশঙ্কার ছায়া? সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গলের কি একটা সম্ভাবনা তার চিত্ত-মুকুরে ছায়া বিস্তার করিল। হাত-ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল ট্রেনের আসিবার আর দুই তিন মিনিট মাত্র সময় বাকী আছে।

"ভাই, সর্ব্বনাশ হয়েছে, ট্রেন কলিশন না কি হয়েছে কলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা জায়গাতে; অনেক লোক না কি মারা গিয়াছে। একটা বগীতে না কি আবার আগুন লেগে"—কণ্ঠে সুরেনের ভয়, ব্যথা, বেদনা-বিমিশ্রিত উত্তেজনা প্রকাশ পাইতেছিল।

সব শুনিবার ধৈর্য্যও ছিল না সামর্থ্যও ছিল না অশোকের। সেই ধূলিমলিন প্ল্যাটফর্মের উপর অশোক বসিয়া পড়িল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন তাহার অকস্মাৎ দ্রুত তালে চলিতে আরম্ভ করিল; কে যেন বুকের মধ্যে সজোরে হাতুড়ি পিটাইতে লাগিল।

খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া চাহিয়া দেখিল উপস্থিত সকলকার মুখেই যেন আষাঢ়ের আসন্ন ঘনঘটার ছায়া নামিয়াছে।

কতক্ষণ এমনি স্তব্ধ, নিস্পন্দভাবে সে বসিয়া থাকিত বলা যায় না—তাহার চমক ভাঙ্গিল যখন কে একজন বলিল—"মশাই চলুন যাবেন তো আমরা যাচ্ছি ঘটনাস্থলে এই ট্রেনটায়।"

কোন দুর্ঘটনার সঙ্গেও জীবনে তাহার চাক্ষুষ পরিচয় তাহার একেবারে ঘটে নাই। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ট্রেন-দুর্ঘটনার হৃদয়বিদারক সংবাদ সে সংবাদপত্রে পূর্ব্বেও পাঠ করিয়াছে বটে, কিন্তু এ যে প্রত্যক্ষ পরিচয়। কোথায় তাহার প্রিয়তমা অপর্ণা, বালক

নন্তু তাহার শ্যালক। অশোক কি চেতনা হারাইয়া ফেলিবে! কি বীভৎস, মর্ম্মন্তুদ ঘটনার লীলাক্ষেত্রের মধ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছে। লাইনচ্যুত ইঞ্জিনটা কলকব্জার পাঁজর বাহির করিয়া একদিকে কাত হইয়া আছে। চারিদিকে লোহা-লক্কড়ের এ কি তাণ্ডব নৃত্য, এ কি উচ্ছৃঙ্খলতা।

মৃতকল্প যাত্রীদের মধ্যে কাহারও কাহারও ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে—"বাঁচাও, বাঁচাও, গেলাম, গেলাম।" কেহ বা চোখ বুজিয়া অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত। খণ্ডিত, দ্বি-খণ্ডিত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন রক্তাপ্লুত মানব-শবদেহের এ কি ভয়াবহ প্রদর্শনী দেখিতে সে আসিয়াছে!

অপর্ণাকে সে ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে বাহির করিবে? বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রেরিত দলে দলে যুবকেরা, রেলের কর্ম্মচারীরা, তাহাদের নিযুক্ত লোকেরা, আঘাত-অপ্রাপ্ত যাত্রীরা, উপস্থিত আরও অনেকে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াও ধ্বংসস্তূপ তেমন করিয়া অপসারণ করিতে পারিতেছে কই? অপর্ণার মৃতদেহ আর নন্তুর শব কখন না জানি আবিষ্কৃত হইয়া যাইবে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে। এ কথা মনে আসিতেই অশোকের ঠোঁট সহসা কাঁপিয়া উঠিল, একটা অব্যক্ত বেদনা, অননুভূত অস্বাচ্ছন্দ্য তাহার সমগ্র দেহ মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। চোখ হইতে অশ্রু শিশিরবিন্দুর মত টপ্ টপ্ করিয়া গালের উপর গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মনে পড়িল তাহাদের বিবাহের দিনটির কথা, স্মৃতি তো এখনও ম্লান হইয়া যায় নাই। যে-দিন সে একটি অপরিচিতা তরুণীর সলজ্জ, ভীরু ও কোমল সুন্দর এক জোড়া আঁখির সঙ্গে চোখ মিলাইয়াছিল এবং সেই বহুজন-সম্মিলিত আলোকোজ্জ্বল উৎসব-রজনীতে যাহার কম্বুকণ্ঠে মাল্যদান করিয়া আরও কত কি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের মাঝে একান্ত আপনার করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। আরও কত খুঁটিনাটি কথা তাহার এই শ্মশানভূমির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে পড়িতে লাগিল—প্রকাশহীন অপরিসীম বেদনায় চিত্ত তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অপর্ণার ভাই—নন্তু—তাহার শ্যালকের প্রাণকুসুম কি অশোকই তাহার জীবনবৃক্ষ হইতে অকালে ঝড়িয়া পড়িতে সহায়তা করিল! ঈশ্বর কি নিষ্ঠুর! অপর্ণা, নন্তু আর এতগুলি মানুষের অপঘাত মৃত্যু তুমি কি তাহাদের কপালে ভাগ্য-তুলিকা দিয়া আঁকিয়া রাখিয়াছিলে! সেই অঙ্কিত লিপিই কি আজ সফল হইল? দৈবই কি মানুষকে নিয়ত চালিত করিতেছে?

এ কি! ঐ যে একটি বালক অবগুণ্ঠনবতী রঙীন শাড়ী-পরিহিতা এক নারীর হাত ধরিয়া আছে আর উভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, উহারা কে?

"এ কি তুমি?"

"হ্যাঁ আমি।"

বলিতে বলিতেই মৃত্যুভীতা অপর্ণা স্বামীর গায়ে দেহ এলাইয়া দিল, বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে খানিকটা জায়গা তার সামান্য ছিঁড়িয়া গিয়াছিল মাত্র। নন্তুর একটুও চোট লাগে নাই। সে দিদির কাছে জামাইবাবুকে দেখিয়া অকূলে কূল পাইল।

ভগবান তাহা হইলে সকলকার উপর অকরুণ নহেন—অশোক যেন জীবনে প্রথম উপলব্ধি করিল।

সেই রাত্রে ট্রেনের কামরায় শুইয়া, বসিয়া, গল্প করিয়া অশোক অপর্ণাকে মুখরা করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইল; কিন্তু করিলে কি হইবে, অপর্ণা কিন্তু চুপ করিয়া জানালার বাহিরে খণ্ড আকাশের নৈশ রূপ দেখিতেছিল। হঠাৎ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর দিকে মুখ তুলিয়া ধরিয়া সে বলিল—"আহা রুগ্না মেয়েটির কি হইল আর তার স্বামীর?" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া কান্নার আভাস জানাইয়া দিল। চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

অশোক নিরুত্তরই রহিল। বুঝিতে পারিল বহুজনের মৃত্যু-বিভীষিকা তাহার পত্নীর চোখের উপর ভাসিতেছে। পথে পরিচিতা পথসঙ্গিনী কোন মেয়ের মৃত্যুর চিন্তা তাহার পত্নীকে বিমনা, শোক-বিহ্বলা করিয়া তুলিতে পারে, ইহাতে বিচিত্র কি! অপর্ণা নিজে ও তাহার ভাই যে অক্ষতদেহে নিষ্ঠুর নিশ্চিত মৃত্যুর নির্ম্মম হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাইবার শক্তিও সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে। প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভ করিয়াও তাহার আনন্দের উৎসমুখ খুলিয়া যায় নাই। এই দুর্ঘটনার জের মনের উপর হইতে নিঃশেষে কোনদিন যে মুছিয়া যাইবে না এবং ইহার করাল ছবি বিশেষ করিয়া অপর্ণার স্মৃতিপটে ক্ষীণ হইয়া আসার সম্ভাবনাও যে বহুদিনসাপেক্ষ, অশোক তাহাও উপলব্ধি করিয়া ব্যথিত ম্লানমুখে নীরবই রহিল।

"দেখুন জামাইবাবু অসময়ে সূর্য্যি উঠল কি?"

সেই দিকে চাহিয়া ব্যথিত মুখে মৃদু হাসির রেখা টানিয়া অশোক বলিল—"না রে বোকা না, সূর্য্যি নয় ওটা, ঐ আবীরের মত রাঙা আগুন আমাদের কারখানারই একটা মস্ত বড় চুল্লীর।"

"আমাকে কিন্তু আপনাদের কারখানার সব কিছু দেখাতে হবে।"

"দেখাব বই কি তোমাকে আর তোমার দিদিকে"—বলিয়া অশোক সস্নেহে নন্তুকে একটু কাছে টানিয়া আনিল।

গ্রাম-মেধ যজ্ঞ বনাম মুশল পর্ব্ব

—শ্রীচুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের মৌলিক কর্ত্তব্য হইল বাঁচিয়া থাকা। সে যাহা কিছু করে…সুখে-স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই করে। প্রত্যেক দেশের সমাজ-গঠনের ভিতরেই রহিয়াছে প্রতি মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার মত ভিন্ন ভিন্ন রুচিকর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র…যাহা হইতে তাহারা নিজ নিজ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বংশপরম্পরা বাঁচিয়া থাকে। সুতরাং সেই সমাজই আদর্শ সমাজ, যে-সমাজে একটি মানুষেরও বেকার থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সমাজ একটি বহু-চক্র-বিশিষ্ট বিরাট সজীব যন্ত্র… প্রতি মানুষ ঐ যন্ত্রের এক একটি সক্রিয় অংশ। ক্ষুধার তাড়না হইল এই সমাজ যন্ত্রের বাষ্প। যুগ যুগ নিঃশব্দে এই বহু-চক্রবিশিষ্ট বিরাট যন্ত্র নিয়মিতরূপে ঘুরিতেছে ক্ষুধার তাড়নায়…বাহিরের ঐ বৃহত্তর জগৎ-যন্ত্রের ছন্দের সহিত ছন্দ মিলাইয়া…গতির সহিত তাল ঠিক রাখিয়া। মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র যখন অপর কোন শক্তিশালী সমাজের মানুষ আসিয়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-শক্তির দ্বারাই হউক, অথবা শারীরিক শক্তির দ্বারাই হউক…জোর করিয়া দখল করিয়া বসে, তখনই সামঞ্জস্য থাকে না বলিয়া সমাজ-যন্ত্র বিকল হইয়া পড়ে। তখনই মানব-সমাজে নানারূপ সমস্যা আসিয়া দেখা দেয়। যে শক্তিশালী সমাজ জয়লাভ করে সেখানেও যেমন জটিল সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়…যে দুর্ব্বল সমাজ বিজিত হয়, সেখানেও ভয়াবহ সমস্যা দেখা দেয়। এ যেন :—

"শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে।"

সমস্যা জিনিষটার বৈশিষ্ট্যই হইল, সে শঙ্খ-বণিকের করাতের মত দুই দিকেই কাটে। কর্ত্তাকেও কাটে…দাসকেও কাটে। কেন না, মানুষ মাত্রেই এক একটি অদৃশ্য বিধানে…একই রকম ক্ষুধায় তৃষায়…একই রকম সুখে, দুঃখে, হাসিতে, কান্নায় গাঁথা মালার মত আমরা সকলেই বাঁধা। সমস্যা আসিয়া সেই মৌলিক বিধানের উপর নির্ম্মম আঘাত করে। তাহারই ফলে সমাজ ভাঙিয়া যায়, সমবায় ভাঙিয়া যায়। তার পর বহু দুঃখ, বহু বেদনা, বহু উপবাস, বহু মৃত্যু প্রভৃতি আসিয়া আঘাতের পর আঘাত করিয়া মানুষের রুগ্ন, বিকৃত চিত্ত সুস্থ করিয়া দেয়। মানুষ যে-মুহূর্ত্তে সুস্থ সবল হইয়া ওঠে… সমাজ-যন্ত্রও সমবায় লাভ করিয়া আবার চলিতে থাকে। এমনি করিয়া মানব-সভ্যতার রথ যুগে যুগে চলিয়াছে অনন্ত জয়যাত্রার পথে। সাময়িক সমস্যা আসিয়া ক্ষণে ক্ষণে তার চলার পথে বাধার সৃষ্টি করে বটে…কিন্তু তাহা ক্ষণিক। সেই বাধা একটানা, একঘেয়ে চাকার গতি-বেগকে বিচিত্র করে…প্রাণবান্ করে…অবসাদ দূর করিয়া জীবনের পথে নব নব আনন্দের কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করে। জীবনের পরমাশ্চর্য্য প্রকাশ যে প্রতি দিবসের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক যুদ্ধের ভিতর দিয়া…সেই মহা সত্য সমস্যা আসিয়া আঘাতের পর আঘাত দিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। আমাদের ভিতরে আত্মপ্রত্যয় জাগাইয়া নিজকে আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলে।

ভারতবর্ষ বলিতে কয়েক লক্ষ গ্রামের সমষ্টি বুঝায়। এই গ্রামগুলির গঠন এমন একটি আশ্চর্য্য-ফলপ্রদ সমবায় অর্থ-নৈতিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, উহার প্রত্যেকটি গৃহই ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয় হস্তনির্ম্মিত গ্রাম্য শিল্পের শিল্পাগার…এবং প্রত্যেক গৃহই ছিল ঐ শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করিবার বিদ্যালয়। সুতরাং ভারতবর্ষের গ্রাম্য সমাজে যিনি যে-ঘরেই জন্ম গ্রহণ করুন না, তিনিই তাঁহার জীবিকা-অর্জ্জনের উপযুক্ত ব্যাবহারিক বিদ্যা-শিক্ষা জন্ম হইতেই তাঁহার নিজ গৃহেই লাভ করিতে পারিতেন। এমনি সুন্দর, স্বাস্থ্যপ্রদ, শিক্ষাপ্রদ, আনন্দপ্রদ পারি-পার্শ্বিকের ভিতর দিয়া জাতির জীবন গড়িয়া উঠিত। এই হিসাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, তখনকার দিনে গোটা ভারতবর্ষই ছিল নানারূপ আবশ্যক বিদ্যা অর্জ্জনের বিশ্ববিদ্যালয়। এই শিক্ষাপ্রদ গৃহ পারিপার্শ্বিকের ব্যবস্থাই ছিল ভারতবর্ষের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক ব্যাবহারিক বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা। এই ভারতীয় ব্যবস্থার

বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা আইন করিয়া চালু করিতে হয় নাই। ইহা স্বভাবতঃই বিনাব্যয়ে গড়িয়া উঠিত। সুতরাং তখনকার গ্রাম্য সমাজে ইচ্ছা থাকিলেও কাহারও যেমন বেকার থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না, তেমনি কাহারও মূর্খ থাকিবার সম্ভবনা ছিল না।

তারপর···গ্রামে সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে প্রতি বৎসরে যাহা আয় হইত···সেই অর্থ সকলের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় হইত। কোন গ্রামই পরমুখাপেক্ষী ছিল না। সকলের চাইতে বড় কথা—তখনকার দিনে গ্রামের ভিতরে একটি মানুষেরও উপবাসী থাকিবার কোন কারণ ঘটিত না। কারণ ভারতের গ্রামগুলি ছিল স্বতঃসিদ্ধ সমবায়ের মূর্ত্তরূপ মানব হৃদয়ের সহজাত স্নেহ-প্রেমের জমাট-বাঁধা লাবণ্য-প্রতিমা। বর্ত্তমান যুগের সমবায়ের মত মুখস্থ করা সমবায় তখন ছিল না। এক কথায় বলা যায়, তখনকার প্রত্যেকটি গ্রামই ছিল এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র (unit)। একটি উদার সার্ব্বজনীন ব্যবস্থায় ভারতের গ্রাম্যরাষ্ট্রগুলি অপূর্ব্ব শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইত। সেই সার্ব্বজনীন ব্যবস্থা এমন নিখুঁত ছিল যে, তাহাদ্বারা কাহারও স্বার্থের সঙ্গে অপর কাহারও স্বার্থের সংঘাত লাগিবার কোন কারণই ঘটিত না। যাহারা কৃষিজীবী ছিল···কৃষিকর্ম্ম করিয়াই তাহারা ডাল-ভাতের জোগাড় করিত, মৎস্যজীবী মৎস্য জোগাইয়া, তন্তুবায় কাপড় জোগাইয়া, কুম্ভকার হাঁড়ি-মালসা জোগাইয়া, গোয়ালা দধি-দুগ্ধ জোগাইয়া, স্বর্ণকার অলঙ্কার গড়িয়া, ছুতার নৌকা গড়িয়া, গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া, মালাকর মালা যোগাইয়া, বাদ্যকর বাজনা বাজাইয়া, নাপিত ক্ষৌর-কার্য্য করিয়া, ধোপা কাপড় কাচিয়া, পুরোহিত পূজা-কর্ম্ম করিয়া ডাল-ভাতের জোগাড় করিত। ইহা ছাড়া সমাজে আর এক দল লোক ছিলেন, যাঁহাদিগকে মসীজীবী বলা হইত। প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদেরই পেশা ছিল পরের চাকুরী করা। সমাজে ইঁহারাই ছিলেন সকলের নিকৃষ্ট। কারণ, ইঁহাদের জমা-জমীও ছিল না, প্রতিভাও ছিল না, সুতরাং ব্যাবহারিক বিদ্যায় ইঁহারা ছিলেন অপটু। কাজেই বাধ্য হইয়া ডাল-ভাতের জন্য ইঁহাদিগকে সরকারগিরি, গোমস্তাগিরি, নায়েব-তহশীলদারী, লস্করগিরি, পাইক পেয়াদাগিরি করিতে হইত। ইঁহাদের সংখ্যা ছিল অতি মুষ্টিমেয়। কেননা, পরের চাকুরী করা তখনকার সমাজে অতি ঘৃণিত কার্য্য ছিল। তাই পারত-পক্ষে এ পথে বড় কেহ আসিতে চাহিত না। এমনই সুন্দর, এমনই নিখুঁত ব্যবস্থার ভিতর দিয়া তখনকার গ্রাম্য সমাজগুলি পরিচালিত হইত। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে, ইংরাজ-শাসনে ভারতের গ্রাম্য-সমাজের এতকালের গড়া সেই অনিন্দ্য-সুন্দর অর্থ-নৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া গিয়াছে। অথচ তাহার পরিবর্ত্তে সার্ব্বজনীন দেশজাত নূতন কোন অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে নাই। ইংরাজ যে ইচ্ছা করিয়া গ্রামগুলিকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা নয়। যে-নীতি দ্বারা তাঁহারা ভারত-শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন, সেই নীতিই গ্রাম্য-জীবন বিকাশের প্রতিকূল। তাহারই ফলে এই দুই শত বৎসরের ইংরাজ-শাসনে আমাদের গ্রামগুলি মরিয়া গিয়াছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষও মরিয়া গিয়াছে। ইংরাজের শাসন আজ পঁয়ত্রিশ কোটি লোককে নিরন্ন করিয়াছে, গৃহহারা করিয়াছে, স্নেহহারা করিয়াছে, কর্ম্মহারা করিয়াছে, ধর্ম্মহারা করিয়াছে। রাষ্ট্র-শাসনের ইহার অপেক্ষা অপকীর্ত্তি আর কি হইতে পারে? অথচ ইহা ইংরাজের ইচ্ছাকৃত পাপ নহে। ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়াছিল বাণিজ্য করিতে। বাণিজ্য করাই ইংরাজের জাতীয় জীবনের মূল প্রেরণা। সুতরাং তাহার শাসন হইল, শাসনের জন্য শাসন নয়, বাণিজ্যের জন্য। এই উদগ্র 'বেনিয়া-শাসন'ই ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। কারণ, এই শাসনে ইংরাজ যেখানে সেখানে বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন করিলেন, সেই সেই স্থানেই এক একটা সহর গড়িয়া উঠিল। এই সহরগুলি সুন্দরী মায়াবিনী রাক্ষসীর মত গ্রামের রসরক্তমাংস খাইয়া খাইয়া যতই অধিকতর সুন্দরী হইতে লাগিল, স্ফীত হইতে লাগিল, গ্রামগুলিও ততই শুকাইয়া শুকাইয়া মরিতে লাগিল। এমনি-করিয়া কোটি কোটি ক্ষুধিত নরনারীর শুভ্র কঙ্কালের উপর এই সহরগুলি স্থাপিত হইল। সহরে সহরে নগরে নগরে নাগরিক আইন, নাগরিক ব্যবস্থা প্রচলিত হইল। সহরের রাজপথে রঙীন বাতি জ্বলিয়া উঠিল, বিচিত্র সাজ-সজ্জায়

রতীন মোটর গাড়ী, হুড় হুড় শব্দে ছুটিতে লাগিল, চাঁদনী গুলজার হইয়া উঠিল, রাজপথে রাজপথে উদ্যানে উদ্যানে মধুর সুরে ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল··· রঙ্গালয়ে রঙ্গালয়ে সুন্দরী নর্ত্তকীরা নূপুর বাজাইয়া গান ধরিল।

এই সহরগুলিই আমাদের গ্রাম্য জীবনের স্বতঃসিদ্ধ সমবায় নীতি ভাঙিয়া দিয়াছে আর তার পরিবর্ত্তে দেশের সর্ব্বত্র একটা অসমবায় নীতির, একটা আস্তিন-গুটান আসুরিক নীতির কসরৎ চলিতেছে। এই সহর-সুন্দরীরাই ইংরাজ রাজত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অপকীর্ত্তি। কেন না, ওগুলি দেশজাত শিল্প-বাণিজ্যের ক্রমবিকাশের ফলে স্বভাবতঃ গড়িয়া ওঠে নাই। ওগুলি বিদেশীয়দের শিল্পসম্ভার জবরদস্তী করিয়া চালাইবার নিরাপদ কেল্লা···আমাদের উপর এই সহরগুলি জোর করিয়া চাপান হইয়াছে। আমরা শুধু চোখ-ঢাকা বলদের মত উহার ভারই বহন করি, উহার মুনাফা বিদেশীরাই পকেট ভরিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া নিজ নিজ দেশে লইয়া যায়। আমাদের দুর্গতি ও অপমানের চরম নিদর্শন এই সহরগুলি। অথচ দুঃখ এই যে, ইহাদের মোহ আমাদিগকে এমন করিয়াই পাইয়া বসিয়াছে যে, অন্নপূর্ণার অন্নসত্র ছাড়িয়া আমরা ঐ কুৎসিত, কদর্য্য আবহাওয়ায় ছুটিয়া যাই বিদেশীয়দের উচ্ছিষ্ট খুঁদ-কণা কুড়াইতে, বিদেশীয়দের বুট-জুতার লাথি খাইতে। ভাঙা গ্রাম্য-সমাজে ডাল-ভাতের ব্যবস্থা আর নাই ইহা সত্য। বিদেশীয়দের যন্ত্রনির্ম্মিত শিল্পের প্রতিযোগিতায় হস্তনির্ম্মিত গ্রাম্য শিল্প টিকিতে পারিল না। সুতরাং গ্রাম্য শিল্পের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাম মরিয়া গেল।

ইহাকেই বলে গ্রাম-মেধ যজ্ঞ। ঘরে কাহারও অন্ন রহিল না। অথচ বিলাতী সভ্যতার চাকচিক্য আমাদের সকলকেই পাইয়া বসিল। আমরা এখন সকলেই চাকুরী করিয়া সহরে বাবু হইতে চাই। আড়ম্বরহীন সরল, গ্রাম্য জীবন আমাদের নিকট নোংরা জীবন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আমরা রাতারাতি সহুরে হইবার নেশায় cut your coat according to your cloth নীতি ভুলিয়া গেলাম। আমাদের ধারকরা ময়ূরপুচ্ছে সুসজ্জিত বাহির দেখিয়া বিধাতা-পুরুষেরও সাধ্য নাই যে বুঝিতে পারেন, আমরা নিরন্ন। ইহাই সাংঘাতিক অবস্থা। মিথ্যা আজ সত্যের মুখোস পরিয়া প্রতারণা করিতেছে, গিল্টিকরা পিতল কি না সোনার দরে বাজারে বিকাইতেছে। এই মোহই আজ মানুষের বিচারবুদ্ধিকে পর্য্যন্ত অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। যে বিচারবুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া মানুষ মোহমুক্ত হইবে সেই বুদ্ধিই আজ বিকৃত। সহরের দশ বিশটা চাকুরী কি দেশজোড়া সকলের অন্নসংস্থান করিতে পারে? যে সহর আমাদের পল্লী-জীবনের কবর রচনা করিয়াছে সেখানে কি প্রাণের সন্ধান মিলিবে? গ্রামের এই ভস্মস্তূপের ভিতরেই রহিয়াছে আমাদের অমর প্রাণ; আমাদেরই বিগলিত সমবেদনার উত্তাপে প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে মরা গ্রামে প্রাণ পাইয়া আবার কথা কহিয়া উঠিবে। মরা লক্ষীন্দর বেহুলা সতীর তপস্যায় আবার বাঁচিয়া উঠিবে। প্রাকৃতিক নিয়মে রোগ যেখানে... ঔষধও সেখানেই থাকে। আমাদের রোগমুক্তির ঔষধ গ্রামেরই ভিতরে রহিয়াছে। এই ঔষধ আমাদিগকেই আবিষ্কার করিতে হইবে। তবেই যেমন ছিলাম তেমনটি হইয়া বর্ত্তমানের প্রগতির সহিত তাল ঠিক রাখিয়া আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিসহ চলিতে সক্ষম হইব। এখনও প্রতিকারের সময় আছে এবং প্রতিকারের অতি শুভ মুহূর্ত্ত আজ জাতির জীবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ ইংরাজ তার ভারত-শাসনে যে মারাত্মক ভুল হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে আর সেই ভুল সংশোধনের জন্য আজ সরকার অনেক কিছুই করিতেছেন। গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন, গ্রাম্য বিচার, গ্রাম্য সমবায়, গ্রাম্য শিক্ষা, পল্লীমঙ্গল, পল্লী-উন্নয়ন, গ্রাম্য শিল্প-বিদ্যালয়, কৃষি-বিদ্যালয়, কচুরী-ধ্বংস, পানীয় জলের ব্যবস্থা, ডাক্তারখানা, গো-জাতির উন্নয়ন ইত্যাদি নানারূপ হিতকর চেষ্টা দ্বারা মুমূর্ষু গ্রামকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু যে-চিকিৎসায় বিকৃত রুগ্ন গ্রাম নবজীবন লাভ করিয়া আবার সুস্থ হইয়া উঠিতে পারে, সেই চিকিৎসা আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। এখানে একটু ইনজেকশন, ওখানে একটু মালিশ, সেখানে একটু ফোমেণ্ট, একটু ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি ছাড়া-ছাড়া বিচ্ছিন্ন

হাতুড়ে চিকিৎসায় কি জাতীয় জীবনের এতদিনের পুরাতন ব্যাধি সারে? যে ভারতবর্ষকে ইতিহাস "সোনার ভারতবর্ষ" বলিত, যে দেশ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের "মুকুট-মণি", সেই মুকুট-মণির আজ এ দুর্দ্দশা কেন হইল বুঝিতে হইলে আমাদিগকে একেবারে সমস্যার মূলে যাইতে হইবে। ভারতের যে-ব্যবস্থায় একদিন এ-দেশের প্রত্যেকটি মানুষেরই ডাল-ভাতের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, যে ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ পর-মুখাপেক্ষী না হইয়া সুখে-শান্তিতে কালাতিপাত করিত, সেই ব্যবস্থাই এ দেশের দেশজাত ব্যবস্থা। সেই সার্ব্ব-জনীন ব্যবস্থা দেশে পুনরায় প্রবর্ত্তন করিতে পারিলেই আবার দেশ বাঁচিয়া উঠিবে, সকলেই ডাল-ভাতের কর্ম্মক্ষেত্র লাভ করিয়া আবার সুখী হইতে পারিবে। উহাই বর্ত্তমান সমস্যার একমাত্র প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্। দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাবস্থাটির ব্যবহারিক দিক্ বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষে শতকরা আশীজন কৃষক আছে। লোক-সংখ্যার অনুপাতে যে-পরিমাণ চাষের জমী আমাদের থাকা একান্ত আবশ্যক সেই পরিমাণ জমী চাষ-বাস করিয়া শস্য ফলাইতে শতকরা ঐ আশীজন কৃষকেরই প্রয়োজন আছে। সুতরাং লোক-সংখ্যার শতকরা আশী-জনের বংশপরম্পরা ডাল-ভাত সংস্থানের কর্ম্মক্ষেত্র হইল তাহাদের নিজ নিজ কৃষিক্ষেত্র। বাকী কুড়িজনের ভিতরে দশজন শিল্পী-জীবী ছিলেন। তাঁহারাও বংশপরম্পরা নিজ নিজ হস্তনির্ম্মিত শিল্প-বস্তুর বিনিময়ে ডাল-ভাতের জোগাড় করিতেন। বাকী দশজনের ভিতরে পাঁচজন ছিলেন জমিদার, তালুকদার, মহাজন ইত্যাদি। ইঁহাদের তালুক বা মহাজনী হইতেই ইঁহাদের ডাল-ভাতের জোগাড় হইত। অবশিষ্ট যে পাঁচজন, ইঁহারাই ছিলেন দেশের সত্যিকার চাকুরীজীবী। বংশপরম্পরা চাকুরী করিয়া ইঁহারা নিজ নিজ ডাল ভাতের জোগাড় করিতেন। এইরূপে দেশের সমস্ত শ্রমার্জ্জিত সম্পদ্ সকলকেই সমান ভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই ভাগমত শ্রমের ব্যবস্থাকে বংশপরম্পরা করা হইয়াছিল—কর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য। এখন যদি একজন কৃষিজীবীকে চাকুরী দেওয়া হয়, তবে তাহাকে ডাল-ভাত জোগাড়ের ডবল সুযোগ দেওয়া হইল। কেন না বংশপরম্পরা ডাল-ভাতের নির্দ্দিষ্ট কৃষিক্ষেত্র ত তার আছেই।

তাহার ফলে এই হইল যে, তিনি একটি প্রকৃত চাকুরীজীবীর ভাত মারিলেন। আর তাহারই ফলে সমাজে সমবায়-নীতি ভাঙিয়া গেল। শিল্পী-জীবী, তালুকদার জমীদার প্রভৃতিদের সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। প্রাচীন ব্যবস্থায় যিনি যে বিভাগে কর্ম্ম করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে শান্ত গ্রাম্যজীবন যাপন করিতেন, সেই ব্যবস্থাই ইংরাজ শাসনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে সমাজে ভয়াবহ কর্ম্মসঙ্কর উপস্থিত হইয়াছে। সমাজের পক্ষে এই কর্ম্মসঙ্কর রাষ্ট্র বিপ্লবের অপেক্ষাও ভয়াবহ।

আজ চাকুরীর কমন প্লাটফরমে সকলেই সার্টিফিকেট ও দরখাস্ত হস্তে দণ্ডায়মান। সম্প্রদায়গত সংখ্যা হিসাবে গণনা করিয়া চাকুরীর সংখ্যা কোন্ সম্প্রদায়ের কত হইতে পারে, তাহার চুলচেরা ভাগাভাগি চলিতেছে। রাষ্ট্রের বড়-কর্ত্তাদের এই সব বালকোচিত ব্যবস্থা দেখিয়া যেমন পায় হাসি তেমনি হয় দুঃখ। যাহারা প্রকৃত চাকুরী-জীবী… চাকুরী তাহারাই পাইবে। সেখানে জাতি-বিভাগ নাই, সম্প্রদায় বিভাগ নাই। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেবার বেলা কি কেহ তাহার জাতিকুলশীল বিচার করিয়া ভিক্ষা দেয়? প্রকৃত চাকুরী-জীবী কে? যাহার খাস জমী-জমা নাই…যিনি শিল্পী নন…যাহার প্রতিভা নাই…সেই সব তৃতীয় শ্রেণীর লোকই বংশপরম্পরা চাকুরী করিয়া কোন মতে টিকিয়া আছেন। কৃষক চাকুরীজীবীর কোঠায় আসিতে পারেন না। তাঁহাকে জোর করিয়া চাকুরী দেওয়ার অর্থ হইল, তাঁহার বংশপরম্পরা স্বাধীনতাকে হত্যা করা। শিল্পী সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। ইঁহাদের চাকুরী দেওয়া—তার অর্থ ইঁহাদিগকে দুই রকমে সুযোগ দেওয়া। এই ডবল সুযোগে ইঁহাদের সুযোগ নয়, ইঁহাদের ভয়াবহ দুর্য্যোগ। কেন না, ইঁহাদের জন্মস্বত্ব—ডাল-ভাতের পাকা দলিল (birth right) চাকুরীর হাটে বিকাইয়া গেল। অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র লইয়া অচিরেই ইঁহারা ভিক্ষুক হইতে চলিয়াছেন। কেন না চাকুরী কখনও ডাল ভাতের পাকা দলিল হইতে পারে না। বর্ত্তমান রাষ্ট্রের আইন ডাল-ভাতের প্রাচীন ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া দিয়াছে,

আর তারই ফলে ভয়াবহ কর্ম্ম-সঙ্করের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই হইল জাতীয় জীবনের ক্যান্সার। ইহারই ফলে দেশ আজ রসাতলে ডুবিয়া যাইতেছে।···সর্ব্বত্র ক্ষুধার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আজ চাকুরের ঘরেও অন্ন নাই, কৃষকের ঘরেও অন্ন নাই, শিল্পীও মরিতে বসিয়াছে। তাই আজ সর্ব্বত্র সমস্যার পর সমস্যা ঘনাইয়া উঠিতেছে, রাষ্ট্রযন্ত্র বিকল হইয়া পড়িতেছে। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ আজ আইন-শৃঙ্খলা ভাঙিয়া ভয়াবহ অরাজকতার সৃষ্টি করিতেছে। এখানে ধর্ম্মঘট, ওখানে কলিসন—ক্ষুধিত কৃষকদের অভিযান, শ্রমিক-বাদের অসন্তোষ, ছাত্রদের স্কুল-কলেজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ত্যাগ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হানাহানি, দেবমন্দিরের মূর্ত্তি ভাঙিয়া ফেলা, সঙ্ঘবদ্ধভাবে জেলে যাওয়া, অহিংস সত্যাগ্রহ, অহিংস উপবাস প্রভৃতি অরাজক ব্যাপার প্রতিদিন সংবাদ-পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইতেছে। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয়, কি প্রলয়ঙ্কর বেদনার আগুন গোটা দেশের বুকের ভিতরে রাবণের চিতার আগুনের মত দিন-রাত জ্বলিতেছে। কর্ম্ম-সঙ্করতাই ইহার একমাত্র কারণ। চাকুরীর মিথ্যা লোভ দেশের প্রকৃত কর্ম্মীদিগকে কর্ম্মস্থান হইতে চ্যুত করিয়াছে বলিয়াই আজ এইরূপ অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। এই রুগ্ন বিকৃত দেশকে যদি আবার সুন্দর সবল করিতে হয়, তবে একমাত্র প্রেসক্রিপ্সন হইল দেশের কর্ম্মীদিগকে আবার নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে রাখা এবং উহাদের কর্ম্মস্থল-গুলি উন্নত করিয়া তোলা। চাকুরীর লোভ দিয়া উহাদের সর্ব্বনাশ সাধন না করিয়া যাহাতে কৃষিকর্ম্ম করিয়াই উহারা পূর্ব্ববৎ সুখে থাকিতে পারে···দেশের শিল্পিগণ যাহাতে নিজ নিজ হস্তনির্ম্মিত শিল্প সৃষ্টি করতঃ দেশের চাহিদা মিটাইয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। শূদ্রবৃত্তি কৃষক ও শিল্পীর স্বধর্ম্ম নয়। চাকুরীর ন্যায়সঙ্গত দাবী তাহাদের যাহাদের জমী-জমা নাই এবং প্রতিভা নাই। এই শূদ্রবৃত্তি তাহাদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং চাকুরীর হাটে 'সংখ্যালঘিষ্ঠ' 'সংখ্যাগরিষ্ঠে'র কোন অর্থই হয় না। দেশে প্রকৃত চাকুরীজীবীর সংখ্যা বর্ত্তমানে কত তাহা অবগত হইবার জন্য সরকার বাহাদুরের একটি নির্ভুল, নিরপেক্ষ সেন্সাস করিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই সরকার বুঝিতে পারিবেন যে চাকুরীর সত্যিকার দাবী কাহাদের আছে।

শুনিয়াছি যদুবংশের যখন অতিবৃদ্ধি হইয়াছিল, তখন সেই বংশেরই একটি ছেলে এক 'মুশল' প্রসব করিয়াছিল। সেই মুশলই ঐ বংশের আত্মহত্যার কারণ হইয়াছিল। আমরাও একদিন এই যে চাকুরীরূপ মুশল সৃষ্টি করিয়াছিলাম, সেই মুশলই আজ আমাদের আত্মহত্যার কারণ-স্বরূপ হইয়াছে। এই মুশলই আজ দেশে-দেশে, সমাজে-সমাজে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, মানুষে-মানুষে হিংসা-বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। আজ ইহারই জন্য আমরা নিজেরা নিজেরা মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছি আর বিদেশের মানুষ আমাদের জীবন-নাটকের এই করুণ প্রহসন দেখিয়া হাসিতেছে।

এই মুষলই ভারতের সাত লক্ষগ্রামকে হত্যা করিয়াছে—এক কথায় গোটা ভারতবর্ষকে হত্যা করিয়াছে। গ্রামমেধের আগুন আজ সর্ব্বত্রই ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। এ-আগুন আমাদিগকেই নিভাইতে হইবে। তাই আজ বিধাতার নিকট আমাদের সমবেত প্রার্থনা—এই আত্মঘাতী সর্ব্বনাশা মুশলের হাত হইতে, এই অপমান ও দুর্গতি হইতে—পরাধীনতার এই নাগপাশ হইতে আমাদের রক্ষা কর।

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

ভেজেনের বিবাহে থিয়েটারের কথা ছিল। প্রীতিভোজ বাদ গেল, অভিনেতাগণ থিয়েটার বাদ দিতে দিল না। দুই-দিন পিছাইয়া গেল মাত্র।

দ্বিজেনের ইচ্ছা বাড়ীশুদ্ধ থিয়েটার দেখে—সেটা সম্ভব হইল না। দিদি গেলে নববধূকেও লইয়া যাইতেন—তাহার জন্যই থিয়েটার।

কেহ যখন রাজী হইল না—দ্বিজেন বলিল, "বাবা—ওরা কেউ যাবে না - বৌদি ভাল আছে সেও যেতে চাইছে না।"

"না—যাক—যাবে বৈ কি।"

লীলা ও পদ্মা জ্বর লইয়াই তৈয়ারী হইল—সখও আছে—থিয়েটার দেখিয়া আসিয়া মাথা বাঁধিয়া শুইয়া থাকিলেই হইবে।

দ্বিজেন একপাক ঘুরিয়া আসিয়া বলিল—"এখনো কাপড় পরা হয় নি? যান্ আমি নিয়ে যাব না, এত দেরি? এসব ঢিলে মানুষ নিয়ে আমার চল্‌বে না।"

দ্বিজেন গেল খুড়ীমার বাড়ীতে তাড়া দিতে।

দ্বিজেন হঠাৎ-রাগী মানুষ—যেমন গলা তেমনি চলন, ধাক্কা দিয়া দরজা খোলে, ধপাস করিয়া বন্ধ করে। বাহিরের ফুলবাগানে কথা বলিলে পুকুর-ঘাট হইতে শোনা যায়, বাড়ীতে পদার্পণমাত্র লোকে বুঝিতে পারে যে, হাঁ দ্বিজেন আসিল।

লীলারা বুঝিল দ্বিজেন রাগ করিয়া গিয়াছে অতএব ক্ষুণ্ণ মনে দুই যায়ে কাপড় গহনা খুলিয়া শয়নের উদ্যোগ করিল।

তখনই খুড়ীমার দল আগে, পিছনে চটাস্ চটাস্ চটির শব্দে দ্বিজেনের আবির্ভাব ঘটিল। খুড়ীমার সখও লীলাদের মত—জ্বর গায়েই আসিয়াছেন—বলিলেন, "বাবা রে বাবা, দুদুর কি রাগ—কই লীলারা কই? গিয়ে বসে থাকব ঘণ্টা খানেক—তবু নিয়ে বসিয়ে রাখবে।"

দিদি বলিলেন—"লীলারা ধমক খেয়ে শুয়েছে।" দ্বিজেন ঘরে ঢুকিল—"এ কি? শুয়ে যে? পোষাক খুলে ফেলা হয়েছে—শীগগির উঠুন—পরুন কাপড়—আমরা থিয়েটার করব—আর ওঁরা দেখবেন না, মজার কথা আর কি!"

লীলা বলল—"নিয়ে যাবেন না বললেন।"

"বলেছি ত কি হয়েছে? অত দেরি করেন কেন? আবার রাগ—দিদিদের ধারা শেখা হচ্ছে - শীগগির উঠুন।"

আবার দুইজনে উঠিয়া বেশভূষা আরম্ভ করিল।

সুরুচি বলিলেন—"লীলা, তোমাদের লজ্জাও নেই—সত্যি চললে? আমি হলে কিছুতে যেতাম না।"

লীলা একটু হাসিল—আনন্দের হাসি—বকুনি দিলেও আনন্দ! কথা মিথ্যা নয়—বউদের রাগ নাই মোটেও।

বিশ্বকর্ম্মার মনে সন্দেহ—এ মেয়ে সে মেয়ে নয়—চৈত্র মাসে তিনি ও প্রফুল্ল যাহাকে দেখিয়াছিলেন। সে খুব বলিষ্ঠগঠনা ছিল—এ পাতলা চেহারার। মনের কথা সকলের কাছে প্রকাশ করিলেন, বলিলেন—"আমার মনে হচ্ছে তারা মেয়ে বদল করেছে—নয় রে খোকা?"

প্রফুল্ল বলিল—"আমি ঠিক বুঝতে পারি নে।"

"নিশ্চয়—সে নয়—সে ছিল একটা জাঁদরেল গোছের—চলতে মাটী কাঁপত, বসলে চেয়ার ভাঙত—কথা বললে গম্ গম্ আওয়াজ হত—আর এ নিতান্ত নিরীহ—তবে তার চেয়ে এ ঢের বেশী ফরসা।"

দিদি বলিলেন—"তবে খুব ভালই হয়েছে—নতুন বৌ জাঁদরেল হলেই বিপদ্।"

বিশ্বকর্ম্মা ঘরে গিয়া ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করেন—"বগুড়ায় তোমায় দেখতে কে কে গেছল বল দেখি?"

"আপনি আর বট্‌ঠাকুর।"

"তুমি সে মেয়ে কিছুতে নও—তবে বাড়ীতেই ছিলে—উঁকি দিয়ে দেখে গেছিলে।"

ইন্দিরা হাসিয়া বলে "আমি গোসাইবাবু, আমিই সেই।"

"উঁহুঁ—কক্ষনো না—এত রোগা হলে কেন?"

"যোশেখ দামটা জরে ভুলেছি যে।"

তথাপি বিশ্বকর্ম্মার বিশ্বাস হইল না, এবং আজও হয় নাই। তাঁহার মনের ভাব সংক্রামিত হইয়া সকলেরই মনে একটা বদ্ধ ধারণা রহিয়াছে যে এ সে নয়।

সরোজিনী সরোজকে বলিয়াছে যে, তাহাদের 'তত্ত্ব'জা না থাকায় তার বাবা বছরে দুটি তত্ত্ব কম দিয়াছেন। তাহা দিদিকে এখনও দেন।

সরোজ সুরুচিকে বলিল, "খুড়ীমা, আপনারা যেম বোকা, আপনার বেয়ান তেমনি ঠকিয়েছে—আমার বং শালীর আট বছর বিয়ে হয়েছে—এখনো সব ক'টা তত্ত্ব তার যুগে নেয়—আমরা জানিনে বলে ফাঁকি দিয়েছেন।"

ইতোমধ্যে শীতের, জামাইষষ্ঠীর ও পূজার তত্ত্ব দেখিয় মেজ-বৌ বেশ অজস্র হইয়াছেন, তিনি বলিলেন—"এইতে ৎ রাগ করে, বলে কেন এত পরের জিনিষ ঘরে তোলা? কেন আমি কি জামাই নই?"

মেজ-বৌ বলিলেন "এটা ভাল নয়—নিজের মেয়ে ত বটে, দুটিকেই সমান দেখতে হয়, আমরা চাই বা না চাই। আর দেনই বা কি, সবই ত জামাই-মেয়ের, কতকগুলো বাজারের মিষ্টি দেঠাই। তাই আর সবার।"

সুরুচি বলিলেন—"মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ"

"এঁকুড়ি যেঁকুড়ি রাখ—ভাল করে বল।"

"মানে মিষ্টি মিঠাই সব ইতর জনের জন্যে।"

"তা সত্যি আমাদের উঁরা ইতর বলেই ভাবেন। শ্বশুর কেমন এসে জামাইটিকে নেমন্তন্ন করে যান আর কাকপক্ষীটি না, তোকে ত একটি দিন নিলে না, তোরাই টানাটানি করিস বেয়াই বেয়ান নিয়ে। দেখেও লোকে শেখে। এই যে জামাইটি আর মেয়েটি ছাড়া আর কেউ কিছু না, এটি আমাদের দেশে হক দেখি, আগে সবাই পরে জামাই।"

সরোজিনী প্রায়ই বাপের বাড়ী যায়, সুরুচি বলিলেন, "আর তত্ত্ব পাঠাতে বারণ করে দিবো, আমার লজ্জা করে, শুধু শুধু কেন ও সব পাঠানো?"

ক্রমান্বয়ে বিশ্বকর্ম্মা বদলী হইয়া চলিয়া গেলেন—মেদিনীপুর ছাড়িয়া বরাবর উত্তরে।

নাটোর হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের রাজত্ব। সুতরাং চেনা লোক ও আত্মীয়কুটুম্বের অভা নাই সে দিকে, বিশ্বকর্ম্মা পৌঁছিবার আগেই সকে "ক্যালকাটা গেজেট" মারফৎ জানিতে পারিয়াছে। পৌঁছি মাত্র দিবা-রাত্র দেখা-সাক্ষাৎ।

দিন দুই পরে জরুরী কাজে মফঃস্বল যাইতে হইল গাড়ীতে উঠিবার সময় বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "এই দেখ, ক বড় একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি, যে ফিজ,— তারার একটা সম্বন্ধ করেছেন রসিক বাবু—বিকাল বেল গিয়ে ছেলেটি দেখে এস।"

তারা ফণীর বড় ভাইয়ের মেয়ে—তাহারা পাবনায় থাকে

সুরুচি অবাক্ হইয়া বলিলেন, "সে আবার কি? কাউকে চিনি নে জানি নে—কোথা যাব?"

"ফণী জানে—ওকে নিয়ে যেয়ো।"

"তুমি এসে যেয়ো।"

"না—না, আমি বলে দিয়েছি তুমি যাবে।"

"কি যন্ত্রণা! কে তোমায় কথা দিতে বলেছিল?"

"ওরা তোমায় খেয়ে ফেলবে না—ভয় নেই, আমাদের বাড়ীর কাছে বাড়ী, যেয়ো কিন্তু, নইলে ভয়ানক লজ্জায় পড়ব।"

"পড়াই উচিত—মেয়েরা পাত্র দেখতে যায় কোথা?"

"বিংশ শতাব্দীতে মেয়েরাই সব করবে যে? এরোপ্লেনে সাগর পাড়ি দিচ্ছে—সাঁতারে রেকর্ড রাখছে, একটা ছেলে দেখে আসতে পারবে না? আলবাৎ পারতে হবে।"

সুরুচি কথা কহিলেন না।

"যেয়ো লক্ষ্মী মেয়ো, স্বামীর মান রাখবে নিজের সুবিধা না দেখে—তবে না সাধ্বী? ছেলেটি কলকাতায় চলে যাবে আজ—তাই তাঁদের এত গরজ।"

বৈকাল বেলা সুরুচিকে যাইতে হইল পাত্র দেখিতে, —ছেলের মা খুব আদর-যত্ন করিলেন। অবস্থা বেশ ভাল, দেখিতেও ভালই ছেলেটি, ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়া এখন গান বাজনা লইয়া কাটায়, খুব ওস্তাদ গাইয়ে।

সুরুচিদের দেশের আত্মীয় সেই রসিক বাবু—দু'পক্ষেই তিনি, ছেলেকে বলিলেন, গান গাহিয়া শুনাইতে।

সুরুচি বিপদগ্রস্ত হইলেন, বারণ করিলে অভদ্রতা হয় ছেলের মার ইচ্ছাও যে গান গায়। একটু হাসিও পাইল "এ কি মেয়ে দেখা না কি?"

ছেলেটি হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান গাহিল—

"নিশি-জাগরণে প্রেয়সী কেন লো
ঢলিয়া পড়িছ ভুয়ে—"

সুরুচির সামনেই ছেলেটি বসিয়াছে, সুরুচি মুখ ফিরাইয়া জানালার দিকে চাহিয়া আছেন, বিশ্বকর্ম্মাকে এই সময় একবার পাইলে হইত!

এই ধরণের দুইটি গান গাহিয়া ছেলেটি একটু থামিল। মা এবং রসিক বাবু অনুরোধ করিতে লাগিলেন, "আর একটা গাও।"

সুরুচি আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, "দুটো গান উপরি উপরি গেয়ে কষ্ট হচ্ছে, একটু বিশ্রাম করুক।"

বলিয়াই উঠিয়া পড়িলেন।

রসিক বাবু প্রশ্ন করিলেন, "ছেলেটি আপনার পছন্দ হয়েছে? বেশ চমৎকার ছেলে, যেমন রূপ তেমনি গুণ।"

ছেলের মায়ের দিকে চাহিয়া সুরুচি বলিলেন, "আমি চিঠি লিখব, মেয়ের মা-বাপ যা লেখে, আপনাদের জানাব"—বলিয়া একেবারে গাড়ীতে।

বিশ্বকর্ম্মা বাড়ী ফিরিয়াই বলিলেন, "দেখতে গেছলে?"

"হাঁ।"।

"কেমন? কেমন? খুব না কি গাইয়ে?"

"তোমার যা কাণ্ড! অমন অসভ্য ছেলের সঙ্গে না কি মেয়ের বিয়ে দেয় লোকে। মা, বড় ভাই, রসিক বাবু, আমি একজন অচেনা, পাড়ার কত মেয়ে—তা' গান গাইলে কি না, লক্ষ বার 'প্রেয়সী' 'প্রেয়সী' বলে, একটা গানের শেষ হচ্ছে, 'বাঁধা বাহু-ডোরে হৃদয়ে হৃদয়ে'।"

বিশ্বকর্ম্মা সহাস্যে বলিলেন, "বাঃ ছেলেটি ত বেশ রসিক, বুদ্ধিমান। ওর এখন প্রেয়সী দরকার, মনটা উতলা হয়ে উঠেছে কি না, তাই দিদি-শাশুড়ীকে জানিয়ে দিলে।"

"কিন্তু তোমার বড় ভাইপোটি যে নেহাৎ বেরসিক—ও জামাই তার চলবে না, আমার ত মনে হলেই রাগ হচ্ছে।"

"নাঃ তোমায় পাঠিয়ে ভাল হয়নি, দিলে বিয়েটা পণ্ড করে।"

গৌরলাল চাকী নামে একটি ছেলে চাকরী করিতে আসিল। সুরুচি খুব দুঃখিত, ভদ্রঘরের ছেলে, লেখাপড়া করে নাই, নদীতে বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে, অবশেষে এই দুর্গতি।

গোরার গানের গলা বেশ ভাল—অভিনয়-ক্ষমতাটি অসাধারণ, যা দেখিবে, অবিকল নকল করিবে। সৌখীন জলখাবার তৈয়ারীতে সিদ্ধহস্ত, মুখে অষ্ট প্রহর খই ফুটিতেছে। দেশে প্রতিভার আদর নাই, নচেৎ সিনেমায় ঢুকিলে গোরা নামজাদা হইতে পারিত, কেই বা তাকে চেনে, আর কেই বা নেয়।

কিছুদিন পরে সুরুচির গোটা দুই টাকা হারাইল, কিছু বলিলেন না, রাগের চেয়ে সহানুভূতি হইল বেশী।

তারপরে হারাইল একটা দশ টাকার নোট।

সুরুচি গোরাকে বলিলেন, "গোরা আমার মনে হচ্ছে তুই নিয়েছিস্।"

"নিই নি, চেয়ে নেব মা, চুরি করব না।"

সুরুচির বিশ্বাস হইল না, তবে আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু গোরা কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বিশ্বকর্ম্মা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে। রাণী নোট টাকা বিছানায় ছড়িয়ে রাখেন, বাক্সে তুলতে কোন দিন দেখলাম না।"

সব সময় বাক্স খুলিয়া বাহির করা অসুবিধা বলিয়া সুরুচি কুড়ি টাকা করিয়া বাহির করিয়া একটা মানিব্যাগে দিনের বিছানার বালিশের তলায় রাখেন।

বিশ্বকর্ম্মার সেজ-দাদার ছোট মেয়ে সতী মেজ-বৌয়ের সঙ্গে আসিয়াছিল, মেজ-বৌ চলিয়া গেছেন—সে যায় নাই। তাহার বরফের উপর ভয়ানক ঝোঁক, বরফওয়ালাকে বলিয়াছে "আমার কয়টা বরফের বাঁচি এনে দিও, বুনে দেব।" বরফওয়ালা দাম চায়, সেই জন্য সে বার টাকা লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

জানিতে পারিয়া সকলে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল।

মাস দুই পরে গোরা আবার আসিয়া হাজির, নিজের দণ্ড স্বরূপে সুরুচি আর বেতন বেশী করিয়া দিলেন।

গোরার সখ হইল একদিন রান্না করিবে, ঠাকুরের উপর বিশ্বকর্ম্মা খুশী নন।

কি আয়োজন! কত রকম জিনিষ যে ছেঁচা হইল, গুঁড়া হইল, পেষা হইল, অন্ত নাই তার। একদণ্ড গোরা উনান ছাড়িয়া নড়িল না এবং মাংস, ডিম, মাছ হইতে মোচা, থোড় পর্য্যন্ত কিছুই বাদ গেল না। রান্নার পরে নিজের হাতে সমস্ত টেবিলে সাজাইয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু কি সাংঘাতিক লবণ, যেন সেরকে সের হিসাবে দেওয়া হইয়াছে

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "ব্যাটা খানিকটা লেবুর রস ঢেলে দিলেই পারত, আচার হয়ে যেত।"

পরে গোরা বলিল, "হয় ঠাকুর নয় নীহার-দা, চুপি চুপি নুন দিয়ে গিয়েছে।"

ফণী বলিল, "তুই ত আগাগোড়া আগলে বসে রইলি, দিলে কখন?"

"ওর মধ্যেই দেওয়া যায়, সাততলা বাড়ী থেকে চুরি করা যায়—এটা কি এমন কঠিন।"

গোরাকে শাসন করা বিপদ, তাহার মুখের ভঙ্গী দেখিলে হাসি চাপা মুস্কিল, হাসিয়া ফেলিলে শাসন চলে না, অতএব গোরা শাসনের বাহিরে।

মাইল তিনেক দূরে একটা বড় পুকুরে সাঁতারের বাজী খেলা হইবে বেলা পাঁচটা হইতে সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত। পুকুরের চারি পাশে দর্শকদের জায়গা, প্রকাণ্ড মেলাও বসিয়াছে।

গোরা যাইবে দেখিতে। ফণী বলিল, "তিন মাইল হেঁটে যাবি? কি দেখবি সাঁতারের, কলকাতার লোক না কি তুই?"

"কে হারে জেতে দেখব, যাব।"

"মরগে যা।"

গোরা চারিটার সময় রওনা হইল, রাত্রি প্রায় আটটায় ফিরিয়া আসিল। একবার সুরুচি ঘরের বাহির হইয়া দেখেন অন্ধকার সিঁড়িতে বসিয়া গোরা নিঃশব্দে দুই হাতে নিজের পা টিপিতেছে।

"ভয়ে চম্‌কে উঠেছি, ভূতের মত বসে আছিস্ কেন? কখন এলি?"

"মা, কষ্টই সার হল, আজ ভোরে উঠে নীহার-দার মুখ দেখেছিলাম, পা ফুলে গেছে, কেটে গেছে!"

ফণীর ঘর হইতে ফণী ও নীহার কথার শব্দে বাহির হইল। গোরা বলিল, "এই হেঁটে হেঁটে গেলাম, চার পয়সার টিকিট করে ভেতরে ঢুকলাম, বেড়া ডিঙ্গিয়ে।"

"বেড়া ডিঙ্গিয়ে কেন?"

"যে দোর খুলে দেয় সে ছিল না,—কে দেরি করে? লাফ দিয়ে পড়লাম এক কাঁটা গাছের ঝোপে—পা কেটে, কাপড় ছিঁড়ে একাকার।—বসতে যাচ্ছি অমনি দেখি সবাই হৈ হৈ করে উঠে দাঁড়াল—বললাম, "তোমরা উঠছ কেন?" বললেন, "হয়ে গেছে।" কি করি—আমার কাটা পা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এলাম।"

ফণী বলিল, "বেশ হয়েছে, বললে ত শুনবিনে তুই।"

"ঐ নীহার-দার জন্যে—আমি আর নীহার-দার ঘরে শোব না।"

গোরার সঙ্গে পারিবার যো নাই। নীহার বসিয়া আছে—আচম্‌কা পিছন হইতে গোরা দিল এক ধাক্কা, নীহার পড়িতে না পড়িতে সামনে আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—"ভাই নীহার-দা আর করব না—মাপ কর।"

দুপুর বেলা গিয়া ডাকে—"নীহার-দা, বাবু এসেছেন তোমায় ডাকছেন।"

নীহার তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখে মিথ্যা, গোরাকে মারিতে যায়, গোরা বলে, "রাগ করো না নীহার-দা, তোমার পায়ে পড়ি আমি তোমার ছোট ভাই।"

আর কি রাগ থাকে?

ফণীর পিছন পিছন গোরা ভেঙ্গাইয়া হাঁটে তাহার অনুকরণ করিয়া,—সকলের হাসি শুনিয়া ফণী পিছন ফিরিয়া ছড়ি লইয়া আসে—"দোহাই ফণী বাবু—নাক-খৎ দিচ্ছি।"

অষ্টপ্রহর গোরা সকলকে জ্বালাতন করে—সুরুচি বলেন, "গোরা এবার ওঁকে বলব।"

"না মা, আমি এখন অনেক ভাল হয়ে গেছি—জিজ্ঞেস করে দেখুন।"

ফণী বলে, "গোরা, কাকা অফিস থেকে এলে তুই ভেতরে আসিস নে কেন? ডাকতে হয় আবার।"

"কেন কেন, বাবু চুপি চুপি আসেন কেন?—আমরা কি জানি কখন এলেন? হুঁ—বলে আসেন না কেন?"

নীহার বলে—"হর্ণ শুনতে পাস না? তোর কপালে একদিন বাবুর হাতের পিট্টি আছে গোরা,—তা না হলে তুই ভাল হবি নে।"

"সে তুমি নীহার দা—সে তুমি, তুমি সব সময় বাবুর কাছে কাছে থাক—ভাল ভাল জিনিষ পাও, সঙ্গে সঙ্গে বেড়াও—পিট্টিও তুমিই পাবে, আমরা কেন? আমরা কেন? বললেই হল?"

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, "নীহার—শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম।"

সুরুচির একান্ত সাধ দিলীপ-মহিষী সুদক্ষিণার মত গাভী-পরিচর্য্যা করেন।

গাভীর খোঁজ পাওয়া গেল—বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "দুধ কতটা হয়?"

সুরুচি বলিলেন, "দুধ দিয়ে আমার দরকার কি—আমার গাই পেলেই হল

ফণী নিজে গিয়া দেখিয়া গাইটি কিনিয়া আনিল—গাইটির মেঘের মত কালো রং, কপালে তারার মত সাদা তিলক, চারিটি পা সাদা—লেজের আগাটি ধবধবে সাদা চামর—পঞ্চ-কল্যাণী ধেনু, সঙ্গে দশ দিনের একটি টুকটুকে লাল বাছুর। ধেনুর নাম হইল নন্দিনী আর বাছুরের নাম লালু।

নন্দিনী বড় ছোট—একটুখানি। নোয়ান শিং, শান্ত চলন, শান্ত চাহনি। দিন পনেরর মধ্যে নন্দিনী বাড়ীর একজন হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার সাবান, তাহার কম্বল, তাহার ব্রাশ লইয়া বাড়ী শুদ্ধ সেবায় ব্যস্ত, বৈকালে ব্রাশ করিতে একটু দেরী হইলে নন্দিনী ঘরের ভিতর চলিয়া আসে।

নন্দিনীকে বাঁধা হয় না, লালুকেও না। বাড়ীর ভিতরেও যেমন প্রকাণ্ড উঠান বাহিরেও তেমনি কম্পাউণ্ড, গেট বন্ধ থাকে—নন্দিনী স্বেচ্ছায় বৎস লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। নীহারের ছোলা, মটর ও শাকশব্জীর ক্ষেত নন্দিনী একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা আপন ঘরে বসিয়া কাজ করেন—লালু কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। নন্দিনী অকুণ্ঠ ভাবে সেই ঘরের ভিতর দিয়া একবার বাহিরে যায়—একবার আসে। বিশ্বকর্ম্মা চা খান—লালু মুখ বাড়ায়, প্লেটে তাহাকে ঢালিয়া দেন।

অন্যান্য ভদ্রলোক বাছুরের ব্যবহার দেখিয়া অবাক্—বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "এই ঘরটার উপর ওর ঝোঁক বেশী।"

সমস্ত দুপুর লালু সেই ঘরের মেঝেয় সতরঞ্চির উপর শুইয়া থাকে, একদিন ফুলদানীর ফুলগুলি খাইয়া ফেলিল, আর একদিন দু'খানা বড় বড় টাইপ করা কাগজ, নীহার দৌড়িয়া আসিয়া তাহার মুখ হইতে অর্দ্ধ-চর্ব্বিত কয়েক টুকরা টানিয়া বাহির করিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "ঘরটা বন্ধ করে রাখিস।"

নীহার বলিল, "মা, এ যদি আর কেউ করত বাপু জ্যান্ত রাখতেন না।"

খড়, খৈল নন্দিনী খুব কম খায়, নীহার বাজার হইতে ফিরিবা মাত্র তাহার পিছন পিছন আসে এবং নিজের ভাগ বুঝিয়া লয়। বাড়ীতে যে দিন খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ আয়োজন থাকে, নন্দিনীর জন্যও সে দিন দোকান হইতে ফর-মাস দেওয়া নিম্‌কী সিঙ্গাড়া জিলাপী আসে।

নন্দিনীর দুধ হয় প্রায় তিনসের, কিন্তু লালু খাইয়া যেটুকু বাঁচিবে, সেইটুকুই দুহিবার কথা। দুহিবার সময় সুরুচি কাছে দাঁড়াইয়া থাকেন।

পাড়ার মেয়েরা নন্দিনীর কাহিনী শুনিয়া মুগ্ধ, দেখিতে আসেন, বলেন, "এ বেলা কতখানি দুধ হয়?"

সুরুচি অবাক হইয়া বলেন, "এ বেলা মানে? হিন্দুরা দু'বার গাই দুইবে না কি? একবার যে দোয়া হয় সেই

তাঁহারা কথা পাল্টাইয়া বলেন, "তিন মাসের বাছুর দেখলে মনে হয়, বছর দুয়ের।"

সুরুচির মনে বড় দুঃখ—সকলে দুধের খোঁজ করে, লালু-নন্দিনীর সঙ্গে সম্পর্ক কি কেবল দুধের?

নীহার বলিল, "মা, ওঁরা সবাই দুই বেলা গাই দুয়ে নেন।"

লালু এখনও ঘাস খাইতে শেখে নাই, আদুরে ছেলের মত সর্ব্বত্র ঘুরে—মায়ের দুধও মন দিয়া খায় না। তা

ছাড়া ভয়ানক বাবু হইয়াছে; গোয়াল ঘরে চেটাই পাতা, তার উপরে খড় বিছান, সে বিছানায় লালু শোয় না, সে ঘরেও যায় না। রান্নাঘরের উঁচু চওড়া বারান্দার সন্ধ্যা না হইতেই উঠিয়া বসে, রাত্রে সেইখানেই থাকে। রাত্রে ঘুম ভাঙিলে সুরুচি উঠিয়া তাহাদের দেখিয়া যান, বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "তোমার যন্ত্রণায় রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার যো নেই—ওদের এ' ঘরে এনে রাখলেই পার।"

"ইচ্ছে করে, তোমার ভয়ে আনি নে।"

নন্দিনী যথার্থই কামধেনু, যখনই দুহিতে যাও, দুধ পাইবে। সে আসার পরে চায়ের দুধ আগের মত নিয়ম করিয়া রাখা হয় না, কি রাত্রে কি দিনে নীহার বাটি হাতে আসিয়া বলে, "দোখ নন্দিনী, একটু দুধ দে।"

এক পোয়া দেড় পোয়া দুধ সব সময়।

নন্দিনী তেমন শান্ত হইল না, সুরুচি তিরস্কার করেন, নন্দিনী তাঁর গায়ে মাথা ঘসে। লালু সেই যে সন্ধ্যার আগে বারান্দার এক দিকে বসে, বেলা হইবার আগে আর ওঠে না, কিন্তু নন্দিনী রাত্রি ভোর না হইতেই বেড়াইতে আরম্ভ করে। ঝোপ-জঙ্গলে ঢোকে, অন্ধকার মানে না। লালু আলো ছাড়িয়া এক পা যায় না।

ছ'মাস বয়সে লালু দুর্দান্ত হইয়া উঠিল। রাস্তা ঘাটে যায়—সকলে চেনে, যে দেখে বাড়ীতে দিয়া যায়। বন্ধুরা বিশ্বকর্ম্মাকে বলেন, "আপনার চেয়ে আপনার নন্দিনী সর্ব্ব-জনিত হয়ে গেছে, এ দেশের দুধ বড্ড খারাপ, বেশ করেছেন।"

"না ভাই দুধের খোঁজ রাখি নি, সব সময় নন্দিনীর সেবা চলছে তাই দেখতে পাই।"

"কেন?"

"আর কেন, আমার মেয়েটি বড় খামখেয়ালী, সেই জন্যে।"

"ও, তা মন্দ কি, এও সখ এক রকম, আপনার ছ'মাসের বাছুর ষাঁড় হয়ে দাঁড়িয়েছে দুধ খেয়ে খেয়ে।"

এক দিন বাজারে এক ব্যাপারী নীহারকে বলিতেছে, "দেখ ভাই, আর একটা বাছুর হলে এটা বিক্রী করবে ত? আমাকে দিয়ো, আগে বলে রাখলাম—দাম যা চাও দেব।"

নীহার বলিল, "পারবে দিতে?"

লোকটি গরুর গাড়ীর জন্য লালুকে চায় বলিল, "দেব, কত দাম বল?"

রণজিৎ সিংহের মত নীহার জবাব দিল "কুড়ি বেত, আগে কুড়ি বেত খাবে, তার পরে লালুকে কেনবার কথা বলবে। পাজি বদমাইস! আমাদের লালুকে তুমি কিনতে চাও? এতবড় আস্পর্দ্ধা! চল বাবুর কাছে।"

বাজারের মধ্যে বিষম গোলমাল! আউটপোষ্টের হাবিলদার উপস্থিত ছিল, সে ব্যাপারটা মিটাইয়া দিল।

বিদেশী যাযাবরদের কখনও মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়িতে নাই, ফল বড় মর্ম্মান্তিক হয়। কয়েকমাস পরেই ফল ফলিল।

কৃষি-প্রদর্শনী বসিয়াছে, বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "লালুকে মেলায় পাঠাতে হবে।"

লালু এখন কালু হইয়াছে, সুপুষ্ট সতেজকায় কালো মিশ্‌মিশে পালিশ, চক্‌চকে একটা ষাঁড় আট মাস বয়সেই।

গো-প্রদর্শনী বিভাগে যে লালু প্রথম স্থান অধিকার করিবে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। লোকে গাই কেনে দুধের জন্য, পরিচর্য্যা করে দুধের জন্য, বাছুরকে কেহই যত্ন করে না। ঘরে ঘরে পরিপুষ্ট গাই দেখিতে পাইবে, বাছুর কি একটাও সে রকম দেখা যায়? যত নিষ্ঠাবান হিন্দুর বাড়ীই হোক না কেন?

সকাল বেলা যথারীতি মা ও ছেলেকে সাবান দিয়া স্নান করান হইল, বেলা একটার সময় লালুকে লইয়া যাইতে প্রদর্শনীর লোক আসিয়াছে, কিন্তু কোথাও লালু নাই।

সুরুচি ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "আমারই অন্যায় হয়েছিল, লালু কেন মেলায় যেতে যাবে? ওর অপমান হয় না? মনের দুঃখে পালিয়েছে।"

সন্ধ্যার পরে গোবার উল্লসিত চীৎকার, "মা মা, লালু বসে রয়েছে।"

নিত্যকার মত লালু বাগানের দিকে মুখ করিয়া বারান্দায় বসিয়া আছে। রাত্রে লালুর সামনে যতই মহার্ঘ্য জিনিষ ধরা হোক না কেন, সে মুখ ফিরাইয়া দেখেও না—খায়ও না।

ফণী বলিল, "লালুকে একদিন বিক্রী করতেই হবে, বজ্জাৎ হলে তখন।"

সুরুচি এই ভাবনাটা চাপা দিয়া রাখেন, রাগ করিয়া বলেন, "সে ভাবনা তোমাদের কেন ?"

বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "সুদক্ষিণা যে কামনা নিয়ে গো-সেবা করতেন, মনে আছে ?"

"নিশ্চয় আছে, কিন্তু আমি কোন কামনা নিয়ে নন্দিনীর সেবা করি না, ভাল বেসে করি, মনে রেখ।"

চিঠিতে পিতার অসুখের খবর পাইয়া সুরুচি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, এদিকে নিজের শরীরও খুব খারাপ সেই সময় সুধীর আসিল।

সুরুচি বলিলেন, "আজই যাই চল।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আজ দিন ভাল নয়, কালও নয়। আজ চিঠি লিখে দাও—ষ্টেশনে গাড়ী রাখতে।"

পরদিন সন্ধ্যা ছ'টার ট্রেনে সুধীর ও সতীকে সঙ্গে লইয়া সুরুচি যাত্রা করিলেন।

রাত্রি এগারটায় ট্রেন হইতে নামিয়া দেখেন কেহ আসে নাই।

টিকিট-চেকার একবার গাড়ী হইতে নামিয়া একটু ঘুরিয়া আবার ট্রেনে গিয়া উঠিল, বলিল, "আপনার লোক বুঝি আসেনি, খুব অসুবিধা হবে ?"

সুরুচি বলিলেন, "আমাদের চেনা ষ্টেশন, কিছু ভাবনা নেই।"

গাড়ী দাঁড়ায় তিন মিনিট, অবিলম্বে ষ্টেশন ছাড়িয়া গেল। সুরুচি বলিলেন, "লোকটি বেশ ভদ্র।"

সুধীর বলিল, "চেকার-কুলোত্তম।"

"আচ্ছা, এখন গাড়ীর চেষ্টা দেখ, ভেবেছিলাম পথে তুই শ্বশুর-বাড়ী নেমে যাবি, তা আর হবে না।"

"আমিও এত রাত্রে শ্বশুর-বাড়ী যেতে চাইনে।"

ছোট ষ্টেশন, লোক জন মোটেই নাই। যা দু'চারজন ছিল, ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দ্ধান করিল। একটি কুলীর সন্ধান করিয়া তাহাকে বাক্স দুটি দিয়া সুরুচি বলিলেন, "গাড়ী পাওয়া যাবে না ?"

কুলী বলিল, "আছে একখানা চলুন।"

ষ্টেশন ছাড়াইয়া গাড়ীর আস্তানা, গাড়োয়ান কথাই কয় না, অনেক বলায় তিন গুণ ভাড়া চাহিল।

সুরুচি বলিলেন, "কেন, এটা ত গাড়ীরই সময়, কিছু বেশী দেব।"

"না আমার গরজ নেই, যা চেয়েছি দেন ত যান, নয় ত না।"

একে খাটিয়া ছাড়িয়া ওঠেই নাই, তার উপরে উদ্ধত সুরের এই কথা শুনিয়া সুরুচি ভীষণ রাগিয়া গেলেন, সুধীরকে বলিলেন, "চল আমি হেঁটেই যাব।"

"যে আজ্ঞে, কিন্তু পারবেন না।"

"পারব, ও লক্ষ্মীছাড়ার খোসামোদ করব না কিছুতে।"

কিন্তু ষ্টেশন ছাড়িয়া বাজারের মধ্যে পর্য্যন্ত আসিয়া সুরুচির পা আর চলে না।

দুইদিকে সারি সারি দোকান—দাঁড়াইবার জায়গা নাই। কিন্তু সুরুচির আর সাধ্য নাই, একটা চাঁপাগাছ তলায় দাঁড়াইলেন। কুলী বলিল, "ষ্টেশনের ওপারে অনেক গাড়ী পাওয়া যায়—আমার কথায় আসবে না—আপনি যান।"

সুধীর বলিল, "আপনি থাকতে পারবেন ?"

"পারব, তুই যা।"

সুধীর চলিয়া গেল। কুলী একটা বারান্দায় বাক্স নামাইয়া বসিল। দোকান-ঘরের লোকেরা বাহির হইয়া কয়েকবার দেখিয়া দেখিয়া ভিতরে গেল, শেষে একজন কাছে আসিয়া বলিল, "আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? সঙ্গে কেউ নেই ?"

সুরুচি বলিলেন, "আছে—গাড়ীর জন্যে গেছে।"

"এই ট্রেণে এলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তবে ঘরে এসে বসুন—না হয় বারান্দায় উঠে বসুন।"

"না, এই বেশ আছি।"

লোকটি দু'খানা চেয়ার আনিয়া গাছতলায় দিল—বলিল, "বারান্দায় বসলেই ভাল হত।"

"না, এখানে বেশ ঠাণ্ডা"—বলিয়া সেই লোহার চেয়ার দু'টিতে সতীকে লইয়া বসিলেন। দিনটা গরম মোটেই নয়, কিন্তু ঘরে কি বারান্দায় কাহারও আশ্রয়ের মধ্যে যাইবেন না। দোকানগুলি সবই খোলা এবং আলো জ্বলিতেছে, পথে আদৌ লোকজন নাই—ভয় ভয় করিতে লাগিল। হঠাৎ

বিপদ হওয়া বিচিত্র নয়, এবং হইলে পরিত্রাণের পথ কি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

দোকানের লোকগুলি অনবরত বাহির হইতেছে, এ-দোকানে ও-দোকানে যাইতেছে, দেখিলেই বোঝা যায়, উদ্দেশ্যহীন গমন অর্থাৎ কোন কাজের জন্য নয়, অকারণ। কুলীটি গামছা পাতিয়া ঘুমে অজ্ঞান, অন্ধকার আকাশের এক কোণে চাঁদের আলো দেখা দিল, কাছের কোন এক ঘড়িতে ঢং করিয়া বাজিল একটা—সতী চেয়ারে ঘুমাইতেছে, সুধীরের পাত্তা নাই। চমৎকার অবস্থা! ইহাকেই বলে দৈব! তথাপি সুরুচি ভাবিয়া বলিয়াছেন, "বাবার পরিচয় দেব না, লোকে বলিবে কি, তাঁর মেয়ে অত রাত্তির দোকানের সামনে গাছতলায় বসিয়া ছিল! তা ছাড়া পরিচয় দিলে ষ্টেশন মাষ্টারই গাড়ী যোগাড় করিয়া দিত। সম্মুখে থানা, সেখানে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র উপায় হয়, দরকার কি, বিনা পরিচয়েই দেখা যাক না কি হয়; ভয়ের সঙ্গে কৌতূহলও আছে।

লাঠি হাতে দুইটি লোক পথে যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া সুরুচিকে দেখিতেছে; সুরুচি বলিলেন, "একটা কাজ করে দেবেন?"

"কি কাজ?" লোক দুটি একটু আগাইয়া আসিল।

"আপনারা কে?"

"আমি থানার কনষ্টেবল, এ চৌকিদার, রোঁদে বেরিয়েছি।"

"ও, দেখুন আমি মাইল দুই দূরে যাব, একটা গাড়ী পাইনে, একটা গাড়ী এনে দেবেন? আমরা বড্ড বিপদে পড়েছি, যদি একটু উপকার করেন।"

"একটা গাড়ী ত ছিল দেখি।" দুইজন চলিয়া গেল। আধ ঘণ্টা না হইতেই গাড়ীর শব্দ ও গাড়ী আসিয়া হাজির, লোক দুটিও আসিয়াছে, কনষ্টেবলটি তাড়াতাড়ি বিছানাটা খুলিয়া পাতিয়া দিল, কুলীকে ডাকিয়া দিল, বলিল, "আপনি উঠুন।"

এতক্ষণে সুধীর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, দোকানদারেরা বাহির হইল, সুরুচি বলিলেন, "চেয়ার তুলে নেবেন।"

সুধীর প্রাণপণে খুঁজিয়াও গাড়ী পায় নাই। শেষে ফিরিয়াছে, ততক্ষণ গাড়ীতে বিছানা পাতা হইয়া গিয়াছে।

সত্য বলিতে কি, এই অবস্থা—এই অজ্ঞাত নূতন বিচিত্র অবস্থা সুরুচির ভাল লাগে, অভিনবত্ব জাগে। এমন একবার হইয়াছিল বাড়ী যাইতে, এমনি অচেনা মানুষের কাছে সাহায্য, আদরযত্ন পাইয়াছি যেন পরমাত্মীয়ের মত। সেই ইজারাদারটির কথা, ভদ্রলোকটির কথা আজও মনে আছে। বিশ্বকর্ম্মা বলিয়াছিলেন, "নাম-ধাম জেনে রাখনি কেন?" সে কথা সুরুচির মনেও হয় নাই। বিশ্বকর্ম্মার দুঃখ ও অনুতাপের অবধি নাই যে, সুরুচি এমন দশায় পড়িয়াছিলেন, স্থলে ও জলে। প্রায়ই বলেন, "যাও, স্বামীর সঙ্গে বিবাদ করে হাতে হাতে পাপের ফল পাও!"

কুলী বেচারীর কষ্টও আরামও, সুরুচি তাহাকে মজুরী দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

"বড় কষ্ট পেলেন মা, যান এবার।"

কনষ্টেবলরা দুনিয়ার মন্দ, এই লোকটি যেন কয়লার মধ্যে হীরা। সুরুচি বলিলেন, "আপনাদের উপকার চিরদিন মনে থাকবে।"

নিশি রাত্রি। গাড়ী না ছাড়া পর্য্যন্ত লোক দুটি দাঁড়াইয়া রহিল। নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে সহায় আপনি আসে, আসিতে বাধ্য। বহুদিন পরে সহসা অতর্কিতে শৈশবের মিশন-স্কুলে আবৃত্তি করা বাইবেলের তিনটি ঋষিবাক্য মনে পড়িল:

'ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের মহিমা', 'পৃথিবীতে শান্তি', 'মনুষ্যদিগেতে প্রীতি।'

বর্ষ-প্রবন্ধপঞ্জী

-শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

[এই পঞ্জীর পূর্ব্বাংশ গত আশ্বিন, কার্ত্তিক ও পৌষ (১৩৪৬) সংখ্যার "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৩৪৫ সালে 'পরিচয়' 'প্রবাসী', 'বঙ্গশ্রী', 'বসুমতী', 'বিচিত্রা' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার তালিকা এই পঞ্জীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পত্রিকাসমূহের সাঙ্কেতিক চিহ্ন এইরূপ :—প—পরিচয় ; প্র—প্রবাসী ; বং—বঙ্গশ্রী ; ব—বসুমতী ; বি—বিচিত্রা ও ভা—ভারতবর্ষ। সংখ্যাগুলি বর্ষ, খণ্ড এবং প্রকাশ সংখ্যাবাচক,—যথা, বং ৬।২।১ = বঙ্গশ্রী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।]

ব্যবহারিক শিল্প

৬৬ (রাসায়নিক শিল্প)

কাচের ইতিবৃত্ত ও ভারতে কাচ-শিল্প—শ্রীকালীচরণ ঘোষ
ভা ২৬।২।১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [১৩৯-৪২]

দিয়ের কথা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
বি ১২।১।৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ [৫৩০-৩৪]

বার্নিসের দেশীয় উপাদান - শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত
ব ১৭।২।৫ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ [৭৬৭-৭১]

বাংলার লবণ শিল্প—শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী
ভা ২৬।২।১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ [২৩-২৫]

ব্যবহারিক শষ্য-দ্রব্যাদি—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত
ব ১৭।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [৪০৮-২১]

ভারতের শিল্প-সংস্থান—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
বং ৬।১।৪ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [৫৮৭-৯০]
বং ৬।১।৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [৬৪০-৪৩]

৬৭ (শিল্পসামগ্রী)

চামড়ার হাতের কাজ—শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত
প্র ৩৮।২।২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ [২৩৩-৪১] ছবি ১৬

ভারতের শিল্প-সংস্থান - শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
বং ৬।২।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [৪৯-৫২]
বং ৬।২।৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ [৪৯৬-৫০১] মানচিত্র ১

রেশম-শিল্পের অবতারণা ও মুর্শিদাবাদ রেশমের পরিস্থিতি
—শ্রীকিরণেন্দু বাগচী
বং ৬।২।৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ [৬৭৬-৮২]
বং ৬।২।৬ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ [৮৪৭-৫৫]

সেলুলোজ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
বং ৬।১।৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৬৮০-৮২)

৬৮ (নির্ম্মাণশিল্প)

বাঙ্গালায় কারুশিল্পের ভবিষ্যৎ—শ্রীঅমরনাথ ঘোষ
ভা ২৫।২।৫ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৮০৬-০৮)

কলা

৭০ (কলা)

আধুনিক কলা—শ্রীযামিনীমোহন কর
ভা ২৫।২।৫ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৭২৮-৩৭) ছবি ১৫

৭১ (কলা সাধারণ)

কলা পরিষদের নব্য প্রদর্শনী [ষষ্ঠ বৎসর]—শ্রীযামিনীকান্ত সেন
বি ১২।২।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ [১০৯-১৩) ছবি ৫

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায়
রূপ-শিল্পের পরিচয়ের ব্যবস্থা—শ্রীকমলা রায়
প্র ৩৮।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [২৩৯-৪২] ছবি ৪

ছয় বোন—শ্রীরতিমোহন সামন্ত
ভা ২৫।২।৫ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [৬৮৬-৮৯]

ত্রোকাদেরো—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী
বং ৬।২।৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৬২৩-২৬) ছবি ৪

বৌদ্ধযুগে শিল্প-শিক্ষা—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
বি ১২।১।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (২৮৪-৮৮)

শিল্প-কমল—শ্রীবেলাবাসিনী গুহ
ভা ২৬।২।৪ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৬২০-২১)

শ্রীনিকেতন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বি ১২।১।৬ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৭১০-১৩)

সখের ফুলবাগান—শ্রীঅনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
ভা ২৫।২।৫ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৭১৭-২০)

৭২ (স্থাপত্য)

কাঞ্চনগর—কাঞ্জী—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
ব ১৭।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৫৬৫-৭১) ছবি ৩

৭২ ও ৭৫ (াপত্যশিল্প ও চিত্রবিদ্যা)

চীনের পিকিং প্রাসাদ মিউজিয়াম—ক. ন.
প্র ৩৮।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৪৩১-৩২)

৭২ (স্থাপত্যশিল্প)

প্রাচীন ভারতীয় সৌধ শিল্প—শ্রীবিমলাচরণ লাহা
ভা ২৬।২।১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৭৫-৭৮) ছবি ৩
বাঁশবেড়িয়া—হংসেশ্বরী—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
ব ১৭।১।৬ ; আশ্বিন , ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৯০১-৮) ছবি ৭
খিচিংয়ের প্রাচীন প্রত্নসম্পদ—ময়ূরভঞ্জ—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
ভা ২৫।২।৫ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৭ (৭৪৪-৬০) ছবি ২২
বঙ্গের পাল-শিল্প—শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
ভা ২৬।১।৫ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ ছবি ; ১৩
বিক্রমপুর লস্কর-দীঘির শিবমন্দির—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
প্র ৩৮।২।৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৮১২-১৫) ছবি ৪
বিক্রমপুরের ও বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি
—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
ভা ২৬।১।৪ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৬১৪-১৯) ; ছবি ১
ভারতীয় ভাস্কর্য্যের অন্তর ও বাহির—শ্রীযামিনীকান্ত সেন
ব ৬।২।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (১৮৫-৮৯) ছবি ৬

৭৪,৭৫ ও ৭৬ (অঙ্কন, চিত্রবিদ্যা ও তক্ষণশিল্প)

হাঙ্গেরীর লোকশিল্প—শ্রীপ্রমথনাথ রায়
প্র ৩৮।১।৪ ; শ্রাবণ,১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৫৭০-৭৩) ছবি ৬

৭৫ (চিত্রবিদ্যা)

আধুনিক চিত্রকলায় বাঙ্গলা দেশ—শ্রীযামিনীকান্ত সেন
বি ১২।১।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৪২-৪৭) ছবি ৭
ইউরোপীয় চিত্রকর্ম্ম—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
প্র ৩৮।২।৪ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১২ (৫১৪-২৫) ছবি ৮
একজন আধুনিক বাঙ্গালী শিল্পীর কথা—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
প্র ৩৮।১।৬ ; আশ্বিন ; ১৩৪৫ পৃঃ ৬ (৮৮৮-৯৩) ছবি ৯
চৈনিক চিত্রকলায় ছায়াপথ—শ্রীযামিনীকান্ত সেন
ভা ২৬।১।৪ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৫৭৯-৮৭) ছবি ১৬
পাপানের প্রাচীর-চিত্রাবলী—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়
প্র ৩৮।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (১২৭-৩৭) ছবি ১৩
বাংলার চিত্রশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা
—শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র নিয়োগী
প্র ৩৮।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৭১-৭৫)
বাংলার চিত্রশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা
শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্র ৩৮।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ (৪৫৭-৬০)
বাংলার পটচিত্র ও পোড়ামাটির ফলক—শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
ভা ২৬।২।৩ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৪৩৩-৩৭) ছবি ১২
রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর চিত্রকলা—শ্রীঅসিতকুমার হালদার
বি ১১।২।৫ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৫৭৭-৭৯)
শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রদর্শনী—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
প্র ৩৮।২।৫ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃ ৬ (৭৪১-৪৬) ছবি ১০
শিল্পী-পরিচয়—শ্রীপ্রকাশ বসু
ভা ২৬।১।৪ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৫৫২-৩৪) ছবি ৫

৭৮ (সঙ্গীত)

বাঙলায় 'আধুনিক সঙ্গীত'চর্চ্চা—শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী
ভা ২৬।২।৩ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৩৯১-৯২)

৭৮ (সঙ্গীত-শাস্ত্র)

বাংগালা গানের আদর্শ—শ্রীনারায়ণ চৌধুরী
বি ১২।২।৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৩৯৩-৯৭)
ভারতীয় সঙ্গীত—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
ভা ২৫।২।৫ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৬৯৬-৯৯)
ভা ২৬।১।২ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (২১০-১৭)
ভা ২৬।১।৩ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৩৯১-৯৪)
ভা ২৬।২।১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৭৮-৮১)
রবীন্দ্রনাথ ও কাব্যসঙ্গীত—দিলীপকুমার
ভা ২৫।২।৬ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৮৩৩-৩৭)
সনাতন সঙ্গীতের সরল সংস্করণ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল
ভা ২৬।২।৪ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৫১৩-১৯)

৭৯ (বিনোদন)

চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় নীতিশিক্ষা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
বং ৬।২।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (১২৯-৩০)
চিতাবাঘ—শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ
ভা ২৬।২।৩ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৩৮৫-৮৮) ছবি ২
জাপানে 'নাৎস্'—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
বি ১২।২।৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৩৪৫-৫১) ছবি ৪
যাত্রার পৌরাণিক নাটক ও অভিনয়—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র
বি ১২।২।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (১১৪-১৭)
শিকার-কাহিনী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ভা ২৬।২।২ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (২১৮-২১)
সমাজের উপর সিনেমার প্রভাব—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দাস
বি ১২।২।৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৩৭০-৭২)

৭৯ (বিনোদন) [শিকার]

হিমালয়ের বাঘ—শ্রীপুলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বি ১২।১।৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৫১৭-২৩) ছবি ১

সাহিত্য

৮০ (সাহিত্য)

আধুনিক সাহিত্যের উৎসমূল – শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
প্র ৩৮।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৬৪৭-৪৯)

৮০ (সাহিত্য, সাধারণ)

কাব্য ও ছন্দ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
বি ১২।১।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (১৫৭-১৬০)
ট্রাজেডি ও তাহার বিবর্ত্তন—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
প ৭.২.৪ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৬ (৯৫৮-৭৩)
পল্লী সাহিত্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ
বি ১২।২।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১ (১৩০)
বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী
ভা ২৬।২।৪ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৪৯৭-৫০৩)
বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যের আদর্শবাদ—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
প্র ৩৮।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৭-১৪)
বাঙ্গালা সাহিত্যে নারী—শ্রীঊর্ম্মিলা সেন
ভা ২৬।২।২ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (২৪৬-৫১)
বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা—মৌলবী একরামুদ্দীন
ভা ২৬।১।৫ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৭৯৯-৮০১)
বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ—ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
বি ১২।১।৩ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৭২০-২৩)
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ—ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
বি ১২।২।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৪৯-৫৭)
বি ১২।২।২ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (১৮৫-৯১)
বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ—শ্রীবিজনকুমার সেনগুপ্ত
বি ১১।২।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৫৬১-৬৬)
মরমী শরৎচন্দ্র—শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়
বি ১২।১।২ , ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (২২২-২৬)
মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য—শ্রীহেরম্ব চক্রবর্ত্তী
বি ১২।২।২ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (২২০-২১)
রবীন্দ্রকাব্যে সত্তিবাদের মূলতত্ত্ব—শ্রীকল্যাণকুমার সোম
বি ১১।২।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৪৫৩-৫৬)
রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতা—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
বি ১১।২।৩ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৩ (৪৪৭-৫৯)
রবীন্দ্র-সাহিত্যে সাধনার আদর্শ—শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন
বি ১১।২।৪ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৪২৭-৩০)
শিল্পী বঙ্কিম—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
বি ১১।২।৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৫৭১-৭৫)
সাহিত্য ও যুগধর্ম্ম—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
বি ১২।২।২ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (১৬৬-৭০)
সাহিত্য ও সংসার—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
ভা ২৫।২।৬ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৮৯৯-৯১)
সাহিত্যিক প্রশ্নোত্তর—শ্রীভোলানাথ ঘোষ
ভা ২৬।১।৪ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৫১৩-১৬)
হাস্যরসে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ
বি ১১।২।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৫২২-২৬)

৮১ (কাব্য)

আধুনিক বাংলা কবিতা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বং ৬।২।৬ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৮৫৬-৬২)
তালতলা সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত।
কবি রবীন্দ্রনাথ—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্র ৩৮।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১২ (১৮৮-১৯৯)
কবিত্বের একটি সূত্র—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
প্র ৩৮।২।১ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৮৯-৯১)
কাব্য ও সুনীতি—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
ব ১৭।২।২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (২০০-০৩)

৮১ (কাব্য-সাহিত্য)

কাব্যের মহত্ব—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
প ৭।২।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (১১৭২-৭৬)

৮১ (কাব্য)

নব-রত্নমালায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য
প্র ৩৮।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৬১২-১৭)

৮১ (বাংলা কাব্য)

মোক্ষধর্ম্ম

২৩ (হিন্দুধর্ম্ম মধ্যযুগীয়)

পল্লীগীতিতে ধর্ম্মভাব—শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
ভা ২৬।২।৪ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৫৮০-৮৯)

৮১ (কাব্য)

ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতা—শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

ব ১৭।২।৫ ; ফাল্গুন ১৩৪৪ ; পৃঃ ৬ (৭৯৪-৯৯)

রামায়ণ ও মহাভারতে বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীজনরঞ্জন রায়

ভা ২৬।২।৩ ; ফাল্গুন ১৩৪৪ ; পৃঃ ৫ (৩৯৩-৯৭)

ভারতীয় নাট্যের বেদমূলকতা—শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

ব ১৭।২২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৭ (১৯৩-১৯৯)

৮৪ (বাংলা গদ্যসাহিত্য)

বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

বি ১২।২।১ ; মাঘ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (১০৩-০)

বি ১২।২।২ ; ফাল্গুন ১৩৪৪ ; পৃঃ ২ (২০৬-০৭)

বি ১২।২।৩ ; চৈত্র ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (৩২৮-৩০)

৮৫ (বক্তৃতা)

অতঃপর ? —শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

বি ১১।২।৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৫ (৪৯৬-৫০০)

অরণ্য-দেবতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্র ৩৮।২।১ ; কার্ত্তিক ১৩৪৪ ; পৃঃ ২ (১৪৫-৪৬)

জে. বী. হ্যাভেল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্র ৩৮।২।৪ ; মাঘ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (৪৯৩-৯৫)

দু'একটি কথা—শ্রীমৃণালিনী গুপ্তা

বং ৬।১।৬ ; আষাঢ় ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (৮১৫-১৭)

নবদ্বীপের লেখকপল্লী—শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

ব ১৭।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৪ ; পৃঃ ৭ (৩৬১-৬৭)

নববর্ষ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্র ৩৮।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (১৭৬-৭৮)

পথনির্দ্দেশ—শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

বি ১১।২।৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (৬৩০-৩২)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

প্র ৩৮।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৫ (৩৬২-৬৬)

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিপূজা—

ব ১৭।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৪ ; পৃঃ ২৫ (৬৭৪-৯৮) ছবি ৮

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বি ১২।১।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৫ (১৬-২০)

বঙ্কিম-স্মৃতি—শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র ৩৮।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৪ ; পৃঃ ১ (৬৮২)

বঙ্গসাহিত্য ও কবি বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী

বি ১২।১।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৪ ; পৃঃ ৪ (৩৬১-৬৩)

মুক্তি-পাগল বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

প্র ৩৮।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৭ (৪০৩-০৯)

৮৫ (বক্তৃতা) [শোকোচ্ছ্বাস]

মৌলানা জিয়াউদ্দিন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্র ৩৮।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৪ ; পৃঃ ২ (৫৭৯-৮০)

৮৫ (বক্তৃতা)

রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বপরিচয়"—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

প্র ৩৮।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (২৪৪-৪৭)

রবীন্দ্রনাথের যুগ—শ্রীঅবনীনাথ রায়

বি ১২।১।৩ ; পৌষ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (৭৬১-৬৩)

৭ই পৌষ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্র ৩৮।২।৪ ; মাঘ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (৫৬৭-৬৯)

৮৬ (পত্রাবলী)

ইউরোপের চিঠি—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার

ভা ২৬।১।২ ; শ্রাবণ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৫ (১৯১-৯৫)

ভা ২৬।১।৫ ; কার্ত্তিক ১৩৪৪ ; পৃঃ ৫ (৭৮০-৮৪)

পত্রালাপ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্র ৩৮।২।৬ ; চৈত্র ১৩৪৪ ; পৃঃ ৪ (৭৮২-৮৫) ও
পৃঃ ২ (৮২১-২২)

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী—(শ্রীযুক্তা অবলা বসুকে লিখিত)

প্র ৩৮।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৪ ; পৃঃ ২ (৪৫৬-৫৭)

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী—[জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত]

প্র ৩৮।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (১-৩)

প্র ৩৮।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (১৭৩-৭৫)

প্র ৩৮।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (৩২১-২৩)

হ'য়ে ওঠা—দিলীপকুমার ও অন্নদানন্দ

ভা ২৬।২।১ ; পৌষ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৪ (২০-২৩)

৮৭ (বিদ্রূপাত্মক সাহিত্য)

রসসাহিত্যে পরশুরাম ও কেদারনাথ—শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ

বি ১২।১।৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৪ ; পৃঃ ৪ (৪৯৯-৫০২)

স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ;

প্র ৩৮।১।৬ ; আশ্বিন ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (৭৫৭-৫৯)

ইতি

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

অমর দরজা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

শীর্ণ চক্ষুদ্বয়ে বুঝি জল নামিয়া আসে। তাহার মেজমামার বাল্যবন্ধু শ্রীপতিবাবুর উপর অখণ্ড বিশ্বাস রাখিয়াছিল। শ্রীপতিবাবু কি মেজমামার অনুরোধ ঠেলিবেন? কিন্তু মেজমামার সুপারিশও ফাঁসিয়া গেল। মেজমামার বাল্যকালের বন্ধুত্বের দাবী, আজ কি ক্ষীণসূত্রে গ্রথিত, এ-দৃশ্য যে মেজমামা দেখেন নাই, সে জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। স্তূপীকৃত দরখাস্ত আর ব্যক্তিগত পত্রের অরণ্যের মাঝে, তাহার সুপারিশ-পত্র হারাইয়া গেল। শ্রীপতিবাবু তাঁহার বাল্যবন্ধুর ভাগিনেয়ের জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু দামী দামী অজস্র উপদেশ দিতে কার্পণ্য করেন নাই।

"বুঝলে হে, আজকালকার ছেলেরা বড্ড বেশী চাকরী-ঘেঁষা। এই চাকরী করা প্রবৃত্তিই, আমাদের জাতের মূল ভিত্তিকে ক্ষয় করে দিচ্ছে। চাকরী করে কি হবে, এতে কি জাত উন্নত হয়? হয় না। দেখ দেখি, মাড়োয়ারী, ইংরেজ, ওরা কি খালি চাকরী করে? ব্যবসা আরম্ভ কর, হোক না কেন প্রথমে অল্প পুঁজি। চেষ্টা আর যত্নে ঐ পুঁজিই এক দিন বিরাট হয়ে উঠবে। যাও ব্যবসা করগে, তোমাকে আমি ভাল যুক্তিই দিচ্ছি। কারণ, তুমি অনুকূলের ভাগনে। দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে, যে অভিজ্ঞতা, যে-জ্ঞান লাভ করবে সেটাই খাঁটি, বুঝলে? দেখেছ তো বড়বাজারে মাড়োয়ারীদের বড় বড় বাড়ী, জুড়ীগাড়ী? কিন্তু জান, ওরা কটা টাকা নিয়ে এদেশে আসে? কিছু না, মাত্র একটা লোটা আর একটা কম্বল। আচ্ছা এখন এস, যদি সুবিধে হয়, তবে খবর দেব। কিন্তু ব্যবসা করাই ভাল, বুঝলে—"

অমর রাস্তায় নামিল। গত রাতে মেজমামার পত্রখানি হাতে করিয়া মনে মনে অনেক স্বপ্ন সে রচনা করিয়াছিল। বেকার জীবনের এই অসহ্য দৈন্যের হাত হইতে, পরিত্রাণ লাভ করিয়া আবার নূতন ভাবে জীবন সুরু করিবে। এই স্যাঁত-সেঁতে ঘর, অনাহার, ছিন্ন মলিন বেশভূষার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, আবার মুক্ত জীবনের নূতন গন্ধে-স্বাদে, তাহার হৃদয় মন পূর্ণ হইয়া যাইবে। তাহার বিষণ্ণ, স্তিমিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন দরিদ্র জীবন নবজীবনের তীক্ষ্ণ রৌদ্রের প্রখরতায় ও শুভ্রতায় প্লাবিত হইবে। আবার নূতন গান, আবার নূতন সুর তাহার হৃদয়-বীণায় বাজিয়া উঠিবে। কিন্তু হইল না কিছুই, সেই ধাবমান, মুক্ত-ফেনসঙ্কুল দুর্নিবার জীবনের স্বপ্ন, একটা সীমাবদ্ধ নিষ্প্রাণ, অগভীর পূতিগন্ধময় স্থানেই বদ্ধ হইয়া গেল।

চারিদিকে মানুষের ভীড়, অজস্র জনতা। শীর্ণ, রুগ্ন ক্ষুধিত মানুষ সব যেন শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে। এই চলিষ্ণু জনস্রোত—ইহাদের জীবনে কি কোন বৈচিত্র্য আছে? মনে হাসি, গান, আনন্দ আছে? না, কিছুই নাই, ইহারাও ঠিক তাহার মত, এক অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে একটু বাতাসের জন্য মাথা কুটিয়া মরিতেছে। দুই বেলা দুই মুঠি অন্নের জন্য, অজস্র মিথ্যা, অজস্র ফাঁকির রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে চলিতে, অসত্যের পঙ্কিল প্রবাহে হাবুডুবু খাইতেছে। তাহাদের অতি ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডীর মাঝে, উহারা একান্ত স্বার্থপর, একান্ত একেলা।

অমরের মনে পড়িল, তাহার মার বিষাদস্নিগ্ধ মুখখানি। সে-মুখ সে কবে ভুলিয়া গিয়াছে। ছোট বেলায় মার কোলে মাথা রাখিয়া আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া, মার কণ্ঠে এক অপূর্ব্ব সুরের গান শুনিত। সে গান সে ভুলিয়া গিয়াছে। সে আজ গীতিহারা—তাহার জীবনে একদিন যে-চন্দ্রালোকের ছায়া অপূর্ব্ব মায়া সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ এই রুক্ষ দিবসের, শত সহস্র দৈন্যের মাঝে, তাহা যেন কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনে আর বুঝি সেই অপরূপ বসন্ত দেখা দিবে না। যদিও বা দেখা দেয়, তাহা দিবে মহামারীরূপে।

অমরের মনে হইতে লাগিল, ঈশ্বর নাই, প্রেম প্রীতি দয়া মায়া কিছু নাই। সব মিথ্যা, সব ভুল।

অমরের কোন দোষ নাই ; শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত খরচ করিয়া আজ এক বৎসরের মধ্যেও একটি চাকরী জুটাইতে পারে নাই। আশায় আশায় একটির পর একটি রাত কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশা বৃন্তহীন, আকাশে ফুল ফুটাইবার মতই বৃথা হইল। কাহারও নিকট এক পয়সা পাইবার উপায় নাই। আফশোষে দৈন্তে ও দুঃখে, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে। দেহ হইয়াছে শীর্ণ, চক্ষু নিষ্প্রভ ও জ্যোতিহীন।

দৈন্ত ও দারিদ্র্য সমস্ত ধৈর্য্যের কঠিন প্রাচীরকে ভাঙ্গিয়া শতমুখে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ভগবানের রাজ্য এমনি কঠিন, যেখানে ক্ষুধার সামগ্রী প্রচুর ফলে, কিন্তু প্রতি মুঠার জন্ত মূল্য চাই। পেটে দিবার কিছুই নাই। কোন দিন জল আর বাতাস। কিন্তু তবুও আশালতা ছিঁড়িয়া যায় না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া, মিথ্যা হয়রাণ হওয়াই সার হয়। অদ্ভুত কল্পনা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। উহা নিষ্করুণ—দুর্ব্বিষহ! মস্তিষ্কের প্রতি শিরা উপশিরা, যেন ছিঁড়িয়া পড়িতে চায়!

হাঁটিতে হাঁটিতে অমর তাহার বন্ধু অমলের বাড়ী গেল। সুন্দর দোতলা বাড়ী, পাশেই লাগাও একটা টিনের ঘরে একটা মোটর গাড়ী পর্য্যন্ত আছে। শ্বেত পাথরের মেঝে, জানালায় জানালায় সুদৃশ্য পরদা, দেওয়ালে বড় বড় ছবি আর সারা ঘরে দামী আসবাব-পত্র।

চারিদিকে রাশীকৃত বই আর সেই বইয়ের মাঝে অমল শুইয়া শুইয়া পড়িতেছে। ঘরের এক কোণে, অমলের বোন ষ্টোভে চায়ের জল গরম করিতেছে।

"কে—আরে এস এস।"

মেয়েটি চোখ তুলিয়া চাহিয়া, কেটলীতে আরও একটু জল দিয়া দিল। মৃদু হাসিয়া মেয়েটি বলিল, "যা হোক্, তবু৲ আজ খোঁজ করতে এলেন।"

অমল কহিল, "লক্ষ্মী বুলু, খানকয় পরোটা ভেজে দে না।"

"দিচ্ছি, কিন্তু খবর্দ্দার, আবার যদি সিগারেট খেয়ে ঘর-দোর নোংরা কর, তবে বুঝবে মজাটা।" দরজার পরদা [illegible] বাতাসে উড়াইয়া, বুলু চলিয়া গেল।

"কি [illegible], হ'ল না কি চাকরীটা ?"

অমর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "চাকরী ? না হল না কিন্তু আর না অমল! আর চাকরীর জন্ত দরজায় দরজায় ছুটব না। লোকের কাছে আর হাত পাতব না। এবার থেকে আমার যাত্রা সুরু হ'ল, সত্যিকারের লড়াই সুরু হ'ল।"

সবিস্ময়ে অমল কহিল, "যাত্রা সুরু হ'ল,—লড়াই,—তার মানে ?"

"মানে সহজ। নূতন জীবনের পথে যাত্রা করব। ভাগ্যের সঙ্গে শক্ত পাঞ্জা ধরে লড়াই করব। আমি সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে আজ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। এই প্রচলিত নিয়ম-কানুন, দয়া-মায়া, ভালবাসা, ভগবান্, এই জীর্ণ পৃথিবী, প্রচলিত সভ্যতা সব, সব কিছুরই বিরুদ্ধে। আমাদের জীবনের চারিদিকে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর—বুঝলে ? এই প্রাচীরকে ভাঙ্গবো। বিংশ শতাব্দীর এই যান্ত্রিক সভ্যতাকে মানুষ দেবতা বলে অর্ঘ্যও দিচ্ছে, কিন্তু মস্ত ভুল, সব মিথ্যা! আমাদের মনের গুহায়, হিরণ্ময় পাত্রে, যে-সুধা সঞ্চিত রয়েছে, সে আজও অনাস্বাদিত, সে আজও রহস্তময় যবনিকার অন্তরালে। আমিই সেই রহস্তকে ভাঙ্গবো।"

অমল বলিল, "তোমার কথা হেঁয়ালী ঠেকছে। বুঝতে পারছি না। সত্যি—বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারছ না ? এ আমার কপাল। দেখ আমাকে—আজ এক বৎসর হ'তে সমস্ত শক্তি নিয়ে সামান্ত মাহিনায় একটি চাকরী বাগাবার জন্ত কত ফন্দী, কত ফিকির না করলাম, কিন্তু সমস্তই মিথ্যা হ'ল। কিন্তু আমি সক্ষম। আমার বুদ্ধি আছে, মস্তিষ্ক আছে, আমার খাটবার ক্ষমতা আছে, তবুও আজ আমি উপবাসী। এক মুঠা অন্নের জন্ত, একটু বাসস্থানের জন্ত, প্রতি মানুষের কাছে হাত পাতছি। আমার মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়েছি,—আমার অন্তরের ঐশ্বর্য্যকে খাটো করেছি। আমি জগতের সমস্ত মানুষকে শোনাবো, এ পথ ভুল। এই অগণিত মানুষ, এই শ্রান্ত মানুষের দল, মুমূর্ষু আহত জন্তুর মত এই সভ্যতার পাষাণ-ঘেরা পাঁচিলের কাছে মাথা খুঁড়ে মরছে, কিন্তু কি পাচ্ছে তাতে ? আমি এই পাঁচিল ভাঙ্গবো। আমার মৃতদেহ দিয়ে রচনা করব অনন্ত সোপান, আর সেই সোপান দিয়ে মানুষ উঠে, রহস্তময় স্বর্গলোকের দ্বার খুলবে।"

পরদা সরাইয়া বুলু আসিল প্রকাণ্ড কাঠের ট্রেতে ধূমায়িত চা আর গরম গরম খানকয় পরোটা।

"কিসের বক্তৃতা দিচ্ছেন অমর বাবু? বাঃ, শুনতে বেশ লাগছিল"—বুলু মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

মাঝে একটা টিউশনির খোঁজ লইয়া অমল আসিয়াছিল। কিন্তু অমর কহিল, "আর না ভাই, আবার লোকের দরজায় হাত পেতে ভিক্ষে করতে চাই নে। জানি ও হ'বে না, দেখগে এখন সেখানে মানুষের মেলা বসে গিয়েছে। আমার মত অভাগার অভাব বাংলা দেশে নেই।"

অমর খবরের কাগজ বিক্রয় সুরু করিয়া দিল।

"কাগজই চাই, কাগজ। ষ্টেটসম্যান, অমৃতবাজার, বসুমতী, —টাটকা খবর।" অমল মোটরে করিয়া যাইতেছিল, মুখ ফিরাইয়া দেখিল, অমর কাগজ বিক্রয় করিতেছে। মাথার চুল রুক্ষ, অনেকদিন তেল পড়ে নাই। খালি পা, ছেঁড়া কালিমাখা ধুতির উপর হাতকাটা একটা জামা।

কিছুদিন পর অমলদের বাড়ীতে অমরকে দেখা গেল। সেই পড়িবার ঘর। এক পাশে বুলু সেলাইয়ের কল চালাইতেছে। পিঠের উপর কাল কাল চুলের রাশি, দুটী হাতে সোনার কঙ্কণ, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ললাটে আভা।

অমর তাকাইয়া তাকাইয়া বুলুকে দেখিতে লাগিল, সৌন্দর্য্য ও সুচারুতায় মুখখানি উজ্জ্বল, দুই চোখে প্রতিভা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দীপ্তি, আর সুদীর্ঘ পল্লবের তলে স্বপ্ন-লোকের বার্ত্তা, সমস্ত চেহারায় একটা ম্লানান্ত নির্ম্মলতা। দুখানি করতল যেন মাধুর্য্যে ভরা। বুলুর সমস্ত দেহে বলিষ্ঠ শ্রী—ললাটে, চিবুকে, চিকুরে জড়াইয়া রহিয়াছে।

মৃদু হাসিয়া কল ছাড়িয়া বুলু উঠিয়া পড়িল, "এতদিন যে দেখি নি অমরবাবু?"

অমর গুঞ্জন করিয়া কি যেন বলে, ভাল বোঝা যায় না।

"বসুন, দাদাকে ডেকে দিই।"

অমর বলিয়া যায়, "ভাই অমল, আমি বড় মানুষ হ'তে চাই নে। মনে মনে মানুষের বড়ত্বকে ঘৃণা করি, আভিজাত্যের উপর আমার স্বভাবজাত ঘৃণা আছে। অনেকে লটারীর টিকিট কিনে, বড় লোক হবার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু আমি সে স্বপ্ন দেখি নে। আমি শুধু চাই, পরিশ্রম করে পেটভরা ভাত, আর পরিধানের কাপড়। দৈন্যকে আমি ভালবাসিনে, দারিদ্র্যকে ঘৃণা করি। আমি চাই, সুস্থ সবল জীবন, মুক্ত জীবন। এই দৈন্য, এই নোংরামী থেকে মুক্তি পাওয়াকে ভাবি, এই আমার ফুলশয্যা। আমি প্রাণ খুলে হাসতে চাই, গান করতে চাই, বই পড়তে চাই। আপ্রাণ পরিশ্রম করে, আমার দেহের দুরন্ত তেজী অশ্বশক্তিকে খাটিয়ে সহজ অনাড়ম্বর জীবনের জন্য পরিচ্ছন্ন গৃহ, পেটভরা ভাত, এই চাই। আমার চাহিদা খুব সাদাসিধে। কিন্তু অমল, আমার চারিদিকে অনাহার, দৈন্য, অস্বাস্থ্য। মানুষের অতৃপ্তি, কুসংস্কার, কুশিক্ষা, আমায় দিন রাত খচ্ খচ্ করে বেঁধে। পৃথিবীতে একটাও সুস্থ বলিষ্ঠ মানুষ দেখতে পাই নে, সব নোংরা, সব শীর্ণ-জীর্ণ। সব ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নূতন সমাজ করতে যাই, কিন্তু আমি অক্ষম। নিজের হাতে নিজের চুল ছিঁড়ি, বোধ হয় পাগল হ'য়ে যাব—"

চা লইয়া বুলু ঘরে ঢুকিল।

রাত্রে বিছানায় অমর স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। বহু দূরে মহাকাশে অগণিত তারকা গ্রহের দল বিরামহীন গতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। সেখানে কক্ষের বন্ধনীতে উহারা যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। তাহারই মত যেন, নক্ষত্রগুলির চক্ষে বাষ্প-বিজড়িত বেদনাতুর দৃষ্টি।

অমরের কাগজ বিক্রয় করিয়াও আর চলে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ও দারুণ অর্থাভাবে সে পাগলের মত হইয়া পড়িল। সব মিথ্যা স্বপ্ন, মিথ্যা কল্পনার রঙীন তুলিতে আর কোন রঙের ছিটে-ফোঁটাও অবশিষ্ট নাই। সব যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। চারিদিক্ যেন শূন্য, পৃথিবী নির্জ্জীব, বিগতপ্রাণ। কোথাও যেন সজীব শ্যামলতার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। সমস্ত চরাচরকে প্লাবিত করিয়া দিয়া, নিষ্করুণ এক অগ্নি-ঝলক করাল গ্রাস বিস্তার করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সমস্ত বিশ্ব বুঝি পুড়িয়া একাকার হইয়া যায়।

সেদিন সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত ঘটা করিয়া বৃষ্টি নামিল। প্রচুর বিরামহীন বর্ষণে চরাচর বুঝি লুপ্ত হইয়া যায়। অমর তাহার কাগজের বাণ্ডিলটি সযত্নে বক্ষের কাছে লইয়া, চলন্ত ট্রাম হইতে নামিতেই, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পিছন হইতে একখানি মোটর আচম্কা হুড়মুড় করিয়া তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। একটা আর্ত্তনাদ—ব্যস্, তার পর সব নিস্তব্ধ। ক্ষীণ রক্তরেখা বৃষ্টির অনর্গল বর্ষণের সাথে মিশিয়া একাকার হইয়া গেল।

অমল খবরটা শুনিয়া স্তব্ধ ভাবে ঘরের মধ্যে নির্ব্বাক্ নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল।

আর বুলু সেলাই কলের উপর মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে থাকিল।

কাব্যের স্বরূপ

—শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

বস্তুবাদ, আদর্শবাদ প্রভৃতি মতবাদ নিয়ে যে-বিবাদ ইয়োরোপের সাহিত্যে কিছুদিন আগে দেখা দিয়েছিল, ঠিক সেই রকমের একটা মত-দ্বৈধ আজ আমাদের দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে এসে পড়েছে। কেউ বলছেন আধুনিক, এবং অত্যাধুনিক প্রগতিশীল কবিতায় প্রত্যক্ষ-বাস্তবতার অভাব। আবার কেউ বলছেন—আধুনিক কবিরা এত বেশী বাস্তবপন্থী যে তাঁদের সৃষ্ট কবিতা প্রকৃত কবিতা না হয়ে নোংরামীর প্রতীকত্ব লাভ করছে। বিবাদের মধ্যে যাঁরা যেতে চান না—তাঁদের মত যে, ভাবুকতাই মানুষের জীবনের সারাংশ, সুতরাং ভাবপ্রবণতাকে বাঁচাতে হবে, নইলে কবিতা প্রকৃত কবিতাপদবাচ্য হবে না। কেউ আবার বলেন: বাস্তব সংসারের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-বস্তুই কাব্যের প্রাণ। বস্তুটাই আসল। বস্তু থেকে ভাবে যে উন্নীত হই—তা গৌণ ব্যাপার।

কোন্‌টা সত্যি? ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাঁর স্কাইলার্ক কবিতায় দেখিয়েছেন, সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যক্ষরাজ্য ও ভাবরাজ্য—দুটোর প্রতিই আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। এখন এই দুটোর প্রতি দৃষ্টি রাখাটাই শুধু কাব্য কি না, তা আমাদের বিচার করতে হবে।

তার আগে দেখা যাক, কবিতা শুধু বাস্তব হতে পারে কি না। বাস্তবতা কবিতার একটা অঙ্গ, এবং তা প্রধান অঙ্গ সন্দেহ নেই, কিন্তু নিছক বাস্তবতাই কবিতার প্রাণ হতে পারে না। তাই যদি হত, তবে ইতিহাস আর কবিতায় কিছুই পার্থক্য থাকত না। শুধু ঘটনা বলা ইতিহাসের কাজ, কবিতার কাজ তাতে রস সংযোগ করা, সত্যকে সুন্দরের পর্য্যায়ে উপনীত করা। অরিষ্টটল তাঁর 'থিয়োরী অভ আর্ট'-এ এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের "চিরদিনের দাগা" কবিতাটিকে ধরা যাক। সামান্য দৈনন্দিন একটা ঘটনার মধ্যে মানব-হৃদয়ের চিরন্তনী ব্যথা-বেদনার আবেগ যে কত গভীর ও অতল, তারই প্রকাশ আছে এই কবিতাটিতে।

তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে সূক্ষ্ম অথচ গভীর করুণ রসের সংযোগ—এই সংযত সমন্বয়-সাধনের মধ্যেই কাব্য সার্থকতা লাভ করে। ঐতিহাসিকের তাজমহল আর কবির তাজমহল মিলে আলোচনাটা আরও প্রস্ফুট হবে। প্রথম তাজমহলে আছে রূঢ় বাস্তবতা, রসের স্পর্শ তাতে নেই—যা দ্বিতীয় তাজমহলের প্রাণবস্তুস্বরূপ। সুতরাং প্রত্যক্ষ বাস্তবতাই যে কবিতা নয়, এ কথা বেশ বোঝা যায়।

তাজমহল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের রচনা এবং কবির রসপূর্ণ দৃষ্টি ছাড়াও অন্য কথা উঠতে পারে। কবি হারীতের তাজমহল কবিতাটি ধরা যাক। ('ছাত্র অভিযান', ভাদ্র সংখ্যা ১৩৪৬ সাল দ্রষ্টব্য)। কবি এখানে অনুভব করেছেন তাজমহলের সৌন্দর্য্যকে নয়, স্বপ্নকে নয়—রূঢ় বাস্তবতাকেও নয়। তিনি অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন শত শত মজুরের বেদনা-ক্লিষ্ট চাঞ্চল্য ও কর্ম্মময় অবসাদ। এখন এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, রচনাটি কাব্য কি না। যতদূর আমরা এগিয়েছি, তাতে দেখা যায় বস্তুর ও ভাবের সংযত সুন্দর সমন্বয়ই কাব্যের সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এখানে যে একেবারে বাস্তবতা নেই, এ কথা বলা চলে না। শত শত শ্রমিকের ক্লান্তিকে দেখতে পাওয়ার মধ্যে সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই ক্লান্তিকে কবি কল্পনায় রূপায়িত করে সুন্দর করবার প্রয়াস পেয়েছেন, এই চেষ্টায় তিনি কিছুটা স্বপ্ন-বিহ্বল হয়ে উঠেছেন। এ ছাড়া কবিতাটি পড়লে আমাদের মনের স্থায়ী ভাবের উদ্বোধনা জাগে,—সুতরাং এটিও কাব্য।

অন্য যাঁরা বাস্তবতা নেই বলে ধুয়া তুলেছেন—তাঁদের জেনে রাখা উচিত, বাস্তবতা না থাকলে কোনও কল্পনা

সম্ভব নয়। যে-কল্পনাই আমরা করি না কেন, তা কখনও বাস্তবকে ছাপিয়ে উঠতে পারে না। ভাবনার জন্ম বাস্তবতা হতে; চিন্তা ও কল্পনা মনের একই কেন্দ্রে অবস্থিত। কাজেই কল্পনা কিছু বাস্তবঘেঁসা হবেই। ছোট একটা উদাহরণে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। কোন গল্পলেখক লেখার সময় কল্পনা করতে পারেন কি যে, নায়িকা মাধবী দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাববশতঃ তার নিজের ছেলেকে গরম তেলে ভেজে খেয়ে ফেলল? এ-কল্পনা কোন সুস্থ ব্যক্তির কল্পনা করাও কল্পনাতীত। কিন্তু যখনই বাস্তবে এটা ঘটবে, এরই সমান্তরাল চিন্তা হাজার হাজার মাথায় আসবে। সুতরাং কবিতায় 'বাস্তবতা নেই'—এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক।

তবে আধুনিক কবিদের নোংরামির প্রতিবাদ যাঁরা করেন—তাঁদের প্রচেষ্টা নিন্দনীয় নয়। কাব্য সাহিত্য, সাহিত্য সত্য, শিব ও সুন্দরকে লক্ষ্য করে নিজস্ব গতিপথে অগ্রসর হয়। সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা সাহিত্যে না থাকলে কোনও রচনা সুস্থ মনকে আনন্দ দিতে পারে না। তাই যে কোনও আনন্দজনক রচনাই কাব্য। (অবশ্য কাব্যের এই সংজ্ঞায় প্রশ্ন হতে পারে—আনন্দজনক রচনাই যদি কাব্য হয়, তবে সীতার বনবাসের কাহিনী, দময়ন্তীর দুঃখের কথা, দ্রৌপদীর ব্যথার গল্প—কাব্য কি না? এর উত্তর অতি সহজ। যত দুঃখের কথাই পড়া যাক না কেন বইয়ে, নাটকে যত করুণ দৃশ্যই দেখা যাক না কেন, মনের মধ্যে সেই ভাবের একটা আন্দোলন জাগবেই। শোক, দুঃখ, লজ্জা, প্রভৃতি বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা ঔৎসুক্য জাগে। এই ঔৎসুক্যই আনন্দের রূপ। ঘটনার পরিণতির প্রতি যে মনোনিবেশ—তাহাই সুখের অলৌকিকত্ব।) সুতরাং দেখা যায় নোংরামির অবতারণা সমর্থনযোগ্য হোক বা না হোক, তা আদৌ সাহিত্য নয়—অসুস্থ ও বিকৃত মনের বিকৃতি মাত্র।

এখানে বোদলের, জোলা প্রভৃতির নাম উঠতে পারে। প্রগতিশীলতার কথা, চরম বাস্তবতার কথা—ইত্যাদি সব মনে হতে পারে। প্রথম ধরা যাক বোদলের, জোলা প্রভৃতির কথা। তাঁরা পৃথিবীর একদিক দেখেছেন, বাস্তব যেমন অশ্লীল, তেমনি সভ্যও বটে। তাঁরা শুধু সভ্যতার নগ্নমূর্ত্তিই দেখেছেন এবং সেই নগ্নমূর্ত্তির মধ্য থেকে বিশ্বজনীন একটি সত্যে উপনীত হবার প্রয়াস পেয়েছেন মাত্র। তাই তাঁদের লেখা সাহিত্য হয়ে উঠেছে। প্রশংসা বা নিন্দার কথা বলছি না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রগতিশীলতা, চরম ও উৎকট সত্যতা। এ-সব যাঁদের লেখার বিষয়বস্তু, তাঁরা বিকৃতমনা তাতে সন্দেহ নেই। অনেক সত্য জীবনে আছে—সব কি প্রকাশযোগ্য? অশ্লীলতা সত্য, এবং তাকে চাপা দেওয়া ভণ্ডামি হলেও তা রুচি ও সভ্যতার সূচক। কিন্তু পাগলের এই লুকোবার বৃত্তি নেই। তেমনি প্রকট অশ্লীল লেখকেরা যে এই পাগলের দলভুক্ত—তা বলা বোধ করি বাহুল্য।

নোংরামি যে কাব্য নয়—তার সহজতম প্রমাণ এই যে, নোংরা কোন কিছু আমাদের মনোগত স্থায়ী ভাবসমূহের বিকাশ ঘটাতে পারে না। স্থায়ী মনের ভাবকে যদি উদ্বুদ্ধ না করে—তবে কোন রচনাই সাহিত্যের পর্য্যায়ে পৌছুতে পারে না। শোক, দুঃখ, ভয়, আনন্দ প্রভৃতি যে সকল মনোভাব, তাদের পূর্ণ পরিবেশনই সাহিত্যের প্রধানতম উদ্দেশ্য। সুতরাং যাঁরা চরম বাস্তবপন্থী তাঁরা যে সত্যকার সাহিত্যিকের গণ্ডীর বাইরে—এ কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নিরপেক্ষ লোকেরা বলছেন ভাবুকতাই কাব্যের সব। যদি তাই হয়, তবে বাস্তব (objective) সাহিত্যের সৃষ্টি অসম্ভব; শুধু অসম্ভব নয়, অভাবনীয়। তবে বিষয়বস্তুকে রসাশ্রিত করে লেখা চলতে পারে। 'প্যারাডাইস লষ্ট' বা 'মেঘনাদবধ'-জাতীয় কাব্যে প্রধানভাবে বাস্তবতা আছে, কিন্তু গৌণ-ভাবে ভাবুকতাও আছে। কবির বস্তুকে দেখবার দৃষ্টি আছে কল্পনায় মিশিয়ে, শুধু ভাবুকতা তো থাকতে পারে না।

ওয়ার্ডসোর্থ বলেছেন সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যক্ষরাজ্য এবং ভাবরাজ্য উভয়ই কাব্যের বিষয়বস্তু। এ কথাটা একটু চিন্তাসাপেক্ষ। আমাদের প্রাণের মধ্যে দুটো ভাব সর্ব্বদাই বিরাজমান; একটা চায় পৃথিবীর মাটি, বাতাস আঁকড়ে নাড়ীর টানে এখানে পড়ে থাকতে, অন্যটার

ইচ্ছা একটু স্বর্গের দিকে চলতে, পৃথিবীর মায়া তার কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দুটো নিয়েই আমাদের জীবন; এর কোনটাকেও বাদ দেওয়া চলে না।

নিত্যকার কাজকর্ম্ম, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-অনুভূতির মধ্যেই কি আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠি? এই বৃত্তিগুলো আমাদের প্রথমকার ভাবের পরিচয়, দ্বিতীয় ভাব সদা-সর্ব্বদা উর্দ্ধমুখে আগতকালের ধ্বনি শুনতে প্রয়াস পায়। দূরাগত বাঁশী যেন তার কানে মাঝে মাঝে সুরের লহর তুলছে। এইরকম মুহূর্ত্ত আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আসে,—এই মুহূর্ত্তগুলিকে বলি আমরা জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্ত।

দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে—প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের সঙ্গে এই মুহূর্ত্তের মনোভাবের সংযোগেই প্রকৃত কাব্য সৃষ্টি হয়। ওয়ার্ডসোয়ার্থ-এর 'To the Skylark' অন্ততঃ তাই প্রতীয়মান করে। ব্র্যাডলেও বলেছেন—"জীবন ও কবিতার মধ্যে প্রচুর সংযোগ আছে।"*

বুচার-এর কথাও চিরকাল সত্য হয়ে থাকবে যে, "মনুষ্য প্রকৃতি এবং জীবধর্ম্মের যে-অংশ বিশ্বচরাচরের সঙ্গে সমধর্ম্মী কবিতা তাকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করে।"†

কিন্তু অনন্ত মুহূর্ত্তের ভাবধারার সঙ্গে জীবনের রোজকার ঘটনার মিলনই কি শুধু কাব্য? অথবা এই মিলন কাব্য-সৃজনের সহায়ক? এই মিলনে কি কাব্যের সকল উপাদান, সকল মালমশলা সংগৃহীত হয়? এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি:

"আমরা কি সত্যিই চাই শোকের অবসান?
আমাদের অতি তীব্র বেদনাও
বহন করে না স্থায়ী সত্তাকে
—সান্ত্বনা নেই এমন কথায়;
এতে আঘাত লাগে আমাদের দুঃখের অহঙ্কারে।"

* "There is plenty of connection between life and Poetry".

—*A. C. Bradley*

† Poetry expresses most adequately the universal element in human nature and in life."

—*S. H. Butcher*

এটি গদ্য-কবিতা। কবি এখানে এই কাব্যে ভাবকে রসের মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করেছেন, এবং ভাবের লৌকিক পরিমিতত্বটুকু ছাড়িয়ে উঠেছেন। তিনি এখানে লৌকিক ভাবের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ বা অভিভূত নন, শুধু প্রাত্যহিক সাংসারিক সম্বন্ধীয় দু'একটা শোক-দুঃখের কথা জানিয়েছেন মাত্র। যদি ভাবরাজ্য (অনন্ত মুহূর্ত্ত যাকে বলা যায়) এবং প্রত্যক্ষরাজ্যের মিলনই কাব্যের পরিমাপ হয়—তবে এই রচনাকে কাব্য সংজ্ঞা দেওয়ায় একটু আপত্তি ঘটে। কিন্তু এই রচনাটি যে, কাব্য সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প।

কবির নিজস্ব চিন্তা-পদ্ধতি এখানে কাব্যের উপাদান। মনে হতে পারে কবি স্বীয় হৃদয়ের চিন্তাকে, মনের অনুভূতিকে পাঠকের প্রাণে সঞ্চারিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন; কথাটা গৌণভাবে সত্য হলেও মুখ্যতঃ তা নয়। শোক ও দুঃখের গর্ব্বকে মনের কোণে বাঁচিয়ে রাখতে যে-আনন্দ, তাই তিনি এখানে পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছেন মাত্র।

তা হলে দেখা যাচ্ছে ভাবরাজ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-রাজ্যের সংমিশ্রণ যেমন কাব্যের পক্ষে অপরিহার্য্য, তেমনি কবির নিজস্ব দৃষ্টি, স্বকীয় চিন্তা এবং স্বতন্ত্র রচনা-কৌশলও অতি প্রয়োজনীয়। একই তাজমহলের উপর বিভিন্ন কবি ভিন্ন ভিন্ন কবিতা লিখেছেন—জিনিষ একই, কাজেই প্রত্যক্ষরাজ্য সেখানে সমান, ভাবরাজ্য এবং নিজস্ব ভঙ্গিমা ও বাস্তবতা দেখবার দৃষ্টি প্রত্যেক কবির বিভিন্ন হওয়ায় তাঁদের লেখনীনিঃসৃত একই বিষয়ের উপর এই বিভিন্ন কবিতার সৃষ্টি হয়েছে।

কবিতা কিছু অন্য জিনিষ নয়, যা আমরা নিত্যদিন দেখি, ভাবি—তাই; শুধু কবিতায় আছে বলবার কৌশল, দেখবার বিভিন্ন দৃষ্টি, ভাববার নিজস্ব ধারা, ইংরাজীতে যাকে আমরা 'ট্রিট্‌মেণ্ট' (treatment) এবং 'টেক্‌নিক' (technique) বলি।

বাস্তবতার প্রত্যক্ষরাজ্যে যখন কবির নিজস্ব ভঙ্গিমা আরোপিত হয়, তখনই তা কবিতা হয়। সুতরাং দেখা যায় বস্তুর সঙ্গে কাব্যের আধ্যাত্মিক ভাবে অন্তরে অন্তরে একটা প্রভেদ রয়েছে। আত্মিক ভেদের মত বাহ্যিক

বা দৈহিক ভাবেও প্রত্যক্ষতার সঙ্গে কাব্যের মিল নেই। আমরা প্রাত্যহিক কথাবার্ত্তায় যে-ভাষা প্রয়োগ করি, তা সাহিত্য হয় না, কিন্তু কাব্যরচনায় সময় সুন্দর এবং সাবলীল কথার সামঞ্জস্য রেখে অনুপ্রাস-অলঙ্কারে বর্দ্ধিত করে দিই, যাতে একটা সুস্পষ্ট অথচ অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন বৃহত্তর কিছুর ইঙ্গিত জানাবে। যেমন—"কালো মেয়ে তুমি এত আলো কোথা পেলে ?" বাক্যটি কাব্যের মূর্চ্ছনাকে জাগিয়ে দেয়। কারণ কথাগুলো এমনভাবে গঠিত বা রচিত করা হয়েছে—এর পেছনে যেমন আছে চিন্তা, তেমন এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে স্বচ্ছ ভাবাবেগ ও স্পষ্ট অনুভূতি। কবি একটি কালো মেয়েকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, সেই দৃষ্টি-ভঙ্গিমাতেই কবিতা মধুর হয়ে উঠছে। কথাগুলো সবই সাধারণ, কিন্তু তার সামঞ্জস্য সুন্দর। কবিতা ধ্বনি ও সুরের সঙ্গে চলে। ভাবরাজ্য বা অনন্ত মুহূর্ত্তের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—তারা সুরের প্রত্যাশী। তাই যদি কোন কবিতা আমাদের অবোধ্য হয়, তবুও তার সুরের ও ছন্দের মাধুর্য্য, ধ্বনির সৌকর্য্যে আমাদের মনের মধ্যে সুখের আলোড়ন তোলে—তখনই আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি এ রচনা কাব্য।

কাজেই দেখা গেল, বস্তুর সঙ্গে কাব্যের আত্মিক ও বাহ্যিক প্রভেদ রয়ে গেছে। যাঁরা বলেন শুধু বাস্তবতাই কাব্য, ভাবাবেগ কিছু নয়, অনুভূতি অলীক, দৃষ্টিভঙ্গিমা মিথ্যা—তাঁরা যে কতদূর ভ্রান্ত, তার উল্লেখ এখানে বাহুল্য মাত্র। তাঁরা বলেন যে, তাজমহল একটা বাস্তব বস্তু। বিভিন্ন কবি একে দেখলেন,—দেখলেন কিন্তু বিভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে, এবং তাঁদের রচিত লেখাগুলি বিভিন্ন হয়ে উঠল অনুভাবে, ভাষায় ও বিন্যাসে। তাহলে এখানে বাস্তবতার মূল্য কি ? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যদিও এই রচনাগুলোর মধ্যে নিরপেক্ষ বাস্তবতা (Absolute Reality) নেই, তবুও স্বতন্ত্রভাবে দেখতে গেলে বলতে হবে তারা আপেক্ষিকভাবে বাস্তব (Relatively Real)। প্রত্যেক দর্শন-ভঙ্গিমা, রচনাকৌশল সত্য—কাজেই স্বতন্ত্রভাবে বাস্তব। এর উত্তরে তাঁরা বলেন—নিরপেক্ষ বাস্তবতা-ই যখন নেই—তখন বাস্তবতা-র মূল্য নেই বলতে হবে। কাজেই যেমন যেটী আছে, তেমন সেটী রেখে দাও, শুধু বর্ণনা দিয়ে যাও সত্যকার। বাহুল্যময়, অতিরঞ্জিত ভাষা দিয়ে নয়। প্রয়োজনীয় নিত্যকার কথাবার্ত্তায় অলঙ্কার ব্যবহার করি না, কাজেই সহজ অনাড়ম্বর ব্যবহারিক ভাষায় বর্ণিত কিছুকেই কবিতা বলব। আপেক্ষিক বাস্তবতা-র মূল্য দেব না। তাই তাঁরা গদ্য-কাব্যের সৃষ্টি করেছেন।

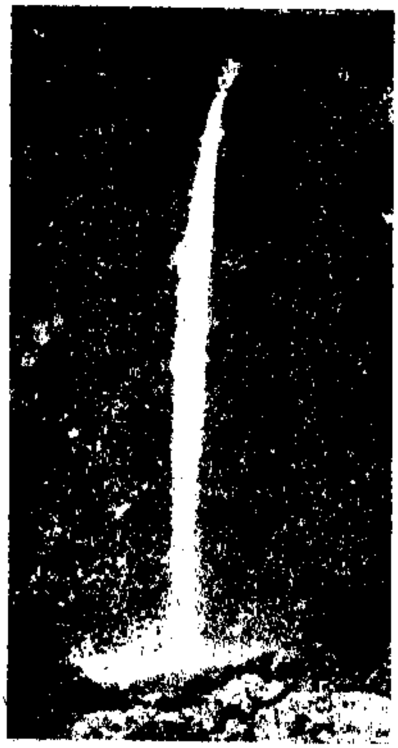
তাঁদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করা অতি সহজ। যদি নিরপেক্ষ বাস্তবতা-ই সব হয়, তবে একখানা ফোটোগ্রাফকে আমরা ছবি বলতে পারবো। দৈনিক কাগজের টুকরো টুকরো বর্ণনা হবে তা হলে সুন্দর ও বিন্যস্ত ছোট গল্প। তাঁদের মত গর্ত্তব্যের মধ্যে নিলে সাহিত্যের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তন করতে হবে। নচেৎ অন্য কোন উপায় নেই।

যাই হোক, কাব্যের প্রাণবস্তু তাই, ভাব, ভঙ্গিমা ও বস্তুর সমবায়। এই তিনের সুচারু মিলনেই কাব্য পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়। একটা সুন্দর ছবি যেমন 'আর্ট', কারণ বাস্তবতা আছে, কল্পনা বা ভাব আছে, আর আছে 'টেক্‌নিক' ও 'ট্রীটমেণ্ট' অর্থাৎ চিত্রকরের বিষয়-বস্তুটী দেখবার এবং প্রকাশ করবার নিজস্ব ভঙ্গি ; তেমনি একটি কবির লেখা—যার মধ্যে আছে ধ্বনি ও মাধুর্য্যের সঙ্গে বাস্তবতা, ভাব আর দর্শন এবং প্রকাশ-ভঙ্গিমা—সুন্দর কাব্য হয়ে উঠবেই।

শিলং-এর পথে

—শ্রীকালীশ্বর দাশগুপ্ত

বেলা তিনটায় শিয়ালদহ থেকে রওনা হয়ে সারারাত জেগে সকাল ছ'টায় যখন পাণ্ডু এসে পৌঁছলাম, তখন প্রভাতী সূর্য্যের সোনালী কিরণচ্ছটা দূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে স্বপ্নালোক রচনা করছে, নীচে নীলোত্তরীয় ব্রহ্মপুত্রের কাল জলের ওপরে আলোর ঝিকিমিকি, নীলিমার ওপারে দিক্‌চক্রবাল-রেখায় কোন্ অজ্ঞানিত জগতের ভাবালু আহ্বান। নীলাচল, উমানন্দ পাহাড়কে ঘিরে বিশ্ব-প্রকৃতির অপরূপ



ব্রোমাড ফল্‌স্‌।

রূপসজ্জা মনকে বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখের বাইরে অসীম অনন্তের দিকে টেনে নিয়ে যায়, ক্ষণেকের জন্যে ভুলে যাই, আমি পথিক—পথ-চলার দুর্ব্বার নেশায় আমার গৃহাঙ্গনের নিবিড় শান্তি উপেক্ষা করে বহির্জ্জগতের দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছি। ওপারের ওই দিগন্তলীন ঘন নীল নভোমণ্ডল আর আমার চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-প্রাচুর্য্য থেকে আমার নিজেকে ত' আমি বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি নে। বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর দিয়েই সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ—আনন্দঘন চিৎ-শক্তির এই বাহ্যিক বিকাশ মনোবীণার তারে তারে ঝঙ্কার তোলে এক অপূর্ব্ব অনাহত সুরের। জীবনে যাকে দেখি নাই, জানি নাই, নদীর কলোচ্ছ্বাসে, কাশগুচ্ছের শোভায়, গিরি-প্রান্তরের শ্যামল অরণ্যানীর মধ্যে, শুধু যাঁর বিরাট সত্তার গতি-ছন্দ ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধি করেছি, তাঁর মধ্যে আমার নিজের অস্তিত্বকেও যেন নূতন করে আমি খুঁজে পেলাম। আমার দেহের সীমাকে ঘিরে যে অসীম প্রতিনিয়ত তাঁর খঞ্জনী বাজিয়ে চলেছেন, তাঁকে ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু তাঁর সত্তাকে ত' অস্বীকার করতে পারি নে, তাই আমার সুমুখের বিরাট সৌন্দর্য্য-দেবতাকে উদ্দেশ করে আমি আমার অন্তরের নতি জানালাম—মন বলল—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র এ-জগতের গণ্ডী ছাড়িয়ে সুদূরের আহ্বানে কোন্ এক অজানা, অচেনা স্বপন-পুরীতে চলে গিয়েছিলাম—ভুলে গিয়েছিলাম বাস্তবের দুঃখ, দৈন্য, ব্যথা, বেদনা। আমার চারিদিকের নৈসর্গিক অপরূপতার ছোঁয়াচ পেয়ে মন 'অরূপ রতনের' সন্ধানে সাগরতলে ডুব দিয়েছিল; সে-অনুভূতি ক্ষণিকের—তাই বলে তো তাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারি নে—এ যেন চেরাপুঞ্জীর লোকের ভাগ্যে সূর্য্যালোক দর্শনের মত। অশ্রান্ত বরষার টিপ টিপ বৃষ্টিপতন-ধ্বনি শুনতেই তারা অভ্যস্ত। যদি কোন দিন ক্ষণকালের জন্যে রৌদ্রালোকিত প্রভাতকে বরণ করে নেবার সৌভাগ্য অপ্রত্যাশিত ভাবেই তাদের হয়, তবে তাকে পরিপূর্ণ করে তারা উপভোগ করে নেয়; হোক না তা ক্ষণিকের তবু সে তো আলোর পরশ।

আমাদের শিলংগামী মোটরবাসের হর্ণ-এর শব্দে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ৭টা বেজে গেছে। বিপদসমাকুল অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে পাহাড়ের বন্ধুর পথে এবার আমাদের যাত্রা সুরু হবে। স্বচ্ছতোয়া, পবিত্র-সলিলা ব্রহ্মপুত্রের কূলে দাঁড়িয়ে অদূরে উন্নতগিরি কামাখ্যার মন্দির-চূড়ার দিকে তাকালাম—পথ-চলার

পূর্ব্বাহ্নে মন্দির-অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

পনের মিনিটের মধ্যে গৌহাটী এসে পৌঁছলাম। এ সেই পৌরাণিক যুগের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—মহাভারত-বর্ণিত



মৌসমাই।

মহারাজ ভগদত্তের রাজধানী। স্থাপত্যে, শিল্পকলায়, ঐশ্বর্য্য-গরিমায়, শৌর্য্য-বীর্য্যে একদিন কামরূপ সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল—কামাখ্যা-উমানন্দ অশ্বক্রান্তার মন্দিরগাত্রে তার সেই অতীত গৌরবের নিদর্শন আজও খুঁজে পাই। অসংখ্য আকাশ-ছোঁয়া মন্দির-চূড়া, আজও অতীতের মতই তেমনই দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু যাদের তপ্ত-শোণিতের আহুতিতে এদের জন্ম, সে-সব শিল্পী যুগ-যুগান্তরের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ পূজা করে আসছে তাদের কীর্ত্তিকে, অথচ তারাই শুধু নামহীন, যশোহীন রয়ে গেল।

জীবনে এমনিই হয়—ব্যষ্টির জীবনে যা সত্য, সমষ্টির জীবনেও তাকে অস্বীকার করতে পারিনে। প্রয়োজনের তাগিদে আজ যাকে স্বীকার করলুম, অপ্রয়োজনে তাকে ভুলে যাওয়াটাই হয়তো স্বাভাবিক। এ-দুনিয়ার কাজ ফুরিয়ে যাবার পর যারা বিস্মৃত নীরব অতীতের মধ্যে হারিয়ে গেল, কালের পাতা থেকে তাদের নাম কি নিশ্চিহ্ন হয়ে বিলীন হয়ে গেছে? যত কথা বলা হয়েছে, যত গান হয়েছে গাওয়া, তাকে ভবিষ্যৎ মানুষ ভুলে থাকতে পারে; কিন্তু মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতির পথে তার সে-দান সে-যোগসূত্র তো কোন দিনই ছিন্ন হবার নয়—অতীত তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

গৌহাটী পিছনে রেখে আবার আমাদের মোটর চলতে আরম্ভ করল সোজা দক্ষিণ দিকে। জনপদ ছাড়িয়ে অল্প-ক্ষণের মধ্যে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এসে পড়লুম। দুপাশে শ্যামল ধানের ক্ষেত—শারদ প্রভাতের সোনালী রৌদ্রচ্ছটা সবুজ ধানের উপরে খেলা করছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল সবুজ মাঠ, তার ওপারে পাহাড়শ্রেণী। মোটর চলেছে চল্লিশ মাইল বেগে। দ্রুত গতিতে আনন্দ আছে; কিন্তু আজকের প্রভাতে আমি ধীর মন্থর গতিকেই একান্ত করে কামনা করলুম, সৌন্দর্য্য-পিপাসী মন চারিদিকের শারদশ্রীকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে চায়, তার সম্ভাবনা যখন নেই, তখন মনের বল্গা নিঃসংশয়ে ছেড়ে দিলুম—সে শ্যামল প্রান্তরে দিগ্‌দিগন্তের সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করুক।

হঠাৎ সুমুখের দিঙ্‌মণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করে চমকে উঠলুম—সারি সারি মেঘ জমাট বেঁধে আছে, শীঘ্রই হয়ত বৃষ্টি নামবে। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, আজকের এমন



রবার্ট হাসপাতাল।

দিনে যখন বিশ্ব-প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-সমারোহ দেখতে দেখতে চলেছি, তখন বৃষ্টির একঘেয়ে পতন-ধ্বনি শুনতে মন প্রস্তুত ছিল না। যতই আমাদের মোটর সামনের দিকে এগিয়ে চলল, ততই আমি বুঝতে পারলুম যে, যাকে আমি একক্ষণ

মেঘ বলে মনে করেছি, তা পাহাড়শ্রেণী ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমতলভূমির উপর দিয়ে বার মাইল পথ চলে শিলং যাবার প্রথম দরজা থানাপাড়া এবং দ্বিতীয় দরজা বারনিহাট

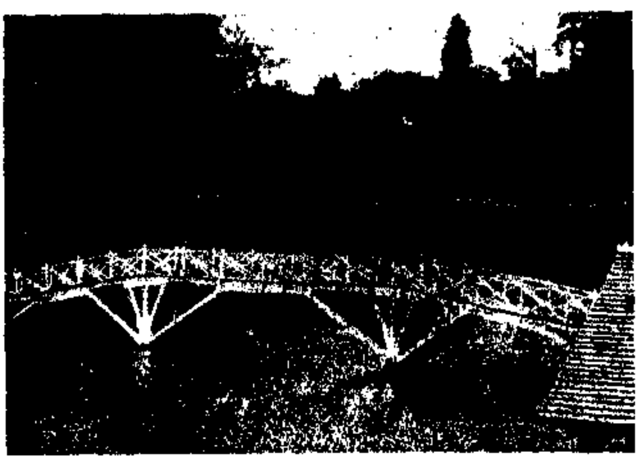


পোলো খেলার মাঠ।

অতিক্রম করে যখন নংপু এসে পৌঁছলাম, তখন বেলা ৯টা বেজে গেছে। রাস্তায় যাতে কোন দুর্ঘটনা না হয় সে জন্য এখানে মোটরের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আমাদের গাড়ী এখানে আধ ঘণ্টা থামবে। এখানে চা পান করা গেল। রাস্তার দুপাশে খাসিয়া মেয়েরা কলা, পেঁপে, কমলালেবু, নানা রকম শাকশব্জীর বিপণি সাজিয়ে বসেছে—খানিকক্ষণ তাদের বেচাকেনা দেখলুম।

নির্দিষ্ট সময়ে মোটর ছাড়বার সঙ্কেতধ্বনি হল, এবার আমাদের চলা সুরু হবে সমতল ভূমির উপর দিয়ে নয়, পাহাড় কেটে বার করা আঁকা বাঁকা রাস্তার মধ্য দিয়ে। আমাদের মোটর ১৪।১৫ জন যাত্রী নিয়ে পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগল—এক পাশে সুউচ্চ পাহাড়, অপর পাশে পাতালপুরী, সরু রাস্তা—একখানার বেশী মোটর পাশাপাশি চলতে পারে না। ড্রাইভারের উপর সবগুলো আরোহীর জীবন মরণ, নির্ভর করছে, একটু এদিক্ ওদিক্ হলে আর রক্ষা নেই, মোটরশুদ্ধ সবগুলো প্রাণী কোন্ অতলে তলিয়ে যাবে। নীচের দিকে চেয়ে দেখি, ধোঁয়াটে কুজ্ঝটিকা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না—কোথাও পাহাড়ের গায়ে গায়ে নিবিড় অরণ্যানী, আবার কোথাও রাস্তার পাশে বয়ে চলেছে গিরিনদী ঊর্মিল গতিতে, প্রচণ্ড বেগে পাথরের উপর দিয়ে—জহ্নুর জানু চিরে বেরবার গঙ্গার যে আদিম উদ্দাম প্রয়াস, তারই খানিকটা হয় তো সে আয়ত্ত করে নিয়েছে। তার এই উচ্ছ্বাস-মুখর, গতিচঞ্চল উদ্দামতার উৎস কোথায় কে জানে, আর কোন দূরদূরান্তের পানে সে তার দুরন্ত বেগ নিয়ে ছুটে চলেছে, তার খোঁজই বা কে রাখে।

এতক্ষণ মোটরের কোলে বসে নিশ্চিন্ত আরামে পথ চলেছি, এখন পাহাড় ঘুরে উপরে উঠতে উপলব্ধি করলুম, এ কোল স্নেহময়ী মায়ের নয়—বিমাতার, পরের ছেলেকে সে কোলে নেয় স্নেহের দাবীতে নয়, প্রয়োজনের তাগিদে, দরদী প্রাণের যেখানে অভাব, বাইরের সোহাগ সেখানে অত্যাচারেরই নামান্তর। মোটরের ঝাঁকুনি আর তার আঁকা-বাঁকা গতিচ্ছন্দ তখন আর বাইরেই আবদ্ধ নেই। পাশের যাত্রীদের অবস্থা মনকে বিষিয়ে তুলল; আবার মনের কোণে একটুখানি ব্যথাও অনুভব করলুম, ভাবলুম হতভাগারা হয়ত জানত না "দুর্গমঃ পথস্তৎ"। সারাটি পথ প্রাণ নামক পাখীটিকে



শিলং লেক্ : সেতু।

দেহরূপ খাঁচার ভিতরে আবদ্ধ করে রাখবার ঐকান্তিক চেষ্টাতেই তাহাদের কেটে গেল—পথের সৌন্দর্য্য-দর্শনের পিপাসা তখন তাদের মিটে গেছে।

পথ চলা শুধু আমার নেশা নয়—পেশা, আমি যাযাবর। পথ চলতে গিয়ে বহু দুঃখ পেয়েছি জীবনে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস দুর্গম পথের পথিক হিসাবে সয়েছি অশেষ লাঞ্ছনা; তাই হয়ত আজ পথের দেবতা আমায় রেহাই দিলেন।

অনেকক্ষণ থেকেই শীত অনুভব করছিলুম, এবার বেশ ভাল করে গায়ে র‍্যাপার জড়াতে হল; কলকাতা থেকে আরম্ভ করে নংপু পর্য্যন্ত গরমের যে-গ্লানি সারা দেহে জমাট বেঁধে উঠেছিল, শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল।

সারাটি পথ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। শীতের কুহেলীমলিন পর্দ্দা কেটে বেরুতে হচ্ছে; দু'চার হাত দূরের জিনিষও দেখা যায় না। গৌহাটী থেকে ৫৩ মাইল অতিক্রম করে বরপানি এসে কয়েক মিনিটের জন্য আকাশের ক্ষীণ হাসি দেখলুম,—অন্তরের ব্যথাকে বাইরে রূপায়িত করে তুলবার একটুখানি দীন প্রয়াস, মেঘ চিরে বেরিয়ে আসা সেই আলোক রশ্মিটুকুকে বরণ করে ধরে তুলবার আর ফুরসুৎ মিলল না, তার বিদায়ের লগ্ন তখনই এসে গেল।

পাহাড়ের উচ্চতা এখানে তিন হাজার ফুট। শিলং এখান থেকে মাত্র দশ মাইল—আরও দুই হাজার ফুট উপরে উঠতে হবে আমাদের। এখান থেকে চলেছে অসংখ্য পাইন গাছের সারি, মাথায় টোপর পরে যুদ্ধের সৈনিকের মত তারা দাঁড়িয়ে আছে, নীরব, শান্ত, সমাহিত। তার পর দুদিকে চলেছে নিবিড় বন, এ-বনের বুঝি আর শেষ নেই। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে বাঁশঝাড়, প্রকাণ্ড উঁচু শালগাছ, দেবদারু বন, তমালরাজি, কাশগুচ্ছ, আর নাম না-জানা অসংখ্য গাছে সদ্য-ফোটা ফুলের শোভা।

আসামের এই অরণ্য-সম্পদ্ আমায় মুগ্ধ করল, নীরস পাহাড়কে সে রসসিক্ত করে তুলেছে, তাকে মরুভূমি হতে দেয় নি। এ-ধরণের বিপুল অরণ্য ছড়িয়ে আছে আসামের সর্ব্বত্র। আসামের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনা নেই, চা-সম্পদ্, কয়লাসম্পদ্ আর অরণ্যসম্পদে আসাম রাজরাণী; তবু আসামীরা গরীব—অন্নবস্ত্রের কাঙাল, পথের ভিখারী।



গৌহাটী হইতে শিলং যাইবার সর্পিল পথরেখা।

বেলা দশটায় শিলং এসে পৌছলাম। স্বপ্নের দেশ শিলং, প্রাচ্যের স্কটল্যাণ্ড। টিলার উপরে সাদা লাল বাড়ীগুলো আর বিশ্বশিল্পীর তুলিতে আঁকা অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্য, এ দু'য়ে মিলে একে ভূস্বর্গ করে তুলেছে। পথের দুধারে ধ্যানমৌন প্রকৃতির যে মূক ভাষা পড়েছিলুম, তার সেই নিস্তব্ধ সমাহিত ভাবের প্রাণস্পন্দন এখানে যেন আর খুঁজে পেলুম না। মানুষের হাতের স্পর্শে এর তপোভঙ্গ হয়েছে। লোকালয়ের সংস্পর্শে এসে প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিতা শিলং-সুন্দরীর আর সেই সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি নেই, সর্ব্ব-গাত্রে তার রাণীর আভরণ, ঐহিকের ভোগলিপ্সায় মসগুল।

দূরে থেকে হিমালয়ের গাম্ভীর্য্য দেখেছিলুম—দেখেছিলুম তার যোগীবেশ। শিলং-এ সেই 'ধ্যানমগ্ন মহাশান্তে'র আভাস পেলুম না কোথাও। রাস্তায় রাস্তায় চঞ্চল নরনারীর কলগুঞ্জন, খাসিয়া মেয়েদের চটুলতা, মোটরের হর্ণ-এর মুহুর্মুহু সতর্কধ্বনি, সিনেমার কোলাহল—সবে মিলে পাহাড়ের নির্জ্জনতাকে জোর করে দূরে হটিয়ে দিয়েছে। বর্ত্তমান যুগের সভ্য মানুষ আমরা—কৃত্রিমতার ছাপ নিয়েছি আমরা আমাদের সর্ব্বদেহে; কিন্তু যা সত্য, যা শাশ্বত, যা চিরসুন্দর তা কি আলেয়ার মতই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যায় নি? আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার জন্যে হয় ত পোষাকী শিলংকে বাদ দিতে পারি নে; কিন্তু চিরদিনকার প্রয়োজন মিটাবার ঐশ্বর্য্য তার কোথায়!

তল্পি-তল্পা নিয়ে একটি হোটেলে গিয়ে উঠলুম। অনেক স্বাস্থ্যান্বেষীর ভিড়—স্থানাভাব। ম্যানেজার বাবু শেষ পর্য্যন্ত আমায় একটা কামরা ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করলেন। এখানে সারাদিন ধরে টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছে, বিকেলে আর বেরোন গেল না। বেলা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শীত বাড়তে লাগল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মুখ ধোয়ার কাজ গরম জলেই হল। ঠাণ্ডা জলের ব্যবহার এখানে খুব কম; স্নান করা, মুখ-হাত ধোওয়া, বাসন মাজা ইত্যাদি গরম জল দিয়েই সারতে হয়।



বিশপ ফল্‌স্‌।

সকাল আটটায় বেরিয়ে পায়ে হেঁটেই লাবান, লেক্‌, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, পাস্তুর ইনষ্টিটুট, রবার্ট হাসপাতাল আর কয়েকটা পাহাড়ী ঝরণা দেখলুম—এর প্রত্যেকটীতেই মানুষের শিল্পীমনের বিকাশ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে—তার ভিতরে বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি-নৈপুণ্যকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার প্রয়াস আছে—নেই শুধু তার সেই চিরন্তন সুরের মাধুর্য্য।

এবার শিলং-এর খাসিয়া-জাতির সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলে আমার প্রবন্ধের উপসংহার করব। খাসিয়ারা ইন্দোচীন জাতি—শিলং-এর এরা আদিম বাসিন্দা, ভারতবর্ষের অন্য কোন ভাষার সঙ্গেই এদের ভাষার কোন সাদৃশ্য নেই। তাদের শব্দ এক অংশাত্মিক (monosyllabic); আমাদের পার্ব্বত্য-জাতির মধ্যে প্রচলিত মনকুমার ভাষার সঙ্গে খাসিয়া ভাষার না কি খানিকটা মিল আছে। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাওয়া অবশ্য আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা, অতএব ক্ষান্ত হওয়া গেল।

খাসিয়ারা দেখতে সাধারণতঃ বেঁটে রং ফরসা—অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতিদের মত নাক চেপ্টা; দেহে তাদের অমিত বল, মনে দুর্দ্ধর্ষ তেজ। এদের ধর্ম্ম প্রাণ-প্রাচুর্য্যের ধর্ম্ম,—দেহের সজীবতার ধর্ম্ম।

ইংরেজী শিক্ষার আওতায় এসে এদের অনেকে পাশ্চাত্য-ধর্ম্মী হয়ে উঠেছে বাইরে এবং মনে। মেয়েরাও পুরুষদের মত সমান তালে পা ফেলে চলেছে। অনেকে বলেন, সম্পত্তি পুত্রে বর্ত্তে না বলেই খাসিয়ারা আজ দলে দলে খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করছে। এদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসায় নয়—মোটামুটিভাবে বোনদের ঠকাবার জন্যে, এমন কথাও শোনা যায়। খাসিয়া আইনে মাতার সম্পত্তির মালিক পুত্র নয় কন্যা।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে খাসিয়াদের ধারণা একটু স্বতন্ত্র, প্রেতপূজা এবং সর্পপূজাকেই এরা ধর্ম্মের চরম বলে মনে করে। তাদের সর্পদেবতার নাম থেগম। অনেকেই গৃহে এ সাপ পোষে এবং সুখৈশ্বর্য্য কামনায় একে পান করতে দেয় নর-শোণিত। এদের মধ্যে নরহত্যাও কম হয় না। অবশ্য, বর্ত্তমানে আদিম মনোবৃত্তিকে বলিদান করে ইউরোপীয় সভ্যতাকে ওরা আদর্শ বলে গ্রহণ করছে।

দু'টো দিন শিলং-এ স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। পথ চলার আনন্দই আমার কাছে সত্য—স্থিতিশীলতাকে আমি মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারি নি। তাই আবার যাত্রা সুরু করলুম, আহোম্ রাজাদের পুরাতন রাজধানী শিবসাগরের উদ্দেশ্যে। বিদায়ের ক্ষণে শিলং পিক্-এর স্তব্ধ মহাশান্তির দিকে চেয়ে অন্তরীক্ষের বিরাট পুরাণ-পুরুষকে মনে মনে প্রণাম করলুম।

বঙ্গদেশ ও আধুনিক কৃষি

—শ্রীসুশীল রায়

ইতিহাস

বর্তমান প্রবন্ধে বাঙ্গালায় বর্তমান যুগে কৃষিসম্বন্ধে সরকার যে-সব কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সামান্য পরিচয় দানের সহিত, সরকারী নথীপত্র অনুযায়ী আনুষঙ্গিক অপরাপর কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হইতেছে। ইহা অবশ্য সত্য যে, বর্তমান সরকারী বিভাগের নথীপত্র হইতে যে-সংবাদ আহরণ সম্ভব, বাঙ্গালার তথা ভারতের কৃষির ইতিহাস তদপেক্ষা অনেক বিস্তৃত এবং ব্যাপক এবং ইহাও সত্য যে, বহুলাংশে এই সকল সংবাদ ভ্রান্তিময়, কিন্তু তথাপি কৃষির প্রতি দেশবাসী শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি অবহিত করিতে হইলে, বর্তমান সরকারের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হওয়াই সর্ব্বপ্রথম বিধেয় বিধায় এই আলোচনা লিখিত হইতেছে। বলাই বাহুল্য, ইহাতে যে-সকল প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে, তাহা প্রাপ্য বিবরণীসমূহ হইতেই গৃহীত, সকল সময়েই লেখক তাহাদের সহিত একমত নহেন। এবিষয়ে ওয়াকিবহাল জগতের মত এই যে, পাশ্চাত্ত্য পন্থায় ভারতীয় কৃষিপদ্ধতির যে সংস্কার-প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে ব্যর্থ হইয়াছে।

বঙ্গদেশের বর্তমান যুগে কৃষিকর্ম্মের ঐতিহাসিক সন্ধান করিতে বসিলে, আমাদিগকে বঙ্গদেশের বর্তমান রাজনীতিক বিভাগের কথা ভুলিতে হইবে। বঙ্গদেশ পূর্ব্বে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশের সমবায় ছিল। মাত্র ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান বাঙ্গালার সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাঙ্গালা সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে বিহার-উড়িষ্যার কথাও তৎসহ বলা হইবে। বাঙ্গালার পূর্ব্বকালীন হাল-চালের কথা বলিলে পৃথক্‌ভাবে বর্তমান বাঙ্গালার কোন কথা বলা সম্ভব নহে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে সাতটি আদর্শ কৃষি-প্রতিষ্ঠান (model farms) স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অচিরেই তাহারা বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড প্রকোপে তাহাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়। এই সাতটির মধ্যে একটি আসাম প্রদেশের শিলঙে সংস্থাপিত ছিল। মনে রাখিতে হইবে যে, আসাম মাত্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা হইতে পৃথক্‌ হইয়া ভিন্ন প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আসামে বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সর্ব্বপ্রথম ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় কৃষি-সংক্রান্ত একটি বিভাগ গড়িয়া উঠে। কিন্তু এই কেন্দ্রে গবেষণা (research) করিবার কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই,বা কৃষির উন্নতি বিধান করিবার জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা তখনও আরম্ভ হয় নাই। কেবলমাত্র ইংলণ্ডের সিরেনসিষ্টর (Cirencester) হইতে কৃষিবিষয়ক বিদ্যালাভ করিয়া প্রত্যাগত দুইজন ছাত্রের হাতে এই কেন্দ্রের যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ কাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল ; কোন কৃষি-পারদর্শী কিংবা কৃষি-অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে এই কেন্দ্রের ভার দেওয়া হয় নাই। বর্দ্ধমানে ও ডুমরাওঁয়ে কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডস্‌-এর এলাকাভুক্ত জমিতে পরীক্ষামূলক দুইটি কৃষি-প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করা হয়। তাহার পর ১৮৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দে শিবপুরে আর একটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সময় মত এখানে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে, কিংবা এই প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন স্থানে কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে—প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল।

তাহার পর ১৮৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কয়েকটি 'ডিমনষ্ট্রেশন ফার্ম' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি ছিল বর্দ্ধমান-রাজের এলাকার মধ্যে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কৃষকদিগকে এখানে আনিয়া প্রত্যক্ষভাবে কৃষিগবেষণার ফলসমূহ দেখান হইবে। ইহার পর হইতে পরীক্ষামূলক ও প্রদর্শনমূলক কৃষি-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কৃষি-বিভাগের জন্য সর্ব্বপ্রথম ডেপুটি ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে।

কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা তখনও ঠিক ভাবে হইয়া উঠে নাই। শিবপুরে এই বিদ্যা শিক্ষা দিবার যে-পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহা কার্য্যতঃ ঘটিয়া উঠিতে রীতিমত সময়

লাগিল। ১৮৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দে শিবপুরের প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়, কিন্তু ১৮৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এখানে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতে দেখা যায় নাই। তখন হইতে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কৃষি-শিক্ষার ক্লাশ বসিতে আরম্ভ হইল। ছাত্রদিগকে যথেষ্টভাবে উৎসাহ দান করিবার জন্য ব্যবস্থা হইল যে, যাহারা কৃষির বিশেষ শিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারিবে, তাহাদিগকে উপযুক্ত চাকুরীতে বহাল করা হইবে। এই ব্যবস্থা কিছুদিন যাবৎ চলিল। তাহার পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুরের নিকট সাবোরে কৃষি-কলেজ স্থাপিত হইবার পর কৃষিশিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা শিবপুর হইতে সাবোরে স্থানান্তরিত হইল।

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আগেও বাঙ্গালার সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ম্মিসংখ্যা এতই অল্প ছিল যে, বাঙ্গালার মত সুবিস্তৃত প্রদেশের মধ্যে কিছু কাজ করা সম্ভব হয় নাই। বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের কৃষি-ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে গেলে আমাদের বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বের বিশেষ কোন বিবরণ দেওয়া কঠিন।

বাঙ্গালার কৃষিকে কি কি সাম্প্রতিক অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার কিছু বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

দুর্ভিক্ষ

মারাত্মক দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, ইহা আমরা সকলেই জানি। যদিও সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস ঘাঁটিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ ভারতে মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়াছে এবং এই দুর্ভিক্ষ ভারতের অনেক অংশের উপর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সে-দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের সমগ্র ভূভাগে একই সময় আক্রমণ করে নাই। হিসাব করিয়া এরূপ দেখা গিয়াছে যে, প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে পরে একটি বিশেষ অঞ্চল দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের একটি প্রধান কারণ হইলেও, একমাত্র কারণ নহে। বন্যার প্রকোপ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, পঙ্গপালের অত্যাচার, ইঁদুরের উৎপাত ইত্যাদিও দুর্ভিক্ষের সহায়ক। তাহা ছাড়া, কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আক্রমণকারী শত্রুর হনন-প্রবৃত্তি দুর্ভিক্ষ আনয়ন করিয়াছে। আক্রমণকারীরা তাহাদের পথে যাহা কিছু পাইত সব তছনছ করিয়া দিয়া যাইত। এই আক্রমণের ফলে গৃহীরা ঘর-সংসার ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিত এবং পিছনে যে-সর্ব্বনাশ ফেলিয়া যাইত তাহা দুর্ভিক্ষেরই সামিল।

সরকারী দায়িত্বের আধুনিক ব্যবস্থা হইয়াছে ভারতবর্ষ কোম্পানীর হাত হইতে সাম্রাজ্যের এলাকাভুক্ত হইবার অনেক পরে। ইহার পূর্ব্বে কৃষিকে রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা দেখা যায় নাই। দুর্ভিক্ষ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য যে-যে কর্ম্মব্যবস্থা এখন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার খসড়া এই সময় তৈয়ারী হয় এবং কার্য্যও সেই সঙ্গে আরম্ভ হয়।

সাধারণ হিসাব হইতেই আমরা এটুকু বুঝিতে পারি যে, চাহিদা হইতে বাড়তি কিছু না থাকিলে বিশেষ অসুবিধা। ব্যবসায়-বিজ্ঞানেও এই কথা খাটে। স্থানীয় চাহিদা হইতে যদি কোন স্থানে বাড়তি কিছু উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে বাণিজ্যের উন্নতি অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভবে রূপান্তরিত না করিতে পারিলে কোন দেশের বহির্ব্বাণিজ্য চলিতে পারে না। বাণিজ্যের কোন সুবিধা যদি না থাকে, তাহা হইলে অযথা কোন ব্যক্তি কিংবা কোন দেশ প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করিতে চাহিবে না। এই অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য তাহার যে অতিরিক্ত মজুরী পড়িবে তাহা ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা পূর্ব্বাহ্নে সে জানিয়া রাখিতে চায়। এই নিমিত্ত কৃষির উন্নতি নির্ভর করিত 'বাজার'-এর উপর—অর্থাৎ উৎপন্ন মাল সম্বন্ধে বাহিরের চাহিদার উপর। কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ 'বাজার'-এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। ভারতের কোন প্রদেশ হইতেই কোন কৃষক তাহার জমিতে বেশী শস্য উৎপাদন করার জন্য কোন উৎসাহ কিংবা উদ্দীপনা লাভ করে নাই। কেবল নিজের জন্য ও নিজের সংসারের জন্য সে যাহা কিছু করিয়াছে তাহাই মোটামুটি সব।

ভারতবর্ষের অধিক অংশের অবস্থাই ছিল এরূপই—অবশ্য গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তাহার পর আভ্যন্তরীণ শান্তি

স্থাপনের ব্যবস্থা এবং সীমানার চতুর্দ্দিকে পাহারার ব্যবস্থা করিয়া প্রথম ধাপ আগাইয়া যাওয়া হইল। বাণিজ্যের বিস্তৃতির পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার। তাহার পর ধীরে ধীরে উনবিংশ শতাব্দী গত হইল যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ভিতর দিয়া। এই সময়ে বাঙ্গালার, তথা ভারতের, কৃষির উন্নতির বিশেষ কোন চেষ্টা লক্ষিত হয় না।

আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপনার পর ভূমির অধিকার লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কারণ, গ্রাম্য ঐশ্বর্য্যের এইটাই মাপকাঠী। ভূমি হইতেই তাহারা (অর্থাৎ গ্রামবাসীরা) চিরজীবন সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছে। ভূমির অধিকার লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার হইয়া যাইবার পর সরকার তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্যের দাবী জানাইয়া কর স্থাপন ও কর আদায় করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কর-স্থাপনার পূর্ব্বে ভূম্যধিকার বিচার করিবার কারণ সহজেই বুঝা যায়। আগে অধিকারীকে চিনিয়া লইয়া তাহার পর করের ব্যবস্থা হইল, ভূম্যধিকারী কর না দিলে আইনমত দণ্ডনীয় হইবেন। কিন্তু করের এই ব্যবস্থা করায় করদাতারও কিছু সুবিধা হইল। করদাতাকে ইতিপূর্ব্বে অনির্দ্দিষ্ট দিনের উপর চাহিয়া থাকিতে হইত—কখন সরকারী আদায়কারী কর দিবার দাবী জানাইবে এই উৎকণ্ঠা লইয়া। কিন্তু সরকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, স্থায়ী কিংবা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দাবী জানান হইবে। ইহাতে করদাতার সুবিধাই হইল বলিতে হইবে। অধিকন্তু কৃষির দিকেও কিছু সুবিধা হইল। এই ব্যবস্থা যে নূতন করিয়া করা হইল এমন নহে। পূর্ব্বের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়াই এই ব্যবস্থার সূত্রপাত হইল। তবে সরকার আর একটু সুবিধা করিলেন এই যে, সমস্ত জমির উপর একই হারে কর স্থাপনা না করিয়া সরকার জমির উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের উপর করের হার নির্দ্দিষ্ট করিলেন। যে-জমির উর্ব্বরাশক্তি কম তাহার উপর তাহা হইলে শক্তি অনুযায়ী কর স্থাপিত হইল। কৃষকেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিল। তাহাদের উপর অযথা উৎপীড়ন করা হইল না। করের বোঝা অনেক পরিমাণে হাল্কা হইয়া আসিল। এই পরিবর্ত্তনের ফল শীঘ্র বিশেষ ভাবে দেখা গেল। ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় করের এই ব্যবস্থার সুফল দেখা গিয়াছিল, এবং আরও প্রত্যক্ষভাবে এই ফল দেখা গেল ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রবল দুর্ভিক্ষের সময়।

এই সময় আর একটি মারাত্মক অসুবিধা বর্ত্তমান ছিল —যানবাহনের অসুবিধা। পণ্য চলাচলের সুবিধা না থাকিলে ব্যবসার বৃদ্ধি কখনই হইতে পারে না। দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্য দিবারও কোন উপায় থাকে না—কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমগ্র ভারতে এক সঙ্গে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আরম্ভ হয় না বা হয় নাই। যে সকল ক্ষেত্রে এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, যানবাহন চলাচলের অসুবিধা বশতঃ তথাকার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত জনসাধারণকে অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে দ্রব্যমূল্যের কোন অর্থ থাকে না। টাকাকড়িরও কোনই মূল্য থাকে না। একটি উদাহরণ দিলে এই উক্তি স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় আজমীরের বণিকদের বিপুল ধন-দৌলত সিন্দুকে পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত উড়িষ্যার ধনিকেরা অন্য দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে না পারিয়া সমান শোচনীয় অবস্থায় আত্মসমর্পণ করে।

এবার জল-সরবাহের কথা কিছু বলিতে হয়। আবহাওয়ার উপর ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গালাকে এই বিষয়ে নির্ভর করিতে হয়। মৌসুমী বায়ুর সহযোগিতা অনিয়মিত ও অনিশ্চিত। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রেই অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। জলসেচের জন্য পুরাকাল হইতে এখানে কূপ, পুষ্করিণী ও খাল ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এ দিক্ দিয়া সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টা হইলেও—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার পক্ষে—তাহা সামান্য। সময়ে জল-সেচের সুবিধা হয়ত হইবে এবং তাহার ফলে জমির দ্রব্যোৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য চালান দিবারও সুবিধা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে যেহেতু রেলপথই পণ্য চালান দিবার প্রধান উপায়, সেহেতু মনে হয় যে, নূতন রেলপথ বসান প্রয়োজনীয়। তাহা হইলে ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সেচের জন্য খাল-খনন ও মাল-বহনের জন্য রেল নির্ম্মাণ এই দুইটি বিষয় পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। একের

উপর অন্যের বিস্তৃতি নির্ভর করিতেছে। খাল কিংবা রেলপথ কোনটিই বিনা অর্থে নির্ম্মিত হইতে পারে না। আবার অর্থ-সমস্যা নির্ভর করে অধিক উৎপাদনের উপর। কারণ, অধিক উৎপাদন হইলেই অর্থাগমের অধিক সম্ভাবনা। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, এই তিনটি সমস্যা একত্রে জড়িত। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ঋণ গ্রহণ করা ছাড়া বোধ হয় কোন উপায় নাই।

জমিতে সার ব্যবহার

ভারতবর্ষের জমির উৎপাদন-শক্তি দিন দিন কমিয়া যাইতেছে কি না,—এই প্রশ্ন লইয়া চারিদিকেই আলোচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যে-জমির উপর মান্ধাতার আমল হইতে চাষ হইয়া আসিতেছে, এতদিনের এত অত্যাচারে তাহার স্বাস্থ্যহানি হইবারই কথা—অন্ততঃ আধুনিক বিজ্ঞান তাহাই বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠিক তাহা নহে; জমির উর্ব্বরাশক্তি কমিতেছে না, হয়ত কোন জমিতে জল জমিয়া মাটি পচিয়া তাহার উর্ব্বরাশক্তি কমিয়াছে। আবার জঙ্গল ছাঁটিয়া চাষের জন্য যে-জমি উদ্ধার করা হইল, সেই জমি হইতে হয়ত আশাতীত ফসল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে জমিতে নিয়মিত চাষ হইতেছে তাহার শক্তি কমিতেছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত দেখা যাইবে—সত্য সত্যই উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাইয়াছে; কিন্তু এরূপ হ্রাস পাইবার কারণ অন্য। পরে তাহা বলিতেছি।

আমরা এখানে এই কথা আলোচনা করিতে চাহিতেছি যে, বহুকাল হইতে যে-জমিতে চাষ হইয়া আসিতেছে, সেই জমি বছর বছর (কিংবা বছরে দুই বা ততোধিক বার) ফসল দান করায় ক্রমাগত তাহার ফসলদানের শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, অথবা নৈসর্গিক প্রক্রিয়ায় তাহার শক্তি-ক্ষয় ও শক্তি-সঞ্চয় যুগপৎ চলিয়া আসিতেছে। সরকারী ইস্তাহারে এইরূপ প্রকাশ যে, তাঁহারা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের নিকট এই প্রশ্ন করিয়া পাঠান, এবং জবাব-স্বরূপ তাঁহারা যাহা পাইয়াছেন তাহাতে প্রকাশ বোম্বাই, বঙ্গদেশ ও ব্রহ্মদেশ না কি জানাইয়া পাঠাইয়াছেন যে, তাঁহাদের নিজ নিজ প্রদেশে ফসল উৎপাদনের ঘাটতির কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, এবং পাঞ্জাব জানাইয়াছেন, তাঁহারা না কি তাঁহাদের প্রদেশে ফসলের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাইতেছেন। বিহার-উড়িষ্যা জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের নিকট আপাততঃ যে-নথীপত্র আছে তাহা হইতে সঠিক বিবরণ দেওয়া যায় না। প্রাদেশিক বিবরণের উপর নির্ভর করিলে আমরা ধরিতে হয় যে, যখন তাঁহাদের ফসলের পরিমাণ (অবশ্য একই জমিতে) ঠিকই আছে, তাহা হইলে তাঁহাদের এলাকার জমির উর্ব্বরাশক্তি আদৌই কমে নাই। জনৈক ইংরাজ গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের জমির বিষয় জানিতে পারা যায়, তিনি সম্রাট আকবরের আমলের কথা বলিতে বলিতে লিখিয়াছেন: "সে সময় যে-জমিতে নিয়মিত চাষ-আবাদ হইয়াছে, সে-জমি নিয়মিতভাবে সমান ফসল দিয়া গিয়াছে।"*

ভারত সরকারের কৃষি-পরামর্শদাতার মতে, "ভারতবর্ষের জমি শত শত বৎসর হইতে চাষ-আবাদে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং এই জমি তাহার চরম দৌর্ব্বল্যে বহুপূর্ব্বে পৌঁছাইয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ বর্ত্তমানে জমির যতটা উর্ব্বরা-শক্তি আছে তাহা আর কমিবার নহে। কমিবার শেষ সীমায় সে পৌঁছাইয়া গেছে ইতিপূর্ব্বেই। এই উক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিলে বোধহয় কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এই উক্তি সমর্থন করিবার জন্য আর উল্লেখ করা যায় যে, আধুনিক কৃষিতত্ত্ব হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া গিয়াছে যে, যখন জমিতে বছর বছর ফসল উৎপন্ন হয় অথচ কোনপ্রকার সার ব্যবহৃত হয় না, তখন ধীরে ধীরে সেই জমির উর্ব্বরাশক্তি একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় নামিয়া আসিয়া থামিয়া যায়; তাহার পর তাহার উর্ব্বরতরে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। শস্য-উৎপাদনের জন্য জমির যে-শক্তি ব্যয়িত হয়, সে-শক্তি সেই জমি প্রকৃতির নিকট হইতে সঞ্চয় করিয়া লয়। সেইজন্যই উৎপন্ন শস্যের বার্ষিক পরিমাণের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, যেটুকু হয় তাহা কেবলমাত্র ঋতু পরিবর্ত্তন ও স্বাভাবিক অনিয়মের জন্যই। মনে রাখিতে হইবে, এই যে শস্যের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না বলিতেছি, তাহা অবশ্য একই প্রক্রিয়ায় চাষের উপর নির্ভর করিবে। এখন দেখা যাইতেছে যে, আমাদের জমির আর শক্তি-ক্ষয় হইবার

* India at the Death of Akbar—*M. A. Morrland*

সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহার উৎপাদন-শক্তি সর্ব্বনিম্ন অঙ্কে পৌঁছিয়াছে। সরকারী দপ্তরেও এইরূপ মতবাদ প্রচারিত।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এদেশে কয়েক জন আধুনিক কৃষি-বৈজ্ঞানিক জমির সার সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহারা এতদিনেও বিশেষ কিছু কাজ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহাদের গবেষণার ফলস্বরূপ তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, এ-দেশের জমিতে ফসলের খাদ্যের মাত্রা কম। না খাইলে কেহই বাঁচিতে পারে না, অতএব খাদ্যপূর্ণ সার আবশ্যক। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যের অভাব। কিন্তু সর্ব্বত্রই নাইট্রোজেনের মাত্রা কম। যদিও যে-পরিমাণ নাইট্রোজেনের অভাব, সারের সহিত ঠিক সেই পরিমাণ নাইট্রোজেন জমিকে যোগান দেওয়া যাইতেছে না, তথাপি শস্যের পরিমাণের দিক হইতে ঘাটতি পড়িতেছে না। এই সকল জমি যদিও কম শস্য উৎপন্ন করিতেছে, তথাপি উৎপন্নের মাত্রা সব সময় সমান। ইহার কারণ এই যে স্বাভাবিক ভাবে জমির ভিতরে যে-প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহাতে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সেখানে উৎপন্ন হইতেছে। এমন কি, মধ্যপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে এই উৎপন্ন নাইট্রোজেনের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই লইয়া এখন গবেষণা করিবার কথা চলিতেছে যে, নূতন কোন পদ্ধতি দ্বারা নাইট্রোজেনের স্বাভাবিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় কি না।

ভারতীয় জমিতে সারমাটি জাতীয় দ্রব্য (humus content) কম, তাহার কারণ জৈব সার এখানে ব্যবহৃত হয় খুব কম। ইহার কারণ এই অঞ্চলে এই সার খুব তাড়াতাড়ি গলিয়া যায়। এই কারণে উষ্ণ এবং মন্দোষ্ণ প্রদেশে কি প্রকারের সার কার্য্যকরীরূপে বেশী ব্যবহার করা যাইবে, তাহা লইয়া না কি প্রচুর গবেষণা চলিতেছে। চুণ ও কাঠের ছাই-এর বৈজ্ঞানিক মিশ্রণের দ্বারা নব-নির্ম্মিত সারেরও প্রয়োজন—কারণ জমিতে চুণের মাত্রা কম—এরূপ উক্তিও শোনা যাইতেছে।

জমিতে বিশেষ কোন রাসায়নিকের অভাব লইয়া গবেষণা চলিতেছে বটে, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, জমি তাহার উৎপাদিকাশক্তির যে-অংশ ক্রমাগত বছর বছর হারাইয়া বসিতেছে তাহা স্বাভাবিক কারণে নয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নাগপুর অঞ্চলে বৎসরে ১৬০ পাউণ্ড নাইট্রিক-নাইট্রোজেন প্রতি একর জমি হইতে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। হিসাবে আরও পাওয়া গিয়াছে যে, নাইট্রোজেনের এই লোকসান বর্ষার জলের প্লাবন হেতুই ঘটিয়াছে, শস্যোৎপাদনের জন্য হয় নাই। অর্থাৎ উক্ত জমিতে যে-শস্য জন্মিয়াছে, সেই শস্যের জন্মগ্রহণ ও জীবনযাপন হেতু নাইট্রোজেনের খরচ হয় নাই, বাহিরের অন্য রিপু আসিয়া সেই নাইট্রোজেন ধুইয়া লইয়া গিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে, জমির নিজস্ব যে-সার রহিয়াছে তাহা বিশেষ খরচ হয় না—যেটুকু হয় তাহা সে নিজেই তৈয়ার করিয়া লইতে জানে।

কিন্তু বন্যার জল আসিয়া জমির যে-সার ধুইয়া লইয়া যায়, তাহা আর পূরণ করা সম্ভব নহে। অবশ্য পূর্ব্বাহ্নে সতর্কতা গ্রহণে ইহা রক্ষা করা চলে। জমির ক্ষয়ের এই দিকটার প্রতি নজর দেওয়া অতি আবশ্যক। বন্যার জল ও বর্ষার জলে জমির এই ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা যায় যুক্তপ্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে। চম্বল ও যমুনার শাখা-প্রশাখার জালে জড়িত হইয়া তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এই শাখা-প্রশাখার জল-স্রোতে জমির স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট হইতেছে। এই নদীরা যেন জমির দেহের 'মাংস' ধুইয়া কেবলমাত্র কঙ্কালটুকু ফেলিয়া রাখিতেছে। অতএব জমিতে কৃত্রিম সার দিবার গবেষণা করার পূর্ব্বে এই জমিকে বাঁচাইবার পথ আবিষ্কার করা দরকার। সুধু যে বন্যার প্রকোপে জমির এই দুর্দ্দশা ঘটিতেছে তাহা নহে। উচ্চভূমির ঢালু স্থানে বর্ষার জলপাত হেতুও জমির উপরের স্তর ধুইয়া যায়। এই বিপদ হইতে বাঁচিবার জন্য জমিকে বাঁধ দ্বারা ঘিরিয়া ফেলা দরকার। এমন ভাবে বাঁধ দিতে হইবে, যাহাতে তাহার ভিতরের সার বাহিরে না গড়াইয়া যাইতে পারে। ঢালু জমিতে চক্রাকারে বাঁধ দিবার প্রয়োজন যাহাতে তাহার সার জলে ধুইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার ভিতরেই আটক হইয়া যায়। যুক্তপ্রদেশে এক অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রায় কুড়ি বর্গ-মাইল পরিমাণ জমিকে জঙ্গলে পরিণত করা হইয়াছে। এই বন-বেষ্টিত ভূভাগ হইতে জমির সার ধুইয়া যাইবার আশঙ্কা অনেকটা কম। তাহা ছাড়া, অর্থকরী সুবিধাও ইহাতে

বিস্তর। এই বন হইতে জ্বালানী কাষ্ঠও পাওয়া যায়। অনেকে বলিতেছেন, জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায় আবিষ্কারের দিকে মন না দিয়া, যে জমি বরাবর সমান ফসল দিয়া যাইতেছে, তাহাকে বাঁচাইবার দিকে মন দেওয়াই বোধ হয় আশু কর্ত্তব্য।

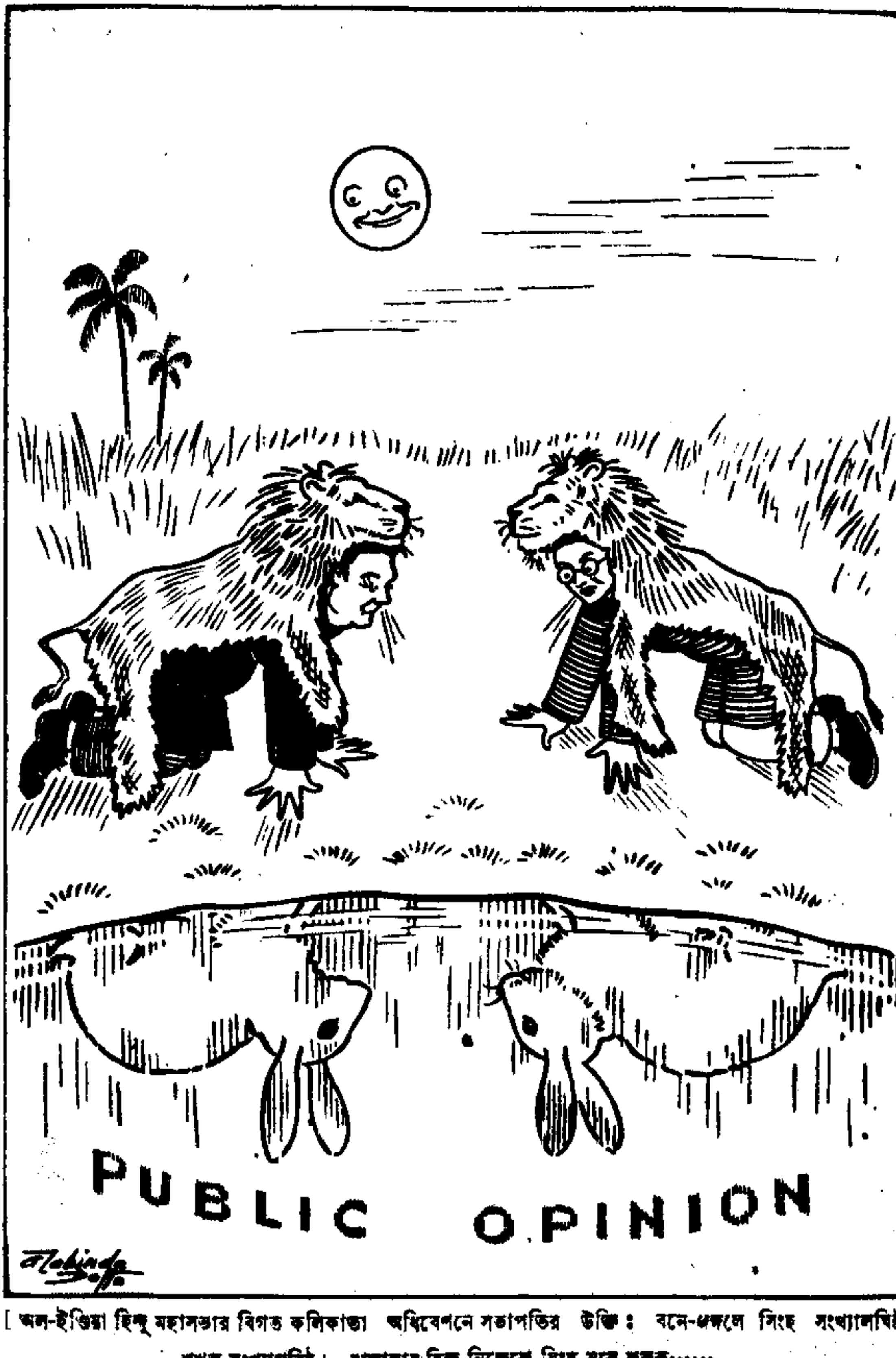
জমিতে সার দিয়া 'হৃষ্টপুষ্ট' করিবার জন্য নানা গবেষণা চলিতেছে। কিন্তু ফল তাহাতে শুভ হইবে কি না, এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। যে জমি যতটা ফসল দিতে পারে, সেইটুকুই তাহার পক্ষে যথেষ্ট—অযথা সার ছড়াইয়া তাহার উপর জুলুম করিয়া বেশী দাবী করিলে অচিরে তাহাকে পঙ্গু হইতে হইবে ইহা নিশ্চিত। জমির সারবান অংশ ক্ষয় (সয়েল ইরোশন) সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্লাবনে ও জলস্রোতে জমি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে জমির জীবনীশক্তি কমিয়া যায়। এখন জমির জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য তাহার উপর নানারূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া 'চাঙ্গা' করিবার চেষ্টা করিলে তাহা চিরস্থায়ীরূপে উপকারী হইবে বলিয়া ভরসা করি না। আপাততঃ হয় ত তাহার নিকট হইতে বেশী ফসল পাইব, কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে বেশী বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ঔষধের উপর নির্ভর করিয়া কেহই বাঁচিতে পারে না; প্রকৃতির উপরই আমাদের ভরসা রাখা কর্ত্তব্য। জমি যখন 'ওভার-মেডিকেটেড' হইয়া যাইবে, তখন তাহার কোন সারেই কাজ দিবে না; বর্ত্তমানে তাহার নিকট হইতে যাহা পাইতেছি তাহাও পাইব না। সার ব্যবহার ঔষধরূপে না করিয়া খাদ্যরূপে ব্যবহার করা অবশ্য চলে—সে কাজ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে—যেমন গোময় ব্যবহার; যদিও এই সার নিয়মিত ব্যবহার করা হয় না। জ্বালানী দ্রব্যরূপে বহু পরিমাণ গোময় নষ্ট হয়। ভারতীয় জমিতে সার ব্যবহার হালে অত্যন্ত বাড়িয়াছে। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের হিসাব, একটু পুরাণ হইলেও, বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে। এই বৎসর বিদেশ হইতে প্রায় ৪,৭০০ টন সালফেট অব্ আমোনিয়া আমদানী করা হয়। তাহা ছাড়া টাটা আয়ার্ণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কম্প্যানী এবং বিহার, উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার খনি হইতে উৎপন্ন এই জাতীয় সারের প্রায় সমস্তই ভারতীয় জমিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

রয়াল কমিশনের মতে উচ্চশ্রেণীর বীজ-বপন করিয়া যদি বরাবর সেই শ্রেণীর ফসল প্রত্যাশা করিতে হয়, তাহা হইলে অবিরত উপযুক্ত সার দিতে হইবে। ইহা অবশ্য থিয়োরী। কার্য্যতঃ, কতদূর কি হইবে বলা এখন শক্ত। বর্ত্তমানে জমিতে সার ছড়াইয়া বীজ বুনিয়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ফসলের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে ও ফসলের ধরণও একটু উন্নত হইয়াছে; কিন্তু সেই জন্যই যে বরাবর এইরূপ চলিবে, তাহা বলা যায় না।

নাগপুরে ডক্টর অ্যানেট সার-সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়াছেন এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কৃষি-গবেষণাগারও এ বিষয় কিছুটা কাজ করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও, রয়াল কমিশনের মতে, সার-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহারা না কি এখনও কৃষকদিগকে উপযুক্ত পরামর্শ দিবার মত কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা তিন ভাবে ইহার গবেষণা করিতে চান: প্রথম, যে সব শস্য কেবলমাত্র বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে; দ্বিতীয়, যে-সব শস্য জল-সেচের উপযুক্ত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে; তৃতীয়, আখ জাতীয় সামগ্রী। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নাইট্রোজেনমিশ্রিত সারই সবক্ষেত্রে ফলপ্রদ হইবে, এমন নয়। সেই জন্য তাঁহারা নানারূপ সারের সন্ধান করিতেছেন। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া ইহাও দেখিয়াছেন যে, যুক্তপ্রদেশে গমের জমিতে প্রচুর সার দিয়া কোন উপকার পাওয়া যায় না।

চীন ও জাপানের কৃষকদিগের নিকট হইতে ভারতীয় কৃষকের না কি অনেক কিছু জানিবার আছে। সে দেশেও কৃত্রিম সার জমিতে আদৌ ব্যবহার করা হয় না। গ্রাম্য আবর্জ্জনা তাহারা জড় করিতে জানে, সেই আবর্জ্জনা ও গোময় দিয়াই তাহারা সারের কাজ সারে। ইহাতে সুবিধা এই যে, জমিতে সার দিয়া তেমন উপকার না পাইলেও, আবর্জ্জনা সার রূপে জমিতে ব্যবহৃত হওয়ায় গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, এবং তাহাদ্বারা গ্রাম হইতে নানারূপ মারাত্মক রোগ বিতাড়িত হয়। আমাদের কৃষকেরা গ্রামের মধ্যে এইরূপ একটা সদভ্যাস সৃষ্টি করিতে পারিলে মন্দ হয় না। পাঞ্জাবে গুরগাঁও জিলায় তীব্র প্রোপ্যাগাণ্ডার ফলে জিলাস্থ গ্রামসমূহ সমস্ত আবর্জ্জনা জমায়েৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পচা পাতা, খড়, গোময় ইত্যাদি যা-কিছু

কায়া ও ছায়া



[অল-ইণ্ডিয়া হিন্দু মহাসভার বিগত কলিকাতা অধিবেশনে সভাপতির উক্তি : বনে-জঙ্গলে সিংহ সংখ্যালঘিষ্ঠ, শশক সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঙ্গালার হিন্দু নিজেকে সিংহ মনে করুক……

জঞ্জাল এই প্রকারে একত্রিত হয়, তাহার সমস্তই সেখানে সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

খাদ্যের অতিরিক্ত সার দিবার জন্ত একটা হুজুগ উঠিয়াছে। বাঙ্গালার কৃষিবিভাগ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সার তৈয়ারী করিয়া জমিতে দিয়া না কি বিশেষ উপকার পাইতেছেন। তাহার পূর্ব্বে যদি গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়া জঞ্জাল একত্রিত করিবার আদেশ ও উৎসাহ বিতরণ করা যায়, তাহা হইলে, আমাদের মনে হয়, জমিও অসার হইয়া পড়িবে না, গ্রাম্য স্বাস্থ্যও উন্নত হইবে। জমির স্বাস্থ্যের দিকে মন দেওয়া খুবই প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহাকে যাহারা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন হইলেও চলিবে না। জমির সার-সৃষ্টির পূর্ব্বে আমরা যদি গ্রাম্য জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হই, তাহা হইলে জমির ভারপ্রাপ্ত কৃষকগণ জমির রক্ষণাবেক্ষণে উৎসাহিত হইবে এবং তাহাতেই জমির প্রতি প্রকৃত উপকার করা হইবে।

হাঁসের নিকট হইতে এক দিনেই সব কয়টি সোনার ডিম লইতে গেলে পরিণাম কি হয়, তাহা সকলেরই জানা আছে। আমাদের জমি হইতে সেইরূপ স্বর্ণ শস্য একই সময় অধিক পরিমাণে লইতে গেলেও হয়ত আমাদিগের তদ্রূপ অবস্থা হইবে। জমির যদি বাৎসরিক উৎপন্নের পরিমাণ হয় ৫ মণ, সে চিরকাল বছর বছর ৫ মণ দিয়া যাইবে, (অবশ্য ঋতু পরিবর্ত্তন এবং প্রাকৃতিক অনিয়মের কথা ছাড়িয়া দিলে), কিন্তু সার দিয়া যদি তাহার বাৎসরিক শক্তি ১০ মণে তুলিতে পারা যায়, তাহা হইলে ১০ বৎসরে হয় ত সে ১০০ মণ শস্য দিবে, তারপর আর দিতে পারিবে না। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে বার্ষিক ৫ মণ হিসাবে চিরকাল পাইতে কে না বেশী উৎসুক!

শাস্তি ও শান্তি

শ্রীমোহিনী চৌধুরী

শান্তি ছিল সেইদিন,—যবে তপোবনে
জীবন বহিত সদা সংযমের স্রোতে,
উদাত্ত মন্ত্রের ধ্বনি উঠিত পবনে,
পূর্ণ ছিল মনঃপ্রাণ মহা পুণ্যব্রতে।

শান্তি ছিল সেইদিন,—যবে দেশমাঝে
ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিল, ছিল সত্য ঋষি,
স্বার্থহীন সেবা ছিল ধর্ম্মে ও সমাজে,
ন্যায়ের মর্য্যাদা ছিল, মহত্বের কৃষি।

ব্রাহ্মণ 'ব্রাহ্মণ' ছিল—পূজ্য দেবসম,
বৈশ্যের প্রবৃত্তি ছিল প্রতারণাহীন,
ক্ষত্রিয়ের তেজোবীর্য্য ছিল শুভ্রতম,—
মানুষের প্রাণে ছিল শান্তি সেইদিন।

নিষ্ঠা 'ত্যজি' সবে যবে হোলো উচ্ছৃঙ্খল,
সেদিন বাজিল প্রাণে শাস্তির শৃঙ্খল।

শিব সঙ্কীর্ত্তন, চণ্ডিকামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল

—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

সতীর শোকে মহাদেব বৈরাগী হইয়া হিমালয়ে গেলেন তপস্যা করিতে। এ দিকে সতী হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন শিবের সহিত মিলনের আশায়। কবিকঙ্কণ গৌরীর জন্মবৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া বর্ণনা করেন নাই, কেবল গৌরী তুষারশিখরের গৃহে জন্ম নিলেন এবং তাঁহার "অন্নপ্রাশন" ও পঞ্চমবর্ষে "কর্ণবেধ" হইল, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। রামেশ্বর কালিদাসের কুমারসম্ভবের ছাঁকা অনুবাদ করিয়া হিমালয় বর্ণনা করিয়াছেন :

"উত্তরে করিয়া স্থিতি   নগেন্দ্র ধার্ম্মিক নীতি
হিমালয় দেবাত্মা প্রচণ্ড।
পয়োনিধি পূর্ব্বাপরে   পৃথক্ করিয়া করে
পৃথিবীর যেন মানদণ্ড॥
উচ্চমেরু বর্ত্তমানে   বৎস করি যাঁরে টানে
প্রথু করে পৃথিবী দোহন।
সর্ব্বশৈল হৈল গড়,   ব্যাপার করিল বড়
হৈল রত্ন মহৌষধিগণ॥
অনন্ত রত্নেতে যাঁর   প্রভা পায় চমৎকার
অসৌভাগ্য হিম কভু নয়।
একদোষে গুণরাশি   যেমন শশাঙ্ক আসি
নিজকরে নাশি অন্ধময়॥*

হিমালয়-বর্ণনার পর কবি উমার জন্ম বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন—

দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন শশধর।
শোভা করে কলান্তরে কৌমুদিনীকর॥ (১)

তাহার পর পঞ্চমাসে কর্ণবেধ ও সপ্তম মাসে অন্নপ্রাশন সারিয়া গিরিরাজ কন্যার নাম রাখিলেন গৌরী। ভারতচন্দ্র সতীর দেহ-ত্যাগ প্রসঙ্গেই হিমালয়-গৃহে মেনকার গর্ভে মহামায়ার জন্মের কথা বলিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে শিবের বৈরাগ্য দেখিয়া দেবতাগণের পরামর্শকালে দেববাণী সাহায্যে উমা নামের অর্থনির্দ্দেশ করিয়া দিলেন—

"উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার।"

সুতরাং হৃষিকেশের ইঙ্গিতে নারদ সাজিলেন শিবের বিবাহ-উদ্যোগ করিতে।

কবিকঙ্কণ যে কিশোরী উমার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কিশোরী রাধিকার রূপের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বর্ণনাটি অতি চমৎকার, কিন্তু কুমারসম্ভবের গৌরীর রূপবর্ণনার সহিত ইহার তুলনা হয় না—

উরুযুগ করিকর   নাভি সুগভীর সর
দুই ভুজ মৃণাল সঙ্কাশ।
বিমল অঙ্গের আভা   নানা অলঙ্কার শোভা
অন্ধকার করয়ে বিনাশ॥
অধর বন্ধুক-বন্ধু   বদন শারদ ইন্দু
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা   কপালে সিন্দুর-ফোটা
তনুরুচি ভুবন মোহন॥
নাসাতে দোলয়ে মোতি   হীরায় জড়িত তথি
বদনকমলে ভাল সাজে।
তুলনা যে দিতে নারি   তাহে অতি মনোহারী
তারা যেন সুধাকর মাঝে॥

---

* অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥
যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্॥
অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥

(কুমার— ১, ১-৩)

বঙ্গবাসী সংস্করণের শিবায়নের অনুবাদে কিছু পাঠান্তর আছে।

(১) দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা॥
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্ জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি॥

(কুমার ১-২৫)

"শোভাকরে কলান্তরে যেন জ্যোৎস্নান্তর" (বঙ্গবাসী)

গৌরীর বদন শোভা　　কহিতে না পারি কিবা
　　দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
মলিন চান্দ সেই শোকে　　না বিচারি সর্ব্বলোকে
　　মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা॥
গৌরীর দশন রুচি　　দেখিয়া দাড়িম্ব বীচি
　　মলিন হইল লজ্জা ভারে।
অনুমান করি মনে　　ওই শোকের কারণে,
　　পককালে দাড়িম্ব বিদরে॥
শ্রবণ-উপর-দেশে　　হেম-মুকুলিকা ভাসে,
　　কিঞ্চিত কুঞ্চিত কেশপাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘমাঝে　　যেমন বিজুলী সাজে,
　　পরিহরি চপলতা দোষে॥
স্থূলতা উদরে ছিল,　　যত্নে তা লুঠিয়া নিল
　　উরঃস্থল জঘন ভুজনে।
চঞ্চল চরণ ভাব　　লোচন করিল লাভ
　　নব নৃপ আসিতে যৌবনে॥

কবিকঙ্কণ এখানে পূর্ব্ব কবিগণের নিকট অনেকাংশে ঋণী। কাশীরাম দাস এবং বিশেষতঃ বিদ্যাপতি তাঁহার এই রূপবর্ণনার উপাদান যোগাইয়াছেন। বিশেষ করিয়া শেষ কয়েকটী পঙ্‌ক্তিতে বিদ্যাপতি-বর্ণিত রাধিকার বয়ঃসন্ধির পরিষ্কার ছাপ রহিয়াছে—

মদনক ভাব পহিল পরচার।
ভিন জন দেল ভীন অধিকার॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একক খীন অওক অবলম্ব॥
প্রকট হাস অবগোপত ভেল।
উরজ প্রকট অব তকিক লেল॥
চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতল যাব॥

রামেশ্বর গৌরীর রূপবর্ণনা না করিয়া তাঁহার অলঙ্কার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে সেই যুগের বহু অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়—

পায় দিল পাশুমল পাশুলির পাঁতি।
মহামণিমণ্ডিত মুকুতা নানা ভাতি॥
গুল্‌ফের উপরে নির্ম্মাইল গোটামল।
দপ্‌ দপ্‌ করে দুটী চরণ কমল॥
কটীদেশে কিঙ্কিনী করিছে কলরব।
ঘাঘরার উপরে ঘণ্টার ঘটারব॥
বিচিত্র কাঁচলি বান্ধা বুকের উপর।
উডুগণ আলো করে আছে নিরন্তর॥
কণ্ঠদেশে করে শোভা কত রত্নহার।
মণির মোহনমালা মূল্য নাহি যার॥
সুবলিত ভুজে সাজে সুবর্ণের চুড়ি।
শুধা রহিলেন যেন সৌদামিনী যুড়ি॥
রজতের কঙ্কণ তার রহিল কোলে।
ছাটিক জড়িত হীরা ঝুল ঝুল দোলে॥
আগে সাজে পঁইছা পশ্চাতে বাজুবন্ধ।
দিবাঝাঁপা পাটঝোঁপা দেখিতে সুছন্দ॥
সকল অঙ্গুলিগুলি অঙ্গুরী-ভূষিত।
মরকতমণি চুনি প্রবাল সহিত॥
দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দুটি দর্পনের ছাপ।
রবি শশী কিরণে করিছে পরিতাপ॥　(১)
দাড়ুমূলে তাড় সাজে বিরাজে পাশ্মিনী।
বিচিত্রকুণ্ডল কাণে বিশ্ব বিমোহিনী॥
পাচাকি উপরে বউলি বিলক্ষণ।
রজত জড়িত বিশ্বকর্ম্মার গঠন॥
দুইদিকে গজমুক্তা চুনি মধ্যস্থলে।
সুবর্ণের নত্তে নকে বিধুভানু জ্বলে॥
সুন্দর কপালে সাজে সিন্দুরের বিন্দু।
তার সনে তারাগণে ঘেরে আসি ইন্দু॥
কজ্জলে উজ্জ্বল করে কুরঙ্গ লোচন।
অপাঙ্গে অনঙ্গ বাণ করে বরিষণ॥
কুটিল কুন্তলে বেণী দেখে লাজে ফণী।
কাননে পলায় কেহ কেহ বা অবনী॥
চূড়ামণি উপরে দীপিত সূর্য্যকান্ত।
উমারে সাজায় গিরি নাশে মনধ্বান্ত॥
সাধ করে হেমঝোপা দিল খোঁপাপাশে।　(২)
বরিষে আনন্দসিন্ধু মন্দ মন্দ হাসে॥
দশনে বিজলী খেলে গজপতিগতি।
মোহন করিতে চান মহেশের মতি॥
বিচিত্র দুকূল মাঝে সাজে হেমগুণ।
যার গুণে পাগল আপনি তমোগুণ॥

ভারতচন্দ্র গৌরীর রূপ বর্ণনা করেন নাই।

(১) দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সারদর্পণের ছাব।
　　রবি শশী উভয়ে করিছে আবির্ভাব॥　(বঙ্গবাসী)
(২) হেমঝাঁপা পাটঝোপা দিল পৃষ্ঠদেশে।　[বঙ্গবাসী]

রামেশ্বর গৌরীর বাল্যলীলার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই মৌলিক এবং স্বাভাবিক। রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্র উভয়েই গৌরীর বাল্যলীলার আদর্শ লইয়াছেন কুমারসম্ভব হইতে।* কিন্তু রামেশ্বর এই বাল্যলীলায় বঙ্গের কিশোরী কন্যার বাল্যলীলার একটি অতি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন—

হৈমবতী পুতুলের বিবাহ দিতেছেন—

বরযাত্র কন্যাযাত্র বসাইয়া ঘরে।
আপনি অভয়া অন্ন বিতরণ করে॥
সবাকার সংমুখে পাতিয়া কচুপাত।
ধরণী ধুলার তাতে ঢালি দিল ভাত॥
শাক দিল শাকম্ভরী শজিনার পাতা।
সুপ দিল তপ্ত বালি ত্রিভুবন মাতা॥
বড়ি-ভাজা বড় ছোট বদরীর বীজ।
কাঁচা কলা ভাজা দিল কাটি কাণ্টাসিজ॥
পুঁঠী মৎস্য ভাজা দিল ভাল খোলা কুচি।
সকরীতে সবার সুন্দর হয় রুচি॥
বড় বড় ঘটিং দিল রোহিতের মুড়া।
তিন্তিড়ী অম্বল দিল তেঁতুলের চুড়া॥ (১)
পুকুরের পঙ্ক আনে ঢালে দধি করে।
স্পর্শমাত্র করে সুখে হয় পরস্পরে॥ (২)
... ...
পিয়ালের পত্রে পর্ণ-খিলী করে দিল।
পূর্ণ হল পেট আর বাকি না রহিল॥

তারপর রামেশ্বর অভয়ার অন্যান্য খেলার কথা লিখিতেছেন—

লুক লুকী খেলিছে আপনি হয়ে বুড়ী।
এক চোরে সবাকারে করে তাড়াহুড়ি॥
লুকাইলে খুঁজে ধরে ধরে সব চাই।
বুড়ীকে না ছুঁলে কার পরিত্রাণ নাই॥
যাবৎ বুড়ীর পদস্পর্শ নাহি করে।
পুনঃ পুনঃ ধাবে যায় পুনঃ পুনঃ মরে॥
চক্ষু চাপে ছাড়ি দিলে পড়ে যায় ভঙ্গ।
খল খল হাসে বুড়ী বসে দেখে রঙ্গ॥

খেলে দশ পঁচিশ ছকড়া লয়ে কড়ি।
দান ধর্ম্ম বুঝে দান পেলে বুড়ী পাড়ি॥
সাতঘর সুন্দরী সুন্দর খেলা খেলে।
বুড়ি বুড়ি কড়ি কত কড়া দিয়া ফেলে॥
মিছা ঘর্ঠ ধরে কার গুয়া পায় করে।
করে কর ধরে কিল মারে যাস ধরে॥
দুইচারি সখী কভু হয় সমবায়।
ফেলিছে ফুল ঘুটিং পুকুর দিয়া গায়॥
আঁটুল বাঁটুল খেলে প্রসারিয়া পদ।
আর লীলা খেলা যত কত কব পদ॥

হর-গৌরীর বিবাহপ্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন হিমালয় কন্যার উপযুক্ত পাত্র কোথায় মিলিবে, এই কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মহর্ষি নারদ ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং আশ্বাস দিলেন, গৌরী খুব ভাগ্যবতী, তিনি শীঘ্রই হরের ঘরণী হইবেন। সুতরাং হিমালয় অন্য বরের আশা ত্যাগ করিলেন। এদিকে মহাদেবও তপস্যা করিতে গঙ্গোত্রীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।* হিমালয় হরের নিকট অনুমতি চাহিলেন—

আমার কামনা নাথ করহ সফল
মোর কন্যা নিত্য দিব কুশ-পুষ্প-জল॥
হেমন্তের বচন শুনিয়া পশুপতি
গৌরীকে করিতে পূজা দিল অনুমতি॥

রামেশ্বর কবিকঙ্কণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, তবে নারদের সহিত হিমালয়ের এবং পরে মেনকার আলাপ একটু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং শিব যে শীঘ্রই হিমালয়ে আসিতেছেন, সে কথাও নারদের মুখ দিয়া বলাইয়া দিয়াছেন। রামেশ্বর শিবের সহিত হিমালয়ের সাক্ষাৎ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

গঙ্গাস্নান করি গিরি গৃহেতে যাইতে।
পথি মধ্যে হৈল দেখা মহেশ সহিতে॥

তারপর গিরিরাজ মহেশকে গৃহে আনিলেন, শিব সতী সতী বলিয়া শিঙ্গা বাজাইলেন, পার্ব্বতী আনন্দিতা হইলেন হইলেন মেনকা নারদের কথা স্মরণ করিলেন। হিমালয়

---

* মন্দাকিনীসৈকতবেদিকাভিঃ সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিমপুত্রকৈশ্চ।
রেমে মুহুর্ম্মধ্যগতা সখীনাং ক্রীড়ারসং নির্ব্বিশতীব বাল্যে॥ (১-২৯)

(১) তেঁতুলি অম্বল দিল চেঁমনের চুড়া (বঙ্গবাসী)

(২) পুকুরের পঙ্ক আনি দধি দিল ঢেলে।
স্পর্শ মাত্র করি সুখে সব দিল ফেলে॥ (বঙ্গবাসী)

* স কৃত্তিবাসাস্তপসে যতাত্মা গঙ্গাপ্রবাহোক্ষিতদেবদারু।
প্রস্থং হিমাদ্রের্মৃগনাভিগন্ধি কিঞ্চিৎ ক্বণৎকিন্নরমধ্যুবাস॥
(কুমার ১-৫৪)

এই শ্লোকটি উপরের বর্ণনার সহিত তুলনীয়

বলিলেন, পার্ব্বতী প্রত্যহ মৃত্তিকার শিবপূজা করেন, সাক্ষাৎ শঙ্করকে দেখিলে তাঁহার সাধ পূর্ণ হইবে। মহাদেবও গৌরীকে দেখিতে চাহিলেন। পার্ব্বতী আসিয়া শিবকে গড় করিলেন, পঞ্চানন আশীর্ব্বাদ করিলেন—

"এও হয়ে জনম জনম থাক সুখে।"

ভারতচন্দ্র নারদকে পাঠাইয়াছেন হিমালয়ে একেবারে সম্বন্ধ করিবার জন্য। নারদ আসিয়া দেখিলেন গৌরী সখী-গণের সহিত মাটীর হরগৌরীর বিবাহ দিতেছেন। মহা-মায়ার মায়া দেখিয়া মহর্ষি চমৎকৃত হইয়া দণ্ডবৎ হইয়া গৌরীকে প্রণাম করিলেন। ভগবতী মনে মনে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক বলিয়া বর দিয়া প্রকাশ্যে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—

শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়।
আমারে প্রণাম কর উপযুক্ত নয়॥
অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে।
দেখিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কেমনে॥

মুনি বলিলেন "তোমার কৃপায় তোমাকে ভয় করি না, তুমি আমার পিতামহী তাই বুঝি বুড়া বলিতেছ, তোমার এমন বুড়া বর আনিব যে তার দাঁত বাতাসে নড়িবে।" উমা বিবাহের কথায় লজ্জিতা হইয়া মায়ের কাছে অনুযোগ করিলেন। মেনকা বুঝিলেন, নারদ আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া নারদকে প্রণাম করিলেন। সংবাদ পাইয়া গিরিরাজ নারদকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। নারদ সম্বন্ধ করিলেন এবং লগ্ন-পত্র করিয়া চলিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র হিমালয়-গৃহে শিবের গমন এবং উমাকর্ত্তৃক তপস্যানিরত শিবের পরিচর্য্যার কথাও লিখেন নাই।*

ইহার পর শিবের তপস্যাভঙ্গের কাহিনী। যাঁহারা কালি-দাসের অমর লেখনী-প্রসূত এই কাহিনী পড়িয়াছেন, তাঁহা-দিগকে ইহার আর নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। কবিকঙ্কণ কুমারসম্ভবের কাহিনীর মূলতঃ অনুসরণ করিয়া-ছেন—দুর্দ্ধর্ষ তারকাসুর ব্রহ্মার বরে অজেয় হইয়া দেবগণকে পীড়ন করিতে লাগিল। দেবতারা আসিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "শিবের পুত্র ব্যতীত তারকাসুর কাহারও হস্তে মরিবে না, সুতরাং শিবের তপস্যা ভঙ্গ করিয়া বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। যতদিন শিবের পুত্র না হয়, ততদিন অযোধ্যাপতি মান্ধাতার পুত্র মহাবীর মুচুকুন্দকে স্বর্গরক্ষার ভার দাও।"* দেবরাজ মুচুকুন্দকে স্বর্গের রাজ্যভার ছাড়িয়া দিয়া মদনের নিকট গেলেন এবং তাহাকে অনুরোধ করিলেন শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে। দেবতাদিগের সহিত কুসুমায়ুধ চলিলেন অগ্নিমুখে পতঙ্গের মত হিমালয়ের উদ্দেশ্যে শিবের তপভঙ্গ করিতে।

রামেশ্বরও একই কাহিনী গাহিয়াছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র তারকাসুরের কোন উল্লেখ করেন নাই—দেবতাগণ শক্তিহীন শিবের বিবাহ হেতুই শিবের তপোভঙ্গের মন্ত্রণা করিলেন।

মন্ত্রণা করিয়া মদনে ডাকিয়া সুরপতি দিলা পান।
সম্মোহন বাণ করিয়া সন্ধান শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান॥

কুমারসম্ভবে বর্ণিত ইন্দ্র কর্ত্তৃক মদনকে অনুরোধ ও মদনের তপোভঙ্গের আয়োজন কিম্বা তপোরত মহাদেবের বর্ণনা এ সকলের বিশেষ কিছু এই তিনটী কাব্যের একটীতেও নাই। কবিকঙ্কণ লিখিতেছেন—

ইন্দ্রের বচনে কাম হৈলা হরষিত।
সঙ্গে নিল মলয় বসন্ত মারুত॥
ফুলময় ধনু ফুলময় পঞ্চবাণ।
মধুকর কোকিল করয়ে গান॥
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে চলিলা মদন।
দণ্ডহাতে গেলা বীর যথা পঞ্চানন॥
যেখানে আছেন হর অজিন আসনে।
বারি হাতে পার্ব্বতী আছেন সন্নিধানে॥

রামেশ্বর এক কথায় সারিয়াছেন—

প্রণমিয়া মীন (গজ) কেতু হর তপ ভঙ্গ হেতু
সত্বরে বিদায় হইল কাম।"

অনর্ঘ সর্ঘ্যেণ তমদ্রিনাথঃ স্বর্গৌকসামর্চিত মর্চয়িত্বা।
আরাধনায়াস্য সখীসমেতাং সমাদিদেশ প্রযতাং তনূজাম্॥
প্রত্যর্থিভূতামপি তাং সমাধেঃ শুশ্রূষমাণাং গিরিশোঽনুমেনে।
বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥
অবচিত বলি পুষ্পা বেদিসম্মার্গদক্ষা
নিয়মবিধি জলানাং বর্হিষাং চোপনেত্রী।
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী
নিয়মিত পরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্রপাদৈঃ॥ [কুমার ১·৫৮-৬০]

* কুমারসম্ভবে মুচুকুন্দের কোন উল্লেখ বা এ প্রসঙ্গ একেবারেই নাই এবং ইন্দ্র স্মরণ করিবামাত্রই মদন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভারতচন্দ্র মাত্র কেবল একটু কবিত্ব করিয়াছেন—

ইন্দ্রের আজ্ঞায় রতিপতি ধায় পুষ্প শরাসন হাতে।
সম্মুখে সামন্ত ধাইল বসন্ত কোকিল ভ্রমর সাথে।
মলয় পবন বহে ঘন ঘন শীতল সুগন্ধ মন্দ।
তরুলতাগণ ফুলে সুশোভন জগতে লাগিল ধন্দ।
যত দেবগণ হৈলা অদর্শন হরের ক্রোধের ভয়।
পূর্ব্ব নিয়োজন নিকট মরণ মদন সম্মুখে রয়।

ইহার পর মদনভস্ম। কবিকঙ্কণ মদনের শরক্ষেপের কথা বলেন নাই, তিনি কালিদাসের বর্ণনারই অনুসরণ করিয়াছেন—

সম্মোহন বাণ বীর পূরিল সত্বরে।
ঈষৎ চঞ্চল হর হইল অন্তরে।
ধেয়ান ভাঙ্গিল হর চারিদিকে চান।
সম্মুখে দেখিল চাপধারী পঞ্চবাণ।
কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইলা মদন। *

রামেশ্বর এবং ভারতচন্দ্র উভয়েই মদন কর্ত্তৃক শরক্ষেপের কথা বলিয়াছেন—

মদন মোহিতে হরে ফুলধনু করে ধরে
মারে পঞ্চাননে পঞ্চবান।
উগ্রতপ হৈল ভঙ্গ ভস্ম অনঙ্গের অঙ্গ
হর কোপানলে গেল প্রাণ। (শিবসঙ্কীর্ত্তন)

আকর্ণ পুরিয়া সন্ধান করিয়া সম্মোহন বাণ লয়ে।
ভূমে হাঁটু পাড়ি দিল বাণ ছাড়ি অনলে পতঙ্গ হয়ে।
কিবা করে ধ্যান কিবা করে জ্ঞান যে করে কামের শর।
সিহরিল অঙ্গ ধ্যান হৈল ভঙ্গ নয়ন মেলিলা হর।
কামশরে ত্রস্ত নারী লাগি ব্যস্ত দেখালেন চারিপাশে।
সম্মুখে মদন হাতে শরাসন মুচকি মুচকি হাসে।
দেখি পুষ্পশরে ক্রোধ হইল হরে অটল অচল টলে।
ললাট লোচনে হৈতে হুতাশন ধক ধক ধক জ্বলে।
মদন পলায় পিছে অগ্নি ধায় ত্রিভুবন পরকাশি।
চৌদিকে বেড়িয়া মদনে পোড়ায়া করিল ভস্মের রাশি।
(অন্নদা মঙ্গল)

মদন তো ভস্ম হইয়া গেলেন। শিব তপোভঙ্গ হওয়ায় অন্যত্র চলিয়া গেলেন। পার্ব্বতীও পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। অন্নদামঙ্গলের বর্ণনায় পার্ব্বতী তো তপস্যানিরত শিবের নিকট আসেন নাই, সুতরাং ভারতচন্দ্র শিবকে কামমত্ত করিয়া অপ্সরী, কিন্নরী ও দেবীর পিছু পিছু ছুটাইয়াছেন। এখানে ভারতচন্দ্রের রুচির প্রশংসা করা যায় না।

স্বামীর মৃত্যুতে রতি স্বামীর ভস্মাবশেষ দেহ লইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই রতি-বিলাপ কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভবের চতুর্থ সর্গে বর্ণনা করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ করুণ রাগে রতির খেদ গাহিয়াছেন, রামেশ্বর পয়ার ছন্দে রতির রোদন রচনা করিয়াছেন এবং ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের ন্যায় দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে রতিবিলাপ লিখিয়াছেন। আমরা একে একে এই করুণ কাব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তুলনা-মূলক সমালোচনা করিব।

কোলে লয়ে নিজপতি, কামকান্তা কান্দে রতি
ধূলায়ে ধূসর কলেবর।
লোটায়্যা কুন্তল ভার, ত্যজে নানা অলঙ্কার
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর।

*

চাহিয়া উত্তর দেহ রতিরে সংহতি লেহ,
পাসরিলে পূরব পিরিতি।
তুমি ত যাইবে যথা, আগে আমি যাই তথা,
এবে কেনে কৈলে বিপরীতি।

*

মোর পরমায়ু লয়্যা চিরকাল থাক জীয়া
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইবে তুমি, সে গতি হইবুঁ আমি,
রহিব তোমার পদতলে।

* "(প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ।)
সংমোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্।
হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি।

... ...

অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্ব্বশিত্বাদ্বলবন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষুর্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্।
স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্।
তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত।
ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার।
(কুমার ৩,৬৬,৬৭,৬৯-৭২)

এই হর কোপানল, তোমারে করিল বল
নাহি দিল রতির জীবন।
তোমা বিনে প্রাণপতি তিলেক না জীয়ে রতি
এই বড় রহিল গঞ্জন॥
(কবিকঙ্কণ)

কান্দে রতি কপালেতে করি করাঘাত।
হরকোপানলে ভস্ম হৈল প্রাণনাথ॥
*
ধৈরয না ধরে ধনী ধরণী লোটায়।
ধরিয়া খবের গলা গড়াগড়ি যায়॥
*
দেখা দিয়া রাখ প্রাণ কোনখানে আছ।
আমি মরি তোমার সদনে তুমি বাঁচ॥
*
দারুণ দৈবের দত্ত দুঃখ কব কাকে।
যৌবন জীবন গেল বিধির বিপাকে॥
*
অভাগীরে আর বা কে করিবে আদর।
সোহাগ সম্মান সুখ শূন্য অতঃপর॥
কি করি কাটিবে কাল কার মুখ দেখে।
কোথা যাব কি করিব কান্তহীনা থেকে॥
মণিহীন ফণী যেন শশীহীনা নিশি।
স্বামীহীনা সীমন্তিনী হয় হারা দিশি॥"
(রামেশ্বর)

পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে রুধির বহিছে ধারে
কামঅঙ্গভস্ম লেপে অঙ্গে॥
আলু থালু কেশ বাস ঘন ঘন বহে শ্বাস
সংসারে পুরিল হাহাকার।
কোথা গেলা প্রাণনাথ আমারে কহ সাথ
তোমা বিনা সকলি আঁধার॥
তুমি কাম আমি রতি আমি নারী তুমি পতি
দুই অঙ্গ একই পরাণ।
প্রথমে যে প্রীতি ছিল শেষে তাহা না রহিল
পিরীতির এ নহে বিধান॥
যথা যথা যেতে প্রভু মোরে না ছাড়িতে কভু
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
মিছা প্রেম বাড়াইয়া ভাল গেলা ছাড়াইয়া
এখন বুঝিনু মিছা খেলা॥
*
শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কি বা গুণ।
একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন।
*
অরে নিদারুণ প্রাণ কোন পথে পতি যান
আগে যাবে পথ দেখাইয়া।
চরণ রাজীব রাজে মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহরে বহিয়া॥
অরেরে মলয়বাত তোর হৌক বজ্রাঘাত
মরে যারে ভ্রমরা কোকিলা।
বসন্ত অন্যায় হও বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও
প্রভু বধি সবে পলাইলা॥
(ভারতচন্দ্র)

এই তিনটী উদ্ধৃত অংশ পাঠে সহজেই বুঝা যায়, রামেশ্বরের কাব্যে অনুপ্রাসের ছটার যেরূপ আধিক্য আছে, করুণ রস সেরূপ ফুটিয়া উঠে নাই। কবিকঙ্কণের রতি পতি-সোহাগিনী কুলবধু পতি-শোকে আকুল হইয়া রোদন করিতেছেন আর ভারতচন্দ্রের রতি যেন সভ্য সত্য কানকাঁন্তা, তিনি পতি শোকে উন্মাদিনী হইয়া শিব হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নি, বসন্ত, মলয়পবন, ভ্রমর, কোকিল এবং অবশেষে ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত গালাগালি দিতেছেন। রতি-বিলাপে বস্তুতঃই পতি-সোহাগিনী কামিনীর দুরন্ত মর্ম্মবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রতি তো সহমৃতা হইবার জন্য সাজিলেন, এমন সময় দৈববাণী হইল "রতি মরিও না, তোমার স্বামী পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিবেন, সম্বরের গৃহে তুমি তাহার আশায় প্রাণ ধরিয়া থাক।" এই খানে সম্বর অসুরগৃহে প্রদ্যুম্নের জন্মের পৌরাণিক কাহিনী তিনটী কাব্যেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

মদন মরিল, শিব হিমালয় ছাড়িলেন, গৌরী বসিলেন তপস্যায়, প্রতিদিন আহার কমাইয়া অবশেষে নিরাহারে গৌরী কঠোর তপস্যা করিলেন; শিব প্রসন্ন হইয়া ছলনা করিতে আসিলেন। ভারতচন্দ্র এসব কিছুই লেখেন নাই, তাঁহার কাহিনীতে তো নারদ আসিয়া যাচিয়া সম্বন্ধ করিয়া গিয়াছেন সুতরাং তপস্যার প্রয়োজন কি? রামেশ্বর হরগৌরীর

কথোপকথন প্রসঙ্গে যোগতত্ত্বের বহু কথা এবং শিবের মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন। কবিকঙ্কন সংক্ষেপে গৌরীর মুখ দিয়া শিবের মহিমা বলাইয়াছেন। শিব সন্তুষ্ট হইয়া নিজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া বর দিতে চাহিলেন। গৌরী বলিলেন, যদি বর দিবে তবে—

"আমার পিতারে প্রভু করহ প্রণাম।"

শিব তখন নারদকে পাঠাইলেন সম্বন্ধ করিতে। রামেশ্বর শিবকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাজাইয়া বর দেওয়াইয়াছেন, তাহার পর শিব স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলে গৌরী তাঁহার গলায় বরমাল্য দিয়াছেন। কবিকঙ্কণ অনেকটা দেবীভাব রাখিয়াছেন? রামেশ্বর এখানে সাধারণ মনুষ্যের মতই গান্ধর্ব্ব বিবাহ দিয়া দিয়াছেন।

নারদ গিয়া বিবাহের কথা পাড়িলেন, গিরিরাজ সন্তুষ্ট হইয়া মত দিলেন। এখানে রামেশ্বর বঙ্গদেশের প্রথানুযায়ী নারদকে দিয়া পাকা কথা বলাইয়া দিয়াছেন। হরগৌরীর বিবাহের উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

হিমালয়ে গৌরীর অধিবাস হইল, গিরিরাজ বসুধারা দিয়া নান্দীমুখ শেষ করিলেন। এ দিকে শিবেরও অধিবাস হইল। শিব যাত্রা করিলেন হিমালয়ের উদ্দেশ্যে, সঙ্গে দেবগণ বরযাত্র, প্রমথগণও সঙ্গে চলিল। কবিকঙ্কণ গৌরীর অধিবাস ঘটা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং রামেশ্বর তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ শিবের অধিবাসের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। রামেশ্বর লিখিয়াছেন—

"নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ শিব কি করিবে বল।
পিতৃপিতামহ আদি আপনি সকল।"

তবে ব্রহ্মা মন্ত্র পড়াইয়া শাস্ত্র অনুসারে অনুষ্ঠান সমাপন করাইলেন।

কবিকঙ্কণ অধিবাসের পর শিবের বিবাহ যাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু রামেশ্বর অধিবাসের পূর্ব্বেই শিবের বিবাহ-যাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ দূর দেশ হইতে আগত পাত্র যেমন কন্যার গ্রামে গিয়া উপস্থিত হওয়ার পর বিবাহের পূর্ব্বে অধিবাস করে, তিনি সেই বিষয় কল্পনা করিয়া কৈলাস হইতে শিবকে কিছুদিন পূর্ব্বেই যাত্রা করাইয়াছেন।' এই সব বিষয় কবিকঙ্কণ যাহা অল্প করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, রামেশ্বর তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। ভারতচন্দ্রে অধিবাসের কথা নাই, তবে শিবের বিবাহযাত্রা রামেশ্বর অপেক্ষাও বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—বিশেষতঃ ভূতপ্রেতগণের

কবিকঙ্কণ ও রামেশ্বর এয়োগণের সহিত 'মেনকার জল সহিবার কথা লিখিয়াছেন এবং বর আসিলে এয়োগণের মধ্যে বর দেখিতে যাইবার তাড়াতাড়ির একটী সুন্দর চিত্র দিয়াছেন—

কোন নাগরীর আধ সীমন্তে সিন্দুর।
কারে ভ্রমে পদে হার করেতে নেপুর॥
কারে এক নয়নে ভালে দিয়াছে কজ্জলে।
পত্রাবলী এক কুচে নহিল সকলে॥

রামেশ্বর শুধু লিখিয়াছেন—

বাদ্য রবে ছুটে সবে অস্থির সবাই।
পর্ব্বত পুরীতে পড়িল ধাওয়া ধাই॥

কবিকঙ্কণ কতকগুলি এয়োর নাম দিয়াছেন, দেখাদেখি রামেশ্বর এয়োর নামের এক দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। অন্নদামঙ্গলে ইহা নাই।

কবিকঙ্কণের হিমালয় এবং রামেশ্বরের হিমালয় শিবের সহিত পরিচিত, কিন্তু অন্নদামঙ্গলের হিমালয়ের সহিত শিবের চাক্ষুষ কোন পরিচয় নাই। কবিকঙ্কণ ও রামেশ্বর সেই জন্য শিব আসিলে গিরিরাজ তাঁহার হাত ধরিয়া বরের আসনে লইয়া বসাইলেন এবং বরণ করিলেন তাহাই লিখিয়াছেন। শিবের বেশভূষা দেখিয়া হিমালয়ের কোন চাঞ্চল্যই হয় নাই। রামেশ্বর বরং লিখিয়াছেন—

অচল অর্চ্চনা কার আত্মারামে পায়ে।
পর্ব্বতের প্রেমধারা পড়ে বুক বায়ে॥
আনন্দে বিহ্বল হয়ে রহে মহীধর।
স্ত্রী আচারে নারদ লইয়া চলে বর॥

ভারতচন্দ্রের হিমালয়ের বর দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল—

বর দেখিয়া হিমালয় হৈল হতবুদ্ধি।
ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি॥
কহিতে না পারে দক্ষযজ্ঞ ভাবি মনে।
ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে॥

মেনকা পূর্ব্বে কখনও মহেশকে দেখেন নাই, সুতরাং স্ত্রী-আচার করিবার সময় বরকে বরণ করিতে গিয়া ভস্মাঙ্গরাগ, ফণীভূষণ কৃত্তিবাসকে দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল—

চরণে নুপুর সাপ সাপ কটিবন্ধ।
বাঘছাল পরিধান দেখি লাগে ধন্ধ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ সাপ সাপের পইতা।
চক্ষু খায়্যা হেন বরে দিলাম দুহিতা॥

(কবিকঙ্কণ)

কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন, দাসী যেই ঔষধের ডালি আনিল, ইসবমূলের গন্ধে সাপগুলি পলাইয়া গেল, শিবের কটিবাস ব্যাঘ্রচর্ম্ম খসিয়া পড়িল, শিব উলঙ্গ হইয়া পড়িলেন। রামেশ্বরও এই কথা লিখিয়াছেন। শিবকে উলঙ্গ হইতে দেখিয়া মেনকা ছুটিয়া পলাইলেন,এই সময় নন্দী দীপ নিবাইয়া দিল। রামেশ্বর কিন্তু লিখিয়াছেন, নন্দী কাছে মশাল আগাইয়া দিল। ভারতচন্দ্র এইখানে বিশেষত্ব করিয়াছেন—কেশব কৌতুক দেখিবার জন্য গরুড়কে বলিলেন, তুমি গর্জ্জন করিয়া সাপকে খেদাইয়া দাও। মেনকা বরণ করিতে আসিলে তিনি পলাইবার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইলেন। গরুড়ের গর্জ্জন শুনিয়া সর্পবৃন্দ মাথা নীচু করিয়া পলায়ন করিল, শিব উলঙ্গ হইলেন। মেনকা জামাতাকে উলঙ্গ হইতে দেখিয়া প্রদীপ নিবাইয়া ঘোমটা টানিলেন। অন্যান্য লোকে মশাল নিবাইল কি শিবের কপালের চাঁদ কিরণ বিকিরণ করিতে লাগিল। পলাইবার পথে কেশব—কোন মতে পাশ কাটাইয়া মেনকা পলাইয়া গেলেন। ঘরে গিয়া নারদকে এবং গিরিরাজকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। কবিকঙ্কণ মেনকার বিলাপ সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, রামেশ্বর তাহা বিশদ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র আবার এই সময় এয়োদিগের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছেন, যে-বিবাহে নারদ ঘটক সেখানে গোল বাধিবেই। অন্নদামঙ্গলের মেনকাও বিনাইয়া বিনাইয়া ফুকরাইয়া অনেক কান্না কাঁদিলেন—

আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে
সাপুড়ের ঝুড়ুড়ের কপালে পড়িলে।

ইহার পর শিব মদনমোহন মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন, গৌরী শ্বেতমাছি রূপে শিবের কাণে কাণে বিকট মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া মদনমোহন বেশ ধারণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। রামেশ্বর পূর্ব্ববৎ কবিকঙ্কণকে অনুসরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র এখানেও বিশেষত্ব করিয়াছেন। তিনি দেবীকে দিয়া মেনকায় দিব্যজ্ঞান দিয়াছেন। মেনকা দিব্য দৃষ্টিতে শিবের মদনমোহন বেশ দেখিলেন।

কবিকঙ্কণ এইখানে শিবের মোহন বেশ দেখিয়া নারীগণের পতিনিন্দা এবং রামেশ্বর শাশুড়ীগণের জামাতানিন্দা বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র এই অংশটী তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছেন এবং সেইখানেই ইহা ঠিক মানাইয়াছে।

স্ত্রী-আচারের পর মহেশের গলায় গৌরী মাল্য দান করিলেন। রামেশ্বর ও কবিকঙ্কণ স্ত্রী-আচারের পর সম্প্রদানের কথা লিখিয়াছেন কিন্তু ভারতচন্দ্র স্ত্রী-আচারের পূর্ব্বেই সম্প্রদান করিয়া দিয়াছেন, এইখানেই দেশাচারের পার্থক্য। সম্প্রদানকালে শিবের গোত্র এবং পিতৃপিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিলে বিধাতা শিবের বহু নামেরই পুনরাবৃত্তি করিলেন। ভারতচন্দ্র রামেশ্বরের কাব্য হইতে ইহার আভাস পাইয়া নিজ ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে শিবের পরিচয়-রচনা করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত তিনখানি কাব্যের আখ্যানভাগ মুখ্যতঃ এক, তাহার পর বিভিন্ন কাব্যের আখ্যান বিভিন্ন গতি লইয়াছে। এই তিনটি কাব্যের তুলনা করিয়া আমাদের মনে হয়, শিব-জীবনের এই আখ্যানটী কবিকঙ্কণ কালিদাসের কুমারসম্ভব ও পুরাণাদি হইতে সঙ্কলন করিয়া সরল ভাষায়, স্বচ্ছন্দ কবিত্বে বর্ণনা করিয়াছিলেন। রামেশ্বর মুখ্যতঃ কবিকঙ্কণকেই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন এবং কাহিনীটি বিশদ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু কবিকঙ্কণের লালিত্য রামেশ্বরের কাব্যে ফুটিয়া উঠে নাই, অনুকরণের জড়তা তাহার যেন সর্ব্বাঙ্গে মাখান রহিয়াছে। ভারতচন্দ্র অতি কৌশলী কবি, তাঁহার কবিত্বশক্তিও অসীম। তিনি উভয় কাব্য হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাহার রূপ ফিরাইয়াছেন।

প্রতীক্ষমাণা

—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত

স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল প্রভাত।

ধীরে ধীরে সুপ্ত রজনীর নির্জ্জনতা ও প্রগাঢ় অন্ধকারকে অপসারিত করিয়া প্রভাতের অমলিন জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে শিশিরসিক্ত চির-বৈচিত্র্যময় ধরণীর মসৃণ বুকে। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিবসের কল কোলাহল চতুর্দ্দিকে নব জাগরণের সাড়া আনিয়া দিয়াছে।

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই হতভাগ্য কেরাণীরা কোন রকমে দুই এক গ্রাস অন্ন মুখে দিয়া, স্ব স্ব কার্য্যাভিমুখে দ্রুতবেগে রওনা হইতেছে। অসীমের এই একঘেয়ে, অবসরহীন কেরাণী-জীবন তাহার নিকট বড়ই বিসদৃশ ঠেকে, কিন্তু সে কি করিবে? তাহার মত কপর্দ্দকশূন্য, গরীব মানুষেরা ইহাকে ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ ও পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফল বলিয়াই মনে করে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহা হইতে বড় আশা করা ধৃষ্টতা ছাড়া তো আর কিছুই নয়; তাহার মত শত শত শিক্ষিত যুবক পথে-ঘাটে অনিদ্রায়, অনাহারে মরীচিকার মত কর্ম্মের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অসীমও শতকরা নিরানব্বই জন লোকের মত অভিশপ্ত কেরাণী-জীবন প্রথমে সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছে—তাই সে নিঃশব্দে ঘানির বলদের মত তাহার এই একটানা দৈনন্দিন কার্য্য করিয়া যায়—তাহাতে তাহার না আছে কোনরূপ উৎসাহ এবং না আছে সুখ বা সান্ত্বনা। তথাপি সে গৃহ হইতে অফিসেই বেশী শান্তি পায়। ছেলেমেয়েদের বর্ণনাতীত অবিশ্রান্ত চীৎকার ও স্ত্রীর বিদ্রূপপূর্ণ বাক্য অসীমকে যেন আরও ব্যথিত করিয়া তোলে, পৃথিবীতে তাহার মত শত শত কেরাণী যে কিরূপে এই সামান্য বেতনে স-পত্নী ও একগাদা পুত্রকন্যা লইয়া পরমানন্দে অতিবাহিত করে, তাহা সে ভাবিয়া পায় না। তাহারা সন্ধ্যার সময় অফিসের হাড়ভাঙ্গা, বিশ্রামহীন খাটুনি খাটিয়া, ছুটির পর প্রিয়ার সেই দিবসের বিরহকাতর সুন্দর মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে দ্রুতবেগে গৃহে আসিবার সময় একঘেয়ে খাটুনীর কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। আর সে……সে কথা মনে হইতেই অসীমের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠে; এইরূপ ভাবে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরাই শ্রেয়ঃ। সে এই দুর্ব্বিষহ ব্যর্থ জীবন কতদিন টানিয়া লইয়া বেড়াইবে? সে আজ শ্রান্ত।

এমনি করিয়া অসীমের দিন কাটিয়া যায়। যদি কোন দিন পুত্রকন্যার ঘরফাটা নিরবচ্ছিন্ন অবিশ্রান্ত চীৎকারে অতিষ্ঠ হইয়া সামান্য তিরস্কার করে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। নির্ম্মলা কোথা হইতে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া পুত্রকে কোলে লইয়া, 'ষাট্ ষাট্' 'সোনা আমার', 'মাণিক আমার' প্রভৃতি স্তোত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অসীমের উপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলে—"কোথা থেকে তো আড্ডা দিয়ে এলে? এসেই ছেলে মেয়েদের পেছনে লাগতে আরম্ভ করেছ? জীবনে তো কোন দিন ভাল জামা-কাপড়টা দিতে দেখলাম না, কেবল বাপগিরি ফলাতেই শিখেছ।"

নির্ম্মলার কথাগুলি অসীমের বুকে যেন বিষাক্ত তীরের মত বাজে। তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে চাপা দুঃখ-বিজড়িত ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে।

নির্ম্মলা বলে,—"বাবা রে বাবা, কোন কথা বললেই আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিশ্বেস ফেলা হয়; কত শেখাই যে শিখেছিলে জীবনে! কেবল রোজগারের বিদ্যেটা ছাড়া। বিয়ের পর থেকে কোন দিন শান্তি পেলাম না। সাত জন্মের পাপ না থাকলে কি এ-ঘরে আসি?"

অসীম তার ব্যথাভরা মুখখানি নির্ম্মলার দিকে তুলিয়া নির্লিপ্তের মত বলে—"তোমার প্রাণে কি একটু মায়া দয়া নেই নির্ম্মলা? জীবনে কি তুমি কেবল খোঁচা দিতেই শিখেছ?—হৃদয়ের দিকে চেয়ে ভাল করে কথা বলতে কি শেখ নি? তুমি অতি নিষ্ঠুর!"

"আমার আর মায়া-দয়া থাকবে কি ক'রে বল?

এবার থেকে তোমার কাছ থেকে কিছু কিছু ধার করব ভাবছি। আমি, তোমার মত দয়াবান্, জ্ঞানবান্, আড্ডাবাজ ব্যক্তি হ'য়ে উঠি নি এখন পর্য্যন্ত।"

নির্ম্মলার মুখে একটা ঘৃণাপূর্ণ তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়া উঠে; প্রতিদিনের মত আজও আফিসে যাইবার সময় ডাক-পিয়ন অসীমকে একখানা পত্র দিয়া গেল; অসীম পত্রখানা পাইয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। আজ প্রায় ৬।৭ বৎসর সে কোন দিন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের পত্র পায় নাই; যদিও তাহার দূর সম্পর্কীয় কয়েক জন আত্মীয় আছেন, তাঁহারা এইরূপ অক্ষম, হতভাগ্য আত্মীয়কে পত্র লিখিয়া নিজেদের মান-সম্ভ্রম হীন করিতে চান না। সুতরাং কাহার আবার তাহার জন্য কৃতজ্ঞতার অশ্রু বহিল? যাহা হউক, অসীম ডাক-পিয়নের হস্ত হইতে পত্র লইয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়িতে লাগিল—

২৬ অমরদাস লেন্, কলিকাতা।

প্রিয় অসীম,

আজ সুদীর্ঘ সাত বৎসর পরে তোমার নিকট একটা পত্র দিলাম। জানি না, পত্র তুমি পাবে কি না? তবে আমার অপ্রত্যাশিত পত্র পেয়ে তুমি হয় ত অত্যধিক বিস্মিত হবে। ভাববে, সাত বৎসর পরে তোমাকে স্মরণ করবার ভেতরে একটা নিগূঢ় রহস্য আছে। তবে উদ্দেশ্য আমার যাই থাক, সেটাকে উপেক্ষা করবার ক্ষমতা তোমার নেই, সে কথা আমি ভাল ভাবেই জানি,—আমার উপর অভিমান করে চুপ ক'রে থেকো না, বাঁচবার আশা আমার মোটেই নেই— না আসলে এ জীবনে আর দেখা হবে না। ইতি

চিন্তা

অসীম স্থির অচঞ্চল নেত্রে পত্রখানার পানে চাহিয়া রহিল; ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ সাত বৎসরের পুরাতন অতীত কাহিনী সিনেমার ছবির মত একটীর পর একটী তাহার মনে পড়িতে লাগিল। যাহাকে সে এতদিন ধরিয়া বিস্মৃত হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল, পুনরায় সে-ই অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহাকে আজ এতদিন পরে তাহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে আহ্বান করিতেছে।

ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিল এই চিন্তা; কলেজে চিন্তার সহিত প্রথম তাহার পরিচয় হয়; চিন্তা ও অসীম দুইজনে একই কলেজে বি. এ. পড়িত। তার পর কিরূপে যে দুইজন পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সে আজও জানে না। চিন্তার পিতা-মাতাও অসীমকে ভাল বাসিতেন। দেখিতে শুনিতে সে মন্দ ছিল না; লেখা-পড়ায় ভাল ছেলে বলিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ম্যাট্রিক ও আই-এ পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল—উপরন্তু অসীমের প্রতি মেয়ের অনুরাগও তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বি.এ.-তে কৃতিত্বের সহিত প্রথম স্থান অধিকার করিবার পর, অসীম যখন চিন্তার পিতা-মাতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল, তখন তাঁহারা সানন্দে সম্মতি দিলেন; কিন্তু চিন্তা অসীমকে বিবাহ করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না। চিন্তার পিতামাতা ও অসীম চিন্তাকে অনেক বুঝাইয়াছিল, কিন্তু তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল না।

ম্লান হাসিয়া চিন্তা বলিয়াছিল, "তখন যে কথা বলেছিলাম এখনও সেই কথা বলছি। এ জীবনে আমি বিয়ে করব না। যদি বিয়ে করব্বার ইচ্ছা থাকত তবে তোমাকেই করতাম, অসীম। পরজন্মে তোমাকে পাবার জন্য এ জন্মে কেবল তপস্যাই ক'রে যাব।"

"এ তোমার ছলনা ছাড়া ত আর কিছুই নয় চিন্তা। যাকে পাবার জন্য অমূল্য জীবন তুমি অবহেলায় বিসর্জ্জন দেবে—তাকে যদি তুমি বিনা তপস্যাতেই পাও—তবে কেন তাকে তুমি স্বামীত্বের অধিকার দেবে না? আবার তাকেই পাবার জন্য সারা জীবন তপস্যা করে যাবে একথার মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারলাম না।"

চিন্তা হাসিতে চেষ্টা করিল, তার পর ভয়ানক ভাবে হাসিতে হাসিতে তাহার চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে প্রবাহিত অশ্রুর বেগকে বহু চেষ্টা করিয়াও রোধ করিতে পারিল না।

অসীম চিন্তার মুখের পানে চাহিয়া বিস্ময়স্তিমিত স্বরে বলিল,—"কাঁদছ চিন্তা?"

আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া চিন্তা কহিল, "কাঁদব কেন? আজ তো বড় সুখের দিন! আনন্দের দিনে কি কাউকেও কাঁদতে দেখেছ অসীম? যাক, প্রশ্নের উত্তর দিই—তোমাকে পাওয়া সত্ত্বেও কেন তোমাকে বিয়ে না করে তোমাকে পাওয়ার জন্য জন্ম ভরে তপস্যা করে যাব—এ কথার উত্তর আজ তুমি পাবে না অসীম। যে-দিন এ কথার উত্তর পাবে সেদিন এই মায়াময় কঠোর ধরণী থেকে মুক্তি পাবার আমার শেষ দিন। আমার একটী অনুরোধ অসীম, আমাদের ক্লাশে নির্ম্মলা নামে যে মেয়েটি পড়ে, তাকে তুমি বিয়ে কোরো।"

এই ঘটনার পর চিন্তা তাহার পিতামাতার সহিত কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল,—এ-পর্য্যন্ত অসীম তাহার কোন সন্ধান পায় নাই। কত খোঁজ সে করিয়াছে কিন্তু সমস্তই বৃথা। অবশেষে চিন্তার কথামত নির্ম্মলাকে বিবাহ করিয়াছে ও পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় একটা সামান্য চাকুরী লইয়া কার্য্যস্থলে চলিয়া আসিয়াছে। সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া নিঃশব্দে অবিশ্রান্ত ভাবে খাটিয়া চলিতেছিল। মাঝে মাঝে অসীমের মনে হয়, চিন্তাই তাহার জীবন ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। তাহার এইরূপ দুঃসহ ব্যর্থ জীবনের জন্য সম্পূর্ণরূপে সেই দায়ী। আজ যদি চিন্তার সহিত তাহার বিবাহ হইত, তাহা হইলে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পীড়ন, সমাজের দুর্ব্বিষহ পরিহাস, ধনী ব্যক্তির তাচ্ছিল্যের ভ্রুকুটী এবং স্ত্রীর অসঙ্গত বিদ্রূপপূর্ণ বাক্য তাহাকে সহ্য করিতে হইত না। আজ সে আত্মমর্য্যাদাশালী গণ্য মান্য ব্যক্তির মতই আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিত।

এই সুদীর্ঘ অতীত সাত বৎসরে অসীম চিন্তার কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু চিন্তার পত্রে সেই বিস্মৃত স্মৃতি তার ব্যথিত হৃদয়পটে পুনরায় নিবিড় ভাবে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। কোন মতেই সে চিন্তার পত্রকে উপেক্ষা করিতে পারিল না। অবশেষে যাওয়াই স্থির করিল। চিন্তার পত্রে লিখিত ঠিকানামত অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া অসীম যখন চিন্তার কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইল, তখন সূর্য্যদেব ধরিত্রীর বিশাল বক্ষে স্বীয় রক্তরশ্মিজাল বিকিরণ করিয়া দিবাবসানে ক্লান্ত দেহে সমুদ্রের অতল জলে বিদায় লইতেছেন, সন্ধ্যাদেবী তাহার লজ্জারুণ রক্তিম মুখখানিতে কৃষ্ণ অবগুণ্ঠন টানিয়া পৃথিবীর কোলে আশ্রয় লইবার জন্য নত মস্তকে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছেন।

অসীম ভাবিয়াছিল যে, চিন্তার বাটী না জানি কত বৃহৎ ও নানারূপ মূল্যবান্ আসবাবপত্রে সজ্জিত। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সামান্য একটা জীর্ণ ছোট একতলা বাটী দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই বিস্ময় দমন করিয়া দরজার কড়া নাড়িল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একটী অপরিচিতা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। অসীম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"চিন্তা কি এই বাড়ীতে থাকে?"

স্ত্রীলোকটী কহিল,—"আপনি কি অসীম বাবু?" অসীম ঘাড় নাড়িল।

স্ত্রীলোকটী চিন্তার ঘর দেখাইয়া দিল। অসীম সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল চিন্তা একটী পালঙ্কে শুইয়া আছে। অস্থিচর্ম্মসার তার চেহারা; সাত বৎসর পূর্ব্বেকার সেই হাস্যমুখী, অপ্সরাবিনিন্দিত স্নিগ্ধোজ্জ্বলা চিন্তা হইতে এই বিগতশ্রী মৃত্যু-মেঘাচ্ছন্ন কাল-ব্যাধিগ্রস্তা চিন্তায় যেন আকাশ-পাতাল ব্যবধান। অসীম চিন্তার পার্শ্বে বসিয়া মস্তকে হাত দিল।

শীতল হস্তের স্পর্শে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া চিন্তা কহিল, "এসেছ? জানতাম তুমি আসবে। আমার পত্র পেলে যে তুমি উপেক্ষা করতে পারবে না, সে-কথা ভালভাবেই জানি।"

অসীম কহিল, "তোমাকে এ রকম ভাবে দেখব বলে আশা করি নি চিন্তা।" হঠাৎ চিন্তার মস্তকের উপর ভালরূপে নজর পড়িতেই অসীম অভাবনীয় ভাবে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "এ কি চিন্তা? এখনও বিয়ে কর নি না কি?—না ·· বি···।"

চিন্তার মলিন মুখে একটা করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিল,—"সাত বৎসর পূর্ব্বের কথা তোমার মনে পড়ে অসীম? যখন তুমি আমাকে বিয়ে ক'রতে চেয়েছিলে সেই কথার উত্তরে এক দিন তোমাকে বলেছিলাম,

জীবনে আমি কোনদিন বিয়ে করব না। তাই আজও আমি অবিবাহিতা। যদি বিয়ে করবার বাসনা থাকত তবে তোমাকেই করতাম। মতের পরিবর্ত্তন যদি কোন দিন বা কোন সময় ঘটত, তবে তুমি জানতে পারতে অসীম।"

মমতাভরা নেত্রে অসীম কহিল, "এ রকম ভাবে কেন জীবন বিসর্জ্জন দিলে চিন্তা? এর উত্তর কি তুমি আজও দেবে না? এই সুদীর্ঘ বৎসর তুমি তোমার ব্যর্থ দুর্ব্বিষহ জীবন টেনে নিয়ে বেড়িয়ে কতটুকু শান্তি পেলে চিন্তা?"

"সে কথার উত্তর দেবার জন্যই তো তোমাকে ডেকেছি। এই মায়াহীন বেদনালিপ্ত কঠোর পৃথিবীতে লোকে যদি শান্তি চাইলেই পেত তবে দুঃখটা কাদের জন্য অসীম? যাক, সে সব কথা, কেন তোমাকে ডেকেছি তা তো বুঝতে পেরেছ? একদিন তোমাকে বলেছিলাম যে, ইহ-জীবনের শেষ দিনে তোমাকে জানিয়ে যাব কেন আমি সন্ন্যাসীর মত আমার জীবন—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই চিন্তা ভয়ানক-ভাবে হাঁপাইতে লাগিল, হঠাৎ তাহার মুখ হইতে গল্‌গল্‌ করিয়া অজস্র রক্ত নির্গত হইয়া বিছানাপত্র ভাসাইয়া দিল। এইরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে অসীম শিহরিয়া উঠিল; নিজেকে একটু প্রকৃতিস্থ করিয়া চিন্তা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল,—"শোন অসীম, কেন তোমাকে বিয়ে করতে সেদিন অসম্মত হয়েছিলাম—"

অসীম তাড়াতাড়ি চিন্তার মুখ চাপিয়া ধরিয়া মিনতি-পূর্ণ স্বরে বলিল—"আর কথা বোলো না চিন্তা। একটু স্থির হ'য়ে শোও, আমি এখনি ডাক্তার আনতে পাঠাচ্ছি।"

ধীরে ধীরে অসীমের হাতখানা সরাইয়া রোগক্লিষ্ট মুখখানিতে ঈষৎ হাসি টানিয়া চিন্তা কহিল, "কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ অসীম? ডাক্তার এসে বোধ হয় আমাকে জীবিত দেখতে পাবে না, তার পূর্ব্বেই আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নেব। সুতরাং মিছিমিছি সময় নষ্ট কোরো না—বলতে দাও লক্ষীটি।

"শোন, যখন আমার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা ঠিক হয়ে যায়—নির্ম্মলা ছাড়া কলেজের আর কেউ জানত না। সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল বলেই আমার সমস্ত কথা তাকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু এ কথা জানতাম না যে, যাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও হিতৈষী ভেবে আমার জীবনের যাবতীয় ঘটনাবলী নির্ব্বিরোধে জানিয়েছিলাম—সেই একদিন আমার সুখের কণ্টক হ'য়ে দাঁড়াবে, সে কথা মনেও কোনদিন স্থান দিই নাই। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হবার কয়েকদিন পরেই তোমাকে নিজের অজ্ঞাতে গভীররূপে ভালবেসেছিলাম, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, স্বামীত্বের অধিকার যদি কাকেও দিই, তবে তোমাকেই দেব। জানতাম না যে, আমার দিকে চেয়ে বিধাতা অলক্ষ্যে বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলেন।

"যে-দিন তুমি আমার পিতার নিকট থেকে বিয়ের সম্মতি পেলে, ঠিক সেইদিন দুপুর বেলায় নির্ম্মলা আমাদের বাড়ীতে এসে আমাকে টান্‌তে টান্‌তে বাগানে নিয়ে গিয়ে বলিল—ভাই চিন্তা! তোকে একটা কথা বলব, সে-কথা কাকেও বলতে পারবি না, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হ'বে তোকে। তা ছাড়া আমার একটা অনুরোধ আছে—সেটা পূর্ণ করতে হবে; তোর বাল্যবন্ধুর একটা অনুরোধ রাখবি না ভাই? এই বলে সে আমাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল; তার চোখ থেকে অশ্রুতরঙ্গ নির্ব্বিরোধে গড়িয়ে পড়তে লাগল। নির্ম্মলার এই অভাবনীয়, অভূতপূর্ব্ব আচরণে আমি বিস্মিত হ'য়ে গেলাম, জীবনে কাকেও এইরূপ ব্যাকুল ও কাতর মিনতিপূর্ণ অনুরোধ প্রকাশ করতে কোনদিন দেখি নি। সুতরাং তার এই ব্যাকুল অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারলাম না, অসীম। প্রতিজ্ঞা করলাম, নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়েও তার প্রার্থনা পূর্ণ করব। তারপর সে যে কথা বলল—অসীম, তোমাকে কি বলব? সে কথা শুনে আমার হৃদয় শতধা হ'য়ে গেল। ইন্দ্রের শত বজ্র যেন আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়ল, মনে হ'ল, এ কথা শোনবার পূর্ব্বে কেন আমার মৃত্যু হোল না। আমি জ্ঞান-শূন্য ভাবে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম তার পানে, তারপর ব্যর্থ দুঃসহ হৃদয়ের নীরব, বর্ণনাতীত হাহাকার নীরবেই দমন

ক'রে তার অশ্রুপূর্ণ মুখের পানে চেয়ে দেখলাম, কোথাও কৃত্রিমতার চিহ্ন নাই। ভাবলাম, হরিশ্চন্দ্র যদি সামান্য ব্রাহ্মণের কথায় বিশাল রাজ্য অবহেলে ত্যাগ ক'রতে পারেন, রামচন্দ্র যদি পিতৃসত্য পালনের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বনে যেতে পারেন এবং দধিচী মুনি যদি পরের মঙ্গলের জন্য নিজ অস্থি দান করতে পারেন, তবে আমি বা কেন এই সামান্য ত্যাগটুকু করতে পারব না।

এই ভেবে বুক বাঁধলাম, বললাম,—'বোন, তুমি আজ আমার কাছে যে-প্রার্থনা করেছ, সে প্রার্থনা পূর্ণ করা মেয়ে মানুষের পক্ষে যে কত কঠিন, কত দুঃসহ সে কথা বোঝাবার শক্তি আমার নেই। সামান্য নারী আমি—কতটুকুই বা বুদ্ধি আমার, তবে যতটুকু জ্ঞান হ'য়েছে এই বয়সে, তার থেকে বুঝতে পারি যে, ভালবাসা যে পেয়েছে ও ভালবাসতে পেরেছে, সেই বুঝতে পেরেছে, প্রকৃত ভালবাসার বেদনা কতখানি? কতখানি সীমাহীন নিরাশা ও আশা তার ভিতরে বিজড়িত। তোমার অমন ভালবাসাকে ক্ষুণ্ণ ক'রতে আমি চাই না। যাকে পাবার জন্য তোমার এত আগ্রহ, এত আকাঙ্ক্ষা, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এই ভালবাসা যেন তোমার চিরদিন অক্ষয় অমলিন থাকে।' তারপর—তারপর —এখানে বড় ব্যথা অসীম।" এই বলিয়া চিন্তা তাহার বুক জোরে চাপিয়া ধরিল।

দুই তিন মিনিট পরে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"ভাবলাম, তোমাকে যখন বিয়েই করব না, তখন নির্ম্মলার সুখের পথে দাঁড়িয়ে বাধা দি কেন? তাতে তো তার মঙ্গল করা হ'বে না, গোপনে শক্রতা করাই হ'বে। আমাকে দেখলে তুমি তাকে কিছুতেই বিয়ে করবে না। এই ভেবে, পিতামাতাকে নিয়ে অতর্কিত ভাবে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলাম। কাশীতে আসবার কিছুদিন পরে বাবা মারা গেলেন, তাঁর মৃত্যুর নিদারুণ শোক সহ্য করতে না পেরে মাও বাবার সহগামিনী হ'লেন। এই দারিদ্র্য-নিপীড়িত, কঠোর, মায়াহীন ধরণীতে পড়ে রইলাম শুধু আমি,—মৃত্যু আমার হলো না। তারপর আমার এই ভবঘুরে ব্যর্থ জীবন নিয়ে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, যদি একটু শান্তি পাই, ভবঘুরে জীবনের মধ্য দিয়ে। অবশেষে হরিদ্বারে এক সাধুর শিষ্যা হ'লাম। তখন থেকেই ভবঘুরে জীবনের সমাপ্তি ঘটল, ধর্ম্মচিন্তায় মন গেল।

"এই ঘটনার কিছুদিন পরেই আমি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হই। অসুখ হবার পরেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই কালব্যাধি আমাকে নির্ব্বিরোধে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেবে। যার জন্য একদিন ফুলের মালা গেঁথে অপেক্ষা করেছিলাম, তখন সে এল না; যখন মালা শুকিয়ে গেল, মতের পরিবর্ত্তন ঘটল, বাঁচবার অফুরন্ত বাসনা জাগল মনে—তখনই সে উপস্থিত হল। অবশ্য প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম। ভাবলাম, মরণশীল জগতে যখন প্রত্যেক মানুষকে মরতেই হ'বে একদিন—তখন আর ভয় করে লাভ কি? এই অকেজো, ব্যর্থ, হতাশাময় জীবন টেনে নিয়ে বেড়ানর চেয়ে সমাপ্তির রেখা টানাই ভাল। হঠাৎ একদিন তোমার সঙ্গে দেখা করবার বাসনা জাগল মনে, আমার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তোমাকে ইহজীবনের শেষ দেখা দেখবার অদম্য বাসনা প্রবল হয়ে দাঁড়াল, তা ছাড়া ব্যাঙ্কে আমার হাজার কুড়ি টাকা আছে, সেগুলি তোমাকে দিয়ে যাব বলে, তা'তে তোমার দারিদ্র্য-যন্ত্রণার অনেকখানি লাঘব হবে।"

অসীমের হাতখানা নিবিড়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া চিন্তা বলিল, "আমার টাকা কি তুমি নেবে না অসীম? যদি না নাও তবে যে আমি পরলোকেও শান্তি পাব না।" চিন্তা অসীমের পানে মিনতিভরা দৃষ্টিতে চাহিল।

চিন্তার হৃদয়ে অশান্তিময় বেদনার গুরুভার উপলব্ধি করিয়া সজল নয়নে অসীম কহিল, "তোমার দেওয়া জিনিষ জীবনে তো কোনদিন উপেক্ষা করি নি। তোমার টাকা আমি নেব চিন্তা।"

যশোহর পরিচিতি

—শ্রীসুশীলকুমার বসু

আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য :

সমগ্র যশোহরের গড় বারিপাতের পরিমাণ হইতেছে মোটামুটি বার্ষিক ৬০ ইঞ্চি (যশোহর শহরে ৬৬ ইঞ্চি)। অন্যান্য জেলার মধ্যে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ হইতেছে, ফরিদপুরে ৬৬ ইঃ, মৈমনসিং-এ ৮৫ ইঃ, বাখরগঞ্জে ৮৫ ইঃ, ঢাকায় ৭৮ ইঃ, এবং মেদিনীপুরে ৫৯ ইঃ। মৈমনসিং-এ জুন মাসেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বারিপাত হইয়া থাকে, কিন্তু বেশীর ভাগ বৎসরে যশোহরে (সমগ্র জেলার হিসাবে) জুলাই মাসেই সর্ব্বাধিক বর্ষণ হয়। গত কয়েক বৎসর বারিপাতে অনেক অপ্রত্যাশিত অনিয়ম ঘটিতেছে। ১৯১৯ সালের জুন মাসে ১২'১২ ইঃ বৃষ্টি হয়; ১৯২০ সালে জুন মাসে ৮'২৫ ইঃ এবং জুলাই মাসে ১১'৬৬ ইঃ বৃষ্টি হয়; ১৯২১ সালে জুন মাসে ৯'৫২ এবং জুলাই মাসে ১৭'৬৩ ইঃ বৃষ্টি হয়।

যশোহরে বৃষ্টির পরিমাণ মধ্যম—অত্যল্পও বা অত্যধিকও নহে। বৃষ্টি যে ভাবে হয় তাহা ফসলের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী। মার্চ্চ এবং এপ্রিলের বৃষ্টিতে পাট, আউশ ও নিম্নভূমিতে আমন ধান্য বপনের সুবিধা হয়। জুন, জুলাই ও আগষ্টের প্রচুর বারিপাতে পাট ও ধানের বিশেষ সুবিধা হয়; সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের বৃষ্টিতে আমন ধান্যে ফুল হইবার ও পাকিবার এবং রবিশস্য জন্মিবার সুবিধা। গত কয়েক বৎসরের অতিবর্ষণের কথা বাদ দিলে, এই জেলা সম্বন্ধে বলা যায় যে, এখানে অতিবর্ষণ অপেক্ষা বর্ষণের অভাবেই শস্যহানি অধিক ঘটিয়া থাকে। ১৩৪৫ ও ১৩৪৬ সালে ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে এবং বর্ষণে ও প্লাবনে ব্যাপক ভাবে শস্যনাশ হইয়াছে।

এখানকার বায়ুতে জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কথা এবং তজ্জন্য গ্রীষ্মের অসহনীয়তার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ডিরেক্টর-জেনারেল অব অবজারভেটারিজ যশোহর এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের আবহাওয়া সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন :

"They are all characterised by a moderately high temperature and high relative humidity and hence the climate is oppressive. In the seasons when these conditions are most strongly marked, as in the breaks in the rain in September and October, when in addition the air is almost motionless, the climate is most trying and unhealthy. They compare unfavourably in this respect with the drier regions of the United Provinces or North-West India, where the temperature, although considerably higher, is bearable on account of the low humidity of the atmosphere."

তাৎপর্য্য : মাঝারি উচ্চ তাপ এবং জলীয় বাষ্পের আপেক্ষিক পারমাণাধিক্য এখানকার আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য বলিয়া ইহা বিশেষ পীড়াদায়ক। যে-সকল ঋতুতে এই অবস্থা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে, যেমন সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বৃষ্টির বিরতির সময় ঘটে এবং যখন আবার বাতাসও প্রায় গতিহীন হইয়া পড়ে, তখন, আবহাওয়া অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং অস্বাস্থ্যকর হয়। যুক্তপ্রদেশ অথবা উত্তর-পশ্চিম ভারতের শুষ্কতর স্থানসমূহের তুলনায় এদিক্ দিয়া এখানকার অবস্থা অনেক খারাপ; ঐ সকল স্থানের উত্তাপ অনেক বেশী হইলেও আবহাওয়ার জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অনেক কম বলিয়া সেই উত্তাপ সহনীয়।

যশোহর জেলার গড় উত্তাপ এপ্রিল মাসে সর্ব্বোচ্চ হইয়া ৯৬'২ হয়। এই সময় আলিপুরের সর্ব্বোচ্চ গড় উত্তাপ ৯৫'৫ এবং বরিশালের ৯১'৫। জানুয়ারী মাসে উত্তাপ সর্ব্বনিম্নে নামিয়া ৫৩'২ (গড়) হয়। এই সময় আলিপুর ও বরিশালের সর্ব্বনিম্ন উত্তাপ যথাক্রমে ৫৫'৬ ও ৫৫'০ হয়। নিম্নের তালিকায় যশোহরের সহিত আলিপুর ও বরিশালের উত্তাপ ও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণের তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল :

মাস	যশোহর			আলিপুর			বরিশাল		
	গড় সর্ব্বোচ্চ উত্তাপ	গড় সর্ব্বনিম্ন উত্তাপ	জলীয় বাষ্পের আপেক্ষিক পরিমাণ	গড় সর্ব্বোচ্চ উত্তাপ	গড় সর্ব্বনিম্ন উত্তাপ	জলীয় বাষ্পের আপেক্ষিক পরিমাণ	গড় সর্ব্বোচ্চ উত্তাপ	গড় সর্ব্বনিম্ন উত্তাপ	জলীয় বাষ্পের আপেক্ষিক পরিমাণ
জানুয়ারী	৭৭·২	৫৩·২	৮৪	৭৭·৫	৫৫·৬	৮৫	৭৭·৬	৫৫·০	৮৬
ফেব্রুয়ারী	৮২·০	৫৭·৩	৮১	৮২·৩	৬০·৩	৮২	৮১·৫	৫৯·৭	৮৪
মার্চ্চ	৯১·২	৬৭·৬	৭৯	৯১·০	৬৯·৪	৮০	৮০·১	৬৮·৭	৮৩
এপ্রিল	৯৬·১	৭৪·৬	৮১	৯৫·৫	৭৫·৭	৭৯	৯১·৫	৭৪·৫	৮২
মে	৯৪·৩	৭৬·৫	৮২	৯৪·৬	৭৭·৬	৭৯	৯১·৫	৭৬·৬	৮১
জুন	৯০·৯	৭৮·৫	৮৭	৯১·৩	৭৮·৮	৮৫	৮৮·৬	৭৮·০	৮৭
জুলাই	৮৯·১	৭৮·৯	৮৮	৮৮·৬	৭৮·৭	৮৮	৮৭·৪	৭৮·৫	৮৯
আগষ্ট	৮৮·৫	৭৮·৭	৮৯	৮৭·৮	৭৮·৫	৮৯	৮৬·৯	৭৮·২	৮৯
সেপ্টেম্বর	৮৯·২	৭৮·৩	৮৮	৮৮·২	৭৮·১	৮৭	৮৮·০	৭৮·০	৮৮
অক্টোবর	৮৮·৪	৭৪·৩	৮৪	৮৭·৪	৭৪·৫	৮৫	৮৭·৪	৭৪·৯	৮৪
নবেম্বর	৮৩·২	৬৩·৮	৮২	৮২·২	৬৪·৭	৮২	৮২·৯	৬৫·৩	৮৩
ডিসেম্বর	৭৭·৩	৫৪·৫	৮০	৭৭·০	৫৬·০	৮১	৭৭·৯	৫৬·০	৮৫

বিল ও বাঁওড় :

যশোহরে কোন হ্রদ নাই সত্য, কিন্তু যে সকল স্থানে খাত পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং পূর্ব্ব খাতে গভীর জল আছে অথবা যে-স্থলে নদীর দুই মুখ মরিয়া গিয়া মাঝ খানের খাতটি জলপূর্ণ আছে, সেই সকল স্থানের জলপূর্ণ খাতগুলিকে হ্রদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যশোহরে এই সকল জলপূর্ণ, কোথাও হ্রস্ব এবং কোথাও দীর্ঘ খাতগুলিকে বাঁওড় নামে অভিহিত করা হয়। যশোহরে এই বাঁওড়ের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নহে এবং অনেকগুলি, নির্ম্মল জল ও বিবিধ মৎস্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। কিন্তু মৎস্যের চাষ করিবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় এই সকল বাঁওড়ের মৎস্য-সম্পদ্ ক্রমেই নিঃশেষিত হইতেছে—অনেক বাঁওড় ইতি-মধ্যেই মৎস্যশূন্য হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকার বিস্তৃত প্রাকৃতিক জলাভূমি থাকিতেও যে, যশোহরের অধিবাসীদের অন্যান্য স্থান হইতে আমদানি মৎস্যের উপর নির্ভর করিতে হয়, ইহা যশোহরবাসীদের নিতান্ত উদ্যমহীনতা ও ব্যবসায়ে নিস্পৃহতার পরিচায়ক। এই সকল বাঁওড়ে মৎস্য ও হাঁস প্রভৃতি জলচর পাখীর চাষ করিতে পারিলে এক দিকে যেমন লোকের পুষ্টিকর খাদ্যের পরিমাণ বাড়িত, অন্যদিকে ইহা ব্যবসা হিসাবে একটি পরম লাভজনক কাজ হইত

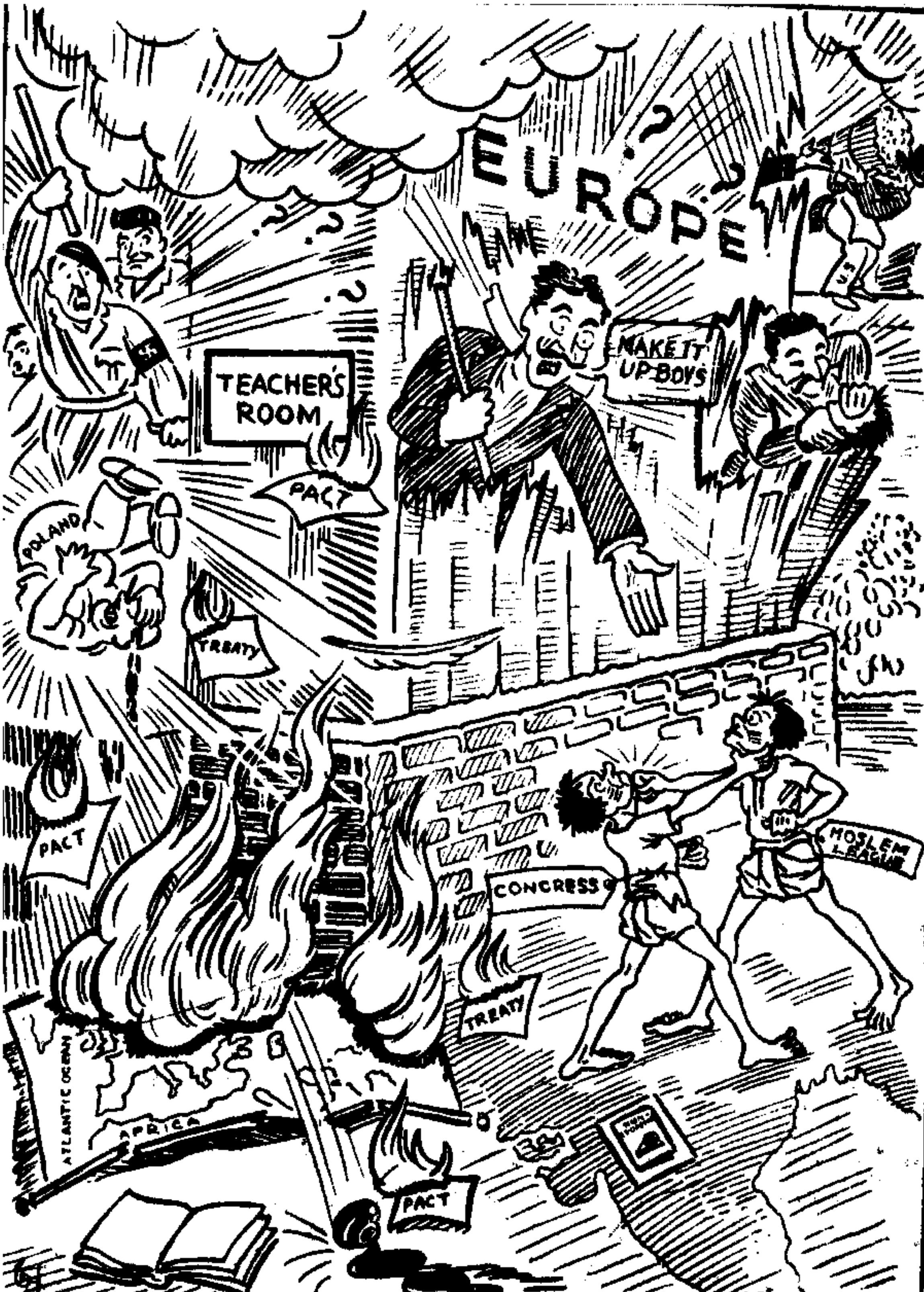
নদী গতিপথ পরিবর্ত্তন করিলেই তাহার পার্শ্বে বাঁওড়ের সৃষ্টি হয়, কাজেই প্রায় সকল নদীর পার্শ্বেই বাঁওড় বা বিল দেখা যায়। যশোহরে তো বহু নদী মরিয়াই অনেক জলার সৃষ্টি হইয়াছে। যে-সকল খাত ভরাট হইয়া এখনও শস্য-ক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই, সেই গুলিই বাঁওড় নামে পরিচিত হইতেছে।

কোটচাঁদপুর হইতে যশোহর পর্য্যন্ত ভৈরব নদ, মল-ডাঙ্গার নিকট বেত্রনদী, বেনাপোলের নিকট নাওভাঙ্গা মরিয়া গিয়া এই প্রকার জলার সৃষ্টি হইয়াছে। চৌগাছার দক্ষিণে বেড় গোবিন্দপুরের চারিধারে, চৌবেড়িয়ার চতুর্দ্দিকে যমুনার খাতে, ঝিকরগাছার দক্ষিণে খাপাগ্রামের তিন দিকে, তাহির-পুর ও বার বাজারের মধ্যে বড় বড় বাঁওড় রহিয়াছে।

নিম্নে কয়েকটি বড় বড় বাঁওড়ের আয়তন দেওয়া হইল :

	বাঁওড়ের নাম	থানা	আয়তন (বর্গমাইল)
১।	বুকভরা বাঁওড়	যশোহর	½
২।	ডুমার বাঁওড়	বনগাঁ	১½
৩।	কাটগড়ার বাঁওড়	মহেশপুর	½
৪।	রামনগর বাঁওড়	গাইঘাটা	¼
৫।	গড়পোতা বাঁওড়	বনগাঁ	½
৬।	ঝাঁপার বাঁওড়	মণিরামপুর	১

গুরুমুখী বিদ্যা


EUROPE
TEACHER'S ROOM
MAKE IT UP BOYS
PACT
POLAND
TREATY
PACT
CONGRESS
MOSLEM LEAGUE
TREATY
ATLANTIC OCEAN
AFRICA
PACT

বাঁওড়ের নাম	থানা	আয়তন (বর্গমাইল)
৭। খেদাপাড়া বাঁওড়	মণিরামপুর	½
৮। রামপুর বাঁওড়	ঐ	
৯। বেড়গোবিন্দপুর	চৌগাছা	১
১০। বালুহরের বাঁওড়	কোটচাঁদপুর	১
১১। জয়দিয়া বাঁওড়	ঐ	১
১২। মর্জ্জাত বাঁওড়	কালীগঞ্জ	১½

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যশোহরের পূর্ব্বাংশকে একটা অখণ্ড বড় বিল বলা যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে কৃষক-পল্লী গড়িয়া উঠিয়া ইহাকে বহু বিভক্ত করিয়াছে। সাধারণতঃ নদী বা বড় খালের উঁচু পাহাড় বা পাহাড়ের ধার দিয়াই পল্লীগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং দুইটি বড় নদীর উচ্চ পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী নিম্নভূভাগ বিলে পরিণত হইয়াছে। এই সকল বিলের অনেকগুলি খালের দ্বারা বড় নদীর সহিত সংযুক্ত আছে এবং নদীর জল বৃদ্ধির সময় জলপূর্ণ হইয়া যায় এবং নদীপথেই আবার ইহাদের জল নিষ্কাশিত হয়। অনেক বিলের মধ্যবর্ত্তী খাল অনেকটা ভরাট হইয়া যাওয়ায় নদীর প্রবল জলবৃদ্ধির সময় ব্যতীত এই সকল বিলে আর জল উঠে না। আবার অনেক বিল আছে, যাহা নদীর সহিত আদৌ সংযুক্ত নহে। এই সকল বিলে বৃষ্টি ও পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ স্থানের জল বার মাস বা বৎসরের অধিকাংশ সময় জমিয়া থাকে। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর বিল জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশেই দৃষ্ট হয়। উত্তর-পূর্ব্বের বিলগুলি বর্ষায় জলপূর্ণ হয় বটে, কিন্তু অল্প পরেই জল ভাল ভাবে নিষ্কাশিত হওয়ায় সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যায়। নদীর সহিত-সংযোগহীন যে-সকল বিলে পূর্ব্বে বার-মাস গভীর জল থাকিত, তাহার অনেক বিল এখন ভরাট হইয়া উঠিয়াছে।

এই সকল বিল হইতেই পূর্ব্বে যশোহরবাসীর মৎস্যের প্রয়োজন পূর্ণ হইত, কিন্তু কালক্রমে বর্দ্ধমান অগভীর বিলগুলি বর্ষার পরেই বা শীতের মধ্যভাগে শুকাইয়া যায় বলিয়া এবং নদীর সহিত সংযোগহীন বলিয়া ইহারা অনেকটা মৎস্যশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

স্বাদ ও আকারের জন্য যশোহরের কই মৎস্যের পূর্ব্বে বিশেষ খ্যাতি ছিল। এই সকল জলপূর্ণ বিলই কই, মাগুর, শিঙ্গী, শোল প্রভৃতি মৎস্যের আবাসস্থল ছিল। বিলে সারা বৎসর জল থাকিত বলিয়া লোকে ইহাদিগকে নিঃশেষ করিয়া ধরিতে পারিত না। বিলের জলে নানাবিধ শক্ত জলজ উদ্ভিদ জন্মে বলিয়া জাল দিয়াও সমস্ত মাছ ছাঁকিয়া লওয়া সম্ভব হইত না। বিল সব অগভীর হইয়া যাওয়ায় এই সকল মৎস্যের স্থায়ী নিরাপদ আশ্রয় নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহাদিগকে হয় স্বল্প-পরিমিত নিম্নভূমির জলায় অথবা কূপ প্রভৃতিতে আশ্রয় লইতে হয়। এই প্রকার স্থান হইতে ইহারা সহজেই ধরা পড়িয়া যায় এবং অল্প যেগুলি বাঁচিয়া যায় তাহাদের দ্বারাই বংশ-বিস্তার কিছু পরিমাণে হয়। এইরূপে যশোহরে মৎস্য দিন দিনই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। নড়াইল অঞ্চলের বিলে কই প্রভৃতি মৎস্য এখনও অবশ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং অন্যান্য স্থানেও একেবারে অপ্রাপ্য হইয়া যায় নাই, তবুও যশোহরবাসীরা প্রধানতঃ বিলের মৎস্যের উপরই নির্ভর করিতেন এবং এই জন্যই বিলগুলি সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবার ফলে যশোহরে মৎস্যাভাব দেখা দিয়াছে। খুলনা ও অন্য নানাস্থান হইতে আমদানী নিকৃষ্ট শ্রেণীর মৎস্যের উপরই বর্ত্তমানে যশোহরবাসীকে নির্ভর করিতে হইতেছে। বড় বড় বিলে পূর্ব্বে শিকারযোগ্য নানাবিধ পাখীও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে।

যে-সকল বিল ভরাট হইয়া শস্যোৎপাদনের যোগ্য হইয়াছে, তাহার মধ্যের গভীর বিলগুলিতে এবং অগভীর বিলগুলির গভীর অংশে বৎসরে একবার মাত্র ফসল হয়। এই সকল নিম্নভূমিতে একমাত্র আমন ধানই জন্মে এবং কোন প্রকারে ফসল নষ্ট হইলে কৃষকদের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না। যে সকল বিল অনেকটা ভরাট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এবং গভীর বিলসমূহের অগভীর উপরের দিকে আউশ এবং আমন দুই প্রকার ধানই জন্মে। তাহা হইলেও সমান মাপের নিম্নভূমিতে যে-পরিমাণ আমন ধান জন্মে, উপরের জমির দুই ফসলের মিলিত পরিমাণ তাহার অপেক্ষা অনেক কম হয়। যে-সব জমি উঁচু হইয়া মাঠ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আউশ ধান ও কলাই, মসুর প্রভৃতির চাষ হয়। আউশ ধান ও পাটের চাষ একই রকম জমিতে হয় এবং আউশের পরিবর্ত্তে বহু জমিতে পাট জন্মে। পাটের চাষ লাভজনক হইলেও সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, উচ্চ ভূমির

কৃষকদের অপেক্ষা নিম্নভূমির কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ব্যাপারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিম্নভূমি ও বড় বিলের ধারে প্রধানত হিন্দু কৃষকদের বসতি দেখা যায় এবং অগভীর বিল ও উচ্চ-ভূমিতেই সাধারণতঃ মুসলমান কৃষকদের সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দু কৃষক ও হিন্দু মহৎস্যজীবিগণই এই সকল স্থানের প্রধান অধিবাসী। জলাভূমিতে বাস কষ্টকর হইলেও, মৎস্যবহুল অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া ইহাদের খাদ্য-তালিকায় প্রোটিন জাতীয় খাদ্য কিছু পরিমাণে থাকে এবং অধিবাসীদের দৈহিক আকৃতি ও স্বাস্থ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গভীর বিলের নিকটবর্ত্তী মুসলমান কৃষকদের পক্ষেও এই কথা সত্য। জলাভূমির অধিবাসী নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুদের দৈহিক উচ্চতা, অস্থির স্থূলতা, পেশীবহুলতা এবং শারীরিক শক্তি যে-কোন লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। হিন্দুরা সাধারণভাবে নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতির হইলেও নিম্নভূমির অধিবাসী এই সকল শ্রেণীর লোক সম্পর্কে ইহা সত্য নহে। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়েরা লাঠিয়াল দাঙ্গায় দক্ষতার জন্য বিশেষভাবে খ্যাতিসম্পন্ন ছিল।' কিন্তু উচ্চ ভূমির অধিবাসী উহাদেরই স্বজাতীয়েরা এই প্রকার দৈহিক শক্তি বা আকৃতির অধিকারী নহে এবং ইহাদের প্রকৃতিও অপেক্ষাকৃত মৃদু।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গভীর ও 'জোব' মৃত্তিকাবিশিষ্ট বিলের শস্যোৎপাদিকা শক্তি উচ্চভূমি অপেক্ষা অনেক বেশী। সেই জন্য এই অঞ্চলের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল এবং কৃষকদের স্বাস্থ্যের উপরও তাহার সুফল অবশ্যম্ভাবী। ইহাদের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইবার অন্যতম কারণ, উচ্চভূমির তুলনায় ইহাদের জমির পরিমাণ বেশী। ইহার কারণ বোধ হয় পূর্ব্বে এই সকল শ্রেণীর লোকেরা অন্যান্য কৃষকদের তুলনায় অনগ্রসর ছিলেন এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত কৃষকদের চাপে তখনকার দিনে অস্বাস্থ্যকর ও চাষের অযোগ্য নিম্নভূমিতে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হন। এই সকল জলাভূমি পূর্ব্বে চাষযোগ্য না থাকায় ইহা মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইত না এবং যাহার যতটা খুসী সে ততটা অধিকারে রাখিবার সুবিধা পাইত। কিন্তু কালক্রমে এই সকল নিম্ন-ভূমি চাষযোগ্য হইয়াছে এবং ইহার উর্ব্বরাশক্তি উচ্চভূমি অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। ফসল উৎপাদন করিবার জন্য এই জমিতে চাষের প্রয়োজনও অনেক কম হয়। ফলে স্বাস্থ্যে ও ঐশ্বর্য্যে নিম্নভূমির কৃষকেরা অনেক উন্নত। খুলনার দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে, এই অবস্থা ততই পরিস্ফুট হইবে। এই অঞ্চলের কৃষকেরা এক এক জনে বহু জমির মালিক এবং এমন অনেক কৃষক এই অঞ্চলে আছেন, যাঁহারা ধনী পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। লোকের স্বাস্থ্য অটুট বলিয়া ও প্রকৃতি নিরীহ নহে বলিয়া এসব দিকে দাঙ্গা-খুন-জখম প্রায় লাগিয়াই থাকে। জমির অসাধারণ উর্ব্বরাশক্তি এবং শস্যোৎপাদনের সহজসাধ্যতা মধ্যবিত্ত ও ধনী লোকদের এদিকে আকৃষ্ট করিতেছে এবং বহু জমি নানাভাবে ইহাঁদের হাতে চলিয়া যাইতেছে।

নিম্নভূমির কৃষকদের জীবনযাত্রায় আরও একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইহারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন হওয়ায় এবং এখানে অল্প শ্রমে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় বলিয়া সাধারণতঃ ইহারা অলস ও কর্ম্মবিমুখ। বিশেষ বিশেষ সময়ে যখন কাজের চাপ পড়ে, তখন ইহারা মজুরের সাহায্য গ্রহণ করে।

খুলনায় বিলের সংখ্যা যশোহর অপেক্ষা অনেক বেশী এবং বিলগুলি অনেক বড়। যশোহরের বিলগুলির চারি-ধারের জমি উঁচু হইয়া ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং বিলের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিতেছে। খুলনার দক্ষিণ অংশকে এখনও একটা প্রকাণ্ড বিল বলা যাইতে পারে, কিন্তু উত্তরার্দ্ধেও বিলের সংখ্যা ও আয়তন যশোহর অপেক্ষা বেশী। নদীজাত মৎস্যের কথা বাদ দিলেও এই স্থানের বিল-গুলিকেও মৎস্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। যশো-হরের বিলগুলি ক্ষয়িষ্ণু হওয়ায় যশোহরবাসীকে মৎস্যাভাব ভোগ করিতে হয় এবং যোগানের জন্য খুলনার উপর নির্ভর করিতে হয়। খুলনায় নদী ব্যতীত জলপূর্ণ বিলের সংখ্যা অধিক বলিয়া খুলনার আবহাওয়া অনেকটা সমভাবাপন্ন। এই জন্যই খুলনায় শীত ও গরম দুইই যশোহর অপেক্ষা অনেক কম।

গৃহপালিত জীবজন্তু :

চাষযোগ্য জমির যে-বর্ণনা দেওয়া হইল, তাহাতে স্বভাবতঃই লোকে মনে করিবে যে, নিম্নভূমিবহুল দক্ষিণ-পূর্বাংশে চাষ করিবার জন্য গরু অপেক্ষা মহিষের ব্যবহারই অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু কার্যতঃ এই অংশে চাষের কার্য সম্পূর্ণভাবে গরুর সাহায্যেই চলিয়া থাকে এবং মহিষ কদাচিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাংশে চাষের জন্য মহিষের ব্যবহার সমধিক প্রচলিত। ভারবহন ও শকটাদি চালাইবার নিমিত্ত গরু, মহিষ ও অশ্বের ব্যবহার হইয়া থাকে। ঝিনাইদহ অঞ্চলে ঘোড়া বিভিন্ন কার্যের জন্য বহু লোকে পুষিয়া থাকে। যশোহরের উত্তর-পশ্চিমে মেষ দৃষ্ট হইলেও অন্যান্য স্থানে মাংসের জন্য গৃহস্থেরা ছাগ পুষিয়া থাকে। দুগ্ধের উদ্দেশ্যে ছাগপালন হয় না—মহিষের দুগ্ধের চলনও খুব বেশী নাই। কিন্তু গোদুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্য যশোহরের সমধিক প্রসিদ্ধি আছে। যশোহরের গাভী পূর্বে খুবই উৎকৃষ্ট ছিল এবং পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও গরু প্রতি দৈনিক ৬।৭ সের দুধ পাওয়া যাইত। জলাভূমির সহিত উচ্চ প্রান্তরও যথেষ্ট থাকায় এবং এই সকল স্থানে প্রচুর ঘাস উৎপন্ন হওয়ায় নিম্নবঙ্গের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা যশোহরের গরু অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু বর্তমানে উপযুক্ত বলিষ্ঠ বৃষের অভাবে গোকুলের শোচনীয় দুর্গতি ঘটিয়াছে। গরুর আকৃতি অনেক ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে এবং দুগ্ধের পরিমাণ এক-চতুর্থাংশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, লোকসানের ভয়ে দুগ্ধ-ব্যবসায়ীরা আর গাভী পুষিতে চাহিতেছে না এবং পূর্বে যাহারা দুগ্ধের ব্যবসা করিত, বর্তমানে তাহাদের অনেকেই জীবিকা হিসাবে কৃষি-কার্য গ্রহণ করিয়াছে। চারণ-ভূমির অভাব গোপালনের বিশেষ বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। এইজন্য যশোহর পূর্বের দুগ্ধ-সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর খাদ্যের প্রধান দুইটি পুষ্টিকর উপাদান দুগ্ধ ও মৎস্য এইভাবে অন্তর্হিত হওয়ায় যশোহরবাসী দিন দিন হীন-স্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে। যশোহরে ম্যালেরিয়া ও কালা-জ্বরের প্রাদুর্ভাবের জন্য এখানকার অধিবাসীদের মৎস্য ও দুগ্ধবিহীন খাদ্য অনেকাংশে দায়ী। এখানকার গৃহপালিত অন্যান্য জীবজন্তুর বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

মানুষের মাঝে

—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

স্বর্গলোক পানে চাও বৃথা ? ঊর্ধ্ব নেত্রে কিবা কর ধ্যান
জীবলোক পানে চাও ফিরে মানুষের কতটুকু প্রাণ ?
ততটুকু পূর্ণ করে নাও, দান কর ততোধিক টুক্
স্নেহ দানে ধন্য কর তারে—শুষ্ক মুখ কেশ যার রুগ্ন।
সাধনা সার্থক হবে তবে, মরুভূমি শ্যাম হবে তৃণে
নরপ্রাণ নারায়ণ নিজে দেউলিয়া মানুষের ঋণে।

মানুষেরে উচ্চে তুলে ধর অঙ্কুরিত শিশু শস্যগুলি
অবাধ স্বাধীন হর্ষে তারা উঠে যেন ঊর্দ্ধে মাথা তুলি।
নির্বিকল্পে কাজ নাহি ভাই, নাহি কাজ কষ্ট কল্পনায়
ওরে ভাই স্বপ্ন-স্বর্গ ছাড়ি মানুষের মাঝে আয় আয়।

মধ্য-বঙ্গের বিধ্বস্ত পল্লী-অঞ্চলের পুনঃ-সংস্কার

—শ্রীহরিদাস মিত্র

(ক্ষয়িষ্ণু) আলোচ্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক সংস্থান

বিশেষজ্ঞগণ কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, মধুমতীর উৎপত্তি অধিককাল হয় নাই। বস্তুতঃ এই অনুমান সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। মধুমতী, পরগণার সীমা-নির্দ্দেশক না হইলেও, এমন কি আকবরের সময়েও মধুমতীই প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমা নির্দ্দেশ করিত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। নদীমাত্রেই যে সীমা-নির্দ্দেশক হইবে এরূপ কথা নাই।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময়ে কবিরাম নামক জনৈক বৌদ্ধ পরিব্রাজক, পাটলীপুত্র হইতে আনাম পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া 'দিগ্বিজয়-প্রকাশ' নামে একখানি সংস্কৃত-গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে স্রোতস্বতী-তরঙ্গিনী মধুমতী সরিৎ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সে সময়ে নিশ্চয় মধুমতী-নদীর অস্তিত্ব ছিল।

"মেজর রেনেল কলিকাতা হইতে ফরিদপুর যাইবার পথে বর্ত্তমান মধুমতী অর্থাৎ বোয়ালমারী হইতে কালনা পর্য্যন্ত যে নদী, তাহার পরিবর্ত্তে ঐ স্থানে এলেংখালী নামে একটী খাল দেখিয়াছিলেন, তাহা তিনি ঘোড়ায় পার হইয়া যান। এখনও মধুমতীর অংশ-বিশেষ এলেংখালী নদী নামে পরিচিত আছে।"

"মহম্মদপুরের কিঞ্চিৎ ভাটিতে প্রায় সমান্তরাল ভাবে, এলেংখালী নামে একটী খাল বারাসিয়া নদীর পশ্চিম দিকে বর্ত্তমান ছিল। ইহাই পরে বৃহদাকার হইয়া মধুমতী নাম ধারণ করিয়াছে। এই এলেংখালী খাল বর্ষার সময়েই বহমান থাকিত,...কিন্তু বারাসিয়া নদী...বারমাসই প্রবাহমান থাকিত। এই নদীর নাম বারমাসিয়া হইতে, বারাসিয়া হইয়াছে। যশোহর অঞ্চলে...'বারাসিয়া' ও 'বারমাসিয়া' শব্দদ্বয় তুল্যার্থবাচক।"

"কুষ্টিয়ার সন্নিকটে গৌরী, পদ্মানদী হইতে বাহির হইয়া নদীয়া জেলা দিয়া যশোহরে প্রবেশ করিয়া কুমার নদের সহিত মিশে এবং পরে কুমারের শাখা বারাসিয়া দিয়া দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়। কিন্তু কালে গৌরীর জল-প্রবাহ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে বারাসিয়া হইতে এলেংখালী নামে একটী পৃথক্ শাখা বাহির হইয়া যায়। পূর্ব্বে বারাসিয়ার নিম্নে মধুমতী নাম ছিল, এখন এই এলেংখালীও বিস্তারলাভ করিয়া মধুমতীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।"

বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে...আকবরের শেষ রাজত্ব কালে... লোহাগড়ার নিম্ন দিয়া, উত্তরে খরস্রোতা নব-গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইয়া মধুমতীতে মিশিয়াছিল এবং পূর্ব্বে মধুমতী উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া দক্ষিণ দিকে ধাবিত হইতেছিল।

"এসময় বারাসিয়া নদী কালনার নিম্নে মধুমতী নাম ধারণ করিয়া প্রবল পরাক্রমে প্রবাহিত ছিল এবং কালনা হইতে শিরগ্রাম পর্য্যন্ত যে নদী মধুমতী নামে প্রসিদ্ধ উহা সে সময়ে এলেংখালীর খাল নামে অভিহিত ছিল।

...গড়াই নদী বারাসিয়া ও মধুমতী এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কালনার নিম্নে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল এবং নবগঙ্গা লোহাগড়ার উত্তর দিয়া ঐ মিলিত স্থানে সংযুক্ত হইয়াছিল। ঐ ত্রিমোহনাকে কীর্ত্তনখোলা বলিত। ঐ স্থানে বর্ষার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিন নদী...কীর্ত্তনের সুর তুলিয়া...প্রবাহিত হইত। ঐ স্থান দিয়া নৌকা-যোগে যাতায়াত করা...অতীব ভীতিপ্রদ—ছিল। বর্ত্তমানে উহা ভরাট হইয়া মরিয়া...গিয়াছে।"

লোহাগড়ার পশ্চিমে, যে বন্যার নালা ছিল, উহা নবগঙ্গা হইতে কালিয়ার নিম্নের সহিত সংযুক্ত ছিল। নবগঙ্গা মরিয়া যাওয়ায়, এই বন্যার নালা বানকানাতে পরিণত হইয়াছে।

ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উপবঙ্গ বা মধ্যবঙ্গের নদনদী সকল, গঙ্গা হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রধানতঃ উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে, সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মধ্যবঙ্গের এই প্রধান পয়োপ্রবাহ সকল, পরস্পর সমান্তরাল না হইয়া, ক্ষুদ্রতর শাখা-প্রশাখা দ্বারা সংযুক্ত। সুতরাং এক নদ, নদী, হইতে স্বচ্ছন্দে সমস্ত নদ, নদী, এমন কি সমুদ্র পর্য্যন্ত, নৌযান সকল যাতায়াত করিতে পারিত।

"গঙ্গা হইতে চারিটী শাখানদী—ভাগীরথী, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা এবং গোরাই বা মধুমতী নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গোরাই বা মধুমতী ও মাথাভাঙ্গার শাখা

নদীসমূহ যশোহর ও খুলনা জেলার মধ্যে প্রবাহিত। কুমার, নবগঙ্গা, নিম্ন ভৈরব ও ইছামতী মাথাভাঙ্গার শাখা। কুমার, নবগঙ্গা, ভৈরব নদ, চিত্রা, বেত্র বা বেগবতী, কটকী, কপোতাক্ষ, হরিহর, ভদ্র প্রভৃতি নদী জালের আকারে সংযুক্ত। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যশোহর ও খুলনা জেলার নদীসমূহ প্রায়ই উত্তর-পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইত। কিন্তু তাহাদের গতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া দক্ষিণ-প্রবাহিণী হইয়াছে। মধুমতী বা গোরাই নদী ভিন্ন অনেক নদনদীর উৎপত্তি স্থান প্রায় শুষ্ক হইয়াছে। মধুমতী নদীর জলস্রোত এখনও বহমান থাকিয়া হরিণঘাটা দিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে এবং কতকাংশ হালিফ্যাক্স কেনাল অ্যালিফাক্স ক্যানাল পথে প্রবাহিত হইয়া বাগকাপা, কালীগঙ্গা, আঠারবাঁকা, ভৈরব, রূপসা দিয়া সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। যশোহরের উত্তরাংশের নদীসমূহ কোথাও বা শুষ্ক কোথাও বা শৈবালাদি জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; এবং দক্ষিণাংশের নদীসকল একমাত্র মধুমতীর জলপ্রবাহে প্রবাহমান রহিয়াছে।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভৈরব পদ্মা হইতে উঠিয়াছে এবং এই ভৈরবই মাথাভাঙ্গা ও জলঙ্গীর জন্মের পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর ও খুলনার মধ্য দিয়া বলেশ্বরের সহিত মিশিয়া সমুদ্রে গিয়াছে। যখন জলঙ্গীর জন্ম হইল, তখন জলঙ্গী ভৈরবকে ভেদ করিয়া দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মাথাভাঙ্গাও ভৈরব অপেক্ষা পশ্চাৎ-উদ্ভূত নদী। মাথাভাঙ্গাও ভৈরবকে ভেদ করিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে।

যশোহরের কুমার, চিত্রা, নবগঙ্গা সকলেই মাথাভাঙ্গা হইতে উদ্ভূত, কিন্তু এখন মাথাভাঙ্গার সহিত সংযোগ নাই; মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মধ্য-বঙ্গের এই ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলের পশ্চিম সীমারেখা, যমুনা নদী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বের দিকে অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে, যমুনা এবং ভৈরব, মধুমতী, ভাগীরথী ও গঙ্গা হইতে উঠিয়া, প্রায় সমান্তরাল ভাবে উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রবাহিত হইতেছে। আবার চিত্রা, নবগঙ্গা, কুমার নদী—এইরূপে, তির্য্যক্‌ভাবেই মাথাভাঙ্গা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্যযোগ্য যে—ইছামতী চূর্ণী হইতে, এবং বেত্রবতী ও কপোতাক্ষী ভৈরব হইতে, আর হরিহর ও ভদ্র নদদ্বয় কপোতাক্ষী হইতে জন্মলাভ করিয়া উত্তর দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইতেছে।

পক্ষান্তরে, অতি পূর্ব্বকালে, ভৈরবনদ সুদূর উত্তরে, পদ্মা হইতে নির্গত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ জেলা অতিক্রম করিয়া, নদীয়ার সমগ্র মেহেরপুর মহকুমা ঘুরিয়া, ভৈরব, যশোহর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জ্যাকার বা হলাকৃতি বক্রপথ অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ ভৈরব এইরূপে উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবতরণ করিয়াছে।

গঙ্গা-পদ্মা হইতে বলেশ্বর পর্য্যন্ত—এই দীর্ঘ পথ, বড় বড় বাঁক ঘুরিয়া, ক্রমাগতই ভৈরব-নদ, উত্তর বা পশ্চিমোত্তর হইতে দক্ষিণে, এবং তথা হইতে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদিকে অবরোহণ করিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জ্যাকার বা হলাকৃতি বক্রপথে, সোপানশ্রেণীবৎ পরম্পরাক্রমে যে ভৈরব অবতরণ করিয়াছে, এবং দিক্‌পরিবর্ত্তন করিয়াছে, ইহাই এ নদের বিশিষ্টতা।

এইরূপ কুৎসিত বক্রাকার পথে পরিক্রমণ—না কি নদ-নদী সকলের নির্জ্জীবতার লক্ষণ, এইরূপ মত বিশেষজ্ঞগণ পোষণ করেন। তথাপি, সম্ভবতঃ, একই সুনির্দ্দিষ্ট পথে, ভৈরব-নদ অতি দীর্ঘকাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহার ঊর্দ্ধাংশে, স্রোতোগতির কোন পরিবর্ত্তনের বিশেষ নিদর্শন এখন নাই। তবে এই নদের নিম্ন অংশে কোথায়ও কোথায়ও গতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এইরূপ প্রমাণ আছে।

মৃত্তিকার বিশেষ কোনও ধর্ম্মের ফলে এইরূপ গতি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, অথবা, কিরূপ কোনও গতি পরিবর্ত্তনের ফলে ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল—তাহা জানিবার উপায় নাই। ভূমিকম্পাদি বহু প্রাকৃতিক বিপ্লব বা উৎপাতে, উপবঙ্গে ভূপৃষ্ঠ যে বারংবার উন্নমিত বা নিম্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অনেক দৃঢ় প্রমাণ আছে।

গঙ্গা-ভৈরবের বিপুল মিলিত জলস্রোত যে যশোহর-খুলনার বহু অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহারও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে। ভূ-পৃষ্ঠের অল্প-বিস্তর নীচে, এতদ্দেশে 'দুধ-মাটি' বা 'দুধে' মাটি নামে পরিচিত, একরূপ গঙ্গা-মৃত্তিকার ন্যায় মসৃণ ও শ্বেতাভ মৃত্তিকা, অতি স্থূল স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে, এখনও তাহা পুষ্করিণী খননকালে দৃষ্টি-গোচর হয়।

"যশোহর-খুলনা যে ভূভাগের অন্তর্গত ইহাই··· গাঙ্গোপদ্বীপ। এদেশ গঙ্গাজল-বাহিত হিমালয়ের গাত্রধৌত পলি হইতে উৎপন্ন। প্রথমে এ স্থান সমুদ্রগর্ভস্থ ছিল; পরে গঙ্গার পলিতে যেমন দ্বীপ হইতে থাকে, সমুদ্রও তেমনি দক্ষিণে সরিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার সঙ্গমও দক্ষিণে সরিয়াছে।

"গঙ্গানীতা পলিমাটী ও সুমিষ্ট জলের সহিত সমুদ্রের লবণাক্ত জলের সংযোগে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৃক্ষগুল্মের সমুদ্ভব করে। উহাই সুন্দরবনের বিশেষত্ব।"

"গঙ্গার মোহনার সঙ্গে সুন্দরবনও···ক্রমে দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে···ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের যে কোন স্থানে জলাশয়াদি খনন করিবার সময় দেখা যায়, মৃত্তিকার স্তর-বিভাগ প্রায় একই প্রকার রহিয়াছে। খুলনা সহরের পশ্চিম পার্শ্বে এবং কলিকাতা শিয়ালদহের নিকট পুষ্করিণী খননকালে উভয় পুষ্করিণীতে মৃত্তিকার একই প্রকার অবস্থা দেখা গিয়াছে, উভয় স্থলে মৃত্তিকানিম্নে যে অসংখ্য গাছের গুঁড়ি পাওয়া যায়, তাহা সুন্দরী বৃক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সমতটের সর্ব্বত্র সুন্দরবন ছিল। আর একস্থলে ভাগীরথীর উভয় পারের মৃত্তিকা খনন করিলে, পশ্চিম পারের বা রাঢ়ের মৃত্তিকার প্রকৃতি সমতটের মৃত্তিকার প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং সমতটের মৃত্তিকা যে ক্রমে পলিসংযোগে গঠিত হইতে হইতে দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

"যশোহর-খুলনারও অনেক স্থানে পুষ্করিণী বা কূপ খনন-কালে এই পলি মাটীর স্তর ৪।৫ ফুট হইতে ৯।১০ ফুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নবর্ত্তী আঁটাল বা জোব মাটীর সহিত এই পলির কোন সম্বন্ধ নাই।"

"এইরূপে ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যে···ত্রিকোণাকার ভূমি-খণ্ড সমুদ্র-সীমা পর্য্যন্ত···আজ যেমন বিস্তৃত পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। কিন্তু ইহার আকৃতি যাহাই থাকুক, ইহার সমুদ্রকূলবর্ত্তী অংশ যে বহু কালাবধি কাননাবৃত ছিল, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। পাণিনির মহাভাষ্যে পতঞ্জলি প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের···পূর্ব্বভাগে কালকবনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কালকবনই বোধ হয় সুন্দরবন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, মগধের অন্তর্গত প্রাচীন রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষের পূর্ব্বদিকস্থ গিরিদ্বয় মধ্যবর্ত্তী যে বন এখনও কাল্‌কা জঙ্গল বলিয়া খ্যাত আছে, সম্ভবতঃ ইহা তাহাই। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের যে সকল সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মগধের বহু পূর্ব্বদিকে তাহার পূর্ব্ব-সীমা বলিয়া বোধ হয়। মগধের মৃত্তিকার অবস্থা পরীক্ষা করিলে তাহা আধুনিক কোন সময়ে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, এমন প্রতীয়মান হয় না। দিগ্বিজয়প্রকাশে* বঙ্গদেশস্থ সরস্বতী ও কালিন্দী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূ-ভাগকে কিলকিলা বলা হইয়াছে। এখনও খুলনা জেলার কালিন্দীতটে কলকলি নামক স্থান আছে। কলিকাতার† নামের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না বলা যায় না। জনৈক জৈন স্থবির নাম কালক।‡ কাহারও কাহারও মতে ইনিই পর্য্যুষণ পর্ব্ব প্রবর্ত্তিত করেন। জৈন কালকের সহিত কালকবনের কি সম্বন্ধ তাহাও একটি নির্ণয় করিবার বিষয়।"

এই শ্বেতাভ অত্যন্ত আটাল, 'দুধ-মাটি'র স্তর—সমস্ত মণিরামপুর, কেশবপুর, নওয়াপাড়া, এমন কি দৌলতপুর থানা পর্য্যন্ত স্থান সকলে, পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ভূস্তর-বিন্যাসে বিভিন্নতা আছে। এই ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকাস্তরসকলের বিশিষ্টতা ও বিন্যাসে বিভিন্নতা, আলোচনার বিশেষ বিষয়। ইহা অনুধাবন করিলে, মধ্য-বঙ্গের নদ-নদী-জলাশয় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সংস্থানের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

---

* দিগ্বিজয় প্রকাশ' এক বিরাট্ গ্রন্থ। 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক, ৺নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের বিখ্যাত গ্রন্থসংগ্রহে, ইহার হস্তলিখিত পুঁথি রক্ষিত ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আবির্ভাব সময়ে, বা তাহার প্রাক্কালে, কবিরাম নামক জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজক কর্ত্তৃক, পাটলীপুত্র (পাটনা) হইতে আসাম পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া, সংস্কৃতে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়।

† সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় সম্প্রতি 'কলিকাতা' শব্দের ব্যুৎপত্তি, বিশেষজ্ঞকর্ত্তৃক অনুরূপও প্রদত্ত হইয়াছে।

‡ জৈন 'কালকাচার্য্য কথা,' প্রামাণিক গ্রন্থ।



সাবিত্রীচণ্ডীর মঠ

[শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

ফাল্গুন—১৩৪৬

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

গীতা-বিচার (৩)

"মোক্ষ-যোগ-বিচার"

তর্করত্ন মহাশয়ের শ্রেণীর পণ্ডিতগণের সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান যে কত বিকৃত, তাহা আমরা আরও কয়েকটী উদাহরণের দ্বারা দেখাইব।

'স্বর্গ' শব্দে যে এক প্রকারের 'সুখ'কে বুঝিতে হয়, তাহা দেখাইবার জন্য তর্করত্ন মহাশয় গীতার নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥"

তর্করত্ন মহাশয় ঐ শ্লোকটীর অর্থে নিম্নলিখিত কথা লিখিয়াছেন—

"এই প্রকার যুদ্ধ উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারস্বরূপ। সুখী ক্ষত্রিয়গণই ইহা প্রাপ্ত হন।"

গীতার "যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং" প্রভৃতি শ্লোক তর্করত্ন মহাশয় যে অর্থে বুঝিয়াছেন অথবা বুঝাইয়াছেন, তাহা যদি নির্ভুল হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হয়, ব্যাসদেবের মতে অবস্থাবিশেষে বর্ণ-বিশেষের পক্ষে দ্বন্দ্ব-কলহ আকাঙ্ক্ষণীয়।

অথচ ব্যাসদেব গীতার মধ্যেই স্থানান্তরে দ্বন্দ্ব-রহিত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকের "নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো" প্রভৃতি ৫ম অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকের "নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে", ৭ম অধ্যায়ের ২৭শ শ্লোকের "ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত, সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ" প্রভৃতি কথা বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি অথবা যুদ্ধের প্রবৃত্তি ব্যাসদেবের মতে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, "যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং" প্রভৃতি শ্লোক তর্করত্ন মহাশয় যে অর্থে বুঝিয়াছেন, সেই অর্থ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয় যে, ব্যাসদেবের মস্তিষ্কে কিছু গণ্ডগোল ছিল, কারণ তিনি এক শ্লোকে যুদ্ধ-প্রবৃত্তিকে অবস্থাবিশেষে প্রয়োজনীয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন অথচ আবার অন্যান্য শ্লোকে উহাকে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন।

যাঁহারা ব্যাসদেবের মস্তিষ্ককে গণ্ডগোলযুক্ত বলিয়া প্রকারান্তরে প্রমাণিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের কোন বিচারের প্রয়োজন নাই, এতাদৃশ মানুষের প্রতি যাঁহারা 'পণ্ডিত' অথবা 'সংস্কৃতজ্ঞ' বলিয়া শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন, উঁহাদিগকেও আমরা কিছু বলিতে চাহি না। যাঁহারা প্রবাদ-বাক্যানুসারে ব্যাসদেব যে ভ্রমাতীত তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই বলিতে চাই যে, ব্যাসদেব কুত্রাপি পরস্পরবিরোধী কোন কথা তাঁহার কোন গ্রন্থে বলেন নাই। তথাপি তর্করত্ন মহাশয়ের শ্রেণীর পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যানুসারে ব্যাসদেবের কথায় যে পরস্পরবিরোধিতা অনুভব করিতে পারা যায়, তাহার একমাত্র কারণ, এই পণ্ডিতগণ ব্যাসদেবের ভাষা, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন না।

এইরূপভাবে সাধারণ চিন্তাশক্তি ব্যবহার করিলেই তর্করত্ন মহাশয়ের শ্রেণীর পণ্ডিতগণ যে ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন না, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। ইহার পর বেদাঙ্গোক্ত ব্যাকরণ, শিক্ষা ও নিরুক্ত প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে এই পণ্ডিতগণ যে ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে 'আকাট মূর্খ' এবং ঐ মূর্খতার দ্বারা যে নিজদিগের ও মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে পারা যায়।

"যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং" প্রভৃতি শ্লোকটীর যে অর্থ তর্করত্ন মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই অর্থ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মূল শ্লোকের "যৎ ঋচ্ছয়া চ উপপন্নং" এই কথা কয়েকটী অনুসারে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, "স্বর্গদ্বারং অপাবৃতং" এই কথা কয়েকটীর অর্থ "উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ" বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং "সুখিনঃ" পদের অর্থ ধরা হইয়াছে "সুখী"।

যাঁহারা নিরুক্তের নাম ও উপসর্গ-বিষয়ক 'অপ ক্ষীয়ত ইতি এতেন এব ব্যাখ্যাতঃ প্রতিলোমং',* 'নামাখ্যাতয়োস্ত কর্ম্মোপসংযোগদ্যোতকা ভবন্তি',* 'আ ইতি অর্বাগর্থে'*—এই তিনটী সূত্র যথাযথ

* এই তিনটি সূত্রের অর্থ অতীব দুরূহ। উহা বাংলাভাষায় অথবা অন্য কোন লৌকিক ভাষায় সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করা অতীব কষ্টসাধ্য। নিরুক্তের প্রায় প্রত্যেক সূত্রে বাচ্য, বাচক ও ভাব এই তিনের সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। উহার কোন সূত্র সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে হইলে ঐ সূত্র উচ্চারণ করিলে উরঃ, কণ্ঠ, শির, মূর্দ্ধা, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ, ও তালু এই আটটী স্থানে যুগপৎ তেজ, রস ও বায়ুর যে বিশেষ বিশেষ উদ্গম হয়, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিতে হয়। ঐ সাধনার পদ্ধতি পূর্ব্বমীমাংসায় লিপিবদ্ধ আছে। "অপ-ক্ষীয়ত" ইত্যাদি সূত্রের মোটামুটী মর্ম্মার্থ—"ব্রহ্মরূপের সহিত পুরুষের সংযোগ হইলে 'অপ' শব্দের উদ্ভব হয়। 'অপ' শব্দের স্পর্শ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে যে, শরীরস্থ বায়ু তামসিক হইয়া ক্ষয়ের সূচনা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। কাযেই 'অপ' শব্দের পারণতি অথবা অর্থ 'ক্ষয়'। 'অপ-ক্ষীয়ত' শব্দের অর্থ 'ক্ষয় ও ক্ষয় কারণের বিদ্যমানতা। 'অপ-ক্ষীয়ত' শব্দটী 'প্রতি-লোমতা' অথবা 'ক্ষয়ের দিকে ধাবমানতা' বুঝাইয়া থাকে।"

অর্থে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, 'স্বর্গদ্বারং অপ-আ-বৃতং' এই কথা কয়েকটীর অর্থে কখনও উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ ধরা যায় না; পরন্তু ঐ কথা কয়েকটির অর্থ "স্বর্গ লাভ করিবার সামর্থ্য-ক্ষয়কারী মোহ আনায়ক" ইহা বুঝিতে হয়।

'সুখিনঃ' শব্দের অনুবাদে তর্করত্ন মহাশয় ধরিয়াছেন "সুখী"। তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থ কিরূপভাবে গ্রহণ করিতে হয় তাহা জানা থাকিলে দেখা যাইবে যে, 'সুখিনঃ' শব্দের অর্থ কখনও "সুখী" হইতে পারে না। নিরুক্তের "সুখং কস্মাৎ সুহিতং খেভ্যঃ' এবং 'খং পুনঃ খনতেঃ" এই দুইটি সূত্র বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সুখ বলিতে বুঝায় এমন কোন গুণ, যাহা সত্ত্বা বহির্মুখী হইলে এবং ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হইলে লাভ করা সম্ভব হয়। প্রত্যয়ের অর্থানুসারে সুখী বলিতে বুঝায় এমন কোন মানুষ অথবা বস্তু, যিনি অথবা যাহা সুখলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আর 'সুখিনঃ' বলিতে বুঝায় এমন কোন কার্য্য, যদ্দ্বারা সুখ লাভ করা সম্ভব হয়। এককথায় 'সুখিনঃ' শব্দটী কর্ম্মার্থক, আর 'সুখী' শব্দটি "দ্রব্যার্থক"। কাযেই 'সুখিনঃ' ও 'সুখী' এই দুইটি শব্দ কখনও একার্থক হইতে পারে না।

"যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং" প্রভৃতি শ্লোকটী যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার মর্ম্মার্থ—

"মায়ার আসুরিক বুদ্ধি ও মনের বহির্ম্মুখীনতার ফলে অহঙ্কারের উদ্ভব হইয়া থাকে। উহা স্বর্গলাভ করিবার সামর্থ্যনাশক। যাঁহারা সুখলাভ করিবার জন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাদৃশ ক্ষত্রিয়গণ এতাদৃশ উচ্ছৃঙ্খল ঘাত-প্রতিঘাতের প্রকাশ অথবা যুদ্ধপ্রবৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন।

এতাদৃশ অর্থে 'যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং' প্রভৃতি শ্লোকটী বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এই শ্লোকেও ব্যাসদেব যুদ্ধপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই। বাস্তবিকপক্ষে ব্যাসদেব সর্ব্বত্রই দ্বন্দ্ব-কলহের বিরুদ্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি সংযত করিতে না পারিলে কখনও কোন সৎকার্য্য সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি যুদ্ধপ্রবৃত্তি বাস্তবিক পক্ষে নিন্দনীয় হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হন কি করিয়া?

মহাভারতের আখ্যানটী লৌকিক ইতিহাসার্থে গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে, যুদ্ধ-প্রবৃত্তি যে কখনও লোকহিতকর হইতে পারে না তাহা দেখাইবার জন্য কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে যে কাহারও মঙ্গল হয় নাই, পরন্তু সকলেরই লৌকিকভাবে অনিষ্ট হইয়াছে ইহা দেখান হইয়াছে। ইহা ছাড়া সংস্কৃত ভাষা বুঝিবার যথাযথ পন্থা বিদিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মহাভারতের মধ্যে যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথোপকথন হইতেছে বলিয়া মনে হয়, সেই সকল স্থানে বাস্তবিকপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের কোন কথোপকথনের কথা নাই, পরন্তু মানুষের মনে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কিরূপ আসুরিক ভাব ও দৈবীভাবের দ্বন্দ্ব হইয়া থাকে

'নামাখ্যাতযোস্তু' সূত্রটীর অর্থ—নাম এবং আখ্যার সহিত কোন উপসর্গ ব্যবহৃত হইলে ঐ উপসর্গের দ্বারা নামের সহিত আখ্যাতের কোন না কোন সংযোগ বুঝান হইয়া থাকে।"

'আ ইতি অর্বাগর্থে' এই সূত্রের অর্থ—

'আ' শব্দের অর্থ কোন না কোন বস্তুর ব্রহ্মরূপের মধ্যে যে বহিঃ ও অন্তঃ বিদ্যমান থাকে সেই বহিঃ ও অন্তর প্রাকৃতিক বৃদ্ধি।"

তাহা দেখান হইয়াছে। এবং শ্রীকৃষ্ণের কথায় অথবা দৈবীভাবের জাগরণে সর্ব্বত্রই দ্বন্দ্ব-কলহ-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ কথা রহিয়াছে। মানুষ এখন আর 'গীতার' অথবা 'মহা-ভারতে'র প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে না বলিয়া গীতার দোহাই দিয়াও যুদ্ধ-প্রবৃত্তি অথবা দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। বোমার যুগে শ্রীঅরবিন্দের দলের গীতার অনুশীলন উহার অন্যতম নিদর্শন। শ্রীঅরবিন্দের গীতা-বিষয়ক প্রবন্ধ ও শ্রীগান্ধীর গীতা-ব্যাখ্যা এতদৃশ কুৎসিৎ ভাব হইতে প্রসূত। ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীগান্ধী নহেন। পরন্তু তর্করত্ন মহাশয়ের শ্রেণীর পণ্ডিতগণ ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী। এই পণ্ডিতগণ যদি যথাযথভাবে সংস্কৃত-ভাষা পরিজ্ঞাত হইয়া গীতার ব্যাখ্যায় লিপ্ত হইতেন তাহা হইলে গীতাতে কুত্রাপি যুদ্ধ-প্রবৃত্তির প্রশ্রয়কর কোন কথা দেখা যাইত না এবং কেহই গীতার দোহাই দিয়া সমাজ-মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি অথবা যুদ্ধের প্রবৃত্তি জাগ্রত করিতে সাহসী হইতেন না।

পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকেন যে, 'বর্ণ-স্ফোট' না জানিলেও সংস্কৃত ভাষা জানা সম্ভব হইতে পারে। 'সংস্কৃত' এই শব্দটীর অর্থ কি এবং ঐ ভাষা কোন্ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "সংস্কৃত ভাষা" বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কখনও সর্ব্বতোভাবে বর্ণ-স্ফোটের জ্ঞান ছাড়া বিদিত হওয়া সম্ভব নহে এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা স্ফোটের নিষ্প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ওকালতি করিয়াছেন, তাঁহারা যতই খ্যাতিসম্পন্ন হউন না কেন, তাঁহারা যে সংস্কৃত ভাষায় সম্যক্‌ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে হয়।

যাঁহারা পাণিনীয় শিক্ষার

যেন অক্ষরসমাম্নায়ং অধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥

এই শ্লোকটীর সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত না হইতে পারিলেও বর্ণ-স্ফোটের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। উপরোক্ত শ্লোকটীর মর্ম্মার্থ—

"মহেশ্বরকে অপাদান করিয়া অর্থাৎ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার কারণের অবলম্বনে স্বকীয় শরীরস্থ তেজকে সমভাবাপন্ন করিয়া অক্ষর-সমাম্নায়ে কিরূপ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে হয় তাহার পন্থা দেখাইয়া যে কার্য্য আমূলভাবে ব্যাকরণ বুঝিবার সহায়তা করে সেই পাণিনিরূপী কার্য্যের উন্মেষ ও বিকাশ লক্ষ্য করিতে হয়।"

"বর্ণ-স্ফোটের অপর নাম "অক্ষর-সমাম্নায়।" ব্যাকরণ বুঝিতে হইলে যদি 'বর্ণ-স্ফোট' একান্ত প্রয়োজনীয় না হইত তাহা হইলে "অক্ষরসমাম্নায়ং অধিগম্য" এই কথা বলা হইত না। 'পাণিনি' শব্দের অর্থ কি তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলে দেখা যাইবে যে, উহার অর্থ "রসের সহিত ভাবের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার ধারা।" কোন্ কার্য্য রসের সহিত ভাবের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার সহায়তা করে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে বর্ণ-স্ফোট'ই উহার একমাত্র উপায়। কাযেই আর কিছু জানা না থাকিলেও, একমাত্র 'পাণিনি' শব্দের অর্থ বিদিত হইতে পারিলেই সংস্কৃত-ভাষা সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যে বর্ণ-স্ফোটের জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে স্থির-সিদ্ধান্ত হইতে পারা যায়।

"শব্দেন উচ্চারিতেন ইহ যেন দ্রব্যং প্রতীয়তে।
তদক্ষরবিধৌ যুক্তং নাম ইত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥"

এই শ্লোকটীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, সংস্কৃত ভাষা সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যে বর্ণ-স্ফোটের জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

তর্করত্ন মহাশয়ের শ্রেণীর তথাকথিত পণ্ডিতগণ বর্ণ-স্ফোট পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়া সংস্কৃত ভাষা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন না এবং ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা করিয়া নিজ নিজ পরিবারের ও সমগ্র মনুষ্যসমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। সংস্কৃত-ভাষা যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কি করিয়া সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষকে সর্ব্বতো-ভাবে দুঃখহীন করা যাইবে, তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞান একমাত্র ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে, প্রাচীন হিব্রুতে লিখিত মূল বাইবেলে এবং প্রাচীন আরবীতে লিখিত মূল কোরাণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞান একদিন মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মনীষী বিদিত ছিলেন এবং উহার সাহায্যে একদিন প্রত্যেক মানুষের দুঃখ দূর করিবার উপযোগী সামাজিক সংগঠন করা সম্ভব-যোগ্য হইয়াছিল। এতাদৃশ সংগঠনের ফলে একদিন সমগ্র মনুষ্যসমাজ সর্ব্বতোভাবে দুঃখ হইতে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিত। সামাজিক সংগঠন যখন এতাদৃশভাবে সর্ব্বতোরকমে মানুষের দুঃখ দূর করা সহজসাধ্য করিয়া তুলিয়াছিল, তখন আর ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার প্রয়োজন হয় নাই। ইহার ফলে ক্রমশঃ এই জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং এমন কি, উহার জ্ঞান পর্য্যন্ত মানুষ বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং গ্রামে গ্রামে ঐ সামাজিক সংগঠনে বিকৃতি আসিয়া প্রবেশলাভ করিয়াছে। ইহার ফলে মানুষ আবার অগণিত দুঃখে হাবুডুবু খাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং দিশাহারা হইয়া গত দুই সহস্র বৎসর হইতে আবার ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও ঐ প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। যদি আবার কখনও ঐ প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান যথাযথভাবে আধুনিক মনুষ্য-সমাজ বিদিত হইতে পারে, তখন তুলনার দ্বারা দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে philosophyর নামে যাহা চলিতেছে, তাহা পাগলের প্রলাপ মাত্র এবং science-এর নামে যাহা চলিতেছে, তাহা বাজীকরের ইন্দ্রজাল মাত্র। উহার কোনটীর মধ্যেই প্রকৃত জ্ঞান অথবা দর্শন অথবা philosophy এবং প্রকৃত বিজ্ঞান অথবা science বিদ্যমান নাই। উহার প্রায় প্রত্যেকটী অজ্ঞানতা-প্রসূত এবং মানুষের সর্ব্বনাশকর। পাশ্চাত্য science ও philosophyর যে দশা, ভারতীয় সংহিতা ও দর্শনের সেই একই দশা। ভাষ্যকার-গণের মধ্যে অনেকে সাধারণের শ্রদ্ধা-কর্ষণ, করিতে সক্ষম হইয়াছেন বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা প্রকৃতভাবে জানিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ভাষ্যকারগণ মূল ঋষিপ্রণীত কোন গ্রন্থের মূল বক্তব্যের মর্ম্ম প্রকৃতভাবে উদ্‌ঘাটিত করিতে কুত্রাপি সক্ষম হন নাই, পরন্তু বহুস্থলে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সংস্কৃতভাষার বিজ্ঞান বিদিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরবী ভাষা যথাযথ বুঝিবার চাবিকাঠিও বেদাঙ্গের মধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং এক্ষণে বাইবেল ও কোরাণ যে অর্থে অনূদিত হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাও প্রায়শঃ ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ।

ঋষি-প্রণীত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ আর দুঃখ দূর করিবার প্রকৃত পন্থা খুঁজিয়া পাইতেছে না এবং মনুষ্য-সমাজের প্রায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুঃখের স্রোত অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ইহারই জন্য আমরা ভারতীয় তথাকথিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের স্কন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা

অধিকতম দায়িত্ব আরোপ করিয়া থাকি। কারণ, এই ঋষির সন্তান তথাকথিত ব্রাহ্মণগণ ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞান রক্ষা করিবার জন্য দায়ী এবং ইহাঁরা বিপরীত-পথগামী না হইলে আজ মনুষ্য-সমাজকে এত অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইত না।

তর্করত্ন শ্রেণীর এই পণ্ডিতগণকে মনে রাখিতে হইবে যে—

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি, যথা ইন্দ্রশত্রুঃ স্বরতো অপরাধাৎ॥
অনক্ষরমনায়ুষ্যং নিস্বরং ব্যাধিপীড়িতম্।
অক্ষতা শস্ত্ররূপেণ বজ্রং পততি মস্তকে॥
হস্তহীনং তু যোঽধীতে স্বরবর্ণবিবর্জ্জিতম্।
ঋগ্‌যজুঃসামভির্দগ্ধো বিযোনিমধিগচ্ছতি॥
হস্তেন বেদং যোঽধীতে স্বরবর্ণার্থসংযুতম্।
ঋগ্ যজুঃ-সামভিঃ পূতো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

তর্করত্ন শ্রেণীর পণ্ডিতগণ ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র বিষয়ে এবং সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে 'আকাট মূর্খ' হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই, চাকুরীজীবী মিত্র, দত্ত, ঘোষ, জ্যাক ও জন প্রভৃতি শূদ্রগণ সংস্কৃত ভাষা আলোচনা করিতে সাহসী হইতেছেন এবং যাহার মনে যাহা আসিতেছে, তাহাই বলিয়া যাইতেছেন। বর্ণ-স্ফোটের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষায় যথোপযুক্ত ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বর্ণ স্ফোটে প্রবিষ্ট হওয়া একমাত্র সংযতেন্দ্রিয় প্রকৃত ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্ভব। শূদ্রের পক্ষে ত' দূরের কথা, উহা কখনও কোন চাকুরী-জীবী, অথবা ভৃতক অধ্যাপক অথবা বৃত্ত্যুপজীবী অথবা বিদ্যা-ব্যবসায়োপজীবী কোন তথাকথিত ব্রাহ্মণের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নহে।

ইহারই জন্য আমরা বলিতেছিলাম যে, তর্করত্ন শ্রেণীর তথাকথিত পণ্ডিতগণের পক্ষে কখনও সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃত ভাবে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব নহে এবং উহাঁরা সংস্কৃত প্রকৃত ভাবে জানেন না।

তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার গীতা-বিচার নামক প্রবন্ধে যে সমস্ত শ্লোক ও সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীর অনুবাদ বিশ্লেষণ করিলে তিনি যে সংস্কৃত ভাষা প্রকৃতপক্ষে জানেন না এবং তাঁহার প্রত্যেকটী অনুবাদ যে অজ্ঞতা-প্রসূত, তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। আমরা কয়েকটী মাত্র দেখাইলাম। প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে আরও দেখাইব।

এক্ষণে, মোক্ষ লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে তর্করত্ন মহাশয় কি বলিয়াছেন, আমরা তাহার আলোচনা করিব।

আমরা আগেই দেখাইয়াছি যে, 'মোক্ষ' যে কি বস্তু, তাহাই সঠিক ভাবে তর্করত্ন মহাশয় বিদিত নহেন। 'মোক্ষ' যে কি বস্তু, তাহাই যখন তিনি সঠিক ভাবে অবগত নহেন, তখন মোক্ষ লাভ করিতে হইলে যে কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সঠিক কথা তাঁহার নিকট যুক্তিযুক্ত ভাবে আশা করা চলে না। বাস্তবিক পক্ষে হইয়াছেও তাহাই। তিনি 'মোক্ষ লাভ' করিবার উপায় সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। অথচ তাঁহার কোন কথাই কার্যে পরিণত করিবার উপযোগী হয় নাই এবং অধিকাংশ কথাই পরস্পর-বিরোধী (self-contradictory) এবং অস্পষ্ট হইয়াছে।

১৩৪৬ সালের আষাঢ় মাসের বসুমতীর ৩৬৩ পৃষ্ঠায় তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—

"মোক্ষ নিষ্কাম ভাবে পরমেশ্বরারাধনা ও শ্রবণাদি সম্পাদিত জ্ঞান-যজ্ঞের ফল। ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও মোক্ষের উৎপত্তি নাই, প্রকাশ মাত্র। পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে সেই মোক্ষ সকল মানবেরই হইতে পারে।"

তর্করত্ন মহাশয়ের উপরোক্ত কথা কয়েকটীর মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা (self-contradiction) ও অস্পষ্টতা বিদ্যমান আছে।

শব্দ-স্ফোটের বিধি অনুসারে 'নিষ্কাম', 'ভাব', 'পরমেশ্বর' এবং 'আরাধনা' এই চারিটী শব্দের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলে 'নিষ্কাম ভাবে পরমেশ্বরের আরাধনা' হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রচলিত রীতি অনুসারে উপরোক্ত চারিটী কথার অর্থ যেরূপ ভাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহাতে নিষ্কাম ভাবে পরমেশ্বরের আরাধনা কার্য্যতঃ হইতে পারে না। প্রচলিত অর্থ গ্রহণের রীতি অনুসারে কোন একটী বস্তুকে অথবা তাহার অনুগ্রহকে পাইবার প্রযত্নের নাম তাহার আরাধনা করা। এতদনুসারে 'পরমেশ্বরের আরাধনা' বলিতে বুঝিতে হয় 'পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য অথবা তাঁহার অনুগ্রহ পাইবার জন্য প্রযত্ন করা'। পরমেশ্বরকে অথবা তাঁহার অনুগ্রহকে পাইবার জন্য কোন প্রযত্নে উদ্যত হইলে কামশূন্যতা অথবা নিষ্কামতা থাকিতে পারে না, কারণ প্রচলিত রীতি অনুসারে 'নিষ্কামতা' বলিতে বুঝায় যাহাতে 'কামনার' লেশমাত্র বিদ্যমান থাকে না। পরমেশ্বরকে অথবা তাঁহার অনুগ্রহকে পাইবার প্রযত্নও একপ্রকার "কামনাযুক্ত প্রযত্ন"। তর্করত্ন শ্রেণীর পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, পরমেশ্বরকে অথবা তাঁহার অনুগ্রহকে পাইবার জন্য যে কামনা তাহা নিষ্কামতারই অন্তর্গত। আমাদিগের মতে এতাদৃশ মতবাদ পোষণ করিলে 'নিষ্কামতা' শব্দটীকে অর্থহীন করা হয় এবং 'কামের' একটী ভিত্তিহীন অভিনব 'সংজ্ঞা' দেওয়া হয়। কাযেই বলিতে হইবে যে, প্রচলিত অর্থগ্রহণের রীতি অনুসারে নিষ্কাম ভাবে পরমেশ্বরের আরাধনা করা আর স্বর্ণের দ্বারা পাথরের বাটী রচনা করা একই কথা।

মোক্ষ পাইবার পন্থা সম্বন্ধে তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—

"পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে সেই মোক্ষ সকল মানবেরই হইতে পারে।"

'পরমেশ্বর', 'আত্মা', 'স্বর্গ' ও 'মোক্ষ' সম্বন্ধে ঋষিগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঋষিগণের কথানুসারে 'পরমেশ্বর' ঘটি-বাটীর মত কোন বস্তু নহে। একটী সর্ব্বপরিব্যাপ্ত অব্যক্ত তেজ-বীজের নাম পরমেশ্বর। এই তেজ-বীজ চরাচর সমস্ত জীবের মধ্যে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। এই তেজ-বীজ সমস্ত জীবের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়াই জীবের জীবত্ব, চরের চরত্ব এবং অচরের অচরত্ব। এই তেজ-বীজের উন্মেষ ও বিকাশ সর্ব্বদাই শৃঙ্খলিত ও সর্ব্বপরিব্যাপ্ত একটী নিয়মের অধীন। যে শৃঙ্খলিত ও সর্ব্বপরিব্যাপ্ত নিয়মে উপরোক্ত 'তেজ-বীজের' উন্মেষ ও বিকাশ চরাচর সমস্ত জীবের মধ্যে সাধিত হইতেছে, সেই শৃঙ্খলিত ও সর্ব্বপরিব্যাপ্ত নিয়মকে প্রত্যক্ষ করাকে ঋষিগণ "পরমেশ্বর লাভ করা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথানুসারে 'পরমেশ্বরকে' লাভ করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে স্বকীয় 'আত্মা'কেও প্রত্যক্ষ করিতে হয়, এবং স্বকীয় 'আত্মা'কে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে 'স্বর্গ' লাভ করিতে হয়, এবং 'স্বর্গ' লাভ করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে 'মোক্ষ' লাভ করিতে হয়। ঋষিগণের উপরোক্ত

কথানুসারে বুঝিতে হয় যে, পরমেশ্বর লাভ করিবার অথবা পরমেশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিবার প্রথম সোপান 'মোক্ষ-লাভ' করা। এতদনুসারে বলিতে হয় যে, "মোক্ষ-লাভ" করিতে পারিলে, পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করা সকল মানবেরই সম্ভবযোগ্য হইতে পারে"। কিন্তু তাহা না বলিয়া তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন "পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে সেই মোক্ষ সকল মানবেরই হইতে পারে।" ইংরাজীতে যাহাকে বলে Putting the cart before the horse অর্থাৎ ঘোড়াটীকে গাড়ীর সম্মুখে না জুড়িয়া গাড়ী-খানিকে ঘোড়ার সম্মুখে জুড়িয়া দেওয়া"—ইহা তাহারই অনুরূপ।

"পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে, সেই মোক্ষ সকল মানবেরই হইতে পারে," এতাদৃশ কথা পণ্ডিত-প্রবর তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন বটে, কিন্তু মোক্ষ-লাভ না করিয়া পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করা যে কিরূপ ভাবে সম্ভব হইতে পারে, তাহার কোন কথাই পণ্ডিত-প্রবর বলেন নাই এবং আমরা যতদূর জানি, তাহাতে পণ্ডিত-প্রবর নিজে যে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিতে সক্ষমতা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ তাঁহার নিজ জীবনের কোন কার্য্য হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি দেখা যাইত যে, তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার নিজ জীবনে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা হইলে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিবার উপায় সম্বন্ধে তিনি কোন পত্রিকায় কিছু না লিখিলেও মানুষ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কার্য্য অনুকরণ করিয়া ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিত, এবং মানুষের পক্ষে মোক্ষ লাভ করা সম্ভব হইত। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার নিজ জীবনে যেরূপ ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিবার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না, সেইরূপ মোক্ষ লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধেও কোন কার্য্যোপযোগী (practical) পন্থা তিনি এই প্রসঙ্গে লেখেন নাই, তখন বুঝিতে হয় যে, তর্করত্ন মহাশয় এই সম্বন্ধীয় কোন বাস্তব কথা পরিজ্ঞাত নহেন এবং তাঁহার এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ মাত্র নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করবার উদ্দেশ্যমূলক।

পরমেশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিলে মোক্ষ যে সকল মানুষেরই হইতেপারে—এতাদৃশ মতবাদ যে গীতাকারও পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য তর্করত্ন মহাশয় গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

এই শ্লোকটীর প্রচলিত অর্থ—

"সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া এক আমাকে শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।"

তর্করত্ন মহাশয় উপরোক্ত শ্লোকের ব্যাখায় যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার ব্যাখ্যারও মূল ভিত্তি ঐ প্রচলিত অর্থ। পার্থক্য এই যে, তিনি ঐ প্রচলিত অর্থকে বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—'এই কথাটী বুঝাইতে বসিয়া তিনি বলিয়াছেন, ইহার অর্থ, "কাম্য-কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ-কর্ম্ম" ত্যাগ করিয়া "(মাসিক বসুমতী" ১৩৪৬ সনের শ্রাবণ সংখ্যা। ৫৩১ পৃঃ)। তর্করত্ন মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতে হয় যে, তাঁহার মতে "সর্ব্বধর্ম্মান্" এই পদের অর্থ 'কাম্য-কর্ম্ম' ও 'নিষিদ্ধ কর্ম্ম' এবং 'পরিত্যজ্য' শব্দের অর্থ 'ত্যাগ করিয়া'।

ব্যাকরণ ও নিরুক্তের অথবা অষ্টাদশ বিদ্যার কোন্ বিদ্যার কোন্ সূত্র অথবা কোন্ কারিকানুসারে 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ যে 'কর্ম্ম' হইতে পারে, তাহা আমরা বিদিত নহি। "কল্প"নামক বেদাঙ্গের শিবতত্ত্ব প্রভৃতি ষট্-ত্রিংশৎ তত্ত্ব অবগত হইয়া দর্শন ও মীমাংসার 'ধর্ম্ম' ও "কর্ম্মে"র স্বরূপ কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে "ধর্ম্মে"র সহায়তায় মানুষ মাত্র স্বকীয় কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত হইতে পারে, আর কর্ম্মের সহায়তায় মানুষের পক্ষে বিশ্বদুনিয়ার কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়। "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মে"র স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে "ধর্ম্মে"র দুইটা রূপ আছে। একটীর নাম "ধরম্", আর একটীর নাম "ধর্ম্ম"। সেইরূপ আবার "কর্ম্মে"রও দুইটী রূপ আছে। একটীর নাম 'করম্' এবং অপরটীর নাম "কর্ম্ম"। পঞ্চতন্মাত্র (অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) এবং পঞ্চভূত (অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্বী) এই দশটী বহির্বিষয় লইয়া উপভোগের জন্য জীব যে সমস্ত প্রেরণা, লক্ষণ ও অর্থমূলক কার্য্য করে, সেই সমস্ত কার্য্যে জীবের ধরম্ বিকশিত হয়। এই সমস্ত কার্য্য প্রায়শঃ বহির্ম্মুখী হইয়া থাকে। এই সমস্ত কার্য্যের ফলে জীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (বর্দ্ধতে), বিপরিণাম-প্রাপ্ত (বিপরিণমতে), অপ-ক্ষয় প্রাপ্ত (অপক্ষীয়তে) এবং বিনাশ-প্রাপ্ত (বিনশ্যতি) হইয়া থাকে।

কোন উপভোগকে লক্ষ্য না করিয়া স্বভাববশে জীব যে সমস্ত কার্য্য করে, সেই সমস্ত কার্য্যে জীবের করম্ বিকশিত হয়।

জীবের করম্ বিকশিত হয় বাল্য-কালে এবং ধরম্ বিকশিত হয় যৌবনের সূচনায়।

জীবের ধরম্ বিকশিত হইলেই তাহার ক্ষয় এবং নানারূপ দুঃখ-ক্লেশের আরম্ভ হয়। তখন জীব জর্জ্জরিত হইয়া তাহার দুঃখ-ক্লেশের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া থাকে। দুঃখ-ক্লেশের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলেই, জীব অন্তর্ম্মুখী হয় এবং তখন তাহার বিভিন্ন ভাবের সহিত তাহার শরীরস্থ আকাশাদি পঞ্চভূতের কি সম্বন্ধ তাহা অনুভব করিবার কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। জীবের ভাবের সহিত তাহার ভূতের অনুভূতি-মূলক ভাবাত্মক কার্য্যে তাহার "ধর্ম্ম" বিকশিত হয়। "ধর্ম্ম" বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই জীবের বিবিধ দুঃখের প্রধান কারণ নষ্ট হইয়া যায় এবং তখন সে তাহার বৃদ্ধির ও অস্তিত্বের কারণ অনুসন্ধানপ্রয়াসী হইয়া নানারূপ কার্য্য করিতে থাকে। বৃদ্ধি ও অস্তিত্বের কারণানুসন্ধানমূলক কার্য্যসমূহে জীবের কর্ম্ম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মে"র এই পার্থক্য সাধারণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভবযোগ্য নহে। উহার জন্য সাধনার প্রয়োজন। ঋষিগণের মতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ না হইলে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের পার্থক্য সর্ব্বতোভাবে বুঝা সম্ভব নহে। খুব সম্ভব তর্করত্ন মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের খ্যাতিলাভ করিলেও প্রকৃত পক্ষে সাহেব-পণ্ডিত। তাই তিনি "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মে"র পার্থক্য না বুঝিতে পারিয়া ঐ দুইটী শব্দকে একার্থক করিয়া ফেলিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয় "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মে"র পার্থক্য বুঝতে পারুন আর নাই পারুন, "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্ম" এই দুইটী শব্দের অর্থে যে অনেকখানি পার্থক্য আছে, তাহা খুব সম্ভব সাধারণ পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

"সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" কথাটীর অর্থ যদি 'কাম্য কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা' হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ব্যাসদেবের গীতা অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হয়। "কাম্য-কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ

করিয়া অমুক সাধনায় অগ্রসর হও” এবংবিধ বাক্য ব্যবহার করিয়া যদি কাম্য-কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা না দেওয়া হয় এবং ঐ কাম্য-কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম কোন্ পন্থায় পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় তাহা না দেখান হয়, তাহা হইলে বক্তব্য যে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহা খুব সম্ভব পাঠকগণও বুঝিতে পারিবেন। গীতাধ্যায় তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেও কুত্রাপি “কাম্য-কর্ম্ম” ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের সংজ্ঞা এবং উহা পরিত্যাগ করিবার পন্থা সম্বন্ধীয় কোন কথা পাওয়া যাইবে না। কাযেই, “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য” এই কথাটীর অর্থ যদি “সমস্ত কাম্য-কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া” এবংবিধ ভাবে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, ব্যাসদেবও আজকালকার তর্করত্নশ্রেণীর পণ্ডিতগণের মত কি করিয়া বক্তব্য সম্পূর্ণ করিতে হয়, তাহা জানিতেন না। প্রাচীন কালে মূর্খ দাম্ভিকগণের সম্বন্ধে যেরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহার অনুকরণ করিতে গেলে বলিতে হয় যে, তর্করত্নশ্রেণীর নরাধমগণ ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে বসিয়া ঋষিগণকে পরোক্ষ ভাবে মূর্খ বলিয়া প্রমাণিত করিতেছেন এবং সমাজ তাহার সহায়তা করিতেছে। ঋষিগণ কতখানি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার ছিলেন, তাহা যখন মানুষ আবার বুঝিতে পারিবে, তখন দেখিবে যে, যে সমাজে তর্করত্নশ্রেণীর নরাধমগণ পরোক্ষ ভাবে ঋষিগণের অবমাননা করিয়া ক্ষণিকের জন্যও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সক্ষম হয়, সেই সমাজের অর্থাভাব ও অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দুর্গতি অনিবার্য্য। হইতেছেও তাহাই। সমাজে যাহাতে তর্করত্নশ্রেণীর পণ্ডিতগণের শাস্ত্রালোচনা অধিকতর প্রসার লাভ না করে, তজ্জন্য আমরা এখনও সমাজকে সতর্ক হইতে অনুরোধ করি। মনে রাখিতে হইবে যে, ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের সর্ব্বতোভাবে ব্যবহার ছাড়া সমাজের বিভিন্ন সমস্যার পূরণ করিবার জন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু ঐ ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র যথাযথ অর্থে ব্যবহার করিতে হইবে। তর্করত্ন শ্রেণীর পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত পন্থায় ব্যবহার করিলে চলিবে না, তাহাতে দুঃখ বৃদ্ধি পাইতেই থাকিবে।

আমরা আবার বলি—

মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতো অপরাধাৎ॥
অবক্ষরমনায়ুষ্যং নিস্বরং ব্যাধিপীড়িতম্।
অক্ষতা শাস্ত্ররূপেণ বজ্রং পততি মস্তকে॥

মানুষ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে যে, অতীতে যাঁহারা তর্করত্ন মহাশয়ের মত ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহারা প্রায়শঃ হয় নির্ব্বংশ নতুবা শ্রী-হীন বংশযুক্ত হইয়াছেন। তাই আমরা এখনও ইহাঁদিগকে সতর্ক হইতে অনুরোধ করি। ইহাঁদিগের লজ্জা নাই, তাই ইহাঁরা ভৃতক-অধ্যাপক অথবা বিদ্যাবিক্রয়ী হইয়াও ব্রাহ্মণ্যের স্পর্দ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রানুসারে ইহারা শূদ্রাধম পঞ্চম, ইহা সমাজকে মনে রাখিতে হইবে এবং তদনুযায়ী ব্যবহার ইহাদিগকে দিতে হইবে।

এই পণ্ডিতগণ যদি যথার্থ সমাজের শ্রদ্ধা পাইতে চাহেন, তাহা হইলে ইহাঁদিগকে শাস্ত্র-জ্ঞানের দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিয়া, যাহা নিজেরা শিখিতে পারেন নাই তাহা পরকে শিখাইবার অভিনয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে এবং পুনরায় শব্দ-স্ফোট কি করিয়া অভ্যাস করিতে হয় তাহার অনুসন্ধানে ইহাঁদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কায়মনোবাক্যে ঐ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ভগবানের নিয়মানুসারে উহা

পুনরায় ইহাঁদিগের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হইবে। তখন ইহাঁরাই আবার সমাজের প্রকৃত শ্রদ্ধা পাইবার অধিকারী হইবেন।

লেখকের ধমনীতে ঐ রক্ত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়াই লেখকের প্রাণে এত তীব্র জ্বালা। পণ্ডিত-গণের মধ্যে যাঁহারা মনে করেন যে, এই লেখক তাঁহাদিগের কাহারও শত্রু, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহারা এখনও এই কথাগুলি তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন। তাহা হইলে ঐ ভ্রান্তি দূর হইয়া যাইবে।

"পরিত্যজ্য" শব্দের অনুবাদে তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন "ত্যাগ করিয়া"। "ত্যাগ" শব্দে কি প্রত্যয় আছে এবং 'ত্যজ্য" শব্দেই বা কি প্রত্যয় আছে, তাহা জানিতে পারিলে এবং বিভিন্ন প্রত্যয়ের যোগে মূল ধাতুর অর্থে কিরূপ বিভিন্নতা ঘটে তাহা বিদিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "পরিত্যজ্য" শব্দের অনুবাদে কখনও "ত্যাগ" শব্দ ব্যবহার করা চলে না।

"ন নির্বদ্ধা উপসর্গা অর্থাৎ নিরাহুঃ ইতি শাকটায়ন" এবং "পরি ইতি সর্ব্বতোভাবম্"—নিরুক্তের এই দুইটী সূত্রের সহায়তায় "পরি" এই উপসর্গের অর্থ কি এবং ইহা যখন কোন কোন ধাত্বর্থক পদের সহিত যুক্ত হয় তখন ঐ ধাত্বর্থক পদের অর্থ কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা জানিয়া লইয়া স্ফোট-বিধি অনুসারে 'ত্যজ্য'-শব্দের অর্থ কি হইবে, তাহা জানিতে পারিলে দেখা যাইবে যে 'পরি-ত্যজ্য' শব্দের অর্থ, "সর্ব্বতোভাবে অনুভব করিয়া"।

"করম্", "ধরম্", "ধর্ম্ম" এবং "কর্ম্ম" এই চারিটী শব্দের তথ্য যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যৌবন-প্রাপ্ত হইবার পর মানুষ সাধারণতঃ ধরম্ ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। হয় "ধরম্" নতুবা "ধর্ম্ম" তাহার প্রত্যেক কার্য্যে ওত-প্রোত ভাবে জড়িত থাকে। একমাত্র "ধর্ম্ম" বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে মানুষ ধরম্ হইতে মুক্ত হইয়া "কর্ম্মে" প্রবিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তখনও তাহার "ধর্ম্ম" থাকিয়া যায়। ইহা অথর্ব্ববেদের কথা। প্রয়োজন হইলে এই কথার মূল-মন্ত্র আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। কাযেই, যাঁহারা মনে করেন যে, ব্যাসদেব গীতার মোক্ষ-যোগাধ্যায়ে "সর্ব্ব-ধর্ম্ম" পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহারা বাস্তবিক পক্ষে সংস্কৃত ভাষার অর্থ গ্রহণ করিতে অক্ষম।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইত্যাদি শ্লোকে যে "মাং" রহিয়াছে তাহার অর্থও "আমাকে" নহে। যাঁহারা "যুষ্মদস্মৎপ্রক্রিয়া"র সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং "ত্বমহং সিনা" এই সূত্রটীর অর্থ সম্যক্‌ভাবে বিদিত হইতে পারিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ব্যক্তি-বিষয়ক বাক্যে যখন "যুষ্মদ্" ও 'অস্মদ্" শব্দের কোন রূপ ব্যবহৃত হয় তখন উহাকে লৌকিক অর্থে গ্রহণ করা ঋষিদিগের অনুমোদিত বটে. কিন্তু যুষ্মদ্ অথবা অস্মদ্ শব্দের কোন রূপ যখন কোন অব্যক্ত-বিষয়ক বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন আর উহাকে লৌকিকার্থে গ্রহণ করা চলে না। তখন উহাকে উহার বাচকার্থে অর্থাৎ অক্ষরের অর্থে গ্রহণ করিতে হয়।

"মা শুচঃ" এই কথাটীর মধ্যে যে "মা" আছে তাহা সাধারণতঃ "না" অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু নিরুক্তের "মেতি প্রতিষেধে, মা কার্যঃ মা হার্ষীরিতি চ"—এই সূত্রটী সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "মা" শব্দটীর মৌলিক অর্থ "না" নহে। পরন্তু উহার মৌলিক অর্থ সেই স্পর্শ—যে স্পর্শ হইতে রূপ রস ও গন্ধের ভোগলালসা বৃদ্ধি পাইয়া মানুষের ক্ষয় কার্য্য আরম্ভ করে।

"সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শ্লোক যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার মর্ম্মার্থ—

"সর্ব্ব বস্তুর ধর্ম্ম কি (অর্থাৎ যাহা মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্ম প্রভৃতি জড় পদার্থ-ময়, তাহা কিরূপে বুদ্ধিযুক্ত হইতেছে) তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুমান করিয়া লইয়া, 'অ' 'ই' প্রভৃতি শব্দ হইতে বিশেষ বিশেষ স্পর্শ এবং তেজ ও রসের বিশেষ বিশেষ সংযোগ ও বিয়োগ সাধিত হইতেছে কি করিয়া, তাহা অনুভব করিবার অভ্যাসে উদ্যত হইলে 'আমি' ও 'তুমি' এই দুইটী ভাবের স্বরূপ কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় এবং তখন সর্ব্বরূপ অভিমানাত্মক বিকৃতির মূল কারণ যে কি, তাহা বুঝিয়া লইয়া মোক্ষ-পরায়ণ হওয়া (অর্থাৎ কেন যে মানুষ সাধারণতঃ বহির্ম্মুখী হইয়া তিলে তিলে ক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়, তাহা অনুভব করিয়া সর্ব্বতোভাবে অন্তর্ম্মুখী হইবার অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া) সম্ভব হয়। জগতের প্রত্যেক কার্য্যে যে 'স্পর্শ' জীবের রূপ, রস ও গন্ধের ভোগ-লালসার বৃদ্ধি সাধন করিয়া তাহার ক্ষয়-কার্য্য আরম্ভ করে তাহা মনন করিতে হয়।"

গীতার মোক্ষ-যোগ অধ্যায়ের এই শ্লোকটী যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যে-যে উপায়ে মোক্ষ-পরায়ণ হওয়া সম্ভব হয়, তাহার মূল কথাগুলি সংক্ষেপতঃ এই শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা অতীব প্রয়োজনীয় কথায় পরিপূর্ণ। কেবল এই শ্লোকের কথাগুলি স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, যে-যে কার্য্যে বাস্তবতঃ মোক্ষ-পরায়ণ হওয়া সম্ভব-যোগ্য হয়, সেই সেই কার্য্যে অনায়াসে অভ্যস্ত হইতে পারা যায়। তর্করত্ন মহাশয়ের শ্রেণীর পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে পারেন না বলিয়া "মোক্ষ" শব্দের অর্থ যে কি, তাহা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন না, এবং মোক্ষের তাৎপর্য্যও ধারণা করিতে পারেন না। ফলে "মোক্ষ" শব্দটী অধুনা একটী 'কথার কথা' মাত্রে পরিণত হইয়াছে এবং কাহারও পক্ষে কার্য্যতঃ মোক্ষ লাভ করা সম্ভব হইতেছে না।

তর্করত্ন শ্রেণীর পণ্ডিতগণ যে ঋষি-প্রণীত কোন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী নহেন, তাহা প্রমাণিত হইল।

পরবর্ত্তী সংখ্যায় 'মোক্ষ', 'মোক্ষ-যোগ' ও 'মোক্ষ-ধর্ম্ম' এই তিনটী কথার প্রকৃত অর্থ অথবা সংজ্ঞা কি এবং মোক্ষ-পরায়ণ হইবার পন্থা সম্বন্ধে ঋষিগণ কি কি নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব।

গীতা-বিচারের আলোচনা

[চব্বিশ-পরগণা জিলার শ্যামনগর পোষ্টাফিসের অন্তর্গত কাউগাছি হইতে শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার মল্লিক, নামক একটী ভদ্রলোক একখানি পত্র আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। ঐ পত্র এবং উহার উত্তরে শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।]

মাননীয়,

"বঙ্গশ্রী" মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সমীপে—

মহাশয়,

নিম্নলিখিত পত্রখানা আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকাতে স্থান দান করিলে অনুগৃহীত হইব। যদি উহা আপনার পত্রিকাতে

স্থান না পায়, তাহা হইলে সঙ্গে ডাকটিকিট দেওয়া রহিল, ফেরৎ দিয়া বাধিত করিবেন :—

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের 'মাসিক বঙ্গশ্রী'তে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় লিখিত 'গীতা-বিচারের' সমালোচনা করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়াছেন। তিনি ১৩৪৬ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'বসুমতী'র গীতা-বিচার ভাগ করিয়া পাঠ করিয়াছেন কি? ১৩৪৬ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'বসুমতী'র ৩৫৭ পৃষ্ঠা, প্রথম কলম, তৃতীয় পংক্তি হইতে অষ্টম পংক্তি পর্য্যন্ত লেখা আছে— "অনেকেই বলিবেন, ইহা তো জানা কথা, স্বর্গ, দেবলোক-ভোগ,……ঐ সব স্থানের নাম স্বর্গ।" "অনেকেই বলিবেন" বলিতে কি করিয়া তর্করত্ন মহাশয়কে বুঝাইল? তর্করত্ন মহাশয় 'স্বর্গ' স্থানের নাম বলিয়া কোথাও অভিহিত করেন নাই।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'গীতা-বিচারের' সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই ব্যাসবাক্য অবহেলা করিবার ফলে…নিজ পরিবারের নির্ব্বংশতা ও শ্রীহীনতা সাধন করিয়াছেন।" (১৩৪৬ সালের পৌষ সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী'র ৬৯৯ পৃষ্ঠা)। এখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি,—'মহাভারত'-রচয়িতা ব্যাসদেবের বংশ আছে কি না? যদি না থাকে, তবে কেন নাই? তিনি তো কোন বেদের কদর্থ করেন নাই। এবং ইহাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি,—কি করিয়া পণ্ডিতগণ বেদের কদর্থ করিলেন? যদি একটা বাক্যের দুইটী মানে হয়, তবে কোন্‌টা ভুল আর কোন্‌টা নির্ভুল, কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? ভট্টাচার্য্য মহাশয় গীতা-বিচারের সমালোচনা করিতে গিয়া পাঠকদের কাছে নিজেকে সবজান্তা বলে জাহির করেছেন; কিন্তু যে সব পাঠকগণ ধৈর্য্য ধরিয়া ১৩৪৬ সালের 'বসুমতী'র আষাঢ়, শ্রাবণ সংখ্যাদ্বয়ের গীতা-বিচার পড়িয়াছেন এবং ১৩৪৬ সালের 'বঙ্গশ্রী' অগ্রহায়ণ, পৌষ সংখ্যাদ্বয়ের ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত 'গীতা-বিচারের' সমালোচনা পড়িয়াছেন তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রত্যেক ছত্রে পাগলের প্রলাপ বকিয়াছেন। ইতি—

শ্রীসুবোধকুমার মল্লিক

উত্তর

শ্রীযুক্ত সুবোধ কুমার মল্লিক মহাশয়ের পত্রে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিনটী অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে :—

(১) তর্করত্ন মহাশয় 'স্বর্গ'কে স্থানের নাম বলিয়া কোথায়ও অভিহিত করেন নাই। আমি অযথা তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়াছি।

(২) শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা করিলে যে বংশহীন অথবা শ্রীহীন বংশযুক্ত হইতে হয় আমার এই কথা ধোপে টিকে না, কারণ ব্যাসদেবের যে বংশ আছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৩) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের 'গীতা-বিচারের' সমালোচনায় আমি যাহা যাহা বলিয়াছি তাহা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে উহার প্রত্যেক ছত্রে পাগলের প্রলাপ দেখা যাইবে।

প্রথম অভিযোগের উত্তরে আমরা—১৩৪৬ সালের আষাঢ় সংখ্যার বসুমতীর ৩৫৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত ছত্রগুলি উদ্ধৃত করিতে চাই :—

"অনেকেই বলিবেন, ইহা তো জানা কথা, স্বর্গ—দেবলোক-ভোগ,—পৃথিবীতে যেমন মনুষ্য বাস করে, ঐ যে উপরের গ্রহগুলি নক্ষত্রাকারে প্রতি নির্ম্মল রাত্রিতেই আমরা প্রত্যক্ষ করি—পৃথিবীর ন্যায় ঐগুলিও জীবের বাসস্থান—ঐ স্থানের অধিবাসী জীবগণ দেবতা নামে খ্যাত আর ঐ সব অবস্থা দেবলোক,—মনুষ্য কর্ম্ম করিয়া মরণান্তে ঐ সব স্থানে গমন করে, এবং পৃথিবীদুর্লভ সুখ তথায় ভোগ করে—ঐ সব স্থানের নাম স্বর্গ। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন আছে;—পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গচ্যুত হইতে হয়। গ্রহগণের কথা বুঝাইবার জন্য বলিলাম, গ্রহ ব্যতীত স্থানও আছে, যাহা দেবলোকের মধ্যে গণ্য।

"মোক্ষ সেরূপ নহে,—মোক্ষ লাভ হইলে, আর বিচ্যুত হইতে হয় না। অতএব এ বিষয়ে বিচার নিষ্প্রয়োজন।"

উপরোক্ত ছত্রগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথম দাঁড়ি পর্য্যন্ত যে কথাগুলি রহিয়াছে,

তাহা মূলতঃ তর্করত্ন মহাশয়ের নহে বটে, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী কথাগুলি তর্করত্ন মহাশয়ের এবং ঐ কথাগুলিতে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির সমর্থন করা হইয়াছে। নতুবা "গ্রহগণের কথা বুঝাইবার জন্ম বলিলাম" এতাদৃশ বাক্য ব্যবহৃত হইত না। আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, মল্লিক মহাশয় বাংলা ভাষার অর্থ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবার পদ্ধতি অবগত নহেন?

দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, "শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা করিলে বংশহীন অথবা শ্রীহীন বংশযুক্ত হইতে হয়" এবম্বিধ কথা মানিয়া লইলে "শাস্ত্রের সু-ব্যাখ্যা করিলেই বংশ রক্ষিত হইবে" ইহা মনে করে চলে না; কারণ, শাস্ত্রের সু-ব্যাখ্যা করিলেও অন্যান্ত দুষ্টতার জন্ম নির্ব্বংশ হওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে। এই যুক্তিটুকু ধরিয়া লইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ব্যাসদেবের বংশ নাই ইহা প্রমাণিত হইলেই শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা করিলেও বংশ থাকিতে পারে ইহা প্রমাণিত হয় না। কাযেই, আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, মল্লিক মহাশয় যুক্তি-প্রদর্শন বিষয়ে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে ব্যাসদেবের বংশ এখনও লুপ্ত হয় নাই। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, পারাশরি গোত্রীয় মানুষ এখনও ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে এবং ইহারাই ব্যাসদেবের বংশসম্ভূত, কারণ 'পারাশরি' বলিতে পরাশরের পুত্র 'ব্যাসদেবকেই' বুঝিতে হয়।

তৃতীয় অভিযোগের উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে, আমার কথাগুলি যে প্রলাপে পরিপূর্ণ, তাহা ঐ কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাহার কোনরূপ অসামঞ্জস্য না দেখাইয়া দিলে প্রমাণিত হয় না। মল্লিক মহাশয় তাহা করেন নাই। পরন্তু কেবল মন্তব্য মাত্র করিয়াছেন। ইহা সুবুদ্ধির পরিচায়ক কি না, তাহার বিচার পাঠকগণ করুন। আমাকে পাগল বলিয়া যদি কাহারও তৃপ্তি হয়, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। অভিধানে দুষ্টতাবাচক যতগুলি শব্দ আছে, আমার সম্বন্ধে তাহার প্রত্যেকটী ব্যবহৃত হইলে যদি সমাজের কাহারও কোন উপকার হয়, তাহা হইলে আমি তাহা মাথায় তুলিয়া লইবার জন্ম প্রস্তুত হইব। কিন্তু তাহাতে কাহারও কোন উপকার হইবে কি? চতুর্দ্দিকে হাহাকারের তুলনায় মরণকে যে বিশ্রাম বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তিযুক্ত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রাণ ভরিয়া উহার সহিত মিলিত হইতে যে ভয় পায়, সমাজের একান্ত ছাড়িয়া উহার মধ্যে আসিতে যে সাহসী হয় না, সে তো সমস্ত গালাগালিরই উপযুক্ত। তাহাকে আর নূতন করিয়া অযথা গালি দিয়া কোন্ ফলোদয় হইবে?

মল্লিক মহাশয় উপরোক্ত তিনটি অভিযোগ ছাড়া আর একটী প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন। সেই প্রশ্নটী এই—

"যদি একটি বাক্যের দুইটী মানে হয়, তবে কোন্‌টা ভুল আর কোন্‌টা নির্ভুল তাহা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, বেদাঙ্গের সহায়তায় সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সংস্কৃত ভাষায় ঋষিগণের দ্বারা যে-সমস্ত বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার কোনটীর একাধিক অর্থ হইতে পারে না। পূর্ব্বমীমাংসায় যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে আমাদিগের কথার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। যে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, কোন ঋষি-বাক্যের একাধিক অর্থ হইতে পারে, সেই পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই, ইহা বুঝিতে হয়। বাক্যের অর্থ সঠিক হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে মূলতঃ বাক্য-পদার্থের নিম্নলিখিত শ্লোক কয়েকটী স্মরণ রাখিতে হয়:—

> অপোদ্ধারপদার্থা যে যে চার্থাঃ স্থিতলক্ষণাঃ।
> অন্বাখ্যেয়াশ্চ যে শব্দা যে চাপি প্রতিপাদকাঃ॥
> কার্য্যকারণভাবেন যোগ্যভাবেন চ স্থিতাঃ।
> ধর্ম্মে যে প্রত্যয়ে চাঙ্গং সম্বন্ধাঃ সাধ্বসাধুষু॥
> তে লিঙ্গৈশ্চ স্বশব্দৈশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্ পরিগ্রহাঃ।
> স্মৃত্যর্থমনুগম্যন্তে কেচিদেব যথাগমম্॥

ইহা ছাড়া আরও মনে রাখিতে হয়—

> ন চাগমাদৃতে ধর্ম্মস্তর্কেণ ব্যবতিষ্ঠতে।
> ঋষীণামপি যজ্‌জ্ঞানং তদপি আগমহেতুকম্॥

আমাদিগের মনে হয়, মল্লিক মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট নহেন এবং তাঁহার পক্ষে উপরোক্ত শ্লোকগুলির বিষয় বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। প্রয়োজন হইলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে আমরা ঐ শ্লোকগুলি বুঝিবার যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি।

হিন্দুমহাসভার আন্দোলন এবং তাহা হইতে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের শিক্ষণীয় বিষয় (২)

পাঠকবৃন্দের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই সন্দর্ভের প্রথমাংশ গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ইহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। যথা :

(১) ধর্ম্মের দিক্ দিয়াই হউক অথবা রাষ্ট্রীয় ভাবেই হউক্, মিঃ সবরকরের মতবাদসমূহ দ্বারা মনুষ্যজাতির কাহারও কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা বর্ত্তমান কি না, তাহার সন্ধান ;

(২) ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় এই শ্রেণীর কোন আন্দোলনের কোন প্রকার প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান কি না, তাহার সন্ধান।

পূর্ব্বসংখ্যায় দেখানো হইয়াছে যে, মিঃ সবরকরের মতবাদসমূহ মনুষ্যজাতির কাহারও কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করা দূরে থাক্, ধর্ম্মের দিক্ হইতে মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের পক্ষে ইহা সমূহ অনিষ্টজনক হইতে বাধ্য।

গত সংখ্যার উপসংহারে আমরা জানাইয়াছিলাম যে, অতঃপর আমরা বিচার করিব, দেশে অথবা বিদেশে মনুষ্যসমাজের কাহারও পক্ষে মিঃ সবরকরের মতবাদসমূহ রাষ্ট্রীয় ভাবে হিতকারী হইতে পারে কি না।

মনুষ্যসমাজের কাহারও পক্ষে মিঃ সবরকরের মতবাদসমূহ রাষ্ট্রীয় ভাবে হিতকারী হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে, বলাই বাহুল্য যে, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম "রাষ্ট্রনীতি" এবং "রাষ্ট্রীয় কল্যাণ" বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তাহার সুনির্দ্দিষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া দেশস্থ জনসাধারণের এবং মনুষ্যসমাজভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির "রাষ্ট্রীয় কল্যাণ" কি ভাবে বিহিত হইতে পারে, তাহার সম্যক্ ধারণা গঠন করিতে হইবে। এই তিনটি ধারণায় সিদ্ধ হইতে পারিলে, মিঃ সবরকরের মতবাদসমূহ আমাদের রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন প্রকার সহায়তা করিতে পারিবে কি না, তাহার নির্দ্ধারণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

"রাষ্ট্রনীতি" এবং "রাষ্ট্রীয় হিত"-এর সংজ্ঞা

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রনীতিবিদ্ "রাষ্ট্রনীতি" কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা দান করিয়াছেন, কিন্তু তাহানিহিত শব্দবিজ্ঞান অনুযায়ী ইহার যে অর্থ দাঁড়ায়, উহাদের কোনটিকেও তাহার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিশিষ্ট বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। এই সকল পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞার তুলনায় উড্রো উইলসন, ম্যাক্স ও'রেল, গায়টে এবং থিয়োডোর পার্কার নির্দ্দিষ্ট ধারণাকে উৎকর্ষমূলক বলা যাইতে পারে, কেন না, "পলিটিক্স (Politics)", এই বচনের অন্তর্নিহিত শব্দাবলী হইতে যে অর্থ স্বতঃই উদ্ভাসিত হয়, তাহাদের সংজ্ঞা তাহার সহিত সম্পূর্ণ এক না হইলেও অনেক পরিমাণে সাদৃশ্যবিশিষ্ট।

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে উড্রো উইলসন নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"রাষ্ট্রনীতি বলিতে আমি বুঝি সমষ্টির স্বকীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট কল্যাণজনকতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের উদ্দেশ্যপথে সমাজকে সুশৃঙ্খলায় উন্নত করিবার বিজ্ঞান (Politics I conceive to be nothing more than the Science of the ordered progress of society along the lines of greatest usefulness and convenience to itself.")

ম্যাক্স ও'রেলের ধারণা নিম্নলিখিতরূপ :—

"রসায়নবিদ্ হইবার নিমিত্ত রসায়নশাস্ত্র অনুসরণ করিতে হয়, ব্যবহারবিদ্ অথবা চিকিৎসাবিদ্ হইবার নিমিত্ত ব্যবহার অথবা চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসরণ করিতে হয় ; কিন্তু রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হইবার নিমিত্ত স্বকীয় স্বার্থ মাত্র অনুসরণের প্রয়োজন (To be a chemist you must study chemistry, to be a lawyer or a physician you must study law or medicine ; but to be a politician you need not only to study your own interests)"

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে গায়টের মতবাদ নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে : —

"সকল কাঁচা কাজকেই আমি পাপের ন্যায় ঘৃণা করি, বিশেষতঃ রাজনীতিসংক্রান্ত কাঁচা কাজকে—ইহা সহস্র সহস্র এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুর্দ্দশা এবং সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে (I hate all bunglings as I do sin, but particularly bungling in politics, which leads to misery and ruin of many thousands and millions of people."

থিয়োডোর পার্কারের অভিমত হইতেছে, "রাষ্ট্রনীতি অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় বিষয়ক বিজ্ঞান (Politics is the Science of exigencies)"

এই চারিটি ধারণার প্রত্যেকটিকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যায় যে, ইহাদের প্রত্যেকটির মতে, "সমাজ, দেশ অথবা মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের স্বার্থের পক্ষে যাহা হিতকর, তাহাই রাষ্ট্রনীতি, অথবা এই মনুষ্যসমাজভুক্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে যাহা কোন প্রকার অহিতসাধক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রনীতি বলিয়া গণ্য করা চলে না, তাহাকে বরং রাষ্ট্রনীতি-বিরোধী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।"

এই চারিটি বচন সম্বন্ধে আরও গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রনীতি বলিতে সাধারণভাবে কি ধারণা করিতে হইবে, ইহাদের দ্বারা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্টভাবে কি কি বিষয়কে রাষ্ট্রনীতি আখ্যাত করিতে হইবে, ইহাদের দ্বারা তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। সুতরাং, রাষ্ট্রনীতি বলিতে নির্দ্দিষ্ট ভাবে কি বুঝিতে হইবে, তাহার সন্ধানপ্রয়াসী হইলে অন্যত্র সন্ধানের প্রয়োজন।

অভিধানে রাষ্ট্রনীতিকে "যে-বিজ্ঞান রাষ্ট্রের অথবা রাষ্ট্রের অংশবিশেষের রূপের সংগঠন ও পরিচালনা এবং অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত ইহার সম্বন্ধ নিরূপণ করে," বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

এই আভিধানিক অর্থ হইতেও "বিজ্ঞান" বলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে কি ধারণা করিতে হইবে তাহা না বুঝিতে পারিলে, "রাষ্ট্রনীতি" সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা লাভ করা যায় না। এমন কি "বিজ্ঞান" শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেও দেখা যায় যে, কোন কোন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গঠিত হইলেও "রাষ্ট্রনীতিকে" একটি "বিজ্ঞান" মাত্র বলিলে ঠিক কথা বলা হয় না, কেন না বিজ্ঞান কেবল ব্যক্ত-বিষয়সংক্রান্ত বিদ্যা মাত্র, কিন্তু রাষ্ট্রনীতি ব্যক্ত এবং অব্যক্ত, সমাজদেহের উভয় বিষয় সংক্রান্তই হইতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান এবং দর্শন, উভয়ই, এবং ইহা একটি বিজ্ঞান মাত্র, তাহা বলা যথাযথ হয় না।

রাষ্ট্রনীতি বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তদ্বিষয়ক নির্দ্দিষ্ট এবং সম্পূর্ণ ধারণা গঠনের একমাত্র উপায় হইতেছে, এই কথার ব্যুৎপত্তি অবগত হওয়া এবং ভাষানিহিত শব্দবিজ্ঞানের সহায়তায় ঐ ব্যুৎপত্তির অর্থ উপলব্ধি।

পলিটিক্স (politics, রাষ্ট্রনীতি) কথার ল্যাটিন্ মূল হইতেছে পলিটিকাস (politicus) এবং বচন-নিহিত শব্দের অর্থ উপলব্ধির প্রণালী অনুসারে ইহার দ্বারা কতিপয় মানসিক ক্রিয়া এবং বাস্তব সংগঠন বুঝায়, যাহাতে সমাজভুক্ত প্রত্যেকে জীবিকাবিষয়ে পরস্পর-নিরপেক্ষ থাকিয়া আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে এবং যাহা তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্ব্বক উহা কি ভাবে বুদ্ধির বিকাশ সাধন করিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিবার এবং কার্য্য করিবার সহায়ক হয়।

রাষ্ট্রনীতির উপরিলিখিত সংজ্ঞার সম্যক্ ধারণা লাভ করিতে পারিলে দেখা যায় যে, কোন জনপদকে রাষ্ট্র আখ্যার যোগ্য বিবেচিত হইতে হইলে, যাহাতে তাহার অধিবাসিগণের প্রত্যেকে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ উপভোগ করিতে পারে, তদ্রূপ সংগঠনের ব্যবস্থা করিতে হয়:—

(১) দৈনিক আট আনা হারে মজুরী হউক, কিংবা হাজার হাজার টাকার লাট-বড়লাটগিরিই হউক, কোন-প্রকার বেতন-ভোগী চাকুরী অথবা নফরগিরির সাহায্য ব্যতিরেকে স্বাধীন জীবিকার্জ্জন ব্যবস্থা। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের সকল কর্ম্মচারীর স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জনের সামর্থ্য থাকা আবশ্যক; রাষ্ট্রের সেবা তাহার অতিরিক্ত কার্য্য হইবে, সুতরাং রাষ্ট্রের সকল চাকুরী বিনাবেতনের হইবে।

(২) সমাজের কাহারও যাহাতে জীবনযাপনার্থ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে কোন বেগ না পাইতে

হয় এবং যোগ্যতার অনুপাতে উপার্জনের তারতম্য যাহাতে অসন্তুষ্টির কারণ না হয়, তদ্রূপ আর্থিক স্বচ্ছলতা।

(৩) সমাজের প্রত্যেকে যাহাতে প্রকৃতি কি তাহা শিক্ষার প্রেরণা লাভ করে এবং প্রকৃতির বিধানের সহিত যাহাতে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে এবং কদাপি উহা লঙ্ঘন না করে, তদ্রূপ প্রকৃতিমুখী ভাব।

(৪) যাহাতে স্বকীয় ইন্দ্রিয়গত এবং মনোগত প্রবৃত্তি দমন করিয়া স্বকীয় দেহাভ্যন্তরস্থ বুদ্ধির কার্য্য উপলব্ধি করিবার প্রেরণা লাভ করে, তা বুদ্ধি-উদ্রেককারী শিক্ষা-ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রনীতির সমগ্র সংজ্ঞা সম্যক্ অনুধাবন করিয়া সংক্ষেপ করিয়া তাহা বলিতে গেলে দেখা যাইবে যে, ইহার মূলীভূত বিষয় দুইটি, যথা :—

(১) প্রত্যেকটি অধিবাসী যাহাতে জীবনযাপনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রব্য, বেতনভোগী চাকুরী ব্যতিরেকেই লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রা তি তদ্রূপ আর্থিক সংগঠন।

(২) প্রত্যেক অধিবাসী যাহাতে স্বকীয় পেশা এবং প্রকৃতির বিধানসমূহ উপলব্ধির জন্য সচেষ্ট হইতে পারে এবং ইন্দ্রিয়গত ও মনোগত প্রবৃত্তিসমূহ দমন করিয়া প্রকৃতির ও রাষ্ট্রের বিধিসমূহ মানিয়া চলিবার ও তাহা কদাপি লঙ্ঘন না করিবার প্রেরণা লাভ করে, রাষ্ট্রান্তর্গত তদ্রূপ শিক্ষাদানে ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রনীতির এই সংজ্ঞা সূচনায় অনেকের পক্ষে অসম্ভাব্য বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজের মধ্যে যাঁহারা অধুনা প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্ক-সামর্থ্যে স্বল্প, তাঁহারা ইহার অর্থ উপলব্ধির চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, অসম্ভাব্য হওয়া দূরে থাক, এই প্রকার রাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণ সুসাধ্য।

রাষ্ট্রান্তর্গত প্রত্যেকে যাহাতে আর্থিক অভাব, শারীরিক পীড়া এবং মানসিক অশান্তি হইতে নিষ্কৃতিলাভের ভরসা করিতে পারে, সেইজন্য উপরিলিখিতানুরূপ আর্থিক এবং শিক্ষাব্যবস্থামূলক সংগঠনে যে-রাষ্ট্রনীতির সামর্থ্য নাই, তাহাকে সংস্কার বশতঃ যথেচ্ছ আখ্যা অনেকে দিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে রাষ্ট্রনীতি আখ্যাত করা যায় না।

বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক রাষ্ট্রের অধুনাতন রাষ্ট্রনীতি যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা জনসাধারণের শারীরিক, মানসিক এবং বুদ্ধিগত অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া কতিপয় ষড়যন্ত্র-নিপুণ ব্যক্তির যেনতেন প্রকারে সমাজে স্বকীয় প্রাধান্য বিস্তারার্থ ছলা-কলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা বিষয়ে যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিলে "রাষ্ট্রীয় হিত" বলিতে কি বুঝা যায়, তাহা অনুমান করিতে বেগ পাইতে হইবে না।

রাষ্ট্রনীতি বলিতে যেমন এমন কতিপয় মানসিক ক্রিয়াকলাপ এবং বাস্তব সংগঠন বুঝিতে হয়, যদ্দ্বারা সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি জীবিকা-বিষয়ে পরস্পর-নিরপেক্ষ থাকিয়া আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে এবং যাহা তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্ব্বক কার্য্য করিবার এবং উহা কি ভাবে বুদ্ধির বিকাশ সাধন করিতেছে তাহা উপলব্ধির প্রেরণা দান করে, সেইরূপ "রাষ্ট্রীয় হিত" বলিতে নিম্নের তিনটি বিষয়কে বুঝিতে হইবে : —

(১) রাষ্ট্র অথবা সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির জীবিকার্জ্জন বিষয়ে স্বাধীনতা।

(২) রাষ্ট্র অথবা সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির আর্থিক স্বচ্ছলতা।

(৩) প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষাজনক উপলব্ধি ও কার্য্যকলাপ, অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক যোগ্যতা ও মানসিক সন্তুষ্টির অর্জ্জন-ব্যবস্থা।

"রাষ্ট্রনীতি" এবং "রাষ্ট্রীয় হিত"-এর সংজ্ঞা গভীর ভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কোন সমাজ অথবা রাষ্ট্রের পক্ষেই কোন কার্য্য অথবা চিন্তার দ্বারা যদি উপরিলিখিত তিন প্রকার রাষ্ট্রীয় হিত সাধিত হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে সেই কার্য্য ও চিন্তাকে রাজনীতির দিক্ হইতে ইষ্টসাধক বিবেচনা করা যায় না।

মিঃ সরকারের প্রস্তাবিত কার্য্যবিষয়ক মতবাদ দ্বারা কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় হিত সাধনের সম্ভাবনা আছে কি না,

অতঃপর আমরা তাহার বিচার করিব,—যাহাতে রাজনীতির দিক্ হইতে উহা দেশের পক্ষে কোনপ্রকার উপকারে লাগিতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে আমরা নির্দ্দিষ্ট ধারণা গঠন করিতে পারি।

মিঃ সবরকর প্রস্তাবিত কার্য্যবিষয়ক মতবাদ দ্বারা দেশের কোন রাষ্ট্রীয় হিত সাধিত হইবার সম্ভাবনা বর্ত্তমান কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কি ভাবে প্রত্যেকটি দেশের রাষ্ট্রীয় হিত সাধিত হইতে পারে, যাহাতে দেশের রাষ্ট্রীয় হিতসাধন পক্ষে কি কার্য্য এবং চিন্তা অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়, তাহা নিশ্চিতভাবে জানিতে পারা যায়।

প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রীয় হিত কি ভাবে সাধিত হইতে পারে

আমরা দেখিয়াছি যে, কোন দেশের রাষ্ট্রীয় হিতসাধন ঐ দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীর তিনটি অবস্থালাভের মধ্যে নিহিত—(১) স্বাধীন জীবিকা, (২) আর্থিক স্বচ্ছলতা, এবং (৩) শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক সন্তুষ্টি এবং শান্তি। এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধে গভীর পর্য্যালোচনার দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জনের দ্বারা আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভই প্রথম সাধ্য, কেন না, স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন দ্বারা আর্থিক স্বচ্ছলতা ব্যতীত শারীরিক সুস্থতা অথবা মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টি, উভয়ের কোনটিই লব্ধ হইতে পারে না। বেতনভোগী চাকুরীরূপী নফরগিরির দ্বারা আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ দ্বারা ইহা সম্ভাবিত হইতে পারে না, কেন না, স্বীয় বিবেক ব্যতীত অপর কাহারও নির্দ্দেশ পালনের জন্য পরিশ্রম করিতে হইলে মানসিক সন্তুষ্টি এবং শান্তি, উভয়ের কোনটিই লাভ করা হয় না।

সুতরাং স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, কোন দেশের রাষ্ট্রীয় হিত কি ভাবে সাধিত হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমাদিগকে প্রথমতঃ জানিতে হইবে, দেশের প্রত্যেকে কি করিয়া স্বাধীন জীবিকার্জ্জন পন্থার দ্বারা আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারেন।

দেশের প্রত্যেকে কি করিয়া স্বাধীন জীবিকার্জ্জন পন্থার দ্বারা আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, জীবিকার্জ্জনের বিভিন্ন পন্থা কি এবং উহাদের কোন্ কোন্টিকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন বিবেচনা করা যায়, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানিবার প্রয়োজন। জীবিকার্জ্জনের বিভিন্ন পন্থা কি এবং তাহাদের কোন্ কোন্টি স্বাধীন, তাহা জানিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হইলে আমরা দেখিব যে, জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থাসমূহ মাত্র নিম্নলিখিত কয় প্রকার :—

(১) কৃষি,—খনিজের বিষয় ইহার অন্তর্ভুক্ত ;

(২) শিল্প ;

(৩) ব্যবসায়,—বিভিন্ন পেশা, মহাজনী ও বীমা প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত ;

(৪) বেতনভোগী চাকুরী।

দেখা যায় জীবিকার্জ্জনের এই চারিটি পন্থার মধ্যে, বেতনভোগী চাকুরী অথবা ব্যবসায়, অথবা শিল্প, ইহাদের কোনটিকেই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন আখ্যাত করা যায় না, কেন না বেতনভোগী চাকুরীর অনুপাত লাভজনক কৃষি, লাভজনক শিল্প এবং লাভজনক ব্যবসায়ের বিস্তারের উপর নির্ভর করে, ব্যবসায়ের বিস্তার শিল্পজাত এবং কৃষিজাত দ্রব্যের অনুপাতের উপর নির্ভর করে এবং শিল্পের বিস্তার কৃষিজাত দ্রব্যের, তথা কাঁচামালের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। সুতরাং যুক্তিসঙ্গতভাবে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, জীবিকার্জ্জনের মূল উপায় কৃষি এবং ইহাই একমাত্র স্বাধীন পন্থা। ইহাও লক্ষণীয় যে, কৃষকগণকে যদি বেতনভোগী দিনমজুর হিসাবে কোন মহাজনের অধীনে চাকুরী করিতে হয় কিংবা কৃষিকার্য্য চালাইবার নিমিত্ত অর্থ-ব্যবস্থার জন্য মহাজনের মুখাপেক্ষা করিতে হয় এবং কৃষকগণ যদি অন্য-নিরপেক্ষ ভাবে কৃষিকার্য্য চালনায় অসমর্থ হয়, তবে কৃষি-ব্যবসায়ও আর স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের পন্থা হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না। ইহার অর্থ দাঁড়াইতেছে এই যে, দেশের প্রত্যেকে স্বাধীন জীবিকার্জ্জন পন্থার দ্বারা আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করুক, ইহাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হয়, তবে প্রত্যেকটি কৃষক অন্য-নিরপেক্ষ ভাবে কৃষিকার্য্য দ্বারা কি উপায়ে লাভবান্ হইতে পারে, আমাদিগকে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। কৃষিবিষয়ক এবং জমীর উর্ব্বরাশক্তি-বিষয়ক বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইয়া এই সমস্যার সমাধানে বিশেষ ভাবে অবহিত হইলে দেখা যাইবে যে, ন্যূনপক্ষে

কোন দেশের জমীর সর্ব্ব নিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বর্ত্তমান না থাকিলে এবং দেশের মধ্যে কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার স্বাধীন প্রচলন ব্যাহত না হইলে, দেশের কৃষকদিগের পক্ষে অন্ন-নিরপেক্ষ ভাবে কৃষিকার্য্য করিয়া লাভবান্ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা জানি যে, আধুনিক অর্থনীতি-বিদ্‌গণ এই বিষয়ে আমাদিগের সহিত একমত হইতে পারিবেন না, কিন্তু বিষয়টি দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ বিস্তৃত যে, আনুপূর্ব্বিক তাহার আলোচনার চেষ্টায় এই পত্রিকার বহুপৃষ্ঠা প্রয়োজন, সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া তাহা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, অ্যাডাম্ স্মিথের কাল হইতে যে-অর্থনীতিবিদ্‌গণের অভ্যুদয় হইয়াছে, স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির উপকারিতা, তথা কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার অবাধ প্রচলনের অনুপস্থিতির উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহাদের অজ্ঞতাবশতঃই প্রত্যেক দেশের সমগ্র অধিবাসীর যাহারা শতকরা নব্বই অংশ, সেই জনসাধারণের মোটামুটি আর্থিক অবস্থা গত কয়েক শতাব্দী হইতে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর হইয়া চলিয়াছে।

আধুনিক এই অর্থনীতিবিদ্‌গণের নির্ব্বোধ প্রতারণার ফলেই ইউরোপের অধিকাংশ জনসাধারণ, সাধারণতঃ হৃদয়-বান্ হইলেও মস্তিষ্কসামর্থ্যে জড়তা লাভ করিয়াছেন, সুতরাং সমাজে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই নিমিত্তই ইউরোপের অধিবাসীদিগের শতকরা নিরানব্বই জনকে যদ্যপি স্বকীয় জীবিকা অর্জ্জনার্থে কোন না কোন প্রকার বেতনভোগী চাকুরী-রূপী নফরগিরির জন্য চেষ্টিত দেখা যায় এবং যদ্যপি ইউরোপের দেশসমূহের অধিকাংশকে প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচা-মালের জন্য অপরাপর মহাদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তথাপি তাঁহারা স্বাধীন বলিয়া গর্ব্ববোধ করিতে ইতস্ততঃ করেন না। দুঃখের বিষয় যে, ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্‌গণ এবং রাষ্ট্র-নেতাগণও, দেশকে কি হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন বলা চলিতে পারে, তাহা জ্ঞাত না হওয়ায়, ইউরোপীয় সংস্করণের স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

যাহাই হউক, সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, দেশের সকলেই যাহাতে বেতনভোগী চাকুরীরূপী নফরগিরির শরণাপন্ন না হইয়া আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে এমন সংগঠন অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়, যদ্দ্বারা নিম্নের দুইটি বিষয় ব্যবস্থিত হয়:—

(১) ন্যূনপক্ষে জমীর সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বিদ্যমানতা।

(২) কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার অব্যাহত প্রচলনের অবিদ্যমানতা।

দেশের প্রত্যেকের অবস্থাকে আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল করিবার নিমিত্ত যদ্যপি উপরের দুইটি ব্যবস্থা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়, এই সমস্যা সম্বন্ধে অভিনিবিষ্ট চিন্তায় দেখা যাইবে যে, যুগপৎ এই দুইটি ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইতে পারে না, কেন না, বর্ত্তমান অবস্থায় সাময়িক ভাবে কাগজের মুদ্রার অব্যাহত প্রচলন ব্যতীত আর কোন উপায়েই জমীর স্বাভা-বিক উর্ব্বরাশক্তির পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে না, উপরন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কাগজের মুদ্রার অব্যাহত প্রচলন নিরোধ করিবার চেষ্টায় অগ্রসর হইলে দেশে বিশৃংখলা উপস্থিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

ইহার অর্থ দাঁড়াইতেছে যে, দেশের প্রত্যেকে যাহাতে আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারে এবং শেষতঃ দেশের রাষ্ট্রীয় হিত যাহাতে সাধিত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্য পূরণার্থ জনসাধারণের প্রথম কার্য্য হইতেছে, দেশের জমীর ন্যূনপক্ষে সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বজায় থাকিতে পারে, তন্নিমিত্ত যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহার সন্ধান। আমরা বহুবার দেখাইয়াছি যে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বলিতে জমীর অভ্যন্তরে তেজ ও রসের অব্যাহত সঞ্চরণকে বুঝাইবে এবং দেশের নদীসমূহ যদি ভূনিম্নস্থ অবিমিশ্র বালুকাস্তর পর্য্যন্ত গভীর না থাকে এবং বৎসরের ৩৬৫ দিনের প্রত্যেকটি দিনে যদি ভূনিম্নস্থ অবিমিশ্র বালুকাস্তর পর্য্যন্ত নদীস্রোতের গভীরতা বজায় না থাকে, তবে রস ও তেজের বাধাহীন সঞ্চরণ সম্ভব হয় না। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, নদীস্রোতে কোন প্রকার বাধা উপস্থিত হইলে দেশের নদী-সমূহ ভূনিম্নস্থ অবিমিশ্র বালুকাস্তর পর্য্যন্ত গভীরতার অধি-কারী থাকিতে পারে না। নদীগর্ভে খনন করিয়া আধুনিক ইঞ্জিনীয়ারগণ তাঁহাদের বিদ্যায় নদীর এই প্রয়োজনীয় গভীরতা বজায় রাখিতে পারিতেছেন বলিয়া গর্ব্ববোধ করিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যকারণসম্মত বিবেচনাশক্তির সাহায্যে সকলেই

এই পর্য্যবোধের অসারতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন। বর্ত্তমান জগতের চিন্তাক্ষেত্রে যাঁহারা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে আমাদের সহিত এ-বিষয়ে একমত হইতে না পারেন, কিন্তু হাতে-কলমে অধিকতর অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রমাণিত হইবে যে, নদীস্রোতকে অব্যাহত গতি দান করা ব্যতিরেকে নদীস্রোতের প্রয়োজনীয় গভীরতা এবং প্রাবল্য দানের অপর কোন উপায়ই নাই। অর্থাৎ দাঁড়ায় এই যে, দেশের প্রত্যেকের আর্থিক স্বচ্ছলতার ব্যবস্থা এবং শেষতঃ দেশের রাষ্ট্রীয় হিত সাধিত করিতে হইলে নদীস্রোতে বর্ত্তমানে যে-সকল বাধা রহিয়াছে, তাহাদিগকে অপসৃত করিয়া নদী-স্রোতকে অব্যাহত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

নদীস্রোতে বর্ত্তমানে যে-সকল বাধা বিদ্যমান, তাহাদের সন্ধানপ্রয়াসী হইলে দেখা যাইবে যে, রেলের বাঁধসমূহ, রেলের সেতু, বাণিজ্যের জন্য নির্ম্মিত সহরের পাড়-রক্ষাকারী প্রাচীরসমূহ, মোটরকার এবং অপরাপর যানের জন্য নির্ম্মিত বড় বড় রাস্তাসমূহই ইহাদের মধ্যে প্রধান। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী যে, দেশের প্রত্যেকের আর্থিক স্বচ্ছলতা ব্যবস্থিত করিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় হিতসাধনের উদ্দেশ্য পূরণ করিতে হইলে প্রথমতঃ আধুনিক কালের এই রেলপথ-ব্যবস্থা, মোটরকারের চলাচল এবং অপরাপর চালানী ব্যবস্থার উচ্ছেদ, অর্থাৎ এক কথায়, আধুনিক কালের তথাকথিত বিজ্ঞানের সকল প্রকার কার্য্যকলাপের উচ্ছেদ সাধনের জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও এই কার্য্য যেমন সুসাধ্য নহে, তেমনই ইহা সম্পূর্ণ অসাধ্যও নহে। সূচনায় ইহা পুঁজিবাদীগণের স্বার্থবিরুদ্ধ বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পুঁজিবাদের পক্ষে ইহা সমূহ ইষ্ট-সাধক বলিয়া প্রমাণিত হইবে। দেশের শাসন-পরিচালনার যাঁহারা কর্ণধার, সেই রাষ্ট্রনেতাগণের দিক্ হইতেই এই কার্য্যে প্রথম বাধা উপস্থিত করা হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই কার্য্যদ্বারা যখন তাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা করা হইবে না, তখন ভজ্জন্য তাঁহারা বাধা উপস্থিত করিতে পারেন না; নদীস্রোত অব্যাহত রাখিবার সার্থকতা কি তাহার অজ্ঞতাহেতুই এবং মস্তিষ্ক-জাড্যজনক শিক্ষায় তাঁহাদের মস্তিষ্ক-সামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই তাঁহারা এইরূপ করিবেন। রাষ্ট্রনেতাগণের এবং পুঁজিবাদীগণের দিক্ হইতে এই বাধা নিবারণের একমাত্র পন্থা হইতেছে, নদীস্রোত অব্যাহত রাখিবার সার্থকতা সম্বন্ধে দেশের সমগ্র অধিবাসীর শতকরা নব্বই জন বলিতে যাহাদিগকে বুঝা যায়, সেই জন-সাধারণকে শিক্ষা দান করিয়া এতদুদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ করা।

সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে যে, দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীর আর্থিক স্বচ্ছলতার ব্যবস্থা করিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় হিত ব্যবস্থিত করিতে হইলে, দেশের সমগ্র জন-সাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করিবার নিমিত্ত চেষ্টার প্রয়োজন। উপরে আমরা যে বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, সকলের সাধারণ স্বার্থের অঙ্গীভূত হিসাবে এই বিষয় লইয়া চেষ্টা করিলে প্রত্যেক দেশের জন-সাধারণের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এতদ্ব্যতিরেকে আর কোন বিষয়ের সাহায্যে জন-সাধারণের ঐক্যবন্ধন যেমন সম্ভব নহে, তেমই তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই হীনচেতা, বিবেকবর্জ্জিত, চরিত্রহীন এবং কুশিক্ষাপ্রসূত দাম্ভিকতার আধার বলিয়া, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর আন্তরিক সমপ্রাণতাও সম্ভব নহে। মাত্র কলরব উপস্থিত করিয়াও দেশের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে; উপরন্তু আর সকল কার্য্য স্থগিত করিয়া উপরিনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুযায়ী সুশৃঙ্খল ভাবে কার্য্যশীল হইলে ঐক্য স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃত ভাবে দেশের যাহা রাষ্ট্রীয় হিত, তাহা সাধনার্থ, দেশের মধ্যে প্রত্যেকের আর্থিক স্বচ্ছলতা ব্যবস্থিত করিতে হইলে, সকলের স্বার্থের অঙ্গীভূত এমন কোন সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সর্ব্বাগ্রে দেশের জন-সাধারণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইবে এবং যে-চিন্তা ও কার্য্য দেশের মধ্যে সামান্য মাত্র দ্বন্দ্ব ও কলহ সৃষ্টি করিতে পারে, প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টির দ্বারা সর্ব্বথা তাহার নিন্দা করিতে হইবে। দেশের জন-সাধারণকে এইরূপ ভাবে শিক্ষিত করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা বিন্দুমাত্র দ্বন্দ্ব-কলহের ভাব মনে না রাখিয়াই এবং কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন অবাধ্যতা প্রদর্শন না করিয়াই তাহাদের আর্থিক সমস্যা-সমূহের সমাধানার্থ আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন যে, ইহা অসম্ভব বস্তু।

তাঁহারা জিজ্ঞাসু হইলে আমরা তাঁহাদিগকে ইহার পন্থা প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত আছি।

মিঃ সবরকরের বক্তৃতায় কাহারও বিপক্ষে দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে কি না, অতঃপর আমরা ইহাই পরীক্ষা করিব। যদি দেখা যায় যে, তন্মধ্যে কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের সংঘর্ষমুখীনতা বিদ্যমান, তবে মিঃ সবরকরের অভিভাষণ যে রাষ্ট্রীয় দিক্ হইতেও নিন্দনীয়, পাঠকগণকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

রাষ্ট্রদৃষ্টিতে মিঃ বিনায়ক দামোদর সবরকরের অভিভাষণ বিচার

এই বিশ্লেষণের প্রথমাংশে মিঃ সবরকরের অভিভাষণকে ধর্ম্মদৃষ্টিতে বিচারপ্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে, উহা আদ্যন্ত মুসলমান-বিরোধী দ্বন্দ্ব ও কলহের মনোভাবপূর্ণ। সুতরাং রাষ্ট্রবুদ্ধি হইতেও মিঃ সবরকরের অভিভাষণ প্রশংসনীয় বিবেচিত হইতে পারে না। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, কেবল মিঃ সবরকর নহেন, দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব পোষণ করেন বলিয়া, ভারতের সকল রাষ্ট্রনেতা এবং তথাকথিত রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণের প্রত্যেকেই জন-সাধারণের পদাঘাত এবং থুৎকারের যোগ্য। অবশ্য জন-সাধারণকে বুঝিতে হইবে যে, নেতৃবৃন্দের কাহারও বিরুদ্ধে এইরূপ মনোভাব পোষণের অধিকার তাঁহাদের নাই। কিন্তু নেতৃবৃন্দের এবং রাষ্ট্রনেতাগণের প্রত্যেককে বুঝিতে হইবে যে, ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টি, কাহারও বিরুদ্ধে কোনপ্রকার দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব পোষণ পাপাচরণ এবং পাপাচরণ দ্বারা কোন ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত প্রতিষ্ঠান, কাহারও কোন প্রকৃত হিত সাধন করা যায় না এবং এইরূপ পাপাচারণ বশতঃই নেতৃবৃন্দের ও রাষ্ট্রনেতাগণের প্রায় প্রত্যেকে তাঁহাদের নেতৃত্বের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বকীয়, পারিবারিক, দেশগত ও রাষ্ট্রগত দুর্দ্দশার জনক হইয়াছেন। মিঃ গান্ধীর উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন যে, যীশুখ্রীষ্টের সমকক্ষ হিসাবে বিবিধ ভাবে আত্মপ্রচার সত্ত্বেও, সময় থাকিতে সাবধানতা অবলম্বন না করিলে অদূরভবিষ্যতে তাঁহার পাপাচরণহেতু তিনি পৃথিবীর ঘৃণ্যতম প্রাণীর পক্ষে প্রযুজ্য ব্যবহার লাভ করিবেন। যীশুখ্রীষ্ট মনুষ্যজাতিকে শান্তি ও সমপ্রাণতার পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ গান্ধী স্বকীয় জঘন্য দ্বন্দ্ব-কলহ-প্রবৃত্তিজনিত ভারতবর্ষকে ক্রমবর্দ্ধমান অনৈক্য এবং দলাদলি, অনাহার ও বেকারের আগারে রূপান্তরিত করিয়া চলিয়াছেন—যীশুখ্রীষ্টের সহিত মিঃ গান্ধীর তুলনা সুতরাং নির্ব্বুদ্ধিতা!

মিঃ গান্ধীর পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় উপলব্ধি এই যে, দুগ্ধপানলিপ্সায় ছাগজাতির ক্রমাগত সাহচর্য্যে তাঁহার মস্তিষ্ক দ্রব্য বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার স্ব-কল্পিত রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন দ্বারা ভারত, তথা মনুষ্য-সমাজের কি সমূহ অনিষ্ট তিনি সাধন করিতেছেন, তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহাকে সবিশেষরূপে আত্মবিশ্লেষণ-পর হইতে হইবে। *

ভারতে হিন্দু মহাসভা আন্দোলনের সার্থকতা

গত সংখ্যায় এবং এই সংখ্যায় এতাবৎ আমরা দেখাইয়াছি যে, নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভার একবিংশ অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে প্রদত্ত মিঃ সবরকরের অভিভাষণ ধর্ম্মবুদ্ধি, তথা রাষ্ট্রবুদ্ধি, উভয় দিক্ হইতেই সর্ব্বথা নিন্দনীয়। অতঃপর বিচার্য্য এই যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেস-অতিরিক্ত হিন্দু-মহাসভার অনুরূপ কোন সংগঠনের কোন প্রকার সার্থকতা বর্ত্তমান কি না। ইহার উত্তর-লাভার্থ, আমাদিগকে মহাসভার আশু-সাধ্য কার্য্যাবলীর তালিকা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, তন্মধ্যে কংগ্রেসের কার্য্য-তালিকার উল্লেখ নাই, এরূপ কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় কি না। যদি দেখা যায় যে, মহাসভার কার্য্য-তালিকায় এমন কর্ম্মের উল্লেখ বর্ত্তমান, কংগ্রেসের কার্য্য-তালিকায় যাহার অভাব এবং ঐ

* "দি ইউবুদি বজ্রী"র ১৮ই জানুয়ারীর সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

কার্য্য দেশের পক্ষে হিতকর হইতে পারে, তবে হিন্দু মহাসভা আন্দোলনের যে কিঞ্চিৎ সার্থকতা বর্ত্তমান, অবশ্যই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। কিন্তু অন্ত পক্ষে যদি দেখা যায় যে, হিন্দু মহাসভার কার্য্য-তালিকায় এমন কর্ম্মের উল্লেখ বর্ত্তমান, দেশের স্বার্থপক্ষে যাহা নিশ্চিত অনিষ্টকর, অথচ কংগ্রেসের কার্য্য-তালিকায় উল্লেখ নাই, এরূপ কোন কর্ম্মের সন্ধান তথায় পাওয়া যায় না, তবে অবশ্যগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত এই যে, মহাসভা আন্দোলন কেবল নিষ্প্রয়োজনীয় নহে, দেশের পক্ষে উহা সমূহ অনিষ্টসাধক।

মহাসভার আশু সাধ্য কার্য্য-তালিকা কি, এইবার আমরা তাহার প্রতি অবহিত হইব। মিঃ সবরকরের অভিভাষণের নিম্নোদ্ধৃত অংশে উহার উল্লেখ পাওয়া যায় :—

"গ্রাম হইতে শহরে, শহর হইতে মহানগরীতে নিম্নবিষয়ক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিবার জন্য আপনারা আপনাদের প্রয়াসশীলতাকে সুতীব্র করুন—

(১) অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন।

(২) সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়, কলেজ এবং স্কুলকে ছাত্রগণের পক্ষে সামরিক শিক্ষা আবশ্যিক করিতে বাধ্য করা এবং আমাদিগের যুবকবৃন্দ নৌ, বিমান এবং সামরিক বাহিনী ও প্রতিষ্ঠানসমূহে যাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, যেন তেন প্রকারেণ, তজ্জন্য সচেষ্টতা।

(৩) যে সকল হিন্দু-সংগঠনী হিন্দুর স্বার্থ-রক্ষার্থ প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি দান করিবেন, হিন্দু নির্ব্বাচকমণ্ডলী যাহাতে যথাসাধ্য তাঁহাদিগকেই কেবল ভোট প্রদান করেন এবং তাঁহারা যাহাতে কংগ্রেসের প্রার্থীকে কোনক্রমেই ভোট দান না করেন, এরূপ ভাবে তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করা—কেন না, যতদিন কংগ্রেস-প্রার্থীগণ কংগ্রেসের প্রবেশ-পত্র এবং নিয়মানুগত্যের শৃঙ্খলে বাধ্য থাকিবেন, ততদিন ইচ্ছা থাকিলেও এবং প্রতিশ্রুতি দান করিলেও তাঁহারা মুক্ত ভাবে হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিবেন না।

যথাবিহিত ভাবে এই কার্য্য-তালিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহার প্রথম এবং দ্বিতীয় দফা কংগ্রেসের কার্য্য-তালিকার প্রায় অনুরূপ এবং কংগ্রেসের আন্দোলনের যতদিন অস্তিত্ব বর্ত্তমান, ততদিন, এই সকল দফার অনুযায়ী কার্য্য সমগ্র জনসাধারণের স্বার্থের আনুকূল্য পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া যদিও বা গণ্য হয়, এতদ্‌কল্পে মহাসভা আন্দোলনের কোন স্বতন্ত্র সার্থকতা নাই। বস্তুতঃ, সমগ্র জনসাধারণের স্বার্থসমূহের গভীর পর্য্যালোচনার দ্বারা বুঝা যায় যে, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের আলোচনা এবং দেশের প্রত্যেক যুবকের পক্ষে সামরিক শিক্ষা আবশ্যিক করিবার জন্য কোন আন্দোলন দেশের প্রত্যেকের পক্ষে তো নহেই, এমন কি অধিকাংশের পক্ষেও হিতকারী নহে এবং ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। কেন না বর্ত্তমান অবস্থায়, অস্পৃশ্যতা সংক্রামক ব্যাধি এবং দুর্জ্জনের জন্যই অপরিহার্য্য এবং সামরিক শিক্ষাও দেশের যুবকবৃন্দের প্রত্যেকের স্বাভাবিক মনোভাবের উপযোগী হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন এবং আবশ্যিক সামরিক শিক্ষা অনাহার ও বেকার-সমস্যা সমাধানের পক্ষে কোন প্রকারে হিতজনক হইত, তাহা হইলে ইউরোপে এইরূপ অনাহার ও বেকার সমস্যা দেখা যাইত না, কেন না, ইউরোপীয় দেশসমূহের অধিকাংশই অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। যাঁহারা অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তনের আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরু বলিয়া বিবেচনা করেন, ইউরোপের অবস্থায় তাঁহাদের কাণ্ডজ্ঞান উদিত হওয়া উচিত। যাহাই হউক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, কংগ্রেস যতদিন এই-সকল কার্য্যকে তাহার উদ্দেশ্য হিসাবে রক্ষা করিবে, তত দিন এই উদ্দেশ্যপূরণের নিমিত্ত নূতন কোন আন্দোলনের বিন্দুমাত্র সার্থকতা নাই।

মহাসভার কার্য্যতালিকায় অতিরিক্ত উদ্দেশ্য বলিতে, অর্থাৎ যাহা কংগ্রেসের কার্য্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, কেবল দেখা যায়:—"যে-সকল হিন্দু-সংগঠনী হিন্দুর স্বার্থরক্ষার্থ প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি দান করিবেন, কংগ্রেসের প্রার্থীকে ভোট দান না করিয়া হিন্দু নির্ব্বাচকমণ্ডলী যাহাতে কেবল তাঁহাদিগকেই ভোট দান করেন এরূপ ভাবে তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করা।" আমরা দেখাইয়াছি যে, যদি কোন ব্যক্তি,

যাঁহারা হিন্দুর স্বার্থরক্ষা করিতে পারেন, কেবল তাঁহাদিগকেই ভোট দান করিতে কৃতসংকল্প হন, তবে যুক্তিসঙ্গত ভাবে তিনি হিন্দু-মহাসভার প্রার্থীকে ভোটদান করিতে পারেন না, কেন না মহাসভার আন্দোলনজনিত মুসলমান-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে-দ্বন্দ্ব-কলহের ভাব নিশ্চিত উদ্ভূত হইবে, তদ্বশতঃ তিনি (অর্থাৎ হিন্দু-মহাসভার প্রার্থী) ধর্ম্মের দিক্ দিয়াই হউক, কিংবা রাজনীতির দিক্ দিয়াই হউক, দেশের স্বার্থরক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন বলিয়া মনে করা যায় না। মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান অবস্থায়, যখন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের প্রায় প্রত্যেকটি অধিবাসী হয় আর্থিক অভাব, নয় শারীরিক অস্বাস্থ্য, কিংবা মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেছে, তখন মনুষ্যজাতির মাত্র একাংশের অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে কোন আন্দোলন যে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না, পাঠকবর্গকে এতদ্বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হইতে বলি। তাহাই যদি না হইত, তবে অন্ততঃ ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, যুক্তরাজ্য এবং রাশিয়ার ন্যায় তথাকথিত স্বাধীন এবং শক্তিশালী দেশসমূহে বেকার ও অনাহার সমস্যা দেখা যাইত না। ইহা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজ হইতে দুর্দ্দশা দূর করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত না হইলে, কোন দেশের এমন কি একটি মাত্র ব্যক্তিও সম্পূর্ণরূপে দুর্দ্দশামুক্ত হইতে পারে না। স্বদেশবাসী স্বীয় ভ্রাতা-ভগ্নীর একজনও যদ্যপি দুর্দ্দশাক্লিষ্ট থাকে, তবে কেহই সম্পূর্ণরূপে দুর্দ্দশামুক্ত হইতে পারেন না, কেন না তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী অন্ততঃ ক্ষণিকের নিমিত্তও তাঁহার মনকে কাতর করিবেই করিবে। এমন কি, স্বদেশবাসী স্বীয় ভ্রাতা-ভগ্নীর সকলকেই আর্থিক অভাবজনিত দুর্দ্দশা হইতে যদি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বলিয়া দেখা যায়, তথাপি অপরাপর দেশের ভ্রাতা-ভগ্নীদের যতদিন অনাহার ও বেকারসমস্যার দ্বারা পীড়িত দেখা যাইবে, তত দিন কেহ সম্পূর্ণরূপে দুর্দ্দশামুক্ত হইতে পারেন না, কেন না তাহারা নিজেদের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য চোর, প্রবঞ্চক অথবা দস্যুরূপে অন্য দেশের শান্তিহরণে বাধ্য হইবে।

এই জন্যই, মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান অবস্থায়, যে সকল আন্দোলনের লক্ষ্য জন সাধারণের একাংশমাত্রের কতিপয় দুরবস্থার সংস্কার-সাধন, তাহা পরিহার করিয়া যে প্রকার আন্দোলন মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের সুনিশ্চিত সহায়তা করিতে পারে, তাহা গ্রহণের ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বলা যাইতে পারে যে, যতদিন পর্য্যন্ত মুসলমানগণ কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থ চেষ্টিত থাকিবেন, ব্রিটিশগণ কেবল ব্রিটিশজাতির জন্য চেষ্টিত থাকিবেন, জার্ম্মানগণ কেবল জার্ম্মানজাতির জন্য চেষ্টিত থাকিবেন, ততদিন হিন্দুগণকে কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য সচেষ্ট হইবার উপদেশ সদুপদেশ নহে, ইহা মনে করিবার কোন অর্থই হইতে পারে না। আমরা যদি দেখিতে পাইতাম যে, মুসলমানগণ অথবা ব্রিটিশগণ অথবা জার্ম্মানগণ তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক আন্দোলন দ্বারা স্বকীয় সম্প্রদায়ের সমগ্রাংশের আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি বিহিত করিতে পারিয়াছেন, তবে যে শ্রেণীর চিন্তানায়কগণ বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুগণ কর্ত্তৃক হিন্দুজাতির কল্যাণকর আন্দোলন প্রচারের বিরুদ্ধভাষণ নির্ব্বুদ্ধিতা, তাঁহাদের সহিত নিশ্চিত একমত হইতাম। ইতিহাস সাক্ষ্য দান করে যে, যতদিন হইতে তথাকথিত ধর্ম্মমতসমূহ এবং তথাকথিত জাতীয় আন্দোলনসমূহ মনুষ্যসমাজে স্থান লাভ করিয়াছে, ততদিন হইতে ইহা (মনুষ্যসমাজ) কেবল ধ্বংস ও সর্ব্বনাশের পথেই চলিয়াছে ও তথাকথিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ই হউক, অথবা তথাকথিত জাতীয় সম্প্রদায়ই হউক, কাহারও কোন স্থায়ী হিতসাধনে কদাপি ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় নাই। সম্প্রদায়গত স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে যে-সকল আন্দোলন, তাহা স্থগিত রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে সমগ্র মনুষ্যসমাজের স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে একটি মাত্র আন্দোলন উপস্থিত করিবার স্বপক্ষে নিঃসন্দিগ্ধ হইবার ইহাই অকাট্য প্রমাণ।

যে আন্দোলন অনতিবিলম্বে মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকটি অধিবাসীর স্বার্থ-সহায়ক হইতে পারে, সেই আন্দোলনের ইতিবৃত্ত মনুষ্যসমাজে আজ যাঁহারা শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও হয়তো পরিজ্ঞাত নহে, কিন্তু সেই নিমিত্ত যে-কার্য্যকলাপ জন-সাধারণের কাহারও পক্ষে শেষতঃ অনিষ্টজনক হইতে পারে, তাহা অবলম্বনের যৌক্তিকতা দেখা যায় না। হইতে পারে যে, গান্ধী-জিন্না কোম্পানী এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা ও জার্ম্মান সেনাপতিবৃন্দ স্বকীয় কার্য্যকলাপ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা বুদ্ধিবিবেচনাহীন

অপোগণ্ড মাত্র, কিন্তু মিঃ সবরকর এবং তাঁহার মতাবলম্বী ভক্তমহোদয়গণকেও সেই একই বিবেচনাহীনতার পথে সেই একই অগ্রসর হইবার যুক্তি রহিয়াছে, ইহা মনে করা যায় না।

এই জন্যই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ভারতবাসীর হউক অথবা ব্রিটিশ জাতির হউক, হিন্দুর হউক অথবা মুসলমানের হউক,—কেবল সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সাধন, তাহা নিষ্প্রয়োজনীয় এবং সর্ব্বনাশকর বলিয়া বিবেচ্য। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, হিন্দু মহাসভা আন্দোলন এবং মুসলিম লীগের আন্দোলন, যাহার উদ্দেশ্য কেবল সম্প্রদায়-বিশেষের সেবার মধ্যে নিহিত, তাহারা কেবল নিষ্প্রয়োজনীয় নহে, জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে সর্ব্বনাশকর।

এতৎসত্ত্বেও কোন দেশে শ্রেণী অথবা সম্প্রদায়গত আন্দোলনের প্রবৃত্তি দেখা গেলে, প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, ইহার কারণ কি। ইহা সর্ব্বৈব সত্য যে, মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকের স্বার্থপূরণোদ্দেশ্যে সুশৃংখলা এবং আন্তরিকতার সহিত নিয়ন্ত্রিত আন্দোলনকালীন সাম্প্রদায়িক কোন আন্দোলনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না, এবং সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের প্রবৃত্তিমাত্র বর্ত্তমান থাকিলেও, যতদিন না দেশের কিংবা সমাজের প্রত্যেকের স্বার্থপূরণের সহায়ক কোন আন্দোলন উপস্থিত করিবার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চেষ্টা উপস্থিত করা হয়, ততদিন আন্তরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই সত্য হইতে বুঝা যায় যে, সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের মনোভাবের বিদ্যমানতা মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যপূরণ-সহায়ক কোন প্রকার আন্দোলনের অবিদ্যমানতার পরিচায়ক। সুতরাং হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের দায় এই সকল আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণের উপর ন্যস্ত করা যায় না, 'জাতীয় কংগ্রেস' সদৃশ সর্ব্বব্যাপক আন্দোলনের নেতারাই ইহার জন্য দায়ী। ভারতে হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের অস্তিত্ব হইতেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে কোন না কোন ত্রুটি ঘটিয়াছে এবং বাহ্যতঃ ভারতের সকলের পক্ষে হিতকারী হওয়া ইহার উদ্দেশ্য হইলেও, ইহার কার্য্যক্রমে কোথাও না কোথাও বিচ্যুতি ঘটিয়াছে।

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের শিক্ষণীয় বিষয়

ভারতে হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ সদৃশ সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের মনোভাবের অস্তিত্ব হইতে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে কোন না কোন প্রকারের বিভ্রান্তি প্রবিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ দেখা যায় যে, ভারতে যন্ত্রশিল্পের প্রসার এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ, কংগ্রেসের এই কর্ম্মোদ্দেশ্যই ইহার মূলগত সর্ব্ববৃহৎ ভ্রান্তি। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ মুখে যাহাই বলুন না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ইহা অকাট্য সত্য যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যতদিন ভারতের স্বাধীনতা লাভকে লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া থাকিবেন এবং তজ্জন্য যন্ত্র-শিল্পের প্রসারকে তাঁহারা কার্য্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রাখিবেন, ততদিন কোন না কোন প্রকারে সংঘর্ষ বর্ত্তমান থাকিবে এবং ফলতঃ দেশে কোন না কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বিবাদও সর্ব্বদাই দেখা যাইবে, কেন না ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-লাভের অর্থই হইতেছে, বৃটিশ জাতির রাষ্ট্রীয় প্রতিপত্তির খর্ব্বতাসাধন এবং ভারতে যন্ত্র-শিল্পের প্রসারের অর্থই হইতেছে তাঁহাদের আর্থিক সংস্থানের সংকোচ সাধন। কোন ব্যক্তি কিংবা জাতির পীড়া উপস্থিত করিলে সেই ব্যক্তি কিংবা জাতি তৎপরিবর্ত্তে আমাদিগকে পীড়িত করিবে না, এরূপ প্রত্যাশা সম্পূর্ণ অর্থহীন। ভারতীয়গণ যদি বৃটিশ জাতিকে বিতাড়িত করিবার অথবা তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিপত্তি ও আর্থিক সংস্থানের খর্ব্বতা-সাধনার্থ চেষ্টা করে, তবে ভারতীয়গণের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিবার উপযোগী কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণের অধিকার ব্রিটিশগণের নিশ্চয়ই আছে। ইহা বাস্তব ঘটনা যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ ভারতে নিকৃষ্টতামূলক ভেদ-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং তাহারই ফলে প্রদেশে প্রদেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ব্যবসায়ে ব্যবসায়ে অনৈক্য দেখা দিয়াছে এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে ইহা অধিকতর বিশৃঙ্খলার কারণ হইবে; কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যতদিন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ তাঁহাদের লক্ষ্য রাখিবেন এবং তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রণালীর মধ্যে "যন্ত্র-শিল্প" যতদিন অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, ততদিন যুক্তি-সঙ্গতভাবে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণকে ইহার জন্য দায়ী করা চলিবে না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে এই রাষ্ট্রীয়

স্বাধীনতালাভের পরিবর্ত্তে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যদি প্রত্যেক ভারতবাসীর তথা মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকটি অধিবাসীর বেকার ও অনাহার সমস্যার সমাধানকে কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে যত্নবান্ হন এবং "বস্ত্র-শিল্পের প্রসারে"র পরিবর্ত্তে যদি তাঁহারা লক্ষ্যে উপনীত হইবার পন্থা হিসাবে "জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির বৃদ্ধি" ধার্য্য করেন, তবে তাঁহারা অচিরাৎ দেখিবেন যে, ভারতের সাম্প্রদায়িক অনৈক্য অতীত ঘটনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং তখন পর্য্যন্ত যদি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন সম্বন্ধে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ মনে এক ভাব রাখিয়া মুখে অন্য ভাব প্রকাশ করিতে থাকেন, তবে ইংলণ্ডের ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক বিবাদ সমুপস্থিত হইতে দেখা যাইবে। যে মুহূর্ত্তে প্রত্যেক ভারতবাসীর, তথা মনুষ্যসমাজভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধানকে লক্ষ্য করিয়া ভারতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরতা-শক্তির বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন উপস্থিত করা যাইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে কংগ্রেসের মধ্যে কোন প্রকার অনৈক্য উপস্থিত করিবার নিমিত্ত কর্ম্মপদ্ধতি এবং কার্য্যক্রম গ্রহণের স্বপক্ষে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের যে মনুষ্য-স্বভাবোচিত কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা তিরোহিত হইবে এবং তৎসত্ত্বেও যদি তখন কোন ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা কংগ্রেসের আন্দোলনে বিপক্ষতা সৃষ্টি করিবার ন্যায় অদূরদর্শী হন, তখন তিনিই ইংলণ্ডের জন-সাধারণ কর্ত্তৃক তং সিত হইবেন এবং তখন ভারতের বর্ত্তমান দলাদলি অপসৃত হইয়া ইংলণ্ডে দলাদলি দেখা দিবে। কেবল ইহাই নহে, ভারতের জমী এমন ঐন্দ্রজালিক গুণবিশিষ্ট—বর্ত্তমান জগতের কোন বৈজ্ঞানিকেরই ইহা বিদিত নহে—যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ভারতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির বৃদ্ধিমূলক কোন সুপরিকল্পিত কার্য্য-প্রণালী গৃহীত হইলে, ইহা (ভারতীয় জমী) এই পরিমাণ উর্ব্বরতাসম্পন্ন হইবে যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমগ্র মনুষ্যসমাজের অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইবে। ইহার ফলে বিশ্ব-রাষ্ট্রসমূহের সমক্ষে ভারতবাসিগণ যে মর্য্যাদা লাভ করিবে, তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় স্বপ্নেরও অগোচর।

সমগ্রভাবেই ইহা সম্ভব, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান ভারতের নেতাগণ এতাদৃশ পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতের যে স্বকীয় বিজ্ঞানকে প্রকৃত বিজ্ঞান বলিয়া আখ্যাত করিতে হয় এবং যাহা পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের শিক্ষণীয়, তাহা বুঝিতে পর্য্যন্ত পারেন না। আমরা উপরে যাহা বিবৃত করিলাম, কেহ তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে চাহিলে, এবং মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকটি অধিবাসীর বেকার ও অনাহার সমস্যার সমাধান-উদ্দেশ্যে ভারতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত আন্দোলন কি প্রকারের হইবে, তাহা জানিতে জিজ্ঞাসু হইলে, আমরা সানন্দে তাঁহাকে ইহার সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত করাইতে পারি।*

আপোষ কিংবা সংঘর্ষ

ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র অধুনা প্রধানতঃ দুই পরস্পর-বিরোধী কার্য্যক্রম দ্বারা সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে, যথা;—(১) আপোষমূলক কার্য্যক্রম, (২) সংঘর্ষমূলক কার্য্যক্রম। আপোষমূলক কার্য্যক্রম মিঃ গান্ধীর মস্তিষ্কপ্রসূত এবং মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু সংঘর্ষমূলক কার্য্যক্রম লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছেন। বোধ হয় মিঃ গান্ধী মনে করিতেছেন যে, কোন প্রকারে যদি ভারতের দুইটি প্রধান সম্প্রদায়কে চুক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হইবে এবং মহামান্য বড়লাট বাহাদুর আহ্লাদে "মহাত্মা"কে কোল দিয়া "স্বাধীনতার সারবস্তু" রূপ উপহার তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিবেন। মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু মনে করিতেছেন বলিয়া প্রতীতি হয় যে, বাধ্য না হইলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ তাঁহাদের ভারতে সাম্রাজ্যবাদ কখনই স্বেচ্ছায় পরিহার করিবেন না এবং তজ্জন্য তিনি সংঘর্ষমূলক কার্য্যক্রম ব্যতিরেকে আর কিছুতেই আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত সংঘর্ষের কোন

* দি উইকলি বঙ্গশ্রীর ২৫শে জানুয়ারীর সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

বিস্তৃত বিবরণী আজিও তিনি দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করেন নাই। আমাদের বিচার্য্য হইতেছে—"এই দুই কার্য্যক্রমের কোনটির দ্বারাই দেশের জরুরী সমস্যাসমূহের সমাধান সম্ভব কি না?"

এই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে দেশের জরুরী সমস্যাসমূহ কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। আমাদের পাঠকবৃন্দ যদি নিজেদের মনে মনে ঠিক করিয়া দেখিতে চাহেন যে, কেবল ভারতের প্রত্যেক পরিবার নহে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকটি পরিবারকে কোন্ কোন্ সমস্যা অধুনা নিপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহাদের বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না যে, হয় অনশন নয় অর্দ্ধাশন, অথবা কোন না কোন প্রকারের শারীরিক অস্বাস্থ্য, কোন না কোন প্রকার মানসিক অশান্তি মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে ম্লান করিতেছে। এই অনশন ও অর্দ্ধাশনের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত কতিপয় সংখ্যক পরিবারও হয়তো দেখা যাইবে, কিন্তু সমগ্র জনসংখ্যার উহা শতাংশের একাংশও নহে, সুতরাং সমগ্র মনুষ্যসমাজের তুলনায় তাঁহারা নগণ্য। ইহাঁদিগের মধ্যেও আবার দেখা যাইবে যে, প্রায়শঃ কেহই শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই।

সুতরাং "এই দুইটি, অর্থাৎ আপোষমূলক অথবা সংঘর্ষমূলক কার্য্যক্রমের কোনটির সাহায্যে দেশের জরুরী সমস্যাসমূহের সমাধান সম্ভব কি না," তাহার উত্তর লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে যে, ইহাদের কোনটির দ্বারা ভারতের জন-সাধারণের অনশন, অর্দ্ধাশন, আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তির সমস্যার সমাধান সম্ভব কি না।

এই দুইটির কোন একটির সাহায্যে এই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব কি না, তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, এতদুদ্দেশ্যে দেশের মধ্যে কি প্রকার অবস্থার সৃষ্টি অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হইতে হইবে।

এক্ষণে আমরা যদি নিজেরা মনে মনে প্রশ্ন করিয়া দেখি, দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীর আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি হইতে নিষ্কৃতিলাভ কি ভাবে সম্ভব, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে, আর্থিক অভাব এবং শারীরিক অস্বাস্থ্য, এই উভয়ের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত না হইলে মানসিক অশান্তি সম্যক্ প্রকারে জয় করা যায় না। ইহাও দেখা যাইবে যে, বেতনভোগী চাকুরীর সহায়তায় আর্থিক অভাব যদিও বা মিটিতে পারে, চাকুরী মারফৎ উপার্জ্জনের সহায়তায় সম্যক্ প্রকার মানসিক শান্তি লাভ হয় না, কেন না চাকুরী দ্বারা উপার্জ্জন করিতে হইলে কাহারও না কাহারও,—সে একটি ব্যক্তির হউক কিংবা ব্যক্তিবৃন্দের হউক্—হুকুমের তাঁবেদারী করিতে হয়—সে-হুকুম যেমন যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, তেমনই খেয়ালপ্রসূতও হইতে পারে। সুতরাং দাঁড়াইতেছে যে, মানসিক অশান্তির কবল হইতে-নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে শারীরিক অস্বাস্থ্যের হাত হইতে রক্ষালাভের ব্যবস্থা যেমন করিতে হয়, তেমনই স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন দ্বারা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভেরও ব্যবস্থা করিতে হয়। এইরূপ, শারীরিক অস্বাস্থ্য হইতে নিষ্কৃতি-লাভার্থ যেমন আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের ব্যবস্থা প্রয়োজন, তেমনই যে-শিক্ষা মোহজ আকাঙ্ক্ষা, কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাড়না-জয়ের সহায়ক হইতে পারে এবং আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের কোন্‌টি সুফলপ্রদ ও কোন্‌টি কুফলপ্রদ, তাহা বুঝিবার যাহা সহায়তা করে, তদ্রূপ শিক্ষারও ব্যবস্থা করিতে হয়। কেন না, কি জন্য মনুষ্য সুস্থ এবং অসুস্থ হয়, তাহার জ্ঞান, তথা সুফলপ্রদ আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য-লাভের নিমিত্ত স্বচ্ছলতা ব্যতীত শারীরিক স্বাস্থ্য কল্পিত হইতে পারে না। সুতরাং ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীকে শারীরিক অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি দান করিতে হইলে দেশের মধ্যে এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন, যদ্দ্বারা প্রত্যেকটি ব্যক্তি, প্রথমতঃ, কোন প্রকার বেতনভোগী চাকুরী ব্যতীত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে, এবং দ্বিতীয়তঃ, মোহজ আকাঙ্ক্ষা এবং কামক্রোধাদি রিপুদমনমূলক, তথা সুফলপ্রদ আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের জ্ঞানলাভসহায়ক শিক্ষা লাভ করিতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন উঠে যে, কি উপায়ে দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীর পক্ষে উক্ত প্রকার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং শিক্ষা লাভ সম্ভব করা যায়। শিক্ষা-সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে, যতদিন পর্য্যন্ত না দেশের জন-সাধারণ যাহাতে বেতনভোগী চাকুরী

এবং প্রতারণামূলক ব্যবসায়াদি ব্যতিরেকেই আর্থিক অভাব হইতে নিষ্কৃতিলাভকল্পে যথেষ্ট স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারে, ততদিন এই সমস্যার যথাযথ সমাধান হইতে পারে না। সুতরাং সকল সমস্যার উপরে সমস্যা দাঁড়াইতেছে যে, দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীর পক্ষে কি ভাবে বেতনভোগী চাকুরী অথবা প্রতারণামূলক ব্যবসায়ের মধ্যস্থতা ব্যতীত আর্থিক অভাব হইতে নিষ্কৃতিলাভ ব্যবস্থিত করা যায়।

এই প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে হইলে মনে রাখিবার প্রয়োজন হয় যে, অর্থ উপার্জ্জনের উপায় মাত্র নিম্নলিখিত চারি প্রকার :

(১) কৃষি (খনিজ সহ)

(২) শিল্প

(৩) ব্যবসায় (বাণিজ্য সহ)

(৪) বেতনভোগী চাকুরী।

অর্থ-উপার্জ্জনের এই চারিটি উপায়ের মধ্যে যে, বেতন-ভোগী চাকুরীর দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ সম্ভবপর হইলেও, তদ্দ্বারা প্রত্যাশানুযায়ী মানসিক অশান্তি হইতে অব্যাহতি লাভ সম্ভব নহে, ইহা আমরা দেখাইয়াছি। সুতরাং বেতনভোগী চাকুরীর ক্ষেত্র বৃদ্ধির চেষ্টা দেশের সমগ্র সমস্যার সমাধানের অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বাণিজ্য ও শিল্পকেও সর্ব্বদাই কৃষির মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়, কেন না, কাঁচা-মাল ব্যতীত কোন শিল্পই বাঁচিতে পারে না এবং কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের অভাব ঘটিলে বাণিজ্যও চলিতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যায় যে, দেশের মধ্যে লাভবান্ কৃষির অভাব ঘটিলে, শিল্প-বাণিজ্যও লাভবান্ হইতে পারে না।

বস্তুতঃ ইতিহাস সাক্ষ্য দান করিবে যে, প্রধানতঃ ভারতের কৃষির সাফল্য বশতঃই উহা পৃথিবীর সমৃদ্ধতম দেশ এবং বৈদেশিক ভাগ্যসন্ধানীগণের শিকারান্বেষণ-ক্ষেত্র হিসাবে পরি-গণিত হইতে পারিয়াছিল। ইতিহাস আরও সাক্ষ্য দান করিবে যে, কৃষিগত সাফল্যবশতঃই শিল্প-বাণিজ্যের দিক্ হইতেও ভারত একদা সর্ব্বাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সুতরাং ইহা অবশ্যগ্রাহ্য যে, ভারতের কৃষিগত সাফল্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে পারিলেই জন-সাধারণের সকল সমস্যার সমা-ধান সম্ভব হইতে পারে। এই বিষয়টি কেহ তলাইয়া বুঝিতে চাহিলে, দেখিতে পাইবেন যে, ভারতের কৃষিগত সাফল্যের পুনরুদ্ধার দ্বারা কেবল ভারতের সমস্যাসমূহেরই সমাধান যে সম্ভব, তাহা নহে, এতদ্দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা সমাধানেরও ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে, কেন না, এই সকল সমস্যাই মূলতঃ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের জন-সাধারণের অধিকাংশের অনশন, অর্দ্ধাশন, আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি লইয়া গঠিত। ইহা যে সম্ভব, তাহার কারণ এই যে, ভারতের কৃষিগত সাফল্যের পুনরুদ্ধার হইলে, ভারতে এত যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচামাল ও আহার্য্য দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে যে, তাহার উদ্বৃত্ত ঐ দ্রব্য-সমূহের অভাব-পীড়িতদিগের মধ্যেও বিতরিত হইতে পারিবে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-লিপ্সার কারণ-সন্ধানের নিমিত্ত অভিনিবেশ-সহকারে চেষ্টা করিলেও বুঝা যাইবে যে, ইহারও মূলে রহিয়াছে যুদ্ধ-রত দেশসমূহের জন-সাধারণের অধিকাংশের অনশন, অর্দ্ধাশন, আর্থিক অভাব, শারীরিক অসুস্থতা এবং মানসিক অশান্তির সমস্যা। অধুনা জার্ম্মানী এবং ইংলণ্ডের যুদ্ধে যাঁহারা লিপ্ত, তাঁহাদের মনোভাবকে যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে আমাদের এই বক্তব্য প্রমাণিত হইবে। জার্ম্মানীর কর্ণধার, হের হিটলার তো স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন যে, সমগ্র জার্ম্মান জন-সাধারণের জীবন-ধারণার্থ প্রয়োজন-পূরণের নিমিত্ত যে-আহার্য্য ও কাঁচামাল আবশ্যক, তাহা উৎপাদন করিবার পক্ষে বর্ত্তমান জার্ম্মানীর পরিসর যথেষ্ট নহে এবং সেই জন্যই তাঁহাকে জার্ম্মানীর অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করিতে হইতেছে। ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী যুদ্ধের কারণ বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেন না, তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, সংঘর্ষমুখীনতার দমনকল্পেই ইংলণ্ডকে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছে। ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রীর এই মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত কি না, বর্ত্তমান সন্দর্ভের তাহা আলোচ্য নহে। কিন্তু অপরাপর ঘটনা বিচার করিলে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইংলণ্ড তাহার স্বকীয় প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচামালের একশত ভাগের আশী ভাগের জন্যই অপরাপর দেশের আমদানীর মুখাপেক্ষী, এবং বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের যাহা বাজার, তাহা খর্ব্ব হইতে দেওয়া চলে না; কিন্তু জার্ম্মানীর আধিপত্য বিস্তার লাভ করিলে বৃটিশের বাজার খর্ব্ব হয়, সুতরাং ইংলণ্ড নিঃসংকোচে

জার্ম্মানীর বিস্তার সমর্থন করিতে পারে না। এই সকল ঘটনা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডের যুদ্ধ-যোগদানের প্রধান উদ্দেশ্য যদ্যপি জার্ম্মানীর সংঘর্ষমুখীনতার দমন, তথাপি ইহাও অস্বীকার করা চলে না যে, অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধান-প্রচেষ্টাও তৎপশ্চাতে বর্ত্তমান।

উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহার পুনরুক্তি করিলে দাঁড়াইবে যে, ভারতের কৃষিগত সাফল্যের পুনরুদ্ধার সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র জন-সাধারণের জরুরী সমস্যার সমাধান করিতে পারে।

পরবর্ত্তী বিচার্য্য হইতেছে—কি ভাবে ভারতের কৃষিগত সাফল্যের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় একাধিক বার আমরা এই আলোচনা করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে, ভারতের কৃষিগত সাফল্যের পুনরুদ্ধারের একমাত্র পন্থা হইতেছে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি এবং ইহা সাধনের একমাত্র পন্থা হইতেছে, ভারতীয় নদীসমূহের স্রোতকে বাধামুক্ত করা। ইহার অর্থ হইতেছে, ভারতের, তথা সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমস্যাসমূহের সমাধানকে লক্ষ্য হিসাবে ধরিতে হইলে রেল-রাস্তা, মোটর চলাচলের রাস্তা, রেলের সেতু, নদীতীরে নির্ম্মিত বাঁধ প্রভৃতি যাহা কিছু নদী-স্রোতের বাধাহীন গতিপথের প্রতিবন্ধক, তাহার বিস্তার এবং রক্ষাকারী সকল সংগঠনের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। স্থলপথসমূহের পরিবর্ত্তে জলপথের ব্যবস্থা করিলে যাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া কি ভাবে শান্তিরক্ষা করিয়াও এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহা আমাদের পূর্ব্বপ্রকাশিত অপর সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সুতরাং পরবর্ত্তী প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে যে, সমগ্র পৃথিবীর এবং তৎসহ ভারতের সকল মুখ্য সমস্যার সমাধান যদি ভারতের নদীসমূহের স্রোতকে বাধাহীন করিতে পারিলেই সম্ভব হয়, তবে তাহা পালিত হইতেছে না কেন?

ইহার একমাত্র উত্তর হইতেছে এই যে, ভারতের শাসন-কার্য্য পরিচালনার মূলে যে সকল ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা রহিয়াছেন, তাঁহাদের যেমন প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় নাই, তেমনই এই বিষয়ক অজ্ঞতা স্বীকার করিবার মত তাঁহারা সরল স্বভাববিশিষ্টও নহেন, এবং তাহারই ফলে অতি সহজ-সাধ্য সমস্যাসমূহের জটিলতা-পাশে আবদ্ধ হইয়া মনুষ্য-সমাজ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

বর্ত্তমান মনুষ্যজাতির, তথা ভারতের মুখ্য সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে অতএব আদি কর্ত্তব্য দাঁড়াইতেছে নিম্নলিখিত রূপ:—

প্রথমতঃ, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ যাহাতে স্বীকার করেন যে, তাঁহারা স্বদেশের জনসাধারণের, তথা তাঁহাদের শাসনাধীন প্রজাসাধারণের মুখ্য সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রকৃত পন্থা পরিজ্ঞাত নহেন, এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে;

দ্বিতীয়তঃ, হয় এই সকল সমস্যা সমাধানের প্রণালীর সন্ধান তাঁহাদিগকে দান করিতে হইবে, নয় ভারতবাসিগণ নিজেরা যাহাতে তাহাদের সমস্যা-সমাধানে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার সুযোগ দানে তাঁহারা বাধ্য হন, এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে।

অনেকের পক্ষে মনে হইতে পারে যে, ভারতবাসিগণ কোনক্রমে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের (ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস) অধিকার লাভ করিতে পারিলেই ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ তখন সমস্যা-সমাধানের প্রকৃত পন্থার অনুসরণ করুন আর নাই করুন, তাহাতে বিশেষ কিছু যাইবে আসিবে না, কেন না তখন ইংলণ্ডের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই ভারতবাসিগণ উহা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারিবেন। আমাদের মতে, স্বাধীনতার সারবস্তু এমন দ্রব্য নহে, যাহা একের হস্ত হইতে অপরের হস্তে তুলিয়া দেওয়া যায়, সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত ভারত-বাসিগণ নিজেরা সে যোগ্যতা লাভ করিতে না পারিতেছেন, ততদিন তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবেন না। ব্রিটিশ-গণ কেবল এইটুকু মাত্র করিতে পারেন যে, বর্ত্তমানে যে সকল দায়িত্বসূচক পদে তাঁহারা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহারা অবসর গ্রহণ করিবেন। কিন্তু, নিজেদের সমস্যাসমূহের সমাধানে নিজেরা যে ভাবে প্রকৃত পন্থায় চলিবেন, তাহার সামর্থ্য ভারতবাসিগণ অর্জ্জন না করিতে পারিলে কেবল, উল্লিখিত ব্যবস্থাতেই ভারতবাসিগণ স্বাধীন হইতে পারে না। সত্য কথা বলিতে হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রিটিশ জাতির অবসর গ্রহণ করিবার পর ভারত-শাসন-কার্য্যের দায়িত্ব যাঁহারা লাভ করিবেন, সেই ভারতবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশবাসীর মুখ্য সমস্যা-সমূহের সমাধান বিষয়ে ব্রিটিশগণের মতই, কিংবা ততোধিক অজ্ঞ ও নির্ব্বোধ। সুতরাং দায়িত্বসূচক পদ হইতে ব্রিটিশ-

গণের অবসর-গ্রহণের ফল দাঁড়াইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে কেবল একটিমাত্র,—ভারতবাসিগণের পরস্পরের দ্বন্দ্ব কলহ, ফলতঃ সর্ব্বব্যাপক অরাজকতা। ব্রিটিশগণ যদি অবসর গ্রহণ করেন, তবে ইহাই ঘটিবার আশঙ্কা। তদুপরি লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশগণের পক্ষ হইতে ভারতশাসন-কার্য্যে সম্পূর্ণ ইস্তফা-দানের চিহ্ন মাত্রও অদ্যাবধি দেখা যায় নাই। ভারতকে যে প্রকারেরই হউক, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দানের ইঙ্গিত যদিই বা তাঁহারা দান করিয়া থাকেন, তথাপি ভুলিলে চলিবে না যে, নিজেদের কার্য্যের সুবিধার জন্যই তাঁহারা তাহা করিতেছেন, কিন্তু ভারতের সহিত তাঁহাদের সকল সম্পর্ক চুকাইতে তাঁহারা পারেন না এবং তাহা করিতে তাঁহারা চাহেনও না। এই অবস্থার সম্যক্ উপলব্ধির দ্বারা বুঝা যায় যে, এমন কি ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস লাভে কৃতকার্য্য হইলেও ইংলণ্ডের সম্মতি ব্যতিরেকে অদূরভবিষ্যতে ভারত স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কোন কার্য্যেই অগ্রসর হইতে পারে না।

অবস্থা যখন এই, তখন, ভারতবাসিগণকে তথা-কথিত ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস অর্পণ করিয়া ব্রিটিশজাতি তাঁহাদের সকল দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন, এমন ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া যে মোটেই নিরাপদ নহে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং ইহার একমাত্র পরিবর্ত্ত হইতেছে, আমরা উপরে যেরূপ বিবৃত করিয়াছি, তদনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি ; যথা :—

প্রথমতঃ, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ যাহাতে স্বীকার করেন যে, তাঁহারা স্বদেশের জনসাধারণ তথা তাঁহাদের শাসনাধীন প্রজা-সাধারণের মুখ্য সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রকৃত পন্থা পরিজ্ঞাত নহেন, এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি ;

দ্বিতীয়তঃ, হয় ভারতবাসিগণের তথা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের মুখ্য সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রণালী ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে উহার সন্ধান দান করিতে হইবে, না হয়, ভারতবাসিগণ নিজেরা যাহাতে নিজেদের সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার সুযোগ দানে যাহাতে তাঁহারা বাধ্য হন্, এমন অবস্থার সৃষ্টি।

এই দুইটিকে ভারতবাসীর, তথা সমগ্র মনুষ্যসমাজের মুখ্য সমস্যাসমূহের জরুরী সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে উপযোগী পূর্ব্ব-ব্যবস্থা বলা চলিতে পারে।

এক্ষণে আমরা বিচার করিব, আপোষমূলক কিংবা সংঘর্ষমূলক কার্য্যক্রমের কোন একটির দ্বারা এই দুই অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে কি না।

মিঃ গান্ধী-প্রস্তাবিত আপোষমূলক কার্য্যক্রম সার্থক হইলে, ভারতবাসিগণ 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস' লাভ করিতেছেন এবং ভারত-শাসনের দায়িত্ব ব্রিটিশগণের হস্ত হইতে ভারতবাসিগণের হস্তে ন্যস্ত হইতেছে। ইহার ফল দাঁড়াইবে যে, ভারতের সমস্যাসমূহের সমাধান বিষয়ে ব্রিটিশগণ আর আইনতঃ দায়ী থাকিবেন না। ফলতঃ, শিক্ষিত ভারতবাসীর যে-অংশ ভারত-শাসন-পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হইবেন, জমীর উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধিকল্পে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাঁহারা যেমন অবলম্বন করিতে পারিবেন না, কেন না তাঁহাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়গত বিদ্যালব্ধ বিজ্ঞানের কুত্রাপি উহার সন্ধান মিলে না ; তেমনই যদিই বা তাঁহারা ঐ বিদ্যালাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, কিন্তু, তখন পর্য্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ-জাতির বহু স্বার্থ ন্যস্ত থাকিবে বলিয়া ভারত-শাসন ব্যাপারে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বও বহুলাংশে বজায় থাকিবে ; সুতরাং ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের কাহারও ঐ ব্যবস্থার অনুধাবন-সামর্থ্য নাই বলিয়া, উহা তাঁহারা কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিতে পারিবেনও না। ভারতীয় শাসন-পরিচালনা-বিষয়ে ভারতীয়গণের কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ব্রিটিশজাতি যদি এই ব্যবস্থায় স্বীকৃত হন্, তবেই কেবল ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস লাভ করিলে ভারতীয় সমস্যা-সমূহের সমাধান সম্ভব হইতে পারে। ভারতে ব্রিটিশজাতির যে-স্বার্থ ন্যস্ত রহিয়াছে, ভারতবাসিগণের হস্তে তাহা বিন্দু-মাত্রও ক্ষুণ্ণ হইবে না, এই বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে নিঃসন্দিগ্ধ না হইলে তাঁহারা এই ব্যবস্থায় কখনও সম্মতি দান করিতে পারেন না। বলাই বাহুল্য যে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসিগণের একাংশ যখন ব্রিটিশ-জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিবার চিন্তায় পঞ্চমুখ, তখন ভারতবাসিগণের হস্তে ভারতে তাঁহাদের ন্যস্ত স্বার্থ যে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইবে না, এ বিষয়ে ব্রিটিশজাতির নিঃসন্দিগ্ধ হইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না।

সুতরাং অতি অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মিঃ গান্ধী-প্রস্তাবিত আপোষমূলক কার্য্যক্রম দ্বারা কোন ক্রমেই ভারতের জরুরী সমস্যাসমূহের সমাধান সম্ভাবনা নাই।

মিঃ গান্ধী-প্রস্তাবিত আপোষমূলক কার্য্যক্রম সম্বন্ধে ইহাই বলা যায়; কিন্তু মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু প্রস্তাবিত সংঘর্ষমূলক কার্য্যক্রম এতদপেক্ষা হাস্যকর এবং অপরিণত। মনে রাখিতে হইবে যে; ভারতবাসিগণের অধিকাংশের পক্ষে অনাহার এবং বেকার-সমস্যা এমন তীব্র হইয়া পড়িয়াছে যে, যদি সাধ্য হয়, তবে তাহার সমাধানে যুক্তিসঙ্গত ভাবে আর একটি দিনের বিলম্ব ঘটিতে দেওয়াও উচিত নহে। প্রথমতঃ ব্রিটিশ জাতির পক্ষে ভারতবাসিগণকর্ত্তৃক আনীত কোন প্রকার সংঘর্ষমূলক কার্য্যক্রম সার্থক হইতে পারে কি না, তাহা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন প্রকার সংঘর্ষমূলক কার্য্যক্রম যদিই বা সার্থক হয়, উহা জন-সাধারণের মহা দুঃখ এবং রক্তপাতের কারণ উপস্থিত করিবে—সে অবস্থা কখনও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, সংঘর্ষমূলক কার্য্যক্রম শেষ পর্য্যন্ত সার্থক হইলেও, তদবস্থায় জন-সাধারণের জরুরী সমস্যাসমূহের সমাধানে এরূপ বিলম্ব নিশ্চয়ই ঘটিবে যে, ততদিন তাহারা ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবে না, সুতরাং দেশময় অরাজকতা সৃষ্ট হইবে।

অতএব আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, জন-সাধারণের অধিকাংশের স্বার্থের দিক্ হইতে দেখিলে আপোষমূলক অথবা সংঘর্ষমূলক, উভয় কার্য্যক্রমই ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

এইবারে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, কি শ্রেণীর কার্য্যক্রমের জন-সাধারণের স্বার্থ-রক্ষার বিষয়ে সহায়ক হইবার সম্ভাবনা।

এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু তথাপি যদি কোন রাজপুরুষ অথবা নেতা, আত্ম-বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসু হন, আমরা সানন্দে তাহার পুনরালোচনা করিব।*

মোহর্‌রম্‌

—আব্দুর রহ্‌মান

এসেছে মোহররম্‌,
মানস নয়নে ভাসে 'কারবালা'
ফোরাত ও জমজম,
হাসান, হোসেন বীর,
তাঁহাদের স্মৃতি হৃদিপটে জাগে
নয়নেতে বহে নীর।
সাকিনা ও আসগর—
মুখে বলি শুধু, মর্সিয়া গাহি
ভাঙিয়ো না পঞ্জর,
ত্যাগের মহান ব্রত,
সাধন করিয়া মুস্‌লিম হও
ধরায় সমুন্নত।

---

* "দি উইক্‌লি স্বদেশী"র ৮ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।



চোরাবালি

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে মন্থরগতি গরুর গাড়ী বাড়ীর কাছাকাছি আসিল, ফুলবাগানের পাশে সুরুচি গাড়ী থামাইতে বলিলেন, নামিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া দিলেন। ভাড়ার চেয়ে বেশী দিলেন বকশিশ, বলিলেন, "তুমি বাক্স আর বিছানা ঐ বারান্দায় রেখে এস, গোল ক'র না, আমার বাবার অসুখ, ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

গাড়োয়ান চলিয়া গেলে সুধীর গেল লীলার মহলে। সুরুচি বারান্দায় উঠিয়া দেখেন, একটা ঘরে বিছানায় কে শুইয়া আছে—জানালা ধরিয়া আস্তে আস্তে ডাকিলেন, সে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

সুরুচির মেজদির ছেলে ছুটীতে আসিয়াছে।

"দাদু, বাবা কেমন?"

"একটু ভাল।"

ঘরে আসিয়া সুরুচি দেখিলেন—মেঝেতে দিদি শুইয়া আছেন—দিদির এই অভ্যাস, মেঝেয় বসিয়া কথাবার্তা বলিতে বলিতে সেইখানে ঘুমাইয়া পড়েন, ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখেন ভোর হইয়াছে, আর বিছানায় শোওয়া হয় না।

"দিদি ওঠ।"

দিদির ঘুম তেমনি—অনেক চেষ্টায় ভাঙ্গিল, অবাক্ হইয়া বলিলেন, "তুই না স্বপন?"

"আমি—বাবার জন্যে—"

ওদিক হইতে লীলা ছুটিয়া আসিয়াছে, সে ইহার মধ্যে দিব্য পাকা গিন্নী হইয়া উঠিয়াছে, তেজেনকে ডাকিয়া তুলিল, এবং ময়দা মাখিতে বসিল। সুরুচি বার বার বারণ করিলেন, সে শুনিল না।

সুধীর বলিল, "আপনি না খান আমার দরকার আছে।"

তেজেন বলিল, "আমারও।"

*

ভোর হলে ঘড়ি দেখিতে আসিয়া পিতা সুরুচিকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "বড় খুকী না? এল কখন ও?"

সুরুচি ঘুমের মধ্যেই শুনিতেছেন—অর্থাৎ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুম। দিদি বলিলেন, "কাল রাত দুটোয়—"

"কি অন্যায়, চিঠি দেয় নি কেন?"

"চিঠি দিয়েছিল, আমরা পাই নি।"

"কার সঙ্গে এল? হেঁটে এসেছে না কি?"

"না, গাড়ী পেতে দেরী হয়েছিল, সুধীর আছে সঙ্গে।"

এক সময় সুরুচি বলিলেন, "দিদি দোকানের লোকগুলোর জন্যে আমার যা ভয় করছিল, কেবলই ও-দোকানের লোক এ-দোকানে আসে, এ-দোকান থেকে ও-দোকানে যায়—আমারই পাশ দিয়ে এক-শো বার পথ পার হতে লাগল।"

দিদি বলিলেন, "তারা তোমায় পাহারা দিলে, অত রাত্তিরে একা পথে বসে রয়েছ সেই জন্য; কাছে এসে যদি বসে থাকে তবে খারাপ দেখায়, তাই ও-রকম করলে। লোকের ভালটাই ভাবতে হয়, ভগবান্ মাথার ওপর আছেন, তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখলে কিছু অনিষ্ট হয় না।"

সুরুচি ও তাপসী দিদির হাতে গড়া, সংসারটাই দিদির হাতে গড়া। দিদি সুরুচির চেয়ে ছয় বছরের বড়।

দুই মাস সুরুচি বাপের বাড়ী রহিলেন, কলিকাতা হইতে তাপসী, পদ্মা, দ্বিজেন আসিল, বিশ্বকর্ম্মা বার চারেক আসিলেন।

লীলাও দিদির মত হইয়া উঠিয়াছে—রান্নাঘর হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করা যায় না। ঘোষ বংশের বউরা রূপে-গুণে অদ্বিতীয় হয়, এটা প্রায় প্রবাদ। পদ্মা সেলাই-শিল্পে ওস্তাদ, গান-বাজনায়ও। লীলা রান্নায়, গৃহকর্ম্মে, গৃহিণীপনায়।

বারান্দায় সকলে খাইতে বসেন, লীলা পরিবেশন করে, পিতা বসিয়া দেখেন। লীলা তাঁর সব চেয়ে বেশী স্নেহের—মেয়েরা বলে, মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী।

লীলার নৈপুণ্যের একটা উদাহরণ দি। হাট থেকে একটা ছোট দু'সের ওজনের চিতল মাছ আসিয়াছে, দ্বিজেন

চেঁচামেচি বাধাইল, ও-মাছ অন্ততঃ চার-পাঁচ সের না হইলে খাইবার যোগ্য হয় না, এবং গলায় কাঁটা বেঁধে। বেগতিক দেখিয়া দিদি বলিলেন, "গাছতলায় পুঁতে দিকগে।" গাছের গোড়ায় প্রায়ই মাছের সার দেওয়া হয়।

লীলা মাছ লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

ঘণ্টা দুই পরে সেই মাছটা আস্তই একটা বড় থালায় পাতের কাছে আনিল এবং ছুরি দিয়া লম্বা ভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া লীলা সকলের পাতে দিল। তখন দ্বিজেন বুঝিল অদ্ভুত উপায়ে সমস্ত কাঁটা ছাড়াইয়া গোটাই রান্না হইয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "সাক্ষাৎ দ্রৌপদী!" সকলের সামনে লজ্জা পাইয়া লীলা পলায়ন করিল।

ছেলেরা সাধ্যপক্ষে পিতার কাছে ঘেঁসে না, বউ-মেয়েরা ধমক খাইয়াও কাছে-কাছে, পাশে-পাশে থাকে। সুরুচি বলেন :

"পুত্র রহে পুত্র সম যত দিন না করে সে কলত্র গ্রহণ।
কিন্তু কন্যা রহে কন্যা সম যাবৎ জীবন।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "না, কর্ত্তা মেয়েদের চেয়ে কলত্রদের বেশী ভালবাসেন, ও ভীরুরা সামনে যেতেই সাহস পায় না।"

পিতার মনটি সবাই জানে, বৌয়েরা গরদ মটকার শাড়ী পরিয়া মন্দিরের কাজ করে। মেয়েরা বাপের বাড়ী আসে, আসিয়াই গোপালের ও পিতার সেবার ভার লয়—দুইই তাদের কাছে এক, একের তৃপ্তিতে অন্যের সন্তুষ্টি। অথচ পাঁচটি বোনেরই কি না বিবাহ হইয়াছে ঘোর অনাচারীর ঘরে, বিধিনির্ব্বন্ধ যাহাকে বলে। কিন্তু মেয়েদের মজ্জায় পিতার জেদ—বৈশিষ্ট্য তাহারা বজায় রাখিয়াছে।

বার বছর বয়সে সুরুচি শ্বশুরবাড়ী গিয়া দেখেন, মাংস-পেঁয়াজ-ডিম না হইলে বিশ্বকর্ম্মাদের খাওয়া হয় না। দিদিকে গিয়া বলিলেন। দিদি বলিলেন, "আমাদের সবার শ্বশুর-বাড়ীই তাই, ওতে দোষ নেই, ওরা জাত ভালই।"

সুরুচির ধারণা ছিল, যাহারা ঐ সব খায় তাহারা হিন্দু নয়, শাক্ত। কপালে তিলক-কাটা, বাড়ীতে কীর্ত্তন "অষ্ট-প্রহর" দেওয়া, মহোৎসব দেওয়ারও বিরাম নাই—আবার মাংস পেঁয়াজও। তাঁহাদের পরিবারের মেয়েরা "কাটা কুটি" বলেন না। সুরুচি তরকারী "কুটিতে" চাহিয়া বিষম বিপদে পড়েন, "ও কি বউ, বানানো বলতে শিখলে না, আজও? কাটা কথাটা যুদ্ধের ব্যাপার, বৈষ্ণব পরিবারে উচ্চারণ নিষেধ।" তাঁহারা পাঁঠাও বানান, কাটেন না।

তাপসী বলেন, "দিদি তুমি মোগল বাদশার হিন্দু বেগম।"

বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "সোজা হিন্দু! হিন্দুয়ানীর জ্বালায় আমরা ত্রাহি ত্রাহি করি।"

পিতার ধারণা তাঁর জামাইরা দেব-অবতার—মেয়েরা অতি স্বাধীন, বেজায় পণ্ডিত ও ওস্তাদ। মনের ভাব তাঁহার কথাতেই সর্ব্বদা প্রকাশ।

তাপসী খুব ভাল হোমিওপ্যাথি জানেন, নিত্য বহুলোকে ঔষধ লইতে আসে, বাড়ীর চিকিৎসা তো আছেই। পিতা বলেন—"ও ভারি ডাক্তার হয়েছে!" আবার নিজের কোন অসুখ হইলে আগে তাপসীকে খোঁজেন—"কৈ রে ছোট খুকী আমার ওষুধ দিয়ে যা।"

হলটি আড্ডা-ঘর—রাত্রে বোনেরা এই ঘরে থাকেন। খাট চৌকিতে ভিন্ন ভিন্ন বিছানা। দিদি নরম বিছানা না হইলে শুইতে পারেন না, যদিও কার্য্যতঃ মেঝের শানের উপরই কাটে। তাপসীর লেপ-তোষক শুদ্ধাচারের চোটে অতি-ধৌতির ফলে স্বর্গলাভ করিয়াছে বহুবার—এখন কম্বল সম্বল। ভাইয়েরা ঝগড়া করিয়া করিয়া এখন হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা আশঙ্কার কথা, লীলাও বোধ হয় অচিরাৎ দলে ভিড়িবে—লক্ষণ দেখা গিয়াছে—পুকুর-ঘাট হইতে আসিতে চায় না। দিদি রাগ করেন—"দুনিয়ার পাহাড়-পর্ব্বত নিয়ে লীলা ঘাটে যায়।"

পিতার নিয়ম—বিবাহের পর ছেলেরা সস্ত্রীক গঙ্গা স্নান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করে।

নিমাইচাঁদ পিতার দোসর, ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতেছে—কাপড় পরিবে না, বিশ্বকর্ম্মার আসিবার দিন কয়েক আগে হইতেই পিসিমারা নিমুকে পাখী-পড়া করাইতেছেন—"পিসেমশাই আসবে, সভ্য হয়ে থেক।"

বিশ্বকর্ম্মাকে দেখিয়া দিন কয়েক নিমু সভ্য হইয়া রহিল, শেষে হলের সভার মধ্যে একদিন অতিষ্ঠ হইয়া কাপড় ফেলিয়া ছুট—"অ নিমু—ছি ছি—"

"না—আমি আর পারি নে, তোমরা বললে, পিসেমশাই

দু'তিনদিন থাকবে, দু'তিনদিন তো হয়ে গেছে, পিসেমশাই যায় না, কিছু না," বলিয়া নিমু নিরুদ্দেশ।

পিতা ডাকিলেন—"দাদামণি শোন শোন।"

"না দাদামণি, না, আমি কিছু শুনব না।"

নিমু বেশভূষার বাহুল্য সহিতে পারে না—মায়ের সাড়ী-গহনার বাহার দেখিয়া বিরক্ত এবং আশৈশব দাদামণির দলে। কৃত্রিম সুগন্ধি সহিতে পারে না—ফুল-ধূপ-চন্দন-গন্ধের ভক্ত। যাহারা প্রসাধন দ্রব্যাদি ব্যবহার করে, নিমু তাহাদের হইতে দশহাত দূরে থাকে। "উঁ পিসিমা কি তেঁল মেঁখেছ মাঁথায়—ছিঁ ছিঁ" বলিতে বলিতে নাক টিপিয়া ধরিয়া নিমু ঘর ছাড়িয়া পলায়।

পিতা বলিলেন "দাদামণি খোকাকে ডাক।" খোকা—প্রফুল্ল।

নিমু গিয়া দেখে প্রফুল্ল স্নো মাখিতেছে—তৎক্ষণাৎ এক দৌড়ে এ ঘরে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"বাবা তোমার স্নো মাখা হোল? এস দাদামণি ডাকছেন।"

"পাজি ছেলে দাঁড়া"—পাজি ছেলেকে শাসন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

বৈকালে ছেলে-মেয়েকে পাউডার মাখাইবার সময় নিমু আগেই আয়ত্তের বাহিরে যায়। বোনদের বলে "পেত্নীরা, আমার কাছে আসিস নে।" এক একবার বলে, "আচ্ছা পিসিমা, কলের ময়দা কি এরারুট মাখলে হয় না? ও-ও যা এ-ও তাই, কেবল কেবল খানিক গন্ধ-বিচ্ছিরি গন্ধ!" দুষ্টামি করিলে তাহার চরম শাস্তি—"আন্‌ত রে গন্ধতেলের শিশিটা," বাস্! নিমু ব্যাকুল হইয়া কাঁদে—"আর করব না—আর করব না।"

"দাদামণি তোমার কত মেয়ে? এ ডাকে বাবা, ও ডাকে বাবা; সব পিসিমা তোমার মেয়ে? এত মেয়ে কেন দাদামণি?"

"তুমি আমার মেয়েদের ওপর চোখ দিয়ো না দাদামণি।"

বাহিরের বারান্দায় সকলে বসিয়া আছেন—নিমু বারান্দায় সামনের গোলাপ গাছগুলা দেখিতেছে—আটটি গাছ, নিমু দাদামণির সঙ্গে গাছগুলি ভাগ করিয়া লইয়াছে, সিঁড়ির ডান-দিকের চারটি নিমুর, বাঁ-দিকের চারটি দাদা-মণির; নূতন কলমের গাছ, সবে কুঁড়ি ধরিয়াছে।

"দাদামণি, দেখ দেখ, কি মজা! তোমার গোপাল কোন কম্মের নয়, গাছে ফুল ফোটাতে পারে না, আমার গোপাল কেমন ফুল ফুটিয়েছে।" সত্য সত্যই নিমুর চারটি গাছে পাঁচ-ছয়টা ফুল ফুটিয়াছে—অমনি ফুলগুলি তুলিয়া লইয়া নিমু গিয়া পূজায় বসিল। তাপসীর ঘরে তার আসন, একটু পরে প্রসাদ আনিয়া দিল—না লইলে রক্ষা নাই।

"দাদামণি—তোমার গোপালের কত গয়না, কত পোষাক, কত লোকজন, কত বাবুগিরি, তবু তোমার গোপালের কোন গুণ নেই—আমিও গরীব, আমার গোপালও গরীব।"

পিতা দিদিকে বলিলেন "হাঁ রে, তোরা নিমুর গোপালের জন্যে কিছু দিস নে?"

"দেব কি বাবা—নিমু নিজেই সব নিয়ে আসে—না পেলে পুরোহিত ঠাকুরকে মেরে আধ-মরা করে।"

"ছি দাদামণি, বামুনের গায়ে হাত দাও?"

"ও আলমারীতে সব বন্ধ করে রাখে কেন?"

নিমুর হাতের মার না খাইলে কাহারও দিন ভাল যায় না।

সাতবছরের ছেলের রামায়ণ মহাভারত কণ্ঠস্থ, পুরাণ-উপাখ্যানে নিমুকে হারাইতে পারা কঠিন। নিমুর ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া এক এক সময় পিতার মুখে চিন্তার সূক্ষ্ম জাল পড়ে।

অন্নপ্রাশনের দিন নিমু ভয়ানক কাঁদিয়াছিল, হাতে-খড়ির দিন ততোধিক—শেষে ফিট হইবার উপক্রম, কোন সামাজিক কাজের মধ্যে নিমুকে নামান যায় না। সে পিসিমাদের সঙ্গে দীর্ঘ উপবাস করে—প্রতি পূজা-পার্ব্বণের দিন।

নিমুর কথার সুর ও ধরণ ঠিক সুরুচির পিতার মত। দ্বিজেনের আসিতে দেরী হইলে বলে—"বড়কাকা তুমি কোথায় গিয়েছিলে? খাও দাদামণির কাছে আজ পিট্টি!"

"ছোট কাকা তুমি এত বেলায় ওঠ কেন? দাদামণি বলে ওটা কিছু লেখা পড়া করে না।"

সুরুচি বলেন—"বেশ, বেশ ঠিক আমাদের ছোট বাবা।"

"এসেন্সের শিশিটা কোথা দিদি? দিই ওর গায়ে ঢেলে—"

দ্বিজেন কলিকাতা যাইবে—প্রত্যেকবার প্রকাণ্ড ফর্দ্দ হয়, ফর্দ্দ-তৈরীতে তাপসী নিপুণ—সুরুচিও কিছু কিছু জানিতে দিলেন।

ফর্দ্দে একশিশি অনুপমা তেলের কথা লেখা ছিল, তেলটা বাহির হইয়াছে অনেকদিন—এ পর্য্যন্ত আনা হয় নাই।

পিতা ফর্দ্দ পড়িয়া বলিলেন "অনুপমা কে?"

সবাই চুপ! সুগন্ধি জিনিষ ফর্দ্দে লেখা হয় না, বাবা দেখিবেন বলিয়া, গোপনে আনা হয়। অনুপমা বিশ্বকর্ম্মার ফরমাস, কিন্তু তিনি এমন ভাবে বসিয়া রহিলেন যেন কিছু জানেন না, লিখিয়াছেন ভুল করিয়া।

পিতা আবার বলিলেন "কে অনুপমা? কলকাতা থাকে? এখানে আসবে না কি?"

পিতা ভাবিয়াছেন নিরুপমা কাহার কোন আত্মীয়, দ্বিজেন তাহাকে লইয়া আসিবে, ভুল না হয়, সেইজন্যে ফর্দ্দে লেখা হইয়াছে।

কে বলিবে অনুপমা তেল—মানুষ নয়?

পিতা একটু সন্দিহান হইয়া বলিলেন "সব চুপ করে আছিস কেন? জিনিষ নে না কি? লেখা কার? ছোট-খুকীর লেখা—ও তো দুনিয়ার লোককে চেনে, ও ভারি দাতা! একে বাড়ী করে দেয়, ওকে টাকা পাঠায়, যে খরচ করে ও? কলকাতায় ওরই বেশী ফরমাস।"

অবশেষে দিদি বলিলেন "ও একরকম তেল মাথা ঠাণ্ডা হয় ওরা আনতে দিয়াছে।"

"কি,—তেল? তেলের নাম অনুপমা? যত সব"—বলিয়া ফর্দ্দ ফেলিয়া দিলেন।

পরে তাপসী বলিলেন "বেশ জামাইবাবু, একটি কথাও না।"

"কর্ত্তার কাছে অনুপমার ব্যাখ্যা?"

দিদি বলিলেন "বড়দি অবধি বাবাকে পেড়ে কাপড় পরতে দেখে নি, বাবা চিরদিন একরকম—ঐ পোষাকেই শ্বশুরবাড়ী যেতেন।"

"কর্ত্তার আবার শ্বশুরবাড়ী ছিল না কি? মনে হয় না দেখে। জামাইয়ের সামনে শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের বেরবার সাহস হত না বোধ হয়।" ধাক ধাক্কাটা ছোট খুকীর উপর দিয়াই গেল।

সুরুচিদের মাসীমা আছেন জন কয়েক, মায়ের মামাতো বোন। একজন খুব আধুনিকা। কবিতা লেখেন, প্রায়ই হাওয়া বদলাইতে যান, প্রত্যেকটি সন্তান কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার ও নার্সদের তত্ত্বাবধানে জন্ম গ্রহণ করে, গরীব স্বামীটির দফা শেষ—এই ব্যয়ভার যোগাইতে।

আনন্দ-কুটীরে বেড়াইতে আসিয়াছেন, শ্যালী সম্পর্কে গেলেন সুরুচির পিতার সঙ্গে কিছু রহস্যালাপ করিতে—অনেক দিন পরে দেখা।

দিদি বলিলেন, "মাসীমার কপালে আজ কিছু আছে।"

"—কি ঘোষ মশাই—খোঁজ খবরও যে নেন না—"

মাসীমা সুরুচির সমবয়সী।

ঘোষ মহাশয় চাহিয়া দেখিলেন, "ব'সো—তার পরে—তোমার শাশুড়ী কোথা?

"দেশের বাড়ীতে।"

"সেখানে আর কে আছে?"

"আমার এক ননদ আছে।"

"দুটি স্ত্রীলোক সেই দূর দেশে পড়ে আছে, তোমার বাসায় কি জায়গা হয় না? শাশুড়ীর সেবা-যত্ন করাই তোমার সবার বড় কাজ, সেটা কর না বুঝি? বছরে বার তিনেক কলকাতায় যাও শুনেছি, দেশের বাড়ীতে ক'বার যাও?"

মাসীমা নিরুত্তর!

"ভাল নয়—বুঝলে? একটি ছেলে—তার স্ত্রীর কাছে কি কোনই আশা নেই? মনে রেখো, শাশুড়ীর সঙ্গে যে ব্যবহার করবে, নিজের ছেলের বৌয়ের কাছে ঠিক তাই পাবে, তখন মনে পড়বে।"

শাশুড়ীর সঙ্গে মাসীমার অবনিবনার খবর কাহারও অবিদিত নহে।

এর পরে মাসীমা আর ঘোষ মহাশয়ের ত্রিসীমায় যান না।

ঘোষ মহাশয়ের পরিহাস-প্রণালীও বেশ। মাসীমার এক ভাই সুরুচিদের মামা প্রফুল্লের সঙ্গে কাপড় রং ও ছাপার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, সদুপদেশ লইতে আসিলেন চৌমহনী যাওয়ার আগে।

"শোন, তোমরা ময়লা কাপড় চোপড় ধুয়ে দাও তো?"

"আজ্ঞে না, আমরা রং করি।"

"ঐ তাই মানেই তাই, ও দুইই এক, কোরা কাপড় ধুয়ে রং কর না তোমরা? তবেই হলো, তা আমার অনেক গুলো পশমী কাপড় চোপড় ময়লা হয়ে রয়েছে, সে-গুলো নিয়ে যাও বুঝলে? বেশ ভাল করে ধুয়ে দিও, ফাঁকি দিও না যেন। তা হলে ব্যবসা চালাতে পারবে না, খুলেছ ত ধোবার ব্যবসা। হাঁ্যা, রং করো না যেন, আমার রংয়ের দরকার নেই; দামী কাপড় বুঝলে? নষ্ট হয় না যেন। এই ছোট খুকী, ডাক সরযুকে, আর তোদের ময়লা কাপড়-টাপড় যা আছে দিয়ে দে তোর মামাকে।"

ছেলেদের সঙ্গে—"এই গোপু—ঠাকুর মশায়কে ডেকে আন তো"

"ঠাকুর মশায়ের বাড়ী আমি চিনিনে।"

"চিনিস্‌নে—ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী চিনিস নে? তোদের বাড়ী চিনিস তো?"

"চিনি।"

"কোনটা তোদের বাড়ী?"

"এইটে।"

"তবু ভাল, নিজের বাড়ীটা যে চিনেছিস, সেও ভাগ্য।"

নিমুর জ্বর হইয়াছে।

"হাঁরে খোকা হাটে গিয়েছিলি কেন?"

"কিছু জিনিস-পত্র আন্‌তে।"

"নিমুর বিস্কুট আনিস নি কেন?"

"ভুলে গিয়েছিলাম—"

"আর যা যা কিনতে গেছলি সেগুলো ভুল হয় নি তো?

"না।"

"নিমুর বিস্কুটটাই ভুল হয়েছে? তা বেশ—বেশ, ওটা বড়ই অপ্রয়োজনীয় জিনিস, তোদের সারা দিন যে রকম গুরুতর কাজ-কর্ম্ম, অত কি মনে থাকে? না অবসর হয়? ঠিক কথাই বটে।"

প্রফুল্ল আবার বাইক চড়িয়া আড়াই মাইল দূরে ছুটিল।

সুরুচির খুড়তুত বোন ইলা মাস তিনেক হইল আসিয়াছে, আজ যাইবে। ইলা তাপসীর বয়সী।

বারোটার গাড়ী। বেলা নয়টার মধ্যেই তৈরি হইয়া ইলা কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ও বাড়ীতে জনে-জনের কাছে কাঁদিয়া প্রণাম আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইয়া আসিল এ-বাড়ী, সঙ্গে সকলেই আসিল।

মেজদির ঘরে গিয়া কান্নার মধ্যেই কথা বলিয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইল। দুয়ারে দিদির সঙ্গে দেখা, তাঁহাকেও প্রণাম ও কান্না, তার পরে সুরুচি, তাপসী, প্রফুল্লরা, সৌম্যেরা—একে একে সকলকেই সম্ভাষণ করিল এবং বিদায় লইল অজস্র কান্নার মধ্য দিয়াই।

ইলাকে কেন্দ্র করিয়া সকলে হল-ঘরে আসিল। আনন্দ-কুটীরের সামনে গরুর গাড়ী, বিছানা পাত্তা ও জিনিস পত্র তোলা হইয়াছে, জ্যেঠামহাশয়কে প্রণাম করিয়া এইখান হইতেই ইলা গাড়ীতে উঠিবে।

বাহিরের বারান্দায় এক দিকে একটা ইজি চেয়ার, তার কাছে নীচু টুলে জল, ঘটি, গামছা। পিতা একবার গরু-বাছুর গাছপালার তদারক করিয়া আসেন—হাত-মুখ ধুইয়া একটু বসিয়া বিশ্রাম করেন আবার যান।

সবে পাঁচনটা রাখিয়া একটু বসিয়াছেন,—ইলা গিয়া কাছে দাঁড়াইল। 'জ্যেঠামশায়' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পায়ের ধুলা লইতে গিয়া বসিয়া পড়িয়া দ্বিগুণ বেগে কাঁদিতে লাগিল।

গাড়োয়ান একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, ঘড়ী না দেখিয়াও তাহারা নির্ভুল সময় আন্দাজ করিতে পারে।

ইলার কান্নার বহর দেখিয়া স্বামী বেচারা তাগাদা দিবার কথা ভুলিয়া গাড়ীর ও-পাশে আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—প্রফুল্লদের সঙ্গে নীচু সুরে কথা বলিতেছে। দুই বাড়ীর এত লোকের সামনে সে কিছু কুণ্ঠিত—স্ত্রীটিকে বাপের বাড়ী হইতে লইয়া যাইতেছে বলিয়াই না এত কান্না—সকলের চক্ষে সে অপরাধী, এমনি ভাব।

পিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কেঁদে লাভ কি? নিজের বাড়ী যাচ্ছিস, কতদিন আর থাকা চলে, তা যখন ইচ্ছে তখন আসবি তার জন্যে আর দুঃখ কি—পৌঁছে চিঠি দিস। তোর বাড়ীটা বড় সুন্দর জায়গায় নদীর ওপর, চমৎকার স্বাস্থ্য—আমি দেশের দিকে একবার যাব যাব করছি, যদি যাই তোকে দেখে আসব, আমার সঙ্গে আসতে পারবি তখন।"

এ সব কথায় ইলা কিছুমাত্র সান্ত্বনা পাইল না, সমান ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

খুড়ী-মা হলের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছেন। কেহ কাঁদে, কেহ চোখ মুছে, কেহ বিষণ্ণ মুখে দাঁড়াইয়া। ইলা আর ওঠে না।

পিতা বলিলেন, "গাড়ীর সময় হয়েছে বোধ হয়, তোরা ওকে তুলে দে - ক'টা বেজেছে ?"

গাড়োয়ান বলিল, "হাঁ বাবু সময় হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি যেতে হবে।"

তাপসী ঘড়ি দেখিয়া বলিল, "এগারটা দশ।"

"তবে আর দেরী নয়, এবার ওঠ।"

দিদি ইলার হাত ধরিয়া তুলিলেন, ইলা চোখে-মুখে আঁচল ঢাকিয়া কান্নার জোর বাড়াইয়া দিল—দিদি তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন, সে তো চোখে দেখিতে পাইতেছে না, খুড়ীমা বাদে সকলেই সঙ্গে চলিল।

বাড়ীর যেই যেখানে যাক, আগে পিতাকে প্রণাম করিয়া তার পরে গোপাল-মন্দিরে ও মণ্ডপে প্রণাম করিয়া যাত্রা করে।

মন্দির মণ্ডপে প্রণামের পরে ইলার গলা আরও উচ্চে উঠিল—দিদি একরকম টানিয়াই তাহাকে গাড়ীর কাছে লইয়া গেলেন, কোলে করিয়া তো তুলিয়া দিতে পারেন না। ইলা কেবলই কাঁদে—গাড়ীতে আর ওঠে না।

পিতা বলিলেন, "দেরি করিস্ কেন ? তুলে দে না, গাড়ী ধরতে পারবে না যে।"

ইলা যতদূর সম্ভব আস্তে আস্তে ও কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীতে উঠিল—গাড়োয়ান চটপট বলদ জুড়িয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। ইলার স্বামী ও প্রফুল্লরা হাঁটিয়া চলিল, জ্যেঠশ্বশুরের সামনে সে স্ত্রীর সঙ্গে একত্র গাড়ীতে উঠিবে না। কিছুদূর গিয়া প্রফুল্লরা যখন ফিরিবে তখন সে গাড়ীতে উঠিবে। ভদ্রলোকটি বড় লজ্জাশীল।

বেলা দেড়টার সময় ইলারা আবার ফিরিয়া আসিল গাড়ী ফেল করিয়া।

গাড়ী ফেল করা পিতার কাছে একটা বড় অপরাধ।

পরের দিন আবার যাত্রা। খুড়ী-মা খুব সকালেই ইলাকে তৈরী করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সে-বিপুল কান্নার বেগে সব ব্যবস্থা বুঝি ভাসিয়া যায়। আবার বিদায় ও কান্না, সঙ্গে দুই বাড়ীর লোকজন—ইলা বাহিরের বারান্দায় আসিল, জ্যেঠা মহাশয়কে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে কান্নার বিরাম নাই।

পিতা বলিলেন, "নে হয়েছে, আর কাঁদিস নে, কাল তো কেঁদে কেঁদে গাড়ী ফেল করে ফেললি আজও তাই করবি না কি ? আর কেঁদে কাজ নেই—এবার গাড়ীতে উঠ, তোরা দাঁড়িয়ে কেন ? ওকে তুলে দে না ? নিজের বাড়ী যাবি, এত কান্নার কি আছে ? ওঠ গাড়ীতে ওঠ।"

সকলের এত হাসি পাইল, বাবার সামনে হাসিতেও পারা যায় না। বিশেষতঃ এত কান্নার মধ্যে। তবু সুরুচি হাসিয়া ফেলিলেন এবং প্রায় সকলেই ঘুরিয়া দাঁড়াইল; খুড়ী-মা তো মুখে আঁচল চাপিয়া সরিয়াই গেলেন দরজার কাছ হইতে।

দিদি খুব শীঘ্র সামলাইতে পারেন, তিনিই ইলাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

শ্বশুর-বাড়ীতে যাইবার কালে মেয়েরা বেশী রকম কান্নাকাটি করিলে পিতা অত্যন্ত বিরক্ত হন। সেই ভয়ে সুরুচিরা আগেই কান্নার পালা সাঙ্গ করিয়া তবে পিতার কাছে আসেন।

গাড়ী চলিয়া গেলে ভিতরে আসিয়া এত দুঃখের মধ্যেও একটা হাসাহাসি পড়িয়া গেল। খুড়ী-মা বাড়ী যান নাই। তিনি ও দিদি একবয়সী, দুইজনে অভিন্ন সখিত্ব। ইলা মেজ খুড়ী মার মেয়ে, ইনি ছোট খুড়ী-মা।

কয়েক দিন পরে মেজদির ছোট মেয়ে ঊষার যাইবার দিন। সে আনন্দ-কুটীরে মানুষ হইয়াছে, পিতা ও সকলের আদরের। অল্পদিন বিবাহ হইয়াছে, তাঁহার কাঁদিবার সময় ও কথাই বটে, কিন্তু সে খুব চাপা মেয়ে।

আগেই খুড়ী-মা বলিলেন, "দেখিস্ গো, বেশী যেন কাঁদিস্ নে, ভাসুর ঠাকুর রাগ করবেন।"

মেজ-দির কোলের মেয়ে, তিনি তো কান্না চাপিতে পারেন না, সুতরাং গাড়ী পর্য্যন্ত তাঁর আসা হইল না, ঘরেই রহিলেন।

যথানিয়মে সজল চক্ষে ঊষা আসিয়া ঠাকুরদাদাকে প্রণাম করিল।

"নে, গাড়ীতে ওঠ, তোর মাসীর মত কেঁদে কেঁদে আবার যেন গাড়ী ফেল করিস নে, একটু সকাল সকাল যাওয়া ভাল।"

চোখে জল মুখে হাসি। উষার মুখেও একটু হাসি ফুটিল। দিদি উষাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

পিতাকে কেহ বিচলিত হইতে দেখে না বড়। মনটা খারাপ হইলে নীরবে নিজের বিছানায় স্থির হইয়া শুইয়া থাকেন, কথাবার্তা বলেন না, এইটুকুই প্রকাশ।

বিশ্বকর্ম্মা বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতা যাইবেন, চোখ ও মাথার যন্ত্রণায় সুরুচির রাত্রে ঘুম হয় না, ডাক্তার দেখাইতে হইবে।

পরামর্শ করিবার জন্য সকাল সকাল অফিস হইতে ফিরিয়াছেন, সুরুচি ঘরে নাই। গোরা বলিল, "মা গোলোক-ধাঁধায় ছবি দেখছে।"

"সে আবার কি?"

নীহার বুঝাইয়া বলিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "তবে আমি খেলতে যাই।"

পোষাক বদলাইয়া বিশ্বকর্ম্মা 'চকি' খেলিতে চলিয়া গেলেন।

ছেলেবেলায় সুরুচিরা গোলোক ধাঁধার ছবি দেখিয়াছেন, আর একবার দেখিবার সাধ। কতদেশ ঘুরিয়া বেড়ান কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায় না, সেই যে "মহারাণী বসে আছে, দুই দিকে দুই দাসী আছে" ছোট্ট কাচের খুপরী দিয়া কি প্রকাণ্ড ছবিগুলি দেখায়! সেই জিনিষ দেখিবার নেশা বর্ত্তমান সিনেমার ছবি দেখিয়াও মেটে নাই। কয়েকটি ছবি স্পষ্ট মনে আছে এখনও। কাশ্মীরের মহারাণী দাসী-মণ্ডলীর মধ্যে সগৌরবে বসিয়া। একটা শিকারের ছবি, প্রকাণ্ড হাতীর পিছনে একটা বাঘ লাফ দিয়া উঠিয়া ধরিয়া রহিয়াছে, হাওদার আরোহীরা ভীত সন্ত্রস্ত, একজন তো ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়-পড়! আর একটা বাঘকে হাতী শুঁড়ে জড়াইয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়াছে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে আর একটা বাঘ দেখা যায়, ভয়ে দুরু দুরু মন লইয়া বার বার সুরুচিরা সেই ছবিটি দেখিতেন। ছবিগুলি সবই সুন্দর রঙীন ও বৃহদাকার, ত্রেতাযুগের চতুর্দ্দশ-হস্ত-পরিমিত দেহের মত।

গোরা আজ পথে দেখিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে, পাশের বাড়ীর ডিপুটী-পত্নী অবাক্ হইয়া জানালা দিয়া দেখিতেছেন, সুরুচি লিচুতলায় টুল পাতিয়া বসিয়া কি না এই বাক্সে ছবি দেখিতেছেন এক মনে। সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, "পাঠিয়ে দিচ্ছি, দেখলে বুঝবেন।"

ছবিওয়ালা সুর করিয়া ছবির বর্ণনা করিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা ছবি বদল হয়।

বিশ্বকর্ম্মা ফিরিয়া আসিলেন, একটু পরে ছবি দেখা শেষ হইল, সুরুচি ঘরে আসিয়া বলিলেন, "তুমি দেখবে?"

"আমার তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। আচ্ছা সখ তোমার।"

"সে রকম ছবি আর নেই, অনেক বদল হয়েছে, তবু ভাল লাগল, আর একদিন আসতে বলেছি, এখন বল কি?"

"গোপুকে চিঠি লিখে দি একটা ফ্ল্যাটের জন্যে।"

"না—তার ফাইনাল এগ্জামিন।"

"আচ্ছা তবে টিকিট কার্ড দাও।"

সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে একগাদা চিঠি লিখিয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু ২৪শে ডিসেম্বর সকালের ডাকেও কোন চিঠির কোন জবাব না পাইয়া উদ্বিগ্ন মনে তেজেনকে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়া বিশ্বকর্ম্মা রওনা হইলেন।

এবার কি দুর্জ্জয় শীত পড়িয়াছে কলিকাতায়—উত্তর বঙ্গের চেয়ে কম নয়। রাত্রি থাকিতে ট্রেন শিয়ালদহ পৌছিল, তেজেন প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া আছে, কাছেই হোটেলে ঘর ঠিক করিয়াছে।

হোটেলে আসিয়া সব উৎসাহ গেল কর্পূরের মত উবিয়া। তেতালায় একটি ঘর, সামনে বারান্দা নাই, ভিতরের দিকে সংকীর্ণ বারান্দা, ঘর অন্ধকার, শীতে যেন চাপিয়া ধরিয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা সুরুচির মুখের ভাব দেখিয়া বলিলেন, "কি হলো?"

"এই ঘরে দশ দিন থাকব?"

"তাই দেখছি, আচ্ছা, চা খেয়ে নাও তার পর দেখা যাক।"

চায়ের অর্ডার দিয়া তেজেন বলিল, "আগে কেন লিখলেন না আমায়? কাল আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে সমস্ত দিন

ঘুরেছি, সব হোটেল বোঝাই হয়ে গেছে, আর একটু দেরী হলে এ-ঘরটাও পাওয়া যেত না।"

তেজেন থ'কে টাউন বোর্ডিংএ, সেই হোটেলের মালিক গিরীন বাবুর বাড়ীও টানিয়াছিল, বিশ্বকর্ম্মা কলিকাতা আসিলে সেখানেই ওঠেন, বলিতে গেলে সেটা ইষ্ট বেঙ্গল হোটেল। অষ্ট প্রহর ভীড়—সুরুচি পছন্দ করেন না বলিয়া সেখানে যাইতে চান না।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "তোমার জন্যেই ফ্ল্যাট চেয়েছিলাম, এখন দেখ মজাটা।"

বছর দুয়েক আগে সুরুচির বাবা অসুস্থ হইয়া এই হোটেলে খানতিনেক ঘর লইয়া মাস দুই-তিন ছিলেন। তিনি অসুবিধা সহিতে পারেন না, অসুবিধা হইলে নিশ্চয়ই এখানে থাকিতেন না। তাপসী দিদি-লীলা-তেজেনরা সকলেই তাঁর সঙ্গে ছিল। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া দেখিয়া যাইতেন মেদিনীপুর হইতে।

সুরুচি বলিলেন, "তুমি যে বলেছিলে খাট টেবিল চেয়ার, খুব সাজান ঘর, আলো হাওয়া খুব—এই কি সেই ?"

তেজেন বলিল, "বাবা ছিলেন চার-তলায়। কিন্তু গিরীনবাবু দুঃখিত হয়েছেন—আপনারা তাঁর ওখানে গেলেন না বলে।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "তাঁর ওখানে রুম পাওয়া যাবে না, সব বোঝাই।"

সুরুচি বলিলেন, "এখানে একদিনও থাকা যাবে না।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "ডাক্তার দেখান হোক আগে—যে জন্যে আসা।"

ফণী গেল ডাক্তারের কাছে। বৈকালে ডাক্তার দেখিলেন, চোখে দিলেন একটা ওষুধ, সঙ্গে সঙ্গে চোখে যেন পর্দ্দা পড়িয়া গেল, তিন দিন পরে আবার দেখিবেন।

তিন দিনের মধ্যে যাওয়া চলিবে না।

মফস্বলের লোক কলিকাতায় যে জন্যই আসুক মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্তে থাকে সওদা করা। কিন্তু বাসস্থানের দুঃখে ফর্দ্দটি বাক্সের কোণেই রহিয়া গেল।

ইতিমধ্যে তেজেন আসিয়া বলিল, "টাউন বোর্ডিংএ তেতালায় একটা ঘর খালি হয়েছে দুপুরবেলা। গিরীন বাবু আপনাদের জন্যে নিজে দাঁড়িয়ে ঘর ধোয়াচ্ছেন—দিদিকে জানেন কি না—চলুন।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "এ বেলা খাবার অর্ডার দিয়েছি যে।"

"এবে খেয়ে নিন—আমি জিনিষপত্র নিয়ে চলে যাই, আবার এসে নিয়ে যাব।"

অর্ডার দিবার সময় বলা হইয়াছিল খাবার আটটার মধ্যে দিতে। আয়োজন প্রচুর, সুরুচি বলিলেন, "মাংসটা না খাওয়াই ভাল।"

বিশ্বকর্ম্মা হোটেলের মাংস কদাচ খান না—সেদিন অন্য-মনস্ক হইয়া ভুলিয়া গেলেন।

টাউন বোর্ডিংএ পৌঁছাইয়া দেখেন—গিরীন বাবু নিজে দাঁড়াইয়া ঘর সাজানো দেখাইয়া দিতেছেন। সাদা দাড়ী গৌর-বর্ণ ঋষিপ্রতিম লোক, একটা নূতন চকচকে আয়না, ড্রয়ার দেওয়া টেবিল ও একটা চেয়ার। দুদিকে দুটি চৌকি, অন্যদিকে একটা আলনা, পুরান টেবিল চেয়ার খান দুই, দেওয়াল ব্র্যাকেট, অভাব নাই কিছুরই।

গিরীন বাবু মহা উল্লাসে অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আপনার আশ্রয় ছাড়া আমাদের গতি নেই।"

"হা-হা-হা আমি সামান্য ব্যক্তি"—সুরুচিকে "আপনি কেমন আছেন ?" দেখা হইলেই গিরীন বাবু সুরুচির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "এঁর জন্যই আসা।"

তেজেন বলিলেন, "গিরীন বাবু আপনাদের জন্য এই টেবিল চেয়ার নিজে গিয়ে কিনে আনলেন।"

"কেন, কেন অনর্থক খরচ করা।"

"আহা, আপনারা তো নিয়ে যাবেন না ? আমারই থাকল।"

সুরুচি বলিলেন, "বেশ করেছেন।"

সুরুচি খাইয়া আসেন নাই, গিরীন বাবু ব্যস্ত হইয়া নিজেই গেলেন আতপ চালের ব্যবস্থা করিতে।

এবার বিছানা খোলা হইল, দশটি লোকের যোগ্য শয্যা, নীহার বাঁধিয়া দিয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "করেছ কি ? তোমাদের নিয়ে চলাই বিপদ।"

জোর না হইতে বিশ্বকর্ম্মার ভীষণ পেটের অসুখ, সুরুচি বলিলেন, "হোটেলের মাংস কি খেতে আছে?"

"বারণ করলে না কেন জোর করে?"

গিরীন বাবু একজন ভাল হোমিওপ্যাথ, তিনিই ঔষধ দিলেন, পথ্যের ব্যবস্থাও করিলেন। বৈকালের দিকে কম পড়িল। কিন্তু রুণী পড়িল দারুণ সর্দ্দিজ্বরে অজ্ঞান হইয়া, সতীরও সর্দ্দিজ্বর ও কাশি। বিশ্বকর্ম্মা দুর্ব্বল দেহে শয়ান, একা সুরুচিও সর্দ্দিজ্বরে পড়িতে পড়িতে রোগীদের জন্য শক্ত হইয়া রহিলেন।

তেজন থাকে চার-তলার চব্বিশ নম্বর ঘরে, পড়া ফেলিয়া অষ্টপ্রহর তাহার তের নম্বর ঘরেই কাটে।

এদিকে চোখের ডাক্তার চোখের চিকিৎসা করিতে করিতে মাথা ও নাকের জন্য বলিয়া দিলেন, আর এক ডাক্তারের নাম—বত্রিশ টাকা ফি।

বত্রিশ টাকা ফিয়ের নাকের ডাক্তার তিন সেকেণ্ডে নাক-পরীক্ষা শেষ করিলেন, বলিলেন, "একদিন পরে আবার দেখিতে হইবে।"

যত বড় উপাধিওয়ালা ডাক্তার, তত অল্প সময়ের মধ্যেই বোধ হয় রোগী দেখা নিয়ম। যখন দু'শো টাকা ফি হইবে, (সেদিনের বেশী দেরী নাই, এদেশে যে ভাবে ডাক্তারের ফি বাড়িয়া চলিয়াছে) রোগী স্পর্শ না করিয়াই দৃষ্টিমাত্র চিকিৎসা করিবার ক্ষমতা বোধ হয় ডাক্তার লাভ করিবে, অর্থাৎ ডাক্তারের দিব্যদৃষ্টিলাভ ও রোগীর ভিটামাটী উচ্ছন্ন।

তের নম্বরের ঘরে বন্ধু বান্ধবের আগমন হয়। নৃপেন ডাক্তার বিশ্বকর্ম্মার পরিচিত ও নাকের ডাক্তারের সহপাঠী চিকিৎসা বিভ্রাটের পরামর্শ-সভায় নৃপেন ডাক্তার বলিলেন, "দেখুন ওঁর কিছুই হয় নি, তবে আমরা মফস্বলে চার টাকা ফিয়ে প্র্যাকটিস করি আমাদের মতের মূল্য নেই, বিলেত থেকে এক পাক ঘুরে না এলে প্রেসকৃপশনের আদর নেই জানেন তো?"

গিরীন বাবু অভিজ্ঞ লোক, তিনিও বলিলেন, "কিছু দরকার নেই।"

বিশ্বকর্ম্মা সন্দিগ্ধমনা। নিজেই গেলেন আর একটি চেনা জানা বড় ডাক্তারের কাছে, তিনিও ঐ একই কথা বলিলেন। কলিকাতায় ডাক্তারের খপ্পরে পড়িলে নিস্তার নাই কোন কালে, ভাগ্য যে এ-ক্ষেত্রে তিন জনই একমত হইলেন, তবু বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আর একবার।"

তিন জনই বলিলেন, "দেখুন চিকিৎসার শেষ নেই। চোখের পর নাক, তার পর কাণ মাথা ছ'মাস চলবে, অনর্থক দরকার কি? তবে টাকা খরচ করতে চান করুন।"

সুরুচি বলিলেন, "না, এখন এখান থেকে গেলে বাঁচি।"

পরের দিন এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আনা হইল।

ঘরে ছিলেন বিশ্বকর্ম্মার এক কলেজপাঠী বন্ধু, অনেক দিন পর দেখা, তাঁহার সামনে হোমিওপ্যাথি জেরা আরম্ভ হইল "নাম ধাম কুল গোত্র স্বভাব বয়স আচরণ" উত্তর দিতে দিতে সুরুচি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

তখনও শেষ নাই, "আচ্ছা আপনি কি ভাল বাসেন? ঝাল না টক না মিষ্টি না তেতো কোনটা ভাল লাগে? আমিষ না নিরামিষ?"

এবার বিশ্বকর্ম্মা সোৎসাহে জবাব দিলেন "[illegible] কুই-নাইনে চিনি মেখে খাওয়া অভ্যাস।"

"কবে আমি কুইনাইনে চিনি মেখে খেয়েছি।"

"খাওনি?—খাওনি? সন্দেশের টুকরার মধ্যে কুইনিন জড়িয়ে গলায় ফেলে দাও না?"

রুণী বলিল, "হ্যাঁ ঠিক।"

"বেশ আচ্ছা, মিষ্টি ভাল বাসেন; তার পরে, কিছু মনে করবেন না—এটা আমাদের নিয়ম। সিমটম্ না জানলে ওষুধ দেওয়া চলে না। আচ্ছা, আপনার স্বভাবটি কি রকম? খুব শান্ত, ধীর চুপচাপ?"

বন্ধুটি বসিয়া আছেন, সুরুচিকে এবার বাধ্য হইয়া মুখ ফিরাইতে হইল, কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা পরম উল্লাসে সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "আমাকে জিজ্ঞাসা করুন ত এর জবাব আমি দিচ্ছি, উনি কি বলবেন?" বলিয়া তাঁহাদের সিগারেট দিয়া এবং নিজে ধরাইয়া বলিলেন, "কি বললেন—স্বভাব? ধীর? সর্ব্বনাশ! মোটেই না, ভীষণ রাগী—ভয়ঙ্কর জেদ, আমি পারি নে মশায়, হার মেনে গেছি, স্বভাবের কথা কি বলব? বারুদে আগুন। তার চেয়ে বেশী। কারও কথা মানা নেই, নিজে যা বুঝবে তাই।"

ডাক্তার অত্যন্ত মন দিয়া শুনিতে শুনিতে মাথা নাড়িতে-ছেন (মনে মনে বোধ হয় সিমটম মিলাইয়া লইতেছেন) পরে বলিলেন, "আচ্ছা কান্না? মানে চোখে জল?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, ঐ যে বারুদে আগুন—তার পরেই চোখে জল—মেঘ বিদ্যুৎ বিষ্টির মত, ওরে বাপরে! সে-সময় সামনে যায় কার সাধ্য? কেমন ঠিক বলছি কি না—চুপ করে আছ যে?"

সুরুচি পাশ ফিরিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া আছেন, বিশ্বকর্ম্মা সগৌরবে সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন "ওষুধ দেবেন, আপনার ওষুধ ঠিক কাজ করবে, এই কড়া মেজাজ আর জেদটা যেন কমে, আমি যেন একটু আরাম পাই; সর্ব্বক্ষণ আমাকে তটস্থ থাকতে হয়।"

ডাক্তার একটু সন্দিগ্ধ হইয়া বলিলেন, "সত্য?"

"হ্যাঁ, একেবারে ধ্রুব, নইলে উনি কিছু বলতেন না? কিরে ফণী, সত্যি নয়?

সুরুচি চুপ করিয়া আছেন, ফণী বলিল, "একেবারে সত্য।"

ডাক্তার বলিলেন, "আচ্ছা, সন্ধ্যা বেলা ওষুধ আনবেন।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে বিশ্বকর্ম্মা সানন্দ উল্লাসে বলিলেন, "কেমন? স্বরূপটি প্রকাশ হল তো? আগুন কি ছাই-চাপা থাকে?"

বন্ধুটি বলিলেন, "আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।"

সুরুচি বলিলেন, "শোনেন কেন? উনি পনের আনা মিথ্যে বলেন।"

"তা বটে, ওকে আমি জানি তো। তা আজ চলুন না সোনার সংসার দেখে আসবেন।"

"যে সোনার সংসার পেতেছি আমরা, তাই দেখে যান না, এলাম কলকাতা—তা সব পড়লেন বিছানায়।"

"আপনি কেমন আছেন?"

"আমি নার্স, আমার অসুখ করলে চলবে কেন?"

পরের দিন চোখের চিকিৎসা এক রকম শেষ হইল। চশমার ব্যবস্থা ছিল দু'জোড়া এক ডাক্তার অর্ডার লইয়া-ছিলেন—তিনি নিজে আসিয়া দেখিয়া ঠিক করিয়া দিয়া গেলেন, এক জোড়া পরবার ও এক জোড়া আলো এবং রৌদ্রের জন্য।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "মোটে দু' জোড়া? স্নানের এক জোড়া, শোবার জন্যে এক জোড়া?"

ডাক্তার বলিলেন, "শোবার জন্যে লাগবে না, ঘুমই চশমার কাজ করবে।"

কলিকাতা আসিয়া না হইল আমোদ-প্রমোদ, না হইল সওদা।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "ঐ ফণীর জন্যে, ওরই জন্যে যাত্রাটা নিষ্ফল হল, ছটা অবধি বারবেলা ছিল—তার পরে বেরুব ভেবেছিলাম—না, ও আগে গিয়ে বসল গাড়ীতে।"

"কৈ আমায় ত বল নি? ষ্টেশনে ত ঘণ্টাখানেক বসে-ছিলাম, খানিকটা পরে এলেই হত, দিন দেখিয়েছিলে না কি? তোমার কাণ্ডই আলাদা, বড়দিনের ছুটীতে আসবে তা আবার দিন দেখান।"

"দিন দেখাইনি, ঠাকুর মশায় এসেছিলেন, তিনি বলে-ছিলেন।"

"তাই বল, বিষ্যুৎবারের বার বেলা—যাত্রা একেবারে ব্যর্থ।"

"ব্যর্থ হয়নি, তোমার চোখের জন্য আসা, সে কাজটা হয়ে গেল, যাত্রা সার্থক বই কি। কিন্তু নাকের চিকিৎসাটা যে বাকী রইল—আমার ভারি মন খারাপ লাগছে, ডাক্তারেরা কি রকম ব্যস্ত তোমার নাকের জন্য দেখছ তো? তবু তো বাঁশীর মত নাক নয়।"

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, "আমার এই নাকের দাম বত্রিশ টাকা তা কি জানতাম? তোমার উন্নত নাসিকাটি তো কেউ চেয়েও দেখলেন না!"

"আমরা সামান্য লোক—ক্ষুদ্র প্রাণী, আমাদের নাক কাণ নিয়ে ডাক্তারেরা টানাটানি করে না। এখন চল দেখি দোকানের কাজগুলো সেরে আসা যাক্।"

মানবের নব অধিকার

—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

শাসনতন্ত্রের দেশব্যাপী আলোচনায় রাশিয়াবাসীরা এই শিক্ষাধিকার সম্বন্ধে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। যদি কর্ম্ম ও ভরণপোষণের অধিকার অস্তিত্বের অধিকার হয়, শিক্ষার অধিকার তবে বৃদ্ধি, বিস্তার এবং পূর্ণ আত্মোপলব্ধির অধিকার। সোভিয়েট ইউনিয়নে আজ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক লোক শিক্ষা পায়। কিণ্ডারগার্টেনের ৬,০০০,০০০, যান্ত্রিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের ২,৭,৩০৩,০০০ এবং কৃষিসমবায় ও শ্রমিকসঙ্ঘগুলি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বিশেষ শিক্ষাবিধির লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী গণিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে যে, ১৯৩৬ সালে ৪,৭০,০০,০০০ জন একটা কিছু শিক্ষা পাইতেছিল, অর্থাৎ দেশের লোকসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের চেয়েও বেশী।* শহরের সোভিয়েটগুলির অধুনাতন সংবাদে জানা যায়, লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষা পাইতেছে। এই প্রকাণ্ড সংখ্যা কেবল সমাজতন্ত্রেই সম্ভব, যেখানে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য শ্রমিকদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধাপ্রদান। রাশিয়ায় দৃঢ় আশা করা হয় যে, শিল্পোন্নতি এবং দৈনিক কর্ম্মকাল হ্রাসের সহিত অতিরিক্ত অবসরহেতু উচ্চশিক্ষার সকল শাখায় ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে।†

সমাজতন্ত্রে কর্ম্ম, অবসর, বস্তু-সাহায্য এবং শিক্ষার অধিকারই মানুষের মূল-অধিকার। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা-ঘোষণার বাণী, "বাঁচিয়া থাকার অধিকার," শত শত বৎসর ধরিয়া একটা অস্পষ্ট উন্মাদনা জাগাইয়াছে। কিন্তু ঐ বাঁচিয়া থাকার অধিকার বাস্তব রূপ লইয়াছে রাশিয়ার এই অধিকার-সমূহে। এখানেই পূর্ণ হইয়াছে "বাঁচিয়া থাকা"র দাবী যাহা কোন—এমন কি সকলের চেয়ে পুরোগামী—ধনতন্ত্রও দিতে পারে না। দেশের সমগ্র উৎপাদিকা সম্পদের উপর সর্ব্ব-সাধারণের প্রভুত্ব-হেতু ইহা সম্ভব হইয়াছে। এই বৈষয়িক ভিত্তিতেই অধিবাসীদের বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা আছে। ফরাসী-বিদ্রোহে ঘোষিত "মানুষের অধিকারে"র একটা প্রসিদ্ধ অধিকার "সাম্য" সোভিয়েট গঠন-তন্ত্রের দুই আর্টিকলে বাস্তব হইয়াছে। ধনবাদী প্রজাতন্ত্রগুলির গঠনতন্ত্রে প্রকাশিত "আইনের সম্মুখে সমতা"র চেয়ে ইহা বড়; "অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, সংস্কৃতিগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে" ইহার বিস্তার। স্ত্রী-পুরুষ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ইহা সকলের জন্যই। পূর্ণ সাম্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এমন অবস্থার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও আছে।

"কর্ম্মে, মজুরীতে, বিশ্রামে, সমাজবীমায়, শিক্ষায় স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার; রাষ্ট্রকর্ত্তৃক মাতা ও সন্তানের স্বার্থরক্ষা; বেতনসহ গর্ভাবকাশ এবং প্রসূতি-সদন, শিশু-ভবন, কিণ্ডারগার্টেনের বিস্তৃত ব্যবস্থা"-হেতু সমাজতন্ত্রে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা কোন ধনতন্ত্রী দেশই সম্পূর্ণরূপে পায় নাই এবং ইহা ফাশিজম্ বিশেষভাবে অস্বীকার করিয়াছে। পুরুষের সঙ্গে সমান সর্ত্তে প্রত্যেক প্রকার শিক্ষায় এবং সমান বেতনসহ প্রত্যেক প্রকার কর্ম্মে নারী প্রবেশলাভ করিয়াছে। কোন কোন বিদেশী নারীপ্রগতিবাদী মাতৃত্ব-বীমাকে স্ত্রীলোকের একটা বিশেষ সুবিধা বলিয়া মনে করে, যাহা সাম্যের পরিপন্থী। সোভিয়েট নারীগণ সাম্যের এই পোষাকী ধারণায় একটু হাসে। বাহিরের কর্ম্মে, রাষ্ট্রিক কর্ম্মে, নারীর স্বাভাবিক বাধাবিঘ্ন যথাসাধ্য দূর করিয়া মাতৃত্ব-বীমার সাহায্য যে প্রকৃত সাম্য সম্ভব করিয়াছে, সোভিয়েট নারীগণ তাহা বেশী পছন্দ করে।

---

* শ্রমিকসঙ্ঘগুলিই সাধারণতঃ নাচ, গান ও বৈদেশিক ভাষা হইতে শুরু করিয়া রাজনীতি এবং শিল্পশিক্ষা পর্য্যন্ত যাবতীয় লোকশিক্ষার জন্য (দরকার হইলে প্রতি শিক্ষায়তনে দশ জন ছাত্র ছাত্রীরও) সমস্ত শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীর ব্যয় বহন করে।

† নাৎসী-জার্ম্মানীতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পূর্ব্বের চেয়ে অর্দ্ধেক সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। ফাসিজমের ইহাই লক্ষণ।

রাশিয়াবাসীদের জাতিবর্ণনির্বিশেষে অধিকার ও সাম্য-সম্পর্কিত বিভাগটি আরও জোরের সহিত লিখিত হইয়াছে। ঘোষণা করা হইয়াছে এই "আইনের রদবদল নাই"। নাৎসী জার্ম্মানি যে জাতিভেদের তুফান তুলিয়াছে, তাহার নিন্দা করার ইচ্ছা নিম্নলিখিত আর্টিকলের ভাষায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে : "এই অধিকারগুলির মুখ্য অথবা গৌণ খর্ব্বীকরণ, অথবা অপর পক্ষে জাতিবর্ণের ভিত্তিতে অধিবাসীদিগের মুখ্য অথবা গৌণ সুখ-সুবিধা-স্থাপন এবং জাতিগত অথবা বর্ণগত পার্থক্য অথবা ঘৃণাবিদ্বেষ প্রচার আইনের হাতে শাস্তি পাইবে।" ১৯৩৫ সালে জার্ম্মান রাইশ্‌ষ্টাগ (আইন-পরিষদ্) কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইনগুলির সঙ্গে ইহার তুলনা করিলে মন্দ হয় না। নূতন নাৎসী আইনের বলে কেবল 'আর্য্য'-বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণ জার্ম্মানীর নাগরিক হইতে পারিবে এবং অনার্য্য-বংশোদ্ভূত কর্ম্মচারীবৃন্দ দূরীভূত হইবে। ফাশিজ্‌ম্ স্পষ্টভাবে অস্বীকার করিয়াছে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে অধিকার-সাম্য, কিন্তু ধনবাদী প্রজাতন্ত্রসমূহ এই প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়াছে। এমন কি, আমেরিকাবাসী নিগ্রোকে ভোটাধিকার দেওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা কেবল ভোটাধিকার সম্পর্কিত, সর্ব্ববিধ সমানাধিকারের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম হইতে বর্ত্তমান কালের মধ্যে যে-কোন সময়ে যদি নিগ্রোকে "অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, সংস্কৃতিগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমান অধিকার" দেওয়ার প্রস্তাব উঠিত তবে সে প্রস্তাবের কি দশা হইত কল্পনা করিলে মন্দ হয় না। অথবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সকল জাতির জন্য এরূপ প্রস্তাব উঠিলে কি হইত? উচ্চ জাতিগুলির নীতির সহিত সংঘর্ষ বাধাইতে সোভিয়েট ইউনিয়ন পরাঙ্মুখ নহে। ইহা গঠনতান্ত্রিক বিধি দ্বারা জাতিবর্ণপার্থক্যপ্রচারকে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছে (আর্টিক্‌ল্ ১২৩)।

কর্ম্ম, বিশ্রাম, বৈষয়িক সাহায্য, শিক্ষা প্রভৃতি চারিটি মূল অধিকারে "বাঁচিয়া থাকার অধিকার" যেমন সমাজতান্ত্রিক রূপ পাইয়াছে, এবং "সাম্যাধিকার" যেমন উপরি-উক্ত আর্টিক্‌ল্‌সমূহে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি অন্যান ছয়টি আর্টিক্‌ল্ লেখা হইয়াছে সমাজতন্ত্রগত "স্বাধীনতার অধিকার" সম্পর্কে। ব্যক্তি-বিবেকের স্বাধীনতা হইতে বিদেশীয় লাঞ্ছিতকে আশ্রয়দান পর্য্যন্ত স্বাধীনতার নানাদিক্ বিবেচিত হইয়াছে।

বিদেশীরা সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া স্বাধীনতা সম্পর্কে বিতর্ক তুলিয়াছে। সেজন্য সোভিয়েটতন্ত্রের স্রষ্টারা যে-কোন প্রজাতন্ত্রের চেয়ে বেশী যত্ন লইয়া স্বাধীনতার অর্থ, হেতু, ব্যাপকতা এবং আশ্বাস বিশদভাবে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"রাশিয়াবাসীদিগকে বিবেকের স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র হইতে গির্জ্জা এবং গির্জ্জা হইতে বিদ্যালয় বিচ্ছিন্ন করা হইবেই। সকল অধিবাসীদের জন্য উপাসনার স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মবিরোধী প্রচারের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবেই। এখানে একটা পার্থক্য ধর্ম্মীদের চোখে সহজেই পড়িবে। সোভিয়েট আইন ধর্ম্মপ্রচারের স্বাধীনতা দেয় নাই। স্পষ্ট উদ্দেশ্য এই যে, কাহারও উপাসনায় হস্তক্ষেপ না করিয়া ধর্ম্মপ্রচার বন্ধ করা। আমেরিকায় হইলে এই প্রভেদ যতটা লক্ষ্য করা হইত, রাশিয়ায় ততটা হয় নাই। কারণ প্রচার রাশিয়ার গির্জ্জার প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল না।"

বক্তৃতাদান, মুদ্রণ, সভা করা এবং পথে শোভাযাত্রা বাহির করার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে (আর্টিক্‌ল ১২৫)। "এজন্য শ্রমিক ও শ্রমিকসঙ্ঘের জিম্মায় ছাপাখানা, কাগজ-সরবরাহ, সরকারী গৃহ, রাজপথ, যানবাহন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাখা হইয়াছে।" অনেকেই সিডনি ওয়েবের* বিস্ময়ধ্বনি সমর্থন করিবেন : "বাস্তবিক সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতার একটা অপূর্ব্ব ধারণা।" বলশেভিকরা এই মত পোষণ করে যে, কেবল তাহাদেরই ভাবপ্রকাশের সত্যকার স্বাধীনতা থাকে, ভাবপ্রকাশের বৈষয়িক উপায়গুলির উপর যাহাদের প্রভুত্ব আছে। ধনতন্ত্রে সংবাদপত্রের মালিকগণই স্বাধীন, কিন্তু "অন্যের" অনুমতি ছাড়া লিখিতে পারে না বলশেভিকরা বলে, শ্রমিক-সঙ্ঘকে এই সব সম্পদ্ দেওয়াতেই ধনতন্ত্রের চেয়ে পূর্ণতর স্বাধীনতা সম্ভব হইয়াছে

অনেকে বরং সেই বাক্যাংশটি লক্ষ্য করিবেন যাহা এই স্বাধীনতার মাত্রা টানিয়াছে, "শ্রমিকদের স্বার্থ এবং প্রজা-তন্ত্রের দৃঢ়প্রতিষ্ঠা অনুসারে।" ক্রাইলেঙ্কো এই বাক্যাংশটি

* বর্ত্তমানে লর্ড প্যাসফিল্ড



'মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু'

সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন : "আমরা কপট হইতে চাহি না। ধনতন্ত্র ফিরাইয়া আনিতে চায় এমন কাহাকেও আমাদের গঠনতন্ত্র যে বক্তৃতাদান কিম্বা মুদ্রণের স্বাধীনতা দেয় নাই ; কোন শ্রমিক, সমবায়-কৃষক অথবা অন্য কোন কর্ম্মজীবী তাহার বিরোধী হইবে না।" বস্তুতঃ, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের উপর আক্রমণ সভাস্থলে পুলিসের হস্তক্ষেপে বাধাপ্রাপ্ত হয় না (যেমন আমেরিকায় মাঝে মাঝে হয়), কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হয় এই জন্য যে, সর্ব্বসুবিধাভোগী শ্রমিক সঙ্ঘগুলি এরূপ আক্রমণে অনুমতি দেয় না।

"সর্ব্বসাধারণের সঙ্ঘমিলনের অধিকার" (আর্টিকল্ ১২৬) ধনবাদী প্রজাতন্ত্রগুলিতে পরিষ্কার ভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সমাজতন্ত্রে ইহা একটি বিশেষ মূল্যবান্ অধিকার, কারণ এই সঙ্ঘসমূহ—যেমন "শ্রমিকসঙ্ঘ, সমবায়সঙ্ঘ, যুবকসঙ্ঘ, ক্রীড়া এবং আত্মরক্ষাসঙ্ঘ, যন্ত্রবিদ্যাবিজ্ঞান ও সংস্কৃতিসঙ্ঘ"—এই সঙ্ঘসমূহেরই উপর নির্ভর করা হয়, স্বেচ্ছাকৃত সমষ্টিপ্রচেষ্টার বিস্তারের জন্য অবশেষে রাষ্ট্রের স্থান অধিকার করিবে। এই সঙ্ঘগুলির মিলনভবন, ছাপাখানা এবং নিজেদের দ্বারা প্রকাশিত বইপত্র আছে। সভাগণ বিবিধ আত্মপ্রকাশের সুবিধা পায়।

ইহা উল্লেখযোগ্য এবং অনেক পাঠকের নিকট বিসদৃশ যে, শাসনতন্ত্রের ঠিক এখানেই, অধিবাসীদের স্বাধীনতাসমূহের তালিকায় এবং "সর্ব্বসাধারণের সঙ্ঘমিলনের অধিকার"-শীর্ষক অংশেই, কম্যুনিষ্ট পার্টির (সাম্যবাদী দলের) প্রধান উল্লেখ আছে : "সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মঠ এবং রাজনীতিবিষয়ে সচেতন ব্যক্তিগণের" (যাহারা সমাজতন্ত্রের উন্নতি এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শ্রমিকদের পুরোবর্ত্তী থাকে, তাহাদের) সঙ্ঘহিসাবে এবং "সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শ্রমিকসঙ্ঘের নেতৃস্থানীয় কেন্দ্র হিসাবে।" অনেকে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেও কম্যুনিষ্ট-পার্টির এই অদ্ভুত কর্ম্মধারার মহিমায় কনষ্টিটুশনাল কংগ্রেসের দুই হাজার প্রতিনিধি—দলের এবং দল ছাড়া সকল সভ্যই উঠিয়া দাঁড়াইয়া হর্ষধ্বনি এবং গান করিয়াছিল। ইহার মধ্যে তাহারা দেখিতে পাইল তাহাদের সর্ব্বোচ্চ অধিকার। তাহারা কেবল নির্ব্বাচন করিতে, নির্ব্বাচিত হইতেই পারিবে না,—কেবল কর্ম্ম, বিশ্রাম, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা সম্বন্ধে আশ্বস্তই হইবে না,—দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের নেতৃত্বের নিরবচ্ছিন্ন অংশও পাইবে।

স্বেচ্ছাচারী গ্রেপ্তার হইতে দেশবাসীদের মুক্তি এবং তাহাদের গৃহের শান্তি ও পত্রবিনিময়ের অটুটত্ব ১২৭ ও ১২৮ আর্টিকলে দেওয়া হইয়াছে। "আদালতের বিচার ও সরকারী এটর্নির অনুমোদন ছাড়া কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইবে না।" "যে সকল বিদেশী শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করিতে চাহিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা চালাইয়া অথবা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নামিয়া লাঞ্ছনা পাইয়াছে" তাহাদিগকে রাশিয়ায় আশ্রয়গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রতন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট না হইলেও, এই আশ্রয়-অধিকার অনেক প্রজাতন্ত্র অতীতে দিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক পুরুষ ধরিয়া বিদেশী অত্যাচারিতদের আশ্রয় দিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আজকাল তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরাইয়া দেওয়া হয়—বন্দীত্ব অথবা মৃত্যুর মুখে। আমেরিকা ফাশিজমের পক্ষে দারোগার কাজ করিলেও রাশিয়া নির্যাতিতের সম্মুখে নূতন আশ্রয়দ্বার খুলিয়াছে।

সমাজতন্ত্রগত মানুষের অধিকারসমূহের একটি আর একটিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদের আরম্ভ জীবনের বৈষয়িক ভিত্তিতে, কর্ম্ম, বিশ্রাম, ভরণপোষণ এবং শিক্ষার অধিকারে। তৎপরে তাহাদিগকে বিস্তৃত করিয়া স্ত্রীপুরুষ এবং সকল মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বাঁচিয়া থাকা ও সাম্যের অধিকারের পরে আসে স্বাধীনতাপরম্পরা : বিবেক, বক্তৃতা, মুদ্রণ, সভামিলন, নেতৃত্ব, স্বেচ্ছাচারী গ্রেপ্তার-বিরোধী বিধি এবং পৃথিবীর নির্যাতিতদের আশ্রয়।

সমাজতন্ত্রে অধিকারের সহিত কর্ত্তব্য জড়িত। সকলের মনোযোগ এবং শক্তিপ্রয়োগ ভিন্ন সমাজতন্ত্রের শ্রী অধিবাসীদের কল্যাণ অসম্ভব। ধনতন্ত্রবাদীদের কর্ত্তব্য নিয়মকানুন মানিয়া চলা এবং রাষ্ট্রতন্ত্রে কোন ব্যবস্থা না করিয়া ইহা জোর করিয়া আদায় করা হয়। সমাজতন্ত্র আরও বেশী চায়। সমাজতন্ত্র দাবী করে দায়িত্বজ্ঞান। "দেশবাসীদের অধিকার এবং কর্ত্তব্য"-শীর্ষক অধ্যায়ের শেষের আর্টিকল চারিটি সমাজতন্ত্রের নূতন নৈতিক ধ্বজা উড়াইয়াছে, যে নীতি সদ্যোজাত বলিয়া এখনও সমগ্র সমাজের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

১৩০ আর্টিকল্ বলে : "প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ত্তব্য রাশিয়ার গঠনতন্ত্র লক্ষ্য করা। ইহার বিধিগুলি কার্য্যে পরিণত করা, শ্রমিক-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সর্ব্বসাধারণের সেবাকাজগুলি সততার সহিত পালন করা এবং সমাজতন্ত্রী সমাজের নিয়মগুলিকে শ্রদ্ধা করা।" সকল দেশবাসীদেরই আইন মানিতে হয় ; কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীরা আইন "কার্য্যে পরিণত করিবে," আরও বেশী আত্মপ্রেরণার পরিচয় দেয়।

সর্ব্বসাধারণের কাজও তাহাদের করিতে হয়। রাষ্ট্রে তাহাদের সহযোগিতা বাড়িতেছে। বিশেষভাবে নূতন

বাক্যাংশটি হইতেছে "শ্রমিকশৃঙ্খলা রক্ষার" দাবী। প্রায়ই সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করা হয় যে, "ইহা চলিবে না, কারণ মানুষ আলস্য ছাড়িবে না।" ধনতন্ত্রে পরের লাভের জন্য খাটিয়া মরিতে হয়, সে জন্য নিরাপদে আলস্যভোগ করিতে পারিলে শ্রমিকেরা ছাড়ে না। সমাজতন্ত্রের প্রথম অবস্থা পর্য্যন্ত এই প্রবৃত্তি থাকে। সর্ব্বসাধারণের সম্পদের দ্রুত ও সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে ইহা অবশ্য দূর করিতে হইবে। রাশিয়ার অলসব্যক্তিদের প্রথমে ধীরভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহারা নিজেদের ও সহশ্রমিকদের কতটা ক্ষতি করে। বিবিধ সামাজিক চাপের অধীন তাহারা, যেমন শ্রমের খাতায় লিখিত অখ্যাতি, "প্রাচীর সংবাদপত্রে"র ব্যঙ্গচিত্র। শ্রমিকরা নিজেরাই নিজেদের শৃঙ্খলা রক্ষা করে, ধনতন্ত্রী দেশে যাহার অভাব। রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজের মধ্যে "সম্মান ও বীরত্ব" দেখিতে পাইয়াছে। আশা করা হয়, এই দৃষ্টি স্থায়ী হইবে এবং সোশ্যালিজম (সমাজতন্ত্রবাদ) যতই কম্যুনিজমের (সাম্যবাদের) দিকে অগ্রসর হইবে, কাজ ততই সম্মানের বিষয় তো হইবেই, মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণীর মত "একটা জীবন্ত প্রয়োজন" হইয়া দাঁড়াইবে।

১৩১ আর্টিক্ল বলে, "সোভিয়েট সমাজ গঠননীতির পবিত্র ভিত্তি, দেশমাতার শক্তিসম্পদের ও শ্রমিকগণের সংস্কৃতিসম্পন্ন সমৃদ্ধ জীবনের উৎস যাহা সর্ব্বসাধারণের সম্পদ্, তাহার রক্ষা ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ত্তব্য।" ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তিই মানিতে হয়। যে কোন ধনতন্ত্রী দেশের সমগ্র ইতিহাস সর্ব্বসাধারণের বিপুল সম্পদহরণের একটা মহাকাব্য। ভূমি, বন, খনি, জলের অধিকার প্রভৃতি অপহরণের পরও অনেকের সম্মানলাভ জনসাধারণের মধ্যে সমষ্টি-সম্পত্তি সম্বন্ধে একটা বিস্তৃত অবহেলা জন্মাইয়াছে, এত বিস্তৃত যে, সমাজতন্ত্রের সমালোচকগণ তর্ক করেন: "ইহা চলিবে না, কারণ মানুষ সমষ্টি-সম্পত্তির অপব্যবহার করিবেই।"

সমাজতন্ত্রে সমষ্টি-সম্পত্তির নাশ অথবা অপব্যয় একটা বড় অপরাধ, কারণ ইহা "সকলের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিসম্পন্ন জীবনের উৎসের" উপর একটা আক্রমণ। ইহার জন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া হয় এবং আড়ম্বরপূর্ণ বিচার করিয়া শাস্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে লোকের মনে ধারণা জন্মান হয়। লোককে নূতন নীতি শিক্ষা দিতে হইবেই; সমষ্টি-ধনের মূল্য তাহাদের উপলব্ধি করিতে হইবেই। রাষ্ট্র কর্ত্তৃক সকল কারখানা অধিকারের প্রথম বৎসরগুলিতে দেশব্যাপী যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল চুরি হইত। সেইরূপ কৃষি-সমবায়ের প্রথম অবস্থায় অপব্যয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপহরণের মহামারী লাগিয়া গিয়াছিল। আজ তাহার প্রচণ্ডতা নাই। বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সহিত দৃষ্টির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যদিও সমষ্টি-সম্পত্তির উপযুক্ত দেখাশোনা এখনও পূর্ণতা পায় নাই। দৃঢ় আশা করা হয় যে, বর্ত্তমান ছেলেরা বড় হইলে বুঝিবে তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে সমষ্টি-সম্পত্তির উপর এবং অতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত স্বভাবতঃই সাধারণ সম্পত্তির যত্ন হইবে। ইহা ভবিষ্যতের কথা, যখন আইন এবং রাষ্ট্র প্রয়োজনের অভাবে "শুকাইয়া ঝরিয়া যাইবে।"

রাষ্ট্র রক্ষা যে দেশবাসীর কর্ত্তব্য তাহা সকল দেশ স্বীকার করে। ধনতন্ত্রের মত সমাজতন্ত্রের যুদ্ধের প্রয়োজন হয় না: ইহা শান্তির সময়ে সবচেয়ে বেশী বিস্তার পায় এবং যুদ্ধকে ভয় করে—লোকবল এবং সমষ্টি-সম্পদ্ উভয়ের বিনাশকারী হিসাবে। কিন্তু পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজতন্ত্রের বোধ হয় আত্মরক্ষা আবশ্যক হইবে। ইহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সকলের সমজীবনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। ধনতন্ত্রের চেয়ে সমজীবন অধিক দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সমস্বার্থ অধিক বাস্তব হইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদীরা সংগ্রামে যায়, প্রভুদের নয়, নিজেদের সম্পদ্ রক্ষা করিতে। নিজ নিজ ঘর রক্ষার জন্য যাহারা যুদ্ধে নামে ইতিহাসে তাহাদিগকে সব চেয়ে অজেয় বলে। নব রাষ্ট্রতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার উৎসবাদনে লক্ষ লক্ষ সোভিয়েট্‌বাসীর স্রোত বাদ্যভাণ্ড-পতাকাসহ পথে পথে বহিয়া গিয়াছিল। পতাকায় ছিল এরূপ বাক্য: "লড়াই করিয়া রক্ষা করিবার মত আমাদের কিছু আছে, লোকও আছে রক্ষা করার।" শব্দকয়টি কল্পনাচক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত ছবি আঁকিল পৃথিবীর স্থলভাগের ষষ্ঠাংশ-ব্যাপী একটা দেশের, যাহার ভূমি, জল, বন, খনিজ পদার্থের বিপুল বিভবের উপর এক শত সত্তর লক্ষ অধিবাসীর সকলের নিশ্চিত অধিকার।

উৎপাদন, পোষণ এবং রক্ষা সমাজতন্ত্রবাসীর কর্ত্তব্য "সমাজতন্ত্রগত সমাজের নিয়ম মানা"—ঠিক রুশীয় শব্দটি এই, সমাজতন্ত্রগত "যৌথ জীবন"। ক্রাইলেঙ্কো লিখিয়াছেন, আমরা নবযুগ সৃজন করিতেছি, শিক্ষা দিতেছি এক নূতন মানবকে—যে ধনতন্ত্রের বোঝা হইতে মুক্ত। 'মানুষ মানুষের শত্রু, মানুষের প্রতি মানুষ বাঘের মত' এই পুরাতন প্রবাদে প্রকাশিত ধনতন্ত্রের মুখ্যনীতির বিপরীত 'মানুষ মানুষের সাথী' এই মুখ্য নীতি অনুসারে আমরা সমাজতন্ত্র গঠন করিয়াছি।"*

[সমাপ্ত

* অ্যানা লুইসি ষ্ট্রংগের "দি নিউ সোভিয়েট্ কন্‌ষ্টিটুশন্" নামক পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ।

কেরাণীর বড়দিন

—"নির্ব্বুদ্ধি"

কেরাণী যে, সে চিরকালই কেরাণী ; তা লাট সাহেবের দপ্তরেরই হোক, সওদাগরী অফিসেরই হোক আর যেখানেরই হোক। তার জীবনে পরিবর্ত্তন আসে কদাচিৎ। ভাগ্যদেবী এই শ্রেণীর লোককে রেহাই দেন বড় কম। যত চেষ্টাই করুক, ঘুরে ফিরে জুটবে গিয়ে ঐ কেরাণীগিরী, না হয় বেকারত্ব। কারণ, কলম-পেষা অভ্যাস অন্য কোন কাজে পর্য্যবসিত করান যেমন হয় শক্ত, তেমনই হয় লজ্জাকর। দীপেশের বেলায়ও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। সাত ঘাটের জল খেয়ে অগত্যা জুটল একটা কেরাণীগিরী। তবে তফাৎ হচ্ছে এই, আগে ছিল একটা দোকানে—এবারে তা নয়, একটা ব্যাঙ্কে—পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে। দীপেশ ভাবল, যাক, এবার একটা সুরাহা হল। কিন্তু অলক্ষ্যের কাঠি যে কোন্ দিকে ঘোরে, তা কে আর কবে জানতে পেরেছেন ? আর দীপেশ তো ছা-পোষা কেরাণী মাত্র।

তিন চার দিন ধরে খোকার একটু একটু জ্বর হচ্ছিল। আজ বাড়াবাড়ি দেখে ইলা দীপেশকে বলল, ডাক্তার আনতে। ডাক্তার এসে চিরাচরিত প্রথামত গম্ভীর মুখ ঈষৎ বিকৃত করে জানাল—ভাল 'টাইপে'র জ্বর নয়। সাবধান হওয়া দরকার। স্বামী-স্ত্রী দু'জন দু'পাশে বসে রাত কাটাল।

ভোর বেলা ইলা বলল, "তুমি আজ অফিসে যেও না।"

"তা কি করে হবে? অফিসে না গেলে খোকাকে বাঁচাব কি করে?" নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "সে হবার উপায় নেই। দিন কয়েক পরে বড়দিনের ছুটি ; তার আগেই সব হিসাব-নিকাশ ঠিক করে মিলিয়ে দিতে হবে।"

"যদি একান্তই যেতে হয় তা হলে হোটেলে থেকে খেয়ে নিও আজকে। ছেলে ফেলে আমি নড়তে পারব না।"

"আর তুমি?"

"আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না, আমরা মেয়েমানুষ।"

অনভিজ্ঞ তিনটি সংসার-যাত্রীর ক্ষুদ্র একটি সংসার। তাও আবার একটি অপোগণ্ড শিশু। দীপেশের চাকর রাখার সঙ্গতি নাই। ইলার তরফ থেকেও আসে না কোন অভিযোগ। ঘরকন্নার সকল খুটিনাটিই করতে হয় ইলাকে।

দীপেশ পকেট হাতড়ে একটা বিড়ি বার করে দেখলে দেশলাইয়ে কাঠি নেই। অগত্যা যত্ন করে বিড়িটাকে আবার পকেটে পুরে তখনকার মত বিড়ি খাবার সখ মেটাল। বিড়ি খাবার সখ মিটালেও কিন্তু ভাবনার সখ মেটাতে পারে নি। সেই ভাবনা এখন চেপে বসল।...যদি সত্যিই খোকার জ্বর খারাপ টাইপের হয়ে থাকে। তবে! মস্তিষ্কের ক্রিয়া ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়। ডাক্তার, ঔষধ, পথ্য—সে যে বিরাট এক অশ্বমেধ যজ্ঞের খরচ! এত চলবে কোথা থেকে! আর শুধু কি তাই? ধোপা, নাপিত, মুদি ও বাড়ীওয়ালা—সকলেরই বাকী!

নতুন চিন্তার আকর্ষণীতে পুরান দিনের সম্ভব-অসম্ভব, সুখ-দুঃখের সকল স্মৃতিগুলিই এসে আজ মনের গোপন কোণে দোলা দেয়। সেই ছেলেবেলায় যখন মুদীর তাগাদা, বাড়ীওয়ালার দাঁতখিঁচুনি রহস্যেরই মত অন্ধকার ছিল—তখন দীপেশ এ পথের অনাস্বাদিত দিনগুলির মধুর কল্পনাতেই শুধু বিভোর ছিল। তখন ছিল আরাম, অনাবিল আনন্দ। কিন্তু কি ক্ষণেই এই ইলা মেয়েটির সঙ্গে গেল ওর ভাগ্য জড়িয়ে। সেই চার-পাঁচ বছর থেকে দীপেশ হারিয়ে ফেলেছে ওর সুখের পুরাতন উৎস। অবশ্য প্রথম প্রথম কিছুদিন লেগেছিল ভালই—যখন ও ভাবত বড় চাকুরে হব, হাজার হাজার টাকা উপায় করব, আর ইলা করত বাড়ীর এষ্টিমেট—গঙ্গার কাছে হবে কি বালীগঞ্জে হবে। কিন্তু দিন চলার সঙ্গে সঙ্গে হাজার টাকার স্বপ্ন, গঙ্গার ধার, বালীগঞ্জ—সব যেন ভোজবাজীর মত উবে।

তার পর ঝিমিয়ে-যাওয়া ওদের মনের মাঝে নব-বসন্ত নিয়ে এল খোকা। ফুলের মত নিষ্পাপ শিশু। সে আজ

কি পাপে, কার পাপে পঙ্কিল হল ? সে-পাপ কি ওর নিজেরই রচিত, না পিতামাতার পাপের ফল ? সে কথা আজ কে বলে দেবে দীপেশকে ?

হঠাৎ ইলার আর্ত্ত স্বরে ওর চিন্তার রাশি ছিটকে পড়ল এদিক্ ওদিক্। দৌড়ে ঘরে এসে দেখল খোকা কি এক রকম করে চাইছে। ইলা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ওগো, এ কি হল ? যাও তুমি ডাক্তার বাবুকে এক্ষুণি নিয়ে এস।"

দশ বারোদিন যমে মানুষে লড়াইয়ে শেষে জয় হল মানুষের। ডাক্তার আশ্বাস দিলেন আর ভয় নেই খোকার জীবনের। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল দীপেশের বুক চিরে ক্লান্তি ও অবসাদের বার্ত্তা নিয়ে। ইলা আবদার ধরল বড়দিনের ছুটির সঙ্গে আর কিছু ছুটি নেবার জন্যে। আর তা ছাড়া দীপেশেরও তো কিছু বিশ্রাম চাই। দীপেশ কিন্তু তখন ভাবছে অন্য কথা। খোকার সেই বাড়াবাড়ির দিন থেকে অফিস কামাই। কাজ-কর্ম্ম সকলই রয়েছে 'পেণ্ডিং'।

তাই অবসাদাক্লিষ্ট পা দুটোকে কোন রকমে টেনে নিয়ে যখন দীপেশ এসে পৌছাল অফিসের দোর গোড়ায়—তখন এগারটা বেজে গেছে। অফিসে ঢুকে সে সন্তর্পণে নিজের টেবিলের দিকে অগ্রসর হতেই পাশের বৃদ্ধ কেরাণী নীলমাধব বাবু মুরুব্বিয়ানা চালে বলে উঠলেন, "এই যে দীপেশ, তা এতদিন কোথায় ছিলে ? কাজটা কিন্তু ভাল কর নি হে ছোকরা।"

নীলমাধব বাবু বয়োজ্যেষ্ঠ। তার উপর আজ দশ-পনের বছর ধরে এই অফিসে একই চেয়ারে আছেন 'পার্মানেন্ট' হয়ে। সবাই তাঁকে দাদা বলে ডাকে, কিন্তু সম্মান দেখাবার বেলায় সমবয়স্কদের চেয়ে বেশী নয়। মাঝে মাঝে অফিসের ছোক্‌রারা ঠাট্টা করে বলত, "মাধব-দা, এতদিন ধরে একই চেয়ারে রয়েছেন, বৌদি অনুযোগ করেন" ইত্যাদি। নীল-মাধব বাবু ভারিক্কি চালে মাথা দুলিয়ে একটু হাসতেন। কোন কথা বলতেন না।

দীপেশ তার কাছে এগিয়ে এসে গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করল, "মাধব-দা, শুনেছেন না কি কিছু আমার সম্বন্ধে কোন আলোচনা ?"

"কেন আর আমার কাছ থেকে শুনে আমাকে মিথ্যে নিমিত্তের ভাগী করবে ভায়া ? তবে সত্য কথা স্পষ্ট করে বলতে এ শর্ম্মা......", বলতে বলতে কথার মাঝখানেই হঠাৎ থেমে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত এসে দীপেশের হাত ধরে টেনে বলল, "এদের সব যা-তা কথা শুনে মন খারাপ কারো না, দীপেশ-দা। চলে এস সিটে।"

এই প্রশান্ত ছেলেটি ছিল একটু অন্য ধাতুতে গড়া। ভয় কাকে বলে জানত না। রাখ্ ঢাক্ করে কোন কথা বলা ছিল ওর স্বভাববিরুদ্ধ। স্পষ্টবাদিতা এবং ব্যক্তিত্বই ছিল প্রশান্তর বৈশিষ্ট্য। তাই সকলে ওকে একটু সমীহ করে চলে। কথা বলতে বলতে নীলমাধব বাবুর থেমে যাওয়ার কারণও ঐ প্রশান্ত।

দীপেশ গুটি গুটি উঠে এসে সিটে বসে বলল, "তুমি কিছু শুনেছ অফিসে আমার সম্বন্ধে ? বল না প্রশান্ত।"

চাপা গলায় প্রশান্ত উত্তর দিল, "তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন, দীপেশ-দা ? ভয় খাওয়ার মত এমন কিছু তো ঘটে নি। আর যদিই বা কিছু ঘটে থাকে—ইউ শুড্ হ্যাভ দি কারেজ টু ফেস্ হোয়াট ইজ টু কাম্, লাইক এনিথিং (বরাতে যা আছে তার সম্মুখীন হবার সাহস রাখ)।"

দীপেশের মন নানা চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল। কাজে ক্রমাগত ভুল হতে লাগল। অজ্ঞাতসারে কখন যে একখানা কচি মুখ রুগ্ন মূর্ত্তি নিয়ে এসে ওর মনের কোণে দাঁড়িয়ে তাকে ভাববার দাবী জানাল, সে হুঁসও দীপেশের ছিল না।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গল বেয়ারার ডাকে—"বাবু, আপকো বড়া বাবু বোলাতে হেঁ।" দীপেশ সন্দেহভরা মন নিয়ে বড়-বাবুর ঘরে ঢুকে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল।

বড়বাবু এতক্ষণ চুরুটের ধোঁয়ার আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। দীপেশ আসতেই একখানা কাগজ তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "আমায় ক্ষমা করবেন দীপেশ বাবু। আই রিয়ালি ফিল্ ফর ইউ (আমি সত্যই আপনার জন্য দুঃখিত)।" পুনরায় তিনি চুরুটে মনঃসংযোগ করলেন।

কাগজখানার উপর দৃষ্টি ফেলতে না ফেলতেই দীপেশের মনে হল পৃথিবীটা তার পায়ের তলা থেকে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে। সামনের কাগজের হরফগুলি কিল্‌বিল্ করে নাচতে নাচতে এগিয়ে এসেই অর্থশূন্য হয়ে পড়ল। শুধু তার ভিতর থেকে,—"দি অফিস্ নো লঙ্গার রিকোয়ার্স ইওর সারভিসেস্···(তোমার কাজে অফিসের আর কোন প্রয়োজন নেই)"। লেখাটুকু আর নীচে সাহেবের সইটা অক্ষয় অমর হয়ে জল্ জল্ করতে লাগল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুর-জীবন

—শ্রীমতিলাল দাশ

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে বহরমপুরে কার্য্যে যোগ দেন এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ছুটি লইয়া বহরমপুর হইতে বিদায় লন। দীর্ঘ চারি বৎসরের উপর বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ছিলেন।

বহরমপুর-জীবন নানাদিক্ দিয়া সুখের ও সম্মানের ছিল। লেখক হিসাবে বঙ্কিমের খ্যাতি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত—দুর্গেশ-নন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনীর রচয়িতা হিসাবে বঙ্কিমের নাম বাঙ্গালা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বহরমপুরে আসিবার কিছুকাল পরেই বঙ্কিমচন্দ্র সাত শত টাকা বেতনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে মুর্শিদাবাদের জজ ছিলেন, এডওয়ার্ড গ্রে ও বেনব্রিজ; ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টার ছিলেন, হার্স্কি ও ওয়াডেল; জয়েণ্ট এবং অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন জেফেরি, কেলি, এণ্ডার্সন, রাডবারি, গ্রিমলি, কারষ্টেয়ার্স, ডাওয়েল, গ্রাণ্ট, রমেশচন্দ্র দত্ত, বোল্টন, উইণ্টার প্রভৃতি।

বহরমপুরেই 'বঙ্গদর্শন'-এর কল্পনা এবং প্রকাশ। বঙ্কিমের চারিদিকে তখন পণ্ডিত ও সাহিত্যরসিক ব্যক্তিগণের সমাবেশ। ইহারই ফলে বাঙ্গালা-সাহিত্যে বন্যা লাগিল।

'সাধারণী'র সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতা, গঙ্গাচরণ সরকার তখন এখানকার সাবজজ ছিলেন। সাব-জজ বলিলে তাঁহার ভুল পরিচয় হইবে। গঙ্গাচরণ হুগলী কলেজের একজন যশস্বী ছাত্র, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে একজন উঁচুদরের সাহিত্য-সেবী ছিলেন।

তখন বহরমপুরে বেশ আনন্দ ও উৎসবের আয়োজন ছিল। বর্ত্তমানে আমাদের জীবন নীরস ও মরুময় হইয়া উঠিয়াছে; মজলিস বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা একদম নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ছিলেন, তখন বহরমপুরে চাঁদের হাট বসিয়াছিল।

বাঙ্গালার রূপকথাকে যিনি ইংরাজী সাহিত্যে পরিচিত করাইয়া বাঙ্গালীর চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন—সেই রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তখন বহরমপুর কলেজে কাজ করিতেন। গ্র্যাণ্ড হল ক্লাব বলিয়া সেকালে বহরমপুরে একটি ক্লাব ছিল। এই ক্লাবের সভাপতি ছিলেন সাবজজ দিগম্বর বিশ্বাস, সম্পাদক ছিলেন লালবিহারী দে এবং বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সহকারী সম্পাদক।

এই সভায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি পঠিত হইত। একবার গুরুদাস এই সভায় 'ভারতবর্ষের গৌরব' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়েন—তাহাতে তিনি সেকালের ভারতের বিলাসিতা এবং পরিচ্ছদপটুতাকে অবজ্ঞা করিয়া বলেন, "যদি দরজি ভারত-বর্ষের নব-জাগরণের দীক্ষাগুরু ও পুরোহিত হয়, তাহা হইলে সে নব-জন্মের তিনি ভিখারী নহেন।"

হাস্যরসিক দীনবন্ধু প্রায়ই বঙ্কিমের নিকট আসিতেন। বন্ধুর সাহচর্য্য লাভের আশা ও সরকারী কাজ—দুইটিই উপলক্ষ্য ছিল। দীনবন্ধুর সমাগম ছিল বারোয়ারি উৎসবের মত। হাস্য, গান ও কৌতুকের বন্যা বহিত। দীনবন্ধু ছিলেন অফুরন্ত রসের ভাণ্ডারী। বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—সর্ব্বত্রই তিনি গিয়াছিলেন এবং এই সব দেশদেশান্তরে তিনি নানা চরিত্রের লোকের সহিত মিশিয়াছিলেন—তাঁহার মত লোকচরিত্রজ্ঞ রসিক তখনকার দিনেও অতি দুর্লভ ছিল, এখনকার তো কথাই নাই। কি অশুভ ক্ষণেই বাঙ্গালা সাহিত্যে হেঁয়ালি ও ভাবালুতার বীজ ছড়ান হইয়াছিল—যাহাতে চারিটি শাদা দেওয়ালের মধ্যে বসিয়াই মনস্তত্ত্বের পুঁথি রচনায় বাধিতেছে না এবং জীবনের সঙ্গে যাহার কোনও পরিচয় নাই—এমন ব্যক্তির অদ্ভুত উপন্যাসও নূতন সৃষ্টি এবং মনোবিজ্ঞানের জগতে নূতন দীপ বলিয়া আদর লাভ করিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র একটু রুচিবাগীশ ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় এবং দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় উভয়ের লেখার অশ্লীলতার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু যদিও অভিজাত সম্প্রদায়ের শুচিতা-বোধকে বুদ্ধিতে আহত করে, তবু দীনবন্ধুর তীক্ষ্ণ বাণ, তীব্র

শ্লেষ এবং স্নেহকরুণাময় কটাক্ষ হাসির হল্লা ছুটাইত—মানুষকে তার দুঃখের ও বিষাদের রাজ্য হইতে একেবারে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে তুলিত। বাঙ্গালাদেশের দুর্ভাগ্য আজ তাহার জীবন আড়ষ্ট ও শুষ্ক। রসিকতা, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ প্রভৃতি রসাল জিনিষ বাঙ্গালার সমাজ-জীবন হইতে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

বহরমপুরের কান্তি তথা চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি 'বঙ্গদর্শন'। বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম মাসিক 'দিগ্‌দর্শন' ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে মার্শম্যান বাহির করেন—১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মিশনারিরা 'দিগ্‌দর্শনে'র অনুকরণে 'গস্‌পেল ম্যাগাজিন' বাহির করেন। রাজা রামমোহনের 'ব্রাহ্মণসেবধি'ও মাসিক ছিল। ইহার পরে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতির চেষ্টায় 'জ্ঞানান্বেষণ' ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা তের বৎসর চলে। ইহা ইংরাজী ও বাঙ্গালার দুই ভাষায় চলিত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'এর একটি মাসিক সংস্করণও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বাহির হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করেন। 'তত্ত্ববোধিনী' বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবায় যে যত্ন ও উৎসাহ দেখাইয়াছিল, তাহা চিরস্মরণীয়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি 'সর্ব্বশুভকরী' নামে একখানি মাসিক বাহির করেন। রেভারেণ্ড কে. এম. বানার্জ্জি 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামে বাঙ্গালা 'এনসাইক্লোপিডিয়া' বাহির করেন, ইহার এক পাতায় ইংরেজী অপর পাতায় তাহার বাঙ্গালা থাকিত। ইহা মাস মাস বাহির হইত, কিন্তু ইহাকে মাসিক বলা চলে না। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃতবহুল এবং সংস্কৃতের সহিত সম্পর্কহীন সরল প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা উভয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। হুগলি কলেজ কর্তৃপক্ষও তাঁহার মতাবলম্বী ছিলেন। বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতসমাসবহুল ভাষাকে জনচিত্তের সদর রাজপথে আনিয়াছিলেন—তাহার মূলে কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয়।

ইহার পর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক মাসিকপত্র চালান। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ছয় বৎসর চলে। ইহা প্রাচীন কালের পত্রিকার মধ্যে বিষয়-গৌরবে ও প্রবন্ধ-সজ্জায় সত্যই প্রশংসনীয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 'রহস্য সন্দর্ভ' বাহির করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিচাঁদ মিত্র 'মাসিক পত্রিকা' বাহির করেন। ভাষার সারল্য এবং সহজ ও সরল প্রকাশভঙ্গী এই মাসিকের বিশেষত্ব ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' বাহির হয়। 'রহস্য সন্দর্ভে'র সুর অনেক উঁচু ছিল এবং ইহা আট নয় বৎসর চলিয়াছিল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 'রহস্য সন্দর্ভে'র সমকালে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' বাহির হয়। বামাবোধিনী পত্রিকা স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু ও গুরু ভূদেবচন্দ্র ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 'শিক্ষাদর্পণ' ছাপেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে ভূদেবের স্থান অতিশয় উচ্চে। অতি অল্প লোকেই তাঁহার সাধনা ও অবদানের কথা জানেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন 'ধর্ম্মতত্ত্ব' বাহির করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে 'অবোধবন্ধু' বাহির হয়। কবি বিহারীলাল এই পত্রিকায় লিখিতেন। কবি রবীন্দ্রনাথ আপন জীবন-স্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, 'অবোধবন্ধু'র রচনা তাঁহার উপর অতিশয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস দেওয়ার স্থান ইহা নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' নূতন নয়, তাহার পিছনে অর্দ্ধ-শতাব্দীর সাধনা ছিল, কিন্তু বঙ্কিমের পূর্ব্বে কেহই বাঙ্গালাকে শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র করিতে পারেন নাই। 'বঙ্গদর্শনে'র পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ভাবিতেন, বাঙ্গালায় সাহিত্য লেখা চলে না, বাঙ্গালায় লেখা মাসিক পড়ার জিনিষ নয়। বঙ্কিম এই মত পরিবর্ত্তন করান।

'বঙ্গদর্শনে'র অভ্যুত্থান তাই সত্যই যুগান্তরকারী। 'পুরাতন প্রসঙ্গে' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য (যিনি বঙ্কিমের সহিত একত্র ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ল' লেকচার শুনিতে যাইতেন) বলেন, "বিদ্যাসাগর বঙ্কিমকেও পছন্দ করিতেন না। Matter সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করিতেন না, কিন্তু manner সম্বন্ধে style সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। আমার মতে Bankim brought about a revolution in Bengali literature similar to that brought about by Crabb and Cowper in English literature, যে revolution-এর চূড়ান্ত হইল Wordsworthএ। *Edin-*

burgh Review Wordsworthকে গোড়াতেই চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল—This will never do, কিন্তু কবি অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হইলেন ও Poet Laureate হইলেন। বঙ্কিমও বিচলিত হইলেন না।"

'বঙ্গদর্শন' বাঙ্গালায় জাতীয় জীবনে ভাবের বন্যা বহাইল, বাঙ্গালীর প্রাণে আশার আলোক বহাইল। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' রুচিসম্পন্ন, শিক্ষাসমৃদ্ধ, অভিজাত লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টি করিল। বঙ্কিমের অনুপ্রেরণায় ও উৎসাহে সাহিত্যের মরা গাঙ্গে যে বান ডাকিল, সে বান আজিও থামে নাই।

অবশ্য দুঃখের বিষয় যে, লেখক-সংখ্যা, সুযোগ ও সুবিধা বাড়িলেও বাঙ্গালা দেশে আজিও খুব উঁচুদরের কাগজ অতি অল্প-সংখ্যাকই বাহির হয়। তথাপি একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, বাংলা সাময়িক সাহিত্যের এই অজস্র প্রাচুর্য্য বঙ্কিমের সাধনার ফল।

বহরমপুর অবস্থানকালে কর্ণেল ডাকিনের সহিত বঙ্কিমের ঝগড়া হয়। শচীশ বাবুর জীবনীতে এই ঝগড়ার কথা আছে।

এইখানে শ্রীনফরচন্দ্র ভট্ট নামক একজন মুন্সেফের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বাঙ্গালা দেশে ডেপুটি ও মুন্সেফের মধ্যে ঝগড়া ও মনোবাদের একটি ঐতিহ্য আছে, চিরকাল ধরিয়া এইরূপ চলিয়াছে শুনিতে পাই। ইহা জাতীয় গৌরবের কথা নহে, নানা কলঙ্কের ইহা অন্যতম কলঙ্ক।

শ্রীযুক্ত ভট্টের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের নিমন্ত্রণ-সভায় ডারউইন লইয়া তর্ক বাধে। বঙ্কিম নফর বাবুকে বলেন, "তুমি না পড়ে ডারউইন ব্যাখ্যা করছ।"

প্রত্যক্ষদর্শীর কোনও বর্ণনা নাই। শচীশ বাবু আমাকে বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মচরিতে ইহার কাহিনী আছে। কাহিনী যাহাই হউক, কালে তাহা অতিরঞ্জিত হইয়াছে নিঃসন্দেহ।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুর ত্যাগ করেন—তখন তিনি ছুটি লইয়া আসেন। ছুটি সহজে পান না, অনেক কষ্টে মেডিকাল লিভ্ যোগাড় করিতে হয়। এই লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁহার কথঞ্চিৎ মনান্তরও হয়। বহরমপুর ত্যাগকালে স্থানীয় লোকেরা বঙ্কিমের যে বিদায়-অভিনন্দন দেন, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুর জীবন নানা দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি স্বীয় অসাধারণ তেজের পরিচয় দেন কর্ণেল ডাকিনের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া। কিল খাইয়া কিল চুরি করা যাহাদের জাতীয় চরিত্র, তাহাদের একজন চাকুরিয়া নির্ভীক ভাবে আত্মসম্মানের জন্য এইরূপ লড়িয়াছিলেন, ইহা অতিশয় প্রশংসার কথা। চাকুরির জন্য ন্যায়, সত্য ও আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে যাহারা কুণ্ঠিত নয়, তাহাদের একজনের এই দৃষ্টান্ত সত্যই প্রশংসনীয়।

শচীশ বাবু তাঁহার পুস্তকে বঙ্কিমের এইরূপ অসাধারণ তেজস্বিতা এবং নির্ভীক বিবেক-বুদ্ধির অনেক পরিচয় দিয়াছেন।



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বহরমপুর 'বঙ্গদর্শনে'র স্রষ্টা বলা যাইতে পারে। 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গদেশের সুপ্তিমগ্ন নয়ন উন্মীলিত করিল। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার উপন্যাসসমূহ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার যে যশঃ-সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া দিল, 'বঙ্গদর্শন' তাহা সমৃদ্ধ করিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে তাই বহরমপুরবাসীরা সপ্তাহব্যাপী উৎসব করিয়া অভিনন্দিত করিল। সেকালের দিনে এমন অনুষ্ঠান বিরল ছিল—তাই এই উৎসবের কথায় বুঝি বঙ্কিমচন্দ্র অতিশয় জনপ্রিয় ছিলেন।

বহরমপুর অবস্থানকালে বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ,' 'ইন্দিরা' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' রচিত হয়। বঙ্কিমের প্রথম তিন খানি উপন্যাস ছিল কল্পনার উৎস, ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা। 'বিষবৃক্ষে'ই

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণ করিয়া আইন করাইয়া লন। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না, 'বিষবৃক্ষে' তিনি বিধবা-বিবাহ দেন, কিন্তু তাহার ফল শুভ না করিয়া প্রমাণ করিতে চান, বিধবা-বিবাহ ঘরে ঘরে বিষবৃক্ষের সৃষ্টি করিবে।

'বিষবৃক্ষে'র হরদেব বঙ্কিমের বন্ধু জগদীশনাথ রায়। জগদীশনাথ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পড়াশুনা যথেষ্ট ছিল। কথিত হয় যে, তাঁহার একখানি চিঠিই অবিকল 'বিষবৃক্ষে' ব্যবহার করা হইয়াছে।

ইন্দিরা যখন 'বঙ্গদর্শনে' বাহির হয়, তখন আট অধ্যায়ে সমাপ্ত একটি ছোট গল্প ছিল—পরে বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে বড় করিয়া উপন্যাসের আকার দেন। 'ইন্দিরা' রসজ্ঞ পাঠকের ভাল লাগে, ইহাতে সমস্যা নাই, ভরসা নাই,—আছে বাঙ্গালার শান্তশীতল গৃহের শান্তি-মধুর ছবি—বাঙ্গালা ঘরের এই হৃদয়মোহন ছবি যদি বঙ্কিমচন্দ্র অধিক আঁকিতেন ভাল হইত।

'যুগলাঙ্গুরীয়'এ বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় ঐতিহাসিক পট-ভূমিকাতে ফেরেন।

সুখ, সম্মান, কীর্ত্তি ও বন্ধুপ্রীতির এই সুখের জীবন ত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ছুটিতে চলিলেন।

ছুটির পর তিনি বারাসতে বদলি হন—সেখানে তিনি অল্পদিন মাত্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার-দক্ষতার একটি 'সেকালের কথা' নামক পুস্তকে পড়িয়াছি এবং ভট্টপল্লীর শ্রীযুত হরিমোহন ভট্টাচার্য্যের মুখেও শুনিয়াছি।

একজন পুলিসের কনষ্টেবল এক ব্রাহ্মণের গৃহে চুরি করিতে যায়। সেখানে অন্য একজন ব্রাহ্মণ অতিথি ছিলেন। তিনি চোরকে ধরিয়া ফেলেন। নিরুপায় সিপাই অতিথিকে চোর বলিয়া চালান দেয়—গল্প যে, বঙ্কিম নিজের পেস্কারকে রাস্তার ধারে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতে বলেন, এবং তাহার লাস আনিবার জন্য এই আসামী ও ফরিয়াদীকে পাঠান—তখন উভয়ের যে কথোপকথন হয়—তাহাতে সত্য আবিষ্কার হয়। বঙ্কিমচন্দ্র techincal justice না করিয়া substantial justice করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। যাঁহারা বিচারাসনে বসেন তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান্ নন, কিন্তু তাঁহাদের যদি আন্তরিক সত্যানুসন্ধানের ইচ্ছা থাকে, তবে লোকের অনেক মঙ্গল হয়।

বারাসত হইতে বঙ্কিমচন্দ্র মালদহে গমন করেন। মালদহের জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় বঙ্কিম ছুটি লইয়া বাড়ী আসেন। নয়মাস ছুটি ভোগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র হুগলিতে যোগ দেন।

অর্থাভাবের হেতু

...কোন দেশের কোন জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পরিমাণ, উর্ব্বরাশক্তি-সম্পন্ন কৃষিযোগ্য জমীর পরিমাণ, এবং স্বাস্থ্যসম্পন্ন কৃষকের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, এই সত্যটি বুঝিতে পারিলে জগতের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে অথবা অবনতি হইতেছে, তাহা স্থির করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। কারণ, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পরিমাণ, উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন কৃষিযোগ্য জমীর পরিমাণ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন কৃষকের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইয়াছে কি না এবং ঐ ব্যবস্থা সফল হইয়াছে কি না, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেই জাতির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে কি না, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যে দেশের গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, সেই দেশের লোকের অধিকাংশের পক্ষেই অর্থাভাবে অত্যধিক ক্লেশ পাওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

জগতের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, কোন দেশেই কৃষির উন্নতি সাধন করিবার জন্য উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থার কোনটিই অবলম্বিত হয় নাই এবং প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষই অর্থাভাবে অত্যধিক ক্লেশভোগ করিতেছেন।...

বিজয়ী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

ধনী ও দরিদ্রে

বিবাহের উৎসব মিটিল, তবু সমারোহের শেষ নাই। শুধু বিদায় আর বিদায়, বিদায়ের সমারোহ এবার। কেহ বলে, "এমন দীয়তাং ভুজ্যতাং এ-অঞ্চলে আর হয় নাই।" কেহ বলে, "এ-রকম ও-বাড়ীতে হয়েই থাকে, কিছুই বেশী নয়।"

গিরিরাজ তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ হৃষীকেশকে বলিলেন, "কিছু থাক আর না থাক, খরচ করছে খুব—রাজ্যের কাঙ্গালী এনে জড় করেছে, কি কি দিচ্ছে জান?"

"একখানা করে নতুন কাপড় দেওয়া হচ্ছে, কাঙ্গালী-বিদায়টা আনন্দের মা'র হাতে—"

"হে-হে-হে, নিশ্চয় গরীবের মেয়ে—গরীব নইলে গরীবের ওপর অত টান হয়? ঠাকুরুণটির কাণ্ডই ঐ—যতসব ভিখিরের মেয়ে এনে বাড়ীতে পুরছে—"

"ঐ কথাটি বলো না—কেশবের শ্বশুরকে না জানে কে?"

"রাখ রাখ, নামেই শুধু, আসলে কিছু নেই।"

গিরিরাজ হাতের নলটি ধরিয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন। কৈকেয়ী কোন বিষয়ে তাঁহাকে ছাড়াইয়া যাইবেন—সে-চিন্তাও অসহ্য। দলে দলে প্রার্থীরা চৌধুরী-বাড়ীর দিকে চলিয়াছে, যেন পিপঁড়ার সারি। ব্রাহ্মণ-বিদায়, পণ্ডিত-বিদায়, ভিখারী-বিদায়। কে কি পাইল, সেটা ঠিক ঠিক জানা না গেলেও এটা ঠিক্ জানা যায় যে, নিরাশ হইয়া কেহ ফেরে না। অসংখ্য কণ্ঠে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ ও জয়ধ্বনি কৈকেয়ীর, সে কি অকারণ? কৈকেয়ীর দর্প আকাশচুম্বী, ব্যবহার কঠোর, সেও যেমন সত্য, প্রজার জন্য অমন মুক্তহস্ততা সেও তেমনি সত্য। দুর্ব্বৎসরে খাজনা মাপ করা—বিপদে বুক দিয়া দাঁড়ানো, কৈকেয়ীর মত কে? কৈকেয়ী গিরি-রাজের চির প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

মুখে স্বীকার না করিলেও মনের অগোচর পাপ নাই। মনে মনে গিরিরাজ পরাজয় মানিতে বাধ্য হন আলোচনা করিয়া দেখিয়া। দুর্গম পল্লীতে পল্লীতে কৈকেয়ী ঘুরিয়া বেড়ান, প্রজার স্বাস্থ্য-সুখ-শিক্ষা ও কৃষির উন্নতি করাই তাঁহার একমাত্র কাজ, সেই উদ্দেশ্যে জলের মত খরচ করেন। ফল কি ফলে নাই? ষ্টেটে একটি কাজ খালি হইলে এক হাজার দরখাস্ত পড়ে—কাজ পায় কে? বাহিরের কেহ নয়, প্রজারা। নিজের প্রজাদের মধ্যে যে-যেমন যোগ্য সেই পদে সে নিযুক্ত হয়। কাজের ভরসা পাইলে লোকের উৎসাহ বাড়ে।

"এস তোমরা, যোগ্য হও, তোমাদের কাজ তোমরাই নাও, তোমাদের অযোগ্যতায় যদি বাইরের লোক নিতে হয়, তার চেয়ে লজ্জা-দুঃখের কথা আমারও নাই, তোমাদেরও নাই।" ইহাই কৈকেয়ীর বাণী। এই বাণীই প্রজাদের মধ্যে মন্ত্র-শক্তির কাজ করে। সেইজন্য কৈকেয়ীর এলাকার নায়েব নিজের যত কর্ম্মচারী সবই প্রজা। শিক্ষা-ব্যাপারে যে যে-দিকে উন্নতি করিতে পারে—তার সমস্ত দায়িত্ব কৈকেয়ীর। এক কথায় অদ্বিতীয়া চৌধুরাণীটি যে, আদর্শ ভূস্বামী, সে-কথা গিরিরাজ মনে মনে অস্বীকার করিতে পারেন না বলিয়াই ঈর্ষা-বিষে জ্বলিতেছেন। আপাততঃ কিছু একটা না করিলেই নয়।

ভাবিয়া চিন্তিয়া গিরিরাজ এক বুদ্ধি বাহির করিয়া ফেলিলেন। দিন কয়েকের মধ্যেই সকলকে অবাক্ করিয়া দিয়া সহরের গরীব দোকানীর সুন্দরী মেয়েটিকে আনিয়া নিজের ছোট ছেলে অজিতের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। এত বেশী জাঁকজমক হইল যে, লোকের চক্ষে সত্য সত্যই ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল। কলিকাতা হইতে এক নামজাদা থিয়েটার আসিল এবং চার পাঁচ দিন ধরিয়া চারি পাশের পল্লীবাসীদের মন ও চক্ষু সার্থক করিয়া গেল। আনন্দের বিবাহে এটা হয় নাই।

কৈকেয়ী হাসিয়া বলিলেন, "থাক, আমার সঙ্গে কেন করে একটা গরীবকে বাঁচালেন।"

নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিলেন রুক্মিণী, হৃদেশ্বার মত এক জোড়া জড়োয়া কঙ্কণ দিয়া নব-বধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আবার গিরিরাজের চার! সুদেষ্ণাকে তিনিও আশীর্ব্বাদী পাঠাইয়াছিলেন।

গিরিরাজের দরবারে নিত্য হাজিরা দেয় ষষ্ঠীতলার যাদব। দুই জমীদারের নিত্য বেবারেষির খবর ষষ্ঠীতলার লোকেরা ঘরে বসিয়াই শুনিতে পায়। আগে এসব কথায় বড় যোগ দিত না, আদার ব্যাপারীদের জাহাজের খবরে দরকারও ছিল না। সুদেষ্ণার বিবাহের পর হইতেই সকলে সজাগ হইয়াছে।

বড়-গিন্নী বলিলেন, "মিত্তিররা কি পেলেন, আর লক্ষ্মণ পেলে কি না ছুটো গিনি।"

করুণা হাসিয়া বলিল, "বরাত ভাল যে, তাঁরা কিছু দেন নি লক্ষ্মণকে, ঐটুকু মেয়ে কখনো অত গয়না পরতে পারে?"

"ঐটুকু থাক্‌বে না কি? বেড়ে উঠ্‌লো বলে—তা আসবে কবে? অষ্টমঙ্গলা তো পেরিয়ে গেল।"

"কি জানি দিদি, দিন গুণছি বসে।"

"গোণা অবধিই সার—বড়লোকের মেয়েরা বাপের বাড়ী যায় বিস্তর—তা সে আসবে! বড় জোর দু'একবার যদি আসে।"

করুণার বিবাহের মাস ছয়েক পরে সুদেষ্ণা জন্মিয়াছিল, সেই যে আঁতুড়-ঘর হইতে তাহাকে মানুষ করিতেছে, একটি দিনের তরেও কাছ ছাড়া করে নাই, এখন করুণার দিন আর কাটে না। বিনোদকে বলে—"কেন বা এত ছোটতে বিয়ে দিলাম—"

বিনোদ বলে, "এটা মানুষের স্বধর্ম্ম, যেই মনের আশাটা পূর্ণ হলো, অমনি গেল তার মূল্য কমে।"

"তুমি তার কি জানবে? সে হাত দিয়ে খেতে শেখে নি মোটে, কে তাকে খাইয়ে দিচ্ছে।"

"খাইয়ে দেবার ঢের লোক আছে সেখানে, আমার বেলা হলো, খেতে দাও দেখি।"

করুণা পিড়ি পাতিয়া ঠাঁই করিয়া গ্লাসে জল ভরিতে ভরিতে বলিল, "তা আছে বৈ কি, যত্ন তো কম নয়; বৌ-ভাতের যে-ঘটা দেখলাম সে-দিন, অমন আর দেখি নি। মস্ত বড় রূপোর থালা, লুচি, ভাত, খিচুড়ী, পোলাও চার রকমই দিয়েছে, বাটী তো অগুন্তি, মিষ্টি-মেঠাই-ফলের অতসব নামও জানি নে, চিনিও নে, দেখি নি তো কখনো—চিনব কি? আমাদেরও অবিশ্যি দেয় যদ্দূর সাধ্য বৌভাতের দিনই লোকে প্রথম খেতে পরতে দেওয়া, যে যেমন পারে সবই সেইদিন আনিয়ে দেয় তাই বলে।"

"তাই আপশোষ করছ? চোখে তেল দিয়ে কান্না বলে যাকে! বড়লোকের বাড়ীর গল্প শুনে আমার খাবার কাজ কি আজ—"

অপ্রতিভ করুণা তাড়া-তাড়ি রান্না-ঘরে ঢুকিল।

করুণার একান্ত ইচ্ছা বিনোদ সুদেষ্ণাকে দেখিয়া আসে, কিন্তু বিনোদ যায় না। বিবাহের দিন বৈকালে একটা বিপুল সমারোহ আসিয়া সুদেষ্ণাকে লইয়া গিয়াছিল, ষষ্ঠীতলাকে চমকাইয়া দিয়া। যেমন সে-আলোর বন্যা, তেমনি বাজনা। বিনোদ সঙ্গে গিয়াছিল—সম্প্রদান করিতে। পর দিন বাসি বিবাহের পরই চলিয়া আসিয়াছে। ষষ্ঠীতলার ঘরে ঘরে মেয়েদের নিমন্ত্রণ প্রতিমা করিয়া গিয়াছিল, করুণার নিমন্ত্রণ বিবাহের দিন হইতেই ছিল। কিন্তু করুণা যায় নাই। বিনোদ যে কেন যায় না, এইটাই করুণার দুঃখ। বেশী তো দূর নয়, রোজই একবার দেখিয়া আসিতে পারে, তা সে নিতান্ত পরের মত বৌভাতের দিন রাত্রে জ্ঞাতি-গোত্রের সঙ্গে কি না নিমন্ত্রণ রাখিয়া আসিল! তাঁদের আদর যত্ন তো কম নয়। তবু বিনোদের মন ওঠে না, করুণা বিনোদের উপর কিছু চটা।

বৈকালে খবর আসিল দেবনাথ আসিবেন। যেদিন তিনি আসেন, আগেই খবর পাঠান, বিনোদ যেন বাড়ীতে থাকে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে দেখা দিলেন, বিনোদ বাহিরের ঘরে অপেক্ষায় আছে।

নমস্কার-আশীর্ব্বাদের পরে দেবনাথ বলিলেন, "কিছু কথা আছে, তোমার কোন তাগাদা নেই তো?"

"না।"

দেবনাথ ইতঃস্তত করিতেছেন, কথাটা বলি বলি করিয়াও বলিতে বাধে যেন। বিনোদ বুঝিল—একটু হাসিল—সরল প্রফুল্ল হাসি, বলিল, "যদি কোন কথা থাকে সে, ওঁদের কথা, আপনি শুধু বলবেন, আপনার সঙ্কোচ কি?"

"তা সত্যি, বলছিলাম কি, আগেই বলা ছিল—গোলমালে আসতে পারি নি," একটু থামিয়া বলিলেন "তোমার সম্বন্ধে ব্যবস্থাটা ঠিক করাই আছে—শুধু তোমাকে জানাতে পারি নি।"

"আমার সম্বন্ধে ব্যবস্থা?" বিনোদ আশ্চর্য হইয়া চাহিল।

"হ্যাঁ তোমারই, তুমি চৌধুরীদের সব চেয়ে নিকট আত্মীয়, তোমার ব্যবস্থা করা তাঁদের প্রধান কাজ"—আবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিলেন, "তোমার বাড়ীটি দোতলা বা একতলা হবে সে তোমার ইচ্ছামত, কেশবের মা বলেছেন, বাড়ী বেশ বড় হওয়া চাই, বছর দুয়েকের বেশী লাগবে না। আমার মনে হয়, তোমার শাক-শব্জীর ক্ষেতটাই বাড়ীর পক্ষে ভাল জায়গা, দিন দেখে শীগগীর আরম্ভ করে দিচ্ছি

বিনোদ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। দেবনাথ বলিলেন, "আর মাসিক ব্যবস্থাটার কথা হচ্ছে এই—তুমি মাসে পাঁচশো করে পাবে, তোমার স্ত্রী পাবেন একশো ক'রে, তোমার বড় ছেলে পঞ্চাশ, তার পরে আর যারা পঁচিশ টাকা করে।"

বিনোদ নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল, লণ্ঠনের আলো পড়িল তাহার মুখে, সুদেষ্ণারই মুখ, আশ্চর্য সাদৃশ্য! শুধু রঙের তফাৎ, বিনোদের রং উজ্জ্বল গৌর।

বিনোদ বলিল, "এ সব কেন?"

"এ রকম নিয়ম আছে, তুমি জান বোধ হয়।"

"জানি, অনেক গরীবের মেয়ের বড় ঘরে বিয়ে হয়, অনেকেই মেয়ের বাড়ীতেই বাস করে, যারা করে না তাদের বাড়ী করে দেওয়া হয়, মাসহারা তো দেওয়া হয়ই, কিন্তু আমি বলি, কেন?"

দেবনাথ বলিলেন, "এ 'কেন'র জবাব আমি তো দিতে পারি নে বিনোদ।"

"পারেন, দেবেন না ইচ্ছে করে।"

দেবনাথ হাসিয়া বলিলেন, "এখন তুমি ওঁদের পর মনে করতে পার না।"

"না, তা পারি নে। পর হলে কি এতটা করতে চান? তাঁদের কাজ তাঁরা করেছেন, আমার কথাই আমি বলি। বোনটিকে আমি দান করেছি, বিক্রী করি নি, দাম নেব কি করে?"

"বিনোদ!"

বিনোদ সচকিত হইয়া বলিল, "আপনি একটুও দুঃখিত হবেন না আমার কথায়, আমি বড় কষ্ট পাব মনে তা হলে। আমি আপনাকে সব বলছি, আপনি বুঝে দেখুন। আমি গরীব, সবাই জানে, ষষ্ঠীতলায় তেমন ধনীও কেউ নেই, এই সব আমার গরীব আত্মীয়ের মধ্যে যদি আমি একটা পাকা বাড়ী খাড়া করি, তবে তাদের চোখে আমার দশাটা কি হবে বলুন? আর কি কেউ আমায় আপন মনে করবে? যদি নিজের চেষ্টায় বড় হতে পারতাম, সে ছিল আলাদা কথা, কিন্তু বোনের শ্বশুর-বাড়ীর টাকায় নিজের পৈতৃক ভিটের উপর দালান তুললে আমার পূর্বপুরুষ কি আমায় মাপ করবেন? নিজের মনেও কি তৃপ্তি পাব? এখন আমার জ্ঞাতিদের সঙ্গে সুখে-দুঃখে আমি এক, তখন তারা করবে আমায় মনে মনে ঘৃণা, মুখে ভয়, আমার পরিচয় হবে ধনীর অন্নদাস।"

"তুমি এ দিক্ দিয়ে ভাবলে কেন বিনোদ? অন্য দিক্‌টা কেন দেখছ না, এ রকম কথা কেউ কখনও বলেছে বলে শুনি নি।"

বিনোদ একটু হাসিয়া বলিল, "ভগবান্ দু'জন মানুষকে এক করে গড়েন নি, একের কাছে যা ভাল, অন্যের সেটা মন্দ, জগতের নিয়মই এই। আমার মনের কথা আমি বলতে পারি, অন্যেরটা বুঝতে চেষ্টা করবার কি দরকার?"

দেবনাথ চুপ করিয়া রহিলেন। বিনোদ বলিল, "আপনি খুব দুঃখিত হচ্ছেন, আমিও দুঃখিত আপনার জন্যে। আপনি আমার হয়ে ভেবে দেখুন, আমি ঠিকই বলেছি। আর ঐ মাসোহারা? কি সাংঘাতিক ব্যাপার! মাসে সাতশো টাকা আয়, ঘরে বসে অকর্মণ্য দান জিনিসটা খুব পবিত্র, খুব উঁচু; কিন্তু পাত্র হিসাবে—নইলে বড় হীন, বড় ঘৃণ্য! আমার বোনটি বড় ঘরে পড়েছে আমার সুখের সীমা নেই। আমার বোন নয়, মেয়ে। সেই তারই কাছে কি আমি ভিক্ষুকের মত হাত পাতব?"

"কেন বিনোদ, বাপ কি ছেলের জন্যে কিছু করে না? শ্বশুর করে না? বড় ভাই করে না?"

"এ কি তাই? তাঁদের সঙ্গে কি আমার সম্পর্ক? আমার বোনটিকে যদি না নিতেন তবে কি এই বন্দোবস্ত

আমার জন্যে হত ?" বিনোদ হাসিল, বলিল, "আপনাকে আমি বোঝাব, আমার সাধ্য কি ? মনের কথা গোপন করি নি, খুলে বলেছি সব। আমার জন্যে কিছু ব্যবস্থার দরকার নেই।"

দেবনাথ নিঃশব্দে রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "লক্ষ্মণ ভাল আছে ?"

"হ্যাঁ, খুব ভালই আছে।"

বিনোদ আর কিছু ব'লল না। দেবনাথ বুঝিলেন, সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না, তখন আপনা হইতে বলিলেন, "কাল পরশু আসতো কিন্তু সঙ্গে যে ঝিয়েরা আসবে তাদের একজনের জ্বর হয়েছে তাই দু'তিন দিন দেরী হবে।"

"ঝিয়েরা আসবে ? বোধ হয় লক্ষ্মণের কাজ-কর্ম্মের জন্যে ?

"হ্যাঁ।"

"কজন ?"

"দু জন তো শুনেছি।

"দেখুন, আমি আপনার ছেলের মত, আমার দোষ নেবেন না। আমার অবস্থা জানেন, দেখছেন, বড় ঘরের ঝিয়েদের চাল-চলনও খুব উঁচু হয়, এত উঁচু যে আমার নাগাল পাওয়া অসম্ভব। আমার শুধু একটি বাহিরের ঝি আছে, আপনাদের ঝিয়েদের আদর অভ্যর্থনা করবো আমি কি দিয়ে ?"

"সে কি ? তাদের তুমি অভ্যর্থনা করতে যাবে কেন ? তারাই তোমাদের করবে।"

"সে আরো বিপদ ; আমার স্ত্রী তাদের কাছে থাকবে ভয়ে কখন কি ত্রুটি হয়, তাঁরা কুটুম-বাড়ীর লোক—আদরের পাত্র তো সত্যিই। না এ-রকম অবস্থার মধ্যে আমি পড়তে রাজী নই। বোনের বিয়ে দিয়েছি, সে তাঁদের হয়ে গেছে। তাঁদের বৌ তাঁরা যেমন ইচ্ছে রাখবেন, তাতে আমার কিছু বলাও উচিত নয়, অধিকারও নেই। কিন্তু আমার স্ত্রীকে আমি কারও চোখে হীন করতে রাজি নই।"

"তাঁদের ঐ একটি বৌ বিনা লোক-জনে কি পাঠাতে পারেন, না উচিত ?"

"অনুচিত আমিও বলি নে। তবে তার আসবার দরকার নেই, আমি দেখে আসবো মাঝে মাঝে ; সমান ঘরের না হলে বড় লোকের বৌয়েরা তো জীবনেও বাপের বাড়ী যেতো না, আজ-কালই সেই নিয়মটা তত কড়া নেই তার ; জন্যে আমি একটু দুঃখিত হব না।"

"আচ্ছা, আমি উঠি এবার, অনেক রাত হলো।"

বারান্দায় বাহির হইয়া দেবনাথ বলিলেন, "বিনোদ আমি একটা কথা বলি ?"

"বলুন।"

"চৌধুরীদের আমিও পর নই, একটা দূর সম্পর্কও ছিল, যদিও সেটা আমরা ধরিনে। কিন্তু ভবানী আমার ছোট ভাই, সহোদর ভাই বলে মানতেম। আর কেশব জানে, সেই প্রজা, আমিই মালিক।" বলিয়া বিনোদের মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন, "আনন্দও বাপের মতই হবে, যদি দরকার হয় কখনও, তুমি আনন্দকে দেখো।"

"আপনি তো আছেন।"

"আমি আর কতদিন থাকবো ? আমার ভাইপোকে অংশু গড়ে তুলছি, তার হাতে সব বুঝিয়ে দিয়ে তীর্থবাস করবো। তোমায় দেখে প্রথম থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে, আনন্দের একজন সত্যিকার অভিভাবক পেলাম। এখনও যদি তোমায় পাই, প্রসাদকে আমি চাই নে। যাক সে তো হবার নয়। কিন্তু দরকার যদি হয় তুমি আনন্দকে দেখবে ?"

"আমার সাধ্য—"

"সাধ্য কি শুধু টাকায় হয় বিনোদ ? সাহায্য যাকে বলে সেইটি তুমি কোরো আনন্দের জন্যে, যদি কখনো দরকার হয়, তখন বড়লোক বলে যেন তাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না। দাও, কথা দাও আমায়।"

গাড়ীর কাছে আসিয়া বিনোদ বলিল, "অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি, আমায় মাপ করবেন।"

দেবনাথ ফিরিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তা করতে পারি, কিন্তু তুমি কি ভেবেছ আর আমি আসব না ? বিদায় সম্ভাষণের কিছু দরকার নেই বিনোদ, তুমি আমায় দেখে বোধ হয় তেমন খুশী হও না, তবু যখনই ইচ্ছা হবে আমি চলে আসবো, সে তুমি যতই অপছন্দ কর।"

"এমন কথা বলবেন না, আপনি আমার পিতৃতুল্য" বিনোদ নীচু হইয়া দেবনাথের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

দেবনাথ বিনোদকে আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "তোমার মত একটি ছেলে যদি আমার থাকতো

পৃথুরাজ

মিত্র-বাড়ী অজিতের বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতার সে থিয়েটার আসিয়া তিন রাত্রি অভিনয় দেখাইয়া গেল।

আনন্দ হেড্ মাষ্টারকে বলিল, "আমরা থিয়েটার করবো না?"

হেড্ মাষ্টার হাসিয়া বলিলেন, "লোকের চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেছে, আর কি কেউ আমাদের অভিনয় দেখতে চাইবে? দিন কতক বন্ধ থাক।"

এ দিকে কর্ম্মচারীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়াছে, 'সরলা' থিয়েটার করিবে, তাহারা আনন্দকে ধরিল।

আনন্দ বলিল, "সরলা টরলা না, পিসীমা ও-সব ভাল বাসে না, বই আমি বেছে দেবো, আমরা কলকাতার চেয়ে ভাল প্লে করি, সেটা প্রমাণ করা চাই।"

বলিয়া কহিয়া আনন্দ হেড্ মাষ্টারকে রাজী করিল। তাঁরও যথেষ্ট সখ আছে, অভিনয়-নৈপুণ্যও চমৎকার, শুধু লোকের তুলনামূলক টিট্‌কারীর ভয়েই দিনকতক সংযত হইয়া থাকিতে চাহিয়া ছিলেন।

আনন্দ জানকীর ঘরে গিয়া আলমারী খুলিয়া বই বাছিতে লাগিল, জানকী পৌরাণিক অভিনয় দেখিতে ভাল বাসে, সুতরাং ভাল একটা বই পাইলেই তাহাকে খুসী করা যায়।

বই বাছিতে বাছিতে আনন্দ একটা গীতাভিনয় পাইল—'পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ'। বইখানা নিজের ঘরে আনিয়া পড়িয়া ফেলিল। নাটকটি তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিল। দেবনাথের ভাই-পো প্রসাদ আনন্দের চেয়ে বয়সে বড় হইলেও দুজনে খুব বন্ধুত্ব। আনন্দ বইখানা প্রসাদের হাতে দিল।

থিয়েটার পার্টি বইটা পছন্দ করিল। হেড্ মাষ্টার ও সেকেণ্ড মাষ্টার ঠিক করিলেন, যাত্রার ধরণে না হইয়া অভিনয় ষ্টেজের উপর থিয়েটারী ধরণে হইবে। সাজিবেন তাঁহারাই। সহস্র চক্ষের সামনে দূর হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে আসা ও যাওয়া বড় বিসদৃশ কাণ্ড! সজ্জিত অভিনেতাকে ও-রকম খেলো ভাবে দেখিলে লোকের আগ্রহ ও শ্রদ্ধা কমিয়া যায়। সুতরাং নিজেদের রুচি অনুযায়ী নাটকটি গড়িয়া লইতে তাঁহারা লাগিয়া গেলেন। অর্থাৎ দুই জনে ঘরে কপাট দিলেন।

খণ্ডে খণ্ডে লিখিয়া দিন তিনেকের মধ্যেই একটা সুন্দর নাটক গড়িয়া উঠিল। জুড়ীর গান বাদ পড়িয়াছে, পুরাণো গান সমস্ত বাদ, নূতন সুরের আধুনিক গান ও কীর্ত্তন ভজন দেওয়া হইল, সেকেলে উৎকৃষ্ট শুদ্ধ ভাষার দীর্ঘ বক্তৃতাগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট ও শোভন করা হইল। দুই তিনটা অনাবশ্যক চরিত্র বাদ গেল এবং নর্ত্তকীর দল একদম বর্জ্জন হইল। আধুনিক রুচিসম্পন্ন লোকের হাতে পড়িয়া প্রাচীন নাটক সম্পূর্ণ আধুনিক হইয়া দাঁড়াইল। তার পরে ঠিক হইল ভূমিকা-লিপি।

স্বভাবগুণে আনন্দ সকলের প্রিয়। হেড্ মাষ্টার বলিলেন, "আনন্দ তুমি বিজিতাশ্ব সাজ, ঠিক মানাবে।"

আনন্দের আপত্তি নাই। বলিল, "বাবাকে জিজ্ঞেস করি, যদি বলেন, তবে সাজব।"

রিহার্সেল সুরু হইল। অনেকগুলি অপ্সরী আছে, মাষ্টারদের ইচ্ছা থাকিলেও অপ্সরী সাজিতে পারেন না, ছাত্রেরা বলিবে কি? সুতরাং অল্পবয়স্ক কর্ম্মচারীরা ঘন কোঁকড়া লম্বা চুল পরিয়া ফুল-তোলা ঝল্‌মলে রঙ-বেরঙয়ের সাড়ী ও গহনায় সাজিয়া আয়নায় দেখিয়া নিজেদের রূপে নিজেরাই মোহিত হইয়া গেল।

পণ্ডিত (জ্যোতিষী) সাজিলেন সনক। দু'তিনটি ছাত্রকেও এবার লওয়া হইয়াছে ছোট ছোট ভূমিকায়।

এদিকে আনন্দের মাথায় নূতন কল্পনা ঢুকিয়াছে, সে চলিল কেশবের কাছে।

কেশবের সঙ্গে আনন্দের সম্পর্ক অসমবয়সী বন্ধুর মত। ভয়-ভক্তির চেয়ে ভালবাসা বেশী। কেশবের নির্জ্জন পড়িবার ঘরে বড় কেহ যায় না—যোগীর যোগভঙ্গ হয়। কেশবের মুখে কটু ভাষা নাই, কিন্তু তাঁর বিরক্ত চাহনিই অনেক তিরস্কারের চেয়ে মর্ম্মভেদী।

আনন্দ গিয়া অসঙ্কোচে বাপের কাছে দাঁড়াইল, আজ তার প্রয়োজন বড় গুরুতর।

"বাবা—"

কেশব মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "কেন?"

"একটা কথা আছে বাবা।"

"কি কথা?"

আনন্দ চুপ করিয়া রহিল। কেশবও লেখায় মন দিলেন, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

"তুমি যদি কেবল লিখবেই, বলব কি করে?"

"আমি কাণ দিয়ে লিখছি নে।"

"তুমি যখন লেখ—তোমার কাণ যে লেখার মধ্যেই থাকে। শোন, আমরা পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ থিয়েটার করব" বলিয়া আনন্দ দরজাটা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া বাপের গলা জড়াইয়া ধরিল, "তুমি যদি পৃথুরাজ সাজ বাবা—তবে আমি বিজিতাশ্ব হই, আমার ভারি ইচ্ছে।"

কথা শুনিয়া কেশবের কলম থামিয়া গেল।

"বাবা।"

"আচ্ছা, ভেবে দেখি, তুমি একটু পরে এস।"

"কতক্ষণ পরে?"

"এই দশ পনর মিনিট, তোমাদের রাজা, রাজপুত্র কি ঠিক হয় নি?"

"তা হবে না কেন? সে ত ঠিকই আছে। প্রসাদ-দা, মাষ্টার মশাইরা, ছোট নায়েব বাবু উঁরাই ত যেন পার্ট করেন। তুমি শুধু লেখা নিয়ে থাকবে তো জানবে কি করে? আমি কিছু শুনব না বাবা, আমার কথা তোমার শুনতেই হবে। আরও পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, ঠিক কুড়ি মিনিট পরে আসব।"

ঠিক সময়ে আনন্দ আবার দরজায় ডাক দিল—একটু ভয় ও একটু উৎকণ্ঠা লইয়া। কেশব টেবিলে হাত রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া আছেন, বলিলেন, "এস।"

ঘরে ঢুকিয়া আনন্দ আবার দুয়ার বন্ধ করিল, তাহাদের মন্ত্রণা তৃতীয় জনে না জানে।

কেশব বলিলেন, "আমি যদি না পারি?"

"ইস্ পারবে না।—সবাই পারে, তুমি পারবে না? ছেলেবেলায় তুমি না কি কত কি সাজতে।"

"সে কোন্ দিন কি করেছি না করেছি, সে কি মনে আছে? তা তুমি যখন এত করে বলছ আমি রাজী। কিন্তু ভাল যদি না লাগে চলে আসব, তখন কিন্তু বলতে পারবে না, "বাবা শেষ অবধি থাক'।"

"না, তা বলব না—তবে তুমি এলে আমিও আর করব না। তোমার পার্টটা তবে তোমায় দিয়ে যাই, আর দেখ বাবা কাউকে তুমি ব'ল না যেন? মাকেও না। ওদের অবাক্ করে দেব আমরা।" বলিয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া আনন্দ চলিয়া গেল।

আজ থিয়েটার, পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ। এককালে যাত্রার আসরে সুরথ-উদ্ধার, সুধন্বা-উদ্ধার, পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি অনেক ভাল ভাল গীতাভিনয়ের যথার্থ আদর ছিল, যাত্রার অধিকারী শাল দোশালা, গিনি-মোহর পুরস্কার পাইত, অনেকগুলি বিখ্যাত দল ছিল যাহারা গীতাভিনয় করিয়া লোককে প্রকৃত আনন্দ দিয়াছে। আজ থিয়েটারের কল্যাণে যাত্রা সভ্যসমাজ হইতে যাত্রা করিয়াছে। প্রাচীন রীতি-নীতি, বেশ-বাস সবই যখন প্রস্থানের পথে, তবে যাত্রা কেন না যাইবে?

লোকে আশা করিয়াছিল—কলিকাতার থিয়েটারের মত একটা জমকাল কিছু অভিনয় হইবে। কিন্তু হাণ্ড-বিলে যখন দেখিল "পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ'' নিরাশ তো হইলই, ঠাট্টা-বিদ্রূপও চলিল। গীতাভিনয়ের রূপ সকলেরই কিছু জানা আছে, বছর বছর চৌধুরী বাড়ীতে দুই তিন বার যাত্রা হয়। সেই লম্বা সাদা-দাড়ি নারদ, পুলিশ কনেষ্টবলের পোষাক-পরা রাজা, এত দিন উপায়হীন হইয়া ভাল লাগিত, কিন্তু কলিকাতার থিয়েটার চোখ খুলিয়া দিয়া গিয়াছে!

প্রবীণ বয়সীরা অত বিরক্ত হইলেন না, চৌধুরী-বাড়ীর থিয়েটার পার্টির নাম আছে, তারা যা তা একটা করিবে না।

যাহোক আশায়, নিরাশায়, অনিচ্ছায় লোক জমিল মন্দ নয়। মিত্র-বাড়ী হইতে গিরিরাজ ছাড়া সকলেই আসিয়াছে, শহর, শ্রীনগর ও ষষ্ঠীতলার লোকও আসিয়াছে। রাত্রি সাতটায় প্রসাদ সাজঘর হইতে একবার বাহিরে আসিয়া দেখিয়া গিয়া হেড্ মাষ্টারকে বলিল, "এর পরে কেউ এলে ফিরে যেতে হবে, আর জায়গা নাই

দোতালায় চওড়া বারান্দা জুড়িয়া মেয়েদের জায়গা। তাহার এক দিকে কৈকেয়ীদের জন্য আলাদা করা জায়গা। যাত্রা-থিয়েটার কৈকেয়ী বড় দেখেন না, রুক্মিণী প্রায়ই আসেন এবং পৌরাণিক অভিনয় না হইলে জানকী আসে না।

আজ কৈকেয়ী আসিয়াছেন আনন্দের খাতিরে। খুব না কি ভাল বই, আজ তিনি না আসিলে আনন্দ তাঁর সঙ্গে জন্মের মত আড়ি করিবে। বলিয়াছে এমন একটা নূতন জিনিষ দেখাইবে—যা কৈকেয়ী দেখেন নাই কোন দিন।

ড্রপ সিন উঠিল। অস্পষ্ট আঁধারে ষ্টেজে দাঁড়াইয়া মায়া, অত্যন্ত ধীর ও ঝঙ্কার-ভরা সুরে গান ধরিল।

"কে পারে বারিতে আমারে—
অবারিত গতি তিন-লোকে মোর —
ডরি না কখন কাহারে!"

গান গাহিতে গাহিতে মায়া দুই হাতের ফুল-পাতা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া উড়াইয়া দিতেছে, ষ্টেজে চলিয়া বেড়াইতেছে, এক একবার তাহার মুখের উপর নীল-লাল আলো পড়ে, আবার অস্পষ্ট হয়। শেষে আলো নিভিয়া গেল—মায়া গাহিতে গাহিতে অদৃশ্য হইল। পট পড়িল।

তখন সকলেই যেন সজাগ হইয়াছে, বাঃ এটা ত বেশ দৃশ্য, বাকী অংশটা যদি এই ভাবের হয়, তবে বইটা মন্দ হইবে না, কেনই বা হইবে না? দুই মাষ্টার দুই বিদ্যাবিনুন্দন! তাঁহাদের হাতে লোহা পড়িলে সোনা হয়।

দ্বিতলে জানকী বলিল, "এটা কি করলে? বইতে তো এ রকম নেই?"

মুগ্ধা রুক্মিণী বলিলেন, "ভারী চমৎকার হয়েছে।"

"তা হয়েছে, আভাসটা দিয়ে গেল। শুনেছি, নিজেরা পোষাক তৈরী করিয়ে নিয়েছে। মায়া তো ভয়েলের সাড়ী পরেছে দেখলাম, পৃথুরাজ না ড্রেসিং গাউন পরে আসে!"

প্রথম দৃশ্যে—জয়ন্ত ও বুধ। জানকী বলিল, "মা চিনতে পেরেছ?"

"না, যে সাজ-গোজ-রঙ্।"

"ছোট নায়েব প্রসাদ।"

"বেশ সেজেছে।"

তার পরে ইন্দ্র ও পবনের প্রবেশ। রুক্মিণী বলিলেন, "এরা কে?"

"বড় নায়েব সেকেন মাষ্টার, সুন্দর কাপড় চোপড় এনেছে, না মা? কলকাতার ওপর বাজী রাখবে না কি এরা?"

কৈকেয়ী একটু হাসিয়া বলিলেন, "তাই দেখছি।"

পোষাক-পরিচ্ছদে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে, সুতরাং কৈকেয়ী খুব সন্তুষ্ট। মিত্র-বাড়ীর লোকেরা দেখিতেছে তো?

সিন পড়িল। আবার উঠিল—দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজ-সভা। রাজা বসিয়া আছেন, পাশে মন্ত্রী ও সেনাপতি। সিপাহীর মত চক্ষুপীড়াদায়ক রাজ-পোষাক নয়, সুরুচি-সাধিত শোভন পরিচ্ছদ। রাজার মাথার উষ্ণীষের ঝলমলে জমকাল রূপালী চূড়াটি জ্বলিতে লাগিল, গলায় মণি-মুক্তার মালা, কাণে কুণ্ডল—জরি-জড়ানো হাল্কা বেগুনী রংয়ের রাজবেশ, দীর্ঘকায় রাজা সত্য সত্য মহাবলা পৃথু রাজার মতই বসিয়া আছেন।

মন্ত্রী ও সেনাপতি কথা বলিতেছে, এমন সময় দুটি ছেলে প্রবেশ করিল গান গাহিতে গাহিতে—

"বম্ বম্ বম বম্ বম, শিব শিব, অশিবনাশন।
হরি হরি ধ্বনি দিবস যামিনী, পঞ্চাননে গান করে পঞ্চানন।
বিপুল বিভব অতুল সম্পদ পূত পবিত্র পুরিত শ্রীপদ
শিশি কোকনদ বিনোদ, বিনোদ নখে যেন চাঁদের কিরণ।"

গান শুনিয়া সকলে মোহিত হইয়া গেল। দর্শক-সভা নিস্তব্ধ। কৈকেয়ী নিঃশ্বাস ফেলিলেন। রুক্মিণী বলিলেন, "কি সুন্দর গান তৈরী করেছে।"

জানকী মৃদুস্বরে বলিলেন, "এটা বইতেই আছে।"

রাজা ছেলেদের সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজার কথা শুনিয়া—স্বর ও উচ্চারণের ধীর ভঙ্গিমায় দর্শকেরা বিস্মিত হইয়া গেল—তাহাদের চোখ পড়িল রাজার উপরে। কৈকেয়ী চমকিয়া উঠিলেন, জানকী হাসিল, রুক্মিণী একটু ফিরিয়া বসিলেন সহজ ভাবে। তিন জনই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন।

"জানকী—"

"চিনেছ মা?"

সেই সময় সনকের প্রবেশ। রাজা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গেল।

রাজার ভঙ্গীতে জড়তা নাই, কৃত্রিমতা নাই, অনাবশ্যক চীৎকার নাই, অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাব—প্রত্যেকটা

কথা শোনা যায়, বোঝা যায়। মুহূর্তের জন্য সকলে ভুলিয়া গেল এটা অভিনয় মাত্র।

গুরুদেবের সহিত রাজার তীর্থ-ভ্রমণের কথা হইল—যেমন গুরু বলিলেন, তিনি তীর্থে চলিয়াছেন, অমনি রাজাও বলিলেন তিনি যাইবেন। গুরু রাজী হইলেন, বলিলেন, "তবে চল কিন্তু যখনই আমি আদেশ করবো, তখনই তোমায় রাজধানীতে ফিরিতে হবে।"

এইবার রাজপুত্রের প্রবেশ। রাজার মতই বেশভূষা, শুধু মাথায় উষ্ণীষ নাই—তার বদলে একটা মোটা সাদা ফুলের মালা জড়ানো। পরিচ্ছদের রঙ্ গোলাপী। সে কাছে আসিয়া বলিল, "বাবা অন্তঃপুরে আসুন।"

দোতলার মেয়ে-মহলে অস্ফুট কথা হাসি—ছেলেদের কান্নার বিরাম নাই—থাকেও না কখনও। এবার নিস্তব্ধ হইবার পালা তাহাদের! মেয়েরা রাজাকে বড় চেনে না—দৈবাৎ কখনও দেখিয়া থাকিলেও চেহারা মনে নাই। কিন্তু রাজপুত্রকে সকলেই খুব ভালই জানে, চেনে। সুতরাং উপরে ও নীচের সমস্ত দর্শকবৃন্দ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল, তেমনি রুক্মিণী, কৈকেয়ী, জানকী বাক্যহারা, নিস্পন্দ অনিমেষ-চক্ষু!

রাজপুত্র আবার ডাকিল, "বাবা—"

রাজা ছেলের দিকে ফিরিলেন, রাজপুত্র বলিল, "দিন যে গেল বাবা, আসুন।"

এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া রাজা বলিলেন, "কি? কি বললে?"

"অন্তঃপুরে আসুন বাবা, দিন যে যায়—"

রাজা আবার মিনিট কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন:

"কে রে, প্রাণাধিক বিজিতাশ্ব পুত্র প্রাণধন
কি কথা বলিলি আজ—যায় দিন যায়!
হায় বাপ! জানিতিস যদি—
কেন আগে না বলিলি একথা আমায়?
কেন আগে বলিলি না, যায় দিন যায়—
হাসি খেলি নাচি গাই মনের উল্লাসে
ভাসি সদা আকাঙ্ক্ষা-পাথারে
কিন্তু কই ভাবি মনে—যায় দিন যায়?
অলক্ষ্যেতে আয়ুঃস্রোত পলকে পলকে
সময়-জলধি-জলে যায় মিশাইয়া।
কত রাজা কত রাজ্য কত রাজ-লীলা
কত গর্ব্ব কত জ্ঞান কতই প্রতিভা
কত প্রেম কত ভক্তি কত সুখ-দুঃখ
ধীরে ধীরে লয়ে যায়—করে বিসর্জ্জন
অনন্ত সময়-সিন্ধু অগাধ সলিলে!"

বলিয়া রাজা থামিলেন। চিন্তিত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন তার পরে রাজপুত্রের দিকে হাত বাড়াইলেন। ধীরে ধীরে চিন্তিত বিজিতাশ্ব সরিয়া আসিয়া বাপের আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা দিল।

রাজা বলিলেন,

"যায় দিন যায়—কিন্তু ফেরে না কখন
যায় দিন যায়—আজ হয়েছে স্মরণ
তাই বাপ করেছি কামনা"

পুত্রের চিবুক ধরিয়া—

"যাইব না অন্তঃপুরে আর
বল গিয়ে মায়েরে তোমার
গিয়েছে অনেক মম দিন যায় বলে
এদিনের কাজ কিছু করিতে সাধন।"

বলিয়া রাজা সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মাথার মুকুট, হাতের দণ্ড, সমস্ত রত্নাভরণ একে একে খুলিয়া সিংহাসনের উপর রাখিয়া দিলেন। শেষে রাজ-বেশ খুলিয়া ফেলিলেন, দেখা গেল রাজার পরণে একটি গেরুয়া কাপড়—গায়ে একটি গেরুয়া চাদর জড়ানো।

সেই সময় রাজদূত প্রবেশ করিল—ডাকিল "মহারাজ!"

রাজা বিরক্তভাবে বলিলেন—

"আঃ, আর কেন মহারাজ!
যা কিছু বলিতে হয় বল ইহাদের।"

বলিয়া দর্শকদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন, ডান হাতটি সিংহাসনের উপরে পরিত্যক্ত রাজবেশের দিকে দেখাইয়া ধীর গম্ভীর ও উদাস স্বরে বলিলেন—

"পড়িয়া রহিল এই রাজ্য তোমাদের
এই রাজ-আভরণ—এই রাজ-সিংহাসন
এরাই তো তোমাদের প্রভু মহারাজ
সামান্য পথিক আমি সংসার-প্রান্তরে
দীনহীন তীর্থযাত্রী, নহি মহারাজ!
আজ আমি পরিয়াছি রাজ-আভরণ
রাজা বলি তাই লোকে করে সম্বোধন।
কাল তুমি এ-সকল কর পরিধান
তোমারেও রাজা বলে করিবে সম্মান!

রাজা এই রাজ-সিংহাসন
রাজা এই রাজ-দণ্ড নাহি তার ভ্রম!
ভিখারী পথিক আমি আর কি বা আছে—"

কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে সকলের উদ্দেশে রাজার মাথা একটু নীচু হইল। তার পরে ফিরিয়া সকলের কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"চল গুরুদেব —
চরণে রেখো এ দাসে।"

বলিয়া গুরুর সঙ্গে রাজ-সভা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ড্রপ-সিন পড়িল।

জানকীর মুখ উজ্জ্বল—আনন্দ ধরে না! রুক্মিণীর চোখ ভরা জল টল্ টল্ করিতেছে। কৈকেয়ী পাথরের মত শক্ত ও কঠিন হইয়া গিয়াছেন।

হৃষীকেশ গিরিরাজের বড় ছেলেকে বলিলেন, "এমনটি দেখেছ কোন দিন?"

সেও সকলের মত অভিভূত হইয়া গিয়াছে, মাথা নাড়িয়া বলিল, "না কাকা।"

"তোমার বাবা এলে ভাল হতো, চোখ সার্থক করে যেতেন।"

তার পরে কয়েকটা অপ্রাসঙ্গিক দৃশ্যের পর আবার রাজ-সভা। রাজ্যে দারুণ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়িয়াছে, মন্ত্রী ও সেনাপতি রাজার সন্ধানে লোক পাঠাইবে পরামর্শ করিতেছে, সেই সময় রাজ্যের দুর্গতির কথা শুনিয়া পৃথুরাজা নিজেই আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

যে দৃশ্যগুলি হইয়া গেল, তাহাতে কোন দর্শকেরই মন নাই, কোন মতে সময় কাটাইতেছে মাত্র, অধীর প্রতীক্ষায় আছে শুধু রাজাকে দেখিতে।

সেই সামান্য বেশ কিন্তু সে রাজা নয়, তাঁহাকে আর দেখা গেল না। ইনি সুপরিচিত হেড্ মাষ্টার, বরাবর রাজা সাজেন।

নূতন রাজা ষ্টেজে আসিবামাত্র কৈকেয়ী জানকী রুক্মিণী উঠিয়া গেলেন। নীচে হৃষীকেশ সদলে প্রস্থান করিলেন, দেবনাথ উঠিয়া গেলেন, দর্শকেরাও কেহ কেহ উঠিয়া যাইতে লাগিল। নূতন রাজা তখন বলিতেছেন—

"গেল রাজা, গেল সব, গেল প্রজাগণ
ধনশূন্য বসুন্ধরা, অন্নশূন্য গৃহ,
তৃণশূন্য গোঠ মাঠ, শস্যশূন্য ভূমি—
ফলশূন্য তরুরাজি, গেল সব গেল!"

কিন্তু কই সে কণ্ঠ? গম্ভীর, ধীর কণ্ঠ, আবেগভরা কণ্ঠ? সেই দীর্ঘাকার সুদর্শন রাজকান্তি কই? ছোট পাহাড় দেখিয়া হিমালয়-দর্শকের মন ভোলে না।

সাজ ঘরে অভিনেতৃবর্গ এবং নিজে দেবনাথ পর্য্যন্ত কেশবকে শেষ পর্য্যন্ত অভিনয়টা শেষ করিতে ধরিলেন, কিন্তু কেশব বলিলেন, "আর কি আমি যেতে পারি? যে-কথা বলে বিদায় নিয়ে এসেছি, তার পরে?"

সাজ-ঘর ছাড়িয়া কেশব একেবারে বাড়ীতে আসিয়া শয়নঘরে ঢুকিলেন।

তখন ক্ষুণ্ণ মনে নিরুৎসাহ ভাবে হেড্ মাষ্টার রাজা সাজিতে আরম্ভ করিলেন। আনন্দও পোষাক পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিয়া ভদ্র হইয়া দর্শকদের মধ্যে গিয়া বসিল থিয়েটার দেখিতে। প্রসাদ বারণ করিল বার বার, কিন্তু আনন্দ হাসিয়া তাহার কানে কানে বলিল, "বিজিতাশ্ব সেজে মাষ্টার মশাইকে 'বাবা' বলে ডাকবো না কি?"

সুতরাং সেই রাজা সেই রাজপুত্রকে আর দেখা গেল না।

•

পরদিন জানকী বলিল, "ধন্যি মেয়ে বটে, কথাটা চেপে রেখেছিলে কি করে?"

"ঠাকুর-ঝি, তোমার দিব্বি ভাই, আমি কিচ্ছু যদি জানি! বাপ-ব্যাটায় কি পরামর্শ করলে চুপ চুপি, আনন্দটা কি কম দুষ্টু?"

কৈকেয়ী বলিলেন, "সেই পোষাকটা পরে আয় দেখি রে।"

আনন্দ বিজিতাশ্ব সাজিয়া আসিল।

কৈকেয়ী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "তেমন মানাচ্ছে না। তোর বাপের কাছে যেমন মানিয়েছিল।"

নিজের-ঘরে

পর দিন সকালে করুণা স্নান করিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে সবে, পিছন হইতে কে জড়াইয়া ধরিল, করুণা ফিরিয়া দেখে সুরেন্দ্রা।

"কখন এলি, কখন এলি ?"

"কেমন পা টিপে এসেছি, টের পাওনি," তার পরে করুণার কোলে মুখ লুকাইয়া বলিতে লাগিল, "দুষ্টু বৌদি, দুষ্টু বৌদি, এক দিনও আমায় দেখতে যায় নি! আমি কথা কইব না, কাছে শোব না।"

"দেখি মুখ তোল, বড়লোকের বাড়ী কি রোজ যেতে আছে পাগলী ?"

"তবে আমায় কেন পাঠালে ?"

"তুমি যে তাদের বৌ।"

"যাও, অমন বৌ ভাল নয়।"

ননদ-ভাজের সম্ভাষণ শেষ না হইতেই বাড়ীতে ঢুকিল গরবিণী সুখদা, পিছনে জন তিনেক লোক, মাথায় বোঝা, দুটি ষ্টীল ট্রাঙ্ক, দুটি ছোট বড় সুটকেস, সেগুলি বড় ঘরটার বারান্দায় নামাইয়া রাখিয়া তাহারা বাহির হইয়া গেল, করুণা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসন পাতিয়া সুখদাকে আদর সমাদর করিল।

একটু বসিয়াই সুখদা উঠিয়া দাঁড়াইল, "আমি কি বসতে পারি ? আমায় নইলে বাড়ীতে একদণ্ড চলে না, তা দেখ বৌ-ঠাকরুণ, গয়নাগুলো মা নিয়ে যেতে বলেছেন, চুরি-চামারী হয়ে যেতে পারে, একেবারে নিরিবিলি পাড়া-গাঁ কি না, কি বল ?"

"সে ঠিক কথা, তা নিয়ে যাও।"

"হাঁ, তুমি খুলে দাও, চুড়ি, বালা, তাবিজ থাক, সোনার হারটা, ছোট মুক্তোর মাথাটাও থাক, কাণবালা দুটোও রাখ, কাণ খালি করতে নেই, নইলে ও দুটোর দাম কম না। ওগুলো বাদ সব জড়োয়া গয়না খুলে দাও আমায়।"

করুণা সুদেষ্ণার গা হইতে সমস্ত হীরা-মুক্তা পান্না সেট-করা গহনাগুলি একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিল, কোন কোনটা সুখদা নিজেই খুলিয়া লইল, সেগুলি খুলিবার কৌশলটা করুণা জানে না। ছোট সুটকেসটা খুলিয়া তার মধ্যে শূন্য কেসগুলিতে গহনাগুলি তুলিয়া সাবধানে একটি একটি করিয়া আবার বন্ধ করিল, সব শেষে বাক্স বন্ধ করিয়া বলিল, "আবার যে দিন আসব, এ সব নিয়ে এসে লক্ষ্মীমণিকে সাজিয়ে নিয়ে যাব।"

ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া করুণা বলিল, "সে কি এখনি যাবে কি, একটু মিষ্টি মুখ করতে হবে, বাইরে কে কে আছে, একটু বসতে বল, উনি এখুনি আসবেন।"

"না-না, ও সব কিছু না, আমরা কি পর ? কত আসব, কত খাব, এখুনি কি হয়েছে ? আপনি ব্যস্ত হয়ো না, এখন দু'জনে মনের সাধে কথা কও, আমি আসি তবে। মনে রেখ বউলক্ষ্মী, রাখবে তো ?"

বউ-লক্ষ্মী করুণার গায়ে মিশিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুই বলিল না।

সুখদা চওড়া লালপেড়ে নূতন গরদ খস্ খস্ করিতে করিতে সুটকেসটি হাতে বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই শোনা গেল মোটরের হর্ণের আওয়াজ এবং ঘোড়ার গাড়ীর টকাটক শব্দ।

শব্দ মিলাইয়া গেল। সুদেষ্ণা বলিল, "খুকু কই বৌদি, আমার খুকু ?"

"খুকীকে পিয়ারের মা নিয়ে গেছে, তুই যাবার পর ওরাই রাখে ওকে।"

"দাদা কই, সুবল কই ?"

"ও পাড়া গেছে। আয় তোকে খেতে দিয়ে আমি উনুন জ্বালি।"

"নাঃ, খেয়ে এসেছি, নাইতে যাবে না বৌদি ?"

"আমি নেয়ে এসেছি, তুমি আজকের মত কুয়োতলাতেই চান কর।"

স্নান করিয়া সুদেষ্ণা আলনা হইতে নিজের একখানা ধোয়া লাল ফিতাপাড় ধুতি পরিল, করুণা বলিল, "এখন মনে হচ্ছে সত্যি লক্ষ্মণ, বড় লোকের বাড়ী হারিয়ে গেছলি দিদি।"

বিনোদ বাড়ী ফিরিয়া দেখে তাহার বোনটি আগেকার মতই খুকীকে ও পুতুলগুলি লইয়া খেলায় ব্যস্ত, পরিবর্তনের মধ্যে তাহার বাঁকা সিঁথি ঘুচিয়া সোজা হইয়াছে, এবং সিঁদূরের রেখা।

"লক্ষ্মী যে—" বলিতে না বলিতে সুদেষ্ণা ঝাঁপ দিয়া বিনোদের কণ্ঠলগ্ন হইল, বিনোদ তাহাকে আদর করিতে করিতে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! কাল ম্যানেজার এলেন, কই

বললেন না কিছু যে তুই আসবি আজ।" তার পরে এ-দিক্ ও দিক্ চাহিয়া বলিল, "আর কেউ আসে নি তোর সঙ্গে ?"

করুণা জবাব দিল, "লোক জন এসেছিল, পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে।"

"সবাই গেছে ?"

"হাঁ।"

"বল্ দেখি শ্বশুর-বাড়ীর গল্প শুনি, কেমন লাগতো ?"

সুদেষ্ণা মাথা নাড়িল।

"সে কি রে ? অত বড় বাড়ী, অত জিনিসপত্র ?"

"হোকগে, সুবল খুকু থাকে না, তুমি না, বৌদি না—ও ভাল না।"

বিনোদের ডান দিকে সুদেষ্ণার বাঁ দিকে সুবল খাইতে বসে, আজও বসিয়াছে। সুদেষ্ণা বার বার রান্না-ঘরের ভিতরে চায়, করুণা একটু ব্যস্ত, শেষে সুদেষ্ণা হাত তুলিয়া বসিয়া রহিল।

বিনোদ দেখিয়া বলিল, "কি হলো ?"

মুখ ভারি করিয়া সুদেষ্ণা বলিল, "বড্ড কাঁটা।"

"এই যে এলাম", কড়া নামাইয়া রাখিয়া করুণা আসিয়া সুদেষ্ণাকে খাওয়াইতে বসিল।

বিনোদ বলিল, "এবার যাবার সময় তোর বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে যাস।"

"আমি যাবই না।"

করুণা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে, সেখানে কি কেউ তোকে খাইয়ে দিত না ?"

"হাঁ, মা, প্রতিমা।"

"নাম ধরতে নেই, বয়সে অনেক বড়, তোর ঠাকুর-ঝি হয়, বড্ড হাসিখুশী মেয়েটি, ভারী সুন্দর স্বভাব।"

"ঠাকুর-ঝি আমায় খুব ভাল বাসে।"

"তা বাসবে বৈ কি, আর কে বাসে, তোর শ্বশুর, শাশুড়ী ? দিদিমা ?"

"হাঁ, সব্বাই।"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "তবে করুণার এবার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত।"

দুপুরবেলা সুদেষ্ণা নিজের বই-খাতা বাহির করিয়া সবে হাতের লেখায় মন দিয়াছে, সুসীমা, সুলেখা, সুনন্দা দেখা দিল, বারান্দায় না উঠিয়া উঠানেই দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া সুদেষ্ণা বলিল, "এস ?"

সুসীমা বলিল, "না, আমরা এখন খেলতে যাচ্ছি।"

"এস আমিও ত খেলব, কি খেলবে ?"

"পেয়ারা পাড়ব, আর বাগানে লুকোচুরি খেলব, এ আর দোতলায় গালচে পেতে বসে পুতুলখেলা নয়।"

সুদেষ্ণা করুণার দিকে একবার চাহিয়া বলিল, "বৌদি যে রোদে ছুটোছুটি করতে দেয় না ? আয় না ভাই এখানে বোস। একটু ছায়া পড়লে তখন বাগানে যাব।"

"বাঃ—বৌরাণী আমাদের সঙ্গে খেলবেন কি দুঃখে ? আমাদের হীরের গয়নাও নেই, বেনারসীও নেই।" বলিয়া সুদেষ্ণার দিকে একটা বাঁকা চাহনি হাসিয়া সুসীমা সঙ্গিনীদের দিকে চাহিল, সকলে হাসিয়া উঠিল।

সুদেষ্ণা মুখ নীচু করিয়া খাতায় লাইন টানিতে আরম্ভ করিল।

তখন সুসীমা বলিল, "বাদ যাও, এস তবে দয়া করে, আমরা আর দাঁড়াতে পারি নি।"

"যাও না তোমরা, আমি এখন হাতের-লেখা করব।" সুদেষ্ণা আর মুখ তুলিয়া চাহিল না।

"দেখলি ভাই অহঙ্কার ? তখনি যে বলেছিলাম—সেই যে"—কথাটা শেষ না করিলেও অর্থটা বেশ বোঝা গেল, এবং উচ্চহাসি হাসিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

করুণা কাছেই শুইয়া ছিল, বলিল, "ছি ছি সুসীমা বড্ড পাকা মেয়ে হচ্ছে দিন দিন, কেন অমন ধারা করে বললে তোকে ?"

ঠোঁট ফুলাইয়া সুদেষ্ণা বলিল, "বলুক গে, আমার বয়েই গেল।"

ঘণ্টা দুই পরে সুসীমা আবার আসিয়া সাধিয়া সুদেষ্ণার সঙ্গে ভাব করিল। কি কি জিনিষপত্র সুদেষ্ণার সঙ্গে আসিয়াছে, সে-গুলি দেখা চাই ত।

করুণার কাছ হইতে চাবি লইয়া সুসীমা নিজেই বাক্স খুলিয়া সব দেখিল, "এক বাক্স খেলনা ! এত সব তুই করবি কি রে একা ?"

করুণা বলিল, "লক্ষণ তোর যেটা সেটা ইচ্ছা হয়, সুসীমাদের দিয়ে দে, ওরাও খেলবে।"

যেমন কথা তেমনি কাজ, অর্দ্ধেকের বেশী খেলনা সুদেষ্ণা বিলাইয়া দিল। এবার সঙ্গিনীরা বেশ খুসী মনে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

সুলেখা বলিল, "চল এবার বেড়াতে যাই বাগানে।"

করুণা বাধা দিয়া বলিল, 'না, সন্ধ্যা হয়ে এল, এখন গাছতলায় যেতে নেই।"

সুসীমা বলিল, "ঠিক ঠিক, বিয়ের বছর না ঘুরলে কোথাও যেতে নেই সন্ধ্যের সময়।"

করুণা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তুই এত জানলি কি করে? তোর বিয়ে হলে তোকে আর কিছু শেখাতে হবে না কাউকে, তুই-ই সবাইকে শেখাবি।"

সুসীমাও একটু হাসিয়া জবাব দিল, "আগে থাকতে শেখাই তো ভাল, নইলে শেষে ভারি মুস্কিল হয়, না ভাই নন্দি?"

সুনন্দা বলিল, "ওমা বলিস কি, লজ্জা করে না তোর?"

"লজ্জা কি? সত্যি কথা? বিয়ে ত হবেই একদিন, না হবে না?" বলিয়া সুসীমা একটু গর্ব্বিত ভাবে হাসিয়া দলবল শুদ্ধ প্রস্থান করিল।

করুণা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "বড্ড বেহায়া হচ্ছে সুসীমা দিন দিন। দিদি ভাবেন এমন মেয়ে আর কারও নেই, বুঝবেন মজা! লঘু-গুরু জ্ঞান নেই, কাজকর্ম্ম তো কিছু করে না, গেরস্ত-ঘরের মেয়ে তো বটে, তুই ওর সঙ্গে মিশিস নে আর।"

(ক্রমশঃ)

পল্লীরাণী

—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

বনে বনে ফুল ফুটেছে
মটর খেতের অঞ্চলে,
কোন রূপসী শিল্প-রাণীর
শিল্প-শোভার রূপ ঝলে!
ধুতুরা ফুল আজ গন্ধ-ব্যাকুল,
পল্লী-বনে—আমের মুকুল,
মন্দারের ঐ সিঁথির সিঁদুর
সন্ধ্যাতারার টিপ্ জ্বলে।

কোন রূপসী পল্লীরাণী
পথ ভুলেছে ভুল করে,
কুয়াসার ঐ ওড়না শিরে
অপরাজিতার দুল্ পরে'।
যবের শীষে—মুক্ত-বেণী,
কচিপাতার—আঁচলখানি,
পলাশ ঝাঁকে—ঝুমকো জবা,
তাই বুঝি আজ চঞ্চলে।

মালদহ-পরিচিতি

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

মালদহের চতুঃসীমা : মালদহ জিলা বঙ্গ-বিহারের সন্ধি-স্থল। ইহার উত্তরে পুর্ণিয়া ও দিনাজপুর। পূর্ব্বে দিনাজপুর ও রাজসাহী। দক্ষিণে রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া।

এক কালে এই মালদহ জিলা সমগ্র বঙ্গদেশের গৌরবের স্থান ছিল। বাঙ্গালার প্রাচীন সমৃদ্ধ রাজধানী হিন্দু ও মুসলমানের স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র, হিন্দু ও মুসলমানের শিল্পনৈপুণ্যের বিদ্যালয় এক কালে এই গৌড়ই ছিল। কিন্তু আজ সেই গৌড় ধ্বংসাবশেষে পরিণত। ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন বক্তিয়ার খিলিজির নিকট পরাজিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে পলাইয়া যান। এইস্থানেই হিন্দুর দীপ্ত স্বাধীনতা-সূর্য্য ডুবিয়া যায় এবং মুসলমানগণের স্বাধীনতা-সূর্য্য ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে থাকে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী-প্রাঙ্গণে বাঙ্গালার শেষ আশাস্থল, স্বাধীনতার শেষ স্বপ্ন বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরেরদ্বারা বৈদেশিক য়ুরোপীয়গণের হস্তে চলিয়া যায়। এইখানেই বাঙ্গালার সব অবসান হয়।

মুসলমানগণ বাঙ্গালাদেশ জয় করিবার পর, ছাব্বিশজন বাদশাহ গৌড়ে রাজত্ব করেন, ও তাঁহাদের সময় অনেকবার রাজধানী পরিবর্ত্তন হয়। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান করানির সময় রাজধানী গৌড় হইতে টাণ্ডায় স্থানান্তরিত হয়। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মুনেম খাঁর সময় রাজধানী টাণ্ডা হইতে পুনরায় গৌড়ে ফিরিয়া আসে। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া রাজধানী গৌড় হইতে রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইস্‌লাম খাঁর সময় রাজধানী ঢাকা নগরীতে চলিয়া যায়। তৎপর শাহ্ মোহাম্মদ সুজা রাজধানী পুনরায় রাজমহলে স্থাপিত করেন। আবার মিরজুমলা রাজধানী পুনরায় ঢাকা নগরীতে স্থাপনা করেন। অবশেষে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুরশিদকুলি খাঁ কর্ত্তৃক রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থাপিত হয়। মুসলমানগণের রাজত্ব কালে যথাক্রমে গৌড়ের নাম ফতেহাবাদ, হুসেনাবাদ, ও নশরতাবাদ হইয়াছিল। গৌড় নগরের সৌন্দর্য্যশ্রী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া যায়। উপস্থিত গৌড়ের দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের মহিমা এবং কালের কুটিলতার সাক্ষ্য দিতেছে।

(১) তাঁতিপাড়া মসজিদ; (২) লোটন্ মসজিদ; (৩) কোতয়ালী দরগা; (৪) ছোট সোনা মসজিদ; (৫) ছোট সাগর-দীঘি; (৬) ঝনঝনিয়া মসজিদ; (৭) নিয়ামতউল্লার কবর; (৮) বাইশগজী প্রাচীর; (৯) পাঁচখিলান সাঁকো; (১০) শূলদণ্ড; (১১) বড় সোনা মসজিদ; (১২) ফিরোজ মিনার; (১৩) কদম-রসুল; (১৪) দরোশ বাড়ী; (১৫) খাজাঞ্চীখানা; এবং (১৬) গুণমন্ত মসজিদ।

মালদহ হইতে ই. বি. রেলওয়ের আদিনা এবং একলক্ষী উভয় ষ্টেশন হইতেই, পাণ্ডুয়া যাওয়া যায়। এই পাণ্ডুয়াতে হিন্দু রাজগণের কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইলেও, এখন যৎকিঞ্চিৎ বর্ত্তমান আছে। প্রস্তরে হিন্দুদিগের দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুয়ায় দেখিবার মত ছোট দরগা, ভাণ্ডারখানা, তন্দুরখান, সোনা মসজিদ, একলাখী মসজিদ, আদিনা মসজিদ, সাতাশঘড়া ইত্যাদি। পুরাতন মালদহ ইংরাজবাজার শহর হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে কালিন্দী ও মহানন্দা নদীর সঙ্গমস্থলে এই শহরটি অবস্থিত। ইহা পাঁচ অংশে বিভক্ত; (১) কাটরা; (২) মোগলটুলি; (৩) শর্ব্বরী; (৪) শাকমোহন; (৫) বাঁশহাটা। এখানে দুটি ষ্টীমার-ঘাট আছে, একটিতে রাজমহলের ষ্টীমার লাগিয়া থাকে, এবং অন্যটিতে আই. জি. এন. কোম্পানীর ষ্টীমার লাগিয়া থাকে। এই স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে জুম্মা মসজিদটি উল্লেখযোগ্য, ও এখানে 'ফুটি মসজিদ' নামক একটি, মসজিদ আছে। নদীর পশ্চিম পারে নিমাসরাই গ্রামে একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। এই পুরাতন মালদহের পূর্ব্বদিকে

ধর্ম্মকুণ্ড ও পশ্চিমে দেবকুণ্ড নামক দুটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারী অনুসারে মালদহ জিলার লোকসংখ্যা ৯,১৫,৬৬১।* ইংরাজী ১৮৭২ ও১৮৮১ সালের তুলনায় দেখা যায়, লোকসংখ্যা শতকরা ৫ ভাগ বাড়িয়াছে, কিন্তু দক্ষিণভাগে লোকসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে।

তারপর ইংরাজী ১৮৮১-১৮৯১ সালে শতকরা ১৪·৫ ভাগ বৃদ্ধি-পায়; ১৯০১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৮·৫ ভাগ বৃদ্ধি হয় এবং লোকসংখ্যা ৮,৮৪,০৩০ হয়। এই বৃদ্ধির কারণ সাঁওতাল পরগণা হইতে অনেক লোক এইস্থানে আসিতে থাকে।

বর্ত্তমানে মালদহ জিলার সমগ্র লোকসংখ্যা, ৯,৮৫,৬৬১; তন্মধ্যে পুরুষ ৪৯২,৮২২, স্ত্রী ৪৯২,৮২২; হিন্দু ৪০০,৫২০, তন্মধ্যে পুরুষ, ২০২,০৫১, স্ত্রী, ১৯৮,৪৬৭; মুসলমান ৫০৭,৬৮৫; পুরুষ ২৫১,৬৫২; স্ত্রী, ১৫৬,০৬৩; খৃষ্টান ৫৪৮; পুরুষ, ২৯২; স্ত্রী ২৫৬; শিখ, ০; ব্রাহ্ম ৩; জৈন ১৭১; স্ত্রী ৭০; পুরুষ ১০১; বৌদ্ধ ০; অন্যান্য ৭৬,৭৩৮; পুরুষ ৩৮৭২৩, স্ত্রী ৩৮,০১৫।

গাজোল, পুরাতন মালদহ ও হরিপুরে অনেক সাঁওতালের বাস। ইহাদের উপজীবিকা চাষ-কার্য্য। ইহারা প্রায়ই অশিক্ষিত। এই সব সাঁওতাল, কোল, চৈন প্রভৃতি নিম্নজাতি সবই অশিক্ষিত ও অবহেলিত। চৈন জাতি কৃষিকার্য্য করে, ইহারা বর্ত্তমানে অনেকে খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। অনেক সাঁওতালও খৃষ্টান হইয়াছে। কিন্তু দিনাজপুরের একজন সমাজ সংস্কারক জনৈক ব্যক্তির চেষ্টায় অনেকে খৃষ্টান হয় নাই, তাহারা হিন্দুধর্ম্মের বিধি-নিয়ম পালন করে; তাহাদের উপাস্যদেবী কালীমাতা। মালদহের কোচ জাতিরা অদ্ভুত পোষাক পরে, নিজেরা চাষ কার্য্য করে, মাদুর বোনে, গৃহে কাপড় বোনে। বাসন ও কাঠের কার্য্য সামান্যই জানে।

এই জিলার মোট রাজস্ব ১১ লক্ষ টাকা। নিম্নলিখিত-গুলি প্রধান আয়ের পথ: (১) ভূমি রাজস্ব; (২) ষ্ট্যাম্প; (৩) ইনকাম-ট্যাক্স; (৪) আবগারী ও লবণ; (৫) আফিম; (৬) অন্যান্য; (৭) পথ এবং পাবলিক ওয়ার্ক সেস; (৮) ডাক-সেস।

ভূমি রাজস্ব ইং১৯১১ সালে ৯,৯২,৬৫৭৲ টাকা ছিল। বর্ত্তমানে তাহা প্রায় একই প্রকার আছে। আবগারী আয়ের নিম্নেই ষ্টাম্পের আয়। ১৮৮০ সাল হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত ৭৯,০০০৲ টাকা আয় হইয়াছিল; বর্ত্তমানেও প্রায় অনুরূপ। ১৮৮০ সালে আবগারী বিভাগে, ১২৫,০০০৲ টাকা ও ১৯১০ সালে ২২৬,০০০৲ আয় ছিল। বর্ত্তমানে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। নিম্নশ্রেণী সাঁওতালগণ ও অন্যান্য জাতিরাই তাড়ি ও মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের লাইসেন্স লয়। ১৯১০-১৯১৪ পর্য্যন্ত ২০,০০০৲ টাকার তাড়ি বিক্রয় হইয়াছিল। মালদহ জেলায় ১৫০টী তাড়ির দোকান আছে। ১৯১৬ সালে ও বর্ত্তমানে পচুই মদ বিক্রয় হয় ৪,০০০৲ টাকা। আফিং বিক্রয় হইয়া থাকে ৫৩,৫০০৲ টাকা; ইহাই বর্ত্তমানের হিসাব। গাঁজার দোকান আছে ছাপ্পান্নটী; ইহা হইতে সরকারের ৬৬,৭০০৲ টাকা আয় হয়।

সেস্-এ প্রায় ৯০ হাজার টাকা উঠে এবং ইনকাম-ট্যাক্স প্রায় দুই হাজার টাকা করিয়া উঠে।

মালদহ জিলার অধিবাসিগণ অন্যান্য অনেক জিলার মতই প্রধানতঃ ধান্যের উপর নির্ভর করে। বাৎসরিক প্রায় ৫৭ ইঞ্চি বৃষ্টির জল এই জিলায় হয়। জিলায় উত্তরাংশ খুবই উর্ব্বর, দক্ষিণাংশে সামান্য তারতম্য দেখা যায়। সমগ্র জিলায় ২,৯০,০০০ একর জমিতে হৈমন্তিক ধান্য এবং ২,৩৪,০০০ একর জমিতে ভাদই ধান্য উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া জিলার মধ্য অংশে ও পশ্চিমে যব, গম, ভুট্টা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া রবিশস্য, মুগ, ছোলা, কলাই, মসুর, তিষি, সরিষা, আগনি ধান্য; জনার, বোরো ধান্য এবং পাট উৎপন্ন হয়। শতকরা বিশ ভাগ রবিশস্য, ৩·২৭ ভাগ ভাদই ধান, ৩৪ ভাগ আগনি ধান, ১৩ ভাগ যব ও গম উৎপন্ন হয়। সরিষা প্রায় ৬০,০০০ একর জমিতে উৎপন্ন হয়। প্রায় ৩০,০০০ একর জমিতে পাট উৎপন্ন হয়, উহার মধ্যে 'পলি' নামক অত্যুৎকৃষ্ট একপ্রকার পাট হয়, গাজোল থানায় ইহার অধিকাংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তামাক প্রায় ১০,০০০ একর জমিতে ছোলা; ও মটর ৮০,০০ একর জমিতে ফলে।

* "The first census of the district was taken in 1872, when the population of the present district area was 6,77,368, or a density of 357 persons per square mile".

পূর্ব্বে যথেষ্ট পরিমাণে নীলের চাষ হইত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মালদহ জিলায় ৩০টি নীল ফ্যাক্টরী ছিল, এখনও বৎসামান্য চাষ দেখা যায়। ইক্ষু খুব অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

রেশম মালদহের একটী লাভজনক ব্যবসায়; ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে কোন ব্যবসায়ী তিন খানি জাহাজে মালদহের রেশম বস্ত্র বোঝাই দিয়া, রুশিয়ায় ব্যবসার জন্য যাত্রা করিয়াছিল। তাহার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলান্দাজরা পুরাতন মালদহে রেশমের ব্যবসায়ের পত্তন করে। বর্ত্তমান কালে মালদহের রেশম একটি লাভজনক ব্যবসায়। এক্ষণে রেশম-পালকের সংখ্যা ৩৪,৫৯৬ জন। মালদহ, আমানিগঞ্জ হাট, সুবলপুর, জালালপুর, প্রভৃতি স্থানে প্রতি বৎসর ৮০,০০০ মণ গুটীপোকা উৎপন্ন হয়। ঐ গুটীপোকা হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকার কাঁচা রেশম উৎপন্ন হয়। দুঃখের বিষয়, এই সব রেশমের কারবার কোন বাঙ্গালী করে না, স্থানীয় গরীব লোকেরা রেশম উৎপন্ন করে, চাষ করে, কিন্তু সমস্ত মাল মাড়োয়ারীগণ কিনিয়া লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকে। মালদহে গরদ ও মটকার কাপড়, তসরের নানা কাপড় ও জামার ছিট্ প্রভৃতি বস্ত্র উৎকৃষ্ট হয়। মালদহে দুটী প্রধান রেশমের কেন্দ্র রহিয়াছে—সাহাপুর এবং শিবগঞ্জ। এই শিবগঞ্জে প্রায় ১৫০ ঘর লোকে রেশমের কাপড় বোনে, তাঁতের সংখ্যা প্রায় দুই শত খানির উপর; প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকার রেশম ও ৫০,০০০ টাকার মটকা উৎপন্ন হয়।

মালদহ জিলায় সূতি কাপড়ও তৈয়ারী হইয়া থাকে, কালিয়াচক থানা, কলিগ্রাম, ও খরবা থানায়। মালদহের দুইস্থানে—সুজাপুর ও গণেশবাড়ীতে সিল্ক রিসার্চ্চ সোসাইটী স্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে, রেশম ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একটী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ধাতুনির্ম্মিত জিনিষপত্র ও গালা এই জিলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। জনসাধারণ গালা-তৈয়ারী কাজে, ও বাসন প্রভৃতিতে অনেক নির্ভর করিয়া থাকে। নবাবগঞ্জ ও ইংরাজ বাজার ধাতুনির্ম্মিত কার্য্যের কেন্দ্র। ইহা ছাড়া, সৌদ্দুল্যাপুর, রহনপুর, চাঁপাই-নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্য তৈয়ারী হইয়া থাকে। সৌদ্দুল্যা-পুরের ঘটী খুবই বিখ্যাত। প্রায় সমগ্র জিলায় তিন হাজারের অধিক লোক এই কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

আম মালদহের একটি প্রসিদ্ধ ও লাভজনক ব্যবসা। মালদহ হইতে একরূপ সমগ্র ভারতে আম চালান যাইয়া থাকে। প্রতি বৎসর ৮ হইতে ১০ লক্ষ টাকার আম বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

মালদহ জিলায় তক্তিপুর পাটের একটি কেন্দ্রস্থল ও এখানে ছোট্ট একটি পাট-কল আছে। সমগ্র জিলায় দুইটি শিল্প-ফ্যাক্টরী, ছয়টি ইট তৈয়ারীর কারখানা, তিনটি চূণ-সুরকীর কারখানা আছে। সামান্য সামান্য চামড়ার কাজও হইয়া থাকে। রসুলপুরে চার পাঁচটি ধান-কল আছে, রসুলপুর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল।

শিক্ষার দিক্ হইতে, অন্য জিলার তুলনায় মালদহ জিলা খুবই নগণ্য। ইহার মধ্যে হিন্দুরাই অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও অগ্রসর। সমগ্র জিলার হিন্দুর মধ্যে ত্রিশ হাজার হিন্দু শিক্ষিত, তন্মধ্যে পুরুষ ২৬,৫৮৩ ও স্ত্রী ৩,৪১৬ জন। ইংরাজীতে লিখন-পঠনক্ষম ২০৭৪; তন্মধ্যে পুরুষ ২,০৫৭, স্ত্রী ১৭। শিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে ইংরাজী-জানা লোক ৬৮২, স্ত্রী নাই। শিক্ষিত মুসলমান অধিবাসী ১৭,০৫৪, পুরুষ ১৬,৫৩৯, স্ত্রী ৫১৯ জন (যাহারা মাত্র বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে জানে)।

বর্ত্তমান মালদহের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল নয়। বহু পূর্ব্বে এই জিলায় স্বাস্থ্য ভালই ছিল। কিন্তু এক্ষণে, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি আগন্তুক ব্যাধিতে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ মালদহের প্রধান নদী, মহানন্দার দৈন্যদশা। শীতকাল হইতে প্রায় আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত নদীতে জল খুবই কম থাকে ও স্থানে স্থানে চর পড়িয়া যায়, তাহাতে পানীয় জল অপেয় হইয়া উঠে।

সময়ে সময়ে মালদহ সহরে ও গ্রামে বসন্ত, কলেরা টাইফয়েড মহামারীরূপে দেখা দেয়। মালদহ জিলায় আর একটি প্রসিদ্ধ জিনিষ হইতেছে, মালদহের গম্ভীরা গান। চৈত্র মাসের শেষে ইহা আরম্ভ হয়। যাঁহাদের প্রচুর অবসর আছে, তাঁহারা ঐ সময় মাল-দহের গম্ভীরা গান শুনিয়া আসিতে পারেন, এবং তৎসহ মালদহের উৎকৃষ্ট আম, খাজা ও টেঁয়ার পেঁড়া খাইয়া আসিতে পারেন। এ-স্থলে আরও বলা দরকার যে, মালদহের খাজা, পেঁড়া, ও চম্‌চম্ বিখ্যাত। মুহুদীপুরের চম্‌চম্ ও মালদহের খাজার কথা অনেকেই শুনিয়াছেন বোধ করি।*

* প্রবন্ধে, ১৯২১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট ও *G. E. Lambourn*-এর Malda Gazette-এর সাহায্য লইয়াছি।—লেখক।

কাকের মায়া

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সেদিনটা ছিল রবিবার। ছুটীর দিনের ভোজনপর্ব্ব সমাধা করিবার পর শরীরের ভিতরে দিব্য একটু আবিলতার সঞ্চার হইয়াছে; মনটাও দিবা-নিদ্রার কল্পনায় রীতিমত মাতাল হইয়া উঠিয়াছে, শ্রীমতী সন্ধ্যা এমন সময় ঝড়ের বেগে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "ওগো শুনছ ?"

নিদ্রার মৌজ ছুটিয়া যাইবার উপক্রম হইলেও যেন শুনিতেই পাই নাই এমনি ভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। ধমকের সুরটা এবার আরও চোখাল হইয়া কাণের ভিতর দিয়া একেবারে সুদূর মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিল। শ্রীমতী কিন্তু ঠিক উল্টা অভিমতটাই প্রকাশ করিলেন, সজোরে কহিলেন, "বলি কাণের মাথা খেয়েছ না কি!"

ওরূপ কোন অপকর্ম্ম যে করি নাই, সেইটাই প্রমাণ করিতে যেন উঠিয়া বসিলাম, তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে কহিলাম, "হুঁ, বল কি বলছিলে।"

"বলবে আবার কি! যেমন তুমি, তেমনি তোমার ঐ পেয়ারের দুলাল—লজ্জাও করে না!"

নিদ্রার আশায় সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়া মিষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, কি ক'রলে আমার পেয়ারের দুলাল ?"

সমান ঝাঁঝে সন্ধ্যা উত্তর দিল, "করবে আবার কি! আমার হাড়-মাংস সে চিবিয়ে খাক্, তাই ত' তুমি চাও ?"

একথার কি জবাব দিব, ঠাহর করিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিলাম। অর্দ্ধাঙ্গিনীর অস্থিমাংস লোপের সম্ভাবনায় অর্দ্ধাঙ্গীর মন যে কি করিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিতে পারে, সেইটাই বোধ হয় তন্দ্রাতুর চেতনা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

ধমক দিয়া সন্ধ্যা আবার চেঁচাইয়া উঠিল, "বলি, হাঁ ক'রে অ ম ন চেয়ে র'য়েছ যে! ডাকবে তোমার আদরের গৌরাঙ্গকে ? না, আমি জন্মের মত বাড়ী ছেড়ে পালাব ?"

গৃহিণীর গৃহপরিত্যাগের আশু সম্ভাবনার কথা শুনিয়া দেহের জড়তা চট করিয়া কাটিয়া গেল, নিমেষে চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া হাঁক দিলাম, "গৌর।"

"যাই বাবাজীবন।" মিঠাগলায় সাড়া দিয়া কলিকায় সযত্নে ফুঁ-দিতে দিতে গড়গড়া সমেত গৌরাঙ্গ আসিয়া হাজির। লম্বা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, মসীবিনিন্দিত বর্ণশ্রী, অঙ্গসৌষ্ঠব কেমন যেন আঁকা-বাঁকা ছাঁদের, মাথার ধব ধবে পাকা চুলগুলি নিপুণভাবে মিহি করিয়া ছাঁটা—লোকে বলিত, 'কদম ছাঁট্,' সুপুষ্ট একটী শিখার গুচ্ছ সেই চুল-গুলার পিছনে অর্দ্ধ-উন্নত ভঙ্গীতে সর্ব্বদাই বিদ্রোহ ঘোষণা করে, মুখে দাড়ী-গোঁফের চিহ্নমাত্র নাই, ভাবটা নিতান্ত নিরীহ।

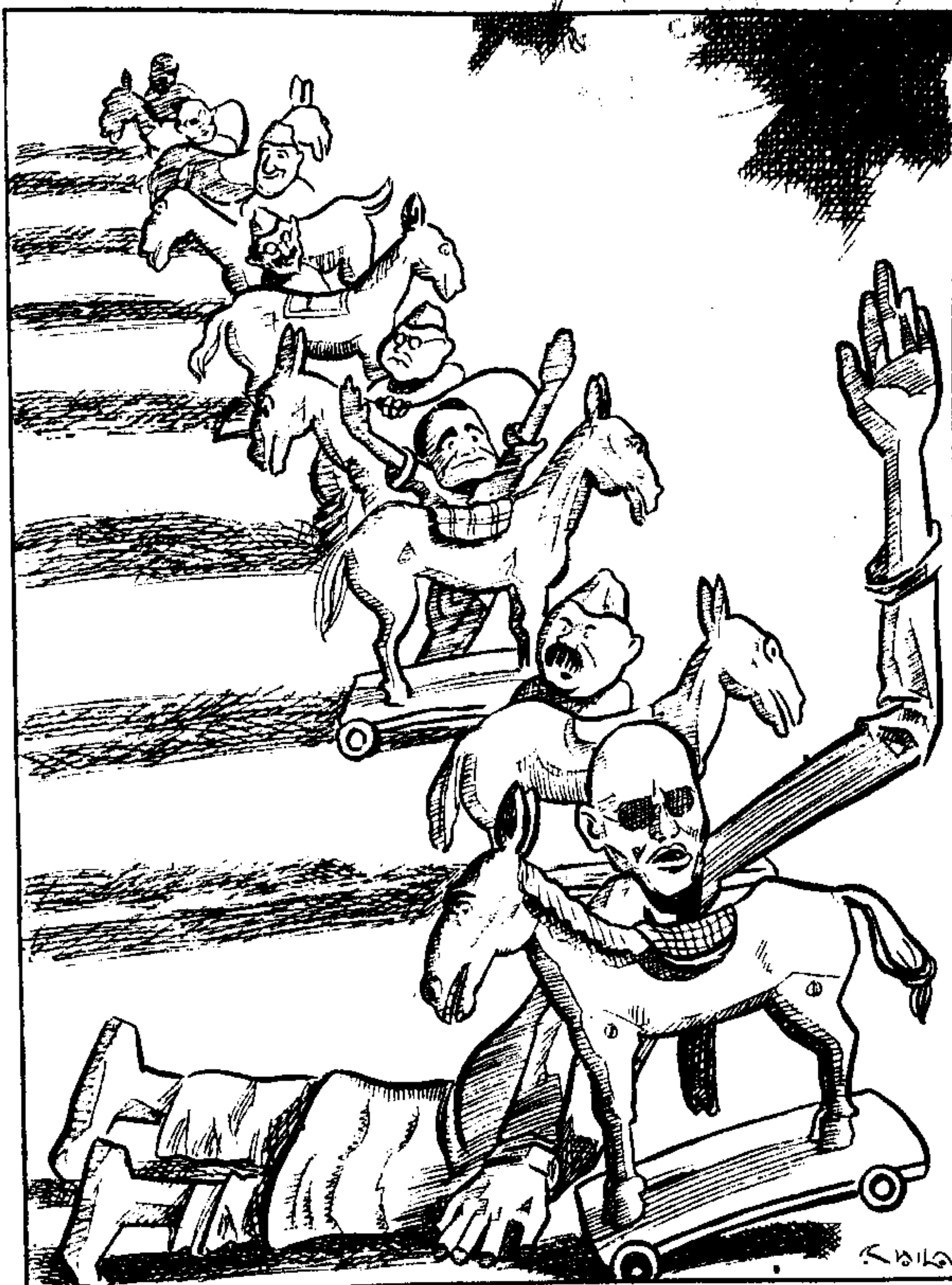
দিবানিদ্রার আশা অতর্কিতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ধিক্কার ও গ্লানিতে অন্তরটা যেন আগুন হইয়াছিল, গৌরাঙ্গের হস্তে তাম্রকূট-লক্ষ্মীর অর্চ্চনা-সমারোহ দেখিয়া সেটার অবস্থা অনেকখানি মোলায়েম হইয়া আসিলেও চড়া ভাবটা বজায় রাখিয়াই কহিলাম, "কি হাঙ্গাম বাধিয়েছ আজ আবার, তোমাকে নিয়ে ত আর পারি নে বাপু।"

পরম সমাদরে গড়গড়ার নলটা আমার হাতে তুলিয়া দিয়া অমায়িক হাসিয়া গৌরাঙ্গ কহিল, "আপনার পেত্যয় হয় বাবাজীবন ?"

কারণ-অকারণে গৌরাঙ্গ হাসিত, এবং হাসিলেই তাহার মুলার মত দুই সারি দাঁত পান-দোক্তায় রাঙা মাড়ী সমেত যেন বিদ্রূপে বিদ্ধ করিতে মুখের বাহিরে ছুটিয়া আসিত। জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলাম, "যা' জিজ্ঞাসা ক'রলাম তার আগে জবাব দাও না বেয়াদব,—জেরা করা হ'চ্ছে আবার!"

নিরীহ মুখভাব ধারণ করিয়া গৌরাঙ্গ জবাব দিল, "জেরা কেন করতে যাব বাবু, আমি ত' উকীল নই ?"

আট ভাই চম্পা



বলিয়া রাখা ভাল যে, আমার ব্যবসা ওকালতি এবং রাগ হইলেই গৌরাঙ্গ আমাকে 'বাবাজীবন' না বলিয়া 'বাবু' সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিত। সুতরাং তাহার জবাবের ভিতরে একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাসের ইঙ্গিৎ পাইয়া নিস্ফল আক্রোশে ঘন ঘন বারকয়েক গড়গড়ার নলে টান দিলাম এবং একরাশ ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়িতে ছাড়িতে কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব গুরুগম্ভীরভাব টানিয়া আনিয়া কহিলাম, "না গৌরাঙ্গ, এখানে চাকরী করা তোমার আর চলল না, তুমি পথ দেখ।"

তৎক্ষণাৎ গৌরাঙ্গের মুখ হইতে জবাব ছুটিয়া আসিল, "বেশ ত' বাবু, দিন আমার মাইনে-পত্তর চুকিয়ে।"

অম্লানবদনে গৌরাঙ্গ চলিল দেখিয়া প্রচণ্ড এক ধমকে সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল, "খবরদার ঘর ছেড়ে এক পা নড়বে না ব'লে দিচ্ছি ; কোথায় যাচ্ছ নবাবপুত্তুর ? যেয়ে ত সেই আমারই বাপের অন্ন ধ্বংস করবে ?"

থমকিয়া গৌরাঙ্গ 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় খাড়া হইয়া রহিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সন্ধ্যা আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, "ওঃ! ভারি ত' তুমি বিচারের কাজী! চোখের সমুখে আসামী চলল ফেরার হ'তে, হাকিমের হুঁস নেই! তা' ছাড়া, ও এখনও এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত মুখে দেয় নি জান ?"

প্রত্যুত্তরে আমাকে কিছু বলিতে হইল না, হাঁউমাউ শব্দে গৌরাঙ্গ অকস্মাৎ কোলাহল করিতে করিতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, "আমাকে আর ঠেকাবেন না বাবু, গরীবের দু'মুঠো খুদ-কুঁড়ো ভিক্ষে করলেও জুটবে, হাত অচ্ছেদ্দা এ বুড়ো হাড়ে আর সহ্য হয় না।" অভিমানে গৌরাঙ্গের কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল এবং মুখে কোঁচার খোঁট চাপা দিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিমূঢ়ের মত আরও বার কয়েক গড়গড়াটায় টান দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর দেখিলাম না ; মনটা কিছু নরম হইয়া আসিয়াছিল, কণ্ঠ মোলায়েম করিয়া কহিলাম, "আঃ ছেলেমানুষের মত কান্নাকাটি ক'রছ কেন! কি হয়েছে তা'ই ব'লেই ফেল না বাপু ?"

অশ্রুরুদ্ধ স্বরে গৌরাঙ্গ কহিল, "তাই ত ব'লতে যাচ্ছিলাম বাবাজীবন, শুনছেন কই আপনি ?" ফুলিয়া ফুলিয়া সে আবার কহিল, "আপনার পেত্যয় হয় বাবাজীবন, আমি মিথ্যে বলেছি ? গরীব বলে কি ব্যামো-ত্যামোও কখন আমার হ'তে নেই ?"

স্নিগ্ধস্বরে সান্ত্বনা দিলাম, "কে ব'ললে হ'তে নেই, শরীর ত সবারই সমান।"

কান্না ভুলিয়া সোৎসাহে গৌরাঙ্গ চেঁচাইয়া উঠিল, "সেকথা আপনি বুঝছেন বাবাজীবন, কিন্তু মা তা মনে করেন না। পেটের ব্যামো হ'য়েছে ব'লে সন্ধ্যে মাকে ডেকে বললুম, 'সন্ধ্যে-মা, বলি মাংসটা না হয় না'ই দিলে আমার পাতে'—ব'ললে পেত্যয় যাবেন না বাবাজীবন, কথাটা যেই না শোনা, সন্ধ্যে-মা অমনি রণচণ্ডী হ'য়ে যেন মারতে এলেন। চাকরী করছি বলে কি বাবু মান ইজ্জৎ—"

"ওরে আমার মান ইজ্জৎ!" বাধা দিয়া সন্ধ্যা কহিল, "পেটেরই যদি অত ব্যারাম তোমার, তবে গুচ্ছার তেলে-ভাজা এখুনি গিলে এলে কোত্থেকে ?"

"তেলেভাজা গিলে এলুম আমি!" গৌরাঙ্গ একেবারে আকাশ হইতে পড়িল।

"এলে না!"—বলিয়া গৌরাঙ্গের কোঁচার প্রান্তদেশের প্রতি চাহিয়া সন্ধ্যা আমার চোখের সামনে প্রমাণ বিস্তার করিল। চাহিয়া দেখি, গৌরাঙ্গদেবের কোঁচার মাঝখানে খানিকটা স্থান প্রচুরপরিমাণে তৈল লিপ্ত হওয়ার ফলে অবিকল গাটাপার্চ্চার রূপ ধারণ করিয়াছে।"

আমাকে উদ্দেশ করিয়া সন্ধ্যা এবার কহিল, "এতক্ষণে বুঝলে ত কাণ্ডটা ? জান ত' ক'দিন ধ'রে তোমার মেয়ের শরীরটা তত ভাল নেই, ডাক্তারে তাকে এখন গুরুপাক জিনিষ খেতে দিতে নিষেধ ক'রেছে, তা'ই মাংসটা তা'র পাতে আজ দিই নি ; এই জন্ত তোমার আদুরে গোপাল, পেয়ারের চাকর একেবারে ক্ষেপে গেলেন। কিছুতেই উনিও আর মাংস ছোঁবেন না! ওঁর 'নাৎনী' মাংস খেতে পায় নি—এই হ'য়েছে রাগ, বুঝলে না ? কিন্তু আমি ব'লি, চাকরের কি এতখানি আস্পর্দ্ধা দেওয়া ভাল ?"

মনে পড়িয়া গেল, আজ বৈপ্রাহরিক ভোজন-ব্যাপারের মধ্যে মাংস একটা বিশিষ্ট 'আইটেম' ছিল এবং সেটার

যথাযোগ্য সদ্ব্যবহারের ফলেই দিবানিদ্রার প্রয়োজনটা আমার নিকটে অত উৎকট আগ্রহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সে যাহা হৌক, চিন্তাসূত্র ইতিমধ্যে ছিন্নভিন্ন হইয়া উড়িয়া পালাইল গৌরাঙ্গদেবের আর এক দফা চেঁচামেচিতে, উচ্চৈস্বরে সে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "বেশ বাবু, তাই যদি হয়, চললুম আমি মাংস খেতে; কিন্তু ব'লে রাখলুম বাবু, কলেরা হ'য়ে যদি সাবাড় হ'য়ে যাই, তখন কিন্তু কথাটী আমায় ব'লতে পারবেন না—তা' আগেই ব'লে দিচ্ছি।"

সবেগে গৌরাঙ্গদেব গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন,—ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন বলিলেও চলে। এতক্ষণে সন্ধ্যাদেবীর অধরপ্রান্তে একটু হাসির চমক খেলিয়া গেল। আমার হিতার্থে একটা চকিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে তিনিও গৌরাঙ্গের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। প্রসন্নচিত্তে আমিও গড়গড়ার নলটা আবার তুলিয়া লইয়া চিৎ হইয়া পড়িলাম।

গৌর ওরফে গৌরাঙ্গ অথবা গৌরাঙ্গদেব সন্ধ্যার ঠাকুরদাদার আমলের বহু পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য। সন্ধ্যাকে সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে শুনিয়াছিলাম, এবং তাহার বয়স দেখিয়া সে কথাটা বিশ্বাস করিতেও আমার কষ্ট হয় নাই, কিন্তু কি করিয়া যে সে আমার সংসারে হঠাৎ বহাল হইয়া গেল সেই কথাটাই কোনদিন ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই এবং এখনও পর্য্যন্ত সে কথা মনে হইলে বড়ই অদ্ভুত লাগে। মধ্যে মধ্যে গৌর অবশ্য রাগ করিয়া চাকরিতে ইস্তফা দিয়া নিরুদ্দেশ হইত,—কিন্তু সে ঐ পর্য্যন্তই। যথাকালে পত্রযোগে একদিন সন্ধ্যার পিতার নিকট হইতে সংবাদ আসিত, 'গৌরের জন্য চিন্তা নাই, সে এখানেই আছে, রাগ পড়িলে আপনিই গিয়া হাজির হইবে।' দেখা যাইত শ্বশুর মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী কোনদিনই নিষ্ফল হয় নাই।

সদ্য বিবাহের পর গাঁটছড়ায় বাঁধিয়া ফেলিয়া গৃহলক্ষ্মীকে যেদিন নিজ গৃহে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ করিতেছি, মনে পড়ে শাশুড়ী আসিয়া স্নিগ্ধহাস্যে সেদিন কহিলেন, "বাবা, গৌরাঙ্গ আমাদের অনেকদিনের লোক, সন্ধ্যাকে মানুষ করেছে, সে সন্ধ্যার সঙ্গে যাবে, কেমন ?"

সলজ্জ হাস্যে ঘাড় নাড়িয়া সেদিন সায় দিয়াছিলাম।

সেইদিন হইতে আমার সংসারে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব; তিরোভাবের সম্ভাবনা যখনই ঘটিয়াছে, কাঁদিয়া কাটিয়া তখনই সন্ধ্যা দুই চোখ রাঙা করিয়া অনর্থ ঘটাইয়াছে; সুতরাং সেটা আর হইয়া উঠে নাই।

তথাপি দাম্পত্য-জীবনের সূত্রপাতে গৌরকে আমার একটা দুষ্টগ্রহ ভিন্ন অন্য কিছুই কোনদিন মনে হয় নাই। নীড় বাঁধিবার নেশায় যখন আমার তরুণ হৃদয় নিত্য নব নব কল্পনায় অধীর হইয়া ছুটিত, বাঞ্ছিতাকে একান্তে নিবিড় করিয়া না পাইলে যখন মনে হইত জীবনটাই বুঝি বৃথায় চলিয়া যাইতেছে, একটা মুহূর্ত্তের অপচয় ঘটিলে যখন মনে হইত, বুঝি বা একটা যুগই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার প্রতি গৌরাঙ্গের স্নেহরসটা তখন এমনই অতর্কিতে কারণে-অকারণে প্রকটভাবে উৎসারিত হইত যে, আমার যেন মনস্তাপের আর সীমা থাকিত না।

হয়ত এক ফাল্গুনী সন্ধ্যায় আম্রমুকুলের গন্ধে উদ্‌ভ্রান্ত দক্ষিণ বাতাসে মনের কোণে নব-বসন্তের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে যে, আজ পর্য্যন্ত অনেক কিছু কথাই আমার সন্ধ্যাকে বলা হয় নাই, বলি বলি করিয়া সেই না-বলা কথার পুঞ্জীভূত বেদনাভার হৃদয় হইতে নামাইয়া ফেলিতে প্রায় স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি, এমন সময় সন্ধ্যা ও আমার ঠিক মাঝখানটিতে যেন মাটী ফুঁড়িয়া হাজির হইয়া গৌরাঙ্গ কহিল, "এই তোমার চা সন্ধ্যে-মা, সময় মত চা না খেলে অসুখ করবে যে!" অথবা হয়ত শরতের এক নির্ম্মল পূর্ণিমায় স্বচ্ছ আকাশের তলে আমি ও সন্ধ্যা আত্মহারা হইয়া প্রকৃতিরাণীর জ্যোৎস্নাস্নাত শান্ত রূপের মহিমায় আত্মসমর্পণ করিয়াছি, ধূমকেতুর মত গৌরাঙ্গ এমন সময় আমাদের দৃষ্টিপথে উদয় হইয়া তিরস্কারের সুরে কহিল, "অসুখ করবে যে সন্ধ্যে-মা, আশ্বিনে হিম ত তোমার শরীরে সহ্য হয় না, যাও ভিতরে যাও!" কিংবা হয়ত বাদলের এক অলস মধ্যাহ্নে, বৃষ্টিকণার সৌরভ নাসারন্ধ্রে লইয়া আমরা দুটীতে গৃহবাতায়নের পার্শ্বে বিভ্রান্ত চিত্তে বাহিরের বারিবর্ষণের

অশ্রান্ত সঙ্গীত শুনিতেছি, এমন সময় "এ কি করছ মা! গায়ে জলের ছাঁট্ লাগছে যে!" বলিতে বলিতে গৌরাঙ্গদেব আসিয়া সশব্দে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

এতটা বাড়াবাড়ি কাহারও সহ্য হইবার কথা নহে—বিশেষতঃ নববিবাহিত তরুণের পক্ষে; আমারও হইত না। কিন্তু কেবলমাত্র মনে মনে বুড়ার মুণ্ডপাত করা ছাড়া অন্য কিছু উপায়ও কোনদিন খুঁজিয়া পাই নাই, কারণ সরবে কোন প্রতিবাদ আমি করিতে গেলেই প্রিয়তমার কোমলাঙ্গে ফোস্কা পড়িত এবং শ্রীমুখে তখন ঠিক প্রিয়বাণী উচ্চারিত হইত না।

অবস্থাটার কিন্তু অতি আশ্চর্য্য রকমের ওলট্-পালট্ হইয়া গেল একটা ব্যাপারে—আমার কন্যা শিখা জন্মগ্রহণ করিবার পরেই। নবজাত শিশুকে দেখিয়া আনন্দে গৌরাঙ্গ যেন আটখানা হইয়া গেল। তাহার পর সেই যে সে ছুটিয়া আসিয়া শিশুকে কোলে তুলিয়া লইল, সেই হইতে শিশুর সম্বন্ধে সমস্ত কিছু দায়িত্বও যেন সে সানন্দে মাথায় তুলিয়া লইল। প্রায় সর্বক্ষণই আদর করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া শিখাকে লইয়া সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিত। বুড়ার প্রচণ্ড স্নেহপ্রপাত যে এইভাবে সন্ধ্যাকে ছাড়িয়া অপ্রত্যাশিতরূপে শিশুতে গিয়া আশ্রয় খুঁজিয়া লইল, ইহাতে আমিও যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া এতদিন পরে বাঁচিলাম।

মাতার দিক্ দিয়া ফলটা কিন্তু ফলিল ঠিক বিপরীত। শিশু যখন স্নেহ-সুকোমল মাতৃঅঙ্গের প্রলোভন স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করিয়া বৃদ্ধের অস্থিপঞ্জরসার রুক্ষ বক্ষপিঞ্জরই বেশী পছন্দ করিতে লাগিল, স্নেহাতুরা জননী তখন সে ব্যবস্থায় ঠিক সানন্দচিত্তে সায় দিয়া উঠিতে পারিলেন না।

*

হয়ত কি-কারণে ঠিক জানা নাই, শিশুর মেজাজ একেবারেই বিগড়াইয়া গিয়াছে, জননীর শতপ্রকার আদর আপ্যায়নের কিছুমাত্র মর্য্যাদা না দিয়া অট্ট চীৎকারে কাণ ঝালাপালা করিয়া সে পাড়া মাথায় করিয়া তুলিয়াছে, এমন সময় ছুটিয়া আসিয়া গৌর তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং আকাশের পানে হাত বাড়াইয়া সুর করিয়া একবারমাত্র কহিল, "আয় পাখী—আয়," শিশুও তৎক্ষণাৎ যেন মন্ত্রবলে স্থির হইয়া গিয়া হৃষ্ট ও নিবিষ্ট চিত্তে অঙ্গুলি লেহনে মনোনিবেশ করিল। যেন হয় নাই!

হাসিয়া গৌরাঙ্গ কহিল, "নাতনীর ভাষায় যেন বাঁশীর মত মিঠে আওয়াজ! না বাবাজীবন?"

উষ্মার সহিত সন্ধ্যা জবাব দিল, "তুমি আর বাক্য-যন্ত্রণা দিও না গৌরকাকা, তোমার বাঁশী নিয়ে তুমি মাঠে চলে যাও।"

সন্ধ্যাকে কিছু না বলিয়া জবাবটা গৌরাঙ্গ আমার দিকে চাহিয়া দেয়, হাসিতে হাসিতে বলে, "বছর আঠার আগে, বুঝলেন বাবাজীবন, এই বুড়োরই কাণের কাছে আর একটা বাঁশী বাজত—উঃ সে কি বাঁশী! বাঁশী নয় ত, যেন রাম-শিঙ্গে! দশ-বিশখানা গাঁয়ের পশুপক্ষী সব-কাজ কি বাবা আমার সে কথায়, আমি হ'লুম মুখ্যু মানুষ"—ইত্যাদি বলিতে বলিতে গৌরাঙ্গ প্রস্থান করে।

চাহিয়া দেখি মুখ ভার করিয়া সন্ধ্যা বসিয়া আছে; কহিলাম, "মেয়েটাকে কিন্তু প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তোমার গৌরাঙ্গদেব না?"

"ছাই ভালবাসে।"—বলিয়া মুখ নাড়া দিয়া সন্ধ্যা উঠিয়া চলিয়া যায়।

*

ক্রমে শিখা বড় হইয়া উঠিতে লাগিল, মা'কে 'মা', এবং বাবাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে শিখিতে তার বিলম্ব হইল না। গৌরকে সে কখন ডাকিত 'গউল', কখন বা বলিত 'গল্লু', তাহার পরে একদিন এক শুভক্ষণে স্পষ্ট ভাষায় গরু বলিয়া ডাকিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিতে সুরু করিয়া দিল। প্রাণঢালা ভালবাসার পরিবর্ত্তে এরূপ পুরস্কার গৌরাঙ্গ নিশ্চয় প্রত্যাশা করে নাই, তথাপি কিন্তু সে ক্ষুণ্ণ হইল না, বরঞ্চ কৌতুকই বোধ করিল এবং নামকরণ ব্যাপারে শিশুর মধ্যে হঠাৎ অসাধারণ প্রতিভার সন্ধান পাইয়া গাঁটের পয়সায় নূতন নূতন খেলনা কিনিয়া

তাহাকে উপহার দিল, বলিল, "দেখলেন বাবাজীবন নাতনীর ঘটে কি বুদ্ধি, মানুষ চিনতে একটুকু ভুল করে নি।"

সন্ধ্যা কহিল, "স্বীকার করলাম না হয় তুমি একটা গরু; কিন্তু গৌর কাকা, তোমার নাতনী যখন শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে তখন তোমার এত সোহাগ ঢালবে কোথায়?"

অমায়িক হাসিয়া গৌরাঙ্গ উত্তর দিল, "সে তুমি ভেব না সন্ধ্যে মা, নাতনী আমার রাজরাণী হবে নিশ্চয়, নাতনীর হুকুমে অন্ততঃ হাজার গণ্ডা দাসদাসী খাটবে।

"তা'তে তোমার আর কি সুবিধা হবে!"

"বা-রে! আমি হব নাতনীর চাকরদের হেড্, এটা আর বুঝলে না?"—বলিয়া শিখাকে কোলে তুলিয়া গৌরাঙ্গ বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

সন্ধ্যার জেদ চাপিয়া গিয়াছিল, মুখনাড়া দিয়া কহিল, "আহা! মরে যাই আর কি! যে-না চেহারার ছিরি! রাণীর চাকরের উপযুক্তই বটে! তা'র উপর তুমি না গাঁজা খাও?"

চমকাইয়া গৌরাঙ্গ জবাব দিল, "আমি গাঁজা খাই! কে বললে গাঁজা খাই?" তাহার পরেই আবার আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, "আর খেলেই বা, বাবা মহাদেবও ত কৈলাসে রোজ গাঁজা খান,—খান্ না বাবাজীবন?"

"আমি ঠিক জানি নে গৌর।"

"শাস্তর পড়ে দেখবেন, শাস্তরে স্পষ্ট লেখা রয়েছে।" বলিয়া বিজয়গর্ব্বে গৌর লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া খুকুকে লইয়া বেড়াইতে চলিয়া গেল।

গঞ্জিকা-সেবন ব্যাপারে বিশিষ্ট একটা নজীর পাইয়া সন্ধ্যা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, আমি কহিলাম, "গৌরের কোলে তোমার খুকুকে বেশ মানায়,—না?"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সন্ধ্যা জবাব দিল, "হ্যাঁ, ঠিক যেন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ।"

হাসিয়া বলিলাম, "উপমাটার অপপ্রয়োগ হয় নি সন্ধ্যা, নাতনী-দাদামশায় সম্পর্ক ত?"

ভ্রূকুটী করিয়া সন্ধ্যা কহিল, "তোমার কিন্তু লজ্জা হওয়া উচিত, মেয়ের বাপ হয়ে মেয়ের সম্বন্ধে ওরকম কচ্কেমী করা তোমার শোভা পায় না।"

বিরস মুখে সন্ধ্যা পিছন ফিরিয়া বসে।

•

দিন চলিয়া যায়। শিশুত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া শিখা এখন কৈশোরের সীমাও ছাড়াইতে চলিয়াছে। 'হাবুল' করা শাড়ী ও 'হাই হিল' জুতা পরিয়া সে এখন খট্ খট্ শব্দে স্কুলে যাইয়া থাকে; পিছনে পিছনে গৌরাঙ্গ থাকে সঙ্গী। হাল্‌ফ্যাশনে সজ্জিত, মাজাঘষা প্রদীপ্ত রূপলাবণ্যের পাশে অষ্টবক্র ভঙ্গিমায় গঠিত, শ্যাম-চিক্কণ সেকেলে চেহারার বিচিত্র সমাবেশে রাজপথের জনতা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকে। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, শিখাকে লইয়া বাহির হইবার পূর্ব্বে গৌরাঙ্গ আজকাল বেশ খানিকটা সময় প্রসাধন-ব্যাপারে ব্যয় করিয়া থাকে। পরণের কাপড় হাঁটুর উপরে উঠিলেও কোঁচাটীকে সে সযত্নে পাট করিয়া মাটী পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেয়; আলপাকার কোটটা বহু পুরাতন ও অসংখ্য তালিযুক্ত হইলেও ঝাড়িয়া মুছিয়া সেটাকে সে পরম সমাদরে গায়ে চড়াইয়া লয়; চুল থাকুক না থাকুক ক্ষুদ্র একখানা আরসির সামনে ততোধিক ক্ষুদ্র একখানা চিরুণী দিয়া মাথাটা ঘন ঘন আঁচড়াইতে সে দ্বিধা বোধ করে না; প্রচুর তৈলাবলেপনে বিদ্রোহী শিখার গুচ্ছকে যথাসাধ্য সে সামলাইবার চেষ্টা করে এবং প্রাণপণ শক্তিতে গামছায় মুখ মুছিয়া মুছিয়া তাহার অপরূপ শ্যাম-শ্রীকে সে আরও অপরূপ করিয়া তুলে

সেদিন ঠিক এই রকম একটা অবস্থায় আমি নিবিষ্ট চিত্তে তাহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছি দেখিয়া গৌরাঙ্গ তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুত ভাবে কহিল, "নাতনী আমার হ'ল মেম সাহেব, তার পাশে মানায় এমন ভাবে বেরুতে হবে ত? কি বলেন বাবাজীবন? নইলে লোকে বলবে কি?"

পিছনে শিখা কখন চুপি চুপি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হাস্য উচ্ছলিত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠে, "কিছু বলবে না লোকে, তুমি এখন বেরোও দেখি, ও-মুখ আর ঘ'স না।"

ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে গৌর জবাব দেয়," ক্যানরে নাতনী! আমার মুখের রঙ বুঝি পছন্দ হয় না?"

খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে শিখা উত্তর দেয়, "কেন হবে না, এমন পেটেণ্ট সোনার!"

"বটে! বটে! আচ্ছা, নাৎজামাই আসুক না দেখি, দেখা যাবে, তার—"

বাধা দিয়া শিখা জিজ্ঞাসা করে, "তোমার 'গৌরাঙ্গ' নামটা বুঝি তুমিই রেখেছিলে গৌরদা?"

"তা কি আর কেউ রাখেরে নাতনী? কাণা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন' বাপ-মা ছাড়া আর কে রাখবে বল্।" পরলোকগত পিতা-মাতার কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় গৌরের মুখ ম্লান হইয়া যায়।

হাসিতে হাসিতে শিখা আবার বলে, "তোমার মলাটখানা এবার খুলে ফেল দেখি।"

"মলাট!" গৌরাঙ্গের কণ্ঠে বিস্ময় জাগে।

"হ্যাঁ, ঐ যে, কোট না কি ছিল এককালে—গায়ে চড়িয়েছ?"

অপ্রতিভ ভাবে গৌর বলে, "কেন, এটা বুঝি তেমন—"

"থাক্ না মা ওটা?" আমি কহিলাম।

"না বাবা", শিখা আব্দার করিয়া উঠে, "গৌর-দা বরঞ্চ খালি গায়েই চলুক—"

"না না, আমি গেঞ্জি গায়েই যাচ্ছি—আচ্ছা! নাৎ-জামাই আসুক আগে, তখন দেখব সে কি রাজপোষাক পরে রাস্তায় বেরোয়" ইত্যাদি বলিতে বলিতে হাস্য মুখেই শিখার সহিত গৌরাঙ্গ বাহির হইয়া যায়।

সন্ধ্যা ইতিমধ্যে কখন রঙ্গভূমিতে আসিয়া হাজির হইয়াছিল, সহাস্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি দেখছ? দুটীতে কেমন ভাব, তাই?"

"হুঁ তাই, ঠিক যেন কাকে আর কোকিলে।" হাসিয়াই সন্ধ্যা উত্তর দেয়।

*

পর পর কয়েকটা বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক কিছু ঘটিয়া গিয়াছে। বৎসরাধিক হইল শিখার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহ ভালই হইয়াছে। বেয়াই অবসর-প্রাপ্ত জেলা-হাকিম, পাত্রও আই-সি-এস, এক মহকুমার সাব-ডিভিশনাল অফিসার। কুলে, মানে, ধনে, পদমর্য্যাদায় সর্ব্বদিক্ দিয়া আমাদের আশাতিরিক্ত সৌভাগ্য লাভ ঘটিয়াছে। তথাপি বিবাহের পর হইতে গৌরাঙ্গের মনে সে স্ফূর্ত্তি আর নাই। বুড়া অনেক কাহিল হইয়া গিয়াছে, সে শ্যামচিক্কণ মনোহর কান্তি ত নাই-ই, উপরন্তু সেই হাস্যোজ্জ্বল সদাপ্রফুল্ল মুখশ্রী যেন চিরকালের মতই নিভিয়া গিয়াছে। সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম সে পূর্ব্বের মতই সমানে করিয়া যায় বটে, কিন্তু নিস্পৃহ, নিরবলম্ব ভাবে, যন্ত্রচালিতের মত।

ডাকপিয়ন সেদিন চিঠির তাড়া দিয়া যাইতেই এক-খানা চিঠি খুলিয়া পড়িয়া আমি হাঁকিলাম, "গৌর, ও গৌর।"

"বাবাজীবন।"—বলিয়া যথারীতি সাড়া দিয়া গৌরাঙ্গ আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া সহাস্যে কহিলাম, "তোমার নাতনী চিঠি লিখেছে যে!"

গৌরাঙ্গ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কহিল, "কি লিখেছে নাতনী?"

"লিখেছে, তুমি কেমন আছ, তোমার শরীর ভাল আছে কি না, তোমার—।"

"নাতনীর শরীর কেমন আছে?"

'তার শরীর তত ভাল নেই, লিখেছে—"

"কোন শক্ত কিছু অসুখ করেনি ত নাতনীর?—গৌরাঙ্গের কণ্ঠে উদ্বেগ ও কাতরতা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

আশ্বাস দিয়া তাড়াতাড়ি কহিলাম, "না না, সে সব কিছু নয়, লিখেছে শরীর-মন তত ভাল যাচ্ছে না আজ-কাল,—সে আসছে যে এখানে!"

"তাই না কি! কবে?"—মুহূর্ত্তে গৌরাঙ্গের চোখ মুখের চেহারা বদলাইয়া গেল; উৎসাহ ও উত্তেজনায় সে অধীর হইয়া কহিল, "কবে আসছে নাতনী?"

"শীঘ্রই আসবে, সামনের ছুটীতে আমি যাব তাকে আনতে।"

আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া গৌর কহিল, "আমিও ষ্টেশনে গাড়ী নিয়ে হাজির থাকব আনার দিন"—মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া উত্তেজিত ভাবে গৌর বলিয়া চলিল, "ও কাজ আপনি আর কাউকে দিয়ে করাতে পারবেন না কিন্তু—তা বলে দিচ্ছি।"

হাসিয়া ফেলিয়া কহিলাম, "তা ত বটেই, ও কাজের

ভার তোমার উপরেই রইল, তা ছাড়া আর আছেই বা কে ?"

গৌরাঙ্গের উৎসাহ বাড়িয়াই চলিল, আমার নিকটে সরিয়া আসিয়া চোখ মুখ নাচাইয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে সে বলিতে লাগিল, "আচ্ছা বাবাজীবন, এক কাজ করলেও ত হয়, ধরুন যদি আমিও আপনার সঙ্গে একেবারে নাৎ-জামাইয়ের বাড়ী গিয়ে হাজির হই, তা হলে কেমন হয় ? খুব মজা হয় তা হলে, নয় ? নাতনী ত একেবারে আকাশ থেকে পড়বে, না ?"

সহাস্যে আমি বলিলাম, "নাতনী নিশ্চয় খুব খুসী হবে গৌর, কিন্তু এখানে দেখবে কে ? তোমার সন্ধ্যে-মা রয়েছে যে।"

"তা ঠিক, তা ঠিক।"—গৌরাঙ্গ হঠাৎ অপ্রস্তুত হইয়া গেল, "যাই আমি, সন্ধ্যে-মাকে খবরটা দিই গে।" বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে সে প্রস্থান করিল।

*

একমাত্র কন্যা আদরের দুলালী শিখাকে আবার দীর্ঘকাল পরে ফিরিয়া পাওয়ায় দিনগুলা সকলেরই বড় আনন্দে কাটিতে লাগিল। গৌরের উৎসাহ ছাপাইয়া গেল সবার উপরে। বুড়ার যেন নবযৌবন ফিরিয়া আসিল। অতি শৈশবে বেচারার পিতা ও মাতা একই যোগে কলেরার কবলে পড়িয়া ইহলোকের মায়া পরিত্যাগ করেন। তখন হইতেই সে মামার বাড়ীতে মানুষ হইতে থাকে। মাতুল-মাতুলানীর এমন-ই কিছু পোষ্যের অভাব ছিল না। সন্তান-সন্ততির সংখ্যাগৌরবে পল্লীর অনেক পরিবারকেই তাঁহারা লজ্জাম্লান করিবার স্পর্দ্ধা রাখিতেন। সুতরাং কালাতিপাতের সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গের প্রতি মাতুলানীর স্নেহের উত্তাপ ক্রমশঃই এমন বাড়িয়া চলিল যে, বেচারা গৌর সেটা ঠিক বরদাস্ত করিতে না পারিয়া একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে কাহাকেও কিছু না বলিয়া গা ঢাকা দিল এবং সটান গিয়া হাজির হইল নিজের জন্মভূমিতে। সেখানে কাঁদিয়া-কাটিয়া পাড়ার দশজনের সাহায্যে সে জীর্ণাবশেষ পিতৃগৃহের সংস্কার করিয়া লইল। তাহার পর ডাগর দেখিয়া একটা বউ ঘরে আনিয়া সংসারও পাতিয়াছিল, কিন্তু একটী কন্যা-সন্তান প্রসবের পর তাহার গৃহিণী যেদিন চোখ বুজিয়া আর মেলিল না, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় গৌরাঙ্গ সেদিন তাহার নবজাত কন্যাকে লইয়া আবার তাহার মাতুলালয়ে মাতুলানীর স্মরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় দেখিল না। তাহার পর সে সহরে চাকরী করিতে চলিয়া আসে এবং প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া অর্জ্জিত যাহা কিছু অর্থ মাতুলানীর নিকটেই পাঠাইতে থাকে। দিন একরকম চলিয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন লোকমুখে সে সংবাদ পাইল যে, তাহার কন্যাটী সুদীর্ঘকাল কালাজ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া কিছুদিন হইল মারা গিয়াছে এবং তাহার প্রেরিত সমস্ত উপার্জ্জন পীড়িত কন্যার চিকিৎসা বা শুশ্রূষার মত তুচ্ছ ব্যাপারে ব্যয় হয় নাই, বরঞ্চ বৃহৎ মাতুল-পরিবারের উদরপূরণ ও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কাজে লাগিয়াছে। হৃদয়ের যাহা কিছু মধুর সুকোমল বৃত্তি মানুষে মানুষের নিকট হইতে একান্ত আগ্রহে নিজের জীবনে ভরিতে চায়, সেগুলা চিরকাল তাহাকে লাঞ্ছনা করিয়া চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহার অতৃপ্ত স্নেহ-প্রবৃত্তি যে ক্রমশঃ তীব্র হইতে তীব্রতর ক্ষুধা লইয়া কাঙ্গালের মত ছুটিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ! কিন্তু তথাপি—

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। "তোমাদের চা এনেছি সন্ধ্যে-মা।" বলিয়া দুই কাপ চা হাতে গৌরাঙ্গ গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যা আমার পাশেই বসিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি করছিলে গৌরকাকা ?"

কাছেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া স্মিতমুখে গৌর কহিল, "কি আর ক'রব মা, এই নাতনীকে একটু পাহারা দিচ্ছিলাম।"

কৌতুক-তরল কণ্ঠে সন্ধ্যা বলিল, "পাহারা দিচ্ছিলে ! কেন ডাকাতের ভয় না কি ?"

হাসিতে হাসিতে গৌরাঙ্গ বলিল, "যা ব'লেছ মা, ডাকাতই বটে ! বাপের বাড়ী মেয়েটা এল, দুদণ্ডকাল জিরুবে—তা' না বন্ধু, বন্ধু, খা-লি বন্ধু ! সোণার অঙ্গ আমার নাতনীর কালী হ'য়ে গেল মা ! আচ্ছা মা,

এত বন্ধুই বা নাতনীর এদ্দিন ছিল কোথায়? ডেপুটীর বউ হ'য়ে নাতনীর কদর কি বেড়ে গেল নাকি?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সন্ধ্যা জবাব দিল, "কেন, তোমার বুঝি হিংসে হয়?"

অপ্রস্তুত গৌরাঙ্গ বলিল, "খাঃ! তা কেন হবে! নাতনীর কষ্ট হয় তাইতেই—যাকগে ও কথা, আমার একটা নিবেদন আছে মা, আপনারা ত দু'জনেই আছেন এখানে, এবার এই বুড়োর একটা ব্যবস্থা করে দিন।"

"কি ব্যবস্থা গৌর?"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। বার কয়েক ঢোক গিলিয়া আমতা আমতা করিয়া গৌর বলিতে লাগিল, "ব্যবস্থা আর এমন কি বিশেষ, বলছিলাম কি—আমি ত দিন দিন বুড়োই হচ্ছি—ইয়ে—তেমন খাট্‌তে ত পেরে উঠি নে আজকাল—তাই—"

হাসিয়া কহিলাম, "বেশ ত, ভাল দেখে আর একটি সাক্‌রেদ ক'রে নাও না কেন, তোমার এত খেটে দরকার কি?"

প্রস্তাবটা গৌরাঙ্গের তেমন মনঃপূত হইল না, ক্ষুব্ধভাবে কহিল, "তাতে আমার এমন কি সুবিধে হবে বাবু, ঐ সাক্‌রেদের পিছনেই বরঞ্চ আমাকে ডবল খাটুনি খেটে মরতে হবে, তার চেয়ে নিজের কাজ নিজের পছন্দ মত করি, একলা একলা, কোনই বালাই নেই,—না বাবু, ওতে আমার সুবিধে হবে না।"

"তবে কি? ছুটী চাই বুঝি দিনকতক?"

অপ্রসন্নভাবে গৌরাঙ্গ কহিল, "ছুটী নিতে যাব কিসের জন্য! ছুটী নিয়ে কোন চুলোয়ই বা যাব বাবু! জানেনই ত আপনারা আমার কোথাও কেউ নেই।"

বিস্মিত হইয়া আমি কহিলাম, "তবে তুমি কি চাও?"

গৌরাঙ্গের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিল, "চাইব আর কি বাবাজীবন, বিয়ের হিড়িকে তখন কথাটা বলবার ফুরসৎই পাই নি;—তা ছাড়া কি জানি বাবা হাকিমের বাড়ী! পাছে কিছু দোষ ঘাট হ'য়ে পড়ে সেই ভয়েই তখন আধমরা হ'য়ে ছিলুম। কিন্তু এখন ত আর সে সেটী হবার যো নেই, এখন ত নাতনীই হয়েছে সে বাড়ীর মনিব ঠাকরুণ, নাতনী যা ব'লবে তাই ত এখন হবে সেখানে—কি বলেন বাবাজীবন, এঁ্যা?"

এতক্ষণ ব্যাপারটা বুঝিলাম, "নাতনীর বাড়ী তোমার নূতন চাকরীর সখ হয়েছে গৌর?" চেষ্টা সত্ত্বেও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিতে পারিলাম না, আবার কহিলাম, "আমাদের মায়া কাটাতে পারবে?"

একগাল হাসিয়া গৌর আশ্বাস দিল, কহিল, "একেবারে কি আর পারব বাবাজীবন? আসব বৈ কি মাঝে মাঝে, নিশ্চয় আসব।" পরে আবার সে কহিল, "তা ছাড়া আপনাদের ত একটা কর্ত্তব্য আছে, আপনারা হ'লেন যা'কে বলে নাতনীর পিতা-মাতা, আপনারা যদি তার মুখের দিকে না চান্ তা হ'লে বেচারী যায় কোথায়? এই বুড়োকে ছেড়ে সে কি সুখে আছে মনে করেন?" ঘাড় নাড়িয়া নিজের প্রশ্নের সে নিজেই জবাব দিল, বলিল, "উঁহু, কখনই না;—ঐ যে, কথায় বলে, বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না?—নিশ্চয় জানবেন আপনারা, আমার নাতনীর হ'য়েছে তাই। যাক্‌গে ও সব, কথাটা হচ্ছে—"

কথাটা আর হইতে পাইল না, পাশের ঘর হইতে শিখা হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছিল, "গৌর, ও গৌর, গৌর—!"

কেন জানি না, গৌরাঙ্গ অকস্মাৎ উঠিয়া পড়িয়া শব্দের ঠিক বিপরীত দিকে ঘরের বাহির হইবার জন্য ছুটিয়া চলিল। দ্রুতপদে শিখা এমন সময় ভিতরে প্রবেশ করিয়া চড়া-গলায় বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও গৌরদা, কোথায় যাচ্ছ এত তাড়াতাড়ি?"

থমকিয়া কাঁচুমাচু মুখে গৌরাঙ্গ কহিল, "না, যাব আর কোথায়, ভাবছিলাম—"

"আর ভেবে দরকার নেই। যা জিজ্ঞাসা ক'রব তার ঠিক ঠিক জবাব দাও আগে।"—শিখা বলিল, "মিসেস্ চৌধুরী খানিক্ষণ আগে দেখা করতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে?"

ম্লান মুখে গৌর চুপ করিয়া রহিল।

কঠোর আদেশের স্বরে শিখা আবার কহিল, "চুপ ক'রে আছ যে বড়? জবাব দাও।"

"হ্যাঁ এসেছিলেন।"

"তুমি তাদের আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে দাও নি? মিথ্যে ব'লে ফিরিয়ে দিয়েছ, বলেছ আমি সিনেমায় গেছি?—বল নি?"

"তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে কি না—"

প্রচণ্ড ধমকে ফাটিয়া পড়িবার মত হইয়া শিখা কহিল, "আমি ঘুমুচ্ছিলাম তাতে তোমার কি? তোমাকে সর্দারী করতে কে ডেকেছিল?"

এ-কথার গৌরাঙ্গ কি জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না, বোবা প্রাণীর মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

তিক্ত-কটু কণ্ঠে শিখা আবার চেঁচাইয়া উঠিল, "কেন তুমি ভুলে যাও যে, তুমি বাড়ীর চাকর একটা! এই মাত্র ওঁরা টেলিফোনে আমার কাছে সব কথা জেনে যা নয় তাই শুনিয়ে দিলেন। চাকর হ'য়ে বাড়ীর মনিবদের ওপরেও তুমি মোড়লী করবে তোমার এতখানি স্পর্দ্ধা!"

তাড়াতাড়ি আমি কহিলাম, "তোমার ভাল ভেবেই নিশ্চয় ওকাজ ও করেছে মা, নইলে—"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শিখা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "তুমি থাম বাবা, আস্কারা দিয়ে দিয়েই না ছোটলোকের মাথাটা খেয়েছ তোমরা? কথায় বলে না, বাঁদরকে নাই দিতে নেই—"

"শিখা!"

সন্ধ্যার প্রদীপ্ত কণ্ঠস্বরে চমকিয়া চাহিতেই দেখি সে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার চোখ-মুখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল, মুহুর্মুহুঃ স্ফুরিত ওষ্ঠাধর প্রাণপণ শক্তিতে দাঁতে চাপিয়া রুদ্ধস্বরে সে বলিল, "শিখা! গৌরকে আমি কাকা ব'লে ডাকি, বাড়ীর চাকরও সে ঠিক নয়—" আর কিছু সে বলিতে পারিল না, দরবিগলিত অশ্রুধারায় তাহার অন্তরের অবরুদ্ধ উত্তাপ রাশি ফাটিয়া ঝরিয়া পড়িল।

পত্রের উত্তর যথাসময়েই পাইয়াছিলাম, শ্বশুরমহাশয় লিখিয়াছিলেন, "গৌরাঙ্গ এখানে আসে নাই, বিশেষ উৎকণ্ঠায় আছি, তাহার কোন সংবাদ পাইলে কি মা পত্রপাঠ মাত্র জানাইবে।"

যন্ত্রের যন্ত্রণা

—শ্রীমোহিনী চৌধুরী

শতাব্দীর ষড়যন্ত্রে হয়েছে নিঃশেষ
জীবনের চিরশান্তি এসেছে দুর্দ্দিন,
কলঙ্ক-পতাকা তার আকাশে উড্ডীন,
ধূলি ও ধূমায় লেখা অতীত-বিদ্বেষ।

আত্মগরিমায় মত্ত এলো বর্ত্তমান,
অকারণ-অহঙ্কার অলঙ্কার তার,
বিজ্ঞানের গর্ব্বে খর্ব্ব বিধি বিধাতার,
চক্রের চক্রান্তে হেরি হত্যার প্রমাণ।

মৃত্যু-আর্ত্তনাদে আজি পূর্ণ চতুর্দ্দিক্‌,
সর্ব্বহারাদের কণ্ঠে করুণ রোদন;
আত্মকৃত দুষ্কৃতির নাহি সংশোধন
শিক্ষার ত্রুটীরে সেই ধিক্কার অধিক।

বল শিক্ষা! কেন এই হতাশা-প্রান্তরে
প্রাণ হয় নিষ্পেষিত মুক্তি-ভিক্ষা তরে।

সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা

—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

কলিকাতার অবস্থা

সিপাহী-যুদ্ধে দিল্লী সিপাহীদিগের হস্তগত হইলে, দিল্লীর শাসন-কার্য্য সম্রাট্ বাহাদুর শাহের নামে তাহাদিগের দ্বারাই চলিতে থাকে। দিল্লীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক বা অসামরিক অল্পসংখ্যক শেতাঙ্গ যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা কেহ হত বা পলাতক হন। সেই অল্পসংখ্যক শ্বেতাঙ্গের হত্যায় ও নির্য্যাতনে সমর্থ হইয়া জেতৃগণ আপনাদিগকে খুবই নিরাপদ মনে করে। তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে, অধিকৃত ভারতের নানা স্থান অবিলম্বে তাহাদের ভাই-ব্রাদারের হইবেই হইবে, সুতরাং তাহাদের আর ভাবনা কি, নির্ব্বিবাদে তাহারা রাজ্যভোগ করিবে।

সিপাহী-যুদ্ধ-সংক্রান্ত বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী গাজীপুরের সিভিল ও মিলিটারী সার্জ্জন (পরে ব্রিগেডিয়রের পদে উন্নীত) ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী (যাঁহার দিনলিপি ভিত্তি করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত) দিল্লীতে সিপাহীদিগের নিরাপত্তা-ভাবের উল্লেখ করিয়া তাঁহার দিন-লিপিতে বলিয়াছেন: "সামরিক নীতির বশে থাকিয়া সিপাহীরা কোম্পানীর তাঁবে যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল, 'স্বাধীন' হইয়া তাহাদের সে গুণ যেন উবিয়া গেল—স্ব-স্ব-প্রধান হইল সকলেই, নেতা কেহ রহিল না। প্রকাশ, দিল্লী-বাসীরা অব্যবস্থিতচিত্ত। সিপাহী পরিচালনায় দিল্লীর অবস্থা উন্নত না অবনত! রাজ্য পরিচালনা ব্যপদেশে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই না কি বলিতেছে। মুখ ফুটিয়া বাহিরের লোকের কাহারও কিছু বলিবার সাহস নাই, বলিলে কোম্পানী পক্ষ গণ্য হইবার সম্ভাবনা।"

ওদিকে গভর্ণর-জেনারল লর্ড ক্যানিং দিল্লী পুনরধিকারের আয়োজনে নিবিষ্টচিত্ত। মিরাটের ঘটনা এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানের অবস্থা আশু আশঙ্কাজনক হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সর্ব্বাগ্রে দিল্লী দখলের উপরই জোর দিলেন তিনি ঠিক। দিল্লী হাতে ফিরিয়া পাইলে অন্যান্য সমস্যার সমাধান সহজেই হইবে, কাউন্সিলের কোনও কোনও সদস্যেরও অভিমত, এই কথা বলিয়া ডাঃ সূর্য্যকুমার কলিকাতা হইতে গাজীপুরে পত্রযোগে প্রাপ্ত বঙ্গদেশের—বিশেষতঃ কলিকাতার, এই সময়ের অবস্থা জানাইয়াছেন:

"মিরাট ও দিল্লীর ঘটনায় কলিকাতায় জনসাধারণ সচকিত। দমদমা, ব্যারাকপুর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে সিপাহীদের পূর্ব্বচাঞ্চল্য ও সিপাহী দলবিশেষের নিরস্ত্রীকরণ ঘটনা সকলেরই মনে আছে। মিরাট ও দিল্লীর ব্যাপারে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া সিপাহীদের এখন নাচিয়া উঠার সম্ভাবনা খুবই—কলিকাতাস্থ মাকিন, ফরাসী, পর্ত্তুগিজ ও ইংরাজের জনে জনের অভিমত। আশঙ্কা বশে ইহাদের অনেকেই ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গে বা গঙ্গায় ভাসমান জাহাজে অবস্থান শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া সেই মত কার্য্য করিতেছেন। ইউরোপীয়ান বণিক্ সম্প্রদায় ও অসম্প্রদায়ী প্রায় সকল শ্বেতাঙ্গই লর্ড ক্যানিংকে ধরিয়া বসিয়াছেন স্থানীয় সিপাহীদের উত্থান নিবারণে কঠোর উপায় অবলম্বিত হউক, এবং ইয়োরোপীয়দিগকে ভলেণ্টিয়র হইতে দেওয়া হউক। লর্ড ক্যানিং দুইটি নিবেদনের একটিও পূরণ করিতে সম্মত নহেন। সম্মত হইলে সুফল অপেক্ষা কুফল হইবার অধিক সম্ভাবনা আছে, তিনি জানাইয়াছেন। তবে স্পেশাল কনেষ্টবল যদি কেহ হন তাহাতে আপত্তি নাই। ইহাতে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় খুবই অসন্তুষ্ট। তাঁহাদের ভয় হইয়াছিল, মহারাণীর জন্মোৎসব ও মুসলমানের ঈদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া সিপাহীরা গোলমাল করিবেই করিবে। ভয় বৃথা ভয়ে পরিণত হইয়াছে। উৎসব দুইটিতে সিপাহীরা আনন্দের সহিত যোগদান করিয়া তাহা সুসম্পাদিত করাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। কলিকাতায় একটি মাত্র গোরা সৈনিকের দল আছে। আর একটি আছে কাছাকাছির মধ্যে চুঁচুড়ায়। সিপাহী যদি খেপিয়া উঠে এই দুইটি দলে কি করিবে! ইহাই শ্বেতাঙ্গ সাধারণের ভয়। বাঙ্গালী হিন্দুর moral support

কোম্পানীর পক্ষে জানিয়াও তাহার উপর তাঁহাদের ভরসার নাই। লর্ড ক্যানিং ও তাঁহার কাউন্সিল কলিকাতার অবস্থার পক্ষে ইহা মূল্যবান্ বলিয়া মনে করেন। এখন যতদূর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে কলিকাতায় কোনও ভয়ের কারণ নাই।"

দিল্লী উদ্ধারের উৎসবের পর মিরাট ও দিল্লীর জনসাধারণের কাহারও কাহারও সহানুভূতি সিপাহীরা পায় নাই, ইহা বলিবার উপায় নাই। বলিলে ইতিহাসবিরুদ্ধ কথা বলা হইবে। হিন্দুপ্রধান তখনকার কলিকাতাবাসী কিন্তু সিপাহীদের কোনও 'আস্কারা' দেয় নাই, ডাঃ সর্বাধিকারীর দিনলিপি হইতে এইরূপ জানিতে পারা যায়।

সেই সময়ে বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, এলাহাবাদ, ও আগ্রার রাজপুরুষেরাও লর্ড ক্যানিংকে জানান, 'অল কোয়ায়েট্', এ সকল স্থানে কোনও গোলমাল নাই। দুর্দ্দিনে ইহা অল্প আশ্বাসের কথা নহে। যেখানে যত গোরা সৈন্য আছে, স্থানীয় নিরাপত্তার বিলি ব্যবস্থা করিয়া তাদের মধ্যে যত অধিকসংখ্যক দিল্লীর উদ্ধারার্থ যত শীঘ্র পাঠান যায় ততই মঙ্গল।

নানা স্থানে শান্তি বিরাজ করার সংবাদ প্রাপ্তিতে লর্ড ক্যানিং উৎসাহ-ভরে আশু দিল্লী উদ্ধারের জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হ'ন এবং সিমলা শৈলে অবস্থিত কোম্পানীর প্রধান সেনাপতিকে সেই মত কার্য্য করিতে লিখিয়া পাঠান। কোম্পানীর দুই প্রধান রাজপুরুষ রাজধানী কলিকাতায় তখন একত্রে থাকিলে কাজের যতটা সুবিধা হইত, পরস্পরের নিকট হইতে বহুদূরে তাঁহারা থাকায় তাহার কিছুই হয় নাই। এ কারণে অসুবিধার যে অন্ত ছিল না – সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস-লেখকদিগের প্রায় সকলেরই এই অভিমত। সে যাহা হউক, মাহেন্দ্রক্ষণে মাদ্রাজ হইতে ইয়োরোপীয় সৈন্য-বাহিনী কলিকাতায় আসিয়া পৌছানতে সেই সমগ্র বাহিনী দিল্লী অভিযানে তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হয়। লর্ড ক্যানিং-এর আদেশমত অন্যান্য স্থানের শ্বেতাঙ্গ সৈন্যাদিরও সাজ-সাজ সাড়া পড়িয়া যায়। কলিকাতার গোরা সৈন্য কলিকাতাতেই থাকে।

মিরাট ও দিল্লীর ভয়াবহ সংবাদ এবং লর্ড ক্যানিং-এর অনুজ্ঞাহেতু প্রধান সেনাপতি অম্বালায় উপস্থিত হ'ন। অম্বালা ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে সিপাহীর বিরুদ্ধভাব বোধ করিয়া তাহা দমন করিতে পাতিয়ালা, ঝিন্দ ও কর্ণাল প্রভৃতির রাজন্যবর্গ এবং অম্বালার ডেপুটী কমিশনর ফরসিত ও শতদ্রুর কমিশনর বার্ণেস্-এর সহযোগিতা বিশেষ কার্য্যকরী হয়, প্রধান সেনাপতি এন্সন্ সৈন্যসামন্ত লইয়া ২২শে মে অম্বালা হইতে দিল্লীর পথে অগ্রসর হ'ন। সিমলা হইতে অম্বালা যাত্রার পূর্ব্বে এন্সন্ ফিরোজপুরের কেল্লা, গোবিন্দগড়, জলন্ধর ও ফিলৌরের অস্ত্রাগার সুরক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত করেন, দিল্লী অস্ত্রাগারের ঘটনার পুনরাভিনয় এসকল স্থানে পারতপক্ষে যাহাতে না হয় তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া। দিল্লীর পথে কর্ণাল প্রদেশে পৌছাইতে না পৌছাইতে কলেরারোগে ২৬শে মে এন্সনের মৃত্যু হয়। দিল্লী-অভিযান বাহিনীর ভার পড়ে স্যার হেনরী বার্ণাডের উপর।

এন্সনের এই শোচনীয় মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া সূর্য্যকুমার তাঁহার দিনলিপিতে লিখিয়াছেন :

"প্রধান সেনাপতি এন্সন্ এক বৎসর মাত্র ভারতে আসিয়াছিলেন। আসিবার অল্প কালের মধ্যেই তিনি বেশ অসুস্থ হইয়া পড়েন। সে অসুস্থতা তাহার লাগিয়াই থাকে। কলিকাতায় থাকিলে তাঁহার স্বাস্থ্য আরও শোচনীয় হইবার উপক্রম হয়, কাজেই বৎসরের অধিকাংশ কাল সিমলার শৈলাবাসে তাঁহাকে কাটাইতে হইয়াছে। অবকাশ লইয়া স্বদেশ যাত্রার অভিপ্রায়ে তিনি ছিলেন, এমন সময়ে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। সিমলা হইতে শেষ যাত্রা যখন তিনি করেন তখন তিনি বেশ অসুস্থ।"

এই কথা লিখিয়া সূর্য্যকুমার আরও জানাইয়াছেন :

"সিপাহীরা অশান্তির উদ্যোগ করিবার সংবাদ পাইয়াও এন্সন্ শৈলাবাসে ছিলেন। ইহার জন্য অপ্রীতিকর কথা যে উঠে নাই, তাহা নহে। এন্সনের অসুস্থতার কারণে স্থানত্যাগে দৈহিক অপটুতার কথা সমালোচকেরা তখন ভুলিয়া যান। অসুস্থ দেহেও কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর বীরবরের জীবন দানে সমালোচকের সমালোচনার অসারতা সকলেই দেখিতে পাইল।"

বার্ণাডের অম্বালার শ্বেত-সৈন্য দিল্লীর পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ওদিকে মিরাট হইতে সেনাপতি উইল্সনের অধীনে আর এক দল শ্বেত-সৈন্য দিল্লীর অভিমুখে প্রেরিত

হইয়াছিল। বুলন্দশহর হইতে পাঁচশত গুর্খা সৈন্য মেজর রীডের অধীনে দিল্লী যাত্রা করে প্রায় একই সময়ে। ঝিন্দ রাজের সৈন্য এবং আফ্‌গান সেনাপতি জান্‌ফিসান্ খাঁর অশ্বারোহী দলও কোম্পানীর পক্ষে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়।

২৭শে মে হিন্দন্ নদীর তীরে গাজীউদ্দিন নগরে মিরাট বাহিনীর সহিত আক্রমণে বহির্গত দিল্লীর সৈন্যের সম্মুখ-যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষের কামান ও বন্দুকের গর্জ্জনে এবং অসির ঝনঝনায় আকাশ-বাতাস কম্পিত হয়। ক্রমে সিপাহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে, শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের জয়ের সম্ভাবনা তাহাতে সূচিত হয়। নবোৎসাহে ছত্রভঙ্গ সিপাহী আবার মিলিত হইয়া ৩১শে মে বিপক্ষকে যুদ্ধ দান করে। প্রচণ্ড রৌদ্রে ও সিপাহীর ভীম আক্রমণে কোম্পানীর সেনাবাহিনী ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াও প্রাণপণ শক্তিতে অকুতোভয়ে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে এবং সিপাহীদিগকে পিছাইয়া লইয়া যাইলেও যুদ্ধের মীমাংসা ঘটিল না। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ কয়দিন ধরিয়া চলিতে থাকে। অম্বালা ও মিরাটের সৈন্যদল এবং মিত্র-সৈন্য দল সম্মিলিত হইয়া দিল্লীর ছয় মাইল দূরে বুদ্‌লিকাসরাই নামক স্থানে ৮ই জুন তথায় সমাবিষ্ট সিপাহী সৈন্যের সম্মুখীন হয়। সিপাহীরা তোপ দাগিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাহার উত্তরে কোম্পানীর সৈন্যবাহিনী চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারিদিক্ হইতে সিপাহী সৈন্যকে আক্রমণ করে। বিপুল উদ্যমে সিপাহীরা কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ করিলেও সমধিক নিয়মানুবর্ত্তী কোম্পানীর পক্ষ অবশেষে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। সিপাহী সৈন্য তখন দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হয়। শত্রুর কামানাদি দখল করিয়া লইয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে কোম্পানীর পক্ষ যুদ্ধে জয়ী হইয়া দিল্লীর কুচ-কাওয়াজের মাঠে সমবেত হইল—তথায় ব্রিটিশ পতাকা উড়িল।

যুদ্ধে তিনশতের উপর সিপাহী নিহত হয়। আহতের সংখ্যা ইহার অনেক অধিক। অবশিষ্ট সিপাহীর মধ্যে পলাইয়া তখনকার মত যাহারা পরিত্রাণ পায়, তাহারা ব্যতীত সকলেই বন্দী হয়। কোম্পানীর পক্ষে এড্‌জুটাণ্ট-জেনারল্ চেস্‌টার ও অন্য চারিজন অফিসর নিহত হ'ন। সাধারণ সৈন্য নিহত হয় প্রায় পঞ্চাশ। আহতের সংখ্যা দেড়-শতের কাছাকাছি। প্রাধান্যরক্ষার জন্য সিপাহীরা কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ হইল না।

নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে :

সূর্য্যকুমারের দিনলিপিতে প্রকাশ, "দিল্লীতে খণ্ডযুদ্ধে সিপাহীদের মনে অসন্তোষ জাগিয়াছিল তাহারা কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হইল না। আজিমগড় তাহার আজিমগড় বেনারসের লাগোয়া, ব্যবধান মাত্র ৬০ মাইল মাত্র। তথায় অবস্থিত ১৩ নং পদাতিক সৈন্যদল কোম্পানীর বিরুদ্ধে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে দেখিয়া সেনাদলের ইয়োরোপীয়ন্ অফিসরেরা এবং স্থানীয় সিভিল্ কর্ত্তৃপক্ষ সম্মুখে ঘোরতর বিপদ্ বুঝিতে পারেন। তাঁহাদের পরিবারকে সে বিপদের সময়ে রক্ষা করিবার যথাসাধ্য আয়োজন করিয়া রাখিতে তাঁহারা বাধ্য হ'ন। বিপদে রক্ষা পাইবার এবং আশ্রয়লাভের জন্য কাছারি গৃহ ছোটখাট কেল্লায় পরিণত হয়। সেই সময়ে প্রায় সাত লক্ষ টাকা আজিমগড়ের তোষাখানায় আসিয়া জমে। সিপাহীরা তাহা হস্তগত করিতে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে কর্ত্তৃপক্ষ জানিতে পারেন। টাকা যতশীঘ্র সম্ভব বেনারসে পাঠান স্থির হয়—সঙ্গে সঙ্গে পাঠানও হয়। টাকা হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে জানিতে পারিয়া, সিপাহীরা মার মার কাট কাট করিয়া উঠে ও সমস্ত টাকা পথে লুটিয়া লয়। সিপাহী উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ইয়োরোপীয় কাছারি গৃহে আশ্রয় লইল। তাহাদের ত্যক্ত গৃহাদি লুণ্ঠন করিয়া তাহারা তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। সেনাদলের ইয়োরোপীয়ান অফিসরদিগের কোনও অনিষ্ট তাহারা করিল না, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গাজীপুরে যাইয়া তাহাদের নিরাপদ্ হইবার সুবিধা বরং করিয়া দিল। সুবিধামত অন্যান্য ইয়োরোপীয়েরা, স্ত্রী ও পুরুষ, গাজীপুরে আসিল। তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও গাজীপুরের সুরক্ষিত ডিস্‌পেনসারীতে আশ্রয় দিতে হয়। আজিমগড় শ্বেতাঙ্গশূন্য দেখিয়া রণোন্মত্ত সিপাহীরা ফৈজাবাদের দিকে গমন করে। আজিমগড়ের সংবাদ গাজীপুরের সিপাহীদের জানিতে বাকি থাকিল না। সৌভাগ্যের বিষয়, 'নেমক রক্ষা' তাহাতেও তাহারা করিল। কোনও গোলযোগের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া গেল না।"

৩৭ নং শ্রেণীর পদাতিক, লুধিয়ানার শিখসেনা ও ১৩ নং শ্রেণীর অশ্বারোহী, এই তিনে মিলিয়া অনধিক দুই হাজার সিপাহী তখন বেনারসে অবস্থিত। শ্বেত-সেনার মধ্যে মাত্র ত্রিশ জন গোলন্দাজ সেখানে ছিল। অসন্তোষের ভীষণ সংক্রমণে স্থানীয় সিপাহীরা তখন জর্জ্জরিত। আজিমগড়ের ঘটনায় তাহা শতগুণ বৃদ্ধি পায়। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়ে মাদ্রাজে শ্বেতসেনাদল এবং দানাপুর হইতে অল্প এক সেনাদল (শ্বেতাঙ্গ) বেনারসে আসিয়া পৌঁছায়। অসন্তুষ্ট সিপাহীদিগকে নিরস্ত্রীকরণে কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ বদ্ধপরিকর হন। ইহার পরের ঘটনা-নিচয়, বেনারসে তখন অবস্থিত, প্রত্যক্ষদর্শী যদুনাথের 'তীর্থভ্রমণ' হইতে উদ্ধৃত করিয়া 'সিপাহীযুদ্ধের নূতন কথা' প্রসঙ্গে 'বঙ্গশ্রী'র পূর্ব্ব এক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ সূর্য্যকুমারের ডায়েরী হইতেও প্রাসঙ্গিক অনেক কথাও সেই সঙ্গে বলা হইয়াছে। সে সকল কথার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই।

শ্বেত-সৈন্য উপস্থিত থাকিলেও বেনারসে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। তবে উদ্ধত সিপাহীরা সম্মুখযুদ্ধ করিবার সাহস করে নাই বা বেনারস হস্তগত করিবার কোনও সুযোগ পায় নাই। না পাইলেও বেনারসের অবস্থা কম সঙ্গীন হয় নাই। গৃহদাহ, লুণ্ঠন, হত্যা সুবিধা পাইলেই সিপাহীরা করিয়াছে। এই অবস্থাতেও দ্বিতীয় পঞ্জাব যুদ্ধে বন্দীকৃত ও পরে মুক্ত হইয়া কোম্পানীর সৈন্যদলভুক্ত শিখ্ বীর সুরৎ সিং ও তাহার অধীনস্থ কয়েকজন শিখসৈন্য অসাধারণ প্রভুভক্তির পরিচয় প্রদান করে। ধনাগারে রক্ষিত বহুমূল্য মণিমুক্তাদি লুণ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকায় সে সকল অতি গোপনে বিশ্বস্ত সুরৎ সিং ও তাহার অনুচরবর্গের সাহায্যে চক্ষের নিমিষে সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত হয়। প্রভুভক্তির পারিতোষিক স্বরূপ কর্তৃপক্ষ সুরৎ সিংকে দশ সহস্র মুদ্রা দান করেন।

কোম্পানীপক্ষের এই বিপদের দিনে বেনারসের জজ্ আদালতের নাজীর ব্রাহ্মণ-বংশজ পণ্ডিত গোকুল চাঁদ, বেনারসের বিখ্যাত ধনী রাও দেবনারায়ণ সিংহ ও রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ আপনাদের ধন ও প্রাণ তুচ্ছ করিয়া আশ্রিত ইয়োরোপীয়গণকে যে ভাবে রক্ষা করেন, অসাধারণ মহানুভব না হইলে তাহা করা সম্ভবপর নহে। দুই দল শ্বেতাঙ্গ সৈন্য তথায় থাকিলেও ইহাদের মহানুভবতা ভিন্ন আশ্রিতের প্রাণরক্ষা হইত না। হিন্দু-জনসাধারণও কোম্পানীর ঘোর সমর্থক থাকায় বেনারসের বিপদ্-সঙ্কুল অবস্থা অল্প সময়ের মধ্যে কাটিয়া যায়। কোম্পানীর শ্বেত সামরিকদল সে কথা কিন্তু বুঝিতে পারে নাই। সিপাহীর অত্যাচারে দিক্-বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হওয়ায় এবং বিচারের হর্ত্তা-কর্ত্তা তখন সামরিক কর্তৃপক্ষ থাকায় দোষীর প্রতি অতি কঠোর দণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিলেও সন্দেহবশে ধৃত, এমন কি সন্দেহের অতীত নিরীহ নগর ও গ্রামবাসীর সম্বন্ধে তাঁহাদের আচরণে প্রগাঢ় ক্ষোভের অন্ত থাকে না। বন্ধুর মন ইহাতে ভাঙ্গিয়া যাওয়া অস্বাভাবিক কি! এই অদূরদর্শিতার ফলে, এক স্থানে নহে, বহু স্থানে, সিপাহীযুদ্ধ নিবারণের দিন যে পিছাইয়া দেয় তাহাতে 'না' বলিবার উপায় নাই।

বারাণসী হইতে ৩৭ নং পদাতিকের লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা এবং বারাণসীতে শিখ সৈন্য সম্বন্ধে কোম্পানীর গোরা সৈন্যের ব্যবহারের অতিরঞ্জিত সংবাদ জৌনপুরে পৌঁছাইতে বিলম্ব হয় নাই। জৌনপুর বারাণসী হইতে মাত্র ৩৭ মাইল দূরে অবস্থিত ও প্রায় দুই শত শিখ-সিপাহী কর্তৃক রক্ষিত। সংবাদ সত্য কি না, তাহার বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া রক্ষকই ভক্ষক হইয়া উঠে। ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া তাহাদের সেনানায়ক মারেকে নিরস্ত্র অবস্থায় একজন সিপাহী গুলি করে। জৌনপুরের শ্বেতাঙ্গ হত্যার তাহাই সঙ্কেত বলিয়া গৃহীত হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ ইয়োরোপীয়ের সেই সময়ে পলায়ন করা ভিন্ন উপায় থাকে না। তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বিপাকে পড়িয়া সিপাহী কর্তৃক নিহত হয়। ধনাগার লুণ্ঠিত হয়। আড়াই লক্ষের উপর টাকা সিপাহীর হস্তে পড়ে। শ্বেতাঙ্গদিগের গৃহাদির চিহ্ন মাত্র সিপাহীরা রাখে না। জৌনপুর ইয়োরোপীয়শূন্য হইয়া যায়। পলাতকেরা কারাকটে পৌঁছাইয়া প্রাণ রক্ষা করে। কারাকটের প্রতিপত্তিশালী রাজপুত সর্দার হিঙ্গনলালের আশ্রয়ে বহু শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনী নিরাপদে অবস্থান করে।

এলাহাবাদের ঘটনা

বারাণসী হইতে লক্ষ্ণৌ-অভিমুখে পলায়িত শিখ ও অন্যান্য সিপাহীর কথা এলাহাবাদে এই সময়ে পৌঁছাইয়াছিল।

এলাহাবাদে ৬ নং পদাতিক, একদল দেশীয় কামান-রক্ষক ও একদল শিখ সৈন্য তখন অবস্থিত। মিরাটের ঘটনায় ইহারা উত্তেজিত হয় নাই। সিপাহীরা দিল্লী হস্তগত করিলে বিদ্রোহী সিপাহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে ইহারা দৃঢ়সঙ্কল্প হয়। তাহাদের এই বিশ্বস্ততার জন্ম লর্ড ক্যানিং-এর তাহারা প্রশংসাভাজন হয়। কিন্তু বারাণসীর ঘটনা অতিরঞ্জিত হইয়া যখন তাহাদের কাছে পৌছাইল এবং তাহারা শুনিল বারাণসীর পলাতক 'ভাই-ব্রাদারেরা' তাহাদেরই কাছে আশ্রয় লইতে ছুটিয়া আসিতেছে—তখন তাহারা চাঞ্চল্যে অভিভূত না হইলেও বিশেষ অসচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিল। ইহা কর্ত্তৃপক্ষের লক্ষ্য এড়াইল না। সিপাহীদিগকে লর্ড ক্যানিং-এর প্রশংসা-জ্ঞাপক বার্ত্তা শুনাইবার জন্ম কাওয়াজের মাঠে তাহাদের সমবেত করা হইল। বার্ত্তা শুনান হইল। সিপাহীরা কৃতজ্ঞতা-সূচক ধ্বনি করিল; কোম্পানীর পক্ষাবলম্বন সতত তাহারা করিবে, একবাক্যে সকলে বলিল। কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ ঘুচিল, তাঁহারা যথেষ্ট নিরুদ্বেগ হইলেন। বারাণসী হইতে পলায়িত সিপাহীদের এলাহাবাদ প্রবেশে বাধা দিতে দারাগঞ্জ নৌসেতুর মুখে ৬ নং পদাতিকের কিয়দংশ দুইটী কামান সহ স্থাপিত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সমধিক নিশ্চিন্ত হইলেন। পরে ঐ দুইটি কামান ফিরাইয়া আনিবার অনুজ্ঞা জ্ঞাপিত হইলে কামানে বিপর্য্যস্ত তাহাদের 'ভাই-ব্রাদারের' কথা বুঝি তাহাদের মনে উদয় হইলে। কামান ছাড়িতে তাহারা অস্বীকার করিল। অনুজ্ঞা পালন করাইতে কোম্পানী পক্ষ ছাড়িল না। উত্তর প্রত্যুত্তর বন্দুকের আওয়াজে দেওয়া আরম্ভ হইল। কামান হইতে গোলাবর্ষণ ও বন্দুকের মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণের শব্দে চারিদিক্ কাঁপিয়া উঠিল। তখন রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকা। সেনাপতি কর্ণেল সিম্‌সন্ সশস্ত্র ও বিশ্বস্ত অনুচর বেষ্টিত হইয়া দুর্গ হইতে অশ্বারোহণে ত্বরিৎগতিতে সেনানিবাস হইয়া কাওয়াজের মাঠে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সিপাহীরা সর্ব্বত্র রণোন্মত্ত। তাঁহার উপর গুলি চালাইতে তাহারা দ্বিধাবোধ করিতেছে না। ত্বরিৎগতিতে ধনাগার রক্ষাকল্পে তিনি ঘোড়া ছুটাইলেন। ধনাগারে ত্রিশ লক্ষ টাকা মজুত ছিল। গতিশীল হইলেও সেনাপতিকে লক্ষ করিয়া সিপাহীর গুলিবর্ষণের বিরাম রহিল না। একটি গুলি বাহনের অঙ্গে লাগায় তীব্রবেগে বাহককে লইয়া বাহন দুর্গদ্বারে উপনীত হইল। প্রভুকে নিরাপদ করিয়া অশ্ব প্রাণত্যাগ করিল।

দুর্গে তখন ৬ নং পদাতিকের একাংশ ও একদল শিখ সৈন্য ছিল। কর্ণেল সিম্‌সন্ শিখ সৈন্যের দ্বারা ৬নং পদাতিক দিগকে নিরস্ত্র করাইতে কাল বিলম্ব করিলেন না। দুর্গের সম্মুখে রক্ষীসহ কামান সজ্জিত রহিল। তাহার পুরোভাগে সমস্ত ইয়োরোপীয়ান ভলেণ্টিয়র দণ্ডায়মান রহিল। কোম্পানীর আধিপত্যের সঙ্কেতস্বরূপ দুর্গ চূড়া হইতে পতাকা পত্ পত্ শব্দে উড়িতে লাগিল। ওদিকে উন্মত্ত ৬নং সিপাহীদল চারিদিকে শ্বেতাঙ্গ-হত্যাকল্পে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানহীন। তাহারা কারাগার-দ্বার ভগ্ন করিয়া লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যাপৃত হইল। গৃহাদি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হইল। উন্মত্ত সিপাহীদের সহিত এলাহাবাদের অনেক অধিবাসী এ কার্য্যে সহায়তা করিল। পেন্‌শন্-ভোগী সিপাহীদেরও অনেকে বিদ্রোহী সিপাহীদের বিদ্রোহে যোগদান করিল। যত দিন যাইতে লাগিল, বিশৃঙ্খলা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। বিপ্লব নগর হইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সংক্রামক হইয়া পড়িতে লাগিল

৭ই জুন কোম্পানীর ধনাগার লুণ্ঠিত করিয়া সিপাহীরা ত্রিশ লক্ষ টাকা হস্তগত করিল। দুর্গে যে সকল শ্বেতাঙ্গ আশ্রয়লাভের সুযোগ করিয়া লইয়াছিল, তাহারা ব্যতীত অপরাপর ইয়োরোপীয় তখন হত বা পলায়িত। কর্ণেল সিম্‌সন্ দলবল সহ দুর্গে রক্ষিত প্রভূত অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং বহু আশ্রিতকে বীর বিক্রমে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্তেজনা-বাণী সিপাহীরা এবং তাহাদের সমর্থকেরা অবাধে প্রচারিত করিলেও স্থানীয় অধিকাংশ অধিবাসী সিপাহীর ভয়ে বাহ্যতঃ তাহাদের প্রতি সহানুভূতির ভাব দেখাইয়া ভিতরে ভিতরে দুর্গাবদ্ধদিগকে যথাসাধ্য সাহায্যদানে বিরত হইল না। বাঙ্গালী অধিবাসীরা বিশেষ বুদ্ধি খাটাইয়া সাহায্য করিতেছে। তাহাদের সম্বন্ধে সিপাহীরা খুবই সন্দিহান। সে কারণে বাঙ্গালীর উপর সিপাহীর রূঢ়াচারের অবধি নাই। আপনাদিগকে যথাসাধ্য-ভাবে রক্ষা করিতে স্থানীয় বাঙ্গালী মিলিত হইয়া এক সৈন্যবল গঠন করিয়াছেন। কয়েকজন মহাশয় হিন্দুস্থানী এ বিষয়ে তলে তলে বাঙ্গালীকে সাহায্য করিতেছেন।

মুন্সেফ, প্যারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সৈন্যদলের নেতা। প্যারীচরণ হুগলীর লোক

এলাহাবাদের প্রায় সর্ব্বত্র যখন বিশৃঙ্খলা এবং সিপাহীর উন্মত্ততায় এলাহাবাদ যখন থরথর, তখন শিখ ও ভলেন্টিয়ার সৈন্যের দ্বারা কোম্পানীর দুর্গ রক্ষা করা ভিন্ন সিপাহী দমন করা সম্ভবপর হয় নাই। খাদ্যের অপর্য্যাপ্ততা বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, দুর্গের দেশী ও ইয়োরোপীয় সৈন্যের অপরিমিত মদ্যপান নিয়মের মধ্যে হইয়া পড়ে। ইহার ফল কি কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিলেও সেনাদিগের এ অভ্যাস নিবারণে তাঁহারা কঠোরতা অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করেন। ফলে দুর্গস্থিত সৈন্যের কেহ কেহ কখনও কখনও বাহিরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া নানা অশোভন কার্য্যও মধ্যে মধ্যে করিয়া বসে। তাহার জন্যও জনসাধারণের কাহারও কাহারও ভয়ানক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

মৌলবী লিয়াকৎ আলী নামক এক ব্যক্তি, সিপাহী-উত্থানের কিছু পূর্ব্ব হইতে এলাহাবাদের মুসলমান সাধারণের চক্ষে খুব ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। সিপাহী-উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর রাজত্ব লোপ হইয়া মুসলমান রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তার কথা অনেক মুসলমানের মনে মৌলবী সাহেব গাঁথিয়া দেন। দিল্লীশ্বরের অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত পতাকা এলাহাবাদে তাহারা উড্ডীন করে। এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তার পদে তাহারা মৌলবীকে অধিষ্ঠিত করে। ১০ই জুন পর্য্যন্ত এইভাবে চলে।

এলাহাবাদের উদ্ধার

১১ই জুন জেনারল্ নীল সসৈন্যে এলাহাবাদে আসিয়া পৌঁছেন। পৌঁছাইয়াই দুর্গাবদ্ধদিগকে নিরাপদ করিতে এবং এলাহাবাদে কোম্পানীর প্রাধান্য স্থাপিত করিতে বিশেষ কঠোরতা সহ তাঁহাকে কার্য্য করিতে হয়। বিরুদ্ধ সিপাহী এবং তাহাদের সমর্থকদিগের দমনে উন্মত্ত তাঁহার সৈন্য তাহাদিগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের চক্ষে তখন দেশীয় মাত্রেই বিদ্রোহী। বিচার করিয়া দোষী-নির্দোষ স্থির করা তখন তাহাদের সাধ্যাতীত। দোষীর সঙ্গে বহু নির্দোষ প্রাণ ও সর্ব্বস্বহারা হয়। দারাগঞ্জ, মুঠিগঞ্জ, রসিদাবাদ, সৈদাবাদ, রসুলপুর ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে কোম্পানীর পক্ষে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ অনুভূত হইলে অন্যান্য স্থানও আপনা হইতে শাসিত হইয়া যায়। ইহা করিতে ১৮ই জুন পর্য্যন্ত সময় লাগে। ইতিমধ্যে ইয়োরোপীয় মহিলা ও বালক-বালিকা এলাহাবাদে যাহারা ছিল। তাহাদে করিয়া তাহাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

বেগতিক দেখিয়া লিয়াকৎ আলী কাণপুরে পলাইয়া যায়। কলিকাতায় লাট কাউন্সিল দ্বারা ইতিমধ্যে যথায় প্রয়োজন তথায় সামরিক আইন (মার্শাল ল) প্রবর্ত্তিত হয়। এলাহাবাদে এই আইন প্রবর্ত্তিত হওয়াতে স্থানীয় লোকজনের 'গঙ্গাজলে ধোয়া হইলে'ও আতঙ্কের অবধি থাকে না। ডাঃ সূর্য্যকুমার তাঁহার দিনলিপির একস্থলে লিখিয়াছেন :

"সিভিল ইয়োরোপীয়দের সিপাহীর অত্যাচারে ভীষণ প্রতিশোধ কামনা এবং দেশীয় সকলকেই সিপাহীর পর্য্যায়ে তাঁহাদের ফেলিয়া দেওয়া কোম্পানীর পক্ষে ঘোর অনিষ্ট কারক হয়। লর্ড ক্যানিং শত চেষ্টাতেও স্বদেশবাসীর মন ফিরাইতে পারেন নাই। সিপাহীর কবল হইতে সদাশয় প্রতিবাসী, আশ্রয়দাতা বা বিশ্বস্ত ভৃত্যবর্গ কর্ত্তৃক রক্ষাপ্রাপ্ত ইয়োরোপীয়ন্ নরনারী প্রতিশোধকামীদের নিরস্ত করিতে পারেন নাই। সামরিক অফিসর তাঁহার অধীন অফিসর ও সেই অফিসরের অধীনে শ্বেতাঙ্গ-সেনাদলকে বাগে রাখিতে পারেন নাই। অবাধ্যদের দেশীয় মাত্রেরই প্রতি বিদ্বেষ অস্থিমজ্জাগত হওয়ায় বৃক্ষশাখা হইতে রজ্জু সাহায্যে লম্বমান্ দেশীয়দের মৃতদেহের সংখ্যা বা গুলির আঘাতে ভূপাতিত হওয়ার সংখ্যা যে অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়, তাহার সন্দেহ নাই। সিপাহী যুদ্ধ সংক্রান্ত ইতিহাস যখন সঠিক লিখিত হইবে, সিপাহী ও দেশীয় বিদ্বেষী 'অবাধ্য'দের মধ্যে কাহার অমানুষিকতা ও অত্যাচার অধিক, ইতিহাস পাঠকের পক্ষে নির্ণয় করা সহজ হইবে না। একথা ঠিক ইতিহাস পাঠক সিপাহী যুদ্ধ বিস্তারের জন্য 'অবাধ্য'কে অল্প দায়ী করিবেন না।"

সিপাহী-যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ডাঃ সূর্য্য-কুমার একথা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে লর্ড ক্যানিং যে সকল কথা তখন লিখিয়া পাঠান তাহা সূর্য্যকুমারের অভিমতের সমর্থক। ইহা

"সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা" প্রসঙ্গে পূর্বে এক সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী'তে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এলাহাবাদের অধিবাসীরা এই সময়ে মহা আতঙ্কে দিন যাপন করিয়াছে। বৃক্ষলম্বিত দেশীয়দের মৃতদেহ যত্র তত্র। কোম্পানীর শিবিরের সন্নিকটে কেহ যাইলেই তৎক্ষণাৎ গুলির আঘাতে তাহার মৃত্যু অনিবার্য। আপনাপন ঘর-দ্বার হইতেও অন্য কোথাও পালাইবার উপায় নাই—পালাইবার চেষ্টা করিলে গুলী তাহার বক্ষ ভেদ করিবে। বহু নির্দোষকে সিপাহীদের কৃতকার্যের প্রায়শ্চিত্ত এই ভাবে করিতে হইয়াছে। সূক্ষ্ম বিচার তখন করে কে? দোষীর সঙ্গে অনেক প্রকৃত নির্দোষও সুতরাং ভীষণ শাস্তি ভোগ করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি।

ডাঃ সূর্য্যকুমার তাঁহার দিনলিপিতে লিখিয়াছেন—"সিপাহীর অত্যাচারের কারণে ক্ষিপ্তবৎ আচরণ কোম্পানী পক্ষে যাহা অনুসৃত হয়, অনেক স্থলে তাহা বর্ব্বরতায় সিপাহীর অত্যাচারও ছাপাইয়া যায়। ইহার জন্য দায়ী শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ন্ কর্ম্মচারী অনেকাংশে এবং শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী প্রায় সকলেই।"

সূর্য্যকুমারের এই মত পরে সমর্থিত হইয়াছে বিদেশীয় ঐতিহাসিক এবং 'ক্যালকাটা রিভিউ' প্রভৃতি নিরপেক্ষ পত্রিকাদি কর্ত্তৃক। লর্ড ক্যানিংও প্রকারান্তরে এই মতই মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে সেই সময়ে জানান।

কাণপুরের সিপাহী-বিদ্রোহ : কাণপুর উদ্ধার :

এলাহাবাদবাসীর আতঙ্কের ফল হাতে হাতেই কোম্পানী পায়। কাণপুরের অবস্থা তখন সঙ্গেমিরে—সিপাহী তথায় দারুণ প্রবল। সৈন্য সাহায্যের জন্য অনুরোধ কাণপুর হইতে এলাহাবাদে মুহুর্মুহুঃ আসিতেছিল। এলাহাবাদ নিরাপদ হইলেও কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য প্রেরণ করা কিন্তু বিশেষ কঠিন হইল। যান, বাহন, আহার্য্য দ্রব্য মেলে না, কারণ দেশীয়ের কেহই কোম্পানীর কাছে ঘেঁসে না, প্রাণভয়ে। এ সকল সংগ্রহ পর্য্যাপ্ত ভাবে না করিয়া সৈন্য পাঠান তো যায় না। কাণপুরে যে সাহায্য আশু প্রয়োজনীয় তাহার বিন্দু-মাত্র, দিনের পর দিন গত হইল, কিন্তু মিলিল না। এই অবস্থায় এলাহাবাদের সেনা-শিবিরে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইল। শ্বেত-সৈন্যের অমিতাচার ও অমিতাহার ইহার কারণ বলিয়া উল্লিখিত—ইয়োরোপীয় সৈন্য একে দু'য়ে-দশে মরিতে লাগিল। কাণপুরকে এলাহাবাদের সাহায্য করা তখন চিন্তাতীত। কলেরার কোপ নিবৃত্ত হইতে যথেষ্ট সময় লাগে। ইতিমধ্যে দেশীয়ের প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করিতে কোম্পানী যৎপরোনাস্তি করে। তাহাতে সুফলও ফলে। ৩০শে জুন আটশত মেজর রেণডে কাণপুর অভিমুখে যাত্রা করে।

এই সময়ে মাদ্রাজের স্যর প্যাট্রিক গ্রাণ্ট কলিকাতার প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হ'ন, এবং বোম্বায়ের কর্ণেল হ্যাভলক কলিকাতা হইতে চারিদল পদাতিক, একদল অশ্বারোহী ও একদল গোলন্দাজ লইয়া এলাহাবাদ যাত্রা করেন। এলাহাবাদে তিনি পৌঁছান ৩০শে জুন। ইহার তিন দিনের মধ্যেই কাণপুর সিপাহীদিগের হস্তগত হওয়ার সংবাদ এলাহাবাদে পেঁছায়। ৭ই জুলাই হ্যাভ্লক্ সসৈন্যে এলাহাবাদ হইতে কাণপুরে যাত্রা করেন। ১১ই জুলাই হ্যাভ্লকের সৈন্যদল রেণডের সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হয় ফতেপুরে। ফতেপুর তখন ইংরাজের হস্তচ্যুত ছিল। সিপাহী পক্ষে কাণপুর হইতে আগত জোয়ালা প্রসাদের সৈন্যদল ফতেপুরের সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া কোম্পানী-সৈন্যের অগ্রসরে বাধা দিল বিপুল বিক্রমে। শেষে কিন্তু সিপাহীদল ছত্রভঙ্গ ও পরাস্ত হইল। ফতেপুর পাঁচ সপ্তাহ সিপাহীর হস্তগত থাকিয়া আবার কোম্পানীর হস্তগত হইল।

ফতেপুর পুনরাধিকারে আনিয়া হ্যাভ্লক্ ও রেণডে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কাণপুর হইতে বাইশ মাইল দূরে আঙ্গ পল্লীতে আর এক সিপাহী সেনাপতি বালরাও হ্যাভ্লকের প্রতিরোধে প্রস্তুত ছিল। হ্যাভ্লকের আগমনে ১৫ই জুলাই দুই ঘণ্টাকাল ঘোর যুদ্ধের পর সিপাহীদল সে-স্থানেও পরাজিত হয়; বালরাও আহত হইয়া কাণপুরে পলায়ন করে। কাণপুরের চারি মাইল দক্ষিণে অহর্বা পল্লীতে নানা সাহেব ১৬ই জুলাই কোম্পানী সৈন্যের প্রতিরোধে যাত্রা করেন। সেই দিনই সেই স্থানে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। নানা সাহেব ও তাঁহার সৈন্য বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেও অবশেষে তাহারা পরাজিত হন—নানা সাহেব বিঠুরে পলায়ন করেন এবং তথা হইতে

রাত্রিকালে অন্ধকারের সুযোগে অন্যত্র পলায়ন করেন। ১৭ই জুলাই হ্যাভ্‌লক্ কাণপুর অধিকার করেন, কিন্তু কাণপুরে পূর্ব্বে অবস্থিত সামরিক, অসামরিক কোনও শ্বেতাঙ্গ বা তাঁহাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কাহাকেও জীবিত দেখিতে পান নাই। কাণপুর অধিকৃত হইল। অধিকার করিয়া হ্যাভ্‌লক দেখিলেন, স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকানির্ব্বিশেষে তাঁহার সেই স্বদেশীয়েরা পৈশাচিক ভাবে সিপাহী কর্ত্তৃক নিহত ও নিশ্চিহ্নীকৃত।

এই পৈশাচিক কাহিনীর বিবরণ ডাঃ সূর্য্যকুমারের ডায়েরীতে যাহা পাওয়া যায়, সংক্ষিপ্তভাবে তাহা এই :

"মিরাট ও দিল্লীর ব্যাপারে এবং অন্যান্য স্থানেও সিপাহীর ঘোর ঔদ্ধত্যে কাণপুরের সিপাহীদিগকে খুবই আন্দোলিত করে। কর্ত্তৃপক্ষের উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না। সিপাহীদিগের সময়ে ধীরতা এবং সময়ে আবার ঘোরতর চাঞ্চল্যের দৃষ্টান্তে কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি স্তর হিউ হুইলার একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া না পড়িলেও কর্ত্তব্য-পালনে তাঁহাকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। মিরাটে তখন মাত্র ৩০০ শত ইয়োরোপীয় সৈনিক ছিল। অপর পক্ষে সিপাহীর সংখ্যা তিন হাজারেরও অধিক। তাহার উপর দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে অনেকের মুখে কোম্পানীর পক্ষে অনিষ্টকর গল্পগুজবে সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করায় ভয়ও কম ছিল না। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া সিপাহীদিগকে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভবপর নহে। সার হিউ তৎপরিবর্ত্তে মহিলা ও শিশু প্রভৃতির বিপদ্‌কালে রক্ষার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে যত্নবান্ হ'ন এবং লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ হইতে উপযুক্ত সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট হন। শেষোক্ত কার্য্য বিফল হয়, কিন্তু 'রক্ষা-দুর্গ' স্থাপনের কার্য্য চলিতে থাকে।

"জাতি ও ধর্ম্মনাশ করে কোম্পানীর নূতন টোটা তৈয়ারী করার রটনা তো সিপাহীকে ক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াই ছিল। এই সময়ে চালানী আটা কাণপুরে যাহা পৌঁছাইল সিপাহীরা দেখিল, তাহা তাহারা যে আটা ব্যবহার করে তাঁহাপেক্ষা অনেক ময়লা। আটার গন্ধও কেমন এক রকমের—গা-ঘিন্‌-ঘিন্ করায়। বাস্তবিক পক্ষে অসাধু ব্যবসায়ী পুরাতন পচা আটাই চালান দিয়াছিল। গুজব উঠিল কিন্তু, জাতিনাশের অভিসন্ধিতে কোম্পানী আটাতেও চর্ব্বি মিশাইয়াছে—সিপাহীর অসন্তোষ সমধিক বৃদ্ধি পাইল। সেই সময়ে তাহারা দেখিল, তাহারা বিশ্বস্ত থাকা সত্ত্বেও কোম্পানী তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতেছে না। 'রক্ষা-দুর্গ' তৈয়ারী করাইতেছে, নূতন গোরা সৈন্য আনাইবার আয়োজন করিতেছে। তোষাখানা ও কেল্লা তাহাদের পাহারায় রাখিতে কোম্পানী ইচ্ছুক নহে। এই সকল কারণে কোম্পানীর বিপক্ষে তাহাদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। সিপাহীর মনে হইল তাঁহাদের ফাঁদে ফেলিতেই কোম্পানীর এই আশু আয়োজন। তাহাদের হালচালে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল। সার হিউ চিন্তায় অভিভূত হইলেন।

"সিপাহীর এই বাহ্যিক লক্ষণে কাণপুরের কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিল রস্‌ডন্ বিঠুরের ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবকে ধনাগার রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। নানা সাহেব পিতৃ অধিকারে এ পর্য্যন্ত কোম্পানী কর্ত্তৃক অনেক বিষয়ে বঞ্চিত হইলেও বাহ্যতঃ কোম্পানীর বন্ধু বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন। নানা সাহেব সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন এবং নিজ সৈন্য লইয়া স্বয়ং ধনাগার রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। কোম্পানী ও সিপাহীরা সংঘর্ষের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নানা সাহেবের মন্ত্রণাদাতা আজিমুল্লা ও তাঁতিয়া টোপী মহারাষ্ট্র পেশ্‌ওয়াকে কোম্পানীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সিপাহীদিগের পক্ষাবলম্বন করিবার কুমন্ত্রণা দিয়া আসিতেছিল এখনও দিতে লাগিল।

"আজিমুল্লা এবং নানা সাহেবের আর এক সহচর জোয়ালাপ্রসাদ সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিতেও ছাড়িল না। ইহাদের ষড়্‌যন্ত্রে অসন্তুষ্ট সিপাহীদের কয়েকজন নেতার নানা সাহেবের সহিতও গোপনে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। ইহার ফলে ধনাগার ও অস্ত্রাগার সিপাহীরা হস্তগত করিল। রণভেরী বাজিয়া উঠিল ৬ঠা জুন, কাণপুরে হুলুস্থুল বাধিয়া গেল। 'রক্ষাদুর্গে' অসহায় নারী ও শিশুদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে প্রায় ৫০০ সামরিক ও অসামরিক ইয়োরোপীয় দণ্ডায়মান হইল। মুষ্টিমেয় রক্ষক সাহসিকতা ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইল—অবরুদ্ধ হইয়াও দিনের পর দিন দিবারাত্র সিপাহীদিগের আক্রমণ ব্যাহত করিতে লাগিল। অস্ত্রাগার সিপাহীদিগের হস্তগত হওয়াতে

তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র, বারুদ গোলা প্রভৃতির কোন অভাব ছিল না। অপরপক্ষে অবরুদ্ধদের এ সকল নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল—হতাহতের সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। আহার্য্য, পানীয়, ঔষধের একান্ত অভাব ঘটিল। খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে শিশুর প্রাণ রক্ষা করা দায় হইল। সে অবস্থাতেও অবরুদ্ধ দল স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বিশেষে অদম্য উৎসাহে সিপাহীর বিরুদ্ধে 'দুর্গ' রক্ষা করিতে লাগিল। স্ত্রীলোক ও শিশু আক্রমণের আরম্ভে ছিল পাঁচ শতের উপর। সিপাহীর গোলা ও গুলিতে এবং রোগে অনেকের ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছিল। সামরিক ও অসামরিক পুরুষের মধ্যেও হতাহতের সংখ্যা অল্প হয় নাই। মৃতদিগকে 'দুর্গ' প্রাঙ্গনস্থ কূপে সমাহিত করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। তিন সপ্তাহে ২৫০ মৃত সমাহিত হয়।

"এই সময়ে (২৫শে জুন) নানা সাহেব প্রস্তাব করিয়া পাঠান—সেনাপতি সার হিউ সসৈন্যে যদি আত্মসমর্পণ করেন তাহা হইলে নিরাপদে তাহাদিগকে এলাহবাদে পাঠাইবার ব্যবস্থা তিনি করিবেন। সার হিউ প্রথমে সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই কিন্তু অপর সকলে অনুরোধ করায় তিনি তাহা করিতে সম্মত হন। ২৭শে জুন দুর্গত্যাগ করিয়া দুর্গের স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু সর্ব্বসমেত ৪৫০ জন গঙ্গা তীরাভিমুখে পদব্রজে (সিপাহীর তত্ত্বাবধানে) যাত্রা করেন। তথা হইতে নৌকারোহণে তাঁহারা কাণপুর ত্যাগ করিবেন। গঙ্গায় ৪০ খানি নৌকাও প্রস্তুত ছিল। সকলে নৌকায় উঠিলে আরোহীরা তাঁতিয়া টোপীর আদেশে গুলি বর্ষণে সহসা আক্রমিত হয়। এই পৈশাচিক কপটাচরণে অধিকাংশ হত হয়। পলায়নপর হইয়াও রক্ষা প্রায় কেহই পায় নাই। বৃদ্ধ সেনাপতি তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা সকলকেই হত্যা করা হয়। কাপ্তেন টম্‌সন্ এবং আর তিনজন কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়া মোরারমৌর বৃদ্ধ ভূস্বামী রাজা দিগ্বিজয় সিং-এর আশ্রয় লাভ করেন। প্রায় দুইশত জীবিত ছিল। তাহাদের মধ্যে চারিজন ব্যতীত সকলেই স্ত্রীলোক ও শিশু। ইহাদিগকে বন্দী করিয়া নানাসাহেবের অনুচরেরা প্রথমে 'সবেদা' কুঠিতে এবং তাহার পরে 'বিবিঘরে' অবরুদ্ধ রাখে। নানা সাহেব কাণপুর যুদ্ধে যাইবার প্রাক্কালে তাহাদিগের সকলকে হত্যা করিয়া নিকটস্থ এক কূপে তাহাদিগের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হয়। হ্যাভ্‌লক্ কাণপুর জয়ী হইয়া দেখেন 'বিবিঘর' রক্ত-স্রোতে তখনও প্রবাহিত। এ নির্মম দৃশ্যে বীরবর ক্রোধে ও দুঃখে আত্মহারা হইয়া পড়েন। সেনাপতির সৈনিকেরা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তাহাদিগকে এ কার্য্যে সবিশেষ বাধা দিতে হ্যাভ্‌লক্ পারেন নাই। হত্যার পরিবর্ত্তে হত্যা হয় তাহাদের পণ—দোষী নির্দ্দোষী নির্ব্বিচারে।

"১৮ই জুলাই কাণপুরে কোম্পানীর আধিপত্যের পুনঃ স্থাপনার ইস্তাহার জারি হয়। জেনারেল নীল এলাহাবাদ হইতে আসিয়া ২০শে জুলাই কাণপুরে পৌঁছান। নীল প্রতিহিংসা বশে অপরাধীদিগের কাহাকেও কাহাকেও দিয়া (উচ্চজাতির হইলেও) 'বিবিঘরে'র রক্ত জিহ্বাদ্বারা পরিষ্কৃত করান। তাহার পরে তাহাদিগের ফাঁসি হয়।"

এ সম্পর্কে ডাঃ সূর্য্যকুমারের শেষ কথা :

"প্রতিহিংসায় পাপীর পাপক্ষয়ই হয়। কাণপুরের সিপাহীদের পৈশাচিক কাণ্ডের মার্জ্জনা ভগবানের কাছে পাওয়া কঠিন। স্বদেশীয়ের এই ঘোরতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে স্বদেশীয়েরাই, শ্বেত সৈনিকের প্রতিহিংসানলে পুড়িয়া। পাপীর তাহাতেও কি মার্জ্জনা নাই ?

"শ্বেত সৈনিকের এই প্রতিহিংসা ভাব স্বাভাবিক হইলেও তাহা দেশে শান্তির আশা যে সুদূরপরাহত করিয়া দেয়, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক সম্ভবতঃ একবাক্যে বলিবেন।"



বিজ্ঞান জগৎ

দুষ্প্রাপ্য গ্যাসের ব্যবহার

—শ্রীদেবেশচন্দ্র রায়

আরগন, ক্রিপটন, নিয়ন, ইত্যাদি গ্যাসকে সাধারণ ভাবে দুষ্প্রাপ্য গ্যাস বলা হয়, কিন্তু এই গ্যাসগুলির প্রয়োগ এত বহুতর ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহাদিগকে দুর্মূল্য বলিলেও দুষ্প্রাপ্য বলার এখন কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বাজারে যে গ্যাসপূর্ণ বৈদ্যুতিক বাতি পাওয়া যায়, উহার মধ্য হইতে বায়ু নিষ্কাশন করিয়া আরগন গ্যাস লঘু চাপে পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিমান-ঘাঁটীর আকাশ-বাতি কিম্বা বিজ্ঞাপনের জন্য নিয়ন-আলোর (নিয়ন লাইন) ব্যবহারের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সম্প্রতি নিয়ন গ্যাসের এক অভিনব ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। শীতপ্রধান দেশে, সারা শীতকাল এবং বসন্তেরও কিছু সময় রৌদ্রের অভাবে গাছ বাড়িতে পারে না, কাজেই ফল, ফুল হইতে দেরী হয়। পরীক্ষায় না কি দেখা গিয়াছে যে, এই সময় মৃদু নিয়ন-আলোর প্রয়োগ গাছের বৃদ্ধিতে প্রচুর সাহায্য করে। ষ্ট্রবেরী, বিট, তরমুজ, গোলাপ, পদ্ম, বেগোনিয়া, প্রিমরোজ ইত্যাদি ফল ও ফুলের উপর এই আলোকপ্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এমন কি বীজের উপর প্রয়োগ করিয়া না কি দেখা গিয়াছে ইহা খুব শীঘ্র অঙ্কুরোদ্গম করে।

হল্যাণ্ড আজকাল শীতকালে ষ্ট্রবেরী, রাস্‌পবেরী ইত্যাদির জন্য অপেক্ষাকৃত গরম দেশের আমদানীর উপর নির্ভর করিতেছে না। নিয়ন-আলোর সাহায্যে চাষ করিয়া ফেব্রুয়ারীর তুষারেই তাহারা পাকা ফল ঘরে তুলিতেছে। এ বিষয়ে বর্ত্তমানে ইংল্যাণ্ডও হল্যাণ্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে। এই সম্পর্কে প্রথম গবেষণা করেন ডক্টর রোডেবুর্গ হল্যাণ্ডের হ্বেগোনিংগেন কৃষিবিদ্যালয়ে। বৈজ্ঞানিকদের মতে নিয়ন-আলোতে লোহিত এবং উন-লোহিত রশ্মির প্রাধান্য; এই রশ্মির প্রভাবেই গাছের অঙ্গার সংগ্রহের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু ইহাতেও লোকে সন্তুষ্ট নয়। ব্যবসায়ীরা চান্ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের পণ্য বাজারে বাহির করিতে, অথচ কৃষিজাত পণ্যের মরসুমের জন্য অল্প-বিস্তর প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। তা ছাড়া কৃত্রিম উপায়ে ফল না হয় অকালে জন্মিল—জন্মানোর পর পাকিতেও ইহার কিছু সময় দরকার। তাই ডাঁসা ফল পাকাইয়া প্রকৃতির উপর টেক্কা দিবার চেষ্টা চলিতেছে। ফল পাকাইবার চেষ্টায় ইথিলিন নামক গ্যাসের ব্যবহার ইদানীং অষ্ট্রেলিয়ায় আরম্ভ হইয়াছে।

পরীক্ষা করিয়া না কি দেখা গিয়াছে, কলা, নাসপাতি, আপেল ইত্যাদি ফল সামান্য ইথিলিন্ মিশ্রিত বায়ুতে বন্ধ করিয়া রাখিলে খুব শীঘ্র পাকে, রঙ খুব সুন্দর হয় এবং বেশ সুস্বাদু হয়। আঙ্গুর কিম্বা কমলালেবুর উপর ইথিলিন্ প্রয়োগের ফল সন্তোষজনক হয় নাই। ইথিলিনের এই অভিনব গুণ আবিষ্কারের ক্রমবিকাশ আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বে ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁবুর ভিতর ষ্টোভের উত্তাপে ফল পাকান হইত। কিছুকাল পর দেখা গেল, ঐ সব ফল পাকিবার কারণ ষ্টোভের উত্তাপ নয়, ষ্টোভ-নিঃসৃত কোন অদৃশ্য গ্যাস। পুরাতন ফোর্ডগাড়ীর 'এগজষ্ট' হইতে যে-গ্যাস বাহির হয়, উহার প্রয়োগেও একই ফল হয়। তখনই ধরা পড়িল, ষ্টোভ-নিঃসৃত গ্যাস ইথিলিন ব্যতীত কিছু নয়।

অষ্ট্রেলিয়ায় আজকাল কাঁচাকলার গুদামে কিছু ইথিলিন গ্যাস ছাড়িয়া বন্ধ অবস্থায় দুই দিন রাখা হয়। অতঃপর

চার দিন মুক্ত বাতাসে রাখিয়া বাজারে ছাড়া হয়। লেবুর চালানেও রেলের কল-গুদামে ইথিলিন ছাড়িয়া দেয়। অ্যাসিটিলিন গ্যাসেও (কারবাইডে জল দিলে যে গ্যাস বাহির হয়) টম্যাটো, কমলা, পিচ, কুল ইত্যাদি ফল খুব শীঘ্র পাকে। উপরোক্ত প্রক্রিয়ার খরচও বেশী নয় বলিয়া প্রকাশ।



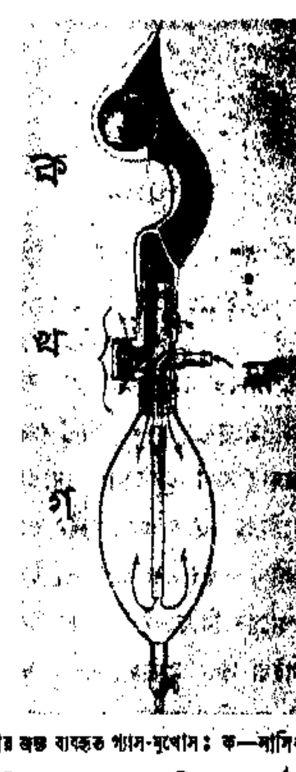
ডাকঘরের ছাদ হইতে অটোজিরো আকাশে উঠিতেছে।

রোগ-নিরাময়ে গ্যাস-মুখোস

বিষাক্ত গ্যাসের প্রতিষেধক হিসাবেই গ্যাস-মুখোস এতকাল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি আমেরিকায় একপ্রকার গ্যাস-মুখোস উদ্ভাবিত হইয়াছে, যাহা রোগীর মুমূর্ষু অবস্থায় জীবনদানে—এমন কি রোগ আরোগ্যের জন্তও ভবিষ্যতেও কার্য্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। অক্সিজেন প্রয়োগে রোগী অনেকটা স্বস্তি লাভ করে এবং রোগের সহিত লড়াই করিবার শক্তি এবং সময় পায়। এই নূতন মুখোসের সাহায্যে অক্সিজেন প্রয়োগের ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি উপরি সুবিধাও আছে।

এই মুখোস ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। যেমন কঠিন অস্ত্রোপচারের পর, আঘাত কিম্বা বৈদ্যুতিক 'শক্' খাইয়া মরণাপন্ন রোগীর উপর এই মুখোস সাহায্যে অক্সিজেন প্রয়োগ করিয়া সন্তোষজনক উন্নতি দেখা গিয়াছে। মস্তিষ্কের টিউমার ইত্যাদি রোগ নির্ণয়ের জন্ত মাথার ভিতর বাতাস পূরিয়া দেওয়া হয়, ফলে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হয়। এই মুখোস সাহায্যে অক্সিজেন দেওয়ায় তখন যন্ত্রণার উপশম হয়। বিমান-চালকেরা যখন উপরে উঠে, তখন অক্সিজেন অভাবে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে। এই মুখোস পরা থাকিলে তজ্জাতীয় বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। ধনুষ্টঙ্কার, গ্যাস-গ্যাংগ্রিন ইত্যাদি রোগে এই মুখোস সাহায্যে অক্সিজেন প্রয়োগ করিয়া আরোগ্যলাভের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

উদ্ভাবকেরা বলেন, এই মুখোস অত্যল্পকালের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়ার কারণ, প্রধানতঃ খরচ অত্যন্ত কম এবং ব্যবহারবিধি অত্যন্ত সহজ। বাড়ীতে, হাসপাতালে অথবা অন্তত্র যেখানেই হউক ব্যবহারে কোন অসুবিধা নাই। প্রচলিত নিয়মে অক্সিজেন সিলিণ্ডার হইতে অক্সিজেন ব্যবহারের অর্দ্ধেক খরচে ইহা চলে বলিয়া প্রকাশ।



রোগীর জন্ত ব্যবহৃত গ্যাস-মুখোস: ক—নাসিকার আবরণী; খ—সংযোগস্থল ও নিয়ন্ত্রক; গ—নিশ্বাস ত্যাগের থলি; ঘ—গ্যাসের প্রবেশ-পথ।

বায়ু-সংক্ষেপের এই মুখোসের সাহায্যে হাঁপানী রোগীকে হিলিয়াম গ্যাস প্রয়োগ করাও চলিবে। হিলিয়াম গ্যাস অত্যন্ত মহার্ঘ বলিয়া উহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল।

এই উদ্ভাবনের ফলে হিলিয়াম-চিকিৎসা জনপ্রিয় হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

শব্দের সীমানির্দ্দেশ

সবদেশেই মোটর-চালকগণ অকারণে তীব্র মর্ম্মভেদী শিঙা বাজাইয়া নিরীহ পদাতিকের শান্তিহরণ করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা সবদেশেই গভীরভাবে অনুভূত হইতেছিল। কম কোলাহলে লোকের মনঃসংযোগ, কর্ম্মক্ষমতা বাড়ে ও স্নায়ু শান্ত থাকে এবং শব্দপড়ুতা বধিরের সংখ্যা কমিয়া যায়—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা লইয়া বিলাতেও অনেক লেখালেখি হয়। ইংলণ্ডের সরকারী যান-বাহন বিভাগ ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল



রোগীর জন্য উদ্ভাবিত গ্যাস-মুখোসের বহির্দৃশ্য।

ল্যাবরেটরীর শব্দবিভাগের সহযোগিতায় কতকগুলি পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছে যে, ১০০ 'ফোন' শব্দশক্তি পর্য্যন্ত শিঙা মোটরে ব্যবহার করা চলিবে। তদতিরিক্ত চলিবে না। গত ১লা অক্টোবর হইতে এই আইন কার্য্যকরী হইয়াছে। শব্দের এই সীমানির্দ্দেশ এবং মাপকাঠী উভয়ই খুব নূতন। যানবাহন বিভাগের নির্দ্দেশেই ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী ইহা লইয়া তথ্য সংগ্রহ আরম্ভ করেন এবং অনেক গবেষণার পর সুপারিশ করেন—২০ ফিট দূরে একটি শিঙার আওয়াজ ১০০ ফোনের অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়। দু'একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ফোন্ অর্থাৎ শব্দের এই মাপকাঠী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করা যাউক। একটি বিমান-ইঞ্জিনের আওয়াজ ১১০-১২০ ফোন্—মানুষ যখন খুব চীৎকার করিয়া কথা বলে, তখন আওয়াজ ৬০ হইতে ৭৫ ফোন্ অবধি হয়। উক্ত গবেষণাগারে আরও গবেষণা চলিতেছে, কি করিয়া মোটর-সাইকেল, ট্রাম, টিউব রেল ইত্যাদির ঘর-ঘর শব্দ কমান যায়।

রেডিও টাইপরাইটার

টেলিগ্রাফ টাইপরাইটারের কথা আমরা জানি—প্রেরিত বার্ত্তা গন্তব্যস্থলে আপনা হইতেই টাইপ হইয়া যায়। সম্প্রতি খুব সরল একটি রেডিও কিম্বা বেতার টাইপরাইটার উদ্ভাবিত হইয়াছে। যে কোন একজন সাধারণ টাইপ-জানা লোকই ইহার সাহায্যে বহুদূরস্থিত স্থানে নিমেষমধ্যে টাইপ-করা সংবাদ প্রেরণ করিতে পারে। ইহা চালাইতে যন্ত্রপাতির জ্ঞান প্রয়োজন হয় না। প্রেরক একটি সাধারণ টাইপ-যন্ত্রে টাইপ করিয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে উহা সুদূরস্থিত গ্রাহকযন্ত্রের সহিত সংলগ্ন কাগজের উপর টাইপ হইয়া যায়।

কোন বিশেষ অক্ষরের চাবিতে চাপ পড়িলে বৈদ্যুতিক সংযোগের ফলে একটী বেতার-তরঙ্গ সৃষ্টি হইয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। গ্রাহকযন্ত্রে ক্ষীণ তরঙ্গটী ধরিয়া লইতে হয়—তখনই আর একটী বৈদ্যুতিক সংযোগ হয় এবং এই তরঙ্গটী একটী পরিবর্দ্ধকের (এমপ্লিফায়ার) সাহায্যে বর্দ্ধিত হইয়া একটী চুম্বক আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের দরুণ প্রেরিত সেই বিশেষ অক্ষরটি ঘূর্ণ্যমান কাগজের রীলের উপরে ক্ষণিক চাপ দেয়—ইহাতেই অক্ষরটি টাইপ হইয়া যায়। এই যন্ত্রে অন্য কোন হাঙ্গামা নাই এবং সাধারণ টাইপ-যন্ত্রের ন্যায় ইহাকে দ্রুত চালান হয়।

খাদ্য

অনেক সময় রোগের এমন সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়, যখন রোগী কোন প্রকার খাদ্যই গ্রহণ করিতে পারে না—যেমন রোগী যদি ক্রমাগত বমি করিতে থাকে, সেই অবস্থায় খাদ্য-গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় আশু প্রতিকার না করিলে পুষ্টির অভাবে মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। প্রাথমিক প্রতিবিধান হিসাবে শিরার ভিতর লবণ-মিশ্রিত জল ইনজেক্‌শন করা হয়, তাহাতে অবস্থার আপাততঃ উন্নতি হয় বটে, কিন্তু খাদ্যাভাবে লোক বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

গ্লুকোজ্ ইন্জেক্শন্ করিয়া কিছুক্ষণ শরীরের তাপের সমতা রক্ষা করা যায়, কিন্তু বিপদ্ এই—দেহের টিসুগুলি ক্রমাগত ক্ষয় পাইতে থাকে—ক্ষয়-পূরণের উপায় কি?

বৈজ্ঞানিকদের মতে আমরা খাদ্যের সঙ্গে যে প্রোটিন (ছানাজাতীয় খাদ্য) গ্রহণ করিয়া থাকি—উহা পরিপক্ক হইয়া অ্যামিনো-অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। এই অ্যামিনো-অ্যাসিডই টিসুর ক্ষয়-পূরণ এবং দেহ-গঠন করিয়া থাকে। কাজেই প্রাথমিক প্রতিবিধানের সময় শিরার ভিতর গ্লুকোজের সহিত অ্যামিনো-অ্যাসিড মিশাইয়া ইনজেকশন করিলে ফল কি হয় দেখা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। প্রথম কুকুরের উপর পরীক্ষা হয়, তার পর মানুষের উপর পরীক্ষার ফলও অতি সন্তোষজনক হয় বলিয়া প্রকাশ। রোগীর শিরার ভিতর অ্যামিনো-অ্যাসিডের অর্থাৎ, পরিপক্ক প্রোটিনের ইনজেক্শন্ দিয়া অনেক দিন বাঁচাইয়া রাখা যায়।

এই চিকিৎসার উদ্যোক্তা আশা করেন, এই সঙ্গে ভিটামিনও দেওয়া সম্ভব হইবে। এইরূপে প্রাণরক্ষা, ক্ষয়-পূরণ এবং দেহগঠনের সমস্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যই শিরা মারফৎ পাইয়া রোগী রোগের সঙ্গে যুঝিতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবে, অন্ততঃ চিকিৎসকগণ এইরূপ আশা পোষণ করিতেছেন।

অটোজিরো

বিমান সাধারণতঃ দূরদেশ হইতে, ডাক, যাত্রী, হালকা মালপত্রাদি বহনের জন্য ব্যবহৃত হয় (ধ্বংসসাধনের জন্য ব্যবহারের উল্লেখ এস্থানে অবান্তর)। বিমানের উঠা-নামার জন্য বিমান-ঘাঁটির সংলগ্ন প্রশস্ত মাঠ থাকে। অটোজিরো কিন্তু অত্যন্ত অল্প-পরিসর স্থানে, এমন কি বাড়ীর ছাদের উপরও উঠা-নামা করিতে পারে। ফিলাডেলফিয়াতে বিমান-ঘাঁটি হইতে ডাকঘর পর্য্যন্ত ডাক আনা নেওয়ার কাজ অটোজিরোর সাহায্যেই চলিতেছে। মোটরে যেখানে পূর্ব্বে ২৫ মিনিট সময় লাগিত, সেস্থলে অটোজিরোয় ৫।৬ মিনিট মাত্র সময় লাগে। সময়ের দিক্ হইতে প্রতিবারে ২০ মিনিট সংক্ষেপ হয়—খরচও খুব বেশী নয়। ইহার সাফল্যে শিকগো, লস এঞ্জেলস্, অটালান্টা, ডেট্রয়েট ইত্যাদি শহরেও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণে আভ্যন্তরীণ ডাক-বহনের জন্য মোটরের পরিবর্ত্তে অটোজিরো ব্যবহারের পরিকল্পনা চলিতেছে। চিত্রে প্রদর্শিত জিরোটিব ওজন প্রায় এক টন, উহা দুই মণ মাল লইয়া ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে ছুটিতে পারে।

মোটর গাড়ীর নূতন কাচ

মোটরের জানালায় যে কাঁচের পাত থাকে তাহা যথেষ্ট মসৃণ না থাকার জন্য চলন্ত গাড়ী হইতে বাহিরের বিকৃত ছবি দেখা যায়। এই বিকৃতির ফলে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয় এবং স্নায়বিক অবসাদ আসে। জনৈক বৈজ্ঞানিক এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছেন যে, কাঁচের পাত পরিবৃত গাড়ীতে তিন ঘণ্টা চলার পর দৃষ্টিশক্তির কার্য্য-

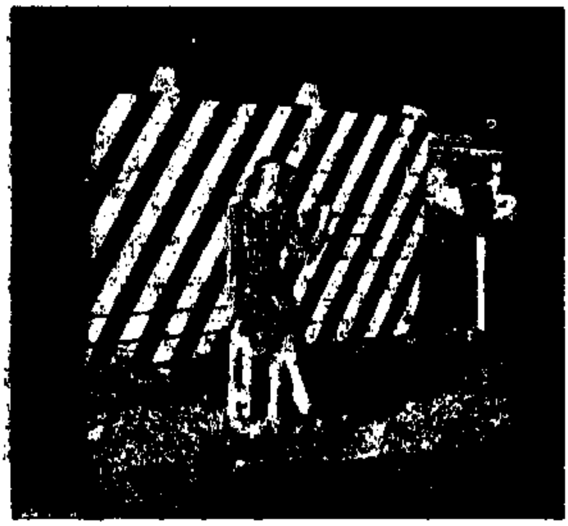


সাধারণ 'নিরাপদ'-কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে এইরূপ বিকৃতি ঘটে।

কারিতা মসৃণ কাঁচের প্লেট-পরিবৃত গাড়ীর তুলনায় শতকরা ৬২ ভাগ ক্ষয় পায়। উক্ত বৈজ্ঞানিকের মতে মোটর-চালনায় চক্ষু ভাল থাকার কথা, কারণ তাহাতে মানুষ আফিস অথবা ফ্যাক্টরীর কাজের পর দূরে তাকাইবার সুযোগ পায়, তখন মসৃণ কাঁচের ভিতর দিয়া দৃষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকা দরকার। কিন্তু তখন ছবির বিকৃতির জন্য যদি চক্ষু মিট মিট করিয়া তাকাইতে হয়, তবে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়। ভবিষ্যতে গাড়ীতে যন্ত্রপাতির আরাম এবং নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া হইতেছে—অধিকন্তু এই নূতন মসৃণ কাচ ব্যবহারের ফলে দুর্ঘটনা হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে, কারণ শতকরা পঁচিশ ভাগ দুর্ঘটনাই দৃষ্টিক্ষীণতার জন্য ঘটিয়া থাকে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এইরূপ অভিমত পোষণ করেন।

উল্কা

রাত্রের অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকাইলে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রচুর উল্কাপিণ্ড তীব্র বেগে পৃথিবীর দিকে আসিতে দেখা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহারা ধাতব পদার্থ। ইহাদের গতি বায়ুমণ্ডলে বাধা পাইয়া উত্তাপ সৃষ্টি হয় এবং এইরূপে উত্তপ্ত হওয়ার জন্যই ইহাদিগকে আলোক বিকিরণ করিতে দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস ছিল, উল্কাসমষ্টি ধূমকেতুর অনুরূপ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এখন তাঁহারা বলিতেছেন যে, এই ধারণা অমূলক।



নূতন 'নিরাপদ' কাচের মধ্য দিয়া এইরূপ স্পষ্ট দেখা যায়।

পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা যায়, একশ্রেণীর উল্কার ঝাঁক বৎসরের বিশেষ সময়ে পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। ইহারা ধূমকেতুরই ভগ্নরূপ—মূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একই কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। পৃথিবী নিজ কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে ইহাদের আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে এবং মাধ্যাকর্ষণের ফলে কক্ষচ্যুত হইয়া ইহাদের কিয়দংশ পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়। পূর্ব্বোক্ত কারণে ইহাদিগকে আগুনের ন্যায় জ্বলিতে দেখা যায়। এই উল্কাশ্রেণী আগষ্ট এবং নভেম্বর মাসে দৃষ্ট হয়। ইহারা প্রস্তরময়।

আমরা যে শ্রেণীর উল্কার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহাদের সহিত, ধূমকেতুর তথা সৌরমণ্ডলের—কোন সংস্রব নাই। উহাদিগকে 'বিক্ষিপ্ত' উল্কা (sporadic meteors বলা চলে। উহাদের গতি পরীক্ষা করিয়া উহারা সৌর মণ্ডলস্থিত কোন দেহ হইতে উৎপন্ন নয়, বৈজ্ঞানিকগ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

এই 'বিক্ষিপ্ত' উল্কা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জ আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জ্যোতির্ব্বিদগ আরিজোনা অভিযানে বাহির হন। সেই অভিযানের বিব বিশদভাবে বলা অবান্তর হইবে। এইটুকু বলিলেই যথে হইবে—সেই অভিযানের ফলেই জানিতে পারা গিয়া যে, সৌরমণ্ডল-জাত যে কোন পদার্থের উর্দ্ধতম সম্ভব গ অপেক্ষা এই উল্কাসমূহের গতি অনেক বেশী।

খুব সাধারণভাবে হিসাব করিয়া দেখা যাইবে যে,—ইহা যেহেতু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ভিতর আসিয়া পড়ে—সেহে ইহা ধরিয়া লওয়া অন্যায় হইবে না যে, উহাদের গতিপ পৃথিবীর খুবই নিকটে। তাহা হইলে ইহাদের গতি সেকেে ২৬ মাইলের অধিক হওয়া সম্ভব নয়, বৈজ্ঞানিকদের হিসা এইরূপ পাওয়া যায়।

আপন কক্ষে পৃথিবীর গতি সেকেণ্ডে ১৮½ মাইল সুতরাং বিপরীত দিক হইতে উহারা পরস্পরের দিকে অগ্রস হইলে আপেক্ষিক গতি প্রতি সেকেণ্ডে ন্যূনাধিক ৪৬ মাই হইবে। একই দিকে চলিতে থাকিলে সেকেণ্ডে ৮ মাই এবং মাধ্যাকর্ষণের টানে বাড়িয়া ১০ মাইল হইতে পারে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই উল্কাসমূহে গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১২৫ মাইল অবধি হইয়া থাকে সুতরাং এইরূপ অনুমান করা যায় যে, ইহারা সৌরমণ্ডলে বহিঃস্থিত আকাশের কোন সুদূর প্রান্ত হইতে আসিয়াছে ইহারা লৌহ-প্রধান পদার্থ। এই শ্রেণীর অসংখ্য উ (দৈনিক প্রায় ১,০০০ কোটী) প্রতিদিন পৃথিবীতে আসি পড়িতেছে, কিন্তু আকারে ইহারা এত ছোট যে, ইহাদে জন্য পৃথিবীর ওজন গড়ে দৈনিক প্রায় দুই মণ মাত্র বাড়ি থাকে।

অনেকে এই বিক্ষিপ্ত উল্কাগুলিকে বিভিন্ন নক্ষত্রের দে হইতে স্খলিত পদার্থ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু এই অনুমা প্রমাণ-সহ নহে। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের এই নূতন তত্ত্ব এখন রহস্যাবৃত।

স্থিতি ও গতি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

৩২

অতীন ও ভিক্টর যে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল, সে সুযোগ সত্যই উপস্থিত হইল। অচিরেই মীনা যারপরনাই বিপন্ন হইয়া পড়িল। অতি মূল্যবান্ বলিয়া যে-অলঙ্কার কয়খানি সম্বল করিয়া সে দাঁড়াইবে ভাবিয়াছিল, দেখিল, ধনীকন্যার অঙ্গশোভারূপে যতই মূল্য বা মর্য্যাদা তাহার থাক, অভাবের সম্বলরূপে আর্থিক মূল্য তাহার কিছুই নাই। নামকরা দুই-চারিজন "জুয়েলার" বা অলঙ্কারওয়ালার দোকানে নিজে গিয়া যাচাই করিয়া দর যা সে পাইল, সে অতি নগণ্য। সে দরে পিতার প্রদত্ত এই অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে কিছুতেই তাহার মন চাহিল না। এ-সব অলঙ্কার এ-জীবনে আর কখনও তাহার ব্যবহারে আসিবে না; যা পাওয়া যায় তাই লাভ; কিন্তু তবু এক-খানিও সে এরূপ মাটীর দরে ছাড়িতে পারিল না। এক এক বার মনে হইত, অসহায় একটি বালিকামাত্র বলিয়া ইহারা তাহাকে ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কি সে করিতে পারে? মূল্য যদি সত্যই কিছু থাকে, সে মূল্য পাইতে হইলে অমুতোষের বা জানকীনাথবাবুর সহায়তা তাহাকে লইতে হয়। কিন্তু সে যে অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া জীবিকাসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে, ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে পারিলে তাঁহারা বাদী হইবেন, তাঁহাদের সাহায্য লইতে তাহাকে বাধ্য করিবেন। কিন্তু প্রাণান্তেও সে তাহা পারে না। এলোকেশীর হাতে সামান্য যে সম্বল আছে, কয়দিন তাহাতে চলিবে? আর তাহা সে লইবেই বা কোন্ মুখে? এক কাজকর্ম্ম, কিন্তু মেয়েদের গান-বাজনা শেখান ছাড়া কি কাজকর্ম্মই বা সে করিতে পারে? সেই কাজই বা কে তাহাকে জুটাইয়া দেয়? এক অমুতোষ; কিন্তু অমুতোষকে এখনই এরূপ কোনও অভিপ্রায়ের কথা সে জানাইতে পারে না। জানাইলেই তাঁহাদের বুঝিতে দেওয়া হইবে, একটা কোনও কাজের আয় ব্যতীত তাহার আর চলিতেছে না।

নিকটেই একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয় ছিল; সংবাদ পাইয়া কর্ত্তার সঙ্গে সে গিয়া একদিন সাক্ষাৎ করিল। কর্ত্তা তাহার সঙ্গীতের কিছু পরীক্ষা লইয়া কহিলেন, "শিক্ষকতা করতে চান, কিন্তু আপনারই এখনও শিখবার অনেক আছে। আধুনিক সঙ্গীতে কিছু দখল আপনার হয়েছে; কিন্তু ধ্রুপদ, খেয়াল, এসব কিছু জানা নেই, সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও কখনও কিছু লাভ হয় নি বোধ হয়। সুতরাং শিক্ষকতার কাজ আপনাকে দিয়ে চলতে পারে না।"

মীনা একেবারে এতটুকু হইয়া গেল; অতি অপ্রতিভ ভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া যখন উঠিয়া নমস্কার করিল, কর্ত্তার যেন কিছু দুঃখ হইল, কহিলেন, "তা দেখুন, আধুনিক সঙ্গীতে যে দখলটুকু আছে সেটা কাজে আমরা লাগাতে বোধ হয় পারি। তবে তার বিনিময়ে আমাদের ওস্তাদের কাছে সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা আপনি নিতে পারেন, বেতন কিছু দেওয়া আপাততঃ সম্ভব হবে না।"

"আজ্ঞে—বেতন কিছু ছাড়া আমার চলবে না। আসি তবে, নমস্কার।"

"নমস্কার। কিন্তু ভবিষ্যতে আপনার সুবিধে হ'ত।"

একটু ভাবিয়া মীনা কহিল, "সম্ভব। দেখি,—যদি বর্ত্তমানের এই অসুবিধেটার ব্যবস্থা কিছু ক'রতে পারি দেখা ক'রব।"

তীব্রদৃষ্টিতে কর্ত্তা চাহিতেছিলেন,—হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আপনাকে বেশ চেনা-চেনা যেন লাগছে। আপনি—"

"হয় ত দেখে থাকবেন কোথাও।" বলিয়াই নমস্কার জানাইয়া তাড়াতাড়ি মীনা বাহির হইয়া আসিল। ভয় হইল পাছে "শকুন্তলা" বলিয়া কর্ত্তা তাহাকে চিনিয়া ফেলেন।

কর্ত্তা তখন তাকে চিনিয়াই ফেলিয়াছেন। চিনিয়া বিশেষ বিস্মিতও হইলেন। কারণ, তাঁহার মনে পড়িল, তিনি শুনিয়াছিলেন এই 'শকুন্তলা' সম্ভ্রান্ত কোনও ধনীর কন্যা।

যতই লজ্জা পাইয়া মনভাঙ্গা হইয়া আসুক, ইহাও মনে মনে মীনা অনুভব করিল, কোনও সূত্রে এরূপ কোনও কাজের সুবিধা সহজে তাহার হইবে না; করিতে হইলে এইরূপ

কোনও বিদ্যালয়েই চেষ্টা করিতে হইবে। পর দিন দৈনিক কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দেখিল: অমুক স্থানে অমুক বিদ্যালয়ে আধুনিক সঙ্গীতে দক্ষ এবং প্রাচ্য নৃত্যকলায় সুপটু একজন শিক্ষয়িত্রী চাই। বিদ্যালয়ের কর্ত্রী মিসেস ঘোষের সঙ্গে অমুক সময়ে সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

আশায় ও আনন্দে মীনার বুকখানি যেন দশ হাত উঁচু হইয়া উঠিল। হাঁ, এইবার সত্যই একটা সুযোগ তাহার উপস্থিত হইল। কর্তৃপক্ষ নারী, নারীর নিকটে সহানুভূতি সে পাইবে, জোর করিয়াও দুইটা কথা বলিতে পারিবে।

সময়মত মীনা গিয়া মিসেস ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। তাহার আবেদনের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মিসেস ঘোষ একটু হাসিলেন; কহিলেন, "হাঁ, জানি, আধুনিক সঙ্গীতে আর ওরিয়েন্টাল নৃত্যে আপনার বেশ দখল আছে।"

"জানেন!"

"আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই মিস মোকার্জ্জি। আপনার 'শকুন্তলা' অনেকবার দেখেছি, আমার ছাত্রীদের নিয়েও ক'বার দেখে এসেছি।"

বেশ একটু অপ্রতিভ হইয়াই মীনা পড়িল।

"ও! তা'হলে—"

"কি জানেন মিস মোকার্জ্জি, ক্ষমতা আপনার যথেষ্ট আছে। তবে আপনি জানেন কি না জানি না—আমাদের এই স্কুলটি গেরস্ত সব ভদ্রলোকের মেয়েদের জন্যেই করা হয়েছে; ঠিক নটীর বৃত্তি এখানে শেখান হয় না। সুতরাং কোনও ফিল্মষ্টারকে শিক্ষয়িত্রীর কাজে আমরা নিতে পারি না।"

"ফিল্মষ্টার! আমি ত ফিল্মষ্টার নই। ভদ্রলোকের মেয়ে, কেবল একটা এমেচার প্লে তে একবার অভিনয় করেছিলাম। একটা চ্যারিটির ফাণ্ড তুলবার উদ্দেশ্যেই সেটার বন্দোবস্ত হয়েছিল।"

"হাঁ, সে প্লেটাও আমরা দেখে এসেছি। খুবই ভাল হয়েছিল। তবে সেটা শেষে ফিল্মে তোলা হয়। ফিল্মটা চলছেও বেশ জোরে। আর ফিল্মষ্টার বলেই বড় একটা নাম আপনার হয়েছে।"

"আমার দুর্ভাগ্য! কিন্তু ওই বৃত্তি আমি গ্রহণ করি নি, ভদ্রঘরের মেয়েই আমি আছি।"

"থাকতে পারেন ভাল কথা, তবে নাম আপনার হয়েছে ফিল্মষ্টার ব'লে। ছাত্রীরা সব দেখেই আপনাকে চিনবে, বাড়ীতে গিয়ে গল্প করবে, স্কুলটিই আমার উঠে যাবে। সে রিস্ক (risk) আমি নিতে পারি না, মিস মুখার্জ্জি।"

"সেটা 'রিস্ক'ই যদি হয়, আমিও বলতে পারি না নিতে। তবে কি না আমার কিছু উপার্জ্জনের দরকার হয়ে পড়েছে। মনে হল এই কাজে উপার্জ্জন কিছু হতে পারে।"

মিসেস ঘোষ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন, "শুনেছিলাম আপনি— আপনি কোনও সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের কন্যা। তা আপনার যোগ্য উপার্জ্জনের দরকারই যদি কিছু হয়, এই প্রফেসনেও ত যথেষ্ট উপার্জ্জন করতে পারেন। আপনার মত আরও কেউ কেউও ত করে থাকেন।"

মীনার মুখখানি একটু লাল হইয়া উঠিল। যাহা হউক, মনের উত্তেজনা একটু চাপিয়াই উত্তর করিল, "করছেন কেউ কেউ জানি। তবে ঐ প্রফেসন (profession)টা নেবার কথা কখনও ভাবি নি। কিছু অভাবে পড়েছি, তাই ভেবেছিলাম শিক্ষয়িত্রীর কাজ যদি কোথাও পাই—"

"তা'হলে নটীর বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয়, এমন কোনও প্রতিষ্ঠানে চেষ্টা করতে পারেন। এখানে সুবিধে হবে না, মাফ করবেন।"

চোখ-মুখ মীনার একেবারে অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই। এ অপমান গায়ে সহিয়াই তাহাকে ফিরিতে হইল। বাহির হইয়া যখন রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল, সমস্ত শরীর থর থর কাঁপিতেছিল, চক্ষুদুটি ভরিয়া উষ্ণ অশ্রুর উচ্ছ্বাস উঠিল, বাসে কি ট্রামে গিয়া উঠিবে সে সামর্থ্যই ছিল না, ট্যাক্সি ভাড়ার সম্বলও হাতে নাই। অগত্যা একটা রিক্সা ডাকিয়া বাড়ীতে ফিরিল; কোনও মতে উপরে উঠিয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

তপ্ত অশ্রু ধারায় উপাধান সিক্ত করিয়া অনেকক্ষণ কেবলই কাঁদিল।

ফিল্মষ্টার! ফিল্মষ্টার! তবে কি তাহাকে ফিল্মষ্টারই হইতে হইবে! সম্ভ্রান্ত গৃহের বাঙ্গালী কন্যাও ফিল্মষ্টার কেহ কেহ আছেন। ইয়োরোপে না কি উচ্চ সামাজিক পদমর্য্যাদাও ইঁহারা ভোগ করেন। সংবাদপত্রের মধ্যে আলোচনাও এ সম্বন্ধে হয়। শিক্ষিত ভদ্রবংশীয় মহিলাদের উচ্চশ্রেণীর

বাসের প্রতীক্ষায়



একটি বৃত্তি ইহা হইতে পারে, হইলে যেমন ফিল্ম ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে, তেমন মহিলারাও তাঁহাদের প্রতিভা-বিকাশের বড় একটি সুযোগ পাইবেন, আর্থিক জীবনেও স্বাধীন ভাবে নিজেরা সুপ্রতিষ্ঠিতা হইতে পারিবেন। কিন্তু ইহাদের ভিতরের যে জীবনটা—সেটা ঠিক কেমন? যে-সংসর্গে সর্ব্বদা ইহাদের থাকিতে হয়, সেই বা কেমন? কিছুই ত সে জানে না। একটি মাত্র নাটকে অভিনয় করিয়াছে, অভিনেতৃবর্গ সকলেই সম্ভ্রান্ত ভদ্র-গৃহের যুবক-যুবতী,—ব্যবহার সকলেরই সুশিষ্ট, সুপরিমার্জ্জিত। মহল্লায় যখনই গিয়া যোগ দিয়াছে, তাহার পিতা সঙ্গে থাকিয়াছেন। কোনও ভয় কি ভাবনা তাহার কিছু ছিল না। আর সে প্লেটাও একেবারে এমেচার বা সখের একটা প্লে। কিন্তু এখন জীবিকার প্রয়োজনে এই বৃত্তিতেই তাহাকে প্রবেশ করিতে হইবে। অন্যান্য অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা যে কোথা হইতে আসিবে, কিছুই স্থির নাই, আর তাহার উপরে কোনও আপত্তিও তাহার থাকিবে না। কোম্পানীর মালিকরা যে ব্যবস্থা করেন, তাতেই তাহাকে বাধ্য থাকিতে হইবে। আর এই যে সব কোম্পানী, তার মালিকরা কি প্রকৃতির লোক? তাঁহাদের ব্যবহারই বা কি রূপ হইবে? অসহায় একটি বালিকা মাত্র সে, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। শেষে কোন্ সূত্রে কোথা হইতে কি বিপদ আসিয়া পড়িবে, কে জানে? তার দরদী বান্ধব এ পৃথিবীতে আছেন এক ঐ জানকীনাথ বাবু আর অমুতোষ, আর আছে ঐ বিন্দু। সে যদি এই বৃত্তি গ্রহণ করে, অনুমোদন ত ইঁহারা করিবেনই না। করিলে ইঁহাদের অজ্ঞাতসারেই করিতে হইবে। কি ইঁহারা বলিবেন? হয়ত সকল সম্বন্ধই তাহার সঙ্গে বর্জ্জন করিবেন। কি উপায় তখন তাহার হইবে? বিন্দু কত ভাল তাহাকে বাসে, কত স্নেহই বা তার শ্বশুর তাহাকে করেন। কিন্তু সেই শ্বশুর তখন তার বাড়ীর ত্রিসীমানাও বিন্দুকে মাড়াইতে দিবেন না। আর বিন্দু নিজেই বা, ধিক্ কি চক্ষে তাহাকে দেখিবে! প্রকাশ্য একজন ফিল্ম-নটী, ঐ বলে, সব ফিল্ম-নটনটীদের নিয়ত সহচারিণী! কিন্তু উপায়ই তাহার আর কি আছে? কাজ যে সে কিছুই আর করিতে পারে না। অতি দীন ভাবেও দিন যাপন সে করিতে পারিত; কিন্তু তাঁর যে সামান্য সম্বল, তাই বা কোথা হইতে আসিবে? যোগ্যতা একটু যেদিকে আছে, তার পথ যে একেবারেই রুদ্ধ। চেষ্টার যে ফল তাহার হইল, তাহার পর একাজের প্রার্থিনী হইয়া কোথাও আর সে যাইতে পারে না। নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান আর অসহনীয় অপমান দুই স্থানে যা পাইয়াছে, তাই মাত্র সে পাইবে। তার অবস্থার বিবেচনায় এতটুকু করুণা কোথাও কি সে আর প্রত্যাশা করিতে পারে? অপমান তাহার আরও বাড়িবে, কালী আরও ছড়াইবে। সর্ব্বত্র লোকে বলাবলি করিবে, 'শকুন্তলা'র সেই অভিনেত্রী—ফিল্ম-নটী সেই মীনা মোকার্জ্জি এখন যৎসামান্য জীবিকার জন্য দ্বারে দ্বারে কাজ ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। কয়দিন বাদে হয় ত আঙ্গুল দিয়া লোকে তাহাকে দেখাইবে, হাসাহাসি করিয়া কত টিটকারীও দিবে! না, উপায়ান্তর কিছুই আর নাই। হয় এই বৃত্তি গ্রহণ না হয় মরণ—ইহার একটিকে তাহাকে বরণ করিয়া এখন লইতেই হইবে! মরণে তাহার কোনও দুঃখ নাই, জীবনে যে পরিণাম তাহার ঘটিল, তার অপেক্ষা মরণ শতগুণে এখন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া নিজের হাতে নিজের জীবনপাত—ভাবিতেও ভয়ে মীনা শিহরিয়া উঠিল!

এলোকেশী আসিয়া তখন আহারে ডাকিল। আহারে রুচি ছিল না; কিন্তু জানিত এলোকেশী ছাড়িবে না, রীতিমত একটা লড়াই তাহার সঙ্গে বাধিয়া যাইবে। অগত্যা উঠিয়া চোখেমুখে একটু জল দিয়া কিছু আহার করিয়া সে আসিল। এলোকেশী তাহার কাজ সারিয়া ঘরে আসিলে কহিল, "তুমি আজ আমার কাছেই শুয়ে থাক এলোকেশী, কেমন যেন ভয় ভয় আমার ক'রছে।"

"ভয়! ষাট! ভয় কিসের গো? সাহেব কবে স্বর্গে চ'লে গেছেন, ছেরাদ্দ-শান্তিও যা হ'ক কিছু হয়েছেক। তবে দাদাসাহেব কিছু কিছু করেক নি—করে কি করবেক তাও জানিনি। তা এক কাজ করো তুমি বরং, গঙ্গায় গিয়ে একটা পিণ্ডে দিয়ে এসো। ওতে ভয়টয় আর কিছু থাকবেক নি।"—

বলিতে বলিতে বিছানায় গিয়া মীনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া শুইল। মীনাও হাত দুটি বাড়াইয়া তাহার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "না, সে ভয় কিছু পাই নি এলোকেশী। আর যদি বাবাকে দেখতে পেতাম, কাছে এলে

আমায় বলতেন, কোলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে একদিন শক্ত ক'রে তাঁকে জড়িয়ে ধরতাম, ছাড়তাম না। কোলে থেকেও নামতাম না।"

"ষাট, ষাট :—ওকথা ব'লতে নেই কো বাছা! তাঁর কোলে এখুনি কেন যাবেক গো। যাবেক—সে সময় হ'ক্ ! আজই ও কথা ক্যানে গো!"

৩৩

পর দিন ভিক্টরের একখানা পত্র আসিল। লিখিয়াছে, ভাল একটি সিনেমা কোম্পানীর সহিত সে সংশ্লিষ্ট আছে, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 'রত্নাবলী' নাটকের ছবি তুলিতে চান এবং সাগরিকার ভূমিকায় তাহাকে তাঁহারা পাইলে বিশেষ সুখী হইবেন। ইহার জন্ম পাঁচ হাজার টাকা তাহাকে দিতে প্রস্তুত আছেন। ভূমিকাটি কিরূপ তাহা বুঝিয়া লইবার জন্ম রত্নাবলী নাটকের একখানি বঙ্গানুবাদও তাঁহাকে পাঠান হইল। যদি তাহার সম্মতি থাকে, খুঁটি-নাটি সব নিয়ম স্থির করিয়া পাকা একটা বন্দোবস্ত কর্তৃপক্ষ গিয়া তাহার সঙ্গে করিবেন। শকুন্তলার ন্যায় এই নাটকখানিকেও নৃত্য-গীত এবং নূতন কয়েকটি দৃশ্যের যোগে আধুনিক ছাঁচে নূতন একটা রূপ দেওয়া হইয়াছে।

পাঁচ হাজার টাকা! আঃ! পাঁচ হাজার টাকা যে আজ তার কাছে পাঁচ লাখ টাকার সমান! একখানি নাটকে এই ভূমিকায় নামিয়া এই টাকা যদি সে পায়, ইহার বলেই একটা স্থান সে করিয়া লইতে পারিবে। ভবিষ্যতের জন্ম আর ভাবিতে হইবে না, এ কাজেও তাহাকে আর নামিতে হইবে না। ফিল্মষ্টার। তা এ নামের গ্লানি ত তাহার হইয়াই রহিয়াছে। আর একখানি নাটকে ক্ষতি আর কি বেশী হইবে? এই সম্বল যদি তাহার হাতে আসে, আর তার পর ইহার সংস্রব যদি সে ছাড়িয়া দেয়, অন্য কোনও কাজকর্ম্মে জীবিকা অর্জ্জন করে, দুই চারি বৎসর পরে এ নামও লোকে হয় ত ভুলিয়া যাইবে। ভদ্রসমাজে আবার একটা মর্য্যাদার স্থান সে পাইবে। তবে আপাততঃ একটা বাধা আসিতে পারে তাহার বর্ত্তমান অভিভাবকদের পক্ষ হইতে। জানিতে পারিলে অতি তীব্র ভাবেই বাদী হইয়া আসিয়া তাঁহারা দাঁড়াইবেন। তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে, কাজটা শেষ হইবার আগে উঁহারা কিছুই না জানিতে পারেন। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এইরূপ একটা সর্ত্ত তাহাকে করিতে হইবে, তাহার নাম তাঁহারা প্রচার না করেন। অন্য একটা নামে এই ভূমিকায় সে নামিবে। পরে ছবি দেখিয়া তাঁহারা চিনিবেন, অন্য অনেকেও চিনিবে। তা তখন যেই চিনুক, কে কি আর করিবে? উঁহারা বড় বিরক্ত হইবেন। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী ব্যবহারে সে যদি তাঁহাদের বুঝাইতে পারে, স্থায়ী ভাবে সে পর্দ্দার কি মঞ্চের নটী-বৃত্তি গ্রহণ করে নাই, সেরূপ অভিপ্রায়ও তাহার ছিল না, তখন নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিবেন। নাই যদি করেন, উপায় কি? আর হয় এই সুযোগে কিছু অর্থ সংগ্রহ তাহাকে করিতে হইবে, না হয় দুটি উদরান্নের জন্ম তাঁহাদেরই দয়ার উপরে নির্ভর করিতে হইবে, যতদিন না ভাই ফিরিয়া একটা ব্যবস্থা তাহার করে। কিন্তু এ দয়ার দান সে গ্রহণ করিতে পারে না। একবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, আবার মাথা হেঁট করিয়া কি বলিয়া কোন্ দাবীতে গিয়া চাহিবে। আর ভাই—সেই বা কি করিবে? রেজিনার কর্তৃত্বকে অতিক্রম করিয়া কিছুই করিবার সামর্থ্য তাহার হইবে না। তাহার পক্ষ হইতে কোনও সাহায্য যদি সম্ভবও হয়, হইবে রেজিনার অনিচ্ছার দুটি ভিক্ষার মত। বরং ইহাঁদের দান সে গ্রহণ করিতে পারে, রেজিনার এ-ভিক্ষা পারে না। না, নিজের উপার্জ্জন ব্যতীত জীবিকার সম্বল কিছুই আর হইতে পারে না, এবং ইহা ব্যতীত পথও আর তাহার কিছু নাই।

নাটকখানি সে পড়িয়া দেখিল। আবার শকুন্তলার মতই প্রেমের অভিনয় কাহারও সঙ্গে তাহাকে করিতে হইবে। ভাল লাগিল না। যে মন লইয়া শকুন্তলার ভূমিকায় রবীনের সঙ্গে সে অভিনয় করিয়াছিল, সে মন তাহার এখন নাই। কিন্তু ইহাও বুঝিল, এইরূপ নায়িকার ব্যতীত আর কোনও ভূমিকায় কেহ তাহাকে চাহিবে না। অভিনয়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইলে, এইরূপ কোনও ভূমিকায়ই অবতীর্ণ তাহাকে হইতে হইবে। উদয়ন! যেমন দুষ্মন্ত, তেমনই উদয়ন! সংস্কৃত নাটকগুলা কি সবই এইরূপ সব নায়ক-নায়িকার প্রেমলীলা লইয়াই রচিত হইয়াছে? আর কোন 'প্লট' (নাট্য-ঘটনা) তাহাতে নাই? কিন্তু এই উদয়ন কে হইবে? রবীন কলিকাতায় আছে। যেমন শকুন্তলার ভূমিকাতে তাহাকে ইহারা জুড়িয়াছে, তেমন যদি

সুমন্তের খ্যাতিতে রবীনকেও ডাকে? না, তাহার সঙ্গে এরূপ এক প্রেমিকার ভূমিকায় প্রাণান্তেও সে অভিনয় করিতে পারিবে না। অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া শেষে ভিক্টরকে একখানি পত্র সে লিখিল। জানাইল, এই ভূমিকা-গ্রহণে সে প্রস্তুত আছে; তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কথাবার্তা সব স্থির করিতে তিনি পারেন।

পত্র পাইয়া ভিক্টর আসিল, সঙ্গে আসিল অতীন্। কেমন একটু চমকিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে মীনা চাহিল। একটু হাসিয়া অতীন্ কহিল, "নমস্কার মিস মোকার্জ্জি। আপনাকে খুব জানি। দেখেছিও অনেক। আমিও একেবারে অপরিচিত নই আপনার। এক দিন দেখা হ'য়েছিল—অবিশ্যি সেদিনকার সেই ঘটনাটা বিশেষ প্রীতিকর নয়, স্মরণ করিয়েও আপনাকে দিতে চাই না, তবে কি না আপনার যেন কেমন একটা চমক লেগেছে আমাকে দেখে, তাই—কিছু মনে ক'রবেন না—আপনারা বোম্বে থাকতে সেই যে মালাবার পাহাড়ে—"

"ও! হাঁ, মনে পড়েছে এখন। বিন্দুদের নিয়ে আপনিই বেড়াতে গিয়েছিলেন?"

"হাঁ, ওঁরা আমার নিকট আত্মীয়। বিন্দুর দিদি আমার ভাজ—আমার এক মামাত ভাই-এর স্ত্রী। ওদের পরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ একটা বন্ধুত্বও আমার আছে। সুতরাং বন্ধু ব'লেই আমাকে মনে ক'রতে পারেন।"

"নমস্কার! আপনিও কি এই কোম্পানীতে আছেন?"

"আজ্ঞে, ঠিক দলভুক্ত যে আছি তা নয়। তবে কাজ-কর্ম্ম চালাতে সাহায্য অনেক করি। টেষ্ট (taste)ও এ দিকে বেশ একটু আছে, আবার কেউ কেউ এঁরা বহুদিনের বন্ধুও বটেন। আপনাকে জানি, আবার ভালপালায় যাহ'ক একটা বন্ধুত্বের যোগসূত্রও রয়েছে, যদিও আপনার অজ্ঞাত সেটা ছিল; তাই আজ আমাকে উনি সঙ্গে নিয়ে এলেন। আর্টিষ্ট (artiste) দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রতে অনেক সময়ই সঙ্গে আমাকে এঁরা নিয়ে যান।"

"হুঁ! তা আপনার সেই বন্ধু—এই বিন্দুর স্বামী রবীন্ বাবু—কলকেতায়ই আছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ, দেখাশুনোও মাঝে মাঝে হয়।"

"উনিও কি এই অভিনয়ে যোগ দিচ্ছেন?"

"আজ্ঞে না। কোনও প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিতই তাঁর কাছে এঁরা হন নি। অবিশ্যি এটা ঠিক, উদয়নের ভূমিকায় তাঁকে পেলে নাটকখানা খাসা উত্‌রে যেত। আপনি সাগরিকা আর রবীন্ উদয়ন—দ্বিতীয় আর একখানি শকুন্তলাই এই ছবিটা হ'ত। তবে কি জানেন, খুলেই আপনাকে বলি, আপনাকে ওঁরা চান। বুঝিয়ে যখন আমি ব'ল্লাম, রবীনের সঙ্গে এক প্লেতে আপনি নামবেন না, আর নায়ক-নায়িকা হ'য়ে, তখন ও! নিরস্ত হ'লেন। ভাল আর একজন আর্টিষ্ট রয়েছেন, তিনিও এমেচার, প্রথম এই প্রফেসনে নামছেন। বেশ শিক্ষিত আর শিষ্টরুচির একজন ভদ্রলোক তিনি। আলাপ ক'রে আপনি খুসী হবেন।

"কি নাম তাঁর?"

"সুধাময় বোস।"

"নাম শুনিনি।"

হাসিয়া অতীন কহিল, "নাম—তা না শুনতেও পারেন। এই ব্যবসায়ের সঙ্গে ত পরিচয় আপনার কিছু নেই। এর সব প্রফেসনাল কি এমেচার আর্টিষ্ট সবাইকে আপনি কি করে জানবেন?"

একটু কি ভাবিয়া মীনা তখন কহিল, "হুঁ—তা'হলে তা'হলে রবীন বাবু এই প্লে'তে আসবেন না?"

"আজ্ঞে না। বললামই ত, এটা বেশ এঁরা বুঝেছেন তাঁকে আনলে আপনাকে পাবেন না। তাই তাঁর কাছে যান নি, যাবেনও না। সুধাময় বাবুর সঙ্গে কন্ট্রাক্টই এঁদের হয়ে গেছে। দলিলটা সঙ্গেই আনা হয়েছে। দেখাও না বের করে ভিক্টর?"

"এই যে।" বলিয়া ভিক্টর পকেট হইতে সুধাময় বসু স্বাক্ষরিত একটা কন্ট্রাক্ট-পত্র বাহির করিয়া মীনাকে দেখাইল। দেখিয়া মীনা কহিল, "বেশ, তাহলে আমি প্রস্তুত আছি। ভেবেছিলাম, নিজেই আমি এই সর্ত্তের কথাটা তুলব। বড় খুসী হলাম, আপনার আগেই আমার আপত্তির কারণটা বুঝে সব ঠিক করেই আমার কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। তবে আর একটা কথা আমার। নিজের নামটা আমি দিতে চাই না।"

ভিক্টর কহিল, "সেটা সবাই দিতে চায় না, কন্ট্রাক্টের ফর্ম্মেও ঐ রকম একটা 'ক্লজ' (clause) থাকে। এই যে

দেখুন এই কণ্ট্রাক্টেও রয়েছে। সুধাময় বাবুও নিজের নাম দিতে চান না, দিয়েছেন সুধাকর। কি নাম আপনি দিতে চান।”

“আমি আর কি বলব? আপনারাই বা হয় একটা নাম ক’রে নিন। আপত্তি আমার কিছুতেই নেই।”

বলিয়া একটা নিশ্বাস মীনা ছাড়িল।

একটু ভাবিয়া ভিক্টর কহিল, “এই ধরুন চন্দ্রা দেবী; খাসা নতুন ধরণের একটা নাম হবে।”

“বেশ, তাই হক্।”

“হাঁ, তা’হ’লে অন্য টার্মসের (terms-এর) কথা হক্। এই দেখুন সুধাময় বাবুকে পাঁচ হাজার টাকা আমরা দিচ্ছি। তিন হাজার কণ্ট্রাক্ট সই-এর সঙ্গে আর দুই হাজার পরে দুই কিস্তিতে সুটিংটা শেষ হবার সঙ্গেই দেওয়া হবে। আপনি প্রস্তুত আছেন এতে?”

“আছি।”

“কণ্ট্রাক্টটা কি আজই তা’হলে সই করবেন? না কারও সঙ্গে পরামর্শ কিছু করবার দরকার আছে?”

“না, পরামর্শ আর কার সঙ্গে কি করব? কেই বা আছে আমার?”

ষ্টাম্প দেওয়া একটা কণ্ট্রাক্টের ফর্ম্ম বাহির করা হইল। যেখানে যাহা লিখিবার লিখিয়া মীনা সহি করিয়া দিল। তিন হাজার টাকার একখানি চেক লিখিয়া ভিক্টর মীনার সম্মুখে রাখিল। ঘনস্পন্দিত বক্ষে থর থর কম্পিত স্বেদাপ্লুত দেহে চেক্ খানি মীনা হাতে তুলিয়া লইল।

“হাঁ, তাহলে উঠি আমরা আজ।”

“আজ্ঞে, আসুন নমস্কার। হাঁ এই সুধাময় বাবু কলকেতায়ই আছেন?”

“আজ্ঞে না। কিছু অসুস্থ ব’লে তিনি এখন বাইরে আছেন। সেই খানেই পার্টটা তিনি অভ্যাস করবেন। বন্দোবস্তও তার সব করা হয়েছে। এখানেও তাঁর একজন সাবষ্টিটিউট (substitute) এর সঙ্গে প্রথম কয়দিন রিহার্সাল আপনাকে দিতে হবে। আমরা অতীনকেই বলেছি। যা হক কিছু জানা-শুনো ত আছে, অসুবিধে আপনার হবে না। আপত্তি বোধ হয় আপনার হবে না?”

একটু হাসিয়া অতীনের দিকে চাহিয়া মীনা কহিল, “আপত্তি আর কি? যে কেউ একজন হলেই হল। একেবারে নতুন লোকের চাইতে উনিই বরং ভাল হবেন। হাঁ, একা আমি যেতে পারব না, আমার চাকরাণী যে এলোকেশী আছে সে যাবে।”

“হাঁ, সেই সর্ব্বদা আপনার সঙ্গে যাবে। কাছেও থাকবে। এটা ত চাই-ই; আপনার মত সব আর্টিষ্টদের সঙ্গে এই রকম একজন ‘স্যাপেরণ’ (chaperon—অভিভাবক) সর্ব্বদাই থাকেন। আর দেখবেন কোনও অসুবিধা আপনার হবে না। ষ্টুডিয়োতে perfect discipline আমরা রেখে চলি। আচ্ছা, আসি তবে নমস্কার।”

“নমস্কার

৩৪

“বটে! এই যে চন্দ্রাদেবী ব’লে একটা নাম দেখি নতুন যে রত্নাবলী ফিল্ম খোলা হ’চ্ছে তার বিজ্ঞাপনে, সে কি সত্যিই আপনি?”

চক্ষু দুটি মুছিয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে মীনা উত্তর করিল, “হাঁ।”

“আর সুধাকর বুঝি রবীন রায়?”

“হাঁ। তা আগে—আগে—ওঁরা বলেছিলেন, সুধাময় বোস্ কে ঐ নামে আস্‌ছে।—তা—এখন—এখন বল্‌ছেন, সুধাময় বোস্ শক্ত কি ব্যামোতে পড়েছে, তাকে মুক্তি দিতে হয়েছে, রবীন রায়কেই ঐ নামে নিতে তাঁরা বাধ্য হ’য়েছেন—ভাল লোক আর পাওয়া গেল না—”

বলিতে বলিতে ফুক্‌রাইয়া মীনা কাঁদিয়া উঠিল। দুই হাতে ঢাকিয়া টেবিলের উপরে মুখখানি রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, “ভুল যা ক’রে ফেলেছি ক্ষমা নেই তার—কৈফিয়ৎও দেবার কিছু আমার নেই। কি ক’রে এই মুখ নিয়ে আবার যে আপনাদের সহায়তা চাইছি, ভাব্‌তেও পারি না। কিন্তু কি ক’রব? আর যে আমার কেউ নেই। বড় বিপদেই প’ড়েছিলাম, একেবারে নিরুপায় হ’য়ে যখন পড়লাম—”

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া অমুতোষ কহিল, “সুধাকরেও যদি বুঝতে তখন কিছু পারতাম—”

“বুঝতে আপনাদের দিই নি। তখনই—তখনই এই প্রস্তাবটা এল—ভাবলাম—ভাবলাম—”

“থাক্। দেখি ওদের এটর্নীর চিঠিটা? আর ঐ কণ্ট্রাক্টের দলিলও ত এক কপি আপনার কাছে আছে?”

"আছে।"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া মীনা এটর্ণীর চিঠি ও কনট্রাক্টের দলিলটা বাহির করিয়া আনিয়া অমুতোষের হাতে দিল।

পড়িয়া অমুতোষ কহিল, "কনট্রাক্টে ত পরিষ্কারই এই সর্ত্ত আছে, আপনার চুক্তি আপনি না রাখলে দশ হাজার টাকা খেসারত দিতে হবে।"

"হাঁ। কিন্তু কথা ওঁরা দিয়েছিলেন, রবীন রায় এই প্লেতে আসবে না। সেই কথা পেয়েই চুক্তিপত্রে আমি সই দিয়েছিলাম।"

"কথা—কেবল মুখের কথাই ছিল। চুক্তিপত্রে লিখিত কোনও সর্ত্ত নেই।"

"না কথাটা মনেও আমার তখন হয় নি। ভদ্রলোক—কথা দিলেন—"

"কি ধাতুর লোক যে এরা, কিছুই ত আপনি জানেন না। এদের মুখের কথার উপরে কেউ কখনও নির্ভর করতে পারে? আর ঐ ভিক্টর আর অতীন এদের বিশেষ ভাবেই জানি। তবে ভিক্টর কিছু বোকা আর হালকা স্বভাবের লোক। আর অতীন হচ্ছে পাকা একজন শয়তান—ধড়িবাজ ওর মত দুটি আর হয় না। এই ব্যাপারে ওদের আসল চক্রীও হচ্ছে ঐ অতীন।"

"হবে। কিন্তু বিন্দুদের নিকট আত্মীয়, ওর দিদি শৈলবতীর দেওর—সর্ব্বদা যাওয়া আসাও ওখানে করে।"

"ক'রতে পারে, তবে আপনার বন্ধু বিন্দুর কাছে খবর নিলেই বোধ হয় জানতে পারবেন, কি চোখে তাঁরা ওকে দেখেন। আমাদের অফিসেও লোকটা যখন তখন এসে আপনাদের খবর নিয়ে যেত। আমাদের একজন কেরাণী আবার ওর সহপাঠী ছিল। তা জানতে পেরে আমি কড়াভাবে নিষেধ ক'রে দিয়েছি একদম ওকে আমল দেওয়া না হয়।"

নীরবে একটি নিশ্বাস মীনা ছাড়িল।

অতীন কহিল, "এই সুধাময় বোসটা কে? নাম কখনও শুনিনি। এমেচার কি প্রফেসনাল এদিকে নাম একটা কিছু থাকলে অবিশ্যি শুনতাম। কারণ, (একটু হাসিয়া) সিনেমা থিয়েটার দিকে বেশ একটু সখ আমার আছে, দেখতেও যাই, খবরা-খবরও রাখি। আমার মনে হয়, এই সুধাময় বোস একটা hoax (ফাঁকি)।"

"কিন্তু তার সই করা চুক্তিও আমাকে দেখিয়ে ছিলেন ওঁরা।"

"জাল চুক্তি! ওটা যে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল আপনাকে দেখাতে, এতেই পরিষ্কার বোঝা যায়, ঐটে দেখিয়ে আপনাকে ভোলাতে ওরা চেয়েছিল। এই রকম একটা সন্দেহও নিশ্চয় ওদের মনে হয়েছিল, রবীন বাবু আসবে না, এই রকম একটা সর্ত্ত আপনি চাইতে পারেন। আর এ চালও ঐ অতীনের। ভিক্টরের মাথায় এ ফন্দী খেলত না।"

ঈষৎ স্ফুরিত মুখে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কেমন স্তব্ধ ভাবে মীনা বসিয়া রহিল।

অমুতোষ কহিল, "কিছু মনে করবেন না, মিস্ মোকার্জ্জি, গোপনে খবরাখবর কিছু নেবার চেষ্টা করি। যতদূর জানি, রবীন রায়ের একটা চেষ্টা আছে আপনার সঙ্গে একটা কণ্টাক্টে (সংস্পর্শে) যদি সে আবার আসতে পারে।"

"হাঁ, এসেছিলেন একদিন এখানে।"

"হুঁ! মনে হয়, ওদের যে এই প্লে-টা তার একটা সুযোগ সে নিতে চায়। হয়ত এমন একটা সর্ত্তও করেছে আপনাকে সাগরিকার ভূমিকায় আনতে পারলে উদয়নের ভূমিকায় সে নামবে।"

মীনা একটু ভ্রূকুটি করিল। মুখখানিতেও কেমন বিরাগের একটা বক্র ভাব দেখা দিল।

এটর্ণীর চিঠি খানা আবার একটি বার দেখিয়া অমুতোষ কহিল, "এই যে খেসারতের দাবী ওরা করেছে, এটা করতে পারে। তবে আদালতে এই বলে একবার লড়ে দেখা যেতে পারে, অভিভাবকবিহীনা অসহায় একটি বালিকা পেয়ে ছলে ভুলিয়ে এই চুক্তিতে ওরা আপনার সই করিয়েছে। মুখে যে এই রকম একটা কথা হয়েছিল আপনার শপথ করা সাক্ষীও আদালতে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারবে না। তবে তার সঙ্গে পূর্ব্বাপর আপনার সব সম্বন্ধের কথাও সব জানাতে হবে, জজকে বোঝাতে হবে এই রকম সর্ত্ত করবার যথেষ্ট কারণ আপনার আছে।"

"সর্ব্বনাশ। তা হলে যে—"

"হাঁ, একটা ঢি ঢি প'ড়ে যাবে দেশ জুড়ে, কাগজ-

ওয়ালারা সব মহাজোশে বড় বড় হেডলাইন দিয়ে খুঁটিনাটি খবর সব ছাপবে। ফিরিওয়ালারা রাস্তায় রাস্তায় আপনার নাম হেঁকে তাই লোককে জানাবে।"

"না না! সর্ব্বনাশ। মামলা-মোকদ্দমা ক'রে কাজ নেই। কি ক'রে তখন লোককে মুখ দেখাব?"

"না, সেদিকে যাওয়াই চলে না। কিন্তু এত টাকাই বা কোত্থেকে আসবে? যোগাড় হ'লেও সহজে ওরা ছাড়বে না। কারণ ওরা জানে, উদয়নের আর সাগরিকার ভূমিকায় আপনাদের দুজনকে পেলে ওদের এই ছবিটা অতি জাঁকাল হয়ে দাঁড়াবে, আর টাকাও আসবে প্রত্যেকটি "শো"তে জলের মত। ক্ষতির প্রতিশোধ নেবে। নানা কৌশলে রঙ্গিন বিজ্ঞাপের ছটায় এই চুক্তির কথা, আর কেন তা ভাঙ্গলেন তাই প্রচার ক'রে।"

"তা হ'লে এখন উপায়?"

"উপায় দেখতে পাচ্ছি নি কিছু। তবে এই একটা প্লে—কদ্দিনই বা আর লাগবে—অভিনয়টা কি আপনি করতে পারেনই না?"

"না, পারব না—প্রাণান্তেও পারব না! ভাবতেও আমার সমস্ত শরীর কেমন বিষিয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তার পর—তার পর—ওর সঙ্গে আবার এইরকম একটা ছবিতে নামব, বিন্দু কি ভাববে? কি চোখে আমাকে দেখবে? তার শ্বশুর শুনেছি আমাকে বড় স্নেহ করেন। তিনিই বা কি ভাববেন? কখনও আর বিন্দুকে আমার কাছে আসতে দেবেন না। না না, বন্ধু বলতে এক বিন্দুই আমার আছে। ওকে হারাতে আমি কিছুতেই পারি না।"

গভীর একটি নিশ্বাস অমুতোষ ছাড়িয়া কতক্ষণ কি ভাবিয়া শেষে কহিল, "আচ্ছা, দেখি আর একটু ভেবে। জানকীনাথবাবুর সঙ্গেও আলাপ ক'রে দেখি, তিনি কি বলেন। কালই আপনার সঙ্গে এসে আবার দেখা করব। আচ্ছা, এই চিঠিটা আর চুক্তিপত্রটা সঙ্গে নিয়ে যাই। ওঁকে দেখাতে হবে। উঠি তবে আজ এখন। অত অধীর হবেন না, ভয় পাবেন না। দেখব কি করা যায়।"

বলিয়া অমুতোষ উঠিল।

বুঝিতে কেবল বাক্যর অপেক্ষা স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে কাজে কিছুদূর অগ্রসর হইলে দাবীর জোর অনেক বেশী হয়, বিশেষ যদি দাবী যে পক্ষ হইতে আসিবে, তারা অপর পক্ষের সর্ত্তানুসারে খরচ-পত্রও কিছু করিয়া ফেলে,—দিনের পর দিন কাজ চালাইয়া লইবার উপযোগী আয়োজন-উদ্যোগ, শ্রমক্লেশও অনেক যখন যেমন দরকার স্বীকার করে। চুক্তি ইহাতে একেবারে পাকা হইয়া দাঁড়ায়। এই সব চিত্র-নাট্যে শিল্পীদের শিক্ষার ও প্রাথমিক মহলায়ও ব্যয় বেশ কিছু হয়, আবার কাজের আয়োজনে হাঙ্গামাও কম করিতে হয় না।

উদয়নের ভূমিকায় রবীনকে দেখিলেই যে মীনা বাঁকিয়া বসিবে, আর তখনই ফিরিতে চাহিবে, ইহা অতীন বেশ বুঝিয়াছিল। কাজে যোগ দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর ফিরিতে চাহিলে তাহাকে আটকান যত সহজ হইবে, কেবল আরম্ভে সেরূপ নাও হইতে পারে। তাই এইরূপ পরামর্শ ডিক্টরের সঙ্গে সে করে যে, প্রথম কিছুদিন রবীনকে উপস্থিত তাহারা করিবে না। এইরূপ একটা সম্ভাবনা আছে বুঝিয়া রবীন নিজেও তাহাতে সম্মত হয়। অন্য একজন নটীর সঙ্গে পৃথক্ ভাবে তার মহলা চলিত; এদিকে মীনার সঙ্গে মহলায় উদয়ন হইয়া দাঁড়াইত অতীন। অভিনয় সে ভালই করিত, আর বেশ প্রাণ দিয়াই করিত, সে শক্তিও তাহার ছিল। গূঢ় একটা উদ্দেশ্যও তাহার ছিল, এই রূপ অভিনয়ের যাদুস্পর্শে মীনাকে যদি তাহার প্রতি আকৃষ্ট সে করিতে পারে। বিন্দুকে সে পাইবে না জানে। ইহাও বুঝিয়া ছিল, বিন্দুর সঙ্গে রবীনের মিলনও আজ না হউক কাল ঘটিবেই। অগত্যা মীনাকে আয়ত্ত করিতে পারিলেও একটা প্রতিশোধ তাহার লেওয়া হইবে। তারপর, তুলনায় মীনা বিন্দু অপেক্ষা কোন অংশে হীনা নহে, যে কোনও পুরুষের বাঞ্ছনীয় সে হইতে পারে। রিহার্সেলের সময়ও এক একবার তাহার মনে হইত এই ভূমিকায় সে যদি সত্যই উপস্থিত হইতে পারিত! কিন্তু সেটা আর এখন সম্ভব নয়; রবীনের সঙ্গে ইহাদের চুক্তি হইয়া গিয়াছে। তার পর রবীনের পিছনে কুণ্ডুজের যে নাম রাখিয়াছে, তাহার তাহা নাই। তবে—তবে—গোড়াতে যদি—হায়, কেন কথাটা তাহার মনে তখন হয় নাই! কিন্তু চিত্র-নাট্যের প্রেমিক নায়কের মুখে ও দেহের গড়নে যেরূপ পরিপুষ্ট কান্তশ্রী একটা চাই, রবীনের সেটা আছে।

তাহার নাই। রবীনের ছবি যে শোভায় ফুটিয়া উঠিবে, তাহার তাহা উঠিবে না। প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলে রবীনকে ফেলিয়া কর্তৃপক্ষ তাহাকে কখনও লইতেন না, অন্য রকম বাধা-বাধকতা যতই থাকুক। যাক, ওসব কথা এখন ভাবাই বৃথা। অগত্যা এখন এই সুযোগে মীনার চিত্তে একটা ছাপ যদি সে ফেলিতে পারে, তাই যথেষ্ট হইবে; মনে প্রাণে সে চেষ্টাও সে করিত। মীনারও মনে হইত অতীন ত বেশ উদয়ন হইতে পারে, দলে এই লোকটি থাকিতে ইহাকে কেন ইহাঁরা মনোনীত করেন নাই? তবে এই সুধাকর কেমন হইবে, সে জানে না। একদিন সে বলিয়াই ফেলিল, "আপনিও ত বেশ উদয়ন হতে পারতেন। এদের দলেও আছেন, কেন হন নি?"

হাসিয়া অতীন কহিল, "পারতাম—হাঁ, এখন রিহার্সাল কদিন আপনার সঙ্গে দিয়ে তাই মনে হচ্ছে বটে; কিন্তু তখন ভরসা পাই নি। সত্যি এখন বড় পরিতাপই হচ্ছে মিস মোকার্জ্জি! এদের আর্টিষ্টদের শিক্ষা অনেক দিয়েছি। কিন্তু এই আর্টের যে সত্যিকার রসটা তার স্বাদই আগে কখনও পাই নি—পাচ্ছি এই কদিন আপনার সঙ্গে এই ভূমিকায় অভিনয় ক'রে। আর তার যে কি আনন্দ! মনে হয় এর তুলনাই আর হয় না। তবে দুদিনে সব ফুরিয়ে যাবে, সুধাকর এসে আমার স্থান নেবে। আহা, ছবিতে যদি উঠত, এই রসাস্বাদের—এই আনন্দের—স্মৃতিটা অন্ততঃ স্থায়ী হয়ে থাকত।"

একটু কাছেও সে ঘেঁসিয়া বসিল; বসিয়া অতীন একটি নিশ্বাসও ছাড়িল। মুখ ফিরাইয়া উঠিয়া মীনা অন্য দিকে সরিয়া গেল।

শিক্ষা ও তাহার সঙ্গে প্রাথমিক রিহার্সাল হইয়া গেল। এখন দুই তিন দিন পাকা রিহার্সাল হইয়া সুটিং আরম্ভ হইবে। মীনা প্রস্তুত হইয়া আসিল, কিন্তু আসিয়াই দেখিল উদয়নের ভূমিকায় উপস্থিত রবীন্! শুনিল, সুধাময় বসু অতি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, অগত্যা শেষে ইহাঁকেই আনিতে ইহাঁরা বাধ্য হইয়াছেন, সুধাকর নামে ইনিই উদয়নের ভূমিকায় নামিবেন। ডিক্টর কি অতীন কেহই তখন উপস্থিত ছিল না। ডিক্টরের সহযোগী গোস্বামী মীনাকে এক পাশে ডাকিয়া লইয়া এই সংবাদ দিল। অভিনয় করিতে অস্বীকার করিয়া মীনা বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিতেই অতীনের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। অতীন কহিল, "কি ক'রব মিস মোকার্জ্জি, লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি, এখানে আপনার সামনে উপস্থিত হ'তেই পারলাম না। আগে কিছুই জানতে পারি নি আমি, কাল রিহার্সালের পর কেবল খবরটা শুনলাম। অনেক ব'লেছিলাম, কিন্তু ব'ল্লেন চুক্তি ক'রে ফেলেছি, এখন ফিরতে পারি না।"

"মিষ্টার সরকার কোথায়?"

"তাঁকেও ত দেখতে পাচ্ছি নি। আমিও খুঁজছি।"

"আপনাকে কেন উদয়ন ওঁরা ক'রলেন না?"

"তাও ব'লেছিলাম। তা ওঁরা বলেন, ষ্টেজে হ'লে চ'লত, কিন্তু ছবিতে চেহারা মানাবে না। আর চুক্তিই আগে ক'রে ফেলেছেন, অসময়ে তখন আর কি ক'রবেন? বোধ হয়—বোধ হয় পাছে আমি দাবী করি, জোর জিদ একটা করি, এই আশঙ্কায় আগে কিছু জানতেই আমাকে দেন নি।"

"কিন্তু অভিনয় আমি ক'রব না।"

"হাঁ, এটা আপনি ব'লতে পারেন বই কি! তবে কি না চুক্তি একটা হ'য়েছে, কাজও এতদূর অগ্রসর হ'য়েছে—"

"কিন্তু কথা ছিল রবীন বাবু নামবেন না।"

"তা ছিল বই কি, তা ছিল বই কি! তবে কি-না—হুঁ হুঁ—তাই এখন ভাবছি, চুক্তিতে কথাটার স্পষ্ট উল্লেখ থাকলেই ভাল হ'ত। সহজে ওঁরা এখন ছাড়বেন ব'লে ত মনে হয় না। তা দেখুন কি হয়। তাহ'লে সত্যিই আপনি ফিরে যাচ্ছেন?"

"হাঁ, অভিনয় আমি ক'রব না, ক'রতেই পারি না। টাকা—টাকা—ওঁরা যা দিয়েছেন, ফিরিয়ে দেব। আসি তবে নমস্কার।"

মীনার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। অতীন একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "আপনি কিছু অধীর হ'য়ে প'ড়েছেন, সঙ্গে গিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসব কি?"

"না, মাফ ক'রবেন। এলোকেশী র'য়েছে, নিজেই আমি যেতে পারব।"

এলোকেশী নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া লইয়া মীনা বাহির হইয়া গেল।

গৃহে ফিরিয়া মীনা একখানা পত্র লিখিয়া পাঠাইল। ডিক্টর ও গোস্বামী গিয়া বুঝাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা অনেক করিল, কিন্তু চেষ্টা বৃথা হইল। অগত্যা তখন এটর্নীর চিঠি গেল। মীনা বুঝিল, কত বড় বিপদজালে সে জড়াইয়া পড়িয়াছে। আর উপায় নাই। অমুতোষকে ডাকিয়া সে তখন সকল কথা জানাইল।

৩৫

পর দিন অমুতোষ আসিল, জানকীনাথবাবুর একখানি পত্র আনিয়া মীনার হাতে দিল। লিখিয়াছেন—

"চুক্তি হইতে নিষ্কৃতি এখন সহজ নহে। অভিনয় তোমাকে করিতেই হইবে। তবে কেবল এলোকেশীকে লইয়া তুমি যাইবে, কোনও অবস্থায়ই সেটা সঙ্গত হইত না, এখন ত' হইতেই পারে না। অমুতোষকে কিছুদিনের জন্য ছুটী দিয়া দিলাম, সে তোমাকে লইয়া যাইবে, কাছে থাকিবে এবং কাজ হইয়া গেলে আবার বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিবে। এলোকেশীও সঙ্গে থাকিবে। ছবি তুলিতে বাহিরেও মধ্যে মধ্যে বোধ হয় যাইতে হইবে, অমুতোষই তোমার সঙ্গে তখন যাইবে। এই কাজটা যত দিন শেষ না হয়, তাকে তোমার অভিভাবক বলিয়া মনে রাখিবে। অমুতোষের রক্ষণাধীনতায় নির্ভয়ে তুমি যাইতে পার, আমিও নিশ্চিন্ত থাকিব।"

পত্রখানি পড়িয়া গভীর একটি নিঃশ্বাস মীনা ছাড়িল। কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া শেষে কহিল, "অভিনয় তাহ'লে ক'রতেই হবে ?"

"হাঁ, অনেক আলোচনা করা গেছে, আমাদের এটর্নীর সঙ্গেও কথাবার্ত্তা হ'য়েছে। কিন্তু কেরা এখন আর সম্ভব নয়। আপনার আপত্তির কারণটা—হাঁ, বুঝতে পারছি সবই। কিন্তু কি ক'রবেন ? ক'দিনই বা ? তা সেরেই আসুন কোনও মতে। তার পর—"

"ওখানে আর যেতে হ'বে না। কিন্তু ছবিতে সব উঠে যাবে, লোকের সামনে বেরোবে—"

"তাই বা আর কি ক'রবেন এখন ? তা একটা ছবি ত বেরোচ্ছেই, আর একটায় বেশী আর এমন কি হবে ?"

একটি নিশ্বাস চাপিয়া মীনা কহিল, "একটা ছবিরই লজ্জা আমার সঙ্গে ফিরছে। আবার আর একটা ! লোকের সামনেই আর বেরোতে কখনও পারব না।" চোখে জল আসিল।

অমুতোষ কহিল, "সব নির্ভর করছে আপনার ভবিষ্যৎ ব্যবহারের উপরে। লোকে যখন দেখবে, সত্যি আপনি ও ব্যবসায়ে যান নি, ভদ্র গৃহস্থকন্যার মতই শিষ্ট ভাবে জীবন যাপন করছেন, তখন লজ্জায় এমন কিছু আর আপনার থাকবে না। আর এই যে লজ্জা—তাও কি জানেন—যত নিজে গায়ে তুলে নেবেন, তত শক্ত হ'য়ে গায়ে জড়িয়ে থাকবে। ওসব কিছু না ভেবে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা করবেন। যারা আপনাকে জানে, শ্রদ্ধা করে, এই যেমন আমরা—তাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করবেন—"

"আপনাদের বাড়ীতে—"

"মা আছেন, বৌদি আছেন, দাদা আছেন—আদরে তাঁরা আপনাকে গ্রহণ ক'রবেন—দয়া করে যদি কখনও পায়ের ধূলো দেন —"

"পায়ের ধূলো তাঁদের মাথায় নিয়ে কৃতার্থ হব, যদি পাই।"

হাসিয়া অমুতোষ কহিল, "ভাল, নিয়ে তবে একদিন যাব —এরই ভেতর যেদিন বলেন, দেখবেন কি চোখে তাঁরা আপনাকে দেখেন।"

আবার একটা নিশ্বাস চাপিয়া মীনা উত্তর করিল, "জানেন না ত তাঁরা সব—আমার নতুন এই কেলেঙ্কারীর কথা—"

"জানেন। বলেছি তাঁদের সব খুলে। মা আজ আসতেই চেয়েছিলেন আমার সঙ্গে।"

"আমার শত নমস্কার তাঁকে জানাবেন। জানকীনাথ বাবুর বাড়ীতেও ওঁরা দয়া বোধ হয় করবেন।"

"নিশ্চয়ই, কিছু ভাববেন না আপনি।"

"ভাবব—ভাববই বা আর কি ? দুকাণকাটা আমি, লজ্জাভয়ের বাইরে গিয়ে পড়েছি।"

হাসিয়া অমুতোষ কহিল, "কেন আর ও সব কথা তুলছেন। যারা জানে তারা জানে কাণ আপনার একখানাও কাটা যায় নি। যারা জানে না, তারাও একদিন জানবে।"

মীনা কহিল, "যা হবার তা হয়েছে। যা হবে তা হবে। ভাববার আমার আর কিছুই নেই এখন। তবে যেটুকু

দয়া মায়া করেন, তাই বড় ভাগ্য ব'লে মাথায় তুলে নেব।"

অনুতোষ উত্তর কিছু করিল না। একটুকাল নীরব থাকিয়া মীনা আবার কহিল, "আপনি তাহলে রোজই যাবেন আমার সঙ্গে?"

"হাঁ, ছুটীই ত ওঁরা দিয়ে দিয়েছেন।"

"রিহার্সাল যখন হবে, সুটিং যখন হবে, সামনেই থাকবেন?"

"থাকব। থাকতেই হবে, জানকীনাথ বাবুর আদেশ এই।"

মুখখানি কেমন যেন একটু লাল হইয়া উঠিল! এক দিকে একটু ফিরিয়া অতি সঙ্কুচিত ভাবে ধীরে ধীরে মীনা কহিল, "কি করে যে ঐ পার্টে এই অভিনয় আপনার সামনে করব—"

হাসিয়া অনুতোষ বলিল, "করবেন, বেশ ত, দেখে আমি খুসীই হব। আপনার শকুন্তলা দেখেছি, সাগরিকাও দেখব—"

"দেখেছেন পার্টে, এও দেখবেন শেষে পার্টে। কিন্তু সামনা-সামনি একেবারে চোখের উপর—জানি না আপনি কি ভাববেন—"

"কিছুই ভাবব না। বরং ভাগ্যিই মনে ক'রব চোখের উপর সশরীরে আপনার এই নৈপুণ্য দেখতে পাচ্ছি।"

"কিন্তু আমি—যাক্ ওসব ভাবা আর মিছে। যা হবে তা হবেই। হাঁ, ওঁদের একটা চিঠি তবে লিখে দিই—কি লিখব?"

"লিখে দিন, আপনি চুক্তিমত অভিনয় করবেন, আর আপনার অভিভাবক স্বরূপ আমি সঙ্গে যাব, উপস্থিত থাকব।"

উঠিয়া মীনা টেবিলের কাছে গিয়া লিখিতে বসিল। কিন্তু হাত কাঁপিতেছিল। কহিল, "পারছি না, হাত কাঁপছে, ভয়ও করছে কি লিখতে কি লিখব, আবার কি ফ্যাসাদে পড়ব।"

"আচ্ছা, আমিই বরং লিখে দিচ্ছি; তাই দেখে আপনি লিখুন। না হয় একটা সই করেই কেবল দেবেন।"

"সেই ভাল, সই করেই দেব।"

মীনা উঠিয়া আসিল, অনুতোষ টেবিলে গিয়া বসিয়া দুই খানা পত্র লিখিল। সহি করিয়া মীনা একখানা কাছে রাখিল, আর একখানা অনুতোষের হাতে দিয়া কহিল, "আপনিই নিয়ে যান পাঠিয়ে দেবেন ডাকে।"

"না, ডাকে নয়। আফিসের পিয়নকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব পিয়ন-বইতে লিখে।"

, সেই ভাল হবে। কি আর বলব? আমি একেবারেই অসহায়। আপনাদের হাতেই নিজেকে সঁপে দিলাম! যা ভাল হয় আপনারাই করবেন। অকূল পাথারে ভেসেছি, কূলে তুলে রক্ষা আপনারাই আমাকে করবেন। দর্প আমার চূর্ণ হয়েছে, হাড়ে হাড়ে আজ বুঝতে পারছি মেয়ে মানুষ আমরা সত্যিই অবলা, আপনাদের আশ্রয় ছাড়া দাঁড়াতেই পারি না।"

হাসিয়া অনুতোষ কহিল, "ওটা ভুল বুঝছেন। পুরুষ আমরাও আপনাদের আশ্রয় ছাড়া দাঁড়াতে পারি না। বাইরে যদি আমরা আপনাদের আশ্রয়, ঘরে আপনারাই আমাদের আশ্রয়। ঘরে বাইরে এই ভাবে পরস্পরের আশ্রয় হয়ে আছি, পরস্পরকে রক্ষা করে চলছি, তাই এ সংসারযাত্রা চলছে। নইলে মানুষের জাতটাই ছন্নছাড়া হয়ে ধ্বংস পেয়ে যেত! আচ্ছা, আসি তবে এখন নমস্কার।"

"নমস্কার। আসুন।"

অনুতোষ বাহির হইয়া গেল। মীনা গৃহতলেই লুটাইয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিয়া যেন আর কূল পাইল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এলোকেশী তখন আসিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিল, হাত মুখ ধোয়াইয়া আনিয়া কাছে বসিয়া কিছু আহার করাইল, তার পর ধরিয়া শয্যায় লইয়া গিয়া শোয়াইয়া রাখিল। কাজ সারিয়া আসিয়া পাশেই বুকে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া রহিল।

রিহার্সাল আরম্ভ হইল, কয়েকদিন রিহার্সালের পর সুটিংও আরম্ভ হইল। অনুতোষ সঙ্গে যাইত, উপস্থিতও থাকিত। এলোকেশীও সঙ্গে যাইত। কিন্তু শেষের দিকে এলোকেশী আর পারিত না; পায়ে তাহার একটা বাতের ব্যথা হইয়াছিল। জানকীনাথ বাবু কহিলেন, "কি ক'রবে? যে দিন পারে যাবে, না পারে না যাবে, একাই তুমি নিয়ে যেও।"

যখন তাহার সঙ্গে দরকার মীনা অভিনয় করিত; হইয়া গেলেই অমুতোষের কাছে আসিয়া বসিয়া থাকিত। অভিনয়ের কোনও প্রয়োজন ব্যতীত অন্য একটি কোন কথাও আর কাহারও সঙ্গে কহিত না। বাহিরে নট-নটীদের ব্যবহার কি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ যেরূপ থাক, এখানে কোনও রূপ অসংযত ব্যবহার কেহ করিবে না, অপ্রীতিকর আচরণ কেহ কাহারও সঙ্গে করিবে না, কড়া এইরূপ নিয়মের শাসন ছিল, সিনেমার সব ষ্টুডিওতে সাধারণতঃ এইরূপ থাকে। নিভৃতে মীনার সঙ্গে একটি কথা বলিবার সুযোগও রবীন পাইত না; আরও দেখিত অবসর সময়ে অমুতোষের কাছে গিয়াই মীনা বসিয়া থাকে!—

অতীন মুচকী মুচকী হাসে; অভিনয়ের শেষে বাহিরে যখন অবসরে আসে কাছে গিয়া বেশ রসাল ঝাঁঝাল টিটকারীও মধ্যে মধ্যে করে। রবীনের অসহ্য হইয়া উঠিল! কিন্তু কি করিবে? নিয়মের শাসন মানিয়া নীরবেই সব তাহাকে সহিতে হইত। ভাল, সুটিং শেষ হইয়া যাক্, তখন—তখন—সে দেখিবে!—

মধ্যে মধ্যে কলিকাতার বাহিরেও যাইতে হইত। শেষ দৃশ্য রাজপুরীতে ঐন্দ্রজালিক অগ্ন্যুদ্গমের দৃশ্য, বাহিরেই তাহার সুটিং-এর বন্দোবস্ত হইল। সুটিং শেষ হইয়া গেল। ডিক্টর ও গোস্বামী চেক সহি করিয়া রাখিয়াছিল; রবীন, মীনাও অন্যান্য নট-নটীদের যাহাদের সঙ্গে যা কথা ছিল, পাওনা চুকাইয়া দিল।

"Now or never!" মনে মনে এই বলিয়া মীনা ও অমুতোষের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্ বাহির হইয়া পড়িল। মীনাকে একেবারে কলিকাতায় লইয়া আসিবে বলিয়া অমুতোষ একখানি গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। গাড়ীর কাছে আসিয়া দুই জনে দাঁড়াইল।

"মীনা!"

চমকিয়া মীনা ফিরিয়া চাহিল; পাশেই দেখিল, রবীন্!

"কি চাই আপনার মিষ্টার রায়?"

কেমন একটা উদ্বেল উদ্দীপনার উচ্ছ্বাসাকুল স্বরে রবীন্ কহিল, "না, সে আজ হবে না মীনা! আজ তোমাকে ছাড়ব না! ও গাড়ীতে নয়, আমার এই গাড়ীতে এস! আমি তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেব!"

"আপনি পৌঁছে দেবেন এ কি ব'লছেন, মিষ্টার রায়"

"বলছি, আমি চাই, তোমাকে আজ আমি বাড়ীতে পৌঁছে দেব আমার গাড়ীতে!"

"কেন?"

"আমার কথা আছে, শুনতে হবে তোমাকে! পথে সব ব'লব।"

"কথা কিছু থাকে, বেশ, এইখেনেই বলুন না?"

"না, নিরেলা তোমাকে ব'লতে চাই, গাড়ীতে, পথে, ওঁর সামনে নয়!"

"বলতে কিছু চান, ওঁর সামনেই ব'লতে হবে। যদি না পারেন, কোনও কথাই আপনার আমি শুনতে চাই না।"

"বটে! কে উনি তোমার মীনা?"

"দেখতেই ত পাচ্ছেন অ্যাদ্দিন, আমার অভিভাবক।"

"অভিভাবক! হাঃ হাঃ হাঃ! তোমার বাবার আফিসের ছোকরা কেরাণী, তোমার টিউটরও না কি কবে ছিল, সে আজ তোমার অভিভাবক!"

অমুতোষ একটু ভ্রূকুটি করিল, আবার হাসিও একটু মুখে ফুটিল, কিন্তু নীরবেই রহিল। মীনা কহিল, "সে যাই হ'ন, আজ আমার অভিভাবকই উনি।"

"কি দাবীতে কিসের দাবীতে উনি তোমার অভিভাবক আজ? কে ওঁকে তোমার অভিভাবক ক'রে দিয়েছে?"

"যিনি দিতে পারেন। বাবার অভাবে, দাদার অনুপস্থিতিতে, আমার অভিভাবক যিনি হতে পারেন, তাঁর আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী জানকীনাথ বাবু, তিনিই এখানে আমার অভিভাবক ওঁকে নিযুক্ত ক'রে দিয়েছেন।"

"এখানকার পাট ত আজ উঠে গেল। আর তবে কিসের অভিভাবক উনি?"

"যতক্ষণ না নিরাপদে তাঁর কাছে আমাকে পৌঁছে দেবেন, ততক্ষণ এ দায়িত্ব ওঁর আছে।"

"কিন্তু আমি বলছি, সে দায়িত্ব এখনই ওঁকে ছাড়তে হবে, আমিই তোমাকে নিরাপদে তাঁর কাছে পৌঁছে দেব।"

মীনা ভ্রূকুটি করিল। কহিল, "আপনি বলছেন! কিন্তু এ-কথা বলবার আপনি কে?"

"আমি কে! আমি কে! আমি কেউ নই, আর আজ ঐ অনুতোষ তোমার কর্তা! বেশ, তাহ'লে বলছি, ওঁর সামনেই বলছি, তোমার প্রেমিক আমি, প্রেমের সূত্রে আমরা বদ্ধ হয়েছিলাম। বিবাহসম্বন্ধ, যে কারণেই হক ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু তাই বলে সে প্রেমের সূত্র ছিন্ন হয় নি, হতে পারে না, আজও আমরা সেই সূত্রে বদ্ধ।"

মীনা উত্তর করিল, "আপনার মনের কথা আপনিই জানেন। তবে আমার কথা এই কোনও সূত্রেই আপনার সঙ্গে আবদ্ধ আমি নাই। কোনও দাবীও আপনার আমার ওপর চলতে পারে না।"

'সে বন্ধন সত্যিই ছিন্ন হয়ে গেছে তোমার! হাঁ নারীর চিত্ত এমনিই অসার বটে।"

"কবিরা তাই বলে থাকেন বটে। বেশ তাই তবে আছি! এখন আসুন তবে, নমস্কার। আসুন অনুবাবু গাড়ীতে গিয়ে উঠি।"

"আসুন", বলিয়া অনুতোষ মীনার হাতখানি ধরিল।

রবীন বলিয়া উঠিল, "বটে! তাহলে—তাহ'লে বল, প্রেম এখন তোমার ওঁকে অর্পণ করেছ। ফিল্ম-ষ্টার কি না, নিত্য নতুন প্রেমিক, বছরে বছরে নতুন স্বামী, এত তাদের রেওয়াজ! দুদিনেই দেখছি পাকা একজন Holywood star ষ্টার (হোলি উডের ষ্টার) ব'নে গিয়েছ!"

অনুতোষ তখন কহিল, "সাবধান হয়ে কথা বলবেন, মিষ্টার রায়! উত্তেজনায় অত অসংযত হবে না। মিস্ মোকার্জ্জি সত্যই আজ এখানে অসহায় নন যে যা-খুসী অপমান করে আপনি যেতে পারবেন।"

"বটে! নতুন প্রেমিক কি না! তা সে যাই হক, আপনার সঙ্গে কোনও কথা আমি বলতে চাই না। মীনাকে জিজ্ঞাসা করছি, দাবীও আমার আছে। হাঁ, বল মীনা, তোমার মুখেই আজ শুনতে চাই—ওঁকেই তবে তোমার প্রেম অর্পণ করেছে—আর বিবাহ, সে যত দিনের জন্যই হক ওঁকেই তবে আপাততঃ করবে?"

"শুনতে চান! তাহলে শুনুন মিষ্টার রায়। মুক্তকণ্ঠেই আমি বলছি, প্রাণে যদি আমার প্রেম বলে কিছু থাকে, তার অধিকারী আজ উনিই। দয়া করে যদি গ্রহণ করেন, ধর্ম্ম পথে জন্ম-জন্মের মত ওঁরই দাসী হব, জীবনের সেবক বলে ওঁরই পায়ে থাকব, পায়ে থেকে ওঁরই পূজা করব।"

"বাঃ বাঃ। নটী কি না, অভিনয়টা অতি চমৎকারই হ'ল! একেবারে দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষা! তাহলে আয়েষার মতই একটি বার বল—'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'।"

"হাঁ,—উনিই আমার—"

"দারুণ এই উত্তেজনার মধ্যেও বলিতে বলিতে মীনা থমকিয়া গেল।

"হাঃ হাঃ হাঃ! থামলে কেন। নটী ত? লজ্জা কি? খোলাখুলি ব'লেই ফেল না উনি তোমার প্রাণেশ্বর।"

"হাঁ, তাই বটেন, আসুন এখন আপনি।"

"কিন্তু এই ঘণ্টা খানেক আগেও সাগরিকা তোমার প্রাণেশ্বর ছিলাম আমি উদয়ন। আবার কবে শুনব কোন্ ভূমিকায় তোমার প্রাণেশ্বর ঐ অতীন, ঐ ভিক্টর—"

মীনা থর থর কাঁপিতেছিল। অনুতোষ বাহুবেষ্টনে তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল।

"ভয় পেও না, এস, আমার কাছে এস, মীনা! তোমার এই বরণ আমি আদরে গ্রহণ ক'রলাম। মিষ্টার রায়, ভদ্রলোক হন ত এখনও নিরস্ত হন ব'লছি। মীনা আজ আমার স্বয়ংবাক্‌দত্তা স্ত্রী, জানবেন তাকে রক্ষা করবার, তার কোনও অপমানের প্রতিশোধ নেবার শক্তি আমার আছে। এস মীনা, গাড়ীতে এস ওঠ।"

মীনাকে লইয়া অনুতোষ গাড়ীতে গিয়া উঠিল।"

"হাঃ হাঃ" করিয়া রবীন হাসিয়া উঠিল।

"অভিনন্দিত আপনাকে ক'রছি অনুতোষ বাবু! A filmstar for a wife! ছ' মাস পরে কাগজে প'ড়ব ডিভোর্স স্যুটের রিপোর্ট! হাঃ হাঃ।"

আসনের সম্মুখে জোরে একটা পদাঘাত করিয়া অনুতোষ হাঁকিল, "চালাও গাড়ী ড্রাইভার। দেরী করতে হো!"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল, হুস্ হুস্ শব্দে ছুটিয়া চলিল।

৩৬

আট দশ দিন চলিয়া গিয়াছে। রাত্রি দশটা। ডিনারের পর কিছু 'পেগ' সেবনে আরক্তচক্ষু হইয়া রবীন একা তার গৃহে একখানি কোচে হেলিয়া এখন ধূম পান করিতেছে।

"কে?"

"অতীন।"

"এস।"

অতীন একটি চুরুট মুখে গৃহে প্রবেশ করিল।

"ব'স। তা কি মনে করে? এই রাত্তির বেলায়—"

"এই এলাম। নিশাচর মানুষ—ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি,

ভাবলাম একটি খবর দেখেই যাই তোমাকে ক'দিন দেখা হয় না, আবার শুনলাম তুমি খুব অসুস্থ।"

"অসুস্থ? না, কে বলেছে? বেশ সুস্থই ত আমি আছি।"

"হুঁ! ভাল কথাই তবে। শুনেছ বোধ হয় আজ মীনার বিবাহ?"

"শুনেছি।"

"অনুতোষের সঙ্গে।"

"তাও জানি।"

"আটটায় লগ্ন ছিল। বিবাহ এতক্ষণে হয়েই গেছে।"

"সম্ভব।"

"খবরও আমি নিয়ে এলাম নির্ব্বিঘ্নে হয়েই গেছে। বরকন্যা বাসর-ঘরে গিয়ে উঠেছে।"

"বিবাহ হয়ে গেলে বাসর-ঘরেই ত গিয়ে উঠবে। কোথায় আর যাবে।"

"কেউ হয় ত ভাবছে যাওয়া ঠিক হত জাহান্নমে।"

"ভাবতে পারে কেউ। তবে সে খবরটা এখনও পাই নি।"

"নিজের মনের ভেতরই খোঁজ, পাবে।"

"না, পাই নি। পাবার এমন কোনও কারণও নেই।"

"নেই! হাঃ হাঃ হাঃ! সত্যি বলছ রবীন, মনের কথা তোমার? আর সত্যিই খুব বেশী সুস্থ আছ আজ? চক্ষু দুটি ত রক্তবর্ণ।"

"ওটা মনের দুঃখে নয়, সুখসুধাময় সুরা প্রসাদে?"

"বটে! তাহ'লে ওটা খুবই চলছে বুঝি? হুঁ—ও প্রসাদটাও লোকে খোঁজে।—"

"অভ্যেসটা কদ্দিন ধরে হয়ে পড়েছে। নইলে খুঁজি নি, কোনও মনের জ্বালায় আগুন নেভাতে। তাহ'লে খবর নিতে যদি এসেছ অতীন, খবরটা এই তবে নিয়ে যাও, মনে আমি আঘাত এমন কিছু পাই নি; নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি, বড় একটা দুঃখ কি জ্বালার মত কিছুই আমি অনুভব করছি না। বরং কেমন একটা স্বস্তি, কেমন যেন একটা মুক্তির শান্তিই পাচ্ছি। শেষের দিকে কেমন একটা জিদই আমার হয়ে গেছল, আর বড্ড রাগ হত অনুতোষের কথা কিছু উঠলে। ঘাড়ে কেমন একটা ভূতই আমার চেপেছিল।"

"হুঁ। কিন্তু সে দিনকার সেই দৃশ্যটা—"

"হাঁ, দেখেছিলাম গাড়ীটা ছাড়তেই, একটা ঝোপের আড়ালে তুমি রয়েছ। ঐ জিদ আর রাগ—ভূতটা যেন ঠেলে নিয়ে গেল আমাকে। বিশ্রী একটা কেলেঙ্কারীই করে ফেলেছিলাম, বড় লজ্জাও হচ্ছে সেই অবধি। মীনার কাছে আর অনুতোষের কাছে বড় হেয়ও আপনাকে করে ফেলেছি। সেটা ঠিক হতে চাই নি, এখনও চাই না। তবে হয়ে পড়েছি। তা সে যাই হক, এই লজ্জাটা ঘাড়ের ভূতটাকে আমার নাবিয়ে দিয়েছি, রক্ষা পেয়েছি।"

অতীন একটু ভ্রূকুটি করিল। কহিল, "হাঁ। সে ভাল কথাই। আর একটি ভাল খবরও তোমাকে দিই। বিন্দু এই বিয়েতে গেছে, এখন বোধ হয় বাসর-ঘরেই বর-কনে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করছে।"

"মীনার বন্ধু সে, বিবাহে ত যাবেই। এটা এমন একটা খবর কিছু আমাকে তুমি দেও নি। আমিও ভাবছিলাম, সে গেছে।"

"হুঁ। তাহ'লে এসবও ভাবছিলে! হাঁ, আর একটি কথা, এই যে বিয়েটা হল তোমার বাবাই মহা উল্লাসে এর উদ্যোগ আয়োজন সব করেছেন। চেষ্টাও কদ্দিন ধরে করছিলেন ঐ জানকীনাথবাবু-টাবুদের সঙ্গে একযোগ হয়ে মীনার যাতে বিবাহ দিতে পারেন। পাত্রও তাঁরা সুলভ ঠাউরেছিলেন ঐ অনুতোষকে, কারণ এটা তাঁরা বেশ জানতেন অনুতোষের বেশ একটু টান পড়েছে, আর সে ছাড়া এতবড় একজন নামজাদা ফিল্ম-ষ্টারকে বাঙ্গালী ভদ্র গেরস্তের ছেলে কেউ বিবাহ করতে আসবে না।"

"হাঁ, এটা একটা খবর বটে। বাবা যে মীনাতে এত ইণ্টারেষ্টেড (interested), এটা জানতাম না।"

"Interested ত হবেনই, নিজের interest এই। কারণ এটা বেশ জানতেন ওকে আর কারও হাতে চালিয়ে দিতে পারলেই তোমাকে মুক্ত করে বৌ-এর টানে শেষে হয় ত ঘরে নিতে পারবেন। বাঃ! বলতে না বলতে এই যে টানটা এসেই পড়েছে।"

অতীন হাসিয়া উঠিল। বিন্দু তখন নিঃশব্দে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল।

অতীনকে দেখিয়াই সে মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া একদিকে সরিয়া দাঁড়াইল। বলা বাহুল্য, বিন্দুর পিতৃগৃহের ও শ্বশুরগৃহের অন্তঃপুরে প্রাচীন আদবকায়দায়ই চলিত।

রবীন কহিল, "তাহলে তুমি এখন"—

"হাঁ, থাকাটা আর সঙ্গত হচ্ছে না, যদিও যুগলমিলনটা দেখতে বড় সাধ হচ্ছিল। তা সেটা নিভৃত গৃহেই হক,—হাঃ হাঃ হাঃ।"

অতীন বাহির হইয়া গেল।

"এস বিন্দু। তা এত রাত্রিতে একা এখানে?"

"মা বাবা পৌঁছে দিয়ে গেলেন।"

"ও। মীনার বিবাহ দেখে তোমরা ফিরছিলে বুঝি?"

"হাঁ।"

"বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেল ?"

"হাঁ।"

"তা কি মনে করে এসেছ ? ওঁরাই বা কি ভেবে তোমাকে একা এখানে নাবিয়ে দিয়ে গেলেন ?"

বিন্দু নীরব ; নতমুখেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রবীন কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটু কহিল, "বোধহয় ভাবছিলে বড্ড মনভাঙ্গা আমি হয়ে পড়েছি, অত্যাহিতই পাছে একটা কিছু করে ফেলি ! মা বড় বেশী স্নেহ আমাকে করেন, যাতে-তাতেই ভয়ে একেবারে অধীর হ'য়ে ওঠেন।"

"সেটা কি তুমি মনে কর কখনও ?"

"গ্রাহ্য অনেক সময় করতে চাই না, তবে না করেও পারি না। আর ঘরে আমার আবদার যা কিছু মার কাছেই চলে। বাবার কাছে ভয়ে ঘেঁসতেও কখনও পারি নি।"

"তা হ'লে চল না আজ সেই মার কাছেই।"

"হাঃ হাঃ হাঃ ! খাসা ফাঁক মতই কথাটা বলে ফেলেছ বিন্দু। ঘরে ফিরিয়েই আজ নিতে আমাকে এসেছ তবে বিন্দু ?—সুবিধে পেয়ে এখন মার দোহাইটা দিচ্ছ ?"

সেটা কি খুব বড় একটা দোহাই নয়—সব চেয়ে বড় ?"

"সব চেয়ে সর্ব্বদা না হ'ক, খুব বড় দোহাই বটে। স্বীকার সেটা আমাকে ক'রতেই হবে। তা তোমার নিজের পক্ষ থেকে দোহাই কিছু নেই ?"

মাথার কাপড় একটু টানিয়া নত মুখে একদিকে একটু ঘুরিয়া বিন্দু দাঁড়াইল। রবীন কহিল, "সেই যে মালাবার পাহাড়ে তোমার সেই কথাটা—তুমি বলেছিলে, তোমাকে যদি চাই, তবে পাব। কিন্তু সে চাওয়াটা নিজে কখনও খুঁজে নেবে না—কথাটা আজও আমার মনে আছে—সেই অবধি সর্ব্বদাই মনে পড়ত

ফিরিয়া বিন্দু ছল ছল চোখে-মুখ তুলিয়া চাহিল, ঈষৎ শ্লথস্বরে কহিল, "তা হলে আজ আমি বলছি, সে পণ আমার নেই, আমাকে চাও কি না স্বেচ্ছায় নিজেই সেটা খুঁজতে এসেছি।"

একটু হাসিয়া রবীন কহিল, "হাঁ, আজ তোমাকে—না, তোমাকে আমি জয় করি নি,—তুমিই আমাকে জয় করলে আজ। শোন বিন্দু, ঘরেই আমি যাব, তোমাকে—তোমাকেও আমি চাইছি, খুব আকুল হয়েই ক'দিন ধরে চাইছি আর একটি কথাও বলছি—মীনার যে আজ বিবাহ হ'ল তাতে দুঃখ আমি সত্যি কিছু পাই নি। বরং—বরং—একটা মুক্তির শান্ত আনন্দই অনুভব করছি। বিশ্বাস হ'চ্ছে না ? না, ঠিক কথাই আমি বলছি। অবিশ্বাস ক'রো না। শেষের দিকে—তার ওপর সেই টানটা আর তেমন ছিল না—হবে বড় একটা জিদ ছিল : ভূতের মতই ঘাড়ে সেটা চেপে-ছিল। তবে, তবে—বড় কেলেঙ্কারীই সেদিন করে ফেলে-ছিলাম—ব'লব তোমাকে সব। তার পর থেকে সেই লজ্জায় ভূতটা নেমে গেছে, মনটাও আমার শান্ত হয়েছে।"

"তা হ'লে—চল না, আজই ঘরে চল।"

"না, আজ পারব না বিন্দু—সম্ভব হবে না। ঘরে ফিরে তুমি যাও, আমার গাড়ী আছে, ডেকে দিচ্ছি, পৌঁছে দিয়ে তোমায় আসবে। কাল সকালে আমি যাব।"

"না আজই চল, তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না।"

বলিয়া বিন্দু হাতখানি একটু বাড়াইয়া অগ্রসর হইল। চমকিয়া রবীন সরিয়া একটু গুটাইয়া বসিল, "না না, এসো না, কাছে এসো না, কাছে এসো না বিন্দু, বুঝতে পারছ না, আজ তোমার স্পর্শের যোগ্য আমি নই। মনুষ্যত্ব এখনও একেবারে হারাই নি, আজ—আজ গিয়ে এমুখ তুলে মা বাবার পানে চাইতে পারব না, এ হাতে পা ছুঁয়ে তাদের প্রণাম করতে পারব না। তুমি ফিরে যাও আজ —হাঁ গাড়ীটা—"

বলিয়া রবীন উঠিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কেমন যেন একটু টলিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

"নাঃ। কি হল। মাথাটা কেমন টলছে, ঘুমেও যেন এলিয়ে পড়ছি। গাড়ীটা—হাঁ তা ঐ ঘণ্টাটা একটু টেপ দেখি বিন্দু—"

বলিতে বলিতে চক্ষু দুটি বুজিয়া কেমন অবশ অবসন্ন ভাবে রবীন ঐ কৌচের উপরেই শুইয়া পড়িল। একটু ভয় পাইয়া বিন্দু ত্রস্ত হইয়া কাছে আসিল, মুখের কাছে একটু নত হইয়া দেখিল, রবীন সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ; স্বাভাবিক ভাবেই নিশ্বাস বহিতেছে। বাহিরের দিকে জানালা দরজা কয়টি খুলিয়া দিয়া কাছে আসিয়া বিন্দু আর একবার চাহিয়া দেখিল। তার পর আলোটি নিভাইয়া দিয়া একখানি চৌকি আস্তে সরাইয়া লইয়া পায়ের কাছে বসিয়া রহিল।

রাত্রি ভোর হইয়া আসিল, রাস্তায় জলসেচনের শব্দ পাওয়া গেল, আলোগুলিও নিভিল ; গাছে দুই একটি পাখীও ডাকিয়া উঠিল, যেন ; পূর্ব্ব-দিকে একটি জানালা খোলা ছিল, উষার মৃদুমন্দ রক্তচ্ছটায় আভা ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, মৃদুমন্দ স্নিগ্ধশীতল বায়ুপ্রবাহ ঘরের মধ্য দিয়া বহিয়া গেল। রবীনের ঘুম ভাঙ্গিল, চাহিয়া দেখিল, বিন্দু তাহার পায়ের কাছে নিঃশব্দে বসিয়া।

[সমাপ্ত

প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্যে ধানের চাষ

—শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

সাধারণ মানব কি ভাবে সহজে নানাবিধ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে, তজ্জন্য বাঙ্‌লার প্রাচীন কবিগণ সবিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বিবিধ ব্রতের সৃজন হইয়াছে ও সেই সকল ব্রতের বিধান এবং অপরাপর সুশিক্ষা ও সদুপদেশমূলক উপাখ্যান দ্বারা বিস্তর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

রামেশ্বরের 'শিবায়ন' রচনারও সেই উদ্দেশ্য। পুরাণ-কর্ত্তারা সাধকদিগের অবলম্বন-নিমিত্ত শিবদুর্গার যে-মানুষী ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, রামেশ্বর শিবকে কৃষক সাজাইয়া তাঁহাদের সেই মানুষীভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। একদা রামেশ্বরের বর্ণিত শিবের পশ্চাতে দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতার মন পড়িয়া থাকিত।

শিবের চাষ-সম্পর্কীয় উপাখ্যানটি চাষী অথবা চাষজীবী অপর জাতীয় লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। শিব স্বয়ং চাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরা যেমন স্বহস্তে চাষের কর্ম্ম না করিয়া কৃষাণদের সাহায্যে তাহা করাইয়া থাকেন ও আপনারা ক্ষেত্রে নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া শস্যাদির তত্ত্বাবধান করেন, রামেশ্বরের শিবও তাহাই করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থের চাষ যেমন অনেক ক্ষেত্রেই ভাল হয় না, শেষে শিবের পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

শিব-ভৃত্য ভীম ধান্য কাটিয়া আড়াই 'হালা'মাত্র ধান্যগাছ প্রাপ্ত হন। শিব ক্রোধান্বিত হইয়া খড় সমেত সেই শস্য ভৃত্যদ্বারা পুড়াইয়া দিলেন। বার বৎসর ধান্য পুড়িতে লাগিল। তৎপরে শিব প্রসন্ন হইলে, সেই দগ্ধ ধান্য হইতে পৃথিবীতে শস্যের বাহুল্য হইল। এই উপাখ্যানের তাৎপর্য্য কি বুঝিতে পারিলাম না। তবে কৃষক জাতির দ্বারা কৃষি হইলে ঠিক হয়, ও দগ্ধ উদ্ভিদে ভূমির সার হয়, এই তত্ত্ব দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। অনেক দেশে ক্ষেত্রের মধ্যে ধান্যের 'নাড়া' জ্বালাইয়া দিবার রীতি আছে, তাহাতে ভূমির শস্যপ্রসবশক্তি বৃদ্ধি পায়।

"চাষের বিবরণ" বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি রামেশ্বর গৌরীর মুখ দিয়া শিবকে বলিতেছেন,—

"শিবে বলে সেই যে সম্পত্তি দিয়াছিলে।
মনে কর মহাপ্রভু কত কাল খাইলে॥
গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে।
ফেলে দিয়া পুরুষ পাসরে সে কি জানে॥
পুণ্যবান লোক পান লক্ষ্মীরূপা নারী।
উত্তম উদ্‌যোগ করি উথলায় গারী॥
অভাগার ঘরে আসে অলক্ষণা মেয়ে।
শতকের গারি দেয় পকাশে উড়ায়ে॥
লঙ্কার বাণিজ্য যদি এনে দেয় ঘরে।
মেয়ে হলে উড়ায় উলুই আঁখি ঠারে॥
শোধন করিয়া সর্ব্বসাধবের ঋণ।
কায়ক্লেশ করিয়া কুলাসু কতদিন॥
ছ'মাসের সম্বল এখন আছে ঘরে।
ফুরাইলে ফেরে কান্ত কষ্ট পাও পরে॥
সঞ্চ রাখি বঞ্চিবার বাঞ্ছা কর শূলী।
বসে খেতে বাঁচে নাই বারিধির বালি॥
পুরুষে উপায় নাই খেতে হইল ঢের।
দিন দুটি ছেল্যার চড়াব পাঁচ সের॥
বিনা অবলম্বনে কেমনে যাবে দিন।

"চিন্তিলাম চন্দ্রচূড় চাষ বড় ধন।
চাষ চষ বারেক কর্ত্তৃক পরিজন॥
চাষী বিনা চাষের মহিমা কেবা জানে।
লঙ্কার বাণিজ্য যদি বাকুড়ির কোণে।
পরিজন পোষে চাষী সুখে সাধু রাজ।
লক্ষ্মী পোষি চাষী করে সবাকারে তাজা।
জীবের নিমিত্ত শিবে করিবেন চাষা।
এইরূপে ঈশ্বরকে ঈশ্যাদির ভাষা॥"

গৌরীর উপরিউক্ত কয়েকটি যুক্তিপূর্ণ কথা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে: (১) গৃহিণীর গুণেই সংসার চলে; (২) পুণ্যবান্ লোকেই লক্ষ্মীরূপা নারীলাভ করেন; (৩)

অলক্ষণা নারী অভাগার ঘরে আসে ; (৪) লক্ষার বাণিজ্যের ফলও সে রক্ষা করিতে পারে না ; (৫) বসিয়া খাইলে রাজভাণ্ডারও নিঃশেষ হয়। (৬) কৃষিকার্য্যই পরম ধন ; (৭) চাষী ব্যতীত কে চাষের মহিমা জানে ? এবং (৮) চাষীই দেশকে বাঁচাইয়া রাখে।

অতঃপর চণ্ডী শিবকে "ব্যবসায়ের বিচার" প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহ উদাসীন হও ছাড় পরিজন॥

শিব চণ্ডীকে তদুত্তরে বলিতেছেন,—

"দেবতার পোদবৃত্তি বড়ই লঘুতা।
ভিক্ষা দুঃখে সুখে আছি অকিঞ্চন পানে।
চাষ চষে বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে।
শুনিতে সুন্দর চাষ আয়াস বিস্তর।
সকল সম্পূর্ণ আর তার নাহি ডর।
চাষ বলে ওরে চাষী আগে তোরে খাব।
মোরে খাবি পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব॥
অনেকে আয়েসে চাষে শস্য উপস্থিত।
শুখাহাজা পড়িলে পশ্চাতে বিপরীত॥
গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।
বার করে সকল বেচিয়া লয় রাজা॥
ক্ষেতে দেখে খন্দ যদি খেতে নাহি পায়।
কুতকাতে কায়েত কিমগতি করে তার॥
কাদা পানি খেয়ে খেটে করে চাষিপণা।
নরোত্তম ছাড়ি নরাধম উপাসনা॥
চাষ অভিলাষ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী।
আর কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি॥"

শিবের এই উক্তি হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারি : (১) যার কর্ম্ম তার সাজে ; (২) কৃষি-কর্ম্মে বিস্তর উদ্বেগ ; (৩) কৃষি আগে কৃষকের দেহের শক্তি হরণ করে, পরে কৃষক কৃষিজাত শস্যের শক্তি পাইয়া থাকে ; (৪) শস্যক্ষেত্রে শুখা-হাজার ভয় আছে ; (৫) গরীব কখনও তাজা শস্যের মালিক হইতে পারে না এবং (৬) কৃষকের কৃষিকাজ করা শোভা পায়, সাধকের তাহা সাজে না।

শিবের এই উত্তর শুনিয়া ভগবতী বলিতেছেন,—

"বিচক্ষণা ব্যবসায় বিচারিয়া কয়।
বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী, সে তোমাতে নয়।
পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।
মহেশের সে ত নাহি সকলি অমূল।
চাষ বিনা আর কোন কর্ম্মযোগ্য তুমি।"

ইহার মূল কথা : (১) ব্যবসায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; (২) বাণিজ্যে লক্ষ্মী বসেন ; এবং (৩) পুঁজি আর প্রবঞ্চনাই বাণিজ্যের মূল।

পার্ব্বতীর এই কথার উত্তরে শিব বলিতেছেন,—

"ত্রিলোচন তাঁরে কন, তবে চাষ করি।
হলের সামাল কিসে হইবে সুন্দরী॥
কোথা হেলা, কোথা হালুয়া কোথা বা লাঙ্গল
রামেশ্বর বলে দেবী দিবেন সকল॥"

শেষ পর্যন্ত মহাদেব চাষ করিতেই সম্মত হইলেন। শ্রীদুর্গা তাঁহাকে শক্তি ও সাহস যোগাইতে লাগিলেন। এ-যুগে যেমন শস্যাদি "বাড়ি" করিবার বা দিবার রীতি আছে, সে-যুগেও এ-প্রথা প্রচলিত ছিল। পার্ব্বতী কৃষি-কার্য্যের পরামর্শপ্রসঙ্গে শিবকে বলিতেছেন,—

"কুবেরের বাটী বীজ বাড়ি করে আন।
তুমি চাষ চষিলে কিসের অসম্ভাব।
শক্রের সাক্ষাৎ হৈলে সব তুমি লাভ।
ঘরে আছে বুড়ো এঁড়ে ধরে মহাবল।
যমের মহিষ আন বলাইর লাঙ্গল॥
ভীম আছে হালুয়া আর অনিবাহ কি।"

এই সূত্রে আমরা কৃষিকার্য্যের উপাদানগুলির একটি মনোরম বিবরণ পাইতেছি : (১) প্রয়োজনীয় বীজধান্য 'বাড়ি' করা চলে ; (২) মহাজনের কাছে জমি মিলে ; (৩) গৃহে ষাঁড় ও বলদ আছে ; (৪) জোয়ান মহিষ ও শক্ত লাঙ্গলও পাওয়া যায় ; (৫) ভীমশক্তিধর কৃষাণও রহিয়াছে।

এক্ষণে পার্ব্বতী মহাদেবকে লাঙ্গল প্রস্তুতের উৎকৃষ্টতম প্রণালী বর্ণনা করিতেছেন,—

"দেখ বিনা বেতনে বিশাইয়ে বলে কালি।
গাছ কাটি গড়াইব লাঙল জোয়ালী॥
খাত করো ঘরে তারে পাতাইব শাল।
শূল ভাঙ্গি সাজ-সজ্জা করাইব ফাল॥
বসিবার বাঘছালে জাঁতা দিউক তোমা।
পাদুকে ফেলুক প্রেত চিতাজার বর্য্যা॥
গেল দুঃখ গঙ্গাধর আর ডর কারে।
মনে কর ভোলানাথ ভাত হৈল ঘরে।"

এই প্রসঙ্গে দেখা যাইতেছে : (১) গাছ কাটিয়া লাঙ্গল জোয়াল গড়ান চলিতে পারে ; (২) আঘাত করিয়া তাহাতে কাঁটা পেরেক ইত্যাদিও বসান যায় ; (৩) শূল ভাঙ্গিয়া অন্যান্য সাজসজ্জার গঠনে কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে ; (৪) জাঁতা করিবার নিমিত্ত ঘরেই চর্ম্ম রহিয়াছে। পার্ব্বতীর এই প্রস্তাবে শিব অবশ্য রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন, কিন্তু সুকৌশলে পার্ব্বতী শিবকে সন্তুষ্ট করেন।

শিব চাষ ত করিবেন, কিন্তু ভূমি কোথায় ? শিব ইন্দ্রের নিকট ভূমি প্রার্থনা করিলেন। অচিরেই তাহা মিলিল।

"ভূমি তুমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ।"

শিব ইন্দ্রের নিকট চাষভূমির পাট্টা গ্রহণ করিলেন। এই প্রসঙ্গে কবি রামেশ্বর লিখিতেছেন,—

"ইন্দ্র বলে আজি হতে অন্ন দিব আমি।
কাজ নাই চাষে বাসে বসে থাক তুমি॥
ভূতো কেন ভূমি মাগ ভূমিস্বামী হয়ে।
যত পার জোত কর কাজ নাই কয়ে॥"

সংসারতত্ত্বে অনভিজ্ঞ শিব বলিলেন,—

"...কিছু চক্রবক্র আছে।
খন্দ হলে ক্ষেতে তুমি খন্দ কর পাছে॥
বিপক্ষীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
পাটাখানি পেলে পরিণাম শুদ্ধ হয়॥"

জনসাধারণ যে-শিবকে জানেন তিনি সংসার বিষয়ে নিতান্ত অপটু, কিন্তু কবি রামেশ্বরের শিব একজন অভিজ্ঞ বিষয়ী। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

"আজ্ঞা কর কোনখানে কত ভূমি লবে ?

মহাদেব বলিতে লাগিলেন,—

"...তৃপান্তর কোচপাশে পড়া
দেববৃত্তি গোবৃত্তি বিপ্রের বৃত্তি ছাড়া॥
একত্র শঙ্কর চক চষকের স্থান।
দেবী চক দ্বীপ দিবে করিতে বিশ্রাম॥
চষকের তরে তুমি চাহ কতখানি।
আর যায় বিচারী বলিছে শূলপাণি॥
গণেশের যোল বাটী বিশ্বাসের যায়।
অতিথির দশ দাস দাসীদের তের॥
শঙ্করের পঞ্চাশত শঙ্করীর শত।
ঠিক দিয়া দেখহ একুনে হৈল কত॥"

অতঃপর ইন্দ্র

"দেবসেবে দিলা লিখে দেবোত্তর পাট্টা।"

শিব যে বুদ্ধিতে অসামান্য ছিলেন, নিম্নের ছত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

"...বাপু এই কালে কই !
দেখ আমি দুঃখী চাষী প্রধান নই॥
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হবে সাবধান।
অঙ্গীকার কৈল ইন্দ্র তবে নিল দান॥"

একণে ইন্দ্রের মত প্রভাবশালী মনিব না থাকিলেও অতি-বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির জন্য ফসলাদি না জন্মিলে রায়তগণ খাজানা প্রভৃতি হইতে রেহাই পাইয়া থাকে।

ঈশ্বরীর ইচ্ছায় বিশাই

"লাঙ্গল জুয়ানী মই সত্ত দিল গড়ে।"

পার্ব্বতী পূর্ব্বেই বিশাইকে পরামর্শ দিয়াছিলেন,—

"শাল পাতি শূল ভাঙি সজ্জা কর বসি।
জোয়ালি কোদাল ফাল দা উখুন পাশী॥

শিবের কৃষিযন্ত্রাদির ওজন প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,—

"তুলে করে শূলে ধরে তৌলিল তখন।
ঠিক সায়া হইল খায়া ছুশ দশ মন॥
পাঁচ মনে পাশী করি আশী মনে ফাল।
দু মনেব দু জলোই অর্দ্ধেকে কোদাল॥
দু মনের দা অষ্ট মনের উখুন।
দুশো দশ মনে দেখ করিয়া একুণ॥"

শিবের শূল কিছুতেই গুঁড়া হইল না। কিন্তু সমসাময়িক দিনের অপূর্ব্ব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শূল দ্রব হইয়া গেল।

"চাষের সজ্জা প্রস্তুত করণ" উদ্যোগে দেখিতেছি,—

"বৈকবী বিচারি বিষ্ণুরস কৈল মূল।
দেবদেব দ্রবে তবে দ্রব হয় শূল॥
বিশাই বুঝিয়া কার্য্য করে সাবধানে।"

"জোলুয়ে নেজনা যুড়ি যুড়ে রাখে আল।
ঈষ ধরে পাশী মেরে পরাইল ফাল॥
বাঁট দিয়া কোদালি জোয়ালি দিল সলি।"

এইবার "রাড়ি বীজ-ধান্য" আনয়নের পালা পড়িল। কুবেরের নিকট "বাড়ি ধান" চাহিতেই কুবের বলিলেন,—

"যক্ষ রাজ্যে রক্ষক রেখেছ নিজধনে।
যত চাহ ধান্য লই যায় মাগ কেনে॥"

ভীম কৃষাণ

"পেয়ে ভরসা জাগায়ে দিল হাত॥
ধান্য ঘর দেখিয়া বিস্তর যুড়া বুড়া।
যায় বুড়ি বাখারে বাঁধিল এক পুঁড়া॥"

শিব পুনরায় ঘরে আসিয়া বিশ্রামে মত্ত হইলেন এবং ভগবতীকে বলিতে লাগিলেন,—

"গৃহস্থ থাকিলে ঘরে পরে চাষ বৃথা।
ভাতে পুঁতে ভাল চাষ অভাবে সোদর।
অন্যথা হাতাতে হেলা বিকায় সত্বর॥
ভাব রেখে ভীম দিয়া চাষ চষ তবে।
পেট ভরে ঢের করে দশ হাতে খাবে॥"

ভগবতী শিবকে আদৌ বসিয়া থাকিতে দিলেন না। বাধ্য হইয়া শিব চলিলেন।

"চন্দ্রচূড় চলে বৃষে চণ্ডী রন চেয়ে।
পাছু ভীম চলিলা চাষের সজ্জা লয়ে॥"

শিবের চাষ আরম্ভ হইয়া গেল। শিব পৃথিবীতে আসিয়াই

"দেবীর চকে দ্বীপের উপরে কৈল স্থিতি॥"

প্রকৃতিও অনুকূল।

"মনে জানি মঘবান মহেশের লীলা।
মহীতলে মাঘশেষে মেঘরস দিলা॥"

বস্তুতঃ মাঘের শেষে বৃষ্টি কৃষি-কার্য্যের পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী।

"দিন সাত বই বাত পাইয়া ঈশানে।
হৈল হলপ্রবাহ শিবের শুভক্ষণে॥
আরম্ভ উগালা গেল এক শত কুড়া।
পড়ে গেল পাশে যেন পর্ব্বতের চূড়া॥
হাল ছাড়ি দুদণ্ড হালুয়া আইল ঘরে।
বান্ধি আলি বৈকালে বাঁধিলা এক পরে॥
ছোট হালুয়া হুঙ্কারে চোটায়ে তুলে চাপ।
শঙ্কর সাবাসি দেন বটে মোর বাপ॥
হেল্যা চড়াইতে হালুয়া বান্ধিলেক ঝাড়ি।
মধ্যখানে খানিক খসায়ে দিল ডালা।
দক্ষিণ মোহান হৈল জল যেতে নালা।
শর আরোপিয়া পগারের চারি পাশে।
সাঁজে শিব সেবক সহিত আইল বাসে॥"

অনন্তর কৃষাণ ভীম শিবের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিল। সে সারাদিন পরিশ্রমে কাতর

"ক্ষেতে খাটি ক্ষুধা বড় খাব কিহে মামা।"

শিবকে তখন বাস্তবিক আর দেবতা বলিয়া মনে হইতেছে না,—গ্রামের কোন 'শিবচরণ'-কেই যেন দেখিতেছি। ক্ষুধার্ত্ত ভীমকে শিব বলিলেন,—

"ভাত খেয়ে প্রভাতে আসি চষ চাষ।"

কৃষাণ ভীম স্বস্তি পাইল না—

"সারাদিন খাটি ক্ষেতে খেতে যাব সেথা।"

বিগলিত হইয়া শিব বলিলেন—

"...বসে থাক তুমি।
যত খাবে এই খানে খাওয়াইব আমি॥
অগ্রভাগ বীজ রাখ বুনিবার তরে।
লুড়া ভাঙ্গি ফেলি রাখ পড়ে থাকু ঘরে॥
চাকরের চারা নাই যা করেন নাথ।
রামেশ্বর বলে হর খাওয়াবেন ভাত॥"

অতঃপর দেখিতেছি,—

"ভূতনাথ ভাত দিয়া ভীমে কৈল তুষ্ট।"

পুনশ্চ

"অন্নভাতে এমতে কেমতে ধরে টান।
অন্নপূর্ণা অন্নের উপরে অধিষ্ঠান॥
চিরকাল ক্ষুদ্ধ ছিল খাইল স্বচ্ছন্দ।
আশীষ করিল ক্ষেতে হউক ভাল খন্দ॥
কত কর কাচা চালু কৃষাণের প্রাণ।

খাস্ত জানা গেল নাই এই কালে কই।
চাকরের চালু চাই চারি দণ্ড বই॥
নারদের ঢেঁকি লয়ে ধান ভানে ভূত।
বাতাসে বাবলা ভূত উড়াইল তুষ॥"

এই প্রসঙ্গে শিবের শস্য-ক্ষেত্রে শস্যোৎপত্তি বর্ণনা করিতে কবি লিখিতেছেন—

"এই রূপে প্রতিদিন যায় রাত্রি কাল।
ভীম করি ভোজন প্রভাতে যুড়ে হাল॥
চারি দণ্ড চষে চন্দ্রচূড় থাকে বসি।
উড়ায়ে লাঙ্গল যেন উড়ু যায় খসি॥
পাঁচ পাঁচ কুড়া তার পড়ে যায় পাকে।
পাশে ফেলে পায় বলে যায় হালে রেখে॥
আয়ুধের কড়কড়ি কুদ্দালের মাঝে।
হুঙ্কারে হাঁকয়ে ঘন মেঘ যেন গাজে॥
হাল ছাড়ি হালুয়া যবে করে জলপান।
হেল্যাকে চরণে হর হয় বলবান॥
দিন দশে দু হেল্যার কাঁধ গেল বসে।
ধুতুরার সত্ব তাতে শিব দিল ঘষে॥"

এক্ষণে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই: (১) বর্ত্তমান কালের কৃষাণদের মত ভীমও প্রত্যহ সকালে খাইয়া মাঠে

যাইত; (২) চারি দণ্ড বেলা অবধি হল চষিত; (৩) শিব নিজে বসিয়া থাকিয়া তদারক করিতেন; (৪) পাঁচ কুড়ো পরিমাণ জমি প্রত্যহ চাষ করিত; (৫) ভীম বিশ্রাম লইলে শিব গোচারণ করিতেন; (৬) বলদের কাঁধ চটিয়া গেলে শিব ধুতুরার নির্য্যাস তাহাতে ঔষধস্বরূপে লাগাইয়া দিতেন।

বলদ কষ্ট পাইলে চাষীর কি পরিমাণ নিগ্রহভোগ করিতে হয়, তাহার বর্ণনায় কবি লিখিতেছেন,—

"হেল্যার দেখিয়া দুঃখ হয়ে হৈল মো।
কালে কালে কৈল হাল কামাক্রের যো॥
সেই সেই দিনে যার হয় হলযোগ।
ধরাশস্য হয়ে ধানে ধরে নানা রোগ॥
বৃষ-কাঁদে বাসব বরিষে নাহি বাড়া।
তেঞি তো হাতাতে চাষী হয় লক্ষ্মীছাড়া॥
হাল কামায়ের দিন হয় দেব বলে।
গাছি মার হুড়া ঝাড় আড়ে কেল তুলে॥

শিবের শস্য-ক্ষেত্রে কর্ষিত হইল।

"চৈত্রে গেল চতুর্দ্দশ চাষ হৈল পূর্ণ।
মাঠ মৈ দিয়া করে মাটি সব চূর্ণ॥
উচ্চ নীচ চালিয়া সমান কৈল সব।
উত্তরাংশে উন্নত দক্ষিণ দিকে প্রব॥
বৈশাখে বিছাতি কৈল সুলক্ষণ দিনে।
সারবর্জী সারি ভূমি ভূমি বাতে বুনে॥"

এবার দেখিতেছি যে, শিবের বীজ বপন করা ব্যর্থ গেল না।

"ব্যর্থ নাহি গেল বীজ বাড়াইল ঘন।
লহ লহ করে পত্র বলাহক যেন॥
হর্ষ হয়ে হর ধান্য দেখে অবিশ্রাম।
কালিন্দীর কূলে যেন নবঘনশ্যাম॥
হাপুতির পুত্র যেন নির্ধনের ধন।
ধান্য দেখি রহিলা পাসরে পরিজন॥"

উপযুক্ত সময়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিলেন,—

"পথে পঙ্ক সঙ্কোচ পৃথিবী পয়োময়।
নদী নালা পূর্ণ হয়ে মহাবেগে বয়॥"

এই প্রসঙ্গে কবি রামেশ্বর শস্যক্ষেত্রের অনিষ্টকারী পঙ্গপালের অত্যাচার-কাহিনীর যে অনবদ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যেমনই মারাত্মক, তেমনই স্বাভাবিক—

"এখন উঞানি আসি ক্ষেত্রের ভিতরে।
ক্ষেরে ক্ষতবিক্ষত করিল দিগম্বরে॥
তৈলহীন তনু তাহে তৃণাঙ্কুরে পেয়ে।
বাকী নাহি কোন খানে খুন কৈল খেয়ে॥
ভীমের উপরে আগে উঞানির দণ্ড।
কামড়ায়ে কলেবর করে খণ্ড খণ্ড॥
কর্ণ ছাড়ি কান্দিয়া কর্ষিন মাথে পায়।
মই লয়ে দুটি হেল্যো পলাইয়া যায়॥

শুধু মশার উপদ্রব নহে, ডাঁশ মাছির অত্যাচার সীমা ছাড়াইয়া গেল।

"ডাগর ডাগর ডাঁশ চারিদিক জুড়ে।
চলিল চঞ্চল মাছি ডাকি যায় উড়ে॥
প্রাণভয়ে পালান শিব যায় তেড়ে।
ধরণী লোটান ধন ধানবনে পড়ে॥
বাড় বাড় করে ভীম বাপ, বাপ, বলা।
কামড়ে কাতর হয়ে কান্দে দুটি হেল্যা॥
জর্জ্জর শোণিতধারা সকল শরীরে।
দড়ি ছিঁড়ে মহিষ প্রবেশ কৈল নীরে॥
হাঁটু পাতি বুড়া এঁড়ে বসি গেল পাঁকে।
ঠাঁই জানি ঠোঁটা কাক ঠোকরায় তাকে॥
আসিয়া চটপটে মাছি বসিলেন তায়।
মাংসেতা পড়িয়া মাত্র কৃমি হৈল তায়॥
রক্ত পড়ে হাঁড় কাকে গাঢ় করে বেয়ে।
হোগলের বনে বৃষ লুকাইল গিয়ে।"

অবশ্য প্রতিষেধক ঔষধের আবিষ্কারও হইয়াছিল।

"ঘৃত মাখি ঘুচাইল সবার যন্ত্রণা॥
হেল্যার কিয়ারী করি কৃমি কৈল দূর।
তাহাতে রসুন তেল দিলেন প্রচুর॥"

অন্যত্র মশক নিবারণে,—

"তুষ যত করে জড় শিব আনিলেন খড়
কড় কড় লাগাইল ধূম।
ধূমের জ্বালায় মশক পালায়
নয়নে আসিল ঘুম॥"

এদিকে শস্যক্ষেত্র নিড়াইবার সময় হইয়াছে। ভীম শিবের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিতেছে,—

"চলে-মাই চরণ চাহবার পাইট বর॥
পাইট বয়ে গেলে কৃষি হয়ে হইল কি।
দিন কত থাকে ক্রান্ত নিড়াইয়া দি॥
কুয়ালে যেবাক পাট ধান্য আসিবেক কুলে।"

এবার জোঁকের উপদ্রব আরম্ভ হইল। কিন্তু ভোলানাথ তাহার ধ্বংস করিলেন। ভীম শস্যক্ষেতে নিড়ান দিতে সুরু করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কবি রামেশ্বর লিখিতেছেন,—

"ক্ষেতে বসি কুষাণে ঈশান দিলা বলে।
চারি দণ্ডে চৌদিকে চৌরস কৈল চেলে॥
আড়ি তুলি ধারে ধারে ধরাইল ধান।
হাঁটু পাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥
বাবুর্চ্চে বনাটে চেচুঁড়া ঝাড়া উড়ি।
শুলামুথি পাতি পারে পুঁতে যায় শুড়ি॥
দলদূর্ব্বা সোলা শ্যামা ত্রিশিরা কেশুর।
গড় গড় নানা খড় উপাড়ে দুর দুর॥
থর থর খুঁজিয়া খড়ের ভাঙে ঘাড়।
কুলি ধরি ধাইল ধান্যের কড়ি ঝাড়॥
কিতা জুড়ি জিতা বেড়ি মাঝে গিয়া রয়।
উলট পালট করে যার পাঁচ ছয়॥
বাদ নাহি বাধ যেন বসি থাকে বুড়া।
সার্দ্ধ যামে সারি উঠে শত শত কুড়া॥
ঘাস কেটে বোঝা বেঁধে বাসে যায় চলে।
এইরূপে প্রতিদিন পাইটগুলি করে॥
প্রভাতে নিড়াতে যায় আসে দেড় পরে॥"

জোঁকের উৎপাতে শিব রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া,—

"চেয়ে চন্দ্রচূড় চূনে লুনে দিল ঘষে।
রক্ত কান্তি করি মৈল সব গেল খসে॥"

এইবার শিবের শস্যক্ষেত্রে ধান পাকিবার উপক্রম করিল।

"যুক্তি করি জল কাটে জল বয়ে যায়।
অর্দ্ধ ভাদ্রপদ মাসে রৌদ্র পাইল ধান॥
পিছু পরিপূর্ণ করি বান্ধিলেন জল।
ডুবে রয় থাড় যেন দেখা যায় জল॥
আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে নাহি করে হেলা।
পদাঘাতে যোগ মারে ঘারে দেই চেলা॥
ডাকসংক্রমণ দিনে ক্ষেতে পুতে নল।
কার্ত্তিকের কতদিনে কেটে দিল জল॥
ধরণী সুধন্যা হৈল ধান্য আইল ফুলে।
ভোলানাথ ভবানীকে রহিলেন ভুলে॥"

এতদিনে পার্ব্বতীর সুপরিচালনার গুণে, মহাদেবের অতীব চেষ্টায়, ভীমের কায়িক পরিশ্রমে পৃথিবী শস্যশালিনী হইলেন। কবি রামেশ্বর ইহার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন,—

"প্রণমিয়া বিশ্বনাথে বৃকোদর নাস্বে ক্ষেতে
হাতে লয়ে দশ মণের দাত্র।
ফিরিয়া চলিল খেয়ে দুদণ্ডে নিলেক দায়ে
হইল আড়াই হালা মাত্র॥"

শিব ক্রুদ্ধ হইয়া ভূতাদারা খড় সমেত এই শস্য পুড়াইয়া দিবার অনুমতি করিলেন। শিব বলিলেন,—

"আমি চষাইনু চাষ পুষিতে জীবের আশ
অনল হবেন অনুকূল।
তাতে সে করিব আমি সাক্ষাৎ দেখিবে তুমি
শিবপদ সকলের মূল॥"

দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া সেই ধান পুড়িতে লাগিল। এইবার—

"শিবদুর্গা দৃষ্টি মাত্র তুষ্ট হয়ে বীতিহোত্র
মূর্ত্তিমান হয়ে দিলা বর॥
এক শস্য দিলে মোকে নানা শস্য হবে লোকে
দক্ষশেষ স্পর্শ ভগবতী।
বলি অগ্নি অন্তর্দ্ধান দ্বিজ রামেশ্বর গান
যে যে শস্য জনমিল তথি॥"

দ্বিজ রামেশ্বরের "গীত-সমাপ্তির" বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে-সমুদায় শস্যের উল্লেখ দেখিলাম, তাহা প্রাচীন ও নবীন বাঙ্‌লার গৌরবের সামগ্রী। চণ্ডীপুথিতে অপর কোন প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্যে ধান্যের এরূপ বৃহৎ নামতালিকা পাই নাই। দ্বিজ রামেশ্বরের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এইখানেই। তালিকাটি এই প্রকার—

"হরিশঙ্কর হইল ধান্য হাতিপাঞ্জর হড়া।
হরকুলি হাতিনাদ হিকি হলুদগুঁড়া॥
খেজে কামু বেজোজিরা কালিকা কার্ত্তিকা।
বয়া কচ্ছা কাশীফুল কপোতকণ্ঠিকা॥
কালিন্দী কটকী কুসুম শালী কনকচুর।
ওধরাজ দুর্গাভোগ পদ্মেশ্বরী ধুস্তুর॥
কৃষ্ণশালী কোঙরভোগ কোঙরপূর্ণিমা।
কাশীগতা কনকলতা কামোদ গরিমা॥
খেজুরথুপী খায়রশালী ক্ষেম গঙ্গাজল।
গয়াবলী গোপালভোগ গৌরী কাজল॥
গন্ধমালতী গুয়াথুপী গুণাকর।
চামরচালি চন্দনশালি কৈল তার পর॥
ছত্রশালি জটাশালি জগন্নাথভোগ।
জামাইলাড়ু জলারাঙ্গী জীবন সংযোগ॥
ঝিঙ্গাশালি দলাভোগ ধুল্যা বিলক্ষণ।
নিমুই নন্দনশালি রূপ নারায়ণ॥
পাতসাভোগ পায়রারস পরমসুন্দর।
পিপিড়াবাঁক তিলসাগরী কৈল তার পর॥
বাঁকশালি বাকোই বুথাৰী দাড়বঙ্গী।
বাঁচুর বুকামাত্রা রামশালি রাঙ্গী॥
রাঙ্গা মেটা রামগড় বঞ্চন করি।
পুণ্যলক্ষ্মী ধান্য রাখে নাম ধরি ধরি॥
লক্ষ্মীপ্রিয় লাউশালি লক্ষ্মীকাজল।
ভোজনা ভবানীভোগ ভুবন উজ্জ্বল॥
সীতাশালি শঙ্করশালি শঙ্কর জটা।
এই মত আর কত হৈল ধান্য ঘটা॥"

কবি দ্বিজ রামেশ্বর তাঁহার শিবায়ন কাব্যে মা লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার স্তব সমাপন-প্রসঙ্গে যে-স্তুতি করিয়াছেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি,—

"লক্ষ নাম লক্ষ্মী হয়ে কৈল লোকহিত
কত নাম কব তার কহিনু কিঞ্চিৎ।"

মধুসূদন-ভারতচন্দ্র সংবাদ

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মধুসূদন। আঃ কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে—মৃত্যুর পরেও শান্তি পাব না?

এক ব্যক্তি। কেন কি হয়েছে?

মধুধুসূদন। তুমিও বাঙালী দেখছি! আমার মৃত্যু-শয্যার শিয়রে বাঙালী কবিরা কলম উঁচিয়ে বসে ছিল, যেমনি নাভিশ্বাস উঠেছে, অমনি কবিতার বান বইয়ে দিলে। আরে ভাল করে মরতেই দে!

এক ব্যক্তি। কেন?

মধুসূদন। দু'চারটে লাইন কানে ঢুকেছিল!

এক ব্যক্তি। তা'তে ক্ষতি কি?

মধুসূদন। ক্ষতি কি! ওই শব্দগুলো এক ঝাঁক মৌমাছির মত তাড়া করে আসছে। মৃত্যুর বিস্মৃতিতেও ওদের আটকাতে পারেনি। কি কুক্ষণেই লিখেছিলাম "রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" মধুচক্রে মধুর সন্ধান পেলাম না, মৌমাছির হুলের দংশনে কাণ দুটো গেল।

এক ব্যক্তি। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

মধুসূদন। পরিহাস বলে' পরিহাস। একেবারে কাণ ধরে পরিহাস। আচ্ছা তুমিও তো বাঙালী, এমন কবিতা জান যাতে কাণ জুড়িয়ে যায়।

এক ব্যক্তি। জানি বই কি!

মধুসূদন। আবৃত্তি কর—কাণ জুড়োক।

এক ব্যক্তি। পছন্দ হবে কি! আচ্ছা তবে শোন

"অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী
ত্বরায় আনিলা নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফেরফার॥"

মধুসূদন। আঃ এতক্ষণে কাণ জুড়লো। থেম না, থেম না, আবৃত্তি করে' যাও—

এক ব্যক্তি। "বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হ'য়ে
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুইব বল॥
পাটনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন
সেঁউতি-উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥"

মধুসূদন। এ যেন সোনা কবিতা! কিন্তু তাহোক, তুমি বলে যাও।

এক ব্যক্তি। "পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধোয়ায়
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতি-উপরে
তার ইচ্ছা নাহি হলে কি তপ সঞ্চারে॥
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥

মধুসূদন। গ্র্যাণ্ড! শুধু সেঁউতি কেন আমার হাতে পড়লে সমস্ত নৌকাখানাই সোনা করে দিতাম, সেই হত আমার সোনার তরী; পরবর্ত্তী কোন কবির জন্য এ'কাজ আর বাকি রাখতাম না! চমৎকার—এতক্ষণে কাণের গ্লানি গেল।

এক ব্যক্তি। কিন্তু মধুসূদন, বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে যে লোকটাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ঈর্ষ্যা করতে এ যে তারই কবিতা।

মধুসূদন। কৃষ্ণনগরের সেই লোকটা?

এক ব্যক্তি। এতই অবজ্ঞা যে তার নামও করতে নেই!

মধুসূদন। ভারতচন্দ্র!

এক ব্যক্তি। যাক, তবু তোমার মুখে রামনাম শোনা গেল!

মধুসূদন। বড্ড পরিহাস করে নিলে।

এক ব্যক্তি। কিন্তু আমার পরিহাস বোধ হয় অদৃষ্টের পরিহাসের মত অঙ্গ স্পর্শ করে নি।

মধুসূদন। নিশ্চয় নয়। আজ একবার ভারতচন্দ্রকে সম্মুখে পেলে খুব করমর্দ্দন করে নিতাম।

এক ব্যক্তি। এই তো হাত বাড়িয়ে দিয়েছি—কর না।

মধুসূদন। তুমি! বাই জোভ!

[প্রবল ভাবে করমর্দ্দন]

ভারতচন্দ্র। আঃ হাতখানা গেল যে।

মধুসূদন। যাক্! আমার যে কাণ যেতে বসেছিল।

ভারতচন্দ্র। আমি বাঁচিয়ে দিলাম—আর এই কি তার প্রতিদান।

মধুসূদন। ঠিক। ও বিদেশী কায়দায় আর নয়; এই নাও নমস্কার।

ভারতচন্দ্র। নমস্কার। মধুসূদন তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। যে-পয়ার পায়ের বেড়ি তুমি বঙ্গভাষার পা থেকে খসিয়েছ বলে গৌরব বোধ করতে, সেই পয়ার আজ তোমার এত মিষ্টি লাগল কেন?

মধুসূদন। কথাটা আগে ভাবি নি—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কি জান, নূপুর আর বেড়ি তৈরি করবার ধাতু একই, ভঙ্গী আলাদা। বহুদিনের অভ্যাসে যাদের হাত বেহাত হয়েছে তারা নূপুর গড়তে গিয়ে বেড়ি তৈরি করে বসে।

ভারতচন্দ্র। যদি তাই হয় তবে দোষ হাতের, নূপুরের নয়।

মধুসূদন। আর যাদের কাণ ধ্বনির সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ধরতে পারে না, তারা বেড়ির শব্দে আর নূপুরের শব্দে ভুল করে বসে।

ভারতচন্দ্র। সে দোষ কাণের, নূপুরের নয়।

মধুসূদন। ও রকম সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সম্ভাবনা কোথায়? ভুলটা ভুলই, দোষ যারই হোক।

ভারতচন্দ্র। কিন্তু অকবিদের স্থূল হস্তাবলেপে পয়ার যদি গোময়লিপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে কবিদের উচিত তাকে ধুয়ে নির্ম্মল করে প্রকাশ করা, অবিচারে ত্যাগ করা নয়।

মধুসূদন। হয় তো তোমার কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু যুগধর্ম্ম নাম?

ভারতচন্দ্র। যুগধর্ম্ম কাকে বলছ?

মধুসূদন। পয়ারের যুগ চলে গিয়েছে।

ভারতচন্দ্র। সাহিত্যিক পত্রিকার বর্ষফল-গণনা আমাদের সময়ে ছিল না, কাজেই আমি তাতে অভ্যস্ত নই; এখন "কেবা রাজা, কেবা মন্ত্রী" বলতো—

মধুসূদন। এখন শুক্র রাজা, বুধ মন্ত্রী।

ভারতচন্দ্র। অস্থার্থ—

মধুসূদন। শুক্র দৈত্যগুরু; পশ্চিমের অসুরদের এখন আমরা গুরুর গৌরব দিয়েছি, তাই শুক্র আমাদের আরাধ্য।

ভারতচন্দ্র। সেই দৈত্য গুরুকন্যা দেবযানী এসেছেন ভারতের ব্রহ্মচারী কবির মনোহরণ করবার জন্য।

মধুসূদন। চমৎকার বলেছ। এক্যাক্টলি।

ভারতচন্দ্র। ওই বিদেশী শব্দগুলো বাদ দিয়ে বল।

মধুসূদন। "অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল"—সে যুগের যে ধর্ম্ম।

ভারতচন্দ্র। আমার অস্ত্রেই আমাকে মেরেছ। কিন্তু বেচারা কচের অবস্থা স্মরণ করে দেখেছ।

মধুসূদন। দেখেছি বই কি। তোমাদের পৌরাণিক কচ ছিল—

ভারতচন্দ্র। হাঁ, হাঁ, আর বলতে হবে না, ইঙ্গিতেই বুঝে নিয়েছি

মধুসূদন। পারবেই তো! "বুঝে লোক যে জানে সন্ধান!" এ যুগের কচ দেবযানীর প্রণয়কে উপেক্ষা করে স্বর্গের মরীচিকার দিকে ছুটে যাবে না; এ যুগের কচ দৈত্যগুরুর বিদ্যার সঙ্গে দৈত্যগুরুর কন্যাকেও গ্রহণ করবে। এই হচ্ছে আমাদের নূতন যুগের বিদ্যাসুন্দরের

উপাখ্যান। আঃ কথা বলতে বলতে তোমার কাব্যের সীমানায় এসে প্রবেশ করেছি।

ভারতচন্দ্র। সে জন্য বিরক্তি কেন?

মধুসূদন। বাংলা সাহিত্যে তোমাকেই এক মাত্র আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে স্বীকার করতাম।

ভারতচন্দ্র। মধুসূদন, বাংলা সাহিত্যের আঙিনা যথেষ্ট উদার; তাতে তোমার আমার এবং আমাদের বড় আরও অনেকের স্থান হবে।

মধুসূদন। আমার চেয়েও বড়!

ভারতচন্দ্র। পৃথিবী বিপুল, কালও নিরবধি। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এই যে নবযুগের উল্লেখ করলে, ওতে কি সত্যিই বিশ্বাস কর?

মধুসূদন। নিশ্চয়!

ভারতচন্দ্র। নবযুগের জন্য এত অকাল ব্যগ্রতা কেন? পুরাতন যুগের কর্ত্তব্য কি শেষ করেছ?

মধুসূদন। সে ভাবনা আমার নয়। আমি নব-সূর্য্যোদয়ের আলো-অন্ধকারের মধ্যে ছায়াশরীরী আসন্ন নবযুগকে লক্ষ্য করেছি।

ভারতচন্দ্র। সে ছায়াশরীরী সত্তা নবযুগ নয়; পুরাতন যুগের অতৃপ্ত প্রেতাত্মা বুভুক্ষু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

মধুসূদন। নাঃ, তুমি নেহাৎ রক্ষণশীল।

ভারতচন্দ্র। আমি বৈপ্লবিক রক্ষণশীল।

মধুসূদন। সে আবার কি?

ভারতচন্দ্র। আমি রক্ষণশীলতার দ্বারা বিপ্লব আনয়ন করব।

মধুসূদন। তার উপায় কি?

ভারতচন্দ্র। প্রথমে রক্ষণশীলতাকে রক্ষা করতে হবে।

মধুসূদন। সেটা কি করে হবে?

ভারতচন্দ্র। পয়ার ছন্দ দিয়ে।

মধুসূদন। একটু বুঝিয়ে বল।

ভারতচন্দ্র। কথায় কথায় সেখানে ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছবো। তার আগে তোমার বর্ষফলের বুধের মন্ত্রিত্বের গুণ সম্বন্ধে কিছু বল দেখি।

মধুসূদন। বুধের বৃত্তি হচ্ছে ব্যবসায়; মনে মনে সে বৈশ্য। আমাদের সাহিত্য হচ্ছে ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যের যুগ্ম বাহুর কীর্ত্তি।

ভারতচন্দ্র। অর্থাৎ তার এক হাতে হচ্ছে অস্ত্র, আর এক হাতে টাকার থলি।

মধুসূদন। এবং সে থলিতে চল্লিশ হাজার টাকা। আমি বেশ চিন্তা করে দেখেছি বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকার কমে কোন সাহিত্যিকের জীবন যাপন সম্ভব নয়। তোমাকে কৃষ্ণচন্দ্র কত টাকার আয়। সম্পত্তি দিয়েছিল!

ভারতচন্দ্র। আমি তো সাহিত্যিক ছিলাম না

মধুসূদন। সাহিত্যিক ছিলে না?

ভারতচন্দ্র। হয় তো পরোক্ষভাবে ছিলাম। কিন্তু আমাদের সময়ে জীবনের আদর্শ ছিল ভদ্রতা; আমি ভদ্রলোক ছিলাম, সেই ছিল আমার সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয়।

মধুসূদন। তোমাদের সময়ে তবে কি সাহিত্যিক ছিল না?

ভারতচন্দ্র। সাহিত্যিক আর ভদ্রলোক বলে দুটো স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল না; কোন কোন ভদ্রলোক কবিতা রচনা করত, এইমাত্র। তোমাদের সময়ে বোধ হয় কোন কোন সাহিত্যিক ভদ্রতা রক্ষা করে চলে, কি বল? এই ভাবে সময়ের হাওয়া উল্টে যাওয়াকেই তো তোমরা নবযুগ বলে থাক

মধুসূদন। নবযুগ নিয়ে পরিহাস করো না। ও তুমি বুঝতে পারবে না।

ভারতচন্দ্র। চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?

মধুসূদন। আমি অমিত্রাক্ষরের খাল কেটে ইউ-রোপের নবীন রক্তকে বাংলার ধমনীতে প্রবাহিত করে দিয়েছি।

ভারতচন্দ্র। অর্থাৎ খাল কেটে কুমীর ঢুকিয়েছ।

মধুসূদন। নাঃ তুমি কিছুতেই বুঝবে না দেখছি "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে।"

ভারতচন্দ্র। আমাকে তুমি অবজ্ঞা করতে, কিন্তু আমার কাব্য তো ভাল করেই পড়েছ দেখছি।

মধুসূদন। আচ্ছা, এই নাও, আমি স্থির হয়ে বসলাম, পয়ার সম্বন্ধে তোমার কি বক্তব্য আছে, বল।

ভারতচন্দ্র। তার আগে একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। আমি জন্মেছিলাম ইতিহাসের এক পর্ব্বান্তে, আর তোমার জন্ম আর এক পর্ব্বারম্ভে।

মধুসূদন। হিয়ার! হিয়ার! "একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে।" ভারতচন্দ্র, এই পর্ব্বভেদকেই আমরা যুগভেদ বলে থাকি।

ভারতচন্দ্র। কিন্তু ভেদটা দেখলে কোথায়? পরিবর্ত্তন তো নিয়তই হচ্ছে, পরিবর্ত্তন তো নবায়ন নয়। ও কি ও রকম মুখ করলে কেন?

মধুসূদন। বুঝতেই পারছ, কথাগুলো খুব হৃদ্য নয়।

ভারতচন্দ্র। ঠিক্, এ-যে "রুগী যেন নিম গেলে মুদিয়া নয়ন।" এখন, এই যুগভেদে ছন্দের ধর্ম্মভেদ হয়েছে। পয়ার এই পর্ব্বান্তের ছন্দ। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ান্তে যবনিকা পড়েছে, দর্শকদের বিদায়ের জন্য কাংস্য ঘণ্টা বাজ্‌ছে, পয়ারের অন্ত্যানুপ্রাসে তারই প্রতিধ্বনি! আমাদের ছায়া-ঘেরা পল্লী, ঘুমে-ঘেরা রাত্রি, বেড়া-ঘেরা অন্তঃপুর, আর নিয়মে-ঘেরা জীবনযাত্রা, এর বাণীকে বহন করবার যোগ্যতা আছে পয়ারের। পয়ার হচ্ছে ছন্দের দলে পদাতিক; পদচারের দ্বারা পায়ে পায়ে পথ অতিক্রম করছে; অশ্বারোহীর উন্মাদনার ঝাঁপতালকে সে বহন করতে অক্ষম। আমার ছন্দ ভাল কি মন্দ, সে তর্কে লাভ নেই; আমার ছন্দ আমার যুগের মাপে তৈরী। জরিদার বাদশাহী নাগরায় কি লাভ, যদি তা আমার পায়ের মাপে না হয়?

বাংলা কাব্যের প্রথম উন্মেষের ক্ষণ থেকে এই ছন্দটিকে পূর্ণায়ত করবার চেষ্টা চলছে, কিন্তু কেউ পূর্ণায়ত করতে পারে নি। বৈষ্ণব কবিরা ছিলেন মহাজন, তাঁদের প্রতিভা ছিল গরুড়ের মত আকাশমুখী, কিন্তু তাঁদের যুগ পয়ারের যুগ ছিল না। গৌরাঙ্গের যে পদধ্বনি অনুক্ষণ তাঁরা হৃৎপিণ্ডের তালে তালে শুনতে পাচ্ছিলেন, তারই সঙ্গে পা মিলিয়ে তাঁরা নাচতে নাচতে চলেছিলেন। তাঁদের বিহ্বল পদচিহ্নের পদাবলীর ছন্দকে আমি বলি নৃত্যচারী বা নাচাড়ী। তারপরে আবার অনেক কাল গিয়েছে, গৌরাঙ্গের পদধ্বনি মিলিয়ে গিয়েছে, বাঙালী কবির আকাশমুখী প্রতিভা ক্লান্ত হয়ে পাখা গুটিয়ে মাটিতে এসে বসেছে; নিত্যকালের সুধার প্রার্থনায় আকাশের দিকে চাইতে ভুলে গিয়ে প্রত্যহের ক্ষুৎ-তণ্ডুলের আশায় মাটির দিকে তাকাতে আরম্ভ করেছে; সংসারের সুখদুঃখের মধ্যে আশা-উৎসাহের উঞ্ছকণা খুঁটে পায়ে পায়ে সে চলতে শিখেছে, বাঙালীর সেই মানসিক পদচারের পদাঙ্ক হচ্ছে পয়ার ছন্দ। একে অবহেলা করতে পার কিন্তু অবজ্ঞা ক'র না; পয়ার হচ্ছে একটা যুগের বাঙালীর মনের ছাঁচ। এ ছাঁচ তোমাদের প্রয়োজনে আর যদি না লাগে, একে রক্ষা কোর, উপেক্ষা করে' ভেঙে ফেল না।

মধুসূদন। আমার অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঁধ-ভাঙা যুগের ছন্দ; এর ভাঙা বাঁধের যতিস্থাপনের স্বাধীনতার ফাঁক দিয়ে ইউরোপের প্রাণ-প্রবাহ বাংলা সাহিত্যে এসে প্রবেশ করেছে, এবং ক্রমে তা বাস্তবে গিয়ে প্রবেশ করবে।

ভারতচন্দ্র। ওই তোমাদের আর একটা মস্ত ভুল। বাস্তব আর সাহিত্যকে তোমরা মিশিয়ে ফেলে মিছামিছি একটা গোল পাকিয়ে তুলেছ।

মধুসূদন। ইউরোপে এমন হ'য়ে থাকে।

ভারতচন্দ্র। ইউরোপ অধঃপাতে যাক্।

মধুসূদন। এত উষ্মা কেন?

ভারতচন্দ্র। সাহিত্য আর বাস্তব সমান্তরাল নদী-তটের মত চলেছে—তার মাঝখানে নিরন্তর তরঙ্গিত হচ্ছে জীবনলীলা। এই জীবনলীলাকে রক্ষা করবার জন্যই সাহিত্যের, শিল্পের সার্থকতা। আর যেখানে সাহিত্য ও বাস্তবের দুই তটরেখা মিশে গিয়েছে, সেখানে নদী তো লুপ্ত। তোমাদের কাছে জীবনের চেয়ে সাহিত্য বড় হয়ে উঠেছে, সেইজন্যই সাহিত্যের সার্থকতাও আর নাই; সাহিত্য তোমাদের মুখের কথায় মাত্র পর্য্যবসিত।

আমরা জানতাম, সাহিত্য আর জীবন স্বতন্ত্র সত্তা—তাই সাহিত্যের গ্লানি জীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি। আমার কাব্যে এমন অনেক অংশ আছে ইচ্ছা করলে

যাকে অশ্লীল বলতে পার, কিন্তু তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হয় নি, তার কারণ আমাদের ধারণায় সাহিত্য হচ্ছে জীবনের ভৃত্য; ভৃত্যের কাঁধে মলিন গামছা হয়তো থাকে, কিন্তু তাকে উত্তরীয় বানাবার সখ মনিব কখনো করেনি।

মধুসূদন। আমার মেঘনাদ বধ কাব্যে কি এই নিরপেক্ষতা দেখতে পাও নি?

ভারতচন্দ্র। মেঘনাদ বধ কাব্যে নিরপেক্ষতার ভাণ আছে মাত্র;—নিরপেক্ষতা নাই। তোমার এই অমর কাব্যের ফ্রেমখানাকে পৌরাণিক যুগের স্বর্ণলঙ্কার সোনা দিয়ে বাঁধিয়েছ। কিন্তু যে ছবি এতে প্রতিবিম্বিত তা পৌরাণিক নয়—নিতান্ত আধুনিক।

মধুসূদন। আধুনিক?

ভারতচন্দ্র। আধুনিক বই কি! তোমার বিদ্রোহী, অনাচারী রাবণ ইংরাজি শিক্ষার প্রথম আমলের বিদ্রোহী, অনাচারী বাঙালী যুবকের প্রতিবিম্ব! তোমরা সকলেই খুদে খুদে রাবণ হয়ে উঠেছিলে, আর সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূর্য্যরশ্মি তোমার প্রতিভার অতসী কাঁচের ভিতর দিয়ে সংহত হয়ে রাবণের অতিকায়িক দীপ্তি সৃষ্টি করেছে, স্বর্ণলঙ্কায় লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আরও একটা সত্য কথা শুনবে? সমুদ্রের পরপারবর্ত্তী অনাচারী রাক্ষসদের ঐশ্বর্য্যময় যে দ্বীপ তোমাদের মনোহরণ করেছিল, তা সিংহল দ্বীপ নয়—তা শ্বেতদ্বীপ—ইংলণ্ড।

মধুসূদন। এ সব কথা কখনও ভাবিনি।

ভারতচন্দ্র। তার কারণ এসব কথা তোমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। মধুসূদন, তোমার অপরিমেয় প্রতিভা ছিল, তাই বঙ্গ-সাহিত্যের স্বর্ণকুম্ভের মুখ খুলে যে দৈত্যকে বের করে দিলে তার হাতে তোমাকে নিগৃহীত হতে হয় নি। কিন্তু তোমার পরে যারা আসবে, তাদের সবারই তোমার প্রতিভা না থাকতেও পারে। তোমার শক্তি পাবে না, ঠাট মাত্র পাবে, তাদের দুর্দ্দশা স্মরণ করে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠছি।

মধুসূদন। এই দৈত্যের হাতে তাদের প্রাণের আশঙ্কা আছে?

ভারতচন্দ্র। তাদের প্রাণ যায়—যাক্। বঙ্গসাহিত্যের স্বর্ণঘট না ভেঙ্গে যায়।

মধুসূদন। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আরও আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

ভারতচন্দ্র। চল—তা হলে আমার সঙ্গে।

মধুসূদন। সঙ্গে কিছু আছে? ধার দিতে পার?

ভারতচন্দ্র। মধুসূদন—তুমি ঠিক সেই রকমই আছ, কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি দেখছি।

মধুসূদন; আচ্ছা ঋণ চাইলে লোকে উপহাস করে কেন, বলতে পার?

ভারতচন্দ্র। তোমার ফিরিয়ে দেবার অভ্যাস নেই বলে।

মধুসূদন। তাতে ক্ষতি কি? আমার শেষ পয়সাটা পর্য্যন্ত আমি ঋণ দিতে প্রস্তুত; কতবার দিয়েওছি। কিন্তু তা নিয়ে তো বিদ্রূপ করিনি; ফিরেও চাইনি; ভুলেই গিয়েছি।

ভারতচন্দ্র। তোমার কাছে ঋণ আর ধন একার্থক; যেমন একার্থক সাহিত্য আর জীবন। কল্পনা আর বাস্তবে মিশিয়ে ফেলেছ বলেই তুমি ধনে ঋণে প্রভেদ করতে পার না।

মধুসূদন। তাতে ক্ষতি কি?

ভারতচন্দ্র। তোমার কিছু ক্ষতি নেই। যে ঋণ দেয় তার ক্ষতি।

মধুসূদন। ধন আর ঋণ বিষয়ে স্বর্গ দেখছি ঠিক মত।

ভারতচন্দ্র। এ কথা কে বললে?

মধুসূদন। তবে?

ভারতচন্দ্র। স্বর্গ হচ্ছে সেই স্থান যেখানে ঋণ চাইলে পাওয়া যায়—আর ফিরে দিতে হয় না।

মধুসূদন। চমৎকার!

ভারতচন্দ্র। পৃথিবী হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে ঋণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ফিরে দিতে হয়।

মধুসূদন। আর নরক?

ভারতচন্দ্র। আর নরক হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে মোটেই ঋণ পাওয়া যায় না।

মধুসূদন। সর্ব্বনাশ!

ভারতচন্দ্র। সর্ব্বনাশ কিসের? তুমি তো স্বর্গে এসেছ—চল।

যক্ষ্মারোগের জল-চিকিৎসা

—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

দেশে কলেরা বা বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইলে জনসাধারণের ভিতর মহা একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে দিনের পর দিন যক্ষ্মারোগে কত যে লোক প্রাণ ত্যাগ করে, জনসাধারণ তাহার হিসাব রাখে না।

প্রতি বৎসর পৃথিবীতে বিভিন্ন রোগে যত লোকের মৃত্যু হয়, তাহাতে সাত ভাগ লোকের মৃত্যু হয় যক্ষ্মরোগে।[1] এই রোগ দেহের যে কোন যন্ত্র আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু যখন ফুসফুসে ইহার আক্রমণ হয়, তখনই ইহাকে যক্ষ্মা (pulmonary tuberculosis) বলা হয়।

এই রোগ যে বিশেষ এক জাতীয় জীবাণু[2] হইতে উৎপন্ন হয়, ইহাই আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই জীবাণু দেহে প্রবেশ করিলেই যে রোগ হয়, তাহা নয়। বহু লোক যেখানে একত্র হয়, সেখানে আপনা হইতে এ জীবাণু জন্ম গ্রহণ করে। বহু অবস্থায় নিশ্বাসের সাথে আমরা উহা গ্রহণ করি। কিন্তু গ্রহণ করিলেই আমরা রোগাক্রান্ত হই না। ইংলণ্ডের শতকরা ২৫টি গরুর যক্ষ্মারোগ আছে।[3] ঐ সকল গরুর দুধ সকলে ব্যবহার করে। কিন্তু কেবলমাত্র ঐ দুগ্ধ ব্যবহারের জন্যই লোকে রোগাক্রান্ত হয় না।

যক্ষ্মার জীবাণু দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়া যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলেও যে রোগ হয়, তাহা নয়।[4] রক্তের ভিতর জীবাণু ছড়াইয়া গেলেও সকল রোগের আক্রমণ হয় না।[5] ফ্রান্সের এক জন চিকিৎসক বলিয়াছেন, শতকরা ৯৫টি স্কুলের ছাত্রের মুখে তিনি যক্ষ্মা-জীবাণু পাইয়াছেন।[6]

প্রকৃতপক্ষে বহু লোকের দেহে যক্ষ্মাজীবাণু আছে। কিন্তু তাহার জন্যই রোগের আক্রমণ হয় না। যখন বিভিন্ন কারণে দেহের ভিতর অত্যধিক দূষিত পদার্থের সঞ্চয় হয় এবং তাহার ফলে দেহের পুষ্টিগ্রহণ ও রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা কমিয়া যায়, তখনই কেবল যক্ষ্মারোগের আক্রমণ সম্ভব হয়। এই জন্য যাহারা বারংবার সর্দি, ব্রঙ্কাইটিস, ডায়াবিটিস অথবা সিফিলিস প্রভৃতি রোগে ভোগে, তাহাদের অনেক সময় এই রোগ হইয়া থাকে।

দেহের পুষ্টিগ্রহণ-ক্ষমতা কমিয়া যাইবার ফলে দেহে বিভিন্ন দূষিত পদার্থের সঞ্চয় হইলেও এই রোগের আক্রমণ হইতে পারে। এজন্য যাহারা যথেষ্টরূপ খাইতে পায় না অথবা যাহাদের খাদ্যে রাসায়নিক ত্রুটি থাকে, যাহারা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ, যাহারা পিতামাতার নিকট হইতে দুর্বল দেহ পাইয়াছে, অথবা দীর্ঘকাল যাহারা অজীর্ণরোগে ভুগিয়াছে, তাহাদের অনেক সময় এই রোগ হয়।

প্রকৃতপক্ষে হঠাৎ এই রোগের আক্রমণ হওয়া কখনও সম্ভব নহে। যতদিন রক্ত পরিষ্কার থাকে এবং দেহের তন্তুগুলি সবল ও সুস্থ থাকে, ততদিন কখনও দেহে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রথমে দেহ বিভিন্ন দূষিত পদার্থের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়, তাহার পর যক্ষ্মার প্রকাশ হইয়া থাকে।[7] যখন দেহের ভিতরে ঐরূপ অনুকূল অবস্থার সঞ্চার হয়, তখন বাহির হইতে রোগ-জীবাণু আসিয়া যে কেবল তাহার ভিতর দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহাই নহে, ঐ অবস্থায় দেহের ভিতর অবস্থিত জীবাণুগুলি বিষাক্ত হইয়া উঠে এবং দেহের ভিতর ধ্বংসকার্যে প্রবৃত্ত হয়।

১। R. N. Chopra, M. D.—Handbook of Tropical Therapeutics p 945.

২। Tubercle bacillus.

৩। Frederick W. Price—A Text book of the Practice of Medicine, p. 122.

৪। Infection does not always take place when bacilli circulate in the blood.

৫। Francis Marion Pottinger, M.D., LL.D.—Tuberculosis in the Child and in the Adult, p. 379.

৬। G. S. Kikla—Natural Ways of Cure, p. 14.

৭। Louis Kuhne—The New Science of Healing, p. 15

সুতরাং কেবল ফুসফুসের চিকিৎসা বা জীবাণু-হত্যার বৃথা চেষ্টা করাই ইহার চিকিৎসা নহে। যে-অনুকূল অবস্থায় যক্ষ্মাজীবাণুর ধ্বংসকার্য্য সম্ভব হয়, তাহা দূর করা, অর্থাৎ ফুসফুসের সহিত সমস্ত দেহকে দোষমুক্ত করা, দেহের পুষ্টি গ্রহণ ও রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, এবং মোটের উপর, দেহটিকে সবল করিয়া গড়িয়া তোলাই ইহার প্রকৃত চিকিৎসা।

২

যে-বিষাক্ত পরিস্থিতির ভিতর যক্ষ্মাজীবাণু বিস্তার লাভ করিবার সুবিধা পায়, তাহা বহুলাংশে আমাদের তলপেট হইতে আসে। এই জন্য চিকিৎসার প্রথমেই রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লওয়া এবং সকল সময়ের জন্য পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য রোগী প্রতিদিন স্নানের পূর্ব্বে দশ হইতে ত্রিশ মিনিটের জন্য 'হিপবাথ' গ্রহণ করিতে পারে।

একটা জলপূর্ণ টবের ভিতর পা দুইটি বাহিরে রাখিয়া বসিয়া অনবরত তলপেট ও উরুসন্ধি ঘর্ষণ করিলেই হিপবাথ লওয়া হয়। রোগীর যদি উত্থানশক্তি না থাকে তবে হিপবাথের পরিবর্ত্তে তাহার তলপেটে সমস্ত রাত্রির জন্য মাটির পুলটিস প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ফুসফুসই যক্ষ্মারোগের প্রধান আক্রমণকেন্দ্র। ঐ-স্থান হইতে রোগের বিষ চর্ম্মের পথে বাহির করিয়া দিতে বুকের 'প্যাক'ই (chest pack) প্রধান অবলম্বন। একখানা ভিজা নেকড়া বুক ও পিঠের চারিদিকে দুই হইতে চারিবার জড়াইয়া আলোয়ান দ্বারা তাহা ভালরূপ আবৃত করিয়া এই প্যাক দিতে হয়। জ্বর থাকিলে এই প্যাক দিন ও রাত্রিতে যথাসম্ভব দীর্ঘ সময় প্রয়োগ করিয়া তিন চার ঘণ্টা অন্তর পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্যাক কিছুদিন নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিলে রোগীর কাসি, জ্বর ও রাত্রির ঘর্ম্ম কমিয়া আসে এবং অনেক সময় বুকের ক্ষত আরোগ্য লাভ করে। বুকের প্যাক গ্রহণে চর্ম্মের পথে যেমন যথেষ্ট বিষ বাহির হইয়া যায়, তেমনি উহা দেহের ভিতর শ্বেতকণিকা যথেষ্ট বৃদ্ধি করে।৮, সুতরাং রোগের মূল কারণ নষ্ট করিয়াই ইহা রোগ আরোগ্য করিয়া তোলে।

রোগীকে সপ্তাহে একবার ভিজা চাদরের প্যাক দিলেও বিশেষ উপকার হয়। একখানা ভিজা চাদর দ্বারা রোগীর গলা পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ মুড়িয়া পরে তিন-চার খানা লেপ ও কম্বল দ্বারা উহা ভালরূপ আবৃত করিলেই এই প্যাক (wet sheet pack) দেওয়া হয়।

লেবুর রসসহ রোগীকে প্রতিদিন প্রচুর জলপান করিতে দেওয়াও আবশ্যক, কারণ মূত্রের সহিত যথেষ্ট বিষ দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। রোগীর শীত শীত ভাব থাকিলে তাহাকে গরম জল দেওয়া উচিত। শীত শীত ভাব কাটাইতে গরম জল পানের মত আর কিছুই নাই। কিন্তু ঐ সময় ব্যতীত অন্য সময় শীতল জল পান করিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

লুই কুনে বলিয়াছেন, যক্ষ্মা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পরিপাক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা অবশ্যই থাকিবে। প্রকৃত পক্ষে রোগীর হজমশক্তি ও পুষ্টিগ্রহণ-ক্ষমতা কম থাকার জন্যই এই রোগের বিস্তার সম্ভব হয়। প্রায়ই রোগীর পুষ্টিগ্রহণ-ক্ষমতা এত কম থাকে যে, যথেষ্ট খাইয়াও রোগী দৈনন্দিন ক্ষয়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে না। এই জন্য যক্ষ্মা ফুসফুসের রোগ হইলেও, রোগীর পরিপাক শক্তি ও পুষ্টিগ্রহণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই রোগের অন্যতম প্রধান চিকিৎসা। নিয়মিত ভাবে ভিজা কোমর পটি (wet girdle) ও হিপ্‌বাথ গ্রহণে এই উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে সাধিত হয়। নাভির চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে তলপেটের শেষ সীমা পর্য্যন্ত পেট ও পিঠের সমস্ত স্থান ভিজা নেকড়ার দ্বারা দুই হইতে চার বার জড়াইয়া এক খানা ফ্লানেল দ্বারা উহা ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিলেই এই পটি লওয়া হইয়া থাকে। এই পটি এ-ভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক যেন পটির নীচে একটা তাপের সৃষ্টি হয়। এই পটি ব্যবহারে ও নিয়মিত হিপ্‌বাথ গ্রহণে অন্ত্রের রসশোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং দেহ দ্রুত গড়িয়া উঠে। রোগীর উদরাময় থাকিলেও ভিজা কোমর-পটি ও হিপ্‌বাথের দ্বারা তাহা আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

উঠিয়া বসিবার ক্ষমতা থাকিলে প্রত্যেক যক্ষ্মারোগীরই নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন হিপবাথ গ্রহণ করা আবশ্যক। দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে এরূপ ফলপ্রদ স্নান আর নাই। জার্ম্মেনীর প্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক চিকিৎসক এ্যাডলফ্ জুষ্ট অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জানাইয়াছেন, এই বাথ

৮। G. H. Kellogg, M. D.—Rational Hydropathy, p. 862.

নিয়মিত ভাবে চালাইলে যক্ষ্মারোগ কিছুতেই বৃদ্ধি পাইতে পারে না।৯ রোগের প্রথম অবস্থা হইতে হিপবাথ চালাইলে এই রোগে মৃত্যু প্রায় ঘটে না।

এই সকল বাথ ব্যতীত স্নানও রোগীর পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন। অধিকাংশ অবস্থায় রোগীদের যখন একটু একটু জ্বর হইতে থাকে, তখন তাহারা স্নান বন্ধ করিয়াই রোগটিকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর করিয়া তোলে। দেহের উপর পরিমিত শীতল জল প্রয়োগে রোগীর ক্ষুধা, হজমশক্তি এবং অন্ত্রের রসশোষণ ক্ষমতা এবং সমস্ত দেহের জীবনীশক্তি বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়।১০ জীবাণুর আক্রমণ রোধ করিতেও শীতল জলের মত আর নাই।

রোগী সবল থাকিলে প্রতিদিন দুইবার অল্প সময়ের জন্য তাহার স্নান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু শয্যাগত রোগীদিগকে সতর্কতার সহিত দিনে দুই তিন বার ক্রমবর্দ্ধমান স্নান (graduated bath) প্রয়োগ করা আবশ্যক। প্রথম প্রথম রোগীকে ঈষদুষ্ণ জলে অল্প সময়ের জন্য স্পঞ্জ করান কর্ত্তব্য। তাহার পর ক্রমশঃ দিনের পর দিন জলের উত্তাপ কমাইয়া আনিয়া শেষে শীতল জল দ্বারা রোগীকে মুছাইয়া দিতে হয়। স্পঞ্জবাথের সময়ও ধীরে ধীরে প্রতিদিন বৃদ্ধি করা আবশ্যক। তাহার পর যখন জ্বর বন্ধ হয়, তখন তাহাকে পূর্ণস্নানে অভ্যস্ত করাইতে হয় এবং দিনে দুইবার স্নান করাইতে হয়।

এই সকল অপনয়ন ও উদ্দীপনামূলক চিকিৎসার সঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গ আয়ত্তে আনাও আবশ্যক হইয়া থাকে। জ্বরই যক্ষ্মারোগীর প্রধান উপসর্গ। সাধারণতঃ বিভিন্ন ঔষধ দ্বারা যক্ষ্মারোগীর জ্বর বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময় তাহাতে উপকার অপেক্ষা রোগীর অপকারই হইয়া থাকে। কারণ, জ্বরঘ্ন ঔষধ রোগীকে অসমর্থ করিয়া ফেলে এবং ঘর্ম্মস্রাব বৃদ্ধি করিয়া তাহার অত্যন্ত ক্ষতি সাধন করে।১১ কিন্তু কেবল মাত্র বুকের প্যাক, ভিজা চাদরের প্যাক, গা-মোছান, নেবুর রসের সহিত প্রচুর জলপান এবং বিশ্রামের দ্বারাই জ্বর আয়ত্তাধীনে আনা যাইতে পারে। শীত-শীত ভাব না থাকিলে জ্বরের সময় রোগীকে প্রতিদিন বিশ মিনিটের জন্য ভিজা চাদরের প্যাক দেওয়া আবশ্যক।

সময় সময় যক্ষ্মারোগীর বুকে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। ঐরূপ অবস্থায় দিনে তিন বার পনের মিনিটের জন্য উত্তাপবহুল একান্তর পটি (revulsive compress) দিয়া অবশিষ্ট সময়ের জন্য বুকের প্যাক খুব ভাল করিয়া আবৃত করিয়া প্রয়োগ করিলে বেদনা আপনি কমিয়া যায়। পাঁচ মিনিট গরম সেঁক দিয়া তাহার পর অর্দ্ধ মিনিটের জন্য শীতল জলে ভিজান তোয়ালে রাখিলেই উত্তাপবহুল একান্তর পটি দেওয়া হয়।

কোন কোন যক্ষ্মারোগীর ফুসফুস হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব হয়। সাধারণতঃ পায়ের গরম প্যাকেই (foot-pack) তাহা প্রশমিত হইয়া থাকে। জানু পর্য্যন্ত রোগীর পা দুইটি পৃথক পৃথক ভাবে ভিজা নেকড়া দ্বারা আবৃত করিয়া পরে ফ্ল্যানেল দ্বারা ঢাকিয়া দিয়া এই প্যাক দিতে হয়। ঐ প্যাকের চারিদিকে কয়েকটি গরম জলের বোতল রাখা আবশ্যক। প্রতিদিন একঘণ্টার জন্য এই পটি দেওয়া কর্ত্তব্য। রক্তস্রাব না হইলেও সর্ব্বপ্রকার ফুসফুসের রোগেই এই পটি প্রতিদিন এক ঘণ্টার জন্য প্রয়োগ করা আবশ্যক। পায়ে গরম পাইয়া ফুসফুসের দূষিত বদ্ধ রক্ত নীচে নামিয়া আসে, আবার কতক্ষণ পর নূতন রক্ত দেহ গঠনের উপাদান বহিয়া ফুসফুসে যায়। এই ভাবে রক্তের চলাচলে ফুসফুসটি শীঘ্রই নূতন হইয়া গড়িয়া উঠে। কেহ কেহ বলেন, ঊর্দ্ধ দেহের যাবতীয় রোগে এই প্যাকই সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসা।১২

এই সকল চিকিৎসার সঙ্গে রোগীকে যথেষ্টরূপে বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য। পরিপূর্ণ বিশ্রামে শক্তির যেমন কম অপচয় হয়, তেমনি ভিতর হইতে দেহকে সংস্কার করিয়া তুলিবার জন্য প্রকৃতি যথেষ্ট অবসর পায়। রোগীকে কেবল মাত্র বিশ্রাম দিলেই তাহার অধিকাংশ উপসর্গ আপনা হইতে কমিয়া আসে। যদি রোগীকে প্রয়োজনানুসারে কয়েক দিন হইতে কয়েক সপ্তাহ শয্যায় রাখিয়া পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া যায়, তবে অনেক সময় কেবল ইহার দ্বারাই রোগীর দুর্ব্বলতা, মন্দাগ্নি, অজীর্ণ, দ্রুত হৃদ্‌স্পন্দন, জ্বর, কাশি ও শ্লেষ্মা কমিয়া আসে এবং কোন কোন অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়। পরিপূর্ণ বিশ্রামে রোগীর ওজনও যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি পায়। এই জন্য যত দিন রোগীর জ্বর বন্ধ না হয়, ততদিন রোগীকে যথাসম্ভব দীর্ঘ সময় শয্যায় রাখিয়া বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য।১৩

৯। Return to Nature, p. 88.

১০। Alfred Martinet M.D. Clinical Therapeutics, p 875.

১১। R. N. Chopra, M.D, M.R.C.P.—A Handbook of Tropical Therapeutics, p. 999.

১২। Otto Juettner, M. D., Ph.D.—Physi al Therapeutic Methods, p. 308.

১৩। Francis Marion Pottinger, M.D., L.L.D.—Tuberculosis in the Child and the Adult, p. 404.

রোগী যত বেশী বিশ্রাম পায়, তাহার আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা তত বেশী থাকে।১৪

রোগীকে যথাসম্ভব দীর্ঘ সময় চলন্ত হাওয়ায় রাখাও একান্ত আবশ্যক। চলন্ত হাওয়ার ভিতর রাখিলে রোগীর দেহের ভিতর ভাঙাগড়া ও শক্তি উৎপাদনের কাজ (metabolism) বৃদ্ধি পায় এবং স্নায়ুর ও সঙ্গে সঙ্গে দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের এবং মোটের উপর সমস্ত দেহের অবস্থাই উন্নতি লাভ করে। রোগীর তখন সুনিদ্রা হয় এবং তাহার ক্ষুধা ও হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়, তাহার স্নায়বিক উত্তেজনা কমিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে রোগীকে প্রতিদিন ১১ হইতে ১২ ঘণ্টা এবং শীতকালে ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা মুক্ত হাওয়ায় রাখা আবশ্যক। এই সময় বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, শীতল হাওয়ায় রোগীর যাহাতে কষ্ট না হয়, এবং রোগী যাহাতে সর্ব্বদা আরাম বোধ করে।

৬

জ্বর-চিকিৎসায় কোন ঔষধ ব্যবহারের আবশ্যক হয় না, পথ্যই তাহার ঔষধ স্বরূপ। রোগীকে এমন ভাবে পথ্য দেওয়া আবশ্যক, যাহা তাহার রোগ আরোগ্য করিতে সাহায্য করিবে এবং দেহ গড়িয়া তুলিবে। জল-চিকিৎসকদের মতে তাহার পথ্যে বিশেষ ভাবে ক্যালসিয়ম, ফসফরাস, ক্লোরিন্ এবং ভিটামিন্ এ বি সি ও ডি থাকা আবশ্যক। কারণ উহাদের অভাবে দুর্ব্বলতা, ওজন-হ্রাস, রোগ-প্রতিরোধে অক্ষমতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। যখন খাদ্যের ভিতর ঐ সকল পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণ থাকে, তখন রোগীর রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা এবং পুষ্টি ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। এইজন্য রোগীকে পরিমিত রূপে কাঁচা দুগ্ধ, ঘোল, সুজি, ওভালটিন, জাঁতার ভাঙ্গা আটার রুটী, পার্ল বার্লি, ডাঁটা, লালশাক, সিমশাক, বেতুয়া, পুঁইশাক, পেঁপে, ঢাঁড়স, আলু, টমেটো, পালংশাক, কাঁটা সমেত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য, মুরগীর ডিমের হলদে অংশ, বেদানা, আঙ্গুর, কমলা লেবু, লেবু, আপেল, সুপক্ক কলা, আনারস, বাদাম, কিসমিস, খেজুর, আখরোট, আঞ্জির, খোবানি এবং ঝোলা গুড় প্রভৃতি দেওয়া বিধেয়। বিভিন্ন ভাবে এই সকল পথ্য গ্রহণ করিলে রোগী ঐ সকল ধাতব লবণ ও ভাইটামিন গ্রহণ করিতে পারে। বিভিন্ন তরকারি সিদ্ধ করিয়া গ্রহণ করা চলে অথবা তাহাদের যূষ গ্রহণ করা যায়। ফলের রস তাহার পক্ষে বিশেষভাবে হিতকর। নানাভাবে রোগীকে ছাঁচি কুমড়াও দেওয়া আবশ্যক। যক্ষের ক্ষতে ইহা যেমন পথ্য তেমন ঔষধ। প্রত্যেক দিন রোগীকে কতকটা করিয়া মধুসহ আমলকির রস দিতে পারিলেও বিশেষ উপকার হয়। কমলা লেবুতে যতটা ভিটামিন এ আছে তাহার বিশ গুণ আছে আমলকিতে। মধুও অতি পুষ্টিকর খাদ্য এবং ইহা হজম করিবার জন্য পাকস্থলীকে আয়াস করিতে হয় না। কারণ ইহা হজম করাই (predigested) থাকে। সর্ব্বপ্রকার কাশিরোগেও ইহা একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ ও পথ্য।

১৪। The better the rest, the better the chance of recovery, R. N. Chopra—A Handbook of Tropical Therapeutics, p. 959.

এই সঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক, যে সকল পথ্যে রোগীর দেহতন্তু গঠিত হয়, তাহার পক্ষে সেই সকল পথ্যেরই বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। এই জন্য তাহাকে ভাত ও রুটি প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় (carbohydrate) পথ্য কম দিয়া আমিষ (protein) ও চর্ব্বিজাতীয় (fat) পদার্থ বেশী দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাকে এমন খাদ্য দেওয়া উচিত নহে, যাহা তাহার কোষ্ঠবদ্ধতা আনিতে পারে অথবা তাহার পক্ষে উত্তেজক হয়। এই জন্য মাংস কম দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে সিম, কলাই-শুঁটি, মুগ ও মসূর ডালের যূষ ও ছানা প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে। ঘিও অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা আনয়ন করে। এইজন্য কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ঘিয়ের পরিবর্ত্তে মাখন দেওয়া উচিত।

রোগীর একবারে অনেকটা না খাইয়া বারে বারে অল্প অল্প করিয়া খাওয়া কর্ত্তব্য। কম কম করিয়া দিনে রাত্রে তাহার অন্ততঃ পাঁচ ছয় বার আহার করা আবশ্যক।

জ্বর বন্ধ হইয়া যাইবার পর কালবিলম্ব না করিয়া কড্‌লিভার অয়েল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহা ভিটামিন এর একটি শ্রেষ্ঠ আধার। কিন্তু কড্‌লিভার অয়েল প্রথম মাত্র তিন ফোঁটা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ এক ফোঁটা করিয়া বাড়াইতে হয় এবং শেষে যতটা সহ্য হয়, ততটাই খাওয়া চলে।

জ্বর বন্ধ হইয়া গেলেও রোগীর নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ জ্বর বন্ধ হইলেই রোগ আরোগ্য হয় না। দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত রোগ তাহার ভিতর সুপ্ত থাকে এবং অনুকূল অবস্থা পাইলেই আবার আত্মপ্রকাশ করে। এইজন্য জ্বর বন্ধ হওয়ার পরও দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে ভিজা চাদরের প্যাক গ্রহণ করা আবশ্যক এবং প্রয়োজনানুসারে ভিজা কোমরপটি ও বুকের পটি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এই অবস্থায় দেহটিকে গড়িয়া তুলিবার জন্যও সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এইজন্য জ্বর থাকিতে রোগীর বিশ্রামই যেমন চিকিৎসা, তেমনি জ্বরত্যাগের পর মুক্তস্থানে ব্যায়ামই প্রধান চিকিৎসা, কিন্তু তাহাও অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ করিয়া অতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

আত্মার আত্মকথা

—শ্রীনরেন্দ্র দেব

একমাত্র পুত্র নীরদকে তাঁর বুকের উপর তুলে দিয়ে বিশ্বম্ভর বাবুর প্রথমা পত্নী যখন অকালে বৃন্তচ্যুত কমলের মতই স্বর্গগতা হলেন, বিশ্বম্ভরবাবু সে আঘাতে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

তিনি যে কতখানি পত্নীগতপ্রাণ ছিলেন একথা তখনই লোকে জানতে পারলে যখন তারা দেখলে যে—তিনি স্বর্গগতা পত্নীর কেবলমাত্র একখানি পূর্ণ প্রতিকৃতি একজন প্রসিদ্ধ তৈল-চিত্রশিল্পীকে দিয়ে প্রস্তুত করিয়ে শয়নকক্ষে টাঙ্গিয়েই নিশ্চিন্ত হলেন না—একজন সুদক্ষ ভাস্করের সাহায্যে লোকান্তরিতা প্রিয়তমার একটি আবক্ষ মর্ম্মর-মূর্ত্তিও নির্ম্মাণ করিয়ে পত্নীর বার্ষিক মৃত্যু-বাসরে মহাসমারোহে স্থাপন করলেন।

সেদিন বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ীর বড় হলে একটি "সুষমা স্মৃতি প্রদর্শনী"ও বসেছিল। প্রদর্শনীর বিশেষত্ব হচ্ছে যে এতে কেবলমাত্র বিশ্বম্ভরবাবুর মৃতা পত্নী সুষমাদেবীর ব্যবহৃত বসন, ভূষণ, অলঙ্কার, প্রসাধন সামগ্রী, গৃহসরঞ্জাম, শিল্পকার্য্য, পাঠ্য-পুস্তক, হস্তাক্ষর লিপি, ভোজন-পাত্রাদি ও বাদ্যযন্ত্রসমূহ প্রদর্শিত হয়েছিল। এই শেষোক্ত বিভাগে হারমোনিয়ম, সেতার, এস্রাজের সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় তিনি গৃহের মঙ্গল ও পারিবারিক কল্যাণের জন্য যে শঙ্খটি বাজাতেন সেটিও সযত্নে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। চারিদিকের দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুষমা দেবীর নানা ভঙ্গীর আলোকচিত্র। নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত বহু লোক এসেছিল সে প্রদর্শনী দেখতে। দর্শকদের মধ্যে পুরুষেরা বলাবলি করলে,—লোকটা পাগল, শীঘ্রই দেখ আর একটা বিবাহ করবে। মেয়েরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলাবলি করলে,—যথার্থ সতীসাধ্বী ছিল বটে, স্বামী-সৌভাগ্যে ভাগ্যবতী একেই বলে।

বিশ্বম্ভর বাবুর ঘড়ীর লকেটে, জামার বোতামে, হাতের আংটিতে সুষমার সুষমামাখা হাস্যমুখখানি অঙ্কিত থাকলেও অন্তরে অন্তরে তিনি প্রিয়-বিয়োগ-ব্যথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। তাঁর বিচ্ছেদকাতর হৃদয় সদাই বিরহী যক্ষের মতো প্রিয় মিলনোৎসুক ছিল। বিশ্বম্ভর বাবুর কিঞ্চিৎ অর্থ আছে, সুতরাং আত্মীয় বন্ধু ও ব্যথার ব্যথীর অভাব ছিল না। আর একবার দার-পরিগ্রহের জন্য সকলেই তাঁকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করতে, মিনতি জানাতে ও পরামর্শ দিতে কসুর করলে না। এমন কি, কচি শিশুটির দোহাই দিয়েও, মা-হারা সন্তানকে মা এনে দেবার সদুপদেশ দিয়েও বিশ্বম্ভর বাবুকে আবার বিবাহে সম্মত করাতে পারলে না কেউই। তাঁর মুখের এই একটিমাত্র উত্তরই সকলকে শুনতে হ'ত, "আমি মরে গেলে কি তোমরা তার পুনরায় বিবাহ দিতে? নিঃসন্তান শিশুর জন্য কি নূতন পিতা সংগ্রহ করতে?"

একে একে সবাই যখন বিশ্বম্ভর বাবুর বিবাহের আশা ছেড়ে দিলেন, বয়স্থা অনূঢ়া কন্যার অভিভাবকেরাও যখন সবাই প্রায় হতাশ হয়ে পড়লেন, সেই সময়, 'পরলোক তত্ত্ব' বলে একখানি বই পড়ে বিশ্বম্ভর বাবুর খেয়াল চাপল 'প্ল্যাঞ্চেট' ধরতে হবে। মেস্মেরিজমের দ্বারা কোন মিডিয়মের সাহায্যে 'স্পিরিট' বা আত্মাকে আহ্বান করতে হবে।

আশ্চর্য্য ভাগ্যবান পুরুষ এই বিশ্বম্ভর বাবু। শীঘ্রই প্ল্যাঞ্চেটে সুষমার আত্মা আবির্ভূত হল;—লিখে দিয়ে গেল, মিডিয়মের সাহায্যে আমার আত্মার সঙ্গে তোমার মিলন হবে। কিন্তু তার আগে আমার এই পরপার থেকে তোমার কাছে অনুরোধ, তুমি আবার বিবাহ ক'রে সংসারী হও। আমার ছেলের বড়ই অযত্ন হ'চ্ছে। তুমি আমার ছোট বোন সুরমাকে বিয়ে কোরো। আমার ছেলেকে সে পরম আদরে মানুষ করবে।

স্বর্গগতা পত্নীর এ-অনুরোধ বিশ্বম্ভর বাবু অবহেলা করতে পারলেন না। সুষমার চেয়ে সুরমা অনেক ছোট হলেও এবং বিশ্বম্ভর বাবুর সঙ্গে তার বয়সের অনেকটা পার্থক্য থাকলেও প্রিয়ার অশরীরী বাণী তাঁকে উৎসাহ ও অভয় দিয়েছিল।

শুভদিনে শুভলগ্নে স্বর্গীয়া সুষমাদেবীর কনিষ্ঠা ভগ্নী সুরমার সঙ্গে বিশ্বম্ভর বাবুর বিয়ে হ'য়ে গেল। সুরমা তখন বেথুনে আই. এ. পড়ছিল। জামাইবাবুর সঙ্গে বিয়ে?—ধেৎ! ব'লে সুরমা প্রথমটা আপত্তি করছিল। কিন্তু, বুদ্ধিমতী সে। দিদির ঐশ্বর্য্য, হীরাজহরত ও মণিমুক্তার খবর জানত, জামাইবাবুর সম্পত্তির আয় ও নগদ টাকার হিসাবটাও দিদির কৃপায় তার অজানা ছিল না।

কলেজের লম্বা ছুটিতে সে মাঝে মাঝে দিদির কাছে এসে এমন বিশ-পঁচিশ দিন ক'রে কতবার থেকে গেছে। সে জানে বিশ্বম্ভরবাবু নিরীহ লোক। সৌখীন, পরিহাস-প্রিয়, আনন্দময়, উদার পুরুষ। স্বামী হিসাবে ঠিক আদর্শ না হলেও একমাত্র বয়স ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আপত্তিরও কিছু নেই। তারপরই সে ভেবে দেখলে— বয়সই বা এমন কি বেশী। তার চেয়ে বছর চৌদ্দ পনেরোর বড় বইতো নয়। জামাইবাবু কিন্তু দেখতে এখনও ছোকরাদের মতন। তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়স হয়েছে বলে মনেই হয় না।

তার মনে পড়লো—দিদি যখন সূতিকাগারে ছিল, সুরমা তখন ওখানেই। জামাইবাবু তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "এবার যে তোমার দিদির জায়গায় তোমাকেই 'অফিসিয়েট' করতে হবে!"

সুরমার গাল দু'টি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল! জামাই-বাবুর সেই পরিহাসই যে এমন ক'রে একদিন সত্য হ'য়ে উঠবে, কে জানতো?

সুরমাকে পেয়ে সুষমার বিচ্ছেদ ভুলতে বিশ্বম্ভরবাবুর বেশী দিন লাগল। বিশেষ তাঁর শিশুপুত্র নীরদ এমন করে সুরমাকে 'সু-মা' বলে জড়িয়ে ধরলে এবং সুরমাও তাকে প্রকৃত মাতৃস্নেহ দিয়ে এমন ক'রে বুকে তুলে নিলে যে, বিশ্বম্ভরবাবুর শূন্য জীবন, শূন্য সংসার আবার পূর্ণ হ'য়ে উঠল, আনন্দে-উল্লাসে-আলোকে-পুলকে।

সুরমা এসেই 'প্ল্যাঙ্কেট্' কেড়ে নিয়েছিল। বৈঠকখানায় যে মেস্‌মেরিজমের দল এসে চক্র করে বসত তাদেরও বিদায় ক'রে দিয়েছিল। দিদির সমস্ত ছবি, মূর্ত্তি, জিনিসপত্র—যা অকেজো এবং মূল্যহীন সমস্ত একটি ঘরে সাজিয়ে রাখার নামে পূরে ফেলে চাবি দিলে এবং সে চাবি রইল তার আঁচলের রিং-এ।

বিশ্বম্ভরবাবুর বিশ্ব জুড়ে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হ'য়ে বসলো সুরমা অতি অল্প দিনের মধ্যেই।

বিশ বছর পরের ঘটনা। বিশ্বম্ভরবাবুর একমাত্র পুত্র নীরদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি-পরীক্ষাটি পাশ হ'য়ে সসম্মানে বেরিয়ে এসেছে। সুরমার কোন সন্তানাদি হয় নি। কাজেই নীরদই ছিল তার গর্ভজাত সন্তানের অধিক। সুরমা কৃতী পুত্রের বিবাহ দিয়ে সুন্দরী বউ ঘরে আনবার জন্য অধীর হয়ে উঠলো। কিন্তু মুস্কিল হ'ল নীরদকে নিয়ে।

নীরোদ কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি নয়। সে বলে—বিলেত যাবে, আরও পড়াশুনা করবার ইচ্ছে করে। কিন্তু একমাত্র পুত্রকে সাতসমুদ্র তেরনদীর পারে পাঠাবার মত সাহস বিশ্বম্ভরবাবুর ছিল না, সুরমারও না। অবশেষে সুরমা স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করলে রুক্মিণী মেয়েটির সঙ্গে যদি ওর বিয়ে দিতে পারি তাহ'লে আর বিলেত যাবার নামও করবে না। মেয়ে ত নয়, ঠিক যেন ইহুদী মেমদের মত রূপসী!

বিশ্বম্ভরবাবু হেসে বললেন,—"তোমার কেবল আকাশ-কুসুম সু'! যাকে বলে সেই 'মাথা নেই তার মাথা ব্যথা!' ছেলে তোমার মোটেই বিয়ে করতে রাজি নয়, তা' ইহুদিই আন আর মেমই আন—"

সুরমা ভ্রূকুটি করে বললে, "কেমন না করে সে আমি বুঝব! ইস্! বিয়ে করব না বললেই হল? ওর বাবা দু'বার বিয়ে করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললে—ওকে একবারও অন্ততঃ করতে হবে!"

বিশ্বম্ভর বাবু তেমনিই হাসিমুখে বললেন, "ভুল বললে সু'! দুবার বিয়ে করলে আমাদের পাকা চুলও কাঁচা হয়ে ওঠে!"

"তবে তোমার চুল সব সাদা হয়ে আসছে কেন?"

"কারণ, আমি তোমায় কাল চুলেই বিয়ে করে এনে-ছিলুম যে! যারা সাদা মাথা নিয়ে বিয়ে করতে যায়, তাদেরই চুল কাঁচা হয়ে উঠে। তা'ছাড়া, আমার যে বয়সও হল পঞ্চাশের উপর, সে কথা ভুললে তো চলবে না।"

"কেন আর একটা বিয়ে কর না। তা'হলে তো বয়স অনেক কমে যাবে!"

"পরামর্শটা তোমার মন্দ নয়; কিন্তু বিয়ে করব কাকে? তোমার তো আর বোন নেই!"

"আমার না থাক, আরও তো অনেকের বোন আছে—বল তো চেষ্টা করে দেখি।"

"তুমি ছেলেরই বিয়ে দিতে পারছ না, তা আবার বাপের দেবে!"

"বাপ-বেটার এক সঙ্গেই তা'হলে পাত্রী দেখি, কি বল?"

"তা দেখ না, আপত্তি কি? কিন্তু নতুন গিন্নী এলে তোমার অবস্থা কি হবে?"

"কি আবার হবে? তোমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সম্পর্কে আমি যা ছিলুম তাই থাকব।"

"আবার জামাইবাবু বলে ডাকতে পারবে?"

"কেন পারব না? একদিন যদি পেরে থাকি, আজও পারব।"

"তা তোমার ছেলে বিয়ে করতে চাইবে না, সে অপরাধে আমার উপর রাগ করছ কেন? আমার কি দোষ বল?"

"দোষ নয়? সমস্ত দোষ তোমার। ছেলেকে আস্কারা দিয়ে একেবারে মাথায় তুলেছ। নইলে বাপকে মানে না? জোর করে ধমক দিয়ে বল, বিয়ে তোমায় করতেই হবে। নইলে একটি পয়সাও আমার পাবে না, সব আমি 'চ্যারিটি'তে দিয়ে যাব!"

"তাতে তো ওর ভারি বয়েই যাবে। পাঁচশ টাকা মাইনের এর মধ্যেই প্রোফেসারি পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। আজ বাদে কাল কোন কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে যাবে। ওর পয়সার অভাব কি? ও যে-থিসিস্‌টা লিখেছে তা না কি বিলেতেও হু হু করে বিক্রী হচ্ছে শুনছি।"

সুরমা একটু চিন্তিত হয়ে বললে "আচ্ছা, থাক। তুমি কিন্তু বল না। আমি দেখি ওকে অন্য উপায়ে রাজি করাতে পারি কি না।"

নীরদ যে দিন রুক্মিণীকে বিবাহ করে নিয়ে এল, বিশ্বম্ভর বাবু হাসিমুখে এসে গলবস্ত্র হয়ে করজোড়ে সুরমাকে বললেন, "ছোটগিন্নী! তোমার পায়ে মাথা নোয়াতে এলুম। তোমার অসাধ্য কিছু নেই! তুমি সব করতে পার!"

সুরমা তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বললে, "ছি ছি, তুমি যেন কি! যত বুড়ো হচ্ছ তত বুদ্ধি বাড়ছে! এতে আমার অকল্যাণ হবে না? কি মূল্য দিতে স্বীকার হয়ে যে তোমার ওই একগুঁয়ে জেদী ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি করিয়েছি যদি শোন, তা'হলে আর আমার মুখদর্শন করবে না।"

বিশ্বম্ভর বাবুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন "কি সে?"

"বিয়ে করলে আমি তার বিলেত যাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব বলে ওকে কথা দিয়েছি—তবে ও বিয়ে করেছে।"

"বেশ করেছ। তার জন্য তোমার কোন দুর্ভাবনার একটুও কারণ নেই। বাবাজীর বিলেত যাওয়া বন্ধ করবার ভার এখন তোমার বৌমাই নেবেন। হাঁ, ছেলের বউ বেছে এনেছ বটে! যত লোক দেখে গেল, এক বাক্যে বলে গেল এমন রূপ তারা এদেশে কখন দেখিনি!"

"তা'হলে, তোমার উচিত আমাকে ভাল করে ঘটক বিদেয় দেওয়া!"

নীচে থেকে এই সময়ে সুরমাকে কে ডাকলে—"ফুলশয্যার তত্ত্ব এসেছে দেখবে এস।"

ঘন ঘন শাঁখ বাজছিল। সদরে শানাইয়ে সাহানা ধরেছে। সুরমা তাড়াতাড়ি বিশ্বম্ভরকে সঙ্গে নিয়েই নীচে নেমে গেল।

বছরখানেক পরে হঠাৎ এক দিন জানা গেল নীরদ নিরুদ্দেশ হ'য়েছে।

রুক্মিণী কাঁদতে কাঁদতে এসে সুরমার হাতে একখানা চিঠি দিলে। নীরদ লিখেছে—

"সুমাকে বোলো বাবাকে যেন বুঝিয়ে শান্ত করেন। আমার জীবনের স্বপ্ন সফল করবার সুযোগ পেয়ে আমি সাগর-পারে পাড়ি দিলুম।"

বিশ্বম্ভর বাবু গম্ভীর হ'য়ে বললেন, "বাঙ্গালোরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কি একটা কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হ'য়ে যাচ্ছি ব'লে বেরুলো। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই আসবে বলেছিল। আজ তো তার ফিরে আসবার কথা? না বৌমা?"

রুক্মিণী আঁচলে চোখের জল মুছে সম্মতিসূচক ঘাড়

নেড়ে জানালে, "হাঁ, আজই ত ফিরে আসবেন বলে গেছেন। আজ ঠিক এক সপ্তাহ পূর্ণ হয়েছে।"

বিশ্বম্ভর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "আর এখন তাকে ফিরিয়ে আনবার কোন উপায়ই নেই। তাদের জাহাজ বহু দূরে।"

সুরমা মৃদুস্বরে বললেন, "একটা 'ওয়্যারলেস টেলিগ্রাম' করে দিলে হ'ত না ?"

বিশ্বম্ভর বললেন, "কোন্ জাহাজে যাচ্ছে তার নাম তো জানি নি! জাহাজের নামটা জানলে তাকে ধ'রতে পারতুম।"

নীরদের পৌঁছান সংবাদের আশায় বিশ্বম্ভর বাবু, সুরমা ও রুক্মিণী যখন দিনের পর দিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, সহসা অষ্ট্রিয়ার একজন প্রিন্সকে হত্যা করা নিয়ে য়ুরোপে মহাসমরানল প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠল, প্রতিদিন সংবাদপত্রে বড় বড় জাহাজ-ডুবির সংবাদ প্রকাশিত হ'তে লাগল। বিশ্বম্ভর বাবু কাতর হয়ে পড়লেন। রুক্মিণী অধীর হয়ে উঠল। সুরমার অন্তরে দুর্ভাবনার ঝড় বইলেও বাইরে কঠিন ও শান্ত হয়ে তিনি স্বামী ও পুত্র-বধূকে আশা ও সান্ত্বনার বাণী শোনাতে লাগলেন।

দিন আর যেন কাটে না। মনও কিছুতে বোঝে না। নিত্য অমঙ্গলের আশঙ্কায় সকলেরই চিত্ত কণ্টকিত। বাড়ীর আনন্দপ্রদীপ নিবিয়ে দিয়ে চলে গেছে নীরদ। বধূ রুক্মিণীর চোখের জল থামেছে না। সদানন্দময় বিশ্বম্ভর বাবুর ম্লানমুখে আর হাসিও নেই, কথাও নেই। স্বভাবশান্ত সুরমার মধ্যেও যেন একটা অস্থির চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে।

ছেলের খবর পাবার জন্য বিশ্বম্ভর বাবু বহু অর্থব্যয়ে নানাদিক থেকে নানা চেষ্টা করতে লাগলেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টের সমস্ত মহল ঘুরে লণ্ডনের হাই কমিশনার, সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া, সেক্রেটারি ফর দি কলোনিজ, মায় সমস্ত য়ুরোপীয় কনসাল জেনারেলদের ও আমেরিকান অ্যাম্বাসেডরের সাহায্যে পর্য্যন্ত পৃথিবী খুঁজতে বাকী রাখলেন না। কিন্তু নীরদ যে কোথায় আছে, তার কোনও খবরই কেউ দিতে পারলেন না। বরং অনেকেই ইঙ্গিতে জানালেন—সম্ভবতঃ জাহাজ-ডুবিতে তার মৃত্যু হয়েছে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। বিশ্বম্ভর বাবু একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর মাথার চুল প্রায় একটিও কাল রইল না। একদিন সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে সুরমাকে বললেন, "ছোট গিন্নী, কালরাত্রে আমি তোমার দিদিকে স্বপ্ন দেখেছি। তিনি এসে আমার কাছে নীরদের খবর দিয়ে গেলেন। বললেন 'তুমি অধীর হয়ো না নীরদ আমার কাছে ফিরে এসেছে'।"

"চুপ! চুপ!" সুরমা তাঁর মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, "অমন অমঙ্গলের কথা মুখেও এনো না! ষাট্ ষাট্! বাছা আমার অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক্! স্বপ্ন-টপ্ন বিশ্বাস কোর না। ও আমাদের উৎকণ্ঠিত মনের দুশ্চিন্তার ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়!"

বিশ্বম্ভরবাবু আরও কিছু দিন চুপ করে রইলেন। তারপর, তাঁর সেই পুরানো প্ল্যাঞ্চেটখানি ঝেড়ে মুছে বার করে একদিন বসলেন জনকতক অন্তরঙ্গকে নিয়ে। সুরমা বললে—"আমি তোমার ওটাকে বিশ্বাস করি নে।" সুতরাং প্ল্যাঞ্চেটের খবর শোনবার জন্য সে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলে না। কিন্তু রুক্মিণী ব্যাকুল হয়ে ছুটে এল— নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর যদি কোন সংবাদ পাওয়া যায়! সুরমার ঔদাসীন্য দেখে মনে মনে সে বললে—"বিমাতা কি না! তোমার তো আর নাড়ীর টান নেই, আসবে কেন তুমি?"

প্ল্যাঞ্চেটে সেদিন সেই খবরটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যেটা এতদিন অস্পষ্ট ছিল। নীরদ আর জীবিত নেই। তার অশরীরী আত্মা এসে নিজের হাতে লিখে দিয়ে গেছে, "এক বছর আগে আটলান্টিক মহাসমুদ্রে জাহাজ-ডুবি হ'য়ে আমার মৃত্যু হয়েছে।"

রুক্মিণী আছাড় খেয়ে কেঁদে উঠল। বিশ্বম্ভরবাবু তাঁর কোঁচার খুঁটে ঘন ঘন নিজের আর্দ্র চোখ দু'টি মুছতে লাগলেন।

এরপর থেকে বিশ্বম্ভরবাবুর চেয়ে রুক্মিণীই হ'য়ে উঠল প্ল্যাঞ্চেটের অধিকতর অনুরাগিণী। 'পরলোক-তত্ত্ব' বইখানি এখন সদা-সর্ব্বদা তারই হাতে ঘোরে। সন্ধ্যার পরই অস্থির হয়ে এসে প্রতিদিন সে বিশ্বম্ভর বাবুকে ধরে, "বাবা আসুন প্ল্যাঞ্চেট বসাই।"

প্ল্যানচেটে ওস্তাদ ছিল নীরদের সহপাঠী বন্ধু মণি গুপ্ত। নীরদের সন্ধানে বিশ্বম্ভরবাবুকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল সেই। এখানে ওখানে ছুটোছুটি করা বিদেশে চিঠি লেখা, দিল্লী যাওয়া, বম্বে যাওয়া, এ্যাডভেশ্‌ টেলিগ্রাম, ফোন, যা-কিছু সব সেই করেছে। বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ীতে ছিল তাই মণি গুপ্তের অবাধ গতিবিধি। 'প্ল্যানচেটে'র নায়ক ও মেসমেরিষ্ট দলেরও চাঁইও ছিল সেই। প্রায়ই কাজের অনুরোধ হ'লেই বৃদ্ধ বিশ্বম্ভর করুণ সুরে বলতেন—"মণি তো এখনও আসে নি মা! মণি না এলে ও হবার যো নেই! ও-সম্বন্ধে আজকাল সবচেয়ে অভিজ্ঞ হচ্ছে মণিই।"

রুক্মিণী একদিন মণি গুপ্তকে স্পষ্ট অনুরোধই ক'রে ফেললে, "দেখুন, আপনি যদি দয়া করে রোজ সন্ধ্যেবেলা এখানে আসেন তো বড় ভাল হয়। আপনার স্বর্গগত বন্ধুর খবর আপনার অনুগ্রহেই আমরা পাই। আর এ-কথা বোধ হয় আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, আমার এ নিঃসঙ্গ জীবনে বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল এখন ওইটুকুই!"

মণি গুপ্ত সেদিন রুক্মিণীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল যে, তার বান্ধবীর প্রীতিসাধনই আজ থেকে তার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত হ'ল।

তারপর আরও পাঁচ বছর কেটে গেছে। বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ীতে এখনও প্রতিদিন সন্ধ্যায় 'প্ল্যানচেট' বসে। প্রতি রবিবার মিডিয়মের সাহায্যে 'স্পিরিট' বা মৃতব্যক্তির আত্মাকে ডেকে প্রেতলোক থেকে নামিয়ে আনা হয়। রুক্মিণীর এ-বিষয়ে উৎসাহের অন্ত নেই। মণি গুপ্ত এখন তার দক্ষিণ হস্ত হ'য়ে উঠেছে। বিশ্বম্ভরবাবুর অনুমতি নিয়ে রুক্মিণী দেবী কিছুদিন আগে তাঁদের এই প্ল্যানচেট ও মিডিয়মের অভিজ্ঞতাসম্বলিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশ ক'রেছেন "আত্মার আত্মকথা"। ভূমিকায় লিখেছেন "আমার স্বর্গগত স্বামীর অশরীরী আত্মা মিডিয়মের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া পরলোক সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব আমার ও আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়ের নিকট উদ্ঘাটন করিয়াছেন, এই গ্রন্থে উহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছি; তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছি; তাঁহার কথা শুনিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর সকরুণ বিবরণ তিনি নিজ মুখে আমাদের নিকট যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ লিখিয়া লইয়াছি। তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা ও রূপান্তর সম্বন্ধেও তিনি আমাদের বহু জ্ঞাতব্য সংবাদ দিয়াছেন। মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে কৃতকার্য্য হওয়ার ফলে আমি আমার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বহুপরিমাণে শান্তিলাভ করিয়াছি।"

বিশ্বম্ভরবাবু একটি পৃথক 'নিবেদনে' জানিয়েছেন—"অকাল মৃত্যুর করাল ছায়া যাহাদের চিত্তে শোকানল জ্বালিয়াছিল, সে আগুনের দহনজ্বালা স্বর্গগত আত্মারা স্বয়ং আসিয়া অতি অলৌকিক ভাবে প্রশমিত করিয়াছেন। আমার পরলোকগত সহধর্ম্মিণী [illegible], আমার প্রিয়তমা প্রথমা পত্নী আমার একমাত্র প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, সকলেই আসিয়া আমাদের কাতর আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। পরম শান্তির যে অমৃত-প্রলেপ আমাদের শোকদগ্ধ হৃদয়ে তাঁহারা সিঞ্চন করিয়াছেন, এই মৃত্যুময় নশ্বর জগতে বহু শোকার্ত্ত জীব তাহাতে পুনরায় আশা, আনন্দ ও সান্ত্বনা লাভে কথঞ্চিৎ প্রবোধ পাইতে পারেন, এই আশায় আমি বধূমাতাকে এই পুস্তক প্রণয়নে উৎসাহিত করিয়াছি। আমার পুত্রস্থানীয় স্নেহাস্পদ শ্রীমান মণীন্দ্র গুপ্ত বি, এ, বাবাজী সকল বিষয়ে আমাদের নানাভাবে সহায়তা না করিলে, আমরা এই মৃত্যু-রহস্যের সন্ধান ও [illegible] ও এই অদ্ভুত পুস্তক প্রকাশে কখনই সমর্থ হইতাম না।"

উচ্ছ্বসিত আবেগে একরকম প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতেই ছুটে এসে মণি গুপ্ত একদিন বললে "হ্যালো! সুখবর আছে! 'আত্মার আত্মকথা'—সব সোল্ড আউট। তোমার পাবলিশার বলছিল 'এবার বোধ হয় দু'হাজার এডিশান দেবো।' সে আসছে রবিবার বিকেলে চেক নিয়ে দেখা করতে আসবে।

রুক্মিণী একটু বিরক্তভাবে বললে—"আপনি কি ভুলে গেছেন, রবিবার সন্ধ্যায় আমাদের 'মিডিয়ম' আসবার কথা আছে? আমরা উদীপুরী বেগমের আত্মাকে নামিয়ে দিল্লী রঙ্‌মহলের মোগল হারেমের গোপন-রহস্য জেনে নেব ঠিক আছে যে?"

"ও প্রোগ্রাম আমাদের বদলাতে হবে। পাবলিশার বলেছে, সে নীরদের কথা শুনবে, তার আত্মার সঙ্গে আলাপ করবে।"

"কেন?"

"পাবলিশার বলে—নীরদের সঙ্গে তার খুব পরিচয় ছিল। নীরদ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস সাবমিট করে, এই পাবলিশার ছিল তখন একজন সামান্য টাইপিষ্ট। সেই তখন সেটা টাইপ করে দিয়েছিল।"

"ও!"

এমন সময়ে বিশ্বম্ভরবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"বৌমা

মণির সাড়া পেলুম যেন! মণি কি এরই মধ্যে আজ এসেছে?"

রুক্মিণী বললে—"হাঁ বাবা, উনি আজ একটা সুখবর নিয়ে এসেছেন।"

রবিবার সন্ধ্যায় বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ীতে মণি গুপ্ত তার মেসমেরিজ্‌মের দল এনে হাজির করেছে। বৈঠকখানায় তাদের জটলা চলছে।

"আত্মার আত্মকথা"র প্রকাশক মহাশয় অনেক আগেই এসেছিলেন। এক হাজার টাকার একখানি চেক বিশ্বম্ভর-বাবুকে দিয়ে তিনি বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ কিনে নেবার যে-প্রস্তাব করেছেন, সে সম্বন্ধে শেষ কথা কইবার জন্ম বিশ্বম্ভর-বাবু তাঁকে সুরমার কাছে নিয়ে এসেছেন; কারণ, বৈষয়িক ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থার ভার সুরমা নিজের হাতে নিয়েছে। পুত্রের নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে বিশ্বম্ভরবাবু তার সন্ধানে এমন অতিরিক্ত ব্যয় করেছেন যে, কতকটা ঋণগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছেন। অবশ্য 'সুষমা-স্মৃতি রক্ষা'ও এর জন্ম কতকটা দায়ী। সুরমা বইখানির কাটতি ও তার চাহিদা সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত হ'য়ে প্রকাশককে বলছিলেন "আপনি দু'হাজারের এডিশন দেবেন বলছেন যখন, তখন আমাদের সেজন্ম দু'হাজার টাকা দেবেন কেন?"

প্রকাশক বলছিলেন—"মাত্র আড়াই টাকা দাম করা হয়েছে। খরচ খরচা বাদ যা থাকে তা থেকে আবার বুক-সেলার্স কমিশন দিতে হয়; বিজ্ঞাপনেরও যথেষ্ট ব্যয় আছে। সুতরাং পোষায় কই? তবে হাঁ, আপনারা যদি মূল্য বৃদ্ধি করবার অনুমতি দেন, তাহলে আমি চার হাজারই দিতে রাজি আছি—"

মণি গুপ্ত ঘরে ঢুকে বললে—"চলুন কাকাবাবু। চলুন কাকীমা, আপনিও আসুন। আমরা প্রস্তুত।"

সুরমা বললে "বৌমা কই?"

মণি একটু মৃদু হেসে বললে—"আজ আপনাদের ছেলে আসবে যে! জানেন তো? সেবার তার আত্মা বলেছিল, 'তুমি আমার কাছে সেজেগুজে এসো। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রইল, তুমি কোনদিন যেন বিধবার মত নিরাভরণা থেক না।' বউঠান্ তাই আজ ভাল ক'রে বেশভূষা করছেন। তাঁকে তাড়া দিয়ে এসেছি। এখনি এসে পড়বেন। আপনারা চলুন, দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

"চল যাই", বলে সকলে মণির অনুসরণ করলেন।

মিডিয়মের মধ্যে নীরদের আত্মার আবির্ভাব দেখে "আত্মার আত্মকথা"র প্রকাশক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তবু তিনি তাঁর সংশয় নিঃসন্দেহে দূর করবার জন্ম বললেন—"নীরদবাবু! আচ্ছা, আপনার সেই থিসিসের ডিক্‌টেশন্ দিতে দিতে আপনি মাঝে মাঝে গুণগুণ ক'রে যে গানটা গাইতেন সেটা অনেকদিন শুনিনি। একবার গেয়ে শোনান না। ভারি শুনতে ইচ্ছে হ'চ্ছে।"

নীরদের আত্মা মিডিয়মের মুখ দিয়ে বললে—"ও! শুনবে, আচ্ছা গাইছি শোন—

'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী!
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্য করোজ্জ্বল'—"

সমস্ত গানখানাই নীরদ মিডিয়মের মুখ দিয়ে গেয়ে গেল। "আত্মার আত্মকথা"র প্রকাশক বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গেলেন।

একটু নড়ে চড়ে উঠে বললে—"তাহলে ঐ কথাই রইল দু'হাজারই দেবো। আর সেকেণ্ড এডিশনে আমি একটু 'পাবলিশার্স নোট' যোগ করে দেবো। আমার এই ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা, এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিটুকুও আমি প্রচার করতে চাই—"

এই সময় ঘরের বাইরে থেকে যেন নীরদেরই কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"অয়ি ভুবন মনোমোহিনী!"

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো সশরীরে নীরদ স্বয়ং।

"অন্ধকার ঘরে বসে তোমরা এ কিসের জটলা করছ? এঁ্যা!"

নীরদ এগিয়ে এসে দেওয়ালের গায়ের সুইচ্ টিপে দিয়ে বৈদ্যুতিক আলো জেলে দিলে!

রুক্মিণী সভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। বিশ্বম্ভরবাবু থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না।

মিডিয়ম তখনও ঘরের মেজেয় চোখ বুজে শুয়ে আছে "আত্মার আত্মকথা"র প্রকাশকের দুই চক্ষু বিপুল বিস্ময়ে বিস্ফারিত। মণি গুপ্ত পা-পা ক'রে সকলের অজ্ঞাতে সরে পড়ল। কেউ তা' জানতে পারলে না।

সুরমা নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়ে নীরদের দু'টি হাত ধরে অনুযোগের সুরে বললে—

"এত দিন পরে কি আমাদের কথা তোর মনে পড়ল নাকি? হাঁ বাবা! বলি, এমনি করেই কি ভুলে থাকতে হয়?"

নীরদ হেসে উঠে বললে—"ভুলেছিলুম কে বললে?—মনে বরাবরই ছিল সু-মা! কিন্তু খবর দিলে পাছে তোমরা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কর, তাই কোন উচ্চবাচ্য করি নি। কিন্তু গেল মাসে আমি যখন জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে গেছলুম সেখানে একটি বাঙালী মেয়ের কাছে "আত্মার আত্মকথা" বইখানা দেখে ছুটে বাড়ী ফিরে আসতে হ'ল।"

ফ্রান্স সম্বন্ধে দু'চার কথা

—শ্রীচিন্তামণি কর

এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজে বিদেশ-পর্য্যটকদের কল্যাণে পৃথিবীর নানাদেশ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছে। অন্য দেশ সম্বন্ধে বলতে পারি না, কিন্তু ফ্রান্স সম্বন্ধে বহু লেখকের স্বকপোলকল্পিত যে-সকল অদ্ভুত বিবরণী পড়েছি, তা বহুক্ষেত্রে ভ্রান্ত ও সংকীর্ণ।

কোন দেশ সম্বন্ধে বলতে গেলে সেখানকার দু'একটা শহর, স্মৃতিস্তম্ভ, সৌধ, পানাগার বা যাদুঘরের অত্যন্ত মামুলী ধরণের বর্ণনাতে দেশের কথা কিছুই বলা হয় না। ফ্রান্সে যাবার পূর্ব্বে পারী সম্বন্ধে বহু লেখকের বহু রচনা পড়েছিলাম এবং তা' থেকে ধারণা জন্মেছিল (যে-ধারণা আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকের মধ্যে আছে) যে, পারী শহরটা কেবল মাতাল, নর্ত্তকী আর উচ্ছৃঙ্খল বিলাস ব্যসনের উপাদানে পূর্ণ। সেখানে নীতিজ্ঞান বলতে কিছুই নেই।

আমাদের দেশ থেকে যারা যাঁরা ইয়োরোপে বেড়াতে যান, তাঁরা সাধারণতঃ নির্ভর করেন প্রধানতঃ 'টুরিস্ট' কোন কোম্পানীর উপর এবং তাদের দেখান দৃষ্টি নিয়ে এঁরা সেই দেশের চুলচেরা বিচার করতে বসেন। এই সব কোম্পানীর কাজ হচ্ছে অত্যন্ত অদ্ভুত—নোংরা জিনিষ, যাতে সাধারণে বেশী আকৃষ্ট হয়, সেই সব দেখিয়ে নিজেদের ব্যবসাকে লোকরঞ্জক ক'রে তোলা। তাই পারী-প্রত্যাগত পর্য্যটকের বর্ণনায় দেখি কয়েকটি পানাগার, বেশ্যালয় বা ঐ-ধরণের স্থানের বর্ণনা এবং লুভর্ ও অন্যান্য যাদুঘরের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন মাসিক পত্রিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপক লিখিত প্রবন্ধে পড়েছিলাম, তিনি কোন রঙ্গালয়ের অভিনয়ে ফরাসী জাতির সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানের পরিচয় পেলেও যা দেখেছিলেন তা আমাদের দেশের রুচি-বিরুদ্ধ এবং সে-দৃশ্য বেশীক্ষণ সহ্য করতে না পেরে উঠে চলে এসেছিলেন। কিন্তু সেখানে দু'বার যাবার লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেন নি।

পারীতে ভারতীয় ভ্রমণকারীদের দুইটি শ্রেণী দেখা যায়। একশ্রেণী, যাঁরা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প, আসেন পারীর বিখ্যাত স্মৃতিস্তম্ভ, গ্রন্থাগার, শিল্পসংগ্রহ, প্রাচীন স্থাপত্য ও বিজ্ঞান-পরিষদ্ প্রভৃতি দেখতে; আর এক শ্রেণী আসেন পারী স্ফূর্ত্তির যায়গা মনে করে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের উপভোগ-আকাঙ্ক্ষায়। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই সংখ্যায় বেশী। কিন্তু আমরা একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারি, এরকম স্ফূর্ত্তির উপাদান পৃথিবীর সব দেশের শহরে খুঁজলেই পাওয়া যাবে, কেবল পারীর প্রতিষ্ঠানগুলি একটু মার্জ্জিত ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ বলেই তাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু ফ্রান্স বা তার ক্ষুদ্র সংস্করণ পারীর সেইটিই আসল রূপ নয়। সমগ্র ইয়োরোপের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রদূত পারীর যে-অতুলনীয় মহান্ রূপ আছে, যা আমরা চোখ থাকতেও দেখতে চাই না, তার সম্বন্ধে কিছু বলার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

যখন লণ্ডন থেকে পারীর 'গার্ সাঁলাজার্' ষ্টেশনে পৌঁছলাম তখন আমার ফরাসী ভাষার সম্বল কিছু ছিল না। পূর্ব্বপঠিত প্রবন্ধাদির ধারণায় বদ্ধমূল আমি মনে করলাম, এক চোরের হাতে প্রাণটা মাঠে মারা যাবে। সঙ্গে লণ্ডন থেকে ইংরাজী-বলা একটি হোটেল এবং ডক্টর দেব-এর ঠিকানা এনেছিলাম। ট্যাক্সিওয়ালাকে হোটেলের ঠিকানাটা দেখিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। কুলিরা যে জিনিষ কয়টি বয়েছিল, তার জন্য ষ্টেশনের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বিহিত ছাপান বিল দিয়ে পয়সা চেয়ে নিলে।

হোটেলে পৌঁছে হোটেলওয়ালার নির্দ্দেশ মত ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ঘর ঠিক করে দেব-মশায়ের সন্ধানে বেরলাম। তখন ছ'টা হ'বে, রাস্তা চিনি না, যাকেই জিজ্ঞাসা করি মাথা নেড়ে হস্তভঙ্গি এবং ঘন ঘন স্কন্ধস্পন্দনে জানিয়ে দেয় যে, ইংরাজী জানে না। দু'-একজন আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে শেষে অপারগ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। অনেক পরে একটি ছাত্রকে পেলাম, সে ইংরাজী বোঝে,

বলতে পারে না। সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে বাড়ীটা বের ক'রে দিলে, কিন্তু তেমনি বাড়ী পাওয়া গেল না।

এরকম ভদ্রলোক ওদেশে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। আমার মনে পড়ে, লণ্ডন যাবার পথে মার্সাইতে নেমে দুইটি চিঠি পোষ্ট করতে বেরিয়েছিলাম। রাস্তায় এক ভদ্রলোককে চিঠি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পোষ্ট-আফিস'। ভদ্রলোক ইঙ্গিতে আমাকে অনুসরণ



বোয়া দ্য বুলোন।

করতে বল্‌লে। প্রায় পনের মিনিট হাঁটবার পর পোষ্ট-আফিস পাওয়া গেল। ভদ্রলোকটি আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে টিকিট কিনে লাগিয়ে চিঠি পোষ্ট-বাক্সে ফেলে কাফেতে তার সঙ্গে কিছু পানের জন্য নিমন্ত্রণ করলে। আমার মনে হল, লোকটা নিশ্চয় বদ, না হ'লে এত ভদ্রতা দেখাচ্ছে কেন? নিশ্চয় কোন খারাপ জায়গায় নিয়ে গিয়ে পয়সা মেরে দেবার মতলব, এই মনে করে অত্যন্ত অভদ্রের মত তার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, এবং পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছিলাম। পরদিন দেবকে আবিষ্কার করে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি ফরাসী শব্দ গলাধঃকরণ করে শহরটার কয়েকটি স্থান মোটামুটি দেখা হল।

ফ্রান্সের ছোট গ্রাম থেকে আরম্ভ ক'রে বড় শহর পর্য্যন্ত গড়ে উঠেছে ঠিক শাবক-পরিবেষ্টিত মুরগীর মত। ফ্রান্সের খুব ছোট গ্রাম থেকে আরম্ভ করে বড় গ্রাম পর্য্যন্ত দেখা যাবে, সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটা গীর্জ্জা আর তার চারি পাশ ঘিরে ছোট বড় বাড়ী। শহরগুলি এই কয়েকটি গীর্জ্জার সমষ্টি নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্যারী শহরেও যে এর ব্যতিক্রম ঘটে নি তা বেশ বোঝা যায়। বিখ্যাত নোতর্‌দাম, সাঁ সুল্‌পিস্, সাঁ জারমাঁ প্রভৃতি গীর্জ্জাগুলির অবস্থান থেকে। সাধারণ শহরে বাড়ীগুলি বেশ শক্ত, বেশ পুরাতন আভিজাত্যের ছাপ আছে। বাড়ীগুলির এক বাড়ীর সঙ্গে আর এক বাড়ী লাগিয়ে শেষ পর্য্যন্ত একটানা। 'আমার দেওয়ালে ঘর তুলো না' ব'লে এ নিয়ে মামলা মোকর্দ্দমা হয় না। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর নীচে মাটির তলায় শক্ত পাথরে গাঁথা ঘর

আছে তাকে বলে 'কাভ্'। এগুলি মদ রাখার জন্ত সাধারণতঃ ব্যবহার করে, কিন্তু বর্ত্তমান বিমানে আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার আশ্রয় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পুলিস থেকে প্রত্যেক বাড়ীর দরজায় লেখা আছে, ক'জন লোক 'কাভ্'-এ আশ্রয় নিতে পারবে, এবং আক্রমণ-সঙ্কেতের ভোঁ বাজলেই লোক মুখোস পরে এর তলায় ঢোকে।

পারীর মধ্যে চলে গেছে অসংখ্য বুলভার্দ বা প্রশস্ত রাজপথ। এগুলি কলিকাতার চৌরঙ্গীর দু'গুণ তিনগুণ চওড়া। বিখ্যাত বুলভার্দ সাঁজেলিজে পৃথিবীর একটি প্রশস্ততম রাজপথ। প্রায় প্রত্যেক বুলভার্দের দু'পাশে সুন্দর গাছের সারি। কোন কোন বুলভার্দের দু'পাশে 'প্লেন' গাছের সারি, এগুলি শরৎকালে নতুন পাতার আর পুরাতন বৃন্তমুক্ত সোনালী বর্ণের কাছে গম্ভীর দেখায়। রাতে গাছের সারির পাশে আলোর সারি, গাছের ডালপালা-পাতার ফাঁক দিয়ে রাস্তায় আলোর বন্যা বয়ে দেয়। যুদ্ধ নিবন্ধন যেদিন থেকে পারীতে ক'রে ঢাকনী দেওয়া মিটমিটে আলোর [illegible] দেওয়া হ'ল রাস্তায় দেখলে মনে হ'ত আলোকময়ী পারীর শরীর বিষিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। রাস্তায় আলোর হাসির সঙ্গে মিলিয়ে পথচারী প্রাণখোলা হাসি যেন এক যাদুকরের সম্মোহনে স্তব্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, আবছায়া আলোয় বিষ বিরস মুখের ভয়াতুর দৃষ্টি। যাক্ অবান্তর কথায় এসে পড়লাম। পারীর বুলভার্দ ছাড়া ছোট রাস্তাগুলির সৌন্দর্য্যও কম নয়। দু'পাশের দোকানের সুসজ্জিত পণ্য-সজ্জাকক্ষ থেকে বিভিন্ন দ্রব্য পথচারীকে প্রলুব্ধ করার জন্ত যেন কাঁচের আবরণ ভেদ করে রূপের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ফ্রান্সের সর্ব্বত্রই গ্রীষ্মের মাঝামাঝি থেকে শীতের আরম্ভ অর্থাৎ আগষ্ট থেকে প্রায় অক্টোবরের প্রথম পর্য্যন্ত স্কুল, কলেজ, দোকান বন্ধ থাকে। এ-বছর বন্ধের পর সেগুলি আর খোলা হয়নি। দোকানের মালিকরা এসে বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্ত দোকানের গায় কতকগুলি কাঠের তক্তা লাগিয়ে শহরকে যেন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত করে তুলেছে।

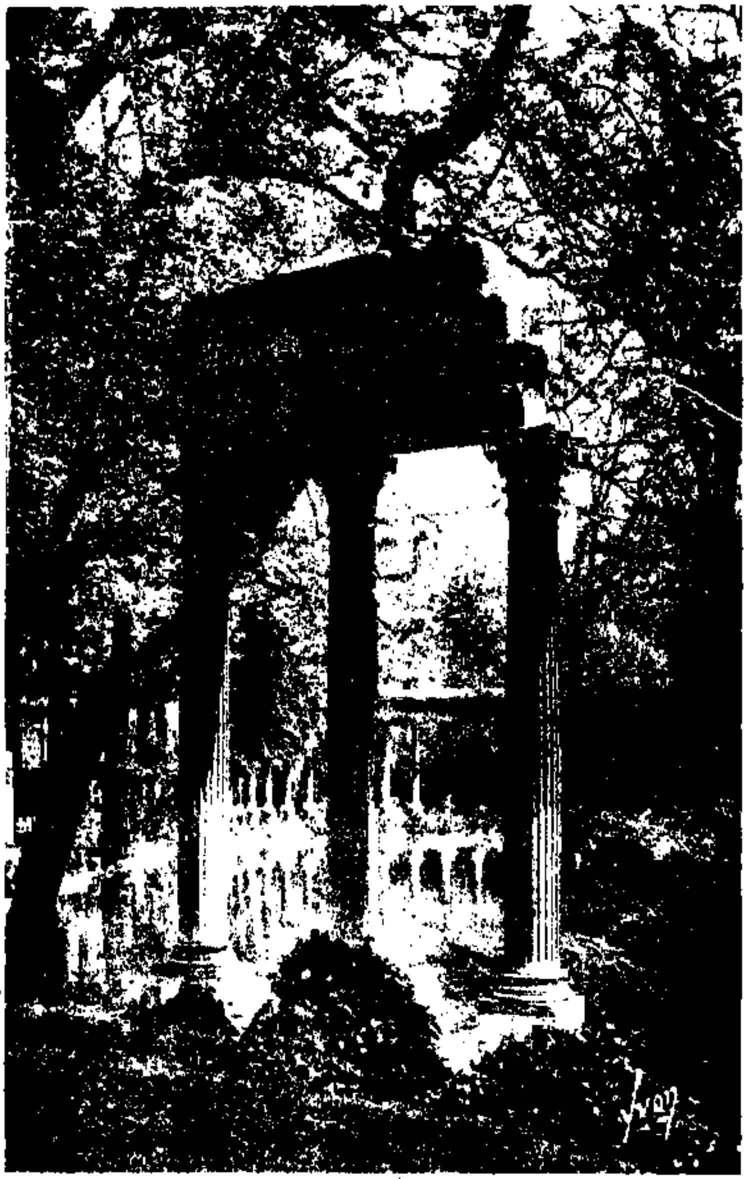


সাক্রু-কর গীর্জা।

সমস্ত পারী শহরটি কুড়িটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। তার এক একটিকে বলে আরঁদিস্মঁ। এ-ছাড়া কলিকাতাতে যেমন ভবানীপুর, শ্যামনগর, সিমলা, গড়পার প্রভৃতি বিভিন্ন পাড়া আছে, পারীতেও মোঁপারনাস্, কার্তে লার্তা, মোমার্ত্র, অপেরা প্রভৃতি বিভিন্ন পাড়া আছে। কার্তে

লাতাঁটি ছাত্রদের পাড়া। এখানে রাস্তার কাফে, রেস্তরাঁ, সর্বস্থানেই বিশ্বের লোককে খুঁজে পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে যদি সত্যিকার আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন শহর থাকে তো সে পারী। ইংলণ্ড বাদ দিলে ইয়ো-



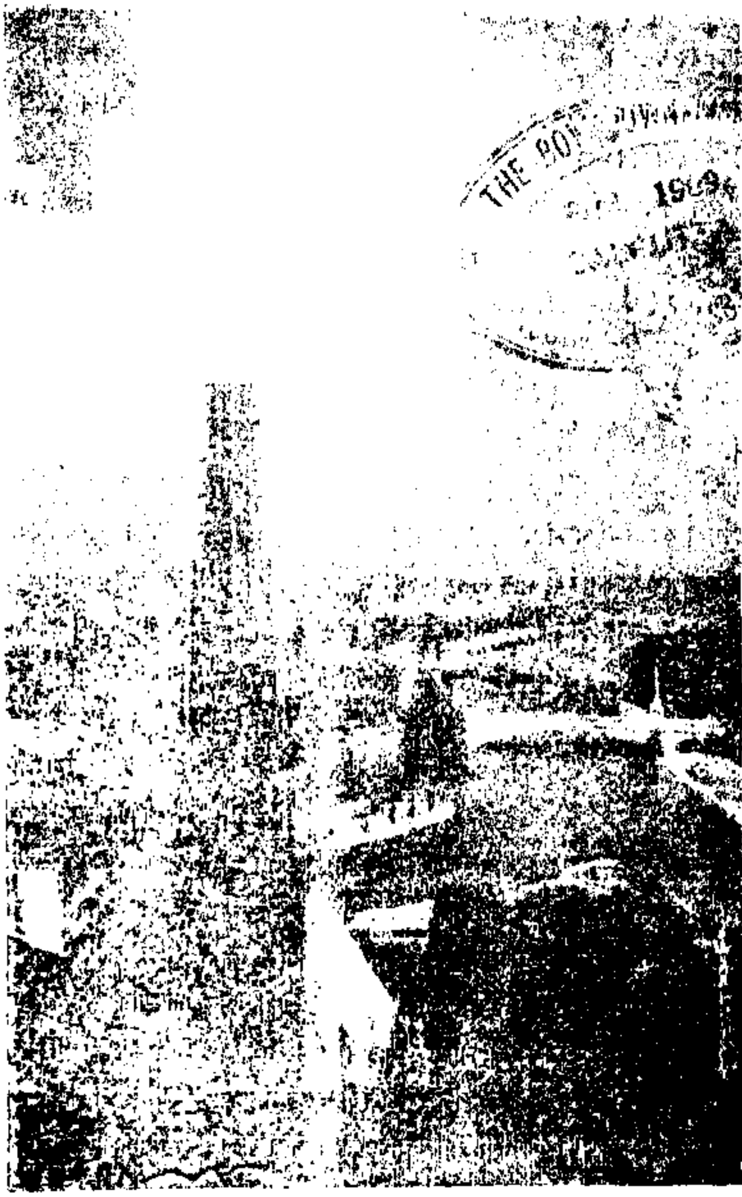
পারীর একটি বাগান।

রোপের আর কোথাও বর্ণবিদ্বেষ বা জাতিবিদ্বেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবশ্য হিটলারীয় শাসনে জার্মানীতে এখন বর্ণ ও জাতি-বিদ্বেষ বিশেষ প্রবল হয়েছে। মোমার্ত্র এবং মোঁপারনাস্ দু'টিই শিল্পীদের পাড়া। এই দুই পাড়ার শিল্পীরা শিল্পে স্ব-শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সর্ব্বদাই ঝগড়া ক'রে থাকে। কিন্তু প্রতিভাবান্ উৎকৃষ্ট শিল্পীকে দু'পাড়াতেই নিজেদের বিচ্ছেদ ভুলে প্রশংসা ক'রে থাকে।

শহরের মাঝে সুন্দর পার্ক আছে। ফরাসী উদ্যানের বিশিষ্টতা সর্ব্বজনবিদিত। জার্দাঁ দ্য লুক্সেমবুর্গ ও জার্দাঁ দ্য তুইলারি মনোহর প্রস্তরমূর্ত্তি এবং কেয়ারী-করা ফুলের গাছে লাবণ্যময়। এর মাঝে মাঝে মূর্ত্তি-অলঙ্কৃত ফোয়ারা বাগানের সৌষ্ঠব আরও বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া আরও বোয়া দ্য বুলোন্, বোয়া দে ভঁ্যাসেন্ প্রভৃতির প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়।

পারী শহরের মধ্যে এত গাছ-পালা থাকার জন্য এবং শহরটির চারপাশে বন থাকায় বিমান-আক্রমণকারীদের দৃষ্টিবিভ্রম জন্মিয়ে দেয়। কালো বনের ফাঁকে কোথায় যে শহরটি আত্মগোপন ক'রে আছে অনেক সময় উপর থেকে রাত্রে তারা তা বুঝতে পারে না। তবুও অমূল্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা-সম্পদের নিদর্শনে পূর্ণ প্যারীকে অসভ্য নিপীড়ক থেকে রক্ষা করার জন্যে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। পার্কগুলির মাঝে ট্রেঞ্চ কেটে বড় বড় বিমান-ধ্বংসী কামান বসানো হয়েছে। সন্ধ্যা হ'লে দেখা যায় অসংখ্য রবারের ফানুসে আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে এগুলি বাঁধা, এয়ারো-প্লেন্ এর গায়ে ঠেকলেই তার জড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। প্রসিদ্ধ স্মৃতি-সৌধ, মূল্যবান্ সংগ্রহশালা ও মর্ম্মর-মূর্ত্তিগুলির চা'রপাশে বালির বস্তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

মোমার্ত্ত পারীর অত্যন্ত পুরানো পাড়া, এখানে সাক্রেকর ব'লে অতি আধুনিক ধরণের একটি গীর্জ্জা আছে। এর চেহারায় প্রাচ্য স্থাপত্যের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পুরাতন মোমার্ত্তের পাড়ায় ঘুরলে মনে হয়, যেন বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক দ্যুমা অথবা য়ুগোর বর্ণনাগুলি চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দী এবং তার আগের কালের রাস্তা, বাড়ী একই অবস্থায় এখনো বর্ত্তমান রয়েছে। মোঁপার্নাস্ বোহেমিয়ান্ পাড়া, বেশীর ভাগ আমেরিকানদের ভিড় এখানে। এখানকার কয়েকটি কাফে বিশেষ প্রসিদ্ধ।



নোতর দামের টাওয়ার হইতে পারীর দৃশ্য।

ফ্রান্সের প্রত্যেক বড় শহরে, এমন কি ছোট গ্রামে পর্য্যন্ত রাস্তার ধারে ধারে কাফে দেখতে পাওয়া যায়। ফ্রান্সের জাতীয় জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এই কাফের মধ্যে। পারীতে বড় বুলভার্দের ধারে বহুসংখ্যক বড় কাফে দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি কাফেই আলোকমালা এবং চেয়ার ও ছোট টেবিলে সাজান। কাফের দেওয়ালগুলি নানারূপ অলঙ্করণ-চিত্রে সুসজ্জিত। সর্ব্বদাই এখানে গান-বাজনা হচ্ছে। এক কাপ চা অথবা কফি নিয়ে বসে থাকতে দেবে আপনার যতক্ষণ খুশী, এর জন্যে আলাদা কিছু লাগে না। পানীয়টির দাম দিলেই চলে। এই কাফের মধ্যে বসে বড় বড় ফরাসী লেখক তাঁদের অমূল্য গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। কত বিখ্যাত দার্শনিক তত্ত্বচিন্তায় এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন, কত বৈজ্ঞানিক নূতন আবিষ্কার-স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন, কত রাজনীতিকের চিন্তাধারা এখানে গড়ে উঠে দেশের অবস্থাকে কতবার অদল-বদল করে দিয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে অনেকে এখানে এক কাপ কফি ও কয়েক ভালুম বই নিয়ে বসে যান গবেষণায় বা পরীক্ষার পড়াশুনায়। এখানে বসলে দেখতে এবং শুনতে পাওয়া যাবে, প্রত্যেকটি টেবিল ঘিরে ছোট ছোট আন্তর্জাতিক সম্মিলনী ও তাদের নানারূপ আলোচনা। এই কাফে থেকে নানাদেশের মনীষী-

দের সঙ্গে আলাপ করা যায়, তা' ছাড়া জনসাধারণ তাদের সঙ্গে আলাপ করে, তর্ক করে তাঁদের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়। সাঁজেলিজের কাফে আম্বাসিয়া, কাফে ডিরোল প্রভৃতিতে রাত্রে সুন্দর অর্কেষ্ট্রা ও জিপ্সি, রাশিয়ান্ ও স্পেন্স্ নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের নৃত্যের বন্দোবস্ত আছে। এখানে নয়ন ও শ্রুতি উভয়েরই রঞ্জন হয়ে থাকে।

একদিন সন্ধ্যায় কার্তে লাতাঁর একটি কাফেতে বসে আমার জনৈক পোলিশ বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছি, আমাদের পাশের টেবিলে একটি মহিলা আমাদের কথার ফাঁকে বুঝেছিলেন যে আমি ভারতীয়, হঠাৎ উঠে এসে, "বসতে পারি" বলে গার্সোঁকে (পরিবেশনকারীকে) কফির হুকুম ক'রে বললেন, "আপনি ভারতীয়?" "হ্যাঁ" বলাতে তিনি বললেন, ভারত হচ্ছে তাঁর ধ্যান, চিন্তা এবং জীবন। বল্লেন—পূর্ব্ব জন্মে বোধ হয় তিনি ভারতীয় ছিলেন। এই রকম জন্মান্তরবাদী বহু বিদেশী লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন আমি 'যোগী' কি না? না বলাতে তিনি প্রথম অবাক্ হলেন এবং পরে মাথা নেড়ে বল্লেন, "আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। আমি জানি ভারতীয়রা তাদের আধ্যাত্মিক জিনিষ বিদেশীদের দিতে বা বলতে চায় না। কিন্তু আমি 'নিরামিষ খাই এবং প্রাণায়াম করি," বলেই নাক টিপে আমাকে দেখাতে লাগলেন ও বললেন, কোন ভারতীয়কে অতি কষ্টে ভুলিয়ে তিনি এই অমূল্য বস্তুটি আদায় করেছেন। আমি যোগী নয় বার বার বলেও তাঁকে বিশ্বাস করান গেল না। ভারত সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্নের পর যখন আমরা উঠবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, তখন তিনি আমার ঠিকানাটি আদায় করে বললেন, আজ না বললেও আর একদিন পরের প্রণালীটি তাঁকে দেখিয়ে দিতে হবেই হবে, না হলে তিনি ছাড়বেন না। অগত্যা তাঁকে বললাম, "এর পরের প্রণালী হচ্ছে নাকের কাছে হাতের উপর এক মুঠা পাউডার রেখে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নেওয়া ও ফেলা। লক্ষ্য রাখবেন, পাউডার যেন না ওড়ে।" তিনি খুব খুশী হয়ে ঘন ঘন করমর্দ্দন ক'রে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন। এর পর কি করবেন জিজ্ঞাসা করায় বললাম, "কয়েকবার এটি অভ্যাস করবার পর অন্য ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা করবেন।"

অনেকেই হয়তো আমার এই কাজটিকে সু-চোখে দেখবেন না। কিন্তু এই সব ভারতের অন্ধ ভক্তদের কিছু না বলে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। যদি মিথ্যাও বলা যায়, এঁরা খুশী হয়ে যাবেন, না হ'লে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন, এবং মনে করবেন আমরা বিদেশী ম্লেচ্ছ বলে আপনার ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার্থে 'এরা কিছু বলতে চায় না।' এদের শুধু সত্য অক্ষমতা জানিয়ে ফেরান বড় মুস্কিল। ফ্রান্সে আমি দু'শ্রেণীর ভারতভক্ত দেখেছি। এক দল মনে করে, ভারতে এখনও বেদ-উপনিষদের যুগ চল্‌ছে এবং প্রত্যেক ভারতীয় হচ্ছে এক একজন যোগী বা বুদ্ধ, তারা মিথ্যা কি তা জানে না, হিংসা কখনো তাদের মনে স্থান পায় না, সকলেই সচ্চরিত্র, সজ্জন—একেবারে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। এরা অনেক সময়ে ইচ্ছা ক'রে জানতে চায় না আমাদের দেশের বর্ত্তমান আসল স্বরূপ কি।

ইয়োরোপের সংস্কৃতি ও সভ্যতা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললেও রাষ্ট্রনৈতিক বর্ব্বরতা এদের মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে, এই সভ্যতার অগ্রগতি বর্ব্বরতা ও ধ্বংসকে আরও কাছে এনে দেবে। এরা সাধারণতঃ অত্যন্ত রক্ষণশীল। অনেক সময় আমাদের দেশের অন্ধ রক্ষণশীলদের এরা হার মানিয়ে দেয়। এখনও পৃথিবীতে এমন একটি দেশ আছে যেখানে সব কিছুই মহান্, নৈতিক ও মানবতায় পূর্ণ; এই ধারণাকে মনে আটকে রেখে নিজের মনকে এরা প্রবোধ দিতে চায়। এদের দেখলে অনেকে ভাববে এরা পাগল, কিন্তু নিজেদের মতবাদে এদের দৃঢ় বিশ্বাস অটল।

ইয়োরোপে যাবার সময় জাহাজে এক বিশুদ্ধ ইংরাজ মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে দু' এক কথা বলা আশা করি অবান্তর হবে না। রোজই সকালে তাঁকে ডেকের উপর হলুদ রঙের অদ্ভুত জামা, গাঢ় নীল রঙের অধোবাস, মাথায় একটি পাতলা হাল্কা রঙের ওড়না করে বাঁধা একটি বড় রেশমী রুমাল এবং কাণে দু'টি তিব্বতীয় কর্ণাভরণ পরে বসে থাকতে দেখতাম। ইংরেজ যে নয়, তা প্রথম দৃষ্টিতেই যে-কেউ বুঝতে পারত। বড় কৌতূহল হল। এক দিন সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, "মাপ করবেন, আপনার স্বদেশ জানতে পারি কি?" উত্তর এল, "আমি জার্মান, বর্ত্তমানে আমেরিকার নাগরিক, কিন্তু

আসলে মনে আমি তিব্বতীয়,—আমি খিওজফিষ্ট।" আমি তাহাজে ফরাসী-জানা লোকের সন্ধানে ফিরতাম, জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি ফরাসী জানেন?" বললেন, "জানি, কিন্তু অনেক দিন চর্চ্চার অভাবে প্রায় ভুলে গেছি।" কাছে একখানি ফরাসী ব্যাকরণ ছিল, সেটি নিয়ে গিয়ে অনুরোধ করলাম, একটি উচ্চারণ দেখিয়ে দিতে। কিন্তু নানা গল্পের ফাঁকে আমার নিজের উদ্দেশ্য চাপা পড়ে গেল। বেশীর ভাগ কথা হ'তে লাগল, ভারতীয় ধর্ম্ম, পুরাণ ও রূপক সম্বন্ধে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিবৃত্ত ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান দেখে মনে মনে প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারলাম না। সব চেয়ে অবাক্ হ'লাম তাঁর ভারত আগমনের কাহিনী শুনে। ইনি বল্‌তে লাগলেন, "জানেন, আমি পূর্ব্বের এক জন্মে কি ছিলাম?" "না" বলাতে তিনি বললেন :—

"আমি ছিলাম প্রাচীন মিশরের এক ফ্যারাওয়ের রাণী। তখন আমার পার্থিব ভোগ-জীবনের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও মনটা বেশ একটা আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরে বাঁধা ছিল। তার ফলে পরবর্ত্তী এক জন্মে তিব্বতীয় এক লামার ঘরে জন্মাই। কিন্তু সেই জন্মে পুনরায় বিষয়াসক্ত হওয়ায় আমার এই জন্মের পরিণতি। আমি একজন যুবকের খুব উজ্জ্বল বড় চোখ এবং দীপ্তিযুক্ত দৃষ্টি দেখে মনে করেছিলাম আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সে বেশ অগ্রবর্ত্তী, ফলে তার প্রেমে পড়ে বিয়ে করি। কিন্তু কয়েক বছর পরে আমার ভুল ভাঙ্গল, সে অত্যন্ত তামসিক, আমার যোগ-ধ্যানকে সে সুচোখে দেখত না, তাই তাকে ছেড়ে বেরিয়েছি আমার গুরুর কাছে। তিনি তিব্বতীয়, তাঁর নাম...... তাঁকে কোন দিন আমি দেখিনি বা তাঁর ঠিকানা জানি'না। কেবল আমার ধ্যানের মধ্যে তাঁকে একবার দেখেছি। তাঁরই সন্ধানে তিব্বত গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি দেখা দিলেন না। ধ্যানে জানালেন, এখনো সময় হয় নি তাঁর, তাই ফিরে যাচ্ছি জার্ম্মানীতে বাপ-মায়ের কাছে।"

আশ্চর্য্য হলাম, তাঁর ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের আবেগ এবং অন্ধ ভাবপ্রবণতা দেখে। সুদূর আমেরিকা থেকে একটা অজানা, অচেনা গুরুর সন্ধানে, তিব্বতের মত দেশে, —যার সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই বললেই চলে,— ইচ্ছার পিছনে কত বড় প্রেরণা থাকলে এ সম্ভব তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু ওদেশে যারা ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে শ্রদ্ধা করে, জানতে চায়, তারা এই রকম ভারতীয় ভাবে আত্মহারা।

ফ্রান্সে আর একদল ভারতভক্ত দেখেছি, এঁরা প্রাচীন ভারতকে যথেষ্ট জানলেও বর্ত্তমানকে মন থেকে তাড়িয়ে দেন নি। বর্ত্তমান ভারতীয় জীবন এবং প্রত্যেকটি আন্দোলন সম্বন্ধে এঁরা রীতিমত সচেতন। এঁরা ভাবপ্রবণতায় বাস্তবকে, যুক্তিকে ভুলে যান নি। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে এরা শ্রদ্ধা করেন এবং নিজেদের এতে যোগ দেওয়াটা বড় কাজ বলে মনে করেন। তর্ক করে সাধারণ সভায় বক্তৃতা ক'রে ওদেশের জন-সাধারণকে জানাতে চেষ্টা করেন আমাদের দাবীর যোগ্যতাকে। এঁদের অনেককে ফ্রান্স-প্রবাসী ভারতীয়দের চেয়ে ভারত সম্বন্ধে বেশী খবর রাখতে দেখেছি। আমরা এক ভারতবন্ধু ফরাসী মহিলার কাছে প্রায়ই যেতাম, সুভাষচন্দ্র, নেহেরু, রায় এঁরা বর্ত্তমানে কি করছেন, কংগ্রেসের খবর কি প্রভৃতি জানতে। কারণ তিনি কেমন করে জানি না, আমাদের সকলের চেয়ে আগে সব খবর পেতেন। ফ্রান্সে, বিশেষ ক'রে, পারী শহরে এঁদের সংখ্যা বিরল নয়। জানি না যাঁরা ওখানে বেড়িয়ে ফিরেছেন। তাঁদের সঙ্গে এই শ্রেণীর লোকের আলাপ হয়েছে কি না, কিন্তু তাঁদের লিখিত বিবরণীতে কদাচিৎ এ-বিষয়ে লেখা দেখেছি। সম্ভবতঃ, তাঁরা স্মৃতি-সৌধ, রঙ্গালয়, পানাগারের বর্ণনার মধ্যে এসব লেখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি।

স্বর্গধামে বঙ্কিম-গিরিশ প্রসঙ্গ

—শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

১৯২৪ সালের শ্রাবণের এক নির্ম্মল প্রভাতে স্বর্গধামে ভূতপূর্ব্ব নাট্যকার স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বসিয়া 'রামকৃষ্ণ' লীলাকীর্ত্তন করিতেছেন। পার্শ্বে একদিকে অমৃত মিত্র, অমৃত বসু, মহেন্দ্র বসু ও অমর দত্ত প্রভৃতি বসিয়া গুরুমুখনিঃসৃত বাক্য-সুধা পান করিতেছেন—অপরদিকে গুরুভ্রাতাগণও গিরিশের মুখে গুরুর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেছেন।* এমন সময়ে হঠাৎ শব্দ হইল—

"গিরিশবাবু বাড়ী আছেন ?"

সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন, মনে হইল যেন বড়ই চেনা গলা। ক্রমে সেই শুভ্রকেশ বৃদ্ধের আগমনে সকলেই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন। গিরিশচন্দ্র সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে, বঙ্কিমবাবু ? এ যে অভাবনীয় ব্যাপার—এ দীনের গৃহে আপনার ন্যায় মহতের আসন ?"

সকলে সবিস্ময়ে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনে 'সুপ্রভাত' 'সুপ্রভাত' বলিতে লাগিলেন।

বঙ্কিম। হাঁ গিরিশবাবু, আজ একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে আপনার দর্শনে আসিয়াছি।

গিরিশ। আমার সৌভাগ্য! মর্ত্তে তো কতবার— আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, কিন্তু অভিমানে যাই নাই। থিয়েটারের লোক বলিয়া আপনি ঘৃণা করিতেন।

বঙ্কিম। গিরিশবাবু, সে কথা আর তুলিবেন না। আপনিই সর্ব্বপ্রথমে আমার 'কপালকুণ্ডলা' নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয় করান। তারপর 'বিষবৃক্ষ' 'দুর্গেশনন্দিনী' 'চন্দ্রশেখর', 'সীতারাম' প্রভৃতির যে রূপ আপনি দেন, অপর কাহারও তাহা সাধ্যায়ত্ত ছিল না। সীতারামে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি সম্বন্ধে আমার মনের প্রকৃত ভাবটী যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্বর্গে বসিয়া আমি উপলব্ধি করিয়া বড়ই তৃপ্তি পাইয়াছি।

গিরিশ। বঙ্কিমবাবু—বড়ই বাধিত হইলাম। আপনার উদারতায় মুগ্ধ হইলাম—কিন্তু আপনি আমাকে 'আপনি' করিয়া বলিবেন না। আপনি ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা এবং সর্ব্বোপরি বয়োজ্যেষ্ঠ—আমায় দয়া—

বঙ্কিম। গিরিশবাবু—ধর্ম্ম ব্যাখ্যার কথা কি বলিতেছেন ? আপনি শঙ্করাচার্য্যের মুখে যে অদ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য বুঝাইয়াছেন, তাহা কোন পণ্ডিতের মুখে শুনি নাই। 'বিল্বমঙ্গলে' যে নির্ব্বিকল্পসমাধির কথা বলিয়াছেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব। আমি অনেক জ্ঞানের কথা লিখিয়াছি বটে, কিন্তু জ্ঞান-ভক্তি জড়িত এমন সুন্দর অবস্থার পরিকল্পনা করিতে পারি নাই। দেখুন, মর্ত্তে আপনার প্রতি আমার একটু বিতৃষ্ণাই ছিল ; আমার ছোট জামাইটী থিয়েটারে ভিড়িয়া আমার মেয়ের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া আমার মেয়েটীর আত্মহত্যারই কারণ হইয়াছিল। যাক্ যত দিন যাইতেছে আপনার গৌরব অনুভব করিতেছি।

গিরিশ। দেব, আপনার বিনয়ে মুগ্ধ হইলাম। আমাদেরও ভ্রান্তি ছিল যে আপনার দম্ভই আমাদের কাছে আপনাকে আসিতে দেয় নাই। কিন্তু পরে অক্ষয়বাবু, চন্দ্রবাবু ও সুরেশের নিকট আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানিয়াছি। আপনি আমায় আর 'আপনি' বলিয়া লজ্জা দেবেন না।

বঙ্কিম। দেখ গিরিশবাবু, বয়োধিকের সম্মান পূর্ব্বে ছিল এখন লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক আজ মর্ত্তে এক ব্যক্তির ক্রন্দন আমাকে বড়ই ব্যথিত করিয়াছে।

গিরিশ ও অমৃতবাবু, প্রভৃতি (সমস্বরে)। সে কিরূপ দেব! কে সে ভাগ্যবান!

* ১২৯১ সালের শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ মাসের "প্রচার" এবং অগ্রহায়ণের 'ভারতী' অবলম্বনে এই প্রবন্ধটী লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত 'সত্যের' ব্যাখ্যা লইয়া বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল, লেখক কথাচ্ছলে সেইটাই বিবৃত করিয়াছেন। দুইটী প্রবন্ধই দুষ্প্রাপ্য। ইতিপূর্ব্বে কোথাও উদ্ধৃত হয় নাই।

বঙ্কিম। চিত্ত ছোঁড়াই আমাকে ঠিক বুঝেছে (এখান হইতে উভয়ে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন)। আজ কি না ভাই—

গিরিশ। ওঁকে আপনি ছোঁড়া বল্‌ছেন! ওঁর দেশবন্ধু নামের জয়ধ্বনি সমগ্র ভারতের গগনে বেজে উঠেছে! ওঁর মত আত্মত্যাগী দেশভক্ত ধরায় কি কেউ আছে?

বঙ্কিম। গিরিশ, এই না তুমি আমায় জ্যেষ্ঠের সম্মান দিচ্ছিলে। ওঁর বড় জ্যেঠামহাশয় কালীমোহন দাশ ও আমি যে একই বৎসরে জন্মেছি—

গিরিশ। ওঃ, তাই। ওঁর সম্বন্ধে আমারও কিছু বল্‌বার আছে। আগে আপনি বলুন। ওঁর কথা শুনবার জন্য আমি বড়ই ব্যগ্র হয়েছি।

বঙ্কিম। গিরিশ, যখন 'সপ্তমীর দুর্গোৎসব' লিখি, দেশের চিন্তায় কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছি। যেন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে লিখেছিলুম "মা, মা, একা রোদন করিতেছি—মা, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা।" ঐ যে জীবনে কেঁদেছি মরণে কেঁদেছি, সেই কান্নার আজ সুফল হয়েছে।

গিরিশ। বঙ্কিমবাবু, অনেক দিন চিত্তরঞ্জন আমার সঙ্গে মর্ত্তে দেখা করতে এসেছিল, তাতে আমি বুঝেছি বাল্য ও যৌবনের প্রারম্ভেই আপনার কথা ওঁর 'মরমে পশেছিল।' আমার লেখা অনেক কথাই ওঁর মুখস্থ ছিল বটে, কিন্তু মর্ত্তে ওঁর ন্যায় আপনার দ্বিতীয় ভক্ত আর নাই।

বঙ্কিম। গিরিশ, আমার কাঁঠালপাড়ার বাড়ীতে—কাল চিত্ত যখন কাঁদতে কাঁদতে বলে 'এস-মা গৃহে এসো—যাহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি'—সে ক্রন্দন স্বর্গেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

গিরিশ। আপনি এখানেও মর্ত্তের চিন্তা করেন কি না, ভাই!—আমি ত এখন 'রামকৃষ্ণ' ছাড়া কিছুই দেখি না।

বঙ্কিম। হাঁ ভাই, মর্ত্তের চিন্তায় এখনও আমি ব্যাকুল—দেখ চারিদিক দিয়ে সপ্তরথীতে আক্রমণ করেছে আর চিত্ত ঐ রুগ্ন দেহখানি লয়ে সকলকে আহ্বান ক'রে বল্‌ছে—

"চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি! ভয় কি, না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"—(আবেগভরে) গিরিশ, 'আমার দুর্গোৎসব' লেখা, 'বন্দে মাতরম্' লেখা, 'আনন্দমঠ' লেখা সার্থক হয়েছে।

বঙ্কিমবাবু নীরব হইলেন—সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে অমৃতবাবু সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, রবীন্দ্রনাথকেও ত আপনি খুব উচ্চসম্মান দিতেন। রমেশ দত্ত মহাশয়ের কন্যা কমলা বসুর বিবাহের সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম। সাহিত্য-সম্রাট্ হিসাবে রমেশবাবু যে মাল্যে আপনার কণ্ঠ বিভূষিত করেন, আপনি তাহাই রবীন্দ্রনাথকে পরাইয়া দেন। শ্রেষ্ঠ সম্মান ত আপনি তাঁকেই দিয়ে এসেছেন—এমন কি আবার অন্যের প্রতি এরূপ কৃপা শোভা পায়।

বঙ্কিম। ও, তুমি অমৃত বসু না? আমার কয়েকখানা উপন্যাস তুমিও রূপান্তরিত করেছ। কিন্তু এতো নাপু নাটক, উপন্যাস বা কবিতা নয়। আমি বলছি দেশাত্মবোধসম্পন্ন সর্ব্বত্যাগী ঋষির কথা। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগে কয়েকটা সঙ্গীত ও প্রবন্ধে সবকে মুগ্ধ করেছিল বটে, কিন্তু নরওয়ে হতে এসে অবধি বড়ই ইবসেন ও মেটারলিঙ্কের ভক্ত হয়েছে। ইউরোপীয় আদর্শ ভারতে চলে না। আর 'বিশ্ব' নিয়ে সে এখন বড়ই ব্যস্ত।

গিরিশ। মশায়, আপনার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ওঁর বড়ই বাদানুবাদ হয়েছিল না?

বঙ্কিম। গিরিশ, তোমার মনে আছে সে কথা? প্রচারের প্রথম সংখ্যায়ই (১২৯১, শ্রাবণ) আমি 'হিন্দুধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখি। তাই নিয়ে ওরা দলবদ্ধ হয়ে আমায় জব্দ করতে চেয়েছিল!

অমৃত বসু। মশায়, আপনি গল্পটি আমাদের বলুন তো—

গিরিশ। ও, মনে পড়েছে! আপনি বলেছিলেন 'রবির পেছনে একটি বড় ছায়া আছে'। হাঁ, তখন এই নিয়ে বড্ড হৈ চৈ হয়েছিল।

বঙ্কিম। দেখ আমি 'প্রচারে'[১] দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখেছিলাম—হিন্দু কে। একজন ছিলেন পূজা-সন্ধ্যা আহ্নিক-প্রিয়; কিন্তু কিরূপে অনাথা বিধবার সর্ব্বস্ব নিবেন,

---

১ 'প্রচার' আমি সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শচীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছি।

বিনাপরাধে লোককে জেলে দিবেন, কাহার ঋণ ফাঁকি দিবেন এই চিন্তায়ই রত থাকতেন। আর একজন সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না—অভক্ষ্যে আপত্তি নেই—ম্লেচ্ছের সঙ্গেও ভোজন করে থাকেন, কিন্তু কখনও মিথ্যা কহেন না, যদি মিথ্যা কহেন তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্ব্বক লোক-হিতার্থে যেখানে মিথ্যা একান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেখানেই কেবল মিথ্যা বলে থাকেন। নিষ্কাম হয়ে দান ও পরহিত সাধন করেন, যথাসাধ্য ইন্দ্রিয়-সংযমী, অন্তরে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন, কাউকে যন্ত্রণা দান করেন না, কখন পরস্ব কামনা করেন না, ইন্দ্রাদি দেবতা আকাশাদি ঈশ্বরের মূর্ত্তিস্বরূপ এবং শক্তি ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ স্বরূপ বিবেচনা করে সে সকলের মানসিক উপাসনা করেন এবং পুরাণকথিত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করে আপনাকে বৈষ্ণব বলে পরিচিত করেন। হিন্দুধর্ম্মানুসারে গুরুজনে ভক্তি পুত্রকলত্রাদির সস্নেহ প্রতি-পালন করে থাকেন। তিনি অক্রোধ ও ক্ষমাশীল। এই সব লিখে আমি জিজ্ঞাসু হয়েছিলাম যে উভয়েই কি হিন্দু? একজন ধর্ম্মভ্রষ্ট, আর একজন আচারভ্রষ্ট। তারপর আলোচনা করি যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি? তারপর আমি শাস্ত্রের বিধিনিষেধ উল্লেখ করে বলি সব সময়ে সব নিষেধই মেনে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে কি কর্ত্তব্য? এক হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা, নতুবা হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ যেটুকু অবলম্বনে সমাজ চলতে পারে বা উন্নত হতে পারে সেইটুকু আশ্রয় করা। আমি এও বলি যে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকর—কেন না পৃথিবীতে যে কয়টি শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আছে—বৌদ্ধধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম এই তিন ধর্ম্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত ক'রে তার আসন গ্রহণ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছিল বটে, কিন্তু কেহই হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করতে পারে নাই—ইসলামধর্ম্ম হিন্দু নামধারী কতকগুলি অনার্য্যজাতিকে অধিকৃত করেছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্য্যসমাজের কোন অংশ বিচলিত করতে পারে নাই—বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে ভারতবর্ষ ছেড়ে দিয়ে দেশান্তরে পলায়ন করেছে—আর খ্রীষ্টধর্ম্ম রাজার ধর্ম্ম হয়েও কদাচিৎ একখানি নমঃশূদ্রের বা পৌণ্ড্রের গ্রাম অধিকার, অথবা দুই এক জন তখনকার দিনের কুক্কুট মাংস-লোলুপ ভদ্রসন্তানকে দখল ভিন্ন আর কিছু ক'রতে পারে নাই। অতএব হিন্দুধর্ম্মের স্থান কোন ধর্ম্ম অধিকার করতে পারে নাই, পারবেও না—আর ব্রাহ্মধর্ম্ম? এতো হিন্দুধর্ম্মেরই শাখামাত্র, বিশেষতঃ এর এমন কোন লক্ষণ দেখা নাই, যাতে মনে করতে পারা যায় যে, ভবিষ্যতে এ সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত হতে পারে।

গিরিশ। হাঁ, তখনকার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের এমন হুজুগ বেড়েছিল যে, আপনার এ লেখায় অনেক কাজ হয়েছিল—আমার "চৈতন্যলীলা"র অভিনয়ও ঐ বৎসরেই হয়—আর দর্শকগণও রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের সঙ্গে হরিনাম করে উঠতো। শশধর তর্কচূড়ামণিও সে সময়ে খুব বক্তৃতা দিতেন না?

বঙ্কিম। হাঁ হে, আমি তাঁকেও উপলক্ষ করে লিখেছিলাম। তারপর শুন, আমি আরও বলি যে—আচ্ছা সব কথাটাই প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি—

"এবে হিন্দুধর্ম্ম লইয়া একটা গণ্ডগোলে পড়িতে হইতেছে। আমরা দেখাইয়াছি যে শাস্ত্রোক্ত যে ধর্ম্ম তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করিয়া কখনও সমাজ চলিতে পারে না—এখনও চলিতেছে না। কিন্তু বোধ হয় কখনও চলে নাই। তা ছাড়া একটা প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম আছে—তৎকর্ত্তৃক শাস্ত্রের কতক বিধি রক্ষিত এবং কতক পরিত্যক্ত এবং অনেক অশাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার বিধি তাহাতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের সপক্ষ ও বিপক্ষ সকলেই স্বীকার করেন যে এই বিমিশ্র এবং কলুষিত হিন্দু ধর্ম্ম দ্বারা সমাজের উন্নতি হইতেছে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, যেটুকু হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্ম, যেটুকু সার ভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম্ম, সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত। যাহা প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম নহে, যাহা কেবল অপবিত্র কলুষিত দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, যাহা কেবল অলীক উপন্যাস, যাহা কেবল কাব্য অথবা প্রত্নতত্ত্ব, যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরদিগের স্বার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে এবং অজ্ঞ এবং নির্ব্বোধগণ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহা কেবল বিজ্ঞান অথবা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিজ্ঞান, যাহা কেবল ইতিহাস অথবা কেবল ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যে বিন্যস্ত বা প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় ধর্ম্ম বলিয়া

গণিত হইয়াছে, সে সকল এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক মানসিক সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয় তাহাই ধর্ম্ম, এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্ম্মেরই সারভাগ গঠিত; এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মেই প্রবল। হিন্দুধর্ম্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ আছে, এরূপ আর কোন ধর্ম্মে নাই। সেইটুকুই সারভাগ। সেইটুকুই হিন্দুধর্ম্ম। সেইটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক—তাহা অধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য তাহা অধর্ম্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে তবু অসত্য অধর্ম্ম বলিয়া পরিহার্য্য।

"এ কথায় দুইটী গোল ঘটে, প্রথম বেদাদিতে অসত্য বা অধর্ম্ম আছে বা থাকিতে পারে একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। এমন কথা শুনিলে অনেকে কানে আঙ্গুল দিবেন। এ সম্প্রদায়ের জন্ম আমরা লিখিতেছি না। তাঁহাদের যা হোক একটা ধর্ম্ম অবলম্বন আছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইয়াছেন, অথচ অন্য কোন ধর্ম্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের জন্যই লিখিতেছি। তাঁহারা একথা অস্বীকার করিবেন না।

"আর একটী গোলযোগ এই যে, শাস্ত্রের কোন কথা সত্য, কোন কথা মিথ্যা ইহার মীমাংসা কে করিবে? কোন্‌টুক ধর্ম্ম কোন্‌টুকু ধর্ম্ম নয়? কোন্‌টুকু সার কোন্‌টুকু অসার? উত্তর আপনাদেরই মীমাংসা করিতে হইবে। যেখানে সত্যের লক্ষণ আছে তাহা গ্রহণ করিব, আর যেখানে সে লক্ষণ দেখিব না তাহা পরিত্যাগ করিব। অতএব প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নিরূপণ পক্ষে, আগে দেখিতে হইবে হিন্দুশাস্ত্রে কি কি আছে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র অগাধ সমুদ্র। তাহার যথোচিত অধ্যয়নের অবসর অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু সকলে পরস্পরের সাহায্য করিলে, সকলেরই কিছু কিছু উপকার হইতে পারে। আমরা সে বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিব।"

বঙ্কিমবাবু 'প্রচারে'র লিখিত প্রাচীন কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

গিরিশ। বঙ্কিমবাবু, এতদিনে অপরাপর 'আনন্দমঠে'র কথাগুলি লোকের বোধগম্য হইবে।

অমৃতবাবু। গুরুদেব, আনন্দমঠের কোন্ কথা?

গিরিশ। ভূপী, তুই জানিস না—আনন্দমঠে যে লেখা আছে—

"প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে।

তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম্ম নহে। সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে।"

বঙ্কিম। গিরিশবাবু, তুমি ঠিক আমার মনের কথাটি বলেছ। কিন্তু রবি কি করেছিল জান?

গিরিশ। চল্লিশ বৎসরের কথা, সবটা ঠিক মনে নাই, আপনি নিবেদন করুন।

বঙ্কিম। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে নীরব ছিলেন, কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে (১২৯১) "ভারতী"তে একটী প্রবন্ধে আমাকে বিস্তর গালাগালি দেন। প্রবন্ধটির নাম ছিল "একটি পুরাতন কথা।" কিন্তু ইতিমধ্যে নব্যভারত ও সঞ্জীবনীতে রবীন্দ্রবাবুর দলস্থ বহুব্যক্তি আমাকে আক্রমণ করেন, তাই আমি তখন লিখেছিলাম "রবির পেছনে একটি ছায়া আছে।"

গিরিশ। রবীন্দ্রনাথ কি লিখেছিলেন?

বঙ্কিম। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতায় বলেন—

"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে অসঙ্কোচে নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্ম্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্ম্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছে না। এই কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সে খানে ধর্ম্মের মূল না জানি কত খানি শিথিল হইয়া গিয়াছে! আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের "মুখ্য" লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন?
(ভারতী ১২৯১, অগ্রহায়ণ, ৩৩৭ পৃ)।

আচ্ছা গিরিশ, বক্তৃতার সময় শ্রোতারা এ 'মৃষা' শব্দটা কি মুর্খের অর্থে গ্রহণ করে নাই ?

আর কবেই বা আমি স্পর্দ্ধা সহকারে লোক ডাকিয়া বলিয়াছি "তোমরা ছাইভস্ম সত্য ভাসাইয়া দাও, মিথ্যার আরাধনা কর"—

গিরিশ। কেবল কি এইটুকুই রবীন্দ্রনাথ লিখে-ছিলেন ?

বঙ্কিম। না হে না, তাঁর কুড়ি স্তম্ভ বক্তৃতার মধ্যে মোটে ছয় ছত্র প্রমাণ প্রয়োগ খুঁজে পাই।

গিরিশ। কি আপনার মনে আছে ?

বঙ্কিম। হাঁ, তিনি আমার বিষয়ে বক্তৃতায় বলেন—

"লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি যদি মিথ্যা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেই খানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"

প্রমাণ প্রয়োগ এই পর্য্যন্ত, তারপরে তিনি বলেন, "কোন খানেই মিথ্যা সত্য হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিতেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিতেও হয় না।"

গিরিশ। এই কথায় এইরূপ বল্‌বার কারণ কি হতে পারে ? সবটা বুঝিয়ে বলুন—

বঙ্কিম। প্রথম দেখ 'কল্পনা' শব্দটি সত্য নয়। আমি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করেছি, আমার লেখায় তা ছিল না। আমি কল্পনা করি নাই, আমি সত্য সত্য দুইটি জীবন্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছি, তাঁরা তখনও বেঁচে ছিলেন। আমি লিখেছিলুম, 'আর একটি হিন্দুর কথা বলি', এতে কল্পনা বুঝায় না।

তারপর 'আদর্শ' শব্দটা আমার কথায় বা ভাবে মাত্রই ছিল না। যে ব্যক্তি কখনও কখনও সুরাপান করে, সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলে গৃহীত কিরূপে হতে পারে ? এই দুই কথাই "অসত্য"। অতএব কৃষ্ণের আজ্ঞায় মিথ্যা সত্য হউক না হউক, লেখকের বাক্য-বলে হয়েছিল, অতএব 'যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়', এ কথার কোন অর্থ নাই।

অমৃত। আপনাকে ত এরূপ শ্লেষোক্তি ভাল হয় নাই।

বঙ্কিম। তারপর মহাভারত যাঁর পড়া নাই, তিনি কৃষ্ণোক্তি কথাটির আরোপ করিয়া শ্লেষ করিতেন না।

গিরিশ। হাঁ, হঁ, মহাভারতে এরূপ কৃষ্ণোক্তির কথা আছে

বঙ্কিম। হাঁ তোমার পড়া আছে জানি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠির শিবিরে পলায়ন করে শুয়ে আছেন, তার জন্য চিন্তিত হয়ে কৃষ্ণার্জ্জুন সেখানে উপস্থিত হলেন। অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠির অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কর্ণ কি নিহত হয়েছে ?" অর্জ্জুন প্রত্যুত্তরে জানান যে হয়নি। তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন ও তাঁহার গাণ্ডীবের অনেক নিন্দা করেন। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে গাণ্ডীবের নিন্দা-কারীর তিনি নিশ্চয় প্রাণবধ করিতে বিরত হবেন না। তিনি স্থির করেন আগে জ্যেষ্ঠের প্রাণবধ করবেন, তারপর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আত্মহত্যা করবেন। এখন জ্যেষ্ঠকে বধ না করলে 'সত্য'চ্যুত হ'তে হয়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বুঝান যে এরূপ সত্য রক্ষণীয় নয়, এখানে সত্যলঙ্ঘনই ধর্ম্ম। সুতরাং মিথ্যাই সত্য হয়। রবীন্দ্রবাবু truth সত্য falsehood মিথ্যা ইংরাজী অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমি ব্যবহার করেছি প্রাচীনকাল হতে ভারতবর্ষে যেরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয়ে আস্‌ছে সেই অর্থে। প্রতিজ্ঞা রক্ষা, কথা রাখা এও তো সত্য, সুতরাং 'সত্য' কথাটা 'truth' এর চেয়ে অনেক বিশাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর হত্যা করব ; দস্যুতা করবো পরপীড়ন করবো এইরূপ প্রতিজ্ঞা যদি কারও থাকে, তা না রক্ষা করাই ধর্ম্ম। এখানেও সত্যচ্যুতিই ধর্ম্ম, অর্থাৎ মিথ্যাই সত্য।

দেখ, গিরিশবাবু—রবীন্দ্রবাবুকে আমি বার বার বলেছি সত্য জিনিষটা খুবই ভাল, সত্যের প্রতি কারও অভক্তি নাই। কিন্তু সত্যের ভাণের উপর আমার বড় ঘৃণা ছিল। যাঁরা নেড়া বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলেন, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভাণ বলেছিলুম। এজিনিষ এদেশে বড় ছিল না কিন্তু বিলাত হ'তে ইংরেজীর সঙ্গে বড় বেশী পরিমাণে আমদানী হয়েছে। এটা বড়ই কদর্য্য। মৌখিক lie direct সম্বন্ধে যত আপত্তি—

কার্য্যতঃ সমুদ্রপ্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সেকালের হিন্দুর এই দোষ ছিল বটে যে lie direct সম্বন্ধে তত আপত্তি ছিল না। কিন্তু ততটা কপটতা ছিল না। আমি 'দেবী চৌধুরাণী'তে তা দেখিয়েছি। তবে দুইটাই পাপ। এখন ইংরেজী শিক্ষার গুণে হিন্দু-পাপটা হ'তে অনেক অংশে উদ্ধার পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু ইংরেজী পাপটা বড় বেড়ে উঠেছে। মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা আন্তরিক অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্রবাবু বোধ হয় এতদিনে বুঝেছেন। আমি সে সময় সাবধান করে দিয়েছিলুম যে, সত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতে গিয়ে কেবল আন্তরিক সত্যের প্রতি অমনোযোগ না ঘটে। পথটা বড় পিচ্ছিল।

গিরিশ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আপনার কি এখনও একটু অনুরূপ ভাব আছে?

বঙ্কিম। বল কি গিরিশ? অত বড় কবি ও সাহিত্যিক বাঙ্গালার ভাগ্যে জন্মেছে? তাঁকে তো এখান থেকেই পুষ্পবৃষ্টি করতে ইচ্ছে করে—সে যেন দীর্ঘজীবী হয় হয়, এখানে যেন শীগ্‌গির না আসে—তার প্রতিভা অসাধারণ, সর্ব্বতোমুখী। তবে এখনও সময় আছে প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে উন্নতি সাধন করুন।

গিরিশ। হাঁ এতবড় কবি, নাট্যকার, গল্পলেখক একাধারে জগতে বিরল।

বঙ্কিম। গিরিশ কথায় কথায় বেলা হ'য়ে গেল—এদিকে যেজন্য এসেছিলুম সে কথাই ভুলে গেছি। দেখ চিত্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে দেশের মুক্তির জন্য কিরূপ পাগলের ন্যায় ছুটেছে।

গিরিশ। দেখুন আমি 'মীরকাশিম' নাটকে এইরূপ নেতারই পরিকল্পনা করেছি।

বঙ্কিম। কি রূপ?

গিরিশ। দেখুন, মীরকাশিম তো যুদ্ধে বেশী জয়লাভ করতে পারেনি—তবে সিরাজদ্দৌলা লিখবার পর এ নাটকখানি লিখতে অনুরুদ্ধ হই। কিন্তু তাতে আদর্শ কল্পনায় এঁকেছি,—এই চিত্তই আমার কল্পনার বাঙ্গালী নায়ক।

বঙ্কিম। তাইতো আজ তোমার কাছে এলাম। চিত্ত বলছে, 'বঙ্কিম ও গিরিশ প্রতিভার সেতুবন্ধন দরকার হয়ে পড়েছে,' এসো গিরিশ, উভয়ে প্রাণভরে ওকে আশীর্ব্বাদ করি—

(উভয়েই চক্ষু বুজিলেন। শঙ্খঘণ্টা বাজিল, দেবকন্যাগণ মর্ত্তে চিত্তরঞ্জনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। সকলেই চক্ষু মুদিয়া রহিলেন)

গিরিশ। দেব, সবই হবে কিন্তু ভারতের লোক যে অন্নাভাবে জর্জ্জরিত, দুঃখ, কষ্ট, অসন্তোষ, অকালমৃত্যু স্বাস্থ্যাভাব যে ভারতবাসিগণকে আচ্ছন্ন করেছে।

বঙ্কিম। সে সম্বন্ধেও অবিলম্বে বাঙ্গালায় আশার বাণী শুনতে পাবে। এ বিষয়ে আর একদিন আলোচনা করব। আজ বড় বেলা হয়েছে, গিন্নী ব'সে আছেন।

(বঙ্কিমের প্রস্থান। সকলে পদধূলি গ্রহণ করেন)

আর্থিক উন্নতি

...মূলতঃ কৃষিজাত দ্রব্যকেই যুক্তিসঙ্গত ভাবে মানুষের প্রকৃত ধন অথবা অর্থ (wealth) বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। টাকা, আনা, পয়সা অথবা পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স না থাকিলেও যদি মানুষের একমাত্র প্রচুর কৃষিজাত দ্রব্য থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে জীবন ধারণ করা অসম্ভব হয় না। কিন্তু, মনুষ্যসমাজে কৃষিজাত দ্রব্য না থাকিয়া যদি কেবলমাত্র অসংখ্য পরিমাণের টাকা, আনা, পয়সা অথবা পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স থাকিত, মানুষের পক্ষে একদিনও জীবন ধারণ করা সম্ভব হইত না।

গত তিন শত বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত অর্থ নৈতিক বিশেষজ্ঞ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মতে কৃষি শিল্পের অন্তর্গত এবং কৃষির যত উন্নতি হউক আর না-ই হউক, অন্যান্য শিল্পের এবং বাণিজ্যের উন্নতি হইলেই জাতির উন্নতি সম্পাদিত হইতে পারে। এই মতবাদও ভ্রমাত্মক। কৃষি ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের ও বাণিজ্যের উন্নতি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইলে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক সমস্যা তিরোহিত হইতে পারে বটে, কিন্তু একে ত' কোন না কোন কৃষিজাত দ্রব্য না হইলে কোন শ্রেণীর শিল্পের সংগঠন করা সম্ভব হয় না, তাহার পর আবার কৃষি ব্যতীত শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সম্পাদিত হইলে আংশিক ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক অভাব দূর করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে সমগ্র শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের আর্থিক সমস্যার সমাধান করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

মূলতঃ কৃষিজাত দ্রব্যকেই যে মানুষের প্রকৃত ধন অথবা অর্থ (wealth) বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে, এই সত্যটী একবার উপলব্ধি করিতে পারিলে, কি উপায়ে জাতির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, তাহা স্থির করা সহজসাধ্য হয়। যে যে উপায়ে কৃষির উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলেই জাতির আর্থিক উন্নতির বিধি-ব্যবস্থা সুগম হইয়া থাকে। কাযেই, কি উপায়ে জাতির আর্থিক উন্নতি সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে কি উপায়ে কৃষির উন্নতি হইতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে হইবে।...

বর্ষ-প্রবন্ধপঞ্জী

—শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

[গত ১৩৪৪ সালে 'পরিচয়' "প্রবাসী', 'বঙ্গশ্রী', 'বসুমতী', 'বিচিত্রা' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার তালিকা এই পঞ্জীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প, প্র, বং ব, বি ও ভা পত্রিকাগুলির যথাক্রম সঙ্কেত। সংখ্যাগুলি বর্ষ, খণ্ড এবং প্রকাশ—সংখ্যাবাচক, যথা—বং ৬।২।১ = বঙ্গশ্রী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা।

ভ্রম-সংশোধন—গত মাসে ৮৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে ৭১ (কলা সাধারণ) ৭১ (শোভন শিল্প) হইবে এবং উহা ঐ স্থানে সন্নিবেশিত না হইয়া 'সখের ফুলবাগান—অনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—ইহার পূর্ব্বে যাইবে।

ঐ সংখ্যার ৯০ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে প্রকাশিত 'ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতা' এবং 'ভারতীয় নাট্যের বেদমূলকতা' ৮১ সংখ্যক বর্গের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া হইয়া ৮২ (নাট্য)-বর্গে সন্নিবেশিত হইবে।]

সাহিত্য

৮৮ (বিবিধ)

আলডুস্ হাক্সলীর প্রতিভা—শ্রীগোপাল ভৌমিক
ভা ২৫।২।২ ; মাঘ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (২৭৯-৮১)

আশী বৎসর পূর্ব্বের বাংলা সাহিত্য—শ্রীমতিলাল দাশ
বং ৬।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৪ (৮০৪-০৭)

ইউরোপে সংস্কৃতানুশীলনের সূত্রপাত ও ইউজেন বুর্নুফ
—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী
প ৮।২।২ ; ফাল্গুন ১৩৪৪ ; পৃঃ ৬ (১৩১-৩৬)

ইন্দ্রনাথ—শ্রীকালিদাস রায়
বং ৬।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (৭৮৭-৮৯)

ইংরাজী ও ফরাসী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
বি ১১।২।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৪ ; পৃঃ ৬ (৭১৪-১৯)

ঈশপ ও বিষ্ণুশর্ম্মা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র
বি ১২।১।২ ; ভাদ্র ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (২৩০-৩২)

কবি ও যোগী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
প ৮।১।৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৭ (৬৪৪-৫০)

গল্পানুদর্শন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
বং ৬।২।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৪ ; পৃঃ ৪ (৩২৬-২৯)

গল্প সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী—শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ
প ৮।২।১ ; মাঘ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৫ (৩৮-৪২)

চণ্ডালিকা—শ্রী প্রতিমা দেবী
প্র ৩৮।১।৬ ; আশ্বিন ১৩৪৪ ; পৃঃ ৩ (৭৭৫-৭৭)

জাপানী কবিতার জোনাকি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
ভা ২৫।২।১ ; পৌষ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৪ (১৪৩-৪৬)

টেকচাঁদ ঠাকুর ও হুতোম শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী
বং ৬।২।৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৪ ; পৃঃ ৫ (৪৮৩-৮৭)

দিগ্‌নাগের সাহিত্য চর্চ্চা (শকুন্তলা)—শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প ৮।১।৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ ; পৃঃ ১২ (৬৩৫-৪৬)
প ৮।১।৬ ; পৌষ ১৩৪৪ ; পৃঃ ১০ (৫৩৯-৪৮)

নতুন ও পুরাতন—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
প ৮।১।৬ ; পৌষ ১৩৪৪ ; পৃঃ ১৪ (৪৯৫-৫০৮)

৮৮ (বিবিধ) ৭৯ (বিনোদন) ৬১ (চিকিৎসা শাস্ত্র)

নানা কথিকা

ব ১৭।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৪ ; পৃঃ ১১ (১০২-১২) ; ছবি ১৩
ব ১৭।১।২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ ; পৃঃ ১০ (৩২২-৩১) ; ছবি ১২
ব ১৭।১।৩ আষাঢ় ১৩৪৪ ; পৃঃ ১২ (৫১৪-২৫) ; ছবি ২২
ব ১৭।১।৪ শ্রাবণ ১৩৪৪ ; পৃঃ ১০ (৬৫৩-৬২) ; ছবি ১৩
ব ১৭।১।৫ ভাদ্র ১৩৪৪ ; পৃঃ ৯ (৮৩৩-৪১) ; ছবি ১৫
ব ১৭।১।৬ আশ্বিন ১৩৪৪ ; পৃঃ ৯ (১০৩৮-৪৬) ; ছবি ১৭
ব ১৭।২।১ কার্ত্তিক ১৩৪৪ ; পৃঃ ১০ (১৪৩-৫২) ; ছবি ১৪
ব ১৭।২।২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৯ (৩১৩-২১) ; ছবি ৯
ব ১৭।২।৩ পৌষ ১৩৪৪ ; পৃঃ ১১ (৫১২-২২) , ছবি বহু
ব ১৭।২।৪ মাঘ ১৩৪৪ ; পৃঃ ১০ (৬৯৫-৭০৪) ; ছবি বহু
ব ১৭।২।৬ চৈত্র ১৩৪৪ ; পৃঃ ৯ (৯৩১-৩৯) ; ছবি বহু

৮৮ (বিবিধ)

নারী চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ঘোষ
বি ১২।১।৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৭ (৬১২-১৮)

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা
—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বং ৭।২।১ ; ফাল্গুন ১৩৪৪ ; পৃঃ ১৬ (১৭২ ক-১৭২ ব)

৮৯ (অনুবাদ সাহিত্য)

জাপানী কবিতা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প ৮।১।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১২ (১১৯-৩০)

সাঁওতাল বিদ্রোহের ছড়া—শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার

ভা ২৬।২।২ ; মাঘ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৪ (২২০-২৪)

হোরেসের কাব্যাদর্শ—শ্রীরাইমোহন সামন্ত

ভা ২৬।১।১ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৯২-৯৪)

ইতিহাস

৯১ (ভ্রমণ)

আগ্নেয়গিরির দেশ গোয়াতেমালা—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বং ৫।১।৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৬৬৮-৭৪) ; ছবি ৬

আফ্রিদি মুলুকে—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভা ২৬।১।১ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৩৬-৪২) ; ছবি ৯

ইউরোপে শীত-বিহার—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

বং ৬।১।৬ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৬১৭-২১) ; ছবি ৫

ইটালির উপনিবেশ ইরিত্রিয়া (হ্যারল্ড লেকেনবার্গের বিবরণ হইতে)

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বং ৬।২।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (২২৪-৩০) ; ছবি ৬

উড়িষ্যার জঙ্গলে তেখটি দিন—শ্রীউমাপদ চক্রবর্ত্তী

ভা ২৬।১।৫ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৬৯৫-৭০১) ; ছবি ৭

কলোন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ভা ২৬।২।১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৩২-৪১) ; ছবি ৯

কাপান উপত্যকা—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

বং ৬।১।৪ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৪৭৩-৭৭) ; ছবি ৩

কাশ্মীরে কয়েক দিন—শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

বং ৭।১।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১২ (৪১-৫৫) ; ছবি ৭

কেনিয়ার কথা—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

বং ৬।২।৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৫০৭-১৩) ; ছবি ৪

কুম্ভমেলার স্মৃতি—শ্রীঅমরকুমার নন্দী

ভা ২৬।১।৩ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৪৩৫-৪১) ; ছবি ৮

খাসি ও জয়ন্তি পাহাড়—শ্রীকাননগোপাল বাগচী

ভা ২৬।২।৩ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৩৬৮-৭২) ; ছবি ৮

গুয়াম—শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

ব ১৭।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৩ (৭৮৯-৮০১) ; ছবি ২৩

চক্রাবর্ত্ত—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

ভা ২৬।১।১ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (১০৯-১৫)

ভা ২৬।১।৩ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৩৫৮-৬৬) ; ছবি ৪

ভা ২৬।১।৪ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৬২০-২৪) ; ছবি ৫

ভা ২৬।১।৫ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৭৫২-৫৭)

চীন তিব্বত সীমান্তের আমনি মাচেন পর্ব্বতমালা

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বং ৮।২।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (১০৬-১১) ; ছবি ৯

চীনা দস্যুদের হাতে—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভা ২৬।১।২ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (২৩১-৩৫) ; ছবি ৭

জয়পুর—শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

বং ৭।১।৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (২৭৪-৮৭) ; ছবি ৪

জাপান ভ্রমণ—শ্রীশান্তা দেবী

প্র ৩৮।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (১০১-১০) ছবি ৫

প্র ৩৮।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (২৬০-৬৯) ; ছবি ১৩

প্র ৩৮।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (৩৬২-৭২) ; ছবি ১৬

প্র ৩৮।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৫৪৬-৫৫) ছবি ১০

প্র ৩৮।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৬৮৩-৯০) ; ছবি ৫

প্র ৩৮।১।৬ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৮৪৪-৫৩) ; ছবি ৯

প্র ৩৮।২।১ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৫ (১১৯-৩৩) ; ছবি ২২

প্র ৩৮।২।২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৫ (২৬৩-৯৭) ; ছবি ২৩

প্র ৩৮।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (৪৪৬-৫৬) ; ছবি ১৮

জাপানের পথে—পি. সি. সরকার

ভা ২৬।১।১ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৬৫-৭৩) ; ছবি ১১

ভা ২৬।১।৫ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৬৭৭-৮৪) ; ছবি ১০

জার্ম্মানী ভ্রমণ—শ্রীশোভারাণী দত্ত

প্র ৩৮।২।৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৮০৮-১৬) ; ছবি ১২

জেচোস্লোভাকিয়া—শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

ব ১৭।১।৬ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৭ (৯৬৪-৮০) ; ছবি ৩১

ত্রিচিনাপল্লী ও শ্রীরঙ্গম্—শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

ভা ২৬।১।৩ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৩৪১-৪৭) ; ছবি ৪

তুরস্কের রূপান্তর—শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

ব ১৭।২।৫ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ২২ (৭৭২-৯৯) ছবি ৪৩

দক্ষিণ ভারত—ডক্টর শ্রীরুদ্রেন্দ্র কুমার পাল

ভা ২৬।২।৪ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৫৫৯-৬৮) ছবি ৮

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)—শ্রীদুর্গাপদ মিত্র

ব ১৭।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (১২১-২৬) ; ছবি ৩

ব ১৭।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (২৭২-৭৫)

ব ১৭।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৪৪৪-৪৯ ; ছবি ৫

ব ১৭।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৫৮১-৮৫) ; ছবি ৩

দেওঘর শিবিরে নয় দিন—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভা ২৬।২।২ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (২২৫-৩০) ; ছবি ৪

নর্থ বেঙ্গল—শ্রীঅবনীনাথ রায়

বি ১২।১।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (২০১-১০) ; ছবি ১৫

বাংলা মা

—শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা মাগো, আবার তুমি সত্য হয়ে দেখা দাও—
(তোমার) তুলসীতলার মাটির তলায় আবার মাথা লুইয়ে নাও ;
নিবিড় ঘন শীতল স্নেহ প্রেম মমতার মন্ত্রে
নূতন স্বপন জাগাও পুনঃ নিতল মনের অন্তরে।
ঘুমিয়ে পড়া অলস আঁখির সুপ্তিবিলীন দৃষ্টিকে—
জাগাও তোমার চুম্বনে মা, মধুর কর সৃষ্টিকে।
তোমার মেঠো ঘাসের পথে সেই শ্যামলের সমারোহ
অঙ্গনের ঐ আলিম্পনে সেই অপরূপ রঙের মোহ,
মোর মানসে সেই রূপেরই অরূপ লিখন আবার আঁকো
জীবন ভরে সত্য হ'য়ে নিত্য হয়ে হিয়ায় জাগো।

শস্য-ক্ষেতের সবুজ সীমার প্রান্তে যে ঐ গাছের সার
দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়ার মনভোলানো রং বাহার,—
একটি ধারে বাঁশের ঝাড়ে ঝাপসা করে সকল দিন
গাছে শোনে গাছের কথা, কী জানি কি তন্দ্রালীন।
বুক চিরে তার খালের রেখা, নৌকা চলে ভিন্ গাঁয়ে
কূল ঘেঁসে তার শষ্প কোমল জড়িয়ে চলে পায়ে পায়ে
দূরে দূরে কানন-ঘেরা ছোট্ট চালাঘরগুলি
অঙ্গনে তার শালিখ নাচে,—দাওয়ায় ডাকে বুলবুলি।
ঘোমটাপরা লক্ষ্মী বৌয়ের আদর মাখা সংসারে,
সংসার যত সবল পুরুষ সন্ধ্যা বেলায় হাঁক ছাড়ে।
ফুলের মতন নরম যত মধুর শিশুর উৎপাতে
উঠানখানি মুখর সদা,—কাড়াকাড়ি দুধভাতে
ঠাকুর-পূজোর ঘণ্টাতে আর ঠাকুর-মায়ের রূপকথায়
ছেলে বুড়ো সবাই মিলে জড়িয়ে থাকার ভুল কোথায়!
সকাল সাঁঝে গোয়াল-ঘরে ঘনধারায় ক্ষীর ঝরে
সুস্বাদু সেই রসায়নে আকণ্ঠ আজ দাও ভ'রে।
ঘুচিয়ে দাও অশোচ-মোহ ঐ বুকেতে লুকিয়ে নাও
শান্ত তোমার ঠাণ্ডা আঁচল হৃদয় ভরে বুলিয়ে দাও।

যে মন গেছে দূরের পানে লক্ষ্যহারা অন্ধ চোখ
ভুলিয়ে তারে দুঃখ শোক আজ দাও চিনিয়ে সত্যলোক;
নিত্য যাহা সত্য তোমার মায়ায় ভরা মর্ম্মে গো,
তাই দিয়ে আজ মুক্ত কর সর্ব্বনাশার ধর্ম্মে গো,
তোমার দীঘির অমল জলে গাহন দিয়ে শুদ্ধ করো
তোমার মাটির মন্ত্রে আবার চিত্তকে প্রবুদ্ধ করো
প্রভাতে যে গোময় ছড়া, শুদ্ধ শুচির মাঙ্গলিক্
নবারুণের যেই কিরণে দীপ্ত করে দিগ্বিদিক্
গোধূলিকার আঁচল তলে যে দীপখানি দ্বার খুলে
শ্যামা বধূর কোমল হাতে ঘুরে বেড়ায় দুলে দুলে,
সেই আলোকের অমল শিখায় পথ চিনিয়ে নাও ঘরে
পুষ্ট কর আবার তোমার বুকের সুধার দুধসরে।

সুপ্তিমগন তোমার যত দেউল দেব-মন্দিরে,—
বেলাশেষের বেণুরবে ফিরিয়ে আন মনটিরে
বৃথাই ঘুরি ছিন্নবেশে হারিয়ে গেছি সকল পথ
তোমার শীতল ধূলার পথে আজকে করি দণ্ডবৎ।
বাস্তুভিটার দুয়ারখানা দাও খুলে দাও একটি বার
বাপ-দাদাদের আশিস্‌মাখা চিরশীতল নির্ব্বিকার—
অলীক নেশা যাকে ছুটে আজ তারাই যত বাদ সাধে
তোমার স্মৃতির ভাব-বিভূতির তিলক কাটি আহ্লাদে
আবার গোষ্ঠে ফিরুক মা গো পথহারা এই ধেনুর পাল
মুহূর্ত্তকে ছিন্ন হোক্ এই মুগ্ধ মোহের ইন্দ্রজাল
সব ভুলিয়ে তোমার কোলেই পাতা আবার শয্যাটি
মায়ের বুকে ফিরবে ছেলে, দুঃখ কি আর লজ্জা কি!



বাঙ্গালার ছবি ([illegible])

শ্রীপরিমল গোস্বামী

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

চৈত্র—১৩৪৬

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

ভারতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতার শপথ-বাক্য এবং ভারতবর্ষের চতুর্ব্বিধ ধ্বংস

ভারতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা-শপথ-বাক্যের একাংশে বিবৃত হইয়াছে, "ভারতে ব্রিটিশ শাসন যে, কেবল ভারতীয় জন-সাধারণকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহা নহে, ঐ জন-সাধারণের শোষণকার্য্যই উহার ভিত্তিস্বরূপ এবং উহা ভারতের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সংস্কৃতিগত এবং আধ্যাত্মিক ধ্বংস সাধন করিয়াছে (the British Government in India has not only deprived the Indian people of their freedom but has based itself upon the exploitation of the masses and has ruined India economically, politically, culturally and spiritually.)"

এই উক্তির যাথার্থ্য সম্পর্কে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার ইউরোপীয় সদস্য মিঃ এফ. ই. জেম্‌স্ বলিয়াছেন যে, ইহা মিঃ গান্ধী সমর্থিত অহিংস-নীতির পরিপন্থী।

"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকা বিবৃত বিষয় লইয়া দুইটি সম্পাদকীয় সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। প্রথমটিতে ইহাকে "জঘন্য মিথ্যা" (an abominable falsehood) বলিয়া তাঁহারা আখ্যাত করিয়াছেন।

"হরিজন" পত্রিকায় মিঃ গান্ধী "চতুর্ব্বিধ ধ্বংস" শীর্ষক একটি সন্দর্ভে প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে, ঐ উল্লেখ মিথ্যা নহে, কিংবা অহিংসা-নীতির বিরোধী নহে।

মিঃ গান্ধীর এই সন্দর্ভের উত্তরে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকা গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় "ভাষাগত একটি প্রশ্ন (A Question of Language)" শীর্ষক তাঁহাদের দ্বিতীয় প্রবন্ধ রচনা করেন।

"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"-এর এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য করা হইয়াছে :—

"অর্থ বুঝিয়া এবং কথার দায়িত্ব রাখিয়া যাঁহারা ইংরাজী বলেন, তাঁহাদের কেহই এমন ইঙ্গিত করিতে পারেন না যে, ব্রিটেন অথবা ভারতবর্ষের ধ্বংস সাধিত হইয়া গিয়াছে। ধ্বংস (ruin) বলিতে—জীবনের বিন্দুমাত্রও অবশেষ আছে, এমন বুঝা যায় না। কোন ইমারৎ অথবা আর কিছুর যতদিন সংস্কার সাধিত হইতে পারে, ততদিন তাহা ধ্বংস হয় না। ধ্বংস লইয়া আর বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে পারে না। ভারতবর্ষ

যদি চতুর্ব্বিধ ধ্বংসই সাধিত হইয়া থাকে, তবে ইহা আর জাতি বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না, ইহার রাজনীতিও থাকিতে পারে না, নূতন করিয়া শিল্প-প্রসারও হইতে পারে না। (But no one consciously and responsibly talking English will suggest that either Britain or India is ruined already. For ruin is dead. There is no life in a ruin. So long as a building or anything else can be restored it is not a ruin. A ruin is beyond argument. If India is a four fold ruin, it can never be a nation, it can have no politics, no new industries."

মিঃ জেমসের বক্তৃতা এবং মিঃ গান্ধীর কয়েকটি রচনা সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলে বুঝা যাইবে যে, তাঁহাদের বাদানুবাদে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গসমূহ উত্থাপিত হইয়াছে :—

(১) ব্রিটেন, অথবা ভারতের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সংস্কৃতিগত কিংবা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার ধ্বংস সাধিত হইয়াছে, এইরূপ মনে করা সঙ্গত কি না ?

(২) "ধ্বংস (ruin)" কথাটির যথোচিত অর্থ কি ?

(৩) যদি প্রমাণ হয় যে, ব্রিটেন অথবা ভারত, উভয়েরই চতুর্ব্বিধ ধ্বংস সাধিত হইয়া গিয়াছে, তবে ব্রিটিশ শাসনকে কোন না কোন প্রকারে ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী সাব্যস্ত করা সঙ্গত কি না ? ব্রিটিশ শাসনের স্কন্ধে এই ধ্বংসের মূল দায়িত্ব আরোপ না করা গেলেও, ব্রিটিশ শাসনকে উহার জন্য কোন না কোন প্রকারে দায়ী করা সঙ্গত কি না ?

(৪) ব্রিটেন অথবা ভারত, কাহারও ধ্বংসের জন্য ব্রিটিশ শাসন মূলতঃ দায়ী বলিয়া ধার্য্য না হইলে, ইহার মূল দায়িত্ব কাহার ?

(৫) ভারতে ব্রিটিশ শাসন ভারতবাসী জনসাধারণকে স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে, ইহা বলা সঙ্গত কি না ?

(৬) ভারতে ব্রিটিশ শাসন ভারতের শোষণের ভিত্তিতে গঠিত, এইরূপ বলা সঙ্গত কি না ?

(৭) ইহা সঙ্গত না হইলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি বলিতে কি বুঝিতে হইবে ?

(৮) ভারতের চতুর্ব্বিধ ধ্বংস সাধিত হইয়া থাকিলে ইহা পুনরায় জাতি বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না, এইরূপ মনে করা সঙ্গত কি না ?

আমরা একে একে এই আটটি প্রশ্নের আলোচনা করিতেছি।

প্রথম প্রশ্নের বিচার করিতে হইলে "ধ্বংস (ruin)" তথা "অর্থনীতি", "রাজনীতি", "সংস্কৃতি" এবং "আধ্যাত্মিকতা", এই কয়েকটি কথারই প্রকৃত অর্থ জানিবার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রথম প্রশ্নের বিচার করিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনা করিতে হইবে।

প্রচলিত ভাষাসমূহের কোন পদেরই প্রকৃত অর্থের সন্ধান দুঃসাধ্য কার্য্য, কেন না প্রতিটি পদের অন্তর্নিহিত শব্দার্থের প্রয়োজনীয়তা না বুঝিতে পারিলে প্রত্যেক প্রচলিত ভাষার প্রত্যেকটি পদের গৃহীত অর্থ সম্বন্ধেই বাদানুবাদের সম্ভাবনা। সকল অভিধানেই প্রায় প্রত্যেকটি পদের সহিত যে বিভিন্ন অর্থ সংশ্লিষ্ট করা হয়, তাহা হইতেই আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে। এই সকল ভাষায় পদের অর্থ লইয়া যদি মতানৈক্যই না থাকিত, তবে কোন ভাষার কোন পদেরই একাধিক অর্থ থাকিতে পারিত না। অর্থাৎ কোন পদের অর্থ লইয়া কোন প্রকার মতানৈক্যের উদ্ভব না হইলে, অর্থ-বিভিন্নতার উদ্ভব হইতে পারিত না এবং প্রত্যেকটি পদের মূলগত অর্থ হইত একটি মাত্র, অপরাপর অর্থ এই একটি মাত্র অর্থ (মূল কিংবা ধাতুগত) হইতে নিষ্পন্ন হইত। কিন্তু পদের অর্থ লইয়া এই প্রকার বাদানুবাদ চিরকাল ছিল না। কোন ভাষার কোন পদের অর্থের ইতিহাস যথাযথভাবে সংগৃহীত হইলে দেখা যাইবে যে, খ্রীষ্ট জন্মাইবার চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে এমন একটি সময় বিদ্যমান ছিল, যখন, সাধারণে প্রত্যেকটি ভাষার প্রত্যেকটি পদের মূলে যে শব্দ বর্ত্তমান, তাহার প্রত্যেকটির প্রকৃত অর্থ পরিজ্ঞাত ছিল এবং বাক্যাংশে ব্যবহৃত পদের কোনটিকে একাধিক অর্থে গ্রহণ করা তখন অসম্ভব ছিল। আমাদের এই উক্তি সম্বন্ধে কোন সুধী বন্ধুর সন্দেহ থাকিলে আমরা তাঁহাকে বেদাঙ্গান্তর্গত অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠের মহেশ্বর-সূত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি।

প্রত্যেকটি ভাষার প্রত্যেকটি পদের মূলগত শব্দের প্রত্যেকটির প্রকৃত অর্থ যখন মনুষ্যসমাজের বিদিত ছিল, তখন সকল দেশের অধিবাসিগণই পরস্পর পরস্পরের বক্তব্য অনুধাবনে সমর্থ ছিল এবং পদ ও বাক্যের অর্থ লইয়া বাদানুবাদ অজ্ঞাত ছিল। কালক্রমে সাধারণে ভাষানিহিত মূল শব্দসমূহের প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হয় এবং এই বিস্মৃতিবশতঃ নানাপ্রকার বাদানুবাদের উদ্ভব হয়। কেন এবং কি ভাবে এই বিস্মৃতি আসে, তাহার ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং উহার আলোচনা বিস্তৃতি-সাপেক্ষ। সুতরাং বর্ত্তমান সন্দর্ভে সে আলোচনা করা সম্ভব নহে। বর্ত্তমানে কোন পদের বিভিন্ন অর্থ লইয়া যে মতানৈক্য বিদ্যমান, তাহা সমাধানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা ঐ পদের বুৎপত্তিগত অর্থের সন্ধান এবং বুৎপত্তি হইতে যে-অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে তাহা গ্রহণ এবং যে-অর্থ তাহা হইতে নিষ্পন্ন না হয়, তাহা সম্পূর্ণ বর্জ্জন।

এইবার আমরা ইংরাজী 'ruin' অর্থাৎ 'ধ্বংস' পদটির ধাত্বর্থের সন্ধান করিব। এই সন্ধানে ব্যাপৃত হইলে দেখা যাইবে যে, ruin পদটির মূল ল্যাটিন ruina এবং ইহার অর্থ হইতেছে, অধঃপতিত হওয়া (to fall), এবং এতদনুযায়ী ruin অর্থাৎ ধ্বংস পদের অর্থ দাঁড়ায় "ব্যষ্টির অথবা সমষ্টির ক্ষয় অথবা অধঃপতন, the downfall or decay of a person or society." অক্সফোর্ড ডিক্‌শনারীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে, তন্মধ্যেও ruin পদটির একটি অর্থ ইহাই (the downfall or decay of a person or society) বলিয়া উল্লিখিত আছে। সুতরাং ধরিতে হয় যে, কোন প্রকার অধঃপতনকেও ruin কিংবা ক্ষয় (decay) বলিয়া, আখ্যাত করা যাইতে পারে। ইহা হইতে অবশ্য-গ্রাহ্য এই যে, কেবল মৃত্যুই (death) ধ্বংস নহে, মৃত্যুকে অবশ্যই ধ্বংস বলিতে হইবে, কিন্তু ব্যাধিবিশেষকেও ধ্বংস বলা যাইতে পারে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" যেরূপ বলিয়াছেন, "ধ্বংস বলিতে জীবনের বিন্দুমাত্রও অবশেষ আছে, এমন বুঝা যায় না (there is no life in a ruin)", তাহা সঙ্গত নহে এবং ইহা হইতে যুক্তিযুক্ত ভাবে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, ইংরাজীভাষী জাতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকার সম্পাদকের ইংরাজী পদের অর্থ সম্বন্ধেই ধারণা সম্যক্‌ অর্জ্জিত হয় নাই।

আমরা "অর্থনীতি," "রাজনীতি," "সংস্কৃতি" এবং "অধ্যাত্ম" পদের অর্থ লইয়া কোন আলোচনা করিলাম না, কেন না ইহা লইয়া বর্ত্তমানে কোন বিতণ্ডা উপস্থিত হয় নাই।

এইবারে আমরা প্রথম প্রশ্নের আলোচনা করিব, অর্থাৎ "ব্রিটেন অথবা ভারতের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সংস্কৃতিগত, কিংবা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার ধ্বংস সাধিত হইয়াছে, এইরূপ মনে করা সঙ্গত কি না।"

ধ্বংস (ruin) কথাটি সম্বন্ধে ধারণা সম্যক্‌ হইলে আমরা অবিলম্বে বুঝিব যে, কোন দেশের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সংস্কৃতিগত কিংবা আধ্যাত্মিক ধ্বংস হইয়াছে কি না, তাহার সন্ধান করিতে হইলে, প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সংস্কৃতিগত এবং আধ্যাত্মিক পূর্ণবিকাশ সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, ঐ বিশেষ দেশ তাহার ইতিহাস-কালে ঐ সকল বিষয়ে কি পরিমাণ উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

যদি দেখা যায় যে, এই সকল বিষয়ের কোনটির, অর্থাৎ অর্থনৈতিক, কিংবা রাষ্ট্রীয়, কিংবা সংস্কৃতিগত, কিংবা আধ্যাত্মিক দিক্‌ হইতে বর্ত্তমানে ব্রিটেন, কিংবা ভারতের অবস্থা তাহাদের বিগত ইতিহাসের কোন সময়ের উন্নতির পরিমাণের তুলনায় কোন না কোন ভাবে ন্যূন, তাহা হইলে ইহাদের ধ্বংস সাধিত হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

অনায়াসেই প্রমাণিত হইবে যে, কোন দেশের আর্থিক উন্নতির পূর্ণবিকাশ নিম্নলিখিত তিনটি অবস্থার মধ্যে নিহিত :

(১) ঐ দেশের আহার্য্য ও কাঁচামালের এমত পরিমাণ প্রাচুর্য্যসাধন, যাহা দেশান্তর্গত সমগ্র অধিবাসীর প্রয়োজনপূরণের পক্ষে যথেষ্ট হয় এবং তজ্জন্য ঐ দেশকে বাহিরের আমদানীর উপর নির্ভর না করিতে হয়।

(২) ঐ দেশের মধ্যে এমন সংগঠন বিস্তার, যাহাতে অধিবাসীদের কাহাকেও ব্যক্তিগত জীবনযাপন পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জনার্থ কোন প্রকার বেতনভোগী চাকুরী অথবা দাসত্বের অধীন না হইতে হয়।

(৩) দেশের মধ্যে এমন শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার, যাহাতে দেশের অধিবাসিগণ জীবনধারণার্থ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জনের দ্বারাই সুখী হয় এবং কেহ অধিকতর যোগ্যতার ফলে অধিকতর উপার্জ্জন করিতেছে দেখিয়া ঈর্ষান্বিত না হয়।

রাষ্ট্রীয় উন্নতির পূর্ণবিকাশ বলিতে যে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয় বুঝিতে হয়, তাহাও প্রমাণিত হইবে :—

দেশের মধ্যে এবম্প্রকার সংগঠন-ব্যবস্থা, যদ্দ্বারা ইহার আর্থিক, সংস্কৃতিগত এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

সংস্কৃতিগত উন্নতির পূর্ণ বিকাশ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত হইতে পারে :—

দেশের মধ্যে এবম্প্রকার জ্ঞান এবং সংগঠন বিস্তার, যাহাতে দেশবাসিগণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ভাবরাশি দমন করিতে সমর্থ হয় এবং দেশবাসীর মধ্যে সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি-দানসহায়ক প্রকৃতি-সম্মত ভাব বিস্তার লাভ করে।

আধ্যাত্মিক বিষয়ের পূর্ণবিকাশ বলিতে এবম্প্রকার জ্ঞানের বিস্তার বুঝিতে হইবে, যাহাতে দেশবাসিগণ তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যের মূলগত প্রেরণাসমূহের আদি কারণ উপলব্ধি করিতে পারে।

এইবারে, আমরা যদি ব্রিটেন অথবা ভারতের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে বুঝিতে পারিব যে, ব্রিটেন এবং ভারত, উভয় দেশেই এমন একটি সময় ছিল, যখন উক্ত সকল বিষয়েই পূর্ণবিকাশ সংসাধিত হইয়াছিল। ইহা সত্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে যাহার সূচনা, সেই বর্ত্তমান ইতিহাস হইতে এই তথ্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, কিন্তু তজ্জন্য এই তথ্য সত্য নহে, এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। প্রাচীন গ্রন্থসমূহ যথাযথ অর্থে অনুধাবন না করিতে পারিলে কোন দেশেরই প্রাচীন ইতিহাস সঙ্গতার্থে অনুসন্ধান করা যাইবে না, এবং বর্ত্তমান ইতিহাসসমূহের ইতিহাস প্রকৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহাদের কোনটিই এ পর্য্যন্ত কোন প্রাচীন গ্রন্থের প্রকৃত অর্থের মর্ম্মোদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, প্রাচীনকালের ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আধুনিক কালের কোন একটি ইতিহাসও নির্ভরযোগ্য নহে। কিন্তু "ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ" হইতে সমগ্র মনুষ্যসমাজের যথার্থ প্রাচীন ইতিহাস এবং প্রাচীন ভূতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে। ঐ গ্রন্থ পাঠের অধিকার অর্জ্জনার্থ বৃহৎসংহিতা এবং সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থের প্রকৃত প্রতিপাদ্যের সহিত পরিচয় প্রয়োজন। এ বিষয়ে কেহ জিজ্ঞাসু হইলে এবং আমরা তাহা জানিতে পারিলে তাঁহাকে পন্থার সন্ধান দান করিতে পারি।

মনুষ্যসমাজের যথার্থ প্রাচীন ইতিহাস পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, আজ হইতে বার হাজার বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্যজাতি সকল বিষয়ের উন্নয়নমূলক প্রকৃত পন্থায় অগ্রসর হইয়াছিল এবং অতঃপর দুই হাজার বৎসরের মধ্যে সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংগঠনের পূর্ণবিকাশ সাধিত হইয়াছিল। জ্ঞানের পূর্ণতা মনুষ্যজাতির সংগঠনসমূহের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয় এবং আজি হইতে দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্য-অধ্যুষিত প্রত্যেকটি দেশ অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সংস্কৃতিগত এবং আধ্যাত্মিক দিক্ হইতে পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই সকল পূর্ণবিকাশলব্ধ সংগঠন সাহায্যে মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি অতঃপর চারি হাজার বৎসর কালের নিমিত্ত তাহার সুফল ভোগ করে এবং সেই সময়ে মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেণীর দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু এই কালে মনুষ্য-জাতি এই সকল ত্রুটিহীন সংগঠনের প্রাণস্বরূপ যে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান, তৎসম্বন্ধে অনবহিত হয় এবং তাহারই ফলে এতদ্বিষয়ে বিস্মৃতি ঘটে এবং ব্যভিচারী ভাবসমূহ সমাজমধ্যে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে ও মনুষ্য-সমাজের পুনরায় দুঃখ-দুর্দ্দশার ভোগ সূচিত হয়। তৎপরবর্ত্তী চারি হাজার বৎসর মনুষ্য-জাতি এক প্রকার নিশ্চেষ্ট থাকে এবং তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা চরমে উপনীত হয় এবং ক্রমশঃ উহা মনুষ্যের সহনশীলতা অতিক্রম করে।

বর্ত্তমান বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহের আবির্ভাবকাল হইতে মনুষ্য-সমাজ পুনরায় প্রকৃত বিজ্ঞানের গবেষণায় অবহিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি ঐ প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকার মনুষ্য-জাতি লাভ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান নামে যাহা কিছু প্রচলিত রহিয়াছে, তৎসমুদায়কেই বিকৃত বিজ্ঞান বলিতে হইবে। এই নিমিত্তই

বর্ত্তমান যুগে কোন ক্ষেত্রেই ত্রুটিহীন সংগঠন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মনুষ্যজাতি এমনই নির্ব্বুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে যে, মনুষ্যজাতির কোন বিষয়ের সংগঠন যে ত্রুটিহীন হইতে পারে, ইহা পর্য্যন্ত অসম্ভব মনে করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বৃহৎসংহিতা ও সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, পূর্ব্বোল্লিখিত কয়টি গ্রন্থনিহিত পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস-পাঠের প্রণালী পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ-সমূহকে প্রত্যেক বার হাজার বৎসর কালের মধ্যে চারি হাজার বৎসর পর পর সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত থাকিতে হয় এবং এই জন্যই তাঁহাদের প্রাচীন ইতিহাস-সমূহের অনুসন্ধান দুঃসাধ্য হইয়া থাকে।

প্রাচীন ইতিহাসের এই বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া যদি কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, ইংলণ্ডে কখনও অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সংস্কৃতিগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্ণবিকাশ সাধিত হয় নাই, ইংলণ্ডের আধুনিক ইতিহাস হইতেই তিনি দেখিতে পাইবেন এলিজাবেথের যুগে বর্ত্তমান ইংলণ্ডের তুলনায় আর্থিক অবস্থা উৎকৃষ্টতর ছিল। ইংলণ্ডের আধুনিক ইতিহাস হইতেই তথ্যাদিদ্বারা সপ্রমাণিত হইবে যে, সে সময়ে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা স্বদেশেই তাহাদের প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচা-মাল রূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের শতকরা ৮৫ অংশ উৎপন্ন করিতে পারিত এবং সমগ্র ব্রিটেনে লোকসংখ্যার শতকরা ৯৫ জন বেতনভোগী চাকুরী কিংবা দাসত্বের সন্ধান না করিয়া স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করিতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডের প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচামালের শতকরা ৮৫ ভাগের জন্যই অপর দেশের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয় এবং জন-সংখ্যার শতকরা ৯৫ জনকে জীবিকার্জ্জনার্থ বেতনভোগী নকরগিরির অধীন হইতে হয়।

ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ধ্বংস যে চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার আরও কি প্রমাণ প্রয়োজন?

ইংলণ্ড যে অর্থনৈতিক দিক্ হইতে চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিলে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝা যাইবে যে, তাহার রাষ্ট্রীয়, সংস্কৃতিগত এবং আধ্যাত্মিক ধ্বংসও সাধিত হইয়াছে, কেন না, সর্ব্ববাদিসম্মত দার্শনিক সত্য এই যে, রাষ্ট্রীয়, সংস্কৃতিগত এবং আধ্যাত্মিক অধঃপতন না হইলে আর্থিক অধঃপতন সম্ভব হয় না। আমাদের জানা আছে যে, ইংলণ্ডের সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক এবং রাষ্ট্রনেতাগণ এই সত্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম, কিন্তু সে-দিনের বিলম্ব নাই, যে-দিন ইংলণ্ডের জনসাধারণের অপরিমিত দুঃখ-দুর্দ্দশা এই সকল বৈজ্ঞানিক এবং রাষ্ট্রনেতাগণকে এই সত্য উপলব্ধি করিতে বাধ্য করিবে। এখনও তাঁহারা যদি ইহা বুঝিতে পারিতেন, তবে ইংলণ্ডের নিরীহ এবং অসহায় জনসাধারণ অনাগত অনেক দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা পাইত।

সুতরাং উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রেই ইংলণ্ডের ধ্বংস হইয়াছে বলা যেরূপ সঙ্গত, সেইরূপ এই সকল ক্ষেত্রে ভারতের ধ্বংস যে চরমতর ভাবে সাধিত হইয়াছে, ইহা বলা অধিকতর সঙ্গত। প্রয়োজন হইলে আমাদের এই বক্তব্যের সমগ্রাংশই প্রমাণিত হইতে পারিবে।

এই বারে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা দেখিব যে, যদ্যপি ইংলণ্ড এবং ভারত উভয়েরই আর্থিক, রাষ্ট্রীয়, সংস্কৃতিগত এবং আধ্যাত্মিক ধ্বংসের চরম হইয়াছে, ইহা বলা সঙ্গত, কিন্তু এই ধ্বংসের জন্য ব্রিটিশ শাসনকে মূলতঃ দায়ী করা যায় না এই ধ্বংসের ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, ইহার যখন সূচনা, তখন বর্ত্তমান ব্রিটিশ শাসনের জন্মই হয় নাই। এই ধ্বংসের মূল কারণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ; যথা, (১) কালচক্র, এবং (২) কালচক্রের আবর্ত্তনে প্রকৃত বিজ্ঞানের বিলুপ্তি। বর্ত্তমান ব্রিটিশ শাসনকে কেবল এই নিমিত্ত দায়ী করা যায় যে, যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানী না হইয়াও নিজদিগকে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ব্যবহারজীবী এবং সাংবাদিক আখ্যায় অভিহিত করেন, এমন কতিপয় দায়িত্বহীন ব্যক্তিকে শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। ব্রিটিশজাতির বিশ্ব-বিপ্লবসমূহ যদি সমূলে উৎপাটিত হয় এবং যিনি কি-ভাবে বেতনভোগী চাকুরীর সহায়তা না লইয়াও ইংলণ্ডের প্রত্যেকটি ব্যক্তি জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রব্য উপার্জ্জন করিতে পারেন, তদ্রূপ সংগঠনের উপযোগী কার্য্যকরী বুদ্ধি-প্রদর্শনে অসমর্থ হইবেন, ব্রিটিশ জনসাধারণ যদি এমন কাহাকেও বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ব্যবহারজীবী এবং সাংবাদিক আখ্যাত করিতে অস্বীকৃত হন, তবেই ইংলণ্ডের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। ব্রিটিশ শাসনের দায়িত্ব এইখানে।

পঞ্চম প্রশ্নের বিচারে অতি সহজেই প্রমাণিত হইবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন ভারতবাসীর স্বাধীনতা হরণ করে নাই। ব্রিটিশ, তথা মুসলমানগণের আগমনের বহু পূর্ব্বেই ভারতবাসী জন-সাধারণ প্রকৃত স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হয়। ইহা ঐতিহাসিক সত্য এবং এতদ্বিষয়ে কোন বাদানুবাদ নিরর্থক। ভারতের পরাধীনতার মূল কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেও দেখা যায় যে, কালচক্র এবং প্রকৃত বিজ্ঞানের বিলুপ্তিই ইহার মূলে। সমগ্র ভাবে পৃথিবীর অবস্থা প্রকৃত দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলেদেখা যাইবে যে, ভারত প্রকৃতি-পরিবেশে এমন সুন্দর ভাবে অবস্থিত যে, ভারতবাসীরা যে কেবল নিজেরা স্বাধীন হইতে পারে, তাহা নহে, সমগ্র মনুষ্যসমাজকে তাহারা প্রকৃত স্বাধীনতার পথও দেখাইতে পারে। ভারত যে আজিও পরাধীন, তাহা অপর কাহারও নিমিত্ত নহে। সমগ্র পৃথিবীকে যে-দাসত্বলব্ধ বুদ্ধি বর্ত্তমানে পরিবৃত রাখিয়াছে, ভারতীয় জন-সাধারণের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা তাহারই দাস হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাই তন্নিমিত্ত দায়ী। ভারতের জন-সাধারণের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা যদি পাশ্চাত্যের তথাকথিত সংস্কৃতি হইতে লব্ধ সংস্কারসমূহ বর্জ্জন করিয়া স্বাধীন গবেষণায় ব্যাপৃত হন, তবে তাঁহারা যে কেবল অদূরভবিষ্যতে স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিবেন তাহা নহে, বিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের উপর নৈতিক প্রভুত্ব-লাভে সমর্থ হইবেন।

ইহা উন্মাদের স্বপ্ন নহে। ভারতবাসীর চিত্ত হইতে দ্বন্দ্ব-কলহের ভাব অপসৃত হইলে এবং ব্রিটেনের প্রতি ভারত-বাসীর দেয় কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁহারা সচেতন হইলে—কোন্ পথে চলিলে ইহা সম্ভব, আমরা তাহার নির্দ্দেশ দিতে পারি।

ভারতে ব্রিটিশ-শাসন যে ভারত শোষণের ভিত্তিতে গঠিত, ইহা বলাও অসঙ্গত। ইতিহাস হইতেই ইহার অলীকতা অতি সহজে প্রমাণিত হইতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন যে, ব্রিটিশ জাতি কর্ত্তৃক ভারত ও ভারতবাসীর সেবার মনোভাব হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য আমরা উপস্থিত করিতে পারিব। ইহা হয় তো সত্য যে, তাঁহাদের অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, কিন্তু পরস্পরের সাহায্যের মনোভাব যে তাঁহাদের মধ্যে সূচনা-বধি লক্ষিত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

অপরাপর নেতৃবৃন্দ এবং ষ্টেট্‌সম্যানের সম্পাদকসদৃশ বন্ধু-বৃন্দ এই সকল প্রসঙ্গে বাগ্‌নিষ্পত্তি করিবার পূর্ব্বে, অন্ততঃ যৎসামান্য জ্ঞানও অর্জ্জন করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আমরা কোথায় চলিয়াছি ?

বর্ত্তমানে মনুষ্যসমাজ যে পথে ধাবিত হইতেছে, সেই পথে যদি ইহা ধাবিত হইতে থাকে এবং কোন নূতন আদর্শের সন্ধান দ্বারা সমাজের গতি পরিবর্ত্তিত না করা যায়, তাহা হইলে ভারতবাসী, তথা সমগ্র মনুষ্যসমাজের রাষ্ট্রীয় এবং আর্থিক অবস্থা অদূরভবিষ্যতে কি দাঁড়াইতে পারে, বর্ত্তমান সন্দর্ভে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এই আলোচনা করিতে হইলে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের অবস্থায় বর্ত্তমানে কোন্ কোন্ লক্ষণ পরিস্ফুট, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে, তথা গত সপ্তাহে ভারতের রাষ্ট্র ও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে।*

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের অবস্থায় যে-সকল বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমানে পরিস্ফুট হইয়াছে, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল :—

(১) প্রত্যেক দেশে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে, তথা শ্রমিক সাধারণের মধ্যে বেকারের প্রাদুর্ভাব।

(২) প্রত্যেক দেশে সমগ্র অধিবাসীর পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য ও কাঁচামালের উৎপাদনে ঘাটতি। ভারতে এই ঘাটতির পরিমাণ প্রয়োজনের অনুপাতে মাত্র শতকরা বিশ ভাগ, কিন্তু যুক্তরাজ্যে প্রয়োজনের অনুপাতে এই ঘাটতির অনুপাত শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ। পৃথিবীর কোন একটি দেশই বর্ত্তমানে এই ঘাটতি হইতে

*দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রীর ১২ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

সম্পূর্ণ মুক্ত নহে এবং যে-সকল দেশের সমগ্র জনসংখ্যা ২ কোটির উপর, তাহার কোনটিতেই এই ঘাটতির অনুপাত শতকরা ২০ ভাগের কম নহে।

(৩) ১৯৩১ সনে পৃথিবীর সমগ্র জন-সংখ্যার পরিমাণ ছিল ২০২ কোটি এবং এই সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র জীবন-ধারণের উপযোগী স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য ও কাঁচামালের প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা ঘাটতি দাঁড়ায় শতকরা ৪৫ ভাগ।

(৪) ১৯১১ সনে সমগ্র পৃথিবীতে এই ঘাটতি ছিল শতকরা ১৫ ভাগ, কিন্তু ভারতে তখন এই ঘাটতির পরিবর্ত্তে উদ্বৃত্ত ছিল শতকরা ২০ ভাগ।

(৫) ১৯৩১ সনে সমগ্র পৃথিবীর এই সমগ্র প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচামালের অনুপাতের অবস্থা এবং ১৯১১ সনের অবস্থার তুলনায় দেখা যায় যে, মাত্র বিশ বৎসর কাল মধ্যে ঐ ঘাটতি শতকরা ১৫ ভাগ হইতে শতকরা ৪৫ ভাগে দাঁড়াইয়াছে।

(৬) ১৯৩১ সনে সমগ্র ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য ও কাঁচামালের অনুপাতের অবস্থার সহিত ১৯১১ সনের ঐ অবস্থার তুলনায় দেখা যায় যে, মাত্র বিশ বৎসর কালের মধ্যে ভারত মোটামুটি ২০ ভাগ উদ্বৃত্তের অবস্থা হইতে মোটামুটি ২০ ভাগ ঘাটতির অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

(৭) ১৯৩১ সনে বিঘা কিংবা একর-প্রতি জমির শস্যের পরিমাণের হিসাবের সহিত ১৯১১ সনের হিসাব তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই সময়ের মধ্যে উহা ৭হইতে ৩-এ নামিয়া আসিয়াছে।

(৮) পৃথিবীর কোন দেশেই জমির স্বাভাবিক উৎপাদন-সামর্থ্যবৃদ্ধির কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু প্রত্যেক দেশে গত ৪০ বৎসর কাল হইতে কৃত্রিম উপায়ে সার এবং জল-সেচ প্রথার সাহায্যে ঐ বৃদ্ধির চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও কোন দেশ কিয়ৎ পরিমাণে বিঘা কিংবা একর-প্রতি স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য ও কাঁচামাল উৎপাদনের বৃদ্ধিতে সামর্থ হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় না, উপরন্তু সকল দেশেই মারাত্মক ভাবে উহার ঘাটতি উপস্থিত হইয়াছে।

(৯) পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার-প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ কোন দেশেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উহাতে কৃতকার্য্যতা দেখা যায় না এবং এতৎসত্ত্বেও প্রত্যেক দেশের আর্থিক দুরবস্থা মারাত্মক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া পরিলক্ষিত হয়।

(১০) পরস্পরের শিল্প-দ্রব্যের বিক্রয়-বিস্তার সম্পর্কে পৃথিবীর নানা দেশের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যা পরিলক্ষিত হয় এবং শিল্প-দ্রব্য উৎপাদনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের ঈর্ষ্যার ক্ষেত্রও বিস্তার লাভ করিতে দেখা যায়, শেষতঃ পরস্পর দ্বন্দ্ব-ভাবের ফলে যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মনুষ্যপ্রাণের সংহারের মধ্যে উহার পরিণতি লক্ষিত হয়।

(১১) প্রত্যেক দেশে, জনসাধারণের মধ্যে অনাহারের প্রকোপবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

(১২) প্রত্যেক দেশে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্ম-শাসন-প্রয়াস সত্ত্বেও কোন দেশেই উহার সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। পর পর যে-কোন দেশের দুই সনের সেন্সাস-বিবরণীতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাত হইতেই ইহা সুপরিস্ফুট হইবে।

(১৩) প্রত্যেক দেশে ৬০ বৎসরের অধিকবয়স্ক জীবিত ব্যক্তির সংখ্যার মারাত্মক হ্রাস, তথা চল্লিশ বৎসরের অনধিকবয়স্ক ব্যক্তির অকাল-মৃত্যুর সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

(১৪) প্রত্যেক দেশে রাষ্ট্রনেতা, রাসায়নিক, পদার্থবিদ্ শিল্প-নেতা, বণিক এবং শাসকবৃন্দ কর্ত্তৃক জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি-সাধনে আপ্রাণ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি জনসাধারণের নির্ভরতার অভাব-বৃদ্ধিও পরিলক্ষিত হয়।

(১৫) প্রত্যেক দেশে গত কতিপয় বৎসর হইতে গণতন্ত্রের জন্য আকাঙ্ক্ষিত ভাব দেখা দিলেও,

অকস্মাৎ, গত প্রায় বার বৎসর হইতে পৃথিবীর কয়েকটি দেশ একনেতৃত্ববাদের অধীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া পরিলক্ষিত হয়।

পৃথিবীর সকল দেশের বর্ত্তমান অবস্থার এই যে-সকল বিশেষ লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া উপরে বিবৃত হইল, তৎসমুদায় যথাযথভাবে অনুধাবন করিলে, নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে অনায়াসেই উপনীত হইতে হয়ঃ—

(১) যত দিন যাইতেছে, ততই পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের অবস্থা নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর হইতেছে।

(২) পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের অধিবাসীর আয়ুষ্কাল হ্রাস পাইতেছে।

(৩) পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৪) বর্ত্তমান সংস্করণের গণতন্ত্র, গত পঞ্চাশ বৎসর কালের প্রাধান্য সত্ত্বেও প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিসাধনে ব্যর্থ হইয়াছে, সুতরাং পৃথিবীর কয়েকটি দেশে একনেতৃত্ববাদের পরীক্ষার মনোভাবের উদ্ভব ঘটিয়াছে।

(৫) যন্ত্র-শিল্প এবং বাণিজ্যের বিস্তার-সংগঠন উদ্দেশ্য-পূরণে বিফল হইয়াছে।

(৬) বিঘা কিংবা একর-প্রতি জমীতে স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য ও কাঁচামালের উৎপাদন-বৃদ্ধি বিষয়ে রাসায়নিক সার এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক জলসেচ-প্রথার ব্যর্থতা প্রমাণিত হইয়াছে।

(৭) আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান এবং বর্ত্তমান চিকিৎসা-পদ্ধতি মনুষ্যজাতির শারীরিক স্বাস্থ্যপোষণে, অকালমৃত্যু নিবারণে এবং দীর্ঘজীবন প্রদানে অনুপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

এই সিদ্ধান্তসমূহ যথাবিহিত ভাবে অনুধাবন করিলে সুস্পষ্ট হয় যে, জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি-সাধনার্থ আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হইতে হইলে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্যনীতির বর্ত্তমান কারনাজিসমূহের আমূল সংস্কার অথবা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। অর্থাৎ, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান লোকের প্রত্যেকটি বিষয়ে নূতন করিয়া সম্পূর্ণ গবেষণার প্রয়োজন এবং মনুষ্যসমাজকে আসন্ন দুর্দ্দিন হইতে বাঁচিতে হইলে তৎসহ সকল প্রকার দম্ভ ও বিশেষজ্ঞত্বের সম্পূর্ণ তিরোধান প্রয়োজন।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে বর্ত্তমানে যে-সকল বিশেষ লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া উপরে বিবৃত হইল, গভীর ভাবে তৎসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিব যে, জনসাধারণকে আসন্ন দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতিদানের পন্থা নিম্নলিখিত রূপ—

প্রথমতঃ, প্রত্যেক দেশের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তি এমন ভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে যে, কৃষকগণ মাত্র পাঁচ মাস পরিশ্রম করিয়া সমগ্র জনসাধারণের বাৎসরিক প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচামাল উৎপাদনে সমর্থ হয় এবং অবশিষ্ট সাত মাস কাল কুটিরশিল্পে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্র-শিল্পের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ কুটিরশিল্পের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, কেন না শ্রমজীবীর পক্ষে যন্ত্র-শিল্প সর্ব্বথা অস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যুর হেতু; কিন্তু কুটির-শিল্পে নিযুক্ত হইলে অস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যুর ভোগের আশঙ্কা যথেষ্ট কম; জমীতে বৎসরের পাঁচ মাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া সম্বৎসরের প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচামাল উৎপাদন করিতে পারিলে কৃষকগণের পক্ষে ইহা অনায়াস ও সুবিধাজনক হয়, কিন্তু জীবিকার্জ্জন বিষয়ে কৃষকগণকে কুটির-শিল্পের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইলে কোন কুটির-শিল্পেই যন্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতায় কৃষক সাফল্য লাভ করিতে পারে না। অথচ জমীতে পাঁচ মাস কাল পরিশ্রম করিয়া অবসর-সময়ে কুটির-শিল্পে নিয়োগ করিলে, যন্ত্র-শিল্প যে কখনও কুটির-শিল্পের প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিতে পারে না, ইহা অতি সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, যে-বিজ্ঞানে মনুষ্যজাতি তাহাদের বিভিন্ন কার্য্য-সামর্থ্য উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে এবং সমাজ-সংগঠনে যাহাতে দৈহিক ও বুদ্ধিগত শ্রমের চতুর্ব্বিধ বিভাগ সম্ভব হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজ যাহাতে কল্যাণজনক ভাবে সুপরিচালিত হয়, তজ্জন্য এমন এক শ্রেণীর ব্যক্তির প্রয়োজন, যাঁহারা অধ্যয়নশীল থাকিবেন এবং বিভিন্ন ভাবে প্রকৃতির

উপলব্ধি সাধন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে জানাইবেন কি ভাবে সর্ব্বব্যাপক বায়ু, তেজ ও রসের যথার্থ হিতজনকতা সহায়ে মনুষ্যমস্তিষ্ক, তথা জমীর উৎকর্ষ-সামর্থ্য বজায় থাকিতে পারে। সমাজে এই শ্রেণীর ব্যক্তির উদ্ভব না হইলে, সুশৃঙ্খল বিধানের ভিত্তিতে ইহার উন্নতিসাধন সম্ভব নহে। বর্ত্তমান সমাজের অনেকে হয়তো প্রচলিত বিধান লইয়া গৌরব বোধ করিয়া থাকেন এবং "নাই মামার চাইতে কাণা মামা ভাল" হিসাবে এই গৌরবের কারণও থাকিতে পারে, কিন্তু ফল দ্বারা যদি বৃক্ষের বিচার করিতে হয়, তবে বর্ত্তমানে কোন দেশের প্রচলিত বিধানকেই সর্ব্বাংশে না হইলেও মুখ্যতঃ নিন্দার্হ বলিয়া গণ্য না করিয়া পারা যায় না। প্রত্যেক সমাজে দ্বিতীয় এমন এক শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের প্রয়োজন যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের আবিষ্কৃত বিধানসমূহ শিক্ষা করিয়া তদ্বিষয়ে শ্রমজীবিগণকে শিক্ষা দান করিবেন। তৃতীয় শ্রেণীর যে ব্যক্তিবৃন্দ, যাঁহাদিগকে সাধারণতঃ শ্রমজীবী আখ্যাত করা হয় এবং যাঁহারা প্রত্যেক সমাজেই অধিকাংশ, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ আবিষ্কৃত ও বিহিত প্রণালী-সমূহ অনুযায়ী কার্য্য করিবেন। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ব্যতীত শাসনকার্য্যের জন্য অপর এক শ্রেণীর ব্যক্তিরও প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহাকেই দৈহিক শ্রম এবং বুদ্ধিগত কার্য্যানুযায়ী চতুর্ব্বিধ বিভাগ বলিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, সযত্নে এবং ক্রমে ক্রমে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে কাগজনির্ম্মিত মুদ্রা, তথা বহু পরিমাণ ধাতুমুদ্রার প্রচলন নিবারিত হয়। যত দিন কাগজ-নির্ম্মিত, তথা ধাতুমুদ্রার প্রচলন অব্যাহত থাকিবে, ততদিন সমাজে যোগ্যতানুযায়ী ধন-বিতরণ সার্থক হইবে না এবং সমাজে যোগ্যতানুযায়ী ধন-বিতরণ সম্ভব না হইলে শান্তি-রক্ষা সম্ভব নহে।

পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন শ্রেণীর মনুষ্যের স্বাভাবিক সামর্থ্যের উপযোগী করিয়া শিক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পনা করিতে হইবে, যাহাতে সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারে যে, সমাজের কার্য্যে তাহারও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং অপরাপর ব্যক্তি সম্বন্ধে ঈর্ষ্যা অথবা দ্বেষপোষণ সম্পূর্ণ অহেতুক।

জনসাধারণকে তাঁহাদের আসন্ন দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে বাঁচাইবার এই পাঁচটি পন্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া অতঃপর যদি পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক ভূতত্ত্ব-সন্ধানার্থ চেষ্টিত হওয়া যায়, তবে বুঝা যাইবে যে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেরই জমিরই স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির বৃদ্ধি সম্ভব হইলেও, ভারতে উহা যত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব, সেরূপ আর কুত্রাপি সম্ভব নহে। পৃথিবীর আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের ইহা অবিদিত হইলেও ইহা বিজ্ঞান-সম্মত সত্য যে, বর্ত্তমান অবস্থাতেও মাত্র সাত বৎসর কালের মধ্যে ভারতের জমির উর্ব্বরাশক্তি এরূপ বৃদ্ধি করা চলে যে, তদ্দ্বারা পৃথিবীর সমগ্র জন-সংখ্যার পক্ষে প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচামাল উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সত্তর বৎসর ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট পন্থায় চেষ্টা করিলেও পৃথিবীর অপর কোন দেশ ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারিবে না। এই বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, সমগ্র মনুষ্য সমাজকে দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতিদান বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে ভারতের অবস্থার প্রতি সর্ব্বাগ্রে অবহিত হইতে হইবে। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে, অদূরভবিষ্যতে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক অবস্থা কি রূপ গ্রহণ করিতে পারে, তৎসন্ধানার্থ ভারতের রাষ্ট্রীয়, তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি কি বিশেষ ঘটনা ঘটিতেছে, তৎপ্রতি অবহিত হইতে হইবে।

যদি দেখা যায় যে, ভারতে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জলসেচ প্রথা ও যন্ত্রশিল্প-বিস্তার-চেষ্টা বর্জ্জিত হইয়া দেশের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি-সহায়ক পন্থা গৃহীত হইতেছে, তবে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, মনুষ্যের দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতিলাভ-মুহূর্ত্তের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু অপর পক্ষে যদি দেখা যায় যে, এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য এবং অবহেলা প্রদর্শিত হইতেছে, তবে ধরিতে হইবে যে, এখনও পাপের বোঝা সম্পূর্ণ হয় নাই এবং কবে যে আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার হ্রাস হইবে, তাহা কেহ জানে না।

এই বারে, গত সপ্তাহ-কালের* মধ্যে ভারতের রাজ-নৈতিক, তথা অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে কি কি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে, তৎপ্রতি আমরা অবহিত হইব।

কোন দেশের রাষ্ট্রীয়, তথা অর্থনৈতিক ঘটনা কোন্ পথে ধাবিত হইতেছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। ইহা করিবার প্রধান উপায় হইতেছে, দেশের শাসক এবং জন-

* রচনার সময় মার্চমাসের প্রথম সপ্তাহ।

নায়কগণের ওষ্ঠনিঃসৃত বিবৃতি, অভিভাষণ এবং প্রস্তাব পরীক্ষা। সুতরাং গত সপ্তাহে ভারতে জননায়ক এবং শাসকবর্গের ওষ্ঠনিঃসৃত এইরূপ বিবৃতি, অভিভাষণ এবং প্রস্তাবের একটি তালিকা উপস্থিত করিতেছি। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য :—

(১) কলিকাতা যাত্রার প্রাক্কালে মালিকান্দায় মিঃ গান্ধীর প্রদত্ত বক্তৃতা।

(২) দিল্লীতে মুসলিম লীগের কাউন্সিল-বৈঠকে মিঃ জিন্না-প্রদত্ত বক্তৃতা।

(৩) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অর্থ-সচিব স্যর জেরেমী রাইস্‌ম্যানের বাজেট-বক্তৃতা।

(৪) আপোষ-বিরোধী সভার অধিবেশনকল্পে মিঃ সুভাষ-চন্দ্র বসুর উদ্যোগ।

(৫) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পাটনা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব।

(৬) এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর মতামত।

(৭) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পাটনা অধিবেশনে গৃহীত আইন-অমান্য বিষয়ক প্রস্তাব।

(৮) মিঃ গান্ধী কর্ত্তৃক লর্ড লিনলিথগোর প্রতি আস্থা প্রকাশ এবং লর্ড জেটল্যাণ্ডের নিন্দা ঘোষণা।

(৯) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উপলক্ষে স্যর জন হার্ব্বার্টের বক্তৃতা।

(১০) ঐ উপলক্ষে মাননীয় খাঁ বাহাদুর আজিজুল হকের বক্তৃতা।

(১১) ঐ উপলক্ষে স্যর মির্জ্জা ইস্‌মাইলের অভিভাষণ।

অতঃপর আমরা এই সকল বক্তৃতা এবং বিবৃতির বিশ্লেষণ করিব —আমাদের উদ্দেশ্য ইহাদের কোন একটিতেও দেশ যে-ব্যবস্থায় দুঃখ-দুর্দ্দশার কোন একটি মাত্র হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবে, তৎপোষণোদ্দেশ্যের লক্ষ্য বর্ত্তমান কি না।

কলিকাতা যাত্রার প্রাক্কালে মালিকান্দায় মিঃ গান্ধী প্রদত্ত বক্তৃতা

এই বক্তৃতার সমগ্রাংশ তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও এমন কিছুর সন্ধান মেলে না, যাহা দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতিলাভের পন্থা বিবেচিত হইতে পারে। বক্তৃতার উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার পন্থা প্রদর্শন। অনেকে তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন যে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেই ভারতবাসী জনসাধারণ স্বতঃই দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। কিন্তু ইউরোপীয় দেশসমূহের অবস্থার প্রতি সামান্য দৃষ্টি দান করিলেই দেখা যাইবে যে, কেবল স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেশ দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে না। অন্যথায় ইউরোপীয় দেশসমূহের প্রত্যেকটি দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি লাভ করিত, কেন না, উহাদের প্রত্যেকটিতেই স্বরাজ বিরাজমান।

মূল উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া এই বক্তৃতা কেবল যে নিষ্প্রয়োজনীয় তাহা নহে। ইহা দেশের পক্ষে বিভ্রান্তিজনকও বটে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, "হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, চরখা এবং মাদক দ্রব্য বর্জ্জন, স্বরাজের কাঠামো এই চারিটি স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া গঠিত এবং আমরা যদি এই চারিটি স্তম্ভকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করি, তবে স্বরাজ নিশ্চিত আসিবে।" দেশের মধ্যে কাহারও যদি রাজনৈতিক দৃষ্টি-বিচক্ষণতা বিন্দুমাত্রও থাকে, তবে তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, এই সকল কথা সম্পূর্ণ অসার এবং শূন্যগর্ভ। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, চরখা ও মাদক দ্রব্য-বর্জ্জনই যদি বস্তুতঃ স্বরাজ অর্জ্জনের উপায় বিবেচিত হয়, তবে অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, দেশের ভাগ্যে স্বরাজ লাভ নাই এবং যে ব্যক্তি ভ্রান্ত কার্য্যক্রমের উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেন, তাঁহার নেতৃত্ব বজায় রাখা অর্থহীন, কেন না, প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে দেশের মধ্যে কখনও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, চরখা অথবা মাদক দ্রব্য-বর্জ্জনের কোন প্রস্তাবই কার্য্যকরী হইতে পারে না। হয় তো কেহ কেহ আমাদের সহিত বর্ত্তমানে বিমত হইতে পারেন, কিন্তু অভিজ্ঞতা এবং বর্ত্তমান ঘটনাদৃষ্টে ভবিষ্যৎ অনুমান-সামর্থ্য যাঁহাদের আছে, তাঁহারা বুঝিবেন যে, আমাদের এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাবধি ভারতের প্রত্যেক নেতা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের নিমিত্ত তারস্বরে চীৎকার করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহার ফল

কি দাঁড়াইয়াছে ? ইহা কি যথার্থ নহে যে, হিন্দু এবং মুসলমানের পরস্পর অনৈক্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে ? আমরা বলিব যে, এই সকল নেতা আগামী পাঁচশত বৎসর ধরিয়া হিন্দু মুসলমান ঐক্যকল্পে চীৎকার করিয়া চলিতে পারেন, কিন্তু কেবল চীৎকার করিলেই বাঞ্ছিত ঐক্য সাধিত হইবে না। অপর পক্ষে, তাঁহারা যদি সমগ্র মনুষ্য-সমাজ যে-ব্যবস্থায় দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে, তন্নির্দিষ্ট পন্থায় চেষ্টিত হন, স্বরাজ স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং রাত্রি-প্রভাতের সহিত দিবস যেরূপ সূচিত হয়, সেইরূপে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রভৃতি ঘটনাক্রমেই সাধিত হইবে।

দিল্লীর মুসলিম লীগ অধিবেশনের বৈঠকে মিঃ জিন্নাপ্রদত্ত বক্তৃতা

এই বক্তৃতাকেও জনসাধারণের দিক্ হইতে কোন ক্রমে হিতকারী বিবেচনা করা যায় না। কেন না, ইহাতেও দুর্দ্দশা-মুক্তির প্রকৃত পন্থার কোন উল্লেখ নাই। এই বক্তৃতার সমগ্রাংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ইহার উদ্দেশ্য ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের নিমিত্ত স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা এবং মিঃ জিন্না আশা করেন যে, ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশগণের অনুগ্রহভাজন হইলেই স্বরাজ লাভ করিবেন,—যেন, স্বরাজ "ছেলের হাতের মোয়া"-বিশেষ, একের হস্ত হইতে অপরের হস্তে প্রদান করায় বাধা নাই। আমাদের মত হইতেছে, ভারতে স্বরাজ যেমন ব্রিটিশজাতি কিংবা পৃথিবীর আর কাহারও প্রতি দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব সহায়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তেমনই কেবল ব্রিটিশজাতির অনুগ্রহ-যাচ্ঞার দ্বারাই স্বরাজলাভ সম্ভব নহে। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরাজ ব্রিটিশজাতির অধিকারে থাকিত, তবে তাঁহারা ভারতীয়গণকে উহার পন্থা প্রদর্শন করিলেও করিতে পারিতেন। কিন্তু যে-দেশকে তাহার আহার্য্য ও কাঁচামালের শতকরা ৮৫ ভাগের নিমিত্ত পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হয় এবং যে-দেশের অধিবাসিগণের শতকরা ৯৫ জনকেই স্বকীয় উদরান্নের নিমিত্ত বেতনভোগী চাকুরী, অর্থাৎ দাসত্বের অধীন থাকিতে হয়, সে-দেশকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন আখ্যাত করা যায় না, সুতরাং এরূপ প্রত্যাশা করাও যায় না যে, ব্রিটিশজাতি নিজেই যে-অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই, সেই অবস্থালাভের পন্থা তাঁহারা ভারতবাসীকে প্রদর্শন করিতে পারেন। সুতরাং বলিতে হয় যে, মিঃ জিন্না মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়াছেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় যে-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্দ্বারা জন-সাধারণ প্রকৃত লক্ষ্যে পরিচালিত হইবে, এমন আশা করা যায় না। বর্ত্তমান ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ব্রিটিশ জাতির অনুগ্রহ ভিক্ষার সাহায্যে অধিকতর সংখ্যায় বেতনভোগী চাকুরী অথবা দাসত্ব লাভ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অনাহার সমস্যার সমাধান যেরূপ তদ্দ্বারা সাধিত হইবে না, তেমনই প্রকৃত স্বরাজও তদ্দ্বারা লাভ করা সম্ভব হইবে না। তাঁহাদের ইহাও বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে যাহা স্বরাজ, কোন ক্রমেই অপরকে ভাগ না দিয়া তাহা কেবল হিন্দু, অথবা কেবল মুসলমান সম্প্রদায় ভোগ করিতে পারে না।

আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে, স্বরাজ কেবল মুসলমান সম্প্রদায়, কি কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যখন প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা হিন্দুর জন্যও যেমন, তেমনই মুসলমানের জন্যও হইবে। ভারতবাসী প্রত্যেকেই উহার অংশ পাইবে, এমন কি ভারতবাসী বৃটিশগণও। সুতরাং বলিতে হয় যে, মুসলিম লীগ যদি প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বরাজের নিমিত্ত চেষ্টিত হন, তবে উহার বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের আপত্তি করার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মিঃ জিন্না-পরিচালিত মুসলিম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়কে কেবল বিভ্রান্ত করিতেছেন এবং উত্তরোত্তর তাহাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া চলিয়াছেন। হয়তো বর্ত্তমানে আমাদের মুসলমান বন্ধুরা মুসলিম লীগের এই বিভ্রান্তিকর আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন নহেন, কিন্তু আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে, অদূরভবিষ্যতে ঘটনাচক্র তাঁহাদিগকে এতৎসম্বন্ধে নিশ্চিত সচেতন করিবে।

স্যর জেরেমী রাইসম্যানের বাজেট-বক্তৃতা

এই বক্তৃতা অনুসরণে দেখা যায় যে, স্যর জেরেমীর বাজেটে ভারত সরকারের যাবতীয় বিষয়ের জন্যই অর্থ ব্যবস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসী জনসাধারণ, তথা

বৃটিশজাতির স্থায়ীভাবে দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতিলাভের পক্ষে যাহা অনতিবিলম্বে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়, তাহার জন্য ঐ বাজেটে একটি তাম্র-মুদ্রাও ব্যবস্থিত হয় নাই। উপরন্তু স্যর জেরেমী রাইস্‌ম্যান ভারতবাসিগণকে সঙ্কটজনক অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি স্পষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, "তাঁহার বাজেট প্রণয়ন-কার্য্যের কাঠিন্য, যুদ্ধ-ঘোষণা সত্ত্বেও, কিংবা উহার ফলেই বলা চলে, ভারত এতাবৎ যে আর্থিক অবস্থার আনুকূল্য লাভ করিয়াছে, তন্নিমিত্ত অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে (difficulties of his budgetting are greatly mitigated by the favourable economic conditions in which India has hitherto found herself, in spite of, rather, by reason of the outbreak of war)." স্যর জেরেমী রাইসম্যানের চিন্তাধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার মতে, যুদ্ধঘোষণার পর হইতে ভারতবাসিগণ অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। স্যর জেরেমী যাঁহাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান কে ও কাহারা, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা যতদূর দেখিতে পাই, তদ্দ্বারা একটি ব্যক্তিও যুদ্ধের ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে উপকৃত হইয়াছেন, এমন মনে করিতে পারি না। সর্ব্বত্র শ্রমজীবীসাধারণের অধিকাংশের মধ্যে অনাহারের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তদুপশমার্থ অনতিবিলম্বে কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুযায়ী কার্য্য সূচিত না হইলে আগামী চারি বৎসরের মধ্যেই কিংবা তাহার পূর্ব্বে, জন-সাধারণের অবস্থায় বিপর্য্যয় ঘটিবার সর্ব্বৈব আশঙ্কা বর্ত্তমান। জন-সাধারণের বাস্তব অবস্থা যখন এইরূপ দুর্দ্দশাজনক, অর্থ-সচিবের ওষ্ঠনিঃসৃত সমৃদ্ধির বাণী স্বীকারে তখন সংশয় জাগে। স্যর জেরেমী ইচ্ছা করিয়া অন্যায় বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করিতেছি না, কেন না, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, তিনি তদ্দেশীয় আর্থিক এবং অর্থ-বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকারগণের নিকট হইতে যে-দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষা করিয়াছেন, তদনুযায়ী তিনি যাহা যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাই কেবল বলিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, এই শ্রেণীর অযথার্থ দৃষ্টি-ভঙ্গীর ফলেই—ইউরোপীয়গণ যেখানে প্রাধান্যলাভে সমর্থ হইয়াছেন, সেইখানেই জন-সাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহারা এখনও সাবধানতা অবলম্বন করুন, ইহাই আমাদের কামনা। স্যর জেরেমী এই বিষয়ে অধিকতর কিছু জানিতে চাহিলে আমরা তাহা তাঁহাকে জানাইতে সানন্দ স্বীকৃত আছি।

আপোষ-বিরোধী সম্মেলন অধিবেশনার্থ মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগ

আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের অধিবেশনার্থ মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগসমূহ যথাবিহিত ভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, উহাকেও জন-সাধারণের দুর্দ্দশা দূরীকরণের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রকার প্রকৃত পন্থা অভিহিত করা যায় না। মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর এই উদ্যোগ মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার হাই-কম্যাণ্ডের নেতৃত্বের পথে কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারে, সুতরাং মিঃ গান্ধীর অত্যাচারের সমুচিত প্রতিফল বলিয়া উহাকে ধরা যাইতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই দেশের পক্ষে উহাকে হিতজনক বলা যায় না।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী সম্পর্কে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাব

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীসমূহের অন্যতমের বিদ্রোহাচরণ দমনপক্ষে কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের এই কার্য্যকেও দেশবাসী জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশামোচনের কোনরূপ সহায়ক বলিয়া মনে করা যায় না। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনার্থ অপরিহার্য্যভাবে যাহা প্রয়োজনীয়, তৎকল্পে কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা যদি বুঝিতে পারিতাম, তবে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর এই বিদ্রোহাচরণ দমনের নিশ্চয়ই সমর্থন করিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ড এইরূপ কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, যুক্তিসঙ্গতভাবে এমন কথা বলা যায় না। নচেৎ যে-সকল প্রদেশ কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, সেই সকল প্রদেশে কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখের উপশম দেখা যাইত। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হইতেছে এই যে, প্রত্যেক প্রদেশের দুর্দ্দশা ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং মিঃ গান্ধী এবং

বর্ত্তমান হাই-কম্যাণ্ডের প্রাধান্যকালে উহার অধিকতর প্রকোপবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। সুতরাং মিঃ গান্ধী কিংবা তাঁহার হাই-কম্যাণ্ড, অথবা মিঃ সুভাষচন্দ্র কিংবা তাঁহার অনুচরবৃন্দ, যিনি কিংবা যাঁহারাই নেতৃত্ব লাভ করুন না কেন, কোন প্রদেশের অবস্থাতেই কোন পার্থক্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার হাই-কম্যাণ্ডের মস্তিষ্কোদ্ভূত এই সকল প্রস্তাব জনসমাজের হিতজনক কোন প্রকারে তো হইতেছেই না, উপরন্তু দেশের মধ্যে উহাদের ফলে কলহ সৃষ্টি হইতেছে; সুতরাং এই সকল প্রস্তাব-প্রণেতাগণকে পাপপ্রভাবান্বিত বলা যাইতে পারে। দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় দেশবাসীকে পরিচালন করিবার নিমিত্ত যে-শ্রেণীর মস্তিষ্কবত্তার প্রয়োজন, মিঃ গান্ধী ও তাঁহার হাই-কম্যাণ্ডের কাহারও তাহা থাকিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই এমন উপায় আবিষ্কার করিতে পারিতেন, যাহার ফলে তাঁহাদের প্রতিপক্ষগণ তাঁহাদের বিপক্ষতা করিতে শঙ্কিত হইত।

ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী ও মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর মত

ইঁহাদের মত হইতে প্রকাশ পায় যে, দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহার প্রতিরোধ করিবার উপযোগী রাজনৈতিক দূরদর্শিতা মিঃ গান্ধীর নাই।

আইন-অমান্য সম্পর্কে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব

যাহাকে বাস্তব সত্য বলিতে হয়, তদপেক্ষা ছল-চাতুরীর উপরই যে সত্য এবং অহিংসার ভারতীয় সেনাপতির বিশ্বাস অধিক, এই প্রস্তাব সেই ঘটনার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সমসাময়িক অনেকে বিশ্বাস করিতেছেন বলিয়া মনে হয় যে, মিঃ গান্ধী অদূরভবিষ্যতে কোন না কোনরূপ আইন-অমান্যের অভিযান সূচনা করিবেন, কিন্তু আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, তাঁহারা অবশ্য নিরাশ হইবেন।* আমরা অবশ্য বিশ্বাস করি না যে, দেশের মধ্যে কোন প্রকার আইন-অমান্য আন্দোলন দ্বারা কোন উপকার হইতে পারে, সুতরাং মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার হাই-কম্যাণ্ডের প্রেরণায় অন্ততঃ কিছু কালের মধ্যেও আইন-অমান্য আন্দোলন সূচিত হইবে না, ইহা বুঝিয়া আমরা স্বস্তি বোধ করিতেছি। এই প্রস্তাবের সমগ্রাংশ যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিলে প্রকাশ পায় যে, সমগ্র দেশ মিঃ গান্ধী-কথিত সংগঠন-মূলক কার্য্যপন্থার অন্তর্গত হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, চরকা এবং মাদক দ্রব্য-পরিহার ব্রত গ্রহণ না করিলে এবং সম্পূর্ণরূপে নিয়মানুগত না হইলে, দেশে আইন-অমান্য আন্দোলন সূচিত হইবে না। অর্থাৎ, চাঁদ হাতে না পাইলে মিঃ গান্ধী আইন-অমান্য আন্দোলন সূচনা করিবেন না, কেন না যতদিন দেশের মধ্যে কোটি কোটি ব্যক্তি অনাহারে থাকিবে, ততদিন সমগ্র দেশ সম্পূর্ণভাবে নিয়মানুগত হইবে না অথবা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যও প্রতিষ্ঠিত হইবে না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া হইলেও ঐ প্রস্তাব হইতেএমন কথাই স্পষ্ট হইয়াছে।

মিঃ গান্ধী এবং তৎপর্য্যায়ের মস্তিষ্কবান্ ব্যক্তিবৃন্দ অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা ছাগদুগ্ধ-বিলাসের বিজ্ঞাপন-দানে লজ্জা বোধ করেন এবং প্রকৃত ভাবে চিন্তাশীল হইবার সামর্থ্য যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইহা মনোবিজ্ঞানসম্মত সত্য। আইন-অমান্য আন্দোলনের নির্ব্বুদ্ধিতা পুনরায় প্রদর্শিত হইবে না, ইহা বুঝিয়া আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, জনসাধারণকে এই ভাবে কেন প্রতারিত করা হইতেছে? আপোষ-বিরোধী সম্মেলন যাহাতে দেশবাসীর মন স্পর্শ করিতে না পারে, তজ্জন্যই কি ইহার সৃষ্টি? ইহাকেও কি মিঃ গান্ধীর সত্যপ্রিয়তার নিদর্শন হিসাবেই ধরিতে হইবে? ছল-চাতুরী তবে কাহাকে বলিব? দেশবাসীর নিকট আমরা নিবেদন করি যে, তাঁহারা আর কতদিন আর এই জঘন্য চাতুরী সহ্য করিবেন?

লর্ড লিনলিথগোর প্রতি আস্থাপ্রকাশ এবং লর্ড জেটল্যাণ্ডের নিন্দাঘোষণায় মিঃ গান্ধীর বিবৃতি

এই বিবৃতি সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, হয় বর্ত্তমান সঙ্কটে দেশের নেতা হইবার উপযোগী মস্তিষ্কসামর্থ্য মিঃ গান্ধীর নাই, নয়, জনসাধারণের বিশ্বাস-ভাজন হইবার নিমিত্ত কোন প্রকার ছলচাতুরীর আশ্রয়-গ্রহণেই তিনি

* অতঃপর মিঃ গান্ধী "হরিজন" পত্রিকার "When, কখন?" নামক রচনায় তাঁহাদিগকে এইরূপ নিরাশ করিয়াছেন।

ভূষিত করেন। যুদ্ধ-ঘোষণায় ব্রিটিশজাতির উদ্দেশ্য-ব্যাখ্যা দাবী করিয়া ভারতীয় কংগ্রেস যে-প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তদুত্তরে লর্ড লিনলিথগো এবং লর্ড জেটল্যাণ্ডের বিভিন্ন বিবৃতি মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উভয় লর্ডের বিবৃতিই সারতঃ অভিন্ন এবং উভয়ের মধ্যে এক-জনকে মাত্র তারিফ করিবার বিশেষ সুযুক্তি দেখা যায় না। উভয়ের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হয়, তবে তাহা ভাষা এবং বলিবার ভঙ্গীতে। এই দিক্ দিয়াও লর্ড জেটল্যাণ্ড অপেক্ষা লর্ড লিনলিথগোকে অধিকার তারিফ করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। আমাদের মতে, লর্ড জেটল্যাণ্ডের কথা সরল এবং সম্পূর্ণ ব্রিটিশোচিত, অন্যদিকে লর্ড লিনলিথগোর কথা অপেক্ষাকৃত মিষ্ট করিয়া, সুতরাং একটু ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে। যে-কেহ সরল ভাষায় বক্তব্য পছন্দ করেন, তিনি লর্ড লিনলিথগো অপেক্ষা লর্ড জেটল্যাণ্ডের কথা অধিক পছন্দ করিবেন। পাঠক কি অনুমান করিতে পারেন, মিঃ গান্ধী তথাপি কেন লর্ড জেটল্যাণ্ড অপেক্ষা লর্ড লিনলিথগোকে তারিফ করিয়াছেন?

যাহা হউক, লর্ড জেটল্যাণ্ড কিংবা লর্ড লিনলিথগো, উভয়ের কেহই ভারতবাসিগণের যাহা কাম্য তাহা পূরণ করিতে পারেন না, কেন না, কেবল বাঞ্ছাকারীর স্বকীয় চেষ্টার দ্বারাই উহা লব্ধ হইতে পারে, কেহ অপর কাহাকেও উহা বিতরণ করিতে পারে না। এই সব বৃটিশ রাষ্ট্রনেতার দোষ এই যে, তাঁহারা ভারতবাসিগণের নিকট সরলভাবে এই সকল কথা না বলিয়া তাঁহাদিগকে এমন সকল আশার কথা শুনাইয়া থাকেন, ভারতবাসীর যে-সকল আশা পূর্ণ হইবার সহায়তা ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতারা কখনও করিতে পারেন না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনে স্যর জন হার্বার্টের বক্তৃতা

এই বক্তৃতায় প্রকাশ যে, বক্তা, সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ সংস্কার-সম্পন্ন, মর্য্যাদাবান্ এবং ভদ্রজন, কিন্তু প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান এবং সংগঠন সম্বন্ধে যথোপযুক্ত জ্ঞান বক্তার নাই। এই বক্তৃতায় আরও প্রকাশ যে, প্রাচীন ভারতের সংগঠন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আধুনিক ভারতবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকার বিষয়ে স্যর জন হার্বার্ট অদ্যাবধি যথোচিত ধারণা গঠন করিতে পারেন নাই। ভারতের প্রচীন বিজ্ঞান ও সংগঠন সম্বন্ধে স্যর জন হার্বার্ট সম্যক্ ধারণা লাভ করিতে পারিলে দেখিবেন যে, প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ও সামাজিক সংগঠন সহায়তাতেই একদিন সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি সকল প্রকার আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি-লাভে সমর্থ হইয়াছিল এবং ঐ সংগঠন ও জ্ঞান বিষয়ে শিক্ষিত ভারতবাসিগণের অজ্ঞতা স্যর জন হার্বার্টের সম-পর্য্যায়ে। স্যর জন হার্বার্টের এই বক্তৃতা অনুধাবন করিতে যিনি যত্নবান্ হইবেন, তাঁহারই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে যে, তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশের অধিবাসি-গণের কোন বাস্তব হিতসাধন করিয়া যশস্বী ও কৃতী বিবেচিত হইবার তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা বিদ্যমান, এবং তজ্জন্য শাসনকার্য্যে তাঁহার কৃতবিদ্য সহযোগিগণের সাহায্যের উপর তিনি নির্ভর করিতেছেন।

আমাদের এই কথা বলিবার কারণ এই যে, তাঁহার বক্তৃতায় স্যর জন হার্বার্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলার লিখিত পুস্তকের নাম ধরিয়া "লাঙ্গলের পশ্চাতের ব্যক্তি, The Man behind the Plough"-এর প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিদানে একদিন প্রাচীন ভারতের যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংগঠন সহায়তা করিয়াছিল, সেই ব্যবস্থার উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছেন, এমন কোন ব্যক্তি খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক লিখিত "দি ম্যান বাহাইণ্ড দি প্লাউ (The Man bchind the Plough)" পুস্তক পাঠ করিলে দেখিবেন যে, ঐ পুস্তকে "লাঙ্গল-চালক কৃষকের" (the man with the plough) সম্বন্ধে কতিপয় অনির্ভরযোগ্য তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে "লাঙ্গলের পশ্চাতের ব্যক্তি (the man behind .the plough)" সম্বন্ধে কুত্রাপি উল্লেখ নাই। ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞান ও সংগঠন সম্বন্ধে সম্যক্ অধ্যয়নশীল হইলে দেখা যায় যে, একদিন ভারতে বিশিষ্ট পর্য্যায়ের একশ্রেণীর ব্যক্তি জমী ও জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি এবং তাহার চাষোপকরণ-বিষয়ক সমগ্র তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারণার্থ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

"লাঙ্গলচালক" যে কৃষককুল, তাহাদিগের কৃতিত্বের অধিকাংশ প্রাপ্য তাঁহাদের এবং তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে "লাঙ্গলের পশ্চাতের ব্যক্তি"। এই বিষয়ক সকল জ্ঞাতব্য জানিয়া খাঁ বাহাদুর আজিজুল হকের "ম্যান বাহাইণ্ড দি প্লাউ (Man behind the Plough)" পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ঐ পুস্তক সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত এবং বিভ্রান্তিকর, সুতরাং চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দের নিন্দার যোগ্য। স্যর জন হার্বার্ট এই শ্রেণীর গ্রন্থপ্রণেতাগণ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ, নচেৎ তদ্‌পদাভিষিক্ত পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ত্তী ব্যক্তিবৃন্দের ন্যায় তিনিও নিশ্চিত অসাফল্যমণ্ডিত হইবেন। স্যর জন হার্বার্টের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের অসাফল্যের উল্লেখ করিলাম বলিয়া আমরা এমন মনে করি না যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ জন-সাধারণের দুরবস্থা দূরীকরণে আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু তৎসত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে তাঁহাদের অবস্থার উপশমের অকৃতকার্য্যতার উল্লেখ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ভারতের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সৃষ্টি এবং তাঁহারা যে-সকল মতবাদ প্রচার করেন, সমগ্র ভাবে তাহা পাশ্চাত্ত্যের প্রেরণালব্ধ।

এবং সেই তালিকা হইতে মিঃ গান্ধী ও মিঃ জিন্না ইত্যাদি ব্যক্তিবৃন্দও বাদ পড়িবেন না। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের ভারতীয়গণের নিকট হইতে বৃটিশ শাসকবৃন্দ কোন প্রয়োজনীয় সাহায্যই প্রত্যাশা করিতে পারেন না। ভারতের সহিত ব্রিটিশজাতির সংযোগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া ভারতবাসী সমগ্র জন-সাধারণের বাস্তব কল্যাণ-সহায়ক কোন কিছু গঠন করিতে হইলে, যাঁহারা মিল, রিকার্ডো, ম্যালথস, মার্শাল প্রভৃতির মতবাদ প্রভাবে কুসংস্কারগ্রস্ত হন্‌ নাই, অথচ ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের কার্য্যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান চালাইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদের সহযোগিতায় সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন গবেষণায় তাঁহাদিগকে নিযুক্ত হইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনে মাননীয় খাঁ বাহাদুর আজিজুল হকের বক্তৃতা

এই বক্তৃতায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে :—

(১) শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষা প্রবর্ত্তনের বিচক্ষণতা ও উপকারিতা।

(২) নূতন পাঠ্য-তালিকার সংখ্যাবৃদ্ধির কৈফিয়ৎ।

(৩) এম. এ. পরীক্ষার স্বতন্ত্র একটি পাঠ্য বিষয় হিসাবে ইস্‌লামীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি।

(৪) বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপকারিতা।

(৫) নূতন গ্রাজুয়েটগণের জীবনের আদর্শ কি হইবে।

সমগ্র বক্তৃতাটি সম্যক্ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতেও এমন কোন নির্দ্দেশ নাই, যাহা গ্রাজুয়েটগণেরই হউক অথবা দেশবাসী জনসাধারণের হউক, কোন প্রকার দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে অব্যাহতিলাভের সহায়তা সাধন করিতে পারে।

উপরন্তু দেখা যাইবে, খাঁ বাহাদুরের মন্তব্য এবং নির্দ্দেশ-সমূহ নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিলেও মনুষ্যজাতির দুঃখ দুর্দ্দশার প্রকোপ নিশ্চিত বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। বস্তুতঃ উক্ত প্রকার শিক্ষানীতির নিমিত্তই গত দুই শতাব্দী মধ্যে যে-সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, এতাবৎকাল কোন ভাবেই মনুষ্যজাতির দুরবস্থার উপশমের তাহারা সহায়ক হয় নাই।

অক্ষর-পরিচয়ের, অর্থাৎ লেখা-পড়া করিবার জ্ঞানার্জ্জন নিমিত্ত মাতৃভাষা অনায়াসসাধ্য বাহন হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করিবার পক্ষে কোন দেশের মাতৃভাষাই একমাত্র বাহন হইতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইলে সকল ভাষার সংস্কৃত শব্দ-বিজ্ঞানের উপলব্ধি অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমানে হয়তো আমাদের বন্ধুবর্গের ইহা বোধগম্য না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগের অবশ্যজ্ঞাতব্য যে, সকল ভাষার সকল পদের মূলে যে শব্দ-সমষ্টি বর্ত্তমান, তাহার বিজ্ঞান আয়ত্ত না করিতে পারিলে, কোন ভাষার কোন একটি পদেরও সম্পূর্ণ ধারণা গঠন সম্ভব হয় না। অর্থাৎ, মূল শব্দ-সমষ্টির বিজ্ঞান আয়ত্ত না করিতে পারিলে, শিক্ষা শিক্ষা-নামের উপযোগী হয় না। ভাষাসমূহের মূল শব্দ-সমষ্টির এই বিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রাচীন কালে জগতে তিনটি ভাষার, প্রাচীন সংস্কৃত, হিব্রু এবং প্রাচীন

আরবীয় উদ্ভাবনা হইয়াছিল। এই তিনটি প্রকৃত বিজ্ঞান-সম্মত ভাষার জ্ঞান ব্যতীত নিজেকে শিক্ষিত মনে করা নিরর্থক। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই তিনটি প্রাচীন ভাষার জ্ঞানই বর্ত্তমানে বিস্মৃতিগর্ভে নিহিত এবং কুত্রাপি ইহাদের পুনরুজ্জীবনের নিদর্শন পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না।

এই তিনটি প্রাচীন ভাষার জ্ঞানের যথাযথ ভাবে পুনরুদ্ধার হইলে দেখা যাইবে যে, বেদ, কোরাণ এবং বাইবেল প্রভৃতি সকল প্রাচীন গ্রন্থই বর্ত্তমানে ভ্রান্ত অনুবাদের মারফৎ প্রচলিত রহিয়াছে। এবং তাহারই ফলে এই তিনটি প্রাচীন গ্রন্থের প্রত্যেকটিতে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতব্যের সন্ধান পাওয়া গেলেও মনুষ্যজাতিকে ভদ্রকমে অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইতেছে। দুঃখের বিষয়, যাঁহারা এই সকল বিষয়ে অণুমাত্রও ধারণালাভে সমর্থ হন নাই, শিক্ষা পরিচালনার গুরুতম দায়িত্বের তাঁহারাই অধিকারী রহিয়াছেন। ভারতবাসীকে বুঝিতে হইবে যে, ইহার জন্য দোষ বৈদেশিকগণের নহে, ইহা তাঁহাদেরই দোষ, এবং বৈদেশিকগণকে অযথাই তাঁহারা শোষক বলিয়া নিন্দা করেন। সঙ্গত ও সমগ্র ভাবে যাহা শিক্ষণীয়, তদ্ব্যতীত আর সমস্তই যাঁহারা এই সকল ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান হইতে অর্জ্জন করিয়া, শিক্ষিত হইবার গর্ব্ব পোষণ করেন, তাঁহাদের নিকট আর এতদপেক্ষা অধিক কি আশা করা যায়?

খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক এবং তাঁহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহকর্ম্মিগণের অতি অবশ্য জ্ঞাতব্য এই যে, তাঁহাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় বিষয়ে কোন কিছু সম্পর্কেই তাঁহাদের গর্ব্ব বোধ করিবার যৌক্তিকতা নাই। উহাদের আগাগোড়া ভ্রান্ত ধারণার উপর গঠিত। বর্ত্তমান শিক্ষার ভিত্তি ভ্রান্ত; ঐ শিক্ষার প্রণালী ভ্রান্ত; ঐ শিক্ষার আদর্শও ভ্রান্ত।

"শিক্ষার ভিত্তি" বলিতে আমরা যে-ভাষায় শিক্ষাদান করা হয়, তাহাই বুঝাইতেছি।

আমরা দেখিয়াছি যে, প্রকৃত শিক্ষার বাহন সাধারণভাবে মাতৃভাষা হইতে পারে না।

"শিক্ষার প্রণালী" বলিতে আমরা বিভিন্ন পর্য্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন কতিপয় শিক্ষার্থী লইয়া শ্রেণীগঠনপ্রণালীকে বুঝাইতেছি।

শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝিতে হইবে যে, কোন দুইজন শিক্ষার্থীরই বুদ্ধিবৃত্তি হুবহু এক নহে, এবং তাঁহাদের প্রত্যেককে কোন বিষয়ে অভিনিবিষ্ট করিতে হইলে প্রত্যেকের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পদ্ধতির প্রয়োজন; কোনও শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে একই প্রকার শিক্ষাভঙ্গী কার্য্যকরী হয় না। এই নিমিত্তই প্রাচীনকালে একজন শিক্ষক কর্ত্তৃক একই সময়ে উচ্চশিক্ষার্থী একাধিক ছাত্রকে শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ছিল।

"শিক্ষার আদর্শ" বলিতে আমরা শিক্ষার ফলে স্বতঃই যে-ভাব জাগে, তাহাই বুঝিতেছি। "শিক্ষা" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্যক্ বুঝিতে পারিলে উপলব্ধি হইবে, যে-শিক্ষা শিক্ষার্থীকে তাহার জীবনযাত্রার পথে যাবতীয় বিষয়ের কার্য্যকারণভাব-বিচারবুদ্ধির বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে না, সে শিক্ষা শিক্ষা নামের অনুপযুক্ত। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কেবল ভোগলালসা-বৃদ্ধির সহায়ক, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভোগ কাহাকে বলিতে হইবে, কিংবা ভোগ-বিষয়েও একটি বর্জ্জন করিয়া অপরটি কেন লিপ্সাযোগ্য, তাহার জ্ঞানও এই শিক্ষায় লব্ধ হয় না। সুতরাং ইহার ফলে কেবল আজীবন অন্ধকারেই হাতড়াইয়া বেড়াইবার শিক্ষা হয়। ইহা কি কৌতুকাবহ নহে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের এত বিস্তার সত্ত্বেও, সমগ্র জগতে বর্ত্তমানে এমন একটি মস্তিষ্কসামর্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, যিনি মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকে কি উপায়ে স্বকীয় জীবন-যাপনের উপযোগী ন্যূনতম দ্রব্য অর্জ্জন করিতে পারে, তদনুরূপ কোন সুনিশ্চিত ব্যবস্থার পন্থা প্রদর্শন করিতে পারেন? প্রচলিত শিক্ষা যদি শিক্ষা নামের যোগ্য হইত, মনুষ্যজাতি কি তাহা হইলে উত্তরোত্তর দুর্দ্দশা-ক্লিষ্ট হইতে পারিত?

ইহাতেই শিক্ষার অগ্নি-পরীক্ষা। আমাদের বক্তব্য এই, মনুষ্য-সমাজে যদি প্রকৃত শিক্ষা প্রচলিত থাকিত, মনুষ্য-জাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা তাহা হইলে স্বতঃই অদৃশ্য হইয়া যাইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও মনুষ্যজাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, এই ঘটনাই নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ত্তৃপক্ষ মিথ্যা দম্ভের প্রতীক এবং বর্ত্তমান শিক্ষা মনুষ্য-সমাজের পক্ষে বিন্দুমাত্র কল্যাণজনক হয় নাই। মস্তিষ্ক-সামর্থ্য যাঁহাদের

আছে, তাঁহারা বুঝিবেন যে, এই শিক্ষার প্রসার যত কম হয়, ততই সমাজের মঙ্গল।

সমাজের কার্য্যে লাগিবার উপযোগী করিয়া শিক্ষিত করিতে হইলে, শিক্ষা-পদ্ধতির প্রাথমিক অঙ্গ কি হইবে, খাঁ বাহাদুরের তদ্বিষয়ে যদি কিঞ্চিন্মাত্র ধারণা থাকিত, তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন পাঠ্যতালিকায় পাঠ্য-বিষয়-বৃদ্ধির পক্ষে ওকালতী করিতে তাঁহার লজ্জা হইত। এই সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনার পক্ষে আমাদের স্থানাভাব। কিন্তু মনুষ্য এবং চরাচর-বিষয়ক বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যদি সঙ্গত হইত, তবে তিনি মুহূর্ত্তকালের মধ্যে বুঝিতে পারিতেন যে, কোন একটি মাত্র বিষয়ের জ্ঞান সম্পূর্ণ এবং অভ্রান্ত হইলেই সমগ্র মনুষ্যসমাজ এবং সমগ্র চরাচর-বিষয়ে জ্ঞানলাভ সম্ভব, সুতরাং কোন পাঠ্যতালিকার বৈচিত্র্য ও কলেবর বৃদ্ধি সাধনের স্বপক্ষে কোন যৌক্তিকতা নাই।

এম-এ পরীক্ষার স্বতন্ত্র পাঠ্য বিষয় হিসাবে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিয়া খাঁ বাহাদুর নিজেকে অতিশয় গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন বলিয়া প্রতীতি হয়। ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস ও সংস্কৃতি সংগৃহীত হইতে পারিলে, ইহা যে তাঁহার পক্ষে প্রকৃতই গৌরবের বিষয় হইত, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। তাঁহাকে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ প্রকৃত ইতিহাস কি তিনি সংগ্রহ করিতে পারিবেন? তাঁহাকে আমরা অবহিত হইতে বলি যে, ইসলামের ইতিহাসের সূচনা কোরাণের প্রণেতা অথবা প্রণেতৃবৃন্দ হইতে এবং ইসলামের যে ইতিহাস এই প্রণয়ন-বিষয় সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইবার উপযোগী প্রমাণ উপস্থিত করিতে অসমর্থ, তাহা বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে না। খাঁ সাহেব কি আমাদিগকে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন যে, বর্ত্তমান জগৎ ইসলামের যথাযথ ইতিহাস সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছে? আমাদের যাহা জ্ঞান, তাহা হইতে বলিতে পারি যে, ইসলাম, অথবা খ্রীষ্টধর্ম্ম, অথবা বৌদ্ধধর্ম্ম, অথবা হিন্দুধর্ম্মের যথাযথ ইতিহাস যখন বর্ত্তমান জগৎ পরিজ্ঞাত হইবে, মনুষ্যজাতির পরস্পর দ্বন্দ্ব-দ্বেষের ভাব তখন অতীত ইতিহাসে পর্য্যবসিত হইবে এবং সমগ্র মনুষ্য-সমাজ দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই চারিটি ধর্ম্মমতেরই যথাযথ ইতিহাস নিঃসন্দিগ্ধভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে কোরাণ, বাইবেল, বেদ ও বেদাঙ্গে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং আধুনিক কালের কোন গ্রন্থকারই আধুনিক কোন ভাষাতে উহা লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। বস্তুতঃ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থের প্রত্যেকখানিই মানব-সমাজে ধর্ম্মমত লইয়া পরস্পর দ্বেষ ও অনৈক্যের উদ্ভবের বহুপূর্ব্বে রচিত। অধুনা হিন্দুরা মনে করিতেছেন যে, বেদ ও বেদাঙ্গ তাঁহাদের সম্পত্তি এবং কোরাণ মুসলমানগণের ও বাইবেল খৃষ্টানগণের সম্পত্তি। কিন্তু এই ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ প্রকৃত অর্থে অনুসরণ করিতে পারিলে বুঝা যায় যে, বেদ ও বেদাঙ্গ যেমন হিন্দুদের, তেমনই মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধদিগেরও সম্পদ; কোরাণ ও বাইবেলও তেমনই, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের সহিত বৌদ্ধ ও হিন্দুদিগেরও সম্পদ।

মনুষ্যসমাজ যখন পুনরায় ভাষাসমূহের মূল শব্দসমষ্টি উপলব্ধির যথার্থ প্রণালী পরিজ্ঞাত হইবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে, প্রাচীন আরবী ও প্রাচীন হিব্রু ভাষা পাঠের যথার্থ পন্থাও বেদাঙ্গসমূহে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং বেদাঙ্গ আয়ত্ত না করিতে পারিলে এমন কি বাইবেল ও কোরাণও প্রকৃত অর্থে পাঠ করা সম্ভব নহে এবং কোরাণ প্রকৃত অর্থে পাঠ না করিতে পারিলে ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে না।

আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, "প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস" নামে যে সকল পুস্তক প্রচারিত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা কেবল মনুষ্য-সমাজ বিভ্রান্ত হইতেছে এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির নামে যে পুস্তকের উদয় হইবে, তাহাদেরও ঐ একই পরিণাম দাঁড়াইবে। আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা এই যে, ছাত্রসমাজকে এই সকল বিভ্রান্ত লেখকবৃন্দের কবলিত করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষের সুবুদ্ধির উদয় হউক।

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রসার-তৃষ্ণাও অদূরদর্শিতা এবং অজ্ঞতার নিদর্শন। মনুষ্যজাতির দুঃখ-দুর্দ্দশার নিষ্কৃতিলাভের উপায় হিসাবে আধুনিক বিজ্ঞানানুযায়ী গবেষণার কিঞ্চিন্মাত্রও হিতকারিতা থাকিলে, আধুনিক ইউরোপীয়গণ পশুভাবাপন্ন হইতে পারিতেন না, এবং মনুষ্য-রক্তপাত করিতে ইতস্ততঃ বোধ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে স্যর মির্জ্জা ইসমাইলের অভিভাষণ

এই অভিভাষণে প্রকাশ পাইয়াছে যে, স্যর মির্জ্জা ইসমাইল তাঁহার স্বদেশবাসিগণের বাস্তব কল্যাণসাধনের মনোভাববিশিষ্ট এবং এই জন্য তিনি স্বাধীনভাবে কিছু চিন্তাও করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যে-পন্থায় জগদ্বাসী দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে, তৎপ্রদর্শনে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে যে-অধ্যয়ন প্রয়োজন, তাহা তিনি অভ্যাস করিতে পারেন নাই। তিনি জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির বিষয়েও উল্লেখ করিয়াছেন, আবার জনসাধারণের দুরবস্থার উপশমার্থ যন্ত্র-শিল্পের প্রসার প্রসঙ্গও উত্থাপন করিয়াছেন। বিঘাপ্রতি ফসলের হারবৃদ্ধির উপায় যে, রাসায়নিক সার এবং তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জলসেচ-প্রথা, ইহাতেও তিনি বিশ্বাসী। স্যর ইসমাইলের জানা উচিত ছিল যে, রাসায়নিক সার এবং তথাকথিত জলসেচ প্রথা, উভয়ই বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপক ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু এই সকল স্থানে কুত্রাপি বিন্দুমাত্র পরিমাণেও কৃষি-সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। ফল যাহা বৃক্ষের পরিচয় লাভ করিতে হইলে, রাসায়নিক সার এবং বৈজ্ঞানিক জলসেচ প্রথা প্রয়োগের মুক্তকণ্ঠে নিন্দা না করিয়া পারা যায় না।

এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বিচার আমাদের সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিবে। আধুনিক কালের যন্ত্র-শিল্পের পদ্ধতিও ঐ একই কারণে নিন্দাযোগ্য। বস্তুতঃ, কোন প্রকার কৃত্রিম সার ও জলসেচের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া স্বাভাবিক উপায়ে জমীর স্বভাবগত উৎপাদন-সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যন্ত্রশিল্প তখন কুটিরশিল্পের প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। জনসাধারণের কল্যাণকার্য্য সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশের পূর্ব্বে স্যর মির্জ্জা ইসমাইল অধিকতর জ্ঞানগর্ভ এবং চিন্তাশীল হউন, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

উপরে যে-সকল বক্তৃতা এবং প্রস্তাব আলোচিত হইল, তৎসমুদায় প্রকৃত দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিয়া, আমাদের নেতৃবৃন্দ ও শাসকবৃন্দের মধ্যে সুবুদ্ধির উদয় না হইলে যে, আমাদের বর্ত্তমান ভীষণ অবস্থা অপেক্ষাও ভবিষ্যৎ অধিক অন্ধকারময়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া থাকা যায় না।

"স্বাধীনতা এবং উহা লাভের কি উপায়" তৎসম্বন্ধে আমাদের মতামত পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত না করিলে, এই সন্দর্ভের উপসংহার হয় না। আগামী সংখ্যায় ঐ বিষয় আলোচিত হইবে।*

*"দি উইক্লি বঙ্গশ্রী"র ৭ই মার্চ্চের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে। পরবর্ত্তী বিষয়, অর্থাৎ স্বাধীনতা এবং উহা লাভের কি উপায়," তৎসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য ১৭ই মার্চ্চের "দি উইক্লি বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত ইংরাজী সন্দর্ভ "What is Freedom How to get it" দ্রষ্টব্য।

ভারতমাতা

..বিনিময়ে কিছু না পাইয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে দিবার সামর্থ্য ছিল একমাত্র আমাদের ভারতমাতার। আমাদের মা-র যে সামর্থ্য হইয়াছিল তাহা আর কোন দেশের হয় নাই। আমাদের মা-র সন্তানগণের উদরান্নের জন্য কোন দিন কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। অধিকন্তু মা আমাদের অন্যান্য দেশের সন্তানগণকে চিরদিন অন্ন বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন এবং সমগ্র জগতের প্রত্যাকর্ষণ করিয়াছেন। যদি তাহাই না হইত, তাহা হইলে এখনও জগতের প্রত্যেক জাতি ধনোপার্জ্জনের জন্য অন্যান্য দেশকে উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষে আসেন কেন? অতি পুরাকাল হইতে যদি ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের অন্নদাতা না হইত, তাহা হইলে নবম শতাব্দীতে যখন ইউরোপীয়গণ প্রথম অন্নাভাবগ্রস্ত হইয়া বিদেশে গমনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন, তখন জগতের অন্যান্য দেশের কথা স্মরণ না করিয়া একমাত্র ভারতবর্ষে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন কেন?...

ফরাসী শিল্পী-সমাজে এক বৎসর

—শ্রীচিন্তামণি কর

পারীতে আসার চারদিন পরে ডক্টর দেব বললেন, "চলুন আপনাকে একটি আতলিয়েতে (শিল্পীদের কর্মশালা) নিয়ে যাই, দেখুন যদি আপনার সেখানে ভাস্কর্য শেখার সুবিধা হয়।"

তাঁর সঙ্গে লাকাদেমী অ লা গ্রাঁদ শমিয়ের শিল্প-শিক্ষায়তনে গেলাম। যে রাস্তার উপর এটির অবস্থান তারই নামানুসরণে এর নাম। এই রাস্তাটির দু'ধারে আরও অনেকগুলি "আকাদেমী"র সাইন-বোর্ড চোখে পড়ল। পারীর সব আরোন্দিস্মতেই দেখা যাবে, শিল্পীরা দল বেঁধে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র পাড়ার সৃষ্টি করেছে। এক একটি রাস্তার দু'ধারের সব বাড়ীগুলিই ষ্টুডিও।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত, সরকারীভাবে সমর্থিত শিল্পীদের প্রতিষ্ঠা ও সেই সঙ্গে বেশ অর্থ অর্জন হ'ত। বলা বাহুল্য, সরকারী প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরাই এই সুযোগ সর্ব্বাগ্রে লাভ করত। রিপাবলিকান্ গভর্ণমেন্ট হওয়ার পরে শিক্ষাবিভাগ ও বিদ্যালয়গুলি সম্পূর্ণরূপে সরকারী অধীনতা ও তত্ত্বাবধানে চলে যায়। আধুনিক শিল্পান্দোলনের স্রষ্টা শিল্পীশ্রেষ্ঠ সেজান্-এর ভাগ্যে জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠা না জোটার কারণ তিনি স্বাধীনভাবে শিল্পসাধনা করেছিলেন এবং তাঁর অঙ্কনপদ্ধতি ও চিন্তাধারা সরকারী বিদ্যায়তনের শিল্পীগোষ্ঠীদের দ্বারা সমর্থিত হয় নি। ঊনবিংশ শতাব্দী এবং তার পূর্ব্বে শুধু ফ্রান্সে কেন, ইউরোপের সবদেশেই, শিল্পীরা ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় চলতেন। কাজেই তাঁদের মন জুগিয়ে তাঁদের পছন্দসই ভাববিলাসী চিত্রণ ও ভাস্কর্য্যের অবতারণা করেই শিল্পীদের জীবন কাটত। অবশ্য ধনীদের রুচি অনুসারে কাজ করলেও শিল্পীরা তাঁদের শিল্প-নৈপুণ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট ফুটিয়ে তুলতেন। কিন্তু ইম্‌প্রেশানিজম্ শিল্পধারার রচয়িতা 'মানে', মনে এবং তাঁদের স্বপক্ষীয় শিল্পিমণ্ডলী, ধনী-সম্প্রদায়ের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ সরে এলেন এবং সেজান্-এর মতবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সে-বন্ধনের ক্ষীণ প্রভাবটুকুও সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে গেল। অবশ্য এই আন্দোলন চালাতে এদের সকলকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল এবং জনসাধারণের আপত্তির চেয়ে সরকারী আপত্তি তাঁদের অধিকতর ভাবে নিপীড়ন করেছিল। ধনী ও সরকার-সমর্থিত শিল্পী ও শিল্প-শিক্ষায়তনগুলি উপরোক্ত মতবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে লোক-চক্ষে হেয়, অবজ্ঞাত হ'য়ে পড়ল। সেই সময়ই বেসরকারী শিল্প-শিক্ষায়তনগুলি বহুল পরিমাণে গড়ে উঠল।

সরকারী ও বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা-প্রণালী ও কর্ম্মসময় নির্ঘণ্টের যথেষ্ট তফাৎ আছে। সরকারী শিল্পশিক্ষালয় 'একোল নাসিয়নাল দে বোজার্ত', 'সাঁ জুলিয়াঁ' প্রভৃতিতে নির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক শিক্ষাতালিকা মেনে চলতে হয় এবং নির্দ্ধারিত তারিখ অনুসারে ভর্ত্তি হ'তে হয়। বেসরকারী আতলিয়েতে বাৎসরিক নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাতালিকার প্রচলন নেই। যে-কেউ যে-কোন দিন ভর্ত্তি হ'য়ে কাজ আরম্ভ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের মান অনুসারে কোন শ্রেণী-বিভাগ নেই। একই ঘরে প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন শিল্পী থেকে আরম্ভ করে প্রথম শিক্ষার্থী পর্য্যন্ত, এক সঙ্গে কাজ করছে। এই সকল আতলিয়েকে ঠিক আমাদের ধারণায় বিদ্যালয় মনে করা ভুল হবে। অনেক শিল্পী, যাঁদের স্বতন্ত্র মডেল রেখে কাজ করার মত অর্থ-



ক্যালের বন্দী নাগরিকবৃন্দ —রোদাঁ

সামর্থ্য নেই তাঁরাও এখানে এসে কাজ করেন। সবাই এখানে স্ব স্ব মতানুসারে কাজ করে। প্রতি সপ্তাহে একদিন কোন এক বিখ্যাত শিল্পী এসে ছাত্রদের কাজ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ও সমালোচনা করে অধ্যাপকের কাজ করে থাকেন। আতলিয়ের দক্ষিণার সঙ্গে অধ্যাপনার দক্ষিণা আলাদা দিতে হয়। কাজেই যার ইচ্ছা হয় সেই কেবল অধ্যাপকের সাহায্য নিয়ে থাকে। অধ্যাপকের সমকক্ষ শিল্পী, যাঁরা এখানে কাজ করেন তাঁদের আর অনাবশ্যক অধ্যাপনার দক্ষিণা দিতে হয় না।

গ্রাঁদ শমিয়ের পারীর একটী উৎকৃষ্ট বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিশ্রুত ভাস্কর রোদাঁর ছাত্র, পৃথিবীখ্যাত কবি-ভাস্কর বুর্দেল, ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন গ্রাঁদ শমিয়ের-এর ভাস্কর্য বিভাগে অধ্যাপকের কাজ করেছিলেন। এখন তাঁর সুযোগ্য ছাত্র অধ্যাপক ব্রেরিক তাঁর স্থানে কাজ করছেন। মঃ ব্রেরিক বর্তমানে ইউরোপে ও আমেরিকায় একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

প্রথম যে-দিন মঃ ব্রেরিককে ক্লাসে আসতে দেখলাম সে-দিন আমার মনে যথেষ্ট ক্ষোভ হচ্ছিল, তাঁর কথা বুঝব না বলে। কারণ, তখন ফরাসী ভাষা আমার বিশেষ আয়ত্ত হয় নি। তাঁর প্রকাণ্ড চওড়া কপাল, উন্নত নাসা, চোখের স্নিগ্ধ চাহনী এবং গোঁফ-দাড়ী দেখে আমার মনে হল আনাতোল্ ফ্রাঁসের আর একটি সংস্করণ। পরণে তাঁর অতি সাধারণ একটি কোট এবং প্যাণ্টালুন, তবু মনে হল যেন কত তার বাহার। ফ্রান্সে বড় বড় শিল্পী, কবি, মনীষীদের গোঁফ-দাড়ির বৈশিষ্ট্য তো আছেই, তা ছাড়া তাঁদের বেশভূষার ধরণও কিছু অদ্ভুত। এ যে তাঁরা ইচ্ছা করে লোক দেখাতে করে থাকেন তা নয়। এঁরা নিজেদের সাধনায় এত আত্মহারা যে, বেশভূষায় সব সময় সামাজিক ভব্যতাকে রক্ষা করতে পারেন না। কিন্তু সেই অতি সাধারণ, পারিপাট্যহীন পোষাকেরও যেন আলাদা একটা আভিজাত্য আছে। বড় বড় মনীষী পণ্ডিত হলে কি হয়, মনের সারল্য দেখলে মনে হয়, এঁরা শৈশবের সরলতার গণ্ডী আজও ছাড়াতে পারেন নি। যখন [illegible] আমাদের কাজের সমালোচনা আরম্ভ করলেন, [illegible] দিয়ে শুনতে লাগলাম। বলার কি অপূর্ব ভঙ্গী। হাতের মুদ্রায় তাঁর বক্তব্য এমন নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠল যে, আমার ভাষা না জানার ক্ষোভ গেল—তাঁর বক্তব্য বুঝতে বিশেষ কষ্ট হল না। যতদিন আমার ভাষা আয়ত্ত হয় নি ততদিন আমাদের সহকর্মী ম্যানে ক্যাজ (ইনি বর্তমান ফ্রান্সের একজন খ্যাতনামা চিত্রকর) সর্ব্ব ব্যাপারে দোভাষীর কাজ করে আমায় যথেষ্ট সাহায্য করতেন।

প্রথম পরিচয়ে অধ্যাপক ব্রেরিক যখন শুনলেন আমি 'এ্যাঁদ্ (হিন্দু)' তিনি বললেন, "শিব, বুদ্ধ, নটরাজ স্রষ্টাদের ছেড়ে শিখতে এসেছ আমাদের কাছে ?"

বললাম, "সে সব শিল্পীর সন্ধান আজকাল আর ভারতে মেলে না। ভারতের শিল্প-ইতিহাসে যে বিরাট ফাঁক আছে তারই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে এই বিরাট স্রষ্টা-দের শেষ শিক্ষাটুকু।"

ব্রেরিক শুনে বললেন, "তাতে কি হয়েছে, আমরা হয়ত শিল্পের আধুনিক ব্যাখ্যা করতে পারব, কিন্তু বর্ণপরিচয়ের সন্ধান মেলে প্রাচীন ভারত, মিশর ও গ্রীসের শিল্প-ভাণ্ডারে। বুদ্ধ শিবের স্রষ্টারা তো আর তাঁদের রচনার প্রেরণা বা কর্ম্মকৌশল বিদেশে গিয়ে অর্জ্জন করেন নি। ছেনী হাতুড়ি নিয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন পাহাড়ে। প্রকৃতিই তাঁদের প্রেরণা ও শিক্ষা দিয়েছিল সে মহান্ মূর্ত্তির গঠন-কৌশলের। তাঁদের রচনা এবং প্রকৃতি হবে তোমার গুরু, যাও দেশে গিয়ে কাজ আরম্ভ কর। অতি প্রাচীন শিল্প-সম্পদের গর্ব্ব আমরা করতে পারি না। গ্রীস পারে, কিন্তু সে-সম্পদের অধিকারী জাতি কোথায় মিলিয়ে গেছে; মিশরেও তাই। কিন্তু তোমাদের ধমনীতে এখনও সেই বিরাট স্রষ্টা-দের রক্ত বইছে—সে-দার্শনিক দৃষ্টি আজও তোমাদের চোখ থেকে সরে যায় নি। তাকে অবজ্ঞা করে এখানে এসেছ শিখতে!"

ভারতের প্রতি, ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি দেখে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হল, মুগ্ধ হলাম তাঁর আন্তরিকতায়। শুধু বললাম, "সে ভাবে কাজ করবার অনুপ্রেরণাও হারিয়ে আজ আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব, অসহায়। আপনাদের কাছে এসেছি আপনা-দের শিল্পের ও কর্ম্মধারার নকল করতে নয়, প্রকৃত শিল্প সৃষ্টির অনুপ্রেরণা নিতে।"

সেদিন যাবার সময় মঃ ব্রেরিক বললেন, "কর, তুমি মাঝে মাঝে আমার ষ্টুডিয়োতে এলে এবং তোমার সঙ্গে আরও কথাবার্ত্তা হলে খুশী হব।

গ্রাঁদ শমিয়ের-এ যখন সকলের সঙ্গে বেশ পরিচয় হয়েছে, তখন এক দিন আমার এক সহপাঠী জিজ্ঞাসা করলে আমি কমুনিষ্ট কি না। বললাম "না"।

তখনই আবার প্রশ্ন করলে, আমি ফ্যাসিষ্ট অথবা সোশ্যালিষ্ট কি না। আমি এর কোনটাই নই বলায় সে অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এ ছাড়াও অন্য রাজনৈতিক মতবাদ ভারতে আছে না কি?"

আমি বললাম, "তোমাদের এখানে যেমন ঐ মতবাদের একটি না একটি প্রত্যেকে মানে এবং সেই মতাবলম্বীদের দলভুক্ত হয় আমাদের দেশের লোকেরা কোন বিশেষ মত নিয়ে চললেও তাদের মত বা দলের রাজনৈতিক নামকরণ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। তাই বলে দল যে নেই তা নয়। তবে তা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়ে নয়, বিশিষ্ট নেতার পক্ষাবলম্বন করে।"

পরে বললাম, "আমি শিল্পী—রাজনীতিতে আমার কি প্রয়োজন?" কথাটা অবশ্যই মূর্খের মত বলেছি বুঝলাম, কিন্তু বলা শেষ হয়ে গেছে, কাজেই নিরুপায়।

সে বললে, "বল্‌ছ কি হে! সমাজ নিয়ে রাজনীতি। শিল্পীরা কি সমাজ এবং তার নিয়মের বাইরে? তুমি ছবি আঁক, মূর্ত্তি গড়—এ তোমার পেশা, কিন্তু তোমার দেশের অপর একটি লোকের রাজনৈতিক বন্ধন ও অধিকার যা তোমারও তাই। তোমার কাজের ভাল-মন্দ তোমার দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। দেখ না, তোমার দেশের অপর লোকের মত, শিল্পী হলেও তুমি ইংরেজের প্রজা, পরাধীন। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের সংস্কৃতির মূলে রাজনীতি। রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সংস্কৃতিরও বিপর্য্যয় ঘটে থাকে। রাজনৈতিক অবস্থা ভাল হলেই শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। ফ্রান্স যে আজ সাহিত্য, বিজ্ঞানে এবং বিশেষ করে শিল্পে, বড়, সে রাজনৈতিক কারণেই।"

বললাম, "এখানেও তো শিল্পীরা ভাল ভাবে খেতে পায় না।" বন্ধু উত্তর করলে, "সত্যি কথা, কেন—অন্য পেশার অনেক লোকও এখানে দরিদ্র, তার কারণ ধনসম্পদ্ অসমান ভাবে ছড়ান রয়েছে ব'লে। সেই জন্যই রাজনৈতিক সংগ্রাম এখন শেষ হয়নি, হয়ত বিগত বিপ্লবের চেয়ে আরও ক্ষমতাশালী বিপ্লব এসে এ-সমস্যার সমাধান করে দেবে। অতি প্রাচীন কাল থেকে শিল্পীরা ধনীদের দাস। তাদের স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ করা মানে তাদের মৃত্যু। কিন্তু আর্থিক চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় প্রাচীন শিল্পীরা ধনী জীবনের কৃত্রিম প্রকাশেও



একটি নিগ্রোর মুখ　　—রোদাঁ

আপনাদের যথেষ্ট সাধনা দিতে পেরেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানের ধনী সম্প্রদায় শিল্পীকে না আর্থিক না তার স্বকীয় সহজাত প্রেরণা মূর্ত্ত করার প্রয়াসের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে বিপ্লবের পর থেকে এখানে শিল্পীরা কতকাংশে সাহায্য এবং জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করে ধনীদের দাসত্ব-নিগড় মোচন করতে সমর্থ হয়েছে। আজ এখানে শিল্পীর বিষয়-বস্তু ভাববিলাসী ধনী সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জক অভিনয় নয়। তার সহজাত প্রেরণা ও অকৃত্রিম হৃদয়োচ্ছ্বাস

দিয়ে গড়া তার রচনা আজ জনসাধারণের মনকে স্পর্শ করেছে। জনসাধারণের মধ্যেই সে খুঁজে পেয়েছে বহু-দিন-হারিয়ে-যাওয়া তার ভাষা। হক না অর্থের দিক দিয়ে গরীব সে, জগতের লোকের হৃদয় কিনে সে আজ মহাধনী, যা কোন দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আজও হ'তে পারেনি। তবে শিল্পীর অর্থ-সঙ্কটকে আমরা একেবারে উপেক্ষা করছি না। এর একমাত্র উপায় ধনী সম্প্রদায়ের বিনাশ। তাদের মন জুগিয়ে চলবার মত আমাদের আর চিত্তবিকার হবে না। অথচ জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না



ভার্জিন মেরী ও শিশু খৃষ্ট —মুর্দেল

হ'লে শিল্পীকে কে সহানুভূতি দেখাবে? আজ তারই অভিযানে আমরা বেরিয়েছি। হয়ত আগামী বিপ্লবই এর সমাধান করে দেবে।"

বললাম, "তোমার কথা খুবই যুক্তিযুক্ত এবং মর্ম্মস্পর্শী, কিন্তু শিল্পী স্রষ্টা, তার যদি ধ্বংসে প্রবৃত্তি হয়, তাকে আমি শিল্পী বলতে কুণ্ঠিত হব।"

বন্ধু বললে, "আমি তো ধ্বংসের কথা বলি নি। বলেছি বিপ্লবের কথা। যে-কোন বিষয়ে উন্নতিশীল পরিবর্ত্তনকে বিপ্লব বলি। তবে উন্নত-স্তরের প্রতিষ্ঠায় যদি অপকৃষ্টকে ধ্বংস করা হয় তবে তাকেই প্রকৃত সৃষ্টি বলব। পাথরে মূর্ত্তি করার সময় তুমি যে, তার পূর্ব্বের আকৃতিটা কেটে নূতন করে আকৃতি দিলে, তাকে তুমি ধ্বংস বলবে, না সৃষ্টি বলবে?"

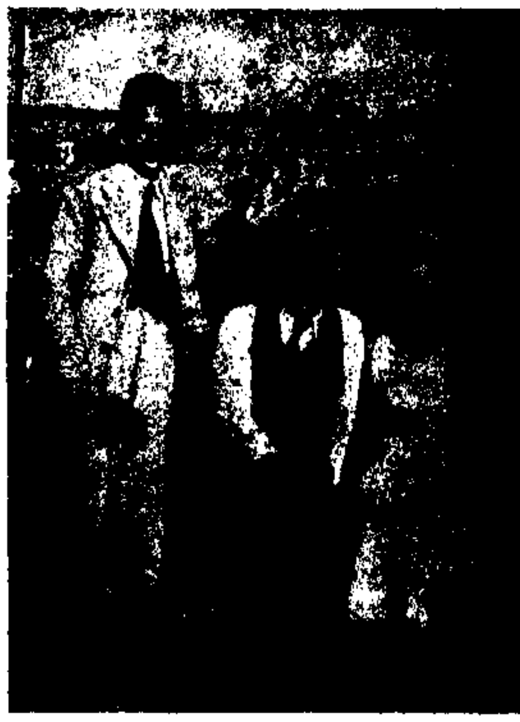
বললাম, "তুমি ঠিকই বলেছ বন্ধু, আজও এমন করে আমরা জীবনকে আলোচনা করতে, দেখতে চাই না বলেই আমাদের জাতীয় শিল্পের সজীব অগ্রগতি নেই। ধনীদের দাস হলেও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীদের রচনা-দক্ষতার যে-প্রকাশ দেখতে পাই তা যদি তোমাদের দেশের মত আজ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসত তা হলে হয়তো ভারতের শিল্প-ইতিহাসের বহু গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় অন্যান্য দেশের শিল্পকে ম্লান করে দিত। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পধারার মধ্যে যে বড় বড় বিচ্যুতি ঘটেছে তার সন্ধি কোন অতিমানুষ শিল্পীও করতে পারে না। তোমরা হয়তো জান না, রাজপুত ও মোগল ধনীর ব্যসন-বিলাসের খোরাক জুটিয়েও শিল্পীরা সাধারণের মধ্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার প্রমাণ পাবে তাদের আঁকা ভারতের জাতীয় সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার চিত্রে। সে-ধারা যদি মাঝখানে না থেমে যেত, আমার মুখেই শুনতে, জগতে ভারতীয় সংস্কৃতির আরও বড় দানের কথা। আজ অর্দ্ধ শতাব্দীও হয় নি আবার নতুন করে আমাদের দেশে শিল্পান্দোলন সুরু হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বড় পঙ্গু সে আন্দোলন। প্রাচীন শিল্পের শুকনো কাঠামোখানা নিয়ে আমরা ছুটে যাই ধনীর দুয়ারে কিন্তু সেখানে আর দান নেই, তবু বার বার তাদেরই করুণা ভিক্ষে চাই। জনসাধারণের কাছে যাবারও উপায় নেই। কারণ তারা বঞ্চিত, নিপীড়িত, নিরক্ষর, নিরুপায়ের দল, কি পাব তাদের কাছে। তবে আমি আশাবাদী, আমার আশা হয়, একদিন তোমাদের কাছে শুনিয়ে দিয়ে যাব ভারতীয় শিল্পীদের নব প্রতিষ্ঠা, যত-খানি তোমরা বহুদিন ধরে পাতা আসনে করতে পার নি। আমাদের প্রয়াস হবে, তোমাদের থেকে বড়, কারণ তোমরা আমাদের মত এত নিগৃহীত, নিঃসম্বল নও।"

আবেগের ঝোঁকে কথাগুলি বলেছিলাম, ওরা ভাল

বুঝতে পারে নি, কিন্তু অন্তরে সকলেই অনুভব করেছিল। গ্রাঁদ শমিয়েরে ছুটি চিত্রণ, একটি ভাস্কর্য্য ও তিনটি ক্রকী (একরঙ বা পেন্সিলের দ্রুত অঙ্কন দ্বারা মডেলের অনুকৃতি করা) বিভাগ লইয়া ছয়টি আতলিয়েতে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১২টা এবং বিকেল ২টা থেকে ৫টা এবং ৭টা ও রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্য্যন্ত কাজ চলে। আমার কাছে গ্রাঁদ শমিয়েরে-এর ভাস্কর্য্য বিভাগটি বেশ লেগেছিল। এইটি পারীর একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্য-শিক্ষায়তন। সেজান-এর শিল্পধারাবলম্বী বিখ্যাত চিত্রকর আঁন্দ্রে লোট-এর বিদ্যালয়টি চিত্রণ-শিক্ষার্থীর পক্ষে চমৎকার। কারণ লোটের মত আরও শিল্পী ফ্রান্সে যথেষ্ট মিললেও তাঁর মত অধ্যাপক বোধ হয় আর একটিও নেই। একদিন মঃ লোটের বিদ্যালয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে, তাঁর অধ্যাপনা দেখতে গেলাম। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা এবং তাঁর সতেজ কথাবার্ত্তার মধ্যে একটি অপূর্ব্ব মোহ আছে। আমার মনে হল, এ যেন বৈদিক যুগের এক ঋষির আশ্রম, গাছের তলায় গুরুকে ঘিরে ছাত্রদের শাস্ত্রাভ্যাস। শুধু মঃ লোট বলে নয়, ফ্রান্সের যত অধ্যাপকের অধ্যাপনা দেখেছি, অধ্যাপন ব্যাপারে সকলের তন্ময়তা দেখে আমার ঐ একই ধারণা মনে হ'ত।

পারীর মধ্যে এই রকম অসংখ্য আতলিয়ে ঘিরে হাজার হাজার শিল্পী নিজেদের যেন একটি স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করে বাস করছে। ধন ও বৈচিত্র্যবহুল পারী শহরে, দারিদ্র্যের সঙ্গে সতত যুদ্ধরত এই শিল্পীকুল, নির্ব্বিকার ভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে লুকিয়ে শিল্প-সাধনা করে চলেছে। এরা চট্ করে ধরা দেয় না, কিন্তু একবার এদের সংস্পর্শে এলে যে বন্ধুত্বের সূচনা হয় তার বন্ধন অক্ষয়। প্রায় পৃথিবীর সব দেশের লোককে এই শিল্পী-সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু শিল্পী ছাড়া এদের অন্য জাতীয় পরিচয় যেন লোপ পেয়ে গেছে। কি অপূর্ব্ব মহামিলনের ভাব্ এদের মধ্যে সর্ব্বদা পরিস্ফুট। আমাদের দেশের শিল্পী-মহলে পরস্পরের সহযোগিতার কথা ভেবে এদের সঙ্গে তুলনা করলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। নিজে আনন্দ পাওয়ার উদ্দেশ্যে শিল্প-সৃষ্টি ছাড়া শিল্পীর বৃহত্তর ধর্ম্ম "to make the beauties of the world loved and understood," এদের মনে সর্ব্বদা জাগ্রত।

নানান্ দেশ থেকে শিল্পীরা পারীতে আসেন পয়সা রোজগারের আশায় নয়, কেবল মাত্র শিল্পশিক্ষার্থে। এখানে দু'একজন শিল্পী ছাড়া আর সকলেই প্রায় গরীব, ভালভাবে খেতে পায় না, অনেক সময় স্ত্রী-পুত্রের লজ্জা নিবারণের সামর্থ্যটুকুও নেই। দারুণ শীতে কয়লার অভাবে ছবি বা মূর্ত্তি বদল দিয়ে কয়লা কেনা শিল্পীদের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার। তবু এদের শিল্প-সাধনা ব্যাহত হয় না—কারণ ভাল খেতে না পেলেও তার কাজের যোগ্য সমাদর ও সহানুভূতি পায় বলে। যে কয়লার বদলে ছবি নিলে তারও



অধ্যাপক জিওভানেলি, তাঁর স্ত্রী ও লেখক

শিল্প-বোধ যথেষ্ট। উপায় থাকলে, শিল্পীকে অন্য উপায়ে সাহায্য করবার মত মন তাদের আছে। তবে সময় সময় শিল্পীরা বঞ্চিতও হয়ে থাকে। আমার একটা ভাস্কর বন্ধুর দাঁত খারাপ হওয়াতে নকল দাঁত বসালে। চিকিৎসকের পাওনা হয়েছিল ৫০০ ফ্রাঙ্ক, অর্থাৎ প্রায় ৪১ টাকা মাত্র। টাকা দেবার সামর্থ্য নেই, বন্ধু চিকিৎসককে তার বদলে একটা মূর্ত্তি নিতে বললে। তিনি এই সুযোগ নিয়ে বন্ধুটির সুন্দর দু'টি ব্রোঞ্জের তৈরী মূর্ত্তি নিয়ে গেলেন।

আমি আগে ব্যাপারটা জানতাম না। পরে শুনে বললাম,

"আমি তোমাকে এখনই ঐ টাকাটা, এমন কি এর দ্বিগুণ টাকা দিতে পারি, আমার মূর্ত্তি দু'টি তার কাছ থেকে এনে দাও।"

বন্ধু হেসে বললে, "তা হয় না বন্ধু, আগে বললে হ'ত, এখন দেওয়া জিনিষ আনতে গেলে আমার কথায় দাম থাকবে না, মানও থাকবে না।" দৈন্যদশা হলেও কি অদ্ভুত আত্মসম্মান-বোধ এই শিল্পীদের।

গ্রাঁদ শমিয়ের-এ প্রায় তিন মাস কাজ করার পর আমি অপরাহ্ণে পাথরে খোদাই শেখার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম।



মানে

সর্ব্বত্রই বড় বড় মূর্ত্তি-শিল্পীরা নিজে পাথর খোদাই করেন না বা খোদাই করতে জানেন না। প্লাষ্টারে মূর্ত্তিটী শেষ করে এঁরা খোদাইকারী শিল্পীদের মূর্ত্তিটা পাথরে রূপান্তরিত করতে দেন। কিন্তু আসল মূর্ত্তির স্রষ্টা যদি নিজেই পাথরে তার রূপ দেন, ত' তার প্রকাশ হয় অনেক উন্নততর।

আমার পরিচিতা একটি ইংরেজ মহিলা ভাস্কর একদিন বললেন, "কর। তুমি তো পাথরে খোদাই শিখতে চাও, আমার অধ্যাপক জিওভানেল্লির কাছে শিখবে?"

তখনই উৎসাহিত হ'য়ে বললাম "নিশ্চয়ই"।

এইসব শিল্পীরা মাত্র একজন কি দু'জন ছাত্র নিয়ে থাকেন, তাও আবার তাঁর বিশেষ জানা বন্ধু লোকের সুপারিশ থাকলে। আমার বান্ধবী লণ্ডনে চলে যাচ্ছেন, কাজেই তাঁর স্থানে, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর আমি কাজ করবার অনুমতি পেলাম। আমি মাত্র এক বছর থাকব শুনে মঃ জিওভানেল্লি বিশেষ আপত্তি করেছিলেন। তিনি বললেন, এত অল্প সময় থাকলে কাজ বিশেষ কিছু শেখা হবে না, তা ছাড়া বহু লোক এসে অল্প সময় থেকে কাজ অর্দ্ধ-সমাপ্ত রেখে তাঁকে বিশেষ বিরক্ত করে গেছে। তিনি বললেন "তোমার মত অনেক ছাত্রই দেখলাম। তোমরা আস এই ধারণা নিয়ে যে, ছেনী হাতুড়ি হাতে পাথরটা ছুঁলেই অনাবশ্যক পাথর ঝরে গিয়ে ইচ্ছামত মূর্ত্তিটী ফুলের মত ফুটে উঠবে।"

আমি বললাম "আমায় এক সপ্তাহ দেখুন, তারপর উপযুক্ত না বুঝলে না হয় তাড়িয়ে দেবেন।" তিনি হঠাৎ আমার কোটটা ধরে এক ঝাঁকুনী দিয়ে বললেন, "এই বাবুর পোষাক পরে কাজ হবে না।" জানালাম "আজ কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসি নি, কাল থেকে কাজ আরম্ভ করব।"

পরদিন তাঁর নির্দ্দেশমত কেনা নীলরঙের প্যাণ্টালুনটি ষ্টুডিয়োতে পরে কাজের জন্য প্রস্তুত হলাম।

তিনি আমার মাথায় চুলগুলি ময়লা থেকে বাঁচাতে একটি খবরের কাগজের টুপি করে পরিয়ে দিয়ে, বললেন "যাও রাস্তায় একটি পাথর পড়ে আছে সেটি এখানে নিয়ে এস।"

ষ্টুডিয়োর গলি রাস্তাটিতে প্রবেশের সময় সদর রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একটী মার্ব্বেল পাথর পড়ে ছিল দেখেছিলাম। তার পরিমাণ ও ওজনটি মনে করে ভাবলাম আমার তাড়াবার এ এক ফন্দী। অসুরের মত বলিষ্ঠ চেহারা হলেও অধ্যাপকেরও যে ঐ পাথরটি বহন করে আনবার ক্ষমতা আছে সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাঁর ধমকানীতে গেলাম পাথরটা আনতে। বাজারের মধ্যে বড় রাস্তাটিতে বহু জনসমাগম। আমার তো লজ্জায় চোখমুখ লাল হয়ে গেল। মনে হল, খবরের কাগজের টুপি ও নীল প্যাণ্টালুনের বিচিত্র পোষাকে আমি যেন সকলের একমাত্র দ্রষ্টব্য হয়ে দাঁড়িয়েছি। আসলে কেউই আমাকে দেখছিল

না। ওটা আমার জাতিগত দুর্ব্বলতা—ভদ্রলোকের ছেলে মজুরের পোষাকে রাস্তায় পাথর বইতে যাচ্ছি! পরে অবশ্য সয়ে গিয়েছিল।

অতি কষ্টে, পাথরটার একধার কয়েক ইঞ্চি মাত্র তুলে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় মঃ জিওভানেল্লি এসে বললেন, "বাঃ, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ?" জানালাম একাজে আমি অপারগ। শুনে বললেন "তা জানি একথা নতুন শুনছি না। যাও ষ্টুডিয়ো থেকে দু'টো গোল কাঠ নিয়ে এস।"

পরে তাঁর কথামত পাথরটির তলায় দু'ধারে কাঠ দু'টি লাগিয়ে ঠেলে, পিছনের কাঠটা পালাক্রমে সামনে লাগিয়ে অনায়াসে সেটি ষ্টুডিয়োর ভিতরে গড়িয়ে আনা গেল। কিন্তু তখন তাঁর নীরস ব্যবহার আমাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। হেসে তিনি বললেন, "বড় দুঃখের জীবন হে শিল্পীর, তোমার হয়তো লোক দিয়ে রাস্তা থেকে পাথর তুলিয়ে আনার মত অর্থ উপার্জ্জন হবে না। এও শিখতে হয়।"

সেদিন তাঁকে আঘাত করে উত্তর দিয়েছিলাম, "কিন্তু এ-কাজ করাতে ছাত্র তো জুটবে।" পরে জেনেছিলাম কি অন্যায় হয়েছিল আমার। তাঁর উদার মন এবং স্নেহসিক্ত হৃদয়ে হয়তো ব্যথা দিয়েছি। চলে আসার দিন আমি তাঁর প্রাপ্য টাকাটা দিতে গেলে আমার হাতটি চেপে ধরে বললেন, "থাক্ কর, ভগবান্ আমায় অনেক দিয়েছেন। তুমি বিদেশী, এই যুদ্ধের দুর্দ্দিনে তোমার অর্থপ্রয়োজন আমার চেয়ে বেশী। ওটা তোমার রাস্তায় পানীয় খরচার জন্য দিলাম। তুমি যাচ্ছ, থাকতে বলার মত দিন নেই, আমার অধিকারও নেই। তবে ষ্টুডিয়োতে একা কাজ করতে আমার বড় কষ্ট হবে, আর ঐ কোণটায় তুমি কাজ করছ মনে ক'রে যখন ভুল করে চাইব এবং স্থানটি ফাঁকা দেখব, তুমি হয়ত বুঝবে না আমার মনটা কত ব্যথিত হবে। অভ্‌ভোয়ার, কর।"

দেখলাম বৃদ্ধের চোখে জল টল্‌টল্ করছে, আমারও চোখ তখন শুক্‌নো রাখতে পারি নি। কেন জানি না, হয়ত নিঃসন্তান বলেই তাঁর আমার প্রতি টানটা এত বেশী হয়েছিল। কিন্তু এখানে দেখেছি শিল্পীদের মধ্যে এমন নিবিড় আত্মীয়তা সহজে গড়ে উঠে যে ছাড়াছাড়ির সময় মনে বেশ কষ্ট হয়।

ফ্রান্সে জনসাধারণের শিল্পবোধ মনে হয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক উন্নত। প্রতি রবিবারে লুভর্, লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি শিল্প-সংগ্রহশালাগুলিতে প্রবেশমূল্য লাগে না। ঐ দিন দলে দলে জনসাধারণ, অতি প্রাচীন থেকে অত্যাধুনিক, চিত্র, ভাস্কর্য্য ও শিল্পসংগ্রহের রসাস্বাদন করে থাকে। হয়তো কোন অধ্যাপক কোন একটি গ্যালারীর সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন আর তাঁকে ঘিরে বহু লোক ধীরভাবে তাঁর বক্তব্য শুনছে। আমার প্রত্যেকটি লোককে দেখে মনে হত, সে শিল্পী, যখন দেখতাম তারা কত আগ্রহে শিল্পপ্রসঙ্গে ব্যাপৃত রয়েছে। ফ্রান্সে ক্রেতার তুলনায় শিল্পীর সংখ্যা অত্যন্ত অসমানভাবে বেশী হওয়ায় ছবি বা মূর্ত্তি কেনা বেচা



ব্রোঁ

বড় কম। কিন্তু সকলেই শিল্পীদের শ্রদ্ধা করে, তাঁর কাজকে বুঝতে চায়। একটি দু'টি ঘটনা থেকে তার নিজে যা পরিচয় পেয়েছি তা জীবনে ভুলব না।

সোরবন্-এর (পারীর বিশ্ববিদ্যালয়ের) একটি ছাত্রী একবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আমার ভারতীয় প্রথায় আঁকা ছবিগুলি দেখতে আসেন। ছবি দেখা শেষ হলে তিনি বললেন, "আপনার একখানি ছবি নিতে আমার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কিনতে পারি এমন ক্ষমতা নেই। তবে আপনি যদি রাজী হন তা হলে যতদিন লাগে ততদিন আপনার মডেল হয়ে সেই পারিশ্রমিকে ছবির দাম শোধ দিতে পারি।" ভাবলাম ঠাট্টা করছে। কিন্তু পরে বহুবার আমার বন্ধুকে

দিয়ে তিনি অনুরোধ করিয়েছিলেন এবং আমি তাঁর দেহের গঠন অভেদ হবার উপযোগী মনে করি কি না তার পরীক্ষাও দিতে হয়েছিলেন।

আর একবার আমার সময়, যুদ্ধ-ঘোষণার প্রায় তিন সপ্তাহ কাল পরে একটি বন্ধু এসে বললেন, আমার একটি ছবি কিনবেন। আমি ত অবাক্! তিনি যুদ্ধনিবন্ধন সৈন্যদলভুক্ত হয়েছেন এবং পরদিনই ফ্রণ্টে যুদ্ধে যাবেন। বললাম, "যাচ্ছেন যুদ্ধে, এখন ছবি কিনে কি হবে, তা ছাড়া বেঁচে ফিরবারও কোন স্থিরতা নেই।"

হাতে টাকাটি দিয়ে বন্ধুটি বললেন, "যদি মরি তো ছবিটা ভোগ না করতে পারার ক্ষোভের সেখানেই পরিসমাপ্তি হবে। আর যদি বেঁচে ফিরি তখন তোমার বা বিক্রী করে হয়তো তোমার এই ছবিখানা পাওয়া সম্ভব না হলে আমার যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ হবে। এর মধ্যে অনেক বিপর্যয় ঘটবে যুক্তি। কিন্তু আমার ভাল লেগেছে তাই কিনলাম, পরে কি হবে ভেবে দেখি নি।"

আমার খুবই আশ্চর্য্য লেগেছিল। হয়ত এই রকম ঘটনাগুলি খুব বেশী চোখে পড়ে না, কিন্তু ওদের জীবনে খুব অসাধারণ না হলেও এ ঘটে থাকে।

গ্রীষ্মকালে রবিবার বা অন্যান্য ছুটির দিন বেশ পরিষ্কার দিন হলে, দলে দলে শিল্পীরা নিজেদের ছবি বা মূর্ত্তির বোঝা কাঁধে করে বড় বড় বুলভার্দে উপস্থিত হন। ফুটপাথের ধারে বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে ছবি টাঙিয়ে, মূর্ত্তি সাজিয়ে পথে প্রদর্শনীর অবতারণা করেন। ফ্রান্সে শিল্পীরা অর্থাভাবে কোন বড় প্রদর্শনীতে কাজ না দিতে পেরে হতোৎসাহ হন না। তাঁরা কোন বড় গ্যালারী, প্রদর্শনীর বা প্রদর্শনীর চিত্র-ভাণ্ডার নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচকের মতামতের ধার ধারেন না, রাস্তায় ছবি টাঙানর জন্য তাঁদের মান নষ্ট হয় না, কারণ যেখানেই থাক তাঁদের কাজের যোগ্য সম্মান দর্শকে দিয়ে থাকে। অনেক সময় এঁদের ছবির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় রাষ্ট্রের কোন একটি বিধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—যে-প্রতিবাদে হয়তো জনসাধারণের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। শিল্পী সেটি আরও পরিস্ফুট করে লোকচক্ষে তুলে ধরেন।

ইউরোপ-প্রত্যাগত অনেক বন্ধু আমায় প্রায়ই বলেন, "আচ্ছা আপনারা কেন আমাদের দেশের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র বা সাধারণ পথ, গ্রাম, শহরের দৃশ্য আঁকেন না? এর মধ্যে কি আর্ট নেই? ইউরোপে বর্ত্তমান শিল্পের বিষয়বস্তু তো এই গুলিই।" কিন্তু তাঁরা বলার সময় ভুলে যান যে, এটা ভারতবর্ষ এবং শিল্পীরা এখানে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক আবেষ্টনের মধ্যে বাস করে তা ও-দেশ থেকে যথেষ্ট ভিন্নতর। আমাদের দেশে শিল্পীরা আজও ধনীদের দাস। ধনীদের ভাববিলাসী মনে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত চিত্রের পরবর্ত্তী উন্নতিশীল অগ্রগমনের শিক্ষা নেই, কাজেই শিল্পীদেরও সে-যুগ মনে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা না দিলেও তারই আড়ষ্ট, প্রাণহীন অনুকরণ নিয়ে ধনীদের দরজায় ভিক্ষার্থী হতে হচ্ছে। রামায়ণ-মহাভারতের বিষয়কে দেখবার চোখ থাকলে নতুন করে, বর্ত্তমান করে দেখা যায়। ইউরোপে আজও শিল্পীরা গ্রীক পুরাণ ও বাইবেলের বিষয় নিয়ে ছবি এঁকে থাকেন কিন্তু তা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নয়। কেবল রামায়ণ মহাভারত ছেড়ে বর্ত্তমান দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্যকে বিষয়-বস্তু করলেই তো শিল্প হবে না। তাকে প্রকাশ করার ভাষা জানা চাই হৃদয়ে, তার প্রতি সহানুভূতি থাকা চাই।

এদেশে অনেকেই তো এখন সাধারণ কৃষক, শ্রমিকদের জীবনচিত্র গ্রাম, শহরের দৃশ্য এঁকে থাকেন। কিন্তু সে সব ছবি দেখলে মনে হয় না, তাঁরা আগ্রহ করে এগুলি দেখতে চেয়েছেন। এর মধ্যে বর্ত্তমানকে পাওয়া যায় না, উপরন্তু প্রকাশেও ভাবপ্রয়োগ রীতিতে দেখা যায় সেই পুরাতন রামায়ণ কথার অসম্পূর্ণ অক্ষম প্রকাশ। শিল্পীদেরই এদেশে জীবনকে দেখবার মত দৃষ্টি নেই পরকে তাঁরা কি দেখাবেন।

সাধারণের বিশেষ করে শিল্পীদের, শিল্পবোধ ও দৃষ্টি জাগ্রত করার এক মাত্র ক্ষেত্র জাতীয় শিল্প-সংগ্রহশালা। এ ছাড়া উপযুক্ত সমালোচনা ভিন্ন শিল্প, সাহিত্য বাঁচতে পারে না। সমালোচনাতেই পরিচয় পাওয়া যায় উপলব্ধির ও সমঝদারের। দেশের লোকের শিল্পবোধই নাই, সমালোচনা, এবং সমঝদার হবে কেমন করে! এত বড় দেশ, আমরা প্রাচীন সভ্যতার গৌরব বহন করে বেড়াই সর্ব্বত্র, অথচ আমাদের একটি জাতীয় শিল্পসংগ্রহশালা নেই, যেখানে গিয়ে সাধারণের শিল্পবোধ জাগ্রত হবে। ব্যক্তিগতভাবে শিল্পীকে উন্নতিশীল করার পূর্ব্বে, শিল্পের উন্নতিশীল অগ্রগমন আনবার জন্য আমাদের উচিত জাতীয় শিল্পসংগ্রহশালা গঠনের প্রাণপণ চেষ্টা। ইতালীর রেনেসাঁস যুগের পর থেকে ফ্রান্স যে শিল্পের নব নব ধারা ও নূতনতর ব্যাখ্যা করে জগতের শিল্পীগোষ্ঠীকে রসদ যোগাচ্ছে তার জন্ম হয়েছে ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পসংগ্রহশালার পুণ্যতীর্থে বহু শিল্পীর আজীবন দর্শন ও সাধনার ফলে।

পিতা

—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত

নিলু ওরফে নিলয় চাকুরী করাটা যত সোজা মনে করিয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া ব্যাপারটা তত সোজা মনে হইল না। বৎসরখানেক ধরিয়া চাকুরীর দরখাস্তে বি.এ. খেতাব জুড়িয়া দিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, সাহেবদের দুয়ারে ধরণা দিয়াও যখন বিফলমনোরথ হইল, তখন আশ্চর্য্য না হইয়া পারিল না।

বি.এ. পাশ করিবার পর সে ভাবিয়াছিল, জজ কিংবা ম্যাজিষ্ট্রেট-এর পদ না হোক, বড় রকমের মোটা মাহিনার চাকুরী সে একটা পাইবেই। এখন মোটা মাহিনা দূরে থাক, সামান্য একটা চাকুরীও সে এত কষ্ট করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারিল না। ইহা অদৃষ্টের ফের ছাড়া আর কি? কই তাহাদের গ্রামে তাহার মত শিক্ষিত বি.এ. পাশ লোক তো একজনও নাই। স্বয়ং জমিদারও বি.এ. পাশ করেন নাই। সে শিক্ষিত বলিয়াই গ্রামের লোক তাহাকে কত সম্মান করে। আর চাকুরীর বাজারে সে কি না অনাদৃত হইয়া রহিল বেকার।

দুঃখে, কষ্টে, রাগে, অভিমানে নিলয়ের চোখ দিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। তার পিতার উপর অভিমান হইল অত্যধিক—যদিও পিতা বহুদিন হইল স্বর্গগত। অভিমান হইবার কথাই। তাহার পিতাই যে তাহাকে চাকুরী করিতে দেন নাই। সেই জন্যই তো তাহার এরূপ দুরবস্থা। চাকুরীর বাজার তো তখন এরূপ মন্দা ছিল না? সেও পাশ করিয়াছে আজ দশ এগার বৎসর হইল। নিলয়ের মাতা নিলয়ের শৈশব অবস্থাতেই গতায়ু হইয়াছিলেন। পিতাই কোলে-পিঠে করিয়া নিলয়কে মানুষ করিয়াছিলেন, কখনও মাতার অভাব পুত্রকে বুঝিতে দেন নাই। তারপর নিলয় বি.এ. পাশ করিবার পর পিতা তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং বিষয়-আশয় দেখিবার নিমিত্ত নিজের সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

নিলয় বি.এ. পাশ করিয়া চাকুরীর নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তিনি সম্মতি দেন নাই। চাকুরীর ব্যাপারে নিলয়ের পিতার বিশেষ অমত ছিল না—শিক্ষিত পুত্র চাকুরী করিয়া বড় মানুষ হইবে ইহা ত অতীব সুখের কথা। তাহাতে পিতার অনিচ্ছা প্রকাশ করিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু পুত্রের মুখে স্বাধীনতার বাণী শুনিয়া পিতা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার এত আদরের একমাত্র পুত্র যদি স্বাধীনতার স্রোতে ভাসিয়া যায়—তবে ক্ষতি তো কেবল তাঁহারই হইবে। এই যে অগণিত শিক্ষিত যুবকেরা নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দেশের জন্য আত্মবলিদান দিতেছে তাহাদের জন্য দেশনায়কেরা কতখানি অশ্রুপাত করিয়াছে, কতটুকু সহানুভূতি দেখাইয়াছে তাঁহাদের পিতা-মাতাদের প্রতি? সেইজন্য পিতা পুত্রকে গৃহে রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিতা একদিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"বাবা নিলু, চাকুরী করে কি ক'রবে বাবা? তার থেকে যা আছে তাই দেখ-শোন। ভগবানের এবং আমার আশীর্ব্বাদে এতেই তোর সোনা ফলবে। এই তো বড় হয়েছিস্, সব-তো বুঝিস্—পিতার মনে কি কোন কষ্ট দিয়ে, কোন কাজ করা ভাল বাবা?"

নিলয় আর যাহাই করুক, পিতাকে অতিশয় ভক্তি করিত। দেখিল, তাহার স্নেহময় পিতার চক্ষে জল। বলা বাহুল্য, নিলয় আর পিতার কথা অমান্য করিতে পারিল না।

সেই মহান্ পিতা আজ পাঁচ বৎসর হইল পরপারের যাত্রী হইয়াছেন। কত অসংখ্য পরিবর্ত্তন এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু নিলয় পিতার আশীর্ব্বাদ মাথায় করিয়া শত্রুর মুখে ছাই দিয়া নির্ব্বিঘ্নে সংসার করিতেছে।

এ সব তো হইল অনেক দিনের কথা। এই সব অতীত-কথার সহিত বর্ত্তমানের কোনও সম্বন্ধ নাই। তবুও এই-সব অর্থহীন অতীত কথাগুলি বলিতে হইল, তাহার কারণ অতীতের পটভূমিকা ব্যতীত বর্ত্তমানকে বুঝা যায় না। আজ যখন নিলয় প্রাতঃকালে বাহির হইয়া বেলা বারটায়

যখন কোন একটা রাজ্য জয় করিয়া শুষ্কমুখে একটুকুরা হাসি মাখাইয়া বাড়ীতে ঢুকিল, তখন তাহার এই বাহিরের উৎকণ্ঠ হাসির ভিতরে যে কতখানি বেদনা লুকাইয়াছিল তাহা সুহাসিনী ছাড়া আর কেহই জানিত না।

২

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া নিলয় কহিল— ওগো শুনছো।'

নিলয়ের স্ত্রী সুহাসিনী স্বামীর এত বিলম্ব দেখিয়া অত্যধিক চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। এত বিলম্ব তো স্বামী কোনও দিন করেন না। যদিও বৎসর খানেক পূর্ব্বে চাকুরীর নেশায় একবার মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সে-সব পুরাতন কথা—তাহাতে এখন ভাঁটা পড়িয়াছে।

এই সব কথার সহিত আরও একটি কথা সুহাসিনীর মনে বারংবার জাগিয়া উঠিয়া তাহার অন্তরের গূঢ় সুপ্ত বেদনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়া চোখে যে দু'চার ফোঁটা জল না আনিতেছিল তাহা নয়,—কিন্তু স্বামীর ডাক শুনিয়া, সুহাসিনী চক্ষের জল মুছিয়া ব্যস্ত হইয়া নিলয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিলয় কহিল—'একটা সুখবর আছে।'

স্বামীর হাসিমুখ দেখিয়া সুহাসিনী প্রথম হইতেই ব্যাপারখানা অনুমান করিয়া লইয়াছিল, কহিল, 'কি?'

নিলয় বলিল,—'আগে বল, কি খাওয়াবে?'

'যা খেতে চাও!'

'শুধু আমাকে খাওয়ালে চ'লবে না, আমার বন্ধুবান্ধবদের সবাইকে খাওয়াতে হ'বে।'

'বেশ খাওয়াবো বলো।'

তখন নিলয় জানাইল যে, সে ত্রিশ টাকা মাহিনার একটা চাকুরী পাইয়াছে।

খবর শুনিয়া সুহাসিনী প্রথমে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। কারণ এই সামান্য চাকুরীর জন্য স্বামী কত কষ্টই সহ্য করিয়াছেন, হইলই বা ত্রিশ টাকা! ইহাতে যদি স্বামী সুখী হন, তবে সে বাধা দিবে কিসের জন্য। কিন্তু যখন সে শুনিল যে, সামান্য এই কয়েকটা টাকার জন্য পাঁচ মাইল হাঁটিয়া ভোর ছ'টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গাধার খাটুনী খাটিতে হইবে, তখন চোখের জলে তাহার সুন্দর মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল।

নিলয় স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া অবাক্ হইয়া গেল। বলিল,—'কি হল, মুখ শুকিয়ে গেল যে।'

'এ-কাজটা কি তোমার না করলেই নয়?'

নিলয় উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল—'কেন এটার দোষ কি?'

সুহাসিনী বলিল, 'দোষের কথা বলছি না, এত খাটুনী তো তোমার সহ্য হবে না।'

নিলয় একগাল হাসিয়া কহিল, 'ও এই জন্য? তার জন্য ভেবো না, চাকুরী করতে গেলে একটু খাটতেই হবে।'

'যা আছে তাতেই তো আমাদের এতদিন বেশ কেটে যাচ্ছিল।'

একটু বিজ্ঞের মত খানিক হাসিয়া নিলয় কহিল,—'এতদিন চ'লছিল বলেই যে চিরদিন এইরকম ভাবে চ'লবে তার তো কোনও কথা নেই? এই ধর, তোমার যখন ছেলে মেয়ে হবে তখন তো আর চলবে না। মেয়ের বিয়ে দিতে আজকাল যা হাঙ্গামা। বাপরে বাপ্! দু'তিন হাজার টাকা খরচ না করলে তো বিয়েই হবে না। বুড়ো বয়সে চাকুরী করার থেকে এখুনি ভাল,—কি বল?'

'ছেলে-মেয়ে আর হয়েছে? বুড়ো হলাম কবে মরবো তার ঠিক নেই, তার আবার' সুহাসিনী একটু হাসিল।

নিলয় অবিশ্বাসের একটা হাসি হাসিয়া বলিল,—'বুড়ো না, আর কি? মোটে তো বাইশ বছর বয়েস।'

'বাইশ? এই তো আষাঢ়ে পঁচিশ বছরে পড়লাম। তোমার থেকে বছর সাতেকের ছোট।'

'হলই বা পঁচিশ বছর, পঁচিশ বছরে ছেলে-মেয়ে আর কারও কি হয় না? হুঁ!'

সুহাসিনী আর তর্ক করিল না। স্বামীর যে এইখানেই সব চেয়ে বড় ব্যথা এবং দুর্ব্বলতা তাহা সে জানিত। তাই এই ধরণের প্রশ্ন যতদূর সম্ভব সে এড়াইয়া চলিত। ইহার জন্য তাহার যে মনোকষ্ট কম ছিল তাহা নয়, কিন্তু এই সব আলোচনায় স্বামীর কষ্ট যে আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহা সে জানিত। সেই জন্য সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা নীরবে মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যাইত। স্ত্রীলোকের ছেলে-মেয়ে না হওয়াটা যে কত বড় অশান্তি তাহা স্ত্রীলোকেরাই মর্ম্মে মর্ম্মে জানে।

পাড়ার মেয়েরা বলিত,—'ও মা! এমন মোমছেলে

তো কখনও দেখি নি। ছেলে-মেয়ে নেই,—সেজন্য একটুও দুঃখ কষ্ট সেই মনে, দিব্যি হেসে খেলে দিন কাটায়।'

সুহাসিনী তার জবাব দিত,—'থাক্‌লেই বা কি স্বর্গে যেতুম; যার নেই—তার নেই। তোমাদের মত ছেলেমেয়ে হওয়ার চেয়ে সাতজন্ম ছেলে-পিলে না হয়—তাও ভালো।

নিলয় প্রায়ই বলিত,—'দেখো' আমাদের ঘরে কৃষ্ণঠাকুর জন্ম নেবেন, সত্যি বল্‌ছি তোমার পা ছুঁয়ে'—এই বলিয়া তাহার হাত স্নেহভরে ধরিয়া বলিত—তিন্ সত্যি।'

৩

কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে নিলয় এই প্রতিজ্ঞাটা করিয়াছিল জানি না। কারণ একদিন এই তুচ্ছ কথাটাও বেদবাক্যের মত সত্য হইয়া গেল। নিলয়ের জীর্ণ কুটীর আলো করিতে সুহাসিনীর গর্ভে বোধ হয় কৃষ্ণঠাকুরই আসিলেন।......

আনন্দে হাত পা নাড়িয়া নিলয় বলে,—'দেখ্‌লে আমার কথা সত্যি কি না? তোমরা তো কিছুই বিশ্বাস ক'রতে চাও না।' সুহাসিনীর মনেও আনন্দ কম নয়; হাসিয়া বলে,—'সত্যি তো।'

আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়া মাস খানেক অতি-বাহিত হইয়া গেল। সুহাসিনী এখন কাঁথা সেলাই করিতে বিশেষ ব্যস্ত। দিনে-রাত্রে তাহার একটুও অবসর নাই। একদিন সন্ধ্যার পর লণ্ঠন সামনে রাখিয়া, ঘরের দরজার সামনে বসিয়া একমনে কাঁথা সেলাই করিতেছিল; হঠাৎ তাহার সম্মুখে ধপ্ করিয়া কি একটা পড়িতেই সুহাসিনী অভাবনীয় ভাবে চম্‌কাইয়া উঠিল, পিছনে চাহিয়া দেখিল নিলয় মিটি মিটি হাসিতেছে। সেও হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—'ওমা, তুমি এত চম্‌কে দিতে পার মানুষকে, যাও তোমার সঙ্গে কথা বল্‌বো না। আমার যা বুক ধড়ফড় ক'রছে।'

নিলয় মৃদু হাসিয়া, সুহাসিনীর সম্মুখে পতিত জিনিষটা তুলিয়া লইয়া লুকাইয়া ফেলিয়া বলিল,—'এত ভয় পাও তুমি!'

'ভয় পাবো না, খালি বাড়ীতে।'

নিলয় বলিল,—'একটা জিনিষ এনেছি।'

'কি এনেছো?'

'না, বলবো না।'

'আহা, বলোই না।'

'যদি না বলি।'

সুহাসিনী এবার সত্যই রাগ করিল, বলিল,—'না দেখাতে চাও না দেখালে, আমি আর মিছি মিছি সাধতে পারি না।' বলিয়া সে মাথা নীচু করিয়া কাঁথা সেলাইয়ে মন দিল।

নিলয় লণ্ঠনটা সরাইয়া লইল। সুহাসিনী বলিল,—'কি যে কর, ভাল লাগে না। অন্ধকারে হাতে সূচ ফুটে যাবে না বুঝি?'

'তবে মাথা নীচু করে ম'নে ম'নে রাগ।'.........

'কক্ষণো আমি রাগ করি নি, মিছে কথা।'

'আচ্ছা, রাগ না হয় নাই ক'রেছ—কিন্তু মাথাটা নীচু ক'রে রয়েছ কেন?'

'আমার ইচ্ছে।'

'এটাও আমার ইচ্ছা।'

দুই জনেই হাসিয়া উঠিল।

নিলয় একটা কাপড়ের বাণ্ডিল তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। সুহাসিনী কাপড়ের বাণ্ডিল খুলিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কহিল,—'এসব কি হ'বে!'

গম্ভীরভাবে নিলয় উত্তর দিল,—'খোকা প'রবে।'

সামান্য লজ্জিত হইয়া সুহাসিনী বলিল,—'এত দামী দামী সিল্কের জামা?—আর এত বড়। ওর গায় এগুলো কি লাগ্‌বে?'

'না লাগে ফেলে দাও। আবার কিনে দেবো। আমার ছেলেকে কি সিল্কের জামা পরাতে পারব না, এতই গরীব হ'য়েছি?' নিলয় রাগ করিল।

সুহাসিনী সব বুঝিল। লজ্জিত হইয়া কহিল, 'না, না, সে কথা আমি বলি নি। বলছিলাম, যদি মেয়ে হয়—'

'হলেই বা। কিন্তু মেয়ে কখনও হবে না, তা আমি তোমাকে বলে দিলাম, তুমি দেখো।'

এমনি করিয়া অনাগত শিশুর জন্য নানাপ্রকার জিনিষ-পত্রাদিতে ঘর পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আজকাল সুহাসিনীকে বেশী কর্ম করিতে হয় না। নিলয় সুহাসিনীর সাহায্যের জন্য একটা ঠিকা-ঝি রাখিয়া দিয়াছে। সেই বাসন মাজে, বাহিরের কাজকর্ম করে।

সুহাসিনীর কেবল রান্নার পাট। তাহার মধ্যে আবার নিলয় প্রায় ছুটী লইয়া তাহার সহায়তা করে। একটু আধটু হইতো নয়! তাহাও নিলয় করিতে দেয় না,—কি দুষ্ট হইয়াছে এই নিলয়, এত দিন তো এরূপ ছিল না?

সুহাসিনী ভাবে—নিলয়ের পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া পুনরায় মাথা নীচু করে। মনে মনে একটু হাসিয়া বলে,—'তুমি একটু বাহির থেকে বেড়িয়ে এস। সব সময় ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াও, আমার ভাল লাগে না; এসব কাজ কি পুরুষদের মানায়!'

নিলয় বলে,—'না—কেবল তোমাদের মানায়।'

'বাঃ রে, তা মানাবে না? আমরা যে মেয়ে মানুষ।'

'তাতে কি, সময় অসময় তো একটা আছে!'

সুহাসিনী আর এ বিষয় লইয়া তর্ক করে না। বলে,—'হাঁ গা! ছেলে হ'লে কি নাম রাখবে?'

নিলয় অনাগত শিশুর জন্ত আর সব চিন্তা করিয়াছিল কেবল এইটী ছাড়া। শিশুর নাম রাখিবার কথা তাহার মনেই ছিল না; হঠাৎ এইরূপ জটিল প্রশ্নে চিন্তিত হইয়া পড়িল। বলিল, 'তাইতো! ভাল কথা মনেই ছিল না। আচ্ছা ভেবে বলব।'

সুহাসিনী কণ্ঠে একটু সোহাগ ঢালিয়া বলিল, 'আহা। তোমার যা ই'চ্ছে তাই রাখবে, এতে আর চিন্তার কি? একটা কিছু বল না শুনি।'

নিলয় ভাবিয়া চিন্তিয়া, নানারূপ গবেষণা করিয়া বলিল—'নীলকণ্ঠ।'

কিন্তু সুহাসিনীর নিকট নামটা মনোমত হইল না। সে বলিল, 'অত বড় চার পাঁচ অক্ষরের নাম ধরে ডাকা যায় না বাপু। ছোট খাট একটা নাম বল।'

নিলয় এবার সত্য সত্যই রাগ করিল। বলিল,—'অত বড় নাম ধরে ডাকা যায় না? তা ডাকা যাবে কেন? আমাদের নামই বা পছন্দ হবে কেন? তার থেকে একটা গরু, ঘোড়ার সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখি, তখন খুব পছন্দ হবে?'

সুহাসিনী অভিমান করিয়া কহিল,—'ওমা, আমি কি তাই বললাম? তোমার ছেলের নাম তুমি যা ইচ্ছে রাখ, তাতে আমার কি? তবে ডাক-নাম ছোটখাট হ'লেই ভাল হয়।'

নিলয় কহিল—'আমি কি ডাকনাম রেখেছি না কি? এটা তো হ'ল ভালো নাম; ডাক্‌নাম তুমি রাখো, মেয়েরাই ভালো ডাকনাম রাখ্‌তে পারে।'

সুহাসিনী ছোটখাট নামের মধ্যে অনেক বাছিয়া অবশেষে অনাগত শিশুটীর নাম রাখিল—'মাণিক'।

৪

এইরূপ স্বামী-স্ত্রীর দিন কাটিয়া যায়। হিন্দু আচারে প্রবাদ আছে যে, পুত্রের হাতের পিণ্ড না খাইলে মানুষ স্বর্গে যাইতে পারে না। ইহারই জন্ত না কি নরপতি দশরথ ধার্ম্মিক হইয়াও স্বর্গে যাইতে পারেন নাই। অবশেষে পুত্রবধূ সীতার হস্তের পিণ্ড খাইয়া বহু দিন পরে তিনি উদ্ধার হইয়াছিলেন। এ-হেন পুত্রের মুখ দেখা পিতা-মাতার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সুতরাং এর দায়িত্ব যে কত বড়, তাহা নিলয় ভালরূপেই জানে। তাই ভবিষ্যত নরকের ভয়ে সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিত।

কিন্তু ইদানিং দুই মাস বেশ আনন্দেই কাটিতেছে। অতঃপর সুহাসিনীর একদিন প্রসববেদনা উঠিল; অতিরিক্ত বেদনায় সে কাতর হইয়া পড়িল। স্ত্রীর কষ্ট দেখিয়া নিলয়ের চোখে জল আসিল। গোপনে চোখের জল মুছিয়া স্ত্রীকে কত উপদেশ দিল, ভাবিল, কষ্ট না করিলে কি কেষ্ট কেষ্ট পায়!

পাড়ার মেয়ে ও পুরুষে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে। পুরুষের দল নিলয়কে লইয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে। মেয়েরা বাড়ীর মধ্যে হৈ চৈ আরম্ভ করিয়াছে। ডাক্তারের উপদেশ মত, কেহ জল গরম করিতেছে—কেহ বা ঔষধপত্র ঠিক করিয়া রাখিতেছে; কাহারও একটু অবসর নাই।

শহর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়াছে। গোটা দুই নার্সও বাদ যায় নাই। নিলয় বিন্দুমাত্র কোথাও কোনও ত্রুটী করে নাই। আঁতুড়-ঘরের যাহা প্রয়োজন তাহা পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে।

আট দশ বছরের মেয়ে একটী দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া কহিল, 'নিলয় কাকা, আপনাকে ভেতরে ডাকছেন, চলুন।'

নিলয় মেয়েটির সহিত ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতেই মেয়েদের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন উঠিল। ডাক্তার বাবু আঁতুড় ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, নিলয়কে দেখিয়া বলিলেন, এদিকে আসুন নিলয় বাবু।

নিলয় ডাক্তার বাবুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তার বাবু কহিলেন, 'অনেক চেষ্টা করলাম নিলয় বাবু কিন্তু শিশুটিকে বাঁচাতে পারলাম না। জন্ম হবার পর মিনিট বেঁচেছিল। মানুষের উপর লোক অকারণে দোষ দেয়, কিন্তু এটা তারা বোঝে না যে, ভগবানের উপর কারও হাত নেই। প্রসূতির অবস্থাও খারাপ, কিন্তু বাঁচবে, ভয় নাই। এখন অজ্ঞান হয়ে আছে, ঘণ্টা দুই পরে জ্ঞান হবে। তাকে জানাবেন না যে, শিশুটি মারা গেছে। কারণ হার্টটা বড় দুর্ব্বল; হঠাৎ এ খবর পেলে খারাপ হতে পারে। আপনিও nervous হবেন না। পুরুষ মানুষ আপনি ধৈর্য্য ধরুন।'

এক নিঃশ্বাসে নিলয় সমস্ত কথা শুনিয়া গেল। একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না—তাহার বুকে যে কি হইতেছিল তাহা শুধু অন্তর্যামীই জানেন। নিলয় দুই হাতে বুক চাপিয়া সেইভাবেই সেইখানে বসিয়া পড়িল।

কে একজন বর্ষীয়সী বলিলেন, 'ছেলেটাকে নিলুকে একবার দেখাও।'

নার্স শিশুটিকে লইয়া আসিল। নিলয় চাহিয়া দেখিল, তাহার হৃদয় জুড়িয়া অব্যক্ত বেদনার একটা দীপ্ত তড়িৎশিখা খেলিয়া গেল, ওই সদ্যোজাত শিশুটির পানে চাহিয়া। কি সুন্দর ওই শিশুটি? কোনখানে কোনরূপ খুঁত নাই, কোনও রূপ আঘাত নাই—যেন এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুন্দর গৌরবর্ণ চেহারা, বেশ বলিষ্ঠ হইয়াছে। নিলয়ের ইচ্ছা হইল যে একবার নাড়া দিয়া দেখে বাঁচিয়া আছে কি না।

একটি স্ত্রীলোক কহিল, 'এর জন্য দুঃখ ক'রো না নিলু। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। তোমার মতই বা ভাগ্যবান কয়জন? ছেলের মুখ তো দেখলে, এতেই তুমি স্বর্গে যাবে।'

নিলয়ের বুক জুড়িয়া বেদনার একটা ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল।

দায়ীত্ব কাহার ?

"…ভারতবর্ষ যে জগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা একটু ভাবুকতার সহিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষের এই সর্ব্বোচ্চতা কাহার দান অথবা কাহার সংগঠনের ফল, তাহা চিন্তা করিতে বসিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, পরবর্ত্তী তান্ত্রিকগণ অথবা সন্ন্যাসীগণ, অথবা ভট্ট, আচার্য্য, মিশ্র প্রভৃতি বর্ত্তমানে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ভাষ্যকারগণ ভারতবর্ষের এতাদৃশ উন্নতি বিধান করেন নাই।

অভূতপূর্ব্ব অথবা বর্ত্তমান বুদ্ধির কল্পনাতীত ঐ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল ভারতীয় ঋষিগণের দ্বারা। ঐ উন্নতির বিকৃতি প্রথম সাধিত হইয়াছে তান্ত্রিকগণের হস্তে এবং ঐ বিকৃতির পূর্ণতা ঘটিয়াছে তথাকথিত সন্ন্যাসীর হস্তে। এই বার হাজার বৎসরের মধ্যেই আর একবার ভারতবর্ষ প্রায়শঃ বর্ত্তমান কালের মতই বিপন্ন হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে যেরূপ সার্ব্বজনীন উদরান্নের ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহা হয় নাই বটে, কিন্তু তখনকার ক্লেশের মাত্রাও খুব কম হয় নাই। তখন ভারতবর্ষকে অথবা জগৎকে আংশিক ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন বুদ্ধদেব। কি করিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়, তাহার কোন উপদেশ বুদ্ধদেবের কথায় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাঁহার কথাগুলি শ্রদ্ধার সহিত প্রতিপালিত হইলে, হয় ত ভারতবর্ষ বর্ত্তমান অন্নাভাবজনিত দুরবস্থায় উপনীত হইতে পারিত না, ইহা মনে করিবার কারণ আছে। ভট্ট, আচার্য্য, মিশ্র প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ তাঁহার কথাগুলি না বুঝিতে পারিয়া ঐ কথাগুলিকে বিকৃত করিয়া জনসাধারণের অবজ্ঞার বিষয় করিয়াছেন।…

জাগহি

—পল্লীচারণ

জাগো গো ভারত-রাণী
শুনাও আবার
সত্যের গীতি
মানব-ধর্ম্ম বাণী।

বিশ্বের "নব-সভ্য" কবলে
প্রতীচী গরিমা
যায় রসাতলে
তারে আজ পুনঃ
হোমের অনলে
প্রাণ দাও জননী।

চেয়ে দেখ দূরে
শুভ্র সাগরে
ওঠে নিতি নব ওঙ্কার
বেদের মন্ত্রে
ঋষির তন্ত্রে
ওঠে নব গীতি-ঝঙ্কার।

একদিন যেথা
নৈমিষ বনে
বসেছিল সামরব
পর্ণ-কুটীরে
জ্ঞান আহরণে
ছিল না কলরব॥

সেই সবে দলি,
যন্ত্র-দানব
মনু-সন্তানে
বাঁধিয়াছে মোহে
প্রকৃতির দ্বার
রুদ্ধ হইয়াছে
তামসীর কালো
কঙ্কাল দেহে।

দধীচীর তনু
ত্যাগের মহিমা
শুনিতাম নিতি
যে আশ্রমে
সেই ঋষিদের
বংশ-দীপিকা
নিভিছে নিয়ত
অচিন ভ্রমে।

বিজ্ঞান আর
বহে না কো জ্ঞান,
রচা মন্দিরে তার—
শিল্প-সাধক
বৃথা অভিমানে
ধ্বনিতেছে হাহাকার!

দুর্নীতি আজ
উল্কায়ে চলিছে
অত্যাচারীর রথে;
দিশি তাই
হেরি ব্যভিচার
নিয়ত জীবন-পথে

ডাক ভগীরথে
ভারতে বহাতে
পুণ্য লাবণি
স্রোতের ধারা
সন্তান-কূলে
কেন না অকূলে
বরণ করাতে
আঁধার কারা॥

আর বার তাই
মোহ-বাঁধ ছাড়ি
হোক প্রচারিত
জ্ঞানের নীতি।
লুটাক জগৎ
ও রাঙা চরণে
লভিবারে শুধু
অমর দ্যুতি॥

মরীচিকা

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

পাচিল-ঘেরা বাগান—তাহাতে ফুলের ছড়াছড়ি। তাহারই মধ্যে একখানি বাড়ী, দূর হইতে ছবির মত সুন্দর মনে হয়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। শুক্ল-পক্ষের রাত্রি, চারিদিক্ জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোয় ভাসিতেছে—পৃথিবী হাসিতেছে। বাগানে অজস্র ফুল—গোলাপ, বেল, রজনীগন্ধা। ওধারে শাক-ক্ষেত আর তরকারী-বাগানের বেড়ার ধারে ধারে হেনা ফুলের গাছ আর তাহারই পাশে স্বর্ণ-চম্পক ফুল ফুটিয়াছে অজস্র। হেনা ও চাঁপার গন্ধ, দক্ষিণের স্নিগ্ধ বাতাস আর জ্যোৎস্নার সহিত ভাসিয়া আসিতেছে। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ ও সুরভিত।

বাগানের মাঝে একখানা ঘর হইতে বেহালার সকরুণ সুর ভাসিয়া আসিতেছে। রাস্তায় চলিতে চলিতে, এই নির্জ্জন, নিস্তব্ধ শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায়, জ্যোৎস্না ও ফুলের সুগন্ধে সুরভিত স্থানে, এমন সুর উপেক্ষা করিয়া বোধ হয় কাহারও চলিবার উপায় থাকে না। পা নিজের অজ্ঞাতসারেই বন্ধ হইয়া যায়।

ঘর নিস্তব্ধ—শুধু মৃদু জ্যোৎস্নার আলোর মাঝে বেহালার সকরুণ সুর বাজিতেছে। হঠাৎ লণ্ঠনের রূঢ় আলোয়, ঘরের সমস্ত মাধুর্য্য যেন নষ্ট হইয়া গেল। যিনি বেহালা বাজাইতেছিলেন, তিনি চমকাইয়া কহিলেন,—"কে? ও তুমি—।" বেহালাটি নামাইয়া, সদানন্দ স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি—কিছু দরকার আছে?"

রেণুকার মুখ গম্ভীর— স্বর যেন আরও গম্ভীর এবং কঠিন—"দরকার আছে বৈ কি! ও বাড়ীর কালী ঠাকুরপো এসেছেন, জান তো। যাও দেখে এসগে—আর তার বৌ, কি বললে জান?"

সদানন্দ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"ব্যাপার কি? আর তার বৌ কি বললে?"

"সে অনেক কথা। তবে আমিও বলি, যে-লোক লেখাপড়া শিখে, গোটা তিন পাশ করে, এই গাঁয়ে চুপ করে বসে থাকে, তাকে লোকে ভাল বলে না।"

সদানন্দ হাসিলেন। সেই পুরাতন কথা। রেণুকার ধারণা, চাকরী না করিলে লোকে ভদ্রলোক হয় না। সদানন্দ বাবুর হাসি, রেণুকার লক্ষ্য এড়াইল না।

"কি যে হাস—গা জ্বালা করে। আমি কোন কথা শুনছিনে, কালী ঠাকুরপো তোমার চাকরি একরকম ঠিক করে এসেছেন। ওঁরই আফিসে লোক নিচ্ছে; এখন পঞ্চাশ টাকা করে দেবে, বুঝলে। আমি কিছুতেই এবার শুনছি নে, গাঁয়ের মধ্যে থেকে থেকে চাষা হয়ে যেতে পারব না। ছেলেদেরও ছোটলোক হ'তে দিতে পারব না।"

"তুমি বুঝছ না রেণু—"

হাত নাড়িয়া, ঝঙ্কার তুলিয়া, রেণুকা কহিল, "আমি সব বুঝি—এই ফন্দী যদি ছিল, কেন তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে? এখানে না একটা লোক—না ডাক্তার—না ভাল ইস্কুল। দেখগে, কালী ঠাকুরপোকে আর তার বৌকে। কলকাতায় চাকরী করছে, লোকজনের সঙ্গে মিশছে—থিয়েটার, সিনেমা কত কি নতুন নতুন জিনিষ দেখছে। এ পোড়া গাঁয়ে আছে কিছু? কি সুখ আছে এখানে বল তো? যদি তুমি না যাও—আমিই চলে যাব; এই কিন্তু বলে দিলাম।"

মৃদু হাসিয়া সদানন্দ বাবু বলিলেন, "তা মন্দ যুক্তি নয়। আমার মনে হয়, চাকরী আমার চেয়ে তুমিই বেশী পাবে—মানে সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র—"

"দাদা— ।" কালিদাস আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

"বল ঠাকুরপো—তোমার দাদাকে সব বুঝিয়ে বল।"

আসন গ্রহণ করিয়া, কালিদাস কহিল—"দাদা আমাদের একটা কাজ খালি রয়েছে। আমি বলি আমার সঙ্গেই চলুন। এখন গোটা পঞ্চাশ দেবে—পরে বাড়বে। এ-গাঁয়ে থেকে কি লাভ? বারমাস ম্যালেরিয়ার রোগ—না ডাক্তার—না একটা স্কুল। ছেলেদেরও মানুষ করতে হ'বে তো। চলুন পরশু দিনই যাওয়া যাক।"

সদানন্দবাবু বলিলেন, "চাকরী না করলে আমার কি ভাত হজম হ'বে না কানা ? চাকরী করার চেয়ে আমি এই বেশ আছি। তুমি তোমার বৌদিকে জিজ্ঞেস করে চাও, ওর কি খাওয়া-পরার কষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় না, তবে হাঁ থিয়েটার, সিনেমা, রেস্তোরাঁর সুবিধা এখানে নেই। বেশ তো ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। মাসখানেক পর এলেই হ'বে, ওঁর একটু চেঞ্জও হ'বে। আর ছেলেদের লেখাপড়া—তার জন্য আমার চিন্তা আছে, সে-ব্যবস্থার কোন ত্রুটি নেই।"

কালিদাস কহিল, "আমি সবই মানছি দাদা। মানছি, বেশ সুখেই আছেন। কিন্তু আপনি এত বড় শিক্ষিত হয়ে, এ গাঁয়ের চাষা-ভূষোদের সঙ্গে থেকে, ভবিষ্যতে বিশেষ যে নিজের লাভ হবে, মনে হয় না। আমার মনে হয়, এতে বিশেষ কিছু হবে না। এমনি ভাবে টুকটাক করে চিরকালই যাবে। কিন্তু ছেলেরা রয়েছে—ওদের ভবিষ্যৎ ভাবাও দরকার। আপনি শিক্ষিত লোক, কাজ করার যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে, আজ আফিসে পঞ্চাশ টাকায় ঢুকছেন বটে, কিন্তু দু'চার বছর পর আফিসের বড়বাবুও তো হ'তে পারেন, তখন মাসে মাসে তিন-চারশো টাকা হাতেও আসবে। চাই কি ভবিষ্যতে নিজের কারবারও খুলতে পারবেন। বাড়ী গাড়ী টাকা পয়সা, সমাজে মানসম্ভ্রম খ্যাতি সবই আপনিই আসবে। লোকে জানবে মানবে, সমাজের একটা স্তম্ভ হতে পারবেন। কিন্তু এচ ভাবে নিজের ক্ষমতাকে, নিজের শক্তিকে নষ্ট করা—আমার মতে ভবিষ্যৎ ভেবে এ সুযোগ হারান যুক্তিযুক্ত নয়। কি বলেন বৌ-ঠাকরুণ ?"

রেণুকা গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমার বলাবলি সব শেষ হয়েছে, ভাই। এখন তুমি তোমার দাদাকে বুঝিয়ে বল।" সদানন্দবাবু নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন।

"বুঝলেন দাদা—আপনি ভাল ভাবে চিন্তা করুন। সুযোগ জীবনে দু'বার আসে না। এটা আমার ধৃষ্টতা, কারণ আমি লেখাপড়ায়, শিক্ষায় দীক্ষায় আপনার পায়ের কড়ে আঙ্গুলের যোগ্য নই। আপনাকে উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না। আপনি আমার নমস্য, শ্রদ্ধার পাত্র। এ ছাড়া পিতু নিতু ওদের সম্বন্ধেও আপনার আমার কর্ত্তব্য রয়েছে। ওদের মানুষ করা প্রয়োজন, এখানে বিশেষ সুবিধে হ'বে না। কলকাতায় পাঁচটা দেখবে শুনবে, পাঁচটা ছেলের সঙ্গে মিশবে, লেখাপড়া করবে, তাতে ভবিষ্যতে ওদেরই ভাল। এ ছাড়া চাকরীটা যখন হওয়ার ষোল আনা আশা রয়েছে তখন আমার মনে হয়, আপনার এই কাজে 'জয়েন' করাই উচিত। এখানে আপনার কদর কে বুঝছে, কে জানছে বলুন দেখি ? তা ছাড়া চাষ-বাস করে ভবিষ্যতে এমন কিছু থাকবে বলে মনে হয় না—"

সদানন্দবাবু বলিলেন, "সবই সত্যি, কিন্তু এখানকার এই সব জমি-জমা কে দেখবে ?"

"তার জন্যে কি ভাবনা। পিসিমা রয়েছেন, গিরিধারী বহুকালের বিশ্বাসী লোক, ও থাকবে। এ ছাড়া দু-এক শনিবারে আসবেন।"

রাত হইয়াছিল, কালিদাস উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তবে আপনি চিন্তা করুন। আমি দু'একদিনের মধ্যেই যাব, যদি মত করেন,—আমার মনে হয় মত করাই ভাল। যা হোক তবে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

রেণুকা ও কালিদাস চলিয়া গেল। আবার সেই, শান্ত সুস্নিগ্ধ কোমল জ্যোৎস্নার আলোয় ঘর ভরিয়া গেল। দক্ষিণের ঠাণ্ডা বাতাসের সহিত ফুলের সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে, দূরে একটি নিশাচর পাখী ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করিতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, গাছে লতায় পাতায় জ্যোৎস্নার শুভ্র আলো মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। চারিদিক্ কি শান্ত, কি অপূর্ব্ব। উপরে নক্ষত্রখচিত নিস্তব্ধ আকাশ যেন ধ্যানে বসিয়াছে।

বেহালাখানি পড়িয়া রহিল, সদানন্দবাবু বারান্দায় পায়চারী করিতে লাগিলেন। উহারা আসিয়া ঘরের সমস্ত শান্তিকে ভাঙ্গিয়া, ইহার সমস্ত মাধুর্য্য যেন দস্যুর মত নির্ম্মম হস্তে লুণ্ঠন করিয়া পালাইয়া গিয়াছে।

ছেলেদের প্রতি কর্ত্তব্য, উহাদের ভবিষ্যৎ, নিজের মান-সম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি ? সংসারে সমাজে দশজনের একজন হওয়া যাইবে। সত্যই কে এখানে আমায় চেনে, কে আমায় জানে ! এই অজ পাড়াগাঁয়ে চাষাভুষোর সঙ্গে বসবাস করিয়া কি লাভ আছে ? অখ্যাত, অবজ্ঞাত অবস্থায়, বনবাসের মত রহিয়া ভবিষ্যতে কি কোন বৃহৎ লাভ হইবে ?

এই সহজ সরল জীবন ! গোলা-ভরা ধান,

গোয়াল-ভরা গরু, নিজের ক্ষেত-খামার, বাগান পুকুর। পল্লীর নিস্তব্ধ অপরূপ শ্রী। প্রতি ঋতুতে ঋতুতে, নব নব শস্যের অঙ্কুরস্থ শাস্ত্য-সম্ভার—এ-সব ছাড়িয়া, এই ছায়া-মাখা গ্রাম্য পথ, আমবাগান, পুষ্করিণী, সহজ জীবন, পাখীর কাকলী এসব ছাড়িয়া কোথায় যাইব! না—না এই ভাল।

কিন্তু টাকা চাই—টাকা। একটা আফিসের বড়বাবু—দুদিন পর নিজেই আফিস খুলিব। অজস্র টাকা আসিবে—বাড়ী—গাড়ী—রেডিও—সিনেমা—নিত্য নূতন থিয়েটার—সেও মন্দ নয়—সে এক নূতন জীবন—নূতন নূতন দৃশ্য-পট আসিবে যাইবে। দিন দিন কত নূতন আবিষ্কার হইতেছে-বিজ্ঞান জয়যাত্রা করিয়াছে—মানুষের সভ্যতা অগ্রসর হইতেছে। সেই ফেন-সঙ্কুল দুর্নিবার জীবনের খরস্রোতের পিছনে থাকার অর্থই মৃত্যু। এ জীবনে উত্তাপ নাই—কর্ম্ম-মুখরতা নাই—চাঞ্চল্য নাই—তরঙ্গ নাই। এই নিস্তরঙ্গ, প্রভাহীন, নিঃশব্দ, উত্তাপবিহীন জীবন, এ মৃত্যুরই নামান্তর।

সদানন্দবাবু ঘাড় হেঁট করিয়া পাইচারী করিতে লাগিলেন।

লোভের হইল জয়। বড় হইবার পিপাসা আর সুবর্ণ হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। সদানন্দবাবু অগ্রসর হইলেন। ভবিষ্যতের গর্ভে তাঁহারই জন্ম যেন অসংখ্য রত্নরাজি মান-সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি অপেক্ষা করিতেছে। লোভ এবং আশা, দূর হইতে হাতছানি দিতেছে—তাহার আকর্ষণ এড়ান কঠিন। তবুও, সদানন্দবাবু একবার পিছনের দিকে চাহিলেন। সেই গোলাভরা ধান—গোয়ালভরা গরু নিজের হাতে লাগান সুন্দর শাক-ক্ষেত—কলাবাগান—ফুলের গাছগুলি। সবই যেন নিঃশব্দে বলিতেছে—আয় ফিরে আয়—

ছেলেগুলি শহরে থাকিবার আনন্দে,—থিয়েটার—বায়স্কোপ—ট্রাম—বাস প্রভৃতি দেখিবার আনন্দে, গাড়ীর মধ্যে কলরব লাগাইয়াছে। কালিদাসের সহিত সদানন্দবাবু গাড়ীর পিছনে পিছনে চলিতেছেন। পথের বাঁকে, গাড়ী অদৃশ্য হইতেই, আর একবার পিছন ফিরিয়া, নিজের বাড়ি-খানির দিকে চাহিয়া, কালিদাস ও রেণুকার অজ্ঞাতে চোখ মুছিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। গাড়ী ধূলা উড়াইয়া চলিতে লাগিল।

*

ইহার পর দীর্ঘ সময় চলিয়া গিয়াছে—প্রায় বার বৎসর। সদানন্দবাবু মাঝে মাঝে দেশে আসিতেন—জমি-জমা দেখিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ শহরের নিত্য নূতন আকর্ষণে, জনতার কলরোলে—আফিসের কাজের চাপে দেশের প্রতি আকর্ষণও যেন কমিয়া গেল।

বুঝি এইরূপই হয়—চোখের বাহিরে দূরে দূরে অতি প্রিয়জন থাকিলেও ক্রমশঃ তাহার স্মৃতি যেন ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া আসে। তাই শহরের নব নব রূপের আকর্ষণে—নিত্য সাহচর্য্যে তাঁহার মনের আকাশ হইতে একটি পল্লীগ্রামের বাঁশবন, ক্ষেতখামার, পল্লীপথ, নিস্তব্ধ সন্ধ্যা, ধূসর গোধূলী ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসিল। শহরের কৃত্রিম জৌলুসভরা রূপলাবণ্য, উগ্র মদিরার মত তাঁহার নয়নে রঙিন আলোর অঞ্জন মাখাইয়া দিল। তারপর কবে যে, একখানি গ্রামের স্মৃতি লুপ্ত হইয়া গেল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না।

ছেলেগুলি বড় হইয়াছে, কিন্তু মানুষ হয় নাই। রেণুকা ভুলিয়াও গ্রামের কথা মুখে আনে না। সদানন্দবাবু, মাসের শেষে যে মাহিনা পান, তাহা সমস্তই রেণুকার হাতে তুলিয়া দেন, সংসার চালাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে রেণুকার সখ ও সৌখীনী বিলাস মেটে। নিত্য সিনেমা, থিয়েটার লাগিয়াই আছে। রেণুকার যেন নেশা লাগিয়াছে, এই দীর্ঘ-কাল কলিকাতার রূপ আকণ্ঠ পান করিয়াও যেন উহার তৃষ্ণা মেটে না। আরও চাই, আরও—। কিন্তু রেণুকার মুখ সব সময়েই ভারী হইয়া থাকে। কালা-ঠাকুরপোর বাড়ীতে রেডিও বসিয়াছে, তাহাদের কেন নাই? উহার বৌ নিত্য নূতন ফ্যাশানের গহনা, নূতন ডিজাইনের জামা-কাপড় পরিতেছে, কিন্তু তাহারই বা কেন হইতেছে?

এই অনুযোগ সদানন্দবাবু প্রত্যহই শোনেন, কথা বলেন না। মাঝে মাঝে ঝগড়া হইত, মান অভিমান এবং কথা বন্ধ হইত। রেণুকা রাগ করিয়া খুড়তুতো বোনের বাড়ী চলিয়া যাইত। অবশেষে সদানন্দবাবু যাইয়া সাধাসাধনা করিয়া রেণুকাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিতেন। এইরূপে দীর্ঘ বার বৎসর চলিয়া গেল।

সদানন্দবাবুর বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই, সামান্য কিছু মাহিনা বাড়িয়াছে মাত্র। নিজের অফিস, কারবার, বাড়ী,

গাড়ী বা সমাজে মান-সম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিছুই হয় নাই। এমন কি বড়বাবুর পদও পান নাই। কালিদাস এখন অফিসের বড়বাবু। প্রকৃতি নিষ্ঠুর ভাবে সদানন্দবাবুর কল্পনার মায়াজাল ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

সদানন্দবাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল, কিন্তু তিনি যে, কলিকাতায় চাকরী করিতেছেন, ইহা জানিতাম না। বহুদিন মনে হইয়াছে সদানন্দবাবুর খোঁজ করি। একদিন সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নাভরা রাতে তাঁহার বেহালা শুনিয়াছিলাম। সে-স্মৃতি, সে-সুর আজও ভুলি নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার হাতের বাজনা শুনিবার বাসনা হইত, কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাটে সময় করিতে পারিতাম না। নিজের এই দুঃখভরা কেরাণী-জীবন লইয়া যখন হাঁপাইয়া উঠিতাম, তখন তাঁহার দেশের কথা মনে ভাসিয়া উঠিত। ছায়াস্নিগ্ধ পল্লীপথ, সুরভি বাতাস, উন্মুক্ত মাঠ-ঘাট সব আসিয়া মনের মাঝে ভিড় করিয়া দাঁড়াইত।

শহরের জন-কোলাহলের মাঝে বিষাক্ত বাতাসের নিশ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে নিজের শীর্ণ দেহের দিকে তাকাইয়া মনে হইত, যদি আজ পল্লীগ্রামের উদার উন্মুক্ত হাওয়ায় থাকিতাম, চাষবাস করিয়া সহজ সরল জীবনের মাঝে কাটাইতাম, হয় তো আরও কিছুদিন বাঁচিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা আর হইবার উপায় নাই; মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাধ্য হইয়া চুপ করিয়া থাকিতাম।

সেদিন রবিবার ছিল। এক আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছায় শ্যামবাজার গিয়াছিলাম। বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। ছাতাটা মাথায় দিয়া, একটী সরু পচা গলির মধ্য দিয়া সদর রাস্তায় আসিতেছিলাম। হঠাৎ একটী যুবক পিছন হইতে আসিয়া কহিল, "বাবা ডাকছেন—"

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "বাবা! কে ডাকছেন?"

যুবকটী হাত দিয়া মাথার সম্মুখের লম্বা লম্বা চুলগুলি অতি কায়দায় পিছনে ঠেলিয়া কহিল, "বাবা—মানে সদানন্দ বাবু—ঐ কানগোপার।"

"অ্যাঃ সদা-দা, এখানে না কি?" এই বলিয়া, তাহার পিছনে পিছনে, বাড়ীতে ঢুকিলাম। বাহিরের ঘরে, তক্তপোষের উপর জীর্ণ মলিন বিছানায় যিনি শুইয়া ছিলেন তাঁহার বয়স অনুমান করা শক্ত, হয়তো ভদ্রলোকের বয়স খুব বেশী নয়, কিন্তু কপালের শিরা, চোখের কোটর, সবগুলির দিকে, লক্ষ্য করিলে, মনে হয়, অকালবার্দ্ধক্য সকল দিক্ হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। কাঁচা-পাকা একমুখ দাড়ি মুখখানায় একটা বিশ্রী গাম্ভীর্য্য আনিয়া দিয়াছে। সদানন্দবাবুকে, বহুবার দেখিয়াছি বলিয়াই, চিনিতে পারিলাম। কিন্তু যাহারা পূর্ব্বে মাত্র একবার সদানন্দ বাবুকে দেখিয়াছে, তাহাদের পক্ষে চেনা সত্যই দুষ্কর।

কহিলাম, "এ কি সদা-দা, এরকম কেন? আর এখানেই বা কেন?"

"সব বলছি", এই বলিয়া হাঁকিলেন, "পিতু ওরে পিতু, নাঃ লক্ষ্মীছাড়া আবার বেরিয়েছে, হতভাগা শূয়োর পশু কোথাকার। দিন-রাত গিলবে, আর বিড়ি সিগারেট টেনে আড্ডা দেবে। একদণ্ড যদি বাড়ীতে থাকে।"

কাশির ধমকে তাঁহার কথা শেষ হইল না। একটু দম লইয়া কহিলেন, "কেমন আছ ভাই, বেশ ভাল তো। কাজকর্ম্ম করছ? বেশ বেশ··· ?"

"···তারপর,—আমার কথা আর বলো না, এই তিন মাস থেকে বিছানায় পড়ে হাঁপানি হয়েছে, কি যে কষ্ট তা আর কি বলব। এর উপর বেটারা মাইনে বন্ধ করে দিয়েছে, এতদিন কাজ করলাম সব ভুলে গেল।"

বলিলাম, "আপনি এখানেই তবে চাকরী করছেন? কিন্তু কেন?—দেশের বাড়ী ঘর বাগান বাগিচা সে-সব?"

হঠাৎ তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, "সে-সব কিছু নেই রে ভাই, কিছু নেই। চাষ-বাস বাগান সব গেছে, বাড়ী-ঘর এখন ইঁটের ঢিবি। সেই সব ছেড়ে ছুড়ে ওদের কথায়—আর তখন নিজেরও লোভ হ'ল, চাকরী করতে চলে এলাম—এসে এই পরিণাম। কি না ছিল? সবই ছিল। জমি-জায়গা, গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, বাগান-পুকুর সবই ছিল। তখন কি স্বাস্থ্য ছিল দেখেছ তো? সন্ধ্যেবেলায় ঘরখানিতে বসে বেহালা বাজাতাম—রাত্রে নানা পড়াশুনা করতাম। আমার সবই ছিল—আজ পথের ভিখারীর মত মরতে বসেছি, উঃ জীবনে কি বিষম ভুলই না করেছি! সব রাক্ষসের দল—লোভ দেখিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করলে। ঐ কালিদাসই মূল। সে লোভ দেখালে গাড়ী-বাড়ী, মোটা



আগামী রণের তরে প্রস্তুতির লাগি।
ছায়ারে দেখায় ঘুঁষি সারা রাত্রি জাগি॥

চাকরী, মান-সম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, কিন্তু এখন দেখছি সবই ভুয়ো, সবই মিথ্যে। কালিদাস এখন আফিসের বড়বাবু, বুঝলে ভাই।"

সদানন্দবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিলেন।

"লোভ রে ভাই—খালি লোভ। টাকার লোভ, সোনার লোভ, নামের লোভ, এ লোভ আমি সামলাতে পারলাম না। এই পঞ্চাশ টাকার মাহিনায়, আমার সোণার দেশ ছাড়লাম—এক এক করে বার বৎসর চলে গেল—কিন্তু কোন আশাই পূর্ণ হ'ল না—চারদিক দিয়ে, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। ছেলে দুটোকে দেখলে তো—একের নম্বরের হয়েছে হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়ার দল সব—। বুঝবে, রক্তের গরম ঠাণ্ডা হলেই মালুম পাবে—"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব! আমার চক্ষের সম্মুখে, একখানি গ্রামের ছবি ভাসিয়া উঠিল। সেখানকার নদীঘাট, বনপথ, ছায়াসুনিবিড় গ্রামপ্রান্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একখানি বাগান-ঘেরা বাড়ী, গোয়াল-ভরা গরু, ধান-ক্ষেত পাট-ক্ষেত সবই যেন সুস্পষ্টভাবে, দেখিতে লাগিলাম। আর এই সদানন্দবাবু! অসুরের মত সুন্দর স্বাস্থ্য, শিশুর মত সরল সদাহাস্যময়, সন্ধ্যার সময় বেহালা বাজাইতেন, আজ সবই যেন মনে হইতেছে-স্বপ্ন।

এই তো সে-দিনের কথা! কিন্তু আজ, তাঁর ভাগ্যের কি নির্দয় পরিহাস! সোণার লক্ষ্মীকে কাচের লোভে ঠেলিয়া, আজ এ কি করুণ পরিণতি। সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সব আশা, সমস্ত রঙীন স্বপ্ন আতসবাজীর মত মহাশূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার জন্য কে দায়ী? বাঙালীর ছেলের, দুর্নিবার চাকরীর লোভ কি এমনি ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাইয়া, ঘর ছাড়াইয়া আলেয়ার মিথ্যা মরীচিকা সৃষ্টি করিতেছে না?

আমি সদানন্দবাবুর মৃতপ্রায় কঙ্কালসার দেহের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আমাদের পরিণাম কি?

শ্রমিক

—শ্রীহলধর মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যা যবে নেমে আসে অগ্রাণের মুক্তাকাশ হ'তে,
কে তখন চমকিয়া চলে ওই কুটীরের পথে—
দিবা ক্লান্ত আত্মহারা মেঘ ঢাকা চরণের মাঝে?
ওদের ডাকিয়া নাও, অবসন্ন তন্দ্রালুতা সাঝে!
ওদের তুলিয়া নাও তোমাদের আপনার ঘরে,
ওদের প্রদীপ ধর, জীবনের ঘোর অন্ধকারে!
ভিত্তি ওরা তোমাদের হাস্যমাখা উচ্চ ধরণীর,
উঁহাদেরি রক্ত-রেখা রচিয়াছে তব পুণ্যতীর!
ওরে কেন কর ঘৃণা? কেন কর তুচ্ছ হেয় জ্ঞান?
উঁহাদেরি রক্ত-ধারা, তোমাদের সকলের প্রাণ!
আলো দাও, জ্ঞান দাও, শক্তিহীন অন্ধকার প্রাণে,
কর পুণ্য পূজা ওই মহামন্ত্র মিলনের গানে।

যশোহর-পরিচিতি

—শ্রীসুশীলকুমার বসু

নদীর ব্যবস্থা

ইতিহাস ও বিবরণ : যশোহর গাঙ্গেয় ব'-দ্বীপের নিম্নাংশের অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই অংশের নদী-ব্যবস্থার উল্লেখ না করিয়া যশোহরের নদী-ব্যবস্থার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে। পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকের পথে ব'-দ্বীপের এই অংশে চারিটি বৃহৎ নদী গঙ্গা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাদের নাম হইতেছে ভাগীরথী, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা ও গৌরী, গোরাই বা গড়ই। গড়ই নিম্নদিকে মধুমতী নামে খ্যাত হইয়াছে।

শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট এই নদীচতুষ্টয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ও গতিপথের ইতিহাসের সহিত সমগ্র নিম্নগাঙ্গেয় ব'-দ্বীপের উত্থান, পতন ও সমৃদ্ধির ইতিহাস বিজড়িত। এই নদীগুলির দুর্দ্দশা ও মৃতাবস্থাই যশোহরের সর্ব্ববিধ দুর্দ্দশার প্রধানতম কারণ। অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানি, সংখ্যাহ্রাস, ভূমির উর্ব্বরাশক্তির বর্দ্ধমান ক্ষীণতা, সর্ব্বব্যাপী দারিদ্র্য একদা প্রবহমান জলরাশির অভাবেই ঘটিয়াছে। ভৈরব, নবগঙ্গা, চিত্রা, ফটকী, বেগু, ভদ্রা, হরিহর, বেতনা, নওভাঙ্গা, মুক্তিশ্বরী, কপোতাক্ষ, বারাসিয়া, কুমার প্রভৃতি নদীতীরের ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত, জঙ্গলাকীর্ণ, জনশূন্য এবং অনেক ক্ষেত্রে জনহীন পল্লীগুলি ইহার সত্যতার প্রমাণ দিতেছে। এই-সকল নদীর স্রোত মজিয়া দেশময় বদ্ধ জলার সৃষ্টি হইয়াছে, জলনিষ্কাশনের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হওয়ায় দেশের অভ্যন্তর ভাগেও ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু জলার সৃষ্টি হইয়াছে। ভূমির উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাওয়ায় এবং দেশ ক্রমে জনহীন হইয়া পড়ায় বহুস্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ফলে অনুকূল উৎপত্তিস্থান ও আশ্রয়স্থল পাইয়া মশককুলের অসম্ভব বংশ-বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাদের হাত হইতে অধিবাসীদের আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই। প্রতিষেধক হিসাবে কুইনাইনের ব্যবহার অথবা আত্মরক্ষার জন্য মশারির ব্যবহার উপদেশ হিসাবে মন্দ নহে। তবে, যাঁহাদের এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন যে, নদীগুলির উদ্ধার-সাধন ব্যতীত এ সমস্যা সমাধানের উপায়ান্তর নাই। নদীগুলির বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনাত্মক সংস্কার-সমস্যার আলোচনা করা হইবে।

এই নদীচতুষ্টয়ের ঐতিহাসিক বিবরণ Report of the Drainage Committee, Bengal, 1907 হইতে উদ্ধৃত হইল :—

"ধমনীর ন্যায় এই জলপথ চারিটি উত্তর হইতে দক্ষিণে সমস্ত ভূভাগে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। গঙ্গার জলরাশির যে অংশ পদ্মা দিয়া গোয়ালন্দ অভিমুখে না যায়, তাহা এই পথ দিয়াই প্রবাহিত হয়। এই ধমনী-চতুষ্টয়ের মধ্যভাগে আরও বহু স্রোতস্বতী জলপ্রবাহ বহন করিতেছে। ইহারা সাধারণতঃ উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে (যদিও যশোহরের পূর্ব্বপ্রান্তে এই গতিপথ বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গিয়াছে) এবং বহুমুখে স্বতন্ত্রভাবে খালের জাল সৃষ্টি করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে। এই সকল সংযোগ-পথের মধ্য দিয়াই গঙ্গার জল সমগ্র ব'-দ্বীপে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে এবং দেশকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে, অথবা এখনও এই উন্নয়ন-কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। পশ্চিমাংশে এই কার্য্য অল্পবিস্তর সম্পন্ন হইয়াছে; পূর্ব্বাংশে এই কার্য্য এখনও চলিতেছে এবং মধ্য অংশে ক্রমশঃ ইহা শেষ হইয়া আসিতেছে। পশ্চিমে মাথাভাঙ্গা এবং পূর্ব্বে মধুমতী এই ভূভাগের মধ্যেই মৃত নদীগুলি অবস্থিত। এখানে কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা, ভৈরব এবং ইছামতী মাথাভাঙ্গার শাখাস্বরূপ থাকিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বগামী হইয়াছে এবং অবশেষে (এক ইছামতী ব্যতীত) নীচের দিকে গড়ই ও মধুমতীর জলের সহিত মিলিত হইয়াছে। গড়ই ও মধুমতীর জল উত্তর-পূর্ব্ব হইতে নানা খাতে প্রবাহিত হইয়া নদীস্রোতকে দক্ষিণাভিমুখী অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী করিয়াছে। কুমার, নবগঙ্গা এবং ভৈরবের মধ্যে বহুসংখ্যক নদী-সংযোগের জাল রচনা করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে চিত্রা, বেগু, ফটকী, কপোতাক্ষ, হরিহর এবং ভদ্রা সমধিক প্রসিদ্ধ।

কাজেই, এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, সংযোগকারী নদীগুলির জীবন, যে নদীগুলিকে ধমনী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহাদের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। এই নদীগুলি যদি মরিয়া যায়, তবে তাহাদের শাখাসমূহকে অংশতই সমভাগের অধিকারী হইতে হইবে। কিন্তু ব-দ্বীপের সমগ্র ইতিহাসই হইতেছে, গঙ্গার ক্রমিক পূর্ব্বাভিমুখী গতি। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে যখন মূল নদী এতদিন যে খাতে প্রবাহিত হইত, সেই ভাগীরথী ত্যাগ করিয়া একবারে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিল, তখন সম্ভবতঃ কালক্রমে ইহা জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, কুমার এবং গড়ুই-এর মধ্য দিয়াই ইহার প্রধান পথ করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু ইহা পূর্ব্বাভিমুখে ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল এবং পশ্চিমের খাতগুলি ক্ষীণ ও মৃতপ্রায় হইতে লাগিল। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ১৮১০ হইতে ১৮৩০ সালের মধ্যে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ব্রহ্মপুত্রের স্রোত এতদিন মধুপুরের জঙ্গলের পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত হইত। এই স্রোত পশ্চিমাভিমুখী হইয়া গঙ্গার স্রোতকে বাধা দিল এবং ইহাকে পশ্চিমের পুরাতন খাতে ফিরাইয়া আনিবে—এমন সম্ভাবনা দেখা গেল। অবশ্য এই অবস্থান্তর পুরাপুরি সংঘটিত হইল না, কিন্তু ইহার ফলে গড়ুই বৰ্দ্ধিতায়তন হইল, পূর্ব্বের একটা তুচ্ছ খাল হইতে মধুমতীর উৎপত্তি হইল এবং যশোহরের পূর্ব্বাঞ্চলে জলস্রোতের পথ পূর্ব্ববর্ণনানুযায়ী দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পরিবর্ত্তিত হইল। শেষের এই একটি মাত্র ব্যতিক্রম ব্যতীত গঙ্গার পূর্ব্বাভিমুখী গতি সম্পর্কে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। প্রধান স্রোতের এই পূর্ব্বমুখী গতির ফলে দক্ষিণ হইতে যে সকল নদী বাহির হইয়াছিল, তাহার আয়তনের ক্ষীণতাপ্রাপ্ত রহিল। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি এই হইল যে, এই নদী-চতুষ্টয়ের উপর নির্ভরশীল নদীগুলি ধ্বংসের দিকে গেল।"

জেলার পূর্ব্বতম প্রান্তে গড়ুই এখনও গঙ্গার সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। অন্যান্য যে-সকল নদী গঙ্গা হইতেই জলস্রোত গ্রহণ করিত, তাহাদের অধিকাংশই আর নদী নামের যোগ্য নাই। পলি জমিয়া ইহাদের খাতগুলি বৎসরের পর বৎসর অধিকতর ভরাট হইয়া যাইতেছে। ইহাদের জল আর তীরভূমি প্লাবিত না করিয়া খাতের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাদের ভূ-গঠন ক্ষমতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। ইহারা বর্ত্তমানে স্থানীয় জলনিষ্কাশনের খাল হইয়া আছে মাত্র। চারিপাশের উঁচু জমির মাটী বৃষ্টির জলে ধুইয়া আসিয়া এগুলি ক্রমেই ভরাট করিয়া ফেলিতেছে। জেলার উত্তরে ও পূর্ব্বে কয়েকটি নদী এখনও সম্পূর্ণ ভরাট হইয়া যায় নাই এবং জলজ উদ্ভিদের উৎপাত হইতেও এ পর্য্যন্ত মুক্ত রহিয়াছে। বৎসরের সকল সময়েই এগুলিতে জলপ্রবাহ থাকে। গড়ুই অথবা মধুমতী, কালীগঙ্গা অথবা বাণকানার অবস্থা এই প্রকারের। হালিফাক্স খালের জন্য শেষোক্ত দুইটির অবস্থার একটু উন্নতি দেখা গিয়াছিল। অন্যদিকে মুচিখালি ভরাট হইয়া যাওয়ায় নবগঙ্গা অথবা চিত্রায় গ্রীষ্মকালে জলপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। ইছামতী ব্যতীত পশ্চিম অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমের নদীগুলি হয় মরিয়া গিয়াছে অথবা মৃতপ্রায় হইয়াছে। জেলার এই অংশ দিয়া নবগঙ্গার ঊর্দ্ধাংশ, চিত্রা এবং ভৈরব প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার সকলগুলিই ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইহারা ক্ষীণকায় বদ্ধ জলায় পরিণত হয়।

এই প্রসঙ্গে ১৮৮২ সালের Nadia Fever Commission-এর বিবরণ পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করিবে :—

"এই অঞ্চলে কপোতাক্ষ, ভৈরব, নবগঙ্গা ও চিত্রা প্রভৃতি অনেকগুলি মৃত নদী রহিয়াছে—পূর্ব্বে ইহার সকলগুলিই বৃহদায়তনের ছিল। এইগুলিকে উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারিলে যশোহর ও নদীয়ার গ্রামবাসীদের যে উপকার হইত, সে কথা আমাদিগকে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে এবং আমরাও তাহার সত্যতা সম্পূর্ণ স্বীকার করি। যাহা হউক, আমাদের মতে এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নহে। মিঃ জে. ফাগুসন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের পরিবর্ত্তন সম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, এই সকল মৃত নদীর পরিবর্ত্তন কি ভাবে সংঘটিত হয়, এবং কেনই বা পুরাতন পথ ত্যাগ করিয়া নদী নূতন পথে প্রবাহিত হয়। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, ৩৯-ইঞ্চি দোলককে দুই সেকেণ্ডে আপনা হইতে একবার আন্দোলিত করাইতে পারা যেমন অসম্ভব, তেমনি প্রকৃতির এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাও অসম্ভব। যন্ত্রের সাহায্যে কিছু সময়ের জন্য ইহাকে এই কার্য্যে বাধ্য করা

যাইতে পারে বটে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে চাপ অপসারিত করা হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই ইহা স্বাভাবিকভাবে আঘাত করিতে থাকিবে। * এই নদীগুলি সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। এই সকল নদীর কার্য্য হইতেছে পলি জমাইয়া ব'-দ্বীপকে উন্নত করিয়া তোলা ; এই কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নদী একটা নির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয় এবং এই কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, হয় ইহা গতিপথ পরিবর্ত্তন করে, না হয় মরিয়া যায় এবং তাহার স্থলে অন্যত্র নূতন নদীর উদ্ভব হয়। নানাবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্যকারিতাকে কিছু সময়ের জন্য ঠেকাইয়া রাখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অবশেষে প্রকৃতিই জয়লাভ করে। যে নদীগুলির কথা উক্ত হইয়াছে সেগুলি পূর্ব্বেই মরিয়া গিয়াছে ; ইহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করা কার্য্যতঃ অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তনের কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"নদী নির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হইয়া ক্রমশঃ নিজ তল-দেশকে এবং চতুঃপার্শ্বস্থ দেশকে ব'-দ্বীপের অন্যান্য অংশের ন্যায় অথবা তদপেক্ষা অধিক উচ্চ করিয়া তুলে। এই সময় একটি অথবা দুইটি ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। হয় নদী তীরভূমি অতিক্রম করিয়া দেশের কোন নিম্নাংশকে প্লাবিত করিয়া উন্নত করিয়া তুলিবার কার্য্যে নিযুক্ত হয় অথবা যদি ব'-দ্বীপের এই অংশের গঠন-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া গিয়া থাকে, তবে নদী ক্রমশঃ নিজ সঞ্চিত পলির দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যায় এবং ব'-দ্বীপের নিম্ন অন্য কোন অঞ্চলে, যেখানে ভূ-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, সেখানে নূতন নদীর সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বকথিত নদী-গুলি শেষোক্ত পথই অবলম্বন করিয়াছে। নদীয়া এবং যশোহরের পশ্চিমাংশে ব'-দ্বীপের গঠন ও উন্নয়ন সমাধা হইয়া গিয়াছে এবং ক্রমিক পলি সঞ্চয়ের ফলে যে জলপথ পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত ছিল, পলি সঞ্চয়ের ফলে এখন তাহা উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে। অন্য কথায়, ভৈরব, কপোতাক্ষ, নবগঙ্গা ও চিত্রার দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইবার ছিল, তাহা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং নদীগুলিও মরিয়া গিয়াছে।"

মৃত নদীসমূহের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে এই মত যুক্তিসহ হউক বা না হউক, ইহাদের ধ্বংস সম্পর্কে কমিশনের এই কারণ ও ইতিহাস নির্দ্দেশ প্রণিধানযোগ্য।

যশোহরের নদীসমূহের বিবরণ :

মধুমতী বা গড়ই :

যশোহরের নদীগুলির মধ্যে মধুমতী বৃহত্তম। কুষ্টিয়ার নিকটে পদ্মা হইতে বাহির হইয়া নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া ইহা যশোহরে প্রবেশ করিয়াছে এবং কুমার হ্রদের সহিত মিশিবা পরে ইহার শাখা বারাসিয়া দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে। ঝিনাইদহ ও মাগুরার সীমারেখা দিয়া ইহার উপরের অংশ প্রবাহিত হইয়াছে এবং গড়ই বা গৌরী নামে অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে নবগঙ্গা গড়ই'তে পতিত হইত, তাহার নিম্ন হইতে নদী মধুমতী নামে অভিহিত হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে উত্তরে মহম্মদপুর পর্য্যন্ত নদীকে মধুমতী বলা হয়। এখন যেখানে কুমার গড়ই'তে পতিত হয়, পূর্ব্বে সেখানে গড়ই মধুমতীতে পতিত হইত—গড়ই তখন দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী খাল মাত্র ছিল। আরও একটু নিম্নে আসিয়া পুরাতন কুমার হইতে বারাসিয়া নামে একটি শাখা বাহির হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় এবং কুমার ফরিদপুর উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গার দিকে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। যখন কুমারের মূলদেশে পলি সঞ্চিত হইয়া জলপথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া উঠিল, তখন গঙ্গার জলস্রোত ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে 'গড়ই'এর পথে নির্গত হইতে লাগিল। এইরূপে গড়ই ক্রমে কুমারকে গ্রাস করিয়া লইল। গড়ই পূর্ব্বে বারাসিয়ার মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইত। কিন্তু বারাসিয়া অত্যন্ত ক্ষীণকায় ছিল বলিয়া গঙ্গার এই বর্দ্ধিত জলরাশি বহন করিবার শক্তি ছিল না এবং এলাংখালি নামক নূতন খালপথে এই জলরাশি নূতন পথ করিয়া লইল। এই বারাসিয়া এবং এলাংখালি মুকিমপুর পরগণার নিকট মিলিত হইয়া সম্মেলন উপস্থিত করে বিস্তৃত নদীতে পরিণত হইল এবং মধুমতী নাম গ্রহণ করিল। অনেকদূর আসিয়া মাণিকদহের নিকট আঠারবাঁকী শাখা বাহির হইয়াছে এবং খুলনা জেলার পূর্ব্ব সীমায় প্রবেশ করিয়াছে। লোহাগড়া-ভাটার সীমার মধ্যে পড়িয়া ইহার আয়তন ও শক্তি অনেক

* পরে দেখা গিয়াছে এই মত যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত নহে। লেখক



"রোজা মরে সাপের বিষে"

বাড়িয়া গিয়াছে এবং মধুমতী বলেশ্বর নাম গ্রহণ করিয়াছে। কচুয়ার নিকটে ভৈরব আসিয়া বলেশ্বরে মিশিয়াছে এবং সমুদ্রের পথে আরও বহু জলস্রোতে পুষ্ট হইয়াছে। হরিণা-ঘাটার মোহানায় বঙ্গোপসাগরে পতিত হইবার পূর্ব্বে ইহা সমুদ্রতুল্য বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে।

গঙ্গা যে সকল প্রধান পথে সাগরে পতিত হইয়াছে, মধুমতী তাহার অন্যতম। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রারম্ভেই মাত্র ইহা এতটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। রেনেল সাহেবের মানচিত্রে দেখা যায় যে, কুমার নদ বর্ত্তমান নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুরের উত্তরাংশ দিয়া ফরিদপুরের অপর-পারে গঙ্গার সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহম্মদপুর অঞ্চলে যে প্লাবন ঘটিয়াছিল, তাহার দ্বারা স্পষ্টতঃ এই পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসরের প্রলয়ঙ্করী বন্যার পর জল-বহনের উপযুক্ত খাতের সৃষ্টি হইল এবং জলপ্রবাহ নিয়মিত পথে চলিতে লাগিল। এইরূপ ভয়াবহ বন্যা প্রায় শতাব্দী কাল ধরিয়া আর হয় নাই। গত দুই বৎসরের প্রবল বন্যার দ্বারা নূতন পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাইতেছে কি না, তাহা বিশেষজ্ঞেরাই বলিতে পারেন। কুমার, ভৈরব, কপোতাক্ষ, ভদ্রা প্রভৃতি নদীর পথ অনুযায়ী পরগণাগুলির সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু, গড়ই ও মধুমতী নদী নলদী, নসরত-সাহী, সাতোর, মুকীমপুর, সুলতানপুর, সলিমাবাদ প্রভৃতি পরগণার মধ্য ভেদ করিয়া গিয়াছে, ইহাদের উৎপত্তি যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ইহাও তাহার অন্যতম প্রমাণ।

প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে এমন সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল যে, গড়ই আরও অধিক বিস্তৃত হইবে। ১৮৫৭ সালে ক্যাপ্টেন সেরউইন মন্তব্য করিয়াছিলেন :

"গড়ই প্রতি বৎসরেই অধিকতর বিস্তৃত হইতেছে এবং ইহার ভীষণ স্রোত দ্রুত ইহার তীরভূমিকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে। এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে পদ্মার জলরাশির সব না হউক অধিকাংশই ইহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে।" পুনরায় মিঃ কার্ণ্ডসন ১৮৬৩ সালে মনে করিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ববর্ণিত কার্য্যের ফলে এমন সম্ভাবনা খুবই রহিয়াছে যে, গঙ্গা, গড়ই, কুমারের ঊর্দ্ধাংশ (মাথা-ভাঙ্গা) এবং চন্দনার (গড়ই-এর পূর্ব্ব) পথে প্রবাহিত হইবে। কিন্তু, পদ্মা উত্তরে সরিয়া যাইবার ফলে এই আশা সফল হয় নাই। গড়ই যেখান হইতে বাহির হইয়াছে, পদ্মা সরিয়া যাওয়ায় তাহার অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে এবং পদ্মায় জলের যোগান অনেক কমিয়া যায়। ফলে নদী উপরের দিকে মরিয়া যাইতেছে ; কুষ্টিয়ার নিকটে ইসটার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সেতুনির্ম্মাণ এই কার্য্যকে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। নদী এখন এতটা মরিয়া গিয়াছে যে, গ্রীষ্মকালে কুষ্টিয়া হইতে যশোহরের নরের-চাঁদ ঘাট হইতে খুলনায় যাতায়াতও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যশোহর জেলার মধ্যে গড়ই নদী গণেশপুর হইতে হরিপুর পর্য্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। দৈর্ঘ্য ২৮ মাইল। ইহার অন্যতম শাখা হবু নদীও উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত। ভাটবাড়িয়ার নিকট গড়ই হইতে বাহির হইয়া, মাগুরা মহকুমার অনেক সমৃদ্ধ গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা নিশ্চিন্তপুরের নিকটে পুনরায় গড়ইতে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫ মাইল। গ্রীষ্ম কালে ইহা প্রায় শুকাইয়া যায় এবং মাত্র বর্ষাকালে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করিতে পারে। বারাসিয়া নদী খালপাড়ায় মধুমতী হইতে বাহির হইয়া ভাটিয়াপাড়ায় পুনরায় মধুমতীতে মিশিয়াছে। ২৫ মাইল ধরিয়া ইহা উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। নভেম্বর মাসের পর খালপাড়া হইতে বাকুরপাশা পর্য্যন্ত ইহার খাত শুষ্ক বালুকারাশিতে পরিণত হয়।

হরিপুর হইতে গড়ই মধুমতী নাম গ্রহণ করিয়া সুন্দরবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত এবং ১৫২ মাইল দীর্ঘ।

কুমার বা পাঙ্গাশী

কুমার হইতেছে জেলার উত্তর প্রান্তের শেষ নদী। ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের আলমডাঙ্গার দশ মাইল উপরে মাথাভাঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া এবং কিছুদূর পর্য্যন্ত নদীয়ার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা যশোহরে প্রবেশ করিয়াছে। যশোহরে ইহা পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে এবং মুচিখালির দ্বারা মধুমতীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা নবগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং

নবগঙ্গা কর্তৃকই ইহার জলরাশি বাহিত হয়। ১৮২০ সাল পর্যন্তও মাথাভাঙ্গার পঞ্চ ষষ্ঠাংশ জল কুমারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। মাথাভাঙ্গার যাহাতে অনিষ্ট না হয়, এজন্য ১৮২০ হইতে ১৮২৮ সালের মধ্যে কুমারের মুখে বাধা সৃষ্টি করিয়া এবং নূতন খাল কাটিয়া মাথাভাঙ্গার জলরাশি যাহাতে কুমার ও পাঙ্গাশীর খাত পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। এই সকল চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। বোয়ালিয়ার মুখটি এখনও উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু এই পথে অতি সামান্য জলই প্রবাহিত হয় (শীতের শেষের দিকে ইহার পরিমাণ মাত্র ১½ ফুট)। মাত্র বর্ষা কালেই এই নদী দিয়া এখন বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু ৫০।৬০ বৎসর পূর্বেও ইহার অবস্থা অনুরূপ ছিল। ইহার মূলদেশ মাথাভাঙ্গার নিকটে ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং ইহার খাত বগাডাঙ্গা পর্যন্ত খুবই অগভীর হইয়া গিয়াছে এবং মধ্যে চড়া পড়িয়া গিয়াছে। নীচের দিকে আসিয়া কালীগঙ্গার মধ্য দিয়া গড়াই হইতে পূর্বে ইহা জলের যোগান পাইত, কিন্তু এই সংযোগও ভরাট হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে মাথাভাঙ্গার প্রবেশের জল এখনও এই খাত দিয়া বহিয়া যায়। কুমার ধুলিয়া হইতে কামুন্দী পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। বগাডাঙ্গা হইতে কামুন্দী পর্যন্ত ইহা মুচিখালি নামে অভিহিত। দৈর্ঘ্য ৫২ মাইল।

মুচিখালি পূর্বে ছোট বারাসিয়া বলিয়া পরিচিত ছিল। কুমার ও মধুমতীকে সংযুক্ত করিয়া ইহা রামনগর হইতে কামুন্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খালটির উত্তর প্রান্তে চর দেখা দিয়াছে এবং ইহার খাত বর্ষার পরেই শুকাইয়া যায়। যশোহর ও ফরিদপুরের মধ্যে পূর্বে ইহাই প্রধান সংযোগসূত্র ছিল, কিন্তু বর্তমানে নৌকা-চলাচল অসম্ভব হইয়া গিয়াছে। ১৮১৮ সালে অর্দ্ধলক্ষ টাকা খরচায় এই চর কাটিয়া দিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু সরকার কর্তৃক এই পরিকল্পনা গৃহীত হয় না।

নবগঙ্গা :

নবগঙ্গাও মাথাভাঙ্গা হইতে বাহির হইয়াছে এবং কুমারের প্রায় সমান্তরালে প্রবাহিত হইয়াছে। পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ইহা যশোহরে প্রবেশ করিয়া কিছুদূর পর্যন্ত পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং দক্ষিণপূর্বগামিনী হইয়া ঝিনাইদহ অতিক্রম করিয়াছে। এই নদীর মূলদেশ অনেক দিন ধরিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ইহার পূর্বের মুখ হইতে ৬ মাইল দূরে একটি বাঁওড় বা বিলের পরে ইহার আর কোন চিহ্ন নাই। নদীয়া জেলায় চুয়াডাঙ্গার দুই মাইল উত্তর-পশ্চিম হইতে ইহা বাহির হইয়াছিল। এই স্থান হইতে মাগুরা পর্যন্ত ইহা মাথাভাঙ্গার জল হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং সমগ্র খাতটি ঘন জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়াছে। পূর্বে মাগুরা সহর ভাল স্বাস্থ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু নবগঙ্গার ধ্বংসের সহিত ইহার সেই প্রসিদ্ধি নষ্ট হইয়াছে। ঝিনাইদহের পরে নৌকা চলাচল করিতে পারে না এবং মাগুরা হইতে ঝিনাইদহ পর্যন্ত বর্ষার তিনমাস নদী নৌকা চলাচলের যোগ্য থাকে। মাগুরায় কুমার আসিয়া নবগঙ্গায় পড়িত হইয়াছে এবং নদীর পরবর্তী অংশকে কুমারই বলা যাইতে পারে। দক্ষিণে বিনোদপুর পর্যন্ত নদী ভরাট হইয়া উঠিয়াছে এবং এই পর্যন্তই বৎসরের সকল সময় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে।

পূর্বে নবগঙ্গা লোহাগাড়ার নিকটস্থ কালনায় মধুমতীতে পতিত হইত, কিন্তু লোহাগাড়া হইতে কালনা পর্যন্ত খাল ভরাট হইয়া যাওয়ায় স্রোত এখন বাঁকারনলী দিয়া প্রবাহিত হইয়া পাটনার নিকট দুইভাগ হইয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব শাখাটি আঠারবাঁকীর সহিত যুক্ত হইয়া কালিয়া অথবা গাজনাই নদী নামে পরিচিত হইয়াছে এবং পশ্চিম শাখাটি ভুতের খাল নামে শুক্তগ্রামে কালীগঙ্গায় পতিত হইয়াছে। ইহার নাম হইতে এবং পূর্বদিকে ইহার যে সকল শাখা বাহির হইয়াছে তাহার সংখ্যা হইতে, এ কথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, ব'-দ্বীপের গঠনে এই নদীটি বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। গোয়ালন্দ অভিমুখে গঙ্গার নূতন খাত সৃষ্টি হইবার পূর্বে, ভাগিরথী ও নদীয়ার অন্যান্য নদী ভরাট হইয়া উঠিলে সম্ভবতঃ গঙ্গার প্রধান স্রোত এই পথ দিয়াই প্রবাহিত হইত। চুয়াডাঙ্গার উত্তরে ইহার উপর ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে সেতুনির্মাণের ফলেই অবশ্য ইহার ধ্বংস সাধিত হইয়াছে এবং এই সেতুই আবার বেগু নদী নবগঙ্গা হইতে যে জলস্রোত পাইত, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। পূর্বে ভবানীপুর, মুচিয়া খাল, চণ্ডী এবং রামপুরের খাল, এই

চারিটি খালের দ্বারা কুমার ও নবগঙ্গা সংযুক্ত ছিল। কিন্তু ইহার সবগুলিই ভরাট হইয়া গিয়াছে। নবগঙ্গা মোটামুটি উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার বিস্তার সাধুটি হইতে লোহাগাড়ার নিকটস্থ মধুমতী পর্য্যন্ত। দৈর্ঘ্য ৯১ মাইল।

ভবানীপুর খাল ভবানীপুরে কুমার হইতে বাহির হইয়া ফুলগাছায় নবগঙ্গায় পতিত হইয়াছে। খালটি সম্পূর্ণ ভরাট হইয়া যাওয়ায় ১৮৯৮ সালে সিন্দুরী নীলকুঠীর মালিক মিঃ ডবলিউ সিরেফ জনসাধারণ ও জেলাবোর্ডের আর্থিক সহায়তায় ইহার মুখটা কাটাইয়া দেন; কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেই খালটি আবার ভরাট হইয়া যায়। ইহার দৈর্ঘ্য ১০ মাইল।

চিত্রা :

চিত্রাও মাথাভাঙ্গা হইতে নির্গত হইয়াছে। যশোহরে ইহা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া কালীগঞ্জ, ঘোড়াখালি, নড়াইল, গোবরা প্রভৃতির পাশ দিয়া জেলার দক্ষিণে হাজিরহাটে আতাইএর সহিত মিলিত হইয়াছে। রেনেলের মতে দামুড়হুদার তিন মাইল নিম্ন হইতে বাহির হইয়া কালীগঞ্জ ও ঘোড়াখালির মধ্যে ইহা দ্বিধা-বিভক্ত হইতেছে। ইহার একটি স্রোত এখন চিত্রা নামে প্রবাহিত হইয়াছে এবং অপরটি আরও উত্তরে যাইয়া ফট্‌কী নামে পরিচিত হইতেছে। চিত্রার মূলদেশ এখন সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নবগঙ্গা ভরাট হইয়া যাওয়াই ইহার একমাত্র কারণ নহে। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এক নীলকুঠীর সাহেব চিত্রার মূলদেশে এক বাঁধ নির্ম্মাণ করাইয়া চিত্রার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। খারাগোদা হইতে ঘোড়াখালি পর্য্যন্ত চিত্রা মূলনদী হইতে কোন জলপ্রবাহ পায় না এবং এই পর্য্যন্ত ইহা জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়া স্থানীয় জল-নিকাশের পথ মাত্র হইয়া রহিয়াছে। কালীগঞ্জের উপরে আর নৌকা চলাচল করিতে পারে না। ঘোড়াখালি হইতে সবপুর পর্য্যন্ত নদী এখনও নাব্য রহিয়াছে, কিন্তু সবপুর বাঙ্কইপাড়ার মধ্যে ইহার খাত ভরাট হইয়া গিয়াছে। ঘোড়াখালির নিম্ন হইতে আতাই পর্য্যন্ত নদী জোয়ার-ভাঁটার অধিকারভুক্ত এবং সুনাব্য। অবশ্য এই অংশেও নদী ভরাট হইয়া যাইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। চিত্রা সাধারণভাবে উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা খারাগোদা হইতে আঠারবাঁকী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ১০৪ মাইল দীর্ঘ।

ঘোড়াখালি খাল নলদীতে নবগঙ্গা হইতে বাহির হইয়া ঘোড়াখালি গ্রামে চিত্রায় পতিত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল হইলেও বৎসরের সব সময় ইহাতে নৌকা চলাচল করিতে পারে বলিয়া যশোহরের নদী-ব্যবস্থায় খালটির স্থান তুচ্ছ নহে।

ফটকী ও বেগু :

চিত্রা যেখানে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে, সেখান হইতে তাহার উত্তরগামী স্রোতটি ফটকী নামে পরিচিত হইয়াছে। ইহা একটি খালের মধ্য দিয়া বেগু নদী হইতে জলের যোগান পাইয়া থাকে। খালটি নবগঙ্গা হইতে বাহির হইয়া নলডাঙ্গার পাশ দিয়া গিয়াছে। জেলার মধ্য দিয়া ইহা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত এবং কোন কোন স্থানে ষড়খালি বলিয়া পরিচিত। নলডাঙ্গার জমিদার বংশ ইহার তীরে তাঁহাদের বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা বৃহদায়তনের ছিল, কিন্তু এখন বর্ষা ব্যতীত অন্য ঋতুতে ইহা প্রায় শুকাইয়া যায়।

বিজয়ী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

দাসী না রাণী ?

বেলা অবসানপ্রায়। কেশব তন্ময় হইয়া লিখিতেছেন। রাত্র দশটা হইতে ছয়টা ও দুপুরে ঘণ্টা দেড়েক মাত্র শয়নঘরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। ধরিতে গেলে দিন কাটে পড়িবার ঘরেই।

কেশবের মহলে পড়িবার ঘরটিই সব চেয়ে বড়। গালিচা-ঢাকা মেঝের উপর সবুজ বনাত আঁটা প্রকাণ্ড টেবিল। দুই দিকে দু'খানা সবুজ গদী-আঁটা চেয়ার, অন্য দিকে বড় একটা সোফা। এক কোণে দুইটি বড় আলমারী ছোট বড় বইয়ে বোঝাই। টেবিলের উপরে কাচের দোয়াতদান, কলম গোটা দুই, কয়েকটা নানা রঙ্‌ ও আকারের ফাউন্টেন পেন, ছুরী, কাঁচি, পেনসিল, পিনকুশন এবং গাদা গাদা কাগজপত্র। খান কয়েক কাগজ ইতস্ততঃ চাপা আছে রূপা, কাচ ও চীনামাটির কাগজ-চাপা দ্বারা। কেশবের চেয়ারের বাঁ দিকে একটা কাগজ ফেলা বাস্কেট, ডান দিকে একটা র‍্যাক, সেটাও কাগজে বোঝাই। তিরিশ দিন রুক্মিণী চিঠি লেখার প্যাডখানা ও পঞ্জিকাটা র‍্যাকে তুলিয়া রাখেন, তিরিশ দিনই সেগুলি টেবিলে নামিয়া আসে। টেবিলের উপরকার কোন জিনিসের বিরহ কেশব সহিতে পারেন না, সেই জন্যই অকর্ম্মা কলম ও অদরকারী পুরান মাসিক কাগজগুলি টেবিলের বোঝা ও শোভা দুইই দিন দিন বৃদ্ধি করে।

পিছন দিকের সরু লোহার বারান্দা। সবুজ রঙ্‌-করা রেলিং-ঘেরা সেই বারান্দায় সারি সারি টবে ফুলের গাছ, লাল শাদা গোলাপী সুগন্ধি ফুলগুলি জানালা দিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে, ইহাদেরই দু'চারিটি ফুল-পাতা লইয়া নিত্য সকালে রুক্মিণী ছোট একটা তোড়া বাঁধিয়া কেশবের টেবিলে একটি জলভরা বড় দোয়াতের মধ্যে রাখেন। ফুলদানী রাখিবার স্থান টেবিলে নাই।

কেশব চিন্তাশীল লেখক। মনের চিন্তা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আছে, জ্ঞানগর্ভ ওজস্বিনী ভাষায় যে-সব প্রবন্ধ কেশবের কলম হইতে বাহির হয়, দেশের সুধী-সমাজে সেগুলির আদর অসামান্য। তাঁহার "দেশের অবস্থা," "জাতির দুর্দ্দশা", "আমরা কোথায় ?", "অতীতের বাঙ্গালী" প্রভৃতি বইগুলি বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্‌। লেখাই কেশবের জীবনের প্রধান আনন্দ, প্রধান সুখ।

রুক্মিণীও মনে মনে কেশবের সাহিত্য-প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গরবিণী। একটা দুঃখ—মা গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু কৈকেয়ী কি ছেলের গৌরবে গর্ব্ব বোধ করেন না ? নিশ্চয়ই করেন, মুখে অবশ্য প্রকাশ করিবার স্বভাব তাঁহার নয়।

আর একজন কেশবের ছাত্র শিষ্য ভক্ত—সে আনন্দ। যখন তখন ঝড়ের মত কেশবের ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। বই ছাপাইবার সমস্ত দায়িত্ব ও উৎসাহ তারই সব চেয়ে বেশী। আনন্দের বড় দুঃখ যে, সে নিজে কিছুই লিখিতে পারে না।

ধীরে ধীরে রৌদ্র লাল ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, রুক্মিণী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "উঠবে না ?"

"উঠি, তোমাকে খুঁজছিলাম।"

"কেন ?"

কেশব আর কিছু বলিলেন না—একটা বই খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন, রুক্মিণী চাহিয়া দেখেন কেশবের মুখে ধূমহীন সিগারেট।

একটু হাসিয়া সিগারেট ধরাইয়া দিয়া রুক্মিণী বলিলেন, "এই ত দেশলাইটা রয়েছে, একটা কাঠি জ্বেলে নিলে হয় না ?"

"কই দেখি নি তো।"

"দেখবে কি, টেবিল ত নয়, মাল-গাড়ী, তোমার জন্যে এক দণ্ড আমার কোথাও সুস্থির হয়ে থাকবার যো নেই।"

ডিবা হইতে একটা পান মুখে দিয়া কেশব বলিলেন, "তোমারই দোষ, তুমি আমায় ডানা-কাটা পাখী করে দিয়েছ।"

"ইস্‌ আর গল্প কর না, ডানা তোমার ছিল না কি কোন দিন ?"

"ছিল ছিল, তুমি আমার পক্ষচ্ছেদ করেছ, আগে আমি সব কাজ নিজেই করে নিতাম।"

"আগে? কত আগে?"

"এই আমার বিয়ের—তুমি আসার আগে।"

রুক্মিণী হাসিয়া বলিলেন, "থাক্ থাক্, পানটি মুখে দিয়ে চুণ টুকু খেতে যার মনে থাকে না—তার বড়াই আর কোরো না।"

"তা না করলাম, একটু চুণ দাও দেখি—তোমার কথায় মনে পড়ল।"

রুক্মিণী চুণ দিলেন, বলিলেন, "তুমি এমনধারা কর যে দুটো দিন কোথাও গিয়ে থাকব, সে যো নেই আমার।"

"আবার দুটো দিন কোথায় যাবার কথা হচ্ছে—সে দিন না বাপের বাড়ী থেকে এলে?"

"বাপের বাড়ী ছাড়া বুঝি আর কোথাও যেতে নেই? প্রতিমার ওখানে একবার যেতেই হয়।"

কেশব নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন, "মা যেতে দেবেন না।"

"মা-ই দেবেন, প্রতির শাশুড়ী মার সই।"

কেশব কলমটি রাখিয়া এবার রুক্মিণীর মুখের দিকে চাহিলেন, "তা তুমি কি করবে? নিজেই যাবে না—সে আমি জানি।"

"যাই কি করে, রোদে মুখ ঝলসে গেলেও সয়ে বসা হয় না, রাত ভোর হয়ে এলেও শোবার কথা মনে পড়ে না—এ সব কার হাতে দিয়ে যাই?"

কেশব হাসিয়া বলিলেন, "আমার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে রুক্মিণী, রুক্মিণী ছাড়া আমার গতি নেই।"

একটু পরে অবশিষ্ট সিগারেট টুকু ছাইদানীতে ফেলিয়া কেশব বলিলেন, "আর একটা দাও।"

রুক্মিণী দাঁড়াইয়া পিন-কুশনের পিনগুলি খুলিয়া কেশবের নামের আক্ষরগুলি ফুটাইয়া তুলিতে ছিলেন—এও তাঁর দৈনিক একটা কাজ। নিত্য পিনগুলি এলো-মেলো হইয়া থাকে আর নিত্যই তিনি আরও কতকগুলি নূতন পিন দিয়া অক্ষর তিনটি সাজাইয়া রাখেন।

লিখিতে লিখিতে কেশব বলিলেন, "কৈ দাও।"

"আর না—মাথা ধরবে।"

"আরে না—ধরবে না। রাত্রে বরং দিয়ো না।"

"রাত্রে খাওয়া তবু ভাল, এখন আর না। সেই সেবারের মত হবে না কি? কি মাথার যন্ত্রণা হয়েছিল, ভুলে গেছ? ডাক্তার তো একেবারেই বারণ করেছিল, তা দু'একটা করে করে এখন দিন দশটায় দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই দিন কুড়িটায় দাঁড়াবে দেখছি।"

"না, তা দাঁড়াবে না, তুমি দিলে ত খাব? আমি আর কোথা পাব বল?"

রুক্মিণী আর একটা সিগারেট দিলেন, কেশব বলিলেন, "এই চারটে হলো না?"

রুক্মিণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "তাই বটে, সাতটা হলো, ওঠো এবার ওঠো।"

"উঠি, আর একটু পরে।"

"আরও পরে? বেলা যে আর নেই, পরীক্ষার পড়া নিয়েও কেউ এমন করে না।"

"বেলা গেছে না কি?"

রুক্মিণী পশ্চিম দিকের একটা জানালা খুলিয়া দিলেন, এক ঝলক রাঙা আলো আসিয়া টেবিলে ছড়াইয়া পড়িল, আকাশে সূর্য্য প্রায় ডুবু ডুবু, পশ্চিমাকাশে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘ; ছেলেদের নানা রঙের ছোট-বড় ঘুড়ি উড়িতেছে।

কেশব সেই দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে, বলিলেন, "ঐ কথাটায় আমার সেই কথা মনে পড়ে"

"কোন্ কথাটা?"

"ঐ যে বললে, 'বেলা নেই।' বিজিতাশ্ব যেমনি এসে বললে, 'দিন যায়!' অমনি বৈরাগ্য এসে পৃথুরাজাকে নিয়ে গেল। এক একটা সাধারণ কথা, অথচ তাই একজনের জীবনে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনে?—জীবনের কি মূল্য আছে বল? ভোরের আলো কেমন কত আশা-ভরসা মাখানো, দুপুরের রোদ কি তীব্র—কত অসহ, আর এখন দেখ, সন্ধ্যার আলোর কোন জ্বালা নেই, কোন শক্তিও নেই। এর পরে আসছে ঘোর অন্ধকার—তার পরে?"

রুক্মিণী বলিলেন, "সে কে জানে? কে বা জানতে চায়—ভগবান্ যতটুকু দরকার—মানুষকে তাই জানিয়ে রেখেছেন।"

"জানতে পারা কি এতই কঠিন!" অন্যমনস্ক হইয়া কেশব চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমে আলো মিলাইয়া চারিদিকে ছায়াময় হইয়া উঠিল।

রুক্মিণী বলিলেন, "ওঠো কখন নাইবে ?"

"হাাঁ উঠি।" একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া কেশব উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

স্নানান্তে জামা-কাপড় পরিয়া ছড়িটি হাতে লইয়া বলিলেন, "খাবার জল ?"

"ঐ যে রেখেছি।"

জল পান করিয়া ডিবা হইতে পান লইয়া কেশব বলিলেন, "একটা সিগারেট দাও।"

"ঠিক্ একটা।"

"যদি কেস-এ আর দুটো না দাও, তবে আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব—বেড়াবার সময় সিগারেট না হলে কি ভাল লাগবে ?"

"তোমার সঙ্গে পারা মুস্কিল—দুটোই দিয়ে দিলাম, এই নাও। দেড় ঘণ্টার আগে ফিরো না, খোলা বাতাসে অনেকক্ষণ থাক্‌বার কথা না তোমার ? ভুলে যাও কেন ? দশটা সিগারেট কিন্তু হয়ে গেল—আজ রাত্তিরে আর খাবে না বল ?"

"সে পরের কথা পরে হবে, তোমার অভাজন স্বামীকে কেন আর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাও ? দ্বিতীয় ভাগে পড়েছি 'রুক্মিণী অতি গুণবতী ছিলেন,' সেটা অবশ্য সত্যি, কিন্তু তিনি যে একজন কঠোর মাষ্টার সেটা দ্বিতীয় ভাগে লেখা নেই।"

"সেই দ্বিতীয় ভাগের কথা তোমার এখনও মনে আছে ?"

"আছে না ? তখন কি জানি আমিই সেই ভাগ্যবান্ ? গুণবতী রুক্মিণী আমারই ঈশ্বরী হবেন ?"

রুক্মিণী হাসিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরী না আরও কিছু—একটা কথা শোন না।"

"কেন ? আমি তোমার কোন্ কথা অমান্য করি রুক্মিণী ? এমন অনুগত অনুচর তোমার আর কে বল ?" কেশব রুক্মিণীর গাল দুটি টিপিয়া ধরিলেন।

"আঃ শশী আসছে," রুক্মিণী সকোপ কটাক্ষ করিয়া লজ্জিত হাসিমুখে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

"অন্যায় করি নি কিছু—তুমি পরস্ত্রী নও।" হাসিয়া রুক্মিণীর দিকে চাহিয়া কেশব বাহির হইয়া গেলেন।

শ্বশুরালয়ে

ভাদ্র-দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। সমস্ত জানালা বন্ধ, শুধু একটি জানালা খুলিয়া সুদেষ্ণা বসিয়া সেলাই করিতেছিল। আগুনের মত তপ্ত বাতাস ঘরে আনা-গোনা করিতেছে—সুদেষ্ণার ভ্রূক্ষেপ নাই। মাথার চুল এলো-মেলো, কপালে সিন্দূরের টিপটি ধূমকেতুর চেহারা ধরিয়াছে, আঁচল খানা মাটীতে লুটানো। দেখিলে মনে হয়, না জানি কতই গুরুতর কাজে ব্যস্ত, অথচ কাজটি কি—না, কাপড়ে ফুল তোলা!

বিয়ের পরে বছর চার পাঁচ কাটিয়াছে। কৈকেয়ী সুদেষ্ণাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন। শিক্ষয়িত্রী আছে দু'জন—সহরের মেয়েস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। সকালে একজন আসে, দু'ঘণ্টা লেখাপড়া শেখায়। সন্ধ্যায় আসে আর একজন, গান শিখাইবার জন্য।

সুদেষ্ণার মনের দিকে কৈকেয়ীর খুব লক্ষ্য আছে। বিয়ের পর প্রত্যেক মাসে পনের দিন করিয়া তাহাকে নিজের কাছে রাখিতেন। এক বছর পরে মাসে সাত দিন করিয়া সে ষষ্ঠীতলায় থাকিত। তৃতীয় বছরে দু'মাস অন্তর সাত দিন এবং চতুর্থ বছরে আরও কম। বাপের বাড়ী বেশী যাওয়া কৈকেয়ী পছন্দ করেন না, তিনি শুধু সময়ের অপেক্ষায় আছেন, যেদিন সুদেষ্ণা নিজেই যাইতে চাহিবে না।

ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে চারটা বাজিল সুদেষ্ণার হাতের কাজও শেষ হইল; কাপড়খানা রুক্মিণীর, সমস্ত শাদা জমিতে ছোট ছোট হল্‌দে পাতার মধ্যে লাল ফুল।

মাসখানেক হইল উমা শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়া এই শিল্পটি সুদেষ্ণাকে শিখাইয়াছে। সেই হইতে যার কাপড় পায় অমনি ফুল তুলিতে বসে। কৈকেয়ীর শাদা ধুতিতে সাদা রেশমী ফুল, জানকীর গেরুয়ায় মুগা সূতার ফুল আর সমস্ত রঙের বাহার দেখ রুক্মিণীর কাপড়ে।

বিন্দু বাহির হইতে ডাক দিল, "বৌদি, দিদিমা ডাকছেন।"

কাপড়খানা বগলে ও সূচ সুতো হাতে সুদেষ্ণা চলিল, কৈকেয়ীর মহলের সিঁড়ির মাথায় কাপড়ওয়ালী তাহার মোট খুলিয়া বসিয়াছে, কৈকেয়ী নীচে নামিতে নামিতে দাঁড়াইয়া আছেন, রুক্মিণী কাপড় দেখিতেছেন, সুদেষ্ণা

তাঁহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। তাহারই চেহারা দেখিয়া কৈকেয়ী অবাক্, মাথায় কাপড় সে অল্প একটু দেয়, কখনও দেয়ই না। খাটো চুল সমস্ত পিঠ ছাড়াইয়া নামিয়াছে এখন।

কৈকেয়ী বলিলেন, "এই গরমে ঘরের কোণে বসে কি হচ্ছিল? চুল বাঁধা নেই, গা ধোয়া নেই, কি এক মাথা-মুণ্ডু শিখে তাই নিয়ে রাত-দিন অজ্ঞান!"

"মাথা-মুণ্ডু? দেখ দিখি, এমন কাপড় একখানাও আছে এখানে?" বলিয়া সুদেষ্ণা কাপড় মেলিয়া ধরিয়া দেখাইল।

"নাঃ হাজার টাকা দাম হবে তোর কাপড়ের। নে এখন কাপড় পছন্দ করে বেছে নে।"

সুদেষ্ণা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না পছন্দ হয় না।"

"ভাল করে চেয়ে দেখ, ভাল ভাল কাপড় আছে। লাল রঙ ভাল বাসিস, তাও দু'খানা আছে।"

"ওর চেয়ে অনেক ভাল কাপড় আমার আলমারীতে আছে", বলিয়া সুদেষ্ণা চলিয়া গেল।

কৈকেয়ী হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বরাত মন্দ।"

কাপড়ওয়ালী বড় আশা করিয়া আসিয়াছে, দুঃখিত হইয়া বলিল, "একখানাও নেবেন না রাণী-মা?"

"যে পরবে সে যদি না চায়, তবে কার জন্যে নেব?"

রুক্মিণী কাপড়ওয়ালীর বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "প্রীতির জন্যে একখানা রাখি না মা? তার সাধেও ত একখানা দিতে হবে।"

"রাখ তবে দেখে," বলিয়া কৈকেয়ী নামিয়া গেলেন।

কাপড়ওয়ালী রুক্মিণীকে বলিল, "মা তুমি একখানা রাখ।"

সুখদা গালে হাত দিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "হয়েছে! বৌদি পরবে তোমার এই রঙীন শাড়ী? এক ছেলে কোলে করে নোলক-নাকী গিন্নী হয়ে বসেচে, নেহাৎ মার বকুনী খেয়ে যদি কখন কখন পরে!"

রুক্মিণী বলিলেন, 'থাম্, আর লেক্চার দিস নি। দেখ মা, শাদা কাপড় তো আন নি, কাল এনো, এদের জন্যে আমার জন্যে রাখব তখন।"

"আচ্ছা মা, কাল আমি শাদা কাপড় আনব।"

দু'খানা ভাল শাড়ী বাছিয়া লইয়া কাপড়ওয়ালীকে বিদায় দিয়া রুক্মিণী নিজের ঘরে গিয়া আলমারী খুলিয়েছেন, পিছন হইতে আনন্দ ডাকিল, "মা।"

ছেলের ক্রুদ্ধ স্বরে শুনিয়া রুক্মিণী ফিরিয়া বলিলেন, "কেন রে?"

একখানা ধোপ-দেওয়া কাপড় খুলিয়া দেখাইয়া আনন্দ বলিল, "পরতে গিয়ে দেখি এই কাণ্ড! এ সব কি?"

রুক্মিণী চাহিয়া দেখিলেন, কাপড়টার হাত তিনেক জায়গা জুড়িয়া ছোট বড় লাল রঙের ফুল, হাসিয়া বলিলেন, "বৌমার কাণ্ড।"

আনন্দ দ্বিগুণ ক্রোধের সঙ্গে বলিল, "তুমি ত হেসেই উড়িয়ে দিলে, এ রকম করলে পারা যায়? কিছু বলবারও যো নেই অমনি কান্না-কাটী পড়ে যাবে, চোখে জল তো এসেই আছে, আমি এ সব কিছু ভাল বাসি নে। দিচ্ছি আচ্ছা বকুনি।"

"না রে, কিছু বলিসনে।"

"না বলবে না! তোমরাই আদর দিয়ে মাথাটি চিবিয়ে খেলে! আমার কাপড় কেন নষ্ট করলে?"

"যা করেছে করেছে, আর করবে না। অন্য একটা কাপড় পরগে না, ওটার ফুল খুলে দেবে।"

"অন্য একটা পরব কি না পরব সে কোন কথা নয়, আমি চাই নে আমার জিনিষে কেউ হাত দেয়, তুমি ভাল করে বকে দিও মা, নইলে ঐ আলমারীর বাহারে শাড়ীর একখানাও যদি আস্ত রাখি তো কি বলেছি!"

একদিক দিয়া সরোষ পদক্ষেপে আনন্দ চলিয়া গেল, অন্যদিক দিয়া গাল ফুলাইয়া সুদেষ্ণা ঢুকিল, "কি অন্যায় করেছি মা? যে দিন প্রথম শিখি হাতের কাছে ময়লা কাপড়টা পেয়ে কটা ফুল তুলে দেখলাম কেমন দেখতে হয়। তার পরে ধোপা-বাড়ী গেছে, আর মনেও নেই। এরই জন্যে এত রাগ?"

"তা বই কি, আনন্দ ঐ রকমই।"

"দিদিই ত নষ্ট করলেন, আজ আমি ওঁকে এখুনি তুলে দিচ্ছি গিয়ে।"

রুক্মিণী হাসিয়া বলিলেন, "সে বেশ কথা, এখন চুল বাঁধবি আয়, নইলে মা তোকেই বকুনি দেবেন।"

"দাঁড়াও, আগে ঐ ফুলগুলো খুলে ফেলে দিয়ে নি, তার পরে যা হয় হবে।"

"না আগে চুল বাঁধবি চল," বলিয়া রুক্মিণী তাহাকে টানিয়া লইয়া বারান্দায় গিয়া বসিলেন, সুদেষ্ণা মুখ ভারি করিয়া বলিল, "রোজ রোজ চুল বাঁধা আমার ভাল লাগে না—একদিন না বাঁধলে কি হয়? অর্দ্ধেকটা কাঁটা রেখে দাও। তোমার চুল আজ আমি বেঁধে দেব।"

চুল বাঁধা হইলে সুদেষ্ণা চিরুণী হাতে উঠিয়া রুক্মিণীর মাথার কাপড় খুলিল, ওদিক হইতে কৈকেয়ী ও জানকী আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শাশুড়ীর সামনে লজ্জা পাইয়া রুক্মিণী তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় তুলিয়া দিলেন, সুদেষ্ণা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "কেন মা?"

"থাক থাক তুই কাপড় কেড়ে আয়, বুড়ো বয়সে আমি চুল বাঁধব, না আর কিছু।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "দিতে চাইছে দিক।"

জানকী বলিল, "অবাক করলে বৌদি, উমার মা তোমার বড় না ছোট? কেমন খোঁপা বাঁধে বল দেখি?"

রুক্মিণী মৃদু স্বরে বলিল, "দে তবে।"

খুসী হইয়া সুদেষ্ণা বলিল, "ফিতে কাঁটা কই?"

"কাঁটা টেবিলের ওপর আছে, ফিতে টিতে কোথা কে জানে।"

জানকী বলিল, "তোমার শুধু ওজর, তোমার আলমারীতেই ত রয়েছে, সে সুখী, নিয়ে আয় সে গুলো, চিরুণীও আনিস, ছোটর জিনিস বড়কে ব্যবহার করতে নেই। লক্ষণ তোমার চিরুণী বৌদির মাথায় দিও না। রুক্মিণীর আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া জানকী সুখদার সামনে ফেলিয়া দিল।

রুক্মিণী একটু ফিরিয়া বসিলেন, সুদেষ্ণা তাঁহার চুল খুলিতে খুলিতে বলিল, "ইস্, মার চুল কি নরম!"

সুখদা হাতের কাছে পাইয়া এক গোছা রঙীন ফিতা ও [illegible] ফুল চিরুণী আনিয়া রাখিল। রুক্মিণী বলিলেন, "ও ফিতে লক্ষ্মীর সেমিজের জন্যে।"

"আমার ঢের সেমিজ আছে, কোন্ ফিতেটা ভাল হবে পিসীমা?"

"কালো।"

"কালো ফিতে? গোলাপীটা চাই না? দিদি গোলাপ ফুল খোঁপা হবে, মা আমার যেমন বেঁধে দেয়?"

রুক্মিণী শাশুড়ীর হুকুমে অনিচ্ছায় মাথাটি বৌয়ের হাতে অর্পণ করিয়াছেন, গোলাপ ফুল খোঁপার কথা শুনিয়া মুখে কাপড় চাপা দিলেন।

কৈকেয়ীও একটু হাসিয়া বলিলেন, "বৌমা খুলে ফেলে দেবে, সাদা-সিদে করে বেঁধে দে।"

ইচ্ছা মত কয়েকটা লাল পাথর দেওয়া ফুল-কাঁটা দিয়া সুদেষ্ণা একটা বেণী গাঁথা কবরী বাঁধিল, নিজেই মুগ্ধ হইয়া বলিল, "কি সুন্দর দেখাচ্ছে মাকে, না দিদি?"

লজ্জা পাইয়া রুক্মিণী মাথায় কাপড় তুলিয়া দিলেন। কৈকেয়ীর মুখে ঈষৎ প্রসন্ন হাসি। জানকী বলিল, "সত্যি বলেছিস, শাশুড়ী বৌয়ে মিলেছিল ভাল। তবে মার মতন রঙ্ তোমাদের না। তোমার ত নয়ই, বৌদিরও না।"

সুদেষ্ণা কৈকেয়ীকে দেখিল, রুক্মিণীকে দেখিল, সব শেষে নিজের দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি যে সবার বড়, দেখতেও সবার চেয়ে ভাল হবেই তো।"

সন্ধ্যায় সুদেষ্ণার উমার সঙ্গে খেলিবার সময়। কোন দিক্ দিয়া বাপের বাড়ীর অভাব না তাহাকে বাজে, সে দিকে কৈকেয়ীর চেষ্টার অবধি নাই। খেলা শেষ হইতে না হইতে গানের শিক্ষয়িত্রী আসে। রবিবারে সুদেষ্ণা সকলকে নিজে গান গাহিয়া শোনায়।

পরদিন সকালে সুদেষ্ণার শিক্ষয়িত্রী কৈকেয়ীকে বলিল, "লক্ষ্মণের বড্ড সেলাইয়ের ঝোঁক দেখছি আজ-কাল, আমার এক বোন আছে খুব ভাল সেলাই জানে, তাকে কিছু দিন রাখলে সব শিখিয়ে দেবে।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "তবে কাল থেকে সঙ্গে করেই এস।"

সুদেষ্ণার মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আর আমায় শিখতে হবে না।"

"কেন রে?"

"আমি শিখে ফেলেছি, বাবার সেই পাঞ্জাবীটা আমি নিজে কেটে সেলাই করেছি, বাবা বলেন, দর্জ্জির চেয়েও ভাল হয়েছে।"

"তবে ত সেরা সার্টিফিকেট পেয়ে গেছিস, শিখবিনে তা হলে?"

"নাঃ—বেশী লিখে কি হবে।"

পড়া শেষ করিয়া সুলেখা গিয়া পিছন হইতে কৈকেয়ীকে জড়াইয়া ধরিল।

"আঃ—দিদি ছুঁলে ? এখনও আমার কাজ রয়েছে পূজার ঘরে।"

সুলেখা কথা কয় না, এটা তার বিশেষ ধরণ, আবদার পূরণ করিবার। যতক্ষণ না কৈকেয়ী স্বীকার করিবেন, সে কথাও বলিবে না ছাড়িয়াও দিবে না।

"কি বল্।"

"আগে বল শুনবে ?"

"আচ্ছা শুনিই আগে", বলিয়া সুলেখার হাত ধরিয়া সামনে টানিয়া আনিলেন।

"সেই ফুল-তোলা কাপড়টা আজ পরতে হবে।"

"এই কথা ? তা পরব এখন স্নান করে এসে।"

কিছুক্ষণ পরে কৈকেয়ী স্নান করিয়া ফিরিতেছেন, সুলেখা জলে সাঁতার কাটিতেছে, রুক্মিণী ও জানকী ঘাটে নামিতে নামিতে একদিকে সরিয়া দাঁড়াইলেন। জানকী বলিল, "মা যে বড় গুলবাহার শাড়ী পরেছ।"

শাদা ধুতিতে ছোট ছোট তারার মত শাদা রেশমী ফুল। কৈকেয়ী একটু হাসিয়া বলিলেন, "বরাতে থাকলে ঠেকায় কে ?"

প্রতিদ্বন্দ্বিতা

এবার প্রকাশ্যে গিরিরাজের সঙ্গে কৈকেয়ীর বিবাদ বাধিয়া উঠিল।

শ্রীনগর হইতে দশ বার ক্রোশ দূরে নিশিন্দা গ্রাম,—নিশিন্দা কৈকেয়ীর সীমানার শেষ। ঠিক পাশের গ্রাম সোনাপুর গিরিরাজার সীমার মধ্যে এবং সীমার আরম্ভ।

অনেক বছর আগে ভবানী চৌধুরীর কথায় কৈকেয়ী নিশিন্দায় একটা বড় পুকুর কাটাইয়াছিলেন,—অন্যের সীমানার এত কাছে এই কাজটায় কৈকেয়ীর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিশিন্দায় পুকুর কাটিবার মত সুবিধার যায়গাও আর ছিল না এবং জলকষ্টও তখন খুব বেশী—কাজেই অন্য উপায়ও আর ছিল না।

সোনাপুর, নিশিন্দা দুইই সাধারণ গ্রাম, দুই গ্রামে দুই নায়েবই কর্তাকর্তা। মধ্যে মধ্যে নিশিন্দার নায়েব খবর পাঠাইত—বাড়ে দু'একটা সুপারী গাছ ভাঙিয়া পড়িয়াছে বা দু'চারটি ডাব নারিকেল চুরি গিয়াছে। কাজটা নিঃসন্দেহ সোনাপুরের, তবু এত তুচ্ছ খবরে দেবনাথ ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

এবার জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম হইতেই ভীষণ ঝড় শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে—সেই দুর্যোগের মধ্যে নিশিন্দার নায়েব যে খবর পাঠাইয়াছেন—তাহা অতীব উদ্বেগ। সোনাপুর কাছারীর নায়েব লোকজন শুদ্ধ আসিয়া পুকুরটা দখল করিয়াছে—ঢোল পিটাইয়া জানাইয়া দিয়াছে যে, পুকুর তাদের। সে কথা না মানিয়া নিশিন্দার জনকয়েক লোক মাছ ধরিতেছিল—সোনাপুরের বরকন্দাজেরা আসিয়া বাধা দেওয়ায় দুই পক্ষে মারামারি হইয়া গিয়াছে। পুকুরটা দখল লইবার পর হইতে সোনাপুরের পাইকেরা প্রায়ই পুকুর পাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়। মারামারির ফলে নিশিন্দার পাঁচ ছয়টি লোক জখম হইয়াছে—তৎসত্ত্বেও উহারা শাসাইতেছে যে, অনধিকার প্রবেশের জন্য নালিশ করিবে। ধরা মাছগুলিও জোর করিয়া লইয়া গিয়াছে। যে দিন এই ব্যাপার ঘটে—নায়েব মফঃস্বলে ছিল। সে উপস্থিত থাকিলে কি এই কাণ্ড হইতে পারে ? ইত্যাদি—ইত্যাদি।

চিঠিখানা লইয়া দেবনাথ নিজের আফিস-ঘর ছাড়িয়া কৈকেয়ীর সন্ধানে চলিলেন।

বেলা প্রায় আটটা। সবে কৈকেয়ী কাগজপত্র দেখিতে বসিয়াছেন—এখনও কাগজপত্রে হাত দেন নাই।

শাদা বেতের চেয়ারে কৈকেয়ী বসিয়া আছেন—জলের থান পরা,—পট্ট-বসন পরাই অভ্যাস,—সুতি কাপড় পরেন খুব কম।

ঠিক সামনে দেওয়ালে প্রতাপ চৌধুরী ও ভবানী চৌধুরীর প্রমাণ সাইজ অয়েল-পেন্টিং—পাশাপাশি হাওদা-কষা হাতীর পাশে দাঁড়ানো তেজস্বী বীর মূর্তি—প্রতাপ চৌধুরী, এবং একখানা চাদর গায়ে জড়ানো ভবানী চৌধুরী—তরুণ বয়সের সুন্দর প্রশান্ত চেহারা। নিজের সন্ধ্যা-পূজা সারিয়া কৈকেয়ী এই ঘরে ইঁহাদের সামনে আসিয়া বসেন এবং স্বামী ও শ্বশুরের বন্দনা চলে তাঁহার অন্তরে অন্তরে। একজনের সস্নেহ উৎসাহ-ভরা দৃষ্টির তলে আজও কৈকেয়ী বধূ, আর একজনের প্রেমের আবদারে হাসিমুখে চাহিয়া আছেন—যেমন ছেলেমানুষ

প্রথম যৌবনে। শ্বশুরের কথা কৈকেয়ীর প্রতি কথার সঙ্গে উল্লেখ হয়—স্বামীর কথা কৈকেয়ীর মনের মণিকোঠার সম্পদ্।

আশ্চর্য্য রূপ কৈকেয়ীর—ছাপ্পান্ন সাতান্ন বছর বয়সে কি রূপ থাকে? বেশীর ভাগই থাকে না, দু' একজনের থাকে। নিয়ম-নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে ত্রিশ বৎসরের স্বাস্থ্য ও রূপ কৈকেয়ীর অঙ্গে বাঁধা। যেমন নিটোল সুগঠিত দীর্ঘ দেহ—তেমনি নিটোল মুখের গঠন—নির্ম্মল মুখ, নির্ম্মল কপাল—একটি রেখার চিহ্নও নাই। এমন সুশ্রী গম্ভীর মুখ বড় দেখা যায় না। শ্বেত পদ্মে রৌদ্র পড়িলে যে রঙ্ দেখায়—ঠিক তেমনি কৈকেয়ীর রং। ভ্রূদুটি চুলের সীমারেখা ছুঁইয়াছে—ধনুকের মত মাথার চুলের ভার বহুকাল তৈল-হীন, ঈষৎ পিঙ্গল, বর্ষা-প্রবাহের মত তরঙ্গময়। শান্ত উজ্জ্বল চোখে অঞ্জন নাই। চাহনি দৃষ্টিমাত্র যেন অন্তস্থ বুঝিতে পারেন। সর্ব্বক্ষণ সমস্ত অবস্থায়ই কৈকেয়ী একটা নিজস্ব জ্যোতি-মণ্ডলের মধ্যে আছেন, দুপুরের আকাশের দিকে যেমন চাহিতে পারা যায় না—কৈকেয়ীর দিকেও চাহিতে গেলে আপনি চোখ নামিয়া পড়ে। গলায় তুলসীর মালা—সেই মালা ডান হাতে ধরিয়া বাঁ হাত টেবিলে রাখিয়া কৈকেয়ী সামনে ছবির দিকে চাহিয়া আছেন,—কি সুন্দর! উচ্চ ভাবময়ী রাজ-সন্ন্যাসিনী।

দেবনাথ ঘরে আসিয়া চিঠিখানি টেবিলে রাখিলেন। কৈকেয়ী সবে একখানা খাতা খুলিয়াছেন, সেটি খোলাই রহিল, চিঠিটা পড়িলেন একবার, দুইবার, মুখের চেহারা কঠিন হইল, বলিলেন, "এতখানি বয়সেও ওঁর স্বভাব বদলাল না।"

দেবনাথ বলিলেন, "আর বদলাবেও না।"

"উনি কি ভেবে কি করেন উনিই জানেন, কিন্তু রাগটা বেড়েছে আনন্দের বিয়ের পর থেকেই, সেই থেকে তো এ পথে হাঁটেন না।"

অনেক দিনের অনেক কথা কৈকেয়ীর মনে হইতে লাগিল, কি কোমল প্রাণ ছিল ভবানীর, কারও সামান্য দুঃখও সহিতে পারিতেন না, ধনবান্ হইয়াও কি সাধারণ ভাবে থাকিয়াছেন, নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করিতেন বিলাসে ব্যয় করিতে।

একটি মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "এ কিছু না, ওঁর বুদ্ধি-শুদ্ধি চিরদিনই কম, ভুতীকেশই ওঁকে চালায়।"

"কিছু খরচ হবে দু'পক্ষে এই পর্য্যন্ত। তবে আক্কেল পাবেন উনি বেশ ভাল রকমই, মান-সম্মানের জ্ঞানও নেই, আশ্চর্য্য মানুষ বটে।"

চিঠিটা দেবনাথের দিকে সরাইয়া দিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "তুমি কখন নিশিন্দে যাবে?"

"আমি এখনই বেরুবো ভেবেছি।"

"না বেলা সাড়ে তিনটে চারটের বেরুলেই হবে, আমিও যাব, সেই রকম বন্দোবস্ত কর।"

"আচ্ছা।"

"লক্ষ্মণ ভাইটিকেও নিয়ে যাব, প্রতির শাশুড়ীকে বৌ দেখিয়ে আনবো।"

"ওটা তো কথা নয়, সবে কাল সে এসেছে, আপনি তাকে ছেড়ে যেতে পারবেন না তাই বলুন।"

কৈকেয়ী একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা যা খুসী বল।"

দেবনাথ চলিয়া গেলেন। পরক্ষণে পিছন হইতে দুটি হাত তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, কৈকেয়ী বলিলেন, "এই রে এ ঘর অবধি ধাওয়া করেছ, তোর জ্বালায় কি কাজ-কর্ম্ম সব বন্ধ করবো?"

সুলেখা সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, ঘরের বাহিরে একজন ঝি পাহারায় থাকে, খবর না দিয়া কেহ ঢুকিতে পারে না। কর্ম্মচারীরা ছাড়া এ ঘরে বাড়ীর লোকে আসে না, নিতান্ত দরকার হইলে ঝিয়েরা কৈকেয়ীকে জানায়।

অর্দ্ধেকটা বেণী খোলা, আঁচলটা মাটিতে লুটানো, এলো-মেলো কেশ, সুলেখা বলিল, "কাজ বারণ করলে ঘরে ঢুকতে, কেন ঢুকবো না? কাল রাত্তিরে এসেছি, আজ দেখতেই পাইনি, আমি বুঝি কেউ নই?"

"কে বল্লে কেউ নস্? তোর মাষ্টারনী গেছে?"

"এই গেল, আমার খোঁজ না নিয়ে চুপি চুপি এসে কাগজ নিয়ে বসা হয়েছে, আমার চেয়ে কাগজ বড় হলো?"

ভুরু দুটি উপর দিকে টানিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া ঘাড় হেলাইয়া সুলেখা দাঁড়াইয়া রহিল টেবিল ঠেসান দিয়া।

আজ দরজায় দাঁড়াইয়া লজ্জিত মুখে সুলেখাকে ফিরিতে ইশারা করিতেছে।

"কে বললে তোর চেয়ে কাগজ বড় ? মেপে দেখ দেখি, এখন যা, মনোযোগ নষ্ট করে দিস্ নি।"

"মনোযোগ নষ্ট ? সে আবার কি দিদি ?"

"এই কাজ করবো, হঠাৎ বাধা পড়লে মনটা ফিরে যায়, তখন আর কাজে মন লাগে না। কাজের সময় ঠিক থাকা চাই।"

"আচ্ছা বিকালে কি সন্ধ্যায় করলে ?"

"তা কি হয়, সময়ের দাম বড় বেশী, যখনকার যা, তখন তা করতে হয়, আপনি মন টেনে নেয়।"

"আমি কই তা করিনে ? আমার চুল বাঁধা, খাওয়া, কাপড়কাচা কিছুই ঘড়ি ধরে করতে আমার ভাল লাগে না। পিসিমা বলে, আমি সৃষ্টিছাড়া। আচ্ছা দিদি, এই সব কাগজ বসে বসে দেখবে ? রোজ রোজ এত কাগজ কিসের ? কি করে পেরে ওঠ ? আমি হলে কখনো পারতাম না।"

"পারবি, পারবি এসব তোকে করতে হবে, আর একটু বড় হলে শেখাতে ধরবো।"

"হুঁস্ আমি করলে তো ? সারা দিনে আমার সময় কই ?" সুদেষ্ণা একপাক ঘুরিয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল, "আমার কত কাজ, পড়া, সেলাই, গান, পাখী, বিড়াল, খেলা", আবার একপাক—"গান শোনানো, বাগান বেড়ানো, আরতি দেখা",—আর একপাক, "পিসীমার গল্প শোনা' আমি কি না কাগজ দেখতে বসবো" এবার রীতিমত ঘুরপাক।

"নাও আঁচল উড়িয়ে নাচতে সুরু করলে, ঘরটাকে কি স্টেজ পেলি ? যা আনন্দকে নাচ দেখাগে, দিব্যি বকৃশিশ দেবে।"

"কি বললে ?"

সরোষে সুদেষ্ণা মাথা হেলাইয়া বলিল, "কি বললে ?"

"ওঃ ভুল হয়েছে, তার সঙ্গে তো তোর সতীন সম্পর্ক, জানকী বলে দিচ্ছে নয়, আমিই তোকে বিয়ে করেছি।"

ঝাঁপ দিয়া সুদেষ্ণা কৈকেয়ীর গলা জড়াইয়া ধরিল, তাহার খুসীর সীমা নাই।

কৈকেয়ী তাহাকে কোলে বসাইয়া আদর করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী ভাইটি, যা এখন আর দেরি করিয়ে দিস নি। আজ আমার বড্ড কাজ, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই, চারটের সময় আবার বেরুতে হবে, তোকে নিয়ে যাব বুঝলি ?"

নড়িবার লক্ষণ না দেখাইয়া সুদেষ্ণা বলিল, "আমায় নিয়ে প্রায়ই তো বেড়াতে যাও, সে আর নতুন কি ?"

"একেবারে নতুন, আনকোরা নতুন, সেখানে কখনো যাসনি, যা তোর মাকে বলগে, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিগে যা, দু'তিন দিনের মতন।"

"দু'তিন দিন ? সত্যি ? চারটেয় ? তবে আর সময় কই ? কখন কি করবো।" বিব্রত মুখে সুদেষ্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল।

"যাঃ পাগলী, দশটা বাজে নি এখনও, ও সাত ছেলে তের নাতির ভাবনা ভাবতে বসলো।"

নিতান্ত চিন্তিত মুখে সুদেষ্ণা ঘর হইতে বাহির হইল, হঠাৎ যেন তাহার মাথায় একটা গুরুভার চাপানো হইয়াছে, মুখের ভাবটা এমনি। একবারও পিছন দিকে চাহিয়া দেখিল না, ভঙ্গী দেখিয়া একটু হাসিয়া কৈকেয়ী নিজের কাজে মন দিলেন।

নিশিন্দা যাইতে পথে দুইবার নদী পার হইতে হয়। তা ছাড়া বর্ষার জলপ্রবাহের জন্য মধ্যে মধ্যে নালা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই সব জায়গায় গাড়ী পার করিবার জন্য এবং পাটনী ঠিক করিতে কতক লোক আগেই রওনা হইয়া গেল। বেলা বারটায় দাস-দাসী, সিপাই-শাস্ত্রীরাও জিনিস-পত্র লইয়া রওনা হইল। সব শেষে কৈকেয়ী সুদেষ্ণাকে লইয়া নিজের সেই চাঁপা রঙের গাড়ীতে যাত্রা করিলেন, পিছনে দেবনাথ।

রুক্মিণী বলিলেন, "এই দুর্যোগের মধ্যে বেরুবেন ?"

কৈকেয়ী বলিলেন, "দুর্যোগ মনে, বাইরে নয়।"

নিশিন্দায় পৌঁছিতে বেলা প্রায় শেষ। প্রতিমার শ্বশুর-বাড়ী হইতে পুকুরটি প্রায় এক মাইল। কতক লোক-জন শুদ্ধ সুদেষ্ণাকে প্রতিমার কাছে রাখিয়া কৈকেয়ী পুকুরের উদ্দেশে চলিলেন।

পুকুরটি অত্যন্ত বড়, স্বচ্ছ জলে কূলে কূলে ভরা। সতেজ সবুজ ঘাসে ঢাকা উঁচু পাড়। খুব কাছে লোকালয় নাই, ক্রমে দু' একজন করিয়া লোক জমিতে লাগিল। গ্রামের জন তিনেক মাতব্বর প্রজার কাছে কৈকেয়ী ব্যাপারটা আগা-

শোনা শুনিলেন, মারপিট খুব বেশী হয় নাই, অথমী লোকেরাও সারিয়া উঠিতেছে, ঝগড়াটা শেষ পর্য্যন্ত খুব ভয়ানকই দাঁড়াইত, যদি না ইহারাই অথম হইয়া চটিত।

পুকুরের তিন দিকেই বাঁধা ঘাট, প্রত্যেকটা ঘাট হাত চারেক চওড়া, শুধু সদর ঘাটটি খুব চওড়া। সদর উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিকে পুকুর পাড়ে একটা সরু পায়ে চলা পথ, তার ওপার হইতে সোনাপুর। এই জন্ত দক্ষিণ দিকের পাড়টি খুব ঘন সুপারী গাছে ঘেরা, ঘাটও বাঁধানো নয়; অব্যবহারের জন্ত সে পাড়টা জঙ্গলময় হইয়া আছে। উত্তর পাড়ে সিঁড়ির উপরকার চাতালের দুই পাশে দুটি সিমেণ্ট করা থাম, থামের গায়ে পুকুর প্রতিষ্ঠার সন, তারিখ, প্রতিষ্ঠাতার নাম, এবং জনসাধারণের জন্ত উৎসর্গ—সবই খোদাই করা ছিল। থামের উপর ছিল তুলসী গাছ। আশ্চর্য্য যে, সেই সন-তারিখ ঠিকই আছে দুই থামের গায়ে—শুধু কৈকেয়ীর নামটি বদল হইয়া দাঁড়াইয়াছে রাধারাণী মিত্র—গিরিরাজের স্ত্রীর নাম।

চারি দিকে সারিবাঁধা নারিকেল-সুপারী গাছ, থমথমে মেঘের ভারে পাতাটি নড়ে না। কৈকেয়ী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সেই নূতন নামটার দিকে চাহিয়া আছেন—নামটি যে সত্ত খোদাই, সেটা বুঝিবার উপায় নাই।

দেবনাথ বলিলেন, "মগের মুল্লুক না কি? ভেবেছে কি?"

নিশিন্দা কাছারীর নায়েব সঙ্গে সঙ্গেই আছে, কৈকেয়ীর ভাব দেখিয়া কোন কথাই বলিতে সাহস পাইতেছিল না, যদিও বলিবার অনেক কিছু তাহার ছিল।

নিজেদের ভূস্বামিনীকে দেখিবার জন্ত জনতা বাড়িয়া উঠিল, এ বলে 'চুপ চুপ' ও বলে 'আরে তুমি চুপ কর আগে'। যথাসাধ্য শান্ত সভ্য হইয়া থাকিবার চেষ্টা সকলেরই, কিন্তু একে অন্তকে উপদেশ দিতে গিয়াই গোলমাল বাধাইতেছে।

কৈকেয়ী ধীরে ধীরে গাছের তলায় তিন দিক্ ঘুরিয়া দক্ষিণ পাড়ে গেলেন, সেই তসরের থান পরা, গায়ে একখানা খদ্দরের চাদর। পিছনে দেবনাথ, কাছারীর নায়েব, দু'তিন জন কর্ম্মচারী ও পাইক, সমস্ত প্রজারা নায়েবের শাসন-ইশারায় উত্তর পাড়েই রহিল

দক্ষিণ পাড়ের পথের ওধার হইতে শস্যের ক্ষেত, ক্ষেত ছাড়াইয়া সোনাপুরের কাছারী-বাড়ীর একটা দিক্ স্পষ্ট দেখা যায়।

সেই দিকে চাহিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "রাধারাণী নামে আমার আপত্তি নেই, গিরিরাজ আসুন, আমার সামনে দাঁড়িয়ে চেয়ে নিন পুকুরটা, এখুনি দান করবো ওঁকে—স্বত্ব ছেড়ে দেবো। কিন্তু দিনে-দুপুরে ডাকাতি করতে দেবো না। তিনি চেনেন না আমাকে? আমারই লোকজনকে মার-ধর করে আমারই জিনিস দখল?"

এই সময় সুযোগ পাইয়া নায়েব বলিল, "আজ আসছেন শুনলাম।"

দেবনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, গিরি মিত্তির?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তুমি জানলে কি করে?"

"দুপুর বেলা ঘোড়া ছুটিয়ে লোক এসেছে খবর দিতে। সোনাপুরের লোকেরা খবরটা চাপা দেয় নি। আমাদের ক'জন প্রজাকে ডেকে নিয়ে অনেক লোভ দেখিয়ে বাগ মানাবার চেষ্টা করছিল, তারাই আমাকে বললে।"

"তুমি কি বললে?"

আমি বললাম, "মা আসছেন, চুপচাপ থাক, ডাকলে আর যেয়ো না, মা এসে যা করবার করবেন।"

দেবনাথ বলিলেন, "বুঝেছি, আমাদের আসবার খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি লোক পাঠিয়েছেন, পাছে সোনাপুরের নায়েব ভড়কে যায় আমাদের দেখে, নিজেও আসছেন।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "খুব ভাল খবর, তুমি প্রজাদের বলে দাও কাল সকাল আটটার আগে সবাই এইখানে জড় হবে; সবার সামনে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো, শুধু একটিবার, যে, ধর্ম্ম তাঁর আছে, না একেবারেই খেয়েছেন? তার পরে মেটে তো মিটলো নইলে যদ্দুর যায় দেখে নেবো। তাঁর মত টাকা-পয়সাকে আমি সম্পত্তি ভাবি নে, প্রজাই আমার সম্পত্তি। যারা জখম হয়েছে, ওঁর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ যা আদায় করে দেবো, তারা ভাববে জখম হয়ে লাভ হয়েছে।"

দেবনাথ বলিলেন, "সোজা নালিশটা করে দিলে—"

"হ্যাঁ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করে দেখো সামনা-সামনি আগে,

ভেবেছিলাম কালই ফিরবো, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্তেই, তা কাজটা এগিয়ে এলো, খুবই ভাল হলো ঠাকুর-পো।"

হঠাৎ গম্ভীর গর্জ্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, উপরের দিকে চাহিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "ঝড়ের লক্ষণ, চল ফিরি।"

উত্তর পাড়ে আসিয়া দেবনাথ হাত তুলিয়া উৎসুক প্রজাদের বুঝাইয়া দিলেন, লোক জুটিয়াছে অনেক, বুঝাইতে সময় লাগে।

তাহারা বলিল, "কাল খুব সকালেই আমরা আসবো।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "বল, খুব সকালে দরকার নেই, আটটার আগে এলেই হবে।"

দেবনাথ উচ্চস্বরে সে কথা বলিয়া দিলেন।

তখন কেহ মাটিতে পড়িয়া কেহ নত হইয়া কেহ হাত যোড় করিয়া কেহ বা হাত তুলিয়া যথাযোগ্য অভিবাদন ও সম্ভাষণ করিল। কৈকেয়ী দুই হাত যোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া মাথা নীচু করিয়া সমস্ত প্রজাকে নমস্কার করিলেন।

দেবনাথ বলিলেন, "আপনি গাড়ীতে উঠুন এবার।"

"এ টুকু হেঁটেই যাই, এতক্ষণ গাড়ীতে বসে থেকে যেন জড় হয়ে গেছি,।"

"আপনি যদি হেঁটে যান, প্রায় সব লোকই আপনার পিছন পিছন চলতে থাকবে, বারণ করলেও মানবে না, এ দিকে ঝড় এলো বলে।"

"তা সত্যি।"

কৈকেয়ীর গাড়ী কিছু দূর গেলে দেবনাথ গাড়ীতে উঠিলেন। লোক জন তখনও দাঁড়াইয়া, এইবার একে একে সরিতে আরম্ভ করিল।

নায়েব দেবনাথের গাড়ীতেই ছিল, প্রতিমার বাড়ীতে পৌছিয়া সে দেবনাথের কাছে দরকারী আদেশ উপদেশ লইয়া কাছারীতে চলিয়া গেল। গাড়ী দুখানাও কাছারীর গ্যারেজের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

কৈকেয়ী বলিলেন, "গিরি মিত্তিরকে আমি কিছু বুঝতে পারিনে, এটা-সেটা লেগে আছেই, সেবার ভাজন বিল থেকে মাছ ধরিয়ে নিলেন, যাক গে ছেলের বিয়ে বলে মাপ করলাম, তাই কি সাহস বেড়েছে? আমি তো কখনো তাঁর অনিষ্ট করি নি?

দেবনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "অনিষ্ট করেন নি তবে অপমান করেছিলেন।"

বিস্মিত হইয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "কই? মনে পড়ে না।"

"বাবার কাছে শুনেছিলাম।"

"কাকা? কি বলেছিলেন বল দেখি।"

"গিরিরাজের সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা হয়েছিল আপনি তাকে হাতী বলেছিলেন।"

"ওঃ" কৈকেয়ী একটু হাসিলেন, "সে কি আজকার কথা?"

"তিনি ভোলেন নি, বড্ড বেজেছিল মনে, নিজেকে কে না সুশ্রী ভাবে?"

"বেশ মনে করে রাখুন।"

"এবার তুমি হাত মুখ ধোও। আমি দেখি কি করছে ওরা।" [ক্রমশঃ

অদৃষ্টবাদ

...অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া আর অজ্ঞতা স্বীকার করা একই কথা, তাহা সকল সময়েই মনে রাখিতে হইবে এবং যাহাতে আমাদের কার্য্যের বিধানগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ বটে, এই হিসাবে আমরা ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পুতুল মাত্র, তাহা সত্য, কিন্তু আমাদের কার্য্যের রকম ও বিষয় বাছিয়া লইবার কর্ত্তা আমরাই, সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদেরই, তাহাতে ভগবানের কোন হাত নাই। তিনি আমাদিগকে কার্য্যের রকম ও বিষয় বাছিয়া লইবার যন্ত্র দিয়াছেন বটে, কিন্তু বাছিয়া লইবার কার্য্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না।

জগতের জাতীয় জীবন এবং স্ব স্ব জীবন পরীক্ষা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, মানুষ যখন আত্ম-শক্তি অর্জ্জনের উপায় সম্বন্ধে শৃঙ্খলার উপর বিশ্বাস হারাইয়া অদৃষ্টের দোহাই দিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার পতন সূচিত হয়। যে-জাতি অথবা মানুষ ভগবানের সৃষ্টির শৃঙ্খলার কথা স্মরণ করিয়া যত কম অদৃষ্টের দোহাই দেয়, তাহারাই তত উন্নতি হইতে থাকে।...

বহুরূপা সভ্যতা

—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমি গত মাঘ মাসের 'বঙ্গশ্রীতে' "সভ্যতা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, যখন জীববিকাশে দৈহিক পরিবর্ত্তন রুদ্ধ হইয়া যায় এবং মানসী শক্তির ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয়, তখনই মানুষ সভ্যতার পথে ধাবিত হইয়া থাকে। এই সভ্যতা মানুষের নৈতিক বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য, প্রেম, ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি বৃত্তির বিকাশধারার সহিত বৃদ্ধি পায়। আমাদের মতে মানুষের ধর্ম্মজ্ঞানও ঐরূপ প্রথমে ক্ষীণ ভাবে দেখা দেয় এবং পরে অনুশীলন দ্বারা ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে। সভ্যতার পথে প্রথম পদার্পণের পরই মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান অঙ্কুরিত হয় কিংবা কল্পনার একটু বিকাশ হইলেই মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে, সে বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান। ইহা যথাযথ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার সম্যক্ সুযোগ সভ্য মানুষের ঘটে নাই। কারণ, ঠিক মনের বিকাশপথে প্রথম যে মানুষ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেরূপ মানুষ কেহ দেখেন নাই। দেখিবার সুযোগও পান নাই। দেখিলেও কেহ তাহা বুঝিতে পারিতেন না। কারণ, সদ্যঃ-প্রকাশিত কল্পনা বা ধর্ম্মভাব তখন এতই ক্ষীণ থাকে যে, তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। বিশেষতঃ, যাঁহারা নিজ ধর্ম্ম-জ্ঞান হইতে পৃথক্ ধর্ম্মজ্ঞানকে কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের তাহা উপলব্ধি করিবার সাধ্য থাকিতে পারে না। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব এবং এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর অন্তরালে একটা চৈতন্যশক্তির বিদ্যমানতা, এই দুইয়ের কিছু ক্ষীণ এবং খণ্ডিত উপলব্ধি জন্মিলেই বুঝিতে হইবে যে সেই নরপশুর (man-animal) মনে ধর্ম্মভাবের অতি ক্ষীণ উন্মেষ হইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা মনে করেন যে, ভগবানের অথবা কতকগুলি দেবদেবীর পূজা করাই ধর্ম্মের লক্ষণ। আমরা তাহা মনে করি না। ধর্ম্মবুদ্ধি মানুষের মানস বৃদ্ধির অনুরূপই হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কখনই অনন্ত বিশ্বের এবং তাহার অন্তরালে অবস্থিত মহাশক্তির পূর্ণ অনুভূতি সম্ভবে না। সামান্য শিশির-বিন্দুতে গ্রহরাজ সূর্য্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা কখনই মহাসাগর-বক্ষে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের প্রতিচ্ছায়ার অনুরূপ বৃহৎ হইতেই পারে না। পরকাল সম্বন্ধে এবং বিশ্বচৈতন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অতি ক্ষীণ অনুভূতিই ধর্ম্মজ্ঞানের আদিম প্রকাশ। আদিম মানুষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিত্ত-মুকুরে ক্ষুদ্র এবং ব্যবচ্ছিন্ন-ভাবে ঐ জ্ঞানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছায়া পড়িয়াছে কি না, তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়।

সে অনুসন্ধান কেহ করে নাই। তবে এ পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় তথ্যানুসন্ধানকারীরা যতদূর সন্ধান পাইয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, সকল দেশের মানুষই তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ সমাহিত করিবার সময় মৃতব্যক্তির শবের সহিত তাহার পরলোকে যাত্রাপথের সম্বল স্বরূপ আহার্য্য বস্তু এবং ব্যবহার্য্য প্রিয় জিনিষ দিয়াছে। ইহাতে এই অনুমানই দৃঢ়ীভূত হয় যে, সভ্যতার প্রথম সোপানে যাহারা সবেমাত্র পদন্যাস করিয়াছে তাহাদের দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মে। প্রায় সর্ব্বত্রই সমাধিগহ্বরে যখন ইহা দেখা যায়, তখন এ বিশ্বাস যে সভ্যতাপথে প্রথম ধাবমান মানুষের মনে সার্ব্বজনীন হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। ফ্রান্সে এইরূপ প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রাপ্ত সমাধিগহ্বরে নরকঙ্কালের সহিত তাহার তীর ধনুক রক্ষিত হইত, ইহার নিদর্শন প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া গিয়াছে। যে যুগে মানুষ প্রথম দার্ষদ অস্ত্র ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল, ইহা সেই যুগের (Paleolithic age) সমাধি। তাহার পর মানুষ যখন দার্ষদ শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছিল (Neolithic age), তখন তাহারা সমাধি-মন্দিরের উপর বড় বড় প্রস্তর-নির্ম্মিত স্মৃতিমন্দির রচনা করিত এবং মৃত ব্যক্তির শবাধারে নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, পাত্র এবং অলঙ্কার রাখিয়া দিত, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দেহাতিরিক্ত পরলোকপ্রস্থিত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে তাহারা কখনই মৃত

আত্মীয়-বান্ধবের প্রিয় বস্তুগুলি তাহার শবের সহিত দিত না।

দ্বিতীয়তঃ এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর অন্তরালে যে, এক চৈতন্যময়ী মহাশক্তির খেলা চলিতেছে, এ বিষয়ে উহাদের একটা অস্ফুট এবং বাবচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত জ্ঞান ছিল না, তাহা মনে হয় না। কাহারও কাহারও বিশ্বেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান তাহাদের সভ্যতার তুলনায় অত্যন্ত উচ্চ অঙ্গের ছিল। টাহিটি দ্বীপের অধিবাসীদিগের ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, আধুনিক অনেক সুসভ্য জাতিরও ঈশ্বর সম্বন্ধে সেরূপ উন্নত জ্ঞান নাই। আমেরিকার আলগঙ্কুইন্ (Algonquin) জাতির পরমেশ্বর সম্বন্ধে উচ্চ অঙ্গের ধারণা ছিল। য়ুরোপীয়-গণ একথা স্বীকার করেন, ধর্ম্ম বা পরকাল সম্বন্ধে ধারণা-বর্জ্জিত কোন অসভ্য জাতি ধরাতলে নাই এবং ছিল না। সুতরাং ধর্ম্মজ্ঞান মানুষের প্রকৃতিপ্রদত্ত সহজাত বৃত্তি তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যখন সর্ব্বপ্রথম বন্য-ভাবাপন্ন মানুষের মনে প্রকৃতির অনন্ত গৌরবে ভাস্বর জবাকুসুমসঙ্কাশ বালভানু দর্শনে চমৎকার ভাবের উদয় হইয়াছিল, তখন তাহার মনে সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে কেবলমাত্র বিস্ময় জন্মিয়াছিল, না, তাহার ভিতর একটা পরিচ্ছন্ন চৈতন্যময়ী সত্তার অস্তিত্ববোধও অস্ফুটভাবে অনুভূত হইয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কারণ সে অবস্থায় সেই নবজীবনের সূতিকাগারে সদ্যোজাত সভ্যতা তাহাকে এমন বুদ্ধি বা এমন ভাষা দেয় নাই, যদ্দ্বারা সে তাহার অননুভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভাব বিশ্লিষ্ট করিয়া ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে। সে ঝোপে ঝোপে ভূত দেখে, গাছে গাছে আত্মিক শক্তির কল্পনা করে,—সেইজন্য আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তাহার ধর্ম্মকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু তাহার সেই ধর্ম্মজ্ঞান যে তাহার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অনুরূপ ভাবে তাহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। দূর্ব্বাদললগ্ন শিশিরকণা অতিক্ষুদ্র, তাহাতে প্রতিফলিত প্রভাকরের প্রতিবিম্বও অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিবিম্বে সমুজ্জ্বল ক্ষুদ্র শিশিরকণা যে একটা গৌরব লাভ করে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। সেইরূপ ধর্ম্মজ্ঞানের আলোক আদিম যুগের মানুষের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইলে তাহার গৌরব বৃদ্ধি পায়, সে অপেক্ষাকৃত দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হয়। সেইজন্য প্রাচীন হিন্দুরা বলিয়া গিয়াছেন যে, যদ্দ্বারা অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের সিদ্ধি হয় তাহাই ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্মজ্ঞানের উন্মেষ পশুবৎ-মানবের (man-animal) হৃদয়ের অন্যান্য জ্ঞানের পূর্ব্বে উদিত হইয়াছে কি না, তাহা বুঝা কঠিন, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কাজেই, সে বিষয়ে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে এদেশের ঋষিদিগের সিদ্ধান্ত যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ধর্ম্মজ্ঞানই অন্য জ্ঞানের পূর্ব্বে মানব-প্রকৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া মনুষ্য-প্রকৃতিতে দয়া, সহানুভূতি, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি বৃত্তিনিচয় উন্মেষিত হইয়া মানুষকে উন্নতির পথ ধরাইয়া দিয়াছে। জ্ঞান বা বিচারবুদ্ধি পরে উন্মেষিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন যে, "মানুষের মন সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞান বা বুদ্ধি (intellect) বিকশিত হইয়া পরে ব্যভিচারী হয়। জ্ঞান ভুল পথে ধায়। তাই আদিম মানবের মানসক্ষেত্রে উদ্ভূত জ্ঞান প্রভঞ্জনের প্রবল শক্তি, অগ্নির প্রবল দাহিকা-শক্তি, জলের প্লাবন-শক্তি প্রভৃতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায় এবং সেই বিস্ময়ের ঘোরে সে এইরূপ অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকে যে, ঐ সকল জড় শক্তির পশ্চাতে একটা ব্যক্তিগত শক্তির মত শক্তি আছে। ঐ জ্ঞান ঠিক প্রকৃতি-প্রদত্ত নহে। কারণ, উহা প্রকৃতিপ্রদত্ত হইলে উহা ব্যভিচারী বা ভ্রান্ত হইত না।" এ যুক্তি নিতান্তই অসার। কারণ, যাহা প্রকৃতিপ্রদত্ত তাহা যদি ব্যভিচারী না হইত, তাহা হইলে জ্ঞান কখনই ভ্রান্ত পথে চালিত হইত না; দয়া মায়া করুণা প্রভৃতি প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রকৃতিগুলিও অস্থানে পতিত হইত না। একথা তখনই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃতি যখন মানুষকে কিছু স্বাধীনতা দিয়াছেন, তখন তাহাকে ভুল করিবার অধিকারও দিয়াছেন। তাহা না দিলে যে স্বাধীনতার কোন মূল্যই থাকে না। সুতরাং, যদি ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, ধর্ম্মজ্ঞান প্রকৃতি-প্রদত্ত একটা স্বতন্ত্র বৃত্তি, তাহা হইলে উহা ব্যভিচারী হয় বলিয়া যে উহা প্রকৃতিপ্রদত্ত নহে, এ সিদ্ধান্ত সত্য

আছে। প্রকৃতি মানুষকে আত্মোন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে যে সকল বিশেষ অধিকার দিয়াছেন, তাহা সমস্তই ভ্রান্তপথে চালিত হয়। মানুষ ভ্রান্তির ভিতর দিয়া সত্যের সন্ধান পায়। বুদ্ধির ভুলে মানুষ ইচ্ছাশক্তিকে ভ্রান্ত পথে চালিত করিয়া স্বয়ং কষ্ট পায় এবং পরকে কষ্ট দেয়। ভুলের ভিতর দিয়া সত্যে উপনীত হইবার পথ স্ব-প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পথ। মা ছেলের হাত ধরিয়া তাহাকে হাঁটিতে শিখান। কিন্তু সন্তানের অভিজ্ঞতা জন্মাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে হাত ছাড়িয়া দিয়া শিশুকে চলিতে বলেন। শিশু স্বাধীনভাবে চলিতে যাইয়া টলিয়া টলিয়া পড়িয়া যায়। তাহার অনেক বেদনা লাগে। কিন্তু তাই বলিয়া স্নেহময়ী জননী তাহাকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করিবার সুযোগ দান করিতে কৃপণতা করেন না। ভ্রান্তি অনর্থক নহে। উহার সার্থকতা আছে। সেইজন্য হিন্দুরা বলেন "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।" অর্থাৎ মহাশক্তি ভ্রান্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজমানা। অতএব ধর্ম্মজ্ঞান যদি কোথাও ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও উহা প্রকৃতি-প্রদত্ত একটা বৃত্তি, তাহা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই।

য়ুরোপীয়গণ, বিশেষতঃ খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী প্রভৃতিরা, আদিম মানবের animism ধর্ম্মটি যতটা ভ্রান্ত মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে উহা ততটা ভ্রান্ত নহে। উহা আদিম অবস্থার অসম্পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞান মাত্র। খৃষ্টধর্ম্ম ঈশ্বরকে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের অধিকাংশেরই ধারণা, ঈশ্বর হইতে তাঁহার সৃষ্ট জগৎ ভিন্ন। তিনি যে বিশ্বরূপ একথা তাঁহারা মনে করিতে পারেন না। কাজেই তাঁহারা animism এবং pantheism-কে ভ্রান্ত মনে করিয়া থাকেন। য়ুরোপের ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টানগণ যে মত পোষণের জন্য জর্দ্দেনো ব্রুনোকে ষোড়শ শতাব্দীতে অশেষ কষ্ট দিয়া জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছিলেন, আজ বিংশ শতাব্দীতে বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকই সেই মত পোষণ করিতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রুনো প্যান্থিজম্ বা অদ্বৈতবাদকে সমর্থন করিয়াই এই শাস্তি পাইয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এখন কেহ কেহ এই সর্ব্বব্রহ্মবাদী। কিন্তু আমার বিশ্বাস বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমস্ত বৈজ্ঞানিকই ঐ মতের সমর্থন করিবেন। ব্রুনোর মত কি, তাহা আমি পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।* যখন মানুষের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ এবং পশুর জ্ঞানের মত সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তাহারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই বা অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডই চৈতন্যময় এই ধারণা করিতে পারে না ; সেই জন্য সেই অখণ্ড চৈতন্যশক্তিকে খণ্ডিত কল্পনা করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা জ্ঞানকে নিসর্গদত্ত বলিয়া মনে করেন,—কিন্তু সেই জ্ঞানও অনেক ভ্রান্তির ভিতর দিয়া বিকাশ লাভ করে। শিশু চাঁদ ধরিবার জন্য হাত বাড়ায়। দূরত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের অভাবই তাহার ভ্রান্তির কারণ। কিন্তু ঐ ভ্রান্তির ভিতর দিয়াই তাহার দূরত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। সুতরাং ধর্ম্মজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি আদৌ ব্যবচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত হয় বলিয়া উহা নিসর্গজ নহে, ইহা মনে করা প্রকাণ্ড ভুল। সাধারণ জ্ঞানের ও বিচারবুদ্ধির ন্যায় আধ্যাত্মিক অনুভূতিও ভ্রান্তির ভিতর দিয়া ক্রমশঃ সত্যের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। দয়া, করুণা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি কালক্রমে ঐরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সেই অজুহাতে উহাকে মিথ্যা বলা যায় না। পাশ্চাত্য মতে মানুষের ধর্ম্মান্ধতাই ধর্ম্মজ্ঞানের দারুণ বাধাস্বরূপ হইয়াছে। সর্ব্বত্র চৈতন্যশক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান, এই জ্ঞান খৃষ্টধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া ধর্ম্মযাজকগণ সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্য ব্রুনোকে অতিশয় নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ধারণা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসম্মত। [ব্রুনো ঐ মত আরব দেশের বিখ্যাত চিকিৎসক অবরজের (Averrves) নিকট হইতে লইয়াছিলেন। অবরজ সম্ভবতঃ ভারত হইতে ঐ মত গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ব্রুনো ছিলেন ইটালীর অধিবাসী। তিনি তাঁহার স্বাধীন মতের জন্য ইনকুইসিশন (inquisition) কর্ত্তৃক

*"There is an intellect which animates the universe and of this Intellect the visible world is only an emanation or manifestation originated and sustained by force derived from it and were that force withdrawn, all things would disappear. This ever-present, all-pervading Intellect is God who lives in all things even such as seems not to live ; that everything is ready to become organised, to burst into life. God is therefore 'the Sole Cause of things' 'the All in All.'
Dooper—
"Conflict between Religion and Science", P. 179

জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের সার জেম্‌স্ জীন্স যদি সেই যুগে জন্মিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও নিশ্চয়ই ঐভাবে নির্য্যাতিত এবং দগ্ধ হইতে হইত। য়ুরোপীয়েরা এইরূপ কঠোর হস্তে ধর্ম্মমত প্রচারে বাধা দিয়াছে বলিয়া আজ তথায় ধর্ম্মহীনতার কবন্ধ সর্ব্বত্র তাণ্ডব করিতেছে। ফলে য়ুরোপে রাজনৈতিক এবং সাংসারিক জীবন অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছে। আজ য়ুরোপে যে এত মারামারি আর কাটাকাটি উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কারণ তথায় ধর্ম্মজ্ঞান অবাধে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই। ইদানীং একদল লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ধর্ম্মবিশ্বাসই জ্ঞানের বাধক। প্রাচীন গ্রীসে পরোপচিকীর্ষা প্রবৃত্তিকে এবং মানব-প্রেমকে বিশেষ উচ্চ স্থান দেওয়া হয় নাই বলিয়া তথায় ধর্ম্মজ্ঞান আহত হইয়া ঐ স্থান ত্যাগ করে। তথাকার লোক প্রেমের পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরতাকেই শৌর্য্যের জন্য আবশ্যক বলিয়া উচ্চ স্থান দেওয়া হয় এবং দয়া দাক্ষিণ্য, পরোপচিকীর্ষা প্রভৃতি ধর্ম্মের পোষক গুণগুলি অনাদৃত হইত বলিয়া ধর্ম্ম সঙ্কুচিত, কলুষিত এবং বিকৃত হইয়া যায়।

যাহা হউক, ইহা আমরা মনে করি যে, ধর্ম্মজ্ঞান মানুষের সহজাত। ভারতীয় সভ্যতা এই ধর্ম্মজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই সভ্যতা যে কোন্ সময়ে প্রথম উন্মেষিত হইয়াছিল, তাহা এপর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। জার্ম্মান অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ঋগ্বেদ খৃষ্টপূর্ব্ব দেড় হাজার বা দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে বলিয়া যে ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিতই ভারতীয় সভ্যতার উদ্ভবকাল সম্বন্ধে ভুল সিদ্ধান্ত করিয়া চলিতেছেন। বাইবেলের মতে এই পৃথিবী প্রায় ৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে এবং নোয়ার আমলে জল-প্লাবনে সমস্ত পৃথিবীর জীবকুল যে ধ্বংস হইয়া যায় তাহা চারি হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। এই মত বহুদিন ধরিয়া পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকে ভ্রান্ত পথে চালিত করিয়া আসিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদেও ভূবিজ্ঞান এই ধরিত্রীর বয়স মাত্র ৬ হাজার বৎসর ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান সে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু মানুষ সহজে তাহাদের বহুপুরুষের সংস্কার ছাড়িতে পারে না। সেই জন্য য়ুরোপীয় জাতিরা মনে করেন যে, পৃথিবীর কোন দেশের সভ্যতাই চারি হাজার বৎসরের অধিক পুরাতন হইতে পারে না। ম্যাক্সমুলার ঐরূপ ভ্রান্ত সংস্কারের বশেই ঋগ্বেদের রচনার সময় চারি হাজার বৎসর অপেক্ষা পুরাতন নহে সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক নাক্ষত্রিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে, ঋগ্বেদের বয়স অন্ততঃ সাত হাজার বৎসরের কম নহে।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ হিউগো উইন্‌খেলার খৃষ্টপূর্ব্ব ১৩৬০ বৎসরের পুরাতন একখানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত করিয়াছেন, উহাতে মতন্নী (Matanni) রাজগণের সহিত হেট্টিটে (Hettites) রাজগণের এক সন্ধির কথা উৎকীর্ণ আছে। ঐ সন্ধিপত্রে বেবিলোনিয়ার দশটি দেবতার নামের সহিত চারিটি বৈদিক দেবতার নাম উৎকীর্ণ আছে। ঐ চারিটি দেবতার নাম : বরুণ, মিত্র, নাসত্য এবং ইন্দ্র। ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, প্রায় সাড়ে ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এসিয়া মাইনরে বৈদিক দেবগণ পূজা পাইতেন। মিটাণী রাজগণের মধ্যে সুতর্ণ, দশরথ, আর্ত্তত্তম নাম ভারতীয় নামের সহিত একত্ব প্রতিপাদক। ফলে ভারতীয় সভ্যতা যে চারি পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ ঐরূপ ভারতীয় দেবগণের নামসম্বলিত যে কয়খানি প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে তাহা যেদিন উৎকীর্ণ হইয়াছিল, সেই দিনই যে বৈদিক দেবগণ তথায় পূজা পাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা মনে করা যাইতে পারে না। বোগাজকৈ (Boghagkoi) নামক স্থানে আর একখানি শাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে যে অঙ্ক উৎকীর্ণ আছে তাহার উচ্চারণ সংস্কৃত উচ্চারণের ন্যায়। ফলে ম্যাক্সমুলারের ঋগ্বেদের কাল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত, তাহা তথ্যদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। ভারতীয় সভ্যতা বহু প্রাচীন। সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় সভ্যতা ধর্ম্মরূপ বনস্পতিকে আশ্রয় করিয়া গজাইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মই এই সভ্যতাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে। আর ঐ সভ্যতাই সমস্ত প্রাচ্য সভ্যতাকে অনুপ্রেরিত করিয়াছে।

কিন্তু প্রতীচ্য সভ্যতার রূপ স্বতন্ত্র। এই সভ্যতা বিকাশের আদি যুগে উহা ধর্ম্মভাবে প্রভাবিত ছিল। তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে উহা ভিন্ন ভাব

ধারণ করে। প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে পাশ্চাত্ত্য খণ্ডের লোকের প্রকৃতি অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ক্ষমতা এবং প্রভুত্বলাভের সহিত স্বেচ্ছাচারিতা মিলিত হইয়া তাহাদের সেই পরিবর্ত্তিত প্রকৃতির বিকৃতি ঘটায়।

সেই বিকৃত প্রকৃতির কল্পনা-বলে গ্রীক জাতি তাহাদের দেবতার যে-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত হীন। হোমার এবং হেসিয়ড (Hesiod) গ্রীক দেবতার যে চরিত্রের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সে দেবপ্রকৃতিকে কথনই স্বর্গীয় বলিয়া কল্পনা করিতে পারা যায় না, তাহা নারকীয় বলিলেই ভাল হয়। গ্রীক সমাজের লোকদিগের যত কিছু কুবৃত্তি ছিল, তাহা সমস্তই তাহাদের দেবতায় প্রতিবিম্বিত ছিল। গ্রীক দেবতা হার্ম্মিস (Hermes) বাক্‌পটুতায়, শঠতায় এবং চুরি করিবার প্রবৃত্তিতে অতিশয় কলুষিত ছিলেন। গ্রীক রণ-দেবতা এরেস (Ares) অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। ইনি কেবল বিবাদ-বিসম্বাদ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন এবং অতি ভীষণ নিষ্ঠুরতা প্রকটিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। ইহার ভগিনী ইরিস (Eris) ভ্রাতার সর্ব্ববিধ লালসাতেই ইন্ধন যোগাইতেন। গ্রীক কাম-দেবের (Cupid) জননী এফ্রো-ডাইট প্রেমের নামে যৌন-লালসায় অনেক ইন্ধন যোগাইতেন। একজন বিশিষ্ট য়ুরোপীয় লেখক লিখিয়াছেন যে, গ্রীকদিগের কল্পিত দেবতারা সর্ব্বপ্রকার কুকর্ম্মের আধার ছিলেন।১ যাহারা ঐ দেবচরিত্রকে আদর্শ করিয়া চলিত, তাহারা যে অচিরকাল মধ্যে আধ্যাত্মিক পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাচীন গ্রীকরা নীতি-জ্ঞান বর্জ্জিত ছিলেন। গ্রীকদিগের মধ্যে কোন নৈতিক নিয়ম বা বিধি-নিষেধ ছিল না, সেই জন্ত তাঁহারা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের এই বিকৃত দেববাদ এবং নৈতিক নিয়মের অভাব প্রাচীন রোমকদিগের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাই পাশ্চত্ত্য-খণ্ডে ধর্ম্মের ঘোর অবনতি ঘটে। খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়াতে তাহার বিশেষ উপশান্তি ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা তেমন দৃঢ় হয় নাই। জড়বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আধ্যাত্মিক ভাবের তথায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঘোর অবনতি ঘটিয়াছে। তাই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ভিন্নরূপ ধরিয়াছে। তাহার ফলে তথায় বুদ্ধির এবং হ্লাদিনী বৃত্তির (æsthetic faculties) যেরূপ উৎকর্ষ ঘটিয়াছে, আধ্যাত্মিকতার সে রূপ উৎকর্ষ ঘটে নাই। তাই আজ তথায় দাবানলের ন্যায় দিকে দিকে অশান্তির অনলশিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে, কোন্ উপায়ে উহার নিবৃত্ত করা যায়, তাহা কেহ ভাবিয়া পাইতেছেন না। ইহা আধ্যাত্মিকতার অভাবের বিষফল। সভ্যতার একরূপ বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি মানবসমাজকে মথিত করিতেছে। অধুনা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-গণ বুঝিয়াছেন যে, এই সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক। কিন্তু কি ভাবে সেই উৎকর্ষ সাধন করা হইবে, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, বিকাশের ধারা পরি-বর্ত্তনের ফলে ভারতীয় সভ্যতার এবং সংস্কৃতির সহিত য়ুরোপীয় সভ্যতার বিশেষ প্রভেদ ঘটিয়াছে। এখন আমাদের পক্ষে অবিচারিতভাবে পাশ্চত্ত্য সভ্যতার অনুসরণ করা কোনক্রমেই সঙ্গত হইবে না। উহা করিলে ভারতীয়-গণের আত্মহত্যা করা হইবে। যত দিন ধরাপৃষ্ঠে জীবের কেবল দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, ততদিন মধ্যে মধ্যে এরূপ দেহধারী অনেক জীবের উদ্ভব হইয়াছিল, যাহারা বাহ্যপ্রকৃতির সহিত আপনাদিগের অবস্থার সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে নাই বলিয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে; সভ্যতা সম্বন্ধেও ঐরূপ হইতেছে। কোন কোন সভ্যতা উত্থিত হইয়া আবার বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং কেবল বাহ্য আকার দেখিয়া কোন সভ্যতার অনুকরণ করা সঙ্গত নহে।

১ Upon the whole then we must admit that Greek mythology indicates a barbarian social state, manstealing, piracy, human sacrifice, polygamy, cannibalism, and crimes of revenge that are unmentionable.—Draper's "Intellectual Development of Europe" vol. 1, p. 43 and "Encyclopœdia Brittanica 9th Edition" Vol. XII, p. 112.

ভারতীয় নাট্যশালা

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভারতের নাট্যকলার ইতিহাস খুবই প্রাচীন, আর উহা বড়ই রোমাঞ্চকর। উহার জন্ম দেবলোকে এবং সেখানেই উহার প্রসার। ক্রমে মর্ত্তে উহার প্রচলন হয়।

কথিত হয় যে, পুরাকালে ব্রহ্মা ইন্দ্র (শক্র) কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য নাট্যবেদ প্রণয়ন করেন, ইহাই পঞ্চম বেদ নামে অভিহিত হয়। বেদের ন্যায় উপবেদও চারিটী এবং গান্ধর্ব্ব বেদ (নাট্যবেদ—গান—ধর্ম্ম যাহার) ব্রহ্মা (স্বয়ম্ভূ) শিবের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করেন। ভরত মুনি আবার ব্রহ্মার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া মর্ত্তধামে প্রচার করেন। এই জন্যই শিব, ব্রহ্মা এবং ভরত, এই তিনজনই নাটকের প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। জগৎপতি শিব নাট্যবেদের আদি শিক্ষাদাতা বলিয়া শাস্ত্রকারগণ শিবকে নটরাজ, নটেশ ও নটনাথ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'সঙ্গীত-বিদ্যাবিনোদ' এবং 'নন্দিকেশ্বর কাশিকা'তে তিনি (শিব) মহানট ও আদিনট নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা শিবের নিকটে নাট্যবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইন্দ্রের প্রার্থনায় দেবগণের মনোরঞ্জনার্থ ইহার পরিচয় দিতে নিমন্ত্রিত হন। সেই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা যে নাট্যবেদ প্রণয়ন করেন, তাহাতে ঋগ্বেদ হইতে ভাষা বা আবৃত্তি, সামবেদ হইতে সঙ্গীত, যজুর্ব্বেদ হইতে চতুর্ব্বিধ অভিনয়াঙ্গ এবং অথর্ব্ববেদ হইতে রস ও ভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

সঙ্কল্প্য ভগবানেবং সর্ব্বান্ বেদানুস্মরণ্।
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্ব্বেদাদি সম্ভবম্।

ভরত, নাট্যশাস্ত্র।

অতঃপর ব্রহ্মা ভরত মুনিকে এই বিদ্যায় শিক্ষিত করেন। অতএব দেখা যায়, হিন্দুর নাট্যকলার মূলে দেবপ্রসঙ্গ বিজড়িত। গ্রীক নাটকের মূলেও এইরূপ প্রাচীন আখ্যান বিদ্যমান ছিল। তাহাদের Bacchus দেবতার উপলক্ষে যে সকল স্তবাদি গীত হইত, উহা হইতেই তাহাদের নাটকের উৎপত্তি। মূল প্রায় একরূপ হইলেও ভারত ও গ্রীস উভয় দেশের নাট্যকলাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় প্রবর্ত্তিত। কোন বিষয়েই—কি গঠন-প্রণালীতে, কি ভাবে, কি ভঙ্গীতে গ্রীক নাটকের সহিত ভারতীয় নাটকের কোন সম্বন্ধ নাই। এমন কি 'যবনিকা' শব্দটিতেও গ্রীক-প্রভাব প্রতিপন্ন হয় না।

ইন্দ্রধ্বজার (বা জর্জরের) সহিত ভারতীয় নাট্যকলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ খুবই বিদ্যমান ছিল। অসুর-বিজয়ের পরে দেবরাজ ইন্দ্র একটি উৎসবের আয়োজন করেন। উৎসব-প্রাঙ্গনে ইন্দ্রের ধ্বজার প্রতিষ্ঠা হয় এবং উহার সম্মুখে দেবাসুর যুদ্ধের অনুকরণে একটি যুদ্ধের অভিনয় হয়। দেবগণ এই অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন।

এই অভিনয়-আখ্যান ভারত-নাট্যশাস্ত্রে নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে :—

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া ভরত দেবগণকে নাট্যবেদে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দেন এবং তৎপরে তিনি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া অভিনয় দেখাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মাও অনুমতি প্রদান করিয়া বলেন—

"বৎস, অভিনয়ের প্রকৃত সময় উপস্থিত, মহেন্দ্র (ইন্দ্র) প্রবর্ত্তিত জর্জরোৎসব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে। এই উৎসবে তোমাকে নাট্যবেশপ্রদর্শন করিতে হইবে।"

ভরত—তথাস্তু।

ইন্দ্রের সভায় এই বিজয়সূচক ধ্বজোৎসব আরম্ভ হইল, দেবগণ সমাগত হইলেন। ব্রহ্মার আদেশ পাইয়া ভরত-ঋষি প্রথমেই "নান্দী" রচনা করেন। এই নান্দী অত্যন্ত মনোরম, —বেদ সংগৃহীত এবং অষ্টাঙ্গসংযুক্ত। তৎপরে দেবগণ কর্ত্তৃক অসুরগণ যেরূপে নিগৃহীত ও পরাজিত হইয়াছিল, ভরত তাহার অনুকরণ-যুদ্ধ প্রদর্শন করেন।

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ অভিনয় দেখিয়া এত আনন্দিত হন যে, অভিনয়ের পরে অভিনয়ের জন্য সংগৃহীত উপকরণাদি ভরতের শত পুত্রকে উপহার দেন। প্রথমেই ইন্দ্র তাঁহার ধ্বজটী (জর্জর) প্রদান করেন। কিন্তু দৈত্যদানবগণ

অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং অতঃপর অভিনয় আরম্ভ হইলেই দানব-সেনাপতি বিঘ্নরাজ সৈন্যসামন্ত হইয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—

"আমরা এরূপ অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ করি, এই অপমান আমরা নিরাপত্তিতে সহ্য করিব না। তোমরা হয় ইহা বন্ধ কর, নতুবা যথার্থ যুদ্ধে আবার আমাদের সম্মুখীন হও।"

কিন্তু দেবগণ বিজয়গর্ব্বে উল্লসিত, তাঁহারা এ সকল কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। এদিকে অসুরগণও নিষ্ক্রিয় রহিলেন না। তাহারা মায়াবলে অদৃশ্য থাকিয়া রঙ্গপীঠস্থ অভিনেতৃগণের কথোপকথন, গতিবিধি ও স্মৃতিশক্তি একেবারে অসাড় করিয়া ফেলিলেন। তখন সকলেই জিজ্ঞাসু হইল যে, ইন্দ্রের সভায় এই বিঘ্ন জন্মিবার কারণ কি, আর কেনই বা সূত্রধার এবং তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিগণের এরূপ বিভ্রম জন্মিয়াছে? তৎক্ষণাৎ ইন্দ্র ধ্যানস্থ হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে রঙ্গপীঠে নানারূপ বিঘ্নের সমাগম হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার অমোঘ ধ্বজটী (জর্জ্জর) গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেহ তখন নানাবিধ রত্নরাজির কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং নয়নও রোষকষায়িত হইল। স্বল্পকাল মধ্যেই অমিতবলশালী ইন্দ্র তাঁহার এই জর্জ্জরের সহায়তায় সমস্ত বিঘ্নকে রঙ্গচক্র হইতে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করিয়া দিলেন। রঙ্গমঞ্চ নিরাপদ হইল।

দানব ও দেবগণ এইরূপে অপসারিত হইলে দেবতাগণ হৃষ্টচিত্তে সমস্বরে ইন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন—

"অহো সাধু, আপনার কি অমোঘ দিব্য অস্ত্র! আপনি এই অস্ত্রের সহায়তায় সমস্ত বিঘ্ন বিতাড়িত করিয়া রঙ্গভূমি নিষ্কণ্টক করিলেন। আজ হইতে এই অস্ত্র জর্জ্জর নামে অভিহিত হউক, এবং আর কোন বিঘ্ন অনাহুত থাকিলে এই অস্ত্র দর্শনে তাহাও নিধনপ্রাপ্ত হইবে।"

শক্র (ইন্দ্র) উত্তর করিলেন, "হাঁ তাহাই হউক, হে দেবগণ, বিঘ্ন-বিনাশন এই জর্জ্জরই আজ হইতে সমস্ত বিঘ্ন বিনাশের মূল বা হেতু হউক।"

অতঃপরে জর্জ্জরের পূজার অনুষ্ঠান হয়। ইহার অর্থই এই যে কি প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে যেন কোন উৎসবাদিতে কোন বিঘ্ন না জন্মে। বস্তুতঃ এই ঘটনা হইতেই জর্জ্জর পূজার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। কলিকাতায় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের অনুষ্ঠিত অভিনয়ের পূর্ব্বে কয়েক বৎসর হইতেই জর্জ্জরের উৎসব অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে জর্জ্জরের পূজাবিধিও নির্দ্দিষ্ট আছে। উৎসবের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে ইন্দ্রধ্বজ মন্ত্রঃপূত করিয়া নাট্যশালায় প্রোথিত করা হইত। উৎসবের দিন প্রথমে সমস্ত দেবদেবীর পূজার পরে জর্জ্জরের পূজা করা হইত। জর্জ্জরের পাঁচটি পর্ব্বে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিকেয় ও নাগের অধিষ্ঠান হয় বলিয়া কথিত আছে। ধ্বজের প্রথম পর্ব্ব শ্বেতবস্ত্রে, দ্বিতীয় পর্ব্ব নীলবস্ত্রে, তৃতীয় পর্ব্ব পীতবস্ত্রে, চতুর্থ পর্ব্ব রক্তবস্ত্রে, এবং পঞ্চম পর্ব্ব বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রে অঙ্কিত করা হইত।

যবনিকা উত্তোলিত হইলেই সূত্রধার দুইজন অনুচর সহ পুষ্পাঞ্জলি হস্তে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতেন। জর্জ্জর ও বাদ্যযন্ত্রগুলি পুষ্পদ্বারা ভূষিত হইলে সূত্রধার নান্দীপাঠ করিতেন।

নান্দীপাঠ সমাপ্ত হইলে, সূত্রধার আটটী বা দ্বাদশটী বাক্য উচ্চারণ করিতেন। প্রত্যেক বাক্য উচ্চারিত হইবার পর অনুচরদ্বয় বলিতেন "এবমুত্তার্য্য"—আর্য্য তাহাই হউক। অতঃপরে ঐক্যতানবাদন দ্বারা জর্জ্জরস্তুতি সমাপন হয়।

অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, রঙ্গভূমির মঙ্গল কামনায়ই অভিনয়ের পূর্ব্বে জর্জ্জরপূজা একটি অবশ্য-অনুষ্ঠেয় কার্য্য। উহা নাট্যকলার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই ধ্বজোৎসব কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন আকারে প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডের May Pole উৎসব ঠিক ইহারই অনুরূপ। শুষ্ক নীরস শীতঋতুর অবসানে বসন্তাগমে গ্রামবাসীরা একত্র হইয়া বৃহৎ এক বৃক্ষ কাটিয়া আনন্দের সহিত ইচ্ছানুরূপ নানাভাবে সুসজ্জিত করিয়া পল্লীর কোন প্রকাশ্য স্থানে উহা স্থাপন করে। পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা নানা পরিচ্ছদে ঐ রোপিত বৃক্ষের সম্মুখে সমাগত হয় এবং হাসিগল্প, নৃত্যগান, পানাহারে সমস্ত দিনটি অতিবাহিত করে। বন্ধু বন্ধুর সহিত মিলিত হয়, প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পর পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া সহাস্যমুখে উৎসবের আনন্দে নিমগ্ন হয়, সমগ্র পল্লী আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে—সর্ব্বত্রই উৎসাহ ও উল্লাস দৃষ্ট হয়।

ভারতের পক্ষেও প্রাবৃটের ঘনঘটা ক্লেশাবহ। শরদাগমে পৃথিবী আবার শ্যামশোভা ধারণ করে। স্রোতস্বিনী স্বচ্ছতোয়া হয়, আকাশ মেঘমুক্ত হয়, প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে প্রাণ সজীব হইয়া উঠে। তাই মেঘরূপ বিঘ্ন-বিদারী ইন্দ্রের উদ্দেশে এখনও অনেকস্থানে ধ্বজারোপণ হয়। শরৎকালে অনেকস্থলে নাট্যকলারও চর্চ্চা চলিয়া থাকে। তাই মনে হয়, এই ধ্বজারোপণও জর্জ্জরেরই অনুরূপ। নেপালে এখনও ইন্দ্রযাত্রাই প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য। তবে সেখানে ধ্বজাপ্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে উর্দ্ধবাহু ইন্দ্রমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

যাহা হউক, ভরতমুনি 'দেবাসুর-সংগ্রাম' এবং 'সমুদ্র-মন্থন' এই উভয় দৃশ্যের অভিনয় করিয়া দেবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তৎপরে গিরিপুরে পার্ব্বতীর পরিণয়োপলক্ষে ভরত-প্রণীত "ত্রিপুরদাহ" নাটকের অভিনয় হয়। মর্ত্তে নাট্যকলার এই প্রথম প্রচার আর স্বয়ং মহানট শিব বররূপে এই অভিনয়ের দর্শক। এরূপ সুযোগ নাট্যকলার ভাগ্যে অভাবনীয়।

এ পর্য্যন্ত নাটকে নৃত্যের কোনও স্থান ছিল না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যার যিনি আদর্শ, সেই সত্য-শিব-সুন্দর কি তাহা অনুমোদন করিতে পারেন? দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংসের পরে সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া ভোলানাথ যে অলৌকিক অপূর্ব্ব প্রেমনৃত্যের অভিনয় করিয়াছিলেন, কখনও নানা দেবতার রূপ ধারণ করিয়া, কখনও বিচিত্র ভঙ্গীতে গীতবাদ্যের সহিত, সেই সকল অনুপম নৃত্যরহস্য ও বাদ্য নাটকের অঙ্গীভূত করিবার জন্য তিনি শিষ্য তণ্ডুকে আদেশ প্রদান করেন। এইরূপে নাটকে তাণ্ডবনৃত্যের প্রবর্ত্তন হয়। কিন্তু এই নৃত্য সময় সময় অত্যন্ত প্রচণ্ড।

সুতরাং নাটকে সুকুমার নৃত্যের কথাও ভোলানাথ বিস্মৃত হইলেন না। তাই নিজের সম্বল দিয়া অতঃপর নাট্যকলাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য মহামায়ার প্রতিও ইঙ্গিত করেন। ভগবতীও বাণরাজকন্যা উষা এবং তাঁহার সঙ্গিনীগণকে কতকগুলি সুকুমার নৃত্যের প্রবর্ত্তন করিতে আদেশ করেন। এই সুকুমার নৃত্য বা লাস্যকলা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন স্বয়ং নটেন্দ্রাণী শঙ্করী। উষাকেই তিনি এই নৃত্যশিক্ষা দিয়াছিলেন। উষার নিকট হইতে গোপিনীগণ এই নৃত্য শিক্ষা করে। ক্রমে উহা সৌরাষ্ট্র এবং পরে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়।

নৃত্য প্রবর্ত্তিত হইবার পরে মুনিরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৃত্য তো উপাখ্যানের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করে না, তবে উহার কি প্রয়োজন?—এ-বিষয়ে অভিনয়ই তো যথেষ্ট।"

তাহাতে ভরত উত্তর করেন—"হাঁ তা হয় না বটে; তবে নৃত্যে অভিনয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।"

বস্তুতঃ নৃত্যকলার প্রবর্ত্তনের পরেই অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। নৃত্য অভিনয়ের একটি প্রধান অঙ্গ। নট, নাটক, নৃত্য সবই 'নৃত্' ধাতুর রূপান্তর মাত্র। আর যিনি নাট্যশাস্ত্রের প্রণেতা, যাহার অনুকম্পায় মর্ত্তে নাট্যকলা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, নৃত্য, নাটক ও নাট্যকলা সেই ভরত ঋষির নামের সহিত ওতপ্রোতভাবেই জড়িত। ভরত এই শব্দটি, ভ—ভাব, র—রাগ ও ত—তান এই তিন অক্ষরের সমষ্টি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই ভাবসংযুক্ত গানই নাট্য-বেদের প্রথম ভিত্তি, এবং ক্রমে উহা নৃত্যের সহিত পরিস্ফুট হইয়াছে।

কেন সঙ্গীত ও নৃত্য নাট্যকলাকে এত হৃদয়গ্রাহী করিতে সমর্থ হইয়াছে সকলেই বুঝিতে পারেন। কাহার প্রাণ সঙ্গীতে না দ্রব হয়? আর নৃত্যের প্রভাব কে না উপলব্ধি করিয়া পারেন? দেবরাজ ইন্দ্র অপ্সরাগণের নৃত্যের সহায়তাই বিশ্বামিত্রের ন্যায় তপোরত ঋষিরও তপোভঙ্গ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যবিরোধী কঠোর বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ সরস্বতীও মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন—তাঁহার মুখে হরিনাম উচ্চারিত হয়—

> দেখিয়া প্রভুর নৃত্য দেহের মাধুরী
> শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বলে হরি হরি॥
>
> চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা।

বাদ্য আবার নৃত্যের প্রধান সহায়। এই নৃত্য, গীত ও বাদ্য অভিনয় কলার প্রধান অঙ্গ এবং ইহাদের সকলের সহিতই ভরত শব্দের নিকট সম্বন্ধ। যে-দিক্ হইতে দেখি, ভরতই প্রথম নাট্যকলার প্রবর্ত্তক।

নাট্যকলা ভারতে প্রবর্ত্তিত হয় চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের রাজত্বকালে। ভারতবর্ষ তখন জম্বুদ্বীপ নামে অভিহিত হইত। নহুষ ইন্দ্রকেও পরাভূত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের রাজ-

স্বর্গেতে নাট্যকলা দেবতাদিগের এক প্রধান সম্ভোগের সামগ্রী। ইন্দ্রবিজয়ী নহুষেরও ইচ্ছা হইল, তিনি তাঁহার প্রজাপুঞ্জকে সেই উচ্চাঙ্গের আমোদ প্রদান করিবেন। তাই তিনি ভরতমুনিকে জম্বুদ্বীপে পাঠাইবার জন্য ইন্দ্রকে আদেশ করেন। কিন্তু ঋষিপ্রবর স্বয়ং না আসিয়া কয়েকজন শিষ্য পাঠাইয়া দেন। শিষ্যরাও অনিচ্ছাসত্ত্বেই আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহাদিগের মধ্যে কোহল, শাণ্ডিল্য, ধূর্ত্তিল প্রভৃতি নাট্যবিচক্ষণ ঋষির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সকল দেবতাগণও মর্ত্ত্যে আসিয়া একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তাঁহারা একদল প্রজা সৃষ্টি করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া যান। অভিনয়ই এই সন্ততিগণের বংশানুক্রমিক বৃত্তি হইয়া দাঁড়ায়, এবং নটনটীরূপে ইহারা মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেবালয়ে নৃত্যগীতাদি করাই ইহাদের জীবিকা-সংস্থানের উপায়। কামরূপ, পুরী প্রভৃতি স্থানে আজও এইরূপ পৃথক সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়।

এই যে ভরত ঋষির নাম করিলাম ইনিই প্রথম নাট্য-সূত্রকার। সূত্রের পরিবর্ত্তে সরলভাবে নাট্যশাস্ত্র রচনা করিবার ভার তিনি তাঁহার প্রধান শিষ্য বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, কোহল ও ধূর্ত্তিলকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ভরতঋষির কালনির্দ্দেশ বড় সহজ নহে। ভবভূতি বলেন, "ভরতমুনি বাল্মিকীর সমসাময়িক ছিলেন"। ভরতের নাট্যসূত্র, বা "আর্য্য নাট্যসূত্র" অতি প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ।* এই পুস্তক হইতে আমরা জানিতে পারি, মহারাজা পুরুরবার পৌত্র আয়ুর পুত্র মহীপতি নহুষই ত্রিপাক প্রদেশ জয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ভারতে নাট্যকলা প্রবর্ত্তিত করেন। বর্ত্তমান মঙ্গোলিয়াই ত্রিপাক প্রদেশ। সেখানে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা দেবতা নামে অভিহিত হইতেন। এই স্থান হইতেই দেবগণ ব্রহ্মাবর্ত্তে (পঞ্জাব প্রদেশে) আসিয়া উপস্থিত হন। অনেকে বলেন, তাঁহাদের উজ্জ্বল গৌরকান্তি এ দেশের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে মলিন হইয়া গেলে তাঁহারা আর্য্য আখ্যা প্রাপ্ত হন। ক্রমে হলচালনও তাঁহাদের একটি প্রধান বৃত্তিরূপে পরিণত হয়।

ভরত নাট্যসূত্রের মধ্যে অভিনয়াদি যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ঐ গ্রন্থের বহুপূর্ব্ব হইতেই এ দেশে অভিনয়-প্রথা প্রচলিত ছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থের রচনাকাল খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় বহুপূর্ব্বেই ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

কালিদাস, ভবভূতি, ভাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটক-রচয়িতাগণ সকলেই ভরত ঋষির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভবভূতি তাঁহাকে ত্রিকলা বিদ্যার রচয়িতা তৌর্য্যত্রিক সূত্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভরত ঋষিই নাট্যকলার স্রষ্টা, এইজন্য নটগণ ভরতপুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, নাট্যকলা-সম্পর্কীয় যাহা কিছু আছে, তাঁহারই (ভরতমুনির) নাম অনুসারে রাখা হইয়াছে। গ্রীসদেশেও Thespis-এর নাম অনুসারে নাট্যকলা-সম্পর্কীয় যাবতীয় জিনিষের নাম করণ হইত।

নাট্যকলা সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে একখানি অতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ আছে, ইহারই নাম "ভরত নাট্যশাস্ত্র"। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে অভিনব গুপ্ত "ভরত নাট্যশাস্ত্রের" একখানি ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্যখানির নাম "ভরত নাট্য বিবৃতি।"

"নাট্যশাস্ত্রে" বিভিন্ন দেশ ও জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকলের মধ্যে আমাদের বাঙ্গলা দেশই নাট্য-কলার গৌরব সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতেছে। "নাট্যশাস্ত্রে" উল্লিখিত আছে, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশের লোকচরিত্র নাটকে অভিনয় করিতে হইলে অভিনেতাকে অধিক শ্বেতবর্ণে অর্থাৎ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে রঞ্জিত হইতে হইবে এবং ঐ দেশের লোক ওড্রমাগধী গীতের অভিনয় প্রিয়। এই গ্রন্থ হইতে বঙ্গদেশের কৃষ্টির প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয়।

"নাট্যশাস্ত্রের" দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিবিধ আকৃতির প্রেক্ষা-গৃহের ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রথম প্রকার গৃহের নাম বিকৃষ্ট, আয়তাকার rectangular দেবতাদের জন্য ; দ্বিতীয়, চতুরস্র সমচতুর্ভুজ square রাজন্যবর্গের জন্য এবং ত্র্যস্র সমবাহু ত্রিভুজাকৃতি equilateral triangle গার্হস্থ্য নাট্যশালা সাধারণের জন্য। মধ্যমাকৃতি বিকৃষ্ট রঙ্গমঞ্চই প্রশস্ত—যেমন ৬৪ হাত দৈর্ঘ্যে ও ৩২ হাত প্রশস্তে।

বিভিন্ন নাট্যশালার ঠিক অর্দ্ধাংশ দর্শকদের বসিবার জন্য নির্দ্ধারিত হইত, অপরার্দ্ধ থাকিত অভিনেতৃগণের জন্য। সকলের পশ্চাৎদিকের অংশের নাম ছিল "রঙ্গশীর্ষ" ; নেপথ্য বা সজ্জাগৃহ (green room) হইতে এখানে আসিবার দুইটী দ্বার থাকিত। সমস্ত রঙ্গমঞ্চে বস্ত্রের উপর উদ্যান, অট্টালিকা, মন্দির, প্রাসাদ, বন, উপবন, নদী, সমুদ্র অঙ্কিত থাকিত, এবং অবস্থামত এইগুলির পরিবর্ত্তন ও অপসারণ হইত। আর দর্শকদিকের অংশে বিভিন্ন জাতির বসিবার জন্য

* ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ও সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদ্ এবং অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে এই পুস্তক পাওয়া যাইতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্ধারিত হইত। সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণেরা বসিতেন এবং শূদ্রগণ বসিতেন সর্ব্বপশ্চাতে।

একটা কথা এই যে, বিভিন্ন নাটকাবলী ও অভিনয়-রীতির প্রচলন না থাকিলে "নাট্যশাস্ত্র" রচনার সম্ভাবনা বা আবশ্যকতা কোথায়? বস্তুতঃ নানারকমের নাটক ছিল বলিয়াই এইগুলির অভিনয়াদির নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত হয়। আগে নাটক, তারপরে 'নাট্যশাস্ত্র'। অতএব 'নাট্যশাস্ত্র' হইতেই নাটকাবলীর প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। আর তখন গ্রীসদেশে নাটকের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

অতএব আমরা দেখিলাম নাটক, রঙ্গমঞ্চ, নট বলিলেই ভরত মুনির কথা আসিয়া পড়ে। ভরতমুনি একাই সূত্রধার ছিলেন না, আরও দুইজন নাট্যসূত্রকারের উল্লেখ 'পাণিনি'তে পাওয়া যায়, তাঁহাদের নাম শিলালী ও কৃশাশ্ব। তাঁহারা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, এখনও শিলালী, শৈলুষ ও কৃশাশ্বী প্রভৃতি শব্দে 'নট' বুঝায়। পণ্ডিতেরা বলেন, পাণিনি খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিনহাজার বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব শিলালী ও কৃশাশ্ব পাণিনির পূর্ব্বের লোক। আর আমাদের ভরত ঋষি ইঁহাদের সমসাময়িক ছিলেন। অতএব ভরত ঋষির অভ্যুদয় কাল খ্রীষ্টের জন্মের ৩,৪ হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে।

এই "নাট্যশাস্ত্র" ব্যতীত বেদ, উপনিষদ এবং সেই যুগের সাহিত্যে প্রচুর নাটকীয় বীজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কথোপকথনই নাটকের প্রধান অঙ্গ, এবং ঋগ্বেদের ভাষাই নাটকের সম্পূর্ণ উপযোগী। পুরূরবা ও উর্ব্বশী, যম ও যমী, সরমা ও পণী, বরুণ ও ইন্দ্রের কথাবার্ত্তার মধ্যে নাটকীয় ভাষার আভাস পাওয়া যায়। যমী যমের প্রেমভিক্ষা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছে। দেবাসুর যুদ্ধে কার্য্যকালে ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিবার জন্য তিনি মরুৎগণকে ভৎসনা করিতেছেন, পুরূরবা উর্ব্বশীর চপলতার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন—এই সকল কথাবার্ত্তা নাটকের কথোপকথনের মতই হৃদয়গ্রাহী। বস্তুতঃ এই সকল সংবাদ-সূক্তই নাট্য-সাহিত্যের প্রথম অঙ্কুর।

সামবেদ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সঙ্গীত বিদ্যা বৈদিক যুগে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই বৈদিক স্তোত্রও নাট্যকলার কম সূচনা করে নাই। আধুনিক দ্বৈত-সঙ্গীতের ন্যায় ঋত্বিকগণ যজ্ঞস্থলে কখনও সামস্তোত্র গান করিতেন, কখনও সূক্তসকল আবৃত্তি করিতেন। এই দ্বৈত-অভিনয় হইতেই নাটকের ক্রমবিকাশ। মরুৎগণের প্রীত্যর্থে যজ্ঞের সময়ে এই সকল কথোপকথন আবৃত্তি করা হইত, কখনও বা দুই দলে বিভক্ত হইয়া অভিনয় করা হইত। একদল ইন্দ্রের ভূমিকায় কথা বলিত, আর একদল মরুৎগণের কথা আবৃত্তি করিত। বৈদিক যুগে নাটকানুষ্ঠান না থাকিলেও ঋত্বিকগণ মর্ত্তে স্বর্গের ঘটনার অভিনয় করিতেন এবং দেবতা ও ঋষিদিগের ন্যায় কথোপকথন ও সঙ্গীতের আবৃত্তি করিতেন। এই ভাবটী বরাবর বাঙ্গালার যাত্রাগানে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল। বেদের সূক্ত ও স্তোত্রগীতির ন্যায় উপনিষদেও নাটকের কথোপকথন দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিদুষী গার্গী এবং পণ্ডিতকুলশীর্ষ যাজ্ঞবল্ক্য, এবং যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীর কথোপকথন নাটকের মতই হৃদয়গ্রাহী। কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার কথোপকথন, পিতার সহিত শ্বেতকেতুর কথাবার্ত্তাও নাটকের পূর্ব্বাভাসই সূচনা করিতেছে।

অনেকে মনে করেন সংহিতাযুগের "সুপর্ণাধ্যায়" একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক।

এতদ্ব্যতীত পুরাণাদিতেও নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আর পাণিনি ভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে কংসবধ ও বলীবন্ধন নামক দুইখানি নাটকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। বসুদেব কংসবধ করিয়াছেন, বলিকে বদ্ধ করিয়াছেন প্রভৃতি কথার উল্লেখ করিয়া নাটকের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দশরূপক, সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ করিলেও প্রাচীন ভারতে নাটক ও অভিনয়ের আভাস পাওয়া যায়।

রামায়ণেও 'নাটকে'র উল্লেখ আছে। ভরত যখন মাতুলালয়ে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া নিরতিশয় বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, তখন বয়স্যগণ তাঁহার বিমর্ষতা অপনোদনের জন্য কেহ মনোহর বাদ্য, কেহ বা বিবিধ প্রহসনের অভিনয় করিতে লাগিলেন—

বাদয়ন্তি তথা শান্তিং লাসয়ন্ত্যপি চাপরে
নাটকান্য পরে স্মাহ হাস্যানি বিবিধানি চ।

রাম-বনবাসের পরেই রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ সত্বর ভরতের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—

ন রাজকে জনপদে প্রহৃষ্টে নটনর্ত্তকাঃ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্দ্ধন্তে রাষ্ট্রবর্দ্ধনাঃ॥

অর্থাৎ অরাজক দেশে নট, নর্ত্তক, উৎসবাদি উৎকর্ষ লাভ করে না।

ভবভূতির সীতার বনবাস ও ভাসের প্রতিমা নাটকের ভিত্তি 'রামায়ণে', এবং রামায়ণের লব ও কুশ হইতেই অভিনেতৃগণের 'কুশীলব' পরিচয়।

মধু-বসন্ত

—শ্রীমন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ

হারাণ ও পরাণ পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া আত্মীয় ও প্রতিবেশিবর্গের প্রীতি ও অপ্রীতির কারণ হইয়া উঠিতেছিল। ঈর্ষায় যাহারা মোড়লবাড়ীর ঐশ্বর্য্য সহ্য করিতে পারিত না, তাহারা চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—

"যে রকম ওদের বাড় হয়েছে, তা'তে আর বেশী দিন নয়!"

কেহ প্রতিবাদ করিলে, চীৎকারে আশ-পাশের বালক, যুবক, বৃদ্ধকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া তাহারা বলিত, "রেখে দাও, রেখে দাও। দু'টো লাঙলা চষে আর এত পয়সা হতে হয় না। কোথা থেকে দুটো পয়সা পেয়েছিল—তা রাখতে পারবে কেন? দু'দিন যাক না, যে হাল সেই হাল হবে—হতেই হবে।"

আর যাহারা সে শ্রাদ্ধোপলক্ষে হারাণ ও পরাণের পিতৃ-ভক্তির নিদর্শন পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিল, তাহারা সকলে একযোগে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, "হারাণ ও পরাণ যে-রকমটা করেছে, তাতে তাদের লক্ষ্মী উছলে পড়বে। বাপের আশীর্ব্বাদে তাদের খুব বাড়-বাড়ন্তই হবে।"

অনেকে এই কথার সমর্থন করিয়া কিছু বলিলে তাহারা বলিত, "আহা তা আর হবে না? দু'টি ভাই নয় তো, যেন রাম-লক্ষণ! বড় হারাণ নিজেকে তো বড় বলতেই চায় না! ছোট পরাণের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজই করে না। আর ছোট পরাণ ত বলেই বসে আছে,—'হুঁ, দাদা কি বলে? আমি কি জানি, কি বুঝি? দাদা যা' করবে, তাই তো হবে।' তা আমাদের জাতের ভেতর যে এমন একটা মিলের সংসার হয়েছে, তা আমাদেরই তো ভাল; ছেলেপিলেগুলো হাতার হোক দেখে শিখবে।"

আলাপ-বলে মিশিয়া শ্রাদ্ধের আন্দোলন দুই চারিখানা পল্লীতে এমনি করিয়া কয়েকদিন ধরিয়া চলিতে লাগিল। স্বভাবতঃ যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল। প্রথম প্রথম মুখোমুখি, তাহার পর হাতাহাতি, তাহার পর দলাদলির সৃষ্টি হইল। ফলে হইল, একদল হারাণ ও পরাণের ভিটা-মাটি চাটি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল; এবং আর একদল তাহাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল।

চাষবাসের সময় এই সকল গরীব পল্লীতে দিনে বা রাত্রিতে কাহারও বড় একটা সাড়াশব্দ পাওয়া যাইত না। কি করিয়া ভাল চাষ হইবে, সেই জন্য সকলে বড়ই ব্যস্ত থাকিত। নিশ্বাস ফেলিবার কাহারও একটু অবকাশ থাকিত না। সমস্ত দিন, আবশ্যক হইলে অধিক রাত্রি অবধি, খাটিয়া শরীর যেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িত, তাহাতে গৃহাগত বন্ধু আলাপ-আলোচনা করিবার কোন সুবিধা পাইত না। ক্লান্ত দেহ সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রামসুখ লাভ করিত। পল্লীগ্রামগুলি কেবল সজাগ থাকিত—পল্লীবধূদিগের পুষ্করিণী হইতে কলসী কক্ষে গল্প করিতে করিতে জল আনায়, মাঠে খাবার পৌঁছাইয়া দেওয়ায়, আর তাহাদিগের অবকাশহীন চাষের কাজে যোগ দেওয়ায়।

তথাপি দুষ্ট লোকের ছলের অসদ্ভাব ছিল না। কখন কখন অতিরিক্ত বর্ষায় যখন মাঠে বাহির হওয়া অসম্ভব হইত, তখন একটু আলোচনা না করিয়া তাহারা থাকিতে পারিত না। শ্লেষ তাহাদিগের কথায় মাখান থাকিত। পরনিন্দা পরচর্চ্চা না করিয়া যে কয়দিন কার্য্যের পেষণে তাহাদিগের দিন-রাত কাটিয়া যাইত, সেই কয়দিনের শোধ এই সুযোগে তাহারা তুলিয়া লইত। নিজের নিজের সহস্র সহস্র অভাব থাকিলেও, সহস্র সহস্র চিন্তার বিষয় থাকিলেও ঐ যে হারাণ ও পরাণের ঐশ্বর্য্যশিখা তাহাদিগকে দগ্ধ করিতেছিল, কথায়-বার্ত্তায়, চালচলনে, আকারে-ইঙ্গিতে ভিতরের উত্তাপ বাহির করিয়া দিয়া তাহারা কোনরকমে তাহার সমতা বিধান করিত। হারাণ ও পরাণের সর্ব্বনাশই এই চিন্তার বিষয় হইত। আপনাকে রক্ষা করা এই সকল আলোচনার উদ্দেশ্য নহে—আপনার কথা ভাবিবার এইখানে কোন অবকাশ হইত না—যাহা কিছু কথাবার্ত্তা হইত, সকলই মোড়লবাড়ীর ধ্বংসের চিন্তায়।

হারাণ ও পরাণ সকলই শুনিত, কখন হাসিয়া উড়াইয়া দিত, কখনও বা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিত, "আমাদের নিয়ে লোকের এত মাথা-ব্যথা কেন ?"

কিন্তু যে যাহাই বলুক না কেন, হারাণ বা পরাণ কোন কথারই উত্তর দিত না, বা প্রতিবাদ করিত না। সুতরাং তাহাদিগের সহিত পায়ে পা দিয়া কলহ করিবার এবং কাহারও কাহারও মনে দুই-এক কথা জোর করিয়া বলিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও তাহাদিগের সহিত কাহারও কোনদিন বিবাদ হইত না। হৃদয়ে পুড়িয়া মরিলেও মুখে মন্দলোকেও তাহাদিগের সহিত ভদ্রতা না করিয়া থাকিতে পারিত না। সুতরাং মোড়লবাড়ীর সর্ব্বনাশ কি করিয়া হইতে পারে, তাহাদিগের কাহারও নিকট তাহার সুযোগ-সুবিধা আসিয়া উপস্থিত হইত না।

চিরদিন কিন্তু কাহারও সমান যায় না মোড়ল-বাড়ীর আগে যেমন দিন কাটিতেছিল, ঠিক আর দিন তেমন কাটিতেছিল না। যেমন মেলা-মেশায়, কর্ম্মে, শ্রমে, শ্রান্তিতে, হাসিতে, কলরবে মোড়ল-বাড়ীর সমস্ত দিনরাত কাটিয়া যাইত, এখন আর ঠিক সেই ভাবে কাটিতেছিল না। একে অপরের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে দুই ভ্রাতৃবধূর দিনের পর দিন সুখে কাটিয়া যাইত, এখন আর তাহাদিগের দিন ঠিক সেই রকম সুখে কাটিতেছিল না। হাওয়া যেন বদলাইয়া যাইতেছিল।

বড় ভাই হারাণের কোন সন্তান ছিল না। ছোট ভাই পরাণের একটি ছোট ছেলে। আর কোন সন্তান হয় নাই। খামারে গরুতে বলদে কৃষাণে বৃহৎ বাড়ী-খানি জমজম করিতে থাকিলেও যেহেতু শিশুর নির্ম্মল হাস্যে ও কলরবে মোড়ল-বাড়ীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইত না। একমাত্র পরাণের ছোট ছেলে—সে আর কত হাসিবে, কত হৈ চৈ করিবে? তাহার উপর অতবড় বাড়ীতে একটি মাত্র ছেলে, সমস্ত দিনই সে এ-কোণ হইতে সে-কোণে বেড়াইয়া বেড়ায়। বিশেষ বড় বউ কমলা আবার নিঃসন্তান হওয়ায় এই ছেলেটিই যেন তাহার গলার হার হইয়া পড়িয়াছিল। বিমলা ছোট বউ, সুতরাং সব কাজই তাহার করা উচিত। সে চরকির মত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, কৃষাণদিগকে মুড়ি দিত, গরুর দুধ দোয়াইত, জাবনা দিত বলদগুলিকে দেখিত, ভাশুর ও স্বামীর জন্য পান্তাভাত, মুড়ি ঠিক সময়ে মাঠে পাঠাইয়া দিত, আবার রন্ধন করিত। বড় বউ সমস্ত দিন ছোট বউ-এর ছেলেকে লইয়াই ব্যস্ত, তাহাকে দুধ খাওয়াইতে, তাহার গা পরিষ্কার করিয়া দিতে, আর নাচাইত, হাসাইত, ও কাঁদাইত। কেবল রাত্রিতে মায়ের কোলে কাজলপরা হাসিমুখ ছেলেটি আসিয়া ঘুমাইত।

পাড়ার পাঁচজন আসিয়া যতদিন না কল্যাণময় গৃহে অধিষ্ঠিত হন, এ-কথা ও কথা সে-কথা কহিয়া কাণ ভাঙ্গি করিয়া না দেন, ততদিন সংসার অটুট থাকে, ততদিন মঙ্গল বিরাজ করে। পাড়ার পাঁচজন মোড়ল-বাড়ীতে সময়মত আসিত, কিন্তু দুই বউ-এর কাহারও বসিবার বা নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় না থাকায় তাহাদিগের বিশেষ কোন সুবিধা হইত না, দুই এক কথা কহিয়াই ক্ষুণ্ণমনে তাহাদিগকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হইত। তাহাদিগের মধ্যে যে দুই-একজন ভাল মানুষ থাকিত, তাহারা শতমুখে প্রশংসা করিতে করিতে যাইত; আর যাহারা দুই এক কথা—নিজের ও পরের—লইয়া রসান দিয়া কহিতে আসিত, তাহারা মনে মনে জ্বলিয়া যাইত, মোড়ল-বউদিগের চৌদ্দপুরুষান্ত করিতে করিতে যাইত। তখন তাহাদিগের মুখ দেখিলে বোধ হইত যেন কুমোরের পোণে কাঁচা হাঁড়ি সবে মাত্র আগুনে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু সর্ব্বদাই যাহারা সুযোগের সন্ধান করিয়া থাকে, এক সময়ে না এক সময়ে তাহাদিগের সেই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সকল দুষ্ট লোকেরও সুযোগ একদিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

কোন অজ্ঞাত কারণে ছোট বউ বিমলার জননী বিনোদিনী মোড়ল-বাড়ীতে আসিয়া কয়েকদিন হইল আছে, দুই ভাই ও বড় বউ তাহার বিশেষ যত্ন করিতেছে, সকলেই। তটস্থ, কোন ত্রুটি না হয়। ছোট বউ তো মা আসিয়াছে বলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগিয়া গিয়াছে। মায়ের কাছে সকলেই সুখ্যাতি করিলে তাহার মনে যে আর আনন্দ ধরিবে না, তাহার মায়ের-বাপের মুখ উজ্জ্বল হইবে। বড় ভাসুরের মুখে, বড় বউ-এর মুখে সুতা সতাই সুখ্যাতি

আর কথা কি, ছোট বউ না থাকিলে তাহাদিগের সংসারের যে কি হাল হইত, তাহা বলিতে পারা যায় না। ইহাতে কিন্তু ফল অন্যরকম হইল। স্বচ্ছ সুনীল না হইয়া আকাশ ঘন-মেঘে আবৃত হইতে থাকিল।

জননী দেখিল, গৃহের যাবতীয় কাজ তাহার কন্যাকেই একা করিতে হয়। বড় বউ কুটোটি ভাঙিয়া দুই খানা করে না। উপরন্তু বড় বউ-এর আদেশ ব্যতীত তাহার কন্যার কোন বিষয়ে—এমন কি অপরাহ্ন হইয়া যাইলেও ভাত খাওয়ারও স্বাধীন অধিকার ছিল না। ইহা যে ছোট বউ তাহার কন্যা বিমলার ইচ্ছাকৃত, তাহা জননী বুঝিল না। জননী এইমাত্র বুঝিল যে, বড় কেবল আত্মসুখে রত, সর্ব্বদাই বসিয়া আছে, আর তাহার কচি মেয়েটাকে "বাকে নল ছাঁচিয়া" খাটাইতেছে। কিন্তু তাহার বলিবার যে সুবিধা হইতেছে না। তাহার মেয়েকে যে এই কথা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে, তাহারও সুযোগ সে পাইতেছে না। যদি কোন দিন একটু কথা বা পড়ে, তাহার কন্যা অমনি বলে, সে যে ছোট তাহাকেই তো সব করিতে হইবে। ছেলের কথা পাড়িলে অমনি বলে—

"দেখছ না, মা, আমার কোন ধকলই পোয়াতে হয় না। সমস্ত দিনটি দিদি ছেলেটাকে নিয়ে লাটাপাটা খেয়ে মরে গেল।"

মেয়ে ভাল নয়। তাহার হিতের জন্যেই তো বলা, কিন্তু সে যদি কোন কথা কাণে না তোলে, সে কি করিবে? অগত্যা জননীকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত—মনে মনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা সত্ত্বেও।

সকাল সকাল চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহারাদি শেষ করিয়া কন্যাকে আহার করিতে বলিতে গিয়া, বড়দিদি না আসিলে তাহার আহার করা বড়ই অন্যায়, এই কথা কন্যার মুখে শুনিয়া, গর গর করিতে করিতে জননী অন্যের অশ্রাব্য অস্ফুট ভাষায় কন্যাকে বহুবিধ তিরস্কার করিয়া মধ্যাহ্নকাল সুখ-নিদ্রায় কাটাইয়া দিত। কিন্তু বৈকালে দুই একটি কথা না কহিলে তো তাহার চলে না। সুতরাং পাড়ার কেহ কেহ স্থান পাইতে লাগিল। আমাদিগের ঠানদিদি তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রধানা এবং প্রাচীনা; জননী বিনোদিনীর ঠিক মনের মত লোক। ঠানদিদিকে পাইয়া বিনোদিনীর বৈকালবেলা, কখন কখন রাত্রির প্রথম যামও কথায় বার্ত্তায়, হাসিতে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইত। যাইব যাইব করিয়াও বোধ হয় এই মনের মত মানুষটির লোভ ছাড়িতে না পারিয়াই জননীর আর যাওয়া হইতেছিল না। তাহার উপর মোড়লবাড়ীর আদর আপ্যায়ন তো আছেই।

৩

সে দিন ভারি গরম। দুপুর বেলা। রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছিল। আকাশে একটি পাখীও উড়িতেছিল না। কেবল দূরে কাঠঠোকরার গাছের ছালের ভিতর হইতে পোকা ঠোকরাইয়া তুলিবার ঠক্ ঠক্ শব্দ শোনা যাইতেছিল। গৃহস্থের ছোট বউ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখে দুইখানা থালায় ভাত বাড়া, একখানিতে নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি, আর একখানিতে শুধু চারিটি ভাত। স্নেহপরায়ণা জননী আহারাদি সমাপন করিয়া তাম্বুলচর্ব্বণ করিতে করিতে কন্যার অদূরে বসিয়া তাহাকে মধ্যে মধ্যে অস্ফুট ভাষায় অনুরোধ-তিরস্কার করিতেছে, ক্ষণেক বা বিরক্ত হইয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে। বড় বউ বড় ঘরের ভিতর খোকাকে লইয়া হাসাইতেছে, আর নিজে হাসিতেছে। ছোট বউ ডাকিতেছে, "দিদি, ভাতগুলো যে শুকিয়ে যাচ্ছে।"

"তুই বস না, বোন। আমি খোকাকে ঘুম না পাড়িয়ে যাই কেমন ক'রে? এখনি গিয়ে ভাত মাখবে আবার।"

জননী বিনোদিনী আর থাকিতে পারিল না। এবারে তাহার গলা একটু শোনা গেল, "ঢঙ দেখ না একবার? আর তুইও ছুঁড়ি তো কম নয়। এত তোকে বলি, বোকামি। কিছুতেই তুই বুঝবি নে?"

এমন সময়ে নিধের মা ঠানদিদি মোড়লবাড়ীর দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বোঝা-বুঝি গো, মাওড়ীঠাকরুণ?"

নিধের মা, কি ছোট কি বড়, সকলেরই ঠান্দিদি, জন্মা-জন্ম, ছোট-বড়র কোন পার্থক্য ছিল না। সকলেই তাহাকে ঠান্দিদি বলিয়া ডাকিত। বিনোদিনীরও তাই সে ঠান্দিদি হইয়াছিল। ব্যস্ত হইয়া সাদর আহ্বান করিল: "কে? ঠান্দিদি। এস এস। এই মনে ভাবছিলাম-পাঁচ, মুখে

দিয়ে উঠলুম। মেয়েটাকে বড় বলছি তুই বস, তা একই কথা 'দিদি আসুক'।"

"ও বাবা, এত বেলা, রোদ্দ, খাঁ খাঁ ক'রছে! এদের বাপু সব উল্টো। ধন-দৌলতে চারদিক জাজ্জল্যমান হলে কি হয়, খেতে দেতে বড় দেরি করে। এই রোদ্দুরে কি ভাত আর ভাল লাগে?"

"বল দিকি, ঠান্‌দিদি। এই কথাটা এই ছুঁ্যাচড়া ছুঁড়িকে বুঝিয়ে দাও দেখি।"

কথাটা একটু উচ্চভাবেই হইয়াছিল। বড় বউ কমলা শুনিতে পাইল কি না, তাহার দিকে অতটা লক্ষ্য ছিল না। আর শুনিতেই বা যদি পায়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? গতর যাহারা খাটায়, তাহাদিগের মহাপ্রাণীটা তো ধড়ফড় করে সময়ে ভাত জল না পাইলে!

তাহারা শুনিল—বড় বউ ঘরের ভিতর হইতে বলিতেছে, "ছোট বউ খেতে বস। আর একটু হ'লেই আমার হয়।"

মা ও ঠান্‌দিদির কথোপকথন বিমলার বেশ ভাল লাগিতেছিল না। বড় বউ-এর কথা শুনিয়া তাহার যেন ভয় হইতে লাগিল, বোধ হয় এ-সব কথা সে শুনিতে পাইয়াছে।

বিনোদিনী ঠানদিদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে কন্যার প্রতি কটাক্ষ করিতেও ছাড়িল না, "শুনছ গো ঠান্‌দি, শোন শোন। দরদ একেবারে উছলে পড়ছে। যখন দেখছিসই, বাপু, তুই না এলে ও কিছুতেই খেতে বসে না, তখন তোরই বা এত গদাইনস্কুরি চাল কেন? কাজ তো কিছু করতে হয় না! দুটো খেয়ে নেওয়া, তাতেও তোর এত দেরা কেন? মেয়েটার আমার খেটে খেটে একেবারে সোনার অঙ্গ কালী হ'য়ে গেল।"

অথচ পরিশ্রমে বিমলার স্বাস্থ্য ও লাবণ্য-সৌষ্ঠব যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। পাড়ার যাহারা মোড়লবাড়ীর মঙ্গল প্রার্থনা করিত, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিত, মোড়ল-বাড়ীর ছোট বউয়ের রঙ ঠিক যেন কাঁচা সোনার মত দিন দিন টক্‌টকে হইয়া উঠিতেছে। স্নেহান্ধ জননী বিনোদিনী তাহা দেখিতে পাইত না। ঠান্‌দিদিও বুকভরা স্নেহ লইয়া সেই কথার সমর্থন না করিয়া থাকিতে পারিত না। ভাতের থালের দিকে লক্ষ্য করিয়া ঠান্‌দিদি জিজ্ঞাসা করিল,—টিটকারী যেন তাহাতে ফুটিয়া উঠিতেছিল,—"হাঁ৷ রে ছোট বউ, এই একটা থালে শুধু চাট্টি ভাত, আর ঐ থালাখানার একেবারে যেন জামাইয়ের ভাত বাড়া, কেন রে?"

ছোট বউ বিমলা অন্য কিছু মনে না করিয়াই সরল সহজভাবে উত্তর দিল, "ও ভাত দিদির।"

"আর তোর যে শুধু ভাত?"

"দিদি এসে আমাকেও দেবে।"

গাত্রে পদাঘাত করিলে সাপ যেমন কোঁস করিয়া উঠে, ফণা বিস্তার করিয়া হন্তারক মনে করিয়া তাহাকে দংশন করিতে দ্বিধা বোধ করে না, তেমনি গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া জননী বিনোদিনী একবার দংশন করিতে ছাড়িল না। বলি —

"বুঝলে, ঠান্‌দি, কথাটা একবার। আমি ওকে পেটে ধরিছি, আমার কথাগুলো দাসী বাঁদীর মত উড়িয়ে দিলে আর দরদী হল কি না বা! বলে—

'মা বিয়োল না, বিয়োল মাসী।
ঝাল খেয়ে ম'লো পাড়াপড়শী।

যে ওকে খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেললে, সে ওকে সব ভাগ করে দেবে, একটু কি দিলে কি না দিলে।"

ঠানদিদিও লোকটী সমজদার কম নহে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিতে লাগিল—

"তা আর জানিনে আমি। কিন্তু ভাই, ছোট বউ, যাই বল—না থাক!"

"কি, ঠান্‌দি, বল না।"

"না, সে কথা আর শুনে কাজ নেই।"

"আমার মাথার দিব্যি, বলবে না ঠান্‌দি?"

"তা ভাই যখন মাথার দিব্যি দিলে, তখন কি আর না বলে থাকতে পারি?"

"দাও তো ঠান্‌দি ওকে একটু বুঝিয়ে দাও তো।"

ঠান্‌দিদি কোনরূপ ভনিতা না করিয়াই বলিতে আরম্ভ করিল –

"রোজ রোজ দেখি, অবিশ্যি যে কদিন এই খাবার আগে এসে পড়ি, এই রকম একচোখোমো! তুই রাঁধবি, বাড়বি আর একজন দেবে, তার যা ইচ্ছে হয়ে তাই দেবে

আর মনের কথা মনে চেপে মুখটি বুজে খেয়ে যাবি। এ বাপু, তুই যা বল, আমার ভাল লাগে না।"

"কেন, ঠান্‌দি? এ তো বেশ। যা'কে দিতে হবে, তাকে নিশ্চয়ই বেশী দিতে হবে আর যদি তাও নাইই হয়, পোড়া পেটের এত দায় কেন?"

"এই পোড়া পেটের জন্যেই ত সব, ছোট বউ।"

"তাই কি?"

"বেশ করে দেখ। এই যে এত যাড়-যাড়ন্ত শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে, তা ভোগ করতে হবে তো। পেটের ভোগই আসল ভোগ। পেটে বাপু কিছু চাই, পেটটা ঠাণ্ডা না থাকলে কিছুই মোটে ভাল লাগে না।"

এমন সময়ে বড় বউ কমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিল। ছোট বউ বিমলা তখনও খাইতে বসে নাই দেখিয়া বলিল—

"ছোট বউ এখনও বসিস নি? তোকে আর পারলুম না!"

ঠান্‌দিদির দিকে লক্ষ্য পড়ায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বড় বউ বলিল,

"কি গো ঠান্‌দি, আজ এত সকাল সকাল?"

"কেন, দিদি, আসতে কি নেই? এই তোমাদের দু'জনকে দিনান্তে একবার না দেখলে থাকতে যে পারি নে! আহা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বউ দুটি। আমাদের হারাণে পরাণের বরাত খুব জোর যে এমন বউ তারা পেয়েছে।"

কথাটা বিনোদিনীর বেশ ভাল লাগিল না। ক্রোধে বিষাদে তাহার মুখখানা যেন কেমন একরকম হইয়া গেল। সে ভাবিল: এ আবার কি হইল? ঠান্‌দিদি বহুরূপী না কি? কিন্তু কিছু বলিল না। কিছু বলিতে গেলে হয় তো বা কলহ উপস্থিত হয়। কিন্তু সামনাসামনি কলহ করাটা তাহার মুখে ভাল দেখায় না। তাহার কন্যাকে হাত করিতে পারিলেই হইল। কাজ কি, যাকে তাকে নামখারাপ করায়।

স্বামীর বরাত-জোর স্ত্রী পাইয়া, ঠান্‌দিদির এই কথায় বড় বউ-এর প্রাণে আঘাত লাগিল। কি যেন অশুভ আশঙ্কা করিয়া তাড়াতাড়ি, সে বলিয়া ফেলিল—

"না—না, ঠানদি, তা' বল না। এ কথা বললে বড় অপরাধ হবে যে, ঠানদি। বরং বল, আমরা কত পুণ্যি করেছিলুম যে, এমন ঘরে এসে পড়েছি। দুই ভাইয়ের জন্যেই তো যা কিছু আমাদের। বিশেষ ছোট বউ আর আমার লক্ষ্মণ দেওরটির জন্যেই সব। আমি সংসারের আর কি করি, সবই তো ছোট বউ করে। আর উনি কোন কাজ করতে গেলেই দেওর আমার ছুটে গিয়ে হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে বলে—'দাদা, আমি থাকতে তুমি কাজ করবে? তা হবে না'।"

"বাঃ বাঃ। এমন থাকলেই তো ভাল, বড় বউ।"

ঠান্‌দিদি বিনোদিনীর প্রতি কটাক্ষ করিল, একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বিনোদিনী সে কটাক্ষের উত্তর দিল তাহার কুঁচের মত চোখ দুটি টিপিয়া; যেন সে বলিতে চাহিল, "বুঝলে ঠান্‌দিদি, মাগী কি কম ধড়িবাজ? মিষ্টি মুখে আমার মেয়েটার মাথা একেবারে খেয়ে ফেলেছে!"

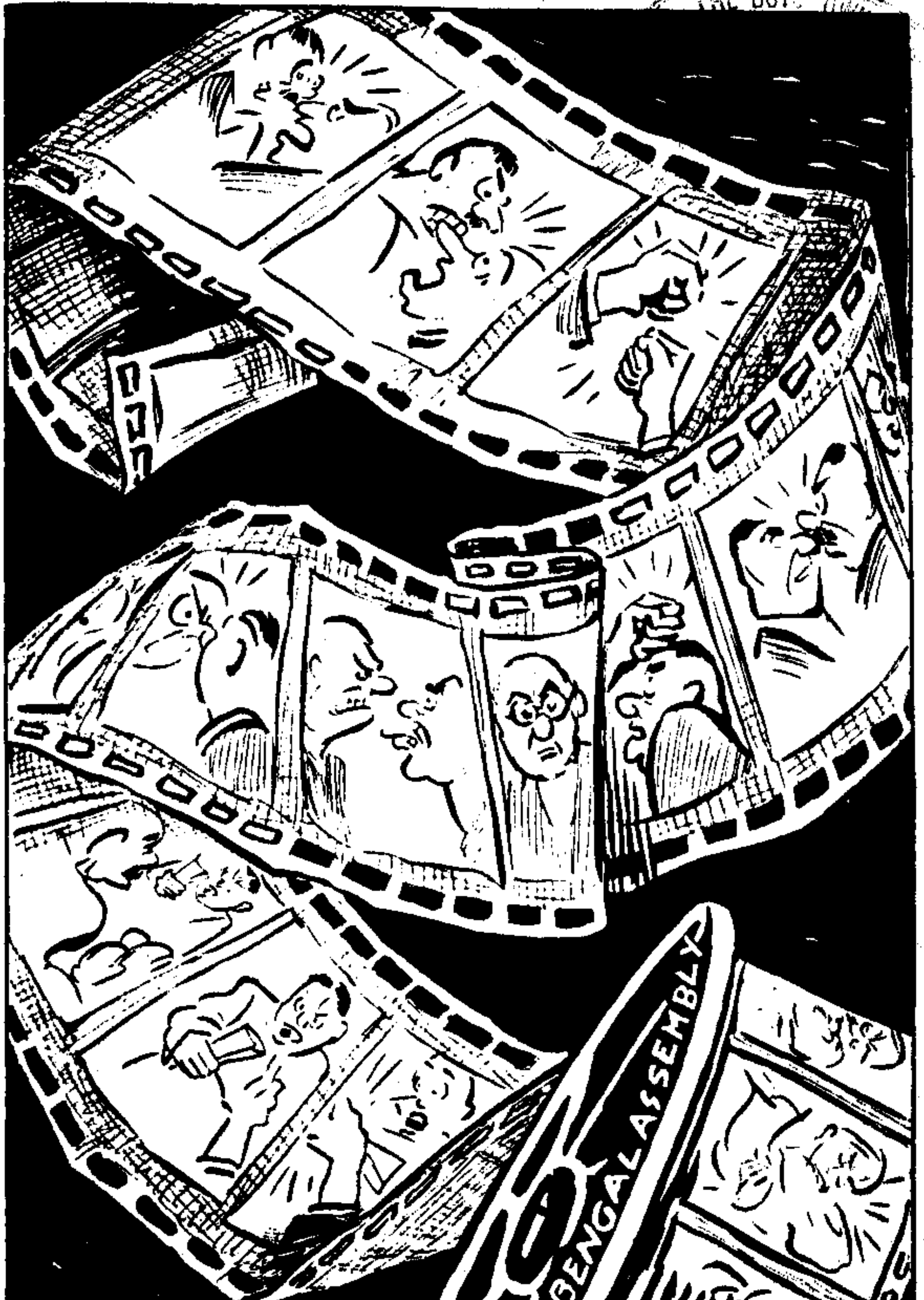
ঠান্‌দিদির শ্লেষ বুঝিতে না পারিয়া বড় বউ কমলা আনন্দে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর, ঠান্‌দি', যেন আমি এমনি দেখেই যেতে পারি।"

"বালাই, ষাট ষাট! একশ বছর পরমায়ু হোক। পাকা চুলে সিঁদুর পর—"

"তা'ই বল, ঠান্‌দি, এদের ছেড়ে যে স্বর্গেও যে'তে ইচ্ছে করে না, ঠান্‌দি।"

বিনোদিনী এতক্ষণ পরে কথা কহিল,—"তা তো করবেই না।"

কথাটি এমন ভাবে সে বলিল, বড় বউ কমলার মনে হইল যেন তাহার ভিতর কোন দুষ্ট অভিপ্রায় লুকান আছে। এত দিন বড় বউ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল যে, বিমলার মা বিমলাকে একা পাইলে কত কি বলে, কত অনর্থক্ষী করে, ছোট বউ যেন তাহাতে সম্মত নহে। ক্ষণপূর্ব্বে মাতা, কন্যা ও ঠান্‌দিদিতে যে কথোপকথন হইতেছিল কখন উচ্চ, কখন বা অনুচ্চ ভাষায়, তাহা তাহার কাণে পৌঁছিলেও সে ততটা গ্রাহ্য করে নাই। হয়ত বা তাহার মধ্যে এমন কোন লুকান কথা ছিল, যাহা তাহার শোনা উচিত নয়, সেই জন্যই বোধ হয় তাহার আগমনে তাহাদিগের কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। মোটের উপর বড় বউ কোন দুষ্ট অভিসন্ধির গন্ধ যেন চারিদিকে পাইতে লাগিল। ছোট বউ-এর মা যদি চুপ করিয়া না থাকিয়া অন্য কথা



পর পর মল্লযুদ্ধে ব্যবহার ভঙ্গী।

পাড়িত, তাহা হইলে বোধ হয় বড় বউ-এর মনে সন্দেহ ঢুকিত না। কিন্তু বিনোদিনী আর কোন কথা কহিল না—এমন কি খাইতে বসিবার কথা তাহাকে না বলুক, তাহার মেয়েকেও বলিল না। বড় বউ লক্ষ্য করিল, ঠান্‌দিদিও ছোট বউ-এর দিকে কটাক্ষ করিতেছে—যেন বলিতে চাহিতেছে—"বুঝলি ছোট বউ? এমনটি ত আর কোথাও গেলে হ'বে না। গতর যে নাড়তে হয় না।"

ছোট বউ ঠান্‌দির কথা শোনা অবধি ভাবিতেছিল—"কেন এমন ক'রে লোকে বলে? ছোট হ'লেই তো কাজ ক'রতে হয়! কই কাজ করে তো কষ্ট হয় না। আর খাবার—দিদি তো সবই আমাকে তুলে দেয়। আমি আপত্তি ক'রলেও শোনে না—বরং বলে, 'তুই না খে'লে খাটবি কেমন ক'রে?' তবুও লোকের এত মাথাব্যথা কেন? আর মা কি নিজের চোখে দেখতে পায় না?"

ঠান্‌দিদি মনে করিয়াছিল যে, ছোট বউ তাহার কটাক্ষের উত্তরে কটাক্ষ করিবে—হাসির উত্তরে মুচ্‌কিয়া হাসিবে! ঠান্‌দিদির প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে। কিন্তু কিছুই হইল না। মনঃক্ষুণ্ণ হইলেও ঠান্‌দিদি কিন্তু আশা ছাড়িতে পারিল না। আর একটি বাণ না ছুঁড়িয়া থাকিতে পারিল না—

"তা, বড় বউ, একটি কথা বলি। সবই ত দেখছি ছোট বউ করে। তোর তো কোন কাজ নেই, বাপু। ভাতগুলো যে সব শুকোচ্ছে—খেয়ে নিলে পারিস তো। তিন প্রহর বেলা কেন করিস বল দিকি কেবল বসে বসে। দেখছিস না খেটে খেটে ছোট বউ হাঁপিয়ে হ'য়ে পড়েছে!"

বড় বউ বুদ্ধিমতী। এতক্ষণে বুঝিতে পারিল তাহাদিগের কি কথাবার্তা হইতেছিল। তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না কুসুমে কীট প্রবেশ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে। তাহাকেই সাবধান হইতে হইবে। ছোট বউ তো তেমন নয়। তবে প্রত্যহ এইরূপ করিয়া মন ভারী করিতে চাহিলে যে অনর্থ ঘটিতে পারে তাহা আজিকার ঘটনায় তাহার বুঝিবার বাকী রহিল না। হয়তো বা ছোট বউ কিছু বলিয়া থাকিবে। নচেৎ ঠান্‌দিদিই কি একথা গায়ে পড়িয়া বলিতে আসিয়াছে? বড় বউ কোন প্রতিবাদ করিল না। কেবলমাত্র বলিল—"হাঁ। ঠান্‌দি বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে। ছোট বউ ছেলে-মানুষ। কষ্ট হয় বই কি!"

বিনোদিনী আর সেখানে রহিল না। সে যাহা একদিন বলিবে বলিবে করিয়া বলিতে পারিতেছিল না, আজ শ্রীমধুসূদনের ইচ্ছায় ঠান্‌দিদির মুখ দিয়া তাহা বাহির হইয়া পড়িল। ভালই হইল, দোষ তাহার হইল না। ঠিক মত না হইলে লোকে বলিতে ছাড়িবে কেন? হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া "রাধে মাধব, সবই তোমার ইচ্ছা" বলিতে বলিতে শয়নাগারের দিকে চলিল। মধ্যাহ্নকাল যে অতীতপ্রায়—একটু না গড়াইলে শরীর টিকিবে কেমন করিয়া? যাইবার সময় পশ্চাতে দুই একবার তীব্র কটাক্ষ করিতে ছাড়িল না। দেখিল ঠান্‌দির কথার ফল ফলিয়াছে—বড় বউ ছোট বউকে প্রায় সমস্ত ব্যঞ্জনাদি তুলিয়া দিয়াছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হাত মুখ নাড়িয়া যেন কি বলিতে বলিতে শয়নঘরে প্রবেশ করিল। ঠান্‌দিদিও অবসর বুঝিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিল।

বড় বউ তাড়াতাড়ি আহার সমাপন করিয়া লইয়া নিজের ঘরে খোকার কাছে গিয়া শুইয়া পড়িল। ছোট বউও প্রত্যেক দিনের মত তাহার নিকটে গিয়া শুইল।

এতক্ষণে বড় বউ নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিল। সে মনে মনে ভাবিল—"আমি এ কি করিতেছি? একজন পাড়া-কুঁদুলির কথায় আমি এতদূর এগিয়ে যাচ্ছি যে ছোট বউ আমাকে কিছু বলতে পারে, তা বিশ্বাস করে ফেলেছি! তবে ছোট বউ-এর মার যে একথা মনে আসতে পারে, তাতে কোন ভুল নেই। প্রথম, আমি কাজ করিনে মোটে। দ্বিতীয়, আমার ঘর খানি ভাল। তা'র ওপর আসবাবপত্রে আমারই ভাগ বেশী।"

বড় বউ ও ছোট বউ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। কিন্তু যে-আঘাত আজ নিধের মা ঠান্‌দিদি দুই বউ-এর প্রাণে দিয়া গেল, তাহার কোন নিরসন হইল না। যে-কথা বড় বউ কমলার মনের মধ্যে উঁকি মারিতেছিল, সে-কথা না বলিয়া বড় বউ ভাল করিল না। বলিলে ছোট বউ বিমলার সহিত একটা বোঝাপড়া হইয়া যাইত, মনে যে কলঙ্ককালিমা ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহা চিরদিনের জন্য মুছিয়া যাইত—যৌথ-গৃহে অশান্তির সৃষ্টি হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না।"

ছোট বউ বিশ্রাম করিবার জন্ত শয়ন করিয়াছিল বটে,—কিন্তু নিদ্রা আদৌ হইল না। সে ভাবিতে লাগিল—"ঠান্‌দিদি যাহা বলিল, তাহা অপরের গৃহে হয়তো ঠিক হইতে পারে; কিন্তু আমার গৃহে আমাদের কাজে তাহা আদৌ খাটে না—খাটিতে পারে না। দিদিমণিকে কি একথা বলা যায়? বলিতে পারি—কিন্তু বলিলে দিদি যদি কিছু মনে করে? যদি দিদির মনে হয় আমি ঠান্‌দি'র কথায় কাণ দিয়াছি! তা না হইলে ও কথা বলিতে যাই কেন?"

ছোট বউ বড় বউকে ভয় করিত, ভালও বাসিত। সে দেখিত, বড় বউ তাহার ছেলেকে লইয়া সমস্ত সময়টা কাটাইয়া দেয়। যাহাতে তাহারই ছেলের কোন কষ্ট না হয়, তাহার জন্ত বড় বউ নিজের স্নানাহার পর্য্যন্তও সময়ে করিতে পায় না। সংসারের কাজ? বড় বউ যদিও কাজ করিত, তথাপি তাহাকেও ত কতক করিতে হইত। তবে এ মন্দ কি? তাহাকে ছেলের তো কিছু করিতে হয় না। সুতরাং অন্ত কাজ করিতে হয়। ছেলেকে দেখে বলিয়াই যে বড় বউ কমলার কাজ করা উচিত নয় তাহা নহে; কিন্তু ছেলের কাজও তো একটা মস্ত কাজ। কি করা উচিত, কি উচিত নয়, ভাল-মন্দ বিচার বড় বউ কমলাই করিত, একটা শক্ত কিছু হইলে সেখানে সেই মাথা দিত। ছোট বউ বিমলার তো আর সে সব কিছু জানা ছিল না। তবে বড় বউ কমলার একটু বেশী খাতির না হইবে কেন? বড় বউকে কিছু বলিতে হইবে সে কথা ছোট বউ বিমলার মনে কখন উদয় হয় নাই। কিন্তু আজ ঠান্‌দিদি বড়ই গোলমাল বাধাইয়া গেল।

আকাশে কাল মেঘের সঞ্চার হইতেছিল। তাহাকে উড়াইয়া দিতে বায়ু বহিল না।

সেই দিন ছোট বউ বিমলা এমন অন্তমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল যে, যে-কাজ সে করিতে যাইতেছিল, তাহাতেই একটা না একটা গলদ হইতেছিল—অন্তদিনের মত সেই দিন কোন কাজে তাহার বেশ মন বসিতেছিল না। সমস্ত বৈকাল বেলা কেবলই মনে হইতেছিল, দিদিমণিকে বলিলে হয়তো ভাল হইত;* আবার পরক্ষণে মনে হইতেছিল দিদিমণিকে বলিলে যদি সে কিছু মনে করে—ও সব কথা তুলিয়া কোন কাজ নাই।

বলা উচিত ছিল, কি ছিল না, এই কথাই বিমলা কেবল মনে মনে তোলপাড় করিতেছিল। ঐ দিকেই কেবল তাহার মন ছিল। সেই কারণে অন্তদিকে তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। রাখালেরা গরুগুলি আনিয়া যথাস্থানে বাঁধিয়া রাখিল কি না, সব গরুগুলি আসিল কি না, প্রত্যহ ছোট বউ তন্ন তন্ন করিয়া তাহার খোঁজ লইত। আজ একবার জিজ্ঞাসা করিল বটে, কিন্তু তাহা নামমাত্রই। মনিবের ঔদাসীন্ত লক্ষ্য করিয়া রাখালেরাও তাড়াতাড়ি যা তা করিয়া গরুগুলিকে বাঁধিয়া জাবনা দিয়া দিনের কাজ শেষ করিল। বাঁধন একটু শিথিল দেখিয়া কাজের শেষ সকাল সকাল হইল ভাবিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। প্রত্যহ কাছে থাকিয়া মনিবের আদরে যত্নে গরুগুলি ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া যেমন দিনের শেষে জাবনা খাইত, আর মাঝে মাঝে গ্রাস লইয়া মুখ তুলিয়া মনিবের দিকে সস্নেহ চাহনি চাহিত ও মনিবের কোমল হস্তস্পর্শে আবার গ্রাস লইতে মুখ নামাইত, আজ আর তেমনটি তাহারা করিতে পারিল না দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে কতক খাইল কতক বা ছড়াইল, আর কতক বা খাইল না—অন্তদিনের মত আহারান্তে তেমন রোমন্থন করিল না, গা চাটিল না, ল্যাজ নাড়িল না। কেবল শুইয়া পড়িল। বিমলা দেখিতে হয় দেখিয়া গেল; তাহার পোষ্যগুলির এ-নৈরাশ্ত লক্ষ্য করিল না।

বড় বউ কমলা প্রত্যহ যাহা করিত, আজ তাহার একটু পরিবর্তন দেখা গেল। গোপালকে দুধ খাওয়াইয়া সাজাইয়া দিয়া তাহাকে অন্তদিনের মত আজ নাচাইতে তাহার অনতিদূরে বসিয়া করতালি দিতেছিল না। অন্তদিনের মত বৈকালিক কাপড়-কাচা, চুল-বাঁধা ইত্যাদি প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে তাহার যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, আজ আর তাহা হইল না। পুত্রের প্রসাধনের পরেই কালবিলম্ব না করিয়া কমলা তাহার নিজের প্রসাধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লইল। অন্তদিনের মত তাড়াতাড়ি প্রসাধন করিয়া আবার গোপালকে লইয়া বসিল না। বৈকালিক রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিল। উনানে আগুন দিতে, ঘুঁটনা ঘুটিতে, চাউল

ধুইতে, এঘর-ওঘর, পুকুর ঘাট তাহাকে করিতে হইতে লাগিল। এই পরিবর্ত্তনে গোপালের বড়ই গোলমাল ঠেকিতে লাগিল। আধ আধ কথা ফুটিয়াছিল। বলিতে লাগিল—

"ও্যা-মা ঝ্যা-মা। দাঁলা না, বথো না।"

"রান্না করি যাদু। তুমি খাবে।"

"না কাবো না। মা করবে।"

"মা কি রোজ রোজ রান্না করবে, গোপাল?"

"হাঁ, করবে।"

"আর আমি কি করব?

"আমার থঙ্গে খেলা—ছুতোছুতি কর্ বি।"

"তা কি হয়, যাদু? মা'র যে কষ্ট হবে, বাবা।"

কমলা আর এক কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। গোপাল কত কাঁদিল, কত কথা বলিল তাহা শুনিয়াও শুনিল না।

বিমলা আজ অন্যমনস্ক থাকিলেও কমলার কার্য্যকলাপ বেশ ধীরভাবে লক্ষ্য করিল। কোন কথা তো হয় নাই, অথচ নিজের কাজের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল কেন? হঠাৎ এরূপ হওয়ায় বিমলার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। অভিমানও হইল। ভয় যাহা হইল, অভিমান তাহার শতগুণ অধিক হইল। সে তো কোন কথা তাহাকে বলে নাই যে, গোপাল হওয়া অবধি যে-কাজ সে এতদিন নিজেই করিয়া আসিয়াছে, আজ বড় বউ নিজে সে-কাজ করিতে চলিয়াছে। যদি তাহার কোন ত্রুটি সে দেখিয়া থাকে, বড় যা সে, কেন তাহার জন্য তাহাকে দু'কথা বলিল না? দুই এক কথায় তো বোঝা-পড়া হইয়া যাইত। অপরাধের আধিক্য কি এতই হইল যে, তাহাকে একটা কথা বলাও চলিল না? ছেলে কাঁদিলে যে লোকের নিজের নাওয়া-খাওয়া পর্য্যন্ত করিত না, আজ ছেলে কাঁদিয়া মাটিতে লুটাইতেছে, তথাপি সে লোকের কেন সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নাই? এত কি তাহার দোষ? কিন্তু সে কি দোষ করিল, তাহা তো সে বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে পারিল না বলিয়া তাহার অভিমান হইল। এমন অভিমান হইল যে, সে প্রতিজ্ঞা করিল, ছেলেকে আর বড় যার কাছে যাইতে দিবে না।

৫

মধু থাকিলে মধুমক্ষিকার অভাব হয় না। সে না জুটিয়া থাকিতে পারে না। মধুর গন্ধ এমনি মিষ্ট যে, অতি দূর দেশ হইতেও মৌমাছি তাহার দিকে ছুটিয়া আসে। পরাণ ছোট—চাষের কাজে, গরুর কাজে, খামারের কাজে আগাইয়া যাইলেও বড় হারাণ তাহাকে সকল সময়ে কাজ করিতে দিত না। সে মাঝে মাঝে একটু আধটু সময় পাইত। যখন সময় পাইত, তখন সে একটি বটগাছের ছায়ায় বসিয়া গুণগুণ করিয়া আপন মনে গান গাহিত।

এমন একদিন গান গাহিতেছে, তখন একজন আগন্তুক আসিয়া তাহার নিকট বসিল। চাষা হইলেও চেহারার সৌষ্ঠবে, লাবণ্যে ও স্বাস্থ্যে পরাণকে ভাগ্যবানের ঘরের বলিয়াই মনে হইত। তাহার নিশ্চিন্ত, হাস্যমুখর মুখশ্রীতে এমন ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, যে কেহ হউক না কেন সে বেশ বুঝিতে পারিত তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব তো নাইই, বরং বিলাসের-ব্যসনে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে সে অপারক নহে, যদি সুযোগ ও সন্ধান আসিয়া উপস্থিত হয়। আগন্তুক যেন তাহার নিকট তাহার কিছু প্রাপ্য হইতে পারে এমন মনে করিয়া কটাক্ষ করিয়া সলীল হাস্য করিল। তাহার অধরোষ্ঠের ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইল, যেন বহুদিন ধরিয়া সে যাহার সন্ধান করিতেছিল, এতদিনে তাহার সন্ধান সে পাইয়াছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আগন্তুক তাহার নিকটে বসিল, যেন কতকালের পরিচিত এমন ভাবে ইতস্ততঃ না করিয়াই বলিল এবং "তোমার গানটি যখন দূর থেকে শুনছিলুম, ভারি মিষ্টি লাগছিল।"

পরাণ অন্য কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়াই বলিল, "তা'হলে কাছ থেকে গাধার ডাক; কেমন?"

"না। বেশ মিষ্টিই লাগছিল। তুমি থামলে কেন? গাও গাও।"

পরাণ তখন গানের শেষ চরণ গাহিল—

"তবে আমায় ভুলে থেক না।"

পরাণ বহু অনুরোধ সত্ত্বেও আর গাহিল না। সে আগন্তুকের পরিচয় লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। পরিচয় লইয়া বড় আনন্দিত হইল যে, তাহার মনের মত লোক একজন সে পাইয়াছে। সে বুঝিল লোকটি বেশ আমুদে। হিংসা-দ্বেষ মনের মধ্যে নাই। তাহার প্রতিবেশীদিগের মত নহে, আমোদে-আহ্লাদে লোকের সম্পাদে হাসি-খুসি করিয়াই দিন কাটাইয়া দেয়। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর

যখন পরস্পরের ভিতর ঘনিষ্টতা জমিয়া উঠিতেছিল, তখন হঠাৎ উঠিয়া আগন্তুক বিদায় প্রার্থনা করিল। পরাণ এক গাল হাসি হাসিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইয়া বলিল, "তা কি হয় ? এত শীগ্‌গির কি যাওয়া হয় ? আগে আমাদের বাড়ীতে চল, খাওয়া-দাওয়া কর তবে তো যাবে। তুমি তো বলছ অনেক দূরে তোমাদের গাঁ।"

আগন্তুক ভ্রমর। সুতরাং এ সুযোগ সে ছাড়িবে কেন ? সে নিজকে জানিত যে, লোককে আমোদে রাখিবার ক্ষমতা তাহার আছে; কিন্তু তাহা বেশী দিনের জন্ম নহে। তবে যতদিন হয় ততদিনই ভাল। তারপর আবার অন্য কোথাও দেখা যাইবে।

নাম মাত্র আপত্তি করিয়া পরাণের অনুরোধে আগন্তুক তাহার বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করিল। চণ্ডীমণ্ডপে তাহাকে বসাইয়া পরাণ নিজে তাহার জন্য তামাকু সাজিয়া আনিল। আগন্তুক তামাকু সেবন করিয়া তাহার জামার পকেট হইতে কিছু লোভনীয় বস্তু বাহির করিল। কলিকার পোড়া তামাকু ফেলিয়া দিয়া তাহাতে ঐ বস্তু দিল এবং আগুন দিয়া টান দিতে লাগিল। পরাণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

আগন্তুক হাসিয়া বলিল, "বড় মিষ্টি জিনিস ভাই। একবার খেলে আর ভুলতে পারবে না। খাবে ?"

মুখের ধোঁয়া ছাড়িয়া কলিকাটী পরাণের হাতে দিতে গেল। পরাণ কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। লোভও যে হইতেছিল না, তাহা নহে, একবার 'পরখ' করিয়া দেখিতে দোষ কি!

"ওহে বিষ নয়, বিষ নয়! তামাকে কি সুখ ? এর এক টানে ব্যোম শিব শঙ্কর!"

আবার টান দিল। কুণ্ডলাকার ধোঁয়া উদ্গিরণ করিতে করিতে জোর করিয়া পরাণের হাতে কলিকা গুঁজিয়া দিল। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া আগন্তুকের অনুকরণ করিতে গেল।

"আহা হা, অত জোরে আগে নয়। আগে সইয়ে নাও। বড় কড়া।"

দুই একবার নয়নে-গরনে পরাণ আর এক নেশার সন্ধান পাইল। আমোদ হইতে ছিল না, এমন নয়, তবে কেমন কেমন বোধ হইতেছিল। পরাণ ভাবিল, প্রথম যখন তামাকু খায়, তখনও তাহার এমনি হইয়াছিল। দুদিনেই ঠিক হইয়া যাইবে।

গল্প-গুজব করিয়া মুড়ি নারিকেল গুড় খাইয়া আগন্তুক বিদায় হইল। প্রতিশ্রুত হইয়া গেল আবার কাল আসিবে।

রাত্রিতে বিমলা পরাণকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি কি গাঁজা খেয়েছ ? তোমার মুখে কি বিশ্রী গন্ধ!"

"কিন্তু, বিমলি, ভারি মজা! যখন টান মারলুম, তখন ততটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ভারি আমোদ।"

"না, ও খেও না আর। আমার এক কাকা গাঁজা খেত, পরে মাথা খারাপ হয়ে গিছল।"

"আচ্ছা, কাল তাকে তোর কথা বলব। কিন্তু সে তো পাগল হয় নি। যাঃ, তুই যা বলছিস কেবল আমাকে ভয় দেখাবার জন্তে।"

"না, গো, না; আমার মিথ্যে কথা বলে বড় লাভ।"

"আচ্ছা কাল তখন আবার বোঝা যাবে।"

অন্যান্য কথার মধ্যে বড়-মা কমলার কথা বলিতেও ছাড়িল না। কিন্তু মাথার দিব্য দিয়া স্বামীকে সাবধান করিয়া দিল, যেন সে-কথা প্রকাশ না হয়। পরাণ কতক শুনিল, কতক শুনিল না। তাহার কেবল নূতন নেশার কথা মনে হইতেছিল। অভ্যাস হইয়া গেলে খুব আমোদ হইবে। তবে এক একবার পাগল হইবার ভয় হইতেছিল। সে সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যাহা হউক রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আগন্তুক আসিয়া উপস্থিত হইল। আগে হইতেই পরাণ অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া মাত্র পরাণ জিজ্ঞাসা করিল,

"আচ্ছা, তোমাকে কি ব'লে ডাকব, তাই বল তো।"

"আমাকে বিশু বলে ডেক।"

"বেশ, আচ্ছা, বিশু, তুমি কি আমাকে গাঁজা খাইয়েছিলে ? তাতে না কি সব পাগল হ'য়ে যায় ?"

"আরে না না। আমি কি পাগল হ'য়েছি ? আচ্ছা আজ তোমাকে আর এক নূতন জিনিষ খাওয়াব।"

নানা প্রলোভনের ভিতর ফেলিয়া কয়েক দিনের মধ্যে বিশু পরাণকে গাঁজা, মদ ইত্যাদি নানারূপ নেশার কবলে

করিয়া তুলিল। পরাণ যেমন ভাল ছিল, তেমনি নেশায় একেবারে চতুর্ভুজ হইয়া উঠিল।

পাড়ার অনেকে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। ঠানদিদি; নিমের মা, এতদিনে মনস্কামনা সিদ্ধ হইবার উদ্যোগ-পর্ব্ব সাজ দেখিয়া বড়ই আত্মতৃপ্তি লাভ করিল। পূর্ব্ব হইতে এখন আরও ঘন ঘন ঠানদিদি বিনোদিনীর নিকট আসিতে লাগিল। এখন বড় বউ আর বড় একটা তাহাদিগের কাছে ঘেঁসিত না। আপন মনেই কাজ করিয়া যাইত। অবসরকালে হয় নিজের ঘরে বসিয়া গোপাল আসিলে তাহার সহিত আলাপ করিত, না হয় বাগানে গাছপালা দেখিয়া সময় কাটাইয়া দিত। ছোট বউ বিমলা গোপালকে বড়মা'র অসাক্ষাতে শাসন করিত, অনেক সময় গোপাল সে-শাসন মানিত, আপন মনে খেলা করিত, ঘুরিয়া বেড়াইত। যখন ভুলিয়া যাইত, তখন ছুটিয়া জ্যাঠাইমা'র কাছে যাইত। জ্যাঠাইমা কমলা সতৃষ্ণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত, কাছে আসিলে কোলে তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমু খাইয়া আদর করিয়া গোপালের মুখখানি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিত, অভিমানিনীর দুঃখে কষ্টে চক্ষুতে অশ্রুধারা বহিয়া যাইত। গণ্ডদেশ বহিয়া মুক্তার মালার আকারে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রুবিন্দু পতিত হইত। গোপাল "কাঁদছিস জ্যাঠামা ?" বলে' দুই গণ্ডদেশে কোমল হাতদুখানি বুলাইয়া দিলে অফুরন্ত ধারায় অভিমান প্রকাশ পাইত। কোনরকমে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া অব্যাহতি লাভ করিত।

এত যে কাণ্ড হইতেছিল, হারাণ তাহার কিছুই জানিত না। বড় বউ কমলাও কোন কথা স্বামীর কর্ণগোচর করে নাই, পাছে সংসারের কোন অমঙ্গল ঘটে। পূর্ব্বের মত সংসারের কাজকর্ম্ম চলিতে লাগিল, তবে তফাৎ রহিল প্রাণে। সে আনন্দ, সে মাখামাখি আর বড়বউ ও ছোট বউ-এর মধ্যে নাই। বড় বউ কর্ত্রী—জোর করিয়া। পাছে পাড়ার লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, সেই জন্য বড় বউ সংসারে আগে যাহা দেখিত না, এখন তাহা বেশী করিয়া দেখিতেছে, ছোট বউ যাহা করে, তাহাতে কোন কথা না কহিয়া যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহা সারিয়া লইয়া সুসম্পন্ন করিয়া রাখিতেছে। তাহার দেবরের অবস্থা তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।

বিনোদিনীর কথায় এখন ছোট বউ কোন ওজর-আপত্তি করে না; সময়ে সময়ে যখন চক্ষুলজ্জা এড়াইতে পারে না তখনই জননীর মনোমত কার্য্য করে না। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে কন্যা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া পড়িয়াছে।

জননী বিনোদিনীর মুখ এখন আর সদাই গম্ভীর থাকে না। এখন হাসিহাসিমুখে সে ঠানদিদির সহিত কত বাক্যালাপ করে। বড় বউ কমলার সহিত তাহার বাগ্ বিতণ্ডা হইবার আর বাহ্যতঃ কোন কারণ নাই। কন্যার জন্যই ত তাহার দুশ্চিন্তা। সে যখন কন্যাকে বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছে যে, সে যাহা বলিতেছে, তাহা সকলই কন্যার মঙ্গলেরই জন্য, এবং কন্যাও যখন তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, তখন তাহার দুশ্চিন্তার ভার অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। একটা ভাবনা এখন কেবল রহিয়াছে কি করিয়া কন্যার সংসার বেশ করিয়া গুছাইয়া দিবে। যে জামাই আগে বড় ভাইয়ের জন্য পাগল হইত, সে এখন নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত, ভাইয়ের ভাল-মন্দর দিকে কোনই লক্ষ্য নাই। কন্যা বিমলার কথার উপর এখন কোন জোর করিয়া কোন কথা বলে না। বিনোদিনী লক্ষ্য করিতেছে যে, দিবারাত্র পরাণ কি এক নিজের তালে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহা ভাল কি মন্দ, তাহা সে বিচার করিয়া দেখিল না। ছোট ভ্রাতার ঔদাসীন্য তাহার ইষ্টসিদ্ধির যে পরিপোষক তাহা দেখিয়া সে সন্তুষ্ট রহিল।

তাহার দীক্ষায় ঠানদিদির পরামর্শে বিমলা অন্য একরূপ হইয়া উঠিল। সে এতদিন যাহা বুঝে নাই, আজ যেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছে; সে যেন প্রত্যক্ষ করিতেছে বড় বউ তাহার ছেলেটিকে পর করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, ছেলেও এমনি বিগড়াইয়াছে যে, সেও জ্যাঠাইমা না হইলে থাকিতে চায় না। তাহার ব্যবস্থা না করিলে ভবিষ্যতে যে ভাল হইবে না, হইতে পারে না, তাহা যেন সে আজ মা ও ঠানদিদির কথায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে। সে ভাবিতেছে, এতদিন কি ভুলটাই না সে করিয়া আসিয়াছে ? মা ও ঠানদিদি যদি না থাকিত, তাহা হইলে হইয়াছিল আর কি! তাহার অভিমানই তাহার কাল হইল। সেই জন্যই সে এত কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল।

বিশু তাহার নিজের কাজ বেশ ভাল করিয়া হাসিল করিতে লাগিল। পরাণের অর্থের অসদ্ভাব ছিল না। হারাণ পরাণকে আপনার অধিক ভালবাসিত। প্রথম কাজ করি-

তেছে না বলিয়া তাহাকে কোন কথাই বলে না। পাছে ভাইটির কষ্ট হয়, সেই জন্য সে এতদিন তাহাকে ইচ্ছা করিয়াই কোন কার্য্য করিতে দিত না। এখন দুইদিন যদি সে কাজ নাই করে, তাহাকে তো বলিবার কিছুই নাই। ভাইটি আমোদে-আহ্লাদে থাকুক ইহা তাহার আন্তরিক ইচ্ছা। তাই শহরে যাইবে, কোন আমোদপ্রমোদে যোগ দিবে, তাহাতে তাহার কোন আপত্তিই হইতে পারে না। সেই জন্য যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তখন তাহা সে নির্ব্বিবাদে পাইত।

একদিন বিশুকে সঙ্গে করিয়া পরাণ দাদা হারাণের কাছে আসিল। তখন হারাণ সবে মাত্র মাঠ হইতে আসিয়া স্নান করিবার জন্য তেল মাখিতেছিল। পরাণ বিশুকে দেখাইয়া বলিল, "দাদা, বিশু ব'লছে শহরে নাকি খুব ভাল থিয়েটার এসেছে, কলকাতা থেকে। সেখানে নাকি মেয়ে-পুরুষ থিয়েটার করে! তা' তুমি যদি বল। বিশু আমার বন্ধু। বড্ড ভাল লোক। আর ওর অনেক বড় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে। সে বলেছে—কেমন বিশু?—দুই একজন বড় লোকের ছেলের সঙ্গে আলাপ ও ক'রে দেবে।"

"নাম তো শুনলুম বিশু। তা' ভাই আমি তো তোমায় কখনও দেখি নি?"

"আমি কদিন বলছি পরাণকে, 'তোমার দাদার সঙ্গে আমার একবার পরিচয় ক'রে দাও।' তা' পরাণ সুবিধা ক'রতে পারে না। আমি আবার পাঁচ কাজে ঘুরে বেড়াই আমারও ঠিক সময় হয় না। আমাদের পাড়াগাঁয়ে কলকাতার থিয়েটার দেখা একটা ভয়ানক ব্যাপার আর পরাণও বলছিল সে কখনও এ রকম থিয়েটার দেখে নি। তা, কলকাতা থেকে একদল নাচওয়ালী এসেছে। এক সপ্তাহ বড় জোর থাকবে। আজ তিন দিন হ'ল।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কি একটা যাদু এসেছে। দেশের চাষাগুলো একেবারে ক্ষেপে গেছে। এই চাষবাসের সময়। লাঙ্গল ছেড়ে সব সে দিকে ছুটেছে। ভারি অন্যায়।"

"অন্যায় কি বড়-দা? কখনও ত ভাগ্যে ঘটে না। কলকেতার লোক রোজ পাঁচশ মজা লুটে, আর আমরা কি দুর্ভাগ্য ক'রেছি যে, একদিনও একটু আমোদ করতে পারব না?"

"দেখ এ একটা যাদু! কলকেতায় তো আর চাষ হয় না। সেখানে বড়লোক থাকে। তাদের কাজ তো চাই ও যাদুতে তারা গেলে শুনেছি ভেড়া হয়ে যায়। এমন নেশা জমে যায় যে, তারা যাদু যাদু করেই ক্ষেপে ওঠে। তা তারা যা হয় করুক গে। তাদের তো আর খেটে খেতে হয় না। আমাদের যে গতরে খেটে খেতে হয়। এই দেখ না। এক তো চাষের সময় এক ঘণ্টাও যদি বাজে যায়, আমরা তো মনে করি খুব ক্ষতি হয়। তার ওপর দু'টাকা, পাঁচ টাকা, খরচা করে সে যাদুঘরে ঢুকতে হবে। আরও গাড়ীভাড়া ইত্যাদি আছে। এই যে গরীব দেশের লোকেদের টাকাগুলো দুই একদিন যাদু দেখিয়ে কলকেতার ভূতেরা বের করে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে আমি ভাল বুঝছি নে। আমার টাকার অসচ্ছল নেই; আমি দশ বিশ টাকা এখনই দিতে পারি; কিন্তু বুঝে দেখ দেখি, আমার ভাই যদি আজ যাদু দেখতে যায়, আমার প্রতিবেশীরা, আমার গাঁয়ে যে-সব চাষীরা খাটে, তারা সবাই ঐ দিকেই ছুটবে। টাকা থাকে ভাল, না থাকে ভাল, কর্জ্জ করেও, তারা আমোদ করতে যাবে। আমি যা করব, আমার গ্রামের লোকেরা তা করবে। আমি কেন দেশের টাকাগুলো বাপে-খেদান, মায়ে-খেদান হতভাগাদের হাতে তুলে দিতে যাই বল তো?"

বিশু একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। কিন্তু সে মানুষ ঘাঁটিয়া এমন পরিপক্ব হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোন কথাতেই কিছুতেই পশ্চাদপদ হইত না। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "দেখ বড়দা, আর্ট—তা তোমাকে কি বোঝাব বল, অর্থাৎ এই কি না মনুষ্যচরিত্র আর্টের ভেতর দিয়ে দেখান হয়। আমরা ঘর পাড়াগাঁয়ে কটা দেখেছি। মানুষের চরিত্র দেখতে কি তোমারও ইচ্ছে হয় না, বড়দা?"

"খুব হয়। বাবা তখন বেঁচেছিলেন। তুমি জান না, পরাণ তখন খুব ছোট, ওর মনে থাকলেও থাকতে পারে, আমার বাবার কলকেতায় চালানি কারবার ছিল। বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন বলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে কলকেতার ঘরগুলো চিনিয়ে দিতে নিয়ে গেলেন। সেই আমার প্রথম কলকেতায় যাওয়া। সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম করে যখন এক বড় জমীদার-

দের বাড়ী যাবা গেলেন, তখন তাঁরা থিয়েটারে যাচ্ছেন। আমরাও সঙ্গী হলুম। আমার ভারি হুজুক লাগল। থিয়েটারে গিয়ে দেখি বিজলী বাতি গণ্ডায় গণ্ডায় জলছে। লেখাপড়া ত জানিনে। কত কি লেখা রয়েছে। সুমুখেই গাড়ীবারাণ্ডা। বেশ মারবেল পাথরের মেঝে বিজলী পাখা বন্ বন্ করে ঘুরছে। বড় বড় হেলান চেয়ার টিনের চেয়ার সাজান। হুকো নেই। বড় বড় নল—পরে জানলুম তাদের বলে শটকা—পাশে একটা কাঠের বেড়া তার পরে কতক-গুলো লোক খাতাপত্র নিয়ে বসে আছে। ঢুকতে ডানদিকে একটি ছোট্ট ঘর। তার ভেতরে দু'টো লোক। জমীদারবাবু ঢুকতেই অমনি মাঝের চেয়ারে যে-লোকটা প্রায় চিৎ হ'য়ে শটকা মুখে দিয়ে শুয়ে ছিল—তামাক খাচ্ছিল, কি না খাচ্ছিল তা বুঝতে পারলুম না—সে তাড়াতাড়ি উঠে হাত কচলাতে কচলাতে সুমুখে এসে দাঁড়াল। দেঁতো হাসি হেসে আমাদের দশ বার জনকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে একেবারে থিয়েটারের সামনে বসিয়ে দিলে। তার পর সে কোথায় চলে গেল। অনেকক্ষণ পরে সে আর তার পিছনে একজন বেশ ভদ্রলোক ব'লে বোধ হল, এসে উপস্থিত হল। কথাবার্ত্তায় বুঝলুম ভদ্রলোকটি কিছু অনুরোধ করছেন, আর লাট সাহেবের মত সে থিয়েটারওলাটা বসে রইল। একটা কথারও জবাব দিল না। খানিক পরে সে উঠে গেল। ভদ্রলোকটি কাঁচুমাচু হ'য়ে বসে রইল। মুখখানি যেন গেরুণে চাঁদের মত দেখাতে লাগল। আমি পাড়াগেঁয়ে চাষা, তা'হলেও সাহসে ভর ক'রে জিজ্ঞেস করলুম। ভদ্রলোকটি বললেন যে, তিনি নাটক লিখেছেন, কর্ত্তাকে অনেক টাকাও নাকি কর্জ্জ করিয়ে দিয়েছেন, এমন কি নিজের নামে হ্যাণ্ডনোট কেটে, হুণ্ডি দিয়ে টাকা পাইয়ে দিয়েছেন। তবুও তাঁর সঙ্গে ঐ থিয়েটারের বড় কর্ত্তা বেশ ভাল ব্যবহার করছে না। তাঁকে আমলই দিতে চায় না। থিয়েটারের লোকটা যে রকম চোখবুজে লোকের দিকে চায়, তাতে প্রথম থেকেই আমার তা'র উপর একটা বদ ধারণাই হ'য়েছিল। ঐ ভদ্রলোকটির কথা শুনে আমার ওর ওপর ঘৃণা হল। তার পর নাটক যা দেখলুম তাতে পিত্তি পর্য্যন্ত জলে গেল। আরে যে ভগবানকে জানতে পারে সে কি আর মেয়ে মানুষ চায়? আবার যে জানে সে বিধবা হয়েছে, সে কখনও সধবা সাজতেও পারে? এই তো মানুষের চরিত্র। না, ভাই, বিশু, আমার ঘেন্না হ'য়ে গেছে। আমি ওখানে পরাণকে যেতে দোব না।"

পরাণের বলিবার কিছু নাই। কখন সে দাদার মুখের উপর কথা কহে নাই। আজিও কহিতে পারিল না। কিন্তু বিশুর নিকটে সে যে তাহার দাদার উপর অপ্রতিহত ক্ষমতা আছে বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছিল, তাহার এমন বিপরীত ভাবে নিরসন হইল দেখিয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল। একে নিজস্ব দেখাইতে পারিল না, তাহার উপর যে প্রলোভন বিশু তাহাকে দেখাইয়া ছিল, এবং যে-আকাঙ্ক্ষা সে হৃদয়মধ্যে আজ দুই দিন ধরিয়া পোষণ করিয়া আসিতেছিল যে, থিয়েটারের মেয়েদের কাহারও সঙ্গে আলাপ করিয়া অর্থে বশীভূত করিয়া আমোদ করিবে, তাহা পূর্ণ হইল না দেখিয়া সে অন্তরে অন্তরে দাদার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। একে গঞ্জিকা ও মদিরার উগ্র উন্মাদনা, তাহাতে আবার স্ত্রীলোকের চিন্তা তাহাকে একেবারে উন্মাদ করিয়া তুলিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট তাহার বলিবার কিছু ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু কালকূট বিষে তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। সে তাহার জ্বালায় ছটফট করিতে লাগিল। [ক্রমশঃ

প্রাচীন ইতিহাস

...জগতের প্রাচীন ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য উপকরণ পাওয়া যায় ভারতীয় ঋষির প্রণীত মার্কণ্ডেয় ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। প্রথমতঃ জগতের রূপ কি, তাহা এই দুইখানি পুরাণে দেখান হইয়াছে এবং তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে, মানুষের মাথা ও ঘাড় লইয়া যে অংশ বিদ্যমান আছে, তাহা গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল স্বরূপ। আর, স্কন্ধ হইতে পদদ্বয়ের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যে অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা পৃথিবী স্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নারীর অলঙ্কার ও প্রসাধন

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালার আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে কৃষ্ণলীলার যে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই বর্ণনার কিয়দংশ পুরাণ হইতে গৃহীত, কিয়দংশ কবির কল্পনার রঙে রঞ্জিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অপৌরাণিক অংশে কবি অনেক স্থলেই নিজের যুগের ও দেশের সামাজিক চিত্রের কিছু কিছু আভাসও দিয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব-কাল হইতেছে আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানির মধ্যে প্রাক্-মুসলমান যুগের সমাজচিত্র স্থানে স্থানে বেশ ভালরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি যে-যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই যুগে নারীর অলঙ্কার ও প্রসাধন-রীতির সহিত কবি সুপরিচিত ছিলেন। অতএব তিনি যে সেই সকল পরিচিত অলঙ্কার ও প্রসাধন দ্বারাই তাঁহার কাব্যের নায়িকা রাধিকাকে সুসজ্জিতা করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা অনুমান করাই স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে মুসলমানেরপূর্ব্ব যুগের অলঙ্কার ও প্রসাধনরীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

সে যুগে মাথায় মুকুট পরার রীতি ছিল। রাধিকাকে আমরা মুকুট-পরিহিতা দেখি। রাধিকা বলিতেছেন—

> মুকুট ভাঁগিআঁ সব পেলাইবোঁ
> সিন্দুর মুছিবোঁ মাথে। পৃঃ ৩৮

গলায় হার পরার রীতি ছিল—

> হার কেয়ূর আর যত আভরণ সব
> দিলে কাহ্নাঞি' মোর বলে। পৃঃ ১০৭

এই হার আবার নানারূপ হইত। 'সাতেসরী হার' বা সপ্তকণ্ঠী হারের কথা বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে—

> দুড়িআঁ সব পসার খাইবোঁ দধি আহার
> কাঢ়ী লৈবোঁ সাতেসরী হারে। পৃঃ ২০
> ... ...
> মাণিক জিণিআঁ দশন জুতী
> পীএ সাতেসরী হারে। পৃঃ ৭৩
> ... ...
> ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সাতেসরী হার। পৃঃ ৮৮
> ... ...

> যে বেলাএ পাটোল মোর দিলে গদাধরে।
> তখিত উপর ছিল সাতেসরী হারে। পৃঃ ২৬৩

এই 'সাতেসরী হার' ভিন্ন আমরা বহুবার 'গজমুতি হারের' উল্লেখ পাই—

> বান্ধুলী জিনিআঁ তোহ্মার অধর
> গীএ শোভে গজমুতী। পৃঃ ৯০
> ... ...
> কনক কুম্ভ আকারে তোর দুই পয়োভারে
> তাহাত উপর গজ মুকুতার হারে। পৃঃ ১৩২
> ... ...
> পিএ গজমুতা হার মণি মাঝে শোভে তার
> উচ কুচ যুগল উপরে। পৃঃ ৩৮১

শেষের এই উদাহরণে হারের মধ্যে 'লকেটে'র ব্যবহার-রীতিও দেখিতে পাইতেছি।

'সাতেসরী হার' এবং 'গজমুতী হার' ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে একপ্রকার সুত-হারের উল্লেখও পাওয়া যায়। কবি ইহাকে 'গুণিআ' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

> আক্ষর কাঢ়িআঁ নিল গুণিআ গলার। পৃঃ ১৩৪

উপর হাতে 'অঙ্গদ' এবং 'কেয়ূর' পরিহিত হইত। ঐ অঙ্গদ রত্নমণ্ডিত করার রীতি ছিল—

> মণি কিরণ উজলে আঙ্গদ ভুজ যুগলে
> পহ্নাইল আতি কুতূহলে। পৃঃ ৩৮১

বাহুর অলঙ্কারের মধ্যে 'বলয়', 'কঙ্কণ' এবং 'বাহুটী'র উল্লেখ পাওয়া যায়—

> বাহের বলয়া না পিন্ধিবোঁ
> না পিন্ধিবোঁ পএর নূপুর। পৃঃ ৬২
> ... ...
> মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সিশের সিন্দুর।
> বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর। পৃঃ ৮৮
> ... ...
> হার কঙ্কন বড়ায়ি সব তেয়াগিবোঁ
> মুণী আক বুক কেবা বান্ধে পৃঃ ৩০৩
> ... ...

তেজিলোঁ মো তার (তাড় ?) টীর নূপুর কঙ্কন বড়ায়ি
তেজিলোঁ মো সব আভরণে। পৃঃ ৩১৫

... ...

হাথের বলয় নিলেঁ আমর বাহুটী। পৃঃ ১৩৪

... ...

সোবন বাহুটী পঞ্চী রূপসী রাধিকা। পৃঃ ১৪৪

সোনার চুড়ী পরার রীতিও সেকালে প্রচলিত ছিল—

বাহুতে কনক চুড়ী মুকুতা রতনে জড়ী
রতন কঙ্কণ কর মূলে। পৃঃ ২৮১

এখানে দেখা যাইতেছে যে, রত্নমণ্ডিত চুড়ী এবং কঙ্কণও প্রচলিত ছিল।

তখন শঙ্খ পরিহিত হইত এবং সেই শঙ্খেও রত্নের কারুকার্য্য করা হইত—

রতনে জড়িত তোর দুই বাহু শঙ্খ
শিশে তোর শোভএ সিন্দুর। পৃঃ ২৮৭

অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় পরিহিত হইত—

কনক কঙ্কন নিলে আমর আঙ্গুলিতে আঙ্গুঠী। পৃঃ ১৩৪

এই অঙ্গুরীয় 'মুদড়ী' নামান্তরেও পাওয়া যায়।

লাখেকের মুদড়ী দিবোঁর হাথ দান। পৃঃ ২৭৯

স্ত্রীলোকেরা কটিতে 'কনক-কিঙ্কিণী', পায়ে 'মুখর মঞ্জীর' পদাঙ্গুলিতে 'পাসলী' পরিতেন—

কনক কিঙ্কিনী নিলেঁ পাএর নূপুর।
বচন সরস তোর হৃদয় নিঠুর। পৃঃ ১৩৪

... ...

চঞ্চল নূপুর ঘন কিঙ্কিনী বাজে। পৃঃ ২৯২

... ...

তেজহ সুন্দরী রাধা মুখর মঞ্জীর।
সত্বরেঁ চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির। পৃঃ ২০৩

... ...

চলিতেঁ চঞ্চল বাজে পাএর নূপুর।
দধি বিকে জাএ রাধা মথুরাপুর। পৃঃ ১৪৪

... ...

কাহের কলসী রাধা পাণি তোলনি ল
পএর বাজে তের নূপুর। পৃঃ ২৮৭

... ...

শিরাষ কুসুম সম আঙ্গে কৌআলী।
কড় দুখ পাইল আঙ্গে কাহ্নিতে পাসলী। পৃঃ ১৩৪

কনক মল্ল তোর (১) আর পাসলী বিকর
দংগ পদ আঙ্গুলিতে সাজে। পৃঃ ৩৮১

'কর্ণকুণ্ডলের' উল্লেখও বহু স্থানে পাওয়া যায়; উহা রত্নখচিতও হইত—

শ্রবণে শোভএ তোর রতন কুণ্ডল। পৃঃ ৫৭

... ...

কপোল যুগলে শোভএ তোর
বিচিত্র মণি কুণ্ডলে।
সংপুর চান্দের দুই পাশে যেহ্ন
উইল সুরুজ মণ্ডলে। পৃঃ ৬০

... ...

কুণ্ডল মণ্ডিত চারু শ্রবণ যুগলা। পৃঃ ৬৮

... ...

কন্নের কুণ্ডল রতনে উজল।
তোর মুখ নিশানাথে। পৃঃ ৯০

... ...

কন্নের কুণ্ডল তোর মাণিক উজলে। পৃঃ ১২৩

কর্ণকুণ্ডল ব্যতীত কানে 'হীরাধর কড়ী' পরিহিত হইত। উহা খুব সম্ভবত আধুনিক যুগের কানের ফুলের মত করিয়া পরা হইত এবং কড়ির উপরে হীরকখচিত করিয়া গঠিত হইত।—

বাহুর বলয়া লঞ কাঢ়ী।
কানের হিরাধর কড়ী। পৃঃ ১১২

সুবর্ণের এই সকল অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিবার জন্য সে যুগে স্বর্ণকার ছিল। কবি তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন—

পড়াইল হরিষ মনে কণ্ঠত ভূষণগণে
দেখি আভিসারে সুশোভনে।
মিলি হেমকরগণে (২) বান্ধিল আতি যতনে
যেন কথু রতনক রতনে। পৃঃ ৩৮১

এই সকল সুবর্ণের অলঙ্কার ভিন্ন সে-যুগে পুষ্পের আভরণ পরার রীতিও প্রচলিত ছিল। রাধিকাকে আমরা পুষ্পাভরণে অলঙ্কৃতাও দেখিতে পাই। বড়ায়ি রাধিকাকে বলিতেছেন যে, বৃন্দাবনে নানা ফুল ফুটিয়াছে—উহা দ্বারা অঙ্গসজ্জা করিয়া তিনি মথুরায় গমন করুন:

নানা ফুল ফুটিতেছে মাঝ বৃন্দাবনে
তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে। পৃঃ ২০৪

১ মল্লতোড়ল—তোড়া। ২। স্বর্ণকার।

পিন্ধি বউল পুষ্পের হার।
কাত কুণ্ডল হিয়ার ধার। পৃঃ ৩৪১

খোঁপায় মালা পরার কথা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে—

খোঁপাত উপর তোর বউল মাল দেখী।
সিসের সিন্দূর তোর লক্ষ দান লেখী॥ পৃঃ ১০৪

... ...

ললিত খোঁপাত শোভে চম্পকের মালা।
হর শিরে শোভে যেহ্ন কনক মেখলা॥ পৃঃ ২৩১

... ...

নীল জলদ সম কুন্তল ভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা॥ পৃঃ ৬৮

... ...

ফুলে জড়ী বান্ধী কেশপাশে।
পরিধান কর নেত বাসে॥ পৃঃ ৩৪৮

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বাসিত ফুলে চুল বাঁধার কথা আছে—"বাসিত ফুলে রাধা বান্ধসি কেশ"—ইহা কালিদাসের মেঘদূতের "অলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং" প্রভৃতি বর্ণনার কথা মনে করাইয়া দেয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নানারূপে খোঁপা বাঁধার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন কানড়ী খোঁপা—

কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো। পৃঃ ৮৮

লবঙ্গ দোলঙ্গ প্রভৃতি খোঁপা বাঁধিয়া উহা পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করাও হইত:

লবঙ্গ দোলঙ্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে।
গুলাল মালতী মালে কুরিল বিলাসে॥ পৃঃ ২১৯

লবঙ্গ এবং মালতী ফুল দিয়া কেশ রচনা করা হইত—

লঙ্গ মালতীএঁ খোঁপা ভরাআঁ
তিড়িআঁ বান্ধে লোটনে। পৃঃ ১৩১

রাধিকার প্রসাধন বর্ণনা করিতে গিয়া কবি আরও বলিয়াছেন যে, সিঁথিতে সিন্দুর পরিবার রীতি সেকালে প্রচলিত ছিল—

সিসের সিন্দূর সুরেখ শোভে
আর দশনের দ্যুতী। পৃঃ ৯০

... ...

শঙ্খ সদৃশ তোর খোম্পা ভাত দিল বেঢ়িআঁ চম্পা
সিমন্ত সিন্দুর নব সুরে। পৃঃ ২৮১

... ...

সিমন্ত শোভএ তোর কাম সিন্দুর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সুর॥ পৃঃ ৬৮

ললাটে সিন্দুরবিন্দু ধারণ করা হইত:

আর আদভুত দেখোঁ চন্দ্রাবলী
সিন্দূর সুর ললাটে। পৃঃ ৩১

ললাটে তিলক পরার রীতি ছিল:

ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা। পৃঃ ৬৮

... ...

সিসের সিন্দূর সুর ললাটে তিলক চাঁদ
নয়নত বসএ মদনে। পৃঃ ২৭৪

নয়নে কাজল পরা হইত এবং অগুরু চন্দন গাত্রে লেপন করা হইত—

আগর চন্দন আঙ্গে মাখী।
কাজলে রঞ্জিল দুই আখী। পৃঃ ৩৪৭

কর্পূর কস্তুরী যোগে, আতর তাম্বুল রাগের দ্বারা একপ্রকার মুখ-রঞ্জিকাও ব্যবহৃত হইত:

কর্পূর কস্তুরী যোগে আতর তাম্বুল রাগে
গন্ধরাংগে রচিল বদনে। পৃঃ ৩৮১

রাধিকা নেত বসন পরিধান করেন। কবির যুগের লোকেরাও এই বসনের সহিত পরিচিত ছিলেন।—

নহুলী যৌবন হের তোর পরবেশ।
নেত বসন রাধা পিন্ধিলে সুবেশ॥ পৃঃ ১১১

এবং সে যুগে ঐ নেত বসনাঞ্চল রত্নখচিতও হইত—

পাট পরিধান তোর নেতের আঁচল ল
মাণিকে খচিল মুঞি পাশে। পৃঃ ২৮৭

পট্টবস্ত্রের সহিতও কবি পরিচিত ছিলেন:

পিন্ধিআঁ অমূল পাটোলে।
কাহ্নাঞি দেখি পড়ি গেলোঁ ভোলে॥ পৃঃ ৩৪১

কবি স্ত্রীলোকদের কাঁচুলী পরিধানের বিষয়ও অবগত ছিলেন। এবং সেই কাঁচুলী বিচিত্রও হইত:

বার বৎসরের তোএঁসি বালী
বিচিত্র কাচুলী শোভে। পৃঃ ৩১

এইরূপ বিচিত্র কাঁচুলীর বর্ণনা আমরা 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্ম্মমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যেও পাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যখানিতে কেবল যে ঐ-যুগের নারীর অলঙ্কার এবং প্রসাধনের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে। এই কাব্যখানির আদ্যন্ত অনেক সামাজিক তথ্যে পরিপূর্ণ। বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল ভিন্ন অন্য কোনো কাব্যে বোধ হয় এত প্রচুর সামাজিক তত্ত্ব ও তথ্য নাই।

পৃথিবীর ইতিহাস

—শ্রীকণা দত্ত

* * * তিনযুগ আগেকার পৃথিবী!

দারিদ্র্যের মর্ম্মান্তিক ভয়াবহতার, অনিবার্য্য সংঘাত আর অবিরাম সংগ্রামে সভ্য মানুষের জীবনযাত্রা তখনও এমন জটিল আর ব্যর্থতা-তিক্ত হইয়া উঠে নাই।

সরল অকপট আন্তরিকতায় মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার যে-দিন স্বাভাবিক ছিল, গলা ফাটাইয়া হাসিলে যে যুগে অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে এতটুকু বেদনা খচ্‌খচ্‌ করিয়া গোপনে বিঁধিত না, জলধি রায় সেই যুগেরই মানুষ ছিলেন।

বারিধি সে বৎসর জন্মায়। শুভলগ্নে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। আনন্দ-সস্মিত মুখে গিনি দিয়া জলধি নাতির মুখ দেখিলেন।

"রাজদণ্ড ললাটে নিয়ে জন্মেছে বউ মা। এ ছেলে তোমার রাজা না হয়েই যায় না। হুঁঃ, জলধি রায়ের কথা—এ দেখে নিয়ো তুমি।"

অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মহামায়াও হাসিলেন। নারী-জীবনের চরম সার্থকতার আনন্দে, সরল, শুভ্র, তৃপ্ত, নিটোল দুটী গণ্ডে, এক রশ্মি স্বর্গের আলো যেন ঝলকাইয়া উঠিয়াছে, এমনি গর্ব্ব আর সুখে পরিপূর্ণ সে হাসি।

"আপনি তো তা হলে বাবা রাজার ঠাকুরদাদা হবেন।"

"আর তুমি রাজমাতা। কি বল মা?"

উচ্চহাস্যে বাড়ীখানি উচ্চকিত করিয়া জলধি রায় বৈঠকখানায় গিয়া কাজে বসিলেন।

সুমুখেই অদিতি তখন অন্দরে ঢুকিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। স্পন্দিত বক্ষ আর অন্তরের সুগভীর উত্তেজনা লইয়া ঠিক পিতার সামনা-সামনিই পড়িয়া গেলেন।

"দেখে এলাম রে, রাজপুত্তুরের মত ছেলে হয়েছে বৌমার। খবরও দিয়ে দিলাম গাঁয়ে, আটকৌড়ে ষষ্ঠীর দিন গাঁ শুদ্ধ লোক খাওয়াবো, কিন্তু হুঁঃ জলধি রায়ের নাতি! তুমি বাপু যেন আবার আপত্তি করে বোসো না।"

অদিতির সারা আননে আকস্মিক রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। লজ্জায় আনন্দে তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপনান্তে তিনি অন্তঃপুরের পানে সরিয়া গেলেন। তাঁহারই প্রতিকৃতি, আশা, আর স্বপ্ন লইয়া, প্রথম সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। চকিতপাতে অদিতি বহুদূর ভবিষ্যতের একখানি সুখস্বপ্ন মানসপটে আঁকিয়া লইলেন। তাঁহার পুত্র, তাঁহার এবং মহামায়ার সুনিবিড় পবিত্র বন্ধনের একমাত্র চিহ্ন সুখে আর গর্ব্বে অদিতি শুধুই স্বপ্ন দেখিলেন।

এমনি অনেক আশা আর আনন্দ, অভ্যর্থনা আর সম্বর্দ্ধনার ভিতর দিয়া বারিধি প্রথম আকাশের উদার আলো-বাতাস আর মৃত্তিকার সৌগন্ধ, আপনার ক্ষুদ্রচেতনা দিয়া উপলব্ধি করিল। এমনি সমারোহ দিয়াই বারিধির জীবনের প্রথম মুহূর্ত্তগুলি আরম্ভ।

স্ত্রী মারা যাইবার পর হইতেই জলধি বৈষয়িক কাজ-কর্ম্মে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। এতদিন পরে সে কর্ম্মভার হইতে নিজেকে তিনি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। অদিতি লইলেন বিষয়-সম্পত্তির ভার, জলধি পড়িলেন নাতি লইয়া।

প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পৃথিবী আপনার কক্ষ পরিগ্রহ করে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে বারিধি বড় হয়। শিশুর নিত্যনূতন চপল মায়ালীলা দেখিয়া জলধি আনন্দে আত্মহারা হন। মহামায়াকে ক্ষণে ক্ষণে ডাকিয়া বলেন, "আদরে আদরে অদিতি আমার মানুষ হোলো না বউ-মা। তোমার এ ছেলেকে কিন্তু অত আদর দিও না মা, একে মানুষ হতে দাও!"

মহামায়া উচ্ছ্বসিত হাসি হাসিলেন, "কিন্তু আদর তো আপনিই বেশী দিচ্ছেন বাবা, আর সেই জন্যেই তো অত দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছে বারি।"

ছেলের পানে ফিরিয়া কপট ক্রোধে মহামায়া শাসন সুরু করেন, "দিলে তো দোয়াতের কালী ফেলে? আদরে

আদরে শয়তান হয়ে যাচ্ছে। থামো তোমায় এবার জব্দ—।"

মহামায়াকে কথা শেষ করিতেও অবসর দিলেন না। 'ষাট্ ষাট্' বলিয়া রোরুদ্যমান বারিধিকে জলধি আপনার বক্ষে তুলিয়া লইলেন, "ঐ তো তোমাদের দোষ বউ-মা। বকে মেরে কখনও ছেলে শাসন হয়? ছোট ছেলে কালী ফেলবে না, গেলাস ভাঙ্গবে না! আশ্চর্য্য তোমাদের সখ বাপু।"

মহামায়া এবার হাসিয়া ফেলিলেন, "এই যে আপনিই বললেন বাবা, ওকে মানুষ করতে।"

জলধি রাগিয়া গিয়াছেন, "তা বলে কি বকে মেরে? বুড়ো যতদিন বেঁচে আছে মা। তার কথাটাও একটু শুনে যেও। বুড়ো মরলে তোমার ছেলে, যাই কর না কেন, কে আর দেখতে আসছে বল!"

শ্বশুরের সঙ্গে তর্কে বাকাব্যয় করিবার মত শিক্ষা মহামায়ার ছিল না। জলধির আদরে আদরেই বারিধি বড় হয়। এবার অদিতি কিন্তু আপত্তি জানাইলেন, "আমি তো একটা অপদার্থ হয়েই রইলাম, ওকে মানুষ হতে দাও বাবা।"

পিতার অমতেই অদিতি জোর করিয়া বারিধিকে সেদিন পাঠশালায় বসাইয়া দিয়া আসিলেন। মহামায়া আপত্তি করিলেন, "বাবা যখন বলছেন, থাক্ না কেন আরও ছদিন।"

কাহারও কথায় অদিতি গ্রাহ্য করিলেন না। মহামায়াকে ধমক্ দিলেন,—"তুমি থামো তো! ইংরিজী লেখা পড়াবার জন্য, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমাকে চাকরের সমুখে গিয়ে অনুগ্রহ ভিক্ষে করে দাঁড়াতে হচ্ছে। ম্যানেজার আমার চাকর নয় তো কি? তুমি মেয়ে মানুষ হয়ে, যা জানো না, চুপ করে থাক।"

তবু মহামায়া ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করিতে ছাড়িলেন না, "বাবা তো তোমার জন্যে ঘরে মাষ্টার রেখেছিলেন, তুমি শিখলে না তা কে কি করবে?"

অদিতি এবার অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, "না শিখি নি, অত আদরের ঘটায় কারুর লেখাপড়া হয় না, বারিধিরও হবে না, দেখো।"

লেখাপড়া সত্যই হইল না। পাঠশালার পথ দিয়ে একদিন বাড়ী ফিরিবার মুখে অদিতি দেখিলেন, পাঠশালা তখনও ভাঙ্গে নাই আর জলধি বাঘভেরেণ্ডার বেড়ার ধারে শুক্‌নো মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বোধ হয় বারিধিরই প্রতীক্ষায়।

এমন অসময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া জলধি ভারী অপ্রস্তুত হইলেন। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া যেন কোনমতে জবাবদিহি করিতেই বলিলেন, "এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম কি না, তা ভাব্‌লাম এইসঙ্গে একেবারে ছেলেটাকেও নিয়ে যাই। তাই দাঁড়িয়ে আছি।"

অদিতি স্পষ্টই দেখিলেন, পিতা বামহস্তের যে পুঁটলিটি লুকাইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া রসগোল্লার মত রস ঝরিতেছে।

পুত্রকে মানুষ করিতে অদিতির যত ইচ্ছাই থাকুক্ ইহার পরও যে পুত্রকে পাঠশালায় পাঠাইবেন, এত কম পিতৃভক্ত তিনি নন্।

পরদিন বারিধির পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। সকলের নজর এড়াইয়া নিভৃত নির্জ্জন কক্ষে নাতি-ঠাকুরদাদা গলা ধরাধরি করিয়া খুব একচোট হাসিয়া লইল।

অদিতিকে জলধি বার বার করিয়া আশ্বাস দিলেন, "তুই দেখ না, আমিই ওকে কিরকম করে পড়াই। হুঁ পাঠশালার গুরুমশাই যদি অমন যত্ন নিয়ে পড়াবে, তা হলে তো আর ভাবনাই ছিল না!"

উত্তরের প্রত্যাশায় চুপ করিয়া থাকিয়া উৎসাহিত মুখে আবার বলেন, "তারপর বড় হোক্ সাহেব মাষ্টার রাখবো আমি! বারির কপালের এই রাজদণ্ড খানা একবার দেখেছিস্ অতু?"

অদিতি নিরুপায় ভাবে শুধু ক্লান্ত হাসি হাসিলেন। স্বপ্ন বুঝি ব্যর্থ হয়! সাহেব মাষ্টার তাঁহারও জন্যে মোতায়েন ছিল। হয় নাই কিছুই। বারিরও যে কিছু হইবে না, তাহা অদিতি জানেন। আর জানেন বলিয়াই এত ভাবনা!

পাঠশালা হইতে ছাড়া পাইয়া বারিধি ঠাকুরদাদাকে আরও এক প্রস্থ ভক্তি করিতে শিখিল।

* * সময়ে অসময়ে বারি শুধায় "আচ্ছা দাদু, "রাজদণ্ড" কি"?

দাদুও উৎসাহিত হইয়া উঠেন, "ঐ যে তোর কপালে একটা টানা রেখা উপর পর্য্যন্ত চলে গেছে! মা বলতেন্ ওটা থাক্‌লে রাজা হয় রে।"

সুতরাং বারিধি শৈশব হইতেই স্বপ্ন দেখিতে সুরু করিল। একখানি রত্নখচিত সিংহাসন, সোনার তরবারী, সোনার মুকুট, ঘোড়া, হাতীর হাওদা আর মেঘমালা রাজকন্যাকে ঘিরিয়া, সে সব স্বপ্ন আবর্ত্তিত হইয়া ফিরিল।

এদিকের ইতিহাসে পৃথিবীও আবার আপনার কেন্দ্র বদল করিল

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইয়া বিংশ শতাব্দীর পানে পৃথিবী চলিয়া পড়িয়াছে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে পৃথিবীর বুকে জলধিকে কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। জলধি এ পৃথিবীর খেলাঘর হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে।

বাঁচিয়া আছেন মহামায়া, অদিতি। বাঁচিয়া আছে বারিধি। বিংশ শতাব্দীর বিলাসলালসাময় ফেণিল জীবনে, সভ্যতার বহুমুখী নিষ্ঠুরতায়, বৈচিত্র্যে আর আত্মবিরোধে একান্ত বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে। তবু বিংশ শতাব্দীর মানুষও হাসে। মহামায়ার হাসি কেমন যেন জোর করিয়া টানিয়া আনা। অদিতি হাসেন কেমন যেন ভীরু আর শুক্‌নো হাসি। বারিধি উচ্চগ্রামে হাসে। শুধু মনের ভিতর যেন গোপনে কি একটা কাঁটা খচ্‌খচ্ করিয়া বুঝি বারবার আপত্তি জানায়।

গত বৎসর জলধি মারা গিয়াছেন। মরিবেন যে একদিন সে প্রত্যাশা সকলেই করিয়াছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত রূপে যাহা অদিতির জীবনে ঘনাইয়া আসিল, তাহা সংসার যাত্রা-নির্ব্বাহের সুবিপুল দায়িত্বভার।

জলধির মৃত্যুর পর দেখা গেল, সারাজীবন মুক্তহস্তে দান করিয়া, পূজাপার্ব্বণে গ্রামশুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণ করিয়া আদর আপ্যায়ন করিতে, জলধি রায় জলের মত সব অর্থই ব্যয় করিয়া বসিয়া আছেন।

অদিতি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। যে কয়টা সম্পত্তি এতদিন তিনি রায়দের সত্ত্ব বলিয়া তদারক করিয়া আসিয়াছেন, সব কয়টাই দেখা গেল, বহু পূর্ব্বেই বন্ধক দেওয়া আছে। চণ্ডীপুর গাঁ জুড়িয়া জলধি রায়ের নামে পুষ্করিণী, কালীমন্দির, ড্রামেটিক ক্লাব, শিক্ষা-নিকেতন। তবু জলধি রায়ের বংশধরকেই জীবিকাসংগ্রহের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত সহরে আসিয়া বাসা বাঁধিতে হইল। মহাসমারোহে যে চণ্ডীপুরে একদিন বনবাস করিয়াছেন, অবস্থার এই চরম দুর্দ্দশার দিনে সে চণ্ডীপুরে থাকিতে অদিতির কেমন যেন আত্মসম্মানে বাধিল।

এতদিনের মসৃণ জীবনযাত্রায় ছেদ পড়িল। চণ্ডীপুরের প্রশস্ত দালানবাড়ী ব্যাপিয়া আনাগোনা করিতে করিতে যাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, সহরের দুখানি ধূম আর অন্ধকার আচ্ছন্ন কুঠরীকে মাত্র কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের জীবনযাত্রা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল।

তবু জীবন-দেবতার বলিষ্ঠ ইচ্ছার নিকট অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় কি?

লেখপড়া বিশেষ কিছু জানা ছিল না, তবু অনেক খোঁজ-খবরের পর বহু বিপক্ষ বেকারপক্ষকে নিরাশ করিয়া অদিতি একটি সামান্য বেতনের চাকরী জুটাইয়া ধন্য হইলেন। অভাবের সংসার। স্বামীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর বদলে কয়টি মাত্র মুদ্রা গ্রহণ করিতে মহামায়ার বুকখানা ভাঙ্গিয়া যায়। বাড়ীর নিম্নতম কর্ম্মচারীও যে ইহার অধিক মাহিনা লইয়াছে। সেদিন আর নাই। তবু মহামায়া আশা করেন দুঃখ ঘুচিবে।

বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর সুসভ্য সমৃদ্ধ সহর। কাজ-কর্ম্মের অবসরে, অন্ধকার-প্লাবিত কুঠরীটির একটিমাত্র সান্ত্বনা ক্ষুদ্র গবাক্ষটির পাশে দাঁড়াইয়া মহামায়া রাজপথের বিপুল জনতার পানে চাহিয়া থাকেন।

পিচ ঢালা সুসংস্কৃত রাস্তা দিয়া অগণিত, অফুরন্ত, বহুমুখী জীবন কর্ম্মব্যস্ততায় আপন আপন লক্ষ্যপথে ছুটিয়াছে। এত জনতা, এত সমারোহ, তবুও মৃতের মত ইহাদের পাণ্ডুর আলোকহীন মুখের পানে চাহিলে শুধু ক্লান্তিই আসে। ইহারা যেন যুগযুগান্তরের সব অতৃপ্ত, বুভুক্ষু আত্মা। অন্তরের গভীর যন্ত্রণা নীরবে লুকাইয়া নিস্পন্দ ভাবলেশহীন মুখে যন্ত্র-চালিতের মত হাঁটিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে মাত্র।

মহামায়া জানেন না, বুঝিতেও পারেন না, জীবনের প্রচ্ছন্ন প্রদেশে ইহাদের কত ব্যর্থতা আর হতাশা, কত তিক্ততা আর লাঞ্ছনার পুঞ্জীভূত ইতিহাস যুগ-যুগ ধরিয়া নীরবে সঞ্চিত রহিয়াছে। মহামায়া কল্পনাও করিতে পারেন না, এই সব ধূলিধূসর প্রাণ, ইহাদের জল্পনা আর ছটফটানী,

আকাঙ্ক্ষা আর শেষ পর্যন্ত এদের চরম নিষ্ফলতা, ব্যর্থতা। কত দুঃখে ইহারা একমুষ্টি জীবিকাসংগ্রহের উঞ্ছবৃত্তিতে অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা সহিয়াও এক দুয়ার হইতে অপর দুয়ার ঘুরিয়া বেড়ায়। উন্মাদের মত তুচ্ছতম জিনিবটী লইয়া কাড়াকাড়ি হানাহানি করে, আর শেষ পর্যন্ত অসহায়ভাবে মুমূর্ষু ক্লান্তিতে এই পৃথিবীর ইতিহাস হইতে নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাই মহামায়া আশা করেন দুঃখ ঘুচিবে। নিদ্রাহীন রাত্রে সুষুপ্ত পুত্রের ললাটের রাজদণ্ডটীর পানে, অভিভূত মহামায়া আশাকুল নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া থাকেন। পুত্র তাঁহার রাজতুল্য মানী হইবে! স্বামীর দুঃখ ঘুচিবে। আবার মিলিবে পল্লীমায়ের শ্যামল বুকের সেই শান্তশীতল স্নেহচ্ছায়া। মহামায়া তখন ফিরিয়া যাইবেন চণ্ডীপুরে। সেখানে রূপসা নদীর তটে সেই অবারিত স্নিগ্ধ-সবুজ ধানের ক্ষেত, মাথার পরে প্রশান্ত মেহে ছড়াইয়া পাকা উদার অপার নীল আকাশ। দূর-দিগন্তে তাল-খেজুরের ঘন বনসীমা-সেখানে উন্মুক্ত আকাশের গায়ে গায়ে মিশিয়াছে। সে গাঁয়ে হলুদ ফুলে ছাওয়া বাবলা ডালে দোয়েল শ্যামা পুচ্ছ নাচায়। ছায়া-ঘন আম্রকুঞ্জে, চূতমঞ্জরী ঘ্রাণে মাতাল কোকিল, সেখানে কুহু কুহু স্বরে ভুবন আকুল করে। আনন্দে মহামায়ার দুই চোখে নিবিড় সুখ ঘনীভূত হইয়া আসে।

লেখাপড়া নাই শিখুক, তবু বারিধি মহামায়া নয়। ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতায় বারিধি জানিয়াছে, পৃথিবীর নির্মম উত্থান-পতনের ইতিহাস। চিনিতে শিখিয়াছে আত্মসম্পূর্ণ, আত্ম-সচেতন ছদ্মবেশী সহরকে। বুঝিয়াছে, এখানে ঐশ্বর্য্য-কুবের বিলাসীর স্বার্থের দম্ভে প্রতিমুহূর্ত্তে শত শত জীবন তরঙ্গায়িত হয়। বুঝিয়াছে, মানুষের মত বাঁচিতে হইলে বিংশ শতাব্দীতে ধাক্কাধাক্কি অনিবার্য্য। বহু শ্রমে, বহু রক্ত-পাতে কাড়িয়া লইতে হইবে একমুষ্টি ভিক্ষার। তাতে ক্ষুধা-নিবৃত্ত হয় না, তবু প্রাণ বাঁচে। শৈশব-স্বপ্নের রাজদণ্ড, সোনার মুকুট, রাজকন্যা নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে হারাইয়া গিয়াছে।

আবাল্য সুখসম্পদে লালিত পিতার রক্তের ধূসর বিবর্ণতা, পাণ্ডুর মুখের অসহায় ক্লান্তিতেই ধরা পড়ে। মায়ের মলিন বেশভূষা আর পিতার মুমূর্ষু চেহারা দেখিয়া বারিধি ব্যথা পায়।

গোপনে গোপনে বারিধি চাকরীর সন্ধান সুরু করিল। সামান্য আয় বাড়িলেও যে পিতার দুঃখ কিছুটা ঘুচিবে।

শশাঙ্কই সেদিন সংবাদটা আনিয়া দিল। চুপি চুপি শুধাইল, "বলছিলি যে, চাকরি করবি? খালি আছে শুনলাম।"

বারিধির যেন হাতে স্বর্গ জুটিয়াছে, "কি রকম কাজ? বিদ্যে তো জানই ভাই।"

"তা হোক্ এতে বিদ্যে লাগে না, দুদিনে আয়ত্ত হয়ে যাবে দেখিস্। দরকার একটু সাহসের।"

বারিধি সম্মতি জানাইল। দাদু বাঁচিয়া থাকিতে বারিধিরই তিনটা সাইকেল আর একটা টাট্টু ঘোড়া ছিল। সে সব স্বপ্নকথা আজ আর স্মরণে কিই বা প্রয়োজন? তবু মনে পড়ে।

শশাঙ্ক বলিল, "বাস-কণ্ডাক্টারি! মাইনের উপর কমিশন ফাইভ্ পার্সেণ্ট, খুব কম নয়, কি বলিস? অনেক ভদ্র-লোকের ছেলেরা এখন সেধে এ কাজ নিচ্ছে। তবে খুব স্মার্ট হওয়া দরকার, তা তুই পারবি। চল তবে এখনি ঠিক করে আসি। যা বাজার—দুমিনিট দেরী হলে গিয়ে দেখবো লোক মোতায়েন হয়ে গেছে।"

জলধি রায়ের চণ্ডীপুর জুড়িয়া দানের ইতিহাস। তাঁহারই নাতি বারিধি উৎসাহভরে মাথা নাড়িল, "সত্যই খুব মোটা কমিশন, ফাইভ পার্সেণ্ট? বেশী বই কি!" দুই বন্ধু তখনই বাহির হইয়া পড়িল।

রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই। উঠিতে তাই একটু বেলা হইয়া গিয়াছিল। ঘুম হইতে জাগিয়া বারিধির আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সহিল না। মুখে চোখে দু'ঝাপটা জল ছিটাইয়াই বারিধি বাহির হইল। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন রান্নাঘর হইতে মহামায়া হাঁকিলেন, "মুড়িটুকু হয়ে গেছে একেবারে খেয়ে যা বাবা, কি এমন রাজকার্য্য যে দুমিনিট দেরী সয় না?"

তবু বারিধি অপেক্ষা করিতে পারিল না। কদিনে তাহার এইটুকু অভিজ্ঞতা খুব জন্মিয়াছে, যেখানে অপরের খেয়াল খুসীর মর্জ্জির উপর জীবিকা নির্ভর করে, সেখানে আপনার জীবনের সুখ দুঃখ ও অবসরের পানে ফিরিয়া চাহিবার ধৃষ্টতা একান্তই অমার্জ্জনীয়।

শেষ হাত-রুটি কখানি সেঁকিয়া তুলিতে তুলিতে মহামায়া বকিয়া চলিলেন। বারিধি তখন অনেক দূরের পথে প্রাণপণে বাইক ছুটাইতেছে।

গ্যারেজে যখন বারিধি পৌঁছাইল, অপর সকল গ্যারেজ তখন ফাঁকা। ড্রাইভাররা যে যাহার বাস লইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহারই জন্ম তাহার সঙ্গী, পাঞ্জাবী ড্রাইভারটা অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "কি বাবু, বঁহু বুঝি ছাড়িতে না দিল?" নূতন বাঙ্গালা শুনিয়া বারিধিও হাসিল। অতঃপর ক্ষিপ্রগতিতে প্যাণ্টালুন কোট লইয়া বারিধি ছুটিল। এদিক্ ওদিক চাহিবারও অবসর নাই। ড্রাইভার গতি বাড়াইল। দেরী হইলেই হয়তো প্যাসেঞ্জার পাওয়া যাইবে না কমিশনের ভাগও কমিয়া যাইবে।

গত মাসে বারিধি মাকে রাঙ্গা কস্তাপাড় চমৎকার একজোড়া কাপড় কিনিয়া দিয়া- ছিল আর বাবাকে একটা নূতন পাঞ্জাবী। তাঁহারা জানেন না, বারিধি কণ্ডাক্টারের কাজ লইয়াছে। কেমন করিয়া টাকা মিলিল, সে প্রশ্ন অনেক কষ্টে বারিধি এড়াইয়াছে। পিতার মুখে ম্লান রেখা ফুটিয়া উঠিবে। মা পুত্রের রাজদণ্ডের পানে চাহিয়া নীরবে সকল অভাব-অভিযোগ সহিয়া যাইতেছেন। থাক্, তাঁহাদের দুঃখ দিয়া কাজ নাই। সামনের মাসে মাকে যদি সস্তায় একজোড়া চুড়ী পরাইয়া দেওয়া যায় আর বাবাকে জুটো ধুতি!

বারিধির কাজ নেওয়ার কথা তাঁহারা জানিবেনই, তবু যত দেরী হয়। লক্ষ্মীপ্রতিমার মত মায়ের সুন্দর হাত দু'খানিতে চুড়ি উঠিবে, পিতা ধূলিধূসর মলিন বস্ত্রটি ছাড়িয়া একখানি শ্বেতশুভ্র ধুতি পরিতে পাইবেন, বারিধি প্রাণপণে হাঁকিয়া চলিয়াছে, "শ্যামবাজার, ওয়েলিংটন।"

শশাঙ্কই অনেক কষ্টে পুলিশ পাহারা আর জনতার দায় এড়াইয়া বারিধিকে বাড়ী আনিয়া তুলিল। জনতা "স্যাড ইন্সিডেণ্ট" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রাখা কণ্ডাক্টারের ব্যাগটি পর্য্যন্ত রক্তে রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। পাথরের মত শুষ্ক কঠিন চোখে মহামায়া শুধু চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন তাহাকেই চাহিয়া, যে দুই চক্ষু অশ্রু প্লাবিত হইয়া গেলেও আর ফিরিয়া চাহিবে না। দেখিলেন, একমাত্র পুত্রের নিমীলিত নয়ন, পাণ্ডুর মুখশ্রী। রাজদণ্ডটি বহিয়া ক্ষীণধারায় রক্তস্রোত গড়াইয়াছে।

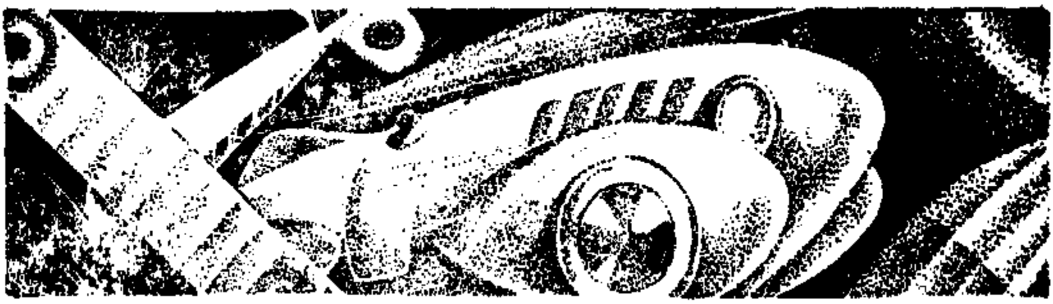
এতদিনে পাগলিনী তিক্তহাসি হাসিলেন।

অফুরন্ত, অগণিত দুঃখের কাহিনী বহন করিয়া পৃথিবীর ইতিহাস যুগ-যুগান্তের পানে বহিয়া যায়। স্বর্গের ঈশ্বর! পৃথিবীর ইতিহাসে রাত্রি প্রভাত হয়।

দুঃখের মূল

"..."ব্যোম" জগতের মূল কারণ এবং "ব্যোমের" অশরীরী এবং ভূত অবস্থা নামক দুইটি অবস্থা আছে। অশরীরী অবস্থার ব্যোম হইতে ভূত অবস্থার ব্যোমের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং ভূত অবস্থার ব্যোমের উদ্ভব হইলে, ভূত অবস্থার বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির উদ্ভব হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ পরমাণু, অণু, মেদ, অস্থি মজ্জা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম এবং রোমকূপের উদ্ভব হইয়া থাকে। রোমকূপ পর্য্যন্ত উদ্ভূত হইলে একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মানুষের সৃষ্টি হয়।...

...মানুষের জীবন যাহাতে সুখে দুঃখে মিশ্রিত না হইয়া অবিমিশ্র সুখময় হয়, তাহা করিতে হইলে প্রথমতঃ জগতের মূল কারণ যে অশরীরী ব্যোম তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ তাহা হইতে কি পদ্ধতিতে ভূত অবস্থার ব্যোম, বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির উদ্ভব হইতে পারে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ ভূত অবস্থার ব্যোম, বায়ু, অম্বু এবং বহ্নি হইতে কি পদ্ধতিতে মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম ও রোমকূপের উদ্ভব হইতেছে তাহাও জানিতে হইবে।...



বিজ্ঞান জগৎ

গ্রহের উপাদান

—শ্রীদেবেশচন্দ্র রায়

গ্রহগুলির উপাদান কি,—ইহাদের ঘনত্ব কত, উহাদের উপরিভাগ গরম কি ঠাণ্ডা, তাহাতে গাছপালা জন্মান সম্ভব কি না—আবহাওয়া কিরূপ, তাহাতে কোনপ্রকার প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে পারে কি না – ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্ন স্বভাবতঃই আমাদের মনে জাগে। এই লইয়া জ্যোতির্বিদগণ বহুকাল হইতে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। অর্থ ব্যয়ও হইতেছে প্রচুর, কিন্তু অদ্যাবধি কোনপ্রকার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

আমরা এখানে শুধু গ্রহের উপাদান সম্বন্ধে মোটামুটি যাহা জানা গিয়াছে তাহাই আলোচনা করিব। কি উপায়ে ঐ সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, ইহাদের উপর কতটুকু আস্থা স্থাপন করা যায়—এবংবিধ জটিল প্রশ্নের মধ্যে যাইব না।

এইটুকু সহজেই বুঝা যায় যে, গ্রহগুলি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। আমরা যে-গ্রহে বাস করি, উহার সম্বন্ধেই বা আমাদের কতটুকু জ্ঞান আছে? পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ খনন করিয়া সামান্য কিছুদূর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি বটে, কিন্তু পৃথিবীর বিশালতার কথা ভাবিলে এই উপায়ে লব্ধ জ্ঞান খুবই তুচ্ছ বলিয়া সহজেই বুঝা যায়।

প্রথম আমরা পৃথিবীর উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পৃথিবীর বহিঃস্তরে আছে মাটী, জল, পাথর এবং বিভিন্ন প্রকারের খনিজ পদার্থ। আমরা খনন করিয়া যতটা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি—উপরোক্ত পদার্থগুলিরই পরিমাণভেদে বিভিন্ন প্রকারের সমাবেশ দেখিতে পাই। তখন স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, তবে কি পৃথিবীর অন্তরতম প্রদেশেও অনুরূপ পদার্থই বিদ্যমান? ইহার সম্বন্ধে আমাদের হাতে সাক্ষাৎ কোন প্রমাণ নাই—পরোক্ষ প্রমাণের উপরই নির্ভর করিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে, পৃথিবীর ঘনত্ব বহিস্থ পাথর অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি ভিতরে এমন কিছু পদার্থ আছে যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্মেই হউক কিংবা অবস্থাবৈগুণ্যেই হউক—পাথর অপেক্ষা ওজনে অনেক ভারী।

এ বিষয়ে কিছু পরিমাণ আলোক সম্পাত করে—ভূকম্পন-লেখ-যন্ত্র (seismograph)। পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিস্ফোরণের ফলে ভূমিকম্প হইয়া থাকে—এই কম্পন তরঙ্গাকারে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। কম্পন-তরঙ্গের গতি পদার্থের ঘনত্বের তারতম্য অনুসারে কম-বেশী হইয়া থাকে। ভূকম্পনলেখ-যন্ত্রে কম্পন-কেন্দ্র এবং তরঙ্গের গতি এই উভয়ই নির্দ্ধারিত হয়। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা কতক তথ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং সেইগুলি হইতে পৃথিবীর মোটামুটি একটি চিত্র খাড়া করা হইয়াছে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। সাড়ে সাত মাইল গভীর একটি প্রস্তরময় স্তরের উপর মহাদেশগুলি অবস্থিত। ইহার নীচে বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে ১৫ মাইল পুরু একটি স্তর আছে। তৎপরবর্ত্তী স্তর প্রধানতঃ ধাতব এবং ৩০০ মাইল গভীর। গভীরতর প্রদেশে প্রস্তরময় পদার্থের বিভিন্ন রূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। অন্তরতম প্রদেশে—কেন্দ্র হইতে ৯০০ মাইল ব্যাসার্দ্ধব্যাপী—খুব ঘন ধাতব পদার্থের সন্নিবেশ আছে বলিয়া অনুমান করা যায়।

এই প্রদেশকে পৃথিবীর 'কোর' (core) কিংবা শাঁস বলা হয়। পৃথিবীর এই অংশে বিভিন্ন ধাতব পদার্থ, প্রধানতঃ লৌহ এবং নিকেলের সংমিশ্রণ অনুমিত হয় কিন্তু অভ্যন্তরস্থ প্রচণ্ড তাপে এবং বহিস্থ স্তরের প্রচণ্ড চাপে এই প্রদেশের পদার্থসমূহ দ্রবীভূত অবস্থাতেই কঠিন ঘনীভূত অবস্থা অপেক্ষা সম্ভবতঃ বহু গুণ অধিক ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্তরের রহস্য যতটা উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা মোটামুটি এই।

এখন আমরা অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইহাদের সম্বন্ধে সংগৃহীত সামান্য তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মগুলির সাহায্যে মোটামুটি এক একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

গ্রহগুলির বহিরাবরণের সংবাদ পাওয়া যায় তাহাদের বিকীর্ণ আলোক-বর্ণালি বা কিরণচ্ছত্র বিশ্লেষণ করিয়া। তাহাদের আয়তন, ওজন এবং ঘনত্ব জানা যায় মহাকর্ষণের নিয়ম সাহায্যে গণনা করিয়া। এইরূপ গণনা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বুধ, শুক্র এবং মঙ্গল গ্রহের বস্তুপিণ্ড পৃথিবীস্থ পাথর অপেক্ষা ঘন। বৃহস্পতি, শনি, য়ুরেনাস্ এবং নেপচুন প্রভৃতির······ ঘনত্ব জল অপেক্ষা অধিক নহে। মঙ্গল গ্রহের ঘনত্ব ভিতরে বাহিরে সমান। বৃহস্পতি এবং শনি গ্রহের অন্তঃপ্রদেশের ঘনত্ব বহিরাবরণ অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক।

সম্প্রতি প্রিন্সটন মান-মন্দিরের অধ্যক্ষ ডক্টর ওয়াইল্ট বৃহত্তর গ্রহগুলির—বিশেষতঃ বৃহস্পতি এবং শনি গ্রহের—অভ্যন্তরের উপাদান সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। উক্ত গ্রহদ্বয়ের আভ্যন্তরীণ ঘনত্ব জল অপেক্ষা প্রায় ছয় গুণ—তদুপরি বহিঃস্থ আবরণের প্রচণ্ড চাপে ঘনীভূত একস্তর বরফ রহিয়াছে। এই ঘনত্বপ্রাপ্ত বরফ জল অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ ভারী। বাহিরে অপেক্ষাকৃত হালকা (জলের ঘনত্বেরএক-চতুর্থাংশ) গ্যাসীয় আবরণ।

সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন পদার্থ ঘনীভূত হইয়া গ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। ধাতব পদার্থ ক্রমে ক্রমে শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া অভ্যন্তরের সর্ব্বাপেক্ষা ঘন অংশ সৃষ্টি করিয়াছে। অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সহিত রাসায়নিক সংযোগে জল এবং ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া বরফের স্তর সৃষ্টি করিয়াছে। অবশিষ্ট হাইড্রোজেন তাপ অভাবে ঘনীভূত হইয়া বহিঃস্থ গ্যাসীয় স্তর সৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল উপাদানেরই মূল উৎস সূর্য্য।

ডক্টর ওয়াইল্ট গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বৃহস্পতির দেহ প্রায় ১৭,৫০০ মাইল ব্যাসার্দ্ধ লইয়া ব্যাপ্ত। বরফের স্তর ১৩,০০০ মাইল পুরু এবং গ্যাসীয় স্তর প্রায় ১২,০০০ মাইল।

শনি গ্রহের অভ্যন্তর ভাগের ব্যাস প্রায় ১৮,০০০ মাইল এবং উপরিস্থিত আবরণ যথাক্রমে ১৫,০০০ এবং ১২,০০০ মাইল। য়ুরেনাস এবং নেপচুন সম্বন্ধে সঠিকভাবে এখনও কিছু জানা নাই, তবে জ্যোতির্বিদের অনুমান ইহাদের



অগ্নিবোমা নির্বাপণের উপায় (৩৬৩ পৃঃ)।

আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও আভ্যন্তরীণ গঠন এবং উপাদান একই প্রকারের।

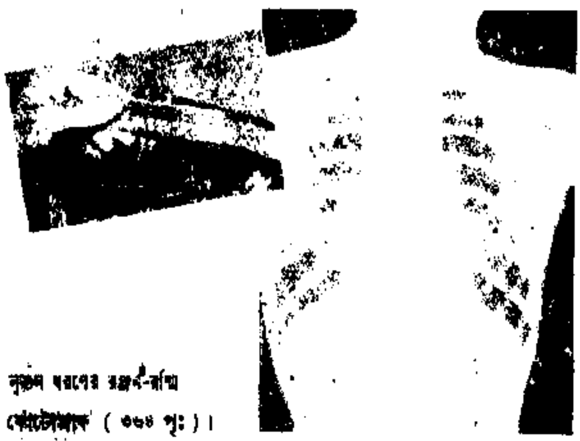
অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ গ্রহগুলির বহিঃস্থ আবহ-মণ্ডল সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীণ উপাদান বৈজ্ঞানিকদের নিকট এখনও রহস্যাবৃত। ইহাদের ঘনত্ব পৃথিবী অপেক্ষা অনেক কম, সুতরাং অনুমান হয়, ইহাদের অভ্যন্তরে পৃথিবীর অনুরূপ কোন ধাতুময় অংশ নাই।

গভীর সমুদ্রে ফোটোগ্রাফ তোলা

সমুদ্রের নীচে জীব-জন্তুর ফটোগ্রাফ যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক উইলিয়াম বীবির নাম

অগ্রগণ্য। তিনি তাঁহার গণ্ডোলা-আকৃতির ব্যাথিস্ফিয়ার ফোটো-ক্যামেরার সাহায্যে সামুদ্রিক জীব-জন্তু সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। অধ্যাপক বীবির এই 'ব্যাথিস্ফিয়ার' যন্ত্র জলের তলে অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত অবতরণ করিতে সমর্থ হয়।

সম্প্রতি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়া জলের তলায় প্রায় দুই মাইল নীচেকার ছবি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এই যন্ত্রটি একটী ক্যামেরা-সংযুক্ত স্বয়ংচালিত যন্ত্র। এই যন্ত্রটিতে আয়তনে খুব ছোট দুইটী খুব মোটা কাচের মজবুত জানালা আছে, যাহাতে এই গম্ভীর প্রদেশের জলের চাপ (প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ৫৮ মণ) সহ্য করিতে পারে।



নূতন ধরণের রক্তবর্ণ-রশ্মি ফোটোগ্রাফ (৩৬৪ পৃঃ)।

অভ্যন্তরস্থ ক্যামেরাটি একটী জানালার দিকে মুখ করিয়া থাকে—অপর জানালা দিয়া বৈদ্যুতিক বাতি হইতে আলো বাহির হয়। একটি ঘড়ির ন্যায় যন্ত্রের সাহায্যে বাতিটি খানিক পর পর জ্বলিয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে ক্যামেরার ফিল্ম মোটর-চালিত একটী দণ্ডে জড়াইয়া যায়।

ক্যামেরার সম্মুখে সামুদ্রিক দানবগুলিকে প্রলুব্ধ করিবার নিমিত্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি সামুদ্রিক মাছের প্রতিকৃতি দেওয়া হয়।

বাতি জ্বলা এবং ভিতরকার মোটর চলা আপনা হইতে হইয়া থাকে—সুতরাং ক্যামেরার ফিল্মে কোন শিকার ধরা পড়িবে কি না তাহা নির্ভর করে নিতান্তই ঘটনা-চক্রের উপর। কোন জন্তু আলোর সম্মুখে না আসিলে ছবি উঠিবে না, কিন্তু তাহাতে বিশেষ আসে যায় না, কারণ এক একটি রিলে বহুসংখ্যক ছবি দেওয়া হয়—কাজেই আশা করা যায়; ইহার কোন একটার সম্মুখে ধরা পড়িবে। উদ্ভাবক তাঁহার নিজ বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, বারমুডার নিকটে যন্ত্রটি পাঁচ বার সমুদ্রে নামান হইয়াছিল। যন্ত্রপাতি বেশ সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছিল কিন্তু ছবিতে বিশেষ কিছু আসে নাই। ছবিতে যাহা ধরা পড়িয়াছে, তাহা ছোট ছোট কতকগুলি প্রাণীর—কিন্তু ইহাদের আকৃতি এত ছোট যে ইহারা কি, তাহা চেনা সম্ভব হয় নাই।

'গ্যারাণ্ড' বন্দুক

যুদ্ধে জয় পরাজয় নির্ভর করে যুধ্যমান জাতির ভিতর কে অপরের বেশী ক্ষতি করিতে পারে তাহার বিচারে। সেই জন্যই অধিকতর শক্তিশালী মারণাস্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা সমস্ত 'সভ্য' জাতির ভিতরই চলিয়া আসিতেছে। এদিকে উন্নতিও হইয়াছে প্রচুর; অগ্নি-বিস্ফোরক বোমা, চুম্বক-মাইন, টর্পেডো ইত্যাদি। কিন্তু পদাতিকদের অবশ্য-ব্যবহার্য্য রাইফেলের উন্নতির দিকে খুব বেশী নজর পূর্ব্বে দেওয়া হয় নাই। সংপ্রতি আমেরিকায় 'গ্যারাণ্ড' রাইফেল তৈয়ারী হওয়ায় সামরিক বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিমান আবিষ্কারের পর ইহা অপেক্ষা যুগান্তরকারী যুদ্ধ-সরঞ্জাম তৈয়ারী হয় নাই। গ্যারাণ্ড রাইফেল ব্যবহারের অর্থ প্রত্যেক পদাতিক সৈনিকের হাতে একটি করিয়া কলের কামান থাকা। এখন যে-বন্দুক ব্যবহৃত হয় তাহাতে প্রত্যেকবার গুলি ছুঁড়িবার পর গুলি ভরিবার জন্য বন্দুক খুলিয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু এই নূতন বন্দুক স্বয়ং-চালিত, চালককে শুধু ঘোড়া টিপিয়া যাইতে হয়। ইহার সাহায্যে প্রতি মিনিটে চল্লিশটিরও অধিকসংখ্যক গুলি ছোঁড়া যায়—অর্থাৎ সাধারণ রাইফেল হইতে ইহার কার্য্যকারিতা চার গুণেরও অধিক। এই আবিষ্কার এখন আর গোপন নাই; য়ুরোপীয় জাতিসমূহ নিশ্চয়ই অনুরূপ রাইফেল এখন নির্ম্মাণ করিতেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এই আবিষ্কারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করার উপর হয়তো যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনেকটা নির্ভর করিবে।

অগ্নিবোমা নির্ব্বাণের উপায়

বিমান-যুদ্ধে শত্রুকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য রাত্রিকালে শহরগুলি অন্ধকার করিয়া দেওয়া হয়। সেই জন্য শত্রু পক্ষ

আক্রমণের পূর্ব্বে অগ্নি-বোমা নিক্ষেপ করে। এই বোমা ফাটিয়া আশে-পাশে আগুন ধরিয়া যায় এবং সেই আলোতেই শত্রু তাহার লক্ষ্য স্থির করিয়া লয়। এই বোমা নির্ব্বাপিত করার এক কৌশল ইদানীং প্যারিসে প্রদর্শিত



গরুর মাথায় বিপদসূচক চিহ্ন (৩৬৬ পৃঃ)।

হইয়াছে। ছবিতে (৩৬১ পৃঃ) দেখা যাইতেছে বালি-পূর্ণ হাতলযুক্ত ঢাকনার মত ধাতু-নির্ম্মিত একটি জিনিষ ফাটন্ত বোমার উপর রাখিয়া হাতে চাপ দিলে বালি পড়িয়া আগুন নিবিয়া যায়। যুদ্ধের সময় ব্যবহারের জন্য ফায়ারম্যান এবং সাধারণ নাগরিকদিগকে এই জিনিষ এক একটা করিয়া দেওয়া হইবে—যাহাতে বোমা পড়া মাত্র নিবাইয়া ফেলিতে পারা যায়। ইহার কার্য্যকারিতা তথাকথিত ছারপোকা-মারা কলের মত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

বীজাণু ও বিস্ফোরণ

বিলাতে কিছু কাল পূর্ব্বে যুদ্ধের উপকরণ হিসাবে রক্ষিত কতকগুলি পেট্রোল-ট্যাঙ্কে ভীষণ বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণের কারণ রহস্যাবৃত। শত্রু পক্ষের কারসাজী অথবা আইরিশ সন্ত্রাসবাদীদের কুকর্ম্ম বলিয়া সন্দেহে গোয়েন্দা বিভাগ এই লইয়া অনেক তোলপাড় করে—কিন্তু কোনই হদিস্ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। অবশেষে একটি কেরোসিনের ট্যাঙ্কে অনুরূপ বিস্ফোরণ হয়। অবিলম্বে সেই স্থান পরিদর্শন করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়—কারণ সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় কি না। দেখা গেল, ট্যাঙ্কের নীচে খানিকটা জলের উপর কেরোসিন তৈল ভাসিতেছে এবং সেই জল হইতে গ্যাসের বুদ্বুদ উঠিতেছে। সেই জল এবং তলানি পরীক্ষা করিয়া ইহার মধ্যে এক প্রকার বীজাণু আবিষ্কার করেন—ইহারা কেরোসিন তৈলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং ইহাকে শত করা দশ ভাগ ইথেন এবং নব্বই ভাগ মিথেনে (উভয়ই অত্যন্ত বিস্ফোরণশীল গ্যাস) রূপান্তরিত করিয়া থাকে। এক-জাতীয় বীজাণুর প্রভাবে চিনি যেরূপ সুরাসারে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাদের ক্রিয়া তদনুরূপ। বৈজ্ঞানিকটি যদিও গ্যাসোলিন বিস্ফোরণ রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই, তবুও তিনি এক প্রকার নিশ্চিত যে, উহাতেও অনুরূপ কারণ বিদ্যমান ছিল।

অ্যামেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটীর সভায় সমবেত রাসায়নিকগণ মিথেন এবং ইথেন তৈয়ারী করিবার এই প্রাকৃতিক উপায় কাজে লাগান যায় কি না, তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনা করিতেছেন।

শিরশ্ছেদের পরও চেতনা থাকে?

শিরশ্ছেদের পর দেহে কোন চেতনা থাকে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে 'জার্ণাল অব্ দি অ্যামেরিকান মেডিক্যাল



অভিনব শ্বাসগ্রাহক যন্ত্র (৩৬৫ পৃঃ)।

অ্যাসোসিয়েশন' বলেন যে, যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত চেতনা লোপ পায়। এই সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণের অবশ্য

খুবই অভাব। এ বিষয়ে একমাত্র পরীক্ষার ফল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কোন ফরাসী কাগজে বাহির হইয়াছিল। সেই বিবরণে প্রকাশ—গিলোটীনে শিরশ্ছেদের পর আসামীর মুণ্ডটি যথাস্থানে পড়িলে ডক্টর বোরিও নামক জনৈক চিকিৎসক কর্তৃপক্ষের সম্মতি লইয়া কর্তিত শিরটি হাতে কুড়াইয়া লয় এবং তাহা যে-লোকের ছিল, সেই লোকের নাম ধরিয়া ডাকাতে মুণ্ডটির চোখের পাতা খুলিয়া যায় এবং ক্ষণিকের জন্য বড় বড় চোখে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাইয়া পাতা বন্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয়বার ডাকিলে পুনর্ব্বার চোখ খুলিয়া তাকাইয়া মুহূর্ত্ত পরে বুজিয়া যায়। তৃতীয় ডাকে



ঘাস কাটিবার মোটর-[illegible] (৩৬৬ পৃঃ)।

কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। এই পরীক্ষা ৩০ সেকেণ্ড-ব্যাপী হইয়াছিল। উক্ত চিকিৎসকের মতে অন্ততঃ এই আধ মিনিট কাল মস্তিকে চেতনা ছিল।

এই সম্পর্কে আর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই—অধুনা উদ্ভাবিত মস্তিষ্কের চেতনা-গ্রাহক যন্ত্র সাহায্যে হয়তো প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজ হইবে। উপরোক্ত ঘটনা আধুনিক চিকিৎসকদের নিকট প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হয় না। তাঁহাদের মতে—এ বিষয়ে যাহা কিছু পরোক্ষ প্রমাণ আছে, তাহাতে মনে হয়, মস্তক ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই চেতনা লোপ পায়।

ইহার কারণ, মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপশিরাগুলিতে রক্ত-সঞ্চালনের সঙ্গে চেতনার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইলে মনুষ্যের চেতনা লোপ পায়, এমন কি মস্তকে সাধারণ আঘাত লাগিলে—যাহাতে মাথায় রক্ত-সঞ্চালনের কোন প্রকার ব্যাঘাত হওয়া সম্ভবই নয়—মানুষকে কখনও কখনও অচেতন হইয়া পড়িতে দেখা যায়।

এ বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ নাই যে, মস্তক ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চালন বন্ধ হইয়া যায়; এবং যতদূর সম্ভব শিরশ্ছেদ হওয়ার পূর্ব্বেই, গিলোটীন, কুঠার অথবা খড়্গের ভীষণ আঘাতেই সংজ্ঞা লোপ পায়।

রঞ্জন-রশ্মির সুলভ সংস্করণ

রঞ্জন-রশ্মি বর্ত্তমান যুগের একটি যুগান্তরকারী আবিষ্কার। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে—ফলিত বিজ্ঞানে, শিল্পে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ হইতেছে। ফুসফুস-সংক্রান্ত পীড়া, হৃদরোগ এবং দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন পীড়া সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসকদের হাতে ইহা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অস্ত্র। চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার ব্যাপক ব্যবহারের একমাত্র অন্তরায় ছিল ইহার দুর্ম্মূল্যতা। কাজেই অপেক্ষাকৃত সুলভ সংস্করণ বাহির করিয়া ইহাকে জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী করিয়া তোলার চেষ্টারও অন্ত ছিল না। সম্প্রতি রঞ্জন-রশ্মি ফোটোগ্রাফ তুলিবার জন্য একপ্রকার সস্তা কাগজের ফিল্ম বাহির হইয়াছে। ইহার সাহায্যে খুব অল্প সময়ে এবং অল্প ব্যয়ে দেহাভ্যন্তরের নির্ভরযোগ্য ছবি তোলা সম্ভব হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

রোগীকে টেবিলে শুইতে হয় না—সোজাসুজি রশ্মি উৎপাদনকারী যন্ত্রের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইতে হয়। তখন মোড়ক খুলিয়া কাগজের ফিল্ম বুকে ঘেরিয়া দেওয়া হয় এবং বুকের মাপ অনুযায়ী যন্ত্রের শক্তি ঠিক করিয়া যন্ত্র চালাইয়া দেওয়া হয়—অতঃপর এক মুহূর্ত্তে কাজ হইয়া যায়।

একটি মোড়কে দেড়শত ছবি তুলিবার মত ফিল্ম থাকে। যন্ত্র-সংলগ্ন একটি কলের সাহায্যে ফিল্ম খোলা এবং মুড়িয়া রাখা যায়।

এই নূতন যন্ত্র এবং সুলভ ফিল্মের সাহায্যে আমেরিকায় প্রায় পাঁচলক্ষ ছাত্র-ছাত্রী, ব্যায়ামবীর, খেলোয়াড়, মজুর ইত্যাদির রঞ্জন ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে। ইহার ব্যাপক প্রয়োগে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে অত্যাবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ অনেক সহজ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

অভিনব শ্রাবক-যন্ত্র

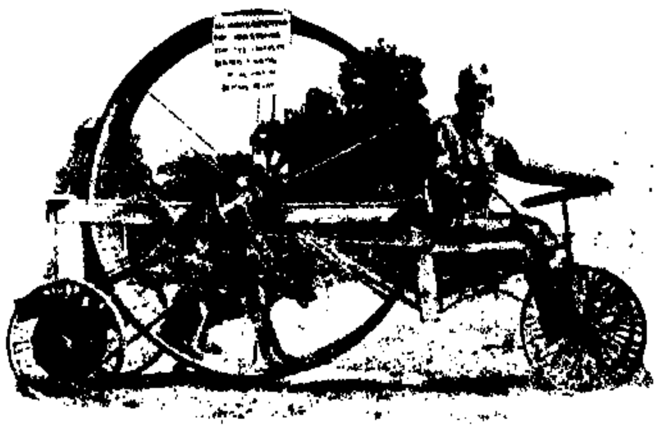
বধিরের শ্রবণশক্তির সহায়তা করিবার জন্ম বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। বাঁশীর মত একপ্রকার ধাতব চোঙ আছে—যাহা কাণে লাগাইয়া শুনিতে হয়। অন্য একপ্রকার ব্যাটারী-চালিত যন্ত্র আছে, যাহা হয় কাণের ভিতর কিম্বা কাণের পিছনে হাড়ের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়—ইহা খুবই কার্য্যকরী। ইদানীং নিউ ইয়র্কের একজন উদ্ভাবক একটি নূতন ধরণের শ্রাবক-যন্ত্রের পেটেণ্ট লইয়াছেন। মূলতঃ ইহা উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকার যন্ত্রেরই রূপান্তর মাত্র—কিন্তু এই যন্ত্রের সমস্ত কলকব্জা একটি তামাক খাইবার পাইপের ভিতর লুক্কায়িত আছে—ধূমপায়ী দাঁত দিয়া পাইপটি চাপিয়া ধরিলেই বাহিরের শব্দ শুনিতে পায়। লোকে বুঝিতে পারে না যে, সে একটি কৃত্রিম শ্রাবক-যন্ত্র ব্যবহার করিতেছে। উদ্ভাবক আশা করেন যে, এই যন্ত্রটি খুবই জনপ্রিয় হইবে।

অভিনব শ্বাসগ্রাহক যন্ত্র

এই নব আবিষ্কৃত শ্বাসপ্রশ্বাস-গ্রাহক যন্ত্রে অস্ত্র চিকিৎসার পথ অনেকটা সুগম হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। যন্ত্রের উদ্ভাবক বলেন যে, এই যন্ত্র রোগীর হইয়া শ্বাস গ্রহণ করিবে—শুধু তাহাই নয়—ইহা ফুসফুসকে নিষ্ক্রিয় এবং অচেতন রাখিতেও সক্ষম হইবে—ফলে ফুসফুসের উপর অস্ত্রোপচার অনেক সহজ হইবে—কারণ অস্ত্রোপচারের জন্য একটি ফুসফুস ফুলান হইলে এই যন্ত্রটি অন্য ফুসফুসে অক্সিজেন-মিশ্রিত বায়ু সরবরাহ করিবে। কাজেই বুকের মাংসপেশী-সমূহের উত্থান-পতন ব্যতিরেকেই শ্বাসক্রিয়া সম্ভব হইবে। যন্ত্রের উদ্ভাবক, সুইডেনের ডক্টর ক্লারেন্স তাঁহার এই উদ্ভাবিত যন্ত্রটির কার্য্যকারিতা লস্ এঞ্জেলস-এ সমবেত অস্ত্র-চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞদের সমক্ষে প্রদর্শন করেন।

তাপমান যন্ত্র বনাম মন-মান যন্ত্র

মানুষ যখন ভয়ানক রাগিয়া যায় অথবা তাহার হৃদয় যখন ভাবাবেগে আপ্লুত হয়, তখন তাহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ঠাণ্ডা হয়। নিউ ইয়র্কের ডক্টর মিটেলম্যান এবং কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উলফ তাঁহাদের পরীক্ষার ফলে অঙ্গুলীর তাপ এবং মানসিক অবস্থার এই সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছেন। গবেষকগণ তাঁহাদের মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় শারীরিক ক্রিয়া—যথা পরিপাক ক্রিয়া, শরীরের তাপ ইত্যাদির উপর মানসিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া উক্ত ফল পাইয়াছেন। তাঁহাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে—রাগ, ভয়, নিরাশা, ভাবাবেগ ইত্যাদি উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে আঙুল ঠাণ্ডা হইয়া যায়। রোগী যখন ভাবাবেগ গোপন করিবার চেষ্টা করে, তখনও অঙ্গুলীর তাপ পরীক্ষায় তাহা ধরা পড়ে। অঙ্গুলীর তাপ সর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায় তখন—যখন কোন গভীর দুশ্চিন্তা কিম্বা মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়।



কুকুর চালিত শকট (৩৬৭ পৃঃ)।

অস্ত্রোপচারে শিল্পীর প্রয়োগ

অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকের ছুরি চলার সঙ্গে সঙ্গে দেহাভ্যন্তরের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা, উপশিরা, পেশী ও টিসু-সমূহ উন্মুক্ত হয়, জনৈক শিল্পী সেগুলির নক্সা পেন্সিলের সাহায্যে আঁকিয়া ফেলেন। ঠিক অস্ত্র-চিকিৎসকের মতই মুখোস—গায়ে সাদা পোষাক পরিহিত হইয়া এই মহিলা চিকিৎসকের পিছন হইতে অস্ত্রের গতি লক্ষ্য করিতে থাকে এবং ত্বরিৎবেগে সেগুলির নক্সা কাগজের উপর আঁকিয়া পরে অবসর সময়ে ঐ নক্সা হইতে পেন্সিল এবং তুলির সাহায্যে চিত্রগুলি সম্পূর্ণ করে। ইঁহার অঙ্কিত চিত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক পুস্তকে, সাময়িক পত্রে স্থান পাইয়াছে। ছাত্র এবং শুশ্রূষাকারিণীদের শিক্ষার জন্যও এই চিত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৈদ্যুতিক রোলার

একটি নূতন ধরণের বৈদ্যুতিক রোলারের সাহায্যে মালিশ করিয়া অবাঞ্ছিত চর্বি কমান হইয়া থাকে। যন্ত্রের মূল ফ্রেমটি ধাতু-নির্মিত—ইহার সহিত একটি কাঠের রোলার সংযুক্ত আছে। একটি ছোট মোটরের সাহায্যে রোলারটি ঘুরিতে থাকে, প্রয়োজন অনুসারে রোগী ইহার উপর শুইতে পারে, পা ছড়াইয়া কিম্বা ঝুলাইয়া বসিতে পারে। নির্মাতার মতে ইহাদ্বারা একসঙ্গে তিনপ্রকার ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহার ঘর্ষণে দেহচর্ম্ম সঞ্জীবিত হয় এবং অকেজো টিসুগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—ঘূর্ণনে চর্বিযুক্ত



অভিনব প্যারাসুট (৩৮৭ পৃঃ)।

টিসুগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং আনুষঙ্গিক কম্পনে সমস্ত দেহে রক্ত-সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়।

মালীর বুদ্ধি

আমেরিকার ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগান-রক্ষক সময় সংক্ষেপের জন্য একটি ঘাসকাটা রিক্সা তৈয়ার করিয়াছে। পেট্রোল-চালিত একটি ঘাসকাটা কলের সঙ্গে একটী পুরাতন চাকাযুক্ত চেয়ার জুড়িয়া দিয়া এখন আরামে বসিয়া কাজ করে। নির্মাতা বলে যে পায় চলিয়া ঘাস কাটার চেয়ে ইহাতে দ্রুততর কাজ হয়—সুতরাং কুঁড়েমীর জন্য এইরূপ করিয়াছে তাহা বলিবার উপায় নাই।

খেলোয়াড়ের পোষাক

ফুটবল খেলায় বুকে কিম্বা পেটে বল লাগিয়া দুর্ঘটনা ঘটিতে শুনা যায় সময় সময়। প্রতিষেধক হিসাবে এক-প্রকার পোষাক তৈয়ারী হইয়াছে—অবশ্য দামের উল্লেখ নাই। ইহা বেশ মোটা প্যাডদ্বারা তৈয়ারী একপ্রকার জামা—বুক, পাঁজরা, ঘাড় এবং শিরদাঁড়াকে আঘাত হইতে রক্ষা করে। ইহা পরিয়া বেশ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা যায়—মোটেই আটকাইয়া ধরে না। ক্রমে ক্রমে ফুটবল খেলোয়াড়ের পোষাক বিমানচালক কিম্বা ডুবুরীর ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়।

গরুর মাথায় বিপদমূলক চিহ্ন

দিন দিন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাগুলি হাস্যকর হইয়া দাঁড়াইতেছে। ছবিতে গরুটির শিং-এ বাঁধা একটী ছোট বৈদ্যুতিক আলো দেখা যাইতেছে। ইহার লেজেও অনুরূপ ব্যাটারীযুক্ত একটী আলো রহিয়াছে। উদ্দেশ্য—রাত্রির অন্ধকারে চরিয়া বেড়াইবার সময় যাহাতে মোটর চাপা না পড়ে। ইংলণ্ডে না কি এক কৃষকের পর পর কয়েকটি গরু রাত্রিবেলায় এদিক্ ও'দিক্ চরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মোটর চাপা পড়িয়া মারা যায়। কাজেই মোটর-চালক দূর হইতেই সতর্ক হইয়া যাহাতে দুর্ঘটনা এড়াইতে পারে, সেইজন্য এই অদ্ভুত আয়োজন। মাথায় আলো থাকিলেই যদি এই জাতীয় বিপদ এড়ান যায়, তবে বুঝিতে হইবে পথচারীর সুদিন ফিরিয়াছে।

কৃত্রিম অঙ্গ

দুর্ঘটনায় আহত হইয়া বা অন্যান্য কারণে অনেক সময় নাক কাণ ইত্যাদি অস্ত্রোপচার করিয়া বাদ দিতে হয়। এই ভাবে নষ্ট অঙ্গের পরিবর্ত্তে রচেষ্টারের মেয়ো হাসপাতালে রোগীকে ব্যবহারের জন্য রবারের নাক কান ইত্যাদি দেওয়া হইতেছে। উহা এক প্রকার জলীয় পদার্থের সাহায্যে যথাস্থানে আঁটিয়া দেওয়া হয়। কৃত্রিম নাক অবশ্য চশমার সাহায্যেই স্বস্থানে রাখা যায়—রোগী ইচ্ছা করিলে স্থায়ীভাবে ঐগুলি ব্যবহার করিতে পারে। অবশ্য অন্যের নাক কাটিয়া

অথবা নিজেরই শরীরের মাংস কাটিয়া নাকে জুড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও আধুনিক অস্ত্র-চিকিৎসায় আছে।

বিনা সূচে সেলাই

নূতন এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সেলাই করিতে সূচ কিম্বা সূতার প্রয়োজন হয় না। রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগান্তে সামান্য গরম ইস্ত্রি দিলেই কাপড় জোড়া লাগিয়া যায়। এই উপায়ে পাড় কিম্বা ঝালর লাগান খুব সুবিধা।

দন্তক্ষয়-নিবারক আবরণ

দাঁতে পোকা ধরা খুব সাধারণ ব্যাধি—অথচ দাঁত তুলিয়া ফেলা ভিন্ন ইহার অন্য কোন প্রতিকার নাই। ফিলাডেলফিয়ার জনৈক দন্ত-চিকিৎসকের মতে মোটরে কিম্বা আসবাব পত্রে ব্যবহৃত ল্যাকারের দাঁতের উপর, এক পরদা মাখাইয়া রাখিলে ভবিষ্যতে দন্তক্ষয় হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। মুখ-নিঃসৃত লালায় অ্যাসিড জাতীয় এক প্রকার পদার্থ আছে—উহার জন্যই দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ল্যাকারের আবরণ থাকিলে ঐ জাতীয় পদার্থ দাঁতের এনামেল স্পর্শ করিতে পারে না। উক্ত চিকিৎসক আশা করেন, কালক্রমে ল্যাকারের প্রয়োগ খুব জনপ্রিয় হইবে।

কুকুর-শক্তির প্রয়োগ

একজন অশীতিপর বৃদ্ধ কুকুর-শিক্ষক কুকুর-শক্তি প্রয়োগ করিয়া একটি শকট উদ্ভাবিত করিয়াছেন। কুকুর-শকটটির মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি চাকা আছে। এই চাকার কেন্দ্রস্থ শ্যাফটের সঙ্গে কুকুরের গলা একটি ফিতা দ্বারা বাঁধা থাকে। কুকুরটি দাঁড়াইলে প্রকাণ্ড চাকাটা ঘুরে এবং সেই সঙ্গে বেষ্টনী এবং কপিকলের সাহায্যে গাড়ীর পিছনের চাকা দুইটিকে ঘুরাইতে থাকে। চালক সম্মুখে বসিয়া একটী লিভার দ্বারা দিক্‌ পরিবর্ত্তন এবং গতি সংযত করে।

কুকুর-বিতাড়ক চূর্ণ

কুকুরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার এক নূতন উপায়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা কোন কল-কব্জা নহে—এক প্রকার কুকুর বিতাড়ক পাউডার। কাপড়-চোপড়, জুতা, চেয়ার, সোফা ইত্যাদির উপর এই চূর্ণ ছড়াইয়া রাখিলে কুকুর আদৌ ঐদিকে ঘেঁসিবে না। এমন কি, ঘরের দরজায় ছড়াইয়া রাখিলে কুকুর ঘরেই ঢুকিবে না। অথচ মানুষের নাকে ঐ গুঁড়ার কোন গন্ধ ধরা পড়ে না।

অভিনব প্যারাশূট

উড্ডীয়মান বিমান হইতে প্যারাশূট সাহায্যে লাফ এক প্রকার দুঃসাহসিক বাহাদুরী বলিয়া গণ্য হইত। উহার বিশেষ কোন কার্য্যকারিতা আছে বলিয়া জানা ছিল না। বিগত পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে রুশ সৈন্যবাহিনী হইতে প্যারাশূট সাহায্যে অবতরণ করিয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। লাফ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি রসি টানিতে হয়—এবং ক্রমে ক্রমে বাতাস ঢুকিয়া প্যারাশূটটি



গোথ-দুধবীণ (৩৮৮ পৃঃ)।

খুলিয়া যায়; না খুলিলে সমূহ বিপদ। সেইজন্যই অনেক উঁচু হইতে লাফ দিতে হয়, যাহাতে প্যারাশূট খুলিবার যথেষ্ট সময় পায়।

সংপ্রতি এক প্রকার প্যারাশূট বাহির হইয়াছে—ইহার সাহায্যে মাত্র পঁচিশ গজ উঁচু হইতে লাফ দেওয়া সম্ভব হইবে। ইহার দড়িতে টান পড়া মাত্র ছাতাটি খুলিয়া যায়। ইহার রহস্য এই যে, প্যারাশূটের ভিতর একটি বায়ুপূর্ণ থলি (pressure dome) আছে এবং এই জন্যই দড়িতে টান পড়া মাত্র বাহিরের বাতাস ঢুকিয়া পড়ে।

ছবিতে (৩৬৬ পৃঃ) নূতন প্যারাশ্যুটটি দেখা যাইতেছে—বায়ুপূর্ণ থলিটী লক্ষ্য করিবার।

শিখীপুচ্ছ বিমান

খুব ক্ষিপ্রগতি বিমানগুলির দুধারের দুইটী ডানা খুব বড় থাকে না, কারণ তাহাতে বাতাসে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া গতি মন্দীভূত হয়। অথচ আকাশে আরোহণ অথবা ভূমিতে অবতরণ করিবার সময় অত্যধিক বেগে চলা মোটেই নিরাপদ নয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য একপ্রকার নূতন ধরণের বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতে দুধারের দুইটি ডানা ছাড়াও আরও কয়টি ডানা থাকে। আকাশপথে চলিবার সময় ঐগুলিকে গুটাইয়া রাখা যায়। আরোহণ কিম্বা অবতরণের সময় ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় ডানা কয়টিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে স্বাভাবিক গতি মন্দীভূত হয়।

যৌথ দূরবীণ

জ্যোতিবিজ্ঞানে ছোট ছেলেদের আগ্রহ জন্মাইবার জন্য নিউ ইয়র্কে এক ভদ্রলোক একটী যৌথ দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করিয়াছেন। একই ফ্রেমের উপর দুইটী দূরবীণ সমান্তরালভাবে আঁটা থাকে—কাজেই একই সঙ্গে দুইজন একই জিনিষের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে ছোটদের গ্রহনক্ষত্রাদি চিনিবার বিশেষ সুবিধা হয়। হাতের উপর রাখিয়া ব্যবহার করার সুবিধার জন্য ফ্রেমটীর মাঝে দুইটী ছিদ্র থাকে।

মাছের চামড়ার জুতা

ইতালীতে মাছের চামড়া হইতে জুতা তৈয়ারী হইতেছে। মাছের চামড়া অত্যন্ত পাতলা বলিয়া ছয় সাতটি চামড়া উপর উপর ভাঁজ করিয়া প্রচণ্ড চাপে জোড়া লাগান হয়। এই জুতা বেশ মজবুত এবং টেকসই হয়। এই চামড়ায় কোমরবন্ধ, যন্ত্রাদি চালাইবার বেল্‌টিং প্রভৃতিও তৈয়ারী হইতেছে।

কৃত্রিম উপায়ে আপেলের রঙ্‌ গাঢ় করা

পশ্চিম ভার্জিনিয়া কৃষি-গবেষণাগারের একজন বৈজ্ঞানিক আপেলের রঙ্‌ কৃত্রিম উপায়ে গাঢ় লাল করার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বেই জানা ছিল যে, আপেলের স্বাভাবিক লাল রঙ idaein নামক রঞ্জক পদার্থের জন্যই। উক্ত রাসায়নিক কি ভাবে এই স্বভাবতঃ বিদ্যমান রঞ্জক পদার্থের পরিমাণ বাড়ান যায় তাহা লইয়া গবেষণা করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কার করিলেন—যাহা ফলের উপর ছিটাইয়া দিলে ফলের অন্তর্নিহিত সুপ্ত ক্ষমতা সঞ্জীবিত হয়—ফলের রঙ্‌ আরও গাঢ় হয়। এমন কি দেখা গিয়াছে উহা প্রয়োগে একপ্রকার স্বভাবতঃ হলদে রঙের আপেলে রক্তিমাভা দেখা দিয়াছে।

প্রকৃত বিজ্ঞান

…দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু যথাযথ দেখিতে পারিলে প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্ভব হইতে পারে…অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তু দেখিলে তাহাকে যথাযথ দেখা হয় কি? ঐ জাতীয় যন্ত্রের সহায়তায় কোন বস্তুকে দেখিতে চেষ্টা করিলে তাহার বাহ্যিক আয়তন এবং পরমাণুর আয়তন বৰ্দ্ধিত করিয়া (magnify) লওয়া হয় না কি? একটি বস্তুকে অথবা তাহার পরমাণুকে বৰ্দ্ধিত করিয়া দেখা আর তাহাকে বিকৃত করিয়া দেখা, একই কথা নয় কি? হইতে পারে, বস্তুকে অথবা পরমাণুকে বৰ্দ্ধিত করিয়া দেখিলেও তদনুরূপ অথবা তৎসদৃশ একটা কিছু দেখা হয়, কিন্তু তাহাকে কি সেই বস্তুটিকে যথাযথ দেখা হয়?

কাজেই দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুকে যথাযথ দেখিয়া বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন না।…



অনর্থ বাধিবে যদি না দাও আশ্রয়
ভূতপূর্ব্ব অর্থ-মন্ত্রী নাহি জানি ভয়॥

প্রাচীন বাঙলা কাব্যে বস্ত্র-শিল্প

—শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

ধবাকে উপভোগ করিবার বিচিত্র প্রচেষ্টায় বসন-প্রীতি মানুষের মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মানুষ কোন দিন বসন-প্রীতি ত্যাগ করিতে পারিবে না। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী সংসার-বিরাগী তাপসেরাও বসন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণব বৈরাগীর কৌপীন ও কটিবাস বসন-প্রিয়তার নিদর্শন। বাঙালী অতি মাত্রায় বসনভক্ত। প্রাচীন বাঙলা কাব্য হইতে বাঙ্গালীর বসন-শিল্পের রুচি-প্রিয়তার কথা আলোচিত হইতেছে।

মুগ্ধমাধবের "কনক নিকষ রুচি শুচি পীত বসন" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে তৎকালীন মধ্যবিত্ত পরিবারের যে দুই একটি বার্ত্তা পাওয়া যায় তন্মধ্যে "নেতের ধুতি ও "পাটযোড়া" সমধিক প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই,

চিত্রবর্ণের পট্টশাড়ী ভুনিফোতা পট্টপাড়ি

কবিরাজ গোস্বামীর নিবাসভূমি কাটোয়া অঞ্চলের মহিলাদের সমসাময়িক যুগের বসন শিল্পের কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাইতেছি।

স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাস কর্ত্তৃক রাই সুনাগরীর বসন শিল্পের বর্ণনাপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই,

বেনন পাটের জাদে বাঁধিয়া কবরী
... ...
রঙ্গ পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
... ...
নীল বসন মণি-বলয়াবিরাজিত

কবি-কল্পনার অংশ বিচ্ছিন্ন রাখিয়াও প্রাচীন যুগের বসন-শিল্পের কিঞ্চিৎ আভাস পাইতেছি।

ষোড়শ শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীবদন নৃপতির মৃগয়া-কালীন বসন পরিচ্ছদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন,

পাগরী সুরঞ্জিত শিরপর শোভিত
শোভন সাজুয়া গায়।
মখমলি উপানহ পায়।

রাজভাটের বসন প্রসঙ্গেও কবি বংশীবদন বলেন,

পরিশোভা ভাল পুরটে মিশাল
সুচিত্র পাথরী মাথে
তাহার উপর জরি মনোহর
মুকুতামণ্ডিত তাথে।

মাণিক গাঙ্গুলী কৃত ধর্ম্ম-মঙ্গলে দেখিতে পাই,

নেতের আঁচল ভিজে নয়নের জলে।

কবি কেতকানন্দ ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসানে "চেলী, মলমল, আনন্দাই শাড়ী, চিকণ বনাত, পট্টাম্বর, গর্ভসূতী ভুরা" প্রভৃতির প্রচলন দেখিতে পাই। কবি জগজ্জীবন কৃত মনসামঙ্গলে অগ্নিকুল শাড়ী, মাত্রাসিধ শাড়ী, গঙ্গাজলী শাড়ী, পাটশাড়ী প্রভৃতির বহুল উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম খুল্লনার রূপসজ্জা প্রসঙ্গে বলিতেছেন,

দোছটি করিয়া দিল তসরের শাড়ী।

কালকেতু প্রিয়ার মনোসাধ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যে সমুদয় জিনিষ কিনিয়াছিল তন্মধ্যে

পাটের কিনিল জাদ মণিময় সূত্র তার বেড়ি।

কবিকঙ্কণ গরীবের পোষাক প্রসঙ্গে বলেন,

খুঞি ধুতি উড়িতে খোলসার।

আবার রাজ-কন্যার যৌতুকাদি প্রসঙ্গেও লিখিতেছেন,

কেহ নেত, কেহ খেত দেয় পাটশাড়ী।

ক্ষিতীশ-বংশাবলীতে দেখিতে পাই,—"রাজ্ঞী, রাজবধু ও রাজকন্যারা কার্পাস বা কৌষের শাটী পরিতেন, পশ্চিমোত্তর দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ কাঁচুলী, ঘাগরা ও ওড়না পরিধান করিতেন।"

বঙ্গ-ললনার কাঁচুলীর বর্ণনা প্রায় সকল কাব্যেই পরিদৃষ্ট হয়।

কাচুলী পর নীল মণি হারিণী।

শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলাপ্রসঙ্গে কৃত্তিবাস তাঁহাকে "পীতধড়া পরিধান" করাইয়াছেন।

সীতার বিবাহকালে পরিহিত বস্ত্রের উল্লেখে কবি কৃত্তিবাস বলেন,

বান্ধিল অপূর্ব্ব পাগ মস্তক মণ্ডলে।

... ...

পাটের পাছড়া ছিল সকল শরীরে।

... ...

বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলী।

... ...

বসন পরায় তাঁরে সুন্দর প্রচুর।

বনগমন প্রসঙ্গে কবি বলেন,

পট্টবস্ত্র পরিলেন সীতা মনোহর।

কুঁজীর বিলাস প্রসঙ্গেও জানিতে পাই,

শোভা পায় পট্টবস্ত্রে আর আভরণে।

অত্রি মুনির আশ্রমে সীতার রূপসজ্জা প্রসঙ্গে দেখি,

পট্টবস্ত্রশোভিত অধিক গৌরগায়ে।

সীতাহরণ কালে সীতার প্রতি রাবণ বলিতেছেন,

উত্তম বসন শোভে তোমার শরীরে।

রাবণের প্রথম দিবসের যুদ্ধ গমনকালে রূপচর্য্যার কথায় জানিতে পারি,

মেঘেতে চপলা গলে সোণার উত্তরী।

ইন্দ্রজিতের রণসজ্জা কালেও দেখিতে পাই,

বীর পরিধান করে নেতের যে ফালি।

রাবণের সজ্জাপ্রসঙ্গে কবি বলেন,

মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী।

... ...

রথের উপরে শোভে নেতের পতাকা।

রাবণের চিতাসজ্জায়,

দিব্যবস্ত্র পরাইল সোনার পইতা

সীতার প্রসাধনপ্রসঙ্গে জানিতে পারি,

নেতের বসনে কেহ মুছাইছে বারি।
যতনে পরায় বস্ত্র যতেক সুন্দরী॥

ভরদ্বাজ আশ্রমে দেখিতে পাই,

রত্ন সিংহাসনোপরি নেতবস্ত্রমেলা।

আদি-দেবীর বন্দনায় কবিকঙ্কণ বলিতেছেন,

পরিধান পট্ট শাড়ে।

ভগবতীর স্তবেও কবিকঙ্কণ বলিতেছেন,

পট্টবস্ত্র পর তুমি গলে রত্ন-হার।

কালকেতুর পোষাক সম্পর্কে দেখিতেছি,

পরিধানে রাঙাধড়ী—মস্তকে জালের দড়ি

অভয়ার নিজমূর্ত্তি ধারণকালে চণ্ডীকাব্যে "পাটের শাড়ী"র কথা কবিকঙ্কণ উল্লেখ করিয়াছেন,

হুঙ্কারে ছিঁড়িয়া দড়ি পড়িয়া পাটের শাড়ী
ষোল বৎসরের হইল রামা।...

অভয়ার বক্ষকাঁচলির কথাও কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন,

পরি নানা আভরণে অবশেষে পড়ে মনে
হৃদয়ে কাঁচলি আচ্ছাদন।

... ...

কাঁচলির মধ্যভাগে লিখে বৃন্দাবন।

... ...

বক্ষের কাঁচলি করে ঝিলিমিলি
কিবা অঙ্গছটায়।

গুজরাটে মুসলমানগণের আগমন প্রসঙ্গে জানিতে পাই,

না ছাড়ে আপন পথে, দশরেখা টুপী মাথে
ইজার পরয়ে দৃঢ় করি।

প্রাচীন বাংলায় টুপী ও ইজারের প্রচলনও ছিল।

মুসলমানগণের জাতিবিভাগ প্রসঙ্গে দেখিতেছি,

বসন রঙ্গায়্যা কেহ ধরে রঙ্গরেজ।
লোহিত বসন শিরে ধরে মহাতেজ।

গুজরাট নগরের পত্তনে কবিকঙ্কণ জর্জ্জর ধুতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন,

পরিয়া জর্জ্জর ধুতি, কাঁধে করি নানাপুঁথি
গুজরাটে বৈষ্ণবগণ ফিরে।

... ...

শত শত একজায় গুজরাটে তন্তুবায়
ভুনী ধুতি খাদিবুনে গড়া।

খাদি গান্ধীর প্রবর্ত্তিত নহে বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা সত্য। প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্যে উহার উল্লেখ হইতে উহার প্রাচীনত্ব সূচিত হইবে।

গুজরাট নগরে আনন্দোৎসব কালে দেখিতেছি,

পরিয়া উজ্জ্বল ধুতি কাঁখেতে করিয়া পুঁথি
হাতে কুশ, নাচে পুরোহিত।

ইন্দ্রের নর্ত্তকী রত্নমালার নৃত্য প্রসঙ্গেও "পাটশাড়ীর" ব্যবহার দেখিতে পাই,

পরি দিব্য পাটশাড়ী রত্নখচিত চুড়ী
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।

ধনপতি সদাগরের অধিবাস প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ লিখিতেছেন,

সুরঙ্গ পাটের শাড়ী　　　লইয়া রঙিন করি
দিব্যমালা সুবর্ণজড়িত।

অন্যত্র,

খট্টায় পড়িয়া তুলী,　　　টাঙ্গায় "মশারী" জালি
শয়ন করয়ে শশিকলা।

কবিকঙ্কণ এস্থলে বস্ত্রশিল্পের অন্তর্গত মশারীর উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রাচীন বাঙ্‌লার গরীবদের সমসাময়িক দিনে "খুঞা" বসনই সহজলভ্য ছিল। লহনা কর্ত্তৃক খুল্লনার দুরবস্থা বর্ণনায় কবিকঙ্কণ বলিতেছেন,

খুঞা পরাইয়া পাটশাড়ী কৈল দূর।

দেবকন্যার সহিত খুল্লনার পরিচয় হইলে খুল্লনা স্বীয় দুঃখের কথা বলিতেছে,

পাটশাড়ী লয়্যা,　　　মোরে দিল খুঞা,
রাখিতে দিল ছাগলে।

খুল্লনার বেশভূষা ধারণ ও স্বামীর নিকট গমন কালে দেখিতে পাই,

দোছুটী করিয়া পরে তসরের শাড়ী।

লহনার আভরণাদি-ধারণপ্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলেন,

দোছুটি করিয়া পরে তের হাত শাড়ী।

কবি অতঃপর "মেঘডম্বুর" কাপড়ের কথাও উল্লেখ করিতেছেন। আধুনিক যুগের "জলতরঙ্গ" "গোদাবরী", "হংস-বলাকা" প্রভৃতি নামকরণের মত সমসাময়িক যুগেও নামকরণে রুচিপ্রিয়তার নিদর্শন পাওয়া যাইত।

বাছিয়া লহনা পরে মেঘডম্বুর কাপড়।
…　　…　　…
বিনোদ কাঁচলী পরে বুকের উপর।

দুর্ব্বলার "পরিধানে তসরের শাড়ী"ও দেখিলাম।

অতঃপর দুর্ব্বলার শয্যা-রচনাতেও চাঁদোয়া এবং পাটের মশারী দেখিতে পাই।

পাটের মশারী বেড়　　　ভূমে নামে গজ দেড়
মাঝে মাঝে লাল পাট ডোরা।

অন্যত্র,

পাটের শাড়ী　　　পরি কটি বেড়ি,
চলিতে নূপুর বাজে।

ধনপতি সদাগর সিংহলে গমন করিয়া তথাকার নৃপতিকে "রাঙা ডাঁটী"-বিশিষ্ট ছত্র ভেট দিয়াছিলেন।

শিখিপুচ্ছে বিজড়িত　　　মণিমুক্তা উপনীত
আতপত্রে শোভে রাঙাডাঁটি।

ছত্রটির আচ্ছাদন অংশ নিশ্চয়ই বস্ত্রের ছিল? শ্রীমন্তের সহিত বিশ্বকর্ম্মার পরিচয়ে দেখিতেছি বিশ্বকর্ম্মা শ্রীমন্তকে বলিতেছেন,

বসনবিহীন　　　পর্য্যাছ কৌপীন
তথি ডোর শণ দড়ি।

সুশীলার বারমাস্যা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলেন,

…সাঙলি গামছা দিব সুগন্ধী কস্তুরী।…
…　　…　　…
মশা নিবারিতে দিব পাটের মশারি।
…　　…　　…
কেহ পেত কেহ নেত কেহ পাট শাড়ী।

অতঃপর বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবনদাস-কৃত চৈতন্যভাগবতেও দেখিতেছি যে, ভক্তগণ মহাপ্রভুকে বস্ত্র উপহার দিতেছেন।

পট্ট নেত, শুক্ল নীল সুপীত বসন।
…　　…　　…
পাদপদ্মে দিয়া নমস্করে সর্ব্বজন।
…　　…　　…
মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।
…　　…　　…
সুকৃত সকলে দিয়া করে নমস্কার।
…　　…　　…
শুক্লপট নীলপীত—বহুবিধ বাস।
…　　…　　…
অপূর্ব্ব শোভায় পরিধানের বিলাস।
…　　…　　…
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
…　　…　　…
শুক্ল নীল পীত—বহুবিধ পট্টবাস।
…　　…　　…
পরমবিচিত্র পরিধানের বিলাস।
…　　…　　…
আইলেন বীর ছাঁদে পরি নীলবস্ত্র।
…　　…　　…
কাহার কৌপীন ছাড়ি দিব্যপট্টবাস।
…　　…　　…
ধরেন চন্দনমালা সদাই বিলাস।

দিব্যরত্নবস্ত্র গোপালনাথের শ্রীঅঙ্গে।

… … …

পট্ট নেত। শুক্ল পীত নীল নানা বর্ণে।

… … …

দিব্যবস্ত্র যেন মুক্তা রচিত সুবর্ণে।

… … …

নয়া বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান।

… … …

সেদিন মাণ্ডুয়া বস্ত্র পরেন ঈশ্বর।

… … …

চৈতন্য ভাগবতে মাণ্ডুয়া বস্ত্রের বহুল উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করিলাম না।

শ্রীরামরসায়ন কাব্যে কবি রঘুনন্দন বস্ত্র-শিল্পের প্রসঙ্গে বলিতেছেন,

শুভ্রসদনের শিরে শুক্লপট্টবাস।

শ্রীরামচন্দ্রের বসনপ্রসঙ্গে রামরসায়ন কাব্যে দেখিতে পাই,

পীতপট্ট পরিধান গলে বনমালা।

পুত্রমুখ দর্শনে দশরথ এত অধীর হইয়াছিলেন যে,

উত্তরীয় বসন ভূষণ না সম্বরে।

পুত্রলাভে দশরথ বিপ্রগণকে "পট্টবস্ত্র আচ্ছাদিত" গাভী দান করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের পৌগণ্ডাদি লীলাকালে দেখিতে পাই,

পীতপট্ট বস্ত্র সাজে শিরেতে পাগড়ী রাজে

… … …

কভু রাঙ্গা পাগ শিরে পীতজামা কলেবরে

কটিরেতে জরীর বন্ধন।

… … …

তবে স্নান করাইয়া প্রভু রঘুবরে।

অরুণিত পট্টবস্ত্র পরাল্য সাদরে॥

… … …

মনোহর মধ্য তার অরুণ বসন তায়

কিবা পরিপাটী সে শোভায়।

যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাকালেও দেখিতেছি,

বাটিতটী আঁটি মল্লধটি পরিধান।

কবি রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের "কোঁচা দোলাইয়া" কাপড় পরিবার বর্ণনা দিয়াছেন,

গজেন্দ্র জিনিয়া গতি মনোহর কোঁচা অতি

ঘন দোলে চলিতে চলিতে।

শ্রীরামচন্দ্রের বসনের শুক্লতাপ্রসঙ্গে কবি বলেন,

গলিত কাঞ্চন হেন তাঁহার বসন।

জনকরাজার সভাসজ্জায় বস্ত্র-শিল্পের উল্লেখ করিয়া কবি লিখিতেছেন,

বিচিত্র বসনে পাগ বান্ধয়ে আনন্দে

… … …

নানামত জামাজোড়া পরিধান করে।

সীতার সখীদের রূপসজ্জা বর্ণনায় কবি রঘুনন্দন নীল ও লাল রঙের পাটশাড়ীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সাজে যাহা যার তাহা সেই পরে

নীল লাল পট্টশাটি।

কিবা সে মাধুরী যতেক সুন্দরী

বেশ করে পরিপাটী।

কুচের উপরি বিচিত্র কাঁচলী

রাম নাম লেখা তায়।

এইবার বরবেশে রামচন্দ্রকে দেখিতেছি,

কটি তটে আঁটি পীত বসন পরায়।

যেন জলদেতে স্থির সৌদামিনী ভায়॥

… … …

পীত উত্তরীয় প্রভু নিল বক্ষঃস্থলে॥

অতঃপর পাঠকগণ সীতাদেবীকে বধূবেশে দেখিয়া লউন।

অরুণ বসনে কটিতট সুশোভিত।

যেন মেরুতটি সন্ধ্যা মেঘে আচ্ছাদিত॥

মিথিলানগরীর ললনাগণের বসনপ্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,

পরে চারু পট্টবাস মুখে মন্দ মন্দ হাস

রসে অঙ্গ ধরিতে না পারে।

সুকঠিন পয়োধরে কাঁচলী কসিয়া পরে

রাম-সীতার নব-সম্মিলনে দেখিতে পাই,

নানা গন্ধ দ্রব্য দিয়া তনুখানি সু-মাজিয়া

পরাইলা বিচিত্র বসন।

রাম-সীতা সরোবর-ঘাটেতে উঠিলা।

সখিগণ দিব্যবস্ত্র আনি যোগাইলা॥

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকে পুরোহিত নব-বস্ত্রের তালিকা দিয়াছেন,

ধৌত নববস্ত্র শুক্ল ব্যজন চামর।
সুসজ্জ করিয়া সবে রাখ অতঃপর॥

অভিষেকে রাজপুর-সজ্জাপ্রসঙ্গে কবি বলেন,

বৎস গাবী বৃষগণে, সাজাইল সযতনে
পৃষ্ঠে দিল বিচিত্র বসন।

সীতার প্রসাধনকালে,

পাটী রচিল ললাটে পরিধানে দিব্য শাটী॥
শাটিনের পটে আচ্ছাদিল স্তনের যুগল।

বনগমন প্রসঙ্গে জানা যায়,

নানা বস্ত্র অলঙ্কার অপূর্ব্ব বসন যার
সে কেমনে বল্কলে পরিবে।
সুতিয়া কুসুম শেজে যাহার অঙ্গেতে বাজে
কি মতে সে ভূমিতে শুইবে॥

ভরতের দুঃস্বপ্ন দর্শন প্রসঙ্গে কবি "কৃষ্ণবস্ত্রের" উল্লেখ করিয়াছেন।

কৃষ্ণবস্ত্র পরি লৌহ পীঠেতে বসিলা।
পিঙ্গল পুরুষ প্রহারিতে আরম্ভিলা॥

পঞ্চবটী বনে বাসকালে মুনিপত্নী অনসূয়া সীতাকে যে-বস্ত্রাদি প্রদান করেন তৎসম্পর্কে কবি বলেন,

অনুসূয়া দিলা দুই অরুণ বসন।
অতি মনোহরতর সর্ব্বাঙ্গ ভূষণ॥

সূর্পনখা রামসমীপে যে-বেশে দেখা দিয়াছিলেন, তাহার বিবরণে জানিতে পাই,

কটি হেমতটে পরিছে বসন॥
তঁহি সূক্ষ্ম সুরঙ্গ পটী পরিছে।

অতি সূক্ষ্ম সুরঙ্গীন পাট শাড়ী সূর্পনখা পরিধান করিয়াছিল। সূর্পনখা সীতার বস্ত্র প্রসঙ্গে দশাননকে বলিতেছে,

সুবিশাল কটি তাহে পরিপাটী।
কিঙ্কিণী বসন ভাতি॥

সীতাহরণ কালে দশাননের যে বেশভূষা ছিল, তদ্বিষয়ে কবি বলেন,

বিভূতিভূষণ অঙ্গ কটিতে কষায় রঙ্গ
বসন শোভয়ে সুললিত॥

অতঃপর রাবণ নিজমূর্ত্তি ধরিয়া "রক্তবস্ত্র" পরিলেন

রক্তবস্ত্র পরিধান গলে মুক্তামালা॥

যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণ আসিলে, বিভীষণ রামকে চিনাইয়া দিতেছেন,

অরুণ সমান ভাস পরিয়াছে পট্টবাস
কটিতটে কিবা শোভা করে।

রাবণসৈন্যের রণসজ্জা প্রসঙ্গে "চিত্রবস্ত্রে"র উল্লেখ দেখিতে পাই,

ধরে চিত্রবস্ত্র তাহাদের পৃষ্ঠের উপরে।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞ-কালে মেঘনাদের "রক্তবস্ত্র" পরিধানের কথা জানিতে পারিতেছি,

রক্তবর্ণ বস্ত্র মাল্য পরিধান করি।
বিভীতক কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালে মন্ত্র পড়ি॥

পুষ্পকযানের মধ্যে বস্ত্রজাত শিল্পের নমুনা দেখিতে পাই,

উপরেতে চন্দ্রাতপ সাজে।
তার মধ্যে দিব্যতুলী বালিশ দিয়াছে ভালী
মুকুতার ঝালর বিরাজে॥

কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি শ্রীরামকে উপঢৌকন দিতেছেন,

প্রভুদের উপযুক্ত বস্ত্র অলঙ্কার॥
বিভীষণ আদি করি যাবদীয় জন।
পাঠাল সবার যোগ্য বিচিত্র বসন॥

ঋষ্যমূক পর্ব্বতের আলোচনায় রাম-সীতা বলিতেছেন,

ইহাতেই দেখি আমি কপি পঞ্চজন।
ফেলি দিয়াছিনু নিজ বিচিত্র বসন॥
শ্রীরাম কহেন প্রিয়ে সে বস্ত্র ভূষণ।
কপিপতি করেছিল মোরে সমর্পণ॥

ভরদ্বাজ আশ্রমে রাম আতিথ্য গ্রহণ করিলে, আশ্রমপতি উপযুক্ত বস্ত্র দান করিয়াছিলেন,

স্নানবস্ত্র-ভূষা নানা ভোগ উপভোগে।
তাহারা তাদিগে সুখী কৈল সেবাযোগে॥
স্নান করি বস্ত্রভূষা করি পরিধান।
নানা রস অন্ন খাও কর মধুপান॥
তবে তাহাদের অন্ন করিয়া প্রোক্ষণ।
পরিবারে দিল দিব্য বিচিত্র বসন॥
লইয়া তাহারা এই বস্ত্র অলঙ্কারে।
পরিধান করে নিজ ইচ্ছা অনুসারে॥

শৃঙ্গবের পুরে অবস্থান কালে গুহকের বস্ত্রপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই,

আঁটি আঁটি কটি পরে রাঙা ধটি
বীর মাটি মাখে গায়।

রাম-রাজসভায় "স্বর্ণরসে চিত্রিত পতাকা ও, নানারঙ্গ পতাকা, ও "চমৎকার চন্দ্রাতপের" উল্লেখ দেখিতেছি।

উড়ে যেন বর্ণরসে চিত্রিত পতাকা

... ...

মধ্যে করে চন্দ্রাতপ তুলি।

কুম্ভকর্ণের রণসজ্জা প্রসঙ্গে কবি রঘুনন্দন রামরসায়ণ কাব্যে লিখিতেছেন,

দিব্য বস্ত্র পরি দিব্য আসনে বসিল।

মেঘনাদের যুদ্ধকালেও দেখিতে পাই,

তরুণীর মত সিন্দুরে ললাট সুরঞ্জন

জন-মনোহর বিচিত্র বসনে আচ্ছাদন।

মকরাক্ষের রণসজ্জায় দশানন স্বয়ং তাহাকে বিচিত্রিত বসন পরাইয়া দিতেছেন,

উঠিয়া সাজায় তারে নিজে দশানন।

দিব্য গন্ধ মাল্য দিল বিচিত্র বসন॥

অন্যত্র,

···পায়ে ধটি পরিছে আঁটিয়া কটিতে।···

রাবণ বধের পর সরমা সীতাকে যে প্রসাধনসজ্জায় দিয়াছিলেন তৎপ্রসঙ্গে রামরসায়নে দেখিতে পাই,

স্নানীয় বিবিধ দ্রব্য বসন ভূষণ।

লইয়া জানকী পাশে করিল গমন॥

কেশাবধি চরণ পর্য্যন্ত প্রক্ষালিয়া।

পোঁছাইলা অতি সূক্ষ্ম বসনে করিয়া।

জলে আর্দ্র হয়্যা বস্ত্র মিলাইলা গায়।

অাগরুরে দৃঢ় করি ধরিল কি তায়॥

এইরূপে স্নান করাইয়া দাসীগণ।

সূক্ষ্ম বস্ত্রে করি করে জলাপসরণ॥

তাহার পর পোঁছাইয়া অঙ্গসব অঙ্গ।

পরিধান করাইলা বসন সুরঙ্গ॥

... ...

তাহার উপরি বিচিত্র কাঁচুরী

পরাইল পরিপাটী সকলে।

অতি সুশোভন বিচিত্র বসন

করিল বন্ধন কটি উপরে॥

শ্রীরামের স্বদেশগমন কালে বিভীষণ কপিগণকে বস্ত্রাভরণ দিতেছেন,

সুগন্ধ চন্দন মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার।

দিলাচর সকলে আনয়ে ভারে ভার॥

অতঃপর,

বসিবার স্থল সুকোমল আসনে ঢাকিল।

তার চারিধারে থরে থরে বালিশ অর্পিল॥

স্নান করাইয়া পোঁছাইয়া সব কলেবর।

দিল নানা রঙ্গ বস্ত্র অঙ্গ ঢাকি পৃষ্ঠপর॥

কবি রঘুনন্দন রামরাজ-সভার শোভা বর্ণনায় "চীন-বস্ত্রের" প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন,

দিল পৃষ্ঠে জিন, দিব্য চীনবস্ত্রে আচ্ছাদিত

অতঃপর,

আগে কলেবরে সানা পরে পরে কেহ জোড়া জামা।

শিরে পাগ ধরে কেহ পরে টুপি অনুপমা॥

... ...

পাগ বান্ধে মাতে শরীরেতে জামাজোড়া পরে।

নারীবিলাসপ্রসঙ্গে,

বুকের উপরি বিচিত্র কাঁচুরী

বান্ধিল কিবা সে তার॥

অতি সুচিকণ সুরঙ্গ বসন

পরিলেক কটিদেশে।

রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রবেশকালে ভৃত্যগণ তাঁহাকে সুবেশ পরাইতেছে,

অঙ্গজল পোঁছাইয়া সুরাগ্যা বাকল।

পরাইল দিব্য পীত সুনির্ম্মল।

কিবা শ্যাম অঙ্গে সেই বস্ত্র শোভা পায়।

পীত উত্তরীয় প্রভু ধরিলেন গায়॥

অতঃপর রামের রাজ্যাভিষেক কালে দেখিতে পাইতেছি, বশিষ্ঠ বলিতেছেন,

···ধৌত নববস্ত্র শুভ্র ব্যজন চামর··· প্রয়োজন।

রাম ভৃত্যগণ

স্নান করি শুক্লবস্ত্র পরিধান করি।

নানা উপায়ন লৈয়া যায় সুখে ভরি।

সীতার প্রসাধন প্রসঙ্গে :—

জনি-মধ্যে যাহা করি নাই কভু বিলোকন।

কনকের রসে চিত্রিত পরিল সে বসন॥

শণ পুষ্পবর্ণ বস্ত্র রূপা-রসেতে চিত্রিত।

রীত অনুসারে পরে কেহ কেহ রক্ত সিত॥

করি তদুপরি বান্ধিল কাঁচুলী মনোহর।

হরষিত চিত্তে দিল শিরে উত্তরী-অম্বর।···

কিবা শোভে কটি গিরিতটী জিনি পরিসর।
তাহে সুপ্রকাশ পীতবাস অতি মনোহর॥

হরিভক্ত প্রসাদের বসনপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই,

উরু মনোহর নিতম্ব সুন্দর
পীত বসনেতে রাজে।

শ্রীরাম বন্ধুবান্ধবদের দেশে পাঠাইবার সময় নানাবিধ বস্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যাদি উপহার দিতেছেন,

শ্রীরাম দিলেন সবে বিবিধ রতন।
বিচিত্র বসন, শয্যা ছত্র ও ভূষণ॥

"রামলীলা" প্রসঙ্গেও দেখিতেছি,

তাহে করিদন্ত-কৃত কান্ত পালঙ্ক বিমল।
তাহে অতি দৃষ্ট তুলী দুগ্ধ-ফেণ-সুকোমল॥
তাহে মৃদুতর মনোহর বালিশ বিস্তর।

সীতার বিলাসসজ্জায়,

কুচেতে কাঁচুরী বান্ধে দিয়া ডুরি
রামচিত চুরি করিবে যাহে।
কটিতটে বাস অতি নীলভাস
কিঙ্কিণী প্রকাশ করিল তাহে॥

"জৈমিনী ভারতে" অর্জ্জুনের বেশভূষা প্রসঙ্গেও দিব্য-বস্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে,

পরিধান দিব্যবস্ত্র সুন্দর সুন্দর ভূষণ।

যৌবনাশ্বের পরাজয় প্রসঙ্গে "জৈমিনী ভারতে" "শির-স্ত্রানের" কথা দেখিতে পাই,

শির হতে শিরস্ত্রাণ যায় গড়াগড়ি।

শ্রীকৃষ্ণের বসনসজ্জায়ও "জৈমিনী ভারত" বলেন,

চারু পরিচ্ছদে শোভে রূপরাশি সীমা।
... ...
পরিধান পীতবাস শ্রীনিবাস ওই।

অতঃপর দেখিতেছি,

কুন্তীপদে প্রণমিয়া যোগ্য সমাদরে।
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া পূজিলা তাঁহারে।

অন্যত্র,

সুন্দর কৌষেয়-বস্ত্র রচিত শিবিরে।
বলিহারি কারিকুরি তাহার উপরে।

জৈমিনী কুরুরমণীর বস্ত্র প্রসঙ্গে বলেন,

বিচিত্র বসন আছে অঙ্গের উপরে।

কুরুরমণী,

বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র আর অলঙ্কারে।
লইবেক দিবে বলি পাণ্ডুর কুমারে॥...

অতঃপর জৈমিনীভারতে "নীলবস্ত্রের" উল্লেখ দেখিতেছি,

নীল বস্ত্র গৃহমধ্যে বিছাইয়া দিব।

সুধন্বা যুদ্ধ গমনের প্রাক্কালে এক সুন্দর কামিনীকে দেখিতে পান। তাঁহার,

কৌষেয় বসনে শোভে শরীরের কান্তি।

কৌষেয় বসনের অন্যত্র উল্লেখ দেখিতেছি,

কৌষেয় বসন পরা সকলেই মনোহরা
যেন সব প্রেমের পুত্তলী।

রামপ্রসাদী জগদ্রামী অদ্ভুত অষ্টকাণ্ড রামায়ণে শ্রীমতীকে সুসজ্জিত-করণ প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,

শ্রীমতীর বেশ করে কেশের মার্জ্জনে।
স্নান করি পরাইল পট্টের বসনে॥
... ...
কনক কোরক কুচে কঞ্চুলি প্রবরে।

কবি রামপ্রসাদ শ্রীরামকে "পীতাম্বরধারী" বলিয়াই ধ্যান করিয়াছেন।

সীতার বাল্যসজ্জায় কবি রামপ্রসাদ বলেন,

নিতম্বে ললিত নীল বিচিত্র অম্বর।

অহল্যা শ্রীরামকে বন্দনা করিতেছে

সুবর্ণ বরণ বাস, হাস চন্দ্র মুখে।

রামরূপদর্শনে অট্টালিকাচূড়ে স্থিতা সীতার উক্তি,

পীতবসন ললিতভূষণ মুক্তামালা গলে দোলে।

স্বয়ম্বর-সভার সজ্জা-বর্ণনায় বস্ত্র-শিল্পের কিঞ্চিৎ আভাস কবি রামপ্রসাদ দিতেছেন,

লাল নীল পিঙ্গল ধবল ধ্বজা করি।
প্রতি ঘরে দ্বারে দিয়া শোভা কৈল পুরী।

অতঃপর সখীগণ সীতাদেবীকে পাত্রীর উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত করিতেছে,

স্নান করি পরাইল বিমল বসন।
নীল পট্টবস্ত্র তাহে লালিমা কিনারি।
বিচিত্র চিত্রিত স্থানে স্থানে দিব্যজরি।
হীরা মণি-মাণিক্যেতে নির্ম্মাণ কাঁচুলী।
পয়োধরে পীবরে পরালো প্রিয় আলী॥

সীতার অধিবাসে কবি রামপ্রসাদ "নেতের বস্ত্রের" কথা উল্লেখ করিয়াছেন,

নেতের বাস পরি, ভালে ত্রিপুণ্ড্র করি,
পূজা করেন বিশ্বম্ভর ॥

অন্যত্র এই প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,

জামা জরি পরি সেনাপতি অগণিত।
বিমানেতে আগে বেগে গমন ত্বরিত ॥

রামজণি কাঙ্গলি নাচয়ে কত ঠাঁই।
কাবা পড়ে ভবাভাটে তার সংখ্যা নাই।

কবি রামপ্রসাদ কৈকেয়ীর মুখ দিয়া রামচন্দ্রকে বলিতেছেন,

পটবস্ত্র ত্যজ পুত্র ত্যজহ বাকল।

সহসা সীতা রামকে দেখিয়া বলিতেছেন,

ধবল উজ্জ্বল ছত্র কোথা রাখি আলো ॥

মেঘনাদের চিতাসজ্জা বর্ণনায় কবি রামপ্রসাদ শণ ও পাটের কাপড়ের কথা উল্লেখ করিতেছেন,

শণ পট্টবস্ত্র তাহে করিয়া মণ্ডিত।
সুলোচনা স্নানদান করিল ত্বরিত ॥

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা নিমিত্ত লক্ষ্মণ যে অগ্নিকুণ্ড করিয়াছিলেন, তাহাতে বহু "পট্টবস্ত্র" দগ্ধ হইয়াছিল। রামপ্রসাদী রামায়ণে তাহা দেখিতে পাই,

ঘৃতধুনা পটবস্ত্র প্রচুর আনিল ॥
কাষ্ঠেতে বেষ্টিত পট্টবস্ত্র ধুনাকরি।
কলসে কলসে ঘৃত ঢালে তদুপরি ॥

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য "শিবায়ণ" কাব্যে গৌরীর বাল্যলীলা প্রসঙ্গে বলিতেছেন,

বিচিত্র কাচুলী বান্ধা বুকের উপর।
… … …
দিল ঝাপা পাট থোপা দেখিতে সুন্দর ॥

শিবের বরযাত্রায় কবি রামেশ্বর "দিব্যবস্ত্রে"র কথা উল্লেখ করিয়াছেন,

দিব্য বস্ত্র পরিধান ভালে ঊর্দ্ধ ফোঁটা।

ঊষার স্বপ্নবিবরণে কবি রামেশ্বর অনিরুদ্ধকে "পীতাম্বর" বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন,

পীতাম্বর সুন্দর শ্যামল বিলক্ষণ।
স্বপনে দেখিনু এই পুরুষ রতন ॥

শঙ্খপরিধান ও শৈলজার সুসজ্জা প্রসঙ্গে কবি রামেশ্বর কৃত শিবায়ণে "কর্ণাটী কাঁচলীর" উল্লেখ দেখিতে পাই।

কুচযুগে কর্ণাটী কাঁচলি কৈল বন্ধ।

অন্যত্র,

সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র বসনাদি পরে।
শাঁখারী সমীপে এল ঝলমল করে ॥

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক কাঁচলি নির্ম্মাণে কবি রামেশ্বর বলিতেছেন,

শিল্প কর্ম্ম সকলে সেবকে দিয়া ভার।
কাঁচলী নির্ম্মাণ করে কামিনাসুন্দর ॥
বিচিত্র বসনে চিত্র চতুর্দ্দশ পুরী।
পূর্ব্বাপরে শোভা করে উদয়াস্তগিরি ॥

কাঁচলিতে নানাবিধ চিত্রও চিত্রিত করা হইয়াছিল :

স্বর্ণ সূত্রে গুঁড়ে চিত্র রচে নানামত।
মাঝে মাঝে সাজে চুণী মণিমরকত ॥
দপ দপ দিব্য রত্ন দীপকের প্রায়।
দীপ্তে দেখি অন্ধকার দীপে নাহি দায় ॥
কাচলি বিচিত্র চিত্র দিল সর্ব্ব ঠাঁই।
দেখি সুখী শশিমুখী সুখে সীমা নাই ॥

হরগৌরীর বাসর-সজ্জা প্রসঙ্গেও দেখিতে পাই,

রতন পর্য্যঙ্ক চিত্র-বসন-মণ্ডিত।
রমণ করিবে যাতে রমণ-পণ্ডিত ॥
যত্ন করি চার খুঁটে বাঁধে রত্ন ডুরি।
ঝলমল করে তায় হেম ঝাঁপা ঝুরি ॥
দুই দিকে বিচিত্র বালিস দিয়া তায়।
ধূপাবলী রাখিল সকল ঝরকায় ॥
করিল বিনোদ শয্যা বিনোদ মন্দিরে ॥

কবি চণ্ডীদাসের

…অঙ্গের বসন কৈরাছে আসন, আলাঞা দিয়াছে বেণী…

সর্ব্বজনবিদিত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি কৃত্তিবাস ওঝা বঙ্গেশ্বর রাজ গণেশের দরবারের যে-বর্ণনা করিতেছেন তাহাতে বস্ত্র-শিল্পের প্রাচুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় :

আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরী।
তার পর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ী ॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার ওপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥

কৃত্তিবাস রামায়ণ পাঠ করিলে গৌড়েশ্বর তাঁহাকে "পাটের পাছড়া" দান করেন।

কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া।...

দশরথের বসন প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস বলেন,

শুকুল অম্বর রাজার শুকুল উত্তরী।
চন্দনে লেপিত রাজা শুকুল বস্ত্রধারী।

কবি বিজয় পণ্ডিত "বিজয়-পাণ্ডব" কাব্যে "পীত বস্ত্রের" উল্লেখ করিয়াছেন,

পীত বস্ত্র না সম্বরি দেব দামোদর।
বিজলী পড়িছে যেন নব জলধর॥

কবি মালাধর বসুও "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" কাব্যে পীতবসনের কথা বলিয়াছেন :

কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।

অন্যত্র,

বিচিত্র সুচিত্র যে পাগ যেবা শিরে ধরে।
তার হেন মানে যদি প্রণাম না করে॥

কবি সহদেব চক্রবর্ত্তী কৃত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত "ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যে "নেতের বসনের" পরিচয় পাই :

নেতের আঁচলে চর্ম্মখণ্ডিত করিয়া ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥

কবি মাণিক গাঙ্গুলী রচিত ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে সাদা কাপড়ের উল্লেখ আছে :

ধবল অম্বর ধবল চামর ধবল পাদুকা পায়।

কবি ভারতচন্দ্র রায় সর্ব্বগুণাকর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে "সাদা শাড়ীর" প্রসঙ্গে বলিতেছেন,

চূড়া বান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী।

ভারতচন্দ্রও "বিচিত্র বসনের" পরিচয় দিতেছেন,

বিচিত্র বসন পরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে।

"পট্টবস্ত্রের" উল্লেখ করিয়া ভারতচন্দ্র বলেন,

নানা আভরণ পট্টাম্বর পরিধান।
যুবকের মরমে হানায় পঞ্চবাণ॥

কবি কালীকৃষ্ণ দাসের "কামিনীকুমার কাব্যে" শ্বেত বস্ত্রের বিবরণ দেখিতে পাই :

গন্ধরাজ ধাইলেক পরি শ্বেত-বস্ত্র।

অন্যত্র,

পীত ধড়া বিজলীতে মযুরে নাচাও হে।

দ্বিজ রসিকচন্দ্রও "পীতধড়ার" উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিতেছেন,

নরকর কটি বেড়া খুলে পর মা পীত ধড়া।

কবি লালন সাঁই-এর গ্রাম্যগীতিকায় শাদাকাপড়ের নিশান ও চাঁদোয়ার কথা দেখিতে পাই,

দুধে ধোয়া কোম্পানীর উড়িল নিশান।
... ...
চাঁদোয়া খাটায়ে কান্দে মোহনলালের বেটি।

কবি দাশরথী রায়ের পাচালীতে "খাদি কাচা" ও "কোঁচা"র বর্ণনার উল্লেখ রহিয়াছে :

বিধির নাই বিবেচনা।
ধার্ম্মিকের খাদি কাচা অধার্ম্মিকের উড়ে কোঁচা।

অতঃপর দাশু রায় "শালের" উল্লেখ করিয়াছেন,

দুষ্ট সব দুষ্ট ছাড়া বাজিয়ে পায় শালের জোড়া
পাণ্ডিতে চণ্ডী পড়ে দক্ষিণা পান চারটি আনা॥

কবি গোলক বন্দোপাধ্যায় ওরফে "দীন বাঁউলের" একটি বাউল সঙ্গীতেও "শালের" উল্লেখ দেখিতেছি :

শ্মশান ঘাটে যাবার সময় কেউ কিছু কি সঙ্গে নিলে?
রঙ্‌ বেরঙের শালের জোড়া, গাড়ী-ঘোড়া চেন ঘড়ী সব
কোথায় খুলে!

প্রাচীন বাঙলার বস্ত্র-শিল্পের ইতিহাসে আদৌ বৈচিত্র্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। প্রাচীন কাব্যসমূহে লীলা ও অভিনয়ের বর্ণনা পদে পদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্য পাঠে সেকেলে বাঙালীর বস্ত্রশিল্পে বিলাসিতার নিদর্শন বহুল পরিমাণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভৌতিক পিতৃশ্রাদ্ধ

অমরাবতীর কাউন্সিল হাউসে হৈ হৈ কাণ্ড। দুর্গাপূজার পর হইতে সরস্বতীপূজা পর্যন্ত দেবদেবীদের প্রায়ই পৃথিবীতে মফঃস্বল টুরে আসিতে হয় বলিয়া কাউন্সিল বহুদিন বন্ধ ছিল। সম্প্রতি কয়েকদিন হইল অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। আজ বাজেট মিটিং। গণ্যমান্য সভাসদেরা সকলেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। দর্শকের গ্যালারীতে তেত্রিশ কোটি সীট একদম ভর্ত্তি, তিলধারণের ঠাঁই নাই।

প্রধান মন্ত্রী বৃহস্পতি বিশেষ জনপ্রিয় হইলেও বর্ত্তমানে একদল প্রগতিপন্থী ছোকরা দেবতা একটা বিরুদ্ধ দল গঠন করিয়াছে। তাহাদের মতে সেকেলে শাসন-ব্যবস্থায় চলিয়া দেব-সমাজ না কি উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে। বর্ত্তমান যুগোচিত করিয়া আইন-কানুন কিছু পাল্টাইবার প্রয়োজন। এই দলের নেতা কম্যুনিষ্ট গণপতি ইন্দ্রের একচ্ছত্র আধিপত্যের ও সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধবাদী। তাঁহার মতে আইন-পরিষদে ইন্দ্রের মনোনীত সদস্যের সংখ্যা কমাইয়া গণভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি আরও বাড়াইয়া তাহা হইতেই মন্ত্রি সভা সংগঠন একান্ত প্রয়োজন। অবিলম্বে তাহা না হইলে তাঁহারা গণ-আন্দোলন দ্বারা বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবেন, ইন্দ্রের মামুলী বজ্র, এমন কি ভারতে অন্নহীণ হওয়াতেও তাঁহারা দমিবেন না বলিয়া শাসাইয়াছেন। আজ বাজেট মিটিংএও তাঁহারা সদলবলে আসিয়াছেন ইন্দ্রের ও তাঁহার অকর্ম্মণ্য ব্যয়বহুল শাসন-ব্যবস্থার জন্য মোটা মোটা ভাতার প্রস্তাবে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে।

বাজেট মিটিং আরম্ভ হইতেই অর্থ-সচিব কুবের বর্ত্তমান বৎসরে দেবরাজ্যে ভীষণ অর্থ-সঙ্কটের কথা উল্লেখ করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতায় কহিলেন, দেবরাজ্যের অধীনস্থ দেবভূমি ভারত সাম্রাজ্য হইতেই এতাবৎকাল দেব-গভর্ণমেন্টের মোটা টাকা আয় হইয়া থাকে। কিন্তু মহাকলির প্রভাবে পড়িয়া দিন দিনই ভারত হইতে এই লাভের অঙ্ক কমিয়া আসিতেছে। দেবরাজন্যদের প্রতি ভারতবাসীর রাজভক্তি ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় পূজা-অর্চ্চনা, মানসা-মানতের দরুণ যে-পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইত, আগামী বৎসরে তাহা মোটেই আশা করা যাইতেছে না। অথচ ব্যয়ের দিক্ দিয়া এমন কতকগুলি ব্যয় অবশ্যকরণীয় রহিয়াছে, যাহার ফলে এবারকার বাজেট বরাদ্দ করা অতীব কঠিন কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

বক্তৃতায় এই স্থলে বিরুদ্ধবাদীদল হইতে পত্রিকা-সম্পাদক শনি তীব্র ভাষায় আপত্তি জানাইলেন, "ভারতবাসীর উপর সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব কমিয়া গিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বোধ হয় জানেন না যে, সম্প্রতি ভারতের কলিকাতা নামক নগরে যেরূপ বিরাট আকারে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারতে হিন্দু ধর্ম্মের প্রবল অভ্যুত্থান না ঘটিয়া পারে না।"

যাঁহারা প্রকৃত ঘটনা জানিতেন না, তাঁহারা এই সংবাদে বিস্মিত হইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে দেবরাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী চিত্রগুপ্ত উঠিয়া সকলকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "হে দেব মহোদয়গণ, আপনারা সকল বৃত্তান্ত অবগত না হইয়া মনুষ্যের ন্যায় বৃথা কোলাহল করিবেন না। হিন্দু মহাসভা নামে একটা সভা সম্প্রতি হইয়াছে সত্য এবং তাহার সমুদায় সংবাদই আমাদের পরিজ্ঞাত। ভারতে আজকাল রাজনীতি নামে যে নূতন এক প্রকার নীতির আমদানী হইয়াছে, উক্ত মহাসভা তাহারই একটা অংশবিশেষ, হিন্দু ধর্ম্মের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। এমন কি, যাঁহারা উহার কর্ণধার, তাঁহাদেরও সনাতন হিন্দু সম্বন্ধে কতটা জ্ঞান বা আগ্রহ আছে তাহা চিন্তনীয়। উপরন্তু, হিন্দু ধর্ম্মের একান্ত নিষিদ্ধ কর্ম্মগুলিতেও তাঁহাদের বিশেষ অরুচি নাই বলিয়া গোপনে সংবাদ পাইয়াছি। সুতরাং হিন্দু মহাসভার হৈ চৈ শুনিয়া ভারতে আবার সনাতন আস্তিক্য ধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইবে

বলিয়া যদি আপনারা আশা করিয়া থাকেন, তবে আপনারা নিতান্তই ভুল করিয়াছেন।”

চিত্রগুপ্তের সারগর্ভ বক্তৃতায় সভার চাঞ্চল্য অনেকটা দূরীভূত হইল। অনারেবল কুবের এইবার পুনরায় খানিকটা গৌরচন্দ্রিকা করিবার পর এক এক করিয়া বাজেট ফর্দ্দ পেশ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই সমর-বিভাগের জন্য প্রচুর টাকা বরাদ্দ করিয়া রাখা হইল। দৈত্যরা না কি পুনরায় দেবরাজ্য আক্রমণ করিবার চেষ্টায় আছে, এ সময়ে একান্ত নিরুদ্বেগে ও নির্ব্বিকার ভাবে কাল যাপন করা আদৌ বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সুতরাং অনতিবিলম্বেই দেবরাজ্যে প্রভূত সমরোপকরণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন। ইন্দ্রের বজ্র ও বিষ্ণুর চক্র মামুলী হইয়া যাওয়ায় বিশ্বকর্ম্মা কারখানায় নব নব মারণাস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যস্ত আছেন। সেই জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু মার্শাল্ কার্ত্তিক এ বিষয়ে স্বতন্ত্র রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

জলাধিপ বরুণের উদ্বৃত্ত তহবিল এবার বড়ই কম, কারণ মর্ত্ত্যের গোয়ালাদের একটা মোটা রকম কণ্ট্রাক্ট গত বৎসর গ্রহণ করিতে হওয়ায় দেব-সমাজে জল সরবরাহ ও সেচকার্য্যের জন্যে অকুলান পড়িয়াছে।

প্রতি বৎসর সূর্য্যের ‘ক্যাণ্ডেল পাওয়ার’ কমিয়া আসিতেছে। এই বৎসরের মধ্যেই তাহার একটা ব্যবস্থা না করিলে অনতিবিলম্বেই হয়ত তাহা নিবিয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইবে।

উপরন্তু এই বারই ইন্দ্রপুরী ও নন্দন-কাননের সংস্কার কার্য্য না করিলেই চলিবে না।

বাজেটের এই স্থানে আপত্তি করিতে গণপতি সবে মাত্র শুণ্ড আস্ফালন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় দ্বারদেশে একটা তীব্র কোলাহল শোনা গেল, এবং একটু পরেই দ্বার-রক্ষীর বাধা অতিক্রম করিয়া সভামধ্যে দ্বাদশটি অদ্ভুত আকৃতির প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব ঘটিল। নগ্নপদ, রুক্ষচুল ও ও গলবস্ত্র অবস্থায় তাহাদের দেখিলে মনে হয় অশৌচ হইয়াছে। মিটিংএ প্রবেশ করিয়াই সমস্বরে তাহারা চীৎকার আরম্ভ করিল, “হে দেবগণ, আমাদের পিতৃদায়, দয়া করিয়া উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করুন।”

অতি প্রয়োজনীয় বাজেট মিটিং পণ্ড হয় দেখিয়া বৃহস্পতি হুঙ্কার ছাড়িয়া উহাদের বাহির করিয়া দিবার আদেশ জারি করিলেন, কিন্তু উহারাও নাছোড়বান্দা। সভামধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। অবশেষে গণপতির নির্দ্দেশ মত সকলে স্থির হইয়া প্রেতাত্মাগণকে তাহাদের বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে নিবেদন করিবার আদেশ দিলেন। সাহস পাইয়া প্রেতাত্মা সমাজের দলপতি আগাইয়া আসিয়া কহিল—“প্রভো, আমরা মরিয়া বহু দুষ্কৃতির ফলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু ইহা হইতে আর উদ্ধারের আশা দেখিতেছি না। বংশধর যাহাদের রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাদের হাতে আর জল-পিণ্ডের আশা নাই। আমাদের যাহা হয় হউক, কিন্তু আমাদের পূজ্যপাদ পিতৃদেবগণের প্রেতত্ব মোচন করিতে না পারিয়া বড়ই মনঃকষ্টে দিন যাপন করিতেছি এবং আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মও যাইবার দাখিল হইয়াছে। প্রেতযোনি প্রাপ্ত হওয়ায় আমাদের স্বোপার্জ্জিত অর্থাদির উপর আইনতঃ কোন অধিকার নাই, অথচ দেব-লোকেও কোন স্থান না পাওয়ায় অর্থাভাবে আমরা পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে পারিতেছি না। আমরা এখন না পৃথিবীর, না স্বর্গের। এই নিরালম্ব অবস্থায় কোথা হইতে অর্থ পাইব, তাহার একটা ব্যবস্থা না করিয়া দিলে আমরা এখান হইতে নড়িব না।”

সভাস্থলে আবার কোলাহল উঠিল। ব্রহ্মা চার জোড়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, “আমার বিশ্ববিধানে সকল ব্যবস্থাই তো করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাদের পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থাটা বাদ পড়িয়া যাইবার ত কথা নহে।”

বৃহস্পতি নিম্ন স্বরে কহিলেন, “ব্যবস্থা তো ছিলই। মৃত ব্যক্তিগণের বংশধর পৃথিবীতে যাহারা থাকিবে, তাহাদেরই উপর তো ঊর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষের জল-পিণ্ড দিবার আদেশ দেওয়া ছিল, কিন্তু মহাকলির প্রভাবে পড়িয়া তাহা মানিতেছে কৈ? সে কাল কি আর আছে পিতামহ! অর্ব্বাচীন পিতা কবে মরিবে উপযুক্ত পুত্র এখন তাহার দিন গণনা করে—”

বিপন্ন ভাবে ব্রহ্মা কহিলেন, “আচ্ছা বৃহস্পতি, পৃথিবীতে ইহাদের স্বোপার্জ্জিত অর্থের কিছু ভাগ দিলে হয় না?”

বৃহস্পতি তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন—“না না পিতামহ, সর্ব্বনাশ করিবেন না। জীবন পর্য্যন্ত যে-অধিকার আপনি দিয়াছেন তাহাতেই পৃথিবীর সহস্র আলমারী

আইনের বইয়ে কুলায় না, এবং উকিল নামক এমন এক প্রকার অদ্ভুত জীব সৃষ্টি হইয়াছে যাহারা—"

পিতামহ ভীত ভাবে বাধা দিয়া কহিলেন, "থাক থাক বৃহস্পতি, উহাদের কথা আর তুলিয়া কাজ নাই। খেয়ালের মাথায় উহাদের সৃষ্টি করিয়া দেব-সমাজে বড়ই কথা শুনিতে হইয়াছে। বুড়া বয়সের সৃষ্টি নষ্ট করিতেও মায়া হয়। কিন্তু প্রেতগণের একটা ব্যবস্থা না করিলেও তো নয়।"

চিত্রগুপ্ত এতক্ষণ একটা খুব পুরাতন মোটা খাতা নিবিষ্ট চিত্তে উল্টাইয়া যাইতেছিলেন। সভা অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। গণপতি-দল দেব-সমাজের শাসন-ব্যবস্থার ছিদ্র পাইয়া নূতন করিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় চিত্রগুপ্ত চীৎকার করিয়া উঠিলেন…"পাইয়াছি, পাইয়াছি"—সংক্ষুব্ধ সভা মুহূর্ত্তমধ্যে স্থির হইয়া গেল, সকলেই আগ্রহান্বিত কি ব্যাপার জানিবার জন্য। চিত্রগুপ্ত পুরাতন খাতাটার এক স্থানে অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া বলিলেন—"হে দেববৃন্দ! আমাদের পিতামহ ব্রহ্মার বিশ্ববিধান মনুষ্য-রচিত আইনের মত ভ্রমপূর্ণ নহে। আপনারা স্মরণ রাখিবেন, কোন কিছুই আমাদের শাসন-ব্যবস্থার ত্রিকালদর্শী ন্যায়-দৃষ্টি এড়ায় নাই। কলিকালে ধর্ম্ম একপাদ মাত্র এবং মনুষ্যজাতি মৃত্যুর পর তাহাদের স্বোপার্জ্জিত অর্থের অধিকারী হইবে না সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অর্থাভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে না পারিয়া প্রেতগণের ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। তাহাদের জন্য ভারতের সমুদায় সরকারী তহবিলের টাকা বরাদ্দ করিয়া রাখা হইয়াছে। লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ম্যুনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন, এমন কি, গভর্ণমেণ্টের যে সকল সরকারী তহবিল আছে, তাহাতে তাহারা সকলেই বারমাস ধরিয়া অতি সমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিতে পারিবে।"

সভায় তুমুল আনন্দধ্বনি উঠিল। গণপতির দল সন্তুষ্ট হইয়া নিরস্ত হইলেন এবং উক্ত দ্বাদশটি প্রেতাত্মা আনন্দে বিগলিতচিত্ত হইয়া ভারতের দিকে যাত্রা করিল।

সভায় বাজেট বক্তৃতা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে।

খেলা-ঘর

—শ্রীমুকুন্দলাল সাহা

শিশু বাঁধে খেলা-ঘর সাগরের বালুকা-সৈকতে,
সন্ধ্যা বেলা ফিরে গৃহে শূন্য মনে কিছু নাহি হাতে,
জননী-অঞ্চল-তলে ঢলে' পড়ে নিদ্রাতুর আঁখি,
রজনীর অন্ধকারে গরজি' তরঙ্গ ছুটে দুই তীর রুধি',
নটরাজ রুদ্র তালে ধায় যেন ধ্বংস অভিযানে,
কাঁপে পৃথ্বী রসাতল তাণ্ডবের প্রলয় নর্ত্তনে;

ভেঙে যায় খেলা-ঘর, মুছে যায় শেষ চিহ্ন তা'র,
শিশু আসে সিন্ধুতটে প্রভাতে আবার—
দ্বিধাহীন, উন্মুক্ত চঞ্চল। নূতন বালুকা করি' জড়—
মহানন্দে খেলি' কাটে দিবসের সারাটি প্রহর।
হারানো-স্মৃতির লাগি' নাহি দুঃখ, আঁখি অশ্রুহীন,—
নূতন করিয়া বাঁধে খেলা-ঘরে খেয়ালের বীণ।

জীবনের বেলাভূমে রচিছে মানব কত-না-সুন্দর—
কামনা-বাসনা ঘেরা নিত্য নব স্ফটিকের ঘর;
কালের প্রবাহ চলে' অনন্তের দুস্তর পাথারে,—
এই ভাঙে, এই গড়ে, সারি সারি কাতারে কাতারে;
তা'র লাগি দুঃখ কেন? মহাসিন্ধু তীরে—
কত বালু মায়াময় রহিয়াছে পড়ে'।



ফেরার পথে।

[শ্রীপরিমল গোস্বামী

ভাবী সংগ্রাম

—হ্যান্স গ্রস্

[দৃশ্য : সীমান্তের এক অতি সুরক্ষিত পরিখার আভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠ। ঘরের দেওয়ালগুলি সব কংক্রিট পাথরের। বাম ও ডানদিকে "সাঁজোয়া দরজা"। পশ্চাতে যাতায়াতের জন্য খুব মজবুৎ ছোট একখানি দরজা, পরিখার খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ঘরের আসবাব-পত্রগুলি কোন এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মত। বাম দিকটায় একখানা টেবিল ও সোফা—টেবিলের উপর একটা আলো জ্বলছে। একখানা পর্দা টাঙিয়ে ডানদিকের একটা কোণকে ছোট-খাটো একটা রান্নাঘর করে নেওয়া হয়েছে—সেখানে রয়েছে রান্নার সংগ্রাম।

বিক্ষিপ্ত খান কয়েক চেয়ার ঘরের মধ্যে। সব কিছু মিলে কিন্তু পারিপাট্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

তেরো কি চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে তার ইস্কুলের খাতায় কি যেন লিখছে। পাশে খোলা রয়েছে একখানা ভূগোলের বই।

পিছনের সেই ছোট্ট দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে সাদাসিধে পোষাকের এক স্ত্রীলোক—তার হাতে একটা কেঁড়ে।]

মেয়েটি (না তাকিয়ে) : কে, মা বুঝি? মা, তোমাকেই খুঁজছিলাম যে! (পর্দাটা সরিয়ে স্ত্রীলোকটি রান্নাঘরে ঢুকল; স্টোভের কাছে কেঁড়েটি রাখল। মেয়েটি এবার ঘাড় ফিরালে)। ওঃ, শান্তা? (একটা নিশ্বাস ফেলে) আচ্ছা, কি করি বল ত, সব মাথামুণ্ড যে গুলিয়ে যাচ্ছে!

শান্তা। কি গুলিয়ে যাচ্ছে, ইভি দিদিমণি?

ইভি। যুদ্ধের সুরু নিয়ে যে আমাকে আজ রচনা লিখতে হবে। ক্লাশে দিদিমণি বলেও দিয়েছিলেন, কিন্তু তা এমন জড়ান যে আমি একেবারে ভুলে গেছি। আচ্ছা শান্তা বুঝতে পারিস, আমরা কেন যুদ্ধ করছি?

শান্তা। আমি মুকখু মানুষ, কি করে জানব?

ইভি। সত্যি, কি বিশ্রী!

শান্তা। কি, যুদ্ধ?

ইভি। না-না, লেখাটা। বোকার মত লোকে যুদ্ধ করে মরবে, আর তা নিয়ে আমাদের রচনা লিখতে হবে। নাঃ, আর পারা গেল না!

শান্তা। সত্যি, লোকে বোকার মতো যুদ্ধ করে।

ইভি। যাই বলো বাপু, আমরা এখানে এই পরিখার মধ্যে দিব্যি আছি। কেমন না?

শান্তা। হাঁা, বাইরে যে মুঠোর মধ্যে প্রাণ নিয়ে থাকতে হয়।

ইভি। আচ্ছা, বাবার চিঠি-পত্তোর অনেকদিন থেকে আসছে না কেন?

[সে লিখতে সুরু করলে। একটা পাত্রে কেঁড়েটা খালি করে শান্তা ওটা হাতে করে বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। ইভি তার কলমের খাপটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরল। বাইরে থেকে দ্রুত ভারী পায়ের শব্দ ভেসে এল; একটু পরেই দরজায় এসে দাঁড়াল অদ্ভুত পোষাকের একটা লোক। মাথায় তার নোংরা, টোল খাওয়া এক শিরস্ত্রাণ, আর কাঁধে ঝুলান একটা ভারী রাইফেল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে ভিতরে এসে ঢুকল; বসে পড়ল সশব্দে দরজার কাছে এক 'সেটি'র উপর। বিস্মিত হয়ে ইভি মুখ তুলল।]

কে, কি চাই এখানে?

লোকটি। বাপস্, ঘাড়ে বুঝি ভূত চেপেছিল—কি ছোটাটাই না ছুটে আসছি!

ইভি। কোত্থেকে আসছো? এখন ছুটিই বা পেলে কি করে?

লোকটি। ছুটি?

ইভি। হাঁা, বিশ্রামের জন্য ছুটি—মেয়েদের এই ট্রেঞ্চ-এ?

লোকটি। হ্যাঁ!

ইভি। ওটা কি আবার তোমার সঙ্গে?

লোকটি। (বিস্মিত হয়ে) কোনটা?

ইভি। ঐ যে ওটা! (রাইফেলটা দেখিয়ে দিয়ে)।

লোকটি। বন্দুকটার কথা বলচ?

ইভি। এখানে বন্দুক এনেছ কি করতে?

লোকটি। বাঃ, হাসছ যে! জান না, বন্দুক নিয়ে কি করে?

ইভি। (হাসি চেপে) না বলছি, বন্দুক নিয়ে এখানে তুমি কি করতে চাও?

লোকটি। কি করতে চাই! কেন, স্বদেশের সাহায্য আমি করব না? যুদ্ধ করতে আসছি যে আমার পিতৃভূমির শত্রুদের সঙ্গে।

ইভি। ফরাসীদের সঙ্গে?

লোকটি। হাঁ। বাঃ, হাসছ যে!

ইভি। (হাসি চাপবার চেষ্টা করে)। শুধু বন্দুক নিয়ে? আর মেয়েদের এই ট্রেঞ্চ-এ ঢুকে?

লোকটি। ছেলে-মেয়েগুলোও দেখছি, আজকাল সব পাগল হয়ে যাচ্ছে?

ইভি (গম্ভীর হবার চেষ্টা করে—ঘরের অনুপস্থিত কোন এক বর্ষীয়সী মহিলার ভঙ্গিতে একটু আদেশের সুরে।) না, বন্দুকটা তুমি এনেছ দেখে ভারী খুশী হয়েছি। ইঁদুরগুলো এখানে আমাদের ভারী জ্বালিয়ে মারছে। তা, তুমি এলে, বেশ হল; এবার থেকে মারতে পারবে। বিষ দিয়ে আর পারা গেল না। মাথা বার করলেই অমনি গুলি কর, বুঝলে? আমরা একদম ওদের বরদাস্ত করতে পারি না। (লোকটি তার দিকে তাকিয়ে একটা বিকট মুখভঙ্গি করলে। ইভি আবার বলে চলল।) শুনছ, বন্দুকটা ভরে নিয়েছ ত? ওই যে, দেখছ, রান্নাঘরের ওপাশটায় ওদের মস্তো বড় এক গর্ত?

লোকটি। (বিশ্রী মুখভঙ্গি করে) এ্যাদ্দূর এই পথ হেঁটে আসছি কি না তোমার ইঁদুর মারতে? তাই যদি হ'ত, তবে আমি ঘরে বসেই তা করতাম।

ইভি। তবে এখানে এসেছ কি করতে? তোমার বউ আমাদের এখানে আছে না কি?

লোকটি। বউ খুঁজতে এখানে আমি আসি নি, আমার ঘরে অনেক বউ আছে।

ইভি। অনেক বউ! ওদের সবাইকে তুমি বিয়ে করেছ?

লোকটি। (আস্তে আস্তে) হাঁ।

ইভি। ক'টা?

(লোকটি ডান হাতের পাঁচ আঙুল দেখালো।)

ইভি। বলো কি ঘরে তোমার পাঁচ-পাঁচটা বউ! তাই পালিয়ে এসেছ ঘর ছেড়ে?

লোকটি। (কি একটা শপথ করতে গিয়ে) না, আমি পালিয়ে আসিনি। জান, আমি জাতিতে জার্মাণ। পিতৃভূমির শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এখানে আসছি। তাই দক্ষিণ-সাগরের দ্বীপ থেকে আমার জায়গা-জমি যা কিছু সব ছিল, তা ছেড়ে ছুটে আসছি এখানে। দেশের ডাক আমার কানে গিয়ে পৌঁছেচে। কখন যে সাগর পেরিয়ে এলাম, কখন যে উত্তরসাগরের কূলে এসে নামলাম, আমার সে সব কিছুই মনে নাই। দিন রাত্রি কেবল চোখ বুজে হেঁটে আসচি। আর পথে যাকে পেয়েছি তাকেই শুধিয়েছি— 'ফ্রন্ট আর কদ্দূর?' তা শেষে এখানে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু এখন যা দেখছি—

[পিছনের দরজা দিয়ে ধূসর বর্ণের এক শোভন পোষাক পরে ঢুকল বর্ষীয়সী এক সুশ্রী মহিলা। ইভি আর লোকটির দিকে তিনি পরপর তাকাতে লাগলেন।]

অ্যানা (মহিলাটি)। ইভি, উনি কে?

ইভি। জানো মা, দক্ষিণসাগরের এক দ্বীপ থেকে ও আসছে সঙ্গে একটা বন্দুক নিয়ে—ঘরে ওর পাঁচ-পাঁচটা বউ! ফরাসীদের সঙ্গে এখন যুদ্ধ করতে যাচ্ছে; কিন্তু আমাদের ইঁদুরগুলোকে গুলি করে মারতে পারে না মা?

লোকটি: শুধু মেয়েরা—মেয়েরা ছাড়া এখানে কি আর কেউ নেই! আছে শুধু ছেলে, মেয়ে আর থুড়থুড়ে বুড়িদের দল! এরাই কি শেষে এসেছে যুদ্ধ করতে?

অ্যানা। কি হয়েচে বলুন তো—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি বুঝি কোন এক জর্মাণ, বিদেশে থাকেন, এখন দেশের হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছেন। তাই যদি হয়, তবে আপনি ভুল করে এখানে এসেচেন। আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না—

ইভি। জানো মা, চোখ বুজে ও বিদেশ থেকে ছুটে

আসছে—আশে-পাশে কোথাও তাকায় নি। [লোকটির প্রতি তারিফি গলায়] আচ্ছা, তুমি কি করতে চাও, বুঝিয়েই বল না।

অ্যানা। তুই থাম, ইভি। (লোকটিকে উদ্দেশ করিয়া) বসুন না, অদ্দুর হেঁটে আসছেন। কফি খাবেন?

লোকটি (প্রবল মাথা নেড়ে)। না এখন থাক! ধন্যবাদ! আচ্ছা, দয়া করে একবার বুঝিয়ে দেবেন, এখানে কি হচ্ছে! যা মনে হচ্ছে, পৃথিবীর সবাই যেন উঠে পড়ে লেগেছে।

অ্যানা। আপনি বীরপুরুষ কি না, তাই পিতৃভূমির সাহায্য করতে এসেছেন।

লোকটি। শীকারে আমার পাকা হাত, আপনি জানেন? রাইফেল ছুঁড়তেও আমি ভাল পারি। কিন্তু—এখানে এই মেয়েদের মধ্যে আমি আর কি কাজে লাগতে পারি বলুন তো! আমার আর সব সৈনিক বন্ধুরা গেল কোথায়?

অ্যানা। তাঁরা এখন সব ঘরে, গাঁয়ে আর শহরে আছেন; আপিস আর ফ্যাক্টারিতে কাজ করছেন। আচ্ছা, আপনি রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতে পারেন।

লোকটি। রাসায়নিক বিশ্লেষণ! সে আবার কি; নামও তো কখনো শুনি নি।

অ্যানা। বন্দুক দিয়ে আপনি এখন আর কি করতে পারেন? এটা হলো আপনার গ্যাসের যুদ্ধ। নিকটের কোন এক শহরে গিয়ে আপনার তা শিখে আসা দরকার। রোজই তো কেউ না কেউ যুদ্ধের নতুন নতুন উপায় ঠাওরাচ্ছে। চারিদিকে এখন নজর রাখতে হচ্ছে। বাতাসের অ্যাসিডিটি যাতে ধরা যায়, সে জন্য এখন লিটমাস (litmus) কাগজ পকেটে রাখতে হচ্ছে। এই তো মাত্র সবে সুরু হল।

লোকটি। ওসব বাজে কথা আপনার রেখে দিন। আমি যুদ্ধ করতে চাই, আর অস্ত্র তো আমার হাতেই রয়েছে। শত্রুদের এবার মারলেই হল। হাঁ'না তো—

অ্যানা। আপনার আসতে যে বড় দেরী হয়ে গেল। বছরখানেক আগেও যদি আসতেন, তখনও আপনাকে দেশরক্ষার কাজে নেওয়া যেত; নয় ত, বিমানচালক করে তোলা হত, শত্রুদের বিমান বোমা ফেলবার আগেই আপনি ওদের তাড়িয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এখন যে বোমা ছোড়া হয় সব হাউইবাজি দিয়ে। যেমন ধরুন, প্যারী থেকে ওরা বোমার হাউই-বাজি ছুড়ল—মেঘের আড়াল থেকে গ্যাসের বোমাটা হঠাৎ বার্লিনে এসে ফেটে পড়ল — কেউ জানতেও পারল না, বোমাটা কি করে এল……এসব আপনি আগে শুনছেন? অত উঁচু দিয়ে যে হাউইটা উড়ে আসবে, আপনি তা দেখতেও পাবেন না। কেবল হুস্ করে একটা শব্দ আপনার কানে এসে পৌঁছবে। আচ্ছা আপনি গণিত জানেন? ট্রাজেক্টরি (Trajectory)র আঁক কষতে পারেন? প্যারাবোলার ইকোয়েশন করতে পারবেন? আচ্ছা, ধরুন, হাইট্ আর ইনিস্যাল্ ভেলোসিটি দেয়া রয়েছে, 'প্রোজেক্টাইলের' 'কার্ভ লাইন' টেনে যেতে পারবেন?

লোকটি। হ্যাঁ, প্রোজেক্টাইল! সে আবার কি? নামতা পর্যন্ত আমার বিদ্যা—তাই দিয়েই ত এদ্দিন চালিয়ে এলাম। এখন কি না—হ্যাঁ কি বললেন! ট্র্যা—ট্র্যা—ট্র্যা—জেক্টাইল! ……শত্রুদের দেখা নেই সাক্ষাৎ নেই, তবুও কি না গুলি ছুঁড়ব আকাশের দিকে?

অ্যানা। (সহজ সুরে) তাই বলছিলাম, আপনি ঘরে থাকলেই বেশ করতেন।

লোকটি। এই ট্রেঞ্চ-ই ত আমাদের সব সৈনিকদের ঘর!

অ্যানা। না, এখানে না। ঘরে—যেখানে আপনার স্ত্রীরা রয়েছেন।

লোকটি। স্ত্রীদের নিকট!

ইভি। জানো মা, ওর পাঁচ-পাঁচটা বউ!

অ্যানা। চুপ কর ইভি। আচ্ছা, ঘরে আপনার স্ত্রীরা একলা একলা করছেন কি?

লোকটি। করছে খালি ঝগড়া আর ঝাটি সত্যি দয়া করে বলুন, আপনারা এখানে কি করছেন? শত্রুদের একেবারে সামনা-সামনি এসব ফ্রন্ট-লাইনে আপনারা সব মেয়েরা এখানে রয়েছেন কেন?

অ্যানা। বুঝতে পারছেন না, এটা যে আমাদের সব চাইতে নিরাপদ জায়গা। এখন লাইন ত আর কেউ

'শেল্' দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারবে না। আর গ্যাসও ঢুকতে পারবে না এর ভিতরে—এমনি মজবুৎ করে এদের মুখ আটকান। যুদ্ধ সুরু হবার গোড়াতেই সব তৈয়েরী করা হয়েছে; পরিখা-যুদ্ধ তখন পুরা দমে চলছিল কি না।

ইভি। যুদ্ধের সুরু নিয়ে আমাকে যে মা আজ রচনা লিখতে হবে। অসীম সাহসের সঙ্গে আমাদের বীরপুরুষেরা যে প্রাণপণে যুদ্ধ করে গেছেন সে সব বর্ণনা করে যেতে বলে দিয়েছেন ইস্কুলের দিদিমণি। প্রথম গ্যাস-যুদ্ধটাও লিখতে হবে, বাদ দিলে চলবে না, মা।

অ্যানা। (লোকটির দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে, বুনবার সাজ-সরঞ্জাম হাতে করে, মেয়ের পাশে বসে পড়ে) গ্যাস ব্যবহার করতে কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে বারণ আছে, তা যুদ্ধের সময় কি আর সে সব আইন-কানুন থাটে? দুটি দেশই যখন সীমান্তে দুর্ভেদ্য পরিখা কেটে বসল, তাড়াতাড়ি করে, তখন একপাও এগোবার আর কারো জো রইল না। সৈন্যদের সব আক্রমণ-অভিযান একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। ক্রমশঃ ওরা বিরক্ত হয়ে উঠল; কি বা আর করে—গ্যাসযুদ্ধই শেষে সুরু করলে।

ইভি (লিখতে লিখতে:)..."ক্রমশঃ ওরা বিরক্ত হয়ে"

অ্যানা। না, ওটা আর লিখো না।

ইভি। কেন, মা?

অ্যানা। তোমার দিদিমণির কাছ থেকে তুমি তা হলে ভাল নম্বর পাবে না।

ইভি। পাব না কেন? তাই না? এই তো আমাদের এই ট্রেঞ্চ-এ, আমার একটুও ভাল লাগে না, কৈ বাড়িতে তো তেমন হতো না। গার্দার বাবা ওকে সেদিন কি লিখেচে জানো, মা? একদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি বসে তিনি তখন মদ খাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখলেন কি—আসল লাল মদটা নীল হয়ে গেছে। গার্দার বাবা তখন তাড়াতাড়ি তাঁর গ্যাস-মুখোসটা বার করে মুখে এঁটে নিলেন। ভাগ্যিস, মদটা হঠাৎ নীল হয়ে গেছলো, তাই রক্ষে; নইলে দমটা কখন আটকে যেতো, তিনি তা টেরও পেতেন না।

অ্যানা। "দেশের পর দেশ যতই আমাদের পিতৃভূমির বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করবে, রাষ্ট্র-সঙ্ঘ ততই একেবারে বিলীন হয়ে যাবে।"

ইভি (লিখতে লিখতে) "রাষ্ট্র-সঙ্ঘ ততই একেবারে বিলীন হয়ে যাবে।"

অ্যানা। আচ্ছা ওটা কেটে লেখো "একেবারে অর্থহীন হবে।"

ইভি। "অর্থহীন হবে।"

অ্যানা। "জার্মানিকে এখন সবাই ঘিরে রেখেছে। তার বেরুবার পথে নেই। সবাইকে শুকিয়ে মরতে হবে। গ্যাস ব্যবহার না করে আমাদের আর উপায় কি? পৃথিবীতে আমরাই সব চাইতে সেরা রাসায়নিক। আমাদের একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে এখন গ্যাস। আমাদের জীবন-মৃত্যু এখন এর হাতেই।"

ইভি। "বেশ লাগছে মা।"

অ্যানা। না, খুশীর কথা মোটেই না। তুমি কিছু জানো না তাই। এই করো, তোমার বাবা এখন বাড়ী গিয়েছেন—ওঁর প্রাণ কিন্তু হাতের মুঠোয়। চোখে দেখা যায় না, নাকে শোঁকা যায় না, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না, এমন সব বিষাক্ত গ্যাস, একটুখানি খামখেয়ালী হলেই সর্বনাশ ঘটতে পারে। (খুব গম্ভীর হয়ে) মনে হচ্ছে আমাদের লোকেরা যেন ফাঁদে পড়া ইঁদুর। ওরা জানে না, ওদের জলে চুবিয়ে মারবে, না বিষ খাইয়ে মারবে।

ইভি (লিখতে লিখতে।) "......ওরা ফাঁদে-পড়া ইঁদুর..."

অ্যানা। ওসব তুমি আবার লিখছ কেন? তোমার দিদিমণি ভাববেন কি?

ইভি। তা হোলে কি লিখি?

অ্যানা। লিখে যাও—ওরা সব বীরপুরুষ—গণিত, আর রসায়ন শাস্ত্রে তাঁরা সবাই মহাপণ্ডিত। সকলেই প্রায় নতুন নতুন গ্যাস আবিষ্কার করতে পারেন; শত্রুপক্ষের গ্যাসের প্রতিষেধক বার করতেও তাঁরা জানেন। কিন্তু একদিন—একদিন—

(হৃদয়াবেগে সহসা থামিয়া গেলেন।)

ইভি। একদিন কি মা?

অ্যানা। ভবিষ্যতের গর্ভে কি সত্য লুকিয়ে আছে, তা ত আর জানি না। থাক্ সে কথা, ও তোমাকে আর লিখতে হবে না। পরিখা-যুদ্ধ ব্যর্থ হবার পর কখন

থেকে যে গ্যাস ব্যবহার হতে সুরু হয়েছে, তাই শুধু লিখে যাও। শহর আর নগরের উপর বোমার উপর বোমা পড়তে সুরু হল, ছেলে-পিলে মেয়েদের মাথার খুলি সব যখন ভেঙে চুরমার হতে লাগল, তখন উপর থেকে হুকুম এল— মেয়েদের আর ছেলে-পিলেদের সীমান্তের নিরাপদ পরিখায় দাও; আর সেখান থেকে সব পুরুষদের সরিয়ে নিয়ে পাঠিয়ে দাও বাড়িতে। সীমান্ত তাই নীরব হয়ে গেল কিন্তু তার উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল হাউইর পর হাউই। প্রথম আমরা যেদিন এখানে আসলাম, সেইদিনেই পুরুষেরা তাদের পরিখা ছেড়ে বাড়ীতে চলে গেল। সে সব লিখে যেও। পাশের ঘরে গিয়ে এসব লেখ গে যাও।

ইভি। (লেখবার খাতাপত্র নিয়ে লোকটির পাশ কেটে বাঁ দিক দিয়ে যেতে যেতে) ইঁদুর মারবার সময় আমাকে দয়া করে ডেকে বুঝলে? ছু ড়বার সময় তোমার বন্দুকটা খুব শব্দ করে, না?

অ্যানা। ইভি, তুই গেলি না?

ইভি। যাচ্ছি মা। আমাকে কিন্তু ডেকে পাঠিও।

[প্রস্থান।

অ্যানা। আশ্চর্য্য, আপনি নিরাপদে এখানে এলেন কি করে, তাই ভাবছি? আপনার গ্যাস-মুখোস নেই—কিছু নেই!

লোকটি। (কোথাও না তাকিয়ে) না, আমার ওসব কিছু নেই।

অ্যানা। আচ্ছা, আপনি কি করবেন ভেবেছেন? কিচ্ছু আপনার নেই—আপনি টেরও ত পাবেন না, আপনার জীবন কখন বিপন্ন হয়েছে।

লোকটি। কেন? শত্রুদের দিকে অগ্রসর হব।

অ্যানা। শত্রু কোথায় আপনার? যান, ওদের মেয়েদের সঙ্গেই দেখা করে আসুন গে।

লোকটি। (উত্তেজিত হয়ে) মেয়ে! মেয়ে!! মেয়ে!!! শুধু মেয়েরা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে কি আর কেউ নেই? এর চেয়ে যে আমার ঘরে থাকাই ভাল ছিল দেখছি।

অ্যানা। হ্যাঁ তাই ভাল ছিল।

লোকটি। (জামার কলার ছিঁড়ে ফেলে) না, আমি একুনি বেরিয়ে পড়ব। দম আমার আটকে আসছে। যেন ফাঁদে পড়েছি!

[দরজার দিকে পা বাড়িয়ে।

অ্যানা। (পিছন হতে ডেকে) আচ্ছা, যেতে যখন চাচ্ছেই, যান তবে। ফিরে এসে কফি খেয়ে যাবেন।

লোকটি। ফিরলে তঁ!

[সে চলে গেল। কিছুক্ষণ কাটল। হুস্ হুস্ করে হাউই উড়ে যাবার শব্দ এল। শান্তা আবার ঘরে এসে ঢুকল।]

অ্যানা। (বাইরে থেকে ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে।) কে, শান্তা এলি? কফির কেটলিটা উনোনে বসিয়ে রাখ।

শান্তা। জলটা গরম আছে। কেকটা কেটে রাখব?

অ্যানা। বাড়ির সেই কেক্ এখনও আছে না কি?

শান্তা। খানকয়েক এখনও আছে।

অ্যানা। আচ্ছা, পিটার গেল কোথায়?

শান্তা। আর সব ছেলেদের সঙ্গে পরিখায় কোথাও বুঝি খেলছে।

অ্যানা। ঝগড়া-ঝাটি করছে না ত?

শান্তা। না মা, ওরা খেলছে। এই তঁ, একটু আগে মেসিনগানটার কাছে ওদের দেখে এলাম।

অ্যানা। আঁ্যাঃ, মেসিনগানের কাছে ওরা কি করছে?

শান্তা। মেসিনগানটার কাছে বসে আছে দেখলাম।

অ্যানা। না বাপু, ছেলে-পিলের ও সব জায়গায় খেলা করা উচিত না। কখন কি ঘটে বসে বলা তো যায় না।

শান্তা। কেন, আজ বছর খানেক ধরে তো ওই অমনি ভাবে পড়ে আছে। ব্যবহার হতে ত কখন দেখলাম না।

অ্যানা। না বাপু, আমার কেমন ভয় করে।

[পরিখা থেকে খুব সুশ্রী একটি যুবতী বেরিয়ে এসে ভিতরে এসে ঢুকলো। পরণে তার সাদা-সিধে পোষাক-পরিচ্ছদ—রূপ তবুও উপচে পড়ছে।]

মারী। অ্যানা, সে ভদ্রলোকটি আসছেন। আমাদের সাথে কফি খাবেন। উনি বলছিলেন, আগেও না কি এক-

বার এসেছেন। তাই না কি? বেশ আলাপ করলে তো? আমাকে দিলে না কেন আলাপ করিয়ে?

অ্যানা। কে?

ম্যারী। সেই যে দক্ষিণসাগরের দ্বীপ থেকে যিনি আসছেন। বেশ লোকটি কিন্তু।

অ্যানা। (শুষ্কগলায়) ওঃ এর মধ্যেই দিব্যি জমিয়ে নিয়েছ, দেখছি!

ম্যারী। (মাথা নেড়ে) জানো। ওর নাম রবার্ট। আমি কিন্তু ওকে ববি বলে ডাকছিলাম। দাঁড়াও, পোষাকটা বদলে আসচি।

[বাঁ দিক দিয়ে দ্রুত প্রস্থান।]

অ্যানা। (মাথা নাড়তে নাড়তে) শান্তা, তিন কাপ নিয়ে আসিস, বুঝলি?

শান্তা। (আগ্রহের সুরে) রাজাসুদ্ধ সবাই আসচে না কি?

অ্যানা। (চাপা হেসে) শুনলি না, বোন কি বলে গেল?

শান্তা। খুব ছোকরা বুঝি?

অ্যানা। তা—তেমন আর কি? তবে কি না খুব ফুর্ত্তিবাজ।

শান্তা। হ্যাঁ, তাই না কি! তবে পরণের নোংরা পোষাকটা বদলায় নি।

অ্যানা। তোর আর দরকার নেই শান্তা, ঘরে ওর পাঁচ পাঁচটা বউ।

শান্তা। মাগো, পাঁচ-পাঁচটা! বাড়ি কোথায় শুনি?

অ্যানা। সেই দক্ষিণসাগরের দ্বীপপুঞ্জে না কোথায়।

শান্তা। সেই রাক্ষসদের দেশে? তা মন্দ না, আর দু'চারটা হলেও বেশ হতো। বলা তো আর যায় না—ওদের কাউকে খেয়ে টেয়ে ফেললে তখন (মাথা নেড়ে উনোনের দিকে অগ্রসর হয়ে) কটা বললেন? পাঁচ-পাঁচটা বউ? আচ্ছা, ওদের নিয়ে উনি ঘর করেন কি করে?

[বিড় বিড় করে কি যেন বকতে বকতে লোকটি এসে ঢুকলো; টুপিটা পেগের দিকে ছুঁড়ে দিলে]

অ্যানা। আপনাকে আবার পেয়ে খুব খুশী হলাম হের—হের—

[লোকটি বিড় বিড় করে কি যেন বকে যেতে লাগলো।]

আপনার নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।

লোকটি। (মুখভঙ্গি করে) ভেবেছিলাম, ট্রেঞ্চে আর সব লোকদের দেখা পাবো।

অ্যানা। পেলেন না বুঝি? বসুন না। শান্তা কফিটা নিয়ে আয়।

শান্তা। (লোকটির প্রতি) খুব বড়া করবো?

লোকটি (খেঁকিয়ে উঠে) কি? (শান্তা পিছু হটিয়া গেল)

অ্যানা। ঘরে আমরা যা খাই, ওঁকে তাই দিস না শান্তা [লোকটির দিকে ফিরে] যুদ্ধের সময় কি না, ঘরে আর বিশেষ কিছু নেই। বড়ো খুশী হবো যদি—

লোকটি। (শান্তার হাত থেকে কাপটা হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে একটা চুমুক দিলে কাপে, একবার শুঁকলে তার পর ঠোঁট দিয়ে স্বাদ গ্রহণের একরকম শব্দ করলে। একরূপ চেঁচিয়ে উঠে) ওঃ, সেই যে কবে বাড়িতে খেয়েচি।

অ্যানা। (হেসে) একটুকরা কেক দিক কেমন?

ম্যারী। [অতি-আধুনিক এক চারু পরিচ্ছদ পরে—পোষাকের ফ্যাশানটা তখনও দেশে চালু হয় নি—বাঁদিক থেকে ঢুকে] এসেচো না কি ব'ব? বেশ হলো! সোফায় তোমার সঙ্গে বসতে পারি তো?

অ্যানা। কেমন, কেক দিক এক টুকরো?

শান্তা। দুধ আনবো একটুখানি?

ম্যারি। আচ্ছা কেমন লাগছে এখানে?

লোকটি। (চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে একবার তাকিয়ে) মনে হচ্ছে বাড়িতেই যেন রয়েছি—যুদ্ধ করতে আর আসি নি।

ম্যারি। আচ্ছা, ঘরে তোমার বউরা কেমন আছে?

লোকটি। কে জানে, আমার বাড়ি না থাকার সুযোগ নিয়ে ওয়াঝগড়া ঝাটি না করলে হয়।

ম্যারি। আচ্ছা ববি, তুমি কি ওদের সকলের আশা মিটাতে পারো?

লোকটি। অ্যাঁ?

ম্যারি। বলছি, ওরা যা চায় তা তুমি কি সব মেটাতে পারো?

লোকটি। হুঁ, তার চেয়ে বলতে পারতে আমাকে ওরা খুশী করতে পারে কি না ?

ম্যারি। আঁা, তাই না কি ! বলো না কেমন শুনি ?

লোকটি। যাা, ওসব বলতে নেই। কে জানতো বাপু এমন—(ইভিকে আসতে দেখে সে থেমে গেল।)

ইভি। (দরজা থেকে) মা, একবার এসো না ? কিছু লিখতে পারছি না যে। আচ্ছা হাউটজার বানানটা কি মা ?

অ্যানা। (একটু হেসে) আসছি ইভি। শান্তা দেখ তো পিটার কি করছে ? এখনো ফিরছে না কেন ?

(বাঁ দিক দিয়ে ইভিকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন। ম্যারিও লোকটির দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিলে, শান্তাও চলে গেল পিছনের পথ দিয়ে।)

ম্যারি। জানো, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে।

লোকটি। সত্যি, 'ক্যাক্'টা খুব ভালো।

মেরি। বলে যাও না, এখানে এলে কি করে ? খুব বাহাদুরের কাজ সব করে এলে তো ?

লোকটি। হে-হে-হে।

ম্যারি। রাস্তা তো আর একদিনের নয়। নৌকায় একলা একলাই এলে বুঝি ? অনেকদিন লাগলো না ?

লোকটি। (চিবুতে চিবুতে) আর 'ক্যাক' নেই ?

ম্যারি। এখানে তো একলাই আছ। আচ্ছা, একলা একলা থাকতে তোমার ভালো লাগে ? ঘরের জন্য মন খারাপ করে না ? হাজার হোক, দেশ তো। ঘরকন্না ছেড়ে বিদেশে এসে একলা—

লোকটি। হে—হে—হে…

ম্যারী। অনেক দিনই তো হলো, ওদের ছেড়ে এসেছ ? (লোকটি কোন জবাব দিল না। ওর কাঁধের উপর মাথা রেখে) নৌকো থেকে নেমেই তো এখানে ছুটে আসছ। কারো সঙ্গে একটু বিশ্রাম করবারও ফুরসৎ পাও নি।

লোকটি। হঁ্যা, কারো সাথে একটুখানি বিশ্রাম করবারও সময় পাই নি।

ম্যারী। তা, এখন এখানে এসে যখন পৌছেছে, (একটু থেমে) কি বলো—তোমার উচিত না ? (আবার একটু থেমে) লজ্জা কি, বলে ফেলো না ববি ?

লোকটি। কি ?

ম্যারী। (দুই বাহু দিয়ে ওর ঘাড়টা জড়িয়ে ধরে) দেখচো না, এখন আমরা সব মেয়েরাই এখানে রয়েছি ?

লোকটি। (উত্তেজিত হয়ে) না, এ সব ট্রেঞ্চ তোমাদের জন্য নয়। এ কাজ মেয়েদের নয় !

ম্যারী। (খুব বিস্মিত হয়ে) মেয়েদের না ?

লোকটি। (ঘরের ভিতর একবার তাকিয়ে নিয়ে) ওর মধ্যে আছে না কি ? দাও না আমার পকেটে পুরে।

মেরী। কি ?

লোকটি। কি আবার ? অবশ্যি ব্র্যাণ্ডির বোতলটা। সিন্দুকে আর রেখে কি হবে ?

ম্যারী। (ক্লান্ত হয়ে, বাহুবন্ধন আলগা করে) ব্র্যাণ্ডি ! না, ও আমাদের নেই। আচ্ছা, ববটি, তুমি কি আর কিছু চাও না, আমার কাছ থেকে ? (উঠে) সত্যি, তোমাকে নিয়ে আমি মস্ত ভুল করেচি।

(হঠাৎ গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শুনা গেল। দু জনেই চমকে উঠল।)

লোকটি। (লাফিয়ে উঠে, বন্দুকটা আঁকড়ে ধরে) যাক, এখন আমার কাজ জুটলো। এবার গুলি ছুঁড়তে পারবো ! (তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে গেল)

অ্যানা। (বাঁ দিক থেকে সন্ত্রস্ত ভাবে ঢুকে) কি হয়েছে, মেরি ?

মেরী। মনে হচ্ছে, কেউ যেন গুলি ছুঁড়লো।

অ্যানা। কৈ, বছরখানেকের মধ্যে তো কেউ এখানে গুলি-গোলা কখন ছোড়ে নি !

শান্তা। (পিটারের হাত ধরে সঙ্গে করে নিয়ে এলে। বছর বারো হবে পিটারের বয়স) এই যে আসামীকে পাকড়াও করে নিয়ে এনেচি মা। পরিখার সবাই এখন মহা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মেশিনগানটা নিয়ে খেলছিলো কি না, কার্তুজ যে ভরা ছিলো সে তো আর জানে না ! হঠাৎ তাই—

অ্যানা। কে, পিটার ! পিটার খেলছিলো মেশিনগান নিয়ে ? হায় ভগবান !

পিটার। কনরেড প্রথম চাকাটা যখন ঘুরালে, কিছুই হলো না মা ! আমি যেই একটু ঘুরিয়ে দিলাম, অমনি ক—

করে গুলিটা বেরিয়ে গেলো। না মা, মেরো না; আর কখ্‌খনো করবো না মা।

অ্যানা। না, মারবে না! গুলিটা যদি কারো গায়ে গিয়ে লাগে? (শান্তাকে) কেউ আহত হয়েচে নাকি?

শান্তা। জানি না।

পিটার। ওদিক দিয়ে গুলিটা গেলো। (হাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে)।

অ্যানা। য়্যা ফরাসীদের পরিখার দিকে? কি হবে, মা গো! (শান্তাকে) যা তো, কি হলো—দেখ তো?

(শান্তা বাইরে গেলো। দরজার লোকটি দাঁড়িয়ে ছিলো নিঃশব্দে আবার ভিতরে এসে ঢুকলো। কাঁধ দুটি কাঁপছে উত্তেজনায়। পিছনের দিকের এক চেয়ারে বসে পড়ল। উদ্বিগ্ন হয়ে অ্যানা পায়চারী করতে লাগল।)

পিটার। (কেঁদে ফেলে) মেরো না মা, অমন কাজ আর কখ্‌খনো করবো না!

অ্যানা। যদি গুলিটা ওঁদের কারো গায়ে গিয়ে লাগে? তখন ওরা ভাববে কি? ঈশ্বর তোমাকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বে না।

পিটার। আমি জানতুম না যে! অমন কাজ আর করবো না মা। কি জানি, গুলিটা বুঝি মারিস্ না হয় জিনের গায়ে গিয়ে লেগেচে। কন্‌রেড প্রথম চাকাটা ঘুরালে কি না—

অ্যানা। (থামিয়ে দিয়ে) মারিস আর জিন কে?

পিটার। ওরা ওপারে থাকে। আমাদের সাথে—(কেঁদে উঠে)।

অ্যানা। কি?

পিটার। আমাদের সাথে খেলতে আসে লুকিয়ে।

(অ্যানার হাত থেকে সেলাইটা খসে পড়লো)

শান্তা। (একরূপ ছুটে এসে) ওদের ওখান থেকে একটি মেয়ে আসছে হাতে একখানা শাদা নিশান নিয়ে। কি হবে, মা? কেউ বুঝি—

লোকটি। (খুসী হয়ে) ওটা যুদ্ধ-বিরতির নিশান। ভয় পেয়েছে কি না, তাই আত্ম-সমর্পণ করতে আসছে।

ইভি। (বাঁ দিক্ থেকে কখন নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে) মা, যুদ্ধ থেমেছে?

লোকটি। (আমিই কর্ত্তা এমনি ভাবে) আমিই কিন্তু সন্ধির সর্ত্তটা পেশ করব।

অ্যানা। কাউকে তুমি জখম করেছ না কি?

পিটার। (কাঁদতে কাঁদতে) আর কখ্‌খনো করব না মা।

লোকটি। (বাইরে থেকে) আসুন—আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক।

(লোকটির আগে আগে ঘরে এসে ঢুকল সুন্দরী এক ফরাসী যুবতী—বেশ-ভূষা সব কায়দা-দুরস্ত; হাতে সাদা একখানি সিল্কের শাল)

ফরাসী মহিলা। (উচ্চারণে একটু দমক দিয়ে) ওরা বলছিল, একটি ছোক্‌রা না কি মেশিনগানের গুলি ছুঁড়েছে। কে, এই বুঝি? (পিটারের দিকে এগিয়ে গিয়ে)।

অ্যানা। যাও পিটার, ওঁর পায়ে পড়ে মাপ চেয়ে নাও।

পিটার। আমি এঁকে চিনি যে মা, মারিসের মাই ত। খেলতে খেলতে ম্যরিস একদিন আমাকে দেখিয়েছিল।

ফরাসী মহিলা। আমাকে তুমি চেন না কি? কৈ, ম্যরিস ত কিছু বলে নি?

পিটার। যদি আপনারা রাগ করেন তাই—

লোকটি। (গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে) হ্যাঁ, তোমার বন্ধু আমাদের এখানে আসত না কি?

পিটার। হাঁ, আমরা এক সঙ্গে খেলতাম কি না।

লোকটি। কি ভয়ানক কথা! গোয়েন্দাগিরি করে না গেলে হয়।

ম্যারি। না, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না ববি! গোয়েন্দাগিরির এখানে পেলে কি? কেমন, কি বলেন আপনি?

ফরাসী মহিলা। সত্যি ত! (পিটারের দিকে ফিরে) আচ্ছা, তুমি যদি সত্যি ম্যরিসের বন্ধু হয়ে থাক, তবে অমন কাজ করতে গেলে কেন?

পিটার। হঠাৎ ফস্‌কে গেল যে!

অ্যানা। আপনাদের কি কেউ জখম হয়েছে?

ফরাসী মহিলা। না, কাচা কাপড়-চোপড়গুলো ট্রেঞ্চ-এর উপর রোদে দিয়েছিলাম, এই শালখানাতে শুধু গুলিটা এসে লেগেছে।

অ্যানা। আপনাদের আমরা আর একখানা পাঠিয়ে দেব।

ফরাসী মহিলা। না-না-না, পাঠাবেন কেন? সে ত আর জানত না, গুলিটা অমনি হঠাৎ ফসকে যাবে। এমনিই শুধু জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম।

অ্যানা। আসবেন বৈ কি? বসুন না, কফি নিয়ে আসুক, কেমন?

ফরাসী মহিলা। ধন্যবাদ।

অ্যানা। (শান্তাকে) এক কাপ এঁর জন্যেও নিয়ে আয়। তারপর ডাকঘরটা একবার ঘুরে আয় ত—ওঁর চিঠিপত্তর পাচ্ছি না অনেক দিন থেকে। (কফি দিয়ে শান্তা চলে গেল)।

ফরাসী মহিলা। এখানে কিন্তু আপনারা দিব্যি আছেন। বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন দেখছি। এটা মিষ্টি কেক বুঝি? উঃ, সেই কবে খেয়েছি জার্মানীর অমন মিষ্টি কেক!

অ্যানা। নিন না আর একটা।

ফরাসী মহিলা। (বসে পড়ে) ধন্যবাদ।

ম্যারী। আপনি বেশ জার্মান বলতে পারেন, দেখছি!

ফরাসী মহিলা। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমি হাইডেলবার্গে পড়তাম যে। (আগ্রহে ফেটে পড়ে) বাঃ, আপনার পোষাকের কাটিংটা বেশ ত!

ম্যারী। নিজেই কেটেছি।

ফরাসী মহিলা। এর নমুনাটা আছে না কি? দিন না একবার দয়া করে, ও, ধন্যবাদ আপনাকে!…(অ্যানার হাতে সেলায়ের কাজটার উপর হঠাৎ নজর পড়ায়) কাজটি ত বেশ হচ্ছে। আপনিই করছেন বুঝি?

অ্যানা। হাঁ, ওঁর জন্য তৈরী করছি গ্যাস-মুখোসটা রাখতে পারবেন।

ফরাসী মহিলা। সৌখীন কিছু একটা দেখলে আমি একেবারে পাগল হয়ে উঠি। দেখবেন, আপনার স্বামী ভারী খুশী হবেন।

লোকটি। (গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে) শুনছেন?

ফরাসী মহিলা। (ওর দিকে ফিরে, হেসে) আমাকে কিছু বলছেন?

লোকটি। মিটমাটের একটা সর্ত্ত হয়ে যাবে—আমি আশা করেছিলাম। সর্ত্ত? কেন—কিসের? ও মাপ চাইল না, আর কখনও করবে না বলে? কি তুমি বল নি? বাছা, তোমার নাম কি?

পিটার। আমার নাম পিটার।

ফরাসী মহিলা। পিটার? বেশ মিষ্টি নামটি ত' তোমার বাবা। আর আপনার নামটা জানতে পারি?

(বিড়-বিড় করে লোকটি কি যেন বললে)

ম্যারি। ওকে আমরা ববি বলে ডাকি। ওর ভাল নাম হচ্ছে রবার্ট।

ফরাসী মহিলা। (ফরাসী ধরণে ওর নামটা উচ্চারণ করে) নামটি বেশ কিন্তু! চলুন না আমাদের ওখানে? 'কন্‌য়্যাক্' (cognac) ব্র্যাণ্ডিটা এখনো আছে।

লোকটি (সাগ্রহে একরূপ ফেটে পড়ে) অ্যাঁ, কন্‌য়্যাক্ ব্র্যাণ্ডি! আছে না কি?

ম্যারী। (উঠতে যাওয়ায় লোকটিকে টেনে বসিয়ে রেখে) না, ববি আপনাদের ওখানে যাবে না। দেশের হয়ে যুদ্ধ করতে সে এখানে এসেছে।

ফরাসী মহিলা। যুদ্ধ করতে! উনি বীর কি না, তাই! (অপর মেয়েদের দিকে ফিরে) তবে আপনারা চলুন না? আচ্ছা, এখানে একটা সেলায়ের কেন্দ্র খুললে হয় না? সারাদিন খালি পরিখার মধ্যে বসে বসে ভারী বিশ্রী লাগে—কেমন মন খারাপ করে ঘরের ওঁদের জন্য—

(ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে শান্তা ভিতরে ঢুকল)

অ্যানা। শান্তা, ওটা কি?

শান্তা। টেলিগ্রাম।

অ্যানা। কার?

শান্তা। বাড়ী থেকে আসচে। (ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে) একটা না কি নতুন গ্যাস আবিষ্কার হয়েছে, তাতে না কি অনেক লোক মারা পড়েছে—গ্যাস-মুখোস আর কোনো কাজেই আসে নি।

অ্যানা। এসেছে কার কাছে?

[শান্তা ফোঁপাতে ফোঁপাতে টেলিগ্রাম খানা অ্যানার হাতে দিল। কম্পিত হাতে অ্যানা সেটা খুললেন, একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন—অসাড় হয়ে হাত দুটি তার পর ঝুলে পড়লো। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বাহিরে—]

(প্রাণহীণ শুষ্ক গলায় হঠাৎ বলে উঠলেন।) ওদের মধ্যে উনিও আছেন—গ্যাসের প্রথম ধাক্কায় মারা পড়েছেন !

পিটার। কি হয়েছে মা ?

অ্যানা। বাবা পিটার !

[সহসা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

ফরাসী মহিলা। ওগো, কি হবে ?

(লোকটি সহসা কেঁপে উঠল, বন্দুক আর শিরস্ত্রাণটি হাতে তুলে নিল—পা বাড়াল দরজার দিকে। ইভি এসে ঢুকল।

মারী। ববি, কোথায় চললে ?

লোকটি। বাড়িতে।

মেরী। ওখানে যে নতুন গ্যাস অবিষ্কার হয়েছে !

লোকটি। হোক্ সে।

(সশব্দে পা ফেলে বেরিয়ে গেল। অ্যানা শোকে অভিভূত হয়ে ফরাসী মহিলাটির কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন।)

ইভি। (জামার প্রান্ত আকর্ষণ করে) ও যে চলে গেল মা ? (খুব কাতর করুণ সুরে) ইঁদুরগুলো এবার মারবে কে ? *

* [আল ব্রস্ আধুনিক নাৎসী-জার্মানীর একজন শক্তিশালী তরুণ নাট্যকার। তাঁর বিখ্যাত–The Next War নাটিকাটির ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। বর্তমান যুদ্ধের এক দিক্‌কার রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন ক্ষুদ্র এই নাটিকাটিতে নিপুণ হাতে]।

অনুবাদক শ্রীনিখিল সেন

কুড়ায়ে নিয়েছে ডাইনীর অপবাদ

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গাঁয়ের পারের জলা মাঠে তার স্বপন-সুষমা হবে,
শ্যামল ঘাসের বিছানার পরে স্মরণ-সমীর বহে।
কতলোকে কহে সে ছিল ডাইনী, তুক্ তাক্ কত জানে !
গাঁয়ের শিশুরা ভয়ে জড় সড়, চাহিতে না তার পানে।
সেই মাঠে তার বসত কুটীর বিভোল করিত মন,
সে ছিল একেলা বিশ্বের মাঝে নাহি ছিল ভাই-বোন।
বোনের অভাব করেছে পূরণ বনের বিহগী যত,
দূর-অদূরের গাছপালাদের দেখিত ভায়ের মত।
ঝড়ের দোলায় মেঘের দুলালী আসিত কুটীরে তার,
দক্ষিণা পবন দেখা দিত তারে বছরেতে একবার।
শ্যামল ক্ষেতের পরিবার মাঝে সে ছিল আপনহারা,
এ কথা কহিত আলেয়ার সাথে নিতুই নৈশতারা।

প্রভাত বেলায় বেড়াতো জলায় আপনার মনে গাহি
সারাটী রজনী কেটে যেত তার গগনের পানে চাহি।
দুপুর বেলায় শীতল ছায়ায় জুড়াতো বাতাসে হিয়া,
নলখাগড়ার বুনিত চাটাই শীর্ণ আঙুল দিয়া।
বাস্তু ভিটা ও বঁইচির বন পায়ের চিহ্নগুলো,
কবরের ঢিপি লতা পাতা আর রাস্তা ঘাটের ধুলো—
সকলি তাহার প্রতিটী দিনের পড়িবার ছিল বই,
জলার ভিতর শালুক সাপলা ছিল যে তাহার সই।

সইদের সাথে অবসর মত করিত সে আলোচনা,
মাটীর মতই মনোরমা হয়ে সে ছিল লক্ষ্মী সোনা।
পতিত জমির পিঙ্গল-রঙা কোমল ঘাসের পরে
তাহারি বেদনা উঠিত গুমরি অতীত দিনের তরে।
কতদিন তার দু'বেলা দুমুঠো অন্ন জোটেনি হায়!
পেটের জ্বালাতে বুনো ফল খেত বসে বসে আঙিনায়।
নিবেছে তাহার জীবন-দেউটী—পূরিল না কোন সাধ!
অভাগা জীবনে কুড়ায়ে নিয়েছে ডাইনীর অপবাদ।

জলা পার হয়ে আমাদের গাঁয়ে কত না পূজার দিনে,
ছেঁড়া কাঁথা পরা কৃষ্ণবরণা আসিত পথটী চিনে।
চাহিত না কিছু, কহিত না কথা—ঠাকুরের পানে চেয়ে
কি যেন ভাবিত, আঁখি হতে তার ঝরিত অশ্রু বেয়ে।
সে দিন আকাশে আজিকার মত সূর্য্য বসিত পাটে,
সে দিন তারকা-বধূরা আসিত নীল গগনের ঘাটে।

বৃদ্ধা ছিল না বীরাঙ্গনা 'রায় বাঘিনী'র মত,
তবুও তাহার স্মরণ কুটীরে শির করি অবনত।
বহুদিন হোল চির দিবসের চিত্ত-বেদনা হরি'
সে গেছে চলিয়া আঁধারের বুকে তারার দীপালি করি।

যেখানেই থাক্ অস্থি তাহার সমাহিত হয়ে আজ,
তাহারে করুণা-কুসুম যেন গো পাঠায় বিশ্বরাজ।



বিজ্ঞানের দৃষ্টি

—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

বিজ্ঞান এখন স্কুলপাঠ্য। কিন্তু বছর চল্লিশ পূর্ব্বেও এফ. এ. বি. এ. ক্লাসে ছাত্রেরা কেমেষ্ট্রি পড়িবার সময় এক্সপেরিমেণ্ট দেখিতে পাইত না। প্রফেসর লেকচার আরম্ভ করিতেন—'সাপোজ্, দিস্ ইজ্ এ টেষ্ট-টিউব,' (মনে কর এটা একটা টেষ্ট টিউব ইত্যাদি)। ছাত্রেরা তাহাতেই সন্তুষ্ট। প্রফেসর ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষরা বোধ হয় "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল" ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এখন এমন কোন অসুবিধা নাই। নানা রঙ্‌বেরঙ্ জলীয় পদার্থ টেষ্ট-টিউবে সমুখেই তৈয়ারী থাকে। বিদ্যুতের বিচিত্র কার্য্যকলাপ এখন দেখান সোজা। চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়, জ্ঞানও না কি সঞ্চয় হয়। কিন্তু কথা, কি শিখিব? প্রশ্নটা প্রয়োজন। মাষ্টার মহাশয়রা নানা কথা উত্তরে বলেন—সে সব কথা থাক। ভাবিয়া দেখিবার দরকার এই বিজ্ঞানশিক্ষার কি প্রয়োজন। এতদিন যাঁহারা বিজ্ঞান শেখেন নাই—বা যাঁহারা জলে ক'আটম্ অক্সিজেন আছে ক'অ্যাটম হাইড্রোজেন আছে বলিতে পারেন না,তাঁহারা কি অশিক্ষিত, নির্ব্বোধ, তাঁহাদের শিক্ষা কি অসম্পূর্ণ? ভাবিবার কথা। অনেকে বলিবেন, তাঁহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। কিন্তু প্লেটো, আরিষ্টটল জলের এই সংগঠনের কথা জানিতেন না। এমন কি, তখন শূন্যের প্রচলন গ্রীসে না থাকায় এখন যে-অঙ্ক সহজেই কষিতে পারা যায়, তাহা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। অর্থাৎ আধুনিক জ্ঞানের বিষয়ে তাঁহারা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।

অত অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও এখনও লোকে ভক্তিভরে তাঁহাদের নাম করে। সকলেই তাঁহাদের পরিচয় জানে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিৎ তাঁহারাই গাড়িয়াছিলেন।

তাহা হইলে কি বলিব? এই অসম্পূর্ণতা তাঁহাদের জ্ঞানকে মলিন করে নাই, ইহা ত সত্য। তবে?

মানচিত্রে পৃথিবীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রতি দেশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ, নদী, পর্ব্বত, শহর সকলই সঠিক-ভাবে দূরত্ব অনুসারে সাজান। সকলের কাছেই চীন, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার স্পষ্ট পরিচয় ফুটিয়া উঠিবে এক টাকার একটি অ্যাট্‌লাসে—প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক ম্যাপে। গ্লোব দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, পৃথিবী কেমন গোল।

গ্রীস দেশ ম্যাপের ছবিতে দেখি, আরব দেশ ম্যাপের ছবিতে দেখি, মধ্যযুগের পৃথিবীর ম্যাপও দেখি। কতদিন ধরিয়া ঐ দেশের সকলেই আমরা বর্ত্তমানে যে-জ্ঞানে জ্ঞানী, সে-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত ছিলেন। কলম্বাস আমেরিকা দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, সেই 'ইণ্ডিয়া' যাওয়ার পথ। আরও কত গল্প আমরা শুনিয়াছি। তখনকার জ্ঞান এখন মনে হয় কত অগভীর।

ধরিলাম গোলাকার পৃথিবীর কথা, তাহার ঘুরিবার কথা। আকাশের তারার কথা। একদিন পৃথিবী গোল এবং ঘুরিতেছে, এসব বলিলে অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। তারাগুলি আকাশের গায়ে গাঁথা নাই আমরা শিখিয়াছি। আগেকার কালে জ্ঞানীদের কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এই।

কেমিষ্ট্রির জন্মকথা ধরি। আগে কেমিষ্ট্রির নাম ছিল আল্‌কেমী বা কিমিয়া-বিদ্যা। মানুষকে অমর আর সোনা করার নানা চেষ্টার কথা আজ গল্পের মত মনে হয়, অন্ততঃ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত হইত। তখনকার কেমিষ্টের



কূপমধ্যে পড়ে তবু খেয়াল না হয়।
আকাশে নক্ষত্র কত গণে মহাশয়॥

ল্যাবরেটরির ছবি দেখিলে বুঝিতে পারি—আমাদের "জ্ঞান" কত "বেশী"।

এই রেলগাড়ীর কথা। মোটর, এরোপ্লেনের কথা। আগের দিনের যাত্রীদের ছবি দেখি, মনে হয়—আমরা যে যুগে বাস করিতেছি, সে যুগের "সুবিধা" কত। কিন্তু এই সুবিধা কেন বাড়াইয়াছি ?

যে-জ্ঞান আমরা শৈশবে আয়ত্ত করি, তাহা এই যুগের সম্পদ্। প্রতি যুগে সাধারণ মানুষের কাছে পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক মনীষীদের চিন্তার খণ্ড মাত্র বোধ্য হয়। শুষ্ক মাটিতে জল পড়িলে অল্প সময়ে শুকাইয়া যায়। অনেকক্ষণ ধরিয়া জল পড়িলে ক্রমশঃ শুষ্কতার বদলে আর্দ্রতা দেখা যায়।

জ্ঞানীরা যাহা চিন্তা করেন, সাধারণ জীবনে তাহার তেমন কোন প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায় না বলিলেও চলে। এমন কি সাধারণ বুদ্ধিমান্ লোকরাও যে তাহার অংশ গ্রহণ করিতে পারেন তাহাও সকল সময় সম্ভব নয়। যেমন আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব। কিন্তু জ্ঞানের প্রবাহ ক্রমশঃ তীরের জমিকে উর্ব্বর করে। সাধারণের কাছে পরবর্ত্তী যুগের দুর্ব্বোধ্য জ্ঞানও সহজলভ্য হয়।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান চর্চ্চা সুরু হয় ইউরোপে। ক্রমশঃ চর্চ্চার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণও তাহার অংশ পায়। এ-অংশ ইউরোপের ঐতিহ্যের অঙ্গ। এদেশে এখন দুই পুরুষের পর তিন পুরুষের কাছে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি ঐতিহ্যের অঙ্গ বলিয়া মনে হইতে পারে। এ-যুগে আমাদের দেশেও এই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের জ্ঞান অনেকের পক্ষে জন্মগত সংস্কার বলিয়া মনে হইতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের দেশে এই জ্ঞানের আভাস পর্য্যন্ত পঁহুছিল না। কিন্তু এই জ্ঞান না থাকিলেও আমরা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলাম না। আজিও এ-দেশের গ্রামে চাষার সঙ্গে কথা বলিলে বুঝিব—জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জ্জন্ম, পাপ-পুণ্য এ সব বিষয়ে তাহাদের ধারণা কেমন স্পষ্ট। বোধ হয় আমাদের চেয়েও স্পষ্ট। ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্যের অঙ্গ ছিল এই সব গভীর তত্ত্বকথা। তাই বিনা আয়াসে চাষীরাও তাহার অংশ পাইয়াছে।

ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি। আজকাল বাড়ীতে ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, বাহিরে বাস, ট্রাম, রেল, এ-সকলই আমাদের না ব্যবহার করিয়া চলিবার উপায় কই ? শহরে থাকিলে আজ না হইলে কাল ইহার একটি না একটি ব্যবহার করিতে হইবেই। ইহাদের অস্বীকার করিয়া চলিবার উপায় নাই।

ব্যবহারিক জীবনে নিত্য যাহা দেখিতেছি, তাহার বিষয়ে মমত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু অজ্ঞতা শোচনীয়। আমাদের পক্ষে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সাহায্য—সুবিধা বলিব না—লইয়া বাঁচিতে হইবে, কাজেই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানগুলি পরিধেয় বস্ত্রের মতই, না হইলে চলে না। পদে পদে অজ্ঞান-তার জন্য বিপদ হইতে পরিত্রাণের জন্য এ জ্ঞান চাই। সুইচ টিপিবার সময় যাহাতে শক্ না লাগে, ট্রাম হইতে নামিবার সময় চলন্ত ট্রামের গতি দেহে সঞ্চারিত না হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া আছাড় বাঁচান—এ সব দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় প্রতিদিনের কথা। এই বিজ্ঞান ক্রমশঃ কি ভাবেই না আমাদের ঘিরিয়া ফেলিতেছে। বয়স্ক লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে কিছু জানিতে পারিব, ৪০ বৎসর আগেও এই দেশ এমন ছিল না। আজ কত দিক্ দিয়া তাহার পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। আজিকার দিনের বিজ্ঞান আমাদের সহচর, ছিল সেদিন আগন্তুক।

সে-দিন এদেশে বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে যাঁহারা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন,—বিদেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা এবং ব্যবহারিক জগতে বিজ্ঞানের দান দেখিয়া স্তম্ভিত,—তাঁহারা কোন প্রশ্ন করেন নাই। বিনা বাধায় মানিয়া লইয়াছিলেন, বর্ত্তমান বিজ্ঞান যাহা বলে তাহা অভ্রান্ত। ভ্রান্ত তাহা, যাহা অবৈজ্ঞানিক জ্ঞান। এই বিজ্ঞান বলিল, পৃথিবী ছিল সূর্য্যের অংশ, অন্তর অগ্নিগর্ভ, ক্রমশঃ শীতলতার পর তাহাতে জীবের সৃষ্টি হইল। লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবীর বর্ত্তমান এই রূপ। এই জল স্থল স্থাবর জঙ্গম সকলের মধ্য দিয়া সৃষ্টির অপরূপ রহস্য ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে। মানুষ আসিয়াছে অনেক পরে। একদিন হঠাৎ আসে নাই। প্রাণি-জগতের সহিত তাহার সুনিবিড় পরিচয়। এমন কি পূর্ব্ব-পুরুষদের পরিচয় পাওয়াও সম্ভব। এসব এখন জানা কথা। সেদিন এমন সামান্য কথাই পরম বিস্ময় আনিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সেদিনকার পৃথিবী ছিল সাধারণের কাছে অনন্ত-বিস্তার সমতল। প্রতি কণাটি তাহার ভগবান্ স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনিই

আবার স্বহস্তে ধ্বংস করিবেন। প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার তখন নিঃস্ব। সাধারণ মানুষ ভূত-প্রেত, দেব-দেবী, সকলেরই ভক্ত। স্বর্গ-নরকের প্রত্যক্ষ ছবি চক্ষুর সম্মুখে প্রোজ্জ্বল। হঠাৎ বিজ্ঞান এই ভূত-প্রেত, দেব-দেবীর কথা অস্বীকার করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা করিল। বলিল, মূর্ত্তিতে প্রাণ নাই, আছে পাথরের ভার। আগাছায় প্রাচীন উদ্যান ভরিয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে তখন জঙ্গল। এই অবস্থায় বিদেশী শিক্ষার সঙ্গে বিদেশী বিজ্ঞান যাহা প্রচার করিল, তাহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকেরই তখন বিশেষ দ্বিধা হয় নাই।

সত্য বড় মজার জিনিষ। সত্য বলিয়া কোন কিছু মানিয়া লইলে চুপ করিয়া থাকা যায় না। মনে তাহার প্রতিক্রিয়া হয়। কার্য্যে তাহার প্রভাব দেখা যায়। দেশলাইয়ের একটি কাঠির আগুন সারা কলিকাতা ভস্মীভূত করিতে পারে। একটি মাত্র সত্য তেমনই সভ্যতার, মানুষের রূপ পরিবর্ত্তন করে।

হঠাৎ সেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে এমন একান্ত ভাবে 'সত্য' বলিয়া আশ্রয় করিবার ফলে দেশে বিপ্লব আসিল। মনে,কার্য্যে, সভ্যতার প্রকাশভঙ্গীতে তার নিদর্শন দেখা দিল। এক দল লোক প্রাচীন শাস্ত্র, জাতীয় ঐতিহ্য, সকল অবজ্ঞা করিয়া বিজ্ঞানের আশ্রয় লইল। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক শাস্ত্রও মানিতে থাকিল, বিজ্ঞানকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিল।

জটিল অবস্থা। অত্যন্ত গণ্ডগোলের কথা। শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের বিরোধ থাকিলে কি করিয়া উভয়ই মানা সম্ভব? শাদা আর কাল দুইটি রঙ। একটি জিনিষের শাদা রঙ বলিতে তাহা কাল রং নহে। একই জিনিষ একই সময়ে শাদা কাল দুই-ই হইতে পারে না। তুমি কলিকাতায় এখন আছ। মধুপুরে এখন কেহ তোমায় দেখিতে পাবে না। সোজা কথা। কিন্তু মনের বড় বিচিত্র গতি। এই প্রকার ধারণা করিতেও তাহার কোন বাধা হয় না।

সে-কালের শিক্ষিত ভারতীয়ের স্বভাব দাঁড়াইল তাই বিচিত্র—বিশ্বাস, অবিশ্বাস, দ্বিধা, সংশয়, ভয়, ভরসা, সমস্ত মিলিয়া সে কুহেলীর ন্যায় ক্রমাগত রহস্যে ভরিয়া উঠিতে থাকিল।

বসন্ত হইলে সে ডাক্তার ডাকে, অথচ ডাক্তারকে বিশ্বাস নাই। জলবসন্ত রোগ কেন হয়, ঠিক জানা নাই; তাই ডাক্তারী চিকিৎসা করার সময় শীতলা পূজা দিতে, কালীঘাটে মানত করিতেও কোন বাধা নাই। অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত রোগের উৎপত্তির কথা মানিতে পার, কিন্তু তাই বলিয়া ঠাকুরের ইচ্ছা মত রোগীকে সুস্থ করিবার ক্ষমতা নাই, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব।

মনে দ্বন্দ্ব বাড়িয়াই চলে। প্রাচীন বিশ্বাস ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না। দুই বিশ্বাসই একসঙ্গে কাজ করে। ফলে কার্য্যে বিরোধ ও শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায়। ইহা খুব স্বাভাবিক কথা। দুইটি বলবতী ইচ্ছা এক সঙ্গে মন অধিকার করিলে ধীর ভাবে কাজ সম্ভব নয়। মজলিসের গল্পে মন বসিয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যার পরই বাড়িতে ফিরিতে হইবে—নয়ত বকুনির অন্ত নাই। তখন স্থিরভাবে গল্পের আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব কই? প্রতিক্ষণ উদ্বিগ্নতা বাড়ে, চিত্ত চঞ্চল হয়। শেষে হয় দুঃখিত মনে বাড়ী ফেরা, নয় বকুনী অগ্রাহ্য করিয়া গল্প শোনা—এ ছাড়া উপায় কি?

তখনকার দিনে যাঁহারা বিজ্ঞানের পরিচয় পাইলেন, তাঁহাদের এই অবস্থা। যতদূর সম্ভব জীবনে বিজ্ঞানের সত্যগুলিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা আনিল নাস্তিকতার বৃদ্ধি ও অহেতুকী আস্তিকতার উপলব্ধি। আগের যুগের লোকের বিশ্বাসকে যাচাই করিবার জোর ছিল। বিজ্ঞানের অ্যাসিড যখন দু'একটি অন্ধবিশ্বাসকে নষ্ট করিল, অন্য বিশ্বাসগুলিকে সযত্নে রক্ষা করাই হইল রীতি—কে জানে আরও কত বিশ্বাস নষ্ট হয়। সোনা বলিয়া যাহার পরিচয়, তাহা গিল্টি বলিয়া মনে হইল। সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য নিমেষেই অদৃশ্য। মন এ আঘাত সহ্য করিতে পারে না। কথা ছিল পরীক্ষায় প্রথম হইবার, গেজেটে নামই পাওয়া গেল না।

সেদিন অনেকেরই এই অবস্থা। সাধারণের মুসলমানী রাজ-দরবারের আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কার বাঁচানই ছিল সমস্যা। জ্ঞানের দীপশিখা ক্ষীণ। সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া লোকে বাঁচিয়া ছিল—সেই সব সংস্কারের মূলে আঘাত করিল বিজ্ঞান।

মনে কর এসপ্লানেডে ট্রামে চড়িয়াছি—খিদিরপুরের ডকে যাইব, সঙ্গে ছয় আনার ডে-টিকিট। হঠাৎ নজরে পড়িল ট্রাম

খিদিরপুর ব্রীজ পার হইয়া অন্যদিকে ঘুরিতেছে নামিয়া পড়িতে হইবে, বন্ধুদের বলিব নামিয়া পড়িতে। যিনি এই ট্রামে চড়িতে বলিয়াছিলেন তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, এ-ভুল করিবার কারণ নাই। আমাদের সঙ্গে 'প্র্যাক্‌টিকাল জোক' করিবেন এ সম্ভাবনাও নাই—তবে? তখন আমার কথা কে মানিবে? আমার যুক্তি অকাট্য—কিন্তু তাহা হইলেও বন্ধুরা তাহা শুনিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? এখানে কণ্ডাক্টরকে বা কোন যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে সমস্যা মিটিবে।

কিন্তু জীবনের যাত্রার পথে কর্ণধারকে কে পায়? কে বলিবে পথ ঠিক কি না?

একটি ঘটনা মনে পড়িল। প্রায় বছর দশ আগে সারকিউলার রোডের রাজাবাজার ট্রামডিপোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক'জনে গল্প-গুজবে মগ্ন, এমন সময় একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—রাণী স্বর্ণময়ী রোডটা কোন্ দিকে? আমারা 'ঐ যে' বলিয়া সম্মুখেই রাস্তাটা দেখাইলাম। ভদ্রলোক হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিলেন "ঠাট্টা পেয়েছেন?" আমরা হাসিয়া উঠিতে তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন আমাদের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলাতে তিনি মাপ চাহিয়া স্বর্ণময়ী রোডের দিকে চলিলেন। শুনিলাম, তিনি ঘণ্টা দুই সারকিউলার রোডের এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন, সুতরাং সম্মুখেই সেই স্বর্ণময়ী রোড, এ কথা বলায় তিনি ঠাট্টা তো মনে করিবেনই।

সকলেই জীবনে এমন ঘটনা দেখিয়াছে। মানুষ আজ এমনি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার যাত্রাপথ নির্দ্দিষ্ট ও সুপরিচিত নয়। গন্তব্য স্থান কোথায় তাহার সম্বন্ধেও নানা মতভেদ। বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া চলা, এই রীতি।

কথা বাড়িয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষার অপরিহার্য্য ফল যাহা, মনোজগতে বিভ্রম আনে। ওদিকে প্রাচীন সংস্কারের প্রতি অনাস্থা আসিয়াছে, কিন্তু অবিশ্বাস করিবার মত দুঃসাহসও সাধারণে সংক্রামিত হয় নাই।

ক্রমশঃ ব্যবহারিক জগতে বিজ্ঞানের উন্নতি ময়-দানবের প্রাসাদের মতই বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এদেশে ইংরাজ অধিকারে বিজ্ঞানের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা সহজ। ফলে বিজ্ঞানের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। বিজ্ঞানের নামে যাহা কিছু বলা যায়, সকলই অভ্রান্ত সত্য: এমন ধারণা শিক্ষিত সমাজে বৃদ্ধি পাইতেছে।

যে-দেশে বিজ্ঞানের প্রচার সে-দেশেও একদিন এমনি অবস্থা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বড় কথা: জীবন বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এদেশী মহারথীরাও বিজ্ঞানের পরিচয়ের সঙ্গে তার ঐ প্রশংসাপত্র বিনা বাধায় হজম করিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে দেবতায় বিশ্বাস মজ্জাগত। আমাদের সংস্কারগুলি এই বিশ্বাস রক্ষার পরিপোষক। তাই বিজ্ঞানের ধাক্কায়ও তাহারা মরে নাই। সারবান জমি পরিষ্কার করিয়া মাটি বার কর, তৃণের চিহ্নও নাই; কয়েক দিন অপেক্ষা কর, আবার জমি সবুজ ঘাসে ভরিয়া উঠিবে। মনের ক্ষেত্রে সংস্কারের সারে সবুজ বিশ্বাস এমনই প্রাণবান্।

ও দেশে সংস্কার ভাঙ্গার ইতিহাস বহুদিনের। বিজ্ঞানের এত প্রতিষ্ঠা, কারণ, নবতর সংস্কার তাহার পরিপোষক। আমাদের দেশের কথা আলাদা। আমরা প্যাণ্ট-কোট পরিয়া সাহেব সাজিতে পারি, কিন্তু পা মুড়িয়া বসা আমাদের অভ্যাস। আমাদের বিজ্ঞানের জীবন যেন এই সাহেব সাজার মত। প্রয়োজনে সাহেব সাজি, কথা বলি বাঙ্গালী ইংরাজীতে, তারপর পোষাক ছাড়িয়া হাঁফ ছাড়ি।

অর্থাৎ, বিজ্ঞানের জীবন গ্রহণ করা হইয়াছে অনুকরণে। মনের কোন গভীর পরিবর্ত্তন হয় নাই বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসিয়া, সম্ভাবনা মাত্র দেখা দিয়াছে।

এ-দেশে আগের যুগের বিজ্ঞানপন্থীরা ছিলেন মনে প্রাণে মধ্য যুগের। তাঁদের বিশ্বাসের মূলে বিজ্ঞানের ভিৎ ছিল না। ছিল বিজ্ঞান অভ্রান্ত—এমনি অবৈজ্ঞানিক ধারণা। সেই ধারণার বশবর্ত্তী তাঁহারা সমাজ ও জীবনকে চালিত করিতে গিয়া মনোজগতে অরাজকতার সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং একটা কথা বুঝিবার চেষ্টা করা দরকার। বিজ্ঞানের রীতি কি? এখানে বিশ্বাসের স্থান কোথায়?

ঘরে বসিয়া পড়িতেছি, পাশের ঘরে হাসির শব্দ শুনিলাম। কে শব্দ করিতে পারে? নিশ্চয় রাম শ্যাম যদু নয়, বাড়ীর লোক বা বাড়ীতে আসিতে পারে এমন কেউ। বাড়ীর লোকদের স্বর শুনিলেই চিনিতে পারি। একটু মনোযোগ দিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, ছোট বোন। পড়া

ছাড়িয়া পাশের ঘরে গিয়া দেখি ছোট ভাই মেঝেতে পড়িয়া কাঁদিতেছে। তাহার দিদির হাসি শুনিতে পাইয়াছি।

অনুমান এখানে প্রত্যক্ষ সত্য দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। ছোটভাই নালিশ করিল, দিদি তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছে। দিদি অস্বীকার করিয়া বলিল, ও বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া আপনি আছাড় খাইয়াছে, সে মাত্র হাসিয়াছে। আমি তাহাকে হাসিতেই দেখিয়াছি। জানি ছোট ভাই বড় দুষ্ট। বিনা দ্বিধায় তাহাকে ধমক দিয়া মিথ্যা কথা বলিলে শাস্তি দিব বলিয়া বিচারের সঠিক মীমাংসা করিলাম। এখানে অনুমান বহুদিনের অভিজ্ঞতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, ছোট ভাইয়ের চরিত্র জানি। দুজনেই সমান। কথাবার্ত্তায়, মুখ চোখ দেখিয়া সত্য নির্ণয় ছাড়া আর উপায় কি?

প্রতিদিনের ঘটনার কথা বলিলাম। আমরা নিত্যই এইভাবে সত্য নিরূপণ করি। ভুলের সম্ভাবনাও বেশী। যে যত বুদ্ধিমান্, যাহার অভিজ্ঞতা যত বেশী, তাহার ভুলের সম্ভাবনা তত কম, কিন্তু সম্ভাবনা থাকিবেই, এড়াইবার উপায় নাই।

এই অনুমানকে প্রত্যক্ষ পর্য্যায়ভুক্ত করাই বিজ্ঞানের সাধনা। সম্ভব হইলেই বিজ্ঞান পাশের ঘরে গিয়া অনুমান আর প্রত্যক্ষের পার্থক্য মিলাইয়া দেখিতেছে। অনুমান হইল কোন পাশের ঘরে, ডাকিলাম সে সাড়া দিল। পাশের ঘরে থাকিবার সম্ভাবনা বাড়িল। তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে স্বীকার করিল। তখনও অনুমান, কিন্তু প্রত্যক্ষের সহিত তাহার পার্থক্য কম। ছোট ভাই আসিয়া সাক্ষ্য দিল তাহারাও ঘরে ছিল। অনুমান আরও বলবান্, কিন্তু এখনও অনুমান অনুমানই। মা আসিয়া বলিলেন তাহারা ঘরের বাহিরে বারান্দায় কুলের আচার চুরি করিবার জন্য বসিয়াছিল। বারান্দা হইতে শব্দ শোনা স্বাভাবিক। ভীত বালক-বালিকাদের প্রহারের ভয়ে মিথ্যা বলাও বিচিত্র নহে। সকল অনুমান ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

এমনি করিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিরোধের সামঞ্জস্য হয়। বৈজ্ঞানিকরা কতকগুলি অনুমান করেন। সেই অনুমান সত্য বলিয়া ধরিয়া অন্য সত্য সন্ধান করেন। লক্ষ সত্যে অনুমান ও প্রত্যক্ষের পার্থক্য ঘুচাইলে প্রথম অনুমান বলবান্ হয়।

এই অনুমানগুলিকে বিজ্ঞানের 'হাইপথেসিস' বলা হয়। অর্থাৎ মানিয়া লও ইহা সত্য, তাহা হইলে কি হইবে পর্য্যবেক্ষণ কর। প্রতি ঘটনায় যদি কল্পিত ও বাস্তব ঘটনার অমিল না হয়, তবে 'হাইপথেসিস্' ক্রমশঃ সুদৃঢ় হয় মাত্র। যেমন আভোগাড্রোর হাইপথেসিস্—দুইটি বিভিন্ন গ্যাসের সমান আয়তন, সমান তাপ ও সমান চাপ হইলে তাহাদের অণুসংখ্যাও সমান। এ পর্য্যন্ত কেমিষ্ট্রির বিস্তারে ইহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় নাই।

কিন্তু বিজ্ঞানের ভিৎ এই অনুমান, এ কথা বলা চলে না। তথ্য, 'ফ্যাক্ট'ই তাহার সম্বল। সেই সব ফ্যাক্টকে শৃঙ্খলে আনার চেষ্টায় অনুমানের জন্ম। বৈজ্ঞানিকরা 'থিয়োরী'তে সমুদয় জ্ঞানকে এখনও আকার দিবার চেষ্টা করেন। সুবিধা অজ্ঞানতা কোথায় তাহার প্রতি নজর পড়ে। ছেঁড়া টুকরা টুকরা লেখা জোড়া দিয়া চিঠিতে কি আছে পড়িবার চেষ্টা করা হইতেছে। বৈজ্ঞানিকদের সাধনা এই টুকরা টুকরা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসল তথ্য সংগ্রহ। চিঠির টুকরার জোড়া মেলে। তথ্যেরও শেষ হয় না।

বিজ্ঞান কি বলে? তাহার প্রধান কথা—এই সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে; ইহার কারণ এই; এই কারণ সত্য হইলে এই প্রকার আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে; অতএব অনুসন্ধান করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরীতে অনুসন্ধান করেন। যখন নির্দ্দেশিত তথ্য পাওয়া যায়, তখন আরও গবেষণা হয়। থিয়োরীর যত 'করোলারী' সম্ভব একে একে বার হয়—ক্রমশঃ নূতন তথ্যের চাপে একদিন থিয়োরী ভাঙ্গিয়া যায়। অনেকগুলি তথ্যের কারণ বলিতে পারিলেও আরও অনেকগুলির তথ্যের কারণ বলা সম্ভব নয়। অন্য থিয়োরী হয়।

একদিন নিউটন প্রচার করিয়াছিলেন—পদার্থ মাত্রই পদার্থকে আকর্ষণ করে। আকর্ষণশক্তির পরিমাণ পদার্থদের ম্যাস্ (ভর) ও দূরত্ব অনুযায়ী। পরীক্ষায় দেখা গেল ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে আকাশে গ্রহগণের গতি-বিধির কারণ নির্ণয় করা সহজ হয়। ক্রমশঃ প্রতি অণুকণা প্রতি অণুকণাকে আকর্ষণ করে একথা প্রমাণের পক্ষে অজস্র তথ্য পাওয়া গেল। বিজ্ঞানের জগতে সেদিন ঘটিল এক যুগান্তর।

এখন এই মাধ্যাকর্ষণের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। অর্থাৎ

মাধ্যাকর্ষণের আশ্রয় না লইয়াও তথ্যগুলির কারণ নির্দেশ করা সম্ভব। ইহা আইনষ্টাইনের থিয়োরীর একটি প্রতিপাদ্য। বর্ত্তমানে বিজ্ঞান আইনষ্টাইনকে মানিয়া চলিতেছে। বিজ্ঞানকে মানিলে তাঁহার এই কথাও মানিতে হইবে।

কিন্তু মানিতে হইবে বলিয়াই সকল কথা মানা যায় না। এতদিন ধরিয়া মাধ্যাকর্ষণ সাহায্যে অনেক তথ্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেই ব্যাখ্যা মনে ভিৎ গাড়িয়াছে। এক কথায় সেই ভিৎ উপড়াইয়া ফেলা যায় কি?

সঞ্চিত সোনা আবার গিল্টি প্রমাণ হইল; ঐশ্বর্য্য একদিনে নিঃশেষ হইল, নিঃস্ব হইতে হইল। কিন্তু নিঃস্বতার পরিপূর্ণ অনুভূতি একদিনের কথা নয়। পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি, দুঃখ হইবে, সে দুঃখের স্বরূপ বুঝিব দিনে দিনে সম্বৎসর ধরিয়া। একদিনের দুঃখে তাহার শেষ হয় না।

এত কথা কেন বলিলাম, তাহার কারণ এইবারে বলি। বাঙ্গালী যখন বিজ্ঞান-চর্চ্চা সুরু করিয়াছিল, তখন বিজ্ঞানের যেরূপ ছিল, এখন তাহার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক মনের এই পরিবর্ত্তন আরম্ভ মাত্র। আজিকার যুগের ছেলেরা তাহার অংশ পাইবে।

সেদিন বিজ্ঞানের যে দীপ্তি ছিল, আজ তাহা মলিন হয় নাই। বরং আজ আরও উজ্জ্বল। মলিন হইয়াছে কেবল সেদিনের বৈজ্ঞানিকদের অবৈজ্ঞানিক মনোভাব। তাঁহারা বিজ্ঞানকে অভ্রান্ত বলিয়া যে যাগ-যজ্ঞের সুরু করিয়াছিলেন, সাধারণ শিক্ষার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনতার মনে তাহার সেই অবৈজ্ঞানিক মূর্ত্তিটিই সজীব হইয়া উঠিতেছিল। ফলে বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের প্রভেদ ঘোরাল হইয়া উঠিল। বিজ্ঞানও মধ্যযুগের ধর্ম্ম-প্রচারকদের মতই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। যাহা তাহার জানা নাই, যাহার সম্ভাবনা তাহার লক্ষিত তথ্যের বিরোধী, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকারে সে তৎপর হইয়া উঠিল।

কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টির স্বরূপ কি? বিজ্ঞান তাহার থিয়োরীতে অখণ্ড বিশ্বাস করিতে বলে না। তাহার থিয়োরী যে অভ্রান্ত একথাও বলে না। এ-পর্য্যন্ত যে-সব তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার আলোচনায় এই থিয়োরী সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন এ-কথাই তাহার বক্তব্য। একটি তথ্য আসিয়া তাহার থিয়োরীকে ভূমিসাৎ করিতে পারে, একথা সে জানে ও স্বীকার করে, কিন্তু যতদিন না সেই তথ্যের সন্ধান পায়, ততদিন এই থিয়োরীই চলুক। নিজেই জীবন পণ করিয়া সেই তথ্যের সন্ধান করে যাহাতে থিয়োরীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। তাহার নির্ম্মিত প্রাসাদ তাসের ঘরের মত ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু তথ্যের বিনাশ নাই। থিয়োরী ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লইতে হইবে মাত্র।

আগের যুগের জোর ছিল এই তথ্যের উপর নয়, থিয়োরীর অখণ্ডতার উপর। থিয়োরী আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকাই ছিল সাধারণ লক্ষণ। মহামানী বৈজ্ঞানিকরাও তাঁহাদের থিয়োরী সযত্নে আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকেন। সকল বুঝিয়াও মনের দৃঢ় ভিৎ এক কথায় উপড়াইয়া ফেলিতে পারেন না।

বর্ত্তমান যুগ যুগ-সন্ধিক্ষণ। বিজ্ঞানের নবরূপ এখন বুঝিতে হইবে। মানুষের মনের ভিৎ নানা কারণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সুতরাং এ-সাধনা সম্ভব। যে-থিয়োরী এতদিন চলিতেছিল, সে-থিয়োরী অভ্রান্ত নহে এমন কথা মানুষের মনে জাগিয়াছে। ক্রমশঃ তথ্যের ভার বাড়িতে থাকিবে, সে থিয়োরীর অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইবে। অবশ্য ইহা একদিন দু'দিনের কথা নয়। জীবনভোর যে-থিয়োরী সত্য বলিয়া মনে হয়, মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে, হয়ত তাহার অকার্য্যকারিতা প্রমাণিত হয়।

স্বীকৃত বিজ্ঞানকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ না করার প্রয়োজন হইয়াছে। জাতীয় জীবন দুঃখ-দুর্দ্দশায় পরিপূর্ণ। এ-যুগের ছেলেদের হাতে পড়িবে নূতন সমাজ গঠনের ভার। সত্যলিপ্সা মনকে সজীব রাখে, বিশ্বাসভঙ্গের আঘাতে সে-লিপ্সা নষ্ট হয় না, ইহাই বিজ্ঞানের দৃষ্টি। বাঙ্গালী আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের সেই দৃষ্টি হারাইয়া বৈজ্ঞানিক সাজিয়া বসিয়া আছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের সকল প্রতিপাদ্যকে তাঁহারা, ভক্ত যেরূপ দেবতার উপর বিশ্বাস রক্ষা করে, সেই অন্ধবিশ্বাস দ্বারা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। এমন অবৈজ্ঞানিক মনোভাবকেই তাঁহারা বৈজ্ঞানিক মনোভাব বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

এই অন্ধবিশ্বাস বিজ্ঞানের দৃষ্টি নহে। সত্যকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, ইহাই বিজ্ঞানের দৃষ্টি।

বিজ্ঞানের সেই দৃষ্টি-সাধনা এ-যুগের ছেলেদের করিতে হইবে। অন্ধবিশ্বাস আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে সে-দৃষ্টি-সাধনা সম্ভব হইবে না।

নির্ম্মম সত্যের জন্ত তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

বারমাসী গীতিকা

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

বিশ্বসঙ্গীতের কলা ও বিজ্ঞানে বাংলা দেশের কীর্ত্তন ও বাউল গানগুলি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সারা জগতের লোক এই কীর্ত্তন ও বাউল সঙ্গীতের মাধুর্য্যময় রসানুভূতিতে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কীর্ত্তন ও বাউল সঙ্গীতের আনুষঙ্গিক ভাবদ্যোতক নৃত্য সার্ব্বজনীন। এই নৃত্যগুলির ভিতর ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা ওতপ্রোতভাবে রূপায়িত আছে। বিশ্বসাহিত্যে বঙ্গভূমির কীর্ত্তন ও বাউল সঙ্গীত যেরূপ অপূর্ব্ব সৃষ্টি, তদ্রূপ বাংলার বারমাসী গানগুলিও অপূর্ব্ব এবং অতুলনীয়। কিন্তু কীর্ত্তন ও বাউল সঙ্গীতের মত বারমাসী সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান হয় নাই বলিয়া এগুলি সারা বিশ্বে সুপরিচিতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

বাংলার পল্লী-গীতি বারমাসী গানগুলিকে প্রেমের কবিতা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রাচীন বাংলার পল্লীকবিরাই বারমাসী কবিতার রচয়িতা। নায়ক-নায়িকার বিরহের মর্ম্মব্যথার উপর ভিত্তি করিয়া গ্রাম্য কবি এই সব গান রচনা করিয়াছেন। নায়িকার বেদনা-বিধুর চিত্তের অস্থিরতা কবি অশেষ রচনা-নৈপুণ্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই গানগুলি হইতে আমরা প্রাচীন বাংলার পল্লীর নায়ক-নায়িকার সত্যকার সরল প্রেমের পরিচয় লাভ করি। আমরা দেখিয়াছি, প্রিয়জনবিয়োগ-জনিত ব্যথিত হৃদয়ের চিত্তব্যাকুলতার আত্মপ্রকাশ হইতেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি রচিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য "মেঘদূত" নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহ-বিলাপ লইয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রীরাধিকার বিরহ লইয়াই রচিত হইয়াছে। বারমাসী গীতিকাগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, এগুলির ভিতর বিরহচঞ্চল তরুণ পল্লীকবিদের চিত্তব্যাকুলতার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি রহিয়াছে।

পল্লীর অধিবাসীরা এই সকল বারমাসী সঙ্গীত গাহিয়া একটা অনাবিল আনন্দ লাভ করে। পল্লীপ্রদেশে বারমাসী সঙ্গীতগুলি খুবই জনপ্রিয়। এই কবিতাগুলির ভাষা নির্ঝরিণীর মত মুক্তপ্রাণ এবং উপমা ও চিত্রগুলি অতুলনীয়-ভাবে মনোরম। আজিও এই বারমাসী গীতিকার বিরহ-সুর গ্রামের মাঠে মাঠে, নদীতে নদীতে গণ-মনের অন্তরে অন্তরে ঝঙ্কার তুলিতেছে। বাংলার সাহিত্যের পরম অনুরাগী পণ্ডিত স্যর জর্জ্জ গ্রীয়ারসন্ বারমাসী গানগুলিকে টমসনের "ঋতুবর্ণনের গীতে"র (Song of Seasons) তুল্য বলিয়াছেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণন অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। এই জন্যই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ধর্ম্মসঙ্গীত, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত ও দেবদেবীর কীর্ত্তনের প্রাধান্য দেখা যায়। সেখানে 'ধর্ম্ম-মঙ্গল,' 'চৈতন্য-মঙ্গল,' 'চণ্ডী-মঙ্গল' একচেটিয়া স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বলিলেই আমরা বুঝি শিব, দুর্গা, ধর্ম্মঠাকুর, মনসা বা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত এবং রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পুরাণের কাহিনী। সেদিনের সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় ছিল খুবই কম এবং ইহাতে একঘেয়ে ভাবটা বিশেষ প্রবল। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে বারমাসী গীতিকাগুলিতে একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয়। ইহাদের রচনার বিষয়বস্তুও একটু জটিলতর এবং রচনাতে নূতনত্বও রহিয়াছে। এই জন্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বারমাসী গীতিকাগুলি একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য।

বারমাসী গানগুলিতে আমরা শুধু প্রেমজনিত বিরহ কথাই জানিতে পারি না, এই গুলিতে প্রকৃতির সম্বন্ধেও অনেক কথা জানা যায়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতির বর্ণনা নাই বলিলেই চলে, শুধু তৎকালীন বারমাসী গীতিকা-গুলিতে যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের সম্বল। এই দিক্ দিয়া বারমাসী গানগুলি আমাদের পরম আদরের সম্পদ্। বারমাসীতে প্রকৃতির কিরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা কয়েকটি বারমাসী গান হইতে আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

'আলওয়ালের বারমাসী'তে বৈশাখের প্রকৃতির বর্ণনা পাইতেছি,—

"বিয়রে মহী অরুণ প্রবলে।
ভ্রষ্ট তেল বায়ু জল বিরহে অনলে।
মিত্র হৈয়া কমল না সহে দিনমণি।
পতি বিনে কেমনে যাইবে কমলিনী॥"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

'মহুয়ার বারমাসী'তে চৈত্র মাসের প্রকৃতির বর্ণনা পাই এইরূপ—,

"ফাল্গুণ মাস চল্যা যায় রে চৈত্র মাস আসে।
সোনার কুইল কু ডাকে বইস্যা গাছে গাছে॥
আগ রাঙ্গিয়া সাইলের ধান উঠ্যাছে প্যাকিয়া।
মধ্য রাত্রে নদ্যার চান উঠিল জাগিয়া॥
... ...
আসমানেতে চৈহার কউ ডাকে ঘনে ঘন।
বাঁশী শুন্যা সুন্দর কইন্যার ভাঙ্গ্যা গেল ঘুম॥

(মৈমনসিংহ গীতিকা)

'সুশীলার বারমাসী'তে চৈত্র মাসের প্রকৃতি বর্ণনা এইরূপ,—

"মালতী মল্লিকা চাঁপা বিগাইব খাটে।
মধুপানে গোঙাইব সদা গীত নাটে॥"

(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

'সীতার বারমাসী'তে গ্রীষ্মের প্রকৃতির পরিচয় পাই,—

"বৈশাখ মাস হইল বাড়িল দিন আর।
প্রখর হৈল রুদ্র অতি খরতর॥
চলিতে না পারি দেখি কমললোচন।
বিরক্ষ নীচে বৈশে কান্দি দুখের কারণ॥

(লেখকের সংগ্রহ)

বারমাসী গীতিকাগুলিতে বিরহব্যথা ও প্রকৃতির বর্ণনা ছাড়া সামাজিক চিত্রের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই সব কারণে বারমাসী গানগুলি বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান্ সম্পদ্।

বারমাসী গানগুলি কত প্রাচীন এ সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করা যা'ক। বারমাসী গানগুলির মধ্যে বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের (পঞ্চদশ শতক) 'পদ্মাবতী'র বারমাসী; পদকল্পতরুর (ষোড়শ শতক) 'বিষ্ণুপ্রিয়া'র বারমাসী, কবি-কঙ্কণ চণ্ডীর (ষোড়শ শতক) 'সুশীলা'র বারমাসী, আল-ওয়ালের পদ্মাবতী কাব্যের (সপ্তদশ শতক) 'নাগমতী'র বারমাসী, মৈমনসিংহ গীতিকায় 'মহুয়া,' 'মলুয়া' কাব্যের (সপ্তদশ শতক) বারমাসীগুলি এবং বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলির (অষ্টাদশ শতক) 'বিদ্যা'র বারমাসী বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পঞ্চদশ শতক অথবা তাহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই বাংলা সাহিত্যে বারমাসী গানের রচনা আরম্ভ হইয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে এইগুলি খুব বেশী পরিমাণে রচিত হইয়াছিল এবং এই সময়েই পল্লী-অঞ্চলে এই গুলির প্রবল জনপ্রিয়তার যুগ।

বারমাসী গানগুলি আমাদের অন্যতম জাতীয় লোক-সঙ্গীত। বারমাসী গানগুলি সহজ, সরল সুরের উচ্ছ্বাস বনফুলের মত স্বতঃ স্বাভাবিক, এবং এগুলি সহজ ভাবে স্ব-দেশের মানুষের প্রাণের উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। এই ধরণের লোক-গীতিগুলির ভিতর আমাদের জাতির ভাষার মতই আমাদের গভীর চরিত্র ও ভাবধারার সন্নিবেশ রহিয়াছে। জাতির উন্নয়ন সাধনায় এই ধরণের স্বজাতীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ স্বদেশের সঙ্গীত-ধারায় নূতন উন্নতি আনয়ন করিতে পারে এবং ইহার ফলে স্ব-ভূমির প্রতি একটা গভীর প্রেমের অনুভূতি আসিবে এবং স্ব-জাতির প্রতি একটা গভীর গৌরব-বোধের সৃষ্টি হইবে।



পূর্ব্ব আমেরিকার স্মোকি পর্ব্বতারণ্যে

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্ব টেনেসির দিক্‌চক্রবাল রেখায় পর্ব্বতশ্রেণী কুয়াসায় অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। আমার সঙ্গী বললে ও পর্ব্বত নয়, মেঘ।

সঙ্গীটী এপ্যালেশিয়ান পর্ব্বতশ্রেণী লম্বালম্বি ভাবে অতিক্রম করেছে বটে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাজ্যের পূর্ব্বদিকের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতমালা কখনও দেখেনি।



স্মোকী পাহাড়ের শ্বেতপুচ্ছ হরিণ।

যারা বাইরে থেকে এখানে শুধু ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে আসে, তারা এ রকম সু-উচ্চ, জনহীন ও সম্পূর্ণ বন্য প্রকৃতির লীলানিকেতন স্বরূপ এই পর্ব্বতশ্রেণীকে উত্তর ক্যারোলিনা ষ্টেটের মাঝখানে দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে যায়।

১৯২৩ সালে নিকটবর্ত্তী দুটী ষ্টেটের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা যখন এ অঞ্চলের পাহাড় অঞ্চলে একটী ন্যাশনাল পার্ক করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, তখন দুর্দ্ধর্ষ পর্ব্বতাভিযানকারীদিগের মধ্যেও অনেকে এ অঞ্চলের অনেক বনেই ভ্রমণ করেননি—যদিও তাদেরই প্রপিতামহগণ চিরোকি ইণ্ডিয়ানদের বিষাক্ত তীর উপেক্ষা করে এক সময়ে এখানে বসতি স্থাপন করেন।

অনেকে অবশ্য এখানে আসে স্ফূর্ত্তি করতে, বন-ভোজন করতে। জঙ্গল এত নিবিড়, তাদের বনের মধ্যে কুঠার দিয়ে লতা-ঝোপ কেটে কেটে পথ করে নিতে হয়।

আর আসে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক ও জরীপকারী আমীনের দল। শিকারীর দল মাঝে মাঝে আসে স্মোকি পর্ব্বতের ঘন অরণ্যে লুক্কায়িত ভালুক, হরিণ ও অন্যান্য নানা প্রকার ছোট ছোট জন্তুর সন্ধানে।

বহু দিন ধরে পূর্ব্ব-টেনেসি ও উত্তর ক্যারোলিনা ষ্টেটের মধ্যে গ্রেট্ স্মোকি পর্ব্বতমালা ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা উৎপাদনকারী প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে। এই পর্ব্বতমালার শিখরদেশ অতীব দুর্গম, তা অতিক্রম করে কোনো যাতায়াতের পথ উভয় ষ্টেটের মধ্যে সহজ যোগসূত্র স্থাপন করেনি—বাণিজ্য চলতো পাহাড়শ্রেণীর শেষ প্রান্ত ঘুরে। এখনও চলে।

বর্ত্তমানে এই পর্ব্বতপ্রাচীর ন্যাশনাল পার্কে পরিণত হওয়ায় উভয় ষ্টেটের নানাদিক থেকে রাজস্ব ও অর্থাগমের সুবিধা হয়েছে।

এই অঞ্চলের একটী স্ত্রীলোকের মুখে শুনেছিলাম, কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বনের মধ্যবর্ত্তী তার কুটীর থেকে নক্সভিল্ শহরে যাতায়াতে এক সপ্তাহ সময় লাগতো। স্ত্রীলোকটীর বয়স যখন আটাশ হয়, তখন সে প্রথম শহর দেখে।

তখনকার আমলে পর্ব্বত-অঞ্চলের বাসিন্দাদের শহরে যাওয়ার প্রয়োজন হোত না। গৃহপালিত ভেড়ার পাল তাদের গরম পোষাকের লোম যোগাতো, মেয়েরা তা থেকে নিজেরাই পোষাক বুনতো; বনের হরিণ ও পাখী তাদের মাংস সরবরাহ করতো; কারণ এ অঞ্চলের প্রত্যেকেই শিকারপটু। পর্ব্বতগাত্রে ও নিম্ন উপত্যকায় জঙ্গল পরিষ্কার করে শস্য বপন করা হোত—সেই শস্যে তাদের রুটী হোত। বাইরের থেকে কাফি ও লবণ ক্রয় করা হোত—তাও পয়সা দিয়ে নয়—শস্যের সঙ্গে বদল দিয়ে।

তারপর এল ১৯২৩ সাল।

নিকটবর্ত্তী দুইটী ষ্টেটের গবর্ণমেণ্ট ঠিক করলেন—প্রকৃতির এই সুরম্য লীলানিকেতনটীকে মার্কিন যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের ক্রীড়াভূমি ও প্রমোদ উদ্যানে পরিণত করবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা টাকা তুলতে লাগলেন—প্রথম বৎসর উঠলো দশলক্ষ ডলার। ক্রমে এই উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ালো পঞ্চাশ লক্ষ ডলার। কিন্তু তখনও যত টাকা দরকার, তার অর্দ্ধেকও ওঠেনি। তখন বিখ্যাত ধনকুবের জন্ ডি. রকফেলার মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন—অবশেষে ১৯২৬ সালে কংগ্রেস এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করে এবং এই নির্দ্দেশ দেয় যে, ৪ লক্ষ ২৭ হাজার একর জমি টেনেসি ও উত্তর ক্যারোলিনা ষ্টেটের অধিবাসীরা সমানভাগে এই ন্যাশনাল পার্কের জন্যে দান করবে।

এতে একটী প্রাকৃতিক সম্পদ্-পরিপূর্ণ স্থানকে মানুষের লোভ ও শিকারস্পৃহা থেকে অক্ষুণ্ণভাবে ও অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করবার ব্যবস্থা করলেন মার্কিন যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট। তবে পর্ব্বত অঞ্চলের অধিবাসীদের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছে। ন্যাশনাল পার্ক অঞ্চলে শিকার চলবে না নিজের খুশীমত, কাজেই এক হাজার গৃহস্থের মধ্যে চারিশত ঘর নিয়ে এখনও আছে, বাকি এদিক্ ওদিক্ চলে গেছে।

ন্যাশনাল পার্ক স্থাপন করার উদ্দেশ্য—কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় স্থানকে অবিকৃত রেখে সেখানে মানুষের আমোদ-প্রমোদের সব রকম ব্যবস্থা করা। দুর্গম স্মোকি পর্ব্বত অঞ্চলে এজন্য প্রথমেই রাস্তা তৈরী করা প্রয়োজন। গত পাঁচ বৎসর ধরে গবর্ণমেণ্ট রাস্তা প্রস্তুত করছেন ও অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যাতে অশ্বারোহীরা স্বচ্ছন্দে যেতে পারে, এজন্য সরু পথ তৈরী করে দিচ্ছেন। প্রথমোক্ত রাস্তা অবশ্য মোটর-চলাচলের জন্য, এ রকম রাস্তা সত্তর



আট মাস বয়সের ভালুক-বাচ্চা।

মাইলের বেশী এখনও হয় নি। কিন্তু শেষোক্ত ধরণের 'ট্রেল' বা ঘোড়া চলাচলের বা মানুষের পায়ে চলার পথ তৈরী হয়েছে ছয় শত মাইল।

গ্রেট্ স্মোকি মাউণ্টেন ন্যাশনাল পার্ক-এর অপূর্ব্ব বনানীর দৃশ্য, এর বৃক্ষগুল্মরাজি, এতই বিচিত্র ও নয়নমনোহর যে, লোকে মার্কিন যুক্তরাজ্যের অন্য পঁচিশটী ন্যাশনাল পার্ক ছেড়ে দিয়ে গত কয়েক বছর ধরে এখানেই ভিড় করছে

১৯৩৫ সালে আমি (লিওনার্ড রয়ের বিবরণ থেকে)

স্মোকি পর্ব্বত অঞ্চলে ভ্রমণ করতে যাই। নক্সভিল শহর এই অঞ্চলের দ্বারস্বরূপ। ওখান থেকে ৩৮ মাইল চমৎকার রাস্তা বেয়ে মোটরে এলাম গ্যাট্লিনবার্গ গ্রামে। এই গ্রামটী পর্ব্বতের পাদপ্রান্তে অবস্থিত। গ্রামটী ছোট, তবে ন্যাশনাল পার্কে ভ্রমণেচ্ছুদের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি হোটেল ও সরাই গত কয়েক বৎসরে স্থাপিত হয়েছে। আমরা যেতে শিল্পদ্রব্যের দোকানীরা দোকানের দোর জানালা খুলে দিলে। পি বিটা ফি সোসাইটি এখানে ১৯১২ সালে গ্রাম্যবালিকাদের শিক্ষার জন্ত একটি স্কুল স্থাপন করেছেন—তখনও কিন্তু সে স্কুলের কোন ছাত্র ওঠেনি দেখলাম। গ্রাম থেকে আরও এক মাইল দূরে স্মোকি মাউনটেন ন্যাশনাল পার্কের সীমানা। সাদা ও সবুজ রঙের প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে।



প্রেরেখিন চূড়া; পিসার হেলান স্তম্ভের সহিত তুলনীয়।

তার পর পর্ব্বতের গাত্রে মোটর রাস্তা উঠে গিয়েছে—প্রথমে একটা বড় বাঁকের পরে রাস্তা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এখানে আমরা ওপরের দিকে চেয়ে দেখলাম মাউন্ট লা কঁৎ ও শুগারল্যাণ্ড পাহাড়ের বৃক্ষলতাশোভিত অধিত্যকা ও মেঘাবৃত শিখররাজির দিকে।

পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভায় আকৃষ্ট হয়ে যখন আমরা ওপরের দিকে চেয়ে দেখছি, তখন একজন পার্ব্বত্য লোক একটা বোঝা কাঁধে ঝুলিয়ে পাশের পথ দিয়ে বার হয়ে এল।

নিউ ফাউণ্ড গ্যাপে কোন্ রাস্তা দিয়ে যাব?—আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

সে বললে—ওই বাঁয়ের রাস্তাটা বেয়ে চলে যান।

যেখানে রাস্তার কাজ হচ্ছে, সে জায়গাটা কতদূর?

সে এখান থেকে অনেক দূর হবে। তবে সেখানে যেতে আপনাদের কোন কষ্ট হবে না।

আমরা লিটল পিজন নদীর উপত্যকার অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি এখন। প্রত্যেক বাঁকে আমাদের চোখে পড়ছে প্রকৃতির অতি মনোরম দৃশ্য।

তার পর আমাদের মোটর একটা গভীর খাদের ধার দিয়ে চললো। আমাদের একদিকে বিরাট পর্ব্বত-প্রাচীর,

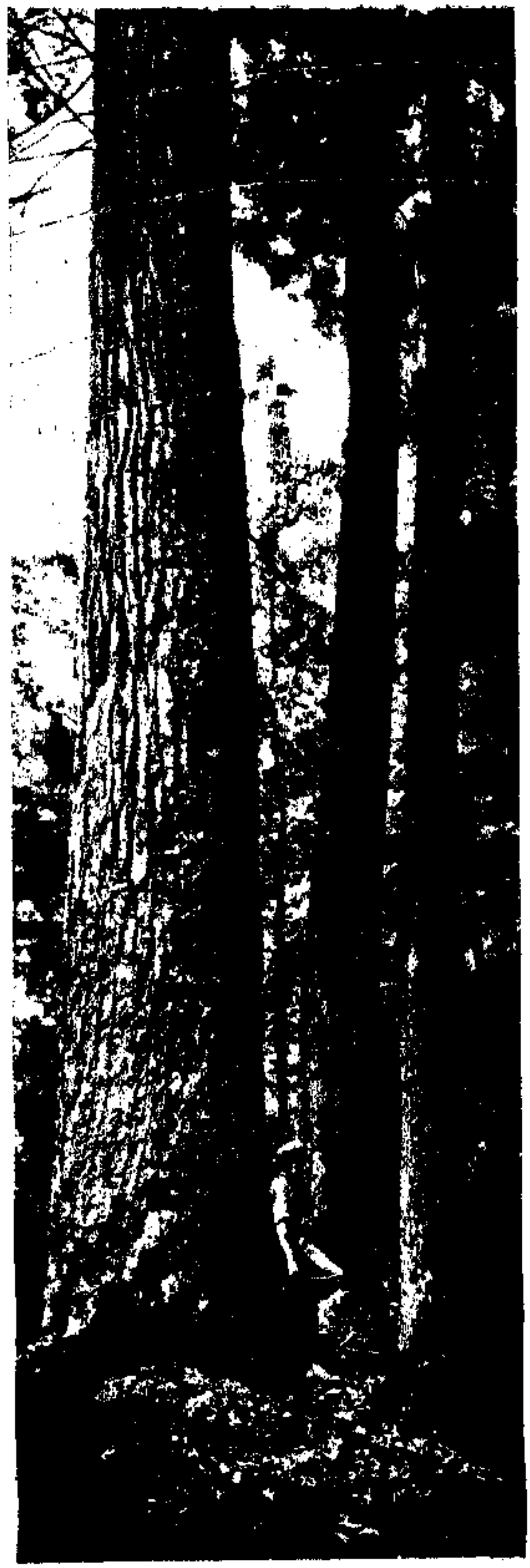
কত কি শ্যামল বৃক্ষলতায় শোভিত, মাঝে মাঝে পর্ব্বতের অধিবাসীদের ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র। আমাদের পথের দুদিকে এইবার দুটী পর্ব্বতশৃঙ্গ (এদের নাম "চিম্‌নীদ্বয়") পথের পাশে দৈত্য প্রহরী-যুগলের মত দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের ঢালু ভীষণ জঙ্গলে ভরা। 'চিম্‌নী' পার হয়ে রাস্তার উপর একটা সেতু তৈরী হয়েছে একটা জলপ্রপাতের জলধারার উপরে। রাস্তা এই সেতু পার হয়ে ওয়েষ্ট্ প্রং উপত্যকার বনানীর দিকে চলে গেল। নিউফাউণ্ড গ্যাপ্ পাহাড়ের মাথা কেটে চৌরস করে তৈরী করা সমতলভূমির নাম। কয়েকশত মোটরগাড়ী এখানে একসঙ্গে রাখা যায়। এই জায়গা থেকে সমগ্র পার্কটা চোখে পড়ে।

নিউফাউণ্ড গ্যাপ থেকে পথ একটি পার্ব্বত্য নদীর ধারে ধারে নেমে গিয়েছে উত্তর ক্যারোলিনা ষ্টেটের সমতল ভূমিতে। এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আর একটা বড় রাস্তা তৈরী আরম্ভ হয়েছে, এই অঞ্চলের সর্ব্বোচ্চ রাস্তা হবে এটা। এই পথের কোন কোন অংশ সমুদ্রবক্ষ থেকে ৬,৩০০ ফুট উঁচু। ঘন বনানীর মধ্য দিয়ে এই পথ এঁকে বেঁকে চলেছে এবং মেইন্ থেকে জর্জ্জিয়া পর্য্যন্ত দু'হাজার মাইল দীর্ঘ পথের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

এই পথ দিয়ে যেতে যেতে একবার বনের মধ্যে ঢুকে অনেকদূর চলে গিয়েছিলাম। কোভ্ পর্ব্বতের কাছে একটি নির্জ্জন কুটীর দেখতে পেয়ে তার দোরে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনটী মেয়ে—তারা তিন বোন্—বন্য আপেল ছাড়াচ্ছে। তাদের ভাষা কিন্তু কিছু পরিমার্জ্জিত ও সভ্য, সাধারণ পর্ব্বতবাসীদের মত নয়।

তাদের কুটীর কাঠের তৈরী, ফাঁকগুলি কাদা দিয়ে বোজান—যেমন এ অঞ্চলের সব কুটীরগুলি সাধারণতঃ হয়ে থাকে। কুটীরের চেয়ার টেবিল এবং অন্য সব আসবাবপত্র তাদের বাবার হাতের তৈরী—কাপড় তারা নিজেরাই বোনে। কাপড় বুনবার তাঁত এবং সূতো কাটবার চরকা পর্য্যন্ত নিজেদের হাতে তৈরী।

গ্যাটলিন্‌বার্গের নিকট বনের মধ্যে একদিন নিদাঘ অপরাহ্নে একটা ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য কুটীরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, দেখি একজন লোক কুটীরের সম্মুখবর্ত্তী ভূমিতে প্রাচীন ওক্ গাছের ছায়ায় শুয়ে ঝিমুচ্ছে—মুখে তার তামাক খাওয়ার দীর্ঘ পাইপ।



জঙ্গলের মধ্যে একটি সুপ্রাচীন বৃক্ষ।

কুটীরের চারিপার্শে আলু, সরগম্ (একপ্রকার ইক্ষু জাতীয় গাছ) ও শিমের ক্ষেত। অদূরে একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী কুলুকুলু রবে বনের মধ্য দিয়ে বেয়ে চলেছে।



উপর হইতে ঝুলিয়া-পড়া পর্ব্বতগাত্রের নিকট পথিকদের বিশ্রাম স্থল।

আমাদের পায়ের শব্দে লোকটী জেগে উঠল। তার স্ত্রী কুটীর থেকে বার হয়ে এসে কাছেই বসল—তার মুখেও তামাক খাওয়ার পাইপ।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার জমি কি পার্কের মধ্যে পড়েছে ?

—কিছু অংশ পড়েছিল বটে, কিন্তু গবর্ণমেন্টের কাছে আমি তা বিক্রী করেছি।

—বেশ ভাল দাম পেয়েছিলে ?

—মন্দ না।

লোকটী একথা স্বীকার করলে, পার্ক হওয়ার পরে বহু ভ্রমণকারী আসার দরুণ সে মধু, ডিম্, আলু প্রভৃতি বিক্রী করবার বাজার পাচ্ছে। ভ্রমণকারীরা ভাল দামও দেয় জিনিষের। কিন্তু তবুও লোকটা সন্তুষ্ট নয়।

এর একটা কারণ আছে। চিরকাল নির্জ্জন স্থানে বাস করে এসে এখন ওরা বেশী মানুষের গতায়াত আদৌ পছন্দ করে না। আমি এমন আর একটী পার্ব্বত্য পরিবারের কথা জানি—তারা তাদের বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল শুধু এই জন্যে যে, তাদের বাসস্থান থেকে দশ মাইল দূরে অন্য এক নবাগত পরিবার এসে কুটীর নির্ম্মাণ করে বাস করেছিল। এত ঘেঁসাঘেঁসিতে কি মানুষে বাস করতে পারে !

বড় চমৎকার গান শুনলাম এই অধিবাসীদের মুখে। এসব গান প্রাচীন দিনে ইউরোপ থেকে নব আগন্তুকেরা এখানে আমদানী করেছিল। 'লর্ড টমাস ও সুন্দরী ইলেওনার' নামক একটি পল্লীগীতি কবি চসারের সময় ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল—সেটী এখানকার বালক-বালিকাদের মুখে শোনা গেল।

একদিন জুন মাসের প্রভাতে আমি একজন সঙ্গীকে নিয়ে ল্য কঁৎ পর্ব্বতে উঠবার জন্য যাত্রা করি। এক মাইল

আবার পথ বেশ সমতল, তারপরে হঠাৎ একেবারে আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে পথটা।

পথ যে রকম দুর্গম, কোন লোক এ পথে ঘোড়া নিয়ে যাবার চেষ্টা যেন না করে। কোন রকমে ঘোড়ার পা পিছলে গেলেই হাত পা ভাঙতে হবে, নয় তো মৃত্যু। কিন্তু রেন্‌বো জলপ্রপাতের রমণীয় দৃশ্য দেখবার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে আমরা পাহাড়ের শিখরে উঠে গেলাম।

রেন্‌বো জলপ্রপাত ৮৪ ফুট উঁচু পর্ব্বতশিখরের রাঙা রডোডেনড্রন, এ্যাজালিয়া ও ক্রক্ষ পুষ্পের বনের ভেতর থেকে হঠাৎ লাফিয়ে পড়ছে নীচে। এ দৃশ্য দেখে আমাদের পর্ব্বত আরোহণের ক্লেশ দূর হোল বটে। আমাদের চারি ধারেই মেঘাবৃত পর্ব্বত শিখর, যেন সমুদ্র-জলের মধ্যে দ্বীপের মত তাদের অগ্রভাগগুলি শাদা শাদা মেঘপুঞ্জের ওপরে জেগে আছে।



জলপ্রপাতের বিচিত্র দৃশ্য।

ন্যাশনাল পার্কের এঞ্জিনিয়ারেরা এই পাহাড়ে উঠে রেন্‌বো জলপ্রপাত দেখবার জন্যে ভাল রাস্তা করে দিচ্ছে—বেশ চওড়াও হবে আর অত দুরারোহও হবে না। উঠতে ও নাবতে সাধারণতঃ দু'দিন লাগে—পার্কের আইন অনুসারে শিখরদেশে একটা ছোট গ্রাম স্থাপিত হয়েছে এবং গ্রামের একজন ইজারাদার আছে—সবই ভ্রমণকারীদের থাকবার সুবিধার জন্য। গ্রীষ্মকালে স্মোকি পর্ব্বতের এই উচ্চ শিখরগুলিতে ওঠা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার—কিন্তু উঁচু গোড়ালির জুতো পরে দুটি মেয়েকেও এ পথে উঠতে দেখেছি। আজকাল যে নতুন পথ তৈরী হচ্ছে—তা ঘন বনের ছায়ায় ছায়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যাতে লোকের কষ্ট না হয়।

দূরে টেনেসির পাহাড়শ্রেণীর দিকে আমরা দেখলাম বৃষ্টি হচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দক্ষিণে উত্তর ক্যারোলিনার ওপরও দেখি বৃষ্টি হচ্ছে—আমাদের ঘিরে মেঘ ডাকছে দূরে দূরে—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। কিন্তু আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, এক ফোঁটা জলও সেখানে পড়ল না।

স্মোকি পর্ব্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাজী প্রথমে দেখেছিলেন জনৈক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত—তাঁর নাম উইলিয়ম বারট্রাম। তিনি নতুন গাছপালার সন্ধানে একা এই পাহাড়ের দুর্গম শিখরে উঠেছিলেন—সে সময় পথ বলে কোন জিনিস ছিল না বনের মধ্যে। তাঁর বর্ণনা পড়ে ক্রমে আরও অনেক উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ লোকের গতিবিধি এখানে সুরু হোল—তাঁরা দেখলেন শ্বেতকায় সভ্য মানুষ আমেরিকায় তাদের উপনিবেশ স্থাপন করবার সময়ে বা তার পূর্ব্বে যে ধরণের বিশাল অরণ্যানী এ দেশের পর্ব্বত অঞ্চলে বর্ত্তমান ছিল; এই

স্মোকি পর্ব্বতের অপূর্ব্ব অরণ্য তাদের মধ্যে অন্যতম এবং সর্ব্বশেষ অবশিষ্ট। সভ্য মানুষের উপদ্রবে আমেরিকার সে স্বপ্নময় অরণ্যরাজি নষ্ট হয়ে গেছে—আছে শুধু গুটিকয়েক ন্যাশনাল পার্ক তাদের স্থলে।

এই পর্ব্বত সত্যই উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদের স্বর্গ।

এত ধরণের বন্য ফুল ফোটে এখানে, যা নীচের সমতল ভূমিতেও পাওয়া যায়—আবার সেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত



চিত্রে প্রদর্শিত গুল্মের গোড়ার ব্যাস ৮২ ইঞ্চি।

এমন ধরণের অনেক ফুলও দেখা যায়। বাইশ রকমের অর্কিড এই ছায়াবহুল ও সজল পর্ব্বতারণ্যে অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হবার সুযোগ পেয়েছে—যেমন পেয়েছে পঞ্চাশ রকমের লিলি, বাইশ রকমের ভায়োলেট এবং পাঁচ রকমের ম্যাগনোলিয়া। বনের অর্কিডের ফুল মানুষের হাতে সযত্নে চাষ করা অর্কিডের ফুল অপেক্ষা ছোট যদিও, রঙের বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্য্যে কিন্তু ছোট নয়। এই পর্ব্বতের অরণ্যে পুষ্পপ্রসবের সময় দীর্ঘস্থায়ী, সুতরাং দু' চারটি সাহসী ও নিতান্ত উৎসাহী অর্কিডকে বরফ ভাল করে গলবার পূর্ব্বেই বসন্তের অত্যন্ত প্রত্যূষেই বনের গলি-ঘুঁজির ছায়ায় যেমন দেখা যায়—তেমনি তারা থাকে শেষ শরতের হিম বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেও। শীত পড়ে গেলে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিদায় নিতে বাধ্য হয়।

ফার্ণ হয় নানা ধরণের। ব্যাঙের ছাতা জাতীয় উদ্ভিদ আছে অতি ক্ষুদ্র থেকে বেশ বড় বড় শ্রেণীর—অনেকগুলি বেশ সুখাদ্য। জুন মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বেই ১৫০০ বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষলতায় ফুল ধরে। আমি এই পর্ব্বতের প্রায় সব স্থানেই বেড়িয়েছি—আমি এমন স্থান বেশী দেখি নি, যে স্থানটি প্রকৃতির শ্যামল সম্পদে ভূষিত হয় নি।

রোডোডেনড্রন ফুলের এত প্রাচুর্য্য অন্য কোন পর্ব্বতে দেখা যায় না—ক্যাটোবা রোডোডেন্‌ড্রন এখানে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও বড় বড় হয়। জুন মাসের শেষে ও জুলাই মাসের প্রথমে পর্ব্বতের সমগ্র শিখর, অধিত্যকা ও বনপথের দুটী ধার অজস্র রোডোডেনড্রন ফুলের সাদা ও লাল স্তবকে ভরে যায়। "পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর দু পাশে পুষ্পিত রোডোডেনড্রন জলের ওপর ঝুঁকে আছে, বনভূমির সে অপূর্ব্ব শোভা দেখতে হলে ও সময় একবার স্মোকি পর্ব্বতে আসা দরকার।

পর্ব্বত অঞ্চলের অধিবাসীরা রোডোডেনড্রন গাছ পছন্দ করে না।

এ গাছ এমন দুর্ভেদ্য ঝোপের সৃষ্টি করে যে, তার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে হলে কুড়ুল নিয়ে গাছ কেটে তবে পথ করে নিতে হয়।

এই পর্ব্বতের এক স্থানে 'হাসিন্‌স হেল' বলে একটা বিস্তৃত রোডোডেনড্রন ঝোপ আছে, যার আয়তন প্রায় ৫০০ একর। আরভি হাসিন্‌স নামে একজন পাহাড়ী লোক একবার গরু নিয়ে এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে যাওয়ার সময় এই রোডোডেনড্রন ঝোপে আটকে পড়ে কয়েক দিনের মধ্যে পথ খুঁজে বার করতে পারে নি।

শুধু বসন্তকালে নয়, একবার আগষ্ট মাসে একটি বনপথ দিয়ে যাবার সময় আমাদের প্রতিপদক্ষেপে কোন না কোন পুষ্পিত গাছ দেখতে পেয়েছিলাম, যদিও রোডোডেনড্রন, ডগউড, ভায়োলেট্‌ ও বন্ধ জিরেনিয়ামের ফুল, তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল; ছিল রাঙা ফ্লক্স, টকটকে লাল কার্ডিনাল ফুল, হলুদ রঙের গোলডেন রড্‌ ও গোলডেন গ্লো, নীল হেয়ার-বেল, সাদা, রাঙা ও হলদে প্যাশন ফুল এবং বড় বড় অর্কিডের হলদে ফুল।

শুধু ফুলগাছ নয়, এই পাহাড়ে শক্ত গুঁড়ির যত বড় বড় গাছ আছে, মার্কিন যুক্তরাজ্যের অন্ধ কোন বন-পাহাড়-অঞ্চলে সে রকম দেখা যায় না। হাউউড্‌ ও লাল স্পস্‌ গাছ এখানকার বনে অত্যন্ত বেশী এবং কাঠুরিয়ার কুঠার এখনও সে বনের প্রান্ত স্পর্শ করে নি। ১৩২ রকমের বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ পূর্ব্বে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, এখন তার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩৮। পাহাড়ের নিম্নদিকের ঢালুতে দেখা যাবে সাইকামর ও টিউলিপ, অ্যাশ, ওক, চেরি, এলম, ডগ্‌উড ও পাইন। এমন কি এখানে এত বড় হেমলক গাছের বন দেখেছি, যা কি না ক্যানাডিয়ান্‌ রকি পর্ব্বতের সুপ্রসিদ্ধ হেমলক বৃক্ষরাজির উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী।

পার্ক প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বে এখানে বহু কাঠুরিয়া গাছ কেটে অর্দ্ধেক বন সাবাড় করেছিল। এখন আইন দ্বারা কাঠ কাটা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যে অর্দ্ধেক অংশ এই আইন দ্বারা রক্ষা পেয়ে গেল, সে দিকটায় আদিম যুগের অরণ্যানী বিরাজমান, সেখানে টিউলিপ বৃক্ষ দেখা যাবে—যার গুঁড়ির বেড় ৬০৭ ফুট; লরেল গাছ দেখা যাবে, দোতালা সমান উঁচু এবং তার গুঁড়ি ৮২ ইঞ্চি বেড় বিশিষ্ট। একটা বন্ধ আঙুর লতার বেড় দেখা গিয়েছে পাঁচ ফুট। শরতে ও বসন্তে এই অরণ্য বিভিন্ন বর্ণের পত্র ও পুষ্পশোভায় অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হয়।

এই পর্ব্বতে পূর্ব্বে যথেষ্ট হরিণ পাওয়া যেত, পাহাড়ী লোকদের অব্যর্থ বন্দুকের গুলির উপদ্রবে হরিণের বংশ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে এখনও ভল্লুক যথেষ্ট পাওয়া যায়। বিশ বৎসর পূর্ব্বেও এই অঞ্চলে বন্ধ নেকড়ে ও পার্ব্বত্য সিংহ দেখা যেত। বন্ধ টার্কি ও গ্রাউজ পাখী এখনও পাওয়া যায়। পাখী হরেক রকমের আছে—রেণ পাখী থেকে ঈগল পর্য্যন্ত। একবার আণ্ডারহেডে যেতে বনের মধ্যে ঈগলের কর্কশ স্বর শুনে চেয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড গোল্ডেন ঈগল, যা কি না সাধারণতঃ চোখে পড়ে না, অনেক উঁচু একটা শৃঙ্গের উপর বসে আছে। বনে অনেক রকমের কাঠঠোকরার শব্দ প্রতিনিয়তই পাওয়া যায়।

প্রস্তাবিত ব্লু রিজ পার্কওয়ে নামক পথটী এই ন্যাশনাল পার্ককে উত্তরস্থ প্রসিদ্ধ শেনানডোয়া ন্যাশনাল পার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়ে উত্তর ক্যারোলিনার কয়েকটি বিখ্যাত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় স্থানের সঙ্গে এর নৈকট্য আনয়ন করছে—যেমন গ্রাণ্ডফাদার পর্ব্বত, লিনভিল জলপ্রপাত ইত্যাদি পার্কের দক্ষিণ সীমানায় পাহাড়ের নিকট ফ্যানটিটলা হ্রদ, যার উপকূলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০ মাইল। এই হ্রদটি যদিও পাহাড়ী জলধারাকে বাঁধ দিয়ে আটকে তৈরী, শান্ত বন পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত এই সুবিস্তৃত জলাশয়টীকে প্রকৃতিসৃষ্ট বলেই মনে হবে। যে দিন আমরা পর্ব্বত থেকে আসি ভ্রমণ শেষ করে, সে দিন গ্যাটলিনবার্গের এক সরাইতে জনৈক পাহাড়ী লোকের সঙ্গে দেখা। আমার মুখে পাহাড়ভ্রমণের গল্প শুনে সে বললে, তুমি এখনও এ পাহাড়ের কিছুই দেখ নি।

তারপর সে এমন অনেক স্থান ও দৃশ্যাবলীর উল্লেখ ও বর্ণনা করলে আমি যাদের নামও শুনিনি।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

—শ্রীমতিলাল দাশ

১

সেদিন বঙ্কিম শতবার্ষিকী এসেছিল। কিন্তু বাংলা দেশে সাড়া দেখি নি। কিছুদিন হল সারা পশ্চিম-য়ুরোপ দেখবার সুযোগ হয়েছিল। বঙ্কিম যদি য়ুরোপে জন্মাতেন, তা হলে তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব হত জাতীয় উৎসব। তাঁর জন্য নগরে নগরে চলত শ্রদ্ধার ও পূজার আয়োজন। বাংলা দেশে কিছু কিছু হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর মহত্ত্বের ও প্রতিভার তুলনায় আমরা কিছুই করি নি।

বঙ্কিম যুগোত্তর এবং যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ। বঙ্কিমের পূজা বাঙালীর প্রতি নর ও নারীর কর্ত্তব্য। তাঁর জন্য আমাদের প্রত্যহ তর্পণ করা উচিত। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছিলেন—আমরা এখনও বঙ্কিমের যুগে বাস করছি—তিনি যে ভাষা দিয়েছেন, যে আদর্শ দিয়েছেন, যে কল্পনা দিয়েছেন, আমরা তারই মণ্ডলে আবর্ত্তন করছি।

বঙ্কিমের তর্পণ করতে হলে, তাই শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করতে হবে, তাঁর বাণীর অনুধাবন করতে হবে, তাঁর মন্ত্রের ধ্যান করতে হবে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

বাংলায় গত শতাব্দীতে যে উদ্বোধন হয়েছিল, বঙ্কিম তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোতা। পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন—

"রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেবদেহের জ্যোতির্ম্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মাণিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা যে-কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্য্যে সমর্থ হইয়াছিল।"

কিন্তু নবযুগের হোতা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী আজিও লেখা হয় নাই—তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যে-জীবনী লিখেছেন, তাকে বঙ্কিমের বিশদ্ জীবনী বলা ভুল হবে—তিনি বঙ্কিম-প্রসঙ্গ দিয়েই কাজ আরম্ভ করেন—প্রসঙ্গ কালক্রমে জীবনীতে পরিণত হয়েছে। তিনি ১৩৩৮ সালে লেখা তার তৃতীয় সংস্করণে লিখেছেন, "এখনও সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ হয় নি।"

তা ছাড়া জীবনী-লেখককে নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু হতে হবে—শচীশ বাবুর নিকট সেই নিরপেক্ষ, নির্ভীক সমালোচনা আশা করা ঠিক নয়। বঙ্কিমের মত অতি-মানবের চরণে তাঁর যে অর্ঘ্য—সে অর্ঘ্য তাঁকে বরণীয় করবে—কিন্তু বঙ্কিমের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জীবন-চরিত লেখা প্রয়োজন।

বিরল-অবসর জীবনে এই দুঃসাহস করা আমার উচিত হয় নি—কিন্তু বন্ধুবর নাগ, পি. ই. এন.ক্লাবের পক্ষ থেকে বঙ্কিম শতবার্ষিকীর আয়োজন করছেন—দেখা হতেই বললেন, "বঙ্কিমের জীবন নিয়ে কিছু লিখুন না।" বন্ধুর কথায় ছিল প্রেরণা—ওটা ভূতের মত ঘাড়ে চাপল।

কারণ বঙ্কিমকে আমি শ্রদ্ধা করি অন্তরের অন্তর দিয়ে, জানি তাঁর মত মহাপুরুষ বাংলা দেশে অবতীর্ণ হয় নি। জগতের সাহিত্যিক মণ্ডলে আমাদের আশার এই সারথীকে পরিচিত করা প্রয়োজন, তাই তাঁর একখানি ইংরেজী জীবনী রচনায় হাত দিতে বসেছি।

কিন্তু উপকরণ সংগ্রহ করাই দায়, আমাদের দেশে এমন একটিও পাঠাগার নেই—যেখানে গবেষণার জন্য সমস্ত বই পাওয়া যায়, যা কিছু পাওয়া যায় তাও খুঁজে বার করাই দায়।

ইতিহাসের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই, বাংলা ভাষার ইতিহাস-লেখক দীনেশ বাবু বলেছিলেন—"জীবনী দিয়ে কি হবে? বঙ্কিমের রচনাই তাঁর বড় পরিচয়, কবে তিনি কি করেছেন তা নিয়ে মাথা ঘামান কেন?"

বৃদ্ধ সাহিত্যরথী আরও বলেছিলেন—"য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতার ধারা দু'টি আলাদা, ওরা খুঁটি-নাটিকে খুব বড় করেছে, আমরা করেছি তাকে ত্যাগ—"

এই যুক্তিই আমাদের দেশে জীবনী-রচনায় ব্যাঘাত জন্মায়। শচীশ বাবুর নিকট ওঁদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে লেখা, বঙ্কিমের অনেকগুলি চিঠি আছে, বললেন "সেগুলি আমি পুড়িয়ে ফেলব, কিছুতেই কাউকে দেব না।"

আমি বললাম—৫০।৬০ বৎসরের পুরাতন জিনিষের আঘাত আজ আর কাউকে পীড়া দেবে না। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হলেন না।

শচীশ বাবু ভূমিকায় বলছেন "যাহা অসত্য ও অসুন্দর তাহা বরণডালায় স্থান পায় নাই।" অসত্যের স্থান নাই এটা ঠিক, কিন্তু অসুন্দরকে বাদ দিয়ে জীবনী হবে কি করে, এটি বোঝা দায়।

মানুষ দেবতা নয়, কাজেই মানুষের ভুল-চুক স্বাভাবিক, সেই স্বাভাবিকতাকে ভুলে যদি আমরা ভক্তির প্রাসাদ গড়ি, কাল তার প্রভাবকে নষ্ট করবে।

বঙ্কিমের যুগে শিক্ষিত বাঙালী মদ্যপান করতেন, বঙ্কিমও হয় তো করতেন—এই সত্যপ্রচারে তাঁর সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ মাহাত্ম্যের ক্ষতি হবে কি? বোধ হয় ক্ষতি হবে না। মিথ্যা স্তাবকতায় যদি আমার জীবনী রচনা করি তবে সে রচনা তার প্রয়োজন সিদ্ধ করবে না।

শচীশ বাবুর নিকট আমি দুদিন গিয়েছিলাম, তিনি আমায় অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখেছেন, তিনি আদর করে তাঁর লেখা জীবনী উপহার দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমের সম্বন্ধে নানা আলাপ হয়েছে। বঙ্কিম-দৌহিত্র, নীলাব্জকুমারীর জ্যেষ্ঠপুত্র, শ্রীযুত নীলাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করে আমায় অনেক সাহায্য করেছেন। মামা ও ভাগিনেয়ের সম্মুখে বঙ্কিমের সম্বন্ধে আমার কিছু কথাবার্তা হয়, তার সারাংশ নীচে দিলাম।

শচীশ বাবুর বর্ত্তমানের একখানা ছবি রাজা প্যারীমোহনের বংশীয় কুমার রমেন্দ্রনাথের সৌজন্যে পেয়েছি। শচীশ বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, বাংলায় অনেক উপন্যাস ও জীবনী লিখেছেন। 'রাজমোহনের স্ত্রী'র অসম্পূর্ণ বাংলাকে তিনি সম্পূর্ণ করে 'বারিবাহিনী' নাম দিয়ে ছেপেছেন। শেষ বয়সে বঙ্কিমের সাহচর্য্য ও উপদেশ তিনি পেয়েছেন; নিজেকে বঙ্কিমের পুত্রস্থানীয় বলতে তিনি গর্ব্ব অনুভব করেন।

বঙ্কিমের লেখা আত্ম-চরিতের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, "আত্ম-চরিত বলে যেটি সাধারণে প্রচার সেটি একেবারেই আত্ম-চরিত নয়; আমি তা দেখেছি এবং পড়েছি আর তার থেকে সার-সঙ্কলন করেছি। সেটা ইংরেজীতে ফুলস্ক্যাপ কাগজে হাফ-মার্জ্জিনে লেখা, তাতে কয়েকটি philosophical theses আছে এবং তাঁর জীবনের কয়েকটি বড় বড় ঝগড়ার কথা আছে। তাতে নফর ভট্ট মুন্সেফের সঙ্গে ডারউইন তত্ত্ব নিয়ে ঝগড়ার কথা, কর্ণেল ডাফিনের সঙ্গে বিবাদের ইতিহাস—বাকলাণ্ডের সঙ্গে কলহ-বৃত্তান্ত, হেম কর ও রামশঙ্কর সেনের সহিত মনোমালিন্যের গল্প আছে।

কলহপ্রসঙ্গে শচীশ বাবুর পুরাতন গল্প মনে পড়ল, বললেন—"বঙ্কিম মেঘনাদবধে মধুসূদন ক্রিয়াপদকে যে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন—তাকে ব্যঙ্গ করে লেখেন—'নাদিল দানব বালা এক ঝুড়ি ভরি'। তার উত্তরে জনৈক মধুভক্ত প্রত্যুত্তর দেন—'নাচিল কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম বানর।' কবির লড়াই ছিল বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগের বিশেষত্ব—সাহিত্য ক্ষেত্রে তার নমুনা এই সব গল্পে মেলে।"

যাদবচন্দ্রের আত্ম-চরিতের কথায় বলেন—"ঠাকুরদাদা ওটা মুখে মুখে বলেন—শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মশায় লেখেন—আমার দাদাই কাকার শ্রাদ্ধ করেন।"

আনন্দবাজারে হীরেন বাবুর কাঁথির বক্তৃতার কথা উল্লেখ করে বললেন—"বঙ্কিমের সম্বন্ধে অনেক গাল-গল্প অনেকে বলে—আসলে তার কোনই ভিত্তি নাই—রাজলক্ষ্মী দেবী বঙ্কিমের কখনই যোগ্যা সহধর্ম্মিণী ছিলেন না।"

অত্যুক্তি বাঙ্গালীর মজ্জাগত—অলঙ্কারের অপপ্রয়োগ আমাদের মত দুনিয়ায় কেউ করে না। রাজলক্ষ্মী দেবী না থাকলে বঙ্কিম ঔপন্যাসিক হতেন না, এ কথা শুনতে মিষ্ট, কিন্তু কোন ক্রমেই সত্য হতে পারে না। বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত ঘরে সহধর্ম্মিণী আজ ঠিক 'সহধর্ম্মিণী' নন—ওখানেও আমাদের division of labour আমাদের সনাতন বৃত্তিভেদ—স্বামী করেন উপার্জ্জন—কর্ম্মের সকল প্রচেষ্টা তাঁর—স্ত্রী থাকেন পাকশালায়, সন্তান-পালনে, কাজেই রাজলক্ষ্মী দেবী বঙ্কিমের প্রিয়তমা হইলেও তাঁর কাব্য ও উপন্যাসের জনয়িত্রী এ কথা বলা বোধ হয় নিতান্তই ভুল হবে।

শচীশবাবু বললেন—"বঙ্কিম রাজলক্ষ্মীকে নিজে দেখেই বিয়ে করেন—তবু বিয়ের পর বধূকে তিনি দেখতে পারতেন না।—আমার মা কান্তমণি দেবী অনেক করে কাকীমাকে ঘরে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা আটকে স্বামী ও স্ত্রীর মিলন করে দিয়েছিলেন—আমার মাকে কাকা খুব সমীহ করে চলতেন।"

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

—শ্রীমতিলাল দাশ

১

সেদিন বঙ্কিম শতবার্ষিকী এসেছিল। কিন্তু বাংলা দেশে সাড়া দেখি নি। কিছুদিন হল সারা পশ্চিম-য়ুরোপ দেখবার সুযোগ হয়েছিল। বঙ্কিম যদি য়ুরোপ জন্মাতেন, তা হলে তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব হত জাতীয় উৎসব। তাঁর জন্ম নগরে নগরে চলত শ্রদ্ধার ও পূজার আয়োজন। বাংলা দেশে কিছু কিছু হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর মহত্ত্বের ও প্রতিভার তুলনায় আমরা কিছুই করি নি।

বঙ্কিম যুগোত্তর এবং যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ। বঙ্কিমের পূজা বাঙ্গালীর প্রতি নর ও নারীর কর্ত্তব্য। তাঁর জন্ম আমাদের প্রত্যহ তর্পণ করা উচিত। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছিলেন—আমরা এখনও বঙ্কিমের যুগে বাস করছি—তিনি যে ভাষা দিয়েছেন, যে আদর্শ দিয়েছেন, যে কল্পনা দিয়েছেন, আমরা তারই মণ্ডলে আবর্ত্তন করছি।

বঙ্কিমের তর্পণ করতে হলে, তাই শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করতে হবে, তাঁর বাণীর অনুধাবন করতে হবে, তাঁর মন্ত্রের ধ্যান করতে হবে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

বাংলার গত শতাব্দীতে যে উদ্বোধন হয়েছিল, বঙ্কিম তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোতা। পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন—

"রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেবদেহের জ্যোতির্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মাণিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা যে-কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্য্যে সমর্থ হইয়াছিল।"

কিন্তু নবযুগের হোতা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী আজিও লেখা হয় নাই—তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যে-জীবনী লিখেছেন, তাকে বঙ্কিমের বিশদ্ জীবনী বলা ভুল হবে—তিনি বঙ্কিম-প্রসঙ্গ নিয়েই কাজ আরম্ভ করেন—প্রসঙ্গ কালক্রমে জীবনীতে পরিণত হয়েছে। তিনি ১৩৩৮ সালে লেখা তার তৃতীয় সংস্করণে লিখেছেন, "এখনও সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ হয় নি।"

তা ছাড়া জীবনী-লেখককে নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু হতে হবে—শচীশ বাবুর নিকট সেই নিরপেক্ষ, নির্ভীক সমালোচনা আশা করা ঠিক নয়। বঙ্কিমের মত অতি-মানবের চরণে তাঁর যে অর্ঘ্য—সে অর্ঘ্য তাঁকে বরণীয় করবে—কিন্তু বঙ্কিমের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জীবন-চরিত লেখা প্রয়োজন।

বিরল-অবসর জীবনে এই দুঃসাহস করা আমার উচিত হয় নি—কিন্তু বন্ধুবর নাগ, পি. ই. এন.ক্লাবের পক্ষ থেকে বঙ্কিম শতবার্ষিকীর আয়োজন করছেন—দেখা হতেই বললেন, "বঙ্কিমের জীবন নিয়ে কিছু লিখুন না।" বন্ধুর কথায় ছিল প্রেরণা—ওটা ভূতের মত ঘাড়ে চাপল।

কারণ বঙ্কিমকে আমি শ্রদ্ধা করি অন্তরের অন্তর দিয়ে, জানি তাঁর মত মহাপুরুষ বাংলা দেশে অবতীর্ণ হয় নি। জগতের সাহিত্যিক মণ্ডলে আমাদের আশার এই সারথীকে পরিচিত করা প্রয়োজন, তাই তাঁর একখানি ইংরেজী জীবনী রচনায় হাত দিতে বসেছি।

কিন্তু উপকরণ সংগ্রহ করাই দায়, আমাদের দেশে এমন একটিও পাঠাগার নেই—যেখানে গবেষণার জন্ম সমস্ত বই পাওয়া যায়, যা কিছু পাওয়া যায় তাও খুঁজে বার করাই দায়।

ইতিহাসের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই, বাংলা ভাষার ইতিহাস-লেখক দীনেশ বাবু বলেছিলেন—"জীবনী দিয়ে কি হবে? বঙ্কিমের রচনাই তাঁর বড় পরিচয়, কবে তিনি কি করেছেন তা নিয়ে মাথা ঘামান কেন?"

বৃদ্ধ সাহিত্যরথী আরও বলেছিলেন—"য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতার ধারা দু'টি আলাদা, ওরা খুঁটি-নাটিকে খুব বড় করেছে, আমরা করেছি তাকে ত্যাগ—"

এই বুদ্ধিই আমাদের দেশে জীবনী-রচনায় ব্যাঘাত জন্মায়। শচীশ বাবুর নিকট ওঁদের পারিবারিক ব্যাপারই নিয়ে লেখা, বঙ্কিমের অনেকগুলি চিঠি আছে, বললেন "সেগুলি আমি পুড়িয়ে ফেলব, কিছুতেই কাউকে দেব না।"

আমি বললাম—৫০।৬০ বৎসরের পুরাতন জিনিষের আঘাত আজ আর কাউকে পীড়া দেবে না। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হলেন না।

শচীশ বাবু ভূমিকায় বলছেন "যাহা অসত্য ও অসুন্দর তাহা বরণডালায় স্থান পায় নাই।" অসত্যের স্থান নাই এটা ঠিক, কিন্তু অসুন্দরকে বাদ দিয়ে জীবনী হবে কি করে, এটি বোঝা দায়।

মানুষ দেবতা নয়, কাজেই মানুষের ভুল-চুক স্বাভাবিক, সেই স্বাভাবিকতাকে ভুলে যদি আমরা ভক্তির প্রাসাদ গড়ি, কাল তার প্রভাবকে নষ্ট করবে।

বঙ্কিমের যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী মদ্যপান করতেন, বঙ্কিমও হয় তো করতেন—এই সত্যপ্রচারে তাঁর সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ মাহাত্ম্যের ক্ষতি হবে কি? বোধ হয় ক্ষতি হবে না। মিথ্যা স্তাবকতায় যদি আমার জীবনী রচনা করি তবে সে রচনা তার প্রয়োজন সিদ্ধ করবে না।

শচীশ বাবুর নিকট আমি দুদিন গিয়েছিলাম, তিনি আমায় অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখেছেন, তিনি আদর করে তাঁর লেখা জীবনী উপহার দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমের সম্বন্ধে নানা আলাপ হয়েছে। বঙ্কিম-দৌহিত্র, নীলাব্জকুমারীর জ্যেষ্ঠপুত্র, শ্রীযুত নীলাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করে আমায় অনেক সাহায্য করেছেন। মামা ও ভাগিনেয়ের সম্মুখে বঙ্কিমের সম্বন্ধে আমার কিছু কথাবার্ত্তা হয়, তার সারাংশ নীচে দিলাম।

শচীশ বাবুর বর্ত্তমানের একখানা ছবি রাজা প্যারীমোহনের বংশীয় কুমার রমেন্দ্রনাথের সৌজন্যে পেয়েছি। শচীশ বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, বাংলায় অনেক উপন্যাস ও জীবনী লিখেছেন। 'রাজমোহনের স্ত্রী'র অসম্পূর্ণ বাংলাকে তিনি সম্পূর্ণ করে 'বারিবাহিনী' নাম দিয়ে ছেপেছেন। শেষ বয়সে বঙ্কিমের সাহচর্য্য ও উপদেশ তিনি পেয়েছেন; নিজেকে বঙ্কিমের পুত্রস্থানীয় বলতে তিনি গর্ব্ব অনুভব করেন।

বঙ্কিমের লেখা আত্ম-চরিতের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, "আত্ম-চরিত বলে যেটি সাধারণে প্রচার সেটি একেবারেই আত্ম-চরিত নয়; আমি তা দেখেছি এবং পড়েছি আর তার থেকে সার-সঙ্কলন করেছি। সেটা ইংরেজীতে ফুলস্‌ক্যাপ কাগজে হাফ-মার্জিনে লেখা, তাতে কয়েকটি philosophical theses আছে এবং তাঁর জীবনের কয়েকটি বড় বড় ঝগড়ার কথা আছে। তাতে নফর ভট্ট মুন্সেফের সঙ্গে ডারউইন তত্ত্ব নিয়ে ঝগড়ার কথা, কর্ণেল ডাফিনের সঙ্গে বিবাদের ইতিহাস—বাকলাণ্ডের সঙ্গে কলহ-বৃত্তান্ত, হেম কর ও রামশঙ্কর সেনের সহিত মনোমালিন্যের গল্প আছে।

কলহপ্রসঙ্গে শচীশবাবুর পুরাতন গল্প মনে পড়ল, বললেন—"বঙ্কিম মেঘনাদবধে মধুসূদন ক্রিয়াপদকে যে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন—তাকে ব্যঙ্গ করে লেখেন—'নাচিল দানব বালা এক ঝুড়ি ভরি'। তার উত্তরে জনৈক মধুভক্ত প্রত্যুত্তর দেন—'নাচিল কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম বানর।' কবির লড়াই ছিল বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগের বিশেষত্ব—সাহিত্য ক্ষেত্রে তার নমুনা এই সব গল্পে মেলে।"

যাদবচন্দ্রের আত্ম-চরিতের কথায় বলেন—"ঠাকুরদাদা ওটা মুখে মুখে বলেন—শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মশায় লেখেন—আমার দাদাই কাকার শ্রাদ্ধ করেন।"

আনন্দবাজারে হীরেন বাবুর কাঁথির বক্তৃতার কথা উল্লেখ করে বললেন—"বঙ্কিমের সম্বন্ধে অনেক গাল-গল্প অনেকে বলে—আসলে তার কোনই ভিত্তি নাই—রাজলক্ষ্মী দেবী বঙ্কিমের কখনই যোগ্য সহধর্ম্মিণী ছিলেন না।"

অত্যুক্তি বাঙ্গালীর মজ্জাগত—অলঙ্কারের অপপ্রয়োগ আমাদের মত দুনিয়ায় কেউ করে না। রাজলক্ষ্মী দেবী না থাকলে বঙ্কিম ঔপন্যাসিক হতেন না, এ কথা শুনতে মিষ্ট, কিন্তু কোন ক্রমেই সত্য হতে পারে না। বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত ঘরে সহধর্ম্মিণী আজ ঠিক 'সহধর্ম্মিণী' নন—ওখানেও আমাদের division of labour আমাদের সনাতন বৃত্তিভেদ—স্বামী করেন উপার্জ্জন—কর্ম্মের সকল প্রচেষ্টা তাঁর—স্ত্রী থাকেন পাকশালায়, সন্তান-পালনে, কাজেই রাজলক্ষ্মী দেবী বঙ্কিমের প্রিয়তমা হইলেও তাঁর কাব্য ও উপন্যাসের জনয়িত্রী এ কথা বলা বোধ হয় নিতান্তই ভুল হবে।

শচীশবাবু বললেন—"বঙ্কিম রাজলক্ষ্মীকে নিজে দেখেই বিয়ে করেন—তবু বিয়ের পর বধূকে তিনি দেখতে পারতেন না।—আমার মা কান্তমণি দেবী অনেক কষ্টে কাকীমাকে ঘরে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা আটকে স্বামী ও স্ত্রীর মিলন করে দিয়েছিলেন—আমার মাকে কাকা খুব সমীহ করে চলতেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমা স্ত্রীকে অতিশয় ভালবাসতেন। প্রথমা স্ত্রী কৈলাসমণি তাঁর নয়নের মণি ছিল। বিয়ের পর হয়ত পুরাতন প্রেমের সহিত নূতন প্রেমের সংঘষ বেধেছিল।

শচীশবাবু বললেন—"কাকা মেজ-খুড়ীমাকে" তাঁর লেখা পড়িয়ে শোনাতেন, কাকীমা কখনও কোনও suggestion দিতেন না—তাঁর সে ক্ষমতা ছিল না—কাকা বলতেন—ওটা ছিল কাণে শোনবার জন্য—একজনকে পড়ে শোনালে বোঝা যাবে ঠিক ঠিক হয়েছে কি না।"

তবে শেষ বয়সে তিনি স্ত্রীর অত্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন।

শচীশবাবুর কোন্নগরের এক দিদি আসায় উঠে গেলে কিন্তু নীলাদ্রি বাবু বললেন—"মামার কথা ঠিক নয়—রাজলক্ষ্মী দেবী সত্যই গুণশালিনী ছিলেন।"

শচীশবাবু বললেন—"কাকীমা আমাকে খুব সংস্কৃতজ্ঞ বলে মনে করতেন—মৃত্যুবাসরে তাঁকে গীতা পড়িয়ে শোনাবার জন্য প্রথমে ডাক হয় জামাতা রাখালের—তিনি পারলেন না—তখন ডাক হল বিপিন-দার। তাঁর পড়াও কাকার ভাল লাগল না—তখন খুড়ী-মা আমায় ডেকে দিলেন—আমার পড়াও তাঁর পছন্দ হল না—আমায় বাঁদর বলে তাড়িয়ে দিলেন। পরে কাকীমার সঙ্গে দেখা হতে বললেন—'এইবার তোমার জারি-জুরি সব ভাঙল'।"

"আমি তখন অং বং জুড়ে সংস্কৃতের শ্লোক আউড়ে চললাম—বললাম, আমি খুব পারি, তবে কাকার সামনে তাও কি হয়?"

"খুড়ী-মা আমার চালাকি বুঝলেন না, ভাবলেন আমি বুঝি সত্যই বড় পণ্ডিত।

"খুড়ীমার বরাবরই ইচ্ছে ছিল যে আমি যেন তাঁর শেষকৃত্য করি। স্বগোত্রীয়ের হস্তে তাঁর মুখাগ্নি হোক এই ইচ্ছে তাঁর বরাবরই ছিল, এই কথা অনেকবার আমায় বলছেন।

"তিনি আমায় প্রলোভনও দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে আমি যেন তাঁর শেষকৃত্য করি, আমায় তা হলে কিছু দেবেন।

আমি বলি—'তুমি কি দেবে?'

"তাতে বলেন, 'তোমার কাকা কিছু দিয়ে গেছেন।'

"ভাগিনেয়েরা তাঁর অসুখ বা মৃত্যুর খবর আমাকে দেয়নি, তাঁর শেষশয্যার কোনও কাজই আমি করতে পাইনি এবং তাঁর প্রতিশ্রুত কিছুও পাইনি।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "বারিবাহিনীর স্বত্ব ত আপনার?"

"হ্যাঁ ওটা আমারই, কাকা ওটা মরবার দু-তিন মাস আগে আমাকে দিয়ে যান, বলেন, যেন আমি এটা শেষ করি।"

আমি ব্রজেনবাবুর প্রকাশিত রাজমোহনের স্ত্রী নামক উপন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করি—"কিন্তু বঙ্কিম নিশ্চয়ই জানতেন যে, তাঁর বই শেষ হয়েছে—কাজেই আপনাকে শেষ করতে বলার মানে কি?"

"বারিবাহিনী যখন লিখতে বসেন তখন *'Indian Field'*এর কপি তাঁর কাছে ছিল না।"

আমি বললাম, *"Rajmohan's Wife* তাঁর প্রথম উপন্যাস, প্রথম সন্তানের প্রতি তাঁর নিশ্চয়ই অত্যন্ত স্নেহ ছিল, কিন্তু এ বইটি কেন তিনি পুনরায় ছাপেন নি?"

বললেন—"ইংরেজীতে লেখা বলে হয়তো, শেষকালে তিনি ইংরেজীতে লিখতে চাইতেন না, তাই বোধ হয় বইটির বাংলা করতে গিয়েছিলেন।"

'বারিবাহিনী' প্রসঙ্গে বললেন, "সাধু চলে যাওয়ার পরে পাণ্ডুলিপিটা আমায় দেন, পাণ্ডুলিপি বরাবরই আমার কাছে ছিল। 'বারিবাহিনী' ছাপবার ৫।৭ বৎসর পরে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে হরিদাস বাবুকে দিয়েছি, কাগজ brittle হয়ে উঠেছিল, বগলির হাঙ্গামে নষ্ট হবে মনে করে ওঁকে দিয়ে দিয়েছি, এটা এখন হরিদাস বাবুর কাছেই

আমি প্রশ্ন করলাম—"বারিবাহিনী কখন তিনি লিখতে আরম্ভ করেন?"

উত্তর পেলাম, "বঙ্কিম বাবু রাজমোহনের স্ত্রী নাম দিয়ে প্রথম সাত পরিচ্ছেদ লেখেন, আমি বইটা শেষ করলে সুরেশ সমাজপতি বারিবাহিনী নাম দিতে বলেন, কাকা এটা ১৮৯৩ সালে বাংলা করতে আরম্ভ করেন।"

বর্ষ-প্রবন্ধপঞ্জী

—শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

[গত ১৩৪৫ সালে 'পরিচয়' "প্রবাসী', 'বঙ্গশ্রী', 'বসুমতী', 'বিচিত্রা' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা এই পঞ্জীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প, প্র, বং ব, বি ও ভা পত্রিকাগুলির যথাক্রম সঙ্কেত। সংখ্যাগুলি বর্ষ, খণ্ড এবং প্রকাশ—সংখ্যাবাচক, যথা—বং ৬,২।১ = বঙ্গশ্রী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা।

ইতিহাস

৯১ (ভ্রমণ)

মণিপুরে দশদিন—শ্রীনৃপেন্দু গুহ

ভা ২৬।১।২ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১২ (২৬৮-৭৯) ; ছবি ১০

মধ্য এসিয়ার যাযাবর জাতি—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বং ৭।১।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (১০২-০৮) ; ছবি ৬ ; মানচিত্র ১

বং ৭।১।২ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (১৯৩-২০০) ; ছবি ৫

মিশর দেশে—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

বি ১২।১।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১২ (৮৯-১০০) ; ছবি ৮

মোজি ও সাংহাইয়ের ঘাটে—শ্রীশান্তাদেবী

প্র ৩৮।২।৫ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৭৩৬-৪১)

মোটর-বাইকে পাঁচ হাজার মাইল—শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ

ভা ২৬।১।৬ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (৮৯৯-৯০৯) ; ছবি ১১

ভা ২৬।২।১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৫২-৬১) ; ছবি ৭

রাজগীর, নালন্দা, ও পাটলিপুত্র—শ্রীঅবনীনাথ রায়

বং ৬।১।৬ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৮০৯-১৪) ; ছবি ৬

রামেশ্বরম্—শ্রীরমেন্দ্রকুমার পাল

ভা ২৬।১।৬ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৮৭৭-৮৩) ; ছবি ৫

রিভিয়েরার স্মৃতি—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

বি ১২।১।৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৬১৩-২২) ; ছবি ৭

লুসার্নে দুটি দিন—শ্রীমতিলাল দাশ

ভা ২৫।২।২৬ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৮৯১-৯৮) ; ছবি ১১

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন—শ্রীসৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

ভা ২৬।১।৪ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৫৫২-৫৯) ; ছবি ৭

শিলং—শ্রীঅবনীনাথ রায়

বি ১১।২।৪ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৫০২-০৯) ; ছবি ১৪

সতী কল্লন্—শিলং—কুমারী কল্যাণী সরকার

বি ১২।১।৬ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৮৫৩-৫৫)

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় শতাব-খোতা—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

বং ৬।১।৬ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৭৫৭-৫৮) ; ছবি ২

বিশেষ বিবরণের জন্য লেখকের "ওসলো ও বের্গেন" নামক ভ্রমণ-কাহিনী বং ৫।২।৬ পৌষ ১৩৪৪ দ্রষ্টব্য।

সাহারা-বক্ষে—শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

ব ১৭।২।১ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ২১ (৮৯-১০৯) ছবি ৩৫

সাহারার পথে লবণবাহী বণিক্‌দল—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বং ৭।১।৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৩১৭-২৩) ; ছবি ৫

পর্যটক ফ্রিল্যাণ্ডের বর্ণনা হইতে

সুন্দর সুইট্‌জারল্যাণ্ড—শ্রীসুবর্ণেন্দু গুপ্ত

ভা ২৬।২।১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৯৮-১০১) ছবি ৫

হরিদ্বারে কুম্ভমেলায়—শ্রীমন্মথচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

বং ৬।১।৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৭১৭-২৪) ছবি ৫

বং ৬।১।৬ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৮২৯-৩১) ; ছবি ৩

হরিপুরার পাড়ি—শ্রীআশু দে

ভা ২৫।২।৬ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৮৭২-৮১) ; ছবি ১২

হাম্পী ভ্রমণ—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার

ব ১৭।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৮৬৪-৭০) ; ছবি ৩

ব ১৭।১।৬ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৯১৬-২৪) ছবি

হিমালয়ের পাদদেশে—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

ভা ২৬।২।৩ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৪০৯-১৭ ছবি ১১

৯১ (ভূগোল)

ওয়াজিরিস্থান পরিচয়—শ্রীমতী শান্তি লাহিড়ী

ব ১৭।২।২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (২১০-১২)

কেপ কলোনির কথা—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

বি ১২।২।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (৭৩-৮৩) ; ছবি ৭

ছোট নাগপুরের মালভূমি—শ্রীকাননগোপাল বাগচী

বং ৬।২।৬ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৮১২-১৫) ; ছবি ১০

জলধি-বেষ্টিত জাপান—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

বং ৬।২।১ শ্রাবণ ; ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৩২-৩৮) ছবি ৩

বং ৬।২।৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৭০০-৭০৭) ছবি ৩

ডানিয়ুবের উপকূলশ্রী—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বি ১২।১।৬ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৩ (৭৮১-৯৩) ; ছবি ; ১১

নরওয়ের কৃষি ও বনসম্পদ—শ্রীএস. পিলসেন

৯২ (জীবনী)

রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

ভা ২৬।১।৩ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৯৩১-৩৫)

রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

বি ১২।১।৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৫৭৩-৮০) ; ছবি ৭

লুই পাস্তুর—শ্রীনীলরতন কর

বং ৬।২ ৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৪২৭-৩৫) ; ছবি ৭

বং ৬।২।৬ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৮০৯-১৬) ; ছবি ৭

বং ৭।১।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৮৪-৯২) ; ছবি ৪ এবং রেখাচিত্র

বং ৭।১।২ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (২১৫-২৫) ; ছবি ৩

শরৎ-স্মৃতি—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র ৩৮।২।১ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৬২-৭১)

শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব শ্রীআলামোহন দাস-জীবনী

—আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্র ৩৮।২।১ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৭২-৮০) ; ছবি ৩

প্র ৩৮।২।২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (২৪৬-৪৯) ; ছবি ১

শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব ২। কর্ম্মবীর আলামোহন দাস

—আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্র ৩৮।১।৬ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৭৫৫-৫৮)

শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব ১। শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

—আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্র ৩৮।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৬৯৬-৭০০) ; ছবি ১

শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্র ৩৮।২।৫ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৬৭৩-৭৫) ; ছবি ৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব (পূর্ব্বানুবৃত্তি) —দুর্গাপদ মিত্র

ব ১৭।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৪৩-৪৬) ; ছবি ৩

ব ১৭।১।২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (১৯০-৯৫) ; ছবি ৪

ব ১৭।১।৩ আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৩৯৮-৪০২) ; ছবি ২

ব ১৭।১।৪ শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৬১২-১৫) ; ছবি ১

ব ১৭।১।৫ ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৭৬৯-৭১)

ব ১৭।২।১ কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (৪-১৪) ; ছবি ৬

ব ১৭।২।২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (২৪৫-৫১) ; ছবি ২

ব ১৭।২।৩ পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৩৯৩-৪০০) ; ছবি ৪

ব ১৭।২।৪ মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৫৮২-৮৮)

ব ১৭।২।৫ ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৮১৯-২২)

ব ১৭।২।৬ চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (৯৯০-১০০০) ; ছবি ২৪

স্বর্গীয় নবীগোপাল মজুমদার—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র ৩৮।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৪৪০-৪২)

স্বর্ণকুমারী দেবী - শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

ভা ২৬।২।১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (১০৮-১২)

স্মৃতি-পূজা - শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ব ১৭।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (২৭৭-৮৩)

স্যর প্রমোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীঅবনীনাথ রায়

ভা ২৬।১।৩ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৪৫৯-৬০)

সাহিত্যিক চারুচন্দ্র—শ্রীকালীচরণ মিত্র

বি ১২।১।৬ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৮১২-২০)

হতভাগ্য দারা শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ

ব ১৭।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৪৪৭-৫৩)

হান্স্ ক্রিশ্চান অ্যাণ্ডেরসেন—শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

প্র ৩৮।২।২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (২১৫-২১) ; ছবি ৯

হ্যাকর্ ব্র. ক্যারনাগেল্ শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

প ৮।২।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (২৩-২৯)

৯৩ (ভারতের পুরাতত্ত্ব)

অতীতের সন্ধান

প্র ৩৮।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৪২৩-৩২) ; ছবি ১৫

৯৪ (ভারতের সাধারণ ইতিহাস)

অশোকের ধর্ম—শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়

বি ১২।২।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৯২-৯৬)

ইবন্ বতুতার ভারত-ভ্রমণ—শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভা ২৬।২।৪ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৫২৬-৩১) ; ছবি ৩

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্বন্ধে দুই-একটি কথা

—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র ৩৭।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৬ (৪৩৩-৩৮)

চন্দ্রগুপ্ত কোন জাতি ?—শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ব ১৭।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৭৫১-৫৫)

ভারতীয় জাতীয়তার জন্ম - শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প ৮।১।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৫৮-৬৬)

মগধ ও দক্ষিণ বিহার—শ্রীঅবনীনাথ রায়

বং ৬।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৫৬৬-৭৩)

মোগল ও রাজপুত, আওরঙ্গজেব ইতিহাসের এক অধ্যায়

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

প্র ৩৮।২ ৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ , পৃঃ ৬ (৮৭২-৭৭)

সম্রাট্ রামগুপ্ত—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

ভা ২৬।২।৩ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৩৩৭-৪২)

সহিফগঞ্জ—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ব ১৭।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (১৫৭-৬১) ; ছবি ১

সিপাহীযুদ্ধের নূতন কথা—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বং ৭।১।১ ; মাঘ ১৩৪১ ; পৃঃ ৭ (১২৫-৩১)

বং ৭।১।৩ ; চৈত্র ১৩৪১ ; পৃঃ ৫ (৩০৯-৯৩)

হায়দর আলি এবং তাঁহার ইউরোপীয় সেনানীবর্গ

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বি ১২।১।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (১৩৮-১৪৭)

বি ১২।১।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ১২ (৩০৮-১৯)

আদিশূর—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ব ১০।২।৪ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৬০৯-১৩)

আদিশূর—শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

ভা ২৮।২।১ ; পৌষ ১৩৪১ ; পৃঃ ৩ (১১৯-২১)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্ধকার যুগ—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী

প্র ৩৮।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৩৫২-৬১)

বক্তিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গবিজয়—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ব ১৭।২।৫ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৭৫৯-৭৯)

বঙ্গদেশ ও আর্য্যামি—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ

বং ৬।২।৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৪৪৭-৫২)

বাঙ্গালার বর্ণী—শ্রীনিখিলনাথ রায়

বং ৬।১।৪ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৫৩৯-৫৮)

বং ৬।১।৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৭৩২-৩৫)

বং ৬।১।৬ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৮৩৪-৪২)

বং ৬।২।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১ (৮১-৮৭)

বং ৬।২।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (১৭৪-৭৭)

বং ৬।২।৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৪৫৩-৫৬)

বাংলা দেশে বৈদিক সভ্যতা—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

প ৭।২।৬ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (১১৫৫-৬২)

বাংলার সীমানার পুনর্গঠন—শ্রীঅমিয় বসু

প্র ৩৮।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৩৮৮-৯৭) ; মানচিত্র ১

বাংলায় মাৎস্যন্যায়—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ব ১৭।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৪৪০-৪৪) ; মানচিত্র ১

মধ্যবঙ্গের বিধ্বস্ত পল্লী-অঞ্চলের পুনঃ-সংস্কার—শ্রীহরিদাস মিত্র

বং ৬।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৫২৬-৩৪)

বং ৬।২।৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৫১৫-১৮)

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতন ও যশোর রাজবংশ

—শ্রীঅমিয়কুমার ভট্টাচার্য

বি ১২।১।৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৪৮৪-৯১)

রাজা গণেশনারায়ণ ভাদুড়ী—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র পাল

ব ১৭।২।৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৯২২-২৮) ; ছবি ৫

ষষ্ঠ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের ধারা—শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভা ২৬।১।৫ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৮০২-০৬)

[ক্রমশঃ

যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে যা জানা দরকার

(জনৈক চিকিৎসক)

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'লেনেক' (Lannec) শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া আবিষ্কার করেন যে ফুস্ ফুসে দানা হইতে "টিউবারকিউলোসিস" (Tuberculosis) রোগের উৎপত্তি হয়। পরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান পণ্ডিত কক (Koch) যক্ষ্মাবীজাণু আবিষ্কার করেন। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও এই ব্যাধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে পুষ্টিকর খাদ্যাভাব, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বহুলোকের একত্রবাস, দুর্গন্ধ দূষিত খূলিশ্বাস গ্রহণ, রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের ছোঁয়াচ প্রভৃতি রোগ সংক্রামণ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

যক্ষ্মার প্রাথমিক লক্ষণগুলি আমাদের জানা থাকিলে আমরা প্রথমাবস্থায় সাবধান হইতে পারি। ভারতীয় প্রাচীন ভিষক, গাত্রস্পর্শ, নিশ্বাস, একই শয্যায় শয়ন, একত্র ভোজন, একই বস্ত্র পরিধান, অতিরিক্ত স্ত্রীসংগম, অত্যন্ত পরিশ্রম প্রভৃতি দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয় এরূপ কারণ দর্শাইয়াছেন। বড় বড় সহরে অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় পুষ্টিকর খাদ্যাভাব, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বহুলোকের একত্রবাস, দুর্গন্ধ দূষিত ধূলিশ্বাস গ্রহণ, পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ, রোগ গোপন করিয়া বিবাহ, রোগগ্রস্ত পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর সাহচর্য্য প্রভৃতি রোগ সংক্রামণ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। দূষিত বাসনপত্র দ্বারাও রোগ বিস্তার লাভ করিতে পারে।

এই ভীষণ মৃত্যুযোগ্য ব্যাধির প্রাথমিক লক্ষণগুলি যথা—অল্প অল্প কাশি সান্ধ্যকালীন জ্বর, বুকে বেদনা, অল্পে ক্লান্তিবোধ, শরীর ক্ষয়, সুধামান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ দেখা মাত্র বিজ্ঞান সম্মত মতে চিকিৎসা করা উচিত। য়ুরোপে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু-সংখ্যা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইলে সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত গবেষণাগারে "সিরোলিনের" প্রথম আবিষ্কার হয়। অধুনা ডাক্তারগণ বহু যক্ষ্মানিবাসে প্রতিষেধক ও রোগ নাশক হিসাবে এবং যক্ষ্মারোগের প্রথমাবস্থায় "সিরোলিন রচি" ব্যবস্থা দিয়া বহু নরনারীকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন।



বাংলার ছবি (১)

শ্রী[illegible] ঘোষ

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

বৈশাখ—১৩৪৭

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

ভা-বিচার (৪)

"মোক্ষ-যোগ-বিচার"

আমরা এক্ষণে "মোক্ষ," "মোক্ষ-যোগ" ও "মোক্ষ-ধর্ম্ম" এই তিনটি কথার প্রকৃত অর্থ অথবা সংজ্ঞা কি এবং মোক্ষপরায়ণ হইবার পন্থা সম্বন্ধে ঋষিগণ কি কি নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব।

অনেকের বিশ্বাস যে, মোক্ষ-লাভ করিতে পারিলে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিবার ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং উহা সর্ব্বতোভাবে জীবনের আরাধ্য। ইহাঁদিগের ধারণা যে, দেহত্যাগ অথবা মরণের পর ছাড়া মোক্ষ-লাভ করা সম্ভব-যোগ্য নহে। অথচ ইহাঁদিগের কেহই "মোক্ষ-শব্দে"র প্রকৃত অর্থ যে কি তৎসম্বন্ধে তলাইয়া চিন্তা করেন না। মোক্ষ-শব্দের প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহা যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "মোক্ষ" জীবিতাবস্থাতেই লাভ করিবার পদার্থ এবং উহা লাভ করিতে না পারিলে সজীব-পদার্থ-সম্বন্ধীয় কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানে যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব হয় না। উহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ সজীব পদার্থ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইবার উহাই একমাত্র প্রথম সোপান। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যে বিজ্ঞানের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আদৌ সজীব-পদার্থ-সম্বন্ধীয় নহে। পরন্তু, সর্ব্বৈব মৃত ও কৃত্রিম পদার্থ-সম্বন্ধীয়।

হেমচন্দ্রের অভিধানানুসারে "মোক্ষ" শব্দের অর্থ "মৃত্যু।" "মৃত্যুঃ—ইতি হেমচন্দ্রঃ"।

পাঠকগণ হয়ত মনে করিবেন যে, হেমচন্দ্র যখন "মোক্ষ"-শব্দের অর্থে "মৃত্যু" লিখিয়াছেন, তখন যে-কোন মরণের নামই "মোক্ষ" এবং দেহত্যাগ না ঘটিলে মোক্ষ লাভ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় "মৃত্যু" ও "মরণ" একার্থক নহে। "মৃ"-ধাতুর উত্তর অনট্-প্রত্যয়ের যোগে "মরণ"

শব্দটী নিষ্পন্ন হয়, আর "মৃত্যু"-শব্দটী সংঘটিত হইয়া থাকে "মৃ" ধাতুর উত্তর ত্যুক্ প্রত্যয়ের যোগে। একই ধাতুর উত্তর প্রত্যয়ের বিভিন্নতা-বশতঃ, অর্থের অনেকখানি বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। "মরণ" শব্দে বুঝায়—"স্পর্শশক্তি অথবা ইচ্ছা-শক্তির যে বীজ বশতঃ জীবের প্রত্যেক অণু ও পরমাণু প্রতিনিয়ত পরিচালিত হইয়া থাকে, জীব-দেহ হইতে সেই বীজের তিরোধান এবং বায়ুমণ্ডলের সহিত তাহার মিলনের অবস্থা।" "মৃত্যু-"শব্দে বুঝায়—"স্পর্শশক্তি অথবা ইচ্ছা-শক্তির বীজ বশতঃ জীবের অহংকৃতি বোধ হইবার পর ক্রমশঃ জীব যখন ভোগ-পরায়ণ হইয়া নানারূপে হাবুডুবু খাইতে থাকে, তখন ভোগ-পরায়ণতার ইচ্ছা সংযত করিয়া কেন ঐ ভোগ-পরায়ণতার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইবার অবস্থা।" অল্প কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, জীবন-বিধান তন্ত্রের (physiological functions) অবসানের নাম "মরণ" আর উপভোগ-পরায়ণ প্রবৃত্তির অথবা বহির্ম্মুখীনতার অবসানের নাম "মৃত্যু"। দুই-এতেই অবসান আছে বটে, কিন্তু একটীতে জীবনের অবসান, আর একটীতে বি-কর্ম্ম ও কু-কর্ম্ম-পরায়ণতার অবসান। "মরণ" জীব মাত্রেরই হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু "মৃত্যু" সকলের ভাগ্যে নাও ঘটিতে পারে। যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহারাই একমাত্র মৃত্যু-লাভ করিয়া থাকেন।

অথচ আজকালকার তথাকথিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রায়শঃ "মরণ" ও "মৃত্যু" এই দুইটী শব্দকে একার্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার একমাত্র কারণ, এই পণ্ডিতগণের কেহই ঋষি-প্রণীত বেদাঙ্গান্তর্গত ব্যাকরণের সহিত সর্ব্বতোভাবে পরিচিত নহেন। ব্যাকরণের কচকচি বাড়াইয়া লইলে পাঠকগণের অনেকেরই প্রবন্ধ পাঠ করিবার অসুবিধা ঘটে এবং তাঁহারা অভিযোগ উপস্থিত করেন, এই কারণে "মরণ" ও "মৃত্যু" এই দুইটী শব্দের অর্থের পার্থক্য বুঝিতে হইলে ব্যাকরণের যে যে সূত্র বুঝিবার প্রয়োজন হয়, তাহা উদ্ধৃত করিবার কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিলাম। যাঁহারা এই বিষয়ে জিজ্ঞাসু, প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগের জিজ্ঞাসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রস্তুত থাকিলাম।

"মৃত্যু" শব্দে যে "উপভোগ-পরায়ণ প্রবৃত্তির অথবা বহির্ম্মুখীনতার অবসান"কে বুঝায়, তাহা নিরুক্তের "মৃত্যুঃ—মা আরয়তি ইতি মতঃ" এই সূত্রটী অনুধাবন করিতে পারিলেও প্রমাণিত হইবে।

"মৃত্যু" শব্দের অর্থে যদি "উপভোগ-পরায়ণ প্রবৃত্তির অথবা বহির্ম্মুখীনতার অবসান"কে বুঝিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, হেমচন্দ্রের অভিধানানুসারে "মোক্ষ" বলিতে বুঝায় "উপভোগ-পরায়ণ প্রবৃত্তির অথবা বহির্ম্মুখীনতার অবসানাত্মক অবস্থা।" বাস্তবিক পক্ষে ইহাই "মোক্ষ"-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য।

বেদাঙ্গান্তর্গত ব্যাকরণের সাহায্যে "মোক্ষ"-শব্দটীর অর্থ অনুধাবন করিতে প্রযত্নশীল হইলে দেখা যাইবে যে, উহা অভিধানান্তর্গত অর্থ হইতে মূলতঃ পৃথক্ নহে।

ব্যাকরণানুসারে 'মোক্ষ' শব্দটী একটী 'জাতি' অথবা 'ভাব'-বাচক শব্দ (দ্রব্য অথবা ভূত-বাচক নহে) এবং উহা 'বিশেষ' পদার্থান্তর্গত। 'মোক্ষ' শব্দটী নিষ্পন্ন হয় 'মোক্ষ্' ধাতুর উত্তর 'অল্' প্রত্যয়ের যোগে। যাঁহারা তদ্ধিৎ এবং কৃৎপ্রত্যয়াধ্যায়ে যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, 'অল্' প্রত্যয় জ্ঞানের একটী অধিকতর বিকৃত অবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় উপনীত হইবার চিহ্ন এবং 'অল্' প্রত্যয়ান্ত পদার্থ সর্ব্বদাই 'বিশেষ'-বাচক হইয়া থাকে। যাঁহারা

বৈশেষিক দর্শনের 'দ্রব্য', 'গুণ', ,কর্ম্ম', 'সামান্য', 'বিশেষ' এবং 'সমবায়' এই ছয়টী পদার্থের সংজ্ঞা যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, "বিশেষ"-বাচক পদার্থ সর্ব্বদাই বিশ্লেষণাত্মক (analytical) ভাবের এবং 'সামান্য'-বাচক পদার্থ সর্ব্বদাই সংগঠনাত্মক (synthetical) ভাবের পরিচায়ক হইয়া থাকে। আজকালকার দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ হয়ত আমাদিগের কোন কথাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, কারণ ইহাঁদিগের অনেকেই পদের প্রধান বিভাগ সম্বন্ধে 'অপ' ও 'উদ্ধৃতি', 'দ্রব্য' ও 'জাতি', 'ভূত' ও ভাব' প্রভৃতি যে সমস্ত কথা ঋষিগণ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সমস্ত কথার কোনটীর সহিত যথাযথভাবে পরিচিত নহেন। ইহাঁরা বুঝুন আর নাই বুঝুন, বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে যে- সমস্ত পদার্থের ব্যাখ্যা সম্যক্‌ভাবে বিবৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত পদার্থকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়া বেদাঙ্গান্তর্গত অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, 'মোক্ষ'-শব্দে বুঝায়— "জ্ঞানের সেই অবস্থা, যে অবস্থায় মানুষের নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া ইচ্ছাত্মক প্রকৃতি হইতে কি করিয়া বিভিন্ন কর্ম্মশক্তি সর্ব্বদা উৎপন্ন হইতেছে তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়"। সাধারণে বুঝিবার জন্য বলিতে হয় যে, যখন কোন মানুষ নিজের বিভিন্ন কর্ম্ম-শক্তি কি করিয়া অর্থাৎ কোন্ কোন্ কারণে বজায় থাকে এবং উহা কি করিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাহা নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন, তখন সেই মানুষ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন ইহা বুঝিতে হয়। পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics) ও রসায়ন-শাস্ত্রের (Chemistry) প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিয়া লইয়া উহাদের মধ্যে যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, স্বকীয় বিভিন্ন কর্ম্ম-শক্তি কোথা হইতে আসিতেছে, কি করিয়া বজায় থাকিতেছে এবং কি করিয়া পুনরায় বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা স্বকীয় শরীরমধ্যে প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে উপলব্ধি করিলে না পারিলে, মৃত অথবা কৃত্রিম পদার্থ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানে আংশিকভাবে প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু কোন জীবিত পদার্থ-সম্বন্ধীয় কোন বিজ্ঞানে অথবা কোন জীব-বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয় না। ইহারই জন্য আমরা বলিতেছিলাম যে, 'মোক্ষ' মানুষের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইবার উহাই প্রথম সোপান।

'মোক্ষ-পরায়ণতা'য় প্রবৃত্ত হইলে অর্থাৎ স্বকীয় বিভিন্ন কর্ম্ম-শক্তি কোথা হইতে আসিতেছে, কি করিয়া বজায় থাকিতেছে এবং কি করিয়া পুনরায় বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা স্বকীয় শরীরমধ্যে প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে উপলব্ধি করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উপভোগ-পরায়ণতা অথবা বহির্ম্মুখীনতাই উহার প্রধান অন্তরায়। উপভোগ-পরায়ণতা অথবা বহির্ম্মুখীনতা অবসান প্রাপ্ত না হইলে কখনও মোক্ষ-লাভ করা অথবা স্বকীয় কর্ম্ম-শক্তি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। কাজেই বলিতে হইবে যে, "উপভোগ-পরায়ণ প্রবৃত্তির অথবা বহির্ম্মুখীনতার অবসান"কে মোক্ষ-লাভ করিবার প্রধান সোপান বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহারই জন্য আমরা বলিতেছিলাম যে, বেদাঙ্গান্তর্গত ব্যাকরণের সাহায্যে মোক্ষ-শব্দটীর অর্থ অনুধাবন করিতে প্রযত্নশীল হইলে দেখা যাইবে যে, উহাও অভিধানান্তর্গত অর্থ হইতে মূলতঃ পৃথক্ নহে।

মোটের উপর মনে রাখিতে হইবে যে, 'মোক্ষ'-শব্দের মৌলিক অর্থ—"স্বকীয় কর্ম্ম-শক্তি সম্বন্ধে

যাবতীয় সত্তা প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণুর মধ্যে যে যে উপলব্ধি ও জ্ঞান অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই উপলব্ধি ও জ্ঞান"। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, উহা লাভ করিবার প্রধান সোপান—উপভোগ-প্রবৃত্তি অথবা বহির্ম্মুখীনতার অবসান।

মোক্ষ-শব্দের উপরোক্ত সংজ্ঞা যথাযথ ভাবে ধারণা করিতে হইলে "কর্ম্মশক্তি", "প্রত্যক্ষ" "উপভোগ-প্রবৃত্তি" এবং "বহির্ম্মুখীনতা" এই চারিটী পদের অর্থ সম্বন্ধে ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়।

"কর্ম্ম শক্তি" এই পদের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা যথাযথ ভাবে ধারণা করিতে হইলে, প্রথমতঃ "কর্ম্ম" এই পদটীর এবং "শক্তি" এই পদটীর অর্থ কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। মানুষ সাধারণতঃ আজকাল 'কর্ম্ম' শব্দে 'ক্রিয়া' ও 'কার্য্য' বুঝিয়া থাকে এবং যাহা কিছু মানুষ তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় অথবা জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সাহায্যে করিয়া থাকে, তাহাকেই মানুষের 'কর্ম্ম' বলা হয়। আধুনিক পণ্ডিতগণের এই ধারণা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতাপ্রসূত এবং ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে প্রবেশাভাবের পরিচায়ক। বাস্তবিক পক্ষে সংস্কৃত ভাষা অনুসারে কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্য কখনও একার্থক হয় না। এই তিনটী পদের অর্থে অনুরূপতা কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিদ্যমান আছে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে একরূপতা বিদ্যমান নাই। 'কর্ম্ম', 'ক্রিয়া' ও 'কার্য্য' এই তিনটী পদের অর্থ যথাযথ ভাবে ধারণা করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের মধ্যে সর্ব্বদা ত্রিবিধ 'সাধনা' বিদ্যমান থাকে। শুধু মানুষের মধ্যে কেন, ঈশ্বরের দ্বারা যত কিছু পদার্থ সৃষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকের মধ্যে এই ত্রিবিধ সাধনা সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। ঐ ত্রিবিধ সাধনা বিদ্যমান থাকে না একমাত্র মৃতের এবং কৃত্রিম পদার্থের মধ্যে। প্রত্যেক জীবটীর প্রত্যেক কার্য্যটী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, জীবের বিভিন্ন অবয়ব, অণু ও পরমাণু বিদ্যমান আছে বলিয়া, একমাত্র স্বকীয় ঐ অবয়ব, অণু ও পরমাণুগুলির পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতের জন্য প্রত্যেক জীবটী কতকগুলি 'ক্রিয়া' সাধন করিতেছে। ইহা ছাড়া বায়ুমণ্ডলের ঘাত-প্রতিঘাতের জন্য প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক অবয়বের অণু-পরমাণুর উপর কতকগুলি 'কর্ম্ম' সাধিত হইতেছে। জীবের উপরোক্ত দুইটী 'সাধনা' ছাড়া তাহার স্বকীয় অবয়বজাত ক্রিয়া এবং বায়ুমণ্ডলজাত 'কর্ম্ম' এই দুই-এর মধ্যে প্রতিনিয়ত ঘাত-প্রতিঘাত সাধিত হইতেছে। জীবের স্বকীয় অবয়ব-জাত ক্রিয়া এবং বায়ুমণ্ডলজাত কর্ম্ম এই দুই-এর ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে জীবের মধ্যে যে-সাধনার উৎপত্তি হয়, তাহাই তাহার তৃতীয় সাধনা। এই তৃতীয় সাধনাকে ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় জীবের 'কার্য্য' বলা হইয়া থাকে।

'কর্ম্ম', 'কার্য্য' এবং 'ক্রিয়া' এই তিনটী পদের অর্থে পার্থক্য কোথায়, তাহা সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, প্রত্যেক জীবের তিনটী সাধনা সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। একটী জীবের স্বকীয় অবয়ব ও অণু-পরমাণুজাত, দ্বিতীয়টী বায়ুমণ্ডলজাত এবং তৃতীয়টী জীবের অবয়ব ও বায়ুমণ্ডলের ঘাত-প্রতিঘাতজাত। যে যে সাধনা সর্ব্বতোভাবে জীবের স্বকীয় কোন না কোন অবয়ব ও অণু-পরমাণুজাত, সেই সেই সাধনার প্রত্যেকটীর নাম জীবের এক একটী 'ক্রিয়া'। জীবের যে যে সাধনা সর্ব্বতোভাবে বায়ুমণ্ডলজাত সেই সেই সাধনার প্রত্যেকটীর নাম জীবের এক একটী 'কর্ম্ম'। জীবের যে যে সাধনা সর্ব্বতোভাবে বায়ুমণ্ডল এবং অবয়বের ঘাত-প্রতিঘাত জনিত, সেই সেই সাধনার প্রত্যেকটীর নাম জীবের এক একটী 'কার্য্য।'

প্রত্যেক জীবের যে এতাদৃশ ত্রিবিধ সাধনা সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, তাহা স্বকীয় কার্য্যাবলী বিশ্লেষণ করিতে পারিলে অতি সহজেই অনুমান করা সম্ভব হয়। জীবের এই ত্রিবিধ সাধনা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করা জীব-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইবার প্রথম সোপান। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক "work and energy (কার্য্য ও কার্য্য-প্রবৃত্তি") সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এখনও জীবের উপরোক্ত ত্রিবিধ সাধনা সম্বন্ধে কোন কথাই শৃঙ্খলিত ভাবে বুঝিতে পারেন নাই এবং বলিতেও পারেন না। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ work and energy সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়া থাকেন, সেই সমস্ত কথা বিশ্লেষণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটী মৃত ও কৃত্রিম পদার্থের সম্বন্ধে বরং কথঞ্চিৎ পরিমাণে সত্য, কিন্তু উহার কোন কথাই প্রাণযুক্ত ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থের সম্বন্ধে সত্য নহে।

জীবের উপরোক্ত ত্রিবিধ সাধনা সম্পূর্ণভাবে শৃঙ্খলিত নিয়মাধীন। ইংরাজী অঙ্কশাস্ত্রে যেরূপ composition and resolution of forces-এর (বেগের সংগঠন ও পরিণতির) কথা দেখিতে পাওয়া যায়, জীবের ঐ ত্রিবিধ সাধনা সম্বন্ধেও সেইরূপ composition and resolution of forces প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। জীবের এই ত্রিবিধ সাধনার সংগঠন ও পরিণতি কোন্ কোন্ নিয়মে পরিচালিত, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে মানুষের দশটী ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়। ইহার অর্থ এই যে, কাণখানি কেন চক্ষুর মত হইল না, কাণের মত হইল, কাণ কেন শুনিতে পায়, চক্ষু কেন শুনিতে পায় না, এতাদৃশ তথ্যগুলি জীবের ত্রিবিধ সাধনার সংগঠন ও পরিণতি কোন্ কোন্ নিয়মে পরিচালিত, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বুঝিতে পারা যায়। একমাত্র সংস্কৃত ভাষায় বৈশেষিক দর্শন, যজুর্ব্বেদ ও পরমসিদ্ধান্তে জীবের ত্রিবিধ সাধনার সংগঠন ও পরিণতির (composition and resolutionএর) কোন্ কোন্ নিয়মে পরিচালিত, তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় কথা নিখুঁৎভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ইংরাজী, জার্ম্মানী প্রভৃতি অন্য কোন ভাষায় উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্ত্য অঙ্কশাস্ত্রের composition and resolution of forces-এর অধ্যায়ে যে সমস্ত কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কৃত্রিম ও মৃত পদার্থ সম্বন্ধে সত্য। ঐ অধ্যায়ের কোন কথাই প্রাণযুক্ত ঈশ্বরের সৃষ্ট, কোন পদার্থের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। তাহা না হইলে পাশ্চাত্ত্য-গণও মানুষের দশটী ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তাঁহারা পারেন নাই। মানুষের দশটী ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিজ্ঞান আমূলভাবে পরিজ্ঞাত না হইতে পারিলে চিকিৎসা-শাস্ত্র অথবা ব্যবহার-বিজ্ঞান কখনও নিখুঁৎ হইতে পারে না। ইহারই জন্য পাশ্চাত্ত্য-গণের চিকিৎসা-শাস্ত্র ও ব্যবহার-বিজ্ঞান সর্ব্বদাই দোষযুক্ত হইয়া থাকে। অন্য পক্ষে ঋষিগণ মানুষের দশটী ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিজ্ঞান আমূলভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগের পক্ষে নিখুঁৎ চিকিৎসা-শাস্ত্র ও ব্যবহার-বিজ্ঞান আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছিল। *আয়ুর্ব্বেদ ও মন্বাদি সংহিতাগুলি উহার পরিচায়ক। পাঠকগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, আয়ুর্ব্বেদ ও মন্বাদি সংহিতাগুলি অধুনা যে অর্থে গৃহীত হইতেছে, ঐ অর্থ ঋষিদিগের অভীষ্ট নহে। ইহারই জন্য আধুনিক কালে আয়ুর্ব্বেদ ও মন্বাদি সংহিতাগুলির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতেছে।

মানুষের কর্ম্ম, কার্য্য ও ক্রিয়া কি কি নিয়মে পরিচালিত. তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে "কর্ম্ম-শক্তি" কাহাকে বলে, তাহা উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে।

প্রত্যেক force-এর (অথবা বেগের) যেরূপ একটা composition (অথবা সংগঠন) এবং resolution (অথবা পরিণতি) আছে, সেইরূপ প্রত্যেক কর্ম্ম, কার্য্য ও ক্রিয়ারও কোন না কোন 'লিঙ্গ' ও 'লক্ষণ' বিদ্যমান থাকে। কর্ম্ম-লিঙ্গ force-এর composition-এর অনুরূপ, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে সমান নহে। কর্ম্মলক্ষণ force-এর resolution-এর অনুরূপ কিন্তু সর্ব্বতোভাবে সমান নহে।

জীবের প্রত্যেক কর্ম্ম. কার্য্য ও ক্রিয়ার ফলে জীবের শরীরস্থ রস ও তেজ বহুবিধ ভাবে আলোড়িত হইয়া থাকে। এই আলোড়নগুলি লইয়া জীবের কর্ম্ম-লক্ষণ প্রকট হয়। ইহার কতকগুলি জীবকে ভোগপ্রবৃত্তিসম্পন্ন করিয়া বহির্ম্মুখী করিয়া তুলে, আর কতকগুলি কারণানুসন্ধান প্রবৃত্তি-সম্পন্ন করিয়া অন্তর্ম্মুখী করিয়া তুলে। যে কর্ম্ম-লক্ষণগুলি জীবকে ভোগপ্রবৃত্তিসম্পন্ন করিয়া বহির্ম্মুখী করিয়া তুলে, সেই কর্ম্মলক্ষণগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় জীবের 'কর্ম্মশক্তি' বলা হইয়া থাকে।

কর্ম্ম, কার্য্য, ক্রিয়া, কর্ম্ম-লিঙ্গ, কর্ম্ম-লক্ষণ, কর্ম্ম-শক্তি প্রভৃতি পদগুলির অর্থ অথবা সংজ্ঞা আমরা যেরূপ 'জলের মত' সহজভাবে লিখিয়া যাইতেছি. পাঠকগণের পক্ষে অত জলের মত সহজভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইবে না। একটু প্রযত্নশীল হইয়া ধৈর্য্যসহকারে অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ পদার্থগুলিকে উপলব্ধি করিতে পারা আপাতদৃষ্টিতে যত কঠিন বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক পক্ষে উহা তত কঠিন নহে। পাঠকগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, এই পদার্থগুলিকে নিখুঁৎভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, "মোক্ষ" যে কি পদার্থ, তাহা যথাযথভাবে আদৌ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। একমাত্র ঋষিগণ, মুনিগণ, শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট ও নবী মহম্মদ "মোক্ষ" যে কি পদার্থ তাহা নিখুঁৎভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের কথা হইতে প্রমাণিত হইতে পারে। ইহা ছাড়া কল্প-সূত্রের ভাষ্য-প্রণেতা যে-ই হউন, তাঁহারও "মোক্ষ"-সম্বন্ধীয় কতকগুলি নিখুঁৎ সংস্কার বিদ্যমান ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত আধুনিক আর কেহ যে সংস্কৃত ভাষার "মোক্ষ" পদার্থ-টীকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা এতৎসম্বন্ধে প্রযত্নশীল হইয়া ঐ "মোক্ষ" পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চবিংশতিবর্ষব্যাপী জীবনের অনেক সময় ক্ষেপণ করিয়াছি বলিয়াই এতাদৃশ দৃঢ়তার সহিত উপরোক্ত কথা বলিতে পারিতেছি। আধুনিক বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অনেকেই অনেক কথা "মোক্ষ" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের কথাগুলি পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, ইহাঁদিগের অনেকেই আধুনিক পণ্ডিতগণের মত সংস্কৃত ভাষা পর্য্যন্ত জানিতেন না।

"মোক্ষ"-পদের যে কি অর্থ, তাহা যথাযথভাবে উপলব্ধি না করিয়া এই বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ "মোক্ষ"-সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন বলিয়া ইহাঁরা মনুষ্য-সমাজকে বিপথগামী করিয়া পাপী হইতে-ছেন এবং ইহাঁদিগের পাপে শাক্যসিংহের মহান্ বৌদ্ধ সাধনা আজ শ্রীহীন ও প্রাথর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। কোরাণের "আন্নাস অধ্যায়ে" (The Chapter 114 called An-Nas) যে ছয়টী মন্ত্র আছে তাহাও মোক্ষ-সাধনার মূল সূত্র। কোরাণের ১১৪টী অধ্যায় যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে,উহার প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক মন্ত্রটী মানুষকে মোক্ষ-সাধনায় সিদ্ধ করিবার জন্যই লিখিত।

মৌলিক শব্দ-বিজ্ঞান ও ভাষা-বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রাচীন আরবী ভাষার ইস্‌লাম-পদ ও প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার মোক্ষ-পদ সর্ব্বতোভাবে এক-লিঙ্গ ও এক-লক্ষণ যুক্ত না হইলেও একার্থক। অথচ আজ মুসলমানগণের প্রায় কেহই মোক্ষ-পদের প্রকৃত অর্থ পর্য্যন্ত অনুধাবন করিতে পারেন না। ইহার একমাত্র কারণ প্রাচীন আরবী ভাষার অনবগতির জন্য এখন আর কেহ 'কোরাণে'র অর্থ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না। এক কথায়, এখন মানুষ 'কোরাণ' না জানিয়া গায়ের জোরে 'মুসলমান' হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কোরাণ অবগত হইলে, কোরাণের আল-ইখ্‌লাস্‌ অধ্যায়ের (Chapter 112 called Al-Ikhlas) মন্ত্রগুলি যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে, প্রকৃত মুসলমান কখনও দ্বন্দ্ব-কলহপ্রিয় অথবা দলাদলি-প্রিয় হইতে পারেন না। মুসলমানগণের মধ্যে যাঁহারা দ্বন্দ্ব-কলহ অথবা দলাদলি-প্রিয় তাঁহারা প্রকৃত মুসলমান নহেন এবং তাঁহারা যদিও মুখে নবী মহম্মদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকেন, তথাপি কার্য্যতঃ নবী মহম্মদকে অপমানিত করিয়া থাকেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণের বাক্যে যেরূপ শাক্য-সিংহের মহান্‌ বৌদ্ধ সাধনা আজ শ্রীহীন ও প্রাখর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ তথাকথিত মুসলমান মৌলভীগণের পাপে, নবী মহম্মদের সুমহান্‌ ইস্‌লাম্‌ অথবা মোক্ষ সাধনাও আজ আবর্জ্জনা-মণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছে। যদি আবার কখনও ইস্‌লাম্‌ সাধনা প্রাখর্য্য লাভ করে, তখন মানুষ দেখিতে পাইবে যে, একমাত্র ইস্‌লাম্‌ সাধনার দ্বারাই মানুষের পক্ষে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব প্রভৃতি সর্ব্ববিধ দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। এখন যে মুসলমানগণ 'মুসলমান' হইয়াও অর্থাভাবে ও স্বাস্থ্যাভাবে জর্জ্জরিত, তাহার একমাত্র কারণ ইহাঁরা প্রকৃত মুসলমান নহেন এবং ইস্‌লাম সাধনার নামে কতকগুলি কোরাণ-বিরুদ্ধ বিকৃত কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে ইহা আমরা যুক্তির দ্বারা বিস্তৃতভাবে প্রমাণিত করিতে প্রস্তুত আছি। মুসলমানগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, কোরাণ হৃদয় ও প্রাণের বস্তু, উহা ঠোঁটের বস্তু নহে। ঠোঁট বুজিয়া জিহ্বার সহায়তায় কোরাণের মন্ত্রগুলি ব্যবহার করিলে অবয়বস্থ বায়ুমণ্ডলে যে অনুকম্পন আরম্ভ হয় সেই অনুকম্পন উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বহিঃস্থিত বায়ু যেরূপ বহিঃস্থিত চর্ম্মকে স্নিগ্ধতা প্রদান করে সেইরূপ অন্তরস্থিত ঐ অনুকম্পন প্রাণ, হৃদয় ও মস্তিষ্ককে স্নিগ্ধতা প্রদান করিয়া থাকে এবং অবয়বের প্রত্যেক অণু ও পরমাণুর কর্ম্ম, কার্য্য ও ক্রিয়াকে প্রকট করিয়া তুলে। বেদের মন্ত্রেরও এই কার্য্য। দুই-এর মধ্যে তফাৎ এই যে, কোরাণের মন্ত্র যত অনায়াসে অবয়বস্থ অণু ও পরমাণুকে যত অধিক পরিমাণে প্রকট করিতে পারে, বেদের অধিকাংশ মন্ত্র তত অনায়াসে উহা করিতে সক্ষম হয় না। অন্যদিকে বেদের মন্ত্রগুলি অবয়বস্থ যত সূক্ষ্মতম অংশগুলিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারে, কোরাণের মন্ত্রগুলি সেইরূপ সূক্ষ্মতম অংশগুলিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারে না। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, জীবের ত্রিবিধ সাধনা উপলব্ধি করিতে হইলে, প্রথম-প্রবেশার্থিগণকে কোরাণ লইয়া আরম্ভ করিতে হয় এবং বেদের মন্ত্রে উহার সমাপ্তি করিতে হয়। মধ্যখানে বাইবেলের উপদেশ ও বৌদ্ধ-দর্শনের উপদেশেরও প্রয়োজন আছে। এই সম্বন্ধে আর বেশী কথা এখানে লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইব না।

আমাদিগের উপরোক্ত কথাগুলি লিখিবার উদ্দেশ্য মোক্ষ-সাধনেচ্ছু হইলে আজকালকার জগতে কত সতর্ক হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা পাঠকবর্গকে বুঝান।

পাঠকগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, মোক্ষ-পদের মৌলিক অর্থ, "স্বকীয় কর্ম্ম-শক্তি-সম্বন্ধীয় যাবতীয় সত্তা প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণুর মধ্যে যে যে উপলব্ধি ও জ্ঞান অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই উপলব্ধি ও জ্ঞান এবং উহা লাভ করিবার প্রধান সোপান 'উপভোগ-প্রবৃত্তি অথবা বহির্ম্মুখীনতা'র অবসান।"

মোক্ষ-পদের উপরোক্ত অর্থটাকে ভাঙ্গ করিয়া বুঝিবার যোগ্য করিবার জন্য আমরা 'কর্ম্ম-শক্তি' 'প্রত্যক্ষ', 'উপভোগ প্রবৃত্তি' এবং 'বহির্ম্মুখীনতা' এই চারিটী পদের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার মধ্যে 'কর্ম্ম-শক্তি' এই পদটীর অর্থ কি তাহা বুঝাইবার জন্য, 'কর্ম্ম,' 'ক্রিয়া,' 'কার্য্য', 'কর্ম্ম-লিঙ্গ,' 'কর্ম্ম-লক্ষণ' এই পাঁচটী পদের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে।

এক্ষণে, 'প্রত্যক্ষ' কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 'প্রত্যক্ষ' কাহাকে বলে তাহা যথাযথ ভাবে বুঝিতে হইল মনে রাখিতে হইবে যে, 'প্রত্যক্ষ,''প্রমাণে'র অন্যতম উপায়। প্রমাণের চারিটী উপায় আছে, যথা—'প্রত্যক্ষ,' 'অনুমান', 'উপমান,' 'শব্দ'। কাযেই দেখা যাইতেছে যে, 'প্রমাণ' কাহাকে বলে তাহা না বুঝিতে পারিলে, 'প্রত্যক্ষ' কাহাকে বলে তাহা যথাযথ ভাবে ধারণা করা সম্ভব হয় না। 'প্রমাণ' কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে ঋষিগণের সূত্র "প্রমাণতো অর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ অর্থবৎ প্রমাণম্।" শব্দ-স্ফোট ও পদ-স্ফোট পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, 'প্রমাণ' এই পদটীর মধ্যে যে যে শব্দ আছে, সেই সমস্ত শব্দের সহায়তাতেই 'প্রমাণ'—এই পদটীর অর্থ সম্যক্ ভাবে ধারণা করা সম্ভব হয়। উপরোক্ত স্ফোটের সহায়তায় 'প্রমাণ' পদটীর অর্থোদ্ধার করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার অর্থ "সর্ব্ব বিষয়ক সত্তা উপলব্ধি করিবার কার্য্য।" ইহারই জন্য বলা হয় "বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং" অর্থাৎ 'বেদ' ও 'স্মৃতি' সর্ব্ববিধ সত্তা উপলব্ধি করিবার কার্য্যের আশ্রয় অথবা অবলম্বন।

"প্রমাণতো অর্থপ্রতিপত্তৌ" প্রভৃতি সূত্রের অর্থ যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, 'প্রমাণ'-পদটীর স্ফোটগত অর্থের সহিত ঐ সূত্রের মর্ম্মতঃ কোন পার্থক্য নাই।

'প্রমাণ' পদে যদি সর্ব্ববিধ সত্তা উপলব্ধি করিবার কার্য্যকে বুঝিতে হয়, তাহা হইলে সত্তা কাহাকে বলে তাহাও বুঝিবার প্রয়োজন হয়, কারণ 'সত্তা' কাহাকে বলে তাহা ধারণা করিতে না পারিলে সত্তা উপলব্ধি করিবার কার্য্য কি, তাহা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না।

বৈশেষিক দর্শনে "সত্তা"র সংজ্ঞা সম্বন্ধে দুইটী সূত্র আছে, যথা—

(১) সৎ ইতি যতো দ্রব্যগুণকর্ম্মসু সা সত্তা॥

(২) দ্রব্যগুণকর্ম্মভ্যো অর্থান্তরং সত্তা॥

উপরোক্ত দুইটী সূত্র যথানিয়মে ধারণা করিতে বসিলে, নিম্নলিখিত দুইটী কথা পাওয়া যাইবে :—

(১) দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মাধিকরণে অর্থাৎ কোন দ্রব্য অথবা গুণ অথবা কর্ম্মের বিশ্লেষণ করিতে বসিলে, যে-সমস্ত ভাবের জন্য ঐ দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম্মটীকে তাদৃশ দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়, সেই সমস্ত ভাবের নাম ঐ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সত্তা।

(২) দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের সম্প্রদানে অর্থাৎ কোন দ্রব্য অথবা গুণ অথবা কর্ম্মের মূলে

কাহার ক্রিয়া অথবা কার্য্য অথবা কর্ম্ম রহিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিতে বসিলে, যে-সমস্ত ভূতের ক্রিয়া অথবা কার্য্য অথবা কর্ম্মের জন্য ঐ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উদ্ভব হয়, সেই সমস্ত ভূতের নামও ঐ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সত্তা।

উপরোক্ত দুইটী কথা সম্যক্‌ভাবে ধারণা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য অনুধাবন করিতে না পারিলে কোন দ্রব্য অথবা গুণ অথবা কর্ম্মের 'সত্তা' যে কি, তাহা অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। মোটের উপর মনে রাখিতে হইবে যে, দুনিয়ায় যত কিছু দ্রব্য আছে, তাহার প্রত্যেকটীর অন্তরে অবয়বগত, গুণগত এবং কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্যগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে এবং ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যেই মানুষ প্রত্যেক দ্রব্যকে এক একটী বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত করে। প্রত্যেক দ্রব্যের অন্তরে অবয়বগত, গুণ-গত এবং কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্যগত যে বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান থাকে এবং যে যে বৈশিষ্ট্যের জন্য ঐ দ্রব্যটীকে তাদৃশ নামে অভিহিত করা হয়, অবয়বগত, গুণগত এবং কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্যগত সেই সেই বৈশিষ্ট্য ঐ দ্রব্যটীর এক একটী সত্তা। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, দুনিয়ার প্রত্যেক দ্রব্যের অন্তরে যেরূপ অবয়বগত, গুণগত এবং কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্যগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক দ্রব্যের উৎপত্তির মূলে কোন না কোন দ্রব্য, অথবা গুণ, অথবা কর্ম্ম, ক্রিয়া, ও কার্য্য কারণরূপে বিদ্যমান থাকে। কোন দ্রব্যের উৎপত্তির মূলে যে দ্রব্য অথবা গুণ অথবা কর্ম্ম ক্রিয়া ও কার্য্য কারণরূপে বিদ্যমান থাকে, সেই দ্রব্য অথবা গুণ অথবা কর্ম্ম, ক্রিয়া এবং কার্য্যও ঐ দ্রব্যের সত্তা।

এইরূপ ভাবে দ্রব্যের সত্তা কাহাকে বলে তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে, গুণের সত্তা এবং কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্যের সত্তা কাহাকে বলে, তাহা অনুধাবন করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। এই বিষয়ক সমস্ত কথা পরিষ্কার করা এই প্রবন্ধে সম্ভবযোগ্য নহে, কারণ সত্তার কথা সম্যক্ ও বিশদভাবে বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ বৈশেষিক দর্শনের প্রত্যেক সূত্র, দ্বিতীয়তঃ ন্যায়-দর্শনের প্রত্যেক সূত্র সম্যক্‌ভাবে অনুধাবন করিবার প্রয়োজন হয়। কাযেই দেখা যাইবে যে, উহা অতীব বিস্তৃত।

কোন দ্রব্য অথবা গুণ অথবা কর্ম্ম, কার্য্য ও ক্রিয়ার সত্তা কি কি হইতে পারে, তাহা অনুমান করিতে হইলেই এত কথা জানিবার প্রয়োজন হয়। তাহার পর আবার ঐ সত্তা নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করিবার পন্থা কি, তাহা জানিতে হইলে বেদের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় এবং আরও অনেক কথা জানিবার ও অনেক সাধনায় অভ্যস্ত হইবার প্রয়োজন হয়। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে, সত্তা-বিষয়ক সমস্ত কথা কোন মাসিক পত্রিকার কোন প্রবন্ধে সম্যক্ ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব-যোগ্য নহে। ইহা ছাড়া সত্তা-বিষয়ে এমন অনেক সূক্ষ্ম কথা আছে, যাহা সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব-যোগ্য নহে এবং এমন কি সংস্কৃত ভাষাতেও একটী নির্দ্দিষ্ট বাক্য ছাড়া অন্য কোন বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা চলে না। কাজেই সত্তা বিষয়ে আদ্যোপান্ত জানিতে হইলে প্রথমতঃ ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে হইবে এবং তাহার পর বৈশেষিক, ন্যায় ও বেদের নির্দ্দেশসমূহে অভ্যস্ত হইতে হইবে। বেদে প্রবিষ্ট না হইতে পারিলে সত্তা-উপলব্ধির কার্য্যে অথবা প্রমাণের কার্য্যে নির্ভুলতা লাভ করা সম্ভব নহে।

'সত্তা' কাহাকে বলে তাহা আব্‌ছা আব্‌ছা ভাবে অনুমান করিতে পারিলেই দেখা যাইবে যে, সত্তা উপলব্ধি করিবার কার্য্য এক হিসাবে দুই শ্রেণীর যথা, (১) স্বকীয় অবয়বস্থিত প্রত্যেক দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্যের সত্তা উপলব্ধি করা; আর (২) পরকীয় অর্থাৎ স্বকীয় ছাড়া দুনিয়ায় আর যাহা কিছু আছে, তাহার প্রত্যেকের অবয়বস্থিত প্রত্যেক দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্যের সত্তা উপলব্ধি করা। সত্তা উপলব্ধি করিবার এই দুই শ্রেণীর কার্য্যের মধ্যে, স্বকীয় অবয়বস্থিত প্রত্যেক দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্যের সত্তা উপলব্ধি করিতে না পারিলে, অন্য কোন পদার্থের

কোন অবয়বস্থিত কোন দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্যের সত্তা উপলব্ধি করা সম্ভব-যোগ্য হয় না। ইহার কারণ 'সত্তা' অন্তরস্থিত পদার্থ এবং নিজের অন্তর বিশ্লেষণ করিতে হয় কোন্ কোন্ উপায়ে তাহা বিদিত না হইতে পারিলে অপর কোন পদার্থের অন্তর বিশ্লেষণ করিতে পারা যায় না। কাযেই, দুনিয়ার প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে যে অসংখ্য দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উদ্ভব হয়, তাহার প্রত্যেকের সত্তা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে নিজের অন্তর বিশ্লেষণ করিতে হয় কি করিয়া, তাহার উপায় জানিতে হয়, তাহার পর জানিতে হয়, অপরের অন্তর বিশ্লেষণ করিবার উপায়। নিজের অন্তর বিশ্লেষণ করিবার উপায় তিনটী. যথা, (১) শব্দ, (২) অনুমান, (৩) প্রত্যক্ষ। নিজ ছাড়া অপরের অন্তর বিশ্লেষণ করিবার উপায় কেবল মাত্র একটী, যথা (১) উপমান। কাযেই দেখা যাইতেছে যে স্বকীয় ও পরকীয় অন্তর বিশ্লেষণ করিয়া সর্ব্ববিধ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সত্তা উপলব্ধি করিবার উপায় চারিটী। ইহারই জন্ত বলা হইয়া থাকে যে, প্রমাণ চতুর্ব্বিধ। 'শব্দ-প্রমাণ' বলিতে বুঝায় স্বকীয় শরীরে যে তেজ, রস ও বায়ু বিদ্যমান আছে, তদ্দ্বারা দ্রব্যরূপী শরীর, গুণরূপী শরীরের গুণ এবং আত্মারূপী কর্ম্ম কিরূপে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা শব্দের সহায়তার উপলব্ধি করিয়া সকল শরীরস্থ তেজ, রস ও বায়ুর মূল অথবা সত্তা কি, তাহা উপলব্ধি করিতে প্রযত্নশীল হওয়া। শব্দের সহায়তা গ্রহণ না করিলে অন্ত কোন উপায়ে স্বকীয় শরীরে যে তেজ, রস ও বায়ু বিদ্যমান আছে, তদ্দ্বারা দ্রব্যরূপী শরীর, গুণ-রূপী শরীরের গুণ এবং আত্মা-রূপী কর্ম্ম কিরূপে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা কোন ক্রমেই নিখুঁতভাবে বিদিত হওয়া যায় না। শব্দের সহায়তা গ্রহণ না করিলে অন্য কোন উপায়ে উহা কোন ক্রমেই নিখুঁতভাবে বিদিত হওয়া যায় না বটে, কিন্তু একমাত্র শব্দের সহায়তাতেই ঐ তথ্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। ক্রমশঃ অনুমান-প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সহায়তা লইতে হয়।

শব্দ-প্রমাণ, অনুমান-প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণ কার্য্যতঃ ব্যবহার করিতে হইলে কি কি জানিতে হয়, তাহা বিবৃত করিলে পাঠকগণের কাছে আমাদিগের কথা অধিকতর স্পষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। এই আশায় আমরা এক্ষণে উহার বর্ণনা করিব।

ঠোঁটটী বুজিয়া জিহ্বাটী নাড়া-চাড়া করিলে জিহ্বার চতুষ্পার্শ্বস্থ আকাশের উপর যে নাড়া চাড়া পড়ে (অর্থাৎ কার্য্য অথবা ইংরাজী কথায় "work" হয়), আকাশের উপর ঐ নাড়া-চাড়া অথবা "work" যে ক্রমশঃ জিহ্বার চতুষ্পার্শ্বস্থ মেদ-পিণ্ডের উপর নাড়া-চাড়ার উৎপাদন করিয়া থাকে, এবং জিহ্বার চতুষ্পার্শ্বস্থ মেদ-পিণ্ডের উপরে নাড়া-চাড়া যে সর্ব্ব-শরীরস্থ প্রত্যেক অংশের উপর কোন না কোন নাড়া-চাড়ার উৎপত্তি করিতে বাধ্য তাহা পাঠকগণ সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাও অনুমান করিতে পারিবেন। কোন পুষ্করিণীস্থিত জলের উপর কোন এক কোণে একটী ঢিল নিক্ষেপ করিলে যেমন পুষ্করিণীর জলের অনেক দূর পর্য্যন্ত স্পন্দনের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়, মুখের মধ্যে জিহ্বা নাড়া-চাড়া করিলেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। পুষ্করিণীর জলের উপর এক কোণে কোন ঢিল নিক্ষেপ করিলে খানিক দূর পর্য্যন্ত স্পন্দনের রেখা স্পষ্টই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে, আর বাকী স্থানে কোন স্পন্দনের রেখা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। বাকী স্থানে কোন স্পন্দনের রেখা স্পষ্টভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না বটে, কিন্তু অণু-পরমাণুর কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্য নীতি অথবা লক্ষণ সর্ব্বতোভাবে বিদিত হইতে পারিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, পুষ্করিণীর জলের যে যে স্থানে স্পন্দনের রেখা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না—সেই সেই স্থানেও স্পন্দনের পরিণতির (অথবা resultant-এর) উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

পুষ্করিণীর জল যেরূপ পারদের অনুরূপ সর্ব্বদা টলটলায়মান, সর্ব্বশরীরব্যাপী রস সেইরূপ পারদের মত টলটলায়মান। পুষ্করিণীর জলের এক কোণে কোন একটী ঢিল ছুঁড়লে সারা পুষ্করিণীর জলে যেরূপ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবের নাড়া-চাড়া অথবা কার্য্য অথবা resulmnt ঘটিয়া থাকে, মুখের মধ্যে জিহ্বা নাড়া-চাড়া করিলেও সর্ব্বশরীরের রসেও সেইরূপ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবের নাড়া-চাড়া

অথবা কার্য্য অথবা resultant ঘটিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখিতে হইবে যে, ঢিলের ওজন (weight), ঢিল নিক্ষেপের বেগ (force), ঢিল নিক্ষেপের দিক্ (direction) এবং ঢিল নিক্ষেপের ক্রমের (time-এর) তারতম্যানুসারে পুষ্করিণীস্থিত জলের স্পন্দনের স্পষ্টতা ও অপষ্টতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ঢিলের ওজন এবং ঢিল নিক্ষেপের বেগ, দিক্ এবং ক্রমের তারতম্যানুসারে যেরূপ পুষ্করিণীর জলের স্পন্দনের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ জিহ্বার স্বাস্থ্য এবং জিহ্বা নাড়া-চাড়া করিবার বেগ, দিক্ এবং ক্রমের তারতম্যানুসারে সর্ব্ব-শরীরের নাড়া-চাড়ার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার তারতম্য ঘটে।

উপরোক্ত কথা কয়েকটী অনুধাবন করিতে পারিলে শব্দের সহায়তায় কিরূপে সর্ব্বশরীরব্যাপী বিভিন্ন দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, ক্রিয়া, ও কার্য্যের উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। শব্দ করিতে হইলে যে জিহ্বার নাড়া-চাড়া করিতে হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। বর্ণমালার বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার নাড়া-চাড়ার বেগ ও দিক্ বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাও একটু অভ্যাস করিতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে। বিভিন্ন বর্ণের বিন্যাসের তারতম্যানুসারে যে জিহ্বার নাড়া-চাড়ার ক্রম পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাও একটু অভ্যাস করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

জিহ্বা নাড়া-চাড়া করিলে জিহ্বার চতুষ্পার্শ্বস্থ আকাশের উপর যে নাড়া-চাড়া পড়ে অথবা কার্য্য হয় তাহা উপলব্ধি করিবার নাম প্রমাণের "শব্দ"-বিধি। জিহ্বার চতুষ্পার্শ্বস্থ আকাশের উপর নাড়া চাড়া পড়িবার ফলে তৎসন্নিকটস্থ মেদ-মণ্ডলের উপর যে নাড়া-চাড়া পড়ে, তাহা উপলব্ধি করিবার নাম—প্রমাণের "অনুমান"-বিধি। 'অ-নু-মা-ন' এই পদটীর অর্থ, কোন আকাশমণ্ডলের কার্য্যের পশ্চাতে অথবা ফলে এবং তাহার পূর্ব্বে অথবা আগে এবং তাহার দুই পার্শ্বে ও উর্দ্ধে তৎসন্নিকটস্থ ভূত-ভাগের উপর যে কার্য্য হয় সেই কার্য্যের উপলব্ধি। মেদ-মণ্ডলের উপর নাড়া-চাড়া পড়িবার ফলে সর্ব্ব-শরীরের সর্ব্ববিধ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্যের উপর যে নাড়া-চাড়া পড়ে, তাহা উপলব্ধি করিবার নাম—প্রমাণের "প্রত্যক্ষ"-বিধি। শব্দ-প্রমাণ, অনুমান-প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ-প্রমাণ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। জিহ্বা নাড়া-চাড়া করিবার পরিণতিতে কোথায় কি কি কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে যেরূপ প্রমাণের শব্দ-বিধি, অনুমান-বিধি ও প্রত্যক্ষ-বিধির সহায়তা লইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার জিহ্বা নাড়া-চাড়া করিবার ক্ষমতার মূলে কি কি দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, কার্য্য ও ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলেও প্রমাণের শব্দ-বিধি, অনুমান-বিধি ও প্রত্যক্ষ-বিধির সহায়তা লইবার প্রয়োজন হয়। ইহা কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। জিহ্বা নাড়া-চাড়ার পরিণতিতে কোথায় কি হয়, তাহা উপলব্ধি করিবার কার্য্য-ক্ষেত্র মুখ অথবা 'বৈখরী', আর, জিহ্বা নাড়া-চাড়া করিবার ক্ষমতার মূলে কি আছে, তাহা উপলব্ধি করিবার কার্য্যক্ষেত্র কণ্ঠ, উরঃ ও শির। মুখ স্পষ্ট বলিয়া মুখের মধ্যে কি কি কার্য্য হইতেছে, তাহা অনুভব করা যত সহজ-সাধনাসাপেক্ষ, কণ্ঠ, উরঃ ও শির সাধারণের কাছে অস্পষ্ট বলিয়া ঐ ঐ স্থানে প্রতিনিয়ত কি কি কার্য্য হইতেছে, তাহা অনুভব করা অতীব কঠোর-সাধনা-সাপেক্ষ হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করা সম্ভব নহে।

যথাক্রমে প্রমাণের শব্দ-বিধি, অনুমান-বিধি, এবং প্রত্যক্ষ-বিধি প্রয়োগ করিয়া স্বকীয় শরীরাভ্যন্তরস্থিত প্রত্যেক অংশের দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে প্রমাণের উপমান-বিধি প্রয়োগের দ্বারা স্বকীয় ছাড়া পরকীয় প্রত্যেক পদার্থের যাবতীয় তথ্য বিদিত হওয়া সম্ভব হয়। আমার শরীরে কি হইলে কি হয় তাহা স্মরণ রাখিয়া অপরের শরীরে কি দেখিতেছি এবং তাহার মূলে কি থাকিতে পারে, ইহা উপলব্ধি করিবার নাম প্রমাণের উপমান-বিধি।

শব্দাদি প্রমাণের প্রয়োগ কিরূপ ভাবে করিতে হয়, তাহা আমরা 'মন্ত্র'-বিষয়ক আর একটী প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্ট করিব।

প্রমাণ-সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই একমাত্র গৌতম-সূত্রে সম্যক্ ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অনেকে মনে করেন যে, গৌতম-সূত্র ছাড়া ঋষিপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থেও প্রমাণ-বিষয়ক কথা আছে এবং এই প্রমাণ বিষয়ে বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করিতেন। এই দিগ্‌গজগণের ধারণা গৌতম-সূত্রের মতে প্রমাণ চারিটী, আর সাঙ্খ্যসূত্রের মতে প্রমাণ তিনটী এবং বেদান্ত সূত্রের মতে 'অর্থাপত্তি' ও 'অনুপলব্ধি' নামে আরও দুইটী অতিরিক্ত প্রমাণ আছে। এই দিগ্‌গজগণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, একমাত্র ন্যায়সূত্র ছাড়া, বৈশেষিক অথবা সাঙ্খ্য, অথবা পাতঞ্জল, অথবা পূর্ব্বমীমাংসা, অথবা উত্তরমীমাংসার কোন মূল সূত্রে প্রমাণ কাহাকে বলে, অথবা প্রমাণ কত রকমের হইতে পারে, তৎসম্বন্ধীয় কোন কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। কোন বিষয়বিশেষকে প্রমাণযোগ্য করিতে হইলে কোন্ কোন্ প্রমাণ-বিধির সহায়তা লইতে হইবে, তাহা বৈশেষিক সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তর-মীমাংসার স্থানে স্থানে লিখিত আছে। সাঙ্খ্য ও উত্তরমীমাংসায় প্রমাণের কথা লইয়া যে ঝগড়া উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে কারিকা ও ভাষ্যকারগণের কল্পনা-প্রসূত এবং অজ্ঞতা-প্রণোদিত।

'মোক্ষ' ও 'প্রমাণ' কাহাকে বলে তাহার ধারণা যথাযথ ভাবে করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "মোক্ষ" জীব-বিজ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করিবার প্রধান সোপান এবং মোক্ষ-বিষয়ে অগ্রসর লাভ করিবার সর্ব্বপ্রধান পন্থা 'প্রমাণ'। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস নিখুঁৎভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানবসমাজে এমন এক দিন ছিল, যখন জগতের অধিকাংশ মানুষই অর্থাভাব,স্বাস্থ্যাভাব অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর হাত হইতে প্রায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাইয়াছিল। কোন্ উপায়ে মানবসমাজের এতাদৃশ আকাঙ্ক্ষণীয় অবস্থা সংঘটন করা সম্ভব-যোগ্য হইয়াছিল, তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত হইলে দেখা যাইবে যে, এই 'মোক্ষ' ও 'প্রমাণে'র জ্ঞানই মানব-সমাজের আদর্শ অবস্থা আনয়ন করিতে পারিয়াছিল। বর্ত্তমান মানবসমাজের ঘরে ঘরে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য, অকালমৃত্যু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে কেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান কারণ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের 'মোক্ষ' ও 'প্রমাণ'-জ্ঞানের অভাব। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ 'মোক্ষ' ও 'প্রমাণ' কাহাকে বলে এবং প্রমাণের প্রয়োগ করিতে হয় কি করিয়া, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই বলিয়া সজীব বিজ্ঞানের একটী কথাও নিখুঁতভাবে জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা যাহাকে বিজ্ঞান বলেন, তাহা বাস্তবিক পক্ষে মৃত ও কৃত্রিম পদার্থ সম্বন্ধীয়। মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সজীব পদার্থ কোন্ উপায়ে বিবিধ দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে এবং কেন ঐ সজীব পদার্থসমূহ দুঃখে হাবু-ডুবু খাইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধীয় একটি কথাও নিখুঁতভাবে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এতৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত কথা আমরা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব।

শুধু যে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণই "মোক্ষ" ও "প্রমাণ" সম্বন্ধে কোন কথা নিখুঁতভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই তাহা নহে, মধ্যযুগের ভট্ট, আচার্য্য, মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যের কারিকাবলী, গদাধর ভট্টাচার্য্যের ব্যুৎপত্তিবাদ ও শক্তিবাদ, জগদীশ ভট্টাচার্য্যের শব্দ-শক্তিপ্রকাশিকা প্রভৃতি নব্যন্যায়ের গ্রন্থ আমাদিগের উপরোক্ত কথার সাক্ষ্য। নব্যন্যায়ের উপরোক্ত গ্রন্থগুলি পড়িয়া মূল কণাদ ও গৌতম-সূত্র যথাযথ অর্থে পড়িয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কণাদ ও গৌতমসূত্র ঐ গ্রন্থগুলির মূল অবলম্বন বটে, কিন্তু উহাদিগের প্রণেতাগণের কেহই কণাদ ও গৌতমসূত্রের মূল উদ্দেশ্য যে কি, তাহা পর্য্যন্ত আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। কণাদ ও গৌতমসূত্র যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে,

ঐ দুই খানি গ্রন্থে সজীব-পদার্থ-বিষয়ক পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics) ও রসায়নের (Chemistrya) সমস্ত কথার মূল সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ আছে। 'নিঃশ্রেয়সং' ও 'নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ' এই দুইটী পদের অর্থ যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। নব্যন্যায়ের গ্রন্থগুলিতে তথাকথিত ভূয়া পাণ্ডিত্যের অনেক পরিচয় আছে বটে, কিন্তু সজীব-পদার্থ-বিষয়ক বিজ্ঞানের একটি কথাও সম্যক্ পরিমাণে ভ্রমপ্রমাদহীন ভাবে বিদ্যমান নাই। এই গ্রন্থগুলি বাস্তবিক পক্ষে মস্তিষ্কের অপব্যবহারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান সমাজে যে মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সজীব-পদার্থ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের অভাব হইয়াছে, তজ্জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের দায়িত্ব অপেক্ষা মধ্যযুগের উপরোক্ত ভট্ট, আচার্য্য প্রভৃতি তথাকথিত পণ্ডিতগণের দায়িত্ব অনেকগুণ বেশী। আধুনিক মনুষ্য-সমাজের শাসকগণের মধ্যে যদি কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের বিশ্বাস অন্ততঃপক্ষে নব্যন্যায়ের পঠন ও পাঠন সমাজমধ্যে শাস্তি-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। নব্যন্যায়ের পঠন ও পাঠনকে যে এখনও প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা সংস্কৃত শিক্ষা-মন্দিরসমূহের অধ্যক্ষগণের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক।

এক্ষণে আমরা 'উপভোগ-প্রবৃত্তি' ও 'বহির্ম্মুখীনতা' কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা করিব।

'কর্ম্ম-শক্তি' ও 'প্রত্যক্ষ' এই দুইটী পদের অর্থ কি, তাহা বুঝিতে পারিলে উপভোগ-প্রবৃত্তি ও বহির্ম্মুখীনতার সংজ্ঞা উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

মানুষের কর্ম্ম-শক্তি কিরূপ ভাবে বিকশিত হয়, তাহা লক্ষ্য করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের বিভিন্ন বৃত্তি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর। মানুষ সাধারণতঃ অনুরাগবিমুগ্ধ হইয়া সুখলাভের আশায় নানারূপ কার্য্য করিয়া থাকে এবং প্রতি পদে পদে সে তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অথচ যে-সমস্ত পদার্থের অনুরাগে বিমুগ্ধ হইয়া মানুষ এতাদৃশ ভাবে প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত পদার্থ যে কেন অনুরাগ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তদ্বিষয়ে ভুলক্রমেও মানুষ নিজেকে কোন প্রশ্ন করে না। এবং এমন কি সে যে প্রতিনিয়ত তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা পর্য্যন্ত অনুভব করে না এবং তজ্জন্য কোন ক্লেশবোধও করে না। মানুষ তাহার এতাদৃশ অবস্থায় যে সমস্ত কার্য্য ও ক্রিয়া করিয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য্য ও ক্রিয়াকে ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষায় মানুষের 'অক্লিষ্টা' বৃত্তি বলা হইয়া থাকে। অক্লিষ্টা বৃত্তি দ্বিবিধ, যথা:—(১) ভূতাত্মক, ও (২) ভাবাত্মক। ভূতাত্মক অক্লিষ্টা বৃত্তির নাম "বিপর্য্যয়" এবং ভাবাত্মক অক্লিষ্টা বৃত্তির নাম "বিকল্প"।

আধুনিক শিক্ষিত মানুষের পৌণে ষোল আনা সর্ব্বদাই অক্লিষ্টা বৃত্তিতে নিমজ্জিত রহিয়াছে এবং প্রতিনিয়ত 'বিপর্য্যয়' ও 'বিকল্প' সাধন করিতেছে।

এতাদৃশভাবে বিভিন্ন পদার্থের অনুরাগে বিমুগ্ধ হইয়া মানুষ যখন প্রতিনিয়ত তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন সময় সময় কোন কোন মানুষ দুঃখানুভব করিয়া যে-সমস্ত পদার্থের অনুরাগে বিমুগ্ধ হইয়া যে ছুটাছুটী করে, সেই সমস্ত পদার্থকে সে অনুরাগ-যোগ্য মনে করে কেন, তদ্বিষয়ে নিজেকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় ঐ শ্রেণীর মানুষ স্বকীয় ক্ষয়প্রাপ্তিকেও অনুভব করে এবং তজ্জন্য ক্লেশ ভোগ করিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে-ক্রমে জীব-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হয়। জীব-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া অথবা স্বকীয় ক্ষয়প্রাপ্তির ও বিবিধ পদার্থে অনুরাগের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া মানুষ যে-সমস্ত কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্য অবলম্বন করে, সেই সমস্ত কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কার্য্য মানুষের 'ক্লিষ্টা'-বৃত্তির অন্তর্গত। ক্লিষ্টা-বৃত্তি কেবলমাত্র এক শ্রেণীর। তাহার নাম "প্রমাণ" অথবা সত্তাকে উপলব্ধি করিবার কার্য্য।

মানুষের এই দ্বিবিধ বৃত্তিছাড়া, ক্লিষ্টা ও অক্লিষ্টা বৃত্তির মিশ্রণে আর এক শ্রেণীর বৃত্তির উৎপত্তি

হয়। ঐ সমস্ত বৃত্তিকে মানুষের মিশ্রিত বৃত্তি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। মানুষের "নিদ্রা"য় ও 'স্মৃতি'র কার্য্যে তাহার মিশ্রিত বৃত্তির অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে।

যত শ্রেণীর মানুষ আছে এবং তাহারা যত কিছু কার্য্য করিয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য্যই এই ত্রিবিধ বৃত্তির অন্তর্গত।

মানুষের বৃত্তিগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে তাহার উপভোগ-বৃত্তি ও বহির্ম্মুখীনতা কাহাকে বলে, তাহা বুঝা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে।

কতকগুলি পদার্থের অনুরাগে বিমুগ্ধ হইয়া মানুষ যখন অক্লিষ্টা বৃত্তিতে নিমজ্জিত হয় তখন যাহা যাহা লইয়া তাহার অস্তিত্ব অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে-সমস্ত ভূত-পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তৎসম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় এবং সে কেবল বিভিন্ন ভাবের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া, কেবলমাত্র ভাবেই মাতোয়ারা হইয়া থাকে। এই কথার অর্থ—এই অবস্থায় মানুষ কোন দ্রব্যের পরীক্ষা করে না, কেবলমাত্র গুণেই বিমুগ্ধ থাকে এবং যে-সমস্ত গুণকে সে ভাল বলিয়া মনে করে, তাহা লাভ করিবার জন্য প্রতিনিয়ত ছট্‌ফট্‌ করিয়া থাকে।

দ্রব্যের দ্রব্যত্ব পরীক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র গুণে বিমুগ্ধ হইয়া গুণ-লাভ করিবার প্রযত্নের নাম "উপভোগ প্রবৃত্তি"। এই উপভোগ প্রবৃত্তিতে মাতোয়ারা হইবার নাম—"বহির্ম্মুখীনতা"। দ্রব্যের দ্রব্যত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য ক্লিষ্টাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইবার অবস্থার নাম "অন্তর্ম্মুখীনতা"। 'বহির্ম্মুখীনতা'ও 'অন্তর্ম্মুখীনতা' ছাড়া মানুষের আর একটী অবস্থা আছে, সেই অবস্থাটীকে "অসারতা"র অবস্থা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। যখন গুণ-মুগ্ধতা অথবা উপভোগ-পরায়ণতাও থাকে না অথচ দ্রব্যের দ্রব্যত্ব পরীক্ষার প্রবৃত্তিরও উদ্ভব হয় না, অর্থাৎ, এক কথায় যখন বহির্ম্মুখীনতাও থাকে না, এবং অন্তর্ম্মুখীনতাও থাকে না, তখন মানুষ যে অবস্থায় উপনীত হয় সেই অবস্থার নাম 'অসারতা'। এই তিনটী অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই তিনের মধ্যে অন্তর্ম্মুখীনতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং 'অসারতা' সর্ব্ব নিকৃষ্ট। বহির্ম্মুখীনতা বরং শ্রেয়, কারণ বহির্ম্মুখীগণের অন্তর্ম্মুখী হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু অসারতা কখনও প্রশ্রয়যোগ্য নহে, কারণ এই অবস্থা হইতে মানুষ কদাচিৎ অন্তর্ম্মুখী হইতে পারে। আজকালকার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের উপাসক, অথবা কবি, অথবা সাহিত্যিক, অথবা শিল্পী, অথবা বণিক, অথবা রাজনৈতিক, অথবা শাসক অথবা সংবাদপত্রের সম্পাদক, অথবা অর্থ নৈতিক অথবা চিকিৎসক, অথবা আইনব্যবসায়ী, তাঁহাদিগের অধিকাংশকে বহির্ম্মুখী বলা যাইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে যাঁহারা শান্ত শিষ্ট অধ্যাপক, অথবা ধর্ম্মযাজক অথবা ভেকধারী সন্ন্যাসী, অথবা তথাকথিত ভক্ত, তাঁহারা প্রায়শঃ 'অসার', এই অসার শ্রেণীর মানুষই মানুষকে সর্ব্বাধিক বিপথগামী করিয়া থাকেন।

'কর্ম্ম-শক্তি', 'প্রত্যক্ষ', 'বহির্ম্মুখীনতা' ও 'উপভোগ-প্রবৃত্তি', এই চারিটী পদের অর্থ যথাযথ ভাবে ধারণা করিয়া লইয়া মোক্ষপদের অর্থ ধারণা করিতে বসিলে অনেকখানি সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইবে। তখন দেখা যাইবে যে, মোক্ষলাভ করার মর্ম্মার্থ—স্বকীয় অবয়বের মধ্যে যত কিছু দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম বিদ্যমান আছে তাহার প্রত্যেকটিকে কার্যতঃ উপলব্ধি করিয়া পুনরায় তাহার প্রত্যেকটীকে কার্য্যকারণসঙ্গত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সাজাইয়া লইয়া উপলব্ধি করা। ইহারই নাম জীব-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হওয়া। এক্ষণে চিন্তাশীল পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখুন 'মোক্ষ' মনুষ্য-সমাজের কত বড় প্রয়োজনীয় পদার্থ। আরও ভাবিয়া দেখুন, ঐ টিকিধারী নামাবলীওয়ালা ভণ্ডগণ এত বড় প্রয়োজনীয় পদার্থকে কিরূপ আলেয়ার আলোতে পরিণত করিয়াছেন। ইঁহারা যে প্রায়শঃ নির্ব্বংশ ও অথবা শ্রীহীন বংশসম্পন্ন হইয়াছেন, তাহা অকারণ নহে। ইঁহারা মনুষ্য-সমাজের রক্ষার্থে বড় প্রয়োজনীয়, কারণ ইহাঁদিগেরই হৃদয়ে আমাদিগের আরাধ্য ঋষিগণের রক্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাঁদিগকে জাগ্রত করিতে না পারিলে মনুষ্য-সমাজের

স্বাস্থ্যবান অস্তিত্ব ফিরাইয়া পাইবার আশা সুদূরপরাহত। ইহাঁদিগের জন্য প্রয়োজন কাণ-মলা ও নাক মলা। পাঠকগণ, লেখককে কোপন-স্বভাব ও হীন-প্রকৃতির মনে করিতেছেন? তাহা করুন। লেখক স্বীকার করিতেছে যে, সে কোপন-স্বভাব ও হীন-প্রকৃতির। কিন্তু তথাপি সে বলিবে যে, টিকিধারী নামাবলীওয়ালাগণের জন্য কাণ-মলা ও নাক-মলার ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের বুদ্ধি যখন বিভ্রান্ত হয়, তখন ঋষিগণ তাহাদিগের বুদ্ধিকে সজাগ করিবার জন্য কাণ-মলা ও নাক-মলার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা বিজ্ঞানসঙ্গত, কারণ কাণ ও নাক মস্তিষ্ক-পদার্থের সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাধিক সন্নিকটে সম্বিষ্ট এবং ঐ দুইটী অঙ্গ নাড়িয়া দিলেই মস্তিষ্ক-পদার্থ অতি সহজেই আলোড়িত হইয়া থাকে। ইহারই জন্য একদিন বালকদিগের পক্ষে কাণ-মলা ও নাক-মলার শাস্তি সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর বলিয়া বিবেচিত হইত।

কত বেদনায় এই লেখকের কলম চলিতেছে, তাহা ঐ টিকিধারী প্রাণহীন পদার্থগুলি বুঝিতে পারিবে না। ইহারা নির্লজ্জ, তাই শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে ও শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিতে ইহারা সঙ্কোচ বোধ করে না। মানবজাতির ইতিহাস যথাযথভাবে পর্য্যালোচনা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বার হাজার বৎসর লইয়া যে এক একটি যুগ হয়, সেই যুগের বর্ত্তমান যুগ আরম্ভ হইয়াছে শাক্যসিংহের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এবং উহার ক্রম-পরিণতি হইয়াছে খৃষ্টদেব ও নবী মহম্মদের জন্মে। এই তিন জন মহাপুরুষই ঐ টিকিধারী নামাবলীওয়ালাগণের ভুয়া শাস্ত্রাধ্যাপন ও শাস্ত্র-ব্যবস্থার সঙ্কোচ-সাধন করিয়াছেন। এই টিকিধারী নামাবলীওয়ালাগণের কুকার্য্যের ফলে ঋষিপ্রণীত যে-মানব-ধর্ম্ম একদিন সারা জগতের প্রত্যেকের ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, সেই মানব-ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং মানুষের ধর্ম্ম সম্প্রদায়গত হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম-পদের অর্থ কি, তাহা যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জল যেরূপ কখনও তারল্য-বিহীন হইতে পারে না, সেইরূপ 'ধর্ম্ম'ও কখনও সম্প্রদায়গত হইতে পারে না। যে মাতামাতির মধ্যে মানব-সমাজ চলিতেছে, তাহাতে এই কথাটি মানব-সমাজকে আবার কে বুঝাইবে এবং কেই বা বুঝিবে? মানব-সমাজের এতাদৃশ অবস্থার মূল কারণ ঐ টিকিধারী ভণ্ড নামাবলীওয়ালাগণ, আমারা উহাঁদিগকে এখনও আত্ম-বিশ্লেষণ-পরায়ণ হইয়া নিজদিগের ত্রুটি অনুধাবন করিতে এবং উহাঁদিগের অধ্যাপনা ও শাস্ত্র-ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করি। পেটের দায়ে চুরি, ডাকাতি ও প্রবঞ্চনা করিতে মানুষ্য বাধ্য হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা কখনও প্রশংসনীয় নহে, পরন্তু সর্ব্বদাই শাস্তিযোগ্য। আধুনিক কালের তথাকথিত ধর্ম্ম-যাজনা ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রাধ্যাপনা চুরি, ডাকাতি ও প্রবঞ্চনারই অনুরূপ। উহা কিছুদিন স্থগিত রাখিয়া প্রকৃত মানব-ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলে মনুষ্য-সমাজের কোন ক্ষতি হইবে না, পরন্তু উপকারই হইবে।

মানুষের কর্ম্ম-শক্তির উদ্ভব হয় কি করিয়া, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া স্বকীয় ভূত ও ভাবাত্মক পদার্থগুলি কার্য্য-কারণসঙ্গত শৃঙ্খলিতভাবে উপলব্ধি করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, অর্থাৎ মোক্ষ-পরায়ণ হইলে দেখা যাইবে যে, চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলের সহিত স্বকীয় সম্বন্ধ নিরূপিত করিতে না পারিলে স্বকীয় কর্ম্ম-শক্তির উদ্ভব হয় কি করিয়া, তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় না। চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলের সহিত স্বকীয় সম্বন্ধ নিরূপণ করিবার নাম "স্বর্গে গমন"। 'মোক্ষ' এবং 'স্বর্গ' এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলিয়াই মহাভারত স্বর্গারোহণ-পর্ব্বে সমাপ্ত করা হইয়াছে।……

স্বকীয় ভূত ও ভাবাত্মক পদার্থগুলি কার্য্যকারণসঙ্গত শৃঙ্খলিত ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে অর্থাৎ মোক্ষ-সাধনায় সিদ্ধ হইলে দেখা যাইবে যে, স্বকীয় ভূত ও ভাবাত্মক পদার্থগুলি সর্ব্বদাই কতকগুলি স্থির নিয়মে চলনশীল। এই নিয়মের সংখ্যা সর্ব্ব-সমেত ১০৮টি। এই নিয়মগুলি জানিতে পারিলে অবয়বমধ্যস্থ কোন অংশের উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন কত বেগে কখন সাধিত হইতেছে, তাহা নির্ভুলভাবে কসিয়া বাহির করা যায়। এই নিয়মগুলি কি করিয়া বাস্তবতঃ অনুমান করা যায়, তাহার কথা মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মাধ্যায়ে আছে বটে, কিন্তু উহা কসিবার নিয়ম মহাভারতে নাই। উহা আছে শুক্লযজুর্ব্বেদের মধ্যে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ দাম্ভিকতায় ভরপূর বটে, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের এই অংশ বর্ত্তমান বিজ্ঞান এখনও অনুমান পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। অবয়বমধ্যস্থ কোন্ অংশের উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন কত বেগে কখন সাধিত হইতেছে, তাহা কসিয়া বাহির করিবার নিয়মগুলি পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে চক্ষুর আকৃতি কেন কর্ণের আকৃতির মত হয় না, যেখানে চক্ষু আছে সেখানে কর্ণ না হইয়া চক্ষু হইল কেন, চতুষ্পদ জীব দুই পায়ে না হাঁটিয়া চার পায়ে হাঁটে কেন, কর্ণের দৃষ্টিশক্তি না হইয়া চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হইল কেন এবংবিধ প্রশ্নগুলির উত্তর সমাধান করা সম্ভব হয়। ভারতীয় ঋষির মোক্ষ-শাস্ত্র যে কতখানি বিজ্ঞানমূলক তাহা পাঠকগণকে বিদিত করিবার জন্য আমরা এই কথাগুলি লিখিলাম।

স্বকীয় অবয়বমধ্যস্থ প্রত্যেক অংশে এবং এমন কি প্রত্যেক অণু ও পরমাণুতে যেরূপ উৎক্ষেপণ (upward motion), অবক্ষেপণ (downward motion), আকুঞ্চন (contraction), প্রসারণ (expansion) ও গমন (outward motion)-রূপী পাঁচটী কর্ম্ম বিদ্যমান আছে, এবং ঐ পাঁচটী কর্ম্ম যেরূপ সম্পূর্ণ নিয়মাধীন, চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলেও সেইরূপ ঐ পাঁচটী কর্ম্ম বিদ্যমান আছে এবং বায়ুমণ্ডলের কর্ম্মও সম্পূর্ণ নিয়মাধীন। স্বর্গাধ্যায়ে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে চন্দ্র পর্য্যন্ত বায়ুমণ্ডলের পঞ্চবিধ কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য (অর্থাৎ বর্ণনা) ও অঙ্কশাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। বায়ুমণ্ডল-সম্বন্ধীয় অনেক তথ্যই মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার সম্পূর্ণ তথ্য অথবা অঙ্কশাস্ত্র মহাভারতে নাই। উহা আছে শুক্লযজুর্ব্বেদে। ভারতীয় ঋষিগণ এবংবিধ তথ্য ও অঙ্কশাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা ফলিত জ্যোতিষ প্রণয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই তথ্যগুলি ও অঙ্কশাস্ত্র এখনও বিদ্যমান আছে এবং এখনও উহা উপলব্ধি করা সম্ভব। ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষা অধুনা বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত আছে বলিয়াই মানুষ মহাভারত ও বেদ অধ্যয়ন করিয়াও ঐ তথ্য ও অঙ্কশাস্ত্রের সন্ধান পায় না। ঐ তথ্য ও অঙ্কশাস্ত্রের সন্ধান পাইলে মানুষ বুঝিতে পারিবে যে, একদিকে যেরূপ টিকিধারী নামাবলীওয়ালাগণ মনুষ্য-সমাজকে বহুদিন হইতে বিপথচালিত করিয়া আসিতেছেন, সেইরূপ আবার আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও মানুষকে যে-সমস্ত তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা প্রায়শঃ ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ। আমরা ইহার পর মোক্ষ-যোগ ও মোক্ষ-ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং মোক্ষ লাভ করিবার উপায় কি এবং জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহে মোক্ষ-লাভ করিবার প্রয়োজনীয়তা কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বৈজ্ঞানিকতা ঃ মেঘনাদ সাহা ও আধুনিক বিজ্ঞানের অসাফল্য

আধুনিক বিজ্ঞানে অসম্পূর্ণতা এবং ভ্রমপ্রমত্ততা কোথায়, তাহা আংশিকভাবে দেখান আমাদিগের এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ কোথায় তাহা দেখানে আমাদিগের এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কোথায়, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে আমরা প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, ডক্টর মেঘনাদ সাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিশ্লেষণ করিব, কারণ আমাদিগের মতে বর্তমান-বিজ্ঞানের বিষয়ে বর্তমান জগতের মধ্যে ডক্টর মেঘনাদ সাহার স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করিলে আধুনিক কালের আসল বৈজ্ঞানিক শ্রেণীর সকল মানুষেরই উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করা হইবে, কারণ ডক্টর মেঘনাদ সাহা ঐ বৈজ্ঞানিক শ্রেণীর আদর্শ স্বরূপ। মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক-বিজ্ঞান বলিতে আমরা বুঝি সেই বিজ্ঞানকে, যাহার বীজ রোপিত হইয়াছে গ্যালিলিও ও নিউটনের হস্তে ও যাহা প্রসার লাভ করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত নানারূপ শাখা-প্রশাখায় শোভিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও মনে রাখিতে হইবে যে, বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারিং ও আর্ট—এই তিনটী কথার অর্থে অনেকখানি পার্থক্য রহিয়াছে। আমাদিগের বিশ্বাস 'সায়েন্স্', 'এঞ্জিনিয়ারিং' ও 'আর্ট' —এই তিনটী কথার অর্থে যে অনেকখানি পার্থক্য আছে, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কোথায় যে পার্থক্য হওয়া উচিত, তাহা লইয়া অনেক মত-ভেদ বর্তমান কালে বিদ্যমান আছে। আমাদিগের ধারণানুসারে এই মত-ভেদ সাধারণতঃ বাক্য-মূলক। কার্য্যতঃ মত-ভেদ অতীব যৎসামান্য। বর্তমান কল-কব্জার সম্বন্ধে বর্তমান কালের ধারণানুযায়ী মানুষের কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে যে পন্থা অবলম্বন করা হয়, তাহার নাম "এঞ্জিনিয়ারিং"। সৌন্দর্য্য-সাধনার উদ্দেশ্যে যে পন্থা অবলম্বন করা হয়, তাহার নাম "আর্ট"। এঞ্জিনিয়ার ও আর্টিষ্টগণ প্রয়োজন ও সৌন্দর্য্য সাধনের উদ্দেশ্যে যে যে পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই সেই পন্থা সার্থক হয় কেন এবং ঐ ঐ পন্থার গাণিতিক নিয়ম কি কি হইতে পারে, তাহা স্থির করা ও তাহার ব্যাখ্যা করাই বর্তমান বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। আধুনিক এঞ্জিনিয়ার, আর্টিষ্ট ও সায়েন্টিষ্ট-গণের মধ্যে কে কি করিতেছেন, অর্থাৎ কোন্ গণ্ডীর মধ্যে কে চলিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে আমাদিগের উপরোক্ত সংজ্ঞার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। অবশ্য এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এঞ্জিনিয়ার, আর্টিষ্ট ও সায়েন্টিষ্টগণের কার্য্য-গণ্ডীর মধ্যে যে উপরোক্ত রকমের পার্থক্য আছে, তাহা তাঁহারা অবগত আছেন কি না, তৎসম্বন্ধে আমরা অপরিজ্ঞাত। বর্তমান বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহা যদি মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদিগের মতে বর্তমান বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে অসাফল্য লাভ করিয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণকে অবিলম্বে সতর্কতা লাভ করিতে হইবে, কারণ এঞ্জিনিয়ার ও আর্টিষ্টগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব উদ্দেশ্য সাধনার্থ যে-পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই সেই পন্থা সার্থক হয় কেন এবং ঐ ঐ পন্থার গাণিতিক নিয়ম কি কি, তৎসম্বন্ধে যে যে কথা বাহির হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক কথাটী অসম্পূর্ণ এবং ভ্রম-প্রমাদ-পরিপূর্ণ। বর্তমান বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব যদি উপরোক্ত ভাবে মানিয়া না লওয়া হয়, তাহা হইলে দুইটী দোষের উদ্ভব হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ সায়েন্টিষ্ট, এঞ্জিনিয়ার এবং আর্টিষ্ট, এই তিন শ্রেণীর মানুষের কার্য্য-গণ্ডী লইয়া খিচুড়ীর উদ্ভব হয়, নতুবা, দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞান উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদিগের বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েসনে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা স্থির করিতে বসিয়া যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রায়শঃ হয় উপরোক্ত রকমের খিচুড়ীত্ব-আনয়ক হইয়াছে, নতুবা মানুষের প্রয়োজন-সাধন-সম্বন্ধে উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। 'বিজ্ঞান'-সম্বন্ধীয় প্রচলিত যে কোন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলে আমাদিগের উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব-সম্বন্ধে আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা মানিয়া না লইলেও, বিজ্ঞান অথবা সায়েন্স্ এই দুইটি পদের মৌলিক অথবা etymological অর্থ কি কি, তাহা ধরিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, বিজ্ঞান অথবা সায়েন্স্ বলিতে মূলতঃ যাহা বুঝায়, তাহা একদিন জগতে বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু অনেকদিন হইতে উহা লুপ্ত ও বিকৃত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান কালে উহা একেবারেই বিদ্যমান নাই। আমাদিগের এতাদৃশ কথা বলিবার কারণ, বিজ্ঞান পদটীর শব্দগত অর্থ "ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ বিশ্ব, জগৎ এবং জীবমণ্ডলে যে যে পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় অথবা যাহাদিগের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারা যায়, সেই সেই পদার্থের বাহ্যিক রূপ ও অন্তরের কর্ম্মপদ্ধতি তাদৃশ হয় কেন, তাহা বিচার করিবার কার্য্য ও উপলব্ধি"। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সংস্কৃত ভাষায় বিজ্ঞান শব্দের যে অর্থ, প্রাচীন হিব্রুভাষার অর্থ-গ্রহণ-পদ্ধতি অনুসারে ল্যাটিন্ "সায়েন্‌টিয়া" শব্দেরও সেই একই অর্থ। ল্যাটিন "সায়েনটিয়া" শব্দ হইতে ইংরাজী "সায়েন্স্" শব্দটীর উদ্ভব হইয়াছে। যাঁহারা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সমস্ত কথার সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা গোঁড়ামী ছাড়িয়া বিচারকের দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, 'বিশ্ব' 'জগৎ' ও 'জীবমণ্ডলে' যে যে পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা যাহাদিগের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারা যায়, সেই সেই পদার্থের বাহ্যিক রূপ ও অন্তরের কর্ম্মপদ্ধতি তাদৃশ হয় কেন, তাহা বিচার করিবার কার্য্য ও উপলব্ধি তো দূরের কথা, ঐ সমস্ত পদার্থের বাহ্যিক রূপ ও অন্তরের কর্ম্মপদ্ধতি যে কত রকমের হইয়া থাকে, তাহা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বিজ্ঞান স্থির করিতে পারে নাই। ইহারই জন্য আমরা বলিতেছিলাম যে, বিজ্ঞান অথবা সায়েন্স্ এই দুইটী পদের মৌলিক অথবা ইটিমলজিকাল (etymological) অর্থে যাহা বুঝায়, তাহা ধরিলে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান কালে প্রকৃত বিজ্ঞান বিদ্যমান নাই। ডক্টর সাহা ও তাঁহার শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করুন আর নাই করুন, আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই প্রকৃত-বিজ্ঞান শুধু ভারতবর্ষে কেন, সমগ্র মানব-সমাজে একদিন প্রচলিত ছিল। এই প্রকৃত বিজ্ঞান যে একদিন সমগ্র মানব-সমাজে বিদ্যমান ছিল, তাহা সপ্রমাণিত করা আমাদিগের এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রকৃত 'বিজ্ঞান' একদিন যে মানব-সমাজে বিদ্যমান ছিল তাহার বড় প্রমাণ, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় ঋষি-প্রণীত অষ্টাদশ বিদ্যার* তেরটী বিদ্যা† প্রাচীন হিব্রু ভাষায় বাইবেল এবং প্রাচীন আরবী ভাষায় কোরাণ। এখন যে, বেদ, বাইবেল ও কোরাণ পড়িয়াও ঐ তিনের মধ্যে প্রকৃত বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহার কারণ প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা, প্রাচীন হিব্রু ভাষা এবং প্রাচীন আরবী ভাষার অর্থ কি করিয়া নির্ভুল ভাবে গ্রহণ করিতে হয়, তাহার পদ্ধতি মানুষ অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ হাজার বৎসর হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা, প্রাচীন হিব্রু ভাষা ও প্রাচীন আরবী ভাষার অর্থ কি করিয়া নির্ভুল ভাবে গ্রহণ করিতে হয়, তাহার পদ্ধতি অবগত হইতে পারিলে আজিও বেদ, বাইবেল ও কোরাণের মধ্যে প্রকৃত বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যাইবে এবং একদিন মানুষের জ্ঞান কত সম্পূর্ণ ছিল, তাহা বুঝা যাইবে। প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু এবং প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত বাক্যাবলীর অর্থ কি করিয়া নির্ভুলভাবে গ্রহণ করিতে হয়, তাহার পদ্ধতি লিখিত আছে বেদাঙ্গান্তর্গত অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠে। অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ ঠিক ঠিক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নহে। উহা যে ভাষায় লিখিত, ঋষিগণ তাহার নাম দিয়াছেন 'প্রাকৃত' ভাষা। প্রাকৃত ভাষায় প্রবেশ করিবার প্রকৃত পদ্ধতি অবগত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহা অতীব সহজ, কিন্তু সকলের পক্ষে সকল অবস্থায় সম্ভবযোগ্য নহে। পেটে ক্ষুধার জ্বালা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকিলে, অথবা দুশ্চিন্তার কুটীল কুহকে প্রমত্ত হইতে বাধ্য হইলে, অথবা রাগ দ্বেষে মত্ত হইলে খাঁটী প্রাকৃত ভাষায় আদৌ প্রবেশ-লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের 'ভূত'-(অর্থাৎ মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্ম প্রভৃতি যাহা কিছু লইয়া মানুষের অস্তিত্ব তাহা) এবং 'ভাব' (অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির কার্য্যের ফলে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা) কত রকমের হয় এবং কোন্ রকমের ভূত ও ভাবাপন্ন হইলে

* ঋষি-প্রণীত অষ্টাদশ বিদ্যা—চারিটী শ্রুতি, ছয়টী বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র (অর্থাৎ সংহিতাবলী), আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব্ব ও নীতিশাস্ত্র।

† তেরটী বিদ্যা—চারিটী শ্রুতি, ছয়টী বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায় ও পুরাণ।

কোন্ রকমের বাক্যের উদ্ভব হয়, তাহার বিচার করিয়া প্রাকৃত ভাষা স্থির করা হয়। প্রাকৃত ভাষার অর্থগ্রহণ করিবার মূল রহিয়াছে, চতুর্দ্দশ মহেশ্বর-সূত্রে এবং উহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠের নবাহ্নিক অধ্যায়ে। প্রত্যেক ভাষার, অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যত কিছু চর-জীব আছে, তাহার প্রত্যেকের ভাষার মূলে রহিয়াছে অ-কারাদি চতুঃষষ্ঠী ধ্বনি ও তাহার সংযোগ-বিয়োগ। প্রত্যেক ভাষার মূলে যে অ-কারাদি চতুঃষষ্ঠী ধ্বনি ও ঐ সমস্ত ধ্বনির সংযোগ-বিয়োগ বিদ্যমান আছে, তাহা ইংরাজী, জার্ম্মান, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, গ্রীক, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, পার্শী প্রভৃতি ভাষার বর্ণমালা ও পশু-পক্ষীগণের ডাক লক্ষ্য করিলেই প্রতীয়মান হইবে। এই চতুঃষষ্ঠী বর্ণমালার কোন্টী কোন্ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা মহেশ্বর-সূত্রে দেখান হইয়াছে। কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া মহেশ্বর-সূত্র আবৃত্তি করিতে পারিলে স্বতঃই ঐ মৌলিক বর্ণমালার প্রত্যেকটীর অর্থ উদ্ভাসিত হয়। ঐ নিয়মগুলি পালন না করিতে পারিলে অথবা না করিলে কিছুতেই মহেশ্বর-সূত্রের অর্থ বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে এবং অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠে অথবা ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় যথাযথভাবে প্রবেশ লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠে প্রবিষ্ট না হইতে পারিলে প্রাচীন হিব্রু অথবা প্রাচীন আরবী ভাষায় যথাযথভাবে প্রবেশ করাও সম্ভবযোগ্য হয় না।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আমাদিগের অভিযোগ সংক্ষেপতঃ দুইটী, যথা :—

(১) বিজ্ঞান অথবা Science শব্দের মূলতঃ (etymological) যে অর্থ, সেই অর্থে আধুনিক বিজ্ঞানকে মোটেই সজীব পদার্থ-সম্বন্ধীয় কোন বিজ্ঞান বলা চলে না। উহাকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে মৃত ও কৃত্রিম পদার্থের বিজ্ঞান বলা চলে।

(২) অধুনা "বিজ্ঞান" বলিতে যাহা বুঝিতে হয়, সেই অর্থেও আধুনিক বিজ্ঞান তাহার দায়িত্ব এতাবৎ সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারে নাই। পরন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের দুষ্টতাবশতঃ আধুনিক এঞ্জিনিয়ারিং ও আর্ট মানুষের হিতকারী হইতে পারে নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের দুষ্টতাবশতঃ পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ, প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব বিপথগামী হইয়াছে এবং পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রও নির্ভরের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।

উপরোক্ত দুইটী অভিযোগই যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা দেখান আমাদের এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

আধুনিক তথাকথিত 'বিজ্ঞান' যে এতাদৃশ দুষ্টতাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা লোক-সমক্ষে প্রমাণিত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, heat-engine, internal combustion engine, turbine, dynamo, motor, æronautic-engineering, radio-engineering, wireless engineering, telegraphic engineeriug প্রভৃতির কার্য্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করিবার জন্য এবং light wave ও sound wave বুঝাইবার জন্য বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ যে সমস্ত theory, law এবং mathematical rules-এর সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সমস্ত theory, law এবং mathematical rules-এর প্রত্যেকটীর অসারতা প্রতিপন্ন করা। ইহা অতীব বিস্তৃত কার্য্য। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার অভিলাষ আমাদিগের আছে বটে, কিন্তু পাপময় জীবনের যে কয়টী দিন বাকী আছে তাহাতে ঐ অভিলাষ চরিতার্থ করিবার অবসর ও সুযোগ জুটিবে কি না, তাহা এখনও বলিতে পারি না। আমাদিগের দ্বারা এই কার্য্য নিষ্পন্ন হউক আর নাই হউক, কাহারও না কাহারও দ্বারা যে ঐ কার্য্য অদূরভবিষ্যতে নিষ্পন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ, কারণ আমাদিগের পাপময় অজ্ঞ চক্ষুর সম্মুখে সামান্য সামান্য যাহা কিছু প্রতিভাত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা হইতে আমাদিগের ধারণা যে, এই ব্রহ্মাণ্ড একটী সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মে পরিচালিত এবং মানুষের হিতসাধনের জন্য যখন যে-স্থানে যে-পদার্থের প্রয়োজন হয়, তাহার সমাধান করা উপরোক্ত নিয়মের অন্যতম কার্য্য। ঐ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ম সর্ব্বদাই মানুষের হিতকারী এবং কখনও মানুষের ক্ষয়কারী হয় না। তথাপি যে মানুষের ক্ষয় ও পাতিত্য ঘটিয়া থাকে, তাহার একমাত্র কারণ, ঐ-নিয়ম সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা এবং তদ্বিরুদ্ধ কার্য্যসমূহে মানুষের প্রবৃত্তি ও হস্তক্ষেপ অথবা এক কথায় মানুষের পাপ। আধুনিক কালের মানুষ যে প্রায়শঃ ঐ সর্ব্বব্যাপী সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মের কার্য্যসমূহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং এই অজ্ঞতাবশতঃ যে প্রায়শঃ উহার বিরুদ্ধ কার্য্যসমূহে হস্তক্ষেপ করিতেছে, তাহা আমাদিগের এই অজ্ঞতাপরিপূর্ণ চক্ষুতেও প্রতিভাত হইতেছে।

এতাদৃশ পাপের ফলে মানুষ পশুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং যুদ্ধের নামে পরস্পরকে হত্যা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না। সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রায় প্রতি পরিবারে হয় অর্থাভাবের জ্বালা, নতুবা অস্বাস্থ্যের জ্বালা, নতুবা অশান্তির জ্বালা, নতুবা অসন্তুষ্টির জ্বালা, নতুবা অকাল-বার্দ্ধক্যের জ্বালা, নতুবা অকালমৃত্যুর জ্বালা, দাউ দাউ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। এক কথায় সমগ্র মনুষ্যসমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে। লিখিত ইতিহাসে মনুষ্যসমাজের এতাধিক দুর্দ্দশার দৃষ্টান্ত আর কোন সময়ে দেখা যাইবে না। এই সময়ে ঐ সর্ব্বব্যাপী সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মের কার্য্যানুসারে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য মানুষেরই প্রবৃত্তির মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এবং ঐ প্রতিক্রিয়ার ফলে বর্ত্তমান অজ্ঞতা নষ্ট হইয়া যাইবে। এইজন্যই বলিতে-ছিলাম যে, তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞান যে এতাদৃশ দুষ্টতাপন্ন হইয়াছে, তাহা আমাদিগের দ্বারা যথারীতি বিস্তৃত ভাবে প্রমাণিত হউক আর নাই হউক, কাহারও না কাহারও দ্বারা উহা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণিত হইবেই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপতঃ আমরা ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব।

ঐ কার্য্যে আমাদিগের অবলম্বন হইবে ডক্টর মেঘনাদ সাহার একটি বক্তৃতা এবং তিনটী প্রবন্ধ। এই তিনটী প্রবন্ধের একটীর নাম "আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম," দ্বিতীয়টীর নাম "আধুনিক জগৎ ও হিন্দুজাতি" এবং তৃতীয়টীর নাম "সমালোচনার উত্তর"। যে বক্তৃতাটীর কথা আমরা উপরে বলিয়াছি, তাহা ডক্টর মেঘনাদ সাহা ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে "শান্তি-নিকেতনে" শিক্ষক ও ছাত্র-মণ্ডলীর সম্মেলনে প্রদান করিয়াছিলেন।

ডক্টর সাহার উপরোক্ত বক্তৃতার বিরুদ্ধে পণ্ডিচারীর শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় একটী সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা ১৩৪৬ সালের বৈশাখ সংখ্যার ভারতবর্ষে "আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম"-শীর্ষক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। ইহারই পরবর্ত্তী সংখ্যার ভারতবর্ষে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-মাসের সংখ্যায় ডক্টর সাহা শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের সমালোচনার উত্তর দিতে আরম্ভ করেন। এই উত্তরও "আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম"-শীর্ষক প্রবন্ধাকারে ১৩৪৬ সালের ভারতবর্ষের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহার সমাপ্তি হয় ১৩৪৬ সালের 'ভারতবর্ষে'র পৌষ সংখ্যায়। এই পৌষ সংখ্যার ভারতবর্ষে প্রকাশিত ডক্টর সাহার প্রবন্ধের নাম হইতেছে "আধুনিক জগৎ ও হিন্দু-জাতি"। গত চৈত্র মাসের ভারতবর্ষে শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত ডক্টর সাহার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ দুইটীর সমালোচনা করেন এবং এই সমালোচনার নামকরণ করেন "ডক্টর সাহার নবনীতি"। এই সংখ্যাতেই ডক্টর সাহা "সমালোচনার উত্তর"-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দত্তের সমালোচনার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

ডক্টর সাহা তাঁহার উপরোক্ত বক্তৃতায় ও তিনটী প্রবন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। এই কথাগুলির মধ্যে দুষ্টতা কোথায়, তাহা দেখাইয়া আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের অপকর্ষ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের মধ্যে জাগরণ আনিবার চেষ্টা করিব।

শান্তি-নিকেতনের শিক্ষক ও ছাত্র-সম্মেলনে ডক্টর সাহা যে-বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার মুখ্য বক্তব্য তিনটী, যথা :— (১) ভারতীয় হিন্দুগণের পতনের কারণ, (২) ভা হিন্দুগণের পুনরুত্থানের সূত্র ও কর্ত্তব্য, (৩) ভারতীয় হিন্দু-গণের পুনরুত্থান সাধন করিতে হইলে কি কি বর্জ্জনীয়।

ডক্টর সাহার এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তদনুসারে ডক্টর সাহার মতে ভারতীয় হিন্দুগণের পতনের প্রধান কারণ তাহাদিগের "ধর্ম্ম ও দর্শন"। ধর্ম্মের প্রধান দোষ এই যে, উহা "বিশ্ব-জগতের যে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ধারণা নিছক কল্পনামূলক"। উহার আর এক দোষ এই যে, উহার ফলে "হিন্দু সমাজে হস্ত ও মস্তিষ্কের পরস্পর কোন যোগাযোগ নাই।"

হস্ত ও মস্তিষ্কের এই যোগাযোগ-সূত্র ছিন্ন হওয়ার পরিচয় হিন্দুর জাতিভেদে এবং তাহার ফলে "সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুগণ শিল্প ও দ্রব্যোৎপাদনে একই ধারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে এবং তজ্জন্য বহুবার যান্ত্রিক বিজ্ঞানে উন্নততর বৈদেশিকের পদানত হইয়াছে।" হিন্দুধর্ম্মের উপরোক্ত দুইটী বিশেষ দোষ ছাড়া সকল ধর্ম্মেরই আর একটী সাধারণ দোষ এই যে-সকল ধর্ম্মেই মনে করা হয় যে, "বিশ্বজগৎ কোন সৃষ্টি-কর্ত্তার দ্বারা সৃষ্ট"। ডক্টর সাহা "ধর্ম্ম ও দর্শন" সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপসংহার এই যে, জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে সৃষ্টি-কর্ত্তার সন্ধানের অথবা ধর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই।

ভারতীয় হিন্দুগণের পুনরুত্থান সাধন করিতে হইলে কোন্ সূত্র ধরিয়া কি কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে ডক্টর সাহা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তদনুসারে বলিতে হয় যে, ডক্টর সাহার মতে উচ্চ-জীবনের আদর্শ স্থির করা এবং তদনুসারে নিয়ন্ত্রিত হওয়াই উচ্চতম সভ্যতা লাভ করিবার প্রধান উপায়। এতদর্থে সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান সভ্যতার আশ্রয় গ্রহণ করাই ভারতের পুনরুত্থানের একমাত্র উপায়, কারণ "সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা ও পরম্পরাগত জ্ঞানরাশির উপর বর্ত্তমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। এই প্রসঙ্গে তাঁহার নিম্নলিখিত দুইটী কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

(১) "বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পৃথিবী হইতে আমাদিগকে শক্তি, খনিজ দ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্য সম্যক্ উৎপাদন করিতে হইবে।"

(২) "দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তিকে কাযে লাগাইতে হইবে এবং সেই ভিত্তির উপর যান্ত্রিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।"

ডক্টর সাহা তাঁহার উপরোক্ত দ্বিতীয় কথার বিস্তার সাধন করিবার জন্য যাহা যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটী উল্লেখযোগ্য :—

(১) যদি দেশে প্রচুর কার্য্যের সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত সমস্যার (অর্থাৎ গ্রামবাসিগণের ভাল ঘর-বাড়ী, পর্য্যাপ্ত খাদ্য ও বস্ত্র এবং জীবনে অপেক্ষাকৃত প্রচুর অবকাশ ও প্রাচুর্য্য লাভ করিবার সমস্যার) সমাধান হয়।

(২) আমাদিগের আত্মরক্ষার খাতিরেও কার্য্য-সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন।

(৩) যদি আমরা পুনর্ব্বার বিদেশীয়গণের পদানত হইবার ইচ্ছা না করি, তবে আমাদিগকে য়ুরোপ ও আমেরিকার মত যান্ত্রিক সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইবে।

(৪) ভারতের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন, তাঁহারা বলেন যে, ভারতবর্ষের পক্ষে চিরকাল কৃষিপ্রধান হইয়া থাকা উচিত। এই মত অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া মনে করি।

(৫) দেশে নানাবিধ নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই আমাদের দেশ য়ুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে।

ভারতবর্ষের পুনরুত্থান সাধন করিতে হইলে কি কি বর্জ্জন করিতে হইবে, তৎপ্রসঙ্গে ডাঃ সাহা যাহা যাহা তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটী কথা উল্লেখযোগ্য :—

(১) "জীবন-সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকে বলেন যে, আমাদিগকে সহর হইতে গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুটীর ও হস্ত-শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই এই সমস্ত যুক্তির অসারতা বুঝা যায়।" কাযেই আমাদিগকে গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তি বর্জ্জন করিতে হইবে।

(২) "যদি কোন আদর্শকে ফলবান্ করিতে হয়, তাহা হইলে উঁহাকে কেবল বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয়। রুষিয়ার বর্ত্তমান জাতীয় জীবন খানিকটা অপূর্ণ, কারণ এখানে আদর্শে ও কাযে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব।" কাযেই আমাদিগকে রুষিয়ার অনুকরণ বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৩) যদি আমরা আমাদের সভ্যতার উৎসকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগের জীবনাদর্শকে সামাজিক মৈত্রী, সার্ব্বজনীন প্রীতি ও নৈতিকতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ বাবুর সমালোচনার প্রত্যুত্তরে ডক্টর সাহা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

১৩৪৬ সালের ভারতবর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দু-ধর্ম্ম"-শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য কথা :—

(১) "আমি যে বক্তৃতা দিয়াছি তাহাতে কোনও মৌলিক গবেষণার পরিচয় নাই—এবংবিধ মন্তব্য যুক্তিহীন ও অসার। "আমার বক্তৃতা সম্পূর্ণ মৌলিক।"

(২) "হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ধর্ম্ম ও ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য ডাঃ সাহা যদি কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেন, পরের মুখেই ঝাল না খাইতেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতেন যে, ঐ বিষয়ে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা তাঁহার ন্যায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই"—এতাদৃশ মন্তব্য অজ্ঞতাপ্রসূত। "বর্ত্তমান সমালোচকের মত অনেক সমালোচকই বোধ হয় কল্পনা

করিয়াছেন যে, আমি হিন্দুধর্ম্মের ও দর্শনের কোন মৌলিক গ্রন্থ পড়ি নাই। এরূপ ধারণা করিবার পূর্ব্বে একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে বুদ্ধিমানের কাজ হইত।"

(৩) "হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শনে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা গঠনের—এমন কি বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতা গঠনের সমস্ত আদর্শই বর্ত্তমান আছে"—এবংবিধ মতবাদ অসার ও অযৌক্তিক।

(৪) "হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞানে ক্রমবিবর্ত্তনবাদ (theory of evolution), পৃথিবীর সূর্য্য-প্রদক্ষিণবাদ (heliocentric theory of the solar system) ইত্যাদি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যাবতীয় মূলতত্ত্ব, এমন কি National Planning পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বীকৃত আছে, না হয় বীজাকারে প্রচ্ছন্ন আছে"—এবংবিধ মতবাদও ভিত্তিহীন এবং অসার।

(৫) "হিন্দু-ধর্ম্ম ও দর্শনের মূল বেদ" এবংবিধ মতবাদ ভিত্তিহীন ও অসার। "বর্ত্তমানে পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শনের অধিকাংশ উপাদানই প্রাগ্বৈদিক, প্রাক্-আর্য্য সভ্যতা হইতে গৃহীত।" "হিন্দুর সমস্তই 'বেদে আছে', একথা প্রস্তরীভূত (fossilized) পণ্ডিতাভিমানী ব্যতীত এই যুগে কেহ বলিতে সাহসী হইবেন না।"

(৬) "বৈদিক সভ্যতার কোন বাস্তব প্রমাণ এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মাটিতে পাওয়া যায় নাই।"

(৭) "ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ-সূক্তে জাতিভেদের উৎপত্তির কোন ইতিহাস নাই। ইহাতে শুধু প্রচলিত জাতিভেদের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য একটী গল্পমাত্র রচনা করা হইয়াছে।"

(৮) "সকল পণ্ডিতদের মতেই দশম মণ্ডল অত্যন্ত পরবর্ত্তী কালের।"

(৯) হিন্দুর অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ, স্বর্গবাদ, নরকবাদ—ভিত্তিহীন ও কল্পনামূলক।

১৩৪৬ সালের ভারতবর্ষের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত "আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম"-শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য কথা :—

(১) সমালোচক অনিলবরণের মতে "বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা না কি বলিয়াছেন যে, বিশ্বজগতের পশ্চাতে একটা বিরাট চৈতন্য আছে; যদিও উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা এই চৈতন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হন নাই।" এতাদৃশ মত বৈজ্ঞানিকগণের অনুমোদিত নহে; বৈজ্ঞানিকগণের মতে "প্রকৃত বৈজ্ঞানিকেরা যে বিষয় লইয়া গবেষণা করেন, তাহার বাহিরে কোন বিষয়ে তাঁহারা যদি কিছু বলেন, তাহাকে যুক্তি ও তর্কের পরীক্ষা দিয়া যাচাই করিয়া নিতে হইবে।" "যদি কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষ মত প্রকাশ করেন, সেই মত তাঁহার পরিবার বা সমাজপ্রদত্ত শিক্ষা হইতে সঞ্জাত মনে করিতে হইবে; তাঁহার এই মত যদি বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ প্রয়োগসহ উপস্থাপিত না হয়, তাহা হইলে নেহাৎ ব্যক্তিগত মত বলিয়া গণ্য করা হইবে।"

(২) "ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রমাণসঙ্গত কোন objective ধারণা এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ'—সাংখ্যকারের এই উক্তি বোধ হয় একালেও চলে।"

(৩) ঈশ্বর লইয়া মাথা না ঘামাইলে সর্ব্ববিধ বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়। তাহার দৃষ্টান্ত বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম এবং আধুনিক রুষিয়া।

(৪) "পৃথিবী বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠ জিনিষ নয়, ইহা বিরাট সূর্য্যের একটী স্ফুলিঙ্গ মাত্র।"

(৫) "তারকাগুলি ধার্ম্মিক লোকের আত্মা", "গ্রহগণ মানুষের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করে"—এতাদৃশ মতবাদ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারমূলক এবং হিন্দু ফলিত-জ্যোতিষের অসারতার পরিচায়ক—। তারকা সম্বন্ধীয় অনেক সারবান্ কথা Shaha's Theory of Ionisation এ পাওয়া যাইবে।

(৬) "আমার বিশ্বাস যে হাঁচি, টিকটিকি ও পঞ্জিকায় অন্ধবিশ্বাস জাতীয় জীবনের দৌর্ব্বল্যের দ্যোতক।"

(৭) "এতদ্দেশে প্রচলিত পঞ্জিকা ভুল গণনা দ্বারা পরিচালিত এবং অর্দ্ধ-সত্যাত্মক কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

(৮) "Hindu Astronomy সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্যই প্রকাশ করি নাই।"

(৯) "লেখক (শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়) হিন্দু-জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমাকে অনেক জ্ঞান দান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বোধ হয় মোটেই জ্ঞাত নন যে, আমি হিন্দু জ্যোতিষ (Astronomy) আজীবন অধ্যয়ন করিয়াছি

এবং ভারতে জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা আছে।"

(১০) বেদ কালের জ্যোতিষ অতি সাধারণ রকমের এবং বহুস্থলেই অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে।

(১১) মহাভারতের সঙ্কলন-কাল ৪৫০ খৃঃ পূঃ অব্দ হইতে ৪০০ খৃঃ অব্দ। তাহাতে উন্নততর বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালগণনা-প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাও নির্ভরযোগ্য নহে।

(১২) বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালগণনা-প্রণালী বর্তমান সময়ের তুলনায় অত্যন্ত স্থূল ও অশুদ্ধ।

(১) ৫৫০ খৃঃ অব্দে যে পাঁচখানি সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের নিজস্ব ছিল মাত্র পৈতামহ, পিতামহ ব্রহ্মা প্রণীত বলিয়া খ্যাত। আর চারিখানি পাশ্চাত্য দেশ হইতে ধার করা। এই পাঁচখানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থের নাম—পৌলিশ বা পুলিশ, রোমক, সৌর, বাশিষ্ট ও পৈতামহ।

(১৪) বরাহমিহির "পিতামহ ব্রহ্মা"কে ভাল কালজ্ঞানজ্ঞ বলিয়া certificate দেন নাই, বরঞ্চ ৮০ খৃঃ অব্দে পিতামহ ব্রহ্মার জ্যোতিষের জ্ঞান সমসাময়িক ইংরাজী কৃষকদের জ্যোতিষ জ্ঞান হইতে বিশেষ উন্নত স্তরের ছিল না ইহা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে।

(১৫) পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ের পর পর ধারণা করিতে হইবে। প্রথমে পৃথিবীর গোলত্ব ও নিরাধারত্ব। দ্বিতীয়তঃ, নিজের মেরুরেখার চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর আবর্ত্তন—যাহাতে দিন-রাত্রি হয়। তৃতীয়তঃ, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বার্ষিক প্রদক্ষিণ।

(১৬) সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ কালে ভারতে কালগণনার অনেক উন্নতি সাধন হয়। বৎসর ও মাসের পরিমাণ, গ্রহদিগের ভগণকাল হিন্দু পণ্ডিতেরা অধিকতর শুদ্ধভাবে নিরূপণ করেন। জ্যোতিষিক গবেষণা করিতে যাইয়া, তাঁহারা জ্যামিতি, ত্রিকোণ-মিতি, বীজগণিতে অনেক মৌলিক আবিষ্কার করেন। কিন্তু এসমস্ত আবিষ্কার pre-renaissance যুগের ইয়োরোপীয় জ্যোতিষের সমতুল্য—এমন কি কোন কোন অংশে মধ্য-যুগের আরব জ্যোতিষেরও সমতুল্য নয়।

(১৭) সম্যক্ অধ্যয়ন ও বিচার না করিয়া অতীতের উপর একটা কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করা শুধু আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র এবং এরূপ 'আত্মপ্রবঞ্চকে'র পক্ষে পরকে উপদেশ দিতে যাওয়া অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা।

(১৮) আমি যুক্তিবাদী, যুক্তি মানিতে রাজী আছি, Shamanism মানিতে আমার কোন আগ্রহ নাই।

(১৯) সূর্য্যকে দেবতা মনে করা একটি প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারণা মাত্র, এই যুগে সেই ধারণার কোন সার্থকতা নাই।

(২০) এখন অতি সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেও জানে যে, সূর্য্য পূজা করিলে গ্রীষ্মের আধিক্য বা অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দূরীভূত হয় না।

(২১) বিজ্ঞানের প্রসাদে সূর্য্যের উত্তাপকে যন্ত্রযোগে সর্ব্ববিধ কাজে লাগান সম্ভবপর এবং উহাতে মানুষের সর্ব্ববিধ সুবিধা, যেমন শক্তি-উৎপাদন, refrigeration (শৈত্যোৎপাদন) air conditioning, cooking (রন্ধন), water raising (জলোত্তলন) ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

(২২) যাঁহারা সমালোচকের মত (অর্থাৎ অনিলবরণ বাবুর মত) গ্রহদিগকে দেবতা জ্ঞান করেন, তাঁহারা শুধু একটি মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের মোহে নিমজ্জিত আছেন। তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা যন্ত্রযোগে সূর্য্যের উত্তাপকে সর্ব্ববিধ কাজে লাগাইতে সচেষ্ট আছেন, তাঁহারা অনেক উন্নত স্তরের জীব।

(২৩) বিশ্ব-জগতের পশ্চাতে চৈতন্যই থাকুন বা অচৈতন্যই থাকুন, তাহাতে মানব সমাজের কি আসে যায়, যদি সে চৈতন্য কোন ঘটনা নিয়ন্ত্রণ না করেন অথবা কোন প্রকারে সেই চৈতন্যকে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে চালিত না করিতে পারি?

(১৪) বর্ত্তমান বিজ্ঞানে ফলিত জ্যোতিষের কোন সার্থকতা উপলব্ধি হয় না।

১৩৪৬ সালের ভারতবর্ষে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত "আধুনিক জগৎ ও হিন্দু জাতি" শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য কথা :—

(১) আধুনিক জগতে নানা কারণে বিজ্ঞানের বেশ খানিকটা মর্য্যাদা বা prestige বাড়িয়াছে।

(২) ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বিজ্ঞানের দৌলতে গত পঞ্চাশ বৎসরে মানবের জীবন-যাত্রার প্রণালী অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছে; এবং জ্যোতিষ, প্রাকৃত বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব-চিকিৎসা, শাস্ত্র, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে মানবের জ্ঞানের পরিধি অপরিসীম বাড়াইয়া দিয়াছে।

(৩) বিজ্ঞানের বিরুদ্ধবাদী তিনশ্রেণীর: একশ্রেণীর বিজ্ঞান-বিরোধীগণ বলেন, বিজ্ঞান আর নূতন কি করিয়াছে? বিজ্ঞান বর্ত্তমানে যাহা করিয়াছে তাহা কোনও প্রাচীন ঋষি, বেদ বা পুরাণ বা অন্যত্র কোথাও না কোথাও বীজাকারে বলিয়া গিয়াছেন। অপর এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, বিজ্ঞান মানব-সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক করিয়াছে, যথা বিজ্ঞানের প্রসারে মানব-সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাড়িয়াছে, বিষাক্ত গ্যাস, বিস্ফোরক প্রভৃতি নানারূপ মানুষ-মারা জিনিষ সৃষ্টি হইয়াছে। অপর এক শ্রেণীর লোক বলেন, যেন বিজ্ঞান মানুষের ভোগ-লিপ্সা বৰ্দ্ধিত করিয়া তাহাকে আধ্যাত্মিকতা হইতে ভিন্নপথে লইয়া যাইতেছে।

(৪) এই সমস্ত (উপরোক্ত তৃতীয় দফায় কথিত) সমালোচক একটা অতি স্থূল কথা ভুলিয়া যান। বিজ্ঞান যে ব্যক্তিগত জীবনকে কতটা উন্নত করিয়াছে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মোটেই কোন ধারণা নাই।

(৫) বিজ্ঞান দীর্ঘজীবনের সমাধা করিয়াছে, মধ্যযুগে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক-যুগের পূর্ব্বে ইয়োরোপেও গড় জীবনকাল ছিল ২৫ বৎসর। কিন্তু গত ৫০ বৎসরের মধ্যে ইয়োরোপ ও আমেরিকার মানুষের গড়-পড়তায় জীবন বাড়িয়া প্রায় দুইগুণ অর্থাৎ প্রায় ৪৬ বৎসর হইয়াছে।

(৬) বিজ্ঞান ব্যক্তিগত জীবনে আয়বৃদ্ধি সাধন করিয়াছে, জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে, এ দেশের লোকের বৎসরের মাথাপিছু আয় ৬৫৲ মাত্র, কিন্তু বিলাতের লোকের আয় প্রায় মাথা-পিছু ২০০০৲ অর্থাৎ এখানকার প্রায় দশগুণ।

(৭) চীন, ভারতবর্ষ ও আবিসিনিয়ার দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ এই যে, এই সমস্ত দেশ (যে কারণেই হউক আংশিক পরাধীনতা, আংশিক ভ্রান্ত জনমত-পোষণ) বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেন নাই এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার এবং জনসাধারণের মধ্যে সেই সম্পদ্ যথাসম্ভব সমভাবে বিতরণ করিবার চেষ্টা করেন নাই।

(৮) যদি মানুষকে সর্ব্বদা অভাব-অভিযোগ ও দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, তবে তাহার ইতর প্রাণী-জীবনের ঊর্দ্ধে উঠিবার অবসর কোথায়?

(৯) প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া তাহার যাবতীয় কাজ করাইয়া লইতে পারে, ক্রীতদাস রাখার প্রয়োজন হয় না বলিলেও চলে।

১৩৪৬ সালের ভারতবর্ষের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত "সমালোচনার উত্তর" শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য কথা:—

(১) কোনও মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতাকে ডাকিলে সিদ্ধিলাভ হয় আমার এ বিশ্বাস কদাপ ছিল না, এখনও নাই, আমার মতে উহা একটি মধ্যযুগীয় কুসংস্কার মাত্র। এখন জিজ্ঞাস্য, যদি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে, বহু দেব-দেবীর পূজা বা যাগযজ্ঞ করিলে দেবতা ও ভগবান্ প্রসন্ন হন, তবে গত দুইশত বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি বেদ-পুরাণ, হিন্দুর দেবতা প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী, সর্ব্ববিধ ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য আহারকারী মুষ্টিমেয় বৈদেশিকের দ্বারা নিগৃহীত, পদদলিত ও অশেষপ্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া আসিতেছে কেন?

(২) ভারতের প্রাচীন সভ্যতা তাৎকালীন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা হইতে যতই শ্রেষ্ঠ হউক না কেন, তাহা যে মধ্যযুগ ও বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নয়, তাহা যাঁহাদের বিগত আটশত বৎসরের ভারত-ইতিহাসে সামান্য জ্ঞান আছে তাঁহাদিগকে বিশদ্ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না।

(৩) বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য দেশকে পৃথিবীর অপরাপর দেশের তুল্য সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলা।

(৪) যেহেতু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সমসাময়িক অন্য দেশীয় সভ্যতার সমতুল্য বা শ্রেষ্ঠ ছিল, সুতরাং বর্ত্তমান ভারতীয় সভ্যতা সমসাময়িক পশ্চিম ইয়োরোপীয় সভ্যতার সমতুল্য বা শ্রেষ্ঠ—ইহা অতি কু-যুক্তি।

(৫) বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃত অধ্যাত্মবাদী আমাদের দেশে আছে কি না সন্দেহ; এই কথাটি এদেশে অধিকাংশ স্থলে কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও ভণ্ডামীর ছদ্মবেশ প্রকাশের জন্ম ব্যবহৃত হয়।

(৬) এ দেশীয় পঞ্জিকাকারগণ বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুর জ্যোতিষী গণনা অধ্যাত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁহারা পাশ্চাত্য জ্যোতিষ গ্রহণ করিতে পারেন না এবং তজ্জন্ম পুরাতন ঋষিপ্রোক্ত নিয়মানুসারেই পঞ্জিকা রচনা করিতে থাকিবেন। দুঃখের বা সুখের বিষয় এই যে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে গোঁজামিল দিবার সুবিধা নাই, কারণ উহাতে সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদির কাল গণনা করিয়া এক বৎসর পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিতে হয়। ঋষিগণ-লিখিত প্রণালীতে গ্রহণ গণনা করিলে সময়ের অনেকেটা বৈষম্য হয়; তজ্জন্য এতদ্দেশীয় পঞ্জিকাকারগণ পাশ্চত্য নাবিক পঞ্জিকা হইতে গ্রহণ-কাল ঋষিপ্রোক্ত বলিয়া চালাইয়া দেন।

(৭) জন্মান্তরবাদ অবতারবাদ, ইত্যাদি গণিতের বা প্রত্যক্ষ দর্শনের ব্যাপার নয়, বাদ মাত্র: মানুষের বিশ্বাসের উপরেই মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত।

ডাঃ সাহা তাঁহার শান্তি-নিকেতনের বক্তৃতায় এবং বর্ত্তী তিনটী প্রবন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহা তলাইয়া পড়িয়া দেখিলে নিম্নলিখিত দুইটী পদার্থ প্রতিভাত হইবে:—

(১) ডক্টর সাহার পড়াশুনার বিস্তৃতি।

(২) ডক্টর সাহার একানিষ্ঠতা অথবা ধারণার দৃঢ়তা (courage of conviction)।

পড়াশুনার এতাদৃশ বিস্তৃতি এবং ধারণার এতাদৃশ দৃঢ়তা অথবা একনিষ্ঠতা আজকালকার "পণ্ডিত-গণের মধ্যে প্রায়শঃ দেখা যায় না। শুধু যে ভারতবর্ষে দেখা যায় না তাহা নহে, এতাবৎ ভারতে ও ভারতের বাহিরের যাঁহারা নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের কাহারও পড়াশুনার এতাদৃশ বিস্তৃতি এবং একনিষ্ঠতা ছিল অথবা আছে কি না তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে। অন্ততঃ পক্ষে উহাঁদিগের রচনা পড়িলে যাহা মনে হয়, তাহাতে বলিতে হয় যে, ডক্টর মেঘনাদ সাহার মত একাধারে বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও বর্ত্তমান ইতিহাসের পড়াশুনা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি একনিষ্ঠতা আর কাহারও নাই।

ডক্টর সাহার পড়াশুনার এই বিস্তৃতি এবং একনিষ্ঠতা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইয়াছি বটে, কিন্তু তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। তাঁহার এই পড়াশুনা ও একনিষ্ঠতা তাঁহার নিজের অথবা অপর কোন ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত জীবনের হিতকারী কি না তদ্বিষয়ে আমাদিগের ঘোর সন্দেহ আছে।

তিনি তাঁহার প্রবন্ধের কয়েকটী স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর জ্যোতিষ এবং ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়াশুনা করিয়াছেন। আমাদিগের মতে নিজের ভাষায় নিজের কোন উৎকর্ষ সম্বন্ধে বর্ণনা না করিয়া, কেবলমাত্র রচনা-কৌশল এবং যুক্তির গম্ভীরতার দ্বারা একমাত্র রচনার সাহায্যেই তাহা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করা অধিকতর শোভনীয়। 'আমি নিজে একজন একটা অতিপ্রকাণ্ড কিছু' এতাদৃশ ভাব প্রকাশ করা' দাম্ভিক প্রবৃত্তির পরিচায়ক। যাঁহারা প্রকৃত পাঠক তাঁহারা লেখকের রচনা পড়িলেই লেখকের বুদ্ধি বিকৃত অথবা সুকৃত, লেখক ফাঁকিবাজ অথবা চিন্তাশীল তাহার ধারণা করিতে পারেন। লেখকের জ্ঞানের অথবা কর্ম্ম-শক্তির অপকর্ষতা কোথায় কোথায় আছে, তাহা সময় সময় লেখকের বলিয়া দিবার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু তাঁহার উৎকর্ষতার কথা কোথায়ও বলিবার প্রয়োজন হয় না।

পড়াশুনা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। একখানা পুস্তক পাইলাম, তাহার প্রত্যেক ছত্রেই চক্ষু বুলাইয়া গেলাম অথচ পুস্তকখানির বক্তব্য বিষয় যে কি কি, ও তাহার বিভিন্ন বক্তব্য বিষয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ যে কি কি, তাহার কিছুই ধারণা করিবার চেষ্টা করিলাম না—ইহা এক শ্রেণীর পড়াশুনা। আবার হয়ত একখানা পুস্তক পড়িলাম, তাহার প্রত্যেক ছত্রেই চক্ষু বুলাইয়া গেলাম এবং এমন কি পুস্তকখানির বক্তব্য বিষয় ও বিভিন্ন বক্তব্য বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ যে কি কি তাহাও ধারণা করিবার চেষ্টা করিলাম, অথচ ঐ বক্তব্য বিষয়সমূহ বাস্তব জগতের সহিত সামঞ্জস্য-বিশিষ্ট কি না, তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলাম না—ইহাও এক শ্রেণীর পড়াশুনা। তৃতীয়তঃ, একখানি পুস্তক পাইয়া তাহার প্রত্যেক ছত্রে চক্ষু বুলাইয়া লইয়া,

তাহার বক্তব্য বিষয় ও বিভিন্ন বক্তব্য বিষয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ যে কি কি তাহার ধারণা করিলাম এবং উহার বক্তব্য বিষয়সমূহ বাস্তব জগতের সহিত সামঞ্জস্যবিশিষ্ট কি না, তাহাও উপলব্ধি করিলাম—ইহাও একশ্রেণীর পড়াশুনা।

উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর পড়াশুনা সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে 'আবৃত্তি' বলে তাহার অন্তর্গত। অবশ্য সংস্কৃত 'আবৃত্তি'র মধ্যে প্রত্যেক ছত্রে চক্ষু বুলান ছাড়া আরও একটু কিছু আছে। ইংরাজীতে তাহাকে syllable scanning বলা যাইতে পারে। পুলিশ আফিস (police office) এই পদটিকে পুলিশ আফিস বলিয়া উচ্চারণ করিব, অথবা 'পুলিশ-অফ্-ফাইস' বলিয়া উচ্চারণ করিব, ইহা স্থির করিবার নাম সংস্কৃত ভাষায় "পদমাত্রা বিভাগ" অথবা syllable scanning।

উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়া-শুনা সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে 'পাঠ' বলে, তাহার অন্তর্গত। আর তৃতীয় শ্রেণীর পড়া-শুনা সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে অধ্যয়ন বলে, তাহার অন্তর্গত। এই তিন শ্রেণীর পড়াশুনা যে কি কি পদার্থ, তাহা তলাইয়া বুঝিলে দেখা যাইবে যে, অধ্যয়ন মানব-জীবন সর্ব্বতোভাবে সার্থক করিবার প্রধান উপকরণ। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, যাহা অধ্যয়ন অথবা পাঠ করা হইবে না, তাহা আবৃত্তি না করাই সঙ্গত, কারণ আবৃত্তির ফলে মানুষের বৃথা অভিমান অথবা দাম্ভিকতার উদ্ভব প্রায়শঃ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

ডক্টর সাহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয় যে, ডক্টর সাহা হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর জ্যোতিষ ও ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়া-শুনা করিয়াছেন তাহা সত্য বটে কিন্তু তৎসমস্তই তিনি 'আবৃত্তি' মাত্র করিয়াছেন। উহার কোনটীরই একছত্রও তিনি 'অধ্যয়ন' করেন নাই। কু-জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া তিনি দাম্ভিক হইয়া পড়িয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি তাঁহার নিজেকে ও নিজের পড়া-শুনাকে বিশ্লেষণ করিবার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ডক্টর সাহার বিরুদ্ধে আমাদিগের এই অভিযোগ আমরা তাঁহার মূল প্রবন্ধের ও বক্তৃতার সমালোচনা কালে প্রমাণিত করিব।

পড়াশুনা যেরূপ তিন শ্রেণীর, একনিষ্ঠতাও সেরূপ তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে।

কোন একটি বিষয়কে সর্ব্বতোভাবে অধ্যয়ন করিয়া তন্মধ্যস্থ সত্য ও মিথ্যা সম্বন্ধে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইল এবং ঐ বিষয় আমি আমার ব্যাবহারিক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে লাগাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে থাকিলাম—ইহা একরকম একনিষ্ঠতা।

আবার, কোন একটী বিষয়কে সর্ব্বতোভাবে অধ্যয়ন না করিয়া উহা কেবল মাত্র পাঠ করিলাম এবং ঐ পাঠের ফলে ঐ বিষয়ের সত্য ও মিথ্যা সম্বন্ধে আমার কয়েকটী অনুমান মাত্র হইল এবং ঐ অনুমানগুলি আমার ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে লাগাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম এবং তদনুসারে কতক কার্য্য করিতে থাকিতাম—ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর একনিষ্ঠতা।

আবার, কোন একটি বিষয়কে অধ্যয়নও করিলাম না, পাঠও করিলাম না, ব্যক্তি-বিশেষের নিকট হইতে শুনিবা-মাত্র, ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে লাগাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম এবং তদনুসারে কতক কার্য্য করিতে থাকিলাম—ইহা তৃতীয় শ্রেণীর একনিষ্ঠতা।

উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর একনিষ্ঠতাকে সংস্কৃত ভাষায় 'সাত্ত্বিক নিষ্ঠা,' দ্বিতীয় শ্রেণীর একনিষ্ঠাকে 'রাজসিক নিষ্ঠা' এবং তৃতীয় শ্রেণীর একনিষ্ঠতাকে "তামসিক নিষ্ঠা" বলা হইয়া থাকে। এই তিন শ্রেণীর একনিষ্ঠার স্বরূপ ও পরিণতি কি, তাহা তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যে-কোন শ্রেণীর একনিষ্ঠতাই হউক উহা অসারতার তুলনায় শ্রেয় বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর একনিষ্ঠতা মানুষের মঙ্গলাপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গলই আনয়ন করিয়া থাকে, আর প্রথম শ্রেণীর একনিষ্ঠতা কখনও মানুষের অমঙ্গল আনয়ন করিতে পারে না। ডক্টর সাহার একনিষ্ঠা কতকটা তৃতীয় শ্রেণীর। উহাও সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার যোগ্য নহে। আমাদিগের এই কথা যথাস্থানে প্রমাণিত হইবে। এক্ষণে ডক্টর সাহা তাঁহার বক্তৃতায় ও তিনটি প্রবন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন তন্মধ্যে প্রধানতঃ বিচার্য্য কি কি, আমরা তাহার আলোচনা করিব।

আগেই দেখাইয়াছি যে, ডক্টর সাহার শান্তি-নিকেতনের বক্তৃতার প্রধান বিষয়-বস্তু ছিল তিনটি, যথা:—

(১) ভারতীয় হিন্দুগণের পতনের কারণ কি কি?

(২) ভারতীয় হিন্দুগণের পুনরুত্থানের সূত্র ও কর্ত্তব্য কি কি ?

(৩) ভারতীয় হিন্দুগণের পুনরুত্থান সাধন করিতে হইলে বর্জ্জনীয় কি কি ?

পরবর্ত্তী তিনটি প্রবন্ধে ডক্টর সাহা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমস্ত কথার ও প্রত্যেকটির মূল বিষয়বস্তু পরোক্ষভাবে তাঁহার বক্তৃতার বিষয়-বস্তুর অন্তর্গত। তিনি তাঁহার মূল বক্তৃতায় যে সমস্ত বিষয়ের উত্থাপন করিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে যে-সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—অনিলবরণ বাবু সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। অনিলবরণ বাবু যে সমস্ত আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন ডক্টর সাহা তাহার প্রত্যেকটির খণ্ডন করিয়া স্বকীয় মতবাদের যুক্তিবত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। একটু দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদিগের বক্তব্য পরিষ্কার হইবে।

ভারতের হিন্দুগণের পতনের কারণ কি, তৎসম্বন্ধে ডক্টর সাহা বলিয়াছেন যে, ঋষিপ্রণীত ধর্ম্ম ও দর্শনই ভারতীয় হিন্দুগণের পতনের প্রধান কারণ এবং এই কথা বলিয়া ডক্টর সাহা তাঁহার মতে ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের দুষ্টতা কোথায় কোথায় তাহা দেখাইয়াছেন। ডক্টর সাহার মতে ঋষিপ্রণীত ধর্ম্ম ও দর্শনের দুষ্টতা মুখ্যতঃ তিনটী, যথা :—

(১) ভারতীয় ঋষির ধর্ম্ম ও দর্শন বিশ্ব-জগতের যে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ধারণা নিছক কল্পনামূলক

(২) ভারতীয় ঋষির ধর্ম্ম ও দর্শন কল্পনামূলক হওয়ায় উহা হইতে যে জাতি-বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে, হিন্দু সমাজের হস্ত ও মস্তিষ্কের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

(৩) হিন্দু সমাজের হস্ত ও মস্তিষ্কের যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় হিন্দুগণ সহস্র বৎসর ধরিয়া শিল্প ও দ্রব্যোৎপাদনে একই ধারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে এবং তজ্জন্য বহুবার যান্ত্রিক বিজ্ঞানে উন্নততর বৈদেশিকের পদানত হইয়াছে।

অনিলবরণ বাবু বলিতে চাহিয়াছেন যে, ঋষি-প্রণীত ধর্ম্ম ও দর্শন ভারতের পতনের কারণ নহে। এবং তাঁহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কতকগুলি অবান্তর কথা কহিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতীয় ঋষির ধর্ম্ম ও দর্শন যে কল্পনামূলক নহে, উহা যে বাস্তব-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ভারতীয় ঋষির জাতি-ভেদ অথবা বর্ণাশ্রমের ফলে যে কখন হস্ত ও মস্তিষ্কের যোগাযোগ ছিন্ন হইতে পারে না, পরন্তু ঐ জাতিভেদ অথবা বর্ণাশ্রমের নিয়ম যথাযথভাবে পালন করিলে যে হস্ত ও মস্তিষ্কের যোগাযোগ আরও দৃঢ় হয়, ভারতীয় ঋষি-কথিত শিল্প-প্রণালী যে তথাকথিত উন্নততর কোন দেশের শিল্প-প্রণালী হইতে কোন অংশে নিন্দনীয় নহে, পরন্তু উহা যে সর্ব্বাংশে সর্ব্বজগতের শ্রেষ্ঠ তাহা অনিলবরণ বাবু কুত্রাপি দেখান নাই।

অনিলবরণ বাবু বলিয়াছেন যে, ডক্টর সাহা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের কথা ধার করিয়াছেন। ডক্টর সাহা বলিয়াছেন যে, তিনি তাহা করেন নাই।

অনিলবরণ বাবু বলিয়াছেন যে, ডক্টর সাহা ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে 'কিছু' জানেন না, ডক্টর সাহা বলিয়াছেন, তিনি তাহা জানেন।

অনিলবরণ বাবু বলিয়াছেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে যে আদর্শ রহিয়াছে, ঋষিপ্রণীত ধর্ম্ম এবং দর্শনেও সেই সভ্যতার আদর্শ রহিয়াছে। ডক্টর সাহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, তাহা নাই। (আমরাও ডক্টর সাহার সহিত একমত)।

অনিলবরণ বাবু বলিয়াছেন যে, ঋষিপ্রণীত দর্শন ও বিজ্ঞানে ক্রম-বিবর্ত্তনবাদ ও পৃথিবীর সূর্য্য প্রদক্ষিণবাদ আছে ডক্টর সাহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ঋষিপ্রণীত দর্শন ও বিজ্ঞানে উহা নাই। (আমরাও ডক্টর সাহার সহিত এই বিষয়ে একমত।)

অনিলবরণ বাবু বলিতে চাহিয়াছেন যে, "হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শনের মূল বেদ" এবং তাঁহার মতবাদ প্রমাণিত করিবার কার্য্যে আর কতকগুলি মতবাদের উত্থাপন করিয়াছেন, অথচ ঋষিপ্রণীত ধর্ম্ম ও দর্শনের মূল বিচার্য্য যে কি, বেদেরই বা মূল বিচার্য্য যে কি, ধর্ম্ম ও দর্শনের মূল বিচার্য্যের সহিত বেদের বিচার্য্যের কি সম্বন্ধ, তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। অনিলবরণ বাবু যেরূপ কয়েকটী মতবাদ মাত্র উত্থাপন করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শনের মূল যে বেদ তাহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ডক্টর সাহাও সেইরূপ

কয়েকটী মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শনের মূল যে বেদ হইতে পারে না, তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। (সায়নাচার্য্য যেরূপ ভাবে বেদকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে উহা যেরূপ ভাবে অনূদিত হইয়াছে, তাহা যদি নির্ভুল বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে আমরাও ডক্টর সাহার সহিত একমত।)

অনিলবরণ বাবু দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, হিন্দুর জাতিভেদ হিন্দুর কোন পতনের কারণ হইতে পারে না, কারণ উহা বেদানুমোদিত। ইহাও একটী মতবাদ মাত্র। হিন্দুর জাতিভেদের মূল সূত্র কি এবং ঐ সূত্রানুসারে জাতিভেদে যে বাস্তবিক সমাজের কেবলমাত্র উপকার হইতে বাধ্য, তাহা যদি অনিলবরণ বাবু দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা অনিলবরণ বাবুর যুক্তিকে মতবাদ মাত্র বলিতে পারিতাম না। জাতিভেদের স্বপক্ষে অনিলবরণ বাবু যেরূপ কতকগুলি মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, ডক্টর সাহাও সেইরূপ জাতিভেদের বিপক্ষের কতকগুলি মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। জাতিভেদের মূলে ঋষিপ্রণীত যে সমস্ত সূত্র আছে, সেই সমস্ত সূত্রানুসারে চলিলে যে, কিরূপে সামাজিক জীবনে হস্ত ও মস্তিষ্কের যোগাযোগ ছিন্ন হইতে পারে, তাহা ডক্টর সাহাও দেখান নাই। (আজকালকার বেনিয়ান ও তালতলার চটী-পরা, সংস্কৃত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন টোলের টিকিওয়ালা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নামধারী মূর্খ প্রতারকগণ জাতিভেদ যেরূপভাবে চালাইতে চাহেন তাহা যদি ঋষিগণের শাস্ত্রের অনুমোদিত হয় তাহা হইলে আমরা ডক্টর সাহার সহিত একমত।)

আধুনিক ক্রম-বিবর্ত্তনবাদ যে হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞানে আছে, তাহা দেখাইতে গিয়া অনিলবরণ বাবু হিন্দুর অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতির কথা আনয়ন করিয়াছেন, ডক্টর সাহা দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুর অবতারবাদ ও জন্মান্তরবাদের সহিত আধুনিক ক্রম-বিবর্ত্তনবাদের কোন সংস্রব নাই, পরন্তু হিন্দুর অবতারবাদ ও জন্মান্তরবাদ সম্পূর্ণ কল্পনামূলক ও বাস্তব ভিত্তিহীন। (মধ্যযুগের ভট্ট, আচার্য্য ও মিশ্রগণ ভারতীয় ঋষির অবতারবাদ ও জন্মান্তরবাদকে যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই যদি ঋষির মূল অবতারবাদ ও জন্মান্তরবাদ হয়, তাহা হইলে ডক্টর সাহার কথাগুলি যে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত তাহা আমরাও স্বীকার করি।)

হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞান যে অতীব উন্নত স্তরের, তাহা দেখাইতে বসিয়া অনিলবরণ বাবু হিন্দু জ্যোতিষের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সূর্য্য-প্রদক্ষিণবাদ হিন্দু জ্যোতিষেও স্থান পাইয়াছে। মেঘনাদ বাবু দেখাইয়াছেন যে, হিন্দু গাণিতিক জ্যোতিষ প্রধানতঃ মূলতঃ পাশ্চাত্ত্যগণের নিকট ধার করা এবং কাযেই উহা বিশেষ কোন গৌরবের বস্তু নহে। অধিকন্তু হিন্দুর ফলিত জ্যোতিষ সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত এবং জাতীয় জীবনের কলঙ্কস্বরূপ। (আজকালকার টিকিওয়ালাগণের দ্বারা জ্যোতিষ যেরূপভাবে ব্যাখ্যাত ও ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা যদি ঋষিগণের অনুমোদিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদিগকেও ডক্টর সাহাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে হইবে।)

হিন্দু জ্যোতিষ যে অতীব উন্নত স্তরের তাহা প্রমাণিত করিতে গিয়া অনিলবরণ বাবু বলিয়াছেন যে, ডক্টর সাহার হিন্দু জ্যোতিষ জানা নাই। ডক্টর সাহা দেখাইয়াছেন যে, হিন্দু জ্যোতিষের বিকাশ ও প্রকাশের ইতিহাস তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবে জানা আছে, পরন্তু উহা অনিলবরণ বাবুরই জানা নাই। (আমাদিগের মতে ঋষিপ্রণীত বেদোক্ত জ্যোতিষ যে কি পদার্থ, তাহা আজকালকার অনেকেরই জানা নাই এবং ডক্টর সাহাও তাহা আদৌ জানিবার সুযোগ পান নাই। উহা তাঁহার জানা থাক আর নাই থাক—বর্ত্তমান জ্যোতিষ সম্বন্ধে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত এবং পণ্ডিচারীর সম্প্রদায় উহা আদৌ না জানিয়াও জানিবার ভাণ করিয়া থাকেন)।

মোটের উপর অনিলবরণ বাবু ও মোহিনীবাবু ডক্টর সাহার বক্তৃতার যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা ডক্টর সাহার বক্তৃতার প্রথম বিষয় সম্বন্ধে, অর্থাৎ, ডক্টর সাহা বলিয়াছেন যে, হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শনই হিন্দুর জাতীয় জীবনের পতনের প্রধান কারণ। আর সমালোচকগণ বলিয়াছেন যে, হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শন অতি উন্নত স্তরের এবং তাহা হিন্দুর জাতীয় জীবনের পতনের কারণ হইতে পারে না। অথচ হিন্দুর পতন যে কেন হইল, তৎসম্বন্ধে সমালোচকগণের কেহই কোন কথা বলেন নাই।

ভারতীয় হিন্দুগণের পুনরুত্থানের সূত্র ও কর্ত্তব্য কি কি হইতে পারে এবং উহার জন্য কি কি বর্জ্জনীয় হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে ডক্টর সাহা যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন—তাহার কোন

কথারই কোন সমালোচনা উপরোক্ত দুইজন সমালোচকের একজনও করেন নাই।

আমাদিগের মতে—ভারতীয় হিন্দুর পতনের কারণ যাহাই হউক, পুনরুত্থানের সূত্র ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ডক্টর সাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি সারগর্ভ হয়, তাহা হইলে ডক্টর সাহা নিশ্চয়ই আন্তরিক শ্রদ্ধার যোগ্য। এই সম্বন্ধে সমালোচক দুই জনের কেহই যখন মুখব্যাদান করেন নাই, তখন আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, একটী সিংহের সম্মুখে দুইটী শৃগাল 'হুক'হুয়া' করিয়া ডাকিয়াছে কিন্তু সিংহের মতবাদের বিন্দুমাত্রও খণ্ডন করিতে পারে নাই।

হিন্দুর পুনরুত্থানের সূত্র ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ডক্টর সাহা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সমীচীন কি না, আমরা সর্ব্বপ্রথম তাহার বিচার করিব। এই বিচারে যদি দেখা যায় যে, হিন্দুর পুনরুত্থানের সূত্র ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ডক্টর সাহা যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বোতোভাবে সমীচীন তাহা হইলে ডক্টর সাহার কোন কথার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করার অধিকার আমাদিগের থাকিবে না। যখন চোখের উপর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, হৃদয়ের গ্রন্থি স্বরূপ ঐ ভাই ও বোনগুলি প্রাণপণে অর্থার্জ্জন করিবার জন্য দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করিতে উদ্যত হইয়াও অধিকাংশই পরিশ্রম করিবার ক্ষেত্র পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, এবং যাঁহারা বা ঐ ক্ষেত্র পাইয়াছেন, তাঁহাদিগেরও অনেকেই হয় অর্থের অপ্রাচুর্য্যে, নতুবা অস্বাস্থ্যে, নতুবা অশান্তিতে, নতুবা অকালবার্দ্ধক্যে, নতুবা অকালমৃত্যুতে জর্জ্জরিত হইয়া দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন, তখন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমস্যা সমাধানের উপায় যিনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি যেই হউন, আমাদিগের পরমারাধ্য দেবতা এবং এই ব্রাহ্মণবংশের হতভাগ্য অকৃতী সন্তানের নমস্য। আমরা তাঁহার পায়ে আমাদিগের সর্ব্বস্ব বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা উপহার দিয়া জীবনের বাকী কয়েকটী দিন তাঁহার ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে আমরা প্রস্তুত আছি। অপর পক্ষে যদি দেখা যায় যে, হিন্দুর পুনরুত্থানের সূত্র ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ডক্টর সাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রায়শঃ সমীচীন নহে, তাহা হইলে হিন্দুর পুনরুত্থান সাধন করিতে হইলে কি কি করিতে হইবে তাহা বলিবার অধিকার আমাদিগের হইবে এবং তখন আমরা আমাদিগের মতবাদের যুক্তি কি তাহা দেখাইব।

হিন্দুর পুনরুত্থানের সূত্র ও তজ্জন্য কর্ত্তব্য কি কি তাহা বলিতে বসিয়া ডক্টর সাহা যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি কথা আছে :—

১। 'যদি আমরা পুনর্ব্বার বিদেশীয়গণের পদানত হইবার ইচ্ছা না করি তবে আমাদিগকে য়ুরোপ ও আমেরিকার মত যান্ত্রিক সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইবে" (১৩৪৬ সালের 'ভারতবর্ষে'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ৯৩৯ পৃঃ)।

২। "য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বিজ্ঞানের দৌলতে গত পঞ্চাশ বৎসরে মানবের জীবনযাত্রার প্রণালী অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছে; এবং জ্যোতিষ, প্রাকৃত বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণী ও উদ্ভিদ তত্ত্ব, চিকিৎসা শাস্ত্র, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে মানবের জ্ঞানের পরিধি অপরিসীম বাড়াইয়া দিয়াছে।" (১৩৪৬ সালের 'ভারতবর্ষে'র পৌষ সংখ্যার ৯০ পৃঃ)।

উপরোক্ত দুইটী কথা তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ডক্টর সাহার মতে আধুনিক বিজ্ঞান, য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানের বিবিধ সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছে এবং সর্ব্বতোভাবে উহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই ভারতবাসীর বিবিধ সমস্যার সমাধান হওয়া ও হিন্দু জাতির পুনরুত্থান সংঘটিত করা সম্ভবযোগ্য হইবে।

কাজেই "আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভবযোগ্য কি না", তাহা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম বিচার করিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তাতেই জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভবযোগ্য, তাহা হইলে ঐ খানেই আমাদিগের প্রবন্ধের সমাপ্তি হইবে। অন্যপক্ষে যদি দেখা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান করা সম্ভবযোগ্য নহে, তাহা হইলে, "কোন্ বিজ্ঞানে জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভবযোগ্য", তাহার আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহার পর "আধুনিক বিজ্ঞানে জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান করা সম্ভবযোগ্য নহে কেন", তাহা পাঠকবর্গকে দেখাইতে হইবে।

প্রথমে উপরোক্ত তিনটী বিষয়বস্তুর আলোচনা করিয়া পরিশেষে ডক্টর সাহার প্রায় প্রত্যেক কথাটী যে মূলতঃ আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের অজ্ঞতাপ্রসূত, তাহা পাঠকবর্গকে দেখাইব।

স্বাধীনতা এবং উহা লাভের কি উপায়

গত সংখ্যায় "আমরা কোথায় চলিয়াছি" শীর্ষক সন্দর্ভে দেখানো হইয়াছে যে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের অবস্থায় চরম দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে এবং উহা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে, কিন্তু ভারতের আর্থিক তথা রাষ্ট্রীয় সমস্যার সম্যক্ সমাধান-চেষ্টা না হইলে পৃথিবীর কোন দেশের অবস্থারই প্রতীকার সম্ভাবনা নাই। ইহাও দেখানো হইয়াছে যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই ভ্রান্ত পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন এবং তাঁহাদের সুবুদ্ধির উদয় না হইলে আগামী চারি বৎসর কালের মধ্যে, তাহার পূর্ব্বেও হইতে পারে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র জন-সাধারণের অবস্থায় অধিকতর বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সর্ব্বৈব আশঙ্কা রহিয়াছে। সাধারণতঃ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই ভাবে বিভোর রহিয়াছেন যে, ভারত স্বাধীন না হইলে ভারতের কোন সমস্যারই যথার্থ সমাধান হইতে পারে না। আমাদের মতে—ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের দুর্দ্দশামুক্তির নিমিত্ত ভারতের "স্বাধীনতা"র প্রয়োজন, কিন্তু এই মুক্তির নিমিত্ত যে শ্রেণীর "স্বাধীনতা"র প্রয়োজন, আমাদের নেতৃবৃন্দ এবং শাসকপর্য্যায়ভুক্ত ব্যক্তি প্রার্থিত স্বাধীনতা তদনুরূপ নহে। আমাদের নেতৃবৃন্দ এবং শাসকপর্য্যায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ যে-শ্রেণীর স্বাধীনতা যাচ্ঞা করেন, আমাদের মতে, উহা পাশ্চাত্ত্যের আমদানী এবং অপ্রাকৃত স্বাধীনতা। পাশ্চাত্ত্যের এই স্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ, দলাদলি এবং যুযুৎসা। ইহা কখনও মনুষ্য-সমাজের শান্তি বিহিত করিতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস যথাযথ ভাবে পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, যে-সময় হইতে স্বাধীনতার বর্ত্তমান প্রকার সূচিত হইয়াছে, সেই সময় হইতে জগতে সর্ব্বত্র যথার্থ শান্তি অদৃশ্য হইয়াছে এবং সেই সময় হইতে মনুষ্য-সমাজ ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতেছে। এইরূপ কেন ঘটিয়াছে, তৎনির্দ্ধারণ-প্রয়াসী হইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমানে স্বাধীনতা কি অর্থে গৃহীত হইতেছে এবং দ্বিতীয়তঃ বুঝিতে হইবে, প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়।

স্বাধীনতা কাহাকে বলে?

বর্ত্তমানে স্বাধীনতার যাহা অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান কালের সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণ উহার কি সংজ্ঞা দান করিয়াছেন, তাহার সন্ধান করা যাউক। এতদ্‌কল্পে আমরা জন ষ্টুয়ার্ট মিল এবং থিয়োডোর পার্কার কথিত সংজ্ঞা নিম্নে উপস্থিত করিতেছি। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, "একমাত্র তাহাকেই স্বাধীনতা অভিহিত করা যায়, যাহাতে অপর কাহাকেও তাহা হইতে বঞ্চিত না করিয়া কিংবা অপর কাহারও তাহা লাভের পন্থায় বিঘ্ন উৎপাদন না করিয়া স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী স্বকীয় কল্যাণ অনুসরণের স্বাধীনতা বিদ্যমান (the only freedom which deserves the name is that of pursuing our own good, in our own way. so long as we do not attempt to deprive others of theirs, or impede their efforts to obtain it)." জন ষ্টুয়ার্ট মিলের "স্বাধীনতা"র এই সংজ্ঞা যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে অনতিবিলম্বে প্রতিপন্ন হইবে যে, এতদ্দ্বারা "স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী স্বকীয় কল্যাণ অনুসরণের স্বাধীনতা" দাবী করা হইয়াছে, সুতরাং ইহার দ্বারা দ্বন্দ্ব-কলহ ঘটিতে বাধা এবং ফলতঃ মনুষ্য-সমাজের শান্তির বিলোপ

মনে রাখিতে হইবে যে, "কল্যাণ" এবং "কল্যাণ-অনুসরণের পন্থা" সম্বন্ধে মনুষ্য-সমাজের, এমন কি কোন দুইজন ব্যক্তি-পোষিত ধারণাও এক নহে। মনুষ্য-স্বভাবের যথাযথ অনুধাবন দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, যুবকবৃন্দের পক্ষে যাহা সাধনার বিষয়, বয়স্কদের পক্ষে তাহা ঘৃণার্হ এবং অবজ্ঞেয়—আবার দার্শনিকের নিকট যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহাই সময়ে বিরক্তিজনক। শঠ প্রকৃতির ব্যক্তির যাহা সাধ্য, সৎ প্রকৃতির ব্যক্তির তাহাই আবার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। সুতরাং বলা যায় যে, "স্বাধীনতা"র দ্বারা যদি "স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী স্বকীয় কল্যাণ-অনুসরণ" বুঝিতে হয়, তবে ইহা অনির্দ্দিষ্ট থাকিয়া যায় এবং বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন প্রকার হইয়া উঠে, এবং জন-সাধারণ এই শ্রেণীর "স্বাধীনতা" লাভ করিতে চাহিলে, সংঘর্ষ সৃষ্টি অনিবার্য্য।

"স্বাধীনতা" বিষয়ের আলোচনায় থিয়োডোর পার্কার বলিতেছেন, "আমার মতে আমেরিকার অধিবাসীদের স্বাধীনতার ধারণা হইতেছে—জনসাধারণ-পরিচালিত জনসাধারণের শাসন, অবশ্য এই শাসন তাহাদের জন্যই বিধান

অনুযায়ী এবং চিরন্তন ন্যায়ের ভিত্তিতে গঠিত (this is what I call the American idea of freedom—a Government of all the people, by all the people ; of course a Government on the principles of eternal justice—the unchanging law of God.)"

"স্বাধীনতা"র এই ধারণাও জন-সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ ইষ্ট-বিধায়ক বিবেচিত হইতে পারে না, কেন না শাসন-দায়িত্ব পরিচালন অথবা শাসন-কার্য্য-পরিচালনে সমর্থ ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিতে হইলে যে-যোগ্যতার অবশ্য প্রয়োজন, সমাজের সকল ব্যক্তির তাহা থাকিবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যায় না। এমত অবস্থায় জনসাধারণ-পরিচালিত জন-সাধারণের শাসন-চালনা উদ্দিষ্ট হইলে তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দাঁড়ায় যে, সমাজের মধ্যে যাঁহারা ধনবান্ এবং স্বার্থ-পর, তাঁহারা বিভিন্ন প্রকার উৎকোচ-সহায়তায় প্রাধান্য লাভ করেন এবং এই সকল ধনবান্ ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে সুতীব্র অনৈক্য এবং সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

"স্বাধীনতা"র এইরূপ বিভ্রান্ত আদর্শ বশতঃই জনসাধারণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে বলিয়া মনে করা হইলেও, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে বিগত কিছুকাল হইতে জন-সাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতের জন-সাধারণকে সচরাচর বিশ্বাস করিতে দেখা যায় যে, স্বাধীন দেশে জন্মাইবার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা ভারতবাসীদের তুলনায় সাধারণতঃ উৎকৃষ্টতর। কিন্তু এই সকল স্বাধীন দেশের অবস্থা বিশ্লেষণে তৎপর হইলে দেখা যায় যে, এই সকল দেশের প্রায় প্রত্যেকটি দেশেরই প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচামালের নিমিত্ত অপরাপর দেশের আমদানীর মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়, এবং তথাপি এই সকল স্বাধীন দেশের প্রায় শতকরা ৮৫ জনকে বৎসরের অধিকাংশ সময়েই অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, নিজদিগকে স্বাধীন আখ্যাত করা সত্ত্বেও এই সকল দেশের প্রায় প্রত্যেকটিতে জন-সাধারণের প্রায় নব্বই জন তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ বেতনভোগী চাকুরী অর্থাৎ নকর্গিরির উপর নির্ভরশীল। বস্তুতঃ ইহাই আশ্চর্য্য যে, তথাপি আমরা তাহাদিগকে "স্বাধীন" অভিহিত করিয়া থাকি এবং ঐ সকল দেশের অধিবাসীদিগকে আমাদিগের অপেক্ষা সুখী বিবেচনা করি। ইহাতে সন্দেহ করা চলে না যে, এমন কি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও যে-অবস্থা ছিল, তৎ তুলনায় ভারতবাসী জন-সাধারণের অবস্থা বর্ত্তমানে অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহাদের অবস্থা তথাকথিত স্বাধীন দেশবাসী জন-সাধারণের অবস্থার তুল্য নিকৃষ্ট নহে। হইতে পারে যে, ভারতবর্ষ সমুদ্রপারস্থ দেশসমূহে বিদ্যমান পর্য্যায়ের স্বাধীনতা লাভ করিলে, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জনকয়েক ব্যক্তির আত্মাভিমান তুষ্টি লাভ করিবে, কিন্তু এই অপ্রাকৃত স্বাধীনতা লাভে কৃতকার্য্য হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তদ্দ্বারা দেশবাসী কোটি কোটি জন-সাধারণের যেমন, তেমনই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশের বিন্দুমাত্রও হিত সাধিত হইবে না। আমাদের এই মন্তব্য সম্বন্ধে যাঁহাদের অনুমাত্রও সন্দেহ বর্ত্তমান, তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য দেশের অধিবাসি-গণের অবস্থা বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, কি ভাবে তাঁহাদের স্বদেশ ও পরিবার সম্বন্ধে স্বভাবতঃ অত্যন্ত অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্য দেশের অধিকাংশকেই প্রবাসী এবং আত্মীয়-স্বজন হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছে।

অতঃপর, প্রকৃত স্বাধীনতা কি, আমরা আমাদের ধারণানুযায়ী তাহার আলোচনা করিব। স্বাধীনতার ইংরাজী প্রতিশব্দ 'লিবার্টি (liberty)' ল্যাটিন মূল হইতে নিষ্পন্ন এবং তাহার সমর্থক অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষায় 'ফ্রিডম (freedom)'। ইহাদের ধাতুগত অর্থ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা লাভ করিলে, স্বাধীনতার সারবত্ত্ব কি, তাহা বুঝা যাইবে। স্বাধীনতার ধাতুগত অর্থ সম্বন্ধে সামান্য শ্রদ্ধা বর্ত্তমান থাকিলেও দেখা যাইবে যে, যে-জাতি কিংবা ব্যক্তি দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে স্বাধীন বলা যায় না। স্বাধীনতার প্রাথমিক উপাদান বলিতে তাহা হইলে দাঁড়ায়, দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভ। সমাজভুক্ত সকল স্তরের ব্যক্তিগণের মধ্যেই যদি সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, তবে তাহাদিগকে "স্বাধীন" বলা অর্থহীন এবং স্বেচ্ছাচারপ্রসূত।

কোন দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে বস্তুতঃ কি প্রয়োজন, এইবার আমরা তাহার বিচার করিব। বলাই বাহুল্য যে, কোন প্রকার অধীনতা বর্ত্তমান

থাকিলে দুঃখও বর্ত্তমান থাকিবে, সুতরাং দাঁড়াইতেছে যে, কোন দেশের স্বাধীন হইতে হইলে তাহাকে আত্ম-নির্ভর হইতে হইবে, অন্যকথায় দেশস্থ সংস্থানসমূহ এমন হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে তাহাকে অপর দেশের আহার্য্য ও কাঁচামালের আমদানীর মুখাপেক্ষী না থাকিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, ঐ দেশের অধিবাসীদিগের প্রত্যেকের বেতন-ভোগী চাকুরী অথবা নফরগিরি ব্যতীতই দিনাতিপাতে সমর্থ হওয়া আবশ্যক। এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এই জন্য যে, দেশের অধিবাসীদিগকে বেতনভোগী চাকুরী করিতে হইলে,—যত মোটা বেতনের চাকুরীই হউক,—কখনও সম্পূর্ণভাবে দেশ দুর্দ্দশাযুক্ত হইতে পারে না।

দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্তিলাভ পক্ষে অপরাপর বিষয়েরও প্রয়োজন হইবে, কিন্তু কোন দেশের স্বাধীনতা-লাভের পক্ষে প্রাথমিক প্রয়োজন হইতেছে নিম্নলিখিত দুইটি :—

(১) আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের স্বচ্ছলতা-কল্পে অপর কোন দেশের আমদানীর উপর যাহাতে নির্ভর না করিতে হয়, এইরূপভাবে দেশকে স্ব-নির্ভর করা।

(২) যাহাতে দেশবাসী প্রত্যেকে বেতনভোগী চাকুরী অথবা নফরগিরি ব্যতীত সুস্থভাবে জীবনযাপন করিতে পারে, দেশের উপার্জ্জন-ক্ষেত্রের এতদনুরূপ সংগঠন।

পৃথিবীর ইতিহাসে যে-কালকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলিয়া আখ্যাত করা হয়, তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এমন এক দিন ছিল, যখন পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ এইরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিত। ইহাও দেখা যাইবে যে, ইউরোপই প্রথম এই শ্রেণীর প্রকৃত স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হয় এবং তজ্জন্যই ইউরোপের অধিবাসীদিগকে কেবল জীবিকার্জ্জনের উদ্দেশ্যেই বিপদ্-সঙ্কুল সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়। সেই সময় হইতে এ-পর্য্যন্ত ইউরোপের কোন দেশই প্রকৃত স্বাধীনতার পুনর্সন্ধানে কৃতকার্য্য হয় নাই এবং তজ্জন্যই, যদ্যপি ইউরোপীয় অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ অগণিত মনুষ্য-প্রাণের সংহার-নিবারণে ইতস্ততঃ পর্য্যন্ত বোধ করেন না, এবং তাঁহারা প্রায়শঃ পরস্বাপহারী হইয়া পড়িয়াছেন এবং যদ্যপি ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশকে সমগ্র দেশবাসীর প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচামালের নিমিত্ত অপর দেশের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইতেছে, তথাপি মিথ্যা আত্মাভিমানে পোষণোদ্দেশ্যে তাঁহারা নিজদিগকে "স্বাধীন" বলিয়া জাহির করেন।

বিগত শতাব্দী হইতে ইউরোপীয়গণ প্রকৃত স্বাধীনতা কি তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন এবং তৎপরিবর্ত্তে যাহাতে অপর দেশকে লুণ্ঠন এবং প্রবঞ্চনা করিতে পারা যায়, তদনুরূপ সংগঠন-প্রবৃত্তি তাঁহারা পোষণ করিয়া চলিয়াছেন। এই ভাবে তাঁহারা দ্বন্দ্ব এবং যুযুৎসাসূচক মনোভাববিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, এবং ফলতঃ এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদের সকল কৃতকর্ম্মের প্রায়শঃ পরিণাম দাঁড়াইয়াছে, স্বদেশবাসী জন-সাধারণের অধঃপতন, তথা যে-যে দেশে তাঁহারা পদার্পণে সমর্থ হইয়াছেন, সেই-সকল দেশেরও অধঃপতন।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ভারতের অবস্থা অন্য প্রকার ছিল, কেন না এমন কি তখন পর্য্যন্ত ভারতকে আহার্য্য ও কাঁচামালের জন্য অপর কোন দেশের আমদানীর মুখাপেক্ষী থাকিতে হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের এই অবস্থায় সম্প্রতি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ভারত আর স্ব-নির্ভর নাই, ভারতবাসীর ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের পক্ষে যথেষ্ট দ্রব্যও আজ আর ভারতে উৎপন্ন হয় না। বৈজ্ঞানিক এবং রাষ্ট্রনেতা আখ্যাত ভারতের মূর্খ সন্তানদল পাশ্চাত্ত্যের নির্ব্বোধ সংস্কৃতির নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা কি, তাহার যথার্থ উপলব্ধি যেমন তাঁহাদের হয় নাই, তেমনই এই অবস্থার প্রতিকার-ব্যবস্থা কি হইতে পারে, তাহার সন্ধানও তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা তোতাপাখী হইয়া পাশ্চাত্ত্যের গ্রন্থকারগণ হইতে লব্ধ শিক্ষার বুলি আবৃত্ত করিয়া চলিয়াছেন। এই নিমিত্তই ভিত্তিহীন ইউরোপীয় সংস্করণের অপ্রাকৃত স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে দেশে এই উদ্দীপনা।

আমরা উপরে প্রকৃত স্বাধীনতার যে-চিত্রের অবতারণা করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা লাভ করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, প্রকৃত স্বাধীনতার সহিত স্বদেশবাসী-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার কোন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নাই, কিন্তু সু-শাসন ব্যবস্থার সহিত ইহার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কোন কারণই থাকিত না, যদি তদ্দ্বারা ভারতের স্ব-নির্ভরতা বজায়

থাকিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় দেড় শতাব্দীকাল ভারতের অধীশ্বর হইবার সৌভাগ্যলাভে সমর্থ থাকিলেও ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ এতাবৎ নিজেদের জ্ঞান এমন পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই, যদ্দ্বারা কোন দেশ কি করিয়া স্ব-নির্ভরতা লাভ করিতে পারে, তথা তাহার প্রত্যেকটি অধিবাসী বেতনভোগী চাকুরী অথবা নফরগিরির সহায়তা ব্যতীতই কি ভাবে সুস্থ-জীবন যাপন পক্ষে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রব্য উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহা ব্যবস্থিত হইতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ জাতির মনোভাব যেরূপ ছিল বলিয়া সাক্ষ্য পাওয়া যায়, বর্ত্তমানে ব্রিটেনে সেই ব্রিটিশোচিত মনোভাবের অস্তিত্ব থাকিলে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, ব্রিটিশ বিশ্ব-বিদ্যালয়-সমূহ এই মুহূর্ত্তে সমূলে উৎপাটিত হইত, কেন না ইহাদেরই ফলে ব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ বর্ত্তমানে হাস্যকর অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের ব্রিটিশ বন্ধু-বান্ধবদিগের কেহ কেহ তাঁহাদের শাসকশ্রেণী সম্বন্ধে আমাদের এই মন্তব্য পছন্দ না করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবার আমাদের হেতু বিদ্যমান, এবং আমরা তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট বলিয়াই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা এই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের শিক্ষানীতির তাঁহারা সংস্কার সাধিত করুন এবং ভারতের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও বড়লাট নির্ব্বাচন বিষয়ে তাঁহারা ক্রমশঃ অধিকতর সতর্ক হউন।

আমাদের ইচ্ছা হয় যে, পৃথিবীব্যাপী ব্রিটিশজাতির প্রভুত্ব-রক্ষায় আমাদের সামর্থ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণেও কার্য্যকরী হউক, কিন্তু সকল দিক দেখিয়া মনে হয়, ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ বর্ত্তমানে অব্রিটিশোচিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহারা এমন দাম্ভিক হইয়া পড়িয়াছেন যে, দৃষ্টতঃ তাঁহাদের ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ করিলেও মূলতঃ ঐ ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনই যাহার লক্ষ্য, তাহাতে পর্য্যন্ত তাঁহারা কর্ণপাত করিতে চাহেন না।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পন্থা

গত সংখ্যায় প্রকাশিত "আমরা কোথায় চলিয়াছি" শীর্ষক সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে, পৃথিবীর কোন দেশই অদূরভবিষ্যতে দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে বিন্দুমাত্র পরিমাণেও মুক্তি লাভ করিবে না। ইহার কারণ এই যে, জন-সাধারণকে যতদিন অনশন এবং অর্দ্ধাশনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, ততদিন প্রকৃত পক্ষে দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে না। ভারতে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে, অদূরভবিষ্যতে পৃথিবীর কোন দেশই বিন্দুমাত্র পরিমাণেও মুক্তি লাভ করিবে না—আমাদের এই কথা বলিবার কারণ, ভারতে উদ্বৃত্ত আহার্য্য ও কাঁচামাল উৎপন্ন না হইলে, পৃথিবীর কোন দেশের পক্ষেই তাহার আহার্য্য ও কাঁচামালের ঘাট্‌তিপূরণ সম্ভব হইবে না। ইহার কারণ এই যে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা শক্তির সংস্কার সাধনের দিক্ হইতে ভারতে সাত বৎসর কালের মধ্যে যে-সার্থকতা প্রত্যাশা করা যায়, অপরাপর দেশে সত্তর বৎসর কালেও তাহা হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যায় না। এতিদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কেবল ভারত-বাসিগণের স্বার্থের নিমিত্ত নহে, সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বার্থ-সাধনার্থ ভারতে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের পরবর্ত্তী আলোচ্য হইতেছে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পন্থা।

আমাদিগকে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, আবশ্যক পরিমাণ আহার্য্য ও কাঁচামালের দিক্ দিয়া ভারত যাহাতে স্ব-নির্ভর হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা। যে-দেশ এক দিন সকল বিষয়ে স্ব-নির্ভর ছিল, কেন তাহার সেই অবস্থায় বিকৃতি ঘটিল, ইহার কারণ অনুসন্ধানে চেষ্টিত হইলে আমরা দেখিব যে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির অবনতিই ইহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ দায়ী। সুতরাং সকল সমস্যার অধিক সমস্যা দাঁড়াইতেছে "কি উপায়ে ভারতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির পুনরুদ্ধার সম্ভব?" ভারতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির পুনরুদ্ধার কি উপায়ে সম্ভব, তাহার অভ্রান্ত উত্তর দান করিতে হইলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বলিতে কি বুঝায়, তাহা জানিতে হইবে। এই প্রশ্নের আলোচনা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় একাধিক বার করিয়াছি। সেই আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, কোনরূপ কৃত্রিম পন্থার সাহায্য না গ্রহণ করিয়া, জমীর অভ্যন্তর-ভাগস্থ তেজ ও

জলের প্রকৃতিগত সংমিশ্রণের প্রাকৃতিক সঞ্চরণকেই জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বলিতে হইবে। ইহা মাত্র সেই অবস্থাতেই সম্ভব, যখন জমীর অভ্যন্তরস্থ খনিজ সংস্থান সমূহ অক্ষত এবং দেশের নদীসমূহের স্রোত অব্যাহত থাকে, এবং ফলতঃ জমীর অমিশ্রিত বালুকাস্তর পর্য্যন্ত, তাহাদের গভীরতা বজায় থাকে। এই জন্যই বর্ত্তমান লিখিত ইতিহাস-কালের পূর্ব্বে দেখা যায়, মনুষ্য-সমাজে কাহাকেও, কোন স্থানের খনিজ সংস্থানের যাহাতে বাধা উপস্থিত হয়, তাহা করিতে দেওয়া হইত না, এবং কোন প্রকারে নদীর স্রোতে বাধা উৎপাদন করিতে পারে, এরূপ রাস্তা অথবা সেতু নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া হইত না।

মনুষ্য-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, খনিজ সংস্থান-সমূহের সম্পূর্ণ সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সম্ভব নহে, কিন্তু তাহাদের অধিকতর ব্যবহার বন্ধ করা যেমন সম্ভব, তেমনই নদী-স্রোতে অধিকতর বাধাসৃষ্টি বন্ধ করাও সম্ভব। আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অপরিজ্ঞাত হইলেও ইহা বিজ্ঞানসম্মত সত্য যে, নদীসমূহের গভীরতা যে-দিন হইতে জমীর অমিশ্রিত বালুকাস্তর পর্য্যন্ত বজায় রাখা সম্ভব হইবে, সেই দিন হইতে খনিজ সমৃদ্ধির প্রকৃতিসঙ্গত ব্যবস্থাও সূচিত হইবে।

সুতরাং দাঁড়াইতেছে যে, ভারতের স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে দেশের নদীসমূহের যাবতীয় বাধা অপসারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ বড় রাস্তা, রেল-রাস্তা, ব্রিজ, নদীতীরস্থ বাঁধসমূহ রক্ষা এবং প্রসারের ব্যবস্থা পরিহার করিতে হইবে। আধুনিক বিজ্ঞান এবং সভ্যতার সমর্থকবৃন্দকে যদি নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে না বুঝাইতে পারা যায় যে, একপক্ষে এই তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞানের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, অন্য পক্ষে সমগ্র মনুষ্যসমাজের শান্তিময় জীবন-যাত্রা—এই দুইটির মধ্যে একটিকে বজায় রাখিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা এই প্রতিপাদ্য কখনও সমর্থন করিতে পারিবেন না।

পরবর্ত্তী জিজ্ঞাসা হইতেছে, দেশের নদীসমূহের স্রোতের সর্ব্ব প্রকার বাধা অপসরণের এই লক্ষ্য পূরণার্থ কাহারা চেষ্টিত হইবেন?

আমাদের মতে বৃটিশ শাসকবৃন্দ এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, উভয়েই ইহা করিতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা বৃটিশ শাসকবৃন্দ ইহা অধিক অনায়াসে করিতে পারেন বৃটিশ শাসকবৃন্দ যে, কাহারও কোন অসুবিধা সৃষ্টি না করিয়া ইহা করিতে পারেন, এবং তদ্দ্বারা আগামী কয়েক শতাব্দী কাল ধরিয়া তাঁহারা ভারতে, তথা পৃথিবীর অবশিষ্টাংশে তাঁহাদের প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা এই যে, ইহার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবার উপযোগী মাহাত্ম্য হারাইয়া তাঁহারা ব্রিটিশ নামধারণের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি এতদ্বিষয়ক কার্য্য কি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমাদের পরিকল্পনা জানিবার সামান্য বাসনাও প্রকাশ করেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে এই বিষয়ে সহায়তা-দানে প্রস্তুত আছি।

ভারতে প্রকৃত স্বাধীনতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পক্ষে মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার হাই-কমাণ্ডের অধিনায়কত্বে কংগ্রেস-দক্ষিণপন্থিগণ এই কার্য্যে তৎপরবর্ত্তী যোগ্যতা ধারণ করেন। কিন্তু মনে হয় যে, ইঁহারাও এমন অনাচারী, দাম্ভিক ও প্রভুত্ব-লিপ্সু হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহাদের মস্তিষ্কে যে-চিন্তার উদ্ভব হয় নাই, তাহাতে তাঁহারা কোন গুরুত্বই আরোপ করিতে চাহেন না। তথাপি আমরা তাঁহাদিগকেও বিস্তারিত কার্য্য-পরিকল্পনা সহ সহায়তা করিতে প্রস্তুত এবং মিঃ গান্ধী যদি তাঁহার দাম্ভিকতা পরিহার করিয়া প্রকৃত দেশপ্রেমিকের ন্যায় ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির নিকট হইতেও শিক্ষণীয় গ্রহণে ঘৃণা বোধ না করেন, তবে দেখিবেন যে, আমাদের পরিকল্পনা কাহারও বাস্তবক্ষেত্রে কোন বিরক্তি উৎপাদন না করিয়াই কার্য্যতঃ গ্রহণ করা চলে।

ভারতে প্রকৃত স্বাধীনতা পুনঃ-প্রতিষ্ঠার দিকে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু-পরিচালিত কংগ্রেসের বামপন্থিগণ পরবর্ত্তী যোগ্যতার অধিকারী। ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে যুযুৎসার নির্ব্বুদ্ধিতা পরিহার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলে, তাঁহারাও এই পরিকল্পনা নির্বিবাদে কার্য্যকরী করিতে পারেন। প্রথমতঃ, তাঁহাদিগের নিশ্চিত উপলব্ধির প্রয়োজন যে, দলকলহের মনোভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হইলে স্থায়ীভাবে কোন সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত মহৎ কার্য্য সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার স্বদেশবাসি-

গণের সম্মুখে স্পষ্টতঃ ঘোষণা করিতে হইবে যে, দেশের সর্ব্বত্র বর্ত্তমানে ঘুরিয়া আসিয়া তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্য সংস্করণের যে-স্বাধীনতা এতাবৎ পাশ্চাত্ত্যের অধিবাসীদিগের অনাহার সমস্যারই সমাধান করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই, সেই স্বাধীনতালাভ অপেক্ষা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণের অনাহার ও বেকার সমস্যার বাস্তব সমাধান অধিকতর প্রয়োজনীয়। তৃতীয়তঃ, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া জানাইতে হইবে যে, কি উপায় অবলম্বনে তিনি জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির উন্নতি সাধন করিয়া দেশবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনযাপনের পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিশ্চিত সংস্থান করিতে চাহেন। চতুর্থতঃ, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে পৃথিবীসমক্ষে ঘোষণা করিতে হইবে, কি উপায়ে তিনি ব্রিটিশ, তথা পৃথিবীর অবশিষ্টাংশের যে স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য ও কাঁচামালের ঘাটতি হেতু কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের বেকার ও অনাহার সমস্যার সমাধানে সহায়তা করিতে পারেন। পঞ্চমতঃ, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে জানাইতে হইবে যে, তাঁহার প্রস্তাবিত কংগ্রেসের ব্রত হইবে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকের সুস্থ জীবনযাপন পক্ষে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রব্যের সংস্থান ও তাহাদের বেকার ও অনাহার সমস্যার সমাধান। তাঁহাকে ইহাও ঘোষণা করিতে হইবে যে, তাঁহার কংগ্রেস পাশ্চাত্ত্য সংস্করণের স্বাধীনতার সার্থকতার দিক্ দিয়াও যাইবে না, কিম্বা কাহারও বিরুদ্ধাচরণও করিবেন না, উপরন্তু ব্রিটনগণ সহযোগিতা-দানে পরাঙ্মুখ না হইলে তাঁহার কংগ্রেস ব্রিটনগণের সহযোগিতাতেই কার্য্যে অগ্রসর হইবার কল্পনা পোষণ করে। ষষ্ঠতঃ, তাঁহাকে ঘোষণা করিতে হইবে যে, প্রত্যেকে, এমন কি জাতি বর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিদেশী এবং ইংরাজগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতবাসী, তথা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের বেকার ও অনাহার-সমস্যার সমাধানে ইচ্ছুক, তাঁহারা সকলেই কংগ্রেসের সদস্য হইতে পারিবেন। সপ্তমতঃ, তাঁহাকে ব্রিটিশ সরকারকে জ্ঞাপন করিতে হইবে যে, হয় যাহাতে ভারতবাসী প্রত্যেকে অনতিবিলম্বে সুস্থ জীবনযাপনে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রব্য উপার্জ্জন করিতে পারে, তাঁহারা সেই ব্যবস্থার সন্ধান করুন, নয় তৎ-পরিচালিত কংগ্রেসকে ইহা কার্য্যকারী করিতে অনুমতি দান করুন।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে যদি প্রকৃত রাজনীতিবিদের অণুমাত্রও বিদ্যমান থাকে, তবে তিনি অচিরাৎ উপলব্ধি করিবেন যে, উপরিলিখিত সব কয়টি পন্থার প্রত্যেকটির ফলে দেশে এমন মনোভাবের সৃষ্টি হইবে যে, মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী কার্য্যশীল একতার সৃজনে বেগ পাইতে হইবে না, এবং তাঁহার কংগ্রেসই প্রকৃত প্রস্তাবে সকল ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার মর্য্যাদা লাভ করিবে এবং জন-সাধারণের প্রভাবে সেই কংগ্রেসে অধিকাংশ দক্ষিণপন্থিগণও যোগদান না করিয়া পারিবেন না। তদুপরি যদি ইংলণ্ড হইতে আমদানী এতদ্দেশীয় দূরদৃষ্টিহীন শাসকবৃন্দ তাঁহার এই কংগ্রেসের তথাপি বিরুদ্ধাচরণ করেন, তখন ইংলণ্ডের জন-সাধারণই তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার চরম লক্ষ্যের পথ বাধাহীন হইয়া যাইবে।

ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনে যদি ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী কিংবা বামপন্থিগণের কেহই অগ্রসর না হন, তবে ভারতের জন-সাধারণকে নিজেদেরই এমন অবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা তাঁহাদের উদ্দেশ্যানুরূপ নেতা সৃষ্টির সহায়ক হয়। এই ব্যবস্থা কি, বর্ত্তমানে আমরা তাহার আলোচনা করিব না। আমাদের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের কার্য্যকলাপ আরও কিয়ৎকাল আমরা পর্য্যালোচনা করিব।

মনুষ্য-সমাজের দুঃখ-দুর্দ্দশা বর্ত্তমানে যে চরমাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্ মনুষ্যকে তাহার উপলব্ধির সহায়ক হন, ইহাই আমরা প্রার্থনা করিতেছি।*

বর্ত্তমান যুদ্ধের ভবিষ্যৎ

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের ভবিষ্যৎ জানিবার নিমিত্ত আমাদের পাঠকবৃন্দ অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া থাকিবেন। ভারতের ভবিষ্যৎ এই যুদ্ধের ভবিষ্যতের সহিত অঙ্গাঙ্গী-ভাবে সংশ্লিষ্ট, সুতরাং তাঁহাদের এইরূপ ব্যাকুলতা স্বাভাবিক।

এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ কি হইতে পারে, তাহা অনুমানার্থ আমাদিগকে নিম্নের কতিপয় বিষয়কে গভীর পর্য্যালোচনা প্রয়োজন :

* ১৭ই মার্চের দি উইক্‌লি বসুমতী'তে প্রকাশিত মূল ইংরাজি সন্দর্ভ হইতে।

(১) কি কারণে যুদ্ধ বাধিয়াছে ?

(২) যুদ্ধ-রত বিভিন্ন পক্ষের অবস্থার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কি ?

(৩) এ পর্য্যন্ত যুদ্ধে কি ঘটিয়াছে ?

(৪) যুদ্ধরত জাতিসমূহের নেতৃবৃন্দের চাল-চলনের মধ্যে বর্ত্তমানে লক্ষণীয় কি ?

যুদ্ধের কারণ

যুদ্ধের কারণ কি, তৎসন্ধানার্থ আমাদিগকে বিশেষ মাথা ঘামাইতে হইবে না, কেন না, যুদ্ধ-মঞ্চের প্রধান নায়কদ্বয়, হের হিটলার এবং মিঃ চেম্বারলেন, যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত তাঁহাদের কি প্রেরণা, তদ্বিষয়ে নিজেদের অভিমত ইতিপূর্ব্বেই পৃথিবীসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন।

হের হিটলারের মতে, জার্ম্মান-অধিকৃত অঞ্চলের বিস্তার ব্যতীত, জার্ম্মানদিগের জীবন-রক্ষার আর কোন পন্থা নাই, সুতরাং তাঁহার যুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। মিঃ চেম্বারলেনের মতে, সতত সংঘর্ষশীলতার প্রবৃত্তিকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান না করিলে পৃথিবীর কোন জাতির পক্ষেই শান্তিময় জীবন যাপন সম্ভব হয় না, সুতরাং তাঁহার জাতিকে অস্ত্র-ধারণে প্ররোচিত করা ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। মঞ্চাধিষ্ঠিত এই উভয় নায়কের উভয় অভিমতের সতর্ক পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে, জার্ম্মানজাতি তাঁহাদের স্বার্থাভিসন্ধি-পূরণের নিমিত্ত অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সমগ্র মনুষ্যজাতি যাহাতে শান্তি লাভ করিতে পারে, ইংলণ্ড তজ্জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। যে মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া মিঃ নেভিল চেম্বারলেন এবং তাঁহার সতীর্থবৃন্দ তাঁহাদের জাতিকে যুদ্ধ-প্রেরণা দানে, তথা অগণিত নর-নারীর প্রাণ বিসর্জ্জনে বাধ্য হইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। ইহা নিঃসন্দেহ যে, নির্দ্দোষ ব্রিটিশ জনসাধারণের নেতৃবৃন্দের নিকট তাঁহাদের বিশ্ব-মানবতার নিমিত্ত সমগ্র মনুষ্যসমাজের কৃতজ্ঞ হইতে হইবে, কিন্তু দুঃখের সহিত আমাদিগকে উল্লেখ করিতে হইতেছে যে, ইংলণ্ডের নেতৃবৃন্দ কি সময়ে সময়ে এমন অভিমত প্রকাশ করেন, যাহা মনুষ্য-মনোবিজ্ঞানের মূল নীতির বিরোধী। ইংলণ্ডের নেতৃবৃন্দ বলেন কিংবা করেন, তাহাতে আমরা কিছু মনে করিতাম না, অন্ততঃ মনে করিবার আমাদের কোন যুক্তি ছিল না—যদি ইংলণ্ডের জন-সাধারণের ভবিষ্যতের সহিত আমাদের স্বকীয় ভবিষ্যৎ এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে না জড়িত হইয়া পড়িত এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণ, বস্তুতঃ তাঁহারাই দেশের অধিকাংশ, এমন সৎস্বভাব ও নিরীহ না হইতেন। একমাত্র সংঘর্ষশীলতাকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যেই এতগুলি নির্দ্দোষ নর-নারীর প্রাণহত্যার ব্যাপারে তাঁহাদিগকে লিপ্ত হইতে হইয়াছে, ইহা বলিয়া মিঃ চেম্বারলেন এবং তৎ-পর্য্যায়ভুক্ত তাঁহার সতীর্থবৃন্দ খুসী হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু লিখিত ইতিহাস-কালের মধ্যে মনুষ্য-সমাজে যতগুলি যুদ্ধ হইয়াছে, সেই-সকল বিভিন্ন যুদ্ধের ইতিহাস যথাযথ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের কোনটির দ্বারাই কাহারও—কি জয়ী কি বিজিত, তথা নিরপেক্ষ—কোন কল্যাণ সাধিত হয় নাই। মূল বিধান হইতেছে এই যে, দ্বন্দ্ব-কলহ এবং যুদ্ধের দ্বারা কোন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না এবং কোন অশুভ পন্থার সাহায্যে কখনও কোন শুভ ফল লাভ করা যায় না। সুতরাং আমাদের বলিতে হয় যে, ইংলণ্ডের নেতৃবৃন্দ যদি প্রকৃতপক্ষে বিচক্ষণ হইতেন, তবে অগণিত নরনারীর প্রাণ-সংহারক যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়াও কি ভাবে তাঁহাদের বিশ্বহিতজনক উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিতেন। এই সকল কারণে, নায়কবৃন্দঘোষিত অভিমতে সন্দেহ না করিয়া থাকা যায় না।

সাধারণ মনোবিজ্ঞান-নীতির একটি বাস্তব তথ্য হইতেছে এই যে, আহার্য্য এবং ব্যবহার্য্যের প্রাচুর্য্যে অনটন সংঘটিত না হইলে কিংবা সর্ব্বপ্রকারে রিপুদমন-সহায়ক শিক্ষার অভাব না ঘটিলে ব্যক্তি কিংবা জাতির মনে দ্বন্দ্ব অথবা কলহের কোনপ্রকার ভাব সঞ্চারিত হইতে পারে না। ইউরোপ এবং ইউরোপীয়গণের অবস্থার যথাযথ অনুধাবন দ্বারাও দেখা যাইবে যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, রুশিয়া কিংবা ইতালী, সর্ব্বত্র সমান ভাবে, এই উভয়ের, অর্থাৎ আহার্য্য ও কাঁচামালের অপ্রাচুর্য্য এবং রিপু দমনকারী যথার্থ শিক্ষার অভাব বর্ত্তমান। সুতরাং মনুষ্য-মনোবিজ্ঞান নীতি অনুসারে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, এই দুইটি কারণ বশতঃই, অপর কোন কারণে নহে, ইউরোপের যুদ্ধরত দেশসমূহের মধ্যে সমর-লিপ্সা দেখা দিয়াছে।

যুদ্ধরত বিভিন্ন জাতিসমূহের অবস্থায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য

যুদ্ধরত প্রত্যেক দেশেই স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য এবং কাঁচামালের, তথা বিভিন্ন রিপু-দমন-সহায়ক শিক্ষার অভাব বর্ত্তমান, ইহা বাস্তব ঘটনা এবং এই সকল দেশ যে গবেষণার দ্বারা কি ভাবে স্বাধীন উপায়ে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জন করা যায় কিংবা কি ভাবে রিপু দমন-সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থিত করা যায়, তাহার সন্ধানলাভে সমর্থ হন্ নাই, তাহাও বাস্তব ঘটনা। উপরন্তু সমাজান্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তির মনে নিশ্চিতরূপে রিপুর উত্তেজনা জাগরণ সহায়ক শিক্ষাপদ্ধতি তথা, আর্থিক অনটন সাধক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই ইহাঁদের প্রত্যেকে অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায়। তাঁহাদের প্রত্যেকে কৃষি অপেক্ষা শিল্প-বাণিজ্য-বিস্তারে অধিকতর অনুরাগবিশিষ্ট এবং তাঁহাদের দ্বারা যে কৃষি-বিজ্ঞান প্রসার লাভ করিয়াছে, তদ্দ্বারা দেশের এবং দেশস্থ কৃষির সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে বাধ্য। তাঁহারা যদি এমন সংগঠন-বিজ্ঞান বিষয়ে প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতেন, যাহাতে বেতনভোগী চাকুরী অথবা নফরগিরির সহায়তা ব্যতিরেকেও দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসী নিশ্চিত ভাবে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করিতে পারে, তবে তাঁহারা অচিরাৎ বুঝিতে পারিতেন যে, কৃষির উন্নয়ন সাধন না করিয়া কেবল শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার সাধন করিলে জাতি বিদেশের বাজারের মুখাপেক্ষী থাকিতে বাধ্য। তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারিতেন যে, দেশে কৃষির যদি এরূপ ব্যবস্থা সাধন করা যায়, যদ্দ্বারা প্রত্যেকটি কৃষক জমীতে বৎসরের মধ্যে মাত্র পাঁচমাস কার্য্য করিয়া তাহারা সাম্বৎসরিক প্রয়োজনীয় আহার্য্য এবং ব্যবহার্য্যের সংস্থান করিতে পারে, এবং বৎসরের অবশিষ্ট সাত মাস কাল এই সকল কৃষক কুটিরশিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিতে পারে, তবে তাঁহারা বিদেশের বাজারের মুখাপেক্ষী না হইয়াও এবং কোন প্রকার বেতনভোগী চাকুরীর শরণ না লইয়াও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যুদ্ধরত কোন জাতিরই—যে-সংগঠন দ্বারা তাঁহাদের প্রত্যেকটি দেশবাসী বেতনভোগী চাকুরী অর্থাৎ নফরগিরির সহায়তা ব্যতিরেকে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জনে সমর্থ হইতে পারে,—তাহার বিজ্ঞান আয়ত্ত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। এই জন্যই তাঁহারা অন্ধকারে হাত্ড়াইয়া হাতড়াইয়া কয়েকটি চেষ্টার সন্ধানলাভ করিয়াছেন এবং তাহাদের উন্নতি সাধন করিয়া তাহাকেই বিজ্ঞান আখ্যাত করিয়াছেন। ইহাই দেখা যায়, বিভিন্ন ভাবে মনুষ্যজাতির সর্ব্বনাশ-সাধক হইতেছে এবং পরস্পর ঈর্ষ্যা ও দ্বন্দ্ব-কলহের ইন্ধন সৃষ্টি করিতেছে।

এ পর্য্যন্ত যুদ্ধে কি ঘটিয়াছে ?

যুদ্ধের কারণসমূহ, তথা যুদ্ধরত জাতিসমূহের অবস্থায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য-সমূহ যথাযথ ভাবে অনুধাবন করিতে পারিলে, অতি সহজেই বাস্তবক্ষেত্রে যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তাহার প্রকৃতির সন্ধান লাভ করা যাইবে।* দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ করা যায় না এবং যুধ্যমান পক্ষের প্রত্যেকে বিপক্ষকে পরাজিত করিতে সমুৎসুকও বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ শক্তি-সহযোগে প্রকৃত প্রস্তাবে রণোন্মুখ হইবার সাহস কাহারও পরিলক্ষিত হইতেছে না। কার্য্যতঃ সম্ভব হইলে, বাগ্‌যুদ্ধে যুদ্ধ-জয়েরই তাঁহাদের প্রত্যেকে পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। মনুষ্যপ্রাণসংহারে আমাদের উৎসাহ নাই এবং বস্তুতঃ সম্মুখযুদ্ধে সমরব্রত জাতিদের শক্তিপ্রয়োগের অভাবের আমরা নিন্দাও করিব না। আমাদের বক্তব্য কেবল এই যে, যদ্যপি সাত মাসকাল হইল, যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে, কার্য্যতঃ এখনও যুদ্ধ সূচিত হয় নাই। ইহা অবশ্যই দেখা যায় যে, জার্ম্মানী এবং রুশিয়া পোল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডের কিয়দংশে প্রভুত্বলাভে অধিকারী হইয়াছে, কিন্তু জার্ম্মানী ও রুশিয়ার বিপক্ষে ফিনল্যাণ্ড কিংবা পোল্যাণ্ড কাহাকেও যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা চলে না। আমাদের মতে, যুদ্ধ কেবল দুই জন সমান বলশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যেই ঘটিতে পারে। যে-সংঘর্ষ অধিকতর বলশালী পক্ষের সংঘর্ষশীলতা কর্ত্তৃক দুর্ব্বলতর পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযানে সূচিত হয় এবং দুর্ব্বলতর পক্ষ কর্ত্তৃক কোন রকমে কিয়ৎকাল আত্মরক্ষার মধ্যে যাহা নিহিত, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে যুদ্ধ বলা চলিতে পারে না। বর্ত্তমান অবস্থায়, এক পক্ষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এবং অন্য পক্ষে জার্ম্মানী ও রুশিয়ার মধ্যেই যদি সম্মুখ-

* এই সন্দর্ভ জার্ম্মানী কর্ত্তৃক ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণের পূর্ব্বে লিখিত, পাঠকালে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন।

যুদ্ধ বাধে, তবেই প্রকৃত যুদ্ধ সম্ভব, কেন না, বলসামর্থ্য এবং সংস্থানের দিক্ হইতে এই দুই পক্ষকে মোটামুটি সমান বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে এখনও সম্মুখ কোন যুদ্ধ ঘটে নাই এবং এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, বিগত সাড়ে ছয় মাস হইল যুদ্ধ ঘোষিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এখনও যুদ্ধ বাধে নাই। কেবল ইহাই নহে, উভয় পক্ষের মধ্যে যাঁহারা বিচক্ষণতর, তাঁহারা এখনও যুদ্ধ ও রক্তপাত হইতে কি করিয়া অব্যাহতি পাওয়া যায়, তাহার সন্ধান করিতেছেন। যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা যে এখনও চলিতেছে, তাহা কিছুকাল পর পর যে শান্তি-প্রস্তাব আনীত হইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে, তাহাতেই প্রমাণ পাওয়া যাইবে। যে পক্ষ বিচক্ষণতর, তাঁহারাই এইরূপে চেষ্টিত হইয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি, কেন না আমাদের মতে, কোন উদ্দেশ্য পূরণার্থ রক্তপাত-জনক দ্বন্দ্ব-কলহ সর্ব্বথা নির্ব্বোধোচিত। যে বিচক্ষণতার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রশংসা উভয় পক্ষের কাহার প্রাপ্য, তাহা নির্দ্দিষ্ট ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া দুঃসাধ্য, কিন্তু খুব সম্ভবতঃ মিত্রপক্ষই ঐ প্রশংসার যোগ্য। আমরা যেরূপে ঘটনা বিচার করি তাহা হইতে মনে হয় যে, মিত্রপক্ষই যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য এবং অচিরাৎ শান্তি-স্থাপনে চেষ্টিত, কিন্তু তাঁহারা নেপথ্যে রহিয়াছেন, কেন না তাঁহারা বিবেচনা করেন বলিয়া প্রতীতি হয় যে, কেহ বা কাহারা এইরূপ চেষ্টাকে কাপুরুষোচিত বলিয়া ভুল করিতে পারেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণাম কি, তাহা যথার্থ অনুমান করিতে হইলে, এই দৌর্ব্বল্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত কি ঘটিয়াছে, সংক্ষেপে তাহা বলিতে হইলে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে উহা বলিতে পারি :—

(১) যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে এবং যুদ্ধের বিস্তারার্থ চেষ্টা হইতেছে বটে, বস্তুতঃ যুদ্ধ এখনও আরম্ভ হয় নাই।

(২) পোল্যাণ্ড এবং ফিনল্যাণ্ড স্বরূপ কতিপয় দুর্ব্বল রাষ্ট্রের অধিকার জার্ম্মানী ও রুশিয়া লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের দ্বারা মিত্রপক্ষের অধিকার ও শক্তির খর্ব্বতা সাধনের সঙ্গোপন চেষ্টা চলিতেছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হইবার স্পর্দ্ধা তাহা করেন নাই।

(৩) যতদূর সম্ভব ঐকান্তিকতার শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা এখনও মধ্যে মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে।

(৪) যদিও যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এখনও সম্পূর্ণ সাড়ে ছয় মাস কাল অতিবাহিত হয় নাই, ইতিমধ্যেই সমর-রত দেশসমূহের প্রত্যেক অধিবাসীর বিভিন্ন আহার্য্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সূচিত হইয়াছে।

এতদুপরি আমেরিকার মিঃ সামার ওয়েলেসের কার্য্য-কলাপ লক্ষণীয়—সরকারীভাবে স্বীকৃত না হইলেও উহাকে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা না বলিয়া থাকা যায় না।

অতঃপর আমরা সমররত জাতিসমূহের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের লক্ষণীয় গতিবিধির বিচার করিব।

সমররত জাতিসমূহের নেতৃবৃন্দের কতিপয় লক্ষণীয় গতিবিধি

সমর-রত জাতিসমূহের নেতৃবৃন্দের কোন্ গতিবিধি লক্ষণীয় বলিয়া মনে করিতে হইবে তৎসন্ধানার্থ ইউরোপে মিঃ সামার ওয়েলেসের আগমন এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ-সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। এতদ্ক্রমে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য :

প্রথমতঃ ইটালীতে মিঃ ওয়েলেসের উপস্থিতি এবং কাউণ্ট চিয়েনো ও সিনর মুসোলিনির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সন্দর্শন।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার জার্ম্মানী গমন এবং তথায় ফন্ রিবেন-ট্রপ ও হের হিটলারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সন্দর্শন।

তৃতীয়তঃ, ফন্ রিবেনট্রপের ইটালী আগমন এবং কাউণ্ট চিয়েনো ও সিনর মুসোলিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সন্দর্শন।

চতুর্থতঃ, মিঃ ওয়েলেসের ফ্রান্স-গমন এবং ফ্রান্সের সকল প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনেতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সন্দর্শন।

পঞ্চমতঃ, মিঃ ওয়েলেসের ইংলণ্ড গমন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনেতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সন্দর্শন।

ষষ্ঠতঃ, মিঃ ওয়েলেসের ইটালীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

সপ্তমতঃ, সিনর মুসোলিনী ও চিয়েনো এবং হের হিটলার ও ফন্ রিবেনট্রপের পরস্পর সাক্ষাৎ সন্দর্শন।

মনোবৈজ্ঞানিক এবং রাষ্ট্রনীতিবিদের দৃষ্টিতে এই সাতটি বিষয়পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাহাদের প্রত্যেকটি বিষয় একটি উদ্দেশ্যবিশিষ্ট এবং ইহাদের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ভাবে সেই একই উদ্দেশ্যের সহায়ক।

যুদ্ধের কারণ, বিভিন্ন যুদ্ধরত জাতিসমূহের অবস্থার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, যুদ্ধের গতি, এবং ইউরোপের উপরিলিখিত ঘটনা-সমূহ যথাযথভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া সমবেত ভাবে ইহাদের সম্পূর্ণ আলোচনা করিলে বর্ত্তমান যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা অনুমান করা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হইবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণাম

মিঃ ওয়েলেস কর্ত্তৃক ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের পরে যে-সকল ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে, তাহাদের যথাযথ অনুধাবন হইতে নিরাপদ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে, ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের একটি মিলিত 'ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। এইরূপ 'ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি এবং ইহার শাসনতন্ত্র কিরূপ হইতে পারে, তাহা যথাযথ ভাবে অনুমান করা সুকঠিন কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধের কারণ এবং তৎসহ সমর-রত বিভিন্ন পক্ষের লক্ষণীয় অবস্থা-বৈশিষ্ট্য মনোযোগসহকারে বিচার করিলে আমাদিগকে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, প্রস্তাবিত এই ফেডারেশনের প্রধানতঃ উদ্দেশ্য সমর-রত বিভিন্ন পক্ষের অনাহার এবং বেকার সমস্যার সমাধান। অতঃপর আমরা গভীরতর কারণ-সন্ধানী হইলে বুঝিতে পারিব যে, সমররত কতিপয় জাতি এইরূপে ফেডারেশন গঠন করিয়া ভারত, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি বর্ত্তমান অধীন রাষ্ট্রসমূহ এবং চীন, মিশর, বল্কান অঞ্চল প্রভৃতি বর্ত্তমান দুর্ব্বল রাষ্ট্রসমূহকে এই ফেডারেশনের অধীন করিবার ধারণা মনে মনে পোষণ করিতেছেন।

এইরূপে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ লইয়া গঠিত কোন 'ফেডারেশন' গঠন সম্ভব কি না এবং উহা সম্ভব হইলেও উহার দ্বারা ইউরোপের যুদ্ধ-রত বিভিন্ন দেশসমূহের অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধান সাধ্য কি না, অতঃপর আমরা তাহার বিচার করিব।

মনোবিজ্ঞানের দিক্ হইতে ইউরোপের বিভিন্ন সমর-রত জাতির স্বভাব যথাযথভাবে অনুধাবন করিলে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের তথাকথিত বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার চর্চ্চার ফলে যে-মনোভাব লাভ করিয়াছেন, তাহা হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিলাভের শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে, ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের এইরূপ কোন স্থায়ী ফেডারেশন গঠন সম্ভব নহে—অস্থায়ীভাবেও ইহার প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না, তাহাও বিচারসাপেক্ষ আমরা অবশ্য ইহা অস্থায়ী ভাবেও সম্ভব বলিয়া মনে করি না, কেন না প্রকৃত ফেডারেশন-এর পক্ষে যাহা অপরিহার্য্য, সেই ঐকান্তিক আন্তরিকতার ভাব ইউরোপীয়গণ বাস্তবতঃ তাঁহাদের চালচলনের মর্য্যাদা এবং নিরীহতা রক্ষার উচ্চাভিলাষ বশতঃ মোটামুটি ভাবে তাঁহাদের মন হইতে দূরীভূত করিয়াছেন। অবশ্য, যুদ্ধরত সকল রাষ্ট্রই যদি এরূপ নির্ব্বোধোচিত কল্পনা পোষণ করেন যে, ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের একটি 'ফেডারেশন' গঠিত করিয়া তাঁহারা অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে তদধীন করিয়া অধীন রাষ্ট্রসমূহের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিবেন এবং তাঁহাদের দেশবাসী জন-সাধারণের বেকার ও অনাহার সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন, তাহা হইলে অস্থায়ী ভাবে এইরূপ একটি 'ফেডারেশন' গঠন তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি না যে, যুদ্ধ রত সকল জাতিই এতখানি নির্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং আমরা মনে করি যে, সাধারণতঃ এইরূপ কোন অস্থায়ী 'ফেডারেশন' গঠনও সম্ভব নহে। এক্ষণে আমাদিগকে কেহ যদি প্রশ্ন করেন যে, ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের এইরূপ 'ফেডারেশন' তাহাদের অধিবাসিগণের বেকার এবং অনাহার সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইবে কি না, তবে আমাদিগকে ইহার উত্তরে বলিতে হইবে "না"। এই ভাবের কোন 'ফেডারেশন' গঠনে তাঁহারা সমর্থ হইলে, তাঁহাদের পক্ষে বর্ত্তমান অধীন এবং দুর্ব্বল রাষ্ট্রসমূহের উপর তাঁহাদের অস্ত্রসজ্জার সহায়তায় অস্থায়ী প্রাধান্যলাভ সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু এতদ্‌সহায়ে তাঁহারা ঐ সকল দেশের উপর নৈতিক প্রভুত্বলাভে কিম্বা তাহাদের অনাহার-সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইবেন না, কেন না ঐ সকল অধীন, তথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কুত্রাপি স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য এবং কাঁচামালের উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য

উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয় না। মনে রাখিতে হইবে যে, অন্ন-সমস্যার যত রাহস্যই থাকুক না কেন, কেবল তৎসাহায্যেই—কোন স্বাধীন জাতির জন-সাধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর যদি অন্ততঃ সামান্য পরিমাণও উদ্বৃত্ত উৎপন্ন না থাকে,—কোন দেশ অপর কোন দেশের স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচামাল হরণ করিতে পারে না। ভারতে যতদিন উদ্বৃত্ত পরিমাণে উৎপাদন হইত, ততদিনই ভারতের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইংলণ্ডের উপকার সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারত আর ইংলণ্ডের পক্ষে স্বচ্ছন্দ-বিহার-স্থল নাই, বরং ভারত বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের কণ্টক-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও যে-পরিমাণ উদ্বৃত্ত উৎপন্ন হইত, আজ আর তাহা হয় না। কি জন্য এরূপ ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনা বিস্তারসাপেক্ষ এবং বর্ত্তমান সন্দর্ভে তাহার স্থান-সঙ্কুলান সম্ভব নহে।

যাহাই হউক, স্বীকার করিতেই হইবে যে, জনসাধারণের অনাহার ও বেকার সমস্যার সমাধান লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধ-রত জাতিসমূহের জনকয়েক মিলিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের একটি 'ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত হইয়াছেন, কিন্তু এরূপে কোন স্থায়ী "ফেডারেশন" প্রতিষ্ঠা যেরূপ সম্ভব নহে, তেমনই এই শ্রেণীর "ফেডারেশন" প্রতিষ্ঠার দ্বারা বেকার এবং অনাহার সমস্যার সমাধানও সম্ভব নহে।

ইউরোপীয়গণ যদি তাঁহাদের প্রস্তাবিত "ফেডারেশন" বিষয়ে আন্তরিক এবং বিচক্ষণোচিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিত স্বীকার করিবেন যে, নিম্নলিখিতরূপ বুদ্ধি-বৃত্তিমূলক বিকাশ ব্যতীরেকে জনসাধারণের কোন প্রকৃত "ফেডারেশন" প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না :—

প্রথমতঃ, জনসাধারণকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, কোন প্রকার দ্বন্দ্ব-কলহের দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, জন সাধারণকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং দায়িত্বজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়াই তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে এবং যে-সকল কার্য্য তাঁহাদের বাসনা কিংবা বিবেকচরিতার্থতামূলক, সর্ব্বত্র তাহা বর্জ্জনীয়।

তৃতীয়তঃ, তাঁহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভের পন্থা এবং পদ্ধতি ব্যতীত কোন দেশের কোন একজন ব্যক্তিই তাঁহার ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে সর্ব্বথা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না।

আমাদের মতে, যুদ্ধ-রত জাতিসমূহের নেতৃবৃন্দের যদি সুবুদ্ধির উদয় হয় এবং তাঁহাদের সকলের স্বদেশের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি সাধনার্থ তাঁহারা যদি তৎপর হয়, তবে বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিণাম সুখের হইতে পারে। কিন্তু এতখানি প্রত্যাশা আমরা করি না। যে-পর্য্যন্ত না যুদ্ধ-রত সকল দেশের জনসাধারণ প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের মর্ম্মান্তিক অভাব পীড়িত হইয়া তাহাদের বিভ্রান্ত নেতৃবৃন্দের প্রাধান্য উৎপাটনে বদ্ধপরিকর হয়, ততদিন যুদ্ধ লপ্সার অক্ষিত্ব থাকিবার সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবনা বর্ত্তমান।

এক কথায় বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অপরিহার্য্য পরিণাম হইতেছে প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সমূহ বিপর্য্যয়।

আমাদের প্রার্থনা যে, যুদ্ধরত জাতিসমূহের নেতৃবৃন্দ এখনও তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হউন।*

বাগ্-দ্বৈরথ এবং মিঃ গান্ধীর বিশ্বাসঘাতকতার সুস্পষ্ট নিদর্শন

বর্ত্তমান সন্দর্ভে রামগড়ে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বিগত ত্রিপঞ্চাশৎ অধিবেশন-কালে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে-সকল বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আলোচিত হইবে। আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে নিম্নে আমরা যে-সকল অসামঞ্জস্যের উল্লেখ করিতেছি, মিঃ গান্ধী যদি তাহার ব্যাখ্যা দান না করিতে পারেন, তবে নির্ব্বোধ এবং বিশ্বাসীদিগকে প্রতারণা করিতেছেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিতে হইবে।

১৩ই মার্চ্চ তারিখে মিঃ গান্ধীর রামগড় আগমনের প্রাক্কালে

* 'দি ইকনমিক বঙ্গশ্রী'র ২৩শে মার্চ্চ সংখ্যার অগ্রলেখের মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

রামগড় অধিবেশনের কার্যকলাপ বস্তুতঃ আরম্ভ হয় ১৪ই মার্চ্চ তারিখের বিশেষ ঘটনা মিঃ গান্ধী কর্ত্তৃক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন এবং তদুপলক্ষে তাঁহার বক্তৃতা।

নির্ব্বাচিত সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আগমনোপলক্ষে শোভাযাত্রা ১৫ই মার্চ্চ তারিখের বিশেষ ঘটনা। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশনের আরম্ভ এই দিবসে।

১৬ই মার্চ্চ তারিখে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর তিনটি অধিবেশন হয় এবং উহাতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত আলোচনা হয়:—

(১) ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা।

(২) কংগ্রেস সোস্যালিষ্টগণের সমস্যা।

(৩) বিচ্ছেদকারী শক্তিসমূহের দমনোপায়।

(৪) কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলির গুরুত্ব।

১৭ মার্চ্চ তারিখের বিশেষ ঘটনা এ-আই-সি-সির তথা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন। এই দিবস পাটনা অধিবেশনে গৃহীত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্ত্তৃক আনীত এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়।

১৮ই মার্চ্চ তারিখে সাবজেক্ট কমিটির অধিবেশনে পাটনায় গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মিঃ গান্ধী এবং সর্দ্দার প্যাটেল, উভয়েই এই অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদান করেন।

পাটনা অধিবেশনে গৃহীত এই প্রস্তাবের রচয়িতাদিগের মনোভাবের সন্ধান লাভার্থ এবং নির্দ্দোষ ও বিশ্বাসীগণকে প্রতারণা করিতেছেন বলিয়া মিঃ গান্ধী বিশ্বাসঘাতক এইরূপ অভিযোগ আনয়ন করিতে হয় আমাদের এই অভিমত প্রমাণার্থ আমরা সর্ব্বাগ্রে এই প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিব। অতঃপর আমাদের অভিমত প্রমাণার্থ ১৮ই মার্চ্চ তারিখে সাবজেক্ট কমিটিতে প্রদত্ত মিঃ গান্ধীর বক্তৃতার আমরা আলোচনা করিব।

এই আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমরা আমাদিগের পাঠকবৃন্দকে স্মরণ করিতে বলি যে, মিঃ গান্ধীর উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন, এমন সকল ভারতবাসীই ক্রমশঃ অনাহার ও বেকার যন্ত্রণা অধিক হইতে অধিকতর ভাবে ভোগ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যাশা রাখেন যে, মিঃ গান্ধী ভারতে এমত অবস্থা আনয়ন করিবেন, যদ্দ্বারা ভারতবাসী সকলে অনাহার ও বেকার সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। মিঃ গান্ধী তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন যে, স্বাধীনতা ব্যতীত বেকার এবং অনাহার সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে এবং ভারত স্বাধীন হইলেই জন-সাধারণের এই-সকল সমস্যারও সমাধান হইয়া যাইবে। মিঃ গান্ধীর নিকট হইতে এইরূপ ভরসা লাভ করিয়াই জন-সাধারণের যাঁহারা তাঁহার উপর বিশ্বাসশীল, তাঁহারা তাঁহার প্রদর্শিত পন্থায় স্বাধীনতার নিমিত্ত আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং দাঁড়ায় এই যে, যদি মিঃ গান্ধী তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা-লাভের প্রকৃত পন্থা প্রদর্শনে অসমর্থ হন কিংবা তিনি তাঁহাদিগকে এমন কার্য্যে ব্রতী করেন, যাহাতে অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত নিশ্চিত স্বাধীনতালাভের পন্থা রুদ্ধ হইয়া যাইবে, তবে তাঁহার কার্য্য-কলাপকে বিশ্বাসী এবং নির্দ্দোষ জন-সাধারণের প্রতারণাসূচক বলিয়া বিশ্বাসঘাতকতার তুল্য হিসাবে ধরিতে হইবে। এই যুক্তি মনে রাখিলে মিঃ গান্ধীর বক্তৃতা এবং প্রস্তাবাদি হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে যে প্রকৃত বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনয়ন করা যাইতে পারে, তাহা বুঝা কষ্টসাধ্য হইবে না।

পাটনায় গৃহীত প্রস্তাবে মূলতঃ নিম্নলিখিতরূপ কয়েকটি বিষয় দৃষ্ট হয়:—

(১) ইহার দ্বারা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রস্তাব সমর্থিত হইয়াছে।

প্রস্তাবের এই অংশের সম্যক্ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ইহা বাক্যসহায়ে দ্বৈরথ সমর মাত্র এবং ভারতের স্বাধীনতা-লাভ-সহায়ক ইহার মধ্যে কিছুই নাই। উপরন্তু, ইহার মধ্যে ব্রিটিশজাতির প্রতি দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব দেখা যায় এবং সেই নিমিত্ত স্বাধীনতা-লাভের ইহা অন্তরায়-স্বরূপ বলিয়া মনে করিতে হইবে, কেন না দ্বন্দ্ব কলহের দ্বারা কোন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, ইহা অন্যতম মুখ্য সত্য। মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ এই প্রাথমিক সত্যের উপলব্ধি না করিতে পারেন, কিন্তু তথাপি ইহা সত্য। মিঃ গান্ধীর যদি মনুষ্যোচিত মস্তিষ্ক-সামর্থ্য থাকিত। তবে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার উপর যাহারা নির্ভর করিতেছেন,

কোন ব্যক্তি কিংবা জাতির বিরুদ্ধে কোনরূপ দ্বন্দ্বসূচক মনোভাব সৃষ্টি না করিয়াও তাহাদের উদ্দেশ্যপূরণমূলক কার্য্য কি ভাবে সাধন করিতে হইবে।

(২) ব্রিটিশ সরকার যে, ভারতের জন-সাধারণের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া ভারতকে যুদ্ধরত জাতি হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাতে তাহা অনুমোদন করা হয় নাই।

ইহাও বাগ্-দ্বৈরথ স্বরূপ। ইহাও ভারতীয় স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যের বিন্দুমাত্র সহায়ক নহে। উপরন্তু, দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাববিশিষ্ট বলিয়া ভারতবাসী জন-সাধারণের পক্ষে যাহা কল্যাণজনক বিবেচিত হইতে পারে, সেই পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে ইহাও নিশ্চিত অন্তরায় সৃষ্টি করিবে। মিঃ গান্ধীর মনুষ্যোচিত মস্তিষ্ক-সামর্থ্য থাকিলে, কোন প্রকার তিক্ততা সৃষ্টি না করিয়াই ভারত-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যে ভারতবাসীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ কি করিলে বাধ্য হন। তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন।

(৩) যুদ্ধ-পরিচালনার্থ ভারতীয় কাঁচামালের অন্যায় ব্যবহার ইহা অনুমোদন করে নাই।

ইহাও কলহপরায়ণতার নিদর্শন এবং বাগ্-দ্বৈরথ মাত্র। মিঃ গান্ধীর যদি প্রকৃত নেতৃপদের যোগ্যতা থাকিত, তবে কোনরূপ তিক্ততা প্রদর্শন না করিয়াই এই কাঁচামালের অন্যায় ব্যবহার কি ভাবে বন্ধ করিতে হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু যে-ভাবেই হউক্, ভারতের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যপূরণে ইহাও কোনক্রমে সহায়ক হইবে না।

(৪) গ্রেট বৃটেনের হইয়া যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের নিয়োগ ইহাতে অনুমোদন করা হয় নাই।

ইহাও এক প্রকার বাগ্-দ্বৈরথ, এবং ইহাও ভারতের স্বাধীনতা-লাভের বিন্দুমাত্র সহায়ক হইবে না।

(৫) ইহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অপেক্ষা ন্যূনতর কিছুতে ভারত সন্তুষ্ট হইবে না।

"সম্পূর্ণ স্বাধীনতা"র সম্যক্ অর্থের ধারণা যদি ইহার প্রণেতাদিগের থাকিত, তবে ইহাতে কোন অনিষ্ট ছিল না। কিন্তু জন-সাধারণের কাহারও জীবন-ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জন বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ব্যতীত মাত্র জন-সাধারণের শাসনকে কোনক্রমেই যথাযথ ভাবের "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা" অভিহিত করা যায় না। আমরা স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা উপস্থিত করিতেছি ভারতে সেই শ্রেণীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইলে মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকের নিশ্চিত স্বাধীনতা ব্যবস্থিত হইতে পারে। ব্রিটিশ জাতির স্বার্থের ইহা পরিপন্থী নহে এবং এই শ্রেণীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্রিটিশ জাতির বিরক্ত হইবার যথার্থ কারণ নাই। এই শ্রেণীর স্বাধীনতায় সর্ব্বদা বৈদেশিক শাসনের ছেদেরও প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেবল প্রয়োজন সুশাসন, এবং ভারতীয়দিগের বর্ত্তমানে বুদ্ধিগত ও সংস্কৃতিগত অবস্থায় ইহা সম্ভব নহে। এমন কি, মিঃ গান্ধীর শ্রেণীর বর্ত্তমান বুদ্ধিজীবিগণের যাঁহারা যুক্তিযুক্তভাবে "গুরু" আখ্যাত হইবার দাবী করিতে পারেন, সেই ব্রিটনগণও কি করিয়া আদর্শ শাসনতন্ত্র গঠন করিতে হইবে তাহা পরিজ্ঞাত নহেন। তাঁহাদের যদি ইহা পরিজ্ঞাত থাকিত, তবে যুদ্ধক্ষেত্রে এতগুলি প্রাণ-সংহার কিংবা এত সংস্থান জলাঞ্জলি দিবার তাঁহাদের প্রয়োজন হইত না।

মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ তোতাপাখীর ন্যায় কেবল "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা", এই বুলিটিই অভ্যাস করিয়াছেন। ইহার দ্বারা কি বুঝায়, তাহার ধারণা পর্য্যন্ত তাঁহারা করিতে অক্ষম। তাঁহারা "দেশবাসী কর্ত্তৃক শাসন পরিচালনা"র অর্থেই ইহা সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ অধিকতর বিচক্ষণতার সহিত যতদিন পর্য্যন্ত না সম্যক্ ধারণা করিতে পারিবেন, কোন দেশের অধিবাসীদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতালাভার্থ কি প্রয়োজন; ততদিন ভারতে কোন পর্য্যায়ের স্বাধীনতাই ভারতবাসীর স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিজনক হইবে। প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাবধি কংগ্রেসী শাসনে প্রদেশসমূহের অবস্থায় যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই আমাদের এই উক্তির জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য। নিছক ব্রিটিশ শাসনে ভারতের বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের অবস্থা বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধ ছিল, যুক্তিসঙ্গতভাবে ইহা কি অস্বীকার করা চলে? ব্রিটিশ পদ্ধতির শাসনেও ত্রুটি বিদ্যমান এবং তাহার সংস্কার প্রয়োজন, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু শাসন-পরিচালনার অ-আ-ক-খ ও সাধারণতঃ শিক্ষা না করিয়া যাঁহারা শাসনকর্ত্তা হইয়া বসিয়াছেন, মিঃ গান্ধীর শ্রেণীর এই সকল ব্যক্তির তুলনায় ব্রিটিশ-শাসন কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি না সমর্থন করিবেন?

বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে, সুতরাং জন-সাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার তুল্য বলিয়াই পরিগণিত করিতে হয় এবং প্রকৃত স্বাধীনতার উদ্দেশ্য তদ্দ্বারা বিন্দুমাত্র পরিমাণেও সাধিত হইবে না। সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকাবহ বিষয় এই

যে, ব্রিটিশ সংস্কৃতির যাঁহারা সম্পূর্ণ ক্রীতদাস এবং কথায়-বার্ত্তায়, চিন্তায়, বেশ-ভূষায়, পানাহারে এবং নিদ্রায় পর্য্যন্ত যাঁহারা ইংরাজী ভাবাপন্ন, তাহাতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান দাবী করিতে তাঁহারাই ইতস্ততঃ বোধ করিতেছেন না। বিচক্ষণ হইবার অভিলাষ পর্য্যন্ত যদি তাঁহারা বিসর্জ্জন না দিয়া থাকেন, তবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এমন অসন্তুষ্টি কেন দেখা দিয়াছে, তৎসন্ধানার্থ তাঁহাদিগকে আমরা পরামর্শ দান করিব এবং তদনুযায়ী তাঁহাদিগকে আচরণ করিতে বলিব। এই সকল নির্ব্বোধ ব্যক্তির মস্তিষ্ক সামর্থ্য নিশ্চয়ই জড়তা লাভ করিয়াছে, তাই তাঁহারা বুঝিতে পর্য্যন্ত পারেন না যে, এই ভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীও ব্রিটিশ প্রণালীর অনুসরণ মাত্র এবং ইহা বস্তুতঃ, এমন কি ব্রিটিশ জাতির পক্ষেও তেমন হিতজনক হয় নাই।

(৬) এতদ্বারা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কেবল ভারতের জন-সাধারণ কর্ত্তৃকই কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীর মধ্যস্থতায় তাঁহাদের শাসনতন্ত্র যথাবিহিত ভাবে গঠিত হইতে পারে, এবং পৃথিবীর অপরাপর দেশের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি হইবে তাহা নির্ণীত হইতে পারে।

ইহা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিজনক। বাস্তবতঃ কোন কিছু না করিয়া, ইহার দ্বারা কেবল জন-সাধারণকে কল্পনাবিলাসের খাদ্য দান করা হইয়াছে। আমরা সংশয়হীনতার সহিত বলিতে পারি যে, ভারতের প্রত্যেকটি অধিবাসী যাহাতে বেকার এবং অনাহার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, এমন কি, মিঃ গান্ধীও তদনুরূপ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারেন না। তাহা সফল করিতে সমর্থ হইলে তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে মুকুটহীন হইয়াও রাজত্ব করিতে পারিতেন। এইরূপ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তিনি অসমর্থ, আমাদের এই অভিযোগ তিনি যদি অস্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে আমরা এইরূপ শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রকাশ করিবার জন্ত বলিতেছি। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অজ্ঞতা এত অধিক যে, এইরূপ শাসনতন্ত্রের নিমিত্ত অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজন কি এবং তাহা কিরূপ দুঃসাধ্য, তাহা পর্য্যন্ত তিনি পরিজ্ঞাত নহেন। অপরিণত যুবকবৃন্দকে তাহাদের সামর্থ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে অযথার্থ ভাবে সচেতন করিয়া তিনি জাতির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার পাত্রদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। দেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব যদি সবল হস্তে পরিচালিত হইত, তবে কেবল এই অপরাধের নিমিত্তই তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হইত। ব্রিটিশ শাসকগণের হয়তো তাঁহাকে শাস্তিদানে বাধা বিদ্যমান, কিন্তু আমাদের যুবকবৃন্দের উচ্ছৃঙ্খলতার এবং অকারণ আত্মাভিমানের জনক প্রধান কারণসমূহের অন্যতম হিসাবে জগদীশ্বর তাঁহাকে কখনও নিষ্কৃতি দান করিবেন না।

(৭) এতদ্বারা ঘোষণা করা হইয়াছে যে কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলি ব্যতীত সাম্প্রদায়িক মিলন-সাধন অসম্ভব।

ইহা মিঃ গান্ধীর অসার দর্শনের উদাহরণ। প্রকৃত মিলন সম্বন্ধে কাহারও সম্যক্ ধারণা থাকিলে তিনি অচিরাৎ বুঝিতেন যে, যাহাকে সুশিক্ষা এবং সুদীক্ষা বলিয়া অভিহিত করা যায়, একমাত্র তদ্দ্বারাই মিলন সম্ভব। কোন প্রকার এসেম্বলি গঠন দ্বারা প্রকৃত মিলন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইলে, আমরা মিঃ গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করি, কেন এত বৎসর ধরিয়া একই এসেম্বলিভুক্ত থাকিলেও, মিঃ সুভাষ চন্দ্র বসু এবং তাঁহার মধ্যে মিলন হইল না? প্রকৃত স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সাধনে এই শ্রেণীর বিভ্রান্ত দর্শন কখনও কার্য্যকারী হইতে পারে না। ইহাতে কেবল জন-সাধারণ বিভ্রান্ত হইবে এবং তাহাদের ক্রমাবনতি সাধিত হইবে।

(৮) এতদ্বারা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারতের স্বাধীনতার পথে দেশীয় রাজ্যসমূহের নৃপতিবর্গের এবং বৈদেশিক কায়েমী-স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের অন্তরায়-সৃষ্টির অধিকার স্বীকার করা হইতেছে না।

মিঃ গান্ধীর স্বেচ্ছাচারিতার ইহা অন্যতম নিদর্শন। যত-দিন দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবর্গ এবং বৈদেশিক কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ বিদ্যমান থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের অধিকারও বিদ্যমান থাকিবে। ইহা অস্বীকার করা নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র। ইহাতে কেবল দ্বন্দ্ব-কলহের ভাব বৃদ্ধি লাভ করে এবং ভেদনীতির সার্থকতা হয়। জন-সাধারণের প্রকৃত স্বাধীনতার উদ্দেশ্য এই শ্রেণীর মস্তিষ্ক-সামর্থ্য দ্বারা কখনও সাধিত হইবে না।

পাটনায় গৃহীত অধিবেশনের এই আটটি বিষয় এবং আমাদের বিশ্লেষণ যথাযথ ভাবে অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে, ইহাদের কোনটিই জন-সাধারণের বেকার এবং অনাহার সমস্যা, তথা প্রকৃত স্বাধীনতার সমস্যা সমাধানের সহায়ক হইতে পারে না। উপরন্তু, ইহাদের প্রত্যেকটি জন-সাধারণকে নিশ্চিত বিভ্রান্ত করিবে এবং দাসত্বের শৃঙ্খল দৃঢ়তর করিয়া তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করিবে। মিঃ গান্ধীর মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতেছে যে, তিনি দেশবাসীর নিকট বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী। অবশ্য ইহাতে নিশ্চিত ভাবে বুঝা যায় না যে, তিনি নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ অথবা অসাধুতাবশতঃ এইরূপ করিতেছেন। যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি কখনও অসাধুতা করেন নাই, সুতরাং কেবল নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃই তিনি এই ভাবে ভ্রান্ত হইতেছেন, তথাপি তাঁহাকে আমরা বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী করিতে পারি, কেন না

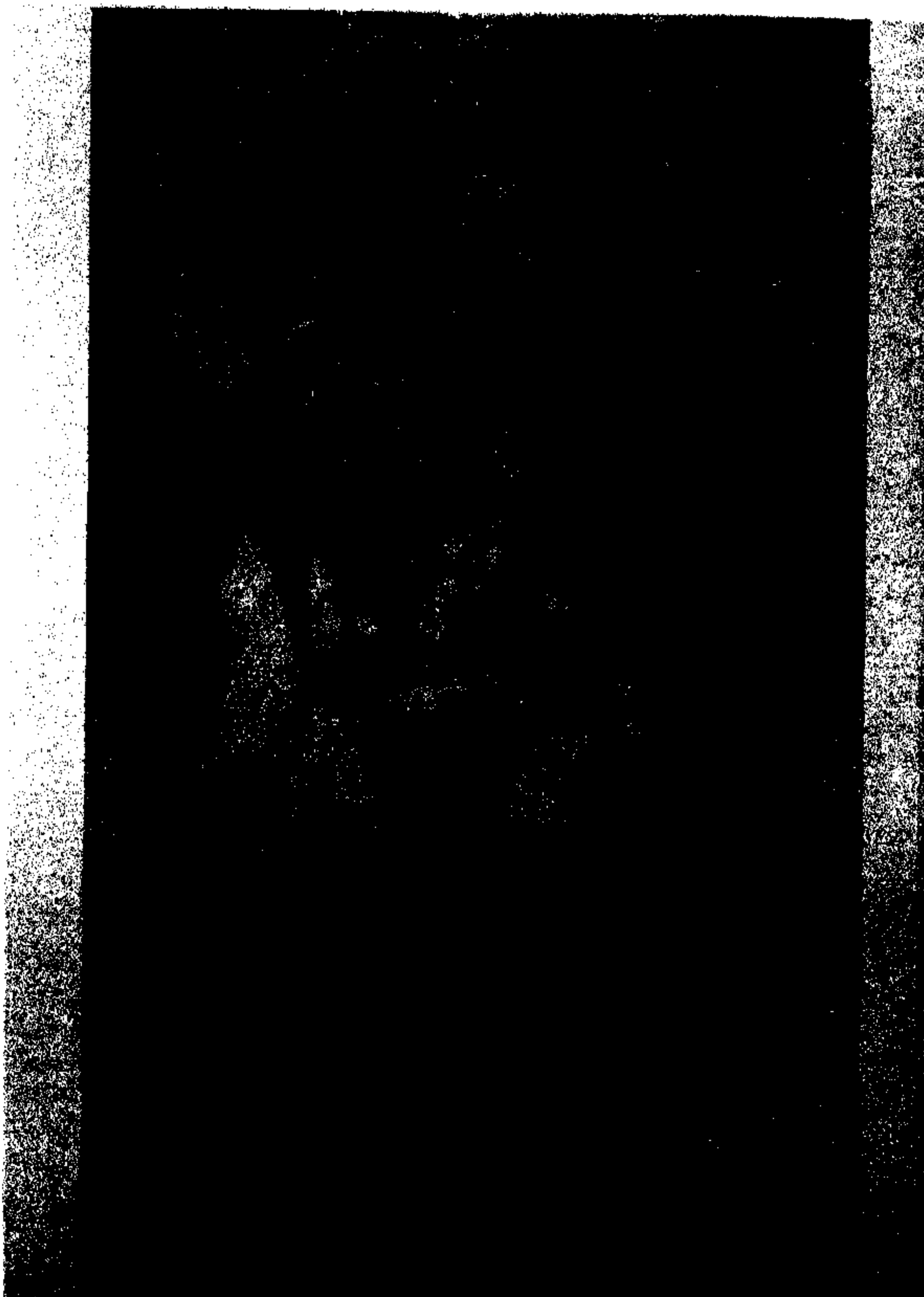
বিপ্লব পরিচালনা প্রতারণারই নামান্তর এবং তাহা বিশ্বাসঘাতকতারই তুল্য। মিঃ গান্ধী কখনও অসাধু আচরণ করেন নাই, প্রমাণিত হইলে তাঁহার অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস পায়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মিঃ গান্ধী কখনও অসাধু আচরণ করেন নাই, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে, সত্য কথা বলা হইবে না। সাবজেক্ট কমিটির ১৮ই মার্চের অধিবেশনে তিনি বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হইবে যে, অসাধু আচরণে তাঁহার দিব্য পারেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, "আমি সংঘর্ষের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইয়াছি, কিন্তু আমার সংযত হইতে হইবে, আমাকে যদি সেনাপতিত্ব করিতে হয়, তবে স্বকীয় সৈন্যবৃন্দকে যুদ্ধে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, সেনাপতি যেরূপ যুদ্ধ-চালনার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে চাহেন, আমাকেও অনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। আমরা অনতিবিলম্বে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত, এরূপ ধারণা গঠন করিবার মত আমি কিছুই দেখি না (I have accepted the need for a fight, but I shall exercise restraint. If I am the general, then just as a general wants to prepare for a fight before he gives orders to his soldiers, I shall do the same. I do not find anything to suggest the we are ready for a fight immediately).

এই বক্তৃতার সমগ্রাংশ পাঠ এবং তাহার মর্ম্মানুধাবন করিলে দেখা যায় যে, মিঃ গান্ধী তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে ইহাই ঘোষণা করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, তাঁহাদের ন্যায় তিনিও আইন-অমান্য আন্দোলন সূচিত করিবার জন্য ব্যাকুল, এবং সমগ্র দেশবাসী সম্পূর্ণভাবে নিয়মাবদ্ধ হয় নাই বলিয়াই তিনি অনতিবিলম্বে তাহা আরম্ভ করিতে পারিতেছেন না। তিনি উপসংহারে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মুখ্য বক্তব্য এই যে, সমগ্র দেশ নিয়মানুগত হইলেই তিনি অচিরাৎ আইন-অমান্য আরম্ভ করিবেন। ইহা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের বিষয় যে, দেশে কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীনতা অর্জ্জন না করিতে পারিলে, সমগ্র দেশবাসী অংশতঃও কখনও নিয়মাবদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং মিঃ গান্ধী কর্ত্তৃক কোনদিন আইন অমান্য আন্দোলন সূচিত হইবে, জন-সাধারণকে এইরূপ বিশ্বাসের প্রেরণা দান করা ফাঁকিবাজী মাত্র। মিঃ গান্ধী যদি পুনরায় আইন-অমান্য সূচনা করিবার নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ না করেন, তবে তিনি আমাদের সর্ব্বথা ধন্যবাদার্হ হইবেন, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের সমগ্র অধিবাসীকে সম্পূর্ণরূপে নিয়মানুগত করা সম্ভব নহে, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তিনি যদি দেশবাসীর সমক্ষে আইন-অমান্য আন্দোলনের আশা প্রদান করেন, তবে তাঁহাকে প্রতারক এবং অসাধু বলিবার নিশ্চয়ই কারণ বর্ত্তমান।

এতদুপরি, বিভিন্ন সংঘ এবং আলোচনা-সংশ্লিষ্ট তাঁহার সহকর্ম্মিগণের ভরণ-পোষণার্থ মিঃ গান্ধীকে বাৎসরিক কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হয়, তাহা সন্ধানার্থ চেষ্টিত হইলে তাঁহার আচরণে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ ভাবের সংবাদ সংগ্রহে আমাদের উৎসাহ নাই, কিন্তু অনুমান করিবার কারণ বর্ত্তমান যে, এই সকল উদ্দেশ্যে তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। তাঁহার যখন জীবিকার্জ্জনের কোন প্রকাশ্য পন্থা দেখা যায় না,—অবশ্য দেশবাসীর নিকট হইতে টাকার তোড়া লাভের কথা বাদ দিলে—তখন তাঁহার পক্ষে এত প্রচুর অর্থ সংগ্রহ কি করিয়া সম্ভব তাহা আমরা জানি না। তিনি যেরূপ উপহার গ্রহণ করেন, হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী তাহাও অসাধুতা এবং পাপাচরণ। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশন মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দের কার্য্যক্রমে প্রহসনমাত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং ইহাতে কেবল বাগ্-বৈদগ্ধ্যের অভিনয়ই দেখা গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতার কোন চিহ্নও ইহাতে দেখা যায় নাই—এবং মিঃ গান্ধী কর্ত্তৃক বিশ্বাস-ঘাতকতার ইহা জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ উপস্থিত করিয়াছে। আমাদের মতে, ভারতে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পথে মিঃ গান্ধী কোনরূপ সাহায্য করিতে পারেন, ইহা প্রত্যাশা করা নিরর্থক। উপরন্তু, তাঁহার কার্য্য-কলাপে দাসত্ব-শৃঙ্খল অধিকতর দৃঢ় হইতে বাধ্য।

জন-সাধারণকে আমরা নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা এই বিশ্বাসঘাতকের কবল হইতে যত শীঘ্র পারেন অব্যাহতি লাভ করুন, নচেৎ তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশা সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইবে।*

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ২৩শে মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী-সন্দর্ভ হইতে।



ফকির [শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

রবির পিছনে একটী ছায়া

[ষাট বৎসর পূর্ব্বের একটী তর্কযুদ্ধ]

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পাদনায় "নবজীবন" নামে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। * ইহার প্রথম সংখ্যা হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' নামে প্রবন্ধ লেখেন। গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর চলে ইহা রচিত হয়। ইহাই পরে 'অনুশীলন' বা 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পুস্তকাকার ধারণ করে। উক্ত 'প্রচার' পত্রখানির সূচনায় অক্ষয়চন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' ও 'তত্ত্ববোধিনী' উভয় পত্রেরই প্রশংসা করেন, তবে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন,—"আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তত্ত্ববোধিনীর অপেক্ষা বঙ্গদর্শনের প্রশংসাটা একটু বেশী ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলেই ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান স্তম্ভ। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদনা করিতেন আর রাজনারায়ণ বসু ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক এবং কৈলাশচন্দ্র সিংহ সহকারী সম্পাদক।

ইহার পর 'সঞ্জীবনী'তে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানির উদ্দেশ্য নবজীবন সম্পাদককে এবং নবজীবনের সূচনাকে গালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু অনেকেই জানেন যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান লেখক ঐ পত্রের প্রণেতা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন "তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং শুনিয়াছি তিনি নিজে ঐ পত্রখানির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, অতএব নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি কেহ ঐ সকল কথা অস্বীকার করেন, তবে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।"

নবজীবন-সম্পাদক সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত এই পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু 'নবজীবনের' আর একজন লেখক চুপ করিয়া থাকা উচিত বিবেচনা করিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়-সুহৃদ স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন; এবং গালাগালির রকম দেখিয়া "ইতর" শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।

ইহার উত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামী পত্র বাহির হইল। নাম ছিল না বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল "র"। কাজেই লোকে বলিল পত্রখানি রবীন্দ্রবাবুর লেখা। লেখক ইতর শব্দটা চন্দ্রবাবুকে পাল্টাইয়া বলিলেন।

ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আর একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন। বঙ্গদর্শন* 'মরেমিরে' অবস্থায় চলিতেছিল। ১২৯০ সালের মাঘে ইহার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইবার পরেই সান্‌কীভাঙ্গা লেন হইতে (২ নম্বর ভবানীচরণ দত্তের লেন) বঙ্কিমচন্দ্র "প্রচার" মাসিকপত্র বাহির করেন। সূচনায় (১২৯১, শ্রাবণ পৃ ১—৬) তিনি প্রকাশ করেন:

"আমাদের এই মাসিক পত্রখানি অতি ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র পত্রের একটা বিস্তারিত মুখপত্র লেখা কতকটা অসঙ্গত বোধ হয়। বড় বড় এবং ভাল ভাল এত মাসিকপত্র থাকিতে আবার একখানি অমন ক্ষুদ্র পত্র কেন? সেই কথা লিখিবার জন্যই এই সূচনাটুকু লিখিলাম।

---

* গত ফাল্গুন মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে (১৩৪৩) "ধর্ম্মধামে বঙ্কিম ও গিরিশ" প্রসঙ্গ বাহির হইবার পরে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—

"আপনি বঙ্কিমবাবুর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া যে বলিয়াছেন, রবির পিছনে একটী ছায়া আছে—এইটী ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন।"

এই প্রসঙ্গে তদানীন্তন সংবাদপত্র এবং দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-মহারথীদের তর্কযুদ্ধের একটী আমূল ইতিহাস বিবৃত করিবার আবশ্যক হইয়া পড়ে। অধিকাংশ কথা আমরা এখন বঙ্কিমবাবু ও রবীন্দ্রনাথের উক্তি হইতেই বলিব।—লেখক।

* 'বঙ্গদর্শনে'র বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত ইতিহাস পাঠক মৎপ্রণীত 'বঙ্কিমের বিবৃত জীবনী"তে পাইবেন।—লেখক।

"একথা কতকটা আমরা বিজ্ঞাপনেই বলিয়াছি। পৃথিবীতে হিমালয়ও আছে বল্মীকও আছে। সমুদ্রে জাহাজও আছে ডিঙ্গীও আছে। তবে ডিঙ্গীর ই গুণ, জাহাজ সব স্থানে চলে না, ডিঙ্গী সব স্থানে চলে। যেখানে জাহাজ চলে না, আমরা সেই স্থানে ডিঙ্গী চালাইব। চড়ায় ঠেকিয়া বঙ্গদর্শন-জাহাজ বানচাল হইয়া গেল—প্রচার ডিঙ্গী, এ হাঁটুজলেও নির্ব্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে ভরসা আছে।

"আমাদের বিবেচনায় সভ্যতাবৃদ্ধির এবং জ্ঞানবিস্তারের সাময়িক সাহিত্য একটি প্রধান উপায়………এমন কি সাময়িকপত্র যদি যথাবিধি সম্পাদিত হয় তাহা হইলে সাময়িক পত্রের সাধারণ পাঠকের অন্য কোন গ্রন্থ পড়িবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না।………

"সত্য, ধর্ম্ম এবং প্রচারের জন্যই আমরা এই সুলভপত্র প্রচার করিলাম এবং এই জন্যই ইহার নাম দিলাম 'প্রচার'।

"ভরসা করি 'প্রচারে' যাহা প্রকাশিত হইবে তাহা পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত সকলেরই আলোচনীয় হইবে। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, যাহা অকৃতবিদ্যব্যক্তি পড়িবে বা বুঝিবে বা শুনিবে, তাহা পণ্ডিতের পড়িবার বা শুনিবার যোগ্য নয়। আমাদের এ বিষয়ে অনেক সংশয় আছে। আমরা দেখিয়াছি, মহাভারতের ব্যাখ্যা পণ্ডিতে ও মূর্খে তুল্য মনোভিনিবেশপূর্ব্বক শুনিয়াছেন। ভিতরে সর্ব্বত্রই মনুষ্যপ্রকৃতি এক। আমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিলে অজ্ঞানীকে যতটা ঘৃণা করি, বোধহয় ততটার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। অজ্ঞ এবং জ্ঞানী উভয়ে কান পাতিয়া শুনিতে পারেন, আজকার দিনে এ বাঙ্গলাদেশে এমন অনেক বলিবার কথা আছে।

"এ শিক্ষা শিখাইবে কে? এ পত্রের শিরোভাগে ত সম্পাদকের নাম নাই। থাকিবারও কোন প্রয়োজন দেখি না। সম্পাদক কে, পাঠকের জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই; কেন না পাঠককেরা প্রবন্ধ পড়িবেন, সম্পাদককে পড়িবেন না। সম্পাদকের এমন কোন দাবি দাওয়া নাই যে তিনি আত্মপরিচয় দিয়া পাঠকদিগের সম্মুখীন হইতে পারেন। তাঁহার কাজ যাঁহারা বিদ্বান্, ভাবুক, রসজ্ঞ, লোকহিতৈষী এবং সুলেখক তাঁহাদিগের লিখিত প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করা, একাজ তিনি পারিবেন এমন ভরসা আছে। আমরা মনুষ্যের নিকট সাহায্যের আশা পাইয়াছি। এক্ষণে যিনি মনুষ্যের জ্ঞানাতীত, যাঁহার নিকট মনুষ্যশ্রেষ্ঠও কীটাণুমাত্র, তাঁহার সাহায্যের প্রার্থনা করি। সকল সিদ্ধিই তাঁহার প্রসাদমাত্র এবং সর্ব্বঅসিদ্ধি তাঁহার কৃত নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।"

'প্রচার' বাহির হয় 'নবজীবনের' ১৫ দিন পরে (১২৯১, ১৫ শ্রা.ণ)। বঙ্কিম বলেন, "প্রচার আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম্ম,—যে হিন্দুধর্ম্ম আমিগ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। 'প্রচারে'ও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম্ম আদি ব্রাহ্মসমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হউক প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকদের দ্বারা চারিবার আক্রান্ত হই।" (১২৯১, অগ্রহায়ণ পৃ ১৭১)।

'প্রচারে' বঙ্কিম লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই শাখামাত্র। তবে ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা পরে সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত হইবে

বোধ হয় আক্রমণের ইহাও কারণ। বিশেষতঃ বঙ্কিম-প্রদর্শিত ধর্ম্মতত্ত্ব আদি-ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের মনঃপূত হয় নাই। ১৮০৬ শকাব্দের ভাদ্রের 'তত্ত্ববোধিনী'তে "নবা-হিন্দু সম্প্রদায়" প্রবন্ধে বঙ্কিম রচিত 'নবজীবনে' প্রকাশিত "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" সমালোচিত হয়। সমালোচনা করেন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়।

বঙ্কিমবাবু বলেন, "এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর এবং ভাবুক। তবে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা না শুনিয়া কেবল প্রথম সংখ্যার উপরে নির্ভর করিয়াই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তথাপি আমি দোষ দিতাম না, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথবাবু অকারণে আমার উপরে নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপ করিয়াছেন। তথাপি বলিব সমালোচনা আক্রমণ নহে। আর তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র।"

তত্ত্ববোধিনীর এই সংখ্যায়ই আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "নূতন ধর্ম্মমত"

শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'নাস্তিক' 'কপট' 'কোমত মতাবলম্বী' প্রভৃতি ভাষায় বিস্তর গালাগালি দেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন (প্রচার ১২৯২, অগ্রহায়ণ পৃ ১৭২) "এই লেখক যিনিই হন বড় উদার প্রকৃতি। তিনি উদারতাপ্রযুক্ত ইংরাজেরা যাহাকে 'ঝুলির ভিতর হইতে বিড়াল বাহির করা বলে' (cat is out of the bag) তাহাই করিয়া বসিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধর্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ লেখক তাঁহার প্রস্তাবের শেষে বলিয়াছেন, "যে ধর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞানে অধিক, সত্য উপাসনা যে ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, যে ধর্ম্মের নীতি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্ম্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"হিন্দুধর্ম্মের সার ব্রাহ্মধর্ম্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রথমখণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল শ্লোক আছে সকলই সত্য। ব্রহ্মোপসনা যেমন চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, এমন অন্য কোন ধর্ম্মের উপাসনা নহে। ঐ ধর্ম্মের নীতি যেমন ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, এমন অন্য কোন ধর্ম্মের নীতি নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিতলোকমাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে জাতীয় ভাব ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে সুসঙ্গত। উহাতে সমস্ত বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। ইহার পর আবার নূতন হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারের উদ্যম, 'নবজীবন' ও 'প্রচারের' ধৃষ্টতার পরিচয় বটে।"

['তত্ত্ববোধিনী', ভাদ্র ১৮০৬ শক পৃঃ ৯১]

দেখা যাইতেছে এ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্য তিনদিক্ হইতেই চলিতেছিল। অন্যদিকে আবার শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছিলেন, স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ও আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান। বঙ্কিমচন্দ্রও জাতীয়তার দিক্ হইতে মধ্যপথ অবলম্বনে হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব সপ্রমাণ করিতে যত্নবান হইয়া লেখনী ধারণ করেন। নাট্যকার গিরিশ ঘোষের "চৈতন্যলীলা"ও এসময়ে বাঙ্গলায় ভক্তির উৎস প্রবাহিত করে, আর এই সময়েই রামকৃষ্ণ পরমহংস সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া প্রচার করেন "যত মত তত পথ"। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বঙ্কিমের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকগণের অনৈক্য থাকিতে পারে, আর কাহার মত শ্রেষ্ঠ, এক্ষেত্রে তাহারও আলোচনা সময়োপযোগী নাও হইতে পারে; কিন্তু একথা ঠিক যে বঙ্কিমের ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা তখনকার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের দিনে হিন্দুধর্ম্মের দিক দিয়া উহার পক্ষে খুবই সহায়তা করিয়াছিল।

এইতো গেল ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের কথা। অন্যান্য প্রবন্ধেও বঙ্কিমকে অল্প আক্রমণ সহ্য করিতে হয় নাই। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিম "বাঙ্গালার কলঙ্ক" বলিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি পুরা মাত্রায় প্রকটিত হয়। বঙ্কিম বলেন,—

"যেরূপে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলম বন্দ করেন নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীচরিত্র সমালোচনা করিলে কথাটা কতকটা সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রী-স্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।

"এ নিন্দার কোনও মূল ইতিহাসে পাই না। সত্য বটে বাঙ্গালী মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন জাতি পরজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই? ইংরেজ *নর্ম্মানের অধীন হইয়াছিল, জার্ম্মানী প্রথম নেপোলিয়নের অধীন হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখি, ষোড়শ শতাব্দীর* স্পেনীয়দিগের মত তেজস্বী জাতি রোমকদিগের পর আর কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা, আটশত বৎসর মুসলমানদিগের অধীন ছিল, তখন বাঙ্গালী পাঁচশত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া সে জাতিকে চিরকাল অসার বলা যাইতে পারে না। ইংরাজ ইতিহাস-লেখক উপহাস করিয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গদর্শনে পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, সে কথার মূল্য নাই; বালক মনোরঞ্জনের

যোগ্য উপাদান মাত্র। সুতরাং আমরা আর সে কথার কিছু প্রতিবাদ করিলাম না।

"বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতার এবং চিরভীরুতার আমরা কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই, কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী তেজস্বী বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। অধিক নয় আমরা একশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী মুসলমানের, বাঙ্গালী লাঠি শড়কী ওয়ালার যে সকল বলবীর্য্যের কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি তাহা শুনিয়া মনে সন্দেহ হয় যে সে কি এই বাঙ্গালীজাতি? কিন্তু সে সকল কাহিনী অনৈতিহাসিক, তাহা আমরা ছাড়িয়া দিই। আমরা দুই একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি।"

এই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রমাণিত সত্যের উপর বিশ্বাস করিয়া সেন ও পালবংশীয় রাজাগণের সময়ের কথা বলেন এবং পরিশেষে সিদ্ধান্ত করেন—

"বাঙ্গালা জয় যে সহজে হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিতে আমরা প্রস্তুত আছি—"

ইহার উত্তরে স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে বিস্তর গালাগালি দিয়া প্রকৃত কথার কোন ধার না ধারিয়া ভাদ্র মাসের (১২৯১) 'নব্য-ভারতে' একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (২১৯—২২৭ পৃঃ) এবং অন্যান্য উক্তির মধ্যে সিংহ মহাশয় লেখেন,—

"'বঙ্গদর্শন' অনন্তধামে গমন করিয়াছে। 'নব-জীবন' ও 'প্রচার' তাহার স্থান অধিকারের জন্য অগ্রসর হইয়াছে। নবজীবন সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। কিন্তু ক্ষুদ্রকায় 'প্রচার' নীরবে আপন প্রাধান্য সংস্থানের জন্য প্রয়াস পাইয়াছে। প্রথম সংখ্যা প্রচারে 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের "ভারত কলঙ্ক" এই প্রবন্ধের আদর্শস্থল, ইহা তাহারই পরিশিষ্ট।

"আমরা বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের নিকট 'দাতাকর্ণ' 'গুরুদক্ষিণা' প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলাম। সে সকল সেই সময়ে নিতান্ত উপাদেয় বোধ হইত, কিন্তু এক্ষণে আমরা আর তাহার পক্ষপাতী নহি। এক সময়ে আমরা বঙ্গদর্শনের ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পক্ষপাতী ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, তাহার অধিকাংশই অনুবাদ, অনুকরণ ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। "বাঙ্গালার কলঙ্ক" প্রবন্ধটী কেবল বালকের নিকট কেন, ঐতিহাসিক তত্ত্বানভিজ্ঞ অনেকের নিকটেই ভাল লাগিবে। কিন্তু আমরা তাহার কতকগুলি কথার প্রতিবাদ না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না।"

সিংহ মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিবাদ করিতে প্রয়াস পান। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাল বংশীয় ও সেন বংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন আমাদের মতে তাহা অখণ্ডনীয়।...গথ কর্ত্তৃক রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেত ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক্ সাম্রাজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত ঐতিহাসিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সেন পাল সম্বাদ আমরা তেমনি নিশ্চিত মনে করি।"

উত্তরে সিংহ মহাশয় বলেন, "আমরা 'বান্ধব' ও 'ভারতী' পত্রিকায় যে সকল ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছি, দুই চারি জন প্রধান পণ্ডিত তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন; রাজেন্দ্র-লাল মিত্রের উক্তি ভ্রমসঙ্কুল এবং বঙ্কিমবাবু অন্যায় ভাবে তাঁহার পদানুসরণ করিয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "ঐতিহাসিকদিগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। তার পর সেনবংশীয়েরা রাজা হন। ঠিক তাহা নহে। এককালে এক সময়েই পাল এবং সেন বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। তারপর সেন বংশীয়েরা পাল বংশীয়দিগের রাজ্যে আসিয়া তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, উভয় রাজ্যের একেশ্বর হইলেন।"

রাজেন্দ্রলাল তাঁহার "পাল ও সেনরাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে যে বংশাবলী প্রচার করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু অতঃপর সিংহ মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের "নেত্রে অঙ্গুলী প্রদানপূর্ব্বক" মিত্র মহাশয়ের মত খণ্ডন করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয় সফলকাম হইতে পারেন নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে আমরা ১২৯১ সালের ভাদ্রের 'নব্যভারতে' সিংহ মহাশয়ের প্রবন্ধটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু যুক্তি দ্বারা মত খণ্ডন করা অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রকে গালি দেওয়াই বোধ হয় সিংহ মহাশয়ের

অধিকতর উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি লজ্জার মাথা খাইয়া মুখ্যতঃ বঙ্কিমচন্দ্রকেই উল্লেখ করিয়া অসংযত ভাষায় লিখিলেন,—

"হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। আবিষ্কৃত শাসনপত্রগুলির মূল শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা কর, কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না। উইলসন, বেবার, মেক্‌সমূলার, কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিংবা মিত্রের ভাউদাজি, মেইন, মিত্র, হন্টার প্রভৃতির কুসুমকাননে প্রবেশ করিয়া তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিও না। স্বাধীনভাবে গবেষণা কর। না পার, 'গুরুগিরি' করিও না।"

পাঠক এই 'গুরুগিরি' কথাটীর উপরে একটু লক্ষ্য করিবেন। 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে "গুরুগিরি"র কিছুই নাই, তাই, বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হইয়া বলেন,—

"কৈলাশ বাবু জোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দিগের ভৃত্য, নায়েব কি কি ঠিক জানি না, যদি আমার ভুল হইয়া থাকে ভরসা করি ইনি আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। অন্যান্যবার "অসৌজন্য বা অসভ্যতা" দেখি নাই। কিন্তু এবারকার এই প্রবন্ধে ভাষাটা বড় নায়েবি রকম হইয়া উঠিয়াছে।···আমার উদ্দেশ্য নয় যে প্রভুদিগের আদেশানুসারে ভৃত্যের ভাষার এই বিকৃতি। ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক বলিয়াই বলিলাম।"

[অগ্রহায়ণ ১২৯১ 'প্রচার']

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ একটী বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেন এবং অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতী'তে (১২৯১) উহাই "একটা পুরাতন কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে বাহির হয়। ফাল্গুনের 'বঙ্গশ্রী'তে আমরা এই প্রবন্ধ সম্বন্ধেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য কথার মধ্যে আরও বলেন "যেখানে সকলেই বিজ্ঞ সেখানে উপায় কি? তাহা ছাড়া বিজ্ঞতার সময় অসময় আছে। বারোমেসে বিজ্ঞতা কেবল বাঙ্গলা দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় আর কোথাও দেখা যায় না।"

তিনি একস্থানে বলেন, "লোকহিতের জন্য যদি মিথ্যা প্রয়োজনীয় হয়—লোকহিত তুমিই বা কি জান আমিই বা কি জানি, ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত 'প্রচারে'র (অগ্রহায়ণ ১২৯১) প্রবন্ধের উত্তর দিয়া বলেন—

"চতুর্থ আক্রমণ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের দ্বারা হইয়াছে। গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি, বড় বাড়াবাড়ি আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি গালিগালাজে প্রভুর অপেক্ষা ভৃত্য মজবুত, এখানে প্রভুই মজবুত। তবে প্রভু ভৃত্যের মত মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই; প্রার্থনামন্দির হইতে আনিয়াছেন। উদাহরণ—'অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারে না।' আরও বাড়াবাড়ি আছে। মেছোহাটার ভাষা এতদূর পৌঁছে না। পাঠক মনে করিবেন রবিবাবু তরুণবয়স্ক বলিয়াই এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তাহা নহে। সুর কেমন পরদা পরদা উঠিতেছে তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। সমাজের সহকারী সম্পাদকের কড়ি মধ্যমের পর, সম্পাদক স্বয়ং পঞ্চমে না উঠিলে লাগাইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না।

রবীন্দ্র বাবু বলেন যে আমার এই মত যে, সত্য ত্যাগ করিবার প্রয়োজন মতে মিথ্যা কথা বলিবে। বরং আরও বেশী বলেন। ইত্যাদি কথা ফাল্গুন মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে।

রবীন্দ্র বাবুর 'ভারতী'র প্রবন্ধ ও প্রচারে বঙ্কিমের সারটুকু আমরা ফাল্গুনের 'বঙ্গশ্রী'তে প্রদান করিয়াছি। ইহার পরেই রবীন্দ্রনাথ পৌষের ভারতীতে 'কৈফিয়ৎ' নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবুর প্রত্যুত্তর দেন।

কৈফিয়ৎ আদ্যন্ত পড়িয়া তরুণ রবীন্দ্রের যুক্তির এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়ার সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রবন্ধটী খুব ধারালো হইলেও ভাষায় বিনয়ের কোন অভাব নাই। কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও প্রবন্ধটী বেশ জোরাল। তাই প্রবন্ধ পাঠে মনে হয় উভয়ের মধ্যে বাহ্যিক সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইলেও তখনও ভাবের কোনও মিলন হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"সত্য বলিতে মানুষে লিখিত সত্যই বুঝায়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝায় না। বঙ্কিম বাবুর প্রথম প্রবন্ধটা ভাল করিয়া বুঝা যায় নাই।"—ইত্যাদি

দ্বিতীয়,—"বঙ্কিম বাবুর মতে কথঞ্চিৎ আচারবিরুদ্ধ কাজ করিলেই যে সমস্ত একেবারে দুষ্ট হইয়া গেল তাহা নহে। ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিলেই বাস্তবিক দোষের কথা হয়। এই দুইটা চিত্রই যে তিনি সমান অপক্ষপাতিতার সঙ্গে আঁকিয়াছেন তাহা নহে। ইহার উপর যে চিত্রের উপর তাঁহার প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে সেইটাকেই সম্পূর্ণ না হউক অপেক্ষাকৃত আদর্শস্থল বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে। যখন বলা যায় বঙ্কিম বাবু একটা হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন তখন যে মহত্তম আদর্শই বুঝায় তাহাও নহে। দোষে গুণে জাতীয় একটি আদর্শও হইতে পারে। যে কোনও একটা চরিত্র খাড়া করিলেই তাহাকে আদর্শ বলা যায়।"

তখনকার রবীন্দ্রনাথের এ কথার অর্থ দুর্ব্বোধ্য; কারণ মনীষীরা বলেন যে আদর্শ চরিত্র আদর্শচরিত্রই, তাহার মধ্যে 'কিন্তু' নাই। রবীন্দ্রনাথ আরও লেখেন,—

"লোকহিত শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বঙ্কিম যে বলিয়াছেন আমি বুঝি নাই, বস্তুতঃ সেই ভুল আমার তখনও রহিয়া গেছে। সলজ্জে স্বীকার করিতেছি এখনও আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারি নাই। অন্য যাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাঁহারাও আমার অজ্ঞানতা দূর করিতে পারেন নাই।"

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "বঙ্কিম বাবু যে বলেন ভারতীতে মল্লিখিত প্রবন্ধে গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি বড় বাড়াবাড়ি আছে, ইহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। লেখার প্রসঙ্গে আমি যাহা বলিবার বলিয়াছি, কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে কোথাও গালি দিই নাই। তিনি আমার গুরুজন তুল্য, আমি তাঁহাকে ভক্তি করি। তাঁহার প্রথম সন্তান 'দুর্গেশনন্দিনী' বোধ হয় আমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু গালিগালাজ হইতে অনেক দূরে আছি। মেছোহাটার ত কথাই নাই, আঁষটে গন্ধটুকু পর্য্যন্ত নাই। যেস্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা গালি নহে আক্ষেপ উক্তি। মেছোহাটাই বল আর প্রার্থনামন্দিরই বল, আমি কোথা হইতে ফরমাস দিয়া কথা আমদানী করি নাই। আমি বাণিজ্য ব্যবসায়ের ধার ধারি না, হৃদয় হইতে উৎসারিত না হইলে সে কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইত না। যিনি বিশ্বাস করেন করুন না করেন নাই করুন।"

অতঃপরে শ্রাবণে প্রকাশিত কথার উত্তর অগ্রহায়ণে কেন দিয়াছেন সেই কৈফিয়ত খুবই গ্রহণযোগ্য। শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ মাস মধ্যে উভয়ের মধ্যে অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ প্রসঙ্গে "কথা হয় নাই" বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, "দুর্ব্বলতাবশতঃ আমার চক্ষুলজ্জা হইতে পারে, বঙ্কিমবাবু পাছে বিরোধী মত সহিতে না পারিয়া আমাকে ভুল বুঝেন এমন আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে"—ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাটা শুনি নাই, মুদ্রিত প্রবন্ধটা দেখিয়াছি। আমিই তাঁহার লক্ষ্য।"

"ইহা আমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে, রবীন্দ্রনাথ যখন ক, খ, শিখেন নাই তাহার পূর্ব্ব হইতে এরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে, আমার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখনও উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে, না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে (এমন কেহ থাকিলে থাকিতে পারে) তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে। কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্র বাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশী প্রয়োজন নাই, রবীন্দ্র বাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব এবং আমার প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক, যদি তিনি দুই একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্ত্তব্য। তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম তাহার কারণ এই 'রবির পিছনে একটা বড় ছায়া' দেখিতেছি। রবীন্দ্রবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, উহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।"

পূর্ব্বোক্ত উত্তর প্রত্যুত্তরে আদি ব্রাহ্মসমাজের লোকদের প্রতি পাছে কিছু কটাক্ষ আসিয়া পড়ে, তাই বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে ত্রুটী স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন,—

"আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকদিগের কাছে আমার একটী নিবেদন আছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা এদেশে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব এমন আশা রাখি, কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদে সে

শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না। বিশেষ আমার বিশ্বাস আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কার্য্যে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। আমি ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা এমন কিছু কাজ হয় নাই বা হইতে পারে না, যাহা আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকেরা গণনার মধ্যে আনেন। কিন্তু কাহারও আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় না। ফল যতই অল্প হউক, বিবাদ বিসম্বাদে কমিবে বই বাড়িবে না। পরস্পরের আনুকূল্যে ক্ষুদ্রের দ্বারা বড় কাজ হইতে পারে। তাই বলিতেছি বিবাদ বিসম্বাদে স্বনামে বা বিনামে স্বতঃ বা পরতঃ প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে তাঁহারা মন না দেন। আমি এ পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম আর কখনও এরূপ প্রতিবাদ করিব এরূপ ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় অবশ্য করিবেন।" *

এ পর্য্যন্ত বলিয়াই বঙ্কিম ক্ষান্ত হন। আমরা দেখিয়াছি তিনি বলিয়াছেন,—

"রবীন্দ্রবাবুর কাছে অনেক ভরসা করি এই জন্যই বলিলাম, রবীন্দ্র বাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব এবং আমার প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। তিনি এত অল্পবয়সেও বাঙ্গালার উজ্জ্বলরত্ন, আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।"

এই কথায় মনে হয় রবীন্দ্রনাথের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধাভাব ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনীয়তাবশতঃ তিনি উত্তর দিতে বাধ্য হন। বঙ্কিমের কথায় কোনরূপ অসৌজন্য, রূঢ়তা বা দম্ভ প্রকটিত হয় না, বরং তিনি রবীন্দ্রনাথকে সুশিক্ষিত, সুলেখক, এবং মহৎস্বভাব প্রভৃতিই বলিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়তে বিনয়ের ভিতরেও বেশ উষ্ণতা পরিলক্ষিত হয়, আর মনে হয় যেন তিনি বঙ্কিমের ক্ষোভমিশ্রিত কথাগুলি তাঁহাকেই পুনরায় প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—

"আমার নিজের সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এখন আর দুই একটি কথা আছে। বঙ্কিমবাবুর লেখার ভাব এই যে তিনি রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তিবিশেষের লেখার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না যদি না উক্ত রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত লিপ্ত থাকিতেন। বাস্তবিকই আমি বঙ্কিম বাবুর মুখামুখী উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্দ্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই। বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল, তাই আমার কর্ত্তব্য বিধায় আমার কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না, ভরসাও হয় না। যাহা হউক আলোচ্য বিষয়ের গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম বাবু উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই, তিনি আমার প্রবন্ধকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজকে দুই এক কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথা এই যে আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকেরা উত্তরোত্তর মাত্রা চড়াইয়া বঙ্কিম বাবুকে আক্রমণ ও গালিগালাজ করিয়াছেন। আক্রমণ মাত্রই যে অন্যায় এরূপ আমার বিশ্বাস নহে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের কতকগুলি মত আছে। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই সকল মত প্রচার হইলে দেশের মঙ্গল হইবে। ... তার পর গালিগালাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে হয় নাই। তত্ত্ববোধিনীতে বঙ্কিম বাবুর মতের বিরুদ্ধে যে দুইটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে গালিগালাজের কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষতঃ "নব্যহিন্দু সম্প্রদায়" নামক প্রবন্ধে বিশেষ বিনয় ও সম্মানের সহিত বঙ্কিম বাবুর উল্লেখ করা হইয়াছে। কৈলাশ বাবুর প্রবন্ধের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দের কোন যোগই থাকিতে পারে না।...আমি যদি বলি বঙ্কিম বাবু নবজীবনে অথবা প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ লেখেন তাঁহার এজলাসের সহিত অথবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সম্প্রদায়ের সহিত সবিশেষ যোগ আছে তবে সে কেমন শুনায়? আমার লেখাতেও কোন গালিগালাজ নাই। দ্বিতীয়তঃ আমি যে লিখিয়াছি বিশেষরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজের হইয়া লিখি নাই।

বঙ্কিম বাবু তাঁহার প্রবন্ধে যেখানেই অবসর পাইয়াছেন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুকঠোর, সংক্ষিপ্ত ও তির্য্যক্ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষপাতে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী যতটা ভীত বা আহত হইব, আদি ব্রাহ্মসমাজের ততটা

* ১২৯১ প্রচার, অগ্রহায়ণ।

হইবার সম্ভাবনা নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের নিকট বঙ্কিমবাবু নিতান্তই তরুণ। বোধ করি বঙ্কিমবাবু যখন জীবন আরম্ভ করেন নাই তখন হইতে আদি ব্রাহ্ম সমাজের নানাদিক হইতে নানা আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছেন কিন্তু কখনও তাঁহার ধৈর্য্য বিচলিত হয় নাই। বঙ্কিমবাবু আজ যে বঙ্গভাষায় ও বঙ্গসাহিত্যের গৌরবের স্থল, আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই বঙ্গভাষাকে পালন করিয়াছেন, সেই বঙ্গসাহিত্যকে জন্ম দিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ বিদেশী-দ্বেষী তরুণ বঙ্গসমাজে য়ুরোপ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্যালোকে অন্ধ স্বদেশদ্বেষী মধ্যে প্রাচীন হিন্দুদিগের ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু-সমাজ-প্রচলিত কুসংস্কার বিসর্জ্জন দিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু হৃদয় বিসর্জ্জন দেন নাই; একন্তু চারিদিক হইতে ঝঞ্ঝা আসিয়া তাঁহার শিখরদেশ আক্রমণ করিয়াছে কিন্তু কখনও তাঁহার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয় নাই ...... আজি সেই আদি ব্রাহ্মসমাজের অযোগ্য সম্পাদক আমি কাহারও কটাক্ষপাত হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইব ইহা দেখিতে হাস্যজনক।

"বঙ্কিম বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতাবশতঃ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার উদারতা গুণে সে সমস্ত মার্জ্জনা করিয়া এখনো আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে করিবেন। আমার সবিশেষ নিবেদন এই যে আমি সরলভাবে যে সকল কথা বলিয়াছি আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্যভাব গ্রহণ না করেন।" *

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র অনেক কিছু লিখিয়া উত্তর দিতে পারিলেও পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি নীরব থাকেন এবং কিছু দিন পরে রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লেখেন যে, উভয়েরই মধ্যে প্রীতিবন্ধন যেন এই সব সাময়িক বাদপ্রতিবাদে সামান্যরূপেও ক্ষুন্ন না হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পত্রখানির অস্তিত্ব আর এখন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "জীবন-স্মৃতি"তে এই তর্কযুদ্ধের ইতিহাস বিবৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"বঙ্কিম বাবু তাঁহার প্রচার পত্রে যে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপরে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই। আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম। আমার তখন এই আন্দোলন কালের লেখাগুলিতে তাহার কতক পরিচয় আছে। তাহার কতকটা ব্যঙ্গকাব্যে, কতকটা কৌতুকনাট্যে, কতকটা তখনকার সঞ্জীবনী কাগজে পত্রাকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।

"সেই লড়াইয়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার 'ভারতী' ও 'প্রচার'এ তাহার ইতিহাস রহিয়াছে। তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিম বাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে। যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিম বাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত সেই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই এ বিষয়ে কি বাস্তবিকই উভয়ের পুনর্মিলন হইয়াছিল? পুনর্মিলন আর বেশী কি হইবে; বঙ্কিম তো রবীন্দ্রনাথের উপর বীতশ্রদ্ধ হন নাই। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ভাবী সাহিত্যনেতা মনে করিয়া তাঁহার গলে বরাবরই জয়মাল্য পরাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমের উৎসাহ ও সমাদর-বাক্য সাহিত্যপথ-যাত্রায় মহামূল্য পাথেয় স্বরূপই মনে করিতেন, অধিকন্তু বঙ্কিমের মহাপ্রস্থানের পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করিয়া শোকসভায় যে বক্তৃতা দেন তাহা সত্যই শ্রদ্ধা-ভক্তি পরিপূর্ণ। তিনি এখানে বঙ্গদর্শনের প্রবর্ত্তককে "সব্যসাচী"র সঙ্গে তুলনা করিয়া তিনি নিজের উদারতার পরিচয় দিয়াছেন।

১২৯১ (১৮৮৪) সালের ঐ বাদানুবাদের পরে দশ বৎসর অতীত হইবার পরে ঐ শোকসভায় তাঁহার বক্তৃতা পঠিত

* ভারতী পৌষ, ১২৯১ পৃঃ ৪০০-৪০৮

হয়। এই দীর্ঘ দশ বৎসরে রবীন্দ্রের লেখনীপ্রসূত ব্যঙ্গকাব্যে, কৌতুকনাট্যে, 'সঞ্জীবনী' কাগজে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আমরা ইতিহাসের খাতিরে তাহার একটু পরিচয় দিব।

দেখিতেছি, শোকসভায়ও রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের গুরুগিরির সম্বন্ধে একটু কটাক্ষ করিতে বিরত হন নাই, অবশ্য এই ইঙ্গিত খুবই সতর্ক এবং ইহার অর্থ অন্যভাবেও লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু 'ধান ভানিতে শিবের গীত গাওয়া'র প্রয়োজন কি ছিল? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—

"যে বল্গার ইঙ্গিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে সেই বল্গার আকর্ষণে তাহাকে সর্ব্বদা সংযত করিতে হইবে বঙ্কিমের এই ক্ষমতা-সামঞ্জস্য ছিল। সেই জন্য মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদ-পুরাণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন বঙ্গসাহিত্যের বড় আশার কারণ ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে আশা সফল হইতে দিল না।

......যুক্তিবিচারকে প্রাধান্য না দিয়া বঙ্কিম যদি নিজেই গুরু সাজিয়া দাঁড়াইতেন, অনুসন্ধান দ্বারা সত্যের দিকে পথ নির্দ্দেশ না করিয়া যদি তিনি নিজেকেই ধ্রুবতারা বলিয়া প্রচার করিতেন, দেশের লোকের মনের গতি বুঝিয়া তিনি যদি অন্ধবিশ্বাস এবং অলৌকিকবাদকে আপন পক্ষভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন তবে এই দেবানুগৃহীত বঙ্গদেশে অনায়াসেই তিনি একজন নূতন অবতার হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন, তবে তাঁহার উন্মত্ত শিষ্যগণ এমন নিবিড় ব্যূহ রচনা করিয়া আজ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত যে, আমরা সাহিত্য-ভক্তগণ আর সহজে আমাদের গুরুর সমীপবর্ত্তী হইতে পারিতাম না।" *

"বাঙ্গালীর কলঙ্ক"এর প্রতিবাদ করিতে বসিয়া কৈলাশবাবুও বঙ্কিমচন্দ্রকে "গুরুগিরি" করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথ তখন কৈলাশ বাবুর একটি কথারও প্রতিবাদ করেন নাই। এবারে আবার রবীন্দ্রনাথও গুরুশিষ্যের কথার অবতারণা করিলেন। উভয়ের উক্তিতে কোন সংস্রব না থাকাই সম্ভব, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে বঙ্কিম-মণ্ডলের অন্যতম গ্রহ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত যে রবীন্দ্রনাথের তর্কযুদ্ধ হয়, তাহাতেও 'গুরুগিরি'র কথা আসিয়া পড়ে কেন? চন্দ্রনাথ গুরুশিষ্যের কথার অবতারণা করেন নাই, বঙ্কিমচন্দ্রই 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা'য় করিয়াছিলেন। তবে বঙ্কিমের দোষ ছিল যে, চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার সংযত যুক্তিতে বঙ্কিমকে দুই একটি বিষয়ে সাক্ষী মানিয়াছিলেন। সমগ্র কাহিনীটী এখানে বিবৃত করিতেছি।

চন্দ্রনাথবাবু 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'আহার' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লেখেন (সাহিত্য, ১২৯৭)। ইহার উত্তরে 'সাধনা'য় (১২৯৮ সালের পৌষে) রবীন্দ্রনাথ লেখেন,—

"গুরুর ভঙ্গিতে কথা বলা একটা নূতন উপদ্রব বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি দেখা দিতেছে। এরূপভাবে সত্য কথা বলিলেও সত্যের অপমান করা হয় কারণ সত্য কোন লেখকের নামে বিকাইতে চাহে না। আপনার যুক্তি দ্বারা সে আপনাকে প্রমাণ করে, লেখক উপলক্ষ মাত্র।

"একেবারে অভ্রান্ত অভ্রভেদী গুরুগৌরব ধারণ করিয়া বিশ্ব-সাধারণের মস্তকের উপর নিজের মতকে বেদবাক্য স্বরূপ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করা কখনও হাস্যকর, কখনও উৎপাতজনক।"

পাঠক লক্ষ্য করিবেন 'গুরুর ভঙ্গীতে,' 'গুরুর গৌরবধারণ' ইত্যাদি কথার প্রতি। যাহা হউক, অতঃপর ১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠে চন্দ্রনাথ বসু 'লয়তত্ত্ব' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথও ইহার প্রতিবাদ করেন। চন্দ্রনাথ বসু শ্রাবণের সাহিত্যে "আমার স্বরচিত লয়তত্ত্ব" সম্বন্ধে আবার একটি দার্শনিক প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ভাদ্রের 'সাহিত্যে' ইহার প্রতিবাদ করেন। উভয়ের প্রবন্ধই বিজ্ঞতাপ্রসূত। ঠিক এই সময়ে ১২৯৯ শ্রাবণের 'সাধনা'য় (১৯৩ পৃঃ) 'হিং টিং ছট্' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন,—

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে
কাছা কোঁচা শতবার খসে' খসে' পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে ক্ষীণ খর্ব্ব দেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়,
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।

* পৃঃ ৫০৭ সাধনা, বৈশাখ ১৩০১

না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।
সপর্ব্বে জিজ্ঞাসা করে "কি লয়ে বিচার
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই চার
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট্ পালট্।"
সমস্বরে কহে সবে হিং টিং ছট্।

অনেকেই অনুমান করেন ইহা চন্দ্রনাথবাবুর উদ্দেশ্যেই রচিত। 'সাহিত্য'পত্রে এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যেই সমালোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিয়া বলেন, উহা চন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত নহে। চন্দ্রবাবুকে বন্ধুভাবে পাওয়া তাঁহার পক্ষে গৌরব। *

রবীন্দ্রনাথকে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। তবে 'গুরুমারা চেলা', 'কি লয়ে বিচার', 'ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট্ পালট্' প্রভৃতি কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যদি এই কৌতুকের নায়ক চন্দ্রনাথ বসু না হয়েন—তবে কে? আর এই কবিতাটাই কি রবীন্দ্র উল্লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে ব্যঙ্গকাব্য? বস্তুতঃ গুরুগিরি, গুরু-গৌরব, গুরুশিষ্য, গুরুর ভক্তি প্রভৃতি কথার ছড়াছড়িতে বড়ই বিস্ময় আসিয়া উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ 'যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলায়' কৈলাশবাবুর উক্তির প্রতিধ্বনি আসিয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জীবনস্মৃতি"তে যেমন অনেকটা স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, জীবদ্দশায় এই সমস্ত কথার মীমাংসা করিয়া গেলে সাধারণের সংশয় দূর হইবে। শুনিতে পাই তিনি এখন পুরাতন রচনাগুলি উদ্ধার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সমস্ত কথা উদ্‌ঘাটিত হইলে সকলেরই সংশয় দূর হয়। রবীন্দ্রনাথ ও উক্ত নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন কি? বঙ্কিম-রবীন্দ্র মিলন যে ১৮৯৩ সালে জেনারেল এসেম্‌ব্লি ইনষ্টিটিউসনের সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সময়ে বা কিছু পূর্ব্বেই হইয়াছিল তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু তাহার ৮ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাবলী জানিবার বাসনা সকলেরই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বিষয়টা রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনিলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। আমাদের আশা কি পূর্ণ হইবে?

* সাধনা ১২৯৯—চৈত্র ৪৫৫।

বর্ষ-বিদায়

—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

রাঙা গোধূলির আলো জ্বলে
ঐ দূর দিগন্ত পানে,
কে যেন পূরবী সুর সঙ্গীতে
ডাকিছে বিদায় গানে!
চঞ্চল আজি তট, নদীজল,
নয়নের কোণ অশ্রুসজল,
হারাণ পথের চির-সঙ্গিনী
কাঁদিতেছে অভিমানে!

যেন তোমা সখি! চিনি আমি চিনি
চির-বিরহিণী রাধা,
স্বপনজড়িত পল্লী-বিতানে
পড়িয়াছে আজি বাধা!
এ বাহু ছাড়াতে উঠে প্রাণ কাঁদি,
অন্তর-লোকে রাখিয়াছি বাঁধি,
আলো আঁধারের মিলন কুঞ্জ—
ব্যথিত পূরবী তানে!

বিজয়ী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

সখীগৃহে

প্রতিমা গরীব ঘরের বৌ। খান-কয়েক মাটীর ঘর ও একটি আম-বাগান তাহার সম্পত্তি। সুরেশ থাকে বিদেশে—ঘরে প্রতিমা ও তার রুগ্ন শাশুড়ী। আশ-পাশের কৃষক প্রতিবেশীরাই ইহাদের দেখাশোনা করে।

প্রতিমার বাড়ী হইতে নিশিন্দা কাছারী বেশী দূর নয়। ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া কৈকেয়ী বাড়ীতে পৌছিলেন যখন, তখন সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবার সময়। প্রতিমার হাসিমুখ আজ বড় উজ্জ্বল, মহা ব্যস্ত হইয়া সে ছুটাছুটি বাধাইয়া দিয়াছে, কি করিবে, কি করিলে ভাল হয় কিছুই যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না।

সুখদা দর্পিতা হইলেও কার্য্যপটু খুব, নিজের হাতে কাজ করে না বেশী, কিন্তু তদারক করিয়া নিখুঁত ব্যবস্থা করিতে তার জুড়ি নাই। এই সময়ের মধ্যে সে কৈকেয়ীর ও দেবনাথের জন্য এমন পরিপাটী বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে, দেখিয়া কৈকেয়ীও একটু অবাক্ হইলেন। সুখদা নহিলে তাঁর চলে না। বাইরের ঘরটা বন্ধ থাকে—সেইটা দেবনাথের জন্য ঠিক করিয়াছে, যা যা দরকার সব ঠিকঠাক। ভিতরে বড় ঘরটিতে প্রতিমারা থাকে, প্রতিমার শাশুড়ী বলিয়াছিলেন, সেইটি কৈকেয়ীকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা একটা ছোট ঘরে থাকিবেন—সুখদা হাত নাড়িয়া তাঁহাকে বলিয়া দিল, "না গো, মা,—তোমার কাছেই মা এসেছে, তার জন্যে যদি তুমি ঘর ছাড়, তবে মা কাছারী-বাড়ী চলে যাবে দেখো, আমি ঘর ঠিক করে দিচ্ছি, তোমাদের ভাবতে হবে না।"

তার পর বার বার কাছারীতে লোক পাঠাইয়া জিনিষ-পত্র আনাইবার কি ধুম; ঘরের এক দিকে শাশুড়ী-বৌয়ের জোড়া চৌকি, আর এক ঘরের জিনিষপত্র অন্য ঘরে চালান দিয়া সেখানে পড়িল জোড়া-চৌকী, ধবধবে মশারি, পুরু কম্বল বিছানা, পাপোষ—উঁচু শেড্-ঢাকা টেবল-ল্যাম্প। পাশের একটা ছোট ঘরে কৈকেয়ীর সন্ধ্যা-পূজার যোগাড়। সমস্ত ঘরে ও বারান্দায় আলো জ্বালা। ঝড়-বৃষ্টির ভয়ে উঠানে আলো না দিয়া বারান্দার আলো-গুলি খুব জোরালো দেওয়া হইয়াছে।

স্নান করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া কৈকেয়ী বড় ঘরটার আসিয়া বিছানায় বসিলেন—বলিলেন, "ঠাকুর-পোকে চা দিয়েছিস্?"

সুখদা বলিল, "হাঁ, তিনি বললেন কাছারী থেকে তো রাত্তিরের সব খাবার আসবে, একটু বেশী যোগাড়-যন্ত্র হচ্ছে কি না, নটার পরে আসবে। তা বৌ-লক্ষ্মী যদি ঘুমিয়ে পড়ে তবে তাগাদা দিতে হয়—তোমায় বলতে বললেন।"

মেঝের মাদুর পাড়িয়া সুদেষ্ণা বসিয়া প্রতিমার উলের কাজগুলি দেখিয়া নমুনা ঠিক করিয়া লইতেছিল—কৈকেয়ী তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—"কি রে কি বলবো? নটা অবধি তো রোজই জেগে থাকিস—"

"যা খুসী বল না—"

"বলগে তাড়াতাড়ি দরকার নেই। তাদের ইচ্ছে মত মালিককে ভোগ দিক যা খুশী—"

এবার সুদেষ্ণা একটু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কে মালিক? আমি?"

"নয় তো কি আমি?"

"জানো না বুঝি? আবার জিজ্ঞেস হচ্ছে—"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ—আমি মালিক হলে আমায় কেউ জিজ্ঞেস করে না? কার জন্যে কাছারীতে এত ধুমধাম হচ্ছে? দণ্ডে দণ্ডে লোক আসছে খবর নিতে কি চাই, আগলাবার জন্য বাড়ীতে পাইক আসছে আট জন—সব আমার জন্যে—না?"

প্রতিমার শাশুড়ী নিজের বিছানায় একটা মোটা বালিশ হেলান দিয়া আধশোয়া হইয়া আছেন—হাঁপানী

রোগী, মাঝে মাঝে ভাল থাকেন মাঝে মাঝে অসুখ বাড়ে, আজ-কাল একটু ভালই আছেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমিই শুধু পারলাম না কিছু আদর করতে।"

সুদেষ্ণা বলিল, "তোমার জন্যে কিছু আসবে না কেন?"

"কেন জানিস নে? পূবের সূর্য্যিকেই সবাই ধ্যান করে, প্রণাম করে, বর মেগে নেয়—পশ্চিমের সূর্য্যিকে কে চায়? সে যে অস্তে যাচ্ছে।"

প্রতিমার শাশুড়ী বলিলেন, "ওরে বাপ রে তুমি অস্ত সূর্য্যি? তবে আর দুপুরের সূর্য্যি বলে কাকে?"

ঘরের সবাই হাসিয়া উঠিল। সকলের উপরে উঠিল সুদেষ্ণার খিল খিল হাসি, ভারী খুশী সে, কথাটা তার মনের মত হইয়াছে।

কৈকেয়ী বলিলেন, "ইনি আমাকেও ছাড়াবেন বলে মনে হচ্ছে, এখুনি আমায় গ্রাহ্য করেন না—এর পর দিন তো পড়েই আছে।"

প্রতিমা বলিল, "তা সত্যি, মামীমা অবধি দিদির সামনে নতুন বৌটি হয়ে থাকে—বৌদির তো মাথায় কাপড়ই নেই।"

সে কথায় কান না দিয়া সুদেষ্ণা সুখদার দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্যি দিদির জন্যে কিছু পাঠাবেন না ওঁরা? তবে বারণ করে দাও গে আমাদের জন্যেও কিছু দরকার নেই।"

"অবাক্ করলে তুমি বৌমা, মা কি এ'সব উড়ে বামুনের হাতের জিনিষ ছোঁবে, না এক রাজ্য থেকে বয়ে আনা খাবার মুখে তুলবে; সে সব আমরা ঠিক করছি, তোমায় ভাবতে হবে না।"

সুখদা চলিয়া গেলে কৈকেয়ী বলিলেন, "ঠাকুর-পো নায়েবকে বলে দিগে নি-কাঁটা মাছ চাই-ই চাই, আমার লক্ষণ ভাইটি মাছ নইলে পাতে বসেনই না—আবার কাঁটা ছাড়া মাছ চাই।"

এবার সুদেষ্ণার হইল তীব্র অভিমান—ঢাক পিটাইয়া তাহার রুচি-পছন্দের কথা সকলকে এখানকার সব নূতন অজানা লোককে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে! লজ্জার কথা নয়? সরোষ কটাক্ষে বারেক কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি বুঝি বলি? নিজেই তো জোর করে করে খাওয়ান হয়!"

"রাগ করিস নি, পাতে একখানাও পড়ে থাকতে দেখিনে, তুই আসবার পর বেরালগুলো মনের দুঃখে বাড়ী ছাড়া হয়ে গেছে।"

হাসি পাইলেও হাসি চাপিয়া ফেলিয়া সুদেষ্ণা তেমনি রাগের সঙ্গে বলিল, "বেশ বেশ আর আমি মাছ ছোঁব না, কখন না, কিছুতে না, হাজার বার বললেও না।"

"সত্যি?"

"সত্যি, নিয়ে এস না তোমার বেরাল খুঁজে, আমার চেয়ে কি না বেরাল বড় হল!" বলিয়া সুদেষ্ণা হাতের সেলায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

"আচ্ছা খুঁজব এবার! এখন আয় দেখি এখানে, অনেকক্ষণ কাছে আসিস নি।"

সেলাই ফেলিয়া রাগিয়া অন্ধকার মুখে সুদেষ্ণা উঠিয়া গিয়া কৈকেয়ীর কাছে পিছন ফিরিয়া বসিল, দুই হাতে কৈকেয়ী তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইলেন, তাহার মাথার চূড়ার মত উঁচু খোঁপাটির ফুলগুলি ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দিতে দিতে হাসিয়া বলিলেন, "এইটি আমার সব চেয়ে আদরের বেড়াল, দেখি পুষুমণির মুখখানি দেখি, আমার মনে হয় পৃথিবীতে এমন আর একটি চমৎকার বেড়াল নেই।"

হাসিয়া ফেলিয়া সুদেষ্ণা কৈকেয়ীর বুকে মুখে লুকাইল।

এতক্ষণ আকাশ মেঘে থম্‌থমে হইয়া ছিল, এইবার আরম্ভ হইল ভীষণ ঝড়, মুহুর্মুহু বজ্র গর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রতিমা তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

প্রায় সাড়ে নয়টার সময় কাছারী হইতে খাজাঞ্চি আসিয়া পৌঁছিল, পাইকরাও খাওয়া দাওয়া সারিয়া আসিয়া কেহ কেহ আস্তানা লইল বাহিরের ঘরের পাশের অব্যবহার্য্য একটা ছোট ঘরে, কেহ বা চাষা পড়শীর কুটীরে।

এ দিকে ভীষণ ঝড়ের শব্দে ও গর্জ্জনে ভয়ে কৈকেয়ীর দাসীদের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তাহাদের জায়গা হইয়াছে প্রতিমার দেওরের ঘরে। চক্‌মিলানো প্রকাণ্ড প্রাসাদে বাস করিয়া করিয়া নিজ নিজ ঘরের কথা প্রায় মনেই নাই। অকস্মাৎ এই খোড়োঘরে ঝড়ের প্রতাপ দেখিয়া তাহাদের ভয়ে-ভাবনায় প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। ইহাদের

মধ্যে সুখদার ভয় সব চেয়ে বেশী। তার প্রবল প্রতাপ লুপ্ত, বাক্‌শূন্য হইয়া সে মেঝেয় বসিয়া আছে এবং কৈকেয়ীর নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া অবাক্ও হইয়াছে।

কৈকেয়ী বলিলেন, "বসে রইলি যে? ঠাকুর-পোকে খেতে দে—লক্ষ্মণ তো ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি দিচ্ছি তুলে, জাগানো বড় শক্ত, তোরাও খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

প্রতিমা শাশুড়ীর বুকে পুরানো ঘি মালিশ করিতেছিল, শাশুড়ী বলিলেন,—"বড্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে, দোর খোলা মুশকিল, একটু থামুক।"

সুখদা বলিল,—"কি ঝড় মা, ভয়ে হাত-পা বেরুচ্ছে না, এমন ঝড় তো আমাদের ওখানে হয় না, কি রকম ঘর দুলছে দেখ—পড়ে যাবে না তো?"

"ক্ষেপেছিস? চার দিকে অত বড় বড় গাছ-পালা রয়েছে, ঘরে ঝড় লাগবে কেন?"

"তোমার ভয় করছে না?"

"কিছু ভয় নেই, এখুনি কমে যাবে, আর কতক্ষণ হবে? খাবার যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায় গরম করে দিস।"

প্রতিমা এবার সেলাই লইয়া বসিল। দিনে বড় সময় পায় না, রাত্রিতে সেলাই করা তার অভ্যাস। অনেক শিল্প-কাজ সে গোপনে বিক্রয় করে।

কৈকেয়ী বলিলেন, "তোর শাশুড়ীকে খেতে দিলি নে?"

"ঝড় না থামলে মা বাইরে বেরুতে দেয় না। আমারও আগে খুব ভয় হোত সুখি পিসির মত, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, শ্রীনগর গেলে মনে হয় ঝড়বিষ্টি নেই, দোর-জানালা বন্ধ করে দিলে কিছু টের পাওয়া যায় না কি না, এখানে বাতাসটি উঠলে তার শব্দ শোনা যায়।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "এদেশে এ কি ঝড়? ঝড় হয় পূর্ব্ববঙ্গে—সে দেখলে সুখি এতক্ষণ ফিট্ হয়ে পড়তো।"

প্রতিমার শাশুড়ী বলিলেন, "হ্যাঁ, সে-দেশের লোকের সাহসও তেমনি, এতটুকুন নৌকো নিয়ে নদী পাড়ি দেয়—ঝড়-বাতাস মানে না—তেমন হাল ধরতে জানে না কোনও দেশের লোক।"

সেই দেশেই এই দুইটি সখীর প্রথম পরিচয়। দুইজনে নিজেদের বাল্য কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে প্রতিমা সেলাই ফেলিয়া অবাক্ হইয়া একবার শাশুড়ীর দিকে ও একবার কৈকেয়ীর দিকে চাহিতে লাগিলেন। ইঁহাদেরও শৈশব-কাহিনী আছে এবং সে কাহিনীর প্রত্যেক পাতা বিচিত্র মধুরতায় ভরা, আজও বিগত একটি কথাও ইঁহারা ভোলেন নাই, এবং সেই আলোচনায় যে আনন্দ-কাহিনী এখনও মনের কতখানি জায়গা জুড়িয়া আছে, কে তার সন্ধান জানে?

ঝড় কমিয়া আসিয়াছে—রাত্রিও কম হয় নাই, এমন সময় দুয়ারে ধাক্কা পড়িল—সুখদা উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল—শশী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "মেনাজারবাবু ডাকছেন মা—বড্ড দরকার—"

"কেন রে?"

"কি জানি মা, শীগগির বলতে বললেন।"

"যাচ্ছি, আমার কি উঠবার যো আছে, অক্টোপাসের মতন জড়িয়ে ধরেছে একেবারে, ওর কি কম ভয় ঝড় তো এসে কোলে ঢুকলো।" ধীরে ধীরে সুদেষ্ণার হাত ছাড়াইয়া উঠিয়া বসিয়া তাহার মাথাটি বালিশে তুলিয়া দিয়া কৈকেয়ী বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন। একটু দূরে বারান্দার কিনারে দেবনাথ দাঁড়াইয়া আছেন। কৈকেয়ী প্রশ্ন করিলেন, "কি?"

দেবনাথ একটু আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, "অপূর্ব্ব সংবাদ, আজ দ্বারে বড় চমৎকার অতিথি।"

"কি রকম?"

"গিরিরাজ আর হৃষীকেশ ভিজে একেবারে পাটের বস্তা হয়ে গেছেন।"

"ও—আচ্ছা। তোমায় দেখেছেন কি?"

—"না, দোরে ধাক্কা পড়তেই দেখে আমি চলে এসেছি।"

—"তা বেশ—তুমি আর যেয়ো না। সুখদা—না তুই না, তোকে চেনে। শশী যা—শীগগির যা, দোর খুলে দিয়ে আয় আগে।"

শশী ছুটিল। কৈকেয়ী বলিলেন, "সুখদা, কাজ্জের ডাক্ শীগগির ঠাকুরপো, তুমি তোমার ঐ পাশের ঘরটিতে

বোসো, ওটা সুরেশের ঘর, বেশ পরিষ্কার আছে, বিছানা দিচ্ছে ; আর, তুই উনুন জেলে আগে গরম জল চাপিয়ে দে ; শুধি যা বলি শোন।"

বড়লোকের জিদ্

গিরিরাজ ছিলেন বাপের আদুরে ছেলে। কিছু চপল-মনা, কিছু বিলাসী। কৈকেয়ীর কাছে একটা বিশেষণ লাভ করিয়া 'হাতী' নামটা ঘুচাইলেন ঘোড়ার সাহায্যে অর্থাৎ ঘোড়-দৌড় করিয়া। সেই সখটা আজও আছে ; তারপর কৈকেয়ী নিজে মহাল দেখিয়া বেড়ান, তিনি কি ম্যানেজারের উপর ভার দিয়া বসিয়া থাকিবেন ? কবে কোন্ দিন শোনা যাইবে কৈকেয়ী আবার কি একটা নাম দিয়া ফেলিয়াছেন, সুতরাং তিনিও ঘোড়ায় চড়িয়া মহালে মহালে যান, তবে ঐ যাওয়া পর্যান্ত, উদ্দেশ্যটা বেড়ানো, অনুসন্ধান বা তদারক করা নয়। সদরে ম্যানেজার, মফঃস্বলে নায়েবেরা যা করে তাহাতেই তিনি রাজী এবং সন্তুষ্ট।

চৌধুরী-বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। সে-বাড়ীর বৌয়েরা ব্রত-নিয়ম-উপবাস করে, পায় হাঁটিয়া কোথাও যায় না, সেকালের সম্ভ্রান্ত ঘরের মত দামী দামী জড়োয়া গহনা পরে। ঝিয়েরা পাল-পার্ব্বণ প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে, বেড়াইতে বাহির হয় দলবদ্ধ, দিল্লী, লক্ষ্মৌ, লাহোর। বছরে ছ'মাস কলিকাতাতেই থাকে, সেকালের রূপার বাসন সিন্দুক হইতে আর বাহির হয় না, কাচ ও চীনা-মাটী সর্ব্বত্র জুড়িয়া বসিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর-বাড়ী আছে, সেখানে পূজারীই কর্ত্তা, বাড়ীর মেয়েদের সেদিকে নজর দিবার সময় নাই। 'বেড্-টি' না হইলে মাথা ধরে এবং কলিকাতার কোন থিয়েটারটা দেখা না হইলে একটা বড় লোকসান হইল বলিয়া মনে করে।

গিরিরাজের পোষ্যসংখ্যা বহু, ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনীতে বাড়ী ভরা। একটা বাস্ বোঝাই করিয়া বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা স্কুল কলেজে যায়। লেখা-পড়ার চর্চ্চা আছে বেশ ভাল রকম। ঝিয়েরা শিক্ষার গৌরব করিতে পারে।

কৈকেয়ী ভ্রূকুটী করেন ঝিয়েদের অতিমাত্রায় উগ্র আধুনিকতা দেখিয়া, ঝিয়েরা নাসিকা কুঞ্চিত করেন চৌধুরীদের সেকেলেপনা দেখিয়া। দুই পক্ষের মনোভাব লইয়া সিংহ ও শিকারী পরস্পরের উপর উদ্যত হইয়া রহিয়াছে বহুকাল হইতে। তবু নাতনীকে কেন সেই ঘরে দিবার চেষ্টা ? অমন বিবি নাতনী ! এ কথার উত্তর এই যে, আনন্দের গলায় যে মালা দিবে তার মত ভাগ্যবতী কে ?

কৈকেয়ী করিলেন প্রত্যাখ্যান, তার পরে গিরিরাজ যে গরীব মেয়েটিকে বৌ করিয়া আনিলেন তাহাকে আশীর্ব্বাদ করা হইল অসম্ভব দামী গহনা দিয়া। সেই কঙ্কণের হীরার দ্যুতি গিরিরাজের মনে জ্বলিতে লাগিল—সে তো অলঙ্কার নয়, কৈকেয়ীর আকাশচুম্বী অহঙ্কার।

গিরিরাজ চাহেন যে কোন উপায়ে কৈকেয়ীকে জব্দ করিতে—কিছু শিক্ষা দিতে। দুঃখ এই যে, জমিদারদের আর সেকাল নাই যে যা-খুশী করা যায়, দিন-ক্ষণ সত্যই বড় খারাপ পড়িয়াছে, প্রজারা দিনে দিনে এতই সাহসী হইতেছে যে, জমিদারকে গ্রাহ্যই করিতে চায় না। ভবিষ্যতে প্রজাই হইবে জমিদার এবং তাহাদের মন যোগাইয়া থাকিতে পার তো ভাল নতুবা জমিদারেরই দফা শেষ। এ সব ঘোর কলির দুর্লক্ষণ ! (সুবিধাবাদী গিরিরাজ কখনও কখনও পাঁজি পুরাণে বিশ্বাস করেন।)

ইতিমধ্যে গিরিরাজ গেলেন একবার সোনাপুর বেড়াইতে। সোনাপুরের কিনারা দিয়া একটা নদীর শাখা বহিয়া গিয়াছে, সেটা ছাড়া আর কোন জলাশয় নাই ; সোনাপুরের লোকেরা নিশিন্দার পুকুরের জলই ব্যবহার করে। গিরিরাজকে প্রজারা ধরিল একটা পুকুর কাটাইয়া দিতে। গিরিরাজের নূতন ফন্দী জুটিল, অত টাকা খরচ করিয়া কাজ কি ? এটা আত্মসাৎ করিলেই তো হয়। 'জোর যার মুলুক তার', মামলা মোকর্দ্দমা যদি বাধে বাধুক না, তাঁহার এক বেহাই হাইকোর্টের উকীল, খুব নামজাদা। কৈকেয়ীর কি সম্বল আছে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ? কেশব ঘরের বাহিরই হয় না, আনন্দ তো সেদিনের ছেলে ; ওদিকে যেমন নিশিন্দার লোক সাক্ষী দিবে, তাঁহার পক্ষেও সমস্ত সোনাপুর। সুতরাং কিছু মাত্র চিন্তা নাই। কৈকেয়ী বড় কুজ্ঝমতি, গাছের একটা পাতা কেহ না বলিয়া ছিঁড়িলে মাপ করেন না, একটা পুকুরের শোক সামলানো তাঁর পক্ষে কত কঠিন ভাবিয়া গিরিরাজ বড় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন,

এইটাই হইবে যোগ্য শাস্তি। তার পরে আস্তে আস্তে দেখা যাইবে কতদূর কি করা যায়।

তবু গিরিরাজের মন খুঁত খুঁত করে, কৈকেয়ীর বিশাল অধিকারের মধ্যে কি না একটা পুকুর নদীর এক গণ্ডুষ জল তুলিয়া নেওয়ার মত তুচ্ছ। বন্ধু হৃষীকেশ সান্ত্বনা দিলেন—"ব্যস্ত কি? একটা একটা করে হবে।"

সুতরাং সোনাপুরের নায়েবকে উপদেশ পরামর্শ দিয়া ফিরিবার দিন কয়েক পরেই কাণ্ডটা ঘটল। গিরিরাজ খুশী হইয়া নায়েবকে সুখ্যাতি করিয়া আর কিছু উপদেশ দিয়া ও সাবধান করিয়া পাঠাইলেন।

হৃষীকেশ বলিলেন, "মার-পিটটা হয়ে সুবিধে হয় নি, তুমি যাই বল।"

গিরিরাজ জবাব দিলেন, "সেটা আমিও ভাবছি। সোনাপুরের লোকেরা গিয়ে পুকুর-পাড়ে কিছু ফুলের চারা-কলম লাগাতে থাক বেড়া ঘিরে নিয়ে। তখন ওরা এসে নিশ্চয় বাধা দেবে, মারামারিও হবে, তা হলে উল্টো দাবীতে নালিশ করা চলবে।"

হৃষীকেশ বলিলেন, "যদি বাধা না দেয়?"

"দেবে, দেবে। ঢোল পেটাবার পরেই তো মাছ ধরছিল, চৌধুরাণী কি বলে পাঠায় নি যে, দখল দিও না? নায়েব কাছারীতে ছিল না,তাই না অত সহজে কাজ হয়েছে? সহজে দখল দেয় কেউ? আর ধর, যদি বাধা নাই দেয় তবে তো পুকুরটা আমারই হয়ে গেল। সেটা তো যাচাই করেই জানা যাবে?"

হৃষীকেশ বলিলেন, "অত সোজা বলে আমার মনে হচ্ছে না, যেমন উনি তেমনি দেবনাথ, শার্লক হোম্‌সের মত কোথা থেকে কি সূত্র টেনে বার করে তোমাকেই জড়িয়ে বেঁধে ফেলবে।"

"আঃ হৃষি, তোমার কোন বুদ্ধি নেই, তাই পারে কখনও? দেখছ আস্পর্দ্ধা? সহ্য হয় মানুষের! আমার প্রজাদের ঘর বাড়ী পুড়ে গেল সে আমি বুঝব, উনি কি না নিজের জায়গা জমি ছেড়ে দিয়ে তাদের বসবাস করালেন! ধার্ম্মিক গিরিরাজ হয়েছেন একবারে! এবার দেখাচ্ছি।"

"ও, সেই চৈত্র মাসের ব্যাপারটা? তা তারা কতদিন তোমার কাছে ঘুরলে তুমি কোন সাহায্য করলে না, শেষে না ওঁর কাছে গেল?"

"কি যে বল? ঘর বাড়ী উঠে পড়ে কি বলতে বলতেই? ওরা নিশ্চয় ভেতরে ভেতরে পরামর্শ দিয়ে জাগিয়ে দিলে, নইলে কি ব্যাটাদের অত সাহস হয়? তবু আমি কিছু বলি নি।"

হৃষীকেশ একটু হাসিয়া বলিলেন, "বলনি ভ.ল ভেবে, শ'পাঁচেক টাকা তোমার বেঁচে গেছে সে ব্যাপারটায়।"

এমন সময় এক ভৃত্য আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল, গিরিরাজ বলিলেন, "কি খবর?"

"আজ্ঞে চৌধুরাণী নিশিন্দে রওনা হচ্ছেন।"

"বটে!" তাকিয়া ছাড়িয়া গিরিরাজ উঠিয়া বসিলেন, "চলে গেছে?"

"এতক্ষণ গেছেন বোধ হয় লোকজন জিনিষপত্র অনেক আগেই গেছে, নতুন বৌও সঙ্গে যাচ্ছে।"

"দেখলে? সাহসটা দেখলে তো? এই দুর্দ্দিনে পথে নদী পারের হাঙ্গামা, তার মধ্যে নূতন বৌ নিয়ে যাওয়া? কিন্তু আমার তো যেতে হচ্ছে সোনাপুর, নইলে যে নায়েবকে ধমকিয়ে কাজ সেরে ফেলবে।" ভৃত্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি একুণি সোনাপুরে ঘোড়া ছুটিয়ে লোক পাঠিয়ে দাও। তারা ভয় পায় না যেন, আমি যাচ্ছি। ওরা নিশিন্দে পৌঁছবার আগে তার পৌঁছনো চাই, যাও যাও; হৃষি—ওঠো—তৈরী হও।"

হৃষীকেশ উঠিবার লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, "যাবে কিসে?"

"ঘোড়ায়, দু'দিন বেরোইনি, চল একটা চক্কর দিয়ে আসি।"

"গাড়ীতে গেলে মন্দ কি?"

"চৌধুরাণীর অনুকরণ চাই? যতই বাহাদুরি করুন ঘোড়ায় চড়াটা মেয়েদের কাজ নয়, পাল্লা যে কেন দিতে চান? ওঠো—ওঠো।"

"এবার তবে সামনা সামনি লড়াই?"

"নিশ্চয়—অবশ্য—আল্‌বাৎ—সার্টেন্‌লি!"

"দরকার কি? পরের জঞ্জাল গায়ে করি? হাঙ্গামা কর কেন?"

"ভয় পেয়ে গেছ ? নাঃ নেহাৎ অপদার্থ তুমি !"

"সেটা মানি। কিন্তু আমি কোন কথা বলতে টলতে পারবো না ওঁর সঙ্গে, সে আগে বলে রাখছি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। কথা কি আমিই বলেছি কোন দিন ? দূর থেকে যা দেখা ! ওঠো।"

অগত্যা হৃষীকেশ উঠিলেন। ছেলেবেলা হতে বন্ধু দু'জনে। পরে কিছু বৈবাহিক সম্বন্ধও হইয়াছে। হৃষীকেশ নিঃসন্তান, অবস্থা ভাল। তাঁহাকে ছাড়া গিরিরাজের এক পা চলে না, এক দণ্ড কাটে না।

ঘণ্টা খানেক পরে যখন অশ্বারোহী বেশে ওইজন দুইটি তেজী সজ্জিত প্রকাণ্ড ঘোড়ায় চড়িয়া বসিলেন, তখন দেখিলে কার সাধ্য বলে—ইঁহারাই আলবোলার নল হাতে তাকিয়া ঠেসান দিয়া পড়িয়াছিলেন নিতান্ত অলসভাবে।

হৃষীকেশ একটু হাসিয়া বলিলেন, "যুদ্ধ-যাত্রাটা আমাদের, জয়টাও আমাদের।"

গিরিরাজের একটি ছোট নাতনী ছুটিয়া আসিতে আসিতে বলিল, "দাদু আমি যাব।"

হৃষীকেশ বলিয়া উঠিলেন, "এই মাটী করেছে রে ! পেছু ডেকে ফেল্লে !"

"ও কিছু না।"

"একটু দাঁড়িয়ে যাও না, যে ঝড়-ঝঞ্ঝার দিন।"

গিরিরাজ আকাশের দিকে চাহিলেন। আকাশ পরিষ্কার, দু'এক খণ্ড শাদা মেঘ আল্‌গা ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে শুধু।

হৃষীকেশ বলিলেন, "যাই বল, তোমার মত নামজাদা লোকের পক্ষে অন্যের জিনিষ কেড়ে নেবার চেষ্টা মোটেই মানায় না, লোকে নিন্দা করবে।"

"নিন্দে ? লোকের নিন্দে কেয়ার করি আমি ? লাভের জন্য নিতে চাইছি না কি ? শুধু জব্দ করা, ওঁর দর্প চূর্ণ করা ! তার জন্য দশ হাজার যদি যায় সেও ভাল।"

"ওঃ জমিদারী জিদ্ ! জমিদারী চাল—এক ছটাক জমির জন্যে এক হাজার যারা ঢালে ! ভুলে গেছলাম ভাই, ধিক্ ধিক্ ! আর তোমার প্রবল প্রতাপে আমার সবই ভুল হয়ে যায়।"

"আঃ তোমার ঐ স্পীচ আমার মোটেই ভাল লাগে না, নাও চল এবার।" গিরিরাজ অশ্বচালনা করিলেন।

"ও পথে কেন ? সোজা পথ ছেড়ে ?"

"যা রে পথের মধ্যে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সেইটে চাও না কি ?"

"তাই বলে অজানা পথে ?"

"অজানা নয়, এইটেই সোজা পথ সোনাপুর যাবার। ওপথে গেলে নিশিন্দের কাছ দিয়ে যেতে হয়, এটা একেবারে উল্টো।"

"গেছলে কখনো ? আমি তো জানিনে।"

"তুমি অনেক কিছুই জান না ! লোকজন এই পথেই বেশী যাওয়া-আসা করে। আমি অবশ্য যাইনি কোন দিন। তা ছাড়া ও পথটায় তিন চার বার নদী পার হতে হয়।"

"তবে থাক।"

দুর্যোগে দুর্গতি

মাইল কয়েক পথ চলিবার পরে নদীর একটা ক্ষীণ ধারা উভয়ের গতি রোধ করিল। হৃষীকেশ বলিলেন, "যা—এই যে—"

"এ পার হতে কি দেরি ? এই পাটনী !"

পাটনী ঘাটেই ছিল। খেয়া-নৌকায় উঠিয়া গিরিরাজ বলিলেন, "আমার মনে চমৎকার একটা প্ল্যান এসেছে।"

"কি ?"

"আনন্দের বৌটিকে লুট করলে হয় না ?"

"কি বললে ?"

"চমকাও কেন ? এখুনি তো নদীতে পড়ে গেছলে আর কি ! শোন, এই কাজটা করতে পারলে চমৎকার হয়, বড় ঘটা করে নতুন-বৌ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

"ঝগড়া বিবাদ তোমাদের—নতুন-বৌ কি দোষ করলে ?"

"আরে সে আমি জানি, এ ওঁর সঙ্গেই আমার যা মনো মালিন্য, নইলে কেশব, আনন্দকে, আমি ছেলে-নাতির মত দেখি। গিন্নী তো আনন্দের মাকে মেয়ের মত ভাল বাসেন। আমি শুধু ওঁকে জব্দ করবার জন্যেই কাজটা করতে চাইছি। কঠিন বটে কিন্তু বড় উত্তম ! দেশময় বৌ-

চুরির কথা ছড়িয়ে পড়বে, উঁচু মাথা মাটির সঙ্গে মিশবে, উচিত শাস্তি হবে, যা চাই আমি।"

"বাঘিনীর মুখ থেকে বাচ্চা কেড়ে আনা? কি রকম করে শুনি?"

"ওদের আগেই আমরা পৌঁছে যাব। উনিও পৌঁছেই নিশ্চয় পুকুর দেখতে যাবেন, বৌ নিয়ে আর যাবেন না; সে তো কাছারীবাড়ী থাকবে—কাছারীর লোকজনও বেশীর ভাগ ওঁর সঙ্গেই থাকবে, সেই তো সুযোগ।"

"হুঁ—তার পরে—কি উপায়?"

"উপায়? জন দুই মেয়ের সঙ্গে পাল্কী যাবে তারা বলবে যে, 'তোমার দিদিমা তোমার জন্ম পাল্কী পাঠালেন—পুকুর দেখবে চল' আর কি? পাল্কী সোজা চলে যাবে আমার বাড়ী—একবারে গিন্নীর কাছে—"

"বেশ, বেশ। তার পরে?"

"তার পরে যা তাই, চৌধুরাণীর কি দশা হবে ভেবে আমার কি আনন্দই হচ্ছে।"

"বৌটির কি হবে?"

"কি আর হবে—গোলমাল থামলে যাদের বৌ তাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।"

"যদি না নেন—"

"না নেয় আমার মেয়ের মতন থাকবে।"

"এমন না হলে বুদ্ধি? ভাই, আমরা সাধারণ মানুষ এ-সব জমিদারী কাণ্ড বুঝবার সাধ্যই নেই। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, সর্ব্বনাশ হবে নির্দ্দোষী বউটির, তা তোমাদের পক্ষে এ আর বেশী কি? প্রজার ঘর জ্বালানো, গুম করে রাখা,—তাদের বৌ চুরি করা, ভিটে মাটী উচ্ছন্ন করা, এ সব জ্ঞান বুদ্ধি-কৌশল যে তোমরা উত্তরাধিকারসূত্রেই পাও, এ-সব না করলে আর তোমাদের বড়-মানুষী কিসের বল?"

"আঃ ঋষি, মাঝে মাঝে লেক্‌চার ঝাড়া তোমার একটা রোগ—এতে সর্ব্বনাশটা দেখলে কোথা?"

"সে ঠিক, কারো সর্ব্বনাশ কারো পৌষমাস, যাকগে কাছারী পৌঁছে তবে তো সে সব? চল এখন যাই—দিনটা বেশ ঠাণ্ডা আছে।"

নদী পার হইয়া উভয়ে চলিলেন। মাইলখানেক না যাইতেই আবার দেখা গেল সেই রকম ক্ষীণ নদী, সেই ধারাটিই বোধ হয় বাঁকিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে।

ঘোড়া হইতে নামিয়া হৃষীকেশ বলিলেন,—"মজা তো মন্দ নয়?"

"বেশী কি? মোটে দু'বার—"

"এইটুকু পথ আসতে দু'বার হলো, আরও কবার আছে কে জানে।"

"আর বোধ হয় নেই। দেখ, এক ঢিলে দুই পাখী মরবে—বউয়ের শোকে কি আর পুকুরের দিকে মন দেবে? অত সাধের বৌ, দেখ দেখি, কি চমৎকার বুদ্ধি বার করেছি।"

"চমৎকার তো বটেই, যদি সোনাপুর আজ পৌঁছতে পারি।"

"বল কি? এলাম প্রায়।"

নদী পার হইয়া আবার ঘোড়া ছুটিল। হঠাৎ মাথার উপর গুরু গর্জ্জনে মেঘ ডাক দিল, সচকিত হইয়া উভয়ে উর্দ্ধে চাহিয়া দেখেন ঘন-কৃষ্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে আকাশ একেবারে ঢাকা পড়িয়াছে। গিরিরাজ বলিলেন, "ঝড় হবে না কি?"

"হতেও পারে—বাতাস তো থমকে গেছে—"

দুই জনে ক্ষিপ্রবেগে ছুটিলেন।

কয়েক ক্রোশ পথ চলিবার পরে আবার দেখা দিল নদী। আগের দুই বারের মত ক্ষীণ জলধারা নয়—প্রখর বেগশালিনী এবং বর্ষার জোয়ারে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উচ্ছ্বসিতা। বিস্তার খুব বেশী নয়—কিন্তু তরঙ্গময়ী। ঘাটে পাটনী নাই—খেয়া-নৌকাখানা ওপারে বাঁধা রহিয়াছে।

হৃষীকেশ বলিলেন, "এবার?"

"এতটা জানলে ঐ পথ দিয়েই যেতাম—এ কি বিপত্তি!"

"এ ঘাটে বোধ হয় কালে-ভদ্রে কেউ পার হয়—ধর্ম্ম-সাক্ষী নৌকো একটা ঘাটে আছে মাত্র। এতটা পথ এলাম, কৈ লোক-জন তো তেমন দেখলাম না?"

"এখন কি করা যায় বল।"

"কি আর করবে? পাটনীটা ঘরে আছে না কি?"

নদীর ওপারে একটা বটগাছ, তলায় দুখানা জীর্ণ ঘর, একটা ঘর একটা হাট-খোলার মত চালা, দু-দিক ঘেরা দু'দিক খোলা। হৃষীকেশ বিস্তর ডাকাডাকি করিলেন—

কেহই বাহির হইল না। চারি দিকেও কেহ নাই। এপারে দুই দিকেই শস্যের ক্ষেত, ও-পারে অনেক দূরে দূরে মাঠের মধ্যে ছোট ছোট দরিদ্র পল্লী।

আবার মেঘ ডাকিল, বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—হতাশ হইয়া গিরিরাজ বলিলেন, "কি সাংঘাতিক মেঘের চেহারা, এখুনি ঝড় উঠবে! তবে কি ফিরবো?"

"সু-যুক্তি বটে, সামনে তিন-চার মাইল বড় জোর আছে, তা ফেলে আবার সাত-আট ক্রোশ ছুটি!"

"সেও মিথ্যা নয়—তবে করি কি, বল না?"

"পাটনীর আশায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কি?"

গিরিরাজ ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন—হৃষীকেশ সিগারেট ধরাইলেন।

সন্ধ্যা হয় হয়—মেঘের আঁধার ও ঘনঘটা ক্রমশঃই বাড়িতে বাড়িতে দিনের আলোটুকু প্রায় নিভিয়া গেল। এমন সময় দেখা গেল, ওপারে ঝুড়ি মাথায় একটা লোক, পিছনে বোধ হয় তাহারই স্ত্রী ও মেয়ে, তাদেরও হাতে পুঁটুলি, তিন জনে সেই জীর্ণ ঘরটার দিকে চলিয়াছে। এ-পারে ঘোড়া শুদ্ধ দুটি বীরবেশধারীকে দেখিয়া লোকটি ঝুড়টা নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি ঘাটের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়া যথাসাধ্য চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা পার হবেন বাবু?"

ততোধিক উচ্চ স্বরে হৃষীকেশ জবাব দিলেন—"আজ্ঞে হাঁ, একবার দয়া করে আসুন।"

পাটনী নৌকা খুলিয়া এ-পারে আসিল, ঘোড়া লইয়া দুজনে নৌকায় উঠিলেন—সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও উঠিল।

উল্টামুখো বাতাসে নৌকা চালানো হইল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। হৃষীকেশ বলিলেন—"কোথা গেছলি রে ব্যাটা, ঘাটে থাকলে কোন্ কালে পার হতে পারতাম—"

"আজ্ঞে এই কাছেই হাটে সওদা করতে গেছলাম।"

"তা সব শুদ্ধ গেছলি কেন? লোক জন পার করে কে?"

"আজ্ঞে, সওয়ার বড় আসে না এপথে, বিশেষ এই দুর্যোগির দিনে। ওই যে ওদিকে একটা কাঠের পুল আছে—নতুন হয়েছে, সেইটে দিয়েই মানুষজন পার হয়।"

"দূর হ ব্যাটা, তা কি আমরা জানি—জানলে কি এই দশা হয়?"

অনেক চেষ্টায় পাটনী নৌকা পরপারে ঠেকাইল, কিন্তু আর এক পা আগাইবার যো নাই—ভীষণ ঝড় উঠিয়া পড়িল, তীব্র বিদ্যুৎ জলিয়া চক্ষু ধাঁধাইয়া দিতে লাগিল। বটগাছ-তলায় সকলে দাঁড়াইলেন, নৌকাটা বাঁধিয়া রাখিয়া পাটনী বলিল, "ঘরের ভেতর বসুন বাবু—বাইরে দাঁড়াতে নেই ঝড়ের সময়।"

চালাটিতে ঘোড়া দুইটি বাঁধিয়া রাখিয়া দুই জনে ঘরে ঢুকিলেন। তক্তার মাচা হইতে ময়লা বিছানা সরাইয়া ফেলিয়া পাটনী তাঁহাদের বসিবার জায়গা করিয়া দিল, পাটনীর স্ত্রী কেরোসিন কুপী জালিয়া বসিয়া কুটনা-কুটিবার আয়োজন করিতেছে সবে, বাবুদের দেখিয়া তাড়াতাড়ি সে সব মাচার নীচে ঠেলিয়া দিয়া এক কোণে গিয়া বসিল। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সে বেড়ায় ঝুলান চক্চকে একটা লণ্ঠন পাড়িয়া জালিয়া বাবুদের সামনে রাখিল, এবং ফুঁ দিয়া কুপীটা নিভাইয়া দিল।

বৃষ্টি নামিয়াছে, ঝড়ের বেগে জীর্ণ ঘরটি কাঁপিতেছে, প্রতি পলকে পলকে গিরিরাজ ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, এখনই বুঝি ঘরটা ভাঙিয়া পড়িয়া তাঁহাদিগকে চাপা দিল—এই ভয়ে তাঁহার শান্তি নাই। হৃষীকেশ বেশ নিশ্চিন্ত মুখে সিগারেট ধরাইয়াছেন। পাটনীটা দুয়ার বন্ধ করিয়া কোমর ঠেস্ দিয়া বসিয়াছে। মেয়েটি মায়ের কোলের কাছে বসিয়া স-কৌতূহলে বাবুদের বেশ-ভূষা দেখিতেছে, চোখমুখ হাসি-হাসি, ভয়-কুণ্ঠার লেশ নাই।

হৃষীকেশ বলিলেন, "আজ বৃহস্পতিবার—বারবেলায় বেরিয়ে এই দুর্ভোগ! চৌধুরাণীর কি হচ্ছে কে জানে!"

গিরিরাজ জবাব দিলেন, "ঝড়ে কি আর রেখেছে, ওদের কোথায় উড়িয়ে ফেলেছে কে জানে!—যে রকম—"

হঠাৎ দমকা ঝড়ের বেগে ঘরটা মড় মড় শব্দে দুলিয়া উঠিল, চমকাইয়া গিরিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন কথাটা শেষ না করিয়াই।

হৃষীকেশ বলিলেন, "ভয় নেই—এরাও তো এই ঘরেই থাকে? বসো তুমি।"

"আরে ওদের কি প্রাণের মায়া আছে, না জ্ঞান-বুদ্ধি আছে ? দেখ দেখি কি কর্ম্মভোগ !- কেনই বা এলাম—পরকে জব্দ করতে গিয়ে এখন—".

"ওটা আর বেশী কি বললে ? 'পরের মন্দ করতে গেলে নিজেরই মন্দ আগে হয়'—তা তোমার সঙ্কল্পটা ঠিক আছে ত ? কাছারী পৌঁছেই আগে আনন্দের বৌটিকে—"

"থাম ঋষি, আর জ্বালিয়ো না। দেখ এখন কি করে এ-বিপদ থেকে উদ্ধার হই, কাছারী এখনো বোধহয় দু-তিন ক্রোশ দূরে। এইখানে কি সমস্ত রাত কাটাবো ?"

প্রবল প্রতাপেষু

অনেকক্ষণ পরে ঝড় কমিল। হৃষীকেশ উঠিয়া দুয়ার খুলিলেন, আকাশ তেমনই নিবিড় কৃষ্ণমেঘে ঢাকা, ঝড় কমিয়াছে বটে—কিন্তু বাতাসের জোর বড় বেশী—তবে বৃষ্টি খুব কম।

গিরিরাজ বলিলেন, "কি রকম ?"

"এই বেলা যাই চল—"

"বৃষ্টি নেই ?"

"আছে সামান্য। না হয় একটু ভিজবো, সেও ভাল, এখানে কি তুমি রাত কাটাতে পারবে ?"

"না না, অসম্ভব।"

"তবে যাই, চল। এখন একটু থেমেছে, আবার যদি বাড়ে, সারা রাত থামবে না—"

গিরিরাজ বলিলেন, "কিছু কি বেয়াক্কেল আমার লোকজনেরা! একটু এগিয়ে কি খবর নিতে পারে না ? যাই আগে—দেখাচ্ছি ব্যাটাদের।"

"তারা কি জানে তুমি এই পথে চলছো ? তারা হয়তো ওদিক্‌কার পথ দেখছে।"

বাহিরে আসিবামাত্র জোর বাতাস গায়ে লাগিল। ঘোড়া খুলিয়া লইয়া চড়িয়া বসিয়া গিরিরাজ বলিলেন, "এই আঁধারে অচেনা পথে যাই কি করে ? পাটনীটা আলো নিয়ে চলুক আমাদের সঙ্গে।"

"আমরা ঘোড়ায় যাচ্ছি—পাটনী আমাদের পথ দেখাবে কেমন করে ? তার চেয়ে আমি আলোটা নিচ্ছি—তুমি আমার পেছনে এসো। ওরে, সোনাপুর কাছারী জানিস ?"

"জানি বাবু, সেইখানে যাবেন ?"

"হাঁ। কোন্ দিকে পথ, কত দূর আছে আর ?"

"আর বেশী দূর নাই—সোজা ডান দিকের পথ ধরে চলে যান পৌঁছতে এক ঘণ্টাও লাগবে না।"

পাটনীর একটি মাত্র সরকারী লণ্ঠন, কাজেই সেটা দিতে রাজী হইল না, গিরিরাজ সরোষে কটমট্ করিয়া চাহিলেন, পাটনী মাথা নীচু করিয়া বলিল, "রাত্তিরে লোকজন পার করতে হলে কি করব বাবু ?"

"ওরে এই রাত্তিরে আর কেউ পথে বেরুচ্ছে না, তুই নির্ভাবনায় ঘরে শুয়ে থাক, যদিও কেউ আসে তাদের সঙ্গে আলো থাকবে, এমন দিনে কেউ আলো ছাড়া বেরোয় ? বলিস আমরা জোর করে তোর লণ্ঠন নিয়ে গেছি", বলিয়া হৃষীকেশ পকেট হইতে মানিব্যাগ বাহির করিয়া একখানা পাঁচ টাকার নোট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই নে তোর লণ্ঠনের দাম আর বক্‌শিশ—ঘরে জায়গা দিয়েছিলি।"

মেয়েটি লণ্ঠনটা বাপের হাত হইতে লইয়া হৃষীকেশের সামনে উঁচু করিয়া ধরিল, সেও বাবুদের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

"বাঃ বেটী তো ভারি লক্ষ্মী, এই নে", দুটি টাকা বাহির করিয়া মেয়েটির হাতে দিয়া লণ্ঠনটা লইয়া হৃষীকেশ ঘোড়া ছাড়িয়া দিলেন।

জলে মাঠের মধ্যে কাদা হইয়া গিয়াছে, মাথার উপরে আসন্ন ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং চারিদিকে নিবিড় সূচীভেদ্য অন্ধকার লইয়া প্রবলপরাক্রান্ত গিরিরাজ মিত্র মহাশয় হৃষীকেশের পিছন পিছন চলিলেন।

জনহীন খোলা মাঠে, ঠাণ্ডা বাতাস তীক্ষ্ণ সূচীর মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল। পদে পদে গতিরোধ হয়, পথ অনিশ্চিত, মাঝে মাঝে পথের কোন নিশানাই নাই, যেখান সেখানে পথ ছাপাইয়া বৃষ্টির জলস্রোত সবেগে বহিয়া চলিয়াছে। কোথাও ঘোড়ার হাঁটু পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যায়, কোথাও বা উঁচু মাটীর ঢিপিতে হোঁচট খাইয়া আরোহী শুদ্ধ পড়িতে পড়িতে ঘোড়া সামলাইয়া লয়।

কিছুক্ষণ এমনি ভাবে চলিয়া গিরিরাজ শ্রান্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "প্রাণ নিয়ে পৌঁছব কি না সন্দেহ হচ্ছে।"

কিছুদূর চলবার পরই বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িতে আরম্ভ হইল, সত্রাসে গিরিরাজ বলিলেন, "ঋষি, উপায় ?"

"উপায় ভগবান্—চলে এস।"

লণ্ঠনের শিখা দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেওয়া হইল, দেখিতে দেখিতে চিমনীতে কালী জমিয়া উঠিল ; বাতাসের ঝাপটায় লণ্ঠনের শিখাটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া এক একবার নিভিবার মত হয়। পথ চলা যে কত কঠিন সেটা গিরিরাজ ভাল করিয়াই বুঝিতেছেন।

সহসা হৃষীকেশ বলিয়া উঠিলেন, "যাক, গ্রামে আসা গেল।"

সাগ্রহে গিরিরাজ প্রশ্ন করিলেন, "কি করে জানলে ?"

"মাঠ পার হয়েছি, দেখতে পাচ্ছ না ? ঐ যে গ্রামের গাছপালা। কিন্তু কাছারী কোন্ দিকে আর কতদূর জানতে পারি কি করে ? লোক-জনের চিহ্নও তো দেখছি নে।"

আঁকা-বাঁকা সরু পল্লী-পথ জলে পিচ্ছিল, দুই দিকে ছোট বড় গাছ ও আগাছার জঙ্গল, ব্যাঙের তীব্র কঠোর উল্লাস-ধ্বনিতে নির্জ্জন পল্লী মুখরিত। হঠাৎ একটা উল্টাইয়া-পড়া গাছের গোড়ায় ধাক্কা খাইয়া হৃষীকেশের ঘোড়াটা সামনে ঝুঁকিয়া পড়িল, তৎক্ষণাৎ হৃষীকেশের হাতের লণ্ঠনটা ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িল সশব্দে এবং ভাঙ্গিয়া নিভিয়া গেল।

হৃষীকেশ বলিয়া উঠিলেন, "যাঃ আপদ্ গেল !'

যে একটু আলো ছিল তাহাও গেল। গিরিরাজ বলিলেন, "না এনেছি টর্চ্চ, না এনেছি আর কিছু, এমন যাত্রা তো আমরা কোন দিন করি নি। আমার ওসব খেয়াল হয় না অবশ্য, কিন্তু তোমা হেন সাবধানীও আজ এমন ভুল করলে কেন, বল তো ?"

"চারটের আগে পৌঁছবার কথা, কে জানে এমন কাণ্ড হবে।"

মুষলধারে নামিল বৃষ্টি, গিরিরাজ ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "ঋষি !"

হৃষীকেশ বলিলেন, 'আর যাওয়া যাবে না, এই স্থানে কোথাও অতিথি হই।"

"কোথায় অতিথি হবে ? কোন দিকেই তো মানুষের চিহ্ন নেই।"

"পাড়াগাঁয়ে এই দুর্যোগে কে বাইরে বসে থাকে বল ? আলো নিভিয়ে সব শুয়ে পড়েছে, ঝড় কম হয় নি তো।"

"কটা বেজেছে দেখবারও যো নেই।"

"দেখে লাভও নেই, নটার কম তো নয়ই, বরং বেশীই হবে।"

দুর্ভেদ্য আঁধার যেন বিশ্ব গ্রাস করিতেছে। আকাশে বজ্রের ঘোর গর্জ্জন, বিদ্যুতের আলোকে হৃষীকেশ চারিদিকে চাহিয়া আশ্রয় খুঁজিতেছেন, শীতে সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট, প্রবল বৃষ্টিতে পোষাক-পরিচ্ছদ ভিজিয়া জল ঝরিতেছে। শ্রান্ত, অবসন্ন, ভীত পথিকদ্বয়ের আর চলিবার ক্ষমতা নাই। ঝড়ে ভাঙ্গা ডালা-পালা বাতাসে খসিয়া গায়ে মাথায় পড়ে, অমনি চমকিত গিরিরাজ শিহরিয়া উঠেন। বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠে, অমনি সেই আলোকে পথ দেখিয়া হৃষীকেশ আগে আগে চলিতে থাকেন। প্রাণ-রক্ষার জন্যই শক্তি সংগ্রহ করিতে হয়।

কই আশ্রয় ? লোকালয় কই, শুধু বৃক্ষারণ্য, শুধু অন্ধকার, ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকা। শুধু উল্লসিত ভেককুলের বিরামহীন তীব্র রব।

প্রায় আধ ঘণ্টা এই ভাবে কাটিবার পর হঠাৎ বিদ্যুতালোকে হৃষীকেশ একটা সোজা ও সরল পথ দেখিতে পাইলেন।

"এসো এই পথে।" হৃষীকেশ ঘোড়ার মুখ ফিরাইলেন। শিক্ষিত শান্ত ঘোড়া প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী সেই পথ ধরিল।

চলিতে চলিতে হঠাৎ দূরে একটা আলোর রেখা দেখা দিল, আলোটা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছে। একটা ক্ষুদ্র আলোর রেখা, কিন্তু কি অভয়দাতা ! মরুভূমির মধ্যে পথিকের চোখে স্বচ্ছ জলাশয়ের চেয়েও আশ্বাস, ভরসাদায়ক।

কিসের আলো, কোথাকার আলো, কিছুই ঠিক নাই, ঘোর হতাশার মধ্যে আশার কণিকা মাত্র, তবু তাই দেখিয়া জীবন্মৃত পথিক দু'টির দেহে নববল আসিল। হৃষীকেশ বলিলেন, "ঐ আলো দেখা যাচ্ছে, আর চিন্তা নেই গিরি।"

তখন সেই আলোক-রেখা লক্ষ্য করিয়া দুইজনে সাধ্যমত তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলেন, মনে ভয়, বুঝি বা মরুভূমে মরীচিকার মত কখন উহা মিলাইয়া যায়।

হঠাৎ গিরিরাজের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, এই রকম নিস্তব্ধ, নির্জ্জন নিশাতেই তো ভৌতিক আলো চলিয়া বেড়ায়, বিপন্ন পথিককে ভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়া শেষে মিলাইয়া যায়। এ যদি তাই হয়?

অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কোন মতে গিরিরাজ ডাকিলেন, "ঋষি—"

"এসো এসো, আর দূর নেই।"

গিরিরাজ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন আলোটা স্থির হইয়াই জ্বলিতেছে, সঞ্চরমাণ নয়, পলাইবারও লক্ষণ নাই। আবার বলিলেন, "ও কিসের আলো ঋষি? বাড়ী-ঘর তো দেখছি নে, কিসের আলো?"

—"এত দূর থেকে কি বাড়ী-ঘর দেখতে পাবে, চল গিয়ে দেখছি কিসের আলো।"

এলোমেলো, উল্‌টা-পাল্‌টা ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টির ধারাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেছে, কি হিম ঠাণ্ডা, দাঁতে দাঁত লাগিয়া যাইতে চায়, তবু দুইজনে আশায় আশায় চলিতেছেন সমস্ত কষ্ট উপেক্ষা করিয়া।

আলোটা এইবার এক একবার লুকায় আবার দেখা যায়, হৃষীকেশ বলিলেন, "অনেক গাছপালা আছে ওখানে, তারই আড়াল পড়ছে।"

আর একটু আসিয়া গিরিরাজ বুঝিতে পারিলেন সত্য সত্য কোন ঘরের ভিতরকার আলো। পথ হইতে সেই বাড়ীটি পর্যান্ত বড় বড় গাছ, ঝড়ে ভাঙা ডালপালা, জল-পাতায় গাছের তলা ঢাকা, ঘোড়া চালাইবার পথ নাই। সেই গাছ-পালার মধ্যে খান কয়েক ঘরের আভাস বোঝা যায়, সামনের ঘরটির জানালা খোলা, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, দরজা বন্ধ। ঘরের সামনে মেটে বারান্দা।

ঘোড়া হইতে নামিয়া লাগাম ধরিয়া বারান্দার কাছ পর্যান্ত গিয়া দু'জন নিজ নিজ ঘোড়া বারান্দার খুঁটির সঙ্গে বাঁধিলেন, গিরিরাজ বলিলেন, "এদের কি উপায় করি?"

"দেখা যাক আমাদের যদি জায়গা হয়, ওদের কি হবে না?" বলিয়া বারান্দায় উঠিয়া সজোরে দুয়ারে ধাক্কা দিয়া উচ্চস্বরে ডাক দিলেন, "কে আছ দরজা খোল।"

[ক্রমশঃ]

নিজের পায়ে দাঁড়া

—শ্রীঅনিলা দেবী

পরের কথায় উঠিস্ বসিস্ এ-তোর কেমন ধারা ভাই?
পরের বুলি আউড়ে মরিস্ ভুলের এ যে বাড়া ভাই!
আপনারে তুই বোকার মত, পরের পায়ে করলি নত
ভাবিস কি তুই সেই গোলতেই হয়ে যাবি খাড়া ভাই?

নানান ছলে ভুলিয়ে তোরে, নেবে সে কাজ হাসিল করে,
হাজার ডাকেও পাবিনে তার সরল প্রাণের সাড়া ভাই!
আপন পানে চা'রে ফিরে, জীবনে তোর কাম্য কি রে,
তাই ধ'রে আজ নিজের পায়ে ভর দিয়ে তুই দাঁড়া ভাই!

নদীয়ার মৃৎশিল্প

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

চারুশিল্প মাত্রই শিল্পীর সূক্ষ্ম অনুভূতির স্বতোৎসারিত অভিব্যক্তি। মরমী হৃদয় ও দরদী দৃষ্টির সাহায্যে শিল্পীর অন্তরের সুপ্ত প্রতিভাই অনুপম ভঙ্গীতে রসায়িত হইয়া উঠে তাহার শিল্পে। এই অলৌকিক প্রতিভার সোনার কাঠি স্পর্শে নদীয়ার কুম্ভকারগণ সামান্য মৃত্তিকাস্তূপকে এমন অপরূপ প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন যে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পশালাগুলিতে তাহার বহু নিদর্শন সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে। নদীয়ার মৃৎশিল্প আজ ভারতের গৌরব, বাঙ্গালার সম্পদ্।

এই শিল্প নদীয়ার, তথা কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারদের জাতীয় ব্যবসায়। পুরুষানুক্রমে তাঁহারা ইহাতে আত্মনিয়োগ করিয়া শিল্প-সৃষ্টির অলৌকিক প্রতিভাকে বংশগত করিয়া ফেলিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কৃষ্ণনগরের কুম্ভকার-গোষ্ঠির ইহা আজ সহজাত সংস্কার। এই পালেদের আত্মীয়-স্বজন, জাতি-গোষ্ঠীর বাহিরে অদ্যাবধি কোথায় এই শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয় নাই। নদীয়া বা নদীয়ার বাহিরে যাঁহারা যেখানে এই শিল্প-চর্চ্চায় অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নদীয়ার কুম্ভকারগণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

কৃষ্ণনগর শহরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ঘূর্ণী পল্লীতে এই পালেরা বসবাস করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই পালগোষ্ঠী অতি বিস্তৃত ছিল বলিয়া জানা যায়। হান্টার সাহেব তাঁহার Statistical Account of Bengal গ্রন্থে ১৮৭২ খৃঃ ৪,০৬৩ জন কুম্ভকার কৃষ্ণনগরে বসবাস করিতেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য ইঁহারা সকলেই মৃৎশিল্পী না হইলেও হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি নির্ম্মাণ হইতে সুরু করিয়া সর্ব্বপ্রকার মৃত্তিকার কাজেই জীবিকা অর্জ্জন করিতেন।

কোন্ প্রাচীনকাল হইতে যে কৃষ্ণনগরে এই শিল্পের সূচনা, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদই আজ প্রামাণিক তথ্য হিসাবে পাওয়া যায় না। 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে' মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য সম্বন্ধে কিছু না থাকিলেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সাড়ম্বরে জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ আছে ও মূর্ত্তির প্রশংসা আছে (অদ্যাবধি কৃষ্ণনগরে এই পূজা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং কৃষ্ণনগরের পালেরাও এই দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণে তাঁহাদের শিল্প-প্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন)। এই জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি কৃষ্ণনগরের কুম্ভকার-গণই প্রস্তুত করিয়া দিতেন, এইরূপ মনে করিলে অষ্টাদশ শতকের প্রথমেই এই শিল্পকলা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

কৃষ্ণনগরে কবে কোন্ প্রাচীনকালে যে এই শিল্প-বিদ্যার প্রথম সূচনা হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা না গেলেও অষ্টাদশ শতকের খ্যাতনামা বিদ্যোৎসাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় যে ইহা যথোচিত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে এই কুম্ভকারগণের শিল্পনৈপুণ্য সমগ্র জগতের সুধী ও গুণী-সমাজে বারবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসাপত্র ও স্বর্ণপদকাদি লাভ করিয়াছে।

মৃৎশিল্পের বিস্মৃতপ্রায় অতীত ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমানকালের শিল্পীদের কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই কালাচাঁদ পালের নাম করিতে হয়। অনেকের মতে ঘূর্ণীর মৃৎশিল্পের এই বর্ত্তমান উৎকর্ষ ও নৈপুণ্যের প্রথম সূচনা হয় কালাচাঁদ পাল হইতেই। ইহারও পূর্ব্বে মৃৎ-শিল্পের চর্চ্চা অবশ্যই হইত তবে তাহা অধিকাংশই দেবদেবীর মূর্ত্তিগঠন ও যৎসামান্য কিছু খেলনা-পুতুল নির্ম্মাণ ইত্যাদিতেই পর্য্যবসিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কালাচাঁদ পাল সর্ব্ব-প্রথম এই শিল্পকে আন্তরিক অনুভূতি ও প্রতিভার স্পর্শ দিয়া নবভাবে উদ্বোধিত করিলেন। শিল্পীর নব নব কল্পনা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া ইহা ললিত শিল্পকলায় উন্নীত হইয়া ধন্য হইল।

কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ সতীশচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে কালাচাঁদ পাল একটি সুবৃহৎ নবনারীকুঞ্জর অর্থাৎ নয়টি সুন্দর রমণীমূর্ত্তি সুকৌশলে সংস্থাপন পূর্ব্বক একটি বিরাট হস্তিদেহ ও বত্রিশ জানোয়ারের যোদ্ধা অর্থাৎ বত্রিশটি

বিভিন্ন প্রকার অঙ্গ সন্নিবেশে একটি ঘোটকদেহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মূর্ত্তি দুইটি বহুদিন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তবে জনসাধারণের মুখে মুখে এখনও তাহার অপূর্ব্ব রচনাকৌশল ও শিল্প-নৈপুণ্যের কথা চলিয়া আসিতেছে।

কালাচাঁদের পরে তাঁহার উপযুক্ত ছাত্র পরাণ পাল এই শিল্পের আরও উন্নতি করেন। পরাণ পাল বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন করিয়া ও বিভিন্ন দেশের ভাস্কর-শিল্প সুনিপুণভাবে অনুধাবন করিয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে এই শিল্পের এতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন যে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ইণ্টারন্যাশানাল প্রদর্শনীতে স্বীয় শিল্পকলা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বোচ্চ পদক ও মানপত্র অর্জ্জন করেন। এই সময় হইতেই কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

পরাণ পালের প্রায় সমসাময়িক কালেই সুবিখ্যাত যদুনাথ পালের অভ্যুদয়। শ্রীরাম পালও এই সময়ে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু যদুনাথই যে ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিল্প-সাধনায় যদুনাথের বহু অলৌকিক কীর্ত্তি-কলাপের কাহিনী অদ্যাবধি গল্প হইয়া আছে, বর্ত্তমানে তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। যদুনাথ প্রথমে রাণীগঞ্জ পটারিতে কর্ম্মারম্ভ করেন কিন্তু নীরস ছাঁচ ঢালাই ও মোটা নক্সার কাজে যদুনাথের শিল্প-প্রবণ চিত্ত সন্তুষ্ট হইল না। কিছু দিন এইখানে কাজ করিবার পর তাঁহার মূর্ত্তি গঠনের অদ্ভুত প্রতিভাদৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া তদানীন্তন গভর্ণর সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী উপযাচক হইয়া যাদুঘরে মূর্ত্তি গড়িবার জন্য তাঁহাকে লইয়া যান এবং বিভিন্ন দেশীয় নর-নারীর প্রমাণ প্রতি-মূর্ত্তি গঠনের ভার তাঁহাকে দেওয়া হয়। এই কর্ম্মসূত্রে যাদুঘরের কিউরেটর মহাশয়ের সঙ্গে যদুনাথের মনোমালিন্য হয়। শিক্ষিত শিল্পী অশিক্ষিত যদুনাথের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চলিতে চাহিতেন না। তৎসত্ত্বেও যাদুঘরের কার্য্যে যে কয়দিন তিনি ছিলেন তেজস্বী যদুনাথ সর্ব্বদা আত্ম-মর্য্যাদা ও গর্ব্বের সঙ্গেই কর্ম্ম করিয়া যান।

অতঃপর গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া যদুনাথ অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন। কিন্তু কিছু পরে একটা তুচ্ছ ঘটনা লইয়া প্রীতির সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। একবার হ্যাভেল সাহেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একটি মূর্ত্তি গড়িবার অর্ডার পান। হ্যাভেল সাহেব মূর্ত্তি গড়িতেছেন, যদুনাথও অবসর সময়ে একান্ত নিভৃতে ও হ্যাভেলের অজ্ঞাতে ঐ মূর্ত্তি গঠন শুরু করিয়াছিলেন। কাজ শেষ হইয়া গেল, মূর্ত্তি লইয়া যাইবার সময়ে গ্রাহকগণ যদুনাথের গঠিত মূর্ত্তি দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে, হ্যাভেল সাহেবের গঠন-কার্য্য তাঁহাদের আদৌ মনঃপূত হইল না। হ্যাভেল ইহাতে নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া যদুনাথের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। এই মনোমালিন্যের ফলেই যদুনাথ আর্ট স্কুলের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ঘূর্ণীতে আসিয়া নিজস্ব শিল্পশালা গড়িয়া তুলেন, এবং এই শিল্পশালাই তখন বাঙ্গলা দেশের মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। যদুনাথের এই প্রকাণ্ড শিল্পশালা হইতে বহু শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া উত্তরকালে শ্রেষ্ঠ মৃৎশিল্পী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত পরাণ পালও যদুনাথের আত্মীয় ও প্রতিভাবান্ শিল্পী। যদুনাথ ঘূর্ণীতে শিল্পশালা নির্ম্মাণ করায় উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতা চলিত, এবং স্ব স্ব শিল্প-কৌশল ও গঠন-বৈশিষ্ট্য গোপন রাখিবার জন্য ঘরে দুয়ার দিয়া তাঁহারা নিভৃতে শিল্পকাজ করিতেন বলিয়া শুনা যায়।

যাহাই হউক যদুনাথের হাতে এই শিল্প এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, সেই সময়ই এই শিল্পের চরমোৎকর্ষের সময় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যদুনাথের চিত্রবিদ্যা ও শিল্পনৈপুণ্য এতদূর খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে অকুণ্ঠিত প্রশংসা করিয়া প্রশংসাপত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মাত্র কিছু দিন পূর্ব্বে ১০২ বৎসর বয়সে এই অলৌকিক প্রতিভাশালী শিল্পী যদুনাথ পরলোক গমন করিয়াছেন।

যদুনাথের পর তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র বক্কেশ্বর পালের নাম এইখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন। পিতৃব্যের অলৌকিক প্রতিভা বহুলাংশেই বক্কেশ্বর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদুনাথের ছাত্রবর্গের মধ্যে ও বর্ত্তমান শিল্পিগণের মধ্যে বক্কেশ্বরকেই একমাত্র প্রথম শ্রেণীর ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিতে হয়; এমন কি, প্রতিভার দিক্ দিয়া কোন কোন

স্থানে তিনি যদুনাথকেও যেন ছাড়াইয়া গিয়াছেন। মৃৎশিল্পে বক্রেশ্বর বহুবিধ নূতন জিনিষ উদ্ভাবন করিয়া এই শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করিয়াছেন, পরে তাহার উল্লেখ করিব। বক্রেশ্বর এখন বৃদ্ধ এবং বার্দ্ধক্যের ফলে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় সূক্ষ্ম কাজ কর্ম্ম করা আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না। তথাপি বক্রেশ্বরের শিল্পশালাই এখনও নদীয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বক্রেশ্বরের উপযুক্ত পুত্র নরেন্দ্র পালও পিতার প্রতিভার অধিকারী হইয়াছেন।

ঘূর্ণীর বর্ত্তমান শিল্পিগণের মধ্যে পরাণ পালের পুত্র ও যদুনাথের ভাগিনেয় ক্ষিতীশচন্দ্র ও সতীশচন্দ্রের নাম উল্লেখ-যোগ্য। যদু পালের নিকটেই ইহাদের কর্ম্ম শিক্ষা এবং বর্ত্তমানে ঘূর্ণীতে ইঁহারা বিশাল কর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন। এই কর্ম্মশালায় বহু কারিগর প্রতিপালিত হয় ও প্রচুর পরিমাণে শিল্প-দ্রব্য দেশ-বিদেশে প্রেরিত হয়। ইতালী, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও ইঁহারা শিল্প-দ্রব্য চালান দিয়া থাকেন।

বক্রেশ্বরের ভাগিনেয় হেমচন্দ্র, রাখালদাসের পুত্র বিজয়কৃষ্ণ, বিশ্বনাথ, রামনৃসিংহ, প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা প্রতিভাবান্ শিল্পী বর্ত্তমানে এখানে আছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৃৎশিল্পের প্রতিভা ঘূর্ণীর শিল্পিগণের সহজাত সংস্কার। কোন স্কুল কলেজে বৈজ্ঞানিকভাবে শরীর-তত্ত্ব বা মূর্ত্তি-গঠন কৌশল শিক্ষা না করিয়াও শিল্প সাধনায় ইঁহারা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। ঘূর্ণীর বালক-শিল্পিগণের নাম এই হিসাবে স্বাভাবিক শিল্পপ্রবণতায় দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখ করিতে পারি। এত অল্প বয়সে এতখানি প্রতিভার পরিচয় এতখানি ব্যাপক-ভাবে আর কোন দেশেই সম্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঘূর্ণীর পালেদের প্রত্যেক বালকই শিল্পী, তন্মধ্যে জন কয়েকের প্রতিভা অসাধারণ। রামনৃসিংহের বালকপুত্র বিষ্ণুপদ, ক্ষিতীশ পালের পুত্র কার্ত্তিক পাল, গোপেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র মণি, শ্রীরাম পালের বংশধর মহীতোষ পাল প্রভৃতি কয়েক জন উদীয়মান তরুণ-শিল্পী ভবিষ্যতে নদীয়ার এই শিল্প-গৌরবকে আরও বর্দ্ধিত করিতে পারিবে বলিয়া আশা করি। কার্ত্তিক ও বিষ্ণু বালক হইলে প্রতিমূর্ত্তি গঠনে অদ্ভুত কৌশল ও ক্ষিপ্রতা অর্জ্জন করিয়াছে। পাঁচ মিনিট কাল সময়ের মধ্যেই ইহারা যে কোন ব্যক্তির চেহারা প্রায় মোটামুটি নকল করিয়া ফেলিতে পারে।

কলিকাতার খ্যাতনামা গোপেশ্বর পাল ও নিতাই পাল ঘূর্ণীর পালেদের বংশোদ্ভূত ও এইস্থানেই তাঁহাদের শিক্ষা। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট বিলাতের ওয়েম্বলী প্রদর্শনীতে গোপেশ্বরকে পাঠাইয়া দেন। সেখান হইতে তিনি বহু অকুণ্ঠিত প্রশংসা, মান-পত্র ও স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। মূর্ত্তি-গঠনে ইঁহার নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতা সর্ব্বজনবিদিত।

নদীয়ায় মৃৎশিল্পকে সাধারণতঃ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা যায়।

১। হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তি ;
২। সম্পূর্ণ মনুষ্য মূর্ত্তি ;
৩। আবক্ষ মনুষ্যমূর্ত্তি ;
৪। পাচক, পুরোহিত, ভিস্তিওয়ালা, মুচি, সাধু, ভিক্ষুক প্রভৃতি বাঙলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের টাইপ বা রূপ ;
৫। জীব-জন্তু ;
৬। বঙ্গীয় প্রাকৃতিক, সামাজিক ও গৃহস্থালীর চিত্র ;
৭। পুরাতন বা ইতিহাসোক্ত ঘটনাবলীর মূর্ত্তি সমাবেশ ;
৮। মাছ, ফল, খাবার, তরিতরকারি ইত্যাদি ;
৯। যে কোন ছবি হইতে তাহার রিলিফ্ চিত্র।

মনুষ্যমূর্ত্তি গঠনে মাটির কাজ ছাড়াও প্যারি প্লাষ্টার ও সিমেণ্টের কাজ হইয়া থাকে।

উপরোক্ত বিভাগগুলির মধ্যে এক একটি বিভাগ এক এক জন শিল্পী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রথম প্রচারিত হয়। তন্মধ্যে মনুষ্য মূর্ত্তি (বাষ্ট বা ষ্ট্যাচু) প্রকরণে যদুনাথ, পরে বক্রেশ্বর, গোপেশ্বর, কার্ত্তিক, বিষ্ণু ইত্যাদিতে এই ধারা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বিভিন্ন জাতীয় সম্প্রদায়ের টাইপ প্রস্তুত বক্রেশ্বরই প্রথম করেন এবং এককালে বিলাতের প্রদর্শনীগুলিতে তাহা প্রচুর পরিমাণে চালান যাইত। সামাজিক ও গৃহস্থালীর বিভিন্ন চিত্র যদিও আজ অনেক শিল্পীই করিয়া থাকেন, কিন্তু বক্রেশ্বরই ইহার প্রধান উদ্ভাবক।

রিলিফ ছবিও বক্রেশ্বরের বৈশিষ্ট্য।



'টাইপ' প্রতিমূর্ত্তি : বামে দরবেশ : দক্ষিণে সন্ন্যাসী



'টাইপ' প্রতিমূর্ত্তি : বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ



আবক্ষ মূর্ত্তি (শেক্সপীয়র)

[শিল্পী – শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাল



সরস্বতী : শিল্পী—শ্রীতারকচন্দ্র পাল



শিল্পী বক্রেশ্বর

মৎস্য নির্ম্মাণ আজ-কাল খুবই সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বক্কেশ্বরের নির্ম্মিত মৎস্য অতি বড় সমালোচককেও বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। প্রদর্শনীতে একবার বক্কেশ্বরের ১৩০ প্রকার বিভিন্ন মৎস্য প্রদর্শিত হইয়াছিল।

দেবমূর্ত্তি গঠনেও নদীয়ার শিল্পিগণের প্রতিভা অসামান্য। প্রত্যেক দেবমূর্ত্তির শাস্ত্রীয় ধ্যানানুযায়ী গঠন ও বর্ণসমাবেশ, লীলায়িত ভঙ্গি ও দৃষ্টিতে স্বর্গীয় দেবভাব ফুটাইয়া তুলিতে ইহাদের সমকক্ষ কেহ নাই। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে কৃষ্ণনগরের শিল্পিগণ পূজার মূর্ত্তি গঠনের আহ্বান পাইয়া থাকেন।

ফল ও তরিতরকারী ক্ষিতীশ পালের কারখানায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে।

এইবার শিল্পের উপকরণ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিতে হয়। নদীয়ার মৃৎশিল্প উন্নতির যতগুলি কারণ আছে তন্মধ্যে বোধ হয় নদীয়ার মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যই প্রধান। শিল্পীরা বলিয়া থাকেন, এইখানকার নির্ম্মল দোয়াঁশ মাটির মত মূর্ত্তি-গঠনোপযোগী মাটী তাঁহারা বাংলার কোন জেলাতেই পান নাই। বিদেশে গিয়া কোন সূক্ষ্ম কাজ-কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হইলে অনেকে এইখানকার মাটী বাঁধিয়া লইয়া যান।

পুতুলের গঠন-নৈপুণ্যের কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তা' ছাড়া রঙ্-ফলানও ইহাদের অননুকরণীয়। এত সুন্দর ও স্বাভাবিক বর্ণবিন্যাস আর কোথাও হয় না বলিলে ভুল হইবে না। বর্ত্তমানে বিলাতী রঙ্ কিনিবারই অবশ্য ব্যবস্থা চলিতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে হরিতাল, গিরিমাটী, সীমপাতা ও কালকাসুন্দী পাতার রস ইত্যাদি দেশীয় উপাদান হইতেই তাঁহারা রঙ্ সংগ্রহ করিতেন। এই রঙের সঙ্গে গঁদের আঠার পরিবর্ত্তে এখনো তেঁতুলের আঠার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে; ইঁহাদের মতে রঙ্-ফলান কাজে গঁদের অপেক্ষা তেঁতুলের বিচির আটা অনেক বেশী কার্য্যকরী।

যাহা হউক, নদীয়ার এই যে শিল্প-গৌরবের কথা এতক্ষণ উল্লেখ করিলাম, দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট ও সহানুভূতি অভাবে তাহা আজ বিশেষ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। শস্তা জাপানী পুতুল বা জার্ম্মানী খেলনায় আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায় মাটীর পুতুলের চাহিদা আর নাই বলিলেও চলে। সৌখিন ভদ্রলোক অর্থব্যয় করিয়া সূক্ষ্মশিল্প ক্রয় করা অপব্যয় মনে করেন। ফলে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই সুকুমার শিল্প নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে। অদ্ভুত প্রতিভাশালী শিল্পীবৃন্দ আজ মৃৎসামান্য উদরান্ন সংগ্রহ করিতেই ব্যাকুল, 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' শিল্প সাধনা করিবার সময় বা উৎসাহ তাহার কোথায়? দেশের সত্যকার রসবোধ ও সহানুভূতির দৃষ্টি যদি আবার কখনও ফিরিয়া আসে, তবেই এই শিল্প রক্ষা পাইতে পারে, নচেৎ নহে।

ভারতীয় ঋষিগণের অভ্যুদয় কাল

...ভারতীয় ঋষিগণ যে সময়ের লোক, সেই সময়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমান বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের অথবা সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না। ইতিহাসের কথায় আস্থা স্থাপন করিলে বলিতে হইবে যে, সেই সময়ে জগতের প্রত্যেক মানুষ হয় ঋষি, নতুবা ঋষির সন্তান অথবা শিষ্য হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় ঋষিগণের সন্তান ও শিষ্যগণই উত্তরকালে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। কাযেই, ঋষিগণের প্রাচীন গ্রন্থে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সমান অধিকার এবং ঐ গ্রন্থগুলিতে যদি গৌরবের কিছু আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই গৌরবের বস্তু। এক কথায় ঋষিগণের গ্রন্থগুলিকে মানবধর্ম্মের গ্রন্থ অথবা জীব প্রকৃতির বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। যদি কেহ মনে করেন যে, ঐ সকল গ্রন্থ সম্প্রদায়বিশেষের বস্তু, তাহা হইলে তাঁহাকে ভ্রান্ত মনে করিতে হইবে।

মানুষ যখন আবার প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানিতে পারিবে, তখন আমাদের কথায় সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। তৎকালে জগতের সর্ব্বত্র সমাজ কিরূপভাবে সংগঠিত হইয়াছিল, তাহা ঐ গ্রন্থগুলি সম্যক্‌ভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে বুঝিতে পারা যায়। অন্যান্য সমস্ত দেশের সেই সংগঠন বহুদিন পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়াছে। এখনও সেই সংগঠনের ধ্বংসাবশেষ কেবলমাত্র ভারতবর্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে। কাযেই, যদি কোন ভারতবাসী প্রাচীন সংগঠনের ঐ বাস্তব ধ্বংসাবশেষের সহিত মিলাইয়া ঋষিগণের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উহা বুঝা সম্ভব হইতে পারে। অন্য কোন জাতির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।...

বীরকুমার

—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বেলা নটা। বৌবাজারের সব-জান্তা বোর্ডিংটায় হট্ট-গোল তখন পুরোদমে, বোর্ডারদের কলধ্বনিতে। চাকুরে যারা তাদের কেউ তখন স্নান করছে, কেউ দাঁতন করছে—কেনদৃষ্টি কিন্তু কলঘরের দিকে। কেউ খেতে বসেছে, কেউ সাজ-গোজ করে তৈরী, বেরলেই হয়। হাজরী দিতে হবে প্রায় সবাইকে দশটা দশ মিনিটে। বাঙ্গালীর অপবাদ, সময়ের মূল্য তারা জানে না। এ অপবাদের স্খালন কেরাণী বাবুরা কিন্তু কতকটা করে, আফিস যাবার উদ্যোগে।

কলঘরের পরদার বাইরে বিপিন তখন মুখিয়ে দাঁড়িয়ে কলঘর দখল করতে। নরেন ছেলে পড়িয়ে বাসায় ফিরে, সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বিপিনকে বললে, "কি হে আজ এত তাড়া, বারটার ত ঢের দেরী।"

বিপিন গম্ভীর হয়ে বললে, "সকাল সকাল একটু কাজ আছে।"

"'ক্লারিয়ন কল্'-এ (clarion call) সাড়া দেওয়া না কি!" মুচকে হেসে নরেন উঠে গেল। আড়-চোখে চেয়ে বিপিন মনে মনে বললে, "গ্রাজুয়েটী গ্যাদা এবার না ভাঙি"—মনের বাকি কথা ক'টা মনেই মিলিয়ে রইল।

দু'বার আই. এ. ফেল করে বিপিন প্রাণ সঁপে দেয় দেশের কাজে। মিটিং-এর যোগাড় করতে, চাঁদা আদায় করতে, ভলান্টিয়রের পাণ্ডাগিরি করতে, বন্যার সাহায্যে কীর্ত্তনের দল নিয়ে ঘুরতে তার উৎসাহ কি! দেশের গা এতে ফুলে উঠুক আর নাই উঠুক তার নিজের পেট ফুলিয়ে রাখবার সুবিধা এতে হল। কর্ম্মফল 'শ্রী পেটায়' অর্পণ করতে উৎসাহ হল তার অসীম।

বিপিনের এই বৈচিত্র্য বাসার যারা চাকুরে তাদের মনে কোনও আঁচড় কাটতে পারলে না। নরেনদের দল কিন্তু তার পিছনে ফিঙের মত লেগে রইল। "ধন্য বিপিন! তার কাছে তারা কতটুকু!" তারা বলে আর মুখ টিপে টিপে হাসে। কর্ম্মীর সূক্ষ্ম সৃষ্টি ধরে ফেললে তা' অনায়াসে। কর্ম্মকাণ্ডে অবনত বিপিনের চিত্ত তাতেও টলল না। নিষ্কামীর জ্যোতি চোখ মুখে ফুটে উঠল। নরেনদের দিনগত পাপ-ক্ষয়ের সুবিধা তাতে বেশীই হল।

ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিয়ে তাই ঘুরে ঘুরে দিনকতক খেয়ে নরেনদের ক'জনের কারও জোটে প্রাইভেট্ টিউশনী, কেউ বা সাহিত্যের অঙ্গনে পড়ে ঘাড় গুঁজড়ে। সেই সঙ্গীন অবস্থায় যেন ত্রাণকর্ত্তারূপেই তাদের সামনে উদয় হয় বিপিন। শিক্ষাদানের মহত্ত্ব যতই হউক, আর সাহিত্যসাগরের রস যতই উথলে উঠুক, অভাবের জীবনে সে বড় পরিপাক হয় না। বাস্তব জীবনের কঠোরতাই তাতে বাধা দেয়। সে অবস্থায় বৈচিত্র্যের বুভুক্ষায় বিপিন লাভ কি কম কথা!

নরেন ঘরে ঢুকে দেখে রুমমেট গিরিশ সেদিনের খবরের কাগজখানা যেন গিলছে আর পাশের ঘরের অনুকূল তার কোনও প্রতিকূলতা করছে না। তারই বেডে সে পড়ে আছে চিৎ হয়ে। ঘরে নরেন ঢুকল—তার দিকে গিরিশ ফিরেও দেখলে না। অনুকূল আড়-চোখে একবার দেখে পাশমোড়া দিলে। গায়ের কামিজটা খুলতে খুলতে নরেন বললে, "যুদ্ধটা তা হলে সত্যিই বাধল।"

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে গিরিশ বললে, "হুঁ, সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডিং-এর মালিকও যুদ্ধং দেহি বলে আহ্বান করে গেল।"

নরেন। কি রকম?

গিরিশ। বলে আজ থেকে মাসে ২৷৹ টাকা বেশী চার্জ্জ পড়বে। অনুকূল তাতে বলে, "কচু-ঘেঁচুও যুদ্ধে লাগবে না কি যে, সে-সবেও টান পড়বে, চার্জ্জ বেশী কেন দেব বলুন তো?" তাতে সে বলে, "তর্কের দরকার কি মশাই, পোষায় থাকবেন, না পোষায় না থাকবেন।" অনুকূল চটে গিয়ে বলে, "যান যান বলবার যা বলা হয়েছে তো—আমাদের যা করবার আমরাও যথা সময়ে করব।" গস্ গস্ করতে করতে লোকটা চলে যায়। অনুকূলও বিছানায় কাৎ হয়ে পড়ে।

নরেন। এসে দেখলাম তো চিৎ।

অনুকূল। তামাশা নয়, আমি সব ক্ষেপিয়ে দেব।

নরেন। কাদের হে ?

অনুকূল। কেন সব বোর্ডারকে।

গিরিশ। বল ও' কাগজেও—

নরেন। 'মবিলাইজ' ক'রতে হবে বৈকি। তামাশা তো নয় দস্তুরমত যুদ্ধ। তবে কি জান অনুকূল, এ ইংলণ্ড নয় আর তুমি চেম্বারলেনও নও যে সাড়া পাবে। তুমি যাদের সত্য ব'লছ খানিক পরে আফিসে গিয়ে শুনো বোর্ডিং হাউসের চার্জ্জ বৃদ্ধির অছিলায় এর মধ্যে তারা ওয়ার এলাউন্স-এর বায়না শুরু করে দিয়েছে। লড়াই যদি চলে 'এলাউয়েন্স' কিছু বাড়বে আর সুড়্সুড়্ করে তারা বাড়তি চার্জ্জ দেবে।

গিরিশ। আর কাগজওয়ালারা আমাদের দিয়ে বিড়াল-তপস্বীর কান্না শুরু করিয়ে দিয়ে আমাদেরই কারও বাড়া ভাতে ছাই দেবে আর কারও অবস্থা এমন করবে যে, এক-বেলাও পেট ভরে খাওয়া তার ভার হবে।

অনুকূল। তা হলেই বোঝ—আর নরেন তোমারও তো ওয়ার এলাউন্সের আশা নেই।

নরেন হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল, বললে, "আশা! মূলে হাবাত না হই। ছাত্রটী যে মেধাবী! দু'দুবার ক্লাস্ প্রমোশন পায় নি। সামনে 'হক্‌ইয়ারলি'। ফস্ করে দেশের তরে নিজেকে বলি দিতে গা ঢাকা না দেয়! শুনেছি গত যুদ্ধে এমন অনেক হয়েছে। 'হিস্‌ট্রি রিপিট্‌স্ ইট্‌-সেল্‌ফ (history repeats itself', তা ক'রলেই ত গেছি। যাক, এক কাজ করা যাক্, বিপিনকে নাচিয়ে মুরুব্বি খাড়া করা যাক্ তাতে কিছু হ'তে পারে। ভলান্টিয়ার টলেন্টিয়ার লেলিয়ে—"

গিরিশ। কি সম্ভাবেই তার সঙ্গে রেখেছ! সে ভিড়বে! রামচন্দ্র—

নরেন। সে ভার আমার। আচ্ছা এখনই তার জমি করছি।

যাঁ ক'রে বিপিনের ঘরে গিয়ে একটু পরেই বিপিনকে নিয়ে নরেন এলো। এসে বললে, "নিজের কাণে এদের মুখে সব শোনো, তোমরা থা'কতে ভদ্রলোককে একটা হোটেলওয়ালা—"

বিপিন ব'ললে, "আপনার মুখে যা শুনেছি তাই যথেষ্ট। কাজটা সেরে আসি। ফিরে এসে—"

নরেন দু'পা এগিয়ে বিপিনের হাত দু'টো ধ'রে গাঢ় ভাবে ব'ললে, "বিপিন বয়সে তুমি ছোট, কিন্তু এসবের অভিজ্ঞতায় আমাদের সবার চেয়ে সত্যিই বড়।"

বিপিন খুশী হ'য়ে তখন যেন বিনয়ের প্রতীক। ব'ললে, "কি যে বলেন নরেনবাবু! আচ্ছা এখন আসি।"

বিপিন উঠে গেলে সহাস্যে নরেন অনুকূলকে ব'ললে, "হোটেলওয়ালাকে এখনই আল্‌টিমেটম্ দাও।"

তারপরে তিনজনে হেসে গড়াগড়ি।

নরেন, গিরিশ আর অনুকূল আর বিলম্ব না ক'রে স্নানাহার সেরে নিলে। বেরবার দরকার সে দিন কারো-রই ছিল না। যে যার নিজের ঘরে সবাই একটু গড়িয়ে নেবার জন্য শুলো। বেলা তিনটের সময়ে অনুকূল নরেন-দের ঘরের দরজার কাছে এসে দেখে, নরেনের দস্তুরমত নাক ডাকছে কিন্তু গিরিশ জেগে ঘুমিয়ে। ঘরে সে আর ঢুকল না, বাইরে থেকেই ব'ললে, "একটু ঘুরে আসি।"

অনুকূল চলে যেতেই গিরিশ বিছানায় উঠে ব'সল। খেয়ে দেয়ে শোবার মিনিট দশেক পরেই নরেনের নাক ডাকা আরম্ভ হয়, আর গিরিশের এপাশ-ওপাশ করেই সময় কেটেছে। এলোমেলো কতকগুলো কথা ভাবতে ভাবতে সে এমন চঞ্চল হ'য়ে পড়ে যে, ঘুম তার কাছে ঘেঁসতেও পারেনি। উঠে বসেও সে সেই সব কথা ভাবতে লাগল।

খবরের কাগজে ঢুকে গত যুদ্ধের অনেক কাহিনী অনেক সময়ে তাকে ঘাঁটতে হয়। তা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বাঙালীর ছেলের সেবক বা সৈন্য-বাহিনীতে যোগদানের সব কথাই সে জানতে পারে। যুদ্ধের শেষে দেশে ফিরে তাদের কারও কারও বড় বড় চাকরীতে ঢোকার ঘটনাও তার চোখ এড়ায় নি। সেই সব কথা এখন ভাবতে ভাবতে তার মনে এক কল্পনার উদয় হ'ল। বিছানায় উঠে ব'সে সেই কল্পনায় সে গা ঢেলে দিলে। অন্যমনস্কভাবে সে ডাকলে 'নরেন'। সাড়া না পেয়ে কাগজ, কলম, দোয়াত

নিয়ে কাগজের জন্ত গিরিশ প্রবন্ধ লিখতে ব'সল। তন্ময় হ'য়ে পাতার পর পাতা সে লিখে গেল। লেখা শেষ ক'রে আর একবার প্রবন্ধটা পড়ে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মন হাল্কা হ'ল। বর্ত্তমান যুদ্ধে বাঙালীর কর্ত্তব্য প্রবন্ধে নির্দ্ধারিত ক'রে সে বিশেষ সন্তোষলাভ করলে।

লেখা কাগজ সব গুছিয়ে গিরিশ উঠবে, আড়মোড়া খেয়ে নরেন গিরিশের দিকে চেয়ে বললে, "কি হে, ফাঁকের ঘরে কাজ গুছোলে! যাক, কটা বাজল?"

গিরিশ বললে, "বেশী আর কি, প্রায় ছটা।" তড়াক করে লাফিয়ে উঠে নরেন বললে, "এ্যাঁ—চা খেয়েছ? খাও নি? চল চল একটু তাজা হয়ে আসি।"

দুই বন্ধুতে বেরল। চঞ্চলতার ঘোরে ঘুমন্ত নরেনকে ডেকে গিরিশ যে-কথা বলবার জন্ত ব্যস্ত হয়েছিল জাগ্রত নরেনের কাছে তার উচ্চবাচ্যও সে করলে না।

ওদিকে রাস্তায় বেরিয়ে অনুকূল দেখে, কলকাতা তোলপাড়। হকার হাঁকছে, 'লড়াইকা টেলিগ্রাফ্ এক্ এক্ পয়সা।' হুড় হুড় করে কাগজ বিক্রি হচ্ছে। খবর পড়ে বিজ্ঞের মত সব কি মাথা-নাড়া, বুক্‌নিই বা কত রকমের! সকলেই যেন 'ফিল্ড-মার্শাল্।' কার বা কো হো, কারও বা হা। কিসের যে এত আনন্দ তারাই জানে। কলিকাতা 'বম্ব্‌ড্' (bombed) হবার সম্ভাবনা, অসম্ভাবনার কথা তেবে কারও কি গভীর অনুশীলন। কেউ সঙ্গীকে বলছে, "ও হে মনের মতন করে বাড়ী-ঘর তো করলে কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াল যে সঙ্গীন"। উত্তর শোনা গেল, "কি আর করব ভাই, বিপদ যদি ঘটে আমার তো একার হবে না।" বক্তা তাতে একটু মুচকে হাসলে। বক্তৃতার উৎসাহ দেখে মনে হল, কলকাতা তছনছ হয়ে যায়, এ যেন তার মনোগত ইচ্ছা। এমন মজা! ভাবটা আর সবাই যাবে, তিনি কিন্তু রয়ে যাবেন!

জার্ম্মানের জের কলকাতাতেও যে হুলস্থুল বাধিয়ে দিয়েছে তার আরও কত প্রত্যক্ষ প্রমাণ কত রকমে যে অনুকূল পেলে। কাপড়ের দোকান থেকে কাপড় খরিদ করে ক্রেতা বেরল, রাস্তার লোক জিজ্ঞাসা করছে, "কতয় নিলেন মশাই?" রাগে মুখ নেড়ে ভদ্রলোক বললে, "আর বলবেন না মশাই, আজই জোড়া পিছু দু'আনা, দশ পয়সা চড়া, গলায় ছুরি দেওয়া এ নয়!"

পেরেক কিনতে গিয়ে রেগে বেরিয়ে এসে কেউ বলছে, "ডাকাত, চার আনা সের—বলে দু'টাকা!" দেশী দেশলাই ফিরি করতে করতে ফিরিওয়ালা হাঁকছে, "দো দো পয়সা।"

এমনি সব জিনিষের দর বেড়ে যাওয়ার ব্যাপার শুনে অনুকূল বাসায় ফিরছে, দু'জন প্রবীণ ভদ্রলোকের কথা তার কাণে পৌঁছিল। একজন বলছেন, "জার্ম্মানীর পোলাণ্ড গ্রাস আর স্বেচ্ছাচারিতা করে জিনিষপত্রের এখানে এই দর বাড়ানর মধ্যে তফাৎ কি বলতে পার?" হেসে অপরে কি বললেন, অনুকূল ঠিক ধরতে পারলে না।

অনুকূলের মনে পড়ে গেল, 'যুদ্ধের অনিষ্টকারিতা' প্রবন্ধ লিখে ক্লাসে সে ফার্ষ্ট হয়েছিল। সে এখন ব্যাক্ নাম্বার।

বাসায় ফিরে অনুকূল দেখে নরেনদের ঘরে হাত মুখ নেড়ে বিপিন বলছে, "নিশ্চিন্ত থাকুন আপনারা। জোঁকের মুখে নুন দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি অবস্থা এইখানে এমনি সময়ে হোটেলওয়ালার কাল হবে।"

গিরিশ সে কথায় বড় সায় না দিলেও নরেন ঐকান্তিক ধন্তবাদ জানিয়ে বিপিনকে বললে, "ও হে বিপিন, লোক আমরা চিনি। চিনি বলেই মধ্যে মধ্যে ঠাট্টা-তামাশা আমরা করি, উস্কে দিয়ে পাকা মালের সার সংগ্রহ করতে।"

আহ্লাদে ডগমগ হয়ে বিপিন চুপ করে রইল। অনুকূলকে দেখে নরেন বললে, "যুদ্ধ ঘোষণা করে দাও; জয় অনিবার্য্য।" কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে অনুকূল বিপিনের দিকে চেয়ে রইল। বিপিন লজ্জা করে বললে, "ওসব কিছু না। যাই, কাপড়-চোপড় বদলে মুখ হাত পা ধুয়ে নি।"

বিপিন যেতে অনুকূল বললে, "ও ভাই কচু-ঘেঁচুরও দর বেড়ে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়।"

নরেন। কি রকম?

অনুকূল বাজারের ব্যাপার বললে। সব শুনে নরেন বললে, "এই দেশে জাতীয়তা। হায় রে কপাল!"

পরদিন সকাল হ'তে না হ'তে গিরিশ উঠে মুখ হাত ধুয়ে বেরল খবরের কাগজ কিনতে। কাগজ কিনে আর

দেরী সইল না, রাস্তাতেই পড়তে শুরু করে দিলে। যুদ্ধের টেলিগ্রাম গুলো দেখে, পাতা উল্টোতে উল্টোতে তার নজরে পড়ল, যুদ্ধের জন্য বাঙালী পল্টন গড়বার আলোচনা করতে সেই দিনই এক মিটিং হবার খবর। উদ্যোগীরা জানিয়েছেন, সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হতে যাঁরা চান, মিটিংএ অতি অবশ্য যেন তাঁরা উপস্থিত থাকেন। মিটিং-এর স্থান আর সময় গিরিশ ভাল করে দেখে নিলে।

বাসায় ফিরে ঘরে গিয়ে গিরিশ কাগজখানা নরেনের কাছে ছুঁড়ে দিলে। কাগজ পড়ে রইল। দু'কাপ চা তৈরী করে, নরেন এক কাপ গিরিশকে নরেন এগিয়ে দিলে। নিজের কাপে চুমুক দিতে দিতে নরেন বললে, "আচ্ছা পাগল যা হ'ক, চা না খেয়েই কাগজ কিনতে দৌড়লে!"

তারপরে কাগজ খুলে টেলিগ্রামের বড় বড় হেড্‌লাইন পড়ে তখনকার মত কাগজ পড়া শেষ করে নরেন বললে, "যাই ছেলে খেদিয়ে আসি। আজ আফিস বেরচ্ছ বোধ হয় গিরিশ। যাই কর এখানকার সান্ধ্য যুদ্ধের কথা মনে আছে তো ?" উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ঘর থেকে বেরল। বেরিয়ে অনুকূলের ঘরে ঢুকে তাকেও যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দিলে। বাকি রইল বিপিন। তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখে সে ঘরে নেই, শুনলে খুব সকালে বেরিয়ে গেছে, বলে গেছে এ বেলা বাইরে খাবে। মুখ টিপে হাসতে হাসতে নরেন বেরিয়ে পড়ল।

নরেন যখন বাসায় ফিরল, বেলা তখন দশটা হয়ে গেছে। গিরিশ বা অনুকূলকে সে দেখতে পেলে না। একটু এদিক্-ওদিক্ করে স্নানাহার সেরে কাগজ নিয়ে শুলো। দু'মিনিটেই কাগজ হাত থেকে পড়ে গেল, চোখে তন্দ্রা জেঁকে বসল। আফিসে গিয়ে গিরিশ বাসায় লেখা প্রবন্ধটা সম্পাদককে পড়ে শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কম্পোজ করতে পাঠাব কি ?"

সম্পাদক গাঢ়-ভাবেই বললে, "চমৎকার প্রবন্ধ, খুব সময়োপযোগী। কিন্তু বড় কর্তাদের বিচার মীমাংসার আগেই ছাপাবেন ? বলে না বসেন, রাজভক্তির গড়াগড়ি।"

গিরিশ বললে, "দেখুন, অতি বড় শত্রুরও ঘোর বিপদে মানুষকে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করতে দেখেছি, শুনেছি—মানুষের এ ধর্ম্ম। এক্ষেত্রে তো একটা সম্পর্ক—"

সম্পাদক উত্তর দিলেন, "আর বলতে হবে না, কপি প্রেসে পাঠিয়ে দিন।"

বেলা যখন প্রায় দুটো, গিরিশ সম্পাদকের কক্ষে গিয়ে সম্পাদককে বললে, "আজকের সব কাজই সেরে ফেলেছি। এখন আমি যেতে পারি ? নিজের কাজে একটু তাড়া আছে।"

সম্পাদক। আমি এখনি ভাবছিলুম আপনাকে ডেকে বলি, বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠন সম্বন্ধে আজকের মিটিং-এ একবার ঘুরে আসুন। তা'—

গিরিশ। যাওয়া খুব দরকার। বেশ সেখানেই যাব, কাজ আমার ওই পথেই।

সম্পাদক। তাহলে আর দেরী করবেন না, বেরিয়ে পড়ুন।

সম্পাদককে নমস্কার করে গিরিশ আফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সভাক্ষেত্রের দ্বারে গিরিশ যখন পৌঁছল মিটিং বসবার তখন আর বিলম্ব নেই। ভেতরে যেতেই তার চোখ পড়ল বিপিন সেখানে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। তার চোখ এড়িয়ে গিরিশ তাড়াতাড়ি এক জায়গায় বসে পড়ল। 'প্রেস'-এর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গেল না।

মিটিং যখন বসল হলঘর তখন প্রায় ভর্ত্তি হয়ে গেছে। প্রবীণ, নবীন—উৎসাহের অভাব কোনও পক্ষে নেই। ধনী ধনমর্য্যাদা ভুলে প্রাণ খুলে এসে দাঁড়িয়েছে সাধারণ সভাক্ষেত্রে।

সভার কার্য্যতালিকা দীর্ঘ নয়; সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় প্রথমেই জানিয়ে দিলেন। বাঙালী সেবা ও সৈন্যদল গত মহাযুদ্ধে গঠিত হওয়া, ও কার্য্যক্ষেত্রে তাদের কার্য্যদক্ষতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে অনুরূপ সেবা ও সৈন্যদল পুনর্গঠনে বাঙালী যুবকের বিশেষ আগ্রহের কথা তিনি উল্লেখ করলেন। কথার কথা এ নয়, তা প্রমাণ করতে সভাক্ষেত্রের এক অংশে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে তিনি বললেন, "আহ্বানের কোনও আড়ম্বর নাই তথাপি ওই দেখুন শতাধিক যুবক কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে আজ এখানে উপস্থিত, সৈন্যদলভুক্ত হতে তাঁদের সম্মতি জানাতে। সভার শেষে আজই এ-সংখ্যা উপস্থিত অজ্ঞাত যুবকের আগ্রহে যে বর্দ্ধিত হবে, আমি

সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আমরা আজ মিলিত হয়েছি গবর্ণমেণ্টকে এই কথা জানিয়ে তাঁদের যথাকর্ত্তব্য পালনে অনুরোধ করতে। আমার এই প্রস্তাবে সভার অভিমত কি ব্যক্ত করতে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।"

সভাপতির প্রস্তাব সভা একবাক্যে সমর্থন করলে, 'বন্দে-মাতরম' ধ্বনিতে সভাক্ষেত্র মুখরিত হ'ল। সর্ব্বশেষে সভা-পতি জানালেন, সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হ'তে যাঁরা সম্মত, এখনই তাঁরা খাতায় নাম-ধাম লেখাতে পারেন, বা পত্র লিখেও সে কার্য্য পরে করতে পারেন।

নাম লেখাতে অনেক যুবক অগ্রসর হ'ল। গিরিশ দে'খলে তাদের সে কার্য্যে বিপিন সাহায্য ক'রছে। নরেন সভাক্ষেত্র ত্যাগ করে ট্রামে উঠে ব'সল। ট্রামে ব'সে তা'র মনে হ'ল, এই সভার বিশেষত্ব অল্প কথায় কাজের কথা বলা। সভার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হ'বার কামনা সর্ব্বান্তঃকরণে সে করলে। ছ'টা প্রায় বাজে এমন সময়ে নরেন বাসায় উপস্থিত হ'ল।

নরেন আর অনুকূল তখন ঘর জুড়ে বসে। গিরিশকে দেখে নরেন ব'ললে, "আমরা বলাবলি করছিলুম তুমি বুঝি মধ্যে ভঙ্গ দিয়েছ। এত দেরী যে?"

গিরিশ বললে, "আফিসের একটা কাজে দেরী হ'য়ে গেল। তারপর, 'অ্যালাই'-এর (ally) খবর কি? সময়ে পাওয়া যাবে তো?"

সভাক্ষেত্রে বিপিনের ব্যাপার দেখে, তা ফেলে চট ক'রে তার আসা সম্ভব কি না মনে হওয়াতে গিরিশ এই কথা ব'ললে।

অভিনেতার গাম্ভীর্য্য মুখে এনে নরেন ব'ললে, "তোমার এ-কথার অর্থ? সন্দেহ-দোলায় কেন তুমি দোলায়িত? বিপিনবাবু কি সাধারণ—"

গিরিশ। বিপিনকে যে চোখে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি বোধ হয় তাতে তার ওপর আমাদের অন্যায় করাই হয়।

বিপিন সম্বন্ধে গিরিশের কথার সুর যেন অন্তরকমের মনে হ'ল। মুখের দিকে চেয়ে নরেন দেখে একটুও হাল্কাভাব তো গিরিশের মুখে নেই। ঠাট্টা ক'রে সে কি ব'লতে যাবে, বাসার সামনে রাস্তায় উচ্চ কণ্ঠে নিনাদিত হ'ল, 'বন্দে-মাতরম্'। তার পরেই খাকি ইউনিফর্ম পরা ১৫।২০ জন যুবক হুড়হুড় করে বাসার ওপর উঠে এল। এসেই তিন চার জন ক'রে সার দিয়ে সামনের ঘর কটার দরজা আগলে দাঁড়াল। তার পরে তাদের আবার 'বন্দেমাতরম্'।

হকচকিয়ে দৌড়ে এল হোটেলওয়ালা, "এ কি!"

খাকি পরার মধ্যে একজন তার কাছে গিয়ে ব'ললে, "আপনি মালিক?" সেই মালিক শুনে যুবক ব'ললে, "আমরা জা'নতে চাই লড়ায়ের অছিলায় বোর্ডিংএর চার্জ্জ আপনি বাড়াবেন কি না?"

কি ভেবে হোটেলওয়ালা বেশ ভড়কে গেলো। শুক্‌নো হাসি হেসে সে ব'ললে, "না না লড়াই ব'লে হোটেলের চার্জ্জ বাড়াতে যাবো কেন?"

দস্তুর মত স্যালিউট্ ক'রে যুবক ব'ললে, "ধন্যবাদ।" তারপরে 'হুইসিল' দিয়ে দল নিয়ে সে নেমে গেল। রাস্তার মোড় পেরিয়ে একটা গলির মুখে বিপিন দাঁড়িয়ে ছিল। খাকির দল সেখানে যেতে সে ব'ললে, "কাজ ফতে?" উত্তর এল—"আল্‌বাৎ।"

সর্দ্দারের পিঠ চাপড়ে বিপিন ব'ললে, "বহুৎ আচ্ছা! এখন চললুম, সেই কোন সকালে বেরিয়েছি।"

বিপিন আর দাঁড়াল না। খাকির দল গিয়ে ঢুকল নিকটে একটা চায়ের দোকানে।

বোর্ডিং-এ তখন মস্ত সোরগোল। চাকরের দলের গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়ানাড়ি কি—"বাবা কোম্পানীর অর্ডিনান্স তার ওপর আবার বন্দেমাতরম-এর বেঁধে-মার, ট্যা-ফোঁ এবার আর চ'লছে না।"

এরাই হার বৃদ্ধির প্রস্তাব কালে মালিককে কতই না বাধিত করেছিল, "বাড়াবার সময়ে বাড়াবেন বৈ কি। আপনি কি ট্যাঁকের কড়ি বার ক'রে আমাদের পু'ষবেন। এর পরেই মালিক ও অনুকূলে সেই বাক্‌বিতণ্ডা। চাকরেরা একটু বাধা দিলে মালিক অনুকূলের সামনে অতো বুক ফুলিয়ে বোধ হয় দাঁড়াত না।

বাসায় ফিরে বিপিন সরাসরি নিজের ঘরে ঢুকল। রুম্-মেট্ বাসায় একটু আগে তুমুল কাণ্ডের কথা শুনিয়ে দিলে। শুনে বিপিন বললে, 'বটে—তাই তো।" সেই কাপড়েই সে মালিকের কাছে গেল। দেখলে মালিক অধোমুখে

ব'সে রয়েছে। গৌরচন্দ্রিকা কিছুমাত্র না ক'রে বিশেষ 'কিন্তু' ভাব দেখিয়ে বিপিন ব'ললে, "মশাই আমাকে মাপ ক'রতে হবে। এখানে ওরা হানা যে দেবে আগেই আমি খবর পেয়েছিলুম। এটা বন্ধ করা যেতো। কাজের গতিকে কথাটা ভুলে যাওয়াতে গোল হ'য়ে গেল এর জন্য আমি বিশেষ লজ্জিত—"

বোর্ডিংওয়ালা জোর ক'রে হেসে ব'ললে, "না না, এর জন্যে আপনি কিন্তু বোধ ক'রছেন কেন। আপনাকে একটা কাজ ক'রতে হবে। গিরিশবাবু আর অনুকূল বাবু যে কাগজওলা আমি জানতুম না। আমার বোর্ডিংএর অনিষ্ট যাতে না হয় ওঁদের একটু অনুরোধ ক'রবেন।"

"নিশ্চয়ই, এখনই যাচ্ছি" ব'লে বিপিন সটান নরেনদের ঘরে চলল। ঘরের দু'জন তো সেখানে ছিলই। আর, যার কারণে এই তুমুল যুদ্ধ, সেই অনুকূলও তখন সে ঘরে। নরেন বিপিনকে গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন ক'রে ব'ললে, "বাহাদুর ছেলে বটে—"

কথা শেষ হবার আগেই বিপিন ব'ললে, "আরও খবর আছে। মালিক গিরিশবাবু আর অনুকূল বাবুর শরণাগত।" ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনজনে চাইতে, বিপিন সব কথা খুলে ব'ললে।

হো হো ক'রে এতে হাসবার কথা। 'সম্ভ্রম' বজায় রাখতে চাপা হাসি হেসে সন্তুষ্ট হ'তে হ'ল সকলকে। বিদায় নিয়ে বিপিন নিজের ঘরে গেল।

বিপিন যেতে গিরিশ নরেনকে ব'ললে; "বিপিন খুব অপদার্থ ব'লে কি মনে হয়—"

নরেন চোখ দুটো টেনে ব'ললে, "দু'এক ধোপ দেখে ব'লব।"

কদিন পরের কথা। বিশাল ও শক্তিশালী জার্মানীর বিবাদে স্বদেশ-রক্ষায় ক্ষুদ্র পোলাণ্ডের অপূর্ব্ব বীরত্বে জগৎ বিস্ময়াবিষ্ট। এ বীরত্বের পুরস্কার কি ধ্বংস? ভগবানের বিচারে এ-কি সম্ভব? না না অধর্ম্মের বিনাশে, ধর্ম্মের জয়সাধনে সর্ব্বশক্তিমানের অণুপ্রেরণায় ক্ষুদ্র পোলাণ্ড পরিণত হ'বে দমগ্র বিশ্বে। ভয় কি! দিনের পর দিন গিরিশের এই কথাই মনে জমাট বাঁধতে লাগল। ক্ষুদ্র, অতি-ক্ষুদ্র গিরিশ, সে এ-কথা ভাবে কেন! তার ভাবনার মূল্য কি? মূল্য থাক আর নাই থাক, এ চিন্তা তো তার মন থেকে যায় না—তার এ কি হ'ল!

গিরিশের একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন যে ঘটেছে, অন্তত নরেন তা' লক্ষ্য ক'রলে। শ্লেষ ক'রে সে ব'লতেও শুরু ক'রলে, "কি হে সাংবাদিক থেকে ফিলজফারের ধাপে পা বাড়াচ্ছ না কি? তোমার কটা প্রবন্ধেও যেন সেই আমেজ আছে।"

একটু হেসে কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা গিরিশ কদিনই করেছে। দু'খানা চিঠি হাতে ক'রে নরেন কিন্তু যে-দিন তার হাতে দিলে, তা প'ড়ে তারই একখানা নরেনকে দিয়ে গিরিশ বললে, "পড়।"

চিঠিখানা খাস গবর্ণমেন্টের দপ্তর থেকে গিরিশকে লেখা। নরেনের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হবার আবেদনের উত্তর। গবর্ণমেন্ট জানিয়েছেন, "বাঙালী সৈন্য গঠন সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত এখনও না হলেও আবেদনকারীর যোগ্যতার কথা বিবেচনা করে সাধারণ সামরিক বিভাগের একটী পদে তাঁকে এখন নিযুক্ত ক'রতে গবর্ণমেন্ট প্রস্তুত, কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশানুসারে আবেদনকারী যদি ভারতের যে-কোনও স্থানে বা ভারতের বাহিরে যেতে প্রস্তুত থাকেন।"

চিঠি প'ড়ে নরেন স্তম্ভিত—"এ কি গিরিশ! ভেতরে ভেতরে কবে এসব ক'রলে আর গবর্ণমেন্টই বা বেছে বেছে এমন যোগ্য লোক কি ক'রে চিনে ফেল'লে—পাগলা গারদে যাকে রাখা উচিত। যাক আর একখানা চিঠি বুঝি, দেখাবার নয়—"

কথার কোনও উত্তর না দিয়ে দ্বিতীয় চিঠিখানা নরেনের দিকে গিরিশ ঠেলে দিলে।

খামের মধ্যে পাওয়া গেল, একখানা নয়—দুই খানা চিঠি। এক খানা সম্পাদকের গিরিশকে লেখা। আর একখানা গবর্ণমেন্টের—সম্পাদককে লেখা।

সম্পাদক লিখেছেন—"গবর্ণমেন্ট থেকে চিঠিখানা কদিন এসেছে। আপনার প্রবন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ কতদূর সন্তুষ্ট হয়েছেন এর সঙ্গে পাঠান গবর্ণমেন্টের চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবেন সঙ্গে সঙ্গেই জবাব আমি দিয়েছি। তাতে

প্রবন্ধ-লেখক কে, জানিয়েছি। লেখকের নাম, ধাম জানান সংবাদপত্র মহলে নীতি-বিরুদ্ধ হলেও এক্ষেত্রে সে নীতি অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি নি। আপনাকে জানালে পাছে আপনি আপত্তি করেন সেই আশঙ্কায় না জানিয়েই আমি এ কার্য্য করেছি। অপরাধ হয়ে থাকে সে-অপরাধ আমি মাথা পেতে নিলুম। আপনার মঙ্গলসাধন-সম্ভাবনার পথ বন্ধ ক'রে নিরপরাধ থাকার মত মনোবৃত্তি আমার নেই। সাক্ষাতে এই সব কথা বলব ভেবেছিলুম, কিন্তু কদিন আফিসে আপনি না আসায় আপনি হয় তো অসুস্থ ভেবে চিঠিতে সব জানালাম। আশা করি আপনার সাক্ষাৎ শীঘ্র পাবো।"

গবর্ণমেণ্টের চিঠির অর্থ সম্পাদকের চিঠিতে ব্যক্ত হ'লেও নরেন সেখানাও একবার প'ড়লে। পড়ে ব'ললে, "তোমার যোগ্যতার মাপকাঠি তা হ'লে তোমার সেই প্রবন্ধ। হুঁঃ, খেলোয়াড় তো তুমি কম নও।"

উত্তেজিত হ'য়ে গিরিশ ব'ললে, "খেলোয়াড় !"

নরেন। খেলোয়াড় নও ? এ কার্য্য বাপের অজ্ঞাতসারে হয়েছে ?

গিরিশ। বাবাকে আভাসে জানিয়েছি। বিস্তারিত ভাবে লিখে এবার তাঁর অনুমতি চাইব।

নরেন। অনুমতি যদি না পাও—

গিরিশ। গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবে।

গিরিশকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে নরেন ব'ললে, "গিরিশ তুই এত' বড়, এত' দৃঢ়চিত্ত এতদিন কাছে কাছে থেকেও কিছুই তো জানিতে পারি নি ভাই। গবর্ণমেণ্ট ব'লে কথা। এক আঁচড়ে যোগ্যতা, অযোগ্যতা গবর্ণমেণ্ট বুঝবে না তো বুঝবে কে ?"

অনুনয়ের সুরে গিরিশ ব'ললে, "বোঝাবুঝির এখন বেশী কাজ নেই। আর গিরিশের মহত্বের পরিচয় তুমি পেয়েছ পেয়েছ, আর কারও কাছে প্রকাশ করে কাজ নেই।"

জোর ক'রে মাথা নেড়ে নরেন ব'ললে, "নিশ্চিন্ত থাকো, কেউ শুনবে না।"

সে কথা ঘরের বাহিরে দরজার পাশে একজন শুনে মুচকে হেসে পা টিপে-টিপে পালাবে নরেন চেঁচিয়ে ব'ললে "কে ও ?" সাড়া না পেয়ে উঠে গিয়ে দেখে, বিপিন মুক্তকচ্ছ হয়ে পালাচ্ছে।

ফিরে এসে নরেন গিরিশকে বললে, "ওহে বিপিন ধোপে টেকে কি না এবার জানা যাবে।"

এক চারদিনের দিন গিরিশের পিতা দুর্গাপদ বাবু বোর্ডিং-এ হঠাৎ এসে উপস্থিত। ছেলের চিঠি পেয়েই দেশ থেকে তিনি ছুটে এসেছেন ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

ছেলেকে দেখে ছোট ছেলের মত তাকে বুকে করে নিয়ে বাপ গাঢ় স্বরে বললেন, "যেতে দেবো না। কোথায় যাবি আমাদের এই বয়সে অমনি করে ফেলে। যাস যদি পিতৃমাতৃ-হত্যার পাতক তোকে অর্শাবে। বৌমা আসন্ন-প্রসবা, আহা সেও কি বাঁচবে।"

বাপের পায়ের ধুলো নিতেও ছেলেকে বাপ অবসর দেন নি। বিনয়-বচনে ছেলে ব'ললে, "এত অধীর আপনি হচ্ছেন কেন ? আপনার অনুমতি না হ'লে আমি কোনও কাজ করতে পারি, একথা আপনি মনে করলেন কি করে ?"

আনন্দে গদ-গদ হ'য়ে দুর্গাপদ বাবু ব'ললেন, "এই তো আমার গিরিশ। চল্ বাবা ঘরের ছেলে ঘরে চল্—"

গিরিশ। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কর্ত্তৃপক্ষকে কিন্তু জানান দরকার, কর্ম্মগ্রহণে আমার বাধা-বিঘ্ন কত। আপনাকে দেখলে, আপনার কথা শুনলে হয়ত আপনা হতেই তারা আমাকে অব্যাহতি দেবে, আমাকে কিছু বলতে হবে না। আপনি আমার সঙ্গে থাকলে ভাল হয়।

দুর্গাপদ বাবু বললেন, "নিশ্চয়ই যাবো।" ব'লে নরেনকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি ?"

গিরিশ বলিল, "আমার বিশেষ বন্ধু, সহোদরের অধিক স্নেহ করেন। এই অনুকূল, এই বিপিন। এরাও আমার বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।" তিনজনে দুর্গাপদ বাবুর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার ক'রলে। দুর্গাপদ বাবু সকলকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে নরেনকে নিয়ে দুর্গাপদ বাবুর ফিরতে একটু দেরীই হ'ল। দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে

নরেনের মনে হ'ল দু'জনেই যেন অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লচিত্ত। ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে সে উভয়ের মুখপানে চেয়ে রইল, কি হ'ল শুনতে। অপেক্ষা বেশী করতে হ'ল না। একটা চৌকিতে বসে দুর্গাপদ বাবু বললেন,

"গিরিশই জিতলে। সম্মতি আমাকে দিয়ে আসতে হ'ল। সহজে দিইনি, কিন্তু পরধর্মী হয়েও সাহেব যখন বললেন, 'হিন্দু আপনারা, ললাট-লিখন বোধ করবার কোনও উপায় নাই, এ সংস্কার আপনাদের অস্থিমজ্জাগত। তবু কেন বিধাতার বিধির ওপর কারসাজি করতে আপনাদের এত চেষ্টা, বোঝা শক্ত। কামানের মুখে পড়েও মানুষ ফিরছে আর ঘরে বসে খেতে খেতে কত লোক দম আটকে মরছে। ব'লবেন, তা বলে জেনে শুনে বিপদের মুখে কি পা দিতে হবে! নিশ্চয়ই না। কিন্তু কল্পনায় বিপদের সৃষ্টি করে মানুষের কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হওয়ায় যে কত বিপদ সে কথা তো একবারও কারও মনে হয় না। ললাট-লিখনের দোষই এখানেও হয়ত দেবেন, পুরুষকারের নামও করবেন না, এ কি জেনে শুনে বিপদে পা দেওয়া নয়? আপনি প্রবীণ! আপনাকে উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। আমি যা বললুম, বন্ধু ভাবেই বললুম। আপনার পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা উচিত মনে হয় করবেন।'

"সাহেবের কথা শুনে গিরিশকে বললুম, 'তুমি কিছু বলবে?' অকপটে গিরিশ বললে, 'আপনার সিদ্ধান্ত আমি মাথা পেতে নেবো।' আমি বিচলিত হলুম। মনে হ'ল এমন ছেলের আন্তরিক মনোবাসনা পূর্ণ ক'রবার পথে অন্তরায় হওয়াও তো বাপের উচিত নয়। সাহেবকে বললুম, 'আপনি বন্ধু, আপনি হিতৈষী আপনার হাতে ওকে সঁপে দিলুম। ভিন্ন-ধর্ম্মী হলেও আসুন আমরা দু'জনে ভগবানের চরণ ধ্যান করে তাঁর শরণাগত হই। মঙ্গলময় গিরিশের মঙ্গল করবেন'।"

নরেন চেয়ে দেখলে দুর্গাপদ বাবু তদগতচিত্ত। ভাবঘোরে তিনি বলে চললেন, "আমার কথায় সাহেব উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে আমার হাত ধরে বললেন, 'আসুন।' হাঁটু গেড়ে আমরা বসলুম ভগবানের চরণ ধ্যানে। আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ধ্যানশেষে আমার মনে হ'ল হৃদয়তাপ আমার প্রশমিত। গিরিশ আমায় প্রণাম করলে। সাহেব বলে উঠলেন, 'ভগবানের কৃপায় ওই চরণ-ধূলি লৌহবর্ম্ম হয়ে সতত তোমায় রক্ষা করবে'।"

বলা শেষ হ'ল। নির্ব্বাক হয়ে প্রাণ-মন দিয়ে নরেন তা' শুনছিল। দুর্গাপদ বাবু নীরব, তবু তার নীরবতা ভঙ্গ হ'ল না। নীরব কক্ষে এলো বিপিন, একখানা চিঠি গিরিশের হাতে দিয়ে সে বললে, "চিঠির বাক্সে ছিল নিয়ে এলুম।" চিঠি দিয়ে সে চলে গেল।

খামখানা রেখেই সেটা দু'ভাঁজ করে হাতের মধ্যে গিরিশ রেখে দিলে। তা' লক্ষ্য করে দুর্গাপদ বাবু বললেন, "চিঠি কোথা থেকে? বাড়ীর না কি—"

বাপের কথায় ছেলের মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল। তাও বাপ দেখলেন। "মুখে হাতে একটু জল দিয়ে আসি," বলে বাপ বাইরে গেলেন।

অনুকূল তখন হেসে বললে, "কি, Her Majesty's Warrant (মহারাণীর পরওয়ানা) বোধ হয়। বোঝ এবার ঠেলা, মিষ্টি কথায় বুড়ো বাপকে তুষ্ট করার কারসাজি ওখানে চলবে না। নাও নাও কাজ সেরে নাও, ওয়ারেণ্ট খানার মর্ম্ম উদ্ঘাটন কর। তার সুযোগ করে দিতেই কর্ত্তা ঘর থেকে গেলেন, সময় নষ্ট কোরো না।"

সময়ক্ষেপ গিরিশ করলে না। ছোট্ট চিঠি, পড়তেও বিলম্ব হ'ল না। পড়েই সেখানা নরেনের হাতে গিরিশ দিলে। নরেন হেসে বললে, "আমাকে দিয়ে তো কোনও উপায় হবে না, উকিল ব্যারিষ্টার হতুম আলাদা কথা। যাক্ দিলে যখন—দেখি।" নরেন দেখলে চিঠিতে লেখা:

"এ চিঠি পাবার আগে বাবা নিশ্চয়ই কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁর মুখে এখানকার খবর সবই শুনতে পাবে, সুতরাং সে সব কিছু লিখলুম না। যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোনও কাজে তোমার ঢোকবার কথা তোমার চিঠিতে প'ড়েই তিনি ছুটে চলেছেন—হায় রে বাপের প্রাণ! যাকে কিছু খুলে ব'লে যান নি। তিনি যখন বলেন নি আমিও কিছু বলি নি।

"আমার মতামত তুমি জানতে চেয়েছ। আশ্চর্য্য—তোমার আর আমার মত কি ভিন্ন! তোমার যাতে মত আমারও তাতে মত। যেথায়, যে-কাজে তুমি যাও না কেন, বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে, আমার এয়োতের জোরে অক্ষত

শরীরে আবার আমার কাছে তুমি ফিরে আসবে। একটা কথা, বাপের অমতে কোন কাজ করবার কল্পনাও কোরো না।"

চিঠি প'ড়ে অস্বচ্ছ কণ্ঠে নরেন ব'ললে—" 'আমার পাগল ভাই, পাগলী আমার বোন।' বাবাটীও ত এদেরই বাবা। পাগলের দলে প'ড়ে আমিও পাগল না হই—নাঃ, এর একটা বিহিত করতে হবে!"

দুর্গাপদ বাবু এসে পড়ায় কথার স্রোতে বাধা পড়'ল। নরেন কেবল ব'ললে, "চিঠিখানা এসেছে বাড়ী থেকেই, খবর সব ভাল।"

"বেশ বেশ। দেখ গিরিশ, কালই কলকাতা থেকে আমি রওনা হ'ব। তুমিও চল একবার ঘুরে আসবে। ছুটি ব'লতে কাজে ঢোকবার হুকুম করে হবে, বলা তো যায় না তার আগেই ঘুরে আসা ভাল!"

সেই কথাই ঠিক হ'ল। সন্ধ্যার পরে বিপিন এসে দুর্গাপদবাবুকে ব'ললে—"আজ্ঞে আমি তীর্থদর্শনে যাবো।" খুব খুসী হ'য়ে দুর্গাপদ বাবু বললেন—"কবে, কোথায়?"

বিপিন "আগামী কাল। আপনারা যেখানে যাবেন।" হেসে দুর্গাপদ বাবু ব'ললেন, "আমাদের দেশ দেখতে যাবে? বেশ তবে সেটা তীর্থস্থান নয়।"

বিপিন। "নয়! যে-দেশে আপনার মত বাপের বা যে-দেশে গিরিশ বাবুর মত ছেলে জন্মায়—যে দেশের নারী সন্তাকার অর্দ্ধাঙ্গিনী তার চেয়ে বড় তীর্থ—থাক সে কথা। এতটা বয়স মেকি নিয়েই আছি। আসলের সন্ধান যখন পেয়েছি, মেকির মায়া আর না পেয়ে বসে, তারই উপায় ক'রতে আমার তীর্থে যাওয়া। আশীর্ব্বাদ করবেন আমার মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয়। যাবার যোগাড় ক'রতে আমি চ'ললুম।"

বিপিন চ'লে গেল। দুর্গাপদ বাবু চুপ করে ব'সে কি ভাবতে লা'গলেন। জনান্তিকে নরেন বিপিনকে ব'ললে, "পাগলামীর বীজাণু প্রাণ ভরে ছড়িয়ে দিয়েছ—"

নরেন বললে, "স্বীকার করলুম না কম দিয়েছি, কিন্তু বিপিন খোপে টিকেছে কি না, ব'ললে না তো।"

একটী ছোট্ট হুঁঃ বলে নরেন ঘাড় বাঁকালে।

দেশের ষ্টেশনে নেমেই দুর্গাপদ বাবু সংবাদ পেলেন বধূমাতা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন। তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। গভীর আনন্দভরে বিপিন ব'ললে—"বীরের দেশে এসেই নূতন বীরের আবির্ভাব সংবাদ পেলুম। নূতনকে 'বীরকুমার' নামে পরিচিত করতে আপনাদের আপত্তি আছে কি?"

পৌত্র-লাভে পরমানন্দে ভাসমান পিতামহ ব'ললেন, "বাঃ বাঃ বেশ নাম। সত্যই ও 'বীরকুমার'।" গর্ব্বভরে পিতা পুত্রের মুখের দিকে চাইলেন। শ্রদ্ধায় পুত্রের মস্তক নত হ'ল।

'তীর্থে' পৌছে বিপিন দেখলে মন্দিরপ্রাঙ্গন আর তার চতুঃসীমা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জ্যোতির্ম্ময়—চোখ তার জুড়িয়ে গেল। সেথায় কোলাহল নাই, পূজার আড়ম্বর নেই, আছে ভক্তের নীরব নিবেদন আর দেবতার নীরবে তাহা গ্রহণ। বিপিনের মনে হ'ল তীর্থের এ সেরা তীর্থ। সোনার বাংলার ইতিহাসে এর প্রাচুর্য্যের কথা সে শুনেছে। কোথায় গেল সেই তীর্থময় বাঙ্গালা! তীর্থ-দেবতার পায়ে সভক্তি অঞ্জলী প্রদান করে বিপিন বেরিয়ে প'ড়ল গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রতে। অসম্পূর্ণ শিক্ষা তার, কিন্তু সেই শিক্ষাতেই তার পেটের ভাতের সংস্থান করতে হবে, পূর্ণ শিক্ষিতদেরও টেক্কা মারতে হবে। সোজা পথে তো তা হবার যো নেই। কাজেই উল্টো পথ সে ধরলে, সাজগোজ করে সে হ'ল দেশ-সেবক। স্বার্থ-সেবকের দেশ-সেবা 'জহুরী'র হাতে পড়ে 'আসল' বলে চালানও হ'ল, কোনও রকমে দুমুঠো ভাতের যোগাড়ও হ'ল। উৎসাহে বিপিনের দিন প্রথম প্রথম মন্দ চ'লল না। চলল বটে কিন্তু পরিপাক যে হয় না! দেশ-হিতের অছিলায় তার ব্রত দেশের অহিত-সাধন। কি করবে সে, উপায় কি—পোড়া পেট যে মানে না। আর মন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে, নরেন, গিরিশের মত পাশ-করাদের 'ঔদ্ধত্যে'। দেশদ্রোহী হ'য়েও সুতরাং দেশ-সেবক সেজে তাকে বসে থাকতে হ'ল। গিরিশের ঘটনায় তার মনে ঝড় উঠল। আশ্রয়ের জন্য সে বেরিয়ে প'ড়ল ছুটে। তারই ফলে বিপিনের 'তীর্থযাত্রা'। তীর্থে এসে গ্রাম-প্রদক্ষিণের পিপাসা তার হবেই তো।

পথে বেরিয়ে বিপিন যেখানে যায়, সেইখানেই দেখে কচুরীপানার সব কর্ত্তি, খোঁজ করে দেখলে সাজা দেশ-সেব-

…শের অভাব এ গ্রামেও নেই। অজ্ঞাতে একটা ছোট্ট নিশ্বাস তার প'ড়ল। পরিচ্ছন্ন মন্দির-সন্নিকটে এত রকমের আবর্জ্জনা! বিপিন শিউরে উঠল। পা তার আর এগোয় না। অন্যমনস্ক হ'য়ে সে কি ক'রবে ভা'বছে, সে শুনলে সুর সংযোগে কে গাইছে "আমার দেশ।" তার অঙ্গে তপ্ত শলাকা যেন কে বিঁধিয়ে দিলে। গ্রাম-প্রদক্ষিণের উৎসাহ তার উবে গেল। ফেরবার জন্য সে পা বাড়িয়েছে, একটু দূরে পেছন থেকে গিরিশের ডাক তার কানে পৌছুল। ঘাড় ফিরিয়ে বিপিন দেখলে গিরিশ কজন যুবককে নিয়ে তারই দিকে আসছে। বিপিন সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

কাছে এসে গিরিশ ব'ললে, "এঁদের আজ মিটিং। তোমার কথা এঁরা শুনেছেন, মিটিং-এ তুমি উপস্থিত থাক বলবার জন্য এঁরা যাচ্ছিলেন—"

বিপিন। সৌভাগ্য, পথে দেখা হ'য়ে গেল, কষ্ট করে ওঁদের এতটা পথ যেতে হ'ল না। গিরিশ, মিটিং-এর হুজুক অনেক করেছি বটে, ও সবে আমি আর নেই। আমায় মাপ ক'রতে হবে, মিটিং-এ যেতে আমি পা'রব না।"

গিরিশ বিপিনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। সঙ্গীদের মধ্যে একজন ব'ললে, "আপনি ত' জানেন যুদ্ধের অছিলায় 'প্রফিটিয়র'-রা কি অত্যাচার ক'রছে। আমাদের পাড়াগাঁয়ের দোকানদারেরা তাতে পেয়ে বসেছে, জিনিষ পত্রের দাম যার যা খুশী ধ'রছে। লোকে তা দেবে কোথা থেকে। কাজেই এর মধ্যে উপবাস পর্ব্ব শুরু হবার উপক্রম। এর উপায়—"

বিপিন। মিটিং ক'রে কি ক'রবেন? বড় বড় লোক মিটিং করে 'পল্লীসংস্কার' যা করেছেন, আপনাদের এই দেশ-ভূঁয়ে নিজের চোখেই ত' তো দেখছি। আপনারা যখন মিটিং করেন পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে আপনারাও নিশ্চয় মাথা ঘামিয়েছেন। ফল কি হয়েছে ব'লতে পারেন?"

বিপিনের স্পষ্ট কথায় কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। মিটিং-বাইগ্রস্ত যুবকদের মুখে বিরক্তির ভাবই দেখা গেল। তাদের একজন কি ব'লতে যাবে, এমন সময়ে নাতিবৃদ্ধ একজন রাগে কাঁপতে কাঁপতে সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। গজগজ করতে করতে সে ব'ললে, "মগের মুল্লুক কি না, 'ডবল দাম নইলে বেচব না!' বেচো কি না দেখছি, কোম্পানীর রাজত্ব, ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ দেখনি! দারোগাকে—"

মিটিং-উৎসাহী একজন বললে, "শুনছেন মশাই, মিটিং ক'রে এ-সবের প্রতিবাদ না ক'রলে—"

বৃদ্ধ যুবকদের দেখে ব'ললে, "ও, তোমরা তারাই না? আটগণ্ডা পয়সা নিয়েছিলে, বলেছিলে পাঁচজনের কাছে চাঁদা নিয়ে তাই দিয়ে গরীবকে অমনি ওষুধ দেবে—সব ধাপ্পাবাজি—"

গিরিশ চুপি চুপি বিপিনকে ব'ললে, "কি হে কি রকম 'তীর্থ'—"

বিপিন হেসে ব'ললে, "তীর্থের আশপাশে এ সব থাকা চিরন্তন।"

বৃদ্ধের অনুযোগের পরেই গ্রামের উৎসাহীরা স্থানত্যাগের জন্য চঞ্চল হ'য়ে পড়ল। স্থানত্যাগে তাদের সুযোগ ক'রে দিতে বিপিন বললে, "তাহ'লে আমরা আসি।" উচ্চবাচ্য না ক'রে তারা চলে গেল। বৃদ্ধও গজগজ করতে করতে চলে গেল।

বাড়ী ফিরতেই দুর্গাপদ বাবু গিরিশকে বলেন, "আফিসের চিঠি এসেছে, এই নাও। তিন দিনের মধ্যে যাত্রা করতে হবে।"

চিঠি নিয়ে, চিঠি পড়ে পিতা-পুত্রে আর কোনও কথা হল না। মুখের কথা না হলেও মনের দ্বার রুদ্ধ রইল না। তার যে কত কথা, মুখের কথায় তা হয় না।

তিন মাস পরের কথা। গিরিশ নরেনকে লিখেছে, "বিপিনের ধোপে টেকার সার্টিফিকেট তুমি দিয়েছ খুব ভাল। অনুরুদ্ধ হয়েও আমাদের দেশের মিটিং-এ যেতে সে যখন অস্বীকার করে তখনই মনে হয়েছিল ফাঁকা আওয়াজে সে আর গলবে না। কচুরীপানা ধ্বংস, মজা পুষ্করিণী উদ্ধার, ভদ্র বেকারের অন্ন-সংস্থানের চেষ্টা প্রভৃতি বিপিন যা ক'রছে লিখেছ, তা কখনও যে তোমার বা আমার দ্বারা করা সম্ভবপর হ'ত, আমার মনে হয় না। পাকা-পোক্ত প্রফেসর হয়েও হোটেলের মায়া এখনও ছাড়তে পারনি কেন যে, ঠিক বুঝলুম না। লিখেছ, হোটেলওয়ালা এখন অন্য মানুষ, আমার কথা তুলে সে সকলের কাছে গর্ব্ব করে। হোটেলে তোমার পড়ে থাকা কি তাকে পুরস্কৃত করতে? পাগলামীর

বীজাণু তা হ'লে তোমাতেও ঢুকেছে। ভাগ্যে আমার পাগলামী হয়েছিল মানুষের মনুষ্যত্বের একটা অপূর্ব্বত্ব তাই অনুভব করতে পারলুম। ভারতীয় সৈন্য জমায়েত হয়েছে এখানে অনেক। তাদের সরলতা, তাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা, তাদের সহিষ্ণুতা, তাদের পরিশ্রমশীলতা দে'খলে মনে হয় না, তুচ্ছ কটা টাকার লোভে তাদের এই সব অমূল্য প্রাণ অকাতরে উৎসর্গ করতে তারা আগুয়ান—বীরকুলোদ্ভব, বীরশ্রেষ্ঠ তারা, বীরধর্ম্ম পালনেই তারা অগ্রসর। আর আমরা—থাক সে কথা। কমিসেরিয়েটে আমার চাকরী। বিপদসঙ্কুল রণক্ষেত্রের তুলনায় আমার অবস্থিতি লৌহ-বেষ্টিত দুর্গে।"

দুর্গাপদ বাবু যে চিঠি পান, তাতে লেখা "আপনাদের আশীর্ব্বাদে ও ভগবানের কৃপায় কর্ত্তব্যপালনের শক্তি যেন আমি অর্জ্জন করি—পথ যতই বিপদসঙ্কুল হোক না কেন। আমার বিশ্বাস কর্ত্তব্যপালনে যদি আমি সমর্থ হই, কোনও বিপদই আমার ঘটিবে না।"

ন'মাস পরের কথা: সামরিক বিভাগের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ দুর্গাপদ বাবুকে জানান, "আপনার পুত্র বদলী হইয়া শীঘ্রই কলিকাতার আফিসে যোগদান করিবেন। আমরা সন্তোষ সহকারে জানাইতেছি এখানকার হেড আফিসে তাঁহার ন্যায় একজন কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন হওয়াতে তাঁহাকে আনা হইতেছে।"

চিঠি নিয়ে হাসিমুখে দুর্গাপদ বাবু গৃহিণীকে শুভসংবাদ দিতে গেলেন। পৌত্র তখন পিতামহীর সঙ্গে যুদ্ধরত। পিতামহের উপস্থিতি দ্বিতীয় শত্রুর আগমন জ্ঞানে বীরকুমার তাঁর দিকে ধাবিত হ'ল। পিতামহ আনন্দের আবেগে তাকে কোলে তুলে নিলেন। জয়োল্লাসে বীরকুমার পরাজিতের সম্পত্তি লুণ্ঠন ক'রলে—পরাহতের হাতের চিঠি জেতার লালা-সিক্তিত হল।

হো হো ক'রে হেসে পিতামহ ব'ললেন, "বীরের বেটা বীর! দেখব কত বড় বীর, বাপ বেটায় লড়ে। তাকে হারিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পার তবে না।"

গিরিশের আগমন-সংবাদ বিপিনের "তীর্থ"-এর উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দিলে শতগুণে।

কেরাণী

—শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

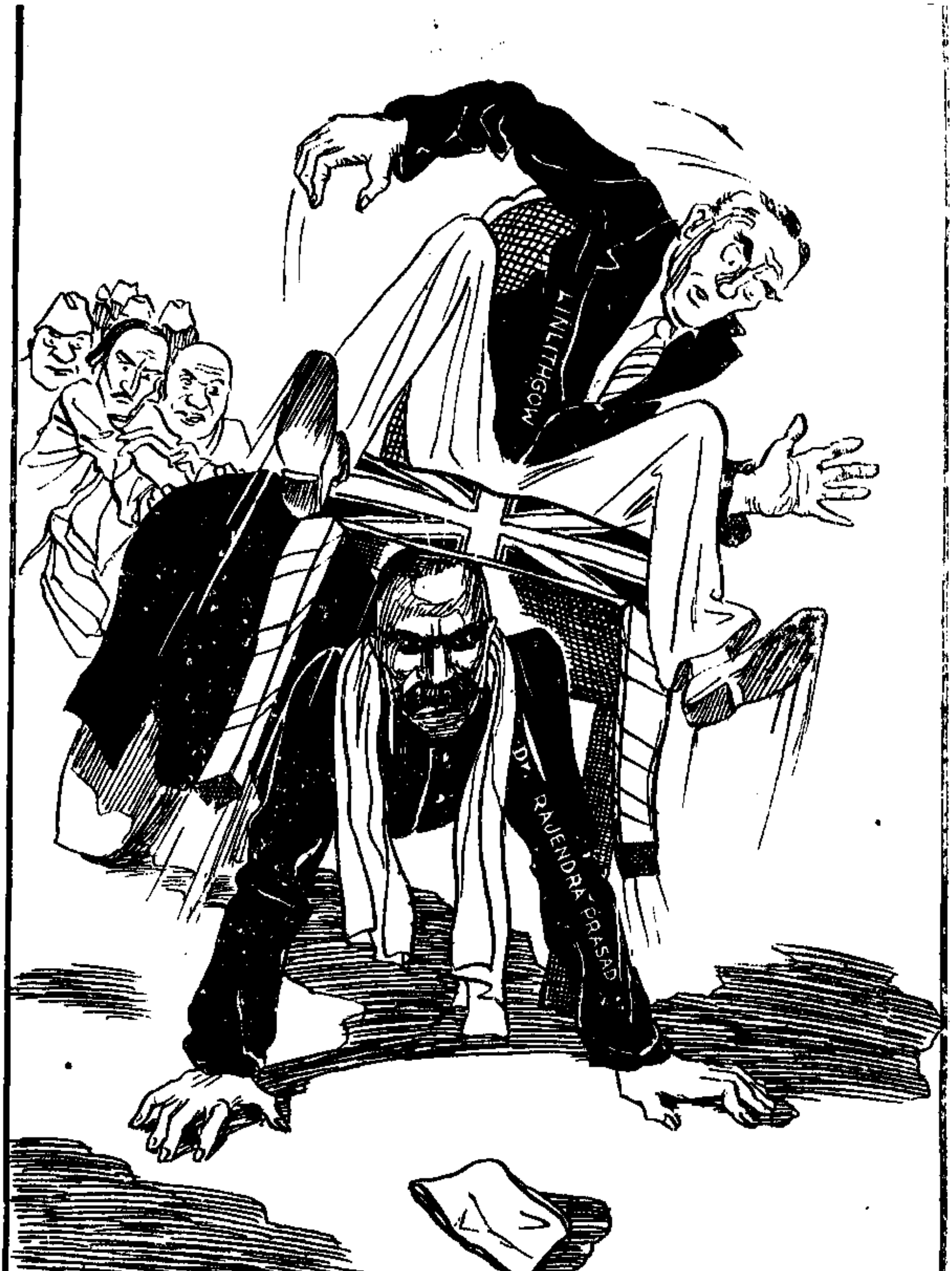
সাতাশে মাসের, পকেট হয়েছে গড়ের মাঠ,
বিছানায় শুয়ে শুধু ঘড়ি দেখি—সবে তো আট!
এখুনি গৃহিণী তাগাদা জানাবে বাজার হাট,
চাল ডাল তেল মৎস্য মিছারী কয়লা কাঠ।

আফিস নেইক, ছুটী আছে তবু রক্ষা নাই।
বধূর রসনা রস জোগাইবে সর্ব্বদাই।
কেরাণী আমরা নিত্য বকুনি বুকনি খাই,
ডরি না তাতেও, ঝাঁটা কি খুন্তি…ভাবনা তাই।

কন্যা রত্নে কেরাণী পিতারা ভাগ্যবান্,
বিধাতার এতে দোষ নেই কোন, এই বিধান!
বয়স বাড়ছে, গৃহিণী ব্যস্ত বিবাহ দান:
যমরাজা মৃত! নহিলে হয় না বিগত প্রাণ!

চাকর গোয়ালা ধোপা মুদিদের বাকী যে সব,
মাসের প্রথমে দুয়ারে উঠিবে কি কলরব।
ভাড়ার তাগাদা? এমন কিছু না সে অভিনব,
লেখনী-জীবীর সকল দিকেতে কী পরাভব!

মার্জ্জনী-ধৃতা গৃহিণী এসেছে বিপদ ঘোর,
চুপ করে শুয়ে ঘুমোবার ভাণে রয়েছে চোর।
চোখে ঢুলে এল রজনী দেখে নিদ্রা ঘোর,
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নাসিকা ডাকাই বেজায় জোর।



পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা—

(রামগড় কংগ্রেসে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে)



বর্ত্তমানকালের শ্যামরাজ্য

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যামরাজ্য তার ডাক-টিকিটের জন্য বিখ্যাত। সারা পৃথিবী খুঁজলেও এ-ধরণের ডাক-টিকিট আর দেখা যাবে না। এদের বিমান-ডাকের টিকিটে গরুড়ের মূর্ত্তি আঁকা, নবীন ও প্রাচীনের মিলনটা এখানে বড় আনন্দদায়ক।

সাত বছর শ্যাম দেশে আমি ছিলাম (রবার্ট মুরের বিবরণ থেকে)—এই সাত বছরে শ্যামরাজ্যের সব জায়গাতে আমি গিয়েছি। যদিও শ্যামরাজ্য প্রতীচ্যের নব আবিষ্কার এবং সভ্যতাকে বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছে, কিন্তু এর প্রাচ্য কৃষ্টি তাতে নষ্ট হয় নি, দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারা এরা বজায় রেখেছে অদ্ভুত ভাবে। শ্যামরাজ্যের বৈশিষ্ট্যই এখানে।

শহরের মোড়ে আধুনিক যুগের ট্রাফিক পুলিস দাঁড়িয়ে হয় তো মধ্যযুগের উপযুক্ত কোনও আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। বড় বড় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আধুনিক যুগের ওষুধ-বিষুধও পাওয়া যায়, তবুও অনেক লোকে এখনও গণ্ডারের শিং এবং দেশীয় গাছগাছড়ার তৈরী পাঁচন খায়। বড় বড় রাজপথে হাতী এবং বলদের গাড়ীর পাশে চলেছে আধুনিকতম মডেলের মোটর গাড়ী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব্ব সংযোগস্থল এই শ্যামদেশ, শ্যাম দেশকে ওরা নিজেদের ভাষায় বলে 'মুয়াং থাই', স্বাধীনতার লীলাভূমি। সে-অর্থে হয় তো শ্যামরাজ্যে প্রজাদের অধিকার খুব বিস্তৃত ছিল না, দু' বছর আগেও। কারণ পৃথিবীর মধ্যে শ্যামদেশ একমাত্র রাজ্য, যেখানে প্রাচীন দিনের গোঁড়া রাজতন্ত্র আজও প্রচলিত আছে। শ্যামের রাজা প্রজাধিপক —যিনি কয়েক বৎসর হল সিংহাসন ত্যাগ করেছেন— অক্সফোর্ডে শিক্ষিত, রাজ্যের উন্নতির দিকে এঁর যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল।

ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কম্প্যানির বা এয়ার-ফ্রান্স কম্প্যানির বিমানে লণ্ডন বা আমষ্টার্ডম থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে শ্যাম পৌঁছান যায়। কিংবা ষ্টীমারে হংকং, পিনাং বা সিঙ্গাপুরে নেমে রেলে ও ছোট ষ্টীমারে যাওয়া যায়।

আমি গিয়েছিলাম সিঙ্গাপুর থেকে।

বর্ষাকাল, পর্ব্বত-প্রমাণ ঢেউ ছিল সমুদ্রে সেদিন। শ্যাম উপসাগরে ঢুকে দেখি সমুদ্রের জলের রঙ্ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হাফ-কোবাল্ট রঙের নীল থেকে সবুজ, ক্রমে ধূসর। তারপরে জেলেদের জালের খুঁটির অসংখ্য মাথা দেখা যেতে লাগল জলের ওপরে, ক্রমে চক্রবাল-রেখায় ফুটে উঠল ধোঁয়াটে নীল রঙের দীর্ঘ রেখা, সমুদ্রকে যেন গ্রীষ্মমণ্ডলের অত্যুচ্চ আকাশ থেকে পৃথক্ করছে।

আরও এগিয়ে চলল জাহাজ।

অপ্রশস্ত বালির চড়া, ধোঁয়াটে নীল রঙটা ম্যানগ্রোভ-গাছের জঙ্গলে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। গ্রীষ্ম-মণ্ডলের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখেছি সমুদ্রের ধারের অপ্রশস্ত বালির চরে ও জলাভূমিতে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল গজায়। ক্রমে জঙ্গলের মধ্যে দেখা দিলে 'মি নাম চাও' নদীর মুখ।

নদী ও সমুদ্র-সঙ্গমস্থলেই একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে একটী প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরের স্থাপত্য শ্যাম দেশীয়, আসলে, সমুদ্র, নদী ও ম্যানগ্রোভের জঙ্গলের পটভূমিতে এই প্রাচীন দিনের মন্দির এক অপরিচিত ছবির সৃষ্টি করে, বিশেষতঃ ইউরোপীয় ও মার্কিন ভ্রমণকারীদের অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে। শ্বেতবর্ণ মন্দিরের প্রাচীরের ওপর থাকে থাকে উঠে গিয়েছে রক্তবর্ণ টালির ছাদ, একটার পর একটা, তার ওপর আবার একটা। মন্দিরের গাত্রে নানা প্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি

উৎকীর্ণ—সরু মিনারেটের মত সূক্ষ্মাগ্র মন্দিরচূড়া যেন নীল আকাশ ভেদ করে ওপরে ঠেলে উঠেছে।

তারপর 'মি নাম চাও 'নদী এঁকে-বেঁকে চলল প্রায় কুড়ি মাইল ধরে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে বস্তি, ছোট ছোট; বাঁশের আর খড়ের তৈরী ঘর লম্বা লম্বা খুঁটির ওপর মাকড়সার মত বসান। দেখতে দেখতে আমরা শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্কক পৌঁছে গেলাম। নদী থেকে ছোট ছোট খাল বেরিয়ে ব্যাঙ্কক শহরের মধ্যে ও আশে-পাশে গিয়েছে। এইখানে ছোট ছোট, তরকারী ও ফল-বোঝাই দেশী নৌকা যাতায়াত করছে—সম্ভবতঃ বাহির থেকে এরা চলেছে শহর অঞ্চলে মাল বিক্রী করতে।



সূর্য্যাস্তকালে "উষা-মন্দির", প্রধান চূড়ার উচ্চতা ২০২ ফুট।

ব্যাঙ্ককের বড় রাস্তা হচ্ছে এই 'মি নাম চাও' নদী ও খাল। সহরের মধ্যে নদীটা খানিকদূর বেঁকে গিয়েছে—শ্যামের বাণিজ্য যে কি পরিমাণ বিপুল, তা এই নদীপথে শহরে ঢুকলেই বোঝা যেতে দেরি হবে না। নদীর ধারে ধারে বড় বড় কারখানা, প্রায় আশিটী বড় বড় চালের কল। চীনা জাঙ্কে ও ছোট জাহাজে জেটি ও নদীর ধার ভর্ত্তি, চীনা ও মালয় কুলীরা চালের বস্তা ওঠাচ্ছে নামাচ্ছে। এখান থেকে মাল বোঝাই জাঙ্ক ও দেশী নৌকা মাদুরে বোনা পাল তুলে নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থান থেকে কিছু দূরে অবস্থিত 'কো চাং' দ্বীপে গিয়ে বড় বড় জাহাজে মাল তুলে দেয়। অপ্রশস্ত ও অগভীর নদীর মধ্যে সমুদ্রগামী বড় জাহাজ সম্ভবতঃ প্রবেশ করতে পারে না।

বহুদূর উত্তর শ্যামের ঘন সেগুন-জঙ্গল থেকে ছেড়ে দিয়েছে বৃহৎ বৃহৎ সেগুনের গুঁড়ির ভেলা, নদীপথে নি-খরচায় সেগুলো ভেসে আসে ব্যাঙ্কক শহরে সমুদ্রের মুখে সেখানকার করাতের কারখানায় কিংবা জেটির কাছে, জাহাজ মেরামতের আড্ডায় সেগুলো কাজে লেগে যায়। সেগুন কাঠের রপ্তানী এ দেশের একটী প্রধান ব্যবসা।

শ্যামদেশের শতকরা নব্বই ভাগ বহির্বাণিজ্য এই নদী-পথেই যাতায়াত করে।

রাজধানী হিসাবে ব্যাঙ্কক শহর খুব প্রাচীন নয়। পটোমাক্ নদীর তীরবর্ত্তী ওয়াশিংটন শহরের চেয়ে কিছু পুরোণো এই মাত্র। ব্যাঙ্কক শহরের দুটো অংশ, একটা পুরাতন, একটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, মি নাম চাও নদীর দুপারে এই দুই অংশ অবস্থিত। যে প্রকাণ্ড সেতু উভয় নগরীর সংযোগ সাধন করেছে তার নাম প্রথম রাম সেতু। বিচিত্র বর্ণের হিন্দু মন্দিরের পটভূমিতে এই বিরাট ইস্পাতের সেতু পূর্ত্তশিল্পের এক অতি উজ্জ্বল নিদর্শন।

১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে এই সেতু প্রথম খোলা হয়, শ্যামদেশের বর্ত্তমান রাজবংশের স্থাপয়িতা রাজা প্রথম রামের পঞ্চাশতধিকশততম স্মৃতি-দিবসে।

ব্যাঙ্কক শহরে সেদিন খুব উৎসব আমোদ হয় এই উপ-লক্ষ্যে। ঐ দিন সকাল ছ'টার সময় তদানীন্তন রাজা প্রজাধিপক প্রথমে সেতুর প্রবেশ-পথে অব-স্থিত প্রথম রামের মূর্ত্তির সম্মুখে পুষ্পাদির অর্ঘ্য নিবেদন করেন এবং যে রেশমের সূতো দিয়ে সেতুর পথ বন্ধ ছিল, সেটি স্বহস্তে কেটে দেন।

তারপর সোনার পালকীতে চড়ে রাজ্যের বড় বড় কর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত হয়ে সর্ব্বপ্রথম তিনিই সেতু পার হন। এই মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমাপনের পর রাজা ঘোষণা করেন যে, এই সেতু সর্ব্ব-সাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হোল।

মি নাম চাও নদীতে তারপর প্রথম ভাসলো রাজবংশের প্রাচীন আমলের নৌকা, তার সামনের দিকে গরুড়ের মূর্ত্তি। রাজার নৌকার পেছনে চলল কামানবাহী জাহাজ ও টর্পেডো বোটের সারি। সকলের পেছনে রাজার প্রমোদতরণী 'মহাচক্রী'।

সেই রাত্রি এবং তারপর আরও তিন রাত্রি ধরে শহরে খুব আমোদ উৎসব চলল; লোকে রাত নেই, দিন নেই কারণে অকারণে প্রথম রাম সেতু পার হচ্ছে। সেতুর দুমুখে মেলা বসে গেল—চীনা থিয়েটার, শ্যামদেশের থিয়েটার, পুতুলনাচ, সিনেমা, সার্কাস, গানবাজনার আসর—হৈ হৈ ব্যাপার। ফলের দোকানে, মিঠাইয়ের দোকানে দিনরাত ক্রেতার ভিড়। এই বিচিত্র প্রাচ্য উৎসবের সাধারণ ফোটো তুললে এর প্রকৃত স্বরূপটি প্রদর্শন করা যায় না, একমাত্র ফিল্মের ছবিই এর প্রতি সুবিচার করিতে পারে।

পূর্ব্বে শ্যামের রাজধানী ছিল অযোধ্যা, নদীর আরও উজানে ঐ শহর অবস্থিত ছিল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মিদের আক্রমণে অযোধ্যা শহর ধ্বংস হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক



শ্যামের বিচিত্র স্থাপত্যের একটি নিদর্শন

বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে অতঃপর জনৈক শ্যামদেশীয় যোদ্ধা বর্ম্মিদের বিতাড়িত করে নিজে রাজা হন, এবং প্রথম রাম নাম গ্রহণ করেন। এই প্রথম 'রাম' থেকে চক্রীবংশের সুরু। বর্ত্তমান ব্যাঙ্কক শহর ইনিই স্থাপন করেন।

গত ১৫০ বছরের মধ্যে ব্যাঙ্কক শহরের বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে। নদীর দু'ধারে শহর ছড়িয়ে পড়েছে বহুদূর পর্য্যন্ত, অনেক নূতন রাজপথ তৈরী হয়েছে, অনেক বাড়ীঘর দেখা দিয়েছে। বর্ত্তমানে শহরে লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লক্ষ। এশিয়ার মধ্যে ব্যাঙ্কক একটী বড় শহর সন্দেহ নেই।

গত শতাব্দীর শেষের দিকেও মি নাম চাও নদীই ছিল শহরের প্রধান রাজপথ এবং নদী থেকে ছোট বড় খাল বেরিয়ে শহরের অন্যান্য রাজপথ ও গলিঘুঁজির উদ্দেশ্য সাধন

করত। পূর্ব্বে শহরের প্রধান প্রধান বাড়ীগুলি সব নদীর দুধারেই অবস্থিত ছিল, ব্যাঙ্ককে তখন প্রাচ্যদেশের ভেনিস্ বলা চলতো অনায়াসেই।

কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। শহর বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যে সব নতুন রাস্তা তৈরী হয়েছে, এখন বড় বড় বাড়ী, আপিস্, ব্যাঙ্ক, দোকান-পসার তাদেরই দুধারে অবস্থিত। পূর্ব্বে নদীবক্ষে কাষ্ঠনির্ম্মিত ভাসমান বাড়ী দেখা যেত এবং এদের সংখ্যা নিতান্ত কমও ছিল না। বর্ত্তমানে তারা অন্তর্হিত।

এখন নগরের প্রধান রাজপথের নাম 'নিউ রোড্'। রাস্তা খুব ভাল নয়—এর দুধারে শ্রীছাঁদহীন বাড়ী যথেষ্ট দেখা যায় এখনও—নদী এঁকে বেঁকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠছে। কিন্তু এখনও শ্যামদেশের ব্যবসাদারের অনুপাত শতকরা দুই থেকে তিনের মধ্যে।

শ্যামদেশে চীনাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আজ হয়ত দেখা গেল যে, চীনা ফেরিওয়ালা কাঁধে বাঁক ঝুলিয়ে জিনিস ফেরি করে বেড়াচ্ছে, কাল তাকে দেখা যাবে, কোন গলির মধ্যে সে হয়ত একটা ছোট্ট দোকান খুলে বসেছে এবং খুব আশ্চর্য্যজনক কম সময়ের মধ্যে সে গলির ভেতরকার ছোট্ট দোকান তুলে দিয়ে শহরের বড় রাস্তার ধারে বেশ সাজান দোকান খুলে বসেছে দেখা যাবে। চীনারা এইভাবেই শ্যামদেশের বাণিজ্য নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে।

তবে সম্প্রতি উঁচু হারের ট্যাক্স বসানর দরুণ চীনাদের শ্যামদেশে আগমন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।



শ্যামের চাষী ধান্য রোপণ করিতেছে।

এই রাস্তাটিও নদীর সঙ্গে সমান্তরাল হবার চেষ্টায় এঁকে বেঁকে চলেছে, কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। রিক্সা, মোটর, পাল্কী, বলদের গাড়ী প্রভৃতি চলার দরুণ এদেশে তো রাস্তা চলা পাদচারী পথিকদের পক্ষে যথেষ্টই দুর্গম—তার ওপরে আবার আছে ট্রাম-লাইন। কোন পরিচিত ইউ-রোপীয় বা মার্কিন ট্রাম-গাড়ীর সঙ্গে এর তুলনা হয় না—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার।

শ্যামদেশে চীনা দোকানদারের সংখ্যা খুব বেশী। শহরের কুলী মজুর প্রায়ই চীনা—গলি-ঘুঁজির মধ্যে ছোট-খাটো চীনাদের বস্তি সর্ব্বত্র। ভারতীয় বণিকও যথেষ্ট, এরা সাধারণতঃ রেশম ও মণি-রত্নের কারবার করে। শ্যামদেশের অধিবাসীদের শতকরা আশি জন কৃষিজীবী, সেজন্য এ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায়ই বিদেশীদের হাতে গিয়ে পড়েছিল। বর্ত্তমানে দেশীয় লোকেরা এ-বিষয়ে সচেতন হয়ে

চীনা বাদে কয়েকটি বড় বড় ইউরোপীয় দোকানদারও ব্যাঙ্ককে ভাল ব্যবসা চালাচ্ছে। শ্যামদেশের লোকের দোকানও আছে অনেক, তবে সেগুলি প্রায়ই খুব বড় নয়। মেয়েরাই এই সব দোকানের দোকানী। ব্যাঙ্কের সকালবেলার বাজারে এত জায়গা থেকে ফলফুল, মাছ তরকারি আসে—প্রায়ই কিন্তু মেয়েরাই তা আনে। আর কত ধরণের পোষাক ওদের পরণে, কত কি বিচিত্র রঙের ছাতা—সকালের বাজারে বেড়ানোর আনন্দের সঙ্গে অন্য কোন আনন্দের তুলনা হয় না।

শহরের যে অঞ্চলে ধনী লোকদের বাস, সেখানকার রাস্তা কিন্তু এরকম সংকীর্ণ নয় বা খারাপও নয়। সেদিকে বড় বড় ছায়াতরুর নীচে দিয়ে অ্যাশফাল্ট দেওয়া চওড়া রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে, রাস্তার ধারে সুন্দর খাল, মাঝে মাঝে কৃষ্ণচূড়ার গাছ, বিশাল বিলাতী চটকা গাছের সারি—যেন পথিক তোরণ

তৈরী করে রেখেছে মাইলের পর মাইল ধরে। ব্যাঙ্ককের বড় রাস্তায় অত মন্দির নেই—কিন্তু এই সব রাস্তার দুধারে অসংখ্য মন্দির। কত তার রঙ, কত বিচিত্র তার কারুকার্য্য—শ্যামদেশের শিল্পীরা ওদের সব শিল্পকৌশল উজাড় করে যেন ঢেলে দিয়েছে এইখানে।

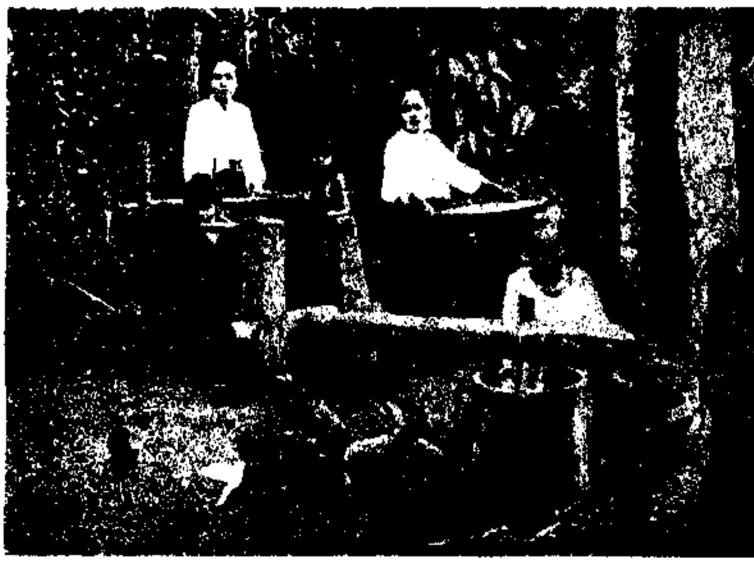
শ্যামদেশের প্রায় সব লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং রাজা হচ্ছেন বৌদ্ধধর্ম্ম মঠের প্রধান ভিক্ষু। একজন্য বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে জীবন্ত ধর্ম্ম এবং নতুন নতুন মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য এখনও চলেছে। সরকারী দপ্তরের গণনা অনুসারে সমগ্র শ্যামে সাড়ে ষোল হাজার মন্দির ও একলক্ষ সাতাশ হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ আছে। ব্যাঙ্কক শহরের পাঁচ ভাগের এক ভাগ জমি দেবোত্তর—এবং শহরের তিনশো মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ বিভিন্ন ধনী বণিক ও রাজকর্ম্ম-চারীদের প্রদত্ত জমির অন্তর্ভুক্ত।

মন্দিরের কারুকার্য্য অনেকক্ষণ ধরে দেখবার জিনিস। পেইপিং সহরের সোনালী টালির রাজ-প্রাসাদ এবং রাজকীয় হ্রদের তীরবর্ত্তী প্রমোদ-সৌধ খুব গর্ব্বের জিনিস বটে পেইপিং-বাসীদের কাছে, কিন্তু ব্যাঙ্কক শহরের মন্দিরসমূহের অপূর্ব্ব স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য তাদের শহরে নেই। পেইপিং-এ আছে সোনালী টালি, এখানকার মন্দির ও প্রাসাদসমূহে দেখা যাবে নীল, লাল ও সবুজ রঙের টালি।

পাশের ছোট রাস্তাগুলি পর্য্যন্ত রঙীন পাথর ও কাঁচের মোজেক্ করা। এই পথের দুদিকে 'প্রচেদী' বা ছোট বড় বৌদ্ধস্তূপের সরু চূড়া। ফুলকাটা চীনামাটীর দেওয়ালের পটভূমিতে বড় সুন্দর দেখায় এই স্তূপের সোজা সারিগুলি। মন্দিরের প্রাঙ্গণের চারিধারেই লম্বা বুদ্ধমূর্ত্তির সারি, বিভিন্ন সময়ে ভক্তের দল এগুলি তৈরী করে দিয়েছে।

মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে নানারকম ছবি, প্রায়ই এই সব বুদ্ধের জীবনী বা রামায়ণের ঘটনা অবলম্বনে অঙ্কিত। মন্দিরের ছাদ থেকে ঝুলছে ছোট বড় ঘণ্টা। প্রত্যেক মন্দিরের এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন ফ্রা কেও' মন্দিরের পদ্মরাগ মণির তৈরী বুদ্ধমূর্ত্তি সোনার সিংহাসনে বসানো আছে—'ওয়াট অরুণ' অর্থাৎ অরুণ মন্দিরে ২৪২ ফুট উঁচু একটা সুন্দর সরু সাপবিশিষ্ট স্তম্ভ আছে, কিংবা আধুনিক কালে নির্ম্মিত 'বেন্ জামাবোপিত্রর্' মন্দিরের শ্বেত প্রস্তরের দেওয়ালের উপরে সোনালী ছাদের সৌন্দর্য্য।

বৌদ্ধবিহারগুলি কিন্তু খুব সাদাসিধে ধরণের, এদের ভেতরে বাহিরে কোথাও কোন কারুকার্য্য নেই। শত শত শ্রমণ এই সব বিহারে জপ-তপে অতিবাহিত করেন।



শ্যামদেশের ঢেঁকিশাল, দক্ষিণের মেয়েটির হাতে দেশীয় কুলা।

শ্যামদেশে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের সংখ্যা খুব বেশী। তবে এখানে শ্রমণ দু-প্রকারের আছে—যাঁরা সন্ন্যাসব্রত চিরজীবন পালন করেন, আর যাঁরা সন্ন্যাসীজীবন কিছু দিন যাপন করবার পরে গৃহী হন।

শ্যামে প্রায় প্রত্যেকেই তরুণ বয়সে বৌদ্ধবিহারে শ্রমণরূপে প্রবেশ করে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই আবার বিহার পরিত্যাগ করে এসে গৃহী হয়ে সংসার-ধর্ম্ম করে। শাস্ত্র ও নীতি শিক্ষাই হোল এই শ্রমণজীবনের উদ্দেশ্য। শ্যামে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে এই সব বৌদ্ধবিহারে লেখাপড়া শেখানো হোত।

ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রমণকে দলে দলে

আলখাল্লা পরতে হয় এবং ভিক্ষাপাত্র হাতে সকলকেই ভিক্ষা করতে হয়। সকালবেলা ব্যাঙ্কক শহরের রাস্তায়, গলিতে খালের ধারে ধারে পীতবাস পরিহিত তরুণ শ্রমণদের দলে দলে ভিক্ষা করতে দেখা যাবে। একদিন পাঁচ মিনিট কাল রিক্শা ভ্রমণের মধ্যে আমি ৭৫টি ভিক্ষারত শ্রমণকে দেখেছিলাম।

বছরে নানারকম উৎসব হয় মন্দির প্রাঙ্গণে।

টট্ কাথিন্ একটা প্রধান উৎসব। প্রত্যেক বৎসর অক্টোবর মাসের শেষে রাজা শহরের প্রধান মন্দিরগুলিতে



এই বুদ্ধমূর্ত্তিটি সর্ব্বাপেক্ষা একটি সুবিখ্যাত বুদ্ধমূর্ত্তির অনুকৃতি; মূল বুদ্ধমূর্ত্তিটি পীঠশানুলোকের জ্ঞা বুদ্ধ জীনরাজ বলিয়া খ্যাত।

নিজে যান এবং শ্রমণদের মধ্যে নানাপ্রকার উপহার বিতরণ করেন। এই উপলক্ষ্যে সমগ্র শহরের লোক উৎকৃষ্ট বেশ-ভূষায় সজ্জিত হয়ে রাজদর্শনের আশায় মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়।

শ্যামদেশের স্থপত্য খুব সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্কক শহরের 'সিংহাসন গৃহ' ইতালীয় প্রণালী ও উপকরণে তৈরী। দেখতে এত সুন্দর দেখায় এই বাড়ীটা যে, মন একথা ভুলে যায়, বাড়ীটা শ্যাম দেশ অপেক্ষা ইতালীর রৌদ্রালোকিত আকাশের তলেই ভাল মানাত।

এই বিরাট সৌধ-নির্ম্মাণের ব্যয় পড়েছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ ডলার। শ্যাম দেশের সাধারণ লোকে জানে যে, এই বাড়ীটা জলের ওপর ভাসছে। আমাদের গাইডের মুখে কথাটা শুনে আমরা প্রথম একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম, পরে জানা গেল গাইড ঠিক বলেছিল।

ব্যাঙ্ককের মৃত্তিকা অত্যন্ত নরম ও কর্দ্দমময়, সমুদ্রের খুব নিকটে বলেও বটে—অল্প খুঁড়লেই জল বার হয়। এই সৌধ-নির্ম্মাণ-কার্য্য কিছুদূর অগ্রসর হবার পরে দেখা গেল বিরাট প্রস্তররাশির ভারে বাড়ীটা মাটীর মধ্যে বসে যাচ্ছে। তখন ভিতের নীচে বায়ুপূর্ণ ফাঁপা পন্টুন্ বসিয়ে দেওয়া হল, ব্যাঙ্ককের ভূগর্ভস্থ কর্দ্দমাক্ত নরম মৃত্তিকার উপর এই বিশাল ভারবিশিষ্ট প্রস্তর-সৌধ ভাসমান রয়েছে একথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়।

সৌধের অভ্যন্তরে প্রাচীর-গাত্রে নানা ধরণের চিত্র। দর্শকের চোখের সামনে শ্যাম রাজ্যের গত দেড় শতাব্দীর অতীত ইতিহাসের পাতা খুলে দেওয়া হয়েছে। খিলান-করা ছাদে একটা খুব বড় ছবিতে দেখা যায় যে, রাজা প্রথম রাম হস্তী-পৃষ্ঠে বসে ব্যাঙ্কক শহর নির্ম্মাণের আদেশ দিচ্ছেন।

আর একটা ছবিতে রাজা দ্বিতীয় রাম সোনার পালকীতে চড়ে পারিষদ্ ও স্থপতিগণ পরিবেষ্টিত হয়ে অরুণ মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিদর্শন করছেন। অন্য এক স্থানে একটী সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তির পদতলে রাজা মহামংকুট (ইনি রাজা চতুর্থ রামও বটে) কতকগুলি খৃষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, চীনা ও মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারককে প্রচারকার্য্যের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্পণ করছেন। রাজা চতুর্থ রাম এদেশের ইতিহাসে সত্য একজন অদ্ভুত ব্যক্তি। ইনি নিজে দর্শনশাস্ত্রে ও জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বৈদেশিক শক্তিগণের সঙ্গে সুবিধাজনক বাণিজ্যচুক্তি স্থাপন করে শ্যামদেশের বাণিজ্যের অনেক সুবিধা তিনি করে দিয়েছেন। এঁর সম্বন্ধে গল্প আছে যে, বিদেশী ভাষা শিখবার জন্যে ইনি কঠিন পরিশ্রম করতেন, এবং মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে আমেরিকান্ মিশনরীদের ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে নিয়ে যেতেন, ইংরাজী গ্রামারের কোন শক্ত অংশ, যা তিনি এতক্ষণ ভাল বুঝতে পারছিলেন না, সেটা ভাল

করে বুঝিয়ে নেবার জন্তে। একবার না কি শ্যামের ব্রিটিশ রাজদূতও এভাবে রাজ্রে শিক্ষকতা কার্য্যে আহূত হয়েছিলেন।

রাজা চতুর্থ রাম ও রাজা চূড়ালংকরণ শ্যাম-রাজ্যে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেন।

রাজা চূড়ালংকরণ বিয়াল্লিশ বছর রাজত্ব করেন এবং এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে শ্যামদেশে বহু আধুনিক ব্যাপারের পত্তন সুরু হয়, প্রাচীন দিনের রীতিনীতি ও ধারায় যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। শাসন-বিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, বিভিন্ন দপ্তর সুনিয়ন্ত্রিত হয়, ডাক ও তার বিভাগ স্থাপিত হয়, প্রথম রেলপথ খোলে এবং আইন দ্বারা জুয়াখেলা বন্ধ করা হয়।

তবুও এখনও একেবারে জুয়াখেলা অন্তর্হিত হয় নি শ্যাম-দেশ থেকে। এখানকার লোক অত্যন্ত সরল-স্বভাব, প্রায় বালকের মত সরল। জুয়াখেলা তাদের অত্যন্ত প্রিয়। ছুটির দিন দেখা যাবে এরা বড় বড় মাছ-রাখা চৌবাচ্চায় মাছের যুদ্ধ দেখছে। ঘুঁড়ি-ওড়ানো এখানকার কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেরই অতি প্রিয় ক্রীড়া। রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ বিশাল প্রাঙ্গণে বসন্তকালের প্রভাতে প্রায় প্রতিদিন বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলে এসে জোটে এবং ঘুঁড়ির প্যাঁচ দেখে। এই উপলক্ষ্যে বাজি ফেলা চলে যেমন ঘোড়দৌড়ের সময় হয়।

রাজবাড়ীর এই প্রাঙ্গণের একপাশে বিরাট লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম। এটীও রাজা চতুর্থ রামের কীর্ত্তি। এই লাই-ব্রেরীতে বহু প্রাচীন তালপত্রের ও ভূর্জ্জপত্রের পুঁথি, প্রস্তর-ফলক, ব্রোঞ্জ ও অন্যান্য ধাতু-নির্ম্মিত পাত্র এবং মূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক 'দ্বিতীয় রাজা'র প্রাসাদে এই গ্রন্থা-গার বর্ত্তমানে স্থাপিত। প্রথম চারজন চক্রীবংশের রাজার রাজত্বকালে শ্যামের আর একজন অতিরিক্ত রাজা থাকতেন, এঁকে 'দ্বিতীয় রাজা' বলা হোত। ইনি প্রধানতঃ হোতেন রাজসৈন্যের অধিনায়ক। শেষবার যিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেন তাঁর নাম 'জর্জ্জ ওয়াশিংটন'।

অবশ্য ইনি আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ জর্জ্জ ওয়াশিংটন নন, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে এই ভদ্রলোকের পিতা আমেরিকার জর্জ্জ ওয়াশিংটনের এত মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন যে, ছেলের নাম রেখেছিলেন, জর্জ্জ ওয়াশিংটন।

বর্ত্তমান শ্যামের উপর আমেরিকার প্রভাব খুব বেশী। আমেরিকার মিশনরীরা এদেশে স্কুল স্থাপন করে এবং প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করে। আমেরিকান্ পরামর্শদাতাদের পরামর্শে রাজা ষষ্ঠ রাম দায়িত্বপূর্ণ বৈদেশিক বাণিজ্যচুক্তি-সকল ১৯২৫ সালে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে রাজ্যের বাণিজ্য-বিষয়ক স্বাধীনতা পুনঃস্থাপিত করেন। এঁর সময়ে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বাধ্যতামূলক দৈহিক ব্যায়াম-চর্চ্চা ও স্কাউট প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সাধারণ শিক্ষাও বাধ্যতামূলক



স্নানের পূর্ব্বে শ্যামের ছেলেদের এইরূপ ভাবে পাউডার-জাতীয় দ্রব্য মাখান হইয়া থাকে।

করা হয়। ব্যাঙ্ককে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকাল কলেজ স্থাপিত হয়।

শ্যামদেশের কথ্যভাষার মধ্যে অনেক গোলমাল আছে, বিদেশী লোকের পক্ষে জিনিষটা আয়ত্ত করা খুব সহজ নয়। আমি ব্যাঙ্কক শহরের কোনো কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলাম, সে-সময় আমি একজন শ্যামদেশীয় লোকের কাছে কথ্যভাষা শিক্ষা করতাম।

আমার শিক্ষক সর্ব্বদাই তাম্বুল-চর্চ্চা করতেন, আমাকে পড়াবার সময়ও মুখে পান রেখে আমার সঙ্গে কথা বলতেন।

ফলে তিনি কি বলতেন আমি ভাল বুঝতে পারতাম না। শ্যামদেশের ভাষায় একই শব্দ উচ্চারণ-ভেদে বিভিন্ন অর্থের সৃষ্টি করে, যেমন 'কাও', উচ্চারণ ভেদে এই কথাটির অর্থ হতে পারে 'সংবাদ', 'পর্ব্বত', 'শাদা', 'চাউল', 'সে' 'হাঁটু' বা 'প্রবেশ করা।'

বিদেশীর পক্ষে এ ভাষা শিক্ষা করা যে কত কষ্টকর তা সহজেই অনুমেয়।

প্রাকৃতিক সংস্থানের দিক্ দিয়ে শ্যামদেশকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

পূর্ব্ব দিকে ফরাসী ইন্দো-চীনের সীমানায় একটি বিরাট পর্ব্বতময় মালভূমি, যার উচ্চতা সমুদ্রবক্ষ থেকে তিন শত ফুটের মধ্যে। এই মালভূমি ঈষৎ পূর্ব্বে হেলে আছে—কাজেই এর সমস্ত জল নিকাশ হচ্ছে মেকং নদী দিয়ে। বছরের মধ্যে ছ'মাস এই দেশে আদৌ বৃষ্টি হয় না এবং বৃষ্টির সময় ভীষণ বন্যা নামে। এই অঞ্চলে শস্যাদি ভাল উৎপন্ন হয় না, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধাও তেমন নেই। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র, কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করে।

সম্প্রতি নগর রাজসীমা পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হওয়ার দরুণ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অনেক সুবিধা হয়েছে উৎপন্ন দ্রব্য শহরের বাজারে প্রেরণ করবার। কালিফোর্ণিয়ার অরণ্যের মত এখানকার পর্ব্বতেও বিরাট রেড্ উড্ গাছের অরণ্য আছে, দেশের এত বড় একটা সম্পদ্ রপ্তানী করবার সুবিধার অভাবে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় ছিল নগর রাজসীমা পর্য্যন্ত রেল হওয়ায় শ্যামরাজ্যের আয়ও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়।

এই অঞ্চলেই কয়েকটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ অরণ্যমধ্যে আজও বিদ্যমান।

আঙ্কোর রাজ্য যে-সময়ে গৌরবের উচ্চ শিখরে সমাসীন, এই নগরীগুলিতে সেই-সময় বহুলোকের বাস ছিল, আট শতাব্দী পূর্ব্বের সে সভ্যতা আজ আর এই বিশাল আরণ্য অঞ্চলের কোথাও বর্ত্তমান নেই, আছে শুধু সুপ্রসিদ্ধ আঙ্কোর ভাট্, মন্দির ও নগরীর বিরাট ধ্বংসস্তূপ।

এই মালভূমির দক্ষিণে শ্যাম উপসাগরের উপকূলে চান্দাচুর প্রদেশ, এখানকার পর্ব্বত ও অরণ্য অঞ্চলে চুণি, পদ্মরাগ ও ইন্দ্রকান্ত মণির খনি আছে।

দক্ষিণ শ্যামের ভূমি-প্রকৃতি অনেকটা মালয় উপদ্বীপেরই অনুরূপ। এখানের অধিবাসীরা অধিকাংশ মালয়। নিম্ন মালয়ের মত এই অঞ্চলে রবার গাছের বিস্তৃত আবাদ হয় এবং অন্যান্য ধাতুর খনিও বর্ত্তমান, তার মধ্যে টিনের খনিই বেশী। প্রতি বৎসর ন'লক্ষ ডলার মূল্যের টিন এখানকার খনিসমূহ থেকে পৃথিবীর নানা দেশে রপ্তানী হয়ে থাকে।

নীল নদী যেমন মিশরের, মি নাম চাও নদী তেমনি শ্যামদেশের অন্নদাত্রী জননী-স্বরূপিণী। প্রতি বৎসর বর্ষা-কালে উত্তর শ্যামের পর্ব্বত থেকে ঢল নেমে নদীর দুকূল প্লাবিত করে বন্যা আনে, এই বন্যার জল মি নাম চাও নদীর বহু শাখা নদী ও খাল-সমূহ দিয়ে উভয় তীরের উর্ব্বরা ধানের জমিসমূহের উপরে পলি পড়িয়ে দেয় এবং ধান্য-ক্ষেত্রের আবশ্যকানুযায়ী জল সরবরাহ করে।

উত্তর শ্যামের যে পর্ব্বতমালা থেকে মি নাম চাও নদীর উৎপত্তি, সেখানে সেগুন গাছের অরণ্য ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ সেগুন জঙ্গলের মতই নিবিড়। এ অঞ্চলের প্রধান শহরের নাম চিয়েঙ্মাই, ব্যাঙ্কক থেকে এই ৪৭০ মাইল রেলপথ ভ্রমণ অত্যন্ত আনন্দ-দায়ক।

সপ্তাহে দুবার ব্যাঙ্কক থেকে এক্সপ্রেস্ ট্রেন চিয়েঙ্মাই যায়। ব্যাঙ্কক থেকে কুড়ি মাইল দূরে রেলপথের ধারেই পড়ে এরোড্রোম। এখানে শ্যাম গবর্ণমেণ্টের এরোপ্লেনের কার-খানাও আছে, মোটর বাদে এরোপ্লেনের অন্যান্য অংশ এখানে হয়। এরোড্রোমের চারি ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত, ক্ষেতের উপর দিয়ে পালতোলা নৌকা চলেছে দূর থেকে মনে হবে, আসলে নৌকা যায় ধানের ক্ষেতের মধ্যেকার সঙ্কীর্ণ খাল পথে। ব্যাঙ্কক ছেড়ে দু'ঘণ্টা পরে প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যা নগরীর ভগ্ন মন্দির ও প্রাসাদ-শ্রেণী চোখে পড়বে। সন্ধ্যার সময় ট্রেন আসে লপ্ বুরি। এটিও অতি প্রাচীন শহর, আঙ্কোর থেকে সুকোটাই পর্য্যন্ত যে প্রাচীন কালের রাজপথ তারই ধারে অবস্থিত।

লপবুরি নগরের আশে-পাশে বহু কাম্বোজ কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আজও বর্ত্তমান। এখানে একজন গ্রীক্ নাবিকের সমাধি দেখা আছে, সমুদ্রে পোত ভগ্ন হওয়ায় সে শ্যাম রাজ্যে আশ্রয় খুঁজতে এসে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তদানীন্তন রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। তার নাম ছিল কন্‌ষ্টান্টাইন্ ফাউলকন্। ফাউলকনের পরামর্শে অনেক বড় বড় প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়েছিল। পরে শ্যামদেশীয় লোকদের মধ্যে ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করায় রাজাদেশে এই হতভাগ্য গ্রীক্ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

পাশাপাশি ট্রেন চলেছে। বিষ্ণুলোক নামে আর একটা প্রাচীন সহর পথে পড়বে রাত্রেই। এক কালে এ-নগরও যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিল। সকাল বেলা দেখা যাবে, ষ্টেশনে ষ্টেশনে যে সব স্ত্রীলোক প্ল্যাটফর্মে ফল বা রুটী বিক্রী করতে আসছে, তারা শ্যামদেশীয় মেয়েদের চেয়ে অনেক সুশ্রী, গায়ের রঙ অনেক ফর্সা, চুল অমন ছোট করে ছাঁটা নয়, কালো কুচ্‌কুচে, নারকোল তেল-মাখানো লম্বা চুল এদের মাথায়। এরা লাও জাতি। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এদের পূর্ব্ব-পুরুষ উত্তর অঞ্চলের পর্ব্বত ও অরণ্য থেকে এসে শ্যামের সমতল ভূমিতে বাস করেছিল। শুধু বাস নয়। কয়েক শতাব্দী ধরে লাও রাজারা শ্যামদের শাসন করতেন।

বেলা দুপুরের সময় ভীষণ অরণ্যবেষ্টিত পর্ব্বতমালা অতিক্রম করে ট্রেন চিয়েংমাই পৌঁছায়। এই শহরই এক কালে লাও রাজাদের রাজধানী ছিল।

ভারতবর্ষ

—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কে বলে তোমারে ভারতবর্ষ শুধু আমাদের জনমভূমি
ধূলায় খেলায় ক্ষুৎ-পিপাসায় জুড়াবার ভূমি জননী তুমি।
কি বা আছে হেথা, কি যে নাই হেথা, হিসাব করিয়া কঠিন বলা—
কত শব যেথা শিব হল সেথা ভাবিলে মাটীতে যায় না চলা।
যবে ও ধান্যে শিশির প্রাচুর্য্যে শস্যশীর্ষ বিনয়নত
সেই ক্ষীর-ধার ঝরিছে মাতার উৎস, প্রপাত, তটিনী শত।
ভাণ্ডারে যার পূর্ণ নীবার শ্যাম শস্যের কি সমারোহ
দেশের লক্ষ্মী আঁচল ভরিয়া বিলায় মায়ের স্নেহের মোহ।
পতঙ্গ পাখী উড়ে পাল তুলি ময়ূরপঙ্খী তরীর মত
চীনাংশুকের চিত্র কেতন সল্‌মা-চুম্‌কি চমকি শত।
গৃহপানে চলে ধেনুর বৎস হাম্বা করুণ গভীর রবে
পাঠশালে চলে কিশোর বালক পাখীসব ডাকে প্রভাতে যবে।
এই ভারতের আতিথেয়তায় আশ্রিত-বৎসলের ব্রত
শিবির পুণ্য চরিত হেথায় সাধিয়া পরাণ কাঁপিতে রত।
ত্রিলোকে ত্রিপাদ ভূমির ভিক্ষা বামন লভিল বলির দ্বারে
দাতা কর্ণের বৃষকেতু সুত হাসিয়া মরণ বরণ করে।
রাম রঘুপতি গুহকের মিতা, শ্যাম গিরিধারী গোপের তরে
সুত-নন্দন পুরাণ কহিল, উদিল বিদুর দাসীর ঘরে।
মীরার ভজন শুনিবার লাগি শাহানশাহের আসন টলে
দরাফ খাঁয়ের গঙ্গাস্তুতি বন্যা বহাল চোখের জলে
সাধু হরিদাস, নানক, কবীর, তুলসী গাহিল বচন খাঁটি
সব ঘটে রাম, কারে নন বাম, মাটি মাটি করে করিল মাটি।
চৈতন্যের প্রেমের প্রবাহ ভুলাল হিন্দু-মুসলমানে
বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণের কথা ও কাহিনী নিখিল জানে।
সার্ব্বভৌম এই ভারতের অপূর্ব মাঝারে অনুস্যূত
মণি-মালিকার সূতার মতন মানব সকলে মনুর সুত।
মহাভারতের মহামানবের করম-ভূমি এ কুরুক্ষেত্র
মর-মানবের অমরাবতী এ সমর-ভূমি, এ সমাধিক্ষেত্র।

মধু-বসন্ত

—শ্রীমন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ

বিশু পরাণকে হাতের মুঠার ভিতর আনিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল যে, পরাণ ইচ্ছামত অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে না, তখন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বিশু দেখিল যে, যদি তাহার ভাগের যাহা কিছু তাহারই হাতে থাকে, তাহা হইলে সে ইচ্ছা মত খরচ করিতে পারিবে, এবং সে যখন তাহার হাতের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, তখন সে ইচ্ছা করিলেই তাহাকে দিয়া যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করাইতেও পারিবে। তখন তাহার সুবিধা হইবে। পরাণকে সে যে প্রকার নেশাখোর করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে পরাণ যে তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে তাহা তো তাহার ধারণাই হইতে পারে না। এখন বিশু ব্যতীত পরাণের আর কোন উপায় নাই তাহা পরাণের হাবভাবে বিশু বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল। কিন্তু অর্থহীন পরাণকে লইয়া বিশুর কি ইষ্ট সাধিত হইবে? তাহার তো পরাণকে প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল তাহার অর্থে। সুতরাং অর্থ কি করিয়া পরাণের হাতে আসিবে তাহার ব্যবস্থার জন্য সে বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিল। উপায় উদ্ভাবন করিতেও তাহার বিলম্ব হইল না। সে ঠিক করিল, যে-কোন উপায়েই হউক দুই ভাইকে পৃথক্ করিয়া দিতেই হইবে।

পরদিন যখন বিশু আর পরাণ আবার একত্র হইল, তখন বিশু তাহাকে বলিল, "দেখ, পরাণ, জীবনে যদি কোন ভোগই না হয়, তা' হ'লে টাকা থেকে কি হ'বে বল? আমার কথা বলছি নে কেন না আমি তো অনেক দেখেছি শুনেছি। তুমি তো কখন এ সব দেখ নি, তাই তোমার জন্যেই আমার যা ভাবনা। এত বড় থিয়েটারটা এল; দেশের ইতর-ভদ্র এমন কেউ বাকি নেই যে একদিন না একদিন এ আমোদটা উপভোগ করে নি। একটা কথা বলি, তুমি কিছু মনে ক'র না। আর মনে করলেও আমার বলা উচিত। তুমিও তো ভাই পরিশ্রম করতে ত্রুটি কর না। শুনিছি তো তুমি বড় ভাইকে কিছুই করতে দিতে না। এত বাড়-বাড়ন্ত সব তোমারই জন্যে তো ভাই। তা যাক সে কথা। তোমার দ্বারা সব হ'লেও একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত ব'লে তুমিই কর, আর তোমার দাদাই করুক, বা দু'ই জনেই কর, তা সমান বখরা করতে হ'বে। তুমি তোমার গণ্ডাটী বুঝে পড়ে নাও না।"

"দাদা কি মনে করবে? আর আমি একা—"

"এইত তো বলি চাচা আপন পরাণ বাঁচা! বলি তুমি না থাকলে, তোমার দাদা কোথায় থাকবে আগে সেটা আমাকে বল দেখি। তোমারই তো নিজের হাতে এ সব করা!"

"সেটা ঠিক, কিন্তু দাদাকে ক'রতে কিছু দিইনি বলেই দাদা করে নি। তা' না হ'লে দাদা যে পারত না, তা নয়।"

"সে আমি অনেকদিন জানি। দাদা পারত না ব'লেই তো তোমার হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'য়েছিল। তার প্রমাণ এইবার পাবে।"

"দাদা একাই তো এতদিন হ'ল কাজ আপনিই চালাচ্ছে। আমি কি করি, না করি, তা'র খোঁজটীও রাখে না।"

"ঐ খানেই বুঝে নিয়েছ তো তোমার কোন খোঁজই রাখে না? এখন চষা জমিতে মই সকলে দিতে পারে। তোমাকে দিয়ে বাঁধুনিটা ক'রে নিয়ে রঙ্, এখন তিনি নিজেই ফলাচ্ছেন। আর এখন তোমাকে দরকার কি? তুমি কাছে থাকলে তো সবটা নিজের করে নিতে পারবে না। এই আর কি।"

কাছেই বুদ্ধিদায়িনী সুরাদেবী অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। পকেট হইতে বোতলটী বাহির করিয়া গ্লাসে ঢালিয়া দুই এক পাত্র পরাণকে দিল। নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করিয়া যখন তাহার মাদক-শক্তিতে পরাণ উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিল, তখন বিশু বিষয়ের কথা, ভাগের কথা, তাহার দাদার অত্যাচারের কথা, তাহার আমোদে বাধা দিবার কথা ইত্যাদি কত কথাই তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিল। সুরার

সম্মোহিনী শক্তিতে কথাগুলি সে বেশ করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল, তাহার রসবোধও করিতে পারিতেছিল। অনেক কথার পর এবং অনেকবার পাত্রস্থ তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করার পর পরাণ বেশ করিয়া বুঝিতে পারিল যে, তাহার দাদা বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়ি সকলই আত্মসাৎ করিতেছে; সুবিধা যাহা কিছু সকলই সে আপনার করিয়া লইতেছে। আর কিছু দিন গেলে তাহাকে হয়ত নিজ বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে।

ছোট বউ বিমলাও ঠিক ঐ কথাই বলিতেছিল যে, বড় গিন্নী সকলই যেন নিজের করিয়া লইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। সে আর তাহার পুত্রকে তেমন করিয়া ভাল বাসে না। কাঁদিয়া গড়াগড়ি গেলেও তাহাকে অনেক সময়ে কোলে তুলিয়া লয় না, তেমন করিয়া আর হাসায় না, নাচায় না, আমোদ করে না। সুরার প্রসাদে বিশুর কথা তাহার নিকট অতি সৎ কথা বলিয়া মনে হইল। সে বিশুর কথায় মত দিয়া স্থির করিল যে, সেই দিনই সন্ধ্যার পর যখন তাহার দাদা বাড়ী আসিবে, তখন সকল কথা বলিয়া ঘর-বাড়ী, বাগান-বাগিচা সকলই আধা-আধি বখরা করিয়া লইবার কথা পাড়িবে।

বিশু বুঝাইয়াছিল সহজে যে তাহার ভ্রাতা তাহাকে অর্দ্ধাংশ ঠিক মত ছাড়িয়া দিবে তাহা সম্ভব নহে। তবে সহজে যদি হয় ভাল, না হয় আদালত তো আছেই! আদালত ভগবান্, গেলেই ইচ্ছামত কাজ করাইয়া লইতে পারিবে, বিশু এ কথাও তাহাকে বুঝাইয়া দিতে ত্রুটি করে না। হারাণ কলিকাতায় যায়-আসে, পাঁচটা কাজ কারবারি লোকের সঙ্গে মেশে, আবশ্যক হইলে মামলা-মকর্দ্দমাও করে। আদালত যে কিরূপ বুভুক্ষের জায়গা, অর্থগ্রাসী রাহুর কর্ত্তিত-স্কন্ধ মুখব্যাদান তাহা তাহার জানা আছে। কিন্তু পরাণ তো কোন দিন সে সব কাজে যায় নাই, বা যাইবার মত সময় না হওয়ায় হারাণ পরাণকে কখনও সেখানে পাঠায় নাই যে, সে আদালতের কথা জানিতে পারিবে! বিশু পরম বন্ধু, মহোপকারক জ্ঞাৎ-উপদেষ্টা। সে যখন বলিয়াছে দাদা ভালয় ভালয় দেয় ভালই, না হয় আদালত তো আছেই, আর তাহার কোন দুশ্চিন্তাই নাই।

ভাগও আগামী কল্য করিয়া লইতেই হইবে, কেন না থিয়েটার আর যে দুই দিন মাত্র আছে। ভাগ করিতে পারিলেই হাতে যে নগদ টাকাটা পাইবে, তাহাতে দুই দিন তো উপস্থিত আমোদ করিতে পারিবে। তাহার পর চাষ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অবাধে আমোদ-প্রমোদ করিতে পারিবে। অতএব স্থির হইল সেই দিনই রাত্রে প্রস্তাব করিয়া পরদিন প্রভাতেই ভাগ-যোগ করিয়া লইবে। সুরাপানে হাসির লহর তুলিয়া দুই পরম বন্ধু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর যে যাহার পথে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বিশু পরাণকে সতর্ক করিয়া দিতে ভুলিল না। যাহাতে উত্তেজনা বহুক্ষণ স্থায়ী হয়, তাহার জন্ম আরও দুই গ্লাস সুরা পরাণকে পান করাইতে ভুলিল না। ভাগের সময়ে বিশু থাকিলে ভাল হইত, এ কথা উত্থাপন করায় বিশু পরাণকে বুঝাইয়া দিল যে, সে ভিন্ন গ্রামের লোক, তাহার স্বগ্রামের লোকের উপস্থিত থাকাই দরকার। তাহা হইলে আইনমত কার্য্য করা হইবে। ভবিষ্যতে আর কোন গোলমাল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বিশু তাহার প্রাণের বন্ধু, অফুরন্ত আমোদের উৎস; সুতরাং সে যাহা বলিবে, তাহা কখনই মন্দ হইবার নহে। পরাণও বুঝিল, গ্রামের লোকের উপস্থিত থাকাই বিশেষ আবশ্যক। পরাণ গৃহে ফিরিল, বিশু তাহার গন্তব্যপথে চলিয়া গেল।

পরাণ গৃহে ফিরিয়া দেখিল যে, হারাণ মাঠ হইতে অনেকক্ষণ হইল ফিরিয়া আসিয়াছে। সে দাওয়ায় একটা মাদুর বিছাইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। দেখিয়া বোধ হইল যেন সে ঘুমাইতেছে। পায়ের কাছে বসিয়া বড় বউ কমলা তাহার পা টিপিয়া দিতেছিল। অপর এক দাওয়ায় ছোট বউ বিমলা ও তাহার মা বিনোদিনী বসিয়া নিঃশব্দে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। গোপাল জ্যাঠাইমা'র কাছেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। দাদাকে সুস্থ ভাবে নিদ্রিত হইয়া থাকিতে দেখিয়া পরাণের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মদিরার তীব্র মাদকতায় তাহার মস্তিষ্কে তীব্র জ্বালা জ্বলিতেছিল। তাহার উপর তাহার অতি নিকট বন্ধু, পরমহিতৈষী বিশুর কথা তাহাকে অনুক্ষণ তাড়না করিতেছিল। সে মাতালও হইয়াছিল। টলিতে টলিতে সহসা হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,

"দাদা আমার যা কিছু আছে, তা আমাকে দিয়ে দাও। তুমি কেবল মজা লুটবে, আর আমি কলা খাব, ছোবড়া চুষব? তা হ'বে না।"

বড় বউ কমলা দেবরের হাবভাব কয়েকদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইতেছিল না। আজ তাহার অভিনব পরিবর্ত্তন দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিল। সামলাইয়া লইয়া বাধা দিয়া বলিল,

"ঠাকুর-পো, তোমার দাদার বড় জ্বর হয়েছে। একটু ঘুমুচ্ছেন এখন বিরক্ত কোরো না। যা বলবার কাল বল।"

"তা তো এখন বলবেই তুমি। আমার জন্যে সব, আর আমার ফুর্ত্তির জন্যে আমাকেই টাকা না দেওয়া। তা হবে না। বিশু ঠিক বলেছে। আমার ভাগ আমাকে এখনই দিতে হবে। নইলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।"

এই বকাবকিতে হাঁকাহাঁকিতে হারাণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। হারাণ পূর্ব্বে ততটা লক্ষ্য না করিলেও কিছু কিছু যে বুঝিতে পারে নাই, এমন নহে। তবে তাহার মুখের উপর পরাণ কিছু বলিতে সাহস করিবে না, এই ধারণাতেই সেদিকে বড় একটা কিছু গ্রাহ্য করে নাই। আজ তাহারই ঔদাসীন্যে পরাণের এতদূর দুর্গতি হইয়াছে দেখিয়া সে বড়ই ক্ষুব্ধ হইল। আর সময় নাই বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ হারাণ পরাণকে বলিল, "বেশ, ভাগে দরকার কি? তোর যা নিলে ভাল হয়, তুই তা নিস। এখন যা খেতে যা, ঘুমুগে যা। কাল সকালে এর একটি ব্যবস্থা করে'খন।"

মদিরার তীব্র হলাহল তাহার শরীর একেবারে পুড়াইয়া দিতেছিল। সে দাদার কথা শুনিয়া আরও জ্বলিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিল, "না, তা হতে পারে না। আজই চাই, এখনই চাই। ও কাল-টাল আমি বুঝি নে।"

বিনোদিনী ও ছোট বউ বিমলা এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে প্রমাদ গণিল। কিন্তু বিনোদিনী মনে মনে করিল, ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। ইহা ছাড়া হইবে না। মাতা ও কন্যা পরাণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদিনী বলিল, "কি বলছ, বাবা? হারাণের যে এখন বড় কষ্ট হচ্ছে। এখন থাক। এত তোমাদের দুজনেরই। তা যখন সুবিধে হবে তখন না হয় যা করবার তা কর। আর হারাণ যখন বলছে, কাল সকালে সব ব্যবস্থা করে দেবে, তখন তোমার ভাবনা কি?"

"না, না। ও এখনই হওয়া দরকার। আমার টাকার অংশ নেই? আমাকে টাকা না দেওয়া?"

হারাণ অতিপ্রসন্ন মুখে বলিল, "সবই তো ভাই তোমার। তুমি সবই নাও না।"

বিনোদিনী তখন বেশ ভাল কথা কহিল, সে বলিল, "দেখ হারাণ, তোমাদের ভেতর আমার কোন কথা কওয়া উচিত নয়। তবুও যখন তোমরা দু'জনেই আমাকে সমান চোখে দেখ, আমার কথাটা না বলা ভাল দেখায় না।"

"হাঁ মা আপনি বলুন। আমার এই ছোট ভাইটিকে বুঝিয়ে দিন।"

"যদি তুমি সর্ব্বস্ব ছেড়ে দাও, সকলেই আমাকে দোষ দেবে, ঐ মাগীই ত এই কাণ্ডটা বাধালে। কিন্তু 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই', এ-কথা ত চিরকালই আছে। যদি বখরা তোমাদের সমান সমান হয়, তাহলে আর কারও কথা কইবার কিছু থাকে না। তাই বলছিলুম, কাল সকালে পাড়ার পাঁচ জনকে ডেকে একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেল। আর, পরাণ, এখন চল বাবা, খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তার পর যা করবার তার ব্যবস্থা হবে'খনি।"

মা ও মেয়ে পরাণকে টানিয়া ঘরে লইয়া গেল। হারাণ সকল কথা শুনিল। বুঝিল, পরাণের শাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে বাড়ীতে রাখা ভাল হয় নাই। তাহাতে পাড়ার পাঁচ জনের পাঁচ কথার সুযোগ হইয়াছে, অধিকন্তু মা আসিয়া কন্যা ও জামাইয়ের কাণ ভারি করিয়া তুলিয়াছে। বড় বউ কিছুই বলিল না। এ মেঘ যে বহুদিন হইতে সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহা সে বেশ জানিত। কিন্তু সে নিমিত্তের ভাগী হইতে চাহিত না বলিয়া স্বামীর নিকট কোন কথাই বলিত না। হয়ত বলিলে এতদূর গড়াইত না। কিন্তু তাহার যতটুকু বুদ্ধি, সে তাহাতেই সাবধানতা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিল এই মাত্র। হারাণ আবার শুইয়া পড়িল। বড় বউ বাতাস করিতে লাগিল। ঘরের ভিতর হইতে বিনোদিনীর গলা শুনিতে পাওয়া গেল—

"তা ছেলে ত তোদের ওদের কাছে যেতে না দিলে ত আর ওরা কেড়ে নিয়ে যায় না।"

পরাণ চীৎকার করিয়া বলিল, "নিয়ে আয়, ছোট বউ, গোপলাকে। হতভাগা ছেলে!"

ছোট বউ বলিল, "আমি কেন আনতে গেলুম। আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই। ও যা করতে হয়, মা আছে, তোমরা যা হয় কর গে।"

বিনোদিনীই বাহিরে আসিল। গোপালকে লইয়া গেল। কেহ কোন কথাই বলিল না। গোপাল চীৎকার করিতে লাগিল, "আমি যাব না, যাব না। জ্যাঠামার কাছে ঘুমোব।"

বড় বউ সতৃষ্ণ নয়নে গোপালের দিকে চাহিয়া রহিল। গোপাল ঘরের ভিতর গেলে বড় বউ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। চক্ষে কএক ফোঁটা বুঝি জলও পড়িল।

দীর্ঘরাত্রি ধরিয়া মাতা, কন্যা ও জামাই বহু জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। ছোট বউ যে কম, তাহা তাহার কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল না। সেও যে এই অনিষ্টের ভিতর একজন পাণ্ডা তাহা বড় বউ-এর বুঝিতে বাকি রহিল না। বড় বউ মনে করিতেছিল, স্বামী নিদ্রা যাইতেছে, কিন্তু পরাণের ব্যাপার দেখিয়া তাহার ঘুম কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। সে অসাড়ভাবে পড়িয়া বিনিদ্র রজনী দুশ্চিন্তায় কাটাইয়া দিল।

নেশার ঝোঁকে রাত্রিতে পরাণ দাদাকে যাহা বলিয়াছিল, নেশা ছুটিয়া গেলে রাত্রিশেষে যখন পরাণ অবসাদে অকাতরে ঘুমাইয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল, তখন মাতা ও কন্যা, বিনোদিনী ও বিমলা, নিজের নিজের ঘরে বড়ই উতলা হইয়া উঠিতেছিল। পরদিন প্রাতঃকালে কি হইবে, তাহার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইতেছিল। পরাণ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল, কে যেন তাহার যথসর্ব্বস্ব লুটপাট করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার আপনার লোক সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কয়দিন হইল স্বামী-স্ত্রীর একমুঠা অন্ন জোটে নাই, গোপাল দুই তিন দিন কিছু না খাইতে পাইয়া নির্জীবের মত পড়িয়া রহিয়াছে ও ছোট বউ বিমলা তাহাকে এমন ভাবে রাগাইয়া দিয়াছে যে, সে ক্ষোভে, ক্রোধে দাদাকে গলা টিপিয়া মারিয়াছে। স্বপ্নের ঘোরে পরাণ বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল। বিমলা তাহাকে ঠেলা দিয়া জাগাইয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল। পরাণ 'ফ্যাল ফ্যাল' করিয়া কেবল চাহিয়াই রহিল—কোন জবাব দিল না। তাহার উদাস দৃষ্টি দেখিয়া বিমলার ভয় হইল। সে কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরাণের অস্বাভাবিক চীৎকারে আর বিমলার ক্রন্দনের রোলে হারাণ 'ধড়ফড়' করিয়া উঠিয়া বসিল। বড় বউ কমলাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—

"বড় বউ, ছোট বৌ কাঁদে কেন? পরাণকে দেখে তার অবস্থা ভাল বলে বোধ হয় নি। মারধর করলে না কি? দেখ ত'। না, তোমার গিয়ে কাজ নেই। কি জানি নেশার ঝোঁকে তোমাকে যদি কিছু বলে।"

কমলার কথায় অপেক্ষা না করিয়াই হারাণ পরাণের ঘরের দরজার কাছে গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিমলা ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেছিল। হারাণ কিছু না বলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই পরাণের দিকে উদাস-দৃষ্টিতে ক্ষণেকের তরে দাঁড়াইল। সকল বুঝিতে পারিয়া পরাণকে ধরিয়া খুব জোরে সে নাড়া দিল। তখন পরাণের সংজ্ঞা হইল। সে 'থাড়িমাড়ি' খাইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল,

"কি, কি? কেন?"

"পরাণে, তোর কি হ'য়েছে রে আজ?"

"না, না। কিছুই ত হয় নি। হ্যাঁ, একটা কেমন স্বপন দেখলুম, তা'তে বোধ হয়, বোধ হয়, তোমরা সব জেগে পড়েছ না? আমার খুব জোরে চেঁচাতে ইচ্ছা হ'য়েছিল, চেঁচাতে চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু চেঁচাতে পারছিলুম না। বুকটা কে যেন চেপে ধ'রেছিল।"

"তুই কি স্বপ্ন এমন দেখলি, যা'তে চেঁচাতে যাচ্ছিলি?"

"এই যে আমার যথাসর্ব্বস্ব কে কেড়ে নিয়েছে—"

"না, না, তোর যথাসর্ব্বস্ব কেউ কাড়বে না রে। এই ভোর হ'তে আর দেরী নেই। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তুই সুস্থ হ। চুপ করে শো।"

বড় বউ কমলা, বিনোদিনী, বাড়ীর চাকরেরা সকলেই আসিয়া পরাণের ঘরের ভিতর একত্র হইয়াছিল। সকলেই উৎসুক হইয়া পরাণের দিকে চাহিয়া ছিল। হারাণ যখন

পরাণকে তাহার প্রাপ্য আর দুই এক দণ্ড পরেই বুঝাইয়া দিবে বলিয়া তাহাকে মন সুস্থ করিয়া ঘুমাইতে বলিল, তখন সকলেই বিষণ্ণ হইল। ছোট বউ বিমলার মনে জননী সে ইচ্ছা জাগাইয়া দিলেও, এই আকস্মিক ঘটনায়, ভাশুরের কথায় যেন ভবিষ্যৎটা ভাল বলিয়া সে মনে করিতে পারিল না। সে শিহরিয়া উঠিল। হারাণের কথাগুলি বিনোদিনীর কর্ণে যেন অমৃত নিষেক করিল,—"আঃ! বাঁচলুম! মেয়েটার এত দিনে একটা হিল্লে করতে পারলুম! ভালয় ভালয় যে কাজটা হ'য়ে গেল, আমাকে যে লোকে দোষী ক'রতে পারলে না, আমি বেঁচে গেলুম।" সে মেয়ের দিকে চাহিয়াই শুলনোড়া কাল কাল পুরু ঠোঁট দুইখানি উল্টাইয়া নাকমুখ চোখ সিঁটকাইয়া মুখখানি ফিরাইয়া অস্ফুট অথচ মেয়ে শুনিতে পায় এমন স্বরে বলিয়া উঠিল,—

"আঃ, বাপের দরদ এতদিন কোথায় ছিল? তা হ'লে ত আর বাছার এ কষ্টটাও হত না।"

কন্যা কিন্তু ইহাতে বিশেষ সায় দিল না। বুদ্ধিমতী মাতা তাহা বুঝিতে পারিল। মনে মনে বিনোদিনী বলিল, "এখনও হয় নি! আচ্ছা, ভাগটা আগে হ'য়ে যাক। একটু থেকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে!"

যে যাহার স্থানে চলিয়া গিয়াছে। বড় বউ কমলা এইবার বড় ভাইয়ের কাছে কথা পাড়িল,—

"হ্যাঁ গা, তুমি কি সত্যি সত্যিই গোপালকে পর ক'রে দেবে? গোপাল যে আর আমার কাছে তা' হ'লে আসবে না।"

"কেন, বড় বউ, তোমার পরের জন্যে অত ভাবনা কেন? যে পর, তাকে পর ভাবাই ত ভাল, বড় বউ।"

"গোপাল পর, তা তো কই আমার মন বলে না। কি জানি, ছেলে হ'লে কি সুখ হত? কিন্তু গোপাল যে আমার ছেলে।"

বড় বউ কাঁদিতে লাগিল। যদি সে লক্ষ্য করিত, সে দেখিতে পাইত, বর্ষার বড় বড় ফোঁটার মত হারাণেরও চক্ষু ঝরিতেছিল। কিন্তু হারাণ বিষয়ী, তদুপরি বুদ্ধিমান, সুবিবেচক ও ভবিষ্যজ্ঞ। সে জানিত দুষ্টচক্রে পড়িয়া পরাণ ঘূর্ণিপাক খাইতেছে। তাহার একবার জ্ঞান হওয়া উচিত। না দেখিলে ভাল মন্দ কিছুই সে বুঝিতে পারিবে না। পরাণ একবার দেখিয়া আসুক আপনার লোক কয়জন আছে। যে মুহূর্ত্তে সে মনে করিবে, সেই মুহূর্ত্তে সে পরাণকে টানিয়া লইবে। পরাণ তাহার মা'র পেটের ভাই! সে বিপদে পড়িবে, সে পর হইবে, এ কখনই হইতে পারে না। তবে তাহার কিছু জ্ঞান হওয়া দরকার। সেই জন্য সে দৃঢ় হইল। জোর করিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল। মিষ্ট অথচ কঠিন স্বরে বলিল, "বড় বউ, 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' এ কথা কি তোমার জানা নেই? বিভীষণই রাবণের মৃত্যুবাণের সন্ধান ব'লে দিয়েছিল।"

বড় বউ বুদ্ধিমতী। সুতরাং তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, যতই বলা যাউক না বড় ভাইকে টলাইবার কোন উপায় নাই এবং যে যুক্তি সে দেখাইয়াছে, তাহাও কাটাইবার কোন উপায় নাই। সুতরাং বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া প্রশান্ত হইল দেখিয়া বড় বউ নিজের কাজে চলিয়া গেল। [ক্রমশঃ

বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান

...বর্ত্তমান জগতের অর্থনীতি হউক, রাষ্ট্রনীতি হউক, সমাজনীতি হউক, স্বাস্থ্যনীতি হউক, অথবা তৎসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও দর্শন যাহাই ধরা যাউক না কেন, উহার প্রত্যেকটি প্রায়শঃ প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায়শঃ মানুষের অহিতকর। আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাও বুঝা যাইতে পারে। ঐ নীতি, দর্শন ও বিজ্ঞানসমূহ যদি মানুষের অহিতকরই না হইত, অথবা তাহার কোনটিতে যদি মানুষের কল্যাণ সাধন করিবার উপায়ের সন্ধান পাওয়া যাইত, তাহা হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ দুর্গতি প্রায়শঃ সর্ব্বত্র উত্তরোত্তর এত অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারিত না।...

যশোহর-পরিচিতি

শ্রীসুশীলকুমার বসু

নদী-ব্যবস্থা

কপোতাক্ষ :

কপোতাক্ষ এই জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে এবং ত্রিমোহিনীর আট মাইল দক্ষিণে যশোহরের সীমানা পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহিরপুর হইতে ইহা ভৈরবের শাখারূপে বাহির হইয়াছে। ১৭৯০ সালে ভৈরবের প্রধান স্রোত ইহার মধ্য দিয়া বাহির হয়। তাহিরপুরের নিকটস্থ অংশ ভৈরব নামে পরিচিত। ১৮০০ সাল হইতে ইহার খাত ভরাট হইয়া উঠিতেছে এবং ত্রিমোহিনীর নিম্ন পর্য্যন্ত জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আরও নীচে আসিয়া জোয়ার-ভাঁটার সীমার মধ্যে নদীর আকার বড় হইয়াছে। কিন্তু ত্রিমোহিনী হইতে খুলনার চাঁদখালি পর্য্যন্ত বাঁকের সংখ্যাধিক্য হেতু এই অংশে নৌ-চালনা বিশেষ কষ্টসাধ্য। এক সময়ে জেলার পশ্চিমাংশের ইহাই বড় জলপথ ছিল এবং মহেশপুর ও কোটচাঁদপুরের সমৃদ্ধি ইহার জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। এখন মাত্র কোটচাঁদপুর পর্য্যন্ত নৌকা চলাচল করিতে পারে। যশোহরে ইহার দৈর্ঘ্য সত্তর মাইল।

ইছামতী

কৃষ্ণগঞ্জে চূর্ণী নাম গ্রহণ করিয়া ইছামতী মাথাভাঙ্গা হইতে বাহির হইয়াছে এবং নোনাগঞ্জের নিম্নে কিছুদূর ধরিয়া ইহা জেলার পশ্চিম সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ভবানীপুরে ইহা পূর্ব্বগামী হইয়াছে এবং বনগাঁ মহকুমার মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়া তিব্রিতে যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। এখান হইতে উভয় নদী মিলিত হইয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। অন্যান্য নদী যে-সকল কারণে ভরাট হইয়া গিয়াছে, ইছামতীও সেই কারণে দ্রুত ভরাট হইয়া যাইতেছে। মাছ ধরিবার জন্য নদীতে 'পাটা' দিবার ফলে নদী আরও দ্রুত ভরাট হইতেছে। কিন্তু নদীটি এখনও সম্পূর্ণ মরিয়া যায় নাই; এবং মাথাভাঙ্গা হইতে কিছু পরিমাণ জলও পাইয়া থাকে। নীচের দিকে আসিয়া ইহা জোয়ার-ভাঁটার অধিকারের মধ্যে পড়িয়াছে। এখানে বড় বড় নৌকা চলাচল করিতে পারে। ইহার জল ব-দ্বীপীয় নদীর পক্ষে অস্বাভাবিকরূপে পরিষ্কার কিন্তু কুম্ভীর-সঙ্কুল।

ভৈরব

ভৈরব এ-অঞ্চলের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম নদীগুলির অন্যতম। যদিও ইহার খাতগুলি বহুদিন পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং অনেকানেক অংশের চিহ্ন পাওয়াই দুষ্কর হইয়াছে তবুও, এক সময়ে যে ইহা খুব শক্তিশালী বড় নদী ছিল, ইহার নাম হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জলপথ হিসাবে ইহার গুরুত্বও এক সময়ে যথেষ্ট ছিল। এক সময় ইহা মুর্শিদাবাদ, নদীয়া যশোহর ও খুলনার মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইত। যেখানে মহানন্দা আসিয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে প্রায় তাহার বিপরীত দিক্ হইতে ভৈরব নির্গত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে ইহা মহানন্দারই দক্ষিণাংশ ছিল। পদ্মার পূর্ব্বাভিমুখী গতির ফলে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং দক্ষিণাংশ ভৈরব নামে অভিহিত হয়।

ভৈরবকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—নদীয়ার মধ্য দিয়া ইহার প্রথম অংশ এবং যশোহরের মধ্য দিয়া ইহার নিম্নাংশ প্রবাহিত হইয়াছে। গঙ্গার সহিত ইহার প্রথমাংশের সম্পর্ক এক সময় সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ১৮৭৪ সালের বন্যায় ইহা আবার উন্মুক্ত হয়। পুনরায় ইহার মধ্য দিয়া গঙ্গার জলধারা প্রবাহিত হইতে থাকে এবং আরও ৪০ মাইল দক্ষিণে ইহা জলঙ্গীর সহিত মিলিত হয়। ইহার ফলে এই সঙ্গমের উপরের দিকে জলঙ্গীর জলধারা শুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করে। এখন জলঙ্গী প্রধানতঃ ভৈরবের মধ্য দিয়াই গঙ্গার জল গ্রহণ করিয়া থাকে। নীচের দিকে

আসিয়া ভৈরব বর্তমানে মাথাভাঙ্গা কর্তৃক অধিকৃত খাতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া যশোহরে প্রবেশ করে। বর্তমানের অবস্থা হইতেছে নিম্নলিখিত রূপ।

তকুলপুরের নিকট মাথাভাঙ্গার সহিত যুক্ত হইয়াছে এবং ছয় মাইল নীচে আসিয়া সুলতানপুরের নিকট নিম্নভৈরব নির্গত হইয়া যশোহর অভিমুখে আসিয়াছে। এক সময় এই নিম্নভৈরবই যশোহরের মধ্যভাগের প্রধান জলপথ ছিল, কিন্তু, একশত বৎসরেরও পূর্ব্ব হইতে ইহার ক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে। ১৭৯০ সালের কাছাকাছি ভৈরবের খাত ভরাট হইয়া যাওয়ায় ইহার প্রধান জলধারা কপোতাক্ষের পথে প্রবাহিত হইতে থাকে (তাহিরপুরের নিকট ইহা ভৈরব হইতে বাহির হইয়াছে)। এবং চারি বৎসর পরে এই স্থানে বালুচর গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া কালেক্টরের রিপোর্টে উল্লিখিত হয়। তিনি বলেন, গ্রীষ্মকালে নদী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল এবং বাধাসৃষ্টি হইবার ফলে ইহার নীচে যশোহরের সমৃদ্ধি বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকায় তিনি কাটিয়া বাধাটি অপসৃত করিবার পরামর্শ দান করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে তাহির-পুরের নিকট বাঁধ দিয়া কপোতাক্ষের জলকে ভৈরবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করা হয়। এই পরীক্ষা কিছু কালের জন্য সফলতা লাভ করে; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কপোতাক্ষ এই বাঁধের নীচে আসিয়া তীরভূমি ভেদ করিয়া নিজের পুরাতন খাতে প্রবাহিত হয়। নদীর উপরের দিক্ ১৮৩০ সাল পর্য্যন্ত বন্যার সময় জল পাইতে থাকে বটে, কিন্তু এই সময় মাথাভাঙ্গার সহিত ইহার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ইহার মাথার দিকে প্রায় আড়াই মাইল ধরিয়া ইহা সম্পূর্ণ ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং তাহিরপুর হইতে যশোহর পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম-কালে জলের একটি রেখামাত্র অবশিষ্ট থাকে। বর্ষাকালে জলবৃদ্ধি হইলেও প্রবাহ থাকে না, তবে গত দুই বৎসর বন্যার খুব প্রবল স্রোত দেখা দিয়াছিল এবং লোকের মনে কিছু আশার সঞ্চার হইয়াছিল। যশোহরের চারি মাইল নিম্নে রাজারহাট পর্য্যন্ত বর্ষার সময় ছোট ছোট নৌকা যাওয়া দেখিয়া কোন প্রকারে আসিতে পারে—অবশ্য সম্প্রতি কচুরিপানায় তাহাও প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। বসুন্দিয়া পর্য্যন্ত নদীর অবস্থা এই প্রকার। বসুন্দিয়া হইতে নদী জোয়ার-ভাঁটার সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে এবং এইস্থান হইতে নদী প্রায় বার মাস সুনাব্য থাকে। পূর্ব্বের বর্ণনানুযায়ী ভৈরবের মধ্য দিয়া জলপ্রবাহ লইবার চেষ্টা করার ফলে তাহিরপুরের উপরে অনেক দূর ধরিয়া ভৈরব কপোতাক্ষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মজুদখালি আড়াই (পূর্ব্বে মালুয়ার খাল নামে পরিচিত) হইতে বাহির হইয়া শিমুলতলায় ভৈরবের সহিত মিশিয়াছে। নদীতে জোয়ার-ভাঁটা উঠে এবং বার মাসই নৌ-চলাচলের যোগ্য থাকে। গোবরা এবং আফ্‌রা খাল গোবরার নিকটে চিত্রা হইতে বহির্গত হইয়াছে এবং আফ্‌রার নিকট ভৈরবের সহিত মিলিত হইয়াছে। উপরের অংশটা গোবরা খাল নামে পরিচিত এবং ছোট ছোট নৌকা চলাচলের যোগ্য। আফ্‌রা খালের গভীরতা বেশী, এখানে বার মাসই বড় বড় নৌকা চলিয়া থাকে।

ভৈরব উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া যশোহর শহরের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং কচুয়ায় মধুমতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৯৫ মাইল।

আফ্‌রা এবং গোবরা খাল (দৈর্ঘ্যে ৯ মাইল করিয়া) পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে ইহা ভৈরব ও চিত্রার মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত জলাভূমির জল ভৈরব ও চিত্রায় লইয়া যাইত, কিন্তু এই জলাভূমি ক্রমে উন্নত হইয়া উঠায় এই জল নিষ্কাশনের পথ খালে রূপান্তরিত হইল এবং দুইটি খালই এক হইয়া গেল। আফ্‌রা খাল চমকুলেরই বর্দ্ধিতাংশ, যদিও ইহার পুরাতন নাম লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। গোবরা খাল প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণনগরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত জলঙ্গী অথবা রাণাঘাটের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত মাথাভাঙ্গা, এই উভয়েরই সৃষ্টি ভৈরবের পরে হইয়াছে। জলঙ্গীর সৃষ্টির পর ইহা পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিবার পথে ভৈরবের সহিত মিলিত হইয়া ইহার অনেকটা জল গ্রহণ করিয়াছে। পরে ভৈরব পূর্ব্বমুখে যাইবার পথে দক্ষিণগামী মাথাভাঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং অন্যথা যে-জল যশোহরের পথে প্রবাহিত হইতে পারিত, তাহা অন্যপথে চলিয়া গিয়াছে।

হরিহর

হরিহর প্রথমে ঝিকরগাছার নিকটে কপোতাক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং দক্ষিণ দিকে মণিরামপুর ও কেশব-

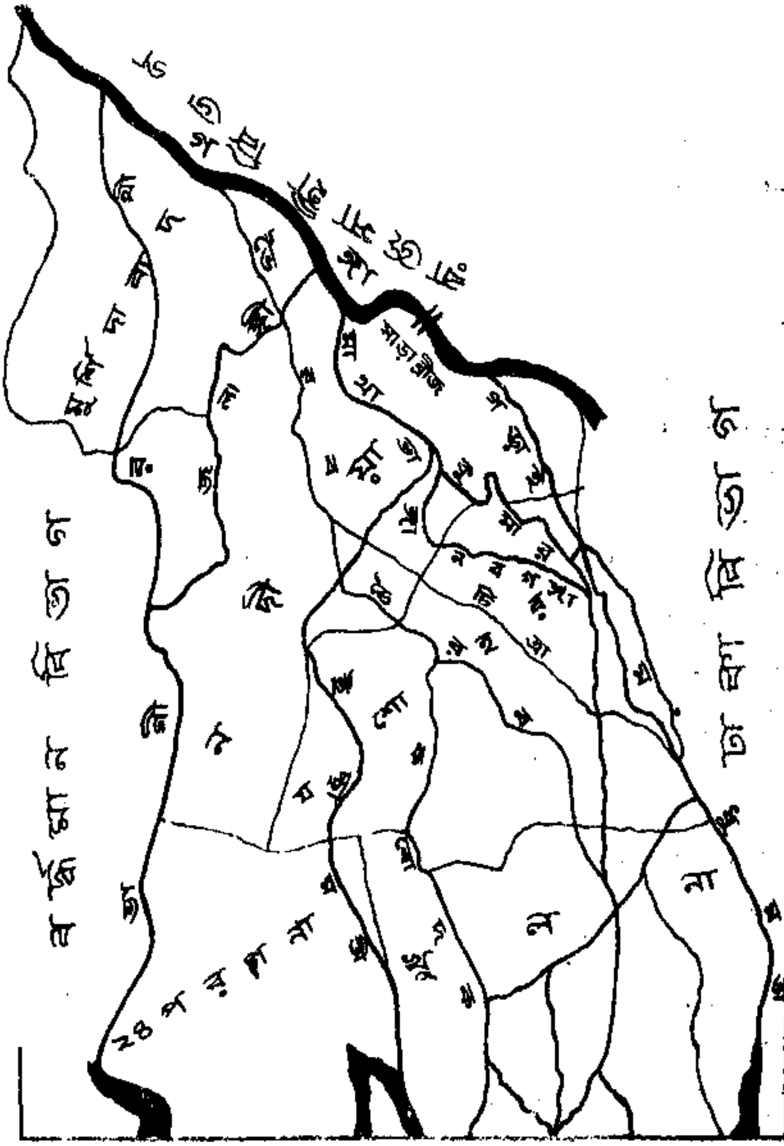
পুরের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভদ্রায় পতিত হইয়াছিল। হরিহরের দৈর্ঘ্য ৩২ মাইল, ইহা উত্তর-পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে কেশবপুর হইতে সুন্দরবনের দিকে গিয়াছে।

বেতনা

বেতনা ভৈরবের একটা শাখা, ইহা মহেশপুর হইতে নির্গত হইয়াছে। এখান হইতে আঁকাবাঁকা পথে ইহা বানাদা ও তথা হইতে যাদবপুরে গিয়াছে। পরে ইহা খুলনা জেলায় যাইয়া কপোতাক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছে। উপরের দিকে নদীতে স্রোত নাই এবং জলও প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু যাদবপুরের নীচে নৌকা চলাচল করিবার মত জল থাকে।

ভদ্রা

ভদ্রাও একটি মৃত নদী। ত্রিমোহিনীর নিকট কপোতাক্ষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া কেশবপুরের ২।১ মাইল নীচে হরিহরের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া সুন্দরবনের দিকে গিয়াছে। ত্রিমোহিনী এবং কেশবপুরের মধ্যবর্ত্তী খাত শুকাইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে চাষ-আবাদ হইতেছে। কিন্তু কেশবপুরের নীচে ইহা জোয়ার-ভাঁটার সীমার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে এবং ক্রমে প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে।



মধ্য বঙ্গের নদীর উৎপত্তি।

বারাসিয়া: বারাসিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত। খালপাড়ায় মধুমতী নির্গত হইয়া ভাটিয়াপাড়ায় পুনরায় মধুমতীতে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ২৫ মাইল, খালপাড়া হইতে ঠাকুরপাশা পর্য্যন্ত নদী শুকাইয়া গিয়াছে।

মশরা খাল: মশরা খাল উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। ফুলবাড়ীতে কুমার হইতে নির্গত হইয়া মুরারিদহে নবগঙ্গায় পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ৮॥ মাইল। সম্পূর্ণ ভরাট হইয়া গিয়াছে।

আরও কয়েকটি ছোট ছোট জলপথ

হনুনদী: উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত ভাটবাড়ির নিকট গড়ই হইতে উদ্ভূত হইয়া নিশ্চিন্তপুরের নিকট আবার গড়ইতে পতিত হইয়াছে। বর্ষা ব্যতীত অন্য কোন ঋতুতে নৌকা-চলাচল হইতে পারে না।

কালীগঙ্গা: উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত শম্ভুনগর হইতে বিস্তৃত হইয়া অচিন্তগালিতে কুমারের সহিত মিশিয়াছে। দৈর্ঘ্য ১০ মাইল

দেখো খাল : ইহা গড়ই-এর সহিত কুমারের মিলন ঘটাইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্বে কুমারখালি হইতে শৈলকূপা পর্য্যন্ত ১৬ মাইল ধরিয়া প্রবাহিত।

কাচনার খাল : ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া দেখোকে কালীগঙ্গার সহিত মিলিত করিয়াছে। দৈর্ঘ্য ৮ মাইল।

কাটাখালি খাল : চুড়িয়ায় কুমার হইতে নির্গত হইয়াছে। এই নদীর উত্তর দিকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে চারি মাইল পরিভ্রমণ করিয়া ফুলবাড়ীতে পুনরায় এই নদীতেই পতিত হইয়াছে।

চপরি খাল : উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত। কুমার হইতে বহির্গত হইয়া চপরিতে নবগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ১০ মাইল।

রায়যাদুপুর খাল : উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। রায় যাদুপুরে কুমার হইতে বহির্গত হইয়া বক্‌রিতে নবগঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

ধোবাঘাটা খাল : ঝিনাইদহে নবগঙ্গা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া একটা বড় বিল অতিক্রম করিয়াছে এবং ১৫ মাইল প্রবাহিত হইয়া কটকীতে পতিত হইয়াছে।

কুমারখাল : কাজলীতে কুমার নদ হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিম-পূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়াছে এবং আমতান নওাটা হালুতে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য তিন মাইল বর্ষা ব্যতীত ইহার খাত প্রায় শুষ্কই থাকে।

পালতিয়া খাল : পালতিয়ায় নবগঙ্গা হইতে বাহির হইয়া বড়খালি খালে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য তিন মাইল। অজাট হইয়া গিয়াছে।

ঘোড়াখালি খাল : নলদিতে নবগঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়া উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে এবং ঘোড়াখালিতে চিত্রায় পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ৪ মাইল।

মাগুরায় খাল (আতাই) : জাবুর হাটে চিত্রা হইতে বহির্গত হইয়া উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে এবং সোনাপুরে ভৈরবের সহিত মিলিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ১৭ মাইল।

যশোহরের নদী-ব্যবস্থার যে বিবরণ উপরে প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে একথা স্পষ্ট রূপেই বুঝা যাইবে যে, অনেকটা ইহা অতীতের কথা। অনেক নদী সম্পূর্ণরূপে অজাট হইয়া গিয়াছে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী খাতে এখন চাষ-আবাদ হইতেছে। আরও অধিকসংখ্যক নদী সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, ইহারা স্রোতোহীন বদ্ধ জলার আকারে অবস্থান করিতেছে এবং জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়া আছে। জলপথ হিসাবে এগুলির ব্যবহার অনেকদিন হইতেই বন্ধ হইয়াছে—বর্ষার সময় কোন কোনটিতে নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। জোয়ার-ভাঁটার সীমান্তর্গত নদীগুলি (যশোহরের অল্পাংশই এই সীমায় অন্তর্ভুক্ত) কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু বিলের ফসল নিরাপদ্ করিবার জন্ম এই সকল নদী ও খালে অনেক স্থলে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে এ-গুলির অবস্থাও অনেক ক্ষেত্রেই ভাল নাই। কিন্তু, যশোহরের নদী-ব্যবস্থা যেমন মধ্য-বঙ্গের নদী-ব্যবস্থার অংশ মাত্র—ইহার ধ্বংসের কারণও শুধু যশোহরেই সীমাবদ্ধ নহে। নদী পরিশিষ্টে ইহাই আলোচিত হইল।

নদী-পরিশিষ্ট

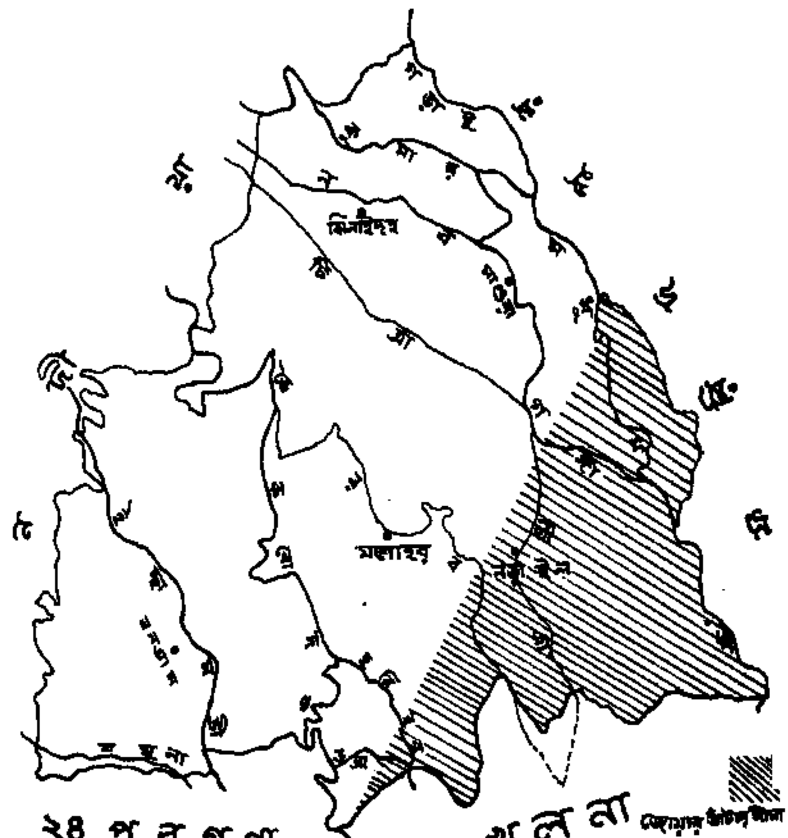
মধ্য-বঙ্গের নদী সমস্যা

"সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি" এ-কথা আমরা সকলেই শুনিয়া আসিতেছি। সাধারণতঃ, স্কুল-পাঠ্য রচনা পুস্তকে বা অনভিজ্ঞ সাহিত্যিকের গ্রামের বর্ণনায় গ্রাম সম্পর্কে যেরূপ উচ্ছ্বাস দেখা যায়, 'সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি'ও কতকটা সে ধরণের উচ্ছ্বাস। পূর্ব্ববঙ্গ ব্যতীত, বঙ্গভূমি আর বর্ত্তমানে সুফলা নহে।

বঙ্গদেশ যে সুজলা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু, সুজলা হইলেই সে-ই সুফলা হয় না। সুফলা হইতে গেলে ফসলের রোপণ, বৃদ্ধি ও পুষ্টির সময়ের প্রয়োজনানুরূপ জল পাওয়া চাই। বস্তুতঃ দেশের বারিপাতের পরিমাণ বা নদী-সমূহের বিবরণ দ্বারা দেশের কৃষি-সমৃদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায় না। বঙ্গদেশে জলের অভাব নাই সত্য, কিন্তু ফসলের যে সময় যেরূপ জল প্রয়োজন, সে সময় সেরূপ জল না পাওয়া যাওয়ায়, বা প্রয়োজনাতিরিক্ত জল পাওয়ার ফলে মধ্য ও পশ্চিম-বঙ্গের কোন না কোন অংশে প্রতি বৎসরই শস্য-হানি, ও ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। অথচ ঐতিহাসিক বিবরণে বঙ্গের, বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গের সুফলতার

প্রমাণ সুস্পষ্ট। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বের্নিয়ার বঙ্গদেশ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: "দুইবার বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে বঙ্গদেশ মিশর অপেক্ষাও সমৃদ্ধিশালী।" এমন কি, মাত্র এক শতাব্দী পূর্ব্বেও (১৮১৫ খৃঃ অব্দে) হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান সম্পর্কে হ্যামিলটন লিখিয়াছেন: "আয়তনের তুলনায় কৃষিজ-সমৃদ্ধির তুলনা করিতে গেলে সমগ্র হিন্দুস্থানের ভিতর বর্দ্ধমানকে প্রথম স্থান ও তাহোরকে দ্বিতীয় স্থান দিতে হয়।"

নদ-নদীর যে সকল বিবরণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে, ঐ সকল নদীর যৌবনকালে যশোহরও সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা ছিল। কিন্তু অধুনা প্রতি বৎসরই এই জেলায় কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। মাত্র পনর কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও যে সকল বিল প্রচুর শস্য উৎপাদন করিত, এক্ষণে তাহা প্রায় শস্যহীন ও মরুভূমিসদৃশ হইয়াছে। আর যশোহরের ম্যালেরিয়া তো আন্তর্জ্জাতিক (কু)-খ্যাতি-সম্পন্ন। এখন মনে এ প্রশ্ন উদিত হওয়া স্বাভাবিক, যশোহরের এরূপ অবনতির কারণ কি? সমগ্র মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের অবনতির যে কারণ, যশোহরের অবনতির কারণও তাহাই। যে-নদীগুলি পূর্ব্বে সজীব ছিল, যৌবনকালে যে-নদীগুলি প্রচুর সারসম্পন্ন পলি বিতরণ করিত ও শস্যের প্রয়োজনানুরূপ জল সরবরাহ করিত, সে-নদীগুলি বর্ত্তমানে হাজিয়া মজিয়া যাওয়ার ফলেই যশোহরের এই অবনতি। এক কথায়, যশোহরের নদ-নদীর দুরবস্থা হইতেই যশোহরের দুরবস্থা। এ দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধান ও দুরবস্থার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে গেলেই যশোহরের, তথা সমগ্র বঙ্গের নদী-সমস্যার কথা উঠিয়া পড়ে। অবিশেষজ্ঞদের নিকট এ সমস্যা অতীব জটিল ও অবোধ্য বোধ হয়। তথাপি যে বিষয়ের সহিত আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও অদূর ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সে বিষয়ের আলোচনা হইতে বিরত থাকা দুরূহ। সুতরাং নিম্নে আমরা সংক্ষেপে যশোহরের নদী-সমস্যা সম্পর্কিত মূল সূত্র ও তথ্যগুলির আলোচনা করিতেছি।



যশোহরের প্রধান নদীসমূহ।

যশোহরের নদীসমস্যার আলোচনার পূর্ব্বে, যশোহরের নদ-নদীর উৎপত্তির কথা স্মরণ করিতে হইবে। রাজমহলের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছে। রাজমহল (বিহার) পর্য্যন্ত গঙ্গা পূর্ব্বগামী, রাজমহলের পর হইতে, অর্থাৎ বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াই, গঙ্গা দক্ষিণ পূর্ব্বগামী হইয়া পদ্মা দিয়া সাগরে পতিত হইতেছে। গঙ্গার অধিকাংশ বারিরাশি বর্ত্তমানে পদ্মা দিয়াই বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় বটে, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত গঙ্গার

অধিকাংশ বারিরাশি ভাগীরথী দিয়াই সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইত এবং ঐ সময় পর্য্যন্ত পদ্মা একটি সঙ্কীর্ণ জল-রেখা মাত্র ছিল। পদ্মার বর্ত্তমান সমৃদ্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যশোহরের নদ-নদীর উৎস—ভৈরব নদই—গঙ্গার দক্ষিণ তীরস্থ উপনদী-সমূহের মধ্যে সর্ব্ব-পূর্ব্ব ছিল। মধ্যবঙ্গের বর্ত্তমান নদ-নদী-সমূহের উৎসরূপে প্রতিভাত জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে পঞ্চাশ শতাব্দীর পরে—অর্থাৎ, গঙ্গার অধিকাংশ বারিরাশি পদ্মাবর্ত্মে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করার পর। গড়ই-মধুমতীর উৎপত্তি হইয়াছে জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গার পর।

পক্ষান্তরে, মিশরে জলসেচের সুব্যবস্থা করিয়া যিনি উষর মিশরকে শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ হইতে সক্ষম করিয়া প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি (স্যর উইলিয়ম উইল-কক্স) মধ্যবঙ্গের নদীসমূহের উৎপত্তি-বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। স্যর উইলিয়মের মতে ভাগীরথী, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের নদীসমূহ হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক খনিত জলসেচের খাল হইতে উদ্ভূত। কৃত্রিম উপায়ে গঙ্গার গতি ও প্রবাহ শাসন করিয়া এই সকল খালের খাতে বারি সরবরাহ করা হইত। কালক্রমে খালগুলি নদীতে রূপান্তরিত হয়। পরে গঙ্গার গতি ও প্রবাহ শাসনের কৃত্রিম উপায় নষ্ট হওয়ায় গঙ্গার অধিকাংশ বারিরাশি পূর্ব্বের মতই পদ্মাবর্ত্মে প্রবাহিত হইতে থাকায় মধ্যবঙ্গের নদীগুলির বর্ত্তমান দুরবস্থা হইয়াছে।

মধ্যবঙ্গের নদীসমূহের উৎপত্তি সম্পর্কে যে-অভিমতই সত্য হউক না কেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যে-কালে মধ্যবঙ্গ শস্যশ্যামলা ও সমৃদ্ধিপূর্ণ ছিল, তখন গঙ্গার অধিকাংশ বারিরাশি ভাগীরথী, ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতির খাতে প্রবাহিত হইত। গঙ্গার অধিকাংশ বারিরাশি পদ্মাবর্ত্মে প্রবাহিত হইতে থাকায় মধ্যবঙ্গের নদীসমূহে যখন জলাভাব দেখা দিল, তখন হইতেই মধ্যবঙ্গের দুর্দ্দশার আরম্ভ হইয়াছে। ফলে মধ্যবঙ্গে যখন জলাভাব দেখা দিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গে তখন প্রয়োজনাতিরিক্ত জল সরবরাহ হইতেছে। সুতরাং মধ্যবঙ্গের সমৃদ্ধির পক্ষে কৃত্রিম উপায়েই হউক বা নৈসর্গিক কারণেই হউক, মধ্যবঙ্গের নদীসমূহের নির্জ্জীব খাতসমূহে পুনরায় প্রয়োজনানুরূপ জল সরবরাহ আবশ্যক।

কৃত্রিম উপায়ে মধ্যবঙ্গকে পুনরায় সমৃদ্ধিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল পরিকল্পনা উত্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে স্যর উইলিয়াম উইলকক্সের পরিকল্পনাটির কিয়দংশ আলোচ্য। স্যর উইলিয়ামের মতে বড়ালের ১৪ মাইল দক্ষিণে মিশরীয় বাঁধের অনুরূপ একটি বাঁধ গঙ্গাতে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই বাঁধের ফলে জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা ও তাহাদের শাখাগুলি দিয়া গঙ্গার প্লাবনের একটি অংশ প্রবাহিত হইবে; অথচ সারা বৎসরই ভাগীরথী ও হুগলী নদীতে পর্য্যাপ্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইবে। স্যর উইলিয়ামের পরিকল্পনা-অনুযায়ী বাঁধ নির্ম্মাণ ও আনুষঙ্গিক অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে ১,২০,০০০০০ (এক কোটি কুড়ি লক্ষ) পাউণ্ড বা প্রায় ১৮ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় সরকার এই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে অক্ষম বা ইচ্ছা করেন না বলিয়াই পরিকল্পনাটি বলিতে গেলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কতকটা জনমতের চাপে, কতকটা বা সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, বঙ্গীয় সরকার জোড়াতালি দিয়া মধ্যবঙ্গের নদী সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন। এ সকল চেষ্টা কোন স্থায়ী সুফল প্রসব করিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, যে কারণে, গঙ্গা মধ্যবঙ্গের নদীগুলিকে বঞ্চিত করিয়া বর্ত্তমানে পদ্মাগর্ভে প্রবাহিত হইতেছে, পুনরায় সে সকল কারণই দেখা দিবে। অর্থাৎ, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, ভাগীরথী প্রভৃতির নির্গম-স্থলগুলি পুনরায় বালুকা চরার দ্বারা বন্ধ হইবে। বঙ্গীয় সরকার হয় তো আশা করিতেছেন, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সংস্কারদ্বারা যে সুবিধা হইবে, তাহার জীবন শেষ হইবার পূর্ব্বে মাথাভাঙ্গা, জলঙ্গী, ভাগীরথী প্রভৃতির খাত দিয়া গঙ্গার অধিকাংশ বারিরাশি পুনরায় প্রবাহিত হওয়ার অনুকূলে যে সকল নৈসর্গিক কারণ কার্য্য করিতেছে, তাহার পূর্ণ ফল দেখা দিবে, ফলে মধ্যবঙ্গ পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায়ই সুজলা ও সমৃদ্ধিপূর্ণ হইবে। এই সকল ছোট-খাট সংস্কার কার্য্য হয় তো নৈসর্গিক সংস্কারকে সহায়তাও করিতে পারে।

আমরা উপরে মধ্যবঙ্গের নদীসমূহের নৈসর্গিক সংস্কার ও সংস্কারের অনুকূলে নৈসর্গিক কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা এই সকল নৈসর্গিক বিষয়ের কথা সংক্ষেপে বলিব। পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া সাগরে পতিত হওয়া পর্য্যন্ত নদীকে তিনটি পর্য্যায় অতিক্রম করিতে হয়। পর্য্যায় তিনটির শেষ পর্য্যায় ব-দ্বীপ পর্য্যায়—বঙ্গদেশে নদীগুলিকে সাধারণতঃ এই তৃতীয় পর্য্যায়টিই অতিক্রম করিতে হয়।

এই অবস্থায় নদী উপর হইতে আনীত পলি প্রভৃতি অবক্ষিপ্ত করে; এবং সাধারণতঃ নদী পুরাতন খাত ত্যাগ করিয়া, নূতন খাত সৃষ্টি করিয়া লয়; নূতন খাত ত্যাগ করিয়া আবার পুরাতন খাত দ্বারা প্রবাহিত হইতে থাকে;—পুনরায় নূতন খাতে যায়। অর্থাৎ নদীর খাত ঘড়ির দোলকের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ করিতে থাকে। প্রথমে নদী যে খাত দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহার দুই কূল ও তৎসংলগ্ন ভূমি পলিসঞ্চয়ের দ্বারা উন্নীত হইলে, নদীকূল ভেদ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রদেশে নূতন খাত সৃষ্টি করিয়া লয়। কালক্রমে আবার যখন এই নূতন খাতের কূল ও তৎসংলগ্ন স্থলভাগ উন্নীত হয়, তখন নদী পুনরায় পুরাতন খাতে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব-উন্নীত ভূমির আরও উন্নতি সাধন করে। এইরূপে ব-দ্বীপের নদীসমূহ ব-দ্বীপকে উন্নীত করে। ব-দ্বীপ নদীসমূহের এই প্রকৃতি অনুসারে গঙ্গা যে স্থল দিয়া বর্ত্তমানে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা উন্নীত হওয়ার পর, গঙ্গার বারিরাশির অধিকাংশ ভাগ পূর্ব্ব খাত দিয়া প্রবাহিত হইবে ও তাহার ফলে মধ্যবঙ্গের পুনর্যৌবন দেখা দিবে, অনেকে এরূপ আশা করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে, হুগলী নদীর সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে গিয়া একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি উপযুক্ত প্রমাণাদির আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা (এই সকল নদীর খাত দিয়াই পূর্ব্বে গঙ্গার অধিকাংশ বারিরাশি সমুদ্রে নির্গত হইত) যে চির অবনতি ঘটিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

আর একটি উল্লেখযোগ্য নৈসর্গিক কারণের উল্লেখ এখানে করিতেছি। সেটি হইতেছে, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম। বর্ত্তমানে ব্রহ্মপুত্র যমুনানদীর খাত দিয়া প্রবাহিত হইয়া গোয়ালন্দের কিছু উত্তরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছে। সাধারণতঃ ব্রহ্মপুত্রের প্লাবন গঙ্গার প্লাবনের পূর্ব্বে সঙ্গম-স্থলে আসিয়া পৌঁছায়। ফলে, গঙ্গার প্লাবনের পক্ষে ব্রহ্মপুত্রের প্লাবন কতকটা বাঁধের ন্যায় কার্য্য করে—গঙ্গার প্লাবনকে এই স্থানে আটকাইয়া রাখিয়া তাহার প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে ও উহাকে আরও উত্তরে কোনও খাত খুঁজিয়া লইতে হয়। মধ্যবঙ্গের উৎসস্বরূপ নদীসমূহের মধ্যে মাথাভাঙ্গাই এই সঙ্গম-স্থলের নিকটতম; সুতরাং আলোচ্য নৈসর্গিক কারণের ফলে মাথাভাঙ্গারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা হওয়া উচিত। কিন্তু এই সুবিধা মাথাভাঙ্গা না পাইয়া পাইয়াছে গড়ই। ব্রহ্মপুত্রের প্লাবন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া গঙ্গার প্লাবনের বারিরাশি অনেকটা গড়ই-এর খাত দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে। রেণেলের মানচিত্রে গড়ইকে একটা সঙ্কীর্ণ জলরেখা বলিয়া প্রতীয়মান হয়—গঙ্গার প্লাবন গড়ই-এর খাত দিয়া প্রবাহিত হওয়ার ফলে, গড়ই তাহার বর্ত্তমান বিশাল রূপ ধারণ করিয়াছে। গড়ই-এর বর্ত্তমান অববাহিকা নিম্নভূমি এবং এই নিম্নভূমিকে উন্নীত করার কাজ গড়ই-এর এখনও সমাপ্ত হয় নাই। সুতরাং, গড়াই আরও বিশালায়তন হইবে ও এখনও বহুদিন পর্য্যন্ত গঙ্গার প্লাবন এই পথেই প্রবাহিত হইবে বলিয়া মনে হয়। ১৯০১-২ সালে যশোহরের জেলাবোর্ডের 'হ্যালিফ্যাক্স-কাট' দ্বারা মধুমতী (গড়ই-এর নিম্নতর অংশ) ও নবগঙ্গাকে সংযুক্ত করা হইয়াছে। ফলে, ভৈরব, নবগঙ্গা, চিত্রা প্রভৃতি হাজিয়া যাওয়ায় পূর্ব্ব-যশোহরে নদীর ব-দ্বীপ গঠনকারী যে সকল কার্য্য অসমাপ্ত ছিল, তাহা এক্ষণে মধুমতী দ্বারা পুনরায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। গড়ই-মধুমতী এই সকল নিম্নভূমিকে উন্নীত করার পর, ব্রহ্মপুত্র প্লাবনের বাঁধের ন্যায় কাজের ফল হয় তো মাথাভাঙ্গার নির্গম-স্থল পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে, এবং গঙ্গার প্লাবনের একটি বৃহৎ অংশ মাথাভাঙ্গার খাতে প্রবাহিত হওয়ার ফলে মাথাভাঙ্গা, তথা যশোহরের অন্যান্য নদীকে পুনর্যৌবন দান করিতে পারে।

উপরে যে দুইটি নৈসর্গিক কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অপর একটি আধা-নৈসর্গিক কারণও কার্য্য করিতেছে। এই কারণটি হইতেছে, গঙ্গার প্রবাহের উপর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ বা সাঁড়া-ব্রীজের ফল। সাঁড়া-ব্রীজের ফলে এই স্থানের গঙ্গার বিস্তৃতির প্রায় অর্দ্ধেকটা লইয়া বিরাট চড়া ভাটার জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ দিকের তীরকে নদীপ্রবাহদ্বারা ক্ষয় হইতে সযত্নে রক্ষা করা হইতেছে। অপর পক্ষে ব্রীজের স্তম্ভগুলির চতুষ্পার্শ্বে প্রচুর প্রস্তরখণ্ড স্তূপ করিয়া দেওয়ায় নদীর তলদেশও বিশেষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না। ফলে, এই স্থলে গঙ্গার প্রবাহ পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণতর হইয়াছে।

এই ব্রীজ হয় তো বাঁধের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে।

ফলে ব্রীজের উত্তর পার্শ্বে বারিরাশি স্তূপীকৃত হইয়া গঙ্গার প্রবাহকে উপরের দিকে একটি প্রবাহ-পথ খুঁজিয়া লইতে বাধ্য করিতে পারে। এই সম্পর্কে অনেকে মনে করেন, পর্য্যাপ্ত বারিরাশি ব্রীজের উত্তর পার্শ্বে স্তূপীকৃত হইলে এই বারিরাশি হয়তো পুনরায় মাথাভাঙ্গার খাতেই সাগরে প্রবাহিত হইবে। কিন্তু সাঁড়াব্রীজ মাথাভাঙ্গা হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী। সুতরাং স্তূপীকৃত বারিরাশি প্রবাহ মাথাভাঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হইবারই সম্ভাবনা। বারিরাশি যদি আদৌ ব্রীজের উত্তর পার্শ্বে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্তূপীকৃত হয়, তাহা হইলে ইহার প্রভাব মাথাভাঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হইয়া সাঁড়াব্রীজের কিছু উত্তরে গঙ্গার বামতীরস্থ লালপুর বাঁধ দিয়াই এই বারিরাশির নূতন খাত কাটিয়া লইবার সম্ভাবনা।

যে সকল নৈসর্গিক কারণের উল্লেখ উপরে করা হইল, তাহার ফল যে একেবারে না দেখা যাইতেছে তাহা নহে। গঙ্গা হইতে মাথাভাঙ্গার নির্গমপথের মুখে যে চড়া দেখা যাইত, তাহা বর্ত্তমানে প্রায় অদৃশ্য। গঙ্গা ও মাথাভাঙ্গার সম্বন্ধও মাথাভাঙ্গার অনুকূলে উন্নতির দিকে অগ্রসর। মাথাভাঙ্গার যতটা উন্নতি হইয়াছে, ততটা না হইলেও, মধ্যবঙ্গের উৎসস্বরূপ জলঙ্গী ও ভাগীরথীর উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে।

মধ্যবঙ্গের অনুকূলে এই সকল নৈসর্গিক কারণ কতদিনে সুফল প্রসব করিবে, তাহা বলা দুরূহ। নৈসর্গিক কারণগুলির সুফল প্রসব করিতে কয়েক বৎসরও লাগিতে পারে, কয়েক শতাব্দীও লাগিতে পারে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, কৃত্রিম উপায় ও নৈসর্গিক কারণ এ দুইয়ের সমবায়ে মধ্যবঙ্গের শ্রীবৃদ্ধিকে আগাইয়া আনা যাইতে পারে কি না?

নদীমাতৃক বাঙ্গালার অতীত যেমন গঙ্গার সহিত বিজড়িত, তেমনি তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎও গঙ্গার সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। প্রকৃতি বঙ্গদেশকে যেমন উর্ব্বরা ভূমি দান করিয়াছেন, তেমনি বঙ্গদেশকে শস্যশ্যামলা করিবার নিমিত্ত প্রচুর জলেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকৃতির এই অকৃপণ দানের জন্যই বাঙ্গালী ও বঙ্গীয় সরকার ভুলিতে বসিয়াছেন, গ্রহীতা যদি ভোগ করিতে না জানে, তবে দাতা যত অজস্র ও অকৃপণ দানই করুন না কেন, তাহাতে গ্রহীতার কোন উপকার হয় না। বঙ্গদেশে জলের অভাব নাই সত্য, কিন্তু সুশস্য উৎপাদনের জন্য, এই জলরাশি সুষ্ঠুভাবে বিতরিত হওয়া আবশ্যক। এ-বিষয়ে বঙ্গীয় সরকার ও বাঙ্গালী সচেতন না হইলে, প্রকৃতির অযাচিত দান সত্ত্বেও বঙ্গদেশের, বিশেষতঃ পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

নদী-সমস্যার একটা বড় দিক্ সম্বন্ধে বাঙ্গালী সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ-দিকটা সম্পর্কে সমগ্র বঙ্গদেশের অচিরে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। মিশরের সমৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ যেরূপ নীলনদের উপর প্রতিষ্ঠিত, বঙ্গদেশের সমৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎও সেরূপ গঙ্গানদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। মিশর ও ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান, এই দুইটী বৃহৎ দেশের মধ্য দিয়া নীলনদ প্রবাহিত; গঙ্গাও তেমনি যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বঙ্গ এই তিনটি প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। অসাধু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া বা বিস্তৃতভাবে জলসেচের উদ্দেশ্যে নীলনদের প্রবাহকে সুদানে অবরুদ্ধ করিয়া যদি নীলনদের প্রবাহমান বারিরাশিকে মিশরদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রবাহিত হইতে বাধা দেওয়া যায়, তাহা হইলে মিশরের যে-অংশ বর্ত্তমানে শস্যশ্যামল, সে অংশ ও তাহার দুই পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ মরুভূমিতে পরিণত হইবে। এই জন্যই যতদিন সুদান ব্রিটিশের অধীন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত মিশরকে ব্রিটিশের সহিত সদ্ভাব রাখিতেই হইবে।

গঙ্গাদেবীর ধারাকেও যদি যুক্তপ্রদেশে অবরুদ্ধ করিয়া বিস্তৃতভাবে জলসেচের কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে হয়তো গঙ্গার প্রবাহে জলের অনটন ঘটিবে। সুতরাং, যুক্তপ্রদেশ ও বিহার যাহাতে যদিচ্ছাক্রমে, বঙ্গের অনিষ্ট সাধন করিয়া গঙ্গার বারিরাশির বিশৃঙ্খল ব্যবহার না করে, সে বিষয় এখন হইতেই সতর্ক হইতে হইবে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে সেচকার্য্যের অচিরে প্রসার লাভ করিবার সম্ভাবনা। সুতরাং বঙ্গের নদী-সংস্কার এখন আরম্ভ করা হউক বা না হউক, কেন্দ্রীয় সরকার ও এই তিনটি প্রাদেশিক সরকারের সমবায়ে যাহাতে প্রদেশ তিনটির মধ্যে গঙ্গার বারিরাশি প্রয়োজনানুরূপ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরিত হয়, এ-জন্য নদী কমিশন গঠন করিবার দিকে বঙ্গীয় সরকারের দৃষ্টির বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। গঙ্গার বারিরাশির যথেষ্ট ও বিশৃঙ্খল ব্যবহার যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে অনুষ্ঠিত হইলে, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের নদনদীর উন্নতি তো সম্ভবপর হইবেই না, পরন্তু যে-সকল সঙ্কীর্ণ জলরেখা এখনও দৃষ্টিগোচর হয় তাহাও একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইবে। ফলে বঙ্গদেশ রোগ-প্রপীড়িত, শস্যহীন হইবে। এমন কি, নদনদীতে নৌকা প্রভৃতির চলাচল বন্ধ হওয়ায় প্রদেশ-আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও যাতায়াতের অবর্ণনীয় অসুবিধা হইবে।

চির-অভিমান

—শ্রীলীলাময় দে

ভাগলপুর।

ক্লিভল্যাণ্ড রোডের উপর 'অ্যাস-কলারের' একখানা দু'তলা বাড়ী। ওপর তলায় রাস্তার ধারের একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসে শ্রীমতী মিনা অর্গান বাজিয়ে গান করছিল—

একদা তোমারি কুঞ্জ-কাননে
পথশ্রমে ছিনু বসিয়া
বনবীথিতলে শত শতদলে
দেখা দিলে প্রিয় আসিয়া।

আর নীচের রাস্তার উপর চানাচুরওয়ালা সুর করে ছড়া বলে চানাচুর বিক্রী করছিল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দল তাকে ঘিরে ভীড় করে দাঁড়িয়ে তার মুখের পানে অবাক্ চোখে চাইছিল। মাঝে মাঝে চানাচুরের ঠোঙা-গুলোর প্রতিও তাদের তীক্ষ্ণ লোলুপ দৃষ্টি গিয়ে পড়ছিল।

তখনও সন্ধ্যার শ্যামলা মেয়ে ধরণীর ধূসর ধূলায় তার শান্ত অচঞ্চল চরণ দু'খানি নামায় নি; নদীর ধারে ধারে বনের আনাচে কানাচে আগমনী চিহ্ন অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠছিল মাত্র

দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশটা হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম ঘোলাটে হয়ে উঠল। নীল আকাশের আঙিনায় ভীড় করা চিলের দল ডানা গুটিয়ে গাছে গাছে নেমে পড়ল। ঈশাণ কোণ বেয়ে একটা দম্‌কা হাওয়ার সুর গুমরে গুমরে উঠে সারা শহরটার বুকে গভীর সন্ত্রাস জাগিয়ে তুলল। ঝড় উঠল, ভীষণ ঝড়। রাস্তা-বাট ধুলোয় ধুলো হয়ে গেল। পথের লোক চোখে মুখে কাপড় গুঁজে অন্ধের মত ঝড়ের মধ্য দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে এগিয়ে চলল। গাছের আগায় পাখীগুলো ডানা ঝাপটে চীৎকার করে মরতে লাগল, এক মুহূর্ত্তও তারা স্থির হয়ে বসতে পারছিল না।

সূচনাহীন, হঠাৎ-গর্জ্জিয়ে-ওঠা দম্‌কা হাওয়া বইতে বইতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। নীল আকাশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভীষণাকার কালো মেঘে ভরে গেল, কে যেন অদৃশ্য হস্তে জমাট বাঁধা একটা কালো পাষাণের চাঁদোয়া আকাশের গায়ে তুলে ধরল। কড় কড় শব্দে মেঘ গর্জ্জে উঠল। বিদ্যুতের তীব্র ঝলকে প্রতি মুহূর্ত্তে চোখের তারা ঝল্‌সে দিয়ে যেতে লাগল। তারপর ধরণীর বুকে নেমে এল মুষলধারে বৃষ্টির ধারা। দেখতে দেখতে ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণাগুলো বৃষ্টির আঘাতে পথের কোলে লুটিয়ে পড়ল। আর তার সাথে সাথে আকাশে বাতাসে ভেসে উঠল একটা মধুর সোঁদা গন্ধ।

গান বন্ধ করে মিনা, জানালার পাল্লা-দুটো ভাল করে খুলে দিয়ে চেয়ারটা এগিয়ে এনে বসে বসে দেখতে লাগল কালো আকাশে বিদ্যুতের ঝলক, আর ঝম্ ঝম্ অবিরল বৃষ্টি-ধারা। জানালার ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে দিয়ে মিনা বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা হাত পেতে নিতে লাগল। বৃষ্টির জলের শীতল স্পর্শে মিনার চেতনা বিলুপ্ত হ'ল। চোখের সুমুখে ফুটে উঠল, সেই বাল্যকালের কথা। কবে সে তাদের পাড়াগাঁয়ে টিনের ঘরে তার ছোট ভাইটির সাথে গা ঘেঁসে বসে বৃষ্টির পানে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকত। কবে, দুটি ভাই-বোনে মিলে কাগজের নৌকা তৈরী করে নর্দ্দমার জলে ভাসিয়ে দিয়ে উৎসুকনয়নে তাকিয়ে দেখত, কবে তাদের সাধের নৌকা রাজকন্যার স্নানের ঘাটে গিয়ে লাগবে। আবার তখনি কচি মুখদু'খানা ভাবনায় কালো হয়ে উঠত; যদি তাদের 'সপ্তডিঙা' ঝড়ের বেগ না সামলাতে পেরে মাঝ-দরিয়ায় অতল জলে তলিয়ে যায়?

এমনি ধারা মেঘের ডাকে কতদিন তারা ঘর ছেড়ে চুপি চুপি পথে বেরিয়ে পড়ে মনের সুখে বৃষ্টির জলে ভিজছে আর অমনি পেছন দিক থেকে বাপের হাতের কাণমলা —উঃ কি নিষ্ঠুর শাসন। মন চায় প্রকৃতির সাথে নেচে বেড়াতে, পারে না। মানুষ হবার জন্য কড়া শাসনে তাদের বন্দী হয়ে থাকতে হয়।

তারপর, দিনের পর দিন তারা দুটি ভাই-বোনে হাত ধরাধরি করে নদীর ধারে ধারে ছুটে বেরিয়েছে। হাঁটু অবধি কাপড় তুলে জলে নেমে হাত দিয়ে জল নেড়ে ঢেউ

তুলেছে। ক্ষুদ্র স্রোতের ক্ষীণ তরঙ্গ-মালা পরপারে গিয়ে কোনও কলতান তুলতে পারে নি, মাঝ-পথেই জলের সাথে মিলিয়ে গিয়েছে।

বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানতেই তারা সব চাইতে বেশী তৃপ্তি পেত। আগাছাগুলোকে দু'পায়ে দলে তারা বনের মাঝে ছুটে চলত। ঝুমকো-লতার দল তাদের পা জড়িয়ে ধরে আস্তে পা ফেলবার জন্য কত কাতর মিনতি জানাত, চোর-কাঁটাগুলো ভয়ে তাদের কাপড়ে আত্মগোপন করে থাকত, বাড়ী ফেরার পথে কোথাও নিরালায় বসে চোর-কাঁটা গুলো কাপড় থেকে বেছে ফেলে তবে তারা ঘরে ঢুকত। বাসায় ফিরতে রাত হ'ত বলে কড়া শাসনের হাত থেকে তারা কোন দিনও রেহাই পেত না। কাঁদতে কাঁদতে দু'টি ভাই-বোনে গলা-জড়াজড়ি করে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ত। আবার সকাল হতে না হতেই প্রভাতের পবিত্র আলোয় তারা সব ভুলে গিয়ে সরল হাসিতে ঘর-দুয়ার ভরে তুলত।

আজ সাত বছর হল সেই মিনার বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আর সে পাড়াগেঁয়ে অসভ্য মেয়ে নয়। স্বামীর অত্যধিক যত্নে সে অতিমাত্রায় সভ্য হয়ে উঠেছে। বার্নার্ড শ,' ইভান বুনিন থেকে শুরু করে আমাদের রবীন্দ্রনাথ, শরৎ-চন্দ্রের সাহিত্য তার কণ্ঠস্থ। কণ্ঠস্থ না হলেও অন্ততঃপক্ষে উদরস্থ তো নিশ্চয়ই। তাদের নাম সর্ব্বদাই তার মুখে খৈ-ফোটা ফুটছে।

এখন সে সকালে-বিকালে অর্গ্যান বাজিয়ে গান করে। স্বামীর সঙ্গে, এমন কি কখন কখন একাও সভ্য-আধুনিক-সমাজের বড় বড় পার্টিতে সে যাতায়াত করে। পাড়াগাঁয়ের মিনা আজ আধুনিক সমাজের দশজনের একজন। তবু যেন এখন তার পরিপূর্ণ তৃপ্তি নেই। অন্তরের কোণে কোন্ এক পর্দার অন্তরালে একটা বিরাট হাহাকার যেন গুমরে পড়ে আছে। কাজ-কর্ম্মের অবসরে একটু ফাঁক পেলেই সেই হাহাকারটা যেন বাইরে বেরিয়ে এসে তাকে পাগল করে তুলতে চায়।

বিয়ের পর সুদীর্ঘ ছ'বছরের মধ্যে মিনা তার পাড়া-গাঁয়ের বাপের বাড়ীতে একটি বারের জন্যও যেতে পায় নি। যাতায়াত দূরের কথা, বাপের বাড়ীর অসভ্য লোকগুলোর সাথে তার কোন রকম সম্পর্ক রাখাও বারণ ছিল। মিনার দু'টী ছেলে মেয়ে। মেয়েটী বড়, তার বয়স পাঁচ বছর আর ছেলেটি তিন বছরের।

বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে। মিনার কাণে গেল, নীচের তলায় কারা যেন কথা কইছে। বড় পরিচিত কণ্ঠের স্বর কিন্তু কিছুতেই সে ঠাহর করে উঠতে পারছে না। মিনা তাড়াতাড়ি উঠে ভেতরকার বারান্দার রেলিং ধরে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাস করল, "রীণা, তোমরা কার সাথে কথা কইছ ?"

মেয়ের নাম রীণা। রীণা বিরক্তির স্বরে উত্তর দিল, "কি জানি মা, আমি চিনি না। ছোঁড়াটা বলছে, সে আমাদের মামাবাবু। দূর্, ওরকম নোংরা লোক কখন আমাদের মামাবাবু হতে পারে ?"

"দেখি কে তোদের মামাবাবু ? ওকে সামনে এসে দাঁড়াতে বল।" বলে মিনা রেলিংএ আরও একটু ঝুঁকে পড়ল।

রীণার নির্দ্দেশমত ছেলেটী এসে দাঁড়াল। গায়ে তার আধময়লা একটা ফতুয়া, পরণে হাঁটু অবধি তোলা একটা ছোট ময়লা কাপড়, তাও আবার বৃষ্টির জলে ভিজে চপচপ করছে। ভিজে কাপড়ের খুঁটটা ভালকরে নিংড়ে নিয়ে চোখের পাতাগুলো মুছে ওপর পানে তাকিয়ে বলল, "কে দিদি ?"

ওপর থেকে প্রশ্ন এলো, "কে, তোমার নাম কি ? কোত্থেকে আসছ ?"

ছেলেটী ম্লান হেসে উত্তর দিল—"আমায় চিনতে পারছ না দিদি ? আমার নাম বিকাশ। মার বড্ড অসুখ। তোমায় একবারটি দেখবার জন্য তিনি বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাই তোমায় খবর দিতে এলাম, যদি একবারটি যাও। যাবে দিদি ?"

"মার অসুখ !" বলে মিনা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসছিল; হঠাৎ তার মনে পড়ল, স্বামীর কড়া হুকুমের কথা। মাঝ-পথে থমকে দাঁড়াল। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উপরে উঠে এসে রেলিংএর কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি ভুল করেছ, এ তোমার দিদির বাড়ী নয়, আমি তোমার দিদি নই। রীণা ওকে বাইরে যাবার



কাঁচি ও সূচ

পথটা দেখিয়ে দিয়ে তোমরা উপরে চলে এসো।" বলেই মিনা ছুটে রাস্তার ধারের জানালায় এসে দাঁড়াল।

পাড়াগাঁয়ের সরল প্রকৃতির ছেলে বিকাশ দিদির এমন অমানুষিক আচরণের কোন কারণই খুঁজে পেল না। বাইরের রোয়াকের উপর বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকাশ ভারাক্রান্ত চিত্তে ষ্টেশনের দিকে রওনা হল। আর মিনা নিশ্চল পাথরের মত জানালার গরাদ ধরে একদৃষ্টে বিকাশের গন্তব্য পথের পানে চেয়ে রইল। বিকাশ অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে পর মিনার চোখের পাতাগুলো ভিজে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হ'য়ে এল, আর দাঁড়াতে না পেরে টলতে টলতে "মা গো" বলে বিছানার উপরে মুখ থুবড়ে পড়ল। ঠিক সেই সময়, "বাবা এসেছেন মা, তোমায় ডাকছেন" বলে রীণা ঘরে ঢুকেই মাকে অমন ভাবে পড়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। কাছে এসে গায়ে ঠেলা দিয়ে বারবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে রীণা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

অফিস থেকে ফিরে মিঃ চৌধুরী পাশের ঘরেই বসে হাত-পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম করছিলেন আর চাকরটা তাঁর পায়ের গোড়ায় বসে জুতো-মোজা খুলছিল। তিন বছরের মাষ্টার মিনটু বাবার 'হাণ্টার'-টা নিয়ে সিমেণ্টের উপর জোরে জোরে কষাঘাত করছিল আর 'হ্যাট' 'হ্যাট' করে শব্দ করছিল। রীণার চীৎকারে সকলে চমকে উঠল। মিঃ চৌধুরী সেই অবস্থাতেই পাশের ঘরে ছুটে এসে দেখেন স্ত্রী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বিছানার উপর পড়ে আছে। কারণ কিছু ঠাহর করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ তিনি সিভিল সার্জ্জেন মিঃ গুপ্তকে ফোন করে আসতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মিঃ গুপ্ত এসে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, "মিঃ চৌধুরী, অত্যধিক উত্তেজনায় মাথায় রক্ত উঠে এরকম হয়েছে, আজ তিনি কোন রকম বড় একটা 'শক্' পেয়েছেন কি ?"

মিঃ চৌধুরী বললেন, "না, মিঃ গুপ্ত, কোন রকম 'শক্' পাওয়ার কারণ তো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।"

মিঃ গুপ্ত বললেন, "হ্যাঁ, কোন রকম 'শক্' তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন, তা না হ'লে এ-রকম হতে পারে না। আচ্ছা থাক, কারণটা না হয় পরেই আবিষ্কার করবেন ; এখন মাথায় 'আইস ব্যাগ' দেবার বন্দোবস্ত করুন। এর উপর যদি জ্বর না আসে তবেই মঙ্গল। জ্ঞান বোধ হয় ভোরের এদিকে আর হবে না। জ্ঞান হওয়া মাত্র তিনি যা চাইবেন তাই যেন দেওয়া হয়। মনে যেন আবার কোন রকম আঘাত না লাগে। মনকে প্রফুল্ল করে তোলাই হচ্ছে এ রোগের একমাত্র ওষুধ।" তিনি সিঁড়ি বেয়ে নেমে মোটরে উঠে বললেন, "সকালের দিকে মিসেস চৌধুরী কেমন থাকেন ফোনে আমায় জানাতে ভুলবেন না।" বলে মোটরে ষ্টার্ট দিলেন।

ভোরের দিকে মিনার জ্ঞান ফিরে এল। ঘোলাটে চোখ দু'টো বিস্তার করে মিনা কাকে যেন খুঁজতে লাগল। মিঃ চৌধুরী মাথার কাছেই বসে ছিলেন, মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কাকে খুঁজছ মিনা ?" স্বামীর মুখখানা একবার করুণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মিনা চোখ বন্ধ করে নিল। মিঃ চৌধুরীর বুঝতে বাকি রইল না, মিনা কাকে খুঁজছে। রাত্তিরে রীণার কাছ থেকে সবই তিনি শুনেছিলেন। একদিন বিকাশকে তিনি পাড়াগেঁয়ে অসভ্য বলে তাঁর ওখানে স্থান দেননি, এমন কি আত্মীয় বলে পরিচয় দিতেও ঘৃণা বোধ করেছিলেন, আর আজ সে যখন তার মায়ের অসুখের সংবাদ নিয়ে এসেছিল, মিনা সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য নিজের উপর অতীব কঠিন হয়ে স্বামী আসবার আগেই ভাইকে অপরিচিতের মত দোর-গোড়া থেকেই বিদায় করে দিয়েছিল।

মিঃ চৌধুরী মিনাকে বললেন, "মিনা শোন, আমি সব শুনেছি, তুমি যাবে তোমার মাকে দেখতে ?"

মিনা চোখ মেলে চেয়ে বলল, "তুমি আমায় সত্যিই পাঠাবে ?" বলতে বলতে তার চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল।

মিঃ চৌধুরী রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, "কেন পাঠাব না, নিশ্চয়ই পাঠাব, তবে আজ তুমি বড্ড দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ। কাল যদি ভাল থাক, তাহলে ছেলেদের সঙ্গে করে তুমি সুধীরকে নিয়ে কাল সকালের গাড়ীতে রওনা হয়ে পড়।"

মিনা জিজ্ঞেস করল, "আর তুমি যাবে না ? চল না, মার অসুখ—বড্ড অসুখ,— একবার দেখে আসবে ?"

মিঃ চৌধুরী বললেন, "কাল তো আমার যাওয়া হতে পারে না মিনা, কাল একটা বড় কেস আমার হাতে আছে। তবে দু'একদিন পরে অবশ্য আমি যেতে পারি। তোমরা তো কাল চলে যাও। কাল সকালেই আমি টেলিগ্রাম করে দেব, ষ্টেশনে যেন লোক থাকে, কোন অসুবিধাই তোমাদের হবে না।" স্বামীর কথায় মিনার মুখখানা আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠল।

তারপর দিন বেলা দশটার ট্রেনে মিনা ছেলে-মেয়ে সহ সুধীরকে সঙ্গে করে রওনা হয়ে গেল। মিঃ চৌধুরী ষ্টেশনে নিজে এসে তাদের ভাল মত উঠিয়ে দিয়ে গেলেন।

বেলা তিনটার সময় ট্রেন এসে থামল মিনার বাপের বাড়ীর দেশে। ছোট্ট ষ্টেশন। ষ্টেশনে বিকাশ আসে নি, এসেছে তাদের পাশের বাড়ীর একটি ছেলে, নাম অজিত।

মিনা গাড়ী থেকে নেমে অজিতকে জিজ্ঞেস করল, "মা কেমন আছেন অজিত?" অজিত বলিল, "ভাল আছেন।"

মিনা তখন জিজ্ঞেস করল, "বিকাশ কেন ষ্টেশনে এল না? সে বুঝি বাসায় নেই?"

এ কথায় উত্তর দিতে গিয়ে অজিতের চোখ ছল ছল করে উঠল; কোন উত্তর দিতে পারল না।

অজিতের চোখে জল দেখে মিনা ভাবল নিশ্চয়ই অজিত মিছে কথা বলেছে, মায়ের নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল হয়েছে। মিনা আর কোন কথা না জিজ্ঞেস করে তাড়াতাড়ি বাসায় যাবার জন্ত গাড়ীতে উঠে বসল।

পাড়া-গাঁ, গরুর গাড়ীতে করে, সকলে চলল। ষ্টেশন থেকে তাদের বাড়ী হচ্ছে এক মাইলের পথ। গাড়ী বাড়ীর কাছে আসতেই কান্নাকাটি শুনতে পেয়ে মিনা অজিতকে বলল, "তুমি আমায় কেন মিছে কথা বলেছ অজিত?" অজিত ছলছল চোখে বলল, "না দিদি, আমি মিছে বলিনি মা ভালই আছেন, তবে—"

মিনা অস্থির চিত্তে জিজ্ঞেস করল, "তবে কি অজিত?"

অজিত বলল, "আজ দুপুরে, মাত্র এক দিনের জ্বরে বিকাশ"—

"বিকাশ!" বলে মিনা গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পড়ে ছুটতে ছুটতে বাসায় এসে বিকাশের অসাড় দেহের ওপর লুটিয়ে পড়ে চীৎকার করে কেঁদে বলল -

"তুই এ কি করলি বিকাশ? ক্ষমা চাইবার একটু অবসরও দিলি না? আমি যে তোরই কাছে ক্ষমা চাইতে মরতে মরতে ছুটে এসেছি রে, আর তুই দিদির মুখ আর দেখবি না বলে—চির জীবনের মত অভিমান করে চলে গেলি?"

মা কাঁদতে কাঁদতে দুর্ব্বল শরীরে এগিয়ে এসে মিনাকে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরলেন।

সাহিত্যের সমাদর

—শ্রীকালিদাস রায়

স্বাস্থ্য নাই যেই দেশে অকালে মরিছে দলে দলে
অন্ন নাই, অন্নাভাবে নর-নারী দহে পলে পলে।
জল নাই, চীৎকারিছে শুষ্ককণ্ঠে চাতকের মত
বল নাই, বীর্য্য নাই নির্য্যাতন সহে অবিরত।
শিক্ষা নাই অন্ধকূপে করে বাস, মুখে নাই ভাষা
সান্ত্বনা সাহস নাই, স্বস্তি নাই, বুকে নাই আশা।
সাহিত্য-বিলাস নিয়ে কি করিবে সে দেশের লোক,
অন্ন কি মিলিবে তায়? দূর হবে যাতে রোগ শোক?
ভিক্ষুক পাতিলে ঝুলি দিবে তায় ভিক্ষা কি কবিতা?
নিরক্ষর কি করিবে নিয়ে গীত, গীতাঞ্জলি, গীতা?
আর্ত্তনাদ করে যে বা সে কি তব শুনিবে কথিকা?
বন্যায় ভাসিছে যে বা সে কি তব শুনিবে গীতিকা?
আর্ত্তে এরিবারে তব জন্ম নয়, তুমি গাবে গান,
জানি কবি তব ধর্ম্ম রস-গান, নহে আর্ত্তত্রাণ।
বসন্তে সমগ্র পল্লী ধ্বংস যবে করে মহামারী,
সমানই গাহিতে থাকে অলিকুল আম্রবনচারী।
তাই বলি কবি-বন্ধু, সমাদর তব কবিতার
এ দেশে না হয় যদি তারে তুমি দিও না ধিক্কার।
সারা দেশ পানে চেয়ে, হ'য়োনা ক ব্যথিত কাতর
তব সাহিত্যের যদি দেশবাসী না করে আদর।
আত্মানন্দে রহ ভোর এর বেশি চেয়োনা ক' আর,
যে দেশ কোকিলে সহে তোমারেও সহ্য হবে তার।

পাইন

—স্বামী ভুমানন্দ

প্রথম শিলং যাচ্ছি। মনে মনে শিলং সম্বন্ধে কত কল্পনাই যে করছি, তার আর অন্ত নেই। কিছু দিন আগেই, শিলং-ফিরতি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি শিলং-এর সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের গল্প করছিলেন। দারজিলিং আমার পূর্ব্বেই দেখা ছিল; তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "শিলং কি দারজিলিং-এর মত সুন্দর?" তিনি উত্তরে ইংরেজীতে বললেন, "Darjeeling is grand, Shillong picturesque (দারজিলিং মহিমান্বিত—শিলং একটি ছবি)।"

সেই থেকে, মানসপটে শিলং-এর কত রকম ছবি আঁকতে থাকলাম। এখন শিলং একবার পৌঁছতে পারলেই তো সেই সব দেখতে পাব। মনে কি উৎসাহ, কি স্ফূর্ত্তি! কোনও রকমে গৌহাটীর ধর্ম্মশালায় রাতটা কাটিয়ে, ভোর হ'তে না না হ'তেই, মোটর আফিসে হাজির হ'লাম। আমি ভোরে গেলেও, গাড়ী তো আর ভোরে ছাড়বে না। তাই টিকিট ক'রে, গাড়ীতে অনেকক্ষণ ব'সে থাকতে হ'ল। অবশ্য আগে যাওয়ার ফলে একটু সুবিধাও হ'ল; সামনের বেঞ্চে বসতে পেলাম, সেখানে ঝাঁকুনি কম লাগে। তখন, এখনকার মত পীচ দেওয়া রাস্তা ছিল না, তাই বেশ ঝাঁকি লাগত; সেটা আবার পিছনের যাত্রীদেরই বেশী ভোগ করতে হ'ত। যা হোক, বেলা প্রায় আটটার সময় মোটর ছাড়ল। বাসখানা প্যাসেঞ্জারে ভরা।

আমার পাশেই একজন ভদ্রলোক ব'সে ছিলেন। তিনি বহুবার শিলং গিয়েছেন, এবারও একটু বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে যাচ্ছেন। ক্রমে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হল। কথায় কথায় তিনি বললেন, "শিলং-এ অনেক পাইন গাছ আছে। পাইনের ঘন বন দেখতে খুব সুন্দর, পাইনের হাওয়াও খুব স্বাস্থ্যকর। সেখানে এত পাইন গাছ যে, শিলংকে 'পাইন-ডেল' (Pine dale—পাইন-উপত্যকা) বলা যেতে পারে।" পাইন গাছের কথা ইংরেজী বইতে পড়েছিলাম। সে সব দেশে পাইন, ওক্ প্রভৃতি কত রকম গাছ আছে, যা আমাদের দেশে নেই। তাই 'পাইন' শব্দটা শুনেই আরও একটু উৎসাহিত হ'লাম। মনে ভাবলাম হয়তো রাস্তাতেও অনেক পাইন গাছ দেখতে পাব।

ইতিমধ্যে মোটর সমতল ছেড়ে ক্রমে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করল। রাস্তা আঁকা-বাঁকা। দশ হাত রাস্তাও সোজা নয়। রাস্তার একদিকে খাড়া পাহাড়, অপর দিকে খাদ। বর্ষাকালে এই খাদ জলে ভরে গিয়ে নদী হয়। পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে। দু'ধারে ভয়ানক জঙ্গল। বড় বড় নানা রকমের অনামগোত্র গাছ; মহীরুহ বললেই ঠিক হয়। ভাবলাম, এর মধ্যে নিশ্চয়ই পাইন আছে। পাশের ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই সব পাইন গাছ না কি?" তিনি একটু হেসে বললেন, "এখানে পাইন কোথায়? শিলং পৌঁছে দেখবেন। রাস্তায়ও কিছু কিছু পাইন গাছ আছে, সে এখনও অনেক দূরে; দেখিয়ে দেব'খন।" বেলা এগারটার সময় নাংপো পৌঁছলাম।

নাংপো, গৌহাটী থেকে ৩০ মাইল; প্রায় ৩ হাজার ফুট উঁচুতে। এখানে আপ্ ও ডাউন্ মোটরগুলি সমস্ত একত্রিত হয়। গাড়ী এখানে আধঘণ্টা দাঁড়ায়। তারপর যে যার দিকে চ'লে যায়। আপ্ ও ডাউন মোটরে যাতে ধাক্কা-ধাক্কি না হয়, সেই জন্য এই নিয়ম সরকার পক্ষ থেকে করা হয়েছে। একই সময় রাস্তার একই অংশে আপ ও ডাউন মোটর চলতে দেওয়া হয় না। নাংপোতে একটা ডাক-বাংলো আছে। সাহেবদের জন্য একটা হোটেলও আছে। অন্য হোটেলও দেখলাম। একটা মুসাফির-খানাও আছে। সকলেই এখানে কিছু জলযোগ করে। আমরাও কিছু খেলাম।

আধ ঘণ্টা পরেই গাড়ী ছাড়ল। কিছু দূর যেতেই, হঠাৎ মাইল ও ফারলং পোষ্টগুলির দিকে একটু নজর পড়ল।

এদিকের মাইল ও ফারলং পোষ্টের সংখ্যাগুলি অন্ত রকমের ব'লে বোধহ'ল। বাংলা দেশে যে-হিসাবে লেখা থাকে সে-হিসাবে নয়। ৩২/৭ দেখে মনে করলাম আমরা ৩২ মাইল ৭ ফারলং এলাম; কিন্তু তার পরেরই মাইল-পোষ্টে দেখলাম ৩২ লেখা; তার পরেই দেখি ৩২/১। কেমন একটু গোলমাল লাগল। ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন "মাইল-সংখ্যা থেকে এক বাদ দিলেই বাংলা দেশের সঙ্গে মিলবে; অর্থাৎ ৩২/৭ এর অর্থ ৩১ মাইল ৭ ফারলং বা 7 furlongs in the 32nd mile (৩২র ৭ ফারলং)।" তিনি আরও বললেন, কোনও এক সময়ে এক নুতন ইঞ্জিনিয়ার এসে এই ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছেন, সেই আইনই এখনও চলছে। পূর্ব্বে এরকম ছিল না।

ক্রমে আমরা উমৰ্ম্মাও পৌছলাম। এ স্থানটা বেশ উঁচু। এখান থেকে দূরে ঘেঁষাটে মেঘের নীচে ঘোর নীলবর্ণ দেওয়ালের মত কি একটা দেখা গেল। হঠাৎ ঘন মেঘ বলেই ভ্রম হয়। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, ঐটাই শিলং। পাহাড়ের উপরের ঘন পাইনের জঙ্গলই এখান থেকে নীল মেঘের মত দেখাচ্ছে। প্রাণটা উৎসাহে ভরে উঠল। শিলং তো তা হ'লে নিকটেই। আরও কিছুদূর চলার পর মোটর নামতে আরম্ভ করলো। মনে হ'লো বুঝি পাতালপুরী যাচ্ছে। এখন আর জঙ্গল নেই। বেশ ফাঁকা মাঠের মত যায়গা। চতুর্দ্দিকের বড় বড় পাহাড়-গুলোতে গাছপালা নেই, কেবল ঘাস। দুর থেকে দেখলে মনে হয় সবুজ ভেলভেট দিয়ে মোড়া। এক জন বললেন, ঐ সব পাহাড়ের নীচে গন্ধকের খনি আছে, তাই ওখানে গাছ জন্মায় না। মাঠের ভিতরে মধ্যে মধ্যে ঝাউ গাছের মত ছোট ছোট গাছ দেখলাম। ভদ্রলোকটি গাছগুলোকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—"ঐ দেখুন পাইন গাছ।" দেখে মনটা দমে গেল। ঠিক যেন ছোট ছোট বন-ঝাউ-এর গাছ; ভাবলাম, এই কি আমার সাধের পাইন!

যা হোক কোনও কথা বললাম না। ক্রমে আরও ফাঁকা যায়গায় এসে পড়লাম। সম্মুখে প্রকাণ্ড উঁচু পাহাড়, গাছে ভরা, সবুজ রং, কি সুন্দর দৃশ্য। ভদ্রলোকটি বললেন—"ওই শিলং পাহাড়; পাইন গাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আমরা ঐ পাহাড়ের গোড়ার দিকে যাচ্ছি, পরে উপরে উঠতে হবে।" কথাটা শুনে মনে একটু উৎসাহ হল; অপলক দৃষ্টিতে সেই পাইন-বনানীর স্নিগ্ধ শোভা দেখতে লাগলাম। ক্রমে পাহাড়ের গোড়ায় এসে বরপানির পুল পার হয়ে মোটর আবার এঁকে-বেঁকে উঠতে লাগল। এইটাই শিলং পাহাড়। শিলং শহর এখান থেকে নয় মাইল।

রাস্তার দুদিকেই বড় বড় পাইন গাছের জঙ্গল। নীচে বেশ পরিষ্কার। ভারি সুন্দর দেখতে। তবে দূর থেকে যে শোভা দেখা যাচ্ছিল, এখন জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে, পাইনের আর সে-শোভা দেখা গেল না। মনে পড়লো—

"Tis distance lends enchantment to the view
And robes the mountain in its azure hue."

এ রাস্তায় তখন মধ্যে মধ্যে পীচ দেওয়া হয়েছে। সে-সব যায়গা দিয়ে উঠতে মোটরে একটুও ঝাঁকি লাগলো না। রাস্তার মোড়গুলো কিন্তু বড় বিশ্রী। একেবারে হঠাৎ উল্টো দিকে ঘুরে গিয়েছে। ইংরেজীতে একে বলে "horse-shoe bend"। ক্রমে বেশ বুঝতে পারলাম, ঠাণ্ডা যায়গায় এসে পড়েছি। গরম কাপড় সঙ্গেই ছিল; গায়ে দিলাম।

বেলা একটা আন্দাজ সময়ে শিলং পৌছলাম। গৌহাটী থেকে শিলং ৬৩ মাইল, প্রায় ৫,০০০ ফুট উঁচুতে। ষ্টেশনের কাছেই সুন্দর একটি স্যানেটোরিয়ম আছে। সেখানে গিয়ে একটা ঘর দখল করলাম। স্যানেটোরিয়মটিও পাইন জঙ্গলের ভিতরে। চতুর্দ্দিকেই পাইন গাছ। মাঝখানটিতে কতকগুলি গাছ কেটে পরিষ্কার করে বাড়ী-ঘর তৈয়ার করা হয়েছে। থাকবার বন্দোবস্ত খুবই সুন্দর, কিন্তু খাওয়ার কোনই ব্যবস্থাই নেই। সেটা নিজেকে করে নিতে হ'ল। আহারান্তে বিশ্রাম করে, অপরাহ্ণে নিকটবর্ত্তী লেকে একটু বেড়িয়ে এলাম ও সন্ধ্যার পরই শুয়ে পড়লাম। শরীর খুবই ক্লান্ত। রাত্রে বেশ শীত, লেপ দরকার হল। এক ঘুমেই ভোর।

পরদিন সকালে স-চা জলযোগ সেরে বেড়াতে বেরলাম। রাস্তাতেই একজন সঙ্গী জুটল, স্থানীয় ভদ্রলোক। চতুর্দ্দিকে চেয়ে দেখি, কেবল পাইন আর পাইন। এমন সুন্দর দেখতে, চোখ ভরে যায়। এখানে পাইন গাছ খুব যত্নে রক্ষা করা

হয়। কোন এক শাসনকর্তা এক সময় জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য অনেক পাইন গাছ কাটিয়ে দেন। তার ফলেই না কি শিলং পূর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর ও গরম হয়ে উঠেছে। আমি চারিদিকে পাইন গাছ দেখে তার ব্যাখ্যা করছি, ভদ্রলোকটি বললেন, "এখানে সর্ব্বত্রই কেবল সরল গাছ; সরল গাছের কাঠেই ঘর দুয়ার, আসবাবপত্র প্রভৃতি তৈয়ার হয়, রান্না ঘরে পোড়াবার জন্যেও সরল কাঠই ব্যবহৃত হয়।" আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এত সরল গাছ কোথায়?" তিনি পাইন গাছগুলি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "এই যে আশে পাশে সামনে চতুর্দ্দিকেই তো অসংখ্য সরল গাছ।" বুঝলাম, পাইন গাছেরই অপর নাম সরল গাছ। নিজের অভিজ্ঞতাটা আর বেশী জানতে না দিয়ে নিঃশব্দে চলতে লাগলাম। একটু লক্ষ্য করে দেখলাম। গাছগুলি বেশী মোটা নয়, একদম সোজা হয়ে উপরের দিকে উঠেছে। মনে হল এই জন্যই বোধ হয় পাইনের নাম সরল। বাসায় ফিরে এসে আহারান্তে বিশ্রাম করতে করতে, হঠাৎ "কুমার সম্ভব" মনে পড়ল। ভাবলাম এই কি কালিদাসের সেই 'সরলদ্রুম'? সরলগাছে বাঁধা রঘুর হাতীর কথাও মনে পড়ল—"সরলাসক্তমাতঙ্গগ্রৈবেয়স্ফুরিতত্বিষঃ।"

একদিন বৈকালে আরও দু'জন নবাগত ভদ্রলোকের সঙ্গে বড়বাজারে গেলাম। একটি বড় টিলার মাথার উপর দোকান-পাট সাজান। মাছ, মাংস, তরিতরকারীর স্থান পৃথক্। এ স্থানটি শিলং শহরের সকল স্থান অপেক্ষা উঁচু। এখানেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তিন দিন হাট বসে—বড়বাজার, লাবান বাজার, ছোট বাজার। আমাদের দেশে সপ্তাহের বার হিসাবে হাট বসে; এখানে কিন্তু অষ্টাহ হিসাবে বাজার বসে। তাই আমাদের হিসাবে এখানকার প্রত্যেক হাটই পূর্ব্ব হাটবার হতে একদিন এগিয়ে যায়। যেমন, সোমবারে বড় বাজার বসলে, পরবর্ত্তী বড় বাজার বসবে মঙ্গলবারে। এই ভাবেই প্রত্যেক হাটবার। এ দেশের আদিম বাসিন্দা খাসিয়া জাতি। তাহাদেরই এই নিয়ম।

বড়বাজারের সর্ব্বোচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে চতুর্দ্দিকের পাইন-বনের অতুলনীয় শোভা দেখতে লাগলাম। দূরে হিমালয়ের তুষার-মণ্ডিত ধবল শৃঙ্গ নজরে পড়ল। ক্রমে বাজারের ভিতরে নেমে



পাইন-বনানী

এলাম। বাজারের সব দিক্ ঘুরে দেখলাম। স্যানেটোরিয়ামের চৌকিদারটি আমাদের সঙ্গেই ছিল। তার নিজের ও আমাদের বাজার সেই করছিল। সে কতকগুলি সরু সরু, ছোট, চেরা কাঠ কিনল। জিজ্ঞাসা করলাম "ওগুলো কি কাঠ?" সে উত্তরে বলল, "ধূপ-লাকড়ী।" আরও বলল "এ দিয়ে উনুন ধরাতে খুব সুবিধে, চট্ করে ধরে ওঠে।" একখানা কাঠ তুলে নিয়ে দেখলাম; একটু লালচে রং, গায়ে আটার মত কি চট্ চট্ করছে, শুঁকে দেখলাম রজনের

মত গন্ধ। জিজ্ঞাসা করলাম, "আসল গাছ কোথায় পাওয়া যায়?" সে চারিদিকের পাইন গাছ দেখিয়ে দিয়ে বলল, "ঐ সব পাইন গাছ থেকেই কেটে আনে।" বাস; মনে মনে একটা ধারণা ঠিক হয়ে গেল, বুঝলাম পাইন, সরল, ধুপ-লাকড়ী, একই জিনিষ। মনে হল, পাইনেরও বুঝি অষ্টোত্তরশত নাম আছে।

পরদিন বেড়িয়ে ফিরবার সময় পাইনের-কতকগুলো শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে এলাম। আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলাম, কোনও গন্ধই পেলাম না। চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, "ও কাঠে গন্ধ নেই; যে কাঠ বাজারে দেখেছিলেন, সেই গুলিতে গন্ধ আছে।" একটু সন্দেহ হ'ল; তা হলে বোধ হয় ধুপ-লাকড়ী গাছ পৃথক্। যা হোক পরের হাটবারে বাজারে গিয়ে দু'আঁটি ধুপ-লাকড়ী কিনে নিয়ে বাসায় এলাম। সন্ধ্যার সময় একটা লোহার আংটার ভিতরে কাঠগুলি রেখে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। কাঠগুলি এমন সুন্দর যে, একটা দেশলাই-এর কাটিতেই আগুন বেশ জ্বলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে গব্ গব্ করে ভীষণ কালো ধোঁয়া উঠতে লাগলো। দু'-তিন মিনিটেই ঘর ধোঁয়ায় ভ'রে গেল। কোথায় সুগন্ধ, কিছুই নেই; একটা রকমওয়ারী বিটকেল গন্ধ বটে। ধোঁয়ার বহর দেখে মনে হলো, বুঝি আরব্য উপন্যাসের দৈত্যরাজ ঐ ধোঁয়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবেন। যা হোক, তাড়াতাড়ি আংটাটা টেনে বাইরে ফেলে দিলাম, নিজেও ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আধপোড়া কাঠগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। তাতে সত্যই একটা সুঘ্রাণ আছে। অথচ আমি যে কাঠ কুড়িয়ে এনেছিলাম সেগুলো ওরকম লাল নয়, তাতে আটাও নেই, সুগন্ধও নেই। পুনরায় চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল—"সব সরল গাছের কাঠে সুগন্ধ থাকে না; গাছের ওপরের কাঠেও গন্ধ থাকে না। গাছ চিরে ভিতর থেকে গন্ধওয়ালা লাল কাঠ বার করতে হয়"। শুনেই, সঙ্গে সঙ্গে "কুমার-সম্ভব" মনে পড়লো—,

কপোলকণ্ডূঃ করিভির্বিনেতুং
বিঘট্টিতানাং সরলদ্রুমাণাম্।
যত্র স্রুতক্ষীরতয়া প্রসূতঃ
সানূনি গন্ধঃ সুরভীকরোতি॥

অর্থাৎ হিমালয়ের হাতীগুলোর গাল চুলকে উঠলে তারা সরল গাছে গাল ঘসতো। সেই ঘর্ষণে গাছ থেকে যে আটা বেরুত, তার সুগন্ধে পর্ব্বতের সানুদেশ পর্য্যন্ত আমোদিত হয়ে উঠত। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলাম। পাইন গাছের ভিতরে ঐ-রকম গন্ধওয়ালা আটা থাকে। তা কালিদাসের হাতীতে গা ঘসতে গিয়ে গাছ ভেঙ্গেই বার করুক বা শিলংএর কাঠুরিয়ারা গাছ কেটেই বার করুক। ভিতরের সেই আটাওয়ালা সুগন্ধি কাঠ বার করতে না পারলে, ধুপ-লাকড়ী বার হবে না। গাছতলায় কুড়িয়ে ধুপ-লাকড়ী পাওয়া যায় না, এটা বেশ বুঝলাম। মহাজন-বাক্য মনে পড়ল—"ভবন্তি বিজ্ঞতরঃ ক্রমশো জনঃ।"

এখন পাইন গাছগুলোর সঙ্গে বেশ চেনা পরিচয় হয়ে গিয়েছে। পাইন গাছ দেখলেই চিনতে পারি। ক্রমে পাইন গাছগুলোকে আরও একটু ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখলাম, শিলং-এ সাধারণতঃ তিন রকমের পাইন গাছ আছে। এক রকম, অনেকটা বাংলা দেশের দেবদারু গাছের মত, কিন্তু পাতাগুলো ঠিক দেবদারুর পাতার মত নয়। পার্ব্বতীয় দেবদারু বৃক্ষের কথা সংস্কৃত বইতেও পড়েছিলাম। শিলং এসে বুঝলাম এই পাইনই সেই দেবদারু, এবং ইহাই রঘুবংশের "দেবদারবঃ"। আর এক-রকম পাইন দেখলাম, তার পাতাকে ঠিক "পাতা" বলা চলে না। কারণ, পাতাগুলো লম্বা লম্বা ছুঁচের মত। তাই ইংরেজীতে এই জাতীয় পাইনের পাতাকে "leaves" না বলিয়া "pine needles" বলা হয়। তৃতীয় রকমের পাইন গাছগুলো দেখতে খুব সুন্দর। ডালগুলো নীচের দিক থেকে ক্রমে ছোট হতে হতে মাথার ওপরে খুব ছোট হয়ে গিয়েছে। দূর থেকে দেখতে ঠিক মন্দিরের চূড়ার মত। এই তিন রকম ছাড়া আর এক-রকম পাইন দেখলাম, তার সংখ্যা খুব কম। গাছের সরু সরু ডাল ও পাতাগুলো মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে আছে। দেখতে অনেকটা বাংলা দেশের বড় ঝাউ গাছেরই মত। কেহ কেহ ইহাকেও পাইন বলেন, কেহ বলেন উহার নাম উইলো-পাইন, কেহ বা উহাকে উইলো বলেন। বিলেতের কবরস্থানে 'উইপিং উইলো'র (Weeping willow) কথা পড়েছিলাম। কেন উহার নাম ঐ রকম, তা এখন গাছ দেখে বুঝতে পারলাম। গাছের নীচুমুখো ডাল-

পাতাগুলো দেখলে মনে হয় যেন গাছটা মুখ নীচু করে কাঁদছে ও তার চোখের জল ধারাকারে মাটির দিকে গড়িয়ে পড়ছে। কল্পনাটা সুন্দরই বটে।

শিলং-এ ছুঁচ-পাতা পাইনই খুব বেশী। একদিন একটা এই পাইন গাছের তলায় দেখলাম কতকগুলো কালো কালো শুকনো ফল প'ড়ে রয়েছে। হাত দিয়ে একটা উঠিয়ে নিলাম। গাছেও দেখলাম ওরকম ফল অনেক রয়েছে। ফলের বাহ্যিক আকারটা দেখলে আনারসের চেহারা মনে পড়ে। মনে হ'লো, এই জন্যই বোধ হয় আনারসের ইংরেজী নাম পাইন-আপেল (pine-apple)। "পাইন" শব্দটা বোধ হয় শিলংবাসী সাহেবদের প্রীতিজনক, তাই ঐ নামযুক্ত তাদের একটা হোটেল ও একটা স্কুলও দেখলাম—পাইন উড হোটেল, পাইন-মাউন্ট স্কুল (Pine-wood Hotel, Pine-mount School)।

প্রত্যহই পাইন গাছ দেখতে দেখতে পাইনের উপর কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। তাদের পূর্ব্বের সেই শোভাও যেন কোথায় চলে গেল। বিশেষতঃ, নদীমাতৃক দেশের লোকের পক্ষে নদীবিহীন স্থান বেশী দিন ভাল লাগতেই পারে না। যা হোক, কয়েক দিনের মধ্যেই শিলংয়ে দ্রষ্টব্য—বিডন ফল, বিশপ ফল, এলিফ্যাণ্ট ফল, লেক, শিলং পীক, চেরাপুঞ্জী প্রভৃতি দেখা শেষ হয়ে গেল। তার পরই পাইন-ভেল শিলং থেকে চলে এলাম। এর পরও অনেক বার শিলং গিয়েছি, কিন্তু পাইন-বনের সেই আদি অপূর্ব্ব শোভা আর চোখে ভাসে নি।

নতুন দিনের আলোক

—শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

দূর বেলাভূমে ফেলিয়া এসেছি অতীতের দিনগুলি
শিশু-হৃদয়ের স্বপন মাখান; কিশোরের বুলবুলি—
হঠাৎ কখন থামিয়াছে মোর যৌবন মধু-বনে—
মুখর যেন সে হইল মৌন হৃদয়ে সঙ্গোপনে।

* * *

অধুনা-লুপ্ত বিগত জীবন—কোথা এর প্রয়োজন?
বর্ত্তমানের পথে যেতে হবে, অতীত সে অকারণ।
তরুণ সে কয়,—'পুরাণো দিনের বঞ্চিত সঞ্চয়—
ইতিহাস তার অক্ষম লাগি—শক্তিমানের নয়।'

* * *

হয় তো বা হবে মিছা এ ধরণী—আমার কবিতা লেখা—
দূর আগ্রার যমুনার বুকে স্মরণের গত রেখা;
রাণা প্রতাপের মেবার-কাহিনী মহিমার রূপচ্ছবি—
অতীত বলিয়া ভুলিবে কে তারে? আমি ভুলি নাই কবি।

* * *

দৃষ্টির মোড় ফিরাও তরুণ বেদনার পারাবারে
তোমারই বৃহৎ মহাদেশ যেথা গভীর অন্ধকারে।
দেখিবে সেথায় ডুবেছে মানুষ আঁধারের কোলাহলে—
মূক ভারতের আশার স্বপন ডুবেছে চোখের জলে।

* * *

নতুন দিনের কই সে আলোক বাঁচিবার নব আশা—
সকলের লাগি ভুবন-ভুলানো মমতা ও ভালবাসা?
মহাশ্মশানের শিবাদল মাঝে শকুনির চীৎকার—
শিহরণ হানে আজিকে নেহারি পরাণে বারংবার।

* * *

অমৃত-লোকের কই সে ভারত, প্রেমের ভারত কই?
অধুনা দিনের দীনতার মাঝে আঁধারে ডুবিয়া রই।

উপ-দেবী

—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার

কুলেশ্বর গ্রামের একটি যৌথ পরিবার। লোক-জনে, ঝি-চাকরে, বৌ-ঝিএ, ছেলে-পুলেয় পরিপূর্ণ সংসার। শোনা যায়, দু'বেলা দেড়শ' পাত পড়ে। রান্নাঘরের চুল্লী কোন সময়েই ঠাণ্ডা থাকে না—চালের উপর কুণ্ডলী-পাকান ধোঁয়া সর্ব্বদাই ঘুর-পাক খায়। আনাচে-কানাচে এঁটো পাত নিয়ে কুকুরের ঝগড়া লেগেই আছে অষ্টপ্রহর। আর রান্নাঘরের পেছনে সুপুরি গাছটার নীচে পর-পর সাজান থাক্ থাক্ নারকেল গাছের গুঁড়ি সমেত যে ঘাটটা ডাইনে-বাঁয়ে বাঁশের খুলোয় ভর ক'রতে ক'রতে নেমে এসে মতিঝিলের জল ছুঁয়েচে, সেই ঘাটটায় বসে' একটা না একটা ঝি সর্ব্বদা সশব্দে বাসন মাজ্‌ছে আর নিজের মনে বিড়্-বিড়, ক'রছে। সেই সুপুরি গাছটার গোড়ায় দেখবে রাশীকৃত ছাই ডাঁই করা,—পাশে একটা কল্-ফলে মানকচু গাছ।...

সাতটি ভাই, পাঁচটি বৌ। শেষেরটি বিয়ে করেনি, তার আগেরটি বিয়ে করলেও বেচারার শাশুড়ী বৌকে তার পাড়াগাঁয়ে শ্বশুর-বাড়ীতে পাঠাতে রাজী হননি এখনও।... বড় ভাইটি ছাড়া কাউকেই বিশেষ কিছু ক'রতে হয় না। দরকার হ'লে বড় জোর বিষয়কর্ম্মগুলো নাড়তে-চাড়তে দু'একদিন বাইরে যেতে হয়; নয়তো ছিপ্ আর বন্দুক নিয়ে শীকার খুঁজতে হয়।

বড় ভাই-ই সংসারের কর্ত্তা। বড়-বৌ সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তিনি জ্যেঠাই-মা নামে আখ্যাত। অন্দরমহলের কোন কাজই জ্যেঠাইমাকে না হ'লে চলে না। ঝি থেকে, বামুন থেকে, লোক-জন ছেলে-বুড়ো সবাই বলবে, "জ্যেঠাই-মা, এটা কি হ'বে?" "ওটা কোথায়?" "সেটা না হ'লে তো চলে না!" "ওটাই রাখবো বা কোথায়?" চারটি বউও সেই পরিমাণ গা এলিয়ে দিয়েছেন:

"বা-রে, আমরা তার কি জানি? বড়দিকে জিগ্যেস্ কর না!"

"কুলো খায়নি. তা আমি কি করবো? বড়দি কিছু বলেছেন নাকি!"

"মনি কতটুকু দুধ খাবে তার আমি কি জানি? আমি কি খাওয়াই কোন দিন?"

"অবাক ক'রলে যা' হোক, অতিথিদের সিধে আমি দেবো কোত্থেকে? বড়দি'কে বলগে যাও!"

সোজা কথায় তাঁরা কেবল বিইয়ে খালাস। মানুষ করবার ভার জ্যেঠাই-মার ওপর। কোন্ ছেলে রাতে বায়না নেয়, কোন্ ছেলেটার মুহুর্মুহুঃ ক্ষিদে পায়, কোন ছেলেটা বিছানায় অপকম্ম করে রোজ, কোন্ ছেলেটা আবার পেটরোগা—গাঁদাল ঝোল দরকার, কোন ছেলেটার সারাদিন গা ছেঁক্-ছেঁক্ ক'রতে থাকে—সব খবর রাখবেন জ্যেঠাই-মা।"

ছেলেদের খাওয়া থেকে শোয়া, হাঁচা থেকে কাশা, জ্যেঠাই-মার চোখে-চোখে। বিশেষ করে' দুবেলা ছেলে-গুলোকে নিজে হাতে খাইয়ে না দিলে, তাদেরও যেমন পেট ওঠে না, জ্যেঠাইমারও তেমনি 'অনিয়মের' আশঙ্কাটা কিছুতে নিবৃত্তি হয় না। "কারুর কি ছাই এতটুকু দায়িত্ব জ্ঞান আছে এ সংসারে?"

ষষ্ঠী-ঠাকুরুণকে একলা কল্পনা করাও যা, জ্যেঠাই-মাকে ঝাড়া-হাত-পা ভাবাও তা। আশে-পাশে জ্যেঠাই-মার একটা-না একটা ছেলে হয় আঁচল, নয় কোল, নয় বায়না নিয়েই আছে। মুখে "নাঃ, মানুষকে একটু দাঁড়াতে-বসতে দেবে না!"—বলে দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখখানাকে ঈষৎ কুঞ্চিত করলেও জ্যেঠাই-মার স্নেহ-সজল চোখ দুটো স্থির হ'য়ে যায়—আঁচলটা আরও আল্‌গা হ'য়ে বায়না-নেওয়া ছেলেটার মুঠোর মধ্যে অনেকখানি আশ্রয় লাভ করে। মাজা-মাজা পায়ের রঙ তাঁর কোমল মসৃণতায় কেমনতর চক্ চক্ করে' ওঠে। কোলের মেয়েটা সুযোগ বুঝে ক্ষুদ্র হাতে জ্যেঠাই-মার মুখখানা আয়ত্তে আনবার চেষ্টা ক'রে বলে—"জেটু, আগ্ কলিস্?"

কিন্তু রাগ আর হ'লো কৈ? আর এই অবোধদের ওপর রাগ করেই বা লাভ কি?

একদিন বর্ষণ-মুখর আষাঢ় সন্ধ্যায়।

রান্না-ঘরে জ্যেঠাই-মা আসন-পিঁড়ি হ'য়ে একথালা ভাত কোলে করে' বসে আছেন। গুটি দশেক ছেলে-মেয়ে সেই থালাকে বৃত্তাকারে ঘিরে বসে'।

ভোজন-সমারোহটায় হঠাৎ একটু বেগড়া লেগেছে। ভোজনকারীরা কোন নিগূঢ় কারণে ধর্ম্মঘট করে বসেছে। জ্যেঠাই-মার হাতে 'ডেলা-পাকানো' ভাতের গ্রাস বিনা বাধায় মুখ-ফিরতী হ'য়ে একই কেন্দ্রে ফিরে আসছে।

জ্যেঠাই-মা একটু রাগবার চেষ্টা করলেন। গম্ভীর হ'য়ে ভাতের গ্রাসটা সবার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "খোকা তুমি? শৈলা তুমি? ভুলো? কেলো? পটা? মানা? কমলি? বেশ কেউ নয় তো? আমি উঠলুম! বামুনদি আপনি এদের আলাদা করে' ভাত দিয়ে যান। অসভ্য ছেলে সব, বললে বুঝবে না।"

যদিও ছেলেরা জানে এমনটি অসম্ভব, তবুও দলের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য পড়ে গেল। কেউ-কেউ আপোষ করবার জন্যে উসখুস্ করতে লাগলো। খেতে যখন হবেই তখন দরকার কি মিছে গণ্ডগোলে?

জ্যেঠাই-মার কোল ঘেঁসে যে খুদে ছেলেটী বসেছিল, সে সবার মুখ-চাওয়া চাওয়ি করে' ব'ললে, "আম্মায় দে জেঠ্-উ!"

কমলি ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "তুমি গল্পটা বল না কেন জ্যেঠাই-মা!"

জ্যেঠাই-মা ব'ললেন, "বলেইছি তো আজ নয়, কাল বলবো! দেখগে না বাইরে কেমন বিষ্টি ঝেঁকে এসেছে—আর সবাই খাবে না?"

যুক্তিটা বুঝবে এমন বয়েস এদের কারুরই নয়। বাইরে ঝেঁকে এলেই বা সবাই উপোস যাবে কেন?

খোকা বললে, "কাল না বলেছিলে, আজ বলবো! তবে আজ বলবে না কেন?"

জ্যেঠাই-মা হেসে ফেললেন। বললেন, "বলেছিলুমই তো। তাতে কি? বাবুরা এখনি খেতে আসবেন, রাত হ'য়ে গেছে!"

শৈল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ব'ললে, "বা-ব্বা, আর খোসামোদ করতে পারি না!"

তাতেও জ্যেঠাই-মা চুপ। পাকান ভাতের ডেলাগুলো ভেঙ্গে আবার পাকাতে লাগলেন।

এর পর আর কথা চলে না। গল্প আজ হতেই পারে না। মিছেই ধর্ম্মঘট করে' পেট কাঁদাব। মাথা হেঁট করে' সুড়-সুড় করে' যে-যার ভাতের গ্রাস মুখে নিতে লাগল।

জ্যেঠাই-মা মনে মনে হাসলেন। কিন্তু দুষ্টু ছেলেগুলো অমন ভূতের মত শান্ত হ'য়ে পড়ায় ব্যথা পেলেন। গম্ভীর মুখে ডান হাতটাকে দু' একবার থালার পরিধির ওপর ঘুরিয়ে আনবার পর হেসে বললেন, "তারপর কি হলো জান, খোকা?" খোকারা সব নড়ে চড়ে উঠলো।

"সে অনেকদিন আগের কথা—তোমরা তখন কেউই হওনি, এমন কি তোমাদের বড়দা, মেজদা, বড়দি, মেজদি, কেউ-ই নয়।"

হেঁট হয়ে জ্যেঠাইমার হাত থেকে ভাতের গ্রাসটা মুখে নিয়ে মুকুল (কোল-ঘেঁসা ছেলেটি) বললে, তুমিও না জেঠু-মা? বামুন-দিও না?"

এত সাধের গল্পে বেগড়া লাগতে কমলি চটে গিয়ে ধমক দিয়ে উঠল: "তুই থাম না—কেবল বাজে কথা বক!"

হেসে জ্যেঠাই-মা বললেন, "না। আমিও না, তোমার বামুন দিও না ঠাকুমাও না। কেউ না।"

মুকুল কিঞ্চিৎ চিন্তিত হয়ে বললে, "ফাজিল মিয়াও না?"

তেমনি হেসে জ্যেঠাই মা বললেন, "না, ফাজিল মিঞাও না।"

মুকুলের মতে 'কেউ-না-দিনে'-এ বৃদ্ধ পেয়াদা দীর্ঘ, শুভ্র-শ্মশ্রু ফাজিল মিঞা বর্ত্তমান ছিল। আর যদি নাই থাকবে তো তার অত বড় দাড়ির এক গাছিও চুল কালো নেই কেন?

কালো কমলি একদমে গর্জ্জে উঠল: "ছেলের কেবল তর্ক! পুঁচকে ছেলে! তুমি বল না জ্যেঠাই মা।"

জ্যেঠাই-মা হেসে আরম্ভ করলেন, "তখন খুব ডাকাতের ভয় ছিল। রাত হ'লে পথে-ঘাটে ডাকাতদের উপদ্রব আরম্ভ হ'ত। তারা বেশীর ভাগ আমাবস্যে রাতে দল বেঁধে গিয়ে লোকের বাড়ী পড়্'ত। যারা ভালয়-ভালয় টাকাকড়ি, গয়না গাঁটি দিয়ে দিত, তাদের তারা কিছু বলত না। আর যারা তা না দিত, তাদের কেটে-কুটে রেখে আসত।"

খোকা বললে, "হাঁ৷ জ্যেঠাই-মা, ডাকাতরা না কি যে-বাড়ীতে ডাকাতি করবে সে-বাড়ীতে আগে থেকে উড়ো চিঠি দিত? ডাকাতরা কি বোকা, চিঠি পেয়ে লোকেরা তো পালাতে পারে, এটা আর বুঝত না?"

জ্যেঠাই-মা বললেন, "পারবে না কেন, তারা দিনের বেলায় ভিখিরী সেজে খবর নিয়ে বেড়াত। পালাবার কি যো ছিল? একবার কারা যেন এ রকম পালাবার পথে ডাকাতদের হাতে পড়ে—গাড়ীতে সকলে যদিও বা কেউ বাঁচত, তখন আর কেউ-ই আস্ত রইল না। ডাকাতরা বাপ-ছেলে, মা-বৌকে দু'খানা করে কেটে মাঠের ওপর শুইয়ে রেখে গেল।"

মুকুল ভয়ে জ্যেঠাই-মার আঁচলের ভিতর সকড়ি মুখটাই লুকিয়ে বললে, "তা—তার চেয়ে বাড়ীতে থাকাই ভালো, না জেটু-মা!"

কমলি বিরক্ত হয়ে বললে, "হাঁ, হাঁ৷ তাই থাকিস। তুমি ওদের কথা শুন না—তারপর কি হ'ল জ্যেঠাই-মা?"

জ্যেঠাই-মা বললেন, "ডাকাতরা খুব কালীভক্ত। তারা ডাকাতি করবার আগে খুব ঘটা করে' কালীপুজো করে' নেয়। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোলের মানুষকে দেখা যায় না, তাই তারা আমাবস্যে রাতে ডাকাতি করতে বেরোয়। তারা সেদিন বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে আকাশে আগুন লাগিয়ে দেয়, এক সঙ্গে বিশ পঞ্চাশজন 'রণ-পা' করে মার-মার করতে করতে গেরস্তের বাড়ীতে পড়ে। এসেই শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলে; আর তা যদি না ভাঙতে পারে, গোয়ালে আগুন লাগিয়ে দেয়। গেরস্ত গো-হত্যার ভয়ে দরজা খুলে দেয়।...যে সব বাড়ীতে তারা কিছু পায় না, ফেরবার সময় সে সব বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়—ছেলে-মেয়ে-বৌকে দড়িতে বেঁধে চোখের সামনে বল্লম দিয়ে কর্তার চোখ খুঁচে দেয়।"

ডাকাতদের উৎপীড়নের নৃশংসতা এতগুলো বালক-শ্রোতার মনে গভীর রেখাপাত করলে—ভয়ে তাদের গায়ে কাঁটা দিলে—উৎপীড়িত গৃহস্থের দুঃখে তাদের চোখে জল এল—অসহায় আক্রোশে তারা পরস্পরের গা-ঘেঁসে বসল।

ভীরু-প্রকৃতি খোকা তো এমন বর্ষণ-মুখর দুর্যোগের দিনেও চোখের সামনে ষণ্ডামার্ক, কৃষ্ণকায়, কৃতান্ত-অনুচরদের শ্বাপদ জন্তুর মত শীকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে স্পষ্ট দেখতে পেলে। মনে হল, রান্নাঘরের একদিকের চাল যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল; কানের কাছে সহস্রাধিক লোক যেন আর্তনাদে আর হুঙ্কারে আকাশ ফাটিয়ে দিলে; হু হু করে বাতাস এসে খাণ্ডবদাহ শুরু করলে; ঊর্দ্ধপুচ্ছ, দগ্ধদেহ গরুগুলো ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল—পেছন দিক্ থেকে একটা জ্বলন্ত চাল খসে পড়ল'—অনেকগুলো দুগ্ধবতী গাভীর জীবন্ত সমাধি হ'লো।...বৃদ্ধ পিতার সে কি করুণ মিনতি! মাতার কি আর্তনাদ! নবদম্পতীর চোখে সে কি কাতরোক্তি! তারপর, তারপর ভীমহস্তে সব মুছে গেল। শ্মশানে শুধু চিতা জ্বলে।

ভীত শশক-শাবকের মত মুকুল চোখ চেয়ে রান্নাঘরের কানাচে কাদের যেন লাঠি হাতে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখতে পেলে, ওই এখনি ওরা এসে পড়বে! মাথায় তাদের বাবরী চুল, কানে কলকে ফুল, কপালে সিন্দুর, ভাঁটার মত রাঙাচোখ তাদের আঁধারে জ্বলছে যেন।

ভয়ে বুক দুর-দুর করে' উঠলো—মুকুল তাড়াতাড়ি চোখ বুজিয়ে ফেললে।

কিন্তু আশ্চর্য্য—এতগুলো শিশুমনে ভয়ের সঞ্চার হ'লেও, তারা কেউ-ই 'তার পরে'র তাগিদ ভুলতে পারছে না। ভিতরে ক্ষীণ-দীপালোককে ঘিরে অখণ্ড নীরবতা আর বাহিরে নব-বর্ষার একটানা ঘন বর্ষণ শিশুগুলিকে ভয়ে বোবা করে দিলেও, তারা তাদের কৌতূহলের প্রথম কথা 'তারপর'-কে কিছুতে যেন ধরে রাখতে পারছে না।

কালো তাড়াতাড়ি আলোর জোর বাড়িয়ে দিয়ে চোখ-টাকে ভাল করে' কচ্‌লে নিলে।

কমলি চোখ মুছে বাষ্পাকুল কণ্ঠে জিগ্যেস ক'রলে, "তারপর?"

জ্যেঠাই-মা খোকার মুখে ভাত দিতে দিতে বললেন, ঐরকম একদল ডাকাত আমাদের বাড়ীতে পড়েছিল।"

তার্কিক মুকুল প্রশ্ন ক'রলে, "কে কে মরলো জেটুমা? তুমি না, বামুনদি না, ফাটিক মিয়াও না, আম্মিও না?"

কালো ভুল ধরে বললে, "এই শুনলে না তখন কেউই হয় নি? তবে তুমি কি করে হবে বোকা?"

খোকা হঠাৎ বিজ্ঞের মত বললে, "জ্যেঠাইমাই যদি মরে-

ছিল, তা হ'লে গল্প ব'লবে কি করে? আর তুই মরলে শুনবি কি করে? মরা লোক গল্প শোনে বোকা?"

জ্যেঠাই-মা হেসে বললেন, "না, কেউ-ই মরেনি আগে শোন—"

তার্কিক মুকুল চারদিক থেকে তাড়া খেয়ে শান্ত হল। কিন্তু তার কেবল গুলিয়ে যেতে লাগলো—কেউই যদি হয়নি তো গল্পটা হ'লো কি করে? মিত্র সাহেব জানল না, জেটুমাও না, এত বড় ডাকাতিটা তো হ'লো?

মুকুলকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে জ্যেঠাইমা ব'ললেন, "সেদিন ভরা আমাবস্যে—কুপ-কুপ করছে অন্ধকার। সন্ধ্যে থেকে কেবল পেঁচা ডাকতে লাগল, কাকগুলো থেকে থেকে বাসায় ডানা ঝটপট ক'রে কেঁদে উঠল। বাজপাখীগুলোও হঠাৎ যেন চীৎকার শুরু করে' দিলে।...রাত আটটার আগে আমাদের বাড়ীর সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেল। 'ঝি-মা'-এর ছোট মেয়ে মালতীমালা ছেলে-পুলে নিয়ে খোকাদের তেতালা ঘরে শুতে গেলেন।...রাত তখন কটা, কে জানে—সদর খামারের মধ্যিখানটায় মশালের আগুনে লালে লাল হ'য়ে গেল, গেটে কুড়ুলের ঘা পড়ল। মালতীমালার ঘুম ভেঙ্গে যেতে তিনি খিল খুলে দোতলার ঐ মস্ত দালানের ছাদ দিয়ে এসে খামারের সামনে আলসের উপর দাঁড়ালেন। দেখলেন, ডাকাতরা গেট ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে গিয়ে সমস্ত কাপড়-চোপড় ছেড়ে রাখলেন, দেওয়ালের গা থেকে ঝুলোন বড় 'কাতান'টা খুলে বাঁ হাতে নিলেন, চুল এলো করে' পিঠের ওপর ফেলে দিলেন—তারপর ফিরে এসে জিভ বার করে আলসের উপর দাঁড়িয়ে এক হুঙ্কার দিলেন। ডাকাতরা মুখ তুলে ওপরের দিকে চাইতে মশালের আগুনে কালীমূর্ত্তি দেখতে পেল। দেখেই তারা যে যার অস্ত্র ফেলে দিয়ে ঐ খামারের উপর হাঁটু গেড়ে বসল। 'মা,-মা!' করে' ডাকতে লাগল। মা কিন্তু কথা কইলেন না; তাঁর ডান হাত গ্রামের বাইরে যাবার পথের দিকে বাড়ান ছিল। তাই দেখে ডাকাতদের সর্দ্দার সঙ্গীদের বললে, 'ভাই-সব, মা আমাদের এ বাড়ীতে পড়তে মানা ক'রছেন—তিনি এবাড়ি বাঁধা আছেন—চল আমরা ফিরে যাই'।

"সকলে তখন দ্বিরুক্তি না করে' গ্রাম ছেড়ে পালাল। পরের দিন গেটের সামনে অনেক হীরে-মোহর, গয়না পাওয়া গিয়েছিল।"

•

অভিভূত ছেলের দল মনে মনে ভারী আত্মপ্রসাদ লাভ করলে। ডাকাতদের অতি বাড় তো খর্ব্ব হ'ল! খোকা মনে মনে আপশোষ করতে লাগল, সে যদি সেদিন থাকতো, ডাকাতদের আচ্ছা করে' শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়তো।

মালতীমালা মেয়েছেলে তাই অল্পে ছেড়ে দিলেন।

বিজয়-গর্ব্বে সবাই পাশ ফিরে নিলে। তার্কিক মুকুল এবার স্বচ্ছন্দে চোখ চেয়ে প্রশ্ন করলে, "সে গয়নাগুলো কি হল জেটু-মা?"

কমলি এতক্ষণ আপনাতে মালতীমালার রূপ আরোপ করছিল মনে মনে। যদি সে মালতীমালা হত? এতগুলো ডাকাত তাড়িয়ে এ সংসারের এতগুলো প্রাণীকে আসন্ন মৃত্যুর হতে থেকে রক্ষা করতে পারতো সেদিন! পরের দিন কত প্রশংসাই না সে পেতে পারতো অনায়াসে। গ্রামে গ্রামে ঢি ঢি পড়ে যেত! সবাই তাকে সেদিন থেকে বিস্ময়, শ্রদ্ধার চোখে দেখতো—মনে মনে তার মত বীর রমণীর পূজো করতো! সে হতো দেবী! ঐ ভীমকায় কৃতান্ত-সহচরেরা তাকে মা বলে' হাঁটু গেড়ে বসে পড়তো তো!

সেদিনের সে কল্পনায় কমলির ছোট বুকটা ভরে গেল। উত্তেজনায় নিশ্বাসের ক্রিয়া গাঢ় হয়ে এল।

মুকুলের কথায় মালতীমালা বর্ত্তমানে ফিরে এল। কমলি বিরক্ত হয়ে বললে, "কি আর হবে? কেউ নিয়ে নিলে—কে দেখতে গেছে অতো! কেবল বাজে কথা যত ছেলের।"

জ্যেঠাই-মা হেসে বললেন, "সে গয়নায় তোমাদের ঐ ঠাকুরদালান হলো—লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের সিংহাসন হলো।"

ব্যবস্থাটা ঠিক মুকুলের মনের মত হয় নি। সে বললে, "আর মালতীমালার কি হ'ল?"

কমলি চেঁচিয়ে উঠলো: "রাগ করে পাল্কী ডেকে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল। এবার হ'ল তো? কি ছেলে বাবা:!"

খোকা হঠাৎ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন ক'রলে, "আচ্ছা জ্যেঠাই-মা, মালতীমালা তো কালীঠাকুরের মত কালো ছিল কুচ-কুচে?"

কমলি জিভ কামড়ে বললে, "ঠাকুরকে বুঝি কালো বলতে আছে, দাদা? ঠাকুর পাপ দেয়, না জ্যেঠাই-মা? গড় কর দাদা!"

জ্যেঠাই-মা বললেন, "হ্যাঁ, খুব কালো।...তারপর মুকুল কি হ'ল জান, এ-বাড়ীর বাবুরা আর মালতীমালাকে শ্বশুর-বাড়ী যেতে দিলেন না। মালতীমালার শ্বশুরবাড়ীটাই বরং এ গ্রামে উঠে এল—মালতীমালা অনেক জমি জায়গা পেলে। ঐ যে জোড়া-সাঁকো আছে না, ওর ওপারে যে-ডাঙ্গায় চৌধুরীরা বাস করে, ওখানে মালতীমালার শ্বশুররা কিছু দিন বাস করেছিল। এখনও ঐ জায়গাটাকে তাই মিত্তির-ডাঙ্গা বলে!—"

খোকার কিন্তু কেন জানি না, কেবলি মনে হ'তে লাগল, এ-বাড়ীর কর্তারা আর মালতীমালাকে ফিরিয়ে দেয়নি !

তার যেন কেমন এক অদ্ভুত ধারণা হ'ল : তার পরের দিন থেকে মালতীমালাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কত পাইক বরকন্দাজ দিকে দিকে ছুটল। গোল সিঁড়ির পথে ঝি-মা গুড় দাদের শিথাকে কাপড় আড়াল দিয়ে বাষ্পাকুল কণ্ঠে কত ডাকলেন—কতদিন দালানের ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রলেন—কিন্তু কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না, কেউ সাড়াও দিলেন না, কেউ ফিরেও এল না। সবাই ভাবলে ডাকাতরা সেদিন কেবল মালতীমালাকে ধরে নিয়ে গেছে।

কিন্তু খোকা ভাবে, তা নয়। মালতীমালাকে সেদিন থেকে এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখা হ'ল যে কেউ তাকে খুঁজে বার ক'রতে পারলে না। এ-বাড়ীর চারিদিকে মালতীমালার নাম উচ্চারিত হ'তে লাগল। ঐ তেতলার সিঁড়ির ঘরের বড় কুলুঙ্গিটার মধ্যে নিশ্চয়ই তাকে গেঁথে দেওয়া হ'য়েছে। তা' না হ'লে ওটারই বা বাইরেটা অতো নক্সা করা কেন ? ওখানটায় দাঁড়ালেই বা খোকার এত ভয় করে কেন ? কতদিন রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে মনে হ'য়েছে, ঐ বন্ধ কুলুঙ্গিটার ভেতর কে যেন অনবরত মাথা কুটছে—রুদ্ধ কণ্ঠস্বর তার চূণ-বালি-ইটের কারা ভেদ করে' বাইরে আসতে চাইছে ! এ নকসা-কাটা কুলুঙ্গিটার জায়গায় চটে গিয়ে পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে কেন ? মাঝে মাঝে বালি খসে পড়ে কেন ? মালতীমালার অদৃশ্য মাথা কোটা, আর আর্ত্ত কণ্ঠস্বরের নিষ্ফল আক্রোশ !

তারপর কতদিন পরে একদিন মালতীমালার আত্মা দেহ ছেড়ে বাইরে এল। সে এখনও রোজ রাত্তির বেলা বেরিয়ে ঐ আটচালায় দাঁড়িয়ে থাকে—দালানের ছাদের আলসের উপর সারারাত পাইচারি করে—গোল সিঁড়ির পথে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। তবুও এ বাড়ী ছেড়ে যেতে পারে নি আজও।

অন্ধকারে তাইতো খোকার গায়ে কাঁটা দেয়—চোখ চাইলে মালতীমালা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে। চোখ বুজিয়ে থাকলে মালতীমালার বিস্রস্ত অলক গায়ে সুড়সুড়ি দেয় !

মালতীমালার জন্ত সুব্যবস্থায় মুকুল আশ্বস্ত হ'লো। বললে, "ওঃ !"

কমলি গম্ভীর হ'য়ে বললে, "মেয়েছেলের শ্বশুর-বাড়ী না-যাওয়া খারাপ কিন্তু, নয় জ্যেঠাই-মা ?"

পাকা গিন্নীর কথায় জ্যেঠাই-মা একটু হাসলেন মাত্র।

এতক্ষণ পরে আর আর মূক শ্রোতারা বললে, "বাঃ রে ! তাকে না যেতে দিলে সে কি করবে ?"

কিন্তু সে-দিন থেকে এ বাড়ীতে আর ডাকাত না-পড়ার কারণ একমাত্র খোকাই বুঝ্‌তে পারলে। মালতীমালাকে একরকম জোর ক'রেই এ বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী ক'রে নেওয়া হয়েছে। অপত্যস্নেহ বাড়ীর স্বার্থের খাতিরে বলি দেওয়া হয়েছে ! উঃ কি ভীষণ, নির্দ্দয় কঠোর সে-ব্যবস্থা—কল্পনায় খোকা কাঁপতে থাকে !

কিন্তু আশ্চর্য্য, মালতীমালার প্রেতাত্মা আজ পর্য্যন্ত সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুললে না, বরং এ বংশের কল্যাণের দিকে নজর রেখেছে বারবার। এত ভালবেসেছে সে বাপের বাড়ির বংশকে ! চোর-ডাকাত ভয় পেয়ে গেছে, গ্রাম থেকে গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, বসু-বংশে উপদেবী বাঁধা আছে—ওদের সাধ্য কি তার কুটিটুকু নেড়ে নিয়ে যায় ! পুরুষানুক্রমিক চোর ছেঁচড়ের এই যে ভীতি, একি শুধু একটি দিনের অলৌকিক কাহিনীতে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ? সে বিশ্বাস খণ্ডন ক'রতে কি আজ পর্য্যন্ত কোনো দুঃসাহসিক ডাকাত-দলের জন্ম হলো না ? সবাই কি বারে বারে ঐ কালীমূর্ত্তি দেখে প্রাণ নিতে এসে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণ হাতে করে পালিয়ে গেছে ? একই কাহিনী কি বর্ষে বর্ষে, যুগে যুগে পুনরাবৃত্ত হয়ে এসেছে এ-বাড়ির জন্যে ?

মালতীমালা মরে নি, সে উপ-দেবী হ'য়ে বিরাজ ক'রছে এই বংশে।

খোকা ভাবলে, এখন মালতীমালা কোথায়, এখনি, এই মুহূর্ত্তে ?

সহসা খোকার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো, ভয়ে কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, চোখ কর-কর করে বাষ্পাকুল হ'য়ে এল।

বাহিরে বৃষ্টি ধরে এল। উঠানে ধূম-মলিন লণ্ঠনের আলো দেখা গেল। পরিচিত আলোটি দেখে জ্যেঠাই-মা বললেন, "ওরে এবার তোরা ওঠ। বাবুরা বোধ হয় খেতে আসবেন।"

ব'লতে ব'লতে লণ্ঠনের অধিকারী আওলাৎ খাঁ দাওয়ার উপর উঠে পড়ে বললে, "বাবুরা আসবেন বড়মা ?"

বিচিত্র আকারের মন্দির

—শ্রীরমেশ বসু

বাংলা দেশে আমরা সাধারণতঃ যে-সকল মন্দির দেখি, সেগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—মঠ ও মন্দির। মঠের নীচের অংশ গোলাকার বা চতুষ্কোণ হয় এবং উপরে একটি উচ্চ চূড়া থাকে। মন্দিরের নীচের অংশ চতুর্ভুজ বা চতুষ্কোণ, এবং উপরে সমতল বা বাংলাঘরের মত বাঁকান ছাদ থাকে; ইহার উপরে একটী উচ্চ চূড়া ঘিরিয়া চার কোণে চারটি ছোট চূড়া থাকিলে পঞ্চ রত্ন, আর প্রত্যেক স্তরে চারটি করিয়া উঠিলে নব-রত্ন, ত্রয়োদশ-রত্ন, সপ্তদশ-রত্ন বা একুশ-রত্ন মন্দির নির্ম্মিত হয়। আসলে মন্দিরের আকার নির্ভর করে উপরের সাজ-সজ্জার উপরে তত নয়, যত ইহার পাদদেশের সংস্থান বা ground plan-এর উপর। অনেক সময় যে জোড় বাংলা দেখা যায় তাহারও আকারের মূল একই। কোন কোন মন্দিরের পাদদেশ গোল বা চতুষ্কোণের একটু রকমফের করিয়া বহুকোণী করা হয়।

প্রাচীন শাস্ত্রে মন্দিরের পাদদেশের সংস্থান কোন্ কোন্ রকমের হইবার ব্যবস্থা ছিল, তাহা একটু আলোচনার যোগ্য। এ বিষয়ে মৎস্যপুরাণের বিধান এইরূপ:—

মণ্ডপাঃ কথিতা হ্যেতে যথাবল্লক্ষণান্বিতাঃ।
ত্রিকোণং বৃত্তমর্দ্ধেন্দুমষ্টকোণং দ্বিরষ্টকম্।
চতুষ্কোণঞ্চ কর্ত্তব্যং সংস্থানং মণ্ডপস্য তু।

—২৭০ অধ্যায়, ১৫-১৬ শ্লোক।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, মন্দিরের সংস্থান ত্রিকোণ, গোল, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, চতুষ্কোণ, আটকোণী ও ষোলকোণী হইতে পারে। অন্য কোন আকারের করা নিষিদ্ধ ছিল। আর এইরূপ নানা আকারের মন্দির করার এক একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তাহাও মৎস্যপুরাণে উল্লিখিত দেখা যায়। আকারগুলি যথাক্রমে এই এই উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিত:—

রাজ্যঞ্চ বিজয়শ্চৈবমায়ুর্বর্দ্ধনমেব চ।
পুত্রলাভঃ স্ত্রিয়ঃ পুষ্টিস্ত্রাসিদ্ধিং ভবেৎ ক্রমাৎ।
এবন্তু শুভদাঃ প্রোক্তা অশুভা তু ভয়াবহাঃ।

—২৭০ অধ্যায়, ১৬-১৭ শ্লোক।

প্রাচীনকালের ভারতবর্ষে শুধু কোন জিনিষের আকারে নয়, তাহার বর্ণ প্রভৃতিও বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসূচক ছিল; ইহা আমরা সেকালে ব্যবহৃত সব রকমের জিনিষের কথা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারি।

মৎস্যপুরাণে মন্দিরের যে আকারগুলির কথা পাওয়া যায় তাহা মৌলিক। কিন্তু আমরা যে-সব জিনিষ দেখিতে পাই তাহা সব সময় মৌলিক আকারের না হইয়া মিশ্র আকারের হয়। যেমন তলভাগ গোলাকার, কিন্তু উপর বহুকোণী, অথবা তলভাগ চতুষ্কোণ বা বহুকোণী, কিন্তু উপর গোল। আগাগোড়া একই আকারের হইবার কথাই বোধ হয় মৎস্যপুরাণে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু নানা অংশ নানা আকারে নির্ম্মিত হইলেই বোধ হয় দেখিতে সুন্দর হয় এবং এইজন্যই আমরা যে-সব মন্দির দেখিতে পাই, তাহা নানা মিশ্র ধরণের। শুধু তল-সংস্থানে নয়, মন্দিরের চূড়ার মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। অনেক মঠের উপরে যে পর পর অনেকগুলি কলস বসান থাকে, তাহাও নানা জ্যামিতিক আকারের জন্য একঘেয়ে হইয়া উঠে না। চূড়ার অগ্রভাগেও সব সময় সূচীর আকারে প্রস্তুত হয় না, কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রিশূল বা অর্দ্ধচন্দ্র বসান থাকে। ইহাতেও সমস্ত চূড়াটির মধ্যে একটা বৈচিত্র্যের সমাবেশ হয়। অতি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের উপরিভাগ গম্বুজ বা dome-এর আকারে নির্ম্মিত হইত, পরে তাহাতে বহু ছত্র আকারের চূড়া দেওয়া হইত। কিন্তু বঙ্গদেশে মধ্যযুগে এরূপ কোন মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। মুসলমানী যুগে মুসলমানেরা গম্বুজ কোথা হইতে পাইল, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। মাত্র মুসলমানদের মস্‌জিদেই আমরা গম্বুজ দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। হিন্দু মন্দিরে যে কোথাও গম্বুজ থাকিতে পারে, তাহা আমরা ভাবিতেই পারি না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোন কোন মন্দিরেও গম্বুজ দেখা যায়। ঐসব মন্দিরের তলভাগ চতুষ্কোণ, তাহার উপর গম্বুজ থাকাতে যে একটা বৈচিত্র্য সম্পাদন

হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এমনও মন্দির দেখা যায়, যাহার চূড়া খাড়া সূচী আকারের নয়, কিন্তু চূড়ার উপর ভাগে উল্টান পদ্ম থাকে। এইরূপ নানা মনোজ্ঞ বৈচিত্র্য বাংলা দেশের প্রাচীন মন্দিরগুলির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

উপরে আমরা শুধু গড়নের হিসাবেই আকারগুলির উল্লেখ করিলাম। কিন্তু আমরা জানি ভারতীয় মূর্ত্তির মত মন্দিরও প্রতীক, অর্থাৎ গভীর রহস্য বুঝাইবার জন্য তত্ত্বেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এইজন্য মন্দিরের আকারেও symbolic ও esoteric ভাব ফুটাইবার প্রয়াস দেখা যায়। মন্দিরের সঙ্গে যে রথের আকারে ঐক্য আছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভাবের দিক্ হইতে রথ বা মন্দির মানুষের দেহ-রথেরই প্রতীক মাত্র। মানুষের দেহকে যে রথরূপে এবং আত্মাকে যে তাহার সারথিরূপে কল্পনা করা হইত তাহা আমরা প্রাচীন শাস্ত্রে, এমন কি উপনিষদেও পাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মন্দিরের আকার শুধু সৌন্দর্য্য-বোধ বা প্রয়োজন মিটানর জন্য নয়, উহার একটা গভীর অর্থও আছে। হিন্দু যখন বলে "রথে তু বামনং দৃষ্টা" তখন তাহাতে শুধু চাকার উপর চলন্ত রথের ইঙ্গিত থাকে না, আর একটি গভীর দ্যোতনাও তাহার মনে জাগিয়া উঠে। এই জন্যই মন্দিরের কেন্দ্রকে 'গর্ভগৃহ' বা 'রহস্য' বলা হয়।

ভারতবর্ষের নানা অংশে যে সকল মন্দির দেখা যায় তাহা সচরাচর চতুষ্কোণ বা বহুকোণী। গোল আকারের মন্দির খুব সাধারণ নয়। প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ গোলাকার হইত, কিন্তু মধ্যযুগে তাহা কত দূর অনুসৃত হইত বলা যায় না। শৈব মঠগুলিই গোল আকারের দেখা যায়। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ভেড়াঘাটে কলচু'র রাজাদের সময়ে যে-সব মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার সমবায়ের নাম গোলকী মঠ; এই মঠগুলি একেবারে গোল আকারের হওয়াতেই এই রূপ নামকরণ হইয়াছিল। এইরূপ মঠ অন্যত্র দেখা যায় না। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, তলভাগ গোলাকার হইলেও উপরভাগ গোলাকার না হইতেও পারে, তাহা হইলে মিশ্র আকারের মঠ হয়। সাধারণতঃ এই মিশ্র আকারের মঠই দেখা যায়। মন্দির যে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নির্ম্মিত হইত তাহার উল্লেখ মৎস্যপুরাণে পাওয়া যাইতেছে এবং তাহা শুভদ বলিয়া কথিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ওরূপ কোন মন্দির পাওয়া গিয়াছে কি না, জানি না। হিন্দুরা স্বস্তিককে শুভদ মনে করেন, কিন্তু ভারতীয় স্বস্তিকের আকারে মন্দির নির্ম্মাণ করিবার কোন বিধান পাওয়া যায় না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, অথচ আমরা জানি উদ্যান-রচনা স্বস্তিক আকারে হইতে পারিত। আবার তারার আকারে নির্ম্মিত মন্দির দেখা যায় না। এই সব আকার কি অশুভ বা ভয়াবহ মনে করা হইত?

এবার আমরা ত্রিকোণ আকারের মন্দিরের কথা বলিব এবং প্রধানতঃ এই জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

উপরে আমরা নানা আকারের মন্দিরের কথা উল্লেখ করিলাম, সেগুলি কম-বেশী চলিত হইলেও অস্বাভাবিক মনে হয় না। কিন্তু ত্রিকোণ মন্দির স্বাভাবিক মনে হয় না। অথচ মন্দির নির্ম্মাণের ফলশ্রুতিতে দেখা যাইতেছে ত্রিকোণ মন্দিরের ফলে রাজ্য লাভ হয়। ভারতবর্ষে যুগে যুগে কত রাজা তো রাজ্য-লাভ ও রাজ্যবৃদ্ধির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কেহ ত্রিকোণ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কি না এ পর্য্যন্ত তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যদি কেহ এরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে রাজ্যলাভের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয় মাত্র, কোন রহস্য (esotericism) প্রকাশ করে না। এই জন্য যখন দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশে ত্রিকোণ আকারের মন্দির নির্ম্মিত হইত তখন তাহা পৌরাণিক উদ্দেশ্য ব্যক্ত না করিয়া তান্ত্রিক গুহ্য রহস্য বুঝাইবার চেষ্টা করিত, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশ তন্ত্রের দেশ, এই দেশে তন্ত্রের যত প্রাধান্য ছিল, যত রকম তান্ত্রিক রীতি ও আচার অনুষ্ঠিত হইত, তাহা বোধ হয় অন্যত্র দেখা যায় না। তান্ত্রিক মতে ত্রিকোণ একটি বিশিষ্ট রূপ, তান্ত্রিকতার সংস্পর্শে নানা রকমে এই ত্রিকোণ ব্যবহৃত হইবার বিধান আছে। সুতরাং বঙ্গদেশে যখন আমরা ত্রিকোণ মন্দির দেখিতে পাইতেছি, তখন উহা এদেশের একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয় এবং উহার উদ্ভব পৌরাণিকতা হইতে নয়, তান্ত্রিকতা হইতে। তন্ত্রের মধ্যে ত্রিকোণ মন্দির নির্ম্মাণ করিবার কথা থাকা সম্ভব, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা ওরূপ কোন বচন পাই নাই। অথচ এগুলি যে তান্ত্রিক মতের অনুযায়ী তাহা পরে স্পষ্টভাবে দেখা যাইবে।

তন্ত্রে তত্ত্ব ও আচার বিস্তৃত ভাবেই বর্ণিত হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এরূপ বিশিষ্ট আকারের মন্দির-নির্ম্মাণের কথা থাকা আবশ্যক হইলেও প্রচলিত তন্ত্রগুলিতে পাওয়া যাইতেছে না। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান দরকার।

এ পর্য্যন্ত নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে বঙ্গদেশের স্থাপত্য-পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। ভারতীয় ও পূর্ব্বদেশীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে ফার্গুসন সাহেবের প্রামাণিক গ্রন্থ, ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে হ্যাভেল সাহেবের গ্রন্থ, বঙ্গীয় রাজ সরকার দ্বারা প্রকাশিত বঙ্গদেশের প্রাচীন মঠ-মন্দিরাদির তালিকা, রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের 'বঙ্গীয় মন্দিরের বিশেষত্ব' নামক প্রবন্ধ (J. A. S. B., May, 1909), ননীগোপাল মজুমদারের 'বঙ্গীয় স্থাপত্যের ধারা' নামক প্রবন্ধ (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন কার্য্যবিবরণী, বর্দ্ধমান অধিবেশন, ১৩২১) প্রভৃতি লেখায় কোন স্থানেই বঙ্গদেশের বিশেষত্বসূচক এই ত্রিকোণাকার মন্দিরের কোনই উল্লেখ নাই। ভারতীয় স্থাপত্য-শাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ প্রসন্নকুমার আচার্য্যের কোন গ্রন্থেও ত্রিকোণ মন্দির সম্বন্ধে উল্লেখ বা আলোচনা নাই। বাংলার জেলাগুলির-বহু ইতিহাস বাহির হইয়াছে, তাহাতেও প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে এরূপ মন্দিরের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এই ধরণের মন্দির খুব সাধারণ না হইলেও ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত যখন বঙ্গদেশেই মিলিতেছে তখন ইহার বিশিষ্টতা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। তন্ত্র যে মত ও আচারের মত মন্দিরের আকারেও একটা নিজস্বতা সৃষ্টি ও প্রকাশ করিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিবার মত। এই ধরণের মন্দির যে-দুই এক জনের নজরে পড়িয়াছে তাঁহারা ভাবিয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্ট মন্দিরই একক ও অদ্বিতীয়, ওরূপ মন্দির আর কোথাও দেখা যায় নাই। কিন্তু মনে হয়, এরূপ মন্দির নির্ম্মাণের পদ্ধতি এক সময় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, কেন না তান্ত্রিক সাধনার পক্ষে এরূপ মন্দির আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, উহার গুহ্যতত্ত্বের ধারণার পক্ষে ইহা পরম সহায় ছিল।



চণ্ডভৈরবের ত্রিকোণ মন্দির, ঈশ্বরীপুর।

এবার আমরা মন্দিরগুলির পরিচয় দিব। বোধ হয় অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র সর্ব্বপ্রথম একটি ত্রিকোণ মন্দিরের কথা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার "যশোহর-খুলনার ইতিহাসের" দ্বিতীয় খণ্ডে যশোহরের প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ঈশ্বরীপুরে চণ্ডভৈরবের যে মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহার আলোচনা করেন ও চিত্র প্রকাশিত করেন। ঈশ্বরীপুর একটি পীঠস্থান বলিয়া গণ্য হয় এবং এখানকার পীঠদেবতার নাম হয় যশোরেশ্বরী। প্রত্যেক পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর একটি করিয়া ভৈরব থাকে, এই যশোরেশ্বরীর ভৈরবের নাম চণ্ডভৈরব। "অতি প্রাচীন কাল হইতে

তাঁহার জন্ম একটি পৃথক্ মন্দির ছিল, এ মন্দিরও কতবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কে জানে! কথিত আছে গৌড়াধিপতি লক্ষণসেন এই চণ্ডভৈরবের জন্ম একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপ যখন ভৈরবটি পাইলেন, তখন তাঁহার মন্দির লুপ্ত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জন্ম একটি ত্রিকোণ মন্দির গঠন করিলেন; বারংবার সংস্কারের পর সে ত্রিকোণ মন্দির এখনও দণ্ডায়মান আছে" (পৃঃ ১৩৩)। প্রতাপাদিত্য যে সর্ব্বপ্রকারে তান্ত্রিকভাব অবলম্বন করেন তাহাও অধ্যাপক মিত্র দেখাইয়াছেন—"দীক্ষার পর প্রতাপাদিত্য রীতিমত তান্ত্রিক আচারানুষ্ঠান দ্বারা সাধন আরম্ভ করেন।…তিনি শুধু পূজা বা সুরাপান নহে, কাজ-কর্ম্মে এবং মন্দিরাদি নির্ম্মাণেও তান্ত্রিকতা দেখাইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যশোরেশ্বরীর মন্দিরের ঈশানকোণে চণ্ডভৈরবের যে মন্দির প্রস্তুত হয়, উহা ত্রিকোণাকৃতি। তিনটি প্রাচীরের মন্দির আমরা দেখি নাই। পূজার পর ৺মায়ের নির্ম্মাল্যাদি রাখিবার জন্ম মন্দিরের দক্ষিণে ত্রিকোণ করিয়া ইষ্টকগ্রথিত পুষ্পাধার প্রস্তুত করেন। ছাগাদি বলি দিলে, তাহা হইতে রক্ত বহিয়া গিয়া পূর্ব্বপার্শ্বে একটি ছোট পুষ্করিণীতে পড়িত, উহার নাম "খর্পর-পুষ্করিণী"; উহাও ত্রিকোণাকৃতি। প্রতাপের প্রচলিত তাঁহার স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রাও ত্রিকোণাকৃতি ছিল বলিয়া কথিত আছে।…প্রতাপ মুসলমানদিগের জন্ম একটি মসজিদ ও খ্রীষ্টানদিগের জন্ম একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দেন; মায়ের মন্দির, মসজিদ ও গির্জ্জা,—এই তিন জাতির তিনটি উপাসনালয় এমন ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল, যেন একটি ত্রিভুজের তিন কোণে পড়ে।" (পৃঃ ১৩৫-৩৭)। আর একটি জিনিষও লক্ষ্য করিতে হইবে। "প্রতাপও চণ্ডের সব অংশ পান নাই; উহা একটি বড় বাণলিঙ্গ; প্রতাপ উহার উর্দ্ধভাগ অর্থাৎ লিঙ্গাংশটুকু পাইয়াছিলেন। এ অংশ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে গঠিত; তিনি উহার নিম্নবর্ত্তী গৌরীপট্টের পরিবর্ত্তে একখানি শ্বেত প্রস্তরের ত্রিকোণপীঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন" (পৃঃ ১৩৩)। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রতাপাদিত্যের তান্ত্রিকতা পরিপূর্ণ ছিল, মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া সব কিছুই ত্রিকোণাকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধ্যাপক মিত্র আমাদিগকে উপরিলিখিত তথ্যগুলি জানাইয়াছেন, কিন্তু উহাদের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। তিনি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা স্পষ্ট করিয়া লিখেন নাই, তাহা এই মন্দিরের দরজার সংখ্যা।

আর একটি ত্রিকোণ মন্দিরের কথা জানা যায়, হুগলী জেলার রাধানগরের কাছে। ইহা খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজে তান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ রত্নেশ্বর আগমবাগীশের সাধনার স্থান ছিল। "আগমবাগীশ প্রান্তর মধ্যে ত্রিকোণ গৃহে কালিকামূর্ত্তি ও পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করেন। উহা রাধানগরের প্রান্তরে এখনও বর্ত্তমান।" রাধানগরের আগমবাগীশ সম্বন্ধে ও-অঞ্চলে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময়ের লোক। ইঁহারা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। (বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন কার্য্য-বিবরণী, রাধানগর ১৩৩১, পৃঃ ২১৩৫-৩৬)।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বেলডাঙ্গার যোগমঠ বা যোগমায়ার মন্দিরও ত্রিকোণাকার। ইহাতে অষ্টধাতুনির্ম্মিত অষ্টভুজা দক্ষিণাকালী ও যোগনাথ শিবলিঙ্গ বিরাজমান। এই মন্দিরের সেবাইৎ বলেন "এরূপ মন্দির ভারতের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। দেহতত্ত্বের সহিত তুলনা করিয়া না কি ইহা নির্ম্মিত।" সেবাইতের দীক্ষিতা একজন ব্রাহ্মণকন্যা ভৈরবীরূপে এখানে অবস্থান করিয়া সেবাকার্য্যে সহায়তা করেন (যোগিসখা, আশ্বিন, ১৩৩০, পৃঃ ১৭৬-৭৭)। এই মন্দিরের একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইহা নবদ্বারবিশিষ্ট।

এইরূপ মন্দির যে গুহ্য রহস্যসূচক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ত্রিকোণাকার ও নবদ্বারবিশিষ্ট হওয়ায় এরূপ মন্দির মানবদেহের প্রতীকরূপে কল্পিত। তান্ত্রিকেরা যে দেহতত্ত্বের মধ্য দিয়া পরমতত্ত্বের সাধন করিতেন, তাহা সকলেরই জানা কথা। শুধু মন্দিরের আকারে নয়, মন্দির-সংশ্লিষ্ট অনেক জিনিষের আকার ত্রিকোণ হওয়াতে তান্ত্রিক রূপক আরও পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত। তন্ত্রে শক্তি বা দেবীর সাধনা করা হয়। এই শক্তি নারী-শক্তি। নারী-শক্তিকে আগ্নেয় বলা হইয়াছে (সুশ্রুত সংহিতা, ৩য় অধ্যায়)। বৈদিক আহবনীয়াগ্নির জন্ম ত্রিকোণ কুণ্ড ব্যবহৃত হইত। মিশরেও অগ্নি বুঝাইতে ত্রিকোণ চিহ্নের

ব্যবহার ছিল। অগ্নি-যন্ত্রও তান্ত্রিক যন্ত্রের মত দুইটি ত্রিকোণের সমবায়, একটির চূড়াগ্র উপরের দিকে, অন্যটির নীচের দিকে। প্রাচীন অতান্ত্রিক সমাজেও সাধনার ব্যাপারে যে পার্থিব, বারুণ, মরুত ও বহ্নিমণ্ডল কল্পিত হইয়াছিল, তাহাতে বহ্নিমণ্ডলের বর্ণনা এইরূপ :—

স্ফুলিঙ্গপিঙ্গলং ভীমমূর্দ্ধজ্বালাশতার্চিতম্।
ত্রিকোণং স্বস্তিকোপেতং তদ্বীজং বহ্নিমণ্ডলম্॥

—শুভচন্দ্র-রচিত জ্ঞানার্ণব, ২৮-২২

ইহাতে দেখা যায় বহ্নিমণ্ডল ত্রিকোণাকার ও উহার মধ্যে স্বস্তিকের সঙ্গে বহ্নিবীজ থাকে। তান্ত্রিকদের পদ্ধতিতে তো ত্রিকোণ অতি পরিচিত এবং গুহ্য রহস্য সূচনা করে। "প্রপঞ্চসার তন্ত্রে অষ্টম পটলের প্রথমভাগে প্রাণাগ্নি হোমের বিবরণ আছে। সাধক কিরূপে বসিয়া কি প্রকারে মূলাধারে সাধনা করিবে এই পটলে তাহার বিবরণ আছে। এই সাধনের অবস্থায় সাধককে শক্তি সত্ত্ব অর্থাৎ কুণ্ডলিনী সাধন করিতে হয়। সাধক "মায়াবীজ" দ্বারা বেষ্টিত থাকে। মূলাধারের মধ্যে একটি ত্রিভুজ ও পাঁচটি কুণ্ড থাকে। এই পাঁচটি কুণ্ডে পাঁচটি অগ্নির অবস্থিতি।" (বঙ্গীয় মহাকোষ-১ম খণ্ড-'অগ্নি'-পৃঃ ৩৪৩-৪৫)। এই গুহ্যসাধনার সহায়রূপে শুধু দেহতত্ত্বে নয়, মন্দির-রচনার মধ্যেও ত্রিকোণ-রূপক ব্যবহৃত দেখা যায়। এই তত্ত্ব বঙ্গদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া মন্দিরের সাধারণ-প্রচলিত আকারে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজেদের ভাবের অনুযায়ী করিয়া বঙ্গদেশের তান্ত্রিকেরা ত্রিকোণ মন্দিরের উদ্ভাবন করিয়াছিল।

ইহার সঙ্গে পৌরাণিক গ্রন্থের ত্রিকোণ মন্দিরের কোন সম্বন্ধ নাই।

বসন্তে

—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

বসন্তের দক্ষিণ বাতাসে
কাননের কাণে কাণে ধীরে ভেসে আসে
যেই গান, শীতে আর্ত্ত ক্লান্ত পথে যার
নটিনীর নূপুরের নিপুণ ঝঙ্কার
ঝরে পড়া পল্লবেরে জানাইয়া দেয়
—নবীনের নূতনের নব অভ্যুদয়,
বকুল ছড়ায় ফুল যার যাত্রাপথে,
কাকলীর কলকণ্ঠ দিগন্তর হ'তে
গাহে যার ছন্দোহীন বন্দনীয় গীতি,
সবুজ আসন পাতি' স্তব্ধ বন-বীথি
যার আবাহন করে,—জানি ওগো জানি
কাননে কাননে ফোটে আজি তার বাণী।

জানি ওগো জানি—অস্ফুট কলিকাগুলি
শাখার ঝুলনে বসি' চাহে চোখ খুলি'
কাহার পরশে। সবুজের সাড়া জাগে
দিকে দিকে স্বপ্ন-রাঙা নব অনুরাগে
আপন আবেগে। আবেশ-বিবশ প্রাণে
ভরাইয়া দেয় বিশ্ব সবুজের গানে
সজীব বন্যায়। আজি বাসন্তী বাতাসে
সৃষ্টির আদিম স্মৃতি আভাসে আভাসে
নিখিলের নগ্ন দেহে বুলাইয়া যায়
তার মায়াময় স্পর্শ স্নেহ মমতায়।
চির-চেনা অতিথি এ, চির-চেনা গীত,'
ফলে ফুলে ভরে তাই যত বন-বীথি।

শীতার্ত্ত শিশিরাঘাতে শীর্ণ পত্রগুলি
নুয়ে নুয়ে ছুঁয়ে যায় ধরণীর ধূলি
চির তরে। হয় ত বা রেখে চলে যায়
যে-গান হয় নি গীত বিদায়-বেলায়
আশা-নিরাশায়। তারি একটুকু রেশ
নীরব আকাশ-বক্ষে ধরি' ছদ্মবেশ
ভেসে ভেসে চলে যায় দিক্ হ'তে দিকে।
হয়ত বা তারাগুলি চাহি অনিমিখে
ফেলিয়াছে দীর্ঘশ্বাস ব্যাকুল বিস্ময়ে।
হিমান্তে দক্ষিণ বায় আজি কি নির্ভয়ে
অসীমের ক্রোড় হ'তে নিয়ে আসে টানি'
সেই সব অবলুপ্ত বেদনার বাণী?
সেই সব অকথিত ব্যথা ও ব্যর্থতা
নবীনের অভ্যুদয়ে পায় সার্থকতা!

বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা

—শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য আজ নানা বিভাগে সমৃদ্ধ হ'লেও সমালোচনা অংশে যে খুবই দরিদ্র এ-কথা অনস্বীকার্য্য। অনেকে বলেন যে, প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের আদর্শ সম্মুখে থাকায় বাংলা সাহিত্যে পৃথক্ কোন সমালোচনা পদ্ধতি গঠন করার প্রয়োজন ঘটেনি। কারণটি কতদূর সত্য তা সুধিগণের বিচার্য্য। তবে আজও অনেককে সাহিত্য-বিচার কার্য্যে প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রকেই পুরোপুরিভাবে আদর্শ মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করতে দেখা যায়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে গত আশী-নব্বই বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষায় যে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন-ধর্ম্মী সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে, তার যথাযথ রসবিচার বা মূল্য-নিরূপণ করতে হ'লে শুধু অলঙ্কার-শাস্ত্রের মাপকাঠিই যে অভ্রান্ত সহায় হ'বে তা মনে হয় না। কালের অমোঘ নিয়মে এ-সৃষ্টির মধ্যে বিষয়বস্তুর যে উদার বৈচিত্র্য, দৃষ্টিভঙ্গির যে নবীন জটিলতা দেখা দিয়েছে, তা হয়ত প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের কল্পনার বহির্ভূত ছিল। সুতরাং তাঁদের প্রবর্ত্তিত বিচার-পদ্ধতি দিয়ে একালের সকল সাহিত্যকে বিচার করলে সাহিত্যিকগণের উপর অবিচার করার যথেষ্ট সন্দেহ থাকে।

এ-প্রসঙ্গে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি কথা মনে পড়ে। 'উত্তররামচরিতে'র সমালোচনায় তিনি একস্থানে বলেছেন,—"এ দেশীয় আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য্য। এবংবিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বলিতেছি, আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।" তাই বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম 'বঙ্গদর্শনে' বাংলা-ভাষায় একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানসম্মত সাহিত্য-সমালোচনার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন।

তবে সাহিত্যে কোন বস্তুই সম্পূর্ণ পরিণত পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের প্রায় একুশ বৎসর পূর্ব্বে রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভে' তাহারই অঙ্কুররূপ লক্ষিত হয়। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' দীনবন্ধু, রামনারায়ণ, প্যারীচাঁদ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ-সমালোচনা দেখা যায়। অনেকে কালীপ্রসন্ন সিংহকে এই সকল সমালোচনার লেখক বলে নির্দ্দেশ করেন। 'বিবিধার্থসংগ্রহে'র এই সমালোচনা পদ্ধতি 'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ' ও 'মিত্র-প্রকাশেও' অনুসৃত হয়। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকরে'ও এক প্রকার সমালোচনা দেখা দেয়। উক্ত পত্রিকায় লেখকগণের সম্বন্ধে বহু মন্তব্য প্রকাশিত হ'ত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলিকে সমালোচনা বলা যায় কি না সন্দেহ। যাদুকরের নিখুঁত কলা-কৌশল দেখে যেমন সপ্রশংস করতালি দেওয়া হয়, 'প্রভাকরে'ও তেমনি লেখকগণকে 'বাহবা' জানান হ'ত।

এর কিছু কাল পরেই বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁর হাতে সমালোচনার যে দ্রুত উন্নতি হয় তা অভাবনীয়। প্রাচ্যের সহজ রসজ্ঞানের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অপূর্ব্ব মিলনের ফলে তাঁর সমালোচনাগুলির মধ্যে একটি সুসংযত শ্রী ফুটে উঠে। শুধু গ্রন্থ-সমালোচনায় নয়, বাংলা ভাষায় সাহিত্য-জিজ্ঞাসা, ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে মৌলিক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার ক্ষেত্রেও তিনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক। উত্তররামচরিতের সমালোচনায়, দীনবন্ধু, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি নিবন্ধে এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের Calcutta Review-এর ৫২ নং সংখ্যায় 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর প্রতিভার এই দিক্‌টি সমধিক পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর সমালোচনা-পদ্ধতি অনেকটা প্রসিদ্ধ সমালোচক Arnold-এর মত। Arnold-এর মত সমালোচনা বলতে তিনিও বুঝতেন—"A disinterested endeavour to learn and propagate the best that is known and thought in the world". বস্তুতঃ, সমালোচনা-ক্ষেত্রে এই 'disinterested endeavour' বা নিরপেক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা কোন দিন পক্ষপাতদুষ্ট ছিল না। সাহিত্যের কষ্টি-পাথরেই

তিনি সাহিত্য বিচার করতেন—অন্ত কিছুর কষ্টি-পাথরে নয়। তাঁর এই নিরপেক্ষতার সম্বন্ধে জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকটি কথা মনে পড়ে—"দেশের ভিতর বঙ্কিম বাবু অদ্বিতীয় সমালোচক ছিলেন। তিনি শত্রুতা বা দ্বেষে কখনও তাঁহার লেখনীকে বিষপ্রদীপ্ত করেন নাই এবং মিত্রতাতেও কখনও অনুচিত প্রশংসা করেন নাই। সাহিত্যের একজলাসে 'বঙ্গদর্শনের' চৌকীতে বসিয়া তিনি 'স্বাধীন' ও অপক্ষপাতভাবে রায় ফয়শালা লিখিতেন।"

এই কারণে, 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"বঙ্কিম যেদিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন সে দিন হইতে এ পর্যান্ত আর সে আসন পূর্ণ হইল না। এখনকার অরাজকতার চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন সাহিত্য-সিংহাসনে কে আমাদের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার অভাবে শাসনভার গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই উপস্থিত নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের সমসময়ে ও তাঁর মৃত্যুর পর যে সকল সমালোচক আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করেন তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, এবং 'পাক্ষিক সমালোচকের' বিশিষ্ট লেখক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনতিকাল পরে সমালোচনা-ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাই। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার দৈন্ত সম্বন্ধে পূর্ব্ব হ'তেই তিনি অবহিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি কবি সত্যেন্দ্রনাথকে এক সময়ে একখানি পত্র লেখেন। পত্রটি তাঁর সমালোচনা-পদ্ধতি বোঝার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। পত্রখানির এক অংশে পড়া যায়—"আমাদের দেশে রসের কারবার বড় ছোট। নিতান্ত মুদির দোকানের ব্যাপার। ছোট ছোট শালপাতার বন্দোবস্ত।......সমালোচকেরা সাহিত্য-কারবারীদের মুচ্ছুদি, তাদের নিজের পুঁজি-পাটা থাকা চাই এবং জগতের বাজার যাচাই করার মত অভিজ্ঞতা এবং শক্তি না থাকলে তাদের চলে না।... কাব্যকে, সাহিত্যকে বিশ্বভূমিকার উপর দাঁড় করিয়ে দেখাও না কেন! যে কবি, সেই তো স্রষ্টা এবং অন্যকে দেখিয়ে দেবার ভার তো তাদের।" (মাঘ ২, ১৩১৯)।

বস্তুতঃ, স্বয়ং স্রষ্টা না হলে অপরের সৃষ্টির রূপ-মাধুরীর যথাযথ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য হীরা-জহরতগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে নির্ভর-যোগ্য জহুরী হওয়া চলে না। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-পদ্ধতির স্বরূপ বুঝতে হ'লে তাঁর সাহিত্য-বোধের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সহজাত ভাবপ্রবণতা ও প্রতিভার বলে চিরন্তন সাহিত্যের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করে সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি একটি বিশিষ্ট মতবাদ (philosophy of literature) গঠন করেছেন এবং তাঁর "লোক সাহিত্য," "সাহিত্য," "সাহিত্যের পথে "এবং "Personality ;" 'Creative Beauty' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে এই মতবাদের প্রচার দেখা যায়

এই মতবাদের সঙ্গে কারও মত-বিরোধিতা আছে কি না জানি না, তবে তাঁর সমালোচনা-সাহিত্য যে এই মতবাদের ভিত্তির উপর গঠিত তা অনস্বীকার্য্য। সাহিত্যের এই আদর্শকে পুরোভাগে রেখে তিনি আলোচ্য সাহিত্যের বিচার করেন। যেখানে এই আদর্শের সঙ্গে কোন অমিল হয়েছে, সেখানে তিনি নির্ভীকভাবে অপ্রশংসা করেছেন আবার যেখানে মিল দেখেছেন, সেখানে তিনি অকৃপণভাবে প্রশংসাও করেছেন। এই কারণে একই লেখকের ভাগ্যে হয়ত তাঁর কাছ থেকে কখন প্রশংসা কখন বা নিন্দা জুটেছে। এতে অনেক অরসিক ব্যক্তি তাঁর সমালোচনাশক্তির উপর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু যদি তাঁরা তাঁর সাহিত্য ও সৌন্দর্য্য-বোধের সঙ্গে পরিচিত থাকেন, তা হ'লে অচিরেই বুঝবেন যে, এ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সাহিত্য-সৃষ্টি যেখানে সার্থক হয়েছে, সেখানেই তিনি প্রশংসা করেছেন আর যেখানে তা হয় নি সেখানে তিনি মৌন হয়েছেন। প্রকৃত সাহিত্য থেকে তিনি যে ভাবে রসোদ্ধার করে অপরকে সেই রস-পরিবেশন করেছেন বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে তেমন আর কেউ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত কালিদাসের এমন রসঘন সমালোচনা কার দ্বারা সম্ভব হয়েছে?

রবীন্দ্র-পূর্ব্ব সমালোচনায় পাণ্ডিত্য ছিল, সহৃদয়তা ছিল, বিশ্লেষণ ও মূল্যনিরূপণের একটা নিরপেক্ষ চেষ্টাও ছিল, কিন্তু রসের বা প্রাণময়তার একান্ত অভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা সাহিত্যে রসাত্মক সমালোচনার প্রবর্ত্তন করেন। সমালোচ্য বস্তুর অন্তর-রহস্যকে উদ্ঘাটিত ক'রে অতি সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও কল্পনার সাহায্যে তাকে এক সুন্দর নূতনতর

রসসৃষ্টিতে রূপান্তরিত করাই তাঁর সমালোচনা-রীতি। উদাহরণ স্বরূপ, 'রামায়ণ' 'মেঘদূত,' 'শকুন্তলা,' 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রভৃতি রচনাগুলির উল্লেখ করা যায়। এগুলি যেন একাধারে সমালোচনা ও মৌলিক রসসৃষ্টি। Oscar Wilde তাঁর 'Intentions' নামক গ্রন্থে সমালোচনা সম্বন্ধে যে-মত ব্যক্ত করেছেন, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাও যেন তার সমর্থন করে। দেখা যায়, তাঁর দ্বারা প্রবর্ত্তিত সমালোচনার এই impressionistic রীতি পরবর্ত্তী সমালোচকগণের উপর তেমন গভীর প্রভাব বিস্তার করে নি।

রবীন্দ্রোত্তর প্রধান প্রধান সমালোচকের রচনাগুলি পাঠ করলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। সমালোচকপ্রবর শশাঙ্কমোহন সেনের কথা ধরা যাক্। তাঁর 'বাণীমন্দির,' 'বঙ্গবাণী' ও অসমাপ্ত 'বাণীপন্থা'র তুল্য সমালোচনা-গ্রন্থ যে-কোন দেশের সাহিত্যে মূল্যবান সম্পদ্ বলে পরিগণিত হবার যোগ্য। শশাঙ্কমোহনের পূর্ব্বে দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন। কিন্তু শশাঙ্কমোহনই প্রথম ইতিহাসের পটভূমিকায় ধারাবাহিকভাবে বাংলা সাহিত্যের রচয়িতৃগণের মূল্যনিরূপণের চেষ্টা করেন।

বলা বাহুল্য, তাঁর এ চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয়েছে। 'বঙ্গবাণী' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি যা লিখেছেন তা থেকে তাঁর সমালোচনাপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়—"কাব্যের অন্তরঙ্গীয় আত্মাটুকুর দর্শন ও কাব্যের মধ্যে ক্রমবিকাশমান কবি-জীবন ও কবি-আত্মার সমালোচনাটুকু লক্ষ্য করিয়াছি।" উক্ত গ্রন্থেরই অপর একস্থানে তিনি লিখেছেন—"প্রত্যেক প্রকৃত কবি নিজের কোন বিশেষ মাহাত্ম্য ও অননুকরণীয় বিশেষত্বের গুণেই কবি। কবিগণের অন্তরঙ্গীয় এই বিশেষত্বটুকু নিরূপণ করাই সাহিত্য-সমালোচকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।" (বঙ্গবাণী, পৃঃ ১৬৮)। তিনি যে কিরূপ সমালোচক ছিলেন তা তাঁর এই উক্তিগুলি থেকে বেশ বোঝা যায়। এ-শ্রেণীর সমালোচনাকে interpretative criticism অর্থাৎ বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা বলা যায়।

সাহিত্যে যে শশাঙ্কমোহনের কি গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তা তাঁর 'বাণীমন্দির' ও 'বাণীপন্থা' পাঠে বোঝা যায়। সভ্য মানবের প্রথম সাহিত্য-চর্চ্চা থেকে সুরু করে কি ভাবে সাহিত্যের ধারা বহু-বিচিত্র রূপের মধ্যে দিয়ে অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান কালের মধ্যে এসে পৌঁছেছে, তা তিনি যেন সম্যক্ উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর অন্তর্ভেদী সমন্বয়কারী দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিটি যুগ যেন আপনার অন্তররহস্য উদ্ঘাটিত করে দিত। তাই তাঁর সমালোচনার মধ্যে একটা উদার সাহিত্য-বোধ ও অতি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শশাঙ্কমোহনের পর আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের ধারা যাঁরা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অতুল গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতুল গুপ্তের মধ্যে প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রের সহিত নব্য রীতির একটি সমন্বয় চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'য় অলঙ্কার-শাস্ত্রের মূল তথ্যগুলি সুচারুরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। মোহিতলাল ও শ্রীকুমারের সমালোচনা পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকতা দেখা যায়। মোহিতলাল স্বয়ং একজন উচ্চস্তরের কবি। তাঁর 'স্বপনপসারী,' 'বিস্মরণী' ও 'স্মরগরল' বাংলা কাব্য-সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করেছে। বর্ত্তমানে তিনি সমালোচনায় অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' ও 'সাহিত্যের কথা' সাহিত্য-বিচারের যে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছে, তা শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, যে-কোন দেশের সাহিত্যে, বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের "অন্তঃনিহিত ধর্ম্ম ও গতি-প্রকৃতির পরিচয় দিতে" চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্য-মহারথীদের কাব্য-সৃষ্টির পৃথক্ পৃথক্ আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁদের ও তাঁদের যুগের বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করেছেন। প্রত্যেকটি আলোচনায় তাঁর বিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও কবিজনোচিত নিবিড় রসানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'সাহিত্যের কথায়' তিনি রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেছেন, ইতি-পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় তেমন আলোচনা অপর কেউ করেছেন বলে জানা যায় না।

উপরি-উক্ত সমালোচকগণ ছাড়া আরও কয়েকজন শক্তিশালী সমালোচক এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনার সময় এখনও আসে নি।

শিকার-কাহিনী

—শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ শিকারী ৺কান্তি চৌধুরীর বৈঠকখানায় আমিও কয়েকদিন উপস্থিত ছিলাম। তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর শিকার কাহিনীগুলি এখনও আমাদের মস্তিষ্কে কিলবিল করিতেছে। যে গল্পটী 'সদ্ধুদ্ধ' এখনও বলেন নাই (হয় ত বিস্মৃতিবশতঃ), আজ আমি সেইটিই শুনাইব।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন,

পানামা ক্যানেল কাটবার ইতিহাস জান?

আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করিলাম।

জান না? শুনেছি সেখানে না কি মশার চাপে বহু সহস্র কুলী মারা গেছ্‌লো। প্রথমটা শুনে যদিও বিশ্বাস করিনি, কিন্তু সেবার এ-ব্যাপারটার নিজের উপর দিয়ে প্রমাণ পেলুম আসামে।

আসামে!

হাঁ৷ তোমাদের জ্যাঠাইমা অর্থাৎ মিসেস চৌধুরী ধরে বসলেন, তীর্থ করবেন। তোমরা জানো চিরকালটাই আমি ধর্ম্ম-কর্ম্ম মানি না—আমার পেশা জীবহত্যা এবং তাতে করে আনন্দ পাওয়া। এটা সাধারণ মানুষের মতে পড়ে অধর্ম্মের কোঠায়। অথচ মিসেস চৌধুরী ছিলেন যাকে বলে পুরো ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা—এই নিয়ে আমাদের দাম্পত্য জীবন যে কি ভয়াবহ......নাঃ থাক, ফ্যামিলী-সিক্রেট না বলাই ভাল। হাঁ৷, বলতে পারো, তবে রাজী হলাম কেন। ভাবলাম, আসামের জঙ্গলে জন্তুর অভাব হবে না। রথ-দেখা, কলা-বেচা দুই-ই হবে, তা ছাড়া মিসেস চৌধুরীকে সন্তুষ্ট করাটাও কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

'দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়লাম কামরূপ কামাখ্যাভিমুখে। ইণ্ডিয়ার কোন রেলপথ ঘুরতেই আমার বাকি নেই, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এমন রেলপথ আর কোথাও দেখি নি। ...ব কি বিয়াল্লিশটা টানেলই পড়ে কেবল দুদিনের পথ ...মিটার গেজের লাইনের উপর দিয়ে গাড়ী চলছে। ...মাঝে টানেল্ আসছে, গাড়ী অন্ধকার, আবার এক-মিনিট পরে দপ্ করে আলো ঢুকছে কামরায়। এমনি ভাবে টানেল্ যায় আসে। টানেলে ঢোকবার আগে একটা হুইসিল দেয় ইঞ্জিন থেকে।

হঠাৎ একবার অন্ধকার হয়ে এলো। কি ব্যাপার, হুইসিল না দিয়েই কি গাড়ী টানেলে ঢুকলো? ভাবতে বা বলতে সময় লাগে, বুঝলাম শব্দে! কি রকম যেন প্রলয়। কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম আমি বাঙ্কের উপরে—এ কি! এখানে এলাম কি করে? আবার দেখি নীচে।

ভৌতিক ব্যাপার না কি? আমরা প্রশ্ন করিলাম।

একরকম তাই-ই। মিসেস চৌধুরী অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—এ কি? তুমি একবার উপরে আর নীচে উঠলে নামলে কেন?

মশা।

মশা!!

হাঁ৷ হাঁ৷ মশা, সব গাড়ীর ভেতরে ঢুকেছে; তাদের ঠেলায় একবার উপরে উঠে গেলাম আবার তাদের চাপে নীচে নেমে এলাম।

সে কি, তা হলে মিসেস চৌধুরীও তো উঠতেন। আমরা আপত্তি করিলাম।

কথার মাঝখানে ফচ্‌কেমি করিস্ না তোরা। শুনে যা শুধু। কান্তি চৌধুরী রাগিয়া উঠিলেন। মিসেস চৌধুরী কেন উঠলেন না, তার আমি কি জানি। সেবারেই মারা গেছলাম আর কি, নেহাত সেগুলো বেশীক্ষণ থাকে না, এই যা বাঁচোয়া। হঠাৎ সেগুলো বেরিয়ে গেল। শেষে শুনলাম যে ডেঙ্গুজ্বরের এরাই বাহন।

এমনি করে পাহাড়ে ষ্টেশনে থেমে থেমে গাড়ী চলতে লাগল। চারিদিকেই পাহাড়, সবই আকাশচুম্বী, এর ভেতর দিয়ে কোথায় যে রাস্তা, কোথায় যে কি, কিছুই বোঝা যায় না। ধন্যি ইংরেজের মাথা। রেল-লাইনের পাশে নানা রকমের নাম-না-জানা জঙ্গল। চেনার ভেতর দেখলাম, অজস্র কলা-বাগানে কাঁদি কাঁদি কলা ঝুলছে।

এতক্ষণে বুঝলাম এখানে এত হাতীর আমদানি কেন। কলাগাছের মত প্রিয় খাদ্য হাতীর আর ত্রিসংসারে কিছু নেই কি না। একটা আশ্চর্য্যের জিনিষ লক্ষ করলাম, ঐ জনমানবহীন জঙ্গলের ভেতর মাঝে মাঝে শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধান ছোট ছোট জায়গা। পাশের এক সংযাত্রীকে জিজ্ঞেস করাতে উত্তর পেলাম—এগুলো কি জানেন না? এগুলো হল কবর।

কবর? কাদের? এখানে কেন?

আরে মশাই রেল লাইন পাততে হয় তা জানেন?

নিশ্চয় জানি।

এ লাইনও একদিন পাততে হয়েছিল, তা বিশ্বাস করেন?

আজ্ঞে হাঁ।

আচ্ছা যখন এ-লাইন পাতে, এক মাইল করে কাজ হচ্ছে আর তাঁবু পড়ছে। তাঁবুতে থাকতো কুলীরা চারিদিকে আগুন জেলে, আর গাড়ীতে সাহেব ইঞ্জিনিয়াররা। এমনি করে রাত্রির কাটিয়ে সকাল থেকে আবার কাজ শুরু হতো। কিন্তু মশাই একদিন চেপ্টা হয়ে গেল।

চেপ্টা হয়ে গেল—সে কি!

হাঁ চ্যাপ্টা হয়ে গেল। কখনো দোতলা বাসের তলায় ঘিয়ের আড়াই-সেরা টিন পড়লে কি অবস্থা হয় দেখেছেন?

আজ্ঞে না, স্বচক্ষে না দেখলেও তা অনুমান করতে পারি।

ঠিক তেমনি চেপ্টা হয়ে গেল। হাতীতে মশায়, হাতীতে। তাঁবুকে তাঁবু উড়িয়ে দিলে। বগী গাড়ীকে শুইয়ে ফেলে দেড়-শ' হাতী যদি তার উপরে উঠে নাচতে থাকে তাণ্ডব নৃত্য—তাহলে আপনি কি আশা করেন? সেই সব সাহেবদের কবর দিয়ে ঐ রকম সব শ্বেত পাথরে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে, বুঝলেন?

শুনে অবাকও হলাম, মনে আনন্দও হল। যাক, তা'হলে শিকারটাও এবার জমবে ভাল।

যা হক কামেখ্যা গিয়ে তো পৌছন গেল। প্রথমে ধরেছিল মশা, এবার ধরল পাণ্ডা। কোথায় তোমাদের মিসেস চৌধুরী আর কোথায় আমি, দুজনকে দুদিকে হিড় হিড় করে কোথায় যে নিয়ে গেল, একঘণ্টা বাদে পেলাম তার দেখা দেড় মাইল ঘুরে।

হাঁ কামেখ্যা পর্ব্বতটি একটা জিনিষ বটে, দেখলেই ভক্তি আসে, আমার মত নাস্তিকেরও মন টলিয়ে দেয়। শুনেছ বোধ হয়, মন্দির সেই পাহাড়ের উপরে। তোমাদের মিসেস চৌধুরীকে দেখলে ভাবতেই পারতে না যে, মানুষের শরীরে এর চেয়ে স্ফীতি সম্ভব। ভক্তির জোরে সেই দেহ নিয়েই তিনি উঠতে লাগলেন। তা পাহাড়ে তিনি উঠছেন কি তাঁর উপরে পাহাড় উঠছে ধরা কঠিন মনে হচ্ছিল।

অনেক কষ্টে তো উপরে উঠা গেল। আমার ওসব ভক্তি-টক্তি নেই, তবুও লোক দেখান একটা নমস্কার ঠুকে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিসেস্ চৌধুরী মন্দিরে ঢুকলেন অর্থাৎ দু'ঘণ্টার জন্য। আমি এতক্ষণ কি করি? পাণ্ডা এনে দিলে কতগুলো ফুল, বোধ হয় প্রসাদ। তাই মুখে পুরে খেতে লাগলাম।

পাণ্ডা বললেন, বাবু মুখের কিছু এখানে ফেলবেন না, এটা দেবস্থান। খোসা টোসা যা সব এক যায়গায় জড়ো করে রেখে শেষে নীচে নেমে ফেলে দেবেন।

যা বল বাবা! 'যস্মিন্ দেশে যদাচার' বলে বীচিগুলিকে পকেটেই ফেলতে লাগলাম। ওভার-কোটের পকেট তো—যেন পাটের আফিসের মালগুদোম।

পূজো সেরে এসে পাণ্ডার বাড়ীতে ওঠা গেল। পাঁচ টাকা দিয়েছিলাম তার হাতে—আড়াই বেলার খোরাক ও পূজো বকশীস ইত্যাদি বাবদ। খাওয়া দাওয়া ভালই হ'ল। তারপর এল ইতিহাস শোনবার পালা—কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য-কথা। আগেই বলেছি আমার ওসব সংস্কার নেই, কিন্তু ঐ যে মিসেস চৌধুরী, সে জীবটির মান রক্ষার্থে কতবার যে আমার কাণ ধর্ষিত হয়েছে সে কথা আর কি বলব।

পাণ্ডা তার পূর্ব্ব-বঙ্গীয় মাতৃভাষায় যা বলে গেল তা অনেকটা এই—পূর্ব্বকালে পূর্ব্ব গৌড় অর্থাৎ আসামের রাজা ছিলেন নিন্দিত-কীর্ত্তি মহাপ্রতাপধারী নরকাসুর। তারই রাজ্যে উক্ত পাহাড়ে কামাখ্যাদেবী ভক্তদের স্বপ্নে নোটিস দিয়ে আবির্ভূত হলেন। নরকাসুরের নারীর প্রতি ছিল একটা অহেতুক টান, তা সে যে-দেশী, যে-জাতীয়, যে-আকৃতিরই হোন না কেন। কামাখ্যাদেবীর কাছে এসে বলে গেলেন এ-রাজ্যে তাঁকে থাকতে হলে নরকাসুরকে পতিত্বে বরণ করা অবশ্যম্ভাবী। দেবী এক কড়ারে রাজী হলেন, যদি

নরকাসুর এক রাত্রির ভেতর উক্ত পাহাড়ের উপরে তাঁর জন্য একটি মন্দির ও সমতল ভূমি থেকে মন্দির পর্য্যন্ত দেড় মাইল উঁচুতে চারিদিকে চারিটী সিঁড়ি তৈরী করিয়ে দিতে পারেন তা হলেই··· ইত্যাদি। দানবের অসাধ্য কিছু নেই। কাজ আরম্ভ হল। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কেবল একদিকের সিঁড়ির ধাপ কয়েকটা বাকী, এমন সময় মজুররা শুনতে পেল, "কোঁকর—কোঁ" অঙ্গনে মুরগী ডেকেছে, প্রভাত হয়ে গেল। তাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। নরকাসুরের হার। দেবী মুশকিল দেখে নিজেই মুরগী হয়ে ডেকে উঠলেন।

আমাদের ভিতর একজন গোঁড়া ছিল, সে আপত্তি করিল—সে কি চৌধুরী মশাই হিন্দুর দেবতা কুক্কুট বনে যাবেন, ধ্যেৎ!

আরে আমি কি তৈরী করে বলছি না কি, কান্তি চৌধুরী আগুন হইয়া বলিলেন—ঠিক যেমনটি শুনেছি তেমনটি বলে যাচ্ছি।

পরের দিন মর্ণিং-এ বরবেশে নরকাসুর এসে তো খাপ্পা—তার মজুরদের কখনও মিস্‌ক্যালকুলেশন হয় না। এসব দেবীর চালাকী অতএব যুদ্ধ। ভীষণ রণ। পৃথ্বী গোড় কাঁপতে লাগল। গুরুতর পরিস্থিতি।

পাণ্ডা বললে—কিন্তু কর্‌তা, শত হইলেও দানবের লগে মাইয়া মানুষ পারব ক্যানে। মায়েরে না কি, পাপ কর্ণে শুনছি, চুলে ধইরা বেটা নরকাসুর এই মাইর। মারতে মারতে হাড্ডি আর যখন কিছু রাখে না তখন—

কামাখ্যাদেবী বাধ্য হয়ে শরণ নিলেন বিষ্ণুর, তিনি যুগে যুগে এই কর্ম্মই করে এসেছেন। চক্রটি ছাড়লেন। ব্যস্ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল নরকাসুর।

তোমাদের মিসেস্ চৌধুরী এর ভেতর কত অশ্রু আর যুক্তকরে যে প্রণাম করেছেন তা তার ঘর্ম্মাক্ত মহাকলেবর দৃষ্টেই বুঝতে পারলাম। হ্যাঁ স্বচক্ষে দেখলাম দানব ছাড়া অত বড় বড় স্ল্যাব্ এক একখানা অত উঁচুতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তখন তো আর ক্রেন্ ছিল না।

আমরা অধৈর্য্য হইয়া কহিলাম—আমরা কি তীর্থ-কাহিনী শুনতে বসেছি, আপনার শিকারের গল্প কই?

শিকারের 'গল্প' বলিস না খবরদার, এ যা বলব সব সত্যি ঘটনা, কান্তি চৌধুরী বলিলেন—অত ব্যস্ত হলে কি চলে। আচ্ছা শোন: তারপর বাড়ী ফেরবার পালা।

এর সুবিধে হয়ে গেল। মিসেস চৌধুরীর এক পিসতুত বোনঝি, তার সঙ্গে দেখা। তার স্বামী 'ডামিচোলাই' ষ্টেশনে ষ্টেশন-মাষ্টারীর কাজ করছে। ভারী অমায়িক ছেলেটি। নানারকম আলাপ-আলোচনা হল। আমি শিকারপ্রিয় শুনে সে বললে—দেখুন মেসোমশাই, বাঘ ভাল্লুক সবাই জব্দ আপনাদের কাছে কিন্তু হাতী চারটিকে আয়ত্তে এখনও আপনারা আনতে পারলেন না।

তার মানে! হাতী কি অমর না কি?

তাইতো দেখছি, না হলে কত শিকারী এল গেল, কিন্তু হাতীমারা ষ্টেশনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে কেউই পারল না কেন?

সে আবার কি ব্যাপার?

এ লাইনের ঐ ষ্টেশনটা অর্থাৎ 'হাতীমারা' ষ্টেশনটা রাখাই তো দুষ্কর হয়ে উঠেছে। দৈনিক যদি ষ্টেশনঘর তৈরী করতে হয় আর এক জনকে স্বর্গে পাঠিয়ে আর একজনকে ষ্টেশন-মাষ্টাররূপে এ্যাপয়েণ্ট করতে হয়, তা হলে কি করে কোম্পানী পেরে উঠে বলুন?

কেন কি হয়েছে?

হাতীর উপদ্রব। রোজ রাত্রিতে এক পাল হাতী পাহাড় থেকে নেমে এসে, ষ্টেশনকে ষ্টেশন উপড়ে ফেলে। যিনি মাষ্টার হয়ে আসেন তিনি মৃত্যুর জন্য প্রহর গুণতে থাকেন, ব্যস্ পরের দিন আবার নতুন ঘর, নতুন মাষ্টার বহাল হয়। এইতো চলছে। আজ পর্য্যন্ত কেউতো কিছু করতে পারল না।

আর বলতে হল না। রক্ত আমার শিরায় শিরায় ব্রতচারী নাচছে। বলে উঠলাম—লাষ্ট এ্যাটেম্‌ট্। এক-বার তোমাদের কোম্পানীকে জানিয়ে দাও কান্তি চৌধুরী একটা হেস্তনেস্ত না করে যাবে না।

আপনি পারবেন কি?

কোন বাজে কথা শোনবার অবসর নেই—দারা পুত্র পরিবার কেই বা কার, বলে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

'হাতীমারা' ষ্টেশনে পৌঁছে দেখলাম, জামাই যা বলেছে তার একবর্ণও মিথ্যে নয়। ষ্টেশনটির দুর্দ্দশা দেখলে চোখে

জল আসে। পাহাড়ী সেগুন কাঠের ফালি দিয়ে টেম্পোরারী আটচালা-বাঁধা ঘর, চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া। হলে কি হবে, প্রথম প্রথম কাঁটা তারে হাতীর শুঁড় কয়েকটা জখম হয়েছে বটে, কিন্তু তারাও বুদ্ধিজীবী, ঠিক উপায় বাৎলে নিয়েছে। কলাগাছের খোসা এনে কাঁটা তারে জড়িয়ে নিয়ে হ্যাঁচকা টান মেরে তুলে ফেলে তার পরেই, কড়াৎ কড়্ ব্যস ষ্টেশান আর ষ্টেশন-মাষ্টার গুঁড়ো।

আমায় দেখে ওরা অর্থাৎ ষ্টেশান মাষ্টার, রেলওয়ের সাহেব ম্যানেজার বিশেষ ভরসা পেলো বলে মনে হল না। সাহেব তো তাচ্ছিল্যের সুরে বলে ফেললো: Are you immortal Babu (তুমি কি অমার বাবু?)?

আমি বললাম—এক প্রকার তাই স্যার, বলে সগর্ব্বে দেখালাম সেই মাদ্রাজের শঙ্খচূড়ের ছোবলের দাগ, বললাম সেই নেপালের তরাইয়ের ভালুকের কথা, সোঁদর বনের বাঘের কাহিনী।

ওদের ওখানেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করা গেল। ষ্টেশন-মাষ্টার বেচারার জন্তে দুঃখ হল, বেচারা ভয়েই অস্থির। তা ছাড়া কার না ভয় হয় বল—আসন্ন মৃত্যু তো তার অপরিহার্য্যই ছিল, নেহাৎ আমি—থাক্, গোড়া থেকেই বলছি।

বিকেল হয়ে এলো। সাহেব ষ্টেশন-মাষ্টারকে অভয় দিয়ে গেলেন—অমনি করে রোজই তিনি এক এক জন নতুন লোককে অভয় দিয়ে যান। যাবার সময় আমার দিকে চেয়ে বলে গেলেন—টিয়ারিও মিঃ চৌধুরী, দেখব তোমার ক্রেডিট্। খুব সাবধান।

আমি রাইফেলটার আঁকুনী দিয়ে বললাম—হাতীতে মাঝ এ. বি. রেলওয়ে উপড়ে ফেলতে পারে লেকিন্ কান্তি চৌধুরীর ফুটোটিও নড়াতে পারবে না সাহেব। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো।

সাহেব চলে গেল। ঠিক করলাম, ষ্টেশনের পশ্চিম দিকে একটা বিরাট শালগাছ ছিল, তারই উপরে মাচান করে বসে থাকব। ঐ পথ দিয়েই হাতী নেমে আসে পাহাড় থেকে, বলতেই ষ্টেশন-মাষ্টার বললে—অমন কাজ করবেন না মশাই, গাছকে গাছ উপড়ে ফেলবে।

সেকি হে, এত মোটা গাছ ওপড়াবে?

হাঁ স্যার, জানেন না ওরা ভয়ানক চালাক, গাছের গোড়ায় গর্ত্ত করে ঝরণা থেকে শুঁড় করে জল এনে ঢালবে সেখানে, তার পর গোড়া আলগা হয়ে গেলে, শুঁড় দিয়ে টাগ-অব-ওয়ার করে ঠিক গাছকে শুইয়ে ফেলবে

ও সব ভয় করলে আর শিকার করা চলে না। বললাম, ঐ গাছেই থাকব, সঙ্গে চার জন পাহাড়িয়া পালোয়ান, হাতে তাদেরও বন্দুক।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। কম্পিত ষ্টেশান মাষ্টারকে অভয় দিয়ে 'দুর্গা' বলে বলে শালগাছে উঠে বসলাম। চারি দিকে নিঝুম হয়ে এলো। হাতী বেটারা এমন বজ্জাত, পা টিপে টিপে এমনি ভাবে আসবে যে কাক-পক্ষীরও বাবার সাধ্য নেই যে টের পায়, ঐটুকুই ওদের বাহাদুরী। আর ঘুপ্টি মেরে বিরাট কানদুটি খাড়া করে আড়ি পাতবে, যেই মানুষের আওয়াজ পেলো আর রক্ষে নেই, সেই খানেই খতম্।

ষ্টেশন-মাষ্টার তাই আলো নিভিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপচাপ পড়ে আছে। আমরা গাছের উপর বসে মশা তাড়াচ্ছি। সময় দিয়েছিল বারোটা, এই সময়ই না কি আসে। ফ্যাকজ্যোৎস্না রাত—বহুদূর পর্য্যন্ত ঝাপসা দেখা যায়—নাম-না-জানা পাহাড়ী ফুলের সুবাসে চারিদিক আমোদিত। চমৎকার সিনারী, কিন্তু তখন সিনারী উপলব্ধি করবার মত বুকের অবস্থা নয়। সময় আর কাটে না। কেবলি ঘড়ি দেখতে লাগলাম, নটা, দশটা, এগারটা, সাড়ে এগারটা, পৌণে বারোটা, কই কোথাও কিছু নেই। বারোটা! ভাবলাম আজ আর বেটারা এলো না কান্তি চৌধুরীর ভয়ে সব পালিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্য ওদের পান্‌চুয়ালিটি—ঠিক বারোটার ঘরে দুটো কাঁটা মিশেছে কি দূরে দেখা গেল এক লাইন কালো কালো সব কি যেন পাহাড় থেকে নেমে আসছে।

ও-বেটারা ঝিমুচ্ছিল, ওদের ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে নিজে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে রেডী হয়ে ছিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাতী এগিয়ে এলো। হাতী যে কি রকম তাড়াতাড়ি দৌড়ুতে পারে, সে ধারণা তোমাদের নেই। অবশ্য আফ্রিকা বা পৃথিবীর অন্য কোন জাতের হাতীরা পারে না, কেবল এই আসামী হাতী ছাড়া। যদিও এরা আফ্রিকারই বংশধর তবুও এখানকার আবহাওয়ার গুণে বহু শতাব্দীতে নিজেদের গতি অতিক্রত বাড়িয়ে নিয়েছে। প্রথমে


Scottish Church College
Asutosh College
Vidyasagar College

বিনিময়

এদেশে অর্থাৎ আসামে হাতী ছিল না। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে বন্ধুক্রম বলে এক নরাধীপ, আফ্রিকাখণ্ড ভ্রমণকালে কয়েকটী হাতীর বাচ্ছা এনে পুষেছিল, তারই ক্রমানুবর্দ্ধিত বংশই বর্ত্তমানে আসামের জঙ্গল ছেয়ে আছে। আফ্রিকার হাতী বৃহদাকার হলেও অত্যধিক গরমের দেশ বলে ঘেমেই অস্থির, গায়ে শক্তি কম, মগজের বুদ্ধিও স্থূল— এক কথায় অকর্ম্মণ্য। কিন্তু এখানকার আবহাওয়ারই একটা গুণ আছে, যাতে করে কি মানুষ কি পশু দুদিনেই একেবারে পালটে গিয়ে হয়ে হয়ে যায়। হঁ্যা কি বলছিলাম, হাতী একদম ছুশো হাতের ভেতর।

আমি বন্দুকটা বাগিয়ে পটাং করে একটা গুলি ছুড়তে যাব, মাচান্টা হঠাৎ থর থর করে কাঁপতে লাগল, এইম্ নষ্ট হয়ে গুলিটা গেল দশহাত উপর দিয়ে। কি হল? ভূমিকম্প আরম্ভ হল, না ঐ হাতীগুলোর পদভরে মেদিনী কাঁপছে? কিন্তু তাও তো নয় তাহলে অন্যান্য গাছপালা নড়তো। হঠাৎ চেয়ে দেখি, ওমা, আমার পাশের সেই চার চারটা পালোয়ান হি হি করে কাঁপছে, দাঁতে তাদের দাঁত লেগে গেছে। হা ভগবান্! বেটাদের নিয়ে এলাম আমাকে সাহায্য করবার জন্যে, না তারাই ভয়ে অজ্ঞান, এখন ওদের শুশ্রূষা করি না হাতীই মারি—নাঃ ব্যাটাদের দেখতেই থুম্সো, বুকে যদি এতটুকুও সাহস থেকে থাকে। আমি জানতাম না, ওরা এত ভীতু। মরগে বেটারা বলে আমি এদিকে ফিরে চাইলাম।

এদিকে আরও চমৎকার। গুলির শব্দ শুনে সমস্ত হাতী ষ্টেশন ছেড়ে এগিয়ে এলো গাছের কাছে। মনে পড়ে গেল ষ্টেশন-মাষ্টারের কথা, অর্থাৎ গাছ ওপড়াবার কথা। সত্যই ভাই, পাঁচ-সাতটা হাতী গাছের গোড়া খুঁড়তে আরম্ভ করেছে, আর গোটা কুড়ি হাতি উত্তর দিকে এগিয়ে গেল, বুঝতে বাকি রইল না যে, ওরা নদী থেকে জল আনতে গেল। সর্ব্বনাশ! এর পরেই গোড়া-ভেজান, তার পরেই টাগ-অব-ওয়ার, অবশেষে চেপ্টা। সত্যি বলতে কি, এ রকম বিপদে আর কখনো পড়িনি। বাঘের মুখে, সাপের দাঁতে, ভল্লুকের আলিঙ্গনে, গণ্ডারের পিঠে, বাইসনের পাল্লায়, কোন কিছুতেই এতটা ঘাবড়ে যাইনি, এবার যতটা হলাম। আরও হতাশ করল ঐ হারামজাদা বেটারা। ভেবেছিলাম এক সঙ্গে পাঁচটা বন্দুক চালালে পাঁচশো হাতী ফেরান যায় আর এতো মোটে গোটা পঞ্চাশেক হাতী। কিন্তু সে গুড়ে বালি দিয়ে বেটারা ভয়ে সেঁটে রইল।

এ দিকে নীচে চেয়ে দেখি দশ বারো হাত গর্ত্ত এর মধ্যেই কমপ্লিট, ওদিকে জল নিয়ে সব এসে গেছে। অস্থির! কি যে করি ভেবে পেলাম না, একবার ভাবলাম দিই লাফ, একটা হাতীর পিঠে আবার মনে হল এ আর গণ্ডার নয়, এ ব্যাটাদের আবার শুঁড় আছে, ঠিক জড়িয়ে ধরে পায়ের তলায় ফেলে 'ফটাস্'।

জল ঢালা শেষ হয়ে গেছে এবার বেটারা লাইন হয়ে ওদিকে দাঁড়িয়েছে টাগ-অব-ওয়ার-এর জন্যে। আর রক্ষা নেই, মৃত্যু নিশ্চিত, শিবের অসাধ্য বাঁচান। মনে পড়ে গেল মিসেস চৌধুরীর বপু, এখন সে সনাসিকাগর্জ্জনে ঘুমচ্ছে। তার হাতের নোয়া আর সীঁথির সিন্দুর মুছলো চিরতরে। তবু সান্ত্বনা, কামাখ্যাধাম দর্শন করে নিলাম— পরকালে চললাম অন্তত একটু পুণ্য নিয়ে।

মরিয়া হয়ে গুলি ছুড়তে লাগলাম—কয়েকটা হাতীকে ধরাশায়ীও করলাম। কিন্তু কতক্ষণ! গুলি অল্প, শিকার অজস্র, তাও পারতাম যদি না গাছ দুলতে আরম্ভ করত, দুটি হাতই নিযুক্ত করে দিতে হল নিজেকে বাঁচাতে, দুটি ডাল ধরতে হল।

টাগ-অব-ওয়ার আরম্ভ হয়ে গেছে। একবার পূবে একবার পশ্চিমে গাছটা দুলছে। আর বেশীক্ষণ নয়, তিন তিন মিনিটের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ!

ঐ ধুমসো বেটাদের একটা শেষ ধাক্কা দিলাম কিন্তু ওদের দেহে প্রাণ আছে বলে মনে হল না—মুখে কেবল গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া। গাছের দোলানি এত বেড়ে গেল যে বন্দুক রেখে শেষ পর্য্যন্ত পাশের দুটো ডাল আঁকড়ে ধরে রইলাম। বসে থাকা দায়। দোলায় ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু ঘুমবার সময় তখন নয়; একটু পরেই যাকে শেষ ঘুম ঘুমোতে হবে তার এ সময় নিদ্রা সমীচীন নয়। মনে মনে ভাবলাম যাক্ ইন্সিওরের বিশ হাজার টাকায় মিসেস্ চৌধুরীর বাকী বৈধব্য-জীবন একরকম কেটে যাবেই। উপোস করে মরতে হবে না।

দোলায় পকেটের ভেতর হঠাৎ ঝর্‌ঝর্‌ করে কি যেন বেজে উঠলো। তোমরা জান নিশ্চিত মৃত্যুর সময়েও আমার কোন জড়তা থাকে না। চিন্তাশক্তি ঠিক সচল থাকে, ভাবতে লাগলাম পকেটের শব্দকারী জিনিষগুলো কি হতে পারে? গিন্নীর রুদ্রাক্ষের মালা? না সে তো কিনব বলেছিলাম, কিন্তু এখনো কেনা হয় নি। কামাখ্যাদেবীর পূজোর শুকনো বেলপাতা? তাই বা পকেটে রাখতে যাব কেন? চাবির গোছা? না, তাতে তো ওরকম খরখরে আওয়াজ হবে না। অথচ পকেটে যে হাত দোবো তাও মুশকিল—দুহাতে দুটো ডাল ধরে আছি শক্ত করে—ছেড়েছি কি নীচে পড়েছি। টাগ-অব-ওয়ার পুরোদমে চলছে। গাছটাকে মাটির সঙ্গে প্রায় তিরিশ ডিগ্রি এ্যাঙ্গল করে ফেলছে দুলিয়ে।

আমি দেখেছি বিপদের সময় আমার মাথায় ঠিক স্মরণ-শক্তি ও বুদ্ধি যুগপৎ এসে যায়। চট্‌ করে মনে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আর কথাবার্তা নাই। এক হাতে ডালটা বজ্রচাপে চেপে ধরে অন্য হাতে পকেট থেকে একমুঠো একমুঠো করে নীচে ছাড়িয়ে দিতে লাগলাম। এক সেকেণ্ড, দু'সেকেণ্ড, তিন সেকেণ্ড। গাছের দোলা কমে এলো; শেষে গাছটা থেমে দাঁড়িয়ে গেল। নীচে চেয়ে দেখি তলা ফরসা। সে কি! দূরে চেয়ে দেখলাম হাতীগুলা দৌড়চ্ছে পাহাড়ের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে হাতীর দলের টিকিটি পর্যান্ত দেখতে পাওয়া গেল না।

সেই থেকে আর হাতীর উপদ্রব সেখানে হয় নি। বেশ নির্ব্বিঘ্নেই ষ্টেশন চলছে। সাহেব আমাকে ও লাইনের ম্যানেজার-এর পোষ্ট অফার করেছিল কিন্তু আমি নিই নি।

আমরা কহিলাম—পকেট থেকে কি তা হলে মুঠো মুঠো মারন উচাটন মন্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন না কি চৌধুরী মশাই?

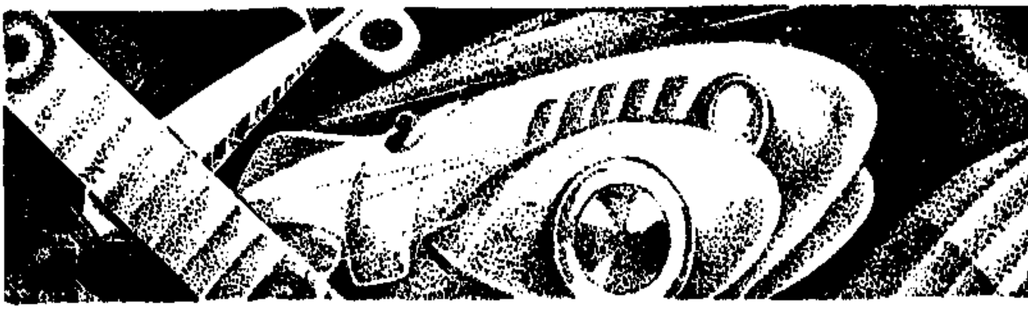
আরে তা নয়, যত সব আহাম্মক, কান্তি চৌধুরী বিকৃত মুখে কহিলেন—কুলের বীচি, বুঝলি? সেই যে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে খেয়ে বীচি পকেটে রেখেছিলাম, ভুলে সেগুলো পকেটেই পড়েছিল। সেগুলো ছুঁড়ে দিতেই···কেন, জানিস না যে কুলের বীচি হাতীর পায়ের নীচে যদি একবার পড়ে তা হলে হাতীর জীবন নিয়ে টানাটানি হয়?

নরেনটা ফাজিল, সে কহিল- এ হতে পারে না চৌধুরী মশাই অতগুলো হাতী কি না শেষে—।

কোন্ জিনিষটাই বা হতে পারে, কান্তি চৌধুরী ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন—অত অবিশ্বাস নিয়ে বসলে কি গল্প শুনে বা বলে আরাম পাওয়া যায়? যত সব ই'য়ে—

বেদ ও মহাভারতের বিষয়-বস্তু

···প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে অব্যক্ত ভাগ রহিয়াছে, উহা কোথা হইতে এবং কি উপায়ে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার পন্থা লইয়া 'বেদ', আর জীব-শরীরস্থ ঐ অব্যক্ত ভাগের পরিণতি কি কি হইতেছে ও কোন্ কোন্ উপায়ে হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার পন্থা লইয়া 'মহাভারত' রচিত হইয়াছে। এক কথায়, ইন্দ্রিয় ও মনোগ্রাহ্য বস্তুর সহিত আমাদিগের প্রকৃত সম্বন্ধ কি এবং ঐ সম্বন্ধ কেনই বা দ্বন্দ্ব-কলহ-বিমুক্ত করিতে হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য মহাভারত আর বুদ্ধি ও আত্ম-গ্রাহ্য বস্তুর সহিত আমাদিগের প্রকৃত সম্বন্ধ কি এবং ঐ সম্বন্ধ কেনই বা আমরা বিস্মৃত হই এবং ঐ সম্বন্ধকে কি করিয়া সর্ব্বদা নিজ শরীর-মধ্যে জাগ্রত রাখা যায়, তাহা বুঝাইবার জন্য বেদ রচিত হইয়াছে।··



বিজ্ঞান জগৎ

গ্রহান্তরে জীবের সম্ভাবনা

—শ্রীদেবেশচন্দ্র রায়

অন্যান্য গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে 'প্রাণী' বলিতে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকরা মোটামুটি ভাবে কি বুঝেন তাহা পরিষ্কার করিয়া লইতে চেষ্টা করিব। দার্শনিক কিম্বা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ না করিয়া আমরা জীবন বলিতে 'পার্থিব জীবের ন্যায়' জীবন—যাহা জল, বায়ু, অঙ্গার এবং তাপ ভিন্ন বাঁচিতে পারে না বুঝিব।

জীবের সংজ্ঞা এইরূপ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু আমরা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রাকৃতিক নিয়ম বিরাজমান দেখিতে পাই। সৌরমণ্ডলে যেরূপ গ্রহগুলি মাধ্যাকর্ষণের টানে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ঠিক অনুরূপ ক্রিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর ভিতরেও চলিতেছে। পৃথিবীতে যে সকল মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সুদূরতম নক্ষত্রের বর্ণাদি পরীক্ষা করিয়াও তদ্ভিন্ন নূতন কোন পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আমরা জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রাকৃতিক নিয়মের কোন তারতম্য স্বীকার করিব না। পৃথিবীতে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জীবজন্তু বাঁচিয়া থাকে, আমরা অন্যত্র অনুরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সন্ধান করিব।

আমরা সৌরমণ্ডলে পৃথিবী ভিন্ন যে কয়টি গ্রহ আছে, তাহাদিগকে একে একে পরীক্ষা করিব।

সন্ধ্যাকাশের দিকে তাকাইলে মঙ্গলগ্রহের উজ্জ্বল আলো আমাদের চোখে পড়ে—তাই মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। মঙ্গল গ্রহের অবস্থান পৃথিবীর ঠিক পরেই—সুতরাং ইহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করার সুযোগ আমাদের বেশী।

শুক্র সময় সময় আমাদের খুব নিকটে আসে, কিন্তু তখন আমাদের দিকে অন্ধকার দিক্‌টা পড়ে বলিয়া কোন তথ্যানুসন্ধান সম্ভব হয় না। শনি, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহের কুয়াসাচ্ছন্ন আবহমণ্ডল ভেদ করিয়া আমাদের দৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না।

বুধের অবস্থান সূর্য্যের খুব নিকটে, কিন্তু যেহেতু উহা সর্ব্বদাই কখনও সূর্য্যের দিকে পিছন ফিরে না, সেই জন্য ইহার একদিক্ আলোকিত এবং অসম্ভব গরম—অপর দিক্ অন্ধকার এবং চিরতুষারাচ্ছন্ন। সুতরাং কোন পার্থিব জীবের উহাতে বাঁচিয়া থাকা কখনও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

মঙ্গল গ্রহের আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা ছোট। ইহাতে পৃথিবীর ন্যায়ই প্রায় ২৪ ঘণ্টায় এক দিন হয় এবং ঋতুপরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অবশ্য এক এক ঋতু পৃথিবী অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, কারণ, মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব সূর্য্য হইতে পৃথিবীর প্রায় দেড়গুণ এবং পৃথিবীর ২৫ মাসে মঙ্গলের এক বৎসর। মঙ্গল হইতে বিচ্ছুরিত আলোক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রহটির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রক্তিমাভ, সারা বৎসরে এই বর্ণের কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। বাকী এক-তৃতীয়াংশে ছোট-বড় নানা আকারের কাল কাল কতকগুলি দাগ দেখা যায়। বসন্তের সমাগমে ঐগুলি পীতাভ বর্ণ ধারণ করে। এই রঙ ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকে—

অবশেষে শীতের প্রারম্ভে গাঢ় পীত বর্ণ এবং ক্রমে চকলেটে রূপান্তরিত হয়। এক গোলার্দ্ধে যখন এইরূপ ঘটিতে থাকে, অপর গোলার্দ্ধে ঠিক বিপরীত পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায়—এই পরিবর্ত্তন বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে তাল রাখিয়া বৎসরের পর বৎসর চলিয়া আসিতেছে।

এইরূপ বর্ণ-পরিবর্ত্তনের নানারূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তবে অধিকাংশ জ্যোতির্ব্বিদ কাল দাগগুলিকে তৃণময় প্রান্তর বলিয়া অনুমান করেন। অনুমান সত্য হইলে আমাদের এই প্রতিবেশী গ্রহটিতে প্রচুর গাছপালা বর্ত্তমান বুঝিতে হইবে; মঙ্গলগ্রহ সূর্য্য হইতে তাপ গ্রহণ করে ইহা ধরিয়া লইলে মনে করা যায় যে, ঐ সকল গাছপালা পার্থিব উদ্ভিদ্-রাজির সমধর্ম্মী—ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে।

প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পর মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর প্রায় সাড়ে তিন কোটী মাইলের ভিতর আসে। গত বৎসর জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর খুব সন্নিকটে আসিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তথ্য যাহা কিছু সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা এই বিষয়ে আলোকপাতের পক্ষে খুবই নগণ্য।

অবলোহিত কিম্বা অতিবেগুনী আলোর সাহায্যে লওয়া ফটোগ্রাফ হইতে মনে হয়, মঙ্গল গ্রহের চতুর্দ্দিকে প্রায় ৬০ মাইল-ব্যাপী আবহমণ্ডল বিদ্যমান। বায়ুমণ্ডলে জলের পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় শতকরা তিন ভাগ এবং অক্সিজেন শতকরা এক ভাগ। গ্রীষ্মমণ্ডলের তাপ ৬০০° হইতে ৮০° ডিগ্রীর (ফারেনহাইট) ভিতর থাকে। সূর্য্যাস্তের পরই সমস্ত তুষারাবৃত হইয়া যায়, সুতরাং তথায় জীবের বাস যদি আদৌ থাকে, তাহা মোটেই আরামপ্রদ নয়। আধুনিক বিজ্ঞান এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত। তাহা ছাড়াও মঙ্গল গ্রহের জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক জল্পনা-কল্পনা হইয়াছে। কতক কতক কল্পনাপ্রবণ লোক তথায় বেতার-বার্ত্তা প্রেরণের কথাও ভাবিয়াছেন। তাহাদের এইরূপ কল্পনার মূলে ছিল ইতালীয় জ্যোতির্ব্বিদ জোভানি শিয়াপারেলি-র সংগৃহীত কতগুলি তথ্য।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে—শিয়াপারেলি যখন মিলান মান-মন্দিরের অধ্যক্ষ—মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর সাড়ে তিন কোটী মাইলের ভিতর আসিয়াছিল। উক্ত বৈজ্ঞানিক সেই সময় দূরবীণ সাহায্যে নিরীক্ষণ করিয়া মঙ্গলগ্রহের একটি মানচিত্র নির্ম্মাণ করেন। তৎকৃত মানচিত্রে কতগুলি চুলের মত সরু কাল রেখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার মতে ঐ রেখাগুলি দেখিয়া কৃত্রিম মনে হয়। তিনি ঐগুলির নাম দিলেন 'canali'—অর্থাৎ খালসমূহ। পরবর্ত্তী পরীক্ষায় কেহ কেহ এই মত সমর্থন করিয়াছেন, যদিও অধিকাংশ জ্যোতির্ব্বিদ, বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান, উক্ত মতকে কোনরূপ আমল দেন নাই।

মঙ্গল গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণার উদ্ভব এইখানে। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, এই রেখাগুলি জল-সেচনের নিমিত্ত কর্ত্তিত কৃত্রিম খাল ব্যতীত কিছু নয়। এই খাল স্থানে স্থানে দৈর্ঘ্যে একহাজার মাইলেরও অধিক, সুতরাং তথাকার জীব বুদ্ধিতে এবং শিল্প-নৈপুণ্যে মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

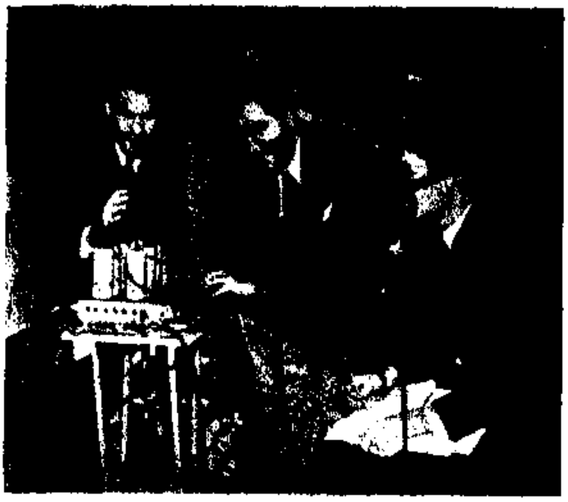
এই বিষয়ে মার্কিন জ্যোতির্ব্বিদ পার্সিভাল লাওয়েল প্রচুর গবেষণা করেন এবং পূর্ব্বোক্ত মত সমর্থন করেন, কিন্তু অতি-আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ তাঁহাদের মত সমর্থন করেন না।

তাঁহারা বলেন যে, যে-পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাতে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে যাওয়া চলে না, তবে আবিষ্কৃত তথ্যের সূত্র অবলম্বন করিয়া চলিলে মনে হয়, তথায় জীব অথবা উদ্ভিদের অস্তিত্ব একেবারে অসম্ভব নয়। এই সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্য আমাদিগকে ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

উড়ন্ত গবেষণাগার

কসমিক রশ্মি (cosmic ray) অতীব শক্তিশালী রশ্মি। ইহা রঞ্জন-রশ্মি (x-ray) কিম্বা গামা রশ্মি (gamma-ray) অপেক্ষাও অনেকগুণ শক্তি সম্পন্ন। ম্যাসাচুসেট্স্ ইনিষ্টিটিউট অব টেকনলজির অধ্যক্ষ আর. এ. মিলিক্যান সর্ব্বপ্রথম ইহার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন। পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কসমিক রশ্মি রঞ্জন রশ্মি কিম্বা রেডিয়াম হইতে বিচ্ছুরিত গামা রশ্মির ন্যায় বৈদ্যুতিক তরঙ্গ নহে। ইহা একপ্রকার অতীব শক্তিশালী বস্তুকণা। পৃথিবীর বহিঃস্থ প্রদেশ হইতে পৃথিবীর দিকে তীব্র বেগে

ছুটিয়া আসিতেছে। উহার উৎপত্তিস্থল, উৎপত্তির কারণ ইত্যাদি বিষয় বৈজ্ঞানিকদের কৌতূহলের বিষয়, ইহা লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপক গবেষণা চলিতেছে



ছয় মাইল উচ্চে বিমানপোতের মধ্যস্থ কসমিক-রশ্মি গবেষণাগার।

এ বিষয়ে পরীক্ষা শুধু গবেষণাগারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নাই। আকাশে, সমুদ্রবক্ষে, সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে, পর্ব্বতশিখরে, গুহার অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই ব্যাপক ভাবে উহার রূপ নির্ণয় করার জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে। এই গবেষণা উপলক্ষে অধ্যক্ষ মিলিকান কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। অধ্যাপক এ. এচ. কম্‌টন-এর নির্দ্দেশে কসমিক রশ্মির রহস্য উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত একটি বিমান গবেষণাগারে পরীক্ষা চলিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটী ছোট বিমান-পোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি লইয়া তিনজন বিশেষজ্ঞ অক্সিজেন মুখোস্ পরিয়া আকাশে প্রায় ২৯,০০০ ফুট উচ্চে আরোহণ করিয়া কতক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। অধ্যাপক কম্‌টন (Compton) নীচে থাকিয়া রেডিও সাহায্যে তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

উপরের ছবিতে দেখা যাইতেছে বৈজ্ঞানিকত্রয় ছয় মাইল উচ্চে বিমান গবেষণাগারে পরীক্ষা চালাইতেছেন, তাঁহাদিগকে মুখোস সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া বাঁচিতে হইয়াছে।

ট্যাঙ্ক-যুদ্ধ

আধুনিক স্থলযুদ্ধে ট্যাঙ্কের স্থান খুব উচ্চে। ট্যাঙ্ক-বাহিনীদ্বারা সর্ব্বপ্রথম সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা হইলে পর পদাতিক-বাহিনী অগ্রসর হয়। ট্যাঙ্কের ক্ষমতা এবং কার্য্যকারিতা খুবই বেশী, ইহারা কলের কামানের বিরুদ্ধে নির্ব্বিবাদে, উঁচু, নীচু, মাঠ, ছোট-খাট খাল অতিক্রম করিয়া, গাছপালা ভাঙ্গিয়া, দৈত্যের মত অগ্রসর হইতে থাকে। কাজেই এই মারাত্মক যন্ত্রকে বাধা দিবার নিমিত্ত ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান উদ্ভাবিত হইয়াছে। কামানচালকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কাঠের ফ্রেমে কাপড় ঢাকা দেওয়া নকল ট্যাঙ্ক তৈয়ারী করা হয়। এই নকল ট্যাঙ্কগুলি উন্মুক্ত প্রান্তরে ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে ছুটিতে থাকে এবং দূর হইতে ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কামান ছোড়া হয়।

যুদ্ধে যে কোন মারণাস্ত্রের প্রয়োগ আরম্ভ হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রতিষেধক এবং ইহাকে ধ্বংস করিবার জন্য পাল্টা অস্ত্র সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়। কলের কামান বিকল করিবার জন্য ট্যাঙ্কের প্রয়োগ—ট্যাঙ্ক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী কামান এবং ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী কামান ধ্বংস করিবার জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বিত হইয়া থাকে। বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া এই কামানগুলি ধ্বংস করা হয়।

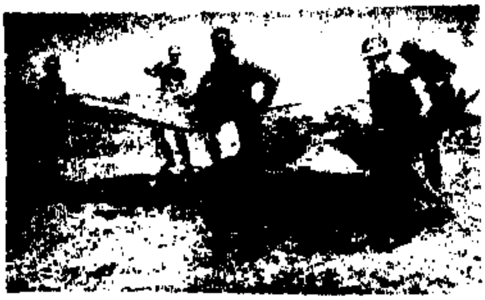
এই কামানগুলি যাহাতে সহজে দৃষ্টিগোচর না হয়, সেইজন্য নানা প্রকার কৌশল অবলম্বিত হয়। জার্ম্মান



ট্যাঙ্ক ধ্বংসকারী সৈন্যদের নিশানা অভ্যাস।

বিশেষজ্ঞগণ পশ্চিম রণাঙ্গণে এই কামান বসাইবার জন্য নানাপ্রকার ছোট ছোট গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই গর্ত্তগুলি নানাপ্রকারে লতাপাতা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে শত্রুপক্ষ ইহাদের অস্তিত্ব সন্দেহ না করিতে পারে।

ছবিতে দেখা যাইতেছে জার্মান সৈন্যগণ গর্তগুলি ঢাকিয়া দিতেছে।





ট্যাঙ্ক ধ্বংসী কামানের আত্মগোপন-কৌশল।

মৃত্যুরশ্মি

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর প্রায় সব 'সভ্য'দেশে নানাপ্রকার অমিত শক্তিশালী মারণাস্ত্র আবিষ্কারের কথা শুনা যাইতেছে। আশা করা যায়, ইহার অধিকাংশই মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত উক্তি। যেমন হিটলার তাহার ডান্‌ৎসিক্ বক্তৃতায় মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে ভয়ানক এক মারণাস্ত্র প্রয়োগের হুমকী দিয়াছিল—কি-যে সেই অস্ত্র এখনও জানা যায় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক অস্ত্র পৃথিবীতে যাহা তৈয়ারী হইয়াছিল, সৌভাগ্যের বিষয়, মানবতার দিক্ দিয়া বিচার করিয়া স্বয়ং আবিষ্কর্ত্তা উহা ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছেন—ইহার নির্ম্মাণ-কৌশলও প্রকাশ করেন নাই।

মৃত্যুরশ্মি অভিহিত এই মারাত্মক রশ্মি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মার্কিন বিজ্ঞানিক ডক্টর অ্যান্টোনিও লংগোরিয়া।

ইনি ক্যানসার রোগের চিকিৎসা আবিষ্কার করিবার জন্য নানা প্রকার শক্তিশালী তড়িৎরশ্মি লইয়া পরীক্ষা করিবার সময় দৈবাৎ এই মারাত্মক রশ্মি আবিষ্কার করেন। ইহা লইয়া পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে চার মাইল দূরে উড়ন্ত পাখীর দিকে এই রশ্মি নিক্ষেপ করিলে পাখীটি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আবিষ্কর্ত্তা একদল বৈজ্ঞানিকের সমক্ষে তাঁহার এই আবিষ্ক্রিয়ার ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছেন। খুব মোটা ধাতব পাতের পুরু বাক্সের দিকে এই রশ্মি পাত করিলে অভ্যন্তরস্থ ইঁদুর, খরগোস তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়।

আবিষ্কর্ত্তার মতে মানুষের উপরও এই রশ্মির ক্রিয়া অনুরূপ হইবে। ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর আলো পড়িলে যেরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়—উক্ত রশ্মি জীবদেহের উপর পতিত হইলে রক্তের ভিতর একপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলে রক্তের সমস্ত সঞ্জীবনী-শক্তি লোপ পায়।

মানবতার নামে যন্ত্রটা যখন ধ্বংস করা হইয়াছে এবং রহস্য গোপন রাখা হইয়াছে—তখন যুধ্যমান দেশগুলির কোন বৈজ্ঞানিক আবার এইরূপ একটি যন্ত্র আবিষ্কার না করা পর্য্যন্ত আমরা হয়তো নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

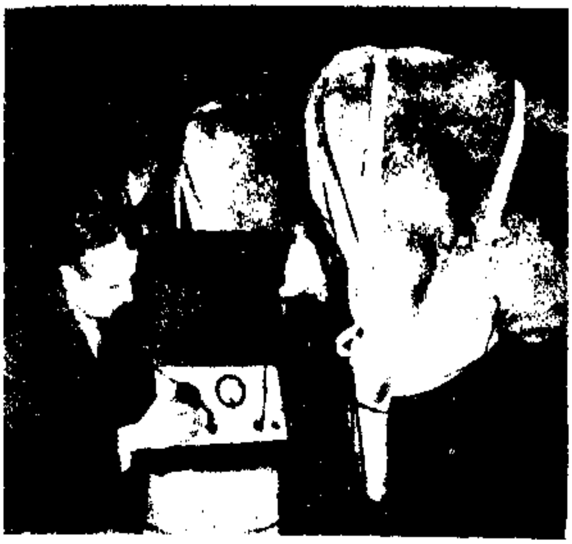


মৃত্যু-রশ্মির মার্কিন আবিষ্কর্ত্তা।

গরুর উপর বৈদ্যুতিক চিকিৎসা

মানুষ আধুনিক জগতে নানাপ্রকার দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন রোগ সৃষ্টি হইতেছে। নানা প্রকার কৃত্রিম উপায়ে রোগ-সংক্রামণের চেষ্টারও ত্রুটি নাই, বিশেষ করিয়া যুদ্ধের সময়। এদিকে আবার মনুষ্যেতর প্রাণীর রোগ নিরাময়ের চেষ্টারও অন্ত নাই। ইদানিং ওহায়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজাণুবিজ্ঞানের

অধ্যাপক ডক্টর হিলড্রেথ গরুর উপর বৈদ্যুতিক চিকিৎসা প্রয়োগের একটি যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন। ক্ষত স্থানের বিপরীত দুইদিকে তড়িৎদ্বার (electrode) ফিতা দিয়া



গবাদি পশুর বৈদ্যুতিক চিকিৎসা।

আঁটিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর ব্যাটারীর সহিত সংযোগ করিয়া দিলে ক্ষত-স্থানের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক রশ্মি প্রবাহিত হইতে থাকে। রশ্মির তাপে রোগী বেশ আরাম বোধ করে এবং ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে থাকে। ছবিতে দেখা যাইতেছে চিকিৎসক তাঁহার যন্ত্রটির সাহায্যে গরুর উপর বৈদ্যুতিক চিকিৎসা প্রয়োগ করিতেছেন।

দ্রুত ক্যামেরা

কামানের গোলার আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ লোকের স্পষ্ট কোন ধারণা নাই। পোর্টস্মাউথে নৌ-বিভাগীয় কুচকাওয়াজের সময় তোলা কামানের গোলার ছবিতে দেখা যাইতেছে গোলাটি কামানের নল হইতে বাহির হইয়া কিছু দূরে গিয়াছে—বেশ স্পষ্ট অবিকৃত ছবি। গ্যাসীভূত বারুদের অকস্মাৎ প্রসারণের ফলে বিস্ফোরণ ঘটিয়া থাকে। এই প্রসারণের চাপেই গোলাটি ছুটিয়া যায় এবং বায়ুর সহিত ঘর্ষণে ক্রমে গতি মন্দীভূত হইয়া পরে থামিয়া যায়। কামান কিম্বা বন্দুক হইতে ছোড়া গুলির বেগ কত তীব্র তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একটি পাখীকে যখন বন্দুকের গুলি মারা হয় তখন সে নিশ্চয়ই বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনিতে পায় না—পাইলে উড়িয়া যাইত এবং গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শব্দের গতি অপেক্ষা গুলীর গতি দ্রুততর। এই দ্রুতগতি গুলীর অবিকৃত ছবি তোলা ক্যামেরারও উৎকর্ষের পরিচায়ক।

পীচ ফলের বীচি বনাম বিষাক্ত গ্যাস

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর জার্ম্মানীতে পীচ ফলের আমদানী অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। স্বতঃই কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি সকলেরই হয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, যতটা ফলের জন্য নয়—তার চেয়ে বেশী বীচির জন্য এই অস্বাভাবিক চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে পীচফলের বীচি পোড়াইয়া যে অঙ্গার পাওয়া যায়, তাহা যতপ্রকার বিষাক্ত গ্যাস আধুনিক যুদ্ধে ব্যবহার হয়, তাহার প্রায় সবগুলির পক্ষেই প্রকৃষ্ট প্রতিষেধক। পীচ-বীচি-দগ্ধ অঙ্গার বিশেষ এক কৌশলে গ্যাস-মুখোসের শ্বাসগ্রহণ-যন্ত্রের ভিতর উপযুক্ত পরিমাণে পুরিয়া দেওয়া হয়। একবার ভরিয়া দিলে একজন লোক সাতদিন পর্য্যন্ত নিরাপদে বিষাক্ত গ্যাস লইয়া কাজ-কর্ম্ম করিতে পারে। সাত দিন অন্তর ব্যবহৃত অঙ্গার ফেলিয়া দিয়া নূতন অঙ্গার পুরিয়া লইতে হয়। এক শত পীচ-বীজ পোড়াইয়া যে-পরিমাণ অঙ্গার পাওয়া যায়, তাহা একটি মুখোসে একবার ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট।



বৃহৎ কামান হইতে সদ্যনির্গত গোলা।

জার্ম্মানীতে গৃহস্থগণ পীচ-বীচি কুড়াইয়া রাখে, সরকারী লোক আসিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়।

চোর ধরার কল

ইতালীতে মোটরগাড়ী চুরি বন্ধ করার জন্ত একটী কলের পেটেণ্ট লওয়া হইয়াছে। গাড়ীতে কলটি বসাইয়া মালিক কোথাও চলিয়া গেলে পর কোন চোর যদি গাড়ী চালাইতে চেষ্টা করে, তৎক্ষণাৎ ইঞ্জিন থামিয়া যায়, গাড়ীর দরজা আপনা হইতেই তালা বন্ধ হইয়া যায়, বৈদ্যুতিক শিঙ্গা আপনা হইতেই বাজিতে থাকে, এবং ফলে আশপাশের লোক বুঝিতে পারে, গাড়ীর ভিতর চোর রহিয়াছে।

দাবানল নির্ব্বাপিত করিবার উপায়

আমাদের হতভাগা দেশের বাড়ীতে আগুন লাগিলে



দাবাগ্নি-নিবারকের বিচিত্র পোষাক

তাহা নির্ব্বাপিত করার উপায় খুব কম শহরেই আছে, গ্রামের তো কথাই নাই। অথচ আমেরিকার জঙ্গলে দাবানলের ক্ষতি হ্রাস করিবার কি চেষ্টা! প্রতি বৎসর না কি যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের দাবানলের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দশ কোটী ডলার। প্রতি বৎসর প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার জায়গায় আগুন লাগে এবং উহাদের এক-দশমাংশের উৎপত্তি বজ্রপাত হইতে। প্রতি বৎসর প্রায় তিনলক্ষ চল্লিশ হাজার বর্গমাইল পরিমিত জঙ্গল পুড়িয়া দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করিবার চেষ্টা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে কিছুকাল পূর্ব্বে এক সীমানির্দ্দেশক যন্ত্র বাহির হইয়াছে, ইহার সাহায্যে জঙ্গলে প্রবেশ না করিয়া বাহির হইতেই অগ্নি-সংযোগ কোথায় হইয়াছে সঠিকভাবে নিরূপণ করিতে পারা যায়। কিন্তু মুশ্‌কিল এই, কিরূপে গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আগুন আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়! যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বনবিভাগ এইদিকে চেষ্টার ফল সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন।

সীমানির্দ্দেশক যন্ত্র দ্বারা সঠিক ভাবে স্থান নিরূপণ করিয়া ফায়ার ব্রিগেডের দল সেইস্থানে উড়িয়া যাইবে এবং আগুন নিবাইবার সরঞ্জাম পীঠে বাঁধিয়া দুই হাজার ফুট উঁচু হইতে প্যারাশুট সাহায্যে লাফাইয়া পড়িবে। এই দলের লোকগুলি ক্যানভাস্ এবং রবারে তৈয়ারী অদ্ভুত রকমের এক প্রকার পোষাক পরিহিত থাকে এবং তাহাদের মুখ আবৃত থাকে এক প্রকার ধাতুনির্ম্মিত তারের জাল দ্বারা। এইরূপে আগুন নিবাইবার কৌশল ওয়াশিংটনে কিছুকাল পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পৃথিবীর জন্ম সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদের আপত্তি

পৃথিবীর জন্ম সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদ এই, বহু পূর্ব্বে কোন অতিকায় নক্ষত্র সূর্য্যের নিকট দিয়া প্রচণ্ড বেগে চলিয়া যায়, সেই নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণের টানে সূর্য্যের গ্যাসীয় আবরণের কিয়দংশ মূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণের সীমা অতিক্রম না করাতে সূর্য্যেরই চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহার তাপ ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে এবং কালক্রমে জীবের বাসোপযোগী হয়। সেই প্রাথমিক জীবন ক্রমবিকাশের নিয়মে পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং মানুষ আমরা বিচরণ করিতেছি।

হারভার্ড মানমন্দিরের অধ্যাপক ডক্টর লেমন স্পিট্‌জার এই মতবাদ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে তারকার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে বিক্ষিপ্ত পদার্থ জমিয়া রূপ গ্রহণ করিতে পারিত না। যেরূপ গভীর সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশের প্রাণী উপরে আসিলে বহিঃস্থ চাপ হ্রাস পাওয়ায় বিস্ফোরিত হয়, ঠিক তদ্রূপ বিস্ফোরণ উক্ত পদার্থেও সংঘটিত হইত।

তরমুজের উৎকর্ষ সাধন

নিউ ইয়র্কে জনৈক আইন-ব্যবসায়ী নিজ বাগানে তরমুজ চাষের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। পরীক্ষাচ্ছলে তিনি তরমুজের উপর মদ্য পানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।



তরমুজ-চাষের নূতন কৌশল

গাছের নিকট লোহার ফ্রেমের উপর পোর্টের বোতল কাৎ করিয়া রাখা হয় এবং বেশ কৌশলে ফলকে মদ্য পান করান হইয়া থাকে। একটী পলিতার এক দিক্ বোতলে ভিজান থাকে, অপর দিক গাছের ডাঁটা একটু কাটিয়া তাহাতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতেই মদ্য চুয়াইয়া তরমুজের ভিতর প্রবেশ করে। ইহাতে না কি ফল বেশ সুস্বাদু এবং সুগন্ধ হয়—খরচ কত হয় তাহার অবশ্য উল্লেখ নাই। বৈজ্ঞানিক চাষ বোধ হয় ইহাকেই বলে!

কণ্ঠস্বর উদ্ধার

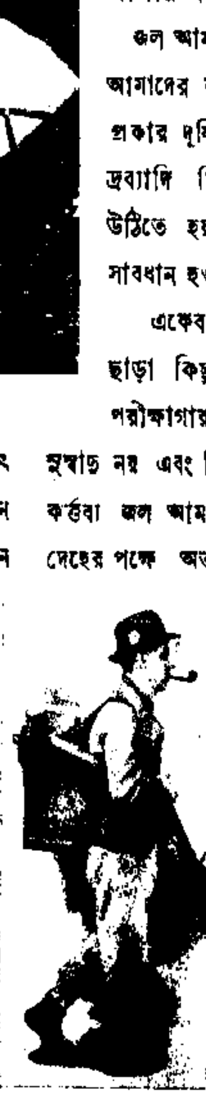
আজ কাল রেকর্ডে মহাপুরুষদের কণ্ঠস্বর রক্ষা করাটা রেওয়াজ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। গলার স্বর মানুষকে খুব জীবন্ত করিয়া তুলে তাঁহার কীর্ত্তির চেয়েও অনেক বেশী, এ বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবদ্দশায় গ্রামোফোন আবিষ্কৃত হয় নাই—তখন ছিল ফনোগ্রাফ। তখনকার একটি অতি পুরাতন সেওলাপড়া ফনোগ্রাফ্ হইতে মহারাণীর কণ্ঠস্বর উদ্ধার করার চেষ্টা হইতেছে। কাজটী খুবই কঠিন, কারণ ফনোগ্রাফের চোঙটি সেওলা পড়িয়া ও আঁচড় লাগিয়া অনেকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, বিশেষজ্ঞগণ পর্য্যায়ক্রমে অনেকগুলি রেকর্ড তুলিয়া সত্যকার স্বর ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপে কয়েক মাসের চেষ্টায় গ্ল্যাডষ্টোন এবং ফ্লোরেন্স নাইটিন্‌গেলের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হইয়াছে।

পানীয় জল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

জল আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য পানীয়। জল ভিন্ন আমাদের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। অথচ জলে কত প্রকার দূষিত, বিষাক্ত এবং সময় সময় মারাত্মক দ্রব্যাদি মিশ্রিত থাকে, তাহা স্মরণ করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। সুতরাং জল সম্বন্ধে আমাদের অতি সাবধান হওয়া উচিত।

একেবারে খাঁটি জলে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ছাড়া কিছু থাকে না—কিন্তু এই প্রকার খাঁটি জল পরীক্ষাগার ভিন্ন কোথাও পাওয়া যায় না, ইহা খাইতে সুস্বাদু নয় এবং বিশেষ উপকারী নয়। ইহা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য জল আমাদের শুধু তৃষ্ণা নিবারণই করে না, পরন্তু দেহের পক্ষে অত্যাবশ্যক অনেক রাসায়নিক দ্রব্যাদি জল মারফৎ আমরা পাইয়া থাকি।"





জল ফিল্টার করিবার এই যন্ত্রটি সহজেই বহন করা যায়।

প্রাচীনকালে চীনাজাতি বিশ্বাস করিত জলের সহিত গলগণ্ড রোগের খুব নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান—আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই মত সমর্থন করে।

আধুনিক মতে জলের মধ্যে আয়োডিন নামক মৌলিক

পদার্থের অভাবই এই রোগ সৃষ্টির কারণ। আয়োডিনের উৎস সমুদ্রে, সুতরাং জলের উৎস সমুদ্র হইতে বহু দূরে হইলে আয়োডিনের অভাব ঘটা খুবই স্বাভাবিক। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এই রোগের প্রাবল্য সমুদ্র-তীরে নয়, সমুদ্র হইতে বহু দূরবর্ত্তী স্থানে।

শহরের জলে অন্যান্য ধাতব পদার্থের সহিত ক্লোরিন মিশ্রিত হইয়া ক্লোরাইডরূপে বিদ্যমান থাকে। স্বাভাবিক ভাবে যে পরিমাণ ক্লোরাইড জলে মিশ্রিত থাকে তাহা নির্দ্দোষ। কিন্তু ক্লোরাইডের পরিমাণ বেশী হইলেই বুঝিতে হইবে পানীয় জল নর্দ্দামার জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইয়াছে। কারণ নর্দ্দামার জলে মানব-দেহ হইতে নির্গত প্রচুর পরিমাণে ধাতব ক্লোরাইড বোঝাই থাকে। নর্দ্দামার জল যে নদীতে প্রবাহিত হয়, সেই নদীর জলেও প্রচুর পরিমাণে ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি দেখা যায়।

নদীর জলে অনেক দূষিত পদার্থ প্রবাহিত হয় বলিয়া নানাপ্রকার রোগের বীজাণু বিদ্যমান। ফিলটারে চুয়াইয়া লইলে জল প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ বীজাণু হইতে মুক্ত হয়। অবশিষ্ট বীজাণু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করা হয়। সেইজন্যই জল শোধনে ব্লিচিং পাউডার-এর ব্যবহার। কিন্তু ইহাতে জলের স্বাদ অত্যন্ত কটু হয় বলিয়া আজকাল তৎপরিবর্ত্তে তরল ক্লোরিন ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু তাহাতেও জলের বিস্বাদ বিশেষ কিছু হ্রাস পায় না। তাহা ছাড়া যাহাদের পরিপাকশক্তি দুর্ব্বল ক্লোরিন-মিশ্রিত জল পানে তাহাদের উদরে প্রদাহ সৃষ্টি হয়—কারণ ক্লোরিন বিষাক্ত গ্যাস।

আমরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যতই শোধন করি না কেন—সর্ব্বোপরি পানীয় জল সুস্বাদু হওয়া প্রয়োজন। জল বিস্বাদ কিংবা কটু হইলে স্বভাবতই আমরা জলপান কমাইয়া দিই; তাহাতে শরীরের প্রচুর ক্ষতি হয়। কারণ দেহযন্ত্রের ক্রিয়া পরিপূর্ণভাবে চলিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে জল গ্রহণ করা দরকার।

আমাদের দেশে দূষিত জলপান করিয়া বহুলোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার জন্য কতকটা দায়ী লোকের অজ্ঞতা এবং কতকটা কর্ত্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা। পাশ্চাত্ত্য দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা হইয়া থাকে। এমন কি যাঁহাদের বাসস্থানের ঠিক নাই—যেমন আবিষ্কারক, পর্যাটক,—তাঁহাদের পর্য্যন্ত যাহাতে দূষিত জল গ্রহণ করিতে না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। আজকাল বাজারে একপ্রকার খুব হাল্কা ফিলটার বাহির হইয়াছে—ইহাতে পাঁচ গ্যালন পরিমাণ জল ধরে এবং সঙ্গে বহন করিয়া লওয়া যায়। ইহাতে সংলগ্ন একটি ছোট পাম্প আছে। এই পাম্প হাতে ঘুরাইয়া সংলগ্ন নলের সাহায্যে নদী, হ্রদ কিংবা কূপ হইতে অনায়াসে জল টানিয়া তোলা যায়।

দুই দিক্

—শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লৌহ-পিঞ্জরে পক্ষী বন্দি-বেদনায়,
পক্ষ চালি মুক্তি আশে করিছে প্রয়াস
বিলাসী কৌতুকরসে হাস্য-সাধনায়
ভাবিল তাহারে হেরি আনন্দ-উচ্ছ্বাস॥

কবিতা রচিল কবি বেদনার স্পর্শে,
পাঠক করিল পাঠ অসীম আনন্দে,
সাহিত্যের মধুরসে ভুলে যায় হর্ষে,
অন্তরের স্পর্শ জাগে কবিতার ছন্দে॥

মুরলী-বিলাস

—শ্রীরামশশী কর্ম্মকার

'মুরলী-বিলাস' নামক পুথীখানি বাঁকুড়ার নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র গ্রামে পাই। বেশ বড় পুথী; পত্র-সংখ্যা ১৪৭। পুথী নকলের তারিখ সন ১২৪৭, ৩রা চৈত্র। পুথীটির বয়স অল্প হইলেও গ্রন্থকারের প্রাচীনত্ব ইহার গৌরব বাড়াইয়াছে। এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর সহিত রচয়িতার যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাতে পুথীটির মূল্য কম নহে। অবশ্য অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও অলৌকিকত্বের ছায়া এড়াইতে পারে নাই। তবুও ইহাতে লৌকিক ও অলৌকিক অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিবে। গ্রন্থখানির বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব এবং রচনাপ্রণালী দেখিয়া ইহাকে চৈতন্যচরিতামৃতের কনিষ্ঠ বলিতে ইচ্ছা হয়। যে মহাত্মার মহনীয় কীর্ত্তিকলাপ এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তু, তিনি যে শ্রীচৈতন্যেরই প্রতিচ্ছায়ার ন্যায় বঙ্গের গৃহে উদিত হইয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থপাঠে অনুভূত হয়।

এই গ্রন্থে এক অতিতেজস্বী, মহাভাগবত, বৈষ্ণব গোস্বামীর জীবনচরিত বর্ণিত আছে। তৎসঙ্গে আমরা অপরাপর অনেক মহাজনেরও অল্প-বিস্তর সংবাদ পাই। ইহাই আলোচ্য গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্যের মূল।

নবদ্বীপে ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় নামক এই কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ছিলেন—

> 'মহাধনি মহাকুলিন মহাভাগবত। *
> মহাবিষ্ণু পণ্ডিতাত্মা হয়েন আস্পদ ॥' (পুথী—১১ক পৃষ্ঠ)

এক দিন চট্টোপাধ্যায় এবং তৎ-পত্নী একই সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন—

> 'ভুবনমোহন এক পুত্র মনোহর।
> দেখিলেন আপন কোলে যেন শুধাকর॥' (ঐ)

চট্টোপাধ্যায় মনে করিলেন, বুঝি গৌরাঙ্গকেই স্বপ্নে দেখিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গে চট্টোপাধ্যায় সপত্নীক শচী দেবীর গৃহে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে কোলে লইলেন—এবং স্বপ্নজনিত বিহ্বলতা দূর করিলেন। গৌরাঙ্গ (সুযোগ বুঝিয়া) চট্টোপাধ্যায় দম্পতীকে বলিলেন—

> 'পুত্র হৈলে মোরে দিবে কর অঙ্গিকার।' (১১খ পৃঃ)

ব্রাহ্মণদম্পতী অঙ্গীকার করিয়া গৃহে ফিরিলেন। অচির-কালমধ্যে তাঁহাদের এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শিশুকে দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন,—

> 'মিশ্রির হইয়াছে এক পুত্র সর্ব্বোত্তম।
> তোমার ঘরে তৎসদৃশ হেন লয় মন॥' (১১খ পৃঃ)

চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকাব্দে ফাল্গুনী (দোল) পূর্ণিমায় অর্থাৎ ইং ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের (দীনেশ বাবুর মতে) ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্ম পরিগ্রহ করেন। চট্টোপাধ্যায়-নন্দন বংশীবদন ইং ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্রপূর্ণিমায় ভূমিষ্ঠ হন। (বঙ্গভাষা ও ও সাহিত্য—পৃঃ ২৯২)।

> বসন্তকালেতে বহে মলয় পবন।
> কোকিলাদি নানা পক্ষ ডাকিছে যখন॥*
> সকল লোকের মনে আনন্দ-উল্লাস।
> সকল লোকের মনে প্রেমের প্রকাশ॥
> জয় জয় করে সবে উঠে কোলাহল।
> শুভলগ্নে গঙ্গাস্নানে চলিল সকল॥
> বসন্তকালের রূপা পূর্ণ-চন্দ্রোদয়।
> আনন্দ উল্লাসে সভে করে জয় ২॥ (১১খ—১২ক পৃঃ)

এই বসন্তের মধুর পূর্ণিমারাত্রে বালক গৌরাঙ্গ, চট্টোপাধ্যায়ের ভবনদ্বারে শিশুসঙ্গে খেলিতেছিলেন, 'ত্রিভঙ্গভঙ্গিম-ঠামে' নাচিতে নাচিতে 'নদীয়া নাগরীগণের নেত্রমন' আকর্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় 'মুরলী মুরলী' বলিয়া ডাকিয়া উঠেন। সেই মুহূর্ত্তেই চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র ভূমিষ্ট হন। গৌরাঙ্গ নবজাত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া 'আমার মুরলী, আমার মুরলী' বলিয়া মুখচুম্বন করেন; প্রত্যহ আসিয়া কোলে লইয়া 'আমার মুরলী' বলিয়া নৃত্য করেন।

---

* পুথীতে যথা দৃষ্ট, এখানে তথা উদ্ধৃত হইয়াছে।

দৈবজ্ঞ গণিয়া নাম রাখিলেন শ্রীবংশীবদনানন্দ। চট্টোপাধ্যায় 'গৌরাঙ্গের রূপে আপনার সুতে' একই স্বরূপ দেখিতে পাইলেন। বৈষ্ণব সমাজে তদবধি প্রচার,—বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় মুরলীর অবতার।

বংশীবদনানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয় সহচর হন। ইনি গৌরাঙ্গের আদেশেই বিবাহ করেন এবং তাঁহারই আদেশে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন নাই। (পুথী—১৩ পৃঃ)। কিন্তু গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পর বংশীবদন সংসারে কিছুমাত্র শান্তি পান নাই। মানসিক আধি ক্রমে কায়িক ব্যাধিরূপে তাঁহাকে নিতান্ত অসুস্থ করিয়া ফেলে। চৈতন্যবিরহ-দুঃখ এবং ব্যাধির দুঃখ ভোগ করিয়া বংশীবদন দুর্ব্বহ জীবন কোন প্রকারে বহন করিয়া যান। কিন্তু যেদিন মহাপ্রভুর তিরোভাব সংবাদ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় নদীয়ায় পৌঁছিল, সেই দিনই বংশীবদন দেহত্যাগ করেন।

> 'চৈতন্য-গোসাঞি যবে অপ্রকট হৈলা।
> শুনি মাত্র বংশীবদন লীলা সম্বরিলা।' (১৪ক পৃঃ)

বংশীবদনের দুই পুত্র; নাম—চৈতন্যদাস ও নিত্যানন্দ-দাস। কথিত হয় পুত্র চৈতন্যদাসের পত্নীর হৃদয়স্পর্শী বিলাপ শুনিয়া পরলোকপ্রস্থানোদ্যত ব্যক্তিরও হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। বংশীবদন মরণ সময়েও পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন—"মা, কাঁদিও না; আমি তোমার পুত্ররূপে আসিব।" (পুথী—১৪ পৃঃ)।

ইহার অল্পকাল পরে মহাপ্রভু নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবী দেবী চৈতন্যদাস-গৃহে আসেন এবং বলেন—

> 'তোমার দুই পুত্র হবে পরম উত্তম।
> জ্যেষ্ঠ পুত্র মোরে যদি কর সমর্পণ।' (পুথী—১৪ক পৃঃ)

সপত্নীক চৈতন্যদাস অঙ্গীকার করেন।

অচিরে চৈতন্যদাসপত্নী গর্ভবতী হন। ক্রমে দশ মাস পূর্ণ হইল, চৈত্র মাসের পূর্ণিমা দিনে ঠাকুর রামাঞি আবির্ভূত হন।

> 'মধুমাস শুক্লপক্ষ পূর্ণিমা দিবসে।
> বৃক্ষআদি পুলকিত বসন্ত বাতাসে।
> কোকিল পঞ্চম গায় ভ্রমর ঝঙ্কার।
> আবাল-বৃদ্ধবামদে আনন্দ অপার।
> জয়-জয় কয়ে লোকে চৌদিগ ভরিয়া।
> প্রেমে সুরধুনী-ধারা জায় উথলিয়া।
> এইকালে আবির্ভূত হইলা ঠাকুর।
> পৃথিব্যাদি করি সভার আনন্দ প্রচুর।' (পুথী—১৫ক পৃঃ)

অন্যের কথা কি? পৃথিবী প্রভৃতিও আনন্দে পুলকিত হইয়াছিল। মহাপুরুষের আবির্ভাবে প্রকৃতি স্বয়ং প্রফুল্ল হন। 'ভাবা হি লোকাভ্যুদয়ায় তাদৃশান্' (রঘু: সর্গ ৩) জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য আবির্ভূত মহাপুরুষের জন্মক্ষণে সমস্ত শুভ সূচিতই হয়।

শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মহিলাগণ নবজাত শিশুকে দেখিতে আসিলেন।

> 'জাহ্নবা গোসাঞি শুনি' আনন্দ উল্লাষ মানি'
> আগমন কৈলা তাঁর বাসে। (পৃঃ ১৫খ)
> ... ...
> 'বিরচন্দ্র কোলে লঞা বসুধা আসেন ধাঞা
> বিষ্ণুপ্রিয়া, অচ্যুতজননি।
> বস্ত্রগুপ্ত দলায় চড়ি, দাসীগণ সঙ্গে করি
> আইলেন সব ঠাকুরাণি। (১৬ক পৃঃ)

জাহ্নবী দেবী আসিলেন; বীরচন্দ্রকে কোলে লইয়া দেবী বসুধা আসিলেন; দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া আসিলেন; অচ্যুতানন্দ-জননী দেবী সীতাও আসিলেন; সকলে দাসী সমভিব্যাহারে দোলারোহণে শিশু রামাঞিকে দেখিতে আসিলেন।

দৈবজ্ঞ শিশুর নামকরণ করিলেন—রামচন্দ্র।

> ইহোঁ সভার মন প্রেমে করিব রমণ।
> অতএব রামাঞি নাম কহিল কারণ। (পুথী - ১৬ক পৃঃ)

ইনি প্রেমদ্বারা সকল জীবের মন প্রীত করিবেন, অতএব ইঁহার নাম হইয়াছিল, রাম।—রামায়ণে রামচন্দ্রকে 'লোকরাম', 'নয়নাভিরাম' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছে। বস্তুতঃ আনন্দার্থক রম্-ধাতু হইতে 'রাম' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে আদরার্থে 'আই' প্রত্যয় করিয়া 'রামাই' পদ বাঙ্গালায় নিষ্পন্ন হয়। প্রাচীন বাংলায় আনুনাসিক প্রয়োগের প্রাচুর্য্যবশতঃ 'রামাঞি' হইয়াছে; নতুবা 'নিমাই', 'কানাই', 'বলাই', 'জগাই', 'মাধাই' প্রভৃতি রূপই সুপ্রচলিত।

এখন প্রশ্ন এই মধুপূর্ণিমা কোন্ সালের? যে-বৎসর আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমীতে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব হয় এবং বর্ত্তমান গ্রন্থ অনুসারে বংশীবদন দেহত্যাগ করেন, সেই

বৎসরেরই চৈত্র পূর্ণিমায় কি ঠাকুর রামাঞি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু বংশীবদনের তিরোভাব কাল নির্ণয় করিয়া দেন নাই ; আলোচ্য গ্রন্থে আমরা পাইয়াছি।

চৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডের ১৩শ পরিচ্ছেদে চৈতন্যের জন্মমৃত্যুকালজ্ঞাপক একটি পয়ার আছে :—

'চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্ধান ॥'

আলোচ্য পুথীর ১৪৭ সংখ্যক পাতায় ঠাকুর রামাঞির কালনির্ণয়ক একটি পয়ার পাইতেছি :—

'চন্দ্র শত পঞ্চান্নে জনম লভিলা।
পঞ্চদশ চতুর্থে সেচ্ছায় লিলা সম্বরিলা ॥'

উল্লিখিত দুইটি পয়ারেই লেখকদ্বয় প্রাচীন শৈলী ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ "অঙ্কস্য বামা গতি"—নিয়ম অস্বীকার করিয়া সহজ ভাষায় কালের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি হইতে পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্য ১৪০৭ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৫৫ শকে দেহত্যাগ করেন। দ্বিতীয় পয়ার হইতে পাওয়া যায় ঠাকুর রামাই ১৪৫৫ অব্দে জন্মলাভ করেন এবং ১৫০৪ অব্দে লীলা সংবরণ করেন। এই অব্দকে শকাব্দ ধরিয়া আমরা পাইতেছি যে, চৈতন্য তিরোধানের বর্ষেই ঠাকুর আবির্ভূত হন।

পূর্ব্বোক্ত শকাব্দাগুলিকে খৃষ্টাব্দে পরিণত করিলে পাওয়া যায় :

শ্রীচৈতন্যের জন্ম সময়—১৪০৭ শক (ফাল্গুন পূর্ণিমা) +৭৯=১৪৮৬ খৃঃ (মার্চ্চ মাস ?)।

মৃত্যু সময়—১৪৫৫ শক (আষাঢ় শুক্লা সপ্তমী)+৭৮= ১৫৩৩ খৃঃ (আগষ্ট)।

চৈতন্যের তিরোভাবের তারিখ যাঁহারা ১৫৩০ বলেন, তাঁহাদের মত ভুল। দীনেশবাবু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (নূতন সংস্করণ) গ্রন্থের ২৬৫ পৃষ্ঠায় এবং "বৃহৎ বঙ্গ" গ্রন্থের ৬৯৮ পৃষ্ঠায় ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যের তিরোভাব ঠিকই লিখিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন "বাংলা সাহিত্যের কথা" পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠায় ১৪৫৫ শকাব্দের আষাঢ় মাসে ইং ১৫৩৪ গণনা করিয়া ভুল করিয়াছেন কি না, বিশেষজ্ঞদের বিচার্য্য। শকাব্দাকে খৃষ্টাব্দে পরিণত করিতে হইলে সাধারণতঃ ৭৮ যোগ করিতে হয় ; কেবল ১লা জানুয়ারী হইতে চৈত্রসংক্রান্তি পর্য্যন্ত ৭৯ যোগ করা আবশ্যক হয় ; কারণ ঐ কয় মাস খৃষ্টাব্দ সংখ্যা বাড়িয়া যায়, কিন্তু শকাব্দ সংখ্যা বাড়ে না। অতএব আষাঢ় মাসের শকাব্দ ৭৮ যোগে খৃষ্টাব্দে পরিণত হইলে ১৪৫৫ শকাব্দ হইতে খৃঃ ১৫৩৩ ই পাওয়া যায়। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই কিম্বা আগষ্ট মাসে চৈতন্যদেব তিরোভাব করেন ইহা আলোচ্য পুথী দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং বংশীবদনেরও দেহত্যাগকাল পাওয়া গেল ইং ১৫৩৩, জুলাই কিম্বা আগষ্ট। শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু চৈতন্যের জন্ম-তারিখ ১৮ই ফেব্রুয়ারী হিসাব করিয়াছেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ২৬৫)। ইহা ১৮ই না হইয়া ২৮শে হওয়া কতকটা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় ; কারণ ফাল্গুনী পূর্ণিমা ফাল্গুন মাসের ১৫ দিনের পূর্ব্বে হওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়টিও বিশেষজ্ঞের বিচার্য্য।

ঠাকুর রামাঞি উক্ত ১৪৫৫ শকের চৈত্রপূর্ণিমায় অর্থাৎ ১৪৫৫+৭৯=১৫৩৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ চৈতন্যের এবং বংশীবদনানন্দের মৃত্যুর ৯ মাস পরে রামাই ঠাকুরের জন্ম হয়। যদি পুত্রবধূর প্রতি বংশীবদন-প্রদত্ত আশ্বাসবাণীর সার্থকতা সম্ভব বলিয়া আলোচ্যরূপে গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে আষাঢ়ের শেষভাগে গর্ভাধান হইলেও চৈত্রমাসে প্রসব অবৈজ্ঞানিক হয় না।

'কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরঃ।
প্রেতলোকং পরিত্যজ্য ভোগলোকং প্রপদ্যতে।'

অর্থাৎ মানব মৃত্যুর পর একবৎসর কাল প্রেতলোকে অবস্থান করিয়া পরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে ; ধর্ম্মশাস্ত্রের এই নিয়মের প্রতিবাদে দুএকটি কথা বলা যাইতে পারে ; প্রথমতঃ এই বলা যায় যে, ভগবদ্ভক্ত জনের পক্ষে সাধারণ নিয়ম খাটে না। দ্বিতীয়তঃ—

'দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ। ভাঃ ১০।১।৩৯

অর্থাৎ দেহ লয়োন্মুখ হইলে কর্ম্মবশীভূত পরতন্ত্র আত্মা অন্য দেহ লাভ করিয়া পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ করে।

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণ জলৌকৈবং দেহী কর্ম্ম গতিং গতঃ। ভাঃ ১০।১।৪০

ভ্রমণশীল ব্যক্তি যেমন একপদ তুলিবার পূর্ব্বে আর এক

পদ ভূমিতে স্থাপন করে; পোকা যেমন এক তৃণ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাবলম্বিত তৃণ ত্যাগ করে; তদ্রূপ কর্ম্মপরতন্ত্র আত্মা নূতন দেহে একপদ স্থাপন করিয়া পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ করে। সুতরাং বংশীবদনের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই রামাঞির গর্ভবাস সম্ভব বলিয়া শাস্ত্র বলিতেছে। আত্মার জন্মান্তর-গ্রহণের সত্যতা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

রামাই ঠাকুর ১৫০৪ শকাব্দে দেহত্যাগ করেন; কিন্তু কোন্ মাসে তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। আলোচ্য পুথীর ১৪৬ক পৃষ্ঠায় দেখা যায়, ঠাকুর রামাঞি অন্তিম সময় জানিতে পারিয়া শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাজবল্লভকে মহোৎসব করিতে বলেন। ঠাকুরের আদেশ অবিলম্বে পালিত হয়; শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বিগ্রহদ্বয় প্রাঙ্গনস্থ মঞ্চোপরি স্থাপন করিয়া সেই রাত্রেই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বহু-জনগণের সমাগম হয়।

উৎসবে অভ্যাগত ব্যক্তিগণের ভোজনানন্দেরও অভাব হয় নাই। রাজবল্লভ বর্ণনা করিয়াছেন—

'শেষ লীলার কথা এই শুন বন্ধুগণ।
একদিন ঠাকুর মোরে কহেন বচন।
কৃষ্ণ-বলরামে দেহ যুগল বারাম।
মহোৎসব কর আজি পূর্ণ হউ কাম॥
আজ্ঞামাত্র সকল সামগ্রী আহরিয়া।
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব আইলা নিমন্ত্রণ পাঞা॥
বসন্তকালের রাত্রি চন্দ্রের উদয়।
যুগল বারামে রামকৃষ্ণ বিরাজয়॥' (পুথী পৃঃ ১০৩ক)

এই বসন্ত-রজনীতে ঠাকুর রামাঞি বিগ্রহ-সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভগবানের স্তব করিতে করিতে লীলা সংবরণ করেন। অতএব বসন্ত কালকে ফাল্গুন কিংবা চৈত্র মাস ধরিলে, ঠাকুর রামাঞি ১৫০৪+৭৯=১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে দেহত্যাগ করেন, ধরা যাইতে পারে।

পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে, যে-গ্রন্থে অলৌকিক কথা অধিক থাকে, তাহা ঐতিহাসিকের ও বৈজ্ঞানিকের নিকট অশ্রদ্ধের হয়। স্বীকার করি। কিন্তু অলৌকিক ঘটনা থাকিলেই গ্রন্থ মিথ্যা হয়, ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ কথা? বোধ হয় না। পাঁচখানা রুটি ও দুইটি মাছ দিয়া পাঁচ হাজারের অধিক লোককে পরিতৃপ্ত করিয়া আহার করান একটা মস্ত বড় অলৌকিক কাণ্ড; (St. Matthew's Gospel, Chap. XIV. 17-21)। কিন্তু তাই বলিয়া বাইবেল অবিশ্বাস্য হইতে পারে না। সেণ্ট কেথারিন্ ছয় বৎসর বয়সে যীশুখ্রীষ্টের দিব্য দেহ দর্শন করিয়াছিলেন। (Life of St. Catherine by F. Raimands). জার্ম্মান সাধু সুসো (Suso), শিশু খ্রীষ্টের মূর্ত্তি দর্শন ও স্পর্শন করিয়াছিলেন। (Christian Mysticism by W. I. Inge)। ইঁহারা উভয়েই চতুর্দ্দশ শতকের লোক। আর্য্য পুরাণ, বৌদ্ধ জাতক এবং বৈষ্ণব শাস্ত্র অনন্ত অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ঘটনা বিশ্বাস করা, না করা পাঠকের ইচ্ছাধীন; এবং সামর্থ্য অনুসারেও হয়। রামায়ণে রাজা দশরথের রথ-যোগে আকাশমার্গে গমন এবং রামচন্দ্রের পুষ্পকরথে সদলে লঙ্কা হইতে আকাশপথে অযোধ্যায় আগমন, জ্ঞানী লোকেও আজগুবী গল্প বলিয়া মনে করিত, যতদিন না মানুষের সামর্থ্যে এরোপ্লেন এবং জেপ্লিন সম্ভব বলিয়া ধারণা জন্মিল। সুতরাং আমরা লেখককে বাঙ্গালী বলিয়া কল্পনাপ্রিয় ও মিথ্যাভাষী বলিতে অধিকারী নহি। জগতে কি যে সম্ভব, কি যে অসম্ভব, তাহা আজও নিঃশেষে নির্দ্ধারিত হয় নাই। যে রহস্যের উদ্ঘাটন করিবার মত বুদ্ধি আমার নাই, তাহাই মিথ্যা, তাহাই প্রলাপোক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করায় ইতো।

আলোচ্য গ্রন্থের আলোচনায় সন্দেহের অবকাশও তত নাই। যাঁহারা অনেক পরবর্ত্তী, লোকপরম্পরায় আগত কাহিনী মাত্র অবলম্বনে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ঐতিহাসিক উক্তি সকল অবশ্য খুব সতর্কতার সহিত ওজন করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থকার রাজবল্লভ গোস্বামী, রামাঞি ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য। রাজবল্লভ গুরুর মুখে যাহা শুনিয়াছেন, ঠাকুরের নিত্যসহচর এবং শিষ্য দুই জনের নিকট যাহা অবগত হইয়াছেন, এবং ঠাকুরের নিকটে বাস করিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই স্বগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকার সে কথা স্বয়ং নিবেদন করিয়াছেন—

'ঠাকুর রামাঞি—কৃপা করি শুনাইল।
তার মুখে শুনি তাহাঞি লিখিল॥' (পুথী পৃঃ ২০ক)

সুতরাং এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কোন প্রকারে খর্ব্ব করিতে সাহস হয় না।

বৈষ্ণব সমাজে চারিদিকে দ্রুত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোধানের দুই বৎসর পরে নিত্যানন্দ প্রভুও লীলা সংবরণ করিলেন। রামাই পিতামাতার স্নেহনীড়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

'প্রথম কিশোর যবে ঠাকুর রামাঞি।
সচি নামে প্রভুর হইল এক ভাই।' (পুথী ১১৪ পৃঃ)

অর্থাৎ বার তের বৎসর বয়সে রামাঞির একটি সহোদর জন্ম গ্রহণ করেন; নাম হয় শচীনন্দন; এই শচীনন্দনও উত্তরকালে পদকর্ত্তা হইয়াছিলেন। শচীনন্দনের জন্মের পর, (কত পরে গ্রন্থে উল্লিখিত নাই) জাহ্নবী দেবী চৈতন্যদাস-গৃহে আসিয়া পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে রামাঞিকে প্রার্থনা করেন। অনেক বাদ-প্রতিবাদের পর পিতা-মাতা সাশ্রুনেত্রে পুত্রকে জাহ্নবী চরণে সমর্পণ করেন। চরণে প্রণত রামাঞিকে ক্রোড়ে লইয়া দেবী বলেন—

'তুমী মোর প্রাণধন তুমী সে জীবন।
বীরচন্দ্র যেন মোর তুমী সে তেমন।' (পুথী ১১৭ পৃঃ)

তৎপরে রামাঞিকে দীক্ষা দিলেন এবং সঙ্গে লইয়া স্বগৃহ খড়দহে যাত্রা করিলেন।

এখানে বীরচন্দ্র বিমাতার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া লোকজনসঙ্গে বাহির হইয়া পড়েন। পথিমধ্যে উভয় দলের সাক্ষাৎ হয়। জাহ্নবী দেবীর আদেশে—

'বীরচন্দ্রে রামচন্দ্রে হৈল কোলাকোলি।' (পৃঃ ২৫ক)

ঐত্য শুভক্ষণে মাতৃস্নেহের বিমল ছায়ায় দাঁড়াইয়া এই তরুণ বালকদ্বয়ের মধ্যে আলিঙ্গনের মধ্য দিয়া যে সুদৃঢ় প্রীতির বন্ধন ঘটিয়াছিল, সারাজীবনে তাহা কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই।

অচিরে সকলে শ্রীপাট খড়দহে আসিয়া উপনীত হইলেন। বাড়ীর সকল লোক নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। রামাই একে একে সকলকে প্রণাম করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিলাপে সকলেরই নিত্যানন্দ-বিয়োগ ব্যথা নবীভূত হইল, গৃহে নবশোক-ব্যাকুলতা প্রকাশিত হইল। অকস্মাৎ

'আবির্ভূত হৈলা পদ্মাবতীর কুমার।' (পৃঃ ২৭ খ)

বীরভূমের একচক্রা গ্রামে ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নিত্যানন্দ প্রভু জন্ম গ্রহণ করেন। ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃঃ ৩৩৭), উক্ত গ্রামের হাড়াই পণ্ডিতের পত্নী—পদ্মাবতী, "যাঁর গর্ভে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি।" (পুথী ৪৩ খ পৃঃ)। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যবিরহ-দুঃখ-জর্জ্জরিত হইয়া নিত্যানন্দ দেহত্যাগ করেন। (*Chaitanya and His Companions* by Dr. D. C. Sen, p. 36) সেই পদ্মাবতী-কুমার নিত্যানন্দ আজ দিবালোকে তথায় আবির্ভূত হইয়া সকলের সহিত সম্ভাষণ করিলেন এবং রামাঞিকে বৃন্দাবন যাইবার উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যাঁহারা এইরূপ আবির্ভাব আজগুবি বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ধারণা ভুল না বলিয়া তাঁহাদিগকে Resurrection-এর কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, অথবা সেক্সপীয়ারের হ্যামলেট নাটকের প্রথমাঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য পড়িতে অনুরোধ করিতেছি।

রামাঞি পরমানন্দে বীরচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর-নির্ব্বিশেষে খড়দহে বাস করিয়া জাহ্নবী দেবীর নিকট ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া লই। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (৩৩৭ পৃঃ) শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু বীরচন্দ্রকে জাহ্নবী-নন্দন লিখিয়াছেন; অবশ্য পাদটীকায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, বীরচন্দ্রের মাতৃদ্বয়ের সম্বন্ধে ইতিহাস আজিও নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই। আলোচ্য গ্রন্থের ১৬ক পৃষ্ঠায়—

"বীরচন্দ্রে কোলে লঞা বসুধা আইলা যাঞা।"

পড়িয়া আমরাও বিপন্ন হইয়া পড়ি। কিন্তু গ্রন্থকার ক্রমশঃ আমাদের সন্দেহ নিরসন করিয়াছেন। জাহ্নবী দেবীও যে সূর্য্যদাস-নন্দিনী, তিনিও যে নিত্যানন্দগেহিনী, তাহা গ্রন্থকার পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথমাংশে তাঁহার সম্মান দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, বুঝি তিনিই প্রধানা পত্নী। বস্তুতঃ সাধন-মার্গে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেও তিনি যে নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া ভার্য্যা, গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্ঠায় তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

জাহ্নবী দেবী বৃন্দাবন যাইবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বসুধা দেবী নিষেধ করিলেন। তখন দেবী জাহ্নবী বলিতেছেন—

'(জাহ্নবা কহেন) দিদি না কর বাদক।
গঙ্গা বীরচন্দ্রে তুমী হয় সে পালক।
তুমীত ঈশ্বরী হেন পুত্র যে তোমার।
ভাগ্যবান্ তুমি অনুসার কি তুমার।'

জাহ্নবী দেবীর উল্লিখিত কথায় 'অস্পষ্টার্থতা' (ambiguity) দোষ আরোপ করা যাইতে পারে। কিন্তু কবি তাহা সুস্পষ্ট করিয়া দিলেন। জাহ্নবী দেবী বলিলেন—

আমার সন্ততি নাই অধমকন্যা আমী।
আমী বৃন্দাবনে যাব আজ্ঞা কর তুমী। (পৃঃ ৮৭ক)

আবার বিদায়ক্ষণে বলিতেছেন—

'তোমার আশীষে যেন আসি কালে-ভাল।' (ঐ)

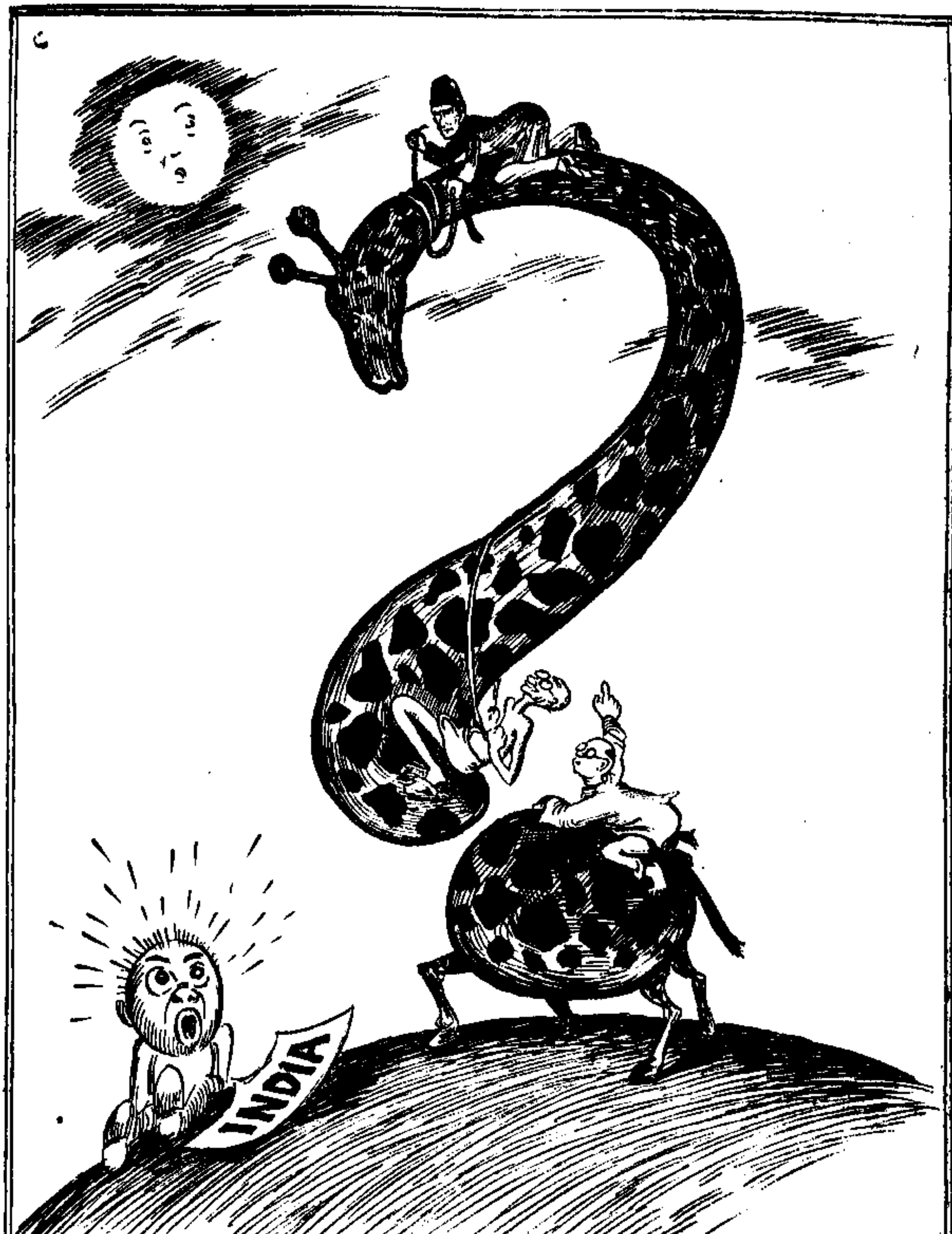
এ সব কথার পরও কাহারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। জাহ্নবী দেবী নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী; তিনি বন্ধ্যা। প্রথমা পত্নী বসুধা দেবীর গর্ভেই প্রথমে পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র এবং পরে কন্যা গঙ্গা জন্ম গ্রহণ করেন। জাহ্নবী দেবীর কথায় আরও বুঝা যাইতেছে যে, মাতৃত্বেই নারী-জীবনের সার্থকতা, তাহা সাধনসিদ্ধা জাহ্নবী দেবীও ভুলিতে পারেন নাই এবং সেই মাতৃত্বের অভাবে সাধনসিদ্ধা হইয়াও নিজেকে ভাগ্যহীনা ভাবিতেছেন।

প্রাচীন বাংলায় ('শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' প্রভৃতিতে) পুংলিঙ্গে 'বাল্য' এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'বালী' ব্যবহৃত দেখিয়া, এবং আলোচ্য গ্রন্থে 'জাহ্নবী' স্থলে সর্ব্বত্র 'জাহ্নবা' দেখিয়া যদি কেহ ইঁহাকে পুরুষ বলিয়া ভ্রম করেন, তাহা হইলে তাঁহার লিঙ্গ-জ্ঞান প্রগাঢ় বলিতে হইবে। গঙ্গাবংশীয় জনৈক পণ্ডিত মহাশয় দীনেশ বাবুকে নানা প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বীরভদ্র গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র নহেন। এমন কি জাহ্নবী দেবী তাঁহার মতে পুরুষ। ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পৃঃ ৩৩৭—পাদটীকা)। দুঃখের বিষয় দীনেশ বাবু উক্ত পণ্ডিতের বহরওয়ালা যুক্তি ও প্রমাণ স্বগ্রন্থে লিপিবদ্ধ না করায়, আমরা তদ্-বিষয়ে অদ্যাপি অনভিজ্ঞ থাকিলাম। আলোচ্য গ্রন্থে জাহ্নবী দেবীকে সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞা, সাধনসিদ্ধা এবং ভগবৎপরায়ণা করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে সত্য, তিনি রামাঞি ও শচীনন্দন প্রভৃতির দীক্ষা দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে তাঁহার নারীত্ব সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছে। বস্ত্রাচ্ছন্ন দোলায় তিনি স্থানান্তরে গমনাগমন করিতেছেন, পটমণ্ডপ হইতে নদীতে স্নানার্থ গমনকালে বস্ত্রবেষ্টিত মার্গে তাঁহাকে যাওয়া-আসা করিতে হইয়াছে। বসুধা-জাহ্নবী সংবাদের পরও কি কোন সংশয় থাকিতে পারে? আরও গুরুতর প্রমাণ এই গ্রন্থেই রহিয়াছে। বংশীবদনের দেহত্যাগের পরই জাহ্নবী দেবী চৈতন্যদাসের গৃহে আসিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই কালে চৈতন্যদাসপত্নী দেবীর নিকট উপস্থিত হইলে, দেবী জাহ্নবী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। (পুথী, ১৫ক পৃঃ)। ইহার পর জাহ্নবীর স্ত্রীত্বে কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, ঠাকুর রামাঞি এই পরম ভাগবত পরিবারে সমাদরে গৃহীত হইয়া বাস করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের যে মুরলী বংশীবদনানন্দ রূপে অবতীর্ণ হন, তিনি পুনরায় রামাইরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই বৈষ্ণব-সমাজের বিশ্বাস। এই পুথীতেই উক্ত আছে;

'শ্রীনিত্যানন্দ সাক্ষাৎ যৈছে বিশ্বচন্দ্র রায়।
বংশীবদন তৈছে রামাঞি সর্ব্বে গায়।' (পুথী পৃঃ ১০খ)

মুরলীরই দ্বিতীয়াবতার রামাঞি ঠাকুরের কীর্ত্তিকলাপ আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই গ্রন্থের নাম 'মুরলী-বিলাস।'



আয় চাঁদ আয়

ঊনবিংশ শতাব্দীর স্পেনীয় সাহিত্য

—শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর বর্দ্ধণ

এস্‌প্রনথেদার পরবর্ত্তী কালে* ঊনবিংশ শতাব্দীর স্পেনীয় সাহিত্যের উত্তরসাধকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হোসে থোরিল্লার (Jose Zorrilla) নাম করা যাইতে পারে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিরোধান ঘটে। Recuerdos del tiemo viejo—অর্থাৎ অতীত দিনের স্মৃতি—নামে ইঁহার স্বরচিত একটি জীবনী আছে। ইহা পাঠে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে পারা যায়। প্রথম জীবনে রাজনীতিতে যোগদানের ফলে ইঁহাকে অনেক দুর্ভোগ পাইতে হয়। এবং তারই ফলে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহাকে সুদূর মেক্সিকো পর্য্যন্ত যাইতে হয়। কিন্তু সেখানে গিয়াও ভাগ্য পরিবর্ত্তন না ঘটায়, শূন্য হস্তে তাঁহাকে আবার স্বদেশেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। এইরূপ সংগ্রাম করিয়া অবশেষে জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া তিনি দুর্দিনের অন্ত সুদিনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

সাহিত্য-সাধনায় থোরিল্লা ছিলেন বরাবরই উদাসীন। তাঁহার রচনাগুলি পাঠে লেখকের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা এবং নিষ্ঠার অভাব সর্ব্বাগ্রে আমাদের চোখে পড়ে। এই ঔদাসীন্য এবং নিষ্ঠার অভাবই তাঁহাকে তাঁহার উপযুক্ত শ্রদ্ধার আসন হইতে অনেক নীচে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। তথাপি একাদিক্রমে বহুকাল পর্য্যন্ত ইঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি অটুট ছিল। ইহাই কি তাঁহার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় নহে? বহু দোষের মধ্যে ইঁহার সতেজ জাতীয়তাবোধ, প্রখর নাটকীয় দৃষ্টি, সহজ গীতি-প্রবণতা প্রভৃতি গুণগুলি উল্লেখযোগ্য। এইগুলিই তাঁহার রচনার বিশেষ গুণ। এই গুণগুলির জন্যই তাঁহার রচনা, একদিনের জন্য হইলেও, সমগ্র স্পেনীয় জাতিকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইঁহার অধিকাংশ রচনাই জাতীয় পুরা-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। জাতির পুরা-কাহিনীকে সহজ ভাবে এমন জীবন্ত করিয়া ফুটাইতে স্পেনীয় সাহিত্যে ইঁহার সমকক্ষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুরা-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত ইঁহার Leyenda de Alhamar, Granada, Leyenda del Cid প্রভৃতি রচনাগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিষয়-বস্তু এবং তাহার সজীব প্রকাশের জন্যই এই রচনাগুলি পাঠকের নিকট সমাদৃত। ইঁহার কয়েকখানা নাটকও আছে। তন্মধ্যে Don Juan Tenorio, El Zapatero y el Rey এবং Traidor inconfeso y martir প্রভৃতি নাটকগুলির নাম করা যাইতে পারে। ইঁহার নাটকগুলি মঞ্চস্থ অবস্থায় দর্শককে যেমন মুগ্ধ করে পাঠককে তেমন মুগ্ধ করে না। নাট্য-বিচারে ইহা রচনার গুণ হইলেও সাহিত্যের বিচারে তাহার খুব মূল্য নাই। নাট্য-জগতের ইঁহার দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম এস্থলে করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে একজন, আন্তোনিও গার্থিয়া গুতিএরেথ—Antonio Garcia Gutierrez—এবং অন্যজন, হুয়ান ইউজেনিও হার্তেনবুশ Juan Eugenio Hartzenbusch। ইঁহারা উভয়েই থোরিল্লার সম-সাময়িক। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত লেখকের El Trovador এবং পরবর্ত্তী নাট্যকারের Amantes de Ternel এই দুইটি নাটকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই উভয় নাটক দুইটিই সেই সময় যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। অদ্যাপি এই নাটক দুইটি স্পেনে নানাস্থানে অভিনীত হইয়া থাকে।

ইহার পর—মানুএল ব্রিতন দে লোস এরেরোস Manuel Briton de los Herroros-এর নাম করা যাইতে পারে। ইঁহাকে এই শতাব্দীর হাস্যরসের একজন শক্তিশালী লেখক বলা যাইতে পারে। ইঁহার রচনায় সর্ব্বত্রই হাস্যরসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ রচনাতেই লেখক তদানীন্তন সমাজের যথাযথ চিত্র ফুটাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যদিও লেখক সমাজের ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তথাপি এই ব্যঙ্গ-কৌতুকের অন্তরালে লেখকের প্রচ্ছন্ন বক্তব্যটিও বেশ সুস্পষ্ট। এই রচনাগুলির মধ্যে Escuela del Matrimonio-ই সর্ব্বোৎ-

* এই সন্দর্ভের প্রথমাংশ কার্ত্তিক (১৩৩৩) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ট। যদিও ইঁহার ব্যঙ্গ অনেকটা খোলাখুলি এবং মাঝে মাঝে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি লেখকের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং পদ্যরচনার শক্তি প্রশংসনীয়। এস্থলে এই সময়কার অপর একজন ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক কবি—Tomas Rodriguer Rubi-র নাম না করিলে অবিচার করা হইবে। কবি মানুয়েল ব্রিতনের উত্তরাধিকারী এবং অনেকটা সমসাময়িক। কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহার রচনাশক্তি বা রসজ্ঞান ব্রিতন অপেক্ষা খাটো নহে। El Tejado de Vidrio বা কাচের ছাদ এবং La Rueda de Fortuna বা ভাগ্যচক্র এই দুইটি রচনাই ইঁহার সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। প্রথম বইটিতে লেখক একটি সামান্য বিষয়ে এমন রসের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। পরবর্তী বইটি রাজনীতি এবং সামাজিক বিষয়কে ব্যঙ্গ করিয়া রচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেনীয় সাহিত্যে দুই চারজন মহিলা লেখিকা সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই সময়কার দুই একজন মহিলা লেখিকার সম্বন্ধে আমরা এ-স্থলে আলোচনা করিব। আভেলানেদা Gertrudis Gomez De Avellaneda-র জন্ম ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। জাতিতে স্পেনীয় না হইলেও এই মহিলা লেখিকা জীবনের অধিকাংশ সময় স্পেনে বাস করিয়া স্পেনীয় সাহিত্যের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য এই লেখিকা সর্ব্বত্রই স্পেনীয় সাহিত্যিক বলিয়া স্বীকৃত। একাধারে ইঁহার কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং নাটক প্রভৃতি সকল রকম রচনাই আছে। ইঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে Sab এবং Espatolino অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। দাসত্বের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্রথম উপন্যাসটি রচিত। উহাতে আছে নির্য্যাতিত শাসিতের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা এবং সকল প্রকার দাসত্ব এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখিকার করুণ কটাক্ষ। সমাজে নারীজাতির পরাধীনতা এবং তাহাদের প্রতি সমাজের অবিচার লইয়াই দ্বিতীয় উপন্যাসটি রচিত। এই উপন্যাসে লেখিকা বিবাহ-ব্যাপারে মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানাইয়াছেন। ইঁহার অন্য উপন্যাস Sra Avellaneda-ও নিছক নারীসুলভ উত্তেজনা এবং আবেগপূর্ণ। ইহাঁর উপন্যাসের বিষয়-বস্তুরাশি যেমন গতানুগতিক, লেখাও তেমনই মামুলি ধরণের। এই জন্যই এইগুলি পাঠক সাধারণের নিকট সেরূপ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। ইহা অপেক্ষা বরং ১৮৪১খৃঃ প্রকাশিত ইহাঁর প্রথম বয়সের লেখা কাব্যগ্রন্থে এবং Alfanso Murio ও Baltasar এই দুইটি নাটকে লেখিকার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই রচনাগুলির জন্যই এই মহিলা সাহিত্যিক খ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন বলা যায়। এই সঙ্গে এস্থলে আমরা আর একটি মহিলা কবির নাম করিতে পারি। ইহাঁর নাম কারোলিনা কোরোনাদো—Carolina Coronado। ইহাঁর অধিকাংশ কবিতাই একটু 'মিষ্টিক্' ধরণের। কিন্তু তথাপি ইহাঁর কাব্যপ্রতিভা নাই, একথা বলা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহিলা লেখিকা দে ফাবের Cecilia Bohl de Faber সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর স্পেনীয় লেখিকাদের মধ্যে ইহাঁকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বলিয়া মনে হয়। ইহাঁর জীবন একটু স্বতন্ত্র ধরণের; এই সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানিয়া রাখা ভাল। তাহাতে সাহিত্যিক হিসাবে ইহাঁকে জানিতে কতকাংশে সুবিধা হইবে। স্পেনীয় সাহিত্যের সাধক হইলেও জার্ম্মান পিতার ঔরসে লেখিকার জন্ম হয়। লেখিকা পর পর তিন বার বিবাহিত হইয়াও সুখী হইতে পারেন নাই। দন কিহোতের দেশে একটি পল্লীতে ইহাঁর জন্ম এবং সেই পল্লীতেই ইহাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। এই লেখিকার ছদ্ম নাম ছিল কাবালেরো Fernan Caballero; এই নামই অধিক পরিচিত। ইহাঁর প্রথম উপন্যাস La Goirota স্পেনীয় সাহিত্যের একটি সম্পদ্ বিশেষ। স্পেনের বাহিরে অন্যান্য দেশে এই বইটির মত খুব অল্প স্পেনীয় লেখকের বই সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। উপন্যাসটি মোটের উপর মন্দ নয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ত্রুটিশূন্য এ কথা বলিতে পারা যায় না। যেখানেই লেখিকা পল্লী ছাড়িয়া শহরের কথা, বা আধুনিক শহরে জীবনের কথা লিখিতে গিয়াছেন, সেইখানেই ব্যর্থ হইয়াছেন। অধিকন্তু লেখিকার বক্তৃতা করার অভ্যাস এত বেশী যে, ইহার পরবর্তী লেখাগুলিতে শুধু কতকগুলি উপদেশ এবং বাণী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু যখনই

পল্লীর সুখ-দুঃখের কথা লিখিতে গিয়াছেন তখনই চমৎকার হইয়াছে। শৈশবের স্মৃতি-সহযোগে পল্লীর চিত্র ইহাঁর লেখায় বেশ জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে।

এইবার আমরা উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম নাট্যকার এবং কবি, আয়ালার Adelardo Lopez De Ayalar সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইঁহার নাটকগুলি পড়িলে মনে হয়, নাট্যকার কাহিনী রচনা এবং ঘটনা সন্নিবেশ করিতে যেমন নিপুণ ছিলেন, চরিত্রসৃষ্টিতে সেইরূপ নিপুণ ছিলেন না। ইঁহার নাটকের চরিত্রগুলি অধিকাংশই গতানুগতিক ধরণের। কোনটিই মনের উপর গভীর রেখাপাত করিতে পারে না। তথাপি মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ এবং হাস্যরস সৃষ্টি করিবার নিজস্ব ভঙ্গিটুকু উপভোগ্য। কি কবিতায়, কি নাটকে লেখকের যে বেশ একটি সুর এবং ছন্দের কান আছে ইহা বেশ বুঝা যায়। ইঁহার রচনার মধ্যে 'Tanto por Ciento Consuelo—এই গুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করা যায়।

এই সময় হইতে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেনে নাট্য-সাহিত্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে বাউস Manuel Tamayo Baus নাট্যকার হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহাঁকে এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র আঠার বৎসর বয়সে ইঁহার প্রথম নাটক Juana de Arco প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি বিখ্যাত জারমান লেখক শিলারের অনুকরণে রচিত। ইহার পর ১৮৫৩ খৃঃ ইঁহার দ্বিতীয় নাটক Virginia প্রকাশিত হয়, ইহাও Alfieri-র প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এই দুইটির কোনটিতেই আমরা লেখকের সৃজনী প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় পাই না। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে এ স্থলে আর আলোচনা করিব না। ১৮৬৭ খৃঃ ইঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক Un Drama Nuevo প্রকাশিত হয়। এই নাটকখানিতে নাট্যকারের যথেষ্ট শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাটকখানি স্পেনীয় সাহিত্যের একটি 'ক্ল্যাসিক্যাল' বা বিশেষ যুগ নির্দ্দেশক নাটকরূপে পরিগণিত। বাউস-এর পরিবারের অনেকেই শ্রেষ্ঠ নট ছিলেন। এই জন্যই হয়তো এই নাট্যকারের পক্ষে এইরূপ নাট্য প্রতিভা লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল।

এই সময়ে কারাসকো Jose Selgas y Carrasco কবিখ্যাতি লাভ করেন। ইঁহার কবিতায় মেয়েলি ভাব অত্যন্ত বেশী। কিন্তু সহজ এবং সনাতন ভাবধারা খুব বেশী থাকায় ইহাঁর কবিতাগুলি সে সময়ে সাধারণের নিকট বেশ সমাদর লাভ করে, কিন্তু বর্ত্তমান কাব্যের বিচারে এই কবিতাগুলির খুব বেশী মূল্য দেওয়া যায় না।

এই সময়ে আমরা অন্যতম কবি বেকার-এর Gustavo Adolfo Becquer-এর সাক্ষাৎ পাই। তিনি এ-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। ইংরেজ কবি কীট্‌স্ ও শেলীর মত বেকার ছিলেন স্বল্পায়ু। ১৮৩৬ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয় এবং ১৮৭০ খৃঃ মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন। কিন্তু এই অল্প দিনেই বেকার স্বীয় সাধনা দ্বারা স্পেনীয় কাব্যকে যথেষ্ট সম্পদশালী করিয়া গিয়াছেন। বেকার জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন। এ স্থলে ইহাঁর দুঃখময় জীবনের কাহিনীর কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে আমরা এই কবিকে সম্যক্ বুঝিতে পারিব না। মাত্র দশ-বৎসর বয়সে ইঁহার বাপ-মা মারা যান। সেই হইতে এই অসহায় অনাথ বালক জনৈকা মহিলা কর্ত্তৃক লালিত-পালিত হয়। সংসারে আর দশজনের মত ভাল ছেলে হইয়া চলিলে ইনি হয় তো উক্ত মহিলার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু কবি হওয়া যাহার অদৃষ্টলিপি সংসারে সুখী হওয়া তাহার হয়তো নিয়তি নয়। তাই উক্ত মহিলার নির্দ্দেশ ক্রমে বেকার যখন পরিণত বয়সে ব্যবসায় কিম্বা চাকুরীর কোন বাঁধা-ধরা পন্থা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন তাঁহাকে স্বীয় অদৃষ্ট লইয়া পথে বাহির হইতে হইল। আঠার বৎসর বয়সে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় ইনি মাদ্রিদ্ শহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া যাহাও একটা ছোটখাটো চাকুরী জুটিল, তাহাও স্বীয় কবিসুলভ খামখেয়ালী স্বভাবের জন্য কিছুদিনের মধ্যেই চলিয়া গেল; অনন্যোপায় হইয়া যখন সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইল। El Contemporaneo এবং El Museo প্রভৃতি সাময়িক পত্রে বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ লিখিয়া কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে লাগিল। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত ইহাই ছিল তাঁহার জীবনধারণের একমাত্র সম্বল।

ইঁহার গদ্য এবং পদ্য রচনা একত্রে Rimas নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি পর পর তিন খণ্ডে প্রকাশিত। স্পেনীয় সাহিত্যে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান বলা যায়। কি গদ্য কি পদ্য রিমাস-এর প্রত্যেকটি রচনা ব্যথার সুরে গাঁথা, দৃষ্টান্ত স্বরূপ রিমাস-এর ইংরেজী অনুবাদ হইতে একটি কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

Sighs are but air and they the air rejoin ;
Tears are but water ; to the sea they go !
Pray tell me whither love goes when forgotten ?
O, woman, dost thou know ?

বাংলায় ইহার অনুবাদ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :

বায়ু হয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস বায়ুতে মিলায় ;
জল হয়ে নামে অশ্রু চোখে, মিশে যায় সাগরের জলে।
বলিবে কি, বিস্মৃত হইলে প্রেম রহে সে কোথায় ?
ওগো নারী, তুমি কি তা জানো—দিতে পার বলে ?

রিমাস-আর একটি কবিতা উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।

In a corner obscure of the parlor,
By its mistress perchance there forgotten,
Wrapped in silence, with dust mantled over,
The harp could be seen.
In its cords what sweet notes there lay dormant
As the bird mid the branches may slumber,
Still awaiting the snowy white hand,
So killed to entice them !
And, alas ! did I muse, o, how often.
In the depths of the soul slumbers genius,
And awaits the great voice, as did Lazarus,
That shall bid it arise and go onward !

বাংলা অনুবাদ :—

প্রাসাদ-কক্ষের কোণে হ'য়ে অগোচর,
হয় ত বা ভুল করে ফেলে গেছে হায়
পড়ে আছে শব্দহীন ধুলায় ধূসর
বীণাখানি ঐ দেখা যায়।

তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তার কত সুর সুপ্ত হ'য়ে আছে,
যেমন বিহগ রহে সুপ্ত হ'য়ে বৃক্ষ-শাখামাঝে।
প্রকাশের প্রতীক্ষায় হিমানী পরশে যার
দুটি জেগে আসে আশ্বাস।

শুনিয়াছি বহুদিন সঙ্গীতের সুরে
প্রতিভা অন্তর তলে রহিয়ে মগন
আছে মহা-আহ্বানের প্রতীক্ষায়, লাজারাস আছিল যেমন
সে আহ্বানে সেই সুর জেগে উঠে চলিবে সুমুখে।

পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য কবিতাগুলি ছন্দ ইত্যাদি যথাযথ ভাবে রাখিয়া বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিলাম। উপরোক্ত উদ্ধৃত কাব্যাংশ হইতে বেকার-এর শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও বেকার-এর কতিপয় কবিতায় কবি হাইনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তথাপি কাব্যে এই অজানা রহস্য-মিশ্রিত ব্যথার সুরটুকু বেকার-এর নিজস্ব সম্পদ্।

ইহার Los Ojos Verdes, El Rayo de Luna (বা চন্দ্রালোক) এবং La Rosa de Pasion প্রভৃতি লেখায়ও সেই ব্যথার সুরই ধ্বনিত। প্রথমটিতে আছে সবুজাক্ষী জলকুমারীর জন্য নায়ক ফেরনান্দোর (Fernando) প্রাণ-ত্যাগ। দ্বিতীয় El Razo de Luna-র নায়ক Mauri-ques-ও উন্মাদ। তাহার উন্মত্ততার সকরুণ কাহিনী লইয়াই ইহা লিখিত। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় বেকার-এর লেখা একটু করুণ-রসাত্মক; শুধু তাই নয়, অধিকন্তু ইঁহার কাব্য এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মধ্য দিয়া যেন এক অজানা মায়া-লোক সৃষ্টি করে। তাই ইঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে মনে হয়, যেন তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছি।

এইবার আমরা লারার Mariano Jose De Larra-র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম। বেকার-এর অপেক্ষাও লারা ছিলেন অধিক স্বল্পায়ু। মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। ফরাসী দেশে ইঁহার জন্ম এবং তথায় বাল্যকাল অতিবাহিত হওয়ায় দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্তও লারা স্পেনীয় ভাষা কিছুই জানিতেন না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্পেনের দেশীয় ভাষা ও প্রচলিত বিশেষ বাক্-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। যৌবনের প্রারম্ভে ভালাদোলিদ্-এ আইন পড়িতে যাইয়া লারা একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ায় তাঁহার আর লেখা-পড়া হইল না। সুতরাং সাহিত্যের শরণাপন্ন হইলেন।

ইহাঁর Figaro এবং Juan Perer de Munquia স্পেনীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। ইহাতে লেখকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং ব্যঙ্গ করিবার সতেজ এবং অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই দিক্ দিয়া এ যুগে লারার সমকক্ষ নাই বলিলেই চলে। স্পেনীয় রাজনীতি, জাতির চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উক্ত লেখাগুলিতে লেখক জাজ্বল্যমান করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অসীম সাহসের সহিত লেখক এইগুলির উপর বিদ্রূপের কশাঘাত করিয়াছেন এবং প্রয়োজন-মত অপ্রিয় হইলেও সত্য বলিতে ত্রুটি করেন নাই। লারার লেখায় ছত্রে ছত্রে আমরা তাঁহারই পরিচয় পাই। এবং ইহাই লারার সত্যকার পরিচয়।

এই শতাব্দীর অন্যান্য প্রাবন্ধিকদের মধ্যে কাল্দেরন Serafia Estebauer Calderon এবং রোমানস-এর Ramon De Mesonero Romanos—নাম করা যাইতে পারে। প্রথমোক্ত লেখকের লেখায় দুর্ব্বোধ্য দেশীয় শব্দ-সংখ্যা বড় বেশী, অধিকন্তু লেখকের ব্যক্তিত্ব-বোধ অত্যন্ত প্রকট। এই জন্যই সুখপাঠ্য নহে। পড়িতে গেলে কেমন যেন বিরক্তি ধরে।

দ্বিতীয় লেখককে অনেকেই লারার শিষ্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, ইঁহার লেখায় লেখকের নিজস্ব শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁর রচিত Escenas Matrifenses উল্লেখযোগ্য।

ইহা অপেক্ষাও রোমানস্-এর Memorias de un Setenton বইখানা উৎকৃষ্টতর বলিয়া আমাদের মনে হয়। স্মৃতি-পুস্তক হিসাবে ইহা এ-শতাব্দীর উৎকৃষ্টতম গ্রন্থ বলা যায়। এই শতাব্দীতে ধর্ম্মবিষয়ক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনায় কর্তে'স্ Juan Druoso Cortes এবং পাদরী উস্পিয়া Jaime Bal nces y Uspia এই দুই প্রাবন্ধিকের নাম করা যায়। কর্তে'স্-এর Ensayo Sobre el Catolicismo, el Liberelismo y el Socialismo এবং দ্বিতীয় প্রাবন্ধিক উস্পিয়া-এর রচিত Protestantismo Camparado en el Catolicismo প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। দুই প্রাবন্ধিক পরস্পর ধর্ম্মমত-বিরোধী।

এই সব প্রবন্ধের মধ্য দিয়া ইঁহারা উভয়ের ধর্ম্মমতকে সমর্থন করিয়া বাদানুবাদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে এই সব প্রবন্ধগুলিও সহায়তা করিয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই শতাব্দীর শেষ ভাগে কথা-সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া ছোট গল্পের একটু উন্নতি হয়। ছোট গল্প লেখক হিসাবে Pedro Antonio De Alarcon, আলারকন-এর খ্যাতি আছে। পল্লীজীবনের চিত্র অঙ্কনে ইহাঁর সমকক্ষ শিল্পী আর বড় দৃষ্ট হয় না। El Sombrero de Tres Picos ইহাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প-গ্রন্থ।

এতদ্ব্যতীত ইঁহার Historietas Nacionales এবং Diario de un Testigo de la Guerra ei Africa প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও উনবিংশ শতাব্দীর স্পেনীয় কথা-সাহিত্যের নিদর্শন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই গদ্যময় মরুভূমিতে কাব্যের মরূদ্যানকে জিয়াইয়া রাখিয়াছিলেন এক মাত্র কবি কম্পোয়ামোর Ramon de Campoamor। তিনি এ শতাব্দীর শেষ কবি। ইহার কবিতায় দর্শনের একটু আঁচ পাওয়া যায়। Doloras ইঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। ইহাঁর কবিতাগুলি যেন মানব-মনের খণ্ড খণ্ড ছবি। ইঁহার দুই একটি কাব্য-কণিকা আলোচনা সমাপ্ত করিতেছি। কবি বলিতেছেন—

In a song I will explain
Our life's eternal wheel :
Sinning, doing penance real,
And doing both again.

বাংলা অনুবাদ—

একটি সঙ্গীতে আমি করিব প্রচার
জীবনের চিরন্তন চক্র যার পাকে ঘুরে মরি :
ক্ষণে করি পাপ—ক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করি,
পাপ আর প্রায়শ্চিত্ত, দুই তবু করি বার বার।

আর এক স্থানে, কবি কল্পনা-চক্ষে যৌবন ও প্রেমের ভবিষ্যৎ পরিণতি ও সর্ব্বগ্রাস্ত রূপ দেখিয়া নিজেও হতাশ হইতেছেন, আমাদেরও হতাশ করিয়া তুলিতেছেন।

কবি দেখিতেছেন :

Now twenty years have past ; again he is here
And meeting, they exclaim, both she and he :
Good Lord ! is this the man I once held dear ?
Good God ! and can this woman here be she ?

বাংলা অনুবাদ :

বিশটি বছর চলে গেছে ফিরিয়া সে এসেছে আবার
প্রেমিক প্রেমিকা দুহঁ মিলনে উঠিল দোঁহে বিস্ময়ে উচ্চারি,
নারী কহে, "হায় প্রভু! এই কি সে প্রিয়তম পুরুষ আমার?"
নর কহে, "হে বিধাতা! এই কি সে প্রিয়া মোর
প্রিয়তমা নারী?"

১৯০১ খৃষ্টাব্দে কবির মৃত্যু হইল। বিংশ শতাব্দীর প্রভাত হইল। আমাদের কথাও ফুরাইল।

চেয়ে দেখ পূর্ব্ব ইতিহাস

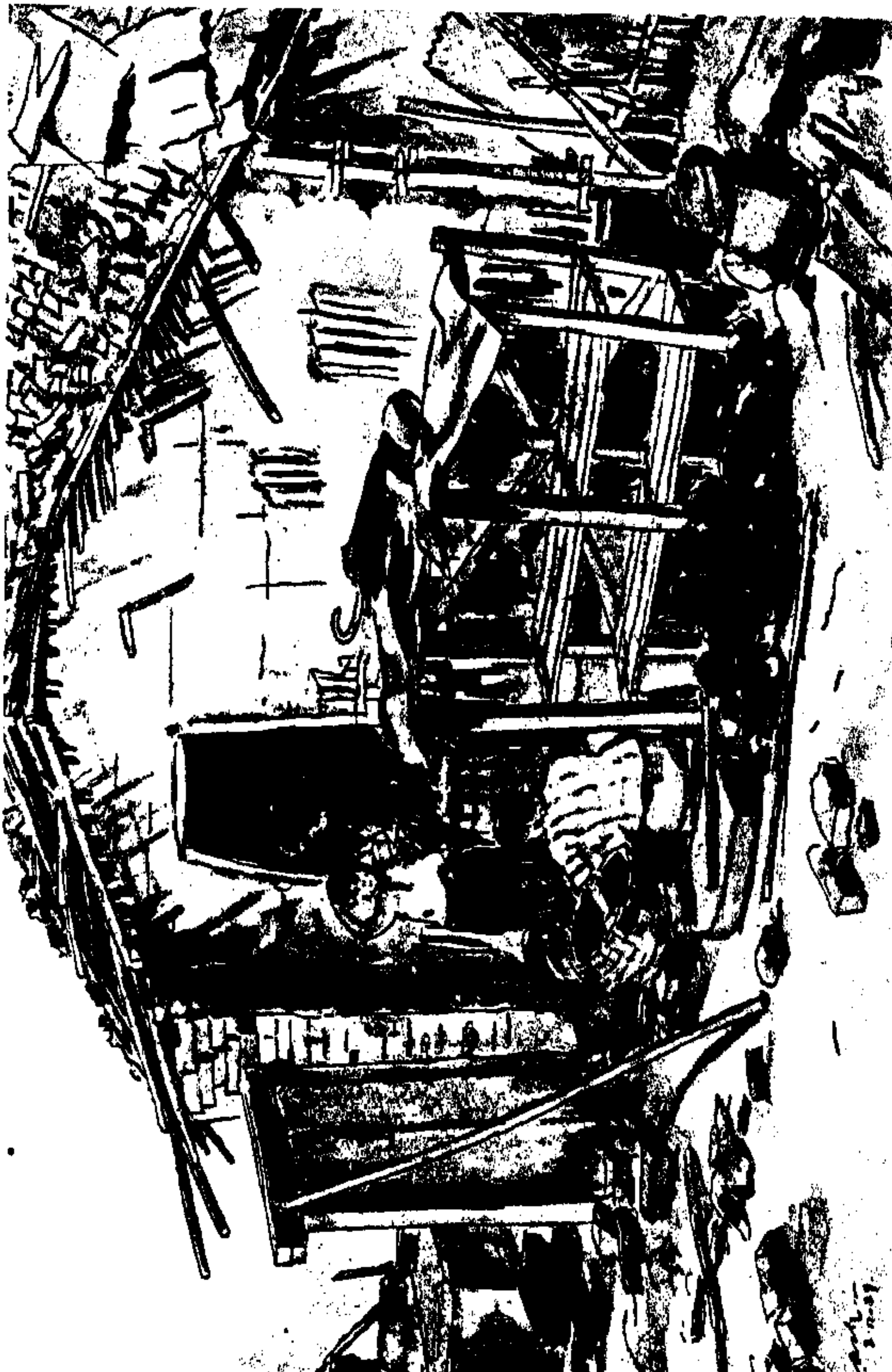
—শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ

অসত্যের অন্ধকারে আপনারে রাখিয়াছ ঢাকি।
তব সত্য ইতিহাস তোমারেই দিয়ে গেল ফাঁকি॥
ভুলে গেলে কে আনিল আদি যুগে মানব-সভ্যতা।
সর্ব্বদিকে প্রচারি সত্য তব বাণীর সত্যতা॥
সাম্যবাদ স্বাধীনতা সে-বাণীর অক্ষরে অক্ষরে।
উজ্জ্বল ভাস্কর সম জ্বল জ্বল তোমারি সাক্ষরে॥
অতীতের পানে চাহ ভাবিও না দূর ভবিষ্যৎ।
অতীত গৌরবময় আদি যুগে অনন্ত শাশ্বত॥
ত্যাগে তৃপ্তি ঢেলে দিয়ে বলি দিয়ে ভোগ-বাসনায়!
স্বকাম অক্ষয় সুখ চেয়েছিলে বিশ্ব কামনায়॥

তোমারি প্রণবধ্বনি চরাচর করিল আকুল।
সর্ব্ব জাতি নতশির ঘিরি তব জ্ঞান-বেদীমূল॥
দেবত্ব আসিল নামি মর্ত্তপুরে ওঙ্কারে তোমার।
তুমি দিলে মানবেরে ধর্ম্মে কর্ম্মে বেদে অধিকার॥
অমৃতের উৎস ঝরে ব্যাধবিদ্ধ বিহঙ্গ ব্যথায়।
আলিঙ্গিলে সাম্যবাদী চণ্ডালেরে বাঁধি মিত্রতায়॥
সৃজনের আদি তুমি বছরের যেমতি বৈশাখ
তোমার অমোঘ তেজে জলশায়ী বিশাল মৈনাক॥
অগ্নিময়ী মহাশক্তি অনিমিষে নাশিল দানবে।
তোমার সাহায্য লভি পুরন্দর বিজয়ী আহবে॥

দুস্তর সাগর বাঁধি বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব কৌশলে।
মৃতে সঞ্চারিলে প্রাণ তব সঞ্জীবনী মন্ত্র বলে॥
অমর নামিত মর্ত্তে হে তেজস্বী তোমার আহ্বানে।
নিনাদিত মধুমিত দশদিক্ তব সাম-গানে॥
তোমারি ত্যাগের বাণী নৃপতিরে সাজাইল ঋষি।
মরতেও চিরশান্তি অমরতা রয়েছিল মিশি॥
গরুড়ের বংশধর অমৃতের চির অধিকারী।
দেবভোগ্য স্বর্গ-সুধা বীর্য্যবলে এনেছিল কাড়ি॥
অফুরন্ত সুখ শান্তি সুদীর্ঘ জীবন সবলতা।
নীরোগ অটুট স্বাস্থ্য ভারতের চির কল্পলতা॥

নিজ হাতে রূপেছিলে দিয়েছিলে সুখের ভাণ্ডার।
মরণের পরপারে বেঁধে দিয়ে মুক্তির কাণ্ডার॥
সর্ব্বহারা আজি তুমি পরাধীন নিস্তেজ দুর্ব্বল।
কোথা গেল শান্তি সুখ কে কাড়িল পেতে মায়াছল॥
ছলনার যূপকাষ্ঠে আপনারে দিলে বলিদান।
পিপাসায় ফাটে বুক মৃতপ্রায় ওষ্ঠাগত প্রাণ॥
দিন দিন হীনবল দীন তুমি কাঁধে ভিক্ষাঝুলি।
নিত্য পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষালব্ধ দাও মুখে তুলি॥
তোমারি আদর্শ আজি শিলাময়ী অহল্যার মত।
নীরবে কাটাবে কাল যুগে যুগে পর পদাহত॥
নিরখি দুর্দ্দশা তব সর্ব্ব জাতি করে উপহাস।
হে ভারত চেয়ে দেখ তব সত্য পূর্ব্ব ইতিহাস॥



"लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी"

বঙ্গশ্রী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৭

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

গীতা-বিচার (৫)

মোক্ষ-যোগ-বিচার*

গত সংখ্যায় আমরা "মোক্ষ" শব্দের মৌলিক অর্থাৎ সামান্যার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ঐ-সংখ্যার শেষ ভাগে বলা হইয়াছে যে, ইহার পর আমরা "মোক্ষ-যোগ ও মোক্ষ-ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং মোক্ষ-লাভ করিবার উপায় কি এবং জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহে মোক্ষ-লাভ করিবার প্রয়োজনীয়তা কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।"

মোক্ষ-যোগ ও মোক্ষ-ধর্ম্ম কাহাকে বলে?

"মোক্ষ-যোগ" ও "মোক্ষ-ধর্ম্ম" কাহাকে বলে তাহার ধারণা করিতে হইলে "মোক্ষ" শব্দের মৌলিক অথবা সামান্যার্থ কি, তাহা সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগ্রত রাখিতে হইবে।

আমরা গত সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে, "মোক্ষ" শব্দের সামান্যার্থ—

"স্বকীয় কর্ম্ম-শক্তি সম্বন্ধে যাবতীয় সত্য প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণুর মধ্যে যে যে উপলব্ধি ও জ্ঞান অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই উপলব্ধি ও জ্ঞান।"

"মোক্ষ"-শব্দে বাস্তবতঃ কি বুঝিতে হইবে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া আমরা গত সংখ্যায় যাহা যাহা বলিয়াছি তাহার প্রত্যেক কথাটী যথাযথভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, চর-জীবের কর্ম্ম-শক্তি প্রস্ফুটিত হয় তাহার দশটী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার কার্য্যে। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, চর-জীবের কর্ম্ম-শক্তি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশ—যে দশটী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার কার্য্যে চর-জীবের কর্ম্ম-শক্তি প্রস্ফুটিত হয়, সেই দশটী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার

অস্তিত্ব চরজীব পায় কোথা হইতে এবং কোন্ শৃঙ্খলায় তাহার তথ্য লইয়া। দ্বিতীয়াংশ—যে দশটি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার কার্য্যে চর-জীবের কর্ম্ম-শক্তি প্রস্ফুটিত হয়, সেই দশটী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা কলুষিত হয় কি করিয়া তাহার কথা লইয়া। চর-জীবের কর্ম্ম-শক্তি-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত বিজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইবার জন্য সচেষ্ট হইল দেখা যাইবে যে, স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণু-সমূহ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে চর-জীবের কর্ম্ম-শক্তি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান নির্ভুলভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব-যোগ্য নহে। স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণু-সমূহ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিবার নাম "মোক্ষ-লাভ" করা।

স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণু-সমূহ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, চর-জীবের অবয়ব প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত। একটী অংশ বায়বীয়, দ্বিতীয় অংশটী জলীয় এবং অপর অংশটী কঠিন। কঠিন অংশের মধ্যে জলীয় অংশ এবং বায়বীয় অংশ উভয়ই বিদ্যমান আছে; জলীয় অংশের মধ্যে কেবল মাত্র বায়বীয় অংশ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু কঠিন অংশ বিদ্যমান নাই; আর বায়বীয় অংশের মধ্যে জলীয় ও কঠিন অংশ এই উভয়ই বিদ্যমান নাই। চরজীবের মেদ, অস্থি, বসা, মাংস ও চর্ম্ম লইয়া তাহার কঠিন অংশ। অবয়বস্থ তেজ ও রস লইয়া তাহার জলীয় অথবা তরলাংশ। আর বায়ু, অম্বু ও বহ্নি লইয়া তাহার বায়বীয়াংশ। যাঁহারা স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণুর উপলব্ধি গ্রহণে সচেষ্ট হন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে অবয়বের উপরোক্ত ত্রিধা-বিভাগ যথাযথভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। অবয়বের উপরোক্ত ত্রিধা-বিভাগ যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, চর-জীবের দশটী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার উদ্ভব অথবা উৎপত্তি তাহার অবয়বের বায়বীয় অংশের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর ঐ-দশটী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার কলুষতা তাহার অবয়বের জলীয় এবং কঠিন অংশের সহিত ওত-প্রোত ভাবে জড়িত। অবয়বের বায়বীয় অংশের কার্য্যের নাম সংস্কৃত ভাষায় "ঈশ্বরে"র-কার্য্য। আর, অবয়বের জলীয় ও কঠিন অংশের কার্য্যের নাম সংস্কৃত ভাষায় 'মায়া'র-কার্য্য। যাঁহারা কল্প-সূত্রের ষট্‌-ত্রিংশৎ তত্ত্বের এবং কল্প-সূত্রের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অনুধাবনে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা 'ঈশ্বর' ও 'মায়া'-সম্বন্ধীয় আমাদিগের উপরোক্ত কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। "ঈশ্বর-তত্ত্ব" ও "মায়া-তত্ত্ব" যথাযথভাবে অনুমান করিতে না পারিলে "মোক্ষ-যোগ" ও "মোক্ষ-ধর্ম্ম" কাহাকে বলে তাহা সর্ব্বতোভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। মোটামুটী ভাবে বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, "ঈশ্বর-তত্ত্ব" লইয়া "মোক্ষ-যোগ", আর "মায়া-তত্ত্ব" লইয়া "মোক্ষ-ধর্ম্ম"।

বেদাঙ্গান্তর্গত ব্যাকরণানুসারে "মোক্ষ-যোগ" ও "মোক্ষ-ধর্ম্ম" এই দুইটী শব্দই সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তৎ-পুরুষ-সমাস-নিষ্পন্ন পদ ও প্রাতিপাদিকসমূহের অর্থ-বৈশিষ্ট্য কিরূপ হয়, তাহা যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে "মোক্ষ-যোগ" ও "মোক্ষ-ধর্ম্ম" এই দুইটী শব্দের অর্থ বুঝিয়া লওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়।

ব্যাকরণের সমাস ও সমাস-শক্তি বুঝিয়া লইয়া ষট্‌-ত্রিংশৎ তত্ত্বের 'ঈশ্বর-তত্ত্ব' ও 'মায়া-তত্ত্ব' অনুমান করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ যখন স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণুর কার্য্য উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হইয়া তাহার দশটী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার উদ্ভব অথবা উৎপত্তি হয় কি করিয়া, তাহা

উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়, তখন সে "মোক্ষ-যোগে" প্রবিষ্ট হইয়াছে ইহা বুঝিতে হয়। আর, স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণুর কার্য্য উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হইয়া দশটী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা কলুষিত হয় কি করিয়া তাহা যখন বোধ-গম্য হয়, তখন মানুষ মোক্ষ-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে ইহা বুঝিতে হয়। "মোক্ষ-যোগ" ও "মোক্ষ-ধর্ম্ম" কাহাকে বলে, তাহা বুঝিবার জন্য সচেষ্ট হইলে দেখা যাইবে যে, "মোক্ষ-যোগ" অনুমান করিতে না পারিলে "মোক্ষ-ধর্ম্ম" প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না এবং "মোক্ষ-ধর্ম্ম" প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে, "মোক্ষ-যোগ" প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। ইহারই জন্য মহাভারতে প্রথমতঃ ভীষ্ম-পর্ব্বে "মোক্ষ-যোগে"র কথা বলা হইয়াছে এবং তাহার পর শান্তি-পর্ব্বে "মোক্ষ-ধর্ম্মে"র কথা বলা হইয়াছে। যাঁহারা যথাযথভাবে মহাভারতের ছাত্রত্ব লাভ করিবার সৌভাগ্যশালী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ভীষ্ম-পর্ব্বে যে মোক্ষ-যোগের কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা চরজীবের দশটী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার উদ্ভব অথবা উৎপত্তি হয় কি করিয়া তৎসম্বন্ধে কেবলমাত্র অনুমান করা সম্ভব হয়, প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। ঐ-সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় দেখান হইয়াছে চারিটী বেদে। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে যে "মোক্ষ-ধর্ম্মে"র কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, একমাত্র ঐ কথাগুলির সহায়তায় চরজীবের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা কলুষিত হয় কেন এবং কি করিয়া, তাহা সর্ব্বতোভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয়।

অনেকে মনে করেন যে, গীতা মহাভারতের প্রক্ষিপ্তাংশ। "মোক্ষ-যোগ" ও "মোক্ষ-ধর্ম্মে"র মধ্যে কি সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, কেবলমাত্র তাহা বুঝিতে পারিলেই গীতা যে মহাভারতের প্রক্ষিপ্তাংশ নহে, পরন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয়াংশ তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হওয়া যায়।

মোক্ষলাভ করিবার উপায় কি ?

"মোক্ষ-যোগ" ও "মোক্ষ-ধর্ম্ম" কাহাকে বলে, তাহা যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মোক্ষলাভ না করিতে পারিলে অর্থাৎ স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণুর কার্য্য সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট না হইলে, মোক্ষ-যোগ ও মোক্ষ-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর হয় না।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণুর কার্য্য সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট না হইলে (অর্থাৎ মোক্ষ পরায়ণ না হইলে) স্বকীয় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার কার্য্য উৎপত্তি হয় কি করিয়া, তাহা উপলব্ধি করা (অর্থাৎ মোক্ষ-যোগ লাভ করা) এবং উহা কলুষিত হয় কি করিয়া, তাহা উপলব্ধি করা (অর্থাৎ মোক্ষ-ধর্ম্ম লাভ করা) সম্ভব হয় না।

কি উপায়ে মোক্ষ লাভ করিয়া মোক্ষ-যোগে প্রবিষ্ট হইতে পারা সম্ভব হইতে পারে, তাহার পন্থা ব্যাসদেব তাঁহার গীতার মোক্ষ-যোগ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখাইয়াছেন। আগেই বলিয়াছি যে, ব্যাসদেব মোক্ষ-লাভ করিবার এবং মোক্ষ-যোগে প্রবিষ্ট হইবার পন্থা সম্বন্ধে গীতায় যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন সেই সমস্ত কথার সহায়তায় ঐ দুইটী বিষয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভবযোগ্য বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হওয়া সম্ভব-যোগ্য নহে। মোক্ষপরায়ণ হইয়া মোক্ষ-যোগে প্রবিষ্ট হইবার কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইতে হইলে চারিটী বেদের কতকগুলি মন্ত্রের অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কি করিয়া মোক্ষ-লাভ করায় ও মোক্ষ-যোগে প্রবিষ্ট হইবার কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইতে হয়, তাহার সম্পূর্ণ পন্থা গীতায় দেখান হয় নাই,

বটে, কিন্তু গীতার মোক্ষ-যোগ অধ্যায়ে ঐ তুইটী বিষয়ে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহার কোন কথাটী বাদ দিয়া কেবলমাত্র বেদের মন্ত্রের সহায়তায় সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করা সম্ভবযোগ্য নহে।

ব্যাসদেবের মতে প্রাকৃতিক কারণে সমস্ত মানুষের সামর্থ্য ঠিক ঠিক একরূপ হয় না। কেহ কেহ জন্মাবধি শারীরিক পরিশ্রমে নিপুণতা লাভ করেন, আবার কেহ কেহ মানসিক পরিশ্রমে নিপুণতা লইয়া জন্মলাভ করেন। মানুষের সামর্থ্য-বিষয়ে এতাদৃশ বিভিন্নতা বিদ্যমান থাকিলেও কোন মানুষই অপর কোন মানুষের ঘৃণার্হ নহেন, এবং কোন মানুষই নিজেকে অন্য কোন মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে যুক্তি-সঙ্গতভাবে অধিকারী নহেন, কারণ মানব-সমাজের সংরক্ষণ ও পরিচালনা বিষয়ে মানসিক অথবা মস্তিষ্কের পরিশ্রমনিপুণতা যেরূপ প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আবার শারীরিক পরিশ্রমনিপুণতারও প্রয়োজন আছে। কর্ম্মকারের হস্তে কুম্ভকারের দায়িত্ব অর্পণ করিলে কার্য্য-সিদ্ধি-বিষয়ে যেরূপ সংশয়ের উদ্ভব হইয়া থাকে, সেইরূপ যিনি প্রকৃতিগত ভাবে শারীরিক পরিশ্রমের নিপুণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার হস্তে মানসিক পরিশ্রমের কার্য্যের দায়িত্ব অর্পণ করিলে সুফল লাভ করা সন্দেহজনক হয়। কর্ম্মকারের হস্তে কর্ম্মকারের কার্য্যভার এবং কুম্ভকারের হস্তে কুম্ভকারের কার্য্যভার অর্পণ করিলে সিদ্ধিলাভ করা যেরূপ অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিত হয়, সেইরূপ যাঁহারা প্রকৃতিগতভাবে জন্মাবধি শারীরিক পরিশ্রমে নিপুণতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের হস্তে শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যভার অর্পণ করিলে এবং যাঁহারা প্রকৃতিগত ভাবে জন্মাবধি মানসিক পরিশ্রমের নিপুণতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের হস্তে মানসিক পরিশ্রমের কার্য্যভার অর্পণ করিলে মানব-সমাজের সংরক্ষণ ও পরিচালনা বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুগম হইয়া থাকে। উপরোক্ত সত্যের উপর একদিন মানব-সমাজের সর্ব্বত্র ভারতীয় ঋষির চাতুর্ব্বর্ণ্য (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এবং শূদ্র-বিভাগ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রকৃতিগত কারণে এই চারিবর্ণের মানুষের নিকট হইতে চারিশ্রেণীর কার্য্য-সাফল্য আশা করা যাইত। কোন্ বর্ণের মানুষের নিকট হইতে কোন্ শ্রেণীর কার্য্য-সাফল্য আশা করা যাইত, তাহা ব্যাসদেব তাঁহার গীতার মোক্ষ-যোগাধ্যায়ের ৪২, ৪৩, এবং ৪৪ শ্লোকে দেখাইয়াছেন। উপরোক্ত যুক্তি-অনুসারে মনে করা যাইতে পারে যে মোক্ষ-পরায়ণ হওয়া অথবা মোক্ষ-যোগে প্রবিষ্ট হওয়া সর্ব্ববর্ণের মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে। কিন্তু ব্যাসদেব তাঁহার গীতার মোক্ষ-যোগাধ্যায়ের পঞ্চ-চত্বারিংশৎ (৪৫) শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, যদিও চারি বর্ণের মানুষের কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রকৃতিগত ভাবে চারিশ্রেণীর, তথাপি মোক্ষপরায়ণতা-বিষয়ে চারিবর্ণের মানুষ তাঁহাদিগের স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন এবং চারিবর্ণের মানুষ স্ব স্ব কর্ত্তব্য-পালন-বিষয়ে অবহিত হইয়া ও ঐ ঐ কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে কোনরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করিয়া কোন্ উপায়ে মোক্ষপরায়ণ হইতে পারেন, তাহার মৌলিক পন্থা তিনি এই প্রসঙ্গে বিবৃত করিয়াছেন।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥

গীতা ১৮ অঃ—৪৫ শ্লোক

এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ—

"(চতুর্ব্বর্ণের) স্ব স্ব কর্ম্মের আশ্রয় লইয়া মানুষ স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণুর উপলব্ধি করিতে স্বকীয় প্রযত্নে সক্ষম হইয়া থাকে। (চতুর্ব্বর্ণের) স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত হইয়াও যে উপায়ে উপরোক্ত সক্ষমতা লাভ করা সম্ভব হয় তাহা শ্রবণ করুন।"

এই শ্লোকের পরই ষট্-চত্বারিংশৎ (৪৬) শ্লোকে ব্যাসদেব বলিতেছেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তং অভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ—

"ভূতসমূহের (অর্থাৎ চরজীবগণের) ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার বৃত্তির মূলে বায়ুর সহিত যে সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের যে আশ্রয়ে ঐ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা কলুষিত হইতেছে, বায়ুর সহিত সেই সম্বন্ধ এবং মেদাদির সেই আশ্রয় (চতুর্ব্বর্ণের) স্ব স্ব কর্ম্মের সহায়তায় উপলব্ধি করিতে পারিলে মানুষ মোক্ষপরায়ণ হইয়া থাকে।"

বায়ুর সহিত যে সম্বন্ধবশতঃ মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার বিভিন্ন বৃত্তির উদ্ভব হইতেছে এবং মেদাদির যাদৃশ আশ্রয়ে ঐ ইন্দ্রিয়াদি কলুষিত হইতেছে, তাহা (চতুর্ব্বর্ণের) স্ব স্ব কর্ম্মের সহায়তায় কি করিয়া উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যাসদেব উপরোক্ত "যতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাং" ইত্যাদি শ্লোকের পরবর্ত্তী-শ্লোকে বলিতেছেন—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
(গীতা ১৮ অঃ—৪৭ শ্লোক)

এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ—

"স্ব অর্থাৎ যাহা লইয়া সত্তার বিকাশ সেই মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের ধর্ম্ম অর্থাৎ বৃত্তি মূলতঃ তামসিকতার উদ্ভবকারী হয়। মেদাদির উত্তেজনাবশতঃ যখনই কোন কার্য্যের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, তখনই যদি মেদাদির উত্তেজনা কেন আসিল তাহা চিন্তা করিয়া উত্তেজনা নিবৃত্তি করা যায়, তাহা হইলে স্বভাবনিরত কার্য্যের সাধনাতেও অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণের স্ব স্ব কর্ম্মেও কলুষতা তিরোহিত হইয়া যায়।"

মোক্ষ-যোগাধ্যায়ের উপরোক্ত শ্লোকটীর মর্ম্ম যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে হইলে কর্ম্ম-যোগাধ্যায়ের পঞ্চত্রিংশৎ (৩৫) শ্লোকটি, অর্থাৎ—

"শ্রেয়ান্ সধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বানুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

এই শ্লোকটীর অর্থ যথাযথভাবে ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত শ্লোকটীর মর্ম্মার্থ—

"যাহা লইয়া সত্তার বিকাশ সেই মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের ধর্ম্ম অর্থাৎ বৃত্তি মূলতঃ তামসিকতার উদ্ভবকারী হয়। শরীরস্থ মেদাদির মূলে যে, বায়ু, তেজ ও রস বিদ্যমান আছে, সেই

বায়ু, তেজ ও রসের ধর্ম্ম অর্থাৎ বৃত্তির সহিত মেদাদির ধর্ম্মের অর্থাৎ বৃত্তির কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে উত্তেজনা সংযত করা সম্ভব হয়। কেবলমাত্র মেদাদির ধর্ম্ম অথবা বৃত্তির আশ্রয়ে যে-সমস্ত কার্য্য করা হয় সেই-সমস্ত কার্য্য তামসিকতার উদ্ভবকারী। আবার কেবলমাত্র বায়ু, তেজ ও রসের ধর্ম্মের অথবা বৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি সজাগ হইয়া থাকে (কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সজাগতা লাভ করা সম্ভব হয় না)।"

উপরোক্ত দুইটী শ্লোকের মর্ম্মার্থ মিলাইয়া লইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যাসদেবের মতে মোক্ষপরায়ণ হইতে হইলে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণু উপলব্ধি করিবার সক্ষমতা লাভ করিতে হইলে এক দিকে যেরূপ যাহা মনে আসিল, তাহাই করিয়া গেলাম, এতাদৃশ ভাব পোষণ করিলে চলিবে না, সেইরূপ আবার কেবলমাত্র পূজা, ধ্যান, জপ ও তপস্যা প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলে চলিবে না। মোক্ষপরায়ণ হইতে হইলে মানুষ যখনই যাহা করে, তাহার মূলে যে বিশেষ প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, সেই বিশেষ প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় কেন তদ্বিষয়ে চিন্তাশীল হইতে হয়।

গীতার মোক্ষ-যোগাধ্যায়ের সপ্তচত্বারিংশৎ শ্লোকে মোক্ষপরায়ণতা লাভ করিবার মূল সূত্র কি, তাহা বুঝাইয়া লইয়া, ব্যাসদেব তৎপরবর্ত্তী অষ্টচত্বারিংশৎ (৪৮) শ্লোক হইতে দ্বি-সপ্ততি (৭২) শ্লোকে বিভিন্ন অবস্থায় কোন্ কোন্ উপায়ে স্বানুষ্ঠানের সহিত (অর্থাৎ মেদাদির উত্তেজনাবশতঃ কার্য্যের সহিত) পর-ধর্ম্মের (অর্থাৎ শরীরস্থ বায়ু, তেজ ও রসের বৃত্তির) সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হয়, তাহার উপদেশ দিয়াছেন।

মোক্ষ-যোগাধ্যায়ের ৪৮ শ্লোক হইতে ৭২ শ্লোক পর্য্যন্ত যথাযথ অর্থে অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ শ্লোকগুলির মধ্যেই মোক্ষপরায়ণতার জন্য কোন্ অবস্থায় কোন্ শ্রেণীর মানুষকে কোন্ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার মূল পন্থা (সার্ব্বাঙ্গিক পন্থা নহে) সর্ব্বতোভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভবযোগ্য নহে। যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অভিমান ও সংস্কারকে সংযত করিয়া নিষ্ঠাপরায়ণ হইতে পারিয়াছেন—তাঁহাদিগকে লেখক ব্যক্তিগত নিয়োগে এই শ্লোকগুলির মর্ম্মার্থ বুঝাইতে সম্মত আছে। গীতার মোক্ষ-যোগাধ্যায়ে যথাযথ অর্থে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "মোক্ষ লাভ করিবার উপায় কি?" তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই এই অধ্যায়ের পঞ্চচত্বারিংশৎ (৪৫) শ্লোক হইতে দ্বি-সপ্ততি (৭২) শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

মোক্ষ-লাভ করিবার উপায় কি তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত মূল কথাই পঞ্চচত্বারিংশৎ (৪৫) শ্লোক হইতে দ্বি-সপ্ততি (৭২) শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু মোক্ষ পরায়ণতার প্রবৃত্তির উদয় না হইলে, মোক্ষলাভ করিবার উপায় পরিজ্ঞাত হইলেও কোন ফলোদয় হয় না! মানুষ সাধারণতঃ কাম-ক্রোধাদি-পরবশ হয় এবং প্রায়শঃ কেহই মোক্ষ-পরায়ণতার প্রবৃত্তিযুক্ত হয় না। ইহারই জন্য ব্যাসদেব মোক্ষ-যোগাধ্যায়ের প্রথম ভাগেই মোক্ষপরায়ণতার প্রবৃত্তিযুক্ত হওয়া যায় কি করিয়া তাহার পন্থা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

ব্যাসদেবের মতে মোক্ষ-পরায়ণতার প্রবৃত্তিযুক্ত হইবার পন্থা দুইটী; প্রথমতঃ ত্যাগ এবং দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাস।

মোক্ষ-যোগাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকেই তিনি "ত্যাগ ও সন্ন্যাস" কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়াছেন।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥
(গীতা ১৮ অধ্যায়—২ শ্লোক)

এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ—

"মানুষ সাধারণতঃ মেদাদির উত্তেজনাবশতঃ যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই সমস্ত কর্ম্মের কোন্ কর্ম্মের ফলে পরিশেষে সুখের অথবা দুঃখের উদয় হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নাম "ত্যাগ" আর মানুষের কামের উদ্ভব হয় কেন, তাহা উপলব্ধি করিবার প্রযত্নের নাম "সন্ন্যাস"। মানুষ কেন সাধারণতঃ মোক্ষ-পরায়ণতার প্রবৃত্তিযুক্ত হইতে পারে না, তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, মোক্ষ-পরায়ণতার প্রবৃত্তিযুক্ত হইতে হইলে উপরোক্ত "ত্যাগ" ও "সন্ন্যাস" একান্ত ভাবে অপরিহার্য্য।"

মানুষ কামাদি বিষয়ে মেদাদির উত্তেজনাবশতঃ যখন যাহা মনে আসে তাহাই করিয়া যায় এবং কেবল মাত্র পরিতৃপ্তি অথবা আশু ফলের দিকে লক্ষ্য করে। কোন্ কর্ম্মের শেষ পরিণতি যে কি হইতে পারে, তাহা একবারও চিন্তা করে না। ইহারই জন্য মানুষ তাহার প্রায় প্রতি কার্য্যে ক্ষণিকের জন্য তৃপ্তি লাভ করে বটে, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময়েই কোন না কোন দুঃখে হাবুডুবু খাইতে থাকে। কেবল মাত্র পরিতৃপ্তি অথবা আশু ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়া যখন যাহা মনে আসে, তাহা করিলে এক দিকে যেরূপ জীবনের অধিকাংশ সময়েই কোন না কোন দুঃখে হাবুডুবু খইতে হয়, সেইরূপ আবার স্বকীয় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার উপলব্ধি করিবার অথবা মোক্ষ-পরায়ণ হইবার প্রবৃত্তির জাগরণ সম্ভব হয় না। তৎপরিবর্ত্তে মানুষ কামাদিবশতঃ সাধারণতঃ যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার কোন্ কর্ম্মে পরিশেষে সুখের উদয় হয় এবং কোন্ কর্ম্মে দুঃখের উদয় হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণনিরত হইলে স্বভাবতঃই মানুষে যে-সমস্ত কর্ম্মে পরিশেষে দুঃখের উদয় হয় সেই সমস্ত কর্ম্মের হাত হইতে এড়াইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়ে, এই উদ্‌গ্রীবতার উদয় হইলে মানুষ দেখিতে পায়, ইচ্ছা করিলেই মানুষ তাহার কামোদ্ভূত কর্ম্মসমূহ ছাড়িয়া দিতে পারে না এবং কামোদ্ভূত কর্ম্মসমূহ ছাড়িয়া দিতে হইলে কামের উদ্ভব হয় কেন, তাহা উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। কামের উদ্ভব হয় কেন, তাহা উপলব্ধি করিবার আগ্রহ হইলেই, স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণু উপলব্ধি করিবার জন্য অথবা মোক্ষপরায়ণ হইবার জন্য প্রবৃত্তিযুক্ত হইতে বাধ্য হইতে হয়।

ইহারই জন্য আমরা মনে করি যে, মোক্ষ-পরায়ণতার প্রবৃত্তি জাগ্রত করিবার জন্য ব্যাসদেব "ত্যাগ" ও "সন্ন্যাস" বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন, ঐ উপদেশ অমূল্য এবং সর্ব্ব-শ্রেণীর মানুষের পক্ষে উহা ব্যবহারযোগ্য।

অনেকে মনে করেন যে, কর্ম্ম-ফল বাদ দেওয়ার নাম "ত্যাগ"। কিন্তু কর্ম্ম (work) হইলেই

তাহার কোন না ফলোদয় (resultant) হইবে এবং ঐ-ফল বাদ দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে।

কর্ম্ম-ফল বাদ দেওয়ার নাম যে "ত্যাগ" নহে এবং কর্ম্মফল বাদ দেওয়া যে কাহারও পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যাসদেব মোক্ষ-যোগ্যাধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক হইতে অষ্টম শ্লোক পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছেন।

ইহার পর নবম হইতে একাদশ শ্লোকে তিনি ত্যাগ কাহাকে বলে, তাহা বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়ন্তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।"
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

এই শ্লোকটীর মর্ম্মার্থ—

"ইহা করিলে পরিতৃপ্তি লাভ করা যাইবে এতাদৃশ মনোভাব পোষণ করিয়া মানুষ নিয়ত যে কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মে উপভোগের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় কেন এবং ঐ কর্ম্মের ফলে সুখ অথবা দুঃখের উদ্ভব হইতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক ত্যাগের উদ্ভব হয়।"

ব্যাসদেবের মতে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি সৎকর্ম্মও উপভোগের জন্য করা অবিধেয়। ঐ সমস্ত সৎকর্ম্মও ত্যাগোদ্দেশ্যে বিহিত।

প্রকৃত ত্যাগ কাহাকে বলে, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া লইয়া, মানুষের উপভোগ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় কেন এবং কেন মানুষ অত্যাগী হয় এবং কি করিলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজ প্রকৃত ত্যাগী হইতে পারে, তাহা ব্যাসদেব মোক্ষ-যোগাধ্যায়ের ত্রয়োদশ (১৩) শ্লোক হইতে চত্বারিংশৎ (৪০) শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন।

এইরূপে গীতার মোক্ষযোগাধ্যায়টী যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এই অধ্যায়ের প্রত্যেক কথাটী মোক্ষপরায়ণ হইবার ও মোক্ষ-যোগ লাভ করিবার সহায়ক। এই অধ্যায়ের যুক্তিগুলি যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, গীতা-প্রদর্শিত পন্থার অন্যথা করিয়া অন্য কোন উপায়ে মোক্ষপরায়ণ হওয়া অথবা মোক্ষ-যোগ লাভ করা সম্ভবযোগ্য নহে।

জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহে মোক্ষ-লাভ করিবার প্রয়োজনীয়তা কি?

জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহে মোক্ষ-লাভ করিবার প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা বুঝিতে হইলে সাংখ্য-প্রবচন সূত্রের আশ্রয় লইতে হয়।

সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া প্রত্যেক মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় এবং এই আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রণোদিত হইয়া প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ইচ্ছানুযায়ী পন্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইবার জন্য কে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ মানুষই দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে সুখ লাভের অথবা ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির চেষ্টা করিয়া থাকেন। অথচ এই পন্থায় কাহারও সর্ব্বতোভাবে দুঃখ দূর করা সাধ্যায়ত্ত হয় না। এইরূপ ভাবে দুঃখ দূর করিবার জন্য কে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতেছেন এবং ফলে কি দাঁড়াইতেছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে,

যে, একমাত্র কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিয়া তদনুসারে চলিতে পারিলে দুঃখ দূর করা সম্ভব হব। নতুবা অন্য কোন পন্থায় উহা সম্ভবযোগ্য হয় না।

যথাযথভাবে কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিতে হইলে মানুষের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকমের কর্ম্ম-শক্তি কোথা হইতে উদ্ভব হয়, তাহা উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়। মানুষের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকমের কর্ম্ম-শক্তি কোথা হইতে কি রকমে উদ্ভব হয় তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণুর উপলব্ধি করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, সুচারু ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে মোক্ষ-পরায়ণ হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

উপসংহারে আমরা পাঠকগণকে এই মাত্র বলিতে চাই যে, ঐহিক দুঃখ দূর করিবার জন্য মোক্ষ-পরায়ণতা কত আবশ্যক এবং মোক্ষ বিষয়ের আধুনিক ধারণা কত দূর আলেয়ার আলোর মত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তাঁহারা চিন্তা করুন।

বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও আধুনিক বিজ্ঞানের অসাফল্য (২)

আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভবযোগ্য কি না?

ডক্টর মেঘনাদ সাহা ১৩৪৬ সালের 'ভারতবর্ষে'র পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত "আধুনিক জগৎ ও হিন্দু-জাতি" শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধানের প্রধান উপায়—আধুনিক বিজ্ঞানের আশ্রয় লওয়া। আমাদিগের মতবাদ উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আধুনিক বিজ্ঞানে শুধু যে কোন বাস্তব সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নহে তাহা নহে, আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তা লইলে সমস্যাগুলি আরও জটিলতা প্রাপ্ত হয় এবং মানুষ অধিকতর মাত্রায় নানাবিধ দুঃখে হাবুডুবু খাইতে থাকে।

আমাদিগের মতবাদ যে সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা প্রথমতঃ কেবল মাত্র সাধারণ বুদ্ধির (common sense-এর) সহায়তায় যে-সমস্ত ব্যাপার বুঝা যায়, সেই সমস্ত ব্যাপারে পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিব।

আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভবযোগ্য কি না, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলি প্রধানতঃ কয় শ্রেণীর তাহা সর্ব্বাগ্রে জানিয়া লইতে হইবে।

জাতীয় জীবনের—শুধু জাতীয় জীবনের কেন, প্রত্যেক মনুষ্য-জীবনের—সমস্যা প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। উহাদের নাম:

(১) অর্থ-গত সমস্যা,

(২) স্বাস্থ্য-গত সমস্যা,

(৩) মন-গত সমস্যা,

(৪) যৌবন-গত সমস্যা,

(৫) মৃত্যু-গত সমস্যা।

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর সমস্যা যুগপৎ সমাধানযোগ্য না হইলে কোন মানুষের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত করা সম্ভব নহে। একজন মানুষের অনেক টাকা আছে, অথচ তাহাকে প্রতিনিয়ত নানারূপ ব্যাধিতে এবং সন্তান-সন্ততিগণের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য মানসিক অশান্তিতে কষ্ট পাইতে হয়।

এতাদৃশ অবস্থায় সেই মানুষটী যে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছে তাহা বলা চলে না। সেইরূপ আবার একটী মানুষ—যথা, পালোয়ানগুলি নানারূপ ব্যায়াম করিয়া শরীরটীকে বেশ ভাল করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, অথচ পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি সংগ্রহের জন্ম যে অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থের অভাব তাহাকে নানারূপে কশাঘাত করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য সে মানসিক অশান্তিও ভোগ করে। এতাদৃশ অবস্থাপন্ন মানুষ যে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিয়াছে তাহা বলা চলে না।

সেইরূপ আবার একজন মানুষ সর্ব্বদা গীতা, ভাগবত, বাইবেল, কোরাণ, জপ, তপস্যা প্রভৃতির সহায়তায় সর্ব্বদা তথাকথিত আধ্যাত্মিকতায় নিমজ্জিত থাকিয়া মনটীকে প্রফুল্ল রাখিতে প্রযত্নশীল হয়, অথচ যখন উদরাগ্নি হু হু করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করে, তখন উহা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ম যে অন্নের প্রয়োজন, তাহা ভিক্ষা না করিলে অথবা অপর কোন দয়ার্দ্র চিত্তের আশ্রয় না পাইলে সংগ্রহ করিতে পারে না এবং প্রায়শঃ অস্বাস্থ্যের জালায় ভুগিতে থাকে। এতাদৃশ মানুষও তাহার সমস্যা যে সর্ব্বতোভাবে সমাধান করিতে পারিয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে মনে করা চলে না।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, শুধু অর্থশালী হইতে পারিলেই, অথবা শুধু স্বাস্থ্যশালী হইতে পারিলেই, অথবা শুধু মানসিক শান্তি লাভ করিতে পারিলেই কোন জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যাসমূহের সর্ব্বতোভাবে সমাধান করা সম্ভবযোগ্য হয় না। জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যাসমূহের সমাধান সর্ব্বতোভাবে করিতে হইলে যুগপৎ অর্থ-গত সমস্যা, স্বাস্থ্য-গত সমস্যা এবং মন-সম্পর্কীয় সমস্যাসমূহের সমাধান করিবার প্রয়োজন হয়।

যাঁহাদিগের অর্থ-গত সমস্যা, স্বাস্থ্য-গত সমস্যা, এবং মন-সম্পর্কীয় সমস্যাসমূহের সমাধান সর্ব্বতোভাবে করা সম্ভব হইয়াছে, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, শুধু ঐ তিনটী সমস্যার সমাধান হইলেই সর্ব্ববিধ দুঃখের হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে এড়ান সম্ভব নহে। এই তিনটী সমস্যার সমাধান হইলে বহুবিধ বিষয় জানিবার জন্ম প্রাণ আপনা হইতেই উদ্গ্রীব হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় যে সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার জন্ম প্রাণ উদ্গ্রীব হয়, তাহার অধিকাংশ প্রায়ই ৪০।৪৫ বৎসরের আগে উপলব্ধি করা সম্ভবযোগ্য নহে। চন্দ্র ও সূর্য্যাদি গ্রহ-বিষয়ক তত্ত্ব ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। যাবতীয় জীবের সর্ব্ববিধ চাল-চলন যে-সমস্ত কর্ম্ম (mechanical work) ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার (chemical action এর) ফল (resultant) স্বরূপ, সেই সমস্ত কর্ম্ম ও রাসায়নিক ক্রিয়ার মূলাধার (component) চন্দ্র ও সূর্য্যের কর্ম্ম ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া। চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত করিয়া স্থির-কর্ম্মা না হইতে পারিলে চন্দ্র ও সূর্য্যের কর্ম্ম (mechanical work) ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া (chemical action) উপলব্ধি করা কোন ক্রমেই সম্ভবযোগ্য নহে এবং পরিণতবয়স্ক না হইতে পারিলে চিত্তচাঞ্চল্য সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত করিয়া স্থির-মনা হওয়া সম্ভব নহে। যাঁহারা চন্দ্র ও সূর্য্যের কর্ম্ম (mechanical work) ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া (chemical action) প্রত্যক্ষ করিবার কার্য্যে জীবনের ৩৫।৩৬ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০।৫১ বৎসর পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, ঐ সাধনার জন্ম একদিকে যেরূপ পরিণত বয়স একান্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আবার স্বাস্থ্য এবং যৌবনও একান্ত প্রয়োজনীয়। শুধু স্বাস্থ্য থাকিলেই এতাদৃশ বিষয়ক সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। উহার জন্ম যৌবনও একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ যৌবনে যে কর্ম্মশক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহা স্বাস্থ্যবান্ বৃদ্ধের নাও থাকিতে পারে।

আমি অর্থ-শালী, স্বাস্থ্য-শালী এবং শান্তি-শালী হইলাম, অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক বহুবিধ প্রশ্ন আমার হৃদয়ে জাগ্রত হইল, কিন্তু তাহার কোনটীরই মীমাংসা করিতে আমি সক্ষম হইলাম না। এতাদৃশ অবস্থায়ও মানুষের পক্ষে দুঃখের হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে এড়ান সম্ভব হয় না।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, যৌবন-গত সমস্যাও (অর্থাৎ অকালে যাহাতে বার্দ্ধক্য না আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও) জাতীয় জীবনের সমস্যার মধ্যে অন্যতম।

অর্থ-গত, স্বাস্থ্য-গত, মন-গত এবং যৌবন-গত সমস্যা-সমূহের সমাধান হইলেও যদি বাপের সম্মুখে সন্তানের মৃত্যু হয়, অথবা জ্যেষ্ঠের সম্মুখে কনিষ্ঠের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে স্বভাবের নিয়মানুসারে শোকে জর্জ্জরিত হইতে হয়। কাজেই বলিতে হয় যে, অকাল-মৃত্যুও জীবনের বাস্তব সমস্যা-

সমূহের অন্যতম এবং জাতীয় জীবনকে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ-মুক্ত করিতে হইলে অপর চারিশ্রেণীর সমস্যাসমূহের সমাধান যেরূপ একান্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ মৃত্যু-গত সমস্যার সমাধানও (অর্থাৎ যাহাতে সমাজের কাহারও অকালমৃত্যু না হয় তাহার ব্যবস্থাও) সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে-জগতের যে, সমস্ত দেশ বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছে, সেই সমস্ত দেশ উপরোক্ত পাঁচশ্রেণীর (অর্থাৎ অর্থ-গত, স্বাস্থ্য-গত, মন-গত, যৌবন-গত এবং মৃত্যু-গত) সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছে কিনা। যদি দেখা যায় যে,—যে-সমস্ত দেশ আধুনিক বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছে, সেই সমস্ত দেশে যুগপৎ উপরোক্ত পাঁচশ্রেণীর সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে আধুনিক বিজ্ঞান যে জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধানে সক্ষম, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। অন্তপক্ষে যদি দেখা যায় যে, যে সমস্ত দেশ আধুনিক বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছে, সেই সমস্ত দেশের কোন দেশে যুগপৎ উপরোক্ত পাঁচশ্রেণীর সমস্যার সমাধান হয় নাই, উপরন্তু ঐ সমস্যাগুলি অধিকতর জটিল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে আধুনিক বিজ্ঞান যে জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয় নাই, তাহা বুঝিতে হইবে।

প্রথমতঃ বিলাতের কথাই ধরা যাউক। ডক্টর সাহা ১৩৪৬ সালের 'ভারতবর্ষে'র পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত "আধুনিক জগৎ ও হিন্দুজাতি" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"বিজ্ঞান ব্যক্তিগত জীবনে আয়-বৃদ্ধি সাধন করিয়াছে, জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, এ দেশের লোকের বৎসরের মাথাপিছু আয় ৬৫৲ টাকা মাত্র, কিন্তু বিলাতের লোকের আয় প্রায় মাথা পিছু ২০০০৲ টাকা অর্থাৎ এখানকার প্রায় "ত্রিশগুণ।"

বিলাতের লোকের আয় যখন মাথাপিছু ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে, তখন আপাতদৃষ্টিতে বিলাতের লোক যে অপেক্ষাকৃত আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। এত আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিয়াও বিলাতের লোক কেন যে এত আদরের ঘর-বাড়ী (sweet home), প্রিয়-পরিজন ছাড়িয়া দিয়া উদরান্নের জন্ত বিদেশে বিদেশে সারা জীবন কাটাইতে বাধ্য হয়, তাহা চিন্তার বিষয়। মানুষের মনস্তত্ব নিখুঁৎভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, নিতান্ত অভাবে না পড়িলে অথবা অবস্থার তাড়নায় বাধ্য না হইলে কাহারও প্রাণ আদরের ঘর-বাড়ী ও প্রিয়-পরিজন ছাড়িয়া বিদেশে বিদেশে জীবন যাপন করিতে চাহে না। ইংরাজদিগের মনস্তত্ত্বও যে এই নিয়মের ব্যভিচারী নহে, তাহা বিলাতের ডাকের দিন তাঁহারা দেশের প্রিয়জনের চিঠির জন্ত কিরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিলে কৃত-নিশ্চয় হওয়া যায়। নবম শতাব্দীর আগেকার বিলাতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বিলাতেও এমন একদিন ছিল, যখন বিলাতী লোকের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ও পরিধেয় প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসমূহের উপকরণ কাঁচামাল প্রভৃতি বিলাতেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং তখন কোন বিলাতী লোক ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া বিপদ্-সঙ্কুল পথে বিদেশে বাহির হইবার কথা মনেও ভাবিতেন না। বিলাতী লোক নবম শতাব্দীতে কেন ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে বাহির হইবার কথা ভাবিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, বিলাতী লোকের তাৎকালিক অন্নাভাবই অথবা অর্থাভাবই তাঁহাদিগের দেশ ছাড়িয়া বিদেশে বাহির হইবার জন্ত সচেষ্ট হইবার প্রধান কারণ। এখন (অর্থাৎ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে) বিলাতী মানুষগুলিকে সমৃদ্ধি-শালী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা আদরের ঘর-বাড়ী ও প্রিয়-পরিজন ছাড়িয়া দিয়া ঐ প্রিয় সংসর্গ হইতে সহস্র সহস্র মাইল দূরে জীবনের অধিকাংশ ভাগই অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন এবং ইচ্ছা করিলেও দেশে বসিয়া সমগ্র জীবন স্বচ্ছন্দভাবে কাটাইতে সক্ষম হন না। কাজেই, বিলাতী লোকের মাথাপিছু পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের আয় দেখিলে যদিও মনে হয় যে, তাঁহারা আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগের যে আর্থিক অভাব রহিয়াছে এবং ঐ-আর্থিক অভাব যে নবম শতাব্দীর পূর্ব্বকালের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, অর্থাৎ নেপোলিয়নের যুদ্ধের বিরক্তির পর ইংরাজগণের আর্থিক অবস্থার সহিত

তাঁহাদিগের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরাজগণের কারেন্সী নোট (currency notes) ও ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা যে পরিমাণে ব্যবহৃত হইত, তাহার তুলনায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উহা সহস্র সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, এবং তদনুসারে ইংরাজগণের মাথাপিছু আয় বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও ইংরাজজাতি তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও পরিধেয় প্রভৃতি ব্যবহার্য্য দ্রব্যের কাঁচামালের শতকরা ৮৫ ভাগ নিজেদের দেশেই উৎপন্ন করিতে পারিতেন, আর এখন উহার শতকরা ৮৫ ভাগের জন্যই ইংরাজজাতিকে অন্যদেশ হইতে আমদানীর (import-এর) উপর নির্ভর করিতে হয়। এক কথায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরাজজাতি শতকরা ৮৫ ভাগ স্বাধীন ছিলেন এবং কেবল মাত্র ১৫ ভাগ পরাধীন ছিলেন, আর বিংশ শতাব্দীতে ইংরাজজাতি শতকরা ৮৫ ভাগ পরাধীন হইয়া পড়িয়াছেন এবং কেবল মাত্র ১৫ ভাগ স্বাধীন আছেন। কাযেই এ-দিক্ দিয়া দেখিলেও ইংরাজজাতির জাতীয় আর্থিক অবস্থা যে স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা মনে করা চলে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরাজ জাতির আর্থিক জীবন-যাত্রা প্রণালী (economic life) কিরূপ ছিল এবং বিংশ শতাব্দীতে উহা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরাজজাতির শতকরা প্রায় ৭৫ জন স্বাধীন ভাবে কাহারও মাসিক বেতনের গোলামী না করিয়া কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা স্বচ্ছলভাবে দৈনন্দিন জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, এবং কেবল মাত্র শতকরা ২৫ জনকে মাসিক বেতনের গোলামীর সন্ধান করিতে হইত, আর বিংশ শতাব্দীতে ইংরাজজাতির শতকরা ৯৫ জনকেই মাসিক বেতনের গোলামীর সন্ধানে যেই-যেই করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় এবং কেবলমাত্র শতকরা ৫ জন স্বাধীন ভাবে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছলতার সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। এ-দিক্ দিয়া দেখিলে, ইংরাজজাতির ব্যক্তিগত আর্থিক স্বচ্ছলতা যে কোনরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা মনে করা চলে না। পরন্তু, উহা যে ভীষণ রকমের অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়।

সুতরাং ইংরাজজাতির মাথাপিছু পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের আয় দেখিয়া যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, ইংরাজজাতি আর্থিক উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন—তথাপি তাঁহাদিগের বিদেশ-বাস, তাঁহাদিগের খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের উৎপত্তির পরিমাণ, তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত বেতনভোগী গোলামী জীবনের হার দেখিলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয় যে, তাঁহাদিগের জাতীয় ব্যক্তিগত আর্থিক জীবনে যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে ইংরাজজাতির মাথাপিছু পাউণ্ড, শিলিং পেন্সের আয়-বৃদ্ধি একটি প্রহেলিকা মাত্র এবং উহা তাঁহাদিগের অদূর-দর্শিতা, নির্ব্বুদ্ধিতা, আত্ম-প্রতারণা ও বিলাসিতার পরিচায়ক।

পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের মাথাপিছু আয় সাধারণতঃ স্থির করা হয় মোট যত টাকার কারেন্সী নোট ও ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা দেশে প্রচারিত থাকে (total currency notes and metallic coins in circulation), তাহাকে মোট অধিবাসীর সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া কারেন্সী নোট ও ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। দেশে খাদ্য-দ্রব্য অথবা কাঁচামাল না থাকিলেও মানুষ যদি কাগজের নোট ও ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা চর্ব্বণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিত, তাহা হইলে এতাদৃশ ভাবে পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি সার্থকতা লাভ করিতে পারিত, কিন্তু উহা চর্ব্বণ করিয়া যখন মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে না, তখন খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের উৎপত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলে কেবল মাত্র পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের মাথাপিছু আয় বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই কোন জাতির আর্থিক উন্নতি হইয়াছে, ইহা মনে করা অসারতা ও অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক। পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের মাথা পিছু আয় মানুষ যথেচ্ছ বৃদ্ধি করিতে পারে, কারণ মোট কারেন্সী নোট ও ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার উৎপত্তির পরিমাণ প্রধানতঃ কয়েকটী ছাপাখানার উৎপত্তির

পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। অনেকে মনে করেন যে, সোণার রিজার্ভ (Gold Reserve) না থাকিলে মোট কারেন্সী নোট ও ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার উৎপত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না। কিন্তু ইহা সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড (Bank of England) হইতে মাসে মাসে যে ঘোষণা-সমূহ বাহির হয়, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কখনও বা মোট প্রচারিত কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার পরিমাণের শতকরা ৬৫ ভাগ, আবার কখন কখন শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র Gold Reserve রক্ষিত হইয়া থাকে। ১৫ পাউণ্ডের সোণা রক্ষা করিয়া যদি ১০০ পাউণ্ডের কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রা প্রচার করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সাহস থাকিলে শতকরা ৫ পাউণ্ডের সোণা রক্ষা করিয়া অথবা কোন সোণা রক্ষা না করিয়া কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রা প্রচার করায় যে কোন বাধা নাই, তাহা সহজেই সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা অনুমান করা যাইবে। বস্তুতঃপক্ষে ১৯১৮ সালের ইউরোপীয় যুদ্ধের পর জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট যে অপরিমিত মাত্রায় মার্কের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার মূলে কোন উল্লেখযোগ্য পরিমাণের স্বর্ণ রক্ষা করা হয় নাই। এতাদৃশ অপরিমিত মাত্রায় মার্কের প্রচার করিয়াও জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মান জাতির আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। তাহার একমাত্র কারণ বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল ক্রয় করিতে না পারিলে, কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রা চর্ব্বণ করিয়া মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে না। এবং দেশে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন না হইলে সাধারণতঃ কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার বিনিময়ে উহা পাওয়া সম্ভব নহে। যদি অন্য কোন দেশের আর্থিক ব্যবস্থার উপর প্রভুত্ব থাকে, এবং ঐ অন্য দেশের খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের উৎপত্তির পরিমাণ যদি যথেষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ অন্য দেশের খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল কতকাংশে কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার বিনিময়ে পাওয়া সম্ভব হয়। নতুবা অন্য কোন দেশের খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল কোন কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার বিনিময়ে পাওয়া যায় না। ইহারই জন্য অপরিমিত মাত্রার মার্কের প্রচার সাধন করিয়াও জার্ম্মানীর পক্ষে তাহার আর্থিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। শুধু জার্ম্মানীর কেন, এক ইংলণ্ড ছাড়া অন্য কোন দেশের পক্ষে কেবল মাত্র কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচার বৃদ্ধি করিয়া অথবা পাউণ্ড, শিলিং, পেনসের মাথাপিছু আয় বাড়াইয়া দিয়া তাহার আর্থিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে। একমাত্র ইংলণ্ডের পক্ষে উহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে সার্থক হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রধান কারণ, ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থার উপর ইংলণ্ডের প্রভুত্ব বিদ্যমান আছে এবং ইংলণ্ডের কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার বিনিময়ে ভারতবর্ষের খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল ক্রয় করা সম্ভব হয়। যে দিন হইতে ভারতবর্ষের খাদ্যদ্রব্যের ও কাঁচামালের উৎপত্তির পরিমাণ ভারতবাসীর প্রয়োজনের তুলনায় কম হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচার বৃদ্ধি করিয়াও ইংলণ্ড তাহার অর্থ-সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইতেছে না। পরন্তু উহা জটিলতা লাভ করিতেছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ইংলণ্ডের মাথাপিছু আয় বাড়িয়া গিয়াছে, তথাপি বস্তুতঃপক্ষে তাহার আর্থিক অবস্থা উন্নতি লাভ করে নাই, পরন্তু উহা ভীষণভাবে অবনতি লাভ করিয়াছে। সাধারণ ইংরাজগণ জগতের অনেকের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধার যোগ্য বটে, কিন্তু ইংরাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকগণ অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। তাঁহাদিগের মূর্খতা ও ঔদ্ধত্যের ফলে ইংরাজজাতির সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে বসিয়াছে। ইংরাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকগণ যদি কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট না হইয়া ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের খাদ্যদ্রব্যের ও কাঁচামালের মোট উৎপত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ হিংস্র জার্ম্মান জাতিকে অতি সহজেই পদানত করা সম্ভব হইত এবং আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন ঐ ইংরাজ জাতিকে এতাদৃশ ভাবে বিপন্ন হইতে হইত না। এতাদৃশ ভাবে কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মাথা-

আয় বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা যে প্রকারান্তরে আত্মপ্রতারণা, ইহা ইংরাজের আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থার প্রবিষ্ট হইতে পারিলে সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। ইহারই জন্য আমরা বলিতেছিলাম যে, ইংরাজদিগের আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থা অদূরদর্শিতা, নির্ব্বুদ্ধিতা, আত্মপ্রতারণা ও বিলাসপ্রিয়তার পরিচায়ক।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে, যদিও ডক্টর সাহা মনে করেন যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় বিলাতের ব্যক্তিগত জীবনের আর্থিক সমস্যার সমাধান হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে তাহা হয় নাই। পরন্তু গত এক শত বৎসরে বিলাতের আর্থিক অবস্থা অতি ভীষণ ভাবে অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থনীতি-বিষয়ক এত সাদা কথাগুলি যাঁহারা ধারণা করিতে পারেন না, তাঁহারাও যে অনধিকার-চর্চ্চায় সাহসী হইয়া থাকেন তাহার প্রধান কারণ দেশে চিন্তাশীলতা প্রায়শঃ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে এবং মানুষের মস্তিষ্ক প্রায়শঃ পশু ও পক্ষীর মস্তিষ্ক-সদৃশ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ডাঃ সাহাকে এতাদৃশ অনধিকার চর্চ্চা হইতে দূরে থাকিতে অনুরোধ করি। তিনি যে অর্থনীতি-ক্ষেত্রে একটি অবোধ বালকসদৃশ, তাহা আত্ম-পরীক্ষার দ্বারা তিনি উপলব্ধি করুন, ইহা তাঁহার কাছে আমাদিগের অন্যতম অনুরোধ।

গত একশত বৎসরে শুধু যে বিলাতের আর্থিক অবস্থাই এতাদৃশ ভীষণ ভাবে অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নহে। জার্ম্মানী, ইটালী, মার্কিন, জাপান প্রভৃতি যে-কোন দেশের আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করা যাউক না কেন, প্রত্যেক দেশের আর্থিক অবস্থাই এতাদৃশ ভাবে জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক দেশেই শতকরা নব্বইটি পরিবারে হাহাকার দেখা দিয়াছে। প্রত্যেক দেশই খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের উৎপত্তির দিকে অপেক্ষাকৃত তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির দিকে অবহিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক দেশেই মোট জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের ঘাটতি পড়িয়া গিয়াছে। ইহারই জন্য জগতের প্রত্যেক দেশেই অধিকাংশ পরিবারের মধ্যে অনাহার, অল্পাহার, খাদ্যের নামে গরলাহার, বেকার বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ প্রত্যেক দেশেই শাসক-সম্প্রদায় কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা প্রচার করিয়া নিরীহ মানুষগুলিকে প্রতারিত করিয়া আসিতেছেন। এতাদৃশ পাপীগণের শাস্তির জন্যই সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়মানুসারে যুদ্ধের অবতারণা ঘটিয়াছে। এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় নাই। এই যুদ্ধের ফলে আধুনিক শাসক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্প্রদায় যে কত অজ্ঞ ও পাপী, তাহা নিরীহ শাসিত সম্প্রদায় মরমে মরমে বুঝিতে পারিবে এবং তাহার পরিপন্থিতে আধুনিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতি ফুৎকার প্রাপ্ত হইবে—ইহা আমাদিগের ভবিষ্যদ্বাণী। প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা যদি জগতে থাকিত, তাহা হইলে প্রকৃতির নিয়মানুসারে মানুষ দিশাহারা হইয়া এত আদরের নিজ প্রাণকে সমরে বিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইত না এবং পশুর মত পরের রক্ত শোষণ করিতে উদ্যত হইত না। ক্ষুধার অগ্নিতে মানুষ যখন জর্জ্জরিত হয়, প্রধানতঃ তখনই মানুষ অন্ধ হইয়া এতাদৃশ পশুভাবাপন্ন হইয়া থাকে। একমাত্র দুর্ভিক্ষের অবস্থাতেই মাতৃ-হৃদয় সন্তানের মাংস গ্রহণ করিতে অসঙ্কুচিত হইতে পারে, নতুবা অন্য কোন সময়ে তাহা হয় না। যে ছেলেগুলি অন্নাভাবে ক্লিষ্ট ও বেকার, তাহাদিগকে যত সহজে দেশপ্রেমের নামে পুলিশের লাঠী খাওয়ান যায় ও জেলে পাঠান যায়, ডক্টর সাহার মত লোকের সুখ-লালিত ছেলে-গুলিকে অত সহজে লাঠী খাওয়ান অথবা জেলে পাঠান সম্ভব নহে। যে মস্তিষ্ক থাকিলে এই তথ্যগুলি বুঝা সম্ভব হয়, তাহা হয়ত ডক্টর সাহার শ্রেণীর মানুষের নাই এবং তজ্জন্যই তাঁহারা হয়ত ইহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা অযথা বিশেষ-বিদের (expert-এর) অভিনয় হইতে বিরত থাকিলে ঊর্দ্ধপক্ষে আগামী ৬।৭ বৎসরের মধ্যে আমাদিগের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

১৮৭০ সাল হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরে যে ভীষণ ভীষণ যুদ্ধ জগতে দেখা দিয়াছে তাহার কারণ কি তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই সমস্ত যুদ্ধের প্রত্যেকটীর প্রধান কারণ বর্ত্তমান জগতের আর্থিক অসচ্ছলতা। প্রয়োজন হইলে ইহা আমরা প্রমাণিত করিতে প্রস্তুত আছি।

ইহা জাজ্জ্বল্যমান থাকা সত্ত্বেও, "বিজ্ঞান কোনরূপ জীবনে আয়-বৃদ্ধি সাধন করিয়াছে" ইহা যে ডক্টর সাহা বলিতে পারেন তাহা তাঁহার একদেশদর্শিতার পরিচায়ক। ডক্টর সাহার মত কোন কোন পরিবারের গোলামীর বেতন হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু গোলামীর বেতন বৃদ্ধি অথবা কাগজের মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি কোন জাতীয় জীবনের প্রকৃত আর্থিক উন্নতির পরিমাপক হইতে পারে না। ডক্টর সাহার যদি মনুষ্যোচিত লজ্জা থাকে, তাহা হইলে তিনি আর কখনও এতাদৃশ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া অজ্ঞান যুবক-

সমাজের কিয়দংশকে বিপথগামী করিতে উদ্যত হইবেন না — ইহা আমরা আশা করি।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের রাজত্বকালে যেরূপ—কোনরূপ প্রকৃত আর্থিক উন্নতি সংঘটিত হয় নাই, পরন্ত অবনতি ঘটিয়াছে, সেইরূপ স্বাস্থ্য-গত সমস্যারও কোনরূপ সমাধান হয় নাই। বরং স্বাস্থ্য-গত সমস্যাও অধিকতর জটিলতাই লাভ করিয়াছে।

পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমরা এতদ্বিষয়ক অন্যান্য কথা আলোচনা করিব।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় জাতীয় মহাসভার কর্ত্তব্য

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় জাতীয় মহাসভার কি কর্ত্তব্য হওয়া উচিত, তাহার সন্ধান করিতে হইলে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে যে-সকল বিশেষ লক্ষণ প্রধান্যলাভ করিয়াছে, পাঠকবৃন্দকে মনোযোগসহকারে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

আমাদের মতে, ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে-সকল বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমানে প্রধান্যলাভ করিয়াছে, তাহারা নিম্নলিখিত তিন ভাবে বিভাজ্য :—

(১) ভারতীয় মুশলিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না পরিকল্পিত ভারত-ব্যবচ্ছেদমূলক মনোভাব।

(২) ভারত যাহাতে কোন না কোন প্রকার ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস কিংবা স্বাধীনতার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে, তৎকল্পে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসাধনার্থ কতিপয় ব্রিটিশ এবং ভারতীয় নেতাগণের আনীত চাপ।

(৩) ভারত যাহাতে কোন না কোন প্রকার ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস অথবা স্বাধীনতার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে, তৎকল্পে সংখ্যালঘিষ্ঠগণের সমস্যা সমাধানার্থ কতিপয় ব্রিটিশ এবং ভারতীয়গণের আনীত চাপ।

ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতিগত অবস্থার এই তিনটি বিশেষ লক্ষণ মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব হইতেছে, যাহাতে —

প্রথমতঃ, ভারতের মুসলমান রাষ্ট্রনেতাগণ যাহাতে তাঁহাদের নেতাকে (অর্থাৎ মিঃ জিন্নাকে) হিন্দু-মুসলমান-বিশেষে পৃথক্ অঞ্চলে ভারত-ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবের ধারণা পরিহারে যুক্তি বা অনুরোধ দ্বারা সম্মত করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত প্রয়াস ;

দ্বিতীয়তঃ, আপনা হইতেই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সম্পাদন ; এবং

তৃতীয়তঃ, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহকে কেবল কথায় নহে, কার্য্য দ্বারা এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত করা যে, ভারতীয় জাতীয় মহাসভার হস্তে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ন্যস্ত হইলে তাঁহাদের সকল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান তাঁহাদের স্বকীয় ইচ্ছানুরূপ সাধিত হইবে।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ যদি এমন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারেন, যদ্দারা উপরিলিখিত তিনটি কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তবে পৃথিবীতে এমন শক্তি নাই, আদর্শ-পূরণকল্পে যাহা কংগ্রেসের অগ্রগতির অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে। দৃশ্যতঃ মনে হইতেছে যে, উপরিলিখিত তিনটি কার্য্য একযোগে সাধন করিতে পারে, এইরূপ একটি মাত্র পন্থা পরিকল্পিত হইতে পারে না। কিন্তু গান্ধী-প্যাটেল এণ্ড কোম্পানী তাঁহাদের দাম্ভিকতা পরিহার করিয়া রাজনীতি-সম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষার্থীর মনোভাব বিশিষ্ট হইতে পারিলে, একটি মাত্র পন্থা অবলম্বনেই যে ইহা অনায়াসে সাধিত হইতে পারে, আমরা এখানে তাহাই দেখাইব।

প্রথমতঃ, ভারত-ব্যবচ্ছেদ ধারণার উচ্ছেদসাধন, দ্বিতীয়তঃ, আপনা হইতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-প্রতিষ্ঠা, এবং তৃতীয়তঃ, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়-সমূহের সকল সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্তকরণ। একযোগে এই উদ্দেশ্য কয়েকটি পূরণের যথার্থ পন্থা হিসাবে কংগ্রেসের সর্ব্বাগ্রে পালনীয় কার্য্য হইবে—নিম্নলিখিত ত্রিবিধ :

(১) যে-সকল প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান, সেই সকল প্রদেশে মন্ত্রিসভা

গঠনে কংগ্রেস সহায়তা করিবে, প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের নিকট এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান ;

(২) ভারতের মুসলমান এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে এই মর্ম্মে ঘোষণা যে, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা মন্ত্রিসভাগঠন সম্পর্কে কংগ্রেসের সহায়তা বিষয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণকে প্রতিশ্রুতি দান করিলেও মন্ত্রী হিসাবে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের নিজেদের মন্ত্রিসভায় প্রবেশের বাসনা নাই। তাঁহাদের একমাত্র বাসনা হইতেছে, মুসলমান এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রনেতাগণকে মন্ত্রিসভা গঠনে, তথা কৃতিত্বের সহিত তাহাদের পরিচালনায় সাহায্য-দান। কিন্তু তাঁহাদিগকে (অর্থাৎ মুসলমান ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে) এমন কার্য্যপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে ভারতের প্রত্যেকটি অধিবাসীর অনাহার ও বেকার সমস্যার সমাধান প্রকৃতভাবে সাধিত হইতে পারে।

যাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক সামান্য-মাত্র বিচক্ষণতাও বর্ত্তমান, তাঁহার নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ উপরিলিখিত দ্বিবিধ কার্য্যে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করিলে অনগ্রসর এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের পুরোভাগস্থ নেতৃবৃন্দের ভারত-ব্যবচ্ছেদ-মূলক মনোভাব পোষণ করিবার কোন ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আর বর্ত্তমান থাকিবে না। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যদি মুসলমান এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়কে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, মুসলমান এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের (কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ) মধ্যে কাহাকেও তদন্তর্ভুক্ত করিতে না চাহিলে, মন্ত্রিত্বের নিমিত্ত তাঁহারা উন্মুখ হইবেন না, এবং কেবল তাহাই নহে, মুসলমান এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভাকে সর্ব্বদা সমর্থন করিবেন ; কিন্তু ভারতের প্রত্যেকটি অধিবাসীর অনাহার এবং বেকার সমস্যার সমাধান যে উপায়ে সাধিত হইতে পারে, তাঁহাদিগকে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তবে মুসলমান এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিবেন যে, কংগ্রেসের লক্ষ্য জাতীয় মঙ্গল সাধন—সম্প্রদায়গত কিংবা ব্যক্তিগত নহে। কংগ্রেস কর্ত্তৃক এই কার্য্যপন্থা গৃহীত হইলে সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির সমক্ষে প্রমাণিত হইবে যে, ভারতবাসী প্রত্যেকটি ব্যক্তির বেকার এবং অনাহার সমস্যার সমাধান-কার্য্যে অগ্রসর হইলে ভারতীয় কংগ্রেস মুসলমান এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকর্ত্তৃক এই দ্বিবিধ কার্য্যপন্থা গৃহীত হইলে, ভারত-ব্যবচ্ছেদমূলক মনোভাবের উচ্ছেদসাধন অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে, অর্থাৎ কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকর্ত্তৃক গৃহীত উপরে উল্লিখিত দ্বিবিধ কার্য্যপন্থায় একপক্ষে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং অপর পক্ষে মুসলমান ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্য সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক গৃহীত এই দ্বিবিধ কার্য্যপন্থায় এক পক্ষে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং অপর পক্ষে মুসলমান ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত সত্য হইলেও তদ্দ্বারা কোন সম্প্রদায়ের জন-সাধারণের পরস্পর ঐক্য সমগ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সুতরাং স্বভাবতঃই পরবর্ত্তী প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ভারতের জন-সাধারণের মধ্যে সমগ্রভাবে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার্থ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অতঃপর কি কর্ত্তব্য। এতৎসম্বন্ধে, অর্থাৎ ভারতবাসী জনসাধারণের মধ্যে সমগ্রভাবে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার্থ বিভিন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় (ভারতের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রানুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করিতে ইচ্ছুক হইলে, ইহাতে কোন বাধা উপস্থিত হইতে পারে না) নির্ব্বাচিত মন্ত্রিবৃন্দকে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ পরামর্শ দান করিবেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের, তথা বড়-লাটের নিকট এইরূপ কার্য্য-পরিকল্পনা যাচ্ঞা করুন, যাহাতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর, অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রিটন, ভারতীয় ইত্যাদি যাঁহারা স্থায়ী কিংবা অস্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের অনাহার ও বেকার সমস্যার সমাধান সাধিত হইতে পারে। ভারতবাসী প্রত্যেকটি ব্যক্তির বেকার এবং অনাহার-সমস্যার সমাধান যাহাতে সাধিত হইবে, তদনুরূপ কার্য্য-পরিকল্পনা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ এবং বড়লাটের নিকট যাচ্ঞা করিলে, হয় তাঁহারা কোন অজুহাত সৃষ্টি করিয়া ইহা এড়াইবার চেষ্টা করিবেন, নয় তাঁহারা এমন কার্য্য-

পরিকল্পনা উপস্থিত করিবেন, যাহা যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণে টিকিবে না। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের গত্যন্তর নাই, কেন না, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ এবং বড়লাট যে-বিদ্যায় হাতে খড়ি পাইয়া শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি যে-উপায়ে কোন দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীর বেকার এবং অনাহার-সমস্যার সমাধান সাধিত হইতে পারে, তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সমগ্র জগতের বর্ত্তমানে যে অবস্থা, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। কি উপায়ে, রক্তপাত কিংবা প্রতারণার সহায়তা ব্যতিরেকেও দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য এবং অশান্তির সমস্যার সমাধান করিতে হয়, বর্ত্তমান মনুষ্যজাতি যদি ইহা বুঝিতে পারিত, তবে সমগ্র মনুষ্যজগৎ জুড়িয়া যুদ্ধের সূত্রপাত হইত না। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, ভারতবাসী প্রত্যেকের বেকার ও অনাহার-সমস্যার যাহাতে সমাধান হইতে পারে, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ এবং বড়লাটের নিকট এইরূপ কার্য্য-পরিকল্পনা যাচ্ঞা করিলে তাঁহারা হয় কোন না কোন অজুহাত সৃষ্টি করিয়া ইহা এড়াইবার চেষ্টা করিবেন, নতুবা এমন কার্য্য-পরিকল্পনা উপস্থিত করিবেন, যাহা যুক্তি-সম্মত বিশ্লেষণের মুখে টিকিবে না।

এইরূপ অবস্থায়, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে এমন পত্রিকার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা কিংবা বড়লাট হিসাবে কার্য্যে নিযুক্ত বিভিন্ন বৃটিশ রাষ্ট্রনেতার প্রস্তাবিত কার্য্য-পরিকল্পনা ও তদীয় ব্যাখ্যার অন্তঃসার-শূন্যতা যুক্তির দ্বারা উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতে সমর্থ। এইরূপ ভাবে উহাদের দোষ উদ্ঘাটিত হইলে, ভারতীয় এবং বৃটিশ জন-সাধারণ উভয়েই বুঝিতে পারিবে যে, ভারতীয় কংগ্রেস বস্তুতঃই মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের বেকার ও অনাহার-সমস্যার সমাধানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু বৃটিশ রাষ্ট্র-নেতাগণ তাহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছেন। ফলতঃ ইহা বৃটিশ ও ভারতীয় উভয় জন-সাধারণের মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবে। বৃটিশ এবং ভারতীয় জন-সাধারণের মধ্যে ইহা দ্বারা নিশ্চিতরূপে ঐক্যের সৃষ্টি হইবে, কেন না, উভয়েই উপলব্ধি করিবে যে, তাহাদের উভয়ের দুঃখ-দুর্দ্দশা প্রায় একই স্তরের এবং শাসক ও রাজকর্ম্মচারী পদে অধি-ষ্ঠিত হইয়া যে-সকল বৃটিশ রাষ্ট্রনেতা তাহাদের পরিচালনা করিতে-ছেন, তাঁহাদের অজ্ঞতাহেতুই তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার সমা-ধান হইতেছে না। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকর্তৃক নির্ব্বাচিত দেশমধ্যে প্রচারিত পত্রিকাসমূহের সামর্থ্যের উপরই এই কার্য্যের উপরিলিখিত পরিণাম অধিকাংশে নির্ভর করিতেছে। আর কোন পত্রিকা এই কার্য্য করিতে অসমর্থ হইলে, আমরা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে প্রতিশ্রুতি দান করিতেছি যে, দেশের বর্ত্তমান আইন সত্ত্বেও আমাদের বক্তব্য উপস্থিতির বিষয়ে যাহাতে বাধার সৃষ্টি না হয়, আমরা তাহা করিতে প্রস্তুত। আমরা এ-পর্য্যন্ত সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে-সকল সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছি, মনোযোগ সহকারে তাহা পাঠ করিলে, যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি আমাদের এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইবেন। আমাদের ভরসা আছে যে, উপরিলিখিত ভাবে দোষোদ্ঘাটন বিষয়ে কেবল আমাদেরই যে সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহা নহে, কংগ্রেস যদি প্রকৃত পন্থায় কার্য্যে অগ্রসর হয়, তবে দেশের প্রত্যেকটি পত্রিকা বাধ্য হইয়াই তাহাদের বর্ত্তমান নীতি পরিহার করিয়া কংগ্রেসের কার্য্যনীতি সমর্থন করিবে।

অতঃপর কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের শিক্ষণীয় বিষয় হইবে, পণ্য-বিক্রয়ার্থ বাজার-প্রসারমূলক প্রতারণা অথবা কোন প্রকার বেতনভোগী নকরগিরির সহায়তা ব্যতিরেকেই, কি করিয়া মনুষ্যজাতির প্রত্যেকে জীবিকানির্ব্বাহযোগ্য ন্যূনতম দ্রব্য অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার পরিকল্পনা।" প্রচলিত বৈজ্ঞানিক প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে এই বিষয় শিক্ষা করা যাইবে না। এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে হয় নিজেদের গবেষণায় নিযুক্ত হইতে হইবে, নতুবা বর্ত্তমানে সংহিতা নামে প্রচারিত ভারতীয় ঋষিগণের রচনার পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিতে হইবে। আমাদের পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টাইলেও এ-বিষয়ে তাঁহারা সাহায্য লাভ করিবেন, কেন না, আমরা ঋষিগণের রচনা-সাহায্যে উহাতে ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, কি উপায়ে কোনপ্রকার দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি না করিয়া মনুষ্য-জাতির প্রত্যেকের বেকার এবং অনাহার-সমস্যার সমূলে সমাধান সম্ভব।

যখন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ মনুষ্য-জাতির বিবিধ সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান-উপযোগী পরিকল্পনায় শিক্ষিত হইতে পারিবেন, এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ যে, মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের বেকার ও অনাহার-সমস্যার সমাধান-উপযোগী

পরিকল্পনা-উদ্ভাবনের অযোগ্য, পৃথিবীসমক্ষে ইহা প্রমাণে কৃতকার্য্য হইবেন, তখন তাঁহারা ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের নিকট জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশায় কার্য্যতঃ সমাধানার্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করিতে পারিবেন।

অবশ্য, মনে রাখিতে হইবে যে, এই দাবী উত্থাপন করিবার পূর্ব্বেই কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের দেশবাসী জনসাধারণকে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ করিতে হইবে :—

(১) মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধান ব্যতীত তাঁহাদের অপর কোন লক্ষ্য নাই।

(২) বিন্দুমাত্র দ্বন্দ্ব-কলহের কারণ উপস্থিত না করিয়া কি ভাবে ইহা সম্ভব, তাঁহারা সে সন্ধান লাভ করিয়াছেন।

(৩) জনসাধারণের বিবিধ সমস্যার কার্য্যতঃ সমাধান কি উপায়ে হইবে, ব্রিটিশ শাসকগণ তাহার পন্থা অবগত নহেন।

উপরে যে-রূপ কথিত হইয়াছে, প্রাথমিক সূচনা হিসাবে এই তিনটি কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিলে পৃথিবীর কোন জাতির পক্ষে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে তাঁহাদের কার্য্য-সাধনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-দানে কোন প্রকার যুক্তিসঙ্গত বাধা থাকিবে না। ইহার অর্থ এই যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যদি একের পর এক করিয়া যথাযথভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইতে যত্নবান্ হন, তবে তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান অথবা সংখ্যালঘিষ্ঠগণের সমস্যা সমাধানে কৃতকার্য্য তো হইবেনই, উপরন্তু, সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রকৃত স্বাধীনতার নিশ্চিত সন্ধান তাঁহারা দান করিতে পারিবেন।

মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার সতীর্থগণের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে-সকল কটূক্তি করিয়াছি, তদ্দ্বারা ক্ষুব্ধ না হইয়া কোটি কোটি ক্ষুধাক্লিষ্ট নর-নারীর বিভিন্ন সমস্যা-সমাধানের নিমিত্ত আমরা যাহা প্রস্তাব করিতেছি, তাহা তলাইয়া বুঝিবার তাঁহারা চেষ্টা করুন। মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার সতীর্থগণ যদি প্রকৃত দেশ-প্রেমিক হন, তবে তাঁহাদের কাহারও বিরুদ্ধে কেহ কটূক্তি করিয়াছে, এই কারণে উদ্দেশ্য-সাধন মূলক কোন কার্য্য-পরিকল্পনা যুক্তিসঙ্গতভাবে অগ্রাহ্য করিতে তাঁহারা পারেন না। কাহারও বিরুদ্ধ-ভাষণ কষ্টদায়ক, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোটি কোটি ক্ষুধাক্লিষ্ট জনসাধারণের বর্ত্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করা কি তদপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক নহে?

আমাদের একমাত্র প্রার্থনা এই যে, সময় থাকিতে আমাদের নেতৃবৃন্দ এখনও সতর্ক হউন। *

নাইট-আখ্যাধারী ভারতীয়দিগের রাজনীতিবেত্তৃত্বের নিদর্শন

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, ভারতীয় নাইটগণের মধ্যে মান্য-গণ্য স্যার জগদীশপ্রসাদ এবং স্যর এন. এন. সরকার সংপ্রতি কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিবর্গকে পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অনুরোধ করিয়া একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাঁহাদের যুক্তি মূলতঃ নিম্নলিখিত ভিত্তির উপর গঠিত :—

(১) "কংগ্রেসের মন্ত্রিবর্গ যতদিন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিবেন, ততদিন সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন যুক্তিসঙ্গত সমাধান হইতে পারে না (there can be no reasonable solution of the communal problem so long as the Congress Ministers remain out of office)।"

(২) "ভারতের কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতীত কিংবা তাঁহাদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ইংলণ্ড যুদ্ধে জয় লাভ করিলে বিশেষভাবে আশঙ্কা করিবার কারণ রহিয়াছে যে, যুদ্ধের পর যখন কোন স্থির বুঝা-পড়ার সময় আসিবে, তখন হিন্দুসম্প্রদায়কে রাজনীতিগত বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে এবং তাহা পূরণ

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ২৭শে এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

করিতে ভবিষ্যতে বহু বৎসর লাগিবে (if England wins the war without the support of an important section in India or in spite of its opposition, there is the utmost danger that in a final settlement after the war, the Hindu community may suffer grave political disabilities, which may take generations to move.)"

ভারতীয় নাইটগণের মধ্যে দুই জন মান্যগণ্য ব্যক্তির বৃদ্ধিতে যখন প্রকাশ পাইতেছে যে, কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিবর্গ যতদিন মন্ত্রিত্ব হইতে দূরে থাকিবেন, ততদিন সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন যুক্তিসঙ্গত সমাধান হইতে পারে না, তখন আমাদিগকে (যাহাদের কোন বুদ্ধি নাই এবং থাকিলেও যাহা কুবুদ্ধি মাত্র বলিয়া ধরা হয়) যে, তাঁহাদের কথাকে বেদবাক্যস্বরূপ বলিয়া নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাঁহারা কি বুঝাইতে পারিবেন, কি করিয়া কংগ্রেসের মন্ত্রিবর্গ মন্ত্রিত্বে সমাসীন হইলেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান সম্ভব ? "কংগ্রেসকর্ত্তৃক মন্ত্রিত্ব গৃহীত হইবার পর পরই রাজনৈতিক মতাবলম্বী একটি বিশেষ দল কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের অব্যাহত শক্তি-পরিচালনার প্রকাশ্য বিরুদ্ধতা করিতে থাকেন এবং উহার উচ্ছেদার্থ অধীর হইয়া উঠেন (soon after the acceptance of office by the Congress a certain section of political opinion viewed with open hostility the continuance in power of the Congress Ministries and were anxious to bring about their downfall)."—এই ঘটনার মর্ম্মার্থ কি, তাহা কি তাঁহারা বিবেচনা করিবেন ? স্যর জগদীশপ্রসাদের লেখনী-নিঃসৃত এই বিবৃতিই কি নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত করিতেছে না যে, এদেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি প্রভাবসম্পন্ন দল কংগ্রেস কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্বগ্রহণকে প্রকাশ্য বিপক্ষতার বিষয় বিবেচনা করেন ? ইহা হইতেই কি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় না যে, কংগ্রেসের সভ্যগণ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা তীব্রতর হইতে বাধ্য ? আমাদের মান্য-গণ্য নাইটদ্বয় মনে করিতে পারেন যে, একপক্ষে কংগ্রেসের হাই কম্যাণ্ড এবং অপরপক্ষে মুসলীম লীগ উভয়ে কোন প্রকারে একটি সাম্প্রদায়িক চুক্তি রক্ষা করিতে পারিলেই, সাম্প্রদায়িক সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান সম্ভব, কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক দেশে জন-সাধারণের মধ্যে যে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-কলহ দেখা দিয়াছে, যতদিন পর্য্যন্ত, দেশের প্রত্যেকে কোন প্রকার বেতনভোগী চাকুরীর অধীনতা স্বীকারে বাধ্য না হইয়া দৈনন্দিন জীবন-যাপনে প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জন বিষয়ে নিশ্চিত হইবে, ততদিন তাহা সম্যক্ প্রকারে তিরোহিত হইতে পারে না। অতি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান হইতে বুঝা যাইবে যে, জন-সাধারণের পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ যদি কোন চুক্তি কিংবা সন্ধির দ্বারা স্থগিত হইতে পারিত, তবে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হইত না। ব্রিটন এবং জার্ম্মানগণের পরস্পর পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ চুক্তি কিংবা সন্ধির বিন্দুমাত্র অনটন ঘটে নাই, কিন্তু তাঁহাদেরই রাষ্ট্রনেতাগণ অগণিত মনুষ্যপ্রাণসংহারক জুয়াখেলায় মাতিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। ইহার কারণ কি, আমাদের মান্য-গণ্য নাইটদ্বয় কি তাহা গভীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিবেন ? এই বিষয়ে গভীর পর্য্যালোচনার সামর্থ্য-অর্জ্জনে কৃতকার্য্য হইলে তাঁহারা সন্ধানলাভ করিবেন যে, গুণের দিক্ দিয়াই ধরা যাউক কিংবা পরিমাণের দিক্ দিয়াই ধরা যাউক, সমগ্র পৃথিবীর জন-সংখ্যার অবশ্য-প্রয়োজনীয় আহার্য্য এবং কাঁচামালের উৎপাদনের অনুপাতে কয়েক বৎসর হইতে অত্যন্ত ঘাটতি উপস্থিত হইয়াছে এবং যদি জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির উৎকর্ষ-সাধনের, অর্থাৎ বর্ত্তমানের কৃত্রিম সার এবং জলসেচ-প্রথার সাহায্য ব্যতিরেকে বিঘাপ্রতি জমীর ফসলের হার-বৃদ্ধির পন্থা গৃহীত না হয়, তবে কেবল চুক্তি ও সন্ধির সাহায্যে দ্বন্দ্ব-কলহের কারণ দূর করিবার অপর কোন সম্ভাবনাই নাই। সাধারণতঃ হিন্দু-মুসলমানের মতবৈষম্যের কথাই শুনা যাইতেছে বটে, কিন্তু ঘটনাসমূহ যথাযথভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা কেবল হিন্দু ও মুসলমানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে, হিন্দু ও হিন্দুর ক্ষেত্রে, মুসলমান ও মুসলমানের ক্ষেত্রে, প্রদেশ ও প্রদেশে, এক ব্যবসায়ে ও অপর ব্যবসায়ে, ভারতীয় এবং অভারতীয় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এই অনৈক্য বিদ্যমান। উপরন্তু, এই প্রকার অনৈক্য কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ

নহে, অধুনা ইংলণ্ড, জার্ম্মানী এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহার বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়। ইংলণ্ডে এই সাম্প্রদায়িক অনৈক্য পরিলক্ষিত না হইলে, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার দেশরক্ষা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিবকে ইংলণ্ডবাসীদের মধ্যে যাঁহারা যুদ্ধের সপক্ষে নহেন কিংবা যাঁহারা যুদ্ধের বিপক্ষে, তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণকল্পে আইন গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে হইত না। এমন হইতে পারে যে, ইংলণ্ডে ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কে যে তিক্ততা বিদ্যমান, তাহা প্রত্যেকের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে, কিন্তু শ্রমিকদিগকে খুসী করিবার নিমিত্ত কিংবা তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত যে-সকল আইন ইংলণ্ডে বর্ত্তমান, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইলে, প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে বুঝা অসম্ভব নহে যে, ইংলণ্ডের বিভিন্ন জন-সাধারণের মধ্যেও ভীষণ মতানৈক্য বিদ্যমান এবং উহার তিক্ততা বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

কংগ্রেস কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ দ্বারা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক অনৈক্য যদি দূরীভূত হইতে পারিত, তবে কংগ্রেস যতদিন মন্ত্রিত্বে সমাসীন ছিল, সেই সময়ের নিমিত্ত এই অনৈক্যের অস্তিত্ব থাকিত না, কিংবা অন্ততঃ ইহার তীব্রতার হ্রাস ঘটিত। কিন্তু বস্তুতঃ যাহা ঘটিয়াছে দেখা যায়, তাহা ইহার বিপরীত। কংগ্রেস যত অধিক সরকারী কিংবা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-দায়িত্বে লিপ্ত হইয়াছে, ততই দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নাইটদ্বয়ের দ্বিতীয় যুক্তি হইতেছে যে, কংগ্রেসের সমর্থন ব্যতীত ইংলণ্ড যুদ্ধে জয়ী হইলে, যুদ্ধের পর যে বুঝা-পড়া হইবে, তাহাতে হিন্দুসম্প্রদায়ের রাজনীতির দিক্ দিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সমূহ আশঙ্কা রহিয়াছে এবং সেই ক্ষতিপূরণার্থ আগামী বহু বর্ষ ধরিয়া চেষ্টা করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ যে, ইংলণ্ডের যুদ্ধ-জয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্যপ্রদান, ভারতের প্রত্যেক কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্য, কেন না "ইংলণ্ডের পরাজয়ে আমাদেরও সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে (If England loses, we shall be lost)।" কিন্তু কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের স্বপক্ষে ইহা কোন যুক্তি নহে। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব পুনর্গ্রহণের ঔচিত্য প্রদর্শনার্থ যদি যুক্তি উপস্থিত করিতে হয় যে, কংগ্রেসের সমর্থন বিনা ইংলণ্ড যুদ্ধে জয়ী হইলে, রাজনীতিগত ভাবে হিন্দুসম্প্রদায়ের সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, তবে ইহাও দেখাইতে হইবে যে, ইংলণ্ড কংগ্রেসের সমর্থন লাভে এবং যুদ্ধে জয় লাভে সমর্থ হইলে হিন্দু সম্প্রদায়ের কি ভাবে হিত সাধিত হইতে পারে। মান্য-গণ্য নাইটদ্বয়ের কেহই তাঁহাদের বিবৃতিতে তাহা দেখান নাই। মনুষ্য-প্রাণ-সংহারক এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের জয়লাভ দ্বারা কোন সম্প্রদায়ের জীবন-রক্ষার উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যলাভে যদি কোন সুবিধার নিশ্চয়তা থাকিত, তবে ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সনে ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীর মধ্যে যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে ইংলণ্ডের জয়লাভাবধি ভারতবাসী প্রত্যেক পরিবারের অবস্থায় আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং মানসিক শান্তির ক্রমশঃ অপকর্ষ পরিলক্ষিত হইত না। অবস্থা-বিচারে ঘটনার পরিণাম দাঁড়াইতেছে যে, শেষতঃ এই যুদ্ধেও ইংলণ্ড কর্ত্তৃক জার্ম্মানীর পরাজয়ের সম্পূর্ণ সম্ভাব্যতা বিদ্যমান, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনেতাগণ জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির উৎকর্ষ সাধনাপেক্ষা অস্ত্রসজ্জার উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে এখনও অধিক-তর আস্থাবান্ থাকিতে চাহেন, তবে মনুষ্য-সমাজকে যুযুৎসু মনোভাব হইতে রক্ষাদানের সহায়তামূলক কার্য্যে ইংলণ্ড কোন-ক্রমেই সফল হইবে না। ইংলণ্ডের অনুকূলেই হয়তো অদূর-ভবিষ্যতে মিত্রপক্ষের এবং জার্ম্মানীর পরস্পর এই যুদ্ধের সুখ-সূচক অবসান ঘটিবে, কিন্তু ইতিমধ্যে শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকে যাহাতে বেতনভোগী নকরগিরী অথবা দাস-ত্বের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া জীবনযাপনের নিমিত্ত ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জন বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারে, তাহার যথাবিহিত পন্থা যদি গৃহীত না হয়, তবে অনতিবিলম্বেই পুনরায় দেখা যাইবে যে, পৃথিবীতে ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের এই উক্তির যৌক্তিকতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা বর্ত্তমান ক্ষুদ্র সন্দর্ভে করা সম্ভব নহে, সুতরাং উহা আলোচনায় আমরা এক্ষণে বিরত থাকিব। উপরে আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যাইবে যে, আমাদের মান্য-গণ্য নাইট-

দর মন্ত্রিত্ব পুনর্গ্রহণ বিষয়ে কংগ্রেসকে প্রবুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে দুইটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অন্তঃ-সারশূন্য। এই প্রকার বিভ্রান্তিকর বিবৃতি প্রচারের দুঃসাহস প্রদর্শন না করিয়া তাঁহারা যেন বিষয়াধ্যয়নে অধিকতর সময়ক্ষেপ করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এই রূপ কার্য্য বর্ত্তমানে পরিহার না করিলে, তাঁহাদের পক্ষে ইহার পরিণতি দাঁড়াইবে যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে জন-সাধারণের উপেক্ষণীয় হইবেন।

যুদ্ধে ইংলণ্ডের যথার্থ জয় লাভে সহায়তা করিবার জন্য ভারতবাসীকে প্রবুদ্ধ করিতে হইলে, ভারতের রাষ্ট্রনেতাগণ রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে বর্ত্তমানে যে-স্তরে বিরাজমান, তদপেক্ষা তাঁহাদিগকে অধিকতর বিচক্ষণ হইতে হইবে। ব্রিটিশ জাতির পন্থা এবং নীতিরই যদি তাঁহারা অনুকরণ করিয়া চলেন এবং উহার পোষকতা করিতে থাকেন, তবে বস্তুতঃ তাঁহারা ইংলণ্ডের কোন সহায়তাই করিতে পারেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দের পক্ষে প্রচলিত বৃটিশ পন্থা এবং নীতি যদি বস্তুতঃ হিতসাধক হইত, তবে ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সনের মহাযুদ্ধ অবসানের পরে এত কম সময়ের মধ্যেই আবার ব্রিটিশ জাতিকে এমন ভাবে প্রাণসংহারক মহাসমরে লিপ্ত হইতে হইত না।

সমগ্র পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা যথাযথভাবে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইলে বুঝা যাইবে যে, ব্রিটিশ জাতির অবনতি সত্ত্বেও তাঁহারাই এখনও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন এবং ব্যক্তিগত ভাবে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতারাও সৎ। কিন্তু রাষ্ট্রনীতি-বেত্তৃত্বের দিক্ হইতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ আদর্শের অনেক নিম্নে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহাদেরই অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি হেতু ইংলণ্ডের ও সাম্রাজ্যের ব্রিটিশ প্রজাবৃন্দকে এমন ভীষণ কষ্ট পাইতে হইতেছে। ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণ যদি ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনেতাগণের উপর এরূপ চাপ প্রয়োগ করিতে পারেন যে, তাঁহাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির কারণ সম্বন্ধে তাঁহারা সচেতন হইতে বাধ্য হন, তবেই ভারত প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের সহায়তা সাধন করিতে পারে। ব্রিটিশজাতির রাষ্ট্রদর্শনের যাহা অনুগামী নহে, তাহার প্রতি কর্ণপাত করিতেও তাঁহারা নারাজ, ব্রিটিশ রাজনেতাগণ এমনই একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছেন—এই নিমিত্তই আমরা "চাপ" কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। "চাপ" কথাটি আমাদিগকে ব্যবহার করিতে হইয়াছে বলিয়া আমরা পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি যে, সাধারণতঃ "চাপ" দ্বিবিধঃ যথা—(১) শত্রুর উদ্দেশ্যে শত্রুর, এবং (২) মিত্রের উদ্দেশ্যে মিত্রের। যখন কেহ তাহার শত্রুর উদ্দেশ্যে কোন বিষয়ে চাপ উপস্থিত করে, তখন বিপক্ষের অস্তিত্ব বজায় থাকুক কিংবা সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক, তাহা সে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু কেহ যখন তাহার মিত্রের উদ্দেশ্যে কোন বিষয়ে চাপ উপস্থিত করে, তখন তাহাকে সচেতন করিবার নিমিত্ত সে তাহাকে এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করিতে পারে, কিন্তু সদা-সর্ব্বদা সজাগ থাকে যে, তাহার মিত্রের যেন বস্তুতঃ অনিষ্ট সাধিত না হয়

ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণকে বৃটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের উদ্দেশ্যে আমরা যে-চাপ দিবার নিমিত্ত বলিতেছি, তাহা উপরি উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকারের—তাহার উদ্দেশ্য কেবল বৃটিশ রাষ্ট্র-নেতাগণকে তাঁহাদের অজ্ঞতা এবং ত্রুটি উপলব্ধি করিতে বাধ্য করা। ইহা কার্য্যতঃ কি ভাবে করিতে হইবে, তাহা আমরা "দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় জাতীয় মহা-সভার কর্ত্তব্য" শীর্ষক সন্দর্ভে উপস্থিত করিয়াছি। আমা-দের পাঠকবৃন্দকে আমরা উপরিলিখিত সন্দর্ভ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি এবং অনন্তর এতদ্বিষয়ে তাঁহাদের যদি কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা নিরূপণের নিমিত্ত আমাদিগের সহিত আলাপ করিতে অনুরোধ করিতেছি।*

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ৬ঠা মের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

ভারত-ব্যবচ্ছেদ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন

নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের সপ্তবিংশতি অধিবেশনের সভাপতিরূপে মিঃ জিন্না যে অভিভাষণ প্রদান করেন এবং লণ্ডনের 'টাইমস্'-পত্রিকা তৎসম্বন্ধে যে-মত প্রকাশ করেন, এই উভয়েই বর্ত্তমান সন্দর্ভ রচনায় আমাদের মনে প্রেরণা দান করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে পার্সিভাল স্পীয়ার নামধেয় জনৈক অধ্যাপক "ভারতে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা (Democracy's Failure in India)" শীর্ষে যে স্মারক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে 'ষ্টেট্সম্যান' পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে-রচনা প্রকাশ করেন, আমাদের তাহাও স্মরণে আছে।

উপরে যে-চারিটি মতবাদের উল্লেখ করা হইল, সকলেরই ধারণা যে, ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার প্রতীকারকল্পে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত-ব্যবচ্ছেদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের মতে, বৃটিশ রাষ্ট্রনীতি-বিদ্‌গণের ইহা যে কেবল অদূরদর্শিতার পরিচায়ক তাহা নহে, উপরন্তু এই মতবাদ কার্য্যতঃ প্রয়োগ করা হইলে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন তদ্দ্বারা নিকটতর হইবার সম্ভাবনা—ফলে যে কেবল ভারত ও ভারতবাসীর সমূহ বিপদ ঘটিবে তাহা নহে, সমগ্র মনুষ্য-জাতির পক্ষেও ইহা সর্ব্বনাশ-সাধক হইবে।

আমরা ইতিহাস-পাঠে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তদনুযায়ী ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বৃটনগণ উচ্চশিক্ষিত জাতি ছিলেন এমন বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই অনলঙ্কৃত, সত্যপরায়ণ, পরিশ্রমী এবং বিবেকসম্পন্ন ছিলেন। প্রধানতঃ ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বৃটিশ জাতির পরিশ্রমনিষ্ঠা এবং সততার নিমিত্তই অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিগঠন সম্ভব হইয়াছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্য সেই কালের নিমিত্ত বৃটিশজাতির সমস্যা-সমূহেরই যে সমাধান করিয়াছিলেন তাহা নহে, সম-সাময়িক পৃথিবীর মনুষ্যজাতিরও সমস্যার সমাধানে তাঁহারা সমর্থ হইয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এক প্রকার সকল দিকেই এইভাবে শুভ অতিবাহিত হয়। ১৮২০ সন হইতে ১৮৭০ সন পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বৎসর কাল মনুষ্যসমাজে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই, সুতরাং সমগ্র পৃথিবী এই সময়ে শান্তিতে ও সন্তুষ্টিতে অতিবাহিত করিয়াছে, এইরূপ বলা চলিতে পারে। কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে স্রোত সম্পূর্ণ বিপরীত দিক্ হইতে বহিতে সুরু করে। তদবধি মনুষ্যজাতির পক্ষে শান্তি দুর্লভ বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। ১৮৭০ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর কালে প্রুশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে, বুয়োর এবং বৃটিশ জাতির মধ্যে, ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ এবং চীনের মধ্যে এবং রুষিয়া ও জাপানের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ ও বাণিজ্যমূলক সংঘর্ষ দ্বারা মনুষ্যজগৎ বিধ্বস্ত হয়। অতঃপর আসিল ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধ। মাত্র ৪৪ বৎসর কালের মধ্যে পাঁচ পাঁচটি বড় যুদ্ধ সংঘটনকে মনুষ্যজাতির, বিশেষতঃ ইউরোপীয় জাতির পক্ষে নিকৃষ্ট প্রকার পশুশক্তির প্রকাশক বলিয়া গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। ইহাতেই শেষ হয় নাই। মাত্র ২৫ বৎসর অতিবাহিত হয় নাই, ইতিমধ্যেই ইউরোপের কতিপয় বৃহৎ জাতি মনুষ্যরক্তপাতে পুনরায় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন দেখা যাইতেছে। মনুষ্যজাতির পক্ষে ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নতির পরিচায়ক, নিশ্চয়ই এমন কথা বলা চলে না।

স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, যে-ব্রিটিশগণ ১৮২০ হইতে ১৮৭০ সনের মধ্যে মনুষ্য-জাতির মধ্যে এমন পরিমাণে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা ১৮৭২ সন হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর কালের মধ্যে পূর্ব্বের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ কৃতিত্বও কেন প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

ইহার একমাত্র সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর এই যে, ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ জাতি অত্যন্ত পরিশ্রমী, সরল-স্বভাব এবং সৎ ছিলেন এবং তাঁহাদের এই সকল গুণের সহায়তায় তাঁহারা অনেক গৌরবে গৌরবান্বিত জাতীয় জীবন গঠনে সমর্থ হন। তদানীন্তন ব্রিটিশ-জাতি কেবল একটি বিষয়ের অধিকারী ছিলেন না—প্রণালীবদ্ধ বিবিধ-বিষয়ক শিক্ষায়;

এই কালে তেমন কোন নাম-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব হইতেই ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ-জাতি শতাব্দীর প্রথমাংশ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের এই শূন্যতা-পূরণে ব্রতী হন এবং তখন হইতে আরম্ভ করিয়া এমন শিক্ষা ও বিজ্ঞান তাঁহারা সংগঠন করিয়া আসিয়াছেন, প্রকৃত শিক্ষা এবং প্রকৃত বিজ্ঞানের অভিশাপ বলিয়া যাহাকে আখ্যাত করিতে কোন বাধাই থাকিতে পারে না।

এই শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ব্রিটিশ-জাতির বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে তাঁহাদের মস্তিষ্ক-সামর্থ্যের দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ যন্ত্র-চালিত করিয়া ফেলিয়াছে এবং মনুষ্যমস্তিষ্কবিশিষ্ট হইলেও তাঁহারা প্রায়শঃ মস্তিষ্কসামর্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন। যে-ব্রিটিশ-জাতি একদা-সর্ব্বতোভাবে সরল স্বভাবের, সত্যানু-রাগের, বিবেকসম্পন্নতার, পরিশ্রম-নিষ্ঠার এবং সততার জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারিতেন, মূলতঃ এই কুশিক্ষা এবং কু-বিজ্ঞানবশতঃই তাঁহারা বর্ত্তমানে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এক শ্রেণী—ব্রিটিশ জাতির অধিকাংশ—ইংলণ্ডের জনসাধারণ বলিয়া যাঁহারা অভিহিত—অদ্যাবধি ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী-কালীন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের গুণসমূহের অধিকাংশের উত্তরাধিকারী রহিয়াছেন। কিন্তু অপর সম্প্রদায়—ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী বলিয়া যাঁহারা অভিহিত—প্রায়শঃ প্রতারণাশীল, মিথ্যাচারী, বিবেকহীন, অলস এবং অসৎ হইয়া পড়িয়াছেন। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত এই সকল ব্যক্তিই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়প্রবণতাহেতু সমাজে এমন বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের মাতা, ভগ্নী এবং কন্যার সহিত ব্যবহার অনবধানসূচক হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতিসম্মত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টি লইয়া ব্রিটিশ-জাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে উদ্‌ঘাটিত হইবে যে, ইংলণ্ডে একদা নারীজাতি এমন গুণরাজিবিভূষিত ছিলেন, যাহাতে তাঁহারা পৃথিবীর যে-কোন জাতির পক্ষে অলঙ্কারস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারিতেন এবং তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তান সৎস্বভাব লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ-জাতির সেই মাতৃস্বরূপিণী নারীজাতি বর্ত্তমানে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছেন। বিবাহবিচ্ছেদ, পুনর্ব্বিবাহ, বিলম্বে বিবাহ, নর-নারীর আজীবন অবিবাহ ইত্যাদির ছদ্মাবরণে ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নর-নারী পরোক্ষে অবাধ ব্যভিচারের প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় উদার সামাজিক চাল-চলনের নামে যে নৃত্যগীত, ক্রীড়া, পান-ভোজনের প্রচলন করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়প্রবণতার চরিতার্থতার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা স্বরূপতঃ জাতীয় প্রাণশক্তির হানিকারক হইয়াছে। আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্রিটিশ-জাতির বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের চরিত্রের বর্ত্তমান দিকের আলোচনা অত্যন্ত রুচিবিরুদ্ধ এবং কষ্টকর, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনাশঙ্কার সম্ভাবনার ইঙ্গিত তদপেক্ষাও কষ্টকর এবং হৃদয়বিদারক, কেন না, যে-পথে মনুষ্য-সমাজের প্রকৃত অগ্রগতির সম্ভাবনা, ইহার ফলে আগামী কিছু কালের নিমিত্ত তাহার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

প্রধানতঃ ব্রিটিশ-জাতির বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অধঃপতন এবং মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতগ্রস্ততাবশতঃই যে-ব্রিটিশ-জাতি একদা উনবিংশ শতাব্দীতে মনুষ্যজাতির উন্নতির পক্ষে অনেকখানি সহায়তা সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে উহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পড়িয়াছেন।

মোটামুটিরূপে ইংলণ্ডে এবং ইউরোপে যে-শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের উদ্ভব ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রিটিশ-জাতির বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করিয়া ব্রিটিশ-জাতির উন্নতির পথই রুদ্ধ করিয়াছে তাহা নহে, উপরন্তু এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা যাঁহারা ইংলণ্ডের নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন, ব্যক্তি কিংবা জাতি যাঁহারাই হউন, তাঁহাদের অবস্থাও ইহাদের ফলে একই পর্য্যায়ের দাঁড়াইয়াছে।

মিঃ জিন্নার সভাপতির অভিভাষণ, লণ্ডনের 'টাইম্‌স্' পত্রিকার তদ্বিষয়ক আলোচনা, অধ্যাপক স্পীয়ারের "ভারতে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা (Democracy's Eailure in India)" এবং তদ্বিষয়ে "ষ্টেট্‌সম্যান" পত্রিকার সম্পাদকীয় সমস্তই আমাদের উপরিলিখিত মতামতের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এই কতিপয় মতবাদেই ভারত-ব্যবচ্ছেদ সমর্থিত হইয়াছে। আমরা এই প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করিতাম না এবং অন্ততঃ পক্ষে ব্রিটিশ

জাতির দৃষ্টিতে ইহার বিচার করিয়া ইহা সমর্থনে কার্পণ্য প্রদর্শন করিতাম না, যদি বুঝিতে পারিতাম যে, ইহা কোন প্রকারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়ুর দৈর্ঘ্যদানে সহায়ক হইবে। কিন্তু প্রাথমিক মনোবিজ্ঞানের একটি শিক্ষণীয় বিষয় হইতেছে যে, কোনরূপ ব্যবচ্ছেদই কোন সাম্রাজ্যের দীর্ঘায়ু দানে সহায়ক হইতে পারে না। ইহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য সত্য যে, জন-সাধারণের সন্তুষ্টি সকল শাসন-ব্যবস্থার সর্ব্ব-প্রধান সম্পদ্। অর্থাৎ, শাসিতদিগের সন্তুষ্টির পরিমাণ এবং তাহার উৎকর্ষ যত অধিক হইবে, শাসকদিগের স্থায়িত্ব তত অধিক দিনের জন্য হইবে এবং ফলতঃ সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। অন্য পক্ষে, জন-সাধারণের সন্তুষ্টি যত অনধিক পরিমাণের হইবে, সাম্রাজ্যের দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব-সম্ভাবনা তত কম হইবে। ভারত-ব্যবচ্ছেদের ফলে এক সম্প্রদায়ের অপর সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সন্তুষ্টিলাভের নিশ্চয়তা রহিয়াছে, অথবা অন্য কথায়, প্রস্তাবিত ব্যবচ্ছেদের ফলে ভারতের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে অপর সম্প্রদায় অপেক্ষা অসন্তুষ্টির নিশ্চিত সম্ভাবনা বিদ্যমান। ইহাতে ভারতের জন-সাধারণের মধ্যে আশানুরূপ সন্তুষ্টির সম্পূর্ণ অভাব ঘটিবে এবং তাহার ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্য্যন্ত শিথিল হইবার কারণ বৃদ্ধি পাইবে। এই নিমিত্তই আমাদের বক্তব্য যে, মেসার্স জিন্না, লণ্ডনের 'টাইম্স্' পত্রিকার সম্পাদক, অধ্যাপক স্পীয়ার এবং 'ষ্টেটস্ম্যান' পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়গণ যে-মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্রুত ধ্বংসসাধনের আশঙ্কা রহিয়াছে।

অতঃপর, ভারত যদি মুসলমান-অধ্যুষিত তথা হিন্দু-অধ্যুষিত, এই দুই বিভাগে ব্যবচ্ছিন্ন হয়, তাহার আশু পরিণাম কি হইতে পারে, তদ্বিষয়ক অধিকতর সূক্ষ্ম আলোচনায় অগ্রসর হইলে আমরা দেখিব যে, ইহার ফলে অন্ততঃ কিছুকালের নিমিত্ত ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের বেকার এবং অনাহার সমস্যার সমাধানের আশা তিরোহিত হইবে। অধ্যাপক স্পীয়ার, লণ্ডনের 'টাইম্স' পত্রিকার সম্পাদক', 'ষ্টেট্সম্যান' পত্রিকার সম্পাদক পর্য্যায়ের ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সম্ভবতঃ অনুমান করিতে পারিবেন না যে, হিন্দু এবং মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে বিভাগের ফলে ভারতের অবস্থা আমরা যেরূপ বলিতেছি কি করিয়া তদনুরূপ দাঁড়াইতে পারে, কেন না, কোন দেশের বেকার এবং অনাহার-সমস্যার সমাধানকল্পে যাহা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা অজ্ঞ। তাঁহারা যে এই বিষয়ে অজ্ঞ, ইহা কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না, কেন না তাঁহারা যদি কোন দেশের বেকার এবং অনাহার-সমস্যার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞই না হইতেন, তবে ইংলণ্ডের বেকার এবং অনাহার-সমস্যার সমাধানসূচক পরিকল্পনা তাঁহারা স্থির করিতে পারিতেন। অধ্যাপক স্পীয়ার, 'ষ্টেট্সম্যান' পত্রিকার সম্পাদক এবং লণ্ডনের 'টাইম্স' পত্রিকার সম্পাদক পর্য্যায়ের বুদ্ধিজীবিগণ ইহা অনুমান করিতে পারুন আর নাই পারুন, বাস্তব সত্য এই যে, এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আমরা ইহা প্রমাণ করিতে পারিব যে, দেশের সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে সর্ব্ব-সাধারণের কল্যাণজনক ভিত্তিতে পরস্পর আন্তরিক ঐক্যের মনোভাব সূচিত না হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় কোন দেশেরই বেকার এবং অনাহার-সমস্যার সর্ব্বতোভাবের সমাধান সম্ভব নহে। এই ঘটনা উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, ভারতের ভেদনীতিই সমগ্র মনুষ্যজাতির বেকার এবং অনাহার-সমস্যার সমাধানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহার ফলে ভারতে ও ভারতবাসীর মধ্যে যে-বেকার এবং অনাহার-সমস্যা একদা একরূপ অবিদিত ছিল, তাহা গত কয়েক বৎসর হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এবং আজিও তাহার শেষ হয় নাই। ভেদনীতির ফলে ভারতবাসীর মধ্যে অসন্তুষ্টি দিনের পর দিন—ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে, কেন না ইহা সুস্পষ্টই যে, জনসাধারণকে যদি বেকার এবং অনাহারের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তবে তাহারা কখনও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিপক্ষে ক্রমশঃ যে-অসন্তুষ্টি বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহার মূলে ভেদনীতিসূচক মনোভাব বর্ত্তমান, আমাদের এই বক্তব্যের প্রমাণ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইলেই পাওয়া যাইবে। অধ্যাপক স্পীয়ার পর্য্যায়ের ব্যক্তিবৃন্দের লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত যে, ভিক্টোরিয়ার আমলের শেষ পর্য্যন্ত ভারতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অসন্তুষ্টি দেখা যায় নাই এবং সেই পর্য্যন্ত ভারত-শাসনেও স্থায়ী ভাবে

ভেদনীতির স্থান পান নাই। লর্ড কর্জন কর্তৃক ভেদ-নীতিমূলক ব্যবস্থার নীতি প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয় এবং শেষে ১৯০৯ হইতে ভারত-শাসন-ব্যবস্থায় ইহা স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়েই প্রথমে মুসলমান সম্প্রদায়ের নিমিত্ত বিশেষ কয়টি আসন সংরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থার প্রথম সূচনা। ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সনের সংস্কার আইনে যে ভেদনীতির ব্যবস্থা অধিকতর প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়, ইহা গোপন করা অর্থহীন। কিন্তু ইহার পরিণাম কি হইয়াছে? অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জন-সাধারণের ক্ষোভ দিন দিন ক্রমশঃ এমন ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিনাশের আশঙ্কা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। রাষ্ট্রনীতিগত বিচক্ষণতা যাঁহার বর্ত্তমান, তাঁহার পক্ষে ভারতে ভেদনীতিমূলক ব্যবস্থা যে বিন্দুমাত্র পরিমাণেও সার্থক হয় নাই, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত কি ইহাই যথেষ্ট নহে?

বৃটিশের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যদি এমন ঋদ্ধি থাকিত, যাহাতে বুঝিতে পারা যাইত—"ঐক্য ও সাম্য" তথা "অনৈক্য ও বৈষম্য"-বিষয়ক মূল সূত্র কি, তবে তাঁহারা অচিরাৎ উপলব্ধি করিতে পারিতেন যে, ভেদনীতি-ব্যবস্থা কোন দেশের পক্ষেই শেষতঃ কল্যাণজনক হইতে পারে না। বুদ্ধিহীন এবং দূরদৃষ্টিহীনেরাই ইহার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। তথাপি, বৃটিশ শাসকবৃন্দ তাঁহাদের অধীন রাষ্ট্রসমূহের ব্যবচ্ছেদমূলক কোন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার পৃষ্ঠপোষকতা করিলে, যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাহার একমাত্র সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, অদূর-ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের জন-সাধারণের মধ্যে তাহাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সংস্কার-সাধনমূলক সুবুদ্ধির উদয় না হইলে— পৃথিবীতে বৃটিশ প্রাধান্যের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে?

আমাদের প্রার্থনা এই যে, এমন দুর্দ্দৈব যেন না ঘটে।

মিঃ জিন্না সম্বন্ধে দুই-একটি কথা না বলিলে আমাদের সন্দর্ভের উপসংহার হয় না। মিঃ জিন্নাকে আমরা ভারত-ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনার মূল প্রবর্ত্তকের দায়ে দায়ী করিব না; কেন না, মিঃ জিন্না স্বীকার করুন আর নাই করুন, আমাদের মনে করিবার কারণ রহিয়াছে যে, মূলতঃ ব্রিটিশ-জাতির অধ্যাপক এবং সাংবাদিকের মস্তিষ্ক হইতেই এই পরিকল্পনার উদ্ভব। আমরা পরিজ্ঞাত আছি যে, ইংলণ্ডের জন-সাধারণ সাধারণতঃ অনুমানও করিতে পারেন না, পাশ্চাত্ত্যের অধ্যাপক এবং সাংবাদিক শ্রেণীর এই ব্যক্তিবৃন্দ কি পরিমাণ অনিষ্টকারী, প্রতারক এবং বিপজ্জনক; কিন্তু আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, জগদ্বাসী অচিরাৎ বুঝিতে পারিবে যে, এই-সকল ব্যক্তিই মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশার মূলে। ইহাঁরাই তাঁহাদের কার্য্যের কি পরিণাম দাঁড়াইতে পারে, তাহা উপলব্ধি না করিতে পারিয়া নিজেদের খেয়াল অনুযায়ী মতবাদ প্রচার করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতেই ধারণা লাভ করিয়া শাসকশ্রেণী শাসিতদিগের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। সুতরাং এই ধারণার প্রবর্ত্তক হিসাবে মিঃ জিন্নাকে আমরা অভিযুক্ত করিতেছি না। মিঃ জিন্নার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ এই যে, তিনি এই নিকৃষ্ট জাতীয় ধারণার প্রচার করিতেছেন, বিশেষতঃ ভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে তিনি প্রকৃত ইশলামের ভাব প্রচার করিবেন, ইহাই সাধারণের প্রত্যাশা। আমরা বুঝিতে পারি না যে, কোরাণের দ্বাদশোত্তর শততম অধ্যায়ে 'আল্ ইখ্লাস'-এর ভাবে যিনি প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছেন, এরূপ কোন প্রকৃত মুসলমান কি করিয়া ব্যবচ্ছেদমূলক কোন পরিকল্পনার সমর্থন করিতে পারেন—এই পরিকল্পনা যে আল্লাহের একত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা হইতে কি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, মিঃ জিন্নার শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ প্রকৃত মুসলমান নহেন এবং কোরাণের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ কেবল তাঁহাদের মুখের কথাতেই সীমাবদ্ধ এবং উহা তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করে না? আমরা মিঃ জিন্নাকে "আল্-মুনাফিকিন্" অধ্যায় অতিশয় মনোযোগসহকারে পাঠ করিতে বলি এবং স্মরণ করিতে বলি যে, কোরাণের প্রত্যেকটি ছত্র সত্যের মূর্ত্ত প্রকাশ এবং এই পুণ্যগ্রন্থের আদ্যন্ত কোথাও সামান্য মাত্র অসত্য নাই। হইতে পারে যে, পাশ্চাত্ত্যের কুশিক্ষার এবং কুজ্ঞানের ফলে যাঁহাদের মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহারা সর্ব্বৈব সত্যের আধার। মিঃ জিন্নার শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, "ফলেন বৃক্ষঃ পরিচীয়তে" এবং কেবল এই মূলনীতির দ্বারা বিচার করিলেই বর্ত্তমান ইউরোপের কোন নীতিকে এবং ধারণার বিন্দুমাত্র মূল্য

দান করিবারও কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান ইউরোপের কোন নীতিতে এবং ভাবে যদি কোন সত্য নিহিত থাকিত, তবে জাতিগতভাবে ইউরোপীয়গণ মনুষ্য-প্রাণসংহারে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ বোধ না করিবার ন্যায় এরূপ পশুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়িতেন না। ইউরোপীয়গণের এই অধঃপতনের কারণ এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের মূল বাইবেল সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন এবং উহার ভ্রান্ত অনুবাদকে সেই আসনে সমাসীন করিয়াছেন। পুরাতন হিব্রু ভাষার ব্যাকরণের প্রতি কোন শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিলে এই অনুবাদকে কোনক্রমেই সমর্থন করা চলে না। মিঃ জিন্না এবং তৎপর্য্যায়ের ব্যক্তিবৃন্দকে আমরা চক্ষু চাহিয়া চারিপার্শ্বের অবস্থা অবলোকন করিতে বলিতেছি। ইহা করিলে তাঁহাদের দৃষ্টিতে পড়িবে যে, জগতের সর্ব্বত্র বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক মনুষ্য-পরিবার আর্থিক অভাবে এবং অনাহারে, অস্বাস্থ্যে এবং অশান্তিতে, অকালবার্দ্ধক্যে এবং অকালমৃত্যুতে জর্জ্জরিত। তাঁহাদের দৃষ্টিতে আরও ধরা পড়িবে যে, মনুষ্যকে যে দুঃখ-দুর্দ্দশা বর্ত্তমানে ভোগ করিতে হইতেছে, পশু-পক্ষীর পর্য্যন্ত তাহা ভোগ করিতে হয় না। মনুষ্য-জাতির এই সর্ব্বনাশের কারণ অনুসন্ধানে চেষ্টিত হইলে দেখা যাইবে যে, শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের নির্দ্দেশ এবং সত্যের অবহেলাই ইহার মূলে এবং পাশ্চাত্যের কুজ্ঞান এবং কু-বিজ্ঞানের প্রচলনাবধি ইহার আধিক্য সূচিত হইয়াছে; কোরাণ, বাইবেল এবং বেদ, এই তিনটি শাস্ত্রের যে কোন একটি যদি যথাযথ অর্থে পালিত হইতে পারিত, তাহা হইলে কোন নূতন বিজ্ঞানের সন্ধানের প্রয়োজনীয়তা পর্য্যন্ত উপলব্ধি হইত না, কেন না সম্পূর্ণ প্রকৃত বিজ্ঞান উহাদেরই মধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। জনসাধারণ যাহাতে এখনও সতর্কতা অবলম্বন করেন, ইহাই আমাদের কাম্য, নতুবা চরম শাস্তির সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত তাঁহারা প্রস্তুত হউন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবপ্রণোদিত অধ্যাপক এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ যে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়—জনসাধারণ যদি তাহাদের বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাহেন, তবে ইহাই সকল দেশের জন-সাধারণের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত।*

ইহা কি প্রকৃত পক্ষে অগ্রগতি

মিঃ গান্ধীর কতিপয় স্তাবক গর্ব্ব প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন যে, গত বিশ বৎসর ধরিয়া মিঃ গান্ধীর নেতৃত্ব-কালে দেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহা অতিশয় ভ্রান্ত ধারণা। আমাদের মতে ভারতীয় জাতীয় মহাসভায় মিঃ গান্ধী কর্ত্তৃক নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৯২০ সনের পূর্ব্বে দেশের যাহা অবস্থা ছিল, রাষ্ট্র এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে উভয়তঃই বর্ত্তমান অবস্থা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কোন প্রকার সরকারী বিবরণীর সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও যদি কেহ নিজের পরিচিত ব্যক্তিবৃন্দের আর্থিক অবস্থার সংবাদ গ্রহণ করেন, তবে দেখিবেন যে, ১৯২০ সনে যে-অবস্থা ছিল, অনাহারক্লিষ্ট জন-সাধারণের সংখ্যা তথা অনাহার-যন্ত্রণার তীব্রতা তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২০ সনে দেশের কৃষকের যে অবস্থা ছিল, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান ১৯৪০ সনে উহা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রতি অবহিত হইলে দেখা যাইবে যে, ১৯২০ সনেও শতকরা ৮০ জন কৃষকই তাহাদের সাম্বৎসরিক ফসল হইতে বৎসরের আহার্য্য এবং ব্যবহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিত, কিন্তু ১৯৩৫ সনে শতকরা ৮০ অপেক্ষাও অধিকসংখ্যক কৃষককেই তাহাদের সাম্বৎসরিক ফসল হইতে এমন কি ছয় মাসের প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সংগ্রহ করিতেও অসমর্থ দেখা যায়। এই ভাবে কৃষকদিগের অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করিয়া অতঃপর যদি ব্যবসায়ী এবং শিল্পীদের ১৯২০ সনে যে-অবস্থা ছিল, তাহার তুলনায় ১৯৪০ সনে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহার তুলনা-মূলক পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলেও অবস্থা একই প্রকার বলিয়া দেখা যাইবে। ১৯২০ সনে ব্যবসায়ী এবং শিল্পীদের প্রায় শতকরা ৮০ জন যথোচিত লাভ করিতেন বলিয়া দেখা যাইত, ১৯৩৫ সনে তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনেরও অধিককে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়।

---

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ১৬ই এপ্রিলের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

অনন্তর শিক্ষিত যুবকবৃন্দের অবস্থার পর্য্যালোচনা এবং তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ১৯২০ সন পর্য্যন্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বার্ষিক পাশ-করা ছাত্রের প্রায় শতকরা ৮০ জন কোন না কোন প্রকার চাকুরি-লাভে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু ১৯৩৫ সনে উহাদের শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিককে বেকার এবং অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। চাকুরিজীবিগণের অবস্থার তুলনামূলক পর্য্যালোচনাতেও এই একই অবস্থা ধরা পড়িবে। ১৯২০ সন পর্য্যন্ত চাকুরিজীবিগণের শতকরা ৮০ জনকেই প্রায় দেখা যাইত তাহাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্বাস্থ্যের অথবা পুত্র-কন্যার স্বভাব-চরিত্রের দিক্ হইতে তেমন কোন জটিলতা ছিল না, কিন্তু ১৯৩৫ সনে তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনেরই এই সকল বিষয়ে ভীষণ জটিলতার সম্মুখীন হইতে দেখা যায়। এতৎসত্ত্বেও যদি এমন ব্যক্তির সন্ধান মিলে, যাঁহারা ভারতের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে ইহা প্রচার করেন, তবে একমাত্র যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত দাঁড়াইবে এই যে, এই সকল ব্যক্তি মস্তিষ্ক এবং দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াও বস্তুতঃ মস্তিষ্কহীন এবং দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িয়াছেন।

কেবল যে আর্থিক অবস্থাতেই এই বিপর্য্যয় সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহা নহে, রাষ্ট্রীয় অবস্থায় অধিকতর বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে দেখা যাইবে। কোন দেশের দুইটি নির্দ্দিষ্ট কালের রাষ্ট্রীয় অবস্থার তুলনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন—ইহার মানদণ্ড কি হইতে পারে। আমরা ধরিয়া লইতেছি, ভারতের রাষ্ট্রগত অবস্থা সম্বন্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য এই যে, ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্য সাধিত না হইলে কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় উন্নতি হইয়াছে বলিয়া ধরা চলে না। অর্থাৎ ভারতবাসীদিগের মধ্যে যত অধিক পরিমাণে ঐক্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে, তাহাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতি তত অধিক হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যে যত কম ঐক্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে, তাহাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতি তত কম হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে সংঘটিত ঘটনা হইতেই এই রাষ্ট্রীয় নীতি প্রমাণিত হইবে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে ভারতবাসী জন-সাধারণের মধ্যে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা গিয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহার অভাব উপস্থিত হইয়াছে। ইহাও অবশ্যস্বীকার্য্য যে, ১৯১৯ সনের শাসনতন্ত্রে ভেদনীতিমূলক যে ভাব পরিস্ফুট, তাহা ১৯৩৫ সনের শাসনতন্ত্রে যেরূপ দৃষ্ট হয়, সেরূপ মারাত্মক হয় নাই। ভাবের দিক দিয়া এই পার্থক্যের একমাত্র মূলগত এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ এই যে, স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে ভারতবাসীদিগের মনে ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত দেখা যায়, সুতরাং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের স্ব-শাসনমূলক শাসনতন্ত্রে দৃশ্যতঃ এক প্রকার উন্নতিমূলক ব্যবস্থা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হন, এবং ফলতঃ ভেদনীতিমূলক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তন বিষয়ে তাঁহাদিগকে তখন অপেক্ষাকৃত সংযত হইতে হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ভারতবাসিগণের মধ্যে দলাদলি এবং অনৈক্য বৃদ্ধি পাওয়াতে, ১৯১৯ সনে ভেদনীতিগত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তন বিষয়ে যে-কুণ্ঠা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহার আর প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, কোন দুইটি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থার তুলনামূলক নির্দ্ধারণ বিষয়ক প্রকৃত পরিমাপক হইতেছে ঐক্যের পরিমাণ এবং প্রকার। অর্থাৎ ভারতবাসিগণের মধ্যে ঐক্যের প্রকার এবং পরিমাণের যত আধিক্য দৃষ্ট হইবে, তাহাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতির সম্ভাবনাতেও তত আধিক্য পরিদৃষ্ট হইবে।

এক্ষণে, ১৯২০ সনে এবং ১৯৪০ সনে ভারতবাসিগণের মধ্যে ঐক্যসূচক ভাবের তুলনামূলক অবস্থাপর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে, যত দিন যাইতেছে, দেশ ততই অবনতির পথে চলিয়াছে। ১৯২০ সনে, হিন্দু ও মুসলমান জন-সাধারণের মধ্যে এই দ্বিবিধ প্রধান বিভাগ পরিলক্ষিত হইত এবং কংগ্রেসের অন্তর্গত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যেও, উদারপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই প্রধান শ্রেণী দৃষ্ট হইত। কিন্তু অতঃপর, জন-সাধারণের মধ্যে উচ্চ বর্ণের এবং নিম্ন বর্ণের, হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, মুসলমান ও অমুসলমান, লীগপন্থী এবং লীগের বাহিরে অপর সম্প্রদায়, বাঙ্গালী ও বিহারী ইত্যাদি বহু প্রকার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়াছে। এক কথায় ভ্রাতায় ভ্রাতায় দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টিকর্ত্তাস্বরূপ যে-শয়তান, তাহার লীলাখেলা ১৯৪০ সনে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, ১৯২০ সনে তাহার এক-চতুর্থাংশও প্রকাশ পায় নাই। সুতরাং

সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, রাষ্ট্রগতভাবে ভারতবাসীর অবস্থাও নিকৃষ্টতর হইয়া পড়িয়াছে। যদি দেখা যাইত যে, বর্ত্তমানে অস্থায়ী ভাবে এরূপ অবস্থা পরিদৃষ্ট হইলেও, অদূর-ভবিষ্যতে সুপথে দিক্‌পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা বর্ত্তমান, তাহা হইলেও আমরা বর্ত্তমানের এই ভ্রান্ত গতি সম্বন্ধে অনবহিত থাকিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, জন-সাধারণ দেশের বর্ত্তমান ভ্রান্ত নেতৃত্বের উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধ-পরিকর না হইলে এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। জন-সাধারণের হইয়া যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে অচিরাৎ ধরা পড়িত যে, দেশে বর্ত্তমানে যাঁহাদের হস্তে নেতৃত্ব ন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহারা অধ্যয়নশীল, প্রাজ্ঞ, দেশপ্রেমিক কিংবা সৎ একটির কোনটিও নহেন। অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি, এই উভয় বিষয়ের প্রকৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই অজ্ঞ, কিংবা মুখস্থ বিদ্যার দ্বারা এবং চাতুর্য্যের সহায়তাতেই তাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চিহ্নলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, ইঁহাদের অধিকাংশই সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি এবং অসততার নানা ভাব প্রণোদিত। তাঁহাদের অধিকাংশেরই জীবিকানির্ব্বাহের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা নাই এবং কিরূপে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহিত হয়, এতৎসম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান-কার্য্যে লিপ্ত হইলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা প্রায়শঃ কোন না কোন অসদুপায়ের সাহায্যে ইহা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এমন কি, অমৃতবাজার এবং আনন্দবাজার পত্রিকার যে-সাংবাদিকগণ তাঁহাদের মতের বহুল প্রচার হেতু পরোক্ষভাবে দেশবাসীকে পরিচালিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও অজ্ঞতা এবং সঙ্কীর্ণ-স্বার্থবোধ হইতে মুক্ত বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

এই সকল নেতা মনে করেন যে, দেশের অর্থনীতিগত উন্নতিসাধনের পন্থা নিম্নলিখিতরূপ :—

প্রথমতঃ, জলসেচ ব্যবস্থা এবং কৃত্রিম সারদান প্রণালীর প্রসার।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি—প্রধানতঃ শিল্পের জন্য যে সকল কাঁচামালের প্রয়োজন তাহারাই ইহার অন্তর্গত।

তৃতীয়তঃ, যন্ত্রশিল্প এবং কুটীরশিল্পের প্রসার।

চতুর্থতঃ, বেতনভোগী চাকুরীর সংখ্যাবৃদ্ধি।

পঞ্চমতঃ, ব্যবহারিক শিক্ষার প্রসার।

তাঁহাদের অর্থনৈতিক প্রচার-কার্য্য মূলতঃ এই পাঁচটি উদ্দেশ্যের সহায়ে পরিচালিত হইয়া থাকে এবং দেশের যুবক-বৃন্দ তাঁহাদের মুক্তির পন্থা হিসাবে এই ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। নেতৃবৃন্দের সম্পূর্ণ মস্তিষ্কহীনতা এবং অজ্ঞতার ইহা সুস্পষ্ট নিদর্শন। এই সকল নেতার মধ্যে একজনেরও যদি মনুষ্যোচিত মস্তিষ্ক-সামর্থ্য বর্ত্তমান থাকিত, তবে তিনি অচিরাৎ উপলব্ধি করিতে পারিতেন যে, প্রকৃত আর্থিক উন্নতির দিক্ হইতে এই সকল পন্থা সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাহাই যদি না হইত, তবে অন্ততঃ ইউরোপীয় দেশসমূহে ঐ সকল ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যে সার্থকতা লাভ করিত—তাহাদের কাহারও আধুনিক জলসেচব্যবস্থা এবং কৃত্রিম সারদান প্রণালীতে কিংবা কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে, তথা যন্ত্রশিল্পের প্রসারে এবং বেতনভোগী চাকুরীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে এবং তথাকথিত ব্যবহারিক শিক্ষার প্রসারে কার্পণ্য দেখা যায় নাই।

সুতরাং স্বীকার্য্য যে, নেতৃবৃন্দ আর্থিক উন্নতির প্রকৃত পন্থাগ্রহণের বিষয়ে ভ্রান্ত এবং অদূরভবিষ্যতে ঐ দিক্ হইতে দেশের কোন সম্ভাবনাই নাই। মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার স্বগোষ্ঠীগণ যাঁহারা কুটীরশিল্পের সমর্থক ইঁহাদের হইতে নিজদিগকে পৃথক্ বলিয়া দাবী করিতে পারেন, কেন না বর্ত্তমান ইউরোপে কুটিরশিল্পের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। কিন্তু আমাদের মতে, ইঁহারাও কোন ক্রমে অনধিক অজ্ঞ নহেন। তাঁহারা যদি অজ্ঞই না হইতেন, তবে অনতিবিলম্বে বুঝিতে পারিতেন যে, জন-সাধারণের শিল্পগত সমস্যার সমাধানার্থ কুটীরশিল্প ব্যবস্থার অবলম্বন প্রকৃত পন্থা বটে, কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কুটীরশিল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে, যন্ত্রচালিত শিল্পের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে না। যদি জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি এরূপ হয় যে, কৃষকগণ তাহাদের জমী চাষ করিয়া বৎসরের পাঁচ মাস মাত্র পরিশ্রমের সাহায্যে তাহাদের সাম্বৎসরিক প্রয়োজনীয় আহার্য্যের তিনগুণ উৎপাদন করিতে পারে, তবেই ইহা সম্ভব। মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের বোধগম্য হইবার পক্ষে ইহা সুকঠিন হইতে পারে, কিন্তু তথাপি ইহা সত্য।

দেশের আর্থিক অবস্থায় উন্নতি-সাধনের সম্ভাবনা যেরূপ সুদূরপরাহত বলিয়া দেখা যাইতেছে, অদূর-ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয়

উন্নয়নের ভবিষ্যৎও সেইরূপ অন্ধকারে নিহিত। কংগ্রেস আন্দোলন, মুসলিম লীগ আন্দোলন এবং হিন্দুসভা আন্দোলন নামে দেশের বুকে যাহা চলিতেছে, তাহা হইতেই ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ পাঠে আমরা বস্তুতঃ মর্ম্মাহত হইয়াছি। উঁহারা সকলেই ঐক্যপ্রচেষ্টার্থ হা-হুতাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কিংবা প্রকারে ঐক্য কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার কোন কার্য্যকরী পন্থার নির্দ্দেশ-দানে সমর্থ হন নাই। উপরন্ত, প্রস্তাব হিসাবে তাঁহারা যে কার্য্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের দ্বারা দেশের মধ্যে উত্তরোত্তর দ্বন্দ্ব-কলহের অধিকতর সৃষ্টি হইবে এবং দেশ শেষতঃ রাষ্ট্রীয়ভাবে সমধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

মিঃ আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের ঐক্যবদ্ধ শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নলিখিত দুইপ্রকার নীতির উল্লেখ করিয়াছেন :—

(১) "ভারতের জন্য যে শাসনতন্ত্রই গৃহীত হউক না কেন, তাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠগণের সকল স্বার্থ এবং অধিকার নিশ্চিতরূপে এবং সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইবে। (Whatever constitution is adopted for India there must be the fullest guarantees in it for the rights and interests of minorities)."

(২) "সংখ্যালঘিষ্ঠগণ নিজেরাই বিবেচনা করিবেন তাঁহাদের অধিকার এবং স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত কিরূপ রক্ষাকবচের প্রয়োজন। সংখ্যাগরিষ্ঠগণের পক্ষে তাহা নির্দ্ধারণ উচিত হইবে না। সুতরাং এই বিষয়ক নির্দ্ধারণ সংখ্যালঘিষ্ঠগণের উপরই নির্ভর করিতেছে, সংখ্যাগরিষ্ঠগণের উপর নহে (The minorities should judge for themselves what safeguards are necessary for the protection of their rights and interests. The majority should not decide this. Therefore, the decision in this respect must depend upon the consent of the minorities and not on a majority)."

মিঃ আজাদের অভিভাষণের সমগ্রাংশ বাদ দিয়া কেবল যদি এই অংশ মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করা যায়, তবে ইহাতেই নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয় যে, মিঃ আজাদ পাশ্চাত্ত্যের রাজনীতির মুখস্থ বুলি তোতাপাখীর ন্যায় আবৃত্তি করিতেছেন মাত্র এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশবাসীর নেতৃত্বের উপযোগী হইবার পক্ষে যাহা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়, সেই রাষ্ট্রীয় বিচক্ষণতায় তাঁহার হাতে-খড়ি পর্য্যন্ত হয় নাই। আমাদের মতে "সংখ্যালঘিষ্ঠগণের অধিকার এবং স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা"র উল্লেখ পর্য্যন্ত বিভ্রান্তিজনক। বরং "সংখ্যাগরিষ্ঠগণের অধিকার এবং স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা"র বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের এই কথা বলিবার কারণ এই যে, আধুনিক সকল রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশবাসী রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে অবশ্যম্ভাবীরূপে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, যথা (১) শাসকগণ, এবং (২) শাসিতগণ। ইঁহাদের মধ্যে শাসকবৃন্দ সকল সময়েই সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং শাসিতগণ সকল সময়েই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শাসকগণ যদি শাসিতগণের, অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠগণের স্বার্থ এবং অধিকার অক্ষুন্নভাবে রক্ষা করিবার নিশ্চয়তা দান করিতে পারেন, তবে দেশের মধ্যে সম্প্রদায়গত অথবা পেশাগত, প্রদেশগত অথবা জাতিগত কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হইতে পারে না। দেশের শাসিত সম্প্রদায়ের বেকার এবং অনাহার-সমস্যার সমাধানরূপী প্রধানতঃ তাহাদের যে সকল স্বার্থ এবং অধিকার, ব্রিটিশ শাসকগণ তাহা অক্ষুন্ন রক্ষা করিবার নিশ্চয়তা যদি প্রদান করিতে পারিতেন, তবে আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে, মেসার্স গান্ধী এণ্ড কোম্পানীর দিক্ হইতে নিয়ন্ত্রিত কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় আন্দোলনই ব্রিটেন এবং ভারতবাসিগণের মধ্যে একদিন যে-মৈত্রীর সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তাহা শিথিল করিতে পারিত না। কিন্তু এই শাসিতগণকে লইয়া যে সংখ্যাগরিষ্ঠগণ, তাহাদের সকল প্রকার স্বার্থ ও অধিকার অক্ষুন্ন রাখিবার নিশ্চয়তা প্রদান না করিয়া, মাত্র মুসলমান কিংবা তপশীল-ভুক্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার অক্ষুন্ন রাখিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া যদি কোন শাসনতন্ত্র গঠিত হয়, তবে আমরা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, দেশে যাঁহারা মুসলমান

কিংবা তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষ সূচিত হইবে। ভারতের ঐক্যবদ্ধ শাসনতন্ত্রের মূলনীতি হিসাবে মিঃ আজাদ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ত্রুটি যে মিঃ আজাদের লক্ষ্যীভূত হয় নাই, ইহা পরিতাপের বিষয়। এই জন্যই আমরা বলিতেছি, মিঃ আজাদের বক্তৃতা কেবল প্রমাণ করিয়াছে যে, তিনি মাত্র পাশ্চাত্ত্যের রাজনীতির বুলি তোতাপাখীর ন্যায় আবৃত্তি করিয়াছেন এবং ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থায় নেতৃত্ব করিতে হইলে যে-রাষ্ট্রীয় বিচক্ষণতার প্রয়োজন অপরিহার্য্য, তাহার বিন্দুমাত্রও তাঁহার আয়ত্ত নহে। মিঃ আজাদ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা শ্রদ্ধা পোষণ করি এবং আমরা নিশ্চিত জানি যে, মিঃ গান্ধীর পাপ সংস্পর্শের দ্বারা কলঙ্কিত না হইলে, তাঁহার অকৃতকার্য্যতার পরিমাণ এতখানি হইত না—কিন্তু মিঃ গান্ধী, যে এ যুগের মনুষ্যজাতির পক্ষে সর্ব্বাধম ক্রতম শীঘ্রই তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

এমন কি, যদি কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে শাসিতগণের সকলের স্বার্থ এবং অধিকার অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিবার কোন নিশ্চয়তা প্রদত্ত হইত, তথাপি দেশবাসীর তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবার কারণ ছিল না, কেন না যদি ধরা যায় যে, ভারত একণে স্বাধীনতা লাভ করিল, কিন্তু সেই স্বাধীন ভারতের যাঁহারা শাসকপদাধিষ্ঠিত হইবেন বলিয়া অনুমেয়, তাঁহারাও ব্রিটিশ শাসকগণের ন্যায়ই জন-সাধারণের প্রকৃত স্বার্থ বজায় রাখিবার উপায় বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

এই সকল কংগ্রেস-নেতার মধ্যে একজনেরও যদি দেশের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মনোভাব ও কার্য্য-প্রেরণা আসিত, তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ উপলব্ধি করিতে পারিতেন যে, কোন সংঘগত প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ যদি প্রত্যেক ব্যক্তি কিংবা অপর সঙ্ঘের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প না হন, তবে তন্মধ্যে প্রকৃত ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয় না। আমাদের বক্তব্যের অর্থ এই যে, ভারতের নেতৃবৃন্দ যতদিন গান্ধী-পন্থী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের মনোভাব পোষণ করিবেন, যাহা কেবল ব্রিটিশ-জাতি এবং শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-কলহের নামান্তর মাত্র, ততদিন ভারতে প্রকৃত ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। অন্যপক্ষে যাঁহারা ব্রিটিশ জন-সাধারণের মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ সৃষ্টি না করিয়া ভারত সরকারের সাহায্যেই সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকের বেকার এবং অনাহার সমস্যার সমাধানের উপায় শিক্ষা করিয়াছেন, যে মুহূর্ত্তে ভারতের জন-সাধারণ বুঝিতে পারিবে, কি উপায়ে সেই সকল ব্যক্তির নেতৃত্ব লাভ করা যাইতে পারে, সেই মুহূর্ত্তে আপনা হইতেই দেশে স্বরাজ এবং সম্পূর্ণ ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ যেমন সকল দিক্ দিয়াই নিন্দনীয়, মুসলিম লীগের সভাপতির অভিভাষণও তেমনই কোন দিক্ দিয়া প্রশংসার যোগ্য নহে। এই অভিভাষণের কোন বিশদ আলোচনা আমরা করিব না, কেন না, মিঃ গান্ধীর কার্য্য-কলাপই সম্পূর্ণতঃ মুসলিম লীগের আন্দোলনের বিভ্রান্তির নিমিত্ত দায়ী। মিঃ গান্ধী যদি কংগ্রেসকে প্রকৃত পন্থায় পরিচালিত করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে মুসলিম লীগ অথবা হিন্দু মহাসভা কাহারও উদ্ভবের কোন কারণ পর্য্যন্ত উত্থাপিত হইত না, কেন না ইহাদের প্রত্যেকেই কংগ্রেস সংগঠনের অন্তর্লীন হইয়া যাইত।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহার মোটামুটি বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, দেশের অবস্থা ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর হইতেছে। মিঃ গান্ধীর পরিচালনায় প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অগ্রগতির পথে চলিতেছে, ইহা বিবেচনা করা সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং নির্ব্বোধোচিত।*

দেশকে ভ্রান্ত নেতৃত্বের কবল হইতে উদ্ধার করিবার পন্থা কি?

মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের বিভ্রান্ত নেতৃত্বের কবল হইতে দেশকে কি ভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার উপায়-নির্দ্দেশ না করিলে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সন্দর্ভের উপসংহার হয় না।

মিঃ গান্ধীকে যদি তাঁহার ভ্রান্ত মতবাদের পরিবর্ত্তে দেশবাসীর পক্ষে প্রকৃত কল্যাণজনক মতবাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যায়—অবশ্য আজিও যদি তাঁহার সে-সামর্থ্য বর্ত্তমান থাকে, তবে ইহা সুসাধ্য হইবে বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। মিঃ

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ৩০শে মার্চ্চের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

গান্ধী যদি প্রকৃত প্রস্তাবে দেশপ্রেমিক হইতেন এবং দেশবাসী দরিদ্র-সাধারণের ব্রত আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করিতেন, তবেই ইহা সম্ভব হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মিঃ গান্ধী প্রকৃত প্রস্তাবে দেশপ্রেমিক নহেন এবং দেশের দরিদ্র এবং লাঞ্ছিত-দিগের নিমিত্ত তিনি কোন নিঃস্বার্থ এবং আন্তরিক অনুভূতির অধিকারী নহেন। তিনি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে দেশপ্রেমিক হইতেন, তবে দেশের মধ্যে তাঁহার মতবাদের খণ্ডনমূলক যুক্তিসঙ্গত মতবাদ-গ্রহণার্থ তিনি তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রবণ উন্মুক্ত রাখিতেন এবং তাঁহার স্তাবকবৃন্দের মধ্যে বিরাজ করা অপেক্ষা যাঁহারা তাঁহার মতবাদের এইরূপ বিরুদ্ধভাবাপন্ন, তাঁহাদের বিরুদ্ধতার কারণ পরিজ্ঞাত হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সঙ্গ নিশ্চয়ই অধিকতর কাম্য বিবেচনা করিতেন। আমরা মনে করি যে, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে দেশপ্রেমিক হইলে তাঁহার এরূপ ব্যবস্থা থাকিত, যাহাতে "বঙ্গশ্রী" নামে কোন পত্রিকাতে যে, তাঁহার বিবিধ কুকার্য্যের উল্লেখ করিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইতেছে, তাহার সন্ধান লাভ করিতেন এবং তাঁহার মতবাদ এবং কার্য্যপ্রণালীর ভ্রান্তি কোথায়, তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভার্থ তিনি আমাদের সাহায্য যাচ্ঞা করিতেন। তিনি যে এতাবৎ ইহা করেন নাই, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, স্বকীয় "মহাত্মা"গিরি এবং সেনাপতিত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত তিনি যতখানি উদ্‌গ্রীব, জন-সাধারণের কল্যাণকার্য্য করিবার নিমিত্ত ততখানি উদ্‌গ্রীব তিনি নহেন। মিঃ গান্ধীকে তাঁহার মতবাদ এবং কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য করা যেরূপ সুকঠিন কার্য্য, তেমনই কোন গণতন্ত্রসম্মত উপায় দ্বারা তাঁহাকে অনতিবিলম্বে নেতৃত্ব হইতে বিচ্যুত করাও অসম্ভব, কেন না, দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার অনুগামী ব্যক্তিবৃন্দের পোষণার্থ প্রতিমাসে তিনি যে বহু অর্থ ব্যয় করেন, ইহা বেশ বুঝা যায়। এই অর্থ তাঁহার কোথা হইতে আসে, ইহা দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু সামান্য মাত্র অনুসন্ধানে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে হউক, অল-ইণ্ডিয়া কমিটিতে হউক কিংবা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনেই হউক, সর্ব্বত্র তাঁহার নেতৃত্ব সমর্থনে যাঁহারা ভোট দান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অধিকাংশই প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে তাঁহাদের স্বীয় এবং পারিবারিক ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মাসিক ভাতা লাভ করিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে আমরা আমাদের এই উক্তির প্রমাণ উপস্থিত করিতে প্রস্তুত আছি। এই ভাবেই মিঃ গান্ধী দেশের সর্ব্বত্র একদল লোকের নেতৃত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহারা দেশের ইষ্টানিষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া তাঁহাকে সতত সমর্থন করিতেছে। এই নিমিত্তই আমরা মিঃ গান্ধীকে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কূতম্ন ব্যক্তি বলিয়া আখ্যাত করিতেছি।

এইরূপ বিপরীত অবস্থা সত্ত্বেও, জন-সাধারণ যদি ইচ্ছা করে, তবে উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য তাহারা সাধন করিতে পারে। যখনই কংগ্রেসের কোন প্রতিষ্ঠান হউক কিংবা সরকারী অথবা আধা-সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান হউক, এবং বাণিজ্য কিংবা শিল্প-প্রতিষ্ঠান হউক, তাহার প্রতিনিধিত্ব-লাভার্থ তাঁহাদের নিকট কোন ব্যক্তি কোন প্রকার ভোটের নিমিত্ত আগমন করিবেন, এই ভোটলাভার্থী ব্যক্তিকে তাঁহাদের এমন কোন কার্য্য-পরিকল্পনার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বলিতে হইবে, যাহাতে দেশস্থ প্রত্যেকে বেকার এবং অর্দ্ধাশন হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং যাঁহারা তাহাতে অসমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগকে ভোট দিতে তাঁহাদের অস্বীকৃত হইতে হইবে। দেশের জন-সাধারণ যদি এই ভাবে দৃঢ়-সঙ্কল্প হন, তবে নিশ্চিত দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের মস্তিষ্কে সাড়া জাগিবে এবং অনপযুক্ত নেতৃবৃন্দ সকল শ্রেণীর সংগঠনের প্রতিনিধিত্বের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন।

আমাদের মতে, যে-পথে সমগ্র মনুষ্যজাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভ সুনিশ্চিত, এই কার্য্য-পন্থা তাহার প্রথম সোপান।

দেশবাসী কি এখনও আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না?*

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী'র ৩০শে মার্চের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

জীবন-অভিযান

সম্প্রতি ক্যানবেরা (অষ্ট্রেলিয়া) হইতে ডাকযোগে একটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ আসিয়াছে। সংবাদটির বিষয়বস্তু "দি কেলোশিপ্ অব ইণ্টারন্যাশনাল আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং" নামক কোন আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-প্রতিষ্ঠানের জন্য লিখিত একটি ইস্তাহার। প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়ার পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

ভবিষ্যতে যুদ্ধ কিরূপে নিবারিত হইতে পারে, এই ইস্তাহারে সেই সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—এবং অষ্ট্রেলিয়ার সেনেটে বিষয়টি আলোচিত হইবার বিষয়ও ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। সেনেটর ম্যাক্‌কার্টনি অ্যাবট পরিষদে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব আনয়ন করিবেন যে, সমরসম্ভার আয়ত্তাধীন রাখা, এবং উহার নির্ম্মাণ ও ব্যবহার সকল জাতির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি সংসদের সম্পূর্ণ এবং একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে। ইস্তাহারটির মতে সমরসম্ভার নির্ম্মাণ ও ব্যবহার করিবার যথেচ্ছ অধিকার থাকার জন্যই জাতিসমূহ বিদ্বেষের প্রকাশ অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করিবার ক্ষমতা লাভ করে—এবং যুদ্ধের প্রকৃত কারণ ইহাই। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান কালে যুদ্ধ নিবারণ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে রণসম্ভার নির্ম্মাণ করিবার অধিকার নির্দ্দিষ্ট জাতিসমূহের হস্ত হইতে অপসারিত করিয়া একটি "কেন্দ্রীয় সমরসম্ভার সংঘ"-এর (সেণ্ট্রাল আর্মামেণ্ট কমন্‌ওয়েল্‌থ-এর) উপর ন্যস্ত করা।

প্রস্তাবটির পশ্চাতে সদিচ্ছার আভাস দেখিলেও, আমাদের বোধ হয় যে, সংপ্রতি অনুরূপ যে-সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, এই প্রস্তাবটিও সেইগুলির মতই কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবাস্তব, কারণ ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থায় সকল জাতির প্রতিনিধিবর্গকে একটি সংঘের মধ্যে আনয়ন করিয়া ঐক্যবদ্ধ করা যাইতে পারে। ইহাতে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, তাহা যদি সম্ভবই হইত তাহা হইলে বর্ত্তমান যুদ্ধ বাধিল কেন? যুদ্ধের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধেও ইস্তাহারের মতবাদ ভ্রান্ত। আমাদের মতে যুদ্ধের কারণ জাতিসমূহের বিদ্বেষ-প্রকাশ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা-লাভের সক্ষমতা নহে, বরং অন্য কোন জাতির কোনরূপ অসুবিধা না ঘটাইয়া নিজেদের শুভেচ্ছা পূর্ণ করিবার এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা লাভের অক্ষমতাই ইহার কারণ। সমরাস্ত্র নির্ম্মাণ, অধিকার এবং ব্যবহার করিবার সুযোগকে কোনরূপ সামর্থ্যের মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করিলে চলিবে না; উহাকে বরং বাঞ্ছনীয় সামর্থ্যের অভাব বলিয়াই ধরিতে হইবে। সুতরাং, যুদ্ধ নিবারণ করিবার জন্য প্রয়োজন একটি "কেন্দ্রীয় সমরসম্ভার সংঘ" নহে; প্রয়োজন একটি সুনিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টা দ্বারা এইরূপ কর্ম্মপ্রণালীর উদ্ভাবন, যাহার ফলে অন্য জাতিসমূহ সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিলে অপর কোন জাতি কোনরূপ বিদ্বেষ পোষণ করিবে না অথবা মনে করিবে না যে, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া গেল। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধ-নিবারণের একমাত্র উপায় ইহাই এবং যদি কোন সময় প্রস্তাবিত কর্ম্মপ্রণালী সুবিহিত হয়, তাহা হইলে কোন জাতির নিকট হইতেই কোন অধিকার হরণ করিতে হইবে না, কারণ, সকল জাতিরই সকল অধিকার থাকিবে এবং তাহার জন্য পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ ঈর্ষ্যার কারণ থাকিবে না।

সেনেটর অ্যাবটের উদ্দেশ্য অস্ত্রসম্ভারের বিলোপসাধন হইলেও তিনি বাস্তবহিসাবে উহার পক্ষই লইয়াছেন, ইহা সহজেই দেখা যায়; কারণ, অস্ত্রসম্ভার-নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি পুনরায় অস্ত্র-সম্ভারেরই প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, "বিভিন্ন রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সমরসম্ভার সংঘের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য…পাহারাদারী এবং পরিদর্শনের ক্ষমতার" প্রয়োজন। "আন্তর্জ্জাতিক সদ্ভাব মৈত্রী"কে যদি এই ভাবে অস্ত্রসাহায্যে রক্ষা করিতে হয় (প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে নির্দ্দেশ তাহাই) তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, একটি মহতী পরিকল্পনার ইহা অত্যন্ত শোচনীয় পরিণতি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে-কর্ম্মপ্রণালীর সহায়তায় সকল জাতির পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছা-প্রকাশের প্রচুর সুযোগ পাওয়া যায়, সেই কর্ম্মপ্রণালী ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ-নিবারণের কোন আশা নাই। আমরা সকলেই জানি যে, যুধ্যমান জাতিসমূহ যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন: তাঁহাদের এক পক্ষের লক্ষ্য অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন এবং অপর পক্ষের উদ্দেশ্য এরূপ একটি নৈতিক

পরিবেশের সৃষ্টি করা, যাহাতে সংঘর্ষোন্মুখীনতা বিদ্যমান থাকিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে, বর্ত্তমানে যুধ্যমান জাতিসমূহের যে প্রচেষ্টা ও সামর্থ্যের অপচয় হইতেছে, তাহা শৃঙ্খলিত করিয়া যদি এমন কোন পরিকল্পনা গঠন করা যায়, যাহার ফলে কোন জাতির অপর জাতির প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্যহেতু কোন অভিযোগ থাকিবে না এবং সংঘর্ষোন্মুখীনতাও নির্ম্মূল হইবে, তবেই যুদ্ধের কারণসমূহ লোপ পাইবে।

একক বা সমষ্টিগতভাবে এই প্রকার পরিকল্পনা গঠন করিবার যে অসামর্থ্য আধুনিক জাতিসমূহের মধ্যে লক্ষিত হয়, তাহাকেই যুদ্ধের জন্য দায়ী করিতে হয়; সেনেটর ম্যাককার্টনি অ্যাবট যে 'সামর্থ্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যুদ্ধের কারণ হইতেই পারে না। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, রাষ্ট্রের সামরিক ক্ষমতা এবং যুদ্ধসজ্জার তাহার শক্তি এবং সামর্থ্যের পরিচায়ক, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা শক্তিহীনতা এবং অসামর্থ্যেরই পরিচায়ক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নব্য জার্ম্মানীর রণসজ্জার তাহার শক্তির পরিমাপক নহে, বরং উহা তাহার দুর্ব্বলতারই দ্যোতক। আমাদের মতে, সমর-বাদের অভ্যুত্থানের ইতিহাস মনুষ্যজাতিসমূহের শক্তিহীনতা-বৃদ্ধির ইতিহাস, কারণ, ইহা বিদ্বেষ প্রকাশের এবং অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা-পূরণের হেতু ও স্বরূপ।

মানব-সমাজে যুদ্ধের ইতিহাস জাতিসমূহের এবং মনুষ্য-গোষ্ঠীর সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের চক্ষুরুন্মীলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। এই ভাবে দেখিলে অতি সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যত অসংখ্য যুদ্ধ বিভিন্ন জাতি কর্তৃক বিজিত হইয়াছে, তাহার সবগুলিই নিরর্থক হইয়া যায়। অর্থাৎ এই হিসাবে কোন জাতি বা গোষ্ঠীর সামর্থ্য ও অসামর্থ্য বিচার করিবার মাপকাঠি হইবে জীবন-সহায়ক অভিযান,—মরণ-সহায়ক অভিযান নহে, যাহার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ এই সমরবাদ। সমরবাদ তখনই পুষ্টি পায়, যখন মানুষ জীবন-সহায়ক অভিযানে নিরাশ হইয়া পড়ে এবং মরিয়া হইয়া মরণ-সহায়ক অভিযানে মত্ত হয়। আমরা এই জীবন-অভিযানের প্রবর্ত্তন বা পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী। বহু বিভিন্ন প্রবন্ধে আমরা ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বর্ত্তমানে পৃথিবীতে এমন কোন জাতি বা মনুষ্য-সমাজ নাই, যাহারা তাহাদের জীবনের সমস্যাসমূহের এরূপ ভাবে সমাধান করিতে পারিয়াছে, যাহাতে এই অভিযান নিষ্প্রয়োজন হইতে পারে।

একটি সংবাদে প্রকাশ, 'ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অফিসে'র স্থায়ী কৃষি-কমিটি-ভুক্ত (পার্মানেণ্ট অ্যাগ্রিকালচারাল কমিটী) কয়েকটি আমেরিকান রাষ্ট্র, আমেরিকার কৃষির উপর যুদ্ধের প্রভাব আলোচনা করিবার জন্য সংপ্রতি হাভানায় একটি বৈঠক বসাইয়াছিলেন। এই বৈঠকে যে সকল সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের চাষীর অবস্থা যাহাতে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল না হয় তাহার উপায় চিন্তা করা হইতেছে। হাভানা-বৈঠকের আলোচনা হইতে আরও জানা যায় যে, এই সকল সমস্যার সমাধানকল্পে প্রধানতঃ কৃষিকর্ম্ম এবং শিল্পকর্ম্মের মধ্যে একটি সুসমঞ্জস সাম্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। আমাদের দেশে যাঁহারা মনে করেন যে, আমেরিকার কৃষিপদ্ধতি সম্পূর্ণ দোষমুক্ত এবং উহার আর অধিক উন্নতি সম্ভব নহে, তাঁহারা ইহা হইতে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বস্তু পাইবেন। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, য়ুরোপের যুদ্ধ এখনও আট মাস অতিক্রম না করিলেও, মার্কিন সরকার কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ ফসলের উপর দাদনকল্পে এবং কৃষিজাত পণ্যের অত্যধিক মূল্যহ্রাস, তথা চাষীর সর্ব্বনাশ নিবারণকল্পে বহুকোটী মুদ্রা চাষীদের ঋণ-দান বাবদ ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা আরও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য শিল্প এবং কৃষির যুগপৎ সামঞ্জস্যমূলক উন্নতি প্রয়োজন।

যে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর পৃথিবীর সকল দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিকে অধুনা নির্ভর করিতে হয়, তাহার ব্যর্থতা ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। আমরা যে জীবন-অভিযানের উল্লেখ করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য হইবে, যুদ্ধকালে এবং শান্তিকালে, সকল সময়েই সকল জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ যে-জন-সাধারণ—তাহাদের অবস্থার উন্নতি-সাধন। সকল জাতিরই কৃষককুল এই মেরুদণ্ডস্বরূপ। যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, যাহার ফলে তাহারা সুখে এবং শান্তিতে বাস করিতে পারে, তাহা হইলে মনুষ্যজাতি যুদ্ধহীন ভবিষ্যতের কল্পনা অনায়াসেই করিতে পারে। দেশের জন-সাধারণ সুখী এবং শান্তিময় থাকিলে,

কোন হিটলারীয় মতবাদের প্রচণ্ড প্রচারকার্য্যের ফলে সমবায়ের বলিরূপে আত্মাহুতি দিতে তাহাদের কোন মতেই সম্মত করা যাইবে না। জার্ম্মাণ জন-সাধারণের মধ্যে শান্তির অভাব না থাকিলে হিটলারি শাসনের এই অরাজক অবস্থার উদ্ভব কোনমতেই হইতে পারিত না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর শান্তি-প্রতিষ্ঠাতাদের কর্ত্তব্য হইতেছে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি, যাহাতে সকল জাতির অধিকাংশ মনুষ্যই সুখ এবং শান্তি লাভ করিতে পারে। অধিকন্তু, যেহেতু সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ব্যতীত প্রকৃত সুখ এবং শান্তি বিহিত হইতে পারে না, সেহেতু এমন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন, যাহার সাহায্যে অধিকাংশ ব্যক্তি সকল প্রকার দাসত্ব-বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেরূপ, তাহাতে অধিকাংশ ব্যক্তিকেই দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হয়; কারণ, কৃষিকর্ম্ম বর্ত্তমানে শিল্পকর্ম্মের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক কালের যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক আবিষ্কারসমূহই এই অবস্থার জন্য দায়ী। বর্ত্তমান তথাকথিত কৃষিবিজ্ঞান এই সকল আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিয়া গঠিত, কাজেই প্রকৃত কৃষি অধুনা গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি চাষী এমন কয়েকটি প্রভাবের ক্রীড়নকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহার উপর তাহার স্বকীয় কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, সুতরাং প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

আমরা জীবন-অভিযানের যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে সকল জাতির অধিকাংশ ব্যক্তিকে এই শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দান করা, অর্থাৎ সমাজমধ্যে এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে যে, সর্ব্ববিধ বহিঃপ্রযুক্ত বাধা হইতে মুক্ত থাকিয়া কৃষক সমাজের প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহ উৎপাদন করিতে পারে। ইহার পর সমাজের অন্য সকল অংশের মধ্যে এরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে যে, চাষীকে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার মুখ্য উদ্দেশ্য কোনরূপে ব্যাহত না হইতে পারে। এই প্রকার অর্থনৈতিক সংগঠনের সহিত যদি এরূপ শিক্ষাপ্রণালী সংযুক্ত হয়, মানুষকে যাহা পাশবিকতা জয় করিবার সামর্থ্য দান করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে যুদ্ধ যে মানব-সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। বর্ত্তমানে ইংরাজী ও ফরাসী শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে সহযোগিতা স্থাপিত হইয়াছে। অবস্থাচক্রে যদি এই দুই দেশের শিক্ষার মধ্যে সহযোগিতার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যেও পরস্পর শিক্ষাক্ষেত্রে কেন যোগ স্থাপিত হইবে না, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজ ও ফরাসী জাতির বর্ত্তমান সহযোগিতা হইতে বুঝা যাইতেছে, উভয়ের শিক্ষা-প্রণালীতেই যে ত্রুটি বর্ত্তমান, তাহা উভয় জাতিই অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। অন্য জাতিগুলিও যে ইতিমধ্যে তাঁহাদের শিক্ষা-প্রণালীর কোন ত্রুটি বুঝিতে পারিয়াছেন ইহা মনে করাকে কাজেই কষ্টকল্পনা বলা যায় না। অন্ততঃ, বর্ত্তমানে সর্ব্বদেশের জন-সাধারণ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের বাস্তব অবস্থা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। মৃত্যুর অভিযানকে ভিত্তি করিয়া গঠিত আধুনিক জীবনের মূলতত্ত্ব এবং আধুনিক শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করাই আমাদের রচনাসমূহের উদ্দেশ্য। মানব-সমাজের অস্তিত্ব যদি বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া জীবন-আহ্বানে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে। একমাত্র এই অভিযানের দ্বারাই যুদ্ধ নিবারিত হওয়া সম্ভব। আমরা মনে করি, এই উদ্দেশ্য লইয়া যে অভিযান সুরু হইবে তাহাতে ভারতবর্ষ এবং ভারতের ব্যক্তি-সাধারণ সমগ্র মানব-সমাজের অবিসংবাদী নেতারূপে দেখা দিবে, কারণ, একমাত্র ভারতবর্ষ এবং ভারতের ব্যক্তি-সাধারণের দ্বারাই মাত্র এই অভিযান সুফলপ্রদ করা সম্ভব।*

* ১৯৪০ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখের 'দি [illegible]'তে প্রকাশিত সম্পাদক-লিখিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।


FINLAND
ALBANIA
NORWAY
CZECHOSLO
VAKIA
AUSTRIA
INDIA
QUICKSAND
OF
POLITICAL
INDEPENDENCE

চোরাবালি

ভোরের কাব্য

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অসীম আকাশে চন্দনে-মাখা-গন্ধ বাতাসে বয়,
পল্লীমায়ের কবরীতে ফোটে অশোক করবী দল।
শেষ রজনীর পূজায় প্রদীপ সুপ্ত গগনে রয়,
বাঁশীর আওয়াজে সহর কাঁপায় ওপারের চট্‌কল।
কুলীমজুরের ছুটেছে পরাণ তাদের চাকুতি লোভে,
কৃষাণ বসিয়া কুঁড়ের দাওয়ায় হুঁকায় দিতেছে টান্।
নদীর চড়ায় বালুর বুকেতে জেলের কুটীর শোভে,
জোয়ারের জলে ভাসিয়া চলেছে পারের নৌকাখান্।
জেটির ধারেতে দাঁড়ায়ে রয়েছে ওপারে ইস্‌টিমার,
ভোরাই পাখীর ভজনের গীত ভেসে যায় পারাবারে,
বিশ্বের হিয়া আশাবরী সুরে স্পন্দিত অনিবার,
ঊষার আলোক ধীরে ধীরে নামে গঙ্গার দুই পারে।

মাথার উপরে উড়িছে বলাকা শকুনি শঙ্খ চিল,
পল্লবে ঢাকা বীথিকার মাঝে গাহিছে কোয়েল একা।
হোগ্‌লা-বেনার বুকের উপরে বিরাজে বিশাল বিল,
কত কৃষাণীর গাগরী ডোবানো দিনে দিনে হোলো দেখা।
এই পারে গ্রাম, ওপারে সহর, রেলের সেতুটা মাঝে,
গির্জ্জায় বাজে ঘড়ির ঘণ্টা সহরের চারিদিকে।
গত রজনীর বিদায় অশ্রু মৃত্তিকা ভরে আছে,
জটার বাঁধনে বাঁধিয়াছে বট জীর্ণ দেউলটীকে।

বাতাবী লেবুর সুবাসের বাস দখিণা বাতাসে ভরা,
বনতুলসীর চিত্ত-পরাগ ঝরিছে কৌতূহলে।
ধূসর রঙের শাড়ীখানি পরে দাঁড়ায়ে রয়েছে ধরা,
ভৃঙ্গ আসিয়া গুঞ্জন করে চরণের শতদলে।
এদিকে ওদিকে শেওলা সবুজ ছোট-বড় জলাশয়,
মশকেরা সেথা লভিছে জনম রোগের বীজাণু নিয়ে।
বায়সের ডাক ভেসে আসে কানে জাগায়ে মৃত্যুভয়,
লাল গোলাপের কুঁড়িটীর মত ঘাটেতে পল্লী-প্রিয়া।

সহরের পথে একটু আগেতে নিবেছে বিজলীবাতি,
ময়লার গাড়ী চলেছে কেবল ধাঙড় মেথর সনে।
আনাচে-কানাচে যত জঞ্জাল পচেছে সারাটি রাতি,
তাহারি ভিতরে ফেলে গেছে ভ্রূণও কাহারা সঙ্গোপনে
ধোঁয়ায় ধূসর সহরতলীর অলিগলি রাজপথ,
লক্ষ প্রাসাদ মাথা উঁচু করে' গর্ব্বে আপনহারা।
প্রাসাদ যাহারা রচিয়াছে আজ, সবাই নহেক সৎ
কত অভাগার নয়ন-সলিলে খিলান গেঁথেছে তারা।

কলের জলের শোনা যায় রব, পাইপের খোলা মুখ,
কেট্‌লিতে জল ফুটিছে বাবুর চায়ের জন্য শুধু।
ডাইনী মায়ের শিশুসন্তান দুধ-মার টানে বুক,
ভৈরবীসুর ভাঁজিতেছে বসে পাউডার-মাখা বধূ।

মিসি-বাবাদের করুণা করিতে জাগিয়াছে খানসামা,
উড়িয়া ঠাকুর রান্নাঘরেতে গিন্নীর কাজ করে।
কলেজী মেয়েরা আলাপ করিছে এস্রাজে সা-রে-গা-মা,
পাস্-করা বউ আঁচল দুলায়ে পিয়ানোতে গান ধরে।
রঙমহলের অর্গ্যানে ওঠে বেটোফেন-সিম্‌ফনি,
নাকিসুরে সুরে কহিতেছে কথা বুর্জ্জোয়া নারিগণ।
কক্‌টেল নেশা মাখান লেডির দুইটী নয়ন-মণি,
বহুরাত ধরে হয়ে গেছে ডাক্স বিনিময় দেহ মন।

সাধারণ বাবু এখনও ঘুমায় নিশি-যাপনার 'পরে,
এখনও তাহার স্বপনে জাগিছে চাঁপা-চামেলীর নাচ।
ভাদুড়ী-প্রভার এক্‌টিং যেন ভাবে আন্‌চান্ করে,
স্ফূর্ত্তিবাজরা ভাসিছে এখনও দিল্‌দরিয়ার মাঝ।
মোটর বাসের বেশী নাহি ভিড়—দুই একখানি ট্রাম,
বীটের পুলিশ আনাগোনা করে রাস্তায় কম লোক,
চালান আসিছে আহার দ্রব্য উজাড় করিয়া গ্রাম,—
কৃষাণ রক্ত শুষিতে যেথায় দালালেরা হোলো জোঁক।

চরের ধারেতে চরিতেছে ধেনু বৎসতরীর সনে,
একে একে সব আসিতেছে ঘাটে নাহন করিতে নারী।
নীল আকাশের আলোক-পরশ ঝরে পড়ে বনে বনে
আলোকের খেয়া বহিতেছে রবি নিখিল-চিত্তহারী।
গোষ্ঠের ধেনু চলিয়াছে মাঠে, রাখাল চলেছে পিছু,
পুষ্প-চয়নে চলেছে কিশোরী সাজিটী লইয়া করে,
গোহাল নিকায় পল্লীর বধূ মাথা করে তার নীচু
গিন্নী পুকুরে বাসন মাজিছে, কর্ত্তা কোদাল ধরে।
শিশুরা বসিয়া উদর পূরিছে নুন ও পান্তা ভাত,
গাঁয়ের মোড়ল ভাবিতেছে বসে—কাহারে জব্দ করি!
মহাজন ভাবে খাতকেরে তার কেমনে করিবে কাৎ,
বাকী-খাজনার তাগিদে পাইক দাঁড়ায় প্রজারে ধরি'।
প্রজার বরাতে নামিছে আঁধার, হবে কশাঘাত পিঠে
নায়েব মশাই কাছারীতে ফেলি করিবে অত্যাচার,
হয়তো তাহার ডিক্রীতে যাবে সাধের বাস্তু-ভিটে।
আদালত হ'তে পেয়াদা আসিয়া দেখাবে অহঙ্কার।

গৌরী চলেছে শ্বশুর-বাড়ীতে নয় বছরের মেয়ে,
গঙ্গার ঢেউ নাচায়ে তুলিছে গৌরীর তরীখানি।
ঘাটের ধারেতে কাঁদিছে জননী মেয়ের মুখটি চেয়ে,
ঘোমটায় ফাঁকে দেখে নেয় মেয়ে মায়ের মৌনবাণী।

কাল রাতে বিয়ে এই গাঁয়ে ছিল, ইতর গ্রাম্য লোকে
কুৎসা রটায়ে উৎসব-বাতি নিভায়ে পেয়েছে সুখ,
কন্যাদায়ীর হোলো অপমান—নর-পশুদের চোখে
জাগে উল্লাস, জব্দ করিয়া দশ হাত হোলো বুক।
কাল্ রজনীতে মেনকার স্বামী প্রহার করেছে খুব,
পান হ'তে চুণ খসেছিল শুধু, রাত্রি দুপুরে বুঝি!
সারা পল্লীতে পড়ে গেছে সাড়া, করে না কেহই চুপ
ঘরের কোণেতে মেনকা নীরব অশ্রু নয়নে মুছি।
গালাগালি দিয়ে গিন্নী পাঠায় তাহারে যমের বাড়ী,
টৈতনধারী মূর্খ শ্বশুর—টুলো পণ্ডিত নামে,
বুড়ো বয়সের ভীমরতি নিয়ে গহনা নিতেছে কাড়ি
মেনকারে আজ ত্যাগ করে দিয়া পাঠাবে পিতৃধামে।

বাইসাইকেলে পিয়ন চলেছে প্রেসের অফিস হ'তে
চায়ের কেবিনে বসে আছে যত গাঁটকাটা বাটপাড়।
গাঁজা-গুলির ছাপানো কাগজ বিলি হয় পথে পথে
পিয়নের দেহে রহিয়াছে যেন বন-মানুষের হাড়।
বস্তির মাঝে বচসা চলেছে কল-পায়খানা নিয়ে,
নোংরা কথায় নারী পুরুষের সহরে-কণ্ঠ রত,
স্নান করে যায় তিলকসেবীরা বস্তির পাশ দিয়ে,
ধর্ম যাদের অপকর্মেই প্রতি দিন হয় গত।
পঁচিশ টাকার বেতনভোগীর গিন্নীর মুখ ম্লান,
মাস-কাবারের সময় হয়েছে—পয়সা নাহিক হায়!
বাজার করিতে কর্ত্তা যাবে না, প্রাণ করে আনচান্
ক্ষুধিত শিশুকে বুঝাবে কেমনে,—ভাবিয়া কান্না পায়!
নগ্ন ভিখারী হোটেলের বাসি ফেলে দেওয়া পচা ভাত
পরম হরষে পেটের জ্বালায় খায় বসে ফুটপাথে।
গভীর ঘুমেতে ছিল রাস্তায় দীর্ঘ বিগত রাত
গাঁথার জীবন মিশেছে তাহার নিত্য অতীব সাথে।

কত না প্রাণের আর্ত্তরুধির দুর্ঘটনায় ঘটে,
হাসপাতালের কত না কক্ষে জীবনের দীপ নেভে,
মসী মেড়ে দেয় ডাক্তার এসে আশার জীবনপটে,
যমদূতীসম নার্সেরে দেখে ভয়ে প্রাণ ওঠে কেঁপে।

ভোটের ভিখারী ভাবিতেছে জোরে কি হবে ভোটের ফল,
পয়সা উপায় করিতে পয়সা ছড়ায়েছে চারিদিকে।
কি হবে অফিসে, রিডাকশানেতে কেরাণীরা চঞ্চল।
ব্যবসা চিন্তা করে শিক্ষিত জাল-জুচ্চুরি শিখে।
চাটুর্য্যের মেলে নন্দিনী ওঠে বিশ বছরের বালা,
হনিমুনে যাবে,—ইস্টিশনেতে জননী এসেছে তায়।
চলে আলাপন জননীর সাথে, নাহি বেদনার জ্বালা,
স্বামীটির হাত ধরিয়া তাহার হাসি ধরে নাক আর,
ছেড়ে যায় ট্রেণ উড়ায়ে রুমাল কহিতেছে—'গুডবাই'
মায়ের নয়নে নাহিক অশ্রু, হাসির রেখাটী ফোটে।
জননী গর্ব্বে কহিতেছে 'মোর মেয়েটী নহেক শাই'
ঝঞ্ঝার মত ছুটে গিয়ে মেল সেতুর ওপরে ওঠে।
এই সেতু যদি হোতো কোন দিন মহামিলনের সেতু
সহর-পল্লী-জীবনে বাজিত মধু-মঙ্গল সুর,
প্রাণের পাখীরা হোতো না কাতর ভ্রষ্ট নীড়ের হেতু,
বয়ে যেত স্রোত কালের সাগরে শান্তিতে ভরপুর।

আসুক প্রলয় ঝঞ্ঝাবাদল আমি যে তাহারে চাই
যত আশা সাধ আয়োজন মিছে—কহিছে শ্মশানচারী।
দেবতা শোনে না মানুষের ব্যথা—তবে কি দেবতা নাই?
মেশিন গানের জয়গান গাও যুগের ধ্বংসকারী
মঙ্গলবাণী শুনায়েছি যত, শোনে নাই কোন লোক
থাক্ ঈশ্বর অসীম একক, দূর হোক্ তার কাজ,
তোমার ধ্বংস, আমার ধ্বংস, সবার ধ্বংস হোক্,
আশীর্ব্বাদের অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকা মিছে আজ।
কাল যেন আর হয় নাক ভোর রবির কিরণ সনে,
ছিঁড়ে দেরে তুই—ছিঁড়ে দে বন্ধু গ্রহ-তারকার মালা।
আজিকার রাতে লাগাবো আগুন চৈত্র কুসুমবনে,
আজিকার দিনে শেষ করি এস মোদের গানের পালা।



হায় রে !

বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র সংবাদ

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বঙ্কিমচন্দ্র। রোহিণী, রোহিণী, আঃ বিরক্ত করে মারলে। কে বাপু! ও তুমি শরৎচন্দ্র? তুমি শরৎচন্দ্র, আমি বঙ্কিমচন্দ্র—আর রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের আকর্ষণ তো স্বাভাবিক। ···কিন্তু ব্যাপার কি শরৎচন্দ্র?

শরৎচন্দ্র। আমি বলছি, তুমি রোহিণীর প্রতি অবিচার করেছ।

বঙ্কিমচন্দ্র। ওঃ এই কথা! আমি যে রোহিণীকে বিচার করতে বসেছিলাম, এ কথা তোমাকে কে বললে?

শরৎচন্দ্র। তুমি কি···

বঙ্কিমচন্দ্র। হাঁ, আমি ডেপুটি ছিলাম বটে—

শরৎচন্দ্র। সে কথা বলছি না, তুমি কি ঔপন্যাসিক ছিলে না?

বঙ্কিমচন্দ্র। গল্প লিখতাম বটে—কিন্তু তাতে বিচারের কথা তো ওঠে না!

শরৎচন্দ্র। বল কি! ঔপন্যাসিকরা হচ্ছে সামাজিক মনের বিচারক।

বঙ্কিমচন্দ্র। কথাটা মনে রাখবো। আচ্ছা, রোহিণীর প্রতি আমি কি অবিচার করেছি—বলতো।

শরৎচন্দ্র। তুমি তাকে মেরে ফেললে কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র। আমি তো মারি নি; গোবিন্দলাল বলে একটা গোঁয়ার ছোকরা মেরেছিল।

শরৎচন্দ্র। ওই একই কথা হ'ল।

বঙ্কিমচন্দ্র। কি রকম?

শরৎচন্দ্র। গোবিন্দলালকে দিয়ে তুমিই মারিয়েছ।

বঙ্কিমচন্দ্র। বটে! কৃষ্ণকান্তের উইলের বাইরে যে-সব গোবিন্দলাল বিচরণ করছে, তারা কি রোহিণীদের মারছে না? সে সবও কি আমার কীর্ত্তি!

শরৎচন্দ্র। মারছে, কিন্তু অন্যায় ক'রে মারছে।

বঙ্কিমচন্দ্র। তাহলে আমার দোষটা কোথায়? আমি সংসারের ধারাকে মাত্র অনুসরণ করেছি। আর গোবিন্দলাল যদি রোহিণীকে না মারতো, তাহলে গোবিন্দলালের স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটানোতে, তার প্রতি অবিচার করা কি হ'ত না?

শরৎচন্দ্র। নাঃ তোমার দরদের একান্ত অভাব।

বঙ্কিমচন্দ্র। দরদ! সেটা আবার কি?

শরৎচন্দ্র। দরদ জানো না?

বঙ্কিমচন্দ্র। না, আমাদের সময়ে ও কথাটা চলতি ছিল না। ওটার বাংলা কি?

শরৎচন্দ্র। দরদ, সিমপ্যাথি, করুণা। তোমাদের মধ্যবিত্ত সংস্কার যাদের অপাংক্তেয় করে রেখেছিল তাদের আমি উপন্যাসের অন্তঃপুরে আদর করে এনে বসিয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্র। মধ্যবিত্ত সংস্কার! এ কথাটাও নূতন। আচ্ছা, সেই সৌভাগ্যবানেরা কে?

শরৎচন্দ্র। সৌভাগ্যবান্ নয়, সৌভাগ্যবতী; তবে ইচ্ছা করলে সৌভাগ্যবান্ও বলতে পারো, আমরা ব্যাকরণকে অত খাতির করিনে।

বঙ্কিমচন্দ্র। দু'চার জন সৌভাগ্যবতীর নাম শুনতে পারি?

শরৎচন্দ্র। সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মী।

বঙ্কিমচন্দ্র। এদের কি তুমি রোহিণীর দলের মনে কর?

শরৎচন্দ্র। কেন নয়?

বঙ্কিমচন্দ্র। এই জন্যে নয় যে তারা একদলের হলেও এক জাতের নয়; রোহিণী সাধারণ পতিতা, আর ও-তিনজনের অসাধারণত্ব আছে।

শরৎচন্দ্র। তা আছে বটে!

বঙ্কিমচন্দ্র। তা হলেই দেখ, তোমার দরদ পতিতাদের প্রতি নয়, তাদের মধ্যে যারা বিশিষ্ট তাদের প্রতি।

শরৎচন্দ্র। কি রকম?

বঙ্কিমচন্দ্র। অর্থাৎ ওরা সমাজের যে-স্তরেই থাক সকলের উপরে ওদের মাথা দেখা যেতো। একটা দলের মধ্যে যারা কোন বিশেষ কারণে বিশিষ্ট তাদের প্রতি বিচার সে দলের প্রতি বিচার নয়; ওরা নিয়ম নয়, নিয়মের ব্যতিক্রম।

শরৎচন্দ্র। ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে ওরা পতিতাদের মধ্যে গিয়ে পড়েছে বলেই আমার মধ্যবিত্ত-সংস্কারমুক্ত মন ওদের পতিতাদের সামিল করে ফেলে নি।

বঙ্কিমচন্দ্র। তোমার মন সংস্কারমুক্তই হোক আর সংস্কৃতিগ্রস্তই হোক—ওদের এক করে ফেলতে পারতো না। বিধাতা পুরুষ ওদের বড় মাপে গড়েছিলেন—এই বড় মাপের পক্ষে খিড়কি দরজা ছোট হলেও সিংহদ্বার অবারিত; আর সিংহদ্বার যদি খাটো বলে ধরা পড়ে, তারা সে দরজা ভেঙে ফেলে দিয়ে প্রবেশ করে। সব দেশের সব সমাজেই এদের জন্ম স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। Mary Magdalene-এর কাহিনী মনে আছে তো? তোমার দরদ আছে কি না, এবং কতখানি আছে, তার বিচার হবে তুমি সাধারণ মাপের পতিতাদের নিয়ে কি করিয়েছ। তোমার মোক্ষদাকে মনে পড়ে? সুখি ঝি, যে আগে নোটখানি আঁচলে বেঁধে তবে কথা বলে! তাকে আঁকবার সময়ে তোমার দোয়াতের সব কালি উল্টে তার উপরে পড়ে গিয়েছিল—মনে হচ্ছে?

শরৎচন্দ্র। আমি যা দেখেছি তাই এঁকেছি, বাড়িয়ে কমিয়ে বলিনি, আমি যে রিয়ালিষ্ট্।

বঙ্কিমচন্দ্র। বটে! বিচিত্র তোমার রিয়ালিজ্‌ম্। তোমার পতিতারা সতী-সাধ্বী, আর ঘরের বউরা পতনশীলা!

শরৎচন্দ্র। কে বলুন?

বঙ্কিমচন্দ্র। রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী অত্যন্ত সাধ্বী, বহুনিষ্ঠাকে অতিক্রম করে তারা একনিষ্ঠায় এসে পৌঁছেছে। আর তোমার অচলা—চঞ্চলা, পতনশীলা; তোমার কিরণময়ী, অভয়া—সদ্যঃপাতী। এমন অবাস্তব বাস্তবতা পেলে কোথায়?

শরৎচন্দ্র। কিন্তু আমার দরদ তো শুধু পতিতাদের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এমন কি মেয়েদের মধ্যেও আবদ্ধ নয়; সমাজের যে কেহ যেখানে দুঃখ-কষ্ট-অনাচার-অত্যাচারের দ্বারা উৎপীড়িত, সকলের জন্ম সমান ভাবে আমার করুণা।

বঙ্কিমচন্দ্র। কথাটা শোনাচ্ছে ভাল—একটু বিচার করা যাক। তুমি যাকে বলছ দরদ, যার অপর নাম হচ্ছে করুণা, সে বস্তু বৃষ্টিধারার মত নিরপেক্ষ; দুর্য্যোধনের কুমড়োর ক্ষেত আর যুধিষ্ঠিরের বেগুনের ভুঁয়ে সমান ভাবে তার আশীর্ব্বাদের বর্ষণ, তার কাছে কুরু-পাণ্ডবের ভেদ নেই।

শরৎচন্দ্র। বাঃ ঠিক বলেছ; বোধ করি এমন ভাবে বলতে আমিও পারতাম না।

বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু তোমার করুণা কি ভগবানের বৃষ্টিধারার মত নিরপেক্ষ!

শরৎচন্দ্র। লোকের তো সেই রকম-ই ধারণা।

বঙ্কিমচন্দ্র। লোকের কথা ছেড়ে দাও—তোমার একখানা উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা যাক; ধর তোমার 'পল্লী-সমাজ', বইখানা আমার খুব ভাল লাগে, অনেকবার পড়েছি; প্রথম দিক্‌টা চমৎকার, কিন্তু শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সমাজের থিওরিকে কাজে খাটাতে গিয়ে সব মাটি করে ফেলেছ। সে যাক গে—প্রথম দিক্‌টাই যথেষ্ট। রমার উপরে তোমার দরদ আছে, কারণ রমার দুঃখের মূলে সামাজিক বিধান; রমেশকে বিবাহ করতে পারলে সে হয়তো সুখী হ'ত। রমেশের প্রতিও তোমার দরদের অন্ত নাই—শহরের মানুষ হয়ে সে গ্রামে এসে পড়াতে বড় বড় শুভ ইচ্ছার পালোয়ারি নৌকা গ্রাম্য সংস্কারের আওড়ে পড়ে বান্‌চাল হয়ে যাচ্ছে, তাকেও তোমার করুণা। আকবর লাঠিয়াল, যে একজনের হুকুমে আর এক জনের মাথা গিয়ে ফাটিয়ে আসে, তার মধ্যেও তুমি মানব মহত্ত্ব আবিষ্কার করেছ, আমরা দেখে বিশ্বাস করেছি। কিন্তু এ থেকে প্রমাণ হয় না যে, সকলের প্রতি তোমার করুণা!

শরৎচন্দ্র। বাদ পড়ল কে?

বঙ্কিমচন্দ্র। বেণী ঘোষাল।

শরৎচন্দ্র। সেটা তো বদ্‌মাইস্! বিশেষ সে তো উৎপীড়িত নয়—সেই তো উৎপীড়ক।

বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু পেয়াদার উপরেও পেয়াদা আছে।

শরৎচন্দ্র। অর্থাৎ—

বঙ্কিমচন্দ্র। উৎপীড়কেরও উৎপীড়ক আছে।

শরৎচন্দ্র। কে সে?

বঙ্কিমচন্দ্র। কোন লোক নয়—একটা ব্যবস্থা, কখনো সামাজিক, কখনো রাষ্ট্রিক।

শরৎচন্দ্র। বুঝিয়ে বল।

বঙ্কিমচন্দ্র। বেণী ঘোষাল খারাপ লোক, কিন্তু খারাপ হ'ল কি করে। রমেশ যে পল্লী-সমাজ থেকে ঘটনাচক্রে দূরে গিয়ে পড়েছিল বেণীর ভাগ্যে তা হয়ে ওঠে নি। রমেশ পল্লী-সমাজে থেকে গেলে খুব সম্ভবতঃ, আর একটা দুর্দান্ততর বেণী ঘোষালের সৃষ্টি হ'ত। বর্ত্তমানে বেণী ঘোষাল যে পল্লী-সমাজের অংশবিশেষ, চিরকাল তা ছিল না। এখন দেখছ বেণী ঘোষাল একজন exploiter, কিন্তু আগস্ত ইতিহাস স্মরণ করে দেখ—এক হিসাবে সেও exploited। এই কথা দুটো আজকাল খুব চলছে না? তোমার দৃষ্টির যথেষ্ট উদারতা থাকলে দেখতে পেতে, অত্যাচারটার সৃষ্টি বেণী ঘোষাল থেকে নয়—তার পিছনেও বহু দূর অবধি অত্যাচারের শৃঙ্খল চলে গিয়েছে; বেণী সেই শৃঙ্খলের মধ্যে একটা গিঠ মাত্র। যেমন ভিড়ের ব্যাপার আর কি? তুমি বুঝছো আমি তোমাকে ধাক্কা দিলাম—কিন্তু আমি যে পিছন থেকে ঠেলা খাচ্ছি। বেণী ঘোষাল অত্যাচার করছে, কিন্তু কত ক্ষুদ্র অত্যাচার, কত নীরব সংস্কার, কত অকথিত ঘৃণার চাপে স্বাভাবিক মনুষ্য-প্রকৃতি বিকৃত হলে তবে বেণী ঘোষালের সৃষ্টি সম্ভব তা কি তুমি জানো? আর যদি জানতে তবে তোমার করুণার বৃষ্টি রমেশের কৃষিক্ষেত্রে নিঃশেষে পতিত হয়ে বেণী ঘোষালের ভূঁইকে শুষ্ক করে রাখ্‌তো না।

শরৎচন্দ্র। একথা মেনে নিলে তো জগতে খারাপ লোক থাকে না।

বঙ্কিমচন্দ্র। মেনে নিলেও থাকবে, না নিলেও থাকবে। খারাপ লোককে ভাল করবার জন্যে তোমাকে মুক্তি-ফৌজ খুলতে বলি নি, আর জগতে যখন খারাপ লোক আছে, আর রিয়ালিষ্ট্‌ লেখক আছে, তারা যথাযথ ভাবে চিত্রিত হবেই। আসল কথা হচ্ছে, খারাপ লোক কি অবস্থাচক্রে পড়ে' কোন্ সুদূর-প্রসারী কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার ফলে খারাপ হ'ল—সেটা দেখিয়ে দিতে হবে।

শরৎচন্দ্র। তা হলে কি হবে?

বঙ্কিমচন্দ্র। তা হলে তার প্রতি সুবিচার করা হবে, আর সুবিচার করা মানেই তাকে করুণা করা। শেক্সপীয়র এই রহস্য অবগত ছিলেন—ম্যাকবেথের অপরাধের দণ্ড দিতে তিনি দুর্ব্বলতা করেন নি, ধনে-জনে-মানে-প্রাণে তাকে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন—কিন্তু যে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলায় ম্যাকবেথের প্রাথমিক মহত্ত্ব লঘুতর হ'তে হ'তে, কলঙ্কিততর হ'তে হ'তে নৈতিক ও চারিত্রিক অস্থিমে এসে পৌঁছল, সেই সূত্রটা তিনি পাঠকদের দেখিয়ে দিয়েছেন, যার ফলে নরঘাতক, শিশুঘাতক, রাজঘাতক, বিশ্বাসঘাতক রাক্ষসটার প্রতিও আমরা করুণা অনুভব করি—তার মৃত্যুতে খুশী হই, তবু করুণার অভাব হয় না।

শরৎচন্দ্র। তুমি করুণার যে সংজ্ঞা দিচ্ছ, সে বস্তু তোমার গল্পেও নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র। কে বলেছে আছে? কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলালকে অপরাধী জেনেও কি তার প্রতি করুণা অনুভূত হয় না? নগেন্দ্রনাথের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা জেনেও তার প্রতি মমত্ব-বোধ হয় না? শেষ পর্যান্ত হীরা দাসীর পতনে কি তাকে অধিকতর করুণার যোগ্য বলে মনে হয় না? আর সেই যে সম্রাটকন্যা জেব-উন্নিসা পুষ্পশয্যায় বসে যে দাবানলের দাহে পলে-পলে দগ্ধ হয়ে মরেছে, তার প্রতি পাঠকের অযাচিত করুণা কি স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে উঠে না?

শরৎচন্দ্র। তোমার করুণা এত নিরপেক্ষ যে তার মত কঠিন অস্ত্র বস্তুই আছে। এই করুণার স্পর্শে মানুষ অমানুষ হয়ে পড়ে। 'চন্দ্রশেখরে'র প্রতাপকে ধরা যাক। সে কি শৈবলিনীকে ভালবাসতো? আমার বিশ্বাস বাসতো—কিন্তু সে যত সহজে তাকে পরিত্যাগ করলে, তাতে মনে হয় না, প্রতাপের পাঁজরার তলে স্বাভাবিক মানব-হৃদয় ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র। না মনে হবার কারণ কি?

শরৎচন্দ্র। তা হলে এক আধবারও এক আধটা অস্ফুট বাক্যেও তার মর্ম্মগ্রন্থি ছেদের আর্ত্তনাদ শোনা যেতো।

বঙ্কিমচন্দ্র। বইখানা অনেক দিন আগে পড়েছিলে মনে হচ্ছে। নতুবা শেষ দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত প্রতাপের আক্ষেপ ভুলতে পারতে না। শৈবলিনীকে ভাল না বাসলে সে কি ওসব কথা অমন করে বলতো!

শরৎচন্দ্র। ওই কটি কথাই কি যথেষ্ট?

বঙ্কিমচন্দ্র। যথেষ্ট নয়, তা জানি। তোমার নায়করা এত অল্পে সন্তুষ্ট হয় না—কি করে কেঁদে আত্মপ্রকাশ করতে হয় তারা জানে। তোমার ধারণা প্রেমের নিবাস চক্ষুতে, কপালে

তার প্রকাশ কটাক্ষে, কখনো অশ্রুতে! তোমার নরেন, একটা বিলাত-ফেরত জগদ্দল ডাক্তার, তুমি যাকে বলো 'জিনিয়স্'—সে লোকটা অনাত্মীয় যুবতীর কাছে যে-ভাবে তার দুরবস্থা প্রকাশ করেছে, স্বীকার করছি, তা লিখবার 'মরাল কারেজ' আমার ছিল না।

তোমার নায়করা আসলে কাপুরুষ, কাপুরুষের সব লক্ষণ তাদের মধ্যে আছে; তারা কাপুরুষ বলেই বাস্তবকে স্বীকার করে নেবার সাহস তাদের নেই, তারা শেষ মুহূর্তে বিবাহ করতে পারে না, আবার কাপুরুষ বলেই পরিত্যক্ত নায়িকাকে—হয়তো এখন সে পরস্ত্রী কিম্বা বিধবা—অন্ধকারে সুযোগমত পেলে দুটো প্রেমের কথা বলে নেবার লোভ ছাড়তে পারে না! তুমি একে বল মানব-হৃদয়ের প্রকাশ!

শরৎচন্দ্র। যা স্বভাব, তাকে অস্বীকার করে লাভ কি?

বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু স্বভাবটা এমন অস্বাভাবিক হ'ল কেন, তারও তো সন্ধান নেওয়া দরকার। বাঙালী এই ক'বছরের মধ্যেই এমনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে, মনের দুর্ব্বলতাকে চেপে রাখবার মত সবলতাও তার নাই।

শরৎচন্দ্র। কিম্বা তোমার আমলে হৃদয়াবেগ অন্ধ ছিল বলে তা প্রকাশ পেতো না—এমনও তো হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র। বিপরীতটাই বা সত্য নয় কেন? আমার সময়ে হৃদয়াবেগও যেমন প্রবল ছিল তাকে আয়ত্ত করে রাখতে পারে এমন ষ্টীম রোলারেরও অভাব ছিল না। এখন হৃদয়াবেগ যে প্রবলতর তা নয়, ষ্টীম রোলার দুর্ব্বলতর হয়ে পড়েছে।

শরৎচন্দ্র। এই ক'বছরে এমন কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে যাতে রোলার দুর্ব্বলতর হয়ে পড়ল?

বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিমধ্যে বাংলা দেশের মস্ত একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

শরৎচন্দ্র। কি রকম?

বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙালীর চরিত্র থেকে ধৃতি বলে একটা পদার্থ চলে গিয়েছে। ধৃতি না বলে ধর্ম্ম কথাটাই মুখে আসছিল, কিন্তু তা'তে বুঝতে ভুল হ'ত।

শরৎচন্দ্র। তোমার ধৃতিই যে বুঝেছি এমন কথা ভাবলে কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র। ধর্ম্ম আর ধৃতি একই বস্তু—তবে ধর্ম্মকে আমরা religion এর বাংলা বলে ব্যবহার করে থাকি তাই ওতে অন্য অর্থের আভাস এসে পড়েছে। ধৃতি হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের মেরুদণ্ড—যা থাকলে একটা মানুষ সংসারের ভিড়ের চাপে নিজের পথে চলতে পারে—আর যার অভাব হলে লোকে বাঙালীর মত চলে।

শরৎচন্দ্র। বাঙালীর চালটা কি শুনি?

বঙ্কিমচন্দ্র। দায়িত্ববিমুখ, ঘর-পালানো লোকের চাল। দেখ্‌ছ না বাঙালী আজ অত্যন্ত অকারণেই রিয়ালিষ্ট হয়ে উঠেছে—তার কারণ কি জানো? সে আজ বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াতে ভয় পায়। বাস্তবের সম্মুখে দাঁড়াবে—এটা তার ইচ্ছা—কিন্তু সে শক্তি আর নাই,—কাজেই ইচ্ছাটাকে সে তথ্য বলে ধরে' নিয়ে একটা অবাস্তব বাস্তবতার সৃষ্টি করেছে। তুমি সেই অবাস্তব বাস্তবতার মুখপাত্র।

শরৎচন্দ্র। বাঙালীকে এত বড় অপবাদ দিলে, কিন্তু কোন প্রমাণ তো দিলে না!

বঙ্কিমচন্দ্র। প্রমাণ প্রতিদিন সংবাদপত্রে বের হচ্ছে। বাংলাদেশের যে কোন দৈনিক খুললে এক সার বিজ্ঞাপন দেখবে—যাতে ঘর-পালানো ছেলেকে ফিরে আসবার জন্য তাদের স্নেহাসক্ত আত্মীয়-স্বজনরা অনুরোধ করছে। এমন ঘর-পালানো দশা আমাদের সময়ে বাঙালীর ছিল না। যে তথ্যবিমুখতা ব্যাধির কথা আমি বললাম—এটা তারই একটা মারাত্মক লক্ষণ। এটা আর কিছুই নয়—ধৃতি-হীনতার চিহ্ন; আধুনিক বাঙালী লক্ষ্যহীন ভাবে খড়-কুটোর মত সংসারের স্রোতে ভেসে চলেছে; মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা থাকলে এমন হয় না।

শরৎচন্দ্র। কিন্তু তার সঙ্গে আমার যোগ কোথায়?

বঙ্কিমচন্দ্র। তুমি এই লক্ষ্যহীন, ঘর-পালানো, তথ্যবিমুখ বাঙালী চরিত্রকে অঙ্কন করেছ; বাঙালী পাঠক তোমার উপন্যাসের দর্পণে তার প্রতিবিম্ব দেখবামাত্র নিজেকে চিনতে পেরেছে—আর তোমাকে তার আত্মীয় বলে গ্রহণ করেছে; আত্মীয় না হলে কেউ কি আত্মীয়কে এমন ভাবে প্রকাশ করতে পারে? তোমার জনপ্রিয়তার মূল ওইখানে।

শরৎচন্দ্র। আমি নিজে ঘর-পালানো ছিলাম বটে—তুমি কি সেই কথা বলছ?

বঙ্কিমচন্দ্র। তোমার ব্যক্তিগত কথা তুমিই জানো। কিন্তু তোমার সৃষ্ট মানুষগুলো দেখ না! সব লক্ষ্যহীন, ভেসে যাওয়া খড়কুটো! কোনো কিছুকে তারা আঁকড়ে ধরতে পারছে না। তোমার দেবদাস, সতীশ, শ্রীকান্ত, জীবানন্দ; এরা সব ঘর-পালানোর দল। এদের প্রত্যেকের জন্য সংবাদপত্রে ফিরে আসবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতো! তোমার শ্রীকান্ত চারটা পর্বের মধ্যে দিয়ে কোথায় যে ভেসে চলেছে তার ঠিক নেই। এরা হচ্ছে আধুনিক বাঙালী—আর আধুনিক বাঙালী হচ্ছে এরাই। আধুনিক অভাজন বাঙালীর এমন চিত্র আর কেউ আঁকতে পারে'ন —সে আমি স্বীকার করবো।

শরৎচন্দ্র। বাঙালীর এমন লক্ষ্মীছাড়া দশা কেন হ'ল বলতে পার?

বঙ্কিমচন্দ্র। পারি বই কি! আশাভঙ্গ হলে এমন —ভবিষ্যতে বিশ্বাস না করলে এমন হয়!

শরৎচন্দ্র। আশাভঙ্গটা কোথায়?

বঙ্কিমচন্দ্র। ইংরিজি শিক্ষার প্রথম আমল থেকে বাঙালী একটা হাওয়ার কেল্লা গড়ে তুলছিল, ভেবেছিল এই কেল্লার গম্বুজ একদিন শেষে তার কামনার স্বর্গে গিয়ে ঠেকবে—কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমেই দেখতে পেল, হায় হায়! তার কেল্লা নিজের ভারেই নিজে ধ্বসে পড়ল—সমস্ত দেশটাকে তার ভগ্নস্তূপের তলে চাপা দিয়ে। আর সেই আশা-ভঙ্গের নীচ থেকে চাপা-পড়া জাতির আর্তনাদ উঠছে।

ঊনবিংশ শতকের বাঙালী দেখেছিল দু' পাতা ইংরিজি পড়লেই চাকুরি পাওয়া যায়; দেখেছিল, দু' কলম ইংরিজি লিখতে পারলেই বর্ক, মেকলে হওয়া যায়; খানিকটা ইংরিজি বক্তৃতা করতে পারলেই লোকে ডিমস্থিনিস বলে! তারা দেখেছিল, সদাগরী আফিসে ঢুকলে অঢেল টাকা! ভবিষ্যতের উপরে তাদের অগাধ বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—ভেবেছিল, এই পথই গিয়েছে চরিতার্থতার দিকে।

শরৎচন্দ্র। তুমি কি বলতে চাও—ইংরিজি শিক্ষা ভ্রান্ত?

বঙ্কিমচন্দ্র। আমি বলতে চাই, বাঙালী ভ্রান্ত। পথ যত দীর্ঘই হোক তারও শেষ আছে। বাঙালী ভেবেছিল, ইংরিজি শিক্ষার কোন শেষ নাই। কিন্তু সে পথে চলতে চলতে সে দেখল—সম্মুখে পথ রুদ্ধ; যাকে এত দিন সে রাজপথ বলে মনে করেছিল—হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ল, তা কাণা গলি মাত্র!

শরৎচন্দ্র। অতএব—

বঙ্কিমচন্দ্র। অতএব হয় নিষ্করুণ দেয়ালে মাথা ঠুকে মর—নয় ফিরে এস। আমি আমার সামান্য শক্তি অনুযায়ী সেই ফিরে আসবার কথা বলেছিলাম—হয়তো কেউ কেউ শুনেছিল। সংক্ষেপে এই হচ্ছে বাঙালীর আশাভঙ্গের ইতিহাস। তার পর থেকে এ পর্য্যন্ত চলছে তার নৈরাশ্যের যুগ—যে নৈরাশ্যে অপাভীত বাঙালী ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। তুমি লিখেছ সেই বাঙালীর কথা!

শরৎচন্দ্র। ওই ঘর-ছাড়ার দল কি নূতন পথের অনুসন্ধানে বের হয়নি!

বঙ্কিমচন্দ্র। হয়তো কেউ কেউ হয়েছে; কিন্তু তুমি তাদের সন্ধান পাও নি। তারা আজও সংখ্যায় মুষ্টিমেয়;—লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে অলক্ষ্যে তারা কাজ করে চলেছে। তুমি যাদের কথা জানো—তারাও ছুটেছে—নূতন পথের সন্ধানে নয় পুরাতন পথ পরিত্যাগ করে, তাদের এ গতি প্রগতি নয়—পলায়ন, সেই টোপখাওয়া বাঙালীর দল বাংলার ওয়াটার্লু থেকে পলায়নপর, ভালমন্দজ্ঞানহীন, হতাশ হতভাগ্যের দল। তোমার উপন্যাস বাঙালীর সেই পরাজয়ের ইতিহাস।

প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে লোকশিক্ষা ও সমাজগঠন

শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বাঙ্গালা দেশে ভাঙ্গনের ও বিপ্লবের যুগ ঊনবিংশ শতাব্দী। মহাকালের নবানন্তর লহরীলীলায় বাঙ্গালী তখন জীবনগঠনের প্রতি স্তরে স্তরে আহত হইতেছিল। সেই বিরাট পরিবর্ত্তনে আমরা ঘরের যে দুর্লভ মণি-কৌস্তুভ-সমূহ হারাইয়া ফেলিয়াছি, আজ আবার নূতন করিয়া সেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলিকে সন্ধান করিতে হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যুগসন্ধিক্ষণে কতিপয় কবিওয়ালা ও পাঁচালীকার বাঙ্গালা কাব্যের ক্ষীণস্রোত নানা খাতে ও নানা পথে প্রবাহিত করিয়া সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ছিলেন লোকসাহিত্যের দরদী চারণ, বাঙ্গালা দেশের মাটির সহজ, সরল খাঁটি কবি। এই পাঁচালী সাহিত্যগুলি সহজেই জনসাধারণের মর্ম্মে আঘাত করিয়া প্রাণতন্ত্রীকে সুরমূর্চ্ছনায় আলোড়িত করে ও বিশিষ্ট ভাবলোকে পৌঁছাইয়া দেয়। পাঁচালীগানের সর্ব্বত্রই আমরা সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বে বাঙ্গালীর একটি খাঁটী নিজস্ব রূপ ছিল। পাঁচালী আপামর সাধারণের সাহিত্য, উহাতে পুণ্যধর্ম্মী বাঙ্গালী মনের সুস্পষ্ট পরিচয় নিহিত। বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষা প্রাণের সহিত কথা বলে। ব্যাখ্যামূলক আখ্যান, হৃদয়গ্রাহী ভাব ও আদর্শ সংযোগে সে যুগের পাঁচালী লোক-শিক্ষা ও সমাজ-গঠনের একটি পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৭৩৪ অব্দে কবি দ্বিজ গৌরীন্দ্রনাথ বিরচিত "শিবশক্তি পঞ্চালিকা" নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে প্রাচীন বাঙ্গালার লোক-শিক্ষা ও সমাজ-গঠনমূলক বহু তথ্য জানিতে পারা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই বিষয়েরই অবতারণা করিতেছি।

প্রথমতঃ কৈলাস পর্ব্বতের মনোরম বর্ণনা লইয়াই গ্রন্থখানির সূচনা পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর—

"দেব মহেশ্বর তথা শঙ্করীর সনে।
সতত করেন বাস আনন্দিত মনে।
পতিপদতলে বসি সুমধুর ভাষে।
যোগমায়া জিজ্ঞাসা করেন জগদীশে॥
মানব-মঙ্গল লাগি ওগো সদাশিব।
কেমনে লভিবে ত্রাণ মর্ত্ত্যের জীব॥"

তদুত্তরে শিব মহামায়াকে বলিতেছেন,—

"আমার বচন সব লঙ্ঘে পদে পদে।
ধর্ম্মকর্ম্মহীন হয়ে পড়িছে বিপদে॥
তথাপি কাহার হায় নাহি হয় জ্ঞান।
মানুষ কি আছে আর মানব-সন্তান॥
আপন উন্নতিপথ কেহ নাহি চিনে।
চলিছে ধ্বংসের পথে তাই দিনে দিনে॥
ভুতুড়ে আজগুবি বলি আমার বচনে।
বিশ্বাস করে না কেহ শুনিয়া না শুনে॥"

শিবের কথায় ভগবতী বিশেষ রুষ্টা হইয়া কোপভরে বলিতে লাগিলেন,—

"কিসে এত হীন দেখ আমার সন্তানে।

*

অপ্রমিত সদা যার ধন-রত্ন দেখি।
ধরণী রহিছে চাহি নির্নিমেষ আঁখি॥
অন্নসুখ তার প্রভু মিছে আর বলা।
গোলায় গোলায় শস্য সম্পদের মেলা॥
বর্ষে বর্ষে যে দেশ প্রসবে শস্যরাশি।
যাচি যাচি ক্ষুধার্ত্তে বিতরে অন্নরাশি॥
কমলা চঞ্চলা হয়ে অচঞ্চলা যথা।
আমিও রয়েছি অন্নপূর্ণা রূপে তথা॥
আনন্দের কলরোল পল্লীতে নগরে।
শিশুমুখে হাস্যমধু সদা যথা ঝরে॥
যথায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সুদেহ সরল।
বাহুমনোবলে বলী যুবক সকল॥
যাহার ব্রাহ্মণগণ জনহিত লাগি।
বিরলে বসিয়া চিন্তে হয়ে সর্ব্বত্যাগী॥
বসে থাক হেথা ভূত সাথে বিল্বমূলে।
এ কল্পনা আসে তাই ভাঙের খেয়ালে॥"

শিবও ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন,—

"আছে কি ধরম তব আর সদাচার।
বুকে উঠে শুধু তুমি নাচিবারে পার॥
দিনরাত হেন কথা কহ তুমি তারা।
তব ভক্তগণ লভিয়াছে তব ধারা॥
কি ছিল ভারত আজ কি হইতে যায়।
পাষাণী কিরূপে তুমি বুঝিবে তা হায়॥
ভারত আদর্শ তুমি ছিল এ ধরায়।
কে জানে এমন দশা হবে তার হায়॥
ধর্ম্মে অনাসক্তি, শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস।
সদাচারে ত্যজি কদাচারে অভিলাষ॥
স্বেচ্ছাচার অনাচার ইত্যাদি সকল।
সাধিতেছে ভারতের মহা অমঙ্গল॥
ভারতের প্রতি প্রিয়ে চাহি একবার।
দেখ, সদা ঘরে ঘরে উঠে হাহাকার॥
রোগ শোক দুঃখ দৈন্য দুর্ভিক্ষ দানব।
হরিয়াছে ভারতের সকল গৌরব॥
অকাল বার্দ্ধক্য আর অকালে মরণ।
ভারতের এবে এই প্রধান লক্ষণ॥
দেখ দেখি প্রিয়ে নেত্র মেলি চারিধারে।
অন্নদার পুত্র সব অন্ন বিনে মরে॥
আপন মরণ আনে স্বেচ্ছায় ডাকিয়া।
কি বলিব মহাদেবী দুঃখে ফাটে হিয়া॥
কদন্নাশন কদাচারে করেছে আশ্রয়।
ধর্ম্মভাব মনোবল পাইয়াছে লয়॥
শাস্ত্রীয় নিষেধ বিধি বাক্যে অবিশ্বাস।
অলস উদ্যমহীন বিলাসের দাস॥"

অতঃপর কবি দ্বিজ শৌরীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী জাতির সর্ব্ববিধ অবনতির উল্লেখ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন,—

"অধম ভারতবাসী বিশেষে বাঙ্গালী।
সদ্বৃত্তি ত্যজিয়া তারা ধর্মবৃত্তি-কাঙ্গালী॥
ধর্ম্মে কর্ম্মে আস্থাহীন অসাধু আচার।
কপটতা প্রবঞ্চনা করিয়াছে সার॥
দূরে ত্যজি ব্রহ্মচর্য্য পালন সংযম।
ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে আছে সর্ব্বজন॥
আহারে বিহারে সদা করে স্বেচ্ছাচার।
বাহুবল সংরক্ষণে দৃষ্টি আছে কার॥
যবনের প্রভাবে ভাবিত অনুক্ষণ।
আপন স্বাতন্ত্র্য সবে করিছে বর্জ্জন॥

বাঙ্গালী কি চিরকালই পরানুকরণপ্রিয়? পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, শিবশক্তি পঞ্চালিকার কবি যে সময়ে বাঙ্গালীদের চরিত্র সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মাত্র দুই বৎসর পরেই ইংরাজ পলাশী যুদ্ধে বাঙ্গালীদের পরাজিত করিয়া বাঙ্গালাদেশ অধিকার করে। এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, জাতির কি নিদারুণ বিপদের ও বিপ্লবের দিনে কবি দ্বিজ শৌরীন্দ্রনাথ তাঁহার শিবশক্তি পঞ্চালিকা রচনা করেন। কলিতে মনুষ্য কিরূপে সংক্ষেপে ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে; তজ্জন্য মনীষিগণ বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই বিবিধ সুসাধ্য ব্রত কথার সৃজন হয় এবং সেই সকল ব্রতের বিধান ও অপরাপর সুশিক্ষা ও সদুপদেশমূলক উপাখ্যান দ্বারা বিস্তর গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। দ্বিজ শৌরীন্দ্রনাথের শিবশক্তি পঞ্চালিকা রচনারও সেই একই উদ্দেশ্য। কবি শিবদুর্গার যে মামুলী ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারি, যে, ভগবতী শিবকে বলিতেছেন,—

"মোহমদে ভ্রান্ত সবে হয়েছে অজ্ঞান।
কিরূপে আবার তারা ফিরে পাবে জ্ঞান॥
মানুষ বলিয়া গণ্য জগৎ ভিতর।
আবার কি হবে দেব ভারতের নর॥"

দ্বাপর যুগের শেষভাগে ও কলি যুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়। নরগণ সত্যভ্রষ্ট ও ধর্ম্মচ্যুত হইয়া পরস্পর হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি পাপাচারে লিপ্ত হয়। তাই তৎকালে ভারতের হিতার্থে শ্রীকৃষ্ণ—

"দেশকালপাত্র আর সময়ানুসারে।
'অষ্টাদশাধ্যায়ীগীতা' কন অর্জ্জুনেরে॥"

শিব ও পার্ব্বতীকে এই সমুদয় কথায় উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

"কিন্তু এই কালে ঘোর কলির প্রভাব।
গীতা উপদেশে হইবে না ফললাভ॥
গীতা রসাস্বাদে আস্থা নাহিক কাহার।
বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র নাহি আর॥
মানব মঙ্গল আর তব প্রীতি তরে।
শিবশক্তি পঞ্চালিকা শুনাব তোমারে॥
ইহা পড়ি যদি কার হয় কিছু জ্ঞান।
পালে যদি ধর্ম্মকর্ম্ম ভারত সন্তান॥

আবার মানুষ হয় মাঝে পৃথিবীর।
দাঁড়াইবে দর্পভরে উচ্চ করি শির॥"

পার্ব্বতীর অনুরোধে সদাশিব শরীর-বিজ্ঞান সারতত্ত্ব কহিতে লাগিলেন,—

"আত্মার স্বরূপ বৃথা জিজ্ঞাসহ মোরে।
স্ব-রূপ রয়েছে আত্মা শব্দের ভিতরে॥
স্ব স্ব প্রকৃতিতে স্থিত স্বস্থ বলি তারে।
তাহার যে ভাব আত্মা জানিবে তাহারে॥
ইন্দ্রিয় ও মন প্রিয়ে প্রকৃতিস্থ যার।
সেই আত্মবান দেবী কহিলাম সার॥
দেহ আর মন দেবী হইলে বিকল।
কিরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাম রবে অবিচল॥
ধর্ম্মজ্ঞান যশ মান বিত্তাদি যত।
চেষ্টাবলে মানুষের করতলগত॥
সে আয়াসে প্রথমতঃ চাই মনোবল।
সতেজ ইন্দ্রিয় চাই দেহ অবিকল॥
এদের বিকল করি ধর্ম্ম অর্থ সুখ।
অসম্ভব জেন প্রিয়ে লভে মাত্র দুখ॥
মন ও ইন্দ্রিয়গণে রাখিতে সুস্থিরে।
প্রধান কর্ত্তব্য তাই রক্ষিবে শরীরে॥"

আদর্শ গৃহস্থের কথা উল্লেখ করিয়া শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন,—

"অনৃতভাষণ আর শঠতাচরণ।
না বলিবে না করিবে ভুলেও কখন॥
মাতাপিতা দেব গুরু দ্বিজ বৃদ্ধ আর।
শক্তি অনুসারে পূজা করিবে সবার॥
মাতাপিতা পুত্র ভার্য্যা অতিথি সোদর।
হেলন না করে কভু সদাচারী নর॥
মানব শরীর দেখি পিতৃপ্রয়োজিত।
জননীমায়ার হয় নিয়ত বর্দ্ধিত॥
শিক্ষালাভ করে সদা হইতে স্বজন।
তাদের সম্মান দিবে সদাচারী জন॥
সুতে শিক্ষাদান পরিবারের লক্ষণ।
গুরুজন আজ্ঞা আর স্বজন পালন॥"

অন্যত্র দেখিতে পাই,—

"শক্তি যদি রয় সতত যতনে॥
জলাশয়, বৃক্ষ, পথ, বিশ্রামভবন।
নদী নদোপরি সেতু কর বিরচন॥"

অতঃপর ভগবতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"নরনারী সংসারে প্রধান দুই হয়।
তবে কেন নারী করে পুরুষ আশ্রয়॥
নরমাঝে সঙ্কীর্ণতা কেন শূলপাণি।
নির্দ্দিষ্ট পুরুষ তরে নির্দ্দিষ্ট রমণী॥"

উত্তরে শিব বলিতেছেন,—

"এই যে বিশ্বে দেখিছ যা সব।
প্রকৃতি পুরুষ যোগে হয়েছে উদ্ভব॥
সৃষ্টি অর্থে পুরুষ ও প্রকৃতির যোগ।
পুরুষ যখন করে প্রকৃতি সম্ভোগ॥
ক্রমে ক্রমে তবে হয় সৃষ্টির বিকাশ।
সাংখ্য আদি শাস্ত্র তার দিয়াছে আভাস॥
সমষ্টির অংশীভূত ব্যষ্টি দেখ যত।
সমষ্টির গুণধর্ম্ম ব্যষ্টিতে নিহিত॥
ব্যষ্টিগত পুরুষ প্রকৃতি আছে যত।
তাই পরস্পরে দোঁহে চাহে অবিরত॥
বিশেষ রমণী কোমলতার আধার।
কঠিন পুরুষ হবে আবরণ তার॥
কঠিন আশ্রয় বিনে কোমল না রয়।
তাই নারী পুরুষেরে করিছে আশ্রয়॥
আশ্রয় সহায় বল ভরসার তরে।
তাই নারী পুরুষে বাসনা সদা করে॥
প্রকৃতি সতত যাচে পুরুষের সঙ্গ।
পুরুষেরও মনে তাই প্রকৃতি প্রসঙ্গ॥
পরস্পর পরস্পরে যদি নাহি চাবে।
বিধাতার সৃষ্টি তবে ধ্বংস হয়ে যাবে॥
স্বভাবে মিলিবে দোঁহে কে রোধিবে তায়।
যথেচ্ছ মিলন নরে শোভা নাহি পায়॥
অন্যজীব হতে নরে শ্রেষ্ঠ করি ধাতা।
সৃজিলা প্রকাশি নিজ সৃষ্টি-নিপুণতা॥
জ্ঞানহীন পশুপক্ষী ভুঞ্জে স্বেচ্ছাচারে।
কিসের শ্রেষ্ঠত্ব যদি নর তাই করে॥
আরও দেখ স্বেচ্ছাচারে যোগ যদি হয়।
পুরুষ সৃজন শক্তি পাবে তায় লয়॥
বহু সঙ্গে রমণীর বহু দোষ হয়।
না থাকে আর আশ্রয় রক্ষক নির্ণয়॥
কালে রমণীর এই দশা হয় শেষে।
স্রোতের তৃণের মত বেড়াইবে ভেসে॥
বিবাহ নামেতে তাই শৃঙ্খলা আচরি।
দিয়েছে মানব তায় নিয়মিত করি॥"



[শ্রীপরিমল গোস্বামী

কবি দ্বিজ গৌরীন্দ্রনাথ দাম্পত্যজীবন, শারীরিক কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে যে অমূল্য উপদেশাবলীর সন্ধান দিতেছেন তাহা প্রকৃতই জনসাধারণের নিকটে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অপেক্ষা কম মূল্যবান্ নহে। এই প্রসঙ্গে দেখিতেছি,—

"অতি সুখময় হয় দম্পতির প্রাণ।
সংসারের শান্তি তাহে বর্ত্তমান॥
ভিন্ন দেহ কিন্তু একমন একপ্রাণ।
সুখে সুখী দুখে দুখী উভয়ে সমান॥
নারীর ভরসা আশা রক্ষক সবল।
সুখ শান্তি দাতা পুরুষ কেবল॥
সুখেতে সুখিনী নারী বিপদে মন্ত্রিণী।
ধর্ম্মে কর্ম্মে সকলেতে রমণী সঙ্গিনী॥
বাহিরে পুরুষ আর রমণী ভিতরে।
রহি স্ব স্ব কর্ম্ম তারা সাধে পরস্পরে॥
অন্তঃপুরে রহে নারী করিয়া যতন।
মুছাইবে কর্ম্মক্লান্ত পতির বদন॥
যত্ন করি তুলে দিবে মুখে অন্নজল।
হৃদয়ের ব্যথা তার হরিবে সকল॥
সম্পদে বিপদে তার হইবে সঙ্গিনী।
তুষিবে নরের মন হইয়া রঙ্গিনী॥
পুরুষ আশ্রিতা নারী পরাধীনা অতি।
যতনে পালিবে তারে পুরুষ সুমতি॥"

মহাদেব মানব-সমাজের এই প্রকার কল্যাণ বিধান করিয়া সমসাময়িক মানবসমাজের কতখানি অবনতির পথ প্রশস্ত হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিতেছেন। কবির এই বর্ণনা আদৌ কল্পনামূলক নহে—সমসাময়িক যুগের সমাজের একখানি নিখুঁত ছবি।

"গৃহেতে যুবতী যার পরিণীতা নারী।
তারে ত্যজি দেখ বারবণিতাবিহারী॥
বেশ্যা ও বারুণী লয়ে যাপে বিভাবরী।
গৃহে পতিব্রতা ফেলে নয়নের বারি॥
স্ত্রীভাগী সমভাবে নিজ বনিতায়।
দুর্ব্বার শাসন শুধু কথায় কথায়॥
শোকদুঃখ কষ্ট তার নাহি মনে গণে।
ব্যস্ত শুধু বারাঙ্গনা চিত্ত বিনোদনে।
মূঢ়মতি সবে দেখি পশুত্বের দাস।
লালসা মিটাতে শুধু যায় নারীপাশ॥
গৃহলক্ষ্মী প্রতি অনাদর অতি বাড়া।
এ পাপে ভারতবাসী হল লক্ষ্মীছাড়া॥

মাতাপিতা বৃদ্ধের বচন নাহি মানে।
সবা হতে আপনারে শ্রেষ্ঠ বলি জানে॥
পিতারে ভাবেন মূর্খ নিজে বুদ্ধিমান।
যবনীর ভাষা পড়ি জন্মে এই জ্ঞান॥
মৃত্যুপথযাত্রী পিতা রোগশয্যাপরে।
বরবেশে চড়ে পুত্র চতুর্দ্দোলাপরে॥
যবন ভাষায় পিতা না হলে শিক্ষিত।
যবন সভ্যতায় না হইলে দীক্ষিত॥
পিতৃ সম্বোধন নাহি করে বন্ধুমাঝে।
পরিচয় দিতে হেট মাথা হয় লাজে॥
সেকেলে অসভ্য বৃদ্ধ মহামূর্খ আর।
সম্ভাষণে রাখে এবে মর্য্যাদা পিতার॥
জননীর মান হয় তাহা হতে বাড়া।
মাতৃঋণ শোধে দিয়ে গুদামের ভাড়া॥
ভ্রাতৃপ্রীতি ইহাদের কি কহিব হায়।
ভাই হয়ে দেয় ছুরি ভায়ের গলায়॥
সাথে সাথে মিলে যত কুমন্ত্রণাকারী।
মদ্যপ লম্পট শঠ বন্ধু নামধারী॥
সকল কার্য্যেতে গ্রাহ্য তাদের মন্ত্রণা।
গুরুজনবাক্য তাহা কেবল যন্ত্রণা॥"

অতঃপর কবি ভারতরমণীর অপূর্ব্ব সহনশীলতা প্রসঙ্গে শিবের মুখ দিয়া বলিতেছেন,—

"পরসুখে মানে সুখ অতুল্য ভুবনে।
স্বার্থহীনা আত্মসুখে সুখ নাহি গণে॥
ভারতের রমণী সে পতিহিত তরে।
হাসিমুখে হৃৎপিণ্ড ডালি দিতে পারে॥
পুরুষে আহার করে ষোড়শোপচার।
নারীর বেলায় দেখি কিছু নাহি আর॥
উপাচার পাত্র ঝাড়ি যদি কিছু রয়।
ভোজনে তাহাই নারী পর্য্যাপ্ত মানয়॥
অভাবেতে ভোজন-বিধান সলবণ।
অন্নে পূর্ণোদরা কেহ কারও অর্দ্ধাশন॥
দুগ্ধঘৃত আদি দেহ পুষ্টিকর যাহা।
রমণীর রসনাতে সুনিষিদ্ধ তাহা॥
শয়ন ভোজন কালে ফেটে যায় হৃদি।
জটিলা কুটিলা সম শাশুড়ি-ননদি॥"

যে সময়ে কবি নবপরিণীতা বধূদের প্রতি সমদরদী হইয়া এই উক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎকালে সত্যই শাশুড়ীননদীরা বধূ-নির্য্যাতন করিতেন; কিন্তু বর্ত্তমানে

চক্রের গতির পরিবর্তন হইয়াছে। দেশের বহু গৃহেই নববধূগণ কর্ত্রীস্বরূপিণী হইয়া শাশুড়ীকে অন্নদানে বঞ্চিত করিতেছেন। ভবিষ্যতে যে এমনই হইবে কবি তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তদনুসারে নারীর কর্ত্তব্য প্রসঙ্গে বহু উপদেশ মহাদেবের মুখ দিয়া বলিয়া গিয়াছেন। নবম অধ্যায়ে দেখিতে পাই,—

"নারীর কর্ত্তব্য হয় পতির সেবন।
পতিই নারীর গতি নহে অন্যজন॥
পতি বিনা নারীর আছয়ে কিবা গতি।
পতির জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি॥
দান-ধ্যান ব্রত-পূজা তীর্থ-পর্য্যটন।
উপবাস রমণীর নাহি কদাচন॥
পতির শুশ্রূষা বিনা কিছু নাহি আর।
পতিসেবা রমণীর সর্ব্বধর্ম্মসার॥
পতিই নারীর তীর্থ তপ দান ব্রত।
পতিই নারীর গুরু শাস্ত্রের সম্মত॥
পতির আদেশে সদা রবে অবস্থিতা।
পতিবন্ধুগণ প্রতি হবে প্রীতিযুতা॥
কোপদৃষ্টি কভু না চাহিবে পতি পানে।
ব্যথিবে না হৃদি তার নিষ্ঠুর ভাষণে॥
না হেরিবে স্বামী বিনা অন্যের বদন।
না করিবে অন্যসহ গুপ্ত সম্ভাষণ॥
না দেখাবে নিজ অঙ্গ অপর পুরুষে।
সতত অচলা রবে পতির আদেশে॥
পতি-পত্নী প্রেমে বদ্ধ হয়ে পরস্পর।
রহিবে দম্পতী সুখে সংসার ভিতর॥"

অতঃপর কবি তখনকার দিনের নারীপ্রগতি বিষয়ে লিখিতেছেন,—

"পুরুষেরই মত নারী গেছে রসাতল।
পতি যে পরম গুরু নাহি মানে আর।
মনে করে শুধু বিলাসের পাত্র তার॥
অলঙ্কার বসন ভূষণ আদি যত।
আনি যোগাইবে পতি প্রয়োজন মত॥
বিলাস বাসনা হৈলে করিবে পূরণ।
এক্ষণে নারীর তাই পতি প্রয়োজন॥
সহস্র পুরুষ মাঝে বসিবে কৌতুকে।
মগ্ন রবে আপন গরবে আত্মসুখে॥
লক্ষ্মীস্বরূপিণী নারী গৃহস্থের ঘরে।
কালভুজঙ্গিনী হয়ে এবে বাস করে॥
পতি যে পরম গুরু নাহি মানে আর।
পুরুষের সম হৈতে বাসনা তাহার॥"

এই সমুদয় অনাচারের অবশ্য সম্ভাবনা দেখিয়া কবি শিবের মুখ দিয়া পুনরায় নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"শশ্রূ শ্বশুরের প্রতি রবে ভক্তিমতী।
আত্মীয়স্বজন প্রতি প্রকাশিবে প্রীতি॥
যতনে শিখিবে সদা গৃহকর্ম্ম যত।
রন্ধন বয়ন শিল্প প্রয়োজন মত॥
আর নিজ পুত্রকন্যা লালন পালন।
বিশেষতঃ তাহাদের চরিত্রগঠন॥
এসকল কর্ম্মে নারী নিপুণা হইবে।
সন্তান-শিক্ষার ভার অপরে না দিবে॥
ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিগ্রন্থ পড়িয়া যতনে।
তাই শিক্ষা দিবে নিজ পুত্র কন্যাগণে॥
সন্তান জননী হৈতে যদি শিক্ষা পায়।
দেশের মঙ্গল কত বলা নাহি যায়॥
রন্ধনাদি কার্য্য শুধু নারীধর্ম্ম নয়।
অশেষ কর্ত্তব্য তার পিছে পড়ে রয়॥
বিপদে মন্ত্রিণী নারী স্নেহেতে ভগিনী।
রমণে রমণী আর ভোজনে জননী॥"

অতঃপর ভারতে নারীর মর্য্যাদা প্রসঙ্গে শিব বলিতেছেন,—

"'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' আমারই বচন।
তাই নারী সহ করে ধর্ম্ম আচরণ॥
রমণীর স্থান দেখ সর্ব্বত্র বিরাজে।
ধর্ম্মে কর্ম্মে মন্ত্রণায় কিংবা অন্য কাজে॥
অধিক কি কব শিবে মানরক্ষা হলে।
দিবা নিশি পড়ে থাকি তব পদতলে॥
প্রবল তরঙ্গ ওই গঙ্গা যার নাম।
সমাদরে তারে দেখ শিরে দিছি স্থান॥
রমণী গৌরবান্বিতা হেথা চিরকাল।
না বুঝে না জেনে শুধু ঘটায় জঞ্জাল॥
অগ্রেতে নারীর পরে পুরুষের নাম।
লক্ষ্মীনারায়ণ রাধাশ্যাম সীতারাম॥"

ভারতের সম-সাময়িক জন-সমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া কবি দ্বিজ গৌরীন্দ্রনাথ স্থির থাকিতে পারেন নাই। জনসমাজের প্রতি সমষ্টিগত ঐক্যভাব জাগরণ উদ্দেশ্যেই তিনি লিখিতেছেন,—

"একতা সমষ্টিগত যথায় অভাব।
ব্যক্তিগত স্বপ্রধান যে দেশের ভাব॥
ঘুচাতে না পারে দীন নয়নের নীর।
অনায়াসে বুকে মারে বিষদিগ্ধ তীর॥
অর্থে করিয়াছে যারা জীবন সম্বল।
অত্যাচার করে পেয়ে দরিদ্র দুর্ব্বল॥
পক্ষপাত বিচার যথায় বলবান।
আশ্রিতে করিতে নারে অভয় প্রদান॥
যাদের সমাজ অন্ধ ভ্রান্ত কুসংস্কারে।
অবিরত মজি রয় যত অনাচারে॥
লভে কি উন্নতি কভু সে দেশের নর।
নররূপে এ ভারেতে যতেক বানর॥
পরপদ সেবা শুধু ভাবিয়াছে সার।
পরধর্ম্ম আর পরনীতি ব্যবহার॥
আদর্শ বলিয়া যারা ভাবে অবিরত।
সদা ভালবাসে হইতে পর-পদানত॥
ঘরের রতনে যারা করি অযতন।
কুড়ায় পরের কাচ করিয়া যতন॥
স্ববুদ্ধি ছাড়িয়া যারা পরবুদ্ধি আচরে।
পরানুবর্ত্তিতা সদা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে॥
দুর্ব্বল বলিয়া যারা ঘৃণ্য এ সংসারে।
শক্তিহীন সে জাতির মুক্তি বহুদূরে॥"

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য তেজ, আচার, ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, সামাজিক অনুশাসন প্রভৃতি স্মরণ করিয়া দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার নিমিত্ত আক্ষেপ করিতেছেন। দেবী পার্ব্বতীকে শিবের মুখ দিয়া তাই বলিতেছেন,—

"কি ছিল ভারত আজ কি হইতে যায়।
পাষাণী কিরূপে তুমি বুঝিবে তা হায়॥
যে ভারতে মুনিগণ বসি তপোবনে।
অবিরত রত ছিলা তপ আচরণে॥
অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরেতে তুলি তান।
করিতেন বেদধ্বনি আর সামগান॥
যে ভারতে নারদের বীণার নিঃস্বন।
বর্ষিত অমৃত সম জুড়াত শ্রবণ॥
যে ভারতে বশিষ্ঠ বাল্মীকি ব্যাসঋষি।
উপদেশ সুধামৃত দিলা রাশিরাশি॥
যে ভারতে বিশ্বামিত্র তপের প্রভাব।
প্রকট করিয়া করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ॥
করিল দ্বিতীয় সৃষ্টি তপস্যার বলে।
ভয় পেয়ে ব্রহ্মা যজ্ঞসূত্র দিল গলে॥
যে ভারতে মহাদেবী! নির্জ্জন নিকর।
নিবাসে বাসনা তারা করে নিরন্তর॥
যাহার মহিমাগান সদা বেদে গায়।
সাধ করে এ ভারতে নর জন্ম পায়॥
যে ভারতে ঈশ্বর হরিতে ভূমিভার।
যুগে যুগে নানারূপে হন অবতার॥
যে ভারত গুণে আমি মোহিত হইয়া।
তব সনে বসি কাশী নির্ম্মাণ করিয়া॥
যে ভারতে রাম পিতৃ-সত্যের কারণে।
অযোধ্যার রাজ্যভার ত্যজি যান বনে॥
যে ভারতে ভোগ-আশা মিটাতে পিতার।
বরি নিল ভীষ্ম চিরকুমার আচার॥
যে ভারতে হরিশ্চন্দ্র সত্যের কারণ।
করিলেন চণ্ডালের দাসত্ব গ্রহণ॥
যে ভারতে শিবি রাজা পরপ্রাণ তরে।
গাত্রমাংস কাটি দান করেন অপরে॥
যে ভারতে ভ্রাতৃপ্রেম দেখাতে লক্ষ্মণ।
করিলেন রাম সহ কাননে গমন॥
যে ভারতে দময়ন্তী, সাবিত্রী ও সীতা।
সতীত্ব প্রকাশি হৈলা জগতে বিদিতা॥
এমন সুন্দর দেশ আর কোথা আছে।
ত্রিদিব লজ্জিত ছিল ভারতের কাছে॥
কত শত পুণ্যক্ষেত্র পূত নদী নদ।
পুণ্যসরোবর যার প্রধান সম্পদ্॥
জ্ঞানমুক্তিকামী কত যার পদরেণু।
অঙ্গেতে মাখিয়া মানে সুপবিত্র তনু॥
ভারত আদর্শ তুমি ছিল এ ধরায়।
কে জানে এমন দশা তার হবে হায়॥"

কবি দ্বিজ গৌরীন্দ্রনাথের শিবশক্তি পঞ্চালিকা সম্ভাষায় এক বঙ্গ-সাহিত্যের একটি অপূর্ব্ব রত্ন। বাঙ্গালায় কোন্ কাব্য ইহার সমতুল্য? এই কাব্যের গল্প উপকথা নহে, আকাশকুসুম নহে, মস্তিষ্কের বিকৃতি নহে,—বাস্তব ঘটনা এই কাব্যের একাংশীভূত। এই কাব্য একাধারে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও পৌরাণিক। কবি-কল্পনায় ইহা কাব্য রূপে পরিণত হইয়াছে। যখন দেশের লোকগণ আপনাপন ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি বিসর্জ্জন দিতে সমুদ্যত,

সেই সময়, বাঙ্গালার সেই বড় দুঃসময় এই কাব্যের রচনাকাল।

দ্বিজ গৌরীন্দ্রনাথ জাতির সেই সঙ্কট-সময়ে বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া দেখিলেন, এদেশে ধর্ম্মবিষয়ক যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা আদৌ শাস্ত্রমূলক নহে। কতক শাস্ত্রমূলক, কতক বা প্রবাদমূলক। দ্বিজ গৌরীন্দ্রনাথ স্বয়ং একজন পুরাণ ব্যাখ্যাকার ছিলেন। "ধর্ম্ম" ও "জয়-বিষহরি" প্রভৃতি অপ্রসিদ্ধ দেবতার উপাখ্যান লইয়া কাব্য রচনা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। এই নিমিত্ত তিনি পুরাণোল্লিখিত বিষয় সকল অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-মঙ্গলের "ধর্ম্ম" বারুণীসেব্য; চণ্ডীমঙ্গলের "চণ্ডী" ব্যাধ-সেবিতা; "বিষহরি"র পূজা রাখালের দ্বারা আরব্ধ হয়, কিন্তু "শিবশক্তি পঞ্চালিকা"র দেবতা বিশ্বপূজ্য অনাদি মহেশ্বর। চণ্ডীপূজা প্রচারের স্থান গুজরাট, সিংহল; মনসা-পূজার স্থান চম্পাই নগর—নারিকেলডাঙ্গা—সিজবন; ধর্ম্মের পূজার স্থান উৎসপুর—চাঁপাই—হাঁকন্দ। এই সকল নূতন ও অপ্রসিদ্ধ স্থান; কিন্তু "শিবশক্তি পঞ্চালিকা"র দেবতার স্থান সর্ব্বজনবিদিত যথাপূর্ব্ব কৈলাস ও হিমালয়। চণ্ডীর নূতন পূজা প্রচারের প্রয়োজন, মনসারও তদ্রূপ, ধর্ম্মেরও অদ্ভুত কর্ম্ম দ্বারা দেবভাবে প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছে; কিন্তু শিব সর্ব্বারাধ্য, তাঁহার কেবল লীলাবিস্তারের প্রয়োজন। হরগৌরীর মানুষীলীলা বর্ণনাস্থলে তাঁহাদিগকে কখনও মায়াতিক্রান্ত বা কখনও মায়াচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদের ঐশ্বরিক ভাবের সহিত মনুষ্য ভাবের যে সমন্বয় করিয়াছেন, তাহাতে কবির যথেষ্ট রচনা-কৌশল প্রকাশ পায়।

দ্বিজ গৌরীন্দ্রনাথ শিবের মুখ দিয়া ব্রাহ্মণ জাতির বর্ত্তমান দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া শঙ্করীকে যে উপদেশ দিতেছেন তাহা অধুনা প্রত্যেকেরই বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

"ক্রমে অন্ধকার হইয়াছে ভারতভবন।
বুঝিতে না পারে কিসে মঙ্গল আপন॥
সূত্রধারী আছে বহু না হেরি ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের শক্তি লোপে লুপ্ত সব ধন॥
শাসিত পালিত হইত তেজেতে যাহার।
ক্রমে অন্ধ হবির সে শক্তি নাহি আর॥
রক্ষক হবির অন্ধ উন্মুক্ত বন্ধন।
হলে যথা হয় বন্ধ বৃষের নর্দ্দন॥
কেহ ভণ্ড অসাধু কেহ বা স্বেচ্ছাচারী।
কেহ কেহ শাস্ত্র-মর্ম্ম কদর্থনকারী॥
সে অলন্ত তেজ আর না হেরি ব্রাহ্মণে।
উপবীত মাত্র ব্রাহ্মণত্ব সমর্থনে॥
তপোবল মনোবল হারায়ে সকল।
ধনীর দ্বারেতে এবে স্তাবকের দল॥
সার করি আছে বিপ্র কামিনী-কাঞ্চনে।
হেরিয়া বিপ্রের দশা দুঃখ হয় মনে॥
নিজে ভ্রান্ত হৈয়ে ভ্রান্ত করিছে অপরে।
অজ্ঞ লোকে যত তাই ধ্রুব জ্ঞানে ধরে॥
না বুঝিয়া মর্ম্ম করি বচন অভ্যাস।
কদর্থ করিয়া করিতেছে সর্ব্বনাশ॥
কুসংস্কারে মগ্ন হৈয়ে সত্য নাহি বুঝে।
শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম নাহি দেখে খুঁজে॥
অথর্ব্ব আচারে মজি সেইত ব্রাহ্মণ।
আর্য্যের প্রকৃত ধর্ম্মে করেছে বর্জ্জন॥
দেহ মন সমাজ শৃঙ্খলা লক্ষ্য করি।
আচার বিচার সব জানিবে শঙ্করী॥
মনের বাড়াতে শক্তি কতক আচার।
কতক আচার লক্ষ্য দেহ রক্ষা তার॥
সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার তরে।
রচিত হয়েছে দেবী আচার অপরে॥
মনের বাড়াতে শক্তি যে সব আচার।
জানিবে প্রেয়সী তার নাম সদাচার॥
আচারের নামে আনিয়াছে কদাচার।
নীচে ঘৃণা বল দেবী বিধান কাহার॥
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হস্তী কুকুর গোধন।
সমভাবে পণ্ডিত যে করে দরশন॥
ভারতের শাস্ত্রকার নহে এত হীন।
ঘৃণা করিবারে বলে হেরি নীচ দীন॥"

অতঃপর সদাশিব পার্ব্বতীকে শেষ উপদেশ কালে বলিতেছেন,—

"আগম নিগম আর সংহিতা পুরাণ।
পড়িয়া হয়েছে মূর্খ লভে নাহি জ্ঞান॥
হারিত পুলস্ত্য ভৃগু যাজ্ঞবল্ক্য যম।
সংহিতা বুঝিত যদি ঘুচে যেত ভ্রম॥

না বুঝিয়া ধর্ম্ম যদি কদর্থ ঘটায়।
বল গো বরদা কে বা দোষী হবে তায়॥
করিবে কুতর্ক শুধু বুঝাইতে গেলে।
বাঁধিবে আঁচলে গিয়া সোনা দূরে ফেলে॥'

"ধর্ম্মই কেবল দেবী ভারতের প্রাণ;
ধর্ম্মই এ ভারতের উন্নতি সোপান॥
সেই ধর্ম্মে যদি গো বিকৃত করি ধরে।
কি আশ্চর্য্য সে পাপে ভারত যদি মরে॥
আর কিছু নয় দেবী কলির প্রভাব।
লুপ্ত করিয়াছে আর্য্য ধর্ম্মের সে ভাব।
তাহারি কারণে লোক অজ্ঞানে যে ভরা।
অনর্থক আর উপদেশ দান করা।"

দ্বিজ গৌরীন্দ্রনাথ-লিখিত একখানি মাত্র কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় যে উক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি :

"যে দাতা ইচ্ছা করিলে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা, অর্দ্ধ রাজ্য ও রাজকন্যা দিয়া অতিথিকে তুষ্ট করিতে পারিতেন, তিনি মুষ্টি ভিক্ষা দিয়াই অতিথিকে বিদায় দিয়াছেন। হউক সে মুষ্টিভিক্ষা, আমরা বলিব, তাহা হীরকমুষ্টি।"

পরিস্থিতি

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

(এবার) উল্টা বিধির বিধানে দুনিয়া
পড়েছে দুর্ব্বিপাকে,
মানুষেরে দেখি ভালুকে নাচায়
দড়ি পরাইয়া নাকে।

সিংহের ভাগে শ্যেন বিহঙ্গ
লোলুপ দৃষ্টি হানে,
ক্ষুদ্র জীবেরা শঙ্কিত মনে
চাহিছে এ' ওর পানে।

ব্যাঘ্র বৃষভে স্বার্থের লোভে
জল খায় এক ঘাটে,
কুমোরের হাতে শুমোরের হাঁড়ি
ভাঙ্গে দুনিয়ার হাটে।

কুম্ভিরীরেরা পাঁচ কণে খালি
জলে নামে না কেউ,
বিড়ালেরা চাহে মৎস্য ধরিতে
না ছুঁয়ে জলের ঢেউ।

হেথা গর্দ্দভও দেখি ঘোড়ার সঙ্গে
দাপাদাপি করে শুরু।
শৃগাল শিখিছে অহিংস নীতি
বকেরে করিয়া গুরু।

ছাগল ভেড়ায় বেধেছে লড়াই
সিংহ-চর্ম্ম পরি,
মর্কটে হায় লইয়া পালায়
খাদ্যের থালা ধরি।

আদার ব্যাপারী মেতে আছে লয়ে
জাহাজের কারখানা
শশক করিছে সিংহ-নীতির
নিষ্ঠুর আলোচনা।

রাজ্য নাহিক রাজনীতি তবু
বেড়ে ওঠে ধাপে ধাপে,
কবির কণ্ঠ, রুদ্ধ আজিকে
'পরিস্থিতি'র চাপে।

মধু-বসন্ত

—শ্রীমন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রভাত হইলেও পরাণ শয্যাত্যাগ করিল না। বিনোদিনী তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়া দেখিল পরাণ তখনও ঘুমাইতেছে, কন্যা বিমলা কোথায় গিয়াছে। তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পাছে সে দোষের ভাগী হয়, সেই জন্য কোন কথাই তুলিল না।

গত রাত্রের উত্তেজনা ও মানসিক অবসাদে প্রাতঃকালেই হারাণের জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। যখন বড় বউ উঠিয়া গেল, তখন হারাণ একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া জাগরণ, একটুও নিদ্রা হয় নাই। সেই জন্য স্বামীকে জাগাইল না। সুতরাং প্রাতঃকালেই বিনোদিনী যাহা আশা করিয়াছিল, তাহা হইল না দেখিয়া বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িল। দুই ভাইয়ের জাগরিত হওয়া অবধি অপেক্ষা না করা ব্যতীত সে আর অন্য কোন উপায় দেখিল না। অগত্যা এ কাজ, ও-কাজ, সে-কাজের অছিলা করিয়া সময় কাটাইয়া দিতে থাকিল। তবে অধিকক্ষণ তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না।

মানসিক চাঞ্চল্য থাকিলে গাঢ় নিদ্রা হয় না। অল্পক্ষণ নিদ্রার পরই হঠাৎ হারাণ শয্যা ছাড়িয়া উঠিল। কিন্তু জ্বর বেশী থাকায় আবার বসিয়া পড়িল। ডাকিল, "বড় বউ, বড় বউ! একবার এদিকে এস তো।" বড় বউ ছুটিয়া স্বামীর নিকট আসিল। বড় বউ আসিলে হারাণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, যেন কি বলিবে, অথচ যাহা বলিতে যাইতেছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। বড় বউ ভাবিল এ আবার কি? গায়ে হাত বুলাইয়া কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে অমন করে ডাকছিলে কেন? তোমার কি বড় কষ্ট হচ্ছে?"

"হ্যাঁ বড় বউ বড় কষ্ট হচ্ছে। বুকের ভিতরটা কেমন করছে। উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। পরাণ কি মনে করছে, দাদা অছিলে করে শুয়ে রয়েছে। বড় বউ একটু হাত-ধোয়ার জল আন। ঘরে যদি কিছু থাকে, একটু দাও। বড় জল তেষ্টা পেয়েছে—একটু জল খাই।"

কালবিলম্ব না করিয়া কমলা সকলই যোগাড় করিয়া দিল। জল খাইয়া একটু সুস্থ হইয়া হারাণ একটি লাঠির উপর ভর দিয়া পরাণের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। পরাণকে ডাকিয়া তুলিল। পরাণের কিন্তু মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। দাদা কি করিবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। মদিরার ঝোঁকে, বিশুর পরামর্শে, শাশুড়ি ঠাকরুণের প্রেরণায় এবং ছোট বউ বিমলার অভিমানে সে দাদাকে যাহা কোন রকমে বলিতে পারিয়াছিল, তাহা যে এখন একা সে আর বলিতে পারিতেছে না। সে যে দাদা ভিন্ন আর কিছুই জানে না। সংসারের কোন্ পথে তাহাকে যাইতে হইবে, তাহা যে সে জানে না। সেই জন্য জ্যেষ্ঠের সম্মুখে কোন কথাই সে বলিতে পারিল না। কিন্তু হারাণ দৃঢ়, সে ছাড়িবার পাত্র নহে। সে দেখাইতে চাহে, জগতে যাহারা আপনার বলিয়া অতিরিক্ত দরদ দেখাইতে কাছে ঘেঁসিয়া বসে, তাহারা কেমন বস্তু। সঙ্কীর্ণতা-কণ্টক না মাড়াইলে সাবধান হইয়া চলিবার ইচ্ছা সংসারের ভবিষ্যতে হয় না!

হারাণ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "পরাণ, পাড়ার ভট্‌চায্যি মশায়, বাঁড়ুয্যে মশায় আর তিনু ঠাকুর্দাকে ডেকে আন। তাঁরা দাঁড়িয়ে থেকে তোমার যাহা প্রাপ্য তোমাকে দিয়ে যান।"

পরাণ কিন্তু উঠিল না। হারাণ এইবার উল্টা বুঝিল। সে মনে করিল, পরাণ তাহাকে অগ্রাহ্য করিল। ক্রোধে উচ্চকণ্ঠে বলিল, "বেশ, আমিই তাঁদের ডেকে পাঠাচ্ছি। তুই তৈরি হ'য়ে নে।"

পরাণের তখন মনে হইতেছিল, সে এমন কি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে, যাহার ফলে দাদা আজি এমন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বেশ, যদি তাহারই দোষ হইয়া থাকে, তাহা কি মার্জনা করা যায় না? তাহাকে তো দুইটা গালি দিয়া ধমক দিলে হইত। সে তো আর কথা কহিতে পারিত না। তবে

কি তাহার দাদার মন তাহারই মত আর কেহ খারাপ করিয়া দিয়াছে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাহারই বা একার দোষ কি? মনে মনে পরাণ এইরূপ তোলাপাড় করিতেছিল, এমন সময়ে তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ভনিতা না করিয়াই সটাং বলিল,

"দেখ পরাণ, নিজে এবার একটু শক্ত হও। তোমার ভাই তো ডাকতে গেল তার নিজের তাঁবের সব লোক। আর তুমি থাক ঘরে বসে। ব্যস্। তা হ'লেই তোমার পাওনা-গণ্ডা বেশ বুঝে নেওয়া হবে খন।"

"দাদা যাঁদের ডাকতে গেল, আমিও ত তাঁদেরই ডাকতুম।"

"আমার মনে হয়, ওঁরা তোমার দাদার লোক।"

"না, না, ওঁরা বড় ভাল লোক। গাঁয়ের সকলেই ওঁদের কাছে ভাল-মন্দর পরামর্শ নেয়।"

"তা হোক। তবুও কি জান, তোমার দিকটা দেখবে, এমন থাকা একটা লোকও ভাল। বিশু কেন এল না?"

"বোধ হয় সে আসবে।"

"তা হ'লেই হবে। নাও, এখন ওঠ। সব ভাল করে দেখে শুনে নাও।"

পরাণ উঠিল। ঘর হইতে বাহিরে যাইতে যাইতে অস্ফুট অশ্রাব্য স্বরে বলিল,—"মাথা আর মুণ্ডু করবে।" বিনোদিনী শ্রীদুর্গা স্মরণ করিতে লাগিল—"হে মা দুর্গে, হারাণের সুমতি দিও মা। পরাণ আমার যে কিছু জানে না, কিছু বোঝে না।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিনোদিনী সতৃষ্ণ নয়নে পরাণের দিকে চাহিয়া রহিল।

পাড়ার যাঁহারা গণ্যমান্য এবং যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয়ের দাবীর সামঞ্জস্য করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতে বিশেষ পটু, তাঁহারা সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হারাণ একদিকে, অসুস্থ বলিয়া তাহার পত্নী কমলা তাহার পার্শ্বদেশে ছিল। অন্যদিকে পরাণ ও সৎপরামর্শ দানে অতিব্যাকুলা শ্বশ্রূঠাকুরাণী বিনোদিনী এবং তাহার কন্যা অর্দ্ধাবগুণ্ঠন অবস্থায়। হারাণ পরাণকে ডাকিয়া অতি ধীর ভাবে বলিল, "পরাণ তোর কি কি চাই? তুই সেই সব নে।"

পরাণ একবার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর দিকে চাহিল। সে ইঙ্গিতে বলিয়া দিতে ছাড়িল না, "এই সুযোগ। ভাল ক'রে দেখে শুনে নাও।"

আর একবার পরাণ পাড়ার পাঁচ জনের দিকে চাহিল। তাহার বড়ই লজ্জা করিতে লাগিল। তাহাকে কোন কথা কহিতে না দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "পরাণ চুপ করে কেন রে? তোর যা যা নিয়ে সুখ হবে, তা বলে ফেল।"

"পরাণে চুপ করে থাকিস নে, ভাই। এঁরা কতক্ষণ এখানে থাকবেন বল?"

পরাণ শ্বশ্রূমাতার কর্ণে ভূপের পরামর্শ ফিস্ ফিস্ করিয়া শুনিতেছিল, উত্তর করিল, "দাদা, তুমি বলে দাও কোন্‌টা আমার।"

"আমিই যদি বলে দেব, ত এত লোকের কি দরকার ছিল বল ত? আমার বলবারও নেই, করবারও নেই। তো'কে নিয়েই সংসার। তো'র যাতে ভাল হয়, যা যা তো'র পছন্দ হয়, তুই দেখে ঠিক করে নে; আমি এই মাতব্বরদের কাছে সমস্ত লিখে পড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।"

বিনোদিনী আর থাকিতে পারিল না। ভিতরে গরল উচ্চস্রোতে ছুটাছুটি করিতেছে। কেমন করিয়া তাহার গতি সে রোধ করিবে? বিনোদিনী পরাণকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিল, "তা বড় ভাই যখন বলছে, তখন তা'র কথা ফেলা কি ভাল? তারই যখন ইচ্ছে, তখন বল না বাবু তোমার কোন্‌টা চাই? হাজার হক বড় তো। সে কি ছোট ভাইকে বঞ্চিত করতে পারে?"

হারাণ একথা শুনিল। পাছে একটা বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত হয়, সেই জন্য সে অতিকষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিল। একবার মাত্র বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। পরে কাহারও কোন কথার অপেক্ষা না করিয়াই বলিল, "তবে আমি-ই বলি আপনারা শুনুন।"

হারাণ যাহা যাহা বলিল, তাহাতে সকলে 'সাধু সাধু' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পরাণের ভাগে সবই রহিল। কেবল হারাণ রাখিল দুইখানি শয়ন-ঘর, একটি গোলা, এক জোড়া বলদ, আর একটি মাত্র হাল। জমি রাখিল মাত্র পাঁচ বিঘা। সকলের সম্মুখে লেখাপড়া হইয়া গেল। মধ্যস্থগণ সহি করিলেন। বিনোদিনী হাঁফ ছাড়িয়া

বাঁচিল—এইবার মেয়ের ঘর-কন্না ভাল করিয়া একবার গুছাইয়া দিতে হইবে। তাহার গর্ব্বোন্নত মুখ দেখিয়া সকলে বুঝিল, বিনোদিনী এই সমান-সমান ভাগে বড়ই আনন্দিত হইয়াছে। পরাণের কিন্তু কিছু ভাল লাগিতেছিল না। তাহার মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। সকলে চলিয়া গেল। হারাণ কাল বিলম্ব না করিয়া বাড়ীর উঠানের মাঝামাঝি লোক লাগাইয়া বেড়া দিতে লাগিল।

এমন সময়ে বিশু আসিয়া উপস্থিত হইল। গতকল্য যখন সে তাহাকে উত্তেজিত করিয়া গৃহে পাঠাইয়াছিল, তখনই সে বুঝিয়াছিল, পরাণ হাল্‌কা লোক। নেশা ছুটিলে তাহার অবলম্বন ঠিক পথে যাইতে পারিবে না। সে আসিয়া দেখিল, তাহার অনুমান ঠিকই হইয়াছে। ভাগ হইয়া গিয়াছে। হারাণ ভাগ চিহ্নিত করিয়া বেড়া লাগাইতেছে। পরাণ নিশ্চেষ্ট হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বিশু তাহার ঔষধও সঙ্গে আনিতে ভুলে নাই। একটু আড়ালে লইয়া গিয়া এক গ্লাস বেশ করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিল। তখন পরাণের চমক ভাঙ্গিল। কথা ফুটিল। আবার এক গ্লাস। আবার আর এক গ্লাস। পরাণ ক্রমশঃ চাঙ্গা হইয়া উঠিল। বাড়ীর ভিতর আসিয়া দেখিল বিনোদিনী অতি ব্যস্ত। অগত্যা নিজের মত না গুছা-ইলে উপায় নাই দেখিয়া ছোট বউও গোছগাছ করিতেছিল।

বিশুকে সঙ্গে লইয়া উঠানে আসিয়া চীৎকার করিয়া পরাণ বলিল, "হ্যাঁ বাবা, বেড়া দিচ্ছ, দাও। বিশু লোকজন ডাক, ভাঁর বাঁধা হচ্ছে, আর আমার হ'বে না। জোর বেড়া লাগাও।"

কথার অপেক্ষা সহিল না। বিনোদিনী পূর্ব্ব হইতেই ঠান-দিদির সাহায্যে সকল যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল। লোক-জন লাগিয়া' গেল। বেড়ার উপর বেড়া পড়িয়া এদিক্ হইতে ওদিক্ দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না, দেখিয়া বিনোদিনী বড়ই সন্তুষ্ট হইল। লজ্জার মাথা খাইয়া বিশুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বাবা, তুমি না থাকলে, পরাণ কি একাজ করতে পারত। একেবারে গোবেচারা। আর দু'দিন গেলেই হারাণ যে-রকম তোখোড় লোক, ঠিক সব আপনার করে নিত। ভাগ্যে তুমি ওকে সৎপরামর্শ দিছলে। তা' না হ'লে তো আমাদের কথা একেবারেই শোনে না। যাও, বাবা, ঘরে বস। বেলা হ'য়ে গেছে, এবেলা না হয় এখানে দু'টি খেও' খন।"

বিশু তো বাড়ীর অন্যান্য সকলের নিকটে এই আত্মীয়তাই চাহিতেছিল। দ্বিরুক্তি না করিয়া বিশু বিনোদিনীর কথায় পরাণকে হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর যাইবে—এমন সময়ে নেশার ঝোঁকে পরাণের পুত্রস্নেহ জাগিয়া গেল, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "গোপাল কোথায়, বিমলী ?"

বিনোদিনী প্রস্তুতই ছিল। জবাব করিতে বিলম্ব হইল না। নাকি সুরে ভঙ্গিমা করিয়া বলিল, "তাই দেখ একবার। সংসারটা খেলেন। ভুজুং দিয়ে দিয়ে মায় পেটের ভাইকে পর করে দিলে। এখনও কি তা'র নিবৃত্তি আছে গো ? শিবরাত্তিরের সলতে ঐ গোপাল, দেখ তার আবার কি হাল করে ? জ্যাঠামা বলতে যেমন ছেলে অজ্ঞান, মাগীও কম গা—গোপাল বলতে অমনি অজ্ঞান! ছেলেটি না হ'লে তা'র এক দণ্ডও চলে না।"

"না না। তা আর হ'বে না। ও আমার কে ? পরম শত্তুর বই তো নয়। আমি বলে দিচ্ছি, আমার ছেলেকে যদি কেউ অমন করে আটকে রাখে, ভাল হবে না বলছি। সব খেলে রাক্ষুসী।"

"ডাইনি, ডাইনি, বাবা, একেবারে ডাইনি! আর একবার যদি যায়, তাহ'লেই একেবারে গপ ক'রে গিলে ফেলবে, বাবা! তুমি এর যা' হয় একটা বিলি-ব্যবস্থা কর।"

মাদকতার তীব্র বহ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। পরাণ তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। চীৎকার করিতে শাসাইতে লাগিল। বড় বউ ভয়ে গোপালকে কত করিয়া ভুলাইয়া পাঠাইয়া দিল। গোপাল যেমন নাচিতে নাচিতে বাড়ীর ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি পরাণ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বাঘের মত ধরিল। উন্মত্ততার ঘোরে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য পিতা পুত্রকে অমানুষিক প্রহার করিল। বড় বউ-এর কতবার ইচ্ছা হইল গোপালকে বুকে করিয়া লইয়া আসে; কিন্তু পরাণের গালাগালিতে তাহার অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হইল না। আরও বড় বউ কাছে যাইলে যদি প্রহারের আধিক্য হয় তাহার জন্যও সে পিছাইয়া পড়িল।

সে শুনিতে লাগিল, আর চক্ষের জল অজস্রধারায় পড়িতে লাগিল :

"যদি যাবি ঐ ডাইনি মাগীর কাছে আর, তো'কে আর আস্ত রাখব না পাজি। জ্যাঠামা, জ্যাঠামা! ফের যদি ও কথা মুখে আনবি তো তোর আর নিস্তার রাখব না"

ছোট বউ গোপালকে যাইতে মুখে মানা করিয়াছিল, কিন্তু গোপাল জ্যাঠামার কাছে গিয়াছিল বলিয়া সে সুখীই হইয়াছিল, রাগ করে নাই। তাহার অভিমান হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অকৃত্রিম স্নেহের কাছে কতক্ষণ টিকে? ছোট বউ জানিত বড়-জা তাহার পুত্রকে পুত্র বলিয়াই কোলে তুলিয়া লয়। আর পরাণ বুঝিল, বড় বউ ডাইনি, তাহার ছেলেটিকে একেবারে গিলিয়া ফেলিবার মত করিয়া ফেলিয়াছে! গোপাল মার খাইয়া মায়ের কোলে নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। গোপাল আর কথা কহে না। বিনোদিনী ভ্রূক্ষেপও করিল না। ছোট বউ কাঁদিয়া উঠিল—

"ওগো, গোপাল আমার কেমন করছে গো?"

হারাণ ও বড় বউ ছুটিয়া আসিল। মুখে জলের ছিটা দিয়া বাতাস করিতে করিতে সে-ভাব সামলাইয়া গেল। ঘরের ভিতর তখন পরাণ ও বিশুর পাত্র চলিতেছিল। বীভৎস চীৎকারও শোনা যাইতেছিল। গোপাল সুস্থ হইলে হারাণ ও বড় বউ চলিয়া গেল। ক্ষণেক পরে এক বাটী গরম দুধ লইয়া বড় বউ ফিরিয়া আসিল। ছোট বউ গোপালকে দুধ খাওয়াইতে যাইবে এমন সময়ে পরাণ টলিতে টলিতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। বড় বউকে দেখিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "কি বাবা ডাইনি, এসেছ ছেলেটাকে খেতে। ছোট বউ এ দুধ কোথায় পেলি?"

"দিদি এনে দিয়েছে। তোমার তো কাণ্ডজ্ঞান কত? ছেলেটাকে মেরে অজ্ঞান করে ফেললে, গোটা নাল ভাঙ্গতে লাগল। করতে গেলে তো ফুর্ত্তি ঘরের ভেতর!"

"কি যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। কার সঙ্গে কথা কইছিস জানিস।"

কিল-চাপড়, লাথি ছোট বউএর উপর অবিরাম পড়িতে লাগিল। মাতাল—গায়ে বল নাই, অথচ কিল-চাপড় লাথি চলিতে লাগিল। ছোট বউ অবাক্ হইয়া গেল। স্বামীর নেশার প্রথম অভিজ্ঞতা তাহার এইরূপে হইল। এইরূপ সাদর আহ্বানে সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার মাতাঠাকুরাণী যে সুখের কল্পনা করিয়া জামাইকে সৎপরামর্শ দিয়া যুধিষ্ঠিরের মত ভাইয়ের অন্তর হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে, তাহার প্রথম অনুভব এই প্রথম সাদর আহ্বানে। বড় বউ চীৎকার না করিয়া "কি কর, কি কর ঠাকুর-পো" বলিয়া তাহাকে যেমন টানিয়া সরাইয়া দিতে যাইবে, অমনি পদস্খলিত হইয়া পরাণ পড়িয়া গেল। উঠিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। শুইয়া শুইয়া যাহা প্রাণ চাহিল, যাহা মুখে আসিল তাহাই গালাগালি করিয়া এক একবার মুখ তুলিতে লাগিল, আর এক একবার মুখ গুঁজড়াইতে লাগিল। বড় বউ ছোট বউকে হাত ধরিয়া তুলিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। ঘরের ভিতর গিয়া ছোট বউ বড় বউ-এর বুকে মাথা গুঁজিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিনোদিনী বাঘিনীর মত সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া মুখ খুলিয়া দিল, "ছেঁচড়া ছুঁড়ি নেকি. জানিস নে তোর সোয়ামি যা বলবে, তা না শুনলে খোয়ার এই রকমই হতে হবে? এ আর আমাকে পাস নি যে কথায় উড়িয়ে দিবি। এ বড় শক্ত ঘানি। এখন যা, মায়া কান্না রাখ। সব অগোছাল এলোমেলো হয়ে রয়েছে।"

পরাণ তেমনি ধূল্যবলুণ্ঠিত অবস্থায় বিকৃত স্বরে চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

"বাবা আসশেওড়া গাছের পেত্নি, ঘাড়ে চেপেছ বাবা আবার? দাঁড়াও। ভূত কেমন করে ঝাড়তে হয়, তার ওষুধ আমার কাছে আছে। হাঃ হাঃ হাঃ।"

বড় বউ প্রমাদ গণিয়া নিজের গৃহে চলিয়া গেল। যাইবার সময় ছোট বউকে বলিয়া গেল—

"দেখ্ ছোট বউ, ওর কথাই শুনিস। কি জানি আরও কি বেশী হবে।"

নগদ টাকা যাহা পাইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ বিশু আত্মসাৎ করিয়াছিল। যাহা সে দয়া করিয়া পরাণকে দিয়াছিল, তাহাতে কয়েক দিন ধরিয়া কলিকাতায় যাইয়া থিয়েটার বায়স্কোপ দেখা ও রাত্রিতে পল্লীগ্রামে গৃহে ফিরিবার সুবিধা না থাকায় উদার-প্রকৃতি নারীত্বাভিমানিনী বার-বিলাসিনীদিগের পক্ষিনীড়-নিকুঞ্জে রাত্রির শেষ অংশটুকু যাপন

করিবার পরাণের বিশেষ সুযোগ হইয়াছিল। ইহার উপর আরও একটি আমোদের সুবিধা তাহার অদৃষ্টে হইয়াছিল। কলিকাতায় যাহারা নব্যতন্ত্রের বাবুলোক, তাঁহাদের 'রেস্' বা 'ঘোড়-দৌড়' একটি মহানন্দের স্থান। ইহাতে যে আনন্দ তাঁহারা অনুভব করেন, তাহার না কি তুলনা কোথাও নাই। শুধু যে আমোদ, তাহা নহে। আমোদের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষপতি ক্রোড়পতি হওয়া। এ রসে যাহারা বঞ্চিত, তাহাদিগের জন্মই না কি বৃথা! সেই জন্য 'রেস্'-দিনে কলিকাতায় সকাল হইতে এক নূতন সাড়া পড়িয়া যায়। প্রাতঃকালে উঠিয়াই 'টিপ্' লইয়া মস্তিষ্ক চালনা, অর্থসংগ্রহের চেষ্টা। মধ্যাহ্নে তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া লইয়া ঘোড়দৌড়ের মাঠে গমন। কি মজা, কি উৎসাহ, কি উল্লাস! "ঐ ঘোড়া ছুটল, ঐ এল—ঐ এল কি আশা! ঐ যাঃ! মুখটা বাড়িয়ে দিলেই ত 'উইন্' হত।" "আমি যে জানি 'উইন' মারবে আজ—বাবা, কত মাথা ঘামাতে হয়, তবে এর হদিশ হয়!" দিবাবসানে যখন ট্রাম, বাস, ল্যাণ্ডো, মোটর প্রভৃতি নানাবিধ যান, এই সব সুরসিকের দলকে তাহাদিগের মামুলি আমোদের খাস-খানায় ফিরাইয়া লইয়া যায়, তখন উৎসাহ নাই, উল্লাস নাই, কথা নাই, তর্ক নাই, আমোদ নাই, প্রমোদ নাই! লক্ষপতি, ক্রোড়পতি, রাজা-রাজড়া হইবার বাঞ্ছা নাই, সে স্ফীতবক্ষ নাই। বিষাদের কালিমায় উল্লসিত মুখকমল শুকাইয়া পাংশুবর্ণ ধারণ করে, হস্তপদে যেন সজীবতা নাই—কেবল হা-হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস "আমি বললুম, ন'-নম্বরের ঘোড়া আজ ঠিক বাজি মারবে। তুই শুনলি নে।" এ আমোদেও পরাণ বঞ্চিত হইল না। আমোদ হইবে, লক্ষপতি হওয়াও হইবে, এ লোভ পরাণ ছাড়িতে পারিল না। বিশু যে তাহার অতি আপনার লোক! কোথায় সুদূর পাড়াগাঁয়ে মাঠে জল-কাদায় লাঙ্গল ঘাড়ে দিন-রাত্তির গরুর পেছনে, আর কোথায় কলিকাতায় থিয়েটার, বায়স্কোপ, 'রেস্'—লক্ষপতি হওয়া, হোটেলে সুস্বাদু সস্তা জাতির উৎকৃষ্ট খাদ্যসম্ভার! কোথায় সেই পল্লীগ্রামে ঘোমটা-টানা লাজে জড়সড় অরসিকা পল্লীবধূ, আর কোথায় কলিকাতায় হাবভাবলীলাময়ী উন্মুক্ত-উদারবক্ষঃ আলুলায়িতকুন্তলা, রেশমী-খোঁপা, সেকেলে-ঘোমটা নিবারণী ফাঁস-চটি পায়ে ফটাফট্ গমনশীলা মধুরা সোহাগিনী মোটর-ট্রাম-বিলাসিনী! বিশু না হইলে কি এ অফুরন্ত আমোদ দিতে পারিত। টাকা খরচা হচ্ছে—তা টাকা কিসের জন্যে? উপভোগের জন্য নয় কি? ঘরে পুঁতিয়া রাখিয়া কি হইবে?

আমোদে আহ্লাদে যখন বিশু পরাণকে মর্ত্তে দ্বিতীয় স্বর্গে লইয়া যাইতেছিল, তখন তাহার নীরস 'একঘেয়ে' চাষবাসের কথা আদৌ মনে আসিল না। টাকার পরিমাণ ঠিক করিয়া কত খরচ করিলে, কত রাখিলে কত দিন চলিতে পারিবে, তাহার সঠিক খবর লইয়া পরাণ আমোদ উপভোগ করিতে কলিকাতাযাত্রী তো হয় নাই। সুতরাং কিছুদিন পরে যখন নগদ টাকার কলসীটা ঠঙ্ ঠঙ্ করিয়া তাহাকে জানাইয়া দিল যে, আর তাহার ভিতরে হাত দিলেই তাহার ভাবনা দূর হইবে না, তখন সে বিশুর শরণাপন্ন হইল। বিশু আগেও যেমন বলিত, এখনও ঠিক তাহাই বলিল,

"জান তো ভাই, আমার এবেলা জোটে ত ওবেলা জোটে না। তুমি ছিলে তাই কোন রকমে বেঁচে আছি।"

পরাণ বিমর্ষ হইয়া যখন গভীর চিন্তামগ্ন হইল, তখন বিশু তাহাকে আর এক পরামর্শ দিল। গোলার যে কয়টি ধান ছিল, তাহা সে বিক্রয় করিল। বিমলা আসিয়া তাহাকে বলিল,

"তুমি তো সংসারের দিকে একবার চাও না। কেবল কলকেতা আর কলকেতা। চাষের তো নাম-গন্ধ নেই। ধানগুলো যদি শেষ করলে, তো আমরা খাব কি?"

পরাণ নেশার ঝোঁকে বিকৃতস্বরে বলিল—

"আমরা খাব কি? বলি আমি কি চোর-দায়ে ধরা পড়েছি না কি যে আমার আমোদ বন্ধ করে তোদের গেলাতে হবে?"

বিমলার অনুযোগের উত্তরে আরম্ভ হইল গালাগালি এবং তাহার পরে প্রহার। এতদিনে বিমলা কিছু কিছু অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীতে কথাকাটাকাটি হইলেই মারধর সুরু হয়। অত্যাচারে ফলে পরাণ আর সে বলিষ্ঠ পরাণ নাই যে, স্বাস্থ্যসম্পন্না পল্লীবধূ তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিত না। সে যে স্বামী—দেবতা! কিন্তু বিমলা এইরূপ সময়ে জোর করিয়া শয়ন করাইয়া দিত। আর কোন অত্যাচার হইত না। পরাণের যখন কোন নেশার ঝোঁক থাকিত না, তখন সে বিমলার নিকটে কত ক্ষমা চাহিত,

কত শপথ করিত যে, আর সে মদ স্পর্শ করিবে না। বিমলা কাঁদিত, ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাইত,, কতদিনে এ দুঃখের অবসান হইবে। অভিমান হইত, বড়-ঠাকুর একবার দেখেন না। তাহা হইলে হয় তো এতদূর হইত না।

মাতা বিনোদিনী এখন সংসারের কর্ত্রী—ঠানদিদি আসিয়া কত পরামর্শ দেয়, কত রহস্যালাপ করে। ছোট বউ স্বামীর অবস্থা দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিল। সে নিজে কিছু দেখিত না। সুতরাং বিনোদিনী যাহা করিত, তাহাই হইত। সে যাহা চাহিতেছিল, জামাইএর গৃহে প্রভুত্ব করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটাইয়া দিবে, তাহা সে পাইয়াছিল। জামাই আমোদ করিতেছে, তাহাতে সে বাধা দিবে কেন? মেয়েকে এত শিখায়, মেয়ে কিছুতেই বুঝে না। ইহাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ।

হারাণের নিকট কত লোকে কত কথা কহিত। হারাণ চুপ করিয়া থাকিত। হাঁ না কিছুই বলিত না। সে নিজের পরিশ্রমে আবার পূর্ব্বের ঠাট বজায় করিতে পারিয়াছে। আবার তাহার গৃহ জমজম করিতেছে। গোপালের জন্ত তাহার উনানে যেমন দুধের কড়া বসান থাকিত, এখনও তেমনি বসান থাকে। গোপাল 'জ্যাঠামা, জ্যাঠামা' বলিয়া কমলার নিকট গেলে, কমলা ছোট বউ, বিনোদিনী, সময়ে সময়ে ঠানদিদিকে শুনাইয়া তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত। স্বামীকে কাছে পাইলে চীৎকার করিয়া বলিত—

"আমি আর পারিনে। কেন ওদের ছেলে আমাদের বাড়ীতে আসবে? এখানে আর যে টেকা দায় হয়ে পড়ল! চল অন্য কোথাও। দিন-রেতে একদণ্ডও সুখ নেই।" হারাণ বড় বউকে চিনিত। কোন কথা কহিত না। হাসিয়া চলিয়া যাইত। তাহার পর যখন কেহ গৃহে না থাকিত, যখন শূন্য নীরবতা ভীষণ আকার ধারণ করিত, তখন মাতৃবক্ষের উদ্দাম আবেগ সহস্রধারায় ছুটিত—বড় বউ কমলা প্রাণের আবেগে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিত না—ধূলায় লুটাপুটি খাইয়া গোপালের ছোট ছোট পায়ের দাগগুলি বুকে আঁকড়িয়া ধরিত আর চক্ষের অবিরল ধারায় ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা করিত—

"হে ভগবান্, কি দোষ করেছি যে গোপালকে আর আমি বুকে করে রাখতে পাইনে?"

ভগবান্ শুনিত কি না শুনিত, তাহা সে বুঝিতে পারিত পারিত না। সে কেবল কাঁদিয়াই যাইত। সেই সময়ে যদি স্বামী আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত হইত, অমনি সে ভাব কোথায় সে লুকাইয়া ফেলিত। ভীষণ আকার ধারণ করিয়া তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিত—

"পারি নে আর হতভাগা ছেলেটাকে নিয়ে। তাড়ালে যায় না, এ কি বিষম দায় হল। ওগো, আমি আর থাকতে পারছিনে। তুমি এর যা হয় একটি উপায় কর।"

স্বামীও পূর্ব্ববৎ স্থাণুর মত চলিয়া যাইত। কিন্তু এমন করিয়া অশ্রুগোপন করিয়া কতদিন কাটিতে পারে?

[ক্রমশঃ

ইংরেজ ও ভারতীয় নেতার পার্থক্য

…ইংরেজগণের কার্য্য পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের নেতৃবর্গ অসাধু, অথবা অলস, অথবা দাম্ভিক নহেন, পরন্তু তাঁহাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কি উপায়ে জনসাধারণের দুরবস্থা অপনোদিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের অভ্যুদয়-কালের প্রারম্ভ হইতে নানারকমভাবে চিন্তা ও কার্য্যতঃ পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। … …অন্যপক্ষে, ভারতীয় ইংরেজী-শিক্ষিত নেতৃবর্গের দাম্ভিকত্ব অপরিসীম। তাঁহারা প্রায়শঃ অসৎ, অলস এবং দাম্ভিক। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান যে অতীব অপরিপক্ক এবং অসম্পূর্ণ, তাহা তাহার প্রণেতাগণ পর্য্যন্ত যতটুকু বুঝিতে পারেন, তাহা পর্য্যন্ত এই নেতৃগণ বুঝিতে পারেন না। অথচ, তাঁহারা এই জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত হইয়া নিজ নিজ মনে শিক্ষার দম্ভ পোষণ করিয়া থাকেন এবং জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া থাকেন।…

বাংলার মৎস্য

—শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়

ভেট্‌কী জাতি : সংস্কৃত—ভাকুর (Perch) :

ভেটকী বাংলার একটি সর্বজনবিদিত মৎস্য। এই জাতির মধ্যে প্রায় চারি শতের উপর অধিশ্রেণী আছে। ইহাদের অধিকাংশ সমুদ্রের অধিবাসী, তবে আমাদের দেশের নদীতে যে-কয়টি শ্রেণী ও অধিশ্রেণীর ভেটকী দেখিতে পাওয়া যায়, এ স্থলে শুধু তাহাদের বিষয় উল্লেখ করা গেল। ইহাদের ইংরাজিতে white fish (শ্বেত মৎস্য) বলে, যেহেতু ইহাদের কর্ত্তিত মাংস লাল বর্ণের দেখায় না। ইহাদের মাংস খুব নরম, সুখাদ্য ও অল্প কাঁটাযুক্ত বলিয়া, বাজারে ইহার চাহিদা অধিক। ইহারা মৎস্যাশী, ইহাদের মধ্যে কতকগুলির দন্ত থাকিতে দেখা যায়; তবে অধিকাংশ শ্রেণীর দন্তের পরিবর্ত্তে, দৃঢ় ও স্থূল অধরোষ্ঠ হইতে দেখা যায়। সমস্ত ভেটকী জাতির বিশেষত্ব এই যে, উহাদের মুখবিবর প্রকাণ্ড ও চক্ষু বৃহৎ। আকৃতিভেদে ইহারা নানাপ্রকার হইয়া থাকে; খুব ছোট মাত্র তিন ইঞ্চির মৎস্য হইতে প্রায় ১০·১২ মণ ওজনের সামুদ্রিক কইভোলা মাছের ন্যায় প্রকাণ্ড আকারের মৎস্যও ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলার নদ-নদী ও মোহানাদিতে প্রায় ৯।১০ প্রকার ভেটকী মৎস্য বিচরণ করে। নিম্নে তাহাদের বিবরণ দেওয়া গেল।

(১) কইভোলা—রাক্ষুসে ভেটকী (Giant Sea Perch)—ইহারা প্রকৃত পক্ষে সমুদ্রের অধিবাসী, তবে অনেক সময় বাংলার নদীগুলির মোহানায় জোয়ারের টানে নদীর অভ্যন্তরে ইহাদের প্রবেশ করিতে দেখা যায়। কলিকাতার যাদুঘরে এই জাতীয় একটি মৎস্য সাধারণের দ্রষ্টব্য হিসাবে, মৎস্যের গ্যালারীতে যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। উহার ওজন ৭।৮ মণের কম হইবে না বলিয়া ধারণা করা যায়। উহা এরূপ প্রকাণ্ডকায় মৎস্য যে, একটি সাত বৎসরের বালককে অনায়াসে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে। গত ১৯৩৭ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গায় মোহানায় বাঙ্গালী ধীবরেরা একটি অতিকায় কইভোলা মৎস্য ধৃত করিয়াছিল। উহারা ধৃত মৎস্যটির সহিত প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল অবিরত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে তিনটি তীক্ষ্ণ 'কোঁচে'র আঘাতে উহাকে কাবু করে। এই যুদ্ধে ধীবরদের মধ্যে একজন সাংঘাতিক আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল। মৎস্যরাজটি ওজনে প্রায় ১২ মণের উপর ছিল। কলিকাতাগামী একটি ইতালিয়ান জাহাজের কাপ্তেন, বড়দিনের বিরাট ভোজের জন্য, উচ্চমূল্যে উহা ক্রয় করিয়াছিলেন।

(২) ভাকুট্ বা সাধারণ ভেটকী—(Lates Calcarifar)—ইহারা বাংলার বড় নদীগুলিতে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহারা মিষ্ট ও লোণা উভয়বিধ জলেই বাস করিতে পারে। তবে লোণা জলে ইহা উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ও ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ইহাদের পৃষ্ঠের কাঁটাগুলি খুব শক্ত ও তীক্ষ্ণ। ইহারা কইভোলার মত সংগ্রাম-পরায়ণ মৎস্য। ওজনে ইহাদের অনেক সময় দেড় মণের উপরও হইতে দেখা যায়; তবে বাজারে সাধারণতঃ দশ সের বা পনের সের পর্য্যন্ত ওজনের ভেটকী মৎস্য আমদানী হইতে দেখা যায়। অন্যান্য মৎস্যকুলের ন্যায় ইহারা প্রবল বর্ষায় ডিম্ব প্রসব করে না। শীতকালে সাধারণতঃ ইহারা মোহানা অঞ্চল হইতে নদীর অভ্যন্তরে অভিযান আরম্ভ করে ও বসন্তকালে ডিম্ব প্রসব করে। সুন্দরবনের বা ভাটী অঞ্চলের খাড়ী প্রভৃতি গুল্মযুক্ত জলে ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। ২০।২৫ দিন পরে উহাদের ডিম্ব ফুটিয়া শাবক নির্গত হয়। ইহাদের শাবকের একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, শাবকগণ ডিম্ব হইতে বহির্গত হইবার পর ইহাদের দেহের সহিত একটি করিয়া yolk-sac বা খাদ্য-থলি সংযুক্ত থাকে। যতদিন না শাবকেরা স্বাধীন হইয়া আহারাদি সংগ্রহ করিতে পারে, ততদিন ঐ প্রকৃতিদত্ত থলিগুলি দেহসংযুক্ত থাকে, বিচ্যুত হয় না। এইপ্রকার খাদ্য-থলি শাবক-দেহে সংলগ্ন থাকিতে একমাত্র হাঙর জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম

প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক লোকে ভেটকী মৎস্য অলক্ষণযুক্ত ও ইহা ভোজন করিলে ভূত-প্রেতাদির কুদৃষ্টি পড়ে বলিয়া সংস্কার বশতঃ ইহা আহার করেন না। এতাবৎ কাল ভেটকী মৎস্যের চাষ কেহ করেন নাই, অধিকাংশ সময় অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতে ভেড়ীর বাঁধ কাটিয়া দিয়া তাহাতে



বর্ণা-মাগুর

জোয়ারের জলে আগত ভেটকীর দলকে আবদ্ধ করিয়া, ভেড়ীর লোণা জলে বর্দ্ধিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। তবে অধুনা অনেক স্থলে, সেইরূপ না করিয়া আবদ্ধ মিষ্ট জলের পালন-ক্ষেত্রে ভেটকী মৎস্যের চাষ করিবার চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্থানে এইপ্রকার পালনক্ষেত্রে আশানুযায়ী ফল লাভ হইতেছে বলিয়া জানা যায়।

(৩) কুঁজো ভেটকী—(Latjaners Margainatus)—আকৃতিতে অনেকটা সাধারণ ভেটকীর সহিত খুব মিল থাকিলেও, আকৃতিগত বৈষম্যও অনেক দেখা যায়। ইহার পৃষ্ঠরেখা কুব্জ ও ইহার পৃষ্ঠ হইতে উদরের দিক খুব বিস্তৃত। ইহার দেহ হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণ ও সাধারণ ভেটকী অপেক্ষা আঁশগুলি ক্ষুদ্রাকারের। ইহার মুখবিবরে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় ইহার পৃষ্ঠের কাঁটা ভেটকী অপেক্ষা বড় ও তীক্ষ্ণ। ইহার মস্তকের মধ্যে দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া চারিটি পাথুরী বা কঠিন প্রস্তরখণ্ড সদৃশ ছোট ছোট আলগা অস্থি-খণ্ড আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মাংস খুব কোমল কিন্তু স্বাদহীন। ইহারাও অন্যান্য ভেটকীর মত মৎস্যাশী এবং ইহারা সম্পূর্ণ লোনা জলের অধিবাসী। চার পাঁচ সের ওজনের কুঁজো ভেটকী বাজারে আমদানী হইতে দেখা যায়। ইহাদের আস্বাদ উত্তম নহে বলিয়া ইহার চাহিদা বেশী নাই। ইহার মাংস খুব গুরু ও পিত্তকর।

(৪) খোড়ো ভেটকী—(Barlistes Stellaris)—আকৃতিতে অনেকটা কুঁজো ভেটকীর অনুরূপ হইলেও, ইহার পৃষ্ঠ-রেখা কুব্জ নহে এবং আকারে একটু লম্বা ও কম বিস্তৃত। ইহারাও লোণা জলের অধিবাসী। ইহার আস্বাদও খুব ভাল নয় বলিয়া বাজারে ইহার অধিক চাহিদা নাই। ইহা ওজনে দেড় হইতে দুই সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার আয়ুর্ব্বেদী গুণ কুঁজো ভেটকীর অনুরূপ।

(৫) দাঁতন বা দেঁতো ভেটকী—(Balistes Stellaris) —ইহার মস্তক প্রকাণ্ড, চক্ষু বৃহৎ এবং দেহ পাতলা ও বিস্তৃত। ইহার মুখবিবর বৃহৎ ও তাহাতে সম্মুখের অধর ও ওষ্ঠে বৃহৎ বৃহৎ স্থূল দন্ত নির্গত হইতে দেখা যায়। দন্তগুলি অনেকটা বৃত্তাকার মূষিক-দন্তের অনুরূপ। ইহার

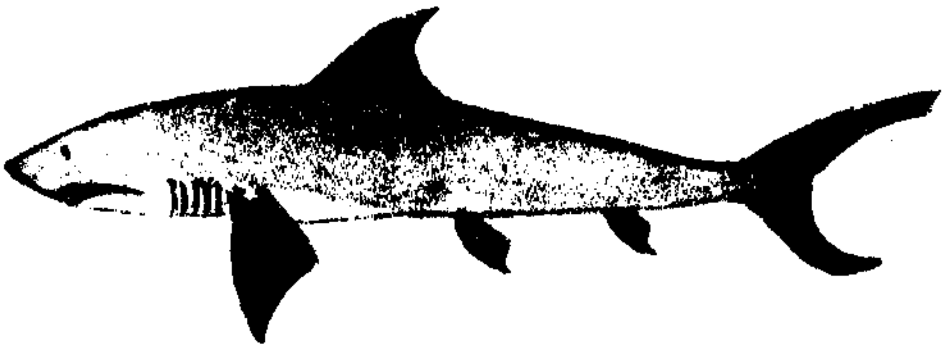


আস্বাদ উত্তম নহে, ভদ্র-সমাজে কেহই প্রায় এই মৎস্য আহার করেন না। ইহাও সমুদ্রের অধিবাসী।

(৬) চাঁদা ভেটকী—(Latjaners Johnii)—পায়রা চাঁদা মৎস্যের ন্যায় অনেকটা গোলাকার দেখিতে। ইহার চক্ষু বৃহৎ, মুখবিবর বিস্তৃত ও বদনের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্ণ শ্বেত, উজ্জ্বল আঁশযুক্ত এবং পৃষ্ঠের সেলাইয়ের দাগটি

বেশ স্পষ্ট। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত ও প্রস্থ ৩॥৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার আস্বাদ মন্দ নহে, মাংস একটু শক্ত। ইহার মাংসগুণ একটু পিত্তকর। ইহারা লোণা জলের অধিবাসী। ইহারা অদন্ত মৎস্য।

(৭) ডোরা ভেটকী—(Striped Perch)—আকারে ইহারা খুব ছোট। দৈর্ঘ্যে ৫।৬ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৩।৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত



গঙ্গার হাঙ্গর

হইয়া থাকে। চাঁদার সহিত ইহার দেহ-সাদৃশ্য থাকিলেও ইহার মুখের দিক একটু সরু এবং অধরভাগের চোয়াল, উপরের অপেক্ষা দীর্ঘ এবং অতি ক্ষুদ্র দন্তরাজি-শোভিত। পৃষ্ঠ হইতে উদরের দিকে, ইহার পুচ্ছের অংশ অবধি তিন চারিটি কৃষ্ণাভ রেখা অঙ্কিত বলিয়া ইহাদের ডোরা ভেটকী বলে। ইহাদের আস্বাদ মন্দ নহে। ইহার মাংসগুণ বায়ুজনক। ইহারা নদীর মোহানাতে বাস করে।



বাগমাগুর

(৮) ভ্যাদোস্—(Black Bass)—আকৃতিতে ইহা অনেকটা ভেটকীর অনুরূপ। তবে ইহারা কৃষ্ণবর্ণের। উদরের দিকের বর্ণ কৃষ্ণাভ হরিদ্রাবর্ণের হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ মিষ্ট জলের অধিবাসী। দেহাংশের অন্যান্য বিষয়ে ভেটকীর অনুরূপ হইলেও, ইহার মুখের দিক একটু সরু। বাংলার মিষ্ট জলের নদীই ইহাদের বাসস্থান। ইহার মাংস সুস্বাদু ও নরম বলিয়া ইহার চাহিদা যথেষ্ট। তবে আস্বাদনে

ইহা একটু পঙ্কগন্ধযুক্ত বলিয়া অনেক ভোজনবিলাসী ইহা পছন্দ করেন না। দৈর্ঘ্যে ইহাদের অনেক সময় ৬।৭ ইঞ্চি ও ওজনে এক একটি প্রায় তিন ছটাক হইতে দেখা যায়। পশ্চিম বাংলায় অনেকে ইহাকে "কাঁঠালকুষি" বলিয়া অভিহিত করেন। গ্রীষ্মে ইহারা ডিম্ববতী হইয়া থাকে।

(৯) ভেদা—(Badis Badis)—ইহারা ক্ষুদ্রকার মৎস্য। দৈর্ঘ্যে ২।৩ ইঞ্চির অধিক হয় না। আকৃতিতে ইহারা অনেকটা ভ্যাদোস মৎস্যের অনুরূপ। মাংসগুণ ও প্রকৃতিতেও উহার অনুযায়ী বলিয়া, ইহাদের ভ্যাদোসের অতি নিকট জ্ঞাতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বাংলার খাল, বিল, নদী প্রভৃতিতে ভেদা মাছ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আস্বাদ মন্দ নহে, তবে ভ্যাদোসের ন্যায় একটু পঙ্কগন্ধযুক্ত। বর্ষার প্রারম্ভে ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। যাবতীয় জলজ কীট ও মশক-শূক ইহাদের প্রিয় খাদ্য।

বোয়াল জাতি : সংস্কৃত—পাঠিন (Wallago Attu)

পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা বোয়াল মৎস্য প্রায় ভক্ষণ না করিলেও, পূর্ব্ববঙ্গীয় লোকের নিকট ইহা অতি প্রিয় খাদ্য। ইহার তৈলাক্ত মাংস কাঁটাশূন্য ও সুস্বাদু বলিয়া অনেকে ইহা খুব পছন্দ করেন। বাংলা দেশের এমন পুকুর নাই,

যাহাতে দুই একটা বোয়াল মৎস্য না পাওয়া যায়। ইহারা আঁশশূন্য মৎস্য শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রকৃতিতে কিন্তু বোয়ালের ন্যায় ভীষণ মৎস্য খুব কমই দেখা যায় বোয়াল শ্রেণীর



শিঙ্গি

অন্তর্গত আর একটি মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার নাম পাবদা।

(১) বোয়াল—(Sweet water Shark)—বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে হাঙ্গর জাতীয় মৎস্য বলিয়া উল্লেখ করেন। বস্তুতঃ আকারে প্রকারে ইহার সহিত হাঙ্গরের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য না থাকিলেও কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। হাঙ্গর সাধারণতঃ



চাঁদা ভেটকী

লোণা জলের অধিবাসী হইলেও মিষ্ট জলের নদী ও বদ্ধ জলের হ্রদাদিতে অনেক জাতির হাঙ্গর দেখিতে পাওয়া যায়। লোণা জলের হাঙ্গর অপেক্ষা ইহারা আকারে খুব ছোট হইয়া থাকে। গঙ্গার যে হাঙ্গর (Carcharicus Gangeticus) দেখা যায়, তাহারা এই মিষ্ট জলের হাঙ্গর জাতির



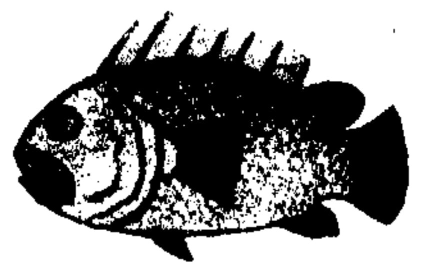
কুজো ভেটকী

অন্তর্গত। যে পুকুরে বোয়াল বাস করে, তাহাতে অন্য জাতীয় মৎস্যকুল প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। হাঙ্গরের ন্যায় ইহারাও ভয়ানক হিংস্র ও অতিভোজী। ইহাদের পরিপাক-শক্তি অসাধারণ; শুনিলে হয়ত অনেকেই বিস্মিত হইবেন যে, ইহারা সমস্ত দিনে নিজ ওজনের দশগুণ অধিক মৎস্য অনায়াসে পরিপাক করিতে পারে। সমগ্র বাংলার মধ্যে শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে ও আসাম প্রদেশের স্থানে স্থানে প্রায় আট ফুট দীর্ঘ অতিকায় বোয়াল মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্য ভিন্ন জলচর পক্ষী, জলচর সর্প, ছোট ছোট পশু পর্য্যন্ত উদরস্থ করিতে ইহারা পশ্চাদ্‌পদ হয় না। প্রবল বর্ষায় ইহারা ডিম



পাবদা

পাড়িয়া থাকে। ইহাদের ডিমের উপর একটি তৈলাক্ত আবরণ থাকে বলিয়া, ডিমগুলি জলাশয়ের গুল্মবহুল স্থানে ভাসিয়া থাকে। জালে বোয়াল মাছ ধরা খুব কঠিন, জাল ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিতে ইহারা ওস্তাদ। ছিপে ধরাও খুব শক্ত, যেহেতু হাঙ্গরের ন্যায় ইহাদের মুখে যে সারি সারি তীক্ষ্ণ দন্তরাজি থাকে, তাহাতে ছিপের সুতা সহজেই কাটিয়া ফেলে। ইহার মাংস একটু গুরু হইলেও খুব

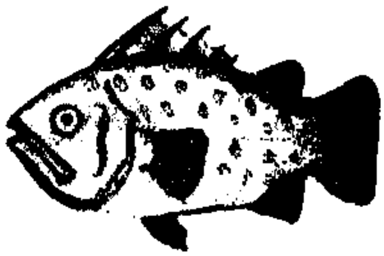


দাঁতন

বলকারক; তবে অধিক ভক্ষণে রক্তপিত্তদূষিতকারী ও কুষ্ঠপ্রদ। ইহাদের সুদীর্ঘ গুম্ফ হইয়া থাকে।

(২) পাবদা (Callichorus Pabda)—আকৃতিতে ইহার সহিত বোয়ালের খুব সাদৃশ্য আছে। তবে ইহা বোয়াল অপেক্ষা খুব নরম ও স্বাদু। এই জন্য ইহার খুব চাহিদা আছে। আকারেও বোয়াল অপেক্ষা অনেক ছোট; পাবদা মৎস্য আধপোয়া হইতে তিন ছটাকের বেশী হইতে দেখা যায় না। বোয়ালের বর্ণ একটু শ্বেতাভ এবং

ইহার বর্ণ হরিদ্রাভ শ্বেত। বোয়ালের ন্যায় ইহার মুখবিবর প্রকাণ্ড এবং দন্তযুক্ত। ইহারাও মৎস্যাশী। ইহারা বর্ষার জলে ডিম প্রসব করিয়া থাকে। ইহার গুণ—বায়ুনাশক, কোমল, স্বাদু ও বলকারক।



চিত্রা ভেটকী

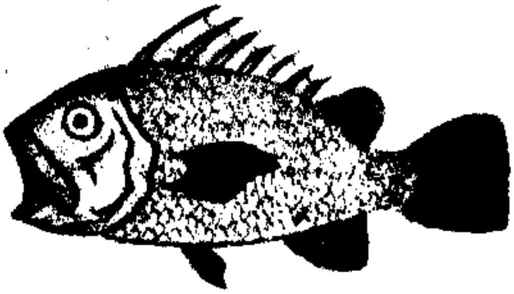
ফলুই (সংস্কৃত—ফলকী) ঃ

এই জাতির মধ্যে দুই তিনটি শ্রেণী মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। চিতল মৎস্য এই জাতির মধ্যে অতি বৃহৎ মৎস্য। ইহারও বোয়ালের ন্যায় খুব হিংস্র ও মৎস্যাশী। বোয়ালের ন্যায় ইহারও মিষ্ট জলে বাস করিয়া থাকে। ইহাদের আঁশ



ভেদা

অতি ক্ষুদ্র, চক্ষু বৃহৎ, মুখবিবর বৃহৎ ও তীক্ষ্ণ দন্ত-শোভিত। ইহাদের দেহাংশের পৃষ্ঠভাগ হইতে উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও পৃষ্ঠ ভাগের প্রস্থের অনুযায়ী ইহার দেহ খুব পাতলা। ইহাদের পুচ্ছ ক্ষুদ্র, কিন্তু উদরের নিম্নাংশে ঝালরের ন্যায় দীর্ঘ, পাখনা পুচ্ছ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। চিতল বা ফলুই জাতির দেহ-



লাল ভেটকী

মাংস সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া পশ্চিম বঙ্গের লোকের নিকট ইহাদের আদর নাই। তবে পূর্ব্ববঙ্গে ইহা পরম আদরের বস্তু বলিয়া মনে করা হয়। চিতল মাছ পূর্ব্ববঙ্গের প্রিয় খাদ্য।

(১) চিতল (মোচিকা Notapterus Chitala)—ফলুই জাতির অন্তর্গত হইলেও ইহারা প্রকাণ্ড মৎস্য; ছয় সাত ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ চিতল মৎস্য অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণাভ ধূসর বর্ণের ও পৃষ্ঠ হইতে উদর পর্য্যন্ত—প্রায় পুচ্ছ পর্য্যন্ত—স্থূল কৃষ্ণাভ বড় বড় রেখা অঙ্কিত। ইহার মাংস খুব কণ্টকাকীর্ণ হইলেও খুব সুস্বাদু। চিতল মাছ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অধিবাসীরা আদরের সহিত ভক্ষণ করেন। জলাশয়ে চিতল থাকিলে



পোড়ো ভেটকী

অন্য মৎস্যদের রক্ষা পাওয়া কঠিন। ইহারা খুব দ্রুতগামী মৎস্য। ইহাদের পৃষ্ঠ-রেখা সুবঙ্কিম হওয়ায় ইহারা জলের মধ্যে খুব দ্রুত সাঁতার দিতে ও লম্ফ প্রদান করিতে সক্ষম। বর্ষাকালে ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। ইহার আয়ুর্ব্বেদীয় গুণ



ভ্যাদোস

বাতঘ্ন, বলকর, স্বাদু, পিত্তনাশক, কফজনক, বসাযুক্ত। ইহা দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে হিতকর।

(২) কাল ফলুই (ফলকী—Notopterus Notopterus)—ইহারা ফলুই জাতির মধ্যে একটু বড়। দেখিতে প্রায় চিতলের ন্যায়। তবে ইহার গাত্রে চিতলের ন্যায় ডোরা

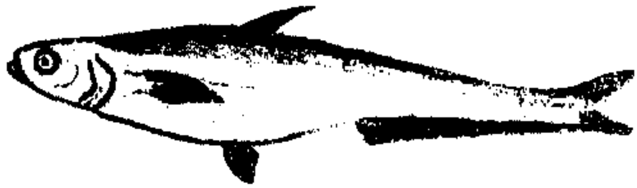


সাবনা

নাই। ইহার পৃষ্ঠ-রেখা কুব্জাকার বক্র ও পৃষ্ঠবর্ণ কৃষ্ণ ও উদরের দিকে কৃষ্ণাভ শ্বেত। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে ও

গুণাদিতে শাদা কলুইয়ের অনুরূপ। ওজনে প্রায় এক সের পর্যন্ত হইতে দেখা যায়।

শাদা কলুই (ফলকী—Notopters Khirat)—আকৃতিতে চিতলের মত। তবে বর্ণ উজ্জ্বল রৌপ্য ও পৃষ্ঠ-রেখা কৃষ্ণ ফলকীর মত সুবঙ্কিম নয়। স্বাদে ও গুণে প্রায় চিতলের অনুরূপ। বর্ষায় ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। ছোট মৎস্য, চিংড়ি প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। পশ্চিম বঙ্গে ইহার মাংস অনেকে পছন্দ করেন না।



বাচা

মাগুর (সংস্কৃত—মদ্‌গুর—Snake-headed Fish):

এই শ্রেণীর মধ্যে তিনটি মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—মাগুর, শিঙ্গি ও বাগবা। ইহারা টেংরার মত আঁশশূন্য মৎস্য। টেংরার ন্যায় ইহাদের দুই পার্শ্বের পাখনার (pectoral fins) সহিত দুইটি তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় কণ্টক সংযুক্ত আছে এবং উহাদের ন্যায় অধর ও ওষ্ঠে স্থূল গুম্ফ আছে। এই শ্রেণীর মৎস্যেরা জলাশয়ের তলদেশে পাঙ্কের মধ্যে সাধারণতঃ বাস করে বলিয়া উহাদের চক্ষুর কার্য্য অপেক্ষাকৃত গৌণ বিধায়, চক্ষুদ্বয় খুব ক্ষুদ্র। ইহাদের দীর্ঘ গুম্ফগুলি অতিরিক্ত স্পর্শানুভূতিসম্পন্ন হওয়া পঙ্কের মধ্যে ও অন্ধকারে চক্ষুর কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। আমরা একবার বাটীর নিকটস্থ একটি পুষ্করিণী হইতে একটি সম্পূর্ণ অন্ধ মাগুর মৎস্য ধরিয়াছিলাম। আমাদের ও দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশে পর্ব্বতগুহাস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে এই প্রকার সম্পূর্ণ অন্ধ মৎস্য অনেক পাওয়া যায়। বোধ হয়, সম্পূর্ণ আলোকবর্জ্জিত অন্ধকার গুহায় নিরবচ্ছিন্ন বাস করে বলিয়া প্রকৃতির নিয়মে ইহার অন্ধরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের গুম্ফগুলি স্পর্শেন্দ্রিয়স্বরূপ। যাবতীয় মাগুর শ্রেণীর মৎস্য স্থলের বায়ুতেও কিছুকাল শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া বাঁচিতে পারে। পাঁকের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ ধরিয়া ইহারা আহার করে। ইহারা গুম্ফযুক্ত বলিয়া Catfish জাতীয় মৎস্য শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের কাঁটা কম, মাংসও নরম। ইহাদের বাংলায় জীয়ল মাছ বলে।

(১) মাগুর—(Clarius Batrachus)—মাগুর মৎস্য স্বাদু, সুপথ্য ও পুষ্টিকর বলিয়া বিখ্যাত। রোগাক্রমণের পর মাগুর ও শিঙ্গি মৎস্যের ঝোল বাংলাদেশের চিকিৎসকগণ-নির্দ্ধারিত একটি উৎকৃষ্ট পথ্য। ইহাদের মস্তক চেপ্টা ও সর্পের মস্তকের ন্যায় একটু ত্রিকোণাকার বলিয়া ইহারা Snake-headed fish বা সর্প-শির মৎস্য বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক অভিহিত। নদী, বিল পুকুর প্রভৃতির মিষ্ট জলে ইহারা বাস করে। ইহারা স্থলের বায়ুতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য ইহাদের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র বর্ত্তমান আছে। আকারে ইহারা স্থূল ও ইহাদের পৃষ্ঠে ও উদরের নিম্নাংশে ঝালরের ন্যায় দুইটি পাখনা আছে। সমস্ত মাগুর জাতি টেংরা মাছের ন্যায় অস্পষ্ট শব্দ করিতে পারে। বর্ষায় ইহারা ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ইহাদের ডিমের দানা স্থূল, নীলাভ ও তৈলাক্ত আবরণযুক্ত। ইহা খুব স্বাদু ও মূল্যবান মৎস্য।

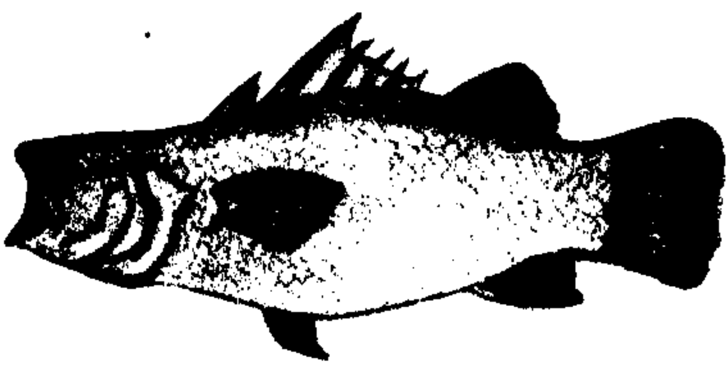


চিতল

(২) শিঙ্গি—(সংস্কৃত—শৃঙ্গী—Saccobranchus Fossils)—ইহা দেখিতে অনেকটা মাগুরের ন্যায় হইলেও মাগুরের সহিত আকারে ইহার অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মাগুর অপেক্ষা ইহারা সরু, মস্তক ক্ষুদ্র ও পৃষ্ঠে ঝালরের ন্যায় পাখনাবিযুক্ত। নচেৎ অন্য সব বিষয়ে, ইহা মাগুর সদৃশ। তবে মাংসগুণে ইহা মাগুর হইতে অল্প পুষ্টিকর, শীতল ও ফলপ্রদ। নিউমোনিয়া, কফরোগী ও আমাশয়-গ্রস্ত রোগীর পথ্যে ইহা খুব সুপথ্য নয়। মাগুর মৎস্য একটু হরিদ্রাভ

কৃষ্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু শিঙ্গি মৎস্য ঘোর কৃষ্ণ বা কৃষ্ণাভ ধূসর বর্ণের হইয়া থাকে। উদরাময়ে, বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে ইহার শাবকের (শিঙ্গির জালির) ঝোল অতি সুন্দর পথ্য। ক্ষুদ্র শিঙ্গি-শাবকের ঝোল রুগ্ন দেহে অতি শীঘ্রই বল ও রক্ত সঞ্চারের সহায়তা করে।

(৩) কাণমাগুর—(সংস্কৃত—কর্দমমদ্গুর—Bagarius Magnum)—ইহারা মাগুর শ্রেণীর মধ্যে অতি প্রকাণ্ড মৎস্য। মাগুরমৎস্য অনেক সময় এক সের পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়, শিঙ্গি মৎস্য একটী প্রায় এক পোয়ার উপরও হইতে দেখা গিয়াছে. কিন্তু একটি কানমাগুর পাঁচ সেরেরও উপর হইতে দেখা যায়। আকার প্রায় মাগুর মৎস্যের সদৃশ,



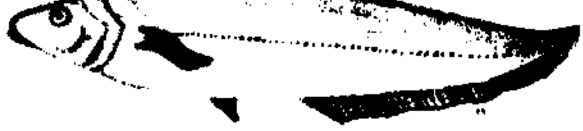
ভেটকী

তবে মাগুরের ন্যায় ইহার পৃষ্ঠ ঝালরের ন্যায় পাখনা নাই। ইহার পৃষ্ঠে একটি তীক্ষ্ণ কাঁটা অবস্থিত। ধীবরেরা উহাকে ধৃত করিয়া ঐ পৃষ্ঠ-কণ্টকটি ভাঙ্গিয়া দেয়, যেহেতু উহাদের বিশ্বাস উহার কণ্টক দেহে বিদ্ধ হইলে, ক্ষত স্থান পচিয়া যাইতে আরম্ভ করে। ইহারা বৃহৎ নদীতে বাস করিয়া থাকে। নদীর মোহানা ও তৎসন্নিহিত স্থানাদিতে অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইহার মাংস খুব সুস্বাদু। পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ইহার আদর ও চাহিদা অধিক। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা কদাচিৎ ইহা আহার করিয়া থাকে। ইহার মাংস গুরু, পিত্তকর ও বলকর। বর্ষায় ইহারা ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

(৪) বাগরা—(Goonch)—মাগুর শ্রেণীর মধ্যে ইহাও খুব বৃহৎ মৎস্য। কাণমাগুরের ন্যায় ইহা খুব বড় না হইলেও, এক একটি বাগরা মৎস্য অনেক সময় প্রায় আড়াই সের হইতে দেখা গিয়াছে। আকারে ইহারা প্রায় অনেকটা কাণমাগুরের ন্যায়, তবে ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার ওষ্ঠাংশ হইতে দুইটি খুব স্থূল ও প্রকাণ্ড গুম্ফ বাহির হইয়া দুই দিকে বক্রভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। এই প্রকার প্রকাণ্ড ও স্থূল গুম্ফ কোন মৎস্যজাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার ডিম্ব-প্রসব সময়, আহার-বিহারাদি ও মাংসগুণ কাণমাগুরের ন্যায়।

(৫) নির্ঝর মদ্গুর—(Balitora Brucei)—ইহা একজাতীয় মাগুর, ঝর্ণায় বাস করে। আকারে প্রায় ইহারা সাধারণ মাগুরের তুল্য হইয়া থাকে। তবে দৈহিক সাদৃশ্যে মাগুরের সহিত ইহার খুব মিল থাকিলেও দুই একটি বিষয়ে মাগুর হইতে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, ইহার দুই পার্শ্বের পাখনা দুইটি অত্যধিক বৃহৎ এবং দ্বিতীয়তঃ, ইহার উদরের ঠিক নিম্নভাগে একটী ক্ষুদ্র বৃত্তাকার ধারণাঙ্গ (sucker) দৃষ্ট হয়। উহা দৈহিক গঠনাদি ও বাসস্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহা অনুমিত হয় যে, পার্ব্বত্য নির্ঝরের প্রবল স্রোতের মধ্যে অনুক্ষণ বাস করিতে হয় বলিয়া প্রকৃতির নিয়মে ঐ প্রকার শারীরিক গঠনাদি হইয়াছে। বৃহৎ পাখনা সাহায্যে জলের মধ্যে প্রবল স্রোতে নিজ দেহকে স্থিরভাবে রক্ষা করিতে সক্ষমতা একস্থান

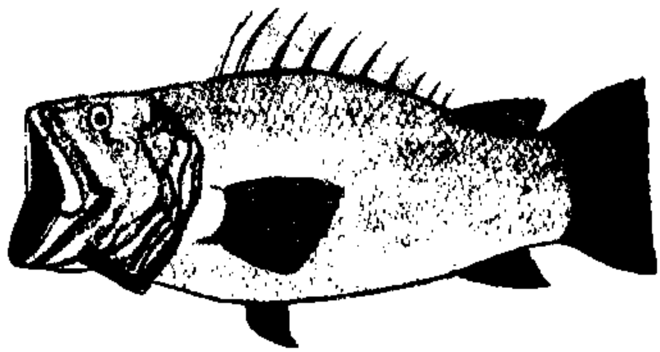


ফলুই

হইতে অন্যস্থানে উল্লম্ফন দেওয়ার ক্ষমতাও প্রদান করে। উদর-নিম্নের বৃত্তাকার উপমাংস সাহায্যে উহার স্রোতোমধ্যস্থ প্রস্তরাদিতে নিজ দেহকে সংলগ্ন রাখিতে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রকৃতিদত্ত এই প্রকার ধারণাঙ্গ (sucker) উদ্ভূত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে ইহারা মাগুরের মত। তবে ইহার মাংস প্রায় কেহ আহার করে না।

বাঁশপাতা (সংস্কৃত—পত্র—Brill) :

এই অদ্ভুত মৎস্যটিকে অনেকেই হয়ত দেখেন নাই, বা দেখিলেও ইহার বৈশিষ্ট্য হয়ত লক্ষ্য করেন নাই। ইহা আকারে বড় হয় না, এবং কদাচিৎ অন্য মৎস্যাদির সহিত বাজারে আসিয়া থাকে। বংশ-পত্রের ন্যায় পাতলা ও ক্রম-সূক্ষ্ম শরীর-গঠনের জন্য ইহার নাম বাঁশপাতা হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০।১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার এক-পার্শ্বের—যে পার্শ্ব সাধারণতঃ উপর দিকে থাকে—বর্ণ পাটল ও অপর পার্শ্বের বর্ণ—যে পার্শ্ব সাধারণতঃ নিম্ন দিকে থাকে—শ্বেতাভ হইয়া থাকে। অন্য মৎস্যাদির ন্যায় ইহার মস্তক, চক্ষু, মুখবিবর ও উদরাদির গঠন হয় না। ইহাদের চক্ষু মুখ, উদরাদি সমস্তই একপার্শ্বিক বা উপরের দিকের অংশে, অবস্থিত। সামুদ্রিক হ্যালিবাট্, ফ্লাউণ্ডার প্রভৃতি মৎস্যও এই প্রকার অবয়বসম্পন্ন। ইহাদের আচরণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই মৎস্যেরা সাধারণতঃ জলতলস্থ পঙ্কের উপর অবস্থিত থাকিয়া খাদ্যান্বেষণ করে, এবং দেহের গঠনাদি সাধারণতঃ অন্য মৎস্যাদির ন্যায় হইলেও জল-মধ্যস্থ পঙ্ক বা মৃত্তিকার উপর অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অসুবিধা ঘটে বলিয়া প্রকৃতির নিয়মে ক্রমে ক্রমে উহাদের দেহ স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহাদের জীবন-যাত্রায় সুবিধার জন্য এই প্রকার চেপ্টা দেহ গঠিত হইয়াছে। উহাদের দেহ এইপ্রকার চেপ্টা ভাবে পত্রের ন্যায় গঠিত হওয়ায় জলতলে পঙ্কের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে উহাদের কোন ক্লেশ হয় না।



কইভোলা

দেশকালপাত্র অনুযায়ী এই প্রকার স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন অনেক জীবের মধ্যে ঘটিতে দেখা যায়। এই মৎস্য কণ্টক-শূন্য ও স্বাদু। ইহা বলকর, শীতল ও লঘু এবং কফকর। ইহার অদ্ভুতাকৃতি দেখিয়া অনেকে ইহা ভক্ষণে বিরক্ত থাকেন। ইহারা গিরিজলের অধিবাসী এবং বর্ষায় ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

বিস্মরণী

—শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

ধানের ক্ষেতে চাষার গানের সুর
ভাসিছে আজিকে আমার মনের বনে—
নগণ্য গ্রাম, দূরে লাগে সুমধুর
শহর ভোলায় সে মোরে সঙ্গোপনে।

চাষারা সেথায় হিংলি ধানের ক্ষেতে
কাস্তে চালায়, পাশে হাসে সুখে সোনা—
সোনার ধানের আলোয় উঠিছে মেতে
প্রাণগুলি যেন সোনার স্বপনে বোনা।

একদিন ছিল এমনি সোনার দিন
চলিতাম আমি শ্যামদাসপুর মাঠে—
ধূলির লহরে হাসিত বুকের বীণ
ভাসিত সে রূপ-মাধুরী পরাণ নাটে।

ভরি ভরি ধান গাড়ীর উপর তুলি
চলত কিষাণ তাহার খামার পানে—
বলদ-হাঁকানো মুখে হৈ হৈ বুলি
দূর পরবাসে আজিও আমায় টানে।

মাঠভরা আজ পাকিল আউস ধান
শ্রীহীন মায়ের ঝলিছে সোনার সাজ—
হিয়ার গোপনে জাগে কার আহ্বান
কাঁদায় যেন সে জননী তোমার লাজ।

অসত্যের ছাপ

—শ্রীসুধাংশু মুখোপাধ্যায়

কোথা দিয়া কি যেন হইয়া গেল। যে উদ্দেশ্য লইয়া এই দীর্ঘপথ বহু বাধা-বিপত্তি এড়াইয়া আসিলাম, তাহা তো সফল হইলই না, উপরন্তু এমন একটা কদর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহা আমার ভবিষ্যৎ চলার পথ দুর্গম করিয়া দিল। একটা ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় বারবার শিহরিয়া উঠিলাম, এবং এই কথাটাই মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, এ কি হইল, এ কি হইল!

কিন্তু প্রশ্ন করিলেই যে সদুত্তর পাওয়া যাইবে, এ মনে করা বাতুলতা মাত্র। তাহা হইলে তো দুনিয়ার অনেক বড় প্রশ্নের সহজে সমাধান হইয়া যাইত। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের জানিবার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় নাই, এমনিই দুরাকাঙ্ক্ষ মানুষ। অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডারকে মানুষ চায় বুদ্ধির জোরে সসীম করিতে। কিন্তু সমর্থ হয় কই! ভুলভ্রান্তিতে ভরা যে মানুষের মন, সে মন লইয়া ভ্রান্তিকে অতিক্রম করিবে সে কোন্ সাহসে! অবিবেচনার ফলে যে ভুল একবার করিয়া ফেলিয়াছি, তাহা সংশোধনের পথ কই? উপায় কই?

সুদূর পল্লীগ্রামের ঘাসের বুক চিরিয়া তৈয়ারী, মাটীর পথ দিয়া রেলষ্টেশনে আসিতে আসতে কত কি ভাবিতেছিলাম। বৈশাখের খর রৌদ্র পৃথিবীর অস্তিত্ব যেন লোপ করিয়া দিবে, এম ই তাহার জ্বালাময়ী ভাব। দেখিতেছিলাম, কোথাও আশ্রয় নাই; আশা নাই; শুধুই যেন মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছি দিনের পর দিন। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শোভাহীন, বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন শুষ্কতা যেন আমার দেহের ও মনের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাহার অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে। জীবনের স্বরূপ দেখিতে পাইয়া যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। এই তো জীবন,—আজ যাহা প্রাণের প্রাচুর্য্যে ভরপুর, ঐশ্বর্য্যের লীলাবিলাসে মহিমান্বিত, যৌবনের রঙীন স্বপ্নে রূপায়িত, ইহারই পরিণতি এই খর-রৌদ্র-তাপ-দগ্ধ প্রান্তরের নিষ্প্রাণ শুষ্কতারই অনুরূপ। আজ আমার জীবনে যদি ব্যর্থতা আসিয়া থাকে, যদি রিক্ততা আসিয়া থাকে, যদি হতাশা আসিয়া থাকে, তাহা হইলে দোষ দিব কাহাকে? অথচ যেদিন ছিল জীবনে পরিপূর্ণতা, সেদিন তো কাহারও উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই নাই।

তথাপি নিশ্চিন্ত হইতে পারি কই! অনবগুণ্ঠিতহীন উত্তপ্ত পথে আমারই পাশে চলিয়াছে যে প্রশান্ত বেদনার প্রতিমাখানি, সে আমাকে নিশ্চিন্ত হইতে দেয় কই! এই মেয়েটীকে কেন্দ্র করিয়া, ইঙ্গিত করিয়া যে তুমুল ঝড় আমার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহা তো সামান্য নয়ই, উপরন্তু তাহা যে ভবিষ্যতের জন্য একটা প্রবল ঝঞ্ঝার সূচনা করিয়া গেল কি না, কে বলিতে পারে!

অথচ আমি তো জানি কত নিষ্পাপ, সরল, কত ধীর এই মেয়েটী। এই কুটিলতাভরা পৃথিবীর কত উপরে ইহার স্থান, সে তো আমার অজানা নাই। জীবনে যারা দুঃখটাকেই বড় করিয়া গ্রহণ করে, তাহারা মানুষের উপরে, ইহাই জানি। তবু ইহাই না কি নিয়ম, যাহারা সৎ, শান্ত-প্রকৃতির, সচ্চরিত্র তাহাদের জন্যই 'দুঃখভোগ' কথাটার সৃষ্টি হইয়াছে। নীলার জীবনে ইহার সত্যাসত্য আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, করিতেছি এবং হয়ত করিবও। আজ মনে পড়ে, কতদিন বাল্য ও কৈশোরের খেলার সঙ্গিনী নীলাকে রাগ করিয়া মরিতে উপদেশ দিয়াছি।

মরিলেই তাহার ছিল ভাল। কিন্তু সে মরে নাই, বাঁচিয়া আছে এমন ভাবে যে, যে-বাঁচার কোন সার্থকতাই নাই, প্রয়োজনও নাই, অর্থও হয় না।

ভাবিলাম, আমার এ বিড়ম্বনা কেন? আমার জীবনের তিরিশটী বছরের প্রতি দিনের সঙ্গে নীলার জীবন জড়াইয়া আছে কেন? এ তো আমি কোনদিনই কামনা করি নাই। তাহার ও আমার আবাল্যের সাহচর্য্যের জের কি জন্মান্ত অবধি থাকিবে? যদি তাই থাকে, তবে এ ভাবে কেন? এমনভাবে তাহার সাহচর্য্য তো কোনদিনই চাহি নাই।

আজ আমি কৃতী, সমাজে আমার মান আছে, সম্ভ্রম আছে, আমার ব্যক্তিগত চরিত্র লইয়া কোনদিন কেহ প্রত্যক্ষ

মন্তব্য করিবে না, এ আমি জানি। আমার প্রতিপত্তি আমার চরিত্রের বড় রক্ষাকবচ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মনকে সান্ত্বনা দিব কি বলিয়া? অপরে আমাকে দেবতা বলে বলুক, কিন্তু নিজের চরিত্র লইয়া নিজে তো সাফাই গাহিতে পারি না। আমি তো জানি, আমি কি! আমার অন্তরে কামনার যে পশুপ্রবৃত্তি এই নীলাকে কেন্দ্র করিয়া একদিন নিরন্তর ঘুরিত ফিরিত, তাহা অস্বীকার করিতে পারি কই! আজ হয় তো আমার মনের সেই কদর্য্য কালিমাভরা স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু একদিন যে ছিল—সে কথা ভুলব কেমন করিয়া। ভাবিতেছিলাম, আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছিলাম যে, নীলা আমাকে বাঁচাইয়াছে, কোন দিন সে আমার পশুপ্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া লয় নাই, অথবা প্রবৃত্তির উদ্দাম স্রোতে গা ভাসায় নাই।

ইহা সত্য, যেমন সত্য সূর্য্যচন্দ্র, দিবারাত্রি তেমনই। এ কথা আমি যত জানি আর কেহ জানে না। কিন্তু কলঙ্ক তাহার মুছিল না। নারীর চরিত্রে কলঙ্কের দাগ যদি আমার সত্য স্বীকারেই মুছিয়া যাইত, তবে পৃথিবী অতি শান্ত ভাবেই তাহার অস্তিত্ব প্রকাশ করিত, থাকিত না মানুষের সহিত মানুষের বিবাদ, বিদ্বেষ। ইতিহাসের পাতায় পাতায় থাকিত না মানুষের রক্ত-লোলুপতার কাহিনী।

কিন্তু সেই সুপ্রকাশও কি আমাকে ভুল বুঝিল? এমন আশঙ্কা তো তাহার নিকটে করি নাই। কেন এমন হইল? আমার অন্তরঙ্গ, পরমপ্রিয় সুহৃদ্ সুপ্রকাশের আমার উপর এ কি অবিচার, এ কি আক্রোশ! অবিচার তো শুধু আমার পরেই নয়, নীলার প্রতি।

আমি কি উন্মাদ হইয়াছি! সুপ্রকাশ একটা শয়তান, ইংরাজীতে ইহাদেরই বলে 'ক্রিমিন্যাল'। আমার বন্ধুত্বের সুযোগ লইয়া সে নীলাকে জীবনের বাহিরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে। সেখান হইতে তাহার উঠিবার আশা নাই, সামর্থ্য নাই, পথও নাই।

প্লাটফর্ম্মে বসিয়া আছি গাড়ীর অপেক্ষায়; দৃষ্টি তখন ধু ধু করা রেললাইন ছাড়াইয়া দিগন্তে আকাশ ও পৃথিবীর মহামিলনের প্রতি স্থির। অকস্মাৎ চেতনা ফিরিল নীলার কথায়। নীলার অস্তিত্বও আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমারই কপালে তার একখানা হাত স্পর্শ করিয়া সে বলিতেছে শুনলাম, "মা গো, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে।"

হইতেও পারে, আশ্চর্য্য কি! মন তখন এই সব তুচ্ছ ব্যাপারের অনেক ঊর্দ্ধে, জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলাম না, কিই বা জবাব দিব;

নীলা কিন্তু আমাকে এত সহজে নিষ্কৃতি দিল না। সে বলিতে লাগিল, "তাই কি ছাই বুঝতে পারি! তোমার পাশে বসে মনে হ'লো যেন গা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। তোমাকে নিয়ে এখন ভালয় ভালয় বাড়ী পৌঁছতে পারলে যে হয়। দেখ দেখি কি করতে এসে কি হ'য়ে গেল!"

রোগটাকে তখন ধরিলাম। এতক্ষণ আমার অসুস্থতা বু'ঝতে পারি নাই, নীলা বুঝাইয়া দিতে বু'ঝতে পারিলাম, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিলাম, "ভয় কি, বাড়ী গিয়ে পৌঁছব ঠিক।"

কিন্তু ভরসাই বা কি? প্রবল জ্বর, চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল, ভাবনাও হইল, বহুদূর অতীতের কত স্মৃতি মনে আসিতে লাগিল। মনে পড়িল বাল্যের কথা, যে দিন নীলা ছিল খেলার সাথী। কত দিন কত কলহ করিয়াছি, তুচ্ছ জিনিষ লইয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছি, সেও নীরবে সহ্য করিয়াছে। তাহার শিক্ষাদাতা আমিই, যা কিছু শিক্ষা সে পাইয়াছে তাহা আমার নিকট হইতেই।

মনে পড়িল, গ্রামের পাশাপাশি দুটী বাড়ীর কথা। একটী প্রাণের প্রাচুর্য্যে, জীবনের নূতনত্বে, ঐশ্বর্য্য-বিলাসে ভরা, সেইটীই নীলার পিতার, আর তাহারই পাশে দরিদ্রের জীর্ণ কুটীর, যেখানে জীবন নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, বাঁচিবার অধিকারও বোধ হয় নাই; এইটীই ছিল আমার পিতার। দুটী বাড়ী পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও, এমন বৈসাদৃশ্য, এমন অসম্পূর্ণতা ছিল দুটীর মধ্যে যে, কেহ দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারিত। মনে পড়িল, গৃহ দুইটার আকৃতিগত পার্থক্যের সহিত গৃহাধিবাসীদিগের মনোগত প্রকৃতিরও পার্থক্য ছিল খুব বেশী। তথাপি, এই পরস্পর-বিরোধী ধনী দরিদ্রের সংসারের মধ্যে দুইটী শিশুর অন্তরঙ্গতা কিছুতেই বাধা পায় নাই। সেই শিশু, আমি আর নীলা। আমার মত হতভাগ্যের সংসারের ছেলের সহিত আন্তরিকতা

রাখার জন্ত নীলাকে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে তাহাও মনে পড়িল।

সেদিন চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর কৈশোর আসিয়াছে, যৌবন আসিয়াছে, তাহাও চলিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে আজ। এই দীর্ঘ দিন, মাস, বৎসরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার ও আমার জীবনে।

আমার জীবনের সহিত এক করিয়া দেখিতে নীলাকে কোন দিন চাহিয়াছিলাম কি না, তাহা জানি না। চাহিলেও যে পাই নাই, এ কথাটাই সব চেয়ে বড় সত্য। দরিদ্র পিতা-মাতার সংসারের একমাত্র অবলম্বন আমি তখন প্রবাসে, অন্নের সন্ধানে ঘুরিতেছি। তাহাকে পাওয়ার প্রত্যাশা দুরাশা বলিয়াই জানিতাম। সেই নির্ব্বান্ধব প্রবাসে যেদিন আমার সামান্ত সুখ-শান্তির প্রবল বাধারূপে কয়েক ছত্রের একটী ছোট পত্র পাইলাম, সেই দিনটা আজও ভুলিতে পারি নাই, কখনও পারিব কি না জানি-না।

পত্রটী ছোট, তাহার ভাষাও ছোট,—

তিমির দা,

আমার মৃত্যুই কি তোমার ইচ্ছা? আসছে মাসে আমার বিয়ে—তোমারই প্রিয় বন্ধু সুপ্রকাশের সঙ্গে। এমন কোন যোগ্যতাই কি তোমার নাই, যে এই দুর্ঘটনা থেকে আমায় বাঁচাতে পার? যদি না পার, মরবার একটা উপায় বলে দিও,—আশা করি এ যোগ্যতা তোমার আছে। তুমি এসো। মরতে আমি পারব না।

তোমার—নীলা

নারী চায় আমাকে, আমাকে ধরিয়া সে বাঁচিতে চায়! হায় রে, কি যোগ্যতা আছে আমার! অক্ষম, অপদার্থ আমি প্রাণশক্তিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ত দেশে-বিদেশে অন্নের সংস্থানের জন্ত ঘুরিতেছি। মৃত্যুর সন্ধান আমি দিব কি করিয়া? সত্যই তো সে যোগ্যতাও আমার নাই। নারীর প্রেম আমার জন্ত নয়, এ সত্য বুঝিয়াছিলাম। দারিদ্র্যের প্রবল সংঘাতে জীবন যাহার ছন্নছাড়া, এলো-মেলো, তাহার জন্ত নারীর দেহ-বিলাসের সৃষ্টি হয় নাই। সে চাহিতেছে আমাকে, আমিও চাই তাহাকে, কিন্তু পাইবার অধিকার আমার কোথায়?

কিন্তু সুপ্রকাশ! সুপ্রকাশ আমার বন্ধু। কিন্তু তাহার স্বরূপ আমি যত জানি আর কেহ তো ততখানি জানে না। সে ধনীর একমাত্র পুত্র, তাহার স্বেচ্ছাচারিতা, গ্লানি-ভরা জীবনের সাথে নীলার জীবন কল্পনা করিয়া আমি ভীত হইলাম। নীলার মত মেয়ের যোগ্য মর্য্যাদা সে তো দিতে পারিবে না। জীবন যাহার কলুষিত, অন্তর যাহার ক্লেদাক্ত, অন্ধকার যাহার ভাল লাগে, সে পবিত্র, উন্নত, আলোকের জ্যোতিতে ভরা জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিবে। ইহাদের উভয়ের সম্মিলিত ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার ছবিগুলি পর্দ্দার পিঠে যেন একে একে আমার চোখের সামনে দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম সেদিন।

কিন্তু আমি কি করিতে পারি! কিছুই নয়, উপায় নাই, উপায় নাই! নীলার ধনী পিতা আমার প্রতিবেশী, আমি তাঁহাকে চিনি। চিন্তার পর চিন্তা, কত কি আজগুবি কল্পনা মনকে অশান্ত করিয়াছিল সেদিন। হইবার নয়,—অসম্ভব। আমি তো কাহারো বিধাতা নই যে, তাহার ভাগ্যকে ফিরাইয়া দিব। যাহা হইবার হইবে।

পত্রের উত্তর দিয়াছিলাম মনে আছে,—

সুচরিতাসু,

তোমার পত্র পেয়ে এই কথাটাই বার বার মনে প'ড়লো যে, আমার মত অক্ষমকে পত্র দিয়ে তোমার নিজের অক্ষমতাকেই বেশী করে সপ্রমাণ করেছ। তুমি আমাকে চাও, আমিও তোমাকে চাই কি না, এ সত্যটা পত্র লিখে তোমায় জানাবার প্রয়োজন বোধ হয় হবে না। কিন্তু আমি সত্যই অপদার্থ, অযোগ্য। মরবার পন্থাও আমার জানা নেই, জানলে বলতাম। আমায় ভুল বুঝো না, এই অনুরোধ। তোমার আমার ভাগ্যকে তো এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তুমি সুখী হও, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই জানাচ্ছি বার বার। অযোগ্যকে ক্ষমা কর। আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি

তোমার তিমির দা

সুপ্রকাশের তরফ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্রও পাইয়াছিলাম কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, রক্ষা করিতে পারি নাই। নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গিয়াছে এ খবরও পাইয়াছিলাম।

কিন্তু এ আমি কি ভাবিতেছি! নিজের অবস্থাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার জন্য চারিদিকে তাকাইতেই বুঝিলাম, আমি এখন ট্রেনে একটী সেকেণ্ড-ক্লাস কামরায় শুইয়া আছি। প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়িয়া কখন ট্রেনে উঠিয়াছি, কতদূর আসিয়াছি, কিছুই লক্ষ্য করি নাই। দেখিলাম, উদ্বিগ্ন দৃষ্টি আমারই মুখের পরে স্থির রাখিয়া নীলা শিয়রে বসিয়া আছে। এতক্ষণে অনুভব করিলাম প্রবল জ্বরে আমার মাথাটা যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে, মুখ দিয়া বাহির হইল, "একটু জল"।

ছোট বালিসটা মাথার দিকে আগাইয়া দিয়া নীলা অতি সন্তর্পণে তাহার কোল হইতে আমার মাথাটা নামাইয়া দিল। পরম যত্নে সে কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া আমাকে খাওয়াইল। কত তৃপ্তি, কত শান্তি আবার আমাকে পূর্ব্ব ভাবনার সূত্র ধরাইয়া দিল।

শুধু বলিলাম, "আমরা কতদূর এসেছি?"

গাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইয়া সে বোধ হয় দূরত্বটা দেখিয়া বলিল, "কোথায়? এখনও আসানসোল আসেনি।"

"তুমি কাছে ব'স! আমাদের গাড়ীতে আর কেউ ওঠে নি?"

"উঠেছিলেন, তাঁরা নেমে গেলেন।"

"মাথায় ভারী যন্ত্রণা হ'চ্ছে।"

নীরবে সে মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া হাত বুলাইতে লাগিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া অতীত জীবনের কথা পুনরায় মনে পড়িল।

নীলার বিবাহের পর, মাঝে কতকগুলি বছর চলিয়া গিয়াছে। চলিয়া গিয়াছে তাহাদের পুরাতন স্মৃতি লইয়া, পুরাতন ঐশ্বর্য্য লইয়া, পুরাতন কত কাহিনী লইয়া। রাখিয়া গিয়াছে নূতন স্মৃতি, নূতন ঐশ্বর্য্য, নূতন কাহিনী। কত পরিবর্ত্তন আনিয়াছে পৃথিবীর রাষ্ট্রে, সমাজে, মানুষের মনে, ইতিহাসের পাতায়।

এই কয়টা বছরে আমি পরিবর্ত্তিত হইয়াছি, আমার পারিপার্শ্বিকতারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পিতা আমার চলিয়া গিয়াছেন পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে, রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ। আমার দরিদ্র পিতার আশীর্ব্বাদকে ভিত্তি করিয়া আমি অজ উন্নত করিয়াছি। দুঃখ এই তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আমার পিতা আমার কাছে ছিলেন সব চেয়ে বড় আদর্শ। যে-শিক্ষা তাঁহার নিকটে পাইয়াছি, সে-শিক্ষার মূল্য আমি হয় তো কখন তাঁহাকে দিতে পারি নাই; অথবা সেই স্বচ্ছ, সরল, অনাড়ম্বর পবিত্র জীবনের আদর্শ আমার ভবিষ্যৎ চলার পথ সুগম করিয়া দিবে, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারি নাই, তথাপি তাহার জন্য কোনদিন দুঃখ বোধ করি নাই। করি নাই এই জন্য যে, আমি জানিতাম, তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন কর্ম্ম করিবার জন্যই, কর্ম্মের ফল কি হইল, তাহা ভাবিবার অবসর তাঁহার ছিল না। আজও জীবনের কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার প্রশান্ত, উজ্জ্বল সুগৌর, সুন্দর মুখখানি আমাকে একটা অজানিত আনন্দের আস্বাদন আনিয়া দেয়।

কিন্তু আমি কি বলিতেছিলাম! নীলার কথা?—না, পরিবর্ত্তনের কথা।

গ্রামের পাশাপাশি বাড়ী দুইটীরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমার ছোট কুটীর আজ প্রকাণ্ড প্রাসাদ হইয়াছে, আর পাশের নীলাদের বাড়ীর অবস্থা সেই রকমই আছে, কিন্তু বহুদিন তাহার সংস্কার হয় নাই। এখন ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে এই যে, আমার বাড়ীর পাশে নীলাদের বাড়ীটাই বেমানান দেখায়। সে কথা যাক, বাড়ীর পরিবর্ত্তনই সব নয়, বাড়ীর অধিবাসীদেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নীলার আপনার ভাই-বোন আর কেহ ছিল না। তাহার বড় ভাই শুনিয়াছি, আমারই বয়সী ছিল, কিন্তু তাহাকে কখন চোখে দেখি নাই, বাল্যকালেই সে মারা যায়।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী পরিবর্ত্তন হইয়াছে নীলার। সুপ্রকাশের সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যে ইঙ্গিত করিয়াছিলাম তাহা সত্য হইয়াছে, পিতার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী সুপ্রকাশ অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। নীলাকে সে কোন দিনই সহধর্ম্মিণীর স্থান দেয় নাই, তাহার কামনার সঙ্গিনীরূপে সে তাহাকে পাইতে চাহিয়াছিল। আবাল্য যে হীন পশুমনোবৃত্তির সহিত তাহার পরিচয়

হইয়াছে, সেই পরিচয়ের সূত্র ধরিয়াই তাহাকে চাহিয়াছিল। কিন্তু নীলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, উন্নত স্তরের মনোবৃত্তি তাহার সহিত সায় দিতে পারে নাই।

এইখানেই বাধিয়াছিল বিরোধ।

সুপ্রকাশ ভুল বুঝিয়াছিল। স্ত্রীকে সে ভুল বুঝিয়াছিল। ভুল বুঝিয়াছিল এইজন্য যে, সে ভাবিয়াছিল নারীর প্রেম কামনার লোলুপতার মধ্য দিয়া পাওয়া যাইতে পারে। অসংযত-চরিত্র সুপ্রকাশ বুঝিতে পারে নাই যে, রূপজীবিনীর সহজলভ্য প্রেম আর নীলার মত স্ত্রীর প্রেম একই জিনিষ নহে।

তাই আমি যখন দেশে ফিরিলাম, পাশের বাড়ী হইতে নীলা আসিল আমাকে অভ্যর্থনা করিতে। নীলার পিতা ইহজগতে নাই, ইহা জানিতাম, এবং বাড়ীটার কর্ত্রী যে এখন নীলাই ইহাও জানা ছিল। কিন্তু যে-ভাবে তাহাকে দেখিলাম, সে-ভাবে কোনদিনই তাহাকে দেখিবার প্রত্যাশা করি নাই। দারিদ্র্যের সহিত পূর্ব্বে আমার পরিচয় ছিল, দারিদ্র্যের ব্যথা কি, আমি জানি; পথের ভিক্ষুক কি করিয়া একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করে তাহাও আমি দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, তাহাদের নিরাশা, মুখে অসহনীয় বেদনার ছায়া। কিন্তু যে-বিষাদের ম্লান আভা নীলার মুখে, সর্ব্বদেহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এমন কখন দেখি নাই।

মাত্র কয়েকটা বছরের ব্যবধান। ইহার মধ্যে এ কি হইল! কোথায় গেল তাহার উন্মাদনাসৃষ্টিকারী রূপ, যে-রূপের জন্য আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তাহাকে পাইতে চাহিয়াছিলাম আমি, রুক্ষ বিপর্যস্ত চুলগুলি তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের চারিদিকে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে। বয়স তাহার যেন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সে সুন্দর, উজ্জ্বল মুখের শ্রী, লাবণ্য গেল কোথায়! যৌবন যে চলিয়া গিয়াছে। এ যে তাহার স্থবিরের মূর্ত্তি।

অনেকক্ষণ চাহিয়া ছিলাম তাহার মুখের পানে। আমার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া সে যখন উঠিল, তখন কোন আশীর্ব্বাণীই মুখে যোগাইল না। বিস্ময়ে শুধুই মুখ হইতে বাহির হইল, "নীলা, তুমি?"

হাসিয়া সে বলিয়াছিল, "হাঁ, চিনতে পার নি, না কি? একদিন নিজেকে অযোগ্য, অক্ষম ব'লে আমাকে এড়িয়েছিল, আজ সে অযোগ্যতাও তোমার নেই, অক্ষমতাও নেই। আজকে তোমার কাছে পথের সন্ধান নেবো বলেই, দিনের পর দিন গুণে বসে আছি তোমারই প্রতীক্ষায়।"

"এ কি চেহারা হ'য়েছে তোমার? সুপ্রকাশ কোথায়? কেমন আছ?" একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলাম।

প্রশ্নের উত্তর পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম।

সুপ্রকাশ তাহার স্বেচ্ছাচারিতা লইয়াই আছে। পঙ্কিলতাভরা জীবনযাত্রায় পরিপূর্ণ পাপে সে ডুবিয়া আছে। নীলা তাহাকে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই; পারে নাই বলিয়াই স্বামীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকাইয়া সে পিতৃগৃহে আসিয়া আছে।

কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল! আমি জানি, যে বিরাট পরিকল্পনা ছিল নীলার, একখানি সুখ ও শান্তিময় সংসারের আদর্শ গৃহিণী হইবার। সে পরিকল্পনা কিসে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল। আমারই ভুলের ফল না কি?

নিজেকে প্রশ্ন করিয়া কোন সদুত্তর পাই নাই।

নীলা বলিয়াছিল, "আর ক'টা দিন বা, এ কটা দিন তুমিই আমার ভার নিও।"

বলিয়াছিলাম, "ছেলেমানুষী ক'রো না নীলা, ঝগড়া হ'য়েছে, মিটে যাবে।"

সে শুধুই হাসিয়াছিল। কত ব্যথা সেই হাসির আবরণে লুকান ছিল, সেদিন বুঝি নাই। মানুষের মনের সহিত স্মৃতির বেশ একটা সহজ সম্বন্ধ আছে। অতীত দিনের দুঃখময় স্মৃতিগুলি মনকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য দোলা দিয়া যায়। যাহা ভুলিয়া যাওয়াই উচিত ছিল, তাহা সহজে ভুলিতে পারি না। সেইগুলি একের পর এক করিয়া মনে পড়ে।

আজিকার ঘটনা সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক। আমার অতীত জীবনের বহু ব্যর্থতা, বহু অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও আজিকার মত ব্যর্থতা ও অপমান আর কোনদিনই সহ্য করিতে হয় নাই।

আমি আশ্রয় দিয়াছিলাম নীলাকে। আশ্রয় অবশ্য তাহারই, আমি শুধু দেখাশুনা করিতাম মাত্র। ইহা লইয়া কেহ কোনদিন কিছু বলিয়াছিল কি না, জানিতাম না।

যদি বলিয়া থাকে আমার পরোক্ষে,—যেহেতু গ্রামের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, প্রভূত বিত্তশালী, তিমির চৌধুরীর সম্মুখে তাহারই চরিত্র লইয়া কোন ইঙ্গিত করিতে কেহ সাহস করে নাই। তবে নীলার কথার আভাসে ইহা বুঝিয়াছিলাম, পল্লীর কুলবধূরা আমাদের উভয়ের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান সম্বন্ধ লইয়া মাঝে মাঝে রুচিকর আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের আমি ভয় করি না। আমি জানি, সম্পর্কহীন পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধটা লোকের মন বিষাইয়া তুলিবেই—উদ্দেশ্য তাহাদের যাহাই হউক না কেন। বোধ হয় ইহা তাহারা জানে না যে, নারী আর পুরুষের পরস্পরের ভোগলিপ্সাই সব নয়।

কিন্তু এভাবে জীবন চলে না। আমি চাহিয়াছিলাম, সুপ্রকাশের সহিত নীলার আবার মিলন হউক। বহুদিন সাধনা করিয়া নীলাকে বুঝাইলাম, সেও বহু বিলম্বে বুঝিয়া সম্মত হইল। তাই শুভদিন দেখিয়া আজ নীলাকে লইয়া সুপ্রকাশের গৃহে গিয়াছিলাম।

সুপ্রকাশ তখন বন্ধুবান্ধব লইয়া কিসের আলোচনায় মুখর। এই সুপ্রকাশ, আমার বাল্যবন্ধু, অসংযমী, চরিত্রহীন, অপদার্থ কতকগুলা সঙ্গী লইয়া চীৎকার করিতেছে। নীলা সোজা বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়াই সুপ্রকাশ যেন মুহূর্ত্তে বদলাইয়া গেল। একদা তাহার ও আমার অন্তরঙ্গতা স্মরণ করিয়া ভাবিলাম, অভ্যর্থনাটা ভাল ভাবেই হইবে। কিন্তু যে অভ্যর্থনা পাইলাম, তাহা জীবনে ভুলিবার নয়।

আমার আগমনটা সে একেবারেই পছন্দ করে নাই এমনই বিরক্তিপূর্ণ স্বরে সে কহিল, "তিমির যে, কি মনে ক'রে ?"

বলিলাম, "তোমার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন আছে ভেতরে চল—"

সে বলিল, "আমার ভেতর-বা'র সবই সমান। তোমার জরুরী বক্তব্যটা আশা করি এখানে বললে কোন ক্ষতি হ'বে না, অন্ততঃ আমার দিক্‌ থেকে।"

তাহার কথার তীক্ষ্ণতা অনুভব করিয়া লজ্জিত হইলাম, বিশেষ করিয়া মনে হইল, সে যেন আমাকে এই সব অপদার্থ সঙ্গীর সম্মুখে অপমান করিতে চায়। কিন্তু কেন ?

বলিলাম, "তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে গোটাকত কথা বলতে চাই তোমাকে।"

এমনই কুৎসিত ভঙ্গীতে সে হাসিল, যে হাসি আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব মনে হইল। দেখিলাম, তাহার সঙ্গীরা ব্যাপারটিকে পরম হাস্যকর বলিয়াই মনে করিয়াছে। ক্ষণপরে সে বলিল—"ও, তোমার সেই পাতানো বোনের সম্বন্ধে ?"

এই কুৎসিত ইঙ্গিতের পর কি ঘটিয়া গেল, সে কথা ঠিক মনে পড়িতেছে না।

জ্বরটা খুব বেশীই হইয়াছে, মাথার যন্ত্রণাও। চোখ মেলিয়া দেখিলাম, সেই একই ভাবে কোলে মাথা লইয়া নীলা বসিয়া আছে। তাহার কোমল হাতখানি আমার মাথায় বুলাইয়া সে বুঝি সকল রোগের অবসান করিয়া দিবে।

তবু ভুলিতে পারি না। ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সুপ্রকাশকে তাহারই গড়ীতে বসিয়া যথেষ্ট হীন ভাষায় অপমান করিয়াছি এবং নীলার হাত ধরিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছি। সেও আমার ও নীলার সহজ সম্বন্ধটাকে সকলের চোখের সামনে বিকৃত, কদর্য্য করিয়া তাহার নগ্ন স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিল। সে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধেই এ কথাগুলি সে বলিতেছে, এমনই পশু সে।

সে বলিয়াছিল, "তুমি বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে আমার বংশের অমর্য্যাদা করেছ। তোমার কাছেই ও বেশ সুখে থাকবে, আমার কাছে এসে তো কেবল অশান্তি বাড়াবে।"

আমি বলিয়াছিলাম, "বংশের বংশধর তো তুমি। তার মর্য্যাদা কতখানি তা আমার চেয়ে তুমিই বেশী জান, তোমার স্ত্রীর আর আমার চরিত্র তোমার খুব ভালই জানা আছে। তবু যে অসত্যকে তুমি বড় করে প্রচার করতে চাচ্ছ, তার উদ্দেশ্য কি বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝেছি যে, তোমার মত পশু নীলার মত স্ত্রীর মর্য্যাদা বুঝতে পারবে না।"

ইহার পর উত্তপ্ত রৌদ্রে নীলাকে লইয়া অভুক্ত, অস্নাত অবস্থায় পুনরায় পথে বাহির হইয়াছিলাম। সেই উত্তেজনাই এই রোগের সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু ঘটনা এইখানেই শেষ হইল না।

নীলার শুশ্রূষার গুণে আমি ভাল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু সে আপনার দেহে রোগ লইয়া শয্যাশায়ী হইল। প্রথমে গ্রাহ্য করি নাই, ভাবিয়াছিলাম, আমারই মত অল্পে সারিয়া উঠিবে। কিন্তু তাহা হইল না, রোগটা বিশ্রীভাবে বাঁকিয়া গেল।

অর্থের অভাব নাই, চিকিৎসারও ত্রুটি হইল না। বড় বড় ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "গোড়া থেকেই চিকিৎসা

কতখান দরকার ছিল, এখন তো অনেকটা বেড়ে গেছে, কি হবে বুঝতে পারছি না। সেবার দরকার খুব বেশী।"

"সেবা, সেবা আমিই করিব। আমার অন্তরের সেবা দিয়া উহাকে বাঁচাইয়া তুলিব।"

কিন্তু বাঁচাইব কাহাকে? স্বামী যাহাকে অসতী আখ্যা দিয়াছে, সে বাঁচিবে কোন্ আশা লইয়া? সেদিনের সেই ঘটনা মনের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে অহরহ দহন করিতেছে, —ইহা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই।

রাত্রির পর রাত্রি তাহার শিয়রে জাগিয়া প্রলাপ শুনিতাম "তিমির-দা আমার স্বামীর কাছে নিয়ে চল,—ওগো তুমি আমায় ভুল বুঝো না,—মেয়েমানুষের সব চেয়ে বড় কলঙ্ক তোমার মুখে শুনে বাঁচতে আমি চাই না,—আমি মরব,—তিমির-দা, আমার অসতীত্ব যে কত বড় অসত্য, তুমি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ো,—তিনি যে জানতে পারলেন না আমি কি —তাঁকে না বলে, না বুঝিয়ে মরতে পারব না আমি,—"

হঠাৎ তীব্রগতিতে সে বিছানায় উঠিয়া বসিতে চায়, জ্বলন্ত দৃষ্টি লইয়া কাহাকে যেন দেখিতে চায়—

"তিমির-দা তাঁকে আনো, তাঁকে আমি জানাতে চাই, কি মিথ্যা তিনি আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন।"

কখনও সে কাঁদিয়া উঠিত। ডাক্তার বলিলেন, "আপনি যে অসুখে পড়বেন, আপনার এই স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই বুঝি?"

দুঃখের মাঝে হাসিলাম, বলিলাম, "না।"

"তা হলে না হয় নার্স একজন,—"

"বেশ তো, বন্দোবস্ত করুন না।"

নার্স আসিল।

কিন্তু মৃত্যুর ছায়া তাহার মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম,—ক্ষয় রোগ। বহুদিনের পুঞ্জীভূত গ্লানি, আজ পথ পাইয়া রূপ পাইয়াছে। ডাক্তার বলিলেন, "রোগটা অনেকদিনের, এত দিন প্রকাশ পায় নাই। কোন ভারী মানসিক আঘাতে পূর্ণভাবে আক্রমণ করিয়াছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাঁচাতে পারেন ওকে ডাক্তারবাবু, টাকা যত লাগে—।"

করুণ হাসিয়া ডাক্তার বলিলেন, "ছি, ছেলেমানুষী করবেন না। চেষ্টা তো করবই, তারপর—" বলিয়া ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি দেখাইলেন।

বিছানার সহিত ক্ষীণ দেহ তাহার মিশিয়া আছে। দেখিলে ভয় হয়, মৃত্যুর রূপ ইহাই। আমাকে দেখিয়া সে হাসিয়া সান্ত্বনা দেয়, "ভয় কি তিমির-দা"—কথা আর বাহির হয় না, হাঁপাইয়া পড়ে। কাসিতে গিয়া মুখ দিয়া খানিকটা রক্ত বাহির হয়।

ভয়ে শিহরিয়া উঠি। কাহার পাপে আজ উহার এই অবস্থা!

আবার বলে, "তুমিও ছেলেমানুষের মত ভয় পাও!"

গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলি, "ছি, কেন বাজে কথা বলছ। তুমি ভাল হয়ে উঠবে।"

কি যেন সে বলিতে চায়, বলিতে পারে না। ক্রমেই সমাপ্তির পথে চলিয়াছে এই অবজ্ঞাত, জীবন, আমার সাধ্য নাই যে তাহাকে ফিরাইতে পারি।

একদিন সে বলে, "একবার তাঁকে আনবে তিমির-দা?" হাঁপাইয়া উঠে সে,—"একবার, যেমন করে হোক, তাঁকে জানিয়ে যাব তিনি অসত্যকে সত্য বলে বুঝেছেন।"

চোখে তাহার জল।

সুপ্রকাশকে সকল অপমান ভুলিয়া পত্র লিখিলাম।

> তোমার স্ত্রী মৃত্যু-শয্যায় তোমাকে একবার দেখিতে চায়। আজও তোমায় বলছি তুমি তাকে ভুল বুঝেছ। আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে একবার এসো, যত শীঘ্র সম্ভব। তার একান্ত কামনা মরণের সময়ে তোমার দেখা পায়। তার প্রার্থনা অপূর্ণ রেখ না।
>
> — তিমির

কিন্তু সুপ্রকাশ আসে নাই। সেই অসত্যকে স্বীকার করিয়াই, কলঙ্কের পশরা মাথায় লইয়াই নীলা চলিয়া গিয়াছে সত্য আর অকলঙ্ক এমন এক দেশে যে, শত সুপ্রকাশের রসনাও তাহাকে কলঙ্কিনী করিতে পারিবে না।

মৃত্যুকালে তাহাকে বলিয়াছিলাম, "তুমি যে কত উন্নত চরিত্রের, কত সৎ আর কত সত্য, আমি জানি।"

বোধ হয় সে একটু হাসিয়াছিল, তৃপ্তির হাসি।

চিতাভস্মের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, এই কথাই ভাবিতেছিলাম, নীলা আর নাই। সুপ্রকাশ বহু সাধনা করিয়াও তাহাকে আর পাইবে না। আরও ভাবিতেছিলাম, ভুল মানুষে করে, ভুলের সংশোধনও করে এবং ক্ষমাও করে মানুষেই।

ক্ষমা করা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কিন্তু সুপ্রকাশ মানুষ নয়, তাহা হইলে সে ভুল করিয়া সংশোধন করিতে পারিত এবং ক্ষমাও করিতে পারিত।

নীলা কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করিয়া গিয়াছে এবং বোধ করি, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছে, ভগবান, ওঁর মঙ্গল ক'রো।

ক্ষমা না করিলে এমন প্রার্থনা তো করা যায় না।



মেয়েদের বর্ত্তমান শিক্ষার স্বরূপ

—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জনৈক মনীষী বলিয়াছেন, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে প্রকৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপন করা ; কি পুরুষ কি মেয়ে সকলের শিক্ষার মূলে এরূপ একটি উদ্দেশ্য না থাকিলে শিক্ষা অবাস্তব হইয়া পড়ে এবং সে-শিক্ষা কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই সাধন করে। বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে মেয়েদের যে-শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার সম্বন্ধে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে—এ শিক্ষা কতটা বাস্তব এবং ইহা নারী-সমাজকে কতটা উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে ; শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি প্রকৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপন করাই হয় তাহা হইলে এই শিক্ষা সে উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে কি না। এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া কঠিন, ইহার উত্তর খুঁজিতে হইবে, আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের আদর্শ, জীবন-যাত্রার প্রণালী, চিন্তাধারা ও অন্যান্য কার্য্য-কলাপের মাঝে। কেন না, শিক্ষার উপর জীবনের আদর্শ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ইত্যাদি একান্তভাবে নির্ভর করে, এবং ইহাদের সাহায্যেই বিচার করা যায়, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, না বিফল হইয়াছে।

প্রথমেই আদর্শের কথা ধরা যাক। এখনকার দিনে লেখাপড়া-জানা মেয়েদের জীবনে লক্ষ্য করিবার প্রধান বিষয় কোনও বৃহৎ জীবন্ত আদর্শের অভাব। বৈদেশিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের আগে এদেশে মেয়েদের যে আদর্শ ছিল, যাহা তাঁহাদের জ্ঞান উন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম ও চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করিত, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংঘাতে সে-আদর্শ খানিকটা স্থানচ্যুত হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে বৈদেশিক আদর্শকেও তাঁহারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আদর্শের ক্ষেত্রে সীতা-সাবিত্রীর সঙ্গে জোয়ান অফ্ আর্ক, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল মিলিত হইয়া এক অদ্ভুত বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার ফলে আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের জীবনে এক 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। পিতামহী-মাতামহীদের আদর্শ তাঁহাদের কাছে অবজ্ঞার বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সে আদর্শকে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতেও পারিতেছেন না, আবার ইউ-রোপ আগত আর্দশকেও তাঁহারা নিজস্ব করিয়া লইতে পারিতেছেন না। এক দিকে রহিয়াছে বহুযুগের সংস্কার, আর এক দিকে রহিয়াছে নূতনের প্রতি মোহ। অনেকে অবশ্য এই আদর্শ-বিপ্লবকে সমন্বয়ের আখ্যা দিয়া অকারণ উল্লসিত হইয়া উঠেন ; কিন্তু ইহা তাঁহাদের বিচারশক্তিহীনতা ও বাস্তববিমুখতাই প্রমাণ করে।

আদর্শের ব্যাপারে অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি থাকিলে জীবনযাত্রায় সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি আশা করা যায় না ; কেন না, সকল মানুষই এক একটি আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে চায়। সুতরাং আদর্শের ক্ষেত্রে যেখানে ঘোরতর অরাজকতা, সেখানে কাজকর্ম্ম ও চিন্তাধারায় একটি অরাজকতা দেখা না দিয়া পারে না। এই অরাজকতার পরিচয় পাওয়া যায় অন্ধ অণুকরণে, আপন স্বাতন্ত্র্য-বিসর্জ্জনে ও বিভিন্ন বিরোধী ভাবের হাস্যকর সংমিশ্রণে। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের জীবন-যাত্রার দিকে চাহিলেই আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। ইহাঁদের গৃহকর্ম্ম, সাজ-সজ্জা প্রভৃতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখনকার দিনে সঙ্গতিপন্ন বাঙ্গালীর ঘরে যে-সকল আসবাবপত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব অল্প দিনের। সেগুলিকে কি ভাবে সাজান যায়, সে সম্বন্ধে মেয়েদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। এখানেও প্রাচ্য এবং

পাশ্চাত্ত্যের এক অভিনব সংমিশ্রণ দেখা যায়! ড্রয়িং-রুমে পান-দোক্তার ব্যবহার কবিরাজের পকেটে বুক-পরীক্ষার যন্ত্রের মতই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। তারপর সাজসজ্জার বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। যদিও শাড়ী বাঙালী মেয়ের নিজস্ব জিনিষ, তথাপি নিত্য নূতন শাড়ী ও ব্লাউজ প্রভৃতির ডিজাইন, সুগন্ধি তৈল, ক্রীম, স্নো ইত্যাদি আধুনিক শিক্ষিতা বাঙালী মেয়েদের একটি নূতন রূপ দান করিয়াছে, যাহাকে কোন মতেই স্বাভাবিক বলা চলে না। অবশ্য, শিক্ষিতা বাঙালী মেয়ে মাত্রই যে বিলাসী, সে কথা আমরা বলিব না; তবে এমনই একটা প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ের চেষ্টা অনেক পরিবারেই দেখা যাইতেছে।

জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহার ফলে কতকগুলি অনুষ্ঠান—ব্রত, পূজা, অর্চ্চনা প্রভৃতি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন নূতন অনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখানেও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মেয়েদের পুরাতন অনুষ্ঠান ও নূতন উৎসব অনুষ্ঠান মিলিত হইয়া এক অভিনবত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। এমন অনেক বাড়ী আছে, যেখানে লক্ষ্মীর কোন মূর্ত্তি বা ছবি নাই এবং তাঁহার পূজাও হয় না, অথচ ঘটা করিয়া মনসা পূজা হয়; বাড়ীতে হয়ত কালীঘাটের কালীর পট ঝুলিতেছে অথচ মেয়েরা কালীঘাটে যান না; জন্মদিনের উৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু জাতকের জন্ম-মাঙ্গলিক কোন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নাই; বড়দিনের কেক আছে অথচ বড়দিনের তাৎপর্য্য বুঝিবার বা বুঝাইবার কোন প্রচেষ্টা নাই। এই সকল ব্যাপারকে সমন্বয় বলা যায় কি না, বিচারসাপেক্ষ।

তারপর যে-সকল বাঙালী মেয়ে আধুনিক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তাধারার মাঝেও একটি ঘোরতর বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। ইহাঁদের মনোভাব খুব অদ্ভুত ধরণের। পুরুষদের সঙ্গে ইহাঁরা সমান অধিকার দাবী করেন, আবার সেই সঙ্গে মেয়ে বলিয়া সকলের নিকট হইতে সকল বিষয়ে পক্ষপাতমূলক ব্যবহারও ইহাঁরা আশা করেন। এক দিকে স্বাধীন হইবার প্রচেষ্টা এবং একই সঙ্গে পরনির্ভরশীলতা একটু লক্ষ্য করিলেই নজরে পড়ে। মনে হয়, সুস্পষ্ট চিন্তা থাকিলে এরূপ স্ব-বিরোধী ভাবের সৃষ্টি হইত না।

মেয়েদের পরিচালিত সাময়িক পত্রিকাগুলির দিকে চাহিলে তাঁহাদের চিন্তাধারার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রিকাগুলির অধিকাংশেরই গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ইত্যাদিতে বিদেশী ভাবের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের সমাজনীতি ও রাজনীতির অনুকরণে এ দেশের সমাজনীতি ও রাজনীতির ধারা নির্ণয়ের প্রচেষ্টা এত স্পষ্ট যে, তাহা অতি সহজেই ধরা পড়ে। এখানে মৌলিকতার অভাব সত্যই পীড়াদায়ক। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ভাল ভাবে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে যেরূপ তথ্যপূর্ণ সুচিন্তিত রচনার আবশ্যক তাহা প্রায় নাই বলিলেও চলে। সকল রচনায় সাহিত্যরস থাকিবে এরূপ আশা করা বৃথা। গল্প-উপন্যাসগুলিতেও ইউরোপীয় গল্প-উপন্যাসের ছায়া খুব প্রত্যক্ষ। মেয়েদের সাহিত্য তাঁহাদের চিন্তাশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাবের পরিচয় দেয়। তাঁহাদের সাময়িক পত্রিকা সম্পর্কে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উহাতে মেয়েদের অপেক্ষা পুরুষদের লেখাই বেশী ছাপা হয়। ইহাও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মেয়েদের বিরাট দৈন্যই প্রমাণ করে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বর্ত্তমানে শিক্ষিতা মেয়েরা যেন আপনার স্থান খুঁজিয়া পাইতেছেন না। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের নানা প্রকার অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে হইলে যে আত্মবিশ্বাস ও আদর্শ-নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহা হইতে মেয়েরা বঞ্চিত হইয়া ইতস্ততবিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছেন। ইহার ফলে একটি নৈরাশ্য তাঁহাদের জীবনে গভীর ছায়া ফেলিয়াছে। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের অনেকের মুখেই তাঁহাদের জীবনের নিষ্ফলতার কথা শুনা যায়। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট তাঁহাদের জীবনে কতকগুলি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার ফলে বিনা দ্বিধায় তাঁহারা সুনির্দ্দিষ্ট পথে আপন আপন শক্তি নিয়োগ করিতে পারিতেছেন না। মেয়েদের সকল সমস্যার আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমরা কেবল শিক্ষা-সম্পর্কিত ব্যাপারে আমাদের আলোচনা নিবদ্ধ রাখিব।

বর্ত্তমান শিক্ষিতা মেয়েদের আদর্শ, জীবনযাত্রা প্রভৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যে-সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে প্রবন্ধের গোড়ায় প্রশ্নটি বারে বারে আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। উহার উত্তর এক কথায় দিতে গেলে

বলিতে হয়, মেয়েদের যে-শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা কোন মতেই উপযুক্ত শিক্ষা নহে। আমরা বলিয়াছি, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপন করা, তাহা না হইলে জীবনের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হওয়া যায় না। সুতরাং, যে-শিক্ষা প্রকৃতি হইতে মানুষকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন করে, তাহার সাহায্যে জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া যায় না। আমাদের দেশে মেয়েদের প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটি এই-খানে—উহা প্রকৃতি হইতে তাঁহাদের দূরে লইয়া যাইতেছে। কথাটি প্রণিধানযোগ্য।

আমাদের দেশে মেয়েদের যে-শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সাধারণত পুঁথিগত শিক্ষা। এ দেশে শিক্ষা অর্থে কতক-গুলি বই পড়িয়া পরীক্ষায় পাশ করা বুঝায়। যদিও বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের শিক্ষাকে পূর্ণতর করিবার জন্য রান্না, সেলাই, গান ইত্যাদির পরীক্ষা প্রবর্তন করিয়াছেন, তথাপি এ-শিক্ষার সহিত জীবনের কোথায় যেন যোগ নাই বলিয়া মনে হয়। পরীক্ষার রান্নার সঙ্গে প্রতিদিনের রান্না, পরীক্ষার সেলাই-এর সঙ্গে সাধারণ প্রয়োজনীয় সেলাইয়ের একটি বিরাট অসামঞ্জস্য রহিয়াছে; তাই পরীক্ষার গৃহকর্মকে মনে হয় যেন টবের গাছ, যাহার সৌন্দর্য্য আছে, সুবিন্যস্ত ভাব আছে, কিন্তু প্রাণশক্তির অজস্রতা নাই, পৃথিবীর সঙ্গে গভীর সম্পর্কের পুলক-রোমাঞ্চ নাই।

বই না পড়িলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না হয় তো সত্য, কিন্তু বইগুলি এমন ভাবে নির্ব্বাচন করিতে হয়, যাহাতে পড়াশুনার ভিতর দিয়া মনের বিকাশ সম্ভব হয়, তাহা না হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কিন্তু এ-দেশে দেখা যায়, বাস্তব জীবন ও মানসিক জীবনের ভিতরে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর সমগ্র শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ফলে বই-এ পড়া জিনিষগুলির বাস্তব অর্থ লুপ্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক; বই-এর লেখাগুলি যেন সাঙ্কেতিক চিহ্নের সমষ্টি মাত্র, বাস্তব জীবনে ইহাদের কোন স্থান নাই। ভূগোলে গঙ্গা-সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য হয় তো পড়া আছে, কিন্তু কলিকাতার পশ্চিম দিক্ দিয়া যে নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই যে সেই ভূগোল-বর্ণিত গঙ্গা, সে সম্বন্ধেও তেমন কোন বাস্তব বোধ সৃষ্টি হয় না। পরীক্ষায় দেখা হয় বই-এ যে কথা-গুলি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা পরীক্ষার্থীর কণ্ঠস্থ আছে কি না; কিন্তু ইহা দেখা হয় না যে, বই-এর কথাগুলি নিছক ছাপার অর্থহীন অক্ষর না থাকিয়া অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে কি না; গঙ্গা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে মুখস্থ-করা উত্তরের পরিবর্তে এমন কোন উত্তর পাওয়া যায় কি না, যাহাতে এই পূত-সলিলা জাহ্নবী-সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বাস্তবানুভূতির পরিচয় বর্ত্তমান। শিক্ষা জীবনের অঙ্গীভূত না হইলে বিলাসের সামগ্রীর মত তাহা কেবল বাহিরের শোভা বর্দ্ধন করে, কিন্তু অন্তরের বিরাট দৈন্য অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া যায়।

এ কথা ঠিক যে, এ-দেশে মেয়েদের শিক্ষা তাঁহাদের জীবনের সমগ্রতা আনিয়া দিতে পারে নাই। ইহার ফলে তাঁহাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা যে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারিতেছেন না, তাহার মূলে রহিয়াছে, এই না-প্রাচ্য-না-পাশ্চাত্ত্য, প্রাণহীন ও অর্থহীন শিক্ষা। মেয়েরা স্কুল-কলেজের বই-এর মারফৎ যে-জগতের সহিত পরিচয় লাভ করেন, তাহা তাঁহাদের মন আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; তাই বাস্তব জগৎ যখন তাহার কঠোর দাবী লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দেখা দেয়, তখন গভীর নৈরাশ্যে গোটা জীবন ভরিয়া যায়। কেবল যে শিক্ষার দোষ, তাহাই নহে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিরও বহু দোষ ত্রুটি রহিয়াছে।

এ-দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, এক শান্তি-নিকেতন শ্রেণীর ও দ্বিতীয় সাধারণ স্কুল-কলেজ। শান্তি-নিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইলেও সেই সঙ্গে নূতন কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রীরা নিজেদের অভিরুচি-অনু-যায়ী দুই একটি করিয়া বিষয় বাছিয়া লইতে পারে। শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষের প্রধান লক্ষ্য এই যে, প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের মাঝে আন্তরিকতার একটি সুমধুর সম্পর্ক স্থাপন করা, আর সেই সম্পর্কের ভিতর দিয়া বিদ্যাকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলা। এজন্য বিরাট ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কেবল মাত্র পুস্তক পাঠের মধ্যে শিক্ষাকে নিবদ্ধ না রাখিয়া নানা প্রকার উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতির সাহায্যে ছাত্রীদের শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। ছাত্রীরা নূতন একটি সংস্কৃতির অধিকারিণী হইবে, তথাকার কর্তৃপক্ষ

ইহাই আশা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ শিক্ষাও ছাত্রীদের বাস্তব-বিমুখতাই বাড়াইয়া তুলিতেছে। সংসারের দুঃখ-কষ্ট এড়াইয়া চলিবার প্রচেষ্টা, বাস্তব অপেক্ষা কল্পনাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজের চারিপাশে তথাকথিত সংস্কৃতির একটি প্রাচীর তুলিয়া রাখা, শান্তি-নিকেতনের শিক্ষাকে কালোপযোগী করিতে পারে নাই। শান্তি-নিকেতনেও অতি প্রাচীন ও অতি আধুনিকতার এক বিসদৃশ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, যাহার ফলে পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি তথাকার শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গাছ-তলায় বসিয়া অধ্যয়ন করা, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আলিপনা ও আম্রপল্লব ইত্যাদির সহিত ড্রয়িং-রুমের সমন্বয় ছাত্রীদের মনে সাধারণ বাঙালী পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি যে গভীর অবজ্ঞার ভাব সৃষ্টি করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

তারপর মেয়েদের স্কুল-কলেজ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায় যে, এ-সকল প্রতিষ্ঠানেও যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার সহিত বাস্তবতার স্পর্শ নাই। শিক্ষক নির্দ্ধারিত সময় অনুযায়ী অধ্যাপনা করিয়া থাকেন; ছাত্রীদের অসুবিধা কোথায় বা তাহারা কি চায়, এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্য চিরস্থায়ী। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে ছাত্রীদের অন্তরের কোন যোগ নাই; তাঁহাদের কথা-বার্ত্তা, সাজ-পোষাকের ভিতরে এমন একটি কৃত্রিমতা থাকে, যাহা খুব বিশ্রী বোধ হয়। প্রতিটি স্কুল-কলেজে খেলা-ধূলা ও কতকগুলি উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এগুলিও শিক্ষাকে সুসম্পন্ন করিতে পারিতেছে না।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরে আর যে কয়টি বিষয়ের ভিতর দিয়া মেয়েরা শিক্ষা লাভ করেন, তাহার মধ্যে সাহিত্য ও সিনেমার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিগত মহা-যুদ্ধের পরে ইউরোপে যে-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে প্রকৃত সাহিত্য বলিতে অনেকে আপত্তি করেন; কেন না, তাহাতে কোন আদর্শ নাই, বৃহত্তর জীবনের কোন ছবি নাই, আছে কেবল ব্যক্তিগত জীবনের একঘেয়ে কাহিনী, অতৃপ্ত কামনা-বাসনার নিষ্ফল আত্মপ্রকাশ এবং সকল-কিছু মিলিয়া গভীর দুঃখবাদ। ঐ সাহিত্যের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে। ইহার ফলে বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ বাঙালা গল্প-উপন্যাসে একটি ঘোরতর অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। এই জাতীয় সাহিত্য মননশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে না বা রুচিও মার্জ্জিত করিতে পারে না। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা যে এদেশের ও ইউরোপের সাহিত্যের প্রভাব হইতে নিজেদের একেবারে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। মেয়েদের সাহিত্যেও বর্ত্তমান যুগের বিশ্ব-সাহিত্যের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

উক্ত সাহিত্যের সহিত সিনেমাও মেয়েদের মনের উপর বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বৈদেশিক সিনেমার যে সমাজের ছবি দেখা যায়, তাহার সহিত আমাদের সমাজের কোন সাদৃশ্য নাই; অথচ সেই সকল ছবির অনুকরণে দেশীয় ছবি তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার ফলে সিনেমার মারফৎ কুৎসিত ভাব-বিলাসিতা বিশেষ ভাবে প্রসার লাভ করিতেছে। সিনেমার নায়ক-নায়িকার প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, সযত্নে তাহাদের জীবন-কাহিনী বা আত্মকাহিনী পাঠ করা এবং বেশ-ভূষায় সিনেমার নায়িকার অনুকরণ আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের মনে সিনেমার প্রভাব নির্দ্দেশ করে।

আমরা যে দিক্ দিয়াই বিচার করি না কেন, মেয়েদের বর্ত্তমান শিক্ষা ও শিক্ষা-পদ্ধতির মাঝে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ও গোঁজামিলের প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। এই বিশৃঙ্খলা ও গোঁজামিলের প্রধান কারণ, এ-দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বৈদেশিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচণ্ড সংঘাত। এ-দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনে একটি বড় অহঙ্কার রহিয়াছে, এবং ইহা অন্যায় নহে, কিন্তু ইহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে যে পরিমাণ দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও সংহতশক্তির প্রয়োজন, তাহা আমাদের নাই। অপর দিকে বৈদেশিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিনবত্ব আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে, উহা আমাদের জীবনে সর্ব্বত্র প্রভাব বিস্তার করিতেছে; উহাকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কাজেই বৈদেশিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনকে নূতন পথে ঠেলিতেছে, অথচ এই নূতন পথকেও আমরা চরম পথ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, ফলে মাঝামাঝি একটি স্থানে আমরা অবস্থান করিতেছি, যেখানে থাকিলে সর্ব্ব প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অসঙ্গতি অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান যুগে আমাদের

দেশে মেয়েদের শিক্ষা- সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে এই দুইটি বিপরীতমুখী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষের কথা মনে রাখিতে হইবে।

মেয়েদের শিক্ষার মোটামুটি দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে আমরা খানিকটা আলোচনা করিয়াছি এবং এ-সকল দোষ-ত্রুটির কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টাও করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, যে-শিক্ষা মেয়েদের দেওয়া হইতেছে, তাহা একেবারেই অসম্পূর্ণ, তাহাতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হইয়া পারে না। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, এ-শিক্ষা প্রকৃতির সঙ্গে মেয়েদের জীবনের যোগ স্থাপন না করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহাদের দূরত্ব বাড়াইয়া তুলিতেছে; ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহাদের আদর্শে, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ও চিন্তা-ধারায়। আমরা দেখিয়াছি, এই শিক্ষার পরিকল্পনার মাঝে যথেষ্ট ফাঁক রহিয়াছে, দূরদৃষ্টি ও বাস্তবতার অভাব রহিয়াছে। তারপর এ-শিক্ষা যে-সকল প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া বিস্তার লাভ করিতেছে, সে-সকল প্রতিষ্ঠানও ভুল পথে চালিত হইতেছে।

মেয়েদের বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে, কেবল তাহারই আলোচনা আমরা করিয়াছি। এই প্রশ্নটির একটি বিশেষ মূল্য আছে, ইহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিলে মেয়েদের শিক্ষা-বিষয়ক কোন সমস্যার নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব হইবে না। মেয়েদের শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপার বিরাট ও ব্যাপক, সুতরাং সে সম্বন্ধে নূতন পথের ইঙ্গিত দিতে হইলে আমাদের পরিপ্রেক্ষণীকে আরও বড় করিতে হইবে।

খুকুর ঘুম

—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

সবার চেয়ে লাগছে ভাল এই :
　　ঘুমিয়ে পড়া এম্‌নি ক'রে শুয়ে
(মন্দ ভাল বোধটুকুনি নেই)
　　ধুলোর 'পরে সর্ব্ব শরীর থুয়ে!

মুখের পরে টলটলে এই হাসি,
　　জ্যোৎস্না রাতেই তুলনা এর পাই :
চাঁদের যেন তরল রূপের রাশি—
　　মিষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই নাই।

আহা! এমন তুল্‌তুলে গালটুকু
　　লুটিয়েছে হায় কাদা মাটির পরে!
ওরে আমার চোখের মণি খুকু,
　　জায়গা কি রে নেইকো মায়ের ঘরে?

তোরই তরে আমার সকল ধন,—
　　সাজে কি তোর মাটির 'পরে শোয়া?
বুঝেছি তোর নির্ব্বিকার ও মন,—
　　গড়িস্ বুঝি তাইতে মাটির মোয়া?

ধুলো মাটি পাতা কাগজ নিয়ে
　　তাইতে বুঝি রচিস্ খেলাঘর?
বল তো শুনি পাগলামি তোর কী এ!—
　　ধুলো মাটির কীই বা আছে দর?

কিনে দেব অনেক ভাল খেলা,
　　খেলো সে-সব খাটের 'পরে নিয়ে,
কাটিয়ে দিয়ো সারা দুপুরবেলা
　　শুয়ো নাকো ধুলোর 'পরে গিয়ে।

ধুলোর 'পরে তোমার এ ঘুম দেখে
　　ব্যথা আমার কেবল বাজে বুকে;
ঘুম পেলে পর বল্‌ছি এবার থেকে
　　আমার বুকে ঘুমিয়ে পোড়ো সুখে।

ঘুমন্ত তোর দেখতে সোনা মুখ
　　ভাল আমি সবার চেয়ে বাসি;
পুলকে মোর উপচে পড়ে বুক—
　　দেখি যবে ঘুমিয়ে পড়া হাসি।

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

শত্রু-দুর্গে

দুইবার ধাক্কার পর দুয়ার খুলিয়া গেল। একটি মধ্য-বয়সী নারী সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আসুন।"

ঘরে ঢুকিয়া হৃষীকেশ গিরিরাজকে একটা ইঙ্গিত করিলেন, পরে বলিলেন, "আমরা সোনাপুর যাব, কিন্তু পথ চিনি নে—তায় এই বিপদ, সোনাপুর কতদূর এখান থেকে ?"

"আমি ঠিক জানি নে তবে খুব বেশী দূর নয়। বড্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে এর মধ্যে তো যেতে পারবেন না।"

"না, সেইজন্যেই এখানে এলাম, আজকের মত একটু জায়গা দিতে পারবেন কি ?"

"হ্যাঁ, একটু দাঁড়ান—আমি কাপড় নিয়ে আসি, বড্ড ভিজে গেছেন।"

"এই বাড়াটি কি আপনার ?"

"না আমি ঝি" বলিয়া সে ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল।

ঘরের একদিকে পরিষ্কার বিছানা। বিছানার কাছে একটা সাদা ঝাঁজ-তোলা কাপড়-ঢাকা টেবিল ও একটা চেয়ার। টেবিলে একখানা খবরের কাগজের উপর ঝকঝকে লণ্ঠন জ্বলিতেছে।

টেবিলের ধারের খোলা জানালা দিয়া এই আলোটাই দেখা গিয়াছিল। বিছানার মাথার কাছের জানালাটাও ঈষৎ খোলা রহিয়াছে।

গিরিরাজ বলিলেন, "আঃ জামাকাপড় ছেড়ে ঐ বিছানাটায় যাবার জন্যে মন ছটফট করছে, এমন বিপদেও মানুষে পড়ে ভাই ! আমার জীবনে এই প্রথম।"

"এক-আধবার এ-রকমটা ঘটা ভাল ভাই, অভিজ্ঞতা বাড়ে। আশ্রয় পাওয়া গেছে আর ভয় কি ? বাড়ী দেখে খুব গরীব ভেবেছিলাম—ঘরের ভেতরটা দেখে যেন ততটা মনে হচ্ছে না, অর্থাৎ এর পরের ব্যাপারটা—মনে না করেও পারা যায় না, মনে করতে সাহসও হয় না।"

"থাক্, আলু-ভাতে ভাত জোটে তো ঢের, তার জন্যে দেখি কিছু বেশী আশা করবার দরকার নাই। এখন একটু ধর জামা-টামা খুলি।"

"সেটা তু'পক্ষেই।"

ঝি এক গাদা কাপড়-চোপড় হাতে ঘরে ঢুকিয়া সেগুলি বিছানার উপর রাখিয়া বলিল, "বারান্দায় গরম জল দেওয়া হচ্ছে, এই কাপড় নিন।"

দরজাটা খোলাই রহিয়াছে ; সেই দিকে চাহিতেই চোখে পড়িল দুইজন লোক ছাতা মাথায় আসিয়া ঘোড়া দুটি খুলিয়া লইয়া চলিল। গিরিরাজ বলিলেন, "ঘোড়া নিয়ে যায় কোথায় ?"

ঝি বলিল, "ওরা আমাদের পাশের বাড়ীর, সেখানে জায়গা আছে—ওরা দেখবে শুনবে, দানাপানি ঘাস সব দেবে।" এই কথা বলিয়া বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বারবেশ ভিজিয়া গায়ের সঙ্গে আঁটিয়া ধরিয়াছে। দুইজনের সাহায্যে দুইজন সেগুলি অঙ্গ হইতে মোচন করিলেন। তোয়ালে, বালাপোষ, সার্ট, পাঞ্জাবী, ধুতি, চাদর সবই ঝি দিয়া গিয়াছে। তোয়ালে দিয়া গা মাথা মুছিয়া কাপড়-জামা পরিয়া হৃষীকেশ বলিলেন, "বালাপোষ গায়ে জড়িয়ে নাও।"

"দাঁড়াও হাত মুখ ধুয়ে আসি আগে।"

বারান্দায় দুটি ছোট ছোট টুল, বালতী-ভরা ধোঁয়া-ওঠা গরম জল, ঠাণ্ডা জল এক বালতী—সাবান গামছা ঘটি ও একজোড়া চটি এবং খড়ম একজোড়া রহিয়াছে, একটি ছোক্‌রা ছাতা মাথায় সব আনিয়া রাখিতেছিল, শেষে লণ্ঠনটাও রাখিয়া গেল।

বৃষ্টির তখনও তেমনই জোর। তবে বাতাসটা কিছু কম। গিরিরাজ দখল করিলেন চটি-জোড়া, হৃষীকেশের পায়ে উঠিল খড়ম।

মুখ মুছিতে মুছিতে ঘরে পা দিয়াই দেখা গেল, টেবিলে একটা ট্রে।

আর কি সবুর সয় ? চেয়ার মোটে একটা—সেটা

গিরিরাজকে ছাড়িয়া দিয়া হৃষীকেশ পেয়ালায় চা ঢালিয়া লইয়া বিছানায় বসিলেন। ঘরে কেহ নাই, ভিজা পোষাকগুলিও নাই।

পেয়ালাটা শেষ করিয়া হৃষীকেশ বলিলেন, "এবার আশা হচ্ছে, যে বাঁচব, কেমন নয়?"

"সে আর বলতে! এর যোগ্য দাম আমি দেব দেখে নিও।"

"ও কথা বল না—এই ঋণ কি শোধ দেবার? কোন আশাই কি ছিল এতক্ষণ?"

সেই ঝি একটা বেতের চেয়ার লইয়া ঢুকিল—টেবিলের অন্য দিকে সেটা রাখিয়া ট্রে-টা উঠাইয়া লইয়া গেল। হৃষীকেশ বলিলেন, "বোধ হয় খাবার দেবে। তুমি টেবিলের সামনেটা জুড়ে বসে আছ, দিতে অসুবিধে হবে, এখানে এসে বোস।"

গিরিরাজ উঠিয়া বিছানায় গিয়া বসিলেন।

এবার দুইজন ঝি দেখা দিল থালা হাতে, আগের ঝিটি গ্লাসে জল রাখিল, শেষের দু'জন থালার উপরকার বাটী ডিশগুলি নামাইয়া রাখিল টেবিলে। শূন্য থালা লইয়া আবার ফিরিয়া গেল, আবার আসিল, তিনবারে পরিবেশন শেষ করিয়া গেল। হয়ত ইহারা ঝি বা রাঁধুনী, কিন্তু যেমন ভদ্রবেশ তেমনি ধীর নম্র ব্যবহার ও ধরণ—ঠিক বিশিষ্ট ভদ্র ঘরের মেয়েদের মত। যেমন সুশ্রীভাবে টেবিলে পাত্রগুলি সাজাইয়া দিয়াছে তেমনটি সাধারণ ঘরে দেখা যায় না।

আগের ঝিটি জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার জন্যে গরম জল দেব?"

"আবার কেন কষ্ট করে—"

"গরম করাই আছে, মা বললেন, বড্ড ঠাণ্ডা লেগেছে, বড্ড ভিজেছেন কি না, গরম খেলে ভাল হয়।"

সুরটা যেন বিদ্রূপ-মেশান। গিরিরাজ ঝিয়ের মুখের দিকে চাহিলেন—না, তেমনি শান্ত বিনীত মুখ; নিজের ভুলে নিজেরই লজ্জা হইল। বলিলেন, "দাও তবে।"

"এবার বসুন আপনারা, আমি জল আনি।"

"বসা যাক তবে, ওঠ।"

"দাঁড়াও, দেখি ব্যাপারটা, অবাক্ করে দিলে যে। আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ এদের আছে না কি?"

'আঃ তোমার ঐ লেফচায়-ঝাড়া রোগটা আর গেল না!"

চেয়ার টানিয়া বসিয়া হৃষীকেশ বলিলেন, "তোমার আলু-ভাতে ভাত কি রকম আশ্চর্য্য চেহারা ধরেছে—লুচি, খিচুড়ী, মাছ, মাংস, আট রকম। এ দুটো কি? বোধ হয় চাটনী, হল বারো, পরমায় মিষ্টান্ন হচ্ছে সাত রকম, সব শুদ্ধ উনিশ—আগে একটা 'মেনু' দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, এই মেটে বাড়ীতে এই রকম ভোজের এগ্‌জিবিশন, অবাক্ হচ্ছ না তুমি?"

"অবাক্ হব কেন? বাড়ীতে হয় তো কোন উৎসব কি নিমন্ত্রণ আছে।"

"আর দিনটি বুঝে আমরাও এসে পড়েছি।"

এক হাতে জলের কেট্‌লী অপর হাতে শাদা পাথরের রেকাবে কাটা ফল লইয়া ঝি ঘরে ঢুকিল, টেবিলে যায়গা নাই বলিলেই হয়, এক কোণে রেকাবটা রাখিয়া গ্লাসের ঠাণ্ডা জল ফেলিয়া দিয়া গরম জল ঢালিয়া দিল।

খাওয়া শেষ হইল। বারান্দা হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিতে যেটুকু সময়, তাহারই মধ্যে টেবিলের কাপড়টা ও বাসন-পাত্রের প্রস্থান—অন্য একটা ধোওয়া কাপড় পাতা এবং তার উপরে সাজান রহিয়াছে, ডিবা-ভরা পান, জল-ভরা কাঁসার চক্‌চকে বাটি ও গ্লাস এবং পরিত্যক্ত ভিজা পোষাকটির পকেটের ভিতরকার দুটি সিগারেট কেস, মানিব্যাগ এবং গোটা দুই দেশলাই—নূতন।

হৃষীকেশ উল্লাসে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ইউরেকা।"

"কি হে?"

"পেয়েছি, এর কথা মনেই ছিল না, অথচ না পেলে কি দশা হত!"

"এত যদি—তবে বার করে রাখনি কেন?"

"আরে, তখন কি কোন দিকে খেয়াল ছিল? আও ধরাও, একটু গরম করে নিই।"

নিজের সিগারেট-কেস্‌টা খুলিয়া দুটি সিগারেট বাহির করিয়া লণ্ঠনের উপর রাখিয়া গরম করিয়া হৃষীকেশ একটা দিলেন গিরিরাজকে, অপরটা নিজে ধরাইয়া অঙ্গুলি লণ্ঠনের উপর রাখিলেন।

ঝি দু'খানা গরম কম্বল আনিয়া বিছানায় রাখিয়া বলিল, "এদিকে কি আর একটা বিছানা করে দেব ?"

গিরিরাজ বলিলেন, "মাটিতে ?"

"না, চৌকি এনে।"

গিরিরাজ একবার বিছানাটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "দরকার নেই, এই বিছানাতেই দু'জনের হবে—বেশ চওড়া আছে।"

"আর কিছু চাই কি ?"

"না, এখন যাও তুমি।"

"আলোটা জ্বালাই থাক, নেবাবেন না। আমরা কাছের ঘরেই আছি, রাত্তিরে যদি দরকার-টরকার হয় এই ভেতরের বারান্দায় বেরিয়ে ডাকলেই শুনতে পাব।"

গিরিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর কর্ত্তা কোথা ?"

"তিনি বিদেশে থাকেন।"

"বাড়ীতে আর কেউ পুরুষ নেই ? এই ঘরটায় কে থাকে ?"

"মার দেওর।"

"তিনি কই ?"

"তাঁর শরীর ভাল না, ভেতরের ঘরে শুয়ে পড়েছেন।" বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহিরের দিকের দুয়ারে খিল লাগাইয়া ঝি ঘর হইতে বাহির হইল এবং সেই দরজাটি টানিয়া ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

উপর্য্যুপরি তিন চারিটা সিগারেট শেষ করিয়া গিরিরাজ বলিলেন, "কটা বেজেছে ? কম্বল টেনে এবার শোয়া যাক, ঘুমে দু' চোখ জুড়ে আসছে।"

ঘড়ি দেখিয়া হৃষীকেশ বলিলেন, "সাড়ে বারটা।"

"ঢের রাত হয়েছে ত ? কি ধাক্কাটাই আজ গেছে, না ঋষি ?"

"হ্যাঁ, বন্ধু।"

"বৃষ্টির শব্দটা এখন কেমন লাগছে ? ঠিক ঘুম-পাড়ানী গানের মত না ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু ঘণ্টা দেড়েক আগে ঠিক এরকম লাগছিল কি ? সেই পাটনীর ঘরে, কিম্বা তার ঘর থেকে পথে বেরিয়ে ?"

"ঠিক বলেছ, কখন যে কি ঘটবে, তা কেউ বলতে পারে না।"

"না, আমাদের দুর্দ্দান্ত মিত্র মশায়ও না।"

"এটাও খুব খাঁটি কথা, মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বড় সীমাবদ্ধ।"

"এইটেই সব চেয়ে খাঁটি কথা।"

হস্তী ও সিংহী

একটু বেলায় গিরিরাজের ঘুম ভাঙ্গিল। উঠিয়া বাহিরদিকের দুয়ার খুলিলেন। গত রাত্রের দুর্য্যোগের চিহ্নও নাই। আকাশ পরিষ্কার নীল। গাছের সবুজ বৃষ্টি-ধৌত চিক্কণ পত্রপুঞ্জ রৌদ্রে উজ্জ্বল। বাতাস খুব ঠাণ্ডা। ছেলেমেয়েরা আম-বাগানে ছুটাছুটি করিয়া আম কুড়াইতেছে। বিগত রাত্রের সেই ঘোর অন্ধকারময়ী, ভীষণরূপা প্রকৃতির আজ দিব্যহাস্যময়, উজ্জ্বল রূপ, শুধু ঝড়ে ভাঙ্গা ডালপালা ও ফলপাতার রাশি অতীত বিপ্লবের সাক্ষ্য দিতেছে।

বারান্দায় তেমনই মুখ ধুইবার আয়োজন রহিয়াছে, গিরিরাজ হাত-মুখ ধুইয়া ফিরিয়া হৃষীকেশকে জাগাইলেন। ঝি দুই পেয়ালা চা আনিয়া দিল।

গিরিরাজ বলিলেন, "আমরা এবার যেতে চাই, আমাদের ঘোড়া দুটো আনতে বল।"

ঝি নম্রভাবে বলিল, "এখুনি যাবেন ? মা বললেন, 'আগে দু' পেয়ালা চা দিয়ে এসো, খাবার তৈরী হচ্ছে,' খাবারের সঙ্গে আবার চা আসবে।"

"না, না, আর কিছু দরকার নেই, ওসব করতে বারণ করো ; এত সকালে কিছু খাওয়া অভ্যাস নেই আমাদের।"

"তবে একটু দেরী করেই আনবো ?"

"না, কিছু না। আচ্ছা এটা কোন্ গ্রাম ?"

"নিশিন্দে।"

গিরিরাজ চমকিয়া উঠিলেন, "নিশিন্দে ? এখানে তোমাদের জমীদারের একটা কাছাড়ী-বাড়ী ছিল না ?"

"হ্যাঁ, বেশী দূর না।"

"আচ্ছা, তোমরা আমাদের অনেক যত্ন করেছ, তোমাদের গিন্নীকে বল, আমরা যাচ্ছি—ও, তাঁর কি ছেলেপিলে ?

"একটি ছেলে।"

"আচ্ছা, তোমার মাকে বলো, যা তিনি চান—ছেলের ভাল চাকরী কি কোন রকম টাকা পয়সায় সাহায্য, যা ইচ্ছে

আমায় জানান যেন, আমি নিশ্চয়ই করবো। একটা কাগজ দাও, নাম ঠিকানা লিখে দিয়ে যাচ্ছি। আর এই নাও, যারা ঘোড়া দু'টোকে দেখছে, তাদের কিছু দিও, তোমরাও নিও।" দু'খানা নোট গিরিরাজ ঘরের মেঝেতে ফেলিয়া দিলেন, "যা যা বললাম তোমার মাকে সব বলো গিয়ে।"

"আমরা তো কিছু করিনি তেমন, টাকা কেন দিচ্ছেন?" নোট দু'খানা কুড়াইয়া বিছানায় রাখিয়া ঝি বলিল, "ও তুলে রাখুন, মাকে বলছি," বলিয়া চলে গেল।

"গিন্নীর শিক্ষা তো বেশ ভাল, কুড়ি টাকার মায়া কাটালে। থাক যা দিয়েছি, ফিরে নেবো না, রইলো এখানে।"

হৃষীকেশ বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখ! এত কাছে এসে পড়ে এই বিপদ? পাটনী যে পথটা দেখিয়ে দিয়েছিল, অন্ধকারে ভুল করেছিলাম দেখছি।"

"ঠিক তাই, উল্টো পথে চলে এসেছি, নইলে নিশিন্দে তো আগে পাবার কথা নয়, আগে সোনাপুর, তারপরে নিশিন্দে।"

"গতস্য শোচনা নাস্তি, এবার চল যাওয়া যাক, তার পর তোমার সে-প্ল্যানটা ভুলে যাও নি তো? আনন্দের বউকে চুরি করবার।"

"চুপ, চুপ, কেউ শুনবে, এটা ওদেরই রাজ্য।"

এমন সময়ে ঘরে ঢুকিলেন কৈকেয়ী। একদিকের দরজা দিয়া পূর্ব্বদিকের সোনালী রোদ ঘরে পড়িয়াছে, অপর দিকের দুয়ারে কৈকেয়ী চৌকাঠ পার হইয়া আর অগ্রসর হন নাই, কপাটের পাল্লার গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় গিরিরাজ এত আশ্চর্য্য হইতেন না। তিনি ছিলেন বিছানায় কম্বল গায়ে আধ-শোয়া ভাবে, হৃষীকেশ চেয়ারে, দুইজন হাতের সিগারেট ফেলিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইতে যে কাণ্ড বাধাইলেন, সেটা বাস্তবিক উপভোগ্য। চেয়ার উল্টিয়া পড়িতে পড়িতে বাঁচিল, হৃষীকেশও ডিগবাজী খাইতে খাইতে শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া গেলেন, গিরিরাজ কম্বল-শুদ্ধ সন্ন্যাসী-বেশে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার হাতের সিগারেট হৃষীকেশের বুক পকেট ছুঁইয়া পড়িয়া গিয়াছে, হৃষীকেশের সিগারেটটুকু পড়িয়া গিয়া বিছানার চাদর পুড়িয়া ধোঁয়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

কৈকেয়ী বলিলেন, "শশী বিছানার আগুন নিভিয়ে দে।" শশী তাঁহার পাশ কাটাইয়া ঘরে ঢুকিয়া ঘুরিয়া বিছানার ও পাশে গিয়া তাড়াতাড়ি থাবা দিয়া আগুন নিবাইল।

কৈকেয়ী বলিলেন, "নমস্কার, রাত্রে বেশ ঘুম হয়েছিল তো? অসুবিধে অনেক হয়েছে।"

দুই বন্ধু হাত যোড়ও করিলেন—কপালেও তুলিলেন। কিন্তু নিঃশব্দে, দুইজন আড়ষ্ট, স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ, লজ্জিত এবং বোধ হয় ভীতও,—সামনে দাঁড়াইয়া কৈকেয়ী, সেই পথে, ট্রেণে, বাড়ীতে বহুবার-দেখা, বহু-পরিচিতা কৈকেয়ী—সেই পরিচিত তসরের থান, প্রসন্ন গম্ভীর মুখ মহিমময়ী রাজ-সন্ন্যাসিনী।

"একটু অপেক্ষা করুন আস্ছি"—কৈকেয়ী চলিয়া গেলেন। চমকিত বাক্‌শক্তিহীন দুই বন্ধু এতক্ষণে যেন শ্বাস লইয়া দুইজন দুইজনের দিকে চাহিলেন মুখ তুলিয়া। হৃষীকেশের মুখে একটু হাসি ফুটিল, প্রকৃতিস্থ হইতে তাঁহার বেশী দেরী হয় না। কৈকেয়ী এখনি ফিরিবেন—দরজার দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া তাড়াতাড়ি কম্বলটা তুলিয়া বিছানায় রাখিলেন,—মৃদুস্বরে বলিলেন, "এতক্ষণে রাত্রের ব্যাপারটা বোঝা গেল। তা কথা বলো না কেন? মনে করবেন কি উনি? আমাদের সামলাবার সুযোগ দিতেই সরে গেলেন বুঝছো না? তোমার হলো কি? এবার এলে—বুঝলে? যা বলবার বোলো, সামনা-সামনি চেয়ে ছিলে, সুযোগ ত পেয়েছ।"

আবার কৈকেয়ী দেখা দিলেন—সেই গৌরব-দর্পিত ভাব চক্ষের চাহনীতে, দাঁড়াইবার ধরণে, আপাদ-মস্তকে। তেমনি ধীর, শান্ত সুরে বলিলেন,—"বসুন আপনারা, দাঁড়িয়ে কেন?"

কেহই বসিলেন না। কৈকেয়ী বলিলেন,—"অতিথি নারায়ণ, এই প্রবাসে আমি আপনাদের যোগ্য কিছুই করতে পারিনি। দোষ ত্রুটি যা কিছু মাপ করবেন, আর,—' একটু হাসিয়া বলিলেন, "আর দক্ষিণাটি দেওয়া হয়নি এখনও। যে সামান্য পুকুরটার জন্য কাল অমন দুর্য্যোগ মাথায় নিয়ে এত কষ্ট পেলেন—সেই পুকুরটি আমি দক্ষিণা দিলাম—লেখাপড়া করে দিয়েছি রাধারাণী মিত্রেরই নামে, দেবনাথ ঠাকুরপোকে পাঠিয়ে দিয়েছি কাগজটা দিয়ে, নমস্কার।"

গিরিরাজ যেন চেতনা পাইলেন, সামনে একটু আগাইয়া গিয়া বলিলেন, "বসুন।"

কৈকেয়ী দাঁড়াইলেন, গিরিরাজ এইবার মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার আদেশ বা অনুরোধ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি, কিন্তু পুকুরটা আমি চাইনে। ও আপনার জিনিষ অন্যায় করে নিচ্ছিলাম,—আর এ রকম অন্যায় আমার দ্বারা হবে না, কথা দিচ্ছি নিজের মুখে। দক্ষিণা বলে আর যা কিছু আপনি আমায় দেবেন কৃতার্থ হয়ে নেবো, কিন্তু পুকুরটা নয়। অতিথি নারায়ণ বললেন—অতিথির অনুরোধ রাখুন।"

একটু হাসিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "আচ্ছা।"

দুইজনের বাক্যালাপ জীবনে এই প্রথম, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জীবনে এই প্রথম সামনা-সামনি। কিন্তু ধীরে ধীরে গিরিরাজের ভয় কাটিয়া গিয়াছে। তিনি তেমনি নম্র বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনি এখানে?"

"এ আমার নাতনীর বাড়ী।"

"আপনি ফিরবেন কবে?"

"গোলমাল মিটে গেলো—আর থাকবার দরকার নেই, বোধ হয় কাল ফিরবো।"

এই সময় সাজানো ঘোড়া দুইটি লইয়া দুইজন লোক বাহিরের আমগাছ তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। সেইদিকে চাহিয়া দেখিয়া গিরিরাজ বলিলেন, "সোনাপুর যাবার দরকার আর ছিল না, তবে নায়েবকে দু'একটা কথা বলতে হবে—আর ঐ মামলাটা তুলে ফেলতে হবে তাই যাচ্ছি। নাম-ধাম যেমন ছিল তিন ঘণ্টার মধ্যে তেমনি হবে, বিকালে একবার গিয়ে দেখবেন। যা করেছি, মাপ করবেন অতিথি বলে।"

"ও কথা বলে অপরাধী করবেন না আর।"

"আর একটা কথা—পাকস্পর্শের নিমন্ত্রণটা আমার বাকী রয়েছে।"

"আমার বৌমা তার পাকস্পর্শের দিন আপনাদের পাতে অন্ন দিয়েছিল—তার বৌমার সে ভাগ্যি হয়নি সে দুঃখ আমার বৌমা ভোলে নি

"আমি আশীর্বাদও করি নি, নতুন বৌমাকে। যাক যা হয়ে গেছে, দয়া করে মনে রাখবেন না আর। আপনি আমায় বলুন কবে যাব শ্রীনগর?"

কৈকেয়ী মাথা একটু নীচু করিলেন, হাত দুখানি যোড় করিয়া নম্র সুরে বলিলেন "পরশু রাত্রে আপনাদের দু'জনার নিমন্ত্রণ রইলো।"

সঙ্গে সঙ্গে গিরিরাজ ও হৃষীকেশ হাতযোড় করিয়া মাথা নীচু করিয়া নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন—"আচ্ছা।"

"এবার তবে আসি, আবার বলি—মাপ করবেন। নমস্কার।"

হৃষীকেশ নীরবে নমস্কার করিলেন। "নমস্কার—নমস্কার।"

দুইজন ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া ঘোড়ায় উঠিলেন। একজন লোক তাঁহাদের গত রাত্রির ছাড়া কাপড়-চোপড় লইয়া চলিয়াছে সোনাপুর পৌঁছিয়া দিবে। দুইজনের চোখ একবার ঘরের দিকে গেল—কৈকেয়ী নাই—ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন।

আবার দুই বন্ধু পরস্পরের দিকে চাহিলেন, মেঘমুক্ত ভোরের আলোর মত নির্মল হাসি এবার দুইজনের মুখেই ফুটিয়া উঠিল, তারপরে দিলেন ঘোড়া ছুটাইয়া।

প্রেমিক-দম্পতী

নিজের শয়নঘরে সোফায় উপুড় হইয়া শুইয়া সুদেষ্ণা যে কাজটা করিতেছে—তার নাম চিত্রাঙ্কন। একটা ছোট বালিশে বাঁ হাতের ভর রাখিয়াছে, সামনে মোটা পুরু কাগজের একটা খুব বড় খাতা অর্থাৎ ড্রইং বই। ডানদিকে টুলের উপরে শুধু লাল ও কালো কালীর দুইটি দোয়াত, একটা পেনসিল ও একটু তুলা—আর কিছু না।

কাগজের পাতায় পেনসিলে রেখাগুলি আঁকিয়া লইয়া শেষে কালি দিতে আরম্ভ করিল, তুলাটুকু পেনসিলে জড়াইয়া, এবং দোয়াতে ডুবাইয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রমাণের চেয়েও বড় একটা পাখীর ছবি ফুটিয়া উঠিল। লাল টকটকে রঙের পাখী শাদা চোখে কালো তারা—পা এবং ঠোঁট দুটিও কালো।

কালী শুকাইবার জন্ত উঠিয়া ফ্যানটা খুলিয়া দিয়া সুদেষ্ণা আবার বসিয়া ছবি দেখিতে লাগিল, নিজ মনেই বলিল, "এত লাল রংয়ের পাখী কি হয়? হয় বৈ কি—লাল মাছ হয়, লাল পাখী হয় না? নিশ্চয় কোন না কোন দেশে আছে। আচ্ছা এটা কি পাখী হলো? কাক, না ময়না, না

টিয়ে, না শালিক কিছু বোঝা যাচ্ছে না—না বাবুগো, তাই বলে আমি আর বুড়ো বয়সে আঁকতে শিখতে বসছিনে—"

কালী শুকাইলে খাতাটা বন্ধ করিয়া একখানা বই হাতে সুদেষ্ণা এবার বালিশটা শিয়রে দিয়া শুইল। বইটা খুলিয়া গুণ গুণ করিয়া পড়িতে লাগিল—

"এক যে ছিল মজার দেশ সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ দিনে চাঁদের আলো।"

"বাঃ বাঃ, মাষ্টার গান শেখাচ্ছে ভাল, তিন চার বছরে এত উন্নতি—আশ্চর্য্য ব্যাপার! কালকে কোন গানটা হবে শেখা? 'ঘুম পাড়ানী মাসী পিসী'—না?"

চমকিয়া সুদেষ্ণা ফিরিয়া চাহিল, মুখটা একটু লাল হইয়া উঠিল, ভ্রু দুটি কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "এ গানটা খারাপ হল কিসে? এমন মিষ্টি কবিতা আর আছে একটাও।"

"ঝাল মিষ্টির কথা হচ্ছে না, বলি এই গানটাই তো বাবাকে আজ সন্ধ্যায় শোনানো হবে? তা হলে আমিও সে সময়টা উপস্থিত থাকব।"

"তুমি থাকলে আমি গাইবই না।"

"ও, ঠিক। আমাদের মতন সামান্য লোকের জন্য কি সঙ্গীত-সরস্বতী গাইতে পারেন? ভুলে গেছলাম।"

আনন্দ বিছানায় শুইয়া পড়িল।

"তুমি শুলে যে?"

"মাথাটা ধরেছে—একটু টিপে দেবে?"

"তা দিতে পারি।" সুদেষ্ণা উঠিয়া আসিয়া আনন্দের শিয়রে মাথা টিপিতে বসিল।

ছুটিতে আনন্দ বাড়ী আসে। দম্পতীর পরিচয় বা প্রেম নিবিড় হইতে পারে নাই এ পর্য্যন্ত। সুদেষ্ণার অতিরিক্ত আদর দেখিয়া আনন্দ বিদ্রূপ করে, সুদেষ্ণা বিরূপ হয়। দুপুর বেলাটা সবাই বিশ্রাম করে, অগত্যা সুদেষ্ণাও নিজের বই, খাতা, ছবি লইয়াই শয়ন-ঘরে কাটায়। আনন্দের বাহিরে অনেক কাজ, রাত্রি ভিন্ন শয়ন-ঘরে আসে খুব কম। কিন্তু রাত্রে সুদেষ্ণা প্রায়ই কৈকেয়ীর কাছে ঘুমায়।

আনন্দ বলিল, "মাথা টিপতে টিপতে আমার চুল এলো-মেলো করে দিও না।"

সুদেষ্ণা ভুরু দুটি টান করিয়া বলিল, "হলোই বা এলো-মেলো, আয়না চিরুণী কি চুরি গেছে? আমার অত বাবু-গিরি নেই—এই দেখ না চান করার পরে আর বাঁধিনি—জট বেঁধে উঠেছে এরি মধ্যে।"

"তোমার সঙ্গে কি আমার তুলনা হয়? তোমার পরনে চোদ্দ-টাকা জোড়ার শাড়ী আট পৌরে, আমার দেড় টাকার ধুতি—কিসে আর কিসে! তা সেলাই টেলাই কিছু দেখছি নি যে এবার?"

"বার মাসই কি সেলাই করব? আবার যখন দরকার হয় করব।"

"থাক, আর দরকার হয় না যেন, দর্জ্জিটা দুঃখ করছিল, 'কর্ত্তা আর জামা-টামা করান না আমাকে দিয়ে—আমার দিন চলে কিসে'?"

"তাই বলছিল? তা অত দুঃখ করবার দরকার কি? কাল আসতে বোল কিছু ফরমাস নিয়ে যাবে। বাবার জামা-টামাগুলো আমি না হয় আর করব না।"

"আঃ এমন সুমতি কি তোমার হবে? কাল দেখি মা এই বড় এক কলকা দেওয়া শাড়ী পরেছেন—তোমার কীর্ত্তি আর কি।"

"ঐ শাড়ী পরে মাকে কেমন মানিয়েছিল বল দেখি—মার খুব পছন্দ।"

"পছন্দ যা তা জানি—শুধু তোমার ভয়ে মাকে পরতে হয়।"

"বেশ, বেশ, তোমায় তো দিইনি—তোমার কি?"

"আমার কিছু না, তবে অদ্ভুত কিছু দেখলে লোকে না বলেও পারে না। উঃ বড্ড মাথা ধরেছে।"

"ধরবে না? দিদি বলেন, অমন টো টো করে বেড়ালে মাথা না ধরে যায়?"

আনন্দ সুদেষ্ণার দিকে মাথা ঘুরাইয়া চাহিল, "কি টো টো করি আমি? আর তুমি কি কর?"

"আমি? বই পড়ি, ছবি আঁকি, বাবাকে যে গানটা শোনাব সেটা ঠিক করে রাখি—তোমার মত দুপুর রোদে টো টো করিনে।"

"কোন্ কোন্ গান আজ ঠিক করলে? একটা তো শুনলাম, আর ক'টা বল না?"

"যাও, শুধু শুধু ঠাট্টা করবে তো এক্ষুণি দিদিকে গিয়ে বলে দেব।"

"ঐ গুণটি তোমার খুব আছে। আচ্ছা আর ঠাট্টা করব না এবার একটু ঘুমই।" আনন্দ চোখ বুজিল। একটু পরেই কিন্তু গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল।

আকাশ যেথা সবুজ বরণ গাছের পাতা নীল,
ডাঙ্গায় চরে রুই-কাতলা জলের মাঝে চিল।

আমি ভাবছি, এইটে আমি বাবাকে আজ শোনাই।"

"তুমি শোনাবে কখন?"

"সন্ধ্যা বেলা।"

"তখন তো আমি শোনাই?"

"তুমি তো বারমাস শোনাও, আমি দু'চার দিনের জন্য আসি, আমি কি একদিনও শোনাব না?"

"আচ্ছা দেখা যাবে, বাবা কার গান শোনেন।"

"তা কেন? দু'জনেই গাইব, গানের কম্পিটিশন হবে আজ।"

"তোমার সামনে? আমি? ইস্—কিছুতেই না।"

"কেন, আমি কি তোমার গান শোনবার যোগ্য নই?"

"না।"

কিছুক্ষণ দুই জনেই চুপ। সুদেষ্ণা তেমনি আনন্দের মাথা টিপিয়া দিতেছে। হাতের চুড়ি-বালা মাঝে মাঝে ঝুন্ ঝুন্ করিয়া বাজিয়া উঠে।

একটু পরে আনন্দ চোখ চাহিয়া বলিল—"আঃ ঘুমটা হলে মাথাটা ছাড়ত। তা কি হ'বার যো আছে—গয়নার বাজনার চোটে ঘুমোয় কার সাধ্যি! কি করে যে দশমণ বোঝা গায় চড়িয়ে লোকে সঙ্‌ সেজে থাকতে পারে, আমি বুঝতেই পারি নে।"

"তুমি আমায় সঙ্‌ বললে?"

"তোমায় বলি নি। এই গয়নাগুলোকে বলেছি।"

"যে পরেছে তাকেই বলা হল।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ সুদেষ্ণা ফিরিয়া বসিল।

আনন্দ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "শোন, তোমাকে বলিনি। তোমায় কি এমন কথা আমি বলতে পারি?"

"তুমিই পার—সব সময় তুমি আমায় ঠাট্টা কর কেন? কেন করবে? আমি আর তোমার সঙ্গে কথাই বলব না যাও।"

"নাঃ তোমার মন রক্ষা করা কাজটা দেখছি দিদিই পারেন সব চেয়ে ভাল—মাও পারেন! আমার কাজ নয়।"

"তোমায় তো কেউ বলেও নি!" বিছানা হইতে নামিয়া পড়িয়া সুদেষ্ণা ঘর হইতে চলিয়া গেল।

আভাস না অঙ্কুর?

কেশবের পড়িবার ঘরটিতে রুক্মিণী ছাড়া কেহ হাত দেয় না। যখন দিনের আলো অস্পষ্ট হইয়া আসে, বইয়ের পাতায় অক্ষরগুলি কালীর রেখার মত দেখায়, সেই সময় কেশব উঠিয়া বেড়াইতে যান এবং রুক্মিণী টেবিল গুছাইয়া রাখেন। আজ কাল সুদেষ্ণা মাঝে মাঝে তাঁহার হাত হইতে কাজটা কাড়িয়া লয়।

জানালা দিয়া গোটা দুই রক্ত গোলাপের ডাল ফুটন্ত ফুলের ভারে কেশবের টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যার তরল আঁধারে কেশব একটা মোটা বই খুলিয়া কি এক রহস্যোদ্ভেদের চেষ্টায় আছেন, তখন সুদেষ্ণা ঝাড়ন হাতে ঘরে ঢুকিল।

গহনার ঝঙ্কার শুনিয়াই কেশব আদরিণী বধূর আগমন-বার্ত্তাটি টের পাইয়াছেন এবং কত কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাও বুঝিয়াছেন, কিন্তু চোখ তুলিয়া দেখিবার সময় নাই।

নিঃশব্দ ঘরে সুদেষ্ণার কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল, "দিদি কি বলেন, জানো বাবা?"

"কি বলেন?"

বলেন, "এতক্ষণ অমন ঘরের ভিতর বদ্ধ থাকলে শরীর নষ্ট হয়ে যায়

"আচ্ছা কাল দেখব।" বলিয়া বইয়ের পাতায় চোখ রাখিয়াই কেশব একটা ছোট্ট নোট বইয়ের উদ্দেশে হাত বাড়াইলেন—তৎক্ষণাৎ সেটা সুদেষ্ণার হস্তগত হইল।

এবার ব্যস্ত হইয়া কেশব মুখ তুলিলেন, "দে মা, বড্ড দরকার।"

"না—কিছুতেই না, ওঠো বাবা, দেখ দেখি, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, তবু তুমি কেবলি পড়বে, কেবলি পড়বে।"

"শুধু একটি কথা টুকে নেব আর কিছু না, দে—"

"না, বইয়ের পাতায় একটা কাগজ দিয়ে রাখ না। রাত্তিরের মধ্যে তো তোমার বই নোটবুক চুরি যাচ্ছে না? অত ভাবনা কি? তুমি না উঠলে টেবিল ঝাড়ি কি করে? ধুলো দেয় কি করে? এতে যে লক্ষ্মী ছেড়ে যান।"

অগত্যা বইয়ের পাতায় চিহ্ন রাখিয়া কেশব উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সুদেষ্ণার চিবুকটি ধরিয়া একটু হাসিয়া সস্নেহে বলিলেন, "লক্ষ্মী ছেড়ে যাবেন কি করে? এই যে লক্ষ্মী ঘরে বেঁধে রেখেছি।"

মনে মনে যথেষ্ট খুশী হইলেও মুখের গৃহিণীযোগ্য গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়াই সুদেষ্ণা বলিল, "যাও, এখন বেড়াতে যাও—" বলিয়া টেবিল গোছান শুরু করিয়া দিল।

ঘরে-দুয়ারে, বাহিরে-ভিতরে, বারান্দায়-সিঁড়িতে একে একে আলো জ্বলিয়া উঠিল। অন্ধকার নিবিড় হইতে না হইতে পলায়ন করিয়াছে। বিদ্যুতের আলোর আভায় আকাশের তারায় ক্ষীণ জ্যোতি চোখে পড়ে না, অন্ধকার কালো আকাশ পৃথিবীর উপরে আনত। ঘরে ঘরে সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি, ধূপের সুগন্ধ উঠিতেছে। মন্দিরের আরতি-বাদ্য থামিয়া গেল। পল দণ্ডে, দণ্ড প্রহরে, প্রহর দিনে, দিন কালে মিশিয়া চলিয়াছে, গতিশীল জগৎ, অফুরন্ত অবিরাম গতি।

সবে কৈকেয়ী ঘরে পা দিয়াছেন, সুখদা বলিল, "মা দাদাবাবুর অসুখ করেছে।"

"কি অসুখ?"

"তা জানিনে, বেড়াতে গেছলেন, ফিরে এসেছেন, বৌদি তোমায় বলতে এসেছিল।"

"দেখে আসি" বলিয়া কৈকেয়ী কেশবের ঘরের দিকে চলিলেন। বারান্দায় হঠাৎ জানালা দিয়া ঘরের ভিতর চোখে পড়িল।

কেশব বিছানায় শুইয়া, পশমী চাদরে গা ঢাকা। পাশে রুক্মিণী বসিয়া কেশবকে কি বলিতেছেন, মাথাটি একটু নীচু, খোঁপার উপরে লাল পাড়টি আলোতে আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। মুখে উদ্বেগের ছায়া, নির্ম্মল কপালটিতে সিঁদুরের টিপ। কয়েক মুহূর্ত্ত কৈকেয়ী চাহিয়া রহিলেন। অতি বিনয় ও অতি নম্র দীন ভাব কৈকেয়ী সহিতে পারেন না, রুক্মিণীকে নিজের সন্তানের একনিষ্ঠ সেবিকা জানিয়াও তাঁহার উপরে কৈকেয়ীর মনের ভাব বদলায় নাই, একটু অবহেলা ও একটু বিরক্তি চিরদিনই রহিয়া গিয়াছে, না জানি কোন্ শুভক্ষণে আজ রুক্মিণীর কোমল মুখের মধুময় ভাবটি তাঁহার মনে রেখাপাত করিয়া ফেলিল। বুঝি বা মনে হইল, যতটা অগ্রাহ্যের পাত্রী বলিয়া তিনি ভাবেন, রুক্মিণী ঠিক ততটাই নহেন।

ধীরে ধীরে কৈকেয়ী নিজের ঘরে ফিরিয়া গেলেন, তিনি কেশবের কাছে গেলে রুক্মিণী উঠিয়া পড়িবে—দরকার কি একটু পরে গেলেই হইবে! সংসারের ভার রুক্মিণীর উপর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিবার বিশ্বাস না পাইলেও কেশবের সমস্ত দায়িত্ব ও ভার যে রুক্মিণীর হাতে দিয়াই তিনি পরম নিশ্চিন্ত, সে কথা খুবই সত্য।

একটু পরে সুদেষ্ণা আসিল, কৈকেয়ী বলিলেন, "ছিলি কোথা?"

"ছিলে কোঠায়, পিসিমা রেকর্ডের একটা গান আমায় শিখতে বলেছিল, খালি গলায় গেয়ে শোনাতে হবে, তাই ঠিক করে নিচ্ছিলাম। পিসিমা আসেনি মন্দির থেকে?"

"না, তোর বাবার জ্বর হয়েছে দেখগে।"

"বাবার জ্বর হয়েছে? তুমি দেখেছ?"

"না, আমি যাইনি।"

"তবে তুমিও এসো।"

"যাব একটু পরে, তুই ততক্ষণ যা।"

তখন বিষম চিন্তাকুল মুখে সুদেষ্ণা আসিয়া কেশবের বিছানার কাছে দাঁড়াইল, মুখের ভাব দেখিয়া কেশব হাসিয়া বলিলেন, "অত ভাবছিস কি? কিছু হয় নি আমার।"

সুদেষ্ণা গম্ভীর মুখে তাঁহার কপালে হাত দিল, নাড়ী দেখিল, যেন কত বড় ডাক্তার! তার পরে কাছে বসিয়া বলিল, "দিব্যি জ্বর হয়েছে, না বললেই হলো! থাক দিন-রাত বই নিয়ে বসে, এখন ক'দিন বিছানা ছেড়ে না উঠতে পার, দেখ।"

"ইস্ মেয়েটার কথাবার্ত্তা ঠিক মার মত হয়ে উঠছে যে।"

রুক্মিণী বলিলেন, "তা হয়েছে, ও মার মতন হয়ে উঠবে সব দিক্ দিয়েই।

সুদেষ্ণা সে কথায় কাণ না দিয়াই বলিল, "ডাক্তারকে ডাকা হয় নি?

"কাল সকালে ডাকলেই হবে

"ঐ তো বাবা তোমার দোষ! কথা বললে কথা শোন না, চা খাবে? করে আনবো?"

"চা খেয়েছি একবার, তা যদি তুমি নেহাৎ না ছাড় তবে দাও আর এক পেয়ালা।"

সুদেষ্ণা উঠিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে এক পেয়ালা চা আনিয়া বলিল, "নাও আদার রস দিয়েছি।"

পেয়ালাটা শেষ করিয়া কেশব গায়ের কাপড়টা ফেলিয়া দিয়া শুইলেন। সুদেষ্ণা একটা পাখা আনিয়া মাথার কাছে বসিয়া হাওয়া দিতে লাগিল।

কৈকেয়ী ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কেমন আছিস?"

"মাথা ধরাটা ছেড়েছে, জ্বরটাও বোধ হয় ছাড়বে—খুব গরম হচ্ছে।"

রুক্মিণী মাথার কাপড় টানিয়া নামিয়া দাঁড়াইলেন। কৈকেয়ী কেশবের কাছে বসিলেন। কেশব বলিলেন, "পাগলীটাকে পাঠিয়েছ কেন মা, কি রকম মুখ করে আছে দেখছো? যেন আমার শক্ত অসুখ হয়েছে একটা—"

একটু ভ্রূকুটী করিয়া রুষ্টভাবে সুদেষ্ণা বলিল, "ঐ-সব বলতে আছে?"

"খুব আছে—এমন মা যদি কাছে বসে থাকে তবে অসুখে ভয় কি?" বলিয়া কেশব সুদেষ্ণার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "পরের ছেলের ওপর এতটা মায়া ফেললি কি করে? আমার মা কি ছেলেটিকে তোকে ছেড়ে দেবেন?"

কৈকেয়ী বলিলেন, "এ কি আমার ছেড়ে দেবার ভরসা রাখে কিছুর? নাত-বৌ তো নয় যেন দিদি-শাশুড়ী।"

"খুব ভাল কথা মা, এমন একজন এ বাড়ীতে আছে যার মনের দিকে তোমাকেও চাইতে হয়।"

"তা হয় বৈকি, আর সবার কথা ঠেলতে পারি কিন্তু ওর দুটো কথার একটা না রাখলেই নয়। জোর করেই ও রাখাবে। বুড়ো বয়সে সাধ করে কি না গলায় পরলাম সোনার শেকল—এখন ফাঁস হয়ে এঁটে না বসে।"

কেশব সুদেষ্ণার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "কারও বাঁধনই তুমি স্বীকার করনি কোন দিন—এরও না, তোমার নিজের মায়াকেই বাঁধন বলে মনে হচ্ছে।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "গান শোনাবি না কেশবকে?

"শোনাব না তো শিখেছি কি করে? অসুখের মধ্যে কি বাবার ভাল লাগবে?"

"খুব লাগবে—তোমার মিষ্টি সুর শুনলে অসুখ সেরে যাবে। মাঝে মাঝে অসুখ করা ভাল মা, নইলে তোমার গান শোনবার সময় আমার হয় না—থাক তুমি পাখা রাখ—আর হাওয়ার দরকার নেই।"

সুদেষ্ণা পাখা রাখিয়া উঠিয়া কেশবের পায়ের কাছে বসিল বলিল, "কোন্ গান গাইব?"

"আজ না কি একটা শিখেছিস বলছিলি?—সেইটে গা।"

সুদেষ্ণা গান ধরিল—

"কেমনে পাইব বল তারে—
ওরে চাইলে পাওয়া যায় না রে—
ও সে যেমন ভোলা তেমনি পাগল—
ধরা ছোঁয়া দেয় না কারে—"
ধরা ছোঁয়া দেয় না রে।

সুদেষ্ণার গলা তেমন চড়া নয়, কিন্তু সুরটি বড় মধুর, একটু ধীর, একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা, কাঁপিয়া কাঁপিয়া সুর একবার ওঠে একবার নামে, কখন বা মিলাইয়া যায়। তন্ময় মুখের ভাব। ঘরের মধ্যে সুরের তরঙ্গ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, উদাস, আকুল, কম্পিত সুর—

"শুনি আমারে ডাকে
তবু লুকিয়ে থাকে
ছায়ার মতন হেরি তবু হারাই বারে বারে—
আমারে সে জড়িয়ে আছে রে
তবু পাইনে তাহার ছোঁয়া রে
কেমনে পাইব বল তারে।"

গান শেষ হইল। কেশব নিস্পন্দ হইয়া শুইয়া আছেন, অনেকক্ষণ পরে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "এ গান তুই পেলি কোথায়?'

"রেকর্ডে।"

"আর একবার গাও [ক্রমশঃ

উত্তরবঙ্গের কবি জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণ

—শ্রীশম্ভুচন্দ্র চৌধুরী

উত্তরবঙ্গে অতীতে যে বিরাট সাহিত্যচর্চ্চার অবসর হইয়াছিল, যাহার নিদর্শনস্বরূপ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ, কমললোচনের চণ্ডিকাবিজয়, মাণিকচন্দ্ররাজার গান প্রভৃতি কিয়দংশ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, কবি জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণ বা মনসার ভাসানও বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই অতীত যুগে আলোকপাত করিবে। গত মে মাসে উত্তরবঙ্গের গ্রামসমূহের উপভাষাসম্বন্ধে অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার সময়ে আমি বহু হস্তলিপিত প্রাচীন পুঁথি দেখিবার অবসর ও সুযোগ পাই। বগুড়ার শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মৈত্র মহাশয়ের নিকট উত্তরবঙ্গের অমর কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের পদ্মাপুরাণের হস্তলিখিত একখানি পুঁথির খোঁজ পাওয়া যায়। উক্ত মৈত্র মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া মহাস্থানের নিকটবর্ত্তী ত্রিলছবড়াইল নামে গ্রামে যাইয়া পুঁথিখানি সংগ্রহ করি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুঁথিখানির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। উত্তরবঙ্গে কবি জীবন মৈত্রের নাম খুবই পরিচিত। তাঁহার মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যও এক সময়ে এই অঞ্চলে অতিশয় সমাদৃত হইত। জীবন মৈত্রের মনসার ভাসান প্রচলিত এই শ্রেণীর গল্প হইতে স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র। ইহার একটি কারণ এই যে, অতীতে উত্তরবঙ্গে মনসামঙ্গলের একটি স্বতন্ত্র শাখা গড়িয়া উঠিয়াছিল। জগতজীবন, বংশীবদন প্রভৃতি কয়েক জন উত্তরবঙ্গের কবির রচনা মনসামঙ্গল ইহার সাক্ষ্য দেয়। সুকবি নারায়ণ দেবের কাব্যেরও এই অঞ্চলে পরিবর্ত্তিত একটি রূপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কবি জীবন মৈত্রের কাব্য উত্তরবঙ্গে প্রচলিত মনসামঙ্গল শাখার প্রতিনিধিস্থানীয় বলা যাইতে পারে। কাব্যখানির একটী মোটামুটি পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

কবির বাসস্থান ও পরিচয় ইত্যাদি

কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের বাসস্থান ছিল বগুড়া জেলার মহাস্থানের নিকটবর্ত্তী করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত লাহিড়ীপাড়ানামক একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রামে। এখনও এই গ্রামের অস্তিত্ব আছে, তবে উহার অতীত গৌরব আজ কাহিনীতেই পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বারেন্দ্রব্রাহ্মণবংশে জীবন মৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। লাহিড়ীপাড়ার মৈত্রদের বংশখ্যাতি আজিও অটুট আছে। কবির পিতার নাম অনন্তরাম, মাতার নাম স্বর্ণমালা, পিতামহের নাম বংশীবদন। এই পরিচয় কবির গ্রন্থমধ্যেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীবংশীবদন মৈত্র জান মহাশয়।
চৌধুরী অনন্তরাম তাঁহার তনয়॥
অনন্ত নন্দন কবি শ্রীমৈত্র জীবন।
লাহিড়ী পাড়াত বাস বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ॥
মনসার পাঞ্চালী বর　　　পদ অতি মনোহর
বিরচিল শ্রীমৈত্রজীবন
লাহিড়ি পাড়াত স্থিতি　　　দ্বিজকুলে উৎপত্তি
রচে কবি স্বর্ণমালার নন্দন।
অনন্তনন্দন কবি শ্রীমৈত্র জীবন।
লাহাড়ি পাড়াত বাস বারিন্দ্রব্রাহ্মণ॥
শ্রীমৈত্রজীবন পদ　　　রচিলেন পদপদ
রচে কবি স্বর্ণমালার নন্দন।

কাব্যখানির বহুস্থলেই উক্তরূপ ভণিতায় জীবন মৈত্র তাঁহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। এক জায়গায় হেঁয়ালীছন্দে তাঁহার পরিচয় দেওয়া আছে। কবি জীবন মৈত্র যে ভারতচন্দ্রের মত দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় ছন্দ রচনা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, অন্যান্য স্থলেও তাহার প্রমাণ মিলিবে। তুলনীয় :—

বৃষভানুসুতাপতি (কতী)　　　তার ভুজে যার স্থিতি
বদনেতে যার প্রয়োজন
কহিব পিতামহের নাম এহি　　　তাত অবধান কহি
বুঝহ সন্তে মনে ত ভাবি॥
জল সাহা সাথে নারায়ণ　　　বিষ্ণুর আধার ভূত
সন্তে দেহ পঞ্চভূত, বলি তাই যে নাম বটে॥
সেবক নন্দি যে　　　তাহার প্রসাদে
তাহার অনুজ সর্ব্বঘটে।

তাহার অনুজ ভ্রাতা জগজ্জন প্রাণদাতা
পঞ্চনাম কৈলাস নিবেদন।
তাহার অনুজ ভাই তপাস আপনার ঠাঁই
বিরচিল শ্রীমৈত্রজীবন।

অন্য একস্থলে সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় কবি নিজের ভ্রাতাগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

সর্ব্বাগ্রজ দুর্গারাম তৎপশ্চাদনুজ আত্মারাম
সর্ব্বেশ্বর প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ
শ্রীকবিভূষণ নাম বাস লাহিড়ীপাড়া গ্রাম
জীবন মৈত্র চতুর্থের কনিষ্ঠ।

কবির পত্নীর নাম সম্ভবতঃ ব্রজেশ্বরী ছিল; দুই একটি জায়গায় মাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিরচিল গান ব্রজেশ্বরীর প্রাণেশ্বর।

কাব্যরচনার সময়ে জীবন যে বিবাহিত ছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

"শ্রীমৈত্র জীবন কয় সদাগর পুবে যায়," "কবির খাওয়ার কিছুই নাই," "তত্ত্ব দিল পুরদারা" ইত্যাদি—

শুন শুন শ্রীজীবন মৈত্র কবি কয়
কবির খরচ কিছুই নাই।
তত্ত্ব দিল পুরদারা সকল বুদ্ধি হইল হারা
পুথি বান্ধি হাটেয় চলি যাই।

কবির বংশপরিচয় ও বাসস্থান সম্পর্কে গ্রন্থমধ্যে উক্তরূপ মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। পরিচয় প্রায় সর্ব্বত্রই অত্যন্ত স্পষ্ট। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ে পরোক্ষ অনুমান বা প্রবাদের উপর নির্ভর করা সমীচীন হইবে না। কবির অন্যান্য পরিচয় গ্রন্থমধ্যে তেমন কিছু নাই। তাঁহার জন্ম শিক্ষা বৃত্তি প্রভৃতি সম্পর্কে তেমন কোনও বিশেষ তথ্য কবির কাব্যে পাওয়া যায় নাই। তবে কবি যে বিশেষ দরিদ্র ছিলেন তাহা তিনি বহুস্থলেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমৈত্র জীবন কবি ঘরে বসি কৈল।
একদিন লিখিতে তাড়ির তৈল ফুরাইল।

শ্রীমৈত্র জীবন কবি বিরচন
লিখিল খাটেত বসি
কাগজ বুড়া কলম মুড়া
দতে পচা মসী।

শ্রীমৈত্র জীবন কবি দুঃখে চান্দি কাটে।
বোকা ব্রাহ্মণ ধরিয়া ছৈল ভবানীগঞ্জের হাটে।
শ্রীমৈত্র জীবন কবি গুরচন
লিখিল খাটেত বসি
একে কাগজ বুড়া তাহাত কলম মুড়া
দোয়াতে হইল পচা মসী।

অপর একস্থলে কবি তাঁহার জমিদার নাটোরের মহারাজাগণের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

তাহার রাজ্যেত বাস ভিক্ষা করি খাই
ভিক্ষুকের কর্ম্মদোষে নির্দ্দয় গোঁসাই।

উত্তরবঙ্গে এক প্রকার 'বেগার' প্রথা বহুদিন হইতেই প্রচলিত আছে। জমিদারের যে কোনও উৎসব বা পর্ব্বে প্রয়োজন হইলেই পেয়াদা পাঠাইয়া ইচ্ছামত প্রজা রাজধানীতে ডাকিয়া লওয়া হয় এবং প্রয়োজনমত বিনা পারিশ্রমিকে তাহাদিগকে খাটান হইয়া থাকে। কখনও কখনও আবার প্রজার নিকট হইতে, তাহার ইচ্ছা অনিচ্ছা উপেক্ষা করিয়া বিনা পয়সায় দ্রব্যসামগ্রী আদায় করা হয়, এইরূপ দ্রব্যসম্ভার 'বেদামী' বলিয়া খ্যাত। রাজা রামকৃষ্ণের বিবাহবর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি জীবন মৈত্র এইরূপ 'বেগার' ধরা পড়িবার ভয় করিয়াছেন। কবি দরিদ্র ছিলেন কাজেই তাঁহাকেও 'বেগার' ধরা হইতে পারে এই ভয়।

রামকৃষ্ণ রায়ের বিভা তাত বেগারের ধুম।
লেখা ছাড়ি রণায় পড়ি চক্ষে চাপিল ঘুম।

গ্রন্থের রচনাকাল

গ্রন্থমধ্যে একাধিকস্থলে গ্রন্থের রচনাকাল কবি দিয়াছেন। এই সমস্ত অংশ হইতে জানিতে পারা যায় জীবন মৈত্র সম্ভবতঃ ১১৫১ সালে (১৬৬৬ শক, ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন।

মহীপৃষ্ঠে শশি দিয়া বাণবিধু সমর্পিয়া
বৃহৎ সনের পরিমাণ
লাহাড়ি পাড়াত স্থিতি দ্বিজকুলে উৎপত্তি
শ্রীজীবনমৈত্র কবি গান।

এই অংশে পাইতেছি, মহী=১, শশি=১, বাণ=৫, বিধু=১, অর্থাৎ ১১৫১ সন (অঙ্কস্য বামা গতি এখানে খাটিবে না, কারণ তাহা হইলে দাঁড়ায় ১৫১১ সন)। সনে দেওয়া এই তারিখ অন্যত্র শকে সমর্থিত হইয়াছে।

অম্বুজের পৃষ্ঠে রস রিপু ঋতু জান
এহি শকে শ্রীজীবন মৈত্র রচে গান ॥

অম্বুজ = ১, রস = ৬, ঋতু = ৬, = ১৬৬৬ শক।

অন্যত্র

নিরনিধিসুত পৃষ্ঠে রিপু আরোপিয়া।
বিরোচন সুতের সুত তাহাত স্থাপিয়া॥
তার পৃষ্ঠে কোকনদবন্ধু অধিষ্ঠান।
এহি শকে শ্রীজীবন মৈত্র রচে গান॥

এই অংশের ইঙ্গিতের সুস্পষ্ট অর্থ করা অত্যন্ত কঠিন। নিরনিধিসুত = ১, রিপু = ৬, বিরোচনসুতের সুত = কর্ণ, ৬ (কর্ণ ৬ষ্ঠ পাণ্ডব)। কোকনদবন্ধু বলিতে কবি কি বুঝাইতে চাহেন ঠিক বুঝা গেল না। এই অংশ হইতে স্থির নিশ্চিত এইটুকুই জানা গেল যে, ১৬০০ শকের ষষ্ঠ দশকে জীবন মৈত্রের কাব্য রচিত হইয়াছিল। কোকনদবন্ধু অর্থে সূর্য্য ধরিয়া ১ করিলে ১৬৫১ শক হয়। কিন্তু উপরে উল্লিখিত শকের সহিত সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে। অপর এক স্থলেও এইরূপ অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মধ্যে কাব্যরচনাকাল সমাহিত হইয়া আছে ॥

মহি পৃষ্ঠে কোন্ অধিষ্ঠান।
কৃষ্ণের তনয় যত দারা তাৎ দান॥
ভণি দিঞা বুঝ মতিমান।
কহে কবি জীবনমৈত্র কৌতুকবাখান॥

কবির এইরূপ "কৌতুকবাখানের" অভ্যাস প্রচুর পরিমাণেই ছিল। ফলে স্থলে স্থলে তাঁহার কাব্যের অর্থ অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। "মহিপৃষ্ঠে কোন্ অধিষ্ঠান" অর্থাৎ ১ সংখ্যার পরে কোন্ সংখ্যা দিতে হইবে প্রথমে কবি এই প্রশ্ন করিলেন। তৎপর তিনি নিজেই পরবর্ত্তী চরণে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। কৃষ্ণেরতনয় যত = ৫৬ কোটী যদুবংশ এই অর্থে ৫৬ ধরা যাইতে পারে; দারা = ষোলশত গোপিনী এই অর্থে যদি "দারা" ইঙ্গিতে ১৬ ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে দাঁড়ায় ৫৬১৭ তৎ পর 'বামাগতি' ধরিয়া যদি "দারা" অর্থাৎ ১৬ সংখ্যাকে ৫৬ সংখ্যার পূর্ব্বে স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে হয় ১৬৫৬ শক; কিন্তু তাহা হইলে প্রথম ও তৃতীয় চরণটির কোনও সার্থকতা থাকে না। মোটের উপর এই অংশ হইতেও কোনও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াও কোন কোন স্থলে কাব্য-রচনাকাল নির্ণয়ে অপ্রত্যক্ষ ইঙ্গিতও সহায়তা করিতে পারে। কবি তাঁহার জমিদার নাটোরের রাজবংশের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

মহারাজা রামকান্ত ভুবনে বিখ্যাত।
তাহার জামাতা বটে রাজা রঘুনাথ॥
তাহার দম্পতি রাণী তারা ঠাকুরাণী।
আপুনে পৃথিবীশ্বরী যাহার জননী॥
সে সতী পুণ্যবতী রাণী ভবানী।
মহারাণী বলি যাক ভুবনে বাখানি॥
যার পুত্র রামকৃষ্ণ রাজা রাজ্যেশ্বর।
অপার মহিমা যশ ভুবনে যাহার॥
তাহার রাজ্যেতে বাস ভিক্ষা করি খাই।
ভিক্ষুকের কর্ম্মদোষে নির্দ্দয় গোঁসাই॥

বঙ্গ দেশের বিখ্যাত নাটোর রাজবংশের মহারাণী ভবানীর নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। তাঁহার স্বামী রাজা রামকান্ত ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তৎপর তাঁহার বিধবা পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কবি জীবন মৈত্র রাণী ভবানীর রাজ্যে বাস করিয়া ভিক্ষুকের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন এবং পদ্মাপুরাণ লিখিয়াছিলেন তাহা উপরের কাব্যাংশ হইতে বুঝা যায়। কাব্য রচনার সময় ১১৫১ হইলে তখনও রামকান্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু রামকান্তের জীবদ্দশাতেও রাণী ভবানীই নাটোরের সমস্ত রাজকার্য্যের অন্তরালে তাঁহার স্বামীকে পরামর্শ দিতেন। রামকান্তের মৃত্যুর পর ভবানীর দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণ নাটোরের রাজ্যভার প্রাপ্ত হন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভবানীই রাজকার্য্য পরিচালিত করিতেন। "যার পুত্র রামকৃষ্ণ ইত্যাদি" অংশ পরবর্ত্তী কালের লেখক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিংবা বহু পরে জীবন নিজেই উক্ত অংশ সংযোজিত করিয়াছিলেন। কারণ কাব্যরচনায় যে সময় কাব্যমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সময়ে রামকৃষ্ণ নাটোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। রামকান্তের কোনও পুত্র জীবিত ছিল না। "কেবল রাজকুমারী তারাকে রাখিয়া এবং দত্তক পুত্রের অনুমতি দিয়া ১৭৪৮খৃঃ রামকান্ত পরলোক গমন করেন।" [রাজশাহীর ইতিহাস—১৬০ পৃঃ] "রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর, রাণী ভবানী রাজশাহী রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। রাজশাহীর

অন্তর্গত খাজুরা গ্রাম-নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রাণী ভবানী জামাতার হস্তে রাজ্যভার সমর্পন করিবেন বলিয়া নবাব দরবারে রঘুনাথের নাম জারী করিয়াছিলেন। রাজ্যের ভারও জামাতার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গালা ১১৫৮ সালে জামাতার মৃত্যু হওয়ায়, রাণী ভবানী স্বয়ং রাজ্যভার পুনরায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।" [রাজশাহীর ইতিহাস —পৃঃ ১৬০]। স্বামীর মৃত্যুর পর রাণী ভবানী ৫৮ বৎসর জীবিত ছিলেন, এবং তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার দত্তকপুত্র রাজা রামকৃষ্ণের উপর রাজ্যভার অর্পিত হয়। [Rajshahi Gazetteer. পৃঃ ১৭২]। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রামকান্তের জীবিতকালেই কবি কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ রামকান্তের মৃত্যুর পর কাব্য রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। "রাজা রঘুনাথে"র উল্লেখও এই দিক্ দিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ পরে রাজা রামকৃষ্ণের কথা কবি গ্রন্থমধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। রামকৃষ্ণের রাজত্ব সময়ে না হউক; দত্তক পুত্ররূপে নাটোরের রাজবংশের সহিত তাঁহার সংস্রবের সময় কবি জীবন মৈত্রের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। জীবন যে দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাহাও অনুমান করার কারণ আছে। আউলার হাটে কবি ভারতচন্দ্রের সহিত জীবন মৈত্রের সাক্ষাতের কথা উত্তর বঙ্গে খুবই প্রসিদ্ধ। জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণ, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। আউলার হাটে বঙ্গের এই দুইজন কবি পরস্পরের সহিত কবিতার মারফৎ পরিচিত হন এইরূপ প্রসিদ্ধি উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে আছে।

জীবন মৈত্রের "কবিভূষণ" ও "কবিরাজ" উপাধি ছিল। গ্রন্থমধ্যে একাধিকবার ইহার উল্লেখ আছে।

সকলে সাধুর আগে ক্ষমতা জোগার তাকে
শ্রীকবিভূষণের বাণী।
... ...
শ্রীকবিভূষণ গাহে গাইন
সাধু পাঠনে রাজার চাইন
বিরচিল শ্রীমৈত্র জীবন।

কহে কবিরাজ শ্রীকবিভূষণ
লাহাড়ি পাড়াত বাস বারিন্দ্র ব্রাহ্মণ।
... ...
কবি কহে কবিরাজ শ্রীকবিভূষণ।
উসাপথা বাকারস হৈল দুই জন। ইত্যাদি।

কাব্যরচনা ও কাব্যপরিচয়

জীবন মৈত্র মনসা দেবী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মনসার বর পাইয়া কাব্য রচনা করিলেও জীবন মৈত্রের কাব্য প্রচলিত মনসামঙ্গলের কাহিনী হইতে স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র।

শ্রীমৈত্রজীবন কবি সুরচন
লিখিল আদেশে মনসা।
... ...
মনসার পাঞা বর পদ অতি মনোহর
বিরচিল শ্রীমৈত্রজীবন।

জীবন যে সাধারণে প্রচলিত আখ্যায়িকা মানিয়া চলিতেন না, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমৈত্রজীবন কবি শ্রীগুরু চরণ সেবি
নৌতন মঙ্গল মনসার গীত।
... ...
নারদের কথা শুনি চণ্ডিকা দুঃখিত।
শ্রীমৈত্র জীবন গায় নৌতন সঙ্গীত।
পুনরপি সৈন্য আনে দুত পাঠাইয়া
শ্রীমৈত্রজীবন গায় মনেত ভাবিয়া।

জীবন মৈত্রের পদ্মপুরাণ প্রধানতঃ তিন খণ্ডে বিভক্ত। সৃষ্টি খণ্ড, দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড। প্রারম্ভে দেব-দেবীর বন্দনাগান রহিয়াছে। "গুরু-বন্দনা" "সরস্বতী-বন্দনা" "রাধাকানু-বন্দনা" "ভগবতী-বন্দনা" "বিষহরি-বন্দনা", ইহাদের অন্তর্গত। এই বন্দনার কোন কোন অংশ নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সিংহের পৃষ্ঠে দিয়া পাও মহিষে হিলায়ে পাও
শূল হানে অসুরের বুকে রঙ্গে।
কার্ত্তিক গণপতি মহালক্ষ্মী সরস্বতী
জয়া বিজয়া দাসী সঙ্গে।

বরমাজি মহেশ্বরী নায়কের মঙ্গল করি
পূর্ণ কর মোর অভিলাষ
শ্রীমৈত্র জীবন কবি অভয়ার পদ সেবি
লাহাড়ি পাড়াত যার বাস ॥

… … …

কর জুড়ি ভূমে পড়ি বন্দোমাতা বিষহরি
জন্মেতে জগ্রিণী নাম।
বন্দোমাতা করপুটে আসিয়া বৈসহ ঘটে
পুরাও দাসের মনস্কাম ॥

… … …

বন্দী করপুটে আসি বৈস ঘটে
পুরাও দাসের কাম।
মরাল বাহিনী জয়শ্রী ব্রহ্মাণী
ত্রিনয়নী চতুর্ভুজা।
দাসেক দয়া করি উর বিষহরি
তব পদে করি পূজা ॥
তোমার চরণ করিয়া স্মরণ
আসরে ধরিনু তাল
নম বিষহরি উর আসি বারি
তাল লহ আপনার ॥
শ্রীমৈত্রজীবন করে সুরচন
মনসার পাইয়া বর
উর উর দেবী তুয়া পদ সেবি
নায়কেরে রক্ষা কর ॥

"কলি"র প্রকোপ সম্পর্কে গ্রন্থারম্ভে কবি বলিয়াছেন

সিংহে খাইবে মীন তপস্বির হবে হীন
গঙ্গার উপরে বালুচর।
ইন্দ্রে দিবে অল্প জল বৃক্ষে হরিবে ফল
রাজা ত করিবে অবিচার ॥
শশুরে হরিবে বধূ শুনিয়া নিন্দিবে সাধু
অকুমারি মাগিবে শৃঙ্গার ॥
শোনহ কলির কথা পুত্রে নাহি মানে পিতা
শিষ্যে না মানিবে গুরুজন।
বাপ মায় ছাড়িবে পুত্রে গুরুক নিন্দিবে শাস্ত্রে
মিত্রকে কপট হবে মন। ইত্যাদি—

তৎপর সৃষ্টিপ্রকরণ :—

সনেক পুছেন কথা নমেশের স্থানে।
পুরাণ প্রবাহ কথা কহ আদিহনে ॥
জেরূপে করিল হরি অসুর সংহার।
জেরূপে করিল প্রভু বেদের উদ্ধার ॥
কি কারণে গেল শিব কমল তুলিবার।
মনসার জন্ম কথা কহ সমাচার ॥
অবধান কর সৃষ্টি হৈল জেহি হনে।
নবমে কহেন কথা সনেকের স্থানে ॥
আপুনে ঈশ্বর কৈল বরাহ অবতার।
হিরণ্যাক বধি মহি করিল উদ্ধার ॥
বিধাতাকে সিরজিলা সৃষ্টি করিবারে।
পুরুষ প্রকৃতি কিছু নাহি চরাচরে ॥
অন্ধকার নিরাঞ্জন নাহি কোন পার।
নিরাঞ্জন বলে বিধি করহ সংসার ॥
আজ্ঞা পাঞা প্রজাপতি সৃজিল আকার ॥

তৎপর মনসার জন্মকথা বিবৃত করা হইয়াছে। তারপর একে একে পদ্মা, নেতাবতী, "আস্তিক" প্রভৃতির "জন্মকথা" বলা হইয়াছে। এইরূপে দেবখণ্ড সমাপ্ত ও তৎপর বণিকখণ্ড আরম্ভ হইল। বণিকখণ্ডের মধ্যে "রাজা পরীক্ষিতের উপাখ্যান" "উষা হরণ" "জগন্নাথ উপাখ্যান" প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। অনেকে মনে করেন উষাহরণ স্বতন্ত্র পালা, কিন্তু জীবন মৈত্রের কাব্যে উষাহরণ মূল কাব্যের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, এবং এখানেই জীবন মৈত্রের কাব্যের নূতনত্ব। সংক্ষেপে গল্পটি এইরূপ :—চাঁদ সদাগর কিছুতেই মনসার পূজা দিবে না জানিয়া মনসা একটি চক্রান্ত করিলেন। বাণরাজার কন্যা উষাকে একটা ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে ইন্দ্রের সভায় আনিবেন এবং নৃত্যরতা উষার তালভঙ্গ করাইয়া তাহার উপর ইন্দ্রের অভিশাপ আনিবেন। ইন্দ্রের সহিত পূর্ব্ব হইতেই ষড়্‌যন্ত্র করা থাকিবে। ইন্দ্রের অভিসম্পাতে উষাকে মানবী হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। পদ্মার প্রভাবে অনিরুদ্ধও মানবরূপে ধরণীতে আসিবে। উষা হইবে বেহুলা ও অনিরুদ্ধ হইবে লক্ষিন্দর। তৎপর মনসার প্রভাবে দুইজনের বিবাহ হইবে। বিবাহরাত্রিতেই লক্ষিন্দরের সর্পাঘাতে প্রাণ যাইবে। উষা অর্থাৎ বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ লইয়া ভাসিতে ভাসিতে পুনরায় স্বর্গে আসিবে, অনবদ্য ও নির্ভুল তাললয়মান সম্বলিত নৃত্যের দ্বারা পুনরায় ইন্দ্র ও শিবাদি দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করিলে তাহার স্বামীর দেহে

পুনরায় প্রাণ সঞ্চারিত হইবে। মনসাও এই সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে চাঁদকে ফেলিয়া তাহার নিকট হইতে পূজা আদায় করিবেন।

প্রধানতঃ এই আখ্যায়িকার উপরে জীবন মৈত্রের মূল কাব্যের ভিত্তি। বেহুলাকে জাতিস্মর করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। বেহুলাই যে উষা তাহা সর্ব্বদা তাহার স্মৃতিতে জাগরূক রহিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, উষাহরণ আখ্যায়িকাটি জীবনের কল্পনায় অভিনবত্বে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

নেতা, পদ্মা ও নারদ এই তিনজনে মিলিয়া উল্লিখিত ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিলেন। প্রথমতঃ নারদের অভি-সম্পাতে উষাকে ইন্দ্রের সভার নর্ত্তকী হইয়া থাকিতে হইল।

হেনকালে বৈকুণ্ঠ হৈতে আইল তপোধন।
দেখি সমাদর কৈল দেবপুরন্দর॥
নারদ বোলেন কথা ইন্দ্রের গোচর।
বানের কুমারি কন্যা নাম উসাবতী।
পরম সুন্দরী বটে অনিরুদ্ধ পতি॥
তাহাক আনহ তুমি অমরা পুরিত।
নিত্ত করিবে সদা তোমার সাক্ষাত॥
এহি বলি গেলা মুনি অমরা হইতে।
অবিলম্বে গেলা মুনি পুরি দ্বারকাতে।
দেখিয়া নারদ মুনি কত অনুবংশ।
সম্ভাসা করিল জানি নারায়ণ অংশ॥
লাজে অনিরুদ্ধ উসা না কৈল প্রণাম।
মনি বলে অনিরুদ্ধ কৈল অপমান॥
আমাকে দেখিয়া তোরা কেন কৈলা লাজ।
ইন্দ্রের নির্ত্তকি হৈয়া থাক সভামাঝ।
অভিশাপ পূর্ণ কালে আসিবে মনসা।
মর্ত্তেত মানুস হবা অনিরুদ্ধ উসা।
জন্মিবে বণিক ঘরে মনসার বরে।
দংশীবে তোমার পতি লোহার বাসরে।
মরা পতি লঞা সঙ্গে ভাসিবে সাগরে।
মরা পতি জিআইবা দেবের নগরে।
পুনশ্চ আসিবে হেথা অনিরুদ্ধ উসা।
অমরাত গেল দোঁহে গোবিন্দ ভরসা।

এদিকে নেতাবতী পদ্মাকে ইন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিল। ইন্দ্র পরম আদরে পদ্মাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে—

মনসা বোলেন বাঞ্ছা বলি যে তোমারে।
শিবের সেবক ব্যাটা বাস চম্পাবতী।
পূজা নাহি করে বেটা দারুণ দুর্ম্মতি।
তার ঘরে পুত্র দিবা লব তার পূজা।
পুন আনি দিব স্বর্গে শুনহ বিরজা॥
বাসব বলেন চিত্রা জাহ শিঘ্র করি।
অবিলম্বে সভাত আসুক বিদ্যাধরী॥
এত বলি গেলা চিত্রা উসাবতীর স্থানে।
কহিল বৃত্তান্ত উসা শুনিল শ্রবণে।
উসা বলে প্রাণনাথ ইন্দ্ররাজা ডাকে।
চিত্ররেখা আসি বার্ত্তা দিলেক আমাকে।
অনিরুদ্ধ বলে বেশ সাজ উসাবতী।
শ্রীমৈত্র জীবন গান মধুর ভারতী।

মনসা বোলেন ইন্দ্র কর অবধান।
অনিরুদ্ধ উসাবতীক আমাকে কর দান।
চন্দ্রধর নামে রাজা বাস চম্পাবতী।
ধনমদে মত্ত বেটা দারুণ দুর্ম্মতি।
গন্ধবণিক জাতি শিবের সেবক।
পূজা নাহি করে বেটা মন্দ বোলে মোক॥
কেহ জদি করে পূজা তাক করে দণ্ড।
নিরবধি গালি পাড়ে ঘট করে খণ্ড।
নর হৈয়া করে বেটা হেন অহঙ্কার।
কোন দেব হেন দুঃখ পারে সহিবার॥
অনিরুদ্ধ উসাক তুমি মোক কর দান।
নহে আজি তোমার এথাত তেজিব পরাণ।
শুনিয়া চিন্তিত হৈল অর্জ্জুনের তাত।
অনিরুদ্ধক ডাক দিয়া আনিল সভাত।

পদ্মাবতী উষাকে অভিসম্পাত করিবার জন্ত ইন্দ্রের নিকট সকাতর অনুরোধ করিল। পদ্মাবতী নিজেই ছলনা করিয়া উষার নৃত্যের তাল নষ্ট করিয়া অভিসম্পাতের কারণ ঘটাইবে। পদ্মা বলিতেছে,

তুমি ইন্দ্র সুভাজন দেহ মোক দুইজন
তুমি এহি কর উপকার।
জদি উসা নাচে তাল কপটে হরিবা তাল
তুমি অভিশাপ দিবা তারে॥

যথাসময়ে নৃত্য আরম্ভ হইল। উষার অনবদ্য তাল-মানসম্বলিত নৃত্যে সকলেই চমকিত; দেবরাজ স্তম্ভিত।

কিন্তু দৈবের নির্ব্বন্ধ কখনও খণ্ডন করা যায় না। পূর্ব্ব-ব্যবস্থামত কপটে উষার নৃত্যের তালভঙ্গ করা হইল।

এক রাগ আনি আর গান আলাপন।
রাগ নষ্ট দেখি এবে সহস্রলোচন।
সাপ দিল পৃথিবীতে নও গিয়া জনম।
বণিকের ঘরে যেন জন্ম হয় তোর।
অনামিকা আত্রপরে আসিবে সোদর।

অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া উষা "ভূমিতে লোটায়ে" কাঁদিতে লাগিল। "অল্প অপরাধে নাথ, জাইব অবনীবাস, কেমনে জাইব মহিখণ্ডে" তখন নিজ কার্য্য সাধন মানসে মনসা দেবী উষা ও অনিরুদ্ধের প্রতি করুণা দেখাইলেন। তাঁহার প্রয়োজনমত বলিলেন :—

দেহত্যাগ কর এথা　　মর্ত্তেত চলহ পুতা
সাধিতে আমার প্রয়োজন।
কহে উষা অনুরুদ্ধ　　আপনি করহ সত্য
পুনু পাঠাইবা অমরাতে।
পদ্মা বোলে সত্য সত্য　　করিলাম তোমাত সত্য

... ...

তখন মনসার বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া দুইজনে "তনুত্যাগ" করিল :—

মনসার বচনে　　তখনি দুইজনে
অনিরুদ্ধ উষা তনুত্যাগ।
পদ্মা জীব থাকি আঁচলে　　জানে আরোহণ করি
আইলা চম্পকা পুরি
নেতা পদ্মা যুক্তি সকারে।

ইহার পর যাহাতে উষা ও অনিরুদ্ধ মর্ত্ত্যলোকে পদ্মার প্রয়োজনমত জন্মগ্রহণ করিতে পারে সে ব্যবস্থাও পদ্মাই সম্পন্ন করিলেন।

নেতা বলে আগে জগি শুন পদ্মাবতী।
বিলম্বে নাহিক কাজ চল শীঘ্রগতি।
সনেকা ঋতুস্নান করিয়াছে বাটে।
অনিরুদ্ধ জীব নয়া দেহ তার পেটে।
চলিলেন বিশহরি　　ঘরেত প্রবেশ করি
রাখে জীব সনেকার পেটে।
অপর দিনে পদ্মা জায়　　চলিল উজানী গাএ
সুমিত্রার ঘরে প্রবেশিয়া।
স্বপ্নে তারে জাগায়　　উঠরে সাহের বরাঙ্গনা।
তুমি হবা ভাগ্যবান　　তোর গর্ভে উপখান
বিপুলাকে করিল স্থাপন।
দুই কুলে দুই জনে　　জন্মিলেক দুইদিনে
অনিরুদ্ধ উষার জনম।

[ক্রমশঃ

দুঃখ ও সুখ

—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

চিত্তের কোষে মধুমক্ষির গুপ্ত দলের মত
কত সুখ দুখ স্মরণ পুঞ্জ ঘুমায় চেতনা হত।
একটি স্মৃতির ঘুম ভেঙ্গে দাও একটীরে দাও নাড়া
লক্ষ মক্ষি মৃদু গুঞ্জনে তুলিবে উচ্চ সাড়া।
সুখের সাগরে সাঁতার কাটিতে উঠিবে কালীয় ফণী
কখনও হইবি বিষে জরজর কখনও পাইবি মণি।

বাপ

—শ্রীঅমূল্য সেনগুপ্ত

যার গল্প আজ বলতে যাচ্ছি, সে হ'চ্ছে তার গির্জ্জার কাছাকাছি গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। তার নাম হচ্ছে থর্ড-ওভেরাস্। একদিন সে ধর্ম্ম-যাজকের পড়ার সময় এসে হাজির হ'ল,দেখতে সে যেমনি লম্বা-চওড়া তেমনি উৎসাহপূর্ণ তার ভাব।

সে বলল, "আমার একটি ছেলে হয়েছে, তাকে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করবার জন্ম এখানে আনতে চাচ্ছি।"

"তার নাম কি দেবে, ঠিক করেছ ?"

"আমার পিতার নামের অনুকরণে তার নাম রাখব 'ফিন্'।"

"আর তার ধর্ম্ম-শিক্ষার ভার গ্রহণ করবেন কে কে ?"

তাদের নাম বলা হল। তারা যে সেখানকার থর্ড বংশীয়দের আত্মীয়ের মধ্যে সব চেয়ে উপযুক্ত তারও প্রমাণ পাওয়া গেল।

"আর কিছু বলবার আছে কি ?" এই কথা জিজ্ঞাসা করে পুরোহিত মুখ তুলে তার পানে তাকাল।

গৃহস্থটি একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল, তারপর সে বলে ফেলল, "দীক্ষার অনুষ্ঠানটি শিশুর নিজের দ্বারা করাতে পারলেই আমি খুব খুশী হ'তাম।"

"তার মানে, আপনি রবিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিনে দীক্ষা দেবার কথা বলছেন ?"

"হ্যাঁ, এই আগামী শনিবারে বেলা বারটার সময়।"

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করল, "আপনার আর কিছু বক্তব্য আছে কি ?"

"না, আর কিছু না," ব'লে বিদায় নেবার ভঙ্গিতে টুপিটি একবার সে ঘুরালো।

এইবার পুরোহিত উঠে দাঁড়াল। "তা হ'লেও এইটুকু ব'লতে বাকী আছে যে," বলতে বলতে সে এগিয়ে গিয়ে তার হাতখানা ধ'রল, তারপর তার চোখে চোখ রেখে গাম্ভীর্য্যের সহিত বলল, "পরমেশ্বর করুন, ছেলেটি তোমার নিকট যেন একটি স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদের মতই হয়।"

তারপর ষোল বৎসর পরে একদিন থর্ড এসে আবার দাঁড়াল পুরোহিতের সেই পড়াশুনা করবার জায়গায়।

"সত্যই থর্ড এটি আশ্চর্য্যের বিষয় যে তুমি খুব সুন্দর ভাবেই তোমার প্রৌঢ় বয়স কাটাচ্ছ।" পুরোহিত এই কথা বলল, যেহেতু মানুষটীর দেহে সে কোন পরিবর্ত্তন দেখতে পায় নি।

থর্ড উত্তর করল, "এর কারণ আমার কোন দুশ্চিন্তার বোঝা নাই।"

উত্তরে পুরোহিত কিছুই বলল না ; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করল, "আজ বিকালে তুমি কি আনন্দ পেয়েছ !"

"হাঁ আজ বিকালে জানতে পেলাম যে, আমার ছেলে কাল তার পদে পাকা হ'বে।"

"সে তো বেশ সুন্দর পাকা ছেলে !"

"গির্জ্জার ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে কত নম্বরের পদে কাল তাকে আসন দেওয়া হ'বে, তা না জেনে পুরোহিতের দক্ষিণা মিটিয়ে দেবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই।"

"তার স্থান হ'বে এক নম্বর।"

"আমিও ঐরকম শুনেছি ; তা হ'লে, এই রইল পুরোহিতের বাবদ দশ ডলার।"

থর্ডের দিকে তাকিয়ে পুরোহিত প্রশ্ন করল, "তোমার জন্য আমায় আর কিছু করতে হ'বে কি ?"

"না আর কিছুই নয়।"

থর্ড চলে গেল।

আরো আট বছর কেটে গেল ; তারপর একদিন পুরোহিতের পড়ার ঘরের বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। কতগুলি লোক এগিয়ে আসছিল, তাদের আগে আগে চ'লেছে থর্ড, আর থর্ডই এসে প্রথম ঘরে ঢুকল।



কশরৎ

পুরোহিত তাকিয়ে দেখেই তাকে চিনতে পারল।

"আজ বিকেলে দেখছি লোকজনে বেশ সুসজ্জিত হ'য়ে এসেছ, থর্ড।" পুরোহিত ঐ বলে তাকে সম্বোধন করল।

"এই যে আমার পাশে মেয়েটি দেখ্‌ছেন এর নাম হ'চ্ছে কারেণ-স্তোরলিডেন্‌, শুডমুণ্ড-এর কন্যা; এর সঙ্গে শিগ্‌গিরই আমার ছেলের বিয়ে হ'বে, তাই সাধারণের মধ্যে বিবাহ-পত্রিকা প্রকাশ করবার জন্যে আপনাকে অনুরোধ কর্‌তে এসেছি।"

"সে কি, এদিকে যে সেই সবচেয়ে বড় ধনীর মেয়ে!"

এক হাতে চুলগুলি পেছন দিকে ফেরাতে ফেরাতে গৃহস্থটি বলল, "হাঁ, লোকে তো তাই বলে।"

যেন খুব চিন্তা ক'রছে এরূপ ভাবে পুরোহিতটি খানিকক্ষণ ব'সে রইল, তারপর কোন মন্তব্য না লিখে নাম কটি খাতায় তুলে নিল, অপরাপর লোকেরা তার নীচে তাদের নাম সই করল। থর্ডও টেবিলের উপর তিন ডলার রাখ্‌ল।

পুরোহিত বলল, "কিন্তু আমার পাওনার কথা যে মাত্র এক ডলার।"

"তা আমি বেশ ভাল ভাবেই জানি, কিন্তু সে যে আমার একমাত্র সন্তান তাই কাজটা আমি খুব সুন্দর ভাবে করতে চাই।"

পুরোহিত টাকা তুলে নিল।

"এই হচ্ছে তৃতীয় বার তুমি ছেলের জন্য এখানে আসছ, থর্ড।"

"তার সম্বন্ধে সব কাজই যে এবার আমার হ'য়ে গেল।" এই কথা বলতে বলতে নোট-বই খানা ভাঁজ ক'রে পকেটে পুরে সে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

অন্যান্য লোকেরাও আস্তে আস্তে তার পিছু পিছু চ'লল।

দিন পনর পরে খুব শান্ত, খুব স্থির একটি দিনে বাপ আর ছেলের মিলে হ্রদের ভিতর দিয়ে নৌকা বেয়ে চ'লেছে, স্তোরলিডেনের বাড়ী যাবে, বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রতে।

"এ রকম খাড়া জায়গা আদৌ নিরাপদ নয়," ব'লে যেখানটায় ছেলেটি ব'সে ছিল সে জায়গাটা সমান করবার জন্যে সে উঠে দাঁড়াল।

এমন সময় যে তক্তাখানার উপর সে দাঁড়িয়েছিল সেখানা তার পা থেকে পিছলে সরে গেল, সে হাত দুখানা ছড়িয়ে দিল, একবার আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল, তার পর পড়ে গেল একেবারে জলের উপর।

বাপ অমনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়খানা বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "দাঁড়টা ধ'রে ফেল।"

কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করবার পরে পুত্রের দেহ অসাড় হ'য়ে এল।

বাপ চেঁচিয়ে বলল, "আর একটু সবুর কর," বলে তার দিকে বেয়ে আসতে লাগল।

তারপর পুত্র তার পিঠটা ঘুরিয়ে নিল, সুদীর্ঘ দৃষ্টিতে বাপের দিকে একবার চেয়ে নিল, তারপর গেল ডুবে।

থর্ড কিন্তু কিছুতেই এ বিশ্বাস করতে পারছিল না, নৌকার গতি সে থামিয়ে দিল, তারপর যেখানটায় তার ছেলে তলিয়ে গেছে সেই দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, সত্যিই যেন আবার সে জলের উপর উঠবে। সেখানে কতকগুলি বুদ্‌বুদ্‌ উঠল, তার পর আরও কতকগুলি উঠল, তারপর সবার শেষে একটি বড় বুদ্‌বুদ্‌ উঠে ফেটে গেল, তখন হ্রদের চেহারা হ'ল আবার মসৃণ আয়নার মত উজ্জ্বল।

তিনদিন তিনরাত্রি বাপকে সেইখানটায়, ঠিক সেই-খানটায় নৌকা বেয়ে ঘুরতে দেখা গেছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, পুত্রের দেহের খোঁজে সে সারা হ্রদময় ঘুরেছে; তৃতীয় দিন ভোরের দিকে সে তা খুঁজে পেয়েছে।

একটি বছর হয়তো কেটে গেছে; শরতের এক সন্ধ্যা বেলা পুরোহিত দরজায় আঘাতের শব্দ শুনতে পেয়ে দুয়ার খুলল, ভিতরে এল একজন লম্বা-চওড়া কৃশ লোক, দেহটা তার নুয়ে পড়েছে, চুলগুলি সব সাদা। ধর্ম্মযাজক অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে তবে তাকে চিনতে পারল। লোকটি হচ্ছে, থর্ড।

"এত দেরীতে তুমি বেড়াতে বেরিয়েছ?" এই কথা বলে পুরোহিত নির্ব্বাক্‌ রইল।

"আঃ! দেরীতেই বটে," বলে থর্ড বসে পড়ল। পুরোহিতও তার কথা শুনবারই জন্য যেন বসে পড়ল।

তারপর দীর্ঘ, অতি সুদীর্ঘ নীরবতা।

অবশেষে থর্ড বলল, "আমার যা সামান্য কিছু আছে

তা আমি গরীবদের দিয়ে যেতে চাই ; এ আমি ছেলের নামে জমা দিতে ইচ্ছা করি।"

সে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপরে কতকগুলি টাকা রাখল, তারপর আবার বসে পড়ল। পুরোহিত সেগুলি গুণে নিল।

পুরোহিত বল্ল, "এ যে অনেক টাকা।"

"এ আমার সম্পত্তির যে অর্দ্ধেক মূল্য ; সম্পত্তিটি আজ বেচে ফেলেছি।"

ধর্ম্মযাজক খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল, তারপর ধীরে ধীরে বল্ল, "এখন তুমি কি করবে ঠিক ক'রেছ, থর্ড ?"

"আগের চেয়ে ভাল একটু কিছু।"

কিছু সময় তারা সেখানে ব'সে রইল ; থর্ডের দৃষ্টি ছিল মাটির দিকে, পুরোহিত চেয়ে ছিল ঠিক থর্ডের মুখের পানে ; খুব আস্তে আস্তে সহানুভূতির স্বরে সে বলতে লাগল, "আমার মনে হ'চ্ছে, তোমার ছেলে তোমাকে সত্যিকারের আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেছে।"

উপর দিকে চেয়ে থর্ড বল্ল, "আমারও যেন তাই মনে হ'চ্ছে।"

বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু তার গণ্ড বেয়ে নেমে এল।

বনানীর ব্যথা

—শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায়

শ্যাম বনানীর হিয়ার মাঝারে নিত্য
মর্ম্মরতানে বেদনার গান ফুটে,
সকল বিত্ত-হারাণো হৃদয় ক্ষুব্ধ
বিরহ-ব্যথায় গুমরিয়া কেঁদে উঠে।
প্রতি বনে তাই বিষাদের আজ সৃষ্টি ;
অতীতের মধু স্মৃতি বুকেতে ধরি,
ক্রন্দন তারা রচিয়াছে সারা বিশ্বে,
ঝঙ্কার তার উঠিছে নিখিল ভরি।
পঞ্চবটীতে আজিও বাজিছে ছন্দে
রাম-সীতা-হারা বিরহ-ব্যথার গান,
দুকূল ছাপায়ে উঠে বেদনায় মূর্ত্ত
গোদাবরী-বুকে উৎকণ্ঠার তান।
অশোক-বনের শান্ত, শ্যামল নেত্র
অশ্রুতে ভরি আজিও জাগিয়া রয়,
গোপন ব্যথার বাক্যবিহীন কণ্ঠে
মর্ম্মর তানে কোন্ সে বারতা বয় ?
বনে নাহি আর ধর্ম্মরাজের রাজা,
ভীমার্জ্জুনের বীরত্ব সমাপন,
রত্নাকরের নেই সেথা আর চৌর্য্য,
বা আজো বসি লিখে না ক' রামায়ণ।

তপোবন-হারা শ্যামল বনানী বৃন্দ
মুনি-ঋষিদের পথ চেয়ে বৃথা কাঁদে,
ঋষি-কন্যার খুঁজিয়া সেবার হস্ত
আকুল হৃদয়ে আশার তরণী বাঁধে।
মিশায়ে মধুর বন-মর্ম্মরে কণ্ঠ
ঝঙ্কারি কই উঠে না তো সামগান,
বেদের স্তোত্রে, যজ্ঞের মহামন্ত্রে
বনানীর বুকে নাহি উঠে কলতান।
বন-বীথিকার সবুজ, মেদুর অঙ্গে
ঋষিবালকের পদ-রেখা নাহি ফুটে,
মুনি-কিশোরীর অলস চরণ-ছন্দ
ঝঙ্কৃত হয়ে সেথা আর নাহি উঠে।
তাপস-তনয় মৃগশিশু লয়ে স্কন্ধে
নাচিয়া তো কই বেড়ায় না নদীতীরে,
সব-হারাণোর ব্যথা বিহগের কণ্ঠে
কেঁদে উঠে হায় নিশিদিন বুক চিরে !
বনের হৃদয় বনের বাতাসে কাঁদে,
ফিরে আয় মোর হারাণো বুকের গান,
তোর স্বপনের স্মৃতি আজো জাগে বক্ষে,
বেদনার নিশি কবে হবে অবসান ?

ভারতের রাষ্ট্রভাষা

—শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ

সমগ্র ভারতবর্ষকে এক-শাসনাধীন একটি অখণ্ড দেশরূপে পরিণত করিতে হইলে উহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কোনও রাষ্ট্রভাষা আবশ্যক। এই রাষ্ট্রভাষার গৌরবে কোন্ ভাষার দাবী সমধিক ন্যায্য, এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচিত হইবে। এই ন্যায্যতা বিচারে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অপক্ষপাত উত্তর স্থির করা আবশ্যক।

(১) নবরাষ্ট্রে ভাষানুসারে প্রদেশ-বিভাগ থাকিবে কি না? রাষ্ট্রভাষার ব্যবহার-ক্ষেত্র কতটা?

(২) রাষ্ট্রভাষার দ্বারা কোন প্রাদেশিক ভাষার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা উচিত কি না?

(৩) রাষ্ট্রভাষার পক্ষে ঐ কার্য্য পরিচালনায় পর্য্যাপ্ত শব্দসমৃদ্ধি আবশ্যক কি না?

(৪) রাষ্ট্রভাষা সকল প্রদেশে জনসাধারণের সহজ-শিক্ষণীয় হওয়া আবশ্যক কি না?

(৫) এই জন্য প্রস্তাবিত ভাষায় আবশ্যকমত অভিজ্ঞ লোক সুলভ হইবে কি না?

(৬) ঐ উদ্দেশ্যে কি কি ভাষা প্রস্তাবিত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বে রাষ্ট্রকার্য্য চলিয়াছে কি না?

(৭) প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত পরিচয় ও যোগ রক্ষা ভারতীয়দিগের পক্ষে প্রয়োজন কি না?

উত্তর—

(১) নূতন শাসনতন্ত্রে ভাষা হিসাবে প্রদেশ বিভাগ অবশ্যই থাকিবে। ঐ প্রদেশের কার্য্যও ঐ ভাষার দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান নগরীগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আফিসও থাকিবে। এতদ্ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে কেন্দ্রীয় সরকারের বড় বড় আফিস থাকিবে। বিভিন্ন প্রদেশগুলির প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সভা-সমিতিতে পরস্পরের ভাব-বিনিময়ও আবশ্যক। রাষ্ট্র-ভাষার ব্যবহার এই সমুদয় দপ্তর এবং ব্যক্তিগণের মধ্যে নিয়মিত ভাবে চলিবে। ঐ সব দপ্তর ব্যতীত অন্য কোন সরকারী আফিসে রাষ্ট্রভাষার প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে।

(২) কখনই নহে। কোন এক প্রদেশের অধিবাসীকে অন্য প্রদেশের ভাষা শিক্ষায় বাধ্য হইতে হইলেই সেই প্রদেশের ভাষার মর্য্যাদাহানি হয়। কোন প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিলে অন্য সকল প্রাদেশিক ভাষার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবেই। এজন্য কোন প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করিবার বিরুদ্ধে অন্য সমস্ত প্রদেশের একবাক্যে প্রতিবাদ করাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

(৩) শব্দ-সম্পদ্ যথেষ্ট না থাকিলে কোন ভাষার পক্ষেই রাষ্ট্রভাষার দাবী কেহ করিতে পারে না। পরন্তু প্রস্তাবযোগ্য ভাষার শব্দ-সম্পদ্ নিজ নিয়মানুসারে নূতন করিয়া বাড়াইতে পারা যায় কি না, অন্য দেশীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান নিজের মধ্যে বিস্তৃত করার জন্য সেই সমস্ত ভাষার শব্দগুলিই হুবহু অন্য অক্ষরে না লিখিয়া নিজের পারিভাষিক শব্দ-সৃষ্টির সামর্থ্য আছে কি না, তাহাও দেখা আবশ্যক।

ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক যে, রাষ্ট্রভাষার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অর্থাৎ উত্তম ব্যাকরণ ও অভিধান আছে কি না। কারণ, নিয়ম-প্রণালী-বিহীন ভাষার দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু অসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝান যায় না।

(৪) একটি দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা সহজ ব্যাপার নহে। উহাতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। দীর্ঘসময় ব্যয় করিয়াও সকলে ঐ বিষয়ে পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারে না। এমত অবস্থায় কোনও জাতির উন্নতির জন্য যদি নিয়তই অন্য ভাষা শিক্ষার অপেক্ষা থাকে, তবে সেই জাতির একটি বৃহৎ অংশকে উন্নতি—এমন কি, জীবিকার পথ হইতে দূরে থাকিতে হয়। প্রাদেশিক সরকারের কাজগুলি স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষায় সম্পন্ন হইবার নিয়ম থাকিলে ভাষান্তর অভ্যাসে অসমর্থ ব্যক্তিরা নিজের দেশেই জীবিকার পথ পাইবে। যাঁহারা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকার্য্যে কেবল তাঁহাদেরই প্রবেশ বাঞ্ছনীয় এবং তাঁহাদেরই সেই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। সেরূপ লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং

রাষ্ট্রভাষা যাহাই হউক না কেন, উহা জন-সাধারণের সহজ শিক্ষাযোগ্য হওয়া নিষ্প্রয়োজন। এখন স্পষ্টই বলা যায় যে, অধিকসংখ্যক লোকে ব্যবহার করে এবং বুঝিতে পারে এই কারণেই কোনও ভাষার পক্ষে রাষ্ট্রভাষার দাবী করাও নির্লজ্জ স্বার্থপরতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ইহাও ভাবিবার বিষয় যে, যে-কয়েক লক্ষ লোক রাষ্ট্রভাষা শিখিবে তাহাদের ভাষান্তর শিক্ষার পরিশ্রম সভা-সমিতিতে বক্তৃতা এবং আফিসের কর্ত্তব্য-সম্পাদনের উপরেও অন্য কোন কাজে আসিতে পারে কি না? যদি তদ্দ্বারা অন্য কোন ফল পাওয়া সম্ভব হয়, তবে তাহাও একটি বিশেষ যুক্তিরূপে গণ্য হইবে।

(৫) স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা স্থির করিবার জন্য একদল লোক যেরূপ তুমুল আন্দোলন এবং প্রচার-কার্য্য চালাইতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, অতি সত্বর উহা স্থির না হইলে হয়ত এ দেশে শাসন-কার্য্য অচল হইয়া পড়িবে। কংগ্রেসী দল হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করিয়া নিজ কর্ত্তৃত্বে মাদ্রাজ প্রদেশে হিন্দী শিক্ষা চালাইতেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সেই জবরদস্তির প্রশ্রয় দেন নাই। হিন্দীভাষীদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক এতই ক্ষেপিয়া গিয়াছেন যে, অন্য কোন ভাষা রাষ্ট্র-ভাষা হইতে পারে কি না, এই আলোচনাতেও তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। 'হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা' এই ধুয়া তুলিয়া ভালমন্দনির্বিচারে তাঁহারা অন্য ভাষার জিনিষগুলি চুরি করিয়া হিন্দীর গুহাগহ্বর পূর্ণ করিতেছেন। অনুবাদকের বিশেষ শক্তি না থাকিলে অন্য ভাষার বস্তু দিয়া সাহিত্য-ভাণ্ডার পুষ্ট করা চলে না। সাহিত্য স্বর্ণ নহে যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোন মতে থলিয়ায় পুরিলেই ভাণ্ডার মূল্যবান্ হইবে। চোর পাকা না হইলে আহৃত মালের বেশী ভাগ আবর্জ্জনা হয়।

যাহা হউক, রাষ্ট্রভাষার জন্য যাঁহারা অন্য ভাষার আলোচনা করিতেও অনিচ্ছুক, তাঁহাদের অন্তরের গূঢ় রহস্য কি ইহাই নহে যে, অতি অদূরভবিষ্যতেই যখন দেশে স্বাধীনতার প্রবর্ত্তন হইবে, তখন তাঁহাদিগকেই ত সমস্ত রাজ্যের ভার বহন করিতে হইবে। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা না হইলে তখন তাঁহারা করিবেন কি? সুতরাং সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত।

বাস্তবিক পক্ষে যাঁহারা এই আশঙ্কায় অস্থির হইয়া হিন্দীর পক্ষে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে পারি যে, যতকাল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন চলিবে ততকাল যে-ভাবে ইংরাজীর দ্বারা রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজন নির্ব্বাহ হইতেছে তাহা সেই ভাবেই চলিবে। যদি হঠাৎ বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়াই ফেলেন, তথাপি অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর কাল রাষ্ট্রব্যাপারে ইংরাজীর প্রভাবই চলিবে। ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে যে, স্বাধীনতা দিবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার বলিয়া উঠিবেন—"খবরদার, যখন স্বাধীনতা পাইয়াছ তখন আর আমাদের ভাষার প্রতি লোভ করিও না, করিলে 'না বলিয়া পরের বস্তু গ্রহণের' অপরাধ হইবে।" সুতরাং ইংরাজীর দ্বারা কার্য্য পরিচালনা করিয়া বৃদ্ধ নেতৃবৃন্দের কাল কাটিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রভাষার প্রকৃত প্রয়োজন হইবে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর পরে।

বর্ত্তমান ভারতে রাষ্ট্রভাষা ইংরাজী। এখনও ভারতের শতকরা এক জন লোকও মোটামুটি ভাবে ইংরাজী লিখিতে বা বুঝিতে পারে না। শতকরা এক জন ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ হইলেও সমগ্র ভারতে সামান্য ইংরাজীজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষের বেশী হয় না। ভাল ইংরাজী-জানা লোকের সংখ্যা ইহার এক চতুর্থাংশ অপেক্ষা বেশী নহে, অর্থাৎ, নয় লক্ষেরও কম। অনেক বিচক্ষণ বৃদ্ধ (ইঁহাদের মধ্যে দীর্ঘকাল বিলাত প্রবাসী ও উপাধিধারী আছেন) বলেন যে, আমরা যে ইংরাজী জানি তাহাকে ইংরাজী জ্ঞান না বলাই উচিত, এইরূপ জানা না-জানারই সামিল। সুতরাং প্রকৃত ইংরাজীভাষাভিজ্ঞের সংখ্যা আরও অনেক অল্প। কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসরের চেষ্টার ফলে আজ ইংরাজী-শিক্ষিতের সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ও গভীরতার এই অবস্থাতেও তদ্দ্বারা ভারতে রাষ্ট্রকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। সম্ভবতঃ পঁচিশ বৎসর চেষ্টা করিলে ভারতীয় যে কোন ভাষায় এই শ্রেণীর জ্ঞানসম্পন্ন ইহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক সহজেই পাওয়া যাইবে।

ইংরাজীর তুলনায় ভারতীয় সকল ভাষাই এমন কি সংস্কৃত ভাষাও ভারতীয়ের পক্ষে সহজ শিক্ষণীয়। কারণ, ইংরাজী

শিখিতে হইলে বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চারণ, বহু কঠিন বানান, ইডিয়ম, ফ্রেজ, প্রত্যেক শব্দের অর্থ ইত্যাদি সমস্তই পৃথক্‌ভাবে শিখিতে হয়, মাতৃভাষার কোন সাহায্যই উহাতে পাওয়া যায় না ; পক্ষান্তরে ভারতীয় একটি ভাষা জানিলে অন্য ভাষার বর্ণমালা বা উচ্চারণ শিখিবার স্বতন্ত্র আবশ্যকতা থাকে না ; এমন কি, বহু শব্দের অর্থও মাতৃভাষার জ্ঞানের দ্বারাই বুঝা যায়।

অতএব দৃঢ়ভাবেই বলা যায় যে, ভারতীয়গণ ইংরাজী শিক্ষার জন্য যেরূপ কঠোর পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে, তাহার এক-চতুর্থাংশের চেষ্টাতেই তাহাদের পক্ষে অন্য আর একটি ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব। অধিকন্তু তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল।

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর হইতে পাওয়া গেল যে—

(ক) কোন প্রাদেশিক ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না, বাঙ্গলা, মারাঠী, এমন কি, হিন্দীও নহে।

(খ) যাহা ভারতে রাষ্ট্রভাষা হইবে তাহা ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীকে অবশ্যই শিখিতে হইবে না, অল্পসংখ্যক মেধাবী বুদ্ধিমান্ ও শক্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষেই উহা অবশ্য-শিক্ষণীয় হইবে ; সুতরাং উহা জনসাধারণের সহজে শিক্ষাযোগ্য না হইলেও চলিতে পারে।

(গ) এখন উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান অথবা নবসৃষ্ট কোন ভাষা কিংবা সংস্কৃত ভাষা ভারতে রাষ্ট্রভাষার জন্য প্রস্তাবিত হইতে পারে। তন্মধ্যে ইংরাজী বৈদেশিক বলিয়া স্বাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন কেহই উহার সমর্থন করিতে পারে না। ফরাসী বা জার্মান ত নহেই।

রাষ্ট্রভাষার জন্যই 'হিন্দুস্থানী'-নামে উর্দ্দু শব্দবহুল যে হিন্দীভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাও রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত নহে। কারণ, উহার দ্বারা হিন্দী ও উর্দ্দুভাষীরাই অধিক সুবিধা ভোগ করিবে। অন্যদেশবাসীরা উহাদিগকে ঐ সুবিধা দিতে সম্মত হইবে না। বিশেষতঃ, এই হিন্দুস্থানী ভাষা সমৃদ্ধ নহে। উহার উত্তম ব্যাকরণ ও অভিধান নাই, যাহাতে উহার শব্দের অর্থ সর্ব্বদা অসন্দিগ্ধভাবে বুঝা যাইবে। প্রচলিত হিন্দীর ব্যাকরণ ও অভিধান অনুসারে ইহা গঠিত হইলে প্রকারান্তরে ইহাও হিন্দী ভাষাই হইল।

এই নূতন "হিন্দুস্থানী" ভাষা কোন দেশেই প্রচলিত নহে। ইহা কার্য্যোপযোগী আকার গ্রহণ করিলে কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহা শিক্ষা করিয়া তবে অন্য সকলকে উহাতে শিক্ষিত করিবেন। এইরূপে "হিন্দুস্থানী"র প্রসার দীর্ঘদিনে সম্পন্ন হইলেও হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ই উহাতে লাভবান্ হইবেন না। কারণ, উহাতে তাঁহাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন পরিচয়ই পাইবেন না। এই "হিন্দুস্থানী" ভাষায় উত্তম ধর্ম্মগ্রন্থ, দর্শন বা সাহিত্য কতদিনে জন্মিবে বা কখনও জন্মিবে কি না, বলা কঠিন। দীর্ঘকালে জন্মিলেও তাহার স্থান মূলগ্রন্থের অনেক নিম্নে থাকিবে। সুতরাং ঐ সকল অনুবাদের দ্বারা হিন্দু যথার্থ হিন্দুত্বের কিম্বা মুসলমান খাঁটী মুসলমানত্বের স্বরূপ জানিতে পারিবে না।

(ঘ) যে জাতির নিজস্ব কোনও সভ্যতা বা সংস্কৃতি আছে, তাহার অবশ্যই উহার সহিত ঘনিষ্ঠ-পরিচয় রাখা উচিত। আর ইতিহাস যাহার প্রাচীন সভ্যতা ও উজ্জ্বল সংস্কৃতির সাক্ষ্য দেয় জাতি যদি সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত পরিচয়ের পথ উন্মুক্ত না রাখে তবে তাহা ঐ-জাতির আত্ম-হত্যারই নামান্তর মাত্র। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ঐ-রূপ জাতি। অতএব ঐ জন্য প্রত্যেকেরই স্ব স্ব জাতির ধর্ম্মভাষা শিখিতেই হইবে। অতএব "হিন্দুস্থানী" ভাষা সৃষ্টির ও তাহা প্রচারের চেষ্টা পণ্ডশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সকল দিক্ বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় ভারতে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সংস্কৃতভাষার দাবী অপেক্ষাকৃত অধিক সমর্থনযোগ্য। কারণ—

(১) এই ভাষা ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই এখনও অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে সকল প্রদেশের লোকেরাই সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। প্রত্যেক প্রদেশেই অধিবাসীরা স্বদেশবাসীদের নিকট ইহা শিখিতে পারিবেন, সুতরাং কাহাকেও রাষ্ট্রভাষার শিক্ষার জন্য অন্যদেশের নিকটে শিষ্যত্বের অবনতি স্বীকার করিতে হইবে না। এক কথায় ইহা প্রাদেশিকতার গণ্ডী হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মুক্ত।

(২) প্রত্যেক প্রদেশে সংস্কৃতের প্রচলন সত্ত্বেও কেহই অনুভব করেন না যে, ইহার দ্বারা কোনও প্রাদেশিক ভাষার মর্য্যাদা নষ্ট হইতেছে। বরং সকল দেশের লেখকরাই সংস্কৃত

হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এবং সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া স্ব স্ব মাতৃভাষা পুষ্ট করিতেছেন। এ হিসাবে সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় প্রায় সকল প্রাদেশিক ভাষারই মাতৃস্থানীয়। সুতরাং সকলেরই ঈর্ষ্যা-অভিমান ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রভাষার গৌরবদ্বারা বৃদ্ধা মাতার সাদর সম্বর্দ্ধনা করা কর্ত্তব্য।

(৩) সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্পদ্ যথেষ্ট। ইহার ব্যাকরণও এমন উৎকৃষ্ট যে প্রয়োজনমত ইহাতে আরও পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করা যায়। ইহার সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের প্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ-পুরাণ প্রভৃতি বিশ্বমনীষীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। চিকিৎসা, সঙ্গীত, শিল্প ইত্যাদি মানবমাত্রের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়েও মৌলিক চিন্তার পরিচয় এই ভাষায় পাওয়া যায়।

(৪-৭) কোনও কালে ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষা ছিল। এই ভাষায় রাজ-কার্য্য-নির্ব্বাহের কথাও জানা যায়। অতএব ইহার দ্বারা রাজকীয় দপ্তরের কার্য্য এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাববিনিময় সুসম্পন্ন হইতে পারে।

রাষ্ট্রভাষার ব্যবহার-ক্ষেত্রের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেক প্রদেশের অল্প-সংখ্যক শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষেই রাষ্ট্রভাষা অবশ্য-শিক্ষণীয় হইবে। ইংরাজী অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষা ভারতীয়দের নিকটে অনেক সহজ ইহাও সত্য। অতএব এখন হইতে চেষ্টা করিলে সংস্কৃত ভাষায় প্রয়োজন নির্ব্বাহের উপযুক্ত-সংখ্যক লোক যথাসময়ে অবশ্যই পাওয়া যাইবে।

কলিকাতার বিগত হিন্দু-মহাসভায় সভাপতি দূরদর্শী সাভারকর মহোদয় বলিয়াছেন, হিন্দু ছাত্র মাত্রেরই সংস্কৃতভাষা অবশ্য শিক্ষণীয়।

আজ যে হিন্দু সম্প্রদায় 'হিন্দু' বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, তাহার প্রধান কারণ তাঁহাদের নিজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা। সংস্কৃত ভাষা একটু বেশী শিখিলে ইঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম অন্য কোন ধর্ম্ম হইতেই হীন নহে, বরং উহা হইতে অনেক উচ্চ। আর সঙ্গে সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহাও দেখিতে পাইবেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে যে সব গলদ আছে—আপাত-দৃষ্টিতে অন্যত্র তাহার প্রকোপ কিছু কম হইলেও মোটের উপরে তাহাদের গলদ অনেক বেশী।

উভয় দিকের এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা করিতে না পারিলে হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কাহারও মনে দৃঢ়তা আসিবে না। দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া প্রতিযোগিতায় জয় লাভ হয় না। পরাজিতেরা কখনও মানুষের মত হইয়া বাঁচিতে পারে না। হিন্দুকে বাঁচিতে হইলে তাহাকে সংস্কৃত ভাষা শিখিতেই হইবে, নিজের স্বধর্ম্ম ও পূর্ব্বসংস্কৃতি বিষয়ে অজ্ঞতা দূর করিতেই হইবে এবং দৃপ্ত কণ্ঠে বলিতে হইবে, 'আমি হিন্দু, পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, আমার ধর্ম্ম সনাতন, অতএব হিন্দুর আসনও শ্রেষ্ঠ স্থানেই হওয়া উচিত, আমরা কাহারও নিম্নে আসন গ্রহণ করিব না। সংস্কৃত-ভাষায় অজ্ঞতা থাকিলে হিন্দু কিছুতেই বাঁচিবে না। সংস্কৃত ভাষা হিন্দুর একান্ত প্রয়োজনীয়।'

সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন এবং আপেক্ষিক স্বচ্ছলাবস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইঁহাদের সংখ্যাই বেশী, যাঁহারা কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়েন। বয়স অতিক্রান্ত হওয়ায় ইঁহাদিগের খেলা ধুলা ইত্যাদি করিবার তেমন উৎসাহ বা সামর্থ্য থাকে না, সঙ্গীও সুলভ হয় না, অর্ব্বাচীন লেখকদিগের গল্প-উপন্যাসেও ইঁহাদের মন বসে না। এই শ্রেণীর লোকেরা চাহেন শান্তি, এবং ধর্ম্ম আলোচনা। কিন্তু ইঁহাদের সাধারণ শিক্ষা যে প্রকারের তাহাতে ইংরাজী দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব ইত্যাদি পড়িবার সুবিধা হয় না, আবার হয়ত ইঁহারা ঐ সকল ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ও নহেন। কেহ কেহ হয় ত ম্লেচ্ছধর্ম্ম পরিহার করাই কর্ত্তব্য মনে করেন, এদিকে নিজধর্ম্মের আলোচনারও বিশেষ সুবিধা পান না, কারণ, উহার প্রবেশ-দ্বার সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়া। পূর্ব্বে যে পথ উন্মুক্ত করা হয় নাই, এখন এই বয়সে সে চেষ্টা দুষ্কর। এই জন্য বহু লোকে সাধু সঙ্গ করিতে ও ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তৃপ্তিলাভ অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না।

রাষ্ট্রভাষার কার্য্য সংস্কৃত ভাষায় নির্ব্বাহের নিয়ম থাকিলে, কর্ম্মজীবনের মধ্যেই ইঁহাদের অবসর জীবন-যাপনের পথ উন্মুক্ত হইবার সুবিধা হইবে এবং অবসর জীবনে ইঁহাদিগের দ্বারাই সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় প্রভূত সাহায্য মিলিবে, আর ইঁহারাও শান্তি-সুখ-লাভে সমর্থ হইবেন।

দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে

মনে হয় যে, স্কুল-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং শুদ্ধ সংস্কৃতপাঠী অর্থাৎ টোলের ছাত্র যেন দুইটি স্বতন্ত্র জাতি। এক দেশে এক গ্রামে বাস করিয়া এবং মামা-ভাগিনা, খুড়ো-ভাইপো এমন কি সহোদর ভ্রাতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াও ইহাদের ব্যবধান যেন কিছুতেই কমে না, বরঞ্চ কালক্রমে বাড়িয়াই চলিতেছে। অন্য দিকে, বিদেশী এমন কি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীও যদি স্কুল-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্থাৎ ইংরাজীনবীশ হয়, তবে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার সহিত যতটা ঘনিষ্ঠতা করে ইংরাজীনবীশ না হইলে স্বদেশীর সহিতও ততটা করে না। ইহারা মনে ভাবে, নিজে যেন ইংরাজের সজাতি এবং সংস্কৃত শিক্ষার্থীকে ইহারা মনে করে তুচ্ছ, দেশদ্রোহী ও কৃপাপাত্র। আর সংস্কৃতছাত্রেরা গোপনে বলিতে থাকে, ইহারা ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য, ভয়ে ইহাদিগকে এড়াইয়া চলে। তবে নিতান্ত জীবিকার দায়ে ইহাদের মুখাপেক্ষী না হইয়া তাহারা পারে না। ইংরাজী ও সংস্কৃত-শিক্ষিতদের এই ভাব অন্যপ্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গলায় সমধিক পরিস্ফুট ও তীব্র। ইহার ফলে দেশের ক্ষতি কম হইতেছে না। এখনও দেশে বর্ণজ্ঞানহীন লোকের সংখ্যাই বেশী। নেতাগণ প্রচার-কার্যদ্বারা তাহাদিগকে ভুলাইয়া স্বাধীনতার নামে বিদেশীয় বিলাস-ব্যসনের পরাধীনতা কায়েম করিতে চাহেন। কিন্তু সরলচিত্ত জনসাধারণ শান্তির পক্ষপাতী, তাহারা স্বধর্ম্মই চাহে, সুতরাং তাহাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি সংস্কৃত শিক্ষার অনুকূলে। নেতৃবৃন্দ যদি এই আভ্যন্তরীণ বিরোধ মিটাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের নেতৃত্ব সার্থক হইবে। নেতারা যদি নিজকে শাসক-জাতীয় মনে না করেন এবং নিজেরা সংস্কৃত শিক্ষিত এবং শাসিতদিগেরই একজন মনে করিয়া শক্তিবলে প্রধান হইয়া থাকিতে চাহেন, তবে দেখিতে পাইবেন রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাবে ভারতের পক্ষে সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষার নাম উঠিতেই পারে না।

এখন ভাবিতে হইবে সংখ্যালঘিষ্ঠ অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা। সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে তাঁহারা সম্মত হইবেন কি না? আমাদের মনে হয়, অপক্ষপাত বিচার করিয়া তাঁহাদিগেরও ইহাতে সম্মত হওয়া উচিত। তবে এই উদারতার বিনিময়ে তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কোন কোন বিষয়ে বিশেষ স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যদি ঐরূপ ব্যবস্থাতেও তাঁহারা সম্মত না হন, তবে বলিতে হইবে, তাঁহারা আরবী বা ফার্সী অথবা ঐরূপ কোন একটি ভাষার নাম প্রস্তাব করুন এবং হিন্দুগণ তাহাও মানিয়া লইবেন। ফলে ভারতে রাষ্ট্রভাষার কার্য্যে উভয় ভাষারই স্বাধীন ব্যবহার চলিবে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে যেমন সংস্কৃত অপরিহার্য্য, মুসলমানদিগের পক্ষেও তাঁহাদের ধর্ম্ম ও প্রাচীন সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতার অনুরোধে আরবী বা ফারসী অবশ্য-শিক্ষণীয়।

যাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে কাজ করিবেন, হিন্দুই হউন অথবা মুসলমান হউন—তাঁহারা প্রত্যেকেই সংস্কৃত ও আরবী (বা ফার্সী) শিখিতে বাধ্য থাকিবেন। সভাসমিতির কার্য্যও উভয় ভাষায় নির্ব্বাহ হইবে। শক্তিশালী লোকের পক্ষে অপর একটি ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন হইবে না। যাহার শক্তি অল্প, তাহার ইহাতে না আসাই বাঞ্ছনীয়। ইহাতেও ইংরাজী অপেক্ষা ভার লঘুই হইবে।

এইরূপ হইলে আর একটি সুফলেরও বিশেষ আশা থাকে। নিজ নিজ ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অজ্ঞতা বা গোঁড়ামী আছে, তাহা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে এবং একে অপরকে ভাল ভাবে বুঝিতে পারিবে। ব্যর্থ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কেহ কাহাকেও প্রতারিত করিতে পারিবে না। ফলে বিরোধের অবসানও ঘটিবে। তাহাতে উভয় সম্প্রদায় এক দেশেই স্থায়ী শান্তিতে বাস করিতে পারিবে। চিন্তাশীলগণ কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন কি?

পাইস্‌-হোটেল

—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

"২নং ঝাল দু' পয়সা, ঝোল দু' পয়সা, ভাজি এক পয়সা।

৯নং টক এক পয়সা।

৮নং ভাত দু' পয়সা, ডাল এক পয়সা—"

পাইস্‌ হোটেলের পরিবেশনকারীরা কলের পুতুলের মত সমানে এইরূপ চীৎকার করে। খাবার ঘরের একধারে কেরোসিন কাঠের টেবিলের সামনে বসিয়া ম্যানেজিং-প্রোপ্রাইটার লম্বা একটা খাতায় হিসাব টুকিয়া লন।

তিনি কখনও জিজ্ঞাসা করেন, "৪নং ভাত কত বললে?"

উত্তর আসে, "দু' পয়সা।"

সরিষতুল্লা লেনে টিনের একটা চালার নীচে মেঝেয় কুশাসনের উপর সারি বাঁধিয়া একদল লোক খাইতে বসিয়াছে। প্রত্যেকের সামনে একখানা করিয়া মলিন থালা ও তোবড়ানো পিতলের গেলাস। দেখিলে মনে হয়, এই মানুষগুলা শুধু বুভুক্ষার চাহিদাই মিটাইতে আসিয়াছে। এদের আহারে না আছে কোন তৃপ্তি, না আছে স্বাচ্ছন্দ্য।

তাদের চোখের সামনেই তক্তাপোষ ও বেঞ্চির উপর আর একদল বুভুক্ষু অপেক্ষা করিতেছে, তারা ভাতের থালার দিকে চাহিয়া আছে ক্ষুধিত দৃষ্টিতে। একটি লোক থালা ছাড়িয়া উঠিলেই নূতন একজন যাইয়া তাহার স্থান অধিকার করে। চাকর থালা ও গেলাস তুলিয়া মেঝেয় গোবরের ন্যাকড়া বুলাইবারও অবকাশ পায় না।

বড় শহরে বাঁচিয়া থাকিবার যে সংগ্রাম, তার চাপে পড়িয়া এক একটা মানুষ যেন এক একটা ট্রেণের ইঞ্জিনে পরিণত হইয়াছে। ছুটিতে ছুটিতে তারা আসিয়া পড়িয়াছে এই "কর্ণাটকুমার" হোটেলে—যাত্রাপথে আবার কয়েক ঘণ্টা চলিবার জন্য বাষ্প সংগ্রহ করিতে।

মানুষগুলা সবই শ্রান্ত ক্লান্ত—জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত, একজনের মুখে শুধু দেখা যায় একটা আত্মপ্রসাদের ভাব। বাহিরে যাইবার সময় খরিদ্দাররা যখন তাঁর কাছে পয়সা দিতে আসে, তখন লম্বা খাতার উপর হইতে চোখ তুলিয়া একটু হাসিয়া তিনি কাহারও হাতে এক টুকরা মসলা তুলিয়া দেন, কোনও ভাগ্যবান্‌ পায় এক খিলি ছোট পান। নূতন লোক দেখিলে ম্যানেজিং-প্রোপ্রাইটর বলেন, "কেমন রান্না হয়েছে, ভাল তো? আবার আসবেন। বাঙ্গালীর বিজনেস, বাঙ্গালী না দেখলে কে দেখবে? আণ্ডারগ্রাজুয়েট হয়েও আমি এই হোটেল করেছি, বাঙ্গালীর দুর্নাম ঘোচাবার জন্য। লোককে দেখাতে চাই বাঙ্গালীও বিজনেস জানে।"

লোকটি বেশ করিৎকর্ম্মা, ছক্‌কাটা খাতায় নম্বরের পাশে পাশে হিসাব রাখা, খরিদ্দারদের তাগাদা দেওয়া, লোক বুঝিয়া খাতির করা এবং মধ্যে মধ্যে কর্ম্মচারীদের ধমকানো একসঙ্গে এতগুলি কাজ তিনি বেশ স্বচ্ছন্দেই করিয়া যান, মুখে সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে ব্যবসাদারের শুষ্ক হাসি।

সেদিন ভিড় কিছু বেশী জমিয়াছিল। মালিক পরিবেশনকারীদের বারংবারই বলিতে লাগিলেন, "হাত চালিয়ে নাও, দেখছ না অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছেন।" তাঁর ইঙ্গিত বুঝিয়া ভোক্তার দলও তাড়াতাড়ি হাত চালাইতেছিল।

পরিবেশনকারীদের মধ্যে একজন ৬নং সিটের কাছে আসিয়া বলিল, "আপনি খেলেন ত' পাঁচ পয়সা, এখানে ছয় পয়সার কম খেলে থালা ধোয়ার জন্য একটা পয়সা লাগে, তার চেয়ে আর এক পয়সায় বেশী খেয়ে যান।"

৬নং সিটের ভদ্রলোক একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলিলেন, "আমি তো' জানতাম না এ নিয়ম। পরশু 'সুপবিত্রে' পাঁচ পয়সায় খেয়েছি।"

সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের কোণ হইতে প্রোপ্রাইটর বলিয়া উঠিলেন, "এটা সুপবিত্র নয়, কর্ণাটকুমার হোটেল। বাইরে সাইনবোর্ডে লেখা আছে, কর্ণাটকুমার হোটেল, আণ্ডার-গ্রাজুয়েট-পরিচালিত, ছয় পয়সার কম খাওয়ানো হয় না।"

৬নং সিটের ভদ্রলোক পরিবেশনকারীকে বলিলেন, "আর তো' পয়সা নেই; তা'ছাড়া সাইনবোর্ড আমি দেখি নি।"

মালিকের একজন মোসাহেব বলিয়া উঠিল, "ছ'টা পয়সা নেই তো' কর্ণাটকুমারে এলেন কেন?"

সকলের দৃষ্টি পড়িল ছয় নম্বরের উপর। তিনি যেন এতটুকু হইয়া গেলেন। থালার অবশিষ্ট ভাত আর রুচিল না।

তাঁহাকে আরও সঙ্কুচিত করিয়া তুলিল হোটেলওয়ালার একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা, "নেভার মাইণ্ড, বিজনেস্ ম্যান হলেও আমি আগে হেডমাষ্টারী করতুম, তার উপর সাহিত্যিক, নাটক লিখেছিলাম 'কর্ণাটকুমার'। আই এ্যাম নো ওয়ান-পাইস্ ফাদার-মাদার (I am no one-pice-father-mother)।"

৬নং পাঁচটি পয়সা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। মালিক খরিদ্দারদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "ওয়ান পাইস্, হ্যাণ্ডস ডার্ট (one pice, hand's dirt) যাকে বলে হাতের ময়লা হবে কি না প্রতিষ্ঠানের অ্যারিষ্টক্রেসি বজায় রাখবার জন্ম—"

মালিকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই যারা বাকীতে খায় তাদের মধ্যে একদল সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "তা'তো বটেই।"

ছয় নম্বর হোটেলের বাহিরে আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

একটি পয়সাকে কেন্দ্র করিয়া জীবনে যে এইরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে ইহা ছিল তাঁর কল্পনারও অগোচর।

অভাব চলিতেছে আজ বহুদিন, কিন্তু অভাবের কাঁটার খোঁচাটা যে কত তীব্র, তাহা বুঝাইয়া দিল হোটেলওয়ালার ঐ মুচকি হাসি আর বক্তৃতা, "ওয়ান পাইস্, হ্যাণ্ডস ডার্ট।"

ভদ্রলোক একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মাথার উপরে প্রচণ্ড সূর্য্য, পায়ের তলায় গলিত অ্যাশফাল্টমের উষ্ণতা কোনদিকেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

মনে পড়িল, বাল্যের কথা, প্রথম যৌবনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ অভিলাষ। বাল্যকালে তাঁহাদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল, আত্মীয়-স্বজনরা তাঁদের বড় মানুষ মনে করিত—শিশু অকিঞ্চনও ভাবিত, তাহারা ধনী।

সেই যে মেজাজটা তাঁহার গড়িয়া উঠিল ধনীর মত তার জন্ম দুঃখও পাইতে হইল অনেকখানি।

প্রথম যৌবনে তারা কয়টি বন্ধু মিলিয়া বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিল। কেহ হইবে বাংলার শ্রেষ্ঠ আইনজীবী, কেহ দেশনেতা, কেহ দ্বিতীয় বিখ্যাত চিকিৎসক, কেহ বা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। জীবনের সাফল্য ছিল যেন তাদের হাতের মুঠার মধ্যে।

অতীতের সেই কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাত সাতটা তালি দেওয়া জুতার দিকে চাহিয়া অকিঞ্চন পাগলের মতন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তালির ফাঁক দিয়া জুতার দাঁতগুলিও যেন তার সঙ্গে হিঃ হিঃ করিয়া হাসিতে লাগিল।

কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল মনে নাই। প্রথমে তিনি সম্বিত ফিরিয়া পাইলেন, একটু দূরে পাতলুন-পরিহিত এক শীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া।

একদিকে-কাত-হওয়া ছেঁড়া জুতা টানিয়া চলিবার সময় মানুষ যেরূপ দোল খাইতে থাকে মূর্ত্তিটি সেইরূপ দোল খাইতে খাইতে অকিঞ্চনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহার হাতে একটি পুঁটুলি। আরও নিকটে আসিয়া অকিঞ্চনের দিকে একটুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া শীর্ণ মূর্ত্তি কহিলেন, "এ কি ব্রাদার অকিঞ্চন না? তোমার এই অবস্থা?"

তোবড়ানো-গাল ও কোটরগত-চক্ষু প্রশ্নকারীকে অকিঞ্চন চিনিতে পারিলেন না।

আগন্তুক বলিলেন, "একেবারে ফরগেটফুলনেস্ (forgetfulness)? আমি তোমাদের সেই বৃহস্পতি—লজিক ক্লাসের সাইনোশ্যুর অফ দি নেবারিং আইজ (cynosure of the neighbouring eyes)—"

অকিঞ্চন বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "এঁ্যা—"

অকিঞ্চনের মনে পড়িল, কলেজের সুশ্রী উজ্জ্বল এক তরুণ মূর্ত্তি, খালি গায়েও যাকে মহাদেবের মত দেখাইত। লজিক ক্লাসে খুব তর্ক করিত বলিয়া অকিঞ্চন তার নাম দিয়াছিল 'বৃহস্পতি।'

ছাত্রজীবনে 'বৃহস্পতি' বলিয়াই সে পরিচিত ছিল।

'বৃহস্পতি' বা সুরেন বোস ছিল অকিঞ্চনের সেই সব বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম যাহারা মনে করিত, ভবিষ্যৎ বাংলার গৌরবের দীপবর্ত্তিগুলি তাদের কেন্দ্র করিয়াই জ্বলিতে থাকিবে।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া অকিঞ্চন বলিলেন, "তুমিই আমাদের সুরেন বোস না?"

'হেঃ হেঃ হেঃ' করিয়া হাসিয়া সুরেন বোস কহিলেন, "ইয়েস, এডভোকেট অফ দি ক্যালকাটা হাইকোর্ট। তুমি বোধ হয় চেহারা দেখে বিস্মিত হচ্ছ, ওটা কিছু নয় এই ষ্ট্রাগল্ ফর এগ্‌জিস্‌টেন্‌স্ (struggle for existence)-এর ফল। বড্ড খাটুনি। সকাল থেকে কন্‌সাল্‌টেশন আর কনসাল্‌টেশন—আলিপুর আর বালিগঞ্জ, সিনিয়রগুলো সব গিয়ে জড় হয়েছে কি না ঐ পাড়ায়। তুমি কি কচ্ছ?"

অকিঞ্চন বলিলেন, "কিছুই না।"

"তার মানে? সাহিত্য ছেড়ে দিয়েছ?"

"ছাড়ি নি তবে ওটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। বেকারী করছি বলা আর সাহিত্য সৃষ্টি করছি বলা একই কথা।"

"ব্রাদার, কি ফাইন গানই তুমি গাইতে! নিজে লিখে গান গেয়ে ক্ল্যাসকে মাতিয়ে তুলতে।"

অকিঞ্চন কোন উত্তর করিলেন না।

সুরেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেইখানেই আছ তো'?"

"না, আমাদের বাড়ী বিক্রী হ'য়ে গেছে।"

"বল কি হে, বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া সবই তো ছিল। তোমরা তো' ছিলে দস্তুর মত অ্যারিষ্টক্র্যাট।"

"ছিলেন একজন—আমার বাবা। তাঁর সঙ্গে সব ধুয়ে মুছে গেছে।"

"তা হ'লে তো' বড় বিপদে পড়েছ?"

সুরেন অনর্গল বকিয়াই চলিল, "ওল্ড ফ্রেণ্ড, ওল্ড ওয়াইন (old friend, old wine) হেঃ হেঃ হেঃ। ফেডারেল ব্যাঙ্ক, জয়প্রকাশ নারায়ণ, প্যাটেল, আজাদ, চাণক্য—"

কোন কোন কথা অকিঞ্চনের কাণে গেল, কোনটা বা গেল না। তার তখন মনে পড়িতেছিল সেই এক সুরেন বোসকে—কথায় কথায় যে অলীয়তীর স্বপ্ন দেখিত—

মধুপুরে একদিন কোন এক বঙ্গবিখ্যাত সলিসিটরের নাম হওয়ায় সুরেন বলিয়াছিল, "হেঃ হেঃ হেঃ, লোকটা পয়সা পেতে পারে, কিন্তু আমার এ্যাম্বিশন সোর্‌স্ হায়ার ইনটু দি স্কাই (ambition soars higher into the sky)।"

এগার-বার হইতে তিন চার বছর পর্য্যন্ত বিভিন্ন বয়সের গুটিকয়েক ছেলে রাস্তায় ছুটাছুটি করিতেছিল।

সুরেনকে দেখিয়া তাদের মধ্যে একদল সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "বাবা এসেছে রে, বাবা এসেছে।"

একজন ছুটিয়া আসিয়া তাঁর কোট ধরিল, সব চেয়ে ছোটটি ধরিল পাতলুন্।

সকলেরই শুষ্ক-মুখশ্রী, পরণে ছিন্ন ইজার, ছোটটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

দু'জনে পিতার নিকট খাবার চাহিল। বড়টি কহিল, "বাবা, তুমি তো' ভারী মিথ্যেবাদী। সকালে বললে, এই খাবার নিয়ে আসছি, আর ফিরলে দুপুর করে।"

সুরেন তাকে এক ধমক দিলেন, "চুপ্ রও, রাস্কেল।"

সুরেন বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলে দশ এগার বছরের একটি মেয়ে তাঁর হাত হইতে পুঁটুলিটি লইয়া বলিল, "তুমি একটু বসো বাবা, আমি বাতাস করছি।"

বড় ছেলে মণ্টু ভগ্নীর হাত হইতে পুঁটুলিটা ছিনাইয়া লইল, তার ভিতর হইতে বাহির হইল চার পাঁচটি আলু, এক ফালি কুমড়া, গুটি কয়েক শুক্‌না পটল ও একটা পাকা শশা।

বন্ধুর সম্মুখে বাজারের এই স্বল্পতায় লজ্জিত হইয়া সুরেন কন্যার উদ্দেশে কহিলেন, "বাজারে যেতে দেরী হয়ে গিছল, বিশেষ কিছু পেলাম না।"

মেয়েটি কহিল, "এতেই খুব হবে।"

সুরেন বলিলেন, "এইটি আমার মেয়ে সাগর, সাগর বড় লক্ষ্মী মা আমার।"

মেয়েটির উজ্জ্বল চোখ ও শান্ত মুখশ্রী অকিঞ্চনকে স্মরণ করাইয়া দিল, বিশ বছর আগের একটি নব বধূকে। এ যেন সেই সবিতারই প্রতিচ্ছবি। তারই মত ধীর সংযত ভাব। সুরেনের বিবাহ রাত্রেই অকিঞ্চন তার স্ত্রীর নাম দিয়াছিল 'বেলা বৌদি'।

দাদাকে শশা কাটিতে দেখিয়া সাগর কহিল, "হাত কেটে ফেলবে, আমাকে দাও।"

খোসা ছাড়াইবার দেরীও সহিল না, সুরেন বলিলেন, "ওরে ভিটামিন এ. বি. সি. আছে ওতে, খোসা ফেলিস নে।"

সাগর চাকা চাকা করিয়া সকলকেই এক এক টুকরা শশা কাটিয়া দিল। নিজের জন্য সে সামান্য একটু রাখিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার আর কিছু জুটিল না।

সুরেন বলিলেন, "তোর ভাগ থেকে আমার একটু দে, সাগর।"

মণ্টু বলিল, "আমায়—একটু—"

শশার শেষ অংশটুকু মুখে পুরিয়া সুরেন মেয়েকে বলিলেন, "এঁ্যা, তোর একটুও নেই ?"

পিতার এই সহানুভূতিতে মেয়ের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।

সুরেন বলিলেন, "সাগর আমার বড় নির্লোভী মেয়ে। সবিতা চলে যাবার পর থেকে ওই আমাদের খাইয়ে রেখেছে।"

"কতদিন মারা গেছেন বেলা বৌদি—"

"গন্ লং থ্রি ইয়ার্স ব্রাদার, (gone, long three years, brother) আজ তিন বছর চলে গেছে, সেই থেকে অল্ টপসী-টার্ভি (ওলট-পালট)। ছেলেগুলো কুকুরছানার মত রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, আমি কোন্ দিক্ দেখি, প্র্যাক্‌টিস্ না এদের। এ জন্ম ছুটোই সফার (suffer) করছে। কেউ কেউ অবশ্য বলছে, 'বিয়ে করে ফেল, সুরেন'।"

অকিঞ্চন পপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "ডোণ্ট টক্ রাবিশ (don't talk rubbish)।"

সুরেন বলিলেন, ঠিক বলেছ ভাই, আমাদের কি আর বিয়ের—থাক সে তবে কি না লোকে বলে।"

বাড়িরের ঘরখানা খোলার চালা, তার পূবে একটা উঠান, উঠানের পিছনে একখানা ছোট কোঠাঘর।

সাগর পাঁচ ছয়খানা ঘুঁটে দিয়া সেই বারান্দায় একটা উনান ধরাইল, তারপর বসিল আনাজ কুটিতে

সুরেন বলিল, "বেলা হয়ে গেছে এখন আর অত রান্নার দরকার নেই। খিচুড়ী আর ভাজিতেই চলে যাবে। কালকের গোটা কয়েক পেঁয়াজ আছে তাকের উপর। তোর অকিঞ্চন কাকাও খাবেন, বুঝলি ?"

অকিঞ্চন কহিলেন, "আমি খেয়ে এসেছি।'

সাগর খিচুড়ী চড়াইলে তাকে সাহায্যের নাম করিয়া হেঁসেলের পাশে বসিয়া সুরেন পেঁয়াজের কুচি চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "তোকে নাচ শেখাব মনে করছি—তোমার কি মত, অকিঞ্চন ?"

রান্না শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুরেন চাখিয়া দেখিলেন প্রায় আধ বাটি খিচুড়ী।

রান্না শেষ হইলে ধূমায়মান খাদ্যের উপর সবাই ঝাঁপাইয়া পড়িল। ফুঁ দিয়া খাবার মুখে পুরিতে হয়, আঙ্গুল জ্বালা করে, মুখ যেন পুড়িয়া যায়। এই অবস্থায় খিচুড়ীটা ঠাণ্ডা হইবার আগেই ক্ষুধার আগুনের তাগিদ তাকে নিঃশেষ করিয়া দিল। সকলেই চাহিয়া মুছিয়া খাইল। শেষটায় শুরু করিল আঙ্গুল চুষিতে।

একমাত্র সাগরের খাওয়া শেষ হয় নাই। সে ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া খাইতেছিল।

শশার মতন তাহার খিচুড়ীতেও সবাই ভাগ বসাইল।

মুখ ধুইয়া ঢেঁকুর তুলিতে তুলিতে সুরেন কহিলন, "দেরী হয়ে যাওয়ায় পানের কথা ভুলে গিছলুম, আমাকে ও তোর অকঞ্চকাকাকে একটু মসলা এনে দে, সাগর।"

সাগরের মুখ দেখিয়া অকিঞ্চন বুঝিলেন, মসলাও বাড়ন্ত।

সুরেনের তখন খোস মেজাজ, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কি বই বেরুল, ব্রাদার ?"

"একখানাও নয়।"

"বেরোয় নি ? ওয়াণ্ডার, আজকাল প্র্যাকটিস্ নিয়েই ব্যস্ত, সাহিত্যের খবর রাখি না। ভেবেছিলুম, তোমার অনেক বই বেরিয়েছে।"

"প্রকাশকরা বিরূপ, তাই বেরয় নি, বড়দের বই না কি পোকায় ছাড়া কাটে না, তাই অনেক নামজাদা লেখক শিশুসাহিত্যে প্রবেশ করেছেন।"

"আমায় বলনি কেন এতদিন, আমার অনেক প্রকাশক ক্লায়েণ্ট (client) আছে। দেখি কোন মাড়োয়ারীকে বলে যদি ব্যবস্থা করতে পারি।"

অকিঞ্চন বলিলেন, "আমি তো এতদিন কিছু পারিনি। দেখ, তুমি যদি কিছু করতে পার।"

সুরেন কহিলেন, "এদেশে দেখছি প্রতিভার কদর নেই, আইনে অবশ্য—সে কথা ছেড়ে দাও, এই তো সকালে কন্‌সাল্টেশন্ করলাম ব্যারিষ্টার ডব্লিউ. ভোবের সঙ্গে। রাত্রে বাড়ীতে মক্কেল আসবে, বিকেলে আছে লোকাল ইন্‌কোয়ারী (local inquiry)।"

অকিঞ্চন নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে শুনিয়া যাইতেছিল।

সুরেন বলিল, "চাকরীর চেষ্টা না করে ভাল করিনি কি ?"

"তখন হয়তো চেষ্টা করলে অন্ততঃ সাব ডেপুটি হ'তে পারতে, ভাল ছেলে ছিলে।"

"বারে জয়েন করার পরও চেষ্টা করলে হয় তো মুন্সেফ হ'তে পারতাম। কিন্তু গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হ'ত। তা'ছাড়া বারে একটা ভবিষ্যৎ আছে। আকাশ লক্ষ্য করে যে বল ছোড়ে তার বলটা অন্ততঃ তেতলার ছাদ টপকে যায়।"

অকিঞ্চন উত্তর করিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না, আকাশের পরিবর্ত্তে সুরেনের উচ্চাশার বল যে মাটি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে পাতালের দিকে যাইতেছে?

সুরেন বলিল, "তারপর আছে ছেলেমেয়েদের এডুকেশন্; কলকাতায় শিক্ষার যেরূপ সুবিধে, আর কোন যায়গায় তা নেই। তারপর আর পাঁচটা কথাও ভাবতে হয়। এই দেখ, আমার মক্কেল বাগরিয়া একটা ব্যাঙ্ক খুলেছেন। আমি হচ্ছি তার লিগ্যাল্ এডভাইসার। এই ব্যাঙ্কে অনেক বেকার আত্মীয়-স্বজনকে প্রোভাইড করতে পারব।"

অকিঞ্চনের হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইল।

সেদিকে লক্ষ্য না করিয়াই সুরেন বলিল, "তারপর আমার অবর্ত্তমানে (অবশ্য death-এর কথা কেউ বলতে পারে না) ম্যাট্রিক ফেল করেও আমার কোন ছেলে যদি বাগরিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, তা'হলেও সে তাদের উপেক্ষা করতে পারবে না।"

এই সময়ে কাঁদিতে কাঁদিতে হারু ঘরে ঢুকিল, "বাবা আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।"

তার কপালের একটা শিরা কালো হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল। সুরেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "মন্টু, মন্টু— কোথায় গেল এই বড় হারামজাদা।"

মন্টুর সাড়া না পাইয়া চোখ দু'টা রক্তবর্ণ করিয়া সুরেন বাহির হইয়া গেল একটু পরে মাথায়-পিঠে-বুকে-কিল, চড়, ও ঘুষি মারিতে মারিতে মন্টুকে লইয়া সে ঘরে ঢুকিল।

মন্টু নীরবে খানিকক্ষণ মার খাইল। শেষটায় বলিল, "ও আমায় শালা বলেছে কেন?"

হারু বলিল, "ও আগে আমার গুলি কেড়ে নিয়েছে—" ক্রুদ্ধ সুরেনের কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল না। "দাদাকে শালা বলেছিস, ছোটলোক কাঁহাকা", বলিয়া সে হারুর উপর লাফাইয়া পড়িল।

কাতর কণ্ঠে মন্টু বলিল, "ওকে মের না বাবা, দোষ আমার।"

সুরেনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। হিংস্র পশুর মতন তাহার মূর্ত্তি, নিজের বিফলতার জন্যে সে যেন এই শিশুগুলির উপরই প্রতিশোধ লইতে চায়।

অকিঞ্চন সুরেনের হাত ধরিয়া বলিলেন, "করছ কি? মরে যাবে যে ছেলেটা।"

"মরুক—মরে সব ভূত হ'য়ে যাক—যত সব ভাগ্যহীনের দল," বলিয়া ক্লান্ত হইয়া সুরেন তক্তাপোষের একধারে বসিয়া

হারু মন্টু চলিয়া গেল। খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর সুরেন বলিল, "এই জীবন অকিঞ্চন আমাদের দরিদ্রের জীবন।"

এই সময় সদর দরজার কাছে একটা কলরব শোনা গেল। বাহির হইতে ডাক আসিল, "সুরেন-দা।"

সুরেন বলিল, "ও ব্রাদার চকু বুঝি? পাড়ার ছেলেরা— চকু, পল্টু, ছক্কা, গ্যায়সা—আমার ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড এডমায়ারার্স। আমি হচ্ছি এদের ডক্।"

"তার মানে?"

"ডি. ও. সি. (D. O. C.) ড্রামাটিক অফিসার কম্যাণ্ডিং।"

সঙ্গে সঙ্গেই চকু, পল্টু, ছক্কার দলের পুরোবর্ত্তীরা ঘরে প্রবেশ করিল, স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় একদল দাঁড়াইয়া রহিল বাহিরে।

একটি সুশ্রী যুবক কহিল, "দাদাকে ক্লাইব হ'তে হবে।"

"মোষ্ট গ্লাড্লি (most gladly), তুমি যখন বলছ, ব্রাদার গ্যায়সা।"

একজন বলিল, "ওয়াটস্—"

সুরেন কহিল, "আপত্তি নেই ব্রাদার জঞ্জাল।"

একজন প্রস্তাব করিল, মোহনলাল। নাম-ভূমিকা ভিন্ন সকল চরিত্রের কথাই এক একবার উঠিল।

রাস্তা হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, "দাদাকে আলেয়া সাজতে হবে।"

সুরেন বলিল, "কে বলছ আলেয়ার কথা, ব্রাদার সম্মোহন বুঝি? বেশ, তাতেই রাজী। সিরাজ থেকে আরম্ভ করে সখীর পার্ট পর্য্যন্ত যে কোনটা বলে আমি চাষা-ধোবা-পাড়ার এই কিশোর সজ্জকে দেখিয়ে দিতে পারি আমার জিনিয়াস্"—বলিয়াই নারীকণ্ঠে আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল।

ছেলের দল উল্লাস করিয়া উঠিল, "ব্রাভো, ব্রাভো, থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার ডি. ও. সি.।"

সুরেন বলিল, "সিগ্রেট আছে ব্রাদার গ্যায়সা?"

গ্যায়সা কহিল, "সঙ্গে নেই আনিয়ে দিচ্ছি।"

মাতব্বর শ্রেণীর একজন কহিল, "থিয়েটারের আর দিন দশেক বাকী, আজ একটা রিহার্সাল দিতে হবে গ্যায়সাদের বাড়ীতে।"

সুরেন বলিল, "আমার কথা ছেড়ে দাও চকু, একদিনের রিহার্সালে ঠিক করে নেব।"

আর একজন কহিল, "আপনারা ভেটারান্ তা জানি, কিন্তু আজ যে কমিটির মিটিং।"

সুরেন কহিল, "আজ এনগেজমেণ্ট আছে। আমাদের গাঁ থেকে একজন লেঠেল এসেছে। তাকে নিয়ে যেতে হবে একটা সার্ব্বজনীন পূজা কমিটিতে। অদ্ভুত লাঠিয়াল। সে যখন বোঁ বোঁ করে লাঠি ঘোরায় সাতজনেও চেষ্টা করে তার গায়ে একটা ঢিল লাগাতে পারে না। বাঙ্গালার গৌরবের জিনিষ ছিল এই লাঠি খেলা। আমি ছোকরাকে কলকাতার হাই সার্কেলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।"

চকু কহিল, "তা নয় কাল হবে।"

"কাল যে সে রামধন দাসের বাড়ীতে খেলা দেখাবে। রামধন আমার মক্কেল। হাই ক্লাস মুচি, নিজের হাতে মোষ বলি দেয় বলে লোকে ব'লে, মোষে রামধন। মিলিয়নেয়র, নাম শোন নি?"

একটি ছোকরা বলিল, "আপনাকে আমাদের যে দরকার আজই।"

"বেশ যাব, কিন্তু রাত হবে।"

গ্যায়সা বলিল, "বেশী দেরী ক'রবেন না কিন্তু।"

আর একজন বলিল, "সেবার যেমন রাত দুপুরে গিয়ে বললেন, দাওতো একখানা ক্ষুর। আজ কিন্তু—"

"নো ফিয়ার ব্রাদার ছক্কা, কিন্তু তোমরা দেখছি সিগ্রেটের কথা একেবারে ভুলেই গেছ।"

চকু একটা সিগারেট বাহির করিয়া বলিল, "একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম দাদা, সঙ্গেই ছিল, এই নিন।"

সিগারেট হাতে লইয়া সুরেন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নামটা পড়িয়া লইল।

তারপর গ্যায়সার কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন, "চল পান খেয়ে আসা যাক। তুমি একটু বোস অকিঞ্চন, আমি আসছি," বলিয়া বন্ধুর মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

এই বাড়ীতে ঢুকিয়া অবধি অকিঞ্চন অনেক কিছুই দেখিলেন, তার মনে পড়িল অনেক পুরানো কথা। মনে পড়িল সেই বাল্যবন্ধু সুরেন ও বেলা বৌদিকে।

তার মনটা ছেলেমেয়েদের এই দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া বেদনায় ভরিয়া উঠিল।

ঠিক এইরূপ কষ্ট পাইয়া ভুগিয়া ভুগিয়াই হয়ত বেলা বৌদি মরিয়াছে।

হয়ত একদাগ ঔষধও সময়মত পায় নাই। যাক মরিয়া তবু বেচারী রক্ষা পাইয়াছে।

কিন্তু কি শোচনীয় অবস্থা এই সুরেনের। আত্ম-প্রবঞ্চনার যত রকম পন্থা মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে একে একে সবগুলিই সে আয়ত্ত করিয়াছে? নামিয়াছে কতটা নীচে তাহা বুঝিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত নাই তার।

ইন্‌ষ্টিটিউটের একজন নামজাদা আণ্ডার-সেক্রেটারী, ক্যালকাটা পার্লামেণ্টের ডিবেটার সেই সুরেন আর এই—

এই সময় মণ্টু আসিয়া কহিল, "কাকাবাবু একটা পয়সা।"

হারু ও পারু কাকাবাবুর পকেটে ইতিমধ্যেই হাত ঢুকাইয়া দিয়াছিল।

ছোটটি বলিল, "'ক্যারট কেরারী' কাকাবাবু।"

পারু হাসিয়া বলিল, "তুমি কিছু জান না কাকাবাবু, এইবার যাবে—খেতে ঝাল ঝাল, লোস্তা, গরমা গরম ক্যারাট কেরারী।"

তার সুর করিয়া বলার ভঙ্গীতে অকিঞ্চন হাসিয়া ফেলিলেন।

একটি পয়সার অভাব দুপুরে তাঁহাকে অনেক পীড়া দিয়াছে। কিন্তু এই ছেলেমেয়েদের হাতে কিছু দিতে না পারার কষ্ট তাঁকে আরও বেশী করিয়া বিঁধিল।

একটু পরে বারান্দা হইতে সুরেন বলিয়া উঠিল, "বড় হওয়ার রিওয়ার্ড। এ্যাক্টর হিসেবে জানই তো?"

তার হাতে কতকগুলি পান, সিগারেট ও একটা দিয়াশলাই। সন্ধ্যে পর্যন্ত খোরাক হল। "একটা নাও।"

"আমিতো খাই না।"

"ওঃ। গ্যায়সারা বড় লোক কি না, বিশেষতঃ লোকটার টেষ্ট্ ভাল, রেজকি সিগারেট দিয়েছে", বলিয়া সুরেন দ্বিগুণ উৎসাহে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

সেই দিনই রাত আটটার কথা। স্ফীত মুখখানাকে যতটা সম্ভব বেশী ফুলাইয়া গাম্ভীর্য্যের কার্টুন মূর্ত্তি পরিশার হারাণ তবিলদার কর্ম্মচারীদের ভীতি উৎপাদন করিতেছেন।

তাঁর চোখের সামনে একখানা দৈনিক কাগজ, কিন্তু কাগজের আড়াল দিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কর্ম্মচারীদের উপর।

অকিঞ্চন তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "নমস্কার।"

স্বভাব-গম্ভীর তবিলদারের একটা চোখের তারা ভিতরে দুইবার ঘুরপাক খাইল, নাসিকা একটু কুঞ্চিত হইল। দরিদ্র লেখকদের অভ্যর্থনা ও প্রতিনমস্কার করিবার এই ছিল তবিলদারী ভঙ্গী। অকিঞ্চন উহা জানিতেন, তিনি একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন।

হারান একটু সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন—"মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত"।

"বিমান হইতে ভীপুরীতে রুষদের গোলাবর্ষণ"। "মানারহাইম লাইনে প্রবেশ"।

অকিঞ্চন কহিলেন, "আপনি বলেছিলেন পঁয়ত্রিশ টাকায় আমার উপন্যাস 'নিশীথরাতে'—"

মানারহাইম লাইনের ভিতর হইতে গম্ভীর আওয়াজ হইল, "বাজার মন্দা।"

দুইদিন আগে হারাণ এই বইটীর জন্ম পঁয়ত্রিশ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, অকিঞ্চন চাহিয়াছিলেন, পঞ্চাশ।

কিন্তু গরজ বড় বালাই, অকিঞ্চন কহিলেন, "কত দিতে পারেন?"

"কাগজ দুর্ম্মূল্য, কালী দুর্লভ।"

অকিঞ্চন হতাশভাবে কহিলেন, "আচ্ছা, তা'হলে উঠি।"

এইবার তবিলদারের নাকের ডগা হইতে কাগজখানা একটু নীচে নামিল।

তবিলদার বলিলেন, "বড্ড দরকার টাকার?

"হ্যাঁ খুবই?"

দেখি কি আছে। আমাদের পাঁচজনকে নিয়েই কারবার, ব'লিয়া তবিলদার দুটা ড্রয়ার খুলিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে কতকগুলি মোড়ক বাহির করিলেন। মোড়কের টাকা, সিকি, আধুলী প্রভৃতি একত্র করিয়া প্রকাশক বলিলেন, "আপনি দেখছি লাকী ম্যান্।"

অকিঞ্চন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত হল?"

"যা হবে সবই আপনার।"

সমস্ত জড় করিয়া মোট দাঁড়াইল, বাইশ টাকা এগার আনা।

অকিঞ্চন তাহাই লইয়া উপন্যাসের কপিরাইট্ লিখিয়া দিলেন।

পরদিন সকালে সুরেনের দরজায় একখান রিক্স থামিল। ছেলেরা রাস্তায় খেলিতেছিল। তাহারা ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, রিক্সর পা-দানিতে দুটো চুবড়ি, তার একটার মধ্যে কপি, কড়াই শুঁটি, আলু, বেগুন, এবং কতকগুলি চিংড়ী ও ভেট্‌কী মাছ। তাদের কাকার হাতে এক ঝুড়ি খেলনা, হাঁটুর উপর কাগজের বড় একটা বাক্স।

অকিঞ্চন বলিলেন, "তোমাদের বাবা কোথায়?"

মণ্টু উত্তর করিল, "কনসালটেশনে গেছেন।"

জিনিষপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া অকিঞ্চন সাগরকে ডাকিলেন, খেলনাগুলি তখনই ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হইল, কাগজের বাক্স হইতে বাহির হইল কয়েকটি রঙীন্ জামা।

তখন পড়িয়া গেল কাড়াকাড়ির ধুম, হাস্য কলরব। এত খাবার, টফি, ক্যারামেল, সন্দেশ ও পান্তুয়া! এত তো তাহারা কোনদিনই দেখে নাই।

হারু বলিল, "কাকা বড় ভাল।"

পারু তার পিঠে চড়িল, সর্ব্বকনিষ্ঠটি ক্যারামেল চুষিতে চুষিতে চটচটে হাত কাকার গালে বুলাইতে লাগিল।

ছেলেদের খাবার খাওয়াইয়া অকিঞ্চন সাগরের সঙ্গে রান্নার যোগাড়ে বসিয়া গেলেন।

নিজে চিংড়ীর মালাইকারী রাঁধিলেন, লুচি ভাজিলেন, ভেটকি মাছ ও কপির কালিয়া হইল।

বেলা বারটা বাজিল কিন্তু সুরেনের দেখা নাই। অকিঞ্চন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও তোমার বাবা আসছেন না যে সাগর।"

এমন সময় সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল।

অকিঞ্চন দরজা খুলিয়া দেখিলেন, সামনে একটা পশ্চিমা দরোয়ান, জিজ্ঞেস করলেন, "কি চাই?"

"উকীল বাবু খবর পাঠিয়েছেন, আসতে রাত হবে।"

"কেন?"

"তিনি ক্যানিং গেছেন!"

"কি জন্তে?"

"আমাদের বাবুদের সঙ্গে পাখী শিকার করতে।"

অকিঞ্চনের মুখখানা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

সকলে মিলিয়া খাইতে বসিল। সাগর কহিল, "বাবা থাকলে কি মজাই হত কাকা বাবু।"

অকিঞ্চন কহিলেন, "তার আসতে রাত হবে।"

"কি করে জানলেন?"

"ঐ লোকটি বলে গেল সে শীকারে গেছে।"

সাগর দুঃখ করিতে লাগিল, "এই ভাল ভাল জিনিষগুলি বাবা খেতে পেলেন না।"

মণ্টু বলিল, "তা হক গে বাবা তো প্রায়ই নিমন্ত্রণ খান।"

শিশুর দল কাকাবাবুর সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে খাইল। খাওয়া শেষ হইলে অকিঞ্চন গল্প জুড়িয়া দিলেন।

"একদিন ছিল যখন এই জগৎটা ছিল শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া…।"

হারু বলিল, "গাছ পালা, নদ, নদী—কিছুই ছিল না? তখন লোকে খেত কি?"

কি আনন্দেই না অকিঞ্চনের দিনটা কাটিল।

নিজের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা, কর্ণাটকুমারের মালিকের বক্তৃতা, এমন কি, সুরেনের কথাও তিনি তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। এই তার বেলা বৌদির ছেলে-মেয়েরা। আজ তিনি ইহাদের মলিন মুখে হাসি ফুটাইতে পারিয়াছেন।

অনিবার্য্য

—শ্রীগোপাল ভৌমিক

ধূলির স্মরণে প্রদীপ্ত দিনগুলি
নির্ব্বাণ-কামী হলুদ মোমের শিখা
কম্পিত পদে নামে অতলের তলে
আমার জীবনে রাখিয়া অগ্নিলিখা!

মনে মনে ভাবি মুছে দেই নিঃশেষে
যাহা কিছু ছিল, লুপ্ত হয়েছে যাহা
বর্ত্তমানের অনাহত কলরবে
প্রত্যাগমন করিবে কি পুনঃ তাহা?

ভাবি আর ভাবি চিন্তার নাই শেষ
লুপ্ত অতীত, তারি জের টেনে চলি,
আমি যে মানুষ, অতীত-সৃষ্ট প্রাণী
উত্তম জানি, মুখে বাই কেন বলি!

তাই ত অতীত অলক্ষ্যে পীড়া দেয়
ইচ্ছা যখন বল্গা শিথিল করে,
বুদ্ধি আমার স্বপনে হারায়ে যায়
দস্যু অতীত হানা দেয় হিয়া পরে।

ফরাসী শিল্পসংগ্রহশালার পুণ্যতীর্থে

—শ্রীচিন্তামণি কর

প্রায় একমাস হল পারীতে রয়েছি। দু'একজনকে বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাবে পেয়ে তাঁদের সাহচর্য্যে নবাগত হিসেবে আমার অসুবিধা ক্রমে কমে আসছিল। এক সন্ধ্যায় একটি বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে বই দেখছি এমন সময় "বঁসোয়ার মঁসিয় কর" বলে সাদ্ধ্যাভিবাদন জানিয়ে ভাস্কর জাঁ দালুগো আমার কাঁধটা ধরে বেশ খানিকটা নাড়া দিলেন। মঃ দালুগোর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একটি কাফেতে। এঁর মতে শিক্ষকের বিনা সাহায্যে কাজ করাটা বেশী উপকারী। আমি বলেছিলাম, প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অধ্যাপকের সাহায্য অপরিহার্য্য। বেশ তর্ক হল অথচ কেউ কারো মতে এক হতে পারলাম না। মঃ দালুগো বললেন, "শিল্প-সংগ্রহশালায় গিয়ে কাজ দেখে একটি আদর্শ মনে ঠিক করে আমি কাজ করে থাকি, তবে সংগ্রহশালার দ্রষ্টব্যগুলি দেখারও একটি ধারা আছে।" কথাটা খুবই মূল্যবান। মঁসিয় আন্দ্রে লোট ও অনেক বিখ্যাত শিল্প-অধ্যাপককে দেখেছি, অধ্যাপনার সময় কোন একটি ভাল শিল্পরচনার উদাহরণ দিয়ে তাকে কেমন করে দেখে অনুশীলন করতে হবে, তার উপদেশ দিয়ে ছাত্রদের লুভ্র্, লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দিতে। তাঁরা কদাচিৎ তুলি রঙ্ দিয়ে এঁকে দেখান। তাঁরা বলেন, হাত তো কাজ করে না, চোখের আজ্ঞা পালন করে মাত্র। যদি শিল্পী হতে চাও তো আগে চোখ তৈরী করে নাও। মঃ দালুগোকে বললাম, "কেমন করে শিল্প-রচনা দেখতে হবে, তা শিখতেও তো অধ্যাপকের সাহায্য লাগে।" তিনি বললেন, অত তর্কে প্রয়োজন নেই, চল কাল আমরা দু'জনে লুভ্র্ দেখতে যাব। সানন্দে রাজী হলাম এ প্রস্তাবে, কারণ তখনও আমি লুভ্র্ দেখি নি। ঠিক হল, আমরা গল্প করতে করতে পদব্রজেই যাব।

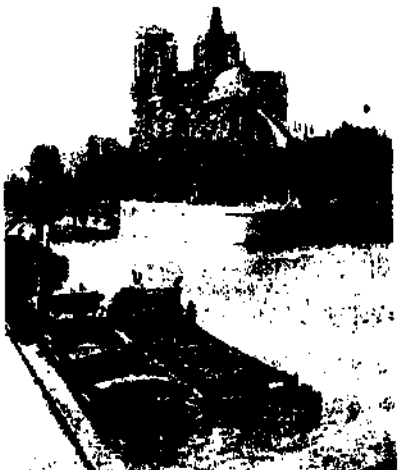
বুল্ভার্দ সাঁমিশেল ধরে কিছু দূর উত্তরে যেতেই আমরা স্তেন নদী পেলাম। তার ধার দিয়ে পশ্চিমে চলতে লাগলাম। এই নদী বৃত্তাকার হয়ে চলে গেছে পারীর বুকের উপর দিয়ে। মাঝে দু'তিন স্থানে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে সহরের মাঝে কয়েকটি দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। এরই একটার শেষ প্রান্তে বিখ্যাত নোত্র্ দাম গীর্জ্জার অবস্থান। নদীর বুকে অসংখ্য সেতু, বহু বুলভার্দকে সংযুক্ত করে গমনাগমনের বেশ সুবিধে করে দিয়েছে। নদীটার দু'ধারে বেশ উঁচু করে সীমেন্ট-কংক্রীটের বাঁধ এবং পাশে প্রকাণ্ড চওড়া বাঁধান চত্বর পারীর সীমানা ছাড়িয়েও কিছুদূর এক-টানা। প্রকাণ্ড গাছের সারি নদীর দু'ধারে চত্বরে, রাস্তায়, জলের উপর ডাল-পাতা ঝুলিয়ে নদীটাকে স্বপ্নময় মনোরম করে তুলেছে। বাঁধের উপর টিনের ঢাকনী দেওয়া অসংখ্য কাঠের বাক্স সারবন্দী ভাবে প্রায় পারীর এক সীমানা থেকে অপর সীমানা পর্য্যন্ত নদীর দু'ধারে সাজান। বহু বিক্রেতা এই বাক্সয় পুরাতন বই, ছাপান ছবি ও পুরাতন নানাদ্রব্যের স্মৃতি-সংগ্রহ ইত্যাদি রেখে বিক্রী করছে। এগুলি দেখে মনে হল, ফরাসী দেশের বিখ্যাত সংগ্রহশালার খেলা-ঘরের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এ রকমের নদীর ধারে বই ও নানা সংগ্রহের দোকান আর কোন দেশে নেই বলে শুনেছি। বই দেখা আমার একটি নেশা। বই দেখতে দেখতে আমরা যেতে লাগলাম লুভ্র্-এর দিকে। মঃ দালুগো সারা পথ তাঁর বংশের প্রাচীন আভিজাত্যের মহাভারত-কাহিনী অনর্গল ইংরাজী ও ফরাসীর খিচুড়ী ভাষায় আমায় বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। যেটুকু আমার কানে গিয়েছিল তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে, তিনি অতি প্রাচীন নরম্যান বংশাবতংস, এবং একেবারে খাঁটী নরম্যান রক্ত তাঁর শরীরে বিদ্যমান। আমরা যখন পোঁ (সেতু) ত্ম আলেকজান্দার-এ পৌঁছলাম, লুভ্র্-এর বিরাট গাঢ় ধূসর মূর্ত্তি চোখে পড়ল। সেতুটা পেরিয়ে বিরাট ফটকের বাঁ'দিকের প্রবেশদ্বার দিয়ে লুভ্র্-এ প্রবেশ করা গেল। লুভ্র্-এর চিত্র-ভাস্কর্য্য সংগ্রহশালায় প্রবেশপথ অনেকগুলি। কিন্তু প্রথম দর্শকের পক্ষে পোঁ ত্ম আলেকজান্দার দিয়ে ক্যারুসেল উদ্যানে প্রবেশ-তোরণের বাঁ-দিকের দরজা সবচেয়ে সুবিধার পথ।

প্যারীর প্রায় সব সৌধেরই বুকে প্রাচীন নবীন অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি জমা হয়ে আছে। লুভ্‌র্-এর বিরাট প্রাসাদ যুদ্ধ-বিপ্লবের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে কয়েক শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেন-এর ধারে। চতুষ্কোণ ক্যারুসেল উদ্যানের



মিলোর মূর্তি।　　—প্যাগে

তিন দিক্‌ ঘিরে, দুটী দিক্‌ প্লাস দ্য'লা কঁকর্দ-এর দিকে লম্বমান। প্রথম এই স্থানে ফিলিপ অগুস্ত একটী দুর্গ নির্মাণ করেন। পরে সম্রাট্‌ প্রথম ফ্রাঁসোয়া ও পিয়ের লোস্‌ক-এর সময় দুর্গটী ভূমিসাৎ করে প্রথমে প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের অংশটী নির্ম্মিত হয়। বাকী অংশটী সম্রাট্‌ ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ লুই-এর সময় তৈরী হয়। পূর্ব্বে যেখানে তুইলারী প্রাসাদ ছিল তার সঙ্গে লুভ্‌র্-এর লম্বমান দুটী দিকের সংযোগ ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কম্যুনিষ্টগণ কর্ত্তৃক অগ্নিসংযোগে প্রাসাদের দক্ষিণ অংশটী বাদে প্রায় সমস্তটাই দগ্ধ হয়েছিল। পরে কেবল মাত্র উত্তরাংশের শেষ অঞ্চলটী পুনঃসংস্কার করা হয়েছে। আমরা ঢুকেই যে বিভাগে এসে পড়লাম, সেটী ফরাসী ভাস্কর্য্যের গ্যালারী। খৃঃ ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতাব্দী থেকে ইতালি শিল্প-ঐশ্বর্য্যে যখন জগদ্বাসীকে বিস্ময়ান্বিত করছিল, ফ্রান্সে তখন গথিক গীর্জ্জার গায়ে ফরাসী চিত্র, ভাস্কর্য্য এক বিশিষ্ট রূপ নিয়ে ভবিষ্যতে শিল্পের এক বিরাট পরিকল্পনাকে সৃষ্টি করছিল। এ শিল্পীদের রচনাশিক্ষা কোথায়, তা আজও পুরাতাত্ত্বিকদের সন্ধান মেলে নি। অনুমান হয়, এরা ফ্রান্সেরই মাটিতেই পেয়েছিল চিত্র-ভাস্কর্য্যের বর্ণপরিচয়-শিক্ষা। এ বিভাগে রক্ষিত প্রাচীন মূর্ত্তিগুলি গীর্জ্জার গাত্র-সজ্জার উদ্দেশ্যে করা হলেও তার মধ্যে শিল্পীর যে সাধনা ও জীবন ফুটে উঠেছে তা আজও কলারসিককে মুগ্ধ করে। ফরাসীরা প্রাচীন সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে। ডুবুরী যেমন সমুদ্রের গভীর তলে মুক্তার সন্ধান করে, ফরাসী শিল্পী, কবি অতীত যুগের স্মৃতি ও সাধনাভরা মন্দির-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের স্তূপে খোঁজে হারিয়ে-যাওয়া, বা বলতে-গিয়ে-থেমে-যাওয়া ভাষাকে। তারা প্রাচীনকে নবীন করে, নতুন রূপ দিয়ে, নতুন কথা বলতে পারে। একবার শার্ত্র-এর বিখ্যাত গীর্জ্জাটি দেখতে গিয়ে আমার ভ্রম হয়েছিল, আমি যেন উন্মুক্ত প্রান্তরে শিল্পশিক্ষার্থীদের ক্লাসে এসে পড়েছি। গীর্জ্জাটীর প্রাঙ্গণ, প্রকোষ্ঠে যে দিকে তাকাই, দেখি শিল্পীদের ভিড়। কেউ জল-রঙে কোন একটি সেন্টের



নোত্রদাম্‌ গীর্জ্জা।

মূর্ত্তির অনুলিপি করছে, কেউ বা তেল-রঙে বা পেন্সিলে কারুকার্য্যখচিত খিলানের জানালায় রঙিন কাঁচের ছবির রূপটি নকল করছে, ইত্যাদি আরও কত কি। এদের জিজ্ঞাসা করলে শুনবেন, এরা এই জীর্ণ মন্দিরে আধুনিক

প্রাণরস দিয়ে এর নির্ম্মাতার দৃষ্টিকে পরিপূর্ণ করে দেখতে চেষ্টা করছে। যে দেখতে জানে সে ঐতিহাসিক যুগের মানব-অঙ্কিত গুহায় বাইসনের রেখাচিত্র, মিশরের স্ফিঙ্কস্, গ্রীসীয় ভাস্কর প্রাক্সিটেলের ভেনাসের ভগ্নমূর্ত্তি, ভারতের বুদ্ধ, নটরাজ, নিগ্রোদের অদ্ভুত-দর্শন কাষ্ঠমূর্ত্তিতে, সমান রস উপভোগ করতে পারে। সে দেখবে, শিল্পী তার ভাবকে কতখানি ভাষা দিতে পেরেছে।

মঃ দালুগো আমায় কতকগুলি কাহিনী বললেন। বলার সময় তাঁর আনন্দোজ্জ্বল মুখভাব দেখে বুঝলাম, মুখে নিজেকে নরম্যান প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেও অন্তরে



স্কেননদীতীরস্থ বিপণি।

তিনি খাঁটী ফরাসী শিল্পী। কোন ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা বা মেরীর একটী কাঠের বিনষ্টপ্রায় মূর্ত্তি একটি কাঁচের আবরণ দিয়ে সযত্নে রাখা হয়েছে। তার সৌন্দর্য্য জীবনে কোনও দিন ভুলব না। আমাদের দেশে কোন কোন মন্দিরের গায়ে যেমন নশ্বরজীবনের অসারতা বিবৃতি করে যে-সকল চিত্র-ভাস্কর্য্য থাকে, ফ্রান্সেও ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ শতাব্দী কি তারও পূর্ব্বের গীর্জ্জাভ্যন্তরে, কবরের উপরস্থ স্মারকমূর্ত্তির তলায়, কীটদষ্ট, গলিতমাংসহীন বিকৃতমূর্ত্তির চিত্র-ভাস্কর্য্য নশ্বর ভোগজীবনের প্রতি অনাসক্ত ভাব জাগাবার জন্য আঁকা বা খোদা থাকত। এ বিভাগে তার কতকগুলি উন্নত ধরণের সংগ্রহ দেখা গেল। সে যুগে, চিত্র-ভাস্কর্য্যে অনেক মূর্ত্তিকে রঙ্ করে আরও জীবন্ত করার প্রচেষ্টা ছিল, তারও কয়েকটি নিদর্শন এখানে রয়েছে। রেনেসাঁস্ যুগের ফরাসী ভাস্কর্য্যের বিচার নিয়ে এখনও সমালোচকরা যুদ্ধ করে থাকেন। এ নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামানই ভাল। যা দেখলাম এবং উপভোগ করলাম পুরাতাত্ত্বিক সমালোকের পর্য্যায়ভুক্ত হলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। পরবর্ত্তীকালে গীর্জ্জা ও ধর্ম্মযাজকের কঠিন বন্ধন থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অধিকার যখন অনেক স্বাধীন হল, তখনকার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীরা এতকাল ধর্ম্ম-আইনে রুদ্ধ ভাবকে প্রকাশ করবার একটা পন্থা খুঁজে পেল।

গীর্জ্জা-কবলিত যুগের ভাস্কর্য্য-বিভাগ ছেড়ে আমরা ষোড়শ শতাব্দীর ভাস্কর্য্য-বিভাগে প্রবেশ করলাম। এই বিভাগের বিরাট হলে, সে যুগের সেরা ফরাসী ভাস্কর জঁা গুজঁর অমূল্য ভাস্কর্য্য-সংগ্রহ, মেরী, সেণ্ট ও মঠ-নিবাসিনী সন্ন্যাসিনীদের মূর্ত্তির স্মৃতিকে ম্লান করে চোখকে সহজে অভিভূত করে দেয়। হলের মাঝখানে গুজঁর খোদিত ডায়না ও মৃগের একটী বিরাট মার্ব্বেলমূর্ত্তি। ডায়নাকে আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু ডায়নার সঙ্গের কুকুরটীকে ভাস্কর্য্য-শিল্পে একটী অপূর্ব্ব দান বলে আমার মনে হল। গুজঁর করা ফঁতাইন দে ইনোসাঁং ফোয়ারার জলকলসযুক্তা চারিটী নারীর লীলায়িত ভঙ্গী জগতের কলারসিকদের চিরকাল মুগ্ধ করে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করবে। এরই পরে চোখকে আকৃষ্ট করে, হলের একটী কোণে তিনটী নারীমূর্ত্তি পরস্পরের হাত ধরে একটি ত্রিকোণাকৃতি স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। এরা একটী সোনালী রঙের আধার মাথায় ধারণ করে আছে। গুজঁর পরে বিখ্যাত শিল্পী পিলঁর নাম করতে হয়। এটী তাঁরই রচনা। যখন সম্রাট্ দ্বিতীয় আঁরি মারা যান, তখন ক্যাথারিন দ মেদিচি, প্রথম ফ্রাঁসোয়া এবং দ্বাদশ লুই-এর সমাধির চেয়ে উন্নততর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করে শোক-প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন। দ্বিতীয় আঁরির হৃৎপিণ্ডটি একটি আধারে সেলস্তাঁ গীর্জ্জায় দেওয়া হয়, সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দ মেদিচির ইচ্ছানুযায়ী পিলঁ এই তিনটী অবর্ণনীয় নারীমূর্ত্তির সৃষ্টি ক'রে তাদের মস্তকে স্বর্ণাধারটি স্থাপন করেন। গীর্জ্জার নীতিতে অশ্লীলতাকে এড়াবার জন্য মূর্ত্তিগুলিকে বস্ত্রপরিহিতা করলেও শিল্পীর রচনা-দক্ষতায় তাদের ললিত তনুর গঠন সর্ব্বাঙ্গে

পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিগত বিপ্লবের সময় মূর্ত্তিটি স্বর্ণাধার সমেত লুণ্ঠিত হয়। মূর্ত্তিটির পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু বেচারী দ্বিতীয় আঁরির হৃৎপিণ্ড বা স্বর্ণাধারটীর আর সন্ধান পাওয়া যায় না। এখন সোনালী রঙের কাঠের নকল একটি আধার তার স্মৃতি বহন করছে। বহু মূর্ত্তিই ছিল হলটীতে। মঃ দালুগো কতকগুলি প্রতিকৃতি দেখিয়ে বহু প্রশংসাই করলেন। সেগুলি সবই প্রায় রাজা রাণী বা বিখ্যাত ধর্ম্মযাজকের মূর্ত্তি। তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব বা রচনানৈপুণ্যের বৈশিষ্ট্য দেখে আমি মুগ্ধ হতে পারি নি

সপ্তদশ শতাব্দীর চতুর্দ্দশ লুই-এর অত্যাচারিত শাসনে ফ্রান্সের মাটীতে রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছিল, আকাশ রণ-দামামার শব্দে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। এ যুগে শিল্পীর সন্ধানে ফেরা মনে হয় বাতুলতা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ-অবস্থাওয়াতেও কয়েকজন প্রকৃত শিল্পী বেঁচে ছিলেন এবং ফ্রান্সকে তাঁরা যা দান করেছেন, তা শিল্প-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। "এ যুগে লুই ফ্রান্সের একমাত্র ব্যক্তি যাঁর শিল্পবোধ ও রুচি আছে," এই ছিল তাঁর চাটুকারদের বন্দনা-বাণী। এটা ঠিক, ফ্রান্সের রুচিকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন। লঁক্রে সম্রাটের রুচিতে শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শিল্পী ও ভাস্কররা রাজপ্রসাদ লাভ করতেন। রাজানুগ্রহ পেয়ে যারা ভেয়ার্সাই ও ফঁতাইনব্লোর প্রাসাদ-উদ্যানকে মূর্ত্তি দিয়ে সাজিয়েছে, তাদের অসংখ্য শিল্প রচনার মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব হারিয়ে গেছে। কেবল অর্থ দিয়ে তো শিল্পীর সাধনাকে কেনা যায় না। তাই যারা রাজপ্রসাদ লাভ করলে, দিতে পারল না রূপের অকৃত্রিম প্রকাশকে। নিজ দেশে নিপীড়িত, বঞ্চিত কিন্তু পরদেশে সম্মানিত অমর ভাস্কর পুগে, দারিদ্র্যের সঙ্গে মিতালি করে জগৎকে জানিয়ে গেলেন, অকৃত্রিম রূপভিক্ষুর ভিক্ষাঝুলি সম্রাটের মুকুট, দণ্ড দান করলেও পূর্ণ করা যায় না। নিজ দেশে অবজ্ঞাত হয়ে পুগে প্রায় জীবনের বেশী অংশটা ইতালিতে কাটিয়ে-ছিলেন। এঁর কয়েকটা কাজ তৃতীয় ঘরে ও একটা উঁচু মঞ্চের মতন ঘরে রয়েছে। বন্যজন্তু-কবলিত এক বিরাট পুরুষের আর্ত্তনাদ মূর্ত্ত হয়েছে মিলোঁ দ ক্রোতন মূর্ত্তিতে। একটী প্রাচীন কাহিনীকে রূপ দিয়েছে এই মূর্ত্তিটি।

প্রায় খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দ পূর্ব্বে মিলো এক বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ছিলেন। তিনি ছয়বার অলিম্পিক ক্রীড়ায় বিজয়মালা পেয়েছিলেন এবং পরে তাঁর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী না পেয়ে ক্রীড়াতে আর বড় যোগ দিতেন না। বনের সিংহ ভালুকদের ধরে শুধু হাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা তাঁর সখের ব্যাপার ছিল। যখন তিনি বেশ বৃদ্ধ, একদিন এক বনের ধার দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন কয়েকজন লোক একটি গাছের কাণ্ড দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করে কৃতকার্য্য হচ্ছে না। মিলো তাদের কাজটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শুধু হাতে সম্পন্ন করতে চাইলেন। কাঠের দুইটি অংশ ধরে তিনি এমন জোরে সম্প্রসারিত করলেন যে, কাঠের কীলকগুলি খুলে পড়ে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তাঁর দুর্ব্বলতা আসায়

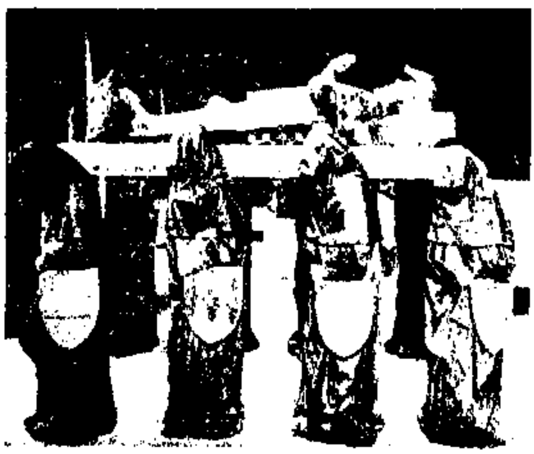


কারুসেল উদ্যান ও লুভর্-এর একাংশ।

মুষ্টিবদ্ধ হাত শিথিল হয়ে কাঠের অংশ দুটির মাঝখানে নিষ্পেষিত ভাবে আবদ্ধ হন। কাঠুরিয়াগণ তাঁকে বিদ্রূপ করে সেই অবস্থায় ফেলে চলে গেল। অত্যাচারিত বন্যজন্তুরা বহুদিন পরে তাদের শত্রুকে এমন অসহায় অবস্থায় পেয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলে।

এই মূর্ত্তিটির আমি প্রশংসা করায় ওদেশী সমালোচকদের কথার প্রতিধ্বনি করে মঃ দালুগো বললেন, "পুগে ইতালীতে থাকার ফলে কতকগুলি দোষ তাঁকে সংস্কারাচ্ছন্ন করেছিল। বন্যজন্তুর কবলে পড়ে ব্যায়ামবীর মিলোর জীবনে শোচনীয় পরিণামটা দেখানোর চেয়ে মাংসপেশী ও দেহ-সংস্থানের দিকে বেশী মনোযোগ দিয়েছেন। সিংহটীর আকৃতির অনুপাতে মিলোর দেহ অতিরিক্ত মাত্রায় বড় হয়েছে, ইত্যাদি।" আমি কিন্তু একটু ব্যথিত হলাম তাঁর কথা শুনে। বুঝলাম নিজের দেশের শিল্পে বৈদেশিক প্রভাবটা এঁদের সহ্য হয় না, এ তারই প্রকাশ। ফ্রান্স ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় ভাস্কর্য্যের গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে

আসছে এবং নব নব শিল্পান্দোলনে অপর দেশকে নিজ ভাবে অনুপ্রাণিত করছে, এর জন্ত ফরাসী শিল্পীর গর্ব্বকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু অপর দেশের শিল্পকে বা তার উন্নত প্রভাবকে ছোট করে দেখা, সংকীর্ণতা বলব। সৌভাগ্যের বিষয় এ সংকীর্ণতা ব্যক্তিগতভাবে মাত্র কয়েকজনের মধ্যেই দেখা যায়। বললাম, "সিংহটিকে ছোট ও মিলোকে বিরাট করাই শিল্পীর উদ্দেশ্য ছিল বলে আমার মনে হয়। মিলো ব্যায়ামবীর, বনের পশু চিরকাল তাঁর কাছে অবনত, হীন ছিল। আজ দৈবদুর্বিপাকে পড়েই মিলো পশু দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছেন। তাই বলে তিনি তাদের চেয়ে



ফিলিপ-এর সমাধি।

ক্ষুদ্র হয়ে যান নি। পশু-শক্তি মানুষী শক্তিকে সময়ে সময়ে নিপীড়ন দ্বারা জয় করলেও মানুষী শক্তি পশু-শক্তির চেয়ে চিরকালই বড়। বোধ হয় শিল্পী এই কথা বলতে চেয়েছেন মূর্ত্তিতে। আমাদের দেশের কবি শিল্পীরা বিষয়বস্তুর প্রাধান্য হিসেবে অতিরঞ্জন করে থাকেন। আপনি হয়তো জানেন না; অজন্তাগুহা চিত্রের একটী দৃশ্যে, বুদ্ধের পুত্র রাহুল মাতার আদেশে বুদ্ধের কাছে পিতৃধন ভিক্ষা করছেন। বুদ্ধকে, তাঁর পত্নী বা পুত্রের চেয়ে বহুগুণ বড় আকৃতিতে এঁকে শিল্পী, সাধারণ থেকে বুদ্ধের মহত্ত্ব এবং বিরাট পুরুষাকার দেখিয়েছেন। এ অতিরঞ্জনকে কি আপনি অশ্রদ্ধা করেন?" মঃ দালুগো হেসে বললেন, "দ্যাগে দেখছি তোমায় কবি করে ছাড়লেন।" বললাম, "না মশাই, আমরা সুজলা-সুফলা-শ্যামলা, রবিকরোজ্জ্বলা দেশের লোক—এ আবহাওয়ায় থাকলে সব কবি হবেই। কল্পনার সম্পত্তি আমাদের যা আছে তা আপনাদের কাছ থেকে ধার না নিলেও কোনদিন ফুরোবে না। কল্পনায় আপনারা জানেন কি? আমাদের বস্তুর বৈচিত্র্যের চেয়ে দৃষ্টির বৈচিত্র্য অনেক বেশী দেখতে পাবেন। দেখতে জানেন না বলেই আপনারা অনেকে আমাদের দেশের শিল্পকে অবজ্ঞা করে থাকেন। আজ বিশ্বের শিল্প-দরবারে আমাদের দেশের শিল্পীর স্থান নেই। তার অবশ্য অন্য যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আপনারা জ্ঞানী, রসজ্ঞ বলে গর্ব্ব করেন, অথচ আমাদের গ্লানিটুকুই দেখেন। হিমালয়ের মত বিরাট ভারতীয় সংস্কৃতিকে একটা ক্ষুদ্র খেয়ালী কবির আবেগ বলতে একটুও কুণ্ঠিত হন না।" মঃ দালুগো লজ্জিত হয়ে বললেন, "মাপ চাচ্ছি কর, আমি উপাহাসচ্ছলে বলেছি। তোমাদের অসম্মান করতে পারি এমন স্পর্দ্ধা করব কিসে! আজও যে জগতের মনের মানুষ, সেরা কবি তাগোর (রবীন্দ্রনাথ) তোমাদের হিমালয়ের মত আকাশ ছুঁয়ে বসে আছেন।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেকগুলি ভাস্করের রচনা এ বিভাগের শেষ প্রান্তের ঘরগুলিতে আছে। নিপুণ ভাস্করের মূর্ত্তিগঠন-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় দিলেও মূর্ত্তিগুলি রচনা-উৎকর্ষের গতি অবনতির দিকে। এ বিভাগে বিদেশীয় ভাস্করদের মধ্যে বিখ্যাত ইতালীয় ভাস্কর বার্ণিনির কতকগুলি অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি ও বিশ্ব-বিশ্রুত ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলোর ক্রীতদাসের বিখ্যাত মূর্ত্তি দু'টীও আছে। এঞ্জেলোর দাসত্ব-বন্ধনে নিগৃহীতের ব্যথা দর্শকের মর্ম্মে আঘাত করে। শিল্পীর সারাজীবনব্যাপী দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের এ আত্মপ্রকাশ কি না, কে জানে! লুভর্ বন্ধ করবার জন্য তাগিদের চীৎকারে আমাদের দেখা সেদিনের মত বন্ধ করতে হল। বাড়ী ফেরার পথে দালুগোকে বহু ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, "মাপ করবেন যদি আপনার মনে আঘাত দিয়ে থাকি। আপনি এত ভদ্রতা করে লুভর্-এ আমায় নিয়ে এলেন অথচ কৃতজ্ঞতার বদলে কি অশিষ্ট আচরণই না করলাম।" মঃ দালুগো আমার কাঁধটী দু'হাতে চেপে বললেন, "এ আনন্দের কথা কর, নিজের দেশের সম্মান সম্বন্ধে সকলেরই সচেতন থাকা উচিত। এ-রকম আলোচনায় আমাদের মনের অনেক গলদ চলে যায়। এস এখন ও সব ভুলে এক কাপ গরম কাফি খেয়ে চিত্ত নির্ম্মল করি।"

আধুনিক যুদ্ধের ব্রহ্মাস্ত্র

—শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৯২৩ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে মিউনিকের রাস্তায় রাস্তায় হিমশীতল ঝঞ্ঝাবাত কর্ধমাক্তের প্রচণ্ড দাপটে ব'য়ে চলেছিল। অ্যাডল্ফ হিটলার এবং তাঁর সঙ্গী অপরাপর জার্মানরা সকলেই শীতার্ত্ত, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির। ভ্রেসেমান্ গবর্ণমেন্ট তখন টলটলায়মান, ওদিকে নিদারুণ অনাহারের কৃষ্ণচ্ছায়া নিঃশব্দে ঘনিয়ে এসেছে সারা রাইশের ওপর।

স্থানীয় মদের দোকানটার ওপরকার বাতায়ন দিয়ে হুল্লোড় করতে করতে প্রচণ্ড শীতের মাঝে গিয়ে পড়ল একদার লোক; তারা জার্ম্মান ন্যাশন্যাল সোশ্যালিষ্ট ওয়ার্কার্স পার্টির কয়েকজন সভ্য, তাদের সাঙ্গে সার দিয়ে আগে আগে চলেছেন তাঁদের লম্বা গোঁফওলা নেতা 'চ্যাপলিন্'। "এগিয়ে চল, এগিয়ে চল" ব'লে হিটলার চেঁচিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলো যোদ্ধ্‌দল স্ফীত গর্জ্জনে এগিয়ে চলল।

দেখতে দেখতে তারা এসে পৌঁছল মিউনিকের ফেল্ডার্ন হলে; তার বাইরে বাভেরিয়ার দ্রুত সন্নিবেশিত পদাতিক সৈন্যদল সজ্জিত হয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল কামান উঁচিয়ে। একজন অফিসার চীৎকার করে শোভাযাত্রা বন্ধ করার নির্দ্দেশ দিলেন; কিন্তু তাঁর সে আদেশ অগ্রাহ্য করা হল, এবং হিটলারও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "কালকে হয় একটা নতুন জাতীয় গবর্ণমেন্টের উদ্ভব হবে, না হয় আমরা দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে যাব। এ ছাড়া আর কোনও তৃতীয় রাস্তা খোলা নেই।"

হঠাৎ কামানগুলো সশব্দে গর্জ্জন করে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ষোলজন লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। দুর্দ্দম অসমসাহসিকতা সত্ত্বেও অল্পবয়স্ক ফুয়েরার্ সেদিন হোঁচট খেয়ে পড়লেন; সেদিন তাঁর ঘাড়টাই শুধু কথঞ্চিৎ স্থানচ্যুত হয়ে গেছিল, এ ছাড়া আর কোনও জখম তাঁকে সইতে হয় নি সেদিন। স্বদেশের সাধারণ বিশ্বাসঘাতক বলে তাঁকে সেদিন লাণ্ডস্‌বার্গের দুর্গে বন্দী করা হল, নিতান্ত দয়াপ্রবৃত্ত হয়েই সেদিন বিজয়ীদল তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয় নি। আর আজ জার্ম্মানীর সর্ব্বেসর্ব্বা হিটলার, তাঁর নিজের গবর্ণমেন্টে সেই দয়াটুকুর বিন্দুমাত্র অংশ দেখাতেও নারাজ!

শক্তি আর অধিকারকে কেন্দ্র করে তাঁর সব অস্পষ্ট ধারণাগুলো বিড় বিড় করে আওড়িয়ে এবং গ্রামোফোন্ রেকর্ড শোনার তন্ময়তায় তেরটি মাস তিনি জেলে কাটিয়ে দিলেন; সেখানে তাঁর জেলের বন্ধু ছিলেন, রেশমী চুলওয়ালা যুবক রুডলফ হেস্,—আজ যিনি 'হিটলারের ডেপুটী' বলে অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করেছেন সাধারণের মধ্যে। হেস্ জেলে বসে বসে তাঁর বন্ধু ও নেতার সমস্ত জীবনকথা লিখে নেন। সেই লেখাই আজ "মাইন্ কাম্ফ্" বলে সবার মাঝে সুপরিজ্ঞাত হয়ে উঠেছে। এর পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে হিটলারের যুদ্ধের অভিজ্ঞতাগুলো সুস্পষ্টভাবে স্থান পেয়েছে। ব্রিটেনের সঙ্গে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে লিপ্ত হতে তিনি সন্ত্রাস অনুভব করেছিলেন, এটাকে আজ আর অনুমান বলা চলে না। কেন না, ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কাজ করবার সময় হিটলার দেখেছিলেন, প্রোপাগ্যাণ্ডার হাত কতখানি, দেখেছিলেন যে, সম্মিলিত সৈন্য-শক্তির বলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স কাইজারকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল, তার তুলনায় এই ব্রহ্মাস্ত্রের শক্তি কত বেশী, কত কার্য্যকরী, কত উগ্র! সেই সূত্র ধরেই "মাইন্ কাম্ফ্"-এ তিনি লিখছেন:

"প্রচার শক্তির অদম্য, দুর্দ্ধর্ষ কৌশলের ব্যবহার লোকের মনে স্বর্গকেও নরক বলে সাংঘাতিক বিভ্রম জাগিয়ে তুলতে পারে।···ছোটখাট মিথ্যার চেয়ে বড় বড় মারাত্মক রকমের অসত্যগুলোকেই সাধারণ লোকেরা গ্রহণ করে অধিক আন্তরিকতা দিয়ে, আর দিশেহারা হয়ে সেই অসত্যের জালেই নিজেদের দুশ্চেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলে।"

ফরাসী সৈন্যদলের মধ্যে ছোট ছোট কামানের গোলার সাহায্যে এই ধ্বংসকারী শক্তির ব্যবহার করবার রীতি প্রচলিত আছে। এক একটি গোলার ভিতরে পাঁচশ' করে ছোট ছোট প্রচার-পত্র থাকে। এই কাগজগুলোকে জার্ম্মান পরিখার ওপর থেকে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এই

ধরণের ব্রিটিশ কামানের মুখটা চওড়ায় ছয় ইঞ্চির বেশী নয়—অথচ এই সব প্রচারপত্র-ভরা কামানের গোলা দশ মাইল পরিব্যাপ্ত শত্রুর জায়গাতেও গিয়ে পড়ে। 'নো ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ডে'র ওপর দিয়ে সংবাদবাহী ছোট ছোট বেলুনগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে আর. এ. এফ. (R. A. F.)-এর বিমান-চালকেরা সারা রাইশের উপর পঞ্চাশ লক্ষাধিক এই ধরণের প্রচার-পুস্তিকা ছড়িয়ে দেয়। তাতে যা' লেখা ছিল তাতে যে কোন দেশের নৈতিক অবস্থার আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘ ও প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের সঞ্চার করতে পারত। এর ফলও হল মারাত্মক; জার্ম্মানদের পরাজয়ের যে সমস্ত ঘটনা এতদিন বহু সতর্কতায় গুপ্ত রাখা হয়েছিল, তা' ছড়িয়ে পড়ল লোকের মুখে মুখে। নিজেদের সৈন্যদল ও গবর্ণমেণ্টের উপর জার্ম্মানদের নিশ্চল আস্থার ভিত্তি ক্রমিক-গতিতে তলিয়ে গেল বিপুল হতাশ্বাস আর হৃদয়ভাঙা নৈরাশ্যে; পরিশেষে পরাজয়ের বিকার ও গ্লানি সারা দেশময় জাগিয়ে দিলে ছন্নছাড়া অবসাদ, নিঃশেষে ডুবিয়ে দিলে তাদের ধ্বংসের ভরাডুবির অতলস্পর্শে।

এক সময় আবার পৃথিবীময় আর এক ধরণের প্রচার-কার্য্য চলত। লীগ অফ নেশন্‌-এর উৎপত্তি হল, সেই প্রতিষ্ঠানের উপর প্রচারকার্য্যের কত কালিই না বর্ষিত হল অনাবশ্যকভাবে; তারপর এল টোট্যালিটারিয়ান্‌দের যুগ, একে একে ইউরোপের ডিক্টেটররা প্রচার-অস্ত্রের 'দোর ধরতে' লাগলেন।

রাশ্যায় সোভিয়েটরা একটা বিরাট এরোপ্লেন তৈরী করল, নাম দিলে তার "মাক্সিম্ গর্কী"। সেই উড়ো-জাহাজটার উপরে ছিল ছাপাখানার পূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম। আকাশে চড়ে তারই সাহায্যে প্রচারের মালমসলা তৈরী হত। তলায় ছিল বড় বড় লাউডস্পীকার, তার ভেতর দিয়ে অগ্নিময় বক্তারা চীৎকার করে আকাশ থেকে প্রচারের স্ফুলিঙ্গ দিতেন ছড়িয়ে। তাঁরা বলতেন, "মাক্সিম্ গর্কী"র প্রবল হুঙ্কারের শব্দ পাঁচ মাইল দূর থেকেও শোনা যেত।

কিন্তু "মাক্সিম্ গর্কী"র আয়ু বেশীদিন গড়াবার আগেই আকাশের এই প্রবল-নিনাদী দৈত্যটা দুনিয়ার বুকে প'ড়ে ধ্বংসের তলে আশ্রয় নেয়, তবু প্রচারকার্যের শৃঙ্খলা ভাঙেনি; অবিরাম অপ্রতিহত গতিতে তারা প্রচারকার্য্য চালিয়ে এসেছে। আর এও তো স্বাভাবিক। দুনিয়ার প্রথম আলোয় মানুষ যেদিন মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান ঘোষণা করেছে, সেইদিন থেকেই এর উৎপত্তি। যুদ্ধের প্রচণ্ডতাকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছে প্রচার-কৌশল, প্রচার-বিজ্ঞান। যুদ্ধে নেমে রোমীয় কন্‌সালরা পর্যন্ত পৌরাণিক, চাই কি কাল্পনিক যুদ্ধজয়ের কাহিনী আওড়েও গৃহে গৃহে সাধারণ, ইতর, অল্পবুদ্ধি জনগণকে উৎসাহে মজিয়ে রাখতেন। স্পেনের ঘরোয়া যুদ্ধের সময় মাদ্রিদের বাইরেকার বিদ্রোহী-দের পরিখাগুলির মাথার ওপর লাউড্‌স্পীকার রাখা হয়েছিল—তার ভেতর দিয়ে বক্তৃতার পর বক্তৃতায় রিপাবলিকান্ সৈন্যদের সারা দিনরাত কুটিলভাবে উৎসাহে, আমোদে ও আহ্লাদে ভরপুর ক'রে রাখা হোত। কিন্তু আজ বাগ্‌যুদ্ধের এ-মারপ্যাঁচ, কলাকৌশল সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হ'য়ে উঠেছে, তার কুচক্র ও ক্রূরতার হাত থেকে নিস্তার পাওয়াও আজ সমধিক দুষ্কর হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য।

গত অক্টোবর মাসে একদিন রাত্রে নাৎসী শর্টওয়েভ্ ষ্টেশন থেকে এক প্রশ্নসূচক ঘোষণা শোনা গেল, "আর্ক রয়্যাল্ (Arc Royal) জাহাজটা গেল কোথায়?" তাতে দাবী করা গেল যে, জার্ম্মান্ বোমাবর্ষীরা এই ব্রিটিশ জাহাজটাকে উত্তরসমুদ্রে আক্রমণ করেছে আর সে সংবাদটা গভর্ণমেণ্ট থেকে চেপে দেওয়া হয়েছে। আর যায় কোথা? রাত্রির পর রাত্রি এই আত্মঘাতী প্রশ্নটা লোকের মনে মনে ভেসে বেড়াতে লাগল, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে আর্ক রয়্যালের কোনও ক্ষতি হয়নি, নিরাপদ নিশ্চিন্ততায় সেটা তখন সমুদ্রপথে বিচরণ করেছে। এইভাবে নাৎসীরা আজগবি মিথ্যা প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগল, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ হুড্ (H. M. S. Hood), রিপাল্‌স্ (Repulse) এবং আরও বহু বৃটিশ রণতরী জলমগ্ন হয়েছে।

ব্রিটেনের শান্ত, নিরীহ, অকপট শ্রোতাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হল, প্রশ্নের ঝড় উঠল,—সত্যই কি জার্ম্মানরা নিছক অসত্যপ্রচারেই সময় নষ্ট করছে? দ্বিধা ও সন্দেহের বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে উঠল। কিন্তু এই বাক্যবিষ-বর্ষণের পিছনে অন্তর্নিহিত গুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল জার্ম্মান্‌দের, ব্রিটিশ রণপোত-সমূহের গতিবিধি আবিষ্কারের।

নাৎসীরা নেহাৎ বোকাও নয়। তারা জানত, ব্রিটিশ রণপোত-সচিবমণ্ডলীর কানে একবার একথা উঠলে সেই সব অসত্য খণ্ডন করতে গিয়ে তারা নৌবহরের প্রকৃত অবস্থান ও সংস্থিতির কথা প্রকাশ ক'রে দেবে। কিন্তু তারা ভেবে দেখলে, রণপোত যখন যুদ্ধকালে সমুদ্রের ওপর থাকে তখন জাহাজের রেডিও একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তার টুঁ শব্দটি যেন কালালোকেও শুনতে না পায়। যাই হোক্ শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রণপোতসচিবরা নাৎসীদের এই চাতুরী ধরে ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ত কিছু মতলব ফেঁসে গেল।

তারই কিছুদিন পরে ব্রিটিশ নৌঘাঁটির ওপর পর পর নাৎসীদের ক'টা বিমান-আক্রমণ চলে; এর পিছনে যে মারাত্মক রকমের অভিপ্রায় ছিল তা' জানাই আছে। কিন্তু বিমান আক্রমণগুলো সবই আন্দাজের ওপর চালানো হয়েছিল, কাজেই সেগুলো ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'য়ে যায়। এইভাবে বাজে অন্তঃসারশূন্য সংবাদ প্রচার ক'রে ক'রে শত্রুপক্ষের আত্মরক্ষার নিগূঢ় তথ্যগুলো জেনে নেওয়ার প্রবল ঝোঁক ইতিপূর্ব্বেই আজকের এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অপরিহার্য্য রকমে বলবান্ হয়ে উঠছে।

জার্ম্মান্ দুর্গসমূহের উপর ব্রিটিশ বোমারু বিমানের আক্রমণের পরে নাৎসীরা কয়েকবার আর্. এ. এফ.-এর কয়েকজন বিমানচারীর মিথ্যা সংবাদ প্রচার ক'রে দেয়; উদ্দেশ্য, এই প্রচারের পরে লণ্ডনের বিমানবাহিনীর সচিববর্গ হতাহতের যথাযথ সংখ্যা প্রকাশ করতে বাধ্য হবেন আর এই সুযোগে নাৎসীরা নিজেদের আত্মরক্ষার ভিত্তিকে কায়েমী ক'রে তোলবার প্রচেষ্টা চালাতে পারবে। ঠিক এই উপায়েই গোড়ার দিকে নিখোঁজ ডুবো-জাহাজগুলির পাত্তা খুঁজে বার করবার চেষ্টা চলেছিল। শুধু তাই নয়,—সমুদ্রগামী একটা বিরাট সাবমেরিন দুঃসাহসিক আক্রমণ সমাপ্ত ক'রে নিজ ঘাঁটে কীয়েল্-এ ফিরে এসেছে ব'লে জোর গলায় নাৎসীরা রটনা করতে থাকে। এই ঘোষণা আগাগোড়াই আজগবি, প্রতারণাত্মক। কাজে কাজেই প্রধান নৌ-সেনাপতি এরিশ রেডার (Erich Render) সমুদ্রে প্রেরিত জলদস্যু জাহাজগুলির সংবাদের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু পোলিশ সৈন্যবাহিনীর ওপর নাৎসীরা যে ক্রূর প্রচারকার্য্যের চাল চেলেছিল তা' প্রচারকার্য্যের ইতিহাসে সত্যিই একটা নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। কোনও এক ছদ্ম বেতার-প্রতিষ্ঠান থেকে একদিন রাত্রে পোল্যাণ্ডবাসীদের উৎসাহিত করবার জন্যে ঘোষণা করা হল, তারা যেন শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপাত ক'রে জার্ম্মানদের এই অবৈধ আক্রমণের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে না ভোলে। তাদের জানানও হ'ল, এ ঘোষণাটা প্রচার করা হচ্ছে কোনও এক ব্রিটিশ বেতার-কেন্দ্র থেকে।

তারপর পোলিশ ভাষায় ইস্তাহার দেওয়া হল,—আর্. এ. এফ.-এর তিনশত বিমান ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে নাৎসীদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে, তারা গিয়ে পৌঁছল বলে! তা ছাড়া আরও বলা হল, ব্রিটিশ নৌবহর ইতিপূর্ব্বেই বল্টিক সাগরে প্রবেশ ক'রে উপকূলস্থ জার্ম্মান নগরগুলির ওপর অবিশ্রাম গোলা বর্ষণ করতে লেগে গেছে।

বিপুল উদ্যমে শেষ প্রচেষ্টায় হতভাগ্য পোল্যাণ্ডবাসীরা আবার আত্মরক্ষার জন্যে নূতন করে সজ্জিত হল, নূতন নূতন সেনাদল গঠন করল, স্ত্রীলোক ও শিশুদের অসহায় ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকার মাঝে নামিয়ে দিল; বিপুল নৈরাশ্যের মাঝেও একটিমাত্র ক্ষীণ আশার স্তিমিত শিখা জেগে রইল, হয়ত তারা ব্রিটিশের সহায়তায় আত্মরক্ষা করলেও করতে পারে।

দিনের পর দিন নৃশংস মানুষ-জবাই চলতে লাগল, ওদিকে রাতের পর রাত বিভীষিকার প্রচণ্ড উত্তাপে পোল্যাণ্ডবাসীদের খিন্ন জীবন পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেল। কিন্তু ওই উৎসাহ-জাগানো বেতার কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে আর কোনও সাড়াশব্দ এল না; হতভাগার দল কান পেতে থাকে বেতার-যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ে, আর তাকিয়ে থাকে ওপর পানে আকাশের দিকে ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হ'য়ে। কোথায় সেই ভুয়ো বেতার-প্রতিষ্ঠান আর কোথায় ব্রিটিশের মিত্রশক্তি! এদিকে পোল্যাণ্ডের উপর নাৎসী আক্রমণ জেঁকে বসল, তার সামনে বিরাট পোলিশ সৈন্যদল পঙ্গপালের মত দলিত, পিষ্ট হ'য়ে ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যেতে লাগল। আসলে কিন্তু সিগফ্রিড লাইন

তখনও অটুট, অভেদ্য হয়ে রয়েছে, ভেষ্টারপ্লাট (Westerplatt)-এর অবরুদ্ধ সেনাদলের সাহায্যকল্পে মিত্রশক্তিবর্গের একখানিও যুদ্ধে জাহাজ এসে পৌঁছয়নি।

এর প্রতিক্রিয়ার মারাত্মক বিষ ছড়িয়ে পড়ল সারা পোল্যাণ্ডের দেহে, কাল্পনিক জয়স্তম্ভ হল ধূলি-ধূসরিত, আশার শিখা গেল নিভে; তারপর নাৎসী বেতার-কেন্দ্র থেকে পুনরায় অস্ফুটভাবে আর একটা নূতন যুদ্ধে তাদের ভাতিয়ে তোলবার চেষ্টা করলে সেখানকার বড় বড় বক্তারা কিন্তু আত্মরক্ষার সকল আশা তখন ওরা ছেড়ে দিয়েছে; পোল্যাণ্ডের বড় বড় মাতব্বররা ওদিকে নেমকহারামি করে নিরুপায়ভাবে তাদের ফেলে রেখে নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন।

ওয়ারস-তে এই অকপট দুঃসাহসী বীরের দল তখনও পরিষ্কার ক'রে জানতে পারে নি যে তারা আগাগোড়াই নির্ম্মমভাবে প্রতারিত হ'য়ে এসেছে; ছদ্ম ব্রিটিশ বেতার-প্রতিষ্ঠান যে জার্মানদেরই আর তার ভেতর দিয়ে তারা শুধু মন-ভুলানো খবরই প্রচার করে এসেছে এটা তখনও তাদের ধারণায় আসেনি। তাদের এই নিরীহতার মাশুল দিতে হল শোচনীয়ভাবে—পোল্যাণ্ডের প্রতিরোধশক্তি একেবারে চূর্ণ হয়ে গেল, প্রচারকার্য্যের গুণেই হিটলারের বরাতে একটা লোভনীয় উপনিবেশ জুটল একথা মানতেই হবে।

প্রবন্ধটা শেষ করবার আগে একটা কথা বলে নিই। আমেরিকার ইন্‌ষ্টিটিউট ফর্ প্রোপাগাণ্ডা এ্যানালিসিস্ (Institute for Propaganda Analysis) থেকে এই প্রচারকার্য্যের একটা মনোরম সংজ্ঞা দিয়েছেন সেখানকার প্রচার-সচিবরা, সেটা হচ্ছে, সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত কার্য্য বা মতামতের একটা চরম প্রকাশ, যার পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে অপরাপর সম্প্রদায় ও ব্যক্তিবর্গকে সহজেই সেই কার্য্য বা মতামতে পরিচালিত করা, সেই দিকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, আর সেই গুপ্ত উদ্দেশ্যের বীজ বপন করতে হয়, অতি প্রত্যূষে, তবেই অভিপ্রায় ভবিষ্যের পানে ফলবতী হয়ে ওঠে।

প্রত্যাশা

—শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

কৃপণের ঘরে বসতি তোমার
মমতাবিহীন প্রাণ;
অজর, অমর, ভাবে যে নিজেরে
তার প্রতি তব টান
জানি তোমা আমি, ধরণী-মাঝারে
অসীম শক্তি ধর;
অভাগা দীনের হৃদয়-রক্ত
তুমি যে গো পান কর।
বিশাল গিরির মাথা নত হয়
ইসারায় তব জানি;
অসীম সাগরে বাঁধিবার বল
আছে তব তাও মানি।
মূর্খও তব কৃপা লাভ করি'
গণ্য মান্য হয়;
অনৃতে সত্য, কর পরিণত
নাহি তব পরাজয়।
চক্রী, গর্ব্বী, দাম্ভিক তুমি
ধরায় তাব যে সখা;
বহিরাবরণ, উজ্জ্বল তব
হৃদয় গরলে ভরা।
অসাধ্য-সাধন, করিবারে পার,
গুণী বট ভুল নাই;
মর্ত্ত্য তোমার, শাসনের ভূমি
স্বর্গে ত নাহি ঠাঁই!
প্রত্যাশা মোরে পরপ্রত্যাশী
ক'রো না পূজি না বলি;
কৃপাকটাক্ষে মোরে দেখো যেন
যাই গান গেয়ে চলি।

সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা

—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

জলন্ধরের ঘটনা

১১ই মে মীরাটের দারুণ সংবাদ ও পরদিনের দিল্লীর পতন-সংবাদ পাঞ্জাবের চিফ-কমিশনার সার জন লরেন্স ও জুডিসিয়াল কমিশনর রবার্ট মণ্টগোমারি প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। লাহোর, মিয়ানমীর, রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি যেখানে যেখানেসৈন্য নিবাস, সেখানকার প্রায় সর্ব্বত্রই সিপাহীর সংখ্যা গোরা সৈনিক-সংখ্যার চতুর্গুণ—সিপাহী এখানে বিগড়াইলে উপায়? পাঞ্জাব যুদ্ধের পরে পাঞ্জাবী শিখ ও মুসলমান নিরস্ত্রীকৃত হইলেও সুবিধা পাইলেই অসন্তুষ্ট সিপাহীদিগের সহিত যোগদান করিতে পারে। অর্থপ্রাপ্তির কারণে আফ্‌গানিস্থান (পাঞ্জাবের সন্নিকটে) কোম্পানীর সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলেও কোম্পানীর দুঃসময় যদি হয় আমীর কি করিবে কে জানে? রাজপুরুষদিগের ভাবনার অন্ত রহিল না।

ভাবনা যে অমূলক নহে, কয়দিনেই বুঝা গেল। গোপন সংবাদ পাওয়া গেল, লাহোর দুর্গের ২৬ নং রক্ষী বদলের দিন (১৫ই মে) ২৬ নং-এর বদলী সৈন্য, ৪৯ নং মিয়ানমীর হইতে আসিলেই দুই দলে মিলিত হইয়া একযোগে দুর্গ দখল করিবে। সর্ব্বনাশ! সিপাহীর মোট সংখ্যা তখন যে হইবে সহস্রাধিক। তাহাদিগকে লাহোরে অবস্থিত মাত্র ১৫০ জন শ্বেত সৈন্য বাধা দিবে কেমন করিয়া? কেবল লাহোর নহে, ফিরোজপুর, ফিলোর, জলন্ধর, অমৃতসর এবং অন্যান্য অনেক স্থান হইতে সিপাহী-ষড়্‌যন্ত্রের সংবাদ পাওয়া গেল। ভাবনা বাড়িল ইহাতে দ্বিগুণ।

মিয়ানমীরে প্রায় ২,৫০০ সিপাহী ছিল। গোরা সৈন্য সেখানে তখন প্রায় ছয়শত। স্থির হইল, সর্ব্বপ্রথমে মিয়ানমীরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করা কর্ত্তব্য। কার্য্য বিপজ্জনক হইলেও তাহা করাইতে একজন সহযোগীকে লইয়া মণ্টগোমারি স্বয়ং তথায় যাত্রা করিলেন। মিয়ানমীরে পৌঁছাইয়া তথাকার ব্রিগেডিয়ার কর্ব্বেটের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি স্থির করিলেন, ১৩ই মে প্রাতে সিপাহীদিগকে নিরস্ত্রীকৃত করা হইবে। ১২ই মে দিবা বা রাত্রিতে সিপাহীরা ঘুণাক্ষরেও একথা জানিতে পারিল না। অতি বিলম্বে তাহাদিগকে জানান হইল, ১৩ই প্রাতঃকালে কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইবে। যথাসময়ে যথাক্ষেত্রে সশস্ত্র তাহারা হাজির দিল।

গোরা কামানবাহিনী ও পদাতিক প্রস্তুত হইয়া গেল। সৈন্যবাহিনী এমনভাবে সাজান হইল যাহাতে সিপাহীরা কার্য্যসিদ্ধির পথে কোন মতে বাধা দিতে না পারে। কামান দাগিবার জন্য জ্বলন্ত মশাল লইয়া গোলন্দাজ দণ্ডায়মান; পদাতিক বন্দুক দাগিতে প্রস্তুত। সিপাহীরা তাহা দেখিল। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিবার হুকুম দিল—অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিপাহীরা আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইল—অবাধ্য হইলে কামানের মুখে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। নিরাপদে ও নিরুদ্বেগে নিরস্ত্রীকরণ-কার্য্য সম্পন্ন হইল।

ইহা সম্পন্ন করিয়া ১৪ই মে লাহোরের কেল্লার ২৬নং সিপাহী দল আকস্মিক গোরা সৈন্যের তথায় উপস্থিতিতে ও সাহায্যে নিরস্ত্রীকৃত হয়। কর্ত্তৃপক্ষ ১৫ই মের ষড়্‌যন্ত্র সাধন নিবারিত করিল এইভাবে। সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকাদিগের ভবিষ্যৎ বিপদ্‌-সম্ভাবনার হস্ত হইতে রক্ষা করার আয়োজন করা হইল। অর্থাদি নিরাপদ স্থানে রক্ষিত হইল।

অমৃতসরের 'গুরুগোবিন্দ'-নামক গড়টী শিখ-গুরু, পুণ্যস্মৃতি গুরুগোবিন্দের নামে স্থাপিত। এই দুর্গেই পূর্ব্বে বিশ্ব-বিশ্রুত হীরক কোহিনুর রক্ষিত হইত। অমৃতসরের শিখ যেমন ধর্ম্মপ্রাণ, তেমনি তেজস্বী ও বীর সুতরাং সে সময়ে গোবিন্দগড় কোম্পানীর হস্তচ্যুত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। দিল্লীর পতন-সংবাদে কালবিলম্ব না করিয়া মণ্টগোমারির পরামর্শে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ সতর্ক হইল। লাহোর হইতে গোবিন্দগড় রক্ষার জন্য ৮১নং গোরা সৈন্য প্রেরিত হইল, তাহাতে তথায় গোলযোগের আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না।

ফিরোজপুরে সিপাহীদের লইয়া কোম্পানীকে কিছু ব্যতিব্যস্ত পড়িতে হয়। সিপাহীদিগের সম্বন্ধে নিরস্ত্রীকরণ পন্থায় সাফল্য লাভ করিতে কর্ত্তৃপক্ষ হিমসিম খাইয়া যায়। নিরস্ত্রীকরণ হইবার সম্ভাবনায় সিপাহীরা কোথাও কোথাও লুঠতরাজ করে, কোথাও কোথাও বা অগ্নিকাণ্ড করিয়া বসে। এই উপলক্ষ্যে কোম্পানীর ২১১ জন গোরা অফিসারও নিহত হয়। ব্যাপার বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের হুকুমে একদল সিপাহীর (৫৭নং) অস্ত্রাগার অগ্নিসাৎ করিতে হয়। আর এক দলের (৪৫নং) অস্ত্রাগার জোর করিয়া কোম্পানীকে কাড়িয়া লইতে হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীদের নিরস্ত্রীকৃত করা হয়। জলন্ধরে সিপাহী-দিগকে বশে রাখিতে কর্পূরতলার নবীন নৃপতি রণধীর সিং সৈন্য ও কামান দিয়া কোম্পানীকে সাহায্য করায় সিপাহী নিরস্ত্রীকরণ পন্থা তথায় অবলম্বিত হয় নাই। জলন্ধর শাসনে থাকায় ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ যথা হোশিয়ারপুর, কাঙ্গরা ও নুরপুরের স্বল্প-সংখ্যক সিপাহীরা কোনও প্রকার গোলমাল করিতে সাহস করে নাই। ফিলোরের সিপাহীরা কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যের সাহায্যে নিরস্ত্রীকৃত হয়।

এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া সূর্য্যকুমার তাঁহার দিন-লিপিতে বলিতেছেন: "১২, ১৩ বা ১৪ই মের মধ্যে পঞ্জাবের এই সকল স্থানে সিপাহী-উত্থানের সম্ভাবনা কর্ত্তৃপক্ষ প্রশংসনীয় ভাবেই রোধ করেন। জুডিসিয়াল কমিশনর ও চিফ কমিশনরের তৎপরতার জন্যই ইহা সুসম্পাদিত হয়।"

পাঞ্জাব-প্রান্তে পেশোয়ার ও কোম্পানীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, খাইবার গিরিসঙ্কটের সন্নিকটবর্ত্তী ও আফগান-দিগের শ্যেনদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। পেশোয়ার পূর্ব্বে আফগানদেরই ছিল—মহারাজ রণজিৎসিংহের সৈন্য আফগানদিগকে তথা হইতে বিতাড়িত করে। পঞ্চনদ কোম্পানীর দখলে আসিলে তাহার সঙ্গে পেশোয়ারও আসে। সিপাহী-উত্থানের সুযোগে আফগানিস্থান কর্ত্তৃক পেশোয়ার পুনরধিকার করার চেষ্টা করা অসম্ভব নহে—কোম্পানীর এইরূপ মনে হয়। সিপাহী সৈন্য তথায় দশ হাজার, ইউরোপীয় সৈন্য মাত্র আড়াই হাজার। এখানে সিপাহী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলে তাহাদের সঙ্গে সীমান্তস্থিত দুর্দ্ধর্ষ আফ্রিদি, ইউসফজি প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতির যোগদানের সম্ভাবনা খুবই। এই বিপদের সম্ভাবনা হইতে এ সময়ে কেমন করিয়া উদ্ধার পাওয়া যায়, এই হইল কর্ত্তৃপক্ষের ভাবনা। সার জন লরেন্স বহু গবে-ষণার পর স্থির করেন, শিখ ও আফগানদিগকে সৈন্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত করা এ ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত। এই দুই জাতিই পূর্ব্বদেশীয় ও মোগল সেনার উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন, সুতরাং উপস্থিত অবস্থায় কোম্পানী ইহাদের দ্বারা প্রভূত সাহায্য পাইবে। এ বিষয়ে লর্ড ক্যানিং সার জনকে সমর্থন করেন। কাল-বিলম্ব না করিয়া নূতন এই সৈনিক দল গঠিত হয়। ফকির সন্ন্যাসী ও বিদেশীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ডাকঘরে দেশীয়ের পত্রাদি পরীক্ষা ও সিপাহীদিগকে ভাগ ভাগ করিয়া রাখা প্রভৃতি সকল কার্য্যেই কর্ত্তৃপক্ষের তৎপরতা বাড়িয়া যায়। কোষাগার, কোর্ট, খেতাঙ্গিনী ও তাহাদের পুত্রকন্যা প্রভৃতির রক্ষাকল্পেও উদ্যোগ আয়োজনের অবধি থাকে না। কামান সহ শান্তিরক্ষক যেখানে যেখানে প্রয়োজন, সেখানে সেখানে টহলদারী করিতে থাকে।

এই সকল ব্যবস্থা যখন কার্য্যে পরিণত হয় তখনও পেশোয়ারের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্রীকরণের কোনও কথা হয় নাই। ২১শে মে পেশোয়ার হইতে ২৪ মাইল দূরে নৌসেরায় সিপাহী-দল কোম্পানীর বিরোধী হওয়ার সংবাদে কিন্তু পেশোয়ারের কর্ত্তৃপক্ষ পেশোয়ারের সিপাহীদিগকে আর সশস্ত্র রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। তথাকার পাঁচ দল সিপাহীর (পঞ্চম অশ্বারোহী, ২১নং, ২৪নং, ২৭নং ও ৫১নং) মধ্যে ৫১নং ব্যতীত অপর চারি দলকে নিরস্ত্রীকৃত করা স্থির হইল। এই সকল সিপাহী অবিশ্বাসী নহে, দলের ইউ-রোপীয়ান অফিসারয়া এক বাক্যে বলিয়া নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবের ঘোর প্রতিবাদ করিলেও উপরওয়ালা নিরস্ত্রীকরণ অনুজ্ঞা বলবৎ রাখেন এবং পরদিনে চারি দলকে নিরস্ত্রী করা হয়। দুঃখে, ক্ষোভে তাহাদিগের ইউরোপীয় অফিসাররাও সেই সময়ে তাহাদের তরবারি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। সিপাহীরা বিনা বাক্যব্যয়ে অস্ত্রত্যাগ তো পূর্ব্বে করিয়াই ছিল। তাহাদিগের অফিসারদিগের তাহা-দিগের অপমানক্ষুব্ধ দেখিয়া নীরব কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ধীরে ধীরে স্ব স্ব শিবিরে খালি হাতে চলিয়া যায়। এইরূপে বিনা বাধায় এই চারি দল নিরস্ত্রীকৃত হয় (২২শে মে)। পরদিনে ৫১নং দলের নিরস্ত্রীকৃত হইবার পালা। ৫৫নং

দলের অধ্যক্ষ কর্ণেল স্পটউড্ ওজস্বিনী ভাষায় এই দলের বিশ্বস্ততার কথা কর্তৃপক্ষের গোচর করিয়া কর্তৃপক্ষকে এ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। কর্ণেল তাঁহার সৈন্যদলের প্রত্যেককে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। নিরস্ত্রীকরণে তাঁহার প্রিয় সৈনিকগণের ঘোর অপমানের চিত্র কল্পনায় দেখিয়া নিজ কক্ষে রিভলভারের সাহায্যে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাহাতে হাবিলদার সিপাহীদের চাঞ্চল্যের অবধি থাকে না। সর্দ্দারের মৃতদেহের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া তাহারা পলায়ন করে। পলায়ন করিয়াও তাহারা নিস্তার পায় নাই। কেহ কেহ সুদূর কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী হইলেও ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পথিমধ্যে হত, আহত ও ধৃত হয় অধিকাংশ।

এই সময়ে জলন্ধরের সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় তাহারা প্রকাশ্যভাবে কোম্পানীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। সে বহ্নি নির্ব্বাপিত করা কোম্পানীর সাধ্যায়ত্ত হয় নাই। জলন্ধরে বহু অনিষ্ট সাধন করিয়া তাহারা ফিলোরের সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হয় এবং দুই দল একযোগে দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করে। কোম্পানীর সৈন্য তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে। শতদ্রুর অপর পারে দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়—নাভা-রাজের সৈন্য কোম্পানীর পক্ষে যুদ্ধ করে। কিছুতেই কিছু হয় না। কোম্পানী-পক্ষ হটিয়া যায়। সিপাহীরা লুধিয়ানায় যাইয়া তথাকার সিপাহীর সহিত মিলিত হইয়া লুধিয়ানা তছনছ করে। অগ্নিকাণ্ড, লুণ্ঠন, কারাগার ভঙ্গ ও বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান তাহারা অবাধে করে। এ কার্য্যে স্থানীয় গুজর, বিতাড়িত কাবুলী ও কাশ্মিরী শালওয়ালা তাহাদিগের সহিত যোগদান করে। এই সকল করিয়া সিপাহীরা দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইয়া সত্বর দিল্লীতে গিয়া পৌঁছায়। ইহার পরে ইয়োরোপীয় সৈনিক লুধিয়ানায় উপস্থিত হয় এবং তথায় শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোযোগী হয়। সিপাহীর সাহায্যকারীদের মধ্যে যাহাকে যাহাকে পাওয়া যায়, তাহাদের অধিকাংশই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অবশিষ্টের কারাদণ্ড হয়।

পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া ডাঃ সর্ব্বাধিকারী পেশোয়ার সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "পাঞ্জাবের সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয় অফিসারদিগের প্রতিবাদ তখন যত সঙ্গতই হউক, দিনকাল তখন যাহা বিশ্বস্তকেও নিরস্ত্রীকরণ তখন দায়ে পড়িয়াই কর্তৃপক্ষ করেন। জলন্ধরে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের দ্বিধাভাবই বিপদ ঘটায়।"

দিল্লীর সন্নিকটে কোম্পানী শিবির

পলাশী যুদ্ধের পরে শত বর্ষ সমাপ্ত, ২৩শে জুন।

বুদলিকা সরাই-এর যুদ্ধের পরে ইংরাজ শিবির দুরাক্রম্য অথচ নিজেদের সর্ব্বরকমে সুবিধাজনক (দিল্লী নগরের যে অংশ পাহাড়ের দিকে সেই দিকে) উপত্যকায় সন্নিবেশিত হয়। সেনাপতি বার্ণাডের অধীনে তিন হাজার ইয়োরোপীয় সৈন্য, ২২টি কামান, গুর্খা সৈন্য (একদল) এবং পাঞ্জাব হইতে প্রেরিত সৈন্যে শিবির পরিপূর্ণ থাকে। শিবির-স্থান সিপাহীর পক্ষে অনাক্রম্য হইলেও এবং অন্যান্য বিষয়ে নিজেদের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও সেই পাহাড়ের দিক্ হইতে দিল্লী নগরীর যতটুকু দেখা যায় ততটুকু ব্যতীত নগরীর অন্যান্য দিকে বার্ণাড বা তাঁহার সহযোগীদের লক্ষ্য রাখিবার সুবিধা ছিল না, অথচ সিপাহীর গতিবিধি সেই সেই দিকে, সুতরাং তাঁহাদিগের জানিবার উপায় থাকে না।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে থাকে, কিন্তু যে-সৈন্য বার্ণাডের অধীনে তাহা দিল্লী আক্রমণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বার্ণাডের মনে হয় নাই, অধিকতর কোম্পানী-সৈন্যের সমাবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত দিল্লী আক্রমণ বিপজ্জনক বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। শিবিরাভ্যন্তরে বার্ণাডকে বসিয়া থাকিতে হয় অনেক দিন। না থাকিয়া কি করেন? দিল্লীর সৈন্যের সহিত নানাস্থানের বিদ্রোহী সৈন্য দিন দিন মিলিত হওয়াতে সৈন্য-সংখ্যা দিল্লীতে তখন ঠিক কত তাহা বাহিরের কাহারও জানা না থাকিলেও তাহা যে কোম্পানী-বাহিনীর চতুর্গুণেরও অধিক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না। দিল্লী-রক্ষায় সিপাহীদের কামান-সজ্জা অগ্রাহ্য করিবার মত গোলাবারুদ তাহাদের অধিকারে যথেষ্ট এবং অর্থেরও অপ্রতুলতা নাই, খাদ্য-সামগ্রী প্রচুর। এই অবস্থায় কোম্পানী সৈন্যের গোঁয়ার্ত্তুমি করার অবকাশ ছিল না। কোম্পানী সৈন্য আক্রমণ করিবে কি ১৯শে জুন ইংরাজ

শিবিরের এক অংশ সিপাহীর কামান গর্জ্জনে বিব্রত হইল, শিবিরের ২০ জন হত ও ৭৭ জন আহত হইল। আহতের সংখ্যায় ক্যাপ্টেন ডেলিও পড়েন।

২০শে ও ২১শে জুন অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে অতিবাহিত হইল। চারিদিকে গুজব উঠিয়াছিল—২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ এবং কোম্পানীর আধিপত্যের পরে শত বর্ষ শেষ হইবে, সেই সঙ্গে কোম্পানীর সেই দিনে ভারতে আধিপত্য সমূলে বিনষ্ট হইবে, গুজব রটাইয়াছিল নানাজনে। সেই গুজবে জ্যোতিষবচনের উল্লেখও ছিল। ২২শে জুন কোম্পানীর দিল্লী-শিবিরে এবং অন্যান্য স্থানে শ্বেতাঙ্গের সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। ২৩শে জুন প্রাতঃকালে দিল্লীর লাহোর-তোরণ দিয়া সিপাহী-সৈন্য কোম্পানী-শিবির আক্রমণে বিনির্গত হয়। ২২শে জুন পঞ্জাব হইতে ৮৫০ জন ইউরোপীয় ও শিখ সৈন্য শিবিরে পৌঁছায়। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধ চলে ১১ ঘণ্টা কাল। যুদ্ধে মীমাংসা বিশেষ কিছু হয় নাই, তবে ইংরাজ পক্ষ সবজীপুর অধিকার করে, সিপাহী-সৈন্য দিল্লীতে ফিরিয়া যায়। ইহার পরে জলন্ধর, বেরিলী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত সিপাহী সৈন্য দিল্লীর বল বৃদ্ধি করে, কোম্পানী পক্ষেও সার জন লরেন্সের নূতন নূতন সাহায্যকারী সৈনিক দল উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও কামান লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে নেবিল চেম্বারলেন এবং রডেফীর বেয়ার্ডস্মিথের লোকজনও থাকে। আর থাকে শিখ ও গুর্খা।

২৪শে জুন বেরিলীর বখত খাঁ চারি সহস্র সৈন্য লইয়া শিবির আক্রমণ করিবে—বার্ণাড জানিতে পারেন। তাহা নিবারণ করিতে ২৩শে রাত্রি শেষে অন্ধকারে কোম্পানী-সৈন্য দিল্লীর প্রাচীরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকিবে এবং শত্রুকে চমকাইয়া দিবে ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা হেতু বখত খাঁর মতলব সিদ্ধ হয় নাই। তাহা না হইলেও নূতন সৈন্য, কোম্পানী পক্ষে যাহা আসিয়াছিল, তাহা লইয়া দিল্লী আক্রমণ যে বাতুলতা, ইহাতে সেনাপতি বার্ণাডের কোনও সন্দেহ ছিল না। তিনি আরও সৈন্য-সমাগমের অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে শিবিরে বিসূচিকা রোগ দেখা দেয়। রোগাক্রান্তের মধ্যে সেনাপতিও পড়েন এবং তাহাতেই ৫ই জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেনাপতি দেহত্যাগ করিলেন, দিল্লী শত্রুহস্তে থাকিয়া গেল। রীড্ সেনাপতির শূন্য স্থান অধিকার করিলেন। তিনিও অসুস্থ হইয়া পড়ায় ১৭ই জুন আম্বালায় চলিয়া যান, উইলসন্ সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই সময়ে খাল্সি, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে দলে দলে বিদ্রোহী সৈন্য দিল্লীতে সমবেত হয়। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় কোম্পানী সৈন্যের শিবির উঠাইয়া অন্যত্র যাইবার প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষ এই সময়ে করেন। উইলসনের চেষ্টায় সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

ইহার এক সপ্তাহের মধ্যে সিপাহীরা কোম্পানীর অধিকৃত স্থানসমূহ অধিকার করিবার চেষ্টা করে। চেষ্টা বিফল হয়।

সূর্য্যকুমার এই সম্পর্কে বলিতেছেন: "ইংরাজ শিবির এই সময়ে ঘোর বিপদের মধ্যে থাকিলেও সৈন্যসমূহের উৎসাহ, অবস্থা ও আশার বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। নাচ, গান, বাজনা, ক্রিকেট্ খেলা তাহাদের সমান ভাবে চলে, যেন কোথায় কিছু হয় নাই।" কিছুদিন পরে স্যর হেনরি লরেন্স লক্ষ্ণৌতে সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়া দেহত্যাগ করেন। সূর্য্যকুমার তখন গাজীপুরের সৈন্যবাহিনীর সহিত ব্রিগেড-সার্জ্জন রূপে লক্ষ্ণৌএ ছিলেন। লরেন্সের পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা তাঁহাকেই করিতে হয়। কিছুতেই কিছু হয় না। স্যর হেন্‌রির মৃত্যু-সংবাদ দিল্লীর সন্নিকটে কোম্পানী-শিবিরে পৌঁছাইলে শিবিরের সকলে হতাশায় অবনত হয়। সে ভাব কিন্তু ক্ষণিক। পরমুহূর্ত্তে প্রতিহিংসা-সাধনে তাহারা বদ্ধপরিকর হয়। দিল্লীর সিপাহীর উপর তাহা তখন ফলাইবার সুবিধা না থাকায় আশে-পাশে দেশীয়ের উপর তাহা নির্ম্মম ভাবে চলিতে থাকে। ইহাতে দিল্লী উদ্ধারের কোনও উপায় হইবে না—প্রতিহিংসা-পরায়ণকে উইলসন বুঝাইয়া দিলেও অল্প-বিস্তর ভাবে প্রতিহিংসা-সাধন কার্য্য চলিতে থাকে।

এই সূত্রে ডাঃ সূর্য্যকুমারের উক্তি এইরূপ:

"সিপাহী-যুদ্ধে দেশীয়ের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয়, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। একদিকে সিপাহীর অন্যদিকে ইয়োরোপীয় জনসাধারণের দেশীয়ের প্রতি কল্পনাতীত বিদ্বেষ ও তাহাদিগের সহিত তদনুযায়ী ব্যবহার। দিল্লীতে বাহাদুর শাহের নামে সিপাহীরা সব কাজ চালাইলেও প্রকৃতপক্ষে বাহাদুর শাহ তাহাদের বন্দী। সিপাহীদের যথেচ্ছাচারিতায় দিল্লীর জনসাধারণ সশঙ্কিত।"

দিল্লী উদ্ধারে

দিল্লী উদ্ধারাভিলাষে পাঞ্জাবের যত সৈন্য সম্ভব দিল্লীর অভিমুখে পাঠাইতে স্যর জন লরেন্স সঙ্কল্প করেন এবং তাহাতে যদি পেশোয়ার আমীরকে দিয়া দিতে হয় তাহাই দেওয়া হইবে, স্থির করেন। তাঁহার এই সঙ্কল্পে মেজর এডওয়ার্ডস, সেনাপতি নিকল্‌স ও নিকল্‌সন চমকিত হন। ইহা করিলে পঞ্চনদ কোম্পানীর অধিকারচ্যুত হইবে তাঁহারা বেশ দেখিতে পান। লর্ড ক্যানিং ও স্যর জনকে এ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান সুতরাং স্যর জন তাহা করিতে নিরস্ত হন। ও-দিকে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিবাহিত—দিল্লীতে সিপাহীরা ঝাঁকিয়া বসিয়া রহিল। স্যর জনের এই বিব্রত অবস্থায় জেলহমের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে গিয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে বিফলকাম হন। সিপাহীরা সম্মুখ-যুদ্ধে কোম্পানীকে হটাইয়া যত্র-তত্র চলিয়া যায়, কিন্তু শেষে তাহাদের অনেকে ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। শ্যালকোটের সিপাহী প্রথমে বেশ শান্ত ভাবেই ছিল, দিল্লী উদ্ধারার্থ যাইতেও তাহারা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। জেলহমের ঘটনার পরে কিন্তু তাহাদের সে ভাব আর থাকে না, বিপ্লবী হইয়া অন্যান্য স্থানের সিপাহী-দের মত লুণ্ঠন, বারুদখানা তোপে উড়াইয়া দেওয়া, হত্যা ও আনুষঙ্গিক কর্ম্ম করিতে তাহারা বিরত হয় নাই। এই সকল করিয়া তাহারা দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে। ইহার পরে কিলোর দুর্গস্থিত সিপাহীরা ঝটিতি নিরস্ত্রীকৃত হয়। রাওয়ালপিণ্ডিতেও নিরস্ত্রীকরণ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। সেনা-নায়ক নিকলসনের সৈন্য এই কার্য্য করিতে করিতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়। এ দিকে স্যর জনের চেষ্টায় সংগৃহীত বেলুচী, শিখ, ইউরোপীয় সৈন্য দিল্লী যাইতে আদিষ্ট হইয়া-ছিল। ৭ই আগষ্ট নিকলসন দিল্লী-প্রান্তে কোম্পানীর শিবিরে সসৈন্যে উপস্থিত হন। উজনওয়ালার এই সময়ের ঘটনা অমানুষিক—সিপাহী ও কোম্পানী উভয় পক্ষেই। উজনওয়ালায় নিহত সিপাহীদিগের মৃতদেহ অপ্রশস্ত কূপে নিক্ষেপ, অপ্রশস্ত গৃহে শত শতের জীবন্ত সমাধি 'অন্ধকূপ'কেও বোধ হয় হার মানাইয়া দেয়।

নিকলসনের আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য, কামান, আরও নানা ভাবে দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্য কোম্পানীর পক্ষে আসিয়া পড়িতে লাগিল। এতদিন দিল্লী-অবরোধকারীরা একপ্রকার অবরুদ্ধের অবস্থাতেই ছিল। লোক ও অস্ত্র বল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এখন পাওয়ায় দিল্লী তাহাদের করায়ত্ত, কোনও সন্দেহ রহিল না। নুজুফগড় উত্তীর্ণ হইয়া সিপাহী-দের একটি প্রধান ব্যূহ (সরাই) নিকলসন্ যুদ্ধ করিয়া অচিরে অধিকার করিল। ৪ঠা সেপ্টেম্বরের মধ্যে দিল্লী অবরোধের জন্য লোক, লস্কর, সাজ-সরঞ্জাম সব প্রস্তুত হইল।

লর্ড ক্যানিং ও কলিকাতা

সিপাহীযুদ্ধের কারণে ভারতে ইউরোপীয় জনসাধারণ অন্ধ ক্রোধে প্রত্যেক দেশীয়ের প্রতি কিরূপ জিঘাংসাপরায়ণ হইয়াছিল, তাহা মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে একাধিক পত্রে লর্ড ক্যানিং স্বয়ং জানান। সে-সকল পত্র হইতে অংশ-বিশেষ পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। কলিকাতায় বা কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে সিপাহী যুদ্ধ-জনিত কোনও ভয়ের সম্ভাবনা না থাকিলেও স্থানীয় ইউ-রোপীয়ের অধিকাংশ এবং ইউরোপীয়-সম্পাদিত সংবাদ-পত্র সকল সতত অনাবশ্যক চীৎকার করিয়া লর্ড ক্যানিং ও তাঁহার সভার সদস্যবর্গের কাণ ঝালাপালা করিয়া দেয়। তাহাদের ইচ্ছা, 'দেশীয়কে দেখ এবং তাহাকে যমালয়ে পাঠাও'। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বহুস্থলে এই ভাবের বিজাতীয় বিদ্বেষে কল্পনাতীত কাণ্ড যে নিত্য ঘটিতেছিল, তাহারই আভাস লর্ড ক্যানিং মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে পত্রযোগে দেন। সে সকল ঘটনা যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষমতার ঘোর অপব্যবহার করিয়া সংঘটিত করে এবং তাহা করিয়া কোম্পানীর স্বার্থে ভীষণ আঘাত যে তাহারা করে, সে কথা লর্ড ক্যানিং বেশই বুঝিতে পারেন। বুঝিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীবর্গ সম্বন্ধে যতদূর দৃঢ়তা অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব, তাহা তিনি করেন এবং ইয়োরোপীয় জনসাধারণের অলীক অভিযোগ ও কল্পিত ভয়ে তিনি বিচলিত হন নাই। লর্ড ক্যানিং-এর এই দৃঢ়তা ও জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমদর্শিতার জন্য লর্ড ক্যানিংকে পদচ্যুত করিবার আবেদন বহু ইয়োরোপীয় বিলাত সভায় মুরব্বি ধরিয়া করিয়া পাঠায়। লর্ড ক্যানিং তাহাতেও বিচলিত হন নাই বা তাঁহার ন্যায়-নীতি-অনুসরণে ক্ষান্ত হন নাই।

ডাঃ সুর্য্যকুমার এই সূত্রে জানাইয়াছেন : "লর্ড ক্যানিং এবং তাঁহার ন্যায় সদাশয় উচ্চপদস্থ কয়েকজন এ সময়ে ভারতে না থাকিলে দেশীয়ের মধ্যে কোম্পানীর বন্ধু খুঁজিয়া পাওয়া দায় হইত। শত চেষ্টাতেও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শ্বেতাঙ্গের ভীষণ প্রতিহিংসা-প্রবণতা রোধ হইতেছে না। কোম্পানীর স্বার্থের কি ভীষণ ক্ষতি যে ইহাতে হইতেছে, অন্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণদের কল্পনা করিবারও শক্তি নাই।"

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আগুন যখন ধূ ধূ জলিতেছে কলিকাতায় ইয়োরোপীয় সাধারণ সেই সময়ে ভলেন্টিয়র হইবার জন্য আবার আবেদন করে। লর্ড ক্যানিং সে আবেদন এবার অগ্রাহ্য করেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিন্তু ইয়োরোপীয় ও দেশীয় সংবাদপত্র দুই দুই না করিয়া মুদ্রা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন, আইন করিয়া। ইহার পরেও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' বাড়াবাড়ি করায় গভর্ণমেণ্ট এই ইয়োরোপীয়-সম্পাদিত সংবাদপত্রটীকে আইনের প্যাঁচে ফেলিতে অগ্রসর হয়। সংবাদপত্রের কর্ত্তৃপক্ষ অপরাধের মূল উৎপাটিত করায় গোল মিটিয়া যায়। ব্যারাকপুরে অবস্থিত সিপাহীরা একাধিকবার গভর্ণমেণ্টের নিকট দিল্লী উদ্ধারার্থ যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। লর্ড ক্যানিং সে জন্য তাহাদিগের বিশ্বস্ততার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ব্যারাকপুরের সেই সিপাহীরাই (৭০ নং ও ৪৩ নং) ১৩ই জুন নিরস্ত্রীকৃত হয়। কাকের মুখে কি কথা শুনিয়া ১৪ই জুন প্রাতঃকালে ইয়োরোপীয় সাধারণ সশঙ্কিত—'ঐ সিপাহী'। স্ত্রী পুরুষ যে যেখানে পাইল (কেল্লা জাহাজ) দৌড় দৌড়। জনরব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সময়ে প্রকাশ পাইল। তাহাদের এই বালকাধম আতঙ্কে লর্ড ক্যানিং ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

আর এক ভীষণ জনরব উঠিল, মুচিখোলায় অবস্থিত নবাব ওয়াদে আলী শা বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া নবাব সাহেবকে কেল্লায় নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। নবাব সাহেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কোনও প্রমাণ কিন্তু পরে কেহ দিতে পারে নাই।

ডাঃ সর্ব্বাধিকারী জানাইয়াছেন : "ওয়াজেদ আলি শা না কি বলিয়াছেন বিশ লক্ষ লোক যখন আমার তাঁবেদার তখন আমি কিছু করিলাম না আর এখন করিতেছি। চমৎকার অভিযোগ!"

ব্যারাকপুরের সিপাহী-নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে সূর্য্যকুমারের সংবাদ : "নিরস্ত্রীকরণ হইবার পর মুহূর্ত্তেই সিপাহীদের ইয়োরোপীয়ন অফিসাররা তাহাদিগকে অস্ত্র ফিরিয়া দিবার প্রস্তাব করে। কতদূর বিশ্বাস থাকিলে লোকে এ প্রস্তাব করে। শুনা যাইতেছে লর্ড ক্যানিং বিশেষ অনিচ্ছায় নিরস্ত্রীকরণে সম্মতি দেন।"

এই সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র অস্ত্র-শস্ত্র অবাধে বিক্রয় হইতেছিল। ইহা নিবারণের উদ্দেশ্যে কলিকাতা কাউন্সিলে 'অস্ত্র-আইন' বিধিবদ্ধ হয়। এ পর্য্যন্ত লর্ড ক্যানিং-এর শরীররক্ষীর কার্য্য ও গবর্ণমেণ্ট হাউসে পাহারা দেওয়া দেশীয়ের দ্বারাই হইতেছিল। লেঃ-গভর্ণর হ্যালিডের অনুরোধে দেশীয়ের স্থলে ইয়োরোপীয় সৈনিক নিযুক্ত হয়।

এ সম্বন্ধে সুর্য্যকুমার জানাইয়াছেন :

"সিপাহী মাত্রেই বিদ্রোহী নহে, স্বদেশবাসীর প্রতীতির জন্যই লর্ড ক্যানিং দেশীয় শরীর-রক্ষী বা শান্ত্রী পাহারা স্থলে (স্বদেশীয়ের শত অনুরোধেও) ইয়োরোপীয় নিযুক্ত করেন নাই। লেঃ-গভর্ণরের ঐকান্তিক অনুরোধ ভারগ্রস্ত হৃদয়ে তিনি রক্ষা করেন।"

পারস্য-যুদ্ধ হইতে আগত স্যর জেমস্ আউটরাম, নেভাল অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন নীল, ভারতের নূতন প্রধান সেনাপতি স্যর কলিন ক্যাম্বেল, চীন-যুদ্ধ-গামী লর্ড এল্গিন্ প্রভৃতি এই সময়ে কলিকাতায় আগমন করেন। যথাসময়ে যে যাহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। লর্ড এল্গিন্ দু'খানি রণতরী রাখিয়া একখানি মাত্র লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন। যাইবার সময়ে তিনি বলিয়া যান "সিপাহীর ভয়ে ইয়োরোপীয় মাত্রেই সদা সশঙ্কিত, শঙ্কা নাই কেবল লর্ড ক্যানিং-এর।"

বিহারে চাঞ্চল্য—কুমার সিং-এর অভিযান

বাঙলার অবস্থা আপাততঃ বিপজ্জনক না হইলেও বিহারের ইয়োরোপীয়েরা আশঙ্কিত হয়, দানাপুরের এবং বিহারের অন্যান্য স্থানের সিপাহীদের জন্য। বিপ্লব বাধাইয়া পাটনার আফিমের গুদাম এবং কোষাগার লুঠ করিয়া ত্রিহুতের নীলকুঠি আদি ধ্বংস করিয়া যদি তাহারা মুর্শিদাবাদ অভিমুখে গমন করে এবং নবাব-নাজীমের প্রাধান্য ঘোষণা করে, তাহা হইলে দিল্লীতে যাহা হইয়াছে,

বাঙ্‌লার পুরাতন রাজধানীতেও সুনিশ্চিত তাহা ঘটিবে—পূর্ব্ব হইতে যদি সাবধানতা অবলম্বিত না হয়। বিহারী ইউরোপীয়গণ একথা লর্ড-ক্যানিংকে জানান। তাঁহারা এবং দানাপুরের ইয়োরোপীয়ও সামরিক নেতৃবৃন্দ একযোগে গভর্ণর-জেনারেলকে অনুরোধ করেন, দানাপুরে সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করা হউক। এ অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। ইহার পরে পাটনার কমিশনর টেলর বিপ্লব-নিবারণের উদ্দেশ্যে পাটনায় এবং অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে বিশেষতঃ মুসলমান প্রজার বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। তাহার ফলে ঘোর অসন্তোষের চিহ্ন সর্ব্বত্র প্রকটিত হয়। তাহাতেও কঠোর নীতি অনুসরণে টেলর ক্ষান্ত হন নাই। নানা অপরাধের জন্য ফাঁসি-কাষ্ঠে মৃত্যুদণ্ড নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে হইয়া পড়ে। গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী ভদ্রলোক সন্দেহ হইবা মাত্র অবরুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। পাটনার তিনজন মৌলভী (মুসলমান সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ) অবরুদ্ধ হওয়ায় জুলাই মাসের ৩রা তারিখে মুসলমানেরা প্রকাশ্যভাবে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করে। শিখ-সৈন্যের সাহায্যে তাহা নিবারিত হয় বটে, কিন্তু অসন্তোষ বহ্নি তাহাতে নির্ব্বাপিত হয় নাই। অধিকতর সুযোগের অপেক্ষা করিয়া তাহারা তখনকার মত চুপ করিয়া থাকে।

ঘটনাচক্রে দানাপুরেও সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনার চিহ্ন উত্তরোত্তর পরিলক্ষিত হয়। কানপুর, দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ-এর ঘটনাবলীই তাহার কারণ। এই সময়ে গুজব উঠে, গোরা-সৈন্য জাহাজে চড়িয়া কলিকাতায় পৌছিয়াছে এবং সিপাহী নিধনার্থ অবিলম্বে তাহারা দানাপুরে আসিবে। সমধিক উত্তেজনায় সিপাহীরা যখন অব্যবস্থিতচিত্ত, বিশেষ চেষ্টায় দেশীয় অফিসরেরা তাহাদিগকে শান্ত করে, গুজব মিথ্যা জানাইয়া এবং তাহার প্রমাণ দিয়া। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সিপাহীর এই ব্যবহারে কিন্তু বিপ্লবের বীজ দেখিতে পান এবং তাহা ধ্বংস করিবার জন্য তৎপর হইয়া ব্যবস্থা করেন, বন্দুকের ক্যাপ সিপাহীদের হস্তে যেন না পড়ে। সিপাহীরা ইহাতে আবার উত্তেজিত হইলেও বিদ্রোহিতা করে নাই। কিন্তু সিপাহীর নিকটে রক্ষিত ক্যাপ ফিরাইয়া দিতে হুকুম যখন হইল, তখন তাহাদের সহিষ্ণুতা ভঙ্গ হইল। ক্যাপ ফিরাইয়া তাহারা তো দিলই না, মার-মার, কাট-কাট করিয়া উঠিয়া তাহারা দানাপুর পরিত্যাগ করিল। ইউরোপীয় সৈন্য তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেও সিপাহীদের অধিকাংশ শোন নদী পার হইল এবং শাহাবাদ অতিক্রম করিয়া আরা অভিমুখে যাত্রা করিল। এ-কাণ্ড ঘটিল জুলাই মাসের পঁচিশ তারিখে।

আরার সর্ব্বজনমান্য ভূস্বামী বীরবর কুমার সিং দানাপুর হইতে পলায়িত সিপাহীদিগের শাহাবাদে আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ও শুভানুধ্যায়ী হরেকৃষ্ণ সিংকে সিপাহীদিগের অভিসন্ধি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তথায় প্রেরণ করেন। কুমার সিংএর প্রতাপে আরা, শাহাবাদ এবং আশে-পাশের সমগ্র স্থান তটস্থ। তাঁহার শক্তি বাঘে গরুকে একসঙ্গে জল খাওয়াইবার মতই। কোম্পানী বাহাদুর তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকায় দেশে শান্তি যখন বিরাম করিতেছে, তখন, এমন কি, সিপাহী-যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরেও যে কার্য্য কোম্পানী করিতে বেগ পাইয়াছে তাহা তাঁহার সাহায্যে করাইয়া লইয়াছে অনায়াসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জেল কয়েদীদিগের অবাধ্যতা এবং কুমার সিং-এর বাক্যে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাহাদের বাধ্যতা স্বীকার করা এবং আরা ও শাহাবাদ হইতে কোম্পানীর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা নিরাপদে স্থানান্তরিত হওয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুমার সিং-এর বন্ধুত্ব কমিশনার টেলর হইতে বিহারের ছোট বড় সকল ইয়োরোপীয়েরই কাম্য। কুমার সিংও সে বন্ধুত্ব দানে অকপট। পূর্ব্বাপর ঐকান্তিক বন্ধুত্বডোরে দুই পক্ষই আবদ্ধ থাকে। একটী ঘটনায় কিন্তু কুমার সিং অন্তরে বিশেষ ব্যথা পান। পরদুঃখকাতর এই সদাশয় ভূস্বামী তাঁহার প্রভূত দানের জন্য ঋণজালে জড়িত হ'ন। রেভিনিউ বোর্ডের আদেশে তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী নিলামে তুলিবার ব্যবস্থা হয়—ঋণ পরিশোধ করিবার সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া হয় না। তিনি মরমে মরিয়া যান।

তাহা হইলেও কোম্পানীর প্রতি বিদ্বেষ তাঁহার হয় নাই। সিপাহী বিপ্লবের সময়ে কোম্পানীর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা নিরাপদ স্থানে রাখাইবার ব্যবস্থা তিনি করাইয়া দেন। ইচ্ছা করিলে কোম্পানীর সেই দুর্দ্দিনে সে সমস্ত টাকা বিনা বাধায় তিনি দখল করিতে পারিতেন। কোম্পানীর সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তাঁহাকে তাহা করিতে দেয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু যখন দানাপুরের উত্তেজিত সিপাহীদিগকে শান্ত করাইবার জন্য

তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন, কুমার সিং বলিয়া পাঠান যে, "সিপাহীদের মধ্যে শাহাবাদ ও এ-অঞ্চলের যাহারা তাহারা তাঁহার নিষেধ-বাক্য মানিয়া চলিবে, সকলে তো মানিবে না সুতরাং 'গাল বাড়াইয়া চড় খান' তিনি কেমন করিয়া।" এই অনুরোধ না রক্ষা করায় কর্তৃপক্ষের কুমার সিং-এর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। পরে পাটনায় তাঁহার সহিত বিশেষ পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাকে তথায় আহ্বান করিতে দূত পাঠান। তাঁহার হিতৈষিবর্গ পাটনার মৌলভী তিন জনের অবস্থা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া পাটনায় যাইবার প্রতিশ্রুতি দিতে তাঁহাকে নিরস্ত করেন। কোম্পানী কর্তৃপক্ষের অসন্তোষের সীমা ইহাতে থামে না। তথাপি কুমার সিং-এর মনে কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব উদ্রেক হয় নাই। তাঁহার অধীনস্থ অনেকে কিন্তু তলে তলে কুমার সিং-এর নামে সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিতে থাকে। রণদলন সিং ও হরেকৃষ্ণ সিং তাহাদের মধ্যে প্রধান। কুমার সিংকেও নাচাইবার তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা করে। হরেকৃষ্ণের পূর্ব প্ররোচনার ফলে দানাপুরের সিপাহীরা সরাসর আরার দিকে দৌড়ায়। হরেকৃষ্ণ আগ বাড়াইয়া শাহাবাদ হইতে তাহাদিগকে আরায় লইয়া আসে এবং স্বীয় প্রভুর কাছে এমন সব কথা বলে যাহাতে কুমার সিং-এর সিপাহীদিগের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করা ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না। সিপাহীরা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে তাহাদের শিরোভূষণ করে। কোম্পানীর এককালীন বন্ধু কুমার সিং ঘটনাচক্রে পড়িয়া প্রকাশ্যভাবে শত্রুরূপে দাঁড়াইলেন। জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ কোম্পানীর সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া বৃদ্ধ বয়সে সে-সূত্র তাঁহাকে যে ছিন্ন করিতে হইবে কল্পনায়ও তাঁহার মনে পূর্ব্বে কখনও আসে নাই। তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হয় অকালে। একমাত্র পৌত্র বিকৃতমস্তিষ্ক। প্রিয় আবাসভূমি জগদীশপুরের অবস্থা এই সংঘর্ষের ফলে কি ঘটিবে কে জানে! ললাটের লিখন কি ভাবিয়া কুমার সিং আকুল হইলেও উপস্থিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ন।

২৭শে জুলাই আরায় সিপাহী কর্তৃক কোম্পানী কলেক্টরী ব্যতীত আদালত, কাছারী, ধনাগার লুণ্ঠিত ও ধ্বংসীকৃত হয়। স্থানীয় ইউরোপীয়দিগের আশ্রয়-দুর্গও অবরোধ করা হয়। ইউরোপীয়েরা সময় হইতে আহার্য্য দ্রব্যাদি ও অস্ত্রশস্ত্র আয়োজন করিয়া রাখায় সময়োচিত আত্মরক্ষা সপ্তাহ ধরিয়া করে। অবরুদ্ধ মাত্র ১৬ জন। এই ১৬ জন যুদ্ধ দান করে অসীম উৎসাহে। দেখা যায়, কুমার সিং সর্ব্বান্তঃকরণে অধিনায়কত্ব করিতেছেন না বা করিতে পারিতেছেন না, কোম্পানীর বিরুদ্ধতা-কার্য্যে স্বেচ্ছায় নিয়োজিত না হওয়ার জন্য। সুতরাং সিপাহীদের দ্বারা শৃঙ্খলা সহকারে কার্য্য করিতে দেখা যায় না। আশ্রয়স্থান ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা, লঙ্কাস্তূপে আগুন লাগাইয়া অবরুদ্ধদিগকে আশ্রয়ের বাহিরে আনিবার আয়োজন, মৃত ও গলিত অশ্বের দুর্গন্ধে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিবার চেষ্টা প্রভৃতি সিপাহীদের অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় নাই—পবনদেব ইংরাজের অনুকূলে থাকায়। পর্য্যাপ্ত ও উন্নত অস্ত্র-শস্ত্রও সিপাহীদের না থাকায় অবরুদ্ধেরা অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে থাকে। ইতিমধ্যে দানাপুর হইতে প্রায় চারিশত ইয়োরোপীয় সৈন্য অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারার্থ কাপ্তেন ডানবারের অধীনে জাহাজ-যোগে প্রেরিত হইয়াছিল। আরার নয় মাইল দূরে তাহারা জাহাজ হইতে নামিয়া দুর্গম পথ বাহিয়া যখন গন্তব্যস্থানে রাত্রির অন্ধকারে উপনীত হওয়া, কুমার সিংএর অগোচর রহিল না। যৌবনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা ৮০ বৎসর বয়সেও যেন তাঁহার স্বরূপ ফিরিয়া পাইলেন। অন্ধকারেই অনুন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সিপাহীদের দ্বারা অভিযানকারীদের অর্দ্ধাংশ নিহত করাইলেন। অপর অর্দ্ধাংশের মধ্যে ১৫০ জন বিষম আহত হইল। কোনরূপে পলাইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্তেরা পর দিন দানাপুরে পৌঁছাইল—দানাপুরে সে সংবাদে ও প্রত্যাবৃত্তের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। ভিন্‌সেণ্ট আয়ার সামরিক বাহিনী লইয়া কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ রাস্তার পথে দানাপুরে উপস্থিত হন। সেই দিনই সিপাহীরা বিপ্লব বাধাইয়া দানাপুর পরিত্যাগ করে। আয়ার তাহা-দিগের পশ্চাদ্ধাবনের প্রার্থনা করিলে তাহা মঞ্জুর হয়। তিনি সসৈন্যে যখন বক্সারে তখন সিপাহী শোন পার হইয়া গিয়াছে। গাজীপুর সুরক্ষিত অবস্থায় দেখিয়া এবং তথায় নিজেদের দুইটী কামান রাখাইয়া আরার যাইতে ৩০শে জুলাই পর্য্যন্ত তাঁহার লাগিল। শাহাপুরে ক্যাপ্টেন ডানবারের পরাজয় ও নিধন বার্ত্তা তিনি পাইলেন। তিনি শুনিলেন সমগ্র আরা কুমার সিং-এর পদানত। অনবরত বৃষ্টিতে পথ তখন অগ্রসরের

অযোগ্য হইলেও যথাসাধ্য দ্রুত গতিতে তিনি ১লা আগষ্ট গুজরাজগঞ্জে পৌছাইলেন। ২রা আগষ্ট সেইখানেই অপর পক্ষ হইতে যুদ্ধভেরী-নিনাদ শ্রুত হইল। কুমার সিং-এর সৈন্য সেইখানেই তাঁহার পথে বাধাস্বরূপ দাঁড়াইয়া আয়ার দেখিলেন। বাধা অতিক্রম করিতে যুদ্ধ বাধিল।

কুমার সিং অসীম তৎপরতা ও রণকৌশলে ইংরাজবাহিনী বিপর্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু অস্ত্রের হীনতা দীর্ঘসময় ধরিয়া তাহা করিতে তাঁহাকে দিল না। ইংরাজ সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল, কুমার সিং-এর সৈন্য পিছাইতে লাগিল। দুই মাইল এইভাবে অতিক্রান্ত হইয়া একটী নদী পাইলে নদীসেতু পার হইয়া কুমার সিং সেই সেতু ধ্বংস করিলেন আয়ার কুমার সিং-এর কৌশলে নদী পার হইতে পারিলেন না—অন্য পথে আরাভিমুখে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন। সে পথ কোথায় কুমার সিং জানিতেন। নদীর অপর তট দিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া সে পথও রুদ্ধ করিতে তিনি অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পরিচালনায় সিপাহীরা কলের মত চলিতে লাগিল। বিবিগঞ্জেও দুইপক্ষ সম্মুখীন হওয়ায় ভয়াবহ যুদ্ধ বাধিল। কুমার সিং-এর অপূর্ব্ব রণকৌশলে আয়ার-বাহিনী বিব্রত। কামান বর্ষণ তুচ্ছ করিয়া কুমার-সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। এইবার উভয় পক্ষে সঙ্গীন-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরাজের সঙ্গীন অত্যুৎকৃষ্ট থাকায় ইংরাজ সে যুদ্ধে সিপাহীদিগকে হটাইয়া দিল। সিপাহীবাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় কুমার সিং তাহাদিগকে লইয়া জগদীশপুরের দিকে যাইতে বাধ্য হইলেন। আয়ার কালবিলম্ব না করিয়া আরার ইয়োরোপীয় অবরুদ্ধদিগের উদ্ধার-সাধনে আরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ৩রা আগষ্ট অবরুদ্ধেরা আয়ারের উপস্থিতিতে নিষ্কৃতি পায়। আরায় কোম্পানীর আধিপত্য পুনঃস্থাপিত হয়।

আরায় যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া, আরাবাসীকে নিরস্ত্র করিয়া এবং বিরুদ্ধ ও ধৃত সিপাহীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া আয়ার জগদীশপুরে সসৈন্যে উপস্থিত হন ১১ই আগষ্ট। জগদীশপুরও তাঁহার হস্তগত হয়। দেবালয় সমেত কুমার সিং-এর সর্ব্বস্ব বিধ্বস্ত হয়। কুমার সিং সাসারামের দিকে চলিয়া যান। ওদিকে জব্বলপুরের সিপাহীরা সামরিক নেতা ম্যাগ্রেগরকে নিহত করিয়া এবং তাঁহার সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া জব্বলপুর তছনছ করিয়া কুমার সিং-এর অধি-নায়কত্বের অধীন হয়। মধ্য ও উত্তর ভারতবর্ষে কুমার সিং-এর জন্য উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হইতে থাকে। দলে দলে সিপাহী কুমার সিং-এর সহিত যোগদান করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৫৭ উত্তীর্ণ হয়। প্রাপ্ত অস্ত্র ও সৈন্যাদির সাহায্যে আত্রাওয়ালিতে সসৈন্য মিলম্যানকে কুমার সিং পরাজিত করেন। মিলম্যান্ আজিমগড়ে আশ্রয় লইলেও আজিমগড় কুমার সিং-এর হস্তে নিস্তার পায় নাই। এপ্রিলের (১৮৫৮) প্রথমাংশ পর্যন্ত আজিমগড়ে কুমার সিং আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন। চারিদিক্ হইতে সৈন্য সমবেত করাইয়া লর্ড মার্কার বহু আয়াসে এবং ঘোরতর যুদ্ধের পর আজিমগড় দখলে আনেন (১৩ই এপ্রিল)।

কুমার সিং গাজীপুরের নিকটে গঙ্গা পার হইয়া জগদীশপুরে যুদ্ধের আয়োজন করিবেন স্থির করিলেন। আজিমগড়ের অনতিদূরে তমসা নদীর কাছে লক্ষ্ণৌ হইতে প্রেরিত লুগার্ড-এর সৈন্য-বাহিনীকে যুদ্ধাভিনয় কৌশলে ব্যাপৃত রাখিয়া নবঘাই পল্লীতে তিনি উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে আত্রা এবং তাহার পরে সেকেন্দরপুরে যুদ্ধের অভিনয় করিতে করিতে তিনি অতিক্রম করিলেন। তাঁহাকে ধরিতে কোম্পানী পক্ষের যত্নের অবধি রহিল না, কিন্তু তাহা বিফল হইল। মান্নহারে (গাজীপুরের অন্তর্গত) শিবির সন্নিবেশে অল্পকাল বিশ্রাম করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল। নবঘাই হইতে পশ্চাদ্ধাবিত ডগলাসের সৈন্য-গাজীপুরের সৈন্য-বাহিনীর সহিত সম্মিলিত হইয়া শান্তিলাভে বাধার সৃষ্টি করিল।

সূর্য্যকুমার এই সূত্রে জানাইয়াছেন :

"কুমার সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযানবাহিনী গাজীপুরে প্রস্তুত ছিল। বাহিনীর সমভিব্যাহারে যাইতে আমিও আদিষ্ট। মৃত বা অবরুদ্ধ কুমার সিং না হইলে বিপ্লবে কোম্পানীর স্বার্থ সমধিক ভাবে বিনষ্ট হওয়া নিশ্চিত। ভারতব্যাপী কুমার সিং-এর প্রভাব। চিরযোদ্ধা কুমার সিং বৃদ্ধ বয়সেও অপূর্ব্ব রণকৌশলী, অপূর্ব্ব তেজীয়ান, তাহার প্রকৃত পরিচয় কোম্পানী পক্ষ পাইয়াছে। সব ছাড়িয়া কোম্পানী পক্ষ এখন কুমার সিংকে দমন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।"

সম্মিলিত বিপক্ষ সৈন্য-বাহিনীর অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া কুমার সিং সত্বর গঙ্গা পার হন। শিবপুর ঘাটের অপর দিকে নিরাপদে তিনি উপস্থিত হইলেন। রাজছত্র তাঁহার মস্তকে স্থাপিত হইল। এদিকে রাত্রিযোগে সম্মিলিত বাহিনীও গঙ্গা পার হইয়া ঘাঁটি গাড়িয়া চুপে চুপে বসিল। প্রত্যূষে রাজছত্র তাহাদিগের দৃষ্টি-গোচর হইল। তাহা লক্ষ করিয়া বর্ষিত হইল কামান, বন্দুক। হস্তী আরোহণে কুমার সিং। রণদলন সিং পার্শ্বে অবস্থিত। কামানের গোলার আঘাতে রণদলন হত হইল, কুমার সিং দক্ষিণ জানু ও দক্ষিণ বাহুতে বিষম আঘাত পাইলেন, অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। কিছু দূরে চৈতন্য সম্পাদিত হইলে তাঁহার আজ্ঞায় বিশ্বস্ত কনৈক অনুচর দক্ষিণবাহুর আহত অংশের অস্থি তরবারির সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া জাহ্নবীর জলে নিক্ষেপ করিল। কুমার সিংকে লইয়া অনুচরের দ্রুতগতিতে জগদীশপুরে চলিয়া গেল; পশ্চাদ্ধাবনে বাধা দিতে সিপাহীরা পশ্চাতে রহিল (২১শে এপ্রিল)।

কুমার সিংএর ভ্রাতা কয়েক সহস্র সৈন্য লইয়া জগদীশপুরে ছিলেন। কুমার সিংএর সৈন্যের সহিত তাহারা সম্মিলিত হইল। সেই সৈন্য দল গ্রাণ্ডের সৈন্য আক্রমণ করিলে আহত কুমার সিংএর পরিচালনায় তাহাদিগকে পরাজিত করে। লে গ্রাণ্ড নিহত হন। তাহাতে শাহাবাদ আবার মাঁথা তুলিল। আবার দলে দলে সিপাহী সমাবেশের সূচনা হইল। আহত ও পরিশ্রান্ত কুমার সিংএর আয়ুষ্কাল কিন্তু পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, শীঘ্রই তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

সূর্য্যকুমার লিখিয়াছেন: "বিদ্রোহী সিপাহী ও সিপাহী নেতা হইতে কোম্পানীর বিরুদ্ধ কুমার সিং ভিন্ন শ্রেণীর। যে কারণই হউক কোম্পানীর বিরুদ্ধতা তিনি করিলেও নৃশংসতা করিতে তাঁহার সিপাহীদিগকে তিনি কোনরূপ অবসর দেন নাই। মহিলা বা শিশু-হত্যা তাঁহার কোনও লোক করিয়াছে তাহার একটি দৃষ্টান্তও বোধ হয় কেহ দিতে পারিবে না। বন্দীর প্রতি সদয় ব্যবহারের কথাই শ্রুত হইয়াছে। কোম্পানী পক্ষের বাঙালী কয়েকজন ধৃত হইয়া তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া পাথেয় দিয়া স্বদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা তিনি করেন। তাঁহার বীরোচিত কার্য্য প্রতিপদেই দেখা যায়। মৃত্যুও তাঁহার হয় বীরশয্যায়।"

জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ অমর সিং একাগ্রতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে সুদীর্ঘকাল কোম্পানীর সহিত যুদ্ধ করেন। সিপাহীর উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছিল, সুতরাং সৈন্য-সংখ্যার অভাব তাঁহার হয় নাই। ডগ্‌লাস্, লুগার্ড, বার্‌ফীল্ড প্রভৃতি কোম্পানীর সেনানায়ক ও সেনাপতিরা অমর সিংএর রণ-কৌশলে বার বার পরাজিত হইয়াছেন। জগদীশপুর, শাহাবাদ, ডুমরাওঁ প্রভৃতি পুনরায় অমর সিংএর অধিকারে আসিয়াছে। অসুবিধায় পড়িলেই নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে এবং পাহাড়ে আশ্রয়গ্রহণ এবং সুবিধা পাইলেই দলবল লইয়া ভীষণবেগে আক্রমণ অমর সিংএর যুদ্ধনীতির মধ্যে পরিগণিত হয়। তাঁহাকে কায়দায় ফেলা কোম্পানীর দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অবশেষে সার হেনরি হ্যাভলকের ন্যায় যোদ্ধাকে, রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয় এবং যুদ্ধে অমর সিংএর কূটনীতি ভেদ করিয়া অমর সিংকে তিনি বিপর্য্যস্ত করেন, তবে তাহা করিতে কোম্পানী পক্ষের সৈন্যসংখ্যার খুবই ক্ষয় হয়। অমর সিং-এর বিচিত্র রণকৌশলে সুদীর্ঘ সাতমাস কোম্পানী পক্ষ বিব্রত হইয়া পড়ে—কোম্পানীর তথায় আধিপত্য স্থাপন করিতে ১৮৫৮ শেষ হইয়া যায়।

মজঃফরপুর, ছাপরা, গয়া প্রভৃতি স্থানের কর্ত্তৃপক্ষ সিপাহীর উত্তেজনায় এবং কমিশনর টেলরের কাণ্ডজ্ঞানশূন্য সারকুলারে এতদূর বিচলিত হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা সব ফেলিয়া পাটনায় পলাইয়া যান। সূর্য্যকুমার জানাইয়াছেন: "কর্ত্তা না থাকিলেও এই সকল স্থানে ধনাগার লুণ্ঠন, কারাগার উন্মোচন, গৃহদাহ বা হত্যা কিছুই হয় নাই। নজীব (পুলিশ) এবং অধিবাসীবৃন্দ এ সকল সুবন্দোবস্তেই রাখে। এই সূত্রে ছাপরার গাজী রমজান আলি নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কর্ত্তাহীন ছাপরার শাসনভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি গ্রহণ করেন এবং কোম্পানীর স্বার্থ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন।"

সূর্য্যকুমার এই সূত্রে আরও বলিয়াছেন: "কর্ত্তারা যেখানে যেখানে ব্যবস্থা করিতে গিয়াছেন সেইখানে সেইখানেই উভয় পক্ষে ঘোর নৃশংসতার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই কয়টী স্থানে কিন্তু বিনা রক্তপাতে কোম্পানীর আধিপত্য অটুট থাকিয়াছে।"

আপনার কর্তৃত্বে টেলরের বিহারে সামরিক আইন প্রচার, মজঃফরপুর প্রভৃতির রাজপুরুষদিগকে ভারপ্রাপ্ত স্থানগুলি অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া পাটনায় যাইতে সার্কুলার প্রেরণ প্রভৃতি অন্যায় কার্য্যের জন্য টেলর এই সময়ে পদচ্যুত হন।

সুধাকুমারের অভিমত: "বিশ্বস্ত কুমার সিং টেলরেরই অবিমৃষ্যকারিতায় সিপাহীদের সহিত যোগদান করেন। ইহাও গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারেন। সেই কারণেই তাঁহার বংশধরদিগকে তাহাদিগের পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করা হয় নাই। টেলরের নৃশংসভাবে নর-হত্যার দীর্ঘ কাহিনীও কর্ত্তৃপক্ষকে বিচলিত করে। এই সবই টেলরের পতনের কারণ। টেলরের অপসারণে বিহারবাসী সন্তোষ প্রকাশ করে। তাহাতে সিপাহীর তথায় কোম্পানীর বিরুদ্ধতা করা আর সম্ভব হয় নাই।"

সিপাহীদিগকে নিরস্ত্রীকরণ গুজবে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীদিগকে বিদ্রোহী হইবার কূট অভিসন্ধির ফলে নানাস্থানে বিপ্লবের কথা উল্লেখ করিয়া সুধাকুমার জানাইয়াছেন: "কটক ও জলপাইগুড়িতে কিন্তু এ দু'য়ে কোন ফল হয় নাই। নিরস্ত্রীকরণ-কার্য্য সেনানায়কদিগের দৃঢ়তায় সম্পাদিত হয় নাই, সিপাহীরাও যারপর নাই বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহীরা ত্রিপুরারাজ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া মণিপুরের দিকে পলায়ন করে। ঢাকার উত্তেজিত সিপাহীরা ভুটানে আত্মগোপন করে। কোম্পানী-ভক্তদিগের সাহায্যে বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই। ছোটনাগপুর ও হাজারীবাগেও কোম্পানীর বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই সকল স্থানে টেলরের ন্যায় অবিচার ও নৃশংসতা সংঘটিত হয় নাই।"

একদিক

—শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

ধরা বুকে কেঁদে ফেরে আত্মা মোর অশ্রান্ত ক্রন্দন,
আমার জীবনরন্ধ্রে জমা হলো সর্ব্ব অভিশাপ—
সকল দারিদ্র্য-দুঃখ, গ্লানি, মিথ্যা, সীমাহীন পাপ;
মোর রিক্ত বক্ষ ঘেরি' দীনতার দুরন্ত নর্ত্তন!
আমারে দিল না সুধা, প্রেম আর সৌন্দর্য্য-বিলাস,
আমার যাত্রার পথে আলোকের নাহি অভ্যুদয়,
নিখিলের হলাহল আত্মা মোর চিরবিষময়;
প্রাণপুষ্পে জমা শুধু ব্যর্থতার তিক্ত হাহাশ্বাস!

মোর শূন্য দৃষ্টি হতে সরে গেছে নীলাভ আকাশ—
আমার বুকের মাঝে থেমে আসে প্রাণের স্পন্দন;
অসতর্কে ছিঁড়ে গেছে সুন্দরের অনন্ত বন্ধন!
সরে গেছে জ্যোৎস্নালোক, তারকারা, ফুলেলা বাতাস।
বসন্ত নামে না হেথা, চিরবর্ষা রাত্রিদিনমান
সন্ধ্যার আঁধারে নামে জীবনের পূর্ণ অবসান!

ভাই ভাই

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ভবেশচন্দ্র মানুষটি ছিলেন একেবারে নিরীহ প্রকৃতির। হৌসের বড় চাকুরে ; সেখানে কাগজ-পত্রের বিরাট স্তূপের মধ্যে তাঁহাকে ডুবিয়া থাকিতে হইত। বাহিরের মানুষের সহিত বড় একটি সম্পর্কই ছিল না।

নীচের আফিস হইতে রাশি রাশি কাগজ আসিতেছে। সেগুলাকে আগাগোড়া পরীক্ষা করা, আবশ্যকমত সংশোধন করা—এবং তাহার পর নিজের দায়িত্বে বড়-সাহেবের ঘরে পাঠাইয়া দিতেই দিন কোথা দিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত, তাহা যেন তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার কথা কহিবার অবসর ছিল না। তাহার উপর অল্পভাষী, রাশ-ভারী মানুষ বলিয়া বড় কেহ তাঁহার দিকে ঘেঁষিত না।

এদিকে গৃহেও তাঁহার প্রায় সেই অবস্থা। গৃহিণী গত হইয়াছিলেন। আবার সংসার-ধর্ম্মে লিপ্ত হইবার মতিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। মাত্র দুইটি পুত্র। তাহারা নিজেদের পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত। উপযুক্ত গৃহ-শিক্ষক নিয়োগ করিয়া দিয়া তিনি সে চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

বাকী থাকে সংসারের দৈনন্দিন ব্যাপার-নির্ব্বাহ। সেখানেও তাঁহার অব্যাহতি ছিল ; পিতার আমলের বৃদ্ধা পরিচারিকা নিস্তারিণী এবং বাঁকুড়া জেলার পরিপক্ক পাচক, বসন্ত চক্রবর্ত্তী।

সংসার খরচের জন্য মোটা টাকা থাকিত নিস্তারের হাতে। ফুরাইলে সে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইত। তখন ভবেশ কথা কহিতেন : "কি নিস্তার, টাকা বুঝি ফুরিয়েছে? একটু বুঝে-শুনে, সামলে চালিও বাপু। সংসারে যেন অপব্যয় না হয়।"

নিস্তার তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনিত। জানিত, একথা তাহাকে তিরস্কারের জন্য নহে ; শুধু একটা কথা কহিবার জন্যই। সংসার পরিচালনে নিস্তার যে কত হুঁশিয়ার তাহা বসন্ত হাড়ে হাড়ে জানিত। তাদের দ্বন্দ্ব, কলহ, মতের অনৈক্য রান্না-বাড়ীর স্বল্প-গবাক্ষ অন্ধকার ঘরে ধূমায়িত হইলেও কোন দিন প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহার অশান্তির কারণ ঘটাইত না।

কিন্তু নিবাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখার মত মানুষটির মনের জ্যোতিতে গৃহের আগাগোড়া উজ্জ্বল ছিল। কথা না কহিয়াও তাঁহার মতামত নিঃশব্দে সংসারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত ছিল। অবহিত হইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইত যে, সেখানে একান্নবর্ত্তী-পরিবারের গৌরব মাথা তুলিয়া অবিসংবাদিত ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে।

দুই পুত্র যাহাতে বনিবনাও করিয়া চিরকাল সম্প্রীতির সহিত কাটাইয়া দিতে পারে তাহার বিধি-ব্যবস্থাগুলি লক্ষ্য করিলে মানুষটির প্রতি সকলের চিত্ত শ্রদ্ধানত হইয়া উঠিত।

দুই জনের কাপড়ের পাড়টি পর্য্যন্ত এক। এক পোষাক। ঘরের আসবাব-পত্রের বিভিন্নতা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন।

ভগবানের রাজ্যে মানুষ কিন্তু ইট-কাঠের সামিল নয়। একরকম করিতে চাহিলেও কোথা দিয়া কেমন করিয়া বৈষম্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তিই কি মানুষের আছে?

হরিশ জ্যেষ্ঠ, এবং যোগেশ কনিষ্ঠ।

হরিশ একবারও অকৃতকার্য্য না হইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ওকালতি ব্যবসায় অবলম্বন করিল। কিন্তু যোগেশ কয়েকবার ফেল হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া অগতির গতি একটা স্কুলে ঢুকিয়া পড়িল।

ভবেশচন্দ্র পেন্‌শন লইয়া ছেলেদের বিবাহ দিবেন মনে করিতেছিলেন। কিন্তু সে কাজ অপূর্ণ রাখিয়াই তাঁহাকে পরলোক গমন করিতে হইল।

পিতার শোক কাটিতে কিছুদিন গত হইল। তাহার পর বিবাহ ব্যাপার। মনে করিলেই কিছু সংঘটিত হইয়া উঠে না। তাহার উপর হরিশ চাহিতেছিল, পিতৃপদাঙ্ক


cizing Mr. Jaiprakash
the Independence
on July 23, Mr. Gandhi declared
out Hindu-Moslem unity India could
freedom". He said that some people
opinion that if he endeavoured, he could
about unity between the comm
added, those who had worked in close co-
operation with him knew
his power to achieve
Mr. Gandhi said
civilization based upon non-violence is
erstwhile village republic of India. I admit
that it was very crude".
Writing in the Harijan of
August 19 he says that "hunger-strikes have
positively become a plague." And then he
upon the Congress Working Committee
frame a rule making public and
hunger-strikes without permission
of disciplineMr. Gandhi writes in the
of August 12, that the Congress is come to
the present state only because
powerful".
The agonizing experience of
fifteen days has resulted in my
discovery that ahimsa should be
as failure, if the Thakore Saheb and Darb
Shri Virawala were to feel that they
give anything under pressure from above
India is too weak for armed revolt.
connexion has made her weaker.
armament is a black chapter
history."
" I own too that India is not
an armed revolt. But this is not
of credit either for Britain or
To my knowledge,
private career, I have
Moslem unity
charkha and
swaraj
a believer in truth. Truth is my God.
in the Harijan of July
should not be insisted on when
flag should not be insisted on when
opposition even from one member.
tyranny of one person.
many offer opposi-
his way, it is
proof of magnanimity
part of the
if the democratic power
heroic act will
disarm him.
the Harijan of July
conscious of the fact that
made a general
intelligentsia. I have already pointed
the reason for the
not to be sought in
the programme, but
of a living faith in
cle of Mr. Gandhi appearing in the Harijan,
says: "The Congress
are damaging
have no doubt
wrong," in the Harijan
apologized thus,
resulting from my 'bad hand-
situation is nonsensical.
June 24, Mr.
The talk of

অনুসরণ করিতে, অর্থাৎ, গৃহে এককালে যুগ্ম-বধূর সমাগম। কিন্তু একরাত্রে যোগেশ উল্কার মত হরিশের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "দাদা!"

"কি ভাই, যোগেশ?"

"একটা কথা ব'লতে চাই।"

"বল।"

"এই জোড়া পাঁঠার ব্যবস্থা না করে, আগে বৌদিদিকে ঘরে আনার ব্যবস্থা কর না! আমার জন্ম অতো তাড়াতাড়ি কিসের?"

"তাড়াতাড়ি? তাড়াতাড়ি তো কোন পক্ষের জন্যেই নেই, আমার। যোগেশ, ভাই, আমি বাবার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রতে চাই; তিনি আজ আমাদের মধ্যে দেহে বিরাজ ক'রছেন না, সত্যি! কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। তাঁর আদর্শ কি আমাদের আজীবন পালনীয় নয়?"

যোগেশ কঠিন হাস্য করিয়া বলিল, "অত সেকেলে হলে চ'লবে না, দাদা, যুগ-ধর্ম্মকে অস্বীকার ক'রে চললে জীবনে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।"

"কেন যোগেশ?"

"তুমি উকিল, তোমার উন্নতির সীমা-রেখা নেই। কিন্তু আমি মাষ্টার। আমার ভবিষ্যৎ তো অঙ্ক ক'ষে ব'লে দেওয়া যায়।

"কিন্তু যোগেশ তার চেয়ে তো বড় কথা—তুমি আর আমি ভাই। দুজনের অদৃষ্টকে এক ক'রে, আমরা শাক-ভাত খেয়েও আনন্দে থাকব।"

"না দাদা! আমার সোজা কথা, আমি এ অবস্থায় বিবাহের দায়িত্ব স্বীকার ক'রতে রাজি নই।"

"বেশ যোগেশ, তবে থাক এখন ও-ব্যাপার বন্ধ।"

"না, তুমি আমার জন্য কষ্ট ক'রতে যাবে কেন? আমি তোমার দুঃখের নিমিত্ত-ভাগী হ'তে চাইনে। তুমি যদি বৌদিদিকে ঘরে আন—আমি থাকব সংসারে, কিন্তু তার অন্যথায় আমি মেস ঠিক করেছি।"

হরিশ কথার উত্তর দিল না; নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

যোগেশ মেসে গেল না, কিন্তু অন্যত্র চাকুরি পাইয়া সুদূর বিদেশে চলিয়া গেল। এমন কি যাইবার কালে হরিশকে কিছু বলিয়া যাওয়ারও প্রয়োজন মনে করিল না।

হরিশ স্তব্ধ হইয়া যোগেশের সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষায় দিনাতিপাত করিতে লাগিল।

সুদূর বিদেশ বলিয়া যোগেশের বেতন-বৃদ্ধি হইয়াছিল। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ব্যয়-সংক্ষেপের নিমিত্ত তাহাকে গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। সে চাহিয়াছিল মেস; কিন্তু পাইল ঘরের আরাম। অধিকন্তু আরও সৌভাগ্য তাহার জুটিয়া গেল।

স্কুলের কর্ত্তা মানব বাবুর কন্যা এবং পুত্র পরীক্ষায় ভাল ফল করিয়া—পুত্র গেল লাহোরে পড়িতে এবং কন্যাটি ঘরেই পড়াশুনা করিতে লাগিল।

যোগেশ তাহাকে মন-প্রাণ দিয়া পড়াইত। তাই বিধাতা ব্যবস্থা করিলেন বিচিত্র। কন্যাটির সহিত তাহার বিবাহের জন্য গৃহ-কর্ত্রী ধরিয়া পড়িলেন।

যোগেশ বলিল, "আমি জানি নে—দাদাকে লিখুন।"

হরিশ পত্র পাইয়া যেমন বিস্মিত, তেমনি ক্ষুব্ধ হইল। সে নিজে-নিজে, মনে-মনে, অনেক আলোচনা করিল; "তাই তো! ভাই, এমন পর হ'য়ে গেল যে, সে নিজে একটা চিঠিও দিলে না?"

দুই-চারিদিন হরিশের কাটিল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়। তারপর পত্রের উত্তর দিতে বসিয়া অভিমানে দুঃখে তাহার চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল।

পত্রের উত্তর কিন্তু হরিশ যোগেশকেই দিল। তাহার যুক্তি তাহাকে বলিয়া দিল, ভাই পর হইয়া গিয়াছে বলিয়া দাদা তো আর পর হইয়া যায় নাই।

ভাই যোগেশ,

এ কি অবিচার তোমার? আমাকে কি ভুলে গেলে? শাস্ত্রে বাধে ব'লে অন্যের মারফতে অনুমতি চেয়েছ? বেশ! তাই হোক।"

অন্য একখানি কাগজে লিখিয়া দিল:—

আমার অনুজ শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র রায়কে বিবাহ করিতে স্বেচ্ছায় সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমতি দিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি, এই মিলন শুভফলপ্রসূ হউক। ইতি—শ্রীহরিশচন্দ্র রায়।

অভিমানের উত্তপ্ততায় পত্রখানি শুষ্কতার চরম মূর্ত্তি ধারণ করিল।

যে সেই লেখাটি পড়িল, সেই বুঝিল যে, বড় ভাই এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তই থাকিতে চাহে।

যথাকালে শুভ-কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেল। অপর পক্ষ বড় ভাইকে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ তো করিলই না। একটি ছাপা চিঠি দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াও সামাজিকতা রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ পর্য্যন্ত করিল না।

এদিকে হরিশ উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটাইয়া মনে করিল—তাহা হইলে সম্বন্ধ নিশ্চয়ই ভাঙিয়া গিয়াছে।

অরুণা যোগেশের স্ত্রী। সে একদিন বলিল, "আচ্ছা কেন বলুন তো, দিন দিন আপনি অমন শুকিয়ে রোগা হ'য়ে যাচ্ছেন ?"

"বিয়ের অভিশাপ লেগেছে !"

"সে আবার কি ?"

"দাদা একদিন আমার জন্যই বিয়ে ক'রলেন না, সংসারী হ'লেন না। আর আমি ?"······যোগেশ কথা না কহিয়া থামিয়া গেল।

"আপনি কি ?" অরুণা জিজ্ঞাসা করিল।

"ব'লতে ইচ্ছে করে না। কথায় আছে না—দশচক্রে ভগবানও ভূত হয় ! আমিও চক্রে প'ড়ে অমন দাদার কাছে ভূত হ'য়ে আছি !"

"চলুন না, এই গরমের ছুটিতে, আপনাদের পরস্পরের ভুল বোঝাটা শেষ ক'রে দিয়ে আসি গে !"

"বাপ্ রে ! পেঁয়াজ, পয়জার—দুই ? দাদা সে কিছুতেই ক্ষমা ক'রবেন না। আছেন তো গঙ্গাজল ! কিন্তু বেঁকলে আর রক্ষা আছে !"

"আমার কিন্তু আপনার দাদাকে দেখতে ভারী ইচ্ছে করে······"

"সে হয় না, অরুণা ! আমার সাহসে কুলোয় না ! হাজার হোক দাদাই তো !"

গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে যোগেশের ঘুস্-ঘুসে জ্বর দেখা দিল। জ্বর ক্রমে ক্রমে বিকারে দাঁড়াইল। বিকারে যোগেশ শুধু একই কথা বলে, "দাদা ! ছোট ভাইটিকে ক্ষমা ক'রবে না ? ম'রেও আমি সুখ পাব না ? ইস্ ! কি ভুলই ক'রে ফেললাম জীবনে !"

জীবনে সে ভুলের আর সংশোধন হইল না। যোগেশের ডাক পড়িয়া গেল।

এদিকে হরিশের অনেকবার ইচ্ছা হইয়াছে যোগেশকে চিঠি দিতে ; কিন্তু লিখি লিখি করিয়াও লেখা হয় নাই ! কোথায় যেন বাধা ! কোথায় যেন মন ঘাড় বেঁকাইয়া বলিয়া বসে : "না ! না ! কাজ নেই !"

হরিশের দিন কাটিয়া যায়। সে ভোরে উঠিয়া মাঠে একটা চক্কর দিয়া বেড়াইয়া আসে। ফিরিয়া দেখে বাড়ীতে মক্কেলের গাঁদি লাগিয়া গিয়াছে। তখন, কাজের মধ্যে ডুবিয়া যায়।

কখন বেলা বাড়িয়া উঠে। এৎবারি চাকর আসিয়া বলে, "বাবুজি ! স্নানের জল যে ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় ?"

হরিশ মাথায় এক খাব্‌লা তেল দিয়া নমোনম করিয়া স্নান সারিয়া, কোন ক্রমে গোবিন্দের পায়ে তুলসী-চন্দন দিয়া খাবারের আসনে আসিয়া বসে। নাকেমুখে গুঁজিয়া সে কেবল দিনগত পাপ-ক্ষয়।

বল্লভ কাছে দাঁড়াইয়া, হরিশ চোখ তুলিয়া দেখিয়া বলে, "চমৎকার রেঁধেছো শুক্তুনিটা আজ, বল্লভ-দা······"

"কৈ শুক্তুনি ? আজ তো রাঁধিনি !"

"তবে এ কি খেলুম ?"

"ওটা ? ওটা তো ডালনা !"

"ও—অ—অ—আমারই ভুল হয়েছে···"

"আর একটু দেবো ?"

"না, না, থাক, কাল শুক্তুনি রেঁধো ! পল্‌তার লতাটা আছে, না গেছে ?"

"না, সেটা নেই, নিস্তার মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই—সে-ই জল-টল দিতো !"

"আহা ! তাই তো ! নিস্তার যাওয়াতে বড় ক্ষতি হয়েছে তো !"

বল্লভ অপ্রসন্ন হইয়া চলিয়া গেল।

বোতাম-ছেঁড়া চাপকান আঁটিয়া এজলাসে দাঁড়াইয়া একটার পর একটা করিয়া মামলা শেষ করিতে হরিশের যেন তারুণ্য ফিরিয়া আসে। এ যেন সেই সেদিনের অভ্যাস। সে তো একলাটি নয় ! তার ভাই যোগেশ

আছে। মাষ্টারি করিয়া সামান্য কিছু অর্জ্জন করে। তাই সে বিবাহ করিতে চাহে না। যোগেশের উপার্জ্জনের ঘাটতি তো তাহাকেই দ্বিগুণ করিয়া পূরণ করিয়া তুলিতে হইবে। সেখানে, আর-সব কথা, মন হইতে নিমেষে সরিয়া যায়, শুধু যোগেশের অভাব যেন পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া আছে!

হাকিমের সামনে দাঁড়াইলে যে উত্তেজনা আসে তাহাই হরিশকে আজীবন জীবনী-শক্তি যোগাইয়া আসিয়াছে। আইনের কূটতর্কের গোলক-ধাঁধার মধ্যে প্রতিপক্ষের তর্কের প্রত্যেকটি বাধা যেন হরিশ রেসের ঘোড়ার মত অক্লান্তে উত্তীর্ণ হইয়া ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায়। হাকিম তারিফ করেন। প্রতিপক্ষ দমিয়া বসিয়া পড়ে, হরিশের মন যেন দুহাত তুলিয়া ডাকিয়া উঠে, "ভাই যোগেশ, আর কেন! ফিরে আয়, ফিরে আয়!"

কিন্তু দিনের পালা শেষ হইলে জেব-ভরা টাকা বহিতে বহিতে হরিশের পরিশ্রান্তির আর শেষ থাকে না!

গাড়ির কোচমান অধীর হইয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আর কেন? বাড়ী ফিরিলেই তো হয়! কিন্তু হরিশের মন সেই নিদারুণ শূন্য পুরীতে ফিরিতে চাহে না! ঠুক্ ঠুক্ করিয়া উকিল-খানার সিঁড়ি বহিয়া হরিশ গিয়া দেখে যদি যোগেশের কোন চিঠি আসিয়া থাকে! হায় অফুরন্ত আশা! সেখানে কোন দিন মন কি একবারের জন্যও "না" বলিতে জানে!

ডাকের বাক্স শূন্য। উকিল-খানায় আর কেহ নাই। গভীর কালো শূন্যতা বহন করিয়া রাত্রি আসে। হরিশের বুকের মধ্যে বিশ্বের শূন্যতা জমাট হইয়া জগদ্দল পাথরের মতোই চাপিয়া বসে।

বাড়ী ফিরিয়া আফিস-ঘরের টেবিলের দেরাজ টানিয়া হরিশ চমকাইয়া উঠিয়া বলে, "ঐ যা! ভুল যে আমার দিনকের দিন বেড়েই চ'লেছে! বেহারী, ও ব্রীজ-বিহারী!"

"জী হুজুর!"

"আ রে! ক'দিন ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওনি কেন?"

ব্রীজবিহারী হরিশের মুন্সী, সে থতমত খাইয়া বলে, "হুজুর তো হুকুম করেন নি!"

"আমার সঙ্গে তোমরাও কি বুড়ো হ'য়ে গেলে? নাও গুণে রাখো! কাল দশটার সময় ব্যাঙ্ক খুললে..."

"কাল যে রবিবার!"

"তাইতো! আর কিছুরই ঠিক থাকে না! একেবারে—"

দেহটা আর বহিতে চাহে না। পাশেই ফরাস-বিছানার দিকে চাহিয়া হরিশ ডাকিল, "ও এৎবারি, এৎবারি!"

"হুজুর!"

"কদ্দিন চাদর দেও নি ধোপার বাড়ী?"

"ধোপার ছেলের অসুখ, এ ধোপের কাপড় দিতে পারে নি।"

"অসুখ? কি অসুখ?"

"জানিনে।"

"একখানা চাদর বদ্‌লে দিয়ে, যা' জেনে আয়, কি অসুখ!"

"চাদর তো আর নেই!"

"না!"

"কি করলি তুই!"

সেই নোংরা বিছানায় শুইয়া পড়িয়া হরিশ ডাকিলেন, "ব্রীজ-বিহারী!"

"হুজুর!"

"তুমি গিয়ে জয়রাম ধোপাকে দশটা টাকা দিয়ে এসো তো! আর জিজ্ঞেস ক'রে এসো, তার ছেলে কেমন আছে।"

"আর শুন্‌ছো......"

"কাল ছ-জোড়া ফরাসের চাদর কিনে দিও। লোক জন এলে ভারি ব্যাভ্রমে পড়ে যাব দেখ্‌ছি!"

ব্রীজবিহারী চলিয়া গেল। নিমেষে হরিশের নাক ডাকিয়া উঠিল।

সেই তন্দ্রার মধ্যে স্বপ্ন। যোগেশ আসিয়া বলিতেছে: "দাদা! আমাকে একটু স্থান দেবে না?"

হরিশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, দেখিল শূন্য ঘর কেউ কোথাও নাই।

তাই তো! যোগেশের অসুখ হয়নি তো!

দেয়ালের উপর তারিখের কার্ডের কাগজগুলো হাওয়াতে ধড়মড় শব্দ করে। হরিশের তাহার উপর নজর পড়ে!

এ কি! সামনের হপ্তার সব লাল দাগ!' ছুটি। কিসের ছুটি! জানিনে তো!

ব্রজবিহারী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জোগ্ ওর ছেলেটা কাল মারা গেছে।"

"মারা গেল! আহা হয়েছিল কি?"

"জিজ্ঞেস করিনি।"

"আচ্ছা ব্রীজবিহারী, আগের হপ্তায় ছুটি কিসের?"

"হোলি, মহরম আর গুড্ ফ্রাইডে।"

"কতো টাকা তোমার হাতে আছে?"

"সাত শো বাইশ।"

"পশ্চিমের গাড়ি কটায় ছাড়ে জান?"

"তিন বাজে রাত।"

"তুমি পারবে আমার সঙ্গে যেতে?"

"কোথায়?"

"আম্বালা।"

"যাবো, আমি তো আপনার তাঁবেদার।"

"তা নয়, তোমার বাড়ী যাওয়ার কথা নেই তো। বেশ! বেশ! চলো একটু পশ্চিমে বেড়িয়ে আসি। জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নাও। কোচমানকে ব'লে দাও, তিনটের গাড়িতেই যাবো।"

* * *

গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে রাত্রি-দিন। হরিশ জীবনে এত বড় দুঃসাহসের কাজ আর ইতিপূর্ব্বে করে নাই। আর কিছুতেই সবুর করা চলে না। মনে হয়, শেষের দিন আসন্ন। এখনই যোগেশের হাতে বিষয়-আশয় বুঝাইয়া দিতে হইবে।

ভোরে গিয়া আম্বালায় গাড়ি পৌছিল। কুটুম্বের বাড়ী না সংবাদ দিয়া উঠা ঠিক হয় না। তা ছাড়া, তাহাদের সহিত কোন পরিচয়ও নাই। অগত্যা ব্রীজবিহারীর পরামর্শে একটা ধর্ম্মশালায় উঠিল।

সন্ধ্যায় একখানা গাড়ি লইয়া সংবাদ লইতে লইতে হরিশ সারা শহর পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিল। আম্বালার লোকে যোগেশ রায়কে চেনে না। তাই তো! রাত্রিতে নিদ্রা নাই! একটা মানুষ এতদিন ধরিয়া এই শহরে বাস করে, আর তাহাকে কেহই জানে না, চেনে না। অসম্ভব!

শেষ রাত্রে একটা কথা মনে হওয়াতে হরিশ উঠিয়া বসিল; এত সহজ! এই কথাই মনে এলো না! ছিঃ বুড়ো হওয়ার অনেক দোষ!

পোষ্ট-মাষ্টার বলিল, "মাধব চক্রবর্ত্তীর কেয়ারে যোগেশ রায়ের নামে এক ভদ্রলোক থাকেন বটে! কিন্তু ইদানীং আর কোন চিঠি-পত্র তাঁর নামে আসে না!"

"বটে! মাধব চক্রবর্ত্তীর ঠিকানাটা।"

ঠিকানা লইয়া হরিশ গাড়িতে গিয়া উঠিল। মনে মনে যোগেশের সহিত দেখা হইলে কিরূপ কথাবার্ত্তা হইবে, তাহারই আন্দোলন চলিতে লাগিল।

মাধব চক্রবর্ত্তীর গেটের উপর পাথরের ট্যাব্‌লেট দেখিয়া হরিশ প্রায় ঝাঁপাইয়া মাটিতে পড়িল।

"যোগেশ রায় কি বাড়ী আছেন?"

উপরের জানলা হইতে একটি অল্পবয়সী মেয়ে বলিল, "না, তিনি নেই!"

"কোথায় গেছেন?"

"বেঁচে নেই!"

বহু চেষ্টায় হরিশের জ্ঞান হইল। দুই চক্ষু দিয়া বর্ষার বন্যার ন্যায় অশ্রু ধারা বহিয়া চলিয়াছে!

হরিশ অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "যোগেশ আমাকে না ব'লেই চলে গেল?"

মহাসমরের মুখে

—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বিশেষজ্ঞগণ কিছুপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, বসন্তকালেই প্রতি-পক্ষীয়দের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা শুরু হইবে। ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্ম্মানী বর্ত্তমান সমরে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ। ইহাঁদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের ভাষণেও ইহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল। এখন তাঁহাদের কথা কতকটা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় গত কয়েক মাসের অবস্থার বিষয় আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জার্ম্মানী এখন ডেনমার্ক ও নরওয়েতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

গত বৎসর ১লা সেপ্টেম্বর জার্ম্মান-বাহিনী পোল্যাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম করে। সেই হইতে আজ আট মাস অতীত হইল। এখন পর্য্যন্ত রণদেবতা ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্ম্মানী ছাপাইয়া অন্যত্র গিয়া পৌঁছায় নাই। রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে সংগ্রাম হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা হইল বামন-দানবের সংগ্রাম। উক্ত রাষ্ট্রত্রয় ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে নাই; বর্ত্তমান সমর প্রকৃত প্রস্তাবে এখনও উক্ত রাষ্ট্র তিনটির মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে।

জগতের, এবং বিশেষ করিয়া ইউরোপের অন্য কোন প্রধান বা অপ্রধান রাষ্ট্র[১] (অবশ্য পোল্যাণ্ড ছাড়া) ইহাতে লিপ্ত না হইয়া পড়িলেও ইহা যে ইতিমধ্যে মহাসমরের পর্য্যায়ে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সাম্রাজ্য জগৎ-জোড়া। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমিদ্বয় যখন সমরে লিপ্ত তখন বিভিন্ন অংশও ইহার মধ্যে জড়িত না হইয়া পারে না। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক্ দিয়াই কেন্দ্রভূমির সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ। কাজেই একদিকে ব্রিটেন-ফ্রান্স ও অন্যদিকে জার্ম্মানী থাকিলেও পৃথিবীর বহু দেশ, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ভারতবাসীরাও ইহার প্রকোপ হইতে অব্যাহতি পাইতেছি না। এ কারণে ইতিমধ্যেই অনেকে ইহাকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাসমর বলিয়া অভিহিত করিতে শুরু করিয়া দিয়াছেন।

এবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে পোল্যাণ্ড লইয়া। পোল্যাণ্ডের উপর জার্ম্মানীর কোপের হেতু আজ ইতিহাসের বস্তু। পোল্যাণ্ডের পক্ষ লইল ফ্রান্স ও ব্রিটেন। কিন্তু ইহারা তাহাকে কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে, সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলে খুবই। কারণ রুশিয়া ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি করিয়া বসে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল ও জার্ম্মানীর সিগ্‌ফ্রিড লাইন আক্রমণ করিল। জার্ম্মান-বাহিনী কিন্তু ইহাতে ভীত বা সন্ত্রস্ত না হইয়া সমস্ত শক্তি পোল্যাণ্ড-অধিকারে বিনিয়োগ করিল। পক্ষ-কালের মধ্যে পোল্যাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে গিয়া তাহারা হাজির হইল। সোভিয়েট রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী এই সুযোগে পূর্ব্ব দিক্ হইতে তাহার ভিতরে প্রবেশ করে ও পোল্যাণ্ডের প্রায় অর্দ্ধেকটা দখল করিয়া ফেলে। ব্রেষ্ট-লিটভস্ক শহরে দ্বিতীয় বার সন্ধি হইল জার্ম্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর। এবারে সন্ধি হইল সমানে সমানে। আর একবার এই দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে ঐখানে বসিয়াই সন্ধি হইয়াছিল ১৯১৮ সনের ৩রা মার্চ্চ তারিখে। জার্ম্মানী সে সময় বিজয়-গর্ব্বে মত্ত, আর বিধ্বস্ত-প্রায় রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী বোলশেভিকরা সবে মাত্র শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে। তখনকার এই সন্ধি বোলশেভিকদের মুখে কলঙ্কের প্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছিল।

বিগত ১৮ই সেপ্টেম্বর পুনরায় ব্রেষ্ট-লিটভস্ক শহরে বসিয়া সোভিয়েট রাশিয়া এই কলঙ্ক স্খালন করিল বটে, কিন্তু ইহার জন্য তাহার আদর্শের কিছু বিসর্জ্জন দিতে হইল। ইহার তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে জার্ম্মানীর সঙ্গে সে অকস্মাৎ সন্ধিবদ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে জগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছিল খুবই, কিন্তু ইহার পরিণাম সম্বন্ধে লোকে তখনও বিশেষ কিছু আঁচ করিতে পারে নাই। জার্ম্মানীর সঙ্গে একযোগে পোল্যাণ্ড বখরা করিয়া লওয়ায় লোকে সর্ব্বপ্রথম ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিল। পরে সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মোলোটোভ এক বক্তৃতায় সোভিয়েটের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির যে ব্যাখ্যা করি-

১ এই রচনা জার্ম্মানী কর্ত্তৃক হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ আক্রমণের পূর্ব্বে লিখিত।

বাছেন, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকে নাই। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে সোভিয়েটের মতে জার্ম্মানী আর "এ্যাগ্রেসর"বা "পররাষ্ট্র-আক্রমণকারী রাষ্ট্র" নহে, ইহার প্রতিপক্ষীয়েরাই এখন "এ্যাগ্রেসর" রাষ্ট্র। জার্ম্মানীর ন্যায় রাশিয়াও যে পররাজ্য আক্রমণ ও গ্রহণ অন্যায় মনে করে না, তাহা আরও স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে তাহার প্রতিবেশী স্বাধীন ফিনল্যাণ্ডকে আক্রমণের মধ্যে।

ব্রিটিশ ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যই জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু রাশিয়া যখন



চেম্বারলেন।

পোল্যাণ্ডের এক অংশ কাড়িয়া লইল, তখন ইহারা উচ্চবাচ্য করে নাই। পরন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড হালিফাক্স বলিয়াছেন, ভার্সাই সন্ধিতে কার্জ্জন লাইনই পোল্যাণ্ডের পূর্ব্ব সীমানা সাব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু পোলরা ১৯২০ সালের পোল-রুশ যুদ্ধের পর নিজের চেষ্টায় আরও দেড় শত মাইল পূর্ব্ব দিকে সীমানা সরাইয়া লয়, এবং পরবর্ত্তী রিগা চুক্তিতে ইহাই পূর্ব্ব সীমানা বলিয়া ধার্য্য করা হয়। এ সময় এ কথা স্মরণ করাইয়া দিবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ব্রিটিশের মতে বোধ হয় পূর্ব্ব সীমানা কার্জ্জন লাইনে আবদ্ধ থাকা তখন উচিত ছিল। পোল্যাণ্ড-বিভাগ কার্য্যে রাশিয়া যোগদান করিলেও তাহার বিরুদ্ধে কিন্তু ফ্রান্স ও বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। ইদানীং রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেন মিত্রতা স্থাপনেই যেন ব্যস্ত।

জার্ম্মানী হয়তো ভাবিয়াছিল রাশিয়ার সহযোগে সরাসরি পোল্যাণ্ড ভাগবণ্টন করিয়া করিয়া লইলে মিত্রশক্তিদ্বয় আবার নাক চোখ বুজিয়া তাহার সঙ্গে সন্ধি করিয়া লইবে—যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে তাহার কার্য্য রুচি-সম্মত না হইলেও ইহারা মানিয়া লইয়াছিল। অথবা রাশিয়ার বিরুদ্ধেও ইহারা তখনই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিবে। কিন্তু কোন ভাবেই তাহার ইচ্ছার অনুরূপ কার্য্য হইল না।

হিটলার কিন্তু যেমন এতদিন মহাসমরের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তেমনি একবার যুদ্ধ বাধিয়া গেলে প্রতিপক্ষকে তাড়াতাড়ি কিরূপে ঘায়েল করা যাইতে পারিবে তাহারও ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ব্রিটিশের বাণিজ্য জগতের সর্ব্বত্র, বাণিজ্যপোতে জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে রসদ ও জিনিষপত্র আমদানী-রপ্তানী হয় ব্রিটেনে। জার্ম্মানী আগে হইতেই 'ইউ-বোট' নামে এক প্রকার সাবমেরিন আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন ঘাঁটিতে মোতায়েন করিয়া রাখিয়াছিল। এক দিকে যেমন পোল্যাণ্ডের উপর চড়াও হইল অন্য দিকে 'ইউ-বোট' হইতে টর্পেডোর আঘাতে বাণিজ্য-পোত ডুবাইয়া দিতে লাগিল। পোল্যাণ্ড অধিকৃত হয় পক্ষকালের মধ্যে, ইউ-বোটের অত্যাচার কিন্তু ইহার পরও কিছুকাল চলে। ব্রিটিশ রণতরী, যাহা হউক, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অতঃপর ইউ-বোটের জাহাজডুবি প্রায় বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হয়। এখন ইউ-বোটের অত্যাচারের কথা শুনাই যায় না।

ইহার পরই জার্ম্মানী আর এক অস্ত্র ব্যবহার করিতে শুরু করে। ইহারও উদ্দেশ্য বাণিজ্যপোত ধ্বংস। এই অস্ত্রটির নাম 'ম্যাগ্‌নেটিক মাইন'। হিটলার একবার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, জার্ম্মানী এক অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব্ব অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। এ বিষয় অন্য কোন দেশই অবগত নয়। এই অস্ত্র প্রয়োগে শত্রুকে অনায়াসে ও অল্প সময়ের মধ্যেই হারাইয়া দেওয়া যাইবে। অনেকে মনে করেন, হিটলার এই অস্ত্রের কথাই বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জে. বি. এস্. হাল্‌ডেন 'দি নিউ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান

ও নেশুন্' পত্রিকায় সম্প্রতি 'ম্যাগনেটিক মাইন' সম্বন্ধে আলোচনা কালে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা এ বিষয় এখনও অজ্ঞই রহিয়াছেন। তবে ইংরেজ বৈজ্ঞানিকরাও ইহার নির্ম্মাণ ও প্রয়োগ আবিষ্কারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। গুজব এই, বিমানপোত হইতে জার্ম্মানরা এই মাইন সমুদ্রের যাতায়াত পথের স্থানে স্থানে ফেলিয়া রাখে। বাণিজ্যপোত গমন কালে ইহা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ইহার দিকে ছুটিতে থাকে ও আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যায়। ম্যাগনেটিক মাইনের আঘাতেও বহু বাণিজ্য-পোত ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জাহাজডুবি যে ব্রিটিশ বা ফ্রান্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, তথাকথিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির অনেকের জাহাজও ইহাদ্বারা নিমজ্জিত হইতেছে। তাহাদের প্রতিবাদ হইতেছে, অরণ্যে রোদন।

জার্ম্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চিম সীমান্ত সিগ্‌ফ্রিড্ লাইন ফরাসী-বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, আগে ইহার আভাস দিয়াছি। ব্রিটেনও পরে সৈন্য পাঠাইয়াছে ফরাসী সীমান্তের ম্যাজিনো লাইনে। মিত্র-শক্তিদ্বয় জার্ম্মানীর সামান্য কিছু আড্ডা অধিকার করিলেও এখনও প্রকৃত পক্ষে ম্যাজিনো লাইনেই অবস্থিতি করিতেছে। জার্ম্মানী তাহার দিকের সীমান্ত রক্ষায় যেমন ব্যস্ত, ইহারাও ইহাদের ম্যাজিনো লাইন রক্ষায় সমান তৎপর। যুদ্ধে বিমানপোত প্রাধান্য লাভ করায় স্থল-যুদ্ধের কৌশলে অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বিমানপোতের সম্মুখে এখন আর শত্রু-রাজ্যে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ বিমানপোত হইতে বোমা ফেলিয়া অগ্রগামী শত্রু-বাহিনীকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা যাইতে পারে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাই এক নূতন পথ গ্রহণ করিয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধকে কেহ কেহ বলিতেছেন 'ইকনমিক ওয়ার' বা অর্থনৈতিক যুদ্ধ। জার্ম্মানী বিদেশ হইতে খাদ্য, রসদ, পেট্রল, তৈল, অস্ত্রশস্ত্র-নির্ম্মাণের জন্য রকমারি কাঁচামাল সরবরাহ করিয়া থাকে। এই সব মাল বেশীর ভাগ আসে সমুদ্র-পার হইতে সমুদ্র-পথে। আবার ইহার একটা মোটা অংশ ফরাসী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে আমদানী হয়। ফ্রান্স ও ব্রিটেন প্রথমে জার্ম্মানীর সঙ্গে নিজ নিজ দেশ ও সাম্রাজ্যের কার-কারবার একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার পর সমুদ্র-পথে জার্ম্মানীর উৎপাত ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিলে তাহারা অন্য উপায়ও অবলম্বন করে। সমুদ্রের রাজা এখনও ব্রিটেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স একযোগে সমুদ্র-পথে জার্ম্মানীর সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অতঃপর জার্ম্মানীতে সমুদ্র-পথে কোন দেশ হইতেই মালজাহাজ যাতায়াত করিতে পারিবে না স্থির হয়। ইহাতে প্রথমে কোন কোন দেশ (যেমন, জার্ম্মানীর নূতন বন্ধু সোভিয়েট রাশিয়া) আপত্তি জানায়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত

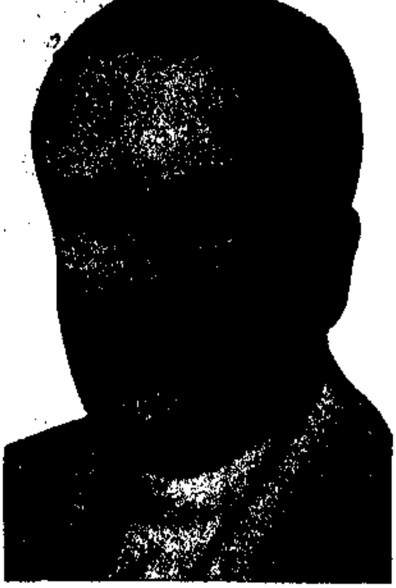


হিটলার।

প্রায় সকলেই সম্মতি দান করিয়াছে। সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে হইলে ব্রিটিশের সাহায্য সকলেরই লইতে হয়। একারণ তাহাকে চটাইতে চায় না কেহই। জার্ম্মানীতে এখন সমুদ্রপথে কোন চিঠিপত্র, মণিঅর্ডার, বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ, পার্সেল কিছুই পৌঁছিবার জো নাই। এক কথায় মিত্রশক্তিদ্বয় জার্ম্মানীকে আর্থিক অবরোধ করিয়াছে।

জার্ম্মানী ইহার প্রতিষেধকল্পে কি কি উপায় অবলম্বন করিতেছে দেখা যাউক। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্র-

মণাত্মক চুক্তিতে আবদ্ধ (২৩শে আগষ্ট, ১৯৩৯) হইবার কিছুকাল পরে উভয়ের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। বিশাল সোভিয়েট রাশিয়ার কাঁচামাল অফুরন্ত। তাহার কিয়দংশ পাইলেও জার্ম্মানী বাঁচিয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য, পশ্বাদির খাদ্য, পেট্রল, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিষের জন্য বিদেশের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের আর্থিক অবরোধের ফলে সমুদ্রপথে এসব আমদানী হইতে পারিতেছে না। রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি করিয়া কতকটা এ অভাব মিটাইতে পারিবে, সে এইরূপ আশা করে। রুশিয়ার



মোলোটভ।

চারিদিকে এই সকল জিনিষের অনেকই ছড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহার সুব্যবস্থা না হইলে সে কতখানি উপকৃত হইতে পারিবে বলা কঠিন।* আবার রুশিয়াকে ফিনল্যাণ্ডের মত অনুরূপ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইলে তাহারও তেল নিজের কাজেই ঢের লাগিবে, এজন্য তেল মজুত করিয়া রাখার দরকার। জার্ম্মানীকে বেচিবার জন্য অবশিষ্ট থাকে কি না সন্দেহ। রাশিয়ার যে বিদেশ হইতেও তেল আমদানী করা দরকার, রুমানিয়া হইতে জার্ম্মানীতে প্রেরিত তেল পথিমধ্য হইতে তাহারা লইয়া যাওয়ায় তাহা বেশ প্রতীতি হয়।

সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া জার্ম্মানীর অপর ভরসা পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইউরোপের বলকান রাষ্ট্রগুলি। রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস্ ও তুরস্ক বলকান আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্র। জার্ম্মানীর পূর্ব্ববন্ধু ইতালী বর্ত্তমান যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিলেও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে তাহার কোন আটক নাই। কিন্তু কাঁচামাল যে তাহারও চাই। এজন্য জার্ম্মানীর আর্থিক সাহায্যে সে আসিবে না মোটেই। এই বলকান রাষ্ট্রগুলির উপরই জার্ম্মানীর ভরসা এবং ইহাদের সঙ্গেই তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য গত কয়েক বৎসরে খুবই বাড়াইয়া লইয়াছে। তাহার ব্যবসার ধারা এই—এসব স্থান হইতে যে কাঁচামাল ক্রয় করে, বিনিময়ে তাহার শিল্পজাত দ্রব্য, মায় অস্ত্রশস্ত্র ইহাদিগকে সরবরাহ করে। যেসব কাঁচামাল এ অঞ্চলগুলি হইতে জার্ম্মানী গ্রহণ করে তাহার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণোপযোগী লৌহাদি ধাতু দ্রব্য এবং আধুনিক যুদ্ধের পক্ষে অপরিহার্য্য পেট্রল ও তৈল প্রধান। রুমানিয়ায় এই পেট্রলের খনি প্রচুর। পূর্ব্বের মত বর্ত্তমানেও তাহার ব্যবসা এখানে অব্যাহত ভাবে চলে ইহাই এখন তাহার একান্ত ইচ্ছা। এসব স্থানের জার্ম্মাণ দূতগণকে বার্লিনে এক কন্‌ফারেন্সে ডাকিয়া গোপনে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বলকান্ রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রসচিবগণ বেলগ্রেডে এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া বর্ত্তমান যুদ্ধে তাঁহাদের মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন। এসব দেশ নিরপেক্ষ থাকিবে কিন্তু নিজেদের নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার জন্য একযোগে চেষ্টা করিবে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে যুদ্ধ যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে ইহারা। ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে। ইহাদের প্রতিবেশী বুলগেরিয়া আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্র না হইলেও স্বতন্ত্র ভাবে এই সব প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়াছে। ইতালীও না কি ইহাতে খুশী হইয়াছে খুবই। কিন্তু আগের চেয়ে আশ্বস্ত হইয়াছে নিশ্চয়ই জার্ম্মানী। কারণ কাঁচামাল, বিশেষতঃ তৈল পাইতে তাহার হয়তো অতঃপর বাধা হইবে না। রুমানিয়ার তৈল সম্বন্ধে কিন্তু ইতিপূর্ব্বে একটা কথা উঠিয়াছিল। এখানকার তৈলের খনিগুলিতে ব্রিটিশ ও ফরাসী টাকা খাটে

---

* অনুসন্ধিৎসু পাঠক এবিষয়ে 'ফরেন এফেয়ার্স' (জানুয়ারী ১৯৪০) ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত How Must Can and Will Russia Aid Germany ? প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা পাইবেন—লেখক।

প্রচুর। কাজেই ব্রিটিশ ও ফরাসীদের তরফ হইতে জার্ম্মানীকে তৈল যোগান দেওয়া যাহাতে কমাইয়া দেওয়া যায় তাহার চেষ্টা হইয়াছিল। রুমানিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, পূর্ব্ব চুক্তি অনুসারে যাহার যতটুকু তৈল প্রাপ্য তাহাকে ততটুকুই দেওয়া হইবে, ইহার কম-বেশী করিলে চুক্তি-ভঙ্গের দায়ে তাঁহাদিগকে পড়িতে হইবে। যাহা হউক, এখন এ সম্বন্ধে আর কোন বাদানুবাদ হইবে বলিয়া মনে হয় না। জার্ম্মানীতে খাদ্যদ্রব্যের দুর্ভিক্ষ না কি অত্যধিক—এইরূপ শুনা যাইতেছে। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক মিঃ এচ্. জি. ওয়েল্‌স্ তাই বলিয়াছেন, জার্ম্মানীতে এরূপ ভাবে খাদ্যাভাব না ঘটাইয়া তাহার উপর এখন বিমানযুদ্ধ চালানোই ঠিক। রাশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া এই অভাব তাহারা কতটা মিটাইতে পারিবে, বলা যায় না।

বর্ত্তমান সংগ্রামে ইউরোপের অন্য রাষ্ট্রগুলির মতিগতি কিরূপ, এবং ইহার প্রতিক্রিয়া অন্যত্র কিরূপ পড়িয়াছে তাহাও একবার লক্ষ্য করিতে হইবে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই দুইটি রাষ্ট্রের কথা মনে আসে—ইতালী ও সোভিয়েট রাশিয়া। সোভিয়েট রাশিয়া জার্ম্মানীর নূতন বন্ধু। সর্ব্বত্রই যেমন, নূতনের প্রতি তাহার আসক্তিই যেন অধিকতর ইদানীং। সোভিয়েট রাশিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানীর সঙ্গে সামরিক ভাবে যোগদান করে নাই। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাহাকে শত্রু বলিয়া গণ্য করে নাই। এ সকলের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এ-সব সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়া যে জার্ম্মানীর সঙ্গেই তাল রাখিয়া চলিতেছে তাহা তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে। তাহার লক্ষ্য মহাসমর বাধিবার পূর্ব্বেই তাহার আটঘাট বাঁধিয়া লওয়া। আর এইজন্যই লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়াকে স্বমতে আনিয়া ফিনল্যাণ্ডের উপর চড়াও হইয়াছিল। এই তিনটি যেমন নিজ নিজ দেশে সোভিয়েটকে নৌ-ঘাঁটি, বিমান-ঘাঁটি প্রভৃতি স্থাপন করিতে দিতে রাজী হইয়াছে, ফিনল্যাণ্ড তেমনটি করিতে প্রথমে রাজী হয় নাই—এই তাহার অপরাধ। ফিনল্যাণ্ডের কিছু অংশও সে আত্মস্থ করিতে চাহিয়াছিল। ফিনল্যাণ্ড ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে সংগ্রাম চলিয়াছিল প্রায় তিন মাস ধরিয়া। ফিনল্যাণ্ড পরে "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিত" নীতি অনুসারে কিছু কিছু ছাড়কাট করিয়া বিরাট রাশিয়ার সঙ্গে আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এই যুদ্ধে ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য করিয়াছিল ফ্রান্স, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপ্রমুখ অনেকেই, কিন্তু ইহাতে তৎপরতা দেখাইতেছিল ইতালী সকলের চেয়ে বেশী।

ইতালী জার্ম্মানীর পুরাতন বন্ধু। সে জার্ম্মানীর নূতন বন্ধুর প্রতিপক্ষকে এরূপ ভাবে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিল কেন? উভয়ের আদর্শের প্রভেদ সত্ত্বেও ইতালী এক সময় সোভিয়েটের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইল। জার্ম্মানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্যই সে তাহাকে ত্যাগ করে



প্রেসিডেন্ট কালিও।

ও সোভিয়েট-বিরোধী যে প্যাক্ট জাপান ও জার্ম্মানী করে সে তাহার সঙ্গে নিজকে যুক্ত করে। জার্ম্মানী অকস্মাৎ সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় ইতালী কতকটা হকচকিয়া গিয়াছে, জার্ম্মানী ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া ইতালীর সাহায্যও চাহিল না। এই সব কারণে ইটালীও নিজকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে। রাশিয়া হইতে তাহার আশঙ্কা বাড়িয়া গিয়াছে ইদানীং। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের দিকেও রাশিয়ার নজর রহিয়াছে—এ কথা সে জানিতে পারিয়াছে। তাই ফিনল্যাণ্ডে তাহাকে লিপ্ত করিয়া রাখিতে স্বভাবতঃই সে চাহিয়াছিল। বলকান্

রাষ্ট্রগুলির নিরপেক্ষতা প্রস্তাবে তাহার যে উল্লাস, তার মূলেও রহিয়াছে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপ হইতে সোভিয়েট রাশিয়াকে সরাইয়া রাখা। ইতালীও জাপানের সহিত সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। জার্ম্মান-সোভিয়েট চুক্তির পর সোভিয়েট ও জাপানের মধ্যে যে আপোষের মনোভাব লক্ষিত হয় তাহা হইতে তাহাকে দূরে লইয়া যাওয়াও তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে।

বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তুরস্ক কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যমূলক চুক্তিতেই আবদ্ধ হইয়াছে।



এচ্. জি. ওয়েলস।

সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তাহার আলাপ-আলোচনা ফাঁসিয়া গিয়াছে। দার্দ্দেনেলিস ও বস্‌ফরাস্ প্রণালী দিয়া রাশিয়ার পক্ষে বাহিরে বাহির হওয়া সম্ভব হইবে না। অথচ তাহার প্রতিপক্ষীয়ের রণতরী প্রয়োজন হইলে ইহা দিয়া কৃষ্ণসাগরে গিয়া পৌছিতে পারিবে। ফিনল্যাণ্ডে রাশিয়ার সুরাহা হইলে এদিকেও সে মনঃসংযোগ করিতে পারে। তুরস্ক ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় এ-কার্য্যে তাহার পক্ষে খুবই ঝুঁকি লইতে হইবে। আবার সে যাহাতে রুমানিয়ার উপরও চড়াও হইয়া না বসে সেজন্য ইতালী ওদিকে ওঁৎ পাতিয়া আছে।

একটু আগেই সোভিয়েট রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে আপোষের মনোভাব উল্লেখ করিয়াছি। জার্ম্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার চুক্তি হইবার কিছু দিন পরেই বহুদিনের পুরাতন সোভিয়েট-মাঞ্চুকুও সীমান্ত-বিরোধের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন যদিও সম্প্রতি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আবার দুইটি অনুরূপ কমিশন গঠনের প্রস্তাব জাপ-সরকার করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে শাখালিনের মৎস্য-শিল্প লইয়া যে বিবাদ ছিল তাহা আগেই মিটিয়া গিয়াছে। এসব সত্ত্বেও জাপান ও রাশিয়ার আপোষের মনোভাব সম্প্রীতির স্তরে গিয়া উঠিবে কি না, এখনও বলা কঠিন। একদিকে ইতালীর চীনে জাপ-অধিকার স্বীকার দ্বারা নূতন করিয়া জাপানের সঙ্গে মিতালী স্থাপনের চেষ্টার মধ্যে জাপানেরও রুশ-বিরোধী মনোভাবই প্রকট হইয়া পড়িতেছে। অন্যদিকে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত ২৬শে জানুয়ারী জাপানের সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলায় জাপান সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করিতে বাধ্য হয় কি না কে বলিতে পারে? সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করিয়া সে এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে পারিবে—চীন-বিজয় সুসম্পন্ন হইবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সব কাঁচামালের প্রত্যাশী সে ছিল, সে সবই চীন ও রাশিয়া হইতে পাইতে পারিবে।

বর্ত্তমান জটিল আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা তাই চীনকেও ভাবিত করিয়া তুলিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়াই তাহাকে স্থলপথে এতদিন অস্ত্রশস্ত্র জোগাইয়াছে। জলপথ তাহার নিকট রুদ্ধ। জাপান চীনের বন্দরগুলির উপর ও পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করায় জলপথের সুযোগ হইতে সে বঞ্চিত। আবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে জাপানকে প্রচুর রণসম্ভার বিক্রয় করা হইয়াছে এতদিন। ব্রিটেন ফ্রান্স হইতে ও চীন তেমন সাহায্য পায় নাই। এই সব বিদেশী রাষ্ট্রের আর্থিক স্বার্থ চীনে বিশেষভাবে থাকায় জাপান ইহাদের প্রতিকূলতার সম্মুখে এতদিন বেশী কিছু সুবিধা করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহাতে চীনের বিশেষ দরকারী প্রত্যক্ষ কোন সাহায্য হয় নাই। এখন যদি কূটরাজনীতির আবর্ত্তে পড়িয়া সোভিয়েট সাহায্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে অস্ত্র-শস্ত্রের অভাবে যুদ্ধ চালানই দায় হইবে। এই সব বুঝিয়াই

বোধ হয় চীন হইতে মার্শাল চিয়াং কাই-শেক আবার নূতন করিয়া বিদেশীদের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছেন। এতদিন এ রকম আবেদনে তেমন কিছুই সাড়া পাওয়া যায় নাই, এখন ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় পাওয়া যাইবে কি?

চীন জয়ের উদ্দেশ্য স্থির থাকিলেও জাপানের বৈদেশিক নীতি কিন্তু ঠিক বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না ইদানীং। রাশিয়ার সঙ্গে সম্প্রীতিও স্থাপন করিতে চাহে, আবার ইতালীর বন্ধুত্বও যে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিও তাহার মনোভাব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করিলেও সে তাহাতে বিশেষ উষ্মা প্রকাশ করে নাই। পরন্তু বলিয়াছে যে, 'শান্তিপূর্ণ' চীনে জাপান বিদেশীদের অধিকার স্বীকার করিয়া লইবে। আড়াই বৎসর যাবৎ চীনে অবিরাম অভিযান চালাইবার ফলে জাপানে আজ না কি ভীষণ অর্থাভাব দেখা দিয়াছে। তাই যে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখিতে হয়তো আজ এত ব্যস্ত! একবার চীনকে নিজ মুঠার মধ্যে ফেলিতে পারিলে সে আবার নিজ মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে পারে।

বর্ত্তমানে আমেরিকা কি করিতেছে? দুইটি আমেরিকার একুশটি রিপাবলিকেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কাজেই তাহার কথাই এ প্রসঙ্গে বিশেষ মনে পড়ে। ইহার প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্ট শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ চেষ্টিত, কিন্তু এখনও কৃতকার্য্য হন নাই, ইতিমধ্যে নিজ দেশে নিরপেক্ষতা আইন এবং পানামায় রিপাব্লিকগুলির সমবেত সম্মেলনে নিরপেক্ষতা প্রস্তাব পাশ করাইয়া ইউরোপের ভিতরই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন যুদ্ধরত দেশগুলির নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে মার্কিন বাণিজ্যপোতের গমনাগমন নিষিদ্ধ। তবে তাহারা নিজ দায়িত্বে সেখান হইতে মাল-পত্র আমদানী করিতে পারিবে। ফ্রান্স ও ব্রিটেনই এ সুবিধা পাইয়াছে, আর্থিক অবরোধ হেতু জার্ম্মানী এ সুবিধা পায় নাই। ব্রিটেন বহু সহস্র বিমানপোতের অর্ডার দিয়াছে যুক্তরাষ্ট্রে। বর্ত্তমান যুদ্ধ যদি যুদ্ধরত তিনটি দেশ ছাড়া অন্যত্রও ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে



প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট।

যুক্তরাষ্ট্র তথা আমেরিকার রিপাব্লিকগুলি কতদিন নিরপেক্ষ থাকিতে সক্ষম হইবে, ইহা বিবেচ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যে কিন্তু এই ছয় মাসের মধ্যে বিশেষ সঙ্কোচ ঘটিয়াছে সর্ব্বত্র। মুষ্টিমেয়ের সুবিধা হইলেও, কোটি কোটি মানুষ ইতিমধ্যেই ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতেছে। মহাসমর সত্য সত্যই আরম্ভ হইলে লোকের দুরবস্থা কোন স্তরে গিয়া পৌঁছিবে, কেহই তাহা বলিতে পারে না

প্রকৃত স্বাধীনতা

...আমাদিগের মতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া আখ্যাত করা চলে না। আমরা যে অবস্থাকেই প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া মনে করি, সেই অবস্থায় ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক মানুষের স্বাবলম্বনে কাহারও কোনরূপ বেতনভোগী চাকুরী অথবা নফরগিরী (অর্থাৎ জজীয়তি হউক আর মেথরগিরী হউক) না করিয়া আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।...

হত্যাকারীর বিচার

—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

মহাদেবপুর ঘাটের নিকটে আটচালার বারান্দায় রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় ক্যাম্প খাটে নিদ্রামগ্ন অনিল।

বারান্দার পার্শ্বে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রসারিত নদীসৈকত—এই কবিত্বপূর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে অনিল স্বপ্ন দেখিতেছিল। স্বপ্নে তাহার মনে হইল যে, বারান্দা উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। কোথা হইতে সুগন্ধবহ পুষ্পের সুবাস ভাসিয়া আসিতেছে, তাহার আনন স্বর্গীয় আভায় দীপ্ত। সেই মুহূর্ত্তেই কে যেন কাণের কাছে তাহার শয্যার পার্শ্বে নিম্নস্বরে বলিয়া উঠিল…"ভাগলপুর'। এই কথা উচ্চারিত হইবার পর হঠাৎ যেন আলোক, সৌরভ, দীপ্তি সকলই অদৃশ্য হইল—অনিলের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না।

শয্যা হইতে উঠিয়া অনিল ভাবিল যে ঘুমন্ত অবস্থায়, সে যাহা দেখিয়াছে তাহা স্বপ্ন ব্যতীত কিছুই নহে—কিন্তু কাণের কাছে কাহার নিম্ন স্বর সে শুনিল? ইহার সহিত স্বপ্নের কোন যোগসূত্র নাই। তবে কি সত্য সত্যই কেহ তাহারও কাণের কাছে নিম্ন স্বরে বলিয়া গিয়াছে "ভাগলপুর"! শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিল আটচালার আর সকলে গভীর নিদ্রাভিভূত, বারান্দায় বা আটচালার চারি পার্শ্বে কাহারও চিহ্ন ছিল না। শেষে সে যাহা দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে তাহা মানসিক দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পুনর্ব্বার শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিয়ৎকাল নিদ্রাদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পর যখন সে তন্দ্রাভিভূত, পুনর্ব্বার কাণের কাছে সেই নিম্ন স্বর আরও স্পষ্টতর হইয়া উপস্থিত হইল—"এখনই ভাগলপুর যেতে হবে"—

যদিও ভাগলপুর তাহার নিকটে বিশেষ প্রিয় ও গঙ্গার অপর পারেই অবস্থিত, তবু গভীর রাত্রে অপ্রত্যাশিত ভাবে নিদ্রিত অবস্থায় ভাগলপুরে ফিরিয়া যাইবার এই আদেশ পাইয়া অনিল বিশেষ বিচলিত হইল

সে বন্ধুবর্গের সহিত প্রভাতে কুমীর-শিকারে বহির্গত হইবে এই উদ্দেশ্যে সবন্ধু মহাদেবপুর ঘাটের নিকটে রাত্রি যাপন করিতেছিল; এই কারণেই সে মাতা ও স্ত্রীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছে। সেও শিকার হইতে ফিরিয়া কলিকাতা যাত্রা করিবে এইরূপ স্থির করিয়াছে—কিন্তু এ কি হইল? কাহার নিম্ন কণ্ঠস্বর বার বার তাহারি হৃদয়ে ধ্বনিত হইতেছে? কাহার বাণী মূর্ত্ত জাগ্রত হইয়া তাহাকে এই রাত্রে ভাগলপুর ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিতেছে? কে যেন তাহাকে আটচালা হইতে বাহির করিতে অলক্ষ্যে দণ্ডায়মান। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। কাহাকেও কিছু না জ্ঞাপন করিয়া নিঃশব্দে জুতা-জামা পরিয়া ও ছোট বালিশটি ও ব্যাগখানি লইয়া আটচালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

তখন গভীর রাত্রি—ঘাটে ষ্টীমার নাই; খেয়া নৌকা শেষ পাড়ি দিয়া ওপারে চলিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় কি করিয়া সে রাত্রিতে নদী অতিক্রম করিবে? অথচ এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে ভাগলপুর ফিরিয়া যাইতে হইবে। চিন্তাকুল হৃদয়ে সে নদীর দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু নদীর তটে নৌকা বাঁধা দেখিল। অসময়ে ঘাটে নৌকা রহিয়াছে কেন? ইহা তো সম্ভব নহে। একবার তাহার সন্দেহ হইল সে কি সত্য সত্যই প্রকৃতিস্থ না স্বপ্নের প্রভাবে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত? কিন্তু তরীর নিকটে আসিতে মাঝিই প্রমাণ দিল যে সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ও যাহা দেখিতেছে, তাহা জাগ্রত-স্বপ্ন নহে, ঘোর বাস্তব।

মাঝি বলিল "বাবু, এত দেরী করলে কেন? তোমাকে নিয়ে যাব ব'লেই তো অসময়ে নৌকা নিয়ে এতক্ষণ বসে আছি।"

অনিল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তোমাকে কে ব'ল্লে যে আমি আজ রাত্তিরে যাব?"

মাঝি উত্তর দিল "প্রায় দু ঘণ্টা থেকে আমার কানের কাছে কে যেন ব'লছে 'তোমাকে এক বাবুকে আজ রাত্তিরে ওপারে নিয়ে যেতেই হবে', চ'ল বাবু।"

অনিল নৌকায় উঠিল।

নদীতট তখন জন-শূন্য, অশ্রান্ত জল-কল্লোলের মধ্যে জাহ্নবীর বিশাল বারি-বক্ষের উপর দিয়া মাঝি অনিলকে লইয়া তরী বাহিয়া চলিল। অনিল নৌকার উপর রাগ ও বালিশের সাহায্যে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় জ্যোৎস্না প্লাবিত নীলাকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইয়াছে—হঠাৎ সে চমকিত হইল। গঙ্গার মাঝে নৌকার উপরে আবার সেই নিম্নস্বর! তাহার কাণের কাছে কে বলিয়া উঠিল, "সকালে কাছারী"। তাহার কানের ভিতর দিয়া সে বাণী যেন মরমে প্রবেশ করিয়াছে—অনিল উত্তরোত্তর অধিকতর বিস্মিত হইতেছে।

ভাগলপুরে গঙ্গার ধারে অনিলের বাড়ী। বাড়ী বড় ও সুন্দর। বাড়ীতে বৃদ্ধ মালী উচাপতি ব্যতীত আর কেহ নাই, তবে তাহার ভাগিনেয় অক্ষয়ের বাটী নিকটেই। বাটীতে অক্ষয় আছে। কিন্তু এই গভীর রাত্রে অক্ষয়কে বিরক্ত করা যুক্তিযুক্ত হইবে কি না, তাহা অনিলকে ভাবিতে হইল, শেষ পর্য্যন্ত স্থির করিল, অক্ষয়ের বাড়ীই যাইবে। নৌকা আসিয়া ভাগলপুরের খেয়া-ঘাটে উপস্থিত হইল। অনিল মাঝিকে দুই আনা খেয়া ভাড়া দিতে গেল, সে গ্রহণ করিল না। অনিল বিরক্তি প্রকাশ করিলে সে বলিল, "বাবু, তুমি তো আমায় নিয়ে আসতে বলনি, আমিই তোমায় নিয়ে এসেছি ; পয়সা কিসের ?"

অক্ষয়ের বাটী আসিয়া অনিল দেখে যে, বারান্দায় লণ্ঠন জ্বলিতেছে ও অক্ষয় বাড়ীর সম্মুখের মাঠে পদচারণা করিতেছে। অক্ষয় অনিলকে দেখিয়া বলিল, "মেজ-মামা এসেছেন ? আমি আপনার জন্যই ব'সে আছি।"

অনিল আর ইহাতে বিস্ময় বোধ করিল না, কেবল বলিল, "কেন ! আমি তো কিছু ব'লে যাই নি।"

অক্ষয় বলিল, "বড় আশ্চর্য্য মেজমামা, প্রায় দু' ঘণ্টা আগে আমি বেশ ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ কাণের কাছে কে যেন চাপা গলায় ব'লে গেল যে, আপনি আসবেন রাত্তিরে। এই কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'লাম, কিন্তু ফের ঘুমোবার চেষ্টা ক'রলাম। তন্দ্রা এসেছে আবার যেন শুনলাম 'সকালে কাছারী'।"

অনিল আর সংযত থাকিতে পারিল না, আশ্চর্য্য হইয়া অক্ষয়ের হাত চাপিয়া বলিল, "বলিস্ কি!" অনিলের মুখে কথা নাই, বিস্ময়ে সে নির্ব্বাক্। কিয়ৎক্ষণ পরে অক্ষয় বলিল, "মেজ-মামা এক কাপ কড়া চা তৈরী করব না কি, কি বলেন ?"

অনিল বলিল, "হাঁ। চা তৈরী কর, মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, চা না খেলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।"

চা-পানের পর এই আলোচনায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া উভয়ে প্রভাতে কাছারী অভিমুখে যাত্রা করিল।

গ্রীষ্মের সময় বেহার ও পশ্চিমে সকালে কাছারী বসিয়া থাকে। অনিল ও অক্ষয় জজসাহেবের কাছারীর সম্মুখে মিষ্টান্নের দোকানে প্রবেশ করিয়া প্রাতঃকালীন আহার সাঙ্গ করিল। চা-পানের সহিত যখন তাহারা গরম গরম অমৃতি আহার করিতে ছিল, শুনিল, মিঠাইওয়ালা কাহাদের সহিত কি একটা মোকর্দ্দমা সম্পর্কে কথা কহিতেছে। কথায় কথায় কে বলিল "আহা আজ মিস্ত্রীটার ফাঁসীর হুকুম হবে বাপু! আমরা হলফ্ করে ব'লতে পারি, ও মিস্ত্রী খুন করতে পারে না।"

প্রাতরাশ শেষ করিয়া জজ্ সাহেবের এজলাসের দিকে তাহারা অগ্রসর হইল। দেখিল, বিচারগৃহ লোকে লোকারণ্য, প্রবেশ প্রায় দুঃসাধ্য। অতি কষ্টে তাহারা দর্শকের মধ্যে স্থান করিয়া লইল।

আসামী লালমোহন মিস্ত্রী। বড় গরীব। কোন উকিল দিতে পারে নাই। সেই কারণে জুরি তাহাকে নানা প্রশ্ন করিতেছেন। কনষ্টেবল্, হেড্-কনষ্টেবল্, পাড়ার দুইজন সাক্ষ্য দিয়াছে যে, তাহারা ঘটনার রাত্রে লালমোহনকে চম্পানগরে দেখিয়াছে। লালমোহনের দা ঘটনাস্থলে পাওয়া গিয়াছে। আসামী স্বীকার করিয়াছে যে, দা তাহার। আসামী সেই রাত্রে খুন করিয়া বাটী হইতে পলায়ন করে, সকালে নীলাকুঠির নিকটে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

লালমোহনকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, দা তাহার বাটী হইতে একমাস পূর্ব্বে অপহৃত হইয়াছিল, অনেক অন্বেষণ করিয়াও সে দা ফিরিয়া পায় নাই, কাছারীতে তাহার দা

বহুদিন পরে আজ প্রথম দেখিতেছে। ঘটনার রাত্রিতে সে চম্পানগরে ছিল না। সেই দিন ভাগলপুরে এক বাবুর বাড়ীতে দরজা ও জানালা মেরামত করিতে তাহার বিলম্ব হওয়ায় সে বাবুর বাটীতে আহার করিয়া সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করে। অতি প্রত্যূষে সে বাবুকে বলিয়া চম্পানগর অভিমুখে রওনা হয়, পথে যখন চীপা কুঠির নিকটে বিশ্রাম করিতেছিল, অকারণ তাহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

আসামীর ছিন্ন বেশ, শুষ্ক কেশ, কোটরগত অশ্রুপূর্ণ নেত্র, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ও খর্ব্ব আকৃতি শুধু মিঠাইওয়ালা নহে, সকলেরই সহানুভূতি অর্জ্জন করিয়াছে—।

জুরী জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবুকে আনিতে পার ?"

সে করুণ স্বরে বলিল, "হুজুর বাবুকে কোথায় পাব—বাবু এখানে নাই।"

এক জুরী আবার প্রশ্ন করিলেন, "আর কোন প্রমাণ আছে ?"

লালমোহন বলিল, "সে রাত্তিরে যখন বাবুর কাছে হিসাব দিয়েছিলাম, বাবুর কাছে পেন্‌সিল ছিল না। আমার পেন্‌সিলে বাবু লিখেছিলেন—সেই পেন্‌সিল পুলিশের নিকটে আছে।" জজসাহেব প্রশ্ন করিলেন সরকারী পাবলিক প্রসিকিউটর্‌কে "সে পেনসিল কোথায় ?"

পাবলিক প্রসিকিউটর্ বলিলেন, তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য নয় বলিয়া পেশ করা হয় নাই। জুরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "প্রয়োজন আছে, সে পেন্‌সিল আনুন।" তখন অগত্যা সে পেন্‌সিল জজসাহেব ও জুরীর নিকট দেওয়া হইল—তাঁহারা উত্তমরূপে পেন্‌সিলটি দেখিলেন।

পাবলিক প্রসিকিউটর্ লালমোহনকে বলিলেন, "সেই বাবুর খবর দাও এবং বাবুকে আন—যত গল্প...।" লালমোহন বলিল, "বাবুকে কোথায় পাব হুজুর—এত কাঁদলাম, ভগবানকে ডাকলাম, কৈ বাবু তো এল না।"

অনিল ও অক্ষয় জনতার মধ্যে হইতে লোকটিকে লক্ষ্য করিতেছিল—হঠাৎ লালমোহনের কথা শুনিয়া অক্ষয় চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "মেজ-মামা দেখুন তো আপনার সেই ছোট ডায়ারি—সে ডায়রি তো আপনার মণিব্যাগেই থাকে—দেখুন তো, সেই মিস্ত্রী নয় তো যে আপনার দরজা-জানালা মেরামত করেছিল, রাত্রে আপনার বাড়ীতে খেয়েছিল ও আমার বারান্দায় ঘুমিয়েছিল। আর ভোর রাত্রে উঠে আমায় বলে চলে গিয়েছিল—দেখুন তো লালমোহনের নাম লেখা আছে কি না ?" অনিল মণি-ব্যাগের মধ্য হইতে তাহার পকেট ডায়রি বাহির করিয়া দেখিল—সত্যই তো লালমোহন মিস্ত্রীর নাম পেন্‌সিলে লেখা আছে, হিসাবও পেন্‌সিলে লেখা, সেই তারিখে যে রাত্রে হত্যা সংঘটিত হইয়াছে। অনিলের সব ঘটনা মনে পড়িল।

অনিল জনতার মধ্যে হইতে দুই হস্ত উঠাইয়া বলিল, "আমি লালমোহনের সাক্ষী।" সে অগ্রসর হইলে লালমোহন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ঐ বাবু, ঐ বাবু।" এজলাসে দর্শকের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। যথারীতি অনিলকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিতে হইল—সে জজ ও জুরী মহোদয়গণকে তাহার ডায়রি দেখাইল।

পাবলিক প্রসিকিউটর্ উত্তমরূপে টেবিল চাপড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাটীতে সেই রাত্রে আসামী ছিল ?"

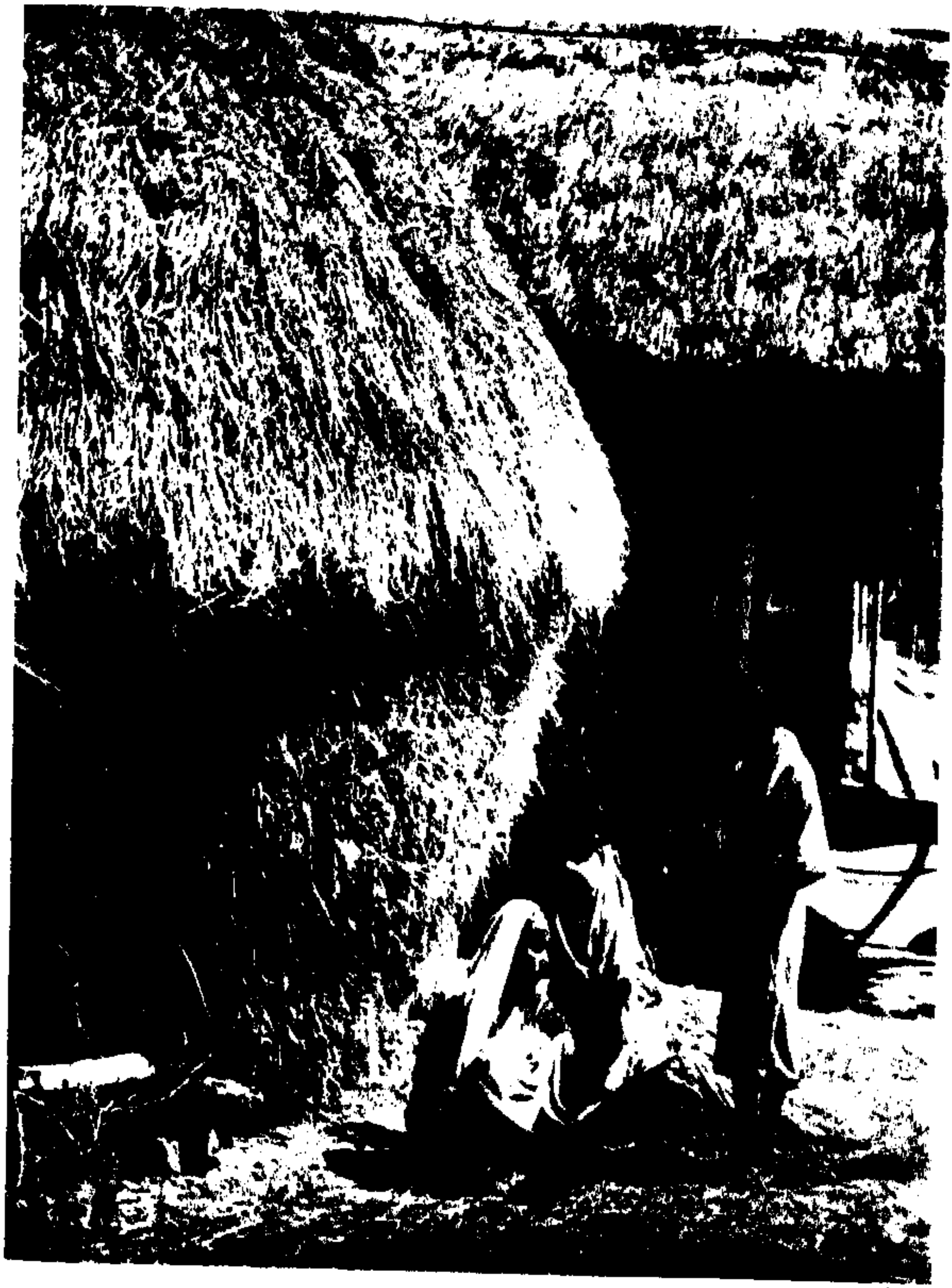
অনিল বলিল, "আমার বাটীতে আসামী সে রাত্রে আহার করেছিল কিন্তু আমার বাটীতে শয়ন করে নাই।"

পাবলিক প্রসিকিউটর্ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "হুজুর নোট করিবেন সাক্ষীর জবানবন্দী—'কিন্তু আমার বাটীতে শয়ন করে নাই'।"

অনিল বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমার কথা শেষ হয় নাই—যার বাড়ীতে শয়ন করেছিল সেও উপস্থিত আছে।" অক্ষয় তখন বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল—অক্ষয় সাক্ষী দিল যে লালমোহন সে রাত্রে তাহার বাটীতে ঘুমাইয়াছিল। অক্ষয় সাক্ষী দিয়া দর্শকমণ্ডলীর হর্ষধ্বনির মধ্যে স্বস্থানে উপবেশন করিল।

অনিলের ডায়রি জজসাহেব ও জুরী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলেন। লালমোহনের পেন্‌সিলে জজসাহেব ও জুরী লিখিলেন—অনিলকেও ডায়রির অন্যস্থানে লালমোহনের নাম ও তাহার প্রদত্ত হিসাব পুনর্ব্বার ঐ পেন্‌সিলে লিখিতে হইল। বিচারক ও জুরীর বিশ্বাস হইল যে, এক পেন্‌সিলে হওয়াই সম্ভব। জুরী পরামর্শ করিতে পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এক বাক্যে রায় দিলেন, "লালমোহন নির্দ্দোষ।" জজ সাহেবও জুরীর মত সমর্থন করিয়া রায় দিলেন, "যখন alibi প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, লালমোহন নির্দ্দোষী, সে মুক্তি পাইল।"

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে জনতা বেষ্টন করিয়া লালমোহন বিচারগৃহ ত্যাগ করিল।



বাংলার ছবি (৫)

[শ্রীঃ বিমল ঘোষাল

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

আষাঢ়—১৩৪৭

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি ভাবিবার বিষয়

জার্ম্মানগণের পক্ষে যুদ্ধ-জয় সম্ভব কি?

পৃথিবীর সর্ব্বত্র জার্ম্মানীর প্রতি পক্ষপাত-মূলক মনোভাব-বিশিষ্ট এক শ্রেণীর ব্যক্তি বিদ্যমান, ইহা অস্বীকার করা যায় না—তাঁহারা মনে করেন বলিয়া অনুমান করা যায় যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে শেষতঃ জার্ম্মানীর জয়লাভ ঘটিবে। জার্ম্মানগণের "পঞ্চম-বাহিনী"র (fifth column) কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিলেই স্পষ্টতঃ বুঝা যাইবে যে, জার্ম্মানীর প্রতি পক্ষপাত-মূলক মনোভাব-বিশিষ্ট এক শ্রেণীর ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই প্রকার মনোভাবের অস্তিত্ব না থাকিলে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স ইত্যাদি কুত্রাপি জার্ম্মানগণের পঞ্চম-বাহিনীর কার্য্যকলাপের যেরূপ সার্থকতা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা দৃষ্ট হইত না। এই "পঞ্চম-বাহিনী"র কার্য্যকলাপ যথার্থরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা কৃতঘ্নতার সহিত এবং বিশ্বাসভঙ্গমূলকভাবে দেশের অনিষ্ট-সাধনের বিরুদ্ধে বাধা-প্রদানে উপেক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। জার্ম্মানগণের উদ্দেশ্যে পক্ষপাতমূলক মনোভাব-বিশিষ্ট এই ব্যক্তিবৃন্দ বিশ্বাস করেন যে, জার্ম্মানগণ যখন খণ্ড খণ্ড ভাবে কতিপয় যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে, তখন তাহারাই শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধে জয়ী হইবে। আমাদের মতে, হের হিটলারের অধি-নায়কত্বে বর্ত্তমানে জার্ম্মানী যে-ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে তদ্দ্বারা ইংলণ্ড-আক্রমণ কিংবা মিত্রশক্তিকে সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত করাও যদি তাহার পক্ষে সম্ভব হয়, তথাপি যুদ্ধে জার্ম্মানীর প্রকৃত প্রস্তাবে বিজয়ী হওয়া সম্ভব হইবে না।

আমাদের এই মতবাদের পশ্চাতে কোন যৌক্তিকতা বিদ্যমান কি না, তাহা বুঝিতে হইলে পাঠকবৃন্দকে প্রথমতঃ সন্ধান করিতে হইবে, মূলতঃ কি উদ্দেশ্য লইয়া জার্ম্মানগণ এই অবস্থ যুদ্ধ-কাণ্ডে লিপ্ত হইয়াছে। যে সকল মূলগত উদ্দেশ্য লইয়া জার্ম্মানী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাহার পূরণ-সম্ভাবনা থাকিলে আমাদিগকে অতি অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, জার্ম্মানগণের শেষতঃ যুদ্ধে বিজয়ী হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। অন্তপক্ষে, যদি দেখা যায় যে, মিত্রশক্তিকে সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেও ঐ সকল উদ্দেশ্য পূরণের তদ্দ্বারা কোন সম্ভাবনাই নাই, তবে আমরা ধরিয়া লইব যে, যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে বিজয়ী হইবার জার্ম্মানগণের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নাই।

অতঃপর, মূলতঃ কোন্ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া জার্ম্মানগণ এই অবস্থ যুদ্ধ-কাণ্ডে লিপ্ত হইয়াছে, তৎসন্ধানে প্রয়াসী হইলে দেখা যাইবে যে, জার্ম্মানগণের অনাহার এবং বেকার সমস্যার

সমাধান-রূপ প্রাথমিক উদ্দেশ্য প্রেরণাতেই হিটলার সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে জার্ম্মানীতে যুদ্ধ-বিষয়ক যে-দর্শন পুষ্টিলাভ করিয়া আসিতেছে, যথাযথভাবে এবং মনোযোগের সহিত তাহা অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, সম-সাময়িক জার্ম্মান চিন্তানায়কগণের মত এই যে, জাতীয় সমৃদ্ধি যেমন আভ্যন্তরীণ সংগঠন, তেমনই বহির্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধের বিস্তার, উভয়েরই উপর নির্ভরশীল। তাঁহারা মনে করেন যে, আভ্যন্তরীণ সংগঠন সাধিত না হইলে বাহিরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব নহে। তাঁহাদের মতে, আভ্যন্তরীণ সংগঠনের যত উৎকর্ষ সাধিত হইবে, ততই বহির্জ্জগতের সহিত সম্পর্কেরও উৎকর্ষলাভ সম্ভাবনা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই প্রিন্স বিশমার্ক দেশের আভ্যন্তরীণ সংগঠন বিষয়ে বিবিধভাবে চেষ্টিত হন এবং তাঁহার জীবনকালে ইহার যথেষ্ট উন্নতিও সাধন করেন। ভূতপূর্ব্ব কাইজার নৃপতি দ্বিতীয় উইলহেলম্স্ (Wilhelm II) প্রিন্স বিশমার্ক সূচিত আভ্যন্তরীণ সংগঠনের গতি রক্ষা করিয়াই চলিতে থাকেন, কিন্তু ক্রমশঃ উপলব্ধি করেন যে, ব্রিটনগণের ন্যায় কোন সাম্রাজ্যের অধিপতি না হইলে বহির্জ্জগতের সহিত কোন প্রকার সম্পর্কই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। অল্প কথায় বলা চলে, কাইজারকে এই ধারণা প্রণোদিত করিয়াছিল যে, ইংলণ্ডের রক্ষিত বাণিজ্য সার্থক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কিংবা ইংলণ্ডের উপর প্রাধান্য লাভ, করিতে হইলে, জার্ম্মান সরকারের প্রচারিত মুদ্রার অবাধ ব্যবহারে বাধা করা যাইবে, স্বকীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে এমন কোন জনবহুল এবং কৃষি-সমৃদ্ধ দেশ অধিকার, কিংবা বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া ইংলণ্ডকে অপরাপর দেশের পর্য্যায়ভুক্ত করা, ব্যতীত উহা সম্ভব নহে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ-ভাব বশতঃই ১৯১৪ সনে ভূতপূর্ব্ব কাইজার যুদ্ধে অবতীর্ণ হন্। সংক্ষেপতঃ ভূতপূর্ব্ব কাইজারের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিম্নলিখিত দ্বিবিধ :—

(১) জার্ম্মানীর অনাহার এবং বেকার সমস্যার সমাধান;

(২) পৃথিবীর মধ্যে জার্ম্মানীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা।

ভূতপূর্ব্ব কাইজার বিবেচনা করে যে, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ার্থ পৃথিবীর বাজারের প্রয়োজনীয় অংশ আয়ত্ত না করিতে পারিলে অনাহার এবং বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। উপরন্তু, ভারতের ন্যায় জনবহুল কোন দেশ জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তথায় তৎপ্রচারিত অগণিত সংখ্যক মুদ্রা চালু করিতে না পারিলে, কিংবা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিয়া ইংলণ্ডকে অপরাপর দেশের সমকক্ষ না করিতে পারিলে ইহা যে সম্ভব নহে, তাঁহার এই ধারণাও হয়। তিনি ইংলণ্ডকে বিশেষ সুবিধা-ভোগী দেশ বলিয়া মনে করিতেন এবং ভারত ও তাহার অপরাপর উপনিবেশে যত দিন ইংলণ্ডের মুদ্রা-প্রচলন অব্যাহত থাকিবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রেয় পণ্যদ্রব্যের উপর রক্ষণ-শুল্ক ধার্য্য করিবার সামর্থ্য ইংলণ্ডের যতদিন থাকিবে, তত দিন শিল্প-ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের সহিত কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব হইবে না, তাঁহার এই ধারণা জন্মে।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য পূরণার্থ, কাইজার ধরিয়া লন যে, হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সদৃশ তাঁহাকে একটি জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, নয় তাঁহাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে হইবে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ব্যতীত উভয়ের কোনটিই সম্ভব নহে। এই নিমিত্তই ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধের সূত্রপাত। কিন্তু তখন জার্ম্মান জাতি সাড়ে তিন বৎসর কাল যুদ্ধের ফলে যুদ্ধ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ হওয়ায়, ভূতপূর্ব্ব কাইজারের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। অনন্তর কাইজার বুঝিতে পারেন যে, জার্ম্মানী আর রাজ-তন্ত্র মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে, এবং যদি তাঁহার জীবনের স্বপ্ন সফল করিতে হয়, তবে অচিরাৎ রাজ-তন্ত্রের অবসান প্রয়োজন—এই নিমিত্তই তিনি তৎকালে অকস্মাৎ সিংহাসন ত্যাগ করেন।

যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব কাইজারের যাহা মূল উদ্দেশ্য ছিল, জার্ম্মানীর অনাহার এবং বেকার সমস্যার সমাধান ও জার্ম্মানীকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা, এবং তৎকল্পে তিনি যে-কার্য্যপন্থা অনুসরণ করেন,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সদৃশ একটি জার্ম্মান সাম্রাজ্য স্থাপন অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া ইংলণ্ডকে অপরাপর দেশের সমকক্ষ করা,—হের হিটলারের কার্য্যকলাপে এবং বক্তৃতাতেও অনুরূপ উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। কাইজার

এবং হের হিটলার, উভয়ের কার্য্যক্রমে এরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় যে, ভূতপূর্ব্ব কাইজারকে বর্ত্তমান যুদ্ধেরও মন্ত্রদাতা বলিয়া সন্দেহ ঘটে।

যাহাই হউক, উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট রূপে বুঝা যায় যে, জার্ম্মানী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া জার্ম্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইলেও তাহার বেকার এবং অনাহার সমস্যার সমাধানে যদি কৃতকার্য্য না হইতে পারে, তবে জার্ম্মানী যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে জয়ী হইয়াছে, এ কথা বলা চলিবে না। জার্ম্মানীর অর্থশাস্ত্রের সম্বন্ধে আমাদের যে সামান্য জ্ঞান বর্ত্তমান, তাহা হইতেই আমরা বলিতে পারি যে, যদি জার্ম্মানী তাহার বিজ্ঞান এবং অর্থনীতির ধারা সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্ত্তিত না করে, তবে কদাপি তাহার বেকার এবং অনাহার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধানে জার্ম্মানী সমর্থ হইবে না। মাত্র সাম্রাজ্য স্থাপন দ্বারাই যদি ঐ দুই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইত, তবে ইংলণ্ড সম্পূর্ণরূপে বেকার এবং অনাহার সমস্যার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিত। ঐ দুই সমস্যার সমাধানকল্পে সাম্রাজ্য যদি অপরিহার্য্য হইত, তবে ভারতবর্ষ কোন দিন বেকার এবং অনাহার সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যাইত না। যথাযথ ভাবে ইতিহাস পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এমন কি মোগল-প্রাধান্যকালেও ভারতবর্ষ নিজের কোন সাম্রাজ্য ব্যতীতই বেকার এবং অনাহার সমস্যা হইতে মুক্ত ছিল। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা বেকার এবং অনাহার সমস্যার সমাধান পক্ষে যেমন অপরিহার্য্য নহে, তেমনই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই এতদ্‌কল্পে যথেষ্ট নহে এবং জার্ম্মানীর বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ একাদিক্রমে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পরিচালিত হইতেছে। এমন কি, জার্ম্মানী যদি বর্ত্তমান যুদ্ধ-জয়ে সমর্থ হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে পর্য্যন্ত সমর্থও হয়, তথাপি দেখা যাইবে যে, যুদ্ধ সাঙ্গ হইবার পর তাহার জন-সাধারণের অন্নাভাব মিটাইতে অসমর্থ হওয়ায় জার্ম্মানী প্রচণ্ড গৃহ-বিবাদের আগারে পরিণত হইয়াছে। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের ফলে যদি হিটলারের মৃত্যু না ঘটে, তবে তাহার দেশবাসীর দ্বারা তাহাকে নিহত হইতে দেখিলে আমরা বিস্মিত হইব না।

সুতরাং আমাদিগকে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইতেছে যে, জার্ম্মানী বর্ত্তমান বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি পরিহার করিয়া, সম্পূর্ণ নূতন করিয়া নিজকে ঢালিয়া সাজিতে প্রবৃত্ত না হইলে, যুদ্ধক্ষেত্রে জয় লাভ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে জার্ম্মানীর বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

জার্ম্মানীর পক্ষে ইউরোপের যুদ্ধ-জয় এবং ইংলণ্ড ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ সম্ভব কি?

গত ৯ই মে হইতে ইউরোপ-ভূখণ্ডে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তৎপ্রতি অবহিত হইয়াও যদি বলিতে হয়, জার্ম্মানগণ ইউরোপখণ্ডে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভে অসমর্থ হইবে, তাহা হইলে প্রকৃত ঘটনা অস্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের যে সকল সুবিধা এবং সংস্থান বর্ত্তমান, তাহার পরিমাণ বিবেচনা করিলে আমাদিগের স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, এমন কি একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার করিতে হইলেও তাহা ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড, উভয়ের পক্ষেই কলঙ্ক-স্বরূপ। বস্তুতঃ যে ইহাই ঘটিতেছে, তাহাও নিশ্চিত স্বীকার্য্য। কিন্তু ইংলণ্ড প্রকৃত রাজনৈতিক নৈপুণ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে একটি মাত্র যুদ্ধেও জার্ম্মানগণ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের পরাজয়-সম্ভাবনা কদাপি ছিল না। কেবল ভ্রান্ত রাজনৈতিক চালের নিমিত্তই—যে-জার্ম্মানী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তুলনায় সমুদ্রের তুলনায় জলবুদ্‌বুদ মাত্র,—সেই জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডকে পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করিতে হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে জার্ম্মানী যে-ভাবে নিজেকে গঠিত করিয়া আসিতেছে, তাহা যে ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক যথাযথ ভাবে অনুসৃত হইয়াছে, ইহার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণ কেবল জার্ম্মানগণের উদ্ভাবিত পন্থার অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র এবং তাহাও সম্পূর্ণতঃ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সকল কার্য্যকলাপ হইতে ইহার প্রকৃত নিদর্শন পাওয়া যাইবে। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান-সম্পাদক তাঁহার পত্রিকায় "ভারতবাসী জাগো (Wake up India)" শীর্ষে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যে রচনাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও তাহারই নিদর্শন। ভারতে বিমান-বাহিনী সংগঠনের স্বপক্ষে তিনি যথাসাধ্য ওকালতী

করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, শত্রুপক্ষের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে হইলে, তাহাদিগের উদ্ভাবিত পন্থার অনুকরণ মাত্র করিলে চলে না। জার্ম্মানী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত বর্ত্তমানে যে বিমান-বিস্তার প্রচলন হইয়াছে, তাহার উন্নতিসাধন জার্ম্মানগণের উদ্দেশ্য বিফল করার পক্ষে যদি সেরূপ কার্য্যকরী হইত, তবে জার্ম্মানগণের সহিত কোন যুদ্ধেই মিত্রশক্তিকে পরাজিত হইতে হইত না। ইংলণ্ডে প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বিদ্যমান থাকিলে, অচিরাৎ উপলব্ধ হইত যে, জার্ম্মানগণ যেমন বিচিত্র মারণাস্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছে, ইংলণ্ডকে তেমনই তদ্বিপরীত কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা বিদিত আছি, ইংলণ্ডের পরাজয় ঘটিলে ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ হইবে। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণের অপদার্থতা আমরা গত ত্রিশ বৎসর কাল লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি এবং সেই জন্যই গত পাঁচ বৎসর হইতে আমরা ইহার দোষ-ত্রুটি সংশোধনার্থ আমাদের যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালনার্থ লেখনী ধারণ করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা কোন রাষ্ট্রনেতারই দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হই নাই। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের অব্রিটিশোচিত কাপট্যের ফলে কেবল নিজেদের দুষ্টতা সাধন করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, ভারতীয় এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র-নেতাগণেরও দুষ্টতা সাধন করিয়াছেন। জার্ম্মান কর্ত্তৃক ইংলণ্ড আক্রমণ নিরোধ করিয়া গ্রেটবৃটেনের সৎস্বভাব জন-সাধারণকে যুদ্ধের দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করা এখন আর বোধ হয় সম্ভব নহে, কিন্তু এখনও যদি ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ প্রকৃত পন্থা অনুসরণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধন নিবারণ করা যাইতে পারে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল ব্যক্তি হিসাবে সদাশয় এবং ব্রিটিশ জাতির কাপট্যহীন ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে তিনি অন্যতম, কিন্তু সদাশয় ব্যক্তি হইলেই তিনি যে ক্ষমতাবান্ শাসকরূপ হইবেন, এমন কথা বলা চলে না। সন্দেহ করিবার কারণ বিদ্যমান যে, মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁহার অনুচরগণের অকুশলতার নিমিত্তই যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই ইংলণ্ডকে জার্ম্মানীর বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে, এবং মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ বর্ত্তমান দুর্য্যোগ উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে সম্পূর্ণ সামর্থ্যের পরিচয় দান করিতে পারিবেন কি না, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তাহাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া উপেক্ষা করাও চলে না। পার্লামেণ্টের ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণ সর্ব্বদলসম্মেলনে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া বর্ত্তমানে যে ধীরতার পরিচয় দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ প্রশংসার অধিকারী; কিন্তু জার্ম্মানী তাহার বেকার এবং অনাহার সমস্যার সমাধানকল্পে প্রান্ত লক্ষ্য হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধন মানস করিয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে যাহা নিশ্চিতভাবে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিতে পারে, সেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-প্রণালীর সন্ধানার্থ তাঁহাদিগকে আমরা অধিকতর গবেষণাপর হইতে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য মনে করি।

তাঁহারা যদি আমাদের সহায়তার প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তবে আমরা যথাসাধ্য কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। *

বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার পন্থানির্দ্দেশ

আমাদের মহামান্য ভূপতি এবং সম্রাট বাহাদুর আমাদিগের উদ্দেশ্যে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যে-বাণী প্রদান করেন, তাহা হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যে আজ বিপন্ন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। আমাদিগের বড়লাট বাহাদুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যে-বাণী প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের স্বদেশ-রক্ষার নিমিত্ত আমাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি অধিবাসীর এই বাণী দুইটি বিষয়ে সবিশেষ অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। শক্তিমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিতে পারে, এমন কোন ঘটনার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে সম্রাট বাহাদুরের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, আমাদের ইহা স্মরণে পড়ে না। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বর্ত্তমান বিপর্য্যয় অভূতপূর্ব্ব এবং ইহা নিবারণ-

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ২০শে মে সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

ক্রমে আমাদিগকে কোন অভিনব পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং স্বভাবতঃ প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, "বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কি উপায়ে রক্ষা করা যাইতে পারে ?"

মনে করিবার কারণ রহিয়াছে যে, ভারতে এমন এক শ্রেণীর নির্ব্বোধ ব্যক্তিবৃন্দ বর্ত্তমান, যাঁহারা মনে করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ভারত কিংবা ভারতবাসীর তেমন কোন অনিষ্ট সাধন করিবে না। তাঁহারা মনে করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হইলে ভারতে কোন উৎকৃষ্টতর বৈদেশিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে, অথবা ভারতীয়গণ স্বদেশীয় শাসন প্রবর্ত্তনের সুযোগ লাভ করিবে। এই সকল ব্যক্তির চিন্তাধারা যুক্তিসঙ্গত হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনাশঙ্কায় আমাদিগের বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইবার হেতু নাই। উপরন্তু ইংলণ্ডের বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় আমাদিগের উল্লসিত বোধ করিবারই কারণ বর্ত্তমান। সুতরাং আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে নিম্নলিখিত দুইটি সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে :—

(১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হইলে, ভারতবাসীর কি অবস্থা হইবে ?

(২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষায় আমাদের, অর্থাৎ ভারতবাসিগণের, স্বার্থ আছে কি না ?

উপরের এই দুই সমস্যার আলোচনা করিতে হইলে, আমাদিগকে সতত মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে দেশমধ্যে যে সংগঠন প্রচলিত—তদধীন অবস্থায় অধিকাংশ ভারতবাসী প্রধানতঃ যে-সকল পেশায় জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) রাজনৈতিক নেতৃত্ব,

(২) ওকালতী,

(৩) ডাক্তারী,

(৪) বিবিধ প্রকার ইঞ্জিনীয়ারিং, অর্থাৎ যন্ত্র-শিল্প সংশ্লিষ্ট কার্য্য,

(৫) ব্যাঙ্কিং,

(৬) বীমা,

(৭) জমিদারী,

(৮) শিল্প,

(৯) বাণিজ্য,

(১০) কৃষিকার্য্য,

(১১) শিল্প এবং বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের চাকুরী,

(১২) মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ইত্যাদির চাকুরী ;

(১৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের চাকুরী, এবং

(১৪) সরকারী চাকুরী।

আমাদিগকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, মূলতঃ এই সকল ব্যবসায়ের পরিচালনা কারেন্সী এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও টাকশাল কার্য্যকরী থাকিবার উপর নির্ভরশীল। সাধারণ বিষয়-জ্ঞান দ্বারাই বুঝা যাইবে যে, কারেন্সী নোট এবং ধাতুমুদ্রার তৈয়ারী ব্যবস্থা, তথা তাহাদের বিতরণ-ব্যবস্থা ব্যতীত আধুনিক কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই চালু থাকিতে পারে না। টাকশালে কারেন্সী নোট এবং ধাতুমুদ্রা তৈয়ারী হয় এবং কারেন্সী ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান মারফৎ কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রা, তথা ধাতুমুদ্রার বিতরণ ব্যবস্থিত হয়। এই নিমিত্তই আমরা বলিতেছি যে, টাকশালের কার্য্য, তথা কারেন্সী এবং ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কার্য্যকরী না থাকিলে আধুনিক কোন পেশাই নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত হইতে পারে না। ইহাও সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে, আইন এবং শৃঙ্খলার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থা যদি এক দিনের জন্যও বন্ধ হয়, টাকশালের, তথা কারেন্সী ও ব্যাঙ্কের কার্য্য চালু থাকিতে পারে না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, অন্য সকল বিষয় বাদ দিলেও আমাদিগকে কেবল যদি দৈনন্দিন জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্যও সচেষ্ট থাকিতে হয়, আইন ও শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থা এক দিনের জন্য বন্ধ থাকিলেও তাহা সম্ভব নহে।

এই বিষয়ে বিবেচনা রাখিয়া অতঃপর আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, অধিকাংশ ভারতবাসী আজ যে-সকল পেশার সহায়তায় দিনাতিপাত করিতেছে, তাহার প্রত্যেকটি পেশা বর্ত্তমান উদ্দেশ্যপূরণ পক্ষে অনুপযোগী প্রমাণিত হইয়াছে। যদি এই জটিল সমস্যাসমূহের অচিরাৎ—অধিকপক্ষে দশ বৎসর কাল মধ্যে—সমাধান না হয়, তবে বর্ত্তমান প্রত্যেকটি পেশার ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং দেশের মধ্যে কোনরূপ আর্থিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকিবে না, এই আশঙ্কা করা যাইতে পারে।

সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, আইন

এবং শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত এমন কোন শাসন-ব্যবস্থা, যাহা অধিকপক্ষে দশ বৎসর কালের মধ্যে আর্থিক সমস্যার সমাধানে সমর্থ, তাহার অভাব ঘটিলে আমাদের একটি দিনও চলিবার উপায় নাই।

অতঃপর প্রশ্ন এই যে,—"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হইলেই কি আমাদের পক্ষে অচিরাৎ এই শ্রেণীর কোন শাসন-ব্যবস্থা লাভ সম্ভব ?" বিভিন্ন স্বপ্ন-বিলাসী কর্ত্তৃক এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তরদান সম্ভব, কিন্তু ইতিহাস পাঠে জানা যাইবে যে, ন্যূনপক্ষে ত্রিশ বৎসর কালের পূর্ব্বে কোন দেশে সম্পূর্ণ রূপে আগন্তুক এক দল শাসনকর্ত্তার সাহায্যে উল্লেখযোগ্য কোন শাসন-ব্যবস্থা সুগঠিত হওয়া সম্ভব নহে। ১৫২৬ সনে বাবরের সময় হইতে মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত বিজিত হইলেও, আকবরের রাজত্বকাল (১৫৬০ হইতে ১৫৯২ সন) পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া শাসন-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায় না। মুসলমানগণের রাজত্ব সময়ে যে-সকল আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, উহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণপূর্ব্বক পাঠে আমাদের এই উক্তি প্রমাণিত হইবে। মুসলমান সম্রাটগণের প্রথম দুই জন—বাবর এবং হুমায়ুনের রাজত্বকালে যে সকল আইন-কানুন প্রবর্ত্তিত হয়, মোটামুটি ভাবে সেগুলি অস্থায়ী এবং দেশের অরাজক শক্তি-সমূহের দমন উদ্দেশ্যেই তাহাদের প্রবর্ত্তন। এই দুই জন মুসলমান সম্রাটের রাজত্বকালে জন-সাধারণের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি-সহায়ক কোন স্থায়ী আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। এই ঘটনার প্রমাণ হয় যে, বাবর এবং হুমায়ুন, এই দুই জন মুসলমান সম্রাটকে দেশের অরাজক এবং বিদ্রোহী শক্তিসমূহের দমনোদ্দেশ্যে অধিকাংশ কাল সশস্ত্র হইয়াই অতিবাহিত করিতে হয়, প্রকৃত শাসন বিষয়ে তাঁহারা নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারেন নাই। আকবরের রাজত্ব-কালেই কেবল জনসাধারণের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধিকর আইন-কানুন প্রবর্ত্তিত হইতে পারিয়াছিল।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসও অনুরূপ। যদিও ব্রিটিশগণ ১৭৫৭ হইতে ভারত-শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড ক্লাইব, ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং স্যার জন ম্যাকফার্সন প্রমুখ প্রথম তিন জন শাসককে রাজ্যের বিরোধী এবং দুষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের দমনেই অধিকতর নিযুক্ত থাকিতে হয়, দেশের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধিকর পদ্ধতিসমূহ প্রবর্ত্তনের তেমন কোন সুযোগ তাঁহারা লাভ করেন নাই। ১৭৯৩ সনের পূর্ব্বে জনসাধারণের প্রকৃত উন্নতিবিধায়ক কোন স্থায়ী আইন-কানুন তাঁহাদের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই—সুতরাং ঐ সনকেই প্রকৃতপক্ষে ভারতে বৃটিশ শাসনের সূচনার সন বলিয়া ধরিতে হইবে। কেবল ভারতে নহে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস হইতে আমাদের উক্তির সমর্থন মিলিবে।

কাহারও কাহারও নিকট রুশিয়া এবং আয়ার্লণ্ডের বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস বিভিন্ন বলিয়া মনে হইতে পারে। তাঁহারা তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন যে, রুশিয়া এবং আয়ার্লণ্ড উভয় দেশেই ত্রিশ বৎসর হইতে অনধিক সময়ের মধ্যে তাঁহাদের এই নূতন জাতীয় শাসন-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, রুশিয়া এবং আয়ার্লণ্ড দশ বৎসর কালের মধ্যে তাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থা যে-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, পৃথিবীর কোন দেশ লিখিত ইতিহাস-কালে ত্রিশ বৎসর কালেও তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রুশিয়া এবং আয়ার্লণ্ড তাহাদের জন-সাধারণের অনাহার ও বেকার সমস্যার তেমন কোন দৃষ্টি-আকর্ষণ-যোগ্য সমাধান ব্যবস্থা অদ্যাবধি করিতে পারেন নাই। তদুপরি, রুশিয়া এবং আয়ার্লণ্ডে যাহা সম্ভব হইয়াছে, ভারতে তাহা সম্ভব নহে। রুশিয়া এবং আয়ার্লণ্ডে গত বিশ বৎসর কালের সংগঠন-ইতিহাস যথাযথ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ দুই দেশেই উন্নয়নের মূলনীতি হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জার্ম্মান দর্শন অপ্রত্যক্ষ ভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে এবং রুশিয়ার ও আয়ার্লণ্ডের অবস্থায় অনেকাংশে জার্ম্মান দর্শন কার্য্যোপযোগী হইতে পারে, কিন্তু ভারতের অবস্থায় উহা উপযোগী নহে। বস্তুতঃ যে দর্শন এবং বিজ্ঞান ভারতের উন্নতি-সহায়ক হইতে পারে, তাহা আজিও গবেষণার বিষয়, কেন না ভারতের প্রাকৃতিক সংস্থান এবং অবস্থান পৃথিবীর অপরাপর সকল দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যে দর্শন এবং বিজ্ঞান বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের গঠনোদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে, তাহা কেবল ভারতবাসী এবং ব্রিটিশ

জাতির প্রকৃত সহযোগিতার দ্বারা গবেষণাসাধ্য। অপর কোন দেশই ভারতকে এই কার্য্যে সাহায্য করিতে পারে না, কেন না এতদ্দেশের সহিত গত দেড় শত বৎসর কালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বশতঃ ব্রিটিশ জন-সাধারণ ভারতের প্রাকৃতিক সংস্থান এবং অবস্থানের সহিত যতখানি পরিচিত হইয়াছেন, অপর কোন দেশ তাহার সহিত অর্দ্ধেকও পরিচিত নহেন।

ইহা বলিলে সম্ভবতঃ অন্যায় হইবে না যে, ভারতের সংগঠন-বিষয়ক প্রকৃত পন্থায় অগ্রসর হইবার ব্যাপারে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ অদ্যাবধি বিন্দুমাত্র সচেষ্ট হইতে পারেন নাই, কিন্তু এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য অবগত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী তাঁহাদের কুবিজ্ঞান এবং অজ্ঞতা, আলস্য এবং অনিষ্টবুদ্ধি নহে। আমাদিগকে যদি সত্য কথা বলিতে হয়, তবে আমরা বলিব যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ অপেক্ষা ভারতীয় রাজনৈতিক দলের পাণ্ডাগণই ভারতের দুর্দ্দশা এবং দারিদ্র্যের জন্য অধিকতর দায়ী। এমন কি আজিও যদি ভারতীয় রাজনীতি-বিদগণের মধ্যে এক জন প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান লাভ করা যায়, তবে তিনি ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের সহযোগিতায় আগামী দশ বৎসর কালের মধ্যে ভারতবাসীর বেকার এবং অনাহার সমস্যার সমাধানকল্পে অনেক কিছু করিবার ভরসা পোষণ করিতে পারেন, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যদি পতন হয় এবং আমাদিগের ভাগ্য অপর কোন জাতির—যাঁহারা আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইতে বাধ্য—সহিত জড়িত হইয়া পড়ে, তবে ত্রিশ বৎসর কালেও ইহার এক-চতুর্থাংশ সাধ্য হইবে না। তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হইলে স্বজাতীয় শাসন-ব্যবস্থা গঠন করিয়া ভারত তাহার মুক্তি-পন্থার সন্ধানের সুযোগ লাভ করিবে। যাঁহারা এই শ্রেণীর মতবাদ পোষণ করেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, ব্রিটিশ জাতির সামরিক শক্তির এই দেশ হইতে সম্পূর্ণ তিরোধানের কথা বাদ যাউক্—যদি কোন প্রকারে উহার শিথিলতা পর্য্যন্ত ঘটে,—তবে কার্য্যতঃ ভারতে কোন স্বজাতীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কি না, তাহা যেন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখেন। ব্রিটিশ জাতি যদি এক মাস কালের নিমিত্তও অনুপস্থিত থাকেন, তবে সমগ্র পুলিশ-বাহিনীর মাসিক বেতন ব্যবস্থা কি করিয়া হইতে পারে, তাহা কি তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছেন? পুলিশের বিরুদ্ধে যতই না কেন উৎকোচ গ্রহণ এবং অপরাধের অভিযোগ থাকুক, তৎসত্ত্বেও বিবদমান কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের সভা-সমিতিতে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক এই পুলিশেরাই নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন এবং স্ব-শাসন-ব্যবস্থায় দেশ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, আমাদিগের তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত। যাঁহারা কার্য্যতঃ শিল্প-বাণিজ্যের অ-আ সম্বন্ধেও প্রায়শঃ অজ্ঞ এবং কোন প্রকার শাসন-পরিচালনা সম্বন্ধে যাঁহাদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটে নাই, তাঁহাদিগকে বার-লাইব্রেরী হইতে সরাসরি আমদানী করিয়া অধুনা দেশে যে মন্ত্রীমণ্ডলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে—দেশের মূক জন-সাধারণের কল্যাণজনক ভাবে সততার সহিত কোন ব্যবসায় পরিচালনা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বলিলে—আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যবসায়ী ব্যক্তি আমাদের সহিত একমত না হইয়া পারিবেন না। ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, বার-লাইব্রেরীসমূহে কার্য্য অপেক্ষা গল্প-গুজব এবং ছল-চাতুর্য্যই অধিক হইয়া থাকে।

ব্যবহারজীবিগণের মধ্যে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য, এবং সেই জন্যই তাঁহাদের সাধারণ সহ-ব্যবসায়ী অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর বিবেকহীন হইয়া থাকেন। দেশে যদি কাহারও কোন কাণ্ডজ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, তবে তাঁহাদের যথাবিহিত শ্রদ্ধার সহিত লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য যে, ব্যবহারজীবিগণের অধিকাংশই বাক্য-বাগীশ মাত্র এবং তাঁহাদিগের কাহাকেও দেশের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করা অনুচিত এবং এই বিধি লঙ্ঘন করিয়াই প্রধানতঃ ব্রিটিশ শাসন বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। স্বজাতীয়গণের শাসন-ব্যবস্থায় কথা শুনিতে মিঠা, কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন এবং স্ব-শাসন হইতে যথাযথ ভাবে শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করিতে পারিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এ দেশে এখনও পর্য্যন্ত এমন কোন এক জন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যিনি ভারতবাসীদের

বিভিন্ন বিরোধী চিন্তাধারাসমূহকে এবং বিভিন্ন প্রদেশ-সমূহকে একত্র করিবার সামর্থ্য রাখেন।

দেশের কোন বিশিষ্ট নেতা, তথা কোন প্রদেশের ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তার সহিত যিনি কোন বিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তিমাত্রেই সমর্থন করিবেন যে, ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তার সহিত মতপার্থক্য ঘটিলে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হইবে না, এবং তিনি যদি যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাহা ব্যবহার করেন, তবে ঐ শাসনকর্ত্তার সম্মুখেই তিনি স্পষ্টতঃ তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার এবং অজ্ঞতার উল্লেখ করিতে পারেন, কিন্তু দেশের ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ পরিমাণে আত্মাভিমানবিশিষ্ট এবং এমন সুতীব্রভাবে অসহনশীল যে, তাঁহাদের সহিত কথায় এমন ভাব দেখাইবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। এমন কি মিঃ গান্ধীও ইহা হইতে মুক্ত নহেন। অস্বীকার করা চলে না যে, শাসনকার্য্যে ধৈর্য্য এবং স্থৈর্য্যের অতিমাত্রায় প্রয়োজন এবং তাহা অর্জ্জন করা সাধনা-সাপেক্ষ। মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার সতীর্থগণ ধৈর্য্য এবং স্থৈর্য্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের যে-কাহারও সম্মুখবর্ত্তী হইয়া—সাহস থাকিলে পাঠক তাঁহাদের মতের প্রতিবাদ করিয়া দেখিতে পারেন, অনতিবিলম্বে তাঁহারা কিরূপ অধৈর্য্য প্রকাশ করেন। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, আজ পর্য্যন্ত ভারতে এমন কোন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যিনি দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দলাতীতগণের শাসন-ব্যবস্থা সংগঠনের পথে দেশকে পরিচালিত করিবার সামর্থ্য রক্ষা করেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হইলে দুর্ব্বারভাবে যে ভীষণ অবস্থা দেশমধ্যে সৃষ্টি হইবে, আমরা তাহার আলোচনা করিব না। আমরা কেবল জনসাধারণকে কল্পনা করিতে বলি যে, বর্ত্তমান অনাহার এবং বেকার সমস্যার উপরে যদি ব্রিটিশ জাতির টাকশাল, কারেন্সী, ব্যাঙ্ক এবং পুলিশ-শক্তির কর্ম্মকারিতা দেশমধ্যে স্থগিত হয়, তবে অবস্থার ভীষণতা কিরূপ দাঁড়াইবে।

তাঁহাদের যদি বিন্দুমাত্রও কল্পনা-শক্তি থাকে, তবে তাঁহাদের উপলব্ধি করিতে বেগ পাইতে হইবে না যে, যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হয়, তবে বর্ত্তমান ভারত সরকারও অন্তর্দ্ধান-প্রাপ্ত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে টাকশাল, কারেন্সী, ব্যাঙ্ক ও পুলিশ-শক্তির কর্ম্মকারিতা লোপ পাইবে। যদি সাময়িক কালের জন্যও টাকশাল, কারেন্সী, ব্যাঙ্ক ও পুলিশ-শক্তির কর্ম্মকারিতা লুপ্ত হয়, তবে সকল সরকারী এবং বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশৃংখলা উপস্থিত হইবে এবং সরকারী এবং বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানসমূহের সমগ্রসংখ্যক কর্ম্মচারী এবং সহকারিগণ বেকার হইবেন। ইহার অর্থ এই যে, বর্ত্তমান সকল পেশার কর্ম্মকারিতা বিলুপ্ত হইবে। আদালতসমূহ যখন অকার্য্যকারী হইয়া পড়িবে, তখন ব্যবহারজীবিগণের পেশাও স্থগিত হইতে বাধ্য। চিকিৎসা ব্যবসায়, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যাঙ্কিং, বীমা, শিল্প, বাণিজ্য এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের চাকুরী—টাকশালে মুদ্রা তৈয়ারী এবং কারেন্সী মারফৎ উহার বিতরণ বন্ধ হইলে সমস্তেরই অবস্থা অনুরূপ দাঁড়াইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হইলে এইরূপ অবস্থা যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা সতত মনে রাখা প্রয়োজন। জনসাধারণকে ভীত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা ইহা লিখিতেছি না, আমাদের উদ্দেশ্য ব্রিটিশ জাতির পরাজয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন সম্বন্ধে যাঁহারা অসার উক্তি প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে সতর্ক করা।

উপরে আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল।

সুতরাং স্বতঃই প্রশ্ন উঠে—"যখন দেখা যাইতেছে, শত্রুপক্ষের তুলনায় পশুশক্তিতে ব্রিটিশ জাতি হীন, তখন বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কি করা যাইতে পারে?" যুক্তিসঙ্গত ভাবে ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, জার্ম্মানগণ পশুশক্তির সহায়তায় যখন যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়ী হইয়া চলিয়াছে, তখন ব্রিটিশ জাতি যে তাহাদের অপেক্ষা পশুশক্তিতে হীন, তাহা এতাবৎ যাহা ঘটিয়াছে, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কি উপায়ে রক্ষিত হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিতে হইলে সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন বিষয়ক সাধারণতঃ যাহা দার্শনিক এবং মূলগত নীতি, আমাদের তাহা আলোচনা করিতে হইবে। সাম্রাজ্যের উত্থান এবং পতন বিষয়ক মূলগত নীতিসমূহ বুঝিতে হইলে

আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে যে, মনুষ্যের মধ্যে যেমন পশুশক্তি রহিয়াছে, তেমনই তাহার বিচারশক্তিও রহিয়াছে এবং এই জন্যই মনুষ্যের কার্য্যকলাপ পশুশক্তি এবং নৈতিক শক্তি, এই উভয়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

যে-ব্যক্তি পারিপার্শ্বিক পশুশক্তি দমন করিবার উপযোগী পরিমাণে তাঁহার নৈতিক শক্তির উন্নয়ন করিতে সমর্থ হন, তাঁহার কখনও পতন হয় না। সুতরাং প্রশ্ন এই যে, "কি ভাবে নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তৎসহায়ে পারিপার্শ্বিক পশু-শক্তিনিচয়কে কার্য্যতঃ বিজিত করা যাইতে পারে?" বেদ, বাইবেল এবং কোরাণের অধিকাংশে এই সমস্যার আলোচনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই সকল শাস্ত্রগ্রন্থের আধুনিক পাঠক-বৃন্দের দৃষ্টিতে যে ইহা পড়ে না, তাহার কারণ হইতেছে, তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু এবং প্রাচীন আরবীয় ভাষার বিজ্ঞানের অজ্ঞতাবশতঃ ঐ সকল গ্রন্থের মূল পুস্তক পাঠ করিতে পারেন না, কেবল তাহার ভ্রান্ত অনুবাদ পাঠ করেন। সে যাহাই হউক, বর্ত্তমান সন্দর্ভে নৈতিক শক্তির বৃদ্ধি সাধন করিয়া তৎসহায়তায় পারিপার্শ্বিক পশু-শক্তিকে কার্য্যতঃ দমন করিবার পন্থার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। সংক্ষেপতঃ বলা যায় যে, মোটামুটি মনুষ্যজাতির তিন প্রকার অবস্থায়, তিন ভাবে ইহা সাধন করিতে হইবে। নিম্নে ইহা উল্লিখিত হইল:—

(১) মনুষ্যজাতি যখন আন্তরিক ভাবে নৈতিক শক্তির উপর আস্থাবান থাকে এবং পশুশক্তিকে ঘৃণা করে, তখন ব্যক্তিগতভাবে নৈতিক শক্তিসমূহের বৃদ্ধি-সাধনকর শিক্ষা কার্য্যকরী হয়। মনুষ্য-প্রকৃতিতে নিহিত যাবতীয় পশুশক্তির ব্যবহারের প্রবৃত্তি এতদ্দ্বারা বিনষ্ট হইবে এবং স্বতঃই পারিপার্শ্বিক পশুশক্তিনিচয়ের দমন কার্য্যকরী হইবে।

(২) মনুষ্যজাতি যখন নৈতিক শক্তির উপর আস্থাবান থাকে না এবং অস্ত্রসজ্জার বৃদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহাতে কার্য্যতঃ সফল হয়, তখন অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, কিন্তু কেবল যাহারা অস্ত্রসজ্জায় বিশ্বাসী, তাহাদের মনে ভীতি উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যেই উহার প্রয়োজন, ব্যবহারের জন্য নহে। অধিকতর অস্ত্রসজ্জার প্রদর্শন দ্বারা অগণিত মনুষ্য-প্রাণ সংহার ব্যতীতও পারিপার্শ্বিক পশুশক্তি সহজেই আয়ত্ত হইতে পারে।

(৩) কিন্তু যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র মাত্র অস্ত্রসজ্জা-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশ্বাসের উদ্ভব ঘটে এবং সমধিক অস্ত্রসজ্জা-বৃদ্ধি অসম্ভব হয়, নৈতিক শক্তির সহায়তায় তখন পশুশক্তিকে বিজিত করিবার এক মাত্র পন্থা হইতেছে "নতি-সাধন।" অর্থাৎ যখন পারিপার্শ্বের ব্যক্তিবৃন্দ অধিকতর অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিপক্ষাচরণ করে, তখন সর্ব্বদা তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির আনুকূল্য করিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের সিদ্ধির পন্থা তাহারা যাহা অনুমান করিতেছে বস্তুতঃ যে তাহা নহে, তদ্বিষয়েও তাহা-দিগকে ধৈর্য্য ধরিয়া শিক্ষা দান করিতে হইবে। এই ভাবে পরিচালিত হইলে রক্তপাৎ না করিয়াই শত্রু-পক্ষের উপর প্রধান্যলাভ সম্ভব।

ব্যক্তিগত ভাবে যাহা সত্য, জাতি ও সাম্রাজ্যের পক্ষেও তাহাই সত্য।

নৈতিক শক্তির সহায়তায় পশুশক্তির পরাজয়করে এই বেদ-নির্দ্দিষ্ট উপায়সমূহের মধ্যে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণকে বর্ত্তমানে তৃতীয় নির্দ্দেশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

সংখ্যা কিংবা উৎকর্ষ, উভয় দিক্ দিয়াই যে, জার্ম্মানীর অস্ত্রসজ্জা মিত্রশক্তির অস্ত্রসজ্জা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিলে সত্য ঘটনা অগ্রাহ্য করিতে হয়। এই অবস্থাতে যুদ্ধ-পরিচালনা মনুষ্য-প্রাণ লইয়া ক্রীড়া করা মাত্র, সকল অবস্থাতেই ইহা পাপ। হইতে পারে যে, জার্ম্মানগণ আজ নিকৃষ্টতম পাপাচরণে লিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু পাপীকে সাজা দিতে হইলে পাপাচরণের আশ্রয়গ্রহণ কোন অবস্থাতেই নৈতিক শক্তিদ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনেতাগণের নৈতিক-শক্তি তাৎকালীন জার্ম্মান রাষ্ট্রনেতাগণের তুলনায় কি পর্য্যায়ের, তৎসম্বন্ধে আমরা নীরব থাকিব, কিন্তু জার্ম্মানীর এবং ব্রিটেনের ইতিহাসের অবহিত পাঠক স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ তদানীন্তন জার্ম্মান নেতৃবৃন্দের তুলনায় অধিকতর নৈতিক বলে বলীয়ান্

ছিলেন। এই কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ জাতি সাম্রাজ্য গঠন করিতে পারিয়াছিলেন। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে, ক্রমাগত জটিলতার পর জটিলতার মধ্য দিয়া চলিয়াছে, এই ঘটনা হইতেই ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের উপলব্ধি হওয়া উচিত যে, তাঁহাদের নৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক নৈপুণ্যের হানি ঘটিয়াছে। এইরূপ হানি না ঘটিলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এলিজাবেথীয় এবং ভিক্টোরিয়ার যুগ চিরস্থায়ী হইত। ব্রিটিশ রাজনৈতিক নৈপুণ্যের যদি হানিই না হইত, তবে যে-জাতি শেক্‌স্‌পীয়ার এবং মিলের জন্মদান করিয়াছে, সে জাতি বার্ণাড শ কিংবা এচ. জি. ওয়েল্‌সের শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের উদ্দেশ্যে এক বিন্দু মাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারিত না। এই শ্রেণীর সাহিত্য এবং চিন্তাধারা প্রচারে সে জাতি লজ্জা বোধ করিত।

বর্ত্তমানে যে-সকল ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই ভাবে চিন্তা করিয়া আত্ম-বিশ্লেষণ করিতে পারিলে "নতি-সাধনে" বিন্দুমাত্র কষ্ট বোধ করিবেন না এবং ফলে তাঁহাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন এবং সম্ভবতঃ সমগ্র মনুষ্যজগতে উহার বিস্তার সাধন করিতে পারিবেন।

নতি-সাধনের প্রথম কথা হইতেছে যে, জার্ম্মান আক্রমণকারিগণ যেরূপ দাবী করিবেন, তাহাদের সহিত অচিরাৎ তদনুযায়ী সন্ধি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সূচনায় ইহা ব্রিটিশ জাতির মর্য্যাদার পক্ষে হানিকর বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর মর্য্যাদা বলিতে কি বুঝায়? সবিশেষ বিশ্লেষণ করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, ইহা বাস্তবতঃ অসার এবং কল্পনার বিষয় মাত্র। এই কাল্পনিক অসারতামূলক মরীচিকাই বর্ত্তমান জগতে অধিকাংশ ব্যক্তির এবং জাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। কেহ কাহারও নিন্দা করিলে মনে করা হয়, তাহার মর্য্যাদা নষ্ট হইয়াছে। কাহারও বিরুদ্ধে কোন নিন্দাবাক্য কার্য্যতঃ বায়ুমণ্ডলে কম্পন মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। শারীরিক ভাবে তাহা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে না। মনকে যদি সে-রূপভাবে প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে উহা মনও স্পর্শ করিতে পারে না। হইতে পারে যে, জার্ম্মানীর প্রস্তাবিত সর্ত্তে ব্রিটিশ জাতি যদি তাহার সহিত বর্ত্তমানে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, তবে পৃথিবীর অপর সকল ঈর্ষ্যাপরায়ণ জাতি তজ্জন্যে সাময়িকভাবে নিন্দাবাক্য রটনার কারণ পাইবে, কিন্তু ব্রিটিশ জাতি যদি তাঁহার রত্ন-সদৃশ যুবকবৃন্দের প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন এবং প্রকৃত পন্থায় চলিতে পারেন, তবে আগামী দশ বৎসর কালের মধ্যে পৃথিবীসমক্ষে ব্রিটিশ জাতি প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, মাত্র ব্রিটিশ জাতিই একাকী আধুনিক জগতের বেকার এবং অনাহার সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইয়া তাহার ত্রাণকর্ত্তা হইয়াছেন,—ইউরোপ কিংবা আমেরিকার আর কোন জাতির দ্বারা ইহা সম্ভব হইবে না। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ কি চিন্তা করিয়া দেখিবেন, জার্ম্মানগণের সহিত তাঁহাদের আনীত সর্ত্তে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার হীনতা বর্ত্তমানে স্বীকার করিয়া লইলেও যদি ব্রিটিশ জাতি সমগ্র মনুষ্যজাতির বেকার এবং অনাহার সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইতে পারেন, তবে তাঁহাদের স্বজাতিকে তাঁহারা কোন্ মর্য্যাদার আসনে উন্নত করিবেন? অপর পক্ষে, বর্ত্তমানে তাঁহারা যে ভাবে চলিয়াছেন, সেই ভাবে চলিয়া তাঁহারা যদি তাঁহাদের রত্ন-সদৃশ যুবকবৃন্দের সমগ্রাংশের হত্যাসাধনেও স্বীকৃত থাকেন, তথাপি তাঁহারা কি ব্রিটিশ জাতির মুখে কলঙ্ক-কালিমা লেপনের পথ সরল করিবার তুল্য কার্য্য করিবেন না?

তাঁহারা কি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন না, বর্ত্তমান অবস্থায় জার্ম্মান আক্রমণকারীর আনীত সর্ব্বনিকৃষ্ট সর্ত্ত কি হইতে পারে? আমরা মনে করি যে, হয় তাহারা সকল জাতির স্বাধীনতা, সমুদ্রপথে অবাধ চলাচল এবং বাণিজ্যের স্বাধীনতা, নয় জার্ম্মান, ইতালীয় এবং অপর কতিপয় জাতির মিলিত কোন ফেডারেশনের প্রাধান্য, দাবী করিবে। বর্ত্তমান জগৎ কি অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে যদি ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের সামান্য মাত্রও বিচক্ষণতা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের অনুমান করিতে অণুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না যে, কার্য্যতঃ যেমন সকল জাতিকে স্বাধীনতা দান করা যাইবে না, তেমনই জাতি-সমূহকে প্রকৃত পন্থায় সুপরিচালিত করিতে পারিলে মাত্র অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যেই এবং জার্ম্মানীর খেয়াল-মত সকলকে যে-কোন প্রকার অধীনতাপাশেও বদ্ধ রাখা চলিবে না। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনেতাগণ যদি উপায় অবগত হইতে পারেন, তবে কেবল ইংলণ্ডই এই সকল জাতিকে সুপরিচালিত করিতে পারেন।

অপর কোন জাতিই ইহা করিতে পারে না। বর্ত্তমান লেখকের সহায়তা-গ্রহণে যদি তাঁহারা ইচ্ছুক হন, তবে তাঁহাদিগের বহু উপকার সাধিত হইবে, এই সম্বন্ধে তাঁহারা নিশ্চিত হইতে পারেন। যত দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ ইউরোপখণ্ডে সীমাবদ্ধ আছে, তত দিন ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ কি করেন, আমরা তাহার অপেক্ষায় থাকিব, কিন্তু যদি কোনক্রমে উহা ভারতে সংক্রামিত হয়, তবে আমাদিগকে অধিকতর চাপ-প্রয়োগের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। যুদ্ধ ভারতে বিস্তৃত হইবার লক্ষণ দেখা দিলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ অধিকতর ব্যাপক এবং বিচক্ষণতর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন, আমরা ইহাই প্রত্যাশা করিতেছি। মনুষ্যপ্রাণ লইয়া অনিশ্চিত ক্রীড়া করিবার মত্তত্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তাঁহারা প্রকৃত নৈতিক শক্তিতে অধিকতর আস্থাবান্ হইবেন, ইহাই আমরা সতত প্রার্থনা করিতেছি—নৈতিক শক্তি মনুষ্যের সকল কার্য্য-কলাপকে কল্যাণজনক করিবার পক্ষে অপরিহার্য্য সম্বল।

আমাদের পাঠকবৃন্দকে অবহিত হইতে বলি যে, আমাদের মত হইতেছে, বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার পক্ষে আবশ্যক—"জার্ম্মানগণের আনীত সর্ত্তে সন্ধি, ফরাসী কিংবা ব্রিটিশদিগের আত্ম-সমর্পণ নহে।" "জার্ম্মানদের আনীত সর্ত্তে সন্ধি" এবং "ব্রিটিশদিগের পক্ষ হইতে আত্ম-সমর্পণ," এই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। "জার্ম্মানদিগের সর্ত্তে সন্ধি"র প্রধান লক্ষ্য হইবে, মনুষ্যপ্রাণ-সংহারক অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার স্থগিত করা এবং মাত্র বুদ্ধিযুক্তির সহায়তায় কূটনৈতিক যুদ্ধের সূচনা—ছল-চাতুরী কিংবা প্রতারণার সাহায্যে নহে। বিচার্য্য হইবে এই যে, উভয় পক্ষের কাহার বুদ্ধি অধিক।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ যদি কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে বিনা রক্তপাতে সদুদ্দেশ্যমূলক কূটনৈতিক যুদ্ধ-জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংস্থান যে অনেক অধিক, এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত না হইলে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতাম না। জার্ম্মানদিগের আনীত সর্ত্তে সন্ধি-আনয়নের প্রস্তাব আমরা এই জন্য করিতেছি যে, যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় আর কোন সর্ত্তেই সন্ধি অথবা মনুষ্য-প্রাণ-সংহারক অস্ত্র-ব্যবহার-বিরতি সম্ভব নহে, ইহাই আমরা মনে করি। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই প্রকার সন্ধি—সূচনায় পরাজয়ের নামান্তর বলিয়া মনে হইতে পারে, শেষতঃ ইহাতে পরাজয়ের গ্লানি বিন্দু-বিসর্গও থাকিবে না। কিন্তু আত্ম-সমর্পণ বলিতে সম্পূর্ণ পরাজয় ধরিতে হয় এবং তাহা ব্রিটিশ কিংবা ফরাসী, কোন প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের পক্ষেই শোভনীয় নহে।

অনতিবিলম্বে যাহাতে আমাদের রাষ্ট্রনেতাগণ অধিকতর রাষ্ট্রনীতিবেত্তার অধিকারী হন, আমরা তাহাই চাহি।*

নিজেদের সম্বন্ধে ইহাঁদের কি লজ্জা বোধ করা উচিত নহে ?

তিনটি রচনা এবং বক্তৃতার বিষয়-বস্তু স্মরণপথে রাখিয়া আমরা বর্ত্তমান সন্দর্ভ রচনা করিতেছি। প্রথমটি "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"এ প্রকাশিত স্যর আর্থার মুর লিখিত "ভারতবাসী জাগো (Wake up India)" শীর্ষক সন্দর্ভ; দ্বিতীয়টি "ষ্টেট্‌সম্যান"এর সম্পাদককে লিখিত স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর একটি পত্র এবং তৃতীয়টি পণ্ডিত জহরলালের ওষ্ঠনিঃসৃত অ্যাবোটাবাদে প্রদত্ত একটি বাণী। তিনটিতেই ভারতবাসীকে কোন না কোন প্রকার "অস্ত্রসজ্জার সহায়তায় ভারত-রক্ষায় প্রস্তুত হইবার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা অহিংস অসহযোগের সমর্থক নহি। আমাদের মতে উহা নির্ব্বুদ্ধিতা এবং প্রতারণামূলক এবং উহাকে চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট বৃত্ত-বিশেষ বলিতে হইবে। যে শত্রুপক্ষ অস্ত্র-শস্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাসী, তাহাদিগকে ভীতি-প্রদর্শনার্থ অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজনেও আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু মনুষ্যপ্রাণসংহারার্থ অস্ত্রের ব্যবহারের—শত্রুপক্ষের অন্তর্গত মনুষ্য হইলেও—আমরা নিশ্চিত বিরোধী। অল্পকালের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী] অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ আমাদের দ্বারা সম্ভব—এই সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে শত্রুপক্ষকে ভীতিপ্রদর্শনার্থ—তাহাদের প্রাণ-

* "দি উইক্‌লি বসুমতী"র ১লা জুন তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

সংহারার্থ নহে—এই অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার দ্বারা জয়লাভ সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতাম। সংপ্রতি ইউরোপ এবং আমেরিকা হইতে যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জার্ম্মানীর বর্ত্তমান আক্রমণকার্য্য হইতে জগদ্বাসী-সমক্ষে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান পৃথিবীর অপর যে-কোন জাতির তুলনায় তাহারা অধিকতর অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণসামর্থ্যের অধিকারী। সুতরাং ইহাই বুঝিতে হয় যে, অস্ত্রসজ্জার অধিকতর সামর্থ্য দ্বারা শত্রু-পক্ষকে ভীতিপ্রদর্শন করিতে আমরা সমর্থ নহি। এমতাবস্থায়, জার্ম্মান অথবা রুষ জাতির আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত আমরা যদি অস্ত্র-সজ্জার আশ্রয় লাভ করিতে চাহি, তবে তাহার অর্থ কেবল এই দাঁড়ায় যে, এই উপায়ে আমরা দেশ এবং প্রাণ-রক্ষায় সফল এবং সার্থক হইতে পারিব ইহা নিশ্চিত প্রকারে না বুঝিয়াও আমাদের যুবকবৃন্দের, তথা শত্রুপক্ষের অগণিত মনুষ্যের প্রাণ-সংহারে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাকে বিচক্ষণতার পরিচায়ক বলা চলিবে না।

আমাদের দেশ-রক্ষার আর একটি মাত্র উপায় হইতেছে "শক্তি-সাধন" অর্থাৎ পশুশক্তির পরাজয়ার্থ নৈতিক শক্তির উন্নয়নমূলক পন্থা। বেদ, বাইবেল এবং কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে এই পন্থার বিষয় বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। উপরে "বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশসাম্রাজ্য রক্ষার পন্থানির্দ্দেশ" শীর্ষক সন্দর্ভে আমরা সংক্ষেপে এই পন্থার জ্ঞাতব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উহার পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই।

আমাদের কেবল জিজ্ঞাস্য এই যে, শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক মনুষ্য-প্রাণহত্যার সমুচিত প্রতিবিধান যদি মনুষ্য-প্রাণহত্যার জন্য প্রস্তুত হওয়া বলিয়াই বিবেচনা করা হয়, তবে আমরা হিটলারের এত নিন্দা করি কেন? মনুষ্যজাতির নিকট হিটলার যে বর্ত্তমানে সর্ব্বনিকৃষ্ট নিন্দাভাজন, ইহাতে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই এবং তাহার একটি কারণ হইতেছে, অগণিত মনুষ্যপ্রাণ-সংহারার্থ অস্ত্র-ধারণে হিটলার ইতস্ততঃ বোধ করিতেছে না। আমাদের বক্তব্য হইতেছে, ঐ একই কারণে স্যর আর্থার মুর, স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু, এবং পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ অধিক না হইলেও—অনুরূপ নিন্দাভাজন কেন হইবেন না?

আমরা মনে করি যে, স্যর আর্থার মুরের মত কুবুদ্ধি-সম্পন্ন রাষ্ট্রনেতাগণের জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বর্ত্তমান বিপন্ন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে এবং এই জন্যই সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। ইঁহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হইবার সময় আসিয়াছে। আমাদের বড়লাট বাহাদুরের যদি ভারতের প্রকৃত রক্ষাব্যবস্থার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে এই সকল দূরদৃষ্টিহীন ব্যক্তি যাহাতে যথেচ্ছ লেখনী পরিচালন হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, আমরা তাঁহাকে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলি।

স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রুকে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার ইচ্ছা নাই। তাঁহাকে আমরা অনুকম্পাভাজন বলিয়া মনে করি। তাঁহার এতদিনে বুঝা উচিত ছিল যে, দেশের কোন হিত সাধন করিবার মত তাঁহার মস্তিষ্ক-সামর্থ্য থাকিলে, যে-রূপ সুযোগ-সুবিধা তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তৎসহায়ে তিনি অনেক কিছু করিতে পারিতেন এবং দেশ বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইতে পারিত না। প্রকৃতপক্ষে যাঁহার মস্তিষ্ক-সামর্থ্য বর্ত্তমান, তিনি কখনও সুযোগ-সুবিধার অথবা অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন না, পরন্তু যে-কোন প্রকারের ব্যর্থতার দ্বারাই তাঁহাকে প্রতিহত হইতে হউক না কেন, তজ্জন্য নিজেকেই তিনি দায়ী বলিয়া মনে করেন। বয়ঃক্রমের সহিত স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রুর যদি কোনরূপ বিচক্ষণতা লাভ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার বুঝা উচিত যে, যে-সকল প্রবৃত্তি মনুষ্যকে দেশের অগণিত নর-নারীর দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্বন্ধে আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন হইবার সহায়তা করে, বর্ত্তমান যুগের আইন-ব্যবসায়ে যিনি কৃতী হইয়াছেন, তাঁহার সেই সকল প্রবৃত্তি নিশ্চিহ্ন হইতে বাধ্য এবং এমন দিন সম্মুখে আসিতেছে, যে দিন জন-সাধারণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া স্বজনক-স্থলক অভিনয়-চাতুর্য্যের সমুচিত প্রতিবিধান দান করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সুতরাং স্যর তেজবাহাদুর সপ্রুকে আমরা ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

পণ্ডিত জহরলালের সমালোচনা করা বৃথা। সহজ মনুষ্য যে-মস্তিষ্ক লাভ করে, নিশ্চয়ই তদপেক্ষা পৃথক্ মস্তিষ্কের তিনি অধিকারী। অন্যথা, যে-কংগ্রেস হইতে

"অহিংসা" মন্ত্রস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে, সেই কংগ্রেসের অন্যতম নেতৃপদে সমাসীন থাকিয়া, ভারত-রক্ষার নিমিত্ত সশস্ত্র সমর-সজ্জা সমর্থন করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেন। জন-সাধারণ আর কতদিন এই অসারতা সহ্য করিয়া চলিবে, তাহা আমরা জানি না। তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার মূলে ব্রিটিশ জাতি নহে, পরন্তু এই শ্রেণীর রঙ্গ-মঞ্চের অভিনেতাগণ। ইহাঁরাই—যে-পন্থায় চলিলে তাহাদের প্রকৃতপক্ষে উন্নতি সম্ভব, সে-পন্থা রোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ঐ পথ সুগম করিতে হইলে জন-সাধারণকে এই শ্রেণীর অসার মস্তিষ্ক হীনতা সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে।

তাহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থাকে বর্ত্তমানে দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের মূল কারণ বলিয়া মনে হইতেছে, ব্রিটিশ জাতি কর্ত্তৃক তাহা সূচিত হয় নাই ; ব্রিটিশ জাতির নিকট পণ্ডিত জহরলাল শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দই সূচনায় ইহার দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন। ভারতবাসী জন-সাধারণ সতর্ক না হইলে ভারত-রক্ষার জন্য এমন ব্যবস্থা গৃহীত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, যাহাতে ভারতবাসী প্রত্যেকটি যুবকের ভবিষ্যৎ অনির্দ্দিষ্ট অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইবে। প্রত্যেক জাতির এবং দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল যে-যুবকবৃন্দ—ইউরোপের সেই যুবক-বৃন্দের এই প্রকার ব্যবস্থাই অকালে প্রাণ-সংহারক হইয়া ইউরোপের ভবিষ্যৎকে ঘন তমসাবৃত করিয়াছে। ভারত-বাসী যাহাতে পূর্ব্বাহ্নে সতর্কতা অবলম্বন করেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বলি।

সন্দর্ভ শেষ করিবার পূর্ব্বে, আমরা যদি আমাদের নাইটগণকে এবং নেতৃবৃন্দকে না জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের সম্বন্ধে কি লজ্জা বোধ করেন না—তবে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে।*

নিরস্ত্র ভারত-রক্ষা, : বড়লাট বাহাদুরের উদ্দেশ্যে নিবেদন

ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি সম্প্রতি একটি বিবৃতি দান করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ইউরোপ-ভূখণ্ডের যুদ্ধ যে-অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষকে আর বিপদ্ হইতে সম্পূর্ণ দূরে বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ভারতকে আক্রমণকারীদের কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বহুবিধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে যে-সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ বুঝিবার নিমিত্ত অবহিত হইলে দেখা যাইবে যে, মূলতঃ উহার লক্ষ্য হইতেছে, (১) সৈন্য এবং বিমানবাহিনীর প্রসার ; (২) নৌশক্তিঘটিত রক্ষাকবচসমূহের উৎকর্ষ সাধন, এবং (৩) বিবিধ প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধার্থে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য নির্ম্মাণ। প্রধান সেনাপতির এই ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রকার সমালোচনা ইতিমধ্যেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। ব্রিটিশ-সরকার যে এখনও সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয়গণের সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার দানে অনিচ্ছুক, এই সকল সমালোচনার অধিকাংশেরই ইহাই মূল প্রতিপাদ্য। এই সকল সমালোচকের মতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস কিংবা স্বাধীনতা, আন্তরিক ভাবে যাহাই ভারতের পক্ষে লক্ষ্যীভূত থাকুক, উভয়তঃই সৈন্যবাহিনী এবং অস্ত্রসজ্জাকে যথাসম্ভব রূপে ভারতীয়গণের অধিকারভুক্ত করিতে হইবে। অর্থাৎ অপর কথায়, এই সকল ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা এই যে, ভারতের প্রধান সেনাপতি শত্রুপক্ষ যে পথের নিশানা দেখাইয়াছে, সেই পথ অনুসরণ করুন। এই কার্য্য-প্রস্তাবের মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় লাভে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম।

আমাদের মতে শত্রুপক্ষকর্ত্তৃক যে উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার অনুকরণের উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইলে তাহাদিগকে আমরা পরাজিত করিতে পারিব কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। কেবল তাহাই নহে, দেশরক্ষার নিমিত্ত সশস্ত্র অস্ত্রসজ্জা আমাদের লক্ষ্য হইলে আমরা আমাদিগকে সম্পূর্ণতঃ রক্ষাও করিতে পারিব না। ইহার কারণ এই যে, সকল সশস্ত্র কার্য্যকলাপেই সর্ব্বদা মনুষ্যপ্রাণের পক্ষে কোন

---

* "দি উইক্‌লি [illegible]"র ১লা জুন সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

না কোন প্রকারে হানিজনক এবং যুধ্যমান উভয় পক্ষেই ইহা অবশ্যম্ভাবী। হইতে পারে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত আমরাই জয়ী হইব, কিন্তু তাই বলিয়া এমন হইতে পারে না যে, কেবল শত্রুপক্ষেরই সৈন্যবৃন্দ হত হইবে, আমাদের পক্ষের সৈন্যবৃন্দের কোন ক্ষতি হইবে না। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই হতাহত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, ভারত-বাসিগণ আক্রমণকারীদের হত্যাকাণ্ড-নিরোধে সমর্থ হইলেও তাহাদের কাহারও কাহারও বন্ধু, পুত্র, অথবা ভ্রাতাকে হারাইতে হইবে। আমাদের পাঠকবৃন্দ কি কল্পনা করিবেন যে, তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধব, ভ্রাতা এবং পুত্রবৃন্দের মধ্যে কাহাকেও হারাইতে হইলে কি ভীষণ আঘাত তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবে। তথাপি কি এই দেশ-রক্ষার নিমিত্ত ভারতকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা গৃহীত হইলে আমাদের সম্পূর্ণতঃ রক্ষা সাধিত হইবে, ইহাই মানিয়া লইতে হইবে ?

আমাদের এই সম্পর্কের বক্তব্য ভারতবাসী জন-সাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত নহে—সামরিক কিংবা অসামরিক ভারতীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের কেহ কোন আদেশ জারি করিলে তাঁহাদিগের তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে পালন করাই উচিত। দেশের মধ্যে সকল সময়েই কর্তৃপক্ষ যে আদেশ জারী করেন, তাহা পালন করা দেশবাসীর স্বার্থের অনুকূল—বিশেষতঃ যুদ্ধকালীন অবস্থাতে। কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের প্রত্যেকটি ব্যক্তির জীবন উৎসর্গের, এমন কি অবসানের পর্যন্ত দাবী করেন, তাহাও আমাদিগকে সম্পূর্ণ অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অন্যথায় দেশে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। সেইরূপ অবস্থা কখনও এই যুদ্ধকালে সামান্য রূপেও ঘটিতে দেওয়া চলিতে পারে না।

আমাদের এই সম্পর্ক আমাদের কর্তৃপক্ষ এবং নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে লিখিত, বিশেষতঃ বড়লাট বাহাদুর, প্রধান সেনাপতি এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে সশস্ত্র সমরসজ্জার বৃদ্ধির নিমিত্ত উত্তেজিত করিতেছেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে। তাঁহাদিগকে আমরা ধৈর্য্য ধরিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলি, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ভারত-রক্ষার নিমিত্ত সশস্ত্র অস্ত্রসজ্জার ব্যবস্থা ব্যতীত আর কোন পরিকল্পনার সহায়তা গ্রহণ সম্ভব কি না। দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলারক্ষার জন্য সামরিক বিভাগের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং বহিঃশত্রুর মধ্যে যে-অংশ আমাদের অস্ত্রসজ্জার প্রাবল্য দর্শনে শঙ্কিত হইবে, তাহাদিগকে ভীতি-প্রদর্শনার্থও উহার প্রয়োজন, ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের মত এই যে, বহিঃশত্রুর কাহারও যদি উৎকৃষ্টতর অস্ত্র-শস্ত্র এবং রণসম্ভার থাকে এবং তাহাদের যদি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সৈন্যবাহিনী থাকে, তবে তাহাদিগকে ভীত করা চলে না ; এমতাবস্থায় সশস্ত্র অস্ত্র-সজ্জার উপর নির্ভর করিলে যুদ্ধ সুনিশ্চিত এবং মনুষ্যপ্রাণ ও সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়াও সুনিশ্চিত। আমরা কাপুরুষতা এবং আলস্যের পক্ষে ওকালতী করিতেছি না এবং আমরাও যুদ্ধে জয়লাভ কামনা করি, কিন্তু সম্ভব হইলে, উহাতে যাহাতে মনুষ্যপ্রাণ এবং সম্পত্তি নষ্ট না হয়, আমরা তাহার পক্ষপাতী।

আমাদের মতে কোন প্রকার অস্ত্রসজ্জা এবং রণ-সম্ভারের কার্য্যতঃ সহায়তা গ্রহণ না করিয়া আমরা যদি প্রথমতঃ ভারতের বিরুদ্ধে সম্ভাবিত আক্রমণকারীদের সহিত কোন সুগভীর কূটনীতিমূলক কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হই ; এবং দ্বিতীয়তঃ দেশের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয়, আর্থিক এবং শিক্ষা-নৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন করি, তাহা হইলে হিটলারের আক্রমণকে সম্পূর্ণ প্রতিহত করিয়া আমরা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণতঃ রক্ষা করিতে পারি।

আমাদের কার্য্য-পরিকল্পনা কি, তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইলে, আমাদিগের প্রথমতঃ জানা প্রয়োজন, আমাদের সম্ভাবিত প্রতিপক্ষ কাহারা, এবং দ্বিতীয়তঃ জানা প্রয়োজন, কোন্ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া প্রতিপক্ষগণ প্রতিপক্ষতায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

আমরা যদি বলি যে, ইউরোপ-ভূখণ্ডে হূনদিগের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং ধ্বংস সাধিত না হইলে জার্মান জাতির 'নিয়ন্ত্র-পাধীন অবস্থায় ইটালীয়, রুষ, জাপানী এবং তুর্কী—ইহাদের সকলেরই অদূরভবিষ্যতে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সম্ভাবনা, তবে কর্তৃপক্ষের সহিত আমাদের মতদ্বৈধ ঘটিবে না, ইহা আমরা হয়তো জোরের সহিত বলিতে পারি। ইটালীয়* এবং রুষগণ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত সম্মুখ-যুদ্ধ ঘোষণা না করিলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি যে তাহারা মৈত্রীভাবাপন্ন

* এই সম্পর্ক ইটালীর যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে লিখিত।

নহে, তাহা বর্ত্তমান যুদ্ধঘোষণা-কাল হইতে ইংলণ্ডের সহিত তাহাদের আচরণ হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। রুষ এবং ইটালীয়গণের ন্যায় জাপানী এবং তুর্কীগণের শত্রুভাব সুস্পষ্ট নহে। ব্রিটিশ-কূটনীতিবিদ্গণ এই উভয় জাতির সহিত মিত্রভাবস্থার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিতেছেন, ইহাও বলিতে পারা যায়; কিন্তু আমাদের প্রতিপাদ্য প্রমাণার্থ এই উভয় জাতিও আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ইহাই ধরিয়া লইব, কেন না, বিশ্বাস করিবার কারণ বর্ত্তমান যে, তাহারা শেষ পর্য্যন্ত শত্রুতাচরণ করিবে। জাপানী জাতি যে ব্রিটিশ জাতি কর্ত্তৃক পৃথিবীর উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক ঘটনাসমূহের বুদ্ধিমান্ পাঠকের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই পড়িয়াছে। তুর্কী জাতি, অধুনা আমাদের প্রতি যত মৈত্রীভাব-বিশিষ্টই হউক না কেন,—আধুনিক প্রথায় তাহাদের স্বদেশ-গঠনার্থ জার্ম্মান সেনানায়ক এবং কূটনীতিবিশারদগণের নিকট হইতে অনেক বিষয়ে তাহারা ঋণী হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং বিশ্বাস করিবার স্বপক্ষে বহু যুক্তি বিদ্যমান যে, তাহারা ব্রিটিশ স্বার্থের আনুকূল্যের বিনিময়ে হয় আমাদের নিকট চড়া মূল্য দাবী করিবে, নয় শত্রুপক্ষভুক্ত হইবে। সুতরাং 'অধিকন্তু' হিসাবে আমরা তুর্কী জাতিকেও আমাদের শত্রুপক্ষভুক্ত ধার্য্য করিতেছি।

ভারতবর্ষ, তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কেন জার্ম্মান, রুষ, ইটালীয়, জাপানী এবং তুর্কী এই সকল জাতি কোন্ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যথার্থভাবে ইহার সন্ধানে ব্যাপৃত হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব গভীর ভাবে তথ্যানুসন্ধান করিতে হইবে:—

প্রথমতঃ, জার্ম্মানীর বিস্তার এবং উন্নয়নকল্পে প্রিন্স বিশমার্কের চিন্তাধারা এবং কার্য্যকলাপ, তথা জার্ম্মানীর তদানীন্তন দার্শনিক মতবাদসমূহ;

দ্বিতীয়তঃ, ঐ একই উদ্দেশ্যে ভূতপূর্ব্ব কাইজারের চিন্তাধারা এবং কার্য্যকলাপ;

তৃতীয়তঃ, ভূতপূর্ব্ব কাইজারের সিংহাসন-ত্যাগের পর হইতে জার্ম্মান জাতির কার্য্যকলাপ;

চতুর্থতঃ, প্রথম উইলিয়মের রাজত্ব সময়ে "মিলিত জার্ম্মানী"র কাল হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধের ঘোষণা-কাল, ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত—রুষ, ইটালীয়, জাপানী এবং তুর্কী জাতির ইতিহাস।

এই সকল ইতিহাস, কার্য্যকলাপ এবং চিন্তাধারা মনোযোগ সহকারে যে-ছাত্র পাঠ করিবেন, তাঁহার দৃষ্টি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আকৃষ্ট করিবে:—

(১) প্রিন্স বিশমার্কের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল জার্ম্মানীর আর্থিক অবস্থাকে ত্রুটিহীন করা এবং জার্ম্মানীকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা।

(২) প্রিন্স বিশমার্ক বুঝিতে পারেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সদৃশ কোন জার্ম্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে কিংবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করিয়া ইংরাজকে অপরাপর সাধারণ জাতির পর্য্যায়ভুক্ত না করিতে পারিলে তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধিলাভ করিবে না।

(৩) প্রিন্স বিশমার্ক বুঝিতে পারেন যে, যত দিন ব্রিটিশ জাতির পশ্চাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে প্রস্তুত কারেন্সী-নোট গ্রহণ করিবার ন্যায় সাম্রাজ্য বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন পৃথিবীর বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সবিশেষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব।

(৪) প্রিন্স বিশমার্ক মনে করিতেন যে, তাঁহার জীবনের মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিবার প্রাথমিক কার্য্য হইতেছে—শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক, তথা অস্ত্র-শস্ত্র ও রণসম্ভার বিষয়ক মৌলিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা ও তাহার উন্নয়ন।

(৫) পৃথিবীর অপরাপর জাতির সহিত শত্রুতাচরণ অপেক্ষা মৈত্রীভাব বজায় রাখাতেই প্রিন্স বিশমার্ক অধিকতর আস্থাবান্ ছিলেন। ইংলণ্ডের সহিত মিত্রভাবে কথাবার্ত্তা চালাইয়া তিনি ইংলণ্ডকে বুঝাইতে চাহেন যে, বাণিজ্য-ক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল জাতিকে সততামূলক প্রতিযোগিতার সুবিধা দান করা হউক্।

(৬) ১৮৯০ সনে প্রিন্স বিশমার্কের অবসর গ্রহণের পর ভূতপূর্ব্ব কাইজার ১ হইতে ৪ দফায় কথিত প্রিন্স বিশমার্কের প্রত্যেকটি কার্য্যনীতি গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি মৈত্রীভাব অপেক্ষা অস্ত্রসজ্জার প্রতি অধিকতর আস্থাবান্ ছিলেন।

(৭) ভূতপূর্ব্ব কাইজারের অধীনে জার্ম্মানী বস্তুতঃ ইংলণ্ডের সহিত মৈত্রীভাব বজায় রাখিয়া, অন্তরালে অস্ত্রসজ্জা এবং অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করিয়া ইংলণ্ড ও তাহার সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধন-মূলক চিন্তাধারা নীতি পোষণ করে।

(৮) ভূতপূর্ব্ব কাইজার পৃথিবীর অপরাপর যে-কোন জাতির সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন, তাঁহাতে লক্ষ্য থাকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে শত্রুতাচারণ বৃদ্ধি এবং পৃথিবীর অপরাপর অঞ্চলে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক প্রস্তুত কারেন্সী-নোট চালু থাকিবার ব্যবস্থার অবসান না ঘটিলে যে, পৃথিবীর বাণিজ্যক্ষেত্রে সভ্যতামূলক প্রতিযোগিতা সম্ভব নহে—এই মতবাদ প্রচার।

(৯) রাজত্ব-গ্রহণের প্রথমে ভূতপূর্ব্ব কাইজার বিশ্বাস করেন যে, জার্ম্মানীর আর্থিক অবস্থা ত্রুটিহীন করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়ন, তখন তিনি কৃষি-উন্নয়ন কার্য্যের উপকারিতার আস্থাবান্ ছিলেন না। ১৯১৪ সনের গত যুদ্ধকাল হইতে এই বিষয়ে জার্ম্মানীর কার্য্যনীতি বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমান জার্ম্মানীর নীতি হইতেছে দেশের আর্থিক অবস্থা ত্রুটিহীন করিতে হইলে শিল্প-বাণিজ্যমূলক উন্নয়নের যেমন প্রয়োজন,তেমনই প্রয়োজন কৃষিকার্য্যমূলক উন্নয়ন। জার্ম্মানগণ এখনও বুঝিতে পারে নাই শিল্প-বাণিজ্যমূলক উন্নয়ন-কার্য্য অপেক্ষা কৃষিকার্য্যমূলক উন্নয়নের প্রয়োজন অধিকতর।

(১০) শিল্প-বাণিজ্য, অস্ত্র-শস্ত্র এবং রণসম্ভার ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ক বিজ্ঞানের গবেষণা এবং উন্নতি সত্ত্বেও আধুনিক জার্ম্মানীর আর্থিক অবস্থা প্রিন্স বিসমার্কের সময় অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে, কৃষিকার্য্যের উন্নয়ন সম্পাদনে ব্যর্থতা। বর্ত্তমানে জার্ম্মান নরনারীকে প্রায়শঃই বেকার এবং অনাহার সমস্যার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

(১১) জার্ম্মান জাতির দর্শন পরোক্ষভাবে বর্ত্তমান রুশিয়া, ইটালী, তুরস্ক এবং জাপানকে তাহাদের শিল্প-বাণিজ্য, অস্ত্র-সজ্জা এবং রণসম্ভার ইত্যাদির গঠন বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে রাষ্ট্রনীতিগত পার্থক্য বর্ত্তমান। এই সকল দেশে জার্ম্মানীর রাষ্ট্রদর্শন যে সম্পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ জার্ম্মানীর রাষ্ট্রদর্শন জার্ম্মান জাতির নিজেদেরই জন-সাধারণের দারিদ্র্য দূর করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই।

(১২) আধুনিক রুষ, ইটালীয়, তুর্কী এবং জাপানীদিগের চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জার্ম্মান জাতি তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি-মূলক পন্থায় পরোক্ষভাবে ইহাদের পরাজিত করিয়াছে এবং গত পঞ্চাশ বৎসরের চেষ্টায় ইহারা যাহা করিতে পারিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ কয়েক মাসের চেষ্টায় নাকচ করিয়া দিতে পারিবেন না। এই জন্যই ইহাঁদের কাহারও সহিত ব্রিটিশ জাতির আন্তরিক মৈত্রীসূত্রের বন্ধন অসম্ভব হইয়াছে।

(১৩) জার্ম্মানীর যুবকবৃন্দের সম্মুখে হিটলার প্রদত্ত বুলেটিনসমূহ পাঠ করিয়া গত যুদ্ধের পরবর্ত্তী কাল হইতে জার্ম্মান জাতির যুবকবৃন্দের সংগঠন ইতিহাস যথাযথ ভাবে অনুধাবন করিতে পারিলে স্পষ্টতঃ বুঝা যাইবে যে, বর্ত্তমান জগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অবিদিতরূপে—এক কৃষিকার্য্য বাদ দিলে শিল্প-বাণিজ্য, অস্ত্র-শস্ত্র এবং রণসম্ভার ইত্যাদির বিজ্ঞান বিষয়ে অধুনাতন জার্ম্মানী অভূতপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছে। জার্ম্মান জাতি এরূপ চাতুর্য্যের সহিত এবং সংগোপনে এই কার্য্য সাধন করিয়াছে যে, তাহারা নিজেরা যদি ইহার ইতিহাস সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকাশিত না করে, কিংবা কর্ত্তা ও কর্ম্ম-বিষয়ক মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য উপলব্ধির সামর্থ্য অর্জ্জন না করা যায়, তাহা হইলে অপর কোন দেশই ইহার বিষয় বিদিত হইতে পারে না।

প্রসঙ্গতঃ আমরা এখানে উল্লেখ করিতে পারি যে, জার্ম্মান জাতি যখন সুগোপন নিষ্ঠার সহিত এই সকল

উন্নতি করিয়াছে, তখন আমাদের ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ, বৈজ্ঞানিকগণ এবং বিবুধগণ নারীসঙ্গ, মদ্যপান এবং অবসর বিনোদনের ক্রীড়া ইত্যাদি উপভোগের কার্য্য-কুশলতা অর্জন করিয়াছেন।

এইরূপ ভাবে তাঁহারা কেবল নিজেরাই অধঃপাতে যান নাই, সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের নৈকট্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও অধঃপাতে লইয়া গিয়াছেন। সিভিল সার্ভিস-ভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের কোন দলের সহিত কাহারও এক-সঙ্গে রেল ভ্রমণ করিবার কিংবা তাঁহাদের সহিত চলাফেরা করিবার সুযোগ যাঁহার হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কিরূপ নির্লজ্জতার সহিত ইঁহারা ষ্টীমারের উন্মুক্ত ডেকে কিংবা রেলগাড়ীর কামরার মধ্যে মদ্যপান করিয়া থাকেন। বাধ্য না হইলে আমরা ইঁহাদের এই দিক্‌কার চিত্র উদ্ঘাটিত করিতে চাহি না। কিন্তু বাস্তব সত্য হইতেছে, ভারতীয় অথবা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস-ভুক্ত এমন এক জন ব্যক্তিকে কদাপি পাওয়া যাইবে, যিনি নারী-সঙ্গ এবং মদ্যপান সম্বন্ধে নিন্দনীয় আচরণ হইতে মুক্ত। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ যদি এই আচরণ দূষণার্হ বলিয়া মনে করিতেন, তবে বর্ত্তমান চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত হইত। পৃথিবী অন্ততঃ পরিচয় পাইত যে, ব্রিটিশ শাসনাধীনে এরূপ আইন-কানুন প্রবর্ত্তিত আছে, যদ্দ্বারা মদ্যপ এবং সন্দেহজনক চরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দকে দায়িত্বসূচক শাসন-বিষয়ক পদাধিকার হইতে বিচ্যুত করা যায়।

বর্ত্তমান জার্ম্মানীর উন্নতির ইতিহাস যথাযথ ভাবে পাঠ করিতে পারিলে দেখা যায় যে, আর্থিক অবস্থা ত্রুটিহীন করা এবং পৃথিবীতে জার্ম্মানীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা, এই দুই উদ্দেশ্যই তাহাদের বর্ত্তমান উন্নতির মূল প্রেরণা দান করিয়াছে। ইহাও দৃষ্ট হইবে যে, তাহারা মনে করে যে, তাহাদের উদ্দেশ্য-সাধনের পন্থা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধন এবং এই জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য যাহা কিছু তাহারা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি কার্য্য তাহারা সাধিত করিয়াছে। আমাদের মতে, গত সত্তর বৎসর যাবৎ জার্ম্মান জাতি যাহা করিয়া আসিতেছে, ব্রিটিশ জাতি তাহা সাত বৎসর কিংবা সাত বৎসরের চেষ্টাতে সাধিত করিয়া দিতে পারিবেন না। ইহার অর্থ এই যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ যদি জার্ম্মান জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়া যতদূর সম্ভব অস্ত্রসজ্জা এবং রণসজ্জা বৃদ্ধি করিয়া এবং তাঁহাদের স্থল-সৈন্য, নৌশক্তি এবং বিমানশক্তির বৃদ্ধি সাধন করিয়া জার্ম্মানদিগকে বিজিত করিতে কিংবা সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে চেষ্টিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সে-চেষ্টা সম্ভবতঃ ভ্রান্ত হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, আক্রমণকারীদিগের অভিযান প্রতিহত করিতে হইলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের কর্ত্তব্য হইতেছে—

প্রথমতঃ, সম্ভাবিত প্রতিপক্ষবৃন্দের সহিত সুগভীর কূটনৈতিক কার্য্যপন্থা গ্রহণ এবং তাহা রক্ষা;

এবং দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ কর্ত্তৃক ভারতের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয়, আর্থিক এবং শিক্ষানৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সংস্কার পরিকল্পনা।

আমরা দেখিয়াছি যে, জার্ম্মান জাতির নিয়ন্ত্রণে রুষ, ইটালীয়, তুর্কী এবং জাপানীদিগের ভারতের বিপক্ষাচরণের আশঙ্কা বর্ত্তমান। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, জার্ম্মানীর এবং জার্ম্মান জন-সাধারণের আর্থিক ব্যবস্থাকে ত্রুটিহীন করা এবং তাহাকে পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা, এই উভয় উদ্দেশ্যই জার্ম্মানীর বর্ত্তমান উন্নতির মূল প্রেরণা দান করিয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যন্ত্র-শিল্প, অস্ত্র-সজ্জা এবং রণসম্ভারকে সর্ব্বোচ্চ স্তরে উন্নত করিবার বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সংগঠন জার্ম্মানী কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা এতাবৎ তাহাদের দেশের কৃষিকার্য্যের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় নাই, কিংবা কৃষিকার্য্যের উন্নয়নকল্পে যে-বিজ্ঞান অত্যাবশ্যক, তাহার সন্ধান লাভ করে নাই। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান হইতেই বুঝা যাইবে যে, কোন দেশ কৃষি-কার্য্যের সর্ব্বোত্তম উন্নয়ন-সাধন-ব্যবস্থার সন্ধান লাভ করিতে না পারিলে তাহা স্ব-নির্ভর হইতে পারে না এবং তাহার আর্থিক ব্যবস্থাও ত্রুটিহীন হইতে পারে না। যে-জাতি এমন দেশের অধিকারী নহে, যাহা কৃষিকার্য্য-বিষয়ক সর্ব্বোত্তম উন্নয়নের উপযোগী, পৃথিবীর মধ্যে এরূপ কোন জাতি যদি এই কার্য্যে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা এই কার্য্য সুসাধিত হইতে পারে না। যিনি সকল দিক্ হইতে সুলক্ষণ

কৃষিবিজ্ঞানের সন্ধানলাভে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, কৃষিজাত সাফল্যের মূল ভিত্তি হইতেছে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি এবং ইহার নিমিত্ত প্রয়োজন মৃত্তিকাভ্যন্তরে রস ও তেজের স্বাভাবিক সংমিশ্রণের একটি সুনির্দ্দিষ্ট অনুপাত। ইহা আবার মৃত্তিকাভ্যন্তরে তেজ ও রসের প্রাথমিক উৎস যে সূর্য্য এবং চন্দ্র, তাহাদের সহিত কোন দেশের অবস্থান বিশেষের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীর সকল দেশের তুলনায় সূর্য্য ও চন্দ্রের অবস্থান যে এক নহে, ইহা বোধ হয় তর্কের বিষয় হইবে না। যখন মনুষ্যজাতি কৃষি-বিজ্ঞানের এই অংশ বিদিত হইতে পারিবে, তখন দেখা যাইবে যে, সূর্য্য এবং চন্দ্রের সহিত অবস্থান-বিষয়ে ভারতবর্ষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং এই বিজ্ঞানের জ্ঞান লব্ধ হইলে ও তদনুযায়ী কার্য্যপ্রয়াসী হইলে, একমাত্র এই ভারতবর্ষই সর্ব্বোত্তম স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি লাভে সমর্থ। সূর্য্য এবং চন্দ্রের সহিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থান কিরূপ, মনুষ্যজাতি যখন তাহা বুঝিবার কৃতিত্ব লাভ করিবে, তখন দেখা যাইবে যে, সূর্য্য এবং চন্দ্রের সহিত অবস্থান বিষয়ে এক ভারত ব্যতীত—পৃথিবীর অপর সকল দেশের বর্ত্তমানে অসুবিধা ঘটিয়াছে এবং দেশকে স্ব-নির্ভর করিতে হইলে দেশের মৃত্তিকার পক্ষে স্বাভাবিক যে উর্ব্বরাশক্তি অপরিহার্য্য, ঐ সকল দেশের কাহারও তদ্বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা লাভ সম্ভব নহে। ইহার অর্থ এই যে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সকল যুদ্ধে জয়ী হইলেও জার্ম্মানী, রুশিয়া, ইতালী, তুরস্ক এবং জাপান কখনও আর্থিক ভাবে ত্রুটিহীন অবস্থা অর্জ্জন করিতে পারিবে না। অতঃপর, ভারতকে প্রতিপক্ষের অভিযান হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের কি কূটনৈতিক কার্য্যপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, আমরা তাহার আলোচনা করিব।

তাঁহাদিগকে জার্ম্মান রাষ্ট্রনেতাগণের সম্মুখীন হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রিটিশ জাতি পরাজয় স্বীকার করিতেছে এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, অধিকতর সংখ্যায় মনুষ্যজীবন নিহত করিয়া তাহারা আরও কি লাভের প্রত্যাশা রাখে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের জার্ম্মান রাষ্ট্রনেতাগণকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, যুদ্ধ জয়লাভের ফলস্বরূপ—এমন কি ভারতও যদি জার্ম্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাঁহারা তাঁহাদের জন-সাধারণের আর্থিক মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। সবিশেষ ভাবে ইহা ব্যাখ্যা করিয়া ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ প্রস্তাব করিবেন যে, জার্ম্মানী, রুশিয়া, ইতালী, তুরস্ক এবং জাপানের সমগ্র জন-সংখ্যার প্রয়োজনীয় আহার্য্য হিসাবে যে খাদ্য-শস্য প্রতি বৎসর প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা তাহাদিগকে উপঢৌকন দান করিবেন। উপরন্তু তাঁহারা প্রস্তাব আনয়ন করিবেন যে, তাহাদিগকে ভারত এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেকাংশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দানে তাঁহারা প্রস্তুত।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের যদি সরল ভাবে এবং বিশ্বাস আনয়নের উপযোগী ভাবে ইহা ব্যাখ্যা করিবার যোগ্যতা থাকে, তবে ভরসা করিবার কারণ বর্ত্তমান যে, এই প্রস্তাব জার্ম্মান জাতি, রুষ, ইটালীয়, তুর্কী এবং জাপানী জাতি সকলেরই সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্টি বিধান করিবে। যতখানি জোরের সহিত আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব, ততখানি জোরের সহিতই আমরা এই প্রস্তাব সমুপস্থিত করিতেছি, কেন না জার্ম্মান জাতি কি উদ্দেশ্য লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি।

এই কূটনৈতিক কার্য্যপন্থায় ভারত তথা সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অধিকতর সংখ্যক মনুষ্যপ্রাণের এবং সম্পদের বিনাশ নিবারণ করিয়া যেমন রক্ষিত হইতে পারে, তেমনই ভারতের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয়, আর্থিক এবং শিক্ষানৈতিক ব্যবস্থার কতিপয় সংস্কার সাধিত হইলে, প্রতিপক্ষের নিকট প্রদত্ত আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণেও কোন বেগ পাইতে হইবে না

এই বিষয়ক কার্য্য-পরিকল্পনা আমাদের প্রস্তুত আছে, কিন্তু আমরা মনে করিতে চাই যে, ভারত এবং ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ সহযোগিতার ফলে তাহাদের মিলিত জ্ঞান-ভাণ্ডারে এমন কতিপয় গূঢ় বিষয় থাকা প্রয়োজন, যাহা তাহাদের নিতান্ত নিজস্ব এবং সেই জন্যই আমরা ইহা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না।

আমরা যাহা লিপিবদ্ধ করিলাম, আমাদের বড়লাট বাহাদুর তাহা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া এতদ্বিষয়ক বিস্তৃততর তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত আমাদের সাক্ষাৎকামনায় উৎসুক হউন—ইহাই আমরা চাহি। এই অসাধারণ ক্ষণে

তাঁহাকেও যে অসাধারণত্ব অর্জ্জন করিতে হইবে, ইহাই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

এই কার্য্য-পরিকল্পনা জার্ম্মান জাতির অত্যাচার হইতে কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবে না, উপরন্তু আগামী কিছু কালের নিমিত্ত সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর ইংলণ্ডের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহা তাঁহার বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত, কেন না, এই কার্য্য-পরিকল্পনা পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের কোটি কোটি ক্ষুধার্ত্ত জন-সাধারণের ক্ষুধা-তৃষ্ণার গ্লানি মিটাইবে।*

ইহাকে কি প্রকৃত মনুষ্য-পদবাচ্য ব্যক্তির বিচার-শক্তি এবং দূরদৃষ্টি বলা চলে ?

আমাদের এই সন্দর্ভের উপজীব্য, স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বার্ষিক মৃত্যু-তিথি স্মারক-সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে প্রদত্ত স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় অপরাপর বিষয়ের সহিত স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন নিম্নলিখিত চারিটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন :

(১) অন্য সকল কিছু অপেক্ষা, স্যর আশুতোষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণকে, প্রকৃত মনুষ্যপদ-বাচ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

(২) দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবাসীদের অধুনা এমন অবস্থা নহে, যাহাতে তাহারা নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলার বিষয়ে কার্য্যকরী সাহায্য দান করিতে পারে।

(৩) ভারতবর্ষ ব্রিটিশ জাতিসঙ্ঘের সকল সদস্যের সহিত সমান অধিকার-ভাগী অন্যতম সদস্য এবং ভারত স্বাধীন হইবে, এই ঘোষণাবাণীর সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষাপূর্ব্বক কার্য্য এবং ভারত সম্বন্ধে শাসননীতির আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া অবিলম্বে উচিত।

(৪) যুদ্ধ অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর বিষয় বর্ত্তমান, ব্রিটেনকে ইহা বুঝিতে হইবে। যুদ্ধে শারীরিক মৃত্যু ঘটে বটে, কিন্তু যে ভয়প্রদ শান্তিতে (dreadful peace) অগণিত নর-নারী পরাধীন অবস্থায় জীবন যাপন করে, তাহাতে আত্মার মৃত্যু সাধিত হয়।

আমাদের মতবাদ অনুযায়ী, স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের উল্লিখিত চারিটি বক্তব্যের প্রত্যেকটি ভ্রান্ত এবং কোন শিক্ষাব্রতী এবং দার্শনিকের অযোগ্য।

তাঁহার চারিটি বক্তব্যের যেটি প্রথম—"অন্য সকল কিছু অপেক্ষা স্যর আশুতোষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণকে প্রকৃত 'মনুষ্য'-পদবাচ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন," —তাহা "মানুষ" এই কথাটির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা-প্রসূত। "মানুষ" এই কথাটির শব্দনিষ্পন্ন যে অর্থ দ্বারা ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়, যিনি তাহা পারিবেন, তাঁহার বুদ্ধিতে অচিরাৎ ধরা পড়িবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধুনা যে-পদ্ধতিতে তথাকথিত শিক্ষা দান করা হয়, তাহা প্রকৃত অর্থে মনুষ্য গড়িয়া তুলিতে পারে না। 'মানুষ' কথাটির শব্দনিষ্পন্ন অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, ইংরাজী ভাষার কোন যাথার্থমূলক অভিধান ইহার অর্থ দিতে পারে নাই, এবং কেবল অর্থ বুঝিবার 'বর্ণস্ফোট' পদ্ধতির মারফতই ইহা বুঝা যাইতে পারে। কথার অর্থ বুঝিবার বর্ণস্ফোট পদ্ধতি বিদিত আছেন, এরূপ যে-কোন ব্যক্তি—আমরা যদি বলি যে, মানুষ হইতেছে সেই জীবন্ত প্রাণী, যে কি ভাবে, অর্থাৎ স্বকীয় শরীরগঠন এবং শরীর-বিধানের কোন্ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তাহার স্বকীয় মন এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-সামর্থ্য কিরূপ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিক্, কাল ও অবস্থা অনু-যায়ী কার্য্যকরী হয়, তাহা স্বকীয় দেহাভ্যন্তরে উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য রাখে—তাহা সমর্থন করিবেন। ইহাই মানুষের "বিশেষ" সামর্থ্য। অপরাপর কতিপয় জীবন্ত প্রাণীরও মন এবং ইন্দ্রিয়সামর্থ্য বর্ত্তমান, কিন্তু তাহারা এই উপলব্ধি-সামর্থ্যের অধিকারী নহে। মনুষ্যের এই "বিশেষ" সামর্থ্যকেই পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ "যুক্তিবত্তা (rationality)" আখ্যায়

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ৮ই জুন সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

করিয়াছেন, অথচ "মুক্তিযুক্তা" বলিতে কি বুঝা যায়, তাহা তলাইয়া বুঝেন নাই। যাহাই হউক, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, যে-ব্যক্তি কি ভাবে, অর্থাৎ শরীরবিধান এবং শরীরগঠনগত কোন্ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী তাঁহার মন এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সামর্থ্য পৃথক্ পৃথক্ কাল, দিক্ এবং অবস্থানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্য্যশীল হইতেছে, তাহা স্বকীয় দেহাভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতে না পারেন, তিনি প্রকৃত অর্থে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করেন না। বেদ, বাইবেল এবং কোরাণের মূল গ্রন্থসমূহ তাহাদের যথাযথ অর্থে, অর্থাৎ তাহাদের ভ্রান্ত টীকা এবং অনুবাদ দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবান্বিত না হইয়া, পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের প্রত্যেকটির অন্যতম প্রধান বিষয়-বস্তু হইতেছে প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্ব-দান। ইহাও দেখা যাইবে যে, নির্জ্জন স্থানে এই সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থের যে-কোন একটির সহায়তায় নীরব সাধনাবিশেষ দ্বারাই কেবল প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন সম্ভব, অপর কোন গ্রন্থের সহায়তায় এবং উপায়ে উহা সম্ভব নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন কোন নির্জ্জন সাধনার ব্যবস্থা নাই এবং কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন যখন তাহার পাঠ্যান্তর্ভুক্ত নহে, তখন উপরে যাহা লিখিত হইল, তদনুযায়ী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত মনুষ্যত্ব-দানের উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে, ইহা কেহ বলিলে তিনি নির্ব্বুদ্ধিতা এবং প্রতারণামূলক কথা বলিতেছেন, ইহাই ধরিতে হইবে।

"মানুষ" কথার শব্দনিষ্পন্ন অর্থের কথা না হয় না-ই ধরা গেল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা যদি কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে অন্ততঃ ইহার সাহায্যে ছাত্রবৃন্দকে এমন বুদ্ধিবৃত্তির অধিকার দান করা সম্ভব হইত, যদ্দ্বারা তাহারা বেতনভোগী চাকুরী, অর্থাৎ দাসত্ব ব্যতিরেকে জীবিকার্জ্জনের যোগ্য হইত। বিষয়নিহিত সত্য বুঝিবার দৃষ্টি যাঁহার আছে, তিনি ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৯৯ জন ছাত্রই এমন বুদ্ধিবৃত্তি এবং সত্তা অর্জ্জন করিতে অসমর্থ, যদ্দ্বারা বেতনভোগী চাকুরীর সাহায্য ব্যতিরেকে জীবিকার্জ্জনের যোগ্যতা লাভ করা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈয়ারী শিক্ষাব্রতী, বৈজ্ঞানিক এবং বিভিন্ন চাকুরিয়াগণ তাঁহাদের সামর্থ্য সম্বন্ধে যিনি যাহাই ভাবুন না কেন, বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, তাঁহাদের যদি চাকুরী না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কাইভকারে, মুটেগিরি এবং চাষীরা যেরূপ করে, সেইরূপে নিজের পায়ে নিজে ভর করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হইত, তবে অধিকাংশই তাঁহাদের বর্ত্তমান বেতনের এক-চতুর্থাংশও অর্জ্জন করিতে পারিতেন না। স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এবং তৎশ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ কি চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, এরূপ সম্ভব হয় কি করিয়া? ইহার কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের শিক্ষার এই কুফলের নিমিত্ত আমাদের নিরপরাধ যুবকবৃন্দকে দায়ী করা যায় না; যাঁহারা শিক্ষার প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ না বুঝিয়া এবং যুবকবৃন্দকে কি উপায়ে শিক্ষিত করা যাইতে পারে, তাহা সম্পূর্ণ না বুঝিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর এবং তাহার বিভিন্ন কমিটির প্রেসিডেন্ট হইয়া তাহার পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

সুতরাং, কোন ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় এ পর্য্যন্ত যে-সকল ভাইসচ্যান্সেলর দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে, তাঁহাদের কাহারও সম্বন্ধে কোন উচ্চ প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিলে ঘটনা অস্বীকার করা হয় এবং ফলতঃ উহা নিরর্থক। ইহা শুনিতে কটু এবং ভব্যতালেশহীন বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহাই প্রকৃত সত্য।

তাঁহার দ্বিতীয় উক্তি,—"দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবাসীদের অধুনা এমন অবস্থা নহে, যাহাতে তাহারা নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিবার বিষয়ে কার্য্যকারী সাহায্য দান করিতে পারে,"—ইহাকে ঔদ্ধত্য এবং অজ্ঞতাপ্রসূত বলিতে হয়। ইহা অজ্ঞতাপ্রসূত, কেন না ইহা ভ্রান্ত। ঘটনা-প্রমাণ উল্লেখ করিয়া যুক্তির সহায়তায় স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন যদি দেখাইতে পারিতেন, কি জন্য ভারতবাসীর পক্ষে নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিবার বিষয়ে যথাসাধ্য কার্য্য করা অসম্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে, তবে তাঁহাকে অজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী করা আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা হইত। আমাদের মতে কোন ভারতবাসীরই এই বিষয়ে যথাসাধ্য কর্ত্তব্যসাধনের পথে বিন্দুমাত্র বাধা নাই। উপরন্তু ইহা মনে করিবার কারণ বর্ত্তমান যে, অদূরভবিষ্যতে ব্রিটিশ জাতির সহযোগিতায় ভারতবাসী পৃথিবীর শান্তি এবং সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী হইবে। স্যর সর্ব্বপল্লীর এই উক্তিকে আমরা

ঔদ্ধত্যপ্রসূত বলিয়া আখ্যাত করিয়াছি এই জন্য যে, ইহাতে ভারতবাসীর চিত্তে ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে এবং তদুপরি এই জন্য যে, ব্রিটিশ জাতির ঔদার্য্যের জন্যই স্যর সর্ব্বপল্লী অধুনা জন-সাধারণের দৃষ্টিতে এই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, যদিও তদনুরূপ বাস্তব যোগ্যতার তাঁহার অভাব। যাঁহারা উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিদ্বেষ-সৃষ্টিকে অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য এবং পাপাচারণ বলিয়া আমরা মনে করি।

স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের তৃতীয় উক্তি অমাবস্যার চাঁদের জন্য ক্রন্দন মাত্র। তাঁহার যদি বিন্দুমাত্রও রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক বুদ্ধি থাকে, তবে তিনি বুঝিবেন, ব্রিটিশ সরকার ভারতকে স্বাধীন, তথা ব্রিটিশ জাতিসঙ্ঘের অপরাপর সদস্যের সহিত সমান অধিকারভাগী বলিয়া ঘোষণা করিলেই ভারতবাসিগণ তদ্‌বাঞ্ছিতরূপে বস্তুতঃ স্বাধীন কিংবা অপর কাহারও সহিত সমান অধিকারভাগী হইতে পারে না। স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন যদি প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাব্রতী হইতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, অধিকাংশ জ্ঞাতব্য এবং অর্জ্জনযোগ্য বস্তুই স্বকীয় ব্যক্তিগত প্রয়াস দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতে, তথা অর্জ্জন করিতে হয়, কোন ব্যক্তি কিংবা জাতি কর্ত্তৃক অপর ব্যক্তি কিংবা জাতির হস্তে উহা ন্যস্ত করা যায় না। ‘স্বাধীনতা’ শব্দটি ভাববাচক, দ্রব্যবাচক নহে। যাহা কিছু ভাববাচক, তাহা অপর ব্যক্তি কিংবা জাতি কর্ত্তৃক শিক্ষা দিবার কিংবা ন্যস্ত করিবার বিষয় নহে। সুতরাং "স্বাধীনতা" কাহারও হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না। স্বকীয় যোগ্যতাদ্বারা ভারতবাসীকে উহা অর্জ্জন করিতে হয়।

ফলতঃ এই দিক্ হইতে ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের কারণ থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রনৈতিক দলের পাণ্ডাগণ নিজেদের অজ্ঞতাবশতঃ কোলাহল সৃষ্টি করিতেছেন মাত্র। তাঁহাদিগকে বরং উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন শ্রেণীর শিক্ষাব্রতীর এই ভাব উপেক্ষণীয় নহে, কেন না, আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয়-জীবনের কাঁচামাল স্বরূপ যে-যুবকবৃন্দ, তাহাদের শিক্ষার দায়িত্ব তাঁহার উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে। যুবকবৃন্দকে যদি তাহাদের শিক্ষকেরাই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেন, তবে তাহা শিক্ষকদের পক্ষে অমার্জ্জনীয় পাপাচারণ।

স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের চতুর্থ এবং শেষ উক্তি কৌতুকাবহ। এমন কোন্ প্রামাণ্যের তিনি উল্লেখ করিতে পারিবেন, যাহা হইতে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, যুদ্ধ অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর কিছু বর্ত্তমান ?

তিনি বলিয়াছেন যে, "যুদ্ধে শারীরিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু যে ভয়প্রদ শান্তিতে অগণিত নর-নারী পরাধীন অবস্থায় জীবন যাপন করে, তাহাতে আত্মার মৃত্যু সাধিত হয়।"

ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার যদি বিন্দুমাত্রও কাণ্ডজ্ঞান থাকিত, তবে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, "ভয়প্রদ শান্তি, dreadful peace"—বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না, কেন না শান্তি সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষণীয়, ইহা ভীতির কারণ হইতে পারে না। "ভয়প্রদ শান্তি" সম্বন্ধে কথা বলাও যাহা, "চতুষ্কোণ বৃত্ত" বিষয়ে কথা বলাও তাই। অকর্ম্মণ্যতা এবং প্রয়াসহীনতা ভয়প্রদ হইতে পারে এবং তাহাই যদি তাঁহার বক্তব্য হয়, তাহা হইলেও ব্রিটিশ জাতিকে কোন ক্রমেই ভারতবাসীর অকর্ম্মণ্যতার জন্য দায়ী করা যায় না, কেন না, ইহা সর্ব্বজন-গৃহীত দার্শনিক সত্য যে, কাহারও স্বকীয় অকর্ম্মণ্যতার জন্য অপর কাহাকেও দায়ী করা যায় না, তজ্জন্য দায়িত্ব তাহার নিজেরই।

তিনি জন-সাধারণের অধিকাংশের পরাধীনতার নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু এমন কোন্ সমাজের তিনি পরিকল্পনা দান করিতে পারেন, যাহাতে বুদ্ধিজীবী কর্ত্তৃক জন-সাধারণের অধিকাংশের পরাধীনতা ব্যতীত সমাজ-দেহের সুস্থতা রক্ষিত হইতে পারে ?

দর্শন এবং সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই ব্যক্তির জ্ঞান কি পরিমাণ নিম্নস্তরের, আমরা আমাদের পাঠকবৃন্দকে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলি। ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তথাপি তাঁহাকে দার্শনিক বলিয়া গণ্য করা হয়!

প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইলে দৃষ্টিশক্তি এবং বিষয়-বিচারের যে সামর্থ্য জন্মে, তাহার তিনি অধিকারী কি না, এতদ্বিষয়ক আত্ম-বিশ্লেষণার্থ আমরা স্যর সর্ব্বপল্লীকে অবহিত হইতে বলি। দেশের এই সঙ্কটকালে আমরা তাঁহাকে লোক-লোচনের অন্তরালে যাইতে অনুরোধ করিতেছি। অন্যথা তাঁহার প্রণীত গ্রন্থসমূহ কি পরিমাণ দুষ্ট-গর্ভ, তাহা অত্যন্ত কটুভাবে লোকসমক্ষে দেখাইয়া দেওয়া আমরা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিব।*

* 'দি উইক্‌লি [illegible]'র ১লা জুনের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

কোন প্রদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা কি ইহাঁদের আছে ? ইহাঁরা কি প্রকৃত হিন্দু ?

গত ৩রা জুন তারিখে মালদহে হিন্দু-সম্মেলনে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, আমরা উহা সম্মুখে রাখিয়া এই সন্দর্ভ রচনা করিতেছি।

এই বক্তৃতায় তিনি নিম্নলিখিত দুইটি মন্তব্য করিয়াছেন—

(১) সাম্প্রদায়িক অনৈক্য নিঃসন্দেহে বর্ত্তমান, কে অস্বীকার করিবে যে, এই অনৈক্য মূলতঃ সুসংবদ্ধ ভেদনীতি দ্বারা প্ররোচিত হইয়াছে ?

(২) কে অস্বীকার করিবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ কলঙ্ক ইহাই যে, ভারতবাসীদিগকে নিরস্ত্র রাখা হইয়াছে এবং তাহাদের স্বদেশ এবং স্বজাতি রক্ষার জন্য তাহাদিগকে বর্ত্তমানে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে।

এই দুইটি মন্তব্যের প্রথমটি হইতে বুঝিতে হয় যে, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতে, হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদ মূলতঃ ব্রিটিশ জাতির ভেদনীতি প্ররোচিত। এই উক্তি বিন্দুমাত্রও সত্য কি না, আমরা পাঠকবৃন্দকে তাহা দেখিতে বলি। স্কুলপাঠ্য কোন ভারতের ইতিহাস, প্রবেশিকার চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক যাহা পঠিত হয়, তাহার সহিত যাঁহার সামান্য মাত্র পরিচয়ও বর্ত্তমান, তাঁহারই বুঝিতে বেগ পাওয়া উচিত নহে যে, যে-দিন হইতে মহম্মদ মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন, সেই দিন হইতেই পৃথিবীতে হিন্দু ও মুসলমানের অনৈক্যের সূচনা। ইহা ভারত এবং ভারতবাসীর সহিত ব্রিটিশ জাতির কোন সম্পর্ক স্থাপনা হইবার বহু পূর্ব্বের ঘটনা বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ভারতে যখন মোগল এবং পাঠানগণ রাজত্ব করিতেন, তখনও—রাজায় প্রজায় স্বভাবতঃ যে অনৈক্য বিদ্যমান, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সেই অনৈক্য বিদ্যমান ছিল। ইহাও ব্রিটিশ-জাতি ভারতে "ভেদনীতি" প্রবর্ত্তন করিবার বহু পূর্ব্বের ঘটনা।

এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সত্ত্বেও যদি কেহ বলেন যে, "ভারতে হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য মূলতঃ সুসংবদ্ধ 'ভেদনীতি' দ্বারা প্ররোচিত হইয়াছে", তবে তাঁহার যে স্কুলপাঠ্য ভারতের ইতিহাসের সহিতও পরিচয় নাই, আমাদের ইহা মনে করা কি অন্যায় হইবে ?

পরিতাপের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দই ডক্টর আখ্যায় ভূষিত হইয়া থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরী এবং তাহার কমিটিসমূহের সভাপতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনা কিরূপ হওয়া সম্ভব, ইহাতে তাহাই কেবল প্রমাণিত হইতেছে। পরস্পর প্রশংসাকীর্ত্তনকারী প্রতিষ্ঠান-(Mutual Admiration Society)-এর সদস্যবৃন্দ আমাদের এই কথার তারিফ করিবেন না বলিয়া আমরা জানি, কিন্তু যত দিন আমাদিগকে আমাদের বেকার এবং অনাহারক্লিষ্ট শিক্ষিত যুবকবৃন্দের ম্লান মুখ চোখের উপর দেখিতে হইবে, তত দিন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ কথা না বলিয়া উপায় নাই—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত ইহা নিবেদন করিতেছি।

আমাদের দেশবাসিগণ বর্ত্তমানে বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, আমরা ইহা নিশ্চয়ই বলিব যে, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রেণীর অজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দের হস্তে দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়াতেই আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিক্ষা-নামের কলঙ্ক হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় ঋষির শাস্ত্রানুযায়ী ইহাঁরা হিন্দু ব্যতীত অন্য যাহা কিছু হইলেও, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মহারথিগণ যে, অকস্মাৎ হিন্দু-মহাসভার সদস্য হইয়া হিন্দু সাজিয়া বসিয়াছেন, বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, তাহার প্রধান কারণ, তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন, মুসলমান মন্ত্রীদের প্রাধান্যের ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাদের শাসনক্ষমতা অপহৃত হইবে। আমরা যদি বুঝিতাম যে, বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে তাঁহারা অপহৃত হইলে আমাদের কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা আছে, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদের সহানুভূতি লাভ করিতেন। পরন্তু, আমাদের প্রত্যাশা করিবার কারণ বর্ত্তমান যে, ভবানীপুরের এই 'সন্তান'দল

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইলে এবং তাঁহাদের স্থান অপর ব্যক্তিবৃন্দ লাভ করিলে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য তাহাতে সার্থক হইবে।

আমরা যাহা বলি, তাহার পশ্চাতে সকল সময়েই যুক্তি থাকে এবং প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যৎ কোন সংখ্যায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা উপস্থিত করিব। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার কোন সমালোচক সম্বন্ধে রুষ্ট হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে আত্ম-বিশ্লেষণপর হউন, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। তিনি যদি ইহা করেন, তবে আমরা নিশ্চিত জানি, তিনি সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরই দায়িত্ব-সূচক পদ-সংশ্লিষ্ট পরিহার করিবেন, কেন না তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার যোগ্যতা তাঁহারই নাই। অন্য দিকে, বর্ত্তমান দায়িত্বসমূহ পরিহার করিয়া তিনি নিজেকে প্রকৃতভাবে যোগ্য করিবার লক্ষ্য লইয়া যদি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন, তবে আমরা জোরের সহিত বলিতে পারি যে, অদূর-ভবিষ্যতে তিনি এই প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতী হইতে পারিবেন। কার্য্যতঃ ইহা করিবার স্থায় সৎসাহস কি তাঁহার আছে?

তাঁহার দ্বিতীয় উক্তি অপর এক প্রকার অজ্ঞতার অন্যতম নিদর্শন। ভারতকে নিরস্ত্র করিবার দায়ে তিনি ব্রিটিশ শাসনকে দায়ী করিয়াছেন। ভারতীয় ঋষিগণের প্রাধান্যকালে প্রাচীন ভারতে যে-সংগঠন ছিল, তৎসম্বন্ধে তাঁহার যদি বিন্দু-মাত্র জ্ঞান থাকিত, তবে তাঁহার বুঝিতে বেগ পাইতে হইত না যে, ব্রিটিশ জাতি কর্ত্তৃক মূলতঃ ভারতবাসীর নিরস্ত্রীকরণ সাধিত হয় নাই, পরন্তু ভারতীয় ঋষিগণই ইহা সাধিত করেন। ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ জন লইয়া যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র—ভারতীয় ঋষিগণের শাস্ত্রানুযায়ী তাঁহাদের অস্ত্র-ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়। কেবল ক্ষত্রিয়-গণই অস্ত্রসজ্জার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও ঋষিগণ ক্ষত্রিয়গণকর্ত্তৃকও মনুষ্যপ্রাণ-সংহারার্থ অস্ত্রশস্ত্র এবং রণসম্ভারের যথেচ্ছ ব্যবহার অনুমোদন করেন নাই। অপরাধীদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই কেবল তাঁহারা অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিতেন। প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী স্বভাবতঃ যে-সকল আত্মরক্ষার অস্ত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাহার ব্যবহার-বিধি বিষয়ে অথর্ব্ববেদের কয়েকটী অধ্যায়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ভারতীয় ঋষিগণের মতে, কোন জীবন্ত প্রাণী স্বভাবতঃ যাহার অধিকারী, তদ্ব্যতীত অপর কোন অস্ত্রসজ্জা এবং সম্ভারের আশ্রয়গ্রহণ অনাবশ্যক এবং ইহাতে কোন দিন কোন সমাজের হিত সাধিত হইতে পারে না। এই সত্যের যাথার্থ্যই রামায়ণ এবং মহাভারত রচিত হয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্ব-বিদ্যালয়-প্রসূত পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত না হইতে পারেন, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে প্রকাশ পাইবে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা বর্ত্তমানে প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে পণ্ডিত সাজিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পাণ্ডিত্য বিবর্জ্জিত। আমরা মূর্খের সমাজে বিচরণ করি, তাই সমাজ ইহাঁদিগকে পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক আখ্যাত করিতেছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে প্রমাণিত হইবে যে, অস্ত্রসজ্জায় আস্থাবান্ হওয়া এবং তাহাদের বৃদ্ধিসাধনে সহায় এবং উৎসাহের অপব্যয় বিরূপ নির্ব্বোধোচিত। সূচনায় ইহা মনে হইতে পারে যে, অস্ত্রসজ্জার দ্বারা জয়-লাভের সুযোগ ঘটে, কিন্তু পরিণামের তথ্য সংগ্রহ করিয়া, তৎসমূহ যদি একত্র করা যায়, তবে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, অস্ত্রসজ্জা এবং অস্ত্রসজ্জার সাহায্যে যুদ্ধ-জয় কেবল মনুষ্য-জাতির দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে। এমন কি জার্ম্মান জাতিকেও অদূরভবিষ্যতে এই সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আমরা ভবিষ্যতে সতর্ক হইতে বলিতেছি। সাধারণতঃ সমাজ অসার চিন্তা সহ্য করিয়া চলে, কিন্তু বর্ত্তমানে আর অসার চিন্তার সময় নাই, কেন না মনুষ্যসমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আজ টলটলায়মান। অপরকে উপদেশ-দানের যোগ্যতায় অধিকারী হইতে হইলে তাঁহার নিজেরই এখনও অনেক শিক্ষণীয় আছে। তিনি কি সেই শিক্ষায় অগ্রসর হইবেন? যত দিন তিনি অস্ত্রসজ্জার স্বপক্ষে ওকালতী করিবেন, তত দিন তিনি নিজেকে হিন্দু বলিয়াই বা দাবী করেন কিরূপে?*

* 'দি ষ্টেটস্‌ম্যান'-এর ৮ই জুন সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

—শ্রীমতিলাল দাশ

(২)*

বঙ্কিমের প্রথম লেখা উপন্যাস রাজমোহনের স্ত্রী—বইটি ইংরাজীতে লেখা। এটি কিশোরীমোহন মিত্রের সম্পাদকতায় পরিচালিত *Indian Field* নামক কাগজে প্রকাশিত হয়। বইটিতে তরুণ লেখকের প্রতিভার অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি, কিন্তু সেই প্রতিভার উপর বিলাতি নভেলের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং ব্যাপক।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় আমরা এই বইটি পেয়েছি। যাহারা লেখক তাহাদের সময় অল্প, লেখার জন্য বাঙ্গালী লেখক কোথাও উৎসাহ পান না। ঘরে পারিবারিক গঞ্জনা, বাহিরে প্রকাশে বিড়ম্বনা আর নিন্দকের হাতে লাঞ্ছনা, কাজেই মারাত্মক ভুল প্রামাণ্য গ্রন্থে থেকে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি কন্যা—'বিশ্বকোষে' দেখেছি—দুইটি কন্যা দেওয়া আছে।

'বঙ্গবাণী' নামক পুস্তকে শশাঙ্কমোহন সেন লিখেছেন—"১৮৪৩ মেদিনীপুর স্কুলে প্রবেশ; (কাঁথির নদীতট দৃশ্যাবলীর মধ্যে কপালকুণ্ডলার অঙ্কুর), লেখকের হয়ত কাঁথি এবং মেদিনীপুরের ভৌগোলিক অবস্থানের বিষয়ে সম্যক্ ধারণা ছিল না—লেখা থেকে মনে হয়, তিনি ভেবেছেন মেদিনীপুর কাঁথির নদীতটে অবস্থিত। কপালকুণ্ডলার অঙ্কুর ১৮৪৩ সালে হয়নি।" কিন্তু ইহাতে আমাদের নির্ব্বিকার পাঠকমণ্ডলীর কিছুই আসে যায় না, অথচ যতদূর জানি 'বঙ্গবাণী' বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য।

কার্য্য ও কারণের তত্ত্ব বিশ্লেষণের দুরূহ কষ্ট আমাদের হাতে সয় না। আনন্দের রস অনুভব করাই আমাদের মতে শ্রেয়স্কর—অঙ্ক ও তথ্যের কোলাহলে আমাদের রসিক আত্মা পীড়িত হয়—কাজেই শচীশ বাবু সম্যক্ অনুসন্ধান না করিয়াই তাঁহার জীবনীতে লিখেছেন (২০১ পৃঃ—৩য় সংস্করণে) "গল্প শেষ হইবার পূর্ব্বেই সহসা তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল" এই ধারণার বশেই তিনি Rajmohan's Wife সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া অমৃতবাজারে পত্রাঘাত করেন।

রাজমোহনের স্ত্রী 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' কাগজে ধারাবাহিক ভাবে শেষ হয়েছিল, ব্রজেন্দ্রবাবুর কল্যাণে আমরা তাঁর এই প্রথম রচনা পেয়েছি, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদভাজন।

তবে শচীশবাবুর এই বিষয়ের স্মৃতি ঠিক নয় বলে মনে হয়, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র যে কয় পরিচ্ছেদ লেখেন, সেগুলি স্মৃতিতে রচিত নয়, সেগুলি তাঁর ইংরেজীর ভাবানুবাদ এবং মনে হয় সেগুলি তিনি ইংরেজী লেখা সম্মুখে রেখে লিখেছিলেন। প্রথম বয়সের বই, হুবহু স্মৃতি থেকে বাংলা অনুবাদ সম্ভবপর বলে মনে হয় না।

'রাজমোহনের স্ত্রী' পড়লে আমরা বুঝি যে, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী নভেল বেশ ভাল করেই পড়েছিলেন—এই বইটিতে প্রথম যুগের ইংরেজী ঔপন্যাসিকদের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বইটি স্মলেট, ষ্টার্ণ প্রভৃতি লেখকদের অনুকরণে রচিত একটি thriller—রোমাঞ্চকর গল্প।

বাল্যবয়সে নিজের বাড়ীতে ডাকাতি হওয়ার গুজবে তিনি যে রক্ষার আয়োজন করেছিলেন, এই গল্পের নায়কও তেমনই ভাবে আত্মরক্ষা করেন। গল্পটিতে বিস্ময়, কৌতুক ও ভয় প্রভৃতি রস প্রকাশের জন্য লেখক অনেক কৌশল অবলম্বন করেছেন।

রাজমোহনের স্ত্রীর আলোচনা করছি না। শচীশ বাবুর সঙ্গে কথোপকথনের গল্প বলি। শচীশবাবু বললেন—"বাঙ্গিবাহিনী থেকে ওঁরা অনুবাদ করলেন, কিন্তু আমার অনুমতি নেওয়ার ভদ্রতাটুকু হয় নি—আমায় একখণ্ড বইও দেন নি—"

সাহিত্যিক সাধুতা বা ভদ্রতা আমাদের দেশে দুর্লভ। আমরা যে ব্যবসায়ে ঠকি সে ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাবে। এ তর্কে লাভ নেই, তা ছাড়া অপ্রিয়-প্রসঙ্গ, আমি চুপ করে গেলাম। আমার মনে হয়, প্রকাশকেরা হয়ত অনিচ্ছাকৃত ভুলই করেছেন।

---

* এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ গত চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়।

শচীশ বাবুর মতে, বঙ্কিমের প্রথমা সহধর্ম্মিণী ছিলেন সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা এবং অপূর্ব্বা রূপসী। কন্যাদের কথায় বললেন, "আমার বিবেচনায় নীলাব্জকুমারী ও উৎপলকুমারী বঙ্কিমের গুণাবলীর অধিকারী হয়েছিলেন—উৎপলকুমারীর কি সুন্দর চেহারা ছিল—কি বড় বড় চোখ—

"প্রথমে ভালবাসা না হলেও শেষকালে বঙ্কিমবাবু অতিশয় স্ত্রী-অনুরক্ত হয়েছিলেন। শচীশবাবু বলেন, "শেষকালে অত্যন্ত স্ত্রৈণ হয়ে পড়েছিলেন—খুড়ীমা খুব গম্ভীর ছিলেন, মুখ যদি ভার করলেন তবে কিছুতেই তা ফেরানো যেত না—

"শরৎ দিদি খুব হিংসুকে ছিলেন। আমার কি একটা অসুখ হয়েছিল হোমিওপ্যাথি করে সারল, কিন্তু ওঁর ছেলে খুটুর বেলায় লাগল হাজার দু'য়েক টাকা। এই নিয়ে হিংসের জ্বলে পুড়ে মরেন—"

শচীশবাবু এখনও হোমিওপ্যাথি নিয়ে থাকেন, আমার বাসায় অসুখের জন্য যত্ন করে দু'ডোজ ঔষধ দিলেন। ক্ষুদ্র আন্তরিকতা—তবু সেটা মনে লেগে থাকে, বড় জিনিষের চেয়ে ছোট জিনিষই জীবনে দাগ রেখে যায়।

সামান্য হোক তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠায় অনেক লাভ আছে তাই এই সব পুরাতন কথা লিখছি।

"চাকুরীর জীবনে বঙ্কিম বেলা সাতটায় উঠতেন প্রাতঃকৃত্য শেষ করে খুব hot tea খেতেন, সে গরম চা আমরা কখনও মুখে দিতে পারতুম না, আর তার সঙ্গে খেতেন আধসিদ্ধ দুটি ডিম।

"বঙ্কিম বাড়ীতে রায় লিখতেন না। প্রাতরাশ করে লোকজনের সঙ্গে দেখা করতেন, কিংবা পূর্ব্বদিন রাত্রের লেখা সংশোধন করতেন, তারপর স্নান করতেন।"

বঙ্কিমবাবুর বই সংশোধনের কথায় বললাম যে, লেখকেরা দুই শ্রেণীর—কেউ মোটেই সংশোধন করেন না, আবার কেউ বারংবার সংশোধন করেন। লর্ড টেনিসন্ খুব সংশোধন করতেন। আমি এই দুই ভাবের ভাল-মন্দ কোনটার সম্বন্ধে কিছুই বলিনি, তবু এটা তাঁর মহত্ত্বের প্রতি দোষারোপ ভেবে তিনি চটে উঠলেন, বললেন—"বঙ্কিমবাবুর তখন মস্ত নাম, তাঁর লেখা বহু লোকে আগ্রহে পড়বে, কাজেই তাঁর লেখা যাতে নিখুঁত হয়, সেই দিকে প্রখর দৃষ্টি ছিল।"

পুনরায় প্রাত্যহিক জীবনের কথায় আসা গেল।—

কাকা আঁচা-পাকা ক'রে স্নান করতেন। তার পর খেতেন। ভাত অল্পই খেতেন, মিহিদানা, রাবড়ী ও পাঁঠার মুড়োর খুব ভক্ত ছিলেন। খেয়ে দেয়ে আফিসে যেতেন, পাঁচটায় বাড়ী ফিরতেন, বাড়ী ফিরে বেড়াতেন না, টিফিন কাছারীতেই করতেন।

"সন্ধ্যাবেলায় চা খেতেন, রাত্রে দুটি মুড়কী, চপ কাটলেট খেতেন, মুরগী খেতেন।"

বললেন—"আমি ভাবছিলুম আপনাকে এখানে খেতে চিঠি লিখে দেব।" বৈকাল বেলা জলযোগের জন্য অনুরোধ করলেন, বাজারের খাবার খাই নে তাই ঘরের তৈরি সন্দেশ দিলেন।

শরৎকুমারীর কথায় বললেন, "শরৎকুমারীর প্রতি বঙ্কিমের অত্যন্ত স্নেহ ছিল, রাখালবাবু ঘর-জামাই ছিলেন, বঙ্কিমই তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করে দেন এবং রাখালকে ছোট বয়স থেকেই মানুষ করে তোলেন, রাখালবাবু অতুলকৃষ্ণ রায় ডেপুটির ভাগিনেয়।

"কাকা অত্যন্ত রাগী ছিলেন, মাঝে মাঝে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন, খুড়ীমা তাঁকে শান্ত করতেন।

"খুব তামাক খেতে ভালবাসতেন, কাঁচের ফরসী ছিল তাতে খুব বড় এক ছিলম তামাক সাজা হত, তার পর দু'ঘণ্টা ধরে তামাক টেনেই চলতেন।"

বঙ্কিমবাবুর প্রাত্যহিক জীবনের গল্প জিজ্ঞাসা করলাম। ভক্তেরা হয়ত চটবেন বলবেন, এই খুঁটিনাটি জানলে তাঁদের মনের বঙ্কিমের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবে।

"রাত্রে ৯॥০ টায় খেতেন—তিনখানি লুচি ও মাংস। মিহিদানা ও রাবড়ী খুব খেতেন।" মেজকাকা এক দিন বলেছিলেন যে, মাংসের যে অংশটা খায় সেই অংশটার পুষ্টি হবে—"

বেলা হয়ে এল, শচীশবাবু সান্ধ্যকৃত্যের জন্য উঠতে চান—কাজেই মধ্য পথে কথা অসমাপ্ত রেখেই ফিরতে হল।



পৃথিবীর কথা

—শ্রীসুশীল রায়

অভিযানকারী ও ভ্রমণপ্রিয় মানুষ আদিম কাল থেকে ঘরের বার হ'তে শুরু করেছে নতুন পৃথিবীর খোঁজে। যে মহাসমুদ্রে কোন কালে কেউ চলাফেরা করেনি, এমন বিপুল জলরাশির উপর পথ খুঁজে কলম্বাস অজানা জমির সন্ধানে দেশ ছেড়ে রওনা হয়েছিলেন কোন্ সাহসে, তা ভাবলে আমরা আশ্চর্য্য হই। হাজার হাজার বীর হৃদয়, হাজার হাজার চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ব্যক্তি আরও জ্ঞান লাভের জন্য এই রকমই দিগ্বিদিকে রওনা হয়েছিলেন,—যাঁদের বীরত্বকাহিনী মানচিত্রের ওপর স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। এঁদের অভিযানের ফলেই দেশ ও মহাদেশ, সমুদ্র ও মহাসমুদ্র আমাদের চোখের সামনে এগিয়ে আস্‌তে পেরেছে। এঁদের পরিশ্রমের ফলস্বরূপই আমরা এখন বৃহৎ পৃথিবীর পরিচয় জান্‌তে পেরেছি ও পরিপূর্ণ ম্যাপ এঁকে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ ধারণার মধ্যে ধরতে পেরেছি। আমরা যারা ঘরের কোণ পছন্দ করি বেশী ও নিজেদের দিকে সজাগ দৃষ্টি দিই, সর্ব্বদা সেই আমরা মানচিত্র খোলার সময় উক্ত মহাপুরুষদের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে করে তাঁদের শ্রদ্ধা করি।

এবার এসো আমরা একে একে পৃথিবীর মানচিত্রের বিভিন্ন রঙের সার্থকতা বিচার করি। উদাহরণস্বরূপ ধরা গেল,—ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত অ্যাটলাসে লালরঙের খুব ছড়াছড়ি। লালরঙা দেশের অর্থ এই যে, ঐ জায়গাগুলির শাসন ও শৃঙ্খলা ইত্যাদির জন্য দায়ী ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জবাসী বৃটিশ; অর্থাৎ ঐ দেশগুলি বৃটিশের অধীনে। যখন আমরা দেখি, পৃথিবীর অনেক অংশই লাল, তখন আমাদের মনে এই চিন্তাই আসে যে দায়িত্বের ভার বড় বেশী হ'য়ে গেছে। ক্ষুদ্র দ্বীপ-বাসীর কাঁধে এতখানি ভূভাগের ভার অত্যন্ত বেশী।

লাল ছাড়াও আরো নানা রকমের রঙ্ আছে, এই সব এক-এক রঙে এক-এক দেশ বোঝায়। আর, দুই রঙ বা দুই দেশ যে-রেখার উপর মিলেছে, তাকে বলে সীমান্ত, ইংরাজীতে বলে ফ্রন্টিয়ার। এখন, প্রকৃতজ্ঞান অর্জ্জনের পথে অগ্রসর হ'তে গিয়ে প্রথমেই আমরা শিখবো যে, উচ্চ-স্তরের বিজ্ঞানবিদের কাছে কোন সীমান্ত-রেখা নাই; আর প্রকৃতই যাঁরা মহান্ আদর্শের চিন্তা করেন, তাঁদের কাছে ম্যাপের উপরকার নানারকম রঙের কোনই মানে নাই। তাঁদের কাছে পুরো পৃথিবীটাই একটি মাত্র দেশ, এর মধ্যে আর ভাগী নাই। একজন মহাপুরুষের একটি কথা এখানে তুলে দেব, ইনি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ শেষ ক'রে যখন দেশে ফিরলেন তখন বললেন, "সারা পৃথিবী ঘুরে কেবল মাত্র দুই প্রকারের মানুষ পেয়েছি, তাহা হচ্ছে, স্ত্রী আর পুরুষ।" ঠিক এই ধরণের কথা আমাদের দেশীয় কবি সত্যেন দত্তের কবিতায় আমরা পেয়েছি, তিনি বলিয়াছেন, "জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।" বিদেশী মহাপুরুষ সারা পৃথিবী ঘুরে দুই প্রকারের মানুষ পেয়েছেন,—এখানে এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বলে রাখি যে, আমরা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ ক'রে বেড়ালে সর্ব্বত্র একটা জিনিষ একই রকমের পাবো, সে প্রকৃতি, যার ইংরাজী নাম 'নেচার'। এই প্রকৃতি বা নেচার যদি একই না হতো তাহলে সব দেশেই বিজ্ঞানের নিয়মগুলো একই ভাবে খাপ খেতো না, বা একই নিয়মে চল্‌তো না। আলো, গতি, জল, বাতাস সর্ব্বত্র একই জিনিষ, আর পৃথিবী হ'লো সব মিলিয়ে একটি প্রকাণ্ড পিণ্ড। তেমনি মানুষ জাতি একটি মাত্রই জাতি, সে জাতি পৃথিবীর সন্তান; যদিও আমরা আমাদের মধ্যে ভাগাভাগি ক'রে এ ওর সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করছি।

পৃথিবীর উপরে তাকালে সর্ব্ব প্রথম আমরা দেখতে

পাই যে, পৃথিবীর খানিকটা জলে ও খানিকটা স্থলে ঢাকা। আমরা জানি পৃথিবীর সাত ভাগের দু'ভাগ শুক্‌নো মাটি ও পাঁচ ভাগ জল। এই শুক্‌নো মাটির বিশাল ভূমিকে আমরা মহাদেশ বলি ও জলের বিশাল অংশকে বলি মহাসমুদ্র।

সমুদ্রের জল থেকে পর্ব্বতচূড়ার আবির্ভাব

সমুদ্র বা মহাসমুদ্রের তলদেশে ভূমি বর্ত্তমান। এই ভূমি যখন খুব উঁচু হ'য়ে মাথা জাগিয়ে তোলে, ধরো এক পর্ব্বত-মালার মত—তখন সমুদ্রের জলের উপর তার ডগাগুলি দেখা যায়, এইগুলিই দ্বীপমালার রূপ গ্রহণ করে। আবার, এর ঠিক উল্‌টো ব্যবস্থাও পৃথিবীর গায়ে দেখা যায়, সে মহা-দেশ—শুক্‌নো জমির মাঝে জায়গায় জায়গায় সুগভীর টোল খেয়ে সাগরের রূপ নেয়—যেমন, উত্তরে বিশাল হ্রদাবলী ও এশিয়ার কাস্‌পিয়ান সাগর। খুব বেশী দিনের কথা নয়, আমরা জানতে পেরেছি, ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থলের এই বণ্টন-ব্যবস্থা অনবরত বদলাচ্ছে।

যখন আমরা পৃথিবীর ম্যাপের দিকে তাকিয়ে মহাদেশ অথবা মহাসাগরের ছবি দেখি, তখন আমাদের এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, যে-চিত্রটি আমরা দেখছি তা বর্ত্তমান সময়ের পৃথিবীর প্রতিকৃতি মাত্র, পৃথিবীর ইতিহাসের একটি মাত্র মুহূর্ত্তের ঘটনা ছাড়া সেটা আর কিছু নয়। আমাদের জীবন বা আমাদের জীবনের পুরো বৃত্তান্ত যেমন পুরো পৃথিবীর ইতিহাসের একটি অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ, তেমনি বিরাট সৌর-জগতের ইতিহাসের সামান্য ভগ্নাংশ পৃথিবীর ইতিবৃত্তান্ত। ক্রম-পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর প্রতি মুহূর্ত্তের ছবি তৈরী করতে গেলে চলমান ছবি তোলা দরকার, বায়োস্কোপের ছবির মত। তা না হলে পৃথিবী অনবরত যেমন বদলে যাচ্ছে অনবরত তেমনি ছবি তুলে অ্যাটলাস তৈরী করতে হয়। এই সব সমস্যা দেখে আমরাও কম সমস্যায় পড়িনি। ক্রমেই আমরা ভাবতে ও ভেবেচিন্তে নতুন ধরণের ম্যাপ তৈরী করার চেষ্টা করতে আরম্ভ ক'রেছি। কি করে একেবারে আলাদা ধরণের ম্যাপ তৈরী সম্ভব, যে-ম্যাপ আমাদের চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে মেলে ধরবে, ধরো, হাজার কি দশহাজার বছর আগের পৃথিবীর আকৃতি ও রূপ কি রকম ছিল। আবার হাজার কি দশহাজার বছর বাদে পৃথিবীর কতটা পরিবর্ত্তন আসবে তাও আমরা জানবো বা খুঁজে বের করার জন্য সচেষ্ট হব। এ-কথা খুবই সঙ্গত ও সম্ভবপর যে, স্থূলভাবে দেখতে গেলে কালের পর কাল পৃথিবীর উপরের আবরণ—অর্থাৎ গায়ের চামড়া—ক্রমেই শুকিয়ে উঠ্‌ছে।

কি ভাবে পৃথিবী শুকিয়ে উঠ্‌ছে ও মঙ্গল গ্রহের মতো হচ্ছে

পৃথিবীর উপর নতুন জল তৈরী হ'চ্ছে, কিন্তু যে দ্রুততায় জল তৈরি হ'চ্ছে তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি জল যাচ্ছে শুকিয়ে। শুকিয়ে যাবার কারণ এই যে, পৃথিবী দিনের পর দিন যতই পুরোনো হ'চ্ছে, পৃথিবীর শরীরের ভেতর দিয়ে ততই জল চুয়ে চুয়ে যাচ্ছে তলিয়ে, উপরটা ততই জলহীন হ'য়ে পড়ছে। আমাদের নিজের বাসস্থান এই পৃথিবী সম্বন্ধে আমরা যতটা আজ পর্য্যন্ত জানতে পেরেছি—মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে আরো খুঁটিনাটি আলোচনা করলে আমরা হয়তো এই পৃথিবী সম্বন্ধে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি জান্‌তে পারব। এবং চন্দ্রগ্রহও হয়তো পৃথিবী সম্বন্ধে জানবার পথে অনেক সাহায্য করবে। কারণ এই দুইটি পৃথিবীর মতই, তবে এদের মধ্যের ক্রিয়া পৃথিবীর ক্রিয়ার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। সেই জন্যেই অগ্রগামী এই দুইটি পিণ্ড কোন্ পথে কি ভাবে এগিয়েছে ও কোন্ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তা যদি আমরা সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখি, তা হ'লে পৃথিবীর পরিণাম কি হবে, তাও আন্দাজ করা সহজ হবে। মঙ্গলগ্রহ বর্ত্তমান সময়ে, সম্পূর্ণরূপে না হ'লেও, প্রায় শুক্‌নো; সেখানে তার দুটি মেরুদেশ ছাড়া অন্য অঙ্গে জল প্রায় নেই, বলতে গেলে।

মঙ্গলগ্রহের যা অবস্থা পৃথিবীকে সমগ্রভাবে ধ'রে বিচার করতে গেলে আমরা সেই অবস্থাই লক্ষ্য করব। এখন পৃথিবীর বহিরাবরণ আমরা যতটা শুক্‌নো দেখি, এর আগে তা অতটা শুক্‌নো ছিলো না; এতে প্রমাণ হয় এই যে পৃথিবী অবশ্যই ধীরে ধীরে শুকিয়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু আমরা এও লক্ষ্য করি যে, এক কালে পৃথিবীর যে-জায়গা শুক্‌নো খটখটে ছিলো, এখন সেখানে মহাসমুদ্র বড় বড় ঢেউ তুলে গর্জ্জন করছে। আবার, এও নিশ্চিত কথা যে, এখন মহাদেশ নাম ধারণ ক'রে যে-সব ভূমি বিস্তৃত জায়গা অধিকার ক'রে চোখের সামনে বিরাজ করছে, তার সবই এক সময় জলের তলেই ডুবে ছিল। আমরা একটা

হারানো মহাদেশের গল্প, না ঠিক গল্প নয় সত্য ঘটনা, জানি ; এই ঘটনার উল্লেখ করলে আমরা আমাদের সুদূর অতীত কালের পূর্ব্বপুরুষদের ইতিহাস জানতে পারব।

পৃথিবীর ম্যাপ খুলে তার দিকে তাকাও। ভারতবর্ষের গা ঘেঁষে শ্যামদেশের কিনার দিয়ে মালয় উপদ্বীপ অতিক্রম ক'রে চোখ চালনা করলে কতকগুলো দ্বীপের মালা দেখ্‌তে পাবে। এই দ্বীপমালার শেষে আবার একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ ; এর নাম অস্ট্রেলিয়া। এই প্রকাণ্ড দ্বীপটি এতই বৃহৎ যে, একে আমরা মহাদেশ নাম দিয়েছি। সত্যিই এই দ্বীপ একটি মহাদেশেরই মত বড়, যদিও আফ্রিকা মহাদেশের মতন অত বড় নয়। আফ্রিকা মহাদেশ আগে দ্বীপ ছিল না, মানুষের হাতে প'ড়ে তাকেও দ্বীপ অপবাদ পেতে হ'চ্ছে। কারণ সুয়েজ যোজক এশিয়ার সঙ্গে আফ্রিকাকে যোগ করে রেখেছিল, সুয়েজ খাল কেটে এশিয়া থেকে আমরা আফ্রিকাকে বিয়োগ ক'রে দিয়েছি এবং মস্ত একটা দ্বীপে দাঁড় করিয়েছি। বিশাল শরীর নিয়েও আফ্রিকা আজ অস্ট্রেলিয়ার মতই দ্বীপ। আবার অস্ট্রেলিয়া দ্বীপ হ'লেও মহাদেশ, কারণ তার শরীর খুব বড়।

সমুদ্রের গর্ভে লুকান মহাদেশ

যখন আমরা অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে এবং অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যের দ্বীপমালার কথা ভাবি, তখন আমরা এ-কথা নিশ্চয় মনে করি যে, সম্ভবতঃ এই জায়গাটা জুড়ে এককালে সুবিশাল এক মহাদেশ ছিল, আর বর্ত্তমান কালের এই সব ছড়ান ছিটান দ্বীপপুঞ্জ সেই তলিয়ে যাওয়া মহাদেশের অংশ মাত্র। আমাদের এই ধারণার যুক্তি নিশ্চয় আছে। আমরা অস্ট্রেলিয়াবাসীর জীবন-ধারণ-প্রণালীর সঙ্গে তার কাছের অন্যান্য দ্বীপবাসীদের জীবন-ধারণ-প্রণালী তুলনা করলে বেশ মিল দেখতে পাই। এতে আমাদের মনে নিশ্চিত এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, একদা এই সমস্ত দ্বীপ এক সঙ্গে মিলে একই ভাবে জীবন যাপন আরম্ভ করে, একই বেশাচার এদের মধ্যে প্রচলিত হয়। এ তো গেলো মানুষের কথা। অন্যান্য জীবন্ত প্রাণী নিয়ে বিচার করলে আমরা তাদের অদ্ভুত অভ্যাসগুলিতে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ একতা দেখতে পাই, যা থেকে আমাদের এই কথা বলা ছাড়া উপায় থাকে না যে, এক সময় অস্ট্রেলিয়া এই পৃথিবীর সঙ্গে একই সূতোয় বাঁধা ছিল, বহু বর্ষ পূর্ব্বে সময়ের চক্র এই পৃথিবীর থেকে তাকে কেটে আলাদা করেছে। এই প্রবন্ধ পড়ার সময় পৃথিবীর ম্যাপ খুলে নেবে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর দিকের দ্বীপে—যব, সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপে আমরা অদ্ভুত জাতির বানর দেখতে পাই। এই রকম বানর দু' একটা চিড়িয়াখানায়ও দেখতে পাবে। এই বানর অবিকল মানুষের আদিমকালের আকৃতি আমাদের মনে করিয়ে দেয়। মানুষের সঙ্গে এদের মত এতটা মিল আর কোনো প্রাণী ধারণ করে না। সেই জন্যেই আমাদের মনে হয় যে, হাজার হাজার বছর আগে মানুষের প্রথম জাতি এই নিরুদ্দিষ্ট মহাদেশে বাস করত, এবং মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর ও সূর্য্যালোকের প্রথম পরিচয় হয় এইখানেই।

যে-প্রশ্ন এবার আমাদের সামনে এসে গেছে তা হ'চ্ছে এই যে, পৃথিবীর জল ও স্থল বিভিন্ন সময় জায়গা বদল করছে। আজ যেখানে জল আছে, একদা সেখানে স্থল ছিল ; আজ যেখানে স্থল দেখতে পাচ্ছি, একদা সেখানে স্থল ছিল না। কিন্তু কেন এমন পরিবর্ত্তন আসে ? নিশ্চয় এমন একটি শক্তি আছে যা অনবরত জল ও স্থলকে জায়গা বদল করাচ্ছে। সে শক্তি কি, যা মহাদেশকে সমুদ্রতলে তলিয়ে দিচ্ছে, আর সে-শক্তিই বা কি, যা সমুদ্রের অগভীর অংশকে ঠেলে তুলে মহাদেশ বানিয়ে দিচ্ছে ? এই প্রশ্নের উত্তরের চেয়ে দরকারী কথা আপাততঃ আমাদের কাছে আর কিছু নেই। আর, এর উত্তর দেওয়াও খুব সহজ কাজ নয়।

সমুদ্রতল ওঠা-নামার রহস্য

আমেরিকার পূর্ব্ব তটরেখা দিন দিন কি করে ক্ষয়ে যাচ্ছে—যদি এই প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহ'লে তার উত্তর দিতে আমাদের মোটেই বেগ পেতে হবে না। কারণ আমরা চোখের সামনে এই ক্ষয় দেখতে পাচ্ছি, রোজই বুঝতে পারছি সমুদ্র-উপকূল ক্ষয় হচ্ছে। এবং তার সঙ্গে এই ক্ষয়ের কারণও আমাদের অজানা থাকছে না। জল আর হাওয়া এই দু'টো জিনিষ ক্ষয় করছে এই তটরেখাকে। এ গেল সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর। কিন্তু একটা সমগ্র মহাদেশ কি করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—তার কারণ যদি আমাদের আবিষ্কার করতে হয়, তাহ'লে আমাদের আরও

অনেক গভীরভাবে বিচার করে দেখতে হবে। গভীরভাবে বিচার করাটাই এ-ক্ষেত্রের উপযুক্ত কথা: কারণ এই প্রক্রিয়াটাও খুবই গভীর। ভূমির বাইরের ভাগের কোনো সাধারণ প্রক্রিয়া এমন ভীষণ এক পরিবর্তন আনতে পারে না। ভূমির আচরণ বদলাতে বাতাসের বেগ, বৃষ্টিপাত ও জল-হাওয়া কার্যকর। কিন্তু এ-কথা সহজেই বোঝা যায় যে, এই বৃষ্টি-বাতাস-জল ইত্যাদি বিষয়গুলি সমুদ্রের তল থেকে ঠেলে কোনো মহাদেশকে ডাঙায় তুলতে পারে না, কিংবা কোনো মহাদেশকে চেপে অগাধ সমুদ্রের ভেতর চেপে বসিয়ে দিতে পারে না—যাতে সেই মহাদেশের বুকের ওপর সমুদ্র নৃত্য করে আনন্দ করতে পারে। আমরা নিশ্চয় খুঁজে বার করতে চাই সেই শক্তি—যা গভীর তলায় গিয়ে ধাক্কা-ধাক্কী করে জোর খাটায়। আমরা এটা নিশ্চয় জানি যে, যদি আমরা একটা ডোবায় অনবরত রাবিশ এনে ঢালি, তাহলে ডোবাটা এক সময় নিশ্চয় ভরাট হয়ে যায়। এমনও হতে পারে যে, ঠিক এই ভাবেই একটি সমুদ্রের মধ্যে যুগের পর যুগ রাবিশ ঢেলে সমুদ্রকে ভরাট করে তোলা হয়েছে। ইংলিশ চ্যানেলের বা চা-খড়ির চক্ পাহাড় যে-জিনিষে তৈরী, অ্যাটলান্টিকের গভীর তলদেশে ঠিক সেই জিনিষই ধীরে ধীরে জমে উঠছে। কালে এই মহাসাগর মহাদেশ হয়ে যাবে হয়ত!

কিন্তু, যেহেতু সমুদ্র গড়ে আড়াই মাইল গভীর—ঠিক এই রাবিশ ঢালার অনুরূপ প্রক্রিয়াতেই যে মহাদেশের দর্শন লাভ হয়, এমন কথা বলা যায় না। সমুদ্র-তলে কোনো জিনিষ জমে জমে মহাদেশ হয় না, সমুদ্র-তলই ধীরে ধীরে জেগে উঠে ধরাতল হয়। তা যদি হয়, তবে আর একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হয় যে, ধরাতল কি করে সমুদ্রতলে ডুবে গেল। সে যাই হোক, এটুকু আমরা বুঝতে পারছি যে, উক্ত দুইটি প্রক্রিয়ার কারণ কি, বলতে গেলে জবাব হবে একটাই। একই কারণে ওই দুটি কাজ হচ্ছে। কিন্তু একটা কাজ যুগ যুগ চলে আসছে, যার দরুণ পৃথিবীর কোথাও টোল পড়ছে আবার অন্য জায়গায় টোল ভরাট হচ্ছে।

জল তরল পদার্থ ও গতি সর্বদা নীচের দিকে, কারণ পৃথিবী সব জিনিষের মত জলকেও নিজের কেন্দ্রের দিকে টানে। পৃথিবীর এই মাধ্যাকর্ষণের জন্য জল সব সময় যতটা সম্ভব পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছে থেকে যায়। এই জন্য পৃথিবীর কোথাও একটা গর্ত হ'লে জল সেইখানে গিয়েই জমে। তেমনি কোনো খানে ভয়ানক একটা টোল পেলে জলের গতি হবে সেই দিকে। আবার জলপূর্ণ কোনো জায়গা উঁচু হ'য়ে উঠলে জল নেমে যেতে চাইবে। তাহ'লেই পৃথিবীর যে-সব জায়গাকে আমরা সমুদ্র বলি, তা কেবল পৃথিবীর উচ্চভূমির তুলনায় নিম্নভূমি মাত্র। এখন, এ-বিষয় মনে একটি ধারণা বদ্ধমূল করতে হ'লে আমাদের মনে ক'রে নিতে হবে যেন পৃথিবীর এত জল কোনো অগস্ত্য-মুনিকে ডেকে শুষিয়ে নিলাম, তখন পৃথিবীকে দেখতে হ'লো কেমন? তার সর্বশরীর যেন ক্ষত বিক্ষত; কোথাও ক্ষত খুব গভীর, কোথাও অগভীর, কোথাও গভীর গর্ত, কোথাও আবার উঁচু।

পৃথিবীর ভূমি-পরিবর্তন ও পরিবর্তনকারী অদৃশ্য শক্তি

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো, সেই শক্তিটি কি—যা উচ্চভূমিকে উচ্চভূমি ও নিম্নভূমিকে নিম্নভূমি ক'রেছে, আবার উচ্চভূমিকে নিম্নভূমি ও নিম্নকে উচ্চভূমিতে বদল করেছে। জলের গতি সম্বন্ধে এইমাত্র যে-কথা ব'লে এলাম, এবারের প্রশ্ন তার চেয়েও সত্য। অথচ জলের ব্যবহার ও চাল-চলনের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা নিশ্চয় জানি যে, আমরা এখানে এই কথা আলোচনা করতে ব'সেছি যে, পৃথিবীর পরিবর্তনের কারণ কি? এর সঙ্গে এ-কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, পৃথিবীর উপরের অংশে যে-কাজ চলছে অগাধ সমুদ্রের জলেও একই সঙ্গে সেই কাজ চলছে। কারণ জলের নীচে হোক আর উপরে হোক, পৃথিবী তো সম্পূর্ণভাবে একটি মাত্র পিণ্ড। তার মধ্যে কাজটা একই হবে। পৃথিবীর বহি-রাবরণ (গায়ের চামড়া) বলতে আমরা মস্ত বড় কথা বুঝি। যদি পৃথিবীর সব জল ছেঁকে ফেলে দিতে পারি, তাহ'লে আমরা পৃথিবীর যে রূপটি দেখতে পাবো, সেটা তার গায়ের চামড়া। এই চামড়া চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ মাইল পুরু হবে বড় জোর। এই পুরু চামড়ায় নড়া-চড়াতেই মহাদেশ ও মহাসাগরের উত্থান-পতন ঘটছে। এই চামড়া ফুলে ওঠে বা চুপসে যায়, তাতেই সাগরের জল গড়িয়ে গিয়ে রূপ পরিবর্তন হয়। কিন্তু চুপসে যাওয়া যা

ফুলে ওঠার কারণ কি? ফুটবলের মধ্যে হাওয়া যখন থাকে না, তখন আঙুল দিয়ে টিপে দিলে বেশ চুপসে যায়, তারপর তার মধ্যে যতই হাওয়া পাম্প ক'রে দেওয়া হয় ততই টোল ভর্তি হ'য়ে উঠে। হাওয়া পুরে দিচ্ছি, অর্থাৎ ভেতরে এক রকমের শক্তি চালান করছি—যে শক্তির জোরে বল টলটলে গোল হ'য়ে উঠে। পৃথিবীর ভেতরও তেমনি অনেক আগে থেকেই শক্তি চালান্ করা আছে, সেই শক্তি যখন গা নাড়া দেয় তখন পৃথিবীর ওপরের চামড়ার টোল কমে বা টোল পড়ে—যার দরুণ পৃথিবীতে এত পরিবর্তন, মহাদেশ ও মহাসাগরের যাতায়াত লেগেই আছে। এতক্ষণে গভীর তত্ত্বটি আমরা পেলাম। পৃথিবীর গভীর দেশে না পৌঁছে গভীর তত্ত্ব পাওয়া কঠিন।

পৃথিবী বলের মত সম্পূর্ণ গোলাকার হ'লে কি হ'তো

এখন প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, বর্তমান সময়ে পৃথিবীর আকৃতি ঠিক কেমন। যদি আমরা পৃথিবীর এত জল নিঃশেষে শুকিয়ে দিতে পারতাম, আর আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে একে ধরতে পারতাম তাহ'লে কেমন দেখাতো। ধরা যাক্, তাহ'লে ঠিক বলের মতন কি একে পেতাম? আমরা নিশ্চিত জেনে রাখতে পারি যে, তা পেতাম না। যদি বলের মতো পুরোপুরি গোল হ'তো, তাহ'লে এর জল চারিদিকে সমান ভাবে ছড়িয়ে থাকতো। তা'হলে সমস্ত পৃথিবীতে আর মাটি পেতাম না, পৃথিবী জুড়ে সমুদ্রের রাজত্ব থাকতো। জীবনধারণের ব্যবস্থা তাহ'লে হ'তো আলাদা রকমের। হয় জলের নীচে, না হয় ঢেউএর ওপর ভেসে ভেসে জীবন কাটাতে হ'তো।

যদি পুরো গোলাকার নয়, তবে এর আকার কেমন? পৃথিবীর একটি ম্যাপ অথবা একটি গ্লোব এ-সম্বন্ধে আমাদের সাহায্য করতে পারে। ম্যাপের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর স্থলের ভাগ উত্তর দিকে অনেক বেশী ও জলের ভাগ দক্ষিণ দিকে বেশী। এ-জিনিষটা আমাদের কাছে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হয়। এমন হওয়া উচিত, এ কথা আমরা বলতে পারি নে; এবং এমন যখন হয়েছে তার কারণ আছে অবশ্যই। দৈবাৎ এই জিনিষ হয়ে গেছে, এর তেমন কোনো কারণ নেই—এ-কথা বলা যুক্তিহীন। দৈবাতেরও নিয়মকানুন থাকে। কিন্তু দৈবাৎ বিশ্বাস রাখলে এ-ক্ষেত্রে আমাদের চলে না। দৈবাৎ একাজ হয় নি। এর কারণ আছে।

দেশ ও মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্ত সূক্ষ্ম

একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করি। পৃথিবীর ভূভাগ উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে এগোবার মুখে ধীরে ধীরে সরু হয়ে গেছে। এ আমরা সর্ব্বত্রই দেখছি। ভূমির এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করার বিষয়: দক্ষিণ ভাগে গিয়ে সরু হয়েছেই, আমাদের জিভ যেমন শেষের দিকে সরু। দক্ষিণ আমেরিকা, গ্রীনল্যাণ্ড, আফ্রিকা, আমাদের ভারতবর্ষ, কিংবা সমগ্র এশিয়া—যার দিকে তাকাই সেই দক্ষিণপ্রান্তে সরু। দক্ষিণ দিকে যতই এগিয়ে আসি ততই সূক্ষ্ম আকৃতি দেখতে পাই। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে তাসমানিয়া দ্বীপ এক সময়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল, যদি এখন তাকে যুক্ত ভাবে কল্পনা করে নিই তাহলে দেখবো এই মহাদেশটি একটি বিন্দুতে গিয়ে শেষ হয়েছে এই দক্ষিণ সীমায় এর নিশ্চয়ই কারণ আছে।

এ-বিষয় নিয়ে নানা দেশের বিদ্বানেরা নানাভাবে গবেষণা করছেন, তাঁদের গবেষণার কাজ এখনো শেষ হয়নি, তাঁরা সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আজও পৌঁছতে পারেন নি, মাঝপথ পর্য্যন্ত তাঁরা এগিয়েছেন মাত্র। তবে, সেইটুকুই আমাদের জেনে রাখা দরকার—কারণ এ-বিষয়টি খুবই দরকারী। উক্ত গবেষণাকারীরা পৃথিবীর নানারকম কল্পিত ম্যাপ এঁকেছেন। তাতে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, সমুদ্র যদি আরো সিকি মাইল গভীর হতো, তাহলে পৃথিবী দেখতে হতো কেমন। তাঁরা সে ছবি আঁকতে পেরেছেন, কারণ গভীর সমুদ্র সম্বন্ধে ও তার তলদেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার জিনিষ জেনে নেওয়া হয়েছে। সেই জন্ম এখন কল্পনা করে বলা চলতে পারে, সমুদ্রের জল এক দিক্ থেকে আর এক দিকে গড়ালে ব্যাপার কি দাঁড়াবে। আর, পৃথিবীকে দেখতেই বা হবে কেমন।

পৃথিবীর আকৃতি

পৃথিবীর আকার বলের মতন সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। আমরা বলি, কমলা লেবুর মতো উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। কিন্তু এর আকৃতি কমলালেবুর মতোও নয়। পৃথিবীকে বলে "pear-shaped", অর্থাৎ 'পেয়ার' ফলের মতো। একদিকে মোটা অন্য দিকে ধীরে ধীরে সরু। পৃথিবীর ভূমির অংশ, অর্থাৎ উত্তর দিক্‌টা ভারী ও দক্ষিণ দিক্‌টা হাল্কা ও সরু। কিন্তু জল এই স্থলের সঙ্গে মিলিত হয়ে পৃথিবীকে গোলাকার করেছে। দক্ষিণভাগের সূক্ষ্ম অংশে জল জমা হয়ে ফাঁক ভরাট করেছে, আর এতেই পৃথিবী হয়েছে গোল।

পৃথিবীর আবরণের নীচে সব সময়ের জন্যে বিপুল শক্তি কাজ করে চলেছে। এই শক্তি পৃথিবীকে মাঝে মাঝে

ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর আবরণ যদি সব জায়গায় একই জিনিষে গড়া ও একই ধরণের পুরু হ'ত এবং জল দিয়ে যে পৃথিবী, তা যদি পুরোপুরি গোল হ'ত তা হ'লে আমরা পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ শক্তির বিষয় ভাল করে বুঝতে পারতাম না।

কি ভাবে পৃথিবীর অন্তর সঙ্কুচিত হয় ও ভূমি পর্ব্বতে পরিণত হয়

পৃথিবীর অন্তঃস্থলে যা ঘটছে অর্থাৎ সঙ্কোচন, তার পরিণাম পৃথিবীর সব জায়গায় সমানভাবে হওয়ার কথা। কিন্তু সমানভাবে হয় না ও হওয়ার কথা নয় এই জন্য যে, পৃথিবীর চামড়া সবজায়গায় সমান পুরু নয় ও একই পদার্থে গড়া নয়। জায়গায় জায়গায় এই আবরণ খুবই পাৎলা, কোন খানে আবার খুবই পুরু এবং এর আকৃতি অদ্ভুত বলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ক্রিয়া সর্ব্বত্র সমান নয়। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ সঙ্কোচনের প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর সবজায়গায় বেশী হয় না, কোনো কোনো জায়গায় হয়; ফলে জমি কুঁকড়ে গিয়ে পাহাড়ে পরিণত হয়; কোনো কোনো জায়গা আবার ফেটে যায়, চিরে যায়, পাকিয়ে যায় বা বিস্তার লাভ করে।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ গণনার জন্য একটি মস্ত বিষয় এখন আছে। বৈজ্ঞানিকরা জানতে চাইছেন, পৃথিবীর অন্তঃস্থলে ঠিক কি কি ক্রিয়া চলেছে ও পৃথিবীর আবরণের গঠন কি কি পদার্থ দিয়ে। আমাদের মতে বিজ্ঞানের জ্ঞান এ-পথে খরচ করার মানে হয় না। ভস্মে ঘী ঢালারই সামিল ওটা। যদিও কেউ কেউ বলেন যে, বিজ্ঞান যদি তাই না আবিষ্কার করতে পারল, তা হলে ভূতত্ত্ব-গবেষক হবার মানে হয় না। ভূতত্ত্ববিদ্ যদি পৃথিবীর অভ্যন্তরের খবরই না দিতে পারলেন তা'হলে তাঁর কাছ থেকে পৃথিবীর বাইরের খবর জানারও আমাদের দরকার নেই। এ-যেন মনুষ্যজাতির আচার-ব্যবহারের ইতিহাস লিখতে বসে ধুতি-পাঞ্জাবী পরা একজনের মুখের দিকে তাকানো, তথ্যসংগ্রহার্থে।

একটি কল্পিত গর্ত্ত খনন ও ব্যয়বরাদ্দ

হিসেব করে পাওয়া গেছে যে, মানুষ যদি এক শতাব্দী ধরে কঠোর পরিশ্রম করে, তা হলে লক্ষ কোটী টাকা ব্যয় করে প্রায় দশ মাইল গভীর একটি গর্ত্ত পৃথিবীর বুকের ওপর খোঁড়া যায়। এটা একটা অনুমান। খুঁড়ে তো কেউ দেখে নি। দশ মাইল গভীর কেন, তার চার ভাগের এক ভাগ গভীর গর্ত্ত খুঁড়ে আমরা সম্মুখে যে কি দেখতে পাব তাই আমরা জানিনে। হয়তো সেখানে বাষ্পের চাপ পাব, কিন্তু তাতে আমাদের লাভ হবে কি? এই গর্ত্তে নামতে গেলে আর প্রাণ নিয়ে পালানও যাবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মানুষ বন্দীজীবন নিয়ে ঘরের কোণে বা ল্যাবরেটরীতে বসেই অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করে চলেছে। যোজন যোজন মাইলে দূর যে সব তারকায় অবস্থিতি, এখানে বসে তাদের অণু-পরমাণুর গুণাগুণ নিরূপণ করেছে মানুষ। এ-কাজ যারা পারে, তারা একদিন নিজের পায়ের নীচের পৃথিবীর সব পরিচয় জানতে যে পারবে, সে বিষয় সন্দেহ নেই। অসাধ্য-সাধন তো মানুষ দ্বারাই সম্ভব। এই তো কিছুদিন আগে রেডিয়ামের মত অতখানি কার্য্যকর পদার্থ আবিষ্কৃত হল; রেডিয়াম পৃথিবীর আবরণের ভেতর থাকে, এ খবর পাওয়া গেল। এই অতিরিক্ত ক্ষমতাবান্ জিনিষটি পৃথিবীর চামড়ার ভেতর বিভিন্ন পরিমাণে কি-ভাবে বিন্যস্ত তাও আমরা জানতে পেরেছি। রেডিয়ামের অদ্ভুত শক্তি: উত্তাপ প্রজনন ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন—এর বিশেষত্ব। এই দুই ক্ষমতা দ্বারা পৃথিবীর গাত্র—যার ভেতর তার বাস—তা সে অদল-বদল করবে এই যুগের পর যুগ। এর প্রভাব হেতুই ক্রমাগত পৃথিবীর আবরণে বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন আসবে একথা নিশ্চিত।

আর একটা মজার কথা বলেই আজকের মত আমি থামব। তোমরা সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার কথা জান। কেউ কেউ হয়ত চোখেও দেখেছ। সমুদ্রের জল মাঝে মাঝে স্ফীত হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে যোগ করা নদী-নালাও সঙ্গে সঙ্গে ফেঁপে ওঠে। এ কাজটি হয় চন্দ্রের আকর্ষণে। জল ফেঁপে ওঠে; কিন্তু মাটিও যে ফেঁপে ওঠে তা তো শোনা যায় নি! অল্প দিন আগে ফরাসী ও জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকরা বিস্তর গবেষণার পর এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পৃথিবীর মাটিও ফেঁপে ওঠে। তাঁরা বলেছেন যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ একদিনে দুইবার সারা পৃথিবীর মাটি প্রায় আট ইঞ্চি আন্দাজ ফেঁপে ওঠে। আমরা পৃথিবীর ওপর বাস করে তা এতটুকু বুঝতে পারিনে। পারবই বা কি করে? আশপাশের সবশুদ্ধই যদি আট ইঞ্চি আন্দাজ আকাশের দিকে ঠেলে উঠে তা'হলে বুঝব কি করে? কোন একটা জিনিষকে স্থির ও অচল ধরে নিয়ে তবেই না আমাদের নড়াচড়া আমরা টের পাব। রেলগাড়ির দরজা জানলা বন্ধ করে বসলে কত বেগে গাড়ি চলেছে কিছুতেই তুমি আন্দাজ করতে পার না। কিন্তু জানলা খুলে পাশের একটা গাছ দেখে বুঝতে পার কত জোরে চলেছ। এ ক্ষেত্রে গাছটি স্থির ও অচল, তার তুলনায় তোমার গতির একটা পরিমাণ স্থির করা চলে। তাই তুমি বুঝতে পার, তুমি তীরবেগে দার্জ্জিলিং যাচ্ছ বা দিল্লী যাচ্ছ।

বর্ষ-প্রবন্ধপঞ্জী

—শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

[গত ১৩৪৫ সালে 'পরিচয়' "প্রবাসী', 'বঙ্গশ্রী', 'বসুমতী', 'বিচিত্রা' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা এই পঞ্জীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প, প্র, বং ব, বি ও ভা পত্রিকাগুলির যথাক্রম সংকেত। সংখ্যাগুলি বর্ষ, খণ্ড এবং প্রকাশ—সংখ্যাবাচক, যথা—বং ৬।২।১ = বঙ্গশ্রী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা।

ইতিহাস

৯৬ (বাংলা জিলার ইতিহাস)

আদিম কলিকাতা ও বঙ্গসমাজ—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্র ৩৮।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ [২২৬-৩১]
কালীঘাট কালী—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
ব ১৭।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ [৯৩-১০১] ; ছবি ১ ; মানচিত্র ১
গুপ্তিপাড়া—বৃন্দাবনচন্দ্র—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
ব ১৭।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ [২৪৫-৫১] ; ছবি ৪
ব ১৭।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ [৬৪০-৪১]
[শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের আলোচনা]
গৌহাটি—শ্রীকৃষ্ণমোহন সেন
প্র ৩৮।২।২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ [৩০৮-১৩] ; ছবি ৭
ঢাকার কাহিনী—শ্রীনারায়ণ গোস্বামী
বং ৬।২।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ [৪০৮-১২]
বং ৬।২।৬ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ [৮২২-২৯] ; ছবি ৫ ; মানচিত্র ১
নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী
প্র ৩৮।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ [৪৮-৫৬] ; মানচিত্র ৪
নদীয়ার কথা [পূর্ব্বানুবৃত্তি]—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য
বং ৬।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ [৫৮৭-৮৯]
বং ৬।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ [৬২২-২৭] ; ছবি ১
বং ৬।১।৩ , আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ [৭৯৪-৯৮]
বং ৬।২।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ [৭৩-৭৫]
বং ৬।২।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [১৯৭-২০০] ; রেখাচিত্র সম্বলিত
বং ৭।১।২ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [২০৪-০৭]
বং ৭।১।৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ [৩২৪-২৮]
পাবনা পরিচিতি—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার
বং ৬।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ [৭৭৩-৭৮]
ময়মনসিংহ পরিচিতি—শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী
বং ৬।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ [৫২১-২৫]
বং ৬।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [৬৪৭-৫০]
বং ৬।২।৬ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [৮৬৩-৬৬]
বং ৭।১।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ [৩৯-৪০]
যশোহর জিলার শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাস (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
—শ্রীমণিগোপাল বসু
ব ১৭।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [৭৩-৭৬]
ব ১৭।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ [৬৩৯-৪০]
রাজশাহী জিলা-পরিচিতি—শ্রীহরিশ রায়
বং ৬।১।১ , বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [৫১৩-১৭]
[illegible] ভাস্কর্য্যের জন্মভূমি—শ্রীশিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ভা ২৬।১।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ [৫৩৭-৩৯]
সিংহপুর বা বর্ত্তমান সিঙ্গুর—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ভা ২৬।১।২ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ [২৪৮-৫২]

৯৭ (ভারতের প্রাদেশিক ইতিহাস)

উড়িষ্যার সভ্যতার ধারা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়
ভা ২৬।১।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [৩৮৯-৯৫]
তমলুক-বর্গভীমা—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
ব ১৭।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ [৭৫২-৬০] ; ছবি ২
প্রাচীন কলিঙ্গের একটি গ্রাম—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু
প্র ৩৮।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ [১৭৯-৮৭] ; ছবি ১৬
মিরাট ও মিরাটের বাঙ্গালী—শ্রীঅবনীনাথ রায়
ভা ২৬।২।২ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ [২০২-১০] ; ছবি ১৫
হাজারীবাগ—শ্রীজনরঞ্জন রায়
ভা ২৬।১।৩ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ [৪৪৩-৪৮] ; ছবি ৫

৯৮ (করদরাজ্যের ইতিহাস)

উড়িষ্যার করদরাজ্য—শ্রীজনরঞ্জন রায়
ভা ২৬।২।৪ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ [৬৩৬-৩৮]

৯৯ (অন্যান্য দেশ)

ইতালির ইতিহাসে প্রাক্-ফাসিস্ত যুগ—শ্রীইতিহাস পাঠক
বং ৬।১।৪ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ [৫৫২-৫৬]
এডেন—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বং ৬।২।৬ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ [৭৭২-৭৮] ; ছবি ৩ ; মানচিত্র ১
সমাজতত্ত্ব ৩২ [রাষ্ট্রনীতি]
খ্রীষ্টের স্বজাতি—শ্রীআর্য্যকুমার সেন
প্র ৩৮।২।৫ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ [৬৭৬-৮৫] ; ছবি ১৮
চীনদেশে প্রাচীন সভ্যতা ও লোকশিল্প—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী
বং ৬।২।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৩৩০-৩৩) ; ছবি ৬
জাপান (পূর্ব্বানুবৃত্তি)—শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ভা ২৫।২।৫ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৭৪০-৪৩)
জাভার ইতিবৃত্ত—শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু
ভা ২৬।২।২ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (১৯৪-৯৯)
টাকারাজুকা—শ্রীমতী চারুবালা মিত্র
বি ১১।২।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৭৩৬-৪৩) ; ছবি ৮
নব্য জাপানের অতি আধুনিক খুঁটিনাটি—যাদুকর পি. সি. সরকার
বি ১২।১।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৩৬২-৭০) ; ছবি ৬
বালী দ্বীপের স্বরূপ—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়
ব ১৭।২।৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৭ (১০৩৯-৫৫) ; ছবি ৩১
ভিক্টোরীয় ইংলণ্ড—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত
প ৭।২।৪ ; বৈশাখ ১৩৪৬ ; পৃঃ ১৫ (৮০৭-২১)
মার্কিনদের দেশ—শ্রীজগন্নাথ রায়
প্র ৩৮।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৭৫০-৫৫) ; ছবি ৮
মেক্সিকোর গভীর অরণ্যে মায়া-সভ্যতার কীর্ত্তি-স্তম্ভ—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বং ৬।২।৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৫৭২-৭৭) ; ছবি ৭
যবদ্বীপ—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ
বং ৬।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৮৬৪-৭০) ; ছবি ৬
হাঙ্গেরীর পথে ঘাটে—শ্রী[illegible] মৌলিক
প্র ৩৮।২।১ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (৫১-৬১) ; ছবি ১৯

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

—শ্রীকালিদাস রায়

বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে কতকগুলি দিনের গায়ে ইতিহাস তাহার মুদ্রাঙ্ক বসাইয়াছে—সেগুলির খবর সাধারণ লোকে রাখে না, ইতিহাসের ছাত্রেরাই জানে। মহাপুরুষগণ কতকগুলি দিনে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এই মর্ত্যভূমিকে ধন্য করিয়া সেগুলিকে কালতীর্থে পরিণত করিয়াছেন। যেমন—জন্মাষ্টমী, রামনবমী, ফাল্গুনী পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা ইত্যাদি। আর দেশের মহাকবি একটি দিনকে চিরস্মরণীয় চিরবরণীয় করিয়া গিয়াছেন তাঁহার অমর কাব্যে—সেই দিনটি আজিকার এই পহেলা আষাঢ়। সমগ্র জগতের গুণী, রসিক, কবি, শিল্পী-দের রসোৎসবের দিন এইটি—এইটিও একটি কালতীর্থ—মহাকালের মহাসাগরে ছায়াঘন শ্যামসুন্দর প্রবাল-দ্বীপ।

মহাকবি কবে তাঁহার অমর কাব্য রচনার সূত্রপাত করেন, কবে তাহা শেষ করেন, তাহা আমরা জানি না—আমরা জানি তাঁহার অন্তর্লোকের মর্ম্ম-গিরির বিরহী যক্ষ আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘোদয় দেখিয়া নব মেঘকে দূত করিয়া তাহার স্বপ্নলোকের বিরহিণী প্রিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। ঐ দিনকেই আমরা মেঘদূত কাব্যের জন্মদিন মনে করিয়া লইতে পারি। যেদিন আশ্লিষ্ট বিপ্রক্রীড়া-পরিণতগজ-প্রেক্ষণীয় 'সানু' মেঘ কবির প্রাণে উদ্দীপন বিভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল সেই দিনকেই কাব্যের জন্মদিন মনে করিতে পারি। তাই আজিকার উৎসব মেঘদূতোৎসব। রসিক জনের পক্ষে এত বড় উৎসবের দিন আর নাই। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের জন্মদিন। "রসিকজনের পক্ষে পরম পুণ্যাহ। ফাল্গুনী পূর্ণিমা যেমন বৈষ্ণবদের, বৈশাখী পূর্ণিমা যেমন বৌদ্ধদের, এদিন তেমনি সারস্বতদের।

পহেলা বৈশাখ বৎসরারম্ভ হিন্দুদের, পহেলা জানুয়ারী খৃষ্টানদের, পহেলা এপ্রিল বর্ত্তমান কর্ম্ম-জগতের আর পহেলা আষাঢ় যেদিন বর্ষার আরম্ভ—সেই দিন বর্ষেরও আরম্ভ সারস্বত জগতে—কাব্য-জগতে—রসের জগতে। আমাদের বর্ষারম্ভ দারুণ রৌদ্র-জ্বালার মধ্যেও নয়—দারুণ শৈত্যপীড়ার মধ্যেও নয়—আমাদের বর্ষারম্ভ সেইদিন যেদিন শতক্রতুর শতাশ্বমেধের পূর্ণাহুতির সঙ্গে সঙ্গে পর্জ্জন্যদেবের শুভাশিস বর্ষিত হয়—যেদিন মার্ত্তণ্ডদেবের বহ্নিজ্বালাকে শান্ত করিয়া দিগন্ত ভরিয়া পুষ্করের প্রসাদ ঘনীভূত হইয়া দেখা দেয়।

আমাদের নববর্ষের উৎসবে যোগদান করে—চাতকাঃ সগর্বাঃ, গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ বলাকাঃ, বিস-কিশলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ মানসোৎসকাঃ রাজহংসাঃ, ভাবৈঃ শিঞ্জাবলয়-সুভগৈর্নর্ত্তিতঃ নীলকণ্ঠঃ, গ্রামচৈত্যের গৃহবলি-ভুকগণ, ভবন-বলভির পারাবতগণ, স্বচ্ছজলের চটুল শফরী-গণ। পুষ্প-জগতের কদম্ব-কেতকী-কুটজ ইত্যাদি ইত্যাদি।

কবি মেঘকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন স্বপ্নলোকে—আর মেঘদূতকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন অনন্তের পথে তাঁহার রসবার্ত্তা বহন করিবার জন্য। বিদ্যুন্ময় অক্ষরে সে বার্ত্তা তাঁহার হাতের পত্রীতে লিখিত—আমরা তাহা আজি-কার দিনেই পাঠ করিবার অবসর পাই। আমাদের প্রাণের বার্ত্তার সঙ্গে সে বার্ত্তা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়। আমরা দূতকে তাই আহ্বান করিয়া বলি—ঐ বার্ত্তার তলে হে দূত আমাদের নামটাও বসাইয়া লইও। আর কবিকে আহ্বান করিয়া বলি—কবি, একা তুমি বিরহী নও, আমরাও তোমার মত বিরহী—অনন্তের সঙ্গে মিলনের তৃষ্ণা আমাদের অল্প নয়। এ বিরহ আমরা ভুলিয়া ছিলাম, তোমার কাব্য সে বিরহকে প্রকট ও প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। আর তোমার দূতটিও সে তাহার যাত্রা-পথে প্রচ্ছন্ন বিস্মৃতপ্রায় বিরহব্যথাকে নব জলসেকে সঞ্জীবিত করিতে করিতে চলিয়াছে। তুমিই তো বলিয়াছ—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।

তোমারই এক অনুগামী কবি বলিয়াছেন—

ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি' বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন বিরহ দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥

কুলিশ-কত-শত- পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী,
ফাটি' যাওত ছাতিয়া।

বাংলার কবি তোমার সুরে সুর বাঁধিয়া বলিয়াছেন—

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

অজানা রহস্যময় স্বপ্নলোকের জন্য বিরহব্যথা জাগাইয়া মেঘদূত চলিয়াছে কোন্ অনন্তের উদ্দেশ্যে। কত কবির কত দূত তাহার অনুসরণ করিয়াছিল—সেই হংসদূত, পদাঙ্কদূত, পবনদূত ইত্যাদি। তাহারা কোথায় পথে হারাইয়া গিয়াছে, মেঘদূত চলিয়াছে—পথে 'দিঙ্‌নাগানাং স্থূলহস্তাবলেপ' পরিহার করিয়া চিরদিন ধরিয়া।

প্রতি বৎসরই আষাঢ়ের প্রথম দিবসে দিগন্ত ভরিয়া নব মেঘোদয় হয়। মহাকবির প্রসাদ হইতে যাহারা বঞ্চিত তাহারা কি মনে করে জানি না, কিন্তু আমাদের অন্তরে একটা উৎসবের কোলাহল বাধিয়া যায়, সমগ্র রসজীবন আলোড়িত হয়, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়, সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। কেন হয়? মেঘ যে 'ধূমজ্যোতিঃ সলিল মরুতাং সন্নিপাতঃ' তাহা কি আমরা জানি না? না জানিলেও বর্ত্তমান যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান খুব ভাল করিয়াই তো তাহা আমাদিগকে শিখাইয়াছে। তবে মেঘকে কেন আমরা অপরূপ চিত্তোন্মাদকর মূর্ত্তিতে দেখি? আমাদের চোখে মেঘ বায়ুবেগে সঞ্চরমান ঘনীভূত বাষ্প মাত্র নয়—মূর্ত্তিমান বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রস—বিশ্বের সকল বিরহীর হৃদয়ের আকিঞ্চন ও আবেদনের শ্যামসুন্দর মোহন মূর্ত্তি। মেঘকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় তোমাকে এরূপ কে দিল? তুমি খুব জোর মঘবানের কামরূপ প্রকৃতি পুরুষ মাত্র ছিলে, তোমাকে এরূপ রসঘন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি কে দিল? কৃষিফল তোমার আয়ত্ত বলিয়া জনপদবধূদের মত তোমার পানে কৃতজ্ঞতা ভরে আমরা চাহিয়া থাকি না, আমরা তোমাকে প্রত্যগ্র কুটজ কুসুম দিয়া বরণ করি। তোমাকে এমন বরণীয় করিয়া তুলিল কে?

জানি জানি বিধাতার সৃষ্টির উপরে তুলিকাপাত করিবার অধিকার আছে যাহার, প্রাকৃত সৃষ্টিকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার শক্তি আছে যাহার, নিরাভরণকে শৃঙ্গারবেশে সাজাইবার কৌশল জানা আছে যাহার, তোমার অঙ্গের জলকণগুলিকে রসলবে পরিণত করিবার নৈপুণ্য জানা আছে যাহার—সেই কবিই তোমাকে এই রূপ দিয়াছে। যে কবি তোমাকে রসঘন মূর্ত্তি দিয়াছে, যে কবি রসাঞ্জনশলাকায় আমাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন, আজিকার পুণ্য বাসরে তাঁহাকে প্রণাম করি।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন—প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের যোগসূত্র তাঁহারা খুঁজিয়া পান না, তাঁহারা খনিত্র-করে সে জন্য মাটি খুঁড়িতেছেন। আমরা মাটির পানে চাই না—আমরা চাই আকাশ পানে। আষাঢ়ের প্রথম দিনে আকাশে চাহিয়া দেখি—প্রাচীন ভারতের সহিত বর্ত্তমান জগতের সংযোগ রচনা করিয়া তুমি গগনে উদিত হইয়াছ। শুধু তাহাই নয়, তুমি কেবল বিরহী যক্ষের বার্ত্তা বহন করিতেছ না—স্বপ্নময় প্রাচীন ভারতের বার্ত্তাও তুমি বহন করিতেছ।

অন্যদিন চিনিতে না পারি, এই আষাঢ়ের প্রথম দিবসে তোমাকে চিনি। তুমি সেই মেঘ যাহাকে রামগিরি-চূড়ায় 'শাপেনাস্তং গমিতমহিমা' যক্ষ দেখিয়াছিল মর্ম্মচক্ষে, আর উজ্জয়িনী-সৌধ-শিখরে কালিদাস দেখিয়াছিলেন নর্ম্মচক্ষে, আর আমরা দেখিতেছি চর্ম্মচক্ষে। তোমার পানে চাহিলেই আমরা দেখিতে পাই সেই কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত প্রাচীন ভারতবর্ষকে। দেখি—সে ভারতে গৃহদ্বারে গ্রামবাসী বৃদ্ধেরা উদয়ন-কথা বিবৃত করিতেছে—বিরহিণীরা দেহলী-রক্ষিত পূজা-পুষ্পে দিন গণনা করিতেছে—পুরনারীরা বলয়-শিঞ্জনের তালে তালে কাঞ্চনীবাস-যষ্টিমূলে সমাগত [illegible]কে নাচাইতেছে—সুন্দরীর বামচরণঘাতে অশোক তরুর দোহদসঞ্চার হইতেছে—আর দেখি,

সানুমান আম্রকূট? কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি; বেত্রবতী কূলে
পরিণত-ফল শ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ-গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা;

পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে বনস্পতি।

কোথায় অবন্তী পুরী ; নির্বিন্ধ্যা তটিনী ;
কোথা শিপ্রা নদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী—
স্বমহিমচ্ছায়া ; সেথা নিশি দ্বি-প্রহরে
প্রণয়-চাঞ্চল্য ভুলি' ভবন-শিখরে
সুপ্ত পারাবত ; শুধু বিরহ-বিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথ মাঝে
কচিৎ বিদ্যুতালোকে ; কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র ; কোথা কনখল,
যেথা সেই জহ্নু-কন্যা যৌবন-চঞ্চল,
গৌরীর ভ্রূকুটী-ভঙ্গি করি' অবহেলা
ফেন-পরিহাসচ্ছলে, করিতেছে খেলা
ল'য়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল !

মনশ্চক্ষে জাগিয়া উঠে সেই স্বপ্ন-ভারত—

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণীরচিতরসনা নিত্যপদ্মানলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈঃ
নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তিঃ
বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি॥

আজিকার দিনে হে মেঘ-বন্ধু! তোমাকে শুধু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কবে বিরহী যক্ষের হৃদয়ের বার্তা বহনের ভার বহন করিয়াছ জানি না, সেই কাল হইতে তুমি বিশ্বের যত বিরহী সকলের হৃদয়ের আবেদন ও আকিঞ্চন কুড়াইতে কুড়াইতে চলিয়াছ—বার্তাভারে তোমার গতি ক্রমে মন্থর হইয়া আসিতেছে—কত দিনে তুমি সেই দিব্যালোকে পৌঁছিবে? সে দেশ হইতে কোন বার্তা, কোন উত্তর তোমার মারফতে পাইবার আশা নাই। তবে কি চিরদিন এই মর্ত্যলোকে যাহারা 'শাপেনাস্তংগমিতমহিমা' তাহারা শুধুই হৃদয়ের আকিঞ্চন এই ভাবে অনন্তের পথে প্রেরণ করিবে? কোন দিন দিব্যলোক হইতে কোন উত্তর পাইবে না? আর তোমার কবি যে অভিশাপকে বর্ষভোগ্য বলিয়াছেন, এই বর্ষ ব্রহ্মার বর্ষ না মনুর বর্ষ না ইন্দ্রের বর্ষ? যাহারা সেই স্বপ্নলোক হইতে নির্বাসিত হইয়াছে তাহাদের কি কখনও শাপমুক্তি হইবে না?

আষাঢ়ে আদি-বাসর পুনঃ আসিল ঐ ফিরিয়া,
নিবিড় ঘোর বাদর মোহে দিগ্বিদিক ঘিরিয়া।
কাজল চোখে অমিয়া ঝরে, সজল পাতা নমিয়া পড়ে,
অতীত স্মৃতি জাগিছে ধীরে ব্যথিত চিত পীড়িয়া।

কে কোথা আজি বিরহী আছ জড়তা হ'তে জাগ রে ;
চপলাতরী ভেসেছে হের বেদনা-শোক-সাগরে।
কুটজ-ফুলে ভরিয়া ডালা, যূথীকফুলে গাঁথিয়া মালা,
অর্ঘ্যরচি' স্বর্গচারী দূতের কৃপা মাগ রে।

দরদী সে যে ঘুমিয়ে তাই ঘনায়ে আসে গোপনে,
বয়ান তার করুণামাখা, সহানুভূতি নয়নে।
ভুবনে যেন আড়াল করি, নিভৃত রচি' কণ্ঠ ধরি
শুধায় তোমা কোন বারতা পাঠাবে প্রিয়া-সদনে।

বারতা তব বিরহ-দূত প্রিয়ারে তব বলিবে,
ভব-বিদিত কূলে সে জাত কখনো নাহি ছলিবে।
দিয়াছে কবি নিদেশ যবে, যুগে যুগে তা বহিতে হবে,
বিরহ লিপি তাহার বুকে দামিনী হ'য়ে জ্বলিবে।

হিয়ার হ্রদে প্রিয়ার মুখ ফুটিছে কার পুলকে?
সুধীরও, শুনি, উদাস মতি নামিলে মেঘ ভূলোকে।
বিরহী তরে উদাসমনা ফেলিও কৃপা-অশ্রুকণা,
দীনা ধরারে করো না ঘৃণা রহিয়া সুখে দ্যুলোকে।

হে কবি, তুমি কল্পলোকে পাঠালে কোন্ বারতা?
প্রতি জনমে জাতিস্মর দূতটি স্মরে সে কথা।
প্রিয়ারে প্রতিলিপিটি তার পাঠাই মোরা, ভাবি না আর,
বহিয়া বুকে অমর তারে করেছে ঘন-দেবতা।

মেঘ-মসীতে লিখিল তব চপলাময়ী লেখনী,
স্মৃতি-ফলকে প্রতিপলকে গুমরে আজও সে ধ্বনি।
প্রেম-তৃষায় চাতকীরূপ দিয়াছ মেঘে হে কবি-ভূপ,
ত্রিলোক লাগি লিখেছ কবি একের লাগি লেখ'নি।

হে কবি তুমি,—জানি না কোন অলকাপানে চাহিয়া,
শোকেরে শ্লোকে সান্দ্র ক'রে' নৃলোকে গেলে গাহিয়া।
উজ্জয়িনী রাজসভার পূজ্য যিনি, কি ব্যথা তাঁর?
খুঁজেছে কোন দ্যুলোকে কূল মেঘের তরী বাহিয়া?

হে কবি, অভিশাপের কথা ব্যথিত চিতে স্মরি যে,
ইহ-জীবনে নির্বাসনে কাহারে দূত বরি হে?
অলকা স্মৃতি-দ্যুলোক-তীরে উদাসী করে এ প্রবাসীরে,
স্বদেশে যাব' কবে যে ফিরে, অকূলে কোথা তরী রে!

মধু-বসন্ত

—শ্রীমন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ

১০

এক এক করিয়া হারাণ দেখিল পরাণের চাষের জমি, ছেলে গরু, হাল, মরাই, ছোট বউমার গহনা, তৈজসপত্র সকলই ভোজবাজির মত উড়িয়া গেল। আরও দেখিল কোন দিন অর্দ্ধাশন, কোন দিন অনশন তাহাও ঘটিতে লাগিল। বালক গোপাল আর দুধ খাইতে পায় না, বায়না করে। ছোট বউ ভুলাইতে চেষ্টা করে। যখন অসাধ্য হয় তখন বেশ করিয়া কিলটা চাপড়টা দিয়া সে বায়নার শেষ করে। বিনোদিনীর কর্ত্তৃত্ব অটুট থাকিলেও অর্থাভাব বশতঃ আহারাদির বিশেষ সুবিধা হইতেছিল না। সুতরাং মাতা ও কন্যাতে—সময়ে সময়ে পরাণ থাকিলে তাহার সহিতও মহা-বচসা, গালাগালি, মারামারি পর্য্যন্তও হইয়া যায়। কোন কোন দিন এমনও হয় মাতা মাথা ঠুকিয়া ফুলাইয়া রক্তারক্তি করিয়াছে, কন্যা মাথার চুল ছিঁড়িয়া রক্তপাত করিয়াছে, বালক গোপালের গায়ের রক্তের ছড়া পড়িয়াছে। যে বিশু পরাণের দ্বিতীয় প্রাণ ছিল, সে কর্পূরের মত কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। পরাণ অনেক চেষ্টা করিয়া বিশু যে গ্রামে থাকিত বলিয়াছিল, সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যে বাটীর কথা তাহাকে সে বলিয়াছিল, সে বাটী সে গ্রামে ত নাইই, উপরন্তু যে-স্থানে সেই বাটী থাকার কথা সেইস্থলে ভীষণ অরণ্য। দিবাভাগেও মানুষ সেখানে প্রবেশ করিতে চায় না। সুতরাং বিশুর আশা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল। বিশুর সহিত কয়েক বৎসর থাকিয়া সে তাহার যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইল বটে, কিন্তু তাহার সাহচর্য্যে পরাণের অনেক শহুরে বুদ্ধি খুলিয়াছিল। সে একদিন কাহাকে কিছু না বলিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মনে মনে সঙ্কল্প ছিল যে, যে এটর্নির কাছে মাঝে মাঝে গিয়া বিশুর নাম করিয়া সে টাকা আনিত, তাহার নিকটে গিয়া বিশুর নাম করিয়া হাজার কয়েক টাকা লইয়া আসিবে। এটর্নি ত তাহার গ্রাম বা বাড়ী চিনে না—সে বিশুকেই চিনে। ঐ টাকা লইয়া আসিয়া দেশে আবার ধানজমি, হাল, গরু সবই করিবে এবং দাদাকে দেখাইয়া দিবে তাহার টাকা ব্যয় করিবারও যেমন ক্ষমতা আছে, তেমনি টাকা রোজগার করিবারও ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। মনে মনে কালনেমির লঙ্কা ভাগ করিতে করিতে সে একদিন মধ্যাহ্নে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

যখন সেই এটর্নির কাছে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন সেই এটর্নির অফিসে একটা মহা গোলমাল হইল। এ এদিকে ছোটে, ও ওদিকে ছোটে, সে সেদিকে ছোটে। পরাণ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে বুঝিল তাহার আগমনেই এটর্নি অফিসের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। সে অবস্থাটা বেশ ভাল বলিয়া মনে করিতে পারিল না। অনেকবার সে এমত অবস্থায় বিপদ দেখিয়াছে বলিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল। এটর্নি এস্. সি. কুণ্ডু সমাদর করিয়া পরাণকে বসাইয়া আলবোলায় তামাক দিয়াছে। কথায়-বার্ত্তায় আদর-অপ্যায়নে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে, যেন এটর্নি তাহার কত বন্ধু, কত উপকারক। কিন্তু পরাণ কোথা হইতে যেন দুষ্ট অভিসন্ধির গন্ধ পাইয়াছে। তামাক টানিতে টানিতে হঠাৎ নল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আহা হা করেন কি, পরাণ বাবু, করেন কি? একটু বসুন। আপনার টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি। টাইপিষ্ট বাবু এসে ডিড্‌টা টাইপ করে দিক। দু মিনিট। বসুন বসুন।"

পরাণ বসিল বটে কিন্তু চারিদিকে কেবল চাহিয়া দেখিতেছে। তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। এটর্নি কিন্তু তাহার সহিত সৌজন্যের মাত্রা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতেছে। এমন সময়ে বিশু একজন পুলিশ ইন্সেপেক্টর আর দুই জন কনেষ্টবল লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশু কাহারও অপেক্ষা না করিয়াই পরাণকে দেখাইয়া দিল। ইন্সেপেক্টর সাহেব পরাণের নিকট গিয়া বলিলেন,

"মহাশয়, আপনার নামে বডি-ওয়ারেন্ট আছে। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

"কেন, আমি কি করেছি। এই যে বিশু, বিশু ভাই দেখত এ কি বলে।"

ইন্‌স্পেক্‌টার সাহেব বোধ হয় ভিতরের ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। হাসিয়া বলিলেন—

"ইনিই তো আপনার নামে ছলিয়া বার ক'রেছেন।"

"বিশু তোমার এ কাজ? না মস্করা করছ?"

বিশু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়াই ইন্‌স্পেক্‌টর সাহেবকে বলিল,—

"আপনার আসামীকে আমি ধরিয়ে দিচ্ছি। এটর্নি বাবু সনাক্ত করে দিচ্ছেন।"

এটর্নি বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া ইন্‌স্পেক্টরের হাত হইতে সনাক্ত-পত্র লইয়া তাহাতে সনাক্তনাম লিখিয়া দিলেন। পরাণ আশ্চর্য্য হইয়া অবাক্ হইয়া রহিল। এটর্নি বাবু হাসিতে হাসিতে বলিল,—

"পরাণ বাবু, আপনাকে দেশে গিয়ে ধরা বড় সুবিধে হত না। তা কিছু মনে করবেন না। এই বিশুর কাছে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনি ধারেন, তা দেবার দিন অনেক দিন হয়ে গেছে। পালিয়ে পালিয়ে আর কদিন থাকবেন। তবে শুনেছি আপনি ধনী। টাকাটা আপনার ভাইকে দিয়ে দিতে বলবেন। তা'হলেই আর কোন গোলমাল থাকবে না।"

পরাণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ইন্‌স্পেক্টরের দিকে কাতর নয়নে চাহিল। ইন্‌স্পেক্টর এই সাধুকে চোর বলিয়া ধরিয়া বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথায় বলিলেন,—"মশায়, আমার অপরাধ কি? আমাদের উপর যা হুকুম হবে, আমাদের তাই তো করতে হবে! এখন আসুন। আর দেরী করবেন না।"

পরাণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল। কেবল হাত হইতে মূল্যবান্ গড়গড়ার নলটি পড়িয়া গিয়াছিল। সে বোধ হয় মানুষের মত অত সৌজন্য প্রকাশ করিতে জানে না। সে ভদ্রতার আবরণে কৃতজ্ঞতার পাশ ছেদন করিতে প্রস্তুত নহে। হায় মানুষ, তুমিই অনর্থ সৃষ্টি কর। তোমার উপর যে সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখে তুমিই তা'কে অস্থির ক'রে তোল। কৃতজ্ঞতা কি তোমার নাই? যাহার খাইবে, তাহাকেই মজাইবে?

বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কনষ্টেবলদ্বয় মহা হুঙ্কার করিয়া উঠিল। পরাণকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহারা সামান্য কনষ্টেবল, অল্পবুদ্ধি, জানে না যে পঞ্চাশ হাজার টাকা যে ধার করে, সে সামান্য লোক নয়। তাহার সঙ্গে কারবার অন্য রকম। তাহাতে দু পয়সা হইতে পারে। এ কথা তাহারা জানে না। ইনস্পেক্টর তৎক্ষণাৎ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। কনষ্টেবলদ্বয় পিছাইয়া আসিল। তখন ইনস্পেক্টর বাবু বলিলেন, "মশায়, দেরী হয়ে যাচ্ছে। আপনি সম্ভ্রান্ত লোক। তাই বলছিলুম আপনার সম্মান নষ্ট না হয়। শহরে ও রকম দু দশটা কেস্ রোজই হচ্ছে। ঐ কোর্টে যাওয়া পর্য্যন্ত। তা'র পর আমরা সবই বন্দোবস্ত ক'রে দিই।"

এতক্ষণে পরাণ বুঝিল যে তাহার কি হইয়াছে। পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। সে একবার নিজের চোখে দেশে দেখিয়াছিল বহু মোড়লের অবাধ্য হওয়ায় পুলিশের হাতে দুর্দশাটা! সে আর কাল বিলম্ব না উঠিয়া বলিল,—"চলুন, কোথায় যেতে হ'বে চলুন।"

ইন্‌স্পেক্‌টর, কনষ্টেবলদ্বয় বিশু ও পরাণ এটর্নি অফিস ছাড়িয়া মোটরে আসিয়া উঠিল।

১১

হারাণ বাড়ীতে বসিয়া শুনিল পরাণ দেনার দায়ে গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে গিয়াছে। বিশু দাবী করিয়াছে যে পরাণ তাহার নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করিয়াছে। টাকা দিতে পারিলে ভাল। তাহা না হইলে ভিটা বাটী জমী যাহা আছে সকলই নিলামে উঠিবে। তাহাতে যদি টাকা শোধ না হয়, তাহা হইলে কিছু দিন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কলিকাতায় তাহার জন্য কে জামিন হইবে? সেই জন্য সে আজ কয় দিন হাজতে রহিয়াছে।

হারাণ এত দিন কেবল লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। নিশ্চেষ্টই ছিল কিন্তু দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণই ছিল। পরাণকে ফিরাইয়া আনিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। কত লোকে কত কথা বলিয়াছে কিন্তু সে কোন কথায় টলিত না। কত লোকে তাহাকে কত দোষারোপ

করিয়াছে, সে কিন্তু উপেক্ষাই করিয়া আসিয়াছে। ছোট বউএর কত ক্রন্দন সে শুনিয়াছে, তাহার সুদৃঢ় বক্ষঃ আরও কঠিন নির্ম্মমতার বর্ম্মে আবৃত করিয়াছে। গোপালের নির্যাতন সে কতবার চোখে দেখিয়াছে, একটি কথাও মুখে উচ্চারণ করে নাই। গোপাল দুধের বায়না করিয়া মার কাছে মার খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে সারারাত্রি ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়াছে, তাহার বহু বিনিদ্র রজনীর সঙ্গের সাথী হইয়াছে, সে কিন্তু একটি কথাও কহে নাই। কানায় কানায় ভরা দুধের কড়া মধ্যরাত্রে বড় বউ কাঁদিতে কাঁদিতে নর্দ্দামায় ঢালিয়া দিয়াছে, তথাপি গোপালকে একবিন্দু দুধ দিতে কোন দিন ভ্রমক্রমেও অনুমতি দান করে নাই। বড় বউ নির্জ্জনে বসিয়া চোখের জল কত ফেলিয়াছে, সে তাহা দেখিয়া নির্জ্জনে নিভৃতে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে, তথাপি ভাই কি ভাইয়ের ছেলে, কি ভাইয়ের স্ত্রীর কথা প্রসঙ্গক্রমেও কখনও উত্থাপন করে নাই। গোপালকে তীব্র তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিয়া তাহার পায়ের দাগগুলি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বড় বউ কত দিন আত্মহারা হইয়াছে, সে করুণ দৃশ্য দেখিয়া আবেগ রাখিতে না পারিয়া ছুটিয়া মাঠে গিয়া অনন্ত শূন্যে পৃথিবীর অলক্ষ্যে প্রাণের অনন্ত ব্যথা ব্যক্ত করিয়াছে, তথাপি কোন প্রসঙ্গে তাহার মনোভাবের কোন চিহ্ন প্রকাশ করে নাই। কিন্তু আজ পরাণের হাজতবাসের কথা শুনিয়া প্রাণে কি বেদনা, কি তীব্র শেল, কি দারুণ অভিযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল? আর তো থাকিতে পারা যায় না! আর তো নীরবে বুকের ব্যথা সহ্য করা যায় না! আর যে ধৈর্য্য থাকে না! আর যে মনকে বোঝান যায় না—এখনও সময় আসে নি এখনও সময় হয় নি!

পরাণ যতই অধঃপাতে যাক, যতই লোকে বলুক, হারাণ কেবল সময়ের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত। সে জানিত সময় না আসিলে সে যাহা বলিবে তাহার কোন মূল্যই হইবে না। পরাণ তো তাহার কথা বলিবেই না; অধিকন্তু উপহাস করিয়া সে কথা উড়াইয়া দিয়া তাহার আশাপ্রবণ অন্তঃকরণে শেল বিদ্ধ করিবে। সুতরাং পরাণকে কিছু বলিয়া সাবধান করিয়া দিতে হারাণ নিবৃত্ত ছিল। কিন্তু এ কি হইল? ঘটনাপরম্পরা এমন অগ্রসর হইয়া চলিল যে, যাহা সে কোন দিন কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাই হইল এবং যখন তাহা হইল তখন সে না জানিয়াই তাহা হইতে দিল। হঠাৎ ঘটনাচক্রের এমন যে বীভৎস আবর্ত্তন হইবে, যে মানস চক্ষে পরাণের শেষ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেও এত তীব্র, এত যন্ত্রণাদায়ক যে পরাণের পরিণাম হইতে পারিবে তাহা তাহার কল্পনায় আইসে নাই। কল্পনায় না আসিলেও যাহা ঘটিবার, তাহা ঠিক ঘটিয়া গেল। হারাণ পরাণের অবস্থা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। চক্ষে জল আসিল। গণ্ডদেশ বহিয়া দর দর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

কিন্তু কাঁদিলে কি হইবে? কাঁদিলে ত আর পরাণকে বাঁচান যাইবে না। হারাণ ঠিক করিল যে, এতদিন যখন সে কাঁদে নাই, আজিও কাঁদিবে না। কর্ত্তব্য আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল। কি কুরিবে তাহার চিন্তার সে কূল-কিনারা পাইতেছিল না। দেশে তাহার প্রতিপত্তি আছে—ভয়ে হউক, ভালবাসায় হউক, দেশের কেহ এখনও পর্য্যন্ত তাহার মুখের উপর কিছু বলিতে সাহস করে না। সে যাহাকে যাহা বলে, কেহ তাহা অমান্য করে না—প্রিয় হউক অপ্রিয় হউক, কেহ তাহার প্রতিবাদ করে না। কিন্তু আজি যদি তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রবঞ্চনা অপরাধে, ঋণশোধ না করিবার অপরাধে হাজতবাস, কারাবাস হয়, তাহা হইলে তাহার কি আর সে প্রতিপত্তি, সে ক্ষমতা থাকিবে? এখনও লোকে পরাণের কোন কথা শোনে নাই, কেন না তাহা হইলে একজনও না একজন আসিয়া তাহাকে ভয়ে ভয়ে সংবাদ দিত—পরাণের কারাবাস হইয়াছে। কিন্তু এ কথা কতদিন চাপা থাকিবে? যে বিশু তাহার প্রাণের এমন বন্ধু হইয়াও তাহাকেই বিপদ-জালে জড়াইল সে যে গ্রামের মধ্যে তাহাদিগের মাথা হেঁট করিতে এই নিন্দকের অতি-লোভনীয় তাহার ভ্রাতার কারাবাস ব্যাপারটি প্রচার করিবে না, তাহা বিশ্বাস সে করিতে পারিল না। কিন্তু কি করিতে হইবে, কি করিলে ভ্রাতাকে আশু বিপদ হইতে উদ্ধার করা যায়, তাহা সে স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। একবার ভাবিল দাবীর টাকাটা দুই একদিনের ভিতর দিয়া দিলেই তো ভ্রাতার মুক্তি হইতে পারে। কেহ জানিতেও পারে না। কিন্তু এত টাকা সে পাইবে কোথায়? সে

অর্থবান্ বলিয়া পরিচিত ; শুধু পরিচিত কেন তাহার সত্য সত্যই অর্থ আছে। পল্লীগ্রামে চাষার পল্লীতে যে অর্থ থাকিলে বড় হওয়া যায়, তাহা তাহার আছে। কিন্তু নগদ টাকায়, গহনায়, জমীতে, বসতবাটীতে তো অত টাকা হওয়া সম্ভব নয়। তাহা হইলেও সে সমস্ত খোয়াইয়া ভাই পরাণের মুক্তি কিনিয়া আনিত। তাহার পর দুই ভাইয়ে কাজ করিলে সকলই ফিরাইয়া পাইতে তাহার কোনই কষ্ট হইত না। সে কত কি ভাবিল, কিন্তু কোথায় সে ভাবনার অন্ত, তাহা সে দেখিতে পাইল না। সে স্থির থাকিতে পারিল না।

যথাপূর্ব্ব উনানে এককড়া দুধ বসান আছে। আগুন নাই। দুধ অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাহা উনান হইতে নামান হয় নাই। যাহারা দেখিয়াছে তাহারা বলাবলি করিত, "মোড়লদের বড় বউ-এর এ কি ধ্যান বাপু, এক কড়া দুধ রোজই উনুনে বসান থাকে। আমসত্ত্ব'র মত সর পড়ে। যখনই যাও, তখনই দুধ উনানে বসান আছে। নিজে তো খায়ই না হারাণও খায় না। ওরা যে কি ভাবে, তা ওরাই জানে। পরাণের ছেলেটা এক ফোঁটা দুধ পায়-না। তো'রা না খাস, সে বেচারিকে দিলে ত' সে খেয়ে বাঁচে ত।"

কিন্তু কোন দিন পরাণের ছেলে দুধের বায়না করিয়া মায়ের নিকট খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পালাইয়া গেলেও বড় বউ যাহাকে একদণ্ডও চক্ষের আড় করিতে পারিত না। যাহাকে দুধ না খাওয়াইলে আহার হইত না তাহাকে ডাকিয়া এক বিন্দুও দিত না, ইহা লইয়া অনেকে অনেক জল্পনা-কল্পনা করিয়াছে, কিন্তু কোন কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। কেহ কেহ বড়-বউকে দুই-এক কথা কথাচ্ছলে বলিতেও ছাড়ে নাই। তাহাতে ফল হওয়া দূরের কথা, বড় বউ-এর ক্রোধ প্রকাশ পাইত। গোপালের কথা তুলিতেই লোকে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিত বড় বউ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছে। চেঁচামেচি করিয়া বলিত, "পোড়ার-মুখো ছেলে! ওকে দুধ দিতে গেলুম কেন? ওর বাপ, ওর মা, ওর গিন্নির অঞ্চলের নিধি আমি ডাইনি তো আর গিলে খেতে পারিনে।"

বড়-বউ আর বলিতে পারিত না—কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত। লোকে হাঁ করিয়া থাকিত। ভাল-মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিত না। বুঝিতও না। আজিও পূর্ব্ব অভ্যাস মত দুধ উনানে কড়ায় ছিল।

গোপাল এখন একটু বড় হইয়াছে। অভাবে, অনশনে প্রহারে গোপালের সে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আর নাই। গোপাল শীর্ণকায়, ম্লানমুখ ও রুক্ষ হইয়াছে। দুই এক বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে যে দেখিয়াছে, এখন গোপাল বলিয়া তাহাকে কেহ চিনিতে পারে না। মায়ের নিকটে খুব মার খাইয়াছে ; ভাত না খাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বাহিরের রৌদ্র অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরিয়া গোপাল ক্লান্ত হইয়া তাহার 'জ্যাঠামা'র রান্না ঘরের ছাঁচের তলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখখানা কালি হইয়া গিয়াছে। বড়-বউ কমলা কোনপ্রকারে ছুটী খাইয়া মধ্যাহ্নকালীন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। চাউল ঝাড়া, ডাল ঝাড়া ইত্যাদি কার্য্যে সে সমস্ত দুপুর বেলা কাটাইয়া দিত। হারাণ একবার ভিতর একবার বাহির করিতেছে, মাঝে মাঝে তামাক টানিতেছে, আর অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া হুঁকা হাতে করিয়া উবু হইয়া বসিয়া আছে। এমন সময়ে গোপালের হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। ক্ষুধার জ্বালায় তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিতেছিল। সে যেদিন মার খায়, বকুনি খায়, সেই দিন তাহার 'জ্যাঠামা'র কাছে যাইতে প্রবল ইচ্ছা হয়। 'জ্যাঠামা'র চোখে পড়িবার জন্য আশপাশ ঘুরিয়া বেড়ায়। দুই এক দিন সে এমনই গিয়াছিল, কিন্তু 'জ্যাঠামা' তাহাকে বকিয়া, ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। সেই অবধি সে নিজে 'জ্যাঠামা'র কাছে যাইতে ভয় পাইত। আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। যদি 'জ্যাঠা-মা' ডাকে তো যাইবে। 'জ্যাঠামা' ডাকেও নাই তাহারও যাওয়া হয় নাই। কিন্তু আজি তাহার মনে বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল যে 'জ্যাঠামা' বকুক, আর ভয়ই দেখাক কখন তো তাহাকে মারে নাই। আজি ক্ষুধার জ্বালায় তাহার ভয় ও তিরস্কার তাহাকে 'জ্যাঠামা'র কাছে যাইতে বাধা দিতে পারিল না। সে সকল ভয় সংশয় তুচ্ছ করিয়া 'জ্যাঠামা'র রান্না-ঘরের দাওয়ায় গিয়া উঠিল।

তখন তাহার পূর্ব্বস্মৃতি মনে উদয় হইল। সে একদিন

'জ্যাঠামা'কে লুকাইয়া উনানের কড়া হইতে দুধ তুলিতে যাইয়া দুধ মাটিতে ছড়াইয়া দিয়াছিল। তাহার পর সে পালাইয়া গিয়াছিল। বিড়ালে দুধ নষ্ট করিয়াছে অতএব তাহা আর গোপালকে খাওয়ান যাইতে পারে না। বড়-বউ উনানের দুধ সব ফেলিয়া দিতে যাইবে এমন সময়ে গোপাল খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে যখন সকল কথা জানিতে পারিল, তখন গোপালকে আদর করিয়া কত কি যে বলিতে লাগিল, তাহার একটী বর্ণও তাহার মনে নাই, বটে, কিন্তু তাহার মনে ছিল তাহার 'জ্যাঠামা'র আদর আর মুহুর্মুহুঃ চুম্বন! তাহার পর তাহার 'জ্যাঠামা' তাহার সম্মুখে দুধের কড়াটী বসাইয়া দিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইয়াছিল। আজ সেই সকল পূর্ব্বস্মৃতি তাহাকে বিভোর করিয়া তুলিল। 'জ্যাঠামা' না দিলেও আজ যদি সে দুধের কড়া হইতে আঁজলা ভরিয়া লইয়া দুধ খায়, তাহা হইলে তাহার সেই পূর্ব্ব আদর সে পাইবে তাহাতে তাহার সন্দেহ আর রহিল না। তাহার সম্মুখে কতদিন 'জ্যাঠামা' দুধ ফেলিয়া দিয়াছে। সে খাইবার জন্ত কত লালসা দেখাইয়াছে; সে দুধ পায় নাই। কিন্তু আজি তাহার পূর্ব্ব আদরের স্মরণে তাহার সে-সব কথা মনেই আসিল না।

তাহার লক্ষ্য পড়িল রান্নাঘরে উনানের উপর এককড়া দুধ। আবেগে বিভোর গোপাল কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়াই রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য ক্ষুধার জ্বালায় পূর্ব্বাপরবিবেচনাহীন গোপাল দুই হাতে আঁজলা ভরিয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে যখন তৃপ্তিলাভ করিল, তখন তাহার সংজ্ঞা হইল। আর এক অঞ্জলি ভরিয়া দুগ্ধ লইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল তাহার 'জ্যাঠামা' তাহাকেই দেখিতেছে। ভয়ে, লজ্জায়, তিরস্কারের কথা মনে করিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। তাহার অঞ্জলিভরা দুগ্ধ রান্নাঘরে পড়িয়া ছড়াইয়া গেল। ছুটিয়া পলাইয়া যাইবার সময়ে গোপালের পায়ের দাগ রান্নাঘরের দাওয়ায় রহিয়া গেল।

গোপাল কিন্তু পলাইল না। রান্নাঘরের পিছনে ছাতের তলায় ছায়ায় লুকাইয়া রহিল। 'জ্যাঠামা' কি করে তাহা দেখিতে তাহার মনে বড়ই অভিলাষ হইল। এই কয় বৎসর সে যাহা দেখিয়া আসিতেছিল, আজ তাহার সকলই বিপরীত সে দেখিল। 'জ্যাঠামা' তাহাকে বকিল না, ভয় দেখাইল না, তাড়াইল না। যেখানে 'জ্যাঠামা' কাজ করিতেছিল, সেইখানেই বসিয়া রহিল। কেবল গোপালকে দেখিতে লাগিল। সে দৃষ্টিতে ক্রোধের তীব্র জ্বালা ছিল না, তিরস্কারের উষ্ণ প্রবাহ ছিল না, ভয়ে অন্তঃকরণ শুষ্ক করিবার কিছু ছিল না। ছিল সেখানে কেবল করুণার ছল-ছল কাতরতা, প্রাণের রুদ্ধ আবেগের উন্মুক্ত বন্যা, অতলস্পর্শী মর্ম্মবেদনা। 'জ্যাঠামা' ধীরে ধীরে উঠিয়া গোপালের যে পদচিহ্নগুলি এখনও দাওয়া মুছিয়া যায় নাই, সেইগুলি বুকে চাপিয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ভাষা নাই, চীৎকার নাই, কোন তাহার অভিব্যক্তি নাই—উচ্ছ্বাস প্রবল, অনন্ত, অবিরাম!

হারাণ কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে যাহা এতক্ষণ ধরিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। নিজে নিজেই কি বকিতে আরম্ভ করিল। বড়-বউ নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ—গোপালের পদচিহ্নগুলি আগুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া—চক্ষে অবিরল ধারা গণ্ড বাহিয়া মিনিহুতায় গাঁথা মুক্তাফলকের অফুরন্ত মালা। হারাণের কথা তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল না। কোন উত্তর নাই, শ্রোতা নাই, তথাপি হারাণ কি বলিয়া চলিল!

এ-ঘর ও-ঘর করিয়া হারাণ হঠাৎ রান্না-ঘরের দিকে আসিল, দেখিল, বড়-বউ রান্না-ঘরের দাওয়ায় শুইয়া দুই হাত বুকে চাপিয়া কাঁদিতেছে। অসুখ হইয়াছে মনে করিয়া হারাণ নিকটে আসিয়া যেমন মুখ নত করিয়া বড়-বউকে জিজ্ঞাসা করিবে, তখনই দেখিল তখনও অমিলিত কাহার পদচিহ্ন বড়-বউ বুকে চাপিয়া ধরিতেছে, আর কাঁদিতেছে। হারাণের মন ভাল ছিল না। বড়-বউ একটা কষ্ট পাইতেছে বুঝিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করিল না। ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই বড়-বউ কমলা দাসীকে দেখিল। অমনি তেজোগর্ব্বিতা স্ফীত ফণিনীর মত সে উঠিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল,—

"দেখ, ত এমন করে আর কদিন চলে? রোজ রোজ ঐ হতচ্ছাড়া ছোঁড়া গোপালটা এসে এমনি করে দুধ নষ্ট করে যাবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। হয়

তুমি এর একটা বিহিত কর, আর না হয় আমাকে কোথাও পাঠিয়ে দাও।"

"কোথায় যাবে, বড় বউ? আচ্ছা এর ব্যবস্থা, আর তোমার কোথাও এক জায়গায় যাওয়া হবে এখন। আগে বল দেখি এই পায়ের দাগগুলো কার? আর তোমারই বা এত কান্না কিসের এইগুলো বুকে চেপে ধরে? আমার কাছে চেপ না। আমি সব বুঝতে পেরেছি।"

"যদি পেরেই থাক তো এর ব্যবস্থা কেন কর না তুমি? আমরা পাষাণ হ'তে পারিনে, তাই থাকতেও পারি না।"

"বুঝিছি। তাই বুঝি গোপাল এসে এই দুধ খেয়ে ছড়িয়ে গেছে? আচ্ছা আজই আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলছি।"

স্বামীর ক্রোধ দেখিয়া বড় বউ কমলা বিপদ গণিল। কি বলিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। হারাণ বুঝিল, আরও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমি আজ এখনই কলকাতায় যাচ্ছি। আমার জানাশুনো অনেক খদ্দের আছে। একজনকে নিয়ে এসে এ বাড়ী জমি-জিরেত দেখিয়ে বিক্রী ক'রে এ গাঁ ছেড়ে একেবারে চলে যাব। তা হলে আর বড় বউ, তোমার এতটা কষ্ট ভোগ করতে হ'বে না।"

কমলা এইবার কথা কহিল। তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ লোকাচারের কঠিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবল বেগে ছুটিয়াছিল। অসংরক্ষিত অবস্থায় স্বামী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, সকলই জানিয়া ফেলিল! সে আর তো কোন কথা গোপন করিতে পারে না। এখানে থাকিয়া তবু দিনান্তে একবারও গোপালকে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি স্বামী সত্য সত্যই রাগ করিয়া বাড়ী ঘর-দুয়ার জমি-জিরাত সকলই বিক্রয় করিয়া অন্য গ্রামে চলিয়া যায়, তাহা হইলে গোপালকে তো আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। সে থাকিতে পারিল না। স্বামীর পাদুটি ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,"তা কোর না। আমি তো তোমাকে সে কথা বলিনি। গোপালকে যে না দেখে থাকতে পাচ্ছিনে। আমরা তাদের মায়া কাটাতে পেরেছি। সে কিন্তু দেখ, তা পারেনি। আগের মত তার যেন নিজের জিনিষ, তেমনি জোর করে খেয়ে গেল। হ্যাঁ গা, গোপাল কি আর আমাদের হবে না?"

বড় বউ কাঁদিতে লাগিল। হারাণ আর ক্রোধ পারিল না। পরাণের হাজতবাস তাহার যে অনুক্ষণ স্মরণ হইতেছিল। তাহার নিজের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে তাহার বৃশ্চিকদংশন হইতেছিল। মিছা-মিছি ক্রোধ করিয়া 'সমর আসে নাই, সমর আসে নাই' করিয়া হারাণ আজ পরাণের যে বিপদ ঘটাইয়া দিল, তাহা হইতে তাহার অব্যাহতি কি? একজন ভুল করিলে কি আর একজনেরও ভুল করিতে হয়? হারাণ কাঁদিয়া ফেলিল। বড় বউ বুঝিল গোপালের কথাই বুঝি স্বামীকে কাঁদাইল।

উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। প্রথম আবেগ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া আসিলে হারাণ বাগাড়ম্বর না করিয়াই বলিল, "দেখ বড় বউ আজ আমাদের মহাবিপদ এসেছে। বিশু পরাণকে দেনার দায়ে গারদে দিয়েছে।"

"এঁ্যা, ঠাকুরপো গারদে? আর তুমি ঘরে বসে কাঁদচ? তা'কে ছাড়িয়ে নিয়ে এস।"

"সে বড় শক্ত, বড় বউ।"

তখন আনুপূর্ব্বিক হারাণ পরাণের সকল কথাই বলিল। সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও যদি পরাণের মুক্তি হইত, তাহাও সে করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইবে না।

বড় বউ কাঁদিতে কাদিতে বলিল, "তবে উপায়?"

"উপায় এখন ভগবান্।"

লুকাইয়া থাকিয়া গোপাল সকল শুনিল। কোন কথা বুঝিল, কোন কথা বুঝিল না। তবে শুনিল পরাণ গারদে গিয়াছে। ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর গেল। বিনোদিনী তো বাঘিনীর মত ছুটিয়া আসিল। চেঁচাইয়া বাড়ী মাথায় করিয়া বলিতে লাগিল,—

"হতচ্ছাড়া ছেলে, কোথায় ছিলি রে, পোড়ারমুখো? একে জোটে না, যদি বা জুটল দুমুঠো, ও রাগ করে ছড়িয়ে দিয়ে পালান হল। কোথায় তোর কে আছে রে মা মাসী, কই একমুঠো দিক্ দিকিন। এই ত সবাই রয়েছেন জাজ্বল্যমান। চোঙা চোঙা সন্দেশ, কড়া কড়া দুধ, পোলাওরা খান। একটি ভাইপো। মুখে বাতি দিতে কেউ নেই। না খেতে পেয়ে মরণের দশা হয়েছে তার। কই হাত তুলে তো একমুঠি কেউ দেয় না। হারামজাদা,

গিয়ছিলি কোথায় রে? একরত্তি ছেলের আবার রাগ দেখ না?"

গোপাল একছুটে মার কাছে গিয়া বলিল, "জ্যাঠাবাবুর কথা।" ছোট বউ বিমলা অনেক সহ্য করিয়া আসিতেছিল। আর সহ্য করিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিনোদিনী সকল কথা শুনিয়া তাহার মুরব্বিয়ানা চালেই বলিল,—"বলেছিলুম তো এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। তা সে ছোঁড়াটি কি শোনে? তা যাই হোক এর মধ্যে আপনার লোক আছে আমি বেশ বুঝতে পারছি। সমস্ত বিক্রী করিয়েও সুখ হল না। জেলে না দিলে বাড়ীটা নেওয়া সুবিধে হবে কেন?"

বিমলা মাতার কথা বড় ভাল বলিয়া মনে করিল না। বলিল, "দেখ মা, তুমি বড় ঠাকুরের দোষ দাও কেন, বলতো? যে নিজে নিজের সর্বনাশ করে বসল, সে হল না দোষী—দোষী হল তার ভাই—যে ভাই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এখন বড় ঠাকুর ছাড়া উপায় কি? যা তো গোপাল তোর জ্যাঠামাকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো।"

বিনোদিনী ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল, "রাখ রাখ, তোর টস রাখ। আমি গোপালকে কিছুতেই যেতে দোব না। ভায়ের মত শত্রুর কি আর আছে? সব ওরই কারসাজি।"

মাতায় কন্যায় বিষম কলহ হইল। কিন্তু বিমলার প্রাণ পুড়িতেছিল। সে মাতার তিরস্কার গঞ্জনা উপেক্ষা করিয়া বড় বউ কমলার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

[ক্রমশঃ

সেথা ও হেথা

—শ্রীবীরাচার্য্য

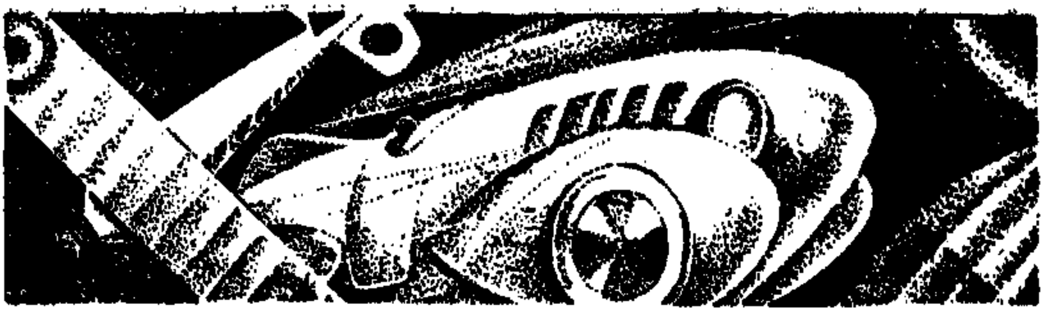
সেথা, কামানে বিমানে চলে অবিরাম
গর্জ্জন খুনোখুনি;
মঞ্চে মঞ্চে বক্তৃতা হেথা
কণ্ঠ গরজে শুনি।

সেথা ফরোয়ার্ড লাগি যুঝে সব জাতি
হেথা ফরোয়ার্ড ব্লক
ইঙ্গ-ফরাসী মিলিয়াছে সেথা
হেথায় সুভাষ-হক।

সেথা, জাতির জন্য সব দেয় সবে
তহবিল করি ফাঁকা
হেথা মহাজাতি-সদনের লাগি
ভিক্ষা লক্ষ টাকা।

সেথা, দেশের লাগিয়া মন্ত্রী ছাড়িছে
নিজ পদ হেলা ভরে
হেথা মারামারি চুরি জুয়াচুরি
অন্ডারম্যানি তরে।

যুদ্ধ বেধেছে হেথা ও সেথায়
(তবে) গতিটা উল্টা দাদা,
বিদেশীরে সেথা বোমা ছুড়ে মারে
স্বদেশীরে হেথা কাদা।



বিজ্ঞান জগৎ

পৃথিবীর উত্তাপ কি বাড়িতেছে?

—শ্রীদেবেশচন্দ্র রায়

উত্তর-মেরু অভিযানের ফলে কতকগুলি ঘটনা অদ্ভুত ভাবে আমাদের চোখের সম্মুখে প্রকট হইয়াছে। তুষারের সীমারেখা সরিয়া আরও উত্তরদিকে আগাইয়া গিয়াছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এই সীমা অক্ষাংশ ৭২° পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মাছ, পাখী ইত্যাদির বিচরণ-সীমা ক্রমে ক্রমে উত্তরদিকে সরিয়া যাইতেছে—ইহাতে মনে হয় মেরুপ্রদেশের উত্তাপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং এই প্রশ্ন উঠে যে, তবে কি সারা পৃথিবীর গড়পড়তা উত্তাপ বাড়িয়া চলিয়াছে? যদি তাহাই হয় তবে ইহার কারণই বা কি? আমরা ঘটনাগুলি একে একে বিবৃত করিব।

আজকাল সোভিয়েট রাশিয়া হইতে মেরু-অভিযান খুবই সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রুশ বৈজ্ঞানিকগণ মেরুপ্রদেশে বিভিন্ন স্থানে গবেষণাগার, বেতার ষ্টেশন, মানমন্দির ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন, কাজেই মেরুপ্রদেশ হইতে যে-সব তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, তাহা অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য এবং অধিকন্তু ব্যাপক।

মেরুপ্রদেশের এই তাপবৃদ্ধি সম্বন্ধে বিজ্ঞান-জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করেন প্রথমে অধ্যাপক নিপোভিচ (N. M. Knipovich)। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেন যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে বেরেণ্টস্ সাগরের (Berents Sea) তাপ যাহা ছিল, তদপেক্ষা অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিগত কয়েক বৎসরের অনুসন্ধানের ফলে এই তাপবৃদ্ধি আরও স্পষ্টভাবে প্রকট হইয়াছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে নোভায়া জেমলিয়াতে (Novaya Zomlya) গ্রীষ্মকালের তাপ তথাকার স্বাভাবিক তাপ অপেক্ষা ১০° পরিমাণ উপরে উঠে। একই সময়ে লেনিনগ্রাডে সর্ব্বোচ্চ তাপ তথাকার একটি স্মরণীয় ঘটনা হইয়া রহিয়াছে।

বিগত কুড়ি বৎসর যাবৎ উত্তর-রাশিয়ায় শীত অনেক কম পড়িতেছে। বরফাবৃত নদীগুলি অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র গলিয়া যাইতেছে—গ্রীষ্মের পাখীগুলি তাহাদের স্বাভাবিক সময়ের কিছু পূর্ব্বেই আসিতেছে—গ্রীষ্মের ফুল তাড়াতাড়ি ফুটিতেছে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের সোভিয়েট অভিযানে দেখা গিয়াছে, মেজেনে (Mezen) তুষার-সীমা প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তরে সরিয়া গিয়াছে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে 'নিপোভিচ' নামক একটি ক্ষুদ্র গবেষণা-পোত মেরু-অভিযানে রওয়ানা হয় এবং ফ্রাঞ্জ জোসেফ ল্যাণ্ড-এর (Franz Joseph Laud) চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। মেরু-অভিযানে কোন জাহাজ ইতিপূর্ব্বে এতদূর যাইতে পারে নাই।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের অভিযান আরও উত্তরে যাইতে সমর্থ হয়। সেই বৎসর 'সাডকো' (Sadko) নামক একটি জাহাজ নোভায়া জেমলিয়ার উত্তরসীমা অতিক্রম করিয়া অক্ষাংশ প্রায় ৮৩° পর্য্যন্ত পৌঁছায়। তখন পর্য্যন্ত জাহাজে করিয়া এতটা পাওয়া যাইবে, তাহা লোক কল্পনাই করিতে পারে নাই।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে গ্রীনল্যাণ্ডে গ্রীষ্ম অপেক্ষাকৃত প্রখর ছিল এবং একই বৎসর লেনিনগ্রাডেও জুন মাসে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল।

এই তাপবৃদ্ধি শুধু উত্তর-মেরুতে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র কম-বেশী চলিতেছে। উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধেও বায়ুমণ্ডলের তাপ গড়ে খানিকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কি জন্য এরূপ ঘটিতেছে—কারণ এখনও নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

অবশ্য এজন্য উষ্ণ স্রোত (Gulf Stream) খানিকটা দায়ী হইতে পারে—কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নয়, কারণ, দক্ষিণ গোলার্দ্ধেও অনুরূপ বৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে।

বস্তুতঃ পৃথিবীর স্বাভাবিক আবহাওয়ার খানিকটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে—বায়ু চলাচলের স্বাভাবিক গতি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উষ্ণ স্রোত উষ্ণতর হইয়াছে।

এখন যতটা মনে হয়, বাহিরের কোন প্রভাব ব্যতিরেকে এরূপ সামান্য পরিবর্ত্তনও ঘটা সম্ভব নয়। পৃথিবীর উপর তাপ-সম্পর্কিত প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সূর্য্যের। কাজেই আমরা অন্ততঃ এইটুকু ভাবিতে পারি যে, সূর্য্যের প্রভাবেই পৃথিবীর তাপ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা দুই প্রকারে ঘটিতে পারে—সূর্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাপ বিকীর্ণ করিতেছে, অথবা পৃথিবী আপতিত তাপ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শুষিয়া লইতেছে। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ প্রক্রিয়ার জন্য তাপ বাড়িতেছে, তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় বলা সম্ভব নয়।

এইরূপে কতদিন তাপ বাড়িয়া চলিবে—বাড়িয়া চলিতেই থাকিবে কি না—না, কোন এক সীমায় পৌছিয়া তারপর কমিতে থাকিবে, তাহাও আমরা জানি না। এইরূপ হওয়াও খুব অস্বাভাবিক নয়, কারণ কার্য্যকারণ আলোচনা করিয়া আমরা যতদূর বুঝিতে পারি—তাহাতে মনে হয় যে, প্রায় তিন চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে গ্রীষ্মের তাপ বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল।

এই বিষয়ের সঠিক সমাধানের জন্য বহু বৎসর ধরিয়া তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

বিষাক্ত গ্যাস এবং ইহার ক্রমবিকাশ

আধুনিক যুদ্ধে জয়-পরাজয় যতটা নির্ভর করে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের সংখ্যা, বীরত্ব এবং কর্ম্মঠতার উপর, ঠিক ততটা নির্ভর করে দেশের বেসামরিক নাগরিকবৃন্দের কর্ম্মতৎপরতার উপর। পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক, শিল্পে মজুর, ডকে শ্রমিক, জাহাজে নাবিক এবং গ্রামে চাষীরা যদি আপন আপন কাজে নিরত থাকিয়া সমরোপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরোক্ষভাবে সমরায়োজনে সাহায্য না করে, তবে সংগ্রাম চালনা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং শত্রুপক্ষের যতটা আক্রোশ থাকে সৈনিকদের উপর, ততটা আক্রোশই থাকে কর্ম্মতৎপর নাগরিকের উপর এবং এই আক্রোশ চরিতার্থ করার প্রকৃষ্টতম উপায় গ্যাস-আক্রমণ। কাজেই বহু দেশে গ্যাস-আক্রমণের সম্ভাবনা বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে এবং যুদ্ধঘোষণার পূর্ব্বে সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি রণসম্ভার প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস-আক্রমণের প্রতিষেধকের কথাও সম্যক্ চিন্তা করিতে হয়।

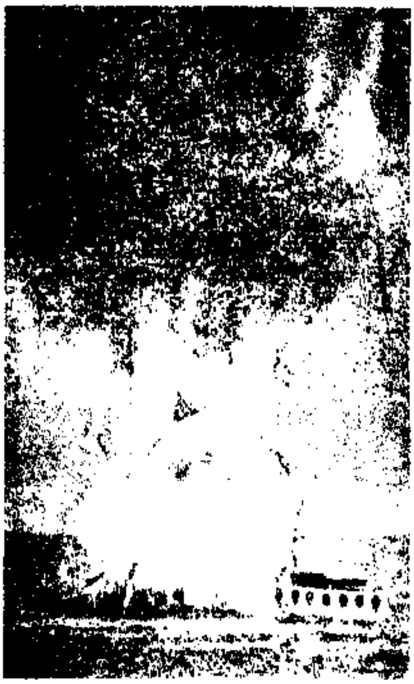
১৯১৪-১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধ আরম্ভের কিছুকাল পরেই উভয়পক্ষ বুঝিতে পারিল যে, যুদ্ধ বহুকাল চলিবে। সুতরাং লোকক্ষয় কমাইবার উদ্দেশ্যে উভয় দলই সুইস্-সীমান্ত হইতে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পরিখা খনন করিয়া ইহার ভিতর হইতে ধীরে ধীরে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল।

এদিকে মিত্রপক্ষ জার্ম্মাণদের ব্যবসা-বাণিজ্য আটক করিবার জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। জার্ম্মানরা অনন্যোপায় হইয়া যুদ্ধনীতিতে অশ্রুতপূর্ব্ব নিষ্ঠুরতম পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিল। বেপরোয়াভাবে তাহারা জাহাজের উপর টর্পেডো-আক্রমণ শুরু করিল এবং স্থলে ব্যাপকভাবে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ সুরু করিল।

প্রথম আক্রমণের ভীষণতা এবং আকস্মিকতা এতই মারাত্মক হইয়াছিল যে, সমর-বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথম হইতে এই আক্রমণ আরও ব্যাপকভাবে আরম্ভ করিলে মহাযুদ্ধের ফলাফল হয় তো বিপরীত হইত।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল যুদ্ধের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। সেইদিন জার্ম্মানরা ফরাসী সীমান্তে সর্ব্বপ্রথম গ্যাস ব্যবহার করে।

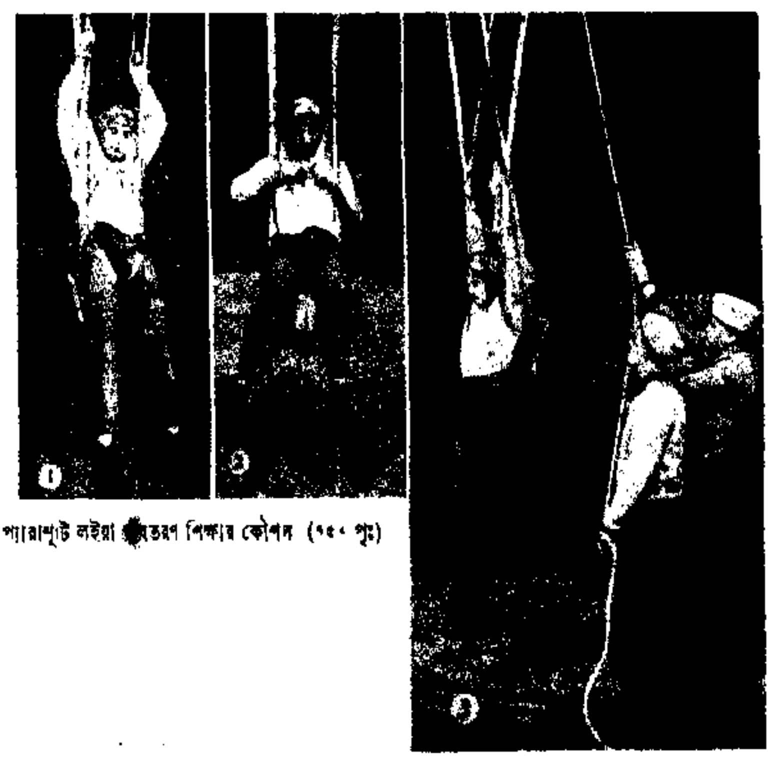
প্রথমে ভীষণভাবে বোমাবর্ষণ করিয়া তাহারা পরিখার ভিতর হইতে গ্যাস ছাড়িতে সুরু করে। বিমান-পর্য্যবেক্ষক দেখিতে পায়, শত্রুপক্ষীয় পরিখা হইতে হলুদ বর্ণের ধোঁয়া বাহির হইতেছে। কি হইয়াছে প্রথমে বুঝা গেল না, ধুমের



মাইন-বিস্ফোরণে নকল জাহাজের অবস্থা (৭৫২ পৃঃ)



যুদ্ধজাহাজে রক্ষিত মাইন : এই জাহাজের সাহায্যে মাইন পাতা হয় (৭৫২ পৃঃ)



প্যারাশ্যুট লইয়া অবতরণ শিক্ষার কৌশল (৭৫০ পৃঃ)



মাইন-ধ্বংসী জাহাজের বহর (৭১০ পৃঃ)



স্বচ্ছ মুখোস (৭০৫ পৃঃ)



অবতরণের উপযোগী হেলিকপ্টার (৭০৫ পৃঃ)



নূতন ধরণের গ্যাস-মুখোস (৭০৫ পৃঃ)

আড়ালে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। মিত্রপক্ষীয় সৈনিকগণ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সেই বায়বীয় বিষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের উপর ইহার ক্রিয়া এতই ভীষণ আকার ধারণ করিল যে, এক ঘণ্টার ভিতর সমস্ত সৈনিক মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইল, এবং অগত্যা কালবিলম্ব না করিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে স্থান ত্যাগ করিতে হইল।

এই ঘটনার দুইমাস পর রুশ-জার্মান সংঘর্ষে জার্মানগণ রুশ-সেনাবাহিনীর উপর গ্যাস প্রয়োগ করে। মাত্র আধ-ঘণ্টাব্যাপী আক্রমণের ফলে যুদ্ধক্ষেত্রেই পাঁচ হাজার সৈনিক নিহত হয় এবং সর্ব্বসমেত হতাহতের সংখ্যা ত্রিশ হাজারেরও উপরে উঠে।

আক্রমণের প্রথম পর্ব্বের ফলাফল দেখিয়া উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং উভয় পক্ষই ব্যাপকভাবে আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ক্যানেস্তারা হইতে সীসার নলের ভিতর দিয়া উভয় পক্ষের পরিখার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া হইত এবং অনুকূল বাতাস উহা শত্রুশিবিরে বহন করিয়া লইত।

তার পর ক্রমে ক্রমে গ্যাস প্রয়োগের উন্নততর উপায় আবিষ্কৃত হয়। কামানের গোলার ভিতর তরলীকৃত গ্যাস পুরিয়া কামান ছোঁড়া হইত। বোমা ফাটিলে অভ্যন্তরস্থ গ্যাস চাপমুক্ত হইয়া বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িত। কাজেই বোমার লক্ষ্য অব্যর্থ হওয়ারও কোন প্রয়োজন ছিল না—নিকটস্থ কোনও স্থানে ফাটিলেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইত। এই কৌশল এতই কার্য্যকরী হইয়াছিল যে, জার্ম্মান সেনানায়ক লুডেন-ডর্ফের আপন স্বীকৃতি হইতে আমরা জানিতে পাই, যুদ্ধের শেষ দিকে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ কেবল গ্যাস-বোমা ব্যবহার করিয়াছিল।

ক্রমে ক্রমে গ্যাস-আক্রমণের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে ধারণা সকলেরই দৃঢ় হয়। সব দেশেই উহা প্রয়োগের আরও উন্নততর উপায়ের সন্ধান চলিতে থাকে। এইরূপে বর্ত্তমানে গ্যাস-আক্রমণের বিভীষিকা নিরীহ অধিবাসীদের নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধে, স্পেনের গৃহযুদ্ধে এবং চীন-জাপান সমরে ইহার চরম নিষ্ঠুরতার কাহিনী আরও দৃঢ় হইয়াছে। এমন কি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহুদূরে ভারতবর্ষে থাকিয়াও যে আমরা নিরাপদ নহি, তাহার প্রমাণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের মহড়া। বিমানের এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, দুই তিন হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থানও উহার আক্রমণলীলা হইতে অব্যাহতি পাইবে এরূপ ভরসা খুবই কম। কে জানে কখন কোন্ সুদূর শত্রুশিবির হইতে উড্ডীয়মান দানব আসিয়া মৃত্যুর বীজাণু ছড়াইয়া যাইবে। কাহারও কাহারও ধারণা পশ্চিম-ভারতের শহরগুলিতে কোন সময় এই জাতীয় আক্রমণ শুরু হওয়া আশঙ্কার বাহিরে নয়।

এখন যুদ্ধে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গ্যাস ব্যবহৃত হয়, সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। এই বিভিন্ন গ্যাসের উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়াও বিভিন্ন।

একপ্রকার গ্যাস আছে,—ইহা মানুষের জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। কার্ব্বন মনোক্সাইড (carbon monoxide) এই শ্রেণীর গ্যাস। উহা রক্তের সঞ্জীবনী শক্তি বিকল করিয়া দেয়। অক্সিজেনের প্রাচুর্য্যও মানুষকে এই গ্যাসের বিষক্রিয়া হইতে রক্ষা করিতে পারে না। কারণ যেখানে রক্ত বিকল—অক্সিজেন গ্রহণে অপারগ, সেখানে অক্সিজেন নিষ্ক্রিয়।

আবার হাইড্রোসায়নিক এসিড গ্যাসের ক্রিয়া টিস্যু-সমূহের উপর—উহা টিস্যুগুলিকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। এই ক্ষেত্রে নিশ্বাসে প্রচুর অক্সিজেন গ্রহণ, রক্তে অক্সিজেন থাকা সত্ত্বেও মানুষ অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিগত মহাযুদ্ধের শেষভাগে ফরাসীরা জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোসায়ানিক-এসিড (hydrocyanic acid) গ্যাস ব্যবহার করিয়া বেশ সুফল পায়।

আবার কতকগুলি গ্যাস আছে যাহা মানুষের শরীর অথবা শ্বাস-যন্ত্রের উপর মারাত্মক প্রদাহ সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ দম আটকাইয়া মারা যায়। ক্লোরিন (chlorine), ফসজিন (phosgene), ডাই-ফসজিন (di-phosgene), সায়ানোজেন ক্লোরাইড (cyanogen chloride), ক্লোরোপিক্রিন (chloropicrin) ইত্যাদি এবং আরও অনেক ক্লোরিন ঘটিত গ্যাস এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

ক্লোরিন কিম্বা ফসজিন গ্যাস বায়ুর মধ্যে লক্ষে চারি ভাগ পরিমাণ মিশ্রিত থাকিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। মহাযুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে গ্যাস ব্যবহারের ইতিহাস এইপ্রকার ক্লোরিন জাতীয় গ্যাসেরই ইতিহাস।

আর এক প্রকার গ্যাস আছে, যাহা সামরিক কৌশলের দিক্‌ হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উহার কাজ মানুষকে সাময়িক ভাবে অন্ধ করিয়া দেওয়া। মাষ্টর্ড গ্যাস (mustord gas), ব্রোম-এসেটোন (bromacetone) এবং অন্যান্য ব্রোমিন-সংযুক্ত গ্যাসই ইহাদের মধ্যে প্রধান। মাষ্টর্ড গ্যাসের আর একটী ধর্ম্ম এই যে, উহা চামড়ার উপর গুরুতর প্রদাহ সৃষ্টি করে—ফলে মানুষ বহুকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

আর্সেনিক-সংযুক্ত কতকগুলি গ্যাস আছে, ইহাদের সরাসর কোন বিষক্রিয়া নাই। ইহাদের অধিকাংশই কঠিন পদার্থ—বোমা ফাটিলে ঐ কঠিন পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণা ধূম্রজালের মত বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। এই পদার্থকণা এতই সূক্ষ্ম যে, অনায়াসেই ইহারা গ্যাস-মুখোস ভেদ করিয়া নাকের ভিতর প্রবেশ করে এবং তথায় ঈপ্সিত প্রদাহ সৃষ্টি করে——ফলে ভয়ানক হাঁচির উদ্রেক হয়—কাজেই মুখোস পরিধান অসম্ভব হইয়া উঠে। এই সুযোগে অন্যান্য মারাত্মক গ্যাস তাহাদের অভীষ্টসাধন সুরু করে। ফলাফল সহজেই অনুমেয়।

গ্যাস-যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব্বে যখন আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য মুখোসের প্রচলন শুরু হয়—সেই সময় মুখোসকে অকর্ম্মণ্য করিবার জন্য এই কৌশল আবিষ্কার হয়।

আর এক শ্রেণীর গ্যাস আবিষ্কৃত হইয়াছে—ভবিষ্যতে ইহার প্রচার বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। ইহারা পারদ-সংযুক্ত পদার্থ। পেট্রোলের সঙ্গে মিশাইয়া ইহা ছিটাইয়া দেওয়া হয়—উহার ক্রিয়া বরাবর মারাত্মক নয়—মর্ম্মান্তিক। উহার ক্রিয়া মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর। কিছুক্ষণ নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করার পর মানুষ উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকে। ইহাকেই বলে আধুনিক রাজনীতি—নিষ্ঠুরতা এড়াইবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে মানুষের প্রাণ হরণ না করিয়া পরোক্ষভাবে প্রাণহানি ঘটায়।

সৈনিকদিগকে ছত্রভঙ্গ করাইবার জন্য কয়েক প্রকার দুর্গন্ধ গ্যাস ব্যবহার করা হয়। ইহাদের দুর্গন্ধ এতই অসহ্য যে, মানুষকে বাধ্য হইয়া পলাইতে হয়—নতুবা সর্ব্বদা মুখোস পরিধান করিয়া থাকিতে হয়। মুখোস পরিয়া থাকাটা স্বভাবতই আরামদায়ক নয়—এবং মুখোস-পরা অবস্থায় নিঃশ্বাস টানা বেশ কষ্টকর। কাজেই মানুষ সময় সময় অসাবধান হইয়া পড়ে—এবং অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস ছড়াইয়া এই অসাবধানতার সুযোগ শত্রুপক্ষ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে।

উল্লিখিত গ্যাসগুলির মধ্যে মাষ্টর্ড গ্যাস সর্ব্বাপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী হয়। একবার ছড়াইয়া রাখিলে তাড়াতাড়ি উড়িয়া যায় না—কাজেই এই গ্যাসের এক অদৃশ্য প্রাচীর খাড়া করিয়া উহার আড়ালে কিছুকাল নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করা যায়—শত্রুপক্ষ সেই স্থান অতিক্রম করিয়া আসার চেষ্টা করিলে অনিবার্য্য ফলভোগ করিয়া থাকে। এই প্রকার গ্যাস-দুর্গ রচনা করিয়া অল্প ব্যয়ে অধিকতর নিরাপত্তায় অবস্থান করা যায়। আত্মরক্ষার এই বৈজ্ঞানিক উপায় বিগত যুদ্ধের সময় অনুসৃত হইয়াছিল।

এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের বিষাক্ত গ্যাস আবিষ্কারের সহিত পা ফেলিয়া দেশে দেশে আত্মরক্ষার নূতন নূতন উপায়ও আবিষ্কৃত হইতেছে। গ্যাস-মুখোসের কি ভাবে আরও উন্নতি করা যায়, সে-চেষ্টারও বিরাম নাই। ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, ফরাসী দেশ ইত্যাদিতে কোটী কোটী পাউণ্ড খরচ হইতেছে—গ্যাস-মুখোস তৈরী করার জন্য এবং অল্প মূল্যে জনসাধারণের নিকট বিতরণের জন্য।

কোটী কোটী পাউণ্ড ব্যয়ে প্রাণনাশের জন্য বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র তৈয়ারী হইতেছে, উহা দ্বারা প্রচুর লোকক্ষয়ের পর আবার কোটী কোটী পাউণ্ড খরচ হইতেছে—উহার প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য। এই ভাবেই বেকার-সমস্যার ইউরোপীয় সমাধান হইতেছে।

মাইন-যুদ্ধ

যুদ্ধে মাইনের ব্যবহার মোটেই নূতন নয়—তবে ইদানীং উহার ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বহু কাল হইতেই শত্রু-পক্ষীয় জাহাজের গতিরোধ করিবার জন্য মাইনের ব্যবহার হইতেছে। অধুনা আত্মরক্ষার অস্ত্র-হিসাবে উহা বিশেষ উপযোগিতা অর্জ্জন করিয়াছে।

শত্রু-পক্ষীয় জাহাজ যাহাতে বন্দরে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই জন্য উপকূলের নিকট মাইনের বেড়াজাল পাতা হইয়া থাকে। নিজেদের জাহাজ যাহাতে নিরাপদে যাতায়াত

করিতে পারে, সেই জন্য মাঝে মাঝে চোরা-পথ থাকে। আবার উপকূলেও বিভিন্ন স্থানে সারিবদ্ধ ভাবে কামান সাজান থাকে। মাইন এবং উহার পশ্চাতে কামান—এতদুভয়ের সাহায্যে শত্রুর গতিরোধ করা হয়।

আক্রমণাত্মক অস্ত্র-হিসাবেও আজকাল মাইনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাহাজ হইতে শত্রুপক্ষের গমনাগমনের পথে মাইন পাতিয়া দেওয়া হয়—যাহাতে শত্রু-জাহাজ নিজেদের পোতাশ্রয়ের বাহিরে যাতায়াত না করিতে পারে। এই পন্থা মোটেই নিরাপদ নয় বলিয়া আরও উন্নত প্রণালীতে এই কাজ সাধিত হইতেছে।

মাইন-বাহী বিমান হইতে প্যারাশ্যুট বাঁধিয়া আকাশ হইতে সমুদ্রের উপর—নদীর মোহানায় মাইন ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে—অথবা ডুবোজাহাজ গিয়া মাইন পাতিয়া আসিতেছে।

এই পন্থার মহা অসুবিধা এই যে, একসঙ্গে কয়েকটী মাত্র মাইন বহন করিয়া লইয়া যাওয়া চলে—কাজেই মাইন-যুদ্ধে সাফল্যলাভের অত্যাবশ্যক আনুষঙ্গিক অঙ্গ প্রচুর পরিমাণে বিমান কিংবা সাবমেরিন থাকা। ভরসার কথা এই যে, যুধ্যমান জাতিগুলির এই সম্পর্কে প্রাচুর্য্যের অভাব কাহারও নাই। কাজেই অসুবিধার বিশেষ কারণ নাই।

উদ্দেশ্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মাইন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আত্মরক্ষার্থ উপকূলের নিকট যে-সকল মাইন পাতা হয়, ইহাদের সহিত উপকূলের বৈদ্যুতিক যোগ থাকে। স্বপক্ষীয় জাহাজ নির্ব্বিবাদে ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আসিতে পারে। এমন কি সংঘর্ষেও উহাতে বিস্ফোরণ হয় না।

উপকূলে লুকায়িত স্থানে ছোট ছোট পর্য্যবেক্ষণ-ঘাঁটী থাকে। তাহাতে দূরবীণ হাতে করিয়া সৈনিকগণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে। দূর হইতে কোন শত্রুপক্ষীয় জাহাজ দেখিতে পাইলে অতি সন্তর্পণে উহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাকে। মাইনের এলাকায় ভিতর আসিলে বৈদ্যুতিক সুইচ টিপিয়া দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। অতঃপর জাহাজটীর অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়।

একে একে অথবা প্রয়োজনবোধে এক সঙ্গে কতকগুলি মাইনেই বিস্ফোরণ ঘটান যায়। এক একটী মাইনে প্রায় দুই মণ পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ থাকে। ছোট ছোট জাহাজে করিয়া এই মাইনগুলি পূর্ব্বাহ্নে পাতিয়া রাখা হয়। একবার বিস্ফোরণের পর আবার সেখানে মাইন পাতিয়া রাখা হয়। এই সকল মাইনের অবস্থান এবং পর্য্যবেক্ষণ-ঘাঁটী সমূহের খুঁটিনাটী অতি সন্তর্পণে সাধারণের নিকট গোপন রাখা হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকায় একটী নকল জাহাজের উপর বিস্ফোরণের ফলাফল জনসাধারণের নিকট প্রদর্শিত হইয়াছিল।

আর এক প্রকার মাইন আছে, উহা জাহাজের সহিত সরাসর সংঘর্ষে বিস্ফোরিত হয়। উহা পাতা হইয়া থাকে নোঙ্গরের সাহায্যে। এক একটি নোঙ্গরের সহিত উহা শিকল দিয়া বাঁধা থাকে বলিয়া উহা জলের নীচে যে কোন স্থানে স্থাণু অবস্থায় অপেক্ষা করিতে থাকে। উহা রক্ষণভাগে নিজেদের উপকূল রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং আক্রমণভাগেও শত্রুর বহির্গমনের পথ ইহা দ্বারা রোধ করা হয়।

তা ছাড়া, আরও কয়েক প্রকার মাইন আছে—যেমন, এন্টিনা মাইন (antenna mine), লিয়োন মাইন (Leon mine) এবং জার্ম্মানরা আজকাল ব্যবহার করিতেছে চুম্বক-মাইন (Maganetic Mine)।

আজকাল আর এক প্রকার শব্দভেদী মাইনের কথা শুনা যাইতেছে। উহার লক্ষ্য অব্যর্থ এবং এক একটীতে থাকে প্রায় সাড়ে তিন মণ উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ (টী. এন. টী)।

'হর্ণ'-মাইনে বাহির হইয়া থাকে ছোট ছোট কয়েকটি সীসক-শলাকা, জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগিলে ভিতরের একটি কাচের পাত্র ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহাতে রক্ষিত বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ ছড়াইয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ বিস্ফোরণ হয়।

এন্টিনা মাইন হর্ণ-মাইনেরই অনুরূপ, কিঞ্চিৎ উন্নত ধরণের। উহা হইতে একটি তামার তার উপর দিকে খাড়া হইয়া থাকে। কোন জাহাজের সহিত স্পর্শেই বৈদ্যুতিক সংযোগ সাধিত হইয়া বিস্ফোরণ ঘটিয়া থাকে।

এই এন্টিনা মাইনই ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মানীর যথেষ্ট

সাবমেরিন-আক্রমণ আয়ত্তের ভিতর আনিয়াছিল। মিত্র-শক্তি স্কটল্যাণ্ড হইতে নরওয়ে পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সমুদ্রে প্রায় সত্তর হাজার মাইন পাতিয়া বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। ব্রিটিশ নৌবিভাগের এবারেও গ্রেট-ব্রিটেনের চতুর্দ্দিকে প্রায় দুই লক্ষ মাইনের এক বেড়াজাল সৃষ্টি করার পরিকল্পনা আছে বলিয়া প্রকাশ।

চুম্বক-মাইন কৌশল এবং কার্য্যকারিতায় এই সবগুলিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। বিস্ফোরণের জন্ত উহার সহিত সান্নিধ্যের কোন প্রয়োজন হয় না। আমরা জানি, লোহার সান্নিধ্যে সূচীচুম্বক উহার দিক্ পরিবর্ত্তন করে। চুম্বকের ঠিক এই বিশিষ্ট ধর্ম্মের সুযোগ লইয়া চুম্বক-মাইন আবিষ্কৃত হইয়াছে। লৌহনির্ম্মিত জাহাজ উহার নিকটে আসিলেই বিস্ফোরণ হয়।

সুইডিশদের আবিষ্কৃত লিয়োন মাইন আরও বিপজ্জনক এইজন্ত যে, উহাকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্ত কোন নোঙরের দরকার হয় না। আপনা হইতেই উহা জলের নীচে ভাসিতে থাকে এবং সংলগ্ন কোন রজ্জু না থাকাতে মাইন-ধরা কৌশলে উহা ধরা পড়ে না। বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন প্রপেলার উহাকে জলের অনেক নীচে ভাসাইয়া রাখে—অবশ্য ব্যাটারীর বৈদ্যুতিক শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে উহার ক্ষমতাও নষ্ট হইয়া যায়।

তারপর আসিল শব্দভেদী মাইন, উহা রেডিও সাহায্যে চালিত হয় এবং জাহাজের শব্দ লক্ষ্য করিয়া উহার পিছনে ছুটিয়া গিয়া সংঘর্ষ বাধায়। কাজেই উহার লক্ষ্য অব্যর্থ। কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্যাবধি উহা ব্যবহৃত হয় নাই, হইলে কি ঘটিবে তাহা দেখিবার জন্ত সাধারণে অপেক্ষা করিতেছে। শুনা যাইতেছে, উহা যুগপৎ সাবমেরিন, জাহাজ এবং বিমান, এই তিন শত্রুকেই প্রতিহত করিতে সমর্থ হইবে।

উহার খুঁটিনাটী সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে, তাহা মোটামুটি এইরূপ। উহা একটি স্বয়ংচালিত বোমা। উহাতে দুইটি ক্ষুদ্রকায় বেতার প্রেরক-যন্ত্র আছে এবং একটি গ্রাহক-যন্ত্র আছে। দুইটি প্রেরক-যন্ত্র হইতে দুই প্রকার সঙ্কেত প্রেরিত হয়। অপর একটি গ্রাহক-কৌশলে প্রথম লক্ষ্যের অবস্থান, দূরত্ব এবং গতি মোটামুটিভাবে নির্ণয় করা হয়। অতঃপর এই বোমাটি লক্ষ্যের দিকে ছোঁড়া হয়। চলন্ত বোমাটি বেতার-সঙ্কেত প্রেরণ করিতে থাকে। কতকগুলি সঙ্কেত লক্ষ্য হইতে প্রতিফলিত হইয়া গ্রাহক-যন্ত্র ধরা পড়ে। এই গ্রাহক-যন্ত্রটী আবার সঙ্কেতের তারতম্য অনুসারে তৎস্থিত হাল নিয়ন্ত্রিত করে। এইরূপে বোমাটির গতি আপনা হইতেই পরিবর্ত্তিত হয় এবং যথাসময়ে গিয়া লক্ষ্যের উপর আঘাত করে।

জাহাজ ধ্বংস করিবার জন্ত মাইনের নানাপ্রকার কৌশল আজ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে – আমরা তাহার আলোচনা করিলাম। আরও হয় তো কত কৌশল আছে, যাহা আমাদের অবিদিত। ব্যবহৃত হইয়া সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ হইলে আমরা জানিতে পারিব।

ইহার পরে যে-প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে, তাহা এই—শুধু মাইনের সাহায্যেই শত শত বৎসরের প্রয়াসে গঠিত প্রকাণ্ড নৌশক্তি বিনষ্ট করা কি সম্ভব? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের আশা এখনও আমরা করিতে পারি না। মাইনের অসম্ভব শক্তি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এপর্য্যন্ত যাহা দেখা যায়, আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার কৌশল আক্রমণাত্মক কৌশলকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

শত্রুপক্ষের পাতা মাইন পরিষ্কার করা খুবই বিপদসঙ্কুল কাজ। কিন্তু বৃহত্তর বিপদ এড়াইবার জন্ত এই বিপদ বরণ করিয়া লইতেই হয়। ছোট ছোট দুইটী জাহাজে শিকল বাঁধিয়া জাল টানার মত শিকল টানিয়া লওয়া হয়। মাইন-সংলগ্ন শিকলে এই শিকল আটকাইয়া গেলে জাহাজে ইহার কম্পন অনুভূত হয়। তখন বিশেষ এক প্রকার বৃহদাকার কাঁচির দ্বারা শিকলটা কাটিয়া দেওয়া হয়—ফলে মাইন ভাসিয়া উঠে এবং তখন বন্দুক অথবা কলের কামানের গুলী দ্বারা উহাকে নষ্ট করা হয়।

এই দানবীয় মারণাস্ত্রের যুগে পৃথিবী এখনও শ্মশানে পরিণত হয় নাই—ইহার কারণ অস্ত্রেরও অস্ত্র মানুষের বুদ্ধিই আবিষ্কার করিতেছে।

প্যারাশুট লইয়া অবতরণ শিক্ষার ব্যবস্থা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নৌবিভাগীয় বৈমানিকদিগকে বিমান হইতে প্যারাশুট লইয়া জলে অবতরণ করিবার কৌশল শিক্ষা দিবার জন্ত এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে—

মাটী হইতে কিছু উপরে ঠিক প্যারাশুটের ন্যায় দোলনা খাটান থাকে। শিক্ষার্থী একটী রজ্জু আঁকড়াইয়া ধরিয়া আসনে বসিয়া পড়ে। তারপর পায়ের এবং বুকের বন্ধন খুলিয়া দিয়া পিছন হইতে মাথার উপর দিয়া হাত ছুঁড়িয়া আসন হইতে খসিয়া পড়ে। কারণ প্যারাশুট গায়ে-বাঁধা অবস্থায় জলে লাফাইয়া পড়িলে দড়িতে হাত-পা জড়াইয়া ডুবিয়া মরার সম্ভাবনা আছে।

সরল গ্যাস-মুখোস

য়ুরোপে গ্যাস-মুখোসের চাহিদা এত বাড়িয়াছে যে, কারখানাগুলি আর দাবী মিটাইতে পারিতেছে না। একজন নাগরিক জরুরী ব্যবস্থার জন্য খুব সহজ সরল একটী গ্যাস-রোধক কৌশল উদ্ভাবিত করিয়াছেন। একটী কাঠের নলের মাথায় কাপড়ের থলির ভিতর কিছু পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য সংগৃহীত থাকে—এই নলের ভিতর দিয়া মুখে টানিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। বায়ু রাসায়নিক পদার্থের ভিতর দিয়া শোধিত হইয়া আসে। নাকে যাহাতে গ্যাস প্রবেশ করিতে না পারে সে জন্য অঙ্গুলী দ্বারা নাক চাপিয়া ধরা হয়।

স্বচ্ছ মুখোস

ছবিতে স্বচ্ছ মুখোস দেখা যাইতেছে—উহা মাথার উপর দিয়া গলাইয়া পরিধান করিতে হয়। ইহা গ্যাস-মুখোস নয়—শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাস হইতে আত্মরক্ষার জন্য পরিহিত হয়।

সৈনিকের উড়িবার ব্যবস্থা

নিউ ইয়র্কের জনৈক ব্যক্তি একটি অদ্ভুত রকমের হেলিকপ্টার (helicopter) উদ্ভাবিত করিয়াছেন। উহা একটি ছোট-খাট গ্যাসোলিন চালিত যন্ত্র—উপর দিকে খাড়া কাঠের আগে দুইটি পাখা (প্রোপেলার) আঁটা থাকে। পাখার তলায় একটী আসনে চালক বেশ আঁটিয়া বসিয়া থাকে এবং হাত-পা নড়াইয়া উহার গতি নিয়ন্ত্রিত করে। উদ্ভাবক আশা করেন, ইহার সাহায্যে সৈনিকগণ ছোট ছোট নদী, নালা, পাহাড় ইত্যাদি অনায়াসে ডিঙাইয়া যাইবে এবং প্রয়োজন হইলে শত্রুপক্ষের উপর তড়িৎ বেগে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিবে।

কুয়াশাভেদী যন্ত্র

কুয়াশার ভিতর দিয়া বৈমানিকদের দৃষ্টি ভূপৃষ্ঠ অবধি পৌঁছিতে পারে না, কাজেই কুয়াশার সময় চলিতে অসুবিধা হয়। অভিনব এক উদ্ভাবনের ফলে এই অসুবিধা দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উদ্ভাবক ইদানীং এক প্রদর্শনীতে তাঁহার এই কুয়াশাভেদী যন্ত্রের কার্য্যকলাপ প্রদর্শিত করিয়াছেন।

সাধারণ আলোকতরঙ্গ কুয়াশা ভেদ করিয়া চলিতে পারে না, কিন্তু অবলোহিত আলোক-তরঙ্গ কুয়াশাকণাগুলি ভেদ করিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। সুতরাং কোনপ্রকার অবলোহিত আলোক-গ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার করিয়া কুয়াশার উপর হইতে ভূপৃষ্ঠের অবলোহিত আলোকচিত্র গ্রহণ করা যায়। একপ্রকার আলোক-কাতর (photo-electric) সেলের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের চলচ্চিত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় রচিত নির্দ্দিষ্ট পটের উপর প্রক্ষিপ্ত করিয়া দেখা হয়।

চক্ষু পরীক্ষার যন্ত্র

চক্ষু-চিকিৎসক যাহাতে চোখের ভিতর পর্য্যন্ত বেশ ভালভাবে দেখিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন, সেই জন্য ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর হিলড্রেথ (Dr. Hildreth) একপ্রকার নূতন পারদ-বাষ্পপূর্ণ বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কার করিয়াছেন।

পারদ-বাষ্পের ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ অতিক্রম করিলে পারদ হইতে একপ্রকার সবুজ আলো নির্গত হয়। এই আলো চোখের মণি, এমন কি অভ্যন্তরস্থ পরদা (retina) ভেদ করিয়া শোণিতকোষগুলি চিকিৎসকের চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরে। কাজেই এই পরীক্ষায় অনিশ্চয়তার আর কোন স্থান থাকে না।

বাংলার সংস্কৃতিতে পুতুলশিল্পের স্থান

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

শিল্পানুশীলন অবকাশ সময়ের চিত্তবিনোদনের উপায়-বিশেষ এরূপ মনোভাব অযৌক্তিক। শিল্প-চর্চ্চার ভিতর কোনও গভীর বস্তু নাই, ইহাও আমরা বলিতে পারি না। আমরা নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, শিল্পসাধনা নরনারীর অন্তরে বিশুদ্ধ উর্ব্বরতা আনয়ন করিতে পারে। শিল্পানুশীলনে মানব সভ্যতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় নরনারীর চিত্তে উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগায়।

শিল্পের মধ্যে জাতির অতীত গৌরব-কাহিনী, জাতির অধ্যাত্মসাধনা ও জাতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত আছে। কোন্ ভাবধারা হইতে শিল্প উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়াছে, কিরূপে শিল্প পরিপুষ্ট হইয়া সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, কিরূপে শিল্প হইতে জাতির কৃষ্টিগত ক্রমোন্নতি হইল, এগুলির সমাধান শিল্পালোচনায় পাওয়া যাইতে পারে। এমন কি, বিভিন্ন যুগের জাতির সামাজিক অথবা ধর্ম্মগত সভ্যতা কিরূপ শিল্প দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে, তাহাও আমরা শিল্পের ঐতিহাসিক পর্য্যালোচনায় অবগত হইতে পারি।

অতি পুরাকাল হইতেই হিন্দু, গ্রীক ও চৈনিক শিল্প সমগ্র পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শিল্প-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে হিন্দু, গ্রীক ও চৈনিক শিল্পরচনার মনোভাব সম্পূর্ণ পৃথক্। গ্রীক জাতির শিল্পসাধনা সম্বন্ধে কেহ অবিদিত নহেন। চীন ও জাপানের শিল্পও সমগ্র পৃথিবীতে সুপরিচিত। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের অনুপ্রেরণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে শিল্পানুশীলন সামাজিক, ধার্ম্মিক, এমন কি দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাচীন ভারতের পণ্ডিতগণ সাহিত্য, দর্শন বা গণিতের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, শিল্পের ইতিহাস আলোচনায় সেরূপ প্রচেষ্টা দেখা যায় না। শুধু এই কারণেই আমরা ভারতবর্ষের শিল্পের মৌলিক কাহিনী অথবা মৌর্য্য-পূর্ব্ব যুগের শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছি না। মহেনজাদড়ো-যুগ হইতে মৌর্য্য-পূর্ব্ব যুগ পর্য্যন্ত তিন চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতীয় শিল্পের ধারা বা মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহাও অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

সমগ্র ভারতবর্ষের কথা বাদ দিয়া বাংলার শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়াও আমরা ঐ একই সমস্যায় পৌঁছাই—বাংলার শিল্পের ইতিহাসের অভাব। বাংলা দেশের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে যতখানি গবেষণা ও প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহার তুলনায় বাংলার শিল্প সম্বন্ধে কতখানি আলোচনা হইয়াছে? অথচ আমরা তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথের নিকট জানিতে পারি যে, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলায় বাংলার শিল্পীরা একটি নূতন শিল্পরচনার ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই নূতন শিল্পধারার প্রবর্ত্তকগণের প্রধান দুইজন হইতেছেন গৌড়ের বীতপাল ও ধীমান। ভারতের শিল্প-ক্ষেত্রে গৌড়ী শিল্প অপূর্ব্ব দান। পাল-যুগের অষ্টভুজা বা দশভুজা দুর্গা, হরগৌরী, তারা, সরস্বতী, সূর্য্য, বিষ্ণু, বুদ্ধ, কার্ত্তিকেয়, গণেশ প্রভৃতি মূর্ত্তির মত দেবতা-মূর্ত্তির অসাধারণ ভাবশুদ্ধ রূপ-প্রতীক সারা ভারতে কেন, সারা জগতে মিলে না। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়ম বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া বিদেশী পণ্ডিত-গণ বাংলার শিল্প-প্রতিভার পরিচয়ে বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন এবং নির্ব্বাকচিত্তে এ-গুলির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

তুর্কীদের আগমনের পূর্ব্বযুগে বঙ্গদেশের প্রাচীন মন্দির-গুলির বাস্তুশিল্প বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের বাংলার প্রস্তর ও ইষ্টকের তৈয়ারী বাস্তুশিল্পের নিদর্শন অবলম্বন করিয়া বাংলার গৃহশিল্পের ইতিহাস লেখা যাইতে পারে। মুসলমান রাজাদের সময়ে বাংলা দেশে প্রস্তরভাস্কর্য্য প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। তখন নূতন পোড়ামাটীর ভাস্কর্য্য আরম্ভ হইল।

অতীত কালে বাংলা দেশ ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য শিল্পে যেমন অসাধারণরূপে উন্নত হইয়াছিল, তেমনি মৃৎশিল্প, দারুশিল্প,

কারুশিল্প (আলিপনা, সূচীশিল্পের কাজ প্রভৃতি) পটশিল্প প্রভৃতি লৌকিক শিল্পেও গৌরবময় স্থান লাভ করিয়াছিল। বাংলার লৌকিক শিল্পের মৃৎনির্ম্মিত শিল্পকাজগুলির মধ্যে পুতুল শিল্পই সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়। কোন্ প্রাচীন যুগ হইতে মাটীর পুতুলের রচনা আরম্ভ হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। খুব সম্ভবতঃ মানব সভ্যতার আদিযুগে ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠার পর মানুষের ভিতর শিল্পের অনুপ্রেরণা জাগিয়াছিল। সম্ভবতঃ ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমোন্নতির যুগে মানুষ স্বভাবজাত সহজলভ্য মাটীকেই শিল্পের প্রধান উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। শিল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মাটীর পুতুলের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা দেশের পুতুল-শিল্পের নিদর্শন পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায়, একটা অন্তর্নিহিত গূঢ় অভিপ্রায়ের সন্ধানেই শিল্পীরা এগুলির রচনা করিতে আরম্ভ করেন। বোধ হয়, শিশুর মনোবিকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া পুতুল-ক্রীড়ার উৎপত্তি এবং মাটির পুতুলের সৃষ্টি। শিশুকে সহজ, সরল, শান্ত ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে জননী পুতুলকে শিশুর সঙ্গী করিয়া দিয়া থাকেন। পুতুলনৃত্যেই শিশুর অস্থিরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা শান্ত হইয়া যায়। পুতুলের সঙ্গে খেলিয়া শিশু একটা সুগভীর ছন্দোময় ও আনন্দময় রসে অনুপ্রাণিত হয়। শিশুর মনোগঠনে পুতুলশিল্প একটি অনবদ্য ও অদ্বিতীয় সৃষ্টি।

মহেনজোদড়োর ধ্বংসাবশেষ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় তিন হাজার বৎসরের প্রাচীন বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। মহেনজোদড়োর মন্দিরগাত্রে যে সব পুতুল-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি পশু, পক্ষী, মানুষের আকারের প্রতীক। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, পুতুল-শিল্পের ভিতর প্রাক্-আর্য্য যুগের শিল্পধারার জীবন্ত অবিচ্ছিন্ন অনুস্মৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাংলা দেশের পল্লী-শিল্পীরা সাধারণতঃ যে-সব মাটীর পুতুল রচনা করিয়া থাকে, সেগুলি পশু, পক্ষী, পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে যে, বাংলা দেশের বহু পুতুলই পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া রচিত হইয়া আসিতেছে। দেবদেবীর নামে প্রচলিত পুতুলগুলির মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, গণেশ, ষষ্ঠী, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা প্রভৃতির মূর্ত্তিগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পল্লী-শিল্পীরা পৌরাণিক যুগের দেবদেবীর রূপ-প্রতীকের ভাবাদর্শ পুতুল-শিল্পের জীবন্ত ধারার মধ্য দিয়া আজিও বজায় রাখিয়াছে।

বাংলা দেশের পুতুলশিল্পের প্রধান রচনা-বৈশিষ্ট্য হইতেছে শিল্পীর অতি সহজাত শিল্প-প্রতিভা। পুতুলগুলির গঠন-সৌন্দর্য্য ও চিত্রসুষমা অতুলনীয়। পুতুল-শিল্পের প্রাণবস্তু ও ইহার ভঙ্গিমা দর্শকের চিত্তে অপূর্ব্ব শিল্প-প্রতিভার ছাপ দিয়া দেয়। পুতুলগুলির গঠনছন্দের সঙ্গে অলঙ্করণের সাবলীল রেখাবিন্যাস মিলিয়া এক অভিনব ছন্দ ও ভাব সমন্বয়ের সৃষ্টি করে। লক্ষ্মী, সরস্বতী বা দুর্গা মূর্ত্তিগুলির অলঙ্করণে এমন একটি আশ্চর্য্য বিশুদ্ধ সজীবতা ফুটিয়া উঠে, যাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। পুতুল-শিল্পের রচনায় এতটুকু আতিশয্য বা আড়ম্বর নাই, গঠন-প্রণালী সহজ, সংযত ও চিত্তাকর্ষক। পুতুল-শিল্পের রচনা-পরিকল্পনাতে কোনও জটিলতার স্থান নাই। বাংলার পুতুল-শিল্পের নারী-মূর্ত্তিগুলির মধ্যে শিল্পীরা বাংলার খাঁটি পল্লীনারীর সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও নির্ভীক জীবনের আদর্শ ফুটাইয়া তোলে। বাঙ্গালী পল্লী-শিল্পীর একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি পুতুলশিল্প পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন পল্লীশিল্পের সহিত তুলনাযোগ্য এবং আমাদের বিশ্বাস তুলনামূলক পরীক্ষায় ইহা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার যোগ্যতা রাখে।

এখানে কয়েকটি পুতুলের পরিচয় দিতেছি। বাংলা দেশে বিভিন্ন যুগের পাথরের বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু সংপ্রতি একটি বিষ্ণুর পুতুল আবিষ্কৃত হওয়াতে জানা যাইতেছে যে, বিষ্ণু-মূর্ত্তির মাটির পুতুলও পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে পল্লীর কুম্ভকারগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইত। চতুর্ভুজ বিষ্ণু, সাদাসিধে বাঙ্গালী ধুতি-চাদরে সজ্জিত, গলায় কণ্ঠি ও মালা। এইরূপ ধরণের মাটীর পুতুল পূর্ব্বে রাজসাহীর খেতুরি মেলাতে বিক্রীত হইয়াছে।

অপর একটি পুতুল পেঁচার উপর অধিষ্ঠিতা লক্ষ্মী দেবী। বাঙ্গালী নারীর সাজ-সজ্জায় পরিশোভিত; ইহাতে বাঙ্গালী নারীর মাতৃ মূর্ত্তির রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। রাজসাহী জেলার কলম গ্রামের শিল্পীদের রচনা। এইরূপ একটি পুতুল লেখক কর্ত্তৃক "আশুতোষ মিউজিয়মে" উপহার প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে রাখালগণ বাল-গোপালমূর্ত্তি রচনা করিয়া মাঠের মধ্যে কোনও স্থানে ইহার পূজা দিত এবং এই উপলক্ষে কৃষ্ণধামালী বা গোষ্ঠলীলা জাতীয় রাখালী সঙ্গীত গাহিত। এইরূপ শিল্পকাজ এখন দুষ্প্রাপ্য। রাজসাহী জিলার কালীগ্রাম হইতে এইরূপ একটি পুতুল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাও লেখক কর্ত্তৃক "আশুতোষ মিউজিয়মে" উপহার প্রদত্ত।

অপর একটি পুতুল বিড়ালপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা ষষ্ঠী দেবীর— পার্শ্বে একটি শিশু দণ্ডায়মান—ষষ্ঠী দেবী যেন মাতৃরূপে শিশুকে সাদর স্নেহে রক্ষা করিতেছেন। পূর্ব্বে এই ধরণের পুতুল পশ্চিম-বঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত।

উত্তরবঙ্গের কবি জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণ

জীবনের কাব্যে বেহুলাকে মনসার সেবিকারূপে দেখি। বেহুলা কখনও মনসার উদ্দেশ্যে তাহার শ্বশুরের মত কোনও অপমানবাণী ব্যবহার করে নাই। বরং বেহুলা পদ্মাকে সাধনা করে।

বেহুলি পদ্মাক বন্দি করে।
আমি নারী অভাগিনী মনসার দাসী
আমাক ভাঁড়িয়া আইল ভণ্ড তপস্বী।

বেহুলা মৃতপতির দেহ ভেলায় লইয়া নানা জনপদ পার হইয়া নেতার উপদেশে দেবপুরীতে উপস্থিত হইলে যখন শিব তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন তখনও বেহুলার পূর্ব্বের স্মৃতি অটুট রহিয়াছে। বেহুলা যে ঊষা, তাহাকে যে মনসা-দেবী স্বকার্য্যসাধনে অভিশপ্ত করিয়া মর্ত্ত্যলোকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহা সে ভুলিয়া যায় নাই। শিব বেহুলার পরিচয় চাহিলে সে করজোড়ে উত্তর করিল:—

বালি কৈল জোড়হাত শুন প্রভু ভোলানাথ
চাম্পানি নগরে মোর ঘর
সশুর চান্দ সদাগর তোমার হও সেবক বর
সেহ কুলে মুই বধু হইনু রাঁড়ি।
হইছিলাম অমরার পুরি ইন্দ্রের বিদ্যাধরি
বাণের কন্যা বটি আমি
ঊষা বটে আমার নাম সশুর মদন কাম,
অনিরুদ্ধ হও মোর স্বামী।
বিরজার সুরবাসে নিত্য করি দুই জনে
সত্য করি আনিল বিপহরি।
অমরা পুরি হৈতে আনিল মোক মন্ত্রেতে
জন্ম দিল বণিকের ঘরে।
অনিমেষে পদ্মাবতী কৈল মায়া দুর্গতি
বিভার রাত্রিতে স্বামী মারে।
মরা স্বামী লয়া কোলে ছয় মাস ভাসিনু জলে
তবে আইনু দেবতার পুরে।
শুনিয়া ঊষার বাণি হাসে দেব শূলপাণি
নিত্য তোর আছে কি সন্ধান।
যদি হয় উপাবতি নিত্য কর রূপবতি
জিয়া দিব তোর প্রাণপতি।
... ...
বিদ্যাধরি সকলে বালির আগে যাও
উত্তর রাখে সভে পরিচয় পাও।
গলাধরি ধরি সভে করিছে ক্রন্দন
ঊষা বলে তোমরা শুনহ কথন।
পদ্মাক পূজাব আমি শশুরের হাতে।
অবশ্য যাইব আমি ইন্দ্রের সভাতে।
বেহুলি বলেন আমি নিবেদন করি।
সর্গ হইতে আন মোর বেশের পেটরি।

বেহুলার সকাতর প্রার্থনায় দুর্গা যখন শিবের নিকট বেহুলার পতির প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন এবং যখন শিব বেহুলাকে বর 'বাছিয়া' লইতে বলিলেন, তখন

বালি বলে শুন প্রভু দয়াল শঙ্কর
সর্গেত আছিনু প্রভু সর্গ নাহি চাই।
ধন নাহি চাহি প্রভু অনাদি গোঁসাই।
মোর শশুর বিবাদিয়া ধনের ঈশ্বর।
ছয় মাস ভাসিয়া আইনু জলের ভিতর।
জিয়া দেহ প্রাণনাথ এহি চাহি বর।

জীবনের কৃতিত্ব এইস্থলে। সমগ্র আখ্যায়িকার সূত্রটি কোথাও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। স্বর্গের মনোরম নিত্যসুন্দর প্রলোভন ঊষাকে তাহার পূর্ব্বকথা ভুলাইতে পারে নাই। মর্ত্ত্যের তুচ্ছ সুখ-দুঃখের মধ্যে বেহুলা জীবনের অমৃতরসের সন্ধান পাইয়াছে। জীবনের বেহুলা চরিত্রে বাঙ্গালা কাব্যের যেন একটা নোতুনত্বের আভাস পাওয়া যায়।

জীবনমৈত্রের পদ্মপুরাণের আখ্যায়িকা অংশে স্বাতন্ত্র্য আছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি যে সত্য-সত্যই "নোতুন" গীত "মনেত ভাবিয়া" রচিত করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কাব্যমধ্যে একাধিক স্থলেই পাওয়া যাইবে। এইরূপ দুই একটি বিশেষত্বের পরিচয় নীচে সংকলিত করা হইল।

চাঁদসদাগরের মহাজ্ঞান হরণ করিবার জন্ত মনসার কৌশলজাল বিস্তার মনসামঙ্গল কাব্যের একটি সর্ব্বসম্মত আখ্যায়িকা। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল (পৃঃ ৯০—৯৪) গ্রন্থে পদ্মার নটী বেশ ধারণ পূর্ব্বক চাঁদসদাগরকে ছলনা ও তাহার রূপে কামমুগ্ধ চাঁদের নিকট হইতে মহাজ্ঞান হরণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। জীবনের গ্রন্থে নেতার পরামর্শে পদ্মাবতী সনেকার ভগিনীর বেশ ধারণপূর্ব্বক কৌশলে চাঁদসদাগরের নিকট হইতে মহাজ্ঞান অপহরণ করিল—এইরূপ পাওয়া যায়।

নেতা বলে পদ্মাবতী কর অবধান।
যুক্তি বলি আমি তুমি হর মহাজ্ঞান॥
চান্দর দম্পতি আছে সুন্দরী সনেকা।
তার ছোট ভগ্নির নাম মালতী কনেকা॥
ধরিঞা তাহার রূপ চলহ আপনে।
তোমাক দেখিলে সাধুক পিড়িবে মদনে॥
রঙ্গে ঢঙ্গে মহাজ্ঞান হরি লহ তুমি।
মালতীর বেশ ধরি পাছে যাব আমি॥

যেমন ব্যবস্থা কার্য্যও তদনুরূপ হইল, তারপর সুযোগমত ছদ্মবেশী পদ্মা কামপীড়িত চাঁদের নিকট মহাজ্ঞান চাহিয়া বসিল।

এককরি মহাজ্ঞান কহে ছত্রপতি।
পদ্মার কর্ণেত মন্ত্র কহিল নৃপতি॥

তখন পদ্মা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া শূন্য হইতে বলিলেন:

শূন্য পথে থাকি বোলেন অযুজা॥
শুন শুন মতিনাশ চম্পকের রাজা॥
আমাক পূজিলে তোমার সর্ব্বাঙ্গে কুশল।
পূজিয়া আমার ঘট বাঞ্ছিত লহ বর॥

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের উপখ্যান নাই। ওঝা ধন্বন্তরীবধ এমনি সাধারণ ভাবে এইরূপ কোনও উপখ্যান অবলম্বন না করিয়াই রচিত হইয়াছে। জীবনের গ্রন্থে ওঝা ধন্বন্তরীবধ, মহাভারতের পরীক্ষিতের উপখ্যান অবলম্বন করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজ পরিক্ষিত ফিরে বনে বনে
প্রাণভয়ে মৃগ ছাড়ি পালায় দূরীবনে॥
নিদাঘে পড়িয়া রাজা তৃষ্ণায় আকুল।
জল অন্বেষণে রাজা হৈলা ব্যাকুল॥
দিন দিনান্তরে জল করেন তলাস।
দৈব যোগে সেহি বনে ছিল মুনীবর।
সমীক তাহার নাম যোগেতে তৎপর॥
তাহার কুটীরে রাজা গেলেন আপনে॥
মুনীক জিজ্ঞাসে রাজা জলের কারণে॥
যোগেত আছেন মুনী নাহি বাহ্যজ্ঞান।
রাজবাক্য নাহি শুনে না দেলে মন॥
ক্রোধ করি মহারাজা করি মহাদর্প।
মুনীর গলাত দিলা তুলি মরা সর্প।
মুনীর গলাত রাজা দিঞা কাল সেব।
নিজ ঘরে গেলা রাজা বেলা অবশেষ॥
হেনকালে আইলেন তপস্বীর নন্দন।
পিতাক দেখিয়া জুড়িলা ক্রন্দন॥
শ্রীমৈত্র জীবন কবি মনসার দাস।
শ্রীপদ্মপুরাণ করি কহিলা প্রকাশ॥

জীবন বর্ণিত এই অংশের সহিত কাশীরাম দাসের মহাভারত বর্ণিত পরীক্ষিত উপখ্যান বিষয়ক অনুরূপ অংশের সুন্দর সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।

তৃষ্ণায় আকুল বড় হয়ে পরীক্ষিত।
গোপ্রচার স্থলে এক হৈল উপনীত।
ঋষিবরে দেখি নৃপ করি সম্বোধন।
তৃষ্ণায় কাতর হয়ে কহেন বচন।
আমি পরীক্ষিত বলি বলেন ডাকিয়া।
দেখিলে কি গেল মৃগ কোন্ পথ দিয়া
কোন্ পথে গেল মৃগ বলে দেহ মোরে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়েছি অন্তরে॥
মৌন ব্রতে আছে মুনি রাজা নাহি জানে।
উত্তর না পায়ে রাজা ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
ধনু হলে করি সর্প গলে জড়াইল।
অশ্ব আরোহণে রাজা হস্তিনায় গেল॥
... ...
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান ও জগন্নাথের উপাখ্যান নাই। জীবনের কাব্যে এই দুইটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন গোলকনাথ মন্দির সহিতে
হেনকালে নারদ গেলা গোবিন্দ সম্ভাষণে॥
নারদ দেখিয়া হরি মন্দির সহিতে।
পাদ্যঅর্ঘ্য কুশাসন দিয়া হরষিতে॥

যুগল জিজ্ঞাসা করে লক্ষ্মী নারায়ণ।
কহিতে লাগিলা তখন ব্রহ্মার নন্দন॥
পৃথিবীতে লোক সব পাপেতে হয় মগ্ন।
কোনরূপে নাহি দেখি লোক পরিত্রাণ॥
তুমি প্রভু হর্ত্তা কর্ত্তা কর অবতার।
তবে দেখি পৃথিবীর লোকের নিস্তার॥
নারায়ণ বলে আমি অবতার করি।
পৃথিবীর পাপী উদ্ধার করিব যতন করি॥
এহি বলি নারদেক বিদায় করিল।
নানা বিহার কৃষ্ণ অবতারে গেল॥
ধন্য প্রভু জগন্নাথ নীলাচলবাসী।
ত্রাণ হেতু দিলা সেত মহিমা প্রকাশি॥
গোলক বিহার ছাড়ি দারু ব্রহ্ম হৈয়া।
চক্রতীর্থে ইন্দ্র দোয়নেক কৈলা দয়া॥
মহারাজা ইন্দ্রদমন কৈল চমৎকার।
নীলাচলে দারুরূপ করিল প্রচার॥
কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে সুভদ্রা ভগিনী।
অবতার ধন্য কৈল আসিয়া অবনী॥
জগবন্ধু জগন্নাথ কৈল অবতার।
ত্রিভুবন ধনজন করিতে নিস্তার॥
ঘোর কলি দেখিয়া প্রভু জিবে করে দয়া।
বৈকুণ্ঠে নাথপ্রভু অবতরি আসিয়া॥

শ্রীমৈত্রজীবন কয় জগবন্ধু দয়াময়
নাম যার প্রভু জগন্নাথ।
যে বলিবে জগবন্ধু সে তরিবে ভবসিন্ধু
কালভয় নাহিক তাহার॥

জীবনমৈত্রের কাব্যে লখিন্দরের কামগঞ্জ নামক একটি নগর স্থাপনের আখ্যায়িকা আছে। যখন লখিন্দরের বিবাহের কথা চলিতেছে, তখন যৌবন-গর্ব্বিত লখিন্দর এই কামগঞ্জের পত্তন করেন। এই আখ্যায়িকা বিজয়গুপ্তের কাব্যে নাই।

বালা বলে হর তাই আছিল আমার।
বিবাহের লোভে কৈল মেল ব্যবহার॥
সম্মত হইল বালা শুনিয়া মন্ত্রণা।
বালা বলে আগে আমি পুরাব কামনা॥
বসাইব কামগঞ্জ করিলা বচন।
করিব আপন নাম যত লাগে ধন॥

ডাকযাত্রে বিরু আসি দিল দরশন
বালা বলে কর যাইয়া নগর পত্তন॥
বালার আদেশে বীর ডাকে সরদার।
সিরবর ডাক দিয়া কহে সমাচার॥
বালার হুকুম হৈছে বসাবে কামগঞ্জ।
বেগার আনিতে আজ্ঞা কৈল মহরত গঞ্জ॥
আজ্ঞা পায়া বহরদার ডাকে কাড়াদার।
সাড়কে ডাকিয়া সব কয় সমাচার॥
বসাইবে কামগঞ্জ বালা লখিন্দর।
মরদাক বিপিন কাটি বসাবে নগর॥

এই কামগঞ্জনগর স্থাপনের বর্ণনা অতিশয় বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বহুসংখক "কামিল্যা" জোগাড় করা হইল, ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই "বেগারি"। তারপর সকলে মিলিয়া বিস্তৃত জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। এই প্রসঙ্গে তাহারা কত প্রকার বন্য ফল ও ফুলের গাছ কাটিয়া বন পরিষ্কার করিল তাহার একটি তালিকা আছে। এই তালিকায় উল্লিখিত ফল-ফুলের মধ্যে উত্তরবঙ্গজাত ফল-ফুলই অধিক।

সাজিল কেদারিগণ কাটি সতে জায়া বন
তাজে সবে মনের হরিষে।
ইক্ষুদণ্ড করে খণ্ড করি করে লণ্ডভণ্ড
বন কাটি আঁখির নিমিষে॥
আম জাম সফরী কাটে কদলি পিয়াল।
গুবাক শ্রীফল কাটে দাড়িম্ব আতর॥
পুষ্পসণ্ড কাটিলেক বন বহুতর।
জিগা নাগেশ্বর দোলা গোলাপ টগর॥
স্বর্ণ ঝিন্টি করবীর কাটিল মঞ্জরী।
দ্রোণ কাঞ্চন বকপুষ্প কাটিল মড়ুই॥
কৃষ্ণচূড়া চাঁপা আর ফুল শতদল।
অতসী কিংশুক কাটে আর পদ্মফল॥
স্থলপদ্ম পলাস আর কাটে দিশাগণ।
হংসরাজ কংসরাজ মন্দার মুচুকুন্দ॥
মালতী মল্লিকা মনোহর অরুণজ্যোতি।
কনকা কস্তুরী কেয়া কেতকী বেলাতি॥
বান্ধুলি মহুয়া বিষ্ণুপদি গন্ধরাজ।
জয়ন্তী মাধবীলতা পুষ্প গন্ধরাজ॥
ইন্দ্রকমল নাগেশ্বরী বকুল রসমালা।
তুলসী আড়িল কাটে বিরাগী গন্ধালা॥

হেন কালে এক কর্ম শুন সর্বজন।
সকলীর ডালে ছিল ভেজুরুলের হাড়ি।
সকরী বলিয়া তাহা কেহ দেখে নাহি॥
সকরী পাকিতে হাগে কেহ বোলে হয়।
কেহ বোলে পাকা কাঁঠাল তাহা মিথ্যা নয়॥
হাঁকা বাকা করিয়া সকলে ধরে চাক।
হাড়ি ভাঙ্গি ভিজুরুল উঠে ঝাঁকে ঝাঁক।
নাকে মুখে ঝাঁকে ঝাঁকে কপালে ধরিল।
বিষের জ্বালাতে লোক জলে ঝাঁপ দিল॥
আদাড়ে পাদাড়ে কেহ পলাইয়া যায়।
তাহাকে ধরিয়া যত ভেজরুল খায়॥
এহি মত বিপত্য হৈল কিষাণগণের।
কামগঞ্জে বসাইবে বালা লখিন্দর॥
তবে স্থির নগর বসায় যত্ন করি।
ঘড়ি ধরি আউক বাজার কৈল পনি॥

যখন সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল, তখন মণিমুক্তাখচিত একটি বিরাট পুরী নির্ম্মিত হইল।

এই কামগঞ্জের হাটে নারী ভিন্ন পুরুষের প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না।

সস্তাহাড়ি কড়াবার ফিরে কড়া দিয়া।
দান নাহি তোলা নাহি বিকাহ বসিয়া॥
সতা মূলে তাই বিকাইহ খবর দ্বারে।
স্ত্রী বিনে পুরুষ আইলে দিবে ভগাগারে।
রবি-বুধবারে হাট প্রত্যহ বাজার।
যদি কেহ নাহি আইসে দোহাই রাজার॥
আইল দোকানি যত কামগঞ্জের হাটে।
পুরুস না চলে কেহ কামগঞ্জের ঘাটে॥

চতুর্দ্দিকে "কামগঞ্জ" সম্বন্ধে একটি সাড়া পড়িয়া গেল। নারীকুল কেহ বা অভিভাবকের অনুমতি লইয়া কেহ বা বিনানুমতিতেই কামগঞ্জ দেখিতে আসিতে লাগিল। নারীগণ পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল :—

চল সখি কামগঞ্জে যাই
কামগঞ্জে যাগা দেখি সুন্দর সবাই॥

ইতিপূর্ব্বেই চাঁদসদাগর উজানীনগরে যাইয়া বেহুলার সহিত লখিন্দরের বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়াছে। এমন কি দিন পর্য্যন্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে।

ডাক দিয়া আনিলেক কুল-পুরোহিত
সব জন বক্তা দেখি হৈল হরষিত॥
রামকৃষ্ণ বাচস্পতি আইল ততক্ষণ।
শুভ রবি দেখি কৈল বিবাহের লগন॥
বিবাহের দিন কৈল করিয়া বিচার।
বৈশাখে হইল দিন সাতই সোমবার॥

এদিকে যুবক লখাই কামগঞ্জ পত্তন করিয়া বসিয়াছে। বেহুলার রূপগুণের খ্যাতি তাহার কানে আসিয়াছে। লখিন্দর "বেহুলীর" দর্শন আশায় ব্যাকুল। লখিন্দরের এই অবস্থা দেখিয়া,

আকাশেতে দেবতা কহে মনসার স্থানে
আপনে যাইয়া বালীক দেখ-হ স্বপনে॥
বালা বালী দুই জনে হউক দরশন।
তবে সে তোমার দেখি পূজার লক্ষণ॥

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী বেহুলা রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিল যে, তাহার স্বামী কামগঞ্জে রহিয়াছে, সেখানে গেলেই তাহার দর্শন মিলিবে। তাই সকালে উঠিয়া,

বালী বলে জননী নিবেদন করি আমি
আজ্ঞা কর কামগঞ্জ যাইতে।
শুনিয়া মেনকা কয় একথা উচিত নয়
বড় ভয় কামগঞ্জের পথে।
জনারে ধরিয়া খায় করি খণ্ড জিনিকায়
হাতিঘোড়া পাই-ক প্যাদা আছে।
তুমি ত কাঙাল হও কি কারণে যেতে চাও
হেলে খেলা ফিরে পথে পথে॥
কল গা তোর পিতাক যদি আজ্ঞা দেয় তোক
তবে তুমি যাও বিনোদিনী।
বালি বলে শুন মাতা পুত্রের কর্ত্তা হয় পিতা
কন্যার কর্ত্তা হয়ত জননী॥

তৎপর বেহুলা কামগঞ্জে যাইবার অনুমতি পাইল এবং কামগঞ্জ হইতে ফিরিয়া মাতার নিকটে তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিল,

বালী বলে ওগো মাতা শুন মোর বাণী।
পুরুস নাহিক হাটে সকলি কামিনী।
কেবল দেখিলাম হাটের চৌধুরী হাটা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি চাঁদসাধুর বেটা॥
যদি জন্মান্তরে মোর ধর্ম্মে থাকে মতি।
সকল দেবের বরে সেহি হয় পতি॥

লখিন্দরের চরিত্রে জীবন মৈত্র বেশ অভিনবত্বের সমাবেশ করিয়াছেন। জীবনের লখিন্দরের চরিত্রে কৃষ্ণচরিত্রের

অনেকটা প্রভাব পড়িয়াছে। তাহার "মামী" কৌশল্যার সহিত তাহার অশিষ্ট ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ভবানীদাসের "দানপূর্ব্বখণ্ড" প্রভৃতি গ্রন্থের কৃষ্ণচরিত্রের অনুগামী। এই আখ্যায়িকাটি একটু কৌতুককর। একদিন

হর ঘাটের ঘাটে গেলা বালা লখিন্দর
সেই ঘাটে দেখিলেন কৌশল্যা সুন্দর॥

হাতেত আছিল গুলাল মারিল বাটুল।
কলসী ভাঙ্গিয়া বামা হৈলা ব্যাকুল॥
কৌশল্যা বোলেন হায়ুর মতিনাশ।
ননদিনীর বেটা হৈয়া কর উপহাস॥
তোমার মাতুল লাগি মোর হয় স্বামী।
তুমি বট ভাগিনা আমি তোমার মামী॥
কৌশল্যা বোলেরে মোর কথা শুন।
মোর নিজ স্বামি সে জ্বলন্ত আগুন॥
এ কথা শুনিলে তারি পাবে অপমান।
মোর কাটিবে নাক চুল তোর কাটিবে কাণ॥

উত্তরে লখিন্দর বলিল,

মামীক হরিলে যদি পাপ কিসে থাকে।
তবে কেন কৃষ্ণচন্দ্র হরিছে মামীকে॥
ছাড় আমার ভগিনা চাতুরি কর দূর।
কাচুলি ছিড়িয়া তোর যৌবন করিব চুর॥

তখন "দানখণ্ডে"র রাধিকার মত

কান্দিয়া চলিল বামা সনেকার স্থানে।
বালার চরিত্র যত কহে আন্দিছনে॥
হের দেখ ননদি তোমার পুত্রের নিসান।
বিপদে সে করিল মোক আজরে প্রমাণ॥
কাঁচুলি ছিড়িছে আর ভাঙ্গিয়াছে কলসি।
বিপদে যে করিয়াছে কহিতে লজ্জা বাসি॥
তোমার বেটা ভাগিনা করিল হেন কাজ।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিল এহি লাজ॥

কৌশল্যার অভিযোগের উত্তরে যশোদার মতই সনেকা বলিল,

মিথ্যা কথা কহ আসি আমার গোচর।

তারপর সনেকা অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া কৌশল্যাকে নিরস্ত করিয়া বাড়ী পাঠাইল, বলিল, "কনক রতনে স্বর্ণ ঝুমু দিব আমি"। কিন্তু পুত্রের চরিত্রে ভীত হইয়া সনেকা তাহার স্বামীর নিকট নিবেদন করিল,

নিবেদন করি অবধান,
আজ বালা হয়ে যুবা আর কিবা হয় জানি
নাহি দেখি কুশল-কল্যাণ॥
সোনরে শুনহ সাধু ঘরে সুখা হয় বধূ
লাজভয়ে নিন্দ হয় সখা।
আমার বচন ধর পুত্রের সম্বন্ধ কর
নহে কুলে রহিবে কলঙ্ক॥

ইহার পর চাঁদ পুত্রের বিবাহ স্থির করিতে বদ্ধ-পরিকর হইল। যথারীতি ঘটককে মনোমত কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল,

কোন দেশ নহে সাধু আমার অগোচর।
কাশি কাঞ্চি বৃন্দাবন মথুরা নগরি।
উরন্ত নগর আর দারকা জুহাড়ি॥
পঞ্চাস বট গোদাবরি উজানি বারানসি।
অযোধ্যা মিথিলা জানি হস্তিনা নিবাসি॥
পূর্ব্বদেশে দেখিয়াছি মহাগিরি।
ত্রিপুরা সহর জানি আর মেঘপুরি॥
উত্তরে দেখেছি হিমালয় আদি যত।
গোকত কামিখ্যা সিবা সিরাপার আরত।
দক্ষিণ পশ্চিম কিছু নহে আমার অগোচর।
যেখানে যেমন কন্যা আছে যাহার ঘর॥
অবধান মহাশয় করি নিবেদন।
বিরচিল গান কবি শ্রীমৈত্র জীবন॥

তারপর বলিল,

উজানি নগরে ঘর সাহ রাজা সদাগর
তার কন্যা আছে একজন।
বেহুলি তাহার নাম রূপে গুণে অনুপাম
পরম সুন্দরী রূপবতী॥

ইহা শুনিয়া চাঁদ কন্যা দেখিতে উজানি নগরে গমন করিল। কন্যার কুমারীত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য চাঁদের এক অভিনব পন্থার কথা জীবনমৈত্রের কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। চাঁদ কন্যার পিতা সাহ-সদাগরের নিকট প্রস্তাব করিল যে, সে সাতদিন অভুক্ত আছে এবং তাহার সঙ্গে লোহার কলাই আছে, তাহা দ্বারা কন্যা অন্ন রন্ধন করুক। 'বেহুলা'র পিতা মাতা ইহাতে অতিশয় আশ্চর্য্য হইল। লোহার ভাত কি করিয়া রাঁধা যায়? তখন চাঁদ ফিরিয়া যাইতেছে, দেখিয়া বেহুলা নিজেই লোহার কলাই দিয়া ভাত রাঁধিয়া দিতে স্বীকার করিল এবং মনসার বরে তাহার প্রতিজ্ঞা

রক্ষিত হইল। চাঁদ সাতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রের সহিত উজানীনাথের কন্যার বিবাহ ঠিক করিয়া গেল।

এইস্থলে নেতা ও পদ্মার ষড়যন্ত্র এবং বৃদ্ধাবেশে পদ্মার উজানীনগরে আগমন ও কৌশলে বেহুলার প্রতি পদ্মার অভিসম্পাত [আরে দুষ্ট জল দিলা আমার গায়। বিবাহ রাত্রিতে তোর পতিক যেন সাপে খায়॥] সমস্তই জীবন-মৈত্রের কাব্যের বিশেষত্ব। সর্ব্বদাই পদ্মা ও নেতার লক্ষ্য ছিল যেন যেমন করিয়া উষাকে শাপভ্রষ্টা করিয়া মর্ত্তে স্বকার্য্যসাধনের জন্য আনা হইয়াছে, তেমনি করিয়াই আবার তাহাকে অভিসম্পাতের মধ্যেই স্বর্গে লইয়া তাহার পূজার মহিমা প্রচার করিতে হইবে। সুতরাং উষা-অনিরুদ্ধের মানবীয় সংস্করণ বেহুলা ও লখিন্দরকে একত্র বিবাহসূত্রে বাঁধার দায়িত্বও পদ্মা ও নেতাবতীই গ্রহণ করিয়াছে। উষাও স্বর্গে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র, সুতরাং সে পদ্মার সেবিকারূপেই কল্পিতা হইয়াছে। তাই, যখনই সে বিপদে পড়ে অমনি পদ্মাকে স্মরণ করে। যখন চাঁদ হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে চাহিল তখন বেহুলা পদ্মার নিকট সাহায্য চাহিল লোহার ভাত রাঁধিবার জন্য। পদ্মাও তাহাকে সহায়তা করিতে বাধ্য হইল, কারণ তাহা না হইলে লখিন্দরের সহিত বেহুলার বিবাহে বাধা পড়ে এবং এ বিবাহ না হইলে পদ্মার মনস্কামনা সিদ্ধ হয় না। কাহিনীর এই পূর্ব্বাপর সঙ্গতি জীবনের শিল্পকুশলতার পরিচয় দেয়।

উপরে উল্লিখিত অভিনবত্ব ছাড়াও জীবনের কাব্যে আরও অনেক বিষয়ে প্রচলিত মনসামঙ্গলের আখ্যায়িকা হইতে অন্যপ্রকার ঘটনা-সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাসর প্রস্তুত, বেহুলার বিবাহ, লখিন্দরের সর্পদংশন ও মৃত্যু, বেহুলার বিলাপ প্রভৃতি বর্ণনা জীবনের মনসামঙ্গলে প্রায়ই নূতনত্বে মণ্ডিত। বেহুলার স্বামীর মৃত্যুর পর যখন সে কলার "মন্দুশে" তাহার মৃত দেহ লইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে, সেস্থলেও জীবনের আখ্যায়িকা স্বতন্ত্র। কেতকা দাস, ক্ষেমানন্দ, নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, বেহুলা ভেলায় ভাসিয়া যাইতেছে এমন সময় তাহার "জ্যেষ্ঠ ভাই" হরি সাধু সেই সংবাদ পাইয়া "অশ্বপৃষ্ঠে" চড়িয়া

সেই ঘাঁকে ভাসে বেহুলা সায়ের কুমারী।
সেই ঘাঁকে বেড়ে দিয়া মহাসাধু হরি॥
কলার মান্দুষে ভাসে মড়া স্বামী কোলে।
উচ্চৈঃস্বরে হরি সাধু বেহুলা বেহুলা বলে॥ ইত্যাদি
[বিজয় গুপ্ত পৃঃ ২১৫]

জীবন মৈত্রের কাব্যে অন্যপ্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়; বেহুলার ভ্রাতা 'শঙ্খধর' সাধু বাণিজ্য করিয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময় বেহুলা মৃতস্বামী লইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। শঙ্খধর প্রথমে বেহুলাকে নিজের ভগিনী বলিয়া চিনিতে পারে নাই এবং তাহার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। পরে তাহার পরিচয় পাইয়া তাহাকে বাড়ী ফিরাইয়া লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইল না। বেহুলা তাহাকে জানাইল :—

অপেক্ষা করিহ ছয় মাস
সাত মাস হইলে ছাড়িহ আমার আশ।
যে দিন হারাবে হাতা হাতের আঙ্গুরি।
সেই দিন জানিহ মৈল বেহুলি সুন্দরি।
এতেক শুনিয়া ভগ্নি ভাসিল সাগরে।
শ্রীমৈত্র জিবন কবি মনসার বরে॥

এই সমস্ত ঘটনাসমাবেশ ছাড়াও কতকগুলি নামকরণ বিষয়ে বিজয় গুপ্তের বা অন্যান্য লেখকের মনসামঙ্গলের সহিত জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণের কিছু কিছু অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। জীবনের গ্রন্থে বেহুলার পিতার নাম বাহো (কচিৎ সাহ) সদাগর, মাতার নাম মেনকা, ও ভ্রাতার নাম শঙ্খধর পাওয়া যায়। লখিন্দরের মাতুলের নাম জীবন মৈত্রের গ্রন্থে নারায়ণ এবং মাতুলানীর নাম কৌশল্যা। চাঁদসদাগরের বংশপরিচয় জীবনের গ্রন্থে নিম্নরূপ :—

দিবাকর সদাগর　　তার পুত্র সম্বর
তার পুত্র প্রসব বাণিয়া।
তার পুত্র গদাধর　　তার পুত্র সুভধর
বসত আছিল হাসনিয়া॥
তার পুত্র শশধর　　তার পুত্র রাজেশ্বর
তার পুত্র সাধু শক্তিধর।
তার পুত্র ঋষিবর　　তার পুত্র গিরিধর
তার পুত্র বাণিয়া ভাস্কর॥
তার পুত্র কুটিধর　　সদাই পুজে শঙ্কর
পুণ্যবাণ সিদ্ধি কলেবর॥
সদাশিব পরায়ণ　　সর্ব্বদা চিন্তিত মন
তপস্যা করেন নিরন্তর॥

এই ভুটিশ্বরের পুত্র চন্দ্রধর বা চন্দ্রপতি (চাঁদসদাগর) চন্দ্রধরের ছয় পুত্র।

এহি মতে চন্দ্রধরর ছয় পুত্র হৈল।
জটাধর রাজ্যধর বিবাহ করিল।
মহাপতি শঙ্খধর সকল কুমার।
জয়ধর আদির কৈল মঙ্গল হুচার।
আনন্দে ফিরেন ছয় সাধুর নন্দন।
চন্দ্রধর রাজকার্য্য করেন অনুক্ষণ।

চাঁদসদাগরের শ্যালিকার নাম মালতি ও কনকা :—

চাঁদঃ দম্পতি আছে সুন্দরী সনেকা
তার ছোট ভগ্নির নাম মালতি কনেকা।

জীবন মৈত্রের গ্রন্থমধ্যে কবির সমসাময়িক অনেক গ্রাম্য রীতিনীতি আচার-ব্যবহারের বর্ণনা রহিয়াছে। অনেকস্থলে বহু বহু সর্পের নাম, ফলফুল প্রভৃতির নাম, নানারূপ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রভৃতি ভোজ্য, স্ত্রীগণের প্রিয় অলঙ্কার, ইত্যাদি নানা-রূপ তথ্যসমাবেশে জীবন মৈত্রের মনসামঙ্গল গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। বহুস্থলেই অতি স্বাভাবিক কারণেই কবির বর্ণনায় উত্তরবঙ্গের বৈশিষ্ট্য অঙ্কিত হইয়াছে। জীবনের গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্য-সমাবেশের মধ্যে কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

চাঁদের বাণিজ্যপ্রসঙ্গে জানিতে পারা যায় যে, তখন 'বদলি' প্রথা ছিল :—

কহে রাজা সাধুর তরে বদলাই সকল করে
তবে যত চাহ দিব ধন।
শুনি চাপড়াইয়া দোহে বসিলেন দোহে দোহে
বিরচিল শ্রীমৈত্র জীবন।

মুকতা বদলে লব পাট বদলে নেত।
চট বদলে লব সন আর চাম সেত।
সাল বদলে মাণিক আর মাস বদলে মতি।
বেল বদলে সস টিয়া পাখা বদলে হাতি।
ছাগল বদলে কাল সঁাড় লব পায়রা বদলে হুয়া।
হরিতকি বদলে জামির লব।···
তৈল বদলে ঘৃত লব ছায়া বদলে মধু।
সরিসা বদলে বিধু।

কেসরি বদলে জয়তি হরিদ্রা বদলে সোনা।
বরি বদলে হিরা লব খিনাই কাজর কোনা।
মুগ বদলে হাতির দন্ত নারিকেল বদলে খুলি।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

বর্ষায়

—শ্রীনারায়ণপ্রসাদ আচার্য্য

গম্ভীর গুরু মেঘ-ডম্বরু বাজে গগনে
পর্জ্জন্যের রত ঘর্ঘর রথ গমনে।
ভেল ছুরিকায় বিদ্যুতে কার ভুরু ভঙ্গিমা
ভরা রঙ্গিমা মেঘ কজ্জল যুগ নয়নে!
কার কৌদিকে আজি চৌদিকে কালো যবনি
আড়ে বিন্দুরে শ্যাম মৌক্তিক ছায়া লাবণি!
কার পক্কেতে জল অম্বরে বারংবার
সৃষ্টির সাথে চূর্ণিত হল হাজার বাণী।
ও কে অজনা দিক অঙ্গনে মাতিয়া ফিরে
জাগাইয়া যোগ তন্দ্রিত ভোলা ভৈরবে রে,—
গঙ্গার বুকে সফরি রাঙা পূর্ব্বরাগে—
ভৈরবী প্রেম সৌরভাকুল গৌরবে রে।

জল-শ্রান্তি-শীক প্রেম-গুঞ্জনে শঙ্খে যোধি,
বর-সজ্জায় চন্দন রচি পঙ্কে বসি,
অম্বর লাজ স্মর বিহ্বল তুর্ণ গতি
পিছনের পথ চুমে মুছে এলো কে এলোকেশী।
মেঘ-মল্লারে জল কল্লোলি বর্ষিছে,
নীপসর্জ্জের শাখা হর্ষেতে মুঞ্জরিছে,
সূর্য্য-শর্ম্ম সুপ্ত বক্ষে স্বপ্ন-সুধা
সঞ্চয়ে সুখ, বঞ্চিত ব্যথা আপনি মুছে।
সর হর সাথে স্মর ডম্বরু বাজে গগনে,
রথ-ঘর্ঘরে ঘুরে ঘন ঘোর নক্তে সঘনে,—
প্রগল্ভ রাগ রণনোদ্দাম কে অজনা
ভুরু ভঙ্গীতে রঙ্গ রব আনে গগনে॥

জ্যোতিঃহারা

—শ্রীঅনুরূপা দেবী

পাত্রগণ

মিঃ দত্ত—	বিলাত-ফেরৎ জজ (নাস্তিক)
কান্তিবাবু—	সেরেস্তাদার (আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম
যামিনীপ্রকাশ—	ঐ উচ্চশিক্ষিত পুত্র
ইন্দ্রনাথ—	ধার্ম্মিক ভদ্রলোক (আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত)
বরেন্দ্র—	অল্পবয়স্ক জমিদার
ভূষণ—	ঐ পার্শ্বচর
মাষ্টারমশাই—	ঐ গার্জেন টিউটার
ইন্দুভূষণ—	যামিনীর পরিচিত যুবক
দাদামহাশয়—	(মিসেস দত্তের ভক্ত ও বিশিষ্ট মহাপুরুষ)
রমেন্দ্র—	মিঃ দত্তের ভাগিনজামাই (ব্রীফহীন ব্যারিষ্টার)

ওস্তাদ, বরেন্দ্রের বন্ধুবর্গ, বয় ইত্যাদি।

পাত্রীগণ

অণিমা—	মিঃ দত্তের কন্যা (উচ্চশিক্ষিতা মহিলা)
মৃণালিনী—	ঐ ভাগিনেয়ী
সুলতা—	যামিনীর স্ত্রী
নলিনী—	ঐ শিশুকন্যা
পিসিমা—	ঐ পিসিমা
অমলা—	ইন্দ্রনাথের কন্যা (বিধবা)
জ্যোৎস্না—	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা (কুমারী)
রঞ্জন—	কলিকাতার বাইজী (অল্পবয়সী)
বালিকাগণ—	(স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অবসরপ্রাপ্ত জজ মিঃ দত্তের গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাটীর গঙ্গা-ধারের গৃহ, পরিপাটিরূপে সাজান। মধ্যে মোরাদাবাদি কাজ করা টেবলে রূপার ফুলদানীতে বড় ফুলের তোড়া, এক পাশে পিয়ানো, অন্যত্র টেবল হার্ম্মোনিয়ম। একখানি কৌচের উপর পাশা-পাশি বসিয়া যামিনী ও অণিমা গল্প করিতেছিল। উভয়েরই প্রসাধন উজ্জ্বলের কিন্তু সংযত। মুখ উৎসাহদীপ্ত। যামিনীর মুখ হাস্যস্মিত।]

অণিমা। এদের দেখলে আমার মন এত খারাপ হয়। দেহে বল নেই, মনে উত্তম নেই, মুখে হাসি নেই, কথা বলে —সব সময় যেন সশঙ্ক। কথা বলতেও জানে না, শুনতেও ভাল বাসে না।

যামিনী। আসল কথা কি জানেন, শিক্ষার হয়েছে বড় বড় অভাব, এখন আমাদেরই প্রাণপণ যত্নে ;

"এই সব মৌন মূক মূখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব আশাহীন প্রাণে জাগায়ে তুলিতে হবে আশা।"

অণিমা। (সাগ্রহে) কিন্তু কি করে? কি করে আমরা এদের জন্যে কিছু করবো? বলুন, বলুন শুধু বড় বড় আইডিয়া নয়, যথার্থ করে ;—প্র্যাক্‌টিক্যালী কি আমি করতে পারি? আর আপনাকেও কিন্তু আমার সহায় হতেই হবে। (মিনতিভরে চাহিল)।

যামিনী। (প্রসন্নহাস্যে) আমাদের সম্মিলিত শক্তিকে, কাল থেকেই আমরা কাজে লাগাতে আরম্ভ করে দিই না কেন, কি বলেন? আমাদের সর্ব্বপ্রথম কাজ হোক পুষ্করিণী সংস্কার ; আর দ্বিতীয়তঃ একটি ভাল করে গার্লস্কুল ষ্টার্ট করা।

অণিমা। (হর্ষধ্বনি সহকারে) কি আশ্চর্য্য! ঠিক ওই দুইটি কথাই যে আমি ভেবে রেখেছিলাম!

যামিনী (সস্মিতমুখে)

"Great thoughts, great feelings came to them, liko instincts unawares."

অণিমা। (সলজ্জ ভাবে) আপনি ভারি দুষ্ট!

[পাশের ঘরের পর্দ্দা সরাইয়া মিঃ দত্ত প্রবেশ করিলেন। কামিজের আস্তিন খোলা, পায়ে স্লিপার, ঢিলা পায়জামা, প্রৌঢ় বয়স।]

মিঃ দত্ত। What a lovely pair! অণি! তোমার জানা উচিত I am a jealous father. তোমার fiancee্র সঙ্গে তুমি যে এমন করে flirt কর্চ্চো, আমার বুঝি তাতে jealousy হবে না! হাঃহাঃ হাঃ।

(উভয়ে লজ্জাবনতমুখে)।

অণিমা। (মৃদু কণ্ঠে) তুমি বড্ড দুষ্ট হয়েছ বাবা !

মিঃ দত্ত। (হাসিতে হাসিতে) Oh, no, no don't be angry আচ্ছা, আচ্ছা এই নটী ওল্ড বয় বিদায় নিচ্ছে, তোমরা দুজনে যত পার গল্প কর। (গুঞ্জন স্বরে)

"Love took up the glass of Time, and
turned it in his glowing hands ;
Every moment, lightly shaken, ran
itself in golden sands."

[বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন পর্দার পাশ দিয়া। দেখা গেল ঐ ঘরে অনেক আলমারি-ভর্ত্তি বই আছে, সবই প্রায় হক্সলি ডারউইন, কাণ্ট প্রভৃতির ফিলোসফি ; ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সাংখ্য মতের বহু পুস্তক দেখা যায়, বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থও অনেকগুলি আছে, এবং তদ্ভিন্ন বহু পুস্তক আছে ; রাইটিং টেবিল ইজিচেয়ার ইত্যাদি রক্ষিত।]

যামিনী। (অণিমাকে সলজ্জ দেখিয়া প্রসঙ্গান্তর আনিবার জন্য) মিহির এ হপ্তায় এল না তো? ওর বিলাত যাওয়ার দিন এখনও ঠিক হয়নি বোধ হয়?

অণিমা। (স্মিত দৃষ্টি তুলিয়া) সে তো বাবার জন্তে খুব ব্যস্তই হয়েছে, শুধু যেতে পারছে না,— (কথা বাধিয়া গেল, ঈষৎ হাসিয়া মুখ নত করিল)।

যামিনী। আমাদের বিয়ের জন্তে? তাকে এইবার মুক্তি দিলেই তো পারেন? অনর্থক বেচারাকেই বা এত দুঃখ দেওয়া কেন? কি বলেন? অন্ততঃ পরার্থে আত্মবিসর্জ্জনই না হয় করে ফেলুন না, মার্টারদের লিষ্টে একটা নাম থাকবে, চাই কি, জগতের ইতিহাসে একটা রেকর্ড করে রেখে যেতে পারবেন !

অণিমা। (স্মিত মুখে ভ্রূভঙ্গী করিয়া) যান্, কের দুষ্টুমী করছেন! সব্বাই মিলে লেগেছেন একজোট হয়ে আমার সঙ্গে! বেশ, থাকুন, যাচ্ছি আমি চলে।

যামিনী। (হাসিয়া) চলুন না, কোথা যাবেন? আমারও তো আর পায়ে ব্যথা হয়নি! (উঠিবার ভঙ্গী করিল)।

ঝি। (দ্বারের নিকট হইতে) বড়বাবু আয়া।

উভয়ে। (সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) বাবা এসেছেন?

কান্তিবাবু। (ভিতরে প্রবেশ করিলেন, খেতবস্ত্র, সামান্য চটি পায়ে, সাদাসিধা সাজ, চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমা) ভাল আছ মা? এই যে প্রকাশও এসেছ! দত্ত সাহেব কোথা? তাঁর সঙ্গে আমার একটু কথা কইবার আছে। (এই সময়ে পাশের ঘর হইতে শোনা-গেল, "বেশ আসতে দাও", আচ্ছা আমি একটু এইখানেই অপেক্ষা করি, ওঁর কাছে কেউ আছেন বোধ হচ্ছে।

[একটি চেয়ারে বসিতে যাইতেছিলেন, অণিমা ব্যস্ত হইয়া আসিয়া হাত ধরিয়া একটি ভাল কুশনওয়ালা আসনে বসাইয়া দিল, হাতের লাঠীটী হাত হইতে লইয়া সরাইয়া রাখিল।]

অণিমা। আমি আপনার জন্তে বাদাম বাটার সর-বতটা করে নিয়ে আসছি, একটু ফল মিষ্টিও আনি না?

। আবার তুমি কষ্ট করে ওসব কেন আনতে যাবে, মা! আমার তো কই একটুও ক্ষিধে পায়নি। না, তুমি বসো।

অণিমা। কিন্তু আমি যে আপনি ভালবাসেন বলে, নিজে হাতে ছানার মুড়কি তৈরি করেছি। আর খুব ভাল আপেল আনানো হয়েছে। খাবেন না?

কান্তি। (হাসিতে হাসিতে) আপেলের লোভ যদি বা সামলানো যেতো, কিন্তু মা! তোমার হাতের তৈরী ছানার মুড়কি তো ছাড়তে পারিনে, যাও নিয়েই এসো। (অণিমা চলিয়া গেল) আজ আমি এসেছি, তোমাদের শুভবিবাহের দিনটা স্থির করে ফেলবার জন্তে। অনর্থক আর বিলম্ব করে লাভ কি!

যামিনী। (স্বগতঃ) আমার দিক থেকে তো কোনই লাভ নেই। উনিও প্রস্তুত আছেন বোধ হলো, এখন আপনারা প্রস্তুত হলেই আমরা বাঁচি। (প্রকাশ্যে) আমি একটু কাজে যাবো, আপনি বসুন। (প্রস্থান)

(পাশের ঘর হইতে মিঃ দত্ত) হ্যাঁ তাই লিখুন, আমি কোন ধর্ম্মমতই মানি নে,—লিখে দিন্ এথিষ্ট!

কান্তি। (চমকাইয়া) অ্যাঁ এথিষ্ট নাস্তিক! কি সর্ব্বনাশ! আমার ছেলের শ্বশুর হবে ধর্ম্মহীন, ঈশ্বর-বিশ্বাস-শূন্য,—নাস্তিক!—থাক্, মেয়েটা ভাল, নাঃ বিয়েটা শীঘ্র করেই দিয়ে ফেলা দরকার দেখছি! এ বাড়ীতে আর ওঁর বেশী দিন



পি-পু-ফি-শু-র দেশ

থাকা সঙ্গত নয়। (দ্বারের কাছে আসিয়া) আমি আসতে পারি?

মিঃ দত্ত। ইয়েস্! ইয়েস্! তুমি কতক্ষণ এসেছ কান্তি! এই যে এইখানে, আমার এই পাশের চেয়ারটাতে বসো না। তারপর? খবর কি? ভাল?

[সেন্সস্ কর্মচারী কাগজপত্র মুড়িয়া উঠিয়াছিল, অভিবাদনান্তে চলিয়া গেল। টেবিলের উপর টিন্‌ড্যালের একটা বই খোলা রহিয়াছে। ঘরের দেওয়ালের ধারে ধারে আলমারি ভরা ভরা অনেক বই এবার স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।]

কান্তি। ভগবানের কৃপায় এদিকে সব ভালই। আজ আমি এসেছি, আপনার কাছে, আমার মা জননীকে ঘরে নিয়ে যাবার দিন স্থির করবার জন্তে অনুরোধ জানাতে।

মিঃ দত্ত। (বিচলিতভাবে) অণিকে নিয়ে যাবেন! তা' যাবেনই তো, দু'দিন যাক্ না?

কান্তি। অনর্থক আর দেরী কেন? বিশেষ শুনছি, এ বিয়ে না হলে মিহির না কি বিলাত যেতে পারছেন না? সেদিক দিয়েও আমাদের ভাববার কথা একটা রয়েছে তো! তা' ভিন্ন 'শুভস্য শীঘ্রম্' এ কথাটাও তো আর তুচ্ছ নয়!

মিঃ দত্ত। বেশ, তা'হলে দিন স্থির কবে করতে চাও?

কান্তি। সেটা আচার্য্য মশাইএর উপরই ভার দিই, তিনি যেদিন বিয়ে দিতে পারবেন, সেই মত একটি দিন স্থির তিনিই করে—

মিঃ দত্ত। (বিস্ময়ভরে) আচার্য্য! আমার মেয়ের বিয়ে দেবে কোন টিকিওয়ালা পণ্ডিত বা দাড়ীওয়ালা আচার্য্যি, এ'ও তো কোন দিন জানতুম না! কোন্ মতে বিয়ে দেবেন তিনি?

কান্তি। (আহতভাবে) কেন, আদি-ব্রাহ্ম মতে। আমি সেই সমাজভুক্ত, আপনি তো তা' জানেন! আমার ছেলের বিয়ে সেই মতেই হবে।

মিঃ দত্ত। না, না, সে হবে না। আমি আদি, অন্য কোন মতই মানিনে, আমার মেয়ের বিয়ে তিন আইন অনুসারে হবে। কোন ধর্মমতেই হ'তে পারে না। আমি এথিষ্ট।

কান্তি। (সক্ষোভে) হাঁ, সেই কথা এই মাত্রই সেন্সসে লেখালেন, সেও শুনতে পেলেম। কিন্তু এমন ধর্মহীন বিবাহ আমিও তো দিতে পারিনে! আপনি জানতেন, আমি আপনার তুলনায় যথেষ্ট দরিদ্র। কিন্তু ধর্মকে যে আমি অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করি, এ'ও আমি কখনও লুকুইনি। তবে, জেনে শুনে এ' অপমান কেন করলেন আমার? কেন, আমার ছেলেকে নিজে যেচে মেয়ে দিতে চাইলেন?

মিঃ দত্ত। আমায় তুমি মিথ্যা দোষ দিও না কান্তি! আমি তোমার বিদ্বান, সুচরিত্র ছেলেকে নিজে থেকে জামাই করতে চেয়েছি বলেই যে তোমার ধর্মে কনভার্টেড্ হবো, এরকম আশা তুমি কেমন করে করেছিলে? আমি যে এথিষ্ট, এতো কই কখনও কারুর কাছেই আমিও লুকিয়েছি, বলে মনে পড়ে না!

কান্তি। (সরোষে) তা'হলে এ বিয়ে হতে পারে না।—আমি যাচ্ছি। (প্রস্থান)

[দ্বারের বাহিরে আসিতেই দেখা গেল শ্বেতপাথরের থালায় কাটা ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া হাসিমুখে অণিমা দ্রুতপদে আসিতেছে।]

অণিমা। অনেক দেরি করে ফেলেছি না? এতক্ষণ কি একলাটিই ছিলেন? কেন, বাবার কাছে যাননি কেন? আসুন, খাবেন আসুন।

কান্তি। (গাঢ়স্বরে) মা! আগে আমার একটি কথার উত্তর দাও, তারপর ভগবান যদি দিন দেন, অনেক খাওয়াই খেতে পাব। তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর? তাঁকে ডাক? তাঁর অর্চনা করে থাক?

অণিমা। (হতবুদ্ধিভাবে) না, বাবা আমাদের কখনও ওসব কথা বলতে বা শিখতে দেননি। তিনি বলেন, ঈশ্বর নেই।

কান্তি। ভগবান্! ভগবান্! উঃ না, না, এই আমার অতি লোভের উপযুক্ত শাস্তি! সুন্দরী শিক্ষিতা ধনী-কন্যাকে ঘরে এনে কুল উজ্জল করতে চেয়েছিলুম, হাঁ, এই তার উপযুক্ত প্রতিফল! উপযুক্ত প্রতিফল! অসম্ভব! অসম্ভব! এ' একেবারেই অসম্ভব! (দ্রুত প্রস্থান)

অণিমা। হঠাৎ কি হ'ল?

মিঃ দত্ত। (ভিতর হইতে) অণি!

[অণিমা খাবারের রেকাবটি একটী টিপয়ের উপর রাখিয়া ভিতরে আসিল।]

মিঃ দত্ত। (চিন্তিত চিত্তে পাইচারী করিতেছিলেন, হঠাৎ মেয়ের সম্মুখীন হইয়া) শুনলে অণি! কান্তিবাবু তোমার বিয়ে ব্রাহ্মমতে দিতে চান। (একচক্র ঘুরিয়া আসিয়া) তা' কেমন করে হবে? তুমি কি বল? তা' কি হয়? আমি ব্রাহ্ম নই, তাদের মতটা খামোকা এমনি নিজের ব্যবহারে লাগিয়ে নেব? এটা কি সম্পূর্ণ মিথ্যাচরণ হবে না? (আবার ঘুরিয়া আসিলেন) কথা বলছ না কেন? আমি যা' নই, লোককে জানিয়ে দেবো, আমি তাই? এর চেয়ে বড় প্রতারণা আর কি' আছে? এটাই কি সঙ্গত?

অণিমা। না।

মিঃ দত্ত। (ঈষৎ সহজভাবে) তাহলে, ওঁর মতে না গিয়ে বলে অন্যায় কিছু করিনি? মিথ্যের মুখোস মুখে পরে যা' নেই, স্থির সিদ্ধান্তে জানছি, তার কৃত্রিম উপাসনার ভান করা, আর যাদের পক্ষে সম্ভব হয়, হোক্ গে, আমার পক্ষে তো কোনমতেই হবে না। উনি রেজিষ্ট্রী বিয়েকে ধর্ম্মহীন বলে, তা'তে ওঁর অসম্মতি জানিয়ে গেলেন। তা'হলে কি হবে? কি মতে বিয়ে হবে?

অণি। (ধীরভাবে) হবে না।

মিঃ দত্ত। হবে না? হবে না? কিন্তু ছেলেটা যে একটা হীরের টুক্‌রো' ছিল ছেড়ে দোব? প্রকাশ! প্রকাশ! হাঁ, তা ওকে একবার জিজ্ঞাসা করা বিশেষ দরকার! তা আর হিঁদুঘরের নাবালক ছেলে নয়! বয়!

বয়। (প্রবেশ করিয়া) জী হুজুর!

মিঃ দত্ত। প্রকাশবাবুকে সেলাম দেও। (বয়ের প্রস্থান)

নাঃ, মনটা বিগ্‌ড়ে গেছে; এসতো অণি! কার্টের ওই বইটে আনতো, সত্য সম্বন্ধে কি সূক্তিটাই করেছেন, ভদ্রলোক। ঈশ্বর মানিনে বটে, কিন্তু সত্যকে বাক্য দিয়ে, কাজ দিয়ে, জীবন দিয়ে মেনে এসেছি। (অণিমা পুস্তক আনিয়া দিলে, পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন)।

বয় (দ্বারের বাহির হইতে) প্রকাশবাবু আয়া।

[অণিমা ত্রস্তে বারান্দার চলিয়া গেল, সেখানে রেলিং ধরিয়া আকাশের দিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। মুখ পাষাণের মত স্থির।]

যামিনী। (প্রবেশ করিয়া নমস্কার) আমায় আপনি ডেকেছেন?

মিঃ দত্ত। তোমার বাবা ব্রাহ্মমতে তোমাদের বিয়ে দিতে চান, রেজিষ্ট্রী বিয়েে তাঁর আদৌ মত নয়। এ'টা কি তাঁর অন্যায় আবদার নয় প্রকাশ?

যামিনী। (গম্ভীর মুখে) তা' কেমন করে বলবো! তিনি যখন দীক্ষিত ব্রাহ্ম।

মিঃ দত্ত। (বিস্ময়সহ) কিন্তু তোমার বোধ হয় ওসব প্রেজুডিস্ অর্থাৎ কি না অন্ধগোঁড়ামী নেই?

যামিনী। নিশ্চয়ই আছে! তিনি আজন্ম আমাকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে শিক্ষা দিয়েছেন। ধর্ম্মমত মান্‌তে শিখিয়েছেন।

মিঃ দত্ত। তা' হলে কি রেজিষ্ট্রী বিয়েতে তোমারও মত নেই? কোন ধর্ম্মমতে বিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে দারুণ মিথ্যাচরণ হবে, আমি তো কিছুতেই তা' পারবো না।

যামিনী। 'কোন ধর্ম্মই মানিনে', একথা বলা, আমার পক্ষেও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলা হবে। আমিও তো তা' বল্‌তে পারবো না।

মিঃ দত্ত। (বসিয়া পড়িয়া) তা'হলে আমি তো দেখছি নিরুপায়।

যামিনী। (কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়া নিবৃত্ত হইল— স্বগতঃ) না বলে কোন ফল নেই! আমি বেশ স্পষ্ট দেখেছি, এই ঘরেই সে ছিল। আমি আস্‌ছি দেখে, সরে চলে গেল; আমার মনের থেকে নিশ্চয়ই চায় না! না চায় না। নৈলে এ সম্ভব? এত বড় সঙ্কট-মুহূর্ত্তে পালিয়ে থাকে? আর চায়ও যদি, তো শুধু খেল্‌নার মত করেই চায়। ইচ্ছা হ'লেই ডিভোর্স করতে পারবে, তার পথ খোলা রেখে দিয়ে; অত্যন্ত তুচ্ছ ভাবেই পেতে চায়! জীবনব্যাপী সম্পর্কের পূর্ণ দায়িত্ব নিতে, কখনই ইচ্ছুক নয়। তবে অনর্থক এ ব্যর্থ চেষ্টায় অপমানের উপর আবারও অপমানিত হওয়া কেন? যথেষ্টই তো হয়েছি। নাঃ, তেলে জলে কখনই মিল খায় না। ওঁরা বড় লোক, আমি গরীব। (প্রকাশ্যে) আমি তা'হলে এখন আস্‌ছি। (নত হইয়া যুক্তহাত কপালে স্পর্শ করিল ও দ্রুত বাহির হইয়া গেল।)

মিঃ দত্ত। (বিহ্বলবৎ) এ কি হোল? এ কি হলো? এ তো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! আমার অণিমাকে এক সঙ্গে

কেউ প্রত্যাখ্যান করে যাবে, এ যে স্বপ্নেরও অগোচর ! অঁ্যা ! ধর্ম্ম ! ঈশ্বর ! কি আছে এর প্রমাণ ? কোথায় এরা ? কিন্তু, কিন্তু আমার মেয়ে ? অণি ? আমার অণি ? সে কি তার চেয়ে অনেক সত্যি নয় ? তার কি এতটুকুও মূল্য নেই ? জগৎ অন্ধ। তারা কল্পনার কল্পলোকে থাকতে চায়, সত্যকে, বাস্তবকে পেতে চায় না, অণি !

অণিমা। (ভাবলেশহীন যন্ত্রের মত প্রবিষ্ট হইল) কি বাবা ?

মিঃ দত্ত। (দু'হাত বাড়াইয়া বুকের কাছে টানিয়া লইয়া আসিয়া) প্রকাশেরও তো দেখলুম ওইই মত ! কিচ্ছুই তো ভেবে ঠিক পাচ্ছিনে, কি করি মা আমি ? আমায় তুই বল্‌তো অণু ? আমায় বল্ মা ?

অণিমা। কি আর করবে ? বারান্দাটায় ইজি চেয়ার দিতে বলি, চায়ের সময়ও হয়ে এসেছে। চা'টা খেয়ে নিয়ে একটু পড়া শুনা করা যাবে,—এসো।

মিঃ দত্ত। ওরা বিয়েটা নেহাৎ বন্ধ করেই দেবে ? অঁ্যা !

অণি। তার আর উপায় কি ? মিথ্যে অত ভেবো না, এসো, তুমি একটু হাওয়ায় এসো, ঘরটা বড্ড গরম বোধ হচ্ছে !

মিঃ দত্ত। তাই চল্ মা ! কিন্তু,—[হাত ধরিয়া উভয়ে বারান্দায় আসিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[উত্তর বঙ্গের একটী জমিদার-বাটী, মাষ্টারমশাই, বরেন্দ্র এবং ভূষণ প্রভৃতি বন্ধুবর্গ।]

জনৈক বন্ধু। 'লং লিভ্ দি জমিন্‌ডার' লেখা এই লাল কাপড়টা ঠিক সামনেটায় দিতে হবে তো ? কি বলো বরেন ?

বরেন্দ্র। মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করো।

ভূষণ। (ঈষৎ নিম্নস্বরে) তোমার মনে রাখা উচিত, তুমি এখন আর মাষ্টারমশাইএর অধীনস্থ ওয়ার্ড নও।

বরেন্দ্র। (বিব্রত হইয়া) চুপ্, শুন্‌তে পাবেন।

ভূষণ। উঃ তা হলে তো মাথাটাই কাটা যাবে ! পেলেনই বা শুন্‌তে ? যার নিজের কিছুমাত্র আক্কেল নেই, তাকে আক্কেল-সেলামী দিতেই হয়। আগাগোড়া দেখাচ্ছেন, যেন উনিই এখনও তোমার অভিভাবক। হাতের মুঠোটী এক ইঞ্চি ফাঁক্ করতে চান্ না।

বরেন্দ্র। আঃ ভূষণ ! অত চেঁচিয়ে কথা বল্‌ছো কেন ? (সরিয়া গেল)।

ভূষণ। ম্যরাল কাউওয়ার্ড ! হক্ কথা বলবো, তার ভয়টা কিসের ? সত্যি কথার কাছে বাপ দাদা মানিনে, তার আবার ভারি এক তিন পয়সার মাষ্টার !

মাষ্টার। (বাড়ী সাজানোর উপদেশ দিতে দিতে) বরেন ! এই লাল সালুটা দেওয়া আমার মত নয়। 'লং লিভ্ দি জমিন্‌ডার—এটা বড্ড বিশ্রী শুনতে ! এই দেখ, তোমার খুড়িমা এই যে জরি চুম্‌কি দিয়ে এইটি তৈরী করে রেখেছেন, এইটে বরং এইখানে দিয়ে দিই।

বরেন্দ্র (সোৎসাহে) বাঃ কি সুন্দর হয়েছে ! দেখি দেখি কি লিখেছেন :

"আজি নবজীবন প্রভাতে, আশীর্ব্বাদ ধরো বৎস ! মোর ;
যশের প্রদীপ্ত প্রভাকর মাথায় মুকুট হোক্ তোর।"

(সাশ্রুনেত্রে মাথায় ঠেকাইল) খুড়িমাকে প্রণাম করে তো আসা হয় নি, এক্ষনি যেতে হবে।

[মাষ্টার কাজ দেখাইতে সরিয়া গেলেন, ভূষণ কাছে আসিল]।

ভূষণ। অসহ্য ন্যাকামী ! তুই মুই করে, আশীর্ব্বাদ দিয়ে, জানানো হচ্ছে, সাবালক হলেও তুমি এখনও সেই নাবালক হয়েই রইলে হে ! মুগুর টিকি বৈল বাঁধা আমার এই শক্ত-করে-ধরা হাতের মুঠোর মধ্যে।

বরেন্দ্র। তুমি ওঁদের একটুও দেখতে পারো না।

ভূষণ। অনৈসর্গ সয়না বলে। আচ্ছা তুমি যে জমিদার হলে, কোর্ট অব ওয়ার্ডের গ্রাস থেকে বেরুলে, এর জন্য এতটুকু আনন্দ করতে শুনেছ ? 'লং লিভ্ দি জমিন্‌ডার' কথাটা সহ্যই করতে পারলে না। আর তার বদলে কি না, বচ্ছ-টচ্ছ বলে একটা ভাকামীর আশীর্ব্বাদ জানানো হলো। যাতে নিঙ্‌ড়ে ফেলেও 'লং লিভ্' বলে একটা শব্দও বেরুবে না ! অর্থাৎ তুমি পাঁচ আর মরো ওঁদের কাছে সব কথাই গেল ! তুমি জমিদার হয়েছ, এই কথাটা তোমার মনে না সেঁধুতে পেলেই হলো। তাহলেই এই খোঁকের দলটি তোমার গায়ের রক্ত চুষে বেঁচে থাকবেন।

বরেন। না, না, তা' কেন, অমন কি তুমি বল্‌ছো ? ছিঃ !

ভূষণ। ছি'ই বল, আর ছ্যাই বল ; যা' বলছি, মিলিয়ে দেখে নিও। ঠিক তাই ! এই যে কল্‌কেত্তা যেতে চাচ্ছো, ভেবেছ তোমায় যেতে দেবে ?

বরেন। নিশ্চয় ! বলেছেন আমায় নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। বার্থ রিজার্ভ করতে লোক পর্য্যন্ত পাঠানো হয়েছে। কালকের আসাম মেলে যাব।

ভূষণ। ওঃ-ত্রাই বলো ! সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন ! নাকের দড়িটা টেনেই রাখা হবে, হাতের মধ্যে ! তা হলে কিন্তু আমরা আর যাচ্ছিনে। এতটা অপমান বরদাস্ত করা আমাদের পক্ষে শক্ত ! (মুখ ফিরাইল)

বরেন। (ব্যগ্রকণ্ঠে) কেন ভাই, রাগ করছো কেন ? এতে তোমাদের অপমানটা কিসের হলো ?

মাষ্টার। (আসিয়া) বরেন। বার্থ রিজার্ভ তো হয়ে গেছে ; কিন্তু বিষম মুশ্‌কিলে পড়ে গেলুম যে বাবা ! যাওয়া তো এখন মুশ্‌কিল !

বরেন। হাঁা কাকাবাবু ! যাওয়া আমার বন্ধ হবে না তো ? উদয়শঙ্করের নাচটা দেখতে পাব তো ? (উৎসুক নেত্রে চাহিল)

মাষ্টার। তাই তো ভাবছি বাবা ! হারুর জ্বরটা টাইফয়েডের দিকে যাচ্ছে বলেই ডাক্তার বাবু এইমাত্র জানিয়ে গেলেন, কি করে যাই ? না, বাবা, তুমি দুঃখিত হয়ো না, তুমি না হয়, ভূষণ আর সত্যকে সঙ্গে নিয়েই এক হপ্তার জন্তে ঘুরে এসোগে। কিন্তু বরেন ! হুগলীতে তোমার যে গঙ্গাতীরের বাড়ী আছে, সেই খানে রাত্রে ফিরে এসে থাকবে, আবার খাওয়া-দাওয়া করে কলকাতায় মধ্যে মধ্যে গিয়ে দেখে শুনে ফের রাত্রেই ফিরে আসবে ; এই সর্ত্তে তোমায় আমি যেতে দেবো, কেমন ? তাতে রাজী তো ?

বরেন্দ্র। (সাগ্রহে) যেমন বল্‌বেন, তাই হবে।

মাষ্টার। ঠিক সাতটি দিন, তার চেয়ে দেরি কর্ব্বে না কিন্তু !

বরেন্দ্র। আচ্ছা,—কিন্তু ক'দিনে কি'ই বা দেখব ?

মাষ্টার। বেশ তো এবারটা অল্প-সল্প দেখেই ঘুরে এস, আবার তখন যাওয়া যাবে। তোমার খুড়িমা তোমায় নিয়ে কালিঘাটে পূজো দিতে যাবেন, বলে কত সাধই করেছিলেন জানো তো ? তা' এবার তো সেটা হলো না। এক সময় সবাই মিলে আবার যাবো'খ'ন, কি বল ?

বরেন্দ্র। আচ্ছা।

মাষ্টার। কাড়গুলো সাজা হ'ল কি না, দেখে আসি, ভেঙ্গে চুরে না যায় ! হারুটা আজকের দিনেই রোগ বাড়ালে, এমন মুশ্‌কিলে ফেললে ছেলেটা ! (প্রস্থান)

ভূষণ। (সাগ্রহে শুনিতেছিল) ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে কি নড়ে না ? দেখলে তো ? সমস্ত ফন্দি-ফিকির কেমন এক মুহূর্ত্তে ঘুরে গেল ! বাব্বা ! চাঁদ সূর্য্যি এখনও যে আকাশের গায়ে উঠ্‌ছে !

বরেন। (ত্রস্তে) কি করছো ভূষণ ? শুনতে পাবেন যে এক্ষণি !

ভূষণ। বড় বয়েই গেল ! পারেন, না হয় চাল কেটে গাঁ থেকে উঠিয়েই দেবেন, তা' বলে কারু বুজরুকি ভূষণচন্দ্র সহ্য করবে না। হাঁ, উচিত কথা বলবো, বন্ধু বেগড়ায় বেগড়াবে, এই হচ্ছে আমার আজন্মের 'মটো'।

বরেন্দ্র। (বিব্রত ভাবে) আচ্ছা ভাই, আচ্ছা, রাগ করো না, আমি ছুটে, একবার হারুকে দেখে আসি। আহা, বেচারার কত সাধ ছিল, আজকের দিনে নিজের হাতে কাঙ্গালীদের পরিবেশন করে খাওয়াবে, কল্‌কাতা যাবে ; আহা, তা' না হয়ে কি না শয্যাগত হয়ে পড়ে রইল ! আবার অত শক্ত অসুখও সন্দেহ হচ্ছে। নাঃ আমার ভাল লাগছে না ! যাই একবারটি। (প্রস্থান)

ভূষণ। (সেই দিকে চাহিয়া) যাও, মাষ্টারের গুষ্টির পা' চেটে এসো ! একবার চলো না তুমি আমার সঙ্গে, তার পর চাটাচ্ছি তোমায় ওই কিসানখো্‌পিষ্ট স্কুল-মাষ্টারের পা ! তখন "দেহি পদ পল্লবমুদারম্‌" বলে যে পাদপদ্ম বুকে ধরবে, তাতে তিন মণ ধূলো থাকবে না, আর বাছুরের চামড়া সেই ফাটা পায়ে ফেটী হয়ে বসে নেই ! তাতে (সুরে) 'অলক্ত রাগানি, পরিশোভিতানি'। তাতে, (সুরে) 'নূপুর বেজে যায় রিণি ঝিনি'। (হাস্য) কে' মধু না ? আরে, এতক্ষণ ছিলি কোথায় ? শোন্ শোন্। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া প্রস্থান)

[বরেন্দ্র ও মাষ্টারের প্রবেশ]

মাষ্টার। আজকের দিনে মন খারাপ করো না বাবা ! ভয় কি ? তোমার হারু তোমার আশীর্ব্বাদের শুভেচ্ছায় সেরে যাবে, কিন্তু বরেন ! টাইফয়েড সন্দেহ যখন হয়েছে, তুমি ও বাড়ীতে এখন আর যেন যেও না !

বরেন। আমার কিছু ভাল লাগছে না। (মাধুর্নেত্রে) ও চোখ বুজে পড়ে রয়েছে। একবারটী চাইলেও না। হাঁ। কাকাবাবু! ডাক্তার কি বলেছেন? ও ভাল হবে তো?

মাষ্টার। হবে বৈ কি? অত কি উতলা হতে আছে? বরেন! জীবনে মানুষকে কতই সহ্য করতে হয়,—তোমায় তো বাবা গীতা পড়ে পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছি। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে কি বলেছেন, সেটি মনে করে দেখ তো! "ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে"—তুমিই বা বাবা, এত অল্পে কাতর হবে কেন? যাও, দুদিন একটু নূতন জায়গায় ঘুরে ফিরে এসো—অনেক কিছু দেখতে শুনতে পাবে; মনটা একটু অন্যমনস্ক থাকবে। রোজ কিন্তু তুমি একটা করে চিঠি দিও, আর সাত দিনের বেশী যেন দেরি করো না, তা হলে আমরা ভেবেই মরে যাবো।

বরেন। আপনিও আমায় রোজ হাফর খবরটা দেবেন কিন্তু! নৈলে, সাত দিনও আমি ওখানে থাকতে পারবো না। ওরা যাবে না, খুড়িমা আপনি যাবেন না সেই_তো কি রকম বিশ্রী লাগছে!

মা। (মাথায় হাত দিয়া) দেখো না, হাফ ভাল হলেই আবার আমরা সবাই একসঙ্গে যাবো। এস, কাঙালী বিদায় হচ্ছে,—দেখতে যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

[ক্রমশঃ

আমাদের রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বড়লোকের ছেলে
প্রমাণ পাবে 'শ্যামলী'তে গেলে
তাই তো তিনি কবি
আঁকেন শুধু স্বপ্নলোকের ছবি।
হিজিবিজি যাহাই আঁকেন, লেখেন যদি গান
সবার আগে পাবেন তিনি মান।
কারণ রবীন্দ্রনাথ বড়লোকের ছেলে,
প্রমাণ পাবে 'মহুয়া'র ছন্দ কলরোলে।
বাঙলা দেশের ছেলে মেয়ে
দেশের তরে যখন জেলে পচে মরে
তাদের রক্তে যখন বাঙলা দেশের মাঠ
রাঙা হয়ে উঠে যেন ছাগল কাটার কাঠ।
তখনো যোদের কবি
দেখেন স্বপ্ন-ছবি
তারি মাঝে
হয়ত কভু লাজে
অনেক কৃপা করে বঙ্গ-জননীরে
বাণী দেন মাঝে মাঝে থরে বিথরে।
তাতেই দেশের লোক
ভুলে সকল দুঃখ
বলে কবির বাণী
কিছুই যে এ নয়, আমরা তা তো জানি।

তবুও রবীন্দ্রনাথ কবি
আমরা সবাই তারে নমি,
কারণ তিনি বড়লোকের ছেলে
সত্যি কি না বুঝতে পাবে 'শ্যামলী'তে গেলে।
বিশ্ব-কবি তিনি
আমরা সবাই তাঁরে চিনি,
রবীন্দ্রনাথ বলেন, তিনি না কি গণ-বিপ্লবী
লাঞ্ছিতদের মস্ত দরদী।
হায় রে পোড়া বাঙ্‌লা দেশ!
শুনতে কি পাও কবির নির্দ্দেশ?
আমি তাই তো বসে ভাবি
যারা স্বপ্ন-বিলাসী
তারা সবহারাদের নিয়েও করে খেলা,
কাব্য লিখতে পারে অনেকগুলা!
রবীন্দ্রনাথ কবি
আঁকেন তিনি স্বপ্নলোকের ছবি।
দেশের বুকে সর্ব্বনাশের ছায়া
যখন ধরে কায়া
তখনো তিনি দেখেন মেয়েদের হরিণকালো চোখ
তারা যত কালোই না হোক!
কেন না রবীন্দ্রনাথ বড়লোকের ছেলে
প্রমাণ পাবে 'শান্তিনিকেতনে' গেলে!

প্রাচীন বাঙ্গালার ভাস্কর্য্যবিজ্ঞান ও তক্ষণ-শিল্প

—শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

প্রাচীন বাঙ্গালায় দেবদেবীর মূর্ত্তি যে কত ছিল, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন। অত্যাচার উৎপীড়নে পলায়িত হিন্দু গৃহস্থের সঙ্গে সঙ্গে কত দেবমূর্ত্তি স্থানান্তরে নীত হইয়াছে, অত্যাচারীর অস্ত্রাঘাতে কত মূর্ত্তি খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছে, কত মূর্ত্তি বিচূর্ণীকৃত হইয়াছে, কত মূর্ত্তি অপহৃত হইয়াছে, কত মূর্ত্তি ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে, কত মূর্ত্তি পুষ্করিণীজলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আজি কে তাহার সন্ধান করিবে? নষ্ট হইয়া গিয়াছে বহু, তথাপি যে কয়েকটি অবশিষ্ট আছে, তাহারই কাহিনী প্রাচীন বাঙ্গালার প্রত্নকলাসম্পদের অতীত গৌরবের পরিচয় প্রদানের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করি। অতীতের শত অত্যাচার-উপদ্রব-বিপ্লবের মধ্যেও এই সমুদায় মূর্ত্তি এতদিন ধরিয়া কিরূপে যে আপনাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাহা ভাবিলে সত্যসত্যই বিস্মিত হইতে হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাঁচগ্রাম নামক গ্রামে "সর্ব্বতী" পুষ্করিণীর সংস্কারকালে একটি ব্রহ্মার মূর্ত্তি পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণের ধ্যানের সহিত এই ব্রহ্মার প্রতিরূপের বহুল ঐক্য পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই মূর্ত্তির বামে সাবিত্রী ও দক্ষিণে সরস্বতী দেবীর কোনও প্রতিমূর্ত্তি নাই। দ্বিতীয় কোনও প্রস্তরখণ্ডে তাহা ক্ষোদিত ছিল কি না তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এদেশে ব্রহ্মা-পূজা প্রচলিত রহিয়াছে। গণেশাদি পঞ্চদেবতার মধ্যে ইনি গণ্য নহেন। এই মূর্ত্তিটি বহু পুরাতন বলিয়া মনে হয়।

বীরভূম জেলার অজয় নদীর তীরে "দেউলি" নামে এক গ্রামে একটি দশভুজ শিব, একটি দশভুজা দেবীমূর্ত্তি এবং একটি অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনীর বৃহৎ মূর্ত্তি আছে। এই সমস্ত মূর্ত্তি সেন-রাজগণের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। সেন-রাজগণ নিঃশঙ্ক-শঙ্কর, বৃষভ-শঙ্কর, মদন-শঙ্কর প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতেন। ঐতিহাসিকগণের মতে তাঁহারা শিবশক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের তাম্রশাসনের শিরোদেশে দশভুজ শিবমূর্ত্তি ক্ষোদিত থাকিত। দশভুজা দেবীমূর্ত্তির বামদিকের এক হাতে কমণ্ডলু এবং দক্ষিণের এক হস্তে অক্ষমালা দেখিয়া সাবিত্রী-মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। মূর্ত্তিটি রাঢ়ীয় ভাস্কর্য্যের—তক্ষণ-শিল্পের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য দর্শনে শিল্পীর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভরে মস্তক আপনা-আপনি অবনত হইয়া আইসে। অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিটি প্রায় চারি হস্ত উচ্চ। একখণ্ড পাষাণে মহিষ, অসুর, সিংহ ও দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মিত। দেবীর নাসিকা কর্ত্তিত। প্রবাদ কালাপাহাড় কাটিয়া দিয়াছে। লোকে দেবীকে "খাঁদা পার্ব্বতী" বলিয়া অভিহিত করে। দেউলিতে একটি শিব-মন্দির আছে। এই মন্দিরের দ্বারদেশে "১৭৫০ শকাব্দা" এবং "শ্রীতিলকচন্দ্র বসাক" ক্ষোদিত আছে। মন্দিরটি ইষ্টক-নির্ম্মিত। শিবের নাম "দেউলীশ্বর"। মন্দির-সন্নিধানে একখণ্ড প্রস্তর পড়িয়া আছে। প্রবাদ বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঐ প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" রচনা করেন। কাঁকুটিয়ার বৈষ্ণবাটীতে কবি লোচনদাসের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীনাথ ও নিতাই-গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি আজিও বর্ত্তমান। তীরগ্রামে একটি ভগ্ন বাসুদেব-মূর্ত্তি, একটি ভগ্ন বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও একটি তারা-মূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। বহুকষ্টে জোড়াতাড়া দিয়া মূর্ত্তিটি চিনিতে হয়।

বীরনগরে বিষ্ণুর বামমূর্ত্তি নরসিংহ বর্ত্তমান। পণ্ডিত বাম-দক্ষিণ দুইভাবেই এই মূর্ত্তির পূজা করিতে পারে। তারাপুর ও পাইকোড়ে বালগোপালের মূর্ত্তিও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পাইকোড়ে বুড়াশিবের মন্দিরে যে কয়েকটি মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে পাদুকা-পরিহিত পদ্মাসনে দণ্ডায়মান, পদ্মহস্ত এবং দ্বিভুজ একটি সূর্য্যমূর্ত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মূর্ত্তির বিশেষত্ব ইহাতে সপ্তাশ্ববাহন ও অরুণ সারথি নাই। পার্শ্বস্থিত দুইটি মূর্ত্তি চিনিবার উপায় নাই। পাল-রাজগণের শাসনকালে বাঙ্গালায় সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রমাণ-স্বরূপ দেখা যায় সম্রাট লক্ষ্মণ সেন পর্য্যন্তও পরবর্ত্তীযুগে

আপনাকে "পরম সৌর" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। আমাদের অনুমান হয়, প্রাগুক্ত মূর্ত্তিটি পাল-রাজগণের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বীরভূম জিলায় তিন প্রকারের সূর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। প্রথম, এই অশ্ব সারথিহীন দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। দ্বিতীয়, অশ্ব-সারথি-যুক্ত দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। তৃতীয়, অশ্ব-সারথিযুক্ত রথোপবিষ্ট মূর্ত্তি। দ্বিতীয় প্রকারের মূর্ত্তি বীরভূমের বহু স্থানেই পাওয়া গিয়াছে। যথা, বারাঢেকা, দক্ষিণগ্রাম, নারায়ণপুর প্রভৃতি গ্রাম। তৃতীয় প্রকারের মূর্ত্তি কেবল-মাত্র তারাপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সূর্য্য-মূর্ত্তির সহিত পাইকোড়ে অপরাপর মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ চতুর্ভুজ মূর্ত্তির দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্ত অক্ষসূত্রে, অধো-হস্ত বরমুদ্রায় শোভিত। অপর দুইটি হস্ত ভগ্ন। সূর্য্যের বাম পার্শ্বের মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে তরবারি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর হস্তগুলি এবং মূর্ত্তির পাদ-পীঠ হইতে কটি পর্য্যন্ত অংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই মূর্ত্তিদ্বয়ের পরিচয় লাভের কোনও উপায় নাই। কালিকাপুরাণে অক্ষমালা, পুস্তক ও বরাভয় শোভিত হস্ত অথবা তরবারি বা ছুরিকা ও পুস্তক-হস্ত কতিপয় মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। কালিকাপুরাণে পুস্তক-হস্ত বিষ্ণুর ও শক্তি মূর্ত্তির ধ্যান বিবৃত হইয়াছে। আমাদের উদ্দিষ্ট সূর্য্যমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বস্থ মূর্ত্তি দুইটি, কালিকাপুরাণোক্ত কোনও তান্ত্রিক দেবীমূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। বুড়াশিবের মন্দিরস্থিত বাসুদেব মূর্ত্তিগুলি সেন-রাজগণের সময়ে নির্ম্মিত হয়; মূর্ত্তির গঠন-প্রণালী দেখিয়া স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। নারায়ণ-চন্দ্রের নরসিংহ মূর্ত্তিটিও সমসাময়িক বলিয়াই অনুমিত হয়। চেদীরাজ কর্ণসেন দেবের সময়ে পাইকোড়ে যে দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই সময়ে অপরাপর আনুষঙ্গিক মূর্ত্তি নির্ম্মিত হওয়াও স্বাভাবিক। অবশ্য তাহার পরে যে আর কোনও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় নাই, এ কথা বলিতেছি না। বিশেষ পাল ও সেন-রাজগণের সময়ের রাঢ়ীয় শিল্প-নৈপুণ্যের বৈশিষ্ট্যদ্যোতক তক্ষণ ও ভাস্কর্য্য-প্রণালী, বহুদিন পর্য্যন্ত এদেশে অনুসৃত ছিল। তবে এই কথাও ঠিক যে, শ্রীচৈতন্যের পর এদেশে বাসুদেব মূর্ত্তির পাদপীঠে যে লিপি খোদিত আছে, সেই লিপির "পণ্ডিত বিশ্বরূপ" কে, তাঁহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। পুরাতন দেবমূর্ত্তি দেখিয়া বীরনগর, ডাঁটরা, ভাণ্ডীশ্বর, পাইকোড় প্রভৃতি স্থান যে বহু প্রাচীন, স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে এই সমস্ত স্থান যে এক সময়ে রাঢ়ের—তথা গৌড়বঙ্গের গৌরব ছিল, তাহাতে কোন নিঃসন্দেহ নাই।

রামপুরহাট মহকুমার কনকপুর গ্রামের রামনাথ ভাদুড়ী, গোপাল দেব, ভাণ্ডেশ্বর মহাদেব ও বীরসিংহপুরের কালিকা দেবীর পূজার ব্যবস্থা করেন। গোপালদেবের ও মহাদেবের মন্দির তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ভাণ্ডেশ্বর শিবমন্দিরের দ্বারের ঊর্দ্ধে যে শিলালিপি খোদিত রহিয়াছে তাহার প্রথম দুইটি শ্লোক—

"রসাব্ধি-ষোড়শ শাকে সংখ্যকে
শাক্রসম্মতে।
রামনাথ দ্বিজঃ কশ্চিৎ ভাদুড়ী
কুলসম্ভবঃ।"

ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় ১৬৭৬ শকাব্দে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ ১৭৫৪ সালে ভাণ্ডীরবনের শিবমন্দির নির্ম্মিত হয়।

কনকপুরের অপরাজিতা দেবীর নাম এতদঞ্চলে চির-প্রসিদ্ধ। কত কাল হইতে তিনি কনকপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরূপে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন, কেহই বলিতে পারেন না। দেবীর মুখমণ্ডল মাত্র পরিদৃষ্ট হয়। দেহের অপরাংশ একটি নাতুচ্চ বেদীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে (ইহাই প্রবাদ)। অনেকেই সন্দেহ করেন, কোনও অত্যাচারী কর্ত্তৃক দেহের সমস্ত অংশ নষ্ট হইয়া গেলে, অবশিষ্ট মুখমণ্ডলটি বেদীর সহিত গাঁথিয়া দিয়া পূজা করা হইতেছে। কৃষ্ণ পাষাণ ভেদ করিয়া সেই হাস্য-প্রফুল্ল-করুণা-মণ্ডিত সৌম্যপ্রশান্ত বদনমণ্ডল হইতে যেন অমিয়-নির্ঝর ক্ষরিত হইতেছে।

মলারপুরের "দামোদর" নামক পুষ্করিণীর উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি অনতিক্ষুদ্র ধ্বংসস্তূপ, একটি ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তি ও কয়েকটি শিবলিঙ্গ পতিত রহিয়াছে। ভগ্ন মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে পরশু হস্তে গণেশ ও বাম পার্শ্বে একটি দেবীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। এতদ্ভিন্ন তথায় প্রস্তরে নির্ম্মিত দ্বারদেশের কয়েকটি ভগ্নাংশ এবং অপর দুই এক খণ্ড প্রস্তর পড়িয়া আছে। গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটি অশ্বত্থ মূলে

"বনদুর্গেশ্বরী" দেবীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান। এই স্থলে একটি হরগৌরীর ভগ্ন মূর্ত্তি এবং দহের নিকটে একটি "গোলা ঢালা ছুঁচ পাথর" দেখিতে পাওয়া যায়।

তন্ত্রে লিখিত আছে, বিষ্ণুচক্র কর্ত্তিত সতী দেহাংশ পতিত হওয়ায় (নলা) নলহাটীতে দেবী কালিকা এবং কৈরব যোগেশ অধিষ্ঠান করেন। কেহ কেহ বলেন, এখানে দেবীর ললাট পতিত হয় তাই দেবীর নাম ললাটেশ্বরী। আমাদের মনে হয় "নলহাটেশ্বরী" হইতেঅপভ্রংশে "ললাটেশ্বরী" নাম প্রচলিত হইয়াছে। কারণ তন্ত্রে "নলা পাতের" কথাই উল্লিখিত আছে। পর্ব্বতে অধিষ্ঠিতা বলিয়া দেবী পার্ব্বতী নামেও পরিচিত। পর্ব্বতের উপর দেবীর মন্দির। দৃশ্যটি অতীব সুন্দর। একটি স্বভাব-সম্ভূত পাষাণখণ্ডের আধারে দেবীর পূজা হয়।

বারার হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি যে কত ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিটি এতদঞ্চলে সমধিক প্রসিদ্ধ। দেবীসিংহ পৃষ্ঠে আসীনা রহিয়াছেন—তাঁহার দক্ষিণ চরণের সর্ব্বনিম্নাংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, গলদেশের ক্ষত-চিহ্ন দেখিয়া অনুমান হয়, স্কন্ধচ্যুত শির পুনরায় সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বারার বিভিন্ন স্থানে কতিপয় মূর্ত্তি পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি, একটি সূর্য্যমূর্ত্তি ও একটি অষ্টভুজা চতুর্ব্বদনাদেবী মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। বারার পূর্ব্ব দিকে কুমারখাণ্ডা গ্রামের এক অশ্বত্থমূলে একটি গঙ্গামূর্ত্তির ভগ্নাংশ ও তাহার নিকটেই একটি শিবলিঙ্গ পড়িয়া রহিয়াছে। শিবের ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির ছিল, শুনিতে পাই, এক্ষণে তাহার চিহ্ন মাত্র নাই।

কুমারখাণ্ডার দক্ষিণে তিলোড়াগ্রামে একটি ব্রহ্মামূর্ত্তি, একটি গঙ্গামূর্ত্তি ও একটি হিরণ্যকশিপুর মূর্ত্তি আছে। বানেশ্বর ও নগরায় একটি বুদ্ধমূর্ত্তি ও একটি বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সাহাকর দীঘি নামক এক গ্রামের কোন পুষ্করিণী হইতে পাঁক তুলিবার সময় মালেরা একটি "শ্রীকৃষ্ণজননী" মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহা হেতমপুর রাজবাটীতে রক্ষিত আছে।

আকালীপুরে মহারাজ নন্দকুমার রায় প্রতিষ্ঠিত গুহ্যকালিকাদেবী বিরাজিতা রহিয়াছেন। এস্থলে গ্রাম্য দেবতা তলায় কতিপয় ভগ্নমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া অনুমিত হয়, এই স্থান মহারাজ নন্দকুমারের বহু পূর্ব্ব হইতেই বীরভূমের শক্তি উপাসনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল ও বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই আকালীপুরে তান্ত্রিক মত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নিকটস্থ দেবগ্রামে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি অক্ষত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আমরা বীরভূমে বুদ্ধমূর্ত্তি, বৌদ্ধ-তন্ত্রোক্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি ও তারামূর্ত্তি এবং গণেশ, গঙ্গা, শিব, দুর্গা, কালী, বাসুদেব, সূর্য্য, ব্রহ্মা প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি পাইয়াছি। অনুসন্ধান করিলে পশ্চিম বঙ্গে বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, জৈন সকল মতেরই বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

সাগরদীঘিতে একটি সূর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তি বারার সূর্য্যমূর্ত্তি হইতে আকারে বড়। ইহার কীর্ত্তিমুখ ও চালচিত্রের মুখ ও গঠনপ্রনালী ভিন্নরূপ। তদ্ভিন্ন অপরাপর বিষয়ে ঐক্য দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তিটি এক্ষণে ষ্টেশনের অনতিদূরে সাগরদীঘির তীরে ইষ্টক-বেষ্টনীর মধ্যে রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সাগরদীঘিতে এক নূতন প্রকারের বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাগরদীঘিতে প্রাপ্ত অপর একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির চিত্র প্রকাশ করিয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' তাহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। মহীপালের রাজধানীর ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত একটি দ্বাদশ হস্তযুক্ত মূর্ত্তির চিত্র মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে প্রকাশিত হইয়াছে। লেয়ার্ড সাহেব প্রভৃতি উক্ত মূর্ত্তিকে বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় বলেন, দ্বাদশ-ভুজ প্রায় হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিমধ্যে দৃষ্ট হয় না। আমরা কিন্তু মৎস্যপুরাণে দ্বাদশ-হস্ত কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তির পরিচয় পাইয়াছি।

> দ্বাপরেৎ খেটে নগরে কুমার দ্বাদশ কারয়েৎ।
> চতুর্ভুজঃ খর্ব্বটে বা-বনে গ্রামে দ্বিবাহুকঃ॥
>
> (মৎস্যপুরাণ ২৬০ অধ্যায়)

তবে মহীপালের মূর্ত্তির দ্বাদশ হস্তের দশটি হস্তে পদ্ম ও পদ্মের উপরে বৃষ প্রভৃতি অঙ্কিত আছে, কিন্তু মৎস্যপুরাণে কার্ত্তিকেয়ের হস্ত শক্তি, পাশ প্রভৃতি অস্ত্রনিচয়ে সুশোভিত রহিয়াছে।

কুমারখাণ্ডা গ্রামে গঙ্গামূর্ত্তির পাদপীঠে একটি মকর

রহিয়াছে। দক্ষিণে গণেশের মূর্ত্তি, বামহস্ত ভগ্ন, কিন্তু প্রসারিত শুণ্ড দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় এই হস্তস্থিত পাত্র হইতে তিনি মোদক গ্রহণ করিতেছেন—দক্ষিণ হস্তে একটি টাঙ্গী। সচরাচর চতুর্ভুজ গণেশই দেখিতে পাওয়া যায়, এই গণেশ দ্বিভুজ। বাম পার্শ্বের মূর্ত্তি ভগ্ন। গণেশের পদতলে দুইটি সিংহ ও বামপার্শ্বের মূর্ত্তির পদতলে দুইটি হরিণ রহিয়াছে। তিলোরা গ্রামেও এই রকমের একটি সম্পূর্ণ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তির পদমূলে মকর। বামে ও দক্ষিণে কার্ত্তিক গণেশ এবং ভ্রাতৃযুগলের পদতলে যথাক্রমে একটি হরিণ ও একটি সিংহ আছে। দেবীমূর্ত্তির দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হস্তে বীণা ও অধো হস্তে একটি কমণ্ডলু, মস্তক মুকুটালঙ্কারে সুশোভিত। ইহা গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। আকালীপুরের নাগছত্রতলে অবস্থিত দেবী-মূর্ত্তিটি বোধ হয় মনসা বা নাগকন্যা। এই মূর্ত্তির বাম-পার্শ্বস্থিত মূর্ত্তি ক্ষেত্রপালের বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কটিহার ও কণ্ঠভূষণ দেখিয়া সন্দেহ আসিয়া পড়ে। মনসার দক্ষিণ পার্শ্বে যে যে মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহা কোনও তান্ত্রিক মূর্ত্তির। নিম্নস্থিতা শবাসনে আসীনা দেবীমূর্ত্তির ঊর্দ্ধ দেশে অপর একটি শব শায়িত রহিয়াছে, তাহার বক্ষে মাত্র একটি চরণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় শবাসনা অপর দুই মূর্ত্তির সহিত এ মূর্ত্তির আকারগত পার্থক্য ছিল। কালিকাপুরাণে (৬১ অধ্যায়) উগ্রতারা ও শিবদূতীর যে ধ্যান বর্ণিত আছে, তাহাতে উগ্রতারার বামপদ শববক্ষে, দক্ষিণ পদ সিংহপৃষ্ঠে ও শিবদূতীর দক্ষিণপদ শবহৃদয়ে ও বামপদ শিবা উপরি সংস্থিত থাকিবার উল্লেখ পাওয়া যায়। উপরোক্ত মূর্ত্তি শিবদূতীর মূর্ত্তি ছিল কি না জানিবার উপায় নাই। বিষ্ণুপুরে গোপালদেব বিগ্রহ আছেন, প্রাচীন কালের প্রতিষ্ঠিত। বর্গীরা গোপালদেবের মন্দির-দ্বার ভাঙ্গিয়া বিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার অপহরণ করিতে উদ্যত হইলে দেবতা আপন মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। বলরামপুর গ্রামেও কতিপয় প্রাচীন মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। দুই একটি বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি ও অবশিষ্টপ্রায় হিন্দু দেবদেবীর ভগ্নাংশ। অনতি-দূরে বাসুদেব মূর্ত্তির অংশবিশেষ দেহরী পদবীধারী বাগদাতি কর্ত্তৃক পূজিত হয়। বড়জোলে বসুমতী দেবী আছেন। বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি ও বহু প্রাচীন শরাকজাতি বৌদ্ধ প্রভাবের ক্ষীণস্মৃতি জাগ্রত করিয়া তোলে। ব্রহ্মাণী দক্ষিণ তীরে নারায়ণপুরের ঈশান কোণে "মহেশ্বর" শিবের মন্দির আছে। তারাপুরস্থ ঠাকরুণ পাহাড়ে এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। সপ্তশূকরবাহনাসীনা, অষ্টভূজা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাস্যা মারীচি দেবী কিরূপে ব্রাহ্মণের হস্তে আসিয়া পতিত হইলেন, আজি আর সেই রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার কোনও উপায় নাই। মূর্ত্তিটির অনেকাংশ ভগ্ন, সুতরাং বিকৃত হইয়াছে। দুইটি মুখ প্রায় অবিকৃত আছে, একটি বানরের মত অপরটি ভল্লুকের মত। মারীচি মূর্ত্তি বৌদ্ধ প্রাধান্যের নিদর্শন। বৈদেশিক আক্রমণকারিগণের প্রভাবে হিন্দু ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখা পশ্চিমবঙ্গে প্রসার লাভ করিলেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, ঠাকরুণ পাহাড়ের মারীচি মূর্ত্তিই তাহার প্রমাণ। পাল নরপতিগণের সময়েই এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারাপুরের সূর্য্যমূর্ত্তি কোনও সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক পশ্চিমাঞ্চল হইতে আনীত হইয়াছিল। কারণ এতদঞ্চলে ঐরূপ মূর্ত্তি আর দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে ঐ প্রকারের মূর্ত্তির সংখ্যাই অধিক। সূর্য্যের পাশে পৃথক যে মূর্ত্তিটি রহিয়াছে, পাণ্ডারা তাঁহাকে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি বলিয়া পরিচয় দান করেন। গঠন প্রণালী দেখিয়া এ মূর্ত্তিটিও পশ্চিমাঞ্চলের বলিয়া অনুমিত হয়। দীঘকার মূর্ত্তিটি অপরিচিত। ঝলকা ও ফুলবেড়ের "শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবী" মূর্ত্তি দুইটি যে শক্তিমূর্ত্তি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দুইটি মূর্ত্তির মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ হাতের সংখ্যা লইয়া। ঝলকার মূর্ত্তিটি দশভুজা, ফুলবেড়ের মূর্ত্তিটি অষ্টভুজা। ঝলকার মূর্ত্তির মাথায় সাপের মুকুট; মূর্ত্তিটি একটি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। হস্তের অস্ত্র নিচয়ে প্রকৃতি ভেদ বুঝিতে পারা যাইবে। ফুলবেড়ের মূর্ত্তির বাম হস্তে পাশ অস্ত্রের সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। চতুর্ব্বিংশতি প্রকার চামুণ্ডা মূর্ত্তির মধ্যে এই দুইটি দুই রকমের চামুণ্ডার মূর্ত্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। এই মূর্ত্তির বিশেষত্ব অসি, পাশ ও খট্টাঙ্গ। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর চামুণ্ডার ধ্যানের সহিত প্রাগুক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কালিকা পুরাণে (৬১ অধ্যায়) "নীলোৎপলদল শ্যামা

চতুর্বাহু সমন্বিতা" চামুণ্ডার উল্লেখ আছে। ইনিও মুণ্ডমালা বিভূষিতা, কৃশোদরী, দীর্ঘদংষ্ট্রা, নিম্ন রক্তনয়না, আবার ভৈরবা, বিস্তার শ্রবণাননা ও ভীষণা। চন্দ্রহাস, খট্টাঙ্গ, চর্ম ও পাশ ইঁহার অস্ত্র। ইঁহার সঙ্গে ভুজ সংখ্যায় মিল না হইলেও অপরাপর বিষয়ে ঐক্য দৃষ্ট হয়। ফুলকোড়ের মূর্তিটি ফুলেশ্বরী দেবী নামে পরিচিতা। ঝলকার মূর্তিটির বিষয়ে এতদঞ্চলের কেহ কিছু বলিতে পারে না।

রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত অম্বু'লায় একটি প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ এবং কোটাসুরে মদনেশ্বর শিবলিঙ্গ, কয়েকটি বাসুদেব মূর্তি ও মৃত্তিকানিয়ে এতদ্স্থানের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ অবশিষ্ট আছে। বীরচন্দ্রপুর গ্রামে নিত্যানন্দ তনয় বীরচন্দ্র প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবঙ্কিম রায় নামক শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের মন্দিরে একটি দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গোস্বামীগণ বলেন, হাড়াই পণ্ডিত পুরুষানুক্রমে শাক্ত ছিলেন, দশভুজা তাঁহারই কুলদেবী। একচক্রার অন্তর্গত মৌড়েশ্বর প্রভৃতি স্থানে বহু দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তন্মধ্যে মৌড়েশ্বর শিব বিশেষ প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য। চৈতন্য ভাগবতে মৌড়েশ্বর শিবের নাম পাওয়া যায়।

"মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কতদূরে।
যারে পূজিয়াছে নিত্যানন্দে হলধরে॥"

ভক্তি রত্নাকরেও লিখিত আছে,—

"মৌড়েশ্বরে গিয়া কৈল শিবের দর্শন।
যাঁরে পূজিলেন পদ্মাবতীর নন্দন॥"

মৌড়পুর গ্রামের একটি পশ্চিম দুয়ারি নবরত্ন মন্দিরে মৌড়েশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। আবার গ্রামের নৈঋত কোণাংশে শিবপুষ্করিণী নামক এক পুষ্করিণীর জলমধ্যে যে একটি মন্দির আছে, তাহাতেও মৌড়েশ্বরের অপরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

মৌড়েশ্বরে "পলাশবাসিনী" নাম্নী এক দেবীমূর্তি দৃষ্ট হয়। শক্তিমূর্তি। চিহ্ন দেখিয়া কিছু বুঝিবার উপায় নাই। কোন দুর্বৃত্তের দল মূলমূর্তির সমস্ত অংশ চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। একখণ্ড কৃষ্ণপাষাণ মাত্র বর্তমান। বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির শেষ চিহ্ন নয়নপথবর্তী হয়। কিন্তু তাহাতে সমগ্র মূর্তির স্বরূপটি পরিকল্পনা অসম্ভব। মন্দিরের অদূরে একটি লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগলমূর্তি অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। "দুর্গাসপ্তশতী" গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, যেখানে যেখানে বিশেষ বিশেষ শক্তিমূর্তি পূজিতা হইতেন, তত্তৎ স্থানেই উক্ত লক্ষ্মী-হৃষিকেশের মত যুগলমূর্তির পূজা হইত। দুর্গাসপ্তশতীর প্রাধানিক রহস্যোক্ত সর্ব্বদাভূতা মহালক্ষ্মী, মহাকালী, মহা-সরস্বতী বা তাহাদের অংশরূপিণী অষ্টদশভুজা মহিষমর্দ্দিনী, দশবদনা কালী বা অষ্টভুজা মহাসরস্বতীর পূজা করিতে হইলেই বিরিঞ্চি-বাণী, হরগৌরী ও লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা বিধিমধ্যে গণ্য।

৺বক্রেশ্বর পীঠতীর্থে একটি অষ্টাদশ ভুজা মহিষমর্দ্দিনী ও ঐরূপ একটি হরগৌরীর যুগল মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বক্রেশ্বরের পীঠাধিষ্ঠাত্রী সম্বন্ধে পীঠ-মালা-মহাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "বক্রেশ্বরে মনঃ পাতুর্দেবী মহিষমর্দ্দিনী।" সুতরাং উক্ত মূর্তিদ্বয় দৃষ্টে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, বক্রেশ্বরে দুর্গাশপ্তশতীর কথিত নিয়মানুসারে পীঠাধিষ্ঠাত্রী ও অপরাপর মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মৌড়েশ্বরে "পলাশ-বাহিনী" শক্তিমূর্তি দেখিয়া অনুমান হয় যে, মৌড়েশ্বরে ও কোনও বিশেষ শক্তিমূর্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন ও তৎসঙ্গে ঐ পলাশবাহিনী ও লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা প্রাপ্ত হইতেন। মৌড়েশ্বর সেকালে বীরভূমির সেই বিচিত্র শক্তিপূজার একটি অন্যতম কেন্দ্র ছিল।

বীরচন্দ্রপুরে একটি দশাবতার চিত্রযুক্ত ভগ্ন বাসুদেব মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি বটবৃক্ষতলে অপর কতিপয় ভগ্নমূর্তিসহ তিনি ষষ্ঠীদেবীরূপে পূজা পাইতেছেন। বীরভূমে বাসুদেব মূর্তির বাহুল্য বিস্ময়জনক। কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর,সুঠাম, মনোরম মূর্তিগুলি রাঢ়ীয় তক্ষণ-শিল্পের অত্যুৎ-কৃষ্ট উদাহরণ। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের কাহারও কাহারও মতে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী গুপ্ত রাজন্যবর্গের সময়ে খৃঃ অঃ ৩২০ হইতে ৪৮০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত হিন্দু ভাস্কর্য্যবিজ্ঞান পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। আমাদের মনে হয় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত গুপ্ত-সভ্যতার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। বীরভূমে বাসুদেব মূর্তিগুলি ঐ সময়ের মধ্যেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এতদঞ্চলে যে বিষ্ণুমূর্তিগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই বাসুদেবের অস্ত্র ও প্রত্যঙ্গের মত্র কল্পিত মূর্তি। অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার

বিষ্ণুমূর্ত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীবিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ তাঁহার বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়ে উক্ত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার মূর্ত্তির লক্ষণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও দশাবতার চিত্রযুক্ত বাসুদেব মূর্ত্তির কোনও উল্লেখ দেখিলাম না।

ডাবুকেশ্বরে—শিবমন্দির নির্ম্মাণের জন্য মৃত্তিকা খনন কালে দুইটি বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া যায়। মূর্ত্তিদ্বয় শিব-মন্দিরের বহির্দ্দেশে রক্ষিত হইয়াছে। বামপার্শ্বের মূর্ত্তিটি পক্ষিরাজোপরিস্থিত এবং তরবারি আদি ভূষিত। মূর্ত্তির দক্ষিণে পদ্মহস্তাশ্রী ও বামে বীণাহস্তা পুষ্টি রহিয়াছেন। শঙ্খাদি স্থাপনক্রম দেখিয়া পদ্মপুরাণ মতে ইহাকে নৃসিংহ, সিদ্ধার্থসংহিতার মতে অধোক্ষজ মূর্ত্তি বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। দক্ষিণ দিকের মূর্ত্তিটি অগ্নিপুরাণ এবং সংহিতার মতে জনার্দ্দন, পদ্মপুরাণের মতে অচ্যুত। এতদঞ্চলের বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলিকে আমরা বাসুদেব আখ্যায় অভিহিত করিয়াছি। ডবাকে প্রাপ্ত মূর্ত্তি অপেক্ষা কোটাসুরের মূর্ত্তি দুইটি দেখিতে আরও মনোরম। সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত। বামদিকের বড় মূর্ত্তিটি প্রায় অভগ্ন পাওয়া গিয়াছে। পদ্মাদি স্থাপনক্রম দেখিয়া মূর্ত্তি দুইটিকেই অগ্নিপুরাণ মতে "অধোক্ষজ", পদ্মপুরাণ মতে নৃসিংহ ও সিদ্ধার্থসংহিতার মতে ত্রিবিক্রম আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। পার্শ্বের মূর্ত্তি দুইটিই স্ত্রীমূর্ত্তি। দক্ষিণের মূর্ত্তিটির হস্তদ্বয়ে চামর রহিয়াছে। বামের মূর্ত্তি বীণা-ধারিণী। মূর্ত্তিদ্বয়কে শ্রী ও সরস্বতী বলিয়াই মনে হয়।

অধুনা কলিকাতা বাগবাজারে অধিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ প্রাচীন বীরভূমেরই সম্পত্তি। বাঁকুড়া জেলার রণপাড়া নামে একটি গ্রাম আছে, এখানে আর একটি মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ক্ষোদিত লিপি হইতে জানিতে পারা যায়, বিগ্রহ সেনপাহাড়ী হইতে আনীত। রাজা বীরসিংহ ৯৭৬ অতীত মল্লাব্দে বঙ্গাব্দ ১০৭৭ সালে এই বিগ্রহের উদ্দেশে এক শিলারচিত মন্দির উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মন্দির প্রাঙ্গনে পতিত একখণ্ড শিলাফলকে নিম্নলিখিত কবিতাটি ক্ষোদিত আছে।

"ষট্‌পর্বত গ্রহমিতে শক বৎসরে—
শ্রী বীরসিংহ নৃপতিঃ প্রবলপ্রতাপঃ।
শ্রী রাধিকা মদনমোহন তুষ্টিকামো
দত্তে শিলারচিত মন্দিরমাদরেণ।"

মল্লারপুরে যেমন সিদ্ধনাথ শিব, তেমনি সিদ্ধেশ্বরী নামে এক দেবীও আছেন। অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি সিদ্ধেশ্বরী নামে পরিচিতা। এইরূপ মূর্ত্তি পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়; প্রায় অধিকাংশই খণ্ডিত। এই মূর্ত্তিটির কোন অঙ্গ হানি ঘটে নাই। মূর্ত্তিটি প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির বাহিরে ইতস্ততঃ কতিপয় বাসুদেব মূর্ত্তি ও দুই একটি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। মন্দির-দ্বারের বহির্দ্দেশে একটি পুরুষ মূর্ত্তি রহিয়াছে। দুই হস্ত উত্তানভাবে জানুদ্বয়ের উপর ন্যস্ত রাখিয়া, স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট, এই সৌম্যশান্ত আত্মসমাহিত মূর্ত্তিটি কোনও বৌদ্ধ অথবা জৈন তীর্থঙ্করের বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার পাদপীঠে দুই পার্শ্বে দুইটি কুক্কুর রহিয়াছে। কুক্কুরদ্বয়ের মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রটিতে একটি লিপি ক্ষোদিত ছিল। কোন অত্যাচারীর কবলে পড়িয়া লিপিটি বিলুপ্ত হইয়াছে। পাদপীঠে কুক্কুর দেখিয়া এবং আপদুদ্ধার স্তোত্রের "আত্মার্ণ সমোপেতং সারমেয় সমন্বিতং" পাঠ স্মরণ করিয়া মূর্ত্তিটি বটুকভৈরবের বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু আপদুদ্ধারে—বটুক দংষ্ট্রা করাল বদন, নানা অলঙ্কার ও খট্টাঙ্গাদি অস্ত্রবিভূষিত ইত্যাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তদনুসারে বটুকের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিন প্রকারের ধ্যানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাত্ত্বিক বটুক দ্বিবাহু, রাজসিক বটুক চতুর্ব্বাহু ও তামসিক বটুক অষ্টবাহু। প্রাগুক্ত মূর্ত্তিটির দুইহস্ত দেখিয়াও তাহাকে সাত্ত্বিক বটুক বলিবার উপায় নাই। কারণ সাত্ত্বিক বটুক নবমণিময় কিঙ্কিণী নূপুরাদিতে ভূষিত ও শূলদণ্ডধারী। এই জন্যই আমরা ইহাকে তীর্থঙ্কর বলিয়া অনুমান করিয়াছি।

মুর্শিদাবাদ জিলার তাঁতিবিরল গ্রামের "জীনদীঘি"র পূর্ব্বে একটি বৃহৎ স্তূপে কতকগুলি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডের মধ্য হইতে একটি মূর্ত্তির পাদপীঠ ও একটি আরবী লিপির ভগ্নাংশ সংগৃহীত হইয়াছে। পাদপীঠে দুইখানি পদের গুল্ফ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অংশ বিদ্যমান। পাদপীঠের নিম্নভাগে একটি শৃগাল এবং তন্নিম্নে একটি লিপি ক্ষোদিত রহিয়াছে। লিপি হইতে মাত্র একটি নাম পাওয়া যায়—"শ্রীতেজন দেবী"।

ইহা দেবতার নাম কি প্রতিষ্ঠাত্রীর নাম বুঝিবার উপায় নাই। তন্ত্রে শৃগাল বাহনা শিবদূতি দেবীর ধ্যান বর্ণিত আছে।

নারায়ণপুরের ধ্বংসস্তূপ হইতে একটি গরুড় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। গরুড় জোড় হস্তে উপবিষ্ট আছেন। কণ্ঠে, কটিতে, করে ও চরণযুগলে বিবিধ অলঙ্কার শোভা পাইতেছে। তাঁহার কারুকার্য্যখচিত পাদপীঠে ক্ষোদিত—আছে "পণ্ডিত আনন্দ ধণাঃ"। দুঃখের বিষয় এই পরম সুন্দর মূর্ত্তিটি মস্তকহীন।

নন্দীগ্রামের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটি সূর্য্যমূর্ত্তি, একটি গণেশজননী মূর্ত্তি ও কয়েকটি বাসুদেব মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তিগুলি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত। নারায়ণপুরের গরুড়মূর্ত্তিটিও এই জাতীয় প্রস্তরেই নির্ম্মিত। নারায়ণপুরের নিকটবর্ত্তী নিস্পরুণ গ্রামে একটি বেলে পাথরের সূর্য্যমূর্ত্তি আছে। অরুণ নামের সহিত নিস্পরুণ গ্রামের হয়ত সম্বন্ধ থাকিতে পারে। এই সূর্য্যমূর্ত্তিদ্বয়ের সৌসাদৃশ্য প্রায় সাগরদীঘি ও বারার মূর্ত্তির অনুরূপ। গণেশজননী মূর্ত্তির দুই পার্শ্বস্থিত কার্ত্তিক ও গণেশের ময়ূর ও ইন্দুরকে চিনিতে পারা যায়।

গঙ্গামূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তির পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাঁর বাম-নিম্ন হস্তে ঘণ্টা আছে। দক্ষিণ ঊর্দ্ধ-হস্ত ভাঙ্গিয়া গেলেও তাহাতে যে শিবলিঙ্গ ধৃত ছিল না, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন গঙ্গামূর্ত্তির কার্ত্তিক ও গণেশের নীচে হরিণ ও বাঘ আছে, ময়ূর ও মূষিক নাই।

কালেশ্বরের মন্দির সন্নিধানে কয়েকখানি চিত্রময় প্রাচীন ইষ্টক, একটি হরগৌরীর যুগলমূর্ত্তি ও কয়েকটি বাসুদেব মূর্ত্তি পড়িয়া আছে, একটি বাসুদেব মূর্ত্তি প্রায় সাড়ে তিন হাত উচ্চে। এত বড় বাসুদেব মূর্ত্তি বীরভূমে আর কোথাও নাই। ঢেকায় কয়েকটি বাসুদেব মূর্ত্তি ও একটি সূর্য্যমূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিগুলিও রামজীবনের পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠিত।

বর্দ্ধমান জিলায় কেতু গ্রামের দুই মাইল দূরে অট্টহাস নামে একটি পীঠ আছে।

"অট্টহাসে মহানন্দো মহানন্দা মাহেশ্বরী"।

*   *   *

অট্টহাসে চ চামুণ্ডা তত্রে শ্রীগৌড়েশ্বরী।"

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু এই অট্টহাস হইতে চামুণ্ডা-মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দিরে উপহার দিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় "হাতীছালা" গ্রামের নিকটে "দেউলে" নামক স্থানে দুই বিঘা জমি জুড়িয়া একটি ধ্বংসস্তূপ আছে। তথায় শিব-মন্দির ছিল। ইচৎপুর গ্রামে অনেকগুলি বাসুদেব মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। গাঙ্গুলিয়া গ্রামে গান্ধিলেশ্বর ও যোগেশ্বর শিব অনাদিলিঙ্গ নামে খ্যাত। নিকটবর্ত্তী রাজহাট গ্রামেও দুইটি বাসুদেব মূর্ত্তি আছে। পালরাজগণের সময়ে নির্ম্মিত বাসুদেব মূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তিগুলির আকার ও ভাবগত যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে।

সুপুর গ্রামের বাহিরে উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজা সুরথ প্রতিষ্ঠিত "সুরথেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। এই শিবমন্দিরের আঙিনায় পূর্ব্বপার্শ্বে হস্তপদ ও মস্তকবিহীন ভৈরবমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। কথিত আছে,—কালা-পাহাড় উহা ভাঙ্গিয়া দেয়। উক্ত শিবমন্দির সুপুরের মথুর হাজরা ও মাণিকদাস বৈষ্ণব কর্ত্তৃক প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। ইলিমবাজার অঞ্চলে মুক্তেশ্বরী নামে একটি বৌদ্ধতারা মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঘোটের-ডাঙার রায়পুকুর নামক একটি জলাশয় হইতে কতকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু চিনিবার উপায় নাই। মূর্ত্তিগুলি অত্যধিক পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুপুরের নিকট-বর্ত্তী রজতপুর গ্রামের কোন দেবমন্দিরে এই পরিচয়হারা মূর্ত্তিগুলি পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৫ঠা জুন প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বক্রেশ্বরের মন্দিরে রক্ষিত একটি ভগ্ন হরগৌরীর মূর্ত্তি লইয়া আসেন। সেই মূর্ত্তিটির উড়িষ্যা দেশীয় প্রাচীন মূর্ত্তির সহিত সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। পার্ব্বতীর কবরী ও অলঙ্কার উড়িষ্যাদেশীয় রমণীগণের ন্যায় ও বক্রেশ্বর মন্দিরও উৎকল দেশীয় মন্দিরের অনুকরণে গঠিত। অনঙ্গভীমদেবের পুত্র নরসিংহদেব তুঘ্রিল খাঁকে পরাজিত করিয়া বক্রেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উপরোক্ত প্রস্তরের ফলকে লিখিত "নরসিংহ" নরসিংহদেব ভিন্ন অপর কেহ নহেন। তিনি তৎকালে বক্রেশ্বর মহাপীঠে বহু মূর্ত্তি স্থাপন করেন।

ঢেকুর (ত্রিষষ্টিগড়, শ্যামারূপার গড়) অঞ্চলে ইছাই ঘোষ যে দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহার নাম শ্যামারূপা। সুশ্যামারূপার অপভ্রংশ বলিয়াই অনুমিত হয়। কালিকাদেবীর অপর নামই যখন শ্যামা তখন কালীরূপা বা শ্যামারূপা

দেবীর নাম হইতে পারে না। ইহারাই ঘোর কালিকাদেবীর উপাসক ছিলেন এবং কালিকা মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সুতরাং সুন্দরাপাই দেবীর প্রকৃত নাম বলিয়া ধারণা হইতেছে। ত্রিবষ্টি গড়ের অদূরে ইলাম বাজার সন্নিহিত দেবীপুর নামক গ্রামের পার্শ্বে সুখেশ্বরী নামক দেবীমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি দ্বিভুজা, বৌদ্ধ তারামূর্ত্তি। মূর্ত্তিটির মুখ হইতে উদর পর্য্যন্ত অংশের অর্দ্ধেক ভাগ ভগ্ন। প্রবাদ কালাপাহাড় কাটিয়া দিয়াছে। তাঁহার পাদপীঠে নিম্নোক্ত শ্লোকটি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

"যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতো।
হ্যবদৎ তেষাঞ্চ যো নিরোধঃ এবং বাদি মহাশ্রমণঃ।"
(বিনয়পিটক মহাবগ্‌গ)

এই বচনটি হইতেই সুখেশ্বরী মূর্ত্তির প্রাধান্য সূচিত হইতেছে।

কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী কোন পালবংশীয় গৌড়েশ্বর এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। সুক্ষেশ্বরীর মূর্ত্তি দেখিয়া যেমন সুহ্মসম্বন্ধীয় অনুমান হয়, শ্যামারূপ গড় হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ১২ মাইল দূরবর্ত্তী আরা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রাঢ়েশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়াও তেমনি শ্যামারূপাগড় যে, রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই ধারণাও বদ্ধমূল হইয়াছে। রাঢ়েশ্বরের প্রকাণ্ড প্রস্তর-মন্দির প্রায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল. গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে তাহার সংস্কার সাধন হইয়াছে। এতদঞ্চলে এত বড় শিবলিঙ্গ আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া শুনি নাই। রাঢ়েশ্বরের শিব দেখিয়া মনে হয় "রাঢ়াপুরি"ই "আরা"র পরিণত হইয়াছে।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়নাগড় নামক স্থানের রঙ্কিনী নামে কালিকাদেবী ও লোকেশ্বর শিব লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানা যায়। জানি না ধর্ম্মরাজ পূজক লাউসেন কালী ও শিবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কি না।*

এমন এক দিন ছিল—দেশে যখন ধর্ম্ম ছিল, সমাজ ছিল, জাতির সজীবতা ছিল, তালপাতার খাঁড়া গড়িয়া দেবতার হাতে দিয়া অনুকল্প করিতে হইত না, তখন মানুষ এ মূর্ত্তির রহস্য বুঝিত, মর্ম্মাবধারণ করিত। পূজা জানিত। জীবন্ত জাতি আপনার প্রাণ দিয়া জড়বুকেও প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিতে পারিত, তাই পাথরের মূর্ত্তি হইলে তখন ভাবের সাড়া মিলিত, বিভূতির উপলব্ধি হইত, তখন মানুষ এ ভৈরব ভাব ধ্যানে বরণ করিয়া লইত, ধারণায় ধরিয়া রাখিতে তাহার সাহসে কুলাইত। আজি আর সে দিন নাই, সে মানুষ নাই, তাই পাথরের মূর্ত্তি এখন শুধু পাথর হইয়া আছে।

ধাওয়া পরগণায় অন্তর্গত মঙ্গলকোট ও উজানী নামক স্থানে বিক্রমকেশরীর শিব বলিয়া একটি শিবমূর্ত্তি আছে। বর্ত্তমানে এই শিবলিঙ্গ ন্যাংটেশ্বর শিব বলিয়া পরিচিত। অদ্যাবধি চম্পাইনগরে চন্দ্রধর বণিকের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গম্বর বর্ত্তমান। ঐরূপ প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ বঙ্গদেশ ত' দূরের কথা, বঙ্গের বাহিরে কোন প্রদেশেও অধিক নাই। বারাণসী ধামের তিলভাণ্ডেশ্বরও এমন বিশাল নহে। বিক্রমাকশরীর শিব, তিনি লিঙ্গমূর্ত্তি নহেন, সব প্রতিমা। ভারতের অন্যান্য স্থানে যে সকল নটরাজ শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন বা আবিষ্কৃত হইয়াছেন এই মূর্ত্তি তেমন নহে। মূর্ত্তির আকার কিশোর বালকের আকারের ন্যায়। ইনি কৃত্তিবাস নহেন, একবারে উলঙ্গ পাদপদ্মের নিম্নভাগে পদ্ম ও তন্নিম্নে বৃষভরাজের মূর্ত্তি আছে। ইহার সহিত আরো দুইটি ছোট ছোট শিবমূর্ত্তি আছে ও দুইদিকে নন্দীভৃঙ্গীর মূর্ত্তিও আছে। শঙ্কর উলঙ্গ মূর্ত্তি বলিয়াই হয়ত উহার "ন্যাংটেশ্বর" নামকরণ হইয়াছে। এই মূর্ত্তির সহিত হস্তী ও সিংহমূর্ত্তি আছে। মহাদেবের এইরূপ অপরূপ মূর্ত্তি আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। অজয় নদীর গর্ভে প্রাপ্ত আর একটি মূর্ত্তি যাহা তীর্থঙ্কর বলিয়া কথিত, তাহাও ন্যাংটেশ্বর বলিয়া কথিত।

শেষোক্ত মূর্ত্তি বর্ত্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরের সংগ্রহালয়ে বর্ত্তমান আছেন। শঙ্কর মূর্ত্তি একখানি প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত। এই অঞ্চলে শিব ও শক্তির যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেই সকলের গঠন-ভঙ্গিমা একই প্রকারের ও সকলগুলিই প্রায় একখানি প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত। সেই উজানী আর বর্ত্তমান নাই, মহারাজা বিক্রম কেশরীর ইষ্টদেবতা শঙ্কর আজ শঙ্করপুর বাবলাডিহি গ্রামে একাকী অবস্থান করিতেছেন।

উপসংহারে এইটুকু বলিতে ইচ্ছা করে যে, "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস রচিত হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহা বাঙ্গালীর দাসত্বের ও কলঙ্কের কথা। অলীক উপকথা মাত্র।" সত্যই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিবৃত্ত মহাকালের ন্যায় মহাকালরূপিণী বর্ত্তমানের পদতলে মূর্চ্ছিত রহিয়াছেন। কালপ্রবাহে আমরা স্রোতের তৃণের মত ভাসিয়া চলিয়াছি। পাঠকগণ, আপনি বা আমি বাঙ্গালাকে প্রকৃত জানি বা চিনি এই কথা সাহস করিয়া সততার সহিত বলিতে পারি কি?

নদীয়ার কথা

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

অন্যান্য শিল্প

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সূক্ষ্ম শিল্প ও শিল্পীর প্রধান কেন্দ্র কৃষ্ণনগর হইলেও নবদ্বীপ শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানেও ইহার চর্চ্চা আছে, বিশেষতঃ সুবৃহৎ দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণে নবদ্বীপের কুম্ভকারগণের কৃতিত্ব অসাধারণ। রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে যে সকল সুবিশাল দেবমূর্ত্তি নবদ্বীপে গঠিত হইয়া থাকে, তাহাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বিশেষ না থাকিলেও বিরাট আয়তনের মূর্ত্তিতে যথারীতি সমানুপাত বজায় রাখিয়া সুডৌল সৌন্দর্য্য ও লালিত্য ফুটাইয়া তোলা সহজ নহে।

শান্তিপুর, নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ আরও একটি শিল্পে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পটশিল্প। বর্ত্তমানে ইহা লোপ পাইয়াছে। কাপড়ের টুকরার উপরে পাতলা কাদার প্রলেপ দিয়া চিত্রের পটভূমি তৈয়ারী করা হইত এবং তাহার উপরে দেশীয় উপাদান হইতে সংগৃহীত রঙের সাহায্যে বিভিন্ন দেবদেবীর বা পৌরাণিক উপখ্যানাবলী চিত্রিত করা হইত। এই সকল চিত্রের অঙ্কনপদ্ধতির একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আজকাল বাংলার প্রাচীন পটের অঙ্কনপদ্ধতি লইয়া বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা করিতেছেন দেখিতে পাই। কালিঘাটের পট বা ঐ জাতীয় অন্যান্য প্রাচীন পটের দেশীয় চিত্র অঙ্কনপদ্ধতির বিশিষ্ট-ধারা অনুশীলন করিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। এই হিসাবে নদীয়ার প্রাচীন পটশিল্পের মূল্য সামান্য নহে এবং স্বতন্ত্রভাবে এগুলির গবেষণা প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। বিশেষজ্ঞগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই লুপ্ত শিল্পের নিদর্শন এখনই প্রায় বিরল হইয়া আসিয়াছে। ৬০।৭০ বৎসরের পূর্ব্বেকার অঙ্কিত দু'একখানি চিত্র যাহা দেখিয়াছি, অতি অযত্নে রক্ষিত হওয়া সত্বেও, তাহার বর্ণবিন্যাস ও ঔজ্জ্বল্য বিন্দুমাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই।

মৃৎশিল্পের পরেই বস্ত্রশিল্পের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ঢাকাই মসলিনের মত শান্তিপুরী বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি জগদ্বিখ্যাত। বস্ত্রের সূক্ষ্মতায় ও সৌখীন কারুকার্য্যে শান্তিপুরের তন্তুবায়গণের অসাধারণ নৈপুণ্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান কালে যন্ত্রশিল্পের প্রচণ্ড পেষণে নদীয়ার এই সূক্ষ্ম কুটীরশিল্প মৃতকল্প হইয়া পড়িলেও এখনও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। উনবিংশ শতকের প্রথমভাগেও লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের শান্তিপুরী মসলিন প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি হইত। পাশ্চাত্য দেশে সূক্ষ্ম শান্তিপুরী কাপড়ের জনপ্রিয়তা ও চাহিদা থাকায় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর উনবিংশ শতকের প্রথম ২৮ বৎসর যাবৎ বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র খরিদ করিয়া বিদেশে চালান দিতেন বলিয়া গ্যারেট সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন।*

বস্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধির জন্য এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্প্যানির রেসিডেণ্টের সদর মোকাম স্থাপিত ছিল এবং এই রেসিডেন্সির মারফত তাঁহারা উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ অবধি বাৎসরিক ১,৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সূক্ষ্ম বস্ত্র ক্রয় করিতেন।†

১৮১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ম্যানচেস্টারের কাপড় আমদানীর ফলে এই বিরাট শিল্পের অবনতির সূত্রপাত হয়। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কলের কাপড়ের প্রতিযোগিতায় কুটীর-শিল্পজাত তাঁতের কাপড় ক্রমশই পরাজিত হইয়া পড়িতে লাগিল এবং এই শিল্প একেবারেই বিপন্ন হইয়া পড়ে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতি কলের সুতার আমদানিতে। রাজকীয় সাহায্যপুষ্ট

---

* The government purchases of Santipur Muslin, which then had a Europen reputation, averaged over 12 lakhs during the first 28 years of nineteenth century—Nadia District, Gazeteer Garret p. 93.

† Santipur was the centre of a great and prosperous weaving industry. It was of sufficient importance to be the headquarters of a Residence under the East Indian Company, and during the first few years of the nineteenth century, the Company purchased here £150000 worth of cotton cloth annually—Ibid p. 63.

কলের প্রতিযোগিতায় এত বড় শিল্পটিকে এই ভাবে হত্যা করা হইল বলিয়া গ্যারেট সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন।*

ঊনবিংশ শতকের প্রথম অংশেও শান্তিপুর বার্ষিক বহু লক্ষ টাকার সূক্ষ্ম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। পরে বিলাতি কলের প্রতিযোগিতায় বিধ্বস্ত শিল্প লইয়াও ঊনবিংশ শতকের শেষ অবধি বার্ষিক ৩½ লক্ষ টাকার বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছিল বলিয়া জানা যায়। †

কিন্তু বিদেশের প্রতিযোগিতায় ও স্বদেশের সহানুভূতির অভাবে বিংশ শতকের প্রথম হইতেই এই শিল্পের দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে। অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে মিলে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হওয়ায় তাঁতজাত বস্ত্রের চাহিদা আজ কাল আর নাই বলিলেও চলে। তন্তুবায়গণ অনেকেই বাধ্য হইয়া তাহাদের জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য কর্ম্মের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজও যাহারা কোনও প্রকারে এই মৃতকল্প শিল্পটিকে কায়ক্লেশে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহাদের অবস্থাও শোচনীয়। শান্তিপুরের তাঁতে এখনও অবশ্য কিছু কিছু সূক্ষ্মবস্ত্র উৎপন্ন হইয়া দেশীয় সৌখীন সমাজের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু ঐ বস্ত্রের সূতা সাধারণতঃ দেশী ও বিলাতি মিল হইতেই ক্রয় করিয়া লওয়া হয়। শিল্পের এখন আর পূর্ব্ব গৌরব নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত উৎপন্নের পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি দেশের এই দারুণ অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার দিনে ও দেশী বিলাতী মিলের প্রতিযোগিতায় আজও যে শান্তিপুরের বস্ত্র সৌখীনতার পরিচায়ক হইয়া বাজারে টিকিয়া আছে, তাহাই তাহার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয়। এতদ্ব্যতীত মিল হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র ক্রয় করিয়া তাহাতে জরি বা সুতার ফুল ও নক্সা তুলিবার শিল্পও শান্তিপুরে আজকাল বিশেষভাবে প্রচলিত। শান্তিপুরী শাড়ীর পাড়েরও একপ্রকার বৈশিষ্ট্য আছে।

* The cloth industry has been practically killed by the competition of machine made goods, and the weavers are no longer prosperous, N. D. Gazeteer, Garret p. 190.

† Mr. Banerjee in his monograph on cotton fabrics of Bengal, published in 1898, says that the outturn of the cotton cloths in Santipur was then worth about 8½ lakhs of Rupees per annum—Garret p. 93.

এইখানে প্রাসঙ্গিক ভাবে একটা কথা উল্লেখ করিব। শান্তিপুরী কাপড় বলিয়া বাজারে আজকাল যাহা চলিতেছে, তাহার সবগুলিই সত্যকার শান্তিপুরী নহে। মিলজাত সূক্ষ্ম কাপড় কথঞ্চিৎ সুলভ মূল্যে শান্তিপুরী বলিয়া বাজারে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়। ডবল ছিলাযুক্ত প্রকৃত শান্তিপুরী কাপড়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেকের জ্ঞান না থাকায় আমাদের কূট ব্যবসায়-বুদ্ধি সহজেই ক্রেতাকে প্রতারিত করিয়া থাকে। ফলে ক্রেতা ও উৎপাদক উভয়কেই প্রতারণার ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

শান্তিপুরী সূক্ষ্মবস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া জন-সাধারণের ব্যবহারযোগ্য সাধারণ মোটা কাপড়ও নদীয়ায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ অবধি নদীয়ার বস্ত্রের চাহিদা সাধারণতঃ নদীয়া হইতেই মিটিয়া যাইত বলিয়া মনে করা যায়। জেলার প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে তাঁতি ও জোলারা স্ব স্ব গ্রামের প্রয়োজনানুসারে বস্ত্র উৎপাদন করিত। সস্তা বিলাতি কাপড়ের প্রবল বন্যায় এই অসহায় কুটীর-শিল্পীকুল একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। নিরন্ন বেকার তন্তুবায়গণ গৃহহারা কর্ম্মহারা হইয়া কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কোথাও বা জাতিব্যবসা ছাড়িয়া কর্ম্মান্তর গ্রহণপূর্ব্বক কোনরূপে টিকিয়া আছে মাত্র।

কুষ্টিয়া, কুমারখালি, মেহেরপুর, হরিনারায়ণপুর, চাকদহ তেহট্ট, দামুরহুদা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে এই সকল বস্ত্র-উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এখন তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জেলা রিপোর্টে এসম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।*

* In 1898 the district officer reported that in almost all villages in this district they are a few families of Tantis and Jolahas. They turn out course cloth for the use of cultivators, but their number is gradually decreasing, and the profession is deteriorating on account of English-manufactured cloth which is cheaper. In several villages which had a reputation for doing business in weaving, this industry is altogether abolished, such as Chakdaha, Tehatta Damurhuda and Dagalbi, though in some of these places the profession is still lingering. The main centres of the industry in the district are Santipur, Kushtia, Kumarkhali, Harinarayanpur, Meherpur and Krisnanagra, Garret. p. 93.

নদীয়ার ধাতুশিল্পও এককালে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নবাবী আমলে উৎকৃষ্ট তরোয়াল, ঢাল, খাঁড়া, বর্শা প্রভৃতি তাৎকালিক সমরোপকরণ প্রস্তুতকরণে নদীয়ার কর্ম্মকারগণ বিশেষ খ্যাতি লাভ করে, এমন কি কামান প্রভৃতি নির্ম্মাণেও তাহারা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে। নদীয়ার কর্ম্মকারদের নির্ম্মিত একটি পিত্তলের বৃহৎ ঢালাই কামান মুর্শিদাবাদ নবাবের অস্ত্রাগারের প্রাঙ্গনে পাওয়া যায়। কামানটি প্রায় তিন ফুট লম্বা ও একটি কাঠের গাড়ীর উপরে স্থাপিত। কামানগাত্র কারুকার্য্য-খচিত ও মুখটিতে যেন একটি বিরাট দৈত্য মুখব্যাদান করিয়া আছে। উপরন্তু যে কর্ম্মকার ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি খুদিয়া কাটিয়া হরফগুলি মুদ্রিত করিয়াছেন ও যাঁহার (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র) আদেশে ইহা নির্ম্মিত হয়, সকলেরই নাম ইহাতে উৎকীর্ণ আছে। এই বিষয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

Mr. Beveridge found in the armoury of the Nabab of Mursidabad, a brass gun of native manufacture. It is mounted on a carriage and stands in the armoury on the ground floor of the palace. It is some 3ft. in length and is of small bore, 4 or 6 pounds. It has floral decoration. The head and the mouth are in the shape of a demon or a monster's head with long pointed ears, a human face and crocodile jaws. There is an inscription on it in raised Bengali letters in a shield on the upper part of the gun and about the middle.

The inscription runs as follows :—

জয়
কালিকা
ঙ ৩৫ সং

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র
রায় মহারাজা রূপরাম
মহাশয় চট্টোপাধ্যায়
ধীরাজ মুদ্রাঙ্কিত
কিশোরদাস কর্ম্মকার *

বলাই বাহুল্য এই অস্ত্রশিল্প বহুদিন যাবৎ লুপ্ত। তবে ধাতুশিল্পের মধ্যে বর্ত্তমানে কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্রাদি নির্ম্মাণে নদীয়ার কিছু কিছু খ্যাতি আছে, এবং এই শিল্প পূর্ব্ব হইতে যেন আরও উন্নতির পথেই চলিতেছে মনে হয়। নবদ্বীপ, দাঁইহাট প্রভৃতি স্থানে কাঁসা ও পিতলের তৈজসপত্র বর্ত্তমানে প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মিত হয়। মেহেরপুরেও সামান্য পরিমাণে ইহার চর্চ্চা আছে। তবে এই সকল স্থানে নিত্য-ব্যবহার্য্য বাসনপত্রই প্রস্তুত হইয়া থাকে, কারুকার্য্য-বহুল বা সূক্ষ্মকার্য্য-সমন্বিত সৌখীন ধাতুদ্রব্যাদির প্রসার তেমন নাই।

নদীয়ার বিনষ্ট শিল্পের মধ্যে নীলের কথা প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্ব অধ্যায়ে একবার আলোচনা করিয়াছি। নদীয়াতেই নীল চাষের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল এবং এই সকল নীলের গাছ হইতে 'নীল' নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও নদীয়ায় ব্যাপক ভাবেই হইত। সমগ্র জেলা ব্যাপিয়া বহুস্থানে এই সকল নীল নিষ্কাশনের কারখানা বা নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ আজিও পড়িয়া রহিয়াছে। কোনও স্থানে বা মেরামত করিয়া লইয়া সরকারী অফিস কাছারী ও আবাস-গৃহ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। নীলশিল্পে তখন বাংলার একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং এই হিসাবে ইহা লাভজনকও ছিল যথোচিত। সাহেবদের অনুসরণ করিয়া এদেশীয় ভূম্যধিকারীরাও অনেকে এই ব্যবসায় শুরু করিয়াছিলেন। এই ভাবে নীলশিল্প দেশের ধনিক, শ্রমিক, চাষী ও অন্যান্য জন-সাধারণের মধ্যে একটি বিশেষ লাভ-জনক কারবারে দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু বিদেশী ব্যবসায়িগণের অত্যধিক লাভের লোভ এই অর্থকরী শিল্পটিকে কি ভীষণ অনর্থের কারণরূপে দাঁড় করাইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ারূপে ও কৃত্রিম নীল উৎপাদন প্রথা আবিষ্কৃত হওয়ায় বহুদিন হইল এই শিল্প লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পরিষ্কৃত চিনি উৎপাদনও নদীয়ার আর একটি বিনষ্ট কুটীরশিল্প। এক কালে এই শিল্পটি শান্তিপুরে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ও ইউরোপীয় ব্যবস্থায় গুড় হইতে চিনি উৎপাদন প্রথার প্রচলন এখানে ছিল না বা সে চেষ্টাও কখন সফল হয় নাই।*

* Asiatic Society of Bengal's Proceeding 1893—p. 24-26

* Sugar refining by European methods has been tried in the district. But it proved unsuccessful—Garret p. 93.

কিন্তু দেশীয় প্রণালীতে খেজুরের গুড় হইতে শান্তিপুর, আলমডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইত, তাহাও নিতান্ত কম নহে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার লর্ড বিশপ শান্তিপুর হইতে দুই মাইল দূরে একটি সুবৃহৎ চিনির কারখানার উল্লেখ করিয়াছেন। এই কারখানায় ৭০০ জন ব্যক্তি কর্ম্ম করিত ও প্রত্যহ ৫০০ মণ চিনি পরিষ্কৃত হইত। ইহা ছাড়া প্রত্যেক গ্রামেই আখের ও খেজুরের গুড় হইতে দেশীয় প্রণালীতে পরিষ্কৃত চিনি উৎপন্ন হইয়া গ্রামের অভাব মোচন করিত। বিদেশী কলের চিনির আমদানীতে এই শিল্পটিও বস্ত্রশিল্পের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঢাকার শঙ্খশিল্পের ন্যায় নবদ্বীপেও এক কালে শঙ্খ-শিল্পের বিশেষ খ্যাতি ছিল। বহু শঙ্খবণিক এইস্থানে শঙ্খ হইতে বলয় প্রভৃতি বহুবিধ কারুকার্য্যখচিত অলঙ্কার-দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দেশ-বিদেশে চালান দিত। এই শিল্পটিও এখন প্রায় লুপ্ত। নবদ্বীপের একটি প্রধান রাস্তা এখনও শাঁখারী সড়ক নাম ধারণ করিয়া ঐ লুপ্ত শিল্পের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে মাত্র।

নদীয়ার আর একটি শিল্পের কথা সগৌরবে উল্লেখ করা যায়—শোলার শিল্প। কালিগঞ্জ থানায় শোলা হইতে হ্যাট টুপি নির্ম্মাণ কুটিরশিল্পরূপে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। কলিকাতা হইতে পাইকারগণ শোলা সরবরাহ করে এবং গ্রামবাসিগণ তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে টুপি তৈয়ার করিয়া দেয়। পূর্ব্বে এই ব্যবসায়ের প্রসার তেমন ছিল না, কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পর হইতে এই শিল্প বিপুল সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত গ্রামবাসীই প্রায় এই শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সামান্য দুই একখানা লোহার অস্ত্রের সাহায্যে তাহারা কত ক্ষিপ্রহস্তে শোলা চিরিয়া টুপি তৈয়ারী করিয়া যায় দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পাইকারগণ এই হ্যাট লইয়া কলিকাতায় কাপড় মুড়াইয়া ও লেবেল আঁটিয়া বিক্রয় করে। স্বদেশী শোলা হ্যাটের একটি বৃহৎ অংশ নদীয়ার কালিগঞ্জে তৈয়ারী। তবে এই শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইলেও পাইকারগণের চক্রে গ্রামের দরিদ্র শিল্পীরা আশানুরূপ পারিশ্রমিক পায় না।

প্রতিমা সাজাইবার শোলার সাজ নির্ম্মাণেও নদীয়ার খ্যাতি আছে। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-খচিত ডাকের সাজ কৃষ্ণনগরে ও নবদ্বীপে বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হয়। এখানকার অনেক প্রতিমা সম্পূর্ণরূপে শুভ্র শোলার সাজে মণ্ডিত হইয়া শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

এতদ্ব্যতীত ছোট-খাট আরো অনেক গৌণশিল্প দেশে প্রচলিত আছে, স্বতন্ত্রভাবে তাহার আর বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই। নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুতের প্রসিদ্ধি আছে। কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া সরভাজার খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত।

নবদ্বীপ বাংলার একমাত্র প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পীঠস্থান বলিয়া এখানে কতকগুলি বিশেষ শিল্পের উৎপত্তি হইয়াছে। ছাপা সাড়ী, নামাবলী, কাঠের মালা, কড়ির কৌটা প্রভৃতি বহুবিধ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া অনেক শিল্পী জীবিকা করে।

যাহা হউক মোটামুটি ভাবে নদীয়ার প্রধান কুটীর-শিল্পগুলির যৎসামান্য পরিচয় প্রদান করিলাম। আধুনিক কালের বস্ত্রশিল্প প্রসারেও নদীয়ার স্থান নগণ্য নহে।

বস্ত্রশিল্পে কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের নাম সকলেরই সুপরিচিত। বাংলার স্বদেশী কাপড়ের কলের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন মিল হিসাবে ও ভারতের সৌখীন সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদক হিসাবে মোহিনী মিলের খ্যাতি আছে।

দর্শনার চিনির কলের ন্যায় বিরাট শক্তিশালী ও বিশাল উৎপাদন-হার সমন্বিত কল বাংলায় আর নাই। ইহা ছাড়া নদীয়ার প্রান্ত সীমায় অবস্থিত গোপালপুর (রাজশাহী) মিল ও বেলডাঙ্গা (মুর্শিদাবাদ) মিলেও প্রচুর পরিমাণে নদীয়ার কাঁচামাল ও শ্রমিক নিয়োজিত। কুষ্টিয়ার রেণুইক কম্প্যানি আখমাড়াই কল, ও নূতন ধরণের লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। বাংলায় ও বাংলার বাহিরেও ইহার চাহিদা আছে।

ইহা ছাড়া কুটীরশিল্প হিসাবে গেঞ্জি মোজার কল, চাউলের কল, সেণ্ট্রিফ্যুগাল চিনির কল, তেলের ও আটার কল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ছোট খাট যান্ত্রিক কুটীরশিল্পের প্রসার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।



মেয়েলী ব্রত ও আলপনা

—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার ও শ্রীমতী চৌধুরী

বাংলায় ব্রত বলিতে বহু প্রকার ব্রতের কথা বলিতে হয়—সেজন্য প্রথমতঃ সাধারণভাবে ব্রত দুই প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে, যেমন ধর্মানুষ্ঠানিক বা পৌরাণিক শাস্ত্রীয় ব্রত এবং মেয়েলী কন্‌ভেন্‌শনাল বা লৌকিক ব্রত। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি হিন্দুধর্মের প্রায় অঙ্গস্বরূপ, পূজা-পার্ব্বণের ন্যায় বিশিষ্ট বিগ্রহ, শিলা বা দেবতার সম্মুখে আরাধনায় সমাপ্ত হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রীয় ব্রতের মধ্যেও কতকগুলি আছে, যাহা বঙ্গদেশে কেবল মাত্র নারীদিগের পালনের জন্য। নারী বলিতে বয়ঃপ্রাপ্ত সধবা ও বিধবাদের বুঝিতে হইবে।

মেয়েলী ব্রতের অধিকভাগই কুমারীগণ পালন করিয়া থাকেন, যদিও কতকগুলিতে বিবাহিতাদেরও অধিকার আছে। শাস্ত্রীয় ব্রতের সহিত আলপনার কোন নিগূঢ় সংযোগ নাই। কেবল মাত্র শোভাবর্দ্ধনেই ইহার নমুনা চক্ষে পড়ে। কিন্তু মেয়েলী ব্রতের অনেকগুলিতেই মন্ত্রের ভাব প্রকাশার্থ বা পূজা দ্রব্যাদি ও কাল্পনিক দেবদেবীর মূর্ত্তি-রূপায়ণে আলপনা ব্রতীদের নিকট অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

নারীব্রতগুলি মেয়েলী ব্রত বটে, কিন্তু মাত্র লৌকিক নয়—রীতিমত শাস্ত্রবিধিমত পুরোহিত আহ্বানে পূজা-নৈবেদ্যে পালন করিতে হয়। কতকগুলি আবার ঠিক শাস্ত্রীয় নয়, অথচ মেয়েলী ব্রত বলিতে যাহা বুঝি তাহাও নহে। যেমন দশপুতুল ব্রত—চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত শিবদুর্গার যুগল মূর্ত্তি এবং দশটী পুত্তলিকা অঙ্কিত করিয়া ঘটস্থাপনায় মনের কামনা প্রকাশার্থে অল্পবয়স্কা বিবাহিতা মেয়েরা এই ব্রত পালন করে।

দশপুতুল ব্রতের ছড়া মন্ত্রটি সম্পূর্ণ অবস্থায় শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারীর নিকটে* যেরূপ পাইয়াছি দিলাম।

দশ পুতুল পুজে যে
দশ বর পায় সে।
এখন মলে বামুন হব
রাজকুলে জন্ম হব

সীতার মত সতী হব
রামের মত স্বামী পাব।
লক্ষণ দেবর পাব
কৌশল্যা শাশুড়ী পাব
দশরথ শ্বশুর পাব
শিবের মত বাপ পাব
দুর্গার মত মা পাব
লক্ষ্মী-সরস্বতী বোন পাব
কার্ত্তিক-গণেশ ভাই পাব
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী পাব
লক্ষ্মীর মত গিন্নী হব
বসুমতীর মত ধীর হব
কলাবৌএর মত লাজুক হব
বাঁশের মত ঝাড় হব
দুর্ব্বার মত লতিয়ে যাব
সাত ভাইএর বোন হব
সাবিত্রীর সমান হব।

সেকালের আদর্শে অনুপ্রাণিত গ্রাম্যবালিকাদের অন্তরে এইরূপ কামনা করিয়া ব্রতপালন স্বাভাবিক। অধুনা এই সমস্ত লুপ্তপ্রায় হইলেও মনোভাব বোধ করি বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই—যেটুকু হইয়াছে, তাহা আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য।

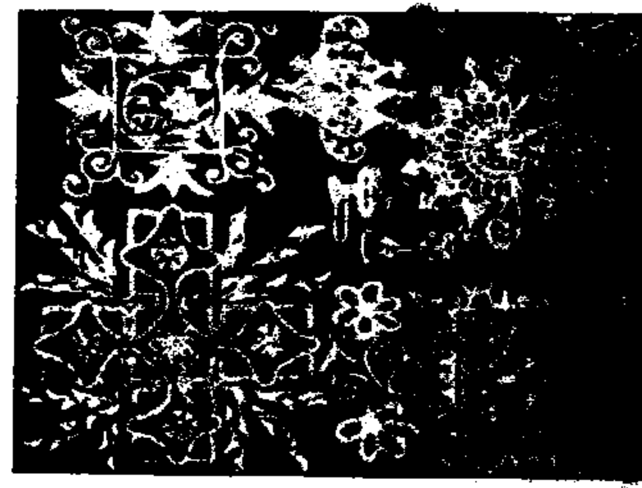
শাস্ত্রীয় নারীব্রতের মধ্যে অক্ষয় তৃতীয়া, সাবিত্রী ব্রত, ষষ্টপঞ্চমী এবং বিপত্তারিণী ব্রত প্রভৃতি, এগুলির বিধি-ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের হস্তে। আমি যে অশাস্ত্রীয় মেয়েলী ব্রত সম্বন্ধে বিশদভাবে এই প্রবন্ধে বলিবার বাসনা রাখি, সেগুলি শাস্ত্রীয় নারীব্রতের ছাঁচেই গড়া। তাহার মন্ত্র ব্রতীরা ছড়ায় নিজেরাই বলিয়া পূজা করে—পুরোহিতের ডাক পড়ে না। এগুলি সমাজ-সংস্কৃতির অঙ্গ pseudo-religious vows।

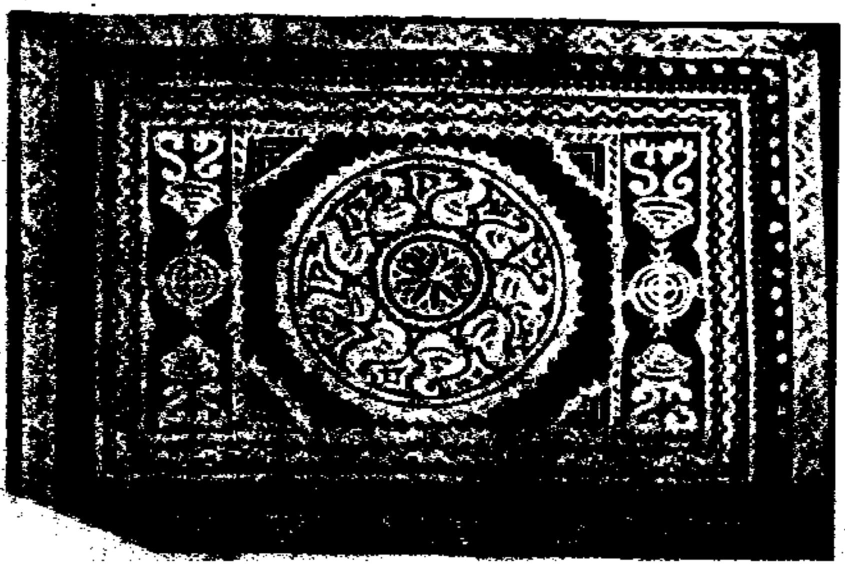
বৈশাখ মাসে বয়স্কারা যেমন অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত পালন করিতে থাকেন, গ্রাম্য মেয়েরা যাহাদের পড়াশুনা বা স্কুলে যাওয়ার হাঙ্গামা নাই, তাহারা ইহাদের দেখাদেখি হরির-চরণ ব্রত বা রূপে-এয়ো ব্রত গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য একই—

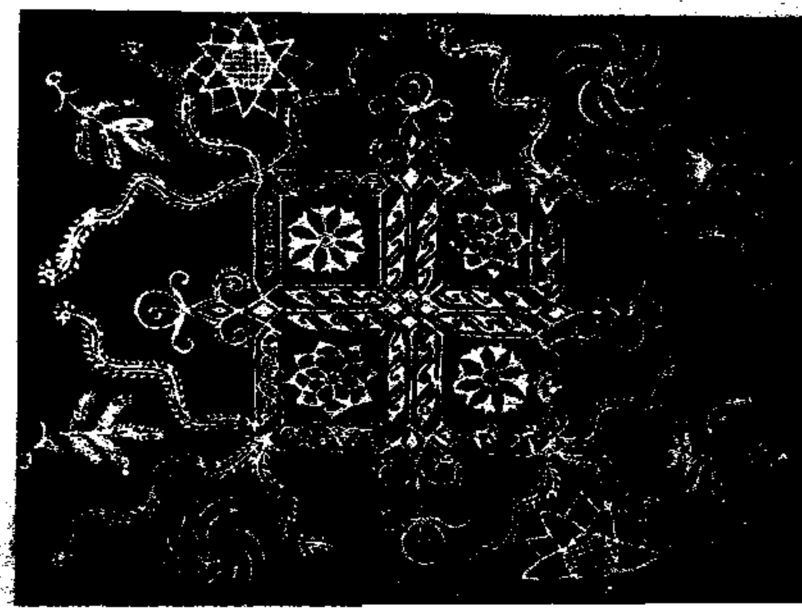
*অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ১৩২১ রিপোর্ট।

অন্তঃপুর (মেয়েলি ব্রত ও আলপনা)









প্রকাশ করিতে এই ছেলেখেলার আশ্রয় করিতে হইয়াছে। এই ছড়ীতে আলপনাশিল্পেও তাহাদের হাতে-খড়ি হয়—সাধারণ কতকগুলি ফিগার আঁকিয়া। ইহা ছাড়া পুণি-পুকুর ব্রতটিও প্রায় একই অর্থ বহন করে। পুরাতন বৎসর এবং নূতন বৎসরের মাঝে পুণ্যদিন চৈত্রসংক্রান্তিতেই ইহার আরম্ভ। আলপনা নাই, ব্রতীরা বাগানের বা গৃহাঙ্গনের একস্থানে ছোট পুকুর কাটিয়া বেলের ডাল পুঁতিয়া তাহাতে জল ঢালিতে থাকে

পুণিপুকুর পুষ্পমালা
কে পুজে রে দুপুর বেলা
আমি সতী লীলাবতী
ভাইএর বোন পুত্রবতী
হয়ে পুত্র মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না।

আলপনা যে নাই তাহা নহে—শ্রীসুধাংশু রায়* বলিতে-ছেন, বেলপুকুর (বেলের ডাল থাকে বলিয়া স্থানে স্থানে বেল-পুকুর বলে) ব্রতে একটি ছোট পুকুর কাটিয়া তাহার আশে-পাশে সমস্ত উঠান ভরিয়া মেয়েরা নানাপ্রকার আলপনা দেয়; আর প্রত্যহ বিকালে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া দূর্ব্বা দিয়া পূজা করে।

বেলপুকুর বেলেশ্বর
ভাই আমার লক্ষ্মীশ্বর।
সোণার থালে ক্ষীরের নাড়ু
শাঁখার আগায় সুবর্ণের খাড়ু।

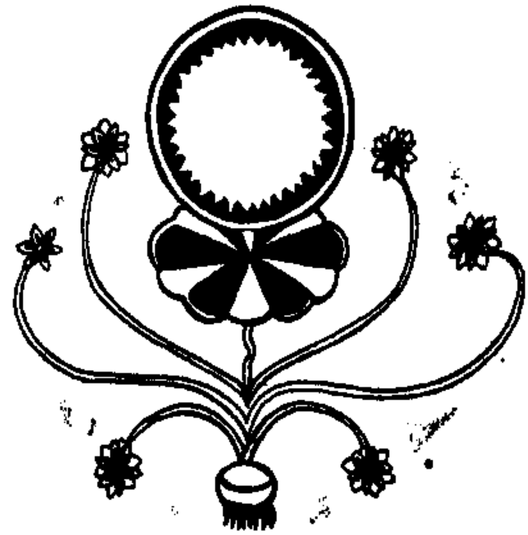
আলিম্পন অঙ্কনের বহর দেখিতে হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে বসুধারা ব্রতে। শুষ্ক জ্যৈষ্ঠের দিনে বারিবর্ষণ কামনা করিয়া তুলসী-তলায় মেয়েরা কি কুমারী, কি সধবা এই ব্রত পালন করে। এই ব্রত আমাদের হিন্দুগৃহস্থের অঙ্গন-কোণে ঝারি বাঁধার অনুযায়ী—নিয়মপদ্ধতি সমানই, তবে ছড়া-আলপনার সহযোগে ব্রতের আকার ধারণ করিয়াছে। আলপনায় আটটি তারা আঁকিয়া আকাশমণ্ডলের রূপ দিয়া তথা হইতে বৃষ্টিপাতের অনুকরণে বৃক্ষের মাথায় ছিদ্র করা মাটির ঘটে জলধারা নিক্ষেপ এবং বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রদেবকে উদ্দেশ্য করিয়া এই ছড়ামন্ত্র মেয়েরা প্রণাম করিতে করিতে বলে।

গঙ্গা গঙ্গা। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকি
তিন কুল ভরে যাও ধনে জনে সুখী।

* আলপনার ছন্দ : বঙ্গলক্ষ্মী ১৩৩৮

(২)

ভাদুলি ব্রতেও আলপনার ঘটা মন্দ নহে। ইহার আলপনায় থাকে সাত সমুদ্র, তের নদী—বড় এক নদী, তাহার তেরটি মুখে সমুদ্রের গায়ে (কতকগুলি রেখা মাত্র) মিশাইয়া নদীর চড়া, বন, ব্যাঘ্র, মহিষ, কাক, কাঁটার পর্ব্বত, তাল গাছ, বাবুইয়ের বাসা, ভেলা, আসন এবং জোড়া ছত্র মাথায় ভদ্রালী ঠাকুরাণী। ভাদ্র মাসের প্রথম দিনটী হইতে শেষ দিনটী পর্য্যন্ত এই ব্রত মেয়েরা পালন করিত বা কোথাও কোথাও এখনও করে। পূজাপার্ব্বণের ন্যায় আনুষঙ্গিক কতকগুলি দ্রব্যেরও প্রয়োজন, যেমন—বৃষ্টির জল, নদীর জল, পিঁড়ি, পৈতা, পাকা তাল, সিধা, পুঁটিমাছ, কলার



পৃথিবী ব্রতের আলপনা।

কাঁদি, নৌকার প্রতীক হিসাবে কলাগাছের খোলা, ফুল, চন্দন, সিন্দুর প্রভৃতি।

ভাদ্রে ভাদুলী নদী বৃষ্টির জল
ভাদুলী পূজিলে হয় সুমঙ্গল।

ভাদুলী ব্রত বড় গোছের মেয়েলী ব্রত, সেজন্য পূর্ব্ববঙ্গে ইহা অল্পবিত্তর মেয়েরা পল্লীগ্রামে পালন করিলেও ছড়াগুলি একটু জোড়া-না-লাগা। এই ব্রতে ভরা ভাদ্রমাসের প্লাবন বা নৌকাডুবি প্রভৃতি বিপদ হইতে আপনার জন নিরাপদে অবস্থান করে বা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে—এই সমস্ত কামনা করিয়া ভদ্রালী ঠাকুরাণী নামে কাল্পনিক দেবীর সৃষ্টি করিয়া তাহার পূজা হয়।

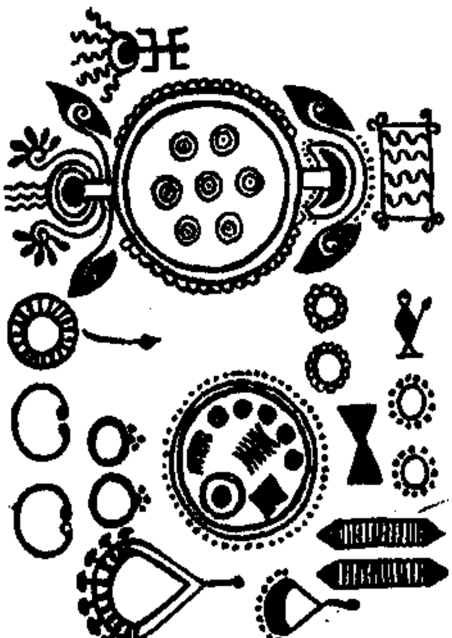
জোড় জোড় সোণার ছত্তর
জোড় নৌকায় পা
আসতে যেতে কুশল করবেন তাম্বুলী মা।

প্রণাম মন্ত্র :

নম নম তাম্বুলী দেবী ইন্দ্রের শাশুড়ী
বছর বছর রক্ষা করো ব্রতীর পুরী।

এমনই লুপ্তপ্রায় ব্রত যমপুকুর ও কুলকুলতী ব্রত। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি হইতে কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত নিত্য প্রত্যূষে যমপুকুর ব্রত পালনের বিধান। উদ্দেশ্য, ইহা করিলে দেশে মড়ক হইবে না। *

কথা :—



তারা ব্রতের আলপনা।

সূর্য্যি গেলেন মায়ের কোলে
ব্রহ্মা গেলেন ভেসে
আমার ঠাকুর জপ করছেন
যমপুকুরে বসে।
যম রাজার মা গো! তোমার এই মিনতি করি
তোমার ছেলে হয় না যেন আমার বাপ-মায়ের অরি,
তোমার ছেলে হয় না যেন আমার ভাই-বোনের অরি।
যমরাজ ধর্ম্মরাজ এই বর চাই
তোমার তাড়না হতে যেন মুক্তি পাই।

যমপুকুর এবং বেলপুকুর ব্রত দুইটীর পালনের সময় এক এবং কামনা বা ইচ্ছা প্রায় এক। কামনার প্রতিচ্ছবি বা যাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া ছড়া-কথা বলা হয়, কখনও কখনও তাহাদের চিত্র আলপনায় অঙ্কিত হয়। অথবা ছড়ায় যে সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রীর উল্লেখ থাকে তাহাদের প্রতীক-রূপ দিতেই মেয়েরা আলপনার সাহায্য লইয়াছে। মূলতঃ এই হইতেই আলপনা দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হইয়া উন্নত আলঙ্কারিক আলপনার উদ্ভব ঘটিয়াছে। সেজন্য ব্রতকথায় ছেলেমানুষিতে বা ছেলেমানুষি আলপনায় মেয়েদের ঝোঁক কমিয়াছে। বর্ত্তমানে উত্তম উত্তম শোভাবর্দ্ধক বৃত্তাকার চিত্রাকার আলিম্পনে মাত্র কয়েকজন নিবদ্ধ আছেন, সাধারণভাবে পূর্ব্বের মত সকল মেয়েরা সেরূপ আলপনার নৈমিত্তিক অক্ষর অঙ্কনে অনভ্যস্ত। প্রায়ই লক্ষ্য করি, মেয়েলি ব্রতপালনে কথাগুলি (ছড়ামন্ত্র) জোড়াতাড়া দিয়া যাহাও টিঁকিয়া আছে—তাহা নারীমুখপরম্পরায়; ব্রতের আলপনার সম্পূর্ণ রূপ বড় একটা দেখিতে পাই না।

অগ্রহায়ণ মাসের সেঁজুতি ব্রতে আলপনা একটী বিশেষ অঙ্গ। পঞ্চাশ রকমের গৃহস্থের পারিপার্শ্বিক বা নাড়াচাড়া করিবার দ্রব্যাদি বা দেবদেবী প্রভৃতি, বা পল্লীমেয়েরা যে-সমস্ত পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি চক্ষে নিয়ত দেখিয়া থাকে, তাহাদের ছবি আলপনায় আঁকিতে হয়, প্রত্যেকটীর চিত্রে পুষ্প ও অঙ্গুলিস্পর্শে ছড়া মন্ত্র বলিতে হয়। পঞ্চাশটীর মধ্যে কতকগুলি আমি বলিতেছি এবং তাহাদের কি কি বলা হয় দেখাইতেছি।

ষোলটী ঘরকাটা ছক্, দোলা, গুয়া গাছ, কাফুনী গাছ, চন্দ্র, সূর্য্য, পাখী, বটী, বেড়ি, বাঁশের কোঁড়া প্রভৃতি আজে-বাজে অনেক জিনিষ যাহার কোন অর্থ নাই, অথচ সরল গ্রাম্য-বালিকার ছড়া মিলাইতে ডাক পড়িয়াছে।

সাঁজ পূজন সেঁজুতি
ষোল ঘরে ষোল ব্রতী
তার এক ঘরে আমি ব্রতী
ব্রতী হয়ে মাগলাম বর
ধনে পুত্রে ভরুক বাপ-মার ঘর
... ...
বাপের বাড়ী দোলায় আসি
শ্বশুর বাড়ী যাই

* ঠানদিদির থলে—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র

আসতে যেতে ছুইজনে
দুধ-মধু খায়।
ভাত খায় কাঁকুনী খায়
মুঠে ধরি খাজা
বাপ হয়েছেন রাজ্যেশ্বর
ভাই হয়েছেন রাজা।
… … …
বাঁশের কৌড়া শালের টোড়া
কৌড়ার মাথায় ঢালি ঘি,
আমি যেন হই রাজার ঝি।
কৌড়ার মাথায় ঢালি মৌ
আমি যেন হই রাজার বৌ।
কৌড়ার মাথায় ঢালি পানি
আমি যেন হই রাজার রাণী।*

অগ্রাণ মাসের থুয়া ব্রতে অতি সাধারণ বৃত্তাকার একটি আলপনা আঁকা হয়, তাহার মাঝে এবং চতুর্দ্দিকে চারিটী থুয়া স্থাপনান্তে ব্রতী ছড়া বলিয়া এই ব্রত পালন করে।

পৌষ মাসে তোষলা বা তুষ-তুষলী ব্রত নামক একটী মেয়েলী ব্রত ছিল। সেটী লুপ্ত বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। ইহাতে আলপনা তো নাই এবং পালন ও বিধান গোময় প্রভৃতি সহযোগে নিতান্ত নিম্নস্তরের, সেজন্ম ইহার বিষয় কিছু বলিলাম না।

(৩)

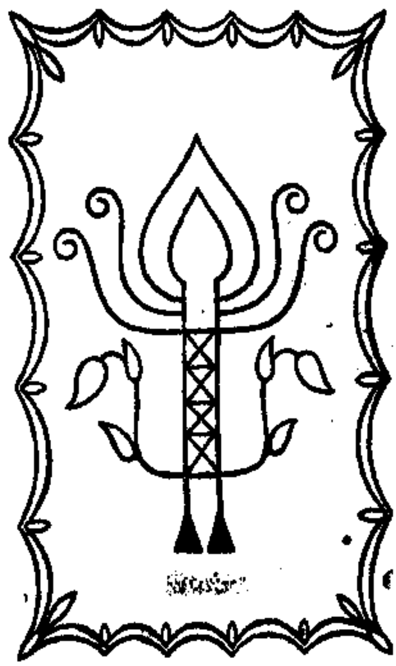
পৌষ মাঘ মাসে তারা ব্রত মাঘমণ্ডল ব্রত এবং ত্রিভুবন চতুর্থী প্রভৃতি মেয়েদের পালনীয়। তারা এবং ত্রিভুবন চতুর্থী ব্রত দুইটীতে আলপনা অঙ্কন অন্যতম বিশেষ অঙ্গ। তারা ব্রতের আলপনায় ঝাঁটা, কাঁটা, ঝিঝিটা, মান্দার, চিরুনী, কৌটা, আয়না, ভরা সিন্দুর চুবড়ি, পাল্কি, সূর্য্যের পিতা, সূর্য্যের মুকুট, আসন, চন্দ্র, পিঁড়ি, ১৭ নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র, সূর্য্যের গহনা, বলয় কঙ্কণ প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য ব্রতীর ইচ্ছামত (অবশ্য ছড়া-কথার অর্থ অনুযায়ী) অঙ্কিত হইয়া থাকিত। যেমন—

যোল যোল তারা তোমরা হবো সাক্ষী
ঘৃত দিয়া পূজা করি মোরা পঞ্চপ্রাণী।

সেতার আসি সেতার বসি
সেতার করি রাজ্যিপাট।
… … …
চন্দ্র সূর্য্যে দিয়া ফুল
জলিয়া উঠুক তিনও কুল

ছড়ার মন্ত্র,

এক তারা নাড়া নাড়া
দুই তারা ভাই তারা,
তিন তারা নাই দোষ
চার তারা আশুতোষ।


মেয়েলী আলপনায় তামার বেড়ী বা অর্কপুষ্প আকারের ।।

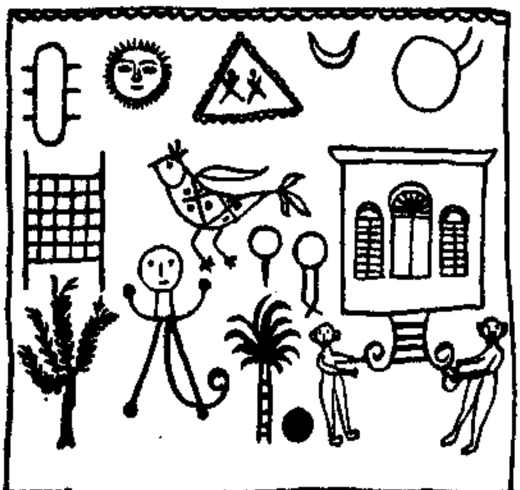
তারা পূজা করে যে
সাত ভাইএর বোন সে,
সাবিত্রীর সমান সে।
ভাইএর বোন পুত্রবতী
কালো পুত্তে সলাঁথা
জন্ম জন্ম আয়ুস্মতী।

কামনা—সেকালের মেয়েরা যাহা চাহিতেন তাহাই, চিরকাল সেই চিরন্তনী ইচ্ছা। আমাদের সমাজে নারী ইচ্ছা করিয়াছে—স্বামী, পুত্র, কন্যায় ঘর ভরিয়া থাকিবে এবং গর্ব্ব শুধু অনেকগুলি ছেলে মেয়ের মা নয়—অনেকগুলি

* বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ

ভাই বোনের মধ্যেও একজন। অধুনা এ কামনা না করার হেতু শুধু আর্থিক অভাব এবং কৃষ্টির সংঘাত। আকাশে তারা যেমন ছাইয়া আছে, ব্রতীর ঘর (শ্বশুরালয় কি পিত্রালয়) তেমনি থাকিবে পুত্র-কন্যায় আত্মীয়-স্বজনে ছাইয়া।

মাঘ মাসের ১লা হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত মাঘমণ্ডল ব্রত পালনের সময়। ইহার অর্থ বা অভিপ্রায় যাহা ব্রতীদের মনে থাকে, তাহা নিম্নলিখিত ছড়ায় প্রকাশ পাইবে। ব্রতটী দীর্ঘ, আলপনা অপেক্ষা কথা বেশী। ব্রতের ভাবটী চমৎকার—সূর্য্য, চন্দ্র, বসন্ত ঋতু প্রভৃতি প্রকৃতির রহস্তে মেয়েদের নিবেদন; মেয়েরা কল্পনা করিয়া লইয়াছে, চন্দ্র



সেঁজুতি ব্রতের আলপনা।

সূর্য্যের বিবাহ, সেইজন্ত মানবের বিবাহ-অনুরূপ হিন্দু মতের অনুষ্ঠানগুলি পুতুল খেলায় অনুসরণ করিয়া সূর্য্য-চন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ছড়া বলিতে থাকে। এই বিবাহে বসন্তের জন্ম এবং পৃথিবীর সহিত তাহার প্রণয়।

চন্দ্র সূর্য্যের রাগ-বর্ণনা :—

চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন কেশ
তাই দেখিয়া সূর্য্য ঠাকুর ফিরেন নানা দেশ।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন শাড়ী
তাই দেখিয়া সূর্য্য ঠাকুর ফিরেন বাড়ী বাড়ী।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল খাড়ু্যা পায়
তাই দেখিয়া সূর্য্য ঠাকুর বিয়া করতে চায়।

আলপনার বিশেষ সংযোগ না থাকাতে এই ব্রতের সমস্ত কথাগুলি বলিয়া লাভ নাই। মাঘ মাসে মেয়েদের আর একটী ব্রত আছে, তাহাতে বড় বড় আলপনার যোগ আছে। ত্রিভুবন বা ভুবন চতুর্থী—এই মাসের দুইটী চতুর্থীর দিনে ইহা পালন করিতে হয়।

মাঘের চতুর্থী
ত্রিভুবনে বর্ত্তী।
বর্ত্ত করে চার বৎসর
ধনে শস্যে পূর্ণ হয়।

চতুর্থীর দিনে সকাল বেলা স্নান করিয়া কাচা কাপড় পরিয়া প্রথমে মেয়েরা গৃহের অঙ্গনে আলপনা দিয়া ব্রত আরম্ভ করে। আলপনায় ত্রিভুবন বা পৃথিবীকে চিত্রান্বিত করিতে একটি বৃত্তাকার মণ্ডল সুন্দর ভাবে আঁকিয়া তাহার মধ্যে চারকোণা একটি কোঠা করিয়া দেওয়া হয়। তাহার নিম্নে আসন খাট প্রভৃতির কয়েকটি জ্যামিতিক চিত্র থাকে। এই আলপনায় পৃথিবীকে পূজা করিবার বা পৃথিবীর তুষ্টি-সাধনের জন্য অল্প-বয়সী মেয়েদের আসন খাট প্রভৃতি আঁকাতে প্রকৃতি দেবীর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকিয়া যায়। ইহার কামনা প্রকৃতি ও পৃথিবী যেন ব্রতীর জীবন সুখে, ধনে, দৌলতে এবং আহার্য্যে ভরিয়া রাখে। এই ব্রতের কথাটি ভারী সুন্দর :

এক সওদাগরের দুই মেয়ে মাখন আর কাঁকন। এক-জন করতো (ত্রিভুবন) চতুর্থী আর একজন করতো ভূষণ চতুর্থী। কাঁকনের অঙ্গ ধরে না অলঙ্কারে, কিন্তু মাখন সে সব কিছু পায় না। মেয়েরা বড় হল, মাখনের বিয়ে হল এক রাখালের সঙ্গে, কাঁকনের হল এক রাজার সঙ্গে। মাখন রাখালের ঘরে গিয়ে খুদ কুঁড়া পায়, কিন্তু ফুল-জল আর কচি কাঁঠালপাতা দিয়ে করে ভুবন চতুর্থী। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাখালের ঘর উঠ্‌ল ভরে ধানে কলাইয়ে। তার গ্রামও উঠ্‌ল শস্যে ধান্যে পূর্ণ হয়ে।

এদিকে রাণী কাঁকন রাজ্যের মেয়েদের নিয়ে জাঁকজমক করে করলেন ভূষণ চতুর্থী—ফলে রাজ্যের যত জিনিষ সব অলঙ্কার হয়ে উঠ্‌ল। চাষার হালে লাঙলে, কামারের হাতুড়ী, কুমোরের চাক, তিলির তেল, খাওয়া দাওয়ার জিনিষ-পত্তর সব হয়ে উঠ্‌ল অলঙ্কার। কারও কোন কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। কেউ কিছু খেতেও পায় না। চালে অলঙ্কার রাঁধতে পারে না, ফলে ফুলে অলঙ্কার, তরি-

তরকারীতে অলঙ্কার। সকল মেয়েরা অলঙ্কার পরে বসে থাকে, কিন্তু পেট চুঁই চুঁই করে। কান্নাকাটি পড়ে গেল। শেষে রাজার রাজ্যে হাহাকার উঠ্‌লে রাজা সন্ধান পেলেন—রাণী দেশশুদ্ধ লোককে নিয়ে ভূবণ চতুর্থী ব্রত করে এই অঘটন বাধিয়েছেন। এখন উপায়? রাণী বললেন, এর উপায় করতে পারে রাখালের বৌ আমার বোন মাখন।

মাখন বললে, "কি বা বলি, সোনা রূপার অলঙ্কারে কি পেট ভরবে! খাওয়া না দাওয়া না, বোন বা তবে ব্রত করলেন কেন? সুখে স্বচ্ছন্দে খাবেন, থাকবেন, ঘি দিয়ে মাটীর প্রদীপ জ্বালবেন, হাল চল্‌বে, গাই চল্‌বে, লক্ষ্মীর হাতের ক্ষীর অলঙ্কার, ক্ষেত ভরে উঠ্‌বে, বোন্ সেই ব্রত করুন।" রাণী তখনি ত্রিভুবন চতুর্থী ব্রত করলেন। অমনি রাজ্যের অলঙ্কার খসে পড়ল, যেমন ছিল তেমনি ঢাকের মত ঢাক বাজে, হালের মত হাল চলে, মাটীর গায়ে ফুল ফোটে, কুমারের চাকে হাঁড়ি, জেলের জালে রুই কাতলা।"

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আলপনার সহিত সংশ্লিষ্ট দুইটী ব্রত পাই, ফাগুনকোণা এবং পৃথিবী ব্রত। ফাগুনকোণা ব্রতের আলপনা অতি সরল ও সাধারণ, তবে অনেক সময় পিটুলি-গোলা জলের পরিবর্ত্তে ফাগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চৈত্রসংক্রান্তি বাংলা বৎসরের শেষ দিন, সেই দিনে বসুন্ধরা বা পৃথিবী ব্রত পালন করিবার দিন। এই ব্রতের ভাবটী ভারী সুন্দর—আলপনা এবং কথায়ও বড় চমৎকার একটী ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৎসরের শেষ দিনে বসুন্ধরাকে প্রণাম জানান, তার সঙ্গে মানবের ক্ষণস্থায়ী জীবনের সম্পর্ক। মেয়েরা এই কামনা লইয়া এই ব্রত সৃষ্টি করিয়াছে—এই যে পৃথিবীতে আমাদের জন্ম, তার বুকে সুখে দুঃখে জলে-স্থলে মানুষ এবং তাহারই রঙ্গমঞ্চে আমাদের ক্রীড়া বা ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিণতি, তাই বৎসরের শেষে তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া একটি সুন্দর রূপক পূজার্থে এই ব্রত পালন। আলপনায় প্রকাশ পায়—অঙ্গনের কোণে পরিষ্কার মেঝেতে একটী পদ্মের ঝাড়, তাতে কতকগুলি পদ্ম এবং একটি পদ্মপাতা, সেই পদ্মপাতার উপরে মা বসুমতীকে চিত্ররূপে একটি বৃত্তে দেখান হয়। পদ্মপাতায় বৃষ্টির জল যেমন বেশীক্ষণ থাকে না, তেমনই পৃথিবীও অনেকের কাছে কতক্ষণ থাকে?

বছর শেষে শঙ্খ বাজে
ব্রত ব্রতীরা পৃথিবী পূজে।
এস পৃথিবী বস পদ্মপাতে
শঙ্খ চক্র গদা হাতে,
খাওয়াব ক্ষীর মাখাব ননী
মলে হব রাজার রাণী।

প্রণাম-মন্ত্রে ব্রতীর অভিমানী মনোভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাই বলে:

বসুমতী দেবী গো! করি নমস্কার
পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার।

উপরোক্ত ব্রতগুলি ব্যতীত প্রকৃত পক্ষে বহু মহিলাব্রত আছে, যাহার সহিত আলপনার সংযোগ নাই এবং যাহার বেশীর ভাগের অস্তিত্বও নাই—আবার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন ব্রত এবং বিভিন্ন পালন-পদ্ধতি। পূর্ব্বোক্ত ব্রতগুলির সম্বন্ধে যে যে মাসে মেয়েরা সাধারণতঃ উদ্‌যাপন করেন বলিয়াছি, তাহা অনেক স্থানে হয়তো ভিন্ন হইতে পারে। এই প্রকার যোষিদ্‌ব্রতে কোন শাস্ত্রীয় বিধান নাই বলিয়া পাঁজি-পুঁথিতে বা পুরোহিতদের নিকট পাওয়া যায় না। যা কিছু authority গ্রামের বা পরিবারের প্রাচীনা স্ত্রীলোকগণ, কারণ, এই সমস্ত ব্রত কেবল মাত্র স্ত্রীলোক-পরম্পরায় এক পুরুষ পর পুরুষক্রম প্রচলিত হইতেছিল বা হইতেছে। এইরূপ কতকগুলি অশাস্ত্রীয় ব্রতের কয়েকটা আমাদের ঘরে ঘরে এখনও দেখিতে পাই। যেমন—চৈত্রসংক্রান্তিতে গোকাল বা গোকল বা গোকুল ব্রত, বৈশাখ মাসে অশ্বত্থনারায়ণ, ঘোষাপুখী, সন্ধ্যামণি; জ্যৈষ্ঠে জয়মঙ্গলবার, আষাঢ় বা ভাদ্রে চাওড়া; অগ্রাণে কুলুইচণ্ডী বা কুলকুলতী, কলাছড়া, লোটন-ষষ্ঠী, নাটাই, ইতুয়াল (ইতুপূজা সূর্য্য আরাধনার), গাড়ুষী, নাগপঞ্চমী, বুড়াঠাকুরাণী প্রভৃতি। আর ষষ্ঠীর ব্রত তো লাগিয়াই আছে।

বয়

—শ্রীনিখিল সেন

দু হাতের উপর ভর ক'রে সামন্ত উঠে বসল।

অন্যমনস্ক হ'য়ে কপালের উপর একবার হাত বুলিয়ে নিলে। সুপুরীর মত অনেকখানি ফুলে উঠেছে ডানদিকটায়। আর যেখানে কেটে গিয়েছিল, সেখানে রক্ত জমাট বেধে শুকিয়ে আছে। আস্তে আস্তে সে হাত বুলোতে লাগলো ক্ষতটার উপর। আঙুলগুলো ব্যথায় টন টন করে উঠল।

ফুটপাথ থেকে এবার সে রোয়াকে উঠে এল। পাশেই রাজীববাবুর রেস্তোরাঁ। উপরে সাইনবোর্ড ঝুলান রয়েচে। সামন্ত অবশ্য পড়তে জানে না। কিন্তু কি লেখা আছে, তার অজানা নেই। রেস্তোরাঁর নাম খুব বড় বড় অক্ষরে: কাফে-দা-হেল্থ। এদিকটা শহরের অভিজাত অঞ্চল। রেস্তোরাঁটাও অতি আধুনিক ধরণের। আসবাবপত্রগুলো সব সৌখীন, শোভন রুচির। আর দেয়ালগুলোও বিচিত্র প্লাস্টার করা। বিদেশী খানকয়েক ল্যাণ্ডস্কেপ দেয়ালে সমান্তরাল ভাবে ঝুলচে। আর রাস্তার ফুটপাথ থেকে প্যাসেজের সরু পথ ধরে সিধে উঠে এসেচে বাদামী রঙের একখানি কার্পেট।

কাফে-দা-হেল্থ এখন ফেঁপে উঠেচে। পূর্ব্বে—এই যখন সামন্ত এখানে প্রথম এসেছিল—তখন এমন ছিল না। ভিজা, স্যাঁত-সেঁতে একখানা মাত্র ঘর। দেয়ালগুলোতে নোনা ধরেচে। দুরন্ত কুষ্ঠরোগীর মত থাবা থাবা তার চুণ-বালি সব ধ্বসে পড়েচে। কিচেন ব'লতে তখন কিছুই ছিল না। মাঝখানটায় কেবল টাঙান ছিল জাহাজের খালাসিরা যে রঙের জামা ও ইজের পরে সেই রঙের এক খানা সস্তা কাপড়। বাইরের উৎসুক দৃষ্টি হতে অন্দরের আবরু আড়াল করে রাখা হত ওটা টাঙিয়ে—যত দূর সম্ভব পারা যায়।

সামন্তর হাত ধরে তার মা এখানে এসে একদিন উঠেছিল। রাজীববাবু তাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। দেশে তাদের দিন আর কাটছিল না। তার বাবাও আজ দেশ ছাড়া হয়েছে সাত বছর। টাকা-পয়সাও পাঠায় না, কোন খোঁজ-খবরও না। নিরুপায় হ'য়ে তাদের শহরে আসতে হয়েছিল বাবার খোঁজ নিতে। তার বাপ না কি এখানকার শহরতলীর এক জুট মিলের দিন-মজুর। সে আজ অনেকদিনকার কথা। তিনটা হেমন্ত তারপর পৃথিবীর উপর দিয়ে সরীসৃপের মত হেঁটে গেছে সতর্ক পা ফেলে।

রেস্তোরাঁর প্রত্যেকটি জিনিষ তাকে আজ যেন হাতছানি দিয়ে ইসারায় ডাক্‌ছে। রাজীব বাবুর পায়ে পড়ে একবার ক্ষমা চাইলে হয়। ক্ষমার শরীর ত মানুষের। তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে দয়া না করে কি কেউ পারেন! নইলে সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? জনাকীর্ণ এই মহানগরীতে আর সকলের স্থান আছে—তার শুধু ঠাঁই নেই। এখন সে যাবে কোথায়? কে জানে এখন মা কোথায়? মোড়ের মাথায় তেতলা ওই বাড়িটাতে আগে কাজ করত। সেটা এখন ছেড়ে দিয়েচে।

সামন্তর মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল। দোষ-ত্রুটি আবার কার না হয়? ভুল ত মানুষের মজ্জাগত—স্বাভাবিক ধর্ম্ম মানুষের। তাই বলে অমন শাস্তি কে কখন কাকে দিয়েছে? আর সব দোষটাই কি তার? রাজীববাবু অমন বেয়াড়াভাবে পথের মাঝখানটায় না দাঁড়ালে সে কি গিয়ে পড়ত তাঁর উপর? না, কাপগুলোও অমন ভেঙে যেত? রাজীববাবুর দেহ ত নয়, যেন মাংসের এক বিপুল পাহাড়। তার উপর দিয়েও ত চোটটা নেহাৎ কম যায় নি। কপালটাও তার অনেকখানি কেটে গেছে।

সামন্তর গায়ের খাঁকি চাপকানটা রেঁস্তোরা হতে দেওয়া। লাল সুতো দিয়ে বুকের উপর রেঁস্তোরার নাম লেখা। কপাল হতে রক্ত পড়ে লেখাটা এখন অস্পষ্ট হয়ে উঠেচে। সামন্ত নখ দিয়ে রক্তের শুকনো দাগটা ওঠাতে লাগল। অনেকখানি বেড়ে গেছে নখগুলো। পুরু হয়ে ময়লা জমেচে তার মধ্যে। দাঁত দিয়ে সামন্ত নখ কাটতে লাগল।



লক্ষ্যভেদ

রাজীববাবুর পায়ে পড়ে সে এবারকার মত ক্ষমা চাইবে। দু'পায়ে মাথা খুঁড়ে সে প্রথম কেঁদে উঠবে। তারপর দুহাত জোড় করে, মিনতি করবে: "এবারকার মতন আমাকে ক্ষেমা করেন, বড়বাবু।"

না, ঠিক 'ক্ষেমা' বলবে না। তোতলা সে। ক্ষমা উচ্চারণ করতে গিয়ে তাকে বিশ্রী ভাবে তোতলাতে হয় 'ক্ষ-ক্ষ-ক্ষ' করে, আর তার এই অপটুতায় রাজীববাবু ও আরো অনেকে বিদ্রূপের হাসি হেসে ওঠেন। বুক ভরে তখন সামন্তর কান্না আসে। সে তোতলা, তার জন্যে কি সে দায়ী? ভগবান তাকে তোতলা ক'রেছেন। তবে তার এই খুঁৎ নিয়ে মানুষ তাকে ব্যঙ্গ করে কেন? সে ভেবে পায় না। তার খুব দুঃখ হয়। রাগও হয় অনেক সময়। ইচ্ছে করে গিয়ে সজোরে এক ঘুষি বসিয়ে আসে তাকে যে অনুকরণ করে ভ্যাঙাচ্ছে, তার মুখের উপর। দাঁত দুপাটী ভেঙে গুঁড়ো হলেই যেন তার তৃপ্তি হয়।

গত জন্মে সে বুঝি অনেক দুষ্কৃতি করেছিল! তাই সে এ জন্মে তোতলা হয়েচে। এ তোতলামী সারতে সে কম চেষ্টা করেচে? বাণেশ্বরের কথা শুনে জিভের ওপর প্রায় আধ-পোয়া ওজনের এক সীসার টুকরো সে বহুদিন বেঁধে রেখেছিল দাঁতের সঙ্গে সুতো বেঁধে। বাণেশ্বর বলেছিল:

"যা বলছি তাই করে ত্যাখ না সামন্ত, তোতলামী তোর না সারলে তখন আমাকে বলিস। আমিও কি আগে এমন কথা কইতে পারতাম? অমনি করেছিলাম ভাই। সেরে গেলে পর শ্মশানকালীর পায়ে গিয়ে সাতটা রক্তজবা দিয়ে আসিস, বুঝলি?"

বাণেশ্বরও বুঝি তাকে ভাঁওতা দিয়ে গেছে।...

আচ্ছা, ক্ষমা না বললেও তো তার চলে? ক্ষমার বদলে আর কিছু বললেও তো হয়। সে তো বলতে পারে: "বড়বাবু, আমাকে এবারকার মতোন মাপ করেন।"

কি আশ্চর্য্য, 'মাপ' বলতে তাকে আর তোতলাতে হয় না। আর বলবার সময় সে খুব সাবধান হয়ে যাবে। একটু রেগে গেছে কি, তোতলামী তার ভয়ানক বেড়ে গেছে। কিন্তু রাজীববাবু কি তার অনুরোধ কানে তুলবেন? এ শ্রেণীর লোককে তার বড় ভয় করে! যাঁরা বলেন, মুখ দেখে মানুষের অন্তরের ভাষা পড়া যায়, তাঁরা ভুল করে বলেন। অন্ততঃ রাজীববাবুর মুখ দেখে তেমন কিছু পড়া যায় না। ঠিক যেন দু-মুখো সাপ! দুনিয়াটাই বুঝি এমনি—এমনি নির্ম্মম, কশাইয়ের মতো এমনি নিষ্ঠুর!

না। সামন্ত পরমুহূর্ত্তে পিছিয়ে এল। তার ভুল হয়েছে। দুনিয়ার সবাই এমন নয়। ওই তো তাদের ভুবন বাবু: এক কাপ চা নিয়ে পাক্কা তিন ঘণ্টা এক ঠাঁয়ে কাটিয়ে দেন। খবরের কাগজটার বিজ্ঞাপনের প্রথম পাতা থেকে সুরু করে শেষ পাতার শেষ পংক্তি পর্য্যন্ত তাঁর একবার চোখ বুলিয়ে যাওয়া চাই। কই, তিনি তো তেমন নন। সদা হাস্যময়, দিল্‌খোলা ভদ্রলোক—মায়া-মমতার শরীর!

আর ওই যে রোগা ছিপছিপে বাবুটী। মাথায় তৈল-হীন একরাশ বিবর্ণ চুল। চোখে চশমা, চশমার মধ্যে চোখ দুটো যেন উধাও হয়ে গেছে দূরের কোন এক স্বপ্নরাজ্যে। তিনি না কি ছবি আঁকেন। মাঝে মাঝে কাফেতে আসেন। কাপের পর কাপ কফি আর বর্ম্মা চুরুটের ধোঁয়া তখন চারি-দিকে গাঢ় হয়ে ওঠে। রাজীববাবু তাঁকে খুব সমীহ করেন। করবার অনেক কারণও আছে। টাকার চেঞ্জ নিতে তিনি প্রায় ভুলে যান, আর নোটের টাকা পকেটে পোরেন তিনি না চেয়ে। তিনি কাফেতে ঢুকলে রাজীববাবু মহা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। পাখার রেগুলেটরটা বাড়িয়ে দেন নিজে উঠে।

"আসুন সার, আসুন। কেমন ভাল তো? হেঁ হেঁ?" তিনি হাসতে থাকেন টেনে টেনে তাম্বুল-রঞ্জিত দাঁত দুপাটী বার করে। কালো মাড়িদুটি বেরিয়ে পড়ে, এমন বিশ্রী তাঁর অকারণ হাসিটা!

চেয়ারখানা তিনি এগিয়ে দেন। আর্টিষ্ট কিন্তু তাঁকে এড়িয়ে যান। কোণের দিকে এক টেবিলে গিয়ে বসে পড়েন। সামন্ত এসে হাজির হয়। অর্ডার আর করতে হয় না, সামন্তর তা জানা আছে। কাফের বিল মেটাবার সময় খুচরো পয়সাটা দিয়ে যান সামন্তকে।

একদিন কিন্তু এ নিয়েই তার তুমুল ঝগড়া বেধেছিল রামপরাণের সঙ্গে। রামপরাণ রাজীববাবুর ছোট শালা। আজকাল দোকানেই থাকে। সামন্ত বুঝি তখন রুটিতে মাখন মাখাচ্ছিল। কোমর থেকে রামপরাণের হাতদুটো সজোরে ঠেলে দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল: "খ-খ-খবরদার ব-ব-বলছি, ট্যাঁকে হাত দিও না।"

"ট্যাঁকে তোর হাত দিচ্ছে কে? নিজে থেকে তুই বার কর না।"

"কেন বার করব? চুরি করছি না কি? চশমা-পরা সে বাবুটি আমাকে বকসিশ দিয়েছে। মাইরি বলছি, কোন্ শালা মিথ্যে বলছে।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোকে বকশিশ দিয়েছে। এখন বার কর্ শীগ্‌গির।"

"না।"

"দাঁড়া তবে, ম্যানেজারকে—"

"যাযা-যা-না, ব-ব-বল-গে গিয়ে। নিজের পয়সা তোকে ভাগ দেবো কেনো?"

রামপরাণ বুঝি তারপর তাকে ভেঙিয়ে উঠেছে। দুর্ব্বলতায় ঘা দিলে তার বড় লাগে। সেও বুঝি তখন রেগে গিয়ে মাখন মাখানো ছুরি দিয়ে আক্রমণ করেছিল রামপরাণকে। রক্তারক্তি কিছু একটা হবার পূর্ব্বেই কিন্তু ছুটে এসেছিলেন রাজীববাবু। হিড়-হিড় করে তার কানে ধরে টেনে তিনি সামন্তকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

"রাস্কেল ব্যাটা হারামজাদা, তোকে আজ আমি ডিস্‌মিস করে তবে ছাড়বো। আমার খদ্দেরবাবুরা এদিকে বসে আছেন, আর উনি দিব্যি ভেতরে ঝগড়া বাধিয়েছেন!"

বকশিসের টাকাটা তিনি গাপ করেছিলেন তারপর।

আজকেও সামন্ত তখন কিচেনে কাজ করছিল। রাজীববাবুর হাঁক-ডাকে ছুটে এসেছে। নবাগত এক যুবক ও যুবতীকে নিয়ে তিনি মহা বিব্রত হয়ে পড়েছেন। কোমরটা ঈষৎ নত করে খাস বিলিতি ধরণে 'নড' করে তিনি জানালেন তাদের সাদর-অভ্যর্থনা। মেনুখানা নিয়ে গিয়ে সামনে ধরলেন নিজেই। তারপর মুখ তুলে সামন্তর দিকে খামাকা বলে উঠলেন, "হুয়া ক্যায়া করতা উল্লুক? জলদিসে লেয়াও পোচ্, রুটি আওর কোকো।"

সামন্ত এটা অনেকদিন লক্ষ্য করেছে, ম্যানেজার বাবু রেগে গেছেন কি বিব্রত হয়ে পড়েছেন, মুখ দিয়ে তাঁর হিন্দী বুলি বেরিয়ে আসবেই, মাতৃভাষা তখন ভুলে যান।…

একটি মুহূর্ত্ত বুঝি তারপর সামন্তর জিরানোর ফুরসুৎ মেলে নি। বহু দূর থেকে ছুটে-আসা জিভ-বেরিয়ে পড়া কুকুরের মত সে তখন হাঁপাচ্ছিল। ঠোঁটদুটো শুকিয়ে গিয়েছে। জিভটা দিয়ে একবার সে চেটে নিলে ঠোঁটদুটো। কয়েক ফোঁটা ঘাম কপালের ওপর এসে জমেছিল। চাপকানের আস্তিনটা দিয়ে ঘামের ফোঁটাগুলো সে মুছে নিলে। মার্ব্বেল পাথরে মোড়া সাত নম্বরের গোল টেবিলখানা পরিষ্কার করতে করতে। সাত নম্বরের বাবুটি কিন্তু তা লক্ষ্য করে হঠাৎ নাসিকা কুঞ্চিত করে উঠলেন। নাক দিয়ে শূকরের মত বিশ্রী একটা শব্দ তার বেরিয়ে এল। রাজীববাবুর নজর তা এড়ায়নি। বয়কে তিনি খামাকা ধমকিয়ে উঠলেন:—"ব্যাটা, রাস্কেল পাজি, সেদিন আনকোরা অমন টার্কিস তোয়ালেখানা দিলুম মুখ-হাত মোছবার জন্তে, তা বুঝি মেরে দিয়েছিস নিজে? না, তোর এ সব নোংরামি বাপু আমার এ কাফে-দা-হেলথ-এ চলবে না, বলে রাখছি। পাবলিক হেল্‌থ মানে লোকের স্বাস্থ্যের দিকে আমাকে জানিস্ রীতিমত নজর রাখতে হয়। যা তা তো আর লোকের সামনে—"

কথার মাঝপথে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। অন্যমনস্ক হয়ে গোঁফের দুপ্রান্তে চাড় দিতে লাগলেন। রেস্তোরাঁখানা চৌরাস্তাটার মোড়ে। ট্রাম লাইন সামনে দিয়ে সহসা বাঁয়ে বাঁক ফিরে চলে গেছে। সামনের ষ্টপেজে লম্বা ছিপছিপে একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল ট্রামের জন্তে। ছোট্ট একটি ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে আর পায়ে উঁচু হিলের জুতো। রাজীববাবুর দৃষ্টিপথ ধরে সামন্ত একবার মেয়েটিকে দেখে নিলে।

কথার খেই বুঝি রাজীববাবু আবার খুঁজে পেলেন। মেয়েটির উপর হতে চোখ দুটো তুলে নিয়ে আবার সুরু করলেন: "বুঝলেন সার, ব্যাটাদের যদি একটু হাইজিন জানা থাকতো? ধোঁয়া-ওঠা অমন তোয়ালেখানা করলি কি, য়্যাঁ?"

ভয়-বিস্ময়ে চোখ দুইটো সে বুঝি তখন তুলে ধরেছিল রাজীববাবুর দিকে।

"জাঁ-জাঁ-জাঁজ্ঞে কো-কো-কোনটা?"

রাজীববাবু জবাবটা কানেই তুলেন নি। বললেন:

"ভাখ তো একবার উনি তেরো নম্বরে কি চাচ্ছেন?"

ঊর্দ্ধশ্বাসে সে বুঝি তারপর ছুটে গিয়েছিল।

"ফাউলকারি এক ডিশ আরচা এক কা-কা-কা"—সামন্ত নিজেকে সামলে নিলে। কাপ উচ্চারণ করতে গিয়ে তাকে

অনেকবার তোতলাতে হয় বিশ্রী ভাবে। নিজেকে তাই তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে সে বলে উঠল, "চা এক পেয়ালা।"

অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি ঘটেছে তারপর।

ফাউলকারি আর চায়ের কাপ ট্রের উপর সাজিয়ে সে আসছিল ছুটে। ম্যানেজার বাবু কিন্তু দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর দেহের বিপুল পাহাড় নিয়ে দু'পাশে সাজানো চেয়ার-টেবিলের মাঝখানের সরু প্যাসেজটায়। হুড় মুড় করে সে গিয়ে পড়ল তাঁর উপর, প্রথম ধাক্কার টাল সামলাতে না পেরে সে গিয়ে পড়ল টেবিলের এক কোণে। সেখান হতে তারপর মুখ থুবড়ে ছিটকে পড়ল চেয়ারের ফাঁকে একেবারে টেবিলের নীচে। চায়ের গরম কাপটি উপুড় হয়ে পড়ল তার সারা মুখের উপর।

পলকের মধ্যে কি যে হঠাৎ ঘটে গেল, সামন্ত নিজেই বুঝতে পারে নি। মাথাটা তার ঘুরছিল। অন্ধকার বুঝি নেমে আসছে পৃথিবীতে। বুঝি নিবে এসেছে অগ্নিস্ফু সূর্যের তাপ। সে যেন কোথায় হারিয়ে গেচে অন্ধকারে। তার চমক ভাঙল রাজীব বাবুর প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে। তিনি ঝুঁকে পড়ে তাকে টেনে তুললেন ঘাড় ধরে। মুঠি তো নয়, যেন বাঘের থাবা। পাঁচটা আঙুল কেটে বসে গেল সামন্তর সরু লিক্‌লিকে গলায়। তিনি চীৎকার করে উঠলেন :

'নিকালো, রাস্কেল ব্যাটা হারামজাদা—নিকালো তুম্ হিঁয়াসে! চার চার আনা দিয়ে সে দিন কাপগুলো হগমার্কেট থেকে কিনলাম—অমন নূতন ধরণের ডিজাইন, তা উনি সব আজ ভেঙে বসলেন।'

কপালটা কেটে গিয়ে সামন্তর তখন ফিন্‌কি মেরে রক্ত-ধারা ছুটেচে। একটা চোখ বুঁজে গিয়েছে রক্ত পড়ে। তার ঘাড় ধরে রাজীববাবু সজোরে আবার নাড়া দিলেন।

'বেরো ব্যাটা, বেরো আমার হোটেল থেকে—বেরো বলছি।'

তিনি রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন। রেঁস্তোরায় সবাই মুখ তুলে তাকাল। কথা সরল না কারো মুখে।

'আহা, অনেকখানি দেখছি কেটে গেছে! ছেড়ে দিন না মশাই, ছেলে মানুষ দেখতে পারনি তাই।'

ভুবনবাবুর দিকে একবার কট-মট করে তাকিয়ে নিলেন

'বলেন কি সার, চার চার আনা দিয়ে সেদিন হগ-মার্কেট থেকে কাপগুলো কিনলাম—অমন সব নূতন ডিজাইন, তা সব ব্যাটা আজ ভেঙে বসলো।"

"ওর মাইনে থেকে দামটা কেটে নিলেই তো পারতেন?"

"মাইনে! ওর আবার মাইনে কি! খাচ্চে দাচ্চে এই তো ঢের। মা-মাগী সেবার পায়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করছিলো, তাই রাখলাম কাজকর্ম কিছু শিখবে বলে। তা ব্যাটা অকম্মার ধাড়ি। কুঁড়িয়ে কুঁড়িয়ে শুধু পিণ্ডি গেলা। বেরো ব্যাটা, বেরো বলচি!'

ঘাড় ধরে তিনি তারপর তাকে বার করে দিয়েছেন।

সামন্ত উঠে দাঁড়াল। মাথাটা এখন খুব হালকা হয়ে গেচে—অনেকখানি রক্ত পড়ায়, আর বুঝি দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। পা দুটি কাঁপচে থর থর করে। না, রাজীব বাবুর সাথে সে একবার দেখা করবে। পুরোন লোক, এখানকার কত সুদিন আর দুর্দ্দিনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সে ওতঃপ্রোত ভাবে। এত দিন এখানে সে খেটে এসেচে— মানুষের কেমন একটা মায়াও তো হয়! খামকা তাড়িয়ে দিলেই হলো না কি?

টলতে টলতে সে এগিয়ে গেল কয়েক পা। তারপর হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। দু' হাতে মুখ ঢেকে এবার সে গুমরে কেঁদে উঠল আহত পশুর মতো। রাজীব বাবুর নিকট সে যে অনেক কিছু বলতে চায়, অনেক কিছুর বিচার চায়,প্রতিবাদ জানাতে চায় সে অনেক— অনেক কিছুর! কিছুই যে তার বলা হলো না! গুমরে উঠল সে অসহায় ভাবে।

পাঠাগার

—শ্রীগৌরমোহন পাল

পাঠাগার সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলেই আজকাল সকলের আগে একটা কথা মনে পড়ে; সেটা হচ্ছে, বর্ত্তমান লাইব্রেরী আন্দোলন। এই আন্দোলন যে আমাদের দেশে কি রকম ভাবে হওয়া উচিত, বা এর সাহায্যে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ যে কতদূর সম্ভব তা' মনীষীদিগেরই বিচার্য্য।

পাঠাগার সম্বন্ধে বহু জ্ঞানী ব্যক্তি অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন; তবে আমার যে কয়টী কথা বিশেষ ক'রে মনে পড়ে, সেইগুলিই পাঠকদের কাছে নিবেদন করছি।

পাঠাগার স্থাপন করা আমাদের দেশে নূতন নয়। এর পিছনে যে সমস্ত কর্ম্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং এখনও করছেন, তাঁরা বাস্তবিকই দেশের জন-নায়কস্বরূপ।

বেশী দিনের কথা নয়, যখন পল্লীই ছিল দেশের ও জাতির প্রাণ; এবং সে প্রাণের স্পন্দন প্রতীয়মান হ'ত তার সমাজে, তার সেবায়, তার শিক্ষায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে যখন আমরা পল্লীশ্রী ম্লান ক'রে, তার ঐশ্বর্য্য পদদলিত ক'রে. গ্রামছাড়া দিশাহারা ছন্নছাড়ার মত শহরের আবিলতায় নিমজ্জিত হলুম, তখন থেকেই লোক-শিক্ষার ন্যায় কল্যাণকর যজ্ঞ আমরা ভুলে গেলুম।

বস্তুতঃ আমাদের দেশে শিক্ষা-সমস্যা নিয়ন্ত্রণে পাঠাগারের দায়িত্ব যে কত বেশী, এ সম্বন্ধে আমাদের ভাববার সময় এসেছে।

লাইব্রেরীকে উদ্দেশ্য করে' জনৈক প্রসিদ্ধ কবি বলেছেন যে, হিমালয়ের মাথার উপর বরফের ভিতর যেমন শত শত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই বন্যায় বাঁধ ভেঙ্গে প্লাবন আনবে কারা?

কই এত বড় বড় পাঠাগার তো' রয়েছে শহরে—কতটা লোকশিক্ষার ভার নিয়েছেন তাঁরা? মুষ্টিমেয় জ্ঞান-পিপাসুর তৃষ্ণা মেটান ছাড়া, আর কি করছেন? দেশের নিরক্ষরতা কমেছে কি? এই যে বিরাট জ্ঞান-সমুদ্র তার কণা মাত্রও যদি দেশের লোকের চোখের সামনে ধরে দিয়ে, তাদেরও সেই বোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারা যায়, তাদের দুঃখ, দারিদ্র্য মনে প্রাণে অনুভব ক'রে তাদের রুচির ধারা পরিবর্ত্তন করতে পারা যায়, যদি তাদের মহাপুরুষদের যে কণ্ঠ সহস্র বৎসর ধরে সহস্র ভাষায় এই লাইব্রেরীর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—সেই ভাষায়, সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারা যায়, তবেই না আমাদের পাঠাগারের সৃষ্টি ও স্থিতির সার্থকতা। তবেই না আমাদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনার চরম উৎকর্ষ।

তাই মনে হয়, পাঠাগার—তা' সে গ্রামেরই হোক বা শহরেরই হোক জনকয়েক লোকের অবসর-বিনোদনের স্থান না হয়ে—একটা বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র হওয়া উচিত। জাতীয়তাবোধ বলুন বা দেশ-সেবা বলুন, পাঠাগারকে ভিত্তি ক'রে আমরা প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট দেশসেবা করতে পারি। দেশের মঙ্গলের জন্য যাঁরা প্রাণ বলি দিয়েছেন, তাঁরা অবশ্য আমাদের নমস্য, কিন্তু যাঁরা ক্ষুদ্র পাঠাগার স্থাপনা ক'রে বা তার পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে গ্রামের শিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত নর-নারীর ভিতর আমাদের যত গৌরব—সাহিত্য, শিল্প, সভ্যতা প্রচারের প্রয়াস করছেন, তাঁরাও কম শ্রদ্ধার পাত্র নহেন।

এক দিন ছিল, বিনা পাঠাগারে এই ধরণের জনসেবা সুচারুরূপে সম্পাদিত হোত—গ্রাম্য-পাঁচালী, কথকতা এবং যাত্রার ভিতর দিয়ে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য সেই পুরাতন কথকতা, পাঁচালী প্রভৃতি সুসংস্কৃত ক'রে দেশবাসীর সামনে হাজির করা।

পাঠাগারের আর একটা দিকের কথা "শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের গর্জ্জন শুনা যায়, পাঠাগারের মধ্যে তেমনি মানব হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছি।" কবি রবার্ট সাদি-র ভাষায় বলতে গেলে লাইব্রেরী হচ্ছে জীবিতের ও মৃতের সঙ্গমস্থল। এটা যেন শত শত পথের মিলনস্থল। যার যে দিকে ইচ্ছা যাও। কত গ্রন্থকর্ত্তা—যাঁরা আমাদের বিস্মৃতির গর্ভে লীন—তাঁদের সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না সবই যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, আমাদের একটু মনোনিবেশের ফলে, মনে হয় তাঁরাই যেন এ জগতে আবার বিচরণ করছেন। তবে প্রয়োজন সত্যকারের গ্রন্থ-নির্ব্বাচন, বিষ বাদ দিয়ে অমৃতরসের পরিবেশন। সুখাদ্য, সৎগ্রন্থ ও সৎসঙ্গ আমাদের বাঁচা বৃদ্ধি তুল্যভাবেই সঞ্জীবিত ক'রে—প্রকৃত ভাবে প্রগতিপরায়ণ করে।

বিজয়ী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

শাশুড়ী-বৌ

"মা, আনন্দ কই ?"

"তুমি কোথা গেছলে বৌমা ? লক্ষণ তোমায় খুঁজছিল।"

রুক্মিণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "উমিদের ওখানে, ওর ছোট বোনটার আমাশা বড্ড বেড়েছে, এলোপাথিতে কিছু হচ্ছে না, আনন্দ দু' ফোঁটা হোমিওপ্যাথি দিয়ে দেখতো—'

"কেন তুমি যাও ওদের বাড়ী ?"

"ওরা তো পর না মা।"

কৈকেয়ী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "কত আর বলবো তোমায় ? কিসের আপনার ওরা, মামলা বাধিয়ে কম জ্বালাতন করলে ?"

"মামলায় হেরেই তো এই দশা হলো।"

"তা হবে না ? পাপের ফল ভুগবে বই কি। পরের জিনিস ধরে টান দেওয়া সোজা—সামলানো কঠিন।"

"তা বাগানটা পেলে ওদের অনেক সুবিধে হতো, ছেলে-পিলের ঘর—"

"না পেলেও ক্ষতি দেখছিনে তো, বাগানটার সব আম কাঁঠালইতো তুমি ওদের বাড়ী চালান দাও।"

ধরা পড়িয়া অপ্রতিভ রুক্মিণী মাথা হেঁট করিলেন।

উমারা চৌধুরীদের একটা সরিক। অপব্যয়ে সম্পত্তি শেষ করিয়াছে। উমার বাবা ছিলেন গিরিরাজের একজন পারিষদ, সুতরাং চৌধুরীদের শত্রু। এখন গিরিরাজ মিত্র-বর্গের মধ্যে গণ্য কিন্তু উমার বাবার স্বভাব বদলায় নাই। সাধ্যমত বিবাদ-বিসংবাদ বাধাইতে ছাড়েন না।

একটু পরে কৈকেয়ী বলিলেন, "উমার মেজ বোনের গায়ে হলুদ কবে ?"

"কাল, সেই তো আরো বিপদ, কাল ছাড়া আর দিন নেই, এ দিকে কোলের মেয়েটার এই দশা, তার মধ্যে বিয়ের যোগাড়। ছেলের বাপ না কি বলেছে এ মাসে বিয়ে না হলে অন্য জায়গায় ছেলের বিয়ে দেবে।"

"গায়ে হলুদে তোমাদের নেমন্তন্ন করেছে ?"

"করেছেন, হাতে ধরে দিদি—উমির মা—অনেক করে বলে দিলেন।"

"যাবে ?"

"যাওয়া কি উচিত না মা ? হাজার হোক রক্তের সম্পর্ক—" রুক্মিণী কৈকেয়ীর মুখের দিকে চাহিলেন।

"ওদের কথা শুনতেও আমার ইচ্ছে করে না। অন্যায় আমি সইতে পারিনে। তুমি জান এত কাল কিছু বলিনি, আর একবার যদি আমার সঙ্গে এই রকম লাগতে আসে দেখে নিয়ো তখন। তা বললে তো তুমি শুনবে না, তুমি যাবেই, না আছে তোমার রাগ, না আছে তোমার মান-সম্মান জ্ঞান।"

রুক্মিণী বলিলেন, "বিয়ের মোটে চারটি দিন বাকী, আনন্দ কি থাকতে পারবে না ? দিদি অনেক করে বললেন।"

"না সে কালই যাবে, অত দিন কলেজ কামাই করবে না।"

"দু' দিনে এমন আর কি ?"

"না।"

রুক্মিণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "কাল সকালে লক্ষণ যাবে তো ?"

"না তাকে নিয়ে যেয়ো না।"

একটু দ্বিধার সঙ্গে রুক্মিণী বলিলেন, "দিদি বার বার—"

"হোক্ গে, তোমার এ সব চক্ষুলজ্জার ব্যাপার থেকে তাকে আমি দূরে রাখতে চাই।" হাতের বইখানা রাখিয়া দিয়া কৈকেয়ী একটু ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "দেখ বৌমা, শুধু মায়া-মমতা নিয়ে সংসার চলে না, বড্ড শক্ত জায়গা এই সংসার, যাকে যা ভাব সে তা নয়। সত্যি কথাই বলছি, তুমি মনে দুঃখ করো না, তোমায় গড়ে তুলবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারিনি, তাই আমি লক্ষণকে

তৈরি করতে চাই এই সংসারকে চালাবার যোগ্য করে, তোমার দয়া-মায়ার মধ্যে তুমি তাকে টেনো না।”

রুক্মিণী একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া ঈষৎ আবেগের সঙ্গে বলিলেন, “সে আমি জানি, আমি জানি মা, আমি তোমায় সুখী করতে পারিনি, লক্ষ্মী যদি পারে তবে ভাগ্যি বলে মানবো।”

কৈকেয়ী সস্নেহে বলিলেন, “এমন কথা বলো না মা, কেশবকে তুমি সুখী করেছ সেই আমার সুখ। তবে সব দিক্ দিয়ে সংসারের ভার তুমি বইতে পারবে না, সেই কথা বলি—”

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সুখদা বলিল, “মা গয়লা-পাড়ার ৬টি মেয়ে আপনার কাছে এয়েছে।”

“কেন, কি চায়?”

“আপনার কাছে বলবে।”

“ডাক এখানে।”

সুখদা দুই জন মাঝারি বয়সের স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া ঘরের ভিতরে আসিল। কৈকেয়ী বলিলেন, “মাদুর পেতে দে।”

“না—না, থাক, এইখানে বস্‌চি, এই আমাদের সগ্‌গো।” তাহারা কৈকেয়ীর পায়ের দিকে মেঝের উপর বসিল, সুখদা মাদুর পাতিয়া দিল।

কৈকেয়ী বলিলেন, “উঠে বোসো, কি জন্তে এসেছে?”

এক জন বলিল, “তোমার কাছেই এসেছি, তুমি যদি না রাখ তবে আর বাঁচবো না মা।”

“বল না কি হয়েছে?”

“আমার দেওর-পো আর এর ছেলে—আমরা দুটি মা ননদ-ভাজ—আমাদের ছেলে দুটিকে সকালবেলা পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।”

“কি করেছিল তারা?”

“কিছু না মা, কিছু করে নি, লোকে শত্তুরতা করে এই কাজ করলে, ওবেলা ছেলেরা সবে খেতে বসেছিল তা হাত আর মুখে উঠ্‌ল না,” বলিতে বলিতে তাহার গলা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রুক্মিণী বলিলেন, “আহা, কেন গা?”

কৈকেয়ী বলিলেন, “যা বলতে এসেছ খুলে বল। না বললে বুঝব কি করে?”

“বলি মা বলি। নাপিতপাড়ার নবীন শীলের বৌ মেয়ে দুটো নিয়ে আমাদের পাড়ায় থাকে, তা রাত্তিরে কারা তাদের ঘরে ঢুকে মারধোর করে গয়নাগাঁটি টাকা পয়সা নিয়ে গেছে, বড় মেয়েটাকেও নিয়ে গেছে। আমাদের ছেলেরা সে দিন দুপুর বেলা গেছলো জেলায় ফরমাস্ যোগান দিতে, রাত্তিরে আসতে পারে নি, পরের দিন বৈকালে এলো। মুখপোড়া পাড়া-পড়সী নিজেরা এই কাণ্ড করে কি না তাদের দিলে ধরিয়ে।”

অন্ত স্ত্রীলোকটি চোখের জল মুছিয়া বলিল, “এক তুমিই আছ মা, তুমি যদি না দেখ তবে কে দেখবে মা?”

কৈকেয়ী উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, “কি নাম বললে? কার বৌ?”

“নবীন শীলের।”

“নবীন শীল?”

“হাঁ মা সেই।”

“সেই স্বরূপ সেই সাধন তোমাদেরই ছেলে? তাদেরই জন্তে এসেছ? এমন ছেলে পেটে ধরেছিলে? আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মারনি কেন?”

স্ত্রীলোক দুইটি হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল।

কৈকেয়ী সুখদার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “নবীনের বৌকে ডাক।”

মাথায় আধঘোমটা দেওয়া, কোলে বছর তিনেকের একটি মেয়ে—নবীন শীলের বৌ কুণ্ঠিতভাবে ঘরে ঢুকিয়া একদিকে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল।

কৈকেয়ী বলিলেন, “এই নবীনের বৌ—চিনতে পার? দেখ ভাল করে। সত্যি কথা বললে না কেন আমায়? ছেলেরা দোষ করেছে তোমরা তো করনি? তা ছাড়া সত্যি কথা শুনলে সবারই মায়া হয়। তোমাদের ছেলেরা তো মহাপাপ করেইছে, মিথ্যে কথা বলে তোমরাও করলে। রাত্তিরেই ফেরেনি স্বরূপ সাধন? ঠিক করে বল দেখি?”

দুই জন মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

“তোমাদের বলা হয়েছে, এবার আমি বলি শোন: জেলার বাবুনা মিত্তিরে রাত বারোটায় স্বরূপ সাধন ফিরেছিল, রাত দুটোয় এই কাজ করেছে, চাবি দেয়নি বলে কচি

মেয়েটাকে কি মার মেরেছে, শেষে মায়ের প্রাণ সইতে না পেরে চাবি ফেলে দিয়েছে।"

নবীন শীলের মেয়েটার কচি গায়ে অসংখ্য দাগ।

কৈকেয়ী বলিলেন, "স্বরূপ সাধনের সঙ্গে বন্ধু পাতিয়ে নবীন শীল নিজের পাড়া ছেড়ে তোমাদের পাড়ায় উঠে গেছলো, তার অনাথ বৌটিকে দেখাশুনা করলে তোমরা খুব ভাল করেই। ডাকাতেরা দল বেঁধে ডাকাতি করে, এমন করে বন্ধু সেজে সর্বনাশ করে—না! মেয়েটাকে নিয়ে কোন্ জঙ্গলে এক ভাঙ্গা ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল জানো? বেড়া ভেঙ্গে মেয়েটা কাল পালিয়ে এসেছে, অমনি নবীনের বৌ মেয়ে নিয়ে চলে এসেছে আমার কাছে। কালই আমি থানায় খবর পাঠিয়েছিলাম, তা কাল তোমাদের গুণধরেরা বাড়ী ছিল না, মেয়েটাকে বোধ হয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল—কি বল? জানো এ সব? না জানো না?"

একজন মাথা নীচু করিয়া আছে, ভয়ে প্রায় বিবর্ণ। অন্য-জন অস্ফুট গলায় কোন মতে বলিল, "ছেলেরই দিব্যি মা—আমরা এ সব কিছু জানিনে, ধরা যখন পড়েছি মিথ্যে বলবো না, সেই রাত্তিরেই ছেলেরা ফিরেছিল কিন্তু তখুনি আবার কোথায় গেল কাজ আছে বলে, এর বেশী কিছু জানি নে মা—নবীনের বৌ তো আমাদের ছেলেদের নাম করে নি মা।"

"আগে করেনি, মুখোস পরা ছিল, চিনতে পারে নি। জঙ্গলে মেয়েটা চিনেছিল, তাই তো মেয়ে নিয়ে আর তোমাদের পাড়ায় থাকতে সাহস করলে না। মেয়েটাই তো সাক্ষী। তাকে পেলে খুন করে ফেলতো না?"

"ও মা, মেয়েটি যেন সাক্ষী না দেয়। এবারকার মত বাঁচিয়ে দাও, আমরা গাঁ ছেড়ে চলে যাব। জেলের দাগী হলে আর কি বাছারা বাঁচবে? মুখ তুলে চাইবার যো থাকবে না।"

কৈকেয়ী বলিলেন, "সেই তো চাই। চার পাঁচ বছরের কম সাজা না হয় যাতে সেইটেই দেখবো।"

"উঃ! না মা, না মা, এইবার, এইবারটি মাপ কর। দুটোরই ঘরে কচি ছেলেপিলে, না খেয়ে মরবে মা সব," বলিতে বলিতে সাধনের মা কাঁদিয়া উঠিয়া কৈকেয়ীর পা জড়াইয়া ধরিল।

রুক্মিণীর চোখে জল ভরিয়া উঠিয়াছে, কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া কুণ্ঠার সঙ্গে বলিলেন, "এবারকার মত মাপ করলে হয় না মা এদের? কচি ছেলেরা, বউ দুটো তো কোন দোষ করে নি।"

কৈকেয়ী পা সরাইয়া লইয়া ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "বৌমা তোমায় কতবার বলেছি না যে, যা বোঝ না তার মধ্যে কথা বলতে এস না? যাও, তোমার নিজের কাজে যাও। সুখী, এদের খিড়কী অবধি পৌঁছে দে এখুনি।"

রুক্মিণী ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ঘরের দিকে চলিলেন। আনন্দ উপরে উঠিতেছিল তাহাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। মাকে অশ্রুমুখী দেখিয়া সবিস্ময়ে আনন্দ বলিল, "কি হয়েছে মা?"

সাগ্রহে রুক্মিণী বলিলেন, "একটা কাজ করতে পারবি বাবা?"

"কি মা? কাঙ্গালী আমায় ডেকে আনলে, বললে তুমি আমায় খুঁজছো।" আনন্দ মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেন যে আনন্দকে খুঁজিতেছিলেন সে কথা রুক্মিণীর মনে পড়িল না, কিন্তু উপস্থিত বিপদে যেন কূল দেখিতে পাইলেন। নীচে স্ত্রীলোক দুইটি চোখ মুছিতে মুছিতে সুখদার সঙ্গে খিড়কীর দিকে চলিয়াছে সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওই যে মেয়ে দুটো যাচ্ছে ওদের একটু কাজ—"

"বল শুনি।"

"স্বরূপ আর সাধন বলে দুটো লোককে আজ থানায় ধরে নিয়ে গেছে জানিস? তারা এদেরই ছেলে। মা বড্ড রেগে গেছেন, জেল থেকে বাঁচান যাবে না বোধ হয়। কচি ছেলে-পিলে, বউ, মা এদের কি গতি হবে বল দেখি?

এবার আনন্দ হাসিল, বলিল, "ও সে খুব জানি, নগদ শ' তিনেক টাকা আর গয়না যা চুরি করেছিল, কিছু পাওয়া যায় নি, স্বীকারই করে নি। মেয়ে চুরির জন্যই ধরা পড়েছে। বেশ ভালই চলবে সেই টাকায়।"

"না, না, মায়েরা কিছু জানে না, চুরি করে বুঝি কেউ মায়ের হাতে দেয়, কোথা লুকিয়ে রেখেছে কে জানে! তুই দেখবি ওদের যদি জেল হয়—যতদিন না ফেরে, মা, বউ, ছেলেরা যেন কষ্ট পায় না সেইটে তুই কাকাকে ভাল করে বলে যাস বাবা, লোকেই যদি কষ্ট পেলে, কি হবে তোদের

টাকা-পয়সার ? মা যেন জানতে পারেন না—আমার হাত-খরচার টাকা থেকে মাসে মাসে যেন দিয়ে দেন।"

এ আর আনন্দের নূতন নয়। ছেলেবেলা হইতে এ-বিষয়ে মায়ের সে বিশ্বস্ত মন্ত্রী। রুক্মিণীর মাসিক হাত-খরচের টাকা এই ভাবেই খরচ হয় বরাবর। কেহ কাঁদিয়া পড়িলে আর ভাবনা নাই। কৈকেয়ীকে লুকাইবার চেষ্টা করিলেও তিনি জানেন সবই।

"তা না হয় দিলেন কিন্তু চোর-ডাকাতকে মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত না মা, তুমি যাই বল—"

"আঃ মায়েরা তো চোর নয়, তারা দুঃখ পাবে কেন বল্? কি কান্না! যদি দেখতিস।"

আনন্দ হাসিয়া বলিল, "সিনেমার ছবিতে অভিনেত্রীর চোখের জল ঝর ঝর করে পড়ে তা হলে বল সেটা তাদের সত্যকার দুঃখ।"

"যা, যা, কিসে আর কিসে; সেটা হলো অভিনয় এটা হলো সত্যি—"

"সংসারে যে কোন্‌টা অভিনয় আর কোন্‌টা সত্যি মা, সে বোঝাই দায়, দান জিনিষটা খুব ভাল কিন্তু অপাত্রে দান মোটেই ভাল না।"

"যেমন তোর বুদ্ধি, পাত্র বেছে বেছে বিচার করে দান করতে গেলে চিরকাল বিচার আর সন্দেহেই কেটে যাবে, দানটা আর শেষ পর্য্যন্ত হয়েই উঠবে না।"

নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া এই দিকেই কৈকেয়ীর চোখ পড়িল; মলিন মুখে রুক্মিণী অত মন দিয়া আনন্দকে যে কি বলিতেছেন দূর হইতেও সেটা কৈকেয়ী স্পষ্ট বুঝিলেন, হাসিমুখে আনন্দ যে কি সান্ত্বনা দিতেছে সেটাও বুঝিতে বিশেষ দেরী হইল না এবং মোটেই যে সন্তুষ্ট হইলেন না, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বড় সুন্দর দৃশ্যটা, যেন অবোধ সরলা মেয়েটিকে বাপ হাসিমুখে সান্ত্বনা দিতেছে, কৈকেয়ীর চোখ জুড়াইয়া গেল।

নববর্ষ

নববর্ষের উৎসব বৎসরের মধ্যে একটা বৃহৎ ব্যাপার। প্রথাটি বহু প্রাচীন। উৎসব চলে তিন দিন ধরিয়া, জের চলে আরও কিছুদিন। সারা বছরের ছোট বড় মানসিক পূজা এই সময়ে শোধ দেওয়া হয়। বহু দূর হইতে আগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা মন্দির-সম্মুখের চত্বরে বসিয়া শাস্ত্র-তর্ক বা শাস্ত্রালোচনা জুড়িয়া দেন। নানা বেশধারী অতিথির দল এ কয়দিন অতিথিশালা ছাড়িয়া মন্দিরেই বাসা বাঁধেন—যেহেতু শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ পূজা এই তিন দিনই সব চেয়ে জমকালো ভাবে হয়। প্রতিদিন বৈকালে রঞ্জন ও শিলা নূতন সাজ পরিয়া পুরোহিত বাড়ীর ছেলে মেয়েদের পিঠে করিয়া রূপার ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে বেড়াইতে বাহির হয়।

মাঠ জুড়িয়া সারি সারি তাঁবু পড়িয়াছে। কোথাও কীর্ত্তন, রামলীলা, কৃষ্ণযাত্রা, কোথাও বা কুস্তিকসরৎ মল্লযুদ্ধ, খেলা-ধুলা, একদিকে যাত্রার আসর চব্বিশ ঘণ্টাই যাত্রাভিনয় চলিতেছে। তাঁবুর বাহিরে চা, পান, শরবৎ, সিগারেট, মিষ্টান্নের অস্থায়ী দোকান। ভাল একটা যাত্রার দলও আসিয়াছে, বাঁধা ষ্টেজে তাহারা অভিনয় করিবে। আনন্দ সেই দিকে।

প্রধানতঃ কৈকেয়ীর হাতে বাহিরের ভার—রুক্মিণীর হাতে বাড়ীর ভিতরের ভার। এক গরীবের জন্য অতিরিক্ত খরচ করা ছাড়া রুক্মিণীর আর কোন দোষ নাই, তবু কৈকেয়ীর অভ্যাস নিজে সব দেখা। তাঁহার ব্যবস্থা বাঙ্গালী ঘরের উল্টা। বাঙ্গালীর ঘরে ছোট বড় সব ব্যাপারেই অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইতেছে ছুটাছুটি, তর্কাতর্কি, চেঁচা-মেচি—সবশুদ্ধ একটা কোলাহল। কিন্তু কৈকেয়ীর কোন কাজে এ সব কিছুই নাই। প্রয়োজনের অনেক বেশী লোক খাটে সুতরাং কেহই শ্রান্ত বিরক্ত হয় না, কোন বিশৃঙ্খলাও হয় না।

জানকী তো নির্লিপ্ত, সুদেষ্ণারও কিছুই করিবার নাই। তবু কাজ পাইলে খেয়ালী বধূটি সব ভুলিয়া যায়। সব জায়গায় সব কাজেই সে আছে—দেবতার জন্য যত্ন করিয়া মালা গাঁথে। কৈকেয়ীর পিছনে ছায়ার মত থাকে, ঠিক সময়ে কেশবের হাতে শরবৎটি তুলিয়া দেয় এবং রুক্মিণীর মুখে সুর্ত্তি-দেওয়া পান। এমন ভাবে কাজে যোগ দেয় যে, দেখিলে মনে হয়, তাহাকে ছাড়া বুঝি এ কাজটি চলিতেই পারে না।

কৈকেয়ীর চোখ আছে তাঁহার কুড়ান মাণিকটির উপর। অস্ফুট কুঁড়িটি আজ ফোট-ফোট, কাল যে শোভা ও সুগন্ধ ছড়াইবে সে তিনি বেশ বুঝিয়াছেন। অবশ্য আর

কেহই তাঁর মত অনুক্ষণ সুদেষ্ণার উপর মন ফেলিয়া রাখে না।

ভোর বেলা নহবতের মধুর রাগিণী শুনিয়া ঘুম ভাঙে। সমস্ত দিনটা কাটে অবিচ্ছিন্ন কাজের মধ্য দিয়া। রাত্রি এগারটার মধ্যে সব শেষ হয়; তখন কৈকেয়ী বিশ্রাম পান। সুদেষ্ণা পাখাটি হাতে গম্ভীরমুখে জ্রধনুতে শরাসন জুড়িয়া বলে, "তোমার বড্ড দোষ, স্বভাব কি যায়? সব কাজের ভেতর যাওয়া কেন, আমরা পারিনে কি? এত খাটুনী সহ্য হয় কখনও?"

কৈকেয়ী শ্রান্ত দেহ বিছানায় ঢালিয়া শ্রান্ত কণ্ঠে বলেন, "আচ্ছা, হয়েছে এখন শুয়ে পড়গে যা, তোর চক্ষে ঘুম নেই? ধন্যি মেয়ে তুই লক্ষ্মণ, আমার তো ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।"

"ঘুমোও না, আমি হাওয়া দিচ্ছি।"

"আনন্দকে হাওয়া করগে যা, দুদিনের জন্য বাড়ী আসে, তুই শুধু তার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াস।"

এ কথার উত্তর মিলে না। কোন দিন কৈকেয়ী ঘুমাইয়া পড়েন। সকালে জাগিয়া দেখেন সুদেষ্ণা তাঁহার কোলের কাছেই ঘুমাইয়া আছে।

বাড়ীর বাঁধা ষ্টেজে থিয়েটার—ভীষ্ম ও রাবণ। জানকীর নির্ব্বাচিত।

কেশবের বিশ্রামমন্দিরে ঢুকিল জানকী, "দাদা।"

"কি দিদি, এ ঘরে যে বড়?"

"কাজ আছে।" জানকী কপাট হেলান দিয়া দাঁড়াইল।

কেশব কলম রাখিয়া জিজ্ঞাসু চক্ষে চাহিলেন।

"দাদা তুমি ভীষ্ম হও না কেন? সেই যেমন পৃথুরাজা হয়েছিলে।"

"ভীষ্ম?" কেশব একটু হাসিলেন, বলিলেন, "ভীষ্ম চরিত্রের যোগ্য তুমি আর কাউকে খুঁজে পেলে না?"

"না তুমি সাজো না দাদা।"

"কবে থিয়েটার?"

"আজ।"

"আজই পেরে উঠবো কি?"

"খুব পারবে। আনন্দকে বললে এখুনি তোমার পার্টটা দিয়ে যাবে। সেই তো আমায় পাঠালে। তোমার বউও নাচতে আরম্ভ করেছে।"

"আচ্ছা ভেবে দেখি। ভীষ্মের রাজ্য ত্যাগ না পতন, কোন্‌টা নিয়ে বইখানা?"

"সবটা নিয়েই, আগাগোড়া ভীষ্ম-চরিত্র।"

"ও তবে তো হবে না, মা কি সইতে পারবেন আমার পতন বা রাজ্য ত্যাগ? সেবার কিরূপ রেগে গেছলেন ভুলে গেছ?" বলিয়া কেশব হাসিয়া উঠিলেন।

জানকীও হাসিয়া বলিল, "সে ঠিক, মা বড় অবুঝ মেয়ে। তবে আর আমার থিয়েটার দেখা হল না, তোমাদের সেকেণ্ড মাষ্টার লিকলিকে চেহারা আর প্যানপেনে গলা নিয়ে না কি ভীষ্ম সাজবে—ও কে দেখবে?"

"হেড-মাষ্টার তো সাজতেন, তাঁর তো চেহারা জমকালো।"

"তাঁর জ্বর হয়েছে। আনন্দকে বলিগে সে যদি করে তবে দেখবো, নইলে নয়।"

"তা দিদি তুমি যদি বল রাবণ সাজতে আমি রাজী আছি।"

"নাঃ, সেও তো পতন।"

"রামের হাতে পতন সে তো সৌভাগ্য।"

"মাকে বোঝাবে কে? যাক্ গে এ বার আর আমার যাত্রা দেখা হলো না।"

কেশব চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। "দাঁড়াও দেখ্‌ছি, আনন্দকে বলি।"

"না, মা আনন্দকে দেবে না।"

"মাকে বোঝানো দায়। অভিনয় অভিনয় সত্যি নয় তো—"

"সংসারে সত্যি কিই বা দাদা, এই যে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, লিখছো এ সবও কি অভিনয় নয়? সংসার-মঞ্চে আমরা অভিনয় করি।"

"কিন্তু এ অভিনয়ের শেষ নেই।"

"শেষ আছে দাদা। সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেলেই সত্যের রাজ্যে প্রবেশ, তার আগে অভিনয় আমাদের করতেই হবে, না করে উপায় নেই। আরও আশ্চর্য্য, আমরা যে অভিনয় করছি সেটাও নিজেরা বুঝিনে। যাকগে চললাম।"

"দাঁড়াও আমি রাবণই সাজবো, শেষটা না হয় অন্ত কেউ করবে।"

এ বার জানকী উচ্চ হাসি হাসিল, "না দাদা, রাবণ তোমায় মানাবে না।"

"মানাবে না? কেন? আমার চেহারা কি এতই খারাপ? লোকে তো বলে ভাল।" বিস্মিত হইয়া কেশব চাহিলেন।

জানকী হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা মানুষ তুমি। নিজের চেহারা ভাল কি মন্দ তাও জান না? চেহারার জন্যে না, রাবণ চরিত্র হচ্ছে রজঃ তমঃ গুণে মেশানো, সে রাজসিক তামসিক ভাব তুমি ফুটিয়ে তুলতে পারবে না"

রুক্মিণী এক থালা বেল ফুল হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "এত হাসি কিসের ভাই বোনে?"

"আচ্ছা বৌদি, তুমি তো খুব পতিপ্রাণা, দাদা সাজবে ভীম, তুমি কি হবে বল দেখি? অম্বা না দ্যুতি?"

থালাটি টেবিলে রাখিয়া একটু হাসিয়া রুক্মিণী চুপ করিয়া রহিলেন।

জানকী বলিল, "অম্বা তো নয়ই, দ্যুতি—কেমন? কিন্তু একটি জন্ম ছেড়ে থাকতে হবে, পারবে?"

রুক্মিণী হাসিয়া বলিলেন, "আর থিয়েটারে কাজ নেই, সেই একবার করেছিলে, তারই রাগ মার মন থেকে যায়নি। আবার?"

মিলনে বিরহ

উৎসব মিটিল। দক্ষিণান্তে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা একে একে বিদায় হইলেন। তাঁবু উঠিল, দোকান ভাঙ্গিল, গোলমাল কমিল এবং কাঙ্গালী-বিদায় শেষ হইল।

কাজ কমিয়াছে। নিশ্চিন্ত হইয়া কৈকেয়ী শুইয়া আছেন। রুক্মিণী আসিয়া বলিলেন, "মা শুয়ে যে? শরীর কি ভাল নেই?"

"ভালই, কেশব আনন্দ খেয়েছে?"

"হাঁ সবারই খাওয়া হয়েছে।"

"ঠাকুর-পোর বাড়ীতে প্রসাদ—"

"পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"উমাদের বাড়ী? ভুলে গেছ বুঝি?"

"না সাজিয়ে রেখেছি—এখুনি পাঠাচ্ছি।"

"লক্ষ্মণ কই?"

"ওঁর ঘরে গেল, তুমি ওঠ মা, জল খেয়ে একেবারে শোও।"

"আমি কিছু খাব না, উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না।"

"এই ঘরে এনে দিচ্ছি।"

"না একটুও খেতে ইচ্ছে নেই।"

"একেবারে নির্জ্জলা থাকবে? শরীর দুর্ব্বল হয়ে যাবে মা। কাল বারোটার আগে তো মুখে জল দেবে না? একটু কিছু এনে দিই না?"

"না এত অনিচ্ছেয় খেতে নেই। তুমি যাও, জুটো মুখে দিয়ে শুয়ে পড়গে, এ ক'দিন যা গেল তোমার উপর দিয়ে।"

রুক্মিণী যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবার বলিলেন, "একটু খাবার জল এনে দিই?"

"না, আচ্ছা একটু জল দিয়ে যাও।"

এ দিকে কেশব টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া শয়ন-ঘরে সবে আসিয়াছেন, আলো নিভাইতে তাঁহার মনে থাকে না। সুদেষ্ণাও ঘরে ঢুকিয়া আগে পড়িবার ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া আসিল, বলিল, "এখনো শোওনি কেন?"

"তুমি যে আসনি, তাড়া দেবে কে?"

"এ বার শোও। বড্ড দুষ্টু হচ্ছ বাবা। কচি ছেলের মত সব সময় তোমায় আগলাবো না কাজকর্ম্ম করবো বল দেখি?"

কেশব নির্ব্বিবাদে বিছানায় শুইলেন, সুদেষ্ণা বসিল পায়ের কাছে, পায়ে হাত বুলাইতে।

কেশব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কাজ করছিলে?"

"শশীর জ্বর হয়েছে, মাথা টিপে দিচ্ছিলাম সে ঘুমিয়ে পড়লে তবে উঠেছি।"

"শশী কি একা থাকে?"

"না বিন্দুদি, সুখী পিসি, নেত্য, কুসী, ক্ষেন্তি সব এক ঘরে থাকে, তা তারা কাজে ব্যস্ত এখনো কেউ ঘরে যায়নি।"

"তাই বল, তুমি কাছে না এলে আমার কিছু ভাল লাগে না, শুতে ইচ্ছা হয় না সেই জন্ত জেগে থাকি।"

একটু লজ্জা ও অনেকখানি গৌরবে সুদেষ্ণা ঈষৎ হাসিল বলিল, "এবার ঘুমোও তবে।"

কিছুক্ষণ পরে রুক্মিণী ঘরে ঢুকিলে সুদেষ্ণা নিঃশব্দে উঠিল, মৃদু গলায় বলিল, "আস্তে দোর দিও, বাবার ঘুম যেন ভাঙে না।"

"দোর দেব পরে, তুই শুয়ে পড়গে যা।"

সুদেষ্ণা কৈকেয়ীর ঘরের সামনে আসিয়া দেখিল, দুয়ার বন্ধ, ধাক্কা দিয়া ডাকিল, "দিদি দিদি।"

কেহ জবাব দিল না। রাত্রি প্রায় বারোটা। নির্জ্জন বাড়ী—চারিদিকে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। উপরের ঝিয়েরা শয়ন-ঘরে চলিয়াছে। বিন্দু সুদেষ্ণাকে দেখিয়া দাঁড়াইল, "হাঁগা বৌদি তোমার হয়েছে কি? কি রাত কি তুমি এমনি চোরের মত ঘুর ঘুর করে বেড়াবে? সবাই পড়েছে, তোমার চোখে কি ঘুম নেই?"

"দিদি কি ঘুমিয়েছে?"

"হাঁ, ওনার শরীর ভাল নেই। তোমার ভয়ে আজ আগে ভাগেই দোর দিয়েছে।"

"বুঝেছি, কাল দেখাব।"

"তা দেখিয়ো, এখন শোওগে যাও।"

"তুমি শোওগে না, শশীকে দেখো তার শিয়রে গরম জল ঢাকা দিয়ে এসেছি, চাইলে দিয়ো।"

"তা দেবো। আগে তুমি ঘরে ঢুকে দোর দাও, তবে আমি যাব।"

সুদেষ্ণা ফিরিয়া আসিয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় নিজের ঘরে ঢুকিল।

আনন্দ শুইয়া বই পড়িতেছে, কটাক্ষ করিয়া কহিল, "কি গো স্বেচ্ছাসেবিকা? আজ কি আমার পালা? তা ঈশ্বরেচ্ছায় আমি ভালই আছি, সেবার দরকার নেই।"

"আমার বয়ে গেছে সেবা করতে—দিদি কি না আগেই দোর বন্ধ করেছেন তাই

আনন্দ হাসিয়া বলিল "তোমার যত্নের তাড়নায় এই ব্যবস্থা।"

"জানি জানি, কাল দেখাবো মজা।"

"কি আর দেখাবে, আমার ওপর দয়া করে এই ব্যবস্থা করেছেন।"

সুদেষ্ণা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আনন্দ বলিল, "আমি তোমার প্রবাসী স্বামী, আমার জন্যে একটুও কি মায়া নেই তোমার? কাব্যে উপন্যাসে পড়েছি বিরহী বিরহিণীর কথা, আমার কপালে সব উল্টো হলো—চিঠি দিলে তার জবাবটা দাও না।"

"অমন চিঠির জবাব দেয় লোকে?" কাঁধের ব্রোচটা খুলিতে খুলিতে সুদেষ্ণা বলিল, "দিদি কাল বলছিলেন তুমি না কি কড়িকাঠ গুণছো?"

আনন্দ বলিল, "কড়িকাঠ গুণছিলাম বটে, কিন্তু হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ায় সবগুলো গোণা হয় নি।"

"তবে আজ এখনো ঘুমোও নি কেন? রাত তো ঢের হয়েছে।"

আনন্দ একটু হাসিয়া বলিল—

"আসে বা আসুক দিবা, আসুক বা রাতি,
তাহাদের যাতায়াত আসে যায় কি বা
প্রিয়া মোর নাহি আসে যদি।"

সরোষে সুদেষ্ণা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা ও কি? থিয়েটার করে আর দেখে দেখে এই সব শেখা হচ্ছে বুঝি? দিদিকে বলে দেবো।"

"দিদিকে বলবে? কি বলবে শুনি?

"বলবো, তুমি আমায় যা তা বলো।"

"এই কি যা তা? তুমি আমার প্রিয়া নও?"

"যাও যাও", সুদেষ্ণা পিছন ফিরিয়া চলিল।

"এস এস, নাঃ তোমার এত লেখাপড়া শেখা সব বৃথা হয়েছে। আচ্ছা, আর বলব না এস।"

"আসছি কাপড় ছেড়ে", সুদেষ্ণা ঢুকিল গিয়া পাশের ঘরে। আলো জ্বালিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইল। পাশা-পাশি দুইখানা ড্রেসিং টেবিল, আনন্দের টেবিলটা সাদাসিধে কিন্তু সুদেষ্ণার টেবিলের ধরণই অন্য রকম, যেমন বড় তেমনি বাহার! খাঁজকাটা ঢেউ-তোলা কিনারা, আয়নার গঠন মন্দিরের মত। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া এক মিনিট সুদেষ্ণা নিজের ছবি দেখিল, সবুজ শাড়ীতে রূপালি ফুল ও আঁচলায় ঝালর দেওয়া, সেই কাপড়ের ব্লাউজ—হাতা ও গলায় সোনালী জরির লতা দেওয়া সরু লাল সিল্কের পাড়। আয়নায় বিদ্যুতের আলো পড়িয়া শাড়ী ও গহনা ঝিক্ মিক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। একটি একটি করিয়া পোষাকী গহনাগুলি খুলিয়া ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া সুদেষ্ণা চাবি বন্ধ

করিল। আলনা হইতে একটা পাতলা ঢাকাই নীলাম্বরী পরিয়া ছাড়া জামা-কাপড় পরিপাটী করিয়া ভাঁজ করিয়া আলমারীতে তুলিল। তারপরে বাথরুমে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া দুই ঘরের আলো নিভাইয়া শয়ন-ঘরে আসিয়া বিছানার কিনারে বসিল।

আনন্দ তাহার সরু হারটা শাড়ীর উপরে ভাল করিয়া ঝুলাইয়া দিয়া বলিল, "দেখ দেখি সাদাসিধে কেমন সুন্দর দেখায়। তা নয় রাজ্যের গহনা আর বেনারসী পরে যাত্রা-দলের রাণী সেজে বেড়াও।"

সুদেষ্ণা হারটি আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "তুমি যেন সাহেব—তোমার পছন্দ মত আমি চলব না কি? দিদি যা বলবেন তাই।"

"ওঃ ঠিক আমার মনে থাকে না, দিদির সঙ্গেই তো তোমার ফুলশয্যা হয়েছিল, তা বটে, তা বটে! যাকগে আমি কেউ নাই হই, তবু পাড়াপড়শীরাও তো বলে থাকে, সেই হিসেবে বলছি যে, দেখতে তুমি বেশ ভালই, আমার মত নও যদিও, কিন্তু এই সব জবড়জং সাজপোষাক করেই সব মাটী কর। আচ্ছা, মানুষে এত বোঝা বইতে পারে? কষ্ট হয় না—আমার তো দেখেই চক্ষু স্থির! নিত্য নতুন শাড়ী-গহনা আসছেই আসছেই। হীরা মুক্তা কথাটা শুনতেই ভাল, মানুষের গায়ে উঠলে যে এত বিশ্রী হয় সেটা অবশ্য আমার জানা ছিল না আগে।"

"বেশ বেশ তোমার ভাল লাগে না আমার দিকে চেয়ো না।"

"সে কি আমি পারি? দুদিনের জন্যে আসি, ইচ্ছে হোক অনিচ্ছে হোক চাইতেই হবে। আমার পড়া তো শেষ হয়ে এলো, এইবার বাড়ী এসে বসবো তখন না হয় চাইবো না তোমার দিকে। তবে একটা কাজ কর যদি—সব দিক্ ভাল হয়। তোমার অর্দ্ধেক গহনাও যদি আমায় দাও আমার খুব উপকার হয়। যে কাজগুলো আমি করবো মনে করেছি—বড্ড সহজে হয়ে যায়।"

উৎসুক হইয়া সুদেষ্ণা বলিল, "কি কাজ?"

"বলবো পরে, তুমি দেবে তো?"

"তা দেবো, সবই দিতে পারি, কিন্তু দিদিকে বলে তো?"

"সর্ব্বনাশ! দিদি তোমায় একটা আংটি হাতছাড়া করবেন ভেবেছ?"

"আমি বললে দেবেন, কিন্তু তোমার কি দরকার দিদিকে বল না কেন?"

"আর কি সে দিন আছে? তুমি ছাড়া দিদির অন্য ভাবনা নেই, অন্য কাজ নেই।"

"নেই তো নেই, তোমার শুধু ঠাট্টা। ঐ জন্য তো তোমার কাছে আসিনে। চিঠিতেও ঠাট্টা, ঐ জন্যে চিঠির জবাব দিই নে। নাও সরো আমি শোব ঘুম পাচ্ছে।"

"শোও শোও। আহা বড্ড পরিশ্রম গেছে তোমার এ ক' দিন, এই সব শাড়ী-গহনা পরে লাটিমের মত সারা দিন ঘুর-পাক খাওয়া, সে কি সোজা কথা?"

সুদেষ্ণা হাসিয়া বলিল "তুমি কি যে বল তার ঠিক নেই। আমি কি লাটিমের মত দেখতে? মাথাটা মোটা পা সরু—না?"

"চেহারার কথা বলিনি, চালচলনটা।"

"যাও তুমি অমন বিশ্রী কথা বলো না, আমার চলতে ফিরতে অমনি বোঁ বোঁ শব্দ হয় না কি? দিদি বলেন আমার মরাল গমন।"

আনন্দ সভয় ভঙ্গিতে হাত যোড় করিল—"সেলাম রাণীসাহেবা সেলাম! মরাল-গামিনী! সেলাম! এতকাল জানতাম শান্ত ধীর চলনকেই মরাল-গমন বলে, ঝড়ের মত উড়ে বেড়ানোর নামই যে মরাল গমন আজ এই প্রথম শুনলাম।"

সুদেষ্ণা ভ্রুকুটী করিয়া বলিল, "যাও, অমন ঠাট্টা কর যদি এক্ষুনি দিদির কাছে গিয়ে শোব।"

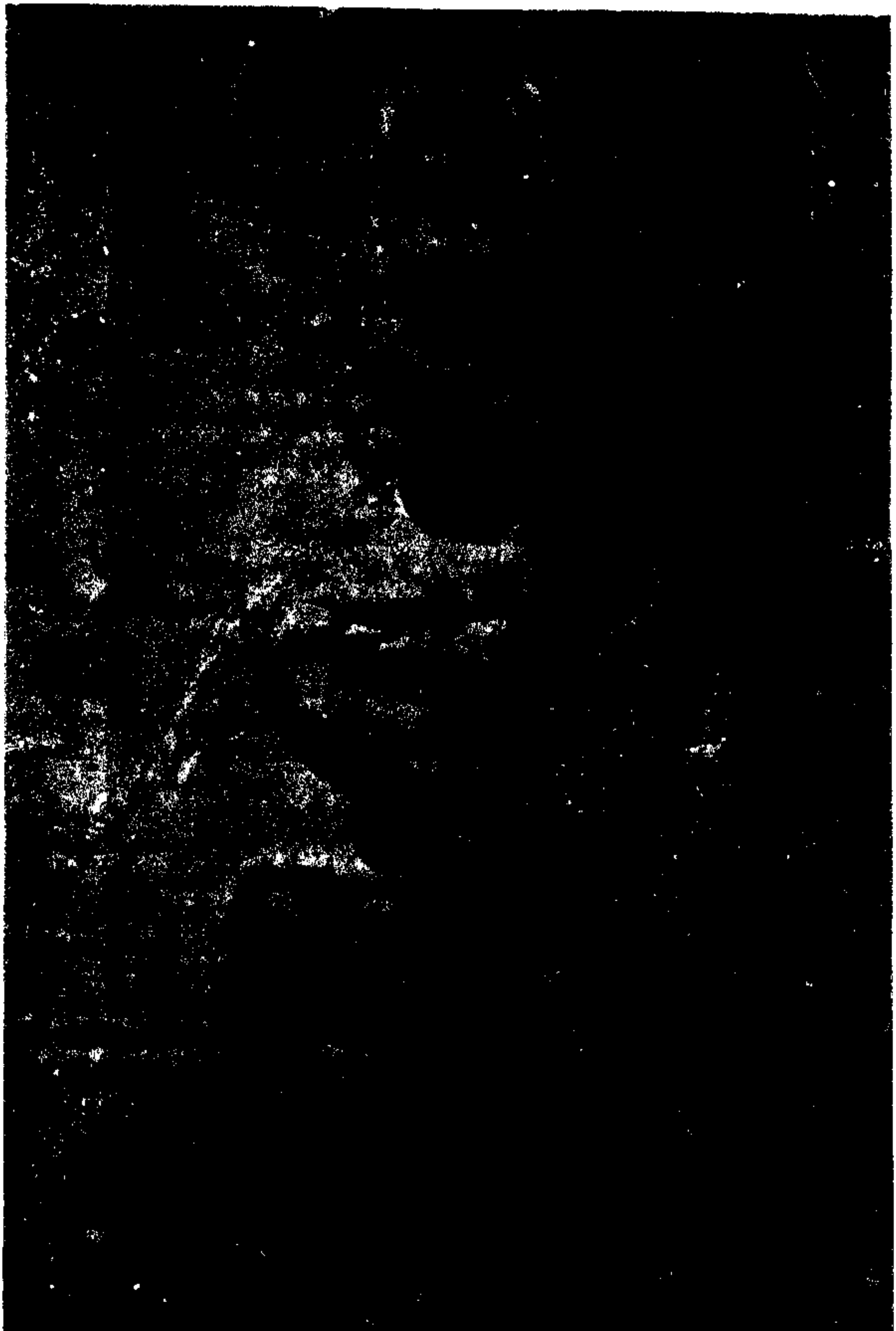
"সে গুড়ে বালি! সেই ভয়েই তো দিদি আজ শুয়ে পড়েছেন, সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকলেও দোর খুলছেন না! কাজেই এই অধম আনন্দ ভিন্ন আজ তোমার গতি নেই—"

"গতি নেই? দেখাচ্ছি ওঃ উনি ভারি লাট সাহেব, উনি ভিন্ন আমার গতি নেই"। বলিয়া সুদেষ্ণা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া সোফায় শুইয়া পড়িল।

সুদেষ্ণা সটান শুইয়া আছে, চোখ বন্ধ, নিশ্বাস শান্ত, কে বলিবে জাগিয়া আছে! আনন্দ বারকয়েক ডাকিল, কিন্তু সুদেষ্ণার আর সাড়া নাই। একটু হাসিয়া আনন্দ হাত বাড়াইয়া আলোটা নিভাইয়া দিল, তারপরে নিশ্চিন্ত ভাবে শুইয়া শুইয়া মৃদুস্বরে গান ধরিল—

"সুন্দরী মম প্রেয়সী
তুমি নিদয়া—তবু মধুরা।"

[ক্রমশঃ



এলোরার পথে

—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দেবগিরি-দৌলতাবাদ

এলোরা ও অজন্তা দেখিব বলিয়া পুণা হইতে ঔরঙ্গাবাদ আসিয়াছিলাম। ২৩শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার রাত্রিশেষে ভোর হয় হয়, এমন সময় পুণা হইতে মানমদের পথে ঔরঙ্গাবাদ আসিয়া পৌছিয়াছিলাম। ঔরঙ্গাবাদ ধরমশালা হইতে বেলা নয়টার সময় তাড়াতাড়ি ডালভাত খাইয়া এলোরা দেখিতে চলিলাম। পথে দৌলতাবাদ, দেবগিরি ও রোজা দেখিয়াছিলাম। প্রথমে সেই কথাই বলিব।

২৪শে কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৩৪৬। রবিকরোজ্জ্বল সুন্দর দিন। আমরা যে ধরমশালাটিতে উঠিয়াছিলাম তাহার নাম পূর্ণচাঁদ ধরমশালা। ধরমশালার কাছেই রেল-ষ্টেসন, ডাক-ঘর, চুঙ্গি আফিস, বাস, মোটর-গাড়ী—এক কথায় সকল প্রকার যান-বাহনই তথায় পাওয়া যায়। আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও নিজেদের ইচ্ছানুরূপ করা যাইতে পারে। যাত্রিগণ এই ধরমশালায় উঠিলে, অনেক অনাবশ্যক ব্যয়ের হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারেন। দাক্ষিণাত্যের ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর যাত্রিগণ ও ছাত্র-ছাত্রীর দল এই ধরমশালাতেই আসিয়া উঠিল।

ধরমশালার ম্যানেজারকে পূর্ব্বাহ্নে পত্র লিখিয়া জানাইলে তিনি সর্ব্বপ্রকারের ব্যবস্থা করেন। আমাকে ম্যানেজার ব্যাঙ্গালোরের University College of Engineering-এর অধ্যক্ষের একখানা পত্র দেখাইলেন, ধরমশালার ম্যানেজারকে অধ্যক্ষ লিখিয়াছেন—"A party of students of the final year B. E. Class, accompanied by a member of the staff of this College is halting at Aurangabad for 2 days to visit works of educational interest.........I request you kindly to provide lodging accommodation to them in your Musafarkhana near the station" ইত্যাদি।

এই ধরমশালাটি দ্বিতল। মালিকের অনুমতি লইয়া দ্বিতলে থাকা চলে। এই ধরমশালার সম্মুখেই রাজারাম বলিয়া একটি বৃদ্ধ রাজপুতের দোকান আছে। সে ডাল, ভাত, ভাজি, সবই সুন্দর প্রস্তুত করিতে পারে, কাজেই বাঙ্গালী যাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধা নাই, শুধু নিরামিষ খাইতে হইবে। আমিষ এখানে চলে না। নিজেরাও রান্না করিয়া খাওয়া যায়, বাসন-কোষন, চুল্লি সব ব্যবস্থাই ম্যানেজার করিয়া দেন। ধরমশালার ভৃত্যকে সামান্য দু'চার আনা বখশিস্ দিলেই চলে। এ অঞ্চলের লোকেরা তেমন লোভী নহে। আমার মনে হয় বাঙ্গালী ছাত্র ও ভ্রমণকারিগণ যাঁহারা এলোরা, অজন্তা বেড়াইতে যাইবেন, তাঁহারা যদি ঔরঙ্গাবাদ হইয়া যান, তবে মিতব্যয়িতার দিক্ দিয়া এখানে উঠাই ভাল। বড় লোকদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, তাঁহারা ধরমশালায় উঠিবেনই বা কেন? নিজামের সুন্দর ডাকবাংলা ও হোটেলই তাঁহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্ দিয়া ভাল।

এখন পথের কথা বলি। সুন্দর প্রশস্ত পথ দিয়া গাড়ী চলিল, চারিদিকে বেড়িয়া নীল গিরিশ্রেণী একটির পর একটি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুক্ত বিরাট প্রান্তরের মধ্যে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে সেকালের সমাধি-ভবন, ধ্বংসস্তূপ পড়িয়া আছে। ঔরঙ্গজেবের প্রিয়তমা মহিষী বেগম রাবিয়া দৌরাণীর মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত তাজের অনুরূপ সমাধিভবনের শ্বেত গম্বুজ হেমন্তের পীত রৌদ্রকিরণে ঝলমল করিতেছে। বিরাট প্রান্তর। তরঙ্গায়িত প্রান্তরের বুকে দূরে দৌলতাবাদ দুর্গের চূড়া দেখা যাইতেছে। ঐ চূড়া যেন ডাকিতেছে, এস এস আমার এখানে।

পথটি ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিল। এক স্থানের মোড় ফিরিতেই দেখিলাম একটি দরগা। দরগার বাহিরে বিস্তৃত জলাশয়, তাহার বুকে নীলা জল টল টল করিতেছে। জানিতে কৌতূহল হইল এ দরগা কাহার। আমাদের মাদ্রাজী বন্ধু

বলিলেন, এ দেশে এমন শত শত দরগা রহিয়াছে, কয়টিরই বা সন্ধান লইবেন? কথাটা ঠিক্, দু'পাশে কত কবর, কোনটি ভগ্ন, কোনটি অভগ্ন, কে এই সবের সন্ধান রাখে? মানুষের জীবনের স্রোতধারা বহিয়া চলিয়াছে সেই কোন্ আদিযুগ হইতে, কতজন আসিয়াছে, কতজন চলিয়া গিয়াছে, কত দম্ভ, কত বীরত্ব, আজ কালপ্রভাবে কোথায় তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছে।

বেলা দশটার মধ্যেই দৌলতাবাদ পৌঁছিলাম পথ পাহাড় কাটিয়া তৈয়ারী হইয়াছে, তাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছিল। আমাদের গাড়ী একটি বৃহদাকার গাছের ছায়ায় রাখা হইল। রাস্তাটি খুব চওড়া নহে। সম্মুখে একটি ডাক-বাংলা। গাছের নীচে—সম্ভবতঃ তেঁতুল গাছ হইবে—দুটি চায়ের দোকান। ছোট একটি ছেলে ডালায় করিয়া খুব বড় বড় আতা লইয়া আসিয়াছিল। আমরা এক পয়সায় তিনটি করিয়া আতা কিনিলাম। আতাগুলি যেমন সুপক্ব তেমনি ছিল সুমিষ্ট।

দুর্গ-পথের সম্মুখে একটি চত্বর। তাহার পাশ দিয়া প্রশস্ত শুষ্ক বহিঃপরিখা চলিয়া গিয়াছে। দুর্গে প্রবেশ করিবার পথে আসিয়া মনে হইয়াছে অত উঁচু দুর্গের উপর কেমন করিয়া উঠিব। একটু ঘুরিতেই দুর্গের প্রাকার। সম্মুখে তোরণ। তোরণের মধ্যে দুই দিকের কয়েকটি কক্ষে নিজামের প্রহরী ও কয়েকজন সৈনিক বাস করে। আমাদের ছাতা সেখানে রাখিলাম। দুর্গের ঠিক সম্মুখের প্রস্তর-নির্ম্মিত হস্তীটি দেখিতে অতি সুন্দর—কিন্তু কালবশে অনেকটা সৌন্দর্য্য লোপ পাইয়াছে। একজন প্রহরী আমাদের 'গাইড' হইতে চাহিল, কিন্তু তাহাকে লইলাম না।

একটি সুন্দর প্রশস্ত পথ দুর্গের দ্বিতীয় তোরণের দিকে চলিয়া গিয়াছে। দূর হইতে আমরা ভাবিয়াছিলাম, এত বড় চূড়াই পাহাড়ের উপর উঠিতে না জানি কত ক্লেশ হইবে, কিন্তু কিছুই ক্লেশ হইল না। সমতল পথ ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়াছে। ডানদিকে অনেক বাড়ী-ঘর আছে। প্রথমেই দূর হইতে দেখা চাঁদ মিনারটির কাছে আসিলাম। মিনারটি প্রায় ২১০ ফুট উঁচু, বেড়ও প্রায় ৭০ ফুট হইবে। চাঁদ মিনার পাঁচতলা, উহার গায়ে অনেকগুলি মৌমাছির চাক। এ দেশের মৌমাছিদের বেশ বুদ্ধি আছে, তাহারা এত উচ্চে ও এমন নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানে বাসা নির্ম্মাণ করে যে, উহাদিগের সেই চাক হইতে মধু সংগ্রহ করা বড় সহজ নহে।

আমরা একটা জিনিষ বেশ প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা এই যে, রাস্তার দুই পাশে ইট-পাথরে গড়া প্রাচীরের গায়ে বিবিধ শ্রীমূর্ত্তি গ্রথিত রহিয়াছে। কোনটি ভগ্ন, কোনটি অভগ্ন। ধ্যানী বুদ্ধ, বিষ্ণু, গণেশ এই সব নানা জাতীয় বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু দেবমূর্ত্তিই রহিয়াছে। এক সময়ে যে এই দুর্গ হিন্দু নৃপতিদের ছিল, তাহা অট্টালিকার গঠন-প্রণালী, বিবিধ কারুকার্য্য ইত্যাদি দেখিলেই অনুভূত হয়। আর এই মূর্ত্তি-গুলি তো প্রতি পদক্ষেপেই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

আমরা প্রথম তোরণ হইতে দ্বিতীয় তোরণে আসিলাম। কয়েকটি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেই দেখা গেল, দ্বিতীয় দুর্গ-প্রাকারটি চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। ছোট ছোট ঘর সৈন্যদের পাহারা দিবার জন্য, ফোকর রহিয়াছে গুলি চালাইবার জন্য। তোরণের বৃহৎ দ্বার, ভগ্ন। প্রস্তর-কীলক ও লৌহ-কীলক মাটিতে পড়িয়া আছে। পথ বেশ প্রশস্ত। দল বাঁধিয়া সৈন্যেরা চলাফেরা করিতে পারে। মোড় ফিরিতেই একটি খোলা যায়গায় আসিলাম। সম্মুখে দেখিলাম, দিগন্তপ্রসারিত সুগভীর অধিত্যকা, নানাজাতীয় তরুশ্রেণী শোভিত হইয়া কোন্ সুদূরে যাইয়া মিশিয়াছে। পাহাড় এত খাড়া ও বন্ধুর যে, এই পথে দুর্গ আক্রমণ করিবার চেষ্টা কখনও সফলতা লাভ করিতে পারে না। একদিকে একটি কামান দেখিলাম। কয়েকটি সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেই ঊর্দ্ধ দিকে মুখ করা একটি কামান রহিয়াছে। এই কামানটির গায়ে খোদিত লিপি আছে কামানটি ঔরঙ্গজেবের সময়কার। এই তোপের নাম "মেড়া তোপ"। কেন না ইহার গায়ে ভেড়ার মুখ খোদিত রহিয়াছে।

আবার পথ চলিলাম। সেকালের রাজাদের থাকিবার ঘর। কোনটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোনটি এখনও দাঁড়াইয়া আছে। এইভাবে ঘর পার হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া তৃতীয় তোরণের কাছে আসিলাম। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা গেল যে, এক একটি পাহাড়ের শৃঙ্গের উপর এক একটি তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া এক একটি সুরক্ষিত মহাল প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মহালের ঘরগুলির ছাদে ও প্রাচীরে অতি অল্প শিল্পকার্য্য বা চিত্রচিহ্নই রহিয়াছে।

এক স্থানে একটি সেতু পার হইলাম। সেতুটি নূতন। পুরাণো সেতুটি হয় তো ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। একটি পাহাড়ের সহিত আর একটি পাহাড়ের বা দুর্গের মহাল সংযোজিত করা হইয়াছে। কাজেই আমাদের অনুমান সত্য। নিম্নে প্রশস্ত পরিখা। জলরাশি বিবর্ণ। পরিখার জল হইতে বন্ধুর মসৃণ পাহাড় খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। আমি খানিকক্ষণ সেতুর উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সম্মুখে সুউচ্চ গিরিদুর্গের বাড়ীর কিয়দংশ সূর্য্যকিরণে ঝলমল করিতেছে। পরিখার গভীর বিবর্ণ জলরাশি পর্ব্বতটিকে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণে ও বামে গিরিদুর্গ—আর অতি দূরে শ্যামল-বনশ্রীশোভিত গভীর উপত্যকা কোন্ সুদূর দিগন্তে যাইয়া মিলিয়াছে। পরিখা বেশ প্রশস্ত, জল একেবারে সবুজ রঙের। নীচে পরিখার দিকে চাহিতে ভয় হয়।

পরিখা পার হইয়া ডানদিকের পথ ধরিয়া চলিলাম। একটি সুড়ঙ্গ পথ। আমাদের মত দীর্ঘকায় ব্যক্তিদের পক্ষে রীতিমত নত হইয়া না চলিলে চলা কঠিন। কিন্তু সুড়ঙ্গটির পরেই দিব্য আলো। প্রকাণ্ড একটি ঘর। এইটির নাম ছিল 'রঙ্ মহল'—চিত্রের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। গৃহটি মোগল স্থাপত্যানুযায়ী নির্ম্মিত। এই ঘরটির ছাদের উপর উঠিলাম। নীচে এক দিকে একটি 'তালাও' বা পুকুর। পুকুরটি সুগভীর বলিয়াই মনে হইল। জল সেই গাঢ় সবুজ বর্ণ। এখানেও একটি বাঁধানো চত্বরের উপর কামান রহিয়াছে। চত্বরের উপর হইতে সম্মুখে চাহিলে দেখা যায়—বহুদূর পর্য্যন্ত—যোজনের পর যোজন বিস্তৃত মাঠ, প্রান্তর, বন, নদী, পর্ব্বত ও নগর। আকাশ ঘন নীল মেঘশূন্য, আর নিম্নে শ্যামলা ধরণী। এই দুর্গ সেকালে কিরূপ সুরক্ষিত ছিল তাহা এই দুর্গের এদিকে দাঁড়াইলে বেশ বুঝিতে পারা যায়; যে দিক্ হইতেই শত্রু আসুক না কেন, দুর্গরক্ষী প্রহরী ও সৈনিকেরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া শত্রুর এ পুরীতে প্রবেশ অসম্ভব।

আমরা ক্রমে একটি লৌহদ্বার উত্তীর্ণ হইলাম। তারপর একটি পথ পাইলাম। পথটি পাহাড় কাটিয়া—প্রশস্ত সোপান দ্বারা গঠিত—যেমন পাহাড়ের পথ হয় তেমনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিয়াছে। উঠিতে কোনরূপ ক্লেশ হয় না। মাঝে মাঝে চত্বর, বিশ্রাম করিতে পারা যায়, মুক্ত বায়ু সেবন করিতে পারা যায় ও চারিদিকের সুন্দর অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য দেখিতে পারা যায়। কাজেই যাঁহারা এই দেবগিরি দুর্গ, এই দৌলতাবাদ দেখিতে আসিবেন, তাঁহাদিগকে আমি অভয় দান করিয়া বলিতেছি যে ৬০০ ফিট উচ্চ দুর্গ-চূড়া শুনিয়াই যেন 'পারিব না' বলিয়া হাল ছাড়িয়া না দেন। উঠিতে যাইয়া আনন্দ পাইবেন এবং এতটা পথ যে কি করিয়া উঠিলেন তাহাও বুঝিতে পারিবেন না, এমনি কৌশলে এই গিরি-দুর্গটি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেকটি প্রাকারের পরেই কামান সাজান। কোথাও ক্ষুদ্র, কোথাও বৃহৎ, এইরূপ এমন অনেক কামান রহিয়াছে। দুর্গশীর্ষে 'শ্রীদুর্গা' নামে একটি বৃহৎ কামান দেখিলাম। তা ছাড়া—কোন তোপের নাম 'বালা হিন্দশা,' কোনটির নাম 'খুলধান,' 'নাথজী,' 'রুদ্রনাথ' এই সব। আর প্রত্যেকটি কামানের গায়েই পরিষ্কার দেবনাগরী হরপের খোদিত লিপি। পরিখার পর পরিখা, প্রাকারের পর প্রাকার, আটটি পরিখ ও প্রাচীর এই দুর্গটিকে এমন করিয়া বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহা হইতে সেকালের দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার কৌশল ও স্থপতিগণের নৈপুণ্য ও দক্ষতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

দুর্গের উপরে একস্থানে ঝাণ্ডা উড়িতেছে দেখিলাম। ঐ স্থানে একটি ছোট মন্দির ও বিগ্রহ আছে—নাম জনার্দ্দন স্বামী। প্রতি বৎসর মেলা হয়। মেলায় হিন্দু-মুসলমান সকলেই যোগদান করেন। দুর্গের শীর্ষে খানিকটা অংশ সমতল এবং যে বাড়ীটি আমাদের দূর হইতে আকর্ষণ করিয়াছিল, সেইটি 'রঙ্ মহাল' নামে পরিচিত—সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নির্ম্মিত। গৃহটি অনেকটা ভাল। তবে পূর্ব্ব সমৃদ্ধি কিছুই নাই। বাড়ীটির নীচের দিক অনেকটা ঢালু। তারপর অতি দুর্ভেদ্য মসৃণ গিরিশৃঙ্গ নীচের দিকে পরিখা পর্য্যন্ত লম্বিত। এইখান হইতে দৌলতাবাদের ধ্বংসাবশেষ চক্ষে পড়ে। আমরা দুর্গ হইতে নামিবার সময় ডানদিকের একটি পথ ধরিয়া একটি বৃহৎ দরবার-ঘরে আসিলাম। প্রস্তরস্তম্ভ, ছাদ, প্রাচীর ইত্যাদি লক্ষ্য করিলেই ইহা যে হিন্দুরাজাদের কীর্ত্তি তাহা উপলব্ধি করা যায়। দেবগিরির হিন্দুরাজাদের কীর্ত্তি যেমন লুন্ঠিত, মোগলের কীর্ত্তি-গৌরবও তেমনি অস্তমিত। নিজাম ষ্টেট দুর্গ রক্ষা

করিতেছেন, কিন্তু কোথায় লোকজন ? দরবার-গৃহের একটু দূরে—চারিদিক বাঁধানো একটি জলাশয়। উহাতে জল ছিল না। এখানে না কি হাতীরা স্নান করিত। প্রাঙ্গণের চারিদিকে জঙ্গল, কণ্টক ও গুল্ম। মসজিদ, মন্দির, প্রস্তর-স্তম্ভ সবই যেন অতীতের ইতিহাস বুকে করিয়া হেমন্তের তীব্র বাতাসে হাহাকার করিতেছিল !

মনে পড়িল এই সেই দেবগিরি একদিন যেখানে মহারাষ্ট্র যাদব রাজারা রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের অতুল ধনসম্পদ ছিল,—কিন্তু একদিন সেই গৌরব, সেই তেজ-বীর্য্যের পরিসমাপ্তি ঘটিল—অদৃষ্টের পরিহাসে, সেই কথাই এখানে একটু বলিতেছি।

দিল্লীর সিংহাসনে যে দিন খিলজিরাজ বসিলেন, সে দিন দাক্ষিণাত্য বিজয়-অভিযানের ভৈরব শঙ্খরব গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল। সুলতান জালালুদ্দীনের রাজত্বকালে এই আফগান বা পাঠানেরা দাক্ষিণাত্যে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন।

খিলিজিরা তুর্কজাতীয় ছিল না। 'তবকত-ই-আকবরি' (Tabqat-i-Akbari) লেখক বলেন, জালাল-উদ্-দীন খিলজি এবং মামুদ খিলজি ইঁহারা দুইজন ছিলেন চিঙ্গিজ খাঁয়ের জামাতা কালিজ খাঁয়ের পৌত্র। ইঁহারা ঘোর এবং গুর্জিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেন। কালিজ খাঁ চিঙ্গিজ খাঁ ঐ অঞ্চল অধিকার করিবার পর হইতে ঐ স্থানে বাস করেন। কালিজ শব্দ সর্ব্বদা খালিজ এইরূপ ভাবে উচ্চারিত হইতে হইতে শেষটায় খালিজি শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। খিলিজিদের বংশধারা লইয়া নানারূপ তর্ক-বিতর্ক চলিয়া আসিয়াছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন ধারণা লেখকগণ পোষণ করিয়া তদনুরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ ইহাঁদিগকে আফগান বলিয়াছেন। আবার অনেকের মতে খিলিজিরা তুর্ক জাতীয়। পরে আফগানিস্থানে বাস করিয়া আফগানদের সহিত মিশিয়া আফগান রূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। আমাদের এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করা অনাবশ্যক।

আলাউদ্দীন জালালউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা ছিলেন—তাঁহার সাহস ও বীরত্ব ছিল অসাধারণ। আলা-উদ্দীনের দিল্লীর সম্রাট্ হইবার আকাঙ্ক্ষা ছিল অতি বেশী। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, দেবগিরের যাদববংশীয় মহারাষ্ট্র নৃপতি রামচন্দ্র দেবের ধনরত্ন কুবের-ভাণ্ডারকেও হার মানায়। কাজেই তিনি ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দেবগির আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। আট হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি মারাঠা রাজ্য সীমান্তে আসিয়া পৌছিলেন। আলাউদ্দীন যে স্থানে প্রথমে শিবির সংস্থাপন করিলেন, সে স্থানের নাম এলিচপুর। এলিচপুর হইতে অগ্রসর হইয়া তিনি দেবগির হইতে মাত্র বারো মাইল দূরবর্ত্তী ঘাট—লাহরা নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। কেহ তাঁহাকে কোন বাধা দিল না। আলাউদ্দীন আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিয়া প্রচার করিয়া দিলেন যে, তিনি তাঁহার শ্বশুর ও খুল্লতাতের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া রাজমহেন্দ্রীর রাজার অধীনে কার্য্য করিতে চলিয়াছেন।

দেবগির দুর্গে তখন নামমাত্র কয়েকজন সৈন্য ছিল। রাজা রামচন্দ্রের পুত্র শঙ্করদেব সে সময়ে বহু সৈন্য-সামন্ত-সহ দক্ষিণ দেশে তীর্থ-যাত্রা করিয়াছেন। রামচন্দ্র আলা-উদ্দীনের আগমন-বার্ত্তা শুনিবামাত্র দুই তিন হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, আলাউদ্দীন আক্রমণ করিলে বাধা দিবেন বলিয়া। আলাউদ্দীন অতি সহজেই এই অল্পসংখ্যক সৈন্যদিগকে পরাজিত করিলেন। সৈন্যেরা কতক মরিল, কতক বাঁচিল। যাহারা বাঁচিল তাহারা পলায়ন করিল। রাজা রামচন্দ্র নিরুপায় হইলেন, কি আর করিবেন, তিনি দুর্গ-মধ্যে আপনাকে সুরক্ষিত করিয়া আলাউদ্দীনের আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন। এ দিকে দেখিতে দেখিতে আলাউদ্দীনের সৈনিকেরা নগরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণেরা বন্দী হইলেন, বণিকেরা ধনসম্পদ্ হারাইলেন। এ সময়ে আলাউদ্দীন প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে, দিল্লীর সুলতান বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশ জয় করিতে আসিতেছেন। রামচন্দ্রদেব নিরুপায় হইয়া সন্ধি করিলেন। আলাউদ্দীনের এই সন্ধিতে বিশেষ লাভ হইল,—তিনি সন্ধির সর্ত্তানুসারে পঞ্চাশ মণ সোনা, ছয়শত মণ মুক্তা, দুই মণ হীরক ও অন্যান্য বহুবিধ মূল্যবান প্রস্তর, প্রচুর ধন, চল্লিশটি হস্তী, কয়েক হাজার ঘোড়া লাভ করিয়া বিজয়-গর্ব্বে কারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজা রামচন্দ্রের পুত্র শঙ্কর পরে আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিতে যাইয়া

রে দুর্গের ভিতরের প্রাচীর—দূরে চাঁদ মীনার

চে দৌলতাবাদ দুর্গের স্বাভাবিক পর্বত-প্রাকার



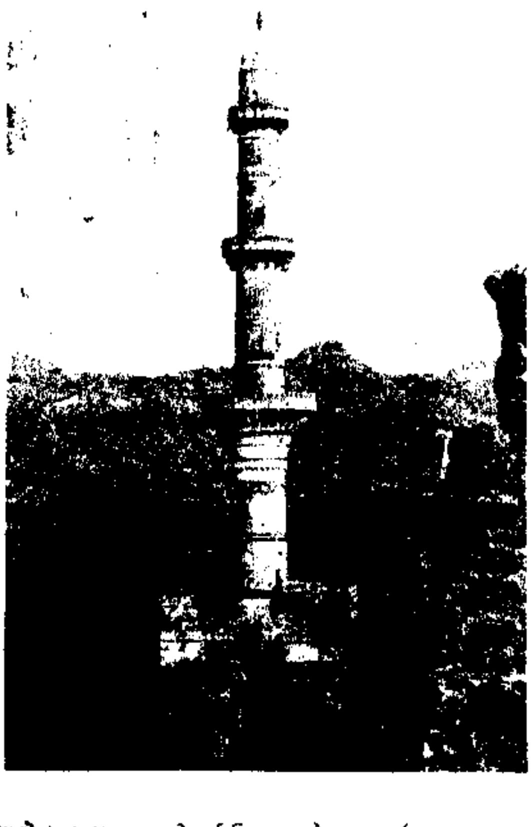




লত —প্রা



দৌলতাবাদ দুর্গের প্রাকার ও বাহিরের পরিখা



চাঁদ মীনার (পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত)—দৌলতাবাদ দুর্গ



চিনি মহল দৌলতাবাদ দুর্গ : এই স্থানে কুতবশাহী নৃপতি আবুল হাসান দশ বৎসর কাল বন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করেন

পরাস্ত হইয়াছিলেন। আলাউদ্দীন সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে আর বেশী অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পান নাই।

আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্যের নৃপতিদের দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই সম্রাট্ হইবার পর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই অভিযানে তিনি তাঁহার প্রিয় সেনাপতি মালিক কাফুরকে এক বিপুল বাহিনী সহকারে প্রেরণ করেন। ১৩০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ অভিযানে কাফুর দেবগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিজয় লাভ করেন।

দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র শঙ্করদেব আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। কাফুর ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দেবগিরিতে বাসস্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক সমুদয় দাক্ষিণাত্য প্রদেশের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তারূপে বাস করেন। এই দেওগির বা দেবগিরির ইতিহাস পড়িলে পাঠকগণ এই দুর্গের প্রাচীনত্ব ও ইহার গৌরব বুঝিতে পারিবেন।

মুহম্মদ তুঘ্লক যখন দিল্লীর তক্তে বসিলেন (১৩২৫ খৃষ্টাব্দে), তখন তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের কতিপয় বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়াছিল। ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে হোয়সল্ রাজাকে পরাজিত করিয়া তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অধিকারী হইয়াছিলেন। উক্ত প্রদেশের বিদ্রোহ দমনের পর তাঁহার মনে হইল যে, দিল্লী হইতে এমন কোন মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাজধানী স্থাপন করা উচিত, যেখান হইতে অনায়াসেই সর্ব্বত্র শাসন-শৃঙ্খলার সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। তদনুসারে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের দেবগিরি নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিবার আদেশ দিলেন ১৩২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে। তিনি দেবগিরির নাম রাখিলেন 'দৌলতাবাদ'। এই দৌলতাবাদ রাজধানী পরিবর্ত্তনের ইতিহাসের বিবরণ পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই অবগত আছেন।

এই দুর্গ দেবগিরি দৌলতাবাদ লইয়া যে কত যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছে, কত ধ্বংস-লীলা চলিয়াছে, কত নৃপতি এখানে বন্দী হইয়াছেন, কত ধনরত্ন এই দুর্গ-গৃহ হইতে লুণ্ঠিত হইয়াছে, কত অসহায় নরনারীর করুণ চীৎকারে রক্তধারায় ইহার প্রত্যেকটি কক্ষ, প্রত্যেকটি পথ, প্রতি ইষ্টক ও প্রস্তর-কণা রঞ্জিত হইয়াছে, আজ সেই কথাই মনে পড়িতেছিল। এই প্রাচীন দুর্গের বিভিন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া মনে হইতেছিল— আজ যদি এই সব মৌন পাষাণেরা কথা বলিতে পারিত, তাহা হইলে কত কথাই না শুনিতে পারিতাম। আমরা দেবগিরি ও দৌলতাবাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম। দেবগিরি যে বৃহৎ ও সুন্দর নগরী ছিল তাহা সহজেই চক্ষে পড়ে। দৌলতাবাদ বারে বারে সুধু গড়িয়া উঠিতেছিল মাত্র, তাই এখানে বেশীর ভাগ কীর্ত্তিই হিন্দু নৃপতিদের। দেবগিরির ইতিহাস, দৌলতাবাদের ইতিহাস,—হিন্দু, পাঠান, মোগলদের ইতিহাস ও কীর্ত্তিচিহ্ন বুকে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকের এই সব ধ্বংসচিহ্ন দেখিয়া মনে হইতেছিল :—

"উপহসি সর্ব্বে　　মানব গর্ব্বে
কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ গড় পুঞ্জে　　কতিপয় তুঞ্জে
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও॥

কৈ? সব আজি　　সময় সমুদ্রে
মজ্জিত সহ শত আশা ও।
দেখি শত শত　　হলো কি নিবারিত
নিরুপ মনুজ পিপাসা ও।

যে গৃহ পাশে　　কাঁপিত ত্রাসে
ভূপতি পদবিক্ষেপে ও।
সে সব ভবনে　　কত শত অধমে
পূরিছে মূত্র পুরীষেও।

*　　*　　*

যে গৃহ অঙ্গে　　বহুবিধ রঙ্গে
বিখচিত ছিল মণিরাজি ও।
সে সব কালে　　হরি! এককালে
ঢাকিল লূতা-জালে ও॥"

দৌলতাবাদ আসিবার পথে খুলতাবাদ বা রোজাতে ঔরঙ্গজেবের কবর দেখিয়াছিলাম। পথের ধারে দুই দিকে দুর্গ ও বাড়ী-ঘর। কতকগুলি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম। দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত বাঁধান অঙ্গন। অঙ্গনের চারিদিক বেড়িয়া মস্জিদ, ছাত্রাবাস, মোল্লাগণের আবাসস্থান। বামদিকে

অল্প একটু যাইতেই ঔরঙ্গজেবের সমাধি দেখিলাম। আড়ম্বর-বিহীন পবিত্র সমাধি। উপরে কোন আচ্ছাদন নাই। সমাধির মধ্যস্থলে মৃত্তিকার মধ্যে একটি তুলসী গাছ রহিয়াছে। সূক্ষ্ম শ্বেতপ্রস্তরের জালি দিয়া সমাধিটি বেষ্টিয়া যে প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাও নিজাম ষ্টেটের নির্ম্মিত। দ্বারদেশে যে স্থানে মোমবাতি জ্বালান হয়, সে স্থানে রহিয়াছে সামান্য একটু আবরণ। আমি সমাধি স্পর্শ করিলাম, ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটের আজ এই পরিণাম!

এখানে আরও অনেক সাধুগণের সমাধি আছে। দেখা হইল না। দেখা শুধু একবার ঘুরিয়া আসা মাত্র। আহমদনগরেও একটি সমাধি ঔরঙ্গজেবের সমাধি বলিয়া পরিচিত। এ সম্বন্ধে একবার বহুদিন পূর্ব্বে ১৩১০ সালের আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী' পত্রে আলোচনা হইয়াছিল। তাহাতে স্বর্গত ঐতিহাসিক বামনদাস বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন: "ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু অহমদনগরে হয়। তাঁহার মৃত শরীর উক্ত স্থানে স্নাত এবং embalmed করা হয়। আহমদনগরে যে স্থানে ঐ সব ক্রিয়া করা হয়, সেই স্থলই তাঁহার সমাধি অর্থাৎ Aurangzeb's Tomb বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার মৃত শরীর রোজা নামক স্থানে প্রোথিত হয়। রোজা শব্দটার অর্থ Mausoleum, ঐ স্থলে অনেক মুসলমান সাধুর সমাধি আছে বলিয়া উহার নাম রোজা হইয়াছে। উহা বলিতে গেলে এক রকম Westminster Abbey। ঐ স্থলে যদিও ঔরঙ্গজেব প্রোথিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু দক্ষিণের মুসলমানেরা আহমদনগরের সমাধিকেই বেশী সম্মান দেখাইয়া থাকেন।" পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ এই কথা কয়টি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষ হিসাবে ঔরঙ্গজেব ছিলেন একজন সুপণ্ডিত খাঁটি মুসলমান। কোরাণ শরীফ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। খাদ্য, বস্ত্র, গতিবিধি কোন বিষয়েই তাঁহার বিলাস ছিল না। সন্তানগণকে শিক্ষাদানের জন্য তাঁহার যত্নের অবধি ছিল না। নিজে রাজকোষ হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। কোরাণ নকল করিয়া, টুপি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন,—কাজেই এই ত্যাগী তাপসের সমাধি যে এইরূপ হইবে, তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইল।

দৌলতাবাদ সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা বলিতেছি। দৌলতাবাদে নিজাম ষ্টেট রেলওয়ের একটি ষ্টেশনও আছে। দৌলতাবাদ হিন্দুর প্রাচীন কীর্ত্তি-বিভূষিত রাজধানী ছিল। টোলেমি (Ptolemy) দৌলতাবাদকে ট্যাগরা (Tagara) নামে অভিহিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ দেওগড়া—দেওগড় শব্দ হইতেই ট্যাগরা শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। হিন্দু ঐতিহাসিক হেমাদ্রির মতে দেওগড় দেবগিরি। যাদব নৃপতি প্রথম ভিল্লম, দ্বাদশ শতাব্দীতে দেওগির নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গপ্রাচীর ও পরিখার গঠন-প্রণালী দেখিলে উহা হইতেও প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। অনেকের মতে এলোরার প্রাচীন গিরি-মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ ও এই দুর্গ নির্ম্মাণ একই সময়ে হইয়াছিল।

আলাউদ্দীন ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে দেওগিরি অধিকার করিয়াছিলেন এবং মুহম্মদ বিন তোগলক ইহার নাম দৌলতাবাদ রাখেন। এই দেবগিরি বা দৌলতাবাদ দুর্গ পরে একে একে বাহমনি সুলতান, আহমদনগরের নিজাম শাহী নৃপতিগণের এবং মোগলের হাতে আসে। মোগলের হস্ত হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে হায়দরবাদের নিজাম আসফ জা এই দৌলতাবাদ দুর্গ লাভ করেন।

প্রাচীন দৌলতাবাদ নগরী দুর্গের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল। শহরটি আড়াই মাইল বিস্তৃত ছিল, এবং শহরের চারিদিক বেষ্টন করিয়া প্রাচীর বিদ্যমান ছিল। এই দুর্গের পরিখা, প্রাকারের গঠন-প্রণালী, ঝুলান সেতু উল্লেখযোগ্য। পরিখাটির গভীরতা ১০০ ফুট। দুর্গের সর্ব্বোচ্চ স্থানের প্রবেশ-পথে প্রহরীদের জন্য অনেক গুপ্তগৃহ ছিল। আর যে লৌহ-সেতুটির কথা বলিয়াছি, তাহা এমনভাবে নির্ম্মিত যে প্রয়োজন হইলে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া শত্রুর গতি প্রতিরোধ করা যাইতে পারে।

দুর্গের বহিঃ-প্রাচীরের বাহিরে রাজপ্রাসাদ, উদ্যান, মন্দির, মস্‌জিদ এবং নানা প্রকারের অট্টালিকার ধ্বংসচিহ্ন বিদ্যমান থাকিয়া সেকালের গৌরব প্রকাশ করিতেছে।

এই দুর্গে প্রবেশ করিলে সকলের আগে চাঁদ মিনারটি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাহমনি বংশের সুলতান আলাউদ্দীন আহম্মদ শাহ (দশম নৃপতি) ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে এই মিনারটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মিনারটি একজন পারস্যদেশবাসী স্থপতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাহমনি রাজারা পারসিক স্থপতিদের খুব সমাদর করিতেন। চাঁদ মিনারটি দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন স্তম্ভসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।

আমরা দৌলতাবাদ ও রোজা দেখিয়া যখন এলোরা আসিলাম, তখন বেলা প্রায় দুইটা হইবে। হেমন্তের স্নিগ্ধ মধুর বাতাসের স্পর্শে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদয় ক্লান্তি দূর হইয়া গিয়াছিল।

নকল ভুলা

—শ্রীপাঁচুগোপাল কুণ্ডু

"দাদা, তুমি যেন ডাক্তার হয়ো না।"

"কেন রে?"

বড় ভাই অনাথ সবে সেকেণ্ড ক্লাস হইতে ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠিয়া দেশে গিয়াছে, ছোট ভাইও শুনিয়াছে, দাদা ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠিয়াছে, সুতরাং তাহার ধারণা দাদা শীঘ্রই একটা ডাক্তার হইয়া পড়িবে।

সে তাহার দাদা আসিবার দুই এক দিন আগে শুনিয়াছে যে, ডাক্তারদের অনেক কিছু হীন কাজ করিতে হয়, সুতরাং দাদাকে যখন কাছে পাইয়াছে, তখন ডাক্তার না হওয়ার বিরুদ্ধে সাবধান করিয়া দিতে সে অবশ্যই ভুলিল না।

বড় ভাই অনাথ কেন-র উত্তর শুনিয়া ছোট ভাইয়ের আজ্ঞায় সম্মত হইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার পিঠে আস্তে দুইটা চাপড় দিয়া বলিল, "না ডাক্তার হব না।"

উত্তর শুনিয়া ছোট ভাই খুব খুশী হইয়া বলিল "দাদা, আমাকে একটা ফুটবল কিনে দেবে?"

"তুই ফুটবল খেলতে পারিস?"

প্রশ্ন শুনিয়া ছোট ভাই খুব উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, দেখবে?"

এই কথা বলিয়া সে একটা রবারের ছোট দুই পয়সা দামের বল আনিয়া লাথি মারিয়া দিয়া বলিল, "ঐ দেখ।"

বড় ভাই তাহা দেখিয়া বলিল, "হ্যাঁ দেব।" ছোট ভাইয়ের এইরূপ বালকসুলভ সরলতায় বড় ভাই ভাবিতেছিল—এ সংসার কতই সুখের আলয়! এই সংসারেই যে আবার দুঃখ কোন্ ফাঁক দিয়া প্রবেশ করিয়া বসে, সে কথা একবারও তখন সে দেখিতে পাইল না।

অনাথ যত বারই কলিকাতা হইতে কোন ছুটী উপলক্ষে দেশে যায়, তত বারই ছোট ছোট ভাই-বোনদের এইরূপ নানারকম অভাব-অভিযোগ তাহাকে শুনিতে হয়।

দাদা একবার দেশে গেলেই হয়, সকলে মিলিয়া দাদাকে ঘিরিয়া নালিশ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়; "দাদা, ও আমার দোয়াত ভেঙ্গে দিয়েছে," ও আমাকে অমুক ক'রেছে, ও আমাকে"…ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ছোট ভাই-বোনগুলির এইরূপ নালিশ অভিযোগগুলি তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিত। তাহাদের এ নালিশ-অভিযোগগুলি শুনিবার জন্যই যেন সে দেশে যাইতে আরও ভালবাসিত।

বড় ভাইও জজ সাহেবের মত যাহার যেরূপ প্রাপ্য সেইরূপ একটা না একটা রায় প্রকাশ করিয়া দিয়া সুবিচার করিয়া দিত।

ছোট ভাই-বোনগুলিও বিচারকের রায় অমান্য না করিয়া বড় ভাইয়ের ফুল-বাগানে 'সশ্রম কারাদণ্ডে' বাহাল হইয়া যাইত।

বড় ভাই অনাথের বাস ছিল কলিকাতায় তাহার মামার বাড়ীতে। সে জন্মাবধি সেই খানেই তাহার দিদিমার কাছে মানুষ। তাহার ছোট মামা প্রায় তাহারই বয়সী—মামীমা তাহাদের দুই জনকেই জননীনির্বিশেষে পালন করিয়াছেন। তাহার মামার বাড়ীর ইতিহাসটা ছিল একটু অন্যরূপ; মামা-ভাগিনেয়ে প্রায় মারামারি লাগিয়া যাইত, সে মারামারি দেখিবার জিনিষ—যেন বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ। পরে যুদ্ধের ফলাফল বাহির হইলে যত দোষ পড়িত তাহার ছোট মামার উপর। সুতরাং যুদ্ধের অবসানে ক্রন্দনপর ভাগিনেয়কে দেখিলে তাহার ছোট মামার দায়িত্বটা একটু বেশী রকম বাড়িয়া যাইত। সে তখন তাহাকে একটু শান্ত করিতে চেষ্টা করিত, কারণ সে জানিত যে ব্যাপারটা না বুঝিয়া সুঝিয়াই, মা বাবা যত দোষ ফেলিবেন্ প্রধানতঃ তাহারই উপর।

এ দিকে অনাথ যখন দেশে যাইত, তখন তাহার অন্যান্য ভায়েরা ভাবিত, দাদার ভারী মজা, খালি মামার বাড়ী থাকে, আর মাঝে মাঝে কুটুমের মত আসিয়া চলিয়া যায়: সুতরাং অনেক সময়ে তাহারা তাহাকে আপনার দাদা

বলিয়া ভাবিতে পারিত না,—মামাবাড়ীর দাদা বলিয়া ভাবিত এবং ইহা লইয়া তাহাদের অনেক সময় 'মিটিং'-ও হইত। অনাথের ছোট ভাই ছিল সকলকে সাবধান করিয়া দিবার তালে। সে বলিত—"এই দাদা শুনলে আর আস্ত রাখবে না, মেরে একবারে ঠিক ক'রে দেবে!"

এইরূপ হিতকারী ছোট ভাইটীকে সকলেই অত্যন্ত ভাল-বাসিত। তাহার চেহারাটাও সকলকার নিকটেই মনোরম লাগিত,—যে দেখিত সেই তাহাকে ভাল না বাসিয়া পারিত না,—তাহার উপর তাহার কথাগুলি ছিল আরও মধুর। এমনি করিয়া সে তাহার চারিদিকে মধু বৃষ্টি করিয়া একটি অর্দ্ধ-ফুটন্ত গোলাপের মত রূপ লইয়া বৃদ্ধি পাইত পাইতে ছ'টা বছর পার হইয়া সাতে পড়িয়াছে। এখন আর তাহার ছোট ভাই বলিয়া আখ্যা নাই; এখন সে সেজ। তাহাকে সকলে ভুলা বলিয়াই ডাকিত। তাহার এই নামটী কিন্তু আদৌ পছন্দ হয় নাই। সে অনেকবার এই নামটীর বিপক্ষে প্রতিবাদ করিয়া একটা নূতন কিছু নামের জন্ত আবেদন করিয়াছিল। তাহার এই ছেলে মানুষ বয়সেই নামের একটু বাহার চাই শুনিয়া তখন সকলে একটু হাসিয়া-ছিল মাত্র। সে কলিকাতায় আসিয়া তাহার বড় মামাবাবুর চুল কাটা দেখিয়া গিয়াছিল। যে নাপিত তাহার চুল কাটিত, তাহাকে একটু 'ফ্যাশান' করিয়া কাটিয়া দিবার জন্ত নজর রাখিতে হইত। যদি তাহার বেশ মনোমত না হইত, তাহা হইলে মন খারাপ করিয়া তাহার আর সে দিন ভাল করিয়া খাওয়াই হইত না। সাত আট বৎসর বয়সে ঐরূপ লক্ষণ সকল প্রকাশিত হওয়ায়, সকলে ভাবিত ভবিষ্যৎ জীবনে বাবুগিরি ছাড়া আর কিছুই সে করিতে পারিবে না।

এইরূপ হাসি-খেলার মধ্যে দিয়া চার চারটা বছর যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল তাহা কেহ টেরই পাইল না।

২

সেইবার সবে ফাল্গুন শেষ হইয়া চৈত্র মাসের দিন দশেক সে বছর বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। কত সন্তান মা-হারা বাপ-হারা, কত জননী তাহার পুত্র-হারা, কত ভাই ভাই-হারা। দেশের চারিদিকে তখন হাহাকার উঠিয়াছে। এইরূপ সময়ে অনাথ একদিন শুনিল, তাহার ভাইয়ের বসন্ত হইয়াছে। বসন্ত নামে সকলেরই একটু ভয় হয়। কিন্তু কোন্ ভাইয়ের যে বসন্ত হইয়াছে, তাহা সে জানিতে পারিল না। পরে অনাথ কলিকাতা হইতে দেশে রওনা হইল। যাইয়া দেখিল তাহার প্রিয় ভাই ভুলার। ভুলা বড় ভাইকে দেখিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিল, "দাদা, ভাল হব তো?"

অনাথ কি বলিবে? সে তখন নীরবে অন্য দিকে চাহিয়া চোখ মুছিতেছিল। ভুলা একবার "দাদা, দাদা" বলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল, তখন জ্বর অত্যন্ত প্রবল, পারিল না, পড়িয়া গেল।

অনাথ তাহার প্রিয় ভাই 'ভুলা-হারা' হইল। 'ভুলা' নাম পাল্টাইয়া একটা নূতন নাম ধারণ করিবার জন্যই বুঝি ভুলা এক দিন সত্য সত্যই পলাইয়া গেল। অনাথ কম্পিত পদে আকাশের দিকে তাকাইয়া মাটীতে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল—সেই সময় তাহার নজরে পড়িল আকাশের কোলেও একটী তারকা কেমন করিয়া ধীরে ধীরে নিভিয়া যাইতেছে।

অনাথ দেখিল যাহাকে হৃদয়ের এতখানি সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে দিয়া দিয়াছিল, সে কেমন করিয়া তাহাকে একা ফেলিয়া চলিয়া গেল। সে যেন বেশ বুঝিতে পারিল, সে একা; শুধু সে নয়, বাড়ীতে যে কুকুরটী ছিল সেও যেন তার-পর হইতে একা হইয়া গিয়াছে। আর ভুলার মত গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া তাহাকে কেহ সময়ে খাইতে দেয় না; আর 'টমি' বলিয়া তাহাকে কেউ আদর করিয়া ডাকে না; তাই কুকুরটীও মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করিয়া যেন তাহাকেই খোঁজে। কুকুরটীকে খাইতে দিলেও সে আর তেমন খায় না। সদাসর্ব্বদা যেন তাহার সঙ্গীকে খুঁজিয়া খুঁজিয়াই বেড়ায়। যখন ভুলার মৃতদেহ সকলে মিলিয়া শ্মশান-ঘাটে লইয়া যায়, তখন ভুলার প্রিয় কুকুরটীও তাহাদের সহিত তেমনি বিষণ্ণ বদনে শবের অনুগমন করিয়া তাহার প্রিয় সঙ্গীটীকে শেষ দেখা দেখিতে গিয়াছিল। তাহার পর হইতেই টমি শ্মশানে যাইয়া 'কেঁউ কেঁউ' সুরে কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত আবার তেমনি সুরে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া একটা নিরিবিলি জায়গায় চুপ করিয়া শুইয়া পড়িত। হায়, এমনি সকলে একা! শুধু টমি বা অনাথ একা নয়, জগৎটাই একা।

দুঃখ বলিয়া একটা কথা আছে অনাথ শুধু এই মাত্র জানিত, তাহা যে কত বড় তাহা সে জানিত না। আজ জানিল।

তাহার পর এক দিন, দুই দিন, তিন দিন এমনি করিয়া কত দিন কাটিয়া গেল। অনাথও একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, সে এখন নূতনরূপে মনকে প্রবোধ দিতে শিখিয়াছে—"ভুলা পুরান দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে।"

প্রবেশিকা পরীক্ষা সসম্মানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সে আই. এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হইল। তখন একবার অনাথের ডাক্তারী পড়িবার ইচ্ছা হইল। এত দিনে আবার তাহার ভুলা ভাইয়ের কথা মনে পড়িয়াছে—ভুলা ভাইয়ের নিকট সেই অঙ্গীকার! তাহার মনটা আবার কাঁদিয়া উঠিল। ভাবিল ডাক্তারী পড়া তাহার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই সে আই. এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হইল।

এদিকে আই. এ. পরীক্ষার মাস খানেক আগে অনাথের খুব ভারী অসুখ হয়। তাহার পর হইতেই তাহার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়। অনাথের মামাদের পুরী চক্রতীর্থে একটা বাড়ী ছিল। যখন ইচ্ছা হইত মাঝে মাঝে সকলে সেই-খানে যাইয়া কিছুদিন থাকিয়া আসিত। এই সময়ে অনাথের বড় মামার শ্বশুর-বাড়ী হইতে তাহার মামীমার বাবা, মা ও দুই বোন পুরী বেড়াইতে আসিয়া ঐ বাড়ীতে উঠেন। অনাথের মামীমাও ঐ সময়ে তাঁহাদের সহিত পুরীতেই ছিলেন। অনাথ ভগবানের কৃপায় কোনরূপে আই. এ. পরীক্ষা দিয়া পুরী যায়। অনাথ তাহার মামীমার বাপের বাড়ীর প্রত্যেকের সহিত খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। অনাথ পুরী আসায় তাহার মামীমা ও অন্যান্য সকলে খুব আনন্দিত হইলেন। এখন অনাথেরও কোন চিন্তা নাই, পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সে তথায় মাসখানেক থাকিতে মনস্থ করিল। খুব উৎসাহের সহিত অনাথ সকলের সহিত দুই বেলা বেড়াইতে বাহির হইত। বৈকাল একবার হইলেই তাহাদের মন পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিত। সেই সুদূর চক্রতীর্থের এক কোণ হইতে স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত সমুদ্রের তীর দিয়া তাহাদের প্রত্যহ বেড়াইবার রাস্তা ছিল। দুপুরের কাজ ছিল তাস খেলা।

এইরূপ খেলা ও বেড়ানর মধ্য দিয়া দিন গুলির অনাথের খুব আনন্দে কাটিল। অনাথের মামীমার কিন্তু সেখানে থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না। তাই একদিন তাহার মামীমা কলিকাতা যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ছোটমামাকে আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য অনাথকে চিঠি লিখিতে বলিলেন। অনাথ তাহার মামীমার কথা শুনিয়া বলিল, "আপনি এখান হতে চলে গেলে, আমি এখানে আর থাকব না, আমিও যাব।" তাহা শুনিয়া অনাথের মামীমা আর কলিকাতা যাইতে চাহিলেন না।

তাহার পর আরও দিন পাঁচ ছয় কাটিয়া গিয়াছে, অনাথ একদিন পুরীর মন্দির হইতে একা ফিরিতেছে, প্রায় সমুদ্রের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে দেখে একটি নয় দশ বছরের ছেলে আপন মনে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কি ভাবিতেছে। অনাথ অবাক্ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভাবিল,—এ কি! এ-যে সেই; কে বলিল ভুলা হারাইয়াছে? অনাথ তাহার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া নির্নিমেষে তাহাকে দেখিতে লাগিল। তাহার দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বালকটি হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমাকে চেন?"

অনাথ যেন কত আশা লইয়া বলিল, "হাঁ হাঁ, চিনি, তোমার নাম কি ভাই?"

বালক বলিল, "আমার নাম, সুশীল।"

"সুশীল? বাঃ বেশ নামটী।"

অনাথ মন্দির হইতে দুইটা খাজা কিনিয়া আনিয়াছিল, একটা তাহার হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও সুশীল, তুমি খাও।"

সুশীল আর দ্বিরুক্তি না করিয়াই হাত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করিল। পরে বলিল, "মাকে বলে দেবে না?"

"না।"

"তুমি আমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করবে?"

"তাঁদের তো আমি কাকেও চিনি না, আমি শুধু তোমায় চিনি।" এই কথা বলিয়াই অনাথ আবার আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় বালকটী ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার কে?"

"আমি? আমি,—তোমার দাদা।" বলিয়াই অনাথ

আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না, নিকটেই বালির উপর বসিয়া পড়িল। আবার বহুদিন পরে ভুলা যেন চারিদিক হইতে তাহাকে 'দাদা দাদা' বলিয়া ডাকিতেছে। নিকটে সমুদ্রের জল আছড়াইয়া ফেনায় ফেনাময় হইয়া যাইতেছে, অনাথ দেখিতেছে এ যেন তাহার সেই ভুলা-ভাইয়ের খল খল হাসি। সমুদ্রের জল চক্ চক্ করিতেছে, অনাথের চোখে তাহার সেই ভাইয়ের ছবি সেই জলে কেবলই ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাটীর সম্মুখে সমুদ্রের ধারে আসিয়া বালির উপর শুইয়া পড়িল, তাহার মনে হইতে লাগিল সে যেন কত ক্লান্ত। এমন সময় সমুদ্রের বক্ষে উজ্জ্বল আলো ছড়াইয়া দিয়া চন্দ্রদেব সমুদ্রে ঢেউএর তালে তালে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। চাঁদনী রাত তাহার ভাল লাগিতেছিল না, সে চায় তখন অন্ধকার! এমনি সময় তাহার মামীমা পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও এমনি অবস্থায় শুইয়া থাকিতে দেখিয়া একটু চঞ্চল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে রে অনাথ? তুই এমনি ক'রে শুয়ে?"

অনাথ সমুদ্রের দিকে একপাশ ফিরিয়া শুইয়া কত কি চিন্তা করিতেছিল। কখন্ যে তাহার মামীমা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সে একটুও টের পায় নাই। হঠাৎ মামীমার প্রশ্ন শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল, বলিল, "ও! কে, মামীমা? হাঁ মামীমা আমি।"

"বালির উপর এমনি ক'রে শুয়ে আছিস কেন রে? তোর কি ক্ষিদেও পায় নি, কখন সেই বেরিয়েছিস?" এতক্ষণে অনাথ তাহার মামীমার কথায় একটু ক্ষুধা অনুভব করিল, এতক্ষণ যে তাহার ক্ষুধা পাইয়াছিল তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারে নাই।

অনাথ বলিল, "মামীমা, আজ আমার বড় মনটা খারাপ।"

উদ্বিগ্নভাবে মামীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে? মন খারাপ কেন?"

অনাথ আর কথা চাপিয়া রাখিতে পারিল না, বলিল, "বসুন মামীমা এখানে, আমি সব কথা আপনাকে বলছি।"

অনাথের মামীমা তাহার পাশে আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িলেন। অনাথ বলিতে লাগিল, "দেখুন মামীমা, ঠিক আমাদেরই ভুলার মত আজ একটী ছেলেকে দেখলুম, তাই ভাবছি, এ কি সে? ভগবান কি একই রকম আকৃতির দুইজন লোক সৃষ্টি করেন? সত্য কথা ব'লতে কি মামীমা, সেই চোখ, সেই নাক, সেই মুখ, সবই যেন একেবারে অবিকল তার মত।"

অনাথ যখন ওই সকল কথা বলিয়া যাইতেছে, তখন এই কথা শুনিতে শুনিতে তাহার মামীমার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল; অনাথ তাহা দেখিতে পাইল না।

তাহার মামীমা আর্দ্রকণ্ঠে তাহাকে বলিলেন, "দূর, তুই যেমন পাগল, কোথাকার পরের ছেলে দেখে তুই এমনি ক'রে মন খারাপ ক'রে শুয়ে আছিস, চল্ বাড়ী চল্।"

"কালই আপনাকে দেখাবো মামীমা তাকে," এই কথা বলিয়া অনাথ তাহার মামীমার সহিত ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ছিল সমুদ্রের অতি নিকটেই। বাড়ীতে ফিরিয়া অনাথ সামান্য কিছু আহার করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন উঠিয়াই বেড়াইতে বেড়াইতে অনাথ সুশীলদের বাড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুশীল বোধ হয় তাহারই অপেক্ষায় ছিল, ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজকে খাজা এনেছো?"

ঠিক ছোট ভাইয়েরই মত যে সে এমনি করিয়া একটা কিছু চাহিয়া বসিবে অনাথ তাহা একবারও ভাবে নাই, তাই সে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আমাদের বাড়ীতে খাজা আছে, সেখানে চলো তোমাকে খাজা দেব।"

সুশীল আর কিছু না বলিয়া অনাথের একটা হাত ধরিয়া তাহাদের বাড়ী আসিল। অনাথ তখন বুঝিল সুশীলের বয়স নয় দশ বৎসর হইতে পারে, কিন্তু সে এখনও যেন ঠিক একটী পাঁচ ছয় বৎসরের শিশু, তেমনই সরল, এখনও তাহার জ্ঞানের একটুও বিকাশ হয় নাই।

অনাথের মামীমাও তাহাকে দেখিয়া একটু চমকিত হইয়া গেলেন, সত্যই এ যেন সেই ভুলা! বালকটী খাজা ও সন্দেশ পাইয়াই তাহার বাড়ীর দিকে ছুটিল; সঙ্গে সঙ্গে

তাহার একটি নূতন নামও হইয়া গেল, তাহার নূতন দাদার দেওয়া নাম, ভুলা। সুশীলের আজ ভারী মজা। সে সন্দেশ চিবাইতে চিবাইতে তাহার মায়ের কাছে যাইয়া বলিল, "এই দেখ মা, আমার নূতন দাদা সন্দেশ দিয়েছে, আর আমার নাম বলে, 'ভুলা'।" বলিয়াই তাহার ভারী হাসি।

ঠিক এরই আগের দিন সে যে-খাজাটী অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল সে কথা তাহার মায়ের কাছে সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল ; আজ কিন্তু এক পকেট সন্দেশ পাইয়া সে তাহার আনন্দ আর চাপিয়া রাখিতে পারে নাই, তাই সে মায়ের বকাবকির ভয় ভুলিয়া গিয়া সব কথা বলিয়া ফেলিল।

ছেলের এই কথা শুনিয়া তাহার মা একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন, বলিলেন, "তুই এ নূতন দাদা পেলি কোথায় ?"

"কাল।" এই কথা বলিয়াই যখন তাহার মাকে একটা গোটা সন্দেশ নির্ব্বিবাদে অতি ভরসার সহিত দাতব্য করিতে গেল, তখন তাহার মা দেখেন, তখনও তাহার পকেটে প্রায় এক পকেট সন্দেশ মজুত। তাহা দেখিয়া তাহার মা ভাবিলেন,—এ কোন শ্রাদ্ধের বা কাহারও রোগের 'তুক' করা সন্দেশ হইবে। ইহা ভাবিয়া তাহার মা সমস্ত সন্দেশ তাহার পকেট হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন ; তখন সে কাঁদো-কাঁদো হইয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত সেই সন্দেশগুলির দিকে চাহিয়া রহিল এবং ঐগুলি কুড়াইয়া লইবার একটা সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। এমনি সময়ে কতকগুলি কাক কোলাহল করিয়া সন্দেশগুলির শেষ চিহ্ন-স্বরূপ দুই একটা টুকরা রাখিয়া উড়িয়া গেল।

ক্রমে এ কথা তাহাদের কাহারও অগোচরে রহিল না। এদিকে যত দিন যায় অনাথ সুশীলের সহিত ভ্রাতৃত্বের শিকল আরও শক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। অনাথ তাহার সাধা-মত তাহার বাঞ্ছিত দ্রব্য যোগাইয়া যায়। খেলনায় সুশীলের ঘর ভর্ত্তি হইয়া গেল। সুশীলের পিতা কিন্তু ইহা ভাল বুঝিলেন না। তিনি ভাবিলেন ইহার ফল নিশ্চয়ই কিছু খারাপ, এ জগতে নিজের স্বার্থ ছাড়া কে ঘোরে ? ইহাও নিশ্চয় কোন স্বার্থ আদায়ের জন্যই এরূপ একটা মিথ্যা ছল। তাই অনাথের উপর সুশীলের পিতা মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। তাহার পর তাঁহারই আদেশানুক্রমে সুশীলের গলায় যে হারটী ছিল, তাহা খুলিয়া রাখা হইল।

পরে অনাথ একদিন সুশীলের মুখ হইতেই শুনিল তাহার বাবা তাহাকে আর এখানে আসিতে বারণ করিয়া দিয়াছেন। সুশীলেরও কাহারও সঙ্গ ছাড়া বাটীর বাহির হইতে নিষেধ। অনাথ এই সকল কথা তাহার নিকট হইতে জানিতে পারিয়া সজলনয়নে কম্পিত-পদবিক্ষেপে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় সুশীল আবার ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ও দাদা, তুমি যেন আর এখানে এসো না।"

অনাথ তাহার ছোট্ট হাত দুটী ধরিয়া বলিল, "না, আমি আর আসবো না।" এই কথা বলিয়া অনাথ তাহার পকেট হইতে একটী টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল।

সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি ?"

অনাথ বলিল, "টাকা।"

সুশীল ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সমুদ্রের তীর। তখন 'হু হু' করিয়া হাওয়া বহিতে-ছিল ; তাহার উপর আবার সমুদ্রের গর্জ্জন। অনাথ দেখিল তখনও সুশীল যাইতেছে। অনাথ সেখান হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "আমায় ভুলে যেতে চেষ্টা ক'র ভাই।" সমুদ্রের হাওয়ায় হয়ত সে সব কথা ভাল করিয়া শুনিতে পাইল না, তাই সে বোধহয় একবার ফিরিয়া চাহিল মাত্র। অনাথ আবার ভাবিল—না, না, আমিই ওকে ভুলতে চেষ্টা ক'রব।

এমনি করিয়া তাহার আর একটী ভাইকে বিদায় দিতে হইল দেখিয়া অনাথ আর তেমন বিচলিত হইল না। অনাথ বাড়ীতে আসিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। তাহার মামীমা তাহার নিকট হইতে সমস্ত কথা শুনিলেন, পরে হাত ধরিয়া অনাথকে তুলিয়া বসাইলেন, দেখিলেন তাহার চোখের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু টল্ টল্ করিতেছে। মামীমা তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "এ যে নকল ভুলা, অনাথ। আসল ভুলা, পালিয়ে গেল, আর নকল ভুলা যে তোকে এড়িয়ে পাশ-কাটিয়ে সরে যাবে সে আর আশ্চর্য্য কি।"

তার পরে অনাথ একদিন তার মামীমাকে বলিল, "চলুন মামীমা, আমরা ক'লকাতায় ফিরে যাই, আর এখানে থেকে কাজ নাই।"



টাহিটি*

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি টাহিটিতে পৌঁছলাম যখন, তখন আমার পকেটে মাত্র দু পাউণ্ড ছিল, আর ছিল নিউ জিল্যাণ্ড যাবার একখানা রিটার্ণ টিকিট। টাহিটি সম্বন্ধে চিরদিন অনেক কথা শুনে এসেছি, সাউথ সি' দ্বীপপুঞ্জের সেরা জায়গা হচ্ছে টাহিটি, সেখানে অন্ততঃ তিনটী সপ্তাহ কাটিয়ে যাব। কিন্তু তিন সপ্তাহের বদলে কেটে গেল ছ'মাস।

আমি টাহিটি গিয়েছিলাম সামোয়া দ্বীপপুঞ্জ থেকে। ছোট একখানা মালবাহী জাহাজ, ঘণ্টায় মাইল পনেরো যায় —যখন চীফ এঞ্জিনিয়ার খোসমেজাজে থাকে। জাহাজে মাত্র দুটি যাত্রী—আমি আর একজন তরুণ আমেরিকান লেখক। এই লেখকটী টাহিটিতেই বাস করে এবং দেশটাকে ভূস্বর্গ বলে মনে করে থাকে।

জাহাজ যখন টাহিটির কাছে এসেছে, তখন এই লোকটি বারো মাইল দূরবর্ত্তী মুরিয়া দ্বীপের দিকে আঙুল তুলে আমায় বললে—অমন জায়গা পৃথিবীতে আর নেই! কি সুন্দর! মনে রাখবেন আমার বাড়ী নিউ ইয়র্কে। আমরা নিউ ইয়র্কের বাহিরে কোনো জায়গা ভাল বলি না। আমি যখন বলছি ভাল, তখন জানবেন সত্যই ভাল জায়গা।

আমি বল্লাম—ভাল বই কি! খুব সুন্দর জায়গা!

তার পর মুরিয়া দ্বীপ সমুদ্রগর্ভ থেকে যেন ধীরে ধীরে জেগে উঠলো আমাদের চোখের সামনে। স্তরে স্তরে উঠেছে শ্যামল বৃক্ষ-লতা-মণ্ডিত শৈলরাজি, তাদের উত্তুঙ্গ শিখর-দেশ থেকে অসংখ্য ঝর্ণাধারা রৌপ্যসূত্রের মত নীচে নেমে আসছে, চারিধারে সুনীল সমুদ্র বিরাজমান, এই মরকতশ্যাম ক্ষুদ্র দ্বীপটাকে বেষ্টন করে। অদ্ভুত ধরণের সুন্দর!

এক ঘণ্টা কেটে গিয়েছে তার পর।

মুরিয়া দ্বীপ অনেক পিছনে পড়ে গিয়েছে—তখনও আমি বলছি,—সত্যি ভারি চমৎকার!

এই সময় আমাদের জাহাজ টাহিটি দ্বীপের রাজধানী প্যাপিটির দিকে সোজা চলেছে।

কিছুক্ষণ পরে আমরা প্যাপিটিতে নামলাম।

ছোট্ট জায়গা, বিশেষ কিছু দেখবার নেই। যারা এ সব জায়গায় আসবে আধুনিক ধরণের বড় বড় বাড়ী কিংবা কল-কারখানা, নতুন ধরণের রাস্তা, ড্রেন, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি দেখবার জন্যে, তারা খুবই নিরাশ হবে, কারণ এখানে আছে নীল সমুদ্রের মহিমা, সমুদ্র থেকে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা উঠেছে নীল আকাশের দিকে, দূরে আছে সমুদ্রবেলায় নারিকেল-কুঞ্জ, আর আছে প্রচুর সূর্য্যালোক, দেশটা না অতি গরম, না অতি ঠাণ্ডা।

এগুলো যদি বাদ দেওয়া যায় তবে প্যাপিটিতে থাকে কতকগুলো ঢেউ-তোলা টিনের কুশ্রী গুদামের ধরণের বাড়ী, চীনাম্যানদের কাফিখানা, দোকান, আপিস, ইউরোপীয়দের কয়েকটি ক্লাব। রাস্তার ধুলো উড়িয়ে কয়েকখানি ট্যাক্সি যেতে দেখা গেল। আর দেখা গেল অনেক লোক সাইকেলে করে যেন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছ' পেনি মাত্র দিলে সারা দিনের জন্যে এই সব সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়, —এটা অবশ্য পরে জেনেছিলাম।

একজন স্থূলকায় টাহিটিয়ান পুলিস কনষ্টেবল চীনাদের দোকান থেকে বড় একটা আইসক্রিম কিনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তৃপ্তির সঙ্গে জিভ দিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছে। দেখে মনে হয় না এই নিভৃত শান্তিকুঞ্জে পুলিসম্যানের কোনো কঠিন কর্ত্তব্য পালনের তাড়া আছে।

*অ্যালান বার্জেসের বিবরণ হইতে











উপরে : টাহিটির দুইটি নিসর্গ-দৃশ্য
নীচে—বামে : মাছ ধরা
দক্ষিণে : টাহিটির একটি আধুনিক গৃ

তাই বলছিলাম, অনেক জায়গায় বেড়িয়েছি বটে, কিন্তু টাহিটির সৌন্দর্য্য, টাহিটির বিশেষত্ব বর্ণনা করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কারণ দেশটাই অসম্ভব ধরণের অন্য রকম। পৃথিবীতে এর মত আর একটী জায়গা মিলবে না।

তুমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকতে পারো পর্ব্বতমালার দিকে, সূর্য্যালোকের দিকে নীল সমুদ্রজলের ওপর আধ-জাগা প্রবালের বাঁধের দিকে—চেয়ে চেয়ে তুমি বলতে পার স্বর্গ! সত্যিই স্বর্গ!

কিংবা তুমি কুশ্রী চীনা দোকানওয়ালার দিকে চেয়ে, ছেঁড়া পেণ্টালুন ও জামা পরা দেশীলোকের দিকে চেয়ে, ময়লা নর্দ্দামাগুলোর দিকে চেয়ে বলতে পারো—ওঃ এই সাউথ সি! ভা—রি! সবই নির্ভর করে দর্শকের প্রকৃতির ওপর।

আমার কথা আলাদা। আমি টাহিটিতে নেমে দম বন্ধ করেছিলাম, ছ'মাসের মধ্যে আর দম নিইনি। স্বর্গ সম্বন্ধে আমার যা ধারণা ছিল, টাহিটির সঙ্গে তার কোন তফাৎ আমি দেখিনি।

তবে আমার পকেটে মাত্র দু পাউণ্ড ছিল। দু পাউণ্ড মাত্র সম্বল করে স্বর্গে থাকতে গেলেও কিছু অসুবিধা ঘটে। পনেরো পাউণ্ড আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে না পেলে কষ্ট পেতে হত বই কি!

টাহিটিতে জিনিষপত্র যথেষ্ট শস্তা। ওখানকার ভাল হোটেলে আমার খরচ পড়তো সপ্তাহে ন'শিলিং মাত্র। হোটেল বলতে ইউরোপ বা আমেরিকায় যা বোঝায়, হয় তো প্যাপিটিতে তা পাওয়া যাবে না। এ হোটেল হোল একটা মাঝারি আকারের পাথরের বাড়ী, তাতে কয়েকটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর আছে, প্রত্যেক ঘরে একখানা শোবার খাট, একটা ড্রেসিং টেবিল, দু'একখানা চেয়ার আছে। নিকটের একটা চীনা রেস্তোরাঁতে এক শিলিং খরচে দিব্যি খাবার মিলতো।

কিন্তু আমার হাতে পয়সা ফুরিয়ে আসছে। সতেরো পাউণ্ডে কত দিন চালাবো?

মেল-বোট দেড় মাস অন্তর টাহিটিতে আসে। আমার হাতে যা আছে, অতদিন চলবে না। সুতরাং ঠিক করলাম আমার ইউরোপীয়দের মত ভদ্রলোক সেজে হোটেলে থাকলে চলবে না, দেশী লোকের মত থাকতে হবে। এতে দেশটা দেখবার সুযোগও পাব বেশী।

আমার তরুণ মার্কিন বন্ধুটীর নিকট বিদায় নিয়ে আমি ছোট একখানা নারকেল-ছোবড়া-বোঝাই মাল-জাহাজে চড়ে অন্য একটা দ্বীপের উদ্দেশে রওনা হলাম। কারণ প্যাপিটি শহর বাজার জায়গা, এখানে একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক অন্য ভাবে থাকতে পারে না, কিন্তু যে দ্বীপ আরও আদিম প্রকৃতির, সেখানে যা খুশী করা চলে।

জাহাজখানার মালিক জনৈক চীনা। দু'টী মাস্তুল আছে জাহাজটীতে। জাহাজের ডেকে আমরা রাত্রে বসে জ্যোৎস্নালোকে গীটার বাজাতাম, মাল্লারা দেশী ভাষায় গান করতো। বিভিন্ন দ্বীপ থেকে গরু, বাছুর, শূকর, মুরগী ওঠাতে নামাতে আমরা টাহিটি দ্বীপপুঞ্জের কত অসম্ভব ধরণের সুন্দর স্থান দেখতে দেখতে চলেছি।

টাহিটির প্রায় দুশো মাইল উত্তর-পশ্চিমে এক ভারী চমৎকার দ্বীপের অদ্ভুত-দর্শন শৈলমালা, পর্ব্বত-শিখর আমাদের চোখে পড়লো—যেতে যেতে।

দিক্‌চক্রবালের হাল্‌কা নীল রঙের পটভূমিতে দূরে সুদূর দ্বীপ দেখে মনে হচ্ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর দেশ ওই দ্বীপ।

হুয়াহিন্ দ্বীপে আমরা নোঙর করলাম। দেখতে বেশ জায়গা, জলের ধারে ঘন সবুজ গাছপালা ও নারিকেল-কুঞ্জ। তবে বাসযোগ্য স্থান নয়, খুব ময়লা, কুশ্রী ও অপরিষ্কার ঘর-বাড়ী ও চীনাদের দোকান ছাড়া আর কিছু নেই।

কয়েক মাইল দূরে পয়াটিয়া দ্বীপেও সেই অবস্থা—সেই চীনাদের বস্তি, চীনাদের দোকান। চীনারা কি প্রশান্ত মহাসাগরের সর্ব্বত্র দোকান ফেঁদে বসেছে!

অবশেষে এলাম বোরা-বোরা দ্বীপে। এখানে জাহাজ থেকে নামলাম এবং ঠিক করা গেল যদি দেশী লোকের পোষাক পরতে হয় তো এখানেই। সত্যই সুন্দর জায়গা! মাঝখানে একটা বড় পাহাড়, চারিধার থেকে আঁকাবাঁকা পাহাড়ের পার্শ্বদেশ সমুদ্রজল ছুঁয়েছে—নীচে প্রবালের বাঁধের মধ্যে বন্দী সমুদ্র নীল প্রশান্ত সরোবরের মত। সরোবরের ধারে ধারে শ্যামল নারিকেল-কুঞ্জ, তার তলায় দেশী লোকদের কাঠের ও খড়ের বাড়ী, কিন্তু চীনা দোকান একটীও নেই।

এখানেই থাকা ঠিক করলাম।

এখানকার ভাষা টাহিটিয়ান্, তবে কেউ কেউ একটু আধটু ফরাসী ভাষা জানে ও বলতে পারে। আমার পক্ষে এটা বড়ই মুশ্‌কিলের কথা দাঁড়ালো, কারণ আমি টাহিটিয়ান্ তো জানিই না, ফরাসী ভাষাও যা জানি, তাতে লোকজনের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা চলে না।

কিন্তু দেশী লোক হয়ে যাবো কি করে? ভাবনা হোল। যদি নারকেল গাছের সারির নীচে পাগলের মত নৃত্য করি, তবে এখনই দ্বীপে যে একটীমাত্র ফরাসী কনষ্টেবল আছে, ও এসে আমায় পাগল বলে গ্রেপ্তার করবে।

অবশেষে এক জন দেশী লোক পাওয়া গেল, তার নাম টিফেন্। সে এবং তার স্ত্রী সামান্য ইংরাজী বলে। তাদের ছোট্ট কুটীরে আমায় ওরা রাখতে চাইলে—কিন্তু আমি দেশী খাদ্য খেতে পারব তো?

খুব পারবো, কিন্তু একটা কথা। আমার কাছে একটী সিকি-পয়সাও নেই। তাদের খাবারের দাম দেওয়ার কি হবে?

ওরা বললে, খাবারের পয়সা? সে দিতে হবে না।

আমি বললাম, সে কি? খাবো তার দাম দেব না?

ওরা আমায় বুঝিয়ে দিলে তাদের খাবার কিনবার দরকার হবে না। তারা যা খায় তা তাদের ক্ষেতে উৎপন্ন হয়, নয় তো সমুদ্র থেকে ধরা হয়। তার আর দাম কি? পয়সা আমার রেখে দেওয়া দরকার প্যাপিটির জন্যে, কারণ প্যাপিটি ভীষণ খরচের জায়গা।

অবশেষে আমি তাদের নিকটবর্ত্তী চীনা দোকান থেকে টিনবন্দী খাদ্য যা কিছু ছিল সব কিনে দিলাম—সে খাদ্যও বেশী কিছু নয়—সার্ডিন মাছ।

ছ' সপ্তাহ ধরে আমি তারপর রোজ রোজ দ্বীপের শান্ত ও নিরুদ্বেগ জীবন যাত্রার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে ফেললাম।

সে জীবনের কথা এখানে বর্ণনা করি।

প্রায়ই সকাল হবার কিছু আগে আমরা উঠে—আমি আর টিফেন—আধ-অন্ধকারের মধ্যে নারিকেল বাগান ও ভ্যানিলা ক্ষেতের পাশ দিয়ে দূরের পাহাড় ও জঙ্গলের দিকে চলে যেতাম। টিফেনের বগলে থাকতো তার প্রিয় লড়াইয়ে মোরগটী।

পাহাড়ে পৌঁছে মোরগটীকে একটা লম্বা দড়ি দিয়ে গাছের গায়ে বেঁধে আমরা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতাম। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে লড়াইয়ে মোরগ বুঝতে পারত যে, সে সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর মোরগ। চুপ করে না থাকতে পেরে সে এই সংবাদ তারস্বরে ঘোষণা করতে শুরু করতো।

বোরা-বোরা দ্বীপের পাহাড় জঙ্গল বন্য মোরগে ভর্ত্তি। সুতরাং শীঘ্রই আমরা দূরে অন্য একটা মোরগের চীৎকার শুনতে পেতাম। তার অধিকৃত রাজ্যে কোন্ বর্ব্বর এমন অসভ্যের মত নিজের মহিমা কীর্ত্তন করতে শুরু করেছে! সে কি জানে না এখানে কে আছে?

অল্পক্ষণের মধ্যে আর একটা চিত্র-বিচিত্র-পালক-ওয়ালা প্রকাণ্ড বন-মোরগ বনের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে এসে হাজির হোত এবং সেও চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিত যে বিপক্ষকে সে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করছে।

তারপরেই যুদ্ধ আরম্ভ হোত এবং আগন্তুক যোদ্ধা-মোরগটী তার বীরত্ব সত্ত্বেও আমাদের টাঙানো দড়িতে এমন জড়িয়ে পড়তো যে আমরা গিয়ে সহজেই ধরে ফেলতাম এবং সে দিন আমাদের খাদ্যরূপে সেটী ব্যবহৃত হোত।

এক দিন আমি গ্রামের আরও অনেক তরুণ যুবকের সঙ্গে মাছ ধরতে গেলাম। একটা প্রকাণ্ড জাল আমরা পেতে রাখলাম প্রবালের বাঁধের গায়ে, আর সকলে মিলে অন্য দিক্ থেকে মাছ তাড়িয়ে এনে আমরা জালে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলাম। আধ মাইল দূর থেকে আমরা ডোঙায় বসে পা দিয়ে জল ছপ্ ছপ্ করতে করতে ক্রমশঃ জালের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলাম—আর সামনে মাছের ঝাঁক ভীত তিতির পাখীর মত সামনে দিয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে জালের মুখে গিয়ে পড়ল।

অত মাছ এক সঙ্গে থাকে বা জালে ধরা যায়, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

আর এক ধরণের মাছ ধরা আছে তা ভারী আমোদজনক বটে, কিন্তু তাতে বিপদ অনেক বেশী। গ্রামের অনেকে

মিলে এক দিন আমরা সে ধরণের মাছ ধরতেও গিয়েছিলাম। মুক্তা ডুবুরির মত চোখে কাঁচের পুরু চশমা পরে, ছোট বর্শা হাতে সমুদ্রের তলায় ডুব দিয়ে বর্শা দিয়ে মাছ গাঁথতে হয়। সে আনন্দের তুলনা নেই। কতবার গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে আমি সমুদ্রে নেমেছি, সমুদ্রের স্বচ্ছ-নীল জলরাশির তলায় পুষ্পিত প্রবাল-ঝোপের উপর বসে আমার চারি পাশে নানা বিচিত্র রঙের মাছের ঝাঁক দেখে বিস্মিত, পুলকিত হয়েছি, হাতের বর্শা হাতেই থেকে গেছে, ব্যাপারটার অভিনবত্বে এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি যে শিকারের কথা মনেই নেই।

মাঝে মাঝে গভীর গুহার মত অন্ধকার রাস্তা, দু'ধারে প্রবালের উঁচু দেওয়াল, গুহার মধ্যে কত দূর নেমে গিয়ে মনে হয়েছে সমুদ্রগর্ভের সহস্র বিপদের কথা, গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদ্রতলের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মধ্যেও ছদ্মবেশে মৃত্যু লুকিয়ে আছে। হাঙর আছে, রাক্ষুসে কাঁকড়া আছে, ক্লাম বা রাক্ষুসে শামুক আছে—এদের যে কোনোটার সামনে বেকায়দায় পড়লে নিষ্ঠুর মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই।

এক দিন পড়েছিলাম ষ্টিং-রে (Sting-ray) বলে অতি হিংস্র মাছের সামনে। এই জাতীয় মাছের দীর্ঘ লেজের গোড়ায় ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ শক্ত কাঁটা থাকে; লেজের এক সজোর ঝাপটায় সেই কাঁটা বিঁধিয়ে দিলেই মৃত্যু!

জলের তলায় দেখি হঠাৎ কোন্ দিক থেকে মাছটা আমার সামনে এসে পড়েছে। ওর শরীরটা যেন একখানা কালো কম্বলের মত অনেকখানি জুড়ে স্বচ্ছ জলের মধ্যে অন্ধকার সৃষ্টি করে, আমার দিকে হিংস্র দানবের মত এগিয়ে আসছে। প্রকাণ্ড লেজটা ওর পিছন দিকে চাবুকের মত এদিক্ ওদিক্ জল কাটছে। আমার এক জন টাহিটিয়ান্ বন্ধু আমার বিপদ দেখে আমার সাহায্যে ছুটে না এলে শেষ পর্য্যন্ত কি ঘটতো বলা যায় না। তারই বর্শায় মাছটা মারা পড়ল।

সে রাত্রে সমুদ্রতীরের নারিকেল-কুঞ্জের তলায় প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করা হোল।

আমাদের যত মাছ সেখানে এনে জড় করে রান্নার পর্ব হোল শুরু। সে যে কত ধরণের রান্না! সেদ্ধ মাছ, ভাজা মাছ, পোড়া মাছ, লেবুর রস ওপর থেকে ফেলে বিনা নুনে কাঁচা মাছ। মাছের অত বড় ভোজ আমি কখনো খাই নি।

মনের আনন্দে বসে মাছ খেতে খেতে ষ্টিফেন একটা বড় হাঙরের গল্প জুড়ে দিলে। সে হাঙরটা একটা জাহাজের মত বড় ছিল না কি। একখানা ডোঙার পিছনে তাড়া করে সেটা এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপ পর্য্যন্ত যায়। ডোঙার লোকে আঁকাবাঁকা ভাবে ডোঙা চালিয়ে সে যাত্রা না কি সেই ভয়ানক রাক্ষুসে হাঙরের হাত থেকে উদ্ধার পায়।

অবশ্য, ষ্টিফেন এ গল্প কাউকে বিশ্বাস করতে বলে নি, সে মনের আনন্দে বলেই চলেছিল।

অবশেষে আমি একদিন প্যাপিটি শহরে ফিরলাম।

আসবার সময় বোরা-বোরা দ্বীপের বন্ধুদের কাছ থেকে একখানা পরিচয়পত্র এনেছিলাম টাহিটি দ্বীপের এক জন সর্দ্দারের নামে। সর্দ্দারটা অত্যন্ত নির্জ্জন স্থানে বাস করেন।

এক দিন একখানা বাস সেখানে যাচ্ছিল, আমি তাতেই উঠে চললাম সর্দ্দারের সঙ্গে দেখা করতে। প্রসঙ্গক্রমে বলে নি, টাহিটির একমাত্র রাজপথে মোটর-বাস চলে। এই রাজপথটা টাহিটি দ্বীপকে বেষ্টন করে রাজধানী প্যাপিটিতে ঘুরে এসেছে।

তবে মোটর বাস বলতে লণ্ডন বা নিউ ইয়র্কের বাস বলে কেউ ধারণা করবেন না—আমার মনে হয়, কোন দেশেরই বাসের সঙ্গে ওর তুলনা চলে না। এর মাথার ওপর একটা কাঠের ছাউনি আছে এই পর্য্যন্ত, অন্য সব দিক্ একেবারে খোলা। ঝড় বৃষ্টি বা রোদ থেকে যাত্রী বেচারীর নিষ্কৃতি পাবে না।

বাসের ছাদের নীচে আছে যাত্রীরা, ওপরে বোঝাই নারিকেলের ছোবড়া-বোঝাই থলে, কলার কাঁদি, তরিতরকারী, যাত্রীদের সাইকেল, মোট, গাঁটরি।

যাত্রীও ঠাসাঠাসি করে বসেছে। তাদের মধ্যে টাহিটিয়ান আছে, চীনা কুলি বা দোকানদার আছে, দু' এক জন ইউরোপীয় ব্যবসাদারও আছে। এদের মধ্যে অনেক মাতাল প্রায়ই থাকে, তাদের বসিয়ে দেওয়া হয় পিছনের সিটে। গুড়ের কলসীর মত যাত্রী বোঝাই করা হয়—তার পর যখন যাত্রী বোঝাই বাস ছাড়বার সময় হয়েছে, তখন এক জন

টাহিটিয়ান্ তরুণী এসে বাসে উঠলো এবং যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে তা হলে তোমার কোলে বসে যেতে তার কোনো আপত্তি হবে না। বাসে জায়গা না থাকলে কি করা যাবে ?

তার পর বাস ছাড়লো। টাহিটিয়ান যাত্রীরা একযোগে চীৎকার করে গান শুরু করলে। আমরা ফরাসী কোর্ট, কাছারী, থানা ছাড়িয়ে ক্রম্ রোডে গিয়ে পড়লাম—সে পথটা সমুদ্রের ধারের নারিকেল বৃক্ষরাজির নিবিড় ছায়ায় ঘুরে ঘুরে গিয়েছে, দূরে ঝক্‌ঝকে সাদা প্রবালবাঁধ ও নীল সমুদ্রের ওপারে মুরিয়া দ্বীপের অস্পষ্ট সীমারেখা চোখে পড়বে।

পথের মধ্যে এক জন মাতাল যাত্রী বাস থামিয়ে একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে কার সঙ্গে গল্প করতে গেল। ড্রাইভার তাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলে। পাঁচ মিনিট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, লোকটা এল না দেখে ড্রাইভার নিজে নেমে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে লোকটাকে বার করে আনলে। আর কিছু দূর গিয়ে একটা বৃদ্ধার পুঁটুলি বাস থেকে কি করে পড়ে গেল। সুতরাং আমাদের বাস্ ঘুরিয়ে যেতে হোল পুঁটুলিটার খোঁজে। এক জায়গায় একজন চীনাম্যান ভুল করে অন্য কার একটা মোট নিয়ে বাসে ঢুকলো যখন ভুলটা ধরা পড়ল তখন বাসসুদ্ধ লোকের কি হাসি!

সময় নষ্ট হচ্ছে সে দিকে কারো দৃষ্টি নেই। টাহিটিতে সময়ের জন্যে কেউ গ্রাহ্যও করে না। তাড়াতাড়ি করবার কি দরকার ? এমন চমৎকার সূর্য্যালোক, এমন সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস বইছে এখানে তাড়াতাড়ি করে কি হবে ?

কাল তো আবার একটা এমনি দিন পাওয়া যাবে, সূর্য্য আবার এমনই আলো দেবে।

পরবর্তী ক্ষুদ্র উপদ্বীপের সঙ্গে টাহিটি দ্বীপের সংযোগ স্থাপন করেছে টারাভাও বলে একটি যোজক—এখানে আমি মোটর ছেড়ে দিলাম। রাতটা কাটিয়ে দিলাম একটা চীনা কাফি-খানায়। পরদিন দীর্ঘ ধূলিময় পথ বেয়ে পায়ে হেঁটে চললাম পূর্ব্বোক্ত সর্দ্দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আমি অবিশ্যি এ আশা করিনি যে সর্দ্দারের নাকে খুব বড় একটা আংটা পরানো থাকবে, কিন্তু অন্ততঃ তাকে টাহিটিয়ানের মত দেখাবে এ আশা করা আমার পক্ষে অন্যায় ছিল না। তা নয়, সর্দ্দার হ্যাম্বলিনের চেহারা ও সাজপোষাক উপন্যাস-বর্ণিত অবসর-প্রাপ্ত বৃদ্ধ ব্রিটিশ কর্ণেলের মত। তাঁর পরণে সাদা পেণ্টালুন, সাদা সার্ট, সাদা সোলার টুপি। লাল মুখ, নীল চোখ, সাদা চুল, সাদা লম্বা গোঁফ, ব্রিটিশ কর্ণেলের বাকি রইল কি ?

সর্দ্দার হ্যাম্বলিন আমায় ফরাসী ভাষায় সম্বোধন করে বললেন—আপনি কি করছেন টাহিটিতে ?

কিছুক্ষণ তার সঙ্গে গল্প-গুজব করে আমি বিদায় নিলাম।

কিছুদূরে আর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম—সেখানে একটী ক্ষুদ্র ইউরোপীয় উপনিবেশ আছে।

একটী আমেরিকান দম্পতীর সঙ্গে সেখানে আলাপ হোল, মিঃ ও মিসেস্ সেক্রিষ্ট। মিঃ সেক্রিষ্টের একটা অদ্ভুত খেয়াল হচ্ছে নানা দেশের মৌমাছির রাণী রপ্তানী করা। খুব ভাল ইটালিয়ান মৌ-রাণী দেখা গেল মিঃ সেক্রিষ্টের কাছে, লম্বা লম্বা পা, কোমর সরু, মিশ্ কালো চেহারা, একেবারে বড় অভিজাত বংশের মেয়ে। সঙ্গে এক একটী মৌ-রাণীর পঞ্চাশটী করে পুরুষ ভৃত্য।

মিঃ সেক্রিষ্টের মৌ-রাণী বহু দূর দূরদেশে যায়—আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যাণ্ড।

এঁদের বাড়ী থেকে কিছু দূরে এক জন তরুণ ইংরেজ চিত্রকর বাস করে, তার নাম গ্রেহাম। তার ইতিহাস যা শোনা গেল আমার কাছে বড় অদ্ভুত মনে হল।

পনেরো বছর ধরে সে লণ্ডনের একটি চা ও কাফির গুদামে চাকুরী করেছিল। সারা দিন হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বেচারী একটী নৈশ শিল্প-বিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কন শিখতো। কিন্তু কিছু দিন যাবার পরে গ্রেহাম দেখলে যে লণ্ডন শহরে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ চিত্র-শিল্পীর সংখ্যা উইঢিবিতে উইপোকার মত অসংখ্য। এখানে থাকলে কিছু করা যাবে না।

তখন অতি কষ্টে সে দুশো পাউণ্ড সঞ্চয় করলে এবং সেই দুশো পাউণ্ড সম্বল করে টাহিটির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো। এখানে এসে সে উন্নতি করেছে। তার ছবি বেশ ভাল দামে বিক্রী হতে শুরু হয়েছে। গ্রেহামের বাড়ীর দুশো গজ দূরে একটী আমেরিকান্ পরিবার বাস করে, মিঃ ও মিসেস্ পার্মনস্ এবং তাঁদের দুটী তরুণী কন্যা।

এঁদেরও ইতিহাস শোনবার যোগ্য বটে।

তিন বৎসর পূর্ব্বে এঁরা ছিলেন কালিফোর্ণিয়ার এক শহরে। হঠাৎ তাঁদের ইচ্ছে হোল সভ্যতার কোলাহল থেকে দূরে কোথাও গিয়ে নীল সমুদ্রতীরে শ্যামল নারিকেল-বনের ছায়ায় ঘর বেঁধে কাব্যিক জীবন যাপন করবেন। যেমন ভাবা, অমনি ঘর-বাড়ী বিক্রি করে টাহিটি রওনা।

এখানে তাঁদের বাড়ী বাঁশের ও তালপাতায় তৈরী। বাড়ী তৈরী করতে খরচ হয়েছে চার পাউণ্ড দশ শিলিং মাত্র। বাড়ীর সংলগ্ন ছোট্ট একটু জমিতে তরি-তরকারী উৎপন্ন হয়। গরু আছে দু'টী, হাঁস মুরগী আছে।

সারা বছরে এই পরিবারের খরচ পড়ে মোটে পঁচিশ পাউণ্ড।

ইউরোপ ও আমেরিকার লোকের কাছে এটা উপকথার মত শোনাবে বটে, কিন্তু টাহিটিতে এ কথা নতুন নয়।

আর একজন ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করলাম।

তাঁর একটা এক-কামরাওয়ালা বাড়ী আছে। তিনি আমায় বললেন, পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক মাসে মাসে দিয়ে তুমি বাড়ী-টাতে থাকতে পার, তবে যদি তোমার এখন টাকা না থাকে, তাতেও কোন ক্ষতি নেই।

হিসেব করে দেখলাম পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক প্রায় দু'শিলিং। দু' শিলিং মাত্র মাসিক ভাড়ায় একখানা ঘর পাওয়া শুধু টাহিটিতেই কল্পনা করা যায়।

ঘরখানা ভাড়া নিয়ে কয়েক সপ্তাহ সেখানে কাটিয়ে দিলাম।

গ্রাম থেকে কলা ও পেঁপে সংগ্রহ করতাম। দুধ আমায় যোগান দিতেন সেই ফরাসী ভদ্রলোকই। নিকটবর্ত্তী একটী চীনা দোকান থেকে টিনবন্দী খাবার কিছু কিছু কিনতাম।

এই বার একবার সর্দ্দার হ্যাবলিনের সঙ্গে দেখা করে আমি টাবাতাও গিয়ে বাস্ ধরলাম।

টাহিটির পশ্চিমপ্রান্তে একটী গ্রাম আছে—তার নাম টান্টিরা। সে দিকে লোক জন বেশী নেই—অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ও বন্ধ অঞ্চল। ওই গ্রাম দেখবার অত্যন্ত ইচ্ছা হোলো আমার মনে।

বাস্ কিছু দূর গিয়ে আমায় পথে নামিয়ে দিলে।

বড় বড় পাহাড় আর ঘন জঙ্গল—বাস্ সে পথে যেতে পারে না—পথ বলে কিছু নেইও। টান্টিরা গ্রামখানি বড় সুন্দর জায়গায় অবস্থিত, দেখতেও বড় সুন্দর। গ্রামের চার ধারে বড় বড় আম গাছ—ঘাস ভরা সবুজ মাঠ, গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে। ফুলের বাগানে।

আমি শুনেছিলাম টান্টিরা গ্রাম থেকে কিছু দূরে মঁসিয়ে ফ্রেডরিক বলে এক জন ফরাসী ভদ্রলোক একা বাস করেন। তিনি নিউডিষ্ট অর্থাৎ উলঙ্গদলভুক্ত লোক। বস্ত্র পরিধানে বীতশ্রদ্ধ এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের সঙ্গে দেখা করাই ছিল আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

বড় বড় পাহাড়ের তলা দিয়ে, নদীর ধার দিয়ে আমি সেখানে গেলাম। প্রাচীন কালে টাহিটি দ্বীপের এই অঞ্চলে অনেক লোকের বাস ছিল—এখনও জঙ্গলের মধ্যে অনেক ঘর বাড়ীর ভগ্নস্তূপ দেখা যায়।

দশ মাইল পথ অতিক্রম করলাম।

একে ওকে জিজ্ঞেস্ করি, মঁসিয়ে ফ্রেডরিক থাকেন কোথায়?

নাম শুনে সবাই হাসে।

দুটী নদী পার হয়ে অবশেষে যখন আমি মঁসিয়ে ফ্রেডরিকের কুটীরে পৌছলাম তখন আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, আমার আপাদমস্তক জলে ভেজা। মঁসিয়ে ফ্রেডরিক আমার অবস্থা দেখে বল্লেন—বেজায় ভিজে গিয়েছে কাপড় চোপড়, ওসব খুলে ফেলুন, খুলে রোদে দিন।

অতি ক্ষুদ্র এক কৌপীন মঁসিয়ে ফ্রেডরিকের পরিধানে। বেশ লম্বা সোনালী রঙের দাড়ি, নীল চোখ, সোনালী রঙের লম্বা চুল। গায়ের রঙ্ রোদেপোড়া কটা।

খুব ভাল লোক মঁসিয় ফ্রেডরিক। এমন আন্তরিক আতিথেয়তা আমি বেশী জায়গায় পাইনি। তিনি আমায় খুব আগ্রহের সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন—আমি যার কোনো খোঁজই রাখি নে।

মঁসিয়ে ফ্রেড্রিক জাতিতে ফরাসী। ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলতে পারেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখানে এ ভাবে আছেন কেন?

উনি বল্লেন—এই আমার ভাল লাগে। আগে যখন ফ্রান্সে ছিলাম, তখনও এই ভাবেই ছিলাম। তবে টাহিটির আবহাওয়া আমার মত জীবনযাপনের পক্ষে অনুকূল।

তিনি চুবড়ি আলু, মিষ্টি আলু ও কলার চাষ করেন। ছোট্ট একটুকরা জমি আছে কুটীরের পাশেই। প্রায়ই সমুদ্রে প্রবাল-বাঁধে মাছ ধরতে যান। আমি যে সময়ে গেলাম তখন তিনি মাছ ধরবার সুবিধার জন্যে একটা ডোঙা তৈয়ারী করছিলেন। ডোঙা তৈরী শেষ হয়ে গেলে তিনি তাঁর কুঁড়ে মেরামত করবেন, সে কাজ শেষ হয়ে গেলে একখানা মাছ-ধরা জাল বুনবেন।

ম'সিয়ে ফ্রেডরিকের হাতে অনেক কাজ। সময় নিয়ে কি করবো এ ভাবনা তাঁকে ভাবতে হয় না। তিনি পনেরো বছর ধরে সেখানে বাস করছেন, সেখানেই দেহান্ত পর্যান্ত বাস করবেন এই ইচ্ছে। তিনি আমায় খেতে দিলেন মাছ, আলু সিদ্ধ, নারিকেল দুধের ক্ষীর—রাত্রে থাকবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হোলো না—কারণ ম'সিয়ে ফ্রেডরিক বেশী কথা বলেন না, এদিকে চুপ করে থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব।

টানটিরা দ্বীপের সর্দ্দারের বাড়ীতে রাত কাটালাম। চাঁদ উঠেছিল, একজন তরুণ যুবক গীটার বাজিয়ে দেশী গান গাইছিল—এই তো জীবন।

সাউথ সি' অঞ্চলে এসেছিই তো এই জীবন আস্বাদ করতে।

ঘরের শোভা

—শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

আমাদের ঘরের শোভা,
কা'রা দেয় তাই বলে যাই;
ক্রোটন্, হাস্নুহানা
টবে ত হেথায় রে নাই।

লাউয়ের শতেক লতায়
ঢেকেছে আঙিনাটী;
পারুল ওই উঠছে চালে
দেখ তারে পারিপাটী।

শিম আর ওই কিঁদুরী
দু'টী বোন পাশাপাশি;
ঈর্ষায় বাড়ছে দোঁহে
দেখতে ভালবাসি।

কলা সদর দ্বারে
গড়েছে তোরণ ভালো;
ঝেলু প্রাচীর-গায়ে
ঝুলিছে কালো কালো।

কাঁকুড়ের ওই লতাটী
কারো চোখ এড়ায় না যে;
দেয়ালের পান্‌পড়নে
ঝিঙাফুল ফুটে সাঁঝে।

বৃদ্ধ ওই শজিনা
কোণেতে ঠেসিয়া আছে;
কুমড়া মাচান ছাড়ি,
আগায় রোজ তারি কাছে।

আমাদের ঘরের শোভা
দৈন্যে দেয় ভুলায়ে;
আমরা কাটাই যে দিন
আনাজের হাট বসায়ে।

সুরমার সংসার

—শ্রীঅমূল্য গুপ্ত

সুরমা রাঁধিতেছে। রাঁধিতেছে কথাটা হয় তো ঠিক বলা যায় না; উনানে কতগুলি লতা-পাতা গুঁজিয়া আগুন ধরাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছে। ছোট বাঁশের চোঙ্গ দিয়া বার বার ফুৎকার দিতেছে, কিন্তু আগুন ধরিবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ঘর ধুঁয়ায় আচ্ছন্ন, যেন সমস্ত ঘরখানি কুয়াশায় ঢাকিয়াছে। সুরমার চোখ জ্বালা করিতে থাকে—রাঁধিবার ইচ্ছা দূরে চলিয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই স্বামী-পুত্রের কথা মনে পড়ে। আর কি বসিয়া থাকা চলে?

"মা বড্ড খিদে পেয়েছে," বলিয়া একমাত্র পুত্র নরু আসিয়া দাঁড়াইল।

"যা বাবা আর একটু পড়ে আয়।" সুরমা নরুকে ফিরাইল বলিয়া নিজের অক্ষমতার জন্য রাগ হইতে লাগিল। কেন সে পাতাগুলি রোদে দেয় নাই সময় মত। ছেলেকে ক্ষুধার সময় খাইতে দিতে পারিল না—সে যে মাতার পক্ষে কিরূপ অপরিসীম লজ্জার কথা তাহা সেই জানে। সংসারের অবস্থা সে ভাল ভাবেই জানে। অনটনের সংসারে চাউল হয় তো রোজ কিনিবার ক্ষমতা থাকিবে না, কাঠ কিনিবে কোথা হইতে: ভাবা তাহার উচিত ছিল।

সুরমার কপাল ভাল, আগুন বিদ্রোহ না করিয়া ধরিল। ভাত আর শাকের ঝোল রাঁধিবে। রান্না করিতে বেশী সময় লাগিল না। নরুকে ডাকিয়া খাইতে বলিল।

"আমি এখন খাব না, বাবা এলে বাবার সঙ্গে খাব," নরু বলিল।

"হাঁ, তার সঙ্গে না খেলে পেট ভরবে কোত্থেকে?" স্বামীর কথায় সুরমা ভীষণ রাগিয়া উঠিল। দিনরাত আড্ডা, ঘর-সংসার কি ভাবে চলে, খবর রাখে না, যেন সে সবের বাহিরে। শুধু দু'টী খাইতে বা বাড়ী আসে, নচেৎ বাহিরে বাহিরে দিনের বেশীর ভাগ কাটায়। সুরমা মাঝে মাঝে রাগিয়া বলিত, "আর পারি না।" কিন্তু তাহাতে সত্যেনের কোন পরিবর্ত্তন সে দেখিতে পায় নাই। উপায় কি? অচল সংসারকে চালাইবার জন্য আবার সুরমা চেষ্টা করে। নাই, নাই, একথা যদিও সুরমা বলিত না, তবুও যেন চারিদিক হইতে তাহাই শুনিতে পায়।

পাঁচ বছর পূর্ব্বের কথা সুরমার মনে পড়ে। কি আদর-যত্নের মধ্যে লালিত হইয়াছিল শ্বশুর মশাইয়ের কোলে। অভাব ছিল না, অভিযোগ করার কারণ খুঁজিয়া পাইত না। কি ভালবাসিতেন শ্বশুর ঠাকুর। সুরমাকে [illegible] করিতে দিতেন না, পাছে তার সোনার অঙ্গে কালি ধরে। সে দিন আর আসিবে না, সুরমার রঙও বদলাইবে না। যতদিন বাঁচিবে, এই গোয়াল তাকে বাস করিবার জন্য পরিষ্কার রাখিতে হইবে। শ্বশুরের মৃত্যুর সহিত তাহারা নির্ধন। ভাশুরের আছে অনেক, কিন্তু আলাদা করিয়া দিয়াছিলেন তাড়াতাড়ি, পাছে সত্যেন ভাগ বসায়। ভাবিয়াছিলেন হয় তো সত্যেন এমন কি জীব যে, ঘরে বসাইয়া খাওয়াইতে হইবে। সত্যেন নির্লিপ্তভাবে সুরমা ও ছেলে নরুকে লইয়া নূতন সংসার পাতিল, যেন তাহার কিছুই হয় নাই। দুই বেলা খাইতে পায় কোন দিন, না হয় এক বেলা খাইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করে। সুরমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল স্বামীর আত্মমর্য্যাদা দেখিয়া।

সুরমার চিন্তার জাল ছিন্ন করিয়া নরু বলিল, "মা ভাত দাও।" ক্ষুধার জ্বালায় পূর্ব্বের কথা সে ভুলিয়াছে। ছেলেমানুষ, দশটা বাজিয়াছে, সত্যেনের আসার কোন লক্ষণ দেখিল না। নরুর লজ্জা করিতে লাগিল, কি বোকা আর একটু দেরিতে হয় তো চলিত।

ছেলের সামনে ভাত রাখিতেই বলিয়া উঠিল, "মা, রোজ রোজ কি তোমার এই খাবার ভাল লাগে?" নরুর দোষ কি? বয়সে ছোট, সংসারের অনটনের কথা সে ভাবিয়া দেখে নাই, বুঝিবার বয়সও তার হয় নাই। [illegible] মাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, কারণ মায়ের চোখের জলের কথা মনে পড়িয়া যায়। জানে মাকে জিজ্ঞাসা করিলে কাঁদিবেন। নরু বিজ্ঞ ছেলের মত শাক-ভাত খাইয়া শুইতে চলিয়া গেল। মাকে তো এখন বিছানার পাশে পাইবে না। বাবা আসিয়া না খাইলে মা রান্নাঘরে বসিয়া থাকে।

সুরমা খাদ্য আগুনের উপর চাপাইয়া, স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। স্বামী অপারক হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ঠাণ্ডা ভাত কি করিয়া খাইতে দিবে? তবু যদি সুখাদ্য কিছু থাকিত! এ যে একেবারে অখাদ্য, কিন্তু উপায় নাই। এই মাসে হয় তো তাও জুটিবে না, বর্ষার মধ্যে এ দিকে অনেকেই আসিতে পারিবে না, বা বৃষ্টি কি'রূপেই বা আসিবে? সুরমার ব্যবসাও বন্ধ, গ্রামবাসীদের জামা সেলাই করিয়া সুরমা সংসার চালাইত। দুঃখ-কষ্ট গরীবদের চিরদিনই সমান।

রাত একটা, সত্যেনের দেখা নাই। সুরমার রাগ হয়, কি করে এই মানুষটা? ঘরে কিছুই ছিল না, আর সে কি না তাহা জানিয়াও এত রাত অবধি বাড়ী ফিরিবার নামও করে না।

রাগ হইল সুরমার। উপায় নাই—সত্যেনকে অভুক্ত রাখিয়া সে খাইবে কি করিয়া? রান্নাঘরের মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া শুইল। রাজ্যের যত সব চিন্তা আসিয়া বার বার তাহার কাছে জড়ো হইল। আকাশকুসুম অনেক ভাবিল: কিন্তু কতক্ষণ হায়! সুরমার চোখে ঘুম নাই। নিজের অলীক কল্পনায় হাসিয়া উঠিল: কি ভাবছে বা তা?

সত্যেনের ডাকে রেহাই পাইল, চিন্তার হাত হইতে। দরজা খুলিয়াই বলিল, "রাত কত হ'য়েছে সে খেয়াল আছে? রোজ রোজ তোমার জন্ত ভাত নিয়ে কে বসে থাকবে? আমি এ ঝিগিরি করতে পারব না।"

সত্যেন যেন কিছুই শুনিতে পায় নাই; ঘরে ঢুকিয়া জামা-কাপড় ছাড়িয়া বলিল, "সুরমা বাজে কথা না ব'লে রাজার সম্মান কর। জান আজ রাতে আমি রাজা সেজেছিলুম। কি সম্মান, কি গর্ব্ব ছিল, কিন্তু পোষাক ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কি আমার রাজত্ব চলে গেল?"

সুরমার রাগ আরো বাড় বাড়িয়া: স্বামী কি এক মুহূর্ত্তও হাসির কথা ছাড়া কহিতে পারে না? পরমুহূর্ত্তে অনশন-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "গল্প রাখ, খাবে চল।"

সত্যেনকে ভাত বাড়িয়া দিল সুরমা। সত্যেন খাইতে খাইতে বলিল, "সুমো, তোমার হাতের রান্নার গুণ আছে, তা না হ'লে পোলাও মাংস ফেলে বাড়ীর শাক ভাত খেতে আসব কেন?"

"এ তোমার অন্যায়, রোজ রোজ শাক ভাত খাও, এক দিন না হয় মাংস খেয়ে আসতে?" সুরমা জানিত স্বামী কিছুতেই তাহা পারিবে না তাহাকে ফেলিয়া। সুরমার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

"ও কি তুমি কাঁদছ? আমরা বেশ আছি, দেখ তো দাদা তিন শো টাকা মাইনে পায়, কিন্তু কি সুখে আছে: দিনান্তে একটা মিষ্টি কথাও শুনতে পায় না বৌদির কাছ থেকে। সে সুখের সংসারের লাভ কি?"

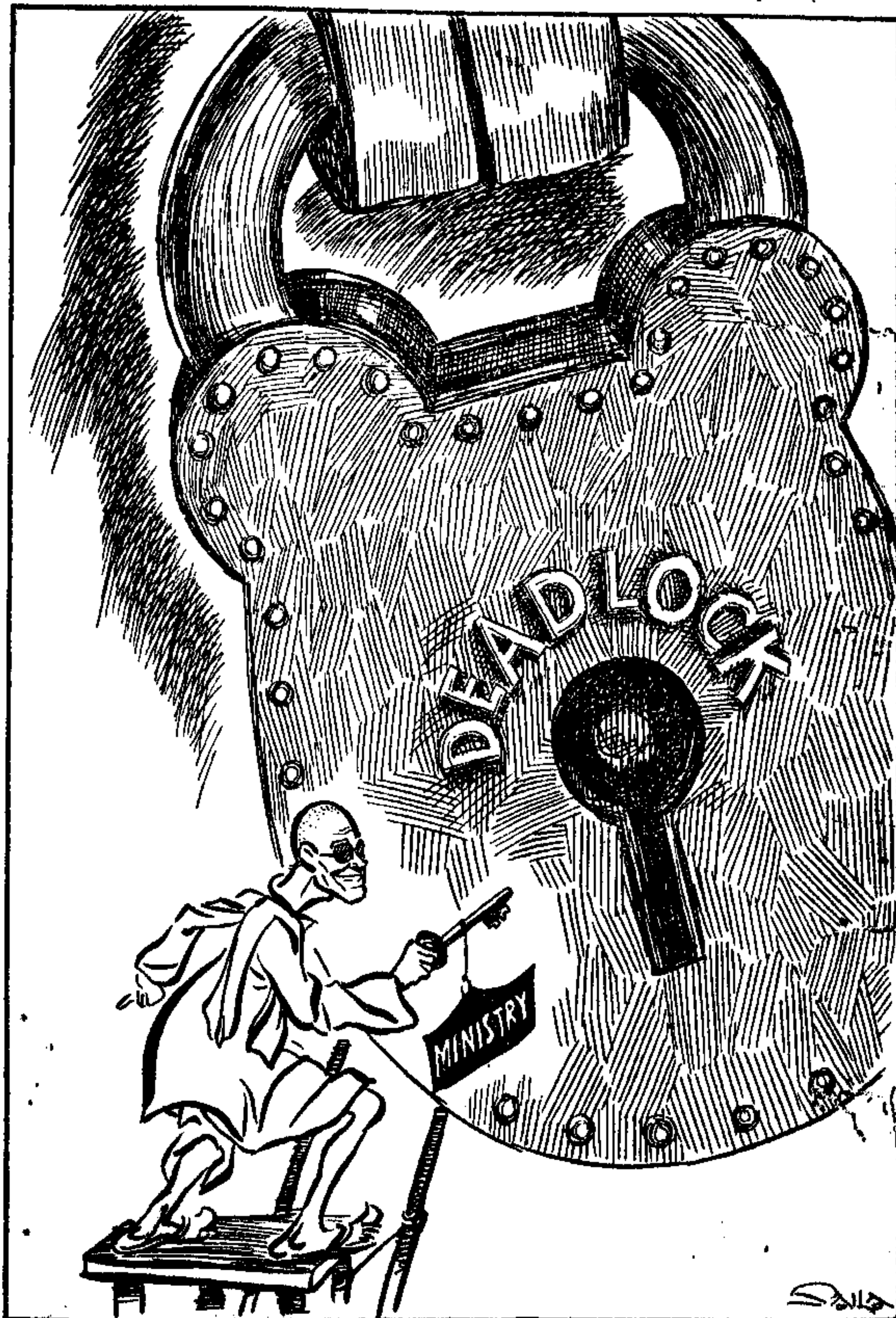
সত্যেন খাইয়া চলিয়া গেল রান্নাঘর হইতে। স্বামীর ভুক্তাবশেষ একটা থালায় লইয়া পরম আনন্দে সুরমা খাওয়া শেষ করিয়া শোবার ঘরে গেল। স্বামীর গর্ব্বে সুরমার বুক ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল কি সুখী সে। জন্ম জন্ম যেন এমন স্বামী পায়। বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, তাহারা যেন চির দিন এমন ভাবে থাকিতে পারে।

সুরমা পুকুর-ঘাট হইতে ফিরিয়া শুনিল ও বাড়ীর দিদি ঝিকে বলিতেছে, "মায়ের এবার আত্মমর্য্যাদা বোধ কোথায়? সে দিন খাবার দিতে গেলুম, বলা হ'ল অপরের দেওয়া জিনিষ নি না। কিন্তু ছেলেকে তো শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, অপরের দ্রব্য না বলে নিতে, এতে বোধ হয় দোষ নেই।" ক্রমশঃই দিদির গলা সপ্তমে চড়িতে লাগিল।

দিদির কথার উপর কথা বলা তার সাজে না, আপন মনে নিজের কাজে চলিয়া গেল। কিন্তু নরুকে সুরমার দরকার, সকাল হইতে তাহার দেখা নাই। দিদির কথায় মনে পড়িল তাই তো? নরু কি উহাদের কিছু লইয়াছে? বার বার নরুকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু নরু জানে সকালের ঘটনা মার কাণে পৌঁছিয়াছে আর রক্ষা নাই। বেঞ্চির তলায় লুকাইয়া রহিল। কি ভুল! লুকাইতে যাইয়া ভাবে নাই, মার চক্ষুতে ধুলা দেওয়া নরুর কাজ নয়। সুরমা বেঞ্চির তলা হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হতভাগা কি নিয়েছিস ওদের?"

"নিই নি, আবার ফিরিয়ে দিয়েছি। একটা লাট্টু নিয়ে খেলা করব ব'লে নিয়েছিলুম, ও আবার কেড়ে নিয়েছে জেঠি-মা।"

নরু মার কাছে সত্য কথা বলে নাই, ভাবিয়াছিল মা



তালা-চাবি

জানে না যে সে সত্যই লাট্টুটা চুরি করিয়াছিল। চুরি অতটা ভাবে নাই। উহাদের তো অনেকগুলি খেলার জিনিষ আছে, কিন্তু নরুর তো একটাও নাই। লইলেই বা দোষ কি? তাহার থাকিলে সে তো আর লইত না।

সুরমা বেত দিয়া প্রহার করিতে লাগিল, বলিল, "আর নিবি?" নরু যতই বলিতে থাকে, "আর নেব না।" মা-র সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সপাং সপাং বেত মারিতে থাকে। নরু আঘাত সহিতে না পারিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। সুরমা রাগে কাঁপিতে লাগিল, যেন ছেলেকে আজ শেষ করিয়া ফেলিবে; যাতে ভবিষ্যতে কাহারও জিনিষ আর না লয়। শেষে সত্যেন আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

বেত ফেলিয়া সুরমা তখন স্বামীকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল: "বাপ হওয়া তোমার সাজে না, যে ছেলেকে দু'মুঠো খেতে দিতে পারে না—তার আবার বিয়ে করা কেন? আমি চাই না এ ছেলে বাঁচুক।"

সুরমার কথায় সত্যেন কিছু বলিতে পারিল না। সত্যই তাহার আত্মমর্য্যাদা বাঁচাইবার জন্য সে কত পরিশ্রম করে, আর নরু কি না তাকে এত বড় ব্যথা দিল! কিন্তু নরুরই বা দোষ কি? তাহাকে যদি সে কিছু দিতে পারিত, আজ তাহা হইলে অপরের জিনিষ লইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার জাগিত না। অনটনের সংসারে সন্তানকে মানুষ করা কত কঠিন এই প্রথম সত্যেন ও সুরমা উপলব্ধি করিল। নরুর আশা আছে, সেই আশা মিটান বাপ-মায়ের কর্ত্তব্য। তারা কতটুকু করিয়াছে? মাত্র দু'মুঠো খাইবার আশা কোন ছেলেই রাখে না। চরিত্র তাদের খারাপ করিয়েছে দারিদ্র্য। কৃষ্ণ সম্মুখে কত প্রলোভনের জিনিষ দেখিয়া আসিতেছে দিন দিন, চাহে নাই একবারও, কিন্তু আজ তার এই দুর্গতির মূলে কি মা-বাপ নয়?

সুরমার কষ্ট হইতে লাগিল, কেন সে নরুকে মারিল? না হয় সামান্য একটা লাটিম লইয়াছিল, তার জন্য এত দূর অত্যাচার করা তাহার উচিত হয় নাই; সবচেয়ে দোষী নিজেরাই। নির্ব্বোধ ছেলেটার উপর অত্যাচার করা তো নয়, নিজেদের দুর্ব্বলতাকে আরও প্রশ্রয় দেওয়া। কি জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় আজ সে দিয়াছে! এমন আত্মভোলা স্বামীর মনে কষ্ট দেওয়া তাহার কি উচিত হইয়াছে। সত্যেনের পা জড়াইয়া সুরমা বলিল, "আমায় মাপ কর।"

"মাপ করার কিছুই হয় নি, তুমি অন্যায় কর নি এই টুকু জানি। এটা নরুর দোষ নয়। আজ থেকে তোমার মুখে হাসি ফোটানই আমার কর্ত্তব্য। শুধু তোমার নয়, নরুকে মানুষ করতে হবে।"

স্বামী তাকে ক্ষমা করিয়াছে জানিয়া সুরমার বুকের পাষাণ নামিয়া গেল। নরুকে কোলে করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া যাইতে যাইতে ভাবিল—সে সত্যই সুখী।

একটী কথা

—শ্রীনিশীথচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কুঁড়ি তখন হয়নি ফুলে শোভা,
গন্ধে তাহার জাগেনিকো প্রাণ,—
বিশ্ব ছিলো স্বপ্ন আঁখি-পাতে,
রূপ-মাধুরী লুপ্ত ম্রিয়মাণ॥
এল ভ্রমর কুঞ্জ-বীথি হ'তে
পরশ পেয়ে উঠলো ফুটে ফুল;—
জাগরণের মুক্ত আবাহনে
সত্য হলো,—নয়কো তাহা ভুল॥

একটী কথা হিয়ায় শুধু জাগে—
"স্বপ্ন যদি সত্য হেন হয়,
নিশীথ-তারা জাগল যারে পেয়ে
ঊষায় কেন তেমনি নাহি রয়?"
"মিলন-প্রাতে পেলাম আজি যাহা—
বিদায়-রাতে হবে কি তার শেষ—?
নিখিল মাঝে রইবে ব্যাকুলতা,
মরীচিকার পাগল-করা বেশ?"

যশোহর-পরিচিতি

—শ্রীসুশীলকুমার বসু

ব্রিটিশ-পূর্ব্ব যুগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পূর্ব্বকালে সুন্দরবন আরও উত্তরে প্রসারিত ছিল। অনেকে মনে করেন, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান সাগরদাঁড়ী সমুদ্রের উত্তর সীমা ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে কৃত টলেমির মানচিত্রে দেখা যায়, গঙ্গার দুইটি বৃহৎ শাখা ভাগীরথী ও পদ্মা দ্বারা গঠিত ব-দ্বীপের দক্ষিণাংশ নদ-নদী-জলরেখা দ্বারা এরূপ ভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ছিল যে, ঐ-অংশকে তৎকালে কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি বলাই অধিকতর সঙ্গত হইত। পূর্ব্বকালে যশোহরও নদ-নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন জলাভূমি ছিল বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ এই জলাভূমির দেশে তৎকালে জেলে ও মাঝি শ্রেণীর লোকের বিচ্ছিন্ন বসবাস ভিন্ন অন্য কোনও লোকের বাস ছিল না।

মহাভারত, রঘুবংশ ও কতকগুলি পুরাণে বঙ্গীয় ব-দ্বীপের এই অংশের উল্লেখ দেখা যায়। ঐ-সকল গ্রন্থ হইতে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে 'সুহ্ম' ও পূর্ব্ববঙ্গে 'বঙ্গ' এই দুইটি রাজ্যের সীমা খুব নির্দ্দিষ্ট ছিল না—রাজার শক্তি ও ক্ষমতানুযায়ী রাজ্যগুলির সীমারেখার পরিবর্ত্তন ঘটিত। বঙ্গবাসীদের তৎকালে নৌবহর ও গজারোহী সেনা ছিল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; আর সুহ্মেরা সমুদ্রের নিকটে, একটি বক্রনদীর (ভাগীরথী) তীরে জলাভূমিতে পরিপূর্ণ স্থানে বাস করিত। যশোহর সুহ্মের নিকটে অবস্থিত হইলেও, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে, রঘুবংশ প্রণয়নের কালে, বঙ্গের অধীন ছিল বলিয়া মনে হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের চতুর্থ দশকে চীনা-পরিব্রাজক হিউয়েন-সঙ্, বঙ্গদেশ পরিদর্শন কালে বঙ্গীয় ব-দ্বীপের দক্ষিণাংশে সমতট ও তাম্রলিপ্তি নামে দুইটী বৃহৎ রাজ্য দেখিতে পান। তাঁহার বর্ণনা হইতে দেখা যায়, সমতট নিম্নভূমির দেশ, সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ও প্রচুর ফল-পুষ্প-শস্য সমন্বিত। সমতটের জলবায়ু 'জলো' ও অধিবাসীদের ব্যবহার ভদ্রোচিত। অধিবাসীরা খর্ব্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু কষ্টসহ ও বিদ্যালাভার্থই উদ্যমশীল। কানিংহাম সাহেব যশোহরকেই সমতটের রাজধানী বলিয়াছেন, কিন্তু ফার্গুসন সাহেব সমতট হইতে কামরূপের দূরত্বের কথা বিচার করিয়া ঢাকা অথবা বিক্রমপুর পরগণার প্রধান শহরকেই সমতটের রাজধানী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সে যাহা হউক, সমতটের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে যশোহরের উত্তরভাগ, সমগ্রভাবে বা অন্ততঃ অংশতঃ যে, সমতটের অধীন ছিল এরূপ মনে করিলে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

সমতট ও বঙ্গ দুইটি বিভিন্ন রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গের অপর নামও সমতট হইতে পারে। নিম্ন সমোচ্চ ভূ-প্রকৃতির জন্যই হয় তো বঙ্গের এরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। সুতরাং বঙ্গের ব-দ্বীপের নদীবহুল অংশ,—যশোহর এই অংশে—যে, বঙ্গরাজগণের অধীন ছিল, ইহা অসম্ভব নাও হইতে পারে।

খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতকে বঙ্গ পালবংশের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। পরে সেনবংশ বঙ্গ ও রাঢ়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যশোহর হিন্দু রাজাদের অধীন ছিল। ১১৯৯-১২০০ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী, সেনবংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষদিকে, অকস্মাৎ রাজধানী নদীয়ায় উপস্থিত হন ও বিনা বাধায় নদীয়া বিজয় করেন। নদীয়া বিজয়ের পর বখতিয়ার খিলজী সমগ্র বঙ্গ জয় করেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। সমগ্র বঙ্গ যদি বখতিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্য যশোহরও এই সময় মুসলমান শাসনাধীনে আসে। কিন্তু বখতিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের গল্পে তথ্য ও সম্ভাব্যতা অপেক্ষা কল্পনারই প্রকাশ অধিক। বখতিয়ার খিলজী যে বঙ্গের কতক অংশ জয় করেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রাপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণী হইতে মনে হয়, এই অংশ সমগ্র বঙ্গের

আয়তনের তুলনায় নিতান্ত সামান্য। সুতরাং বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক 'বঙ্গ'-বিজয়ের সময় যে, যশোহরও তৎকর্তৃক বিজিত হইয়াছিল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না।

বখতিয়ার কর্তৃক যশোহর বিজিত না হইয়া থাকিলে, কোন্ সময় যশোহর মুসলমান শাসনাধীনে আসে তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু মুসলমানগণ কর্তৃক যশোহর বিজয়ের তারিখ যে, পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে, ইহা নিশ্চিত।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে যশোহরের দক্ষিণ অংশ খান্ জাহান আলী নামক জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল। যশোহরের এই অংশে খান্ জাহান আলী সাধারণতঃ খান্জা আলি নামে পরিচিত। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে চারি শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে সুন্দরবনের আবাদ পরিষ্কৃত ও চাষ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া খান্ জাহান আলী তথায় আগমন করেন। খান্ জাহান আলী ষাট হাজার লোক সঙ্গে লইয়া যশোহর জেলার মধ্য দিয়া যাত্রা করেন; ঐ-সময় এত অধিক লোকের চলিবার উপযোগী কোন পথ ঘাট না থাকায়, তাঁহাকে প্রতি পদে রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। খান্ জাহান আলীর এই অভিযান খুলনা জেলার বাগেরহাটে সমাপ্ত হয়; এবং তিনি ঐ-খানেই বসবাস করেন। যশোহরের বিভিন্ন স্থানে খান্ জাহান আলীর নাম জড়িত দেখিতে পাওয়া যায়। কেশবপুরের চারি মাইল পশ্চিমে বিদ্যানন্দবাটী ও যশোহর শহরের উত্তরে বড়বাজার খান্ জাহান আলীর স্মৃতির সহিত সংযুক্ত। ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী একটী রাস্তার ধ্বংসাবশেষকে লোকে খান্ জাহান আলী কর্তৃক নির্ম্মিত রাস্তার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। বৃদ্ধ বয়সে খান্ জাহান আলী সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফকিরের জীবন-যাপন করেন বলিয়া কথিত হয়। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে খান্ জাহানের মৃত্যু হয়। খান্ জাহানের সমাধি অদ্যাপি বাগেরহাটে বর্ত্তমান।

মুসলমান আমলে যশোহর সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য অন্য স্থান হইতেও পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী' অনুসারে উত্তর যশোহর 'সরকার মাহ্মুদাবাদ' ও দক্ষিণ যশোহর 'সরকার খিলাফতাবাদ'এর অন্তর্গত ছিল। যিনি মধুমতীর তীরে মাহ্মুদাবাদের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহারই নামানুসারে 'সরকার মাহ্মুদাবাদে'র নামকরণ হইয়া থাকিবে। 'আইন-ই-আকবরী' অনুসারে, শের শাহ্ কর্তৃক মাহ্মুদাবাদ বিজিত হয়। শের শাহের বিজয় কালে, এই স্থানের ভূ-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিবে। কারণ শের শাহের অভিযান বর্ণনা করিতে যাইয়া উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, মাহ্মুদাবাদের চতুর্দ্দিক জলাভূমিতে পূর্ণ থাকায় মাহ্মুদাবাদের সুদৃঢ়তা বর্দ্ধিত হইয়াছিল ও এই 'সরকারে' হস্তীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নদীর প্রবাহপথের ঘোর পরিবর্ত্তনই ভূ-প্রকৃতির এরূপ বিপর্য্যয়ের কারণ বলিয়া অনুমান হয়। নদীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া এই অংশে জলাভূমির আধিক্য ঘটায় চাষ-বাস পরিত্যক্ত হইল, জঙ্গল বৃদ্ধি পাইল, ফলে হস্তী-সংখ্যার প্রাচুর্য্য ঘটিল।

খিলাফতাবাদের নামকরণ সম্ভবতঃ খান্ জাহান আলীর নামানুসারে হইয়া থাকিবে। খিলাফতাবাদ অর্থাৎ 'রাজ প্রতিনিধির আবাদী দেশ।' খান্ জাহানই সর্ব্বপ্রথম সুন্দরবন অঞ্চল পরিষ্কৃত করিয়া আবাদের প্রচলন করেন্। মাহ্মুদাবাদ ও খিলাফতাবাদে 'টাকশাল' ছিল। এতদঞ্চলে এই দুইটী নগরে 'টাকশাল' থাকার কথা হইতেই অনুমান করা যায়, এ সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে ও ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে মুসলিম শাসনাধিকার এতদঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থান ঘটে ষোড়শ শতকের শেষ দিকে। কিংবদন্তী অনুসারে প্রতাপাদিত্যের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা নিম্নে দেওয়া হইল।

রামচন্দ্র নামক জনৈক পূর্ব্ববঙ্গীয় কায়স্থসন্তান, ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ নামক তিন পুত্রসহ বঙ্গরাজ সুলেমন কররাণীর (খৃঃ অঃ ১৫৬৩-৭২) রাজধানীতে আগমন করেন ও রাজসরকারে চাকুরী লাভ করেন। ভবানন্দের পুত্র শ্রীধর বা শ্রীহরি এবং গুণানন্দের পুত্র জানকীবল্লভ সুলেমন কররাণীর পুত্র দায়ুদ খাঁ-এর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। শ্রীধর দায়ুদ খাঁ কর্তৃক রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত হন; জানকীবল্লভও বসন্ত রায় নামে উচ্চপদে উন্নীত হন। পরে দায়ুদ খাঁ বিদ্রোহী হইলে সম্রাট আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে গৌড়াভিমুখে বিপুল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। দায়ুদ খাঁ

ভয়ে রাজধানী হইতে পলায়ন করেন ও পলায়ন করিবার সময় ধন-রত্নের ভার রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের উপর অর্পণ করিয়া, কোন নিরাপদ স্থানে ঐ সকল ধনরত্ন অপসারিত করিতে আদেশ দেন। ভ্রাতৃদ্বয় যে ধনরত্ন আহরণ করিতে পারিলেন, তাহা সুন্দরবনাঞ্চলে যমুনানদীর তীরে নির্ম্মিত তাঁহাদের গৃহে অপসারিত করিলেন। কথিত আছে, তাঁহারা এত ধনরত্ন লইয়া গিয়াছিলেন যে, গৌড়ের অনুপম সমৃদ্ধি এই নবনির্ম্মিত উপনিবেশে স্থানান্তরিত হইল,—এবং সেই হইতে ঐ অঞ্চলের নাম হইল 'যশোহর' বা সমৃদ্ধি হরণকারী। খুলনা জেলার ঈশ্বরীপুরেই (পূর্ব্বে খুলনার অধিকাংশ যশোহরের অন্তর্গত ছিল) বসন্ত-বিক্রমাদিত্যের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রতাপাদিত্য রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র। প্রতাপাদিত্যের জন্মগ্রহণকালে গণৎকারেরা গণনা করিয়া বলেন, ভবিষ্যতে পুত্র পিতাকে বিতাড়িত করিবে। প্রতাপাদিত্য শৈশবেই শৌর্য্যবীর্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অল্প বয়সেই প্রতাপের এইরূপ শৌর্য্য ও বীর্য্য দর্শন করিয়া, পিতা গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হইবে আশঙ্কা করিয়া প্রতাপকে আগ্রায় প্রেরণ করেন। আগ্রায় প্রতাপ সম্রাটের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হন ও অত্যল্পকালের মধ্যেই সম্রাট্ সনদ দ্বারা প্রতাপাদিত্যকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন ও পিতার রাজ্য পুত্রকে অর্পণ করেন। অতঃপর প্রতাপ যশোহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতাকে রাজ্যচ্যুত করেন ও রাজধানী ধূমঘাটে আনয়ন করেন।

কিছুকাল প্রতাপাদিত্যের দ্রুত প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হয়। সুদৃশ্য অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, নবনির্ম্মিত মন্দিরাদির দ্বারা প্রতাপাদিত্য তাঁহার রাজ্য বিভূষিত করেন। এতদ্ব্যতীত প্রতাপাদিত্য পুষ্করিণী খনন, কূপ নির্ম্মাণ প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান দ্বারাও প্রজাদের সুখ-সুবিধা বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজ্যের পরিধিও প্রতাপাদিত্য অনতিবিলম্বে প্রসারিত করিতে সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে প্রতাপাদিত্য এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, ইউরোপীয় পর্য্যটক ও মিশনারীর ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতিতে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ দেখা যায়। এইস্থানে উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপীয় মিশনারীরা প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে একটি গীর্জ্জাও নির্ম্মাণ করেন।

কিংবদন্তী অনুসারে প্রতাপাদিত্যের এরূপ দ্রুত সফলতার কারণ হইতেছে তৎকর্ত্তৃক যশোরেশ্বরী (কালী) দেবীর অনুগ্রহ লাভ। প্রতাপের ভক্তি ও দয়াদাক্ষিণ্যে প্রীত হইয়া দেবী প্রতাপের সর্ব্বকার্য্যসাধিকা হইবেন বলিয়া প্রতাপকে আশ্বাস দেন; এবং প্রতাপ বিতাড়িত না করিলে দেবী স্বয়ং কখনও প্রতাপকে পরিত্যাগ করিবেন না বলিয়া প্রতাপের নিকট অঙ্গীকার করেন। দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া ও স্বীয় সফলতা দর্শন করিয়া অতঃপর প্রতাপের পরিবর্ত্তন ঘটে—প্রতাপ অত্যাচারী ও প্রজা-উৎপীড়ক হইয়া উঠেন; এমন কি সামান্য কারণেও প্রজাদের স্কন্ধ হইতে মস্তক চ্যুত করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতে লাগিলেন না। প্রতাপের এরূপ ঘোর অত্যাচার দর্শনে দেবী ব্যথিতা হইয়া প্রতাপের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ প্রত্যাহার করেন। এক দিন এক মেথরাণী প্রতাপের সম্মুখে প্রাসাদ অঙ্গন পরিষ্কৃত করে; মেথরাণীর এরূপ স্পর্দ্ধায় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতাপ মেথরাণীর স্তনদ্বয় ছেদন করিবার আদেশ দিয়া যখন ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন দেবী প্রতাপের কন্যার ছদ্মবেশে প্রতাপের সম্মুখে আবির্ভূত হন। প্রতাপ কন্যার এরূপ অশোভন, শ্লীলতাহীন গর্হিত কার্য্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাভ্রমে দেবীকে চিরকালের জন্য প্রাসাদ ত্যাগ করিবার আদেশ দিলেন। দেবী তখন ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'স্বয়ংপ্রকাশ' হইলেন ও প্রতাপ নিজেই তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়াছেন এই অজুহাতে প্রতাপের উপর হইতে পূর্ব্ব অনুগ্রহ ও প্রতিশ্রুত সাহায্য প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।

অতঃপর প্রতাপের দ্রুত পতন ঘটে। প্রতাপাদিত্যের জীবনের কৃষ্ণতম কলঙ্ক হইতেছে, তৎকর্ত্তৃক সবংশে পিতৃব্য বসন্ত রায়ের নিধন। প্রতাপের হস্তে এক মাত্র পুত্র রাঘব ব্যতীত বসন্ত রায় সবংশে নিহত হন। কচু বনে লুকাইয়া রাখিয়া রাঘবের জীবন রক্ষা করা হয়; এবং সেই হইতে রাঘব কচু রায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিক্রমাদিত্যের দেওয়ান ও কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ, ভবানন্দ মজুমদার, বসন্ত রায়ের শিশু পুত্র 'কচু রায়কে' লইয়া সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন। সম্রাট্ কচু রায় ও ভবানন্দ মজুমদারের নিকট হইতে প্রতাপাদিত্যের ঘোর অত্যাচারের

কাহিনী শ্রবণ করিয়া বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা মানসিংহকে প্রতাপাদিত্যের বিনাশসাধন করিতে আদেশ দেন। ভবানন্দের সহায়তায় মানসিংহ হঠাৎ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী আক্রমণ করেন ও প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। বন্দীদশায় প্রতাপকে দিল্লী লইয়া যাইবার সময় কাশীতে প্রতাপাদিত্য আত্মহত্যা করেন। কথিত আছে, পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় দিল্লীর রাজপথে প্রদর্শিত হইবার আশঙ্কাতেই প্রতাপাদিত্য এই কার্য্য করেন।

অপর কিংবদন্তী অনুসারে প্রতাপাদিত্য মানসিংহের নিকট পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক সন্ধি করেন। আকবরের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশের ভূইঞাগণ পুনরায় বিদ্রোহী হইলে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁকে বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত বঙ্গে প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্য প্রথমে ইসলাম খাঁকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেও পরে ঐ সাহায্যদানে অস্বীকৃত হন। ইহাতে ইসলাম খাঁ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। প্রথমে ধূমঘাটের নিকটস্থ বসন্তপুরে ও পরে ধূমঘাটে উভয় দলের সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য রডা ও কমল খোজার ন্যায় দক্ষ সেনাপতি হারাইয়া নিরুৎসাহ হইয়া ইসলাম খাঁএর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ইসলাম খাঁ পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া প্রতাপাদিত্যকে দিল্লীতে প্রেরণ করেন; কিন্তু পথেই কাশীতে প্রতাপের মৃত্যু হয়।

প্রতাপাদিত্য বঙ্গের সুবিখ্যাত বারভূইঞাদের অন্যতম। ভূইঞারা নামে সম্রাটের অধীন হইলেও কার্য্যতঃ স্বাধীন ছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত মুঘলেরা বঙ্গে বিশেষ প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। মুঘলেরা যখন অন্যত্র আফ্গানদের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, তৎকালে প্রাকৃতিক দুর্গস্বরূপ জলাভূমি ও বিপুলায়তন নদনদী দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বারভূইঞাগণ স্বাধীন ভাবে বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন।

প্রতাপাদিত্যের নিজের গুলি-বারুদ-কামানের কারখানা ছিল। পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে দৃঢ়কায় কষ্টসহ কুকীগণকে প্রতাপাদিত্য তাঁহার সৈন্যদলের নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে তাঁহার সৈন্যগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। কালে প্রতাপাদিত্যের শক্তি এত দূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, প্রতাপাদিত্য বঙ্গে মুঘলদের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে দমাইয়া রাখিবার নিমিত্ত উড়িষ্যা হইতে কতিপয় আফগান সর্দ্দারকে আনাইয়া খিলাফতাবাদে জায়গীর প্রদান করেন।

প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তীর মধ্যে অন্ততঃ একটির মূলে কোনও ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কিংবদন্তীতে যশোহর নামকরণের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও সত্য বলিয়া মনে হয় না। 'আইন-ই-আকবরী'তে দেখা যায় 'সরকার খিলাফতাবাদে' 'জেসর' নামে একটি মহাল ছিল। 'জেসরে'র অপর নাম ছিল রসুলপুর। 'সরকার খিলফতাবাদ' ও 'সরকার মাহ্মুদাবাদে'র মহালগুলির মধ্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব ১,৭২৩,৮৫০ দাম (প্রায় ৪৩,০৯৬৲ টাকা) আদায় হইত 'জেসর' মহাল হইতে। ইহার পূর্ব্বেও মুহম্মদ কুলি খাঁ-এর আক্রমণ সম্পর্কে 'জেসরে'র উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং, স্পষ্টতঃই রাজা বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বেই যশোহরের নামকরণ হইয়াছিল। তবে হয় তো রাজা বিক্রমাদিত্যের নব-নির্ম্মিত শহরের সমৃদ্ধি দেখিয়া, বিক্রমাদিত্যের সময় হইতেই 'যশঃ হরণকারী' রূপে যশোহর নামের ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

মুঘল শাসনাধীনে যশোহরের গুরুত্ব এত অধিক ছিল যে, এখানে একজন পৃথক্ ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। শাহজাহানের রাজত্বকালে ফৌজদার ছিলেন শাহকলী খাঁ। ইনি পারস্যের রাজবংশীয় ছিলেন। কপোতাক্ষ নদের তীরে মীর্জ্জানগরে তাঁহার ঘাঁটি ছিল। এখনও সেখানে (বর্ত্তমান নাম ত্রিমোহিনী) তাঁহার দুঃস্থ বংশধরগণকে দেখা যায়। সেখানে ইমামবাড়া প্রভৃতি পূর্ব্বসমৃদ্ধির ধ্বংসাবশেষও রহিয়াছে।

১৬৯৬ খৃঃ অব্দে, আওরংজেবের রাজত্বকালে সুভা সিং ও রহিম খাঁ যখন বিদ্রোহী হন, তখন নুরুল্লা খাঁ ছিলেন যশোহর, হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের ফৌজদার। ফৌজদার সামরিক কর্ত্তা হইলেও, ধন আহরণে পটুত্বই ছিল তাঁহার অধিক। তাঁহার না ছিল সামরিক অভিজ্ঞতা, না ছিল সৈনিকোচিত সাহস। নবাব কর্ত্তৃক বারংবার আদিষ্ট হইয়া

নুরুল্লা খাঁ অতি কষ্টে ৩০,০০ সেনা সংগ্রহ করিলেন; এবং যশোহর হইতে বহির্গত হইয়া হুগলী পৌঁছিলেন। কিন্তু সেখানে, আফগানদের ভয়ে বিনা যুদ্ধে হুগলী দুর্গ হইতে রাত্রে পলায়ন করিয়া নৌকাযোগে যশোহরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

নুরুল্লা খাঁ-এর অযোগ্যতায় সম্রাট রুষ্ট হইয়া, জবরদস্ত খাঁকে ফৌজদার নিযুক্ত করেন। জবরদস্ত খাঁ ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির লোক, তিনি শীঘ্রই যশোহর, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আফগানদিগকে বিতাড়িত করিয়া আফগানদের অত্যাচার সম্পূর্ণভাবে দূর করেন।

ইহার পর বিশ বৎসরের মধ্যে, মুর্শিদ কুলি খাঁ বা জাফর খাঁ-এর সময়ে মহারাজ সীতারাম কর্তৃক যশোহর অধিকৃত হয়। সীতারামের রাজধানী ছিল মধুমতী নদীর তীরে মাহ্‌মুদপুরে।

ফতাবাদ ও ভূষণার ক্ষমতাশালী হিন্দু জমিদার মুকুন্দ রায় ছিলেন সীতারামের পূর্বপুরুষ। ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদে মুকুন্দের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে আকবর মুনিম খাঁ-এর অধীনে এক দল সেনা বঙ্গ-অভিযানে প্রেরণ করেন। মুনিম খাঁ বঙ্গ ও উড়িষ্যা আক্রমণ করেন; এবং মুরাদ খাঁ নামে জনৈক কর্মচারী দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ-বিজয়ে প্রেরিত হন। মুরাদ খাঁ বাক্‌লা ও ফতাবাদ সরকার জয় করিয়া সেখানে বসবাস করেন। কিছুকাল পরে মুকুন্দের সহিত মুরাদ খাঁ-এর সংঘর্ষ বাধিতে লাগিল। মুকুন্দ পথের কণ্টক দূর করিবার নিমিত্ত মুরাদ খাঁকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া সপুত্র মুরাদ খাঁকে নিহত করেন। মুকুন্দের পুত্র শত্রুজিৎ জাহাঙ্গীরের বঙ্গীয় শাসনকর্তাদের বিশেষ উত্যক্ত করেন। পরে অবশ্য শাহজাহানের রাজত্বকালে শত্রুজিৎ ধৃত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। যশোহরের উত্তর-পশ্চিমে, মাহ্‌মুদপুরের সন্নিকটস্থ শত্রুজিৎপুর অদ্যাপি শত্রুজিতের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে।

সীতারামের অভ্যুদয় ঘটে প্রতাপাদিত্যের অভ্যুদয়ের কিঞ্চিদধিক একশত বর্ষ পর। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ছিল দক্ষিণের খলিফতাবাদ সরকার; সীতারাম-অধ্যুষিত ভূ-ভাগ ছিল মাহ্‌মুদাবাদ ও ভূষণা পরগণা। উভয়েই সামান্য জমিদারী হইতে, পার্শ্ববর্তী জমিদারগণের ভূ-ভাগ নিজেদের শক্তি ও সাহসিকতায় দ্বারা জয় করিয়া রাজ্যের সৃষ্টি করেন। রাজধানী সুদৃঢ় করিয়া উভয়েই মুঘল-অধীনতা হইতে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া পরাজিত ও ধৃত হন। প্রতাপাদিত্যের ন্যায় সীতারামও নিজ রাজধানীতে গুলি-বারুদ প্রস্তুতের ও কামান-নির্মাণের কারখানা স্থাপন করেন।

আধুনিক যশোহরের উত্তর-পূর্বে মাহ্‌মুদপুরে সীতারাম রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। মাহ্‌মুদপুর চতুর্দিকেই প্রাকৃতিক বর্ম দ্বারা রক্ষিত ছিল—তিন দিকে সৈন্যচালনার অনুপযোগী জলাভূমি পরিবৃত ও চতুর্থ পার্শ্বে মধুমতী প্রবাহিত। এই সুরক্ষিত রাজধানীর চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিয়া আরও সুদৃঢ় করা হয়। এরূপ সুরক্ষিত রাজধানীতে ধীরে ধীরে সীতারাম প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করেন। অবশেষে সীতারাম প্রকাশ্যে মুঘল সরকারের অধীনতা অস্বীকার করেন ও ভূষণার ফৌজদারকে কর দিতে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ভূষণার ফৌজদার মীর আবু তুরাব ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সীতারামকে ধৃত করিবার চেষ্টা করেন। উভয় পক্ষে দু'একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা ফৌজদারের উদ্দেশ্য সফল হইল না। অবশেষে ফৌজদার নিজ সেনাপতি পীর খাঁকে দুই শত অশ্বারোহী সেনাসহ সীতারাম-দমনে প্রেরণ করেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া সীতারাম নিজ সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করিয়া পীর খাঁকে অতর্কিত আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ওঁৎ পাতিয়া রহিলেন। এক দিন মীর আবু তুরাব কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে সীতারামের রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করেন। পীর খাঁ আবু তুরাবের সঙ্গে ছিলেন না। (মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে) সীতারাম এ কথা জানিতে পারিয়াও মীর আবু তুরাবকে পীর খাঁ বলিয়া ভুল করিবার ভাণ করিয়া, হঠাৎ জঙ্গল হইতে সসৈন্যে বহির্গত হইয়া পশ্চাৎ হইতে আবু তুরাবকে আক্রমণ করেন। আবু তুরাব উচ্চৈঃস্বরে নিজ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সীতারাম ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া লাঠির আঘাতে আবু তুরাবকে জখম করিয়া অশ্ব হইতে তাঁহাকে ভূমিতে আপতিত করিয়া নিহত করেন। এই রূপে ভূষণার দুর্গ সীতারামের হস্তগত হইল।

ফৌজদার মীর আবু তুরাব নানাবিধ গুণালঙ্কৃত ছিলেন;

এতদ্ব্যতীত সম্রাটের সহিত তাঁহার আত্মীয়তাও ছিল। সুতরাং মীর আবু তুরাবের হত্যার সংবাদ মুর্শিদাবাদে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ বা জাফর খাঁ-এর কর্ণগোচর হইলে, নবাব বাদশাহের রোষের আশঙ্কায় কম্পিত হইলেন। নবাব নিজ শ্যালিকাপতি হাসান আলি খাঁকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া বহু উৎকৃষ্ট সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে দিয়া সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সীতারামের রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ জমিদারদের সীতারামকে কোনও প্রকার সাহায্য না করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। তাঁহাদের আরও জানান হইল, সীতারাম যে জমিদারীর মধ্য দিয়া পলায়ন করিবেন, সে জমিদারীর জমিদারকে শুধু উৎখাতই করা হইবে না, তাঁহাকে দণ্ড-ভোগও করিতে হইবে। নবাবের এই আদেশ ও ভীতি-প্রদর্শন ফলপ্রদ হইল। অন্যান্য জমিদারগণ সীতারামকে সাহায্য তো করিলেনই না, পরন্তু চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে বেড়িয়া ধরিলেন। সীতারাম কিন্তু ইহাতে ভীত হইলেন না, তিনি একাই ফৌজদারের আক্রমণ প্রতিরোধের সঙ্কল্প করিলেন।

এইরূপে জমিদারগণের সাহায্য পাইয়া নূতন ফৌজদার হাসান আলি খাঁ সীতারামকে চূর্ণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। সীতারাম, দৈত্যপ্রতিম বিচক্ষণ, বিশ্বস্ত সেনাপতি রামরূপের উপর মাহ্মুদপুর রক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং ভূষণা দুর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ফৌজদার নিজ সেনা-দল দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একাংশ সংগ্রাম সিংহের অধীনে ভূষণাভিমুখে ও অপরাংশ বর্ত্তমান দীঘাপতিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়ের নেতৃত্বে মাহ্মুদ-পুরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সংগ্রাম জলপথে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু সীতারাম তাঁহার অগ্রগমনে বাধা দিয়া তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করিলেন। সংগ্রাম দুর্গ অধিকারে অকৃতকার্য্য হইয়া ভূষণা দুর্গ অবরোধ করিলেন। অপর দিকে দয়ারাম দেখিলেন, রামরূপের ন্যায় বিচক্ষণ ও শক্তিশালী সেনাপতি জীবিত থাকিতে মাহ্মুদপুর অধিকার করা অসম্ভব। সুতরাং দয়ারাম রামরূপকে হত্যা করিবার ষড়্যন্ত্র করিলেন। এক দিন রাত্রিতে রামরূপ যখন নিদ্রিত ছিলেন, তখন হত্যাকারীরা পশ্চাৎ দিক্ হইতে তাঁহাকে বর্শাবিদ্ধ করিয়া আহত করিবার পর নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহার মস্তক ছেদন করিল।

রামরূপের হত্যাসংবাদ সীতারামের কর্ণগোচর হইল; সীতারামের সকল আশা-ভরসা নির্ম্মূল হইল। সীতারাম দেখিলেন, রামরূপের অবর্ত্তমানে একক তাঁহার পক্ষে দুইটি দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব। সুতরাং ভূষণা দুর্গে অল্প কতিপয় সেনা রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্যসহ সীতারাম গোপনে ভূষণা হইতে বহির্গত হইয়া মাহ্মুদপুরে যাত্রা করিলেন। সীতারাম মাহ্মুদপুরে পৌঁছিয়া দেখিলেন, মুঘলসৈন্য নগরের প্রান্তসীমা হইতে নগরাভ্যন্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। সীতারামের সহিত মুঘলসৈন্যের অনেক যুদ্ধ চলিল; সীতারাম অবশেষে পরাজিত হইয়া কয়েক জন ব্যতীত সপরিবারে বন্দী হইলেন। হাসান আলি খাঁ সপরিবার সীতারামের গলায় লৌহ-শৃঙ্খল পরাইয়া, উহাঁদের মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। সীতারামের শিশুসন্তান ও পরিবারস্থ ছয় জন স্ত্রীলোক কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহাদের আশ্রয় গ্রহণের কথা কলিকাতাস্থ ইংরাজ বণিকেরা জানিতেন না। পরে যখন নবাব এই পলায়নের সংবাদ অবগত হইয়া, ইঁহাদের ধৃত করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় লোক প্রেরণ করেন, কলিকাতাস্থ ইংরাজ বণিকগণ অনুসন্ধান দ্বারা সন্ধান পাইয়া, ইঁহাদের নবাবের লোকের হস্তে সমর্পণ করেন। মুর্শিদাবাদে সীতারামকে পরম নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করা হয় ও পরিবারের অন্য সকলকে আজীবন কারাগারে রুদ্ধ করা হয়।

সীতারামকে হত্যা করিবার পর, নবাব সীতারামের জমিদারী নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামজীবন রায়কে অর্পণ করেন। সীতারামের পতনের পর সমগ্র যশোহর তিন জন জমিদারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। চাঁচড়ার রাজা নামে পরিচিত যশোহরের রাজার অংশে পড়িল সমগ্র দক্ষিণ ভাগ; নলডাঙ্গার রাজা উত্তরস্থ মাহ্মুদশাহীর জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন; এবং নাটোর রাজ সমগ্র ভূষণার জমিদারী পাইলেন। উত্তরস্থ নলদি পরগণা ও আধুনিক কালের সমগ্র ফরিদপুর জেলা তৎকালে ভূষণা জমিদারীর অন্তর্গত ছিল।

মুঘল আমলে জমিদারগণ কর-সংগ্রাহক ছিলেন—এবং তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য রাজস্ব আদায় করা এবং সম্রাটের প্রাপ্য অংশ রাজপ্রতিনিধির নিকট জমা দেওয়া হইলেও, তৎকালে শাসনের সুব্যবস্থা না থাকায় জমিদারগণ

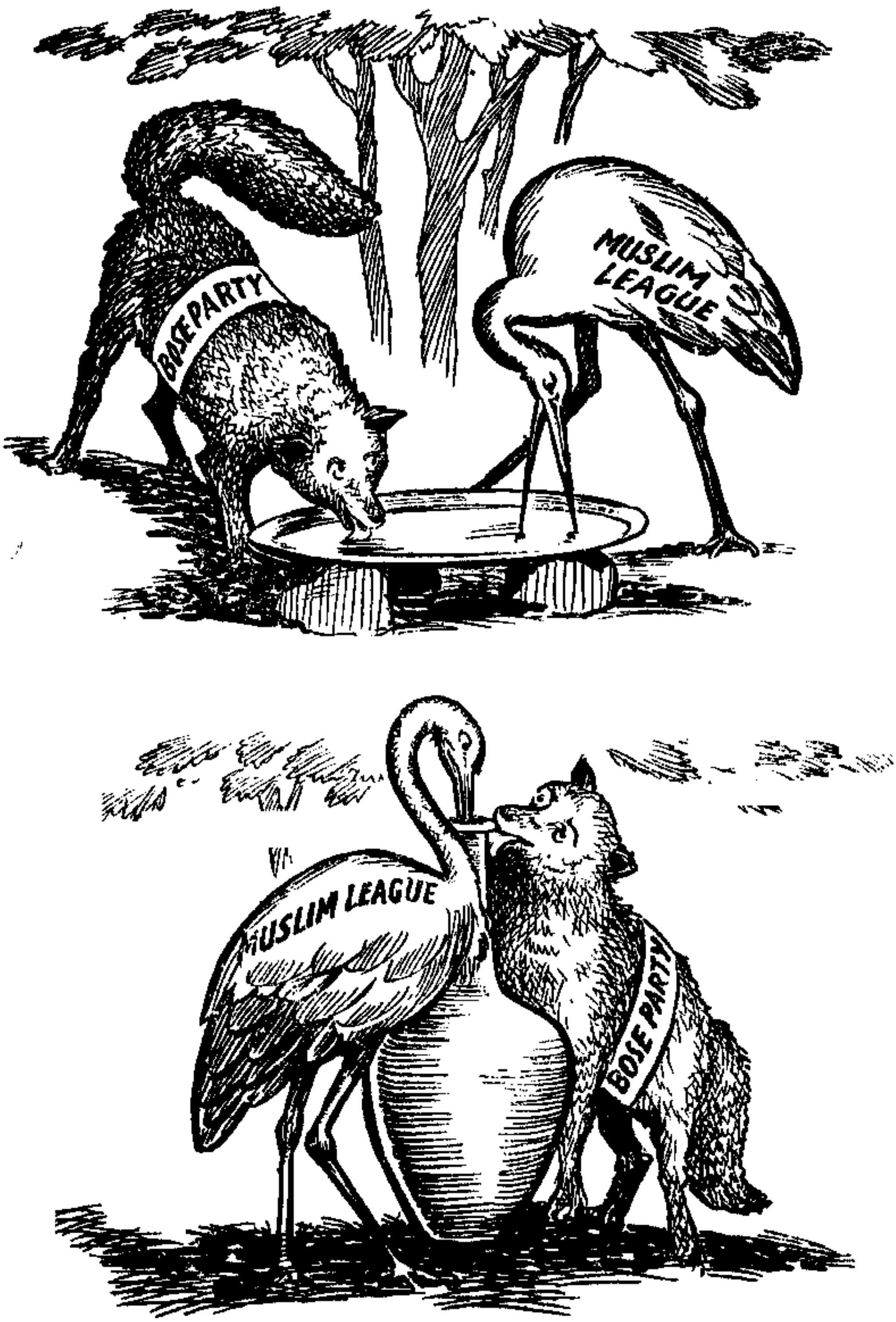
নিজ এলেকার সর্ব্ব ব্যাপারে পূর্ণকর্ত্তৃত্ব করিতেন এবং সুযোগ বুঝিলে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেও আলস্য করিতেন না। সাধারণভাবে পিতার জমিদারী পুত্রের উপর বর্ত্তিলেও, এ বিষয়ে কোনও নিয়ম ছিল না, বা জমিদার পুঁথিপত্রে জমির মালিক বলিয়াও স্বীকৃত হইতেন না। সুতরাং বাদশাহ্ বা তদীয় প্রতিনিধি অনেক সময় এক জমিদারের নিকট হইতে জমিদারী লইয়া অন্য লোককে জমিদারী দিতেন। বাদশাহ্ বা তদীয় প্রতিনিধির জমিদার পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা থাকিলেও এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহারা এ ক্ষমতার ব্যবহার করিলেও, যত দিন পর্য্যন্ত জমিদার রাজস্ব নিয়মিতভাবে রাজকোষে জমা দিতেন বা যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর অভিযোগ শুনা না যাইত, তত দিন জমিদার পরিবর্ত্তন বা জমিদারীর এলেকার কোনও ব্যাপারে সম্রাট্ বা তৎপ্রতিনিধি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না।

জমিদার ও রাজ-সরকারের ভিতর প্রকৃত সম্পর্ক স্পষ্ট করিবার জন্য বলা চলে যে, জমিদারগণ কর সংগ্রহ করিয়া রাজ-সরকারের প্রাপ্য অংশ রাজকোষে জমা দিতেন বটে, কিন্তু জমিদারগণ শান্ত, সুবোধ ও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য-শীল ছিলেন না, সুযোগ বুঝিলেই তাঁহারা রাজকোষে রাজস্ব জমা দেওয়া বন্ধ করিতেন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন। ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজকর আদায়ের জন্য ফৌজদারের অধীনে সৈন্য থাকিত; এবং সাধারণতঃ ফৌজদারের ভয়েই জমিদারগণ রাজস্ব প্রদান করিতেন। রাজস্ব নিয়মিতভাবে প্রদত্ত হইলে, ফৌজদার বা সম্রাটের অপর কোনও কর্ম্মচারী জমিদারের এলেকার কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না—এবং নিজ এলেকার সকল ব্যাপারে জমিদারই পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিতেন। জমিদার নিজ এলেকার দস্যু, নরহত্যাকারী প্রভৃতি ধৃত করিয়া বিচার করিবার জন্য সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারী দারোগার নিকট প্রেরণ করিতেন। জমিদারীর এলেকার শাসন ব্যাপারে রাজ-সরকারেরসহিত এইটুকুই মাত্র যোগ ছিল। আব্‌গারী কর ও আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একটা ক্ষুদ্র জমিদারগণ রাজ-সরকারে প্রদান করিতেন—এবং ইহার পরিবর্ত্তে এই দুইটি প্রত্যক্ষ রাজ-সরকারের অধীন ব্যাপারেও তাঁহারা যথেচ্ছ কর্ত্তৃত্ব করিতেন। সংক্ষেপতঃ, সম্রাটের লক্ষ্য ছিল অর্থ সময়মত আদায় করা এবং জমিদারগণ রাজস্ব নিয়মিত ভাবে জমা দিলে নিজ নিজ এলেকায় স্বাধীন নৃপতির ন্যায়ই আচরণ করিতে পারিতেন।

সীতারামের পতনের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে প্রতাপাদিত্য বা সীতারামের ন্যায় কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষ জমিদারের অভ্যুদয় ঘটে নাই। আওরংজেবের মৃত্যুর পর তদীয় অকর্ম্মণ্য পুত্র বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে সীতারাম ধৃত ও নিহত হন। সীতারামের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া অরাজকতা দেখা দিল এবং এই অরাজকতার মধ্যে ধীরে ধীরে যেমন দেশীয় শক্তিবর্গ শক্তিহীন হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, তেমনই বিদেশী শক্তিবর্গের, বিশেষতঃ ইংরেজের, ধীরে ধীরে অভ্যুত্থান ঘটিতে লাগিল ও উহারা ক্রমশঃ অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলে। দেশী ও বিদেশী শক্তির মধ্যে এই দ্বন্দ্ব পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খৃঃ অব্দে) সিরাজের পরাজয়ে বিদেশী শক্তির অনুকূলে নির্দ্দিষ্ট আকার গ্রহণ করিল এবং তখনও ভারতের প্রায় সকল স্থানই দেশীয় শক্তি-বর্গের অধীন থাকিলেও, ইংরেজ-শক্তির অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে সেই সময় হইতেই সকল সন্দেহের নিরসন ঘটিল। বাঙ্গলার দেওয়ানী ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করতলগত হয়।

কাম ও মোক্ষ

……মানুষ কামাধিবশতঃ সাধারণতঃ যে-সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার কোন্ কর্ম্মে পরিশেষে সুখের উদয় হয় এবং কোন্ কর্ম্মে দুঃখের উদয় হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণনিরত হইলে স্বভাবতঃই মানুষে যে-সমস্ত কর্ম্মে পরিশেষে দুঃখের উদয় হয় সেই সমস্ত কর্ম্মের হাত হইতে এড়াইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়ে; এই উদগ্রীবতার উদয় হইলে মানুষ দেখিতে পায়, ইচ্ছা করিলেই মানুষ তাহার কামোদ্ভূত কর্ম্মসমূহ ছাড়িয়া দিতে পারে না এবং কামোদ্ভূত কর্ম্মসমূহ ছাড়িয়া দিতে হইলে কামের উদ্ভব হয় কেন, তাহা উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। কামের উদ্ভব হয় কেন, তাহা উপলব্ধি করিবার আগ্রহ হইলেই, স্বকীয় অবয়ব, অণু ও পরমাণু উপলব্ধি করিবার জন্য অথবা মোক্ষপরায়ণ হইবার জন্য প্রবৃত্তিযুক্ত হইতে বাধ্য হইতে হয়।



বক ও খেঁকশিয়ালী

আবহাওয়া

—শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র

অবিনাশ প্রায় সব সময়েই বলে—অন্ততঃ যে সময়ে বিরক্ত হয় সে সময়ে তো বলেই—"ঝ্যাঁটা মার—এটা কি আবার একটা জায়গা না কি, না এখানে মানুষ বাস করে! আমরা নেহাত জানোয়ার তাই এই 'অজ—কুচ্ছিৎ' জায়গায় বাস করি, নইলে—"

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়, কারণ, জায়গাটা প্রায় বস্তী না হইলেও তাহারই সমতুল্য বটে। একটা প্রকাণ্ড বাড়ীকে তাহারা নয় দশটি পরিবার মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়াছে। ভাড়ার তারতম্য অনুসারে কাহারও ভাগে দুইখানি ঘর, কাহারও ভাগে বা তিনখানি। যে আট গণ্ডা পয়সা বেশী ভাড়া দিতে পারে, সে হয়ত একটু অধিক আলো-বাতাস যুক্ত ঘরে বাস করে—আর যে তাহা পারে না সে অন্ধকার অন্ধকূপে গিয়া বাস করে।

সকলের হয় ত এ অবস্থাকে সহ্য হয়, কিন্তু অবিনাশের হয় না; কারণ এখন যে অবস্থার মধ্যে অবিনাশ বাস করিতেছে, চিরদিনই সে সে-অবস্থার মধ্যে বাস করিত না। বছর চারেক পূর্ব্বেও সে সৎ পল্লীতে সৎ ভাবে জীবন যাপন করিত। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া এই দরিদ্রদিগের মধ্যে দরিদ্র ভাবে বাস করিতে হইতেছে। তাই সে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইলেই বলে, "ঝ্যাঁটা মার—"

শান্তি বলে, "কেন, ঝ্যাঁটা মার কেন, বাসা বদল করলেই তো পার। এখানে ছ'টাকা ভাড়া দিচ্ছ, তার ওপর আর বেশী নয়—এই গোটা দশেক টাকা বাড়িয়ে দাও, তা হলেই দেখবে ঐ ষোল টাকাতেই এই কলকাতা সহরে কেমন খাসা বাসা পাওয়া যাবে।"

সে কথা অবিনাশও জানে, কিন্তু ষোল টাকা বাসা ভাড়া সে দেয় কোথা হইতে! চটকলে উদয়াস্ত কাল পরিশ্রম করিয়া মাসান্তে মাহিনা তো পায় মাত্র সাতাশটি টাকা, পুরাপুরি ত্রিশ টাকাও নয়। তাহা হইতে প্রথমেই তা ছ'টি টাকা দিতে হয় বাড়ীওয়ালাকে, বাকী একুশ টাকায় দুটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন চলে। আবার তাহার উপর তাহাদের মধ্যে আর একটি নব অতিথির আসিবার সময় প্রায় হইয়া আসিল। শান্তি তো এখন হইতেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার সকল প্রকার ব্যবস্থা করিতেছে। অবশ্য এ সমস্ত কথা শান্তিও জানে, তথাপি সে যখন তখন অবিনাশকে খোঁটা দিতে ছাড়ে না। স্ত্রীর কথায় রাগিয়া গিয়া অবিনাশ বলে, "সে কথা কি আর জানি না মশাই, জানি, ষোল টাকা কেন, বত্রিশ টাকা দিলে আরও ভাল বাসা পাওয়া যায়, কিন্তু তা পাচ্ছি কোথায়?"

শান্তি বলে, "তা হলে চুপ করে থাকতে হয়। 'ঝ্যাঁটা মার, ঝ্যাঁটা মার বলে' চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করতে নেই,—আর নয় মেসে গিয়ে থাকতে হয়।"

অবিনাশ বিকৃতস্বরে বলে, "মেসে থাকবার পথ রেখেছ না কি তুমি? তুমি—আমার সাত পুরুষের পুণ্যির ছালা যে রয়েছ!"

শান্তিও ঝাঁঝিয়া বলে, "পুণ্যির ছালা যেচে তোমাদের ঘরে এসেছিল, না? নির্গুণ পুরুষের শুধু তেজটুকুই আছে। আরে গেল যা—বলে ভাত দেবার কেউ নয় কো কিল মারবার গোঁসাই!"

অবিনাশ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলে, "চোপ রও!"

"কেন চুপ করবে শুনি? যখন এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে পুণ্যির ছালাকে ঘরে নিয়ে এসেছিলে, তখন ভাবতে পার নি? নিজের পরিবারকে যে পুরুষ খেতে দিতে পারে না, তার গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!...আমরা হলে এত দিন তাই দিতুম, তুমি নির্লজ্জ বেহায়া, তাই এখনও মুখ নেড়ে কথা বল—"

ইহার পর যে কাণ্ড আরম্ভ হয়, তাহা প্রকাশযোগ্য নয়।

পথ দিয়া যদি এক জন ধনীকে যাইতে দেখা যায় ত পথের দু'ধারে একশত জন দরিদ্রকে দেখা যায়। অবিনাশ এই দরিদ্রগুলাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। তাহার

'ধারণা', পৃথিবীতে যে এত দুঃখ-কষ্ট, সে-সবের জন্য মূলতঃ দায়ী ইহারাই। ইহারা পেটে খাইতে পায় না বলিয়াই পিঠে ছুরি মারিয়া পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা করে। জাল, জুয়াচুরী, খুন-জখম সব কিছুর জন্য ইহারাই দায়ী। পৃথিবীর বুক হইতে যদি ইহাদের নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলা যাইত, তাহা হইলে হয়ত পৃথিবীর অনেক উপকার হইত, কিন্তু তাহা হইবার নহে। যে আবহাওয়ার ভিতর এই দরিদ্রদল বাস করে, তাহাতে পুরুষানুক্রমে কতকগুলি দরিদ্রই সৃষ্টি হইবে—একটাও ধনীর সৃষ্টি হইবে না। সে দেখিয়াছে দরিদ্র মা-বাপ যেন তাহাদের সন্তানের জন্ম দিয়াই খালাস—তার পরে যে আর তাহাদের প্রতি কোন কর্ত্তব্য আছে, সে কথা যেন ইহারা স্বীকারই করে না। ছেলেদের শিক্ষা বা সভ্যতার ব্যবস্থা তো করেই না, মেয়েদের যে বিবাহ দিবে সে ব্যবস্থাও করে না। ফল দাঁড়ায় এই যে, একটু বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা বিড়ি খাইতে, পকেট কাটিতে, অস্থানে-কুস্থানে যাইতে শিখে, আর মেয়েরা হয় মাতা-পিতার নির্ব্বাচিত কোন পুরুষকে বিবাহ করিয়া আজীবন দুঃখ ভোগ করে, অথবা নিজের পছন্দমত কোন পুরুষের সহিত একেবারে সমাজের বাহিরে গিয়া দাঁড়ায়। অবিনাশের মতে এই দরিদ্রদের আইন করিয়া কুকুরের মত গুলি করিয়া মারা উচিত। ইহারা মানুষ তো নয়ই, পশুরও অধম।

আবহাওয়া জিনিষটাকে অবিনাশ ভয় করে। অরণ্যে মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে যে গাছই হউক না কেন দ্রুত বাড়িতে থাকে, কিন্তু কতকগুলি শুষ্ক গাছপালার ভিতরে যত সতেজ গাছই রাখা হউক না কেন, তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িবেই। তাহাদের চটকলের প্রভাতবাবু প্রথম যখন কাজ করিতে আসিল, তখন সে কত বড় বড় কথাই বলিত। কখনও রাশিয়ার দোহাই পড়িত, কখনও বা ধর্ম্মঘট করিবার জন্য গোপনে চটকলের সকল কর্ম্মচারীদের ডাকিয়া লইয়া নানা-প্রকার উপদেশ দিত। তখন লোকটাকে দেখিলে সত্যই ভক্তি হইত। কিন্তু এক বছর পার হইল না, দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া সেও সাধারণ লোকের মত কোথায় ভাসিয়া গেল। প্রথম প্রথম সে দু'একটা অশ্লীল কথা শিখিল, তার পর একটু একটু মদ খাইতে শিখিল, প্রথমে গোপনে, তার পর প্রকাশ্যে।—তার পর এখন সে মদও খায়, তাড়িও খায়, অস্থানে গিয়া হল্লাও করে।

একবার কে এক জন তাহার সহকর্ম্মীর নামে বড়বাবুর কাছে কি লাগাইয়াছিল বলিয়া প্রভাত সমস্ত কর্ম্মচারীদের সেই লোকটির সহিত কথা বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিল এবং একতার উপকারিতা সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড বক্তৃতা দিয়াছিল। আর এখন? এখন সে নিজেই পরের নামে লাগাইয়া বড়বাবুর 'পেয়ারের' লোক হইয়াছে। এমন দিন নাই যে দিন সে কোন না কোন লোকের নামে বড়বাবুর কাছে না লাগায়। এমন মহৎ, উদার লোকটা আজ এমন নীচ এবং সংকীর্ণমনা হইল কি করিয়া! অবিনাশের ধারণা চটকলের দূষিত আবহাওয়াই প্রভাতকে এমন অধঃপতনের পথে লইয়া গিয়াছে। তাই অবিনাশের আবহাওয়াকে এত ভয়।

নিজের ঘরখানিকে অবিনাশ যথাসম্ভব সাজাইয়া রাখিয়াছে। বাজার হইতে সস্তাদরের ছবি, খেলনা, কাঁচের জিনিষ-পত্র আনিয়া ঘরখানি সাজাইয়া জোর করিয়া সে আভিজাত্য আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহে। সে দিনও সে কি একটা কিনিয়া আনিয়াছিল।

শান্তি বলিল, "ও কি হবে?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে বলিল, "ঘর সাজাব।"

শান্তির বোধ হয় কথাটা তেমন পছন্দ হইল না, সে ঠোঁট উল্টাইয়া উত্তর দিল, "এঃ! ভাত জোটে না মুড়কি জলপান! এই তো ঘরের ছিরি, তার আবার সাজানো!"

অবিনাশ দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "না, তা সাজাবে কেন, ঘর-দোর সব নোংরা আর বিদ্‌কিচ্ছি করে রাখতে হয়, না? কোন ভদ্রলোক যদি এসে দেখে তো বলবে অসভ্যের চূড়ান্ত।"

একটু থামিয়া আবার বলিল, "শিখবে কোথা থেকে, ভদ্রতাই কাকে বলে বাপের জন্মে কোন দিন শিখেছ তাই?"

শান্তি চক্ষু বড় বড় করিয়া বলিল, "বাপ তুল না খবরদার।"

ফলে আবার কলহ সুরু হইল।

সন্ধ্যাবেলা অবিনাশ তাহার সঞ্চিত দ্রব্যগুলি এক বার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একবার চোখ বুজিয়া ভাবিয়া লইল যে, তাহার সভ্য এবং ভদ্র হইতে

আর কত দেরী। তার পর পাশের ঘরের ভাড়াটে যুবক বিনোদের কাছে গিয়া বলিল, "ভায়া, আজ আমাকে সেই গানটা শিখিয়ে দিতে হবে। সেই যে 'সবার রক্ত-এ রক্ত মিশাতে হবে'।"

অবিনাশের ধারণা, যে এই গানটা জানে না, সে একেবারেই গ্রাম্য ও অসভ্য।

বিনোদ অবিনাশ প্রদত্ত সিগারেটটায় টান দিয়া বলিল, "আরে ছিঃ! অবিনাশদা' তুমি এ কি সিগারেট খাও—এর চেয়ে বিড়ি খেলেই ত তুমি পার!"

অবিনাশ চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "বিড়ি? বিড়ি খেলে কি প্রেষ্টিজ্ থাকে?"

বিনোদ কিছু না বলিয়া গানের সুর বাজাইতে লাগিল।

অবিনাশ তাহার সঙ্গীদের বুঝাইবার চেষ্টা করে, তাহারা যদি ভদ্র হয় তাহাদের পুত্র-কন্যারাও ভদ্র হইবে।

তাহারা বিরক্ত হইয়া বলিল, "খুবতো 'টাঙাই ম্যাণ্ডাই' করছ ভদ্দর হও, ভদ্দর হও, কিন্তু হই কি দিয়ে বল দেখি? চাট্টি টাকা দিতে পার, তা হলে না হয় এক বার 'ভদ্দর' হয়ে দেখি।"

অন্য জন হাসিয়া বলে, "কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগে চুটকী দিতে।"

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে।

অবিনাশ লজ্জায় মুখ কালো করিয়া বসিয়া থাকে। তাহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় এক জনের দুঃখ হয়, সে সান্ত্বনার সুরে বলে, "আমাদের যে সভ্যভব্য হতে বলছিস্, হই কোথা থেকে বল্ তো?"

বিকৃতকণ্ঠে অবিনাশ বলে, "কেন, হওয়া যায় না?"

লোকটা উদাসভাবে বলে, "কি করে হই তাই বল, যা উপার্জ্জন করি, তাতে ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। কুড়ি বাইশ টাকা আয়ে কি আর মানুষের মত হয়ে থাকা যায়? তার ওপর বছরে বছরে এক একটা ছেলের জন্ম হয়, সে ওই পর্য্যন্ত। সে না পায় মায়ের দুধ, না পায় গরুর দুধ—মায়ের বুকে দুধ নেই, গরুর দুধ কেনবার পয়সা নেই। ও গুলো হয় শুধু মরতে, আর কষ্ট দিতে। দুধের বদলে জলের মত বার্লি খেয়ে খেয়ে সব কটাই টাঁসে, আর যেটা টেঁকে যায় সেটা দশ বছর বয়স হতে না হতে পকেট কাটতে শেখে! ব্যস্! তা হলেই পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল। হয় জেল খাটে, নয় পরের গলায় ছুরি চালায়। মেয়েগুলো বড় হয়ে যায় বেরিয়ে।"

অবিনাশ গর্জ্জন করিয়া বলে, "কেন, শাসন করা যায় না?"

"কি করে শাসন করব, তারা না পায় এক পাতা পড়তে, না পায় পেট ভরে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে। কাজে কাজেই, এক মুঠো ভাত কিম্বা একখানা ভাল কাপড়ের লোভে, দুনিয়ায় হেন কাজ নেই যা ওরা করতে পেছপাও হয়।"

অবিনাশ বলে, "যত সব বাজে কথা—এ হচ্ছে হাওয়ার দোষ, মাটির দোষ। এই গণ্ডমূর্খ্য জানোয়ারগুলোর ভেতর থেকে বছরে বছরে কেবল জানোয়ারই জন্মায়।"

অপর এক জন বলিল, "তা এই জানোয়ারদের মধ্যে থাকতে তোমার ভাল না লাগে, তুমি অন্য যায়গায় উঠে যেও।"

দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া অবিনাশ বলে, "তাই যাব।"

অবিনাশ ঠিক বুঝিল যে, এই হতভাগ্যদের ভিতর তাহার বাস করা পোষাইবে না। এই দূষিত আবহাওয়ার ভিতরে যে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারই পরিণাম এই। এ যেন রক্ত-বীজের ঝাড়। সে দিন সে কি একটা প্রয়োজনে বাগবাজারে গিয়াছিল। ফিরিবার পথে এক জন বৃদ্ধা অবিনাশকে ডাকিয়া বলিল, "বাবু, আপনাকে আমার মা-ঠাকরুণ ডাকছেন।"

অবিনাশ বিস্মিত হইলেও বৃদ্ধার সহিত চলিল।

বাড়ীর দরজায় পা দিতেই একটি সুসজ্জিতা যুবতী আসিয়া অবিনাশকে প্রণাম করিল। অবিনাশ বিস্মিত হইয়া যুবতীর মুখের দিকে চাহিতেই সে বলিল, "আমায় চিনতে পারছ না অবিনাশদা? আমি কমলা।"

অতঃপর অবিনাশ চিনিল, বৎসর দুই পূর্ব্বে সে যে বাড়ীটায় বাস করিত, এই মেয়েটীও সেই বাড়ীর এক অংশে বাস করিত। অধিক বয়স পর্য্যন্ত মেয়েটির বিবাহ হয় নাই—শুধু পয়সার অভাবে। তাই সে সেই বাড়ীটারই এক যুবক বাসিন্দার সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, তার পর আজ এই সাক্ষাৎ।

অবিনাশ বলে, "ব্যাপার কি কমলা এত বড় বাড়ী।"

কমলা মৃদু হাসিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল, "কি করি দাদা, পেটের জ্বালা, বড় জ্বালা—তাই।"

পেটের জ্বালাই কমলাকে যে-স্থানে আনিয়াছে তাহা বুঝিয়া অবিনাশ আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে দাঁড়াইল না।

পথ চলিতে চলিতে এক জন পুরাতন সঙ্গীর সহিত দেখা হইল।

"কি রে কেমন আছিস্?"

"ভাল, তুই?"

"ওই কাটছে এক রকম।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অবিনাশ বলিল, "তোর চেহারা বদলে গেছে।"

"মানে, বদ অভ্যাসগুলো ছেড়ে দিইছি।"

"সে কি! মদ খাওয়া ছেড়ে দিইছিস্।"

"না দিয়ে উপায় কি? এ তো আর বস্তী নয় যে, মদই খাও আর মাতলামই কর, কেউ আপত্তি করবে না। এখন ভদ্র-পল্লীতে বাসা নিইছি একটু বেচাল দেখলেই সবাই তেড়ে এসে বলে, মশায় এটা ভদ্র-লোকের পাড়া!"

"তুই আর সেখানে নেই?"

"নাঃ! ছেড়ে দিইছি," একটু থামিয়া আবার বলিল, "সেখানে কি আর মানুষ থাকে রে—না, সে সব জায়গায় থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব বলে কোন পদার্থ থাকে!"

ঠিক! অবিনাশ তাহা জানে।

বাসায় ফিরিতেই সে এক অভিনব কাণ্ড দেখিল।

সমস্ত বাসাটার মধ্যে একটি মাত্র কল—তাও আবার খোলা জায়গায়, সকলের যাতায়াত করিবার পথের উপর। সেই কলতলায় বসিয়া সমস্ত গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া একটি যুবতী তখনও স্নান করিতেছে। অবিনাশের সমস্ত মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। স্নানরতা যুবতী অবিনাশের সাড়া পাইয়া ত্রস্তে গাত্রবস্ত্র সংবরণ করিয়া লইল। অবিনাশ সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একেবারে নিজের ঘরে গিয়া বলিল, "ছি, ছি, কি সব বেহায়া!"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কে আবার বেহায়া হল গো?"

"কে জানে, একটা ফরসা মত ছেলেমানুষ বউ। স্নান করছিল কল—তা নয়, গায়ের মাথার কাপড় ফেলে; নির্লজ্জের একশেষ।"

শান্তি একটু ভাবিয়া লইল; বোধ হয় বধূটি কে, মনে মনে তাহাই স্থির করিয়া লইল। তার পর বলিল, "ও পশ্চিমের ঘরের সাবিত্রী…তা কি করে বল, বাড়ীতে একটিমাত্র কল, তাও পথের ধারে মেয়েদের অসুবিধের একশেষ।"

অবিনাশ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তাই বলে, কি অমন বেহায়া হতে হবে না কি?"

শান্তিও রাগিয়া গেল, বলিল, "বেহায়া-বেহায়া করছ যে বড়—বেহায়া হতে আমাদের বড় সাধ, না? দাও না স্নানের ঘর করিয়ে, জারি মুরোদ!…নিজেরা পারে না মেয়েদের আব্রু রক্ষে করতে, আর মেয়েদের এসে বলবেন বেহায়া!"

"তুমিও বোধ হয় অমনি করে স্নান কর?"

"করিই তো—বেশ করি—খুব করি—কি করবে আমার তুমি?"

অবিনাশ গর্জ্জন করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তখনই তাহার মনে পড়িল, এই ধরণের ইতর আলোচনা স্ত্রীর সহিত করা উচিত কি না। সে থামিয়া গেল; কিন্তু আর নহে, এখানকার বাস তাহাকে উঠাইতেই হইবে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াই মানুষকে সৎ ও অসৎ পথে চালিত করে। সে এই মাত্র তাহার মদ্যাসক্ত বন্ধুর মুখে শুনিয়া আসিয়াছে যে, শুদ্ধ ভদ্র-পল্লীতে বাসা করার জন্যই তাহাকে মদ্য পান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে—অর্থাৎ নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আর অবিনাশ নিজে? সে ক্রমশঃই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই দূষিত আবহাওয়া শান্তির মনের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব সে এই স্থান পরিবর্ত্তন করিবে।

কিন্তু করি করি করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত বাসা আদৌ পরিবর্ত্তন করা হইল না। ইতিমধ্যে শান্তি এক পুত্রসন্তান প্রসব করিল। অবশ্য অবিনাশ সে জন্য দুঃখিত হইবার পরিবর্ত্তে আনন্দিত হইল। তাহার বহুকালকার আশা যে, এই দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াও কি করিয়া সন্তানকে সভ্য এবং শিক্ষিত করিতে হয়, তাহা সকলকে দেখাইয়া দিবে। তাহার সঙ্গীরা বলিয়াছিল, "মানুষ হবে কোথা থেকে, না পায় মায়ের দুধ, না পায় গরুর দুধ—মায়ের বুকে

দুধ নেই, গরুর দুধ কেনবার পয়সা নেই।" অবিনাশ ছেলের জন্ত হর্লিকস্ কিনিয়া আনিল।

শান্তি বলিল, "ও কি হবে?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে প্রস্তুত প্রণালী পাঠ করিতে করিতে বলিল, "কেন খোকা খাবে।"

"গরুর দুধের ব্যবস্থা করলেই পারতে—মিছিমিছি পয়সা খরচ।"

অবিনাশ ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল, "তা বই কি! কতকগুলো ঘোলো দুধ গিলিয়ে গিলিয়ে ছেলেটাকে বাঁদর তৈরী কর আর কি?"

শান্তি আর কোন কথা বলিল না।

কিন্তু ছেলেকে সে বেশী দিন হর্লিকস্ খাওয়াইতে পারিল না। শেষ দিন হর্লিকস্ কিনিতে যাইবার সময় তাহার খেয়াল হইল যে, ঘরে একটিও পয়সা নাই। হর্লিকস্ যদি কিনিতেই হয় তাহা হইলে ঋণ করিতে হইবে। বাধ্য হইয়া সে গরুর দুধের ব্যবস্থা করিল। শান্তি দেখিয়া মনে মনে হাসিল, কিছু বলিল না।

মাস ছ'য়েক পরে এক দিন শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "খোকার নাম কি হবে?" অবিনাশ মনে মনে ছেলের একটা নাম ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, একবার বায়োস্কোপ দেখিতে গিয়া। সে ছায়া-ছবির নায়কের নাম শুনিয়া আসিয়াছিল 'দীপক।' তাহার আন্তরিক ইচ্ছা যে, তাহার পুত্রের নামও দীপক হয়। শান্তি বলিল, "গোপাল নামটা কেমন?"

অবিনাশ বিরক্ত হইল, কোথাকার এক অজ পাড়াগেঁয়ে নাম পাইয়াছে 'গোপাল!' কিন্তু শান্তিরই বা অপরাধ কি? গোপাল, দুলাল, কেলে, ভুতো, ছাড়া যে মানুষের নাম আর কিছু হইতে পারে, শান্তির কল্পনারও অতীত। সে তাহার চারি দিকে কেলে এবং ভুতোকেই দেখিতে পায়, সমীর অথবা অসীমকে দেখিতে পায় না। সে অনেক ভাবিয়া ছেলের নাম রাখিল অসীম।

বছর দুই পরে শান্তি এক কন্যা প্রসব করিল। তাহার নাম শান্তি রাখিয়াছিল কালিদাসী—অবিনাশ সে নাম পরিবর্তন করিয়া মেয়ের নাম রাখিল প্রতিমা।

অসীম একটু বড় হইতেই অবিনাশ ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। বলিল, "আমার ছেলে বিড়িও বাঁধবে না, গুণ্ডামিও করবে না—সে হবে মানুষের মত মানুষ।"

শান্তি বলিল, "ভালই তো। কিন্তু শেষ রক্ষে হলে হয়!"

অবিনাশ চীৎকার করিয়া বলিল, "আলবৎ হবে, একশ বার হবে।" কিন্তু শেষ রক্ষা হইবে কি না, সে বিষয়ে অবিনাশের সন্দেহ ছিল। কারণ, পোষ্যের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না, সুতরাং সংসারের খরচও বাড়িতেছে। অথচ আয় সেই পূর্ব্বের মত সাতাশ টাকাই আছে। অবশেষে এক দিন অসীম লেখাপড়া ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া বসিল।

শান্তি বলিল, "কি, ছেলেকে লেখাপড়া শেখালে না?"

অবিনাশ কিছু না বলিয়া একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল

অবিনাশ ভাবে, পাঁকেও তো পদ্মফুল জন্মায়। কিন্তু তখনই মত পরিবর্তন করে। পাঁকে পদ্মফুল জন্মায় সত্য, কিন্তু সে পুকুরের পাঁক, এ রূপ খানা-ডোবার পচা পাঁক নহে, এখানে যাহা জন্মায়, তাহা পদ্ম নহে, ভঁাট ফুল।

এক দিন সে বাসায় আসিবার সময় দেখিল অসীম মোড়ের মাথায় বিড়ির দোকানটায় বসিয়া বিড়ি বাঁধিতেছে। ফেরতা দিয়া কাপড় পরা, মাথার চুল দশ আনা ছ' আনা করিয়া ছাঁটা, গুণ গুণ করিয়া কি একটা গান গাহিতেছে, তাহার কাণের পাশে একটা আধ-পোড়া বিড়ি।

গভীর মনোবেদনায় সে অতি কষ্টে বাড়ী ফিরিল।

*

দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকটা বছর কাটিয়া গেল।

সে দিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শান্তি বলিল, "মেয়ের বিয়ে দেবে না, মেয়ে যে ও-দিকে ষোল পেরিয়ে সতেরয় পা দিল।"

অবিনাশ তামাক টানিতে টানিতে বলিল, "বিয়ে তো দেব—পাত্র? পাত্র কই?"

আশান্বিত হইয়া শান্তি বলিল, "কেন, এই তো আমাদের ক্ষীরো-দির ভাই রয়েছে, বয়েসটা একটু বেশীই হয়েছে, তা রোজগেরে পুরুষের আবার বয়েস, সোনার আংটি আবার বেঁকা!"

"কি করে ছেলেটি?"

"ওই যে গোয়ার বাজনায় সেই বড় যন্ত্রটা ভোঁ-পোঁ-পোঁ-

পোঁ-পোঁ-পোঁ করে বাজে, সেইটা বাজায়। তা উপায় করে ভাল।"

অবিনাশ চীৎকার করিয়া বলিল, "কি ওই একটা বাজনদারের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব! কখ্‌খনো না।"

শান্তি বেশ মোলায়েম সুরে বলিল, "বেশ তো, ক্ষমতা থাকে, রাজপুত্ত্বুর জামাই নিয়ে এস!"

এমন সময় অসীম বাড়ী ফিরিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া অবিনাশের চক্ষু স্থির। অসীম মদ খাইয়াছে। অসহ্য ক্রোধে তাহাকে মারিবার জন্য হাত উঠাইয়াও অবিনাশ হাত নামাইয়া লইল। অসীমের দোষ কি! অসীমের এই অবস্থার জন্য সে নিজেই দায়ী।

উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করিবার জন্য সে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে এক দিন সকালে অবিনাশ শুনিল, কাল রাত্রি হইতে প্রতিমাকে ও পাশের ঘরের ভাড়াটে সুবলকে পাওয়া যাইতেছে না।

পল্লী-রেণু

—শ্রীনকুলেশ্বর পাল

পল্লী আমার সোণার মাটি,
পল্লী আমার ব্রজের রেণু;
রাখাল রাজা যুগে যুগে
বাজায় হেথা গোঠের বেণু।

পল্লীমায়ের শ্যামল কোলে
নাই মদিরা বিলাসছায়া;
প্রতি ধূলিকণা ইহার
হর্ষ জাগায়, জাগায় মায়া।
এই মাটিতেই মানুষ হ'ল
আমার পিতা পিতামহ;
এ যে আমার স্বর্গ-ভূমি
এ যে আমার স্মৃতির গেহ।

অণু পরমাণু হেথায়
স্মৃতির গাঁথা কতই কহে;
পল্লীমায়ের ফল্গু-বুকে
গঙ্গাধারা নিত্য বহে।
সৌধ-কিরীট নাইকো হেথায়
এ নয় কভু বিলাসভূমি;
রাজিয়ে দেয় স্বর্ণ-চাঁপায়
বন-কুসুম সুবাস চুমি।

পল্লীমায়ের অঙ্গশোভা
উছলে পরে ভুবন ভরি;
ধূলি কণা—ব্রজের রেণু
ধন্য হব মাথায় করি।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার ইতিহাস

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসম্মেলন বা কংগ্রেসের জন্ম। প্রথমে ইহা ছিল বৎসরান্তের একটী মিলনসভা মাত্র। কিন্তু পরে ইহাই ক্রমে একটী মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে। জাতীয় মহাসমিতি আজ জাতীয় বিশাল শক্তিতে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার প্রভাব কাহাকে না নত করে? একদিন ইহার সুবিশাল শক্তিই ইহার সাধনা পূর্ণ করিবে।

কিন্তু ন্যূনাধিক এই সার্দ্ধ শতাব্দীতেই কি কংগ্রেস এত অমোঘ শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে? সে দিনই কি সবে ইহার জন্ম হইয়াছে? সত্যই কি এত অল্প দিন হইতে ইহাকে বাড়িতে দেখিয়াছি? ঠিক তা নয়। ফুল তো এক-দিনেই ফোটে না। কত যুগ-যুগান্তরের সাধনা যে ইহার পশ্চাতে নিহিত থাকে, কে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করে? আমাদের জাতীয় ইতিহাসও সে দিন হইতেই আরম্ভ হয় নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ নিজ শৌর্য্য, স্বাধীন চিন্তা ও কৃষ্টির প্রভাবে হিন্দুস্থানকে যে পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে, সেই সাধনা সমভাবেই তাহার রক্তের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কেবল নিজের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি-গণকেই সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হয় নাই, পরন্তু ক্রমে নবাগত ভ্রাতৃবৃন্দের—শক, হুন, পাঠান, মোগল প্রভৃতি সকলকেই সমভাবে আপনার করিয়া লইয়াছে। এই যুগ-যুগান্তরের সাধনাই ভারতবর্ষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে দেয় নাই, এই সাধনাই ক্রমে ইহার প্রাধান্য বাড়াইয়াছে, আর এই সাধনাই কালে ইহার প্রভুত্ব বিস্তার করিবে।

বস্তুতঃ, কৃষ্টি ও জাতীয়তা ভারতবাসীর অস্থি-মজ্জাগত—মান তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে—স্বাধীনভাব তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। একবার এই জাতীয়তা-শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া-ছিল 'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা' বাদশাহ আকবরের শাসন-কালে। ভারতের যখন বড়ই দুঃসময়, সমগ্র ভারতের সম্রাট্‌রূপে তখন আকবর শাহের আবির্ভাব হইল, রাজপুত বীরগণ পদানত হইয়াও সন্তোষ-হৃদয়, বাদশাহের সদয় ব্যবহারে তাঁহারা বিমোহিত-চিত্ত। ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞান, ভারতীয় মহাকাব্য, ভারতীয় জ্ঞানগরিমা আকবর শাহকে মুগ্ধ করিল, তিনি তাহাদের আভিজাত্যশক্তি বুঝিলেন এবং এই আভিজাত্যের তেজস্বিতা উপলব্ধি করিলেন। সম্রাট্‌ আকবর রাজপুত-গৌরবে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, সে গৌরব চূর্ণ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সকলে জালবদ্ধ হইল, হিন্দুর আত্মবিস্মৃতি আসিল, তুর্কীর হাতে কন্যা দান করিয়া মূর্খ হিন্দু প্রবলপ্রতাপ সম্রাটের পদপ্রান্তে সে আভিজাত্য-গৌরব জলাঞ্জলি দিল। সকলেই জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিল বটে, কিন্তু একজন প্রাণ দিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু মান বিসর্জ্জন দিলেন না, বীরদর্পে আপনার প্রদীপ্ত তেজোগর্ব্ব রক্ষা করিলেন। বীরবর প্রতাপসিংহ বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে একা দাঁড়াইয়া জাতির গৌরব রক্ষা করিলেন—তিনি জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিলেন "মানের জন্য আত্মবিসর্জ্জনই ভারতবাসীর কাম্য।" সকলে বিমুগ্ধ হইল, তুর্কী-পদানত জাতিবৃন্দও প্রশংসা করিতে লাগিল, সহোদর শক্ত শত্রুপক্ষ ত্যাগ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, মোগল রাজকবি পৃথ্বীরাজও প্রতাপকে আপনার গর্ব্ব রক্ষা উদ্দীপ্ত করিতে লাগিলেন। এই ভাবেই প্রতাপ আবার সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং তাহার সাধনা জয়যুক্ত হয়। তিনি ভারতীয় জাতীয়তা রক্ষা করেন। জাতিত্ব-বলে একাকী প্রতাপ ভারতের মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রতাপের সমসাময়িক আর দুই জন বাঙ্গালী বীরও ঐ সময়ে আপন আপন অঞ্চলে আভিজাত্যগর্ব্ব, জাতীয়তা-গৌরব ও মানরক্ষা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। বাঙ্গলার প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ করিয়া মোগল-সেনাপতিকে সন্ত্রস্ত করিয়া-ছিলেন, আর বাঙ্গলার কেদার রায় আরাবালি পর্ব্বতরাজি

সংরক্ষিত না হইয়াও যৌবুদ্ধে মানসিংহকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়েন, আর কিছুদিন পরে আবার বাঙ্গলার সীতারামও ফৌজদারকে পরাভূত করিয়া আদর্শ রাজ্য গঠনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে আবার মিবারের রাণা রাজসিংহ ও মারহাট্টা-সূর্য্য শিবাজী দুই দিক্ হইতে এমন ভাবে মোগল সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি একেবারে শিথিল করিয়া দেন যে, কে বলিবে যে ভারতীয় বীর স্বজাতি রক্ষার জন্য, স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য, স্বদেশ উদ্ধারের জন্য কখনও কোন অবস্থায়ই পশ্চাদ্‌পদ হইয়াছেন? তাই বলিতেছিলাম, যত দুর্দ্দিনই আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করুক না কেন, ভারত বারংবার বিদেশীয় কর্ত্তৃক হয়তো বিজিত হইয়াছে কিন্তু ভারতবাসী কখনও আপনার মান, জাতিত্ব ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দেয় নাই, কখনও দিতে পারে না। জাতীয়তাবোধ ভারতবাসীর অস্থিমজ্জাগত।

সে দিনও দেখিয়াছি বাঙ্গলার ভেদবুদ্ধি, বিশ্বাসঘাতকতা, মহারাষ্ট্রে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, মহীশূরে কৃতঘ্নতা যখন ভারতীয় জাতীয় জীবন পঙ্কিল এবং অধস্তন স্তরে অবনমিত করিয়াছিল, সেই সময়েও বাঙ্গলার মোহনলাল, বীর মীরমদন, মহারাষ্ট্রের মলহর রাও, বাজীরাও, আর মুসলমান সিরাজদ্দৌলা ও হায়দরপুত্র স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন—মাতৃ-স্বরূপিণী ভবানী ও অহল্যাবাঈও স্বীয় নারীত্বের পূর্ণমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

অতঃপর ইংরাজ আসিয়া বাঙ্গলা দখল করিল। পলাশী-কলঙ্ক ললাটে মিরজাফর নবাবী গদিতে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু অকর্ম্মণ্য নবাব কেবল গুলি খাইতেন, শাসন করিতেন না। এই সময়ে আবার ভাগ্যান্বেষী কাশিমালীর ভাগ্য ফিরিল—তিনি নবাব হইলেন। কিন্তু অবস্থায় পড়িয়া জাতীয়হৃদয় মিরকাশিমের আত্মবোধ জাগিয়া উঠিল, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের—শ্বেতাঙ্গ-বণিকগণের অসমদর্শিতা তাঁহার প্রাণে ব্যথা দিল। প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পাদির বিনাশ-সাধনে তাঁহার শোণিত উত্তপ্ত হইল, ইংরাজের সহিত তাঁহার বিরোধ অনিবার্য্য হইল। বাঙ্গলার মান রক্ষা করিতে নবাব মিরকাশিম স্বীয় সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন।

ইহারই পাঁচ বৎসর পরে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। আর এই সময় হইতেই ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় ইতিহাসের আরম্ভ। রামমোহন যখন এই জাতীয়তার বীজ প্রথমে রোপণ করেন, তখন বাঙ্গলা সম্পূর্ণ ইংরাজ করতলগত—আর হেষ্টিংস, ওয়েলেস্‌লি, ময়রার শাসন-কালে সমগ্র ভারত তখন উহাতে আবদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তখন এক জন ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি রামমোহনকে চিনিলেন, তাঁহাকে সাহায্য করিলেন, রামমোহন প্রোথিত জাতীয় বীজ তাঁহারই সাহায্যে অঙ্কুরে পরিণত হইল।

রামমোহন মনে করিলেন ইংরাজী না শিখিলে দেশবাসীর মধ্যে আত্মবোধ জাগিবে না, তাই তিনি ইংরাজীতে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবাসী যেন চাকুরী লাভ করিতে পারে, বিলাতে আন্দোলন করিয়া তাহাও পাশ করাইলেন।* তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন স্বাধীনতার বিরোধী জাতি পরিণামে জয়লাভ করিতে পারে না। "Enemies to liberty and friends of despotisms have never been and never will be ultimately successful—" তাই তিনি অষ্ট্রিয়ার প্রবল শক্তির নিকটে দুর্ব্বল নেপলসের হতোদ্যমে এতই ম্রিয়মাণ হন যে, বাক্ল্যাণ্ড নামক জনৈক ইংরাজের সহিত পূর্ব্বে সাক্ষাতের কথা স্থির হইলেও তিনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন নাই। আবার Reform Bill পাশ হওয়ায় এতই আনন্দিত হন যে, জনৈক বন্ধুকে লেখেন, "জাতির মুক্তি এবং সমগ্র জগতের মুক্তি দেখিতে আমি একান্ত উদ্‌গ্রীব। রিফর্ম্ম বিল পাশ না হইলে আমি ইংরাজ জাতির সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম।" এই স্বাধীনতা-প্রিয় রামমোহনই ইংলণ্ডে গমনপথে স্বাধীনতার পতাকা-বহনকারী ফরাসী জাহাজ দেখিয়া উহা থামাইয়া তাহাতে উঠেন এবং Glory, Glory, Glory to France বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।†

রামমোহন বিলাতে গিয়াও তাঁহার জাতীয় পোষাক পরিত্যাগ করেন নাই। ব্রাহ্মণ পাচক ও ভৃত্য হরিদাসকে সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং ফরাসী সম্রাট্ লুই ফিলিপের নিমন্ত্রণে ভোজন-মজলিসেও জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দেন নাই।

* Vide Indian Charter Act of 1833.

† ইতিপূর্ব্বে উত্তমাশা অন্তরীপে উঠিবার সময় সিঁড়িতে পিছলাইয়া রাজা পায়ে গুরুতর আঘাত পান।

বর্ত্তমানের 'স্বাধীন ভারত' রামমোহনেরই প্রথম কল্পনা। এই স্বাধীন ভারতকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন তিনি ইংরাজের বন্ধুরূপে এবং এসিয়ার পথ-প্রদর্শক রূপে। "As Independent India, Friend of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and Enlightener of Asia."

রামমোহন পরলোকপ্রাপ্ত হন ১৮৩৪ সালে। গুপ্ত কবি তখন ২৩ বৎসরের যুবক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন চতুর্দ্দশ বৎসরের বালক—মধুসূদন দত্ত, হরিশ মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তখন দশ বৎসরের কিশোর। দীনবন্ধু পাঁচ বৎসরের শিশু। আর মহামানব রামকৃষ্ণ পরমহংস ইহারই দুই বৎসর পরে ভূমিষ্ঠ হন। বঙ্কিম, কেশব, হেমচন্দ্রও চারি বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই সমধিক পরিমাণে জাতি-গঠনে সহায়তা করিয়াছেন।

রামমোহনের মৃত্যুর পনের বৎসর মধ্যেই একটী ভয়ানক আন্দোলনে জনশক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। বাঙ্গলার জিলায় জিলায়, পল্লীতে পল্লীতে, প্রজাগণের দুর্দ্দশা তখন চরমে উঠিয়াছিল। ১৭৮৪ সালের পিটের ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট অনুযায়ী কলিকাতায় একটী সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। ক্রমে জিলায় জিলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়। মফঃস্বলের ফৌজদারী আদালতে কিন্তু ইংরাজগণের বিচার হইত না—তাঁহাদের বিরুদ্ধে নালিসের বিচার হইত সুপ্রীম কোর্টে। ফলে অভিযোগের কারণ থাকিলেও, কলিকাতা আসিয়া মফঃস্বলের লোক অভিযোগ করিতে সাহস পাইত না। অর্থেও কুলাইয়া উঠিতে পারিত না। এ সময়ে আবার নীলকর কুঠীয়াল সাহেবেরা এক এক জন দুর্দ্ধর্ষ জমিদার হইয়া উঠিলেন। প্রজার প্রতি অত্যাচার অসহ্য হইল, ক্রমে উহা চরমে উঠিল। উদার-হৃদয় বীটন সাহেব তখন এই সকল অত্যাচারের মূল বিনাশে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। তিনি ১৮৪৯ চারিখানি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।* বীটন সাহেব দেখিলেন যে, কেবল কৃষকবর্গ ও প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচারের প্রতীকারই যথেষ্ট নয়, কোম্পানীর দেওয়ানী বিচারকগণের রক্ষার বিধান করাও আবশ্যক। কিন্তু তিনি চেষ্টা করিলেন বটে, সফলকাম হইলেন না। ইংরাজগণের মধ্যে তখন অসাধারণ সংহতি; তাঁহারা এই বিলকে 'কালা আইন, Black Act' বলিয়া আখ্যা দিলেন। বীটন সাহেবকে উপহাস, বিদ্রূপ ও অপমান করিলেন; আর এ দেশে ও বিলাতে আন্দোলন চালাইবার জন্য ৩৬ হাজার টাকা চাঁদা করিয়া সংগ্রহ করিলেন। এই আন্দোলনে দেশ কাঁপিয়া উঠিল। একা রামগোপাল ঘোষের বজ্রনির্ঘোষ-ধ্বনি শ্রুত হইল, কিন্তু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রমে উহা শুদ্ধ হইয়া গেল।

দেশীয়গণ হারিলেন বটে, কিন্তু এ অপমান তাঁহাদের হৃদয় বিদ্ধ করিল। তাঁহারা ইংরাজের সংহতির ফল দেখিলেন এবং অতঃপর আপনাদের সমবেত শক্তি বৃদ্ধি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সংহতির ফলই British Indian Association। ১৮৫১ সালের ৩১শে অক্টোবর ইহার প্রতিষ্ঠা। রাজা রাধাকান্ত দেব ইহার প্রথম সভাপতি এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক।

ইহার পরের ঘটনাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহ। অসন্তোষে ইহার সৃষ্টি কিন্তু জাতীয়তাবোধে ইহার বৃদ্ধি। তাই বুঝি বিদ্রোহীগণ পলাশীযুদ্ধের তারিখটিকেই প্রথম আক্রমণের দিনরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পঞ্জনদের খালসার মনে তখন ঘোর অসন্তোষ, নানাসাহেবের পেন্‌শন তখন বন্ধ, ঝাঁসীর রাণীর† তেজোদ্দীপ্ত বাণী 'মেরী ঝাঁসি নেহি দেঙ্গি' তাঁতিয়া টোপি, কুমার সিংহের বীরত্ব—সেই অনলে বিরাট ইন্ধন জোগাইয়াছিল। সেই মহাবিপ্লবে হিন্দু-মুসলমান একতাবদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইয়াছিল—দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ ও স্থির-মস্তিষ্ক ভারত শাসনকর্ত্তা ক্যানিংএর তৎপরতায়। তিনি ভারত ও ইংলণ্ডের বন্ধন দৃঢ়ীভূত করিয়া অপূর্ব্ব ধীশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন।

* 1. Draft of an Act abolishing exemption from the Jurisdiction of the East India Company's Criminal Courts.

2. Draft of an Act declaring the privileges of Her Majesty's European subjects.

3. Draft of an Act for the protection of Judicial officers.

4. Draft of an Act for trial by Jury in Company's Courts.

† সমসাময়িক জনৈক ইংরাজ বলেন, "Rani Lakshmi Bai is the only man amongst the Indian people."

১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ এবং ১৮৪১-এর বাঙ্গলায় জাগরণ এতদুভয়ের নীতি এবং আদর্শে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ১৮৫৭ সালের সেই বিদ্রোহে বারাকপুর, বহরমপুর ও রাণীগঞ্জে সামরিক চাঞ্চল্য দৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালী তাহাতে যোগ দেয় নাই।—দেয় নাই—অনেকটা ধর্ম্মাদর্শে এবং অনেকটা রামমোহন রায়ের শিক্ষাগুণে। যে বাঙ্গালী এক দিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বিরাট কার্য্যকুশলতায়, অবিশ্রান্ত সংগ্রামে, আত্মবোধের প্রেরণায় সমগ্র জগতে প্রমাণ করিয়াছিল "হিংসার দ্যোতনা কেবল শক্তি, সময় এবং সংহতির অপব্যয় মাত্র—আরও প্রমাণ করিয়াছিলেন অহিংসনীতিতে স্বাধীনতা অর্জ্জন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু হিংসায় কখনও আমরা প্রকৃত অধিকার পাইতে পারিব না—" সেই বাঙ্গালী সেই বিদ্রোহে কিছুমাত্র সহানুভূতি না দেখাইয়া বড়ই বুদ্ধিমত্তা ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিল।

তাই বিদ্রোহের পরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যখন হিংসাত্মক বিদ্রোহের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নিষ্ক্রিয়তা আনিয়া ঐ সমস্ত প্রদেশকে জড় ভাবাপন্ন করিয়া ফেলিল, বাঙ্গলা তখন সংহতি-বলে আপনার আন্তরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। আর মহারাণীর ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্র (Magna Carta of India) সেই শক্তি সঞ্চয়ে সাময়িক-ভাবে সহায় হইল।

এই জনশক্তি আবার প্রবল হইয়া উঠে ১৮৬০ সালে নীলকর সাহেবগণের বিরুদ্ধে প্রজা-জাগরণে। ইহাও বিদ্রোহ; তবে তাহা নিরস্ত্র ও অহিংসাত্মক। তাই উহা এত প্রবলাকার ধারণ করিয়াছিল, আর বাঙ্গলার জনশক্তিও তাহাতে সম্পূর্ণরূপেই জয়যুক্ত হইয়াছিল। উহার ইতিহাস আমরা আগামীবারে প্রদান করিব।

পরম আহ্বান

—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

আনন্দ-বিলাস-মুগ্ধ এ দুটি নয়ন
ছিল যবে নিমীলিত স্থলপদ্ম সম,
স্বর্ণ ও রৌপ্যের রূপ-দীপ্তি অনুপম
চেতনা আচ্ছন্ন করি, আছিল যখন,
এক দিন শুভক্ষণে তোমারে তখন
ডেকেছিনু কাছে এসো পুরুষ পরম;
হায়, আসিলে না তুমি নিষ্ঠুর নির্ম্মম!
আবার ভুলিনু তোমা নিঃশব্দে কখন।

বহুবর্ষ গেছে চলি মৃত্যুপথ ধরি'
তার পর, আজি আমি ভিক্ষুকের মত
ঘুরে ফিরি তৃষ্ণাতুর অশ্রু ভারানত;
ডাকি তোমা পুনর্ব্বার আঁখি-জলে ভরি,
এস আজ, সারা বক্ষ আলোড়িত করি';
কাছে এলে সর্ব্ব দুঃখ মুছে হৃদিক্ষত।

সুয়াঙ্থাই

—শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

বিংশ শতাব্দীর জনজাগরণে শ্যামবাসীর সাড়া দিবার ভঙ্গি অভূতপূর্ব্ব। তাদের বিপ্লব জলের আবরণে প্রচ্ছন্ন অগ্নির মত। একটা রাজ্যের প্রচলিত পদ্ধতিকে পুড়াইয়া ছাই করিল; অথচ জাতির প্রাণে জ্বালা দিল না এতটুকুও। আজ বিশ্বের স্বাধীন জাতির সহিত শ্যাম তাহার বিজয়-কেতন দুলাইয়া বলিতেছে, "আমিও একটি দেশ, আমারও জাতীয়তা আছে, স্বাধীনতা আছে!"

অতীতের সংস্কৃতির জরাজীর্ণ আদর্শকে দূর করিয়া পাশ্চাত্যমন্ত্রে দীক্ষিত শ্যাম আজ অনাগত যুগের আধুনিকতাকে বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক বিপ্লবের অবসান করিয়া আজ তাহার নৈতিক ও জাতীয় জীবন, আচার-ব্যবহার, শিল্পকলা, বাণিজ্য প্রভৃতির মধ্যে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে। দেশের আপামর জনসাধারণকে পাশ্চাত্যের সমকক্ষ করিতে আধুনিক স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, হাসপাতাল প্রভৃতিতে দেশ ভরিয়া উঠিয়াছে। কৃষকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সমবায় সমিতিসমূহ গঠন ও নব্যতম আদর্শের কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এমন কি বন্য অঞ্চল ও গ্রামের লোকদিগকেও শহরে আনাইয়া নব্যপ্রণালীর স্বাস্থ্য-সেবা ও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা দিয়া স্বস্থানে প্রচারের জন্য পাঠান হইতেছে।

ব্যাঙ্কক প্রভৃতি শহরে এখন মোটর-গাড়ীর ছড়াছড়ি। উপরে বিমানপোত ও দেশের সর্ব্বত্র রেলপথের ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যাঙ্ককের উপকণ্ঠে একটি বিমান-ঘাঁটি খোলা হইয়াছে।• আকাশ-পথে চীনদেশ হইতে ইয়োরোপ যাতায়াতের ইহাই এখন প্রধান আড্ডা। ছয় বৎসর পূর্ব্বে সেই দেশে এই সমস্ত সুবিধার কিছুই ছিল না। শিক্ষা-দীক্ষার বহুল প্রচার বা যানবাহনের এত উন্নতি সমস্তই মাত্র কয়েক বৎসরের চেষ্টার ফল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রেলপথ ছিল মাত্র ৯০ মাইল, তাহাও একজন বৈদেশিকের দীর্ঘ আট বৎসরের চেষ্টায়। আজ শ্যামরাজ্যের জলের তলায় ডুবোজাহাজ ঘোরাঘুরি করে। সে দেশের সর্ব্বত্রই যেন একটা নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছে। যেন মৃতদেহে প্রাণের সাড়া লাগিয়া গিয়াছে।

সেখানে নারীর স্থান ঠিক পুরুষের পার্শ্বেই। পথে, ঘাটে সর্ব্বত্র পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা ও মহিলাগণ বীরদাপে বিচরণ করে। তাদের সামরিক কায়দার চলন-বলন যেন প্রাচীনতাকে উপহাস করিয়া বলিতেছে,—"সে দিন আর নাই!" এখন তাহারা পোষাক পরে ইংরাজ মহিলার মত—টাইট বডি, পুলওভার প্রভৃতি।

শ্যাম এখন চায় জগজ্জাতির সহিত মৈত্রী বন্ধন করিতে। বিগত বৎসর সে গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জাপান, সুইডেন ও সুইট্‌সারল্যাণ্ডের সহিত বাণিজ্য ও নৌ-বিভাগীয় চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক শক্তিপুঞ্জের নিকট তাহার স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ায়, সে পাইয়াছে তাহার আদালতে সকল জাতির বিচারের ক্ষমতা। দেশের সর্ব্বত্র মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে; ইহাদের নববিধানের কার্য্যপদ্ধতি চমকপ্রদ।

মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য লটারির প্রবর্ত্তন শ্যামরাজ্যের একটি বিশিষ্ট ব্যবস্থা। ইহার লভ্যাংশ হইতে দেশের জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, আরোগ্যশালা ও অগ্নিনির্ব্বাপক সমিতির ব্যয়ভার নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহার ডাক হয় বছরে তিনবার; এবং নির্দ্দিষ্ট দিন আগত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া যায়। ইহাদ্বারা দেশবাসীর বিশেষ সহানুভূতির লক্ষণই প্রকাশ পায়। তাই ক্রেতাগণকে সুবিধাও দেওয়া হয় যথেষ্ট পরিমাণে।

এই লটারির মীমাংসা হয় সাধারণের সমক্ষে। ইহার পদ্ধতি এত সূক্ষ্ম যে, কাহারও কোনরূপ অসন্তুষ্টির কারণ থাকে না। প্রতি ক্ষেপে টিকিট বিক্রয় হয় সাত আট লক্ষ। প্রাপ্ত অর্থের শতকরা ৪০ ভাগ মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়ের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ পুরস্কাররূপে বিতরিত হয়। নিষ্পত্তির ফলাফল লাউড্‌স্পীকারের সাহায্যে আগত-সাধারণকে শুনান হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাহা রেডিও-

যোগে ও পরে সংবাদপত্র মারফৎ দেশময় প্রচারিত হইয়া যায়। *

প্রতি বৎসর ২৪শে জুন জাতীয় দিবস উপলক্ষে শ্যামরাজ্যে বিশেষ উৎসবের আয়োজন হয়। গত বৎসরও ইহা দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী সেখানে ঘোষণা করিয়াছেন যে, অতঃপর ইংরাজীতে শ্যামের নাম হইবে থাইল্যাণ্ড বা মুয়াঙ্‌থাই; এবং অধিবাসীরা পরিচিত হইবে 'থাই' নামে। কারণ তাহাদের 'থাই' শব্দের ভাবাগত অর্থ স্বাধীন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন শ্যামের শাসনতন্ত্রের নব-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। তাহারই স্মৃতিকল্পে এই উৎসবের অনুষ্ঠান।

প্রধান মন্ত্রী লুয়াং আজ বিশ্বের বিপুল দুয়ারে করাঘাত করিয়া বলিতেছেন, "একনায়কত্ব চিরদিনই জন-জাগরণের পরিপন্থী; কিন্তু শ্যামের নায়কতা তার গণশক্তি বিকাশেরই সহায়ক।"

বিদ্রোহ-পর্ব্বের পূর্ব্ববর্ত্তী জাতীয় জীবন অতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। এ দৌর্ব্বল্য যেদিন জাতির চক্ষে ধরা পড়িল, সেই দিনই হইল তার অন্তর-সংস্কারের গোড়াপত্তন। পূর্ব্বে জনসাধারণের ধারণা ছিল, মৌচাকে যে সব মাছি মধু সংগ্রহ করে, তাহারা নিকৃষ্ট। আর যাহারা আরামে থাকিয়া সেই মধু উপভোগ করে, তাহারাই রাণী। ইউরোপবাসীরা অতি হীন, চাকরের মত শুধু খাটিতে চায়। আফিসের কাজ, রেলপথ তৈয়ারী, সৈন্য চালনা, শাসন-সংস্কার প্রভৃতি মস্তিষ্কবিকৃতকারী চিন্তাগুলি হীনপর্য্যায়ের এবং সেইগুলিই যেন পাশ্চাত্ত্যবাসীর জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। আর তাহারা নিজেরা বাবু সম্প্রদায়ের; ঐ সমস্ত জটিল চিন্তা মাথায় ঢুকাইয়া উপভোগ্য চিন্তার বাধা জন্মাইবে না।

জনৈক ইতিহাস-লেখক তখনকার জাতীয় জীবন বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, শ্যামের শিশুরা হাঁটিতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে জলে সাঁতার দিতেও শিখে। তাহার পর নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে (klong) কখনও সাঁতার কাটিয়া, কখনও পথে পথে ছুটাছুটি করিয়া কাটায়। কাপড়, জামার বালাই বড় একটা থাকে না। রোদ, বৃষ্টির বাধাও মানে না। তার পর দশ এগার বৎসর বয়সে পাড়ার পুরোহিত মহাশয়ের টোলে কিছু বর্ণবোধ করিয়া লয়। ইহাই তাদের দীর্ঘজীবনের পাথেয়।

সেই দেশের টোলগুলি 'ওয়াট' নামক মন্দির বা মঠ সংলগ্ন পাঠশালা বিশেষ। যাজকেরাই তাহার শিক্ষক ও পরিচালক। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে গভীর চিন্তার কিছুই থাকে না। মোটামুটি লিখিতে ও পড়িতে জানিলেই যথেষ্ট। পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া যুবকগণ পাড়ায় পাড়ায় যাত্রা, গান, ক্রীড়ার উৎসাহ দিয়া তাহারই সমালোচনা করিয়া বেড়ায়।

তাহাদের জাতীয় পোষাক "পনাং" একখানি এক গজ প্রস্থ ও তিন গজ দীর্ঘ কাপড়ের টুকরা। তাহার মধ্যস্থল জড়াইয়া দুইটি কোণ একত্রে পিছনে গুঁজিয়া দেয়। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষের কোন পার্থক্য নাই। কেবল বয়স্থারা বগলের নীচ হইতে একখানা অতিরিক্ত কাপড় ব্যবহার করে। তবে পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে জামা, জুতা ও মোজার ব্যবহারও দেখা যায়।

জাতির মধ্যে জড়তা আসিলেও মহিলাগণ সে দেশে বিশেষ তৎপর। তাদের স্থান পুরুষের অনেক উপরে। ধান্য বপন, বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি চাষের কাজ তাহারাই করিয়া থাকে। গৃহস্বামী পত্নী বা বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করে না। অথচ ওয়াট নামক বিদ্যা-গৃহের বিদ্যা বণ্টনের সময় তাহাদের অংশ থাকে না মোটেই।

আপামর জনসাধারণের মধ্যে পান খাইবার রীতি আছে। পুরুষেরা এক গাল পান করিয়া খোস-গল্প, হাসি, রসিকতার মধ্য দিয়া জীবন কাটায়। তাহাতেই তাহাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি। বিবাদ, বিসংবাদের ধারও ধারে না। অযথা কাহারও আনন্দে বাধা দেওয়া ঘোরতর অন্যায় মনে করে। কোথাও কলহ বা মারপিটের কথা শুনিলে গ্রামবাসীরা যথাসাধ্য আপনাদের বাঁচাইয়া চলে, তার সংস্পর্শেও যায় না।

দেশের এই অবস্থায় সমস্ত জাতি একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িল। প্রকৃতির চিরন্তন প্রথামত ইহার পরিণামে আসিল অর্থসঙ্কট। তার পর যখন চোখ ফুটিল, তাহারা বুঝিল যে,

* এই নিবন্ধের প্রবর্ত্তক ঘোষাই অঞ্চলের একজন পার্শী ভদ্রলোক। তিনি বহুকাল হইতে শ্যামরাজ্যে বসবাস করিতেছেন।

রাজশক্তিই জাতির মজ্জায় ঘুণ ধরাইয়াছে। তখন কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সারা দেশময় বিপ্লবের এক অন্তঃস্রোত বহাইয়া দিল।

তখন শ্যামের শাসনদণ্ড ছিল রাজা প্রজাধিপকের হস্তে। তিনি প্রজার ব্যথা বুঝিয়া সিংহাসনের একাংশ তাহাদের ছাড়িয়া দিলেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন দেশে প্রবর্ত্তিত হইল Limited Monarchy বা জনমতসিদ্ধ শাসনতন্ত্র। প্রজারা ইহাতে সাময়িকভাবে সন্তুষ্ট হইলেও দারিদ্র্যের কোন উপশম হইল না। পর বৎসর তাহারা আবার বিদ্রোহ করিল ১২ই অক্টোবর তারিখে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন, ব্যাভারাদাজ রাজার এক জন জ্ঞাতি ও লুয়াং প্রদীৎ—বর্ত্তমান পররাষ্ট্র-সচিব। রাজা প্রজাধিপক তৎপরতার সহিত বিদ্রোহ দমন করিলেন, ছয় দিনের মধ্যেই। কিন্তু নেতাদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান না করিয়া তিনি করিলেন বিপরীত। এক বার প্রজানুরঞ্জন করিতে, তিনি চিরন্তন স্বৈরাচার প্রথার উচ্ছেদ করিয়াছেন। এ বারও প্রজাদের অসন্তোষের কারণ দূর করিতে, তিনি তাহাদের সকল প্রকার ব্যবস্থাতেই রাজী হইলেন। রাণী রাম বাঈ বার্নীও মত দিলেন রাজার উদারতার অনুকূলে।

এই জয়-যজ্ঞের হোতা, ফয়া বাহোল ও লুয়াং প্রদীৎ। তাঁহারা স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ইয়োরোপভূমিতে। তাহার পর দেশে ফিরিয়া কাণে কাণে সে বাণী প্রচার করিতে থাকেন। ক্রমে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের দলগত করিয়া নব্য-তন্ত্রের একখানা লিপি প্রস্তুত করেন। তার পর এক রাত্রে রাজাকে দিয়া তাহা সমর্থন করাইয়া লইলেন। ব্যস! পরবর্ত্তী প্রভাতে অধিবাসীরা দেখিল, তাহারা এক নূতন দেশের মানুষ। জগতের অন্যতম স্বাধীন জাতি!

এ দিকে রাজা দেখিলেন, তিনি রাজশক্তিতে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। একে একে সমস্ত ক্ষমতাই প্রজাদের হাতে গিয়া পড়িল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে রাজোচিত ক্ষমতা এত দূর খর্ব্ব হইল যে, এখন আর সিংহাসনে বসিয়া থাকার কোন যথার্থ অর্থই হয় না। তিনি সিংহাসন-পরিত্যাগ করিলেন। উত্তরাধিকারী হইল আনন্দ মহীদল, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র।

আনন্দ মহীদলের বয়স তখন মাত্র এগার বৎসর। সুইট্‌সারল্যাণ্ডের লোসানের এক বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন। খুল্লতাতের সিংহাসন ত্যাগে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি রাজ্য গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। সে কথা কাহারও কাণে লাগিল না। মন্ত্রীমণ্ডলী রাজপ্রতিনিধি-সভা গঠন করিয়া রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রজাধিপক ইচ্ছা করিলে দমন-নীতির দ্বারা বিদ্রোহিগণকে শায়েস্তা করিতে পারিতেন। কয়েক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বিদ্রোহ করিলেও সৈনিকগণ ও প্রজাসাধারণ তাঁহারই পক্ষপাতিত্ব করিয়াছিল। জাপান সরকার বিদ্রোহ দমনে তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন না। হত্যাকাণ্ড দ্বারা আপনার রাজত্বকাল কলঙ্কিত করা অপেক্ষা প্রজাদের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়াই সুবিবেচনা মনে করিলেন।

শ্যামরাজ্যে সেই সময় ঘোর দুর্দ্দিন। চতুর্দ্দিকের বৈদেশিক গ্রাস হইতে দেশ রক্ষা করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

প্রজাধিপকের সিংহাসন ত্যাগের পর হইতে শ্যামদেশে জাপানের শক্তিসঞ্চালন চিন্তার বিষয়। পাশ্চাত্ত্য-বাদের ঘোর বিপক্ষ জাপান আজ সমগ্র এশিয়াকে আপনার নেতৃত্বে প্রাচ্য আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চায়। যেই জাপান এক দিন শ্যামরাজকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল; সেই জাপানই আবার পরদিবস বিপক্ষী বিদ্রোহীপক্ষ সমর্থন করিতেছে। তার এই কুটিল রহস্য মোটেই দুর্ভেদ্য নয়। আজ শ্যামের রাজনৈতিক প্রগতিতে জাপানের বুদ্ধি ও নৈপুণ্য কাজ করিতেছে যথেষ্ট পরিমাণে। সরকারের উচ্চতর কর্ম্মে জাপানী কর্ম্মচারীর অধিষ্ঠান; বায়ুযান বিভাগে, সেনা বিভাগে, জাপানী বিশেষজ্ঞের শিক্ষকতা যেন পাশ্চাত্ত্যবাদকে দলিত করিবারই বিপুল চেষ্টা। শ্যামের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আজ দলে দলে জাপানে চলিয়াছে শিক্ষা করিতে। তাহার ইংরাজ ও ফরাসী অধিকৃত স্থানগুলি পুনরায়ত্তে অনিবার্য জন্য দাবী জানাইতে জাপান আজ তাহাকে উত্তেজিত করিতেছে বারে বারে। কে জানে, ইহা ভারত আগমনের পথ সুগম করিবারই অভিসন্ধি কি না!

শ্যামরাজ্যে পাশ্চাত্ত্যের ক্ষমতা কতকাংশে ক্ষুণ্ণ হইলেও ইংরাজ তথা ইয়োরোপের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা বিন্দুমাত্রও

স্থান পায় নাই ভূতপূর্ব্ব মহারাজা প্রজাধিপক রাজ্যত্যাগের পর হইতে ইংলণ্ডেই বসবাস করিতেছেন। গত বৎসর শ্যামবাসীরা তাঁহাকে স্বদেশে আনিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও বিফল হইয়াছে। প্রজাধিপকের এক ভ্রাতুষ্পুত্র চুলচক্রবংশী (Culachakrabangse) বহুদিন হইতে ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন। গত বৎসর ইংরাজ মহিলা এলিজাবেথ হান্টারকে বিবাহ করিয়া তিনি ইংলণ্ডের সহিত এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন।

শ্যামরাজগণের ইয়োরোপ যাত্রা বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই শুরু হইয়াছে। রাজ সরকারে ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। রাজা মহামুকুটের (Maha Moukut) পুত্র চূড়ালংকরণ (Chulalonkorn) ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপ ভ্রমণে যাইয়া সর্ব্বত্র আন্তরিক অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন। গঠন মূলক উদ্দেশ্য লইয়া পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ শ্যামরাজবংশে তাঁহারই প্রথম। চূড়ালংকরণের পুত্র মহাভজির বুধ বা ষষ্ঠ রাম শিকার জন্ম কিছু কাল ইংলণ্ডে বসবাস করেন। সেই সময় তথাকার কতকগুলি অনুষ্ঠানে তিনি শ্যামরাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়ন্তী উৎসব ও তাঁহার মৃত্যুতে শব-যাত্রা উল্লেখযোগ্য। তখন শ্যামের রাজ-পরিবারে পাশ্চাত্যভাব এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, রাজা মহামুকুটের ভ্রাতা তাঁহার পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন জর্জ্জ ওয়াশিংটন। তাঁহার মতে জর্জ্জ ওয়াশিংটনই জগতের শ্রেষ্ঠ বীর। এবং সেইজন্য তিনি রাজবংশের জাতীয় নাম বর্জ্জন করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। রাজা জর্জ্জ ওয়াশিংটনের রাজত্ব কালেই (১৮৬৬-১৮৮৫ খৃঃ অব্দ) শ্যামের সহিত গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য-চুক্তি স্থাপিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা ফরা নরাই বা নরেৎ-(প্রভু নারায়ণ বা নরেশ)-এর সহিত ফরাসী রাজ চতুর্দ্দশ লুই-এর বিশেষ সখ্য ছিল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফরাসীরাজ শ্যামদূতকে পুরস্কার দানে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করেন। তখন শ্যামের প্রধান মন্ত্রী ছিল কনষ্টান্টাইন্ ফালকন (Constantine Phaulcon) নামে এক জন গ্রীক। ইনি ভাগ্যান্বেষণে পূর্ব্ব দেশে আসিয়া কিছুদিন ভারতে ইংরাজের অধীনে চাকুরী করেন। পরে শ্যামরাজ্যে গিয়া সামান্য অবস্থা হইতে বুদ্ধিবলে ক্রমে প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। প্রভু নারায়ণকে ফরাসীরাজ্যে দূত প্রেরণের পরামর্শ তিনিই দিয়াছিলেন।

সেই সময় সে দেশে পর্ত্তুগীসদের বিলক্ষণ প্রভাব। তাহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়া রাজ সরকারে চাকুরী গ্রহণ করিত। এক সময়ে পেগু, ব্রহ্ম ও কম্বোজ রাজ যখন উপর্য্যুপরি শ্যামদেশ আক্রমণ করিয়া তাৎকালিক রাজধানী অযোধ্যা নগরী (বর্ত্তমানে আয়ুথিয়া) লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল ; তখন পর্ত্তুগীসদের সাহায্য শ্যামের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

ফরাসী রাজের নির্দ্দেশমত একবার ফরাসী দূত শ্যাম রাজকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্ম সেখানকার খৃষ্টান মিশনারীর সহিত পরামর্শ আরম্ভ করেন। মন্ত্রী ফালকনও সেই পরামর্শে যোগদান করেন। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া ফালকনের হত্যাসাধন করান এবং ফরাসীর সহিত বন্ধুত্বসূত্রও ছিন্ন করিয়া ফেলেন। তৎকালে শ্যামের দেশীয় খৃষ্টানগণ পর্য্যন্ত ভয়ে তটস্থ থাকিত।

শ্যামের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগের বিক্রম প্রদর্শন তাহার জাতির পক্ষে কম গৌরবের নয়। শক্তিমান জাতির অত্যাচারের যথার্থ প্রত্যুত্তর দিতে সে কখনও ভয় পাইত না। এক বার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ বিশেষ কারণে শ্যামদেশ আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাতে শ্যামবাসিগণ রাজাদেশে মার্গুই বন্দরের ইংরাজগণকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে ও অযোধ্যানগরীর কুঠী উঠাইয়া দেয় (১৮৮৭ খৃঃ অব্দ)। শ্যামে তখন ইংরাজের অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক।

জাতি সংগঠনের জন্য শ্যামরাজগণ রাজ-সরকারে ইংরাজ, ফরাসী ও পর্ত্তুগীসদের ন্যায় জাপানী কর্ম্মচারীও নিয়োগ করিতেন। এক বার সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, (১৫৯২-১৬০২ খৃঃ অব্দে) শ্যামের জাপানী কর্ম্মচারিগণ আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা পাইয়াছিল। ফলে শ্যামবাসিগণ একযোগে সমস্ত জাপানী হত্যা করিতে লাগিয়া

গেল। কয়েক জন মাত্র দেশে খবর দিবার জন্ম পলাইতে পারিয়াছিল। ইহারই পরে ১৬৩৬ খৃঃ অব্দে জাপানরাজ জাপ জাতির বিদেশ গমন প্রথা রহিত করিয়া দেন। পরে যখন তাহারা আবার বাণিজ্য করিতে আসে, তখন চীন, ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকদের সহিত একত্রিত হইয়াই আসিয়াছিল।

বৈদেশিক অধিকারেও শ্যাম একেবারে খর্ব্ব ছিল না। লাও, পেগুয়া, কাম্বোজ, মালয়, মলাক্কা ও যবদ্বীপে পর্য্যন্ত এক দিন সে তাহার বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দিয়া আসিয়াছিল।

সে দিনের কথা,—জাপান যখন জাতি-সঙ্ঘকে অগ্রাহ্য করিয়া মাঞ্চুকুও দখল করিতে যায়, তখন শ্যাম তাহাকে অভয় দিয়াছিল, জাতি-সঙ্ঘের ভয় সে করে নাই।

শ্যাম সিংহাসনে এ পর্য্যন্ত পাঁচটি বংশ রাজত্ব করেন। ভিন্ন ভিন্ন বংশের রাজত্বকালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজধানী নির্ম্মিত হয়—সুখোদয়, অযোধ্যা, ধনপুরী ও ব্যাঙ্কক। পূর্ব্ব চারিটি রাজ-বংশ রাজধানীর নামেই উল্লিখিত হইয়া থাকে।

সুখোদয় বংশের রাজা রাম গামহেনের (Ram Gamhen) সময় ধর্ম্মে যথেষ্ট গ্লানি প্রবেশ করে। তিনি ধর্ম্মের মতানৈক্য দূর করিতে সিংহল রাজের নিকট উপযুক্ত যাজকের আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। তাঁহার সময় শ্যামরাজ্য পূর্ব্বে মেকং নদীর তীর হইতে পশ্চিমে পেঁচাবুড়ি নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাম গামহেনের পুত্র রাজা প্রথম ধর্ম্মরাজ একটি ধর্ম্মমহামণ্ডল গঠন করিয়া সিংহলী যাজকের দ্বারা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের শিক্ষার ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন (১৩১৭ খৃঃ অব্দ)। তাঁহার নিজেরও হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

শ্যাম ও সিংহলের বৌদ্ধবাদ একমতসিদ্ধ। সেই জন্য পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মদ্বন্দ্বে সাহায্য করিতে পারে। তাই আবার ১৭৫০ খৃঃ অব্দে অযোধ্যা বংশের রাজত্বকালে সিংহলরাজ কীর্ত্তিশ্রী এক জন উপযুক্ত যাজকের জন্য সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কারণ, সেই সময় সিংহলের ধর্ম্মাচরণ সংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে।

রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যানগরীর অনুকরণে শ্যামের অযোধ্যানগর নির্ম্মিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে। অযোধ্যা-নগরের এককালে অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল; কিন্তু বার বার পেগু, ব্রহ্ম ও কাম্বোজ রাজ্যের অত্যাচারে সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সেই সময় জাতি পর্য্যন্ত একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তার পর অযোধ্যার পতনের সময় ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে দেশময় অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দিল। তখন ব্রহাতক নামক চৈনিক বংশীয় এক জন বীর সিংহাসন অধিকার করিয়া ধনপুরীতে রাজধানী স্থাপন করেন।

ধনপুরীর সিংহাসনে আর কোন রাজা উপবেশন করেন নাই। বৃদ্ধ বয়সে ব্রহাতক বায়ুগ্রস্ত হইয়া যথেচ্ছা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। মন্ত্রিকুল ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিলে, তাহাদের নেতা জয়চক্রী রাজা হইয়া বসেন। তিনিই বর্ত্তমান চক্রী বা চক্রবর্ত্তী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয় ব্যাঙ্কক নগরে।

বর্ত্তমান শ্যামজাতির আদি ইতিহাস সম্বন্ধে বহু মত পাওয়া যায়। ব্রহ্ম, শ্যাম, আনাম, মালয়, কাম্বোজ, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতি আসিয়া বাস করিতে থাকে। পণ্ডিতগণ শরীর-গঠনের সাদৃশ্য দেখিয়া তাহাদিগকে একই বংশের অবতংস অনুমান করেন। ভাষা ও আচারগত বৈষম্য যথেষ্ট থাকিলেও, তাহাদিগকে মধ্য-এশিয়ার মঙ্গোলিয়ান সম্প্রদায়ের মিশ্র জাতি বলিয়া ধরা হয়। সর্ব্বপ্রথম মালয়-জাতি ও ইন্দোচীনারা উত্তর দেশ হইতে আসিয়া ঐ দুই স্থানে বাস করিতে থাকে। তাহারা ছিল মঙ্গোলিয়ানদের অতি দূর আত্মীয়। ইহার পরে আসে মন্‌স্‌ বা কাম্বোজ জাতি দক্ষিণ চীন হইতে। থাই বা শান জাতি আসিয়াছিল আরও অনেক পরে। সম্ভবতঃ তাহারা চীনদেশ হইতে আসিয়া লাও প্রদেশের উচ্চভূমিতে প্রথম বসবাস করিতে থাকে।

অনেকে অনুমান করেন যে, চীনের প্রাচীন শাং-জাতি এই শান জাতিরই একটা শাখা। চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে শান অথবা থাই জাতি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। দক্ষিণ চীনে বাস করিবার সময়, কবে কোন্ সময় যেন তাহারা আরও দক্ষিণে সরিয়া আসে।

দক্ষিণ চীনে আসিবার পূর্ব্বে ইহারা কিছুকাল তিব্বতের মালভূমিতে বাস করিয়াছিল। শান ও ব্রহ্মবাসীর সহিত

তিব্বতীয়দের চরিত্রগত সামঞ্জস্যই ইহার সমর্থক। তবে তিব্বত, ব্রহ্ম, শান ও লাও জাতিরা যে একই পূর্ব্বপুরুষের সন্তান, তাহা সমর্থন করিবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। বর্ত্তমানের শ্যাম নাম সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজদের দেওয়া। তাহারাই শান বা শিয়ান শব্দকে শ্যাম বা শিয়াম বলিয়া অভিহিত করিত।

অপর দিকে, শ্যাম, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতবর্ষের আচার ও ভাবাগত বৈষম্য অতি সামান্য। শ্যামের পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ভারত হইতে দুই জন ব্রাহ্মণ কুমার পর্য্যটনে আসিয়া শ্যামরাজ্য স্থাপন করেন। সেই সময় ভারতে ভগবান শাক্যসিংহ তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছিলেন। হয় তো ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই তাঁহারা পূর্ব্ব দিকে পলাইয়া আসেন।

কাহারও কাহারও মতে, মহাভারতের দিগ্বিজয় পর্ব্বে শর্ম্মক ও বর্ম্মক নামে যে দুইটি জনপদের উল্লেখ আছে, তাহাই বর্ত্তমানের শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ। আধুনিক থাই জাতির অপর নাম শান বা শ্যাম শব্দের ভাবাগত অপভ্রংশ উচ্চারণ শয়ম্। ৪০৭ খৃষ্টাব্দে যখন কাম্বোজরাজ অরুণরত শ্যামদেশ শাসন করিতেছিলেন, তখন সেখানে থাই নামের কোন জাতি ছিল না। শ্যাম শব্দ তখন শয়ম্ নামেই অভিহিত হইত।

ভারতীয় কাব্যে, পুরাণে কাম্বোজ রাজ্যের উল্লেখ আছে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নির্দ্দেশ করিলেও অধিকাংশই কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী সন্দেহ নাই। কাম্বোজের প্রাচীন শিল্পকলা সমস্তই কাশ্মীরী-শিল্পের আদর্শে গঠিত। কথিত আছে, ক্রথং নামে ভারতীয় কাম্বোজের এক রাজপুত্র কোনও কর্ম্মের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তিনিই এই দেশে আসিয়া স্বদেশের অনুকরণে এক নূতন কাম্বোজ নির্ম্মাণ করেন।

আনাম দেশের প্রাচীন নাম অঙ্গম্। কেহ কেহ বলেন, ভারতের অতীত যুগের অঙ্গরাজ্যের অনুকরণে অঙ্গম্ দেশের নামকরণ হয়। অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ছিল চম্পা নগরে। আনামের রাজধানীর নামও চম্পা। আজও সেখানে অঙ্গ-চন্দ্রিক্ নামের একটি জনপদ বর্ত্তমান।

কাম্বোজের প্রাচীন শিলালিপিতে সংস্কৃত ভাষায় কিরাত জাতির নাম পাওয়া যায়। তাহারাই ঐ দেশের আদিম অধিবাসী। ভারতীয় পুরাতত্ত্বে ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে কিরাত জাতির বসবাসের উল্লেখ আছে।

এখনও শ্যাম ও তাহার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে সাবেক হিন্দুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ অনেক লুপ্ততথ্যের সাক্ষ্য দেয়। হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরে সমগ্র দেশ ছাইয়া আছে। মন্দিরগাত্রের শিল্প-চাতুর্য্যে হিন্দুর পৌরাণিক ঘটনাবলী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই সমস্ত মন্দিরের মধ্যে যশোধারাপুরের (Yacodhara-pore) ওঁকারধাম (Ankor Thom) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইয়োরোপীয় পর্য্যটকগণ ইহাকে প্রাচীন মিশরীয় বা গ্রীসীয় শিল্পের সমকক্ষ বলিয়া অভিহিত করেন। ওঁকারধাম একটি শিবমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীর-ঘেরা স্থানবিশেষ। ইহার কারুকার্য্য, ভিতরের চত্বর, পথ, নক্সা অপূর্ব্ব। নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়। রাজা যশোবর্ম্মণের ইহা অমর কীর্ত্তি।

ইহা ব্যতীত আরও বহু শিবমন্দির, ব্রহ্মমন্দির, গণেশ-মন্দির, ইন্দ্রমন্দির সমস্ত দেশময় ভগ্ন অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। শ্যামবাসীদের মধ্যে পুরাতন মন্দির সংস্কারের প্রবৃত্তি কখনও জাগে না। কতকগুলি মন্দিরগাত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পৌরাণিক ঘটনাবলীর চিত্র একত্র সমাবিষ্ট দেখা যায়। ইহা দ্বারা মনে হয়, হিন্দু মন্দিরের অনঙ্কিত অংশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবাহের সময় বৌদ্ধ চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শুনা যায়, মহারাজ অশোক কলিঙ্গবিজয়ের পর বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান হইয়া যখন চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করেন, তখন শোণ ও উত্তর নামক দুই জন ভিক্ষুকে সুবর্ণভূমিতে পাঠাইয়াছিলেন।* সেই দেশের কোন কোন স্থানে পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধভাব প্রবেশ করিলেও, অধিবাসীরা সাধারণভাবে হিন্দুমত পোষণ করিত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী পণ্ডিতগণ কাম্বোজ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সংস্কৃত ভাষায় বহু শিলালিপি উদ্ধার করিয়া, প্রাচীন ইতিহাসের যুগান্তর আনিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সেই দেশের বহু রাজার নাম, শাসনকাল, কীর্ত্তিকলাপ পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতি অনতিবিস্তারে লিখিত আছে।

---

* কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, পেগু হইতে মালয় উপদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ এককালে সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল।

শ্যাম, কাম্বোজ, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশগুলি যে এক দিন ভারতের বৃহদায়তনের অংশভূত ছিল, ইহারাই তাহারই ভিত্তি দৃঢ়ীকৃত হয়। আজিও সেই দেশে ঐ সমস্ত উপজীব্যকে অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট অনুসন্ধান চলিতেছে

ইহাদের ভাষায় ভারতীয় ভাষারই প্রাধান্য বেশী; তাহা কতকগুলি নাম হইতেই বেশ বুঝা যায়। এখনও যজন-যাজনের সময় পালি ভাষা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ধর্ম্মগ্রন্থগুলি প্রায় সমস্তই পালি ভাষায় লিখিত।

শ্যামের অনেক আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি ভারতীয় রীতি-নীতির অনুরূপ। ভারতীয় নামকরণ, চূড়াকরণ সংস্কার সে দেশে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। চূড়াকরণ সংস্কারেই তাহাদের চূড়ান্ত উৎসব। ইহা জাতকের এগার বৎসর বয়সের সময় অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় মস্তক মুণ্ডন করাইয়া শিখা রাখিবার ব্যবস্থা আছে। তাহারা শিখা বন্ধন করিয়া তাহাতে ফুল বা ফুলের মালা জড়াইয়া রাখে। কাহারও শিখা স্পর্শ করা ঘোরতর পাপ বলিয়া মনে করে। বালকেরা শিখা-স্পর্শের ভয়ে বয়োজ্যেষ্ঠের মস্তকে হাত দেয় না।

পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সেখানে নদীতে স্নান করা বা চাল ভাজা চিবাইবার বিধি আছে। ঝাড়-ফুঁকে বিশ্বাস আজিও একেবারে উঠিয়া যায় নাই। এখনও অনেকের ধারণা আছে যে, মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার বা ছাই ভস্ম হইতে সোণা প্রস্তুতের ক্ষমতা কোন কোন সন্ন্যাসীর মধ্যে আজিও বর্ত্তমান।

ভারতীয়ের মত শ্যামবাসীরা প্রস্তর ও নুড়ির উপরে শিবের পূজা করে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা প্রস্তরে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াও পূজা করিয়া থাকে। ইহারা আপদশান্তির জন্য 'কীর' ও 'নাট' নামক ভূত ও প্রেতের পূজাও করে।

অতীতকাল হইতে সে দেশে ভারতীয় বংশের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা মন্দির-বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকেন। ব্যাঙ্কক শহরেও এক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা পৌরোহিত্য করেন। জনসাধারণ বৌদ্ধ হইলেও পারিবারিক শান্তি ও বুদ্ধ-বিগ্রহের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের দ্বারা দৈবকার্য্য করাইয়া থাকে। বিবাহ প্রভৃতি শুভকার্য্যের দিন দেখাইয়া লয়।

রাজ-পুরের উৎসবাদির প্রধান হোতা ব্রাহ্মণগণ। অভিষেকের সময় রাজার মাথায় মুকুট পরাইয়া দেন বিষ্ণু-মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিত। শিবমন্দিরের পুরোহিত মন্ত্র-পাঠদ্বারা মণ্ডপমধ্যে রাজাকে স্নান করাইয়া থাকেন

কিছুদিন পূর্ব্বে আনন্দ মহীদল সুইট্জারল্যাণ্ড হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। এই অভিষেক-পদ্ধতি স্বাধীন ভারতের অভিষেকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অভিষেক-দিনের পূর্ব্বে রক্ষাকবচ, যজ্ঞসূত্রদ্বারা অপদেবতার দৃষ্টি হইতে রাজপুরী বন্ধন করা হয়। তার পর অভিষেক-দিবসে শ্বেতবর্ণ পরিয়া মণ্ডপগৃহে রাজার স্নান। স্নানের সময় পঞ্চনদীর জল, চারি পুষ্করিণীর জল সুবর্ণপাত্র করিয়া ব্রাহ্মণগণ ঢালিয়া দেন। সেই সময় অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মন্ত্র পাঠ করেন। তার পর স্বর্ণপদ্মের ধারা-জলে স্নান হয়। আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সমস্তই যেন প্রাচ্য আদর্শের অনুসরণ। ইহা ছাড়া, দীপদান, ধূপ-ধুনা পোড়ান, শঙ্খবাদন, চামর ব্যজন, স্ত্রী-আচার। পরে বালশৈল গৃহে পূর্ব্বমুখী হইয়া সিংহাসনে বসিয়া রাজার রাজ্যরক্ষার প্রতিজ্ঞাগ্রহণ সমস্তই তাহাদের প্রাচ্য আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

হিন্দু আমলের পূজা-পর্ব্বাদি এখনও আছে; তবে কিছু বিকৃত অবস্থায়। শিবরাত্রির উৎসব আগে ব্যাপকভাবেই হইত; আজকাল সঙ্কীর্ণ হইয়া অধিকাংশ স্থানেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় শিবলিঙ্গের উপর চারিটি বাঁশ খাটাইয়া, মধ্যস্থলে একটি মৃৎপাত্র ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। তার পর ঐ পাত্রটি ছিদ্র করিয়া জল পূর্ণ রাখে। আমাদের বৈশাখী ঝারার মত সমস্ত রাত্রি ঐ জলধারা শিবের মস্তকে পড়ে। শেষরাত্রে ব্রাহ্মণগণ চরু পাক * করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের সহিত আহার করিয়া লয়। পরে প্রভাতে স্নান করিয়া আসিয়া সেই শিবস্নাত জলে মস্তক সিক্ত করে। ইহাই তাহাদের শিবরাত্রি যাপন। এই উৎসব হয় মাঘী পূর্ণিমার দিন, আমাদের শিবরাত্রির বার তের দিন পূর্ব্বে।

---

* মাখন, মধু, দুধ, চাল ও চিনি একত্র সিদ্ধ।

'মহাসংক্রান্তি' বা 'মেষ সংক্রান্তি' (Mesa Sankranti) আর একটি উৎসব। এ দেশীয় মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন ইংরাজী ১৩ই বা ১৪ই এপ্রিল ইহা পালন করা হয়। ঐ দিবস লোকেরা স্নান করিয়া আসিয়া মন্দির ও মঠের মূর্ত্তিগুলিকে স্নান করায়। তারপর স্নানীয়োদকের মত ছিটাজলে যাজকদের স্নান করায়। বৈকালে মঠ ও মন্দির-চত্বর বালির পাহাড় দিয়া সজ্জিত করে। সর্ব্বত্র দেবতার স্থানে ধূপ-দীপ জ্বালান হইয়া থাকে।

'ধান্যদাহ' উৎসবে অগ্রহায়ণ* মাসে নূতন শস্য অগ্নিদেবকে আহুতি দেওয়া হয়। পূর্ব্বে এই উৎসবে রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মাঠের মধ্যে রাশি রাশি ভারা ভারা ধান পোড়াইতেন, এখন আর তদ্রূপ হয় না।

শরৎকালে "বিধিশারদ" উৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। এই উৎসব ভাদ্রপদের শেষ দিবস হইতে আশ্বিনের দ্বিতীয় দিবস পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। ইহাতে শুধু ভোজনের আয়োজন। ঘরে ঘরে, মঠে, মন্দিরে, রাজগৃহে সর্ব্বত্রই ভোজনপর্ব্ব। ইহা শরৎকালীন উৎসব হইলেও, শারদীয়ার কোন সংস্পর্শ ইহাতে নাই। খুব সম্ভব শ্রাদ্ধবিধি হইতেই বিধিশারদের উৎপত্তি। আমাদের দেশে ভাদ্র আশ্বিন মাসে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধের বিধি আছে। অতীত কালে শ্যামদেশে বিধিশারদ উৎসবে প্রেতাত্মাদের জন্যই আহারের আয়োজন করা হইত। পরে সে রীতি উঠিয়া গিয়া ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা হইল। হয় তো পূর্ব্বে শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবহার ছিল; শেষে শ্রাদ্ধ উঠিয়া গিয়া ভোজনটাই রহিয়া গিয়াছে। এখন সে ভোজনে ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষু বড় একটা আসে না; নিজেরাই সম্পন্ন করিয়া থাকে।

* শ্যামদেশে 'অগ্রহায়ণ' মাস হইতে বৎসর আরম্ভ এবং বৈশাখাদি বারোটি মাসের নাম তাহারাও ব্যবহার করে।

ইহা ছাড়া বলদেবের হলকর্ষণ, আকাশ-প্রদীপের ব্যবহার প্রভৃতি হিন্দু আমলের বহু আচার বিকারগ্রস্ত অবস্থায় তথায় দেখা যায়। পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাবে এই সকল পর্ব্বাদি বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই উঠিতে বসিয়াছিল; কিন্তু রাজা ষষ্ঠ রাম তাঁহার রাজত্বকালে আবার নূতন করিয়া পত্তন করেন। প্রাচ্যপন্থীর অনুতাপের বিষয়, এই সমস্ত রীতিগুলি বর্ত্তমানে আবার লোপ পাইতে বসিয়াছে।

সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরোধী পাথর পূজাদি পৌত্তলিকতা শ্যামরাজগণ এক কালে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও দূর করিতে পারেন নাই। পৌত্তলিকতা যেমন এক দিকে আধ্যাত্মিকতার প্রথম সোপান; আবার অন্যদিকে, আত্মিক জ্ঞানের অভাবে ইহাই হয় ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান গ্লানি। আজকাল শ্যামবাসীরা সংস্কারাচ্ছন্ন স্বধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া ভারত ও এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্তের ভজনা-ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে।

শ্যামরাজ্যের রামযাত্রা উৎসবের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ইহা পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রামায়ণ অভিনয়ের অনুরূপ। অভিনয়ের সময় রাম ও রাক্ষসপক্ষীয় বীরেরা মুখোস পরিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা, রামদাস হনুমান ছিল একটি শ্বেতবর্ণের বানর এবং জটায়ু একটি শ্বেতবর্ণের কাক বিশেষ। রামায়ণের দেশীয় উচ্চারণ রামাকিয়েন (Ramakien)। তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের মধ্যেও রামায়ণের যথেষ্ট প্রভাব বর্ত্তমান।

সেই দেশে সামাজিক অভিনয়ের মধ্যেও রাজারাণীর অবতারণা করা হয়। ঘটনা অনেক স্থলেই প্রেমঘটিত। সকল অভিনয়ের মধ্যেই হাস্যরসের চরিত্র থাকে। অনেক স্থানে ঘটনার শেষের দিকে সেই চরিত্রই প্রধান হইয়া যায়। অভিনয়ের পরিচ্ছদ ও প্রচ্ছদপট বিলক্ষণ ব্যয়বহুল।

সংবাদ ও মন্তব্য

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে

প্রবীণ সাংবাদিক প্রবাসী-সম্পাদক সংপ্রতি একটি মহিলা-সভায় বক্তৃতা করিয়া জানাইয়াছেন—দেশের এই দুঃসময়ে নারীরা যাহাতে মাত্র পুরুষের গলগ্রহ না হইয়া থাকেন, তন্নিমিত্ত নারীদের আজ উপার্জ্জক হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

প্রবাসী-সম্পাদক আজ প্রথম এইরূপ কথা বলিতেছেন না। যে-দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় ভারতে ইংরাজী-শিক্ষার প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ নানা ভাবে এবং ভাষায়, নানা দিকে এবং নানা রূপে ইউরোপীয় চিন্তাধারা আমাদের দেশের তথা-কথিত মনস্বিগণকে উৎপীড়িত করিয়া আসিতেছে। কার্য্যক্ষেত্রে ইহার ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা আজ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে উৎকণ্ঠার বিষয়। কেবল আমাদের দেশেই নহে, যে-দেশ এই চিন্তাধারার মাতৃ এবং ধাত্রীভূমি, সে-দেশের নর নারীর বাস্তব অবস্থাও নিতান্ত চক্ষুহীন ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেরই পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ উপস্থিত করিয়াছে। ইহারই মধ্যে ইউরোপের আধুনিক চিন্তা-নায়কগণের মধ্যে দেশবাসীর এইরূপ দুরবস্থা হইতে বাঁচিবার উপায় কি, তদ্বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে যাঁহারা চিন্তাক্ষেত্রে এ যাবৎ পুরোভাগে ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের প্রাক্কালেও যে-কথা বলিয়া বাজার মাৎ করিতেন, আজিও সেই কথার সাহায্যেই বাজার মাৎ করিবেন ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে দেশের এবং পৃথিবীর অবস্থা যে, কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে-দিকে তাঁহারা অবহিত পর্য্যন্ত হইতেছেন না।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল ধরিয়া শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় , বাংলাদেশকে ইউরোপীয় "সুসমাচার" শুনাইয়া আসিতেছেন। এই কালের মধ্যে ইউরোপের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে এবং তিনি ও তাঁহার সতীর্থগণ যে-সকল কথা দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন, বস্তুতঃপক্ষে দেশের মধ্যে তাহাতে কি ফল ফলিয়াছে, তাহা তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। ইহা চিন্তা করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত তাঁহাদের আছে কি না, তাহাও সন্দেহ করিবার কারণ অবশ্য আছে—কেন না, কেবল দেশের অবস্থা নহে, ব্যক্তিগত, পরিবারগত এবং সমাজগত ভাবে যে-অবস্থা পশ্চাতে পরিহার করিয়া শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাঁহার সতীর্থগণ বর্ত্তমানে যে-অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, তাহার ভাল-মন্দ বিচার করিবার সামর্থ্য যদি তাঁহাদের থাকিত, তাহা হইলে আজ দেশবাসীকে তাঁহারা ইউরোপীয় "সুসমাচার" শুনাইতে কেবল লজ্জা নহে, পাপ বোধ করিতেন। এবং তাঁহাদের যদি সত্যই দেশপ্রেম থাকিত, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে এবং সরল কথায় স্বীকার করিতেন—তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন এবং করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই ভুল হইয়াছে। সুতরাং দেশবাসীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া সাংবাদিকের এবং নেতৃত্বের জীবন হইতে সসম্ভ্রমে বিদায়-গ্রহণের সময় তাঁহাদের আসিয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতেন।

ইহা না করিয়া অদ্যাবধি যদি তাঁহারা জন-সভায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে থাকেন, তবে তাঁহাদের ভাগ্যের বিড়ম্বনা ঢাকিবার সুযোগ পর্য্যন্ত তাঁহারা পাইবেন না, ইহা আমরা স্পষ্ট চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছি।

সমাজ-জীবনে পুরুষের কর্ত্তব্য এবং নারীর কর্ত্তব্যে ভেদাভেদ কেন হইবে, কেন পুরুষকে নারীর অন্ন সংগ্রহ করিতে হইলে, নারী তাহার গলগ্রহ হইল, ইহা মনে করা চলে না, কেনই বা পুরুষের সন্তানের জননী হইবার দায়িত্ব নারীকে ভোগ করিতে হয় বলিয়া পুরুষের বিবেক-দংশনের কারণ নাই, এই সমস্ত বিষয় সহজবোধ্য। কিন্তু তাহা হইলেও বর্ত্তমানে বিস্তৃত আলোচনাসাপেক্ষ। এবং ইতিপূর্ব্বে তাহার অধিকাংশ আমাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আলোচিত হইয়াছে।

পুরুষের বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে নারীকে বেকার করিবার যে অত্যাশ্চর্য্য প্রতিষেধক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাৎলাইতেছেন, তাহার ফলাফল কি হইবে, হইতে পারে এবং হইয়াছে, ইহা তাঁহাকে আমরা স্বতন্ত্র ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব না। যে-সমাজ-ব্যবস্থায় চাকুরী করিয়া টাকা সংগ্রহ করাটাই আদর্শ, সে সমাজ-ব্যবস্থায় যে কিছুতেই নরনারীর জীবনের সর্ব্বাধিক স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, ইহাও তাঁহাকে স্বতন্ত্র ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা আমরা করিব না।

সে-সময় আসিয়াছে, যখন চক্ষু থাকিলে ইহা সকলের দৃষ্টিতেই পড়িতে বাধ্য।

আমরা কেবল সসম্মানে তাঁহাকে অনুরোধ করিব—এইবারে সাংবাদিকের দায়িত্বপূর্ণ আসন ত্যাগ করিবার তাঁহার সময় আসিয়াছে, ইচ্ছা করিলে লাঞ্ছিত হইবার পূর্ব্বে তিনি তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়কে দেশবাসী ভুলিয়া থাকিতে চাহিলেও, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার কথা ভুলিতে দিতে চাহেন না। এক দিন ছিল, যখন দেশের লোক তাঁহার নিকট কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিল এবং যে-দিন গান্ধীজীর—অহিংস হইলেও, দৃঢ়মুষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তিনি দেশবাসীর সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সে-দিন সে-প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহার পর আজ বৎসরাধিক ধরিয়া তিনি যে-ভাবে চলাফেরা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে দেশবাসীর পক্ষে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকা তাহাদেরও শ্রেয়, তাঁহার পক্ষেও নিরাপদ—বাংলা সরকার বোধ হয় ইহা বুঝিয়াই তাঁহার কার্য্যকলাপ সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বন্ধুর কার্য্যই করিয়াছেন।

কিন্তু দেশবাসী তাঁহাকে ভুলিতে চাহিলেও তিনি তাহা চাহেন না। তাই থাকিয়া থাকিয়া তিনি মৎলব আঁটেন, ফন্দী-ফিকির খাটাইয়া থাকেন—দেশপ্রেমের আতিশয্যে তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। সে দিন এক জনসভায় তিনি বক্তৃতা করিয়া জানাইয়াছেন, 'এতদিনে তাঁহার পরিচালিত স্বাধীনতা-অভিযানের প্রথম পর্ব্ব—দেশবাসীর নাগরিক মর্য্যাদা (civil liberty) রক্ষা করিবার কার্য্য তাঁহার সাঙ্গ হইয়াছে।' কাহাকে নাগরিক মর্য্যাদা বলিতে হইবে, কি জন্য নাগরিক মর্য্যাদার প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় তিনি জীবনে বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার রকম-সকম দেখিয়া মনে হয়, চেষ্টা করিলেও তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না।

সুতরাং সে কথা যাউক্। বর্ত্তমানে তিনি ফতোয়া দান করিয়াছেন, দেশের মধ্য হইতে "পরাধীনতার প্রতীকসমূহ" দূর করিতে হইবে—এই ক্রমে তাঁহার প্রথম লক্ষ্য-বস্তু হইতেছে হলওয়েল মনুমেণ্ট। হলওয়েল মনুমেণ্ট কেন পরাধীনতার প্রতীক, এক নম্বর উডবার্ণ পার্কের বাড়ী তাহা নহে কেন—ইহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু প্রশ্নটা ব্যক্তিগত, সুতরাং আধুনিক রুচিসঙ্গত নহে। তাঁহাকে তাই জিজ্ঞাসা করি, হলওয়েল মনুমেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া অক্টারলনি মনুমেণ্ট পর্যন্তই, যদি তাঁহার 'ফরোয়ার্ড ব্লক' উপ্ড়াইয়া ফেলিতে পারেন, তাহা হইলেই দেশের স্বাধীনতা মিলিয়া যাইবে?

সকল ব্যক্তিকে সৃষ্টিকর্ত্তা বিচার-বুদ্ধি দেন না—ইহা তাঁহার অমোঘ কারসাজী। ইহারই জন্য অনেকেরই জীবনে অভিভাবকের প্রয়োজন, সুভাষচন্দ্রের স্বভাব দেখিয়া আমাদের মনে হয়, সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহাকে অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবার জন্যই প্রেরণ করিয়াছেন।

গান্ধীজীর অভিভাবকত্ব তাঁহার ঘুচিয়াছে। আমরা তাঁহাকে পরামর্শ দান করি, এই বারে তিনি আর একটি নূতন অভিভাবক সংগ্রহ করুন। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইলেই ভাল।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে আমাদের বাংলাদেশের ত্যক্ত নেতৃত্ব-সিংহাসনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। মহাসমারোহে তিনি ইহাতে আসীন হইবার জন্য গদা-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন—শিলং হইতে মালদহ, মালদহ হইতে কলিকাতা—সর্ব্বত্র আমরা তাঁহার সরব গদা-পরিচালনায় সতত শঙ্কিত অবস্থায় দিন যাপন করিতেছি। কিছুদিন হইল কলিকাতার কোন একটি দৈনিক পত্রিকায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামে কি একটি ব্যঙ্গ-বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল—ইহার প্রতিবাদে তাঁহার সেই সরব গদায় নিষ্কম্প আস্ফালন উত্তোলিত হইয়াছে। তিনি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—কি ইহার কারণ। তাঁহার মতে কারণ হইতেছে এই যে, হিন্দুরা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে, এবং সুভাষচন্দ্র মুসলিম লীগের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত দৈনিক পত্রিকার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্পাদক কিন্তু জানাইয়াছেন যে, ইহার কারণ উভয়ের একটিও নহে, ইহার কারণ কোন জাপানী রচনার অনুরূপ উল্লেখ। এই দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক রসিক ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আমরা সঙ্গোপনে একটি গোপনীয় কথা বলিতেছি—তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্ণধার। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরিয়া হিসাবে তাঁহার অধীনে যে কয়েকটি অধ্যাপক আছেন, তাঁহাদের ক্লাব-গৃহের কথা-বার্ত্তা অন্তরালে থাকিয়া তিনি যদি শুনিবার ব্যবস্থা করেন, তবে দেখিবেন তাঁহাদের অধিকাংশই যে-প্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, তাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কটূক্তিকারীর মনোভাবেরই সমর্থক। তিনি এবং ইহাঁদের মধ্যে যে-কেহ প্রকাশ্যেই যে-পরিমাণ স্বধর্মনিষ্ঠা এবং হিন্দুত্বে বিশ্বাসী, তাহাতে কোন পত্রিকার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্পাদক যদি তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কটূক্তি করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে গদাহস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার কি আছে? নাটকীয় ভঙ্গীতে হিন্দুয়ানীর গদা লইয়া আস্ফালন করিলেই কি হিন্দুত্বের মহিমা বজায় থাকে?

আমরা শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিবেদন জানাইতেছি যে, সে-দিন কাটিয়া গিয়াছে, যে-দিন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া রাজনীতির আসর জমান যাইত, এখন আর তাহা যাইবে না। সময় থাকিতে এই বারে তিনি সতর্ক হউন। একবার ঢিল খাইয়াছেন, আবার কি খাইবেন কে জানে।

বাঙ্গালার জিলা-পরিচিতি

পর্য্যায়ে যে-প্রবন্ধ পর্য্যায় মাসিক বঙ্গশ্রীতে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কয়েকটিঃ—

গত মাঘ হইতে "যশোহর-পরিচিতি" সূচিত হইয়াছে
বর্ত্তমান সংখ্যায় মালদহ-পরিচিতি দ্রষ্টব্য

গত কয়েক সনে প্রকাশিত হইয়াছে—

(১) ঢাকার কাহিনী—

(২) ময়মনসিংহ-পরিচিতি—

(৩) নদীয়ার কথা—

তাহারও পূর্ব্বে (১৩৪৫-৪৬)—

(১) **নোয়াখালীঃ** (সচিত্র) সেকাল ও একালের নোয়াখালী (গত কার্ত্তিক); নোয়াখালীর জীবিকা ও অর্থ-সমস্যা (অগ্রহায়ণ); নোয়াখালীর কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী (পৌষ); নোয়াখালীর চর, দ্বীপ ও নদী (মাঘ); নোয়াখালীর জলপথ ও স্থলপথ (চৈত্র)।

(২) **মুর্শিদাবাদ বৃত্তান্তঃ** (সচিত্র) মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রে প্রকাশিতঃ পুরাতন কাহিনী, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, স্বাস্থ্য শিল্প ও বাণিজ্য, শিক্ষা, উল্লেখযোগ্য স্থান, বস্তু ও ব্যক্তি, প্রসিদ্ধ বংশসমূহ। অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় মুর্শিদাবাদ রেশম শিল্প।

(৩) **রাজসাহী জিলা-পরিচিতিঃ** (সচিত্র) পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় অবস্থান ও ইতিহাস, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত আয়তন ও জন-সংখ্যা, পশু, পক্ষী ও মৎস্য এবং বৈশাখ সংখ্যায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

(৪) **মধ্য-বঙ্গের বিধ্বস্ত পল্লীর পুনঃ-সংস্কারঃ** অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, বৈশাখ ও কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

(৫) **বাঙ্গালার কৃষি-জাত দ্রব্যাবলীঃ** (ফাল্গুন) সচিত্র।

(৬) **বীরভূমের প্রত্নকলা-সম্পদ্ঃ** (পৌষ) সচিত্র।

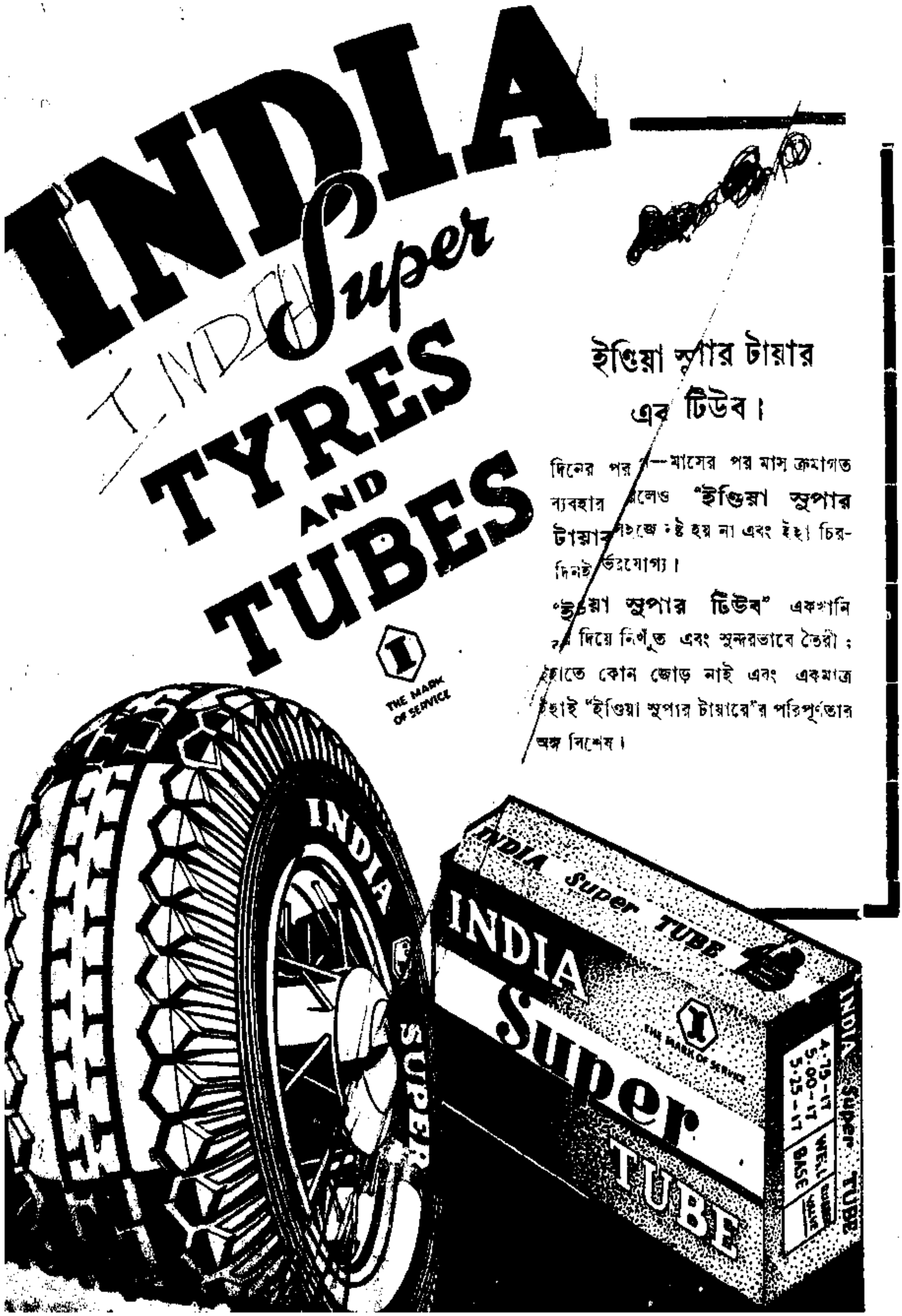
(৭) **মালদহের গম্ভীরা গানঃ** (অগ্রহায়ণ)

(৮) **বিষ্ণুপুরের প্রত্নকলা-সম্পদ্ঃ** (চৈত্র) সচিত্র।

(৯) **বাঙ্গালায় জল-সেচনের ব্যবস্থা** (বৈশাখ) সচিত্র।

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা]   [চৈত্র—১৩৪৬

চিত্রসূচী—বঙ্গশ্রী—চৈত্র, ১৩৪৬


INDIA
Super
TYRES
AND
TUBES
THE MARK OF SERVICE
ইণ্ডিয়া সুপার টায়ার
এবং টিউব।
দিনের পর দিন—মাসের পর মাস ক্রমাগত ব্যবহার করলেও "ইণ্ডিয়া সুপার টায়ার" সহজে নষ্ট হয় না এবং ইহা চিরদিনই নির্ভরযোগ্য।
"ইণ্ডিয়া সুপার টিউব" একখানি রবার দিয়ে নিখুঁত এবং সুন্দরভাবে তৈরী; ইহাতে কোন জোড় নাই এবং একমাত্র ইহাই "ইণ্ডিয়া সুপার টায়ারে"র পরিপূর্ণতার অঙ্গ বিশেষ।
INDIA
SUPER
INDIA Super TUBE
INDIA
Super
TUBE
THE MARK OF SERVICE
INDIA Super TUBE
4.75–17
5.00–17
5.25–17
WELL BASE

বঙ্গশ্রী—বিষয়সূচী

৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা] [বৈশাখ—১৩৪৭

চিত্রসূচী—বঙ্গশ্রী—বৈশাখ, ১৩৪৭

Kanan Devi

ওটীন প্রসাধনের পূর্ণতা ও উৎকর্ষ আপনিও অনুভব করিবেন।

নিউ থিয়েটার্সের সুন্দরী ও প্রতিভাময়ী ফিল্ম-তারকা **কানন দেবী** কি বলেন পড়ুন :—





Of all the toilet creams that I have used I unhesitatingly prefer Oatine Cream as being the pleasantest and most satisfactory for improving the complexion.

Kanan Devi

Oatine CREAM *for nightly massage*
SNOW *for daily protection*

অভিনেত্রীর জীবনে রূপ-চর্চ্চার প্রয়োজন যত বেশী এমন আর কাহারও নহে। বর্ণের ঔজ্জ্বল্য এবং ত্বকের মসৃণতা সম্বন্ধে তাহাদের সব সময় অবহিত থাকিতে হয়।

* * *

এই নিখুঁত রূপচর্চ্চার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সবই **ওটীন ক্রীমে** বর্ত্তমান।

* * *

ওটীন ক্রীম লোমকূপের ময়লা দূর করে, গায়ে ময়লা জমিতে দেয় না। ফলে লোমকূপের কাজ ভাল চলে।

* * *

এই ক্রীম ত্বকের ভিতর ও বাহির সতেজ রাখে, ধমনী সজীব করে এবং স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করিয়া যৌবনের দীপ্তি ও লাবণ্য আনয়ন করে।

* * *

রাত্রিতে ওটীন ক্রীম :: দিবাভাগে ওটীন স্নো

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এই দুইটী প্রসাধনই অপরিহার্য্য।



[শ্রীপরিমল গোস্বামী

নিশীথ।


হাঁ, দশ মিনিট আগে
আমার ভীষণ
মাথাব্যথা
করছিল, কিন্তু এখন
সেরেছে
সারিডন
সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও দ্রুত বেদনা-নাশক